৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

চতুর্দ্দশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

চতুর্দ্দশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

আষাঢ়—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র,—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন,—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক,—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ,—১৩৩১

বহুবর্ণ চিত্র

আষাঢ়, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সুর-ভোলা

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনিনা যে।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে,
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে;
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনিনা যে॥

চলেছিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুনরাতে জাগে,
তোমার সুর অশোকশাখে অরুণ-রেণুরাগে,
সে সুর বাহি' চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে
গুঞ্জরিত ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে;
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে।
তোমার বাণী কখনো শুনি, কখনো শুনিনা যে॥

২ চৈত্র ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ণাশ্রম-ধর্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম হিন্দু জাতির উপকার করিয়াছে না অনিষ্ট করিয়াছে, এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শূদ্র-ধর্ম" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিরোধী তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাবলে এবং চিন্তাশীলতায় রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ জন্য উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলির বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বিষয়টির গুরুত্ব অতিশয় বেশী। হিন্দুর আচার-ব্যবহার, ধর্ম কর্ম সকলই বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে কি কর্ত্তব্য, তাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে; এবং সে সকল শাস্ত্রবিধান বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাকে হিন্দু-সমাজ-সৌধের ভিত্তি বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু-সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্মরূপ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম ও সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য গভীর চিন্তার সহিত, ধীর ও সংযত ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি এই যে ইহা বংশগত। পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে পুত্রকেও যে শাস্ত্রব্যবসায়ী হইতে হইবে, ইহা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। শাস্ত্র-চর্চ্চা করিবার জন্য বা ধর্ম জীবন যাপন করিবার জন্য যেরূপ শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন, পুত্রের সেরূপ শক্তি ও সাধনা যদি না থাকে, তাহা হইলে পুত্রকে পিতার ন্যায় জীবন যাপন করাইবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মতে অনর্থক,—শুধু অনর্থক নহে, অনিষ্টকর। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, বা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, তা' ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হ'তেই পারে না।" কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সে সত্যটি এই যে পুত্রের মন ও বুদ্ধি পিতা-মাতার অনুরূপ হয়। পিতা-মাতার যেরূপ মতিগতি, পুত্র সেইরূপ স্বাভাবিক মতিগতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। একই প্রকারের মতিগতি যদি পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে পুত্রের তদনুরূপ মতিগতি হইবার সম্ভাবনা আরও বেশী। পুত্র পিতামাতাকে যেভাবে জীবন যাপন করিতে দেখে, নিজের সেইভাবে জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি হয়। এই সকল কারণে যদি পুত্রের শৈশব হইতে পিতামাতা যত্নপূর্ব্বক নিজ বিদ্যাবুদ্ধি এবং আচার ব্যবহার পুত্রকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কে কি ভাবে জীবন যাপন করিবে তাহা প্রথম হইতে স্থির করিয়া তদনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করাই সমীচীন। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেইভাবে জীবন যাপন করুক, এরূপ ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না।

এই গেল সাধারণ বুদ্ধির কথা। আধুনিক সৌজাত্য-বিজ্ঞান (Eugenics) সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও বলেন যে, বংশের মধ্য দিয়া বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ লক্ষণগুলি সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। সন্তানের যে কেবল বাহ্য আকৃতি পিতামাতার অনুরূপ হয় তাহা নহে, তাহার আন্তরিক বৃত্তিগুলিও পিতামাতার অনুরূপ হয়। অধিকন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যদি একপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তানের সেইরূপ বিশেষ বুদ্ধির স্বাভাবিক আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা বেশী। এরূপ হইবার কারণ মোটামুটি এই ভাবে নির্দেশ করা যাইতে

পারে যে, মানবদেহ অসংখ্য অণুকোষ দ্বারা গঠিত। আমরা যে সকল কার্য্য করি বা চিন্তা করি, সেইরূপ প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তার ছাপ প্রতি অণুকোষের উপর পড়ে। যে বীজ হইতে পুত্রের জন্ম হয় তাহার মধ্যে এই অণুকোষ বিদ্যমান। এজন্য সন্তানের বাহ্য আকৃতি এবং আন্তরিক প্রবৃত্তি সকল পিতামাতার অনুরূপ হয়। সৌজাত্যবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুক্ষেত্রে এই সকল তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া ইহাদের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুর বংশগত বর্ণাশ্রম-ধর্ম এই সকল বিজ্ঞান-সম্মত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। বংশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা—heredity and environment—এই দুইটি জিনিসের উপর সন্তানের চরিত্রের বিশেষত্ব নির্ভর করে। এই সত্যও বর্ণাশ্রম-ধর্ম বংশগত করিবার পক্ষে অনুকূল। পিতামাতা যদি যথার্থ ব্রাহ্মণ হন এবং নিষ্ঠার সহিত ধর্ম-জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে সন্তানের শান্ত স্বভাব, আত্মসংযম, আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলি সঞ্জাত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। শৈশব হইতে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পালিত হয়, তাহার প্রভাবে এই সকল গুণাবলি পুষ্টি লাভ করে;—তাহার পিতামাতার জীবনে শান্তি, ধর্মানুরাগ, ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রভৃতি দেখিয়া সেও ঐ সকলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। কারণ শৈশবে অনুকরণ-স্পৃহা অতিশয় বলবতী থাকে। পুত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলি যাহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, পিতা দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন এইরূপ আশা করা যায়। পিতা যেরূপ অনুরাগের সহিত নিজ জীবনের সাধনা পুত্রকে অভ্যস্ত করাইতে চেষ্টা করিবেন, অন্যের পক্ষে ততদূর অনুরাগ স্বাভাবিক নহে। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, যে সকল কাজ "বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা সাধিত হইতে পারে" সেগুলিও বংশগত হওয়া উচিত। যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন—শক্তি ও সাধনা। এ কথা রবীন্দ্রনাথও উক্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তা'র জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার।" আমরা পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বংশ বা heredityর প্রভাবে এইরূপ ব্যক্তিগত শক্তির আবির্ভাব হওয়া খুবই সম্ভব; এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা environmentএর প্রভাব এইরূপ সাধনার অনুকূল।

ইহা সত্য যে কোনও কোনও স্থলে পুত্রের স্বভাব পিতামাতার স্বভাব হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলি নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম এই যে পুত্রের স্বভাব পিতামাতার স্বভাবের অনুরূপ হইবে। সামাজিক ব্যবস্থা সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করা সমীচীন। দুই এক স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে এই সামাজিক ব্যবস্থা সুফল প্রসব করিতে না পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সাধারণ নিয়ম অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থায় যে সুফল পাওয়া যাইবে, তাহা যথেষ্ট মূল্যবান। দুই চারি স্থলে সুফল না ফলিলে সামাজিক ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আসল জিনিসটি ম'রে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হ'য়ে উঠে' জীবন-পথের বিঘ্ন ঘটায়।" কিন্তু কাজ-বংশগত হইলে যে আসল জিনিসটি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা কম, ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিবাহ অনিয়মিত হইলে বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত বংশের মিশ্রণের ফলে প্রত্যেক বংশের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব মন্দীভূত বা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী; এবং অবিচ্ছিন্ন বংশাবলীর মধ্য দিয়া অনুরূপ চর্চ্চার ফলে "আসল জিনিসটি" সমধিক প্রাণময় এবং তেজস্বী হইবার সম্ভাবনাই অধিক। বংশপরম্পরা ধরিয়া যে সাধনা চলিয়া আসিয়াছে, সেই সাধনা যাহাতে সজীব থাকে, মানবের এইরূপ চেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয় যে ধর্মের প্রাণ নাই, সেখানেও যে আচারের কোন মূল্য নাই এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত—ইহা সমীচীন মনে হয় না। অনেক সময় প্রাণশক্তি সুপ্ত থাকে, পরে অনুকূল অবস্থায় তাহা জাগ্রত হইয়া উঠে। জলমগ্ন ব্যক্তিকে যখন জল হইতে তোলা হয়, তখন মনে হয়, তাহার প্রাণ নাই। কৃত্রিম নিঃশ্বাস বহাইবার জন্য তাহার হাত তুলিয়া নামান হয়; এই ভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। সেইরূপ, যেখানে ধর্মের প্রাণ নাই বলিয়া মনে হয়, সেখানেও আচার পালন করিবার ফলে প্রকৃত ধর্মভাব আবির্ভূত হইতে পারে।* বৈষ্ণবেরা যে বলেন নাম করিলেই মুক্তি হইবে, আর কিছুর প্রয়োজন

* তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন "আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ"—আচার পালন করিলে ধর্মভাব আবির্ভূত হয়।

নাই, তাহার মধ্যেও এই সত্য নিহিত আছে। নাম করিয়া গেলে ভক্তি আসিবে, ভক্তি হইলে মুক্তি হইবে। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্মেই প্রত্যহ নিদিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার নিয়ম আছে। হয়ত নিদিষ্ট সময়ে মনে যথেষ্ট ভক্তির উদয় হইল না; তথাপি প্রত্যহ নিদিষ্ট সময়ে যে প্রার্থনা করিবার কোন ফল নাই তাহা বলা যায় না। রবিবাবুর কথাতেই বলা যায়,

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনও হে দেব প্রণমি তোমায়,
গাহি বসে তব গান।
অন্তর্যামী ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন
ভক্তিবিহীন প্রাণ।

বীজকে রক্ষা করিবার জন্য তুষের যেরূপ প্রয়োজন, সাধনকে রক্ষা করিবার জন্য আচারের ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন। তুষটি শুষ্ক কঠিন এবং কর্কশ বটে, কিন্তু সেই কারণে কেহ যদি তুষটি ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তণ্ডুল হইতে নূতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। সাধনা বস্তুটি অতি শুদ্ধ এবং কোমল, নিরাবরণ অবস্থায় সংসারে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহা অচিরাৎ শুকাইয়া যাইবে। তাহাকে বাঁচাইতে হইলে, তাহাকে প্রাণবান এবং সফল করিতে হইলে, আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। আচারগুলিকে অর্থহীন বোঝা হ'য়ে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটাতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন; তিনি কি ইহাও দেখেন নাই যে, অনেক স্থলে বাহ্য আচার পরিত্যাগ করাতে সাধনার প্রাণ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? রোমান ক্যাথলিকদের অনেক আচার প্রোটেষ্টান্টরা পরিত্যাগ করিয়াছেন; সেই সঙ্গে ধর্মের প্রভাবও কি প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যে শিথিল হইয়া যায় নাই? মধ্যযুগে খৃষ্টানধর্মযাজকদের মধ্যে St Francis of Assissia ন্যায় যথার্থ সাধুপুরুষ অনেক দেখা যাইত। আজকাল প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যে তত বেশী দেখা যায় না। গির্জায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ধর্মভাবের অভাবের দরুণ অনেক ধর্মযাজক অনুযোগ করিয়া থাকেন। তাহার তুলনায় আমাদের তীর্থস্থানে নিরক্ষর দরিদ্র রমণীর মুখে যে পবিত্র ভাব, যে ভগবদ্ভক্তির আকুলতা দেখা যায়, তাহা কি সমধিক স্পৃহনীয় নহে? এক স্থানে আচার বর্জন, অপর স্থানে আচার রক্ষা। উভয়ের ফলের পার্থক্য দেখিয়া সুধিগণ বিচার করিবেন কোনটি ভাল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান ক'রতে ছোটে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভাল লোককে বাহ্য শুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে ক'র্‌তে দ্বিধা বোধ করে না।" সত্য কথা। এখানে "স্নান করা ভাল" এই আচারের অপব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু আচারটি কি খারাপ? মেয়েটির বুদ্ধি কম, ঘৃণা করিবার প্রবৃত্তি প্রবল, তাই এই ভাল নিয়মটি সে খারাপ ভাবে দেখিয়াছে। সব ভাল নিয়মেরই অপব্যবহার হইতে পারে। ঈশ্বরের নামেরও ত অপব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু সেজন্য কি ঈশ্বরের নাম পরিত্যাগ করা উচিত? দেখিতে হইবে নিয়মটি ভাল কি না; এই নিয়মের যে ভাল ফল হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অধিক, না যে খারাপ ফল হইয়াছে তাহার গুরুত্ব অধিক? অনেক নিরপেক্ষ সমালোচকের মতে শারীরিক পরিচ্ছন্নতায় দরিদ্র হিন্দুরা অপর জাতির দরিদ্র লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। Is India Civilized এই পুস্তকে Sir John Woodroffe বলিয়াছেন, "প্রত্যহ স্নান করিবে এবং ধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে" এই নিয়মটি ভারতবর্ষের নিকট য়ুরোপের শিক্ষা করা উচিত। শরীর পরিষ্কার রাখিবে, মন পবিত্র রাখিবে, হিন্দুধর্ম এই দুইটি উপদেশই দিয়াছে। ইহার ফলে দেহ ও মন উভয়ই শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। যাহারা কেবল দেহকে পবিত্র করিয়া রাখে, তাহারাও একটা ভাল কাজ করে। তাহারা যদি অন্য অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে ঘৃণা করে তাহা হইলে একটা অন্যায় কাজ করে, কিন্তু এ অন্যায় কাজের কারণ শাস্ত্রের উপদেশ নহে; ইহার কারণ তাহার মনে ঘৃণা নামে একটি দুষ্ট প্রবৃত্তি আছে। সে যদি শুচিবায়ুগ্রস্ত না হইত, তাহা হইলেও অন্য কারণে ভাল লোককে ঘৃণা করিত। আচার বংশগত হইলে যে এইরূপ ঘৃণার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকিবে, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না; রবীন্দ্রনাথও কোনও কারণ দেখান নাই। সকল ধর্মেই সমগ্র অনুশাসনের কিয়দংশ সহজ, কিয়দংশ কঠিন। কঠিন অংশ অপেক্ষা সহজ অংশ যে বেশীর ভাগ লোক পালন করিবে তাহা স্বাভাবিক। কঠিন অংশ বাদ দিয়া

সহজ অংশ পালন করা—উভয় অংশ পালন না করা অপেক্ষা খারাপ নহে। যাহারা এরূপ করিবে তাহাদের অধিকাংশের মনে যে দম্ভ ও ঘৃণার উদ্রেক হইবে তাহা নহে। খুব অল্প সংখ্যকের মনেই হইবে। এই কুফলের জন্য ধর্মানুশাসন যে পরিমাণে দায়ী, ধর্মানুশাসনটি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সুফল প্রসব করিয়া থাকে।

পাছে আচারকে লোকে অত্যধিক আদর করে এবং উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করে, এজন্য হিন্দুধর্মশাস্ত্র যথেষ্ট সাবধান হইয়াছে। সাধনার পথে সাহায্য করে বলিয়াই আচার প্রয়োজনীয়, সাধনা সিদ্ধ হইলে আর আচারের প্রয়োজন থাকে না,—এ কথা হিন্দুধর্মে খুব স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আচারের সবচেয়ে কড়াকড়ি, গার্হস্থ্য আশ্রমে ততদূর নহে, বানপ্রস্থ আশ্রমে অনেকটা শিথিল, সন্ন্যাস আশ্রমে প্রায় কিছুই নাই। সাধনার পথে লোকে যেমন অগ্রসর হয়, আচারের বাঁধন সেই পরিমাণে খুলিয়া দেওয়া হয়। হিন্দুর আরাধ্য মহাদেব শ্মশানে থাকেন, সর্বাঙ্গে ছাই মাখেন, গলায় সাপ জড়ান। শুচিবায়ু-গ্রস্ত মেয়েও যে এ কথা জানে না তাহা নহে। আচারহীন সাধু সন্ন্যাসীকে সেও ভক্তি করে। তবে যে কোথাও ভাল লোককে অন্যায় ভাবে ঘৃণা করে, তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সে যাহাতে এরূপ না করে সেজন্য হিন্দুধর্ম যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। বোধ হয় এরূপ সঙ্কীর্ণতা অপর ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মে কম। শুনিয়াছি বিলাতে যদি কেহ ধুতি পরিয়া পথে হাঁটে, লোকে তাহাকে পাগল করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে প্রথমে যিনি ছাতা লইয়া পথে হাঁটিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপ দল বাঁধা সঙ্কীর্ণতার উগ্র অত্যাচার আমাদের দেশে কম বলিয়াই মনে হয়।

যে সকল কাজ বুদ্ধিমূলক, কেবল সেই সকল কাজ বংশগত করিতে যে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন, তাহা নহে; যে সকল কাজ কেবল শারীরিক চেষ্টার উপর নির্ভর করে, সে সকল কাজও বংশানুক্রমিক করিতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন।* এজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির তেল বের করা, বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়,—বরং তাতে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হ'য়ে আসে। এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম্ম পালন ক'রতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকী থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক আজ ভারতে বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা।' শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নাই। এই জন্যেই ভারতবর্ষের নিমকে জীর্ণ দেশফেরা ইংরেজ গৃহিনীর মুখে অনেকবার শুনেছি স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তা'রা বড় বেশী অনুভব করে।" হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করা প্রভৃতি দরিদ্রের উপ-জীবিকাকে রবীন্দ্রনাথ যতটা হীন বলিয়া মনে করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহারা ততটা হীন নহে। দরিদ্রের জীবিকা অবলম্বন করিলেও মানুষ যদি সৎপথে থাকে, ঈশ্বর-চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক হয়। চাকুরি ওকালতী প্রভৃতি তথাকথিত ভদ্রজনোচিত বৃত্তি অপেক্ষা দরিদ্রের জীবিকা অধিক অনিষ্টকর বা লজ্জাজনক নয়। আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়াছিল বলিয়াই তাহার এত দুর্গতি।

বাস্তবিক পক্ষে তথাকথিত ভদ্রবৃত্তিতে মনের যেরূপ অধোগতি হয় একঘেয়ে হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করা বা চরকা কাটাতে সেরূপ অধোগতি হয় না। হাঁড়ি তৈরি করা, তেল বের করার সময় শরীরের একঘেয়ে পরিশ্রম হয় বটে, কিন্তু মন মুক্ত থাকে। চাকুরি ওকালতি প্রভৃতিতে মনের দাসত্ব প্রায় অনিবার্য্য। দেহের দাসত্ব অপেক্ষা মনের দাসত্ব অধিকতর শোচনীয়। মনের দাসত্ব হইলে কোন্ কাজ করা উচিত আমরা তাহার বিচার করি না, যে কাজ করিলে প্রভু খুসী হইবেন সেই কাজ করিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তখন আত্মসম্মানবোধ থাকে না; চাটুকারিতা, পরনিন্দা, প্রবঞ্চনা, পরের সর্বনাশ করিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না। কুমার, তেলি, কামার, তাঁতীদের হৃদয় অনেকটা সরল থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বংশগত জাতিভেদের ফলে মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে। কিন্তু ইহা কি সত্য নহে যে, য়ুরোপের শ্রমজীবী অপেক্ষা আমাদের শ্রমজীবীদের মধ্যে ধর্মভাব বেশী? স্মরণ হয়, পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয় ইংলণ্ডের একটি শ্রমজীবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যিশুখৃষ্টের বিষয় কি জান?" সে বলিয়াছিল, "তাহার নম্বর কত?"—

অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট কত নম্বরের কুলি? আমাদের শ্রমজীবিগণ ধর্মবিষয়ে এতদূর উদাসীন নহে। ইংলণ্ডে বংশগত জাতিভেদ নাই, আমাদের আছে। অতএব জাতিভেদ বংশগত হইলে যে শ্রমজীবীদের বেশী অবনতি হইবে ইহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের দরিদ্র লোকেরা অন্য দেশের দরিদ্র লোক অপেক্ষা শান্ত, সংযত এবং ধর্মবিষয়ে উন্নত। ইহা অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ লোক আমাদের দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী লেখাপড়া জানে। কিন্তু বেশী লেখাপড়া শিখিলেই যে মনোবৃত্তিসকল বেশী উন্নত হয়, তাহা নহে। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের মনের ভাব অন্য দেশের লেখাপড়া-জানা লোকদের মনের ভাব অপেক্ষা হীন নহে। পাশ্চাত্যদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, বেশী টাকা রোজগার করা এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা ও বিলাসভোগই জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরাও জানে যে, এসকল জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ এসকল চিরকাল ভোগ করিতে পারা যায় না। ঈশ্বরকে লাভ করিলে যে সুখ হয় তাহা চিরস্থায়ী; অতএব ঈশ্বরলাভই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। রামায়ণ এবং মহাভারতের শিক্ষাপ্রদ গল্প, ঈশ্বরের দয়া, সর্ব্বশক্তিমত্তা, পার্থিব সুখসম্পদের অনিত্যতা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এসকল কথা আমাদের দেশের দরিদ্র নিরক্ষর সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জানে। যাত্রা, কথকতা, সাধুসন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপদেশ, ভিখারী, বৈষ্ণব এবং বাউলের গান, এই সকল উপায়ে ধর্মের বড় বড় তত্ত্বগুলি দরিদ্র ও নিরক্ষরের হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কৃষক গান শুনিয়াছে

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত—
আবাদ করলে ফলত সোণা।

কলু শুনিয়াছে

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।

এই সকল গানের পদ অনেক শ্রোতার মন ঈশ্বরের দিকে "মোড় ফিরাইয়া" দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই সকল কাজেও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই।" তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে বংশগত ভাবে একই রকম কাজ করিয়া আমাদের শিল্পীদের চিত্তের অবনতি হইয়াছে; এজন্য তাহারা শিল্পের নূতন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতে সকল প্রকার শিল্পবিদ্যা যে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। এবং প্রাচীন ভারতে বংশগত ভাবেই শিল্পচর্চ্চা হইত। অতএব বংশগত ভাবে শিল্পচর্চ্চা করিলে যে শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না, ইহা যথার্থ নহে। আজকাল ভারতে শিল্পের অবনতি হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার কারণ প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা; বংশগত শিল্পচর্চ্চা তাহার কারণ নহে। কার্পাস, পশম, রেশম, কাষ্ঠ, ধাতু প্রভৃতির উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের জন্য ভারত অতীত কাল হইতে বিখ্যাত। ভুবনেশ্বর, কোনারক এবং মাদুরার মন্দির, অজন্তা এবং এলোরার চিত্র, আজমীরের বিগ্রহরাজ-নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়, এ সকল যাহাদের কীর্ত্তি, তাহারা বংশগত ভাবেই শিল্পচর্চ্চা করিয়াছিল। গভীর চিন্তাশীল এবং স্বদেশের ঐকান্তিক উন্নতিকামী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে জাতিভেদ-প্রথা প্রাচীন ভারতের শিল্পে উৎকর্ষলাভের পথে বাধা দেয় নাই, সহায়ক হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "জাতিভেদ প্রচলিত থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে উহা তুলনারহিত হইয়াছে।" (সামাজিক প্রবন্ধ ১০৪ পৃঃ) পাশ্চাত্যদেশে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীতে অনেক "নূতনতর উৎকর্ষ" হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সকল উৎকর্ষে মানবজাতির কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়। কারণ এই সকল "নূতনতর উৎকর্ষ" কলকারখানার উপযোগী; কলকারখানাতে খুব দ্রুতভাবে দ্রব্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু কারখানায় কার্য্য করিলে মানুষ কলের মত হইয়া যায়, উচ্চ মনোভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, পারিবারিক সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া সে নানা প্রলোভনে পতিত হয়; এবং পাশ্চাত্যদেশে সস্তায় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ফলে আমাদের ন্যায় অনেক দেশের দরিদ্র লোকদের জীবিকার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে কলের নূতন উৎকর্ষ বাস্তবিক বাঞ্ছনীয় কি না, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে কামার, কুমার, তেলীরা বংশগত ভাবে একই কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের মত হইয়া যায়—ইহা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার বিপরীত অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। কলকারখানায় কয়েক বৎসর কাজ করিলেই মানুষ কলের একটা অঙ্গের ন্যায় হইয়া যায়। কারণ, কল-কারখানাতে শ্রমজীবীকে কলের ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতে হয়। গৃহশিল্পে সেরূপ নহে। সেখানে শ্রমজীবী প্রভুর ন্যায়, এবং যন্ত্রগুলি তাহার সম্পূর্ণ অধীন। ইহাই স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিক ভাবে কাজ হইলে বংশপরম্পরাতেও শ্রমজীবীর অবনতি হয় না। কলের অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে অল্প দিনেই তাহাদের অবনতি হয়। একঘেয়ে কাজ করিলেই যে মনের অবনতি হয়, ইহা কুসংস্কার মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আজ ভারতে বিশুদ্ধ ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা।" কিন্তু ইহা সত্য নহে। ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষি বৈশ্যের কাজ। কৃষি এবং ব্যবসাতে বৈশ্যধর্ম এখনও উচ্ছিন্ন হয় নাই। পরাধীন জাতির ক্ষাত্রধর্ম বিনষ্ট হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। বাকী ব্রাহ্মণ। দেশ পরাধীন হইলে ব্রাহ্মণের স্বধর্মে টিকিয়া থাকা খুব কঠিন। ব্রাহ্মণের রাজদত্ত বৃত্তি এখন বন্ধ। পরাধীনতার ফলে দেশের অতিরিক্ত ঝোঁক পড়িয়াছে ইংরাজি শিক্ষার উপর; সংস্কৃত শিক্ষার যারপরনাই অনাদর হইয়াছে। ইহাতেও ব্রাহ্মণের জীবিকা সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষার ফলে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ধর্মকর্মে আস্থা অত্যন্ত শিথিল হইয়াছে। তাহাতেও ব্রাহ্মণের জীবিকা বন্ধ। যে সকল জীবিকা অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ত্তব্যপালন সহজ হইত, সে সকল জীবিকা প্রায় বন্ধ হওয়াতে, ব্রাহ্মণকে অপর সকল জীবিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে; তাহার ফলে ব্রাহ্মণের নিজধর্ম পালন করা কঠিন হইয়াছে। তথাপি এখনও দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ আছেন,—নির্লোভ, পরোপকারী, ঈশ্বরে নির্ভরশীল, দারিদ্র্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ। দেশের সুগভীর ঔদাসীন্য সত্বেও, শিক্ষিত লোকের নির্মম বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়াও, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত এখনও যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রাণপণে প্রাচীন আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক এবং প্রাচীন আদর্শের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতে যদি আবার কখনও সুদিন ফিরিয়া আসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যুগ্র আলোকের মোহ কাটাইয়া আবার যদি ভারতবাসী প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে নিজের ঘরের জিনিসের যথার্থ আদর করিতে শিখে, তাহা হইলে যে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আজিকার দুর্দিনে দৈন্যের অন্ধকার এবং বিদ্রূপের শিলাবর্ষণ সহ্য করিয়া বুকের রক্ত দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শ বাঁচাইয়া রাখিতেছেন তাঁহাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। মহাত্মা গান্ধি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধী তাহা সত্য; কিন্তু তিনি যে স্বদেশের ত্রুটি নির্ম্মমভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া যাহা সত্য মনে করেন নির্ভীক ভাবে তাহা প্রচার করেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি বলিয়াছেন, I have not a shadow of doubt that Hinduism owes it all to the great traditions that the Brahmins have left for Hinduism. They have left a legacy for India which every Indian, no matter to what **Varna** he may belong, owes a deep debt of gratitude. Having studied the history of almost every religion in the world it is my settled conviction that there is no other class in the world that has accepted poverty and self-effacement as its lot. * * * Even in this black age, travelling throughout the length and breadth of India, I notice that the Brahmins take the first place in self-sacrifice and self-effacement. * * * I wish to confess too that the Brahmins together with the rest of us have suffered a fall. They have set before India voluntarily and deliberately the highest standard which a human mind is capable of conceiving, and they must not be surprized if the Indian world exacts that standard from them. The Brahmins have declared themselves, and ought to remain the custodians of the purity of our life.

Mahatma Gandhi's speech in Madras at the Seabeach on the 8th April 1921.

অনুবাদ :—আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে হিন্দুধর্মের যাহা কিছু ভাল সে সকলেরই কারণ ব্রাহ্মণগণের গৌরবময় কার্ত্তিকলাপ। ব্রাহ্মণেরা যে সকল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুর গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ইহা আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, পৃথিবীর আর কোন শ্রেণীর লোক দারিদ্র্য এবং স্বার্থোৎসর্গ নিজ ভাগ্য বলিয়া বরণ করিয়া লয় নাই। * * * এমন কি বর্ত্তমান অবনতির দিনে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, স্বার্থোৎসর্গ এবং স্বার্থবিলোপ বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। * * * ইহাও আমি স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি যে, আমাদের অন্য সকলের ন্যায় ব্রাহ্মণদেরও পতন হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং গভীর চিন্তার পর ভারতের সম্মুখে এমন এক আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ মানব-মন কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং ভারতের লোকেরা যদি তাঁহাদের নিকট সেই আদর্শ অনুযায়ী আচরণ প্রত্যাশা করে, তাহা হইলে তাঁহাদের আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুর জীবনের পবিত্রতার রক্ষক বলিয়া নিজদিগকে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহাই হওয়া উচিত।—৮ই এপ্রিল ১৯২১ তারিখে মাদ্রাজনগরী সমুদ্রতটে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা।

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা মহাত্মাজির জীবনের মূলমন্ত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম স্মরণাতীত-কাল হইতে বংশগত। ব্রাহ্মণদের যে গৌরবময় কীর্ত্তি-কাহিনী মহাত্মাজি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বংশগত বর্ণাশ্রমধর্মের সময় সম্ভব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদের যে অবনতির কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহার কারণ বংশগত বর্ণাশ্রমধর্ম নহে; কারণ, তাহা হইলে তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণ তাহার মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত না। সে অবনতি আধুনিক এবং তাহার কারণ প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থা।

ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজ মহিলার নিকট ভারতের চাকরদের প্রশংসা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়াছেন; বলিয়াছেন, বংশানুক্রমে চাকর থাকিয়া তাহারা মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত হইয়াছে, নীরবে লাথি-ঝাঁটা সহ্য করে, তাই প্রভুদের এত ভাল লাগে। এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, বোধ হয় ইংরেজ মহিলা ভারতের চাকরদের লাথি ঝাঁটা সহ্য করিবার ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন নাই—তাহারা বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, কষ্টসহিষ্ণু—এই সকল কথাই বোধ হয় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজের ভৃত্য সচরাচর মুসলমান হয়, বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দু হয় না। সাংহাই (Shanghai) সহরে একজন শিখ পুলিশ চীনাদিগকে অন্যায় ভাবে তাড়না করিয়াছিল, আমেরিকার Nation পত্রে তাহার বিবরণ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং অনুমান করিয়াছেন যে, আমাদের শূদ্ররা বংশানুক্রমিক শূদ্র বলিয়া এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করে না। রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, শিখদের বর্ণাশ্রমধর্ম নাই। অতএব বংশানুক্রমে শূদ্রত্ব করিয়া শিখদের এরূপ প্রবৃত্তি হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। বিদেশী বেতনভুক সেনা বা পুলিশের লোক (mercenaries) প্রায়ই অত্যাচারী হয়, ইতিহাসে তাহার বহু নিদর্শন আছে,—ইহাও তাহার অপর একটি নিদর্শন। ইহার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মকে দায়ী করা যায় না। হংকঙের (Hong Kong)এর যে পাঞ্জাবী পুলিশ রবীন্দ্রনাথের চক্ষের সম্মুখে একজন চীনীয়কে লাঞ্ছনা করিয়াছিল, সে শিখ কি না রবীন্দ্রনাথ তাহা লেখেন নাই। খুব সম্ভব সেও শিখ। কারণ, ঐ সকল অঞ্চলে শিখ পুলিশই (প্রায় অবসর-প্রাপ্ত সৈনিকেরা) গিয়া থাকে। ইহার জন্যও বর্ণাশ্রমধর্মকে দায়ী করা যায় না। আর এ সকল দৃষ্টান্ত ক্ষাত্রধর্মের অপব্যবহার—শূদ্রধর্মের নহে। সেনা বা পুলিশে কাজ করা ক্ষত্রিয়ের কাজ,—শূদ্রের নহে। “পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং”—পরিচর্য্যা শূদ্রের কাজ, শাসন-করা শূদ্রের কাজ নহে। ইংরেজ সৈনিক বা পুলিশ যে মনোবৃত্তি লইয়া ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করে, শিখ পুলিশ সেইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া চীনীয়দের উপর অত্যাচার করে,—শিখ পুলিশ এবং তাহার প্রভু ইংরেজ যে ভিন্ন জাতীয় তাহা অবান্তর প্রসঙ্গ মাত্র। যাহারা বেতনভুক হইয়া বিদেশে পুলিশ বা সৈনিকের কর্ম করিতে যায়, তাহাদের মনোভাব অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত হইয়া যায়। তাহাদের মনোভাব দেখিয়া দেশের সাধারণ লোকদের মনোভাব নির্ণয় করা উচিত নহে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে হিংস্রভাব অপর দেশের সাধারণ

লোকদের অপেক্ষা কম। আমাদের দেশের সাধারণ লোক অন্য সকল দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী অভদ্র নহে। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়দের মত পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধি এ বিষয়ে পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় বলিয়াছেন,——I ask you to accept the testimony given by Sir Thomas Munro, and I confirm that testimony, that the masses of India are really more cultured than any in the world. অনুবাদ :—"স্যর টমাস্ মনরো যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমি তাহা আপনাদিগকে গ্রহণ করিতে বলি, —এবং আমি সে সাক্ষ্য সমর্থন করি যে ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর অপর সকল দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য।" ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন।" (সামাজিক প্রবন্ধ ৩৭ পৃঃ) ভূদেববাবু পুনশ্চ বলিয়াছেন, "একজন বহুদর্শী ইংরেজের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল। অপর সকল সমাজের ছোট লোকেরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্যভাবাপন্ন।" (সামাজিক প্রবন্ধ) রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন :—From a careful survey and observation of the people and inhabitants of various parts of the country and in every condition of life, I am of opinion that the peasants or villagers who reside at a distance from large towns and head stations and courts of law are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever. &c.

(Quoted in Mr. P. N. Bose's National Education and Modern Progress. p. 41).

অনুবাদ :—"দেশের বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, যে সকল কৃষক এবং গ্রামবাসী নগর এবং বিচারালয় হইতে দূরে বাস করে, তাহারা যে কোনও দেশের লোক অপেক্ষা কম নির্দোষ, সংযত এবং উন্নত-চরিত্র নহে।" এই সকল বিচক্ষণ ব্যক্তির মত হইতে প্রতীতি হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে শূদ্ররা বংশানুক্রমিক শূদ্র বলিয়া নিরীহ লোকদের উপর দুর্দান্ত এবং অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যথার্থ নহে।

গীতার "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্মো ভয়াবহঃ" এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোথাও বা বাক্যটিকে "স্বধর্মে হননং শ্রেয়" এই ভাবে বিকৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, বাক্যটিরও তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, "ধর্ম্ম অনুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন ক'রা যায়, তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তা'র কোন প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিজ নিজ কর্ম্ম পালন করিবে, ইহাই গীতার উক্ত বাক্যটির উদ্দেশ্য। অর্থটির মধ্যে বিশেষ কিছু জটিলতা নাই। এই সহজ অর্থই সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ইহাদের কোনও বর্ণের কাজ কি সমাজে অপ্রয়োজনীয়? ব্রাহ্মণের কাজ সমাজকে সংশিক্ষা দেওয়া, নিজে ধার্মিক হওয়া, এবং সাধারণের মধ্যে ধর্মভাব বিস্তার করা। ক্ষত্রিয়ের কাজ সমাজকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বৈশ্যের কাজ কৃষি বাণিজ্য, শূদ্রের কাজ পরিচর্য্যা। প্রত্যেক বর্ণের কাজই সমাজে প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন 'প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্ করতে হবে' এ কথা কেমন করিয়া উঠে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, চীন ও জাপান যদি য়ুরোপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, তাহা হইলে ভারতবাসী ইংরাজের ভৃত্য হইয়া চীন ও জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবে, কারণ ভারতবাসী কেবল শিখিয়াছে,—"শূদ্রের বহু যুগের দীক্ষা"—স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। কিন্তু যুদ্ধ করা ত শূদ্রের দীক্ষা নয়, ক্ষত্রিয়ের দীক্ষা; বেতনভুক সৈনিক হইয়া যুদ্ধ করাও ক্ষত্রিয়ের কাজ, শূদ্রের নহে। আরও এক কথা শাস্ত্র ক্ষত্রিয়কে ন্যায় যুদ্ধই করিতে বলিয়াছে, অন্যায় যুদ্ধ করিতে বলে নাই—ধর্ম্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। সকলেই জানেন যে, হিন্দুশাস্ত্র বরাবর বলিয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রেও ন্যায়,

ধর্ম, দয়া, ক্ষমা এ সকল পরিত্যাগ করিবে না। এই সকল শাস্ত্রোপদেশ যে ক্ষত্রিয়রা পালন করিত না, তাহা নহে। প্রত্যুত যুদ্ধের সময়ও হিন্দুবীর এই সকল গুণাবলির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; তাহা দেখিয়া বৈদেশিকগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। রাণা কুম্ভ মালব এবং গুর্জরের মিলিত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া মালবরাজ মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে আনিয়া উপঢৌকন দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া Todd বলিয়াছেন, Such is the character of the Hindu: a mixture of arrogance, political blindness, pride and generosity. To spare a prostrate foe is the creed of the Hindu cavalier, and he carries all such maxims to excess.

অনুবাদ:—"হিন্দুর চরিত্র এইরূপ: দর্প, রাজনৈতিক অন্ধতা, অহঙ্কার এবং দয়ার সংমিশ্রণ। পরাস্ত শত্রুকে ক্ষমা করা হিন্দুর ধর্ম, এবং সে এই সকল ধর্মমতকে অতিরিক্ত মাত্রায় অনুবর্তন করে।" রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনা করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে হিন্দুর বর্ণবিশেষকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছে বলিয়া হিন্দু অন্ধভাবে যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, ইহা যথার্থ নহে। চীন ও জাপান য়ুরোপের সহিত যুদ্ধ করিলে হয় ত বেতনভুক ভারতীয় সৈনিক ইংরাজের হইয়া লড়াই করিতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মের অনুশাসন তাহার কারণ নহে; তাহার কারণ, সকল দেশেই এমন লোক পাওয়া যায়, যাহারা বেতন পাইলে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, সে আজ্ঞা ন্যায় বা অন্যায় তাহা বিচার করিবে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে বেতনভুক মুসলমান সৈন্য ইংরাজের ও ফরাসীর হইয়া তুর্কীর বিপক্ষে লড়াই করিয়াছিল—ইহা সকলেই জানে। মুসলমানদের মধ্যে ত জাতিভেদ নাই, তবে এমন হইল কেন? আজ যদি হিন্দুদের জাতিভেদ উঠিয়া যায়, তাহা হইলেই কি ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে বেতনভুক সৈন্য লইয়া যাহার বিরুদ্ধে ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে পারিবে না?

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—কথাটিতে খারাপ কিছুই নাই। নিজের ধর্ম, নিজের কর্তব্য পালন করিবে, তাহাতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। ইংরাজিতে যাহাকে বলে to die at the post of duty—মনুও এই কথাই বলিয়াছেন,

ন সীদন্নপি ধর্মেন মনো ধর্মে নিবেশয়েৎ। ৪।১৭১

"কষ্ট এবং অভাবে পড়িলেও শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ করিবে না।" এই ধরণের কথা Ruskinএর লেখাতেও আছে। তাঁহার Unto this last হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

Five great intellectual professions, relating to daily necessities of life, have hitherto existed,—three exist necessarily in every civilized nation:

The Soldier's profession is to defend it,
The Pastor's, to teach it,
The Physician's, to keep it in health,
The Lawyer's to enforce justice in it,
The Merchant's, to provide for it,
And the duty of all these men is, on due occasion to die for it,

"On due occasion", namely,

The soldier, rather than leave his post in battle,
The Physician, rather than leave his post in plague,
The Pastor, rather than teach falsehood,
The Lawyer, rather than countenance injustice.

For, truly, the man who does not know when to die, does not know how to live.

মর্ম:—পাঁচ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছে,

সৈনিক,—	তাহার কাজ	সমাজকে রক্ষা করা
ধর্মযাজক,	„ „	শিক্ষা দেওয়া
চিকিৎসক,	„ „	সুস্থ রাখা,
আইন ব্যবসায়ী	„	সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা
বণিক	„	সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা।

এই সকল লোকের কর্ত্তব্য হইতেছে প্রয়োজন হইলে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য প্রাণত্যাগ করা,—

প্রয়োজন হইলে,—অর্থাৎ

সৈনিকের, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করিয়া,

চিকিৎসকের, ব্যাধির স্থান পরিত্যাগ না করিয়া,

ধর্ম্ম যাজকের, মিথ্যা শিক্ষা না দিয়া,

আইনব্যবসায়ীর, অবিচারে প্রশ্রয় না দিয়া,

—কারণ যে মানুষ যথোপযুক্ত সময়ে প্রাণত্যাগ করিতে জানে না, সে বাঁচিতেও জানে না।

Ruskin এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে কর্ত্তব্যের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন, গীতার "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" সেই আদর্শই প্রচার করিতেছে।

যাহার যে খুসী বৃত্তি অবলম্বন করিলে যে সমাজের কল্যাণ হয় না, এবং কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহা ঠিক করিয়া সেই মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে যে সমাজ শীঘ্রগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাও রাস্কিনের মত। এ বিষয়ে তিনি Political Economy of Art প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—National law has hitherto been only judicial; contented, that is, with an endeavour to prevent and punish violence and crime; but as we advance in our social knowledge we shall endeavour to make our government paternal as well as judicial; that is, to establish such laws and authorities as may at once direct us in our occupations, protect us against our follies and visit us in our distress.

অনুবাদ :—এ পর্য্যন্ত আইন কেবলমাত্র বিচার করিয়াছে,—অর্থাৎ সমাজে উপদ্রব এবং পাপে বাধা দিয়া এবং দণ্ড দিয়াই সন্তুষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের সামাজিক জ্ঞান যত বাড়িবে, তত সামাজিক শাসন পারিবারিক শাসনের অনুরূপ হইবে। এরূপ আইন এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা আমাদের জীবিকার পথ নির্দ্দেশ করিবে, মূর্খতার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে এবং বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করিবে।

পুনশ্চ রাস্কিন বলিয়াছেন,—the notion of Discipline and Interference lies at the root of all human progress or power;—the "Let Alone" principle is, in all things which man has to do with, the principle of Death" [The Political Economy of Art] অনুবাদ :—মানবের সকল প্রকার উন্নতি ও শক্তির মূলে নিয়ম এবং শাসন বর্ত্তমান থাকে। মানবসংক্রান্ত সকল বিষয়েই স্বেচ্ছাচার হইতেছে মৃত্যুর পথ।

রাস্কিনের মতে, কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহা শৈশবেই পরীক্ষা করিয়া স্থির করা উচিত; এবং তদনুযায়ী তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। রাস্কিন যাহা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে বলিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্র তাহা জন্ম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পিতামাতা এবং পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে যেরূপ প্রবৃত্তি বেশী প্রবল ছিল, সন্তানের সেইরূপ প্রবৃত্তি সহজাত হইবার সম্ভাবনা অধিক, এবং শৈশব হইতে সে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পালিত হয়, তাহার প্রভাবে সেই সহজ প্রবৃত্তির অধিক বৃদ্ধি লাভ করিবার পক্ষে অনুকূল। একটি শিশু বড় হইয়া কোন্ বৃত্তির উপযোগী হইবে—পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা অনেক সময়ই কঠিন হয়। জন্ম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা (heredity and environment) প্রকৃতি যেরূপ নির্ভুল ভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, পরীক্ষা দ্বারা সেরূপ নির্ভুল নির্ব্বাচন সম্ভব নহে। হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃতির এরূপ আচরণের যুক্তিসঙ্গত কারণও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সে কারণ হইতেছে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল; যাহার যেরূপ কর্ম্মফল, যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তাহার অনুরূপ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। পৃথিবীতে অহেতুক ঘটনা কিছুই ঘটে না। একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন; Birth is no more an accident than the delivery of a letter to the person whose address is written on the envelope. "পত্রের উপর যাহার ঠিকানা লেখা থাকে তাহার নিকট পত্র পৌঁছান যেমন দৈবাধীন ব্যাপার নহে, জন্মও সেইরূপ দৈবাধীন ব্যাপার নহে।" আর এক বিষয়ে রাস্কিনের প্রস্তাব অপেক্ষা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। সমাজে কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাজ আছে; সেগুলি

সাধারণতঃ হীন কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। মানবকৃত কোন ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের কতকগুলি লোককে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিলে, অসন্তোষ উৎপন্ন হইবেই,—সে ব্যবস্থা যতই উৎকৃষ্ট হউক। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থাতে সেরূপ অসন্তোষ উৎপন্ন হয় না। কারণ, হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছা যে সে তদনুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করিবে। বাস্তবিক সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা এইরূপ বিশ্বাসে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া আসিতেছে। অথচ ইহাতে যে তাহাদের নৈতিক অবনতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, Sir Thomas Munro এবং মহাত্মা গান্ধির মতে The masses of India are more cultured than any in the world.—"ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর অন্য সকল দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক সভ্য।" পিতৃমাতৃভক্তি, দাম্পত্য প্রেম, সন্তানবাৎসল্য, অহিংসা, ঈশ্বরভক্তি—এই সকল উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুর মধ্যে প্রবলতর। হীন বৃত্তি সত্ত্বেও যে নৈতিক অবনতি হয় না, তাহার কারণ এই যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও জানে যে তাহাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি পালন করিয়াও তাহারা জীবনের যাহা উদ্দেশ্য—ঈশ্বরলাভ, তাহা সাধন করিতে পারে। কারণ ঈশ্বর সমদর্শী,—কোন বৃত্তিকে তিনি হীন চক্ষে দেখেন না। যে কার্য্যই হউক, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে করা যাইতেছে, এইরূপ মনে করিয়া করিলে, মনের অবনতি হয় না, প্রত্যুত চিত্ত শুদ্ধ হয়।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

"যাহা হইতে প্রাণীদের উৎপত্তি, যিনি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলে মানব সিদ্ধি লাভ করে।" শূদ্র যখন অন্য বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে তখন ভাবিবে, সকলেই ত ভগবান হইতে উৎপন্ন, আমি এই পরিচর্য্যা ভগবানেরই করিতেছি—ইহা ত লজ্জার বিষয় নহে, সৌভাগ্যের বিষয়; দুঃখের বিষয় নহে, আনন্দের বিষয়। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিলে চিত্তের অবনতি হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বহস্তে পায়খানা পরিষ্কার করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধি এই কার্য্য করিতে গর্ব অনুভব করেন। হিন্দুর সমাজতত্ত্বের মর্ম্মকথা ইঁহারা অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই ইঁহারা এরূপ আচরণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এরূপ ভাব দেখা যায় না। তাহারা ভাবে,—অন্যের পরিচর্য্যা করা লজ্জাকর—আমার অন্য কিছু বড় কাজ করিবার সুযোগ নাই বলিয়াই এরূপ করিতেছি। বড় লোকেরা পরিশ্রম না করিয়াও কত রকম সুখভোগ করিতেছে, আমি এত কষ্ট করিয়াও কত কষ্টে দিনপাত করিতেছি। এইরূপ মনোভাব হইলে অসন্তোষ ও মানসিক অবনতি অনিবার্য্য।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুকে অন্যরূপ ভাবিতে শিখাইয়াছে। সে বলে—

প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়মারভ্য প্রাততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনং তব

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত যাহা করি, হে জগন্মাতঃ, সে সকলই তোমার পূজা।

দেবেশ চৈতন্য মায়াদিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে দেবেশ, চৈতন্যময়, হে আদিদেব, লক্ষ্মীকান্ত, বিষ্ণো, তোমরা আজ্ঞাতেই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার প্রিয়সাধন করিবার জন্য সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব।

অন্যায় কার্য্য করিবার সময় এরূপ মনোভাব লইয়া করা যায় না; কিন্তু খুব দরিদ্র ব্যক্তিরও নিজ জীবিকার অনুরূপ কর্ম করিবার সময় এইরূপ মনোভাব লইয়া করা সম্ভব। এই সকল শাস্ত্রোপদেশ কেবল পণ্ডিতের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যাত্রা, গান, কথকতার মধ্য দিয়া এই সকল মূল্যবান তত্ত্ব নিরক্ষর দরিদ্রের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও ধর্ম্মভাবের অভাব হয় নাই। তাহাদের মধ্য হইতেও অনেক সাধু মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।

যে সকল সমাজে এরূপ ধর্ম্মানুশাসন নাই, যেখানে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হইয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, সেখানে অসন্তোষ, ঈর্ষা, বিদ্রোহ অনিবার্য্য। সেখানে সামাজিক শান্তি দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার

করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি বলিয়াছেন, "বাধ্য হ'য়ে কাজ করা অপমানকর।" "রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তাহ'লেও তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাক্‌ত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থাম্‌ত না।" "ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করবার মধ্যে তা'র একটা আত্মপ্রসাদ আছে" "আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত ক'রে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ এবং বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে।" "তাতে মানুষকে শান্ত করে" "ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে।" কিন্তু এসকল সত্ত্বেও তিনি বৃত্তি বিষয়ে ধর্মানুশাসনের অত্যন্ত বিরোধী। তিনি আশঙ্কা করেন—এইরূপ ধর্মানুশাসনের ফলে আচারের চাপে আধ্যাত্মিকতার প্রাণ বহির্গত হয়, এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সুবিধা পাইলেই দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। আমরা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এরূপ হইবার কোন কারণ নাই; এবং অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয় নাই।

ভারতবর্ষে কত দিন ধরিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচলিত আছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। উপনিষদে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উপনিষদ যে অন্ততঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বেকার, ইহাতে কাহারও বোধ হয় সন্দেহ নাই। প্রাচীনপন্থীদের মতে জাতিভেদ ৩০০০ বৎসরের অনেক বেশী দিন ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। কিন্তু জাতিভেদ যে ৩০০০ বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। ভারতের এই তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস সবটাই লজ্জাকর নহে। অতীত ইতিহাসে গৌরব করিবার বিষয় হিন্দুর যথেষ্ট ছিল। উপনিষদ, ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা,—কালিদাস, ভবভূতি, আর্যভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, তুলসীদাস, শ্রীচৈতন্য—কোনারক, ভুবনেশ্বর, এলোরা, অজন্তা, তাঞ্জোর, মাদুরা,—অতীত ভারতের কয়েকটিমাত্র উজ্জ্বল নিদর্শন। ভারতের মুসলমান অধিকারের পূর্বে অন্ততঃ ২০০০ বৎসর—বংশগত বর্ণাশ্রমধর্ম সত্ত্বেও ধর্ম, দর্শন, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বয়ন প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা এবং শিল্পে ভারতবর্ষ যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম, দর্শন ও কাব্যে তাহারা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, পৃথিবীর কোন যুগে কোন দেশ তাহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। এই সকল বিদ্যা এবং শিল্পের বংশগত ভাবেই চর্চ্চা করা হইয়াছিল। হিন্দু মনে করে—বংশগতভাবে চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়াই এত উন্নতি হইয়াছিল। যে সকল কারণে সে এইরূপ মনে করে, এই প্রবন্ধের পূর্বভাগে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বংশগত ভাবে বিদ্যা ও শিল্প-চর্চ্চার ফলে উন্নতি হইয়াছিল—কেহ যদি ইহা স্বীকার না-ও করেন, তাঁহাকে অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করিতে হইবে, যে, বংশগত ভাবে বিদ্যা এবং শিল্প-চর্চ্চা হওয়াতে ঐ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের পথে বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। কারণ অন্তরায় হইলে ভারত এত শীঘ্র এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

এরূপ একটা কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদ প্রথা আছে বলিয়াই হিন্দুজাতির অবনতি হইয়াছে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া বলেন, তাহা মনে হয় না। কারণ, একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পৃথিবীর অপর সকল জাতির তুলনায় হিন্দুজাতির বেশী অবনতি হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। ব্যাবিলনিয়া, কার্থেজ, মিশর ও ফিনিশিয়াতে যে সকল সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল, আজ সে সভ্যতা কোথায়? বহু যত্নে মৃত্তিকাস্তরের নিম্ন হইতে খনন করিয়া তাহার যে সকল ক্ষীণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাদুঘরে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তাহাদের সমসাময়িক, অথবা তাহাদের অপেক্ষাও প্রাচীন, হিন্দুর সভ্যতা এখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্বে সিন্ধুনদের তীরে দাঁড়াইয়া আর্যঋষিগণ যে বেদমন্ত্র গান করিয়াছিলেন, আজিও হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত, সহস্র সহস্র মন্দিরে এবং বিদ্যালয়ে সে সঙ্গীতের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করেন; উপনয়ন এবং বিবাহাদি সংস্কারে সেই সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আশ্রমের পর্ণকুটীরে বসিয়া প্রাচীন হিন্দু ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে

যে সকল মহীয়ান সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল, ইংলণ্ড জার্মণি ও ফ্রান্সের মনীষিগণ আজিও বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে তাহার অনুশীলন করিতেছেন। বিজ্ঞানের অত্যুগ্র আলোকচ্ছটায় জগতের আর সকল ধর্ম সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, কেবল হিন্দুধর্ম হয় নাই; সে যেন ঈষৎ স্মিতবদনে বিজ্ঞানকে বলিতেছে,—বৎস, চরম সত্য নির্ণয় করিতে এখনও দেরী আছে। পরাধীন হইবার পরও ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, নানক, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি। ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীর আর কোনও জাতি কি হিন্দু অপেক্ষা অধিক দিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? এতদিন স্বাধীনতা রক্ষা করা দূরের কথা, আর কোনও জাতি হিন্দু জাতির ন্যায় এত দিন নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারে নাই। যে ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শক্তি বলিয়া পরিচিত, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করুন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে জাতি ইংলণ্ডে বাস করিত, সে জাতি আজ কোথায়? Saxonরা আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর তাহারা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়াছে, কিংবা Saxonদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেই Saxon জাতিই বা কত দিন নিজ বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিল? তাহারা প্রথমে Daneদের দ্বারা, পরে Normanদের নিকট বিজিত হইল এবং ক্রমশঃ Normanদের সহিত মিশিয়া গেল। দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড চারবার বিজিত হইল এবং দুইটি জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। য়ুরোপের অন্যান্য জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও এইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। বিটনদের, স্যাক্সনদের, রোমানদের, গ্রীকদের যে ধর্ম ছিল, সে ধর্ম এখন কোথায়? হিন্দু জাতি ২৫০০ বৎসর ধরিয়া স্বাধীন ছিল, ৩।৪ সহস্র বৎসর ধরিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং নিজ ধর্ম রক্ষা করিয়াছে, সুতরাং অপর সকল জাতির ইতিহাসের তুলনায় ভারতের ইতিহাস অধিকতর লজ্জাজনক নহে। মহামতি Todd লিখিয়াছেন,—

What nation on earth would have maintained the semblance of civilization, the spirit or the customs of their forefathers, during so many centuries of overwhelming oppression but one of such singular characters as the Rajpoots? * * * How did the Britons at once sink under the Romans, and in vain strive to save their groves, their Druids or their altars of Bal from destruction! To the Saxons they alike succumbed; they, again, to the Danes; and this heterogenous to the Normans. Empire was lost or gained by a single battle, and the laws and religion of the conquered merged in those of the conquerors. Contrast with these the Rajpoots: not an iota of their religious and customs have they lost through many a foot of land. [Annals of Mewar, Chapter V]

ভূদেববাবু বলিয়াছেন, "কোনও সমাজ অন্য কর্ত্তৃক বিজিত হইলেই যে তাহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, তাহা নহে। মূঢ় স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, অসভ্য ম্যাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল, বন্য তাতারীয়েরাও সুসভ্য চীনীয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল, অসভ্য বর্ব্বরজাতিয়েরা রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, পাণ্ড পালোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসাম দেশ অধিকার করিয়াছিল। যে যুদ্ধে হারে সে হীন, এটা গোঁয়ারের কথা, বিচক্ষণ লোকের কথা নয়।" (সামাজিক প্রবন্ধ ৩৫—৩৬ পৃঃ) "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"আরবদেশীয়রা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী, যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে তখনই সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরবেরা মিশর ও সিরিয়দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয়বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণ অধিকার করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিনশত বৎসর ধরিয়া যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই।" পুনশ্চ

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "যখন কোন প্রাচীন দেশের নিকটে নবঅভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থান করে, তখন প্রাচীনজাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্বাস্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি - প্রাচীন য়ুরোপে রোমকেরা, এসিয়ায় আরবা এবং তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যতদূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্পকাল মধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারশ্য, তুরস্ক এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষে বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৫ খৃঃ পূর্বাব্দে প্রথম রোমকদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ ১০ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্বরোমক বা গ্রীস সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক—যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ :—তাহাই ২৮৬ খৃঃ অব্দে উত্তরীয় বর্বর জাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম বর্বরবিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃঃ অব্দে আরবা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে ৫২৯ বৎসর পরে শাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দিন বা তাঁহার অনুচরেরা আরবা জাতীয় ছিলেন না। আরবেরা যেরূপ বিফল-যত্ন হইয়াছিল গজনীনগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারত অপহরণ করে তাহারা পাঠান বা আফগান। পাঠানেরা কখনই আরবা বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্বগত আরবা এবং তুরকীয়দের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরবা তুরকী এবং পাঠান এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।"—বিবিধ প্রবন্ধ—ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

আমার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, হিন্দু জাতির কোন দোষ নাই, ইহাদের সব ভাল। হিন্দু জাতির মধ্যে যে পরিমাণে স্বার্থ, দলাদলি, নিরুদ্যম প্রভৃতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সে পরিমাণে তাহাদের জাতীয় উন্নতির বাধা পড়িয়াছে। সে সকল দোষ উঠাইয়া দিন এবং তাহার স্থানে নিঃস্বার্থপরতা, ঐক্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চারিত করা হউক। জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি যে সকল দুর্নীতি স্থান পাইয়াছে, সে সকল উঠাইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের যৌবন যেমন চিরদিন থাকে না, কালক্রমে জরা বা বার্দ্ধক্য আসে, একটা জাতিরও অবস্থা সেরূপ চিরদিন সমান থাকে না, কালের প্রভাবে তাহার কখনও উন্নতি কখনও অবনতি হয়। অবনতি হইয়াছে বলিয়াই যে তাহার সামাজিক ব্যবস্থা সব খারাপ এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। পরাধীন জাতির পক্ষে বিজেতার অনুকরণ অনেকটা স্বাভাবিক। সে মনে করে বিজেতার আচার ব্যবহার যাহা কিছু সব ভাল। সে বিজেতার অনুরূপ বেশ পরিধান করিতে ইচ্ছা করে, মাতৃভাষার অনাদর করিয়া বিজেতার ভাষার আদর করে, ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়েও বিজেতার অনুকরণ করে। তাহার সমাজের ব্যবস্থাগুলি যদি বিজেতার সমাজে না থাকে সে মনে করে সেগুলি বড় খারাপ, সেগুলি নাই বলিয়াই বিজেতৃগণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেগুলি আছে বলিয়াই তাহাদের পরাধীনতা ঘটিয়াছে। এইরূপ বিকৃত দৃষ্টিতে ভাল ব্যবস্থাগুলিও খারাপ বলিয়া মনে হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম হিন্দুসমাজকে যে সুগভীর শান্তি দিয়াছে, আজ আমরা তাহার মূল্য বুঝিতে পারিতেছি না; যখন হারাইব তখন বুঝিব কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭

লীলার পীড়া দিন-দিন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তিন চারি দিন পরে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ডবল নিউমোনিয়া—জীবনের আশা অতি অল্প, কি হয় বলা যায় না।

মিঃ রায়ের আনন্দময় ভবনে শোক ও আতঙ্কের ছায়া দিন দিন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, লীলার জীবনের আশঙ্কায় সকলের চিত্তই কাতর ও সন্ত্রস্ত, দুর্ভাবনায় ও দুশ্চিন্তায় মিসেস রায়ের দর্পিত ও উদ্ধত প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি লীলার ঘরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিতেন না, নিজের ঘরেও শান্তি ছিল না; ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেবল নর্সদের নিকট হইতে তাহার সংবাদ লইয়া অধীর ভাবে তাঁহার সময় কাটিত। বীণাও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে সর্ব্বক্ষণ তাহার তত্ত্বাবধান করিত।

বাড়ির চাকর-দাসীরা তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ও ম্রিয়মাণ; তাহারা তাহার বিপদ কাটিয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা ও নানা দেবস্থানে মানসিক করিয়া বেড়াইতেছিল।

কান্ত তাহার অতি প্রিয় পরের চর্চ্চা, ও কলহ-বিবাদ ভুলিয়া, দিন-রাত্রি লীলার বিছানার পাশে পড়িয়া থাকিত। নর্সেরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সে ঘর হইতে বাহির করিতে পারিত না।

কিন্তু লীলার অসুখে যে সর্ব্বাপেক্ষা মনে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাকে সে সমস্ত গোপন করিয়া প্রতিদিনের মতই সহজ ভাবে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম বজায় রাখিয়া বেড়াইতে হইত।

সে কিরণ। সে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে বীণার নিকট হইতে লীলার সংবাদ জানিয়া যাইত। যে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় তাহার মন অশান্ত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, বাহিক ভাবে তাহা কিছুই প্রকাশ পাইত না। বীণা নিশ্চয় মনে জানিত, লীলার অসুখের ছলে কিরণ তাহারই জন্য এ বাড়ীতে আসে।

অবশেষে এক দিন লীলার জীবনের সঙ্কট মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীতে সকলেই সেদিন কি একটা অতর্কিত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন,—কখন কি হয়, কখন কি শুনিতে হয়, এইরূপ একটা ভীত-উৎকণ্ঠিত ভাব। সকলে নিঃশব্দে চলা-ফেরা করিতেছে,—জোরে কপাটি কহিবারও সাহস কাহারও ছিল না।

কিরণ সেদিন সব ভুলিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অনাহারে একাসনে কাটাইয়া দিল। লীলার জীবনের কোন আশা ছিল না, তবু সে এ কথা কিছুতেই মনে আনিতে পারিতেছিল না। লীলার মৃত্যু! অসম্ভব! এ কথা ভাবিতে গেলে একটা তীব্র বেদনা তাহার অন্তরে ঝড়ের মত ঠেলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত দিন একই ভাবে কাটিল। দিন-ভোরের কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত যুদ্ধের পর রাত্রি নয়টার সময় ডাক্তারেরা প্রকাশ করিলেন—তাহার সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে; এ যাত্রা সে বাঁচিয়া যাইবে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষান্ত আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে কিরণকে সে সংবাদ দিয়া আসিল। কিরণকে সে বড় ভাল বাসিত।

নিঃশব্দে কিরণের নয়ন হইতেও বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। গভীর কৃতজ্ঞতায় ও পরিপূর্ণ শান্তিতে সে যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

দীর্ঘ চল্লিশ দিনের পর লীলা প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রথমে তাহার কিছুই মনে পড়িল না,—শুধু সে বিহ্বলের মত চাহিয়া নর্সদের অচেনা মুখ ও গৃহের সাজ-সজ্জা দেখিতেছিল। একবার সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, কিরণ!

নিঃশব্দে নর্স আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল; কিরণ কে, তাহা সে জানে না; জানিলেও, ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ, রোগীর ঘরে নর্স ছাড়া আর কেহ যাইতে পারিবে না। সে শুধু লীলাকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া স্থির হইয়া থাকিতে অনুরোধ করিল। লীলাও গভীর ক্লান্তিতে আবার তখনি ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহার পর হইতে অৰ্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় লীলা প্রায়ই দেখিত,—সেদিনের রাত্রির সেই বিজন কক্ষ, মৃদু স্তিমিত আলোক, তাহার সেই রুগ্ন-শয্যার পাশে কিরণের সেই উদ্বেগ কাতর অবিচল স্থির গম্ভীর মুখ! লীলার শত দোষ সত্ত্বেও তাহার প্রতি কিরণের কি প্রবল স্নেহ; তাহাকে একটু সুস্থ রাখিতে, একটু আরামে রাখিতে তাহার কি একাগ্র প্রয়াস!

ধীরে ধীরে লীলা যতই সুস্থ হইতে লাগিল, ততই তাহার মনে কিরণকে দেখিবার ইচ্ছা অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইত, যেন তাহাদের বিচ্ছেদের পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে!

আর একজনের কথা মনে হইলে সে চঞ্চল হইয়া উঠিত। বেচারা অরুণ! সে হয় ত তাহার এ অসুখের কথা জানেও না! এত দিন তাহাকে না দেখিয়া সে হয় ত তাহাকে আর সব মেয়েদের মতই চঞ্চল ও খামখেয়ালি ভাবিতেছে! সে না গেলে অরুণের যে সবই নষ্ট হইয়া যাইবে! সে ছাড়া আর কে তাহাকে জীবন্ত ও উৎফুল্ল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে!

অরুণের কথা মনে পড়িলেই লীলা ভাবনায় উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিত; সে নিজের মনে জোর করিয়া বলিত, আমায় বাঁচতেই হবে; আমি কখনো মরবো না! যে কাজ আমি আরম্ভ করেছি, আমি না বাঁচলে সে কাজ শেষ করবে কে? এই ইচ্ছার প্রাবল্য ও মনের শক্তি তাহার দুর্ব্বল রুগ্ন শরীরে তড়িতের মত শক্তি সঞ্চার করিত, দিন দিন তাহার উন্নতি দ্রুততর হইতে লাগিল।

লীলার পীড়ার সময় আর এক জন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করা মিঃ রায়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি এই ঘটনা বাহিরে শান্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবু তাঁহার মুখে চিন্তা ও বেদনার ছায়া স্পষ্টই দেখা যাইত। কাছারী হইতে আসিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে লীলার শিয়রে বসিয়া থাকিতেন।

'তুমি আমাদের বড় ভাবিয়ে তুলেছিলে' লীলা সারিলে একদিন সকালে মিঃ রায় তাহার বিছানায় বসিয়া তাহার শীর্ণ হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার জন্য যে ভাবনা হয়েছিল! যা হোক্ এবার খুব শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠবে, কেমন? আমি শীঘ্রই টুরে দিতে বেরোব ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, তুমি গায়ে বেশ বল পেয়েছ! তখন একটা পার্টি দেওয়া যাবে। তোমার অসুখের সময় যে সব বন্ধু বান্ধব সর্ব্বদা খোঁজ খবর নেওয়া, দেখা-শোনা করেছেন, তাঁদের সব তুমি সে দিন নিজে আদর অভ্যর্থনা করবে—কি বল?'

লীলা এ কথায় বিশেষ তৃপ্তি পাইল না, বরং সে একটু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আবার তুমি এর মধ্যে বাইরে যাবে? কি যে তোমার এত কাজ, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না। তা কবে যাবে? ফিরতেই বা কতদিন লাগবে তোমার?

মিঃ রায় একটু হাসিয়া তাহার উৎসুক মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, কেন বল ত, এ খোঁজ হচ্ছে?

লীলা বলিল, তুমি হাসছ ; সত্যি বলছি—তুমি চলে গেলে বাড়ীতে একটুও ভাল লাগে না আমার। বল—কত দিনে ফিরবে ?

মিঃ রায়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি লীলার পাণ্ডুর গাল দুটি টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, কিছু ভেবো না! আমি যত শীগ্গির পারি, আমার এই ছোট্ট মা-টির কাছে ফিরে আসবো। আমিই কি তোমায় একলা ফেলে বেশি দিন থাকতে পারি ?

লীলা আর কোন উত্তর করিল না। সে ক্লান্ত ভাবে চোখ বুজিয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। মিঃ রায় ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে লীলা বলিল, বাবা, কিরণকে আজ সন্ধ্যার সময় একবার পাঠিয়ে দেবে ? ডাক্তার এখনো আমায় খালি-খালি একলা থাকতে বলে। আমি যদি আধ ঘণ্টা তার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলি, তাতে আমার এমন কি ক্ষতি হবে বল ত ?

মিঃ রায় কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, কি দরকার তোমার তাকে লিলি ? তুমি এখনো বড় দুর্ব্বল কি না, তাই ডাক্তার—

লীলা বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, না বাবা, না, আমি নিজে একবার তাকে দেখতে চাই। আমার গোটা কতক কথা বলবার আছে।

সে দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুমি একবারটি তাকে আধ ঘণ্টার জন্য পাঠিয়ে দেবে বল ? দেখো তুমি—আমার তাতে কিছুই ক্ষতি হবে না। দেবে তো ? বল !

এ আবদার নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা জজসাহেবের ছিল না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা ; আচ্ছা ; যদি সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে গিয়ে তার দেখা পাই তাহলে পাঠিয়ে দেব ! কিন্তু মনে রেখো—বেশি বকতে পাবে না, খবরদার !

২৮

সন্ধ্যার সময় একা বসিয়া লীলা কিরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখ তখনো একেবারে রক্তশূন্য, সাদা। প্রচুর রুক্ষ কালো চুল দুইটি বিনুনি করিয়া মাথার দুই ধারে জড়ানো। কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ মুখে চোখ দুটি যেন অসম্ভব বড় দেখাইতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কিরণ সেখানে প্রবেশ করিল। সেই মাত্র বিলিয়ার্ড টেবিলে মিঃ রায়ের কাছে লীলার কথা শুনিয়া সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে নাই।

মিঃ রায় বাললেন, লীলা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোমার যদি বিশেষ অসুবিধা না হয়, তা হলে বাড়ী যাবার সময় তার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও।

অসুবিধা! কিরণের মন সেই মুহূর্ত্তে লীলার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল! এই আহ্বানটির জন্য সে আজ কত দিন হইতে তৃষিত, পিপাসিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে!

সে খেলা ফেলিয়া সবিনয়ে বলিল, আমি এখনি তার কাছে যেতে চাই! যাব কি ?

মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন—এই দেখ ; এত তাড়া কিসের ? দুজনেই সমান ব্যস্তবাগীশ! তোমার সুবিধামত এক সময় গেলেই হবে! সে জন্য নিজের কাজকর্ম্ম বা আমোদ-আহ্লাদ নষ্ট করা কেন ?

আমার এখন কোন কাজ নেই ; আর তাকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পাওয়ার চেয়ে আমার কাছে আর অন্য কিছু আনন্দের বিষয় থাকতে পারে না।

কিরণ আর দাঁড়াইল না। নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার ভয় ছিল—বীণা জানিতে পারিলেই, তখনি তাহার সঙ্গে বাড়ী যাইবার আবদার জুড়িয়া বসিবে।

রোগীর ঘরের শেড-ঢাকা স্তিমিত আলোয় কিরণ সেই রাতের প্রায় দুই মাস পরে লীলাকে দেখিল,—যেন একটি ঝটিকা-তাড়িত ফুলের মত। শীর্ণ মুখ ; তবু সেই মুখে তাহার মনের অদম্য শক্তি ও তেজ পূর্ব্বের মতই অব্যাহত।

আজ আর তাহার কোন সাজসজ্জা ছিল না। তবু কিরণ মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিল—কি সুন্দর !

সে প্রথমে কোন কথা বলিতে পারিল না ; শুধু নিঃশব্দে তাহার ক্ষীণ শুভ্র হাতখানি ধরিয়া পাশে বসিল। তাহার এত কথা বলিবার ছিল, কতদিনকার কত বিষয় বলিবার জন্য মনে সঞ্চিত হইয়াছিল যে, সে সময় সে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

লীলা খুব সহজ ভাবেই তাহার অভ্যর্থনা করিল। তাহার ব্যবহারে বা কথায় কোনো সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা ছিল না।

সে বলিল—তুমি জান না—একটু জ্ঞান হবার পরই তোমায় দেখবার জন্য আমি কত ব্যস্ত হয়েছিলুম! কত দিন তোমায় ডেকেছি—ওরা কেউ আমার কথা শুনতো না—আজ বাবাকে কত করে বলায় তিনি তোমায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিরণ কোন কথা বলিল না—কেবল লীলার মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তুমি কথা বলছো না কেন? ভাবছো—বেশি বকলে আমার অসুখ হবে? তা নয়; আমি ত এখন বেশ ভালই আছি; খালি দুর্ব্বল বলে চলা-ফেরা করতে পারি না; তুমিও আমার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলে কিরণ?

লীলার রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে কিরণ সস্নেহে বলিল,—সে কথা কি আবার জিজ্ঞেস করতে হয় লীলা? কি করে যে আমার এ সব দিনগুলো কেটেছে, সে তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না।

লীলা প্রীত হইয়া প্রসন্নমুখে বলিল, সে আমি সব জানি। তোমার মত আমাকে আর কেউ এত ভালবাসে না,—এক বাবা ছাড়া আর কেউ নয়; তোমার কাছে কত কথাই যে আমার শোনবার আছে; বুঝেছ ত—কি বলছি আমি? বেচারা অরুণের কথাটাই শোনবার জন্য আমি আরো ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম! সে ভাল আছে ত? আমায় না দেখে সে কি ভাবছে?

সে ভালই আছে! তোমার জন্য সে মনে মনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আমি তাকে বলেছি—বীণা তার ছোট বোনের অসুখের জন্য বাড়ী ছেড়ে আসতে পারে না। সে তাই বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত মনে আছে।

আহা! বেচারা! কি মন্দ ভাগ্য নিয়েই সে এসেছে! তার কথা মনে হলে আমার যে কি কষ্ট হয়, সে তোমায় আর কি বোলবো! কত বড় মহৎ জীবনটা কি ভাবে নষ্ট হয়ে গেল! কি করে যে তার এই অবশিষ্ট দীর্ঘ জীবনটা কাটবে, আমি তাই ভাবি! তুমি যে ঠিক আমারি মত তাকে ভালবাস, আর তার ব্যর্থ জীবনের দুঃখের কথা আমার মতই মন দিয়ে অনুভব কর, এটা যে আমার কত ভাল লাগে। মানুষের দুঃখ কষ্ট মানুষ হয়ে বুঝবে না, কিম্বা বুঝতে চায় না, এরকম হৃদয়হীন লোকেদের আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।

কিরণের মন তখন লীলার জন্য ব্যস্ত, মানব-প্রকৃতির তথ্য আলোচনার দিকে তাহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সে নিজের মনের আবেগে পূর্ণ হইয়া লীলার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

লীলা আপন মনেই বলিতে লাগিল,—আমার এখন নিজেকে কি একলাই মনে হচ্ছে! আরো কত দিনে যে গায়ে একটু বল পাবো, বাইরে যেতে পারবো, তা কিছু বুঝতে পারছি না। দিন রাত একলা থেকে থেকে আর ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই মনে হয়, এ সময় যদি আমার একজন সঙ্গী কেউ থাকতো!

কিরণ তাহার ভাবে-ভরা দীপ্ত দুই চোখ লীলার মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল।—আমায় যদি বিশ্বাস হয়, তা হলে আমাকে তোমার সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গী বলে গ্রহণ করতে পারো। তাহার মনের সমস্ত কথা সে তাহার সেই দীপ্ত দৃষ্টির মধ্য দিয়া বুঝাইতে চাহিতেছিল।

লীলা কিন্তু তাহার কথা বা সে দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিল না। সে ভাবিল, কিরণ তাহাদের অখণ্ড বন্ধুত্বের কথাই বলিতেছে। সে মুগ্ধ হইয়া বলিল, তুমি চিরদিনই আমার প্রতি এত সদয়! কত অবাধ্যতা করেছি, কত দোষ করেছি তোমার কাছে, যখন মনে হয়, তখন ভাবি, আমি তোমার এত স্নেহ পাবার উপযুক্ত নই! তোমার বন্ধুত্ব পৃথিবীর মধ্যে আমার কাছে অমূল্য।

কিরণ ডাকিল—'লিলি'!

সে স্বরে চমকিয়া লীলা তাহার উচ্ছ্বাস বন্ধ করিয়া কিরণের মুখের দিকে চাহিল। তাহার উত্তেজিত মুখ ও জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখিয়া লীলা নিজেও অবাক্ হইয়া গেল।

কিরণ বলিল,—তুমি কি কোন দিনই আমার কথা বুঝবে না লিলি? দেখছো না আমি তোমাকে কত ভালবাসি! কেন শুধু বন্ধুত্ব বলে ভুল করছো? আর কি করে এ কথা তোমাকে বোঝাব বল?

লীলা পাংশুমুখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল! এ কথা যে সে কল্পনায়ও মনে আনিতে পারে না! এ কি অসম্ভব কথা আজ সে শুনিতেছে।

কিরণ বলিল, এখনো বোঝ নি? কত দিন কত

ভাবে তোমায় এ কথা জানাতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি কোন দিনই বুঝতে চাওনি! আমিও ভেবেছিলুম, যত দিন নিজ হতে না বুঝবে, তত দিন এ বিষয়ে কথা বলবার কোন দরকার হবে না। কিন্তু আর যে আমি চেপে রাখতে পাচ্ছি না লিলি? আজ তিন চার মাস দূরে থেকে আমার মনের ভাব আমি বেশ বুঝেছি। তুমি জানো না লিলি, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তোমায় ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব!

এবার আর বুঝিতে লীলার ভুল হইল না। কিরণের আবেগে উচ্ছ্বসিত আরক্তিম মুখ ও অনুরাগ-দীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে সে প্রথমটা সংজ্ঞাশূন্যের মত নিস্পন্দ হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল! তাহার দুর্ব্বল দেহে এ উত্তেজনা সহ্য হইল না। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিরণ ক্রমে নিজের মনের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া শান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। লীলার অবস্থা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। লীলার কম্পন তখনো থামে নাই। কিরণ ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল, মাপ করো লিলি! আজ তোমাকে এ কথা বলা আমার উচিত হয় নি। আমার আরো অপেক্ষা করা উচিত ছিল! এখন তুমি এ কথা ভুলে যাও! ভাল করে সেরে উঠলে, তখন আবার এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো—আমি তোমারই! আমার জীবন নিয়ে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো! যত দিন জীবন থাকবে —আমি তোমার।

লীলা কিন্তু কোন কথা শুনিল না; বিহ্বলের মত অবশ ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

যেমন শত বৎসরের অন্ধকার গৃহে একটি দীপ-শলাকা জ্বালাইলে তাহার সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়, কিরণের একটি স্পষ্ট কথায় তেমনি লীলা তাহার এত দিনের অজ্ঞাত মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়া ভয়ে বিস্ময়ে মুহ্যমান হইয়া রহিল!

আজ সে বুঝিল, সেও কিরণকে ভালবাসে। কিন্তু হায়! এখন—এখন যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! এখন বুঝিয়া আর ফল কি?

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া লীলা নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিল! কি অপূর্ব্ব আনন্দে, কি তীব্র বেদনায় তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে!

কত দিন কত ভাবে কিরণ তাহাকে এ কথা বুঝাইতে চাহিয়াছে! আজ একে একে সেই সব কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল! কেন সে বুঝিল না—কেন সে জানিল না? যখন সময় ছিল, তখন কেন সে বোঝে নাই! আর আজ? আজ যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! আজ বুঝিয়া ফল কি?

কিরণকে হারাইয়া কেন যে সে জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়াছিল, কেন যে তাহার মন নিশি-দিন কিরণের জন্য কাঁদিয়া ফিরিত, এত দিন পরে সে আজ তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল! মানুষে এমন অন্ধ হইয়া থাকিতে পারে? আজ সে বুঝিল, কিরণ তাহার অন্তর-বাহির জুড়িয়া রহিয়াছে—সেখানে আর কাহারও স্থান নাই। কিন্তু হায়! এত বিলম্বে! এখন যে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আর বুঝিয়া ফল কি?

যে কিরণকে সে নারীর প্রেমে অনাসক্ত ও অভেদ্য বলিয়া জানিত, সে তাহারই একান্ত অনুরক্ত! সংসারে যাহাকে করুণায়, শক্তিতে, স্নেহে, বীরত্বে অসাধারণ বলিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই তাহার বন্ধু, সখা—তাহার চির-নির্ভরস্থল কিরণ—সে তাহাকেই ভালবাসিয়া, তাহাদের মধ্যে বয়সের তারতম্যের প্রভেদ ঘুচাইয়া, তাহাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে? কেন সে বুঝিল না, কেন সে জানিল না—জানিলে কি সে কখনো অরুণের কাছে যাইত?

লীলার মনে পড়িল, এক দিন সে গাহিয়াছিল, 'যদি তুমি প্রাচীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার যৌবন বিসর্জ্জন দিতাম, যাহাতে তোমার বয়সের পার্থক্য আমাকে তোমা হইতে দূরে না রাখিতে পারে।' সেদিনও কিরণ এই গান শুনিয়া কি অনুরাগ-বিহ্বল চিত্তে তাহাকে তাহার মনের কথা জানাইতে চাহিয়াছিল! সে দিন লীলা কিছুই বোঝে নাই! ভবিষ্যতে যে এ গান তাহারই জীবনে সত্য হইবে, তাহা কে জানিত?

লীলা বিবেক-বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের তাড়নায় মর্ম্মাহত হৃদয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল।

তাহার জীবনের এই আনন্দময় স্বর্গের দ্বার সে নিজের

হাতে চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়াছে! প্রেম, আশা, আনন্দ, সবই জীবন হইতে চিরবিদায় দিয়া তাহাকে এখন কঠোর কর্ত্তব্যের পথই বরণ করিয়া লইতে হইবে! অন্ধ অসহায় অরুণ! তাহার দুঃখময় জীবনের প্রতি করুণা ও মমতায় স্বেচ্ছায় লীলা তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে! তাহার কাছে সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ—তাহাকে ত্যাগ করিবার কোন উপায় নাই!

যে সত্য এত দিন তাহার অজ্ঞাত ছিল, তাহা চিরদিনই অজ্ঞাত রহিল না কেন? লীলার সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত দুঃখ ও নিরাশায় ভাসাইতে কেনই বা আজ সে সত্য আত্মপ্রকাশ করিল? সে এখন কি করিবে? কিরণকেই বা কেমন করিয়া এত বড় আঘাত সে দিবে?

লীলা কোন দিকে কিছু কূল-কিনারা পাইল না, কেবল বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

তাহার এই কম্পিত ও নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া কিন্তু কিরণের মনে আশার সঞ্চার হইতেছিল। সে তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল,—আমি জানি, তুমি কোন দিন অরুণকে ভালবাস নি, তুমি নিজেকে ভুল বুঝেছিলে, নিজের মন তুমি জানতে না, তুমি আমাকে শুধু ভালবাস! আমারই তুমি! আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় নিয়ে যেতে পারবে না! লিলি! মুখ তোল! আমার দিকে ফিরে চাও!

লীলার এই উভয়-সঙ্কটের অবস্থা তাহার দুর্দ্দশার সাক্ষ্য দিতেছিল। সে মুখ তুলিতে পারিল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বুঝিতেছিল, তাহার অন্তর কত দুর্ব্বল। কিরণের চিরপ্রিয় সুন্দর মুখের দিকে চাহিলে সে বুঝি আর তাহার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিবে না।

শান্ত নীরব সন্ধ্যায় তাহারা দুইজনে কতক্ষণ এমনি নীরবে কাটাইল। মাঠ হইতে প্রত্যাগত ধেনুদলের ঘণ্টার শব্দ ও কুলায়-প্রত্যাগত পাখীদের সেদিনের বিদায়-গীতির কলতান কেবল মধ্যে মধ্যে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

কতক্ষণ পরে কিরণ চুপি চুপি ডাকিল—'লিলি'!

'কি—বল'?

'একবার বল—'তোমায় ভালবাসি!' একটিবার শুধু—একটিবার বল'!

লীলা বাণবিদ্ধের মত আবার বিছানায় লুটাইয়া পড়িল! 'কিরণ! এটা কি হাসি-তামাসার মত তুচ্ছ কথা'? সে আর কিছু বলিতে পারিল না। বলিবারই বা তাহার কি আছে? অরুণকে সে ছাড়িতে পারে না। কিরণের এই অগাধ প্রেম ও বিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয়কেই বা সে কিরূপে এত বড় আঘাত দিবে? নিজের দুঃখ ভুলিয়া কিরণের জন্যই তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল। কিরণ তাহা বুঝিয়া হৃষ্ট হইল।

তখন সে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অরুণের কথা তুলিয়া সে লীলাকে জানাইল, অরুণ তাহার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। সে লীলার স্থান গ্রহণ করিয়া প্রতি দিনই তাহার পাণ্ডুলিপি তাহাকে পড়িয়া শোনায়। আজকাল সে আর বড় একটা বাহিরে বেড়াইতে যায় না,—দিনের বেলা সর্ব্বক্ষণ তাহারই কাছে কাছে থাকে!

অরুণের কথা উঠিলে লীলা বালিশ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অত্যন্ত লজ্জিত ও অরুণ রাগে রঞ্জিত সে মুখ! সে কিরণের চোখের দিকে না চাহিয়াই অরুণের সম্বন্ধে কথা বলিতে উদ্যত হইল।

তখন নর্স আসিয়া জানাইল—কিরণের বিদায় লইবার সময় হইয়াছে। প্রথম দিনে এত বেশি কথা বলা উচিত নয়।

কিরণ সেদিনের মত বিদায় লইয়া স্বপ্নাভিভূতের মত গাড়িতে গিয়া উঠিল। নবীন অনুরাগে তাহার চক্ষু তখন জ্বলিতেছিল। (ক্রমশঃ)

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

(১)

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়

ভারতে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সর্ব্ব-প্রথম কোন সময়ে আগমন করেন, তাহা ঠিকমত নির্দ্ধারিত করা যায় না। যতদূর জানা যায়, দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে খৃষ্টানদের সর্ব্বপ্রথম অভ্যুদয় হয়। আরমাণীয়দের ইতিহাস আলোচনা করিয়া জানা যায়, তাঁহারাই প্রথম ঐ প্রদেশে আগমন করেন। ভারতে আগত প্রথম যে উল্লেখযোগ্য খৃষ্টান প্রদেশে সিউপান নামে একজন দেশীয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি মালাবার উপকূলে আগমন করেন। (১) অন্য একজন ঐতিহাসিক থমাসের ভারতে আগমন-কাল ২০১ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন। তিনি এন্টিয়ক্ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ভারতে আইসেন। এই এন্টিয়ক্ প্রদেশেই যিশু-

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা—বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খ্রীষ্টান উপাসনাগার

মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়, তিনি খ্রীষ্টের প্রেরিত শিষ্য থমাস্ (Apostle Thomas)। ইনি সেণ্ট টমাস্ নামেই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভাসকোডিগামার ভারতে আগমনের ঠিক ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮০ খৃষ্টাব্দে যখন ক্রানগানোর খ্রীষ্টের অনুগামিগণ প্রথম নিজেদের খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে এবেনাস্ (Abenus) নামক এক

(১) History of the Armenians in India.

আইরিশ মিশনারি লঙ্কা দ্বীপে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (২)

প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি ভারতে আগমন করেন, তাঁহার নাম সিল্যাক্স (Seylax)। ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথম চেষ্টা হইবার সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। (৩) থমাস্ ভারতের যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, তথায় বহু সংখ্যক দেশীয়কে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের করোমণ্ডলে তাঁহার কেন্দ্রস্থান ছিল।

এবৃসিনিয়ার খ্রীষ্টানামুচর বহু দিন ভারতবর্ষে থাকিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং বহু হিন্দুকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ও অনেকগুলি উপাসনাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৪)

মালাবারের মালিয়াপুর নামক স্থানে সেণ্ট্ টমাস্ দ্বারা প্রথমে একটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে, তথাকার রাজা প্রথমে এ কার্য্যে বাধা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি দৈববলে রাজার স্বৈরতা জয় করেন। ইনি তথাকার ব্রাহ্মণদের অত্যাচার হইতে হিন্দুদের রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। ফলে ব্রাহ্মণদের দ্বারা

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার ভিতরের দৃশ্য

সেণ্ট্ টমাসের পূর্ব্বেও ভারতে খৃষ্টান ছিল। প্যান্টোনাস (Pantonus) নামক এক শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি তাঁহার বহু পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া খৃষ্টান দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিকট হিব্রু ভাষায় লিখিত একখানা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিয়াছিলেন। ফ্রুমেণ্টাস (Frumentus) নামক একদল

তিনি হত হন। কথিত আছে, সেই সময় তিনি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য এক ছোট পর্ব্বতের কঠিন পাষাণময় বক্ষে নিজ পদাঙ্ক রাখিয়া যান। উহার মাপ লম্বে ষোল ইঞ্চ। উহা এখনও বিদ্যমান আছে।

পোর্টুগিজরা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া সেণ্ট্

(২) The History of India and of the British Empire in the East Vol. 1 by E. H. Nolan Ph. D. LL. D.

(৩) The Good Old days of Honourable John

(৪) Promotion of Learning in India by European Settlers. And

The History of India and The British Empire

টমাসের খৃষ্টান নামে নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহারা সেই সময় এ দেশে বহু খৃষ্টান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে মালবারে খৃষ্টানদের প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, সেণ্ট্ টমাস্ দক্ষিণ ভারতে মোট ৩৩০০ খৃষ্টান উপাসনাগার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পোর্টুগালের রাজা তৃতীয় জনের আদেশে, অনুসন্ধান দ্বারা মালিয়াপুরে একটি ভগ্ন ভজনালয়ের মধ্যে সেণ্ট্ টমাসের সমাধি আবিষ্কৃত হয়। তথায় কতকগুলি কঙ্কালাদি পাওয়া যায়। উহা গোয়া নগরীতে লইয়া যাইয়া, তাহার স্মৃতি রক্ষার্থ যে মন্দির নির্ম্মিত হয়, তথায় রক্ষিত হয়। (৫)

বঙ্গেও আরমাণীয়দের আগমন বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছিল। জব্ চারনক কলিকাতায় আসিবার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে, তাহারা চুঁচুড়াতে বসবাস করিয়াছিল। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত বর্ত্তমান আরমাণী গির্জ্জার পূর্ব্বদিকে প্রায় এক শত গজ দক্ষিণে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ছোট উপাসনাগারে তাঁহারা ভজনা করিতেন। (৬)

বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন খৃষ্ট ধর্ম্মোপাসনার মন্দির হুগলীর ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ (৭)। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে (৮) পোর্টুগীজদের বাঙ্গলায় আগমনের পর, গৌড়ের রাজার প্রীতি উৎপাদনান্তর পাদরি ডি ক্রুজ্ (De Cruz) এর অনুরোধে বাদশা শাহজেহান ৭৭৭ একার নিষ্কর ভূমি পোর্টুগীজদিগের গির্জ্জা নির্ম্মাণার্থ দান করিয়াছিলেন। এই গির্জ্জা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের সময়, অর্থাৎ যে বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দত্ত হয়, সেই বৎসর প্রথম নির্ম্মিত হয়। পরে মোগল কর্ত্তৃক হুগলী আক্রমণের সময়, সম্ভবতঃ ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে উহা বিধ্বস্ত হয় এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মিঃ সোতোর (Mr. Soto) দ্বারা উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। বাঙ্গলায় ইয়োরোপীয় নির্ম্মিত অট্টালিকার মধ্যেও ইহাই প্রথম। (৯)

এই হিন্দু মন্দিরটি খ্রীষ্ট উপাসনাগারে পরিণত করা হইয়াছিল—শ্রীরামপুর

Notes on the Right bank of the Hooghly নামক নিবন্ধের লেখক বলিয়াছেন, আরমাণীয়েরাই ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম চুঁচুড়ায় গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। এ কথা ঠিক নহে। ওলন্দাজদের নির্ম্মিত একটি অষ্টভুজ গির্জ্জা এখনও চুঁচুড়ায় বিদ্যমান আছে।

কলিকাতায় প্রথম যে গির্জ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে জব্‌চার্ণক কলিকাতায় আসিবার পর আর্ম্মেনিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানদের দ্বারা ১০ বিঘা জমির উপর খড় ও মাদুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে হুগলী ও অন্যান্য স্থানে এই সম্প্রদায়ের বহু খ্রীষ্টান অবস্থান

(৫) Cassell's Illustrated History of India Vol. II, by James Grant.

(৬) Job Charnock the founder of Calcutta and the Armenian Controversy.—The Calcutta Review 1915.

(৭) Calcutta Review, Vol. IV, 1845

(৮) কেহ কেহ বলেন ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ।

(৯) The Portuguese in North India—The Calcutta Review, Vol. V. 1846.

করিতেন। তৎপরে টেঞ্চ (Mrs. Tench) নাম্নী এক মহিলা ১৭০০৲ টাকা ব্যয়ে, একটি ইষ্টক নির্ম্মিত গির্জ্জা প্রস্তুত করেন। (১০) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সেন্ট্ য়্যান্ নামে যে গির্জ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাই উক্ত উপাসনা মন্দির কি না জানি না। উহা বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পশ্চিম পুরাতন দুর্গের পূর্ব্বে ছিল।

কলিকাতায় ইংরাজদিগের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে, একটি বৃহদায়তন সুন্দর চূড়া-

চন্দননগরের পুরাতন গির্জ্জা ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত

বিশিষ্ট গির্জ্জা প্রস্তুত হয়। উহা ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত চাঁদা ও বোর্ট অব্ ডিরেক্টরের ১০০০ পাউণ্ড চাঁদায় নির্ম্মিত হয়। অষ্টাদশ বৎসর পরে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে উহা ভূপতিত হয়। এই ঘটনার ত্রয়োদশ বৎসর পরে কোম্পানির আদেশে উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজের গোলায় পুনরায় ধরাশায়ী হয়। কোম্পানির তদানিন্তন অট্টালিকা-সমূহের তালিকায় উহার মূল্য ধরা ছিল ৫০০০ পাউণ্ড। মুরশিদাবাদের সিংহাসনে ক্লাইব কর্ত্তৃক নব অধিষ্ঠিত নবাব পর বৎসর এই মুদ্রা প্রদান করেন। উহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রাজা নবকৃষ্ণ প্রদত্ত ৩০০০ পাউণ্ড মূল্যের জমীর উপর উক্ত টাকা এবং লটারি ও অন্যরূপে সংগৃহীত টাকা হইতে এক গির্জ্জা গঠিত হয়। উহাই সেণ্ট্ জন্ চার্চ্চ নামে অভিহিত। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সমাধা হয়। উহাই তৎকালে রাজকীয় উপাসনা মন্দির ছিল। গভর্ণর ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য স্বতন্ত্র মখমল মণ্ডিত আসবাব প্রভৃতির দ্বারা উহা সজ্জিত থাকিত। এই ভজনালয়-প্রাঙ্গণেই কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের সমাধি আছে। (১১) কলিকাতার সেণ্ট পল্ ক্যাথিড্রাল বহু কাল পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এ দেশে বহু সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। ডেনমার্কের রাজা ৪র্থ ফ্রেডরিক কর্ত্তৃক ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম

(১০) The Portuguese in North India—The Calcutta Review, Vol. V. 1846.

(১১) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I.

প্রোটেষ্টাণ্ট্ মিশনরি প্রেরিত হয়। যে ব্যক্তি প্রথম আইসেন তাঁহার নাম জিগেন্‌বাল্গ (Ziegenbalg)। তিনি প্রথমে করোমণ্ডেলের ট্রাণ্‌কোয়েবার নামক দিনেমার উপনিবেশে আগমন করেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে একজন ভারতীয়কে খৃষ্টান করিয়া তিনি ইয়োরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (১২) ইংলণ্ড হইতে ভারতে মিশনারি পাঠাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হন মিঃ উইলবারফোর্স (Mr. Wilberforce)। লওলা কর্ত্তৃক গঠিত জেসুট সম্প্রদায়ের জেভিয়ার (Mork Francis Navier) প্রথম ভারতে আসিয়া জেসুট মিশন্ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মোগল দরবারে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল। আকবরের অনুমতি লইয়া লাহোরে তাঁহারা একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে শাহজেহানের আদেশে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। (১৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও চন্দননগরে জেসুটদের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং উহাদের একটি গির্জ্জাও ছিল। ইহার পূর্ব্বে চন্দননগরের দুর্গ মধ্যে সেণ্ট্ লুই নামে একটি দুর্গ ছিল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বত মিশনের রোম্যান ক্যাথলিক যাজকগণের প্রতিষ্ঠিত একটি গির্জ্জা এখনও গঙ্গার ধারে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাদরি কেরি ও তাঁহার হিন্দু পণ্ডিত

প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ মিশনারি, যিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন, তাঁহার নাম কির্নাণ্ডার (John Zachariah Kiernander) 'Kiernandr the Swede' নামেও তাঁহাকে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। ইনি প্রসিদ্ধ মিশনারি কেরির ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সরকারি যাজক-রূপে আগমন করেন। (১৪) ক্লার্ক (Mr. Clarke) নামক একজন প্রসিদ্ধ মিশনারি এই সময় আসিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ বিশপ মিড্‌লটন্ (Thomas Fanshawe Middleton D. D.) তৎপরে আগমন করেন।

বঙ্গ দেশীয় খ্রীষ্টান।

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সহিত বাঙ্গালায় দেশীয় লোকেদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের কথা জানা যায়। তৎপূর্ব্বে এখানে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

(১২) Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol I.

(১৩) The Portuguese in north India—The Calcutta Review, Vol. V, 1840.

(১৪) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol.—I.

প্রথম যে বাঙ্গালী হিন্দু খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ পাল। সে ব্যক্তি শ্রীরামপুরের অধিবাসী; জাতিতে সূত্রধর। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীরামপুরের গভর্ণর এবং বহু পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ ও হিন্দু মুসলমানের সমক্ষে জাহ্নবীতীরে একটি ঘাটে নির্ব্বিঘ্নে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মিঃ কেরি এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গঙ্গাতীরে এই দীক্ষা কার্য্য সাধিত হওয়ায় পাছে কেহ মনে করেন, গঙ্গার পবিত্রতা মনে করিয়াই এই স্থান মনোনীত হইয়াছে, সেই কারণ কেরি সাহেব জনতাকে সম্বোধন করিয়া তখনই বলিয়াছিলেন, গঙ্গার পবিত্রতা তাঁহারা স্বীকার করেন না, উহার জলকে সাধারণ জল বলিয়াই তাঁহারা জানেন। ঐ দিন বৈকালে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত কার্য্যই বাঙ্গালা ভাষায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ কার্য্যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার ইহাই প্রথম। কৃষ্ণের স্ত্রী কন্যা এবং গোলোক নামক আর এক ব্যক্তিও এই সঙ্গে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন।

এই ব্যাপারে শ্রীরামপুরে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। পরদিন প্রাতে প্রায় দুই সহস্র লোক কৃষ্ণ ও গোলোকের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, উহাদের ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যায়। উহাদের নামে কোন অভিযোগ ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের কার্য্যের বরং প্রশংসা করিয়া জনতাকে বিক্ষিপ্ত হইতে আদেশ করেন। সাবধানতার জন্য স্থানীয় গভর্ণর—কৃষ্ণ, গোলোক ও মিশনারিদের বাটীতে পাহারার ব্যবস্থা করেন।

পর বৎসর জয়মণি নাম্নী কৃষ্ণের এক শ্যালিকা এবং গোলোকের স্ত্রী কমল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তৎপরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম রবিবারে পীতাম্বর সিংহ নামক একজন বাইট্ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ কায়স্থ খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পর বৎসর আর তিন জন কায়স্থ ও একজন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টান হন। তন্মধ্যে শ্যামদাস নামক এক ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কয়েক মাস পরে তাঁহার বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে যাইলে, তথায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ভাগবৎ নামক কোন লোক খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাহার স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মত্যাগের দিন গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও স্ত্রী তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। এই সময় সুন্দরবনের অন্তর্গত দেহাটী নামক স্থানের কৃষ্ণপ্রসাদ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি নিজ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উহা পদদলিত করেন। এই উপবীত হস্তে লইয়া শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ মিশনারি ওয়ার্ড সাহেব বলিয়াছিলেন,—"ইহাপেক্ষা মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন রোমের কোন ধর্ম্ম-মন্দিরেও নাই।"

প্রথম দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে বিবাহ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরেই সম্পন্ন হয়। উক্ত ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব খৃষ্টান কৃষ্ণপ্রসাদের সহিত সূত্রধর-বংশোদ্ভব কৃষ্ণের কন্যার খৃষ্ট ধর্ম্মমতে বিবাহ হয়। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে একটি বৃক্ষতলে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বিবাহ

শ্রীরামপুরের পুরাতন দিনেমার উপাসনা-মন্দির

সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সমস্ত বঙ্গভাষায় সম্পন্ন হয়। বর কন্যা যথারীতি এগ্রিমেণ্ট পত্র স্বাক্ষরিত করেন এবং সমবেত মিশনারিগণ সাক্ষী স্বরূপ তাহাতে সহি করেন। বিবাহ উপলক্ষে কৃষ্ণের বাটীতে যে সান্ধ্য-ভোজ হয়, তাহা দেশীয় প্রথাতেই ব্যবস্থিত হইয়াছিল এবং পাদরিরা এই উপলক্ষেই দেশীয় খৃষ্টানের বাটীতে প্রথম ভোজন করেন।

এই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও আইনের চক্ষে ইহার সারবত্তা সম্বন্ধে মিশনারিদের বিশেষ সন্দেহ ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ বিবাহ আইন-সঙ্গত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

শ্রীরামপুরেই প্রথম দেশীয় খৃষ্টানের গোর হয়। খৃষ্টান পদ্ধতিতে যে ব্যক্তির প্রথম সমাধি দেওয়া হয়, তাহার নাম গোকুল দাস। এই লোকটি মৃত্যুর মাত্র কয়েক

গোর দেওয়া হয়, গোকুলের মৃত্যুর মাত্র চারি দিন পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের মধ্যে গোরস্থানের জন্ত ঐ স্থান খরিদ করা হয়। গোরের জন্য শবাধারটি কৃষ্ণ নিজ ব্যয়ে শ্বেত মসলিন্ দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। (১৫)

হিন্দুদের খৃষ্টান করা বিষয়ে মিশনারিরা শীঘ্রই যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সাফল্য দেখিয়া কোম্পানী কলিকাতা একদল প্রতিনিধি পাঠাইয়া কোম্পানীর নামে ৫০০৲ টাকা পূজা দিয়াছিলেন। (১৬) তাহার সংখ্যা পাওয়া যায় না। এই যুগে মুসলমানদের খ্রীষ্টান হওয়ার কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, যশোহর হইতে তিন জন মুসলমান খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে দেশীয় লোককে খৃষ্টান করা বিষয়ে এবং খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিতে রেভারেণ্ড কেরি, মার্শম্যান্ ও ওয়ার্ডের নাম প্রথম আসিয়া পড়ে। কেরি ১৭৯৩ এবং মার্শম্যান্ ও ওয়ার্ড্ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে
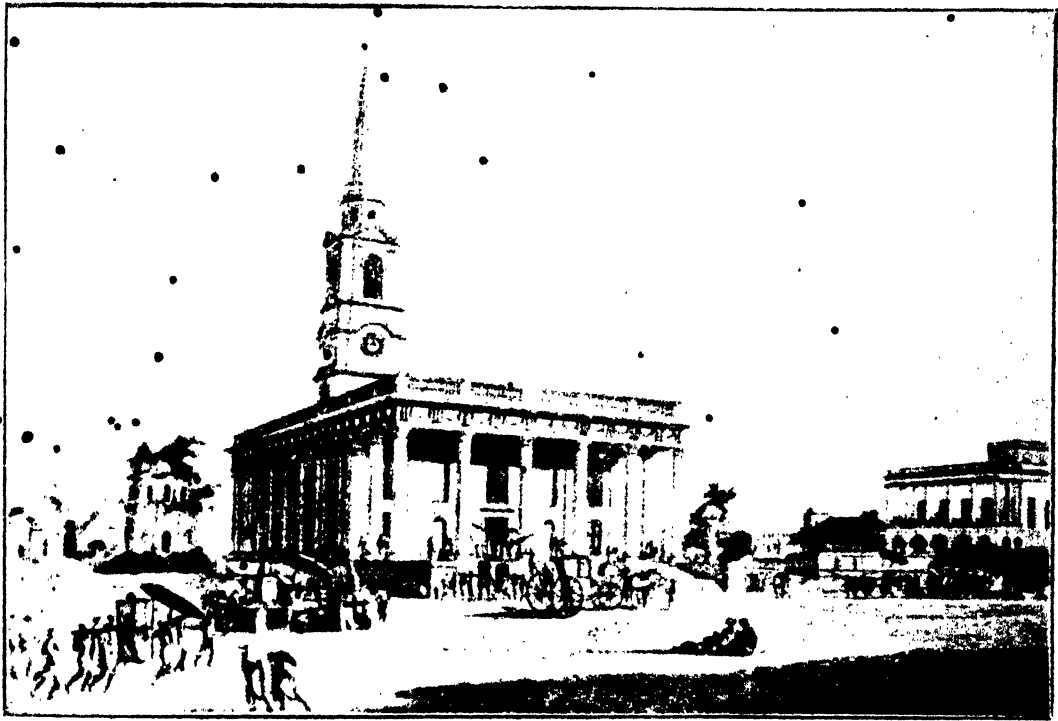
কলিকাতার সেণ্টজন গির্জ্জা — ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম আরম্ভ হইতে কতিপয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় মোট কত হিন্দু খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা বলা যায় না; তবে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় খৃষ্টানের সংখ্যা মোট ১৩১৩৮ ছিল। তন্মধ্যে দেশীয় খৃষ্টান কতগুলি ছিল, বাঙ্গালায় আগমন করেন। হেনরি মার্টিন নামক আর একজন প্রসিদ্ধ মিশনারি ছিলেন। শ্রীরামপুর ইঁহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইলেও, ধর্ম্ম-প্রচারের জন্ত তাঁহারা বহু স্থানে যাইয়া বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে তাঁহারা বাঙ্গালা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন এবং গ্রন্থাদি তর্জ্জমা করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। তাঁহারা শুধু লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সে সময়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। দেশীয় লোকেদের শ্রবণার্থ তাঁহারাই বাঙ্গলা ভাষায় বাইবেলের বক্তৃতা প্রথম আরম্ভ

(১৫) Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol. I. বাঙ্গলায় প্রথম দেশীয় খৃষ্টানদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থ হইতে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

(১৬) Life and Times of Carey, Marshman and Ward Vol. I.

করেন। কলিকাতায় বৌবাজারে যে স্থানে এক্ষণে গির্জ্জা আছে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ৭২৫০৲ টাকা মূল্যে ঐ জমি খণ্ড ক্রয় করিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহারা উহাতে একটি বাঙ্গালা নির্ম্মিত করেন। পরে ৩২০০ পাউণ্ড ব্যয়ে গির্জ্জা প্রস্তুত হয় এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ডাক্তার কেরি কর্তৃক উহার দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

তাঁহাদের উদ্দেশ্যের মূলে যাহাই থাকুক, আজিকার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এই বিস্তৃতির মূলে যে তাঁহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম বিশেষভাবে নিহিত আছে, ইহা অস্বীকার তেলেঙ্গা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি অগ্নিসাৎ হওয়ায় তাঁহারা অধিক ক্ষতি বোধ করিয়াছিলেন। (১৭) বঙ্গ ভাষার প্রথম সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" কেরি ও মার্শম্যানের উদ্যোগে শেষোক্ত ব্যক্তির সম্পাদকতায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। (১৮) দেশীয় বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে তাঁহারা অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পর বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে তাঁহারা ১৫টিরও অধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মিলন মন্দির
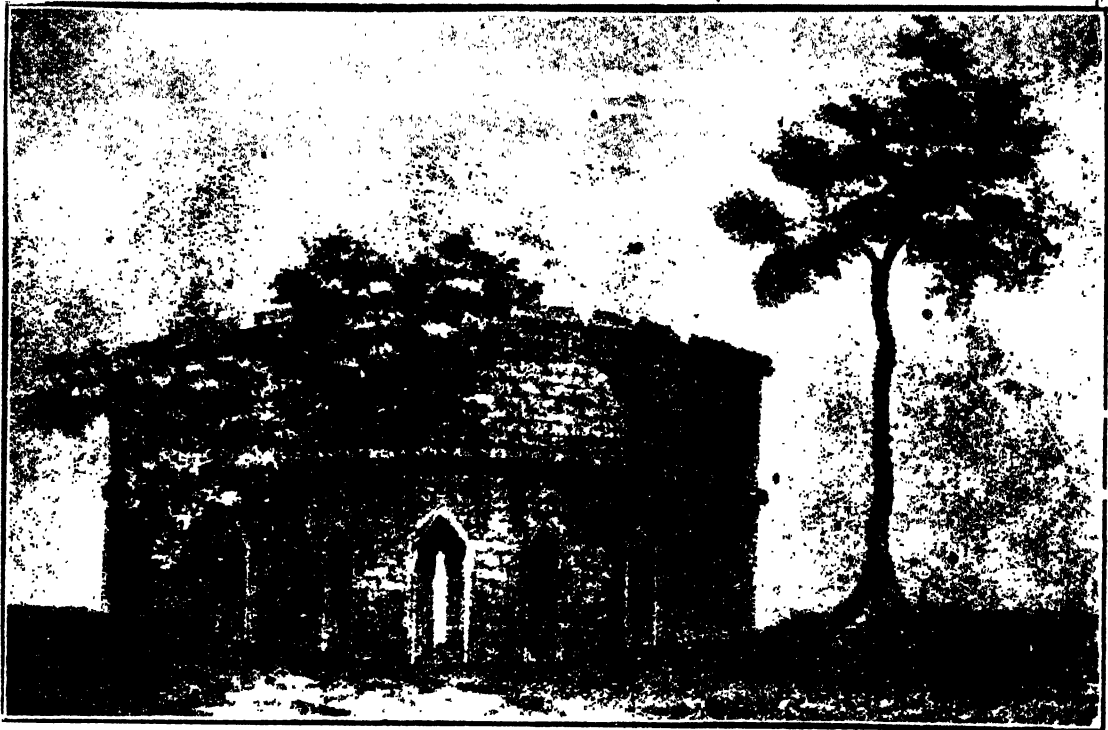
শ্রীরামপুরে এই বাটীতে কেরি, মার্শম্যান ওয়ার্ড, হেনরি মার্টিন প্রভৃতি মিশনারীগণ উপাসনা ও পরামর্শাদির জন্য মিলিত হইতেন।

করিবার উপায় নাই। ডাক্তার কেরির দ্বারা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বিপুল অর্থ ব্যয়ে নিউটেষ্টামেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ২০০০ খণ্ড প্রকাশ করিতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড। তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ ভস্মসাৎ হইয়া প্রায় ১০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হয়। কিন্তু ইহার সহিত মিঃ ওয়ার্ডের চেষ্টায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এক শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অনেকগুলি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট কথা—বাঙ্গালায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে শ্রীরাম

(১৭) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I.

(১৮) Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থে "দিগ্দর্শন"কে বাঙ্গলার প্রথম সাময়িক পত্র বলিয়াছেন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রকাশিত বাঙ্গলা সাময়িক পত্রের তালিকা পুস্তকেও

পুরের এই তিন জন মিশনারিদের মত অন্য কাহারও নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতে সর্ব্বপ্রথম যে পুস্তক ছাপা হয়, তাহা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম বিষয়ক একখানি পুস্তক। উহা দক্ষিণ ভারতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রায় ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে মিশনারীদের দ্বারাই প্রথম মাদ্রাজে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। (১৯) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

(১৯) Promotion of Learning in India by European Settlers.

মিলন-পূর্ণিমা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১·)

নিত্যরঞ্জনের সেবাসঙ্ঘ হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া সৌরীন স্থির করিল, সে মফঃস্বলে গিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কাজ আরম্ভ করিবে। সে সেবাসঙ্ঘ আফিসে শুনিয়াছিল, চট্টগ্রামে একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা চলিতেছে এবং ময়মনসিংহেও নিত্যরঞ্জনের দল খুব প্রবল নয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই দুই স্থানের মধ্যে ময়মনসিংহ বাছিয়া লইল।

ময়মনসিংহে গিয়া সে প্রথমে একটা সভা করিয়া বক্তৃতা করিল। তার পর তার কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সহানুভূতি সংগ্রহ করিল। সৌরীনের মুখে তার উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির কথা শুনিয়া অনেকেই তাহাকে সাধুবাদ করিলেন এবং কেহ কেহ অর্থসাহায্যও করিলেন।

প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত কয়েকটি কর্ম্মী লইয়া সৌরীন সেবামণ্ডলী স্থাপন করিল। একজন ভদ্রলোক সেবামণ্ডলীর জন্য তাঁর একখানা বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। সেখানে বসিয়া ধীরে ধীরে পরম উৎসাহে সৌরীন কাজের সূত্রপাত করিয়া লইল।

ময়মনসিংহ সহরের উপকণ্ঠবর্ত্তী তিনটি গ্রামে তিনটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৌরীন ও সেবামণ্ডলীর অন্যান্য সভ্য পর্য্যায়ক্রমে গিয়া সেই সব পাঠশালায় পড়াইতে লাগিল। ক্রমে পাঠশালার শ্রীবৃদ্ধি হইল, ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিল, সৌরীন উৎফুল্ল হইল।

পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাদান করা ছাড়া সৌরীনের আর একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল। এই পাঠশালা উপলক্ষে তারা গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসী লোকদিগের সহিত পরিচিত হইবে, তাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইয়া, তাদের জীবনের প্রকৃত অভাব ও ত্রুটির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিবে—ইহাই ছিল সৌরীনের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইল।

এক বৎসর পাঠশালার কাজ করিয়া সৌরীন যে অভিজ্ঞতা লাভ করিল, তার ফলে সৌরীন লোকাল বোর্ডের সাহায্যে গ্রামে ইঁদারা কাটাইয়া জলাভাব দূর করিল, ঔষধ বিতরণ এবং চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া লোকের স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করিল। একবার ভীষণ ওলাউঠার মড়ক যখন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন এ তিনটি গ্রাম প্রায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইল। কারণ সেই সময় সেবা-মণ্ডলী গ্রামবাসীদের প্রত্যেককে সর্ব্ববিধ সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিল। তার পর প্রত্যেক গ্রামে মণ্ডলীর ছয়জন সভ্যের তত্ত্বাবধানে যুবকদের দ্বারা দল বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সবার উপর তাহারা নজর রাখিতে লাগিল,—কেহ কোনও রকমে যাহাতে সাবধানতার বিধি লঙ্ঘন করিতে না পারে। এই রকম কাজ করিয়া দুই বৎসরে তাহারা স্থানীয় লোকের প্রভূত হিতসাধন করিল।

এই কষ্টসাধ্য কার্য্যে সৌরীনের অর্থবল ক্ষীণ হইয়া আসিল, তার আশ্রমবাসীর সংখ্যা ভয়ানক কম হইয়া গেল। তখন সৌরীনকেও তার মণ্ডলীর কাজ ছাড়িয়া চাঁদা সংগ্রহে নিযুক্ত হইতে হইল। ইহাতে সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপচয় হইল, কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হইল না। অতি কষ্টে কোনও মতে কাজ চলিতে লাগিল। বাড়ী বাড়ী মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমবাসীদের কোনও মতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। সেবাকার্য্য সম্যকরূপে পরিচালন করিবার উপায় হয় না।

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া দ্বারে দ্বারে সকল মান বিসর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া সৌরীন তৃতীয় বৎসর কার্য্য চালাইল। তার কার্য্যের প্রসার কতকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে হইল। সে আশা করিয়াছিল যে, তিনটি গ্রাম হইতে তার কাজ ছড়াইয়া ক্রমে অন্য গ্রামে সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে দেখিতে পাইল, কাজে ঠিক উল্টা দাঁড়াইল। প্রথম ঝোঁকে লোকে তাহাকে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু ঝোঁক কাটিয়া গেলে, তাদের সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা কমিয়া আসিল—তার কাজ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল।

যখন চাঁদার টাকায় আর কাজ চলে না, তখন সৌরীন ভাবিয়া এক উপায় স্থির করিল। সে ভাবিল যে, সে যে কাজ করিতেছে, লোকে তাহা বিশেষ অনুভব করিতে পারিতেছে না। তিনটি নিভৃত পল্লীর নিতান্ত অবনত শ্রমজীবীদের ভিতর সে সামান্য একটু সুবিধা, সামান্য একটু আনন্দ ও সামান্য একটু স্বচ্ছন্দতা আনিয়াছে মাত্র। কাজ করিতে গিয়া সে দেখিয়াছে যে, এইটুকু সফলতা অর্জ্জন করিতে তার কি বিপুল চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু যারা কোনও দিন এই প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কার্য্য করে নাই, তাদের কাছে এ কাজের প্রকাণ্ডত্ব দেখাইবার তার কোনও আয়োজন নাই। যে দিক দিয়া এ কাজ খুব বড়, সে দিকটা বড় করিয়া লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া বলা তার কার্য্য নয়। এ কাজের ভিতর যে তার কর্ম্মীদের প্রকাণ্ড ত্যাগ ও অধ্যবসায় আছে, অশেষ ক্ষুদ্র বিঘ্নের সঙ্গে অক্লান্ত সংগ্রামে যে সাহস ও শৌর্য্যের পরিচয় আছে, সে কথা সৌরীন নিজেও কোনও দিন প্রকাশ করিয়া বলে নাই, তার দলের কাহাকেও বলিতে দেয় নাই।

সে বিবেচনা করিয়া দেখিল যে, এখন পর্য্যন্ত সে এমন কোনও একটা খুব দৃশ্যমান বড় কাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই, যাহা লোকে সাদা চোখে দেখিতে পায়। দুই বৎসর ধরিয়া উপদেশ দিয়া, বার বার নিজে লোককে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিয়া, সে এক গ্রামের মুচিদের ইহা বুঝাইয়াছে যে তাদের পানীয় জল যে ইঁদারা হইতে তারা আনে, তার পাশে বসিয়া কাপড় কাচা বা অন্য কোনও নোংরা কাজ করা বিপদসঙ্কুল। এখন তারা ইঁদারা হইতে তফাতে বসিয়া সে সব কাজ করে এবং বাড়ীর ভিতরও নোংরা জল প্রভৃতি যথাসম্ভব দূরে রাখে। এ তো আঙুল দিয়া দেখাইবার মত একটা জিনিস নয়, আর লোকের চক্ষে একটা বড় কাজ বলিয়া দাঁড় করাইবার মত কিছু নয়। এমনি ছোট ছোট কাজ সে অনেক করিয়াছে, কিন্তু তার কোনটিই বিশেষ চমক লাগাইয়া দিবার মত নয়—লোকের কাছে একটা বড় কাজ বলিয়া দেখাইবার মত কিছুই নয়। আর ছোট ছোট কাজকে রঙ চড়াইয়া চটকদার করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার বিদ্যা বা আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। কাজেই লোকে যে তার কাজটা খুব বড় করিয়া দেখিয়া মুক্ত-হস্তে অর্থসাহায্য করে না, সে কিছু আশ্চর্য্য নয়। যদি সে ক্রমে এমন একটা কিছু করিয়া তুলিতে পারে, যাতে সবাই বুঝিতে পারিবে যে সত্য সত্য সে একটা প্রকাণ্ড লোকহিতের সূত্রপাত করিয়াছে, তখন তারা তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে।

সে ভাবিতে বসিল—কি উপায়ে এমন একটা কিছু করা যায়, যার হিতকারিতা লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে। একটা কথা সে অনেক দিন হইতেই ভাবিতেছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। একটি গ্রামে প্রায় চল্লিশ ঘর মুচি বাস করে—তাদের দুরবস্থার অন্ত নাই। তারা ঢোল বাজায়, কেউ কেউ সস্তা চটি জুতা বানায়, আর বেশীর ভাগ লোকে ভিক্ষা করিয়া খায়। সে দেখিতে পাইল যে, ময়মনসিংহ নগরে কলিকাতা হইতে অনেক জুতার আমদানী হয়; একটু শিক্ষা ও সংরক্ষণ এবং মূলধনের সহায়তা পাইলেই, এই মুচিরাই এ সমস্ত জুতা তৈয়ার করিতে পারে। তাহাতে তাহারা বেশ স্বচ্ছন্দে খাইয়া বাঁচিতে পারে। আর একটি গ্রামে যে সকল জোলা বাস করে, তাহাদের সমবায়-বদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইতে

পারিলে, তারা অন্নবস্ত্রের কষ্ট পায় না। কোনও রকম উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্য না লইয়াও তারা বেশ স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তাদের অভাব ঘুচে না, কেন না, প্রথমতঃ, তারা মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত। দ্বিতীয়তঃ, তাদের এমন মূলধন নাই যে, তারা সমস্তক্ষণ কাজ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, কাপড় তৈয়ার হইলেই তাদের বেচিবার চেষ্টায় বাহির হইতে হয় এবং নিতান্ত অভাবের দায়ে অল্প দামে বেচিতে হয়।

সে স্থির করিয়াছিল যে, উভয় স্থলেই অনায়াসে গ্রামবাসীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যদি এই শ্রমজীবীরা মিলিয়া এমন একটা সমবায় বা কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করিতে পারে, যাহা তাহাদিগকে আবশ্যক অনুসারে কাঁচা মাল সরবরাহ করিবে এবং মাল প্রস্তুত হওয়া মাত্র তাহা কিনিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিবে, তবে ইহারা সারা বৎসর ভাল কাজ করিয়া পরম সুখে বাস করিতে পারে। এই স্থির করিয়া, সে তিন বৎসর ধরিয়া কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীদের সহায়তায় ইহাদের ভিতর সেই প্রকার সমবায় গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তিন বৎসরের চেষ্টায়ও সে ইহাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া উঠিতে পারে নাই। কো-অপারেটিভ সোসাইটি করিবার জন্য যে শিক্ষা ও মনোভাবের প্রয়োজন, তাহা গড়িয়া তুলিতে আরও অনেক দিন লাগিবে, এই স্থির করিয়া সে নিরাশভাবে এই চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, অন্য দিক দিয়া ইহাদের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছে।

এখন তার মনে হইল যে, এই কাজই তার কর্ত্তব্য। এ কাজ যদি সে ভাল রকম গাড়িয়া তুলিতে পারে, তবে লোকের চোখে ইহার উপকারিতা অনায়াসে প্রকাশ হইবে। আর তাহাতে ইহাদের খুব বৃহৎ হিতসাধন করা হইবে। কেন না, ইহাতে ক্ষুধিত, দরিদ্র গ্রামবাসীর পেটে অন্ন পড়িবে, এবং সমবায় গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক উন্নতি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা অসম্ভব। সোসাইটি না গড়িয়া ঠিক সমবায়-সঙ্ঘের প্রণালীতে যদি ইহাদের দ্বারা কাজ করান যায়, তবে এই প্রক্রিয়ায় ক্রমে এমন একটা ব্যবস্থা করা যাইবে, যাহা অনায়াসে একটা সমবায়মণ্ডলী রূপে পরিণত করা যাইতে পারিবে।

সে স্থির করিল যে, সেবামণ্ডলী হইতে সে শ্রমিকদিগকে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে, ও যারা কাজ জানে না, তাহাদিগকে কাজ শিখাইবে। কাপড় এবং জুতা তৈয়ার হইলে সেবামণ্ডলী তাহা তৎক্ষণাৎ নগদ মূল্যে কিনিয়া লইয়া নিজেরা দোকান করিয়া ময়মনসিংহের বাজারে বিক্রয় করিবে। সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, ইহাতে দশ হাজার টাকা মূলধন হইলে লাভের সহিত কাজ করা যাইবে। লাভের টাকায় সেবামণ্ডলীর সব কাজ অনায়াসে চলিবে। প্রথমে হিসাব করিয়া সে দমিয়া গেল। এখন সেবামণ্ডলীর নিত্য ভিক্ষা তন্নুরক্ষার অবস্থা। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দশ টাকা তুলিতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়, দশ হাজার টাকা সে পাইবে কোথায়?

কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিল। সে কিছুদিনের জন্য নিজ গ্রামে গেল। সেখানে তার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিল। আট হাজার টাকা লইয়াই সে কাজ আরম্ভ করিল।

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সে অনেকগুলি তাঁতি জোলা এবং মুচি কারিগর সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে যথারীতি চুক্তি করিল। প্রত্যেকের ঋণ পরিশোধ করিয়া কাঁচামাল সরবরাহ করিল; এবং প্রত্যেকের কাছে যে তৈয়ারী মাল ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া ময়মনসিংহে দোকান খুলিল। দুই চার দিনের মধ্যেই কথাটা জানাজানি হইয়া গেল। সহরের অনেক ভদ্রলোক সেবামণ্ডলীর দোকানে আসিয়া কাপড় ও জুতা কিনিতে লাগিলেন। সৌরীন দেখিয়া তৃপ্ত হইল যে, প্রথম সপ্তাহেই তার প্রায় সাতশ' টাকার মাল বিক্রয় হইয়া গেল।

(১৮)

চার বৎসর পরে দেরাদুন হইতে রেখা পাটনায় আসিয়া চাকরী লইল। সে এখানে চারশ' টাকা মাহিনা পায়; শিক্ষাদানে তার কৃতিত্বের খ্যাতি জন্মিয়াছে।

রেখা বেশ মোটা মাহিনা পায়। তাহা হইতে সে তার মাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠায়। নিজে সে খরচ করে অত্যন্ত কম। সে বোর্ডিং এ থাকে,—মেয়েদের চেয়ে

তার খরচ অতি সামান্যই বেশী। তার কাপড়-চোপড়ের খরচ কিছুই নাই, গয়না সে পরে না, কেবল হাতে ক'গাছা চুড়ী বই তার কোনও গয়নাই নাই। আর সব টাকা সে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। সে টাকায় সে সহজে হাত দেয় না।

রেখার সঙ্গেই বোর্ডিংএ থাকিত আর একটী শিক্ষয়িত্রী। তার নাম লীলাবাই, জাতিতে মারাঠি, কিন্তু কলিকাতায় শিক্ষিতা এবং সর্ব্ব বিষয়েই সে বাঙ্গালীর মেয়েরই মত। লীলা দুইশত টাকা মাহিনা পায়,—তার সবই সে আপনার জন্য খরচ করে। তার মত কাপড়-চোপড় গয়নাপত্র স্কুলের কোনও লোকের নাই। লীলার সঙ্গে রেখার অল্প দিনেই বেশ সদ্ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল।

এক দিন রেখা বোর্ডিংএর বাগানে বসিয়া ছিল, দুটি মেয়ে তার সঙ্গে এমন ভাবে হাস্য পরিহাস ও খেলাধুলা করিতেছিল যে, তারা যেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু—ছাত্রী নয়।

প্রেমদেবী বলিল, "রেখাদি, সুচরিতা আজ এত হাসছে কেন জানেন?"

সুচরিতা খুব চটিয়া বলিল, "না কখ্খনও না, আমি কিছু হাসছি না; আমি রোজ হাসি।"

রেখা বলিল, "রোজ হাস আর আজ হাসছো না, তারও তো একটা কারণ থাকা চাই? কি বল প্রেমদেবী?"

প্রেম। হাঁ রেখা দি, সত্যি ওর—

সুচ। প্রেমদেবী খবরদার, মিথ্যে করে যা' তা' বলো না আমার নামে। আর আমি তোমাকে কোনও দিন কিছু বলি যদি তবে—

রেখা হাসিয়া বলিল, "তুমি তা' হ'লে আজ কিছু ব'লেছো ওকে। সে কথাটা যদি ও বলে তবে তা' মিথ্যে হ'বে কেমন করে সুচি?"

সু। না দেখুন, রেখাদি, ওর, কথা মিথ্যে।

রে। বা রে, কথা ও বল্লেই না তো মিথ্যে হ'ল কেমন করে? তা প্রেমদেবী, বদ্‌নাম যদি হ'য়েই গেল তবে ব'লেই ফেল না—তা' সে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হ'ক।

"না, দেখুন, তবে আমি চল্লেম," সুচরিতা উঠিতে গেল। রেখা তাহার হাত ধরিয়া বসাইল এবং সুচরিতাকে কোলের উপর টানিয়া লইল। প্রেমদেবী ইতিমধ্যে বলিয়া ফেলিল, "সামনের রবিবার সুচরিতার বিয়ে, কাল ওকে নিতে আসবে।"

রেখা সুচরিতার মাথাটা বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তাই এত পাগলামি হ'চ্ছিল। তা' বেশ। বেশ। আমার কাছে ব'লতে লজ্জা কি সুচি. আমি যে তোর দিদি। তা, তোমার বর কি করেন?"

সুচরিতা চক্ষু নত করিয়া রহিল।

প্রেমদেবী বলিল, "বর ভয়ানক ভাল ছেলে,—এম-এ'তে ফার্ষ্ট হয়ে এবার ফিনান্স পরীক্ষা দিয়েছে।"

কথাটা ছাঁৎ করিয়া রেখার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে যেন ছেঁকা দিয়া দিল। রেখা চমকাইয়া উঠিল—তার মুখখানা এক মুহূর্ত্তে সাদা হইয়া উঠিল। তখনই সে কোনও মতে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "তা বেশ।" আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে সে বলিল, "তবে তুই আর আসবি না সুচি?"

সুচরিতা মাথা নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িল। তার মুখে লজ্জার কালিমার ভিতর দিয়া আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

রেখা সুচরিতার মুখখানা তুলিয়া ধরিল। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "তা হ'লে তোর বুঝি বিয়ে হ'বে?"

সুচরিতা বলিল "জানি না।"

রেখা বলিল, "বেশ দিদি, আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।" বলিতে বলিতে তার গলা ভার হইয়া আসিল। দুই ফোঁটা জল তার চোখের কোলে চক্ চক্ করিতে লাগিল। রেখা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

রেখা আপনার ঘরে আসিয়া নদীর ধারের জানালার পাশে বসিল। শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সে নদীর পরপারের শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল। তার মনের ভিতর প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গেল, দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরত প্রবাহ বহিয়া গেল, সে চক্ষু মুছিবার কোনও চেষ্টা করিল না। ষোল'

বছরের কচি মেয়ে সুচরিতার মুখের ভিতর যে উদ্বেলিত আনন্দের ছায়া আজ সে দেখিয়াছে, সেই আনন্দ, সেই আশা এক দিন তার অন্তরের দুই কূল ছাপাইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ দারুণ প্রলয়ের সূর্য্য আসিয়া নিমেষে সে আনন্দ-সাগর শুষিয়া লইয়া হৃদয়টাকে মরুভূমি করিয়া দিয়া গেল। সেই দিন মনে পড়িল; মনে পড়িল, সে দিন হইতে সে মরুভূমি তার প্রাণের ভিতর তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা লইয়া জ্বলিয়া মরিতেছে,—জীবনে তাহাতে এক ফোঁটা জল পড়িবে না।

সে পাঁচ বৎসরের কথা। কিন্তু পাঁচ বছরে তো তারি অন্তরের সে ক্ষত একটুও পুরাতন হয় নাই। সামান্য একটা বাহিরের পরদার আড়ালে সে আঘাত যে এখনও কত তীব্র বেদনায় টন্ টন্ করিতেছে, তাহা সে আজও অনুভব করিল।

যখন সে সৌরীনকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, তখন সে মুখে যাই বলুক, তার ভিতর সব চেয়ে প্রবল মনোবৃত্তি ছিল—অভিমান। সৌরীন যে কেবল কর্ত্তব্যের দায়ে তাহাকে বিবাহ করিয়া বন্ধনকে বরণ করিতে যাইতেছে, এ কথায় তার অন্তরের সকল দর্প সংহত হইয়া তীব্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছিল।

যখন সে দূর দেশান্তরে চলিয়া গেল, তখন তার দর্পের তেজ নরম হইয়া আসিল। তখন সে তার মনের কান্না এই বলিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল যে, সে সৌরীনের একটা মস্ত উপকার করিয়া আসিয়াছে—তার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছে। এ চিন্তায় সে কতকটা শান্তি পাইল; কিন্তু তখন সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অন্তর সৌরীনকে একান্ত ভাবে কামনা করিতে লাগিল। যে স্পর্শ সে কোনও দিন পাইবে না, যে আলিঙ্গন তার বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, যে সম্ভাষণ সে আর শুনিবে না, তারই জন্য তার অন্তর পিপাসিত হইয়া উঠিল। যতদিন তার সৌরীনের সঙ্গ ও তার ভালবাসা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, সে সব দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে মনের ভিতর পুনরাবৃত্তি করিয়া গেল। প্রত্যেকটি প্রণয়-সম্ভাষণে সে নূতন করিয়া পুলকিত হইল, প্রত্যেকটি চুম্বনের স্মৃতি তার রক্তের ভিতর নৃত্যোৎসব লাগাইয়া দিল। সৌরীনের মুখের উক্ত কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সে আনন্দ লাভ করিত, তার আদর্শে জীবন নিয়মিত করিবার সংকল্প করিত। সৌরীনের বীরমূর্ত্তি, তার চরিত্র-গৌরব, তার অশেষ সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া সে স্বর্গসুখ লাভ করিত। এই নীরব তপস্যায় তার মনের ভিতর হইতে অভিমান ও অনুযোগের শেষ কণাটুকু পর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—বিশুদ্ধ মলিমা-শূন্য প্রেমে তার সমস্ত সত্তা আগাগোড়া ভরপুর হইয়া গেল।

সে চলিয়া আসিবার সময় সৌরীনের সঙ্গে কোনও রকম যোগ রাখিয়া আসে নাই। সৌরীন যাতে তার ঠিকানা পর্য্যন্ত জানিতে না পারে, সেজন্য সে যত্ন করিয়াছিল। সেজন্য মাঝে মাঝে তার ভয়ানক আপশোষ হইত। মনে হইত যে, সংযোগের সূত্র যদি সে রাখিয়া আসিত, তবে হয় তো সৌরীন এক দিন আবার ফিরিয়া আসিত। কে জানে, সৌরীনও হয় তো তাহাকে হারাইয়া তাকে এমনি ভালবাসিতেছে, তার জন্য এমনি হাহাকার করিতেছে! কিন্তু সব চেয়ে বেশী অনুতাপ হইত তার এই ভাবিয়া যে, সে সৌরীনের সংবাদ জানিবার কোনও উপায়ই হাতে রাখিয়া আসে নাই। তার অন্তরের মরু-ভূমির দারুণ জ্বালা শান্ত করিবার জন্য তার প্রেমাস্পদের একটুকু সংবাদ পাইবার উপায়ও সে হাতে রাখিয়া আসে নাই।

প্রথমে রেখা ভাবিয়াছিল যে, সৌরীনের কার্য্য-কলাপের সংবাদ সে খবরের কাগজে জানিতে পারিবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সে বাঙ্গালা দেশের খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াও সৌরীনের কোনও সংবাদই যখন পাইল না, তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। তখন তার মনে পড়িল যে, সৌরীন কোনও দিনই খবরের কাগজে নাম বাহির করা পছন্দ করে না। নিতারঞ্জনের দল যে কাগজে নাম বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত, সেজন্য সে তাহাদিগকে কতবার ধিক্কার দিয়াছে। সুতরাং সৌরীনের নাম যে খবরের কাগজে উঠিবে, এ আশা করাই তার অন্যায় হইয়াছে। এদিক সেদিক পত্র লিখিয়া চেষ্টা করিয়াও সে কিছু জানিতে পারিল না। তখন সে কাঁদিয়া ভাসাইল। কত আশঙ্কায় তার মন কাঁপিয়া উঠিল—কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিল না।

আজ পাঁচ বৎসর সে সৌরীনকে ছাড়িয়াছে—পাঁচ বছরের পুরাতন স্মৃতি ছাড়া তার আর কোনও সম্বল নাই। সে স্মৃতি তাকে থাকিয়া থাকিয়া দারুণ আঘাত দেয়—কোনও সান্ত্বনা দিতে পারে না। কিন্তু সেই পাঁচ বছরের পুরাতন প্রেম তার অন্তর যে অপূর্ব্ব কোমলতায় ভরিয়া দিয়াছিল, তাহা এই ধ্যান ও স্মৃতিপূজা আরও সুকুমার করিয়া তুলিয়াছিল। তাই রেখার হৃদয় তার ছাত্রীদের দিকে অশেষ স্নেহসম্ভার লইয়া প্রবাহিত হইত—সে প্রত্যেক ছাত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

সেই সব পুরাতন স্মৃতি, সেই নষ্ট স্বর্গ তার মনের ভিতর আজ আবার তোলপাড় করিতে লাগিল। আর সে অবাধে কাঁদিতে লাগিল। যখন লীলা ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রেখা জানিতে পারিল না, তখনও সে কাঁদিতেছিল।

লীলা তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে ভাই, কাঁদছো কেন?"

রেখা সুধু বলিল, "অদৃষ্ট, ভাই।" লীলা স্নিগ্ধ কথা বলিয়া তাহাকে সুস্থির করিতে চেষ্টা করিল, রেখা চক্ষু মুছিয়া গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রেখা বলিল, "দেখ ভাই, স্কুলে মেয়ে পড়াবার কাজের মত এমন হতভাগ্য কাজ আর নেই।"

"কেন ভাই এ কথা বলছো?"

"কেন? তোমার কোনও দিন মনে হয় না?"

"না, আমি তো বেশ সুখে আছি মনে করি।"

"কিন্তু একটুও কষ্ট হয় না তোমার ভাবতে? এই যে প্রতি বছর একদল মেয়ে আমাদের হাতে আসে—দু'বছর আমার কাছে থাকে তারা—তার পর চলে' যায়, আর তাদের সঙ্গে দেখা-শোনাও হয় না। এ দু'বছর তাদের উপর প্রাণের ভালবাসা উজাড় করে' ঢেলে দিচ্ছি—কিন্তু দু'বছরের পর সে কোথায় যায়—কিছু মনে থাকে না। আমাদেরও বোধ হয় থাকতে পারে না।"

লীলা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা এই তো সংসারের নিয়ম। মায়ের কোলে যে মেয়ে আসে, সেও তো চিরদিন থাকে না। কেউ মরে যায়, কেউ বা বিয়ে হ'য়ে চলে যায়—অরা তাদের সংসার, তাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে, মায়ের খোঁজ ক'জনে নেয়।"

"কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ক'রছিস ভাই! মা যে মেয়ে পেয়েই সার্থক হ'য়ে যায়, তাকে এতটুকু থেকে এত বড় ক'রে তোলে, তার চেয়ে আর আনন্দ আছে? তার পর যখন তার বিয়ে হয়, তখন মেয়ের চেয়ে মায়ের আনন্দ কি কম? যদি ভাল বরে পড়ে? কিন্তু আমাদের কি? ঠিক দু' বচ্ছরের স্নেহ-সম্বন্ধ, তার পর তার কি হয় না হয় তাও জানি না। এ যেন একটি মায়ের বৎসরে পঞ্চাশটি করে মেয়ে হ'য়ে ঠিক দু'বছর অন্তর তাদের সবগুলি নিঃশেষে মরে' যাওয়া। বছর বছর এমনি হ'চ্ছে আমার। প্রথম যে বচ্ছর আমার ক্লাশের মেয়েরা পাশ করে' চলে গেল, তখন আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছিল। তার পর বছর বছরই যখন এরা যায়, আমার যে কষ্ট হয় কি ব'লবো।"

"এ কষ্ট থাকবে না ভাই, ক্রমে সয়ে' যাবে। আর দু দশ বছর গেলে, মেয়েরা আসবে-যাবে তা' তুমি টেরও পাবে না।"

"তা হয় তো হ'বে। কিন্তু তার মানে কি? তার মানে এই যে, প্রাণের ভিতর আর তখন স্নেহের এক ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না। তুমি হয় তো ভাই বুঝতেই পারছো না—আমার কি দুঃখ। তোমার মা আছেন, ভাই-বোন আছে, তোমার বিয়ে হ'বে দু'দিন বাদে, তোমার স্নেহের হাজার আশ্রয় আছে—আমার, আমার এই মেয়েগুলি ছাড়া যে ভালবাসবার মত কিছুই নেই, কেউ নেই।"

রেখার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। লীলা তার মনের কথা বুঝিল না। প্রেমে বঞ্চিত স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় তার এই অস্থায়ী নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল আয়তনে আর তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। তার স্নেহ একটা স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

রেখা তার ক্লাশের মেয়েদের মায়ের মত স্নেহ দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিত। যে দুই বৎসর তারা তাহার কাছে পড়িত, সে দুই বছর তাহাদিগকে সে চারিদিক দিয়া স্নেহের প্রস্রবণে ডুবাইয়া রাখিত। মেয়েরাও সে স্নেহের প্রতিদান দিতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রেখার ভালবাসার

অতৃপ্ত-আশা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ই আকুল আবেদন তাদের অন্তরে পৌঁছাইত না। সুকুমার শিশু তারা, যখন স্কুল ছাড়িয়া যাইত তখন তাদের স্থায়ী স্নেহবন্ধনের আবেষ্টনের ভিতর তারা রেখাদি'র জন্য কোনও একটা বিশিষ্ট স্থান রাখিতে পারিত না। যখনই মেয়েরা নীরব নমস্কারে তার কাছে বিদায় লইয়া গিয়াছে, তখনই রেখার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তার মনের এই বিরাট শূন্যতা, তার স্নেহের এই নির্ম্মম ব্যর্থতায় সে কোনও দিন এত অভিভূত হয় নাই, যেমন সে আজ হইল। এই সুচরিতা মেয়েটিকে রেখা বড় বেশী ভালবাসিয়াছিল। সে যে চলিল, তাহাতে তার ভয়ানক দুঃখ হইতেছিল। সে যে হাসিমুখে জীবনের চরম আনন্দ বরণ করিতে চলিয়াছে, তাহাতে যেন রেখার অভিমানে আঘাত পড়িল,—কি জানি কেন, তার অন্তরে একটা বিশেষ ব্যথার সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে Finance Departmentএর কথায় তার মনের ভিতর তার পাঁচ বছরের পুরাতন ব্যর্থতা ও বেদনা জাগিয়া উঠিল। রেখা তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে এই সত্যটা আবিষ্কার করিল যে, তার হৃদয় আর এই অস্থায়ী স্নেহ-বন্ধনে তৃপ্তি-লাভ করিতেছে না,—তার স্নেহের একটা স্থায়ী আশ্রয় চাই। তার হৃদয়ের দিবার সম্পদ এত আছে,—সারাজীবন ভরিয়া দুই হাতে তাহা কুড়াইয়া লইবে এমন একজন কেউ চাই।

[ক্রমশঃ]

বিবিধ-প্রসঙ্গ

মিশর

অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পিএইচ-ডি

মিশর প্রাচীন কাল হইতে ইয়োরোপীয়দের দ্বারা "ইজিপ্ত" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রাচ্যে বাইবেলে উল্লিখিত হামের বংশধর মিস্রেইমের নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। আমরাও এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া ইজিপ্তকে বঙ্গভাষায় মিশর বলিয়া অভিহিত করিব।

মিশর প্রথমে স্বাধীন ছিল, তৎপর হিকসস্ (Hyksos) নামক একটি যাযাবর জাতির দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হয়। হিকসসেরা পাঁচশত বৎসর রাজত্বের পর বিদ্রোহী মিশরীদের দ্বারা তৎদেশ হইতে বিতাড়িত হয়; এবং পরবর্ত্তী সময়ে পারস্য সম্রাট কামবয় (Cambyses) দ্বারা অধিকৃত হয়। পারস্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মাকিডোনিয়ার বীরবর আলেক্সাণ্ডার ইহা বিজয় করেন ও তাঁহার সেনাপতি টলেমি (Ptolemy) এই স্থলে মাকিডনীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ইহারা নিজেদের মধ্যেই বিবাহাদি করিত, মিশর তাহাদের উপনিবেশ মাত্র ছিল। ইহার পর ক্লিয়োপাট্রার সময় রোমানেরা এই দেশ বিজয় করে এবং তাহাদের নিকট হইতে শেষে আরবেরা ইহা বিজয় করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। আরব-বিজয়ের ফলে মিশরের লোকের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়—তাহারা সর্ব্ববিষয়ে আরবীভূত হয়। এই সকল কারণে বর্ত্তমান কালের মুসলমান-মিশরীরা নিজেদের আরব-বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহার পর ককেসাস পর্ব্বত-সন্নিকটবর্ত্তী সিরকাসিয়া নামক স্থানের দাস যোদ্ধৃবৃন্দের দ্বারা এদেশ বিজিত ও শাসিত হয়। মিশরে এই সিরকাসিয়ানরা (Circassians) মামেলুক নামে অভিহিত হইত। ইহারাও কালে ওসমানলি তুর্কদের দ্বারা বিজিত ও শেষে বিনষ্ট হয়। তুর্কি অভিজাতবর্গই আজ পর্য্যন্ত মিশর শাসন করিতেছে, যদিচ আরবী পাশার বিদ্রোহের পর হইতে তুর্কি উপনিবেশিকেরা নিজেদের মিশরী বলিয়া পরিচয় দিতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ের জাতীয় ভাবের প্রাধান্যে সর্ব্ববর্ণের লোকেরা নিজেদের 'মিশরী' বলিতেছে।

মিশরী জাতির ভাগ্যপটে এবম্প্রকারে ঘন ঘনও আমূল পরিবর্ত্তনের ফলে ও সংমিশ্রণে নানা জাতীয় লোকের (racial elements) তৎদেশে উদ্ভব হইয়াছে। তজ্জন্য সে দেশের বর্ত্তমানের অধিবাসী-দের মধ্যে জীবাকৃতির (racial type) ঐক্য লক্ষিত হয় না। এই দেশে আরবী-ভাষী মুসলমানের মধ্যে উত্তর-ইয়োরোপীয় জাতির লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ ও নিগ্রোয় লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহারও মতে (১) বর্ত্তমান মিশরীদের মধ্যে

১। Lane Poole—Egypt and her People.

অর্দ্ধেক রক্ত আরবজাতি হইতে আগত। আবার অনেকের মতে মিশরীদের নিম্নস্তরে ও গ্রামে প্রাচীন মিশরীয় জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিজাতীয় রক্ত সহরের লোকের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন মিশরী পণ্ডিতের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি অনুমান করেন যে, মিশরীদের মধ্যে শতকরা ৬০ অংশ প্রাচীন জাতির রক্তোদ্ভব, কিন্তু কোন মিশরীই এ কথা স্বীকার করিবে না; তাহারা সকলেই আরব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবে! এ বিষয়ে তাহাদের মনস্তত্ত্ব আমাদের দেশের মুসলমানদের ন্যায়! মিশরীদের বাহ্যিক লক্ষণাদি নিরীক্ষণ করিলে অনুমান করা যায় যে, বেশীর ভাগ লোক প্রাচীন হামিতদের বংশধর। তাহাদের মুখের ও মস্তকের গঠন, নিগ্রোর মত কোঁকড়া চুল, মলিন শ্বেতবর্ণ হইতে শ্যামবর্ণ গাত্রের রং, প্রভৃতির প্রাচীন ফ্যারোর সময়ের প্রস্তরের স্থপতি-কাব্যে খোদিত তৎদেশীয়দের প্রতিমূর্ত্তির সহিত মিল দেখা যায়। এই জন্যই অনেকেই বলেন যে, অজস্র বিপ্লব সত্ত্বেও উক্ত দেশের জল বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও মিশরের প্রাচীন অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানের ফেলাহিনগণ (কৃষক) প্রাচীন ফ্যারোর যুগের কৃষকেরই বংশধর। (২)

আর যে সব আরব মিশরে বসবাস করিতেছে, তাহারা যাযাবর অবস্থায় আজ পর্য্যন্ত মরুভূমিতে বাস করিতেছে। তাহাদের আকৃতিই আরব রক্তের পরিচয় প্রদান করে। তৎপর বাকী থাকে কপ্তেরা (copts)। ইহারা মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বের খৃষ্টীয় মিশরীদের অবশিষ্ট অংশ। ইহাদের উৎপত্তির বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাদের প্রাচীন মিশরীদের বংশধর বলিতে চাহেন, কেহ বা মিশ্রিত জাতি বলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্যিক আকৃতিতে দাক্ষিণ ইয়োরোপীয়দের ন্যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের শারীরিক লক্ষণ কি প্রকারের ছিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মিশরের অধিবাসীদের বৃহৎ হামিত জাতির অন্তর্গত বলিয়া পণ্ডিতেরা গণ্য করেন। প্রাচীন মিশরের জনশ্রুতি অনুসারে তাহারা পুন্ত (Punt) নামক স্থান হইতে আগত। মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, পুন্ত মিশরের দক্ষিণে কোনস্থানে অবস্থিত ছিল—হয় সোমালী দেশে, না হয় দক্ষিণ আরব দেশে, না হয় উভয় দেশে ব্যাপিয়া একটি দেশে। সেইস্ (Sayce) (৩) বলেন, মিশরীরা পুন্তের লোক। ইহারা আরব হইতে আফ্রিকায় আগত হয়। তিনি সেমিত ও হামিতদের এক বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রুগস্ (Brugsch) (৪) হারিস তালপত্র (Harris papyrus) পড়িয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পুন্তদেশ আফ্রিকায়; বোধ হয় মিয়সহরমস (Myoshormos karnak) হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য গহ্বর-সঙ্কুল তীরভূমি। এই সিদ্ধান্ত কারণকের মন্দিরে প্রাপ্ত ভৌগোলিক তালিকা দৃষ্টে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ইহাতেই পুন্ত যে আফ্রিকায়, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নাভিল (Naville), (৫) ডেইর-এল-বাহারির আধুনিক ভূগর্ভ হইতে খনিত পুন্তের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দ্রব্য-সমূহের বিষয় বিচার করিবার কালে কহিয়াছেন "এইসব ভগ্নাবশেষগুলি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার দ্বারা পুন্তদেশের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়। পুন্তের আফ্রিকান লক্ষণ প্রতিনিয়ত সুন্দররূপে স্থিরীকৃত হইতেছে। আবার মুলার (৬) পুন্তের অধিবাসীদের লক্ষণ বিষয়ে সঠিক সংবাদ দেন। সারশি বলেন ইহা দ্বারা তাহাদের বর্ত্তমানের সোমালীলাও-কূলবর্ত্তী অধিবাসীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি পুন্ত অধিবাসীদের তথাকথিত ককেশীয় জাতির আফ্রিকান শাখার অন্তর্গত বলেন। আর ইহারা মিশরের সহিত এক বংশোদ্ভব। ডেইর-এল-বহোরি প্রস্তরের খোদিত পুন্তের রাজার আকৃতি মিশরী রাজাদের ন্যায় লম্বা ছুঁচোলা (long pointed) দাড়ী, হস্তে বুমেরাং (ক্ষেপনাস্ত্র), ও দক্ষিণ পদে অনেকগুলি মল (ring)-পরা আকৃতিবিশিষ্ট এতদ্ব্যতীত তাহার মুখের গঠনে হামিতের লক্ষণ প্রকাশিত। অন্য দিকে, নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন, আফ্রিকার এই স্থলের অধিবাসীরা—(সোমালি হাবসি প্রভৃতি) হামিত জাতির অন্তর্গত। এই জন্যই অনুমান হয় যে প্রাচীন মিশরীরা হামিত মূলজাতি (race) সম্পর্কীয় ছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সব প্রত্ন-সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে পুরাতন সংস্কারগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, পুন্ত দেশ বিষয়ের জনশ্রুতি অতি পুরাতন নহে,—মিশর দেশও প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর যুগ প্রভৃতি সভ্যতার স্তরের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই নব আবিষ্কর্ত্তাদের নাম ফ্লিনডার্স পেট্রি (Finders Petrie), ইনি ইংরেজ; আর ডি, মরগান (De Morgan); ইনি ফরাসী। ইঁহারা উভয়ে নিজেদের আবিষ্কারের উপর স্বতন্ত্রভাবে মত প্রকাশ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মিশরে দুইটা মূলজাতি বসবাস করিয়াছে। ইহার মধ্যে একটা আফ্রিকার আদিম, অন্যটি এসিয়া হইতে আগত। এই শেষোক্তরাই ফ্যারোদের সভ্যতার বাহক-স্বরূপ ছিল। ইঁহারা প্রথমোক্ত আদিম ও অসভ্য জাতিকে জয় করিয়াছিল। আবিডস (Abydos), নাকাদা (Naqada) ও বাল্লাসের (Ballas) আবিষ্কারসমূহ এই অভিমতকে আরও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। নাকাডাতে ইংরেজ আবিষ্কর্ত্তা একটি বৃহৎ সমাধি-স্থল বাহির করিয়াছেন। তাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি দর্শনে অনুমিত হয় যে তাহা ফ্যারো-সভ্যতা হইতে পৃথক। এই সমাধিটি নবপ্রস্তর-যুগের সভ্যতার অন্তর্গত। ইহাতে কতকগুলি

২। Denicker—The Races of man, পৃ ৪৩৫।

৩। Sayce—Races of the old Testament, ch. v, 1891.

৪। Brugsch—Die Altagyptische volkertafeln—fifth congress of orientalists, 1880.

৫। Griffith—Egypt Exploration Fund, Archaeological Report, 1895. ৬। Miller Asien und Europa nach Altagyptischen Deukmadern. 1892.

পিত্তলের দ্রব্য ছিল। কবরগুলি ঐ যুগের ইয়োরোপীয় কবরের স্থায় অর্থাৎ শবদের হাঁটুগেড়ে বসান ছিল। পেট্রি অনুমান করেন, যে জাতি এই বৃহৎ সমাধিস্থলটি রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা একটি নূতন জাতি। এই জন্ত ইনি এই জাতিকে "নবজাতি" (New race) বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জাতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০—৩৫০০ বৎসর সময়ে অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের মিশরের সাম্রাজ্যের সময়ের মধ্যে আসিয়া মিশর-বিজয়ান্তর হয় তথ'কার অধিবাসীদের বিনষ্ট করিয়া না হয় দূরীভূত করিয়া থিবাইড (Thebaid) অধিকার করিয়াছিল। তিনি, দক্ষিণ মিশরে (Upper Egypt) এই যুগে মিশরীয় দ্রব্যের উপস্থিতির অভাবে অনুমান করেন যে, এই "নব-জাতির" রাজত্ব তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল। এই নবজাতি লিবিয় মূলজাতীয় ছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পেট্রি ইহাদের করোটি (Skull) পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই নব-জাতির করোটিকে ফেদার্ব দ্বারা পরীক্ষিত রকনিয়ার (Roknier) skullএর সহিত তুলনা করা হইয়াছিল; এবং ফলস্বরূপ দৃষ্ট হয় যে, প্রথমোক্তগুলি সকল মিশরী skull হইতে capacityতে (ভিতর-কার পরিমাণে) ও নাকের index হইতে বিভিন্ন এবং অন্তপক্ষে আলজিরিয়ার বর্ত্তমান skull সমূহ রকনিয়ার প্রাচীন খুলির সদৃশ; অতএব তাহারা লিবিয় (Libyan) জাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ডি মরগান (৭) কিন্তু নাকাডার আবিষ্কারের আলোচনা করিয়া পেট্রি হইতে বিভিন্ন মতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন "নব জাতিকে" "পুরাতন জাতি" (Old race) বলা উচিত। কারণ ইহারাই মিশরের আদিম অধিবাসী এবং যথার্থ মিশরীদের (ফ্যারোর জাতির) আগমনের পূর্ব্বের জাতি। অন্তপক্ষে ভিদেমান (৮) (Wiedemann) বলেন যে নাকাডা যুগের ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্ম্মবিশ্বাস পরবর্ত্তী মিশরীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; সেই জন্ত তিনি নাকাডার জাতি (পেট্রির 'নবজাতি' ও মরগানের 'পুরাতন জাতি') ঐতিহাসিক মিশরীয় জাতি হইতে বিভিন্ন—এই মত গ্রহণ করিতে পারেন না। সারগি, (৯) কবরের প্রথা, লিখন-প্রণালী প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলেন, এই সকল অনুষ্ঠান, যাহা আমরা তথাকথিত আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দর্শন করি, তাহা ঐতিহাসিক মিশরীয় সভ্যতার প্রারম্ভ—ইহা এই আদিম অধিবাসীরা (যাহারা লিবিয় জাতি) ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করে ও নিজেদের উৎপত্তির চিহ্ন পশ্চাতে অতিদূরে রাখিয়া যায়। অর্থাৎ এই আদিম অধিবাসীরাই পরে ঐতিহাসিক জাতি রূপে অভিব্যক্ত হয়। তৎপর তিনি বলেন যে, মিশরীয় ভাষাও আফ্রিকা হইতে উৎপত্তির পরিচায়ক। ম্যাসপেরো (Masparo) সেইস্ প্রভৃতি মিশরীয় ভাষাকে (সেমিতিক) ভাষা-সম্পর্কীয় বলেন; কারণ তাঁহাদের মতে সেমিতিক ও হামিতিক ভাষাদ্বয় একমূল-সম্ভূত। সেইস্ প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন মিশরীয়দের আরবাগত বলেন, তাঁহারা কিন্তু আরবে হামিতভাষার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে অক্ষম। অন্তদিকে আফ্রিকার সাহারা হইতে মরোক্কো পর্য্যন্ত হামিত ভাষার একটি বিশাল শৃঙ্খল বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্তই সারগি বলেন, আফ্রিকা ছাড়িয়া আরবে কি প্রকারে হামিতদের উৎপত্তি সম্ভব?

নাকাডা skull সমূহ, যাহা পেট্রি ইয়োরোপে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা টমসন ও থেন (Thomson and Thane) দ্বারা পরীক্ষিত হয়; ফলস্বরূপ তাঁহারা বলেন, "এই খুলীসকল ছোট অথচ লম্বাকার, নাক ছোট ও বেঁকান। এই skull সমূহে গোরান্চ জাতির সহিত সাদৃশ্য নাই, কিন্তু আলজিরিয়ানদের সহিত মেলে। ইহা লিবিয়জাতি মূলক, মিশরী নহে।" (১০)

অন্ত পক্ষে ডি, মরগান দ্বারা এল-আমরা হইতে আনীত Skull সকল ফুকে (Fouquet) (১১) দ্বারা পরীক্ষিত হয়। এই এগারটি খুলির মধ্যে দশটি লম্বাকৃতি ও একটি মধ্যমাকৃতি (৭৫, ৫৫ Index)। এই শেষোক্তটিকে তিনি "মিশরীয়" বলেন, আর বাকীগুলিকে এসিয়াগত বলেন। স্যাইনফূর্থ (১২) (Schweinfurth) বিশ্বাস করেন যে, মরগান ও পেট্রি আবিষ্কৃত Skulls মধ্যে মূল জাতীয় প্রভেদ রহিয়াছে। এই জন্ত তিনি হামিতদের আরব হইতে আমদানী করিতে চাহেন; আর অন্ত জাতিটিকে মহা মিশরীয় সভ্যতা ও লিখন-প্রণালী সমেত মেসোপোটামিয়া উপত্যকা হইতে আনয়ন করিতে চাহেন!

সারগি কিন্তু বলেন ফুকের পরীক্ষা দৃষ্টি করিয়া ইহার সহিত ফ্যারোর যুগের মিশরীয় Skull সমূহের সহিত আশ্চর্য্য হন, এবং সেই সঙ্গে ইহাদের অন্ত ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যবোধ করেন। এক কথায় তিনি যাহাকে Euratrican species নাম দিয়াছেন, ইহারা তাহারই অন্তর্গত। তৎপর তিনি (১৩) বলেন, average cephalic Indexএর (মাথার Indexএর গড়পড়তার) বিভিন্নতা দেখিয়া দুইটা জাতি সৃষ্টি করা ভুল গণনা। তিনি মাথার গঠনের উপর বেশী জোর দেন। কারণ, তাঁহার মতে একপ্রকারের মাথার গঠন মাপেতে ও Indexএ বিভিন্ন হইতে পারে।

পেট্রি আনীত skullগুলির মাথার indices ৬৫—৮০ পর্য্যন্ত, বেশীর ভাগ ৭০—৭৫ সংখ্যায় পড়ে। মাথার Capacity ১১০০ c-c—১৫০০ c-c পর্য্যন্ত; নাকের index ৫৩.৭। ইহার দ্বারা ইহারা

৭। De-Morgan—Recherches sur les origines del' Egypt (পৃঃ ১৬) ৮। ডি, মরগান দ্রষ্টব্য। ৯। The Mediterranean Race, পৃ ১০০।

১০। Naqada and Ballas পৃঃ ৫১—৫০।

১১। ডি, মরগান দ্রষ্টব্য।

১২। Uberden ursprung der Aegypter" Ver. Berlin S. F Anth 19 June, 189 Fi.

১৩। The Mediterranean Raee, পৃঃ ১০৪।

dolichoid (dolichoceppaland mesocephal)—mesorrhive অর্থাৎ লম্বাকৃত মাথা মধ্যমাকৃত নাক লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে হামিতদের মধ্যে এই জাতীয় উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহ মধ্যে অনেকেই এই লক্ষণাক্রান্ত। সারগি নিজে যে সব মিশরীয় skulls মাপ করিয়াছেন তাহাদের Cranial capacity গড়ে ১,৪৪৫-c-c ; ডি, ব্লাসিও (De Blasio) (১৪) আরও অনেক Skulls মাপিয়াছেন। তিনি average দিতেছেন, ১,৩১৪-৫ যাহা পেট্রির "নবজাতির" সহিত মিলে। আর ফুকের skullগুলিকে সারগি, ellipsoid, pentagonoid, ovoid লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াছেন। পেট্রির skullএতেও তিনি এই লক্ষণ নিরীক্ষণ করেন।

এই সব পরীক্ষা করিয়া সারগি বলেন, অতীত কালের করোটি সমূহের (Skulls) সহিত ঐতিহাসিক কালের করোটির তুলনা করিয়া উভয়েই এক গঠন-সাদৃশ্য ব্যক্ত করে, এই জন্ত ইহাদের এক মূল জাতীয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ; আর ডেইর-এল-বাহারির রাজকীয় মমিসমূহ (mummies) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহারাও ellipsoidal, pentagonal, ও beloid গঠন ব্যক্ত করে। এই সব কারণে তাঁহার বিশ্বাস যে আদিম অধিবাসীদের সহিত ঐতিহাসিক মিশরীয়দের মূল-জাতিগত প্রভেদ নাই। উভয়েই ভূমধ্যসাগরীয় জাতি ও আফ্রিকার উদ্ভূত। (১৫)

আবার ইংরেজ পণ্ডিত C. D. Fawcett (১৬) নাকাডা করোটির biometric পরীক্ষা করিয়া বলেন যে "ঐতিহাসিক যুগের অতীত কালের মিশরীয়দের প্রতিনিধিস্বরূপ নাকাডা করোটি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের এক প্রকারের (homogeneous) বলিয়া প্রতীত হয়। কোন কোন লক্ষণে এই করোটিসমূহ অন্ত হইতে প্রাচীন বা নিম্নশ্রেণীর (primitive or inferior), অন্ত বিষয়ে তাহারা আধুনিক। কতক লক্ষণে তাহারা নিগ্রোদের সদৃশ, আর কতক লক্ষণে তাহারা ইয়োরোপীয়দের সদৃশ। বেন্টর ভাগ নাকাডা, থিবান ও বহু কপ্টদের মাথার গঠনের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় কেহ যেন সেই একটা জাতিকেই ৮০০০ বৎসরের ব্যবধানের পর পরীক্ষা করিতেছে! আবার Oetteking (১৭) পুরাতন মিশরীদের মাথার index ৭৩.৭ দিতেছেন। আর বর্ত্তমান মিশরীদের শারীরিক নৃ-তত্ত্ব হিসাবে ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে খারগা (Kharga) Oasis (১৮) এর লোকদের মস্তক লম্বাকৃতি ও নাক মধ্যমাকৃতি ; মাথার index ৭৪.৪ ও নাকের index ৭৬.৬ (৭৭.০), শরীরের দৈর্ঘ্য ১৬৩০.৮ (১৬৪.০) সেন্টিমিটার। হার্ডলিক্কা (Hrdlicka) ইহাদের মাপিয়াছেন। আর এমিল স্মিড্‌ট (১৯) (Emil Schmidt) বর্ত্তমান মিশরীদের মাথার index ৭৬.৬ (৭৭.০) দিতেছেন। আবার খৃষ্টীয় মিশরীদের (যাহাদের কপ্ট বলে dechantre) তাহাদের (২০) মাথার index ৭৬.. দিতেছেন।

এই বিভিন্ন লোক দ্বারা গৃহীত প্রাচীন, ঐতিহাসিক ও বর্ত্তমান মিশরীদের শারীরিক মাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, মিশরের অতীতের ও বর্ত্তমানের অধিবাসীরা এক মূল জাতি সমুদ্ভূত। মাথার মাপের indexএর যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য যাহা উপরে ধৃত হইয়াছে তাহা বিভিন্নতার সীমার মধ্যেই (range of variation) পড়া সম্ভব।

উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকা

মিশরের নিম্নে নিউবিয়া আবিসিনিয়া, সোমালিলাও প্রভৃতি দেশসমূহ রহিয়াছে। এই ভূখণ্ডকে হাবসিদের দেশ বলিয়া অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বে যে সব আফ্রিকার কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসসমূহ ভারতে আনীত হইত, তাহারা এই সব স্থলের অধিবাসী ছিল। ভারতবর্ষে তাহাদের হাবসী ও সিদ্দি বলা হয়। তাহারা নিগ্রো নয়। "হাবেসি" শব্দ আরবী ভাষা-সম্ভূত, অর্থ—মিশ্রিত। পশ্চিম এসিয়াতে অর্থাৎ মুসলমান দেশসমূহে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় দাসেরা হাবেসি বলিয়া অভিহিত হয়। প্রাচীন কালে নিউবিয়া বা কুবা এবং বর্ত্তমানের আবিসিনিয়াকে এথিওপিয়া (Ethiopia) বলিত; ইহার অর্থ কৃষ্ণকায়ের দেশ। হোমার তাঁহার ইলিয়াডে ও গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ তাঁহার পুস্তকে কৃষ্ণকায় এথিয়োপিয়ানদের উল্লেখ করিয়াছেন। হেরোডোটাস্ এথিওপিয়ান জাতির যে লক্ষণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরদের প্রতিও তাহা প্রযুক্ত হয়। তাঁহার বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এথিওপিয়েরা কৃষ্ণকায়, মাথার চুল কোঁকড়া, যোদ্ধা ও মাংসপ্রিয়। বর্ত্তমানেও এ স্থলের অধিবাসীদের স্বরূপ তৎপ্রকার।

এই স্থলের উত্তরভাগে বেজারা (Bejas) বা নিউবিয়ানেরা বাস করে। ইহাদের বিভিন্ন কৌমেরা (tribes), যথা বেজারা বিসহারিন, হামরান, হাডেনদোয়া, হালেঙ্গা প্রভৃতি একটির পর একটি করিয়া লোহিত সমুদ্র ও নীলনদীর মধ্যস্থানে প্রথম জলপ্রপাত হইতে আবিসিনিয় উচ্চভূমি পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে বাস করে।

কতকগুলি বেজা কৌমেরা যথা : আবাবদেরা (জনসংখ্যায় প্রায় বিশ হাজার) যাহারা দক্ষিণ মিশরে বাস করে, বেণি-আমেররা যাহারা পূর্ব্বে কতকটা স্থায়ীভাবে বাস করে ও পশ্চিমের জালিনেরা অনেকাংশে আরবী ভাবাপন্ন হইয়াছে, যদিচ এখনও হামিতিক ভাষা ব্যবহার করে। আবার ইহাদেরই পার্শ্বে সেমিটিক ভাবাপন্ন আরবী-ভাষী এথিওপিয়

১৪। Lavarieta umanenell Egitto Aulico 1893.

১৫। "The mediterranean Race."

১৬। C. D. Fawcett in Biometrika vol 1 Oct 1901 to Aug 1902 "Variation and correlation of the Human skulls" পৃঃ ৪০৪—৪৮৫।

১৭। Martin—Lehrbuch der Anthropologieতে উদ্ধৃত।

১৮। Martinএ উদ্ধৃত।

১৯। ঐ।

২০। Deniker এ উদ্ধৃত।

কৌমেরা বাস করিতেছে, যথা হাবারেরা ও হাসানিয়েরা, যাহারা বাসাদের উচ্চভূমিতে বসবাস করে ও আবুরক্ ও মুক্রিয়েরা বুনীলের দক্ষিণে বাস করিতেছে। (২১)

ইহার পরে আসে আবিসিনিয়া। ইহা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী কতকগুলি কৌমের সমবায় সম্বন্ধে স্থাপিত একটি খৃষ্টীয় ষ্টেট। আরবেরা এই বিভিন্ন খৃষ্টীয় জাতিসমূহের রাজনীতিক সম্বন্ধে সংযুক্ত ষ্টেটকে ঘৃণার সহিত "হাবেসি" (মিশ্রিত) বলিয়া অভিহিত করিত। "হাবেসি" শব্দের ল্যাটিন-রূপান্তরে এই দেশের বর্ত্তমান নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জগতে এই স্থলের ধর্ম্মমণ্ডলীকে "এথিওপিয়ান চার্চ্চ" বলা হয়। আবিসিনিয়ার মধ্যে আমহারিংগা ভাষা (আমহারা ও গডজামে যাহা প্রাচীন আমহারিংগা ভাষা হইতে উদ্ভূত তাহা) জুরাই হ্রদের পশ্চিমে ও সোয়ার দক্ষিণে এবং হাওয়াসের উৎপত্তি স্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কথিত হয়। ডেনিকার বলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের নিম্নস্তর আগাও (Agaw) জাতি (যাহারা এথিওপিয় লক্ষণাক্রান্ত ও হামিটিক্‌ভাষী তাহাদের) দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু উচ্চশ্রেণী সমূহ বিশেষভাবে সেমিটিক ভাবাপন্ন। (২২)

আবিসিনিয়ার দক্ষিণে গাল্লা বা ওরোমাজাতি বাস করে। ইহাদের ডেনিকার খাটি এথিওপিয় জাতি বলেন। ইহাদের পূর্ব্বে সোমালিজাতি বাস করে। তাহারা সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান যথা জিবুটি অন্তরীপ হইতে আজি-ফিন্দার সমতলভূমি পর্য্যন্ত স্থলে বসবাস করে। গাল্লাদের উত্তরে আবিসিনিয়া ও সমুদ্রতীরের মধ্যে (জিবুটি অন্তরীপ হইতে হামফিলা উপসাগর পর্য্যন্ত) আফার বা ডানাকিল জাতি বাস করে। ইহারা বেশীর ভাগ ওবক-তাজুরা নামক ফরাসী উপনিবেশের অধিবাসী। শারীরিক লক্ষণে ইহারা সোমালীদের স্থায়, কিন্তু কমবেশী আরবী ভাবাপন্ন। ডানাকিল জাতির উত্তরে সাহোজাতি বাস করে। ইহাদের নাকি আগাও জাতির সহিত সাদৃশ্য আছে। ইহারা মাসোয়া নামক স্থানের দক্ষিণে থাকে, আর উত্তরে বিভিন্ন ইথিওপিয় কৌমেরা (যাহাদের সমষ্টিভাবে মাসোয়ান (Massowans) বলা হয় তাহারা) বাস করে। (২৩)

এই স্থলে বক্তব্য যে ডেনিকার যাহাদের ইথিওপিয়ান জাতির অন্তর্গত বলিয়াছেন, তাহারা আজকালকার নৃতত্ত্ববিদ্‌দের বিভাগানুসারে হামিটিক মূলজীবজাতির অন্তর্গত, এ কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আরবী ভাষা-ভাষী ও আরবী-ভাবাপন্ন হইলেও জাতি হিসাবে হামিটিক।

শারীরিক লক্ষণে এথিওপিয় বা উত্তরপূর্ব্বের হামিটেরা দীর্ঘাঙ্গ। ২৯ জন আবিসিনিয়েরা মাপেতে ১,৬৬৯ মিলিমিটার, ৩৫ ডিনাকিলেরা ১,৬৭০ মি, মি লম্বা। গাত্রবর্ণে Brown বা চকোলেট রংয়ের উপর রক্তিমাভা লক্ষণাক্রান্ত। মাথার গঠন dechantre গৃহীত মাপানুসারে লম্বা indices হইতেছে ৭৫·৭ (—৭৮·০) হইতে ৭৫·১ পর্য্যন্ত। ইহাদের চুল নিগ্রো চুলের ন্যায় কোঁকড়া, লম্বা মুখাকৃতি, নাক সরু, এবং কাহারও বা সিধা ও কাহারও বেঁকান (Convex)। ইহাদের শরীরের গঠন পাতলা; পায়ের ও হাতের কবজি শক্ত; লম্বা ও স্নায়ু বিশিষ্ট হস্তপদ (বিশেষতঃ হস্তের অগ্রভাগ) চওড়া কাঁধ ও শরীরের সমভাগটা প্রাচীন মিশরী প্রতিমূর্ত্তির মতন ত্রিকোণ ভাগে গঠিত। শারীরিক গঠন হিসাবে ইহারা সুন্দর জাতি।

এই ভূখণ্ডের জাতি সমূহের শারীরিক মাপের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ডেনিকার নিম্নলিখিত তালিকা দিতেছেন—শরীরের দৈর্ঘ্য হিসাবে ২৫ বেজা ১,৭০৪ মিলিমিটার উচ্চ; ৪৬ সোমালি ১,৭১৭ মি, মি। মাথার মাপের indexএ ৩৫ ডানাকিল ৭৪·৮। সোমালি পুরুষদের স্কন্ধের দৈর্ঘ্য ২০·০ সেন্টিমিটার (মার্টিনে দ্রষ্টব্য)। টাকার, মাইয়ার ও সেলিগম্যান নিউবিয়ানদের শরীরের দৈর্ঘ্য পুরুষদের জন্য ১৭৩·৫ ও স্ত্রীলোকের ১৫৭·২ সেন্টিমিটার দিতেছেন। হস্তের দৈর্ঘ্য হিসাবে আমহারা পুরুষ আবিসিনিয়েরা ৪৪·৫ সেন্টিমিটার ও সোমালিয়া ৪৫·০ (মার্টিন দ্রষ্টব্য) ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে এই স্থলের কতিপয় জাতি যথা বেজা, সোমালি, নিউবিয়ানেরা শারীরিক দৈর্ঘ্যে অত্যন্ত লম্বা পুরুষ; ও মাথার গঠনে তাহারা লম্বাকৃতি।

২০। Hartmann—"Die Bedjah" Zeitschrift. f. Ethnologie vol. xi, 1840, P 11 and Virehow Z. F. vo x. 18 and 8 vol x. 18 and 8; Denikar—Bull soc, Anthr Paris 1880 p 594. ২১। Deriker—The Races of Man পৃ ৪৩৬।

২২। Revil, La vallee du Darrar, Paris 1882; Sanlethi—Bull Soc Anth Paris 1893 p 4 and 9

রাষ্ট্রীয় শাসন-পদ্ধতি

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম-এ

ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি

(৩)

দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির মূলস্তম্ভ-স্বরূপ কতিপয় প্রধান প্রধান দলিল ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় নৃপতিগণের আমলে সম্পাদিত হইয়াছিল। টিউডর-বংশীয় ও ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় রাজগণের আমলেই পার্লামেন্টের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ এই সময়েই হাউস্ অফ্ লর্ড্‌স্ ও হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ পার্লামেন্টের এই দুই বিভাগ ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমতঃ যাজক সম্প্রদায়ের ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যে সমুদায় লর্ড রাজ-আহ্বান প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাই হাউস্ অফ্ লর্ড্‌স্ বিভাগে যোগ দান করিতেন। যে সকল লর্ডকে আহ্বান করা নৃপতি সঙ্গত মনে করিতেন, তাঁহারাই আহূত হইতেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে এইরূপ ঘটিতে লাগিল, যে লর্ড

একবার পার্লামেন্টে আহুত হইতেন, তিনি চিরকালই রাজ-আহ্বান প্রাপ্ত হইতেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার স্থলে আহুত হইতেন। যাজক সম্প্রদায়স্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ আর্চ-বিশপ-বিশপ ও এবটগণ আহুত হইতেন। ক্রমে ক্রমে ভূম্যধিকারি সম্প্রদায়স্থ লর্ডগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। টিউডর আমলের প্রারম্ভে হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ বিভাগে প্রায় তিনশত সভ্য ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতে থাকে। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য ইংলণ্ডের সহিত ওয়েলস্ প্রদেশ যোগ করা হয়।

যাহা হউক, এই সময়ে পার্লামেন্টের যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হইলেও পার্লামেন্টের উপর টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট-বংশীয় রাজগণের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। নৃপতিগণ আবশ্যকস্থলে পার্লামেন্টকে বাদ দিয়া প্রিভি-কাউন্সিলের নামমাত্র অনুমতি লইয়া Proclamation বা ঘোষণাপত্র-সমূহ জারি করিতেন, এবং সেই সকল ঘোষণাপত্র আইনের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কখন কখন আইন রদ করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা দাবি করিতেন। এই সময়ের শাসনকার্য্য পরিচালনের একটি বিশেষত্ব আছে; টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট আমলে কাউন্সিলের দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। এই সকল কাউন্সিলের মধ্যে প্রিভি কাউন্সিল সর্ব্ব-প্রধান; পার্লামেন্ট্ কাউন্সিলে বিস্তর জনসঙ্ঘ থাকায় নৃপতি কতিপয় সভ্যকে বাছিয়া লইতেন। পার্লামেন্টের সভ্যগণই প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য হইতেন বটে, কিন্তু পার্লামেন্টের নিকট তাঁহাদিগের কোন দায়িত্ব থাকিত না। প্রথমতঃ এই কাউন্সিল হইতে নৃপতি উপদেশ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু প্রথম দুইজন ষ্টুয়ার্ট নৃপতির আমল হইতে এই কাউন্সিল সমুদায় শাসনকার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাই নৃপতির প্রতিনিধি-স্বরূপ ছিল। সমুদায় শাসন-কার্য্যই কাউন্সিল পরিদর্শন করিত, এবং ঘোষণাপত্র ও আদেশসমূহ বাহির করিত। এই কাউন্সিলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় ভাবে পরিগণিত হইত। তৎকালে ইংলণ্ডেশ্বর ইহার সভাপতি থাকিতেন। এই প্রিভি কাউন্সিল হইতে অন্যান্য কতিপয় কাউন্সিলের উদ্ভব হইয়াছিল।

এই স্থলে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সভার দ্বারা গোপনে রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনের সুবিধা হইয়া থাকে। বৃহত্তর সভার এই সুবিধা থাকে না। বহুসংখ্যক সভ্যের একতা রক্ষা করিয়া ত্বরায় কার্য্য সম্পাদন করা দুষ্কর হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রিভি কাউন্সিলের উৎপত্তি। ক্রমশঃ প্রিভি কাউন্সিলও বৃহত্তর আকার ধারণ করিতে থাকে। এই হেতু প্রিভি কাউন্সিল হইতে আর একটী ক্ষুদ্রতর সভার সৃষ্টি হইল, এবং কালে এই ক্ষুদ্রতর সভাই ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িল। এই ক্ষুদ্রতর সভাই ক্যাবিনেট্ বা মন্ত্রিসভা। দ্বিতীয় চার্লসের আমল হইতেই এই ক্যাবিনেটের উৎপত্তির সূত্রপাত। তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে হুইগ্ ও টোরি এই দুই রাজনৈতিক দলের লোকই ক্যাবিনেটে স্থান পাইতেন। তৎপর উইলিয়ম হুইগগণের মধ্য হইতে বিশিষ্ট লোক লইয়া ক্যাবিনেট গঠন করেন। হ্যানোভার বংশের প্রথম রাজা প্রথম জর্জের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব হয়। নৃপতি নিজে ইংরাজি জানিতেন না, এবং ইংলণ্ডীয় রাজনীতি বিষয়েও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই হেতু ওয়ালপোলের হস্তেই তিনি সমুদায় ভার অর্পণ করিতেন। ওয়ালপোলই ইংলণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ক্যাবিনেটের দ্বারা শাসন-বিষয়ক নিম্নোক্ত প্রথাসকল সংস্থাপিত হইয়া পড়িল;—ক্যাবিনেটের সভ্যগণ হাউস্ অফ্ লর্ডস্ অথবা হাউস্ অফ্ কমন্‌সের সভ্য হইবেন; একবিধ রাজনৈতিক মত তাঁহারা অবশ্যই অবলম্বন করিবেন। হাউস্ অফ্ কমন্‌সের অধিকাংশ সভ্যের মত তাঁহাদের অনুকূলে থাকা চাই। হাউস্ অফ্ কমন্‌সের নিকট তাঁহাদের একযোগে দায়িত্ব থাকিবে; অর্থাৎ যদি কোন একজন মন্ত্রীর অভিমত হাউস্ অফ্ কমন্‌সের নিকট অমান্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই এককালে পদত্যাগ করিবেন; এবং তাঁহারা সকলেই প্রধান মন্ত্রীর অধীনে থাকিবেন। এই সকল বিষয়ই আধুনিক ক্যাবিনেট-গভর্ণমেন্টের মূলমন্ত্র স্বরূপ। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ক্যাবিনেটের কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তিনজন বা চারজন সভ্যের দ্বারা একটী ক্ষুদ্রতম সমর-ক্যাবিনেট সংগঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতদ্বৈধ সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছিল; এবং সকল-দলের লোক লইয়াই সভা গঠিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় শাসনপদ্ধতি বলিলে আমরা কি বুঝিব, এক্ষণে দেখা যাউক্। কোনও একখানি নির্দ্দিষ্ট দলিল পাঠে ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি অবগত হওয়া যায় না। বহু পৃথক্ পৃথক্ উপকরণের দ্বারা এই শাসন-পদ্ধতি গঠিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায় কতকগুলি আইনের দ্বারা এই শাসন-পদ্ধতি স্বীয় আকার পরিগ্রহ করিয়াছে; The Bill of Rights, the Act of Settlement, the Habeas Corpus Acts, The Libel Act, the Reform Acts, the Septennial and Quinquennial Acts, the Elections Acts, the Parliament Act of 1911 প্রভৃতি আইন উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ Magna Charta এবং the Petition of Right,—এই দুইটী দলিল উক্ত শাসন-পদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান মূলস্তম্ভ স্বরূপ। এতদ্দ্বারা শাসন-ব্যাপারের পদ্ধতিসমূহ বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, কতকগুলি লিখিত ও অলিখিত সাধারণ আইনের বিষয় রহিয়াছে। চতুর্থতঃ, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বহুসংখ্যক সন্ধি ও আন্তর্জাতিক এগ্রিমেন্টসমূহ রহিয়াছে। এতৎসমুদায় ব্যতীত শাসনপদ্ধতি-সংক্রান্ত বহু প্রথা ক্রমে ক্রমে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে; তৎসমুদায় লিখিত আইনে পরিণত হয় নাই।

যাহা হউক, পার্লামেন্টে অবস্থিত রাজাই গ্রেটব্রিটেনের আইন-প্রণয়ন বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা। ইংলণ্ডেশ্বর, হাউস্ অফ্ লর্ড্‌স্ ও হাউস্ অফ্ কমন্‌স্, এই তিনই হইল ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতির কর্ত্তা। ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক পার্লামেণ্ট আহুত হইয়া থাকে। পার্লামেণ্ট্ বসিবার অন্ততঃ বিংশতি দিবস পূর্ব্বে প্রিভি কাউন্সিলের পরামর্শ অনুসারে নৃপতি সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন। পার্লামেন্টের

প্রাগুক্ত দুইটী বিভাগ সম্বন্ধে এক্ষণে বিশেষ বিশেষ কথা বিবৃত হইতেছে। হাউস্ অব লর্ডসের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পাঁচ শ্রেণীর সভ্য এই বিভাগে স্থান পাইয়া থাকেন:—১। রাজবংশজাত প্রিন্স্ সকল। ২। পুরুষানুক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লর্ডগণ। ৩। স্কটিশ লর্ডগণ। ৪। আইরিস লর্ডগণ। ৫। স্বকীয় পদগৌরবে যাঁহারা লর্ড হইয়াছেন, তাঁহারা। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লর্ড্গণ পুরুষানুক্রমে অধিকার ভোগ করেন নাই। এই সমুদায় লর্ড আবার দুই প্রকারের আছেন; (ক) আইনজ্ঞ লর্ডগণ, ও (খ) যাজক সম্প্রদায়স্থ লর্ডগণ। হাউস্ অফ্ লর্ডস্ ইংলণ্ডে আপীলসংক্রান্ত চরম বিচারালয়; এই হেতু সর্ব্বপ্রধান আইনজ্ঞগণকে লর্ডপদে উন্নীত করিয়া এখানে স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। আর আধুনিক কালে যাজক-সম্প্রদায়স্থ লর্ড: বলিলে আর্চবিশপগণ ও ইংলণ্ডের চার্চ্চের কতিপয় বিশপগণকে বুঝিতে হইবে। সভ্যগণ অবশ্য একবিংশতি বা তদধিক বর্ষ বয়স্ক হইবেন। বদমাইস বা দেউলিয়াগণকে হাউস্ অফ্ লর্ডসে স্থান দেওয়া হয় না।

গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের জেলা, নগর, ও ইউনিভার্সিটি সকল হইতে হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্যসমুদায় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বাচনকারী ভোটারগণ-সংক্রান্ত নিয়মসমূহ অতীব জটিল। বর্ত্তমান কালে ১৯১৮ সালের the Representation of the People Act দ্বারা নির্ব্বাচন বিষয়ক নিয়মসমূহ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই আইনের দ্বারা লক্ষ লক্ষ ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই আইনের দ্বারাই ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে রমণীগণ ভোটের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনকারী পুরুষগণ অন্ততঃ একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক হইবেন এবং নির্ব্বাচনকারিণী রমণীগণ অন্ততঃ ত্রিংশ বর্ষ বয়স্কা হইবেন। বিদেশী লোক, দেউলিয়া, পাগল, বদমাইস, বোকা ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণের ভোট প্রদানের অধিকার নাই। লর্ডগণেরও ভোট নাই। হাউস্ অফ কমন্সের যে সমুদায় সভ্য বেতনভোগী নহেন, তাঁহারা বার্ষিক চারিশত পাউণ্ড করিয়া পাইয়া থাকেন। হাউস্ অফ্ লর্ডসের সভ্যগণ বেতনভোগী নহেন। নূতন পার্লামেণ্ট্ বলিলে বুঝিতে হইবে নূতন হাউস্ অফ্ কমন্স্ গঠিত হইল। পার্লামেণ্ট্ ভঙ্গ করা বলিলে বুঝিতে হইবে হাউস্ অফ্ কমন্স্ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল এবং পুনরায় নূতন ভোট গ্রহণ করা হইবে। এম, পি (মেম্বর অফ্ পার্লামেণ্ট্) বলিলে হাউস্ অফ্ কমন্সের মেম্বরগণকে বুঝায়। হাউস্ অফ্ লর্ডসের সভ্যগণ ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন না। ইংলণ্ডেশ্বর পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন এবং ভঙ্গ করেন। গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের চান্সেলারগণ রিটার্ণিং অফিসারগণের উপর নির্ব্বাচনের হুকুম জারি করেন, এবং তৎসমুদায় অফিসার ১৮৭২ সালের ব্যালট্ য়্যাক্ট্ অনুসারে নির্ব্বাচন ব্যাপার সম্পাদন করেন। উক্ত অফিসারগণই নির্ব্বাচনের তারিখ ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নোটিশ দেন। নির্ব্বাচনের দিনে প্রার্থিগণের নামোল্লেখ হয়; এবং যদি মাত্র একজন প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচিত হইলেন এইরূপ ঘোষিত হয়। যদি একাধিক প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে ভোটের দিবস নিরূপিত হয়। গোপনে ব্যালটের দ্বারা ভোট সম্পাদিত হয়। নির্ব্বাচনের খরচা সচরাচর অত্যধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। প্রার্থী যে দলের অন্তর্ভুক্ত, কখন কখন সেই দলের টাকা হইতে ঐ খরচা দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই প্রার্থী নিজে সেই ব্যয়ভার বহন করেন। তাই বলিয়া তিনি বেশী পরিমাণ খরচ করিয়া তাঁহার ভোট সংগ্রহের সুবিধা করিয়া লইতে পারেন না। ব্যালট্ য়্যাক্ট ও ১৮৮৩ সালের The Corrupt and Illegal Practices Act-এর দ্বারা ঘুষের প্রথা এবং ভোটারগণের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার যতদূর সম্ভব নিবারিত হইয়াছে। ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের স্থিতিকাল খুব বেশী হইলে সাত বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত ছিল; ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট্ য়্যাক্ট অনুসারে পাঁচ বৎসর সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পার্লামেণ্টের কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহকল্পে বহু কমিটী গঠিত হইয়া থাকে। পার্লামেণ্ট্ হাউস্ লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনষ্টরে অবস্থিত। পার্লামেণ্ট্ খুলিবার সময় বিশেষভাবে আদব-কায়দা পালিত হইয়া থাকে। সভ্যগণ প্রথমতঃ তাঁহাদিগের নিজেদের হাউসে একত্র হইয়া থাকেন। অতঃপর সাধারণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ হাউস্ অফ্ লর্ড্সে গমন করেন। তথায় লর্ড্ চ্যান্সেলর তাঁহাদিগকে একজন Speaker বা বক্তা নিয়োগ করিতে বলেন। তাঁহারা বক্তা নির্ব্বাচন করিয়া লর্ডগণের নিকট প্রত্যাগমন করেন এবং সেখানে ইংলণ্ডের লর্ড্ চ্যান্সেলরের দ্বারা বক্তার নিয়োগ অনুমোদন করিয়া লন। তার পর সাধারণ সম্প্রদায়ের প্রাচীন কাল হইতে লব্ধ অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়া থাকে, এবং তদনন্তর উক্ত সম্প্রদায়ের সভ্যগণ নিজেদের হাউসে গমন করিয়া থাকেন। অতঃপর শপথ গৃহীত হয়। পরদিবস নৃপতি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার পর পার্লামেণ্টের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। স্পিকার, সার্জেণ্ট্ য়্যাট আর্ম্স্, চ্যাপ্লেন প্রভৃতি হাউস্ অফ্ কমন্সের প্রধান কর্ম্ম করেন। পূর্ব্বকালে হাউস্ অফ্ কমন্স্ কেবল দরখাস্তই করিত, এবং একজন বক্তার দ্বারা তাঁহাদিগের দরখাস্ত করা হইত। এই কারণে—এই বক্তানিয়োগ-প্রথা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কোন বহুদর্শী সভ্যই এই পদে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তিনি ঐ হাউসের সভাপতি হয়েন, নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যা করেন, যাহা স্থিরীকৃত হইল তাহা ঘোষণা করেন, যাহা আদেশ দেওয়া হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করেন এবং সভ্যগণকে অনেক বিষয়েই পরামর্শ দিয়া থাকেন।

১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট্ আইন অনুসারে সর্ব্বপ্রকার আইন প্রণয়ন বিষয়ে হাউস অফ্ কমন্সই সর্ব্বপ্রধান; বিশেষতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন বিষয়ে এই হাউসই সর্ব্বেসর্ব্বা। হাউস্ অফ্ কমন্সের কার্য্যসমূহ সম্পাদনের যে সমুদায় নিয়ম আছে, তাহা অতীব জটিল। সাধারণ সভ্যেরা মোটামুটি নিয়মগুলি মাত্র জানিয়া রাখেন। বিশেষভাবে জানিতে হইলে 'বক্তার' পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। বক্তাই সমুদায় কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেন; কেহ অসঙ্গত বলিতেছেন এইরূপ বোধ হইলে তিনি তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কোন একটী

আলোচনা বন্ধ করিবারও নিয়মাবলী রহিয়াছে। যাহা হউক, হাউস্ অফ্ লর্ড্‌সেও এতাদৃশ নিয়ম সমুদায় রহিয়াছে। প্রত্যেক হাউসের সভ্যগণেরই কতিপয় অধিকার আছে। প্রধান প্রধান অধিকার-গুলি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে (১) মেম্বরগণকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় না। সেসনের সময় ব্যাপিয়া এবং সেসনের পূর্ব্বে ও পরে চল্লিশ দিবস ধরিয়া তাঁহারা এই অধিকার ভোগ করেন। (২) বক্তৃতার স্বাধীনতা; অর্থাৎ পার্লামেণ্টে তাঁহারা যে বক্তৃতা করিবেন তাহার জন্য পার্লামেণ্ট্ ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহাদের দায়িত্ব থাকিবে না। (৩) ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট যাইবার অধিকার। লর্ডগণ ব্যক্তিগত ভাবে এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ একযোগে এই ক্ষমতা উপভোগ করেন। সভ্যগণকে জুরির কার্য্য করিতে হয় না; তবে সাক্ষ্য দিতে হয়। হাউস্ অফ্ লর্ড্‌সের কোন সভ্য রাজদ্রোহ বা বদমাইসির মোকদ্দমায় পড়িলে হাউস্ অফ্ লর্ড্‌সেই তাঁহার বিচার হইবে। দেওয়ানী মোকদ্দমায় তাঁহারা গ্রেপ্তার হইতে পারেন না। আরও নানাপ্রকার সুবিধা ও অধিকার তাঁহারা ভোগ করেন।

মন্ত্রিসভার কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রিসভাই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক বিষয়ে যে দল প্রবল থাকে, সেই দলের লোক লইয়াই এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। উভয় হাউসের সভ্যই মন্ত্রি-সভায় স্থান পান। প্রধান মন্ত্রী এই মন্ত্রিসভার কর্ত্তা। সাধারণ সম্প্রদায়ের আস্থা যতকাল তাঁহার উপর থাকে, ততকাল তিনি এই পদে থাকেন। যাহা হউক, মন্ত্রিসভা গঠনের প্রথা এই প্রকার:— হাউস্ অফ্ কমন্‌সে যে দল প্রবল থাকে, তাহার নেতাকে ইংলণ্ডেশ্বর ডাকিয়া পাঠান, এবং তাঁহাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলেন। যদি সেই নেতা বিবেচনা করেন যে, তাঁহার গঠিত মন্ত্রিসভায় হাউস্ অফ্ কমন্‌সের আস্থা থাকিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার নিজদলের লোক হইতে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আরম্ভ করেন; অবশ্য তিনি সেই দলের প্রধান লোক গুলিকেই বাছিয়া লন। তাঁহাদের দ্বারা দলের কতটুকু কি উপকার হইয়াছে, তাঁহাদের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা কিরূপ, এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় মন্ত্রিসমূহের পদে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবেন কি না, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই তিনি লোক পছন্দ করেন। যাঁহাদিগকে তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাঁহাদের নাম তিনি নৃপতির হস্তে প্রদান করেন। তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়া গেল। মন্ত্রিসভায় যে যে মন্ত্রিপদ থাকে, সময়ে সময়ে তাহার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত মন্ত্রিসমূহ ছিলেন:—প্রধান মন্ত্রী (তিনি সচরাচর রাজকোষের প্রধান লর্ড) প্রধান বিচারপতি, রাজকোষের কর্ত্তা, পাঁচজন ষ্টেট্ সেক্রেটারী (স্বদেশীয় ব্যাপারের ষ্টেট্ সেক্রেটারী, বৈদেশিক ব্যাপারের ষ্টেট্ সেক্রেটারী, উপনিবেশসমূহের ষ্টেট্ সেক্রেটারী, যুদ্ধের ষ্টেট্ সেক্রেটারি ও ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী), লর্ড প্রিভি সিল, কাউন্সিলের সভাপতি, নৌবলের প্রধান লর্ড, স্থানীয় শাসন-সমিতির সভাপতি, শিক্ষা-সমিতির সভাপতি, ল্যাঙ্কাষ্টারের চ্যান্সেলর, কার্য্য-সম্পাদন সমিতির সভাপতি, পোষ্টমাষ্টার জেনারল, স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী এবং আয়ারলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী। এই উনবিংশটি মন্ত্রীর সম্মিলনে মন্ত্রিসভা গঠিত। তবে, প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিবেচনা অনুসারে মন্ত্রিপদ বৃদ্ধি করিতেও পারেন, আবার কমাইতেও পারেন। বিগত যুদ্ধের সময় মন্ত্রিসভাটী বৃহত্তর বলিয়া বোধ হওয়ায়, পাঁচজন মন্ত্রীর সম্মিলনে একটী ক্ষুদ্রতর সমর-মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ১৯১৮ সালেও সমর-মন্ত্রিসভা চলিয়াছিল। প্রথমতঃ হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ মন্ত্রিসভার আনুগত্য করিতেছিল, অতঃপর হাউস্ অফ্ কমন্‌সের সহিত মন্ত্রিসভার মতদ্বৈধ ঘটিতে লাগিল। যাহা হউক, প্রধান মন্ত্রী সেই সমর-মন্ত্রিসভা শেষ করিয়া ফেলা সঙ্গত মনে করিলেন, এবং পুরাতন প্রথায় একটী নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কোন বিষয়ে প্রস্তাব করিতে হইলে সেই বিষয় যে মন্ত্রীর হস্তে রহিয়াছে, তিনিই তদ্বিষয়ে প্রস্তাব করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই প্রস্তাবের জন্য মন্ত্রিসভা একযোগে দায়ী। বাস্তবিক পক্ষে হাউস্ অফ্ কমন্‌সের নিকট মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব রাখিয়া থাকে, এবং মন্ত্রিসভার হাত দিয়াই হাউস অফ্ কমন্‌স্ সমুদায় বিষয়ে আধিপত্য করিয়া থাকে; কিন্তু এই মন্ত্রিসভার ক্ষমতাসমূহ আইনের দ্বারা স্বীকৃত নহে। আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই মন্ত্রিসভার সভ্যগণ প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন। ১৯০৫ সালে প্রধান মন্ত্রীর পদ আইনের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর পদের বেতন নাই। তবে তিনি একটী বেতনের পদ গ্রহণ করেন; সাধারণতঃ First Lord of the Treasuryরূপে তিনি কার্য্য করেন। মন্ত্রিসভার কার্য্যাবলী গোপনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে এই মন্ত্রিসভার যে সকল মিটিং হইত, তৎসমুদায়ের কার্য্য-বিবরণ রাখা হইত না। যুদ্ধের পর হইতে কার্য্য-বিবরণ রক্ষা করা হইয়া থাকে; এবং বাহিরের লোকদিগের সহিতও অনেক বিষয়ে পরামর্শ করা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, মন্ত্রিসভার হস্তে সকল বিষয়ের ক্ষমতা থাকিলেও, হাউস্ অফ্ লর্ড্‌স্ চরম বিচারালয় হইলেও, এবং হাউস্ অফ্ কমন্‌স্ মন্ত্রি-সভাকে নিজের আধিপত্যাধীন রাখিলেও, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইংলণ্ডেশ্বরই তৎসমুদায়ের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহার নামেই সমুদায় শাসন-কার্য্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে। আর বিচার বিষয়েও তিনিই সকল বিচারের মূলস্বরূপ, বিচারালয়সমূহে তাঁহার নামেই সব বিচার করা হইয়া থাকে। তাঁহারই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহক ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাত দিয়া পরিচালনা করা হইয়া থাকে; এবং বিচার বিষয়ক ক্ষমতা বিচারালয়সমূহের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে নৃপতির নামে যে সমুদায় ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তৎসমুদায় কার্য্যতঃ যেভাবে পরিচালিত করা হইয়া থাকে, এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিলেই, ইংলণ্ডের শাসন-পদ্ধতি বুঝিতে পারা যাইবে। দেখিতে গেলে ইংলণ্ডেশ্বরের ইচ্ছাতেই পার্লামেণ্টের অস্তিত্ব। তিনিই সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন; আবার ইচ্ছা করিলে তিনি পার্লামেণ্ট,

ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। তিনি ঘোষণা প্রভৃতি জারি করিতে পারেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার মন্ত্রিসমূহের পরামর্শ অনুসারেই এই সমুদায় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে; আর এই মন্ত্রিগণের সমষ্টিই মন্ত্রিসভা, সুতরাং সকল বিষয়েই মন্ত্রিসভার আধিপত্য রহিয়াছে বলিতে হইবে। নৃপতির অসংখ্য কার্য্য-নির্ব্বাহক ক্ষমতা রহিয়াছে, আইন-সকল কার্য্যে পরিণত হইতেছে কি না তৎপ্রতি তিনিই লক্ষ্য রাখিবেন। বড় বড় পদগুলিতে লোক নিযুক্ত করা তাঁহারই কার্য্য। জজ প্রভৃতি কয়েকটা বড় বড় পদের কথা বাদ দিলে, অবশিষ্ট সব কর্ম্মচারীকেই তিনি সরাইয়া দিতে পারেন। ব্যয় বিষয়ক ক্ষমতাও তাঁহারই হস্তে। অপরাধীকে তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমাও করিতে পারেন। তিনিই লর্ড সমুদায় সৃষ্টি করেন, এবং সম্মানের উপাধিসমূহ প্রদান করেন; মুদ্রা প্রস্তুত করার আদেশও তিনিই দিয়া থাকেন। নৌ-সৈন্যের এবং স্থলপথের সৈন্যের তিনিই সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনিই রাজ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্য দেশীয় রাজগণের সহিত প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। দূতসমূহ তাঁহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া থাকেন। তিনি চার্চসমূহের কর্ত্তা; কিন্তু কার্য্যতঃ মন্ত্রিসভা নৃপতির এই সমুদায় কার্য্যের জন্য দায়ী। ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতির একটা মূল মন্ত্র এই যে রাজা কর্ত্তৃক কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য আচরিত হইতে পারে না। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইংলণ্ডেশ্বরের নামে যে সমুদায় কার্য্যই কৃত হউক না, মন্ত্রিগণ সব কার্য্যের নিমিত্তই দায়ী থাকিবেন। বর্ত্তমানকালে দেখিতে গেলে রাজার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকার এই রহিয়াছে যে, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই করা হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে এই অধিকারের খুবই মূল্য রহিয়াছে; রাজার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বহু কার্য্যের উপরই ঘটিতে পারে। রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তাঁহার মন্ত্রিসমূহের সহিত তিনি আলোচনা করিতে পারেন এবং যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরামর্শ বা উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন, অথবা সতর্ক করিয়া দিতে পারেন।

ছাত্র-স্বাস্থ্য

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এস্

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় হঠাৎ মনে হইল—আমাদের দেশের ছাত্রেরাই ভগ্নস্বাস্থ্য, না জগতের সর্ব্বত্রই এই অবস্থা? এবং সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠিল—আমাদেরই দেশের ছাত্রেরা কাহার সম্পত্তি—ক্ষমা করিবেন, ছাত্রেরা জীবিত ও প্রাণশক্তি বহুল হইলেও, কথাটা ঐ ভাবেই আমার মনে উঠিয়াছিল! এরূপ চিন্তা অকারণে বা অকস্মাৎ আমার হৃদয় অধিকার করে নাই—অর্থাৎ খোস খেয়ালের বশে ঐরূপ চিন্তা করি নাই—পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া গভীর মনোবেদনার বশবর্ত্তী হইয়াই ঐরূপ দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলাম। আমি আমার স্বর্গগত পিতামহ বা মাতামহ কাহাকেও দেখি নাই; তবে পিতামহের অন্তিমশয্যার একখানি অস্পষ্ট আলোক-চিত্র দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, মরণেও তাঁহার বিরাট দেহের গরিমা লুপ্ত হয় নাই। তাহার পরে আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বিশালকায় না হইলেও বিপুল-বক্ষঃ ও পুষ্ট অস্থিবিশিষ্ট দেহধারী ছিলেন। ক্রমাগত ৪৫ বৎসর কাল ডায়াবিটিজ বা মধুমেহ নামক কালরোগে ভুগিয়াও, প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে, রক্ত-আমাশয় ব্যারামে, হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। অর্থাৎ আমাশয়ের ন্যায় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা না ঘটিলে, তিনি আরো বেশী দিন জীবিত থাকিতেন। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি অতীব সুন্দর ছিল তিনি মৃত্যুর ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে সাহিত্য-সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আমি—না তাঁহার মত দেহ, না তাঁহার মত স্বাস্থ্য পাইয়াছি। আবার আমার পুত্র, এই বয়সেই (২২ বৎসর বয়সে) চশমাধারী ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত—বেচারী শুধু নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে, আজ দাঁড়াইয়া আছে। এই যে চার পুরুষের স্বাস্থ্যের হিসাব দিলাম, ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এক এক পুরুষ আমাদিগের গত হইতেছেন, আর স্বাস্থ্য ও আয়ু হিসাবে আমরা যেন ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছি! এই কথাটি যে শুধু আমারই বংশে প্রযোজ্য, তাহা নহে। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লীগ্রামবাসীদের কথা বলিতে পারি না; সহরবাসী সকল হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বংশেই, এই একই কথা—জাতি বিষয়ে আমরা ক্রমশঃই স্বাস্থ্যে, আয়ুতে, সহিষ্ণুতায়, কর্ম্মকুশলতায়—যে বিষয়ে ভাবি, সকল বিষয়েই ধ্বংসের মুখে যাইতেছি। আশা করি, মুসলমান ভ্রাতাদিগের সংসারে এই ভয়াবহ দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না।

এই যে ধাপে ধাপে আমাদিগের দুর্গতি ঘটিতেছে, এই কথা সত্য কি মিথ্যা, কতকটা এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্যই, আমি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১০০০ ছাত্রের স্বাস্থ্য স্বয়ং চারমাস পরিশ্রম করিয়া, নির্ণয় করি। নির্ণয়ের ফল অতীব শোচনীয়। আমাদের দেশের বালকেরা ইংলণ্ড ও আমেরিকবাসী বালকদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কমিশনের রিপোর্টের দ্বাদশ খণ্ডে তাহা পাইবেন। উক্ত শোচনীয় ফলাফলের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। তৎকালে "ভারতবর্ষ", "অমৃতবাজার", "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট", "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদপত্রেও তথ্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে খুব কম লোকেই মন দিয়াছে।

আমার আন্দোলন বৃথায় যায় নাই। আমার আন্দোলনের ফলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গল হেল্‌থ্ ডিপার্টমেণ্ট, কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড এ দিকে দৃষ্টি দিতেছেন—ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন। আমি ছাত্র-পরীক্ষাকালীন কয়েকটি মূল সূত্র ধরিয়া কাজ করিয়াছিলাম; বর্ত্তমান কর্ম্মীরা "লেফাফা দুরস্ত" রাখার মত কায করিতেছেন; কলেজে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা আজ কলেজে পড়েন, তাঁহারা আর ২।৩ বৎসর পরে যখন সংসারী হইবেন, তখন তাঁহাদিগের দেহের কথা

ভাবিবারও সময় থাকিবে না। খুব অল্প বয়সে ছাত্রদিগের শারীরিক বা মানসিক কোনও ত্রুটি থাকিলে, সেই বয়সেই তাহার প্রতিবিধান করা যায়। এই জন্যই প্রাইমারী ক্লাসের, মাইনর ক্লাসের ও হাইস্কুলের অর্থাৎ ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, যত ছাত্র আছে, তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাই উচিত এবং পরীক্ষা করিয়া, যদি কোনও দোষ ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ভাল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে ছাত্রের চোখের দৃষ্টি কম, তাহাকে একজোড়া চশমা দেওয়া কর্ত্তব্য; যাহার বুকের দোষ বা দুর্ব্বলতা আছে, তাহাকে মাঠের মাঝে গাছতলায় ক্লাস করিয়া পড়ান উচিত ইত্যাদি।

কিন্তু যদি ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের স্বাস্থ্যঘটিত দোষ ত্রুটির অন্ততঃ আংশিক প্রতিকার না করা যায়, তাহা হইলে পরীক্ষা করিয়া কোনও ফল নাই। উক্তরূপ নিষ্ফল পরীক্ষা কিছুদিন করার পরে কি পরীক্ষক, কি ছাত্রমণ্ডলী ও তাহাদিগের অভিভাবক সকলেই বিরক্ত হইয়া পড়িবেন।

তদুপরি, বিষয়টি অত্যন্ত বিরাট। এ দেশের বিজাতীয় গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ শিক্ষাকার্য্যে কখনই যথেষ্ট ব্যয় করেন নাই এবং বোধ হয় করিবেনও না। এমন স্থলে, স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যয়, আবার তাহার উপরে ত্রুটি সংশোধনের গুরু ভার কে বহন করিবে? কাযেই, এই নিষ্ফল কর্ম্ম করিয়া লাভ কি? যেহেতু এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর, এ দেশের ছাত্রেরা কাহারো সম্পত্তি নহেন। এমন কি পিতামাতারও নন। সন্তান হিসাবে তাঁহারা স্ব স্ব বাপ-মায়ের কাছে থাকেন বটে এবং তাঁহাদেরই অর্থে স্কুলের বেতন ও ঘরে প্রাইভেট মাষ্টারের বেতন যোগান বটে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ বিশাল বাঙ্গালাদেশে, কয়জন পিতা-মাতা নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন? জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পিতা নিজ সন্তানের শিক্ষার গতি, ক্রম বা উন্নতি প্রত্যহ না হউক, মাসেও একবার লক্ষ্য করেন? তাঁহারা অর্থ যোগান, পুত্রগণকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন, আর বৎসরান্তে ক্লাস প্রমোশনের সময়ে আনন্দ চিত্তে অথবা বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে সম্বৎসরের পাঠের ফলাফল শুনেন মাত্র। শিক্ষার্থী হিসাবে কয়টি বালক নিজ পিতামাতার যত্ন বা চেষ্টার দাবী করিতে পারে? এদেশে, বর্ত্তমান সময়ে যতক্ষণ না বাড়ীর কেহ শয্যাগ্রহণ করে, ততক্ষণ তাহার স্বাস্থ্যের কথা সে বাড়ীর কাহারো মনে থাকে না; কাযেই ছেলে রুগ্ন কি স্বাস্থ্যবান্, তাহার চোখ কাণ ঠিক আছে কি না, এ বালাই কখনো পিতামাতার হয় নাই। যদি জ্যান্ত মানুষটার সম্বন্ধেই এই উদাসীনতা, তখন ছাত্রের মনোবৃত্তি কোন্ অভিমুখে ধাবিত, কোন্ ধারায় তাহার প্রতিভা বিকশিত অথবা তাহার শিক্ষার কোন্ দিক আলগা বা কাঁচা আছে, সে কথার চিন্তা অনেক দূরে!!! এটা একটা মস্ত সত্য কথা যে, আমাদের দেশের ছেলেরা গড়াইয়া-গড়াইয়াই বড় হয়—অর্থাৎ পিতামাতার রীতিমত যত্ন পায় বলিয়া বড় হয় না, পিতামাতার রীতিমত অযত্ন সত্ত্বেও বড় হয়!!! Our children grow, because of, but inspite of, their parents. কাযেই, যদি বালকেরা নিজ পিতামাতার ঐকান্তিক যত্নে বঞ্চিত হয়, তবে আর কাহার কি দায়? এই ত নিজ পিতামাতার সম্বন্ধ; দ্বিতীয়তঃ সমাজের কথা ধরুন। আজ হিন্দুর সমাজ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই; আছে সমাজের প্রেতমূর্ত্তি। কাজেই, বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র সম্বন্ধে সমাজেরও কোন দায়িত্ব নাই। পূর্ব্বে সমাজ সুশিক্ষিত অধ্যাপকগণকে বৃত্তি দ্বারা সংসার সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ রাখিতেন; অধ্যাপকেরা তৎ-পরিবর্ত্তে সমাজের হইয়া মানুষ গড়িতেন। যদি খাঁটি নিজ গণ্ডী ছাড়াইয়া সমাজের বাহিরে দৃষ্টিপাত করি, তবে ছাত্র সম্বন্ধে ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে গবর্ণমেণ্টকে ধরুন; গবর্ণমেণ্টের চিরকালই টাকার টানাটানি; তাহার উপরে বড় বড় বাড়ী তৈয়ারী করিতে, ও তাহার আসবাব যোগাইতে, বড় বড় মাহিয়ানাওয়ালা ডাইরেক্টর ও ইন্স্পেক্টর যোগাইতে, এবং ছাত্রদিগের প্রতি বন্ধনের শৃঙ্খল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে গবর্ণমেণ্টের না থাকে হাতে টাকা, না থাকে ভাবিবার সময়। তাহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ধরুন। তাঁহারা ইংরাজ সরকারের রাজকার্য্য চালাইবার জন্য উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, হাকিম, কেরাণীকুল তৈয়ারি করিবার ৭৫ বৎসরের সনাতন কলটির কর্ণধার হইয়া আছেন। সেই ৭৫ বৎসরের জীর্ণ প্রথার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার সাহসও নাই, ক্ষমতাও নাই এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বোধোদয়ের "ঈশ্বরের" মত ছাত্রদিগের অবস্থা চক্ষে দেখিতেও পান না, কর্ণে শুনিতেও পান না! ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্র-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার সময়ে আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম "আপনার প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দায়িত্ব কতটুকু?" ইহার উত্তর যাহা পাইয়াছিলাম, আজও আমার উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে আকাশে বাতাসে হা হা করিয়া ঘুরিতেছে:—

(১) বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রী।
(২) ডাইরেক্টর অফ্ পাব্লিক্ ইন্ষ্ট্রাক্সান।
(৩) " " " হেল্থ্।
(৪) সার্জ্জন জেনারেল উইথ্ দি গবর্ণমেণ্ট।
(৫) রেজিষ্ট্রার, বিশ্ববিদ্যালয়।
(৬) কলিকাতা কর্পোরেসনের চেয়ারম্যান।

ইঁহারা সকলেই কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন! আর আজ মামুলি ধরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে মুক্তকণ্ঠে ও বাষ্পাকুলনেত্রে জানাইতে হইতেছে যে, তাঁহারা বে-ওয়ারীশ, তাঁহারা না ঘরকা, না পরকা। অথচ এই ছাত্রগণই সকল দেশে সকল কালে সকলেরই আদরের পাত্র!

আমি দুইটি কথা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম—প্রথমটি—আমাদের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য কেমন? এবং দ্বিতীয়টি—ছাত্রেরা কাহার সম্পত্তি। এবং জানিলাম যে স্বাস্থ্য-হিসাবে আমরা ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে যাইতেছি এবং জানিলাম যে পথিপার্শ্বে ত্যক্ত এই ছাত্রেরা কাহারো আপনার নহে!!!

এমন অবস্থায় ছাত্রদিগেরই বা কি কর্ত্তব্য এবং আমাদিগেরই বা কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্যের কথা বলিতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা

বলিতে হয়; কিন্তু ইংরাজের রাজত্বে ছাত্রদিগের উপরে যেরূপ কড়া ও বিষময় দৃষ্টি এবং ট্রান্সফার সার্টিফিকেট্, হষ্টেল প্রভৃতির নাগপাশ এতই দৃঢ় যে, আমরা তাহাদেরই চাপে অবশ হইয়া পড়িতেছি। সে সকল কাহিনীর উল্লেখমাত্র করিবার অধিকার আমাদিগের আছে—প্রতিকার করিবার ক্ষমতা নাই।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, একযোগে অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং নিম্নোক্ত চারি পক্ষীয় লোকের সহযোগিতা সফল করিয়া, তবে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সেই পক্ষগণ এই :—

(১) সরকার বা গবর্ণমেন্ট পক্ষ।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ।

(৩) সমাজ।

(৪) ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি পক্ষ।

আজ আমরা আমাদের স্বকীয় সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিয়াছি। কাযেই, এখন ইংরাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই। আমাদের সমাজ নাই, আর সে দেবচরিত্র, সর্ব্বত্যাগী একনিষ্ঠ শিক্ষার সাধক নাই, আর শিক্ষার মর্য্যাদা নাই, আদর্শ নৈতিক চরিত্রের গৌরব নাই; নাই সমাজের বন্দোবস্ত, নাই শিক্ষকগণকে নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাচর্চ্চা করিবার সুযোগ দান—নাই সরলতা, নাই সন্তোষ। অত্যন্ত নিরাশায় পড়িয়াই, এই দুঃখের কাহিনী বলিয়া ফেলিলাম।

অথব ছেলেরা লেখাপড়া শেখে—বাপ-মা শিখান বলিয়া। বাপ-মা ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শিখান জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক এবং পরহিতব্রতী হইবে বলিয়া নয়, ভবিষ্যতে ছেলের দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সুখে থাকিবে বলিয়া—তাহাতে সমাজের কিছু সুবিধা অসুবিধা থাকে তাহা মৃতপ্রায় সমাজ বুঝুক। তবেই কথাটা দাঁড়াইল এই যে—লেখাপড়া শিখানর উদ্দেশ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য—গাড়ী ঘোড়া চাড়বার সুবিধা লাভ করিবার জন্য—অর্থোপার্জ্জনের জন্য।

আদর্শটা এত খাটো বলিয়াই—যেখানে ভিক্ষা মিলিবে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার্থীগণকে তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন হয়; অর্থাৎ সে-যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে, ইংরাজের দ্বারে হাত পাতিয়া "ভবান্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইয়া, তার স্বরে চীৎকার করিতে হয়—সেই বিদ্যাই শিখে। কাযেই—ইংরাজের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাদের পরম ও চরম গতি। সেটা গতি কি অগতি করিয়াছে তাহা এখন আমরা বেশ বুঝিতেছি। কাযেই আমাদের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ছাত্রদিগকে দুই দলে বিভাগ করিয়া লইতে হইবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আজ হঠাৎ আবার "জাতীয়" বিদ্যালয়ের কথা তুলিতেছি কেন? সে ধৃষ্টতায় অনেক রকম-ফের ত হইয়া গিয়াছে। আমার কেন'র উত্তর এই যে, ইংরাজী নাম পাণ্টাইয়া, অথচ ষোল-আনা ইংরাজীর অনুকরণে, ছদ্ম ইংরাজী বিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয় বলিতেছি না; আমার বলিবার উদ্দেশ্য—দেশের লোকের ষোল-আনা কর্ত্তৃত্বে, দেশের জল-হাওয়া ও সমাজ ও ধর্ম্মানুসারে যে যে বিদ্যালয় ছিল বা গঠিত হইবে, সেইগুলিকেই জাতীয় বিদ্যালয় বলিতে চাহি। যতদিন সেরূপ বিদ্যালয় না হইবে, সহস্র তথাকথিত মুখস-পরা ইংরাজী ধরণের স্বদেশী বিদ্যালয়েও ততদিন কিছুই করিতে পারিবে না। অথচ, শিক্ষাটা জাতীয়ভাবে না হইলে আর আমাদের ভদ্রস্থতা নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেমিক ও জাতীয় শিক্ষালয়ভুক্ত—মোটামুটি এইভাবে ছাত্রগণকে দল বিভক্ত করিয়া না লইলে কোনও কায করা যাইবে না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই আসে যে, গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় মামুলি ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষা যেমন দিতেছেন তাহাই দিন, কারণ, চাকুরী-জীবীরা তাহাকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইবে। বাকি যাবতীয় ছাত্রকে লইয়া মোটামুটিভাবে শিক্ষা দিবার জাতীয় ব্যবস্থা হউক। তজ্জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং দেশের গণ্যমান্য লোকেরা ভার লউন। কিন্তু এ দেশের ছাত্রদিগের চুলের মুঠি যেরূপ ও কায়েমীভাবে গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে রাখিয়াছেন, তাহাতে অন্ততঃ প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা ভিন্ন জাতীয় শিক্ষার মূল পত্তন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

যাহা হউক—ছাত্রগণকে, শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে, দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়ার সময় আসিয়াছে। এবং ছাত্রগণের সংঘবদ্ধ হইবার সময়ও আসিয়াছে। অর্থাৎ একযোটে, ছাত্রগণকে নিজ নিজ প্রাপ্য দাবী করিতে হইবে এবং একযোটে দেশের লোককে ছাত্রদিগের বিষয়ে ষোল আনা অবহিত হইতে হইবে। আমাদিগকে জাতি হিসাবে, শিক্ষার আদর্শকে বড় করিতে হইবে, জাতি হিসাবে শিক্ষাকার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে; সরকারের উপরে মাদার দিয়া স্রোতে গা ভাসাইলে আর চলিবে না। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ-বচন আছে—যা'র বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নেই। ছাত্রেরা শিক্ষার জন্য ব্যস্ত—কিন্তু কি শিখিবে, কতটুকু শিখিবে, কি ভাবে শিখিবে—সে কথা তাহারা ভাবে না—যেহেতু কেহ ত আমাদিগকে নিজ নিজ স্বার্থ বিষয়ে ভাবিবার অবসরও দেয় নাই! আবার আমাদের দেশের অভিভাবকেরাও এতটাই দাসমনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন যে, তাঁহারাও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার ভার তাঁহাদের মনিব ইংরাজের হস্তে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তাই আজ এ দেশের মেয়েরাও মাতৃতত্ত্ব শিশুতত্ত্ব না শিখিয়া হিষ্ট্রি লজিকে সুপণ্ডিতা হইয়া, অকালে হয় ক্ষয়কাশ বা সূতিকায় প্রাণ হারান। সেই কারণেই, এ দেশের ছেলেরা বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়াও ঢাক ঢোল বাজাইয়া বর সাজিয় বিবাহ করিতে যাইতে লজ্জাবোধ করে না।

তাই উপায় হিসাবে আবার বলি—এ দেশের লোকেরা সর্ব্বপ্রথমে জাগুন—তাঁহারা জাগিয়া একযোটে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে রফা করুন—যে, যাহারা তথাকথিত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে চাহে, তাহারা তাহাই করুক—বাকী শতকরা ৯০ জন ছাত্র যাহাতে মানুষ হইয়া সংসারে বেড়াইতে পারে এমনভাবে মোটামুটি শিক্ষালাভ করুন। আমি চাহি না যে, কেরাণী সৃষ্টিকারী শুধু স্কুল-

ফাইনাল পরীক্ষাই আমাদের আদর্শ হউক। আমাদিগের কায আমাদিগকেই করিতে হইবে—নিজের বোঝা নিজেকেই বহিতে হইবে—অপরের স্কন্ধে তাহা তুলিয়া দিলে চলিবে কেন? এই ভাবে ও এই হিসাবে, শিক্ষাকে জাতীয়তা ভাবে ভূষিত করিতে হইবে। এই হইল আমাদিগের প্রথম কায। অর্থাৎ বাঙ্গালীজাতি যদি তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে মানুষ করিতে চাহে, তবে বাঙ্গালীর প্রথম কর্ত্তব্য—প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য—যাহাতে শিক্ষাকার্য্যে আমাদের ষোল আনা কথা বলিবার অধিকার থাকে, তাহাই করা।

যে দিনে আমরা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙ্গালীই, দেশের শিক্ষাকার্য্যে অবহিত হইব, সেই দিনেই আমরা ছাত্রগণকে বেশ বুঝিতেও দিতে পারিব যে তাহারা আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা—আমাদের সর্ব্বস্ব ধন' এ ভাব জাগাইতেই হইবে। এখানকার মত ভাব রাখিলে—ছাত্ররা শিক্ষককে মানিবে না, শিক্ষকও ছাত্রকে প্রীতির নজরে দেখিবেন না—ছাত্ররাও অভিভাবককে মানিবে না। এখনো সময় আছে—আমাদের বাছাদিগকে আমাদিগকেই বুকে তুলিয়া লইতেই হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—যদি কখনো সে সুদিন আসে—ছাত্র ও তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া একযোগে যথাবিধি ব্যবস্থা করা। যাহাতে ছাত্রেরা দেহে বলিষ্ঠ, জ্ঞানে গরীষ্ঠ ও নৈতিক বলে সমুন্নত হয়—সকলে মিলিয়া সে ব্যবস্থা করিয়া জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

কিন্তু যতদিন সে সুদিন না আসে,—যতদিন গবর্ণমেণ্ট বজ্রমুষ্টিতে ছাত্রগণকে আকর্ষণ করিয়া রাখেন—ততদিন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? এবার তাহাই কতকটা আভাসে বলিব।

আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বড় অভাব জ্ঞানের অভাব। তাহার পরে—স্বাবলম্বনের অভাব—তাহার পরে স্বাস্থ্যের (দৈহিক ও নৈতিক) অভাব। এই তিনটি অভাব মোচন না করিতে পারিলে, জাতিহিসাবে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার। জ্ঞানের অভাব দূর করিবার উপায় নির্দ্দেশ আমাদের করিয়াছি—কায করা কত দিনে সম্ভবপর হইবে, তাহা ভগবানই জানেন—কারণ, সকলই কাল-সাপেক্ষ। স্বাবলম্বন শিক্ষা কতকটা জাতীয় শিক্ষার মুখাপেক্ষী। যদি দেশের ছেলেদের চাকুরী-প্রীতি, বিলাসিতা ও বিদেশী মোহ কতকটা নষ্ট করা যায়, তাহারা মোড় ফিরিবে—আপনার পায়ে আপনি ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। যে শিক্ষা ছাত্রগণকে আত্মস্থ করে না, যে শিক্ষা লালসা ও বাসনার ইন্ধন যোগায়, যে শিক্ষায় মন প্রবল ও একটানা বেগে সুধু বহির্মুখীই হয়, সে শিক্ষা পরমুখাপেক্ষী ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। ইহার উল্টা দিকে স্রোত বহাইতে হইলে, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সে কত দূর?

কিন্তু এই নিরাশাময় মহানিশায় কিছু খদ্যোৎ-আলো দেখা যাইতেছে। আমরা এমন একটা কাম করিতে পারি, যাহার জন্ম কাহারও অনুগ্রহ বা সাহায্য আমাদিগের প্রয়োজন হয় না। সেটি—স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ গঠন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্বাস্থ্যহিসাবে আমরা ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছি। স্বাস্থ্যরক্ষা কতকটা ব্যক্তিগত চেষ্টা সাপেক্ষ, কতকটা রাজসাহায্য সাপেক্ষ। দেশের জল নিকাশের ব্যবস্থা, সুপেয়ের ব্যবস্থা, জঙ্গল কাটান, হাজা মজা নদী কাটান প্রভৃতি ব্যয় ও সময় সাধ্য কাযগুলির জন্ম আমাদিগকে 'গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। কিন্তু নিজ দেহকে বলিষ্ঠ ও সুস্থ রাখিতে শুধু আমার ব্যক্তিগত চেষ্টাই যথেষ্ট। আমি এই চেষ্টার কথাই বলিতেছি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ৬ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক এক সহস্র কলিকাতার বাঙ্গালী ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি, তখন বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের দেশের পুরুষ ছাত্রেরা বিলাতের পুরুষ ছাত্র এবং মার্কিণদেশীয় মেয়ে ছাত্রীদের অপেক্ষা স্বাস্থ্যে হীন! এ বড় লজ্জার কথা—এ লজ্জা দূর করিতেই হইবে।

এ লজ্জা দূর করিবার একমাত্র উপায়—রীতিমত ব্যায়াম-চর্চ্চা করা। আমার পিসামহাশয় পঠদ্দশায় বড়িষা-বেহালা হইতে নিত্য হেয়ার স্কুলে যাতায়াত করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই বাঙ্গালা দেশেই বড়লোকের ছেলেরা কুস্তি ও লাঠি খেলা শিখিতেন। আর আজ সে সকল ঘুচিয়া গিয়াছে। আমরা মেয়েলী ঢংটাকে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। আমরা বেশ-ভূষায়, চুল কাটায়, চলনে বলনে, গলার আওয়াজের ভঙ্গীতে সকল বিষয়েই মেয়েলীয়ানার দিকে চলিয়া পড়িতেছি। যুবকেরা তাস দাবা ও পালগল্প এবং বালকেরা লুডো ক্যারম্ প্রভৃতি কুড়েমি-খেলায় মাতিয়া আছে। এরূপ করিলে আর চলিবে না।

সন্তরণ, ডন-বৈঠক, ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজা, কুস্তি, লাঠিখেলা, বক্সিং জ্যু—জুৎসু-দৌড়ান, লাফান, কপাটি পাটিখেলা প্রভৃতি কোনটাতেই অর্থব্যয় নাই বলিলেও হয়—কাজেই ওগুলো ছোটলোকেদের কসরত্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফুটবল, লনটেনিস, হকি, ব্যাডমিণ্টন—এ সকল খেলায় বড়মানুষি দেখান যায়—কাজেই বর্ত্তমান সময়ে যুবকদিগের ঐ দিকেই ঝোঁক বেশী। কিন্তু যতলোক ফুটবল খেলা দেখে বা রাতদিন ফুটবল খেলার কথায় মাতে—তাহার এক সহস্রাংশ লোকও ত সে খেলা খেলে না! আজ যে জাতীয় তরুণদিগের আনন্দধ্বনি "হিপ্ হিপ্ হুরে," হইয়া পড়িয়াছে সে জাতি আত্মস্থ না আত্মবিস্মৃত? যে জাতি পল্লী ছাড়িয়া সহরেই বাস করিতে ভালবাসে, যে জাতি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া পিতামাতাকে ইংরাজীতে পত্র লেখে, যাহারা দেশী ভাষা, বেশ, ব্যবহার এমন কি আনন্দধ্বনিও ভুলিয়া যাইতেছে—সে জাতি—সে ছাত্রজাতি—আজ কোন্ মুখে চলিয়াছে তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

ছাত্রদিগের অপরাধ কি? তাহাদের পিতৃ-পিতামহ অতি হীন আদর্শে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা করেন—হীন স্বার্থের ও ভোগের পথে ঠেলিয়া দেন; তাহাদের সমাজ আজ নীরব; তাহাদের দেশ আজ বিজাতীয় বিলাস-লালসায় ষোল আনা মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের শিক্ষা আজ সর্ব্বতোভাবে বহির্মুখী—আজ তাহারা আত্মস্থ হয় কিসের জোরে?

কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ত চলিবে না! ছাত্রদিগকে স্ব স্ব হিত চিন্তা করিতেই হইবে—কেহই তাহাদিগের হইয়া ভাবিবে না, কেহই তাহাদিগের স্বাস্থ্য গড়িয়া দিবে না, কেহই তাহাদিগকে "মানুষ" করিবার পথে ঠেলিয়া দিবে না। আজ যদিও বা "ছাত্র" বোধে কেহ দয়া করিয়া তাহাদিগকে হিতোপদেশ দেন—ছাত্ররা স্মরণ রাখিবেন যে, আর দুচার বৎসর পরে, যখন তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বোঝা আপনাকে বহিতে হইবে—তখন একটু সহানুভূতি সূচক "আহা"ও কেহ বলিবে না। আজ যে ভগ্ন স্বাস্থ্য রুগ্ন শীর্ণ দেহ, দুর্ব্বল চক্ষু বা বক্ষোদেশ লইয়া লেখাপড়া করা চলিতেছে—সংসারে ঢুকিলে, ছেলে-পুলেদের ব্যারাম পীড়া, নিজের দৈহিক দুরবস্থা প্রভৃতি যখন চাপিয়া ধরিবে,—আজ হাঁপানি, কাল কাশ,—এই রকমে সংসারে যখন "জের-বার" হইবে—তখন কেহই ফিরিয়া তাকাইবে না। তখন অনুতাপ আসিবে—"কেন সময় থাকিতে শরীরটাকে শোধরাইবার ব্যবস্থা করি নাই—কেন দেহটাকে কর্ম্মঠ করি নাই"—ইত্যাকার নিষ্ফল রোদনই তখন সার হইবে!

তাই বলিতেছি হে ছাত্রগণ, আজ এই মুহূর্ত্ত হইতেই নিজ নিজ দেবতা স্মরণ করিয়া শপথ করুন—"আজ হইতেই দেহের প্রতি যত্ন করিব—আজ হইতেই এই দেহকে কর্ম্মঠ করিব।" কারণ, স্মরণ রাখিবেন যে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। সুধুই কি তাই? "বলং বলং বাহুবলং"—যতক্ষণ নিজে চেষ্টা না করিবেন, ততক্ষণ কোন কাযই কেহ করিয়া মাথা কিনিবে না। তাহা ছাড়া, আরো একটা কথা আছে—সে কথাটা আমরা যে কেন ভুলিয়া যাই তাহা জানি না। এই দেহ—এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ—শ্রীভগবানের মন্দির। জীর্ণ, ভগ্ন, অপরিষ্কার মন্দিরে ভগবানকে অতি বড় মূর্খও রাখে না। এই দেহকে কাযেই দৃঢ় ও কর্ম্মঠ করিতেই হইবে। সুধু যে রুটি রোজগারের জন্য গায়ের বল চাই, তাহা নহে—সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ হইলে, সে ব্যক্তির মনও দৃঢ় হয়। যাহার শরীর দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত তাহারই মন দুর্ব্বল। কাযেই দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে, মনও সবল হয়—অর্থাৎ, সংযম করিবার ক্ষমতা বাড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যে, রুগ্ন ব্যক্তিরা অত্যাচারী ও অসংযমী। এই জন্য মনের উপরে আধিপত্য করিবার জন্যও—ষড়রিপুকে দমন করিবার জন্য—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের জন্যও দেহকে সুস্থ ও সবল করা চাই—"নায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ"—এই জন্যই এই ঋষি বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া, তপ জপ করিয়া, ব্রহ্মকে যে সে লাভ করিতে পারে না—কারণ ছাদ দেখিলে ছাদে উঠার কায হয় না—সিঁড়ি চাই। সেই সিঁড়ি হইতেছে—শরীর গঠন, মনকে তৈয়ারি করা। সেই জন্যই আবার বলি—বাঙ্গালীর ঘরের ছেলেরা বাঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী—ধর্ম্মকে আশ্রয় কর। ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইলে, মনকে গড়িতে হইবে; মনকে গড়িতে হইলে, শরীরকে গড়িতে হইবে।

কাযেই, আমরা বেশ বুঝিলাম যে, যদি আমরা ভবিষ্যতে সংসারে সুখে বিচরণ করিতে চাই, তাহা হইলেও আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য শরীরকে তৈয়ারি করা; আর যদি আমরা যুগযুগান্তরের সাধনা করা হিন্দুর বাঞ্ছিত পথে চলিতে চাই—তাহা হইলেও দেহকে গড়িয়া তুলিতেই হইবে! দেহকে গড়িয়া তুলিতে হইলে ধন চাই না—মন চাই। মানুষ হইতে হইলে তাহার জন্য সাধনা করিতে হইবে—সে সাধনা দেহকে লইয়া। আজ হইতে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে ছাত্রেরা নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম চর্চ্চায় মন দাও—এ জাতির ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল হইবে! ব্যায়াম সম্বন্ধে নিয়ম কানুন লইয়া আমি সময় ক্ষেপ করিব না—আমি বারবার বলিয়াছি—আবার বলিতেছি—এবং যতদিন জীবিত থাকিব ততদিনই বলিব—হে বাঙ্গালী, তোমার ভবিষ্যৎ তোমার বাহুর উপরে নির্ভর করিতেছে।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলোপ যখন ব্যস্ত হইয়া মৃদুলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিলো তখন অনন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলো না। সে তাহার মটো করিয়া লইয়াছিলো—Strike the iron while it is hot! লোহার মতন কঠিন মৃদুলার মন অন্তরতাপে তপ্ত থাকিতে থাকিতে তাহাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী গঠন দিয়া লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া অনন্ত কোর্ট হইতে দ্বিপ্রহর বেলাতেই ফিরিয়া বাড়ীতে আসিলো। আহুতি জিজ্ঞাসা করিলো—এতো সকাল-সকাল চলে' এলে যে?

অনন্ত মনের হাসি মুখে চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলো—শরীরটা বেশ ভালো নেই।

অনন্ত স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইয়া একবার মৃদুলার কাছে যাইবার সুযোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া মনের মধ্যে ছটফট করিতে লাগিলো; যতোই বিলম্ব হইয়া যাইতেছিলো ততোই সে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলো। অবশেষে তিনটার সময় তাহার সুযোগ মিলিলো; আহুতি ভিক্টোরিয়া ক্রসের আনা লম্বার্ড উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলো। স্ত্রী নিদ্রায় অচেতন হইয়াছে দেখিয়াই অনন্ত সন্তর্পণে পা

টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া মলয়ের অন্তঃপুরে গিয়া উপস্থিত হইলো। সে মৃদুলার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দ্বার-লম্বিত পর্দ্দার এপার হইতে ডাকিলো—বৌদিদি, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

মৃদুলা ঘুমাইতেছিলো না। সে বিলোপের আগমনের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া মুহূর্ত্ত গণিতেছিলো এবং অশ্রুধারায় তাহার মুখ প্লাবিত হইতেছিলো। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলো মলয় কবে তাহাকে ভালোবাসার কি কথা বলিয়াছে, কবে কেমন করিয়া তাহাকে আদর করিয়াছে, কবে তাহার দৃষ্টিটি পত্নীর দিকে প্রণয়াবেশে রঙীন হইয়া তাকাইয়াছে! এই সমস্তের সহিত তাহার পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন কিছুতেই মৃদুলা খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিলো না। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলো না যে মানুষ কি এতো শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, অথবা নিজের প্রকৃত প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অমন একাগ্র তন্ময় প্রণয়ের অভিনয় ও ভাণ করিতে পারে? অনন্ত 'বৌদিদি' বলিয়া ডাকিতেই তাহার চিন্তায় বাধা পড়িলো, সে চমকিয়া উঠিলো, মনে করিলো বিলোপ আসিয়াছে বুঝি। সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিলো; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই 'ঘুমুচ্ছেন নাকি?' প্রশ্নের ঢং ও স্বর শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিলো যে প্রশ্নকর্তা বিলোপ নহে, অনন্ত। তাহার ত্বরা করিবার প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া গেলো। প্রথমে সে মনে করিলো সে সাড়া দিবে না, অনন্ত তাহাকে ঘুমন্ত মনে করিয়া ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু অনন্ত আবার যখন গলা-খাঁখারি দিয়া ডাকিলো—"বৌদিদি! এখনো ঘুমুচ্ছেন?" তখন সে আর সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলো না, সাড়া না দিলে অসভ্যতা করা হইবে বলিয়াই সে সাড়া দিলো—"না ঘুমুই নি, যাচ্ছি……" মৃদুলা চোখ মুখ মুছিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলো।

অনন্ত মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলো যে সে কাঁদিতেছিলো এবং কেনো যে কাঁদিতেছিলো তাহা অনুমান করিতেও তাহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলো না। সে মৃদুলাকে বলিলো—বৌদিদি, চোরের উপর রাগ করে' ভুঁয়ে ভাত খেয়ে লাভ কি? শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! এ তো আমাদের শাস্ত্রেরই সুবচন! মানুষে মানুষে সম্পর্ক তো আয়নায় মুখ দেখা, যে যেমন মুখভঙ্গী করবে সে তেমনি পাল্টা জবাব পাবে। মলয়-বাবু যে-রকম আচরণ করছেন, আপনিও ঠিক অমনি করুন দেখি, তা হলেই মলয়-বাবু দুদিনেই সায়েস্তা হয়ে যাবেন, ঢিট হয়ে যাবেন। আপনি ওঁকে দেখান তো যে আপনি আমার অনুরাগিণী হয়েছেন, এমনি দেখ্‌বেন যে ওঁর এমন হিংসা হবে যে উনি আপনাকে চোখের আড় করতে পারবেন না। আমি আপনাকে যেদিন দেখেছি সেইদিনই আমার মনপ্রাণ আপনাকে সমর্পণ করেছি। আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তাই করবো। আজ বিকালবেলা চলুন না নিজের চোখে মলয়-বাবুর কীর্ত্তি দেখে আসবেন—প্রেয়সীর বাড়ীর কাছে আপনি গাড়ীতে বসে' থাকবেন, আর মলয় বাবু সেই বাড়ীতে ঢুকবেন আপনি স্বচক্ষে দেখবেন……

মৃদুলা অবাক্ হইয়া অনন্তর সমস্ত কথা শুনিতেছিলো এবং তাহার মনের উপর দিয়া বিরুদ্ধ চিন্তার ঝড় বহিয়া যাইতেছিলো—ক্ষণিকের জন্য একবার তাহার মনে হইলো রবি-বাবুর মানভঞ্জন গল্পের নায়িকা গিরিবালার মতন সেও কি স্বামীর অনাচারের প্রতিহিংসা অনাচার করিয়া লইবে? অমনি তাহার সর্ব্ব দেহমন সঙ্কুচিত হইয়া অশুচিতার ভয়ে ও ঘৃণায় বলিয়া উঠিলো—ছি! অনন্তর প্রস্তাবে তাহার সহিত গিয়া স্বামীর কুচরিত্রের চাক্ষুষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতেও একবার ঈষৎ ইচ্ছা মনের মধ্যে উঁকি মারিতেই তাহার মনে হইলো যে ব্যক্তি নিজের মুখে পরস্ত্রীর সম্মুখে প্রণয় প্রকাশ করিতে পারে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া একাকিনী তাহার সহিত বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। এই কথা মনে হইতেই মৃদুলা গম্ভীর ভাবে "না" বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলো।

মৃদুলাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়াই অনন্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া সামনে ঝুঁকিয়া খপ্ করিয়া মৃদুলার হাত চাপিয়া ধরিয়া একটু নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলো—বৌদিদি, আপনি চলে' যাবেন না, আমি আপনাকে এমন ভালো বেসে ফেলেছি যে তেমন ভালোবাসা কখনো কেউ কাউকে বাসে নি……

মৃদুলা দৃষ্টি হইতে অগ্নিময়ী জ্বালা অনন্তর মুখের উপর হানিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলো—হাত ছাড়ুন, অসভ্য বর্ব্বরের মতন ব্যবহার করবেন না……

অনন্ত মৃদুলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলো—আপনি

আমার হাত থেকে বা মন থেকে কিছুতেই ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না—

'প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।'

এমন সময় বিলোপ সিঁড়ি হইতে দালানে উঠিয়াই দেখিতে পাইলো অনন্ত মৃদুলার হাত ধরিয়া কোমল স্বরে প্রণয়সূচক কবিত্ব করিতেছে! সে এই ব্যাপার দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলো—তাহার হৃদয়-মন্দিরের দেবীপ্রতিমা যেনো বিধর্ম্মীর অত্যাচারে চূর্ণ অপবিত্র হইয়া পড়িলো! পাছে মৃদুলার দাম্পত্যজীবনে ঈষৎ কলঙ্ককালিমার রেখাপাত হয় এই ভয়ে সে নিজের প্রাণপূর্ণ প্রণয় লইয়া কখনো তাহার সম্মুখে আসিতে সাহস করে না, আর সেই মৃদুলা কিনা পরপুরুষের হাত ধরিয়া প্রণয় নিবেদন নির্ব্বাক্ হইয়া অপ্রতিবাদে শুনিতেছে! বিলোপের সমস্ত অন্তর ব্যথিত পীড়িত লজ্জিত হইয়া হায় হায় করিয়া উঠিলো! এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া এতো কথা ভাবিয়া লইয়াই স্থির করিলো এখানে তাহার দাঁড়াইয়া এই অদর্শনীয় ব্যাপার দেখা ও অশ্রাব্য কথা শোনা উচিত নয়; তাহার অতর্কিত আগমন উহাদের দুজনের কেউ জানিবার পূর্ব্বেই তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে, নতুবা মৃদুলা লজ্জা পাইবে! খানিক পরে সে নীচে হইতেই ডাক দিয়া মৃদুলাকে সতর্ক করিয়া উপরে আসিবে।

বিলোপের আগমন মৃদুলা ও অনন্ত টের পায় নাই; একে বিলোপ পায়ের শব্দ করিয়া চলা অসভ্যতা মনে করে বলিয়া সন্তর্পণে সমস্ত পা পাতিয়া চলে এবং পায়ের ডগার উপর মাত্র ভর দিয়া সিঁড়িতে উঠে, তাতে আবার তাহার জুতার তলা রবারের; কাজেই তাহার আগমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারেই হইয়াছিলো।

অনন্তর কবিত্ব শুনিয়া মৃদুলার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিতেছিলো; কিন্তু সে একবার চেষ্টা করিয়াই বুঝিয়াছিলো অনন্তর বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তিলাভের জন্য বল প্রকাশ করিয়া কোনো ফল হইবে না; চীৎকার করিয়া চাকর-দাসীদের ডাকিয়া জড়ো করিতেও তাহার অপমান বোধ হইতেছিলো; তখন সে নিজের সতীত্বতেজ এবং অনন্তর মনুষ্যত্ব ও ভব্যতার উপর নির্ভর করিয়াই আপনাকে মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলো; সে দৃপ্ত স্বরে বলিলো—আপনাকে এতোদিন ভদ্রলোক বলে' জান্‌তাম…

এই কথা বলিতে বলিতে মৃদুলার মনে হইলো তাহার চাকর-দাসীদের কেউ তাহার এই দুরবস্থা দেখিতেছে না তো! এই কথা মনে হইতেই সে মুখ ফিরাইয়াই দেখিলো বিলোপ চোরের মতন সঙ্কুচিত ভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে। বিলোপকে পলায়নোদ্যত দেখিয়াই মৃদুলা বুঝিতে পারিলো বিলোপ কী ভুল করিয়া সেখানে আসিয়াও কোনো সাড়া না দিয়া পলায়ন করিতেছে! বিলোপ যে মনে করিয়াছে মৃদুলা দ্বিচারিণী ইহাতে সে ব্যথিত ও লজ্জিত হইলেও সেই সময় বিলোপকে দেখিয়া তাহার সাহসও হইলো এবং সে সাহায্যের সম্ভাবনা দেখিয়া মনে বিশেষ আশ্বাসও অনুভব করিলো।

বিলোপ সিঁড়ির এক ধাপ নামিয়াই যেই শুনিলো যে মৃদুলা রুষ্ট স্বরে অনন্তকে ভৎ‌র্সনা করিয়া বলিলো—"আপনাকে এতোদিন ভদ্রলোক বলে' জান্‌তাম……" অমনি তাহার চিত্ত চম্‌কাইয়া উঠিলো; সে ভাবিলো—তাহা হইলে আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহা তো মিথ্যা! অমনি তাহার হৃদয়-মন্দিরের চিত্তপীঠের উপর দেবীপ্রতিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বমহিমায় উদ্ভাস্বর হইয়া উঠিলো। তাহার এখন কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবার জন্য সে পিছন দিকে মুখ ফিরাইতেই মৃদুলার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি সম্মিলিত হইলো; সে দেখিলো মৃদুলার মলিন ভয়-ব্যাকুল মুখ সতীমহিমায় জ্বলজ্বল করিতেছে!

বিলোপের দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সম্মিলিত হইবা মাত্র মৃদুলা আগ্রহের সহিত তাহাকে ডাকিয়া বলিলো—দাদা, এই বাঁদরটার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন!…

বিলোপ সিঁড়ির দুই ধাপ নামিয়াছিলো। সে ফিরিয়া এক লাফে দুই ধাপ ডিঙাইয়া দালানে উঠিলো এবং দ্রুতপদে অনন্তর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে অবরুদ্ধ ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপিয়া রূঢ় ব্যঙ্গের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলো—এই বাঁদরটি কোন্ পশুশালার?

মৃদুলার ও বিলোপের কথার আঘাতে চকিত হইয়া অনন্ত মুখ ফিরাইয়াই বিলোপকে দেখিলো—লম্বা-চওড়া কৃষ্ণকায় জোয়ান হনহন করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে!

ভয়ে তাহার মুখ, শুকাইয়া গেলো! মৃদুলার বিবাহের পর এই অল্প কয়দিনের মধ্যে বিলোপ মাত্র একবার তাহাদের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর আসিয়াছিলো, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্য; তাই অনন্ত কখনো বিলোপকে দেখে নাই এবং তাহাকে চিনিতো না।

বিলোপের প্রশ্নের উত্তরে মৃদুলা বিরক্ত স্বরে বলিলো—ইনি এই পাশের বাড়ীটাকেই পশুশালায় পরিণত করেছেন!

বিলোপের আবির্ভাবে অনন্তর মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেলেও সে শুষ্ক মুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলো—স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ! যেই ধরা পড়ে' গেছে আর অমনি হয়ে পড়্লেন পরম সতী! কিন্তু এই সতীপণা আমার তো আর জান্‌তে বাকী······

বিলোপের বজ্রমুষ্টির এক ঘুষি অনন্তর মুখের উপর পড়িয়া তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিলো এবং বিলোপকে দেখিয়া অনন্ত যে একটুও ভয় পায় নাই তাহাই দেখাইবার জন্য সে মৃদুলার হাত ছাড়ে নাই; কিন্তু বিলোপের ঘুষির ধাক্কায় সে ঠিক্‌রাইতে ঠিক্‌রাইতে দূরে গিয়া কোনো মতে টাল সাম্‌লাইয়া দাঁড়াইলো, কখন যে কেমন করিয়া তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া মৃদুলার হাত ছাড়িয়া গিয়াছিলো তাহা সে জানিতেও পারিলো না। তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিলো, দৃষ্টি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলো; সে সাম্‌লাইয়া কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই বিলোপ তাহার ঘাড় ধরিয়া এক ধাক্কায় চৌকাঠ ডিঙাইয়া তাহাকে তাহার বাড়ীর মধ্যে চালান করিয়া দিয়া বলিলো—ফের যদি এই চৌকাঠ কোনোদিন ডিঙিয়েছো তো তোমাকে আস্ত রাখ্‌বো না।

অনন্ত ঠিক্‌রাইতে ঠিক্‌রাইতে নিজের বাড়ীর মধ্যে গিয়া থামিতে পারার পূর্ব্বেই বিলোপ সশব্দে ধড়াস করিয়া উভয় বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী দরজা বন্ধ করিয়া হুড়্‌কা লাগাইয়া দিলো।

অনন্তকে তাহার বাড়ীর মধ্যে চালান করিয়া দিয়া বিলোপ যেই ঘুরিয়া মৃদুলার মুখের দিকে তাকাইলো, অমনি মৃদুলা স্বামীর প্রতি অভিমানে, বিলোপের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, অনন্তর কুৎসিত আচরণে অপমানিত হওয়ার ক্ষোভে এবং বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার আশ্বাসে পূর্ণ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলো, এবং তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিলো।

বিলোপ মৃদুলার ক্রন্দন দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বিরক্তি-মিশ্র অনুযোগের স্বরে বলিলো—এমন বানর-প্রকৃতি লোকের সঙ্গে মলয় সংস্রব রাখে কেনো আর এদের প্রশ্রয়ই বা দেয় কেনো!

মৃদুলা বিলোপের সমবেদনায় সান্ত্বনা পাইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলো—আজকাল ওঁর এই রকম সব লোকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে! আমার মান-মর্য্যাদার দিকে দেখ্‌বার অবসর তাঁর আর নেই। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, আমাকে এই নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে হবে·····

বিলোপ বলিলো—তার জন্যে আর ভাবনা কি? আমি এখনই একটা ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে এনে দু-বাড়ীর মাঝখানের দরজাটায় কাঠ দিয়ে স্ক্রু আঁটিয়ে দিচ্ছি। আর মলয়কে বলে'······

ইতিমধ্যে মৃদুলা সম্বৃত হয়ে স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলো—আমি এ বাড়ীতে আর থাক্‌বো না, থাকতে পার্‌বো না, এখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।······

বিলোপ অবাক্ হইয়া মৃদুলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলো! মৃদুলা বলিতে লাগিলো—আমি বাবার কাছে পুরীতে যাবো। আপনি আজ এখনই যদি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন তো ভালো হয়; আপনিই ঘট্‌কালি করে' আমার বিয়ে দিয়েছিলেন।······

মৃদুলার কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন মৃদু তিরস্কার বিলোপ বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলো নিশ্চয় মৃদুলা ও মলয়ের মধ্যে কোনো দাম্পত্য কলহ হইয়া থাকিবে এবং সে সম্বন্ধে শাস্ত্রবচনে তাহার বিশেষ বিশ্বাস ছিলো বলিয়া সে স্থির করিয়া লইলো যে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া শীঘ্রই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। তাই সে মৃদুলার তিরস্কারে কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া বলিলো—ঘট্‌কালি করে' বিয়ে দিয়েছিলাম আমি, আমিই আবার সালিসী মকদ্দমায় আপোষ নিষ্পত্তি করে' দেবো! আমি চিরকাল আপনার দুজনের মধ্যে মিলন-সাধন হাইফেন হয়ে থাক্‌বো!

মৃদুলা বিলোপের রসিকতায় হাসিতে পারিলো না; মুখ কালো করিয়া থাকিয়াই মৃদুস্বরে বলিলো—আপনি

নিয়ে যেতে যদি না পারেন তা হলে আমাকে একলাই যেতে হবে।

বিলোপ মৃদুলার দৃঢ়তা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলো; সেও গম্ভীর হইয়া বলিলো—আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাবো! কিন্তু গাড়ী তো সেই রাত ৮টার সময়……

মৃদুলা পুনরায় দৃঢ় স্বরে বলিলো—গাড়ী যখনই ছাড়ুক, আমি এ বাড়ী থেকে এখনই বেরুবো, ষ্টেসনে গিয়ে বসে' থাকবো, তবু এ বাড়ীতে থাকতে পারবো না। আপনি সঙ্গে যান ভালো, নয় তো আমি একলাই যাবো।……

মৃদুলার কেবলই মনে হইতেছিলো পাঁচটার সময় মলয় আপিস হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া নিবারণের সঙ্গে প্রেয়সীর বাড়ীতে যাইবে। বারবনিতার গৃহে স্বামীর অভিসার মৃদুলা কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাই সে বিলোপকে আপনার দৃঢ় সঙ্কল্পের শেষ কথা শুনাইয়া দিয়া তাহাকে কোনো কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই নিজের চাকরকে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলো—রুপী!… একখানা গাড়ী কি ট্যাক্সি চট্ করে' ডেকে নিয়ে এসো তো।…

বিলোপ মৃদুলাকে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলো—তা হলে আমি একবার বাসায় গিয়ে আমার জামা কাপড়……

মৃদুলা বলিলো—ষ্টেসনে যাবার পথে নিয়ে নেবেন, অথবা পুরীতে গিয়ে আমি কিনে আনিয়ে দেবো……

এই দৃঢ়তার পর বিলোপের বক্তব্য আর কিছুই থাকিলো না।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিলো—ট্যাক্সি আসিয়েসে।

মৃদুলা ভৃত্যকে বলিলো—ঐ ঘরে একটা ব্যাগ আর বিছানা বাঁধা আছে, গাড়ীতে তুলে দাও……

বিলোপ বুঝিলো মৃদুলা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলো। সে কেবলই ভাবিতেছিলো একবার কোনো-রকমে মলয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাপার কি জানিতে পারিলে ভালো হইতো। তাই সে সময় কাটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলো—ব্যাপারটা কি হয়েছে আমাকে যদি বলতেন……

মৃদুলা সিঁড়িতে নামিতে নামিতে বলিলো—পুরীতে গিয়ে সব বলবো। এখন বলতে পারবো না।

বিলোপ অগত্যা মৃদুলার অনুসরণ করিলো।

মৃদুলার ভৃত্য ঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলো—মাইজী, খাবারের বাক্স্ ঔর জলের কুঁজাভি যাবে?

বিলোপ যদি সঙ্গে যায় তাহা হইলে তাহার আহারের জন্য মৃদুলা লুচি তরকারী তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলো। ভৃত্যের প্রশ্নের উত্তরে মৃদুলা বলিলো—হ্যাঁ; এক জায়গায় যা আছে সব নিয়ে আয়……

মিনিট পাঁচেক পরেই মৃদুলা ও বিলোপকে লইয়া মোটর-গাড়ী উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিলো!

সাড়ে চারটার সময় মলয় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মৃদুলাকে খুঁজিলো। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অথবা তাহার অবস্থানের কোন চিহ্ন না দেখিয়া সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ রে, তোর মাইজী কোথায়?

ভৃত্য তাহাকে সংবাদ দিলো—মাইজী বিলোপবাবুর সাথে বেরিয়ে গিয়েসেন।

মলয় মনে করিলো মৃদুলা বায়োস্কোপে যাইতে চাহিয়াছিলো এবং সে লইয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া মৃদুলা হয়তো বিলোপকে ডাকাইয়া আনিয়া বায়োস্কোপে গিয়াছে। মৃদুলা যে নিজের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইয়াছে ইহাতে সে সুখীও হইলো এবং সে যে মৃদুলার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে নাই ও মৃদুলাকে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অপরের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছে ইহাতে সে দুঃখিতও হইলো।

মলয় দেখিলো খাবার ঘরে তাহার জলখাবার ঢাকা রহিয়াছে। সে সেই খাবার খাইয়া, নিবারণকে সঙ্গে লইয়া প্রেয়সীর বাড়ীতে গিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইতেই দ্বারবান্ রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলো—নেই বাবু নেই, বাইজীকা সাথ মুলাকাৎ নেহি হোগা!

মলয় দ্বারবানের হুঙ্কারে দমিয়া না গিয়া বাড়ীর দালানে উঠিয়া বলিলো—আমরা তো আর জোর করে' দেখা করতে যাচ্ছি না। তুমি শুধু বাইজীকে গিয়ে খবর দিয়ে এসো যে মলয়-বাবু এসেছে।

দ্বারবান্ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলো—কোন্ বাবু? মালাই-বাবু?

মলয়ের নিজের নামটার হিন্দুস্থানী উচ্চারণে কবিত্বের রাজ্য হইতে ঔদরিক রাজ্যে অর্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটিতে দেখিয়া

অত্যন্ত হাসি পাইলো; সে হাসি চাপিয়া বলিলো—হাঁ, মালাই বাবু বল্‌লেই হবে। আর তুমি যে কষ্ট করে' আমার নামটা বয়ে নিয়ে যাবে তার জন্তে তুমি কিছু মালাই খেয়ো... ..

মলয় দ্বারবান্‌জীর হাতে পাঁচটি টাকা গুঁজিয়া দিলো।

হাতের মুঠার মধ্যে অনেকগুলি টাকার সমাগম অনুভব করিয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত হনুমান্‌প্রসাদ চৌবে মহারাজ খুসী হইয়া নিজের টুলটা মলয়ের কাছে রাখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলিলো—আপ্ বৈঠিয়ে বাবু, বৈঠিয়ে।

তাহার পর সে মলয়ের সঙ্গীকেও কিছু একটা বসিতে দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে চক্ষু সঞ্চালিত করিতে লাগিলো।

মলয় তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলো—থাক, আমাদের দর্‌কার নেই, তুমি খবরটা দাও গে—মলয়-বাবু···

দ্বারবান্‌জী যাইতে যাইতে মলয়কে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেলো—হাঁ, হাঁ, ইয়াদ হ্যায়, মালাই-বাবু······

দ্বারবান্ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মলয় নিবারণকে বলিলো—চলো আমরা ওর পিছন-পিছন যাই·· যদি দেখা কর্‌তে না চায়...তার চেয়ে আমরা একেবারে গিয়ে উপস্থিত হই···তুমি তো একদিন এসেছিলে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে?

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলো—তা পার্‌বো······

"তবে চলো" বলিয়া মলয় দ্বারবান্ যে পথে বাড়ীর ভিতর গিয়াছে দেখিয়াছিলো সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলো।

সিঁড়ির কাছে উপনীত হইয়াই দেখিলো শ্রেয়সী তাহার স্রস্ত অবগুণ্ঠন মাথায় তুলিয়া দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দ্রুতপদে রূপ-তরঙ্গের ন্যায় সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিতেছে। সে সিঁড়ির উপরে থাকিতেই মলয়কে দেখিয়াই আবেগভরা স্বরে বলিয়া উঠিলো—দাদা, তুমি এই নরককুণ্ডে কেনো এসেছো?

মলয় তৎক্ষণাৎ বলিলো—আমার পথভ্রান্ত বোনটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে' দিতে······

শ্রেয়সী ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া মলয়ের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলো এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলো—দাদা, তুমি আমার গুরু বন্ধু, তোমার পায়ের ধুলো নেবারও আমার আর ক্ষমতা নেই। নইলে তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌তাম আমি বড় দুঃখে অসহ্য কষ্ট পেয়ে এই পথে এসেছি! আমার এই মাতৃভক্ত স্বামী যখন কিছুতেই তার পত্নীকে রক্ষা কর্‌বার সাহস সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লে না, তখন নিরুপায় হয়েই······

মলয় ব্যথিত হইয়া বলিলেন—জানি রমা জানি, নিবারণ তার ভুল বুঝে প্রায়শ্চিত্ত করেছে; সে তোমাকে খুঁজে খুঁজে যে-সব জায়গায় বেড়িয়েছে তাতে তার মিথ্যা কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেছে; তার মাও তাকে ঘৃণা করেন। তুমি ফিরে চলো......

শ্রেয়সী মাটিতে মলয়ের পায়ের কাছে বসিয়া থাকিয়াই বলিলো—তুমি যদি আদেশ করো তবে···

মলয় দৃঢ় অথচ মমতাময় স্বরে বলিলো-হ্যাঁ আমি বল্‌ছি, আমি জামিন হচ্ছি, তোমার পত্নীর মর্যাদা কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না, নিবারণ···

শ্রেয়সী চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলো—তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এই জন্তে তুমি এলে কেনো? একখানা চিঠি লিখে দিলেই তো হতো...

মলয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলো—আমি তো তোমাকে দুখানা চিঠি লিখেছিলাম, তার জবাব না পেয়েই তো .....

শ্রেয়সী ঘাড় নাড়িয়া বলিলো—আমি তো একখানা চিঠিও পাইনি।......তুমি বস্‌তে পারো এমন শুচি স্থান বা আসন এ বাড়ীতে একখানাও নেই···তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই বিদায় দিচ্ছি। তোমার এই পায়ের ধুলো দিয়ে আমার জীবনের সমস্ত পাপ ঘসে' দূর করে' দিয়ে আজ থেকে আমি আবার পবিত্র হবো... ..

মলয় বলিলো—তোমাকে না নিয়ে তো আমরা বিদায় হবো না......

শ্রেয়সী বিব্রত কাতর হইয়া বলিলো—কিন্তু থিয়েটার-ওলাদের সঙ্গে যে আমার কন্‌ট্রাক্‌টের চুক্তি লেখাপড়া করা আছে......

মলয় বলিলো—তা থাক। যদি তাদের বলে' কয়ে' চুক্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারি তো ভালোই, না হয় তো তুমি তোমার চুক্তির মেয়াদ পর্য্যন্ত নিবারণের বাসা থেকেই······

শ্রেয়সী মাথা নত করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলো; একবার অপাঙ্গে নিবারণের ম্লান উৎসুক মৌন মুখের

দিকে তাকাইলো; তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলো—তবে চলো · কিন্তু আমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে যেয়ো ··

এতো শীঘ্র যে মলয় প্রেয়সীকে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে সক্ষম হইবে তাহা সে বা নিবারণ কেহই ভাবে নাই; সফলতার আনন্দে উভয়ের মুখই উজ্জ্বল হইয়া উঠিলো। তাহারা গাড়ীতে চড়িতে চলিলো।

গাড়ীর পা-দানীতে পা দিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় প্রেয়সী বাড়ীটার দিকে একবার ফিরিয়া দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মলয়কে বলিলো—বাড়ীর জিনিস পত্তরগুলো নিলাম করিয়ে বাড়ীভাড়া আর চাকর-দাসীদের মাইনে চুকিয়ে যা বাঁচ্‌বে গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ো।

মলয়ও প্রেয়সীর অভ্যস্ত বিলাসের জীবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার বেদনায় ব্যথিত হইয়া কোমল স্বরে বলিলো—তোমার ইচ্ছা অনুসারেই সব করা যাবে······

প্রেয়সী সিঁড়ির নীচেই মলয়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়াছিলো বলিয়া দ্বারবান্‌জী হনুমানপ্রসাদ সিঁড়ি হইতে আর নামিবার সুবিধা পায় নাই; সে প্রেয়সীকে মলয়ের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলো; বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিলো এবং ময়ূরের পেখমের মতন ঊর্দ্ধে ছড়াইয়া চওড়া করিয়া তোলা গোঁফজোড়া ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিলো! প্রেয়সী যে বেশে নীচে নামিয়া আসিয়াছিলো সেই সামান্য সাধারণ বেশেই গৃহত্যাগ করিয়া গেলো, কোনো প্রসাধন পারিপাট্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিলো না, ইহাতেই তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিলো না!

মলয় যখন প্রেয়সীকে নিবারণের বাসায় রাখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে পারিলো তখন রাত্রি ১০টা। তখনও মৃদুলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই দেখিয়া মলয় একটু চিন্তিত হইলো, আবার বিলোপের সঙ্গে গিয়াছে বলিয়া ব্যস্তও হইলো না; সে ভাবিতে লাগিলো মৃদুলারা যদি বায়োস্কোপে গিয়া থাকিতো তাহা হইলে তো নয়টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতো; পথে গাড়ীতে আসিতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নাই তো? এই আশঙ্কা মনে উদয় হইতেই মলয় তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলো—তোর মাইজী কোথায় গেছেন কিছু বলে' যান নি?

ভৃত্য বলিলো—না; আমাকে শুধু বল্‌লেন একটা গাড়ী কি ট্যাক্‌সি ডাকিয়ে আন্; আমি ট্যাক্‌সি ডাকিয়ে আনে দিলাম; তার পর হামাকে বল্‌লেন—ঘরে ব্যাগ বিছানা আছে, গাড়ীমে চড়িয়ে দে···

মলয় আশ্বস্ত ও উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—ব্যাগ বিছানা নিয়ে গেছে?

ভৃত্য বলিলো—আজ্ঞে; হামি জিগিস কর্‌লাম যে খাবার বাকস্ আর জলের কুঁজাভি কি দিবো? তিনি বল্‌লেন—হাঁ, এক জায়গাসে যো আছে সভ নিয়ে আইসো···

মলয় নিশ্চিন্ত হইলো; ব্যাগ বিছানা খাবার জল লইয়া যখন গিয়াছে তখন কোথাও দূরে গিয়াছে; রাত্রে ফিরিতেও পারে, নাও পারে। অতএব সে মৃদুলার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া না থাকিয়া ভৃত্যকে বলিলো—ঠাকুরকে খেতে দিতে বল্··· ··

মলয় নিশ্চিন্ত হইলেও তাহার মন কৌতূহলে পীড়িত হইতে লাগিলো মৃদুলা তাহাকে না বলিয়া কোথায় যাইতে পারে? সে তাহাকে বায়োস্কোপে লইয়া যায় নাই বলিয়া বোধ হয় অভিমানে মৃদুলা তাহাকে চিন্তিত করিবার এই ফন্দি করিয়াছে! কিন্তু সে তো একটুও চিন্তিত হইলো না যখন সে জানিতে পারিয়াছে বিলোপকে সঙ্গে করিয়া সে গিয়াছে! মৃদুলার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া মলয় মনে মনে হাসিতে লাগিলো।

বিলোপ মৃদুলাকে লইয়া হাবড়া ষ্টেসনে গিয়াও স্থির হইতে পারিতেছিলো না, তাহাদের গৃহত্যাগের সংবাদ মলয়কে জানাইবার জন্য তাহার মন চঞ্চল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলো, সে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলো। সে মৃদুলাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিনী মহিলাদের বিশ্রামকক্ষে বসাইয়া জিনিষপত্র তাহার কাছে রাখিয়া মলয়ের সন্ধান করিতে গেলো। সে ষ্টেসন হইতে টেলিফোন্ করিয়া জানিলো মলয় তখনও বাড়ীতে ফিরিয়া আসে নাই এবং সে তাহার আপিসেও নাই। বিলোপ মৃদুলার বিশ্রামকক্ষের দ্বারপ্রান্তে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইয়া খুঁজিতে লাগিলো যদি কোনো চেনা লোককে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহাকে দিয়া মলয়কে সংবাদ দিবার চেষ্টা করিবে। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই তাহার মনে হইলো অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; আবার সে টেলিফোন্ করিলো; শুনিলো মলয় বাড়ীতে আসিয়াছিলো, কিন্তু

আসিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে! বিলোপের মন এই সুযোগটি হারাইয়া হায় হায় করিয়া উঠিলো; সে নিজের নির্বুদ্ধিতাকে শত ধিক্কার দিতে দিতে মলয়ের ভৃত্যকে জানাইয়া রাখিলো—আটটার আগেই যদি বাবু বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন তবে যেনো তাহাকে সে খবর দেয় যে তিনি যেনো তৎক্ষণাৎ হাবড়া ষ্টেসনে আসেন। এই সংবাদ মলয়ের ভৃত্য মলয়কে বলিতে পারে নাই, কারণ সে যখন মাইজীর গৃহত্যাগের বর্ণনা সবিস্তারে করিতেছিলো তখন তাহার বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়াই তাহার প্রভু তাহাকে আদেশ করিয়াছিলো "ঠাকুরকে খেতে দিতে বল্।" এই আদেশ পালন করিতে গিয়া বিলোপের আদেশ পালন করা তাহার ঘটিয়া উঠে নাই; এবং তাহার প্রভুকে বিলোপ আটটার আগে হাবড়া ষ্টেসনে যাইতে বলিয়াছিলো, সেই সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এজন্যও সে অসময়ে ঐ সংবাদ দেওয়ার কোনো বিশেষ আবশ্যকতা যে আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

বিলোপ মৃদুলার বিশ্রামকক্ষের সম্মুখে চঞ্চল ভাবে পদচারণা করিতে করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিলো এইবার হয় তো মলয় আসিবে এবং সে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটাইয়া দিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলো। ষ্টেসন আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মৃদুলা বিশ্রাম কক্ষের দ্বারোপান্তে আসিয়া পদচারী বিলোপকে বলিলো—ট্রেনের সময় হয় নি? দেখ্‌বেন, ট্রেণ ফেল করিয়ে দেবেন না।

বিলোপ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুলার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলো—ভয় নেই, ট্রেণ ফেল হবে না; এখনো দেরী আছে; আমি বার্থ্ রিজার্ভ্ করে' এসেছি······

মৃদুলা আবার বিশ্রামকক্ষের মধ্যে আপনার অনন্ত দুর্ভাবনার তলায় ডুবিয়া গেলো।

ট্রেণের সময় ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলো; বিলোপের ব্যস্ততা ততো বাড়িতে লাগিলো। যাহাকে সে ভালোবাসে সেই প্রিয়তমা রমণীকে লইয়া একাকী সে সুদূর দেশে যাইবে! মৃদুলা তাহার মনেব ভাব হয় তো জানে, হয় তো বা জানে না; কিন্তু তাহার উপর উহার আস্থা তাহাকে মুগ্ধ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলো; কিন্তু মৃদুলা বন্ধুপত্নী হইলেও তাহার স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাহার সম্মতি-ক্রমে মৃদুলাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিতে যাইবার গুরু দায়িত্ব সে কতকটা নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই গ্রহণ করিতে পারিতো; যদিও মলয় তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং মলয় তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করে, তথাপি সে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার স্ত্রীকে লইয়া দূর দেশে প্রস্থান করিতে বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলো; যদি সে মৃদুলাকে ভালো না বাসিতো তাহা হইলে হয় তো তাহার মন এতো চঞ্চল হইতো না; কিন্তু তাহার ভালোবাসা তাহাকে নিশ্চিন্ত হইতে দিতেছিলো না, তাহার আত্মবিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতেছিলো।

গাড়ী ছাড়িবার সময় যখন আসন্ন হইয়া আসিলো এবং মলয় তখনও আসিয়া পৌঁছিলো না, তখন বিলোপ মলয়কে সমস্ত সংবাদ জানাইয়া এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম করিলো; তাহার মর্ম্ম ই যে মৃদুলার আহ্বানে সে মলয়ের বাড়ীতে গিয়াই দেখিলো যে পাশের বাড়ীর ভাড়াটিয়া এক পুরুষ পুঙ্গব মৃদুলাকে আক্রমণ করিয়াছে ও মৃদুলা উহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে আত্মমোচনের চেষ্টা করিতেছে; বিলোপ সেই লোকটাকে তাহার বাড়ীতে তাড়াইয়া মৃদুলাকে মুক্ত করিয়া দিতেই মৃদুলা গৃহত্যাগ করিয়া পুরী যাইতে উদ্যত হইলো; কাজেই বাধ্য হইয়া সে সঙ্গে চলিয়াছে।

মলয় আহারাদি করিয়া যখন শয়ন করিয়াছে তখন সে এই টেলিগ্রাম পাইলো। অনন্তর আচরণের পরিচয় পাইয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেলো এবং ক্রোধে সে অধীর হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলো; তাহার দুর্দ্দম বাসনা হইতে লাগিলো অনন্তকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিয়া আচ্ছা করিয়া পিটিয়া শিক্ষা দিয়া দেয়; কিছুক্ষণ অস্থির চরণে সঞ্চরণ করিতে করিতে তাহার মনে হইলো—বিলোপ তাহাকে অমনি ছাড়িয়া দিবার পাত্র নয়, সেই উহাকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে নিশ্চয়। এই কথা মনে হইতে তাহার মন অনেকটা স্থির হইলো। তখন আবার তাহার মনে পড়িলো প্রেয়সী তাহাকে বলিয়াছে সে তাহার একখানা চিঠিও পায় নাই; অথচ দুখানা চিঠিই ডাকে দিবার ভার লইয়াছিলো অনন্ত! অনন্তর কোনো সয়তানী মৎলব ছিলো বলিয়া দারুণ সন্দেহে মলয়ের মন পূর্ণ হইয়া উঠিলো। সে দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারিলো না। (ক্রমশঃ)

লক্ষহীরা

এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ কথানাট্য

মন্মথ রায় এম-এ

চন্দনদত্ত।

—এই তার অতিথিদের অভ্যর্থনা-কক্ষ।

অদিতি।

—অথচ আজ আমি এই প্রাসাদের সম্মুখ দিয়েই কতবারই না যাতায়াত করেছি!...আমার মনেই হয় নি, আমি ধারণাই কর্ত্তে পারি নি যে এ প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ না হয়ে...

চন্দনদত্ত।

—কোন বারবিলাসিনীর প্রণয়ের পণ্যশালা হতে পারে!

অদিতি।

—আমি ভেবেছিলুম এ রাজপ্রাসাদ!

চন্দনদত্ত।

—বিদেশী সকলেই এমনি ভুল করেছে। রাজপ্রাসাদের চাইতেও এ প্রাসাদ সুন্দর। এ প্রাসাদ অনুপম।...এই প্রাসাদ দেখে রাজার হিংসা হওয়াতে...রাজা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই প্রাসাদেই দিবস যামিনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহন করেন!

অদিতি।

...রাজকার্য্য?

চন্দনদত্ত।

—এই সুন্দরীর চরণপদ্মে অর্ঘ্যদান। রাজার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই সুন্দরী।

অদিতি।

—পৃথিবী সুন্দর হ'ত, আরো সুন্দর হ'ত,...সংসার সার্থক হ'ত, যদি এই প্রেম বিবাহের ফুলটি হয়ে ফুটে উঠ্‌ত!

চন্দনদত্ত।

...পৃথিবী সুন্দর হয় নি, আরো কুৎসিত হয়েছিল, সংসার অসার্থক হ'ল...যেদিন এই প্রেম বিবাহের বন্ধনে কারারুদ্ধ হ'ল!"—এই নারী এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে! তার নিজের মুখেই শুনেছি সে যুগে যুগে মানবের প্রেয়সী প্রিয়া,...কিন্তু...পত্নী নয়। সে কথা যাক্!... তোমার স্বামী কি ঘুমিয়েই আছেন?

অদিতি।

—হাঁ, ঘুমিয়েই রয়েছেন।.. কেন, লক্ষহীরা দেবীর কি দর্শনদানের সময় উপস্থিত?

চন্দনদত্ত।

—না, এখনো সে প্রাসাদে ফিরে আসে নি। সে যখন ফিরবে, রাজপথ জয়-ঘণ্টায় মুখরিত হবে। সে প্রত্যহ রাজার সঙ্গে বৈকালে নদীবক্ষে নৌকা-বিহারে যেয়ে থাকে। ঐ ..প্রাসাদ-শীর্ষেও প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল!...ঐ সন্ধ্যাদীপের আলোতে প্রাসাদগাত্রের লক্ষহীরা ঝলমল্ কচ্ছে!.. জানো, এই লক্ষহীরার প্রাসাদ হ'তেই এর অধীশ্বরীর নাম লক্ষহীরা দেবী?

অদিতি।

—হীরা আজ আমি এই প্রথম দেখলুম!...

চন্দনদত্ত।

—অদিতি! তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। তুমি তোমার রুগ্ন স্বামীকে সারাটি দিন পিঠে বহন ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ! ঝোলাটি না হয় এখন নামাও...

অদিতি।

...না।...তাতে তিনি জেগে উঠ্‌তে পারেন!...এখন আর অনর্থক জাগা'বো না। জাগলেই তাঁর আগুন জ্বলে উঠবে...ব্যথাটা আজ বেশী বলছিলেন, আজ সারাটি দিন বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

চন্দনদত্ত।

—কিন্তু তোমারো বিশ্রাম আবশ্যক ভগিনি।

অদিতি।

…উনি ঘুমো'চ্ছেন!…আমার এত ভালো লাগছে!… ঘুমের মধ্যে ওঁর আর কোন ব্যথা বোধ নেই!…শুধু এই শান্তিটুকু উনি পান সেই জন্যই আমি কত কামনা করি!… ওঁর এই শান্তিতে আমার মনে হচ্ছে আমিই যেন ঘুমিয়ে পড়েছি!…আমার আর এতটুকু অবসাদ নেই!…আমি যেন স্বপ্ন দেখছি লক্ষহীরা দেবী ওঁকে গ্রহণ করেছেন!… ওঁর ঘুমন্ত মুখে কি হাসি ফুটে উঠেছে?…আমার এত ভালো লাগছে!

চন্দনদত্ত।

.. ঘুমিয়ে থাকা ভালো।…স্বপ্ন দেখা আরো ভালো!… আমার ঘুম হয় না!…কতকাল স্বপ্ন দেখি না!.. তোমার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ…গলিত কুষ্ঠ, ঘা ..পুঁজ।…আমারো মনে অমনি জ্বালা!.. কিন্তু, আমার চোখে ঘুম নেই!

অদিতি।

…আমিও সারাটি দিন সারাটি রাত্রি প্রায় চেয়েই থাকি!…চেয়ে না থাকলে মাছি পোকার দৌরাত্ম্য হতে ওঁকে রক্ষা কর্ত্তে পারি না! হাঁ, আমি ওঁর পানে চেয়ে চেয়ে রাত কাটাই!…সে আমার বেশ লাগে…আমি ওঁর ঘুম মনে মনে প্রাণে প্রাণে অনুভব করি!…উনি তা পারেন না। ঘুম যে সুন্দর; সে কি ঘুমিয়ে অনুভব করা যায়?

চন্দনদত্ত।

গুরুদেব যখন তোমাদের ভার আমার হাতে আজ সঁপে দিলেন, তখন তোমার পরিচয়ে বলেছিলেন তুমি দেবী। আমি আজ সাক্ষাৎ দেবী দর্শন করলুম!

অদিতি।

না, আমি দেবী নই। আমিও তাঁরই মন্ত্র-শিষ্যা।… আপনি আমার গুরুভ্রাতা।…দেবীই যদি হ'তুম, তবে কি উনি এত কষ্ট পান?…তাই যদি হ'তুম, তবে আমার মনের চক্ষুতে ওঁর যে রূপ-টি দেখে আমি মুগ্ধ, সেই রূপ-টি ওঁর দেহে ফুটিয়ে বলতুম দেখ তুমি কত সুন্দর!…লক্ষহীরা দেবীকে দেখে উনি পাগল হয়েছেন, আমার-দেওয়া ওঁর সে রূপ দেখলে ঐ লক্ষহীরা দেবীই আজকে ওঁর জন্য আমারি মতো পাগল হ'তেন!…হাঁ, . হ'তেন, আমি জোর গলাতেই সে কথা বলতে পারি।…না, না, আমি দেবী নই। দেবী হ'লে কি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে, দাসীবৃত্তি ক'রে, কোন দিন না খেয়ে, কোন দিন শুধু জল খেয়ে লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী শত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ কর্ত্তে হয়?

চন্দনদত্ত।

তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ…বড়ই ভাবিয়ে তুলেছ! …আমার বড় ভয় হচ্ছে!…আমি শুধু প্রার্থনা কচ্ছি, তোমার স্বামীর খেয়াল চরিতার্থের জন্য তোমার এই দেহ পাত সফল হোক্ ..সার্থক হোক্…

অদিতি।

ওঁর খেয়াল!…কিন্তু খেয়াল তো আমারো কম নয়! শত স্বর্ণমুদ্রা ওঁকে লক্ষহীরা দেবীর চরণে দর্শনী দিতে হবে …সে তো আমার আঁচলেই বাঁধা রয়েছে!…এলেই খুলে দেব।…কিন্তু, তারপর কি দেখ্‌ব!…দেখ্‌ব, উনি রোগ-যন্ত্রণা ভুলে গেছেন! মনের আনন্দে লক্ষহীরা দেবীর গান শুনছেন! তাঁর নৃত্য দেখছেন! একটি রাত্রির জন্য আমার ঐ দরিদ্র-নারায়ণ রাজরাজেশ্বরীর সেবা পাচ্ছেন!… আনন্দে ওঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে!..আর আমি? .. আমি.. আমি চুরি ক'রে আমার দেবতার সেই আরতি দেখ্‌ব!

চন্দনদত্ত।

…কিন্তু অদিতি! আমার বড় ভয় হচ্ছে!…ভগবান তোমার এই অপূর্ব্ব সেবা, অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠা জয়যুক্ত করুন!

অদিতি।

আপনি বার বার ঐ সেবা আর নিষ্ঠার কথা ব'লে আমাকে অবাক্ করছেন!…শুনুন! আপনি এই বয়েসে সংসার-বিরাগী হয়ে ভালো করেন নি! আপনি বিবাহ কর্লে, আমারি মতো আর একটি নারী সেবা ক'রে সুখী হ'ত, ভালোবেসে ধন্য হ'ত। সেই যে আনন্দ দান, সে তো আপনার কম পুণ্য হ'ত না ঠাকুর!

চন্দনদত্ত।

আমার কথা থাক্ অদিতি!…হাঁ, সে থাক্।…তুমি শত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেছ বললে। কিন্তু, লক্ষহীরা দেবীর দর্শনী এক শত এক স্বর্ণমুদ্রা।

অদিতি।

সে কি!…তবে উপায়?…আমি যে শত স্বর্ণমুদ্রার কথাই শুনেছিলুম!

চন্দনদত্ত।

তবে সে তুমি ভুল শুনেছ।

অদিতি।

...সর্ব্বনাশ!

চন্দনদত্ত।

...কিন্তু আমি সে কথা ভাবছিনে!...আমি ভাবছি—

অদিতি।

—বেশ, আমি এক শত এক স্বর্ণমুদ্রাই দেব। আমি আর এক স্বর্ণমুদ্রা এখনি নিয়ে আসছি...হাঁ, আমি আন্তে পর্ব্বি...সেই সজ্জাকরের কথায় আমি তখন সম্মত হইনি,...এখন হব।...আপনি দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি যথাশীঘ্র ফিরে আসব। সেই সজ্জাকর আমাকে এক স্বর্ণমুদ্রা দেবে...

চন্দনদত্ত।

শোন অদিতি—

অদিতি।

না, আর কোন কথা নয়।

চন্দনদত্ত।

...চলে গেল!...পতিভক্তির ঐ গঙ্গাকে গোমুখীতে রুদ্ধ করা দেবতারও অসাধ্য।...পৃথিবী ধন্য হোক্.. সংসার পবিত্র হোক্...সমাজ শিক্ষা লাভ করুক!...কিন্তু, কী আশা ঐ নারীর!...অথবা...দুরাশা?...লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী দিলেও সেই যৌবন-মদ-মত্তা লক্ষহীরা ঐ কুষ্ঠরোগীকে দর্শন দান করবে না।...আমি তাকে চিনি, জানি।...কিন্তু তবু গুরুর আদেশ—,...ঐ...তার জয়ঘণ্টার জয়-ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে!...ঐ.. ঐ...সে!...পাশে রাজা!...ঐ...রাজা সোপানপথে দ্বিতলে বিশ্রাম-কক্ষে উঠে গেলেন!.. সে একা এখানে আস্‌ছে...কত দিন পরে আজ তাকে দেখ্‌ছি!... আজো তার ঐ রূপচ্ছবি আমাকে মুগ্ধ কর্ছে! কি অপরূপ ঐ রূপ?—কিন্তু, কিন্তু, আজ তার মুখখানি অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে আবৃত কেন?...না, না,...মুখের ঐ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর দেবী!

লক্ষহীরা।

—জানি, এ স্পর্দ্ধা শুধু এক তোমারি হ'তে পারে।... কিন্তু, হে সন্ন্যাসীপ্রবর! হে যোগেশ্বর! সুন্দরীর মুখপদ্ম-দর্শন সন্ন্যাসের কোন্ স্তর? যোগের কোন্ অঙ্গ?

চন্দনদত্ত।

তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে......

লক্ষহীরা।

কিন্তু...সে আজ নয়......

চন্দনদত্ত।

আমি সে দিন না এসে আজ এলুম!

লক্ষহীরা।

আজ আর তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই!

চন্দনদত্ত।

কিন্তু তোমাকে আজ আমার প্রয়োজন আছে!

লক্ষহীরা।

শোন! আমি তোমার উপদেশ শুনব না। আলাপ কর্ত্তে পার, কিন্তু, দোহাই তোমার, উপদেশ দিয়ো না।

চন্দনদত্ত।

—...এসো, গল্প করি...

লক্ষহীরা।

সে মন্দ হবে না, কিন্তু, সাবধান...নীতিমূলক গল্প কচ্ছ বুঝ্‌লেই, আমি শপথ করে বলছি...উপর হ'তে রাজাকে নীচে আনিয়ে, তোমারি চোখের সম্মুখে, দুইজনে একপাত্রে সুরাপান করে...মাতাল হব!...হাঁ...!

চন্দনদত্ত।

আমি তাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।...কিন্তু, তোমার স্বরে সে উচ্ছ্বাস কই? তোমার চোখে মুখে অবসাদের আভাস পাচ্ছি!...কেন?...কুশলে আছ তো?

লক্ষহীরা।

......অর্থাৎ..... দোকানদারি কেমন চল্‌ছে, এই কথা তো?...

চন্দনদত্ত।

দোকানদারি!

লক্ষহীরা।

সাধুভাষায়, গণিকাবৃত্তি।

চন্দনদত্ত।

—তাতে তোমার জয়জয়কার! ঐ লক্ষহীরা তার জলন্ত বিজ্ঞাপন, আর উপরে প্রতীক্ষমান রাজা তার জয়-নিশান!...কিন্তু, আমি তো সে কথা জিজ্ঞাসা করি নি! আমি তোমার কুশল প্রশ্ন করেছিলুম!

লক্ষহীরা।

গণিকার জন্ত অতখানি দরদ কি সংসার-বিরাগী সাধুর শোভা পায়?

চন্দনদত্ত।

ভেবে দেখ…একদিন তুমি আমার…একান্তই আমার ছিলে! তোমার আত্মা, তোমার সত্তা, তোমার দেহমনের সকল সম্পদ আমার অধিকারে ছিল! পুরোহিত অগ্নি সাক্ষ্য রেখে ঘোষণা করেছিল আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী!

লক্ষহীরা।

…মানুষ তখনো সভ্য হয় নি। অসভ্যদের মধ্যেই 'স্ত্রী' পুরুষের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল।…বিবাহের অনুষ্ঠান পুরুষের সেই সম্পত্তি-লাভ ঘোষণা কর্ত্ত। বর্ত্তমান কালে বিবাহ আদিমযুগের সেই অসভ্য প্রথার স্মৃতি।

চন্দনদত্ত।

…তবু ভালো, সেই স্মৃতিটুকুও বিস্মৃত হও নি!

লক্ষহীরা।

—না, তা হইনি বটে!…ঐ স্মৃতিটুকুর মূল্য আছে। ঐ স্মৃতিটুকু আছে বলেই আজ পরিমাণ কর্ত্তে পারি যুগ হ'তে যুগান্তরে আমরা কতখানি এগিয়ে চলেছি!…কিন্তু আমি আর পার্চ্ছি নে, বড়ই ক্লান্ত মনে হচ্চে।…বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে,…এই জ্যোৎস্নায় আমার পদ্ম-কুঞ্জ স্নিগ্ধ শান্তিতে লুটিয়ে পড়েছে!…যাবে?

চন্দনদত্ত।

না।

লক্ষহীরা।

কোন আবেদন আছে?

চন্দনদত্ত।

আছে।

লক্ষহীরা।

নিবেদন কর…

চন্দনদত্ত।

এক হতভাগ্য তোমার রূপ দেখে মোহার্ত্ত হয়েছে।

লক্ষহীরা।

—লক্ষহীরার রূপ দেখে লক্ষ হতভাগ্য কামার্ত্ত হয়েছে!

চন্দনদত্ত।

লক্ষহীরা।

…উন্মত্ততা? না…বিকার? না…আত্মহত্যার জন্ত সাভিমানে ছুরিকা গ্রহণ?…কি?

চন্দনদত্ত।

তুমি তা শুনলে শিউরে উঠবে!

লক্ষহীরা।

…কি?…বিষভক্ষণ? না…জলে ঝম্পপ্রদান?

চন্দনদত্ত।

সে কুষ্ঠ রোগী। গলিত কুষ্ঠ! সর্ব্বাঙ্গে ঘা, পুঁজ!

লক্ষহীরা।

—হাঁ…, বিশেষত্ব আছে বটে!…তা আমাকে কি কর্ত্তে হবে?

চন্দনদত্ত।

তুমি ঐ হতভাগ্যকে গ্রহণ করে তাকে আদরে আলিঙ্গনে অভিষিক্ত কর্ব্বে।

লক্ষহীরা।

হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দনদত্ত।

কল্পনা কর এ সেই আদিম অসভ্য যুগ। মানুষ তখন কামকে জয় কর্ত্তে শেখে নি। মনে কর আমি স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী। আমার সর্ব্বাঙ্গে ঐ গলিত কুষ্ঠ হয়েছে…। —নারী!…তখন?

লক্ষহীরা।

হাঃ হাঃ হাঃ!

চন্দনদত্ত।

ও অট্টহাস্য শ্মশানেই শোভা পায় নারী! যখন শ্মশানে ঘুরে বেড়াই, তখন আমি নিজেই ঐরূপ অট্টহাস্যে শৃগাল শকুনিকে চমকিত করে মরার মাথার খুলি কেড়ে নি!…সে যাক্।…মণিমালিনীকে মনে পড়ে?

লক্ষহীরা।

একদিন সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল বটে! হাঁ, যোগ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিনীই ছিল!

চন্দনদত্ত।

রাজা তাকে কি ভালোই না বেসেছিল! সেই প্রেমের দৌলতে কত কবি কত কাব্যই না রচনা করেছে!

লক্ষহীরা।

আমরা রয়েছি বলেই তো কবি রা বেঁচে আছে?

চন্দনদত্ত।

একদিন রাজা আলিঙ্গনকালে লক্ষ্য করল তার প্রিয়তমা সেই প্রেয়সীর কপোলের চর্ম্ম কুঞ্চিত...

লক্ষহীরা।

চন্দনদত্ত! তারপর?

চন্দনদত্ত।

তার পরদিনই লোল-চর্ম্ম মণিমালিনীর সকল মণিমাণিক্য আঁধার করে নগরীর আর একটি কুটীরে লক্ষহীরা জ্বলে উঠ্‌ল।...সেই হতে তুমি "লক্ষ-হীরা!"

লক্ষহীরা।

চন্দনদত্ত! আমার সুরা-পানের সময় এসেছে...আমাকে ক্ষমা কর...

চন্দনদত্ত।

কিছুদিন পর, আমি শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দেখলুম একটি গলিত শব নিয়ে শৃগাল আর শকুনিতে কি নিদারুণ যুদ্ধ!...সহসা মনে পড়ে গেল তোমাদের নিয়ে মানুষে মানুষে যুগে যুগে এমনি লড়াই-ই হয়েছে বটে!...যাক্‌... খোঁজ নিয়ে পরে জানতে পারলুম...মণিমালিনী...

লক্ষহীরা।

সুরা! সুরা! সুরা আনো, পেয়ালা আনো!

চন্দনদত্ত।

শুনলুম বারবিলাসিনী বারবনিতা মণিমালিনীর শবদাহের জন্য নগরীর লক্ষ নাগরিকের একটি নাগরও মোহার্ত্ত বা কামার্ত্ত হয় নি!

লক্ষহীরা।

চন্দনদত্ত! চন্দনদত্ত!

চন্দনদত্ত।

সত্যি!...হাঁ..., কোন কুষ্টরোগীও না!

লক্ষহীরা।

[চক্ষু মুদিত করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন...] উঃ উঃ......[সহসা] হাঃ হাঃ হাঃ...আমি কি মাতাল হয়েছি! আমি কি পাগল!...এ যে স্বপ্ন!... দুঃস্বপ্ন! [কপালের ঘাম মুছিয়া]...কে তুমি?

চন্দনদত্ত।

আমি চন্দনদত্ত। আমি তোমার সেই আদিম অসভ্য যুগের স্বামী।

লক্ষহীরা।

—সে যুগের স্বামীরা স্ত্রী নিয়ে কি কর্ত্ত?

চন্দনদত্ত।

—সম্পত্তি রূপে পরম আদরে রক্ষা কর্ত্ত। ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ কর্ত্ত। সভ্যতাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবের জয়-যাত্রায় সৈন্য সরবরাহ কর্ব্বার জন্য বংশবৃদ্ধি কর্ত্ত, বংশরক্ষা কর্ত্ত। ভালোবাস্‌তো। জীবনযাত্রার বিষ এবং মধু, সুখ এবং দুঃখ সমভাগে ভাগ করে নিয়ে জীবন-যাত্রাকে সহজ সরল সুন্দর সার্থক কর্ত্ত। পরস্পরে, পরস্পরের অক্ষমতার দিনে, পরস্পরকে সাহায্য কর্ত্ত, সেবা কর্ত্ত, শুশ্রূষা কর্ত্ত, লালন পালন ভরণ পোষণ কর্ত্ত। জরাতে, বার্দ্ধক্যে, এবং মৃত্যুতেও কেউ কাউকে পরিত্যাগ কর্ত্ত না। তাদের শবদেহ সংকার কর্ত্তেও লোকের অভাব হ'ত না। মৃত্যুর পরও, তাদের জন্য, মর্ত্ত্যে, চোখের জল পড়তো!

লক্ষহীরা।

উপদেশ! উপদেশ! !...তুমি আমাকে তোমার সদুপদেশ শোনাচ্ছ! আমি আমার শপথ রক্ষা কর্ব্ব। আমি এখনি আমার মদের ভাণ্ডারীকে ডাক্‌ব...

চন্দনদত্ত।

—ক্ষণেক অপেক্ষা কর...।...শোন নারী, একদিন তুমি কামদেবের মন্দিরে আলুলায়িতা-কুন্তলা হয়ে বেদীমূলে প্রণাম করছিলে! পাশেই ছিলুম আমি। মুগ্ধনেত্রে আমি তোমার সেই কৃষ্ণ কেশদাম দর্শন করছিলুম।

লক্ষহীরা।

—সে তো প্রণাম নয়...সে আমার কৃষ্ণ কেশদামের বিজ্ঞাপন।...আমরা যে ঐ ছলেই ফাঁদ পাতি!...কিন্তু সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে।

চন্দনদত্ত।

কেন?

লক্ষহীরা।

তুমি আমার পাশে ছিলে আমি জানতুম না। প্রণাম করছি, এমন সময় পাশে এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনলুম।

আমি চমকে উঠে তাকাতেই তোমাকে দেখলুম !...ভাবলুম আর্ত্তনাদ স্বাভাবিক। তবু, এক সুযোগে তোমাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। তুমি কিন্তু কারণ বললে না!

চন্দনদত্ত।

হাঁ, বলিনি। কিন্তু, আজ কি বলব ?

লক্ষহীরা।

বল .....

চন্দনদত্ত।

...না; থাক্।

লক্ষহীরা।

আমার লতাকুঞ্জে চারুদত্ত এক মর্ম্মর ঝর্না প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জ্যোৎস্না রাত্রে সেই ঝর্নার নৃত্য ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে। স্বপ্ন-মধুর সেই দৃশ্য!...যাবে ?

চন্দনদত্ত।

—না।...আমি তোমার পরিণাম ভাবছি!

লক্ষহীরা।

আবার পরিণামের কথা ?...না, আমি রাজাকে ডাকি...সুরা আর পানপাত্র আসুক!

চন্দনদত্ত।

যে মুহূর্ত্তে রাজা এই কক্ষে পদার্পণ কর্ব্বেন সেই মুহূর্ত্তে......

লক্ষহীরা।

হাঁ, সেই মুহূর্ত্তে...?

চন্দনদত্ত।

আমি সেদিন কেন আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলুন, তার কারণ বলব!

লক্ষহীরা।

সে তো বেশ ভালো কথা!...এই, কে আছিস!...রাজাকে ডেকে আন্...

চন্দনদত্ত।

যে মুহূর্ত্তে রাজা এই কক্ষে পদার্পণ কর্ব্বেন সেই মুহূর্ত্তে আমি বল্‌ব...

লক্ষহীরা।

বেশ, তখনো না হয় ব'লো, এখনো না হয় একবার বলো!...ওগো, বলো না শুনি!...কি বল্‌বে তুমি রাজার কাছে ?

[চন্দনদত্ত।...

—বল্‌ব "দেবী! তোমার ঐ অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর।"

লক্ষহীরা।

—ও হো—হো—! [আর্ত্তনাদ করিয়া কৌচে লুটাইয়া পড়িলেন।]

চন্দনদত্ত।

ভয় নেই!...তোমার অসভ্যযুগের সেই স্বামী তোমাকে হাত ধরে...যেখানে জরামৃত্যুর ভয়ে মানুষ কেঁপে ওঠে না, যেখানে লোলচর্ম্মের বা তোমার ঐ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠন-অন্তরালে লুক্কায়িত সেই এক গুচ্ছ শুক্ল কেশের জন্য আশঙ্কা নেই উদ্বেগ নেই,...আমি তোমাকে আমার সেই সংসারাশ্রমে নিয়ে যাব। তুমি আমার পুনর্ভূ বধূ হবে। আমার বধূকে অবগুণ্ঠন দিয়ে তার শুক্ল কেশ লুকিয়ে রাখতে হবে না। সংসারে কেশ যত শুক্ল হয়, প্রেম তত শুভ্র হয়। তোমার ঐ শুক্ল কেশ-গুচ্ছ, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় যে কত দীর্ঘকালের...তারই সুপ্রাচীন সাক্ষী। হে আমার যুগ-যুগান্তব্যাপী প্রেমের স্মারক-চিহ্ন!...ভয় কি ? ক্রোড়ে এস!

লক্ষহীরা।

আমার হাত ধর...! আমায় নিয়ে চল...

চন্দনদত্ত।

—কিন্তু, তার পূর্ব্বে তোমাকে দিয়ে দাম্পত্য প্রেমের আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে রেখে যেতে চাই। পতিভক্তি যে কত উচ্চে উঠ্‌তে পারে যদি তা দেখাতে চাও, দেখতে চাও..., তবে, আমার সেই অনুরোধটি রক্ষা কর...

লক্ষহীরা।

বল...শীঘ্র বল...। তুমি যা বল্‌বে...আমি তা-ই কর্‌ব। তুমি আমায় নিয়ে চল...তুমি আমায় নিয়ে চল...

চন্দনদত্ত।

—নিয়ে যাব, আজই, এই রাত্রিতেই।...কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমাকে সেই কুষ্ঠ রোগীর সর্ব্ব কামনা পূর্ণ কর্ত্তে হবে...

লক্ষহীরা।

তাতে কার কি লাভ ?

চন্দনদত্ত।

সংসারের লাভ। সংসারাশ্রমে·· পতিভক্তির এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা!

লক্ষহীরা।

সে তুমি ভালো জানো। কিন্তু দেহমনের এই দোকান-দারি হ'তে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। সাজ সজ্জা ক'রে, মুখে রং মেখে, শুভ্র কেশগুচ্ছ অবগুণ্ঠনে ঢেকে ঢেকে আমি এত ক্লান্ত, এত শ্রান্ত···যে···আমি তাই মদ ধরেছি! কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠরোগী? শেষ কর..ইতি কর। আঃ···তার পর মুক্ত জীবন! তোমার সেই শান্তস্নিগ্ধ সংসার! সেখানে আবার আমি সেই বধূটি! যৌবন গেল, তাতে কি বা এল গেল! স্বামি! প্রভু! প্রিয়!·· সত্যি?···আমার যে আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। কোথায় তোমার সেই কুষ্ঠ-রোগী? আমি আমার বিলাস কক্ষেই চললুম·· তুমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দাও!...হাঁ শেষ হোক্, ইতি হোক্।—তুমি এইখানেই আমার জন্য অপেক্ষা কর... যেমন যুগে যুগে ক'রে এসেছ! আমি ফিরে এলে তোমার চরণ দুখানি এগিয়ে দিয়ো...হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ো...

চন্দনদত্ত।

চলে গেল মনে হচ্ছে রাত্রি-শেষে চন্দ্রমা অস্ত গেল। তার পরই কি নবজীবনের প্রভাত-সূর্য্য উঠবে!·· ও কে আসে?···অদিতি?···হাঁ, অদিতি।—অদিতি! ভগিনি! সার্থক তোমার স্বামিসেবা! সার্থক তোমার নিষ্ঠা!·· লক্ষহীরা তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর্ত্তে সম্মত হয়েছেন··· কিন্তু, এ কি!

অদিতি।

কি ভদ্র?

চন্দনদত্ত।

তোমার কেশপাশ কই? তুমি মুণ্ডিত-মস্তক কেন ভগিনি?

অদিতি।

সজ্জাকর কালই বলেছিল···কিন্তু হাত দিয়েও তো ওঁর পা ধুয়ে তৃপ্তি পেতুম না, পাখা দিয়ে বাতাস ক'রেও আশ মিট্‌তো না! ওঁর পা ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে পা মুছে দিয়েছি, মুখে চোখে বাতাস করেছি! তাই সজ্জাকরের স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভনেও আমি ভুলি নি!...কিন্তু আজ এল আমার সব চাইতে বড় পরীক্ষা! সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হ'য়ে এলুম!··· এই আমার হাতে সজ্জাকরের স্বর্ণমুদ্রা···

চন্দনদত্ত।

আজ যদি সত্যযুগ হ'ত, তবে তোমার ঐ মুণ্ডিত মস্তকে স্বর্গ হ'তে পুষ্প-বৃষ্টি হ'ত! কিন্তু, সে যাক্।···আর বিলম্ব নয়···দর্শনী সে নেবে না···সে তার বিলাস কক্ষে তোমার স্বামীর প্রতীক্ষা করছে।···ঐ সোপান-পথ দিয়ে উঠে নির্ভয়ে তোমার স্বামীকে সেখানে রেখে এস···

অদিতি।

ওগো! জাগো! জাগো!

···জাগো-গো, জাগো!

*   *   *   *

চন্দনদত্ত।

সবাই চলে গেল! পড়ে রইলুম আমি! সে সত্যই বলেছে যুগে যুগে আমি তার জন্য এমনি করেই প্রতীক্ষা করেছি! আজ আমার সেই প্রতীক্ষার অবসান হবে! ..অদিতি! দেবি! তুমিই আজ আমাদের এই নব জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছ! তোমার পাতিব্রত্যের ভিত্তির উপর লক্ষহীরার নূতন সংসার গড়ে উঠুক...যুগে যুগে সীতা সাবিত্রীর মত তোমার জয়গান হোক্···কে!···তুমি!

লক্ষহীরা।

হাঁ, আমি। জয়গান হবে কার?

চন্দনদত্ত।

জয়গান হবে সতীর!···জয়গান হবে তোমার··তুমি রাজরাজেশ্বরী হয়েও অদিতির অলৌকিক পাতিব্রত্যকে জয়-মণ্ডিত করেছ তাঁর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে আলিঙ্গন দিয়ে···

লক্ষহীরা।

না···না···না ..

চন্দনদত্ত।

সে কি!

লক্ষহীরা।

এই বা কি! সঙ্গে তার স্ত্রী! স্ত্রী নিজে দেহপাত ক'রে স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেছে তার স্বামীর কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে! এই তোমাদের সতী? এই 'সংসারের আদর্শ?' ···তুমি সরে দাঁড়াও—তুমি চলে যাও...আমি বমি করব!·· রাজা কোথায়? সুরা কই? পেয়ালা আনো...ঢালো!

সেকালের-শিক্ষা

শ্রীনির্ম্মলা দেবী

আমার লেখা, সেকালের গৃহিনীদিগের গৃহস্থালী, ও রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলি "ভারতবর্ষে" স্থান পাইয়া প্রকাশ হওয়াতে অনেকে আমায় উৎসাহ দিয়াছেন। এ সকল আলোচনার মধ্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই,—যাঁহাদের চরণতলে এই সব ব্যবস্থা শিক্ষা ও শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাদেরই শিক্ষা মত অশিক্ষিতা বঙ্গবধূ আমি আবার সেই সেকালের শিক্ষা ও সভ্যতার কথা আপনাদের জানাইতে সাহস করিলাম। আমি এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, সেকাল বলিয়া আমার কথা সেই খনা লীলাবতী, গার্গীযুগেরও নয়, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের কি পরের কথাও নয়। আমাদের ঠাকুরমাতা ও দিদিমাতা প্রভৃতির সময়ের ৬০।৭০ বৎসরের প্রাচীনাদের কথাই বলিতেছি। আজকাল আমাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক সহরেই, একাধিক বালিকা স্কুল আছে, কলিকাতার ত কথাই নাই। যেমন এখনকার মেয়েদের তুলনায় আমরা অশিক্ষিতা, তেমনই আমাদের সেকালের প্রাচীনাদের মধ্যে, কাহারও বা অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না; যদি বা তাঁহারা অতি কষ্টে একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন, তবুও একালের তুলনায় তাঁহাদের অশিক্ষিতাই বলা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দূরদর্শিতা, সভ্যতা, এখনকার শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যাশিক্ষার প্রধান গুণ বিনয়, নম্রতা, ভব্যতা ইত্যাদি। এখনকার ইংরাজী বাংলা প্রভৃতি লেখাপড়া শিক্ষার গুণে, উল্লিখিত গুণগুলি, সেকালের নিরক্ষরা প্রাচীনাদের অপেক্ষা আমাদের বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? বরং মনে হয়, এ গুণগুলি তাঁহাদেরই বেশী ছিল। এই থেকেই মনে হয়, এ সমস্ত শিক্ষার সাধনা বি-এ, এম-এ পাশের উপর নির্ভর করে না, বংশ ও পিতা মাতার স্বভাব ও শিক্ষার ব্যবস্থায় বিনয়, নম্রতা, ভব্যতা, সততা শিক্ষা হয়। যদি প্রাচীনাদের উপযুক্ত পুত্র-কন্যাগণ. পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে ও তাঁহাদের উপদেশ পালনে তৎপর হন, তবে আবার তাঁহাদের পুত্র-কন্যারা উক্ত শিক্ষা অনুযায়ী চলিতে শিক্ষাও করেন, বুড়ো বুড়ীর কথা অগ্রাহ্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের থাকে না। যদি বা স্বভাব ও বয়সদোষে একটু আধটু ব্যতিক্রম দেখা যায়, অল্প বয়সেই শুধরাইবার সুযোগও পিতা মাতা পান। গৃহের শিক্ষাই আসল শিক্ষা; আর বালক-বালিকার কোমল অন্তরে যাহা গাঁথা হয়, বয়সেও তার প্রভাব কম থাকে না। আমাদের বাল্যকালে খৃষ্টান মিসনরী টিচারেরা এটিকেট্ শিক্ষা দিতেন,—দেখ মেয়েরা, মাননীয় কেহ স্কুলে আসিলে তৎক্ষণাৎ বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া

তাঁহাকে সম্মান করিবে, হাসি পাইলে মুখে হাত দিয়া উচ্চ হাসি নিবারণ করিবে, কাহাকেও দেখাইয়া অপর সহচরীর কানে কানে কোনও কথা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিও না; সে মনে করিবে, তাহার নামেই বলিতেছ ইত্যাদি। এখন কথা এই, যাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্তই শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিতা (অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ পাশ); কিন্তু আমাদের ঘরেও নিরক্ষরা প্রাচীনাদের নিকট উহারই অনুরূপ শিক্ষা পাইতাম। ইহা হইতেই সেকালের সভ্যতার, ধারা পাওয়া যায়, তাঁহাদের শিক্ষা ও ভব্যতার দুএকটী উদাহরণ দিতে চেষ্টা করিলাম। অবশ্য বালক ও বালিকার শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। বালিকাকে কালে শ্বশুরালয়ে যাইয়া পরের মন যোগাইতে হয়; যাহাতে বংশের সুনাম ও নিজের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই সেকালের গৃহিণীরা করিতেন। আমরা উপদেশ পাইতাম,—কোনও পূজনীয় সম্মানার্হ লোকের আগমনকালে উচ্চ জায়গায় (বা চৌকি খাট, চেয়ার ইত্যাদি) যদি বসিয়া থাক, তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে আসন দিবে, ও পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। স্থান কাল ও গুরু-বিশেষে অঞ্চল দিয়া স্থান মার্জ্জনা করিয়া আসন পাতিবার শিক্ষা পাইতাম, গলায় অঞ্চল দিয়াও প্রণাম করিতে হইবে। আবার যখন নববধূবেশে শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে যাইবে, সেখানে শাশুড়ী ননদ, ও বড় যায়ের অনুমতি ব্যতীত যে কোনও আগন্তুক অতিথি, ও আত্মীয়ার সহিত কথা না বলিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া মৌন থাকিও; তবে তাঁহাদের উপযুক্ত আসন, জল, পান ইত্যাদি দিতে ত্রুটী করিও না। যদি গুরুজন অন্যায়ও বলেন বুঝিতে পার, তবুও প্রতিবাদ করিবে না। বাল্যকালে, তাঁহারা ভয় দেখাইয়া নীতি শিক্ষা দিতেন। আহার-কালে পা ছড়াইয়া বসিও না, দূরদেশে বিবাহ হইবে; থালা নাড়িও না, স্বামীর সহিত ঝগড়া হইবে; পা নাচাইও না, অলক্ষণ; গা দুলাইও না; উচ্চহাস্য করিও না; উচ্চস্বরে কথা বলিও না, গলা মোটা হইবে; পান খাইও না, তোত্‌লা হইবে। আহারের পর বসিয়া আঁচাইবে, ধীরে ধীরে কুলকুচা করিবে (পাছে কাহারও গায়ে ছিটা লাগে)। প্রাতঃকালে বাসিমুখ না ধুইয়া দন্ত পরিষ্কার না করিয়া জলখাবার খাইতে পাইবে না। ভাল করিয়া মাথায় ও গায়ে তেল মাখিয়া স্নান করো, নাভিদেশে পায়ের তলায় নখের মাথায় তেল দাও, ইত্যাদি। কলা বৌয়ের মত অবগুণ্ঠন কেহই এখন পছন্দ করেন না, নববধূরাও সকলের সহিত কথাবার্ত্তাও বলেন, এখনকার গৃহিণীরাও ইহাতে তত দোষ মনে করেন না। ঘোমটা টানা এখন হাসির কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে (বিশেষ সহরে)। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, কেন, সেকালের দূরদর্শী বুদ্ধিমতী গৃহিণীরা বধূকে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে রাখিতে বাধ্য হইতেন। এ প্রথা হইতেও তাঁহাদের মঙ্গল কামনা ও ভব্যতা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাইবেন। কথাটী একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। সহর কলিকাতার কথা একটু স্বতন্ত্র, এখানে এমন স্থান অধিকাংশ আছে যে বাটীর পার্শ্বে অপর বাটীর লোকের বিপদেও অনেকে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন;—কিন্তু অন্যান্য সহরে, বিশেষ পল্লীগ্রামে, কাহারও বাটীতে নববধূর আগমনে, বিশেষ করিয়া তাহারই রূপ-বর্ণনা ও গুণ-আলোচনাই সকল সময় চলিতে দেখা যায়। সে অবস্থায়, সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ, কাহাকে কেমন সম্মান প্রদর্শন করিবে, কে কি চরিত্রের লোক তাহা বুঝেও না; হয় ত বা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, কাহাকেও বা ন্যায্য প্রাপ্য আদর, সম্মান সহকারে কথা বলিতে পারিবে কি না, অথবা একদেশ হইতে আগতা বধূ অন্য দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কি বলিয়া বসিবে; তাহাতে বধূর নিন্দার প্রসারটা বৃদ্ধিই পাইবে; হয় ত বা বালিকা-সুলভ চপলতায় কোন হাসির কথায় উচ্চহাস্য করিয়া ফেলিবে। ইহা অপেক্ষা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বধূকে তাঁহারা নিরাপদে রাখাই শ্রেয় মনে করিতেন। ধোপানী, নাপিতনী, কাহারও বাটীর আগন্তুক দাসীর সহিতও কথা বলা নিষেধ ছিল। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদেরই এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া নিন্দা প্রচারের সুবিধা বেশী। এখন বলুন দেখি, এ ব্যবস্থাগুলি, তাঁহারা কি মন্দ করিতেন? অবশ্য পরে বধূরা দুই তিন পুত্র কন্যার জননী হইলে অনেকের সহিত কথা কহিবার অনুমতি ও সুবিধা পাইতেন। ইহাও সুব্যবস্থা—কেন না নববধূর আগমন-কালে, প্রথম প্রথমই নবাগতার নিন্দা সুখ্যাতিটী বেশী প্রচার হইতে থাকে; পুরাতনে সে সব আলোচনা অধিক থাকে না। প্রথম

আসিয়া যে সৌভাগ্যবতী বধূ প্রতিবেশীর সুখ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তাহার সম্বন্ধে সকলেরই একটা ভাল ধারণা থাকিয়া যায়; তারপর বেশী আঁটাআঁটী না করিলেও চলে। আমরা বাল্যে শিক্ষা পাইতাম, শ্বশুরালয়ে প্রাতঃকালে উঠিয়া শয্যাত্যাগ-কালে স্বামীকে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহিরে আসিবে,—এবং শ্বশুর, শ্বাশুড়ি ও গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিবে। পুরাতন দাসী একটু মুখরা হয়; যদি সে-রকম দাসী তোমায় কোন কথা বলে, ও তিরস্কারও করে, তবু দাসী মাত্র ভাবিয়া তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে যাইও না। ইহাদের নিকটে অনেকে বধূর দোষ-গুণ শুনিতে পায়। পুরুষ চাকর, ও পাচকের সঙ্গেও কথা বলা নিষেধ ছিল। সেকালের গৃহিনীদের ভব্যতা সভ্যতা ত ছিলই, আর বিনয়, নম্রতা এই সব গুণগুলি আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদেরই বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। এ কথা বলিলাম, ইহা হইতে যেন কেহ না মনে করেন যে, আমি বলিতে চাহিতেছি—সেকালে সকলেরই এই গুণগুলি ছিল, একালের শিক্ষিতা মেয়েদের কাহারও এ গুণ নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, একালে অনেক বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াও আমাদের মধ্যে সকলের যে গুণ থাকে না, সেই গুণ, নিরক্ষরা কিম্বা অক্ষর-মাত্র-পরিচয়-জ্ঞানবিশিষ্টা প্রাচীনারা অনেকেই সহজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখন অনেক মেয়ে নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা দেখাইতে গিয়া শ্বশুরবাটীর অপ্রিয়া হন। "আমি কাহাকেও ভয় করি না" এ ভাবটী এখন অনেক স্থলে দেখা যায়। সেকালের প্রাচীনারা এইটী পছন্দ করিতেন না। এই বিংশ শতাব্দীর এটিকেটের তুলনায় সেকালের সভ্যতা ও শিক্ষা খাপ না খাইলেও, তাঁহাদের অসভ্য বলা যায় না। তাঁহাদের স্মৃতিশক্তি কিরূপ ছিল বিবেচনা করুন। এখন প্রত্যেক গৃহেই বাংলা লেখাপড়া-জানা মহিলা আছেনই। ঘরে পাঁজী থাকিলে, কোন্ দিন কি তিথি, কি বার, পড়িয়া দেখিলেই জানিতে পারেন; কিন্তু তখন ত সকলে পড়িতেও পারিতেন না; এক দিন কোন তিথি জানিয়া, বরাবর ঠিক মুখে মুখে হিসাব রাখিতেন, আবার তিথির হ্রাস বৃদ্ধির জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া ঠিক রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। আবার কোন্ তিথিতে কি খাওয়া উচিত কি অনুচিত, বিদ্বান পুরুষ পারিবেন। তা ছাড়া সংসারের খুঁটী, নাটী, তুক্, তাক্, কোন্ পূজার কয়খানি নৈবেদ্য, বিবাহের সময়ে দেশ-ভেদে, গোত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার, সমস্ত খবরই তাঁহাদের নিকট পাইবেন। এখনকার গৃহিনীদেরও এই সব বিষয়ে এখনও সেই অশীতিবর্ষীয় প্রাচীনাদের নিকট ব্যবস্থা লইতে ছুটিতে হয়।

সংসার চালানোর মিতব্যয়িতা ও খুঁটী নাটী বিষয়ে এবং কোন্ মাসে, কি বারে, কি তিথিতে কি কি আহার করিতে নাই, একেবারে যে ঠিক রাখা কত দূর কঠিন কাজ, এখনকার অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না। আমাদের একে মনে থাকে না, আর যদিই বা থাকে, ও-সব অবহেলার যোগ্যই মনে করি। এখন অনেক সুধী বিদ্বান পণ্ডিত, শাস্ত্রকার, ডাক্তার, বৈদ্য, আমাদের সেই প্রাচীনকালের আহার-বিহারের শত সাবধানতা, শরীরের পক্ষে উপকারী বলিয়া নূতন করিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই যে ফাল্গুন, চৈত্র মাসে নিমপাতা খাওয়া খুবই উপকারী, ইহা ত তাঁহারা অনেকদিন পূর্ব্বেই জানিতেন, আর পুঁথী পাঁজী না দেখিয়াই ব্যবস্থা দিতেন। বলিতে শুনিয়াছি, জ্যৈষ্ঠ মাস বেল খাইও না, বসন্তের প্রকোপ যে সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; করলা, উচ্ছে খাও। আমার পিত্রালয় মুর্সিদাবাদ জেলায় বরাবর বসন্ত রোগটা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বেশীই হইয়া থাকে; ওলাউঠাও খুব বেশী। ৩০ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও, আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমাতা, বসন্তের সময় হরিতকীর আঁটি আমাদের সকলের হাতে বাঁধিয়া দিতেন। তা ছাড়া ঐ সময়ে আমাদের সকলের অঞ্চলে এক টুকরা কর্পূর বাঁধিয়া, সেইটী মধ্যে মধ্যে আঘ্রাণ লইবার হুকুম করিতেন। ভাতের সঙ্গে তিন চারিখানি লেবুর ফালি সকলকে খাইতে দিতেন;—এখনকার বিচক্ষণ ডাক্তারেরাও এ ব্যবস্থার শুভফল স্বীকার করেন। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, তাঁহারা শুধু গৃহস্থালী গুছাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, গো-সেবা, ছোট রকম তরি-তরকারীর বাগানের দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইত। আমাদের একটী পাতিলেবুর গাছ ছিল; তাহাতে কিছুদিন একটী ফুল কিম্বা লেবু হইতে দেখি নাই। আমার ঠাকুরমাতা অনেকদিন দেখিয়া একদিন চাকরকে দিয়া, গাছের লম্বা লম্বা ডগ্গুলি কাটাইলেন।

অসংখ্য ইটের টুকরা (টিল) কাপড়ের পাড় দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া দিলেন। তাহাদের ভারে গাছটী খানিক নুইয়া পড়িল। তাঁহার এই কাজে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়—ছয়মাসের মধ্যে গাছটী একেবারে ফুলে ভর্ত্তি হইয়া গেল, এবং সেই লেবু গাছে বার মাসই লেবু ফলিতে লাগিল।

সেকালের গৃহিণীরা যে এখনকার গৃহিণীদের অপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন, সে কথা একবার বলিয়াছি। আমার মনে হয়, আমাদের এখনকার মেয়েদের তুলনায় তাঁহাদের মেধা, স্মৃতিশক্তিও বেশী ছিল। আমরা এখন যতই ইংরাজী বাংলা বিদ্যায় পারদর্শী ও শিক্ষিতা হই না কেন, তবু মনে হয় বিদ্যার গুণে জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইলেও তাঁহাদের মত সংসারের সব বিষয় মনে রাখিয়া নানারূপ ব্যবস্থা করিতে পারি কই।

আমরা সেকালের গৃহিণীদের তুলনায় মুখস্থ-বিদ্যায় অধিক শিক্ষিতা হইতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের সময় ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষার সুবিধা ও রীতি পদ্ধতি ছিল না বলিয়াই তাঁহারা বেশী লেখাপড়া জানিতেন না। আমরা শিক্ষালাভ করিলেও ভগ্নস্বাস্থ্য ও নানা জটিল রোগে ভুগিয়া কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়া ফেলি, এবং অল্পেই বিরক্ত হইয়া নানা ভ্রমে পতিত হই। আরও, অল্পবয়সে অনেকগুলি সন্তানের মাতা হইয়া সাংসারিক বুদ্ধি ও গৃহস্থালী গুছাইবার ক্ষমতাও থাকে না। অভিজ্ঞা গৃহিণীদিগের পরামর্শও বোধ হয় অন্তরের সহিত সকলে গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত, রোগের নানাবিধ টোট্‌কা-টুট্‌কা ঔষধ, উদ্ভিদবিদ্যার পুঁথি না পড়িয়াই সে বিষয়ে সহজ জ্ঞান, গো-সেবা দেব-সেবা, অতিথি-বৎসলতা, ভব্যতা, শিক্ষা ইত্যাদির কথা শুনিলে ও দেখিলে কি স্বতই মনে হয় না যে তাঁহারা শিক্ষিতা, না আমরা বেশী শিক্ষিতা? সেকালের গৃহিণীদিগের নামে আরও একটী অনুযোগ এখন শুনিতে পাই। তাঁহারা নাকি স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন দেখিলেই "বেহায়া" আখ্যা দিয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা করিতেন। এখন দেখা যাক্, কথাটা কি? সত্য বটে, একালের ন্যায় সর্ব্বসমক্ষে স্বামীর সম্মুখে বসিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করা ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুগৃহে স্বপ্নের অগোচর ছিল। দিনমানে ও সন্ধ্যাকালে, স্বামীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎও কঠিন ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহার ভিতর সবই দোষের ছিল, ইহা বলা যায় না; তখনকার পদ্ধতি, প্রতিবেশীদিগের নিন্দা ভয় ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের তত দোষ দেওয়া যায় না। গৃহের বধূর নিন্দা শুনিতে কাহারও ভাল লাগে না। এখনকার অবাধ-মিলনে যে ভালবাসা, প্রেম, শ্রদ্ধা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থাপিত হয়, তখনকার সেই নির্জ্জন রাত্রিতে অবগুণ্ঠনবতী বেপথুমতী বধূ দীপহস্তে ধীরে ধীরে অভিসারিকারূপে ভীত চকিত দৃষ্টি মেলিয়া সাবধানে স্বামীর সন্নিধানে গমন করিলেও, প্রেম, শ্রদ্ধার অভাব ঘটিত না;—দিনমানে সদাসর্ব্বদা নববধূ স্বামীর সহিত মিলিত থাকিলে নবপ্রণয়ের মধুর মোহ, বেশী দিন থাকিতে পারে না। সুলভ অপেক্ষা দুর্লভ দ্রব্যেই লোকের আকাঙ্ক্ষা বেশী হয়। গোপন জিনিসের মোহময় মাদকতা বেশী, এ কথা বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "চোখের বালি"তে মহেন্দ্র ও আশার দিবারাত্রি অবাধ মিলনকালে, ক্রমশঃ অস্বস্তি ও তৃতীয় মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই যে সমস্ত দিন দুইটী উন্মুখ অন্তর পরস্পর পরস্পরের আশা-কামনায় কাটাইয়া ঈপ্সিত মিলন যে কত সুখের, কত আনন্দের, তাহা আমাদের কালে দেখিতে না পাইলেও বুঝিতে পারি। এমন কথা আমি বলিতে চাহিতেছি না, এবং যেন কেহ মনে না করেন, সেকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভাব ছিল, এখন তাহা হয় না। না, এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। তবে সেকালের গৃহিণীদের ইহাতে তত দোষ না ধরাই আমার কথা। কেহ কেহ এই হইতে এবং আরও নানা কারণে, তখনকার খাশুড়িরা বউকাটকী ছিলেন, এ অপবাদও দেন। এ কথায় বলি, ভাল আর মন্দ, এই কথাটী ও জিনিসটী সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগেই আছে; সেকালেও যেমন "দজ্জাল" খাশুড়িও ছিলেন, আবার মাতৃসমাও ছিলেন, অনুসন্ধান করিলে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিছু কষ্ট না পাইলে কথায় কথায় কেরোসিনে পুড়িয়া মরা পদ্ধতিটী আজ কাল প্রচলিত প্রথায়-মত দাঁড়াইত না। তবে একালের মেয়েরা যে অসহিষ্ণু, এই পুড়ে-মরা ব্যাপার হইতে তাহাও বুঝা যায়। সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন, কোন ভগিনী ও পাঠকবর্গ যেন না মনে

করেন যে, আমি সেকালের শিক্ষা, ও সভ্যতা লইয়া যে সামান্ত কথা তুলিয়াছি, ইহাতে একালের মেয়েদের নিন্দা করিতেছি। না, তাহা আমি করিতে বসি নাই। বরঞ্চ এই কথা জানাইতে গৌরব অনুভব করিতেছি যে, একালে যাঁহারা নানারূপ শিক্ষায় নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির সুবিধা পান, তাঁহাদের বিনয়, নম্রতা, উদারতা, সভ্যতা, প্রভৃতি গুণগুলি থাকা ত কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কথা নহে, বরং ইহার বিপরীত ভাব দেখিলে মুখস্থ বিদ্যা ও শিক্ষার দোষের কথা স্বতঃই মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু নিরক্ষরা বা কোনও স্থলে, অক্ষরমাত্র পরিচয়-জানা, প্রাচীনা গৃহিণীদিগের উচ্চ শিক্ষার অনুরূপ জ্ঞান, সহজ বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি সভ্যতা, ভব্যতার বিষয় অনুধাবনপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহাদেরই বংশের কন্যা বধূ আমরা, আমাদের সকলেরই কি গৌরব বোধ হইতে পারে না?

রামকৃষ্ণ

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

হে রামকৃষ্ণ পরমহংস
মুগ্ধ ভারত এসেছে আজ,
ঢালিতে তোমার পূত চরণে
স্নিগ্ধ-ভকতি-কুসুম-লাজ।
তোমার উজল মূরতি-আলোকে
দীপ্তি উঠিছে ফুটি'
পুঞ্জিত যত সুপ্তির ঘোর
পরশে তাহার টুটি
শিক্ষা তোমার শিষ্য যেদিন
ফুটাল সাগর-তীরে
স্তব্ধ বিশ্ব, হীরক কিরীট
শোভিল ভারত-শিরে
জ্ঞানের পুণ্য-নির্ঝর-ধারায়
রচিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য-মাঝ
ধন্য ধরণী বন্দি তোমারে
ধন্য তুমিও হে রাজরাজ।

(২)

নবীন যুগের হে গুরু সাধক,
বিশ্ব প্রণত তোমার দ্বারে
সঙ্গীত তব ঝঙ্কারে আজি
মহামানবের হৃদয় তারে,—
উঠেছিল যাহা এক দিন হেথা
শাক্য-কণ্ঠে করুণ সুরে
উঠেছিল পুনঃ শঙ্কর গানে
গম্ভীর তানে জগৎজুড়ে
উঠিল যে গান নিমাই-কণ্ঠে
তৃপ্ত করিয়া সবার মর্ম্ম,
সিক্ত ধরণী মুক্তি গাথায়

(৩)

ভারতের সেই দূর প্রাঙ্গনে
উঠেছিল যত মধুর স্বর
শত লাঞ্ছনা অত্যাচারের
বহ্নি শিখায় গেছিল দূর,
কোন্ সে সুদূর প্রাঙ্গণ হ'তে
উদিলে হে দেব, ভারতে দীন,
শুনাতে আবার মধুর ছন্দে
তুলে নিলে তব মুরজ বীণ।
উল্লাসি তব কণ্ঠে মধুর
মিনার-মঠের সাম্যগান
গীতোপনিষদ্-খৃষ্ট-বুদ্ধ
একই গাথায় বেদ কোরাণ।
কঠিন দুরূহ দর্শন যত
প্রাঞ্জল করি তোমার তুলি
ব্যাস-পাতঞ্জল-গোতম-কনাদ
জৈমিনী-কপিল দেখাল খুলি।
দখিণেশ্বর মন্দির তলে
স্নিগ্ধ পঞ্চবটীর মূলে,
শিখালে নবীন যুগের ধর্ম্ম
চির-পবিত্র জাহ্নবী-কূলে!

(৪)

হে রামকৃষ্ণ পরমহংস
রিক্ত ভারত দৃপ্ত আজ
ভক্তি-অর্ঘ্য-দীপ্ত-রাগ

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

অগ্রহায়ণ মাস। তখন রাত্রি ১১টা কি আরও বেশী হইবে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল ঝিঁঝিঁ পোকা তার সেই চির-পুরাতন একঘেয়ে তারস্বরে আঁধারের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কাঁদিতেছে না গাহিতেছে কে জানে! খড়দহ বাঁড়ুজ্যেপাড়ার একটা ভাঙ্গা ইট-বার-করা একতলা পুরানো বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে একটা লোক নিম্নস্বরে ডাকিল—"কলি, ও কলি"। চতুঃপার্শ্বে গাছ-গাছড়া, লতায় পাতায় ঢাকা ঠাসাঠাসি অন্ধকারের মধ্যে জোনাকী পোকার হাট বসিয়াছে।

দরজাটার গায়ে একটা ভাঙ্গা রক। দেয়ালে কতক-গুলো ঘুঁটে দেওয়া আছে। তাহার একটু উঁচুতে একটা এক হাত-প্রমাণ ভাঙ্গা জানালা, আধখানা ভেজানো এবং বাকীটা একটা ছেঁড়া চট দিয়া ঢাকা হইয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইতেছিল একটা ক্ষীণ আলোক-রেখা ও মৃদুকণ্ঠের করুণ সুর।

যে ডাকিতেছিল তার আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া ছিল একখানা চেক শালে। লোকটার বয়স বেশী নয়, মাত্র ২২।২৩ বৎসর হইবে, তবে তার চেহারাটা তাহাকে তার বয়স হইতে অনেকখানি আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভিতরে কাহারো সাড়া না পাইয়া সে বিরক্ত ভাবে দুই দরজার ফাটলে মুখ লাগাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ও কুলীন পিসি! শুনতে পাচ্ছ না?

ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল—কে?

আমি ধীরে, দরজা খোল।

একটী প্রদীপ হস্তে একজন বিধবা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রে ধীরু এত রাত্রে? লোকটা দরজার ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, হাঁ—মাধু-খুড়ো মল্লেনপুর গেছে কলির জন্তে পাত্র ঠিক করতে। আজ রাত্রে ফিরবে না, বরং ২।১ দিন দেরীও হতে পারে। তাই আমায় খবর দিতে বলে গেছে।

বৃদ্ধা কহিল—তা দাদা রাত্তিরে না গিয়ে কাল সকালেও ত যেতে পারতো।

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, ওগো না-না—খুড়ো সন্ধ্যাবেলায়ই গেছে। খবরটা আমায় দিতে বলেছিল সকাল সকাল—তা আর আমি পেরে উঠিনি। হরির মার জরটা বিকারে দাঁড়িয়েছে কি না, তাই ডাক্তারকে ডাকতে শুকচরে গিছলুম।

"আহা বুড়ী আছে বলে' তাদের সংসারটা বজায় আছে রে! বুড়ী এখন ভালয় ভালয় এ যাত্রা রক্ষে পেলে হয়! হাঁ। পাত্র কোথায় বলছিলি?"

পাত্র হচ্ছে মল্লেনপুরের জমীদার জগদীশ মুখুজ্যে। সম্প্রতি তার বউ মারা গেছে। আজ বিকেলে নোড়-তলায় আমরা যখন বসে আছি, তখন কথায় কথায় কলির বিয়ের কথা উঠতেই, শিরোমণি কাকা এই সম্বন্ধের কথা বল্লেন। —জান ত, কাকা হচ্ছে তাদের কুলপুরোহিত। বাবু আবার আজ কালের মধ্যেই মহালে চলে যাবেন কি না, তাই মাধু-খুড়ো আজই শিরোমণি কাকাকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

বৃদ্ধা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—পাত্রের বয়স কত?

ধীরু একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, হাঁ৷ বামুণের পাত্রের আবার বয়সের একটা হিসেব-নিকেশ আছে না কি? ও ৪০।৫০ কিছুতেই বাধে না পিসি! কাঠামটা দাঁড়িয়ে থাকা পর্য্যন্ত—

বৃদ্ধা বাধা দিয়া কহিল—তবু ত তার একটা বয়স আছে।

—তা আর এমন কি—ধর না ৫০।৫৫ হ'তে পারে। তবে এ বিয়ে যদি হয় পিসি, কলির খুব বরাত-জোর বলতে হ'বে। বুঝলি কলি, একেবারে জমিদার-গিন্নী। তখন আমাদের তুই চিনতে পারলে হয়।

১৫।১৬ বছরের মেয়েটী ছিন্ন লেপখানা গায়ে জড়াইয়া তক্তার উপরে বসিয়া একটা উঁচু কাঠের উপর স্থাপিত

প্রদীপের আলোকে কি একখানা বই পড়িতেছিল। হঠাৎ সে হাসিবার ভঙ্গীতে মুখ তুলিয়া কহিল, সাফ্...এইবার তোমরা নিশ্চিন্ত হলে ধীরুদা......কলি একেবারে জমিদার-গিন্নী! তোমার খেয়াল মেটাবার পয়সার জন্য আর কারুকে জ্বালাতন হতে হবে না! সে ভারটা আমিই নেব।

দেখছ পিসি, কলির কথা শুনছ! আমার পয়সা জোগাবেন উনি!—কেন রে?

কলি ওরফে কল্যাণী হাসিয়া কহিল—বাঃ রে, তুমি আমার এতখানি উপকার করছ, আর আমি তোমার কিছুই করব না বুঝি?

ধীরু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল—তার মানে?

কল্যাণী তেমনি হাসিয়া কহিল—তার মানে হচ্ছে যে সকালে তোমার পিসী পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে হরি ভট্‌চাযের কাছে কেঁদে বলছিলেন যে, ধীরের জ্বালায় অস্থির হয়েছি। যে টাকা কয়টা ছিল, সে তা নয়ছয় করে উড়িয়ে দিল। মুখে আগুন ওর লেখাপড়া শেখায়। কোথায় দু পয়সা রোজগার করবে তা নয়—

ধীরু বাধা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, আমি উড়িয়ে দিয়েছি? এই কথা বলেছে পিসি?—আচ্ছা দেখছি, ভজিয়ে দিতে হবে কিন্তু। ওঃ, আমার মা হলে সে কি এমনি পাড়ায়-পাড়ায় মিথ্যা নিন্দা করে বেড়াতে পারত?—আবার বলা হয় আঁতুড় থেকে মানুষ করেছি। ও সবাই সমান!

কল্যাণী মৃদুহাস্যে বলিল, বাঃ গো, লোকের বল্লেই বুঝি বড় দোষের হয়? বেটাছেলে রোজগার করবে না কিছু না—কেবল এ-আড্ডায়, সে আড্ডায় ঘুরে বেড়াবে, কার কি হল, এই সব বাজে কাজে—

বাধা দিয়া ধীরু কহিল, হ্যাঁ, -হ্যাঁরে!—ধীরে আড্ডা দেয়, নেশা করে, চোর, জোচ্চোর, বদমাইস—তাকে আর তোরা বাড়ীতে ঢুকতে দিস্ না—ব্যস্—তাহলেই ত হ'ল? আমিও আর আস্‌ছি না—দুম দাম শব্দ করিয়া খটাস্ করিয়া দরজা খুলিয়া ধীরু একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে উচ্চ হাসির সঙ্গে কল্যাণীর স্বর ভাসিয়া আসিল, ও ধীরুদা শোন, যেও না—সব মিথ্যা কথা;—কিন্তু ধীরেন সে কথা কাণে না তুলিয়া ছেলেদের দম দেওয়া কলের গাড়ীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া আপনার মনে চলিয়া গেল।

দিগম্বরী কহিলেন, কেন ওকে রাগাস্ কলি। একে ও অভিমানী, হয় ত রাগ করে আর আসবে না।

কল্যাণী মৃদুহাস্যে কহিল, হ্যাঁ আসবে না আবার!

মা বলিলেন—যা দরজা বন্ধ করে আয়!, কল্যাণী দরজা বন্ধ করিয়া আসিলে তাহার মা বলিলেন—আজ আর পড়ে না! আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়্।

কল্যাণী ছেঁড়া রামায়ণখানার পাতাগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল কেন সে ধীরুকে সে কথা বলিল! যদি সত্যই ধীরুদা আর তাহাদের বাড়ী না আসে! তা কি ধীরুদা পারে? আমার কথায় সে রাগ করে না। কিন্তু কেন?—এই কেনর মীমাংসা কল্যাণীর মনের মধ্যে উঁকি মারিতেই কল্যাণী লজ্জায় তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিল ও শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

ধীরু ঘোষেদের পুকুর ধার দিয়া অন্যমনস্কভাবে চলিয়াছে। একটা লোক অন্ধকার ভেদ করিয়া হন্ হন্ করিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া যাইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—কে?

লোকটা কহিল, "আমি হরি বাগ্দী!"

"হরে?—এত রাত্রে এদিকে কোথায় চলেছিস্ রে?"

আর দাদাঠাকুর—অদেষ্ট! মতেটা মরে গেছে।

ধীরু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, সে কি রে! কখন? দুপুরেও দেখে এসেছি একটু ভাল—এরি মধ্যে—বলিস্ কি রে?

হ্যাঁ, বিকেলের দিকটায় ভেদবমি কমে গেল; কিন্তু ছট্‌ফটানি বাড়তে লাগল। তারপর কাতরাতে কাতরাতে ব্যস্—হয়ে গেল!

তাই ত! বেচারার ত কেউ নেই-ও আর! তা' হলে—

কি করব দাদাঠাকুর, হাতেও একটা পয়সা নেই—আর এত রাত্রে কাউকে জোটাতেও পারছি না—থাকবার মধ্যে আমি আর ভজা ব্যাটা!

সে ত কাণা!...তাকে দিয়ে কি হবে?

কি আর করি...তাকেই মড়ার কাছে বসিয়ে রেখে আমি লোক খুঁজতে বেরিয়েছি! মরেছে বলে কি আর তার গতি না করলে চলে, তুমিই বল না দাদাঠাকুর!

ধীরু অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "না—তা কি করে চলে?"

তা দেখ না—যত্নুর কাছে গেলাম, সে বলে—তার পরিবার পোয়াতী, সে যাবে না। নিধে হাড়িকে ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গলাম, তার মা বেরিয়ে বল্লে, সে নেশা করে পড়ে আছে। কি করি বল ত দাদাঠাকুর! নেহাৎ একসঙ্গে নেশাটা আশটা করতুম বুঝলে কি না, তাই তার গতিটা করলে—

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, হাঁারে, তোদের দলের আর কেউই এল না!

"না দাদাঠাকুর, কেবল রাখালের ভাই সোমরা যাবে বলেছে!

তা হলে ধর তুই, সোমরা আর আমি এই তিনজনে মিলে নিতে পারব না রে?—খুব পারা যাবে কি বলিস্?

হরি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, বল কি, তুমি যাবে কি দাদাঠাকুর। কাওরার মড়া—জেতে বাগ্দী—তুমি হলে বামুণ—

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, নে থাম্—গঙ্গা নাইলেই ত সব শুদ্ধ। তাতে আবার কি?

মাথা নাড়িয়া হরি কহিল, তুমি কি ক্ষেপেছ দাদাঠাকুর! সে কি হয়! কাল তাহলে গাঁয়ে তোমায় একঘরে করবে।

ধীরু বিরক্ত ভাবে কহিল, তুই চুপ কর না বাপু, সে হয় না হয় আমি বুঝব! এখন কাঠের জোগাড় করা যায় কি করে?

কাঠের দুঃখু কি দাদাঠাকুর! তার দরজায় এখনও ঘোষেদের আমগাছের চেলা চিপি দেওয়া রয়েছে। একটা ছেড়ে দশটা মড়া পোড়াও না। আর কাট চেলাই করবার দাম ঘোষেদের কাছে মতের পাওনা আছে।

চল্ তাহলে, আর দেরী করে কাজ নেই···বাড়ীতে একবার···না থাক্‌গে—চল!

কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ধীরু দ্রুতগতিতে চলিল, বিস্ময়বিমুগ্ধ হরিবাগ্দী তাহার অনুসরণ করিল।

২

যাহারা বিশ্বের অবজ্ঞাত, পরিত্যক্ত, ভগবান যেন বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের প্রাণগুলাকে পাথরের মত শক্ত করিয়া দিয়া সকলের অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা সহ্য করিবার দুর্জ্জয় ক্ষমতা প্রদান করেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, জগতের কাছে এত নির্ম্মমতা পাইয়াও এই পাষাণ প্রাণই নিজের বক্ষ নিংড়াইয়া, জগতের উপর স্নেহের মন্দাকিনী বহাইয়া দিয়া যায়।

ধীরু ছেলেটি সেই দলের। ছেলেবেলায় মা বাপ হারাইয়া দাদাদের অভিভাবকতার গণ্ডীর ভিতর সে যখন একঘেয়ে জীবনটার মধ্যে কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল না, তখন সে নিজেকে ভিন্ন পথে চালিত করিল। এই ছন্নছাড়া জীবনটার মধ্যেও রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শের অনুভূতি পাইতে চেষ্টা করিল। লোকে বলিল, "ভবঘুরে", "লক্ষ্মীছাড়া", "হতভাগা" আরও কত কি; কিন্তু কোন শ্লেষ-বিদ্রূপই এই খেয়ালের একটানা স্রোতে ভাসমান জীবন-তরণীখানাকে কূলে ভিড়াইতে পারিল না। লাঞ্ছনা, পীড়ন, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখের "ছি ছি" "ঘৃণা" অপর্য্যাপ্তভাবে খরচ হইলেও ধীরুর কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তাহাকে দেখিলে এখন কেহ বলিতে পারিবে না যে, এই ছেলেটিই এক দিন ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিল, বরাবর পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার পাইয়া আসিয়াছে। তাহার ধীর, নম্র স্বভাবে সে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে বালকে আর এ-যুবাতে আজ কত প্রভেদ; কোন দিন যে কোন সামঞ্জস্য ছিল—এ কথা অতিবড় মনস্তত্ত্ববিদও আজ বলিতে পারিবে না!

নাথু পালের শ্মশানঘাটে বসিয়া মতি কাওরার শবদাহান্তে ধীরু আজ এই কথাটাই ভাবিতেছিল, সংসারে কেহ কখন চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না; তখন কেন মানুষ আপনার আপনার করিয়া মরে! কেনই বা নিজেকে লইয়া এতখানি বিব্রত হয়!—এই ত! কাল যে দেহটার ভিতর একটু প্রাণের সাড়া ছিল, তখনো মানুষ বলে যা'কে সম্বোধন করা চলত, আজ তার জীবন-চিহ্ন জগৎ থেকে মুছে গেল! এতকাল যে প্রাণটা আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িত থেকে একটা দেহকে আশ্রয় করে মায়া, মমতা, ভালবাসা নিয়ে তার ভিতর লুকিয়ে ছিল, এতকালের বসবাস একদিনে ভেঙ্গে দিয়ে দেহটাকে ফেলে সে কোথায় পালিয়ে গেল! তখন চিতার আগুন নিভিয়া আসিতেছে।

ধীরু উঠিয়া কলসী করিয়া গঙ্গার জল আনিয়া চিতার উপর ঢালিয়া দিল। হরি বাগ্দী ও সমস্ত যাহারা ধীরুর সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা মদ খাইয়া গায়ের ব্যথা মারিতে বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কেবল ধীরু দাহ শেষ না হওয়া

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আহা, বেচারী নিঃসহায় মতি কাওরা! কলেরা রোগে মরেছে বলে কেউ তার কাছে এলো না, ছুঁলে না, দাহ করলে না! অথচ এই মতি যতদিন বেঁচে ছিল, সে লোকের এমনি বিপদে ছুটিয়া গিয়া বুক দিয়া পড়িত! রাত্রির আঁধার, দুর্য্যোগ কোনও দিনই তাকে তার কর্ত্তব্য থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি'।

আর আজ!—কেহ তার নামটীও আর মুখে আনিবে না। এই ত মানুষ,—আর এই তার জীবনের পরিণাম! ধীরু হঠাৎ যেন নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ ভাবিয়া একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিল সেই স্থানটা, যেখানে মতিকে সে দাহ করিয়াছে। কোথায় সে? তার স্মৃতি যে শুধু দগ্ধ, অর্দ্ধ-দগ্ধ কয়েকখানা কাষ্ঠখণ্ডে ও একটী ভগ্ন মৃৎভাণ্ডের সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়া জীবনকে পরিহাস করিতেছে মাত্র! একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরু সেস্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন ঘাটের পাড়ে অন্যমনস্কভাবে নামিয়া পড়িল।

আজ চতুর্দ্দশীর গঙ্গা। জোয়ার মা জাহ্নবীর বুকখানাকে কানায় কানায় ফুলাইয়া তুলিয়াছে। উদাস ঢেউগুলি একের পর আর একটা স্তবকে স্তবকে গম্ভীরভাবে গড়াইয়া চলিয়াছে, একটা উন্মাদনা লইয়া। কিসের এ আকুলতা? ধীরু যন্ত্রচালিতের মত এক পা, দুই-পা করিয়া গঙ্গায় নামিল। ঝুপ ঝুপ করিয়া কয়েকটা ডুব দিয়া কোঁচার কাপড়ে মাথা এবং গা মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল। তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, মুখখানা শুষ্ক, বিবর্ণ।

বাটীতে ঢুকিতেই পিসিমা দয়াদেবী চীৎকার করিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে ধীরে! তোর জ্বালায় কি গলায় দড়ি দেব রে?

ধীরু বিস্মিতভাবে কহিল, কেন পিসি, আমি কি করেছি?

দয়াদেবী কপাল চাপড়াইয়া কহিলেন,—আমার মাথা আর মুণ্ড করেছ।

ধীরু উদাসভাবে কহিল, তাই নাকি।—যাক্ গে, তুমি এখন একখানা কাপড় দেবে আমায় পরতে।...না এই ভিজে কাপড়েই থাকতে হ'বে?

বামুণের ছেলে হয়ে কি না তুই শেষে কাওরার মড়া পুড়িয়ে এলি? সারা রাত বসে আমি ভেবে মরছি, তোর কি প্রাণে একটুও দয়া মায়া নেই! দেবু বলেছে তোকে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেবে!

শেষ করিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া ধীরুকে দেখিয়া বিদ্রূপকণ্ঠে কহিলেন, এই যে পিসী, রাত কাটিয়ে তোমার গোপাল ফিরে এসেছেন দেখছি!

দয়াদেবী চুপ করিয়া রহিলেন। দেবেন ধীরুকে কহিল, শোনহে, ছোটবাবু, আমি বড় কর্ত্তাকেও কাল বলেছি, দিন দিন তুমি যে রকম বেড়ে উঠছ তাতে এ বাড়ীতে তোমার আর যায়গা হবে না।

ধীরু কহিল, তার মানে?' বল্লেই হল আর কি? কোথায় যাবো?

দেবেন 'বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল। ধীরুর মুখের কাছে হাত পাকাইয়া কহিল, কথার ওপর কথা! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব তা' জানিস্? স্বত্ব দেখাতে এসেছে... বেরো এখুনি বাড়ী থেকে, নইলে—দেবেন ধীরুর দিকে ক্রুদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেই দয়াদেবী তাড়াতাড়ি তা'র সম্মুখে আসিয়া উভয় হস্তে দেবেনের হাত দুখানি ধরিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে কহিলেন, আহা, করিস্ কি দেবু—

মেজবৌ সত্যবালা এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘাড় বাঁকাইয়া স্বামীকে কহিল, 'দেখ্‌লে ত ভায়ের মেজাজ, শুনলে ত কথা! আমরা ত পরের মেয়ে—তোমার ভাইকে দেখতে পারি না, তোমাদের ঘর ভাঙতে এসেছি,—এখন ভাই কেমন দাদার মান রাখলে? বেশ হয়েছে!

সত্যবালার কথা শুনিয়া ধীরু তাহার নত মুখখানি ঈষৎ তুলিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত দৃষ্টিতে সত্যবালার দিকে চাহিতে, সত্যবালা রুক্ষকণ্ঠে কহিল, কটমট করে চাইছ যে, মারবে না কি?

দয়াদেবী দুঃখিতভাবে কহিলেন, তুমি থাম না মেজ-বৌমা।

সত্যবালা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, থামব কেন পিসী, হয়েছে যদি, ভাল করেই তা'হলে হ'ক! চিরদিন যে তোমার ছোট ভাইপো সকলকে হেনস্তা করে বুক ফুলিয়ে বেড়াবেন—কেন বল ত? এবার একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাক্।

এ সব কি কথা বউ-মা?

দেবেন কহিল, হ্যাঁ পিসী, মেজ-বউএর সঙ্গে যখন কারুর বনে না, তখন যে যার আলাদা হলেই ভাল। আমি একটু শান্তি চাই! রোজ রোজ আমার আর সহ্য হয় না। আমি দাদাকেও বলেছি যে আমি আলাদা থাকবো।

দয়াদেবী গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল হ'বে দেবু? সংসারে কোথায় না ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। বড়গাছেই বেশী ঝড় লাগে যে বাবা। আর লোকেই বা কি বলবে! বলবে বাপ মরতে পাঁচ বছরও গেল না, ভায়ে ভায়ে আলাদা হয়ে সংসারটা নষ্ট করলে—

দেবেন বাধা দিয়া কহিল, লোকের যা' খুসী তা' বলুক, আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না! তোমরাও বল যে পরিবারের কথা শোনে, আরও যা ইচ্ছা তাই বল! আমি ও রাস্কেলের মুখও দেখবো না, একটা কানা কড়িও দাব না। ওর যা' খুসী করুক।

দয়াদেবী আর কোন কথা কহিলেন না, দুঃখবিজড়িত দৃষ্টিতে দেবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। এমন সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র আসিয়া কহিল, কি হে দেবু, সকালবেলা এত চেঁচামেচি কিসের?

সত্যবালা অন্তরালে সরিয়া গেল।

দেবেন হাত নাড়িয়া কহিল, দেখ না, পিসী ঠাকুর যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে এসেছেন।

দয়াদেবী রাগতস্বরে কহিলেন, কথাটা কি ঠিক হ'ল দেবু?

দেবেন রুক্ষস্বরে বলিল, না আমার সবই অন্যায়। তোমরা আমায় রেহাই দাও না বাপু! আমি কারুর সঙ্গে এখানে থাকব না, থাকব না, থাকব না।

দয়াদেবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, সে ভয় আমাকে দেখাচ্ছিস্ কি-রে? আমি কি তোদের বাড়ী চারটী ভাতের পিত্যেশে পড়ে আছি? আমার যা সংস্থান আছে—তার না থাকলেও একটা পেট কাশীতে ভিক্ষে মাগলেও চলে যাবে! তোর মা আবাগী যদি ঐ শত্তুরকে আমার গায় ফেলে দিয়ে না মরত তবে আমি আজ তোদের বাড়ীর মাটী কামড়ে থাকব কেন? দয়াদেবীর বুকের কাছে একটা ক্রন্দন ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ঠাকুর দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, দেখ্ হতভাগা, যদি ঘেন্না পিত্তি তোর থাকে, যদি মানুষ হোস্, আর একদণ্ড থাকিস্ না এখানে। যেখানে দু' চোখ যায় চলে যা। তুই ব্যাটাছেলে, একটা পেটের ভাবনা কি!—আমার যা অদৃষ্টে আছে তাই হ'বে—চক্ষু মুছিতে মুছিতে দয়াদেবী গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেবেন একটু মৃদু হাসিয়া রাজেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে কহিল, দেখলে দাদা ব্যাপারটা, শুনলে পিসীর কথা! এমন কি সহ্য করা যায়, না সহ্য করা উচিত?

রাজেন্দ্রনাথ বিমর্ষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার কি হ'ল?

দেবেন তা'র দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া নাচাইতে নাচাইতে কহিল, কি না হচ্ছে কবে? সংসারের খবর ত কিছু রাখ না, সে সবে তোমার দরকারও নেই। যাক্ সে সব কথা, রোজ রোজ আর আমার এত বকাবকি ভাল লাগে না। পারব না আমি এত হাঙ্গামা পোহাতে, আমার কি দায়।—প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দেবেন সিঁড়ি বাহিয়া খট্ খট্ শব্দে উপরে চলিয়া গেল, থামের অন্তরাল হইতে সত্যবালাও তাহার অনুসরণ করিল।

বৃক্ষের উচ্চশিরে আরোহণ করিয়া হঠাৎ দৃষ্টি নত করিলে প্রাণটা যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে, দেহটার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করে, রাজেন্দ্রনাথের অবস্থাও তদ্রূপ হইল। বুকের উপরে বসিয়া পড়িয়া সম্মুখে পূজার দালানের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল অতীতের কত কথা!

এই ব্রাহ্মণ-প্রধান খড়দহ গ্রামের মধ্যে তাহাদের পিতা ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ই ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য;—বিদ্যায়, সম্মানে সে অঞ্চলে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। একদিন এই বাটীর প্রাঙ্গণে দোল, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, সত্যনারায়ণের সিন্নি প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য উপলক্ষে কত লোক প্রসাদ পাইয়াছে; এই চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া প্রাতঃকালে কত ব্রাহ্মণ-বালক চীৎকার করিয়া কলাপ, মুগ্ধবোধ, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে বিদ্যাপীঠ মুখরিত করিত, আজ সেই স্থানগুলি গদাই মালা, নবীন খানসামা, ছিদাম রাখাল প্রভৃতি লোক দ্বারা অধিকৃত। পাঠ-মন্দির ছাগল-কুকুরের থাকিবার স্থান, ঠাকুরদালানে বাদুড় ও চামচিকা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! সাক্ষীগোপাল শালগ্রামশিলা সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাকালে কয়েকখানি বাতাসার ভোগে তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার পাষাণ প্রাণের জাগ্রত পরিচয় দিতেছেন—কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

রুষ্ট রাজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ধীরুর বিবর্ণ মুখের দিকে পড়িতেই তাঁহার গা জলিয়া উঠিল। ওই হতভাগাই যত অনিষ্টের মূল। সে যদি ভবঘুরে না হয়ে, সংসারের কোন কাজে লাগিত, অন্ততঃ দেবুর ও মেজবউএর মন যোগাইয়া চলিত—তা হইলেও কথা ছিল। তা নয়, মুখে মুখে জবাব, কারুকে কেয়ার নাই, রাত কাটাইয়া ইয়ারকি দিয়া ঘুরিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ! এ অত্যাচার তাহার সহ্য করিবে কে? রাজেন্দ্রনাথ তীব্র কণ্ঠে কহিল, কোথায় ছিলি কাল সারারাত?

ধীরু নির্ব্বিকার কণ্ঠে কহিল, শ্মশানে—

কারণ?

মতি কাওরা কলেরা হয়ে মরেছে কি না—

বাধা দিয়া রাজেন্দ্রনাথ কহিল, আর তুই হতভাগা বুঝি তার সৎকার করে এলি? বামুনের ছেলে হয়ে হাড়ি, ডোম, কাওরার মড়া পুড়িয়ে আজকাল বুঝি মুদ্দফরাসের কাজ হচ্ছে?

ঈষৎ হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া ধীরু কহিল, মড়ার আবার জাত কি দাদা? আর নাইলেই ত সব শুদ্ধ!

তোর শাস্ত্রে! তুই মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েছিস্ কি না? গুণের মধ্যে ত কথায় কথায় তর্ক করা, আর দিন রাত ইয়ারকি দিয়ে বেড়ান! ঘর-সংসারের একটা কাজ দেখা নেই, কি করে দু'পয়সা আনতে পারবি সে চেষ্টা নেই—কে তোকে আজন্ম এমন করে বসিয়ে খাওয়াবে? আজ শুনলি ত মেজবাবুর কথা, এখন বেড়া' ঘুরে পথে পথে···আমি কি কর্ব্ব? রাজেন্দ্রনাথ মুখ গম্ভীর করিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে চলিল।

ধীরু পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—বড় দা' শোন···

রাজেন্দ্রনাথ তাহার দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই কহিল—শুনে আর কি করব—আমার কিছু সাধ্য নেই। তোমার হয়ে ত দেবুর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারি না।

ধীরু সেই খানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল, কেন এমন হইল? তার অপরাধটা কোথায়? কিন্তু একটার পর একটা গ্রন্থি খুলিতে গিয়া দেখিল যে সূত্রটা এমন বিশ্রী জটিল ভাবে পাক খাইয়া গিয়াছে যে, তাহা হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই। মাথা নীচু করিয়া ধীরু ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শৃঙ্খল

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

কেন গো দিয়াছ মোরে এমন শৃঙ্খল?
তোমারি স্পন্দিত বিশ্ব আনন্দ-সঙ্গমে
ছুটিয়াছে, মোরে কেন করেছ অচল?
আমি যে ফুটিতে চাই বিশ্বের মরমে
নির্ম্মল বাসনারূপে, প্রেমের নয়নে
আমি যে জলিতে চাই চঞ্চল আবেশে
চকিত দৃষ্টির মত, বিরহ-বেদনে

আমি যে জাগিতে চাই বেদনার রসে
অভিষিক্ত অশ্রুর মতন! বল নাথ
আমারে দিয়াছ কেন এমন শৃঙ্খল!
আমি যে জাগিতে চাই জীবনের রাত
তব সাথে, সাধিবারে বিশ্বের মঙ্গল
আমি যে ফুটিতে চাই করুণা স্বরূপে,
নীরব হৃদয়মন ভরি চুপে চুপে!

ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্র

শ্রীগণেশচন্দ্র মৈত্র, বি-এস্‌সি

ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্রগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে; সেজন্য স্থানে স্থানে সামান্য মন্তব্য মাত্র প্রকাশ করিয়া, আমি চিত্রগুলি প্রদর্শনের দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছি; সুতরাং আমার 'ব্রহ্ম-প্রবাসের চিত্র'কে চিত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব।

The Great Bell—Shwe Dagon Pagoda

(সোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা-মধ্যস্থ বৃহৎ ঘণ্টা)

চিত্রে প্রদর্শিত ঘণ্টার ব্যাস প্রায় ৪ ফিট ও উচ্চতা ৭ ফিট এবং ওজনও প্রায় ২০।২৫ মণ। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, কোন বিদেশী এই ঘণ্টা একবার বাজাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেও তাঁহাকে এখানে অন্ততঃ আর একবার আসিতেই হইবে। এই কিম্বদন্তীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে রীতিমত প্রমাণাদি না থাকিলেও, কয়েকটী স্থলে আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, কোনও কোনও ভদ্রলোক এ দেশের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াও ২।১ বৎসরের মধ্যে পুনরায় এখানে আসিয়াছেন;—বলা বাহুল্য আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে তাঁহারা এই ঘণ্টা বাজাইয়াছিলেন।

এ দেশটাকে যে Land of Pagodas বা প্যাগোডার দেশ বলে, তাহা পাঠকমণ্ডলীকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। নিম্ন প্রকাশিত ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানের কতিপয় বিখ্যাত প্যাগোডার চিত্র হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। শুনা যায় এখানে এমন কোনও গ্রাম নাই যেখানে অন্ততঃ একটি প্যাগোডাও নাই। বড় বড় সহর মাত্রেই বহুসংখ্যক প্যাগোডা আছে; তন্মধ্যে পেগানের প্যাগোডার সংখ্যাই নাকি সর্ব্বোচ্চ।

Bell Pagoda—Bhamo (ভামোর ঘণ্টাকৃতি প্যাগোডা)

The Serpent Pagoda—Thayetmyo. (থাযেট্‌মিওর সর্পাকৃতি প্যাগোডা)
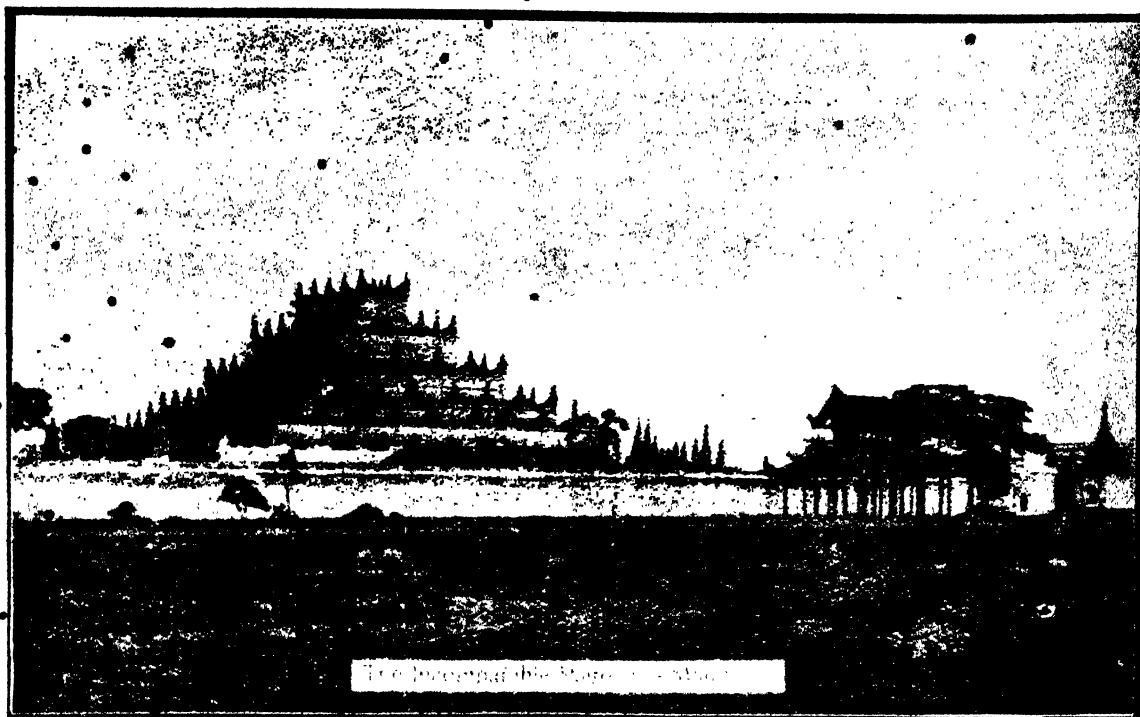
The Incomparab'e pagoda—Mandalay. (মান্দালয়ের অতুলনীয় প্যাগোডা)
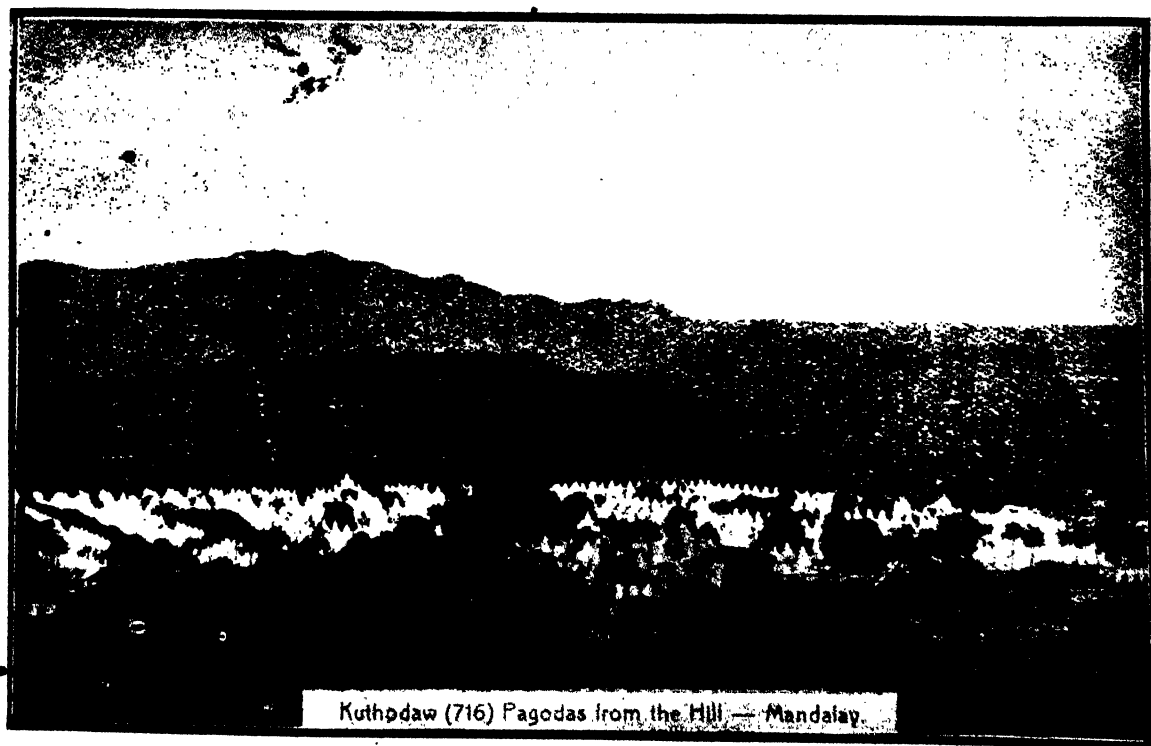
Kuthodaw (716) pagoda from the hill—Mand lay. (পাহাড়ের উপর ৭১৬টি প্যাগোডা—মান্দালয়)
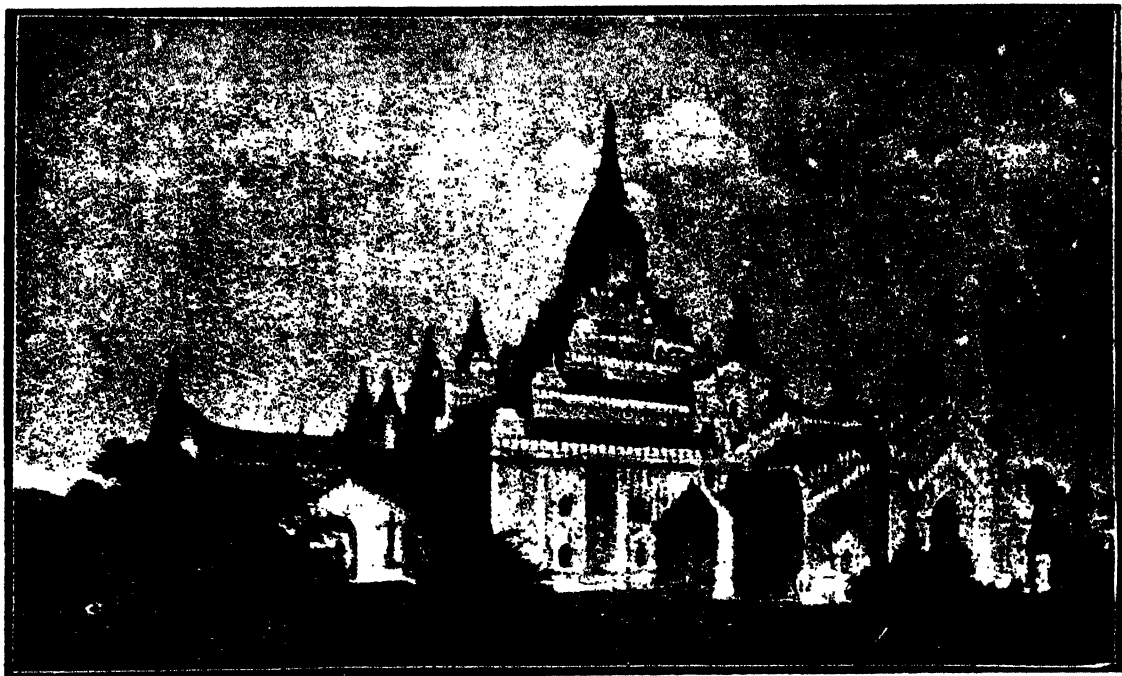
Ananda pagoda—Pagan (পেগানের আনন্দ প্যাগোডা)

আনন্দ বুদ্ধদেবের একজন খুব ভক্ত শিষ্য ছিলেন; তাঁহারই নাম-অনুযায়ী এই প্যাগোডার নামকরণ হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়।
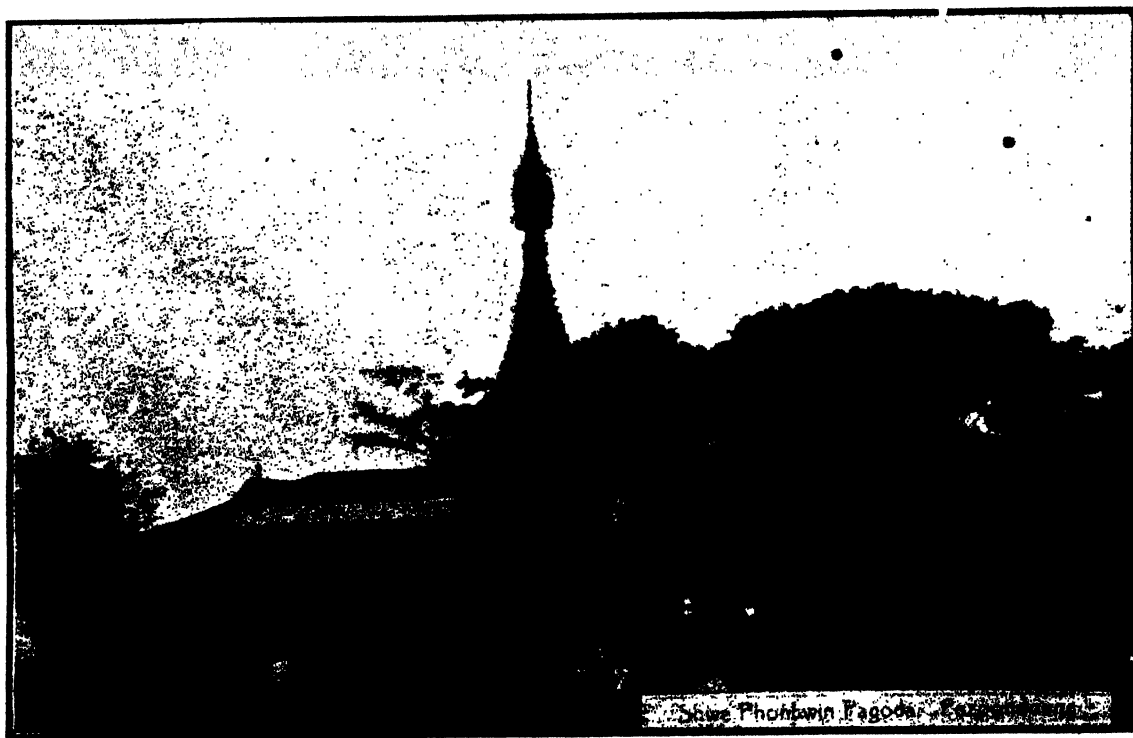
Shwe Phon Buin pagoda—Pajundang. (সোয়ে ফন্ বুইন্ প্যাগোডা—পজুনডং)

ব্রহ্মভাষায় সোয়ে অর্থে সুবর্ণ, ফন্ অর্থে গৌরব এবং বুইন্ অর্থে উন্মুক্ত করা। যুক্তভাবে ইহার অর্থ সুবর্ণময় গৌরবের পথ-উন্মুক্তকারী। পালিভাষায় সোয়ে অর্থে মহান্ (Sublime) ফন্ অর্থে শ্রী (glory); সংযুক্ত অর্থে যাহার দ্বারা মহান্ শ্রী প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ কোনও রাজা তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় অথবা কোনও অপ্রত্যাশিত ধন লাভের পর এই সব প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন, এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়। কাজেই এই প্যাগোডার নামের দুইটি অর্থ করা যাইতে পারে;—প্যাগোডা-নির্ম্মাতার গৌরব-প্রকাশকারী অথবা সেই মহান্ বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব প্রচারকারী।

A Scene on the Twante Rubber Estate
(টোয়ান্টে রবার ক্ষেত্রের একটী দৃশ্য)

ব্রহ্মদেশ মালয় রাজ্যের ন্যায় রবার উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। এখানে বহুসংখ্যক রবারের ক্ষেত আছে। রবারের ক্ষেত একটি দেখিবার জিনিষ। সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ রবার গাছগুলির শোভা অতি সুন্দর। রবার বর্ত্তমান যুগের একটি লাভজনক ব্যবসায়। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার প্রচলন এবং বাণিজ্য পণ্য হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা আজকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ মোটরকার হইতে আরম্ভ করিয়া, ওয়াটার প্রুফ, কোমরের বেল্ট, মোজার গার্ডার প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য, এমন কি রোগশয্যায় আইস্ ব্যাগ, হট্ ওয়াটার ব্যাগ প্রভৃতি, সকল বিষয়েই আজকাল রবারের সমধিক প্রয়োজন। মধ্যে রবারের বাজার নরম হইয়া যাওয়ায় বাগানগুলির তাদৃশ যত্ন ছিল না, এখন হঠাৎ ইহার মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় আবার পূর্ণোদ্যমে এখানে রবারের চাষ চলিতেছে এবং বাগানগুলিও নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে।

ভিক্টোরিয়া পার্কটি রেঙ্গুনের চিড়িয়াখানার (Zoological Gardens) অভ্যন্তরে। বেড়াইবার এমন সুন্দর ও মনোরম পার্ক ড় একটা দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় পার্কটি চিড়িয়াখানার ভিতরে অবস্থিত হওয়ায় প্রবেশের মূল্য দুই আনা না দিলে আর এ সুবিধাটুকু উপভোগ করিবার উপায় নাই।

Victoria Park—Rangoon (ভিক্টোরিয়া পার্ক— রেঙ্গুন)

Myingyan—Upper Burma. (মিইঙ্গান সহরের দৃশ্য)
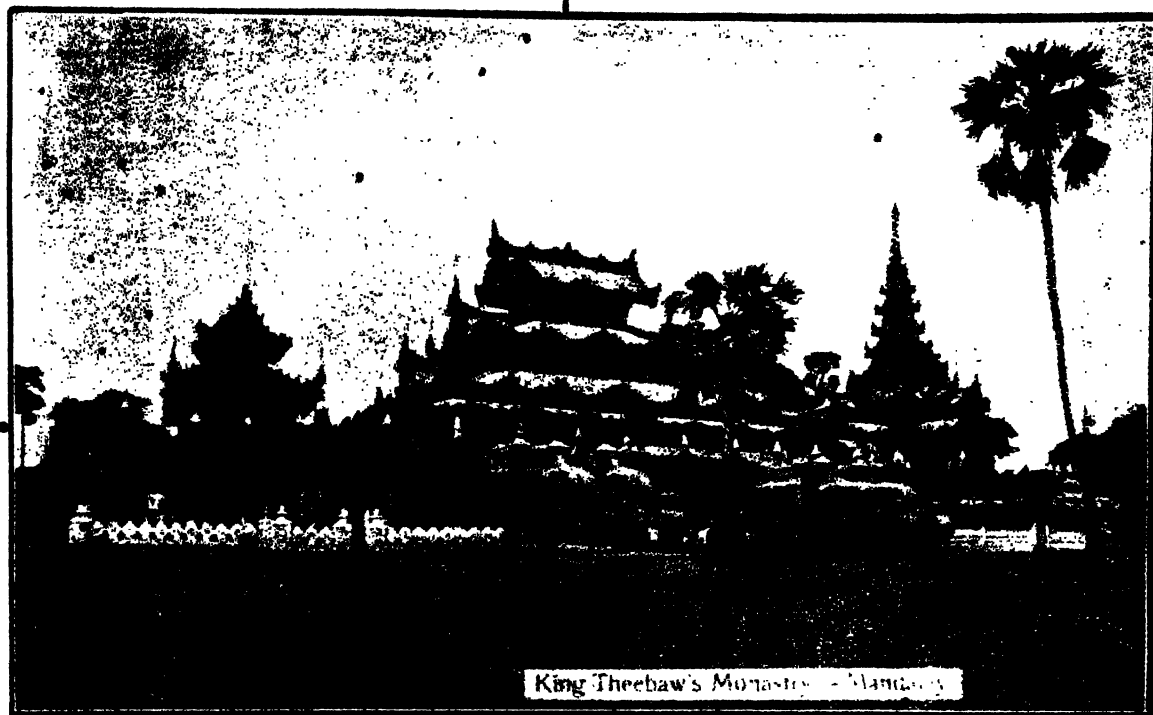
King Theebaw's Monastery—Manda'ay. (ব্রহ্মরাজ থিব প্রতিষ্ঠিত মঠ—মান্দালয়)

প্রোমের সাধারণ দৃশ্য

Maymyo Street Scene. (মেমিও রাজপথের দৃশ্য)
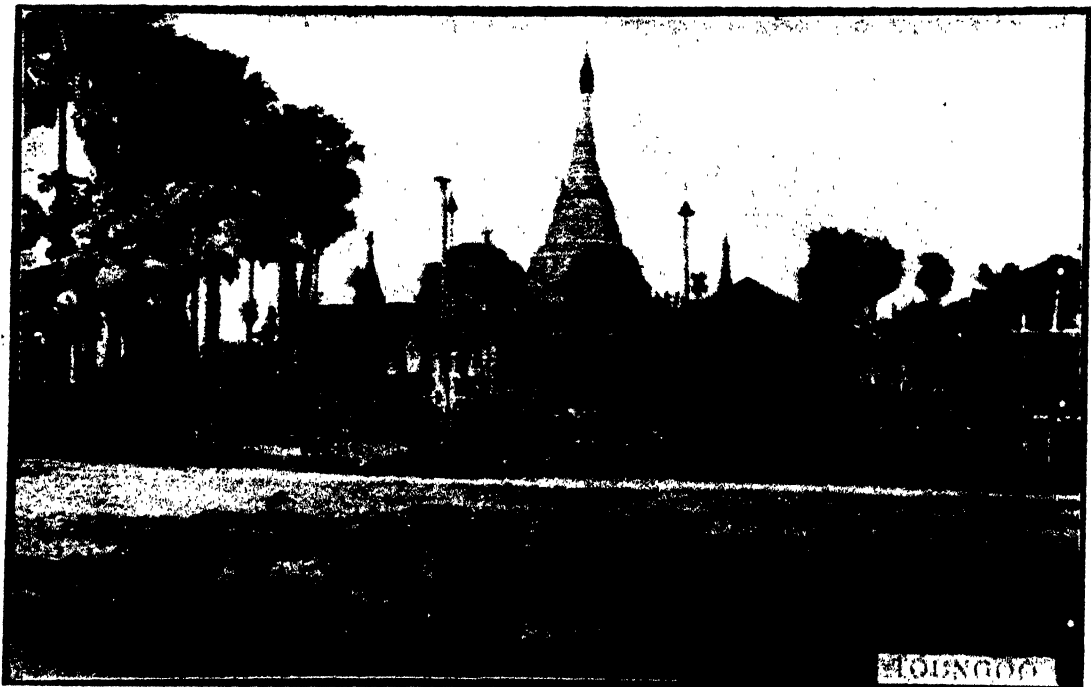
Toungoo. (টাঙ্গু সহরের দৃশ্য)
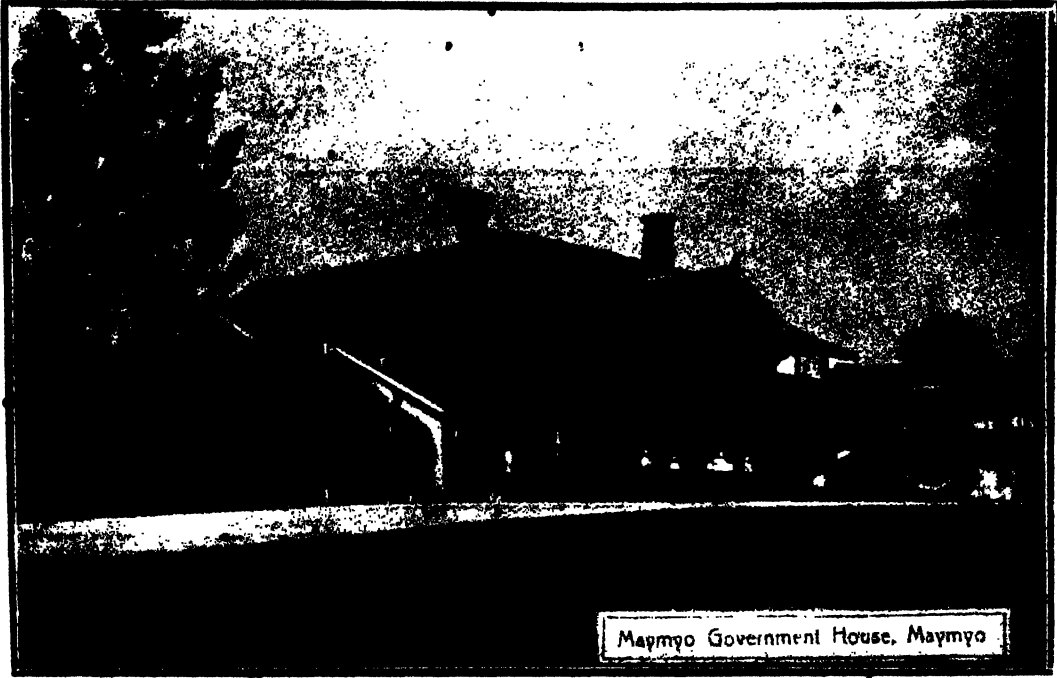
Maymyo Government House. (মেমিও লাট-প্রাসাদ)
বাঙ্গালার লাটবাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস যেমন দার্জ্জিলিংএ, ব্রহ্মের লাটবাহাদুরের গ্রীষ্মাবাসও সেইরূপ মেমিওতে; কারণ মেমিও সহরটি পাহাড়ের উপর, কাজেই শীতপ্রধান।

Government House—Rangoon. (লাটপ্রাসাদ—রেঙ্গুন)

নঙ্‌ ড জী অর্থে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দুই বা ততোধিক প্যাগোডা একই স্থানে পাশাপাশি নির্ম্মিত হইলে, যেটি সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়, তাহাকে ইহারা "নঙ্‌ ড জী" আখ্যা দিয়া থাকে। এই প্যাগোডাটি বৃহৎ সোয়ে ড্যাগন ও কণ্ঠাস্থি এই তিনটি চিহ্ন (relics) আনয়ন করিয়া এই সুবৃহৎ বিবিধ কারুকার্য্য-শোভিত বহুমূল্য প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইতিহাসে কিন্তু মহারাজ অশোকের রাজত্ব-কালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার সাধিত হওয়া এবং
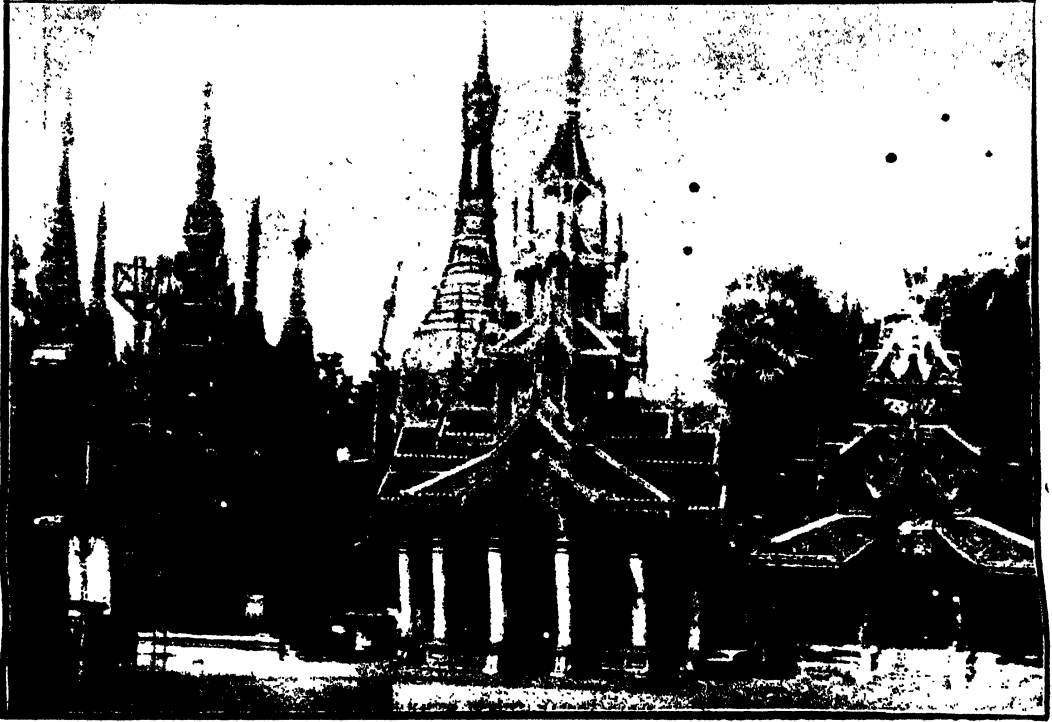
Naung Daw Gyi Pagoda—Rangoon. (নঙ্‌ ড জী প্যাগোডা, রেঙ্গুন)

প্যাগোডা-অঙ্গনে অবস্থিত এবং ইহা সোয়ে ড্যাগনের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই নঙ্‌ ড-জী নামে অভিহিত। প্রবাদ আছে যে ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশবাসী "তাপুসা ও ফলিকা" (Tapussa and Phalika) নামক দুই জন ধনী ব্যবসায়ী ব্রহ্ম-দেশাভিমুখে আগমনকালে পথিমধ্যে বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া বুদ্ধদেবের আদেশানুসারে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহারাই বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর সেই মহাপুরুষের কেশরাশি, জ্ঞানদন্ত

St. Paul's Institute—Rangoon. (সেণ্ট পল বিদ্যালয়—রেঙ্গুন)
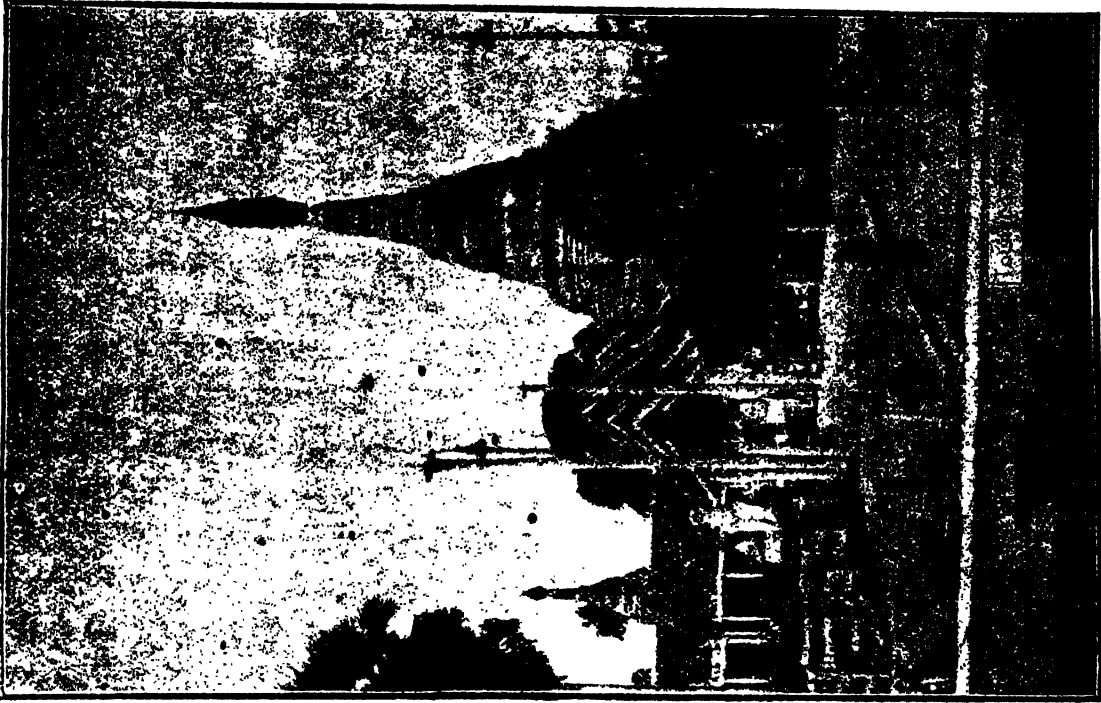
Toungoo pagoda (টাঙ্গু প্যাগোডা)
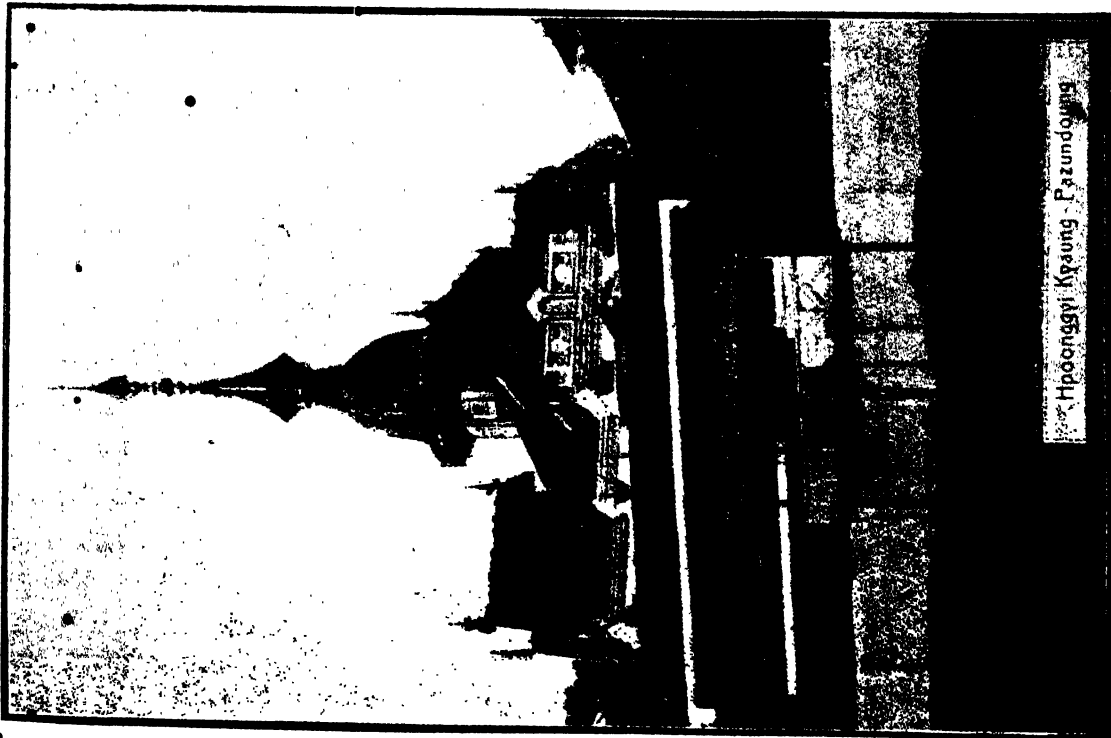
Hpoongyi Kyaung—Pazundaung. (বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আশ্রম—পজুনডং)

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মাধিপতি আলম্ পায়ার (Alamng Paya) সময়ে এই প্যাগোডা নির্ম্মিত হওয়ার কথা জানা যায়। সমগ্র ব্রহ্মদেশের মধ্যে এরূপ প্যাগোডা আর দ্বিতীয় নাই। এই প্যাগোডার চূড়ায় একটী স্বর্ণময় বল আছে এবং তাহা এত মণিমাণিক্য-খচিত যে ঐ বলটি নির্ম্মাণ করিতে নাকি ৫৪০০,০০০৲ চুয়ান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

চ্যং এ দেশের বিশেষত্ব। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মবাসীগণ কোন্ অতীত যুগ হইতে, যাঁহারা ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করেন তাঁহাদের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আসিতেছেন। এই আশ্রমগুলিকে চ্যং বলা হয়। ব্রহ্মদেশের প্রধান বিশেষত্ব এই যে এদেশবাসী নর নারীগণের মধ্যে কেহই একেবারে নিরক্ষর নহেন। ইহার প্রধান কারণ এই সব চ্যং। ইহা গৌণভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার স্থল। প্রতি ব্রহ্ম বালক-বালিকা নিকটবর্ত্তী চ্যংএ বৌদ্ধ শ্রমণদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করে। আর ইহাই বোধ হয় এই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবাসের সর্ব্বোচ্চ দান। এই চ্যংএর অধিবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ স্বদেশবাসীর আতিথেয়তার উপর নির্ভর করিয়াই জীবন যাপন করেন এবং ব্রহ্মবাসীরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভার এই সব ফুঙ্গিদের উপহার দিয়া আপনাদের ধন্য মনে করেন। ঊষার অরুণালোকের সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্রহ্মপল্লীর নিকটে প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সারি সারি হরিদ্রা-বসন-পরিহিত ব্রহ্ম ফুঙ্গিবৃন্দ আপন আপন ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে চলিয়াছেন। এই দৃশ্য আমাদের নয়নসমক্ষে কোন্ এক অতীত বৌদ্ধযুগের শ্রমণ শ্রমণিদের সুমধুর স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীত*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

You can not look upon a great man however imperfectly without gaining something by his contact... Carlyle.

চৈত্রের নির্ম্মল প্রভাত। বেলা নটা। আশে পাশে গাছপালার মধ্যে শিহরণের মর্ম্মরশব্দের সঙ্গে প্রভাতের রূপালি রৌদ্রালোক-স্নাত গাছের সবুজ রূপ এক বিচিত্র বারতা বহন ক'রে আন্‌ছিল।

রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ সামনের অশ্বত্থ গাছের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন: "আমি একজন মহা কুড়ে লোক হে। তবে সেটা কি রকম কুড়েমি জানো? মুটে মজুরের সারাদিন খেটে খুটে অজস্র নিদ্রার জড়তার কুড়েমি নয়। আমার হচ্ছে বাদশাহী কুড়েমি—rich কুড়েমি।" ব'লে অলস ভাবে আরামকেদারাটিতে হেলান দিয়ে তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু পরে বল্‌লেন: "অথচ আমাকে যে পরিমাণ খাট্‌তে হ'য়েছে সেটা অনেক সময়ে আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না হে। সৃষ্টির এটা একটা বিচিত্র অসঙ্গতি-দোষ। যার যেটা ভালো লাগে না তাকে দিয়েই বিধাতা সেটা চুটিয়ে করিয়ে নেন, নয় কি?"

একটা ভৈরবী গাইলাম। "বাবুল মোরা নইয়ার ছুটা যায়।" বল্‌লাম: "গানটি বরোদার ফৈয়াস খাঁর কাছে শেখা—লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যখন ইংরাজরাজ সিংহাসনচ্যুত ক'রে গত শতাব্দীর শেষভাগে মেটেবুরুজে পাঠিয়ে দেয় তখন তিনি ঠুংরি ভৈরবীতে এই করুণ গানটি রচনা ক'রে গেয়েছিলেন।" গানটির ভাবার্থ: "পিতা আমার সবই যেতে বসেছে, তাই এখন ডুলি নিয়ে এসো আমি চিরপরিচিত যা-কিছু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিই।"

---

* গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে আলিপুরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আলোচনা হয়। মাসখানেক পরে কবিবরকে এ রিপোর্টটি শোনাই ও তিনি অনুমোদন করেন যে তাঁর বক্তব্যের প্রতি সুবিচারই করা হ'য়েছে ও এ আলোচনা আমি প্রকাশ করতে পারি।

কবিবর গানটি শুনে খানিক চুপ ক'রে বল্‌লেন: "আচ্ছা দেখ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যে ভৈরবীটি তুমি গাইলে সেটার ধারা হচ্ছে অজস্র বিস্তারের—বিকাশের। অর্থাৎ একটা রাগিনী সম্বন্ধে তোমার যা-কিছু বল্‌বার আছে তার—সবটা না হোক্—অনেকখানি তুমি নিজের কল্পনা ও ধ্যান অনুসারে স্ফুট ক'রে তুল্‌লে। কিন্তু এই ভৈরবীকে অন্য একটা বিশেষ ভাবেও দেখা যেতে পারে। যেমন দেখ ভৈরবী ঠাটের ও গঠনপ্রকৃতির একটা নির্দ্দিষ্ট রস থাকলেও তার সমগ্র রূপটুকে বাদ দিয়েও আমরা তার বিশেষ বিশেষ রূপের উপরই দৃষ্টি রেখে সেই সেই রসকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারি। যেমন দেখ ঐ অশ্বত্থ গাছ আর ঐ দেখ পাশের বটগাছ। প্রতি গাছই উদ্ভিদের পর্যায়ে পড়ে বটে কিন্তু তা সত্বেও কি বলা চলে না যে উদ্ভিদের সংজ্ঞার মধ্যে পড়া সত্বেও অশ্বত্থ গাছের এক বিশেষ রূপ ও বটগাছের এক বিশেষ রূপ? তেম্‌নি ভৈরবীর মধ্যে ভৈরবীর একটা বিশেষ রস থাক্‌লেও নানা গায়ক নানা গানে সে রসের কমবেশি এদিক ওদিক করতেই পারেন। নয় কি?"

আমি বল্‌লাম: "তা ত বটেই। ধরুন না কেন, ধ্রুপদের খাম্বাজের মধ্যে খাম্বাজের যে বিশেষ রসটি বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে ঠুংরির খাম্বাজের মধ্যে সে রসটি ঠিক্ সেভাবে ফুটে উঠ্‌তে পারে না। অন্য একটা রস দেখা দেয়।"

কবিবর বল্‌লেন: "আচ্ছা বেশ। কিন্তু গাইয়েরা কোনও গান বিশেষ রাগিনীতে গাইবার সময়ে তার কোনও বিশেষ বিকাশটির দিকে কি এ ভাবে দৃষ্টি রাখেন? অর্থাৎ প্রতি ভৈরবীতেই ভৈরবীর রূপটি সমগ্রভাবে ফুটিয়ে না তুলেও তার একটা বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় এ কথা কি তাঁরা সজাগ ভাবে উপলব্ধি করেন?"

আমি বল্‌লাম: "সজাগভাবে করেন কি না জানি না।—তাঁদের সে শিক্ষা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা বোধ হয় নেই। কিন্তু তবু বড় গুণী সব ভৈরবীই এক রকম ভাবে গান না। টপ্পায় "নজরা দিলবাহার" এক রকম ভাবে গান ও ঠুংরিতে "বাজুবন্দা খুলি খুলি যায়" অন্য ভাবে গান। কাজেই আপনি যে-কথাটার উপর জোর দিচ্ছেন সেটার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা যে কিছুই জানেন না তা নয়।"

কবিবর খুসি হ'য়ে বল্‌লেন: "তাহ'লেই হ'ল। এই সম্পর্কে দুচারটে কথা আমি তোমাকে বল্‌তে চাই। শোন। তুমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাল যে প্রবন্ধটি পড়ছিলে তার মধ্যে একটা কথা তুমি ঠিক্ ধ'রেছ। অর্থাৎ প্রতি বড় আর্টের মধ্যে একটা অনন্তসম্ভাবিতা বা inevitability আছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই। আমি যে কথাটা তুল্‌লাম সেটার আলোচনা করতে করতে এ কথাটা বোধ হয় বেশি ক'রে বোঝাতে পার্‌ব।

"ব্যাপারটা কি জান? আর্ট মানেই হচ্ছে সীমার মধ্যে একটা অসীম সৌন্দর্য্যের পরশ দেওয়া। যে-মুহূর্ত্তে অশরীরীকে শরীরী হ'তে হয় সে-মুহূর্ত্তে তাকে সীমাকে স্বীকার করতেই হয়। তানালাপ সম্বলিত গানেও গায়ক এ সীমাকে অস্বীকার করেন না ব'লেই ভৈরবীতে ভৈরবীর একটা বিশেষ রূপ ফুটে উঠ্‌তে পেরেছে যেটা খাম্বাজের বিশেষ রূপটির চেয়ে পৃথক। এটা বোঝা সহজ। কিন্তু এখন আমি চাই প্রতি রাগের বৈশিষ্ট্যটিকে আরও individuality দিতে। অর্থাৎ আমি বল্‌তে চাই এই কথা যে প্রতি রাগের বৈশিষ্ট্যটি এমনভাবে সংহত করা যেতে পারে যাতে করে ঐ রাগে রচিত পৃথক্-পৃথক্ গানে তার রাগটির গুটিকয়েক পৃথক্ পৃথক্ রস আমাদের মনে একটা নির্দ্দিষ্ট তৃপ্তি দিতে পারে। যেমন ধর, ভৈরবীকে এমন ভাবে গাওয়া যায় যাতে ক'রে তার মধ্যে মিনতির কাছাকাছি একটা ভাবই বিশেষ ক'রে ফুটে উঠ্‌বে। আবার অন্য একটা বিশেষ কাঠামে ঐ ভৈরবীই হয়ত বৈরাগ্যের একটা আবেদন জানাবে। কিম্বা হয়ত বিরহব্যথার ভাব জাগাবে। এখন ধর দশটা ভৈরবীর মধ্য দিয়ে ভৈরবীর এই রকম দশটি ভাব মূর্ত্ত করে তুলে ধরা যেতে পারে।* কিন্তু প্রতি ভৈরবী গাইবার সময়ে গায়কের দেখ্‌তে হবে সে ঐ দশটির মধ্যে কোন্‌টি প্রকাশ করতে চাইছে। কারণ কোনও একটি বিশেষ ভৈরবী গানের মধ্যে যে বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করা গুণীর উদ্দেশ্য সে ভৈরবীটির মধ্যে অন্য নয়টির একটা ভাবও

* আমি ফরোয়ার্ডে একবার এই কথা লিখেছিলাম। তার উত্তরে একজন গতানুগতিক ওস্তাদিপন্থী চটে গিয়েছিলেন যে আমি হিন্দু সঙ্গীতের কিছুই জানি না ব'লেই এমন হাস্যকর কথা বল্‌তে সাহসী হয়েছি, যেহেতু প্রতি রাগের রস একটির বেশী হ'তেই পারে না। এখন হাস্যাস্পদ কে তা সাধারণের বিচার্য্য।

প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে আর্টের ঐ inevitability নীতি-টির ব্যত্যয় ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। এই কথাটা গায়কের মনে রাখা দরকার। এটা কঠিন। এবং কঠিন ব'লেই ওস্তাদেরা দেড় ঘণ্টা ধ'রে রাগটির সমস্ত রূপ প্রকাশ করতে বেশী উৎসাহী হয়ে পড়েন। তোমাকে যদি দেড় ঘণ্টা সময় দেই তাহ'লে তুমি ভৈরবীর মধ্যে হয় ত নানা সৌন্দর্য্য দেখাতে পারবে। কিন্তু যদি তোমাকে বলি দশমিনিটের মধ্যে ভৈরবীর শুধু একটা facet বা বিশেষ আবেদন—ধর অনুরোধের কাছাকাছি একটা ভাব—ফুটিয়ে তোল দেখি; কিন্তু দেখো অনুরোধের আবেদনের মধ্যে যেন ভৈরবীর বৈরাগ্যের আবেদন এনো না। তখনই দেখ্‌বে ওস্তাদ প্রভু মহা বিপদে প'ড়ে যাবেন।

এটা হচ্ছে এক শ্রেণীর গানের বাণী। এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। কেন না কানাড়া গাইতে বললেই যে সব সময় গুণীকে কানাড়ার আপাদমস্তক বর্ণনা সুরু করতে হবে তার কোনও মানে নেই। একজন গুণী বল্‌তে পারেন আমি অমুক কানাড়া গানের মধ্য দিয়ে কানাড়ার উদাস ভাবটিই শুধু ফুটিয়ে তুলব। অবশ্য সে এই কথা বল্‌বামাত্র কানাড়াকে আরও সীমাবদ্ধ করল। কিন্তু বলেছিই ত, যে সীমাকে স্বীকার করা আর্টের ফুটে-ওঠার একটা প্রধান সর্ত্ত। কেউ যদি কানাড়ার এ বিশেষ রূপটি শুনে বলেন বেশ হ'ল কিন্তু আমার এতে তৃপ্তি হ'ল না আমি আরও চাই—তাহ'লে সেটা কিরকম হ'ল জান? ধর, গল্প বল্‌তে বল্‌তে আমি শেষ কর্‌লাম শেষে হতাশ রাজপুত্র যখন হতাশার চরম সীমায় পৌঁছেছেন তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তাঁর বাঞ্ছিতা রাজকন্যাকে দেখতে পেয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলেন। এতে কয়েকজন শ্রোতা মহা উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন: 'তারপরে কি হ'ল? তার পর বিয়ে হ'ল ত?' আমি তাহ'লে তাঁদের বল্‌তে পারি যে তার পরে কি হ'ল আমি বল্‌তে চাই না। কিন্তু এ কথায় তাঁরা খুসী হলেন না। যদি আমি এই রকম কথা ব'লে শেষ কর্‌তাম: 'তার পর পুরুত এল বাদ্যি বাজল দীপালোকিত কক্ষে রাজকুমার সোণার কাটি দিয়ে জিয়োনে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌লেন, তাহ'লে সেদিনকার গল্পে হয় ত পূর্ব্বোক্ত শ্রোতৃবৃন্দ হাঁফ ছেড়ে বল্‌তেন: "আঃ, বাঁচলাম, এই ত চাই। কিন্তু আপনার সেদিনকার গল্পটার মধ্যে এ সম্পূর্ণতার রস পাই নি।" গল্পের শ্রোতার এরকম আপত্তি যেমন ন্যায়সঙ্গত নয়, গানের শ্রোতার প্রতি গানেই তানালাপের অজস্রতা না-পাওয়ার দরুণ আপত্তি করাও তেমনি যুক্তিসঙ্গত নয়।

আমি তারপর আমার "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটির বাকী অংশটুকু প'ড়ে শোনালাম। * তাতে আমি একজায়গায় লিখেছিলাম এই কথা যে আমাদের উচ্চ-সঙ্গীতের বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ এ নয় যে ইংরাজরাজ মোগলরাজের মতন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন না বা সাধারণে উচ্চসঙ্গীতের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। তার কারণ এই যে আমাদের সঙ্গীত বর্ত্তমান সময়ে যুগধর্ম্ম মেনে চলে নি। অর্থাৎ এককথায় উচ্চ সঙ্গীত কখনই আর সে মামুলি ধারায় বিকাশ লাভ করতে পারে না। তাকে একটা নবজন্ম দিতেই হবে।

কবিবর বল্‌লেন: "তুমি কথাটা ঠিক্ বলেছ। কেবল এখনকার যুগধর্ম্ম বল্‌তে তুমি কি বোঝ সেটা যথেষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে দাওনি। আজকালকার যুগধর্ম্ম মানে হচ্ছে যেটা undifferentiated ছিল সেটা differentiated করা ব্যক্তিত্বের দানের সাহায্যে। ধর বিদ্যাসাগরী আমলে রামের রাজ্যাভিষেক ও সীতার বনবাসে মূলতঃ একই ঠাট বজায় ছিল। অর্থাৎ রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কর্‌তে হয়েছিল এই ধরণের একটা ভাষা। কিন্তু বঙ্কিমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ মামুলি শব্দের গর্জ্জনের ধারা লোপ পেল ও সে স্থলে এল, কি না, প্রতি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফলে একটা সাহিত্য গড়ে ওঠা। সে ধারা আজ আরও বিকাশ পেয়েছে। তাই শরৎবাবু বঙ্কিমেরই এই ধারা নিয়েছেন কিন্তু তিনি বঙ্কিমী ঠাট বজায় রাখেন নি; নিজের মতন লিখে গেছেন। এইরকম ক'রেই প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের এক একটা দিকের উপলব্ধি ফুটে ওঠে এবং যুগে যুগে এই সব নানাব্যক্তির আত্মপ্রকাশের সমষ্টির ধারার নামই যুগধর্ম্ম।" †

* বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য।

† হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের "Progress" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এই কথাটিই বিশদ করে বলেছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে বহুল দৃষ্টান্ত

আমি বল্‌লাম: "তাহ'লে tradition জিনিষটির মধ্যে কি কোনও সত্য নেই?"

কবিবর বল্‌লেন: "আছে বই কি? ব্যক্তিত্বের বিকাশকে সত্য ব'লে স্বীকার করার মানে কি tradition-এর ভিতরকার সত্যটিকে অস্বীকার করা? Tradition হচ্ছে আসলে মাটি। কিন্তু সে মাটি যখন জীবকে আবদ্ধ না ক'রে আশ্রয় স্বরূপ হ'য়ে ওঠে, তখনই তা বন্ধন না হয়ে সত্য হ'য়ে ওঠে।"

আমি বল্‌লাম: "তার মানে?"

কবিবর বল্‌লেন: "কেমন জান? যেমন নদী ও তার দুই তীর। তীরের কাজ কি? না, নদীর শক্তিকে সংহত ক'রে তাকে গতিশক্তি দেওয়া। এখানে তুমি বল্‌তে পার না যে নদীর দুই তীর তার অবাধ স্বাধীনতাকে ব্যাহত ক'রে একটা অসত্যতারই পরিপোষণ করছে। কারণ এই দুই তীরের জন্যই নদী—নদী। নইলে তা বদ্ধ জলাশয় হ'য়ে পড়'ত। সেই রকম, Tradition হচ্ছে প্রতি জাতির মধ্য দিয়ে গুটিকতক সত্যের প্রকাশের আশ্রয়। মানুষ তার সৃষ্টিলীলায় দেখেছে যে তার স্ফুরণের আনন্দ পাবার উপায়ের গুটিকতক বিধি ব্যবস্থা আছে। তার মনের প্রকৃতিই এ সব বিধি ব্যবস্থার সৃষ্টি ক'রেছে। তাই ঐ সব নিয়ম বা ধর্ম্মকে নৈমিত্তিক (accidental) বা সাময়িক বলা চলে না। বলা চলে না যে যেহেতু গৃহ আমাদের প্রকৃতি হ'তে বিচ্ছিন্ন করে সেহেতু গৃহ অসত্য, বন জঙ্গলই সত্য।"

আমি বল্‌লাম: "কিন্তু traditionএর অত্যাচার সম্পর্কে—"

কবিবর: "প্রতি জীবন্ত traditionএর মধ্যে যথেষ্ট elasticity থাকেই থাকে। তা যদি না থাকত তাহ'লে tradition নদীতীরের মতন নদীর গতিকে সহজ না ক'রে নদীর মোহানায় 'ব'দ্বীপের মতনই স্রোতরুদ্ধকর হ'য়ে দাঁড়াত। মানুষ এ সত্যটি অনেক সময়ে ভুলে গিয়ে traditionএর কঙ্কালকেই বড় ক'রে দেখে থাকে। অর্থাৎ traditionএর মধ্যে সত্য যেটুকু সেটুকুর সুবিধে না নিয়ে তার বন্ধনকেই একান্তভাবে স্বীকার ক'রে বসে। সেই সব সময়ে প্রতিভার অভ্যুদয় দরকার হ'য়ে পড়ে ও তিনি এসে traditionএর মধ্যে যা জড়তারই পরিপোষক তাকে ভেঙেচুরে দিয়ে জীবনীশক্তির স্রোত বহান—তাঁর সৃষ্টির গঙ্গোত্রী দিয়ে। কিন্তু অনেক traditionএর প্রাণশক্তিহীন জাড্যকে তিনি দূর ক'রে থাকেন ব'লেই বলা চলে না যে তিনি তাঁর নিত্য-নূতন সৃষ্টির দ্বারা মানুষের যুগসঞ্চারী traditionএর ভিতরকার গভীর সত্যটাও অস্বীকার ক'রে বসেন। কারণ tradition হচ্ছে বস্তুত মানুষের আনন্দ প্রেরণা পাবার ও নিজেকে প্রকাশ ক'রে তুলে ধরবার উপযোগী পরীক্ষিত নিয়মকানুন বা ধর্ম্মের সমষ্টি। তাই তাকে একদম অস্বীকার করলে যা সৃষ্টি হয় সেটা খাপছাড়াই হ'য়ে ওঠে, সত্য হয় না। বস্তুত: যিনি প্রকৃত কলাবিৎ তিনি বিধাতার কাছ থেকে সেই সহজ অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ অনুভূতির (intuition) আলোর বর নিয়েই আসেন যার আলোয় তিনি এক মুহূর্ত্তে দেখ্‌তে পান প্রতি traditionএর কতটুকু সত্য ও চিরন্তন ও কতটুকু নির্জীব ও সাময়িক।"

ব'লে একটু থেমে বল্‌তে লাগলেন: "এখন গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্‌। আমি গানের মধ্যে অনেক সময়ে কি চাই জান? আমি বলি বেশ, খাম্বাজের সমগ্র রূপটি আমার জানা আছে—সেটা ত তুমি আমাকে অনেক-বার শুনিয়েছ—এখন এসো আমাকে খাম্বাজের একটা বিশেষ রূপ দাও। অর্থাৎ খাম্বাজের traditionকে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু তবু খাম্বাজের মধ্যেই তার একটা নতুন বিকাশ কামনা করি। যদি একটি ছোট্ট গানেও আমি খাম্বাজের এ বিশেষ রসটি পূর্ণভাবে পাই তাহ'লে আমার মন একটা পরম খুসিতে ভ'রে উঠ্‌বে ও সে গানটি অনেকবার শুন্‌তেও ক্লান্তি বোধ করব না। কারণ সেটা একটা সত্য প্রকাশ হ'ল। আমি বলি হে গুণী তুমি তোমার মধ্য দিয়ে গানকে প্রকাশ কোরো না গানের মধ্য দিয়ে তোমাকেই প্রকাশ কর। তাহ'লেই তোমার গান সত্য হবে। কারণ এক প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের নানান্‌ দিক ও মুখ প্রকাশ ক'রে তুলে ধর্‌তে পারে তাহলেই

দিয়ে দেখিয়েছেন যে মানুষ সভ্যতার প্রতি বিকাশই সাক্ষ্য দেয় যে progressএর অর্থ differentiation বা change from the homogeneous to the heterogeneous. তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে একথা শুধু যে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে খাটে তাই নয় শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত মানসিক সৃষ্টি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

তার সমষ্টি জাতীয় শিল্পের ধারার একটা বৃহৎ রূপ দেখাতে পারে। একটু আগেই তুমি বল্‌ছিলে না যে আমাদের আজকের উচ্চসঙ্গীত আজকাল নিষ্প্রভ প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়েছে, যেজন্য শরৎ চাটুয্যে মহাশয় তোমার কাছে কোনও ওস্তাদের গান্ শুনতে যাবার আগে শঙ্কাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন যে তিনি গান আরম্ভ করলে থামেন কি না? এর কারণ কি জানো? কারণ এই যে আমাদের আজকের গাইয়েরা স্রষ্টা শিল্পী (creatirve artists) নন। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি যে তানসেন তাঁর দরবারী কানাড়ায় কানাড়ার যে একটা বিশেষ মূর্ত্তি দিতে পেরেছিলেন তাঁর বংশধরগণ সে রূপের Spiritটি ধরতে পারেন নি। তাই তাঁরা অভ্যাসবশে প্রতি রাগের ঠাট ও নিয়মকানুন জেনে ও তাকেই একান্তভাবে মেনে রাগটি বজায় রেখে অনন্তকাল ধ'রে গান গাওয়াকেই তাঁদের কৃতিত্বের চরম মানদণ্ড ব'লে মনে ক'রে বসেন। তাঁরা এটা করেন যে এটা শক্ত তা ব'লে নয়। তাঁরা এটা করেন শুধু এই জন্তে যে এটা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ এজন্য অভ্যাসের খাঁজে চল্‌লেই হয়, অপরিচিত পথের সন্ধান নেবার দরকার হয় না; এবং জানই ত অভ্যাস বশে কোনও কাজ কত সহজ হ'য়ে যায়। তাই অনন্তকাল সময় না নিয়েও প্রতি গানে রাগের একটা সমাহিত সৌন্দর্য্য বিকাশ করতে পারা ঢের কঠিন। সেটা পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা স্রষ্টা শিল্পী, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ অনুকারক মাত্র নন। স্রষ্টা শিল্পী সীমার মধ্যেই ভূমার মহিমা উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেন। অন্ধ অনুকারকেরা করতে পারে শুধু তাঁর ধাতকে নকল—তাঁর সে সহজ অনুভূতির তারা ধার ধারে না। কারণ একটা গানের ঠিক্ Spiritটি যে কি সেটা বুঝে সেই Spiritটি বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারা কল্পনা ও সত্য অন্তর্দ্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে—যে-রকম লোক আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে আশা করা আজ বিড়ম্বনা। এককথায় আজ তারা creative artist নয় ব'লেই আমাদের সঙ্গীত এখন চলৎশক্তিহীন হ'য়ে প'ড়েছে। দেখ না কেন গত কয়েক শতাব্দীতে আমাদের মধ্যে সঙ্গীতে নতুন কোনও বিকাশই হয় নি, এক ভজনে ছাড়া। ভজনে যে হ'য়েছিল তার কারণ সেটার উদ্ভব হ'য়েছিল ঠিক্ স্থান হ'তে।" ব'লে কবিবর নিজের হৃদয়ের দিকে নির্দ্দেশ কর্‌লেন।

আমি বল্‌লাম: "এ সম্বন্ধে আমার কেবল একটি মাত্র বল্‌বার কথা আছে যা নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ হ'য়েছে এবং সে আলোচনা প্রকাশিতও হ'য়েছে। * তাই সে-সব যুক্তির পুনরুত্থাপন আজ আর করবার ইচ্ছে নেই। কেবল আজ আপনারই একটি বিশেষ গান আপনাকে গেয়ে শুনিয়ে দেখ্‌তে চাই আপনি এখনও আপনার সেই পূর্ব্বমতটিই সত্য মনে করেন কি না। আমি এ গানটি গেয়ে শুনিয়ে আপনাকে সাধ্যমত এইটে দেখাবার প্রয়াস পাব যে প্রতি গানের individuality বজায় রাখবার একমাত্র পন্থা তার সুরের কাটামটিকে অনড় অচল ক'রে গাওয়া নয়, তার উপায় হচ্ছে—গুণী সে সুরটিকে যে ভাবে গ্রহণ করেন সেই ভাবেই নিজের মতন ক'রে তাকে প্রকাশ করা। বস্তুতঃ আপনার রচনাকে মানুষ কখনই ঠিক্ আপনার মতন গ্রহণ করতে পারে না। রোমাঁ রোলাঁ আমায় একটা চিঠিতে বড় সত্যি কথা লিখেছিলেন যে একজন কখনই অপরের চিন্তা বা আর্ট হুবহু ধরতে পারে না; তা থেকে সে নিজের যতটুকু আবশ্যক ততটুকু গ্রহণ করে—দরকার হ'লে সেটা সৃষ্টি করে নেয়—ও বাকিটুকু বর্জ্জন করে।" †

"যাক্, এখন গানটির প্রসঙ্গে আসা যাক্। গানটি হচ্ছে আপনার 'শেষবর্ষণের' 'হে ক্ষণিকের অতিথি'। শেষবর্ষণ অভিনয়ে গানটি যখন কোরাসে শুনেছিলাম তখন এক দিক্ দিয়ে যেমন সুরের রচনাভঙ্গীটি আমার ভাল লেগেছিল, অপর দিক্ দিয়ে তেম্‌নি আমাকে একটু নিরাশ হ'তেই হ'য়েছিল যে সে গাওয়ার ধরণে এ গানটিকে যথেষ্ট সঞ্জীবিত ক'রে তোলা হয় নি। তাই আমি নিজে গানটি একটু নিজের মতন ক'রে গেয়ে থাকি যে ভঙ্গী অনেক সঙ্গীতানুরাগীকেও আনন্দ দিয়ে থাকে, যদিও সম্ভবতঃ আপনার মতাবলম্বীদের কাটাছাঁটা ভাবে গাওয়ার ধরণই বেশি ভাল লাগ্‌বে। এ মতভেদের আশু মীমাংসা বোধ হয় সম্ভব নয়, এক সময়ের

---

* বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, সঙ্গীত শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† Je suis trop certain que personne ne comprend vraiment l'art et la pensee d'un autre. Il en prend ce qui lui convient, ce qu'il veut d'avance (au besoin meme il l'invente) et il laisse le reste. চিঠির তারিখ—৩১.৭.২২

বিচারেই তা হ'তে পারে। তাই আমি বলি এই কথা যে বেশ, আপনার হুবহু সুরটা আপনারা বজায় রাখুন, আমরাও আমাদের নিজেদের মতানুসারে গানটি নিজের মতন ক'রে গাইতে থাকি। আমার মনে হয় যে এ স্বাধীনতা আমাদের থাকা উচিত—যখন কেউই জোর ক'রে বল্‌তে পারে না যে আপনারাই ঠিক আমরাই ভ্রান্ত। অবশ্য আপনার-দেওয়া সুরের বদল সদল করতে যাবার বিপদ আছে একথা আমি মানি। কিন্তু একথার উত্তর আমি ইতিপূর্ব্বে দিয়েছি যে বিপদের সম্ভাবনা আছে ঐ যুক্তি-বলে কোনও আদর্শকে ছোট মনে করা চলে না। আমি মানি যে প্রতি রচনার interpretationএর একটা সীমা থাকেই থাকে যেটা লঙ্ঘন করলে তার রসের ব্যত্যয় ঘটে। কিন্তু মুস্কিল এই যে কোথায় যে এ সীমানা টান্‌তে হবে সেটা নির্ভর করতে পারে—এক গুণীর সহজ রসবোধের ক্ষমতার ও সূক্ষ্ম সৌষ্ঠবজ্ঞানের ওজনের ওপর—আপনার নির্দ্দেশ বা আপত্তির ওপর নয়।"

ব'লে আমি 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি নিজের মতন ক'রে গাইলাম—অবশ্য কবিবরের সুরের কাঠামটি বজায় রেখে। গানটি শেষ হ'লে বল্‌লাম: "এখন আমি আপনার অকপট মত চাই গানটির রসের এতে হানি হ'ল কি না। নিন্দা করলে আমি ব্যথা পাব মনে করবেন না, কেন না আপনার সুরের ওপর হস্তক্ষেপ করা যে আপনার ভাল লাগবে না এটা আর যাই হোক্ না কেন অস্বাভাবিক যে নয় এটা নিশ্চিত। তাই আপনার অনুমোদন না পেলে আমি আপনাকে দোষ দেব না বা মর্ম্মাহতও বোধ করব না। কেবল আজ আমি জান্‌তে চাই এই কথাটি যে আমার ও অনেক সঙ্গীতানুরাগীর কানে যখন এ-ভাবে গাওয়া আপনার ঢঙে গাওয়ার চেয়ে বেশি ভাল লাগে তখন কেমন ক'রে আপনিই বা জোর ক'রে বল্‌তে পারেন যে গায়ককে তা সত্ত্বেও তার সত্য অনুভূতির কণ্ঠরোধ ক'রে হুবহু আপনার সুরের পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হবে?" *

কবিবর বল্‌লেন: "ঠিক্ তা আমি কখনও বলি না। প্রতি গানের সুরভঙ্গীর মধ্যে একটা elasticity আছে এ কথা কোন্ কলাবিৎ না জানেন? তোমার মুখে আমার এ গানটি আমার আজ সত্যিই খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু সেটা এই জন্যে যে তুমি আমার সুরভঙ্গীর সেই elasticity-টুকুর সীমাটি লঙ্ঘন কর নি। অবশ্য কোথায় ও কেমন ক'রে যে সীমা লঙ্ঘন করা হয় তা আগে থেকে বলা যায় না মানি। কিন্তু প্রতি গান শোন্‌বামাত্র বোঝা যায় সে গানে সীমাটি লঙ্ঘন করা হ'ল কি না। ঢাকায় এবার আমি এক জমিদারের স্ত্রীর মুখে আমারই দু একটি গান হিন্দুস্থানী ঢঙে গাইতে শুন্‌লাম যা আমার ভারি চমৎকার লাগ্‌ল। কই, সে ক্ষেত্রে আমি ত জোর ক'রে বলিনি যে না, তাকে গানগুলি হুবহু আমার ঢঙেই গাইতে হবে? আমি অন্যায় আবদার করব‌ই বা কেন?

আমি বল্‌লাম: এ ভরসা আপনার কাছ থেকে পেয়ে একটু আশ্বস্ত হ'লাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে এ আংশিক নিষ্পত্তির নজীর যে আপনার সুরের মাছিমারা অনুকরণ-পন্থীদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে এতটা আশা করার দুঃসাহস আর যারই থাকুক না কেন আমার যে নেই এটা নিশ্চিত।

অবশ্য মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু—মাফ করবেন—এঁরা আমাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবার জন্যে যে-সব যুক্তির সাহায্য নেন সে-সব খুব সুযুক্তি ব'লে বোধ হয় না। এঁরা বলেন যে যেহেতু সুরটি আপনার দেওয়া সে-হেতু অপরের তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই থাকতে পারে না। এ কথাটা আমার নিতান্তই arbitrary মনে হয়, অথচ তাঁরা একে এতই স্বতঃসিদ্ধ গোছের মনে ক'রে থাকেন যে তাঁদের বল্‌তে ইচ্ছে হয় যে মানুষের অভিজ্ঞতা বহুবার ঠেকে শিখেছে যে আজ কোনও-কিছু স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মনে হচ্ছে ব'লেই বলা চলে না যে বস্তুতঃ সেটা সত্য। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন থিওরির উত্থান্ পতনের ইতিহাস যাঁরা একটু ভেবে দেখেছেন তাঁরা একথা জানেন।

* রোমাঁ রোলাঁ পূর্ব্বোক্ত পত্রে আর একস্থলে বড় সুন্দর লিখেছিলেন: "ললিতকলার মানে এ নয় যে স্রষ্টা তাঁর নিজের ভাবরস হুবহু অপরকে গলাধঃকরণ করিয়ে দেবেন। স্রষ্টা সৃষ্টি করেন—বপন করার জন্যে। সব সৃষ্টিই যেন একটা প্রসবের কাজ; প্রকৃতি আগে থেকে জানতে পারে না কি রকম সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সে যায় শুধু জীবনের বীজ ছড়িয়ে।" (On n'ecrit pas une œuvre. d'art, On ne cree pas pour imposer sa penseə On_creep oural semer !)

অনেক ধ্রুব scientific axiom ও Euclidian postulatesও আজ ধ্বংসে পড়ছে। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশী আক্ষেপজনক সেটা হচ্ছে এই যে তাঁরা ভুল উপমা প্রয়োগ দ্বারা এ রকম একটা অপরীক্ষিত axiomকে চিরন্তন সত্য ব'লে প্রমাণ করবার প্রাণপণ প্রয়াস পেয়ে থাকেন। সাধারণ লোক এ রকম পন্থা অবলম্বন করলে অবশ্য তাতে ক্ষুব্ধ হবার বিশেষ কারণ থাকত না। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'তে হয় যখন অবনীন্দ্রনাথের মতন লোকও এ রকম স্বচ্ছ ভুল উপমা দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণ করতে যান। তিনি একদিন অম্লানবদনে আমাকে এমন কথাও বলেছিলেন যে আপনার গান যদি কোনও গায়ক ইচ্ছামতন বদ্‌লে সদ্‌লে গাইবার অধিকার দাবী ক'রে বসেন তাহ'লে ত যে-কোনও অসন্তুষ্ট লোক তাঁর ছবির আঙুল ছোট ক'রে নেবারও অধিকার দাবী ক'রে বসতে পারে? আমি উত্তরে বলতে চাই যে এরূপ উপমা দিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করতে যাওয়ার মতন বিড়ম্বনা জগতে কমই আছে। যেখানে মূল বক্তব্যটি স্বীকৃত কেবল সেখানেই উপমার সার্থকতা, কেননা সেখানে উপমা বক্তব্যটিকে স্ফুটতর ক'রে তোল্‌বার সহায়তা ক'রে থাকে। কিন্তু যেখানে গোড়ায়ই মতান্তর সেখানে উপমা কোনোমতেই যুক্তির স্থান অধিকার ক'রে বসতে পারে না। সুতরাং আমি বলতে চাই যে সাহিত্য বা চিত্রকলার উপমা এখানে অবান্তর। আসল কথা স্রষ্টার সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন interpretationএর স্বাধীনতা থাকা সমর্থনীয় ও বাঞ্ছনীয় কি না।"

কবিবর বল্‌লেন: "এ স্বাধীনতা আমি কখনও অস্বীকার করি না। হ্যামলেটের আজ একশ' এক রকমের interpretationএর চলতি হ'য়েছে। কিন্তু কে বলতে পারে এটা সুষ্ঠু নয়? আর সুষ্ঠু নয় বললেই বা কোন্ interpretationটি যে সত্য তা কে নির্দ্দেশ ক'রে দেবে? আমি কেবল বলতে চাই—যে প্রতি গানের বিশেষ রূপটি সম্বন্ধে একটু আন্তরিকভাবে ভাবো, ও এক শ্রেণীর সঙ্গীতের আদর্শ অন্য শ্রেণীর সঙ্গীতের স্কন্ধে চাপিয়ো না। অবশ্য ভাবলেই যে প্রতি গায়ক এটা ধরতে পারবেন তা বলা যায় না। তবে এ সমস্যার অন্য কোনও সমাধানও যখন দেখা যাচ্ছে না তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ত গুণীকে কমবেশি স্বাধীনতা দিতেই হবে—বিশেষতঃ যখন ললিতকলার মধ্যে সঙ্গীত এ বিষয়ে একটু বেশি রকম অসহায়। কেমন জান? ধর কাব্য বা চিত্র বা ভাস্কর্য্য। এদের স্থিরত্বকে স্থায়ী করা যায়। কিন্তু সঙ্গীত ত তা নয়। তাকে যে প্রতি মুহূর্ত্তে নির্ভর করতে হয়, গুণীর গুণপনার উপর। তাই সঙ্গীতকারের স্বরচিত গানকে গায়কের হাতে সঁপে দেওয়া যেন মেয়েকে জামাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে বলার মতন যে 'বাপু হে আমার এ আদরের ধনটিকে আমিই জন্ম দিয়েছি বটে কিন্তু এখন থেকে এর ভার একেবারে তোমার—একে সুখে রাখ সুখে থাকবে, দুঃখ দাও দুঃখ পাবে'।"

কবিতা ও কুসুম

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

কুসুমে যেমন তুমি পরিপূর্ণ, রস ঢল-ঢল
প্রস্ফুট লাবণ্যভার অর্পিয়াছ একটি নিমেষে;
পল্লবে যেমন তুমি চিরদিন পেলব, বিমল
শ্যামল সস্নেহ বাণী দিয়ে গেছ সুমধুর হেসে;
তেমনি কোমলস্পর্শে সঞ্জীবনী সুধা দাও ঢালি'
মধুর কবিতা প্রাণে; ভরি' দাও নব অর্ঘ্য ডালি।
অশোক-অমৃত-মন্ত্রে পরিশুদ্ধে প্রাণদান দিয়া
সযত্নে কটাক্ষে তোলো ভাবময়ী কবিতার হিয়া।

হে চিরসুন্দর, কবি, ক্রান্তপ্রজ্ঞ, সৃজন-বিধাতা!
কুসুমে যেমন তুমি দিলে প্রাণ, দৃশ্যরূপরাশি
ভাষার তেমনি আজি হও তুমি নবপ্রাণদাতা;
বিচ্ছুরিত বিভাজালে বিভাসিয়া তোলো তার হাসি
কুসুমে যেমন দিলে নব বর্ণ, নব মধুধারা;—
কবিতায় দাও প্রেম, নব রূপ, বাধা-বন্ধ-হারা।
কবিতা-কুসুমে হো'ক ধীরে ধীরে প্রাণ-বিনিময়
তুমি যে বাঁধিবে জানি, তারি মাঝে অমর আলয়।
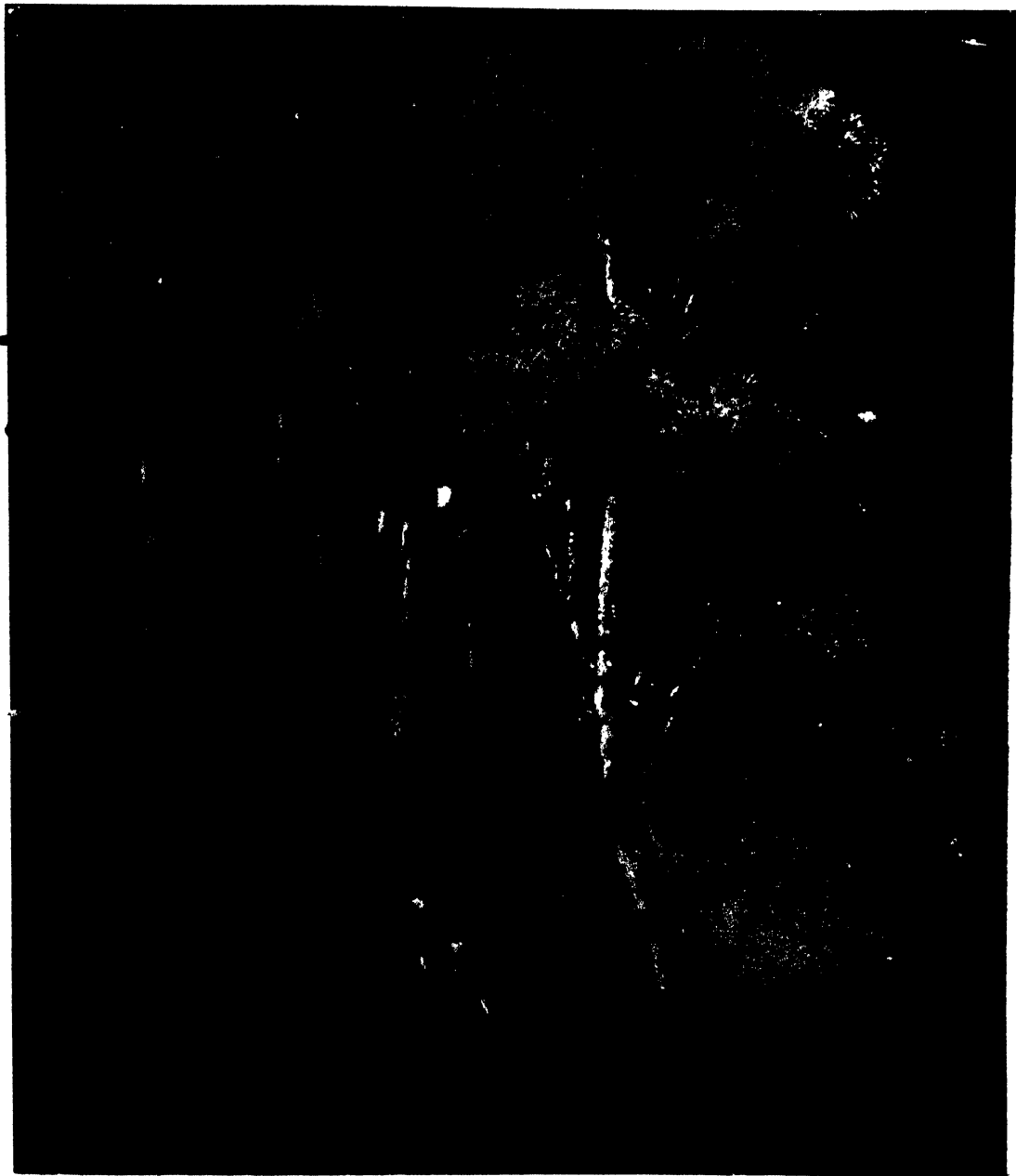
বসন্তের সজ্জা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুর

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। মালয়ী ভাষায় ইহাকে 'তিরুবিতাম্কুর' বলা হয়। কুমারিকা অন্তরীপকে শৃঙ্গ ধরিয়া ইহাকে একটী বিষমবাহু ত্রিভুজ বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে কোচিন্‌রাজ্য ও বৃটিশ কোয়াটোর জেলা; পূর্ব্বে—বৃটিশ মাদুরা ও তিন্নিবিল্লী জেলা; দক্ষিণ এবং পশ্চিমে—ভারতমহাসাগর। উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য—১৭৪ মাইল; পূর্ব্বপশ্চিমে প্রস্থ—৭৫ মাইল; ক্ষেত্রফল—৭,৬২৫ বর্গমাইল। অর্দ্ধেকেরও বেশী জায়গা পাহাড় পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেগুন্, আব্লুশ, কাঁঠাল ও অন্যান্য বিবিধ বাহাদুরী কাষ্ঠ এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসী আমার জনৈক বন্ধু এক দিন বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বাংলাদেশের অপেক্ষা তথাকার ফলগুলি আকারে অনেক বড় হয়। এক একটী কাঁঠাল দুইজন লোকের কমে তোলা যায় না। হস্তী, ব্যাঘ্র বৃষ, চিতাবাঘ প্রভৃতি বন্য জন্তু যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত গরম খুব বেশী। ভাত, মাছ, আটা প্রভৃতি অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

প্রাচীন ইতিহাস মাত্রই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে। তবে, ইহা সুনিশ্চিত যে, ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-পরিবার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চেরবংশ-সম্ভূত। মিঃ স্মাথ ত্রিবাঙ্কুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The Kerala or Chera kingdom included the Malabar District with the modern Cochin and Travancore States, and sometimes extended eastwards." P. 144

"The Chera or Kerala territory consisted in the main of the rugged region of the Western Ghats to the South of the Chandragiri river, which falls in the sea not far from Mangalore, and forms the boundary between the peoples who severally speak Tulu and Malayalam." P. 206.

Little is known about the details of the mediaeval history of the Chera kingdom, which was subject to the more powerful members of the Chola dynasty. The conquest was the first military operation on a large scale undertaken in the reign of Rajaraja Chola, about A. D. 990 The kingdom ordinarily included greater part of the modern Travancore State. Village assemblies exercise extensive powers, as in the Chola territory. The Kollam or Malabar era of A. D. 824-5, as commonly used in inscriptions seems to mark the date of the foundation of Kollam or Quilon." P. 215.

The immediate cause of the (Carnatic) war was Tippoo's attack on Travancore, a state in alliance with and under the protection of the Company. On December 29, 1789 he assailed the 'lines of Travancore,' a rampart covering thirty miles of the northern frontier of the state, and suffered a repulse owing to a sudden panic among his troops. P 559.

The strangest event during Lord Minto's term of office was the mad rebellion in Travancore organized by the Diwan or minister, Velu Tampi. The country had

been shockingly misgoverned, and constant disputes had existed between the minister and the Resident concerning the administration and the arrears of payment for the subsidiary force. In December 1808 the minister, who felt much aggrieved at certain measures taken by the Resident, made a furious attack on the House of that officer, who barely escaped with his life. Velu Tampi then issued a violent proclamation calling on the inhabitants to defend caste and the Hindu religion, which elicited an eager response from the Nayars. 'The whole country rose like one man. Their religious susceptibilities were touched, which in a conservative country like Travancore is like smoking in a powder magazine'. An officer and about thirty European soldiers of H. M. 12th Regiment were foully murdered, an incident which induced Thornton to echo an opinion that in turpitude and moral degradation the people of the State transcend every nation upon the face of the earth. That severe judgment is not justified by the later history of the State, which is now, and has been for many years, exceptionally well administered. The rebellion, of course, never had any chance of success and was soon suppressed. The minister committed suicide and his brother who deservedly hanged for his active share in the murder of the soldiers." (History of India by Mr. Smith.) P. 615.

সারমর্ম্ম—কেরল বা চের রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার জেলা ও কোচিন রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাষা সাধারণতঃ তুলু ও মালয়ালাম ছিল। ৯৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা-রাজ চোল বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুরের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়তদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও কার্য্যদক্ষতা দেখা যাইত। 'কোল্লম্' বা মালাবার অব্দ হইতে 'কুইলন' নামক স্থানের উৎপত্তির তারিখ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতানের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে যুদ্ধ হয়, তাহার অব্যবহিত কারণ টিপুর ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ। তখন হইতেই ত্রিবাঙ্কুর বৃটিশগবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ্য। ১৮০৮-৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর সময়ে ত্রিবাঙ্কুরে ভীষণ বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ইংরাজ প্রতিনিধি এবং দেশী শাসনকর্ত্তার মধ্যে নানা কারণেই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তত্রত্য সৈন্যবাহিনীর খরচ যোগাইতে জন-সাধারণ অসম্মত হইল। দেওয়ান বেলু তাম্পীর অধীনে সুসংবদ্ধ হইয়া তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। প্রথম অবস্থায় তাহারা জয়লাভই করিয়াছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। কোম্পানীর পশুশক্তির নিকট পরাজিত হইল। বেলু তাম্পী আত্মহত্যা করিল এবং তাহার ভাই ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিল।

মহারাজা মার্ত্তণ্ডবর্ম্মা (১৮২৯—৫৮ খৃঃ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনিই বর্ত্তমান ত্রিবাঙ্কুরের স্থাপয়িতা। রাজধানী ত্রিবান্দ্রামের কয়েক মাইল উত্তরে আঞ্জিঙ্গো নামক স্থানে ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তথায় একটী কারখানা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্ণাটক ও মহীশূর যুদ্ধে ত্রিবাঙ্কুর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সময় ত্রিবাঙ্কুরের নামও যুক্ত ছিল। টিপুসুলতানকে বাধা দিবার জন্য ১৭৮৮ খৃঃ ত্রিবাঙ্কুর ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে একটী সাধারণ চুক্তিপত্র হয়। কিন্তু পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে যথা-যথভাবে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সেই সন্ধির সর্ত্তমতে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ত্রিবাঙ্কুরকে রক্ষা করিতে কোম্পানী প্রতিশ্রুতি দেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা নজরানা ত্রিবাঙ্কুর সরকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিয়া থাকেন।

(Report on the Administration of Travancore, 1924—25.)

মহামান্য 'শ্রীপদ্মনাভ দাস ভাঞ্চিপাল রামবর্ম্মা কুলশেখর কীরিতপতি মান্নী সুলতান মহারাজা রাজারাম রাজা বাহাদুর সমসেরজাঙ্ ত্রিবাঙ্কুর মহারাজ ১৯১২ খৃঃ ৭ই নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে তারিখে তিনি 'মসনদ' প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত মহামান্যা 'শ্রীপদ্মনাভসেবিনী ভাঞ্চিধর্ম্মবর্দ্ধিনী রাজরাজেশ্বরী' মহারাণী সেথু লক্ষ্মীবাই প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। মহারাজার অভিনন্দনের জন্য ১৯টী তোপধ্বনির ব্যবস্থা আছে। মালাবার প্রদেশের রীতি অনুসারে ত্রিবাঙ্কুর রাজ-পরিবারে মাতৃসূত্রেই জাতাধিকার জন্মিয়া থাকে। Marumakkathayam Law অনুসারে রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয়।

রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা

মহারাণীর নামে এবং শাসনাধীনেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রধান মন্ত্রীকে 'দেওয়ান' বলা হয়। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য বৃটিশ ভারতের আদর্শানুযায়ী পৃথক পৃথক বিভাগ গঠিত হইয়াছে। আইনের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন এবং নূতন আইন তৈরীর জন্য একটী আইন-পরিষৎ আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উহার সৃষ্টি হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পরিষদের একটু সংস্কার করা হইয়াছে। নূতন নিয়মানুসারে পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যা—৫০ জন; তন্মধ্যে ২৮ জন জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত, ও ২২জন সরকারের দ্বারা মনোনীত। শেষোক্ত ২২জনের মধ্যেও মাত্র ১৫ জন সরকারী কর্ম্মচারী থাকিতে পারেন। দেওয়ানই পরিষদের সভাপতি। দেওয়ানের অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সরকারী বা বেসরকারী যে কোন যোগ্য ব্যক্তি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন। বাৎসরিক আয়ব্যয়ের খসড়ায় মতামত প্রকাশ করিবার এবং প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার সভ্যদের আছে। নির্ব্বাচিত ২৮ জনের মধ্যে ১ জন ত্রিবান্দ্রামের নগরপালদের সভা (Municipality) হইতে, ২২ জন—৩০টী তালুক ও বাকি ১৮টী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে, ১ জন জমিদার পক্ষ হইতে, ১ জন পেনসন প্রাপ্ত সৈন্যদের মধ্য হইতে, ১ জন—কৃষক সম্প্রদায় হইতে ও অবশিষ্ট ২জন—ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। যাঁহাদের ভূমির খাজনা বাৎসরিক ৫৲ টাকার নীচে নয়, মিউনিসিপালিটীর এলাকাধীন যাঁহাদের জমির কর ৩৲ টাকার কম নয় (ত্রিবান্দ্রামসহরে ১৲), যে সব ব্যবসায়ীর আয়ের উপরে মাশুল (Income tax) দিতে হয়, যেসব 'গ্র্যাজুয়েট' সরকারের অনুমোদিত কলেজ হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন, নায়ার সৈন্যবাহিনীর যে কোন অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা মহারাজার নৌবল বা স্থলবলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি ত্রিবান্দ্রামে অবস্থান কালে—সভ্যপদ প্রার্থীদের নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন। ২১ বৎসরের কম বয়স্ক বা বিকৃত-মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি ভোট দিতে পারিবে না। নির্ব্বাচনে এবং সভ্যপদে স্ত্রীপুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার।

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একটী রাষ্ট্রীয় পরিষদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভিতর দিয়া এক দিকে যেমন সাধারণ প্রজারা তাঁহাদের অভাব অভিযোগ নিজেই সরকারের নিকট নিবেদন করিতে পারে, তেমনি, অপর দিকে সরকারও জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব জানিবার ও যুক্তি-পরামর্শ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই সভার নাম—'শ্রীমূলম পপুলার এ্যাসেম্বলী।' ইহার মোট সভ্য সংখ্যা ৪০০। প্রথম বৎসর সভ্যগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন—কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর হইতে নিম্নলিখিতরূপে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।—

যাঁহার ভূমির খাজনা বাৎসরিক ৫৲ টাকার অন্যূন, যাঁহার বাৎসরিক আয় ২০০০৲ টাকার কম নহে, এবং যে সব 'গ্র্যাজুয়েট' অন্ততঃ ১০ বৎসর কাল নিজ তালুকে বাস করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—কেবলমাত্র তাঁহারাই উক্ত পরিষদের সভ্যপদপ্রার্থীদিগকে ভোট দিতে পারেন।

শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটী ৩০টী তালুকে বিভক্ত হইয়াছে। কোন কোন বিশেষ তালুকের অধিবাসী-দিগকে একাধিক সভ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ৩০টী তালুক হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে

তহসীলদারের (তালুকের প্রধান শাসনকর্ত্তা) তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাচনকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাকি সভ্যগণের মধ্যে ১৯টি মিউনিসিপালিটী হইতে ১৯ জন, কৃষক-সম্প্রদায় হইতে ৪ জন, ব্যবসায়ী-সমিতি হইতে ৭জন, ও জমিদার-পক্ষ হইতে ৪ জন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। অবশিষ্ট ২৩ জন মাত্র সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। সভাতে যে-কোন দুইটী বিষয় উত্থাপনের জন্য প্রত্যেক সভ্যকেই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে, বৎসরে একবার মাত্র (সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে) উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবার পরই সভ্যগণ স্ব স্ব প্রস্তাব ও প্রশ্নাদি স্থানীয় পেশকারের মারফতে দেওয়ানের নিকট প্রেরণ করেন। যথাসময়ে দেওয়ান সভা আহ্বান করেন। দেওয়ানের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে যথারীতি সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভ্যগণ স্ব স্ব বিজ্ঞাপিত বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও প্রশ্নাদি করিয়া থাকেন; এবং দেওয়ানই সরকারের পক্ষ হইতে এ সবের উত্তর দিয়া থাকেন।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য রাজ্যটীকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দেবীকুলম্, বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে 'কমিশনার' বলা হয়। এ ছাড়া অন্য তিনটী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে দেওয়ান-পেশকার বলা হয়। ইঁহারা সকলেই নিজের নিজের এলাকায় ভূমি-রাজস্ব ও আয়-কর বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহারা প্রত্যেকেই বৃটিশ-ভারতের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সমান ক্ষমতাপন্ন। প্রত্যেক বিভাগই কতিপয় তালুকে বিভক্ত এবং প্রতি তালুকের অন্তর্ভুক্ত অনেক 'পকুথি' বা 'পঞ্চায়েত' আছে। পকুথির প্রধান 'কর্ম্মচারীকে 'প্রোবের্থিকর' বলা হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩২টী পকুথি আছে।

লোকসংখ্যা ও সাধারণ লক্ষণ

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে ত্রিবাঙ্কুরের লোকসংখ্যা ৪০,০৬,০৬২ (পুঃ ২০,৩২,৫৫৩; স্ত্রীঃ ১৯,৭৩, ৫০৯)। লোকসংখ্যা ১৯১১ সালের অপেক্ষা শতকরা ১৬·৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মই প্রধান।

গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুর ভ্রমণকালে মহাত্মা গান্ধী জাতিহিসাবে লোকসংখ্যার যে তালিকা দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

জাতি	সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	৬০,০০০
অন্যান্য উচ্চজাতির হিন্দু	৭,৮৫,০০০
অস্পৃশ্য হিন্দু	১৭,০০,০০০
খৃষ্টিয়ান	১১,৭২,৯৩৪
মুসলমান	২,৭০,৪৭৩
এ্যানিমিস্ট	১২,৬৩৭
অন্যান্য ধর্ম্মের লোক	৩৪৯
মোট	৪০,০১,৩৯৩ জন

গত দশ বৎসরে শতকরা হিন্দু ১১·৭, মুসলমান ১৯·৪, এবং খৃষ্টান ২৯·৮ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে শিক্ষায় ত্রিবাঙ্কুরবাসীরা নিম্নলিখিত রূপ অগ্রসর হইয়াছে——

পাঁচ বৎসরের শিশুদিগকে বাদ দিয়া হাজার করা ———

	১৯১১		১৯২১	
	সাঃ শিক্ষায়,	ইংরাজী শিক্ষায়	সাঃ শিক্ষায়,	ইং শিক্ষায়
ব্যক্তি	১৫০	৮	২৪১	১৩
পুরুষ	২৪৮	১৩	৩৩০	২১
স্ত্রী	৫০	২	১৫০	৫

বাৎসরিক আয় ব্যয়ের সাধারণ হিসাব নিকাশ

ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত টি রাঘবিয়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে পর্য্যন্ত রাজকার্য্য সুপরিচালিত করিয়াছিলেন এবং ২৩শে জুন হইতে বর্ত্তমান দেওয়ান মিঃ এম্, ই, ওয়াটস্ মহারাণী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের সরকারী বিবরণ অনুসারে ত্রিবাঙ্কুরের মোট আয়—২৮৫,৪২,১২৬ টাকা; মোট ব্যয়—২০১,২২,৫৫৩ টাকা; ফাজিল—৮৪,১৯,৫৭৩ টাকা। আলোচ্য বর্ষের ফাজিল টাকা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ফাজিল টাকা ও এবারের অতিরিক্ত ব্যয় (কুইলন-ত্রিবান্দ্রাম রেললাইন নির্ম্মাণের জন্য ৪,৩৯০ টাকা এবং কোচিন পোতাশ্রয় নির্ম্মাণের জন্য ৭৮,০৩৪ টাকা) মোট ৭৫৫৬৯৭৫ টাকা বাদ দিলে দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা

৮,৬২,৫৯৮ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের বাৎসরিক আয় ও ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আয়-ব্যয় সমভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে সরকারের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্যই আয় বৃদ্ধি করা হইতেছে না। অতিরিক্ত আয়টা দেশের ও দশের কাজেই ব্যয় হইতেছে। আয় বৃদ্ধির মোটামুটি কতকগুলি কারণ নিম্নে দেওয়া গেল। ব্যয়ের তালিকায়ও দেখা যায় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মত কেবলমাত্র সৈন্য ও পুলিশ বিভাগের জন্য সমগ্র আয়ের বেশী-অর্দ্ধেক টাকা ব্যয় করা হয় নাই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগেও টাকার

৩। বনবিভাগে মোট ৭৩, ৯৪৩ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ সেগুন কাষ্ঠের রপ্তানী খুব বেশী হইয়াছে।

৪। ডাক বিভাগের আয় বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চিঠি পত্রের ব্যবহার অধিক হইয়াছে এবং মামলা মোকদ্দমাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৫। কলেজে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্র-বেতন বাবৎ শিক্ষাবিভাগের আয় সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী বিভাগে আবার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে—
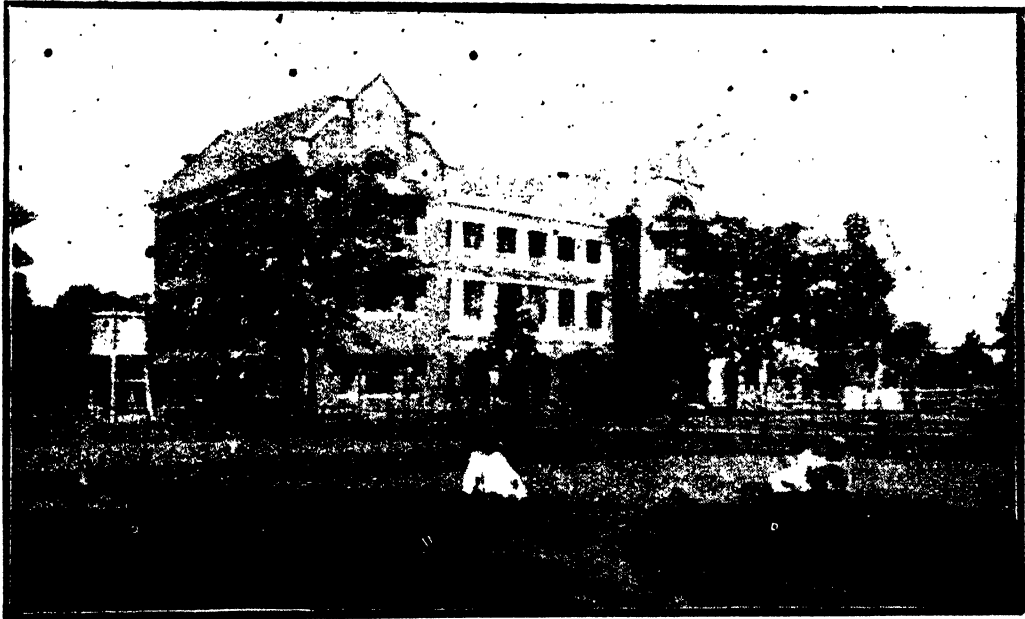
মডেল স্কুল ও ট্রেনিং কলেজ—ত্রিবাঙ্কুর

কৃপণতা করা হয় নাই এবং এ সব জনহিতকর ব্যাপারে নূতন ট্যাক্স বসাইবারও প্রস্তাব করা হয় নাই।

১। আয়কর বিভাগে মোট ২,৪৩,৯৭৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার মোটামুটি কারণ এই যে বন্দোবস্ত ভাল থাকায় প্রায় সমুদায় টাকাই আদায় হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে অনেক বাকী থাকিত।

২। আবগারী দোকানের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও মোট আয় ৩,১০,৬৮৮ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত দোকানগুলি অত্যন্ত উচ্চহারে নীলাম-বিক্রী হইয়াছে।

১। লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়াতে লবণবিভাগে মোট ৬,৫৩,০০৭ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্যয় ৮,৩০৭ বাড়িয়াছে।

২। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও পূর্ত্তবিভাগে যথাক্রমে ৬৬,৮১১ টাকা, ১,৯৬,৫২৬ টাকা, ৩,৩৯,৩৩৯ টাকা ও ১১,৩৪০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন যে আমরা বৃটিশ ভারতে যে সব ব্যয় কমাইতে বা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছি, ত্রিবাঙ্কুরে কার্য্যতঃ তাহাই হইতেছে। শুধু আবগারী বিভাগটীর অসামঞ্জস্য আছে। এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ে ত্রিবাঙ্কুরের আয়

বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের অতিরিক্ত ব্যয়টী নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করা হইয়াছে—

	টাকা
(১) কলেজ	৬২,০৭৬
(২) ইংরাজী স্কুল	৪১,৬৩৮
(৩) দেশী ভাষার স্কুল	৩৬,২৩৫
(৪) বিবিধ	৫৫,৪৮৭

কলেজের শিক্ষায় বেশী ব্যয় হইবার প্রধান কারণ এই যে, মহারাজার কলেজকে বিজ্ঞান ও কলা দুই পৃথক শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরে যত লবণ দরকার হয়, তার অধিকাংশই দেশী কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং বাকী অংশ তিন্নিবেল্লী ও বোম্বাই হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

কৃষি-প্রধান ভারতবর্ষে ভূসম্পত্তির যথাসম্ভব পরিষ্কার আইন থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক ধনী ব্যক্তি সুযোগ পাইলেই জমি ক্রয় করিয়া থাকেন; কারণ ভূসম্পত্তি সহজে নষ্ট হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুরে জঙ্গল পরিপূর্ণ অনেক পতিত জমি আছে। বৎসরের পর বৎসর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনেক স্থান চাষ আবাদের উপযুক্ত করা হইতেছে। সুবিধাজনক মনে করিলে কৃষকেরা তথায় বসবাসও করিতে পারে। এইরূপ বন জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান সরকার অতি অল্পমূল্যে প্রজার নিকট বিক্রয়ও করিয়া থাকেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অধিকাংশ বেসরকারী সভ্যের মতানুসারে একটী নূতন আইন তৈরী করা হইয়াছে ইহাতে পতিত জমির কতকাংশ গরীব দুঃখীর ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; কতকাংশ, যুদ্ধে আহত হইয়া যে সব সৈন্য অকর্ম্মণ্য হয়, তাহাদের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং অবশিষ্টাংশ সরকারের খাসে রাখা হইয়াছে।

উপনিবেশ স্থাপন বিধির ৬নং সর্ত্ত অনুসারে সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে মোট ১৪টী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেওয়ান-পেশকার বা কমিশনার স্ব স্ব বিভাগের অধীন সমিতিগুলির সভাপতি এবং কৃষি ও মৎস্য-বিভাগের তত্ত্বাবধায়কগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিরা এবং বন-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ঐ সমিতি গুলির সরকারী সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

দরিদ্র জনসাধারণের উপকারার্থ নূতন আইন দ্বারা সান্ধ্য বাজারগুলির শুল্ক রহিত করা হইয়াছে। যে সব বাজার ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট ইজারা ছিল, কেবলমাত্র তাহাতেই বর্ত্তমানে শুল্ক আদায় করা হয়। বৎসরকাল মধ্যে পূর্ব্ব ইজারার ম্যাদ শেষ হইলে, নূতন ইজারা আর দেওয়া হইবে না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনে ত্রিবাঙ্কুরের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ বন্যা হইয়াছে বলিয়া কেহ বলিতে পারে না। বন্যায় প্রপীড়িত প্রজাদের সাহায্যার্থ এবং রেললাইন ও রাস্তাঘাট মেরামত করিবার জন্য সরকার হইতেও প্রতি বৎসর যথেষ্ট টাকা ব্যয় করা হইতেছে।

কৃষি-বিভাগ

কৃষি-বিভাগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পরীক্ষা খুব জোরে চলিতেছে। কৃষির উপযোগী মাটী, সার এবং ধান্য অনেক আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে নারিকেল, তাল প্রভৃতির সারোদ্ধার করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। উদ্ভিদের বিবিধ মারাত্মক ব্যাধি ও শত্রু নিবারণের জন্য গভীর গবেষণার পর অনেকটা কৃতকার্য্যতা দেখা যাইতেছে। কোন কোন গাছে দদ্রুর মত এক প্রকার চর্ম্মরোগ দেখা যায়। চাষ করিবার সময় মাটী বেশ করিয়া পোড়াইয়া তার পর পরীক্ষিত সার প্রভৃতি দেওয়া হইলে এ রোগের ভয় থাকে না। ফুলের কুঁড়িতে অনেক রোগ জন্মিতে দেখা যায়। ফ্রান্স দেশীয় 'বোর্দ্দো' মিশ্র রঞ্জন বা ধুনার সহিত মিশাইয়া বৃক্ষাদির উপর ছিটাইয়া দিলে এ রোগ আর বিস্তার লাভ করিতে পারে না। কোন কোন বৃক্ষের গোড়া হইতে অনবরত রস নির্গত হয়। ঐ ব্যাধিগ্রস্ত স্থান কাটিয়া তাহাতে গরম আল্‌কাত্‌রা লাগাইয়া দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। বহুবিধ উদ্ভিদের তন্তু হইতে দড়ি, সূতা, ব্রাস্ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে।

ধান্য, নারিকেল, লঙ্কা, এবং বিবিধ প্রকার তুলা ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উৎকৃষ্ট বীজ, সার এবং যন্ত্রাদি যাহাতে কৃষকেরা সহজে পাইতে পারে, তজ্জন্য সরকার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট গরু সরবরাহ করিবার জন্য সরকারী গো-শালা খোলা হইয়াছে। মধুমক্ষিকা,

মৎস্য ও কুক্কুটাদি পালনের জন্য পৃথক পৃথক যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারও প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবসায়ীদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছেন। সরকারী পশুচিকিৎসা ও কৃষি-বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর যথোপযুক্ত ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানে যত্নবান হইয়াছেন।

শিল্প বিভাগ

বিবিধ বৃক্ষ, ছাল ও ফল হইতে নানাপ্রকার আটা, তৈল, রং, ছাপিবার কালি, বার্নীস্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষজ্ঞরা নিযুক্ত হইয়াছেন। রাসায়নিক উপায়ে পরিদর্শকও নিযুক্ত আছেন। মহারাজার কলেজের রসায়ন শাস্ত্রাধ্যাপক ডাঃ মৌদগীল স্থানীয় গাছগাছড়া হইতে চারি প্রকার উৎকৃষ্ট তৈল আবিষ্কার করিয়াছেন; এবং আদা হইতে শীঘ্রই অন্য একপ্রকার তৈল আবিষ্কার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

মৃৎপাত্র প্রস্তুত, চিনি সংস্কার, দিয়াশলাই প্রস্তুত প্রভৃতির বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের বালিশের ও মশারীর ঝালর প্রভৃতির ব্যবসায় একসময়ে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিলাতে পর্য্যন্ত এ সব মাল রপ্তানি হইত, কিন্তু বৃটিশ সরকার আমদানী মালের উপর শতকরা ৩০ টাকা শুল্ক বসানোর দরুণ মন্দা পড়িয়া গেল।
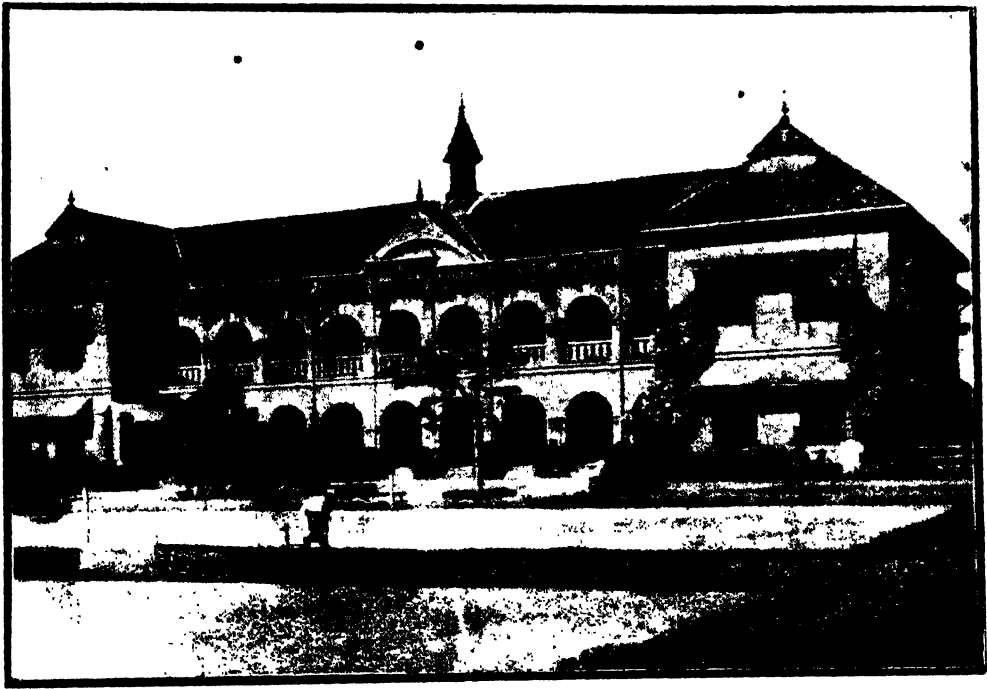
ত্রিবাঙ্কুর—মহারাজার আর্ট কলেজ

প্রস্তুত আদার নির্য্যাসের ব্যবসায় ইতিমধ্যেই খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। চামড়া পাকা করা ও রং করার কারখানা-গুলিও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাগেরকৈল ও পল্লীয়াদী নামক স্থানে বেসরকারী চামড়ার ব্যবসায় দুইটী বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সূতা-কাটা ও কাপড়-বুনা শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে বিশেষজ্ঞরা নিযুক্ত হইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে বয়ন-বিদ্যালয়গুলি যথারীতি পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক গৃহশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার একটী নূতন খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। নিকেলের বাসন তৈয়ার, সোণারূপার কারুকার্য্য, সেলাই, ছাতার লেইস্, রেশম বুনা, জরীর কাজ ও অন্যান্য চিকণ কাজ শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই নাগেরকৈলে "দি এস, এম্, আর, ভি, শিল্পাগার" নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; ত্রিবান্দ্রামে "দি শ্রী মূলম্ শিল্পবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে রাজমিস্ত্রী ও ছুতারের কাজ

শিক্ষা দেওয়া হয়। ত্রিবান্দ্রামের শিল্প কলেজে ছবি আঁকা, হাতীর দাঁতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 'কুইলনে'র ছুতারমিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়টী প্রসিদ্ধ। এল্লীপের সরকারী বাণিজ্য-শিক্ষালয় হইতে প্রতি বৎসর অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাহির হইতেছেন। বর্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬টী শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সরকারী ব্যয়ে সংবাদ-সংগ্রহ-সঙ্ঘ ও শিল্প-ঋণ-দান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্প-বিভাগের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য সময় সময় পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বিভাগে গত বৎসর মোট ১,৪০,৭২০ টাকা ব্যয় হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে মাত্র ২১,৩৯৬ টাকা আয় স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রজাদের মঙ্গলার্থ আয়ের প্রায় ৭গুণ বেশী টাকা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী সদস্য আছেন। স্থানীয় লোকেরা যৌথকারবার এবং সমবায়-সমিতির উপকারিতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। অধুনা ১২৫টী যৌথকারবার এবং ১০০২টী সমবায়-সমিতি কাজ করিতেছে। ত্রিবাঙ্কুরে চামড়া, চিনি, লবণ, প্রভৃতির মোট ১২০টী ভাল কারখানা আছে। 'চা' ও 'রবারে'র চাষ করিবার জন্য দুইটী সুগঠিত যৌথকারবার সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। এল্লীপী, কুইলন, ত্রিবান্দ্রাম এবং কুলাচল—এই চারিটী পোতাশ্রয় ও বন্দর অতি প্রসিদ্ধ।

পূর্ত্ত-বিভাগের কাজও প্রশংসার যোগ্য। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি নূতন রাস্তা তৈরী হইয়াছে; এবং কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য খাল, কূপ প্রভৃতি খনন করা হইয়াছে। ডাক-বিভাগের কাজও বেশ সুন্দররূপ চলিতেছে। বর্ত্তমানে ২৪১টী ডাকঘর ও ৩৬৪টী চিঠির বাক্স আছে। তন্মধ্যে ৬টি পোষ্টাফিসে সেভিংস-ব্যাঙ্কের নিয়মে জনসাধারণের টাকা গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

নগরপালগণের সভা (Municipality)

ত্রিবাঙ্কুরে মোট ১৯টী স্বয়ং-শাসিত নগর আছে। প্রত্যেক সহরেই নগরপালদের সভায় যথেষ্ট পরিমাণে বেসরকারী সদস্য আছেন। সদস্যদের মোট সংখ্যা ৩০৮ জন; ইঁহাদের মধ্যে ২৫৩ জনই বেসরকারী সদস্য। ত্রিবান্দ্রাম ব্যতীত সর্ব্বত্র বেসরকারী সদস্যই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। নাগেরকৈলের মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে চারিজন স্ত্রীলোককে মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য ত্রিবান্দ্রামের "বালকবালিকা হাসপাতালে" পাঠান হইয়াছে। প্রত্যেক মিউনিসি-পালিটীর অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্তও আছে। সরকার হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ২৯টী হাসপাতাল এবং ৩১টী ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পাগল বা সংক্রামক রোগীর জন্য পৃথক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৯২টী সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় আছে।

শিক্ষা-বিভাগ

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজার কলেজ মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন হইতে বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়ই উক্ত কলেজে পড়ান হইবে। মুসলমান অধিবাসীদের সুবিধার জন্য স্থানীয় ভাষায় ৬টী অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষভাবে স্থাপিত হইয়াছে। দুই বেলা স্কুল বসাইবার নিয়ম অনেক স্থানেই প্রচলিত করা হইয়াছে। ইহাতে বেশ সুফল পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

	সরকারী	বেসরকারী সাঃপ্রাপ্ত	বেসরকারী সাঃঅপ্রাপ্ত	সরকারের সম্বন্ধ রহিত	মোট
বিদ্যালয় সংখ্যা	১০৮৬	২১০৮	২৬৫	৫২৭	৩৯৮৬
ছাত্র সংখ্যা	২২৭৫৪১	২১৬৫০০	২৬৯৮১	১৮৩৪২	৪৮৯৩৬৫

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, প্রতি ১.৯ বর্গমাইলে বা প্রতি ১০০৫ জন অধিবাসীর মধ্যে একটী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, প্রতি ২.২০ বর্গমাইল বা প্রতি ১১৫৮ জন অধিবাসীর মধ্যে একটী করিয়া সরকারের অনুমোদিত স্কুল আছে, এবং মোট লোকসংখ্যার শতকরা ১১.৩৫ জন অনুমোদিত স্কুলে পড়িতেছে। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৪৮.৩ জন খাস সরকারী স্কুলে আছে এবং শতকরা ৫১.৬ অন্যান্য অনুমোদিত স্কুলে স্থান পাইয়াছে। পীড়ামিড তালুকের একটী পকুথী এবং দেবী-

কুলমের ৭টী পকুথী ব্যতীত সর্ব্বত্রই অন্ততঃ একটী সরকারের অনুমোদিত স্কুল আছে। কেবলমাত্র অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্র সংখ্যা ৪,৭১,০২৩ জন। তাহাদের মধ্যে কোন্ বিদ্যালয়ে কত ছাত্র বর্ত্তমানে আছে, নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে –

কলেজ	২,৫০৩
ইংরাজী স্কুল	৪৪,৬৯০
দেশীভাষার স্কুল	৪,২১,৩০৭
বিশেষ স্কুল	২,৫২৩
মোট	৪,৭১,০২৩ ছাত্র

• ত্রিবাঙ্কুরের স্বর্গীয় মহারাজ—উপাসনার পরিচ্ছদে

মোট অধিবাসীর শতকরা ১৫ জন যদি প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত ছেলে মেয়ে বলিয়া ধরা যায়, তবে দেখা যায়, মোটামুটি হিসাবে শতকরা ৬৪·৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

১৯২৫ সালের রিপোর্ট অনুসারে শিক্ষাবিভাগের মোট ব্যয় ৩৭,১৮,০৫৩ অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুরের বাৎসরিক মোট ব্যয়ের শতকরা ২০·১ অংশ।

এতদ্ব্যতীত বেসরকারী অন্যান্য শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থও সরকার হইতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে 'ল'কলেজ, আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, শিল্প ও ব্যবসায় বিদ্যালয়, ফরেষ্ট স্কুল, সার্ভে স্কুল, কৃষি বিদ্যালয়, কম্বল তৈরীর স্কুল, কার্পেট বুনা শিক্ষালয় প্রভৃতি ১৮টী সরকারী শিক্ষালয় আছে। তা'ছাড়া সাহায্য-প্রাপ্ত আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, শিল্পাগার প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। এ সবের জন্য গত বৎসর মোট ব্যয় ১,১১,০৯৪ টাকা হইয়াছে। আবার, সাধারণ পুস্তকাগার, পাঠাগার, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সংস্কৃত ও মালয়ী ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়, শিক্ষালয় মেরামত প্রভৃতির জন্যও বাৎসরিক অনেক টাকা ব্যয় হয়। এইরূপে সমগ্র ব্যয় একত্র হিসাব করিলে ত্রিবাঙ্কুরের মোট ব্যয়ের শতকরা ২১·৬ অংশ শুধু জন-সাধারণের শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইয়া থাকে বলা যায়। ইহাতে দেখা যায়, গড়ে প্রতি অধিবাসীর শিক্ষার জন্য মোটামুটি হিসাবে ৵৫ ব্যয় করা হয়। কিন্তু, বৃটিশ ভারতে প্রতি অধিবাসীর জন্য প্রতি টাকার মাত্র ০·০৫ অংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানের সঙ্গে তুলনা করিয়া শিক্ষা বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুরের অবস্থা দেখান হইতেছে—

প্রদেশ বা দেশীরাজ্য পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে বাদ দিয়া হাজার করা—

	ব্যক্তি	পুরুষ	স্ত্রী
ত্রিবাঙ্কুর	২৭৯	৩৮০	১৭১
ব্রহ্মদেশ	৩১৭	৫১০	১১২

	ব্যক্তি	পুরুষ	স্ত্রী
কোচিন	২১৪	৩১৭	১১৫
বরদা	১৪৬	২৪০	৪৪
কুর্গ	১৪৪	—	—
দিল্লী	১১২	—	—
আজমির মাড়োয়ার	১১৩	১৮৫	২৬
বাংলা	১০৪	১৮৮	২১
অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীরাজ্য	একশতেরও কম		

(আদম সুমারী ১৯২১)

পুরুষ ও নারী শিক্ষিতের সংখ্যা একত্র হিসাব করিলে সমগ্র ভারতবর্ষে ও ব্রহ্ম দেশের ভিতর ত্রিবাঙ্কুরের স্থান দ্বিতীয়; কিন্তু কেবল নারীশিক্ষার বা উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ধরিলে ত্রিবাঙ্কুরই **প্রথম** স্থান অধিকার করিবে।

শিক্ষা বিভাগের জন্য উন্নত দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে কে কিরূপ ব্যয় করিতেছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।:—

রাজ্য	রাজস্ব	শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়।	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়।
	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
ত্রিবাঙ্কুর	২,৮৬	৪০	২১
কোচিন	৬২	১০	৫ ১৩
মহীশূর	৩৪৪	৪৪	১৩
বরদা	২২১	৩০	১৭
যোধপুর	১২৫	২১৪	১৪

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যত বেশী টাকা ব্যয় করা হয়, সে দেশ তত বেশী পরিমাণে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হইতেছে।

প্রত্যেক বিভাগে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকারা অনেক সময় না বুঝিয়া অপরাধ করিয়া থাকে। তাহাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য এবং লেখাপড়া শিক্ষার জন্য একটী সরকারী সংশোধক স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টার প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হইতেছে এবং সুফলও পাওয়া যাইতেছে। অনাথ শিশুদের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুসারে সরকারের অনুমোদিত সর্ব্বশুদ্ধ ৪২৭টী বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীসংখ্যা ১,৬৩,৫৬২। নীচে বিশেষ ভাবে দেখান হইল।:—

পরিচালনার ব্যবস্থা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা
সরকারী	২৩২	৭৫,৬৫০
সাহায্যপ্রাপ্ত	২০০	৮২,৬৫৩
সাহায্য অপ্রাপ্ত	৯	৫,২৫৯
মোট	৪৪১	১,৬৩,৮৬২

তন্মধ্যে কলেজে—২২৪ জন, ইংরাজী স্কুলে ৮,৪১৮ জন, স্থানীয় ভাষার স্কুলে—১,৫৩, ৮১৫ জন এবং বিশেষ স্কুলে—১,১০৫ জন ছাত্রী পড়িতেছে। প্রতি ১৭ জন শিক্ষিত অধিবাসীর মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরে নারীর সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রপরিষদেও সভ্য নির্ব্বাচনে বর্ত্তমানে স্ত্রী-পুরুষের সম্পূর্ণ সমান অধিকার।

পূজা ও দান বিভাগ

বর্ত্তমান দেওয়ান মিঃ ওয়াটস্ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খৃষ্টান। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশেই কাটাইয়াছেন; বিদেশী আচার ব্যবহারেই অভ্যস্ত। তাহা হইলেও রাজকার্য্য পরিচালনে তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি, সন্দেহ নাই।

গত বৎসর বিধর্ম্মী মিঃ ওয়াটস্‌কে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য পূজা বিভাগ ও তৎসংলগ্ন দান বিভাগটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এখন হইতে উক্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিজের কার্য্যকলাপের জন্য স্বয়ং মহারাণীর নিকট দায়ী থাকিবেন। বর্ত্তমানে ২৯টী পূজাবাড়ী সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে পরিচালিত হইতেছে। পুরাতন অনেক দেবমন্দিরের সংস্কার করা হইতেছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ আরও ১৪৬০টী পূজাবাড়ী অল্পাধিক সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। গত বৎসর এই বিভাগে মোট ১৬,১৩,৯২৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং দান বিভাগে মোট ৩৩২৭১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বিবিধ

'নায়ার' সৈন্যবাহিনীতে বর্ত্তমানে ১৪৭১ জন সৈনিক আছে। এই সৈন্যবাহিনীর পদাতিক সৈন্য দুইটী ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত। অশ্বারোহী সৈন্যের একজন ইউরোপীয়ান Commissioned officer আছেন। গোলন্দাজ সৈন্যের মধ্যে একজন এবং পদাতিক সৈন্যের মধ্যে ৬৫ জন ভারতীয় Commissioned officer আছেন। ২০° গজ পাল্লা-বিশিষ্ট মার্টিনী-হেনরী-রাইফেল্ মাত্র সাধারণ সৈনিকেরা ব্যবহার করিতে পারে। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবসায়ের জন্য সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে সাধারণ প্রজারা বাৎসরিক অন্নাধিক একশত পাস্ পাইয়া থাকে মাত্র।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মুদ্রাবিভাগে গত বৎসর বৃটিশ ভারতের ৪৫,৩৩৪ টাকা মূল্যের স্থানীয় বিবিধ মুদ্রা তৈরী হইয়াছে।

সমগ্র ত্রিবাঙ্কুরে সরকারী 'গেজেট' ছাড়া ৫২খানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ এবং ৭৯খানি মাসিক পত্রিকা আছে। তন্মধ্যে ৬০খানি মালয়ী, ৩৮খানি ইংরাজী-মালয়ী ১৯খানি ইংরাজী, ৯খানি তামিল, এবং ৩খানি ইংরাজী-মালয়ী- তামিল ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। মালয়ী ও সংস্কৃত ভাষায় হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। ত্রিবান্দ্রামে সরকারী ব্যয়ে জনসাধারণের জন্য একটী সুদৃশ্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের উপকারিতা শিক্ষা দিবার জন্য একটী আদর্শ জীবন-বীমা আফিস্ সরকার হইতে খোলা হইয়াছে। বন্য পশু ও বন্য বৃক্ষ রক্ষার জন্য একটী নূতন আইন তৈরী হইয়াছে। এখান হইতে বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ কোন বন্য জন্তু শিকার করিতে পারিবে না।

মহাত্মা গান্ধী রাজপরিবারের অনাড়ম্বরতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মহারাণীকে হঠাৎ দেখিয়া আমি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম। সামান্য গৃহস্থ-বধূরাও

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী (রাজপ্রতিনিধি)

আজকাল মূল্যবান বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন (বিশেষ ভাবে কোন লোকের সঙ্গে দেখা করিবার সময়)। আমি ভাবিয়াছিলাম মহারাণীকে কত কি হীরকরজত-

শোভিত বেশভূষায় সুসজ্জিত দেখিব। বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিলাম কি না সামান্ত একখানা মোটা থান কাপড় পরিয়া মহারাণী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার পর দেখিলাম তাঁহার গলদেশে একটী 'মঙ্গলমালা' মাত্র শোভা পাইতেছে। গৃহসজ্জাও তদনুরূপ আবিলতাশূন্য। নেহাৎ সাদাসিধা রকমের কয়েকখানা আসবাবপত্র ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ছোট মহারাণী সেথু পার্ব্বতীবাই (রাণীমা) ও নাবালক মহারাজ শ্রীমান চিত্তিরুনলকেও সর্ব্বপ্রকার

ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত টি, রাঘবিয়া, সি-এস-আই

কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত দেখিলাম। তাঁহাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সুগঠিত দেহ আমার বেশ প্রীতিদায়ক হইয়াছিল। বলিতে কি, তাঁহাদের অনাড়ম্বরতার আতিশয্য আমার হিংসার বস্তু হইয়াছে।"

এত সব বর্ণনা দ্বারাও তাঁহার মনের আনন্দ সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে না পারিয়াই যেন অবশেষে তিনি বলিয়াছেন—"The reader must pardon this minute description of the Travancore Royalty. It has a lesson for us all. The Royal simplicity was so natural because it was in keeping with the whole of the surroundings. I must own that I have fallen in love with the women of Malabar."—'Travancore and its Ruler' by M. Gandhi

যে স্থানের অধিবাসীদের অনাড়ম্বরতা ও সারল্য মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিতে পারে, তাহার তুলনা দ্বিতীয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। মিঃ স্মিথ লিখিয়াছেন—"The country and people of Travancore are the most interesting in all India on many accounts." এ সম্বন্ধে অন্য কিছু বলা অনাবশ্যক।

উপসংহার

ত্রিবাঙ্কুরের অভাব এখনও যথেষ্ট আছে। সমাজ-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। গোঁড়া হিন্দুরা পরিবর্ত্তন মাত্রকেই ভয় করেন। আবার, অস্পৃশ্য জাতিসমূহ সংস্কারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এ বিষয়ে লোকের স্বাধীন মত সংগ্রহ করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভাব যাহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বেকার-সমস্যা ত্রিবাঙ্কুরে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। শিক্ষিত যুবকেরা কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। এই গুরুতর সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানের জন্য বিশেষভাবে উত্তর-ত্রিবাঙ্কুরে রেল লাইন শীঘ্রই খোলা হইতেছে। সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার সমাধান কোন দিনই হইবে না। তাই কার্য্যকরী শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সেদিন দেওয়ান বলিয়াছেন—

"A variety of reasons has led to the unemployment problem being inextricably mixed up with the educational question. I am not surprised. As the administration of the State became more highly organised and more complex from year to year, the need for public servants in many capacities grew

rapidly. University degrees and school certificates became the only means of testing fitness for Government employment; and the whole current of our youth set towards the institutions where such qualifications could

ত্রিবাঙ্কুরের মানচিত্র

e procured. Hence our swollen colleges, our ultiplicity of schools. Hence this spectre of nemployment. There is no getting away om the fact that the Government are the largest employers of educated labour in Travancore. In so far as there are Government posts available the Government will continue to distribute them and will continue to afford equality of opportunity to every son of the soil. A change must and will come over the outlook of our people once they have manfully faced the cold hard fact of the struggle for existence. Meantime the Government will leave nothing undone to narrow the margin of unemployment. A progressive railway policy and electric and water supply schemes will open up fresh avenues of useful service." Address of the Dewan, Travancore, 1926 p. 1.

দেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রজাকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে সরকার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই এ বিভাগে আশানুরূপ ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে মিঃ ওয়াটস্ বলিয়াছেন—

"The growth in the value and volume of imports and exports indicates prosperity which is reflected in the increase of revenue

under 'Income Tax,' 'Stamps,' and 'Customs'. The strong revival of the rubber market and the recent high rise of pepper and lemon grass oil have benefited a large section of the population. The State-aided Bank of Travancore Ltd., with a capital of Rs. 30,00,000, was registered on the 18th December 1925." Address of the Dewan, Travancore, 1926, p. 6.

মহারাণীর আদেশ অনুসারে গত বৎসর হইতে দেব-মন্দিরে পশুবলি রহিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাণীর মাতৃ-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রাজ্যে কোথাও এখন ধর্ম্মের নামে প্রাণিহত্যা হয় না।

ত্রিবাঙ্কুরের একটী বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক বিভাগই স্বদেশী ব্যক্তি দ্বারা সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এত সব উন্নতির মূল কারণ যে ভূতপূর্ব্ব দেশী দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত টি, রাঘবিয়া, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারতীয়দের কার্য্যদক্ষতায় যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহাদিগকে ত্রিবাঙ্কুরের ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আবগারি বিভাগ হইতে ত্রিবাঙ্কুরের যথেষ্ট আয় হয়। মহাত্মা ইহার খুব নিন্দা করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, খৃষ্টান অধিবাসীরাই বেশী মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আশার কথা এই যে, এ কলঙ্ক দূর করিবার জন্ত সরকার স্বয়ং বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন। দেওয়ানের অভিভাষণে আবগারি বিভাগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"As you (members of the Council) are aware, advantage was taken of the renewal of the biennial contracts for 1100 01 to make a substantial reduction in the number of country liquor shops. The total number of shops opened under the new contracts is 1,915 against 2,015 in the previous year. The independent shop system in the case of toddy now obtains in all the taluks of the State except Devicolam where there is no manufacture or sale of toddy. The sale of arrack or toddy to minors and of arrack to adult women has been prohibited from the 1st Chingam 1102. The department has been active in putting down llicit traffic as can be judged from the larger number of cases detected and the growth in the percentage of convictions." Address of the Dewan, Travancore, 1926, P.6

সমাধিস্থ

শ্রীনির্ম্মল দেব

অনেক দিন পরে দেশে ফিরিয়া যেখানে-সেখানে শুনিতে লাগিলাম—গৌর মল্লিকের বাগানে কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়া সমাধিস্থ হইয়া আছেন!

এই গৌর মল্লিক লোকটি না কি এক সময়ে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তা'র পর উচ্ছৃঙ্খলতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার সে অগাধ ঐশ্বর্য্য এক দিন দুর্দ্দশার অতল তলে তলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। আজ এই বন-জঙ্গলে ভরা, পোড়ো বাগানের মালিক যে কে, গ্রামের কেহই তাহা জানে না; কিন্তু তবু এই বাগানটি নির্দ্দেশ করিতে হইলেই, সেই গৌর মল্লিকের নামটি কেহ কোনো দিন বিস্মৃত হয় না। এই চির-স্মৃত মানুষটিকে প্রত্যক্ষ দেখার সৌভাগ্য আমার কোনো দিন হয় নাই; কিন্তু তাঁহার এই অতীত প্রমোদ-কাননটি আমার বাল্যের স্মৃতির সহিত একান্ত ভাবে জড়াইয়া আছে! ছেলেবেলায় কত দিন পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া এই বাগান হইতে পাকা পেয়ারা, কাঁচা গোলাপজাম পাড়িয়া আনিয়া বিজয়-গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি,

কত কন্‌কনে শীতের রাতে এই বাগানের খেজুর-গাছে উঠিয়া রসের পূর্ণ-কলস্ নামাইয়া আনিয়া সগৌরবে বন্ধুদের বিতরণ করিয়াছি, কত স্তব্ধ-গম্ভীর নিশীথে এই বাগানের ফুল চুরি করিয়া আনিয়া মা-সরস্বতীর চরণে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এক্‌জামিনে পাশের বর প্রার্থনা করিয়াছি! আমার কৈশোরের কত অত্যাচার, কত উপদ্রব এই বিগত-শ্রী বাগানের গাছের শাখায় শাখায়, পাতায়-পাতায় আঁকা আছে! প্রথম-জীবনের সেই উন্মুক্ত-উদ্দাম দিনগুলা এই বাগানের মালিকেরই মত আজ সুদূর অতীতের কালো অন্ধকারে ঝাপ্‌সা হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে! তখন শুনিতাম, এই বাগানে তাঁহার এক পেয়ারের রক্ষিতা বাস করে। কত দিন কত চেষ্টা করিয়াও এই নারীকে একবার দেখার অকারণ কৌতূহল মিটাইতে পারি নাই। কেবলমাত্র একটি দিন—এক প্রচণ্ড ঝড়ের সন্ধ্যায়—এই বাগানের পাশের রাস্তা দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর পানে ছুটিতে-ছুটিতে উপরে দ্বিতলের জানালার গরাদেয় গাল্‌টি রাখিয়া সে হতভাগিনীকে ম্লান-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম! সেই একটি দিন মাত্র, আর কোনো দিন তাহাকে দেখিতে পাই নাই! .....তা'র পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে,—সেই পরিত্যক্ত বাড়ীর সে জানালা আজ জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, সেই ফুলের-আল্‌পনা-আঁকা গোলাপ বেলার গাছগুলি শুকাইয়া গিয়া অতীত সম্পদের মূক সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, কেয়ারির ফাঁকে-ফাঁকে সেই মর্ম্মর-নির্ম্মিত নগ্ন নারী-মূর্ত্তিগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়া হেলিয়া রহিয়াছে! আমার জীবনেও তা'র পর কত আসিয়াছে, কত গিয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে, কত গড়িয়াছে! কিন্তু সেই এক দিন এক উদ্দাম ঝড়ের সন্ধ্যায় এক কুলত্যাগিনী ঘৃণিতা নারীর সেই আচম্‌কা দেখা বেদনা-বিহ্বল মুখখানি আমার চক্ষের সম্মুখে আজও ঠিক তেম্‌নি করিয়াই জাগিয়া আছে!

আজ এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া তাই যখন সেই গৌর মল্লিকের বাগানে এক সমাধিস্থ সন্ন্যাসীর কথা যা'র তা'র কাছে শুনিতে লাগিলাম, তখন পরম বিজ্ঞের মত মনে মনে বলিলাম—এ মজা মন্দ নয়! একে সন্ন্যাসী, তা'য় সমাধিস্থ, তা'য় আবার সেই গৌর মল্লিকের বাগানে!—এ একটা কাণ্ড বুজ্‌রুকী না হইয়া যায় না! কিন্তু মানব-চরিত্রের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে, যেখানে যত সংশয়, কৌতূহলও সেখানে তত বেশী। তাই ঠিক করিলাম—এমন মজা ছাড়িলে চলিবে না!

বিকালে সুধীর আসিতেই বলিলাম—"ওহে চলো, তোমাদের সমাধিস্থ সন্ন্যাসী জীবটিকে একবার দর্শন ক'রে আসা যাক্!"

সুধীর একেবারেই সোজাসুজি বলিয়া ফেলিল—"না, তোমার সেখানে যাওয়া হবে না!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?"

সুধীর বলিল—"না, তুমি যে সেখানে গিয়ে তাঁ'কে বিদ্রূপ ক'রবে, তা' হবে না। তুমি যে চিরকালই নাস্তিক!"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি—কিছু ব'লবো না, শুধু দূর থেকে চুপ্‌টি ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো ব্যাপারখানা কি!"

সুধীর তবু সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল—"আচ্ছা চলো, কিন্তু যা' ব'ললে মনে থাকে যেন,—সেখানে গিয়ে যেন ভুলে যেয়ো না!"

সুধীরের সঙ্গে চলিলাম গৌর মল্লিকের পোড়ো বাগানে।

* * * * * *

অনেকখানি পথ চলিয়া, চাল-কল ছাড়াইয়া, শ্মশান পার হইয়া, গ্রামের উত্তর প্রান্তে ভাঙ্গা ফটকের ভিতর দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নিরালা-নির্জ্জন নদীতীরে অতীতের সেই ফুলে-ফলে-ভরা সুন্দর বাগানটি আজ বিগত-যৌবনা রূপজীবিনীর দেহের মত রুক্ষ, ভাষণ! সেই ভাঙ্গা বাড়ীটার পানে চাহিয়া কত কথাই না মনে পড়িতে লাগিল! এক দিন যাহার সজ্জিত বিলাস-কক্ষে উন্মত্ত ভোগের বাতি সারা-রাত নিনিমেষে জ্বলিয়াও নিভিতে চাহিত না, যে উৎসব-মুখর ঘরের মর্ম্মর-মেজ কত লীলাময়ী তরুণীর আবেশ-বিহ্বল চরণ-চুম্বনে এক দিন পুলকিত হইয়া উঠিত, কত চঞ্চল চোখের চাহনি, কত তরল হাসির উচ্ছ্বাস, কত গোলাপী ওড়্‌নার শিথিল অঞ্চল-প্রান্ত যাহার বাতাসকে এক দিন মাতাল করিয়া তুলিত,—আজ সেথায় শুধু মৃত্যুর মত একটা বিরাট-গম্ভীর স্তব্ধতা যেন হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

সুধীরকে বলিলাম—"কই হে, তোমার সন্ন্যাসী-ঠাকুর কোথা?"

সুধীর বলিল—"বাগানের শেষে সেই চাঁপা গাছ-তলায়।"

সুধীরের সঙ্গে চাঁপা-গাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন সেখানে কেহ বড় একটা ছিল না, সারা দিন ধরিয়া সন্ন্যাসী-দর্শনে পুণ্যের ঝুলি বোঝাই করিয়া সন্ধ্যা-বেলা যে-যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এক ভস্মাচ্ছন্ন, দীর্ঘ-জটাজুট-শোভিত, লোটা-চিম্‌টা-পরিবৃত, উলঙ্গ-প্রায় মানব-মূর্ত্তিকে উইয়ের ঢিপির মত খাড়া হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিব। কিন্তু দেখিলাম, এক সাধারণ মানুষেরই মত মানুষ। পরণে তাহার এক মোটা আধ-ময়লা ধুতি, গায়ে একখানা সুতি চাদর। সেই চাদরের ভিতরে হাত দুইটা জোড় করিয়া কোলের উপরে রাখিয়া মুদিত নয়নে নিশ্চল-নিস্পন্দ দেহে লোকটা বসিয়া আছে। উপরের গাছ হইতে খসিয়া পড়িয়া দু-একটা চাঁপা-ফুলের শীর্ণ পাপ্‌ড়ি তাহার গায়ে ও মাথার রুক্ষ বিপর্য্যস্ত চুলের উপরে ছড়াইয়া আছে। অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসিত্বের একটুও বিজ্ঞাপন কোথাও ধরিতে পারিলাম না। মনে মনে হাসিয়া বলিলাম—লোকটা খুব ওস্তাদ! ও বুঝিয়াছে যে, অবিরত ঠকিয়া-ঠকিয়া লোটা-চিম্‌টা, জটাজুটে লোকের আজকাল আর তেমন শ্রদ্ধা নাই, তাই ও এক নূতন ফন্দি আঁটিয়াছে! সাধারণ বেশ-ভূষায় চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া মহা-যোগীর ন্যায় বসিয়া থাকিয়া লোকের ভক্তি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দু-পয়সা কামাইবে!

কিন্তু তাহার আনত মুখটার দিকে চাহিতেই কেমন-যেন একটু থমকিয়া গেলাম! ঝড়ের রাতের প্রভাতের মত তাহার সারা মুখখানার উপর কেবল যেন ছিঁড়ে-যাওয়া, ভেঙে-পড়া, উড়ে-যাওয়ার চিহ্ন আঁকা! মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার ওই মৃদু-স্পন্দিত বুকখানার মধ্যে একটা রুদ্র-ভীষণ আগ্নেয়-গিরি ঘুমাইয়া আছে,—কে জানে সেথায় কি দাহ, কি জ্বালা গোপনে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে!

সুধীর আমার পাশে পরম ভক্তিভরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁ হে, লোকটার ইতিহাস কিছু জানো?"

সুধীর বলিল—"না, কেউই তা জানে না, কবে-যে উনি এখানে এসেছেন, তা'ও কেউ ব'লতে পারে না। এক দিন ওই শিবমন্দিরে পুজো দিতে এসে গোপালের-মা এঁকে প্রথম দেখ্‌তে পান্।"

চলিয়া না আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম,—ঠিক করিলাম, দেখি, লোকটা কতক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকে!

দিনান্তের শেষ আভাটুকু সাঁঝের আকাশ হইতে ধীরে-ধীরে মুছিয়া গেল। বাদুড়ের ঝাঁক নদীর এপার হইতে ওপারে উড়িয়া গেল, কর্ম্ম-চঞ্চল দিনের ব্যস্ত কোলাহল ক্রমে-ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আমি ঠিক তেমনই ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

নিকটে শিব-মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দে লোকটা চোখ খুলিয়া জোড়-করা হাত দু'টা কপালে ঠেকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাশে শ্মশানের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেথায় একটা সদ্য-প্রজ্বালিত চিতা হইতে ধূসর ধূম-রাশি ঊর্দ্ধপানে কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিতেছিল। খানিকক্ষণ অনিমেষ নয়নে সেই দীপ্ত চিতার পানে চাহিয়া থাকিয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইতেই আমার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সেই স্তব্ধ-নির্জ্জন জঙ্গলের মাঝে আসন্ন অন্ধকারে আমায় অমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সন্ন্যাসী বোধ হয় খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমার সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া ক্ষণকাল আমায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বেশ ভদ্র, বিনীত ভাবে বলিল—"আমার কাছে কি তোমার কোনো দরকার আছে ভাই?"

আমি কিছুই চিন্তা না করিয়া মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলাম—"না, বিশেষ কিছুই নয়, তবে হাঁ, আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে দু'-চারটে কথা কইতে পার্‌লে মন্দ হয় না!"

মনে মনে কি ভাবিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"বেশ ত, যে-কোনো দিন একটু গভীর রাতে যদি আস্‌তে পারো, তা'-হ'লে বেশ হয়। রাত্রে আমি ওই বাড়ীতে থাকি।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী সেই জীর্ণ দ্বিতল বাড়ীটা দেখাইল। মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া সন্ন্যাসী আবার বলিল—"কিন্তু ভাই, আমার একান্ত অনুরোধ—তুমি একলা এসো, রাত্রে আমি বেশী লোকের সঙ্গ সইতে পারি না।"

আমি আর অনর্থক কথা না বাড়াইয়া "আচ্ছা" বলিয়া তাহার ভদ্রতার প্রতিদানে একটা নমস্কার করিয়া সুধীরের সঙ্গে চলিয়া আসিলাম। খানিকটা আসিয়া একবার

পিছন ফিরিয়া দেখিলাম—সন্ন্যাসী মন্ত্র-চালিতের মত ধীর-পদক্ষেপে সেই প্লোড়ো বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

* * * * *

আড্ডা মারিয়া, গাল-গল্প শেষ করিয়া রাত্রি এগারোটার সময় শুইতে গেলাম। ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নাছোড়্‌বান্দা ঘুম আজ কিছুতেই কাছে ঘেঁসিতে চাহিল না! কেবলই মনে হইতে লাগিল—গভীর রাতে সেই বাড়ীতে গেলে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইবে। আমার বুকের মধ্যে যে একটা ডানপিটে সৃষ্টিছাড়া মানুষ আজন্মকাল দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে,—যাহাকে কোনো দিন সাম্‌লাইতে পারিলাম না,—সে আমায় কেবলই ঠেলা দিতে লাগিল। বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম, ঠিক করিলাম—আরো খানিকটা রাত্রি হইলেই উঠিয়া পড়িব!

বারোটা বাজিয়া গেল, তখনও শুইয়া রহিলাম। ঢং করিয়া একটা বাজিতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

নিকষ-ঘন নিশীথ রাতে চলিয়াছি নির্জ্জন গ্রাম্য-পথ বাহিয়া—জানি না কোন্ অদম্য আকর্ষণে! চতুর্দ্দিক স্তব্ধ নীরব, কোথাও একটু সাড়া নাই, কোনো শব্দ নাই! মাথার উপরে কেবল ওই নিশাচর তারাগুলা নির্নিমেষ নয়নে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে!

ভাঙ্গা ফটক দিয়া গৌর মল্লিকের বাগানে ঢুকিলাম। কি একটা জানোয়ার আমার গা ঘেঁসিয়া শ্মশানের দিকে ছুটিয়া পলাইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেই বাড়ীটার দিকে চলিলাম। উপরে দ্বিতলের একটা ঘরে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখিতে পাইলাম। অন্ধকারে হাতড়াইয়া, সেই আলো লক্ষ্য করিয়া, ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া আস্তে-আস্তে উপরে উঠিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—একটা রেড়ীর তেলের প্রদীপ মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে ধূলি-ধূসরিত মেজেয় একটা ছেঁড়া কম্বলের উপরে গেরুয়া কাপড় পরিয়া সেই সন্ন্যাসী চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—পাশে একখানা গীতা খোলা রহিয়াছে। ঘরের দেওয়ালের চূণ-সুরকী সব খসিয়া গিয়া জীর্ণ ইঁটগুলা মড়ার মাথার মত ওষ্ঠহীন দাঁত মেলিয়া রহিয়াছে! দরজা-জানালা-গুলি ভাঙ্গিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ছাতের কড়ি-বরগাগুলাও যেন এই ধর্ম্মঘটে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া হেলিয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইবার সুযোগ খুঁজিতেছে! এম্‌নি একটা ভয়ঙ্কর ঘরে এই নিবিড়-নির্জ্জন রাতে ওই রহস্য-ময় মানুষটাকে এমন করিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মনটা কেমন-যেন একরকম বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল।

আমার পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইয়া আমায় দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"এস ভাই! এত রাত্তিরে তুমি এসেছো! আমি ভাবিনি তুমি আজ আস্‌বে।" এই বলিয়া একটু সরিয়া কম্বলের উপরে আমার বসিবার স্থান করিয়া দিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম—"আমি আজ না এসে থাক্‌তে পার্‌লুম না। আমার বড্ড জান্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে!"

সন্ন্যাসী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—"কি জান্‌তে চাও ভাই?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম—"এই জন-মানবহীন জঙ্গলের মধ্যে এই ভুতুড়ে বাড়ীতে কী আকর্ষণ আপনাকে টেনে এনেছে? এ বাড়ীর ইতিহাস বোধ হয় আপনি জানেন না!"

আমার কথায় সন্ন্যাসী যেন একটু চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"জানি।"

আমি বলিলাম—"সব জেনে-শুনে আপনি এসেছেন!"

সন্ন্যাসী একটুখানি হাসিল,—সে-হাসি যেন অনেক-দিনের-অনেক-অশ্রুর-বাষ্প-জমা মেঘের সজল বর্ষণ! সন্ন্যাসী বলিল—"এই ঘরখানি যে আমার জীবনের মহাতীর্থ! এর চেয়ে বড় তীর্থ তো আমার কোথাও নেই,—স্বর্গেও নয়,—ঈশ্বরের চরণেও নয়!"

আমি তাহার কথার কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাইলাম না। যে-ঘর একদিন ঐশ্বর্য্য-দৃপ্ত ধনীর স্থূল ভোগের লীলাক্ষেত্র ছিল, যেখানে একমাত্র দুর্দ্দান্ত লালসা ছাড়া আর কোনো জিনিসের সাধনা কোনো দিন হয় নাই,—সে-ঘর কি করিয়া যে এক স্থবির ভোগ-বিরাগী সন্ন্যাসীর মহাতীর্থ হইতে পারে, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। তাই কিছু না বলিয়া আমি জিজ্ঞাসু চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সন্ন্যাসী বলিল—"তুমি বিয়ে ক'রেছ?"

আমি বলিলাম—"না।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল—"জীবনে কোনো দিন কোনো

নারীকে যথার্থই ভালোবেসেছ—হাসি যেমন ক'রে কান্নাকে ভালোবাসে ?"

এ কথার উত্তরে সহজে স্পষ্ট ভাবে "হ্যাঁ" বলিতে পারিলাম না, "না" শব্দটাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—"ঠিক—বোধ হয়—নয়।"

মুহূর্ত্ত কাল চুপ করিয়া সন্ন্যাসী চোখ-দু'টা বুজিয়া বুকের মধ্যে কি যেন অনুভব করিয়া লইল। তা'র পর হঠাৎ আমার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিল—"কিন্তু আমি বেসেছিলুম! শুধু, ভালোবেসেছিলুম নয়—দু'-পায়ে থেঁতলে সে ভালোবাসার লক্ষ অপমান ক'রেছিলুম! তাই সে আজ আমার সারা জগৎ ঘিরে অক্ষয় অমর হ'য়ে আছে! অপমানের পূর্ণ অর্ঘ্য দিয়ে পূজা ক'রেছিলুম, তাই আমার সে পূজা আমার ভালোবাসার দেবতার চরণে গিয়ে পৌঁচেছে!"—অবরুদ্ধ অশ্রুর ভারে সন্ন্যাসীর গলাটা ভারী হইয়া আসিল।

খানিক থামিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে আবার বলিতে লাগিল:—"যখন আমার বিয়ে হ'য়েছিল, তখন আমার বয়স তেইশ্‌ বছর। তা'র আগে কোনো দিন আমার প্রাণের চোখ দিয়ে কোনো নারীর পানে চাইনি! সেই এক দিন দীপালোকিত উৎসব-রাতে সপ্ত-আয়তির-কলহাস্য-কুহরিত ছান্‌লা-তলায় লাল চেলীর নীচে দু'খানি লজ্জা-কম্পিত কালো চোখের কুণ্ঠিত-আনত দৃষ্টির সঙ্গে যখন আমার শুভ-দৃষ্টি হ'লো, তখন কী নিবিড়-মৌন মহিমা যে সেই স্নিগ্ধ-করুণ দৃষ্টি হ'তে ঝ'রে প'ড়ছিলো, ভাষায় তা'র কণামাত্রও কোনো দিন প্রকাশ ক'রতে পারবো না! এই নিঃসঙ্গ জীবনের কত নিদ্রাহারা রাতে শয্যা ছেড়ে উঠে ওপরে অন্ধকার আকাশের পানে চেয়ে মনে মনে বিধাতার উদ্দেশে ব'লেছি—ভগবান, এই জীবনই যদি মানুষের শেষ না হয়, যদি পর-জন্ম ব'লে কোনো জিনিস তোমার সৃষ্টিতে থাকে, তা'-হ'লে আর কিছু চাই না দয়াময়,—একটিবার—শুধু আর একটিবার—তুলসীর মূলে সন্ধ্যা-প্রদীপের মৃদু-কম্পিত শিখাটির মত, লাল চেলীর নীচে সেই দু'খানি কালো চোখের সেই সলজ্জ চকিত চাহনি তেম্‌নি ক'রে আমায় দেখ্‌তে দাও!—সাধ যে আমার মেটেনি!

"বাসর-রাতের ভোরের বেলা যখন নির্জ্জন ঘরে শুধু আমরা দু'জনে,—পাশে চেয়ে দেখ্‌লুম তা'র আনন্দ-বিহ্বল মূর্ত্তিখানি! কণ্ঠের মধ্যে যেন নিখিল-জগতের সমস্ত ছন্দ, সমস্ত সুর এক ক'রে আমি ডাক্‌লুম—'লীনা!' সে আমার কাছে স'রে এসে আমার বুকের ওপরে তা'র উচ্ছ্বসিত বুকখানি এলিয়ে দিয়ে, আমার গালের ওপরে তা'র লজ্জারক্ত গালটি রেখে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ব'ললে—'আমি ম'রে গেলে তুমি আবার বিয়ে ক'রবে ?'—দু'টো তপ্ত অশ্রুর বড়-বড় ফোঁটা তা'র বিহ্বল চোখ থেকে আমার গালের ওপর গড়িয়ে প'ড়লো! আমি শিউরে উঠ্‌লুম! এই বাসর-ঘরে হাসির দেওয়ালীর মাঝে কেন যে সে তা'র মরণের কথা ভাব্‌ছে, জীবনের প্রভাতেই কেন যে সন্ধ্যার কথা তা'র মনে প'ড়ছে,—তা' কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না! আজ পর্য্যন্ত কত ভেবেও সে দিন তা'র অন্তরের এই অকারণ আশঙ্কার কোনো কারণই আমি খুঁজে পাইনি!

"তা'র পর পাঁচ-পাঁচটি বছর ধ'রে আমার এই আল্‌গা জীবনটাকে কী প্রেম, কী সেবা, কী যত্ন দিয়ে যে সে ছেয়ে রেখেছিল—একটু কণামাত্রও ফাঁক কোথাও রাখেনি! আজ যখন পেছন্‌ ফিরে জীবনের সেই-সব হারানো দিন-গুলোর কথা ভাবি, তখন মনে হয় যেন সে-সব সত্য নয়, বাস্তব নয়!—আমার জীবনে যেন সে-দিন কখনও আসেনি, সে-সব যেন একটা স্বপ্ন—সুখস্বপ্ন,—একটা নিদ্রা-বিরল রাত্রির ক'টি অলস মুহূর্ত্তের জন্য তা'রা এসেছিলো এক দিন আমার ঘুমন্ত জীবনে—যৌবনের কল্প-লোক থেকে! কত জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধে অমন পরিপূর্ণ সুখ আমার জীবনে এসেছিল—জানি না! আজ কেবলই ভগবানকে বলি—ভগবান, মানুষকে যত দুঃখ দিতে পারো দিও, কিন্তু পরিপূর্ণ সুখ—অতো বড় অভিশাপ—তা'কে কখনও দিও না! অপূর্ণ রেখে তা'র সুখকে বেঁচে থাক্‌তে দিও, পূর্ণ ক'রে তা'কে অমন্‌ নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলো না!

"সুদুর্লভকে পেয়েছিলুম! যা' জগতে কেউ পায় না—তা'ই আমি পেয়েছিলুম! তাই সে আমার আকাঙ্ক্ষার ধন না হ'য়ে, অবসাদের বোঝা হয়ে উঠ্‌লো! তা'র পর কি ক'রে যে প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্ত্তে অসময়ে, অকারণে, অযথা ভাবে তা'র কচি প্রাণটির মাঝখানটিতে ঘা দিতে লাগলুম, সে-সব কথা আর তোমায় ব'লবো না ভাই! এক দিন বাগান থেকে নিজের হাতে একটি করবী ফুল তুলে

এনে সে হাসি-মুখে আমার জামার বোতামে আটবো দিতে এলো, আমি তা'কে রূঢ় ভাবে ঠেলে দিয়ে ব'ললুম—'যাও, আমার এখন কাজ আছে, অতো ন্যাকামী করবার সময় আমার নেই!' লোহার সিন্দুকে হীরে জহরৎ ভরা র'য়েছে, কোনো দিন তা'কে প'রতে দেখিনি! এক দিন তা'কে ব'ললুম—'গয়নাগুলো কি তোমার প'রে চাপাবার জন্যে হ'য়েছে?' সে আমার রূঢ় কথা কাণে না তুলে ছেলে-মানুষের মতন হেসে ব'ললে—"হাঁগা, ভগবানের-দেওয়া রূপের চেয়ে কি মেয়েমানুষের আর-কিছু বড় রূপ আছে? গয়না রূপকে বাড়ায় না, ঢেকেই রাখে!' আমি তা'র এ নিরীহ-সরল কথার উত্তরে বিষ ছড়িয়ে ব'ললুম—'ভদ্র-সংসারে অতো রূপের দেমাক ভালো নয়, রূপ খুব দামে বিকোয় তা'দেরই যা'রা—!' এমন-একটা জঘন্য-কদর্য্য কথা আমার মুখে শুনবে—সে কোনো দিন ভাবতে পারে নি। তাই কেমন-যেন থম্‌কে গিয়ে আহতা হরিণীর মতন একটা মুহূর্ত্ত আমার হিংস্র মুখের দিকে কাতর চোখে চেয়ে সে ক্লান্ত চরণে আস্তে-আস্তে আমার কাছ থেকে চ'লে গেল। সেই দিনের পর আর কোনো দিন তা'কে হাস্‌তে দেখিনি!

"তা'র পর হঠাৎ এক দিন কাউকে কিছু না ব'লে, তা'র কোনো বন্দোবস্ত না ক'রে, তা'কে একলা ফেলে, ভারতবর্ষ ছেড়ে সোজা চ'লে গেলুম বিলেতে—ব্যারিষ্টারী প'ড়তে! তা'র পর কোনো দিন তা'কে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখিনি! তা'র খবর জান্‌বার কোনো ব্যগ্রতাই আমার ছিল না, তবে নায়েব-গোমস্তার চিঠিতে মাঝে-মাঝে তা'র খবর আমার কাণে পৌঁছতো।

"পুরো পাঁচটি বছর ক'লকাতায় আমার সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি কোণে সে দুঃখিনী চোখের জলে ভেসে নীরবে, নির্জ্জনে কাটিয়েছে। যে বাড়ীতে আমার ঘরের-লক্ষ্মী রূপে তা'কে বরণ ক'রে এনেছিলুম, যে-বাড়ীতে তা'কে আঘাতের পর আঘাত ক'রে জর্জ্জরিত ক'রে-ছিলুম, যে-বাড়ীতে তা'কে অসহায়া ফেলে বিলেতে পালিয়ে-ছিলুম, সে-বাড়ী ছেড়ে সে কোথাও যায়নি, সে-বাড়ীর মাটি কাম্‌ড়েই সে প'ড়ে ছিলো!

"এক দিন নায়েবের চিঠি পেলুম—লীনা হঠাৎ এক দিন রাত্রে ঘর ছেড়ে চ'লে গেছে—কোথায় গেছে কেউ জানে না! সেদিন বিলেতে প্রচণ্ড শীতের স্তূপীকৃত তুষার গ'লে বসন্তের প্রথম রোদ্ দেখা দিয়েছে, তরুণ-তরুণীর দল দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে হাইড্ পার্কে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, পাইন্-এ কচি পাতা গজাচ্ছে, চেরীর ফল ধ'রেছে,—দিকে দিকে জাগরণের সাড়া! আমি তখন যৌবনের নেশায় মাতাল হ'য়ে ভর-আবেশে ভেসে চ'লেছি! তা'র মাঝে লীনার এ অতি-নগণ্য খবরটা আমার কাণেই পৌঁছোলো না। কোথায় কোন্ সুদূর সাগর-পারে কে-একটা অবমানিতা, নির্য্যাতিতা, স্বামী-পরিত্যক্তা নারী কেন যে সংসারের আকাশ হ'তে খ'সে গিয়ে দিশাহারা আঁধারে পাড়ি দিলে,—সে-সব তুচ্ছ কথা ভেবে মাথা ঘামাবার ফুরসৎ তখন আমার ছিল না!

"আরও কিছুদিন এম্‌নিভাবে কাট্‌লো, লীনার কথা একেবারেই ভুলে গেছি!—কিন্তু আমার স্বর্গের মাঝখানে যা'র সোণার আসন বিধাতা পেতে রেখেছেন, আমার নিভৃত অন্তর-দেউলে যা'র পূজার পঞ্চ-প্রদীপ নির্নিমেষে জ্ব'লছে, আমার পরমাত্মার নাদ-লোকে যা'র সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা অবিরত ধ্বনিত হ'চ্ছে,—আমার সাধ্য কি আমার কাছ থেকে তা'কে ঠেলে দিই! এক দিন রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লুম—লীনাকে! সেই এক দিন বিয়ের রাতে সম্প্রদান সভায় হোমানলের দীপ্ত আলোয় আবেগ-কম্পিত হাতে তা'র গৌর সীমন্তে আয়তির গৌরব-রেখা এঁকে দিয়ে, তার সেই সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত রক্তাভ মুখখানি যে-রূপে দেখেছিলুম,—ঠিক সেই সদ্য-বধূরূপেই সুদূর প্রবাসে সে আমায় স্বপ্নে দেখা দিলে! চট্ ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল, বুকের ভেতরটা তখন কি-যেন এক সব-হারানোর ব্যথায় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে! অভিভূতের মতন বিছানার ওপর উঠে ব'সলুম!—দূরে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে বিগ্ বেল্ ঘণ্টাটায় ঢং ঢং ক'রে দু'টো বাজ্‌লো। বাকি রাতটা তেম্‌নি খাড়া হ'য়েই চুপ ক'রে বসে রইলুম!......

"পরের মেলেই দেশে ফিরলুম। ক'লকাতায় পৌঁছে বাড়ীর মুখে গেলুম। সদর-দরজার চৌকাটে পা দিয়েই একবার তড়িৎ-স্পৃষ্টের মতন চ'ম্‌কে উঠে থ'ম্‌কে দাঁড়ালুম! তা'র পর—দুঃখের পরশ-মণিকে আমার বুকের মাঝখানটায় একবার ভালো ক'রে ছুঁইয়ে নিতে শুষ্ক চক্ষে আমার শোবার ঘরে ঢুকলুম—সেই ঘরে, যে-ঘরে তা'কে দু'-হাতে জড়িয়ে ধ'রে জেগে-ঘুমিয়ে ফুলশয্যার রাত

কাটিয়েছি !—যে-ঘরে তা'র সেই উথ্‌লে-ওঠা রূপের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রেছি ! তা'র বড় ছবিখানার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মনে-মনে ব'ললুম—'দেবি, ক্ষমা চাইবার কোনো পথ আমি রাখিনি, তবু জানি আমি ক্ষমা চাইবার আগেই তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে !'

"তা'র পর বাড়ী থেকে সোজা বেরিয়ে প'ড়লুম ! আর কোনো দিন সে-বাড়ীতে ঢুকিনি,—এ-জীবনে আর কোনো দিন ঢুক্‌বো না। তা'রপর কত—কত বছর ধ'রে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তা'কে খুঁজে খুঁজে ফিরিছি ! যৌবন প্রৌঢ়ত্বে গিয়ে প'ড়লো, প্রৌঢ়ত্ব আজ বার্দ্ধক্যের সীমান্তে এসে পৌছেচে !···একদিন আচম্‌কা শুন্‌লুম সে এই বাগানে স্বর্গীয় গৌর মল্লিকের—!"

খানিকটা থামিয়া ভাঙ্গা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের থম্‌থমে অন্ধকারের পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী যেন ঘুমের ঘোরে বলিতে লাগিল—"এই ঘরে সে তার নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রেছিলো ! এর বাতাসের স্তরে স্তরে তা'র কত দিনের কত বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস জমাট্ হ'য়ে আছে ! সে যে কত বড় সতী ছিল, কেউ জানে না—ভগবানও জানেন না ! কিন্তু আমি জানি,—তা'র রক্তের প্রতি অণু-পরমাণুতে লক্ষ সীতা, কোটি সাবিত্রীর রক্তধারা মেশানো ছিল ! সেই চির-সতী স্ত্রী আমার, সেই অভিমানিনী লীনা আমার,—উঃ ! কী আগুনে পলে পলে জ্ব'লে, পুড়ে, ছাই হ'য়ে—!"

হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া উর্দ্ধে আকাশের পানে দু'টি ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিল—"না—না—এসো লীনা, ও মিথ্যা স্বর্গ ছেড়ে দিয়ে, এসো— আমার এই বুকের স্বর্গে নেমে এসো—!"

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীসুরজিৎ দাশ

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কর্ম্ম-জীবনের এমন দু' একটি কথা আমি জানি, যা' অনেকে জানেন না। আজ তাঁ'র তিরোধান দিনে সে কথা স্মরণ করছি।

কবি সেটেল্‌মেণ্ট্ অফিসার হয়ে মেদিনীপুর সুজামুঠায় আসেন। সুজামুঠা পরগণা বর্দ্ধমান মহারাজের জমিদারী। বর্দ্ধমান ষ্টেট্ তখন কোর্টস্ অব্ ওয়ার্ডসে ছিল। সাব্ ডেপুটি হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় সুজামুঠার ম্যানেজার ছিলেন। আমার বাবা ছিলেন সেখান্‌কার চেরিটেবল্ ডিস্‌পেন্সরীর ডাক্তার। আর কবির স্বগ্রামবাসী রামগোপাল মুখোপাধ্যায় সাব্‌রেজিষ্ট্রার ছিলেন। এই সব একান্ত অ-কবিদের নিয়ে সদ্য-বিলাত প্রত্যাগত কবি দুধের পিপাসা ঘোলে মেটাতেন। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বারো তেরো বছর হবে।

কবিবরের থাক্‌বার বাঙ্‌লা ছিল বড় একটা দীঘির উত্তর পাড়ে। দীঘির চা'র পাড়ে বকুল গাছের সারি; মাঝে মাঝে এক একটা বট গাছ।

কবি তখন জীবন যাপন করতেন খাঁটি সাহেবী ধরণে। তাঁ'র ভাষায় বলতে গেলে তিনি তখন—ফরাসী ধরণে কাসতেন, বিলাতি ধরণে হাস্‌তেন। 'পা ফাঁক্ করে' সিগারেট্ খেতে বড্ড ভালোবাস্‌তেন।

কবি সেই বাঙ্‌লার পুব্‌দিকের বারাণ্ডায় দক্ষিণ-মুখো হয়ে কখন ইজিচেয়ারে শুয়ে কাগজ পড়্‌তেন, কখন হার্‌মোনিয়াম্ বাজাতেন।

কবি ছোটো ছোটো ছেলেপুলেদের বড় ভালোবাস্‌তেন। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা তাঁর সাম্‌নে এগুতে সাহস পেতো না। দূরে দাঁড়িয়ে সাহেব দেখ্‌ত। তিনি তা'দের ডেকে ছবি দিতেন। আমার একটি দেড় বছরের বোন ছিল। কবি তাঁকে কোলে কর্‌তে চাইতেন—সে সাহেব দেখে ঘাব্‌ড়ে যেত। শেষে এক দিন ধুতি পরে আস্‌তে, সে কোলে এল। তিনি হেসে বলতেন—"ও আমাকে বিলেতি বাঁদর 'মনে করেছে।" "আম্‌রা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর; হ্যাট্‌কোট্ পরে' সেজেছি বিলেতি বাঁদর।"

কে জানে এই কবিতাটির কল্পনা এই ঘটনায় তাঁ'র মনে উদিত হয়েছিল কি না।

এক মাসকাবারে তিনি মাইনে পাওয়ার পর ঘর থেকে দু'শ টাকার নোট্ চুরি গেল। কবি খান্‌সামা বাবুর্চি মেথর সবাইকে ধমকালেন, তবু তা'র কোনো কিনারা হ'ল না। শেষে কিছু দিন পরে এক দিন হারমোনিয়াম বাজাতে গিয়ে দেখ্‌লেন, সেই দু'শ টাকার নোট হারমোনিয়ামের ভিতরে আছে। তখন তিনি অনুতপ্ত হ'য়ে সবাইকে ডেকে দেখালেন। বৈষয়িক লোক হ'লে ভুল প্রকাশ করা আহম্মকি মনে করে চেপে যেতেন। কবি এই করেই ক্ষান্ত হলেন না। তা'দের বৃথা দোষী করেছেন বলে প্রত্যেককে এক এক মাসের মাইনে দিয়ে নিজেকে দণ্ডিত করে শান্তি পেলেন। এতে তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কত দূর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই ঘটনাটি কবির ম্যাথর ভাগবত ঘড়াইর মুখে শুনেছি। সে এখনও জীবিত আছে।

কবিকে কার্য্য-ব্যপদেশে প্রায়ই মফঃস্বলে যেতে হ'ত। কবি-পত্নীর সখ হ'ল—তিনি মফঃস্বল দেখ্‌বেন। রাজবাড়ীর হাতী চড়ে কবি ও কবিপত্নী চল্লেন। সেটা চৈত্র কি বৈশাখ মাস হবে। এই গরমে মাঠে মাঠে দু'মাইল রাস্তা গিয়ে বেলা বারোটায় পৌঁছলেন ক্যাম্পে। ক্যাম্পের চাপরাসী বৈদ্যনাথ মাইতি দু'টি ডাব কেটে এনে তাঁ'দের সাম্‌নে ধর্‌লে। তৃষ্ণার্ত্ত কবি-দম্পতি তা'র এই সেবাপরায়ণতায় ভারি খুসি হলেন। কবি তা'কে দু' টাকা বক্‌সিস্ দিলেন। কবিপত্নী বল্‌লেন—এমন কষ্টে যে এতখানি আরাম দিলে, তা'র বক্‌সিস্ দু'টাকা ?"

কবি তৎক্ষণাৎ তা'কে চা'র টাকা বক্‌সিস্ দিলেন।

কবি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই সাহেব সেজে থাক্‌তেন, কবিপত্নী বাসায় শাড়ী পর্‌তেন, বৈকালে বেড়াবার সময় গাউন্ পরে বেরোতেন। কবি খেতেন বাবুর্চির রান্না; কবিপত্নী খানা খেতেন না। তাঁর জন্য একজন বামুন ছিলেন। যতটা মনে হয়—তাঁ'র নাম রাম ছিল। বুড়া বাবুর্চির নাম মনে নাই। কবি-দম্পতি এইভাবে জীবন যাপন কর্‌তেন। তাঁরা এখন বেঁচে থাক্‌লে বল্‌তে পারা যেতো—"বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়া ছিল শাক্ত।"

যা কিছু বীরত্বব্যঞ্জক, যা কিছু তেজস্বিতার পরিচায়ক, তাই ছিল কবির প্রিয়। আমাদের এক ছোক্‌রা চাকর ছিল, কবি আমার বাবাকে বল্‌তেন—"ডাক্তার বাবু, কষ্টি-পাথর কোঁদা আপনার চাকর ছোক্‌রাকে দেখ্‌লে ইচ্ছা হয়, ওর সঙ্গে শরীরটা বদ্‌লাই।"

একদিন কবি ও কবিপত্নী বেড়াতে বেরিয়ে দেখ্‌লেন, পথে একটা লোক কাঠ চেলা কর্‌ছে। কবি একটু দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেন। শেষে তা'র হাত থেকে কুড়ুল নিয়ে খানিকটা কাঠ চেলা করে ফেল্‌লেন। কবিপত্নী তো হেসেই খুন।

কবি কুসুম-কোমল হলেও বজ্র-কঠোর ছিলেন। একবার তাঁর এক জন চাপরাশীকে সেখানকার সব্ ম্যানেজার অন্যায় রূপে অপমান করেন। তা'তে কবি নিজেকে অপমানিত বোধ করে, চাপরাসীর পক্ষ সমর্থন করেন। শেষে বেগতিক দেখে ম্যানেজারবাবু নিজে বাঙ্‌লায় এসে মুরুব্বিআনার ভাব দেখিয়ে মিটিয়ে ফেলেন।

তখন মাত্র কবির দু'খানা বই বেরিয়েছে—"আর্য্যগাথা" আর "একঘরে"। কবি দু'খানা বইই বাবাকে দিয়েছিলেন। 'একঘরে'র এই কবিতাটি আমি মুখস্ত করে' ফেলেছিলাম।—

"বিলাত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়,
মুড়িয়ে মাথা ঢেলে ঘোল,
ধর্‌লেন আবার মাছের ঝোল ;—ইত্যাদি।

কবির সাধারণ আলাপেও কবিত্ব প্রকাশ পেতো। কবির স্বদেশবাসী রামগোপালবাবুর ছেলে মেয়েরা ছেলেবেলা দেখ্‌তে খুব সুন্দর থাকৃত, বড় হলে বিশ্রী হয়ে যেতো। আর কবির শ্যালক শ্যালিকাদের ছেলেবেলা তেমন ভাল দেখাত না, বড় হ'লে চেহারা খুল্‌ত। কবি রহস্য করে বল্‌তেন—"মেয়ে মানুষ দু'রকম থাকে ; কুকুর-বিয়াণী আর ময়ূর-বিয়াণী ।"

কবি হারমোনিয়াম্ আর বেহালা বাজাতে পার্‌তেন। আমার যতদূর মনে হয়—তব্‌লা বাজাতেও যেন তাঁকে দেখেছি। কিছু দিন একজন ওস্তাদ রেখে সেতার শিক্ষা কর্‌ছিলেন। ওস্তাদ কোথায় যেন দূরে থাক্‌তো, প্রতি রবিবার এসে তাঁকে শেখাতো। কবি এমন সদাশয় ছিলেন—অনেক সময় সান্ধ্য বৈঠকে বেহালা বাজিয়ে নেচে গান কর্‌তেন। কবির গীতস্পৃহা এত বলবতী ছিল যে, সামান্য যাত্রা গান কীর্ত্তন মনোযোগী হয়ে শুন্‌তেন। যাত্রার কথা বল্‌তে গিয়ে একটা কথা মনে হ'ল। একবার রাজবাড়ীতে ভবতারণ পাহাড়ীর যাত্রা হচ্ছে—"শ্রীমন্তের মশান"। কার একটি

ছোট ছেলে উপরের রেলিং পার হয়ে কার্নিসের উপর এসে দাঁড়িয়েছে ; তাই দেখে নীচে থেকে একজন "পড়্‌ল পড়্‌ল" করে চেঁচিয়ে উঠেছে। ভূমিকম্পে বাড়ী পড়্‌ছে মনে করে সকলে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে লাগ্‌ল। তা'তে যাত্রা ওয়ালাদের বেহালা কার পায়ের চাপে ভেঙে গেল। কবি দুঃখিত হয়ে বল্‌লেন—"কার পায়ের চাপে ভেঙেছে যখন কেউ দেখেনি, তখন হয়ত আমার পায়ের চাপেও ভাঙ্‌তে পারে।" এই বলে দাম দেবার জন্য বিশেষ জেদ্ কর্‌তে লাগলেন ; তাঁ'রা তা' নিলেন না।

আগেই বলেছি যে দীঘির চার পাড়ে বকুল গাছ আছে। কবির বাঙ্‌লার পাশেই একটা বড় বকুল গাছ ছিল। ছিল কেন, এখনও আছে। কবিপত্নী রোজ সকালে ফুল কুড়িয়ে তা'র তলায় বসে মালা গাঁথ্‌তেন। এক দিন এক ছড়া মালা গেঁথে কবির গলায় পরিয়ে দিলে, কবি বলেছিলেন—

"একি আমার বিজয় মাল্য ?"

তা'র পর কবি একটা গান বেঁধে ফেল্‌লেন—

"আমি সারা সকালটি বসে বসে
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।"

সেদিন সন্ধ্যায় ঘটনাটি বলে' আমার বাবাকে গানটা গেয়ে শোনালেন। এই গানটি কবি উত্তরকালে সাজাহান নাটকে দিয়েছেন। কাব্য জিনিসটা একেবারে কল্পিত নয়। কবির জীবনের এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছায়া। •

এবার কবির আর একটি মহত্ত্বের কথার উল্লেখ করে আমার কথা শেষ কর্‌ব। কবির একবার খুব জ্বর হয়। বাবা তাঁকে আরোগ্য করেন। কবি পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করেও বাবাকে টাকা গছাতে না পেরে নিরস্ত হ'লেন। বাবা মনে কর্‌লেন গোল মিটে গেল। কিন্তু তা'র কিছু দিন পরে কবি কল্‌কাতা থেকে ফিরে এসে একখানা "প্রাকৃটিস্" বাবাকে উপহার দেন। তা'তে কবির নিজ হাতের লেখা আছে—Presented to Babu Kailash Ch. Das Gupta with D. L. Roy's Compliment

সে বইখানা আমি খুব যত্ন করে রেখেছি—যতদিন বাঁচ্‌বো রাখ্‌বো।

যখনই আমি সুজামুঠায় যাই, কবির আবাস-স্থানটি দেখে আসি। সে বাঙ্‌লা আর নাই। সে বকুল গাছটি, সেই দীঘিটি, আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। আমি মনে করি, প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীরই সেটি শ্রদ্ধেয়। আমি কবি-পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারকে অনুরোধ কর্‌ছি; তিনি তাঁর পিতা-মাতার স্মৃতি-জড়ানো স্থানটি একবার প্রত্যক্ষ করে আসুন।

মনের মত

শ্রীরেবা দেবী

দুপুর বেলা, মুখুযোদের বাড়ীতে কোন সাড়া-শব্দ নেই, ঘুম-পাড়ানী বুড়ী বাড়ীর ছেলে-বুড় সকলকেই নিজের কবলে এনেছে, কেবল একজন মেয়ে বাদ পড়ে গিয়েছে। অনিতা নিজের ঘরে জোরে সেলাইয়ের কলটা চালিয়ে দিলে,—এক নিশ্বাসে হাতের কাজ সাঙ্গ করে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি ; তবে শীতটা একেবারে যায় নি। অনিতা একবার দিদিমার মহলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। রোদে পা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি দিব্য আরামে নাসিকা গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এ পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর রাঁধু ঝির পাঁচ বছরের ছেলেটা হাঁ করে শুয়ে আছে। মাদুর ছেড়ে সে যে মেজের উপর পড়ে আছে, এটা বোঝ্‌বার ক্ষমতাটা বুঝি তখন তার ছিল না। গ্রামের একটা ঘেও কুকুর কুয়োতলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মগ্ন! এদিকে সোণালী বেড়ালটা খাবার ঘরে একটা আসনের উপর নিজের বেশ সুব্যবস্থাই করে নিয়েছে।

অনিতার মনে হল, সে যেন রূপকথার কোন্ এক ঘুমন্ত পুরীতে এসে পড়েছে,—এই নিস্তব্ধ, নিঝুম বাড়ীটা যেন রাক্ষসীর মত তাকে গিল্‌তে আসছে।

আস্তে আস্তে সে তার মাসিমার সন্ধানে বেরুল। তাঁর শোবার ঘর খালি দেখে অনিতা বুঝ্‌লে যে, তিনি এ বাড়ীতেই নেই,—তিনি এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর সইএর বাড়ী তাসের আড্ডায় জমে গিয়েছেন।

বিরক্ত হয়ে অনিতা খিড়্‌কির দোর দিয়ে বেরিয়ে

পড়ল। অনেকখানি জমির উপর তাদের বাড়ীটা,—চার ধারে নানা রকম ফলফুলের গাছ। সে একটা শিউলি গাছের তলায় আশ্রয় নিলে। এখানেও মানুষের কোন চিহ্ন নেই; তবে দু'একটা জাগ্রত প্রাণী তার নজরে পড়ল। দূরে ঐ গোয়াল-ঘরের সামনে কালো ভাগলপুরী গাইটা নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটছে; আর তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তার ক'দিনের বাছুরটা। পাতার খড়্ খড়্ শব্দে বেশ বোঝা যায় যে, কাটবিড়ালীরা এবার তাদের আহারের অন্বেষণে বেরিয়েছে।

অনিতা ধীরে ধীরে তার জামার ভিতর থেকে একখানা চিঠি বের করলে। চিঠিখানার অবস্থা দেখে মনে হয়, খুব কম করে বার দশেক সেটা পড়া হয়েছে। চিঠিটা আসছে তার বন্ধু সুধার কাছ থেকে। সে লিখছে :—

"ভাই অনু,

তুই যে একেবারে ডুব দিলি, তোর হ'ল কি? পাড়াগাঁ লাগছে কেমন? আর একটা মাস থাকতিস্ যদি, তা হলে আমরা সব একসঙ্গে কলেজ-ষ্টুডেন্ট হয়ে যেতাম। সত্যি বলছি ভাই, তোকে না হলে মোটেই জমে না। আমাদের ক্লাশে অনেক নতুন মেয়ে এসেছে। তবে তারা আমাদের দলের মধ্যে কখনই ঢুকতে পারে না। আর ছাই দলই বা কাকে বলি—আমাদের দলপতিই এখন আমাদের ছেড়ে বনবাসে গিয়েছে। দু'মাস হতে চল্ল—তুই একখানাও চিঠি দিলি না। প্রথমে রাগ করে ভেবেছিলাম, চিঠিই লিখ্ব না। তার পর ভেবে দেখ্লাম, এতে তোর কিছু হবে না, আমারই লোকসান্. তাই আবার কলম ধরেছি। যাক্, এতে কোন জোর নেই,—তুই যদি মনে করে নিজের খবরটা মাঝে মাঝে দিস তো সে আমার পরম ভাগ্যি।

এবার কলেজের ক'একটা খবর দিই। আমাদের ইতিহাসের প্রোফেসরটি একটি দেখ্বার জিনিস। ওঃ, কি তার বাহার! এই লুটিয়ে কোঁচা,—গায়ে প্রায় গরদ কি তসরের পাঞ্জাবি। আমরা তার নাম রেখেছি "জমিদারের জামাইবাবু।"

ও ভাই, এক দিন কি বিপদে পড়েছিলাম—কি আর বলি! কেন যে মরতে হীল-তোলা জুতো পায়ে দিয়েছিলাম, তা সে আমিই জানি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ওমা এক পায়ের হীল গেল খুলে,—আমার চোখের সামনে দিয়ে সেটা গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে গিয়ে পড়ল,—আমি একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময় জামাইবাবু বেরিয়ে এলেন। হঠাৎ খটাং করে একটা জুতোর হীল তাঁর ঘাড়ে এসে পড়াতে তিনি তো একেবারে অবাক! কি ভাগ্যি মোটা হেমাঙ্গিনীটা সিঁড়ি দিয়ে সেই মুহূর্ত্তে নামছিল, তাই আমি রক্ষা পেলাম। যেই না ওকে দেখা, অমনি আমি তার পিছনে সোরে গেলাম। জামাইবাবু উপর দিকে চেয়ে মুটকুকেই দেখ্তে পেলেন,—ঠিক ভেবে নিলেন, এ তারই জুতোর হীল। ওঃ, কি বাঁচন্টাই বেঁচেছি! আর কখনও হীল-দেওয়া জুতো পরব না এটা ঠিক।

আর এক দিন ভাই, এই বাঁদর স্নেহটার জ্বালায় এই রকম আর একটা বিপদে পড়তে হয়েছিল। জানিস্ তো ভাই, একটু চাটনী না হলে আমার ভাত মোটেই রোচে না, তাতে আবার স্কুলের ভাত। সেদিন চাট্নীটা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই স্নেহ বাড়ী থেকে এনে দেবে বলেছিল। যেই ভাই হিষ্ট্রি ক্লাশে ঢুকতে যাব,—ও বাঁদরটা ঠিক তখনই আমার হাতে আচারের বোতলটা তুলে দিলে। আর কি ভাই আমি লোভ সাম্লাতে পারি? বাইরে দাঁড়িয়েই একটা আমের কুচো মুখে দিলেম। স্নেহ অম্নি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে—'ভিতরে আয়, জামাইবাবু এখনও আসেন নি।' আমার এক হাতে আচারের বোতল, আর এক হাতে আমের টুক্রো,—যেই না এ অবস্থায় ক্লাশে ঢোকা, ওমা চেয়ে দেখি—প্রোফেসর মশায় দিব্যি চেয়ারের উপর বসে আছেন। প্রথমটা আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তার পর কোন দিকে না চেয়ে একেবারে দে ছুট্। সোজা গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে বল্লাম যে, আমি হিষ্ট্রি ছেড়ে দেব। তা' তিনি কিছুতেই শুন্লেন না, আবার আমায় ক্লাশে গিয়ে বস্তে হ'ল। এবার একেবারে পিছনে গিয়ে বস্লাম। তাতেও কি কিছু হয়? দুষ্টু লোকটা ঘাড় উঁচু ক'রে ক'রে আমার দিকে চায় আর হাসে।

আরও অনেক খবর আছে। তোর যদি চিঠি পাই তবে আবার জানাব। তা' না হলে এ সব রইল।

হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি কনকের সেই খোকা দাদাকে মনে আছে? সেই যে ব্যক্তি টেনিস্ খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মোটর হাঁকান থেকে আরম্ভ করে পিয়ানো বাজিয়ে গানও কর্‌তে পারে? ইলা শুন্ছি না কি

তাকে বিয়ে করবার জন্তে একেবারে পাগল। তাঁর পিছনে সে এমন লেগেছে যে বেচারা ভদ্রলোক না কি শীঘ্র কোলকাতা ছেড়ে কোথায় পালাচ্ছেন। ছিঃ, মেয়েগুলোর কি একেবারে লজ্জা নেই? এ সব "লভে পড়া" মেয়েদের জ্বালায় আমাদেরও নাম খারাপ হয়। ছিঃ ছিঃ, এমন নির্লজ্জের মত একটা পুরুষের পিছনে ছোটাছুটি করার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল নয় কি?

আজ এখানেই শেষ করা যাক্। যে হাতের লেখা,—পড়তে পারলে হয়। লক্ষীটি ভাই, যত শীঘ্র পারিস চিঠির উত্তরটা দিস্,—আমি তোর চিঠির আশায় পথ চেয়ে রইলুম ইতি—

তোর সু"

অনিতা চিঠিটা শেষ করে আবার যথা স্থানে রেখে দিলে। কত সুখ-দুঃখের কথা ঠিক আলো-ছায়ার মত তার মনের মধ্যে খেলে গেল। মাকে তার মনে নাই, তার বাপই তার সর্ব্বস্ব ছিল। ঠিক ম্যাট্রিক দেবার এক মাস আগে হার্ট ফেলিয়রে তার পিতার মৃত্যু হয়। অনিতা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। এক দিদিমা আর এক বিধবা মাসি ভিন্ন তার তিন কুলে কেউ ছিল না। এই দুটি বিধবা জন্মাবধি গ্রামেই বাস করতেন,—তাঁরা কিছুতেই নিজের ভিটা ছেড়ে অনিতাকে নিয়ে কোলকাতায় থাকতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে অনিতাকেই তাদের কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হল। কোল্‌কাতার বসবাস উঠিয়ে দিয়ে অনিতা তার অল্প-পরিচিত দিদিমা ও মাসিমার কাছে চলে গেল।

আজ প্রায় ছয় মাস হ'ল অনিতা দিদিমার কাছে আছে। এত দিনে পল্লীগ্রামের চাল-চলন তার একটু দোরস্ত হয়ে এসেছিল। সুধার চিঠি পেয়ে অবধি কিন্তু অনিতার আর একদণ্ড এখানে থাকবার ইচ্ছা করছিল না। মনে হচ্ছিল, সব ছেড়ে দিয়ে কোল্‌কাতায় পালিয়ে যায়। সেখানে সে অনায়াসে একটা বোর্ডিংএ থেকে পড়া-শুনা করতে পারে। এ কথা আজ সে দিদিমার কাছে তুলেছিল। তিনি কিন্তু সে কথায় একেবারে কাণ দেন নি। বেশী পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—"আমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কখন ইস্কুলে থাকে নি,—সেই অনাচারীদের মধ্যে আমি তোমায় যেতে দিতে পারব না, আমি মোলে যা খুসী তাই কোর।" এর উপর আর কথা বলা চলে না,—অনিতা মুক্তির আশা ছেড়ে দিলে।

অনেকক্ষণ গাছতলায় বসে সে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করলে। সে বেশ ভাল করেই বুঝেছিল যে, এখান থেকে ছাড়া পাবার তার কোন উপায় নেই। তার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে বলে তার দিদিমা আর মাসিমা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,—তার জন্তে তাঁদের লোক-সমাজে মাথা কাটা যাচ্ছে। তাকে বিয়ে করতেই হবে এবং সেটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। অনেক করে সে তার মনকে বোঝালে; কিন্তু তার বাঁকা মন কিছুতেই বুঝতে চাইছে না। চির জীবন কি তার এই পল্লীগ্রামেই কেটে যাবে? এ কথাটা সে কিছুতেই মানতে চাচ্ছিল না।

রোদ পড়ে এসেছে দেখে অনিতা ভিতরে যাবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় দেখে যে, একজন ভদ্রলোক তাদের বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখেই বৃদ্ধ বল্লেন—"হ্যাঁ মা, এটা কি অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ী? আমি তাঁর নাত্‌নীর জন্য একটি সম্বন্ধ এনেছি।" ফস্ করে অনিতা বলে ফেল্লে—"তাঁর নাত্‌নীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।" বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"ও মা, কবে হল? কৈ আমরা তো কিছু শুনিনি? শশী বিশ্বেস সেদিন আমাদের গ্রামে গিয়েছিল। তা সে ত অন্নপূর্ণা দেবীর নাম করে বল্লে কি যে, তাঁর নাত্‌নীর বিয়ের বয়স হয়েছে, তার জন্তে যেন একটি পাত্তর খুঁজে দেওয়া হয়। আমি এত দিনে ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি, তাই তাঁকে বল্‌তে এলাম। তা তাঁর নাত্‌নীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে? যাক্, ভালই হ'ল, আইবুড় মেয়ে যত শীঘ্র বাড়ী থেকে বিদেয় হয় ততই ভাল।" অনিতা আর বেশী কিছু বল্লে না, বৃদ্ধও আবার অনেক দূর যেতে হবে ব'লে একটা গরুর গাড়ীর সন্ধানে চলে গেলেন। অনিতা খানিক চুপ করে পথের দিকে চেয়ে রইল; তার পর বৃদ্ধকে যখন আর দেখা গেল না, তখন সে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

মাসিমা বাড়ী এসে খবর দিলেন, আজ তাঁর সইএর জামাই কোলকাতা থেকে আস্‌বে; তাই রাত্রে তাঁদের ওখানেই খাওয়া। মাসিমার সই বাঁড়ুযে-গিন্নি লোক ভাল; সকলেরই সঙ্গে তাঁর ভাব। তাঁর বড় মেয়ে সরসীর শ্বশুরবাড়ী কোল্‌কাতায়; তার স্বামী নরেন সেখানেই

কাজ করে। সরসী'র শরীর খারাপ বলে' সে কিছু দিন হল বাপের বাড়ী এসেছে। সরির বরের বিষয়ে অনিতা অনেক কথা শুনেছিল বটে, তবে তাকে এক দিনও দেখে নি।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই,—মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন, তখনও অনিতা রোয়াকে বসে সোণালীর সঙ্গে খেলা করছে। তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"ও কি হচ্ছে অনু? বেলা গেল যে, কাপড়চোপড় ছাড়বে না? মানুষ খেতে বলেছে বলে কি একেবারে খাবার মুখেই যেতে হয়? যাও—কাপড় ছেড়ে ফেল গে। আর দেখ, একটু ভাল করে [illegible]। অনেক তো কাপড় আছে,—বেছে বেছে কি যে সব বুড়ির মত সাদা কাপড় বার কর, তার ঠিক নেই।"

তার পর একটু সুর নরম করে বল্লেন—"ওঠ্ মা, অমন করে বেড়াল ঘাঁটিস নি বাবু, দেখ্‌লে গা কেমন করে। যা বাছা যা, ঝপ্ করে সেরে নে।" অনিতা সোণালীকে কোল থেকে নামিয়ে বল্লে—"মাসিমা, আমার জন্য তুমি দাঁড়িও না, তুমি বেরিয়ে পড়, আমি এখুনি সব সেরে নিচ্ছি, আজ আমার মাথাটা বড় ধরেছে, আমি একটু তাল-বনের দিকে বেড়িয়ে বড় মাসিমার ওখানে সন্ধ্যার আগেই গিয়ে পৌছব।"

মাসিমার তখন সইএর ওখানে যাবার জন্যে প্রাণ হাঁপাচ্ছে, একবার নিজের মনেই বল্লেন—"কোল্‌কাতার মেয়েদের ঐ এক রোগ—মাথা ধরা! আমাদের ত বাপু মর্‌বার বয়স হল, মাথা ধরা কাকে বলে তা জানিই না।" কথা শেষ হবার আগেই তিনি বাড়ীর বার হয়ে গেলেন।

অনিতার আজ মাথা ধরার কারণ ছিল। সে আজ দুপুরে যে কাজটা করে ফেলেছে, তার জন্যে তার অনেক ভোগ আছে, সে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পার্‌লে। সরসীদের ওখানে যাবার তার কোনই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু না গেলেও নয়। সে চিন্তিত ভাবে কাপড় ছাড়তে গেল। সাদা কাপড় দেখ্‌লে মাসিমা চোটে যাবেন, হয়ত সব লোকের সাম্‌নেই তাকে বক্‌তে সুরু করে দেবেন, তাই সে নট্‌কানে ছোপান একটা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল।

সূর্য্য তখনও একেবারে অস্ত যায় নি। পশ্চিম আকাশ-টাকে কে যেন একরাশ আবীর ঢেলে রাঙিয়ে দিয়েছে। সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে যে বাঁকা পথটা এঁকে বেঁকে চলেছে, সেইটা ধরে অনিতা তালবনের ভিতর ঢুক্‌ল। মাথার উপর দিয়ে ধব্‌ধবে সাদা বকগুলো উড়ে যাচ্ছে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে। দূরে গ্রামের ঐ নির্জ্জন পথে কোন রাখাল ছেলের বাঁশীর করুণ স্বর এই ফাল্গুনের গন্ধ-ভরা সন্ধ্যা-বাতাসকে পাগল করে কেঁদে কেঁদে মিশিয়ে যাচ্ছে কোন্ শূন্যের মাঝে!

অনিতা ধীরে ধীরে একটা গাছের নীচে এসে বসল। কত এলোমেলো ভাব্‌না তার মনকে একেবারে গ্রেপ্তার করে ফেল্লে। এমন সময় মনে হল, কারা যেন এইদিকেই আসছে। তাদের দামী সিগারেটের গন্ধ তাদের আগমনের বার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছে। এদের মধ্যে একজন যে সরির বর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। অনিতা একবার ভাব্‌লে পালায়। কিন্তু পালাতে গেলে এদের সাম্‌নে দিয়ে যেতে হবে। তার চেয়ে বরং গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা ভাল। তারা নিশ্চয় এখুনি চলে যাবে। তারা সরে গেলেই সে ঐ ঘোষেদের আমবাগানের মধ্যে দিয়ে বড় মাসিমার ওখানে চলে যাবে। তাদের যাবার কিন্তু কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং তারই অতি নিকটে আর এক সারি তালগাছের আড়ালে তারা নিজের আসন গাড়্‌লে।

অনিতা মহা বিপদে পড়ল,—পলায়নের কোন আশা নেই। তারা যতক্ষণ থাক্‌বে, তাকেও ততক্ষণ বসে থাক্‌তে হবে। ভয়ে তার নিশ্বাস ফেল্‌তেও সাহস হল না। সে একেবারে জড়সড় হয়ে এক পাশে চুপ করে বসে রইল।

দু'জন লোকের মধ্যে একজন বল্লে—"ওহে, এখানে কি নট্‌কানের গাছটাছ আছে না কি? আমি যেন নট্‌কানের গন্ধ পাচ্ছি।"

ভয়ে অনিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হল; এইবার যদি ধরা পড়ে! এর চেয়ে এদের সাম্‌নে দিয়ে চলে যাওয়াও যে ছিল ভাল!

অপর লোকটি একটু হেসে বল্লে—"দূর পাগল, এখানে আবার নটকানের গাছ কোথায়? এখানে বেশীর ভাগই তো তাল গাছ, এর নামই যে তালবন।"

সরির বরটা কি বোকা, কলকাতার মানুষ বলে কি তাল গাছও চেনে না? অনিতার হাসি পেল। লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে আবার বল্লে—"গাছ থাকুক বা না থাকুক, আমি কিন্তু নট্‌কানের গন্ধ পাচ্ছি।" পুরুষ মানুষের এত নাক? সরির সৌখীন বরের জালায় যে অস্থির!

অপর লোকটি বল্লে—"বোধ হয় এদিক দিয়ে কেউ

নট্‌কান নিয়ে গিয়েছে, তারই গন্ধ বাতাসে রয়ে গিয়েছে।"

"হবে।"

তার পর সে আবার বল্লে—"আঃ. এই নট্‌কানের গন্ধটা আমার বড় ভাল লাগে,—কত কথা যে মনে পড়ে! সত্যি, এ গন্ধটা আমায় একেবারে পাগল করে তোলে।"

"কি কথা মনে পড়ে শুনি?"

"ও, সে অনেক কথা।"

"আরে বল্ না ছাই শুনি।"

খানিক বাদে সরির বর বল্লে—"জানিস্, এই নট্‌কানের গন্ধ পেলেই আমার মনের মধ্যে একটি মেয়ের ছবি জেগে ওঠে—"

অনিতা অন্যায় জেনেও সরির বরের কথাগুলো শোন্‌বার জন্যে কাণ খাড়া করে রইল।

"—তার রংটা খুব সাফ নয়, এই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হবে। কি জানি কেন নট্‌কানের সঙ্গে আমার খুব ফর্সা রং ভাল লাগে না। তার চোখ দুটো বেশ ভাসা-ভাসা; তবে সব থেকে ভাল তার মিষ্টি মুখের হাসিটি। বেশ ছিপছিপে দোহারা চেহারা—মোটা মেয়েদের আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি না, তবে একেবারে খুব রোগাও ভাল না,—বেশ গোল-গাল গড়ন, আর তার মাথায় একরাশ চুল। মেয়েদের এই চুলের মধ্যে যে কতখানি সৌন্দর্য্য লুকান থাকে, তা বলা যায় না। আমার মনে হয়, আমি মানুষ বাদ দিয়ে শুধু একরাশ কালো কোঁকড়া চুলকে ভালবাস্‌তে পারি।"

বন্ধু তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে—"আরে থাম্ থাম্, একেবারে অত কবিত্ব করিস্ নি, আমার এই মোটা বুদ্ধিতে তত ভার সইবে না। দাঁড়া কতদূর গিয়েছিস্—মেয়েটির মাথায় গাদা গাদা চুল আছে, তার পর?"

"থাম, তুই অমন ভাবে বলিস্‌নি,—সব মাটি হয়ে যাবে। তার মাথায় একরাশ চুল একেবারে পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা চুলের গুচ্ছগুলো তার গালে কপালে সারাক্ষণই খেলা করছে, আর তার কপালে জ্বল-জ্বল করছে একটা বড় সিঁদুরের টিপ। এই নট্‌কানের মৃদু গন্ধ নিয়ে সে যখন সরল সহজ গতিতে কাছ দিয়ে চলে যাবে, তখন মনে হবে—"

ব্যস্ত হয়ে বন্ধু বলে উঠ্‌ল—"যথেষ্ট হয়েছে, এবার ক্ষান্ত হও। এসব রাত-দিন কবিতা পড়বার ফল। আজকালকার এই কাজের দিনে নট্‌কানের শাড়ী পরে কেউ তোমার মন ভোলাতে আস্‌বে না। গৃহিণীরা কাজের ভিড়ে ওসব কবিত্ব করবার সময়ই পান না।"

"আরে বোকা, এ সব যে হবার নয় তা কি আমি জানি না? না, আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে এসব খুঁজতে যাব? স্ত্রী তো হল আটপৌরে জিনিষ,—এটা হ'ল আমার মানস প্রতিমা, এ মনেই থাকে।"

অনিতার বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল—"মানস-প্রতিমার সঙ্গে স্ত্রীর কি কোন্ মিল হবার উপায় নেই? এ দুটোকে কোন রকমে জোড়া তাড়া দিয়েও কি এক করা যায় না?" সরি'র বন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে বল্লে—"আচ্ছা, আপাততঃ তোমার মানস-প্রতিমা তোমার মনেই থাক্, এখন বাড়ী যাওয়া যাক্ চল।" দুই বন্ধুতে বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

খিড়্‌কির দোর দিয়ে অনিতা বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী ঢুক্‌ল। রান্নাঘরের দিকটা একেবারে খালি। কেবল এক কোণায় মতি ঝি উবু হয়ে বসে কলাপাতা ধুচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি মতিকে অন্য কাজে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজেই পাতা ধুতে আরম্ভ করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে তার মাসিমা আর সরির মা সেদিকে এসে অনিতাকে দেখে একেবারে অবাক্। মাসিমা গালে হাত দিয়ে সুর করে বল্লেন—"ও হরি, এখানে বসে পাতা ধোয়া হচ্ছে? আমরা ভেবে মরি—মেয়ে এখনও বাড়ী এল না কেন। এই মাত্র ভজাকে লণ্ঠন নিয়ে তালবনে যেতে বল্‌ব ভাব্‌ছিলুম, তা এসে একটু খবর দিতে হয়—"

সরির মা একটু এগিয়ে এসে বল্লেন—"হ্যাঁ রে অনু, তোকে কি আমি পাতা ধুতেই ডেকেছি না কি? পাড়ার সব বৌ-ঝিতে মিলে ওপরের ঘরে কত হাসি-ঠাট্টা করছে, আর তুই সেই অবধি একা বসে পাতা ধুচ্ছিস? যা মা, উপরে যা, সরি সেই অবধি অনু অনু করে হেদিয়ে গেল। মতিটাকে বল্লাম পাতা কটা ধুয়ে দিতে, তা সে নিশ্চয় পান-দোক্তার নাম করে পালিয়েছে—! এই মাগীগুলোকে নিয়ে আর পারি নে বাবু।"

অনিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—"না, বড় মাসিমা, মতির দোষ নেই, আমিই ওকে ছুটি দিয়েছি। উপরে যাবার আগে ভাব্‌ছি, খাবার জায়গাগুলো করে দিয়ে যাই।"

"না, তোকে ওসব করতে হ'বে না। এমন মেয়েও তো

কোথাও দেখি নি। কোথায় একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে,—না, কেবল কাজ আর কাজ। আমরা বুড়ীরা সব রয়েছি কি করতে?"

"না বড় মাসিমা, আমাকে করতে দাও,·· তোমরা গল্প করতে যাও। চিরকালই কি তোমরা খাটবে না কি? আমি এক দণ্ডের মধ্যে সব সেরে নিচ্ছি। বাইরের ঐ বসবার ঘরেই তো খাওয়ান হবে? সেইখানেই পাতা সাজাইগে যাই।" অনু জায়গার বন্দোবস্ত করতে চলে গেল।

সরির মা সস্নেহে অনুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"সই, অনুর মত মেয়ে বাপু দেখা যায় না,—ও যার হাতে পড়বে লক্ষ্মী তার ঘরে বাঁধা থাকবে।"

মাসিমা ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"ও যে কার হাতে পড়বে আমার এখন তাই ভাবনা। পেটে তো কাউকে ধরিনি আমি—এক রকম ঐ সব চিন্তে থেকে রেহাই পেয়েছিলাম। এখন আবার ঐ মেয়েটা এসেছে। যা হোক করে ওর একটা উপায় করে দিতে হবে তো? আপন বল্‌তে ওর আর কে আছে বল? আমাদের দুই মায়ে ঝিয়ের সময় তো হয়ে এল,—কখন আছি কখন নেই। এই বেলা যদি ওকে কারুর হাতে দিয়ে দিতে পারি, তবেই নিশ্চিন্দি। ওর কপালে কি আছে তা ভগবানই জানেন।"

যার সম্বন্ধে এই আলোচনা চল্‌ছিল, সে তখন এক-মনে খুরি গেলাস সাজাচ্ছিল। খানিক পরে সরির ছোট ভাই রমু এসে বল্লে—"এই যে অনুদি, ঘরে পাণ আছে? জামাই বাবু যে পাণ পাণ করে অস্থির হচ্ছেন।"

"ঘরে পাণ থাকবে না কেন? একটু দাঁড়া আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

ভাঁড়ার খুলে পাণ আন্‌তে বেশ একটু সময় গেল। ফিরে এসে অনু দেখে, রমু তো নেই, উল্টে মেজেতে খানিকটা রস ছড়ান। রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে লক্ষ্য করে দেখে, তার মধ্যে থেকে কতকগুলো রসগোল্লা বেশ বেমালুম উবে গিয়েছে। পাণের থালা নামিয়ে রেখে সে আবার কাজে মন দিলে। খানির পরে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। অনু পিছনে না ফিরেই বল্লে—"এই বাঁদর ছেলে, পাণের নাম করে রসগোল্লা চুরি করে পালান হয়েছে?" তার পর ফিবে দেখে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে একজন নিতান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক। ইনিই যে সরির বর তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অনিতা প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে কি করবে বুঝ্‌তে পারলে না। তার পর তখুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—"জামাই বাবু বুঝি? এই দেখুন না রমুর কাণ্ড, আমাকে পাণ আন্‌তে পাঠিয়ে নিজে বেশ রসগোল্লার সদ্ব্যবহার করে রেখেছে।"

সরির বর একটু হেসে বল্লে—"রমুটা তো ভারি দুষ্টু হয়েছে।"

"আর বলেন কেন? সারাদিন যে কি দস্যিপনা করে বেড়ায়, তার ঠিক নেই।" দুজনেই হাস্‌তে লাগল। তার পর অনু বল্লে—"শেষে পাণের জন্যে নিজেকেই আসতে হ'ল? একটা চাকর পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।"

"কাউকে ওদিকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না।"

"সত্যি—চাকরগুলো যে সব কোথা পালিয়েছে! আপনি দুদিনের জন্যে এসেছেন, তাও তেমন যত্ন হচ্ছে না। সত্যি—এটা আমাদের বড় অন্যায়।"

"এতে অযত্নটা কোনখানে হল?"

"লজ্জার খাতিরে আপনি এখন তো ও-সব বল্‌বেনই। দেখ্‌বেন, কোল্‌কাতা গিয়ে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের নিন্দে করবেন না যেন।"

"নিন্দের তো কিছু দেখ্‌ছি না।" নরেন একবার অনিতার দিকে চকিতে চেয়ে দেখ্‌লে। সে দৃষ্টিতে প্রশংসা বেশ স্পষ্ট করেহ লেখা ছিল।

"পাণ নিন।"

অনিতা পাণের থালা এগিয়ে দিয়ে যাবার মত্‌লব করছে দেখে নরেন বল্লে—"আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি?"

"সম্পর্কটা বেশ মধুর,—সরি আমার বোন হয়। আমায় আর আপনি বল্‌তে হবে না,—সরি আমার থেকে বয়সে বড়।"

"তোমাকে কি বলে ডাক্‌ব?"

অনিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লে—"সরি যা বলে ডাকে তাই বলে ডাক্‌বেন।"

"সেটা কি?" ঘরের বাইরে থেকে শুধু একটি কথা শোনা গেল—"অনু।"

রাত্রে বাড়ী এসে অনু নিজের খাটটা জান্‌লার কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। চাঁদের আলো চোখের উপর

পড়াতে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল, তবুও সে খাটখানা সরালে না। চোখের উপর হাত রেখে সে ঘুমবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় দূর থেকে মনে হ'ল কে যেন গান গাচ্ছে। প্রথমটা গানের কথাগুলো ভাল শোনা যাচ্ছিল না। পরে একটা পরিচিত গানের কথা ভেসে এল—"আজ মনে মোর যে সুর বাজে কেউ তা শোনে নাই কি? একলা প্রাণের কথা নিয়ে একলা এদিন যায় যে!" আঃ! সরির বরের কি সব গুণই আছে? পৃথিবীতে এক-একজন কি স্বামীভাগ্য নিয়েই না জন্মায়!

সেদিন সকালে বারাণ্ডায় বসে অনিতা পাণ সাজছে, এমন সময় রমু এসে সংবাদ দিলে যে, আজ দুপুরে পাণ সাজ্‌তে তাদের ওখানে অনিতাকে যেতে হ'বে, তার মা বলে পাঠিয়েছে। অনিতার রমুর কাছ থেকে অনেক কথা জান্‌বার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রমু তার বক্তব্য শেষ করে তখুনি কোথায় উধাও হয়ে গেল। কুলগাছ-তলায় গেলে তাকে দেখ্‌তে পাওয়া গেলেও যেতে পার্‌ত।

দুপুর বেলা খেয়ে অনিতা সরসীদের বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। তার মাসিমা তখন বারাণ্ডায় বসে তেঁতুল কাট্‌ছিলেন। তিনি অনিতাকে যেতে দেখে বল্লেন—"অনু, ঘোষেদের আম-বাগানের মধ্যে দিয়ে যেও, রাস্তায় এ সময় ছোঁড়াগুলো বড্ড ছুটোপাটি করে।" তার পর অনিতার দিকে একবার চেয়ে বল্লেন—"ও কি, ভিজে চুলগুলো অমন করে পোঁট্‌লা পাকিয়েছ কেন? চুলগুলো যে সব যাবে! একে তো মাথায় তেলের নাম নেই!" অনিতা হেসে বল্লে—"মাথায় রোজ এক পো' করে তেল দিই—তাও হয় না?" "হ্যা, দাও বৈ কি? এক ফোঁটা পড়ে তো যথেষ্ট।" তার পর অনুর মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"একটা পাণ মুখে দে না, কি যে মেমেদের মত সাদা ধব্‌ধবে দাঁত, দেখ্‌তে ভাল লাগে না।" অনিতা হাস্‌তে হাস্‌তে একটা পাণ মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

আমবাগানের মধ্যে দিয়ে সে বরাবরই যাওয়া-আসা করে,—এ জায়গাটা তার বড়ই প্রিয়। খানিক দূর গিয়ে সে দেখে যে, একটা ঝড়ে-ওপ্‌ড়ান গাছের গুঁড়ির উপর বসে সরির বর নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে দেখেই সে সিগারেট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু হেসে সে বল্লে—"কোথা যাওয়া হচ্ছে?"

"এই আপনাদেরই ওখানে।"

"এ সময় যে? গান তো বিকেলে হবে।"

"মানুষের গান শোনা ভিন্ন আর কোন কাজ থাক্‌তে পারে না বুঝি?"

"তা থাক্‌বে না কেন? তবে তুমি কি সত্যি কাজ করতে যাচ্ছ?"

"কেন, বিশ্বাস হয় না? আপনার স্ত্রীই বুঝি এক কাজের লোক?"

"তা কি আমি বল্‌ছি? তুমি কেন এমন গায়ে প'ড়ে ঝগ্‌ড়া করছ?"

"এখন তো সব দোষ আমারই হবে। জানেন, আমি ঠিক করেছিলাম—সরিকে আপনার মনের মত সাজিয়ে দেব, কিন্তু আপনি যদি শুধু শুধু আমার সঙ্গে লাগেন তো কখনই দেব না।"

"না—না, মাপ কর, অত বড় শাস্তিটা একেবারে দিও না। আচ্ছা এখন বল তো তাঁকে কি রকম সাজাবে?"

"এখন কেন বলব? রাত্রে তো দেখ্‌তেই পাবেন।"

"তবু এখন একবার শুনে রাখা ভাল। যদি তুমি আমার পছন্দটা ঠিক না বুঝে থাক, আমি এই বেলা শুধ্‌রে দিতে পারি।"

"আমায় আর শোধ্‌রাতে হবে না, আমি ঠিক জানি। বলব? আচ্ছা বলুন তো, আপনার নট্‌কানের গন্ধটা কেমন লাগে?"

"ছিঃ অনু, তুমি লুকিয়ে আমাদের কথা শুনে নিয়েছ? এটা কিন্তু তোমার অন্যায় হয়েছে।"

অনু কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বল্লে—"আমার কি দোষ,—আমি তো আর ইচ্ছে করে শুনি নি। আমি আগে থেকে সেখানে বসে ছিলাম। আপনাদের প্রাইভেট্‌লি যদি কিছু বল্‌বার ছিল, তো ভাল করে দেখে নিলেন না কেন? শুনুন, অত ভয় পাবেন না, আমি সরিকে একটি কথাও বলি নি,—বলবও না।"

"আচ্ছা, তুমিই সেদিন নট্‌কানের কাপড় পরে বসে ছিলে?" নরেন একবার অনিতার খোলা চুলের দিকে চাইলে। স্ত্রীলোকের চুল সম্বন্ধে নরেনের মতটা মনে পড়ে যেতে লজ্জায় অনিতার মুখখানা রাঙা হয়ে গেল। সে

তাড়াতাড়ি বল্লে—"আমি এবার পালাই—অনেক দেরি হয়ে গেল।"

নরেন তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করলে না—কেবল যতদূর দেখা গেল, সে একদৃষ্টে অনিতার দিকে চেয়ে রইল।

দুপুরে অনিতা একটা বই নিয়ে শোবার চেষ্টা দেখ্‌ছে, এমন সময় বাইরে থেকে কে হাঁক্‌লে—"মা সরস্বতী বাড়ী আছ ?"

অনিতার মাসিমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্লেন—"এই যে আসুন, ভিতরে আসুন।"

আগন্তুকের গলা পেয়েই অনিতা বুঝেছিল, এ শশি বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ নয়। সে নিশ্চয় তারই সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে এসেছে। অনিতা যা সন্দেহ করেছিল, তাই ঠিক হ'ল। অনেকবার হেঁচে, কেসে শশি বিশ্বাস যা বল্লেন, তার মর্ম্ম এই যে, মিথ্যা কথা বলে সরস্বতী দেবীরই বাড়ীর একজন অসুর একটি ভাল পাত্র হাতছাড়া করে দিয়েছে। অনেক বিবেচনার পর দু'জনে মিলে ঠিক করলেন যে, রাধু ঝি ছাড়া এ কায আর কারুর নয়। সরস্বতী দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"ঠিক্ ঠিক্, এ নিশ্চয় রাধুর কায, ঘুস্ টুস্ খেয়েছে বোধ হয়। আসুক না মাগী,—তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে তবে ছাড়ব। যার শীল তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গে দাঁতের গোড়া। আমাদেরই খেয়ে-পরে মানুষ হলি, আর আমাদেরই সঙ্গে এই বাধ সাধা। কলি কাল কি না ?"

এরপর মিষ্টিমুখ করে শশি বিশ্বাস বিদায় হলেন। তাকে বেরুতে দেখে অনিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এল; আস্তে আস্তে মাসিমার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলে। অনিতার কথায় মাসিমা একেবারে গালে হাত দিয়ে বসলেন—"ও মা, এমন করে শত্রুতা করতে হয় ? আমরা তোর কি করেছি অনু ? এই বুড় বয়সে কোথায় একটু হরিনাম করতে করতে চোখ বুজব, না কেবলই আমাদের সংসারের মধ্যে জড়িয়ে রাখবি ? আর-জন্মে তুই আমাদের কে ছিলি যে, এ জন্মে শান্তিতে মরতেও দিবি নি ? এমন স্বার্থপর কবে থেকে হলি অনু ? আমাদের মান অপমানের দিকে কি একবারও চেয়ে দেখতে নেই ?"

অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে অনিতা বল্লে—"মাসিমা আর বোলো না,—আমি সত্যি তোমাদের প্রতি অন্যায় করেছি। আমি এত দিন কেবল নিজেরই বিষয় ভাবছিলাম; তোমাদের দিক দিয়ে দেখি নি। আমি আজ তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি যাকে বিয়ে করতে বল্‌বে, তাকেই করব, আর একটিও আপত্তি তুলব না।" অনিতা চোখের জল সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গেল।

বিকেল বেলা, একটু খোলা হাওয়ার আশায়, আম-বাগানের পাশ দিয়ে যে ছোট মাঠটি গিয়েছে, সেইখানে একটা বকুল গাছের নীচে অনিতা এসে বস্‌ল। অনেক কথাই আজ তার মনে পড়ল। সে সব স্মৃতি যত শীঘ্র মন থেকে মুছে যায়, ততই ভাল। তা না হলে, সে মাসিমার কাছে যে কাজ করতে স্বীকার হয়েছে, সে কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না—এখনকার মেয়েরা কি করে অচেনা, অজানা লোকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে, সেই বা কেন পারছে না ? হঠাৎ সরির কথা তার মনে পড়ল—সেও তো বিয়ের আগে নরেনকে দেখে নি; শুভদৃষ্টির সময় প্রথম সে যখন তাকে দেখলে, তখনই যে সে তাকে স্বামী বলে বরণ করে নিলে, এটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সকলেরই কি সরির মত ভাগ্য ? তার অন্তরের মধ্যে যে বেদনাটা চাপা ছিল, সেটা এবার রূপ ধরে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়্‌ল।

একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি যে তারই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে, সেটা অনিতা একেবারে টের পায় নি। সে যখন অতি নিকটে এসে বল্লে—"ওঃ, তুমি ? আমি ভাব্‌লাম, বনদেবী-টেবী হবে।" তখন অনিতা চোখ তুলে তার দিকে চাইলে,—তার চোখের জল তখনও শুকায় নি। বৃষ্টির পর ফুলের মধ্যে যেমন দু' এক ফোঁটা জল রয়ে যায়, অনিতারও চোখের কোণে জলের রেখা ঠিক সেইরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। নরেনের মুখের হাসি মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সে একটু ঝুঁকে পড়ে ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—"অনু কাঁদ্‌ছ ? কি হয়েছে তোমার ?"

"বিশেষ কিছু নয়।" অনু হাস্‌বার চেষ্টা করলে,—সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

"তোমাকে প্রশ্ন করবার অধিকার আমার নেই। তবে যদি কোন কাজে আস্‌তে পারি, তো বন্ধু মনে করে' নিঃসঙ্কোচে আজ্ঞা কর।" নরেনের কথায় অনিতার চোখ জলে ভরে এল। সে তার কাছ থেকে সেটা লুকোবার আশায় চোখ নামালে।

"অনু, আমার খুব বিশ্বাস, তুমি বিশেষ রকম একটা আঘাত পেয়েছ, তা না হলে এমন করে কাঁদ্‌তে না।"

"আমার কাঁদবার কারণ শুনলে আপনি হাসবেন।"

"সেটা পরীক্ষা করেই দেখ।"

"সত্যি বল্‌ছি, এমন কিছুই নয়।" তার পর একটু থেমে বল্লে—"আমি এই মাত্র মাসিমাকে বলে এলাম যে, তিনি যার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন আমি তাকেই বিয়ে করব,—সে কানাই হোক বা খোঁড়াই হোক। ও কি? অমন গম্ভীর হলেন কেন? হাস্‌ছেন না যে বড়?"

"এর মধ্যে হাস্‌বার তো কিছু দেখ্‌ছি না।"

"আপনি তা' হলে আমারই মত বোকা। এই সারা গ্রামে এমন একটিও লোক পাবেন না, যে এর মধ্যে কাঁদ্‌বার কারণ দেখ্‌তে পাবে।"

নরেন চুপ করে রইল,—মনে হল, কি যেন ভাবৃছে। অনিতা একটু হেসে বল্লে—"আচ্ছা, বলুন তো, যদি আমায় কেউ দেখতে আসে, তো আমায় কি কি পরীক্ষা দিতে হবে? ভিজে পায়ের ছাপ নেবে? হাত ধুইয়ে দেখবে রংটা আসল কি নকল?"

"থামো, আমার এ সব কথা শুন্‌তে একটুও ভাল লাগে না।"

"রাগ করছেন কেন? এ ত কিছু নতুন নয়! আপনি না হয় কোল্‌কাতার মানুষ, তাই সরিকে এসব পরীক্ষা দিতে হয় নি,—সকলের তো আর তা' হয় না।" তার পর নরেন কোন উত্তর দিল না দেখে অনিতা বল্লে—"সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়ী যাওয়া যাক্।" সে উঠে দাঁড়াল, হাস্‌বার বৃথা চেষ্টা করে বল্লে—"আজ আমার নিজের উপর এত ঘৃণা হচ্ছে,—আমি এত দিন জান্‌তাম না যে, কথা দিয়ে কথা রাখ্‌বার মত সাহস আমার নেই।" সে দ্রুতপদে বাগান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সারা রাত কেঁদে কাটাবার পর সকালবেলা মাথার যন্ত্রণায় সে বিছানা থেকে উঠতে পার্‌লে না। তার চোখ মুখ লাল দেখে মাসিমা, জ্বরের আশঙ্কায় তাকে দু'দিন শুইয়ে রাখ্‌লেন।

পরদিন দুপুরে অনিতা সরির সঙ্গে দেখা করতে বেরুল। বাড়ী থেকে একটু দূরে যেতেই পুঁটির সাক্ষাৎ মিল্‌ল। পুঁটি বিশেষ মুখরা মেয়ে, তার উপর সে অনিতাকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারত না। সে একটু মুখ টিপে হেসে বল্লে—"কি গো, বিরহিনীর মত কোথা যাওয়া হচ্ছে?" পুঁটির কথা বল্‌বার ধরণটা অনিতার মোটেই ভাল লাগল না,—সে কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চল্ল। পুঁটি কিন্তু থাম্‌বার মেয়ে নয়, সেও এগিয়ে গিয়ে হেসে বল্লে—"কি চলানটা চলালি ভাই! বিজয় বাবু চলে গিয়েছে বলে একেবারে দু'দিন বিছানা থেকে উঠ্‌তেই পার্‌লি না? লোকের বর বিদেশে গেলেও তো কেউ এমন করে না।" পুঁটির কথার কোন মানে না বুঝতে পেরে অনিতা বিরক্ত হয়ে বল্লে—"সকাল থেকে কি বাজে কথা বক্‌তে আরম্ভ করেছ; সর, আমি যাই।"

"যাও না, আমি কি তোমায় ধরে রেখেছি? আমরা গরীব মানুষ, তোমাদের মত বড়লোকের সঙ্গে কথা বল্‌বার যোগ্য নই, তা কি আর আমি জানি না? বড়লোকের সবই শোভা পায়। আমরা যদি আজ এ কেলেঙ্কারীটা করতাম, তা' হলে গাঁয়ের আর পাঁচজনায় এসে এক গালে চুণ আর এক গালে কালি মাখিয়ে একেবারে দূর করে দিত।"

অনিতার এবার সত্যি রাগ হল। পুঁটির সব কথা সে বুঝতে পারলে না বটে, তবে এটা সে স্পষ্ট বুঝ্‌লে যে, তাকে কোন একটা অন্যায় কাজের জন্যে দোষী করা হচ্ছে। পথে দাঁড়িয়ে পুঁটির সঙ্গে এসব বিষয় আলোচনা করবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না; তাই সে কিছু না বলে বাড়ীর দিকে চলে গেল। যেতে যেতে সে শুন্‌লে পুঁটি বল্‌ছে—"ঈষ, চলন দেখ না, যেন মহারাণী,—সকলে যখন গুণের কথা শুনবে, তখন গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।"

সন্ধ্যা বেলা অনিতা সরসীদের বাড়ী গিয়ে দেখে, সরি ছাতে বসে আছে। তার মুখ দেখে মনে হ'ল, তার কি একটা হয়েছে। খানিক বাজে কথার পর সরসী বল্লে—"ভাই অনু, তোর নামে একটা কথা শুন্‌লাম, তুই যদি রাগ না করিস তো বলি।"

"রাগ করব কেন? বল্‌ই না কি শুনেছিস্?"

"লক্ষীছাড়া পুঁটিটা ভাই তোর নামে যা' তা বলে বেড়াচ্ছে। তুই না কি ভাই রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আম-বাগানে বিজয় বাবুর সঙ্গে দেখা করতিস্? ওই পেঁচা-মুখো মেয়েটা না কি সব দেখেছে। আজ দুপুরে এই নিয়ে সে ঘোঁট করতে এসেছিল, আমি দু' ধমকে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি।"

শরীরের সব রক্ত যেন এক ঝলকে অনিতার মুখে এসে পড়ল। ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞেস করলে—"বিজয় বাবু কে?"

"বিজয় বাবু এঁ'রই এক বন্ধু।"

"তাঁকে তো আমি দেখি নি।"

"দেখ্‌লি, আমি ঠিক জানি এর ভিতর এক কাণা কড়িও সত্যি নেই। পুঁটিটার মত মিথ্যেবাদী ছুনিয়ায় ছ'টো নেই, পরনিন্দা পেলে ও আর কিছু চায় না।" সরি একটি আরামের নিশ্বাস ফেল্লে।

"দাঁড়া ভাই, পুঁটির সব দোষ নয়, আম-বাগানে যেতে-আস্‌তে ছ' একবার তোর বরের সঙ্গে দেখা হয়,—ও হয় ত তাকেই বিজয় বাবু বলে ভুল করেছে।"

"কি বল্লি অনু, এঁর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে? ওমা লোকটা কি ন্যাকা! এই কাল রাত্রে সরে আমায় বলা হচ্ছে—'তুমি এত অনু অনু কর, কিন্তু কৈ আমার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলে না।' আমার অত মনে ছিল না যে তুই ওঁকে দেখিস্‌ নি,—এঁর কথাতে সেটা মনে পড়ল। তাই এঁনাকে বলেছিলাম, আজ যেন সকাল সকাল বাড়ী আসেন,—তোর সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দেব। এই এল বলে। আচ্ছা লোক যা হোক—এত রঙ্গও জানেন।"

সরির কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল—"ঐ যে আস্‌ছেন।" সরসী মাথার কাপড়টা তাড়াতাড়ি টেনে দিলে। নরেন ছাতে পৌঁছবার আগেই অনিতা একটু ব্যঙ্গ করে বল্লে—"কি নরেন বাবু, আমায় না কি আপনি চেনেন না?" মুখের কথা আর বের হল না,—অনিতা একজন নিতান্ত অপরিচিত লোকের দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল।

এর পর অনিতা বাড়ী থেকে বের হওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে। সকলেই তাকে নিয়ে আলোচনা করে। কেউ মেয়ের দোষ দেয়; কেউ বা আবার বলে, এতে অনিতার দোষ নেই। তবে বিজয় তো বরাবর জান্‌ত যে, অনিতা তাকে নরেন বলে ভুল করেছে? তবুও যখন সে তার এ ভুল ভাঙ্গায় নি, তখন ধরে নিতে হবে—তার কোন কু-অভিসন্ধি ছিল।

বাড়ীর বাগানটাই এখন অনিতার বেড়াবার এক মাত্র স্থান। বাগানের এক কোণে কতকগুলো গোলাপ ফুলের গাছ ছিল। আজকাল আর বড় তাদের যত্ন হয় না, তবুও গরীবের মেয়ের মত অনাদরে মানুষ হয়েও তারা বেশ বেড়ে উঠেছে। সইখানেই অনিতা প্রায়ই বসে থাকৃত। সন্ধ্যা নাম্‌তে, অনিতা ভিতরে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় বিজয় তার কাছে এসে বল্লে—"অনিতা একটু বস, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" সহসা এমন স্থানে বিজয়কে দেখে তার মুখ দিয়ে একটিও কথা বের হল না।

বিজয় বল্লে—"আমি প্রথম থেকেই জান্‌তাম, তুমি আমায় নরেন বলে ভুল করেছ। সেদিন তোমাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, হঠাৎ ভগবান বুঝি আমার প্রতি বিশেষ দয়া করে আমার মানস-প্রতিমাকে রূপ দিয়ে আমার তৃপ্তির জন্য পাঠিয়েছেন। তার পর তুমি আমার সঙ্গে না জেনে যে সম্পর্কটা পাতালে, সেটা উপেক্ষা করবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বুঝেছিলাম, তোমার সঙ্গ পেতে হলে এ ছলনাটা রাখতেই হবে। আমি এখন বুঝ্‌ছি—এ কাজটা করা কতদূর অন্যায় হয়েছে। দু'দিন হল আমি কোল্‌কাতায় গিয়েছিলাম, আজ এসে আমি সব শুন্‌লাম। আমারই দোষে লোকে তোমার নামে যা' তা' বল্‌তে সাহস পেয়েছে,—" বিজয়ের গলার স্বরটা ভেঙ্গে গেল। একটু পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আবার সে বলতে সুরু করলে—"আমি যখন বুঝলাম, তোমাকে না হ'লে আমার আর এক দিনও চল্‌বে না, তখুনি আমি বাড়ী গেলাম। ছোট বেলা থেকে মার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে আমি কোন কাজে হাত দিই নি। তাই আমার জীবনের এত বড় ব্যাপারটা তাঁকে না বলে থাক্‌তে পার্‌লাম না। তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি। এসেই যা শুন্‌লাম, তাতে আরও স্পষ্ট করে মনে হচ্ছে, আমি কোন অংশে তোমার উপযুক্ত নই। তোমাকে আর সকলের হাত থেকে রক্ষা করা দূরে থাক্‌, আমিই তোমার অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। তোমার মাসিমার সঙ্গে দেখা করলাম, তাঁকে সব কথা খুলে বল্লাম। তিনি নিজগুণে আমায় মাপ করেছেন। তোমার প্রতি যে অন্যায়টা করেছি, সেটার জন্তে ক্ষমা চাইবার সাহস হ'ত না, যদি না মাসিমার কাছে একটা কথা শুন্‌তাম—"

গম্ভীর হবার বৃথা চেষ্টা করে অনিতা বল্লে—"মাসিমা আমার নামে কি বানিয়ে বলেছেন শুনি?"

"মাসিমা বল্লেন যে, লোকে যখন আমার নিন্দে করে, তখন না কি তুমি বলেছিলে যে তুমি নিজের বদনামের জন্য দুঃখিত নও, কেবল আমার নিন্দে তোমার অসহ্য। এ কথাটা কি মাসিমা বানিয়ে বলেছেন?"

"আমি মাসিমাকে বিশেষ করে যা' বলেছি, মাসিমায়

কখনও উচিত হয় নি যাকে-তাকে বলে বেড়ান।" অনিতা বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। বিজয় জোর করে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লে—"কে বলে সতী সাবিত্রীর যুগ চলে গিয়েছে?"

বাসি-বিয়ের কনের বেশে অনিতা যখন তার স্বামীর বাড়ী নাম্‌ল, তখন তার মনে হল, এত দিনের অপেক্ষা তার সার্থক হয়েছে। যে সৌম্য-মূর্ত্তি বিধবা নারী তাকে "ঘরের লক্ষ্মী" বলে নিজের কাছে টেনে নিলেন, তাঁকে দেখেই অনিতা বুঝেছিল, স্বামীর মনের মত হতে হলে এঁরই ছায়ায় জীবন গঠন করতে হবে।

ফুলশয্যার দিন অনিতার ননদেরা তাকে মনের মত সাজিয়ে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালে। এমন সময় অনিতা শুন্‌তে পেলে পাশের ঘরে কে বল্‌ছে—"খোকাদাদা যে শেষে এমন বিয়ে করবে, আমি তা' স্বপ্নেও ভাবি নি। কত মেয়েই না তাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছিল,—তা কাউকেই আর পছন্দ হ'ল না। এর চেয়ে আমার মনে হয়, ইলার সঙ্গে হলেও ভাল হ'ত। ও একটা তবু মানুষের মত মানুষ। আমার খুব বিশ্বাস, খোকাদা কোন এক অরক্ষণীয়া মেয়েকে উদ্ধার করে এনেছে। বিয়ে-থার সম্বন্ধে এ সব "কুইকসোটিসম" আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

স্বরটা অনিতার পরিচিত। সে হাসিমুখে এই মেয়েটির আগমনের প্রতীক্ষায় রইল। যে মেয়েটি এতক্ষণ উঁচু গলায় এ সব মন্তব্য প্রচার করছিল, সে এইবার মুখ অন্ধকার করে ঘরে ঢুক্‌লো; কিন্তু কনেকে ঘরে দেখেই সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। তার পর এক লাফে মনের উল্লাসে অনুকে জড়িয়ে ধরে কনক বলে উঠলো—"ওমা তুই! আমি এতক্ষণ বৃথা কতই না বক্ বক্ করলাম। কোথা থেকে যে কি হয়, কিছুই বলা যায় না। তুই যে শেষে আমার বৌদিদি হবি, এ আমি কোন দিনই ভাবি নি।

রাত্রে অনিতা স্বামীকে বল্লে—"দেখ, আজ সকালে একটা সুখবর পেলাম। আমি একেবারে শুধু হাতে তোমার কাছে আসি নি,—বাবা আমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গিয়েছেন।"

"তাতে তোমার এত বেশী কি লাভ হ'ল?"

"আমার আবার লাভ কিসের? তবে তোমার যদি কোন কাযে লাগে—"

বাধা দিয়ে বিজয় বল্লে—"তুমি কি মনে কর তোমার টাকা আমি নেব?"

"কেন? আমার টাকা নিলে তোমার জাত যাবে না কি?"

"জাত না হোক, মান যাবে।"

"ঈষ, মান অপমানের জ্ঞানটা যে বড্ড টন্‌টনে দেখ্‌ছি। আচ্ছা, আমার টাকা নিও না, আমি নিজেই সেটা সব খরচ করব।"

"তা বৈ কি? তুমি ওর থেকে এক পয়সাও নিতে পাবে না। তোমার যা দরকার—আমার টাকা থেকে কিন্‌বে।"

"অতগুলো টাকা তবে কি হবে?"

"কেন, তোমার যে-কোন চ্যারিটিতে ইচ্ছা দিয়ে দাও।"

"তবুও ব্যবহার করতে দেবে না?"

"না, তুমি যখন আমার স্ত্রী, তখন তোমার সব অভাব আমি পূর্ণ করব।"

"বাবা, ঢের ঢের অহঙ্কারী লোক দেখেছি, কিন্তু তোমার জুড়ি পাওয়া যাবে না।"

"সে তুমি যাই বল, তোমাকে আমার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হবে, এটা ভুল না যেন!" অনিতার বল্‌বার ইচ্ছা ছিল—"এর চেয়ে সুখের বিষয় আর নেই।" তবে আজকালকার এই নারী-স্বাধীনতার যুগে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়েও বেরুল না।

এক এক লাফে দু'টো করে সিঁড়ি পার হয়ে বিজয় যখন প্রায় তার মার ঘাড়ের উপর পড়ছিল, তখনই তার বড় বোন সুনন্দিনীর মোটর গাড়ী বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল। সুনন্দিনী বিজয়কে দেখে বল্লে—"খোকা, তোর হাতে ওটা কি রে?"

"ওঃ—এটা? ও একটা পার্শেল।" লজ্জিত ভাবে বিজয় মাথা চুল্‌কে এদিক ওদিক চাইলে। তার দিদি হেসে বল্লে—"আর লুকচ্ছিস্ কেন? বুঝ্‌তে পেরেছি—বৌয়ের জন্যে নিজের পছন্দমত কাপড় কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" মায়ে-ঝিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে উপরে চলে গেলেন।

বিজয় নিজের ঘরে ঢুক্‌তেই নট্‌কানের মৃদু-গন্ধ-মাখা একটা হাল্‌কা বাতাস তার মুখে এসে পড়ল। দূরের একটা চেয়ারে অনিতা বসে ছিল; পরনে তার একখানা নটকানের শাড়ী। বিজয়কে দেখে সে বল্লে—"কি গো? মনের মত সাজ হয়েছে?" বিজয় তার দিকে একবার চাইলে; তার পর একটু হেসে বল্লে—"শুধু সাজটা কেন? তোমার আগাগোড়াই আমার মনের মত।"

হিমালয়ের পত্র

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ-এম-এ-ঈ, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)

বদরীনাথ ধাম, ৫ই জুন, ১৯২৪ সাল।

তরশু যোশীমঠে আপনার পত্র পেয়েছিলাম। আজ আমি বদরীনাথে। এখানে তিন দিন থাকবো। সমুদ্রতীর হ'তে কেদার এবং বদরী যথাক্রমে ১১,৭৫৩ এবং ১০,২৮৪ ফিট উঁচু। আগে কেদার থেকে বদরী যাবার জন্য বরফের মধ্য দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রাস্তা ছিলো। তিন দিনে যাওয়া যেতো। পাহাড় ভেঙ্গে পড়াতে সে পথ বন্ধ হয়েছে। ফলতঃ যে রাস্তায় আমরা কেদারে গিছলাম, তাতে ১৫ ক্রোশ নেমে এসে, নালা থেকে উত্তর-পূর্ব্বগামী রাস্তায় ৫০ ক্রোশ চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে বদরীনাথে এসেছি। এই পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে প্রসিদ্ধ উখীমঠ ও যোশীমঠ আছে। উখীমঠ নালা থেকে দু' ক্রোশ। মনে করুন, পূবে-পশ্চিমে দুটী পাহাড় আছে, সামনা-সামনি। উভয়ের পায়ের কাছে, অনেক নীচে, নদী। পূর্ব্বদিকের শৃঙ্গটার উপরে উখীমঠ এবং পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে গুপ্তকাশী আর নালা চটি। কেদারনাথ থেকে আপনাকে যে চিঠি লিখেছিলাম, তাতে আমি গুপ্তকাশীর এবং অভ্রভেদী পাহাড় দুটীর বর্ণনা করেছি। শীতকালের আট মাস কেদার এবং বদরী বরফে চাপা থাকে। অধিবাসীরা গৃহপালিত পশু নিয়ে নিম্নদেশে গমন করেন।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কেদার, বদরী, উখীমঠ এবং যোশীমঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অষ্টম শতকের শেষভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা থেকে হিন্দু ধর্ম্মকে রক্ষা করতে শঙ্কর আবির্ভূত হ'ন। শঙ্কর-বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে তার ইতিহাস পাওয়া যায়। ভারতের "চার ধামে" তিনি চারটী মঠ স্থাপিত করেন, ধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ। সেতুবন্ধে সিঙ্গিরী মঠ, পুরীধামে গোবর্দ্ধন, দ্বারকায় শারদা এবং হিমালয়ে যোশীমঠ। উখীমঠও তাঁরি স্থাপিত। Lhasa and its Mysteries নামক পুস্তকে লাসার ছবি দেখেছিলাম—অনন্ত হিমালয়ের চিরতুহিন গাত্রে তাসের খেলাঘরের আকৃতি বাড়ীঘরের মধ্যে প্রধান লামা মহোদয়ের সুবৃহৎ আবাস। নালা এবং গুপ্তকাশী হ'তে ওপারের উখীমঠ অনেকটা সে রকম দেখতে। মন্দিরের উঁচু প্রাকার ঘিরে ছোটো ছোটো বাড়ী। নালা থেকে আমরা উৎরাই পথে নামলাম, সেতুর সাহায্যে নদী অতিক্রম করলাম এবং খাড়া

উখীমঠ পথে

চড়াই পথে উখীমঠে উঠলাম। সহরে প্রবেশ করবার মুখে প্রায় সমতল ক্ষুদ্র উপত্যকা দেখা যায়। তার মাঝে সেকালের মোহান্ত বা রাওয়ল মহারাজদের সমাধি আছে। নিকটে সেকালের জলাধার। তার তটদেশে নক্সা-খোদা পাষাণ-প্রাচীর। উখাজীর মঠ সমচতুষ্কোণ; এবং পাষাণ

প্রাকার ও সিংহদ্বারে ঘেরা। প্রাঙ্গণে ছটী মন্দির আছে। একটি মাঝারি, অপরটি ছোটো। প্রথমটী প্রাচীন কালের বলে মনে হ'ল। ছোটোটীর চারপাশে দালান এবং উঠান। দেয়ালে যক্ষ, দ্বারপাল, কৃষ্ণ, রাধা, গণপতি প্রভৃতির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। সুন্দর মূর্ত্তি। বৈষ্ণব যুগের ছাপ। পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তিও আছে। প্রাঙ্গণের চারধারে বারাণ্ডা ও কক্ষ। তথায় রাওয়ল মহারাজের গদী, কার্য্য-গৃহ এবং যাত্রী থাকবার কুটুরী। সেগুলি প্রাঙ্গণ হ'তে হাত দুই উপরে

বিষ্ণু-প্রয়াগ

হ'বে; কিন্তু পাশের রাস্তার উপরে অন্ততঃ পনের হাত। দূর থেকে কক্ষগুলোকে একটি দুর্গের প্রাকারের শিরোভাগ বলে মনে হয়। শীর্ষদেশে এরূপ কক্ষ সমেত পাষাণ প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী সিংহদ্বারটী বৃহৎ, কারুকার্য্য-খচিত ও চিত্র-বিচিত্রিত। সাঞ্চী স্তূপের উত্তর তোরণের উপরে কতকগুলো গজরাজ lintel বা তোরণ-শীর্ষ ধরে আছে দেখেছিলাম। এই দ্বারের উপরে লাল ও কালো রঙের গজরাজের br.cket বা বন্ধনী আছে। তবে সে কয়টা উচ্চশ্রেণীর নয়।

মন্দিরে হস্তীর বন্ধনীগুলি আমার দৃষ্টি বিশেষ কোরে আকর্ষণ করেছিলো। শুধু এখানে কেন, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নানা মন্দির ও প্রাসাদের স্থাপত্যে গজরাজের প্রতিপত্তি দেখা যায়। এতই সুন্দর সেগুলি যে রক্ষ, যক্ষ, পশুপক্ষীর ভাস্কর্য্য তাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। প্রাচীন যুগ হ'তে হস্তী আমাদের কাছে বরণীয়। সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে মিশরের প্রথম নরপতি মেনেসের (Menes) জন্মস্থানে হস্তীদন্তে-নির্ম্মিত রাজার মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। সে সময়কার রাণীদের গন্ধদ্রব্য ও গয়নার কৌটা, চিরুণী, দর্পণের হাতল, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি হাতীর দাঁতে তৈরী হ'ত। ইরাক্ দেশে নীমরুদ (Nimroud) এর ঢিবিতে খৃঃ জন্মের হাজার বছর আগেকার ফিনিসীয়ানদের কৃত হাতীর দাঁতের কাজ পাওয়া গেছে। সলোমনের সিংহাসন তদ্দ্বারা তৈরী হয়েছিলো। গ্রীকেরা হস্তীদন্তের আদর করতেন। সোণা আর হাতীর দাঁত মিলিয়ে অনেক সময়ে গ্রীকেরা তাঁদের দেবতার মূর্ত্তি গড়তেন। শরীরের যে সব অংশ অনাবৃত রাখা যায়, সে গুলি হাতীর দাঁতে, আর পরিধেয় প্রভৃতি সোণায় তৈরী হ'ত। হস্তীদন্তের পাণ্ডু রঙে দেবদেহের শ্বেতিমার চমৎকার অনুকরণ হ'ত। এ সকল মূর্ত্তিকে গ্রীকেরা "স্বর্ণেভ" মূর্ত্তি (ইংরাজীতে Chryselephantine) ব'লত। ওলিম্পিয়াতে শিল্পী ফিদিয়াস (Pheidias) কৃত জেউস (Jeus) বা দ্যৌঃ পিতা দেবতার এবং আথেন্সে আথেনী পার্থেনস্ (Athene Parthenos) বা কুমারী আথেনী দেবীর এরূপ দুটী মূর্ত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। গ্রীকেরা বাদ্যযন্ত্র, চেয়ার, টেবিল, তৈজসাদি হস্তীদন্তে নির্ম্মাণ করতেন। রোমাণ, বাইজান্টাইন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিও তৎকরণে বিমুখ ছিলেন না।

ভারতে কিন্তু হাতীরা লাগলো প্রধানতঃ দেবতার কাজে। বিদেশী শিল্পীরা বলেন, ভারতবর্ষের মন্দির এবং প্রাসাদের স্থাপত্যের তক্ষণ-শিল্পে গজরাজের যেরূপ অদ্ভুত, প্রাণবন্ত ভাব ফুটেছে, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ দেখা যায় না। কি বানরের সঙ্গে বৃক্ষশাখা নিয়ে খেলা করবার কালে, কি যুদ্ধাবস্থায়, তার সহজ সরল স্বচ্ছন্দ গতির ভাব দেখলে বিস্ময় জন্মে। পাষাণের বোধি-দ্রুম তলে বুদ্ধদেব সমাধি-মগ্ন। পর্ব্বতপ্রমাণ ক্ষ্যাপা হাতী এনে মার তাঁকে সংহার করবার জন্য লেলিয়ে দিলো। তাঁকে সংহার না করে হস্তীবর জানু

পেতে তাঁর পদতলে বসে পূজা করছে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারত-শিল্পী তাঁর ভাস্কর্য্যে হাতীর যে ভক্তি-ভাবটা ফুটিয়েছেন, তা হেলেন রাজ্যের রাজকুমারীর নগ্ন বক্ষে আর বিলোল কটাক্ষে সম্ভবপর হয়নি। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-শিল্পে হস্তীর অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ছিলো; মুসলমান যুগে মন্দিরাদি ধ্বংস হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। বেহারে প্রায় আড়াই হাজার বছরের লোমশ মুনির গুহাতে চলন্ত হাতীর শ্রেণী উৎকীর্ণ আছে। গুহার গঠন দেখলে মনে হয়, কাঠের বাড়ীর অনুকরণে তৈরী। বোম্বাইএর এলিফ্যাণ্টা এবং দক্ষিণ ভারতের কতকগুলো গুহা-মন্দির দেখেও তাই মনে হয়। কাঠের বাড়ীতেও হাতী খোদা হ'ত। মথুরার অশোকস্তম্ভে, সাঞ্চির উত্তর তোরণের শীর্ষভাগে, ভরুৎ এবং অমরাবতী স্তূপের পাষাণ-বেষ্টনীতে, ভুবনেশ্বর, এলোরা এবং কার্লির গিরি গহ্বরে, মহাবল্লীপুরের রথে, মাদুরাতে, শ্যাম ও যবদ্বীপে, রাজস্থানের মন্দির-প্রাসাদে সর্ব্বত্র গজরাজ বিদ্যমান। মহীশূরের হালবেদ্ মন্দিরে উৎকীর্ণ বিরাট শোভাযাত্রায় হাতী শুঁড় তুলিয়ে যেন উল্লাসের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন,—যদি হাতীর পক্ষে বৃংহিতরবে রেখাব সুরে গান গাওয়াটা সম্ভব হয়! অজন্তায় হস্তীযূথের চিত্র আছে। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে হস্তী নরনারায়ণের সহচর। কমলা কমলাসনে উপবিষ্টা—হস্তী-যুগল স্বর্ণ-কলসে গঙ্গোদক নিয়ে তাঁর শিরে ঢালছেন। গোকুলে বংশীধারী করিণীরূপিণী নবনারীর পৃষ্ঠে গমন করছেন। করী-রূপে বুদ্ধ মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করে জন্মগ্রহণ করেন। Col. Simmএর Embassy to Ava নামক দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে পড়েছিলাম—ইংরাজদের সঙ্গে ব্রহ্মরাজের যুদ্ধ বেধেছিলো "শ্বেত হস্তী" নিয়ে। ব্রহ্মরাজ হাতী ফিরে পাবার আশায় ইংরাজকে প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকৃত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য "শ্বেত হস্তীদের" শুভাধিষ্ঠানের জন্য নরপতি "চ্যাং" বা মন্দির এবং দাসদাসী নিযুক্ত করেছিলেন। হস্তী মহাশয়দের হীরা-মুক্তার গহনা, বেনারসী চেলী এবং কাশ্মীরি শাল ছিলো। গন্ধবারিতে তাঁদের স্নান করানো, মাল্যচন্দন পরানো, সকাল-সন্ধ্যা ভোগ দেওয়া এবং সুন্দরীদের কণ্ঠে গান শোনানো, এবং "পোয়ে" নাচ দেখানো হ'ত। এ থেকে ইংরাজীতে white elephant পোষার খরচায় প্রবাদ সৃষ্ট হয়েছে। "শ্বেত হস্তী" অবশ্য বিশেষ কোনো ভিন্ন জাতের হাতী নয়—এ কথাটা বলা দরকার। ভারতবাসীদের মধ্যে কারো কারো আর সকলের মত শ্যাম বর্ণ, কালো চুল, কালো চোখ না হয়ে ইয়োরোপীয়-সুলভ শ্বেতবর্ণ, পিঙ্গল কেশ আর কটা চোখ হয়। এরকম বৈচিত্র্যের কারণ হচ্ছে শরীরের রঙের ভিন্ন সমাবেশ। এরকম লোককে albino বা সাদাটে বলা হয়। হাতীদের
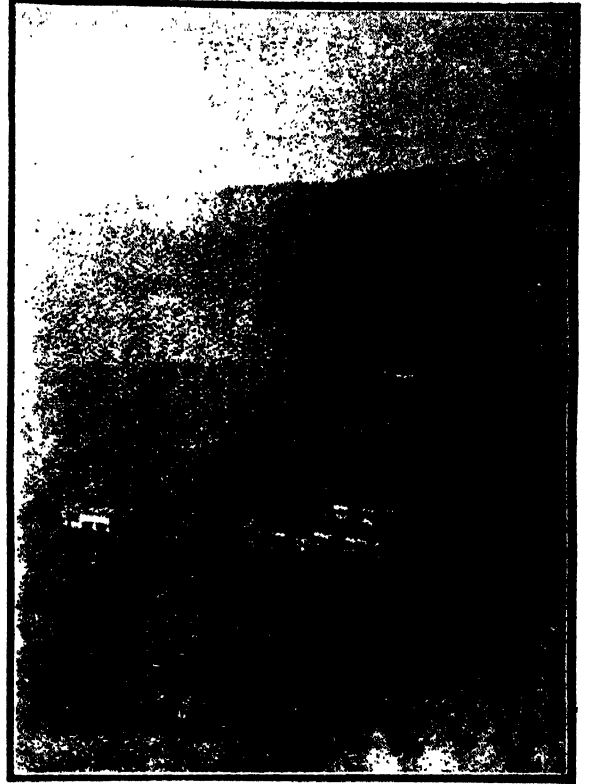
অনন্তের কোলে—যাত্রীর চটী

মধ্যে দু'একটা বিধাতার বিচিত্র বিধানের ফলে সাধারণ কালো রঙ না পেয়ে albino বা সাদাটে রঙ নিয়ে জন্মায়, তারাই হয়ে যায় বর্ম্মী আর শ্যামীদের পূজিত শ্বেত-হস্তী।

মন্দিরের কথা শেষ হ'ল। উখীমঠও গুপ্তকাশীর মত সমৃদ্ধিশালী। ডাকঘর, ডাক্তারখানা, দোকান ও বসত-বাড়ী অনেকগুলি। একটি দোকানে আমি Leader এবং Bengalee সংবাদপত্র দেখেছিলাম। সহরে কিন্তু জলের অভাব। ক্ষীণা ঝরণা হতে কুণ্ডে জল পড়ছে; লোকের ভীড় সেখানে। গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের গোমুখী জলধারায় আধ মিনিটে একটি জালা ভরে ওঠে কিন্তু! উখীমঠে যে

প্রশস্ত ঘরখানি অর্থাৎ 'বাংলায়' আমরা ছিলাম, সেটি অন্যান্য বাড়ীঘর, দোকান হ'তে অনেক উঁচু পাহাড়ের উপরে তৈরী। আর তার চারদিকে ফাঁকা, আর তার নীচে মুদীর দোকান। একাদশীর পারণের জন্য সেখানে আমরা দুদিন থাকি। অনেক নীচে নেমে আমাদের স্নান করতে এবং জল নিয়ে উপরে যেতে হ'ত। সেই বাংলার দ্বিতলের জানালা হ'তে উত্তর-পশ্চিম কোণে অনন্ত-তুষার-কিরীটিনী কেদার-শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। বাইশ হাজার ফিট উঁচু! মেঘের কোলে তুষারমালার অনির্ব্বচনীয় শোভা,—লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি

বরফের উপরে—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র (বেচাচন্দ্র)

নীল আকাশে ভেসে ভেসে কেদারের ক্রোড়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—আমি জানালার ধারে বসে বসে দেখতাম। আর ভাবতাম, পুণ্য-নিস্যন্দিনী মন্দাকিনী সেই হিমধামে জন্মগ্রহণ করে, কেদার ও হরিদ্বার প্লাবিত ও সঞ্জীবিত করে, সাগরের উদ্দেশে ছুটেছেন—এবং কতকাল পরে ওই লঘু শুভ্র মেঘ-খণ্ডাকারে ফিরে এসে পুনরায় হিমধামের হিরণ্য-গর্ভে বিলীন হচ্ছেন।

এই পথে অনেকবার জলের কষ্ট পেয়েছি। বিশেষতঃ চোপাতা চটীতে। চোপাতাতে সকল যাত্রীকে থামতে হয়—তুঙ্গনাথে যাবার জন্য। যাঁরা আগে পৌঁছাতে পারেন, তাঁরা জলের সুবিধা করে নিতে পারেন। চটী থেকে দূরে, মাঠের মাঝখানে, বুদ বুদ করে জল উঠছে—জনতা ঠেলে জল নিতে হয়। কাঠ ফাটা রোদ। ঘন ঘন তৃষ্ণা পায়। আর মাছির উৎপাত। চোপাতা থেকে একটি সরু, দুর্গম চড়াই পথ তুঙ্গনাথে গেছে। অন্য রাস্তাটী বদরিকার দিকে। সেটাও চড়াই; ও বনজঙ্গলের মধ্যে।

আবার গভীর অরণ্যে পড়লাম, ঘনোন্নত পাদপরাজি। ওক, আখরোট, বাদাম, শাল, মেহগিনি, আবলুস, হরিতকী, তিন্তিড়ি, পলাশ, পিয়াল, ন্যগ্রোধ, জায়ফল—ঠেলাঠেলি করে আকাশে ওঠবার চেষ্টা করছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট বেতসীলতার মধ্যে দোদুল্যমান ভুঁই চাঁপা ফুল। আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। রং-বেরঙের পাতাগুলি। আবার সেই পাখীর গান—বনস্পতির মর্ম্মর ও নির্ঝরের ঝর্ঝর কাহিনী। হিমারণ্যে এ সময়ে বসন্ত কাল। বনে বনে "ফাগুন" লেগেছে। বসন্তের অনিল, বসন্তের রঙীন আলো। আবার সেই "বরাঁস" (Rhododendron) গাছের সারি *—করবীর পাতার মত সুচল পাতা গুলোর সঙ্গে পলাশের মত ঘোর লাল ফুলগুলি হুড়োমুড়ি করছে। বক্র সঙ্কীর্ণ, নির্জ্জন বীথি-পথ অবলম্বনে আমি একা 'জঙ্গল' চটীতে যাচ্ছি। আশ্চর্য্য জিনিস দেখলাম। প্রকৃতির বিরচিত পাষাণের সেতুবন্ধ। আজ পর্য্যন্ত আমি কোনো পাহাড় থেকে উৎরাই পথে নেমে এসে, আবার চড়াই পথে অন্য পাহাড়ে গেছি। পরন্তু এক স্থানে দেখলাম, হাবড়ার পুলের চেয়ে কিছু বেশী চওড়া একটি পাহাড়ের সেতুর উপর দিয়ে আমাদের পথটা অন্য শৃঙ্গে গেছে। পরীক্ষা করে দেখলাম মানুষের রচিত সেতু নয়। ভূকম্পনের ফলে সে যুগে ধরিত্রী যখন ওলট-পালট হয়েছিলো,—এবং হিমালয় সাগর-গর্ভ হ'তে সরাসরি আকাশ-মণ্ডল স্পর্শ করতে উঠেছিলেন—রোষান্ধ গিরিরাজ শীতল হ'লে, সঙ্কোচনের ফলে,—সে সময়ে ধরিত্রীর সমতল ভূভাগের অবস্থার বিপর্য্যয়

* ইংরাজীতে একে এক বিরাশী সিক্কার ওজনের অভিধা দেওয়া হয়েছে rhododendron; কথাটা গ্রীক, মানে হচ্ছে "গোলাপ-দ্রুম," পাহাড়ী-হিন্দী ভাষায় "বরাঁস" বলে।

এবং এবম্বিধ "সেতুর" উদ্ভব হয়েছিলো, Syncline এবং Anticlineএর মধ্যভাগে। ভূতত্ত্ববিদেরা সেই সেতুকে Fau't বলেন। উত্তর ব্রহ্মে শাণরাজ্যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য, গোটেয়িক্ সেতুর নীচে ওরূপ Fault আমি দেখেছি। শতকোটী বর্ষ পূর্ব্বেকার সেই ভূকম্পনের প্রভাবে হয় ত এই "সেতুটীর" সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সেই সেতুর উপর দিয়ে আজ আমরা পারাপার হচ্ছি। আমাদের ডাইনে ও বামে গভীর খদ, আর সম্মুখে পশ্চাতে পর্ব্বতমালা! চারিদিকে "নানামৃগগণ্যকীর্ণা মৃক্ষশার্দ্দূল সেবিতাং নিষ্কুজমান শকুন্তি ঝিল্লিকাগণ নাদিতাং" নিবিড় অরণ্যানি!

তখন প্রায় সন্ধ্যা; আমি জঙ্গল-চটীর পাহাড়-জঙ্গল থেকে মণ্ডল-চটীতে নেমে এলাম। সমতল উপত্যকা। বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যস্থলে কয়খানি চালাঘর ও দোকান। পাশে স্বচ্ছতোয়া সুরধনী উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে চঞ্চল চরণে ধাবমানা। তীরে শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র, আল-দেওয়া। ক্ষেতের পশ্চাতে জঙ্গলচটীর পাহাড় ও জঙ্গল। ওকগাছ-গুলির শীর্ষ দেশে অস্তাচলগামী রবির স্বর্ণাভ কিরণ প্রতিফলিত হয়েছে। পাহাড়ের কোলে, ওকের ছায়াতলে, দুটি তাঁবু দেখলাম। বিশ্রামান্তে সেখানে গেলাম। সরকারি পূর্ত্ত-বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়র (Mr. E. M Crew) ক্রু সাহেবের তাঁবু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সাহেব আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বল্লাম যে আমিও তাঁর মত ইঞ্জিনীয়র। সাহেব মিষ্ট-ভাষী। নানা কথা আমাকে বল্লেন। স্থানীয় রাস্তার দুরবস্থার কথা তাদের মধ্যে একটি। "এবছরের বজেটে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা চার-শো মাইল রাস্তার সংস্কার কার্য্যে দেওয়া হয়েছে। তা'তে কি করে রাস্তা ভালো রাখা যায়? সুতরাং, আপনি যা বলেছেন, রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। কয়টা পুল অব্যবহার্য্য হয়েছে। ফলে যাত্রীদের অসুবিধা। দুর্ঘটনাও ঘটেছে।"

হিমালয়ের খবর পেলাম। অদূরে তামার পাহাড় আছে। সীসা, শ্লেট, মার্ব্বেল এবং অভ্রের পাহাড় আমি দেখে এসেছি। জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি আছে। সাহেব শিকার করেছেন। বাঘ ও হরিণের চামড়া দেখালেন। সম্প্রতি একটি নেকড়ে দুজন পাহাড়ীর প্রাণসংহার করেছিলো। তিনি তাহাকে বধ করেন। আমাকে Pioneer পড়তে দিলেন। কুলীর ডাক বসিয়ে সংবাদপত্র ও রসদ আনাতে হয়। প্রাতে আমাকে মঠ চটীতে যেতে বল্লেন। এগার মাইল। সেখানে প্রচুর শাক সবজী ও ফল ফুল মেলে।

চা পান কালে বল্লাম "এই যাত্রায় আমার মানস সরোবর ও কৈলাসে যাবার ইচ্ছা আছে। আপনার সেখানকার

বরফের নদী

অভিজ্ঞতা আছে কি?" তিনি বল্লেন, বদ্রী অথবা যোশীমঠ থেকে 'মানা' অথবা 'নীতি' সঙ্কট দিয়ে কৈলাসে যেতে হয়। গিরি সঙ্কটের ৫০ মাইল মাত্র তাঁর অধীনে। তিনি কৈলাসে যান নি। তাকালকোট পর্য্যন্ত গেছেন। দুরন্ত শীত ওই বরফের রাজ্যে। চামড়ার পোষাক ছাড়া বুকে গরম জলের বোতল রেখে দিতে হবে। তত্রাচ শীত লাগবে। কৈলাসের পথে এক স্থানে উনিশ হাজার ফিট উঁচু গিরিসঙ্কট অতিক্রম করতে হয়। পথ দুর্গম। তবে, স্থান-বিশেষে সমতল উপত্যকা, কৃষিক্ষেত্র এবং পার্ব্বত্য সহর আছে। "গাইড" পাওয়া যাবে। তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং দুখানি সুপারিশ-পত্র লিখে দিলেন। একখানি চম্পা

সহরের মোড়ল মহাশয়কে, আর একখানি যোশীমঠে তাঁর সহকারী ওভারসিয়র বাবুকে।

পরম আনন্দে সে রাত্রে গাওয়া ঘী-এ ভাজা, অত্যুৎকৃষ্ট আটার গরম গরম খাস্তা লুচি, আলুর দম, কুমড়া ও পাঁপর-ভাজা, আচার, চাটনী এবং চিনি খেলাম। আহারান্তে সেই চাঁদের আলোয়, নদীর সৈকতে, বৃহৎ পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে গুণগুণ স্বরে অনেকগুলো গান করলাম। বিছানায় শুয়ে কিন্তু ঘুম আসে না, এতো
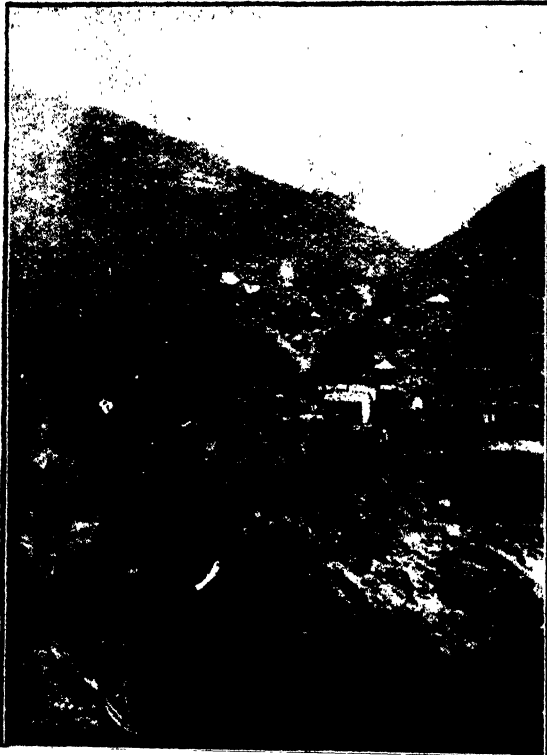
বদরী ধাম

উৎসাহ আমার! কৈলাস যাত্রা এবং চিঠির কথা কিন্তু সঙ্গীদের কাউকে বলিনি। বাধা পাবো তাহলে।

ভোরে কাক কোকিল ডাকবার আগে মঠ চটীতে যাত্রা এবং অন্যান্য যাত্রীদের পৌঁছাবার অনেক আগে সেখানে পৌঁছানো, বেলা নটায়। আমি যাই পদব্রজে, সঙ্গীরা ঝাঁপানে অথবা ডাণ্ডীতে চেপে আসেন। মধ্যে লালসাঙ্গা অতিক্রম করলাম। সেখানে অলকানন্দার উপরে বৃহৎ Suspension bridge বা লোহার ঝোলানো পুল আছে। তিনটী রাস্তা। একটিতে কেদারে যাওয়া যায় এবং আমরা তা ধরে এলাম। একটিতে আমরা বদরিকা যাচ্ছি। অপরটী পুল পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে রামনগর রেল ষ্টেসনে গেছে। বাড়ী ফেরবার সময় আমরা সে পথে রামনগর যাই। এখানে অলকানন্দার জল কর্দ্দমাক্ত। মঠ চটীতে ঝরণা আছে; তা থেকে জলসরবরাহ হয়। কয়েকটা বাগান দেখলাম। ক্ষেতে ধান, তামাক, মূলা ও পেঁয়াজকলি জন্মেছে। বাগানে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও কলাগাছ। মোচা ও কলা ফলেছে। গোলাপ ও মতিয়া বেল ফুল দেখলাম। একটি বাগানের মধ্যে গেলাম। দোতালা একটি বাড়ী আছে। গৃহস্বামী তখন ক্ষেতে। গিন্নি এলেন। নাকে বৃহৎ নথ, ময়লা কাপড়। তিন আনায় দশটা পাকা কলা, এক আনায় দুটো মোচা, এবং পেঁয়াজকলি, কুমড়া, লাউ, মূলা, লেবু কিনলাম। মূলা ও পেঁয়াজকলি বাগান থেকে তুলে এবং মোচা গাছ থেকে পেড়ে দিলো। একটি যুবতী মেয়ে ছিলো। সুন্দরী মেয়ে। তার হাতে মুখে ঘা—উপদংশের মত।

ঝরণার জলে স্নান, পরিতোষ পূর্ব্বক আহার, দুঘন্টাকাল বিশ্রাম ও সরবতি লেবু ও মিছরির সরবৎ পানান্তে অপরাহ্নে যাত্রা করা গেলো। নদীর ধারে রাস্তা। মাইলখানেক গিয়ে পরে পরে দুটী সেতু। জু-সাহেবের কথা মত একটি সেতু সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য বটে। তার পরে বিরল-বৃক্ষ লোহার পাহাড়ের উপরে মসৃণ রাস্তা। লোহার পাথরের নমুনা দিয়েছি। সেতুর অদূরে দুটি ঝরণা আছে। উভয়ের মধ্যে একটি "পাকদণ্ডী" বা ছোট পথ প্রায় খাড়া ভাবে শিখরে উঠেছে। সে পথে গেলে অন্ততঃ আধ মাইল রাস্তা কম হ'বে। সঙ্গীরা পিছনে। অগ্রগামী যাত্রীরা পাকদণ্ডীতে গেলেন না। একটি পাহাড়ী বালক সে পথে উঠছিলো, আমি তার অনুসরণ করলাম। উঠে বুঝলাম—বাঙালীর পক্ষে পথটা অতীব বিপদসঙ্কুল। পুস্তকে আছে এলিজা তার হারানো ছেলেকে আনবার জন্য গাছের শিকড় ধরে "রকী" পর্ব্বতের উপরে ঈগলের বাসায় গিছলো। নামবার সময় ছেলেকে বুকে বেঁধে গড়িয়ে পড়া। এ পাহাড়ও তাদৃশ। প্রতি পদে হড়কাবার ভয়। অতি সন্তর্পণে অর্দ্ধেক পথ উঠলাম। নীচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে গেলো। বুক ধড়াস ধড়াস করতে ও পা কাঁপতে লাগলো। অনেক নীচে নদী। আমি যেখানে আছি সেখানে থেকে

হড়্‌কে গেলে, গড়িয়ে বিশ হাত যেতে হবে না, পাহাড়ের কার্ণী থেকে, ঢিলের মত, টুপ করে তিনশ হাত নীচে নদীতে পড়ে যাবো। পাহাড়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম এবং উচ্চৈঃস্বরে ছোকরাকে ডাকলাম। নীচে নামতে বেশী ভয়। তার সাহায্যে উপরের রাস্তায় উঠি।

পিপুল চটীর পথে। নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির ভস্মাচ্ছাদিত, কূর্ম্মপৃষ্ঠ উপত্যকা। গৈরিক নিঃস্রাব জমে গিয়ে পাথর হয়েছে। নমুনা নিয়েছি; যাঁরা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করেন তাঁদের দেখাবো। বৃক্ষ নাই, লতা নাই; একপ্রকার কণ্টকাকীর্ণ লতাগুল্ম, আর শিয়াল কাঁটা। যে দিকেই তাকাই—একেবারে নেড়া, খাড়া, আকাশচুম্বী বিরাট পাহাড়! শৃঙ্গে-শৃঙ্গে ঢেউ-খেলিয়ে আকাশে মিশেছে। কঠিন, ধূসর-কালো পাষাণের ঢেউ। নরকঙ্কালের কোটর চোখের মত বিশাল পর্ব্বত গুহা খাঁ-খাঁ করছে। সুদীর্ঘ ফাটল। বহু নিম্নে খরস্রোতা। গিরিসঙ্কটের বায়ুপথে অবিশ্রান্ত রেলগাড়ির মত গড়্ গড়্ শব্দ আসছে। সে শব্দ নদীর গর্জ্জনের। নদীর পাষাণময়ী তলদেশ বড়ই উঁচু নীচু এবং তার বক্ষদেশে রাশিকৃত এবড়ো খেবড়ো পাথর। উদ্দাম প্রবাহের ও উত্তাল পাষাণের সংঘাতের ফলে এরূপ গড়্ গড়্ শব্দ। কাল এ সময়ে আমি বনস্পতির ছায়াশীতল ক্রোড়ে ছিলাম। আজ দানবের শ্মশানভূমে।
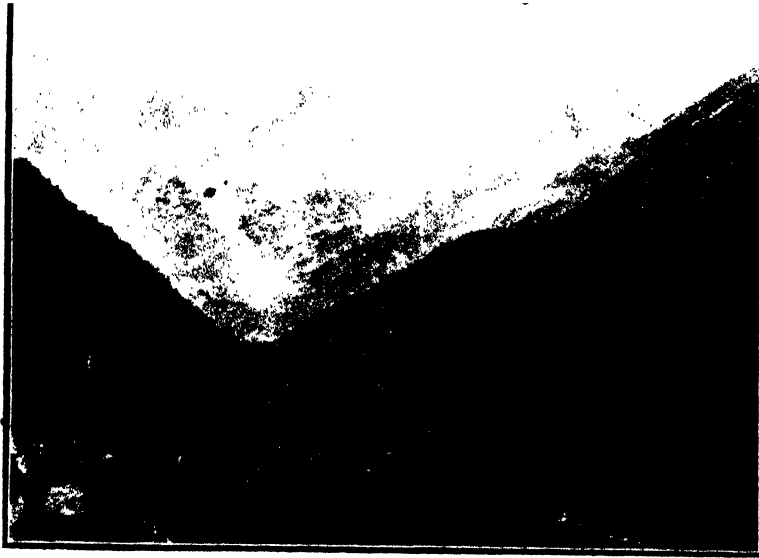
গিরিসঙ্কটে অলকানন্দা

মাদ্রাজ হ'তে মহীশূর হয়ে বোম্বাই যাবার পথে বহু প্রাচীন Archæan যুগের পূর্ব্ব-ঘাট পর্ব্বত দেখেছিলাম; শাখাপ্রশাখাহীন ফণীমনসার জঙ্গলসমাকীর্ণ। তৎপরে দাক্ষিণাত্য উপত্যকার কোলার প্রদেশে উঠি। উপত্যকাটী আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাব (Basaltic lava, হ'তে উদ্ভূত। সেখানে কিন্তু কাঁটা গাছ পর্য্যন্ত নাই; কেবল কালো কালো অঙ্গারের কর্কশ, কঠিন পাহাড়। সোণার খনি দেখবার কালে সেই পাহাড়ের গর্ভে চার হাজার ফিট—এবং ভারত মহাসাগরের নীচে একহাজার ফিট নেমেছিলাম। সেখানকার পাথরও আগ্নেয়গিরির অঙ্গার-সম্ভূত, এবং ছাইরঙা (Quartzite) এবং সোণা-মেশানো। রেঙ্গুনের ৫০০ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে আলোন (alon) নামে মৃত একটি আগ্নেয়গিরির মুখবিবর আছে। তিন মাইল পরিধির হ্রদের মত দেখায়। পিপুল চটীর পথের গিরি-গহ্বরের মুখের পাঁশুটে রং সেই বিবরের রংএর মত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পিপুল উপত্যকাটী অগ্ন্যুৎপাতের পরিণাম। কিন্তু সে কথার উল্লেখ কোথাও আছে কি না জানি না। যদি বলেন, তার অত কাছের মঠ চটীতে কলাগাছ হয় কি প্রকারে? ঠিক সেই প্রকারে যে প্রকারে কোলারের কাছে বাঙ্গালোরে অত ফল-ফুলের আধিক্য। কোলারের দশক্রোশ দূরে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ও লব কুশের জন্মস্থান দেখে এসেছিলাম। সে স্থানও উর্ব্বর। আলোনের উপকণ্ঠবর্ত্তী Shewb প্রদেশে ধান উৎপন্ন হয়। এরূপ উর্ব্বরতার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। তাহা বলতে গেলে, ভূ-তত্ত্বের আলোচনা করতে হয়। সন্ধ্যার পরে পিপুল চটীতে পৌছালাম। পিপুল চটীকে সহর বলা চলে এরূপ জনবহুল স্থান। সেখানে রাত্রি যাপন করে পর দিন প্রভাতে গরুড়-গঙ্গা যাত্রা করলাম। পথের দৃশ্য মনোরম। কোথাও কিংখাবের মত শ্যামল, ঈষৎ সমতল কৃষিক্ষেত্র

কোথাও নগ্নকায় দৈত্যের আকৃতি পাষাণ স্তূপ। ঊর্দ্ধে তুষারের মেখলা। নিম্নে অলকানন্দা। বীণ এবং ডমরু লয়ে একদল নর্ত্তক-নর্ত্তকী যাচ্ছিলো। আমার অনুরোধে নৃত্য-গীত করলো। আট আনা বকসিস এবং ছেলেদের মিছরি ও কিসমিস দিলাম। ছুচ, সুতো চেয়েছিলো। গরুড়-গঙ্গা একটি নির্ঝরের নামান্তর। তীরে দোকান-পাট এবং দেবালয় আছে। গরুড়-গঙ্গায় যাত্রীরা স্নান করবার কালে ডুব দিয়ে নুড়ী তুলে থাকেন। প্রবাদ, সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে সেই নুড়ী ঘষে দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। গরুড়-গঙ্গার ছয় ক্রোশ দূরে যোশীমঠ। চড়াই পথ। যোশীমঠের কথা অনেক শুনেছিলাম। এখন স্বচক্ষে দেখলাম। সহরে একতলা ও দ্বিতলা কোঠা অনেকগুলি। বাড়ীর নীচের তলায় দোকান। থানা, পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস, ডাক বাংলো, দাতব্য চিকিৎসাগার, হাসপাতাল এবং অশত্থ, বট ও অন্যান্য গাছ। হিমালয়ের এ প্রদেশের সহর বললে এই বুঝতে হবে যে, আঁকাবাঁকা, অসমতল, অপ্রশস্ত রাস্তার দুধারে তিন চারশ'খানা কাঁচা-পাকা ইমারত। একধারের বাড়ীগুলো রাস্তার পাশে নীচু জায়গায়; অন্য ধারের গুলো রাস্তার উপরে। যোশীমঠের বাড়ীগুলো মাঝারি এবং ছোটো। পাথরের দেয়াল, কাঠের বারাণ্ডা, শ্লেটের অথবা খোলার ঢালু ছাদ। আর বাড়ীগুলো ঘেঁসা-ঘেঁসি। মেঝে প্রধানতঃ গোবর-মাটীর,—দরজা, জানালা, বারাণ্ডায় রং নাই। ফলতঃ পাঁচ বছরের বাড়ীকেও পুরানো দেখায়। সহরের রাস্তা অতিক্রম ক'রে হাত দুই চওড়া একটা ঝরণা, বাঁধানো ড্রেনের মত, রাস্তার ও-পাশে গভীর খদের দিকে ছুটেছে। সহরবাসী সে জলে কাপড় কাচে এবং বাসন মাজে। রাস্তার ডান দিকে একটি দোতালা বাড়ীর উপরের ঘরে আমাদের থাকবার স্থান হয়। তার নীচে বাড়ীওলার মুদীর দোকান। দোকানে চাল, ডাল, আটা, আলু থেকে আর্শি চিরুণী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। রাস্তার বামে ঢালু পাহাড়ের নিম্ন ভূমি। সেখানে হরপার্ব্বতী, গণেশ এবং নরসিং দেবের মন্দির। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের এখানে সমান প্রভাব। উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে আছেন। তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব আছে। দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী ধামের অবস্থা কিন্তু বিপরীত। সহরের এক অংশে শিব-কাঞ্চী, অপর অংশে বিষ্ণু-কাঞ্চী। শুনেছিলাম, এ দলের আখড়ায় লোক ওদলের আখড়ায় যেতে পারেন না। যোশীমঠের প্রধান মন্দিরের চার দিকে পাথরে-বাঁধানো প্রাঙ্গণ এবং দোতালা, চকমিলানো বারাণ্ডার সঙ্গে ছোটো ছোটো কুঠুরী আছে। সিংহ-দ্বারের মাথায় গুপ্ত-যুগের চৈত্য বাতায়নের মত দেখলাম। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের গঠনও চৈত্যের মত। মন্দিরগুলির প্রাচীনতার ইহা অকাট্য প্রমাণ। পাথরের সোপান দিয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে নামবার বাঁ দিকে একটি পাকা ঘর আছে। সে ঘরের মধ্যে পাথরের দেয়াল দিয়ে বাঁধানো একটি ঝরণা আছে। যাত্রীরা সেখানে স্নানাদি করেন। কপালে সিঁদূরের টিপ এবং কাছা দিয়ে খেজুর-ছড়ী শাড়ী-পরা হৃষ্টা-পুষ্টা একটি মরাঠী তরুণী আধমণি তামার হাণ্ডাতে জল ভরছিলেন। তিনি বল্লেন যে তিনি স্বামী পুত্র লয়ে যোশীমঠে বাস করেন। স্বামীর দোকান আছে। যোশীমঠের মন্দির ও বাড়ীগুলিতে প্রাচীনতার ছাপ দেখা যায়। সহকারী রাওয়ল মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। মঠে শঙ্কর-যুগের পুঁথি ও অনুশাসন আছে। তবে সেগুলি দেখতে অথবা তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম না। পুঁথির অনুবাদ এবং তালিকা প্রস্তুত হয়েছে কি না তাও জানা গেল না। জৈসলমের দুর্গের গোপাল-মন্দিরে শিকলে-ঝোলানো একটি পেটিকা দেখেছিলাম। তন্মধ্যে হাজার বছরের পুরানো জৈনগ্রন্থ আছে। বৎসরান্তে তাদের বের করে পূজা করা হয়। সাধারণে তাদের দেখতে অথবা নকল নিতে পান না। যোশীমঠের গ্রন্থাগারেও সাধারণের অধিকার নাই।

আহারান্তে সাহেবের সুপারিশ-পত্র নিয়ে ওভারসিয়র বাবু আনন্দস্বরূপের বাসায় গেলাম। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন বল্লেন, এবং ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের মঠাধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সহর-প্রান্তে তাঁর মঠে নিয়ে গেলেন। মঠটী মনোরম নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। প্রাঙ্গণে শত সহস্র গোলাপ ফুটেছে। অধ্যক্ষ মহাশয় হিন্দী এবং অল্প ইংরাজী কথা কহিতে পারেন। বল্লেন, তিনি দুবার কৈলাসে গেছেন। নীতিপাশ এখনো বরফে ঢাকা। মাসখানেক পরে খোলা হ'বে। ভুটিয়া ব্যাপারীরা লবণাদি বাণিজ্য-সম্ভার, ঘোড়া, ছাগল, চমরী, তাঁবু এবং অস্ত্র লয়ে সে সময়ে তিব্বতে যাত্রা করবেন। তাঁদের সঙ্গে গেলে আমার বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। তাঁদের সঙ্গেই

আমার যাবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। তবে, তাঁরা কৈলাসে যাবেন না। লাসা যাবার পথ থেকে ৫।৬ দিন লাগে কৈলাসে যেতে। আমার সঙ্গে যে দোভাষী কাণ্ডীওলা আমার মাল পত্র নিয়ে যাবে, সে-ই আমাকে মানস সরোবর ও কৈলাস পরিক্রম করিয়ে আলমোড়ায় পৌঁছিয়ে দেবে। হিসাব করে দেখলাম, দু'মাস সময় লাগবে এবং গরীবানা চালে থাকলে তিনশ' টাকা খরচ হ'বে। ব্যাপারীদের সঙ্গ ছেড়ে যেদিন কৈলাস মুখে যাবো, পনর দিনের খোরাক—রুটী, গুড় ও মাখন—সঙ্গে নিতে হ'বে। গুহায় রাতে থাকতে হ'বে। পথে তিব্বতী পোষাক তৈরী করাতে হবে। ৫০।৬০টাকা লাগবে। আমার ইচ্ছা, লাসা হ'য়ে দার্জ্জিলিং-এর পথে বাড়ী ফিরি। টাকা ফুরিয়ে গেলে ভিক্ষা করে খাবো, তথাপি যাবো। তিনি বল্লেন—সেখানে যাবার ছাড়পত্র পাওয়া একরূপ অসম্ভব। তবে তিনি ব্যাপারীদের প্রধানকে চেষ্টা করে দেখতে অনুরোধ করবেন—লামা বা সাধু সাজিয়ে যদি আমাকে পাঠানো যায়। এ রকম সাধু সেখানে গেছে। সেখানে সাধুরা পূজার্হ। লাসা থেকে দার্জ্জিলিং যাবার পথের বিষয় তিনি কিছু জানেন না। আমাকে সন্ধান নিতে এবং ব্যবস্থা করতে হ'বে। স্থির হ'ল, আমি তাঁর আশ্রমে থাকবো এবং যাত্রার আয়োজন করবো। আমি সেখানে কিছু দিন থাকলে তাঁরও উপকার হ'বে। মঠের একটি নতুন বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে। স্থানীয় ঠিকাদার কাজ সুরু করে গোলমাল করছেন। কাজ বন্ধ আছে। আমি বাড়ীটা আরম্ভ করাবো। সন্ন্যাসী-বরের নাম ও ঠিকানা—নর্ম্মদা স্বামী হঠাত্যাগী ; ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল, যোশীমঠ, গাড়োয়াল জেলা। যদি কেউ বদরীর পথে কৈলাস যাবার ইচ্ছা করেন, উক্ত ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে পত্র বিনিময় করতে পারেন, তিনি সাহায্য করতে পারেন।

যোশীমঠ হ'তে খাড়া উৎরাই পথে বিষ্ণু-প্রয়োগে নামলাম। লাঠির সাহায্যে অতি সাবধানে নামতে হ'ল, পাছে টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ি। বিষ্ণু-প্রয়াগে অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গম হয়েছে। ঝোলানো লোহার পুল দিয়ে পেরোতে হ'ল। সঙ্গমে সাবধানে স্নান করলাম, শীতবস্ত্রে গা ঢাকলাম এবং পূজার্থে মন্দিরে গেলাম। ছোটো মন্দিরটী সঙ্গমের ঠিক উপরে এবং পাহাড়ের গায়ে। বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে দশ ক্রোশ চড়াই পথে বদরিকা যেতে
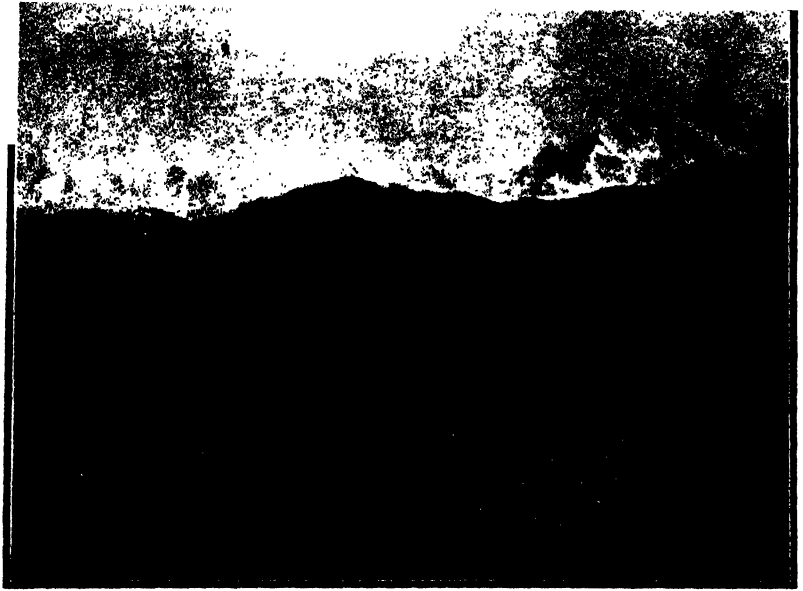
তুষারের দৃশ্য

হয়। এ পথের দৃশ্য অতি মনোরম ও বিচিত্র। অলকানন্দা তির্য্যগাকৃতি গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে আছড়ে পড়ে সফেণ তরঙ্গ ছড়িয়ে ছুটেছে—খাড়া, উঁচু, উনুনের ঝিকের মত শীর্ষ, শত সহস্র শৃঙ্গগুলি রেখাকারে তাকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে। উন্মাদিনী নির্ঝরিণী সশব্দে নদী-বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জলপ্রপাতের উপরকার সেতু দিয়ে যাত্রী চ'লছে। সঙ্গমের ঘূর্ণায়মান ফেণিল আবর্ত্তে সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশ করেছে। হনুমান-চটী বদ্রীনাথের তোরণ স্বরূপ। পবননন্দন দ্বারী হ'য়ে দণ্ডায়মান। তার পরে গন্ধমাদন-চটী। লক্ষ্মণকে

বাঁচাবার জন্য তিনি সেখান থেকে বিশল্যকরণী সহ গন্ধমাদন শৃঙ্গ তুলে নিয়ে যান। চটী জঙ্গলের মধ্যে। একজন পাহাড়ী চটীতে ভাল্লুকের পিত্ত বেচতে এনেছিলো, বলে ৪০০৲ সের। দোকানী—মধু, ভূর্জ্জপত্র, চমরীর লেজ বা চামর, হরিণ, ভাল্লুক ও বাঘের চামড়া বিক্রীর জন্য রেখেছে। পুরাকালে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিরা যে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করতেন, সেরূপ বস্ত্রের চলন হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান—পাহাড়ীদের মধ্যে। তার নাম "ভাঙ্গেলা"। ভাং অর্থ সিদ্ধি গাছের ছাল হ'তে তৈরী হয়, নাম সেজন্য ভাঙ্গেলা। ৪॥৹ টাকায় একখানা কাপড় কিনলাম। শ্রীনগরের মুখুজ্জে মহাশয় আমাকে ভাঙ্গেলার সন্ধান দিয়েছিলেন।

গন্ধমাদনের স্মৃতি আমি ভুলতে পারবো না। নীলাভ ধূসর পর্ব্বতমালার ক্রোড়ে নীলবরণা স্রোতস্বিনী। অলকানন্দার অশ্রান্ত কলগানের সঙ্গে বনস্পতির মর্ম্মরতান। দীর্ঘজটাধারী বট। তার পাষাণময় তলদেশের শৈবালময় শিলা পৃষ্ঠে, পাকা বট ফল প'ড়ে আছে কতো পাখী এসে বটফল ঠুকরে খেয়ে ফেলে রেখে গেছে। বনফুল, গৌরীফল, শ্বেত গোলাপ, কামিনী ও চামেলীর অফুরন্ত জঙ্গল—স্থানটি সুগন্ধে ভুর ভুর করছে। ফুলের গন্ধে আকুল নির্জ্জন সেই বন-বীথিকার মহাদ্রুম তলে যেখানে লীলাময়ী প্রকৃতি-রাণী আলো আঁধারের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন, সে স্বপ্ন-রাজ্যে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেখানকার শোভা বাড়িয়ে তুলেছিলেন একজন সন্ন্যাসিনী। অলকানন্দার বিজন পুলিনে, বিহগকূজন-মুখরিত নিবিড় কাননে, দূরাগত গিরি-নির্ঝরিণী যেখানে ফেণায়মান জলপ্রপাত রূপে অলকানন্দার কল্লোলে মিশেছে—শীকর-সম্পৃক্ত তরুতলে, পাষাণ-চত্বরের কোলে, বনফুলে আলুলায়িত কেশসম্ভার সুসজ্জিত ক'রে, চামেলীর মালা গাঁথছিলেন তিনি। পরনে লাল গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; সহাস, সৌম্য, প্রশান্ত, পবিত্র মূরতি। কপোলে বিভূতি মাখা। স্বামীকে হারিয়ে আনন্দময়ী নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি আমাদের সহযাত্রী। সাধারণতঃ ঝাঁপানে চেপে যান। তীর্থক্ষেত্রে বহুবার তাঁকে মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করতে দেখেছি।

তুষারের রাজ্যে উঠছি। শীত করছে। খাড়া পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা বের করা যেখানে সম্ভবপর হয়নি, সেখানে সেতুর সাহায্যে নদীর ওপারে গিয়ে অন্য পাহাড়ের গা দিয়ে আবার উপরে উঠতে হয়। মনে করুন, গিরি সঙ্কটের বাঁ পাশ থেকে সেতু দিয়ে ডান পাশে গেলাম। একটুখানি গিয়েই একসঙ্গে নদী ও পাহাড়ের বাঁক, ডান দিকে। নদীর একশ হাত উপরে, পাহাড়ের গায়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় আমরা চলেছি, এমন সময়ে নদী ও রাস্তা ডাইনে বেঁকে গেল। বাঁকের মুখে নদী আমাদের সামনে পড়ল; তার পরে বামে। এবং নদী যখন সামনে তার ঠিক ওপারে, অনেকটা তীর ভূমির পিছনে, অন্য একটি পাহাড়ে দেখা গেলো, নদীতীর হ'তে তিনশ' হাত উপরে পাহাড়টার গায়ে ঘুরন্ত সিঁড়ির মত পাক দেওয়া রাস্তা উঠেছে। আমাদের এই বাঁক থেকে বাঁ দিকে নদী রেখে, অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে অনেকটা গিয়ে, চড়াই পথে, সেই পাকের মুখে উঠতে হ'বে। আবার সেই কোণ থেকেও নদী ডাইনে বেঁকে গেলো। এরকম ভাবে ঘন ঘন এঁকে বেঁকে আমরা অনেকবার এসেছি। যখন নীচে ছিলাম পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখেছি—কালো পাহাড়ের এখানে ওখানে যেন চূণ ছড়ানো। ওপরে ওঠার কালে তুষারগুলি ক্রমশঃ আমাদের নিকটে, পরিশেষে একেবারে পাশে এলো। নদী জমে গেছে দেখলাম; বরফের নীচে জলের স্রোত। ক্রমে আমরা তুষার মাড়িয়ে চল্লাম। এক ইঞ্চি পুরু, ভিজে দোবরা চিনির মত তুষার প'ড়ে। রং কিন্তু ধবধবে সাদা নয়—অতি অল্প কালচে ভাবের। বিষম চড়াই ভেঙ্গে ওঠার দরুণ আমার বেশী শীত করেনি। যাঁরা ঝাঁপানে অথবা দাণ্ডীতে বসে আসছিলেন, তাঁরা কম্বল গায়ে দিয়েছেন।

কেদারে হিমালয় বিরাট, বিশাল, গম্ভীর—লক্ষ কোটি বর্ষব্যাপী ধ্যান-নিমগ্ন মহাদেবের মত। শৃঙ্গগুলি বদরিকার পথের শৃঙ্গগুলির মত ঘন ঘন এবং আ-ফোটা পদ্ম-কলির মত ছুঁচালো নয়। সেখানে এক শৃঙ্গ হ'তে অন্য শৃঙ্গে যেতে সময় লাগে। নদী সহস্র ফিট নীচে, গিরিসঙ্কট বেশী চওড়া। সেখানে চিল মানুষের নীচে ওড়ে। সেখানকার তুষার এখানকার তুষারের চেয়ে পুরু; এবং অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে থাকে। ত্রিশ হাত চওড়া বরফের নদী অতিক্রম করে গেছি। বড় বড় গুহা, বড় বড় জলপ্রপাত দেখেছি। কেদারনাথ—কেদারা চৌতাল সঙ্গীতের মত উদাত্ত গম্ভীর। সুরধনী মন্দাকিনী—সঙ্গীত-ছন্দের গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে তাঁর সামগানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। নীহার-স্ফোট মৃদঙ্গ

বাজাচ্ছে। অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী শেষ করে কেদার আভোগ ধরেছেন।....৺

বদরীনাথ—খেয়ালের মত। পরের পর ছুঁচাল অফুরন্ত শৃঙ্গগুলি যেন কলকল ছলছল অলকানন্দার অবিশ্রান্ত গিটকিরী। এখানকার দ্রুত-লয় দৃশ্য দর্শনে মানব হৃদয়ে দ্রুতগতি স্পন্দন ও কম্পন আসে বিশাল কেদারের গাম্ভীর্য্যের অনুভূতি-প্রসূতি আত্মহারা সমাধির ভাব আনে না।

ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে কেদারে যাচ্ছি—হঠাৎ একটা

দড়ির ঝোলা

বাঁকের মুখে দেখলাম—বাইশ হাজার ফিট কেদার-শৃঙ্গের পাদপ্রান্তে নীলকণ্ঠ কেদার মন্দির! নীল মেঘের আকৃতি পাষাণের দেবালয়। একেবারে এগার হাজার ফিট খাড়া বরফের স্তূপের নীচে মন্দির দেখা গেলো—অন্য বাড়ীর চিহ্ন মাত্র দেখতে পেলাম না—যা দেখতে চোখ সরাতে হবে! এক নিমেষে চোখের এক পলকে দুটী দৃশ্য দেখলাম—শৃঙ্গ ও মন্দির। ৺নন্তের গানে ডুবে গেলাম। কালও আমি, ঠিক সেই রকম একটা বাঁকের মুখে গিয়ে অকস্মাৎ বদরীনাথ দেখলাম। কিন্তু বসত-বাড়ীগুলোর মাঝে মন্দিরের কলস। চোখ নামিয়ে মন্দির খুঁজে নিতে হ'ল। যেহেতু, মন্দির ও বাড়ীগুলি উপত্যকার নীচে এবং আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার চাইতে নীচু জায়গায়। মন্দিরের পিছনে কেদারের ন্যায় বিশাল শৃঙ্গ নাই। আগ্রা দুর্গের সমন্ বুরুজ থেকে তাজমহল দেখবার কালে আবেশে যে রকম বিভোর হয়েছিলাম, সে রকম বিভোর হয়েছিলাম অসীম কেদারের কোলে অখণ্ড অব্যয় দেবালয় দেখে। কেদার হচ্ছে ধূর্জ্জটীর ধ্রুপদ সঙ্গীত, আর তাজমহল শাহাজাদীর লক্ষ্ণৌ-ঠুংরী।

এখন বদরীনাথের কথা একটু বলা যাক। এক মাইল দীর্ঘ এবং আধ মাইল প্রস্থ উপত্যকার তিন দিক জুড়ে, ঘোড়ার খুরের মত বক্রাকারে, পাঁচ ছয় হাজার ফিট উঁচু কয়টী শৃঙ্গ। শৃঙ্গগুলি বরফে ঢাকা। উপত্যকার বুকে অলকানন্দা। এবং তার দক্ষিণ তীরে ৺বদ্রীনাথ ধাম। সহরে ৩০০ খানা একতল, দ্বিতল বাড়ী। পাথরের বাড়ী। কাঠের ছাদ শ্লেটে ঢাকা। বারাণ্ডা নেই। পূর্ব্বে বর্ণিত পাহাড়ের বাঁক থেকে নীচে নেমে অলকানন্দার ছোটো সেতু পার হলাম এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে সহরে পৌঁছালাম।

ধূলা পায়ে মন্দিরে গমন এবং দেব-দর্শন। তখন মহা সমারোহে আরতি হচ্ছিলো। চতুর্ভুজ নারায়ণের সুন্দর মূর্ত্তি। কালো পাথরের। গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার। হীরক-খচিত মুকুট। কেদারে পাণ্ডার সঙ্গে দেবদর্শন করেছিলাম। এখানে কিন্তু পাণ্ডাদের যাত্রী লয়ে মন্দিরে যাবার অধিকার নেই।

আমাদের চটীটি দ্বিতল। দরজার পাশে, পাথরে লেখা আছে;—

৺ কালীচরণ দাস তস্য পত্নী নিস্তারিণী দাসী
তস্য পুত্র
শ্রীপ্যারীমোহন দাস তস্য পত্নী শ্রীমতী হরিমতি দাসী
তস্য পুত্র
শ্রীমাণিকলাল দাস তস্য পত্নী শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী
ঠিকানা ২৩১ নং আম পোস্তা কলিকাতা।

আমাদের পাণ্ডা রামপ্রসাদ সূর্য্যপ্রসাদ লক্ষভাইএর প্রতিনিধি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে লেপ দিলেন

ও ঘরে আগুন রাখলেন। শীতে হাত পা যেন বেঁকে যাচ্ছিলো। পাণ্ডা ঠাকুর রাত্রে দেবতার প্রসাদ পাঠালেন। ভূর্জ্জপত্রে আতপ চালের ভাত, আটার ডালপুরী, ময়দার লুচি, মালপো, পাপর ভাজা, বেসমের লাড্ডু, আলুর ঝোল, আলু চচ্চড়ী, উচ্ছে ভাজা, ঝাল-দিয়ে ঢেঁড়শ, আম তেল, আমড়ার আচার, কুমড়ার মোরব্বা, লেবুর আচার এবং আলুর পকৌড়ী। অনেক দিন সেই একঘেয়ে ভাত-ডাল-আলু-কুমড়া-রুটী লুচি খাবার পর আজ রাজভোগ খেয়ে প্রাণ জুড়ালো।

সকালে হাত মুখ ধুয়ে তপ্ত কুণ্ডে স্নান করতে গেলাম। তপ্ত কুণ্ড মানে গরম জলের ঝরণা। মন্দির এবং অলকানন্দার মধ্যে এই ঝরণা এবং একটি ছোটো এবং অগভীর কুণ্ড আছে—পাকা ছাদের নীচে। ঝরণা থেকে ফুটন্ত জল কুণ্ডে পড়ে। মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে ত্রিশ ধাপ নেমে কুণ্ডে গেলাম। জল অত্যন্ত গরম। ঠিক তার পাশে আর একটি গরম জলের ঝরণা আছে,—পাহাড়ের গা থেকে চাতালের উপরে জল পড়ছে। সেখানে কুণ্ড নাই। আর পাঁচ ধাপ নেমে সেখানে গেলাম—এবং আরও বিশ ধাপ নেমে অলকানন্দা থেকে বালতি করে বরফ জল এনে গরম জলে মিশিয়ে স্নান করলাম। ঝরণার জল চেকে প্রথমে মিষ্ট পরে কষা লাগলো। এই গরম জল থাকার দরুণ যাত্রীদের অনেক সুবিধা হয়। হাত মুখ ধোবার জন্য সকলে এ জল বাসায় নিয়ে যায়।

বদ্রীনাথের মন্দির আধুনিক কালের। গর্ভ-মন্দিরের উপরে নেপালী ধরণের কাঠের ছাদের মত বিমানের উপরে সোণার কলস। জগমোহনের উপরে মোগল-ধরণের পাথরের গম্বুজ। সিংহদ্বারে এবং অন্যান্য অংশে মোগল এবং রাজপুত স্থাপত্যকলার প্রভাব।

নানা দেশের যাত্রী এসেছে। বুড়া বুড়ীই অধিক। তামিল, মরাঠী, পঞ্জাবী, শিখ, সিন্ধী ও গুজরাটীদের সঙ্গে আধা-বয়সী রমণী ও ছোট ছেলেমেয়ে এসেছে। কেউ কেউ কচি ছেলে এনেছেন। একটি শিখ বালিকা পদব্রজে এসেছে। সুন্দর ও প্রফুল্ল মুখখানি, টানা চোখ। আমার সঙ্গে অনেক কথা কয়। এমন মিষ্ট কথা! চসমা চোখে, "রিষ্টওয়াচ" হাতে ভাটিয়া শেঠনী এসেছেন। দাণ্ডীতে বসে যান, ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন। সঙ্গে দূরবীণ থাকে। খুব ধনী তাঁরা। তাঁদের দলটীর জন্য চটীতে ভালো স্থান পাওয়া শক্ত। একজন উড়েনী ভিখারিণী এসেছেন। ছেঁড়া পুটলি ও বাঁশের লাঠি সম্বল। কঙ্কালসার দেহ। পায়ে গোদ। একটুখানি হাঁটেন এবং মাথা থেকে পুটলি নামিয়ে রাস্তায় রেখে জিরোন। আর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রাণ ভরে বলেন "কেদারনাথ বদ্রীবিশাল কি জয়।" ভিক্ষা হয় ত কোনো দিন জোটে, কোনো দিন অনাহার!

ডান পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত কাটা একজন ভিক্ষুক দুহাতে লাঠি ধরে এক পায়ে আসেন। অন্ধ পদব্রজে আসছেন। কেদার থেকে রামবাড়া নামবার পথে একজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা বার বার মাথা ট'লে বসে পড়ছিলেন। তাঁর সঙ্গীও বৃদ্ধ। সহধর্ম্মিণীকে সাহায্য করতে অক্ষম। আমার অনুরোধে আমার কাঁধে ভর দিয়ে বৃদ্ধা রামবাড়া চটীতে এলেন। সেদিন অপরাহ্ণে যোশীমঠ থেকে বিষ্ণু-প্রয়াগে নামছি। সঙ্গীরা এগিয়ে গেছেন। আমি সেদিন সকলের পিছনে—কৈলাস যাবার ব্যবস্থা করতে দেরী হয়ে যাওয়ার দরুন। পথে প্রৌঢ়া বাঙালী রমণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দেখলাম। পাহাড়ীর দ্বারা জল আনিয়ে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলাম। পকেটে কিচমিচ, বাদাম, খেজুর ও মিছরি ছিলো। খাওয়ালাম।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়জন দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষ এক দিন রাতে চটীর বাইরে কম্বল পেতে শুয়েছিলেন। তাঁরা রসদ কিনতে পারবেন না শুনে মুদী চটীর মধ্যে তাঁদের আশ্রয় দেয়নি। খুব শীত। তাঁদের জামা নাই। দোকানীকে বলে কয়ে আমাদের নীচের তলায় তাঁদের স্থান করে দিলাম এবং আহার্য্যের ব্যবস্থা করে দিলাম। যুবতী স্ত্রীটির অসুখ করেছে। নরুদা ওষুধ দিলেন। তাঁরা একবেলা খেয়ে নারায়ণ দর্শনে চলেছেন। নবদ্বীপের একজন বাবাজী আট দশজন বৈষ্ণবী নিয়ে—হরিদ্বার থেকে আমাদের সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন। বহুকাল পরে, গুপ্তকাশীতে, তাঁদের দলের দুজনকে—প্রৌঢ়া পিসি এবং যুবতী ভাইঝী "বুড়ী"কে—দেখলাম। সঙ্গীরা কেউ ঝগড়া করে আলাদা যাচ্ছেন, অর্থাভাবে এবং পথের কষ্টে কেউ কেউ ফিরে গেছেন। এঁদেরও সম্বল কম। অনেক যাত্রীদের পৌঁছাবার আগে আমি চটীতে যাই, এবং আমাদের, ও দুর্ব্বল, নিঃসহায়, সঙ্গীদের জন্য জায়গা দখল করে রাখি। তাতে তাঁদের

কিছু সাহায্য করা হয় এবং তাঁদের আশীর্ব্বাদে আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ হয়—প্রাণে নব বলের সঞ্চার হয়। বিশেষ রমণীয় স্থান না হ'লে পথিমধ্যে আমি বসি না.. একদমে পাঁচ ক্রোশ হেঁটে আসি। সেদিন প্রদোষে প্রকৃতির নিকুঞ্জ কাননে, সুনীল অলকানন্দার তীরে উপলখণ্ডের উপরে শুয়ে, উর্দ্ধে অস্তাচলগামা দিনমণির সিন্দুর-রাগে রঞ্জিত হিমাদ্রির তুষারের টোপরের দিকে চেয়ে, নদী কল্লোলের আকর্ষণে, শান্ত সমীরের সঞ্চালনে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার মা এবং অন্যান্য সঙ্গীরা ঘাট চটীতে আমি যাবার আগে গিছলেন। তাঁদের খাবার একটু

বদরী-পথে চড়াই

পরেই আমি যাই এবং দেখি, যাবার আসবার যাত্রীতে চটী পূর্ণ। আমাদের দলকে পেয়ে চটী-রক্ষক দরিদ্র হিন্দুস্থানী-দিগকে জোর করে সরিয়ে দিচ্ছে। দুজন বাঙালী বৃদ্ধা শুয়ে ছিলেন—আমাদের রাঁধবার জায়গা করবার জন্য তাদের ধাক্কা দেওয়া হ'ল। একজন কেঁদে উঠলেন। আর বাঙালীকে, স্বজাতিকে, ধিক্কার দিয়ে বল্লেন. "বাঙালীর চেয়ে খোট্টারা ভালো। তাদের দয়ামায়া আছে। আমাদের জায়গা করে দিয়েছিলো।" আমাদের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, অর্থশালী, সঙ্গী মহাশয় পরম আনন্দে বসলেন।

দরিদ্রাদের শুধু চোখ রাঙিয়েই তিনি নিরস্ত হ'লেন না, মারবার উদ্যোগ করলেন। আমি তাঁদের থামাই।

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অনেকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব আছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেয়েছি বদরী যাত্রায়। এ "বেণে" (এদিকে তাঁকে "মাসি" বলে সোহাগ করা আছে), ও "জেলে", "মেড়ো মাগীগুলো মোট-মাথায় দুপুর রোদে ধিঙ্গির মত হাঁটছে দেখো, ওদের আর কি—ছাতু খেয়ে দিন কাটাবে, চান করবার বালাই নেই" "গতোর বয় না" (অথচ ঝাঁপানে যাচ্ছেন),—খালি নাকি-সুর, পর-নিন্দা, পর-চর্চ্চা, সদা আরামের চেষ্টা, আর প্রলয়ঙ্করী অল্প পয়সার অকথ্য দেমাক! গাড়োয়ালের মেয়েরা দুক্রোশ চড়াই ভেঙ্গে একজন জল তুলছে—প্রশান্ত বদন, হাসিমাখা,—বিশ্রাম করতেই সময় পায় না, পরনিন্দা করবে কখন!

যতগুলি সাধু দেখলাম, তাঁদের মধ্যে দুজনকে দেখে যথার্থ ভক্তি হয়। একজন মধ্য-ভারতের লোক। পাগলাব মত। প্রতিনিয়ত ভগবানের নাম করছেন। অপরের বাড়ী গঞ্জাম জেলায়। তিনি খুব কম কথা ক'ন এবং কেউ কথা কইলে সংক্ষেপে উত্তর দেন। স্বেচ্ছায় কেউ তাঁকে খেতে দিলে একবারকার খাবার মত খাবার নেন। পয়সা নেন না।

কেদার-বদরী পরিক্রম করলাম। নিদ্রার ঘোরে স্বপ্নে আমি হিমালয়ের শোভা দেখি,—অলকানন্দার তীরে গগনস্পর্শী সহস্র হিম-শৃঙ্গের পাষাণ-প্রাকার,—অলকানন্দার অশ্রান্ত সঙ্গীত, সে সঙ্গীতের বিরাম নাই। হরিদ্বার ছেড়ে পর্য্যন্ত রাত্রি-দিন নদীর কল্লোল শুনছি। হিমালয়ে শুধু গান, আর আলো, আর হাওয়া, আর বরফ। গন্ধমাদনের বিজন অরণ্যে মালা হাতে সন্ন্যাসিনীর পবিত্র মূর্ত্তি আমি বিস্মৃত হবো না—অলকানন্দা-মন্দাকিনীর মিষ্টি জল আমি বিস্মৃত হ'বো না—আর আমাদের ঝাঁপান ও কাণ্ডীওলাদের সরল হাসি ও মধুর বচন আমি কখনো ভুলতে পারবো না। যাত্রী-কাঁধে পাহাড়ে ওঠে; থাম্‌লে কোনো প্রশ্ন করলে—খালি হাসে।

জয়

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

স্বদল-পরিবৃত রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সমাসীন। দ্বিতল গৃহ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত; মাথার উপর বিজলী-ব্যজনী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া সকলের গ্রীষ্মতাপ দুর করিতেছে ও পুষ্পাধারে রক্ষিত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ গৃহ মধ্যে বিকীর্ণ করিতেছে। বারান্দায় টবের উপর নানা জাতীয় গাছ শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত। সম্মুখের পরিচ্ছন্ন রক্তাভ রাজপথ তৃণ-শ্যামল প্রান্তরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া শ্যামল বসনের রক্তবর্ণ প্রান্তের মত শোভা পাইতেছে। প্রান্তরের পরবর্ত্তী শান্ত নদীর পরপারের শ্যামল তরুশ্রেণীর শিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গণেশ। বড় বাবু, এবার আর চুপ করে থাকলে চলবে না। রীতিমত তোড়যোড় চাই। এবারকার কার্য্যসাধন-মণ্ডলীতে আর ওদলের একটি লোককে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

রাইচরণ। তা যদি চাও, সঞ্জীবের ঠ্যাং দুখানা খোঁড়া করে দাও—ব্যস্।

শিবনাথ। অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ঠ্যাং ভাঙ্গার চেয়ে তার জিভ্ কেটে দেওয়া হোক্।

গণেশ। তার মানে?

শিবনাথ। জিভ্ দিয়েই ও বেশী অনর্থ করেছে। গেল বছরই তো রাইচরণের এক বিঘে জমী সবাইকে বলে কয়ে গোচারণের জন্য দেওয়ালে তবে ছাড়লে। সেই থেকেই তো রাইচরণের রাগ।

রাইচরণ। আপনি কি বলতে চান, তার জন্যে রাগ না করে তাকে সন্দেশ খেতে দিতে হবে?

নরেন্দ্র। থামো দিকি—ঝগড়া থামাও। এ দল ও-দল কিছু নেই; আসল কথা সঞ্জীবকে নিয়ে। ও ভেতরে আসতে পেলে নিজের দল গড়তে একটুও দেরী হবে না।

গণেশ। আপনি থাকতে ও মাথা তুলবে—এ কথা—

নরেন্দ্র। আঃ, থাম তো গণেশ—বাজে বোকো না। সে কি পারে আর আমি কি পারি, তা তোমার চেয়ে বোধ হয় আমি বেশী জানি। শোন—তাকে দলে পেলে সব কাজ সোজা হয়ে আসে—যদি সে আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়। যদি না হয়, যেমন করে হোক্ তাকে বাধা দিতেই হবে। সে না থাকলে আর কেউ আপত্তি তুলতে সাহস করবে না।

গণেশ। তবে যাতে ভাল হয় তাই করুন। আমার হাতে যত লোক আছে—সব আপনারই জানবেন্।

এক কর্ম্মচারী আসিয়া একখানি খামে-বন্ধ-করা পত্র নরেন্দ্রের হাতে দিল।

নরেন্দ্র। এখনি কর্ত্তব্যের মীমাংসা হয়ে যাবে। সকালে তাকে সব কথা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলাম—এই তার উত্তর। (মনে মনে পত্র পাঠ)—"নরেন্দ্র, বন্ধুত্ব আমাদের আমরণ বাঁচিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা সুধু তোমার ও আমার;—কার্য্যসাধন-মণ্ডলীর মধ্যে তাহার স্থান নাই।

তোমার প্রস্তাব আমার কাছে সুধু অগ্রাহ্য নহে—অশ্রাব্য। সঞ্জীব।"

(প্রকাশ্যে)—সঞ্জীব রাজী নয়। লিখেছে, এ প্রস্তাব তার কাছে সুধু অগ্রাহ্য নয়—অশ্রাব্য। অশ্রাব্য! কি আস্ফালন!

শিবনাথ ব্যতীত সকলে। উঃ কি আস্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার!

গণেশ। ওর অহঙ্কার ভাঙ্গতেই হবে।

হীরালাল। যে মুখে ও এ কথা বলেছে, সেই মুখে যদি বড় বাবুর কাছে apology চায়, তবেই ওর রক্ষে; নইলে ওর দুর্দ্দশার একশেষ করতে হবে।

পান্নালাল। যে হাতে ও-কথা লিখেছে সেই হাত যোড় করে যদি ও বড় বাবুর কাছে ক্ষমা চায়, তবেই ওর বাঁচোয়া।

নরেন্দ্র। শিবনাথ খুড়ো, হঠাৎ উঠ্‌লেন যে?

শিবনাথ। (যাইতে যাইতে) আর সহ্য কত্তে পারলাম না, বাবাজী। এদের আস্ফালন যদিও বা সহ্য কত্তে পারতাম্—তোমার মৌনভাব সইল না।

নরেন্দ্র। সঞ্জীবের অহঙ্কারে যদি কেউ স্বাধীন মত প্রকাশ করে, আমি তাতে বাধা দিতে যাই কেন?

শিবনাথ। এতই যদি তোমার স্বাধীন মতের উপর শ্রদ্ধা, তবে সঞ্জীবকে তার স্বাধীন মত নিয়ে কেন থাকৃতে দিচ্ছ না, তা তো বুঝ্‌তে পারি নে। যাকৃগে বাবা—ও সব কথা যেতে দাও। আমি আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কি দরকার আমার! যদি বেফাঁস্ কিছু বলে থাকি, বুড়ো বলে মাপ কোরো। রোজ তোমার এখানকার চা ও আফিংয়ের লোভে কর্ণেন্দ্রিয়ের যতদূর দুর্গতি করবার তা করেছি। আর নয় বাবা—আজ থেকে বিদায়।

[শিবনাথের প্রস্থান।

রাইচরণ। আসেন তো বাবুর বাড়ীতে দুবেলা চা মারতে—এদিকে বুলি খুব লম্বা। কি বল্‌ব—বড় বাবু একটু খাতির করেন ওকে—

গণেশ। বড় বাবুর এ সব দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা। শিব্ চক্কত্তি নিশ্চয় সঞ্জীবের কাছে গিয়ে এসব কথা বল্‌বে।

নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া)। আচ্ছা, লোকের কুৎসা ছাড়া তোমাদের কি আর কোন কাজ নেই? সকলে খারাপ আর তোমরাই খুব সাধু—এই কথাটা কি আমাকে বোঝাতে চাও?

সকলে চকিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

গণেশ (বহুক্ষণ পরে)। তাহলে বড় বাবু আমাদের কর্ত্তব্য কি বলে দিন্। আপনি যা করবেন্ আমরা তারই পেছনে আছি জানবেন্।

নরেন্দ্র। আজ বড় শ্রান্ত আছি—উঠি। কাল পরামর্শ শেষ করে ফেলা যাবে।

সকলে উঠিয়া গেল। নরেন্দ্র নিজে আলো ও পাখা বন্ধ করিয়া দিতে, শুভ্র পুষ্পরাশির মত বিমল জ্যোৎস্না বারান্দা ও গৃহতল মুহূর্ত্তে ভরিয়া দিল। বাহিরের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বসিত পবন কক্ষ-মধ্যে হিল্লোল তুলিয়া প্রবেশ করিল।

সম্মুখের জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাজপথ, প্রান্তর, ও নদীবক্ষঃ গৃহের পানে মমতাভরা দৃষ্টিতে চাহিতেছিল।

নরেন্দ্র নির্ব্বাক্ হইয়া বহুক্ষণ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

(২)

অপরাহ্ণ। কয়েকখানি সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন কুটীর। পিছনে ফল ও ফুলের বাগান। সম্মুখস্থ কুটীরখানির সম্মুখে কিঞ্চিৎ মুক্ত স্থান গৃহস্বামীর নিজ-হস্তে সুন্দর ভাবে ঘেরা। কুটীর মধ্যে জনকয়েক যুবক কথোপকথনে নিমগ্ন।

মিহির। কার্য্যসাধন-মণ্ডলীতে আপনি তাহলে থাকৃবেন না?

সঞ্জীব। আচ্ছা মিহির, আমরা কাজ করি কেন?

মিহির। আমাদের আদর্শ বজায় থাকৃবে, তাই।

সঞ্জীব। আমাদের আদর্শ কি?

মিহির। দেশের অভাব দূর করা।

সঞ্জীব। নরেন্দ্র এবার নিজে সে ভার নিয়েছে। সকলকে বলেছে, যদি আমাকে তারা বর্জ্জন করে, তাহলে দেশহিতকর সকল কাজ সে সানন্দে করবে।

নিখিল। আর আপনি এই ভাবে তার পথ স্বেচ্ছায় পরিষ্কার ক'রে দেবেন?

সঞ্জীব। তার পথ পরিষ্কার করে দিচ্চিনে, পরিষ্কার কচ্চি দেশের উন্নতির পথ। সে যদি এ কাজে হাত দেয়—আমার হাত দেবার কোন প্রয়োজন হবে না। আমার চেয়ে ঢের ভালরূপে সে এসব কাজ সম্পন্ন কর্ত্তে পারবে।

মিহির। তিনি যে কথা রাখ্‌বেন তার প্রমাণ কি?

সঞ্জীব। আমি তাকে খুব ভাল জানি মিহির। আমরা যে আবাল্যের বন্ধু। কথার নড়চড় করবার লোক সে নয়।

শিশির। আপনার তিনি বন্ধু, অথচ আপনাকে বাদ দিতে পারলে তিনি বাঁচেন কেন?

সঞ্জীব। এ শুধু আমার ওপর তার অভিমান। বন্ধুত্বের চেয়ে আমার মতকে আমি বড় করে দেখ্‌ছি, এই তার দুঃখ।

শিশির। তিনিও কি তাই দেখ্‌চেন না?

সঞ্জীব। সে আমায় ডাকে, আমি যাই না; আমি তো তাকে ডাকি নি।

মিহির। ডাকৃলে কি আস্‌তেন?

সঞ্জীব। নিশ্চয়।

মিহির। তবে কেন ডাকেন না?

সঞ্জীব। তার মতকেও আমি তার মতন শ্রদ্ধা করি। আমার খাতিরে সে নিজের মত বদলাবে, তা আমি চাই না। আমাদের বিরোধ কোন্ খানে জান তো? সাধারণ নিরক্ষর লোকদের সে ঘৃণা করে। আমি তাদের গড়ে তুল্‌তে চাই। তাদের সে কোন সুবিধা দিতে রাজী নয়। আমি তাদের সব সুবিধা দিয়ে, তাদের চোখ মুখ ফুটিয়ে দিতে চাই।

মিহির, শিশির ইত্যাদি। আমরাও তাহলে এবার মণ্ডলীর বাধ্য থাক্‌ব না।

সঞ্জীব। তাহলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে—আমায় দেশসেবা থেকে বঞ্চিত করবে। আজ আমার আদর্শ নরেন্দ্র গ্রহণ করেচে। তোমরা আমার দক্ষিণ হস্ত। তার সঙ্গে তোমরা থাক্‌লে আমার পরিপূর্ণ ভাবেই থাকা হবে।

নীরদ। একটা কথা কিন্তু ভুলে যাচ্চেন—এতে যে আপনার অপমান হবে?

সঞ্জীব। আমার নিজের সম্মানের চেয়ে আমার আদর্শের সম্মানই আমি বড় বলে মনে করি। তোমরাও তাই মনে করলে আমি সুখী হব।

সকলে গাঢ়স্বরে। আপনার আদেশ মতই আমরা চল্‌ব।

সঞ্জীবকে প্রণাম করিয়া সকলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

(৩)

সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল। উৎসব-শোভায় সজ্জিত কক্ষে বিজয়োৎফুল্ল দলবল সহ নরেন্দ্র উপবিষ্ট। দুই জন সুকণ্ঠ গায়ক আসিয়াছেন—শীঘ্রই গান আরম্ভ হইবে।

হীরালাল। আজ একটা শোভাযাত্রা বার করলে হয় না? ও-পাড়াটা একবার বেশ করে ঘুরে আসা যায়।

রাইচরণ। তা মন্দ হয় না। ব্যাপারটা কি রকম চল্‌ছে একবার দেখে আসা যায়—দেখানোও হয়।

গণেশ। বড় বাবু বলেন তো সে ব্যবস্থা এখনি করে ফেলা যায়।

নরেন্দ্র। না, তাতে আর দরকার নেই বড় বাড়াবাড়ি হয়।

হীরালাল। কিন্তু এরকম victory আর হয় না—একেবারে, যাকে বলে, Complete—

গণেশ। তা নয় ত কি! শেষটা বাছাধনকে মানে মানে সরে দাঁড়াতে হ'ল। এর চেয়ে আর অপমান কি হতে পারে!

নরেন্দ্র। তার এ অপমানের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাকে দলে নেবার জন্য কম চেষ্টা করেছি! চিঠি লিখেছি,—তার পর নিজে তার বাড়ী গিয়ে তাকে সেধেছি। তবু সেই এক উত্তর—কোন সর্ত্তে আমি তোমার দলে যেতে রাজী নই। তাই না আমার রোক্ চাপ্‌ল—যেমন করে হোক্ ওকে সরাতেই হবে।

গণেশ। কথায় বলে—'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'—হ'লও তাই। 'সঞ্জীব বড় কাজের লোক, সঞ্জীব বড় ভাল'—সবারই মুখে এই কথা। এখন?

নরেন্দ্র। গণেশ, নয়ানপুরে একটা পুকুর সব আগে দিতেই হবে। যখন কথা দিয়েছি তখন তা রাখ্‌তে হবে! কালই লোক লাগিয়ে দাও।

গণেশ। যে আজ্ঞে—তাই হবে।

হীরালাল। নয়ানপুরে এরি মধ্যে না কি দু' একটা কলেরা দেখা দিয়েছে।

রাইচরণ। বড় ২।১টা নয়—দু'দশটা এরি মধ্যে সাবাড় হয়েছে। সেদিন দেখি ২।৪ জন শিষ্য নিয়ে বাবু যাচ্ছেন নয়ানপুরে 'স্রাবা' কত্তে। এখন ঐ সব কাজই থাক্‌ল। যত পারেন এবার স্রাবা করুন।

সন্ধ্যা নামিল। আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরে চন্দ্রকিরণ লতায়, পাতায়, তৃণে, প্রান্তরে ও রাজপথে ঝরিতে লাগিল।

গায়ক গৃহমধ্যে উৎসব-গীতির উদ্যোগ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া বসিল।

গণেশ (নিকটে আসিয়া)—বড়বাবু, আপনার শরীর কি আজ ভাল নেই? কেমন যেন দেখাচ্ছে।

নরেন্দ্র। তা দেখাক্ গণেশ; আমায় একটু চুপ করে একা বসতে দাও দিকি!

সহসা দূর হইতে বহুকণ্ঠে সম্মিলিত গীতিধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

নরেন্দ্র। (চমকিয়া) এ কি গণেশ?

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

গণেশ। (ভাল করিয়া শুনিয়া)—সংকীর্ত্তন আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছে।

নরেন্দ্র। এই যে মোড়ের মাথায় এসে পৌছাল। এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কীর্ত্তনের ভাষা শুনা যাইতে লাগিল :—

হরিনাম বিনা ভবে গতি আর নাই রে।
সংসারে সব অসার হরিনাম সার রে॥

গণেশ। কেউ মারা-টারা গেল না কি ?—কি জানি।

নরেন্দ্র। ওই যে মোড়ের মাথায় ভিড় জমে গেল। গণেশ, গানটা একটু থামাতে বল ত ; আর দৌড়ে একবার শুনে এস ত—ব্যাপার কি।

গান থামিল। গণেশ খোঁজ লইতে ছুটিয়া গেল। নরেন্দ্র উৎকণ্ঠিত ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

গণেশ। (উদ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া)—বড়বাবু !—

নরেন্দ্র (সোদ্বেগে)—কি, ব্যাপার কি ?

গণেশ। সঞ্জীব মারা গেছে। নয়ানপুরে গিয়ে কলেরা হয়েছিল। চারিদিক থেকে দলে দলে লোক আস্‌ছে তাকে দেখ্‌তে ঐ দেখুন—এসে পড়্‌ল।

নরেন্দ্র (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে)। এঁ্যা, সঞ্জীব মারা গেছে !

নরেন্দ্র খালি পায়ে, খালি গায়ে ব্যস্তভাবে নীচে নামিয়া আসিয়া দেউড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল।

দিবস ফুরায়ে গেছে, ডুবে গেছে রবি রে।
চারিদিক ঘিরে শুধু গভীর আঁধার রে॥

গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনীয়ারা অগ্রসর হইয়া আসিল। পশ্চাতে শিশির, মিহির, নিখিল ও শিবনাথ সঞ্জীবের পুষ্পমালা-সজ্জিত শবদেহ বহিয়া চলিল।

নরেন্দ্র অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—কাহার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আর কেনই বা করিয়াছিল ?

জ্যোৎস্না যেন ম্লান হইয়া আকাশে ফিরিয়া গেল। রাজপথ, প্রান্তর, নদী, আপনার অট্টালিকা—সব যেন মুহূর্ত্তে মিলাইল। মনে হইল—এসব কোথাও ছিল না, কোন দিন ছিল না ;—সব মিথ্যা, সব মায়া !—

গানের সুরে চমক ভাঙ্গিল। শববাহীরা একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে ; সেখান হইতে শুনা যাইতেছে :—

সম্মুখেতে মহাসিন্ধু গরজে ভীষণ রে।
হরিনাম ভেলা তাহে কেবলি সম্বল রে॥

নিশ্বাস ফেলিয়া নরেন্দ্র সেই অবস্থায় একাকী—দূর হইতে শবদেহের অনুসরণ করিল।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

বারেক আমারে তুমি দেখা দিয়ে আজ
ভাঙিলে সকল গর্ব্ব হে রাজাধিরাজ,
সৃষ্টি-পিতামহ-ভীষ্ম ওগো হিমাচল !
দিনে দিনে তিলে তিলে আপনা বিহ্বল।
রচেছিনু মনে মনে যে দম্ভ-নিলয়,
কঠিন কটাক্ষে তব লভি' তা বিলয়
মুহূর্ত্তে মিশেছে ওই চরণের তলে,
চরণ-ধূলার মত, আজি পুণ্যফলে !
কি আনন্দ ! ক্ষুদ্র আমি, লঘু আমি আজ,
মুক্ত আমি তব স্পর্শে হে নগাধিরাজ !
এ কি হর্ষ ! আজি মোর ভারমুক্ত প্রাণ
সুদূরের যাত্রাপথে বিহঙ্গ সমান
লভিল অপূর্ব্ব গতি ! তুচ্ছতা তাহার
সত্যরূপে আজি তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

২

আমারে করিয়া ক্ষুদ্র, ওগো হিমরাজ !
সত্যকার বড় তুমি করিয়াছ আজ,
হে দেব, হে হিমালয় ! অহঙ্কারে গড়া
অসত্যের আবরণ, কলঙ্ক-পসরা
নিজ হাতে কাড়ি' লয়ে করিয়াছ দান
সুযোগ্য শিষ্যের মূর্ত্তি মঙ্গল মহান্ ;
প্রেম দিয়া অগৌরবে করিয়াছ জয়,
মাভৈঃ-অভয়-মন্ত্রে হরিয়াছ ভয়
দুর্ব্বলের চিত্ত হ'তে, লভি সঙ্গ তব
সকল রিক্ততা মোর স্বর্ণ অভিনব
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা ; লঘু বাষ্পরাশি
তোমার শীতল স্পর্শে দ্রব হয়ে আসি'
দুই বিন্দু আঁখিজলে পরিণত আজ,
হে মোর কঠিন-কান্ত, হে অচলরাজ !

ভারতের স্থাপত্য-শিল্প

(প্রতিবাদ)

একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের পুনঃ প্রচলন মানসে বদ্ধপরিকর হইয়া তৎসম্বন্ধে আবেদন আন্দোলন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও বাঙালী এ বিষয়ে তাঁহার মত উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন কি না আমি জানি না। বিদেশী শিল্পের কবল হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের চেতনা এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আনয়ন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তজ্জন্য নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া বিবিধ উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শ্রীশ বাবুর ইচ্ছা - আমরা সকলে সমবেত হইয়া সেইরূপ একটি অনুষ্ঠান করি। শ্রীশবাবু তাঁহার মহতী আকাঙ্ক্ষাকে কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার কৌশল ও প্রণালী আমি বিশদ ভাবে অবগত আছি।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতবর্ষে' বিবিধ প্রসঙ্গে জনৈক ইঞ্জিনীয়র শ্রীশচন্দ্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং তাঁহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

শ্রীশচন্দ্রের কার্য্যকলাপে অথবা বাংলা ও ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধে "হুজুগের" বিন্দুমাত্র আভাস পাই নাই। তিনি প্রকৃতই একজন কর্ম্মী। তবে তাঁহার কর্ম্ম একাকী তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সে কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা সর্ব্বতোভাবে অপরিহার্য্য। সেজন্য বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজন আছে। আমিও ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অনুরাগী। সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছি। কিন্তু শ্রীশবাবুর একাগ্রতা, আন্তরিকতা, দেশহিতৈষিতা, স্বীয় স্বার্থ-বিসর্জ্জন করিয়া অর্থে-সামর্থ্যে অপরের উপকার করিবার আকুলতা এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা এবং সংগঠন-শক্তির উচ্চ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। অশেষবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সংখ্যাতীত আপদ-অসুবিধা ভোগ করিয়া এবং বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করিয়া—জেসলমেরের মরুভূমে ৯৮ মাইল পদব্রজে গমন করিয়া—সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ তিনি পঞ্চদশ বর্ষ ধরিয়া পর্য্যটন করিয়াছেন; এবং তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। শুধু পুস্তক পাঠে তাঁহার পিপাসা মিটে নাই। নানা অধ্যয়নে এবং দেশ ভ্রমণে তিনি তৃপ্ত হয়েন নাই। রাজপুতানায় বাস করিয়া ভারতীয় শিল্পের নির্দ্দেশ অনুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার কৌশল তিনি শিখিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীশচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার এই তথাকথিত "হুজুগে" যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দুকুমার এবং পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়র, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং গভর্ণমেণ্টের কনসল্টিং আর্কিটেক্ট এবং দেশের অন্যতম নেতা স্যর হরি সিং গৌর এবং বোম্বাইএর যমুনাদাস দ্বারকাদাস মহোদয়ের মত কর্ম্মী। লর্ড লিটন এবং স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শ্রীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়া তাঁহার প্রাণে নব বলের সঞ্চার করিয়াছেন।' লেখক মহাশয় হয়ত ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু "চিত্র শিল্পী, বিজ্ঞানবিদ এবং সাধারণে এই বৈঠকে" যোগদান করেন নাই। প্রথমতঃ এই পুনরুদ্ধার ব্যাপারটীতে ইনষ্টিটিউটের হাত ছিল না [ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষেরা শ্রীশবাবুকে স্বতন্ত্রভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।]; ইঞ্জিনীয়র এসোসিয়েশন তদীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যমণ্ডলীর অবিসংবাদী সমর্থনে—এই বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন। দলে দলে ইঞ্জিনীয়র আসিয়াছিলেন—শিবপুর কলেজের ছাত্রপ্রিয় সুপণ্ডিত অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রেরা আসিয়াছিলেন, পবলিক ওয়ার্কসের, কর্পোরেশনের এবং অন্যান্য সরকারী এবং বেসরকারী নিম্ন এবং উচ্চ পদস্থ পূর্ত্তবিদ এবং শ্রীযুক্ত সি, কে, সরকারের মত স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ সেই সভায় সমাসীন ছিলেন। মিষ্টার পার্সি ব্রাউন এবং কনসল্টিং আর্কিটেক্ট কেয়ার সাহেব কার্য্যবশতঃ আসিতে পারেন নাই। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন; এবং মিউনিসিপ্যাল গেজেটে সেই মুগ্ধকরী বক্তৃতা পাঠাস্তে তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতি, সহানুভূতি এবং সমর্থনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পত্রগুলি আমি দেখিয়াছি। ব্রাউন সাহেব লিখিয়াছেন তিনি শ্রীশবাবুকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। লাটসাহেবের সেক্রেটারী লিখিয়াছেন, লর্ড লিটন তাঁহার ইনষ্টিটিউটের বক্তৃতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জে, সি, ব্যানার্জ্জী সেই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি বহুদর্শী, বিচক্ষণ এবং সুদক্ষ ব্যবসায়ী। শ্রীশবাবুর ব্যবস্থাটা "উদ্দাম কল্পনা" কি না, তাহার বিচার করিবার তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র।

"চিত্র শিল্পী এবং বিজ্ঞানবিদের কথা"। শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় কি বলিতে চাহেন যে, কলেজে-পাশ-করা ইঞ্জিনীয়র ব্যতীত এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার অধিকার অপরের নাই? ভারত-গৌরব অবনীন্দ্রের বিশ্বপ্রসারিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অথবা জগদীশের তপস্যালব্ধ বিজ্ঞানবাদ, লেখকের মতে স্থাপত্য বিদ্যা-মন্দিরের রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে

অথবা প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী হইবে কি না বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ ? স্থাপত্য-কলার সঙ্গে যে চিত্র ও সঙ্গীত-বিদ্যার অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে ! তিনি কি তাহা কাটাইতে চান ? তিনি একবার অবনীন্দ্রের চিত্রশালার স্থাপত্যকলা দেখিয়া আসুন। তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দির এবং আচার্য্যের আবাস-ভবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসুন। আচার্য্যের সৌধের পরিকল্পনা করিবার এবং হিন্দু রীতিতে রমণীয়—বিচিত্র উদ্যান রচনা করিবার এবং দেশীয় ধরণে কক্ষ সুসজ্জিত করিবার অদ্ভুত শক্তি প্রণিধান করিতে পারিবেন। আচার্য্য বসু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশবাবুকে দুইটি বাটীর "ডিজাইন" করিতে দিবেন বলিয়াছেন। তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আবাস-ভবন নির্ম্মিত হইতেছে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিরচিত আট লক্ষ টাকা মূল্যের প্রাসাদতুল্য বিশাল ভবনের আলোক-চিত্র প্রকাশিত করিয়া "ভারতবর্ষ" দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটীর সহকারী সভাপতি এবং "রূপম্" পত্রিকার বিশ্ববিশ্রুত সম্পাদক, শিল্পী অর্দ্ধেন্দুকুমার একজন খ্যাতনামা এটর্ণী। শ্রীশবাবুর প্রবন্ধ পাঠান্তে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রত্যেক ভারতবাসী যিনি civic architecture এর সংকলের প্রয়াস করেন, লেখকের সুচিন্তিত ও প্রশংসনীয় প্রস্তাবগুলির মতে কার্য্য করাইবেন।" City Architect Hathaneay সাহেব শ্রীশচন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বহুকাল হইতে আমরা দেশের শিল্প পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী স্থাপত্য-কলার আরাধনা করিতেছি। বিদেশী ধরণ-ধারণ এবং Slave mentality আমাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া আছে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের ধ্যান ধারণা সকলই বিদেশী প্রণালীতে ওতঃপ্রোত। আমরা নূতন কিছু ভাবিতে পারি না—বৃহৎ কিছু কল্পনা করিতে পারি না। মিউনিসিপ্যালিটির পূর্ত্ত-বিভাগও সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহরে দেশীয় স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠান করিতে হইলে, মিউনিসিপ্যাল আইনের "আমূল পরিবর্ত্তন" করা না হৌক, কিছু অদল-বদল করা আবশ্যক। শ্রীশবাবু তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ অথচ বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। অত্যধিক ব্যয়-সাধ্যও নহে। তিনি বলিয়াছেন—জল, ড্রেণ বিভাগের মত ভারত স্থাপত্যের একটি নূতন বিভাগ স্থাপন করিতে হইবে। প্রথমতঃ অনাড়ম্বর ভাবে ; এবং ব্যবসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ে লাভ হইলে, এবং প্রণালীটা হৃদয়ঙ্গম ও কার্য্যকরী হইলে, সেই আপাততঃ ক্ষুদ্রাকৃতি ভারতীয় স্থাপত্য বিভাগটা বিশাল মহীরুহে পরিবর্দ্ধিত হইবে। সমালোচকের উল্লিখিত "মাল মশলা বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলা," "বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহের মারফত সাধারণকে ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যায় শিক্ষা" প্রদান, "পুস্তকালয়" "কারখানা" প্রভৃতি শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হইবে—তখন। ইহার মধ্যে আরব্য উপন্যাসের কথা কি আছে ? স্থপতি যখন নগরের পরিকল্পনা করেন, তখন দুই শত বৎসর পরে নগরের কিরূপ পরিণতি হইবে, তাহার হিসাব করিয়া কার্য্য করেন। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব চীফ ইঞ্জিনীয়র এবং দেওয়ান স্যর বিশ্বেশ্বরের অদ্ভুত কার্য্যকারিতার প্রসঙ্গে শ্রীশবাবু যখন বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন তিনি বাল্মীকির তপোবন—অবনী গ্রামের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, সুদূর অরণ্যের মধ্যে দীনতম পল্লীগ্রামের কিরূপ উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছেন ওই ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনীয়র। ভারতের এক আদর্শ পল্লীগ্রাম শ্রীশবাবু দেখিয়া আসিয়াছেন—মহীশূরের গণ্ডগ্রামে। আমরা Geddesএর বক্তৃতা শুনিয়াছি এবং তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। কী বিরাট "উদ্দাম কল্পনার" ব্যাপার ! ইয়োরোপ আমেরিকার অনেক মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রীশবাবুর কল্পিত ভারতের ভাবী মিউনিসিপ্যালিটি-গুলির অপেক্ষা বহু গুণে বৃহত্তর অনুষ্ঠান আছে। মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই উৎপাদন এবং সরবরাহ এবং তজ্জন্য শত বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারেন। হোটেল, থিয়েটার হইতে রেলওয়ে পর্য্যন্ত। স্বায়ত্তশাসন তাহার মূলমন্ত্র। সম্প্রতি ত্রিচিনাপল্লীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষেরা মিউনিসিপাল বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে জাতীয় সঙ্গীত শিখাইবার নিয়ম জারি করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের ইচ্ছা—ভারতবর্ষের বৃহত্তর সহরগুলিতে Municipal School of Arts and Crafts খোলা হৌক। জয়পুরে কতকটা সেরূপ ভাবে কার্য্য করা হয়। তার ফলে জয়পুরে শিল্পের এত উন্নতি। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আয় অল্প নহে। ইহার চতুর্থাংশ আয় হইলে আমেরিকার পল্লীগ্রামে এবম্বিধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত। সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও চিত্রকলাতে জগতের মাঝে বাঙালীর উচ্চ আসন আছে। কিন্তু Molesworthএ বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ারের উদ্ভাবিত একটি formula পর্য্যন্ত নাই, আবিষ্কারের কথা দূরে থাকুক। নিতান্ত গতানুগতিক ভাবেই আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাই ; এতটুকু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারি না। শ্রীশবাবু আমাদের জাতিকে, আমাদের অত্যাচার-প্রপীড়িত দেশকে জাগরিত, উত্তোলিত এবং "হুজুগ" ছাড়িয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে চাহেন।

মহামতি হ্যাভেল প্রমুখ সুধীমণ্ডলী ভারতের স্থাপত্যের উদ্ধার-কল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। "রাতারাতি" ফললাভ না হইলেও, হ্যাভেল যে ঢেউ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে তাহা কালক্রমে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। এরূপ কার্য্যের ফল এক দিনে পাওয়া যায় না। বৃহৎ কার্য্য করিতে হইলে বৃহৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়—এবং তাহা সিদ্ধ হইতে সময় লাগে। সমালোচকের বিদ্রূপ মত "কল্পতরু"ই হইতে হইবে। তবে কর্পোরেশন তাঁহার ব্যবস্থামত কার্য্য করিতে সাহসী অথবা সমর্থ হইবেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।

এ বিষয়ে প্রথমেই একটি কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব শ্রীশচন্দ্র করিয়াছেন। কমিটি শ্রীশবাবুর প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে কয়টা যুক্তিযুক্ত বোধ করিবেন গ্রহণ করিবেন, নতুবা অন্য উপায় উদ্ভাবন করিবেন। মোটের উপর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা চলে না। আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন তাঁহারা। একখানি ঘর এবং জন কয়েক কর্ম্মচারী লইয়াই

কার্য্য আরম্ভ করা যায়। ঐ নূতন স্থপতি বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য নূতন আইন প্রবর্ত্তন করা হৌক। আইন নাই; আইন হইতে কতক্ষণ! বিভাগটী বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের অধীনে তাহার শাখা বলিয়া পরিগণিত হৌক। তাহার ব্যয়ভার সাধারণ বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টকে বহন করিতে হইবে। তজ্জন্য সহরবাসীদের উপরে স্বতন্ত্র কর স্থাপন করিবার হয় ত প্রয়োজন হইবে না। আবশ্যক হইলে বিধিমত উপায়েও কর সংগ্রহ করা যায়। সে সম্বন্ধে শ্রীশ বাবু উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন। সহরবাসীর গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যের "ঠিকা" লইলে মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ লাভ হইবে। তাহা হইতে, ক্রমশঃ অন্য প্রস্তাবগুলির মত কার্য্য করা সাধ্যায়ত্ত হইবে। কেবলমাত্র হিন্দুর স্থাপত্যের পরিপুষ্টির জন্য এই স্থাপত্য বিভাগ সৃষ্ট হইবে না। মুসলমান স্থাপত্যেরও ইহাতে সমান অধিকার থাকিবে।

করদাতৃগণ "মিউনিসিপ্যালিটিকে ব্যবসায়ের আড্ডা করিতে দিলে" তাঁহারা নিজেরাই লাভবান হইবেন। তাঁহাদের অর্থ ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিবে। জেমসেদপুরে টাটা মদের দোকান খুলিয়া কুলি মজুরদের বিক্রয় করিতেছেন। জেমসেদপুরের টাকা টাটারই থাকিবে; বিদেশী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। মিউনিসিপ্যালিটি "ঠিকা" লইলে বিদেশী ঠিকাদারেরা প্রতিযোগিতায় এরূপ সর্ব্বগ্রাসী ভাবে দাঁড়াইতে পারিবেন না। হিন্দু মুসলমানের অর্থ হিন্দু মুসলমানেরই থাকিবে। ইহাকেই বলে স্বরাজ্য। সাধারণ বাঙ্গালী "বিল্ডিং ব্যবসায়ীদের তাহাতে গলা টিপিয়া মারা" হইবে না। পৃথিবীর কুত্রাপি কোনও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ে আজ পর্য্যন্ত একাধিপত্য লাভ করেন নাই; এক্ষেত্রেও তাহা হইবে না। Ford carএর দিনে অন্য গাড়ীও বিক্রীত হইতেছে। কয়েকখানা বাড়ী ঠিকা লইতে আপত্তি কি? Sanctionএর এবং বাটী নির্ম্মাণ করিবার সময় অহরহ গাঁথুনি ভাঙ্গিবার হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না ভাবিয়া অনেকেই মিউনিসিপ্যালিটিকে বাটী প্রস্তুত করিবার "ঠিকা" দিবেন।

ভারত স্থাপত্যের হিতৈষী বন্ধু City Architect মহাশয় উপযুক্ত সহকারীর এবং সহানুভূতির অভাবে সহরে দেশী ধরণের ইমারত প্রস্তুত করাইতে পারিতেছেন না, শ্রীশবাবুকে এ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগের কথা তিনি পত্রস্থ করিয়াছেন। তাঁহার অধীনে উক্ত রূপে নূতন বিভাগ অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহার অভিলাষ মত কার্য্য করিবার সুবিধা হইবে। শ্রীশ বাবু কুত্রাপি এ কথা বলেন নাই যে, মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়রদের পদচ্যুত করিয়া বড়োদা জয়পুর হইতে লোক আনয়ন করিতে হইবে। তিনি বলেন—উক্ত ইঞ্জিনীয়র মহাশয়েরা মিউনিসিপ্যালিটির স্থাপত্য বিভাগে হইতে ভারত-স্থাপত্য শিক্ষা লাভ করুন—সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বৃদ্ধ ইংরাজ সেনাপতি ভারতবর্ষে আসিয়া যেমন হিন্দুস্থানী পরীক্ষা পাশ করেন। এরূপ উদ্যম আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ ভুবনবিজয়ী। আমরা শুধু পরচর্চ্চা করিতেই জানি। আর সৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য দল পাকাইতে পারি। শ্রীশ বাবু বলেন, বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়র মহাশয়েরা মনোমোহন বাবুর মত, কলিকাতায় থাকিয়াই দেশী ভাবের বাটী নির্ম্মাণ করিতে শিখুন—অক্লেশে তাহা পারিবেন—এবং, তাঁহাদের সম্মুখে আদর্শ গঠন করিবার জন্য জয়পুর বড়োদা হইতে প্রয়োজন মত ইঞ্জিনীয়র এবং আর্কিটেক্ট আনাইয়া Chief Architectএর অধীনে, প্রস্তাবিত বিভাগে কার্য্য করানো হৌক। একই ইঞ্জিনীয়র হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য অনুযায়ী বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর পরে, স্থানীয় লোকেরা যখন পাকা হইবেন, তখন বড়োদা রাজপুতানা হইতে ইঞ্জিনীয়র আনাইতে হইবে না। তিনি যখন বড়োদায় গিয়াছিলেন, তখন কলাভবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন বাঙ্গালী যুবক তাঁহার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার ছেলে হইয়া কলিকাতায় তিনি চাকরী পাইলেন না। শ্রীশবাবু বলিয়াছেন যে, জয়পুর বড়োদা বোম্বাইএর শিল্প-বিদ্যালয়ের পাশ-করা বাঙ্গালী ছাত্রদের কলিকাতায় পবলিক ওয়ার্কস বিভাগে এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরী দেওয়া হৌক।

বাংলার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দেশীয় স্থাপত্য বিধান করিবার সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বলি সেরূপ বাটী করা সম্ভব। যেমন রবীন্দ্রনাথের নূতন আবাস-ভবন "উত্তরায়ণ।" বাংলাদেশের অনুকূল বাটীর পরিকল্পনাও শ্রীশবাবু করিয়াছেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক, চনমাধারী বাঙ্গালী মসীজীবী এবং উদয়পুরের উগ্রক্ষত্রিয়ের আকারে-প্রকারে যেরূপ পার্থক্য আছে, উভয় দেশের স্থাপত্য-শিল্পে সেরূপ অধিক প্রভেদ থাকিবে না। বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের প্রভাব উত্তর-ভারত এবং রাজপুতানায় বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে পরে আলোচ্য। ঘোড়া হইলে চাবুকের জন্য আটকাইবে না। সারা ভারতের সঙ্গে স্থাপত্যের আদান প্রদান বাংলায় থাকিবে- কিন্তু গথিক স্থাপত্যের সঙ্গে নহে। অগ্রে আমরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করি—বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান পরে হইবে।

দেশী ভাবের গৃহ নির্ম্মাণের খরচ সম্বন্ধে করপোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়র এবং পবলিক ওয়ার্কসের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র মহাশয়েরা অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমারও বিশ্বাস, অতিরিক্ত ব্যয় হইবে না। বৌবাজার ষ্ট্রীটের "গিনি হাউস" এবং মাড়বারী মহাশয়দের বাটী নির্ম্মাণ করিতে যে পরিমাণে খরচ হইয়াছে, তদপেক্ষা কম খরচে দেশী ভাবের অতি প্রিয়দর্শন অট্টালিকা হইতে পারিত। দশ হাজার টাকাতেও দেশী এবং সুদৃশ্য বাটী করানো যায়। শ্রীশ বাবু এ কার্য্যে অভিজ্ঞ। এবং তিনি এরূপ ভাবের বাটী কলিকাতায় ও মফস্বলে নির্ম্মাণ করাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার মতের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন "ভারতীয় স্থপতির কতকগুলি অঙ্গ বিশেষের আয়তন এরূপ যে তাহা বসাইতে গেলে হয় রাজপথ হইতে অনেকখানি জমি ছাড়িতে হইবে, নতুবা মিউনিসিপ্যালিটিকে জমি দখলের বাবদে অনেক 'ফি' দিতে হইবে।" কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। রাজপথ হইতে অনেকখানি জমি ছাড়িতে হইবে কেন? সমালোচক মহাশয় গত ভাদ্রের "ভারতবর্ষে" স্থাপত্য-শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধে শ্রীশ বাবুর

রচিত আট লক্ষ টাকার ইমারত দেখুন· রাস্তা হইতে এক ইঞ্চি জমী ছাড়িতে হয় নাই। যদিই বা ছাড়িতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? ইংরাজী ধরণের বাটীতে কি জমী ছাড়া হয় নাই? Writers' Building এবং Govt. Science Collegeএ কি প্রচুর জমী রাজপথ হইতে ছাড়া হয় নাই? আর দেশী বাড়ীর ঝরোকা ও কার্নিস করপোরেশনের জমীর উপর ঝুলিয়া থাকিবে বলিয়া সমালোচক মহাশয় "ফির" ভয়ে ভীত হইয়াছেন। কিন্তু সেণ্ট্রালয়্যাভিনিউএর শত সহস্র বারাণ্ডাগুলি কি করপোরেশনের জমী দখল করে নাই? করপোরেশন দেশী ধরণের বাটীর পক্ষে উক্ত "ফি" ছাড়িয়া দিতে পারেন। তদ্দ্বারা বাটীওয়ালা দেশী ধরণের বাটী নির্ম্মাণ করাইতে প্রলুব্ধ হইবেন।

Bombay Architectural Associationএর রিপোর্টে আছে, বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট এবং পোর্ট ট্রষ্ট দেশী ধরণের বাটী নির্ম্মাণে উৎসাহিত করিবার জন্য "ছাড়-ছোড়" মঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ভারতের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিরাও তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র যে নক্সাগুলি ছাপাইয়াছেন, তাহাদের বাতায়ন ও দ্বারগুলি বৃহৎ আকারের। বাটীর মধ্যে প্রচুর আলোক, বাতাস এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা আছে। গবাক্ষও দিতে হইবে - দেশী ছাপ আনয়নের জন্য। তাহার আলোচনা করিবার স্থানের অভাব। তিনি বলেন নাই যে কলিকাতার সমস্ত রাস্তাগুলিই উজ্জয়িনীর গলির মত অল্প-পরিসর হৌক। কৌটিল্যের কাল হইতে সহরে গঙ্গাপথ, রাজপথ, গজপথের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত। সহরে রাজপথ এবং গলিপথ উভয়ই থাকিবে। আর সকল গলিতে মোটর চলিতে পারে না। জয়পুরের রাজপথ সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউ অপেক্ষা বিস্তৃত; তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বাটীগুলি জয়পুর সহরকে ভুবন-প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বড়বাজারের গলির মধ্যে যাইলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কিন্তু উজ্জয়িনীর বক্র সঙ্কীর্ণ পাষাণ পথে দাঁড়াইলে আত্মহারা হইতে হয়।

শ্রীশচন্দ্র হিন্দু স্থাপত্যের উপরে অযথা পক্ষপাতী নহেন। হিন্দু মুসলমানের মিলন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। হিন্দু মুসলমানের মিলনে ভারত স্থাপত্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। হিন্দুর গৃহে তিনি মুসলমানী গম্বুজ দিয়াছেন। খাঁটি হিন্দু ভাবের "ডিজাইন"ও করিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় কটাক্ষপাত করিয়াছেন যে শ্রীশবাবু Saracenic আদর্শে বাটীর ডিজাইন করেন নাই। গত ২৪শে এপ্রিলের মিউনিসিপ্যাল গেজেটে তিনি শ্রীশ বাবুর পরিকল্পিত Indo-Saracenic Styleএ বৃহৎ অট্টালিকার চিত্র দেখিবেন।

নান্নুর-পথে

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কতদূর কতদূর মধুগীতি ভরপুর
পীরিতি-সায়র-তীরে মধুর নান্নুর!
প্রখর ভানুর করে রবি-তপ্ত এ প্রান্তরে
ঝঙ্কৃত কতদূরে ব্রজবেণু সুর!
ওগো, আর কতদূর!

আবরিয়া দিক-রেখা বনরাজি লীলা-লেখা
ওই কি যেতেছে দেখা প্রেম-পূত পুর!
কিশলয়ে শোভাময় দোলে তরুশিরচয়
সঙ্কেতে বুঝি বা কয়—হেথায় নান্নুর।
ওগো, আর কতদূর!

"রাখাল, জান কি তুমি চণ্ডীদাসের ভূমি
মধুপুর নান্নুর আর কতদূর?"

রাখাল কহিল হেসে "এসেছ পথের শেষে,
চণ্ডীদাসের দেশে—এই ত নান্নুর।
ওগো, আর নহে দূর॥"
'শোন ভাই, শোন ভাই— এখানে কি শোনা যায়
প্রাণগলা মনভোলা মধুঢালা সুর!'
কহিল সে 'শুনি নাই' প্রাণ করে হায় হায়
দেবীহারা বেদীকার পারা এ নান্নুর।
ওগো, এসে এতদূর!
রাখাল চলিয়া যায় এ কি সুর! ও কি গায়
'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম সুর!'
কাণের ভিতর দিয়া পশিয়া ভরিছে হিয়া
গীতিহারা নয় এ যে গীতিভরা পুর॥
ওগো এসেছি নান্নুর—
ওই—ওই সেই সুর॥

ভূমিকম্প

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

১

[যুবক জমিদার শেখরের নববিবাহিতা স্ত্রী বিমলা। প্রকাণ্ড বাড়ী,—দাস-দাসী, আসবাব-সরঞ্জামের অভাব নাই। কিন্তু অভাব হৃদয়ের দান-প্রতিদানের। এত বড় বাড়ী, এই বিলাস-আয়োজন, বিমলার কাছে যেন মস্ত উপহাস বলিয়া মনে হয়। শেখর তাহার অসীম প্রেমের প্রতিদান না পাইয়া ক্ষুণ্ণ, কিন্তু ধীর, সহিষ্ণু চিত্তে সে অপেক্ষা করিয়া আছে।

দ্বিতলের বারান্দার রেলিংএর ওপর হেলান দিয়া বিমলা দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে আকাশে নবীন মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার আর্দ্র শীতল বায়ু আসিয়া বিমলার দেহে লাগিতেছিল, কিন্তু মনকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না। পাশে দাঁড়ের উপর ময়না শেখরের স্নেহের ডাক 'বিমলা' নাম বারম্বার আওড়াইয়া বিমলার বিরক্তির উদ্রেক করিতেছিল।]

বিমলা। (সক্রোধে পাখীর ডাকের পুনরাবৃত্তি করিয়া) বিমলা– বিমলা—বিমলা। পোড়া পাখীর আর অন্য ডাক নেই! একটা ঠাকুর-দেবতার নামও যদি বলতে পারত! ও-ডাক আমার কাণে কঠিন বিদ্রূপের মত লাগে! (উচ্চৈঃস্বরে) ঝি—ও ঝি!

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। কি মা?

বিমলা। শুনতে পাচ্ছিস না—পাখীটা চীৎকার ক'রে মরছে? ও আমার নাম ডাকে কেন? কে আমি

ঝি। তুমি যে বাড়ীর কর্ত্রী মা, তাই ও তোমার নাম ডাকতে শিখেছে।

বিমলা। কর্ত্রী না ছাই! ও-যেন আমার নাম এমন করে একশ' বার ডাকে না।

ঝি। ও কি আমার মানা শুনবে মা? ও ত মানুষ নয়, ও যে পাখী। ও যে নিজের মনেই গাবে,—মানুষ ওকে শাসন করবে কি করে?

বি। শাসন করতে না পারিস ওকে বিদেয় করে দে! চাইনে আমার এমন পাখী!

ঝি। বিদেয় কেমন ক'রে করব মা! ওর ওই ডাকের জন্যেই ত ও বাবুর সবচেয়ে আদরের পাখী; ওকে বিদেয় করতে তিনি দেবেন কেন?

বি। দেখ্ ঝি, তুই আমার মুখের ওপর অমন ক'রে জবাব করিস নে বলছি। বিদেয় ওকে করতেই হবে। ও যদি বিদেয় না হয়, ত' আমি এই বাড়ী থেকে বিদেয় হব। দেখি কার কদর বেশী—আমার, না ওই লক্ষীছাড়া পাখীটার?

(বাহির হইতে শেখরের প্রবেশ। ঝির প্রস্থান)

শেখর। (জোর করিয়া হাসিয়া) বিমলা, রাগ করবার দরকার নেই। তুমি কি সত্যিই চাও যে ও-পাখীটা না থাকে?

বি। হাঁ আমি তাই চাই। কাণের কাছে, আমার নাম দিবারাত্র এমন করে ভেংচান আমি শুনতে চাই নে। ওকে যদি রাখতে চাও ত' আমাকে বিদেয় কর।

শেখর। ওকে আমি ভালবাসি বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়—ওর ওই স্নেহের ডাকের জন্যেই বিমলা। আসল যেখানে পাওয়া গেল না, সেখানে তার নামই যে মস্ত বড়। কিন্তু তোমার আর ওই পাখীটার যদি একসঙ্গে থাকা না সম্ভব হয়, ত' ওকেই যেতে হবে। আমিই ওকে বিদেয় করছি।

(শেখর পাখীর দাঁড় নামাইয়া পাখীকে খুলিয়া উড়াইয়া দিল। পাখী খানিকটা ঝটপট করিয়া আসিয়া শেখরের হাতের উপর বসিল।)

শেখর। (দুই চোখ আর্দ্র) তবু যেতে চায় না,—ও ত' মানুষ নয়। ওরে আমার স্নেহের পাখী, আজ আর তোর

কিছুতেই থাকা চলবে না ; আজ ওই মুক্ত অবাধ আকাশের মাঝখানে তোকে বিদেয় দিলাম। যদি কোন স্নেহ কোনও দিন পেয়ে থাকিস; তাকে তোর দুই পায়ে দ'লে দিয়ে উড়ে যা অবাধ নীলিমায়।

(বলিয়া দুই হাতে জোর করিয়া পাখীকে উড়াইয়া দিল। পাখী উড়িয়া গেল)

বি। ওকে তুমি উড়িয়ে দিতে পারলে ত!

শে। হাঁ পারলাম বৈ কি!

বি। তুমি ওকে ভালবাসতে

শে। বাসতাম।

বি। তবু উড়িয়ে দিলে?

শে। তবুও উড়িয়ে দিলাম বিমলা। বড় লাভের ভরসায় এমনি কত ছোট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। রাস্তা তৈরী করা দেখেছ বিমলা? কত ইট ভেঙ্গে, কত পাথর চুরমার করে, তাকে কত নির্ম্মম ভাবে পিটিয়ে রাস্তা তৈরী হোল, কবে কোন্ প্রার্থিত জনের আসার অপেক্ষায়—

বি। তোমার চোখে ও কিসের তীব্র আলো?

শে। দেখতে পেয়েছ? বোধ হয় মনের আগুনের একটা রেখা-মাত্র।

বি। ওকে দেখে আমার ভয় কচ্ছে যে!

শে। (হাসিয়া) ভয় নেই বিমলা, চোখের জলে অমন আলো কতবার নিভে গিয়েছে!

বি। তুমি কি সব কথা বলছ, আমার বড় ভয় হচ্ছে। তুমি আমাকেও ঐ পাখীর মত মুক্তি দাও—দিন-কতকের মতও। তোমার পায়ে পড়ি।

শে। দোবো।

বি। কবে?

শে। কালই; তোমার দাদাকে তার করে দিই গে—তিনি কালই এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন।

বি। তাই ভাল, তাই ভাল।

(শেখরের প্রস্থান)

২

(বাহিরের ঘর। শেখর তাহার শ্যালক অমূল্যকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় বন্ধু অমর আসিল।)

শেখর। বোস ভাই।

অমর। (বসিয়া) তোমার মুখটা বড় গম্ভীর!

শেখর। গম্ভীর না কি? তাই যদি হ'য়ে থাকে ত ওর অপরাধ বড় নেই। জীবনে হাসবার সুযোগ পাওয়া যায় কমই।

অ। নতুন কোনও গৃহ-বিবাদ না কি?

শে নতুন নয়। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। ভাবছি, একবার পশ্চিম ঘুরে আসি। কালই বোধ হয় বেরোবো।

অ। পশ্চিম? কতদূর?

(এমন সময় চঞ্চল-চিত্তে বিমলা পর্দ্দার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।)

শেখর। ঠিক নেই। কাশী, এলাহাবাদ, দিল্লী, আগ্রা,—ইচ্ছা হয় ত' আরও। এমন কি উত্তর দক্ষিণও হয়ত' বাদ না যেতে পারে।

অ। ফিরবে কবে?

শে। ঠিক নেই।

অ। তোমার স্ত্রী?

শে। তিনি কাল বাপের বাড়ী যাচ্ছেন।

অ। (সহসা গম্ভীর হইয়া) শেখর, এ সব তুমি কচ্ছ কি?

শে। (হাসিয়া) তুমিও যে ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে উঠলে, অমর! দেশ-ভ্রমণে যাওয়াও কি একটা বড় বিচিত্র জিনিস হোল? হাতে কাজ নেই, ঘুরেই আসি না!

অ। কিন্তু, এ ত' সখ করে যাবার মত বোধ হ'চ্ছে না।

শে। সখ ক'রেই হোক, আর প্রয়োজনেই হোক, দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য থেকে যায় একই,—সেটা হ'চ্ছে মনকে ভুলোনো। আমার এই ঘরের চেয়ে মন যদি বিদেশে ভাল থাকে, ত' বিদেশই যে তার কাছে ঘরের চেয়ে বড় হোল।

অ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমি সবই জানি শেখর, তবুও আমার মন যে দুঃখ পাচ্ছে!

শে। দেখ অমর, মানুষের প্রতি ভগবানের যত বিচিত্র দান আছে, সব চেয়ে বড় তার মন। পৃথিবীর ধুলো-মাটি—ময়লার ছাপ যদি তাতে পড়ল, তাদের মলিনতা যদি মনে সংক্রামিত হোল, তা হ'লেই যে মানুষের সব-চেয়ে বড় ক্ষতি! সে ক্ষতির পূরণ ত' আর কোন লাভের দ্বারাই হবে না। আমি সেই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চাই, তার জন্যে যা

কিছুর দরকার তা' আমাকে করতেই হবে। পরীক্ষা ভাল, কিন্তু ক্রমাগতই যদি পরীক্ষা চলতে থাকে, ত পরাক্ষার্থীর পক্ষে সে যে বিষম হ'য়ে ওঠে! মাঝে মাঝে তাকে দম না নিতে দিলে, শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেবার লোকেরই যে অভাব হয়ে উঠবে।

অ। এ অতি করুণ।

শে। দোহাই তোমার—এর সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে, একে আরও করুণ করে তুলো না। কঠোরের চেয়ে করুণ অসহ।

অ। তা হ'লে যাওয়াই ঠিক?

শে। হাঁ ভাই, কালই।

অ। আমি আজ আসি ভাই। বাইরের ওই মেঘের মত আমারও মনটা থম্‌থমে হ'য়ে আসছে। ভাল লাগছে না কিছু।

শে। (হাসিয়া) এসো।

৩

(সেইদিন সন্ধ্যা। অমরের স্ত্রী অরুণা—বিমলার বন্ধু, অমরের নিকট সংবাদ পাইয়া বিমলার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।)

অরুণা। তুমি না কি কাল কলকাতায় যাবে বোন?

বিমলা। হাঁ।

অ। হঠাৎ?

বি। ইচ্ছে হ'ল একবার বাপ মা ভাইদের দেখে আসি।

অ। এই ত সে-দিন মোটে এসেছ বোন! এত ঘন-ঘন গেলে যে নিজের ঘরে গোলযোগ হবে!

বি। নিজের ঘর? সে কি? বাপ-মা ভাই-বোনের চেয়ে নিজের আর কে আছে?

অ। কি যে বল তার ঠিক নেই। বাপ-মা, তাঁরা দেবতা (বলিয়া অরুণা দুই হাত মাথায় ঠেকাইল), কিন্তু যে লোকটির হাতে ঈশ্বর সাক্ষী করে তাঁরা তোমাকে তুলে দিলেন, মেয়ে-মানুষের সেই যে হোল একমাত্র। সে কথা ভুলে গেলে মেয়ে-মানুষের যে বড় অনর্থ বোন।

বি। (অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার দুই চোখ লাল কেন দিদি, মুখ শুকনো।

অ। (সলজ্জে) কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বোন, কলকাতা থেকে উনি আমার জন্যে একটা নতুন হার তৈরী ক'রে এনেছেন, সেই উপহারের আনন্দে কাল অনেক রাত কাটলো দুজনে জেগে।

বি। আশ্চর্য্য কথা। হারের উপহারের আমোদে রাত কাটলো জেগে? কই আমার ত' কত হার আছে, তার জন্যে ত' এক দিনও জাগতে হয় নি। হারের মধ্যে কি এত আমোদ পাওয়া যায়, যে আবার রাত জাগতে যাবো?

অ। সে ত' হারের আমোদ নয় বোন,—সে আনন্দ যে হারকে উপলক্ষ্য করে জেগে উঠল।

বি। সে আবার কি কথা?

অ। সে কথা যে নারী না জানে, তার লাঞ্ছনার অবধি নেই বোন। সেই আনন্দ যে নর-নারীকে আশ্রয় ক'রে রক্ত-কমলের মত ফুটে না উঠল, তাদের জীবনই যে নীরস হ'য়ে গেল। তখন তাদের আর স্থিতি রৈল না, প্রতিষ্ঠা রৈল না,—তখন তারা এই পৃথিবীতে উদ্দেশ্য-হীন গোলক-ধাঁধার মত ঘুরেই মরল। সেই সোণার কমল যে মানুষের অফুরন্ত আনন্দের খনি, সেই ত' রোজকার ছোট-খাট তুচ্ছ ঘটনাকে উজ্জ্বল করে। সেই ত' রাতের পর রাত চোখ থেকে ঘুমকে তাড়ায় বোন।

বি। কি যে হেঁয়ালির ছন্দে কথা কও দিদি! এ না কি আবার সত্যি?

অ। সত্যি,—সত্যি বোন্। তোমার চেয়ে সত্যি, আমার চেয়ে সত্যি। তোমার-আমার মত কত কোটি লোক, কত লক্ষ বৎসর এলো গেল, কিন্তু এ সত্যি হ'য়ে রৈল অক্ষয়!

বি। আমি ত' কিছুই বুঝতে পারি নে!

অ। নারী-জন্ম যখন নিয়েছ, তখন এক দিন বুঝতেই হবে। আমি শুদ্ধ এই আশীর্ব্বাদটুকু করি, যেন সেই দিনটি অচিরে আসে।

বি। কেমন করে আসবে দিদি?

অ। কারুর বা আসে সহজে, আর কারুর আসে হঠাৎ এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে, মস্ত বড় দুঃখে, মস্ত বড় পরীক্ষায় পড়ে। ভূমিকম্প দেখেছ বোন,—কেমন করে, এক মুহূর্ত্তে সে মাটির জায়গায় জল এনে দেয়, জলের জায়গায় মাটি? ঠিক তেমনি। তখন দেখবে যে পাহাড় ফেটে জল বেরিয়ে একেবারে চারি দিক ভাসিয়ে দিয়ে গেল—আর থৈ পাওয়া

যায় না। তখন দেখবে যে আনন্দে সমস্ত মনটা নিমেষে ভরে গেল, এবং আর একটি লোক দিবারাত্র তোমার মনের সঙ্গী হ'য়ে রৈল—আর (হাসিয়া) তখন এমন করে রোজ রোজ বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে হবে না—বরং কেউ নিতে এলে তাকে ফিরিয়ে দেবার অছিলে খুঁজবে। আর তখন মনে পড়বে এই দিদিটিকে। (সহসা ঘড়ির দিকে চাহিয়া) যাই বোন, রাত হোল, ওঁর খাবার সময় হয়েছে।

বি। দিদি, তোমার কথাগুলো বেশ লাগছে। আর একটু বসতে পারবে না? আজকে না হয় রামুন ঠাকুরই ওঁকে খাওয়াবে!

অ। (জিভ কাটিয়া) ছি বোন, তা কি হয়। খাবার সময়টিতে আমি না থাকলে কি চলে? ভাল-মন্দ কি খাওয়াবে বামুন-ঠাকুর তার কি ঠিক আছে? আমারই বা মন মানবে কেন? আজ আসি বোন।

(প্রস্থান)

৪

(রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। শেখর বাহিরের ঘর হইতে তখনও আসে নাই। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা সুরু হইয়াছে,—যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি, তেমনি বিদ্যুৎ। ইহারই মধ্যে বিমলা নিজের ঘরে একাকী—আজ যেন বড় অসহায় বোধ হইতেছে।)

বি। অরুণাদিদির কথা শুনে আজ মনটা কেমন করে উঠল। মিথ্যে কথা, বানানো কথা।—তাই কি? কি নিয়ে সে এমনি করে রাতের পর রাত জাগে—কেমন করে ভাল লাগে? ভালই যদি না লাগে ত' জেগে থাকে কেমন করে? একটুও বসতে পারলে না—পাছে তাঁর ভাল খাওয়া না হয়। আমার অনুরোধ পর্য্যন্ত রাখলে না। রোজ ত' খাওয়া আছেই—এক দিন একটু ভাল-মন্দয় কি এসে যেতো?

(খানিকটা চুপ্ করিয়া রহিল)

এসে-যেতো নিশ্চয়ই, তা নইলে সে কিছুতেই রইল না। এত টান? অথচ আমি কাল ওঁকে ছেড়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছি—উনিও শুনলাম আগ্রা দিল্লী চলে যাবেন! আচ্ছা, আগ্রা দিল্লী—এত দূর কেন—আমার ওপর রাগ করে?

না—রাগ তিনি আমার ওপর কোনও দিন করেন না। আমি কত রাগ করি, কিন্তু তিনি কখনও একটা উঁচু কথা পর্য্যন্ত বলেন নি। এ আমাকে বলতেই হবে। অত সাধের পাখী তাঁর, তাকে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিলেন আমার জন্যে। তার পর থেকে তাঁর মনটা ভার হ'য়ে রয়েছে—এ আমিও বুঝতে পারছি। তার পর থেকে এ-দিকে আর আসেন নি। আমি যাব বলাতে তিনি একটুও বাধা দিলেন না।

(চোখের জল মুছিয়া) আচ্ছা, দিলেন না কেন? এত ভাল? তিনি যদি 'না' বলতেন, তা হ'লে কি আমি যেতে পারতাম?

না—আমি যাব না। দেশ-বিদেশ ঘুরতে গিয়ে যদি শরীর খারাপ হয়ে পড়ে? এ কথাটা আমার এতক্ষণ মনে হয়নি! তাই ত', একে দুর্ব্বল শরীর!

(আবার চোখের জল মুছিল) অরুণাদিদি, একটিবার পর্য্যন্ত খাওয়ার কাছে থাকা বাদ দিতে পারে না,—আর আমি কোনও দিনই ত' থাকি নে! চোখে এত জল আসচে কেন? এ-সব কথা আগে কোনও দিন মনে হয়নি ত'!

আজ কি আর আসবেন না? এই একলা দুর্য্যোগের রাত্রি—ভয় করছে যে। তিনি যদি এসে জোর করে বলে যে, বিমলা তোমার যাওয়া হবে না—তা হ'লে? উঃ, তা হ'লে বেঁচে যাই, বেঁচে যাই।

(এমন সময় দিগন্ত আলোকিত করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল।)

উঃ—কি আলো! ভয় করছে যে—কোনও দিন ত' এমন ভয় করে নি। পোড়া চোখে ঘুমও নেই।

পাখীটা যদি না উড়িয়ে দিতে বলতাম ত' তাঁর এত দুঃখ হোত না! আমার দোষ হ'য়েছে, অপরাধ হ'য়েছে। তুমি এসো—আমাকে বকো, বলো আমার দোষ! তবু তুমি এসো—এসো!

(এমন সময় বাহিরের ঘরে বন্দুকের শব্দ হইল।)

বিমলা। বন্দুকের আওয়াজ—বাইরের ঘরে? কি কাণ্ড হোল, কি কাণ্ড হোল! ওঃ, আমি কি করি? ওরে অভাগিনী—

(বিমলা ছুটিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিল জানালার কাছে শেখর বন্দুক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে বন্দুকের ধোঁয়া। শেখরের মুখে কঠিন দৃঢ় সঙ্কল্প। বিমলা ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে শেখরকে জড়াইয়া ধরিল।)

শেখর (ত্রস্তে)। ছাড় ছাড়—বন্দুক গাদা আছে—নাড়িও না বিমলা—গুলি ছুটে যাবে।

বিমলা। যাক্! লাগুক আমার বুকে। বন্দুক তুমি কাকে মারলে? তোমার কিছু হয়নি?

শেখর। না বিমলা। ছাড়, এ ভয়ানক অস্ত্র।

(বিমলা আঃ বলিয়া মেজেতে গিয়া বসিল। তার চোখে ভয়-চকিত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। শেখর আকাশের দিকে বন্দুক ছুড়িয়া দিয়া, বন্দুক রাখিয়া দিল। বিমলা তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিল।

বিমলা। এবার আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

(শেখর বিমলাকে আপনার বাহু-বন্ধনের মধ্যে লইয়া, একটা কৌচে গিয়া বসিল।)

শেখর। ভয় পেয়েছ বিমলা, কাঁপছ যে?

বিমলা। তুমি কাকে গুলি করছিলে?

শেখর। সেই পাখীটাকে।

বি। কোন্ পাখী?

শে। সেই যাকে সকালে উড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমার কথায়। সে তার স্নেহের বন্ধন ত' কাটাতে পারে নি; আশে পাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সেই তাকে, বিমলা। যে অবোধ পাখী মনে করে স্নেহই সব চেয়ে বড়, তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছিলাম—আর যেন সে স্নেহের টানে এমন করে ঘুরে না মরে।

বি। (শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া) তোমার চোখে আবার সেই আলো, যা বিদ্যুতের চেয়ে কড়া! ওতে আমার বড় ভয় করে। ওগো—তুমি এত নিষ্ঠুর হ'লে কেন? তুমি কি জান না যে সেই পাখীর জন্যে আমারও মন সমস্ত দিন কেঁদেছে? (শেখরের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।)

(দুইজনে খানিকক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিল।)

শে। যাও—শোও গে।

বি। (শেখরকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া) না—আমি আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

শে। কাল, বাপের বাড়ীতে?

(বিমলা কোনও উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

(শেখর বিমলার মুখ আলোতে ধরিয়া অনেকক্ষণ দেখিল। তার পর কহিল।

শে। বিমলা তোমার চোখ আজ আশ্চর্য্য শান্ত, সুন্দর; তোমার মুখ আজ অপরূপ! বিমলা!

বি। কি?

শে। এমনি তোমাকেই আমি এত দিন ধরে চেয়ে এসেছিলাম!

বি। (বুকে মুখ লুকাইয়া) আমার পাপকে ক্ষমা করে' আজকের আমাকে গ্রহণ করো, দেবতা আমার!

(এমন সময় জানালার ভিতর দিয়া ময়না উড়িয়া আসিয়া তাহাদের সংবদ্ধ হাতের উপর বসিল।)

শে। (উচ্চৈঃস্বরে) এসেছে—এসেছে বিমলা! আজ আমাদের স্নেহের পাখী, আমাদের অপরূপ আনন্দের ক্ষণে আনন্দেরই দূত হ'য়ে ফিরে এলো। আজ আমাদের মিলনকে সার্থক করলে পাখী! ওরে আমার পাখী! ভাল লাগলো না তোর নীলাকাশ, অবাধ অসীম মুক্তি! তাই আবার ফিরে এলি এই প্রেমের অগ্রদূত হ'য়ে! (বিমলার কপোলে চুম্বন করিয়া) বিমলা, আজ এই দূত যে প্রেমের অপার বারতা নিয়ে এলো, তাকে, এসো, আমরা আনন্দের সঙ্গে, সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করি।

(বিমলা শেখরের পায়ে গড় হইয়া প্রণাম করিল। শেখর তাহাকে আপনার আলিঙ্গন বদ্ধ করিল।)

বিমলা। (চোখ মুছিয়া) আজই অরুণাদিদি বলছিল ভূমিকম্পর কথা—যা পাহাড় ফাটিয়ে জল বার করে! আজ হ'ল সেই ভূমিকম্প আমার জীবনে—উঃ বড় দুঃখের, কিন্তু অপরূপ—অপরূপ!

৫

(তাহার পর দিন সকালে বিমলার বড় ভাই অমূল্য আসিল। শেখরের সহিত অমূল্য বাহির বাড়ী হইতে আসিয়া ডাকিল—বিমলা, বিমলা! বিমলা হাস্যমুখে আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিল।)

অমূল্য। হঠাৎ তোদের টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা ত' ভেবেই অস্থির। ভাবলাম, এ আবার কি ব্যাপার। কি ভাবনাই যে হ'য়েছিল আমাদের। ভাল আছিস্ ত?

(শেখর চলিয়া গেল)

বিমলা। (সলজ্জে) আছি।

অমূল্য। তবে হঠাৎ টেলিগ্রাম করলি যে!

বিমলা। (হাসিয়া) তোমাদের সকলকে দেখবার ইচ্ছে হ'লো, তাই।

অমূল্য। বুঝেছি, ঝগড়া টগড়া হ'য়েছিল বুঝি। তুই

যেন কি! যাক্ এ-বারটা ঘুরে এসে আর এত ঘন ঘন যাবার ইচ্ছে করো না বোন। শেখরের যে অসুবিধা হয়। কোন ট্রেনে যাবি—বিকেলের ট্রেনেই যাওয়া যাক্—কি বল?

বিমলা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অমূল্য। কি বলিস্?

বিমলা। (ধীরে ধীরে সলজ্জ ভাবে) এবার আর যাওয়ার সুবিধে হবে না দাদা।

(নেপথ্যে অরুণা শাঁক বাজাইয়া উঠিল)

অমূল্য। ও কি?

বিমলা। না, ও কিছু নয়। এবারটা থাক দাদা। শরীর টরীর সব তেমন ভাল নেই।

অমূল্য। (স্মিতমুখে) তা বেশ। এই ত' ভাল কথা। শুনে সুখী হোলাম। তুই এক কাজ কর দিকিনি; খুব ভাল করে পোলাও-টোলাও খাবার যোগাড় করগে যা,' আর আমি একটা তার করে দিই গে যে তোরা সব ভাল আছিস। কেমন?

বিমলা। (হাসিয়া) আমি চল্লুম—নিজের হাতে তোমার খাবার তৈরী করবো।

(প্রস্থান)

(শাঁক বাজাইতে বাজাইতে অরুণার প্রবেশ।)

বিমলা। তুমি যেন কি অরুণাদিদি! লজ্জা করে না?

অরুণা। লজ্জা কার কাছে করবি বোন, ও কি লুকোনো যায়? ওর আলো যে মুখে-চোখে খেলে! কি চক কথাই না বলেছিলাম! চব্বিশ-ঘণ্টা যেতে না যেতে সেই দাদাকে অছিলা ক'রে ফেরাতে হ'লো। শাঁক এখন বাজাব না ত' আর কবে বাজাবো বোন্?

কে মোরে চিনিতে পারে ?

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কে মোরে চিনিতে পারে ?
আজি আমি স্নিগ্ধস্রোতা
তটিনীর ক্ষীণ প্রাণধারা,
বাজাইয়া চলি একতারা
শ্যামলী পল্লার মেয়ে
মেদুর, মৃদুল
নাচন দোদুল ;
চলি গান গেয়ে ;
কাল আমি প্রলয়-দুলালী
দিয়ে করতালি
মরণের প্রেমে অনুরাগী
ভৈরবী বৈরাগী
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতি
মরণের গান গাঁথি' গাঁথি'
সারাবেলা।
এ কী খেলা
দুনিবার
দুরন্ত আমার !

কে মোরে চিনিবে,
কে আমার পরিচয় দিবে
শেষ করি ?
রহস্য-শর্ব্বরী
রাত্রিদিন
আদিহীন অন্তহীন
অন্ধকারে
ঢেকেছে আমারে।
কে সেথায় বাতি জ্বালাইয়া
আলোকের মূর্চ্ছনা রচিয়া
দেখাবে আপনি
চিহ্নহীন দুর্গম সরণি !
কে বোঝাবে কোথা যেতে চাই,
কোথা আছে এ পথের শেষ,
কোথা ঠাঁই
কত দূরে আছে মোর দেশ !
কাহারে শুধাই ?
কারে চাই ? তারে কোথা পাই ?

দারুণ বিস্ময়ে
ভয়ে ভয়ে
দেখি চেয়ে,
চলিয়াছি ধেয়ে
কোটি সূর্য্য-অগ্নি-নৃত্য বেগে,
দুর্দ্ধর্ষ আবেগে
ছন্দে ছন্দে বন্ধহীন আনন্দ-পসরা
বিচ্ছুরিয়া, সঞ্জীবিয়া ধরা ;
ব্যঞ্জনার পিপাসায়
আমার প্রাণের দীপ কাঁপে,
নিভে যায়
ক্ষণে ক্ষণে,
সৃষ্টির দুর্ম্মদ প্রভঞ্জনে
উড়ে উড়ে চলিয়াছি আমি
দিনযামী ;
এর মাঝে দুটি দণ্ড কোথা পাব
নিরালা নির্জ্জনে
নিজেরে দেখিব একমনে।

আমি শিখা উদ্দীপ্ত অগ্নির,
ঊর্দ্ধগ, অস্থির!
আমি জানি, এ রহস্য-তিমিরের মাঝে
গোপনে বিরাজে
স্নেহম্লান একটি প্রদীপশিখা,
অন্ধকারে আবরিত একখানি
গোপন লিপিকা;
কিন্তু হায়, কোথা তার লেখা
কোন্ খানে কতদূরে?
তাই যে সুদূরে
দলে দলে নীহারিকা
আদিহীন সৃষ্টির পশ্চাতে
কাঁদে একসাথে
প্রসব-ব্যথায়,
কেহ হতে চায়
দীপ্ত সূর্য্য, কেহ চন্দ্র, কেহ তারা গ্রহ,
অহরহ
তাহাদের প্রকাশ-ক্রন্দন
অনুক্ষণ
হানে মোর মন,
ঘুচাইতে ক্রন্দসীর
রহস্য-রাত্রির
অসহ্য-বন্ধন!
আমি ভ্রূণ,
জ্বলিতেছে সৃষ্টির আগুন
প্রাণ-অন্তরালে;
কে মোর আড়ালে
হাহাকারে
বারে বারে
রক্ত-অস্থি-শিরায়-শিরায়
তীব্র প্রত্যাশায়
ডাকিতেছে, খোল দ্বার,
খোল ওগো দ্বার,
আমারে ফুটিতে দাও,
প্রদীপ জ্বালাও!
অন্ধকার, হায় অন্ধকার,...

কোথা দ্বার, খুঁজে নাহি পাই,
কোথা দীপ, কাহারে জ্বালাই!

কে আমার ভগবান
এমন করিয়া কাঁদে
নিষ্ঠুর আহ্লাদে
কোথা তার মিলিবে সন্ধান,
কেমনে ফুটাব তারে?
তাই হাহাকারে
ঘুরে মরি আমি
প্রস্ফুটন-কামী
চিনিতে ও চিনাতে আমারে
দেবতারে।
তাই সারা নিশি যাপি
হই পাপী,
বুভুক্ষায় পঙ্ক করে পান
মোর ভগবান।
যারা করে অপমান
দেয় শিরে কলঙ্ককল্যাণ,
তারা ভুল করে,—
সেথায় নহে ত মোর পরিচয়;
যে ঈশ্বরে
হানে তারা অবজ্ঞায়
আনন্দ-প্রভায়
সে ঈশ্বর রমণীয় করিয়াছে
গগন-আলয়।

তাই এই আকাশের তলে
দুই চক্ষু ভরি তুলি অশ্রুজলে,—
আমার বাহিরে যাহা আছে
তার পাছে
কত দূরে
গোপন অঙ্কুরে
আমার সত্য সে আমি
অন্তর্যামী
কোথায় করিছে ধ্যান একমনে
সঙ্গোপনে।

আমি নর
জঘন্য বর্ব্বর
হিংসায় প্রখর
লালসা-জর্জ্জর
ভয়ঙ্কর
ক্রূর বিষধর;
এত দৃপ্ত, তবুও নশ্বর,
তাই ত' সুন্দর।
তাই,
যাহা পাই, সকলি হারাই,
ছড়াইয়া যাই
দুরন্ত সদাই;
যাহা কিছু করেছি সঞ্চয়
তার মাঝে পাই না যে পরিচয়,
তাই করি ক্ষয়
নির্লজ্জ নিষ্ফল যাহা কিছু রয়
ভার হয়ে;
সৃষ্টি-স্রোতস্বতী চলে বয়ে,
তাই রিক্ত সেজে
তরঙ্গে তরঙ্গে তার চলি বেজে বেজে।
মোর মাঝে কি বারতা
বহিয়া এনেছি আমি
মৃত্যু-অনুগামী—
জানি না সে কথা,
জানিতে চাহি না।
শুধু যাই বাজাইয়া জীবনের বীণা
বর্ত্তমান হতে ভবিষ্যতে,
নব পথে পথে
লক্ষ্যহারা;
ভাঙি সব বন্ধনের কারা
তবু বন্দী অপরূপ কারাগারে
রহস্য-পাথারে।
অহরহ সুরে সুরে মত্ত হয়ে রই
নব নব কবিতায়,
আজ মোর বীণাখানি ধুলাতে লুটায়,
কাল তারে বুকে তুলে লই!

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম *

(সমালোচনা)

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

চিরদিন স্মরণের যোগ্য কোরে, সুন্দর ধরণে, সুন্দর বরণে, সুন্দর আবরণে, বন্ধুবর নরেন্দ্র দেবের এই বই বের কোরেছেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। এমন বই এর চেয়ে মনোহর কোরে আর কোনো দিন বাঙ্‌লা দেশে প্রকাশিত হোয়েছিল বোলে আমার জানা নেই।

বইটির অন্তরের সৌন্দর্য্যেও রসপিপাসু বিশেষজ্ঞরা মুগ্ধ হবেন। শুধু প্রধানতঃ ওমর খইয়ামের, বিদেশী ভাষায় হোয়েছিল তার প্রচার, তার থেকে বাঙ্‌লায় হোলো তার রূপান্তর ও প্রকাশ। এর আগেও রোবাইয়াতের বহু অনুবাদ হোয়েছে; কিন্তু এক সুহৃদ্বর কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ ছাড়া আর কোনোটিই উল্লেখযোগ্য নয়।

গঠন-প্রণালীর ও ভাবের বাহনের নিরবচ্ছিন্ন সমতা শ্রবণমন-দৃষ্টির পীড়াদায়ক হোতে পারে; এই কারণে শ্রীনরেন্দ্র দেব বিবিধ ছন্দে তাঁর ভাষাকে গতি দিয়েছেন—এতে যে কাব্যের লীলা বিচিত্র ও বিমোহিনী হোয়েছে, তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। এই বৈচিত্র্য অক্ষম হাতের অপটুতায় বার বার বাধা পেতো; কিন্তু শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁর যাদু লেখনীর স্পর্শে, তাঁর ভাষার মহিমময় ঐশ্বর্য্যে, তাঁর কবিত্বের নৈপুণ্যে ওমরের রোবাইয়াৎকে একেবারে বুকের পরতে পরতেই গেঁথে দিয়েছেন—সাকীকে আমাদের আলিঙ্গনের মধ্যে ধ'রে দিয়েছেন।

আগেও প'ড়েছি এবং শুনেছি—এই বইয়ের ভূমিকা থেকেও জান্‌লুম—রোবাইয়াৎ না কি দর্শন-শাস্ত্রে ভরা—বেদ উপনিষদের সঙ্গে তার অনেক মন্তব্য না কি মিলে যায়। আমি অজ্ঞতাবশতঃ দর্শন-শাস্ত্রের ব্যাপারটা ঠিক উপলব্ধি কোর্‌তে পারি নি। তবে প্রেমের এই অমর কাব্যকে আমি ললাটে স্পর্শ কোরেছি, হৃদয়ে ধারণ কোরেছি, ওষ্ঠে চুম্বন কোরেছি।

ওমর বোল্‌ছেন, জীবন সার্থক হয় কেবল দুটিমাত্র ব্যাপারে—আনন্দ ও রস। সেই আনন্দের শ্রেষ্ঠ হোলো প্রেম—সেই রসের সার হোলো দ্রাক্ষারস। ওমর বোল্‌ছেন, বাধা মেনো না, নিষেধ মেনো না,—ভবিষ্যতের ভ্রূকুটির বিভীষিকা যারা দেখায়, তাদের কথা গ্রাহ্য কোরো না; ভালোবাসো, সুধু ভালোবাসো। অতীতের ভাব্‌না ভেবো না, এই প্রকৃতির মাঝে থেকে তার প্রীতির ধারা থেকে বঞ্চিত হোয়ো না। কা'ল যদি চিরনিদ্রাই আসে, তখন যে সব ফুরিয়ে যাবে। তুমি রস পরিবেষণ করো, আর আমি তা উপভোগ করি—আর সব চুলোয় যাক্।

দাও পিয়ালা, প্রিয়া আমার,
পূর্ণ ক'রে এই অধরে,
যাক্ অতীতের অনুতাপ আর
ভবিষ্যতের ভাব্‌না ম'রে!
কাল কি হবে—ভাব্‌বো কেন
আজ ব'সে লো তাই,
তার আগে সই এখান থেকে
চ'লেই যদি যাই—
—বিচিত্র নয় ত!
ফুরিয়ে যাওয়া অসংখ্য দিন নিরুদ্দিষ্ট যত—
তা'র ভিতরেই কোন্ অতীতের প্রায়
মিশিয়ে যাবো হায়।
(রোবাইয়াৎ—শ্রীনরেন্দ্রদেব—২২)

কিম্বা—

দেবতা মানব নিয়ে মিছে আর হোয়োনা বিহ্বল,
তর্ক তুলে প্রতিদিন স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচারে কি ফল?
কা'লের সমস্যা যত কালে হোক্ লয়,
জীবনে যেটুকু আজো র'য়েছে সময়,
সুরা-সংবাহিনী সখী—উচ্ছ্বসিত বক্ষতলে যা'র
যৌবনের যুগল আধার,
বেড়ি তার ক্ষীণ কটি চপল ভঙ্গীতে
ডুবে যাও মিলন-সঙ্গীতে। (রোবাইয়াৎ—ঐ-৯৯)

রোবাইয়াতের আগাগোড়া বল্‌বার কথাই এই:—যে প্রেমিক সে দুনিয়াকে অগ্রাহ্য ক'রে, দেশকাল তুচ্ছ ক'রে, কালের লিখন অবজ্ঞা ক'রে কেবলই ভালোবাস্‌বে, কেবলই রসধারায় তৃষ্ণা দূর কোর্‌বে, অরসিকের অবহেলাকে অবজ্ঞা ক'রে নিভৃতে কাল যাপন কোর্‌বে শুধু প্রাণধারণের সামান্য উপকরণ সঞ্চয় কোরে, কাব্যের আমোদে, তার রস-সংবাহিনী সখীকে সাম্‌নে নিয়ে, তার পরিবেষণ করা সুধায় ওষ্ঠ আর্দ্র কোরে—প্রেমিকের পরম তৃপ্তির এই চরম আকাঙ্ক্ষা; সে আর কিছু চায় না, আর কাউকে চায় না।

* শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য চার টাকা।

এইখানে এই তরুতলে,
তোমায় আমায় কুতূহলে
এ জীবনের যে-কটা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র,
আর একখানি ছন্দ-মধুর কাব্য হাতে নিয়ে ;
থাকবে তুমি আমার পাশে,
গাইবে সখী প্রেমোচ্ছ্বাসে,
মরুর মাঝে স্বপ্ন-স্বরগ ক'রবে বিরচন,
গহন কানন হবে গো সই নন্দনেরই বন।
(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্রদেব—১০)

Fitzgeraldএর ছিল শুধু "a Book of Verse" (একখানি কাব্য)। যথার্থ রস-নিপুণ কবি, 'ছন্দ-মধুর' বিশেষণটি সংযুক্ত কোরে ওস্তাদ ভাবুকের বাহাদুরী দেখিয়েছেন। যেখানে দ্রাক্ষাসব, সাকীর স্তব, প্রেমের বৈভব, সেখানে এমন কবিতা, যার শ্রবণে বা পাঠে অমৃত বর্ষণ না হয়, যার ছন্দোভঙ্গ হোয়েছে, চোলবে না—একেবারেই চোলবে না—তাতে সমস্ত ললিত আবহাওয়ার যাহটুকু নষ্ট হোয়ে যাবে - সেখানে শুধু একখানি কাব্য, তা সে যেমনই হোক্ কোনোমতেই প্রবেশ কোরতে পাবে না, সেখানে যে কাব্যের ধ্বনিতে অন্তর সাড়া দেবে তা হওয়া চাই 'ছন্দ মধুর' ; সুন্দর সংযোগ !

বহু স্থানেই এই রকম মনোজ্ঞ সমাবেশ আছে। অনুবাদ যে কত চমৎকার হোয়েছে তা Fitzgeraldএর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। কিন্তু অনুবাদ ইংরাজীর অনুরূপ হোয়েছে বোলে এ জিনিষকে আমি খাটো কোরতে চাই না। বাংলার নমনীয় সু-লীল ভাষার গুণে, শ্রীনরেন্দ্র দেবের সেই ভাষার নিপুণ বিন্যাস ও প্রশংসনীয় অধিকারের ফলে, এই বাঙলায় রূপান্তরিত রোবাইয়াৎ প্রভান্বিত হোয়েছে। ইংরাজী ও বাঙলা পদগুলি তুলনা কোরে যিনি দেখবেন, তিনিই এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন :—

'Tis all a Chequer-board of Nights and Days
Where Destiny with Men for Pieces plays ;
Hither and thither moves, and mates, and slays,
And one by one back in the Closet lays.
(Fitzgerald Quartrain 24—XLIX)
(First Edition)

রাত্রি আর দিনে আঁকা দু'রঙের সাদা কালো ছকে
সৃষ্টির আনন্দ-ভরা অফুরান প্রাণের পুলকে
নিয়তির চলে পাশা খেলা—
ঘুঁটির বদলে নিয়ে অগণিত মানুষের মেলা !
এ ঘরে ও-ঘরে ক'রে ঘোরে ঘুঁটি ছকে আঁকা ফাঁদে ;
কখনও বা চিকে এসে হেসে জোড় বাঁধে,
কেউ মরে, মারে কেউ দানে-দানে আড়ি,
খেলা-শেষে একে-একে ফিরে আসে বাড়ী !
(রোবাইয়াৎ— নরেন্দ্র দেব-৫১)

কিম্বা—

And that inverted Bowl we call the Sky,
Whereunder crawling Coop't we live and die,
Lift not thy hands to It for help—for It
Rolls impotently on as Thou or I.
(Ibid—LII)

উপুড়-করা পাত্রটা ওই,
আকাশ মোরা ব'লছি যা'কে,
যার নীচেতেই কু'কড়ে বেঁচে
আঁকড়ে ধরি মরণটাকে,
হাত পেতে কেউ ওর কাছেতে
হোয়ো না আর মিথ্যে হীন,
তোমার আমার মতই ওটা
অক্ষমতায় পঙ্গু দীন।
(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব-৫৪)

সমস্ত বইখানিতেই এই রকম—যে গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের সমবেত চেষ্টায় ওমরের এই অপূর্ব্ব সুন্দর সংস্করণ বাঙলায় বেরুলো, তাঁরা বাণী-অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই চিরন্তন প্রেমের কাব্যখানিকে প্রেমিক কবির মোহিনী লেখনী সত্যই প্রাণারাম কোরেছে। তত্ত্ব বা দর্শন বোঝবার মত মস্তিষ্ক আমার নেই। আমি জানি—প্রেমিকার প্রেমাধারের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষাই হোলো দ্রাক্ষা, অধর হোলো তার পান-পাত্র, চুম্বন হোলো দ্রাক্ষারস। যুগে যুগে সৃজনের আরম্ভ থেকে প্রেমিক তার প্রিয়তমার কাছ থেকে এই রসই যাচ্ঞা কোরে এসেছে। সে সর্ব্বত্যাগী—কেবল ওই তার সাধনা। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য তার কাছে ছার, রাজা বাদশা তার গণনার মধ্যেই নয়। সে তাই বোলছে—

হ'তেম যদি বাদশা আমি,
এর চেয়ে কি সুখের হ'তো !
তোমার রূপের এই যে আলো
চাঁদের চেয়ে উজল কতো !
এই যে আদর, এই যে সোহাগ,
অযাচিত পাচ্ছি তোমার,
অমর করা এই যে চুমা
তুলনা এর কোথায় আর ?
(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব - ২৩৪)

এর ভিতর দর্শনশাস্ত্র থাকে তো থাক্—কিন্তু প্রেমের বন্যায় সে ভেসেই যাবে।

ওমর পরকাল মানতেন না ; কিন্তু তাঁর মনে নিশ্চয়ই সাকীকে মৃত্যুহীন করবার দুর্ব্বার আগ্রহ ছিল। একজন ইংরাজ কবি বোলেছেন যে, তিনি তাঁর প্রণয়িনীর নাম সাগর-পুলিনে লিখেছিলেন ; কিন্তু তরঙ্গস্পর্শে তা তখনি মুছে যায় ; দ্বিতীয় বারের লিখনেরও ঐ দশা হয়। কবি বোলছেন—তাঁকে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ স্পর্দ্ধা কোরে বোল্‌লে 'মত্ত মানব ! নশ্বরকে অমর করার চেষ্টা বৃথা'। কবি তখন তাঁর প্রণয়িনীকে উদ্দেশ কোরে বোল্‌লেন "যা কিছু নগণ্য তুচ্ছ, তা ধূলিলীন হোক্, কিন্তু তোমার যশোভাতি তোমায় চিরন্তন কোর্‌বে, আমি তোমার নামে এমন কাব্য লিখ্‌বো যা তোমার গুণকে অমরত্ব দেবে, আর দ্যুলোকে তোমার মহিমময় নাম চিরাঙ্কিত রাখ্‌বে—যেখানে, মৃত্যু সমস্ত জগৎকে জয় কোর্‌লেও আমাদের প্রেম থাক্‌বে, আবার সঞ্জীবিত হবে :—

* * "Let baser things devise
To die in dust, but you shall live by fame :
My verse your virtues rare shall eternize,
And in the heavens write your glorious name,
Where, when as Death shall all the world subdue
Our love shall live, and later life renew."

পরকাল না মান্‌লেও, কে বোল্‌তে পারে ওমরের মনে এমন কোনো কল্পনা জাগে নি যে, আর সব ধ্বংস হোলেও, তাঁর সাকীর যেন ক্ষয় না হয় ! তাঁর যে এই অরসিক অপ্রেমিক, বিধি-নিষেধ পীড়িত এই জগতের পরিবর্ত্তে নূতন জগৎ গড়বার ইচ্ছা প্রাণে ছিল :—

তুমি আমি প্রিয়তমে,
নিয়তির সাথে
ষড় করি' যদি আজ
মিলি হাতে-হাতে,
পারিতাম ধরিবারে
সৃজনের ভুল,
উৎপাটন করি' এই
বিশ্বেরে সমূল,
চূর্ণ করি ফেলি' তা'রে
ধূলি-কণাবৎ
গড়িতাম মনোমত
নূতন জগৎ !

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব—৭৫)

এই সাকীর গান শ্রীনরেন্দ্র দেব যে বাঙলায় গেয়েছেন, এ যোগ্যই হোয়েছে। কেন না যে কবি, সেই কেবল নারীর হৃদয়-ব্যাপারের প্রকাশ-কুশলী। আমিও ইংরাজ কবির সঙ্গে বলি—যে এত দিন ধ'রে কবি-প্রাণ আন্দোলিত কোরেছে, তার উদ্দেশে মরমের পানপাত্র পূর্ণ কর !—

Drink to her who long
Hath waked the poet's sigh,
The girl who gave to song
What gold could never buy.
Oh ! woman's heart was made
For minstrel hands alone ;
By other fingers played
It yields not half the tone.
Then here's to her who long
Hath waked the poet's sigh,
The girl who gave to song
What gold could never buy.

শ্রীনরেন্দ্র দেবের লেখনী জয়যুক্ত হোক, জগতের শ্রেষ্ঠ কবির নাম বুকে ধ'রে তাঁর যে কাব্য আমাদের হৃদয় হরণ কোরেছে, তা বাঙলা ভাষার ও বাঙালীর সম্পদ বোলে যেন আমরা স্বীকার কোর্‌তে না ভুলি।

কবির সুরে সুর মিলিয়ে যাকে ভালোবাসি, তাকে বোল্‌তে ইচ্ছে কোর্‌ছে —

মত্ত পরাণ মিলন যাচে,
স্বর্গ নরক পায়ের কাছে
তুচ্ছ হয়ে লুটায় যে তার রাণী !

(রোবাইয়াৎ—নরেন্দ্র দেব—২৮২)

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জাতিগত সমাজগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিবিধ বৈচিত্র্য যেমন জার্ম্মাণীতে দেখতে পাওয়া যায়, এমনটি আর কোথাও নেই। জার্ম্মাণীর অধিবাসীদের সম্বন্ধে জানতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ জাতটা নানা জাতের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে; এবং যে সকল জাতি আজ একত্র মিলিত হ'য়ে জার্ম্মাণ জাতি বলে জগতে পরিচিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ইতিহাস, কুলকাহিনী, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা ও শিক্ষা বিদ্যমান ছিল এবং দুইটি বৃহৎ বিভাগের মধ্যে ফেলতে পারা যায়। উত্তর জার্ম্মাণী ও দক্ষিণ জার্ম্মাণী। উত্তর জার্ম্মাণী সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সমতল ভূমি; কিন্তু দক্ষিণ জার্ম্মাণী ঠিক পার্ব্বত্য প্রদেশ না হ'লেও অসমতল উচ্চ ভূমি, পশ্চিমে আর্ডেনেস্ ও ভোস্‌জেস্ পর্ব্বত শ্রেণী থেকে সুরু করে সমস্ত জার্ম্মাণ ভূখণ্ড অতিক্রম করে একেবারে পূর্ব্বে বহিমীয়া ও অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। জার্ম্মাণীর উচ্চভূমি আরম্ভ হ'য়েছে রাইন্‌ল্যাণ্ডের শ্লেট

প্রকৃত শিক্ষা। (প্রকৃতির সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষালাভ হবে বলে জার্ম্মাণরা নদীতীরে অরণ্যের মধ্যে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।)

এখনও আছে। সুতরাং সংক্ষেপে জার্ম্মাণীর বর্ণনা ক'রতে হলে তাদের সম্বন্ধে কেবল সেই কথাটুকুই বলা চলতে পারে যেটা তাদের এই সম্মিলিত মহাজাতির জীবন ও চরিত্রের এবং বিশেষ ক'রে কেবল রাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জার্ম্মাণ মহাজাতির স্তম্ভ-স্বরূপ যে-কটি খণ্ড জাতি তাদেরই বিভাগ বিষয়ে একটু বিশদ ভাবে বলা বিধেয়।

ভৌগোলিক সংগঠনের দিক দিয়ে জার্ম্মাণীকে প্রথমতঃ পর্ব্বত-মালা থেকে ওয়েষ্টারওয়াল্ড্, হেনসরুক, টাওনুস, থুরিঙ্গীবন, হারজ্ পর্ব্বত, আরজ্‌গেবারজ্ বা স্যাক্সনী ও বহিমীয়ার মধ্যবর্ত্তী ওরপাহাড়, রীশেনগেবারজ্ বা জায়েন্ট পাহাড় যেটি প্রাশীয়ান সাইলেশীয়ার মধ্যে অবস্থিত এবং তৎসংলগ্ন উচ্চ উপত্যকা ভূমি যার দু'দিকে ওডেন্‌ওয়াল্ড্ ব্ল্যাক্ ফরেষ্ট্ বা কৃষ্ণবন এবং বাভেরীয় ও অষ্ট্রীয় আল্পস পর্ব্বতের অপরাংশ। কিন্তু জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত-চূড়া 'স্নীকোপে' যেটি জায়েন্ট্ পর্ব্বতমালার একটি অংশ তার

ফ্রিজ্যান ক'নে।

কুসুম সাজে 'বুকেবার্গের' বধূ

ওয়ার্মের গির্জ্জা সংলগ্ন বাজার। (ওয়ার্ম জার্ম্মাণীর একটি প্রাচীন সহর। এই ওয়ার্মের

ষ্ট্যাটগাটের গ্রাম্য জার্ম্মাণ পরিবার। (রবিবার ছুটীর দিনে গির্জ্জার পোষাকে সকলে সুসজ্জিত হয়েছে।)
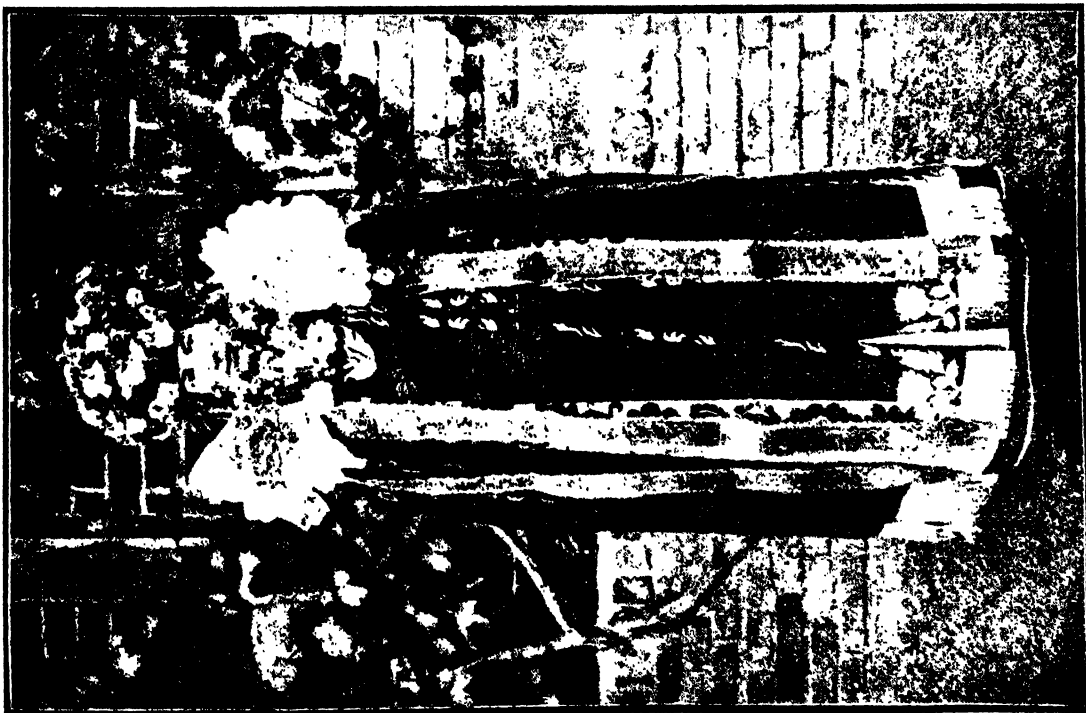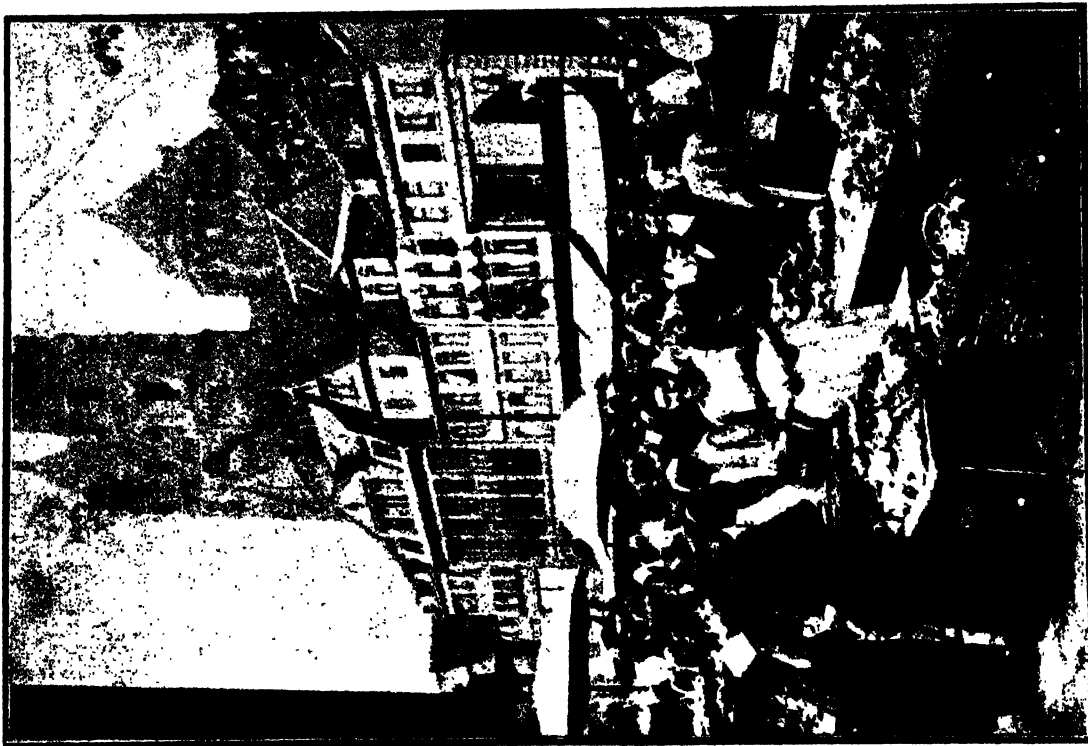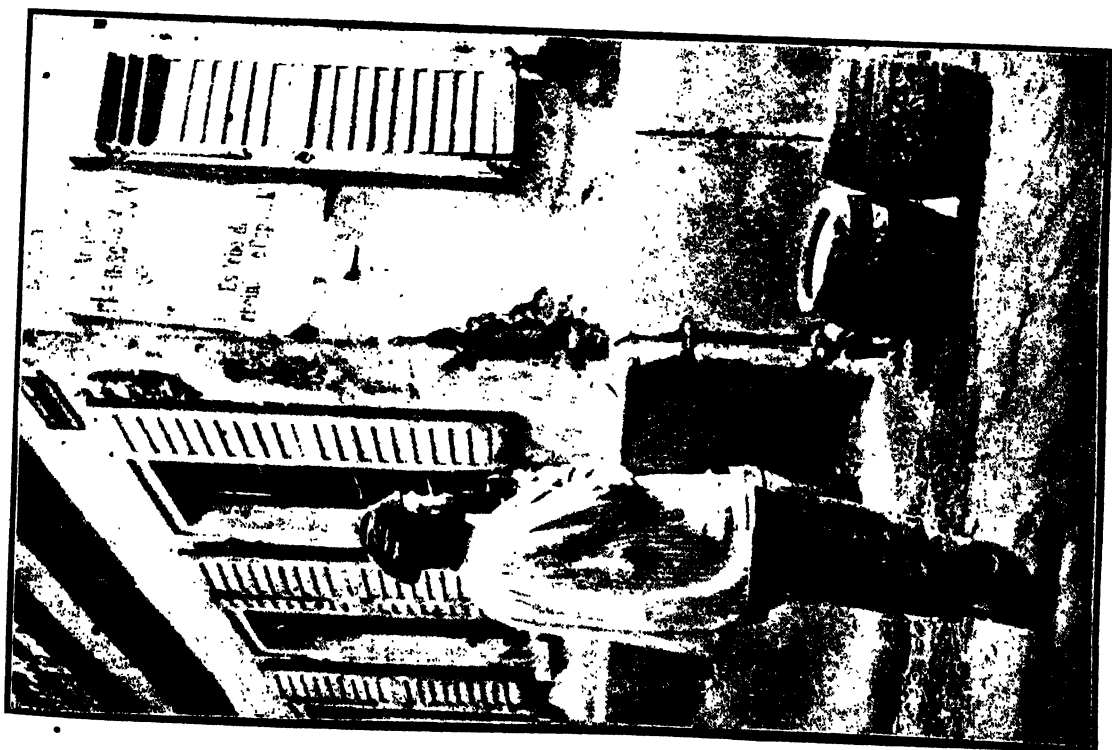
বিবাহের প্রীতি উপহার (কন্যার পিতা মেয়েকে একটি ভাল গরু দিয়েছেন।)

রাইনের মজুর। (ধূমপান করতে করতে বিজ্ঞাপন পড়ছে)

উচ্চতা মাত্র ৫২৬০ ফিট্! এই পার্ব্বত্য ভূভাগের প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে একাধিক বিস্তৃত অরণ্যানী।

জার্ম্মাণীর উত্তর বিভাগের সমতল প্রদেশের বিশেষত্ব হচ্ছে, অসংখ্য হ্রদ-তড়াগ-বিশিষ্ট ভূখণ্ড। এই অংশেই হলষ্টাইন, মেক্‌লেন্‌বার্গ, পমীরেণীয়া ও পূর্ব্ব প্রাশীয়া। এ অঞ্চলের অধিকাংশ প্রদেশ যেমন কৃষিপ্রধান, তেমনি অকর্ষিত ভূমিও পড়ে রয়েছে অনেক। এই অঞ্চলেই মুরেদের বাসভূমি; বালুকাময় সমতল-ক্ষেত্র এবং অফুরন্ত অরণ্য-সম্পদ—ঠিক যেমন দক্ষিণেও আছে!

বহন করবার মত অবস্থায় আপনাকে প্রসারিত করে দিয়েছে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমেনীয়ায়! উত্তর প্রদেশের হ্রদগুলির পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েছি। দক্ষিণে কনষ্টান্স্ হ্রদ। এই বৃহৎ হ্রদটিতে জার্ম্মাণীর আংশিক অধিকার আছে,—সম্পূর্ণ মালিকান স্বত্ব আর নেই। বাভেরীয়ার একাধিক রমণীয় হ্রদ আশী বর্গ মাইল পর্য্যন্ত আকার থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদ্র ডোবার মতো হ্রদও আছে। ছোট ছোট হ্রদের সংখ্যাও খুব বেশী ব্ল্যাক্ ফরেষ্টের পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে। এই হ্রদগুলির আশের পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য একেবারে চিত্র-

বাভেরীয়ার বিচিত্র পোষাক পরা মেয়েদের দল।

জার্ম্মাণীকে নদীবহুল দেশও বলা যেতে পারে। বড় বড় নদ ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এর চারিদিকে বেষ্টন ক'রে আছে বলে জলপথে জার্ম্মাণীর প্রায় সর্ব্বত্রই যাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে জার্ম্মাণীর উন্নতির একটা প্রধান কারণ এই নদীপথের সুবিধা। সমস্ত বড় বড় নদ নদীগুলিই উত্তরাভিমুখী—রাইন্, বেশাদ্, এল্‌ব্, এ তিনটিই উত্তর সমুদ্রে গিয়ে পড়'ছে; এবং ওদার ও ভিষ্টুলা বল্‌টিক্ সমুদ্রকে আশ্রয় করেছে! দানীয়ুব নদের উৎপত্তি জার্ম্মাণীর 'কৃষ্ণারণ্য'-গর্ভে হলেও এবং কেবলমাত্র জার্ম্মাণ রাজ্যেরই বহু শাখা-নদীর দ্বারা পরিপুষ্ট হলেও দানীয়ুব বাণিজ্যতরী

করের তুলিকায় আঁকা রঙীণ ছবির মতো! অসংখ্য ঝরণা ও পার্ব্বত্য উৎসও জার্ম্মাণীর একটা সম্পদের মধ্যে গণ্য!

উত্তর সমুদ্র-তীরের সন্নিকটে ও বল্‌টিক্ সাগরে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি এত ক্ষুদ্র যে সে সকল দ্বীপে মানুষের বসবাস নেই। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপটির নাম 'রুগেন্'। এটি হেলিগোল্যাণ্ড, নর্ডার্ণী, জুয়িষ্ট্, বোর্কুম প্রভৃতি অন্যান্য দ্বীপের ন্যায় ছুটী কাটিয়ে আসবার পক্ষে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ জার্ম্মাণীর উভয় বিভাগের মধ্যে লেখ্য ও কথ্য ভাষায় যতখানি প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের

আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি, আদব কায়দা এমন কি চিন্তাধারার মধ্যেও ততখানি পার্থক্যই লক্ষ্য হয়। অনেকে হয় ত জানেন না যে ইংলণ্ডেও স্কচ ও ইংরেজদের মধ্যেরএমনি বিপুল পার্থক্য আছে ; এমন কি খাস ইংলণ্ডে

কৃষ্ণারণ্যের (Black Forest) উৎসববেশে সুসজ্জিতা কৃষক রমণীর দল

খৃষ্ট-ধর্ম্মের দীক্ষা। (Baptisement)

(পিতামাতা আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ মিলিত হ'য়ে মিছিল ক'রে শিশুকে গির্জ্জায় নিয়ে যায়।)

উত্তর অধিবাসী ও দক্ষিণ অধিবাসী ইংরেজদের মধ্যেও এতখানি পার্থক্যই দেখতে পাওয়া যায়। ভাষার পার্থক্য হিসাবে নীচের জার্ম্মাণীর উচ্চারণ-ভঙ্গী যেমন একটু কোমল মিষ্ট ও শান্ত, উপরের জার্ম্মাণীর তেমনিই তীক্ষ্ণ তীব্র ও সতেজ। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতর জার্ম্মাণ সাধু-ভাষার জন্ম যে উত্তর-খণ্ডে, সেইখানেই আবার নিকৃষ্টতর জার্ম্মাণ চল্‌তি ভাষারও জন্মস্থান! এই ভাষার নাম প্লাট্‌ডয়েশ্‌ (Plattdeutsch) এবং এই ভাষায় ফ্রীট্‌জ রয়টার (Fritz Reuter) মেক্‌লেন্‌বোর্‌গ্যের্‌ (Meck'enburger) প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনাবলী জার্ম্মাণ সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।
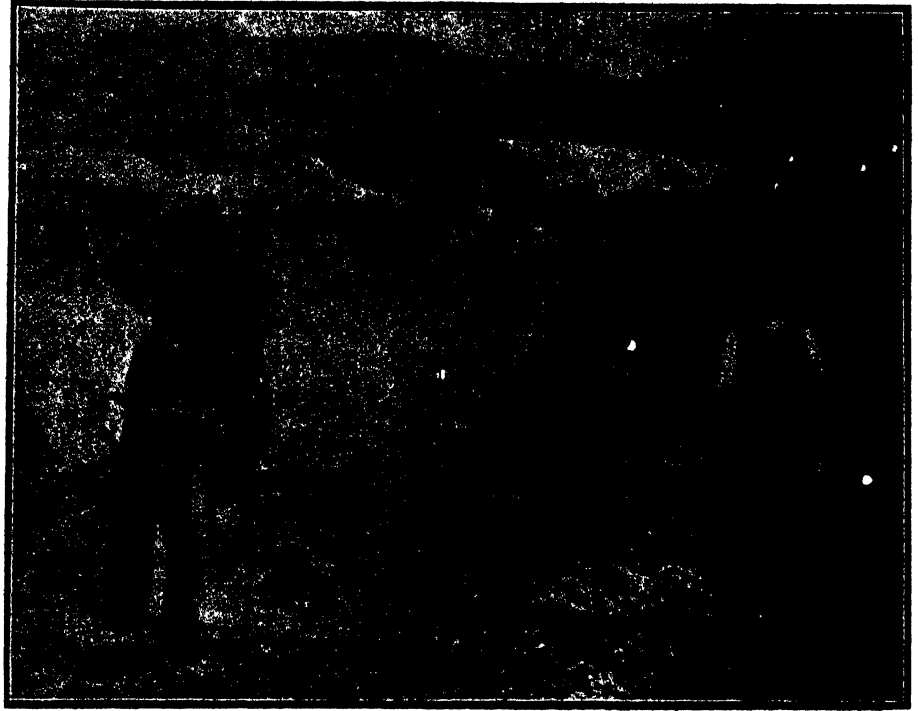
বৃক্ষারণ্যবাসী গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম! (এরা প্রতি দিন অধিকাংশ সময় কৃষিক্ষেত্রে চাষবাসের কাজে সাহায্য করে।)

রীচেনহলের রাস্তায় অধিবাসীদের নাচ। (বাভেরীয়ার মধ্যে রীচেনহল স্বাস্থ্যকর স্থান বলে বিখ্যাত। এখানে অনেকেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম আসেন।)

উত্তর জার্ম্মাণীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবী করে, কারণ দক্ষিণ জার্ম্মাণীতে উত্তরের অধিবাসীরাই গিয়ে প্রথম বসবাস সুরু ক'রেছিল। ইতিহাস-বর্ণিত নানা বিভিন্ন জার্ম্মাণ উপজাতির মধ্যে কেবলমাত্র স্বাধীনতাপ্রিয় শ্যাক্সনরাই সমস্ত প্রদেশ অধিকার ক'রে আছে। এদের এই প্রদেশটি একটু উত্ত

।য়ার পার্ব্বত্য কৃষক পরিবার
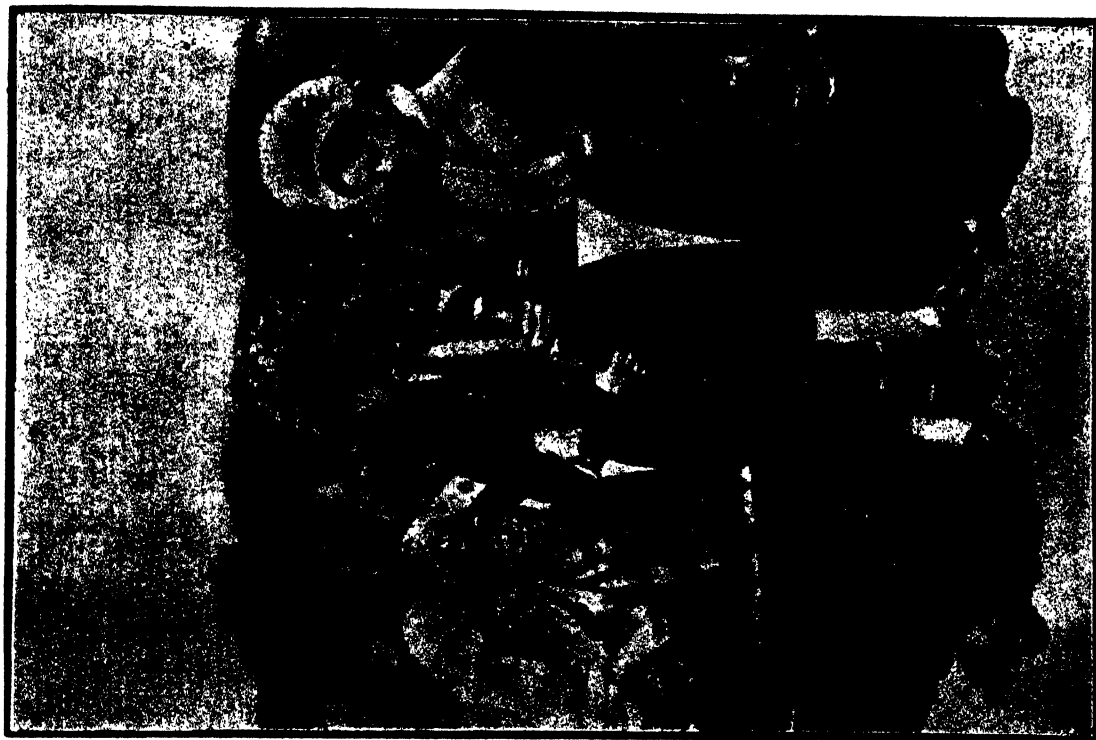
কৃষ্ণারণ্যবাসিনীদের খড়ের দড়ী বোনা।

পশ্চিম কোণে রাইন্ নদী ও হারজ্ পর্ব্বতের মাঝখানে। কঠোর পরিশ্রমী দৃঢ়কায় ফ্রিশীয়ানরা ওল্ডেনবার্গের তটভূমি ও শ্লেস্ উইগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং উত্তর সাগরের একাধিক দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করে।

দু'টি ইস্কুলের মেয়ে (জার্ম্মানীতে মেয়েরা গাড়ীর চেয়ে হেঁটে ইস্কুল যাওয়াই পছন্দ করে।)

এরা কখনও এদের এই বাসস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি। পুরাতন বাস্তুভূমি আঁকড়ে যুগযুগান্তকাল যদি কেউ প'ড়ে থাকে ত' সে এরা। তার পর 'ফ্রাঙ্ক'দের উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা রাইনের নীচের দিক থেকে মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে। জার্ম্মাণীর যে পূর্ব্বাংশকে শ্লাভ'দের দেশ বলে, সেখানে নানা বিভিন্ন জার্ম্মাণ উপজাতির সমাবেশ হয়েছে। তাদের মধ্যেও প্রধান হচ্ছে আবার সেই স্যাক্সন্ ও ফ্রাঙ্করা। 'থুরিঙ্গীয়ান' ব'লে আর একটা শাখাকেও এই প্রধানদের দলে ফেলা যায়।

সেই আদিম যুগের প্রাচীন জার্ম্মাণ জাতির বৈশিষ্ট্য যদি কিছু আজও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় তো সে ওই নিম্নশ্রেণীর স্যাক্সন্দের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সেই রেশমী চুল, সেই ফর্সা চেহারা, সেই নীল আঁখি তারা, এ সং যত দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ক্রমশঃ যেন মিলিয়ে গিয়ে চখের সামনে ভেসে আসে ব্যোয়াবীয়া ও বাভেরীয়ার সেই বাদামী চেহারা, দীর্ঘকায়, লম্বা সঙ্কীর্ণ মুখ ; কিন্তু জার্ম্মা গঠনের বিশেষত্ব বর্জ্জিত নয়! উত্তর পশ্চিম ও দক্ষি পূর্ব্ব অঞ্চলে এই ধরণের চেহারাই খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। আবার দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে 'শ্লাভ' প্রদেশে বেঁটে চেহারা ও চওড়া মুখ লোকই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

এদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে একটু বল যেতে পারে। নিম্নশ্রেণীর স্যাক্সনরা বেশ দৃঢ় ও স্বাধী চরিত্রের লোক। একটু ভারিক্কে গোছের চেহারা। বেশ

কৃষ্ণারণ্যের তরুণী

গম্ভীর প্রকৃতি। চট্ ক'রে কাছে ঘেঁসতে পারা যায় না কখনই তারা কারুর সঙ্গে যেচে আলাপ করে না অপরিচিতকে তারা যেন একটু সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চ দেখে। তাদের চরিত্রে সেই পুরাকালের ক্ষাত্র প্রবৃ

এখনও বেশ প্রবল আছে। নিজের অধিকার সম্বন্ধে তারা সর্ব্বদাই বেশ প্রবল ভাবে সজাগ। ন্যায়সঙ্গত দাবী তারা কিছুতেই ছাড়তে চায় না; কাজে কাজেই তাদের স্বভাব

শিরভূষা। (কৃষ্ণারণ্যের কুমারীদের টুপীর মাথায় লাল ঝুঁটি আঁটা থাকে এবং বিবাহিতাদের কালো)

একটু মামলাবাজ হ'য়ে পড়েছে। তাদের প্রকৃতি বেশ প্রফুল্ল উজ্জ্বল লঘুহাস্যময় নয়, কারণ তাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা তার বিরোধী। সেই মেঘাবৃত আকাশ ও ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন বাতাস তাদের স্বভাবতই ম্রিয়মাণ ও অপ্রসন্ন করে তুলেছে। জীবন তাদের একেবারেই গদ্যময়, কোথাও এতটুকু কাব্যের ছায়ামাত্র নেই। তবে একটা দুর্লভ জিনিস তাদের মধ্যে আছে; সেটা হচ্ছে তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও পরিহাসের রহস্যালাপ। তারা ভাবের দুলাল নয় বটে, কিন্তু জনে জনে প্রকৃত কর্ম্মবীর। এদের মধ্যে কত পরিব্রাজক ও কত বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছে! — কিন্তু কাব্য ও কলা-বিদ্যার কাছে এরা কেউ ঘেঁসতেই চায় না।

পূর্ব্বেই বলেছি ফ্রিশীয়ানরা একটু কষ্টসহিষ্ণু। তারা দেহে ও মনে খুব দৃঢ় হয়ে উঠতে পেরেছে। তাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তারা একটু বেশী রকম গোঁড়া। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে তারা বড় একটা মেশে না। আন্তর্জাতিক বিবাহের তারা খুবই পক্ষপাতী। এক একটা গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় যে তারা সকলেই প্রায়ই পরস্পরের আত্মীয়! এরাও কাব্য ও শিল্পের কোনও ধার ধারে না, এমন কি গানবাজনার সুর পর্য্যন্ত তারা পছন্দ করে না!

আরও উত্তরে এল্‌ব নদী যেখানে পশ্চিমের প্রাচীন জার্ম্মান্ ভূমিকে 'শ্লাভ' প্রদেশ থেকে পৃথক্ করে রেখেছে, এই 'শ্লাভ' অংশ যে স্যাক্সন্ ও অন্যান্য জার্ম্মাণ উপজাতির দ্বারাই পরিপূর্ণ ও তাদেরই সভ্যতার প্রভাবে সুসভ্য হ'য়ে উঠেছে, এ কথাটা ভুলে গেলে চ'ল্‌বে না! এই পূর্ব্বাংশেই

জার্ম্মাণ জননী। (সন্তান-সন্ততিদের খাবার খাওয়াচ্ছেন ও সেই সঙ্গে উপদেশ ও শিক্ষা দিচ্ছেন)

বুকারা কৃষক দম্পতি

কৃক 'নিনী বিভিন্ন সাজে
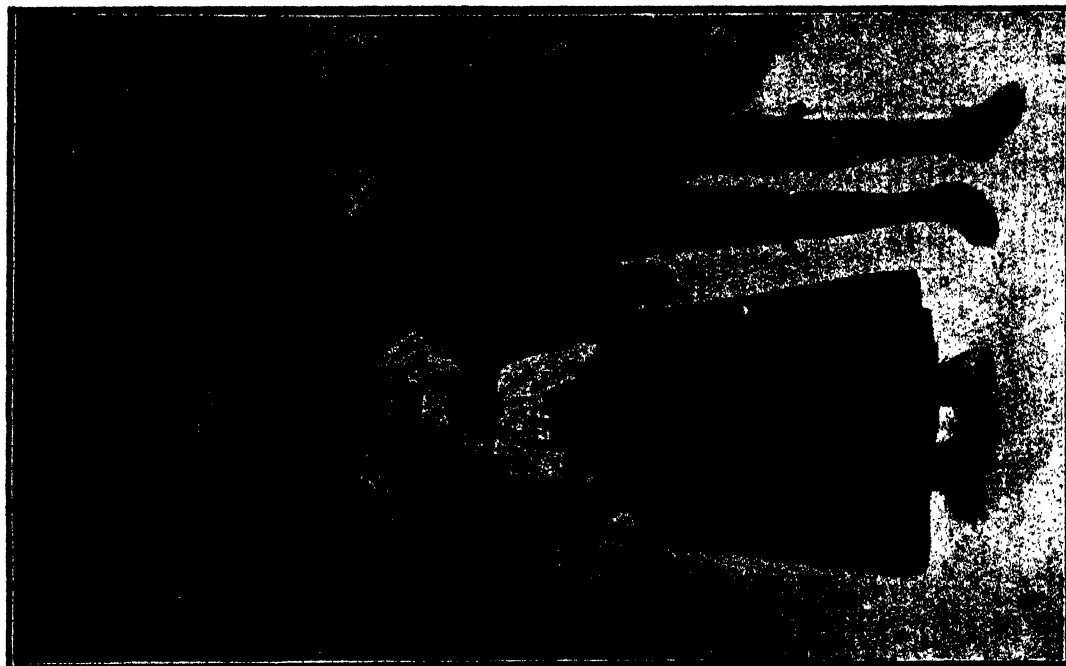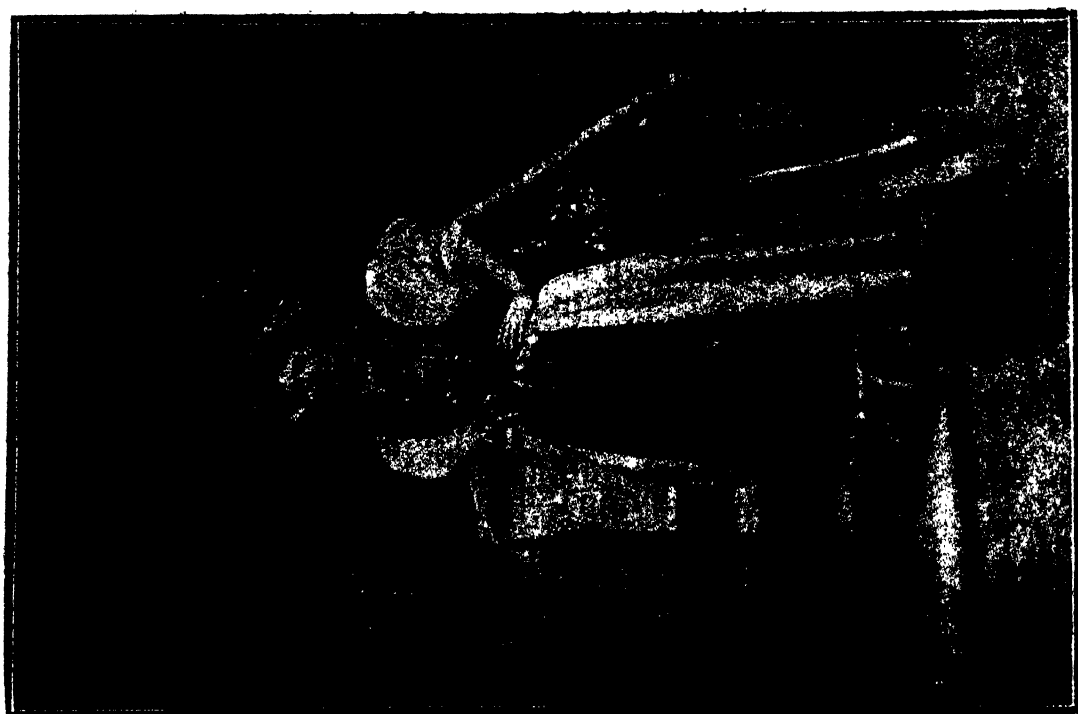
শার্লটেন্‌বার্গের অরণ্য-বিদ্যালয়। (অনেক অসুস্থ বালিকা এই অরণ্য আশ্রমে শিক্ষার্থিনী হ'য়ে হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।)

ধর্ম্মোৎসবের মিছিল
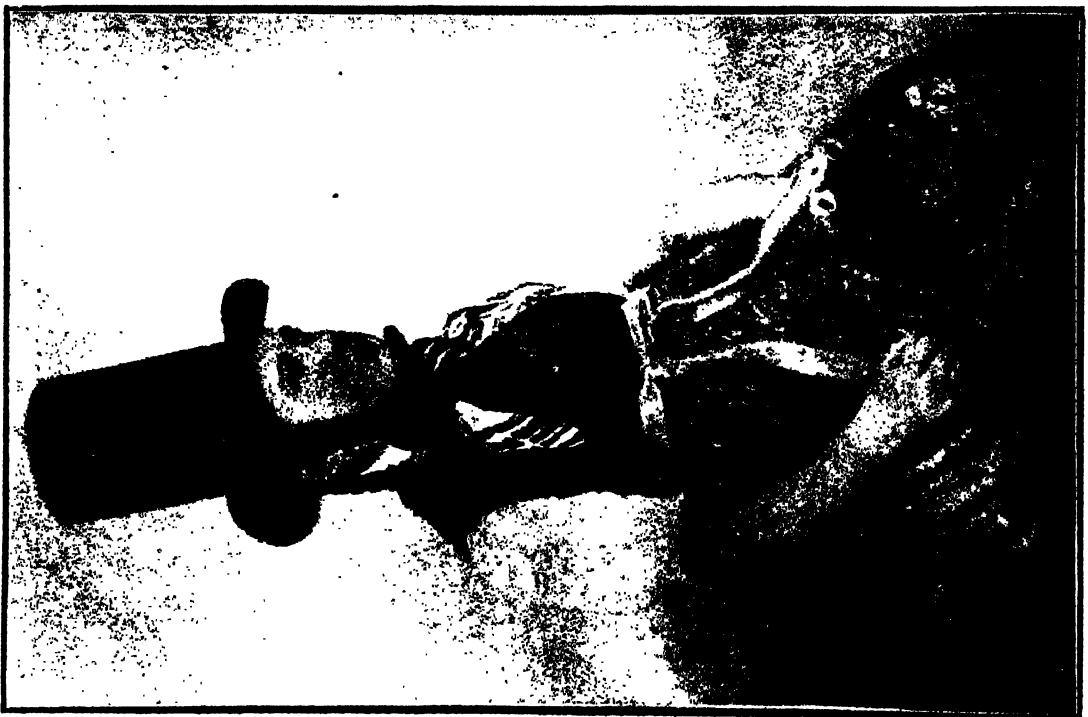
রবিবারের পোষাক। (এই লম্বা লাল টুপী পরা তাদের ফ্যাশান)

পূর্ব্ব প্রাশিয়ার মজুরণীর দল।

প্রুশীয় বীরগণের জন্মভূমি। বর্ত্তমান জার্ম্মাণ জাতির সকল শাখার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সজীব ও তেজস্বী জাত এই অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। 'শ্লাভ' উৎস থেকে এদের উৎপত্তি হ'লেও বর্ণিক্ লিথুয়ানীয়ান জাতির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দেখতে পাওয়া যায়।

অধিবাসীদের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়! খোয়াবীয়ানদের উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানের উৎকর্ষের সে সূক্ষ্ম অনুপ্রেরণাও তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না! জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান সভ্যতা-বিস্তার ও জাগতিক উন্নতি-পথের পথপ্রদর্শক মন্ত্রদাতা গুরুই হ'চ্ছে এরা। বিধিনিয়মের অনুকূল যে যে বিষয় এবং যা এই বিধি-নিয়মের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত হ'লেই উন্নত ও সুসম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, সে বিষয়ের পরিচালনায় প্রুশীয়ানদের মতো উপযুক্ত জাত আর জগতে নেই ব'ল্‌লেও চলে! প্রকৃতপক্ষে তাদের শক্তি সামর্থ্য যা কিছু তা হাতে-কলমের কাজের মধ্যেই প্রকাশ পায়, স্ফূর্ত্তি পায়! তারা কাজের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে কল্পনার তাজমহল গড়তে পারে না।

রাজনৈতিক ব্যাপারে এরা তেমন মাথা ঘামায় না বটে, কিন্তু নিজেদের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা এমন সুচারুরূপে সংগঠিত করেছে যে, জগতের কোনও দেশে এমন সুনিয়ন্ত্রিত মিউনিসিপ্যাল গভর্মণ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণীর ব্যবসায় সংক্রান্ত কৃতকার্য্যতা ও শিল্প সিদ্ধির মূলে এই প্রুশিয়ানদের মাথা ও অদম্য উৎসাহ বিদ্যমান। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর জীবনের গতি নিয়ামক প্রকৃত পক্ষে ধরতে গেলে এই প্রুশিয়ানরাই! এদের অস্তিত্ব জার্ম্মাণীতে না থাকলে জার্ম্মাণীর অবস্থা যে আজ অন্য রূপ হ'তো, এ কথা বেশ জোর করেই বলা চলে। আধুনিক গণতন্ত্রের নেতাও এই প্রুশিয়ান জাতি। এদের বিপুল শক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে জার্ম্মাণীর বেঁচে থাকা অসম্ভব। কাজে কাজেই এদের নেতৃত্বের অনুসরণ করা ছাড়া জার্ম্মাণীর গত্যন্তর নেই।

প্রমোদোদ্যান।
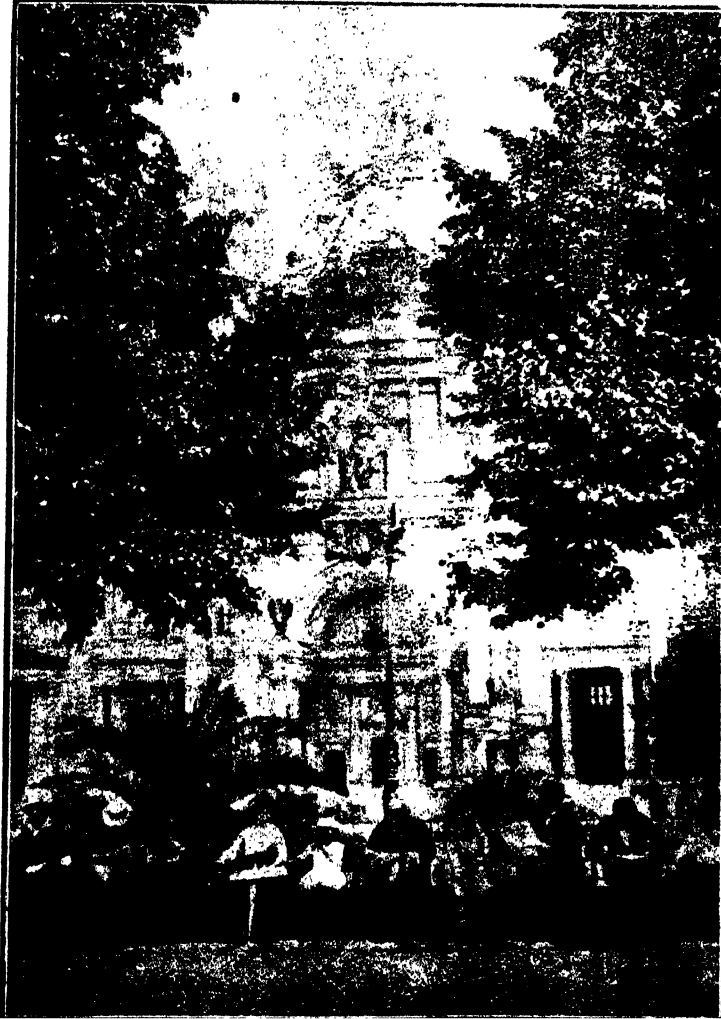
(বার্লিনের নূতন ক্যাথিড্রাল গির্জ্জা সংলগ্ন এই মনোহর উদ্যানে অসংখ্য জার্ম্মাণ নরনারী তাদের অবসর যাপন করে।)

মোটের উপর প্রুশীয়ানরা শক্তিমান গুণশালী এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অধিকারী। তবে 'গলেদের' মতো তাদের সে কল্পনাশক্তি নেই; সে জীবনের প্রতিপলে আনন্দের সঞ্জীবনী লীলা-চাপল্য নেই, যেমন রাইনল্যাণ্ডের

মধ্য-জার্ম্মাণীর প্রধান জাত হ'চ্ছে ফ্র্যাঙ্ক্ ও থুরীঞ্জিয়ানরা। সমস্ত জার্ম্মাণ জাতির মধ্যে সব চেয়ে স্ফূর্ত্তিবাজ

গ্রামের ঝরণা-তলায়।

প্রাচীন গ্রামের দৃশ্য
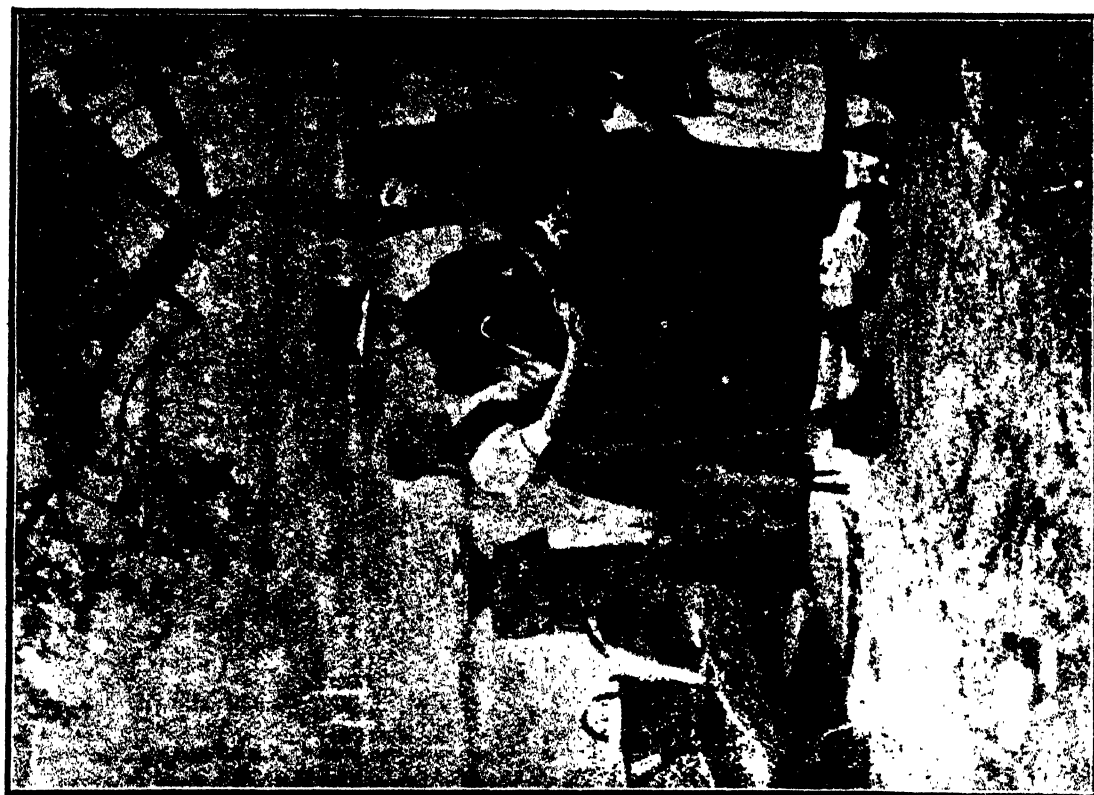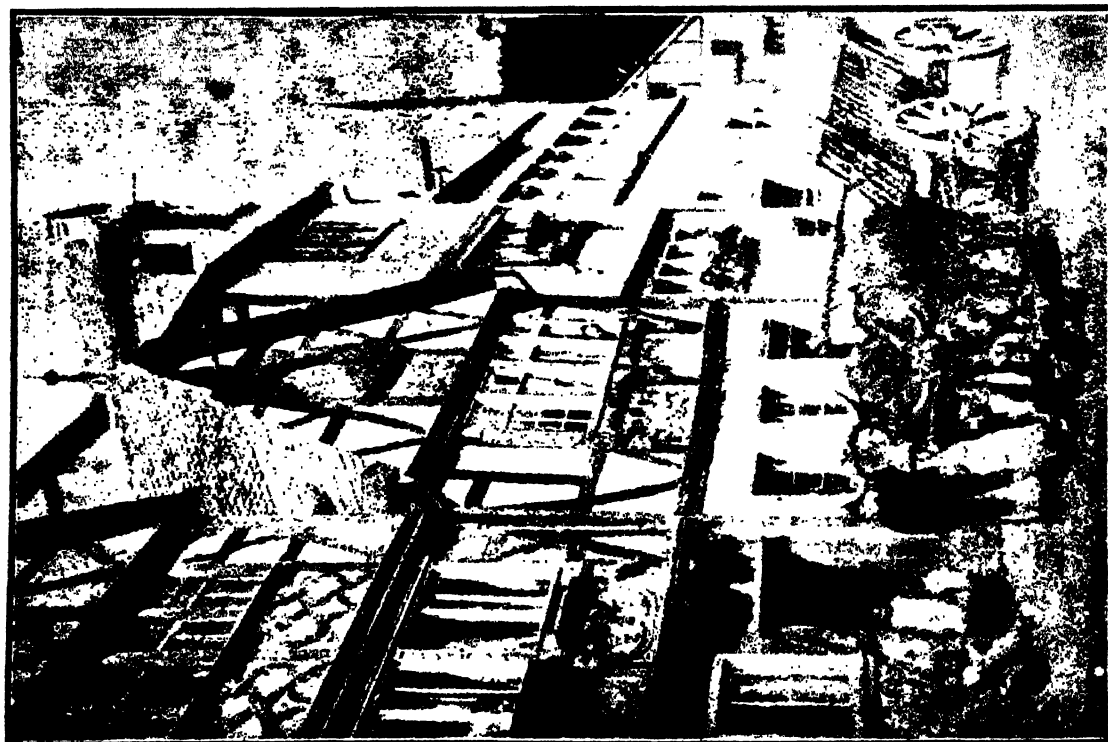
কার্য্যতৎপর সর্ব্বগুণশালী সজীব জাত হচ্ছে এই ফ্র্যাঙ্ক্‌রা! এরা কাব্যামোদী ও কল্পনা-কুশল। শিল্পকলা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের বিশেষ অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়। এরা ভারি মিশুক ও মজ্‌লিসী—সহজেই এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রতে পারা যায়। থুরীঙ্গিয়ানরাও খুব আমুদে লোক। এদের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য ও কাজকর্ম্মে সবিশেষ উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। এরা একটু ভাবপ্রবণ জাত। গীতবাদ্যের একান্ত অনুরক্ত! অপরিচিতদের সঙ্গে এরা অতি ভদ্র ব্যবহার করে। এদের মতো এমন সহজে সন্তুষ্ট হবার সদ্‌গুণ অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না। দোষের মধ্যে এদের আত্ম-নির্ভরতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার প্রয়াস বড় কম। বাইরের যে কোনও প্রবল প্রভাবে এরা সহজেই অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার এদের মত অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমীও খুব কম দেখতে পাওয়া যায়!

দক্ষিণে আলেমান্নী বা শ্বোয়াবীয়ানরা ও বাভেরীয়ানরা প্রধান। বেনেড ও উর্টেম্‌বার্গ প্রদেশে শ্বোয়াবীয়ানরা বাস করে। পূর্ব্বাঞ্চলের শ্লাভ্‌দের মতো এই শ্যামবর্ণ শ্বোয়াবীয়ানদের মধ্যে বেশ একটু কেলটিক্‌ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এদের স্বভাব বেশ মধুর। এরা খুব ধীর প্রকৃতির এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও শিক্ষার উৎকর্ষের দিক দিয়ে এরা জার্ম্মাণীরা অপর সব জাতকে ছাপিয়ে গেছে।

বাভেরীয়ানরা খুব চতুর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং সব্ব বিষয়ে বিশেষ সাবধানী জাত। জার্ম্মাণীর অপর সকল জাতের চেয়ে এদের একটা একটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব খুব বেশী আছে। দুঃসাহসের কাজ করতে এরা মোটেই পশ্চাৎপদ হয় না। চট্‌ করে এরা কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে চায় না বটে; কিন্তু এদের ঠিক অমিশুকও বলা চলে না। একটু আত্মসর্ব্বস্ব ভাব এদের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মভাব ও স্বজাতি-প্রেম এদের মতো আর কারুরই তেমন প্রবল নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের আগে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় দু'লক্ষ আট হাজার সাতশ' আশী বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ছয় কোটী আশী লক্ষ। কিন্তু যুদ্ধের পর ভার্সেল্‌ সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণ্‌ সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ায় এদের আয়তন উপস্থিত প্রায় সাতাশ হাজার বর্গ মাইল কমে গেছে, এবং লোকসংখ্যাও সেই অনুপাতে কমে গিয়েছে প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষ! সুতরাং বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের আয়তন দাঁড়িয়েছে এক কোটী একাশী লক্ষ সাতশ' আশী বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ছ'কোটীর কিছু বেশী।

বাভেরীয়ান বরবধূ। (প্রাচীন বিবাহ পরিচ্ছদে)

১৯১৮ সালের আগে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য ছিল পঁচিশটি সম্মিলিত প্রদেশের সমষ্টি। তার মধ্যে চারটি পৃথক্‌ রাজ্যও সংযুক্ত ছিল—প্রূশীয়া, স্যাক্সনী, বাভেরীয়া ও উর্টেম্‌বার্গ! আলসেস্‌ লোরেন্‌ প্রদেশটিও তখন জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীতে যে প্রজাবিদ্রোহ প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল, তার ফলে জার্ম্মাণীর সমস্ত রাজন্যবর্গ সিংহাসনচ্যুত হ'তে বাধ্য হ'য়েছেন এবং রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সেখানে সর্ব্বত্রই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ তারা পূর্ব্বের সেই একাধিক

সাইকেলে বিহারিণী। (ওয়েণ্ডিশ্ মেয়েরা ঝল্মলে পোষাক পরেও অনায়াসে বাইকে চড়ে যায়।)

রাইন্ নদী-তীর।

সম্মিলিত প্রদেশের সমষ্টিগত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন করেনি, কেবল গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে সেগুলির শাসন-ব্যাপারের ঈষৎ সংস্কার ক'রে নিয়েছে মাত্র। উপস্থিত যে বিধি ব্যবস্থার প্রচলন তারা সেখানে করেছে সেইটেই হচ্ছে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা! তবে কার্য্যতঃ এ ব্যবস্থায় কী রকম সুফল পাওয়া যায় সেটা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ।

পূর্ব্বের পঁচিশটি প্রদেশ উপস্থিত অদল বদল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র আঠারোটিতে—আনহাল্ট্, বাডেন্, বাভেরীয়া, ব্রান্সুইক্, ব্রেমেন্, হামবার্গ, হেস্, লীপ, লুবেক্, মেকলেন্‌বার্গ শোয়েরীণ, মেক্‌লেন্‌বার্গ ষ্ট্রেলিট্‌জ্, ওল্ডেন্‌বার্গ, প্রশীয়া; স্যাক্সনী, স্কাউম্‌বার্গ লিপ্, থুরাঙ্গিয়া, ওয়ালডেক্, ও উর্টেম্‌বার্গ!

আগে জার্ম্মাণীর অধিবাসীদের মধ্যে প্রোটেষ্টান্ট্ ছিল প্রায় শতকরা ৬২ জন, রোমান ক্যাথলিক ছিল শতকরা ৩৭ জন, আর য়িহুদী ছিল শতকরা ১ জন। কিন্তু আলশেস্ লোরেন্ আর পোলিশ অংশ বেরিয়ে যাবার পর এখন প্রোটেষ্টান্ট্ সংখ্যাই বেশী হয়ে পড়েছে। তারা এখন শতকরা প্রায় ৬৫ জন!

একটা অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হবার আগে জার্ম্মাণী খণ্ড খণ্ড দেশে বিভক্ত ছিল। এবং সেই সময়েই তাদের মধ্যে নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার যে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল, সে ভাবটা উপস্থিত এদের মধ্য থেকে অনেক কমে গেলেও এখনও একেবারে বিদূরিত হয় নি। এখনও এরা সাম্রাজ্যের কল্যাণের চেয়ে স্ব স্ব জন্মভূমির কল্যাণের দিকে অধিক সজাগ! নিজেদের ছোট ছোট দেশগুলিকে তারা যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যকে তারা ঠিক সে চক্ষে দেখে না! জার্ম্মাণ কবিরা অধিকাংশই তাদের স্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতায় কেবল নিজেদের ছোট ছোট জন্মভূমির প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠেছে! সমস্ত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যকে নিজের স্বদেশ বলে দেখবার মতো প্রসারিত উদার দৃষ্টি তাদের অন্তরে এখনও উন্মীলিত হয়নি। পিতৃভূমি (Fatherland) ব'লে তারা সমগ্র জার্ম্মাণীকে অভিহিত না করে নিজেদের ছোট ছোট জন্মপ্রদেশগুলিকেই বলে।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর পত্তন হ'য়েছিল ধরতে গেলে সেই ১৮৭০ সালের ফরাসী যুদ্ধের পর। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জার্ম্মাণীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি আরম্ভ হ'য়েছিল। গত বিশ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণ রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই একটা সংস্কারের বন্যা বহে গেছে। সমস্ত

কৃষ্ণারণ্যে বিবাহ-উৎসব। (মেয়েদের মাথার মুকুটগুলি দ্রষ্টব্য)

ওলোট পালোট হ'য়ে প্রাচীন সহর ও পুরাকালের নগর সব ভেঙে পুনর্গঠন সুরু হয়েছিল। তিনশত কোটী টাকা তারা এই দেশের উন্নতির জন্য ব্যয় ক'রতে নামায় তাদের চাষবাস ও কলকারখানার কাজ এমন একটা সুযোগ পেয়ে গেল যে দেখতে দেখতে স্বপ্নের মতো জার্ম্মাণী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলে পরিচিত হ'য়ে গেল।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী-কাল ধরে দেশের শিক্ষা-বিস্তারের দিকে, অর্থকরী বিদ্যালাভের দিকে এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে জার্ম্মাণীতে গত বিশ বৎসরের মধ্যে যে অসংখ্য কারু-কর্ম্মী রাসায়নিক শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হয়েছে—তারাই আজ জার্ম্মাণীর অসংখ্য কলকারখানার সুযোগ্য পরিচালক!

(ক্রমশঃ)

কান্নাহাসি

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমি ব'সে আছি, আকাশের পানে চাহি—
দূর দিগন্তে কোথাও সীমানা নাহি,
ঘন কুয়াসার অবগুণ্ঠনে ঢাকা;

সন্ধ্যারৌদ্র মেঘের অন্তঃপুরে
বাহিরে আসিতে মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
ক্ষীণ আলো দীন ব্যথার ম্লানিমা মাখা।

অন্ধ আকাশ নিঃসীম ভাষাহীন,
দিবসের আলো ধীরে হয়ে আসে ক্ষীণ,
ধরণী লুকাল অন্ধকারের মাঝে;

আমি একা বসে তমিস্রা উপকূলে
নিখিলের ব্যথা মোর বুকে ওঠে দুলে
চিত্তে এক ব্যথিত রাগিণী বাজে

ধরা যেন চায় ফেলিতে এ আবরণ
ঘন হয় পাশ, দৃঢ় হয় বন্ধন,
ক্ষীণ দীপালোকে মরে গৃহকোণে ঘুরে!

মানবের ব্যথা মৃদু এ আলোর মতো
শুধু হয় গৃহ-বাতায়নে প্রতিহত,
নিবিড় হতেছে বন্ধ অন্তঃপুরে।

বেদনা-আঘাত আমার চিত্তে লাগে,
অসীম শূন্যে মুক্তির দিশা মাগে,
অন্ধকারেতে হয় শুধু দিশাহারা।

ক্রন্দন বুকে উছলি ভাঙ্গিয়া পড়ে
আঁধার বিশ্বে তট খুঁজে খুঁজে মরে,
এ মূক শূন্যে কে দিবে কাহারে সাড়া।

মানব যেন রে নীড়হারা ভীরু পাখী
নিজেরে ভুলায় মুদিয়া আপন আঁখি,
আশ্রয়হীন ভাবে আছে আশ্রয়!

হায় অসহায় কে খুলিবে তোর দ্বার—
যে দিকে তাকাস বন্ধ এ কারাগার
বন্দী, কে দিবে মুক্তির পরিচয়?

নিশার আঁধার নিবিড় হইয়া আসে
মানব চিত্ত শিহরি কাঁপিছে ত্রাসে
জানে না যাহারে তারে আশ্রয় মানে,

অকূল, আঁধার, ছিঁড়েছে তরীর পাল,
ভাবিছে অজানা নাবিক ধরেছে হাল
সভয় স্তব্ধ, তারি বন্দনা গানে।

* * * *

কাটিল কুয়াশা তারকা আলোক জ্বালে,
দশমীর চাঁদ হাসে গগনের ভালে,
অসীম আকাশে মেঘের চিহ্ন নাহি;

হাসিয়া উঠিল ভীরু মানবের মন
কোথা বন্ধন, কোথায় বা গৃহ-কোণ,
কোথা ভাঙ্গা তরী, কে আনিল তরী বাহি?

অসীম শূন্য বিস্তার সীমাহীন—
দ্বিধা-হীন মনে ব্যথা কোথা হ'ল লীন
কারা-শৃঙ্খল কোথায় পড়িল টুটে!

মুক্তপক্ষ পাখীরা অবাধে উড়ে
প্লাবিয়া গগন ভরা হৃদয়ের সুরে
কত না শক্তি ক্ষীণ সে পক্ষপুটে।

হৃদয়ের সাথে হৃদয় আসিয়া মেলে
শূন্য আকাশে সঙ্গীত-সুধা ঢেলে;
কোথা গ্লানি, কোথা কুয়াশার মলিনতা—

আনন্দ শুধু অক্ষয় হয়ে রয়
বাধা নাই, নাই ব্যথা বন্ধন ভয়
অসীম আকাশ, উড়িবার অধীরতা!

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

৭

রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে আমাদের প্রধান কাজ হলো, গাড়ী দুখানি এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির ওয়ার্কশপে দেওয়া। কোথাও কোনো স্ক্রু আল্‌গা, বা, কল্‌কব্জা কোথাও ঢিলা হলো কি না, তা ঠিকঠাক করা আর ব্রেকে কোনো খুঁৎ না থাকে—এই সব পরখ করানো। কারণ, এবার সুদীর্ঘ পাহাড়-পথে পাড়ি! পাহাড়ের বাঁক, গোড়েন পথ,—ব্রেক যদি একটু বিগড়োয়, তাহলে গাড়ীশুদ্ধ সকলের প্রাণ নিয়ে হলো। অথচ গাড়ী যথাসম্ভব হাল্‌কা করাই সঙ্গত আর নিরাপদ! কাজেই একখানি পৃথক্ গাড়ী ভাড়া করা হলো এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির কাছে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর অবধি সে গাড়ীর ভাড়া পড়্‌লো ৯০৲ নব্বই টাকা। স্থির হলো, নেহাৎ প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া, বিছানা-পত্র বাসন-কোসন প্রভৃতির মোট সেই ভাড়া-গাড়ীতে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে একটি পাচক ব্রাহ্মণও

রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িবার উদ্যোগ

টানাটানি ঘট্‌তে পারে। কাজেই এখান থেকে শ্রীনগর-যাত্রী মাত্রেরই গাড়ীর অঙ্গরাগ-পর্যাবেক্ষণ একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সদ্য কাচিয়ে নেবার জন্য রজক ডাকিয়ে তার কাছে সব কাপড়-চোপড় পাঠানো হলো। এখান থেকে ছেলেরা আমাদের সহযাত্রী হবে—তাদের সঙ্গেও মোট-ঘাট আছে বিস্তর। বড় ট্রাঙ্ক প্রভৃতি অনেক ট্রেনে এসেছিল—সে আর আমাদের সাথী নেপালী বয়,—এরাও দুজনে এই মোটঘাটের সঙ্গে সেই গাড়ীতে যাবে। গোটা-চারেক ভারী ট্রাঙ্ক নিয়ে শেষে সমস্যা বাধ্‌লো! রাধাকিষণ কোম্পানির ভারবাহী প্রকাণ্ড লরি ভোরেই শ্রীনগর যাত্রা করছিল—ভারী ট্রাঙ্ক ক'টা সেই লরিতে চাপানো হবে, স্থির হলো। এ-সবের মীমাংসা সেরে

সারাদিনটা গোছগাছ করতেই কেটে গেল। রাধাকিষণ কোম্পানির অংশীদার এম্, কে, শেঠী মহাশয় আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এমন মনোযোগী হলেন যে তাঁর আতিথ্যের ঘটায় আমরা অপ্রতিভ হয়ে পড়ছিলুম! কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা···আমাদের কোনো প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। শেঠী-সাহেব পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ; তাঁর ভদ্রতা, তাঁর আতিথেয়তা অপূর্ব!

মারী ও কোহালার পথে

বৈকালে তিনি বললেন,—চলুন বাগে [illegible] কালি ডালে

ষ্টেট

আমরা বললুম, এই দীর্ঘ পাড়ির পর রাত্রি জাগা ঠিক হবে না। আবার সামনে এই দীর্ঘ পাড়ি পড়ে আছে! তখন তিনি ছাড়ান্ দেন!

তাঁর কাছে শুনলুম, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অর্থাৎ মোটরে তিন-চার ঘণ্টার পথে তক্ষশিলা...... দেখবো না? এই তক্ষশিলা ছিল সূর্য্যবংশীয় ভরতের পুত্র তক্ষের রাজধানী। জন্মেজয় রাজার সর্পযজ্ঞও এইখানে

পেশোয়ার হিন্দু আমলের পুরুষপুর। সবক্তাগিন এইখানে রাজা জয়পালকে পরাস্ত করেন। তার কিছু দূরে সিন্ধুনদের ওপারে শুনলুম, প্রাচীন গান্ধার রাজ্য। মনটা চন্‌মন্ করে উঠলো! ভারতের একেবারে সীমান্তে এসে পড়েছি! প্রাচীন গৌরবের লীলাভূমিগুলি এত কাছে, হাতের নাগালে বললেই চলে! এই পঞ্জাব হলো মহাভারতের লীলাক্ষেত্র! মহাভারতের মদ্র, শিবিরাজ্য, রামায়ণের কেকয়—সব এই

ঝিলামভ্যালি রোড

হয়েছিল। তাছাড়া ঐতিহাসিক যুগের বহু প্রাচীন শিলালিপি, ইমারতের ধ্বংস-স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে! দেখার লোভ প্রবল হলেও আমরা বললুম, আমাদের লক্ষ্য এখন শ্রীনগর, সেখানে যেতে পথের উপর যা-কিছু দেখবার থাকবে, দেখে যাবো—আপাততঃ অচল পথে কোনো কিছু দেখবার থাকলেও দায়ে পড়েই সে লোভ সম্বরণ করতে হবে। ফেরবার মুখে তক্ষশিলা, পেশোয়ার প্রভৃতি দেখে যাবার বাসনা আছে।

পঞ্জাবেই। শতদ্রু আর বিপাশা (বিয়াস্) নদীর উত্তরে অবস্থিত ভূখণ্ড ছিল কেকয় রাজ্য। রাজগির কেকয় রাজ্যের রাজধানী। রাজগির এখনো বর্ত্তমান আছে; প্রাচীন সমৃদ্ধির কঙ্কালের মত। চন্দ্রভাগা (চেনাব) আর ইরাবতীর (রাভী) মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ছিল সেকালের মদ্র দেশ; আর বিতস্তার (ঝিলাম্) তীরবর্ত্তী প্রদেশ ছিল শিবিরাজ্য!

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে মোটরে চড়ে রাওয়ালপিণ্ডি দর্শনে বেরিয়ে পড়া গেল। শেঠী মহাশয় সখের সাথী হলেন;

ওখানকার নানা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রঘুনাথজীর মন্দির; বিখ্যাত টোপি পার্ক...মানুষের হাতে গড়া নয়—প্রকৃতির বুকে আপনি জেগে উঠেছে তার অপূর্ব্ব শোভা আর

রাওয়ালপিণ্ডি খুব প্রাচীন সহর নয়; তবে মস্ত ক্যাণ্টনমেণ্ট। সিটি আর ক্যাণ্টনমেণ্টের মাঝে ছোট একটি নদীর ব্যবধান—নদীটির নাম লেহ। প্রাচীন হিন্
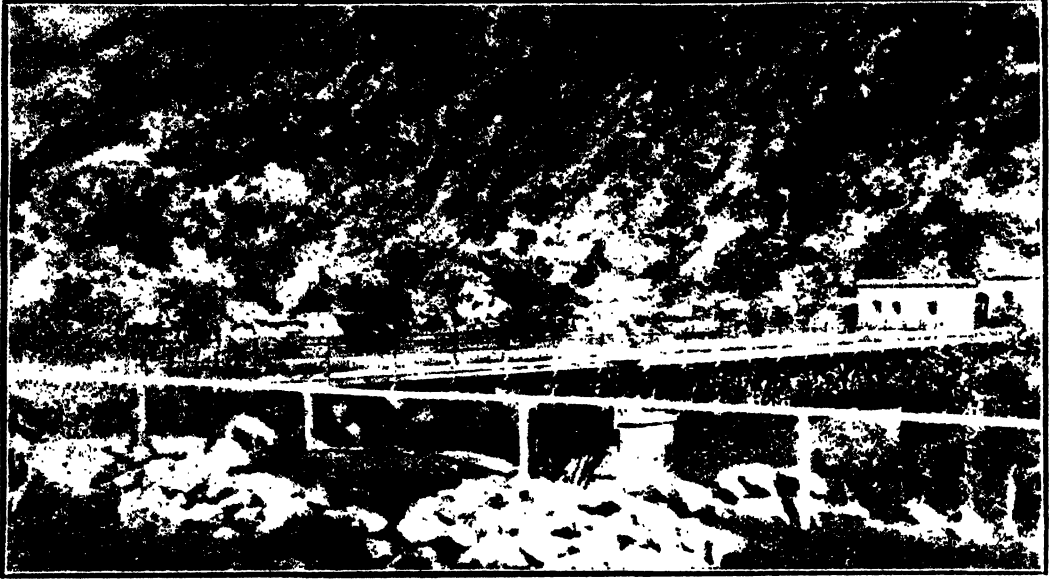
কোহালা—ঝিলামের উপর পুল।—এপারে ব্রিটিশরাজ্য, ওপারে কাশ্মীর-ষ্টেট্

ঐশ্বর্য্য নিয়ে। 'টোপি' কথাটি কোথা থেকে এলো? কেউ কেউ বলেন, টোপি স্তূপের অপভ্রংশ। হতে পারে, কারণ পার্কটি বেশ উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত।

নগর গজীপুর বা গজনীপুরের উপর এই ক্যাণ্টনমেণ্টে সৃষ্টি। গজীপুর ছিল ভটি-রাজাদের রাজধানী। মোগল আমলে রাওয়ালপিণ্ডির নাম ছিল ফতেপুর বাওরী। পরে

উরির পর—পাহাড় ধ্বসা। কুলিরা পথ সাফ করছে

শক্কর-সর্দ্দার ঝাণ্ডা খাঁ রাওয়ালপিণ্ডির পত্তন করেন। এই রাওয়ালপিণ্ডিতে কাবুলের নির্ব্বাসিত আমীর শাহ সুজা তাঁর ভাই শাহ জামানের সঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ-সর্দ্দার ছত্তর সিং ও শের সিং গুজরাট-যুদ্ধের পর ব্রিটিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। সীমান্ত-রক্ষাকল্পে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাওয়ালপিণ্ডিকে প্রকাণ্ড মিলিটারী ক্যাণ্টনমেণ্টে পরিণত করেছেন।

পাহাড় পথে জল লওয়া

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ন' মাইল দূরে মঙ্গল পাশ্। এইখানে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল জন্-নিকলসনের স্মৃতি-রক্ষার্থে একটি স্তম্ভ ও জলের ঝর্ণা তৈরী করা হয়েছে। জন নিকল্‌সন্ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অবরোধের সময় নিহত হন্।

রাওয়ালপিণ্ডির পার্কগুলি, ম্যাগি গেট, রঘুনাথজীর মন্দির, ইস্‌লামিয়া কলেজ ও হোষ্টেল, জুমা মসজিদ প্রভৃতি দেখবার জিনিষ। তাছাড়া এখানে পথ ঘাট চমৎকার—সে কথা আগেই বলেছি।

১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা আটটায় স্নানাহার সেরে আমরা রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করলুম। প্রশস্ত পথ। রেলোয়ে ব্রিজের তলা দিয়ে সোজা উত্তর-মুখে চললুম। দুধারে প্রশস্ত ক্ষেত, সামনে বহুদূরে পাহাড়ের প্রাচীর। পাঁচ-সাত মাইল আসার পর দেখি, পাহাড় আপনার শরীর এমনি বিসর্পিত করে
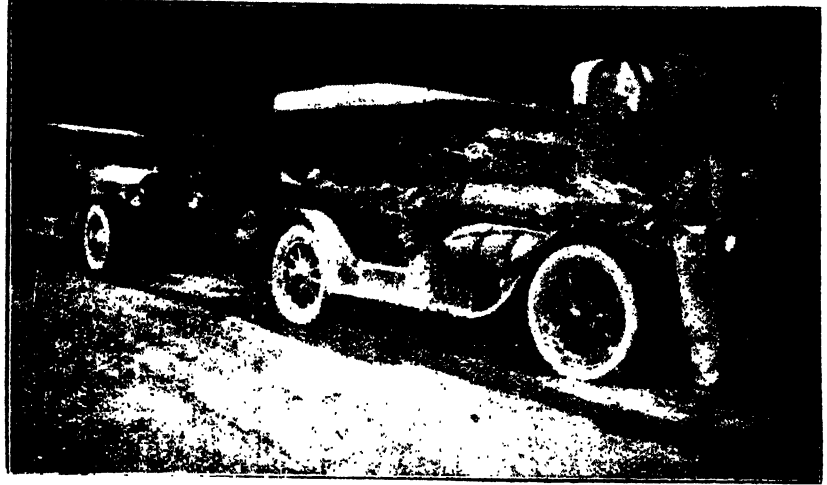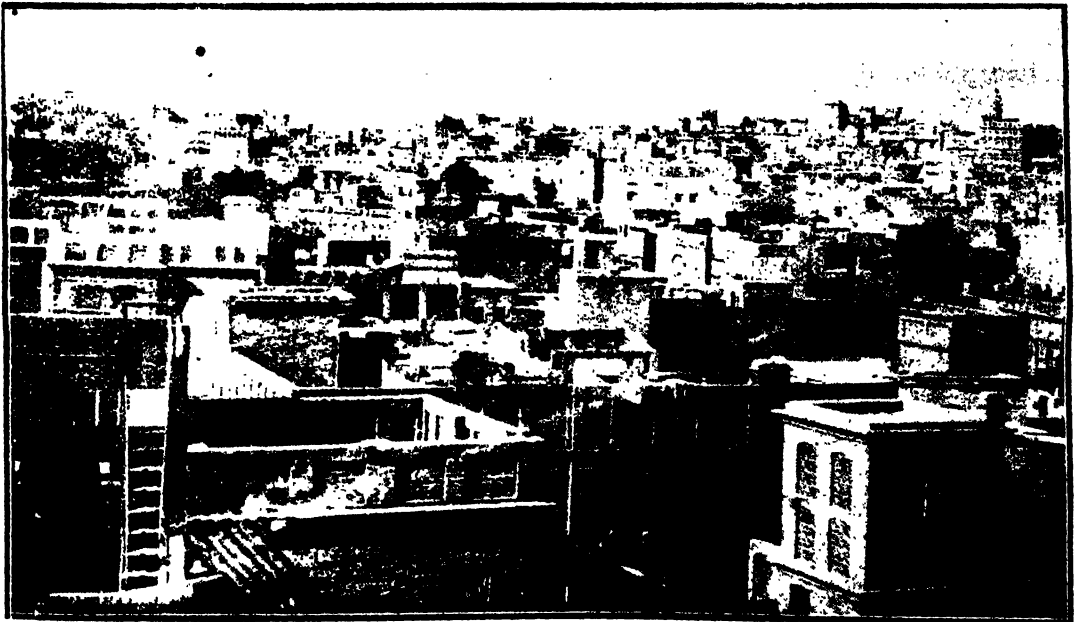
রাওয়ালপিণ্ডি সহরের দৃশ্য

পড়ে আছে যে দেখলে মনে হয়, ঐখানেই বুঝি পথের শেষ! ভারতবর্ষের সীমারেখা চেপে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দীঘল সরে-সরে যায়—যেন লোভ দেখিয়ে আমাদের নিজের কবলে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে! পাহাড়ের গায়ে
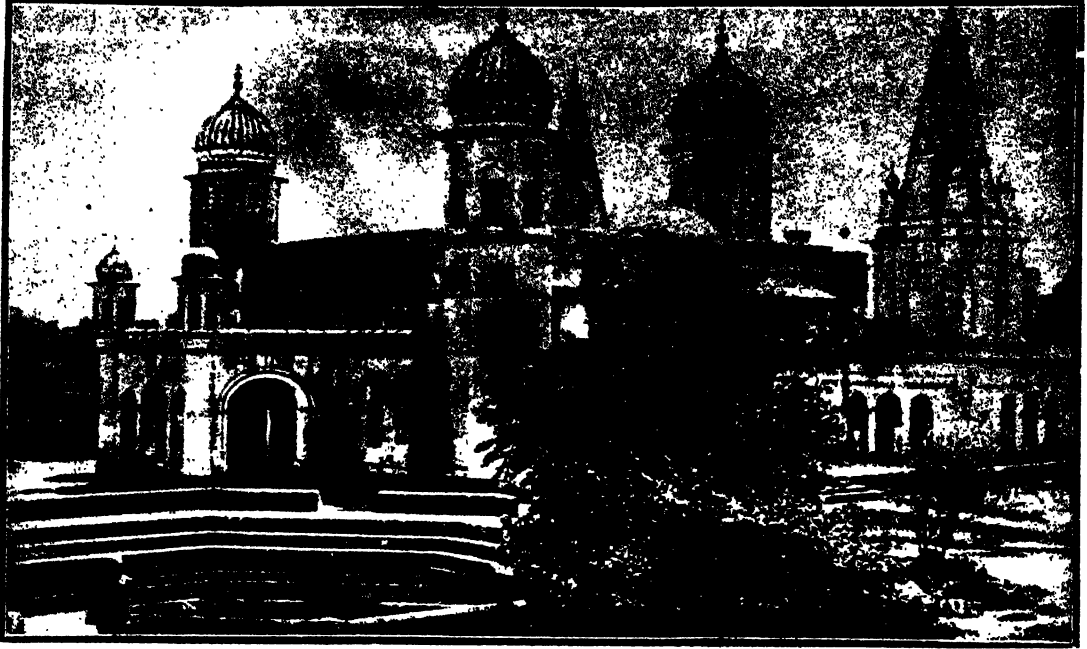
রঘুনাথজীর মন্দির—রাওয়ালপিণ্ডি

পাহাড়ের শ্রেণী। এত উঁচু, মনে হয়, ওধার থেকে এধারে অন্তরীক্ষ-পথ দিয়ে কোনো খেচরেরও বুঝি কোন কালে আসার সম্ভাবনা হবে না! গাড়ী যত এগোয়, পাহাড়ও তত পথের চিহ্নমাত্র অনুভব করা যাচ্ছিল না। আর তা যাচ্ছিল না বলে মনটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করছিল,—না জানি, কি দুর্গম পথ পাবো পাহাড় উত্তীর্ণ হতে! রাওয়ালপিণ্ডি থেকে

গড়হি ডাকবাংলা

১৩ মাইল দূরে পথ একটু চড়াই—একটু উঁচুতে যে উঠছি, তা বোঝা গেল। ১৭ মাইলে বরাকো—এখানে পথটা হুশ্‌ করে বাঁয়ে বেঁকে পড়েছে। শেষের চার মাইল গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ শ্যামল। বরাকোতে তিনখানি গাড়ীর জন্ম টোল দিতে হলো ৬॥৶০, অর্থাৎ গাড়ী-পিছু ২৶০ করে। টোল্ যাত্রীদেরই দিতে হয়। টোল-ষ্টেশনের ধারে চায়ের দোকান—গরীব সরাই-খানার মত। তার সামনে ধূলিধূসর কাষ্ঠ-ফলকে লেখা আছে—"Welcome. Tea-Shop Very clean".

গড়ি ওপারে হাতিয়ান গ্রাম

বরাকোর টোল-ষ্টেশন একেবারে পাহাড়ের বুকে। বরাকো থেকে পথ উঁচু হয়ে চলেছে,—খুবই গোড়েন—উপরে মার্বেল রাখলে গড়িয়ে পড়ে। বরাকোর ছ'
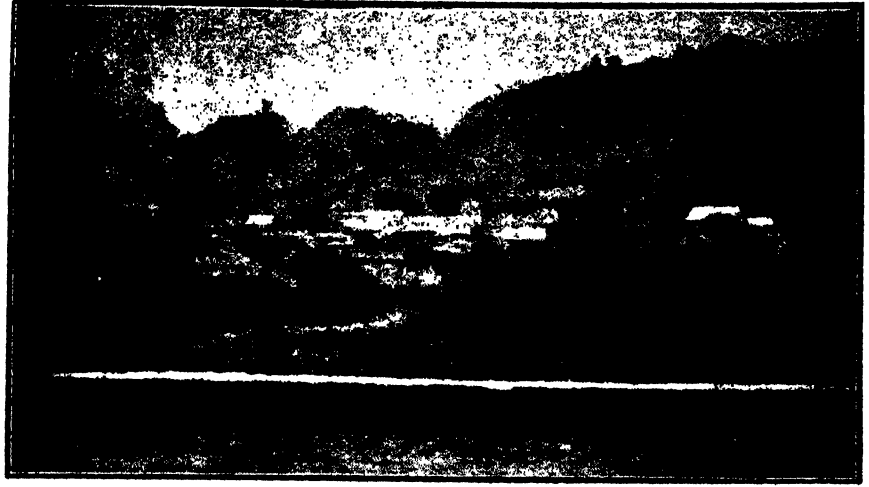
বরাকোয় বাঁয়ে বেঁকে একেবারে পাহাড়ের গায়ের উপর উঠলুম। ডাইনে উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর, তার পায়ের তলায় পথ, আর বাঁদিকে ২০০।৩০০ ফীট গভীর গহ্বর; গহ্বরের ওপারে পাহাড় আর পাহাড়···ছোট বড় মাঝারি পাহাড়—যেন নগাধিরাজের ধনী-গৃহস্থ আর গরিব প্রজার দল সপরিবারে বাস করছে! দৃশ্যে বৈচিত্র্য খুব।

উরির বাজার

মাইল পরে পাহাড়ের উপর ছত্তর গ্রাম। ছত্তরে নানা ফল-ফুলের মনোহর বাগান আছে। ছত্তরে বিশ্রাম-বাসের ব্যবস্থাও খাসা। এখান থেকে আবার চড়াই—ঠিক কোমর-বন্দের মত পথ ঘুরে ঘুরে উঠেছে। আরো চার মাইল পরে অর্থাৎ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে তেইশ মাইল দূরে একটী নদী পেলুম, নদীর নাম শৈলগা। নদীর উপর পুল আছে—নিরাপদে সে পুল পার হয়ে আবার চড়াই। দস্তুরমত উঁচু পথে উঠতে লাগলুম; ইংরাজী S হরফের মত বাঁকা পথ। গোটাচারেক বাঁক পার হয়ে চেয়ে দেখি, প্রায় চার-পাঁচ তলা উঁচু পথে উঠে পড়েছি!

এইখান থেকে পথের ধারে পাইন গাছের শ্রেণী নজরে পড়তে লাগলো। গাড়ী থামিয়ে এঞ্জিনে জল নেওয়া হলো। পাহাড়ের গা ফেটে মাঝে মাঝে ঝরণা ঝরেছে—কোথাও বা পাইপ দিয়ে ঐ ঝর্ণার জলকে সরু ধারে বহাবার চেষ্টা করা হয়েছে—লোকে যাতে এই জল সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারে! পাইপের মুখে বালতি পেতে যত-খুশী জল নাও। জল নেওয়া হলে গাড়ী চললো। পথ ক্রমে যত উঁচুতে উঠছে, বিভীষিকার মধ্যে তার গোপন সৌন্দর্য্য-মাধুরীও ততই ফুটে

বেরুচ্ছে! পথের একধার উঁচু পাহাড়ে ঘেরা—অপর দিকে চীর গাছের ঘন জঙ্গল। এই চীর গাছের নির্য্যাস থেকেই টারপিণ তেল তৈরী হয়। আমাদের এখানে যেমন তাল বা খেজুর গাছের গলার কাছটায় খানিক ছাল কেটে ভাঁড় বেঁধে তাল-খেজুরের রস সংগ্রহ করে, চীর গাছের গায়ে মাঝে মাঝে কেটে তেমনি সরু তার দিয়ে ছোট ছোট মাটীর গ্লাস বেঁধে দেছে—সেই সব গ্লাসে নির্য্যাস সংগৃহীত হয়। চীরের কি ঘন জঙ্গল, অথচ থাকে-থাকে কে যেন গাছগুলিকে সাজিয়ে পুঁতেছে! বিলাতী-ঝাউয়ের মত গাছগুলি দেখতে—পাতার গাঢ় সবুজ রঙে বাহার যা খুলেছে, চমৎকার!

অবশেষে ট্রেট্ বলে এক জায়গায় এসে পৌছুলুম। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ট্রেট সাতাশ মাইল। ট্রেটে ডাক বাংলা আছে; তার উপর বরাকোর মত চায়ের দোকান তিন-চারখানি। সামনে লেখা আছে,—Your Refreshment Room—to the left. ডাহিনেও তাই। দোকানগুলির দেওয়াল মাটীর—মানুষ-ভোর উঁচু। পাহাড়ের গায়ে লাল-নীল-হলদে হরেক রঙের ফুলের গাছ—তাছাড়া ডালিম গাছের ঝাড়। কোনো ঝাড় ডালিমের লাল ফুলে আলো হয়ে রয়েছে, আবার কোনো ঝাড়ে থোলো-থোলো ডালিম ফলেছে। বাংলার সেই মিঠে ছড়াটা মনে পড়ছিল, "ডালিম-গাছে তোতা পাখী"...কিন্তু তোতা পাখীর দর্শন মিললো না! একটু পরেই দেখি, একটা পাহাড়ের মাথা এমন উঁচু—যে সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে যায়! তিন-তলা, চারতলা পাহাড়ের বুকে বিস্তর আবাদ-ক্ষেত, লোকের বসতি! পাহাড়ের গায়ে ছাগল চরছে। প্রকাণ্ড ছাগল.. গায়ের রঙ পাঁশুটে আর কপালের উপর মস্ত বাঁকা শিং। আকারে রামছাগলের মত আর বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট! এ জায়গার নাম শুনিব্যাঙ্ক। শুনিব্যাঙ্ক হলো ৬০৫০ ফুট উঁচু—এখানে একটা মদের ভাঁটী আছে (Brewery)। শুনিব্যাঙ্কে টোল দিতে হলো ৪৲ চার টাকা। যারা ম্যরিতে যাবে, এ টোল তাদের দিতেই হবে। যারা ম্যরিতে থাকবে না, ম্যরি পেরিয়ে আরো এগিয়ে যাবে, তারা রসিদ দেখিয়ে ম্যরিতে এ টাকা ফেরত পায়। বরাকো থেকে এই যে পাহাড়ের বুকের উপরকার পথ দিয়ে চলেছি, এ পথের নাম হলো ঝিলাম-ভ্যালি রোড। এই পথ রক্ষা করার জন্যই যাত্রীদের কাছ থেকে টোল সংগ্রহ করা হয়। যেখানে টোল দিলুম, সেখানে এক কাশ্মীরী মুসলমান বসে সারেঙ্গী বাজাচ্ছিল। পাহাড়ের উপর এমন জায়গা, আর তার সেই মিঠে সুর—আমাদের একেবারে বিমুগ্ধ করে তুললে! খানিক অপেক্ষা করে তার সুর উপভোগ করে বেলা এগারোটায় শুনিব্যাঙ্ক পার হলুম। শুনিব্যাঙ্কের দেড় মাইল পরে ম্যরি। ম্যরি সব-চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর; ৭০০০ ফিট উঁচু। ম্যরি ক্যান্টনমেণ্ট মস্ত সহর—হাট, বাজার, বিলাতী দোকান, ফৌজের ছাউনি, চার্চ্চ, হোটেল, সিনেমা-হাউস,—অভাব কিছু নেই! ম্যরিতে পৌছুলুম, ঠিক বেলা দুপুরে। ম্যরি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস; তাছাড়া ফৌজের মস্ত ছাউনি। এখানে রৌদ্রের তাপ প্রচণ্ড হলেও কষ্ট হচ্ছিল না। ম্যরীতে এসে দেখি, যে-সব পাহাড় বনজঙ্গল আমাদের মাথার বহু উপরে প্রায় আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকছিল, সেগুলো আমাদের কত নীচে যে নেমে পড়েছে! চীর গাছের জঙ্গল, পাইনের শ্রেণী—আর ঘোরা-বাঁকা পথ, নীচে খাদ এত গভীর—সে যেন পৃথিবীর বুকখানা ফেটে পাতালের কোন্ বিরাট গহ্বর প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে

উরি—ডাকবাংলা

হাঁ করে পড়ে আছে! দেখলে শুধু চক্ষু স্থির নয়, মাথা অবধি ঘুরে যায়! যদি গাড়ী একটু বেসামাল হয়; ড্রাইভার যদি একটু অন্যমনস্ক হয়, তা হলে গাড়ীশুদ্ধ কোথায় কত নীচে যে গিয়ে পড়বো,—কারো হাড়-পাঁজরার চিহ্ন থাকবে না, গাড়ীসমেত গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবো! তার পর পাহাড়ও কি অমন একটা! পাহাড়ের পর পাহাড়, তার পর পাহাড়! সংখ্যা নেই! আতঙ্ক হলো এই ভেবে যে,এত পাহাড় পার হয়ে কোথায় সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর—সেখানে পৌছুনো কি আর সম্ভব হবে! অথচ পেছুবার কথা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে! এই সাত

উরি—ধ্বসা পথ

ডোমেল—অদূরে কিষণগঙ্গা নদীর তীরে বিষ্ণুমন্দির

হাজার ফিট উঁচু পাহাড় থেকে গড়ানে বাঁকা পথে নামতে হবে! গা শিউরাবার কথাই! এ পথে দুর্ঘটনাও খুবই হয়! এলাহাবাদে ললিত বাবুর কাছে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে শেঠী সাহেবের কাছে শুনেছিলুম, ড্রাইভারের গোঁয়ার্ত্তুমি বা বেহুঁসিয়ারিতে কিম্বা গাড়ীর কলকব্জা ঢিলে হয়ে কত গাড়ী কত লরি অমন কত লোকজন-মালপত্রসমেত যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার আর সংখ্যা নেই! তাছাড়া উল্টো-মুখ থেকে হু-হু হাওয়ার গতিতে মোটর আসছে! কোথায় কোন্ বাঁকের মুখে হর্ণ না দিয়েই একদম্ সাম্‌নে পড়লো—এমনও হয়। এ-পথে একটা জিনিষের দিকে হুঁশিয়ার হয়ে চল্‌লে কতক
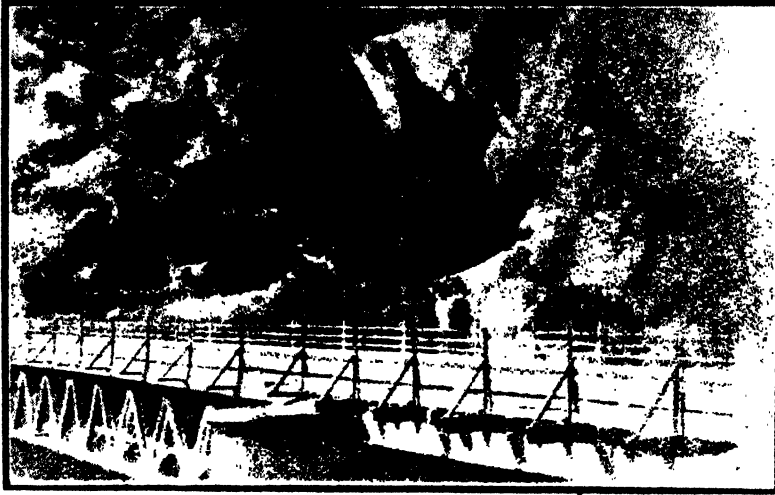
ওপিনালার উপর পুল

নিরাপদ—সামনের পথে ধুলোর ঘূর্ণীচক্র দেখলে বুঝতে হবে, আগে গাড়ী আছে। সেই বুঝে হর্ণ দিয়ে সতর্কভাবে গাড়ী চালানো চাই, না হলে বিপদের আশঙ্কা। কাজেই আতঙ্ক হওয়ায় ত্রুটি ছিল না।

ম্যরি থেকে পথ আবার নামতে সুরু হলো। সে কি নামা—বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে নেমে চলেছি তো নেমেই চলেছি! ভাগ্যে গাড়ীর নামা, তাই রক্ষা! মানুষকে এমন ছুটে নামতে হলে কখন্ হয়তো বেদম্ হয়ে উল্টে ঠিকরে পড়তো! সে পথ-নামার ভঙ্গী খুবই রোমাঞ্চকর ব্যাপার! নেমে-নেমে একটা পাহাড়ের ঝর্ণার ধারে বেলা সাড়ে বারোটায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে লুচি-তরকারী ফল-মূলে টিফিন সারা হলো। তারপর ঝর্ণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ১২-৫৫ মিনিটে আবার গাড়ী ছাড়লুম। ম্যরী থেকে দশ মাইল পরে দেওয়ালী—দেওয়ালী ২৫০০ ফিট উঁচু। ৭০০০ ফিট থেকে একেবারে ২৫০০ ফিটে নামা—যে নেমেছে, সেই জানে, আতঙ্কের সঙ্গে আমোদ এতে কতখানি! সামনে-পিছনে আশেপাশে সবুজ জঙ্গল আর পাহাড়ের দৃশ্য আগাগোড়া রমণীয়। এইখান থেকে আবার উঁচুতে ওঠা। যাকে বলে Zigzagging, এ পথে তাই। গাছের ছায়া নেই—পাহাড়ের পথ এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছে। দেওয়ালী থেকে প্রায় আট মাইল পরে ঝিলামের সঙ্গে দেখা হলো। দুধারে উঁচু পাহাড়—মাঝখানে বড় বড় শিলা-পাথরে গতি প্রতিহত হয়ে নাতিপ্রশস্ত স্রোতস্বিনী বিপুল স্রোতে নেমে নেমে চলেছে। সে-স্রোতে কাঠ ভেসে আসছে—পঞ্জাবে ঝিলাম ষ্টেশনের কাছে যেমন দেখেছিলুম। বেলা দুটোয় কোহালায় এসে পৌছুলুম। কোহালার বাঁ দিকে পাহাড়ের কাঁধে ডাকবাংলা, পোষ্ট অফিস—ডাহিনে ঝিলাম নদী সগর্জ্জনে শিলাস্তূপে তরঙ্গের আঘাত দিতে দিতে বয়ে চলেছে। কোহালা হলো ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা। কোহালায় মস্ত পুল ঝিলামের ওপারের পাহাড়কে আঁকড়ে ধরেছে—কোহালার ওপার থেকেই কাশ্মীর-রাজ্য। এখানেও টোল্ দিতে হলো। এখানে পেট্রোল পাওয়া যায়। আমরা পেট্রোল নিলুম—তার পর বেলা ২-৫৪ মিনিটে পুলের উপর উঠলুম। পুল পার হয়ে বেলা ২।৫৬ মিনিটে কাশ্মীরের হিন্দুরাজ্যে পদার্পণ করলুম। হিন্দুরাজ্য! নিমেষে প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো যেন চোখের সামনে জল্‌জ্বল্ করে উঠলো।

ঝিলাম এতক্ষণ ছিল আমাদের ডাইনে—এবার আমরা এলুম ডাইনে, ঝিলাম বাঁদিকে পড়লো। কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করবা মাত্র গাড়ীর ড্রাইভারদের নাম আর

গাড়ীর নম্বর একজন কর্ম্মচারী note করে নিলেন। এঁর আফিস-ঘরটী ঠিক পুলের প্রান্তে; পাকা ঘর। পথের ধারে লেখা আছে, Beware of Boulders. লেখা দেখেই গা ছমছমিয়ে উঠলো। এতক্ষণ যে পথ দিয়ে এলুম, সেখানে উঁচুতে ঝুলন্ত পাথর পাহাড়ের গায়ে দেখেছি বটে—কিন্তু সে পথে পথিককে সতর্ক করার জন্য কোনো লেখা ফলক দেখিনি। এখন অকস্মাৎ লেখা দেখে মনে হলো, এ পথের ঝুলন্ত পাথর তাহলে একদম্ অচঞ্চল নন্—তাঁর গড়িয়ে পড়ার অভ্যাস তাহলে রীতিমত আছে! নাহলে হুঁশিয়ার করার দরুণ এ ফলক থাকবে কেন? এ পথে

কোহালার বারো মাইল পরে ডুলাই। ডুলাইয়ে ঝিলামের দিকে পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত ডাকবাংলাখানি দেখতে যেন ছবির মত! লেডি রিপন এই বাংলায় কিছুদিন বাস করেছিলেন; তিনি এর নাম দেন Honeymoon Cottage. Honeymoon-যাপনের পক্ষে এ কটেজ—এ যেন কোন্ কল্পনায় গড়া মায়াপুরী! এখানকার পথ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী। অল্প বৃষ্টি হলে প্রায়ই পাহাড় ধ্বসে পড়ে! ডুলাই থেকে পথ ঘুরে ঘুরে গেছে—কখনো নেমে ঝিলামের জলের কাছে গিয়েছে, আবার হঠাৎ বনজঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বহু উর্দ্ধে অমন আট-দশ তলার সমান
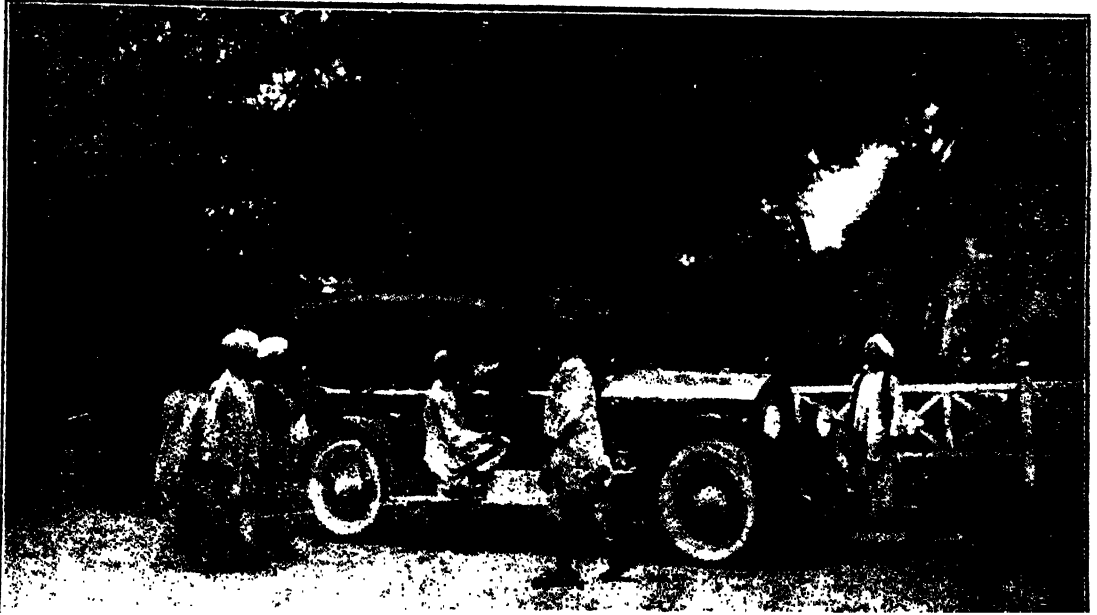
শ্রীনগরে পৌঁছানো

প্রায় পাঁচ মাইল আসার পর এক টানেল পার হলুম—তাছাড়া ছোটখাট কয়েকটি পুলও পার হতে হলো। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, মাঝখানে গভীর খাদ—এই পুল ছাড়া পার হবার উপায়ও নেই। মাঝে মাঝে দেখলুম, পুরানো পুল ভেঙ্গে পড়ে গেছে, তার কাছে নূতন পুল তৈরী হয়েছে অর্থাৎ পাহাড়ের উন্নত অবয়ব আর ঐ খাদ, গহ্বর, নদী—এ যেন প্রকৃতির খেয়ালের মতই দাঁড়িয়ে আছে। দরদ জানে না, মমতার ধার ধারে না—যখন খুশী খেলার ছলে ভেঙ্গে ধ্বসে পড়লেই হলো—তাতে মানুষ বা গাড়ী চাপা পড়ুক বা তাদের অদৃষ্টে যাই ঘটুক!

উঁচুতে উঠে গেছে! ডুলাই থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ডোমেল। ডোমেল ২১৭১ ফিট উঁচু। এখানেও ডাকবাংলা এবং পোষ্ট অফিস আছে। বেলা ৪।১৫ মিনিটে আমরা ডোমেলে পৌঁছুলুম। ডোমেলে ঝিলামের সঙ্গে কিষণগঙ্গা ও কোন্হার নদী মিশেছে; বাঁয়ে চমৎকার পুল। সেই পুল পার হয়ে বাঁদিকে যে পথ, সে পথ গেছে এ্যাবটাবাদ—সিধে পথ শ্রীনগরে গেছে। পুলের অদূরে কিষণগঙ্গা নদীর তীরে বিষ্ণু-মন্দির; তার পিছনে এক প্রাচীন শিখ-কেল্লা আছে। ডোমেলে কাষ্টম অফিস। এখানে টোল দিতে হলো—তার পরে সরকারী খাতায় আমাদের

নাম-ধাম, কোথায় যাচ্ছি, কতদিন থাকবো, সঙ্গে বন্দুক আছে কি না, কার্টরিজ আছে কত, এই সব পরিচয় লিখিয়ে, বন্দুকের লাইসেন্স দেখিয়ে পাঁচটায় আবার গাড়ী ছাড়া হলো। আঁকা-বাঁকা পথে কখনো উপরে উঠি, কখনো নীচে নামি—এইভাবে খানিক এসে এক সুন্দর ঝর্ণা দেখলুম। ঝর্ণার নাম যশকুল। বেলা পড়ে আসছিল—বেলা ৫।২০ মিনিটে পৌঁছুলুম গড়হি। গড়হির ডাকবাংলাখানি একেবারে পাহাড়ের গায়ে। পথের বাঁ দিকে ঝিলাম। ঝিলাম এখানে বেশ প্রশস্ত হয়েছে। গড়হির ওপারে পাহাড়ের ধারে হাতিয়ান্ গ্রাম; হাতিয়ান কাশ্মীর ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। ওপারে নদীর ধারে কাশ্মীরী রমণীরা এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নান করছিলেন,—অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটা, আর তাঁদের অঙ্গে ঐ দুধে-আলতার রং, বাহার যা খুলেছিল···নদীর জলে যেন কমলের মালা ভাসছে! যেমন রূপশ্রী, তেমনি দেহের গড়ন—সুডৌল, সুঠাম, নাক-মুখ-চোখ একেবারে নিখুঁত! নদীর তীরে ঘাগরা খুলে রেখে 'সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণে তাঁরা জলে নামছিলেন এমন অসঙ্কোচে যে, দেখলে অবাক্ হতে হয়! তীর-পথে লোক চলেছে—সেদিকে লক্ষ্যমাত্র নেই!

গড়হির ডাকবাংলাটি খুব প্রশস্ত—বারো-চৌদ্দটী কামরা, বহু বাথরুম—তাছাড়া য়ুরোপীয় ও কাশ্মীরী খানার বন্দোবস্ত আছে। রাত্রির মত এইখানেই আস্তানা পাতবো স্থির করে গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করলুম। হিন্দু কিচেনে কাশ্মীরী খানার ফরমাশ দেওয়া গেল। তারপর গরম জলে স্নান সেরে আহারাদি করে শয়ন করা গেল।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই কাশ্মীরী খানা ও টিফিনের ফরমাশ করলুম। আগের রাত্রে খুব বৃষ্টি বজ্রাঘাত হয়ে গেছলো। ভোর থেকেই এমন শীত পড়লো যে গরম গেঞ্জি, ফ্লানেল সার্ট, গরম কোট, ওভার কোট, এমন কি মাফলার পর্য্যন্ত বার করতে হলো। তারপর তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারবার পালা!

হিন্দু-কিচেনে খাওয়ার বন্দোবস্ত খুব ভালো। লোকজন সামনে বসে যত্ন করে খাওয়ায়। কি চাই? যত খুশী খাও! কেল্‌নার বা য়ুরোপীয় আদর্শের বাঁধা-ধরা গোণা রকম খাওয়ানো নয়। ডাল, রুটী আর মাংস—এ তিনটি রান্নাও ভারী পরিপাটি।

আহারাদি সেরে বেলা ঠিক আটটায় গড়হি ছাড়লুম। গড়হিতে একটি ঠাকুর-বাড়ী আছে; সেখানেও যাত্রীদের বাসের ও আহারের ব্যবস্থা আছে।

গড়হির একটু আগে ঝিলামের উপর ঝোলা পুল। নদীর অপর পারে একটা পুরানো দুর্গের ধ্বংস-স্তূপ পড়ে আছে। শিখদের সঙ্গে এখানে পাহাড়ীদের এক যুদ্ধ হয়েছিল সেকালে। পাথর ছুড়ে পাহাড়ীরা বহু শিখকে জখম করে।

শ্রীনগর—বাজার

গড়হি থেকে ষোল মাইল পরে চেনারি। চেনারিতে একটি বড় ঝরণা আছে। এখানে পথ বহুবার ধ্বসে ভেঙ্গে গেছে, এবং বারবার সরকারকে সে পথ সাফ করিয়ে নতুন পথ তৈরী করতে হয়েছে। পথ সর্ব্বক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য বহু কর্ম্মচারী মজুত আছে। যেখানে ভাঙ্গছে বা ধ্বসে পড়ছে, সেখানে অমনি লোক লাগছে পথ মেরামত করতে।

চেনারির আঠারো মাইল দূরে উরি। উরির দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের আর তুলনা নেই! চারিদিকে উঁচু-উঁচু পাহাড়···এর পাশ দিয়ে

ওর গা ঘেঁষে সে-সব পাহাড় ঘুরে এসে নদীর তীরে বাজারের সামনে দাঁড়ালুম। বেলা তখন দশটা। ডানদিকে বাজার; বাজারের অপরদিকে সুদৃশ্য ডাকবাংলা। এখানে সাদা কাক দেখলুম। তাছাড়া দেখি, উরিতে বহু মোটর আর লরি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মেল-ভ্যানের একজন কর্ম্মচারী আমাদের জানালেন, আগের রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড় ধ্বসে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে—প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে—তবে পথ সাফ হবে। তখন গাড়ী থেকে নেমে চারধারে বেড়ানো গেল। বাজারে ঢুকে আপেল, নাশপাতি, আখরোট, বাদাম প্রচুর কিনলুম। আখরোট দু' আনা চার আনা করে শ'।
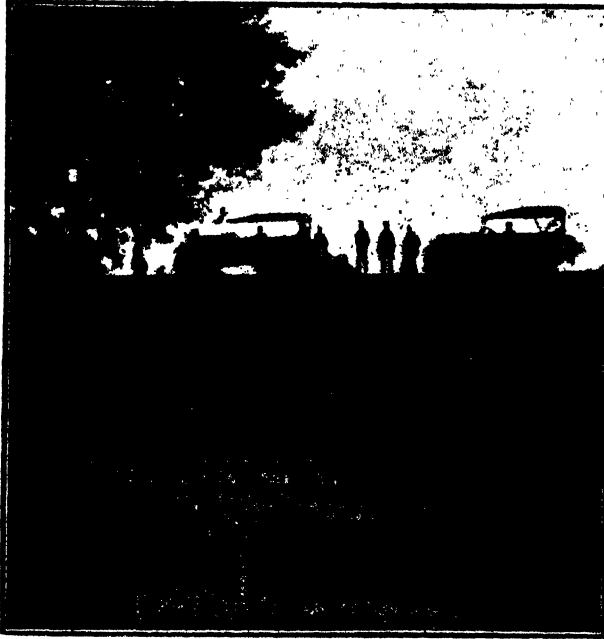
চেনার বাগ হাউস বোটে পৌছানো

খোলা এমন নরম—দু আঙুলে টিপে ধরলেই ভেঙ্গে যায়! এগুলোকে বলে কাগ্জী আখরোট, কি তার স্বাদ—তেলা গন্ধ মোটে নেই!

দেড় ঘণ্টা পরে পথ সাফ হয়েছে শুনে আবার অগ্রসর হলুম। পথ তখনো সাফ হচ্ছে। সন্তর্পণে সে জায়গা পার হয়ে আবার গাড়ীর গতির বেগ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পথ একই রকম···সেই ওঠা আর নামা, নামা আর ওঠা! উরির পর ঝিলামের শরীর আবার শীর্ণ হয়েছে। দূরে পীর-পাঞ্জাল পাহাড়ের দীর্ঘ শ্রেণী। উরি থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে পথের ধারে এক ভাঙ্গা মন্দির—মন্দিরটার নাম ব্রাঙ্কুটীর। ব্রহ্মা-কুটীর নয় তো? মন্দিরের পর থেকে পথ একটু সমতল হয়েছে। এর একটু আগেই রামপুরের ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউস। এখান থেকে শ্রীনগর অবধি ইলেকট্রিকের তার গেছে কাঠের ঢাকার মধ্য দিয়ে। এখানে একটি চমৎকার পুল পার হলুম। পুলের নীচে মস্ত ঝর্ণা বয়ে চলেছে; নাম ওপিনালা। একটি জীর্ণ মন্দির দেখলুম, ভনিয়ার মন্দির। মন্দিরের দু' মাইল আগে নৌশেরা গ্রাম। নৌশেরার তিন মাইল আগে থেকে ঝিলামের অঙ্গ আবার প্রশস্ত হয়েছে। সামনের পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমে লুপ্ত হয়ে এলো। শুধু কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয়ের একটা অংশ নাঙ্গা পর্ব্বত (২৬৯০০ ফিট উঁচু) আর হরমুখ শৃঙ্গ (১৬৯০০ ফিট উঁচু) মাথায় তুষার কিরীট পরে' দাঁড়িয়ে আছে! সূর্য্যের কিরণ শুভ্র তুষারের উপর পড়ে' তার রংটাকে কতক ঘোলাটে মেটে গোছ করে তুলেছে! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথায় কে অজস্র নুন ছড়িয়ে রেখেছে! মাঝে মাঝে কাশ্মীরী বস্তী। বস্তী পার হবার পর দুধারের পাহাড়ের কপাট যেন কে খুলে দিলে! সামনে সমতল প্রান্তর—সবুজ তৃণলতায় সমাচ্ছন্ন! শস্যের প্রাচুর্য্যের আর সীমা নেই! ক্রমে বারামুলায় পৌছুলুম। বারামুলায় বহু লোকের বাস। ঝিলামের বুকে ক'খানা হাউস-বোট দেখা গেল; তার পর ফলের বাগান। পথের দুধারে অসংখ্য বাগান···আপেল-নাশপাতির ভারে গাছের ডাল একেবারে নুয়ে পড়েছে! এমন লোভ হচ্ছিল··বাগানে ঢুকে পড়ে সেই তাজা পাকা ফল পেড়ে খাবার জন্য! ডাইনে পথের ধারে কাঠফলক, তাতে লেখা Way to Gulmarg. ডানদিকে তুষার-মণ্ডিত গুলমার্গ পর্ব্বতও দেখা গেল।

বারামুলা থেকে পথের দুধারে পপলার গাছের শ্রেণী। গাছগুলি সোজা সুপুরি গাছের মত উঠে গেছে—মাথার কাছে ঝাঁকড়া পাতার গোছা······ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি পথের দু'ধারে এই গাছ যেন সুদীর্ঘ পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পথে চেনার গাছের দেখা মিললো। গাছগুলি আমাদের বট-অশথের

মত। পাতাগুলি বড় বড়, আঙুরের পাতার মত দেখতে।

এই চেনার গাছ পারস্য থেকে আমদানি। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই গাছ কাশ্মীরে আমদানি করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লাহোরে এই গাছ পুঁতিয়েছিলেন, কিন্তু লাহোরের মাটীতে এ গাছ গজালো না! কাশ্মীরেই এই গাছের প্রাচুর্য্য, তা'ও বারামুলা থেকে! বারামুলা থেকে বাঁয়ে পথ গেছে সোপুর। সোপুর থেকে উলার হ্রদে যেতে হয়। বারামুলা থেকে প্রায় ১৭ মাইল পরে পাটন গ্রাম। পাটনে বড় বড় মাঠ চেনার গাছে ঘেরা। মাঠে তরুণী কাশ্মীরী রমণীরা ঝুড়ি হাতে কেউ কাঠি-কুটো গাছের ভাঙ্গা ডালপালা কুড়োচ্ছে, কেউ বা রৌদ্রে-দেওয়া ঘুঁটের তদ্বির করছে! পরণে রঙীন ঘাগরা আর রূপের প্রভায় দেহের গড়নে ঐ মুক্ত প্রান্তরে যেন কোন্ পরী-রাজ্যের বিচিত্র স্বপ্নকাহিনীর আভাস জাগিয়ে তুলেছে! কাশ্মীরী নারীর রূপের খ্যাতি ভুবন-জোড়া···সে খ্যাতির মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নেই! এই সব গরিব কাঠ-কুড়ুনির মেয়েরা কোনো রাজার সিংহাসনে বস্‌লে সিংহাসন তাদের রূপের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! তারা ডাগর চোখ তুলে ব্রীড়াহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে আমাদের গাড়ীর পানে মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তাদের দেখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দে মন থেকে প্রশ্ন জাগছিল,···

> কোন্ কাননের ফুল,
> তুমি কোন্ গগনের তারা!

প্রান্তর-বুকে এই রূপ সুষমা কবির চিত্রকরের কল্পনার ঝর্ণা বইয়ে দেয়!

পাটন থেকে ১৮ মাইল পরে শ্রীনগর। শ্রীনগরের সীমায় এসে দেখি,সামনে ঝিলাম, দু'ধারে পথ দুখানি হাতের মত ডাহিনে আর বাঁয়ে বিস্তারিত রয়েছে। কোন্ দিকে যাবো, প্রশ্ন করবো বলে গাড়ী থামানো হলো। অমনি দলে দলে লোক এসে ছেঁকে ধরলে। রবিবাবুর সেই কবিতা মনে পড়ছিল—লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত! লোকগুলো কত আশাই যে দিতে লাগলো—হাউসবোট দেবে, হোটেল দেবে ইত্যাদি। আমরা জানালুম, রাওয়ালপিণ্ডির এন্, ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির অফিসে আমরা যেতে চাই। একটী ছোকরা গাড়ীর ফুটবোর্ডে চট্ করে বসে পড়লো, বললে, —আমি পৌঁছে দেবো, জী হুজুর।

তাকেই গাইড করে গাড়ী ছাড়লুম।

ডান দিকে বেঁকেই শ্রীনগরের বাজার। বাজার পার হয়ে বাঁয়ে আমীরা কাদাল বা ফার্ষ্ট ব্রিজ। এই পুল পার হয়ে শ্রীনগরে প্রবেশ করলুম। পুল থেকে বাঁ দিকে নদীর গায়ে মহারাজার প্রাসাদ দেখা গেল। কাদাল অর্থে পুল। ঝিলামের উপর এই শ্রীনগরে সাতটি পুল আছে।

চেনার নালা

অচিরে এন্, ডি, রাধাকিষণের অফিসে এসে পৌঁছুলুম। পরিচয় পাবা মাত্র তাঁদের এক কর্ম্মচারী গাড়ীর সঙ্গে এসে আমাদের চেনার-বাগে নিয়ে গেলেন। চেনার বাগের মধ্যে চেনার নালা। এই চেনার নালায় আমাদের জন্য দুখানি হাউসবোট তাঁরা ঠিক করে রেখে ছিলেন। একটির নাম Cutty Shark, অপরটির নাম Vishnu Vavan, দু'খানি হাউস-বোটের সঙ্গে দুখানি কিচেন-বোট এবং

দুখানি শিকারাও আছে। শিকারা ছোট পাল্কীর মত; তবে পাল্কীর চেয়ে ছোট এবং ঢের হাল্কা। এই শিকারার অর্থ Pleasure-boat, এতে চড়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও।

একদিনের জন্যও মাথা ধরা বা কোন অস্বস্তি বোধ হয় নি। এই দীর্ঘ পনেরো দিনে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত··· সুদীর্ঘ পাড়ি—নব নব দৃশ্যে প্রাণ যে কি আনন্দ পেয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

ম্যাপ

বেলা তিনটার সময় হাউস-বোট অধিকার করলুম। ২রা সেপ্টেম্বর কলকাতা ছেড়েছিলুম—১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগর। পথে বিশ্রামের জন্য বহু সময় ব্যয় করেছি; তার দরুণ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ভোগ করতে হয়নি—কারো

তারপর শ্রীনগর······তার শোভা-সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। কাশ্মীরকে কেন যে ভূস্বর্গ বলা হয়, আর তা বলায় যে কেন অত্যুক্তি দোষ হয় না, সে পরিচয় আগামী সংখ্যার জন্য মুলতুবি রইলো।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১১]

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সমস্ত দিন নিরবসর পরিশ্রমের পর সরমা গাত্রধৌত করিয়া তাড়াতাড়ি কলঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দ্বারে দ্বারে জল-সিঞ্চন করিল। একটি মৃন্ময় দীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে আলো দেখাইয়া গৃহাঙ্গনের তুলসীমঞ্চে তাহা স্থাপন করিল; তাহার পর তিনবার শাঁখ বাজাইয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিতে বসিল।

অন্য দিন অপেক্ষা দীর্ঘ সময় প্রণামে অতিবাহিত করিয়া যুক্ত-করে উঠিয়া বসিতেই সহসা অতর্কিতে তাহার দুই

চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই নিত্য-সেবিত গৃহ-দেবতাকে সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়ার আজ শেষ দিন! কাল প্রাতে এই কল্যাণ-পূত আশ্রয়, বহু সাধের শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সরমা মনে মনে বলিল, "হে মা তুলসী, শীঘ্র যেন তোমার কৃপায় স্বামী নিয়ে আবার এ বাড়ীতে ফিরে আসতে পারি।"

অর্থোপার্জ্জনের অন্য কোনো উপায় করিতে না পারিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে রমাপদ তাহাদের বাস গৃহটি মাসিক কুড়ি টাকায় ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ আট টাকায় ভাড়া লইয়াছিল। এইরূপে অর্জ্জিত মাসিক বার টাকার দ্বারা আর কিছু না হউক একান্ত অনাহার হইতে ত' পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে! রসনার পরিতৃপ্তি না হউক, জঠরের ক্ষুধা নিবৃত্তি ত' কোনো প্রকারে হইবে!

সমস্ত দিন রমাপদ, সরমা এবং বিশুয়া, তিনজনে মিলিয়া, দ্রব্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত ছিল; অপরাহ্ণে রমাপদ বিশুয়াকে লইয়া নূতন গৃহ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কৃত করিতে গিয়াছে। পরদিন বৈকালে ভাড়াটিয়াকে এ গৃহ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

শুষ্কালস ভাবে সরমা তুলসীতলায় বসিয়া রহিল। সমস্ত দিন পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া, এখন যেন সহসা তাহার দেহ হইতে শক্তি, এবং মন হইতে উৎসাহ, নিঃশেষে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল; শুধু সামর্থ্য নহে—উঠিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যেন তাহার ছিল না।

দেহ-মনে সরমা দুর্ব্বল নহে। শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু, স্বামীর দারিদ্র্য, সংসারের দুঃখ-দৈন্য সে যেমন করিয়া বহন করিতেছিল, সতের বৎসর বয়সের অতি অল্প মেয়েই তেমন করিয়া পারে। কিন্তু চিরদিনের কার্য্যক্ষম শক্তিশালী স্নায়ু পক্ষাঘাত রোগে যেমন কোনো এক মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ নির্জ্জীব হইয়া যায়, তাহার চিরাভ্যস্ত সাহস এবং ধৈর্য্য সহসা আজ তাহাকে ঠিক সেইরূপে পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। যে সংসারের সুখ-দুঃখের সহিত সে এত দিন হাসিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে, যাহার বক্ষঃমাঝে আশ্রয়-নীড় বাঁধিয়া সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিয়াছে, সহসা আজ ম্লানায়মান সন্ধ্যার কুহকজালের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার একান্ত নিরাশ্রয়নীয়তা উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল স্তব্ধ উদাস গৃহের এই পরিপূর্ণ সঙ্গিহীনতা যেন আসন্ন ভবিষ্যতের অশুভ ছায়াপাত, তাহার নির্ভরহীন নিরবলম্ব জীবনের অভিসূচনা। অন্ধকারে মানুষে যেমন দুই হাতে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায় সরমা সেইরূপ ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে সহায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না—এমন কি তাহার স্বামীকে পর্য্যন্ত নহে! তখন অধীর ভাবে সে নিজের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থা সম্বরণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসিবার জন্য যতই ব্যগ্র হইয়া উঠে ততই ডুবিতে থাকে, বিলীয়মান শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে গিয়া সে তেমনি ততই শক্তি হারাইতে লাগিল।

সদর দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া সরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। অবচ্ছিন্ন বহির্জ্জগতের এইটুকু মাত্র সাড়া পাইয়া সে তাহার অপহৃত শক্তি অনেকটা ফিরিয়া পাইল। তাড়াতাড়ি একটা হাত-লণ্ঠন জ্বালিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও, সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

চাপা গলায় বাহিরে উত্তর হইল, "সে।"

সরমা দ্বার খুলিয়া দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

রমাপদ প্রবেশ করিয়া অর্গল লাগাইয়া দিল; তাহার পর বারাণ্ডায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীর বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি? ভয় করছিল না কি সরমা?"

"করছিল।"

"ভূতের?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "না; ভবিষ্যতের।" তাহার পর স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হস্তের মধ্যে তাহার দুই হস্ত গ্রহণ করিয়া উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমাদের সংসার ঠিক চলবে বলে তোমার মনে হয়?"

এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া রমাপদ বলিল, "হঠাৎ, এ কথা তোমার কেন মনে হল বল ত?"

রমাপদর হস্তদ্বয়ে মৃদু চাপ দিয়া সরমা বলিল, "তাই জিজ্ঞাসা করছি! বল না, চলবে?"

এ বিষয়ে রমাপদই এ পর্য্যন্ত সরমার নিকট হইতে যাহ

কিছু আশা এবং আশ্বাস পাইয়া আসিয়াছে—আজ সহসা সরমাকে এরূপ দুর্ব্বল দেখিয়া সে তাহার শীর্ণ সাহসকে তাড়না দিয়া বলিল, "চলবে না ত' কি হবে? নিশ্চয়ই চলবে।" তাহার পর সরমার স্কন্ধে বাম হস্ত স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, "তাছাড়া চালাবার তোমার যা অদ্ভুত শক্তি আছে, না চলে ত' উপায় নেই!"

ঈষৎ আবেগের সহিত মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "না, মা, আমার একটুও শক্তি নেই! তা' যদি থাকত তা হ'লে আমি কখনই তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ী যেতে দিতাম না!"

"তা দিচ্ছই বা কেন? এ বাড়ী ছেড়ে যেতে তোমার এতই যদি কষ্ট হয়, তা হলে না হয়——"

রমাপদর অসমাপ্ত বাক্য অনুসরণ করিয়া সরমা বলিল, "তা হলে না হয়,—কি?"

"তা হলে না হয় যাওয়া বন্ধ করে দিই।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সরমা বলিল, "না, তা' হয় না। তা'হলে থাওয়াও বন্ধ করে দিতে হয়!"

কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও এত বেশী সত্য যে রমাপদর মুখ দিয়া কোনও উত্তর বাহির হইল না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সরমাই মৌন-ভঙ্গ করিল; বলিল, "আচ্ছা, আবার কত দিনে এ বাড়ীতে ফিরে আসা যাবে বলে মনে হয়?"

এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর রমাপদ অতি সহজে দিল; বলিল, "বছরখানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ বাড়ীতেই যে ফিরে আসতে হবে তার কি মানে আছে সরো? এ বাড়ী ভাড়ায় রেখে আমার এর চেয়ে ভাল বাড়ীতেও ত যেতে পারি।"

সরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা হবে না। এই বাড়ীতেই ফিরে আসতে হবে; প্রথম যে দিন আসবার মত অবস্থা হবে সেই দিনই!"

সরমার এই অত্যধিক আগ্রহে ও পক্ষপাতিতায় বিস্মিত হইয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, তা না হয় এসো। কিন্তু এ বাড়ীতে ফিরে আসবার জন্যে তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

রমাপদর প্রশ্নে সরমার মুখ পাংশু হইয়া গেল। একবার মনে করিল কিছু বলিবে না; কিন্তু যে কথা তাহার কণ্ঠদেশে আটকাইয়া শ্বাসরোধ করিতেছিল, তাহা না বলিয়াও থাকিতে পারিল না; চকিত নেত্রে রমাপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল, "তুমি এরি মধ্যে ভুলে গিয়েছ? এ বাড়ী ছেড়ে যেতে মা যে আমাকে মানা করে গিয়েছেন!"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "এ বাড়ী ছেড়ে যেতে ত' মানা করেন নি;—আমাকে ছেড়ে যেতে মানা করেছেন।"

রমাপদর ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলী দিয়া দুইবার ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া সরমা বলিল, "ও-সব যা' তা' কথা মুখে আনতে নেই! বাড়ী ছেড়ে যেতেও মানা করেছিলেন।" তাহার পর সহসা তাহার দুই চক্ষু কৌতুক-হাস্যের মৃদু-প্রভায় চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল; বলিল, "এক দিন অবশ্য তোমাকে ছেড়ে যাব। কিন্তু সে কবে জান?"

পরিহাস-ছলে সরমা যে-কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাপদ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া বলিল, "খবরদার! ও-সব যা' তা' কথা মুখে আনবে ত—"

রমাপদ একটা কঠিন দিব্য দিল।

বিমূঢ় ভাবে এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অপ্রসন্ন মুখে সরমা বলিল, "দেখ দেখি কি অন্যায়! কথাটা বলতে পর্য্যন্ত দিলে না, ফট্ করে একটা দিব্যি দিয়ে দিলে!" তাহার পর ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল, "আমি ত' আর সত্যি-সত্যিই সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম না—আমি বলতে যাচ্ছিলাম অন্য কথা। আমি বরং বলতে যাচ্ছিলাম যে প্রাণ থাকতে তোমাকে ছেড়ে যাব না!"

সরমার নিরুপায় বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া রমাপদ মনে-মনে অতিশয় পুলকিত হইয়া প্রকাশ্যে গম্ভীরমুখে বলিল, "এখন আর ও-সব কৈফিয়ৎ দিলে কি হবে? এক দিন ছেড়ে যাবে সে কথা স্পষ্ট করে বলেছ ত!"

"কখ্‌খনো আমি সে কথা বলিনি!" বলিয়া সরমা কপট ক্রোধের সহিত প্রস্থান করিল।

রাত্রে গৃহকর্ম্মান্তে সরমা তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—রমাপদ শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। নিকটে আসিয়া তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমিয়েছ না কি?"

রমাপদ পাশ ফিরিয়া বলিল, "না, কেন?"

"একটু ছাদে যাবে? ভারী চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে!"

"চল যাই। আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।"

রমাপদ সত্যই সে কথা ভাবিতেছিল; কিন্তু ছাদে যাওয়ার কথা সে যত না ভাবিতেছিল, ছাদে না যাওয়ার কথা বোধ হয় ততোধিক ভাবিতেছিল। জ্যোৎস্না রাতে অবকাশকালে স্বামীর সহিত ছাদে বসিয়া জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া সরমা অপরিমিত আনন্দ এবং তৃপ্তি পাইত। পশ্চিম দিকের আলিসার নিকট হইতে অদূর প্রবাহিত জাহ্নবীর কিয়দংশ দেখা যায়,—সরমা যখনই ছাদে যাইত সেই স্থানটি অধিকার করিয়া বসিত। আজ তাহার সেই অতিপ্রিয় স্থানটিতে উপস্থিত হইয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে সে যাহা পাইবে তাহার কথা মনে করিয়া রমাপদ নিজের আগ্রহ সত্ত্বেও, ছাদে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছিল। কিন্তু সরমা নিজে যখন সে বিষয়ে অনুরোধ করিল তখন অগত্যা বলিতেই হইল, 'চল যাই।'

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি শুভ্র জ্যোৎস্নার তরল ধারায় স্নান করিতেছিল। রমাপদ এবং সরমা ছাদে আসিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাশাপাশি উপবেশন করিল। অদূরে নববর্ষার অর্দ্ধস্ফীত নদী স্বপ্নরাজ্যে অপরিস্ফুট দৃশ্যের মত বহিয়া চলিয়াছিল; সরমা গ্রীবা বাঁকাইয়া একবার মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। বহুক্ষণ উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া রহিল, কিন্তু কেহও কোনো কথা কহিল না। উভয়েই মনে করিতেছিল একটা কিছু কথা আরম্ভ করিলে ভাল হয়, কিন্তু সাহস হইতেছিল না; পাছে বাক্য-সংযোগে পরস্পরের অন্তরের নিগূঢ় বেদনা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়ে! উভয়েই নিজ নিজ মানসিক অবস্থা উভয়ের নিকট হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। দুঃখ স্বীকারের মধ্যেও বোধ হয় একটা স্বতন্ত্র দুঃখ এবং গ্লানি আছে।

পাশের বাড়ীর বাগানে একঝাড় হেনা ফুটিয়াছিল। তাহার গুরু গন্ধ অলস-মন্থর বায়ুতে ঘনীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ক্রমশঃ মধ্য-গগন হইতে চন্দ্র পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িল। রজনীর গভীরতায় চতুর্দ্দিক থম্ থম্ করিতে লাগিল।

সরমার দিকে চাহিয়া রমাপদ মৃদুস্বরে বলিল, "এবার যাবে?"

শিথিল নিস্তেজ মনকে কতকটা সম্বৃত করিয়া লইয়া কম্পিতকণ্ঠে সরমা বলিল, "চল।"

নীচে নামিয়া আসিয়াও উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। শয্যা গ্রহণ করিয়া উভয়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে জাগিয়া রহিল। প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিতেছিল যে অপরে জাগিয়া আছে, কিন্তু তথাপি কেহও কাহারো সহিত কথা বলিতে পারিল না। মিশন স্কুলের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ঘন-ঘন ঘণ্টা এবং অর্দ্ধঘণ্টা বাজিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ে যখন ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল তখন প্রভাত হইতে মাত্র ঘণ্টা দু-এক বিলম্ব ছিল।

[১২]

ঘুম ভাঙ্গিয়া রমাপদ চাহিয়া দেখিল দীপ্ত সূর্য্যকরে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বিমূঢ়ভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; তাহার পর পর-মুহূর্ত্তে যখন মনে পড়িল যে বেলা নয়টার মধ্যে নূতন গৃহে যাত্রা করিতে হইবে, তখন সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমা তখন কোমরে আঁচল জড়াইয়া সবেগে বাকি কার্য্য সমাধা করিতেছিল। তাহার শান্ত-অচপল মুখমণ্ডলে পূর্ব্বরাত্রের বিহ্বলতার আর কোনো চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। রমাপদকে দেখিয়া সরমার মুখে-চক্ষে স্বাভাবিক মিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

"ঘুম ভাঙ্গল?"

"তা' ত ভাঙ্গল। কিন্তু তুমি ত' দেখছি সমস্ত রাতই জেগে ছিলে!"

মৃদুহাস্যের সহিত সরমা বলিল, "আর তুমি?"

"আমি ত, দেখতেই পাচ্ছ, এত বেলা পর্য্যন্ত দিব্যি ঘুমিয়ে উঠলাম।"

সরমার শান্তমুখে সুমিষ্ট হাল্কা হাস্য ফুটিয়া উঠিল। "তবে কি করে দেখ্‌লে যে আমি সমস্ত রাত জেগেছিলাম?"

পত্নীর বাক্‌চাতুর্য্যে পরাজিত হইয়া রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা বটে!" তাহার পর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সবই ত' দেখছি গুছিয়ে ফেলেছ। বাকি আর কিছু আছে না কি?"

সরমা সহাস্যমুখে বলিল, "বাকি শুধু তুমি আছ।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রমাপদ বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, আমাকেও একটা বাক্স পেঁটরার মধ্যে ভরে নিতে চাও না কি?"

স্বামীর আশঙ্কার অভিনবত্বে পুলকিত হইয়া সরমা খিল্

খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "সে ভয় যদি থাকে তা হলে শীঘ্র নিজে তয়ের হয়ে নাও।"

"তুমি যে রকম বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করেছ, সে ভয় যথেষ্ট আছে।" বলিয়া রমাপদ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

স্কুলের ঘড়ীতে আটটা বাজিয়া গেল।

সরমা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, "বিশ্বনাথ! অ, বিশ্বনাথ!"

বিশুয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "কি মায়জী?"

"এই কলসীটা ভাল করে ধুয়ে গঙ্গা থেকে এক কলসী জল এনে মাঝের ঘরে মধ্যি-খানে রাখ; আর একটা ভাল দেখে আমের ডাল তাতে দিয়ে দাও। বুঝলে?"

"হাঁ মায়জী, বুঝলে।" বলিয়া সরমা-প্রদত্ত মৃন্ময় ঘট লইয়া বিশুয়া প্রস্থান করিল।

যথা সময়ে স্বামীর সহিত ঘট প্রণাম করিয়া সরমা গাড়ীতে গিয়া উঠিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা রুদ্ধশ্বাস ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল—বহু যত্নেও সে তাহা রোধ করিতে পারিল না।

নূতন গৃহে আসিয়া সরমা চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিতরে দুইটি ছোট পাকা ঘর এবং বাহিরে একটি খাপরার বৈঠকখানা; তাহা ছাড়া রান্না ভাঁড়ার স্বতন্ত্র। ইহাই বাড়ী।

রমাপদ বলিল, "কেমন? পছন্দ হল?"

সরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, হয়েছে। তুমি বলেছিলে কষ্ট হবে; কিছু কষ্ট হবে না!"

রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "কষ্টর মানে যদি সুখ হয় তা হলে অবশ্য কষ্ট হবে না।"

সরমা রমাপদর প্রতি সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "না, সত্যিই কোনো কষ্ট হবে না। এর চেয়ে বেশী আমাদের দরকার কি?"

সরমার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "কিন্তু এর চেয়ে আর কমও যেন আমাদের দরকার না হয়!"

সরমা বলিল, "ভগবান করুন তা যেন না হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ইচ্ছা করলে আমরা আরো-কিছু কমাতে পারি!"

"কি করে? তোমার খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে?"

সরমা হাসিয়া বলিল, "না, না, তা' কেন? চাকর ছাড়িয়ে দিয়ে। ললিতবাবুরা ত' একজন চাকর খুঁজছেন—আসছে মাস থেকে বিশুয়াকে ললিতবাবুদের বাড়ীতে রাখিয়ে দাও না।"

রমাপদ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "তা' মন্দ নয়। একেবারে বেকার বসে দুবেলা অন্ন ধ্বংস করছি—তবু একটু খেটে খাওয়া যাবে!"

বিস্মিত স্বরে সরমা বলিল, "তুমি খাটবে? কেন, কোন্ দুঃখে?"

"তবে কে খাট্‌বে? তুমি?"

"নিশ্চয়ই!"

"বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা,—এ সব করবে তুমি?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, সব করব। এ সব কাজ যত কঠিন মনে কর তত কঠিন নয়!"

রমাপদ বলিল, "আচ্ছা, কঠিন না হয় না-ই হ'ল; কিন্তু তিন চার মাস পরে যখন বাধ্য হয়ে তোমার কাজ করা বন্ধ করতে হবে, তখন কি হবে?"

সরমার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; সে নতনেত্রে মৃদু-স্বরে বলিল, "তখন ত' বিশুয়ার বউ আসবে ঠিক হয়ে আছে।"

"কিন্তু বিশুয়ার বউ ত' তোমাকে দেখবে,—আর—আর—" রমাপদর মুখ কৌতুক-হাস্যে ভাস্বর হইয়া উঠিল। সরমার কাণের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল, "—আর তোমার খোকাকে নেবে!"

নিমেষের জন্য স্বামীর প্রতি আরক্ত মুখ তুলিয়া সরমা মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি ভারী দুষ্টু!"

রমাপদ সরমার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "তোমার খোকা বললে যদি তোমার এতই আপত্তি হয় তা হলে না হয় এবার থেকে আমার খোকা বলব! তা হলে ত' আর আমাকে দুষ্টু বলবে না?"

এবার সরমা কোনো কথা বলিল না, একবার মাত্র রমাপদর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নতনেত্রে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। সন্তান সম্ভবের এই অনাবৃত আলোচনায় সলজ্জ-হর্ষের সুমিষ্ট ধারায় তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল! স্বামী-কণ্ঠনিঃসৃত খোকা শব্দের অননুভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার সহিত ভ্রূণ স্পন্দন মিলিত হইয়া আসন্ন মাতৃত্বের কল্পনা-প্রভায় তাহার আরক্ত-নত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অভিনব দৃশ্য ঃ—

রাত্রিকালে ঘাসের এবং অন্যান্য নানা লতাপাতা ইত্যাদির উপর শিশির পড়ে—এ কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এই সকল শিশির-বিন্দু লতাপাতা ইত্যাদির উপর পড়িয়া কি মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি করে, বেন্‌ট্‌লি নামক এক ভদ্রলোক ক্যামেরার সাহায্যে বিবিধ দ্রব্যাদির এবং লতাপাতার উপর শিশির-বিন্দুর সৃষ্ট কতকগুলি চমৎকার দ্রব্যের ছবি তুলিয়াছেন। ছবিগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন দৃশ্যগুলি কি চমৎকার!
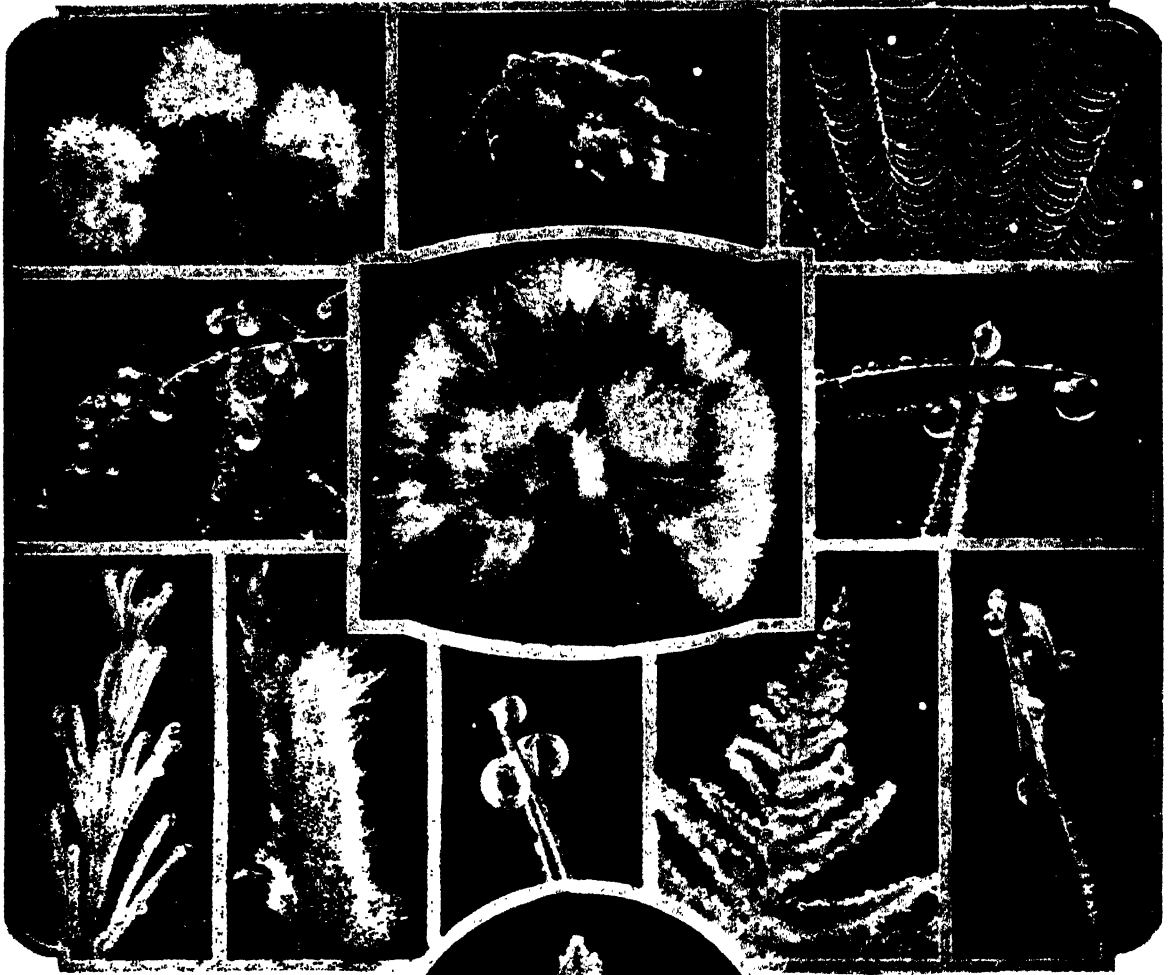
তাহা আমরা অনেকেই জানি না। ঘাসের উপর শিশির-বিন্দু ঝলমল করে—দেখিতে ঠিক যেন মুক্তা! কিন্তু অনুবীক্ষণের ভিতর দিয়া এই সকল শিশির-বিন্দু যে কি চমৎকার দেখিতে হয়, তাহা যে না দেখিয়াছে, সে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

বিজ্ঞান বলে যে লতাপাতার শীতল ডগার স্পর্শে বায়ুস্থ বাষ্প জল-বিন্দু হইয়া যায়—অনেক ক্ষেত্রে গাছ পাতার ভিতরের জলই পাতার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পাতার ডগায় বিন্দু আকারে অবস্থান করে। দারুণ গ্রীষ্মে এই প্রকারে ঘর্ম্ম বাহির হইয়া

অভিনব দৃশ্য

আসিয়া গাছপালাকে বাঁচায়। রাত্রিকালে যখন আর বেশী জলের দরকার হয় না, তখন গাছপালার ভিতরের জল বাহির হইয়া আসে এবং রোদ উঠিলে বাষ্পাকারে আকাশে মিশিয়া যায়।

অনেক দেশের লোকের বিশ্বাস যে শিশির-বিন্দুর দ্বারা সকাল বেলায় মুখ ধৌত করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। অনেক দেশে শিশির প্রচুর পরিমাণে পড়ে এবং কেবল মুখ ধোওয়া কেন—তাহা দিয়া ইচ্ছা করিলে স্নানও করা যায়।

কুকুর-গোয়েন্দা ঃ—

বালিন সহরে একবার এক বাড়ীতে একটি নিহত স্ত্রীলোকের লাস পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটি নিহত হইবার পূর্ব্বে ঘরের মধ্যে যে ধস্তা-ধস্তি হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট চিহ্ন ছিল—কিন্তু খুনিকে ধরা যায়, এমন কোন চিহ্ন

সেখানে ছিল না। এই প্রকার রহস্যময় ব্যাপারে পুলিসের পাকা গোয়েন্দার সাহায্য দরকার; কিন্তু বালিন পুলিস এইরূপ অনেক স্থানে মানুষ গোয়েন্দার সাহায্য না লইয়া কুকুর গোয়েন্দার সাহায্য লইয়া থাকে। বালিন পুলিসের প্রায় ১৩০টি শিক্ষিত কুকুর গোয়েন্দা আছে। আলোচ্য ঘটনায় এই গোয়েন্দাদলের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কুকুর হেক্‌সিকে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে সে লাস এবং তাহার বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিল, তাহার পর তাহার সামনে দশজন সন্দেহ-ধৃত ব্যক্তিকে দাঁড় করান হইল। হেক্‌সি এক একজন করিয়া যখন অষ্টম ব্যক্তির কাছে আসিল, তখন সে অষ্টম ব্যক্তিকে ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পর তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া উঠিয়া কামড় দিবার উপক্রম করিল—অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখা হইল।

কুকুর-গোয়েন্দা

সেই অষ্টম ব্যক্তি তাহার অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

এই গোয়েন্দা কুকুরেরা এই প্রকারে অনেক রহস্য খোলসা করিয়া দেয়। একবার আর একটি কুকুর বহু রাস্তা অতিক্রম করিয়া, কতকগুলি বাড়ীর ছাত টপকাইয়া অবশেষে অপরাধীকে ধরাইয়া দেয়।

শিশুকাল হইতেই তাহাদিগকে এই সকল কার্য্য শিক্ষাদান আরম্ভ করা হয়। শিক্ষা দিবার সময় চাবুক ব্যবহার বা ধমকানো একেবারেই হয় না। অতি মিষ্ট ব্যবহার এবং মিষ্ট কথার দ্বারা কুকুরদের চোর এবং অন্যান্য অপরাধী ধরিতে পারগ করিয়া তোলা হয়। গোয়েন্দা কুকুরদিগকে গাছে চড়া, সাঁতার দেওয়া, দেওয়াল লঙ্ঘন করা ইত্যাদি নানা প্রকার বিদ্যা শিখান হয়। এই কুকুরদের প্রত্যহ চারঘণ্টা করিয়া, পল্টনদের মত, প্যারেড অর্থাৎ কুচ্-কাওয়াজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বয়ং-ক্রিয় সিঁড়ি ঃ—

চলন্ত গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া প্রায়ই অনেক দুর্ঘটনা হয়। গাড়ীর দুয়ার হইতে রাস্তা অনেকখানি নীচে বলিয়াই এই দুর্ঘটনা বেশী হয়। আমেরিকার শিকাগো সহরে এক প্রকার নতুন ধরণের সিঁড়ি অনেক গাড়ীতে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সিঁড়ি গাড়ীর নীচে লুকান থাকে—গাড়ীর দুয়ারে পা-পোষের মত একটি ইস্পাতের পাত পাতা

স্বয়ং-ক্রিয় সিঁড়ি

আছে। দুয়ার দিয়া বাহির হইবার সময় এই পাতে পায়ের চাপ পড়িবামাত্র সিঁড়িখানি বাহির হইয়া আসে—এই সিঁড়িতে পা দিয়া নির্ভয়ে রাস্তায় নামা যায়। ইস্পাতের পাতের উপর হইতে পায়ের চাপ সরিয়া যাইবামাত্র সিঁড়িটি আবার দুয়ারের তলায় চলিয়া যায়।

অদ্ভুত উপস্থিত-বুদ্ধি ঃ—

ডিক্ রিয়ান্ নামক একজন বিখ্যাত মোটর দৌড়ানেওয়ালা একবার মোটর রেস দিবার সময়, হঠাৎ তার মোটরে আগুন ধরিয়া যায়। রাস্তার পাশেই একটি হ্রদ ছিল, ডিক্ রাস্তার রেলিং ভাঙ্গিয়া মোটর-

অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি

খানাকে সেই হ্রদের মধ্যে চালাইয়া দিল—এবং মোটর জলে পড়িবামাত্র সে সামান্য একটু আঁচড় খাইয়া মোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বুদ্ধি করিয়া এই ভাবে জলে না পড়িতে পারিলে ডিক্ আগুনের হাত হইতে রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ।

ক্ষুদ্রতম হরিণ ঃ—

সিংহলে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রকায় হরিণ পাওয়া গিয়াছে। এই হরিণগুলি দেখিতে ছুঁচার মতন তবে ছুঁচা অপেক্ষা কিছু বড়। ইহারা

ক্ষুদ্রতম হরিণ

বড় হরিণের মত দেখিতে সুন্দর নয়। ইহাদের পা দেখিলে মনে হয় যেন সরু সরু কাঠি কোনো রকমে দেহের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিংহলে এই অদ্ভুত হরিণের নাম "গোটোন" অর্থাৎ

ছুঁচা হরিণ। ছবিতে যে দুটি হরিণ দেখা যাইতেছে—কয়েক মাস পূর্ব্বে সিংহল হইতে উহাদের বোষ্টন সহরে আনয়ন করা হইয়াছে। উহাদের তিনটি পথে মারা যায়।

কাচনির্ম্মিত নৃত্যশালা ঃ—

ফ্রান্স দেশের এক সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহরে একটি কাচ-নির্ম্মিত নৃত্যশালা আছে। ইহার আশেপাশে বা উপরে কোথাও বাতি নাই—

কাচনির্ম্মিত নৃত্যশালা

নৃত্যকারে যতটুকু আলোর দরকার, তাহা কাচের মেঝের নীচে হইতে আসে। কাচের মেঝের নীচে বৈদ্যুতিক আলো বসান আছে। যখন নৃত্য চলিতে থাকে, তখন দূর হইতে তাহার দৃশ্য বড় সুন্দর হয়। ছবি দেখিলে নৃত্যের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিদ্যালয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা ঃ—

বিলাতের এক শিশু-বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য বৈকালে বিশ্রাম করিবার চমৎকার এক ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ের পাঠ এবং ক্রীড়া ইত্যাদির পর শিশুরা খুব ক্লান্ত হয়—তখন তাহাদের বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন। স্কুল-ঘরের বেঞ্চিগুলিকে এই সময় উল্টাইয়া দেওয়া হয়—এবং বেঞ্চির চার পায়ায় ৪টি হুকের সাহায্যে জাহাজের নাবিকদের মতন দোলা বিছানা (hammock) টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার বিশ্রামলাভের ফলে দেখা গিয়াছে যে শিশু ছাত্রদের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়। লেখা এবং পড়া—দুইই তাহারা মনোযোগ দিয়া করিতে পারে।

বিদ্যালয়ের বিশ্রাম-ব্যবস্থা

র‍্যাডিও-সাহায্যে ছবি তোলা ঃ—

বর্ত্তমান যুগে "র‍্যাডিওর" সাহায্যে জগতে নানা প্রকার অসাধ্য সাধন হইতেছে। বেতারের সাহায্যে পাঁচ-হাজার মাইল দূরে সংবাদের আদান-প্রদান প্রায় সহজসাধ্য হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুকালের মধ্যেই ইহা টেলিগ্রাফের মত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান সময়ে র‍্যাডিওর সাহায্যে দূর হইতে ফটো তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা সামান্য পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে। G. L Baird নামক একজন স্কচ বৈজ্ঞানিক এই পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি একটা ঘর হইতে সামান্য দূরে অন্য একটি ঘরে একটি মুখের "motions" অর্থাৎ "নড়ন চড়ন"এর ছবি প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। র‍্যাডিওর সাহায্যেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। র‍্যাডিও-প্রেরিত ছবিটির সহিত আসল বা মূল মুখচ্ছবির একেবারেই কোন প্রকার মিল নাই। র‍্যাডিও-ছবিখানি একটি কঙ্কালের মুখ বলিয়া মনে হয়। চোখ দুইটির এবং মুখের স্থানে কাল কাল চিহ্ন আছে—তাহাতে ছবিটিকে কোন কিছুর

র‍্যাডিও-সাহায্যে ছবি তোলা

মুখের ছবি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইতি-

পূর্ব্বে আর কেহ চলন্ত কোন দ্রব্যের এমন বদ্ ছবিও তুলিতে সমর্থ হন নাই।

র‍্যাডিও-প্রেরিত এই ছবিখানি দেখিলে হাসি পায়। কিন্তু যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায় যে, আর কোন বৈজ্ঞানিক এই কার্য্যে এতখানি সাফল্য লাভ করেন নাই—এবং এই প্রণালীতে কার্য্য হইতে হইতে অবশেষে র‍্যাডিও-প্রেরিত ছবি মূল ছবির একেবারে হুবহু অনুকৃতি হইবে—তখন আশ্চর্য্য না হইয়া পারা যায় না। এই বৈজ্ঞানিক television অর্থাৎ বহুদূর হইতে কেমন করিয়া একজন লোক আর একজনের মুখ দেখিতে পাইবে, তাহারও চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য এই কার্য্যে এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই। র‍্যাডিও-প্রেরিত ছবিখানি এতৎসহ মুদ্রিত হইল—ইহা দেখিলে কৃতকার্য্যতার সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সাময়িকী

'ভারতবর্ষ' আজ চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিল। বিগত ত্রয়োদশ বৎসর যাঁহার কৃপায় 'ভারতবর্ষ' বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করিতেছি। তাহার পর, 'ভারতবর্ষে'র যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই অমর সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের নাম পরম শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণ করিতেছি। এই ত্রয়োদশ বৎসর যে সমস্ত লেখক-লেখিকার অনুগ্রহ ও সহানুভূতিতে 'ভারতবর্ষ' তাহার উদ্দেশ্য সাধনে অবহিত হইতে পারিতেছে, যে সকল পাঠক-পাঠিকা আমাদিগকে উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। 'ভারতবর্ষে'র সেবায় আমরা যত্ন চেষ্টা-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে কোন দিন ত্রুটী করি নাই; বর্ত্তমান বৎসরেও আমরা যাহাতে আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিতে পারি, তাহার জন্য ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

নববর্ষের এই প্রথম সংখ্যায় যাঁহার প্রতিকৃতি 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট সুশোভিত করিল, তাঁহার নাম পৃথিবী-বিখ্যাত, তাঁহার অবদান ভারতবর্ষের কেন, সমস্ত পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ্। বাঙ্গালা দেশ ধন্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তেজস্বী, মনস্বী পুরুষকে এই দেশেরই একজন, এই বঙ্গ-জননীর একজন সুসন্তান বলিয়া জগতের সম্মুখে গর্ব্ব করিতে পারে। আজ দেশের দুর্দ্দিনে যদি স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অগণিত শিষ্যগণ যে ত্যাগের, যে সেবার আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহাতে সেই পুরুষ-প্রধানের নাম চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আজ আমরা সেই অনন্ত-প্রতিভার আধার, কর্ম্মযোগী, নর-নারায়ণের শ্রেষ্ঠ সেবকের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া সেই মহাত্মার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেবার ইউরোপ-ভ্রমণ সময়ে অকস্মাৎ অসুস্থ হওয়ায় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি অসমাপ্ত রাখিয়াই ইটালী পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইটালীর পণ্ডিতবর্গ ও কবির অকৃত্রিম বন্ধুগণের যে ইহাতে আশা-ভঙ্গ হইয়াছিল, কবিবর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। তাই, কয়েকদিন হইল তিনি পুনরায় ইটালীতে গমন করিয়াছেন। বিশ্বদূত সংবাদ দিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ইটালীতে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত হইতেছেন; নানা-স্থানের অধিবাসিগণ সাগ্রহে তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বিশ্ব-ভারতীর দরবারে আমাদের রবীন্দ্রনাথের এই সমাদর দেখিয়া আমরা পুলকিত হইতেছি; আর ভাবিতেছি, কি আগ্রহ এই বৃদ্ধের! কি একাগ্রতা এই মহাপুরুষকে অনুপ্রাণিত করিতেছে! যে বাঙ্গালী পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই স্থবির হইয়া স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই বাঙ্গালীই একজন বিশ্বের দরবারে তাঁহার বাণী শুনাইবার জন্য অধীর হইয়া, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে নির্ভয়ে গমনাগমন করিতেছেন। বাঙ্গালী কি এ আদর্শ অনুসরণ করিবে না?

হিন্দু মুসলমানের অভিনয় এখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মফস্বলে চলিতেছে। অভিনয়টা কিন্তু এক তরফা হইতেছে; মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুর মন্দিরাদি ও মূর্ত্তির অবমাননা করিতেছে, আর হিন্দুরা সেই সংবাদ দেশ বিদেশের খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। সরকার বাহাদুর বলিতেছেন, খবরের কাগজওয়ালারা তিলকে তাল করিয়া মনান্তর আরও বাড়াইতেছে। যা সামান্য কিছু হইতেছে, তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি না করিয়া, একটু সহিয়া গেলেই দুদিনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এ উপদেশ অমূল্য; ইহা সুশীল ও সুবোধ বালকের মত প্রতিপালন করাই নাবালক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

কলিকাতা সহরে দাঙ্গা মিটিয়াছে বটে, কিন্তু হাঙ্গামা মিটে নাই। সে হাঙ্গামাও বড় সহজ নহে। ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, এখন রহিলেন শুধু ঢাক। এই ঢাকের বাদ্য লইয়াই গোল বাধিয়াছে। মুসলমান বলিতেছেন, মসজিদের সম্মুখ দিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা হিন্দু করিতে পারিবে না, তাহারা কখনও এমন কুকর্ম্ম করেও নাই; এখন কুচক্রীদিগের পরামর্শে মসজিদের পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিবার জন্য হিন্দুরা মসজিদের সম্মুখ দিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা চালাইবার জিদ্ ধরিয়াছে; মুসলমানের জান কবুল, তাহারা কখনও ঢাক বাজাইতে দিবে না। এই ভয়ে জড়সড় হইয়া কলিকাতার পুলিশ সেদিন শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরীর বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা পূর্ব্বে ছাড়-প্রাপ্ত পথে যাইতে দিতে অস্বীকার করেন; হিন্দুরাও, সেই পথেই শোভাযাত্রা না যাইতে দিলে মাকে বিসর্জ্জনই দিবেন না বলিয়া ঘরের দেবীকে আবার বাহির হইতে ঘরে তুলিয়াছেন। সরকার বলিতেছেন, বেশ ত, দেবী আর কয়েকদিন সেবাই পান না, মুসলমানের ঈদ চুকিয়া যাক্, তাহার পর দেবীর বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করা যাইবে। একটু ক্ষমা-বেন্না (give and take) না করলে কি চলে? তথাস্তু!

এ ত গেল রাজ রাজেশ্বরীর কথা। দারজিলিং হইতে শ্রীল শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুর এক রোবকারী জারী করিয়া কলিকাতার রাজপথে হিন্দুর শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। লাটসাহেব বলিয়াছেন, চিৎপুর রোডের সু-প্রসিদ্ধ নাখোদা মসজিদের সম্মুখ দিয়া কোন সময়েই কোন শোভাযাত্রা বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে না; আর আর যে-সব মসজিদ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ সময়ে উপাসনা হয়, তাহা স্থির করিয়া জানিয়া সেই-সেই সময়ে বাজনা বন্ধ করিয়া শোভাযাত্রা চালাইতে হইবে। এই আদেশে হিন্দুরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; তাঁহারা বলেন, আগাগোড়া বাজনা বাজাইয়া তাঁহারা আবহমানকাল রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন, কোথাও বাজনা বন্ধ করেন নাই; সুতরাং এ আদেশে তাঁহাদের অধিকার লোপ হইল। এ কথার কোন অর্থই নাই। যারা এতদিন দয়া করিয়া অধিকার বহাল রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই দয়া করিয়া সে অধিকার বন্ধ করিলেন। ভিক্ষুকের আবার অধিকারের দাবী!!

আমরা বলি, এই যে বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা, বলিতে গেলে, এক রকম বন্ধই হইল, ইহাতে ভালই হইল। কলিকাতার অলিতে-গলিতে মসজিদ, আর পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ আছেই। সুতরাং বাজনা বন্ধই হইল। বড়লোক হিন্দুর কথা বলিতেছি না, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের গৃহিণীরা আর বড়-মানুষের দেখাদেখি ছেলের বিয়েতে গোরার বাজনা, রহমতুল্লার ব্যাণ্ড, ব্যাগ-পাইপ, ঢাক-ঢোল, সানাই, রোশনচৌকীর বাহানা ধরিতে পারিবেন না, কারণ বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা যে এক রকম বন্ধই হইল। সুতরাং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের একটা বড় খরচ কমিয়া গেল। এজন্য তাঁহারা সদাশয় মুসলমান-নেতৃবৃন্দ তথা গবর্ণমেণ্টের বহুত খোসনামী করিতে বাধ্য। তবে একটা কথা আছে। এই যে সব মুসলমান বাজনাদার বিবাহ, বিসর্জ্জন প্রভৃতির শোভা-যাত্রায় বাজনা বাজাইয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহাদের উপায় কি হইবে? বোধ হয় করিম রহিমের দল সে ব্যবস্থাও করিবেন; সরকারকে বলিয়া এই সকল বেকার ভদ্রলোককে কলিকাতা পুলিশের পাহারাওয়ালা অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিবেন; কারণ, অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে কলিকাতায় মুসলমান পাহারা-ওয়ালার সংখ্যা অতি কম থাকাতেই বিগত দুই দফা দাঙ্গা ঘটিতে পারিয়াছিল। অধিক সংখ্যক মুসলমানের নিয়োগে সে আশঙ্কা দূর হইবে। আর এই সকল বেকার বাণ্ড ও ব্যাগ-পাইপওয়ালাদের মধ্যে যাঁহারা কোন রকমে উর্দ্দু বা ইংরাজীতে (বাঙ্গালা অক্ষরে নহে) নাম সহি করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মুন্সেফ্, ডেপুটী, সবডেপুটী, সব্ রেজিষ্ট্রার, কাউন্সিল ও মিউনিসিপালের সদস্য পদে বাহাল করিলেই বেকার সমস্যাও মিটিয়া যাইবে এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি হিন্দু-মুসলম নে গোলযোগও শেষ হইয়া যাইবে। কারণ যাহা লইয়া গোলযোগ, তাহারই যে মীমাংসার পথ আমরা দেখাইয়া দিলাম!

৺কেদারনাথ মজুমদার

ময়মনসিংহের গৌরব, বাঙ্গালা-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, আজীবন সাহিত্য-চর্চ্চা-নিরত, 'সৌরভ' পত্রের সম্পাদক, বহু গ্রন্থ-লেখক কেদারনাথ মজুমদার আর ইহজগতে নাই। এই সেদিনও কলিকাতার রাজপথে কেদারের সঙ্গে দেখা হইল; কেদার বলিলেন "দাদা, বাড়ী চলিলাম।" তখন ত বুঝি নাই, কেদারনাথ নিত্যধামে যাইবার কথা বলিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পরই ময়মনসিংহে যাইয়া কেদারনাথ আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। কেদারনাথের মৃত্যুতে আমরা ভ্রাতৃ-বিয়োগ-শোক পাইলাম—এ শোকের সান্ত্বনা নাই।

বর্ষ-বোধন

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

যে রূপ দেখায়েছিলে বৈশাখে সুন্দর,
রক্তিম মদির-রশ্মি নিদাঘ অরুণে ;
ছায়াঘন আম্রবন-কুঞ্জে মনোহর,
ঝঙ্কারি বিহগ গীতি সুকণ্ঠ তরুণে !
হে বর্ষ ! বিগত সেই অসীম উল্লাস,
সন্ধ্যার আরতি সম দেবতা দেউলে !
গেল যে শিশির অন্তে মুগ্ধ মধুমাস,
রাঙাইয়া যাত্রাপথ অশোকের ফুলে !
আন সে সুখের দিন সৌর-করোজ্জ্বল,
গ্রহ-তারাময়ী নিশি চন্দ্রমাশালিনী ;
হেমান্ত মঞ্জরী বুকে মধুভরা ফল,
নলিনীর মৃদুহাসি-চঞ্চলা দামিনী!
অনন্ত সৌন্দর্য্যে তব বিশ্বের বিকাশ,
ভূতলে পাতালে স্বর্গে জ্যোতিঃ পরকাশ!

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত রসরচনা 'কৌতুক-যৌতুক' মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নূতন নাটক 'শ্রীকৃষ্ণ' মূল্য—১৷৹

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত 'দীপালীর বাজী' মূল্য—১৷৹

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত নাটক 'লছমী' মূল্য—১৲

রায় নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বাহাদুর প্রণীত "স্মৃতিপথে" বা বঙ্গের নব জাতীয়তার অর্দ্ধ শতাব্দী মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ অনূদিত মাইকেল্ মধুসূদনের ক্যাপটীভ্ লেডীর বঙ্গানুবাদ মূল্য—৷৹

শ্রীযুক্ত নীলকমল সেন প্রণীত 'পুণ্যপ্রেম' মূল্য—১৷৹

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত হাওড়া হুগলীর ইতিহাস ১ম খণ্ড মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা প্রণীত রাজার জাতি, বা কায়স্থ জাতির ইতিহাস মূল্য—২৷৹

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে —রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু Bharatvarsha Halftone & Printing Works
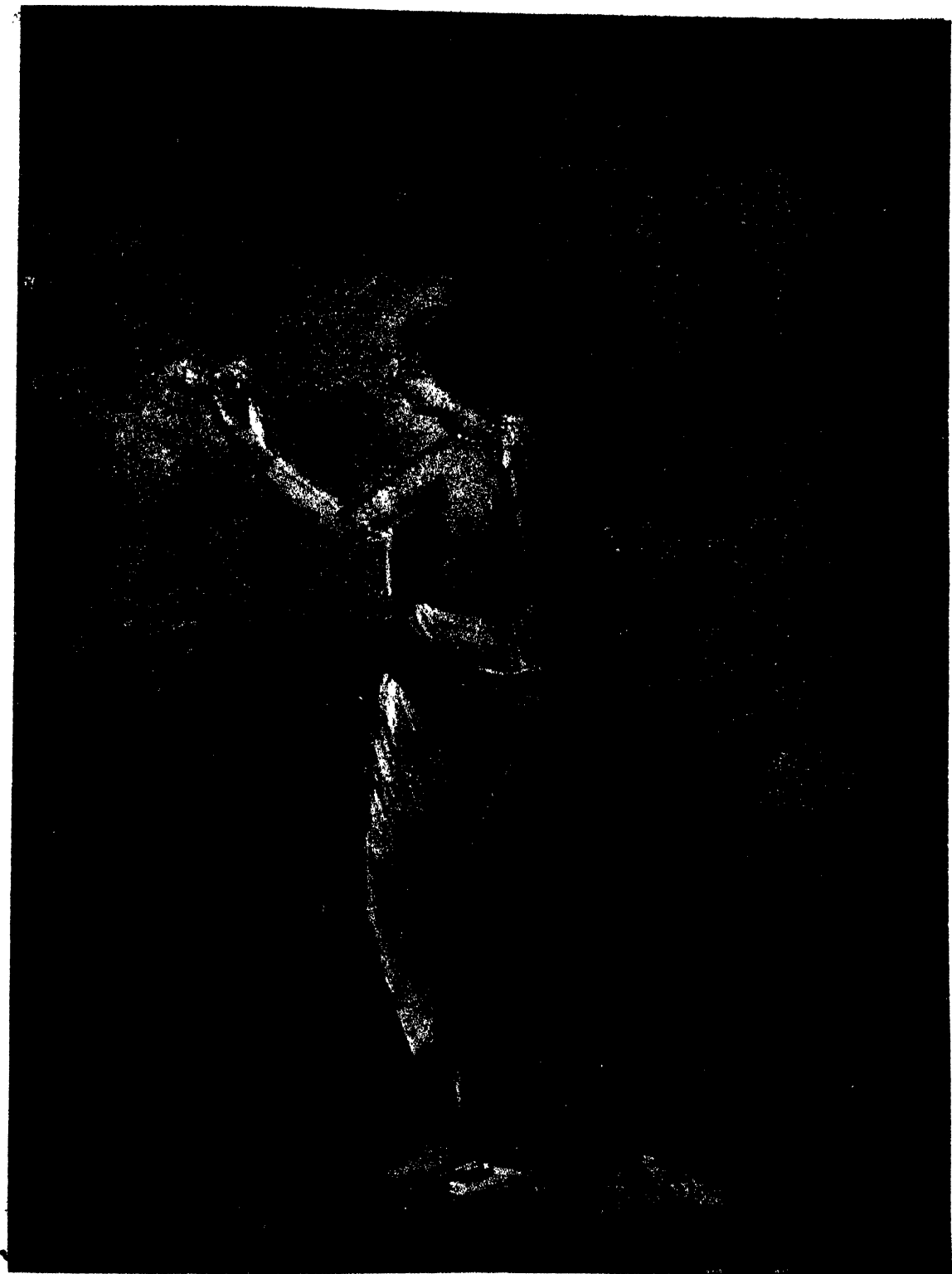
শ্রাবণ, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

দেশবন্ধুর ব্রত

(বৎসরান্তে স্মৃতি-তর্পণ)

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

বিরাট মনের বিরাট সৃষ্টি—বিরাট জীবনের বিরাট অনুষ্ঠান-মাত্রই অজর ও অমর। তাহা রূপে, রসে, ভাবে, গৌরবে প্রাণশক্তিতে ও সৃজনীশক্তিতে বহুধা বিতত হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। বস্তু-জগতে তাহা অনেক সময় ধরিত্রীর ভূষণের রূপ ধারণ করে—কিন্তু মনোজগৎকে তাহা ভাঙিয়া গড়ে। ঐ বিরাট অনুষ্ঠানের যতটুকু আকারে, গঠনে, গুরুত্বে, ও শ্রীসৌষ্ঠবে প্রকট—জনসাধারণ জ্ঞাতসারে ততটুকু বুঝে, ঢের বেশী তারা অজ্ঞাতসারে পায়। কবি, শিল্পী, রসিক ও ভাবুকগণ তাহার রসময় ও ভাবময় স্বরূপটী পান। কিন্তু তাহাতেও উহার সার্থকতার পরিমাণবোধ নিঃশেষিত হয় না। দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ দেখেন তাহার প্রাণশক্তি, সৃজনীশক্তি বহু শাখায় প্রবাহিত হইয়া দেশে ও কালে—দূর ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় জীবনকে কিরূপে ভাঙিয়া গড়িতেছে—দেশের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি ও সমাজদেহের নাড়ী-ধাতুকে কিরূপে বিবর্ত্তিত করিতেছে।

মোগল ভারতের বিরাট অনুষ্ঠান,—প্রেমিক সম্রাটের বিরাট উৎসর্গ মর্ম্মর-রূপ ধরিয়া তাজমহলের সৃষ্টি করিয়াছে। তিন শতাব্দী ধরিয়া উহা ধরার রম্য ভূষণ স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। উহাতে পর্য্যটক, পরিব্রাজক, প্রেমিক, রসিক ও শিল্পী স্ব-স্ব আদর্শের চরিতার্থতা দেখিয়া আনন্দ পান। কিন্তু উহাতেই উহার সার্থকতা পরিচ্ছিন্ন নয়। তাহার রসরূপ, স্বপ্নরূপ কবির লেখনীকে, চিত্রকরের তুলিকাকে ও ভাস্করের ছেদনীকে যুগে যুগে নব নব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে প্রণোদিত করিতেছে। শিল্পীর মনে ভাবময় আদর্শরূপে বিরাজ করিয়া তাহাকে শুধু দ্রষ্টা মাত্র নহে, স্রষ্টাও করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতেও বিরাট অনুষ্ঠানের বিরাটত্ব পরিমেয় হইয়া উঠিল না।

সম্রাট-কবি এই তাজমহল গঠনের জন্য যে দূরদূরান্ত, দেশদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র শিল্পীকে একত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক একজন ধীমান্ বা বিট্পাল ছিলেন না। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর অধীনে অসংখ্য কারুকর আদেশ পালন করিত। ফলে এই বহু-বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানটি কেবলমাত্র তাজমহল সৃষ্টি করে নাই, সহস্র সহস্র শিল্পীকেও সৃষ্টি করিয়া দেশে দেশে প্রেরণ করিয়া শিল্পজগতে একটা যুগান্তর আনিয়াছে। তাজমহল একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়,—মোগলযুগের নালন্দা।

এইরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় চিত্তরঞ্জনের বৈচিত্র্যময় কর্ম্মঘন, রসনিবিড়, ভাবসংহত বিরাট জীবন। ইহা বাঙালীর চিত্তকে ভাঙিয়া গড়িয়াছে। এক দিন চিত্তরঞ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙিতে গিয়াছিলেন,—ভাঙা হয় নাই,—ভালই হইয়াছে ; কারণ তাহাতে মন্দের সঙ্গে অনেক ভালও বিধ্বস্ত হইত। চাপ-বলে তিনি যাহা করিতে পারিতেন, তপোবলে তাহা হইতে ঢের বেশী করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-রূপ বিদ্যাপীঠের ছাত্র হইতে হইলে ঐ নিম্নতর বিদ্যাপীঠও চাই। তাঁহার জীবন-বিদ্যালয়, আমাদের শিক্ষার যাহা কিছু অসংস্কৃত, অমার্জ্জিত, বিকৃত, শূদ্রভাবাপন্ন,—হীন ও বিজাতীয়—সে সমস্তকে পরিশুদ্ধ, মার্জ্জিত, পবিত্র ও আমাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। উভয় শিক্ষায়তন পরিপূরক-পরিপূর্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই আজ মনে হয় চিত্তে বাণীর আসনপদ্ম বিকাশের জন্য দেশবন্ধুর জীবন-সূর্য্যের কিরণ চাই—নতুবা মনোমৃণাল কেবল মরালের পদভারেই ন্যুব্জ হইয়া নীরতলেই মগ্ন রহিবে। সমগ্র বিনিয়োগ না জানিলে শরভারাক্রান্ত তূণ কেবল মেরুদণ্ডকে ন্যুব্জই করিবে। এই বিনিয়োগ বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র চিত্তরঞ্জনের জীবন-বিদ্যালয়। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" মেধা, বিদ্যাবুদ্ধি, বহুশ্রুত ও প্রবচনে লাভ কি, যদি আত্মশক্তি লাভই না ঘটে? আত্মা ত "বলহীনেন লভ্যঃ" নয়। চিত্তরঞ্জনের জীবন এই আত্মশক্তি লাভের ব্রহ্ম-বিদ্যাশ্রম। জাতীয় শিক্ষায়তন তিনি গড়িয়া যাইতে পারেন নাই—এ কথা স্থূল-দর্শীরাই বলিবে। বিজ্ঞেরা জানেন তাঁহার জীবনই সেই শিক্ষায়তন। তাঁহার জীবনের ব্রতটিকে বিশ্লেষণ করিলেই এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন ত্যাগী, দানবীর। কিন্তু তাঁহার উৎসর্গে এমনি একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, এ বিষয়ে কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা চলে না। তাঁহার উৎসর্গ-ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা লক্ষ্য করি :—

(১) তাঁহার যশোলোভ ছিল না, অপযশকেও তিনি ভয় করিতেন না। তাঁহার অধিকাংশ দানই গোপনে সম্পাদিত।

(২) পিতৃঋণ-ভার-ন্যুব্জ-স্কন্ধে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন—তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার সমস্তই তাঁহার স্বোপার্জ্জিত।

(৩) এই আকণ্ঠ ভোগমগ্নতার যুগে তিনি সৌভাগ্যের সমস্ত লোভনাস্বাদন লাভ করিয়াও সর্ব্বস্ব বর্জ্জন করেন।

(৪) ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা তাঁহার দান-ধর্ম্মের প্রকৃতিকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করে নাই।

(৫) দানে তিনি বে-হিসাবী ছিলেন, টাকা গুণিয়া দান করিতেন না—দানের হিসাব রাখিতেন না—নিঃসম্বল হইয়াও দান করিতেন—ঋণ করিয়াও দান করিতেন। দানে মাত্রাজ্ঞান, পৌর্ব্বাপর্য্যবোধ বা যোগ্যাযোগ্য বিচার কিছুই ছিল না।

(৬) প্রার্থীর প্রার্থনার আংশিক পূরণ করিয়াই তুষ্ট হইতেন না।

(৭) জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে দান করিতেন।

(৮) বিনাসর্ত্তে বিনা বাধ্যবাধতায় দান করিতেন—গ্রহীতা কোনরূপে লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ না করে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

(৯) উদারতার দ্বারা চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে ও সৎপ্রবৃত্তি উদ্বোধনের আশায় অতিবড় পাষণ্ডকেও আশ্রয় দান করিতেন।

(১০) সন্তানগণকে সমগ্র ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। সন্তানবৎসল পিতার পক্ষে ইহা নির্ম্ম আত্মোৎসর্গ।

(১১) দান করিতে পাইলেই আনন্দ অনুভব করিতেন—দানান্তে স্বর্গীয়ানন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়া জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া যাইত।

(১২) কোন দৈবী-শক্তির প্রত্যাদেশে বা কোন

দৈবীশক্তি-সম্পন্ন নরদেবতার অনিবার্য্য প্রভাবেই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন নাই।

(১৩) দানের জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার দাবী ছিল না—অকৃতজ্ঞতার জন্য কখনো আক্ষেপ করেন নাই—কে কি সাহায্য পাইয়াছে তাহা তাঁহার মনেও থাকিত না।

অর্থাৎ তিনি নিঃসম্বল হইয়া ঋণ করিয়াও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, বিনা সর্ত্তে, বিনা চুক্তিতে, বিনা যুক্তিতে, প্রতিদান, কৃতজ্ঞতা, যশ বা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা না করিয়া, প্রাণপ্রিয় সন্তানকে ও পরিজনগণকে বঞ্চিত করিয়া, সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত ধন নির্ব্বিচারে, প্রফুল্ল চিত্তে, লীলাচ্ছলে দান করিয়াছেন। স্বেচ্ছাশোধ্য পিতৃঋণ পরিশোধে মহৎ জীবনের আরম্ভ, বিশ্বের ঋণ পরিশোধ করিতেই যেন তাঁহার জীবন। তাঁহার দান ও উৎসর্গ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিল না—দৈবীশক্তি বা গুরুমন্ত্রের প্রত্যাদেশে তাঁহার ত্যাগলিপ্সা জন্মে নাই। উদার প্রেমে মুক্তহস্তে তিনি আনন্দের সহিত বিত্তের বিনিময় করিয়া গিয়াছেন।

কেবল করুণায় বিগলিত হইয়াই তিনি দান করেন নাই। দয়ালু, প্রার্থীকে দান করেন বটে, কিন্তু নিজেকেও একেবারে বঞ্চিত করেন না। অপরের দুঃখ নিবৃত্তি অপেক্ষা আপনার অন্তরের কারুণ্যগত বেদনা-নিবৃত্তির দিকেই তাঁহাদের অধিকতর দৃষ্টি থাকে। সেই বেদনার গাঢ়তার অনুপাতে দানেরও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। দয়ালু হৃদয়ের সংসারযাত্রায় ইহা অবশ্য-করণীয় ব্যয়—মায়ামুগ্ধ মহাপুরুষের ইহা বিধিনির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড। দুঃখরাজের চরণে রাজভক্ত প্রজা এ রাজস্ব দিতে বাধ্য। এ দানের অন্তরালে অর্থের প্রতি মমতার অভাব নাই।

চিত্তরঞ্জন পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যও দান করেন নাই। যাঁহারা পুণ্যলোভে দান করেন, তাঁহাদের ত্যাগও এক প্রকারের ভোগ—তবে এ ভোগ দেহের নয়,—আত্মার; এর পুরস্কার শুষ্ক যশ নয়,—সরস পুণ্য। নিস্পৃহ চিত্তরঞ্জনের পুণ্যফলেও লোভ ছিল না। প্রকৃত বৈষ্ণবের মতই তিনি বলিতে পারিতেন—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ" কিছুই আমি চাহি না—আমি চাই "পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন।" চিত্তরঞ্জনের দানের লক্ষ্মী ছিল করুণা—কিন্তু তাঁহার দানসত্রের অন্নপূর্ণা ছিল অর্থে নিস্পৃহতা। দেশবন্ধুর এই অর্থে নিস্পৃহতা—আত্মপ্রসাদ, স্বর্গীয় সুখ-লালসা বা পুণ্যপিপাসা হইতেও উচ্চতর সাধনান্তরের প্রেরণা—করুণা হইতেও গরীয়সী। ভক্তমালের সনাতন,—"যে ধনে ধনী হইয়া মণিরেও মণি গণনা করেন নাই", তাহারি খানিক তিনি পাইয়াছিলেন। ইহা সেই তপোলভ্য নিষ্কামতারই অভিব্যক্তি, যে নিষ্কামতার সঙ্গে শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময়, মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছিলেন,—"জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।" চিত্তরঞ্জন তাঁহার দানকে গচ্ছিত-ধন-প্রত্যর্পণ-স্বরূপ মনে করিতেন।

নিস্পৃহ চিত্তরঞ্জন শেষে বুঝিলেন—অর্থে মানবের চরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না—উহা দানেরও যোগ্য নহে—আদানেরও যোগ্য নয়। কিন্তু উৎসর্গই যাঁহার সংসারাশ্রমের মূল বন্ধন, তিনি উৎসর্গ না করিয়া থাকিবেন কি করিয়া? তাই যাহা কিছু অসার তাহাকে দানের অযোগ্য ভাবিয়া যাহা কিছু মানব-জীবনের সার, পবিত্র ও অমর, তাহাই দান করিতে লাগিলেন। রঘু যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিলেন, তখন নিঃস্ব রঘুর দ্বারে এলেন প্রার্থী হইয়া কৌৎস। রাজপ্রাসাদে একখানিও তৈজসপত্র নাই, তাই মৃৎপাত্রে রঘু অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিলেন—সেই মৃৎপাত্রের অর্ঘ্যই রঘুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

নিঃস্ব দেশবন্ধু আত্মার দানসত্র খুলিলেন—তিনি দান করিলেন দেহমনের সকল সুখ—নিদ্রা-সুখ—অশন-সুখ—বসন-সুখ। উৎসর্গ করিলেন—নেত্র, শ্রুতি, রসনা, কণ্ঠ, অঙ্গুলি, দুটী বাহু—এক কথায় সমগ্র দেহ। সমর্পণ করিলেন, তাঁহার শক্তি-ভক্তি; ধ্যান-স্বপ্ন, চিন্তা-চেষ্টা, শিক্ষা-দীক্ষা, সমগ্র সত্তা—ইহ-জীবনের সর্ব্বস্ব। বিরাট পুরুষের সবই বিরাট। এই বিরাট উৎসর্গেই চিত্ত-শিক্ষায়তন গঠিত।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসে তিনি ছিলেন আদর্শ হিন্দু—হিন্দুধর্ম্মের অন্তরাত্মার শাশ্বত প্রকৃতিরই সন্ধান পাইয়া, তিনি তাঁহার নখচুল চর্ম্ম বা খোলস লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার মতে কয়েকটি আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার বা রীতিপদ্ধতিতেই ধর্ম্ম পর্য্যবসিত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নীরস ন্যায়শাস্ত্রও তাঁহাকে তৃপ্ত করে নাই। বহিরঙ্গের শুদ্ধি অপেক্ষা চিত্ত-শুদ্ধিকেই তিনি বড় মনে করিতেন। তিনি জানিতেন,—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" সহস্র তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতায়

মধ্যে তিনি ভূমাধনের সন্ধান করিয়াছেন—তাঁহার কাব্যে ও জীবনে এই সন্ধানই মূলসূত্র। এই অমৃতধনের সন্ধান করিতে তাঁহাকে শুদ্ধাশুদ্ধি, উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার না করিয়াই এমন অনেক ক্ষেত্রে যাইয়া পড়িতে হইয়াছে—যেখান হইতে ঋতম্ভর সত্যরক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারো উদ্ধার নাই।

তিনি জানিতেন "রসো বৈ সঃ"—তাই রসবর্জ্জিত কোন উপাসনাই তাঁহাকে তৃপ্ত করে নাই। আদর্শ হিন্দু মনের দুর্দ্দম মুমুক্ষুতা তাঁহার সমস্ত সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—এই মুমুক্ষুতাই তাঁহাকে দেশের মুক্তির জন্য অস্থির করিয়াছিল।

সত্ব ও রজোগুণের অপূর্ব্ব মিলনে তাঁহার আদর্শ ভীমকান্ত ধীরোদাত্ত জীবন গঠিত। একেবারে—

True to the kindred points of heaven and home.

শঙ্খগদায়, দীপক এবং মল্লারে।
সন্ধ্যারাগে চন্দ্রিকাতেও রক্তজবা কহ্লারে।

অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল তাঁহার জীবনে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আদর্শ বাঙালীর স্বপ্ন মূর্ত্ত হইয়াছিল চিত্তরঞ্জনে। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির অপূর্ব্ব সংহতি—চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণোৎকর্ষ তাঁহাকে যুগাবতার—জাতীয় জীবন-গঠনের প্রজাপতি—জাতীয় যুগে একাধারে হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পর-বিরোধী ভাব ও বৃত্তিনিচয়ের এরূপ অপরূপ সামঞ্জস্য এ যুগে অন্য কোন জীবনে দৃষ্ট হয় না।

নিস্পৃহ চিত্তরঞ্জন নিজ ব্রতে, সাধনায় ও তপস্যায় এমনি তদ্গত ছিলেন যে, ঐহিকতার বা দৈহিকতার প্রতি তাঁহার কোন মমতাই ছিল না। জানিতেন,—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" তাই যোগক্ষেমের জন্য চিন্তা করেন নাই—জানিতেন "যোগক্ষেমাং বহাম্যহং" যিনি বলিয়াছেন, তিনি সতত যোগযুক্তগণকে প্রবঞ্চনা করেন নাই।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ" এই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি বুঝিতেন। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যতীত স্বধর্ম্ম পালন হইতে পারে না। সেজন্য তিনি নিধনও বরণ করিয়াছেন, তবু পরধর্ম্মের সহিত সন্ধি করেন নাই। তাই বলি, দেশবন্ধু যদি হিন্দু নহেন—তবে কি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যাঁহাদের উপাস্য দেবতা, বল্লাল সেনই যাঁহাদের চিত্তলোকে সম্রাট, তাঁহারাই প্রকৃত হিন্দু?

তিনি ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব—'তৃণাদপি সুনীচ, তরোরি সহিষ্ণু, অমানিনে মানদ।' অহিংসায় রতি ছিল। নাম কীর্ত্তনে মতি ছিল—বৈষ্ণবের ক্ষমা তিতিক্ষা তাঁহার ছিল,—রঘুনাথের মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্য কেবল তাঁহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতেছি না। তাঁহার বৈষ্ণবতা কেবলমাত্র ভাবাবেশে, প্রেমাশ্রুপাতে ও রসমগ্নতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। শ্যামের মুরলীরব তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছিল—এই চিরশ্যামবঙ্গদেশে তিনি সৌম্যশ্যামে ভৌমরূপ দেখিয়াছিলেন—এই শ্যামদেশই শ্যাম বেশ ধরিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল। চণ্ডীদাসের রাধার মত তিনি অভিসারেই ছুটিয়াছেন—কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়া এই অভিসার-পথ শ্রাবণধারায় পিচ্ছিল, কণ্টকময়, তমসাচ্ছন্ন অহিসঙ্কুল, কিন্তু অনন্যলক্ষ্য, শ্যামগতপ্রাণ, আত্মহারা মিলনাগ্রহ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। এই যে প্রেমের জন্য আত্মবিলোপ—এই যে তদীয়তায় মদীয়তা বিসর্জ্জন,—এই যে অকৈতব অহৈতুক প্রীতি—ইহাই দেশবন্ধুকে প্রকৃত বৈষ্ণব নামের যোগ্য করিয়াছে। এক দিন বাঙালীর চিত্তই ব্রজভূমি গড়িয়াছিল, আজ আবার বাঙালীর 'চিত্তই' নবব্রজভূমি গড়িয়া গেল। চিত্তরঞ্জনে ধর্ম্মজীবন গৌড়বঙ্গে নবচৈতন্যচরিতামৃত। উহাই চিত্তবিদ্যাপীঠের ধর্ম্মতত্ব। চিত্তরঞ্জন ধর্ম্মকে কর্ম্মের মধ্যে জীবন্ত করিয়া জীবনের সাধনায় সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া যেমন ধর্ম্মগুরু, কাব্যের সহিত সাধনার যোগ সাধন করিয়া এবং স্বপ্নকে সত্য রূপ দান করিয়া তেমনি সাহিত্যগুরু।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন কবি, বঙ্গদেশের প্রাচীন ভক্ত কবিগণের নিকট তাঁহার রসদীক্ষা। স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও সাধকতার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সেজন্য চাতুর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রতিই তাঁহার অধিকতর লোভ ছিল। তাঁহার কাব্য 'বিলাস কলাসুকুতূহল' চরিতার্থ করিবে না। তিনি নূতন কোন ভাবধারা, রচনাভঙ্গী বা রসবিলাসের প্রবর্ত্তক নহেন। কিন্তু তিনি ত শুধু কাব্যরচনা করেন নাই—তিনি নিজেই ছিলেন শরীরী কাব্য, মূর্ত্তিমান ছন্দোমাধুর্য্য

তাঁহার চিন্তা, চেষ্টা, স্বপ্ন, জাগরণ, হাস্য, দৃষ্টিগতি, তাঁহার প্রতি রক্তকণা ছিল কবিত্বময়। ছন্দে বলিতে গেলে বলিতে হয় :—

ভক্তরসিক চিত্ত তোমার সজীব চির তারুণ্যে
জীবন তোমার কাব্য-সরস রামায়ণের কারুণ্যে।
অশ্রু প্রাবৃট কাব্য মরণ জিনেছে সে মেঘদূতেও,
কায়মনোবাক্ কর্ম্মে কবি অমর কবি মৃত্যুতেও।
তোমার জীবন কাব্যখানি ভারতবাণীর কণ্ঠহার,
স্বর্গারোহণ সর্গটি তার অন্তে চরম চমৎকার।
এ যে সদ্যোজাগ্রতদের জীবন-উষার নবীন বেদ
মুক্তি বোধন সূক্তে ভরা এর প্রতি ভাগ পরিচ্ছেদ।

জীবনে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে—রচনায় যাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা যদি সামান্যই হয়—তিনি জীবনে যে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছেন তাহা অসামান্য। মরণেও তিনি বঙ্গভারতীর ভাণ্ডারকে অশ্রুমৌক্তিকে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন উদয়ন কথার ন্যায় তাঁহার কথা যুগে যুগে নবনব কাব্যের জন্ম দান করিবে।

জীবনের সমগ্র লীলা ও স্বপ্ন বৈচিত্র্যকে একত্র করিয়া বিচার করিলে তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবি জগতেও দুর্লভ। তিনি কবিত্বের অভিনয় করিতে জন্মান নাই। যে ধ্যানময়, ভাবময় মুহূর্ত্তগুলি কবি-জীবনে মাঝে মাঝে প্রবুদ্ধ হয় মাত্র, সেই মুহূর্ত্তগুলি নিরন্ধ্র নিরন্তরাল ভাবে ঘনীভূত হইয়া তাঁহার আয়ুষ্কাল রচনা করিয়াছে। তিনি ছিলেন কাব্য-সরস্বতীর বহিশ্চর রূপময় মূর্ত্তি। তাই তাঁহার জীবন মরণের অপূর্ব্ব মহাকাব্য 'চিত্তবিদ্যাপীঠের' অধিতব্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

নদী যেমন এক কূল ভাঙে অন্য কূল গড়ে—তিনিও তেমনি রাষ্ট্রনীতির এক দিক ভাঙিয়া অন্য দিক গড়িয়াছেন। স্বরাজ প্রাপ্তির বাধাগুলিকে যেমন একহাতে ভাঙিতে চাহিয়াছেন—অন্যহাতে তেমনি ঐ স্বরাজলাভের উপযুক্ত জীবন ও মন গড়িয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্রে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে, উপদেশে, আদেশে, অনুরোধে, সেবাব্রতে, নেতৃত্বে, চুক্তিতে, নানা ভাবে নানা রূপে তাঁহার সৃজনীশক্তি জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনই প্রথম জাতীয় আন্দোলনের নগর-সঙ্কীর্ত্তনকে নগর ছাড়িয়া পল্লীর পথে পথে লইয়া যান মৃদঙ্গ-নিনাদে সবার সুপ্তি ভাঙাইয়া। সরকারের দুয়ারে সারাদিন কড়া না নাড়িয়া তিনি মাটীর খাঁটী মালিকদের দ্বারে দ্বারেই করাঘাত করিয়াছেন। নগরের সহিত পল্লীর নূতন করিয়া যোগসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাঙ্‌লা দেশ নগর-সর্ব্বস্ব নহে, উহা পল্লীসংহতি—এ কথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার রাজনীতি-চর্চ্চা বিলাতীর অনুকরণ মাত্র নহে—উহা বাঙালীর নিজস্ব প্রজানীতি চর্চ্চা।

আগেকার দেশপ্রীতি জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত ছিল না—কঠোর ব্রতে উহা সত্য-রূপও ধরে নাই। উহা ছিল বাক্‌সর্ব্বস্ব, নানা ভঙ্গীর অভিনয় মাত্র,—রসনা ও লেখনীর বিলাস, অবসর-কাল বিনোদের জন্য শুষ্ক যুক্তির খেলা, যশ উপার্জ্জনের প্রক্রিয়া এবং তর্কশাস্ত্র ও সাহিত্যালঙ্কারের অঙ্গ স্বরূপ। দেশবন্ধু দেশপ্রীতির বাঙ্ময় রূপকে প্রথম চিন্ময় রূপ দিলেন,—যাহা বিলাসমাত্র ছিল তাহাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার মত স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম্ম করিয়া তুলিলেন। খেলাকে কর্ম্মের ঘর্ম্মে গলাইয়া দিলেন। যশ অর্জ্জনের প্রয়াসকে অযশ সহ্য করিবার ক্ষমতায় পরিণত করিলেন—আর যাহা ছিল সাহিত্যের অলঙ্কার তাহা হইল কারার শৃঙ্খল। আর যাহারা দেশপ্রীতির অভিনয় করিয়া করতালির সাধুবাদ লাভ করিত—তাহাদের কাহারো দাড়ী, কাহারো পরচুলা, কাহারো জটা, কাহারো রাজবেশ ধরিয়া টান দিয়া তাহাদের কদর্য্য রঙমাখা সঙসাজা, হুঙ্কারজনক মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন। সব ভুয়ো ভণ্ডামি ফাঁকী ঝুঁটো জাল যেথানে যা ছিল, ধরা পড়িয়া গেল।

এক হিসাবে পূর্ব্বের আন্দোলনকে রাজনীতি বলা যাইতে পারে; কারণ উহা রাজার দ্বারাই নীত হইত। রাজাই ছিলেন সে সকলের প্রবর্ত্তক—প্রজার অন্তর হইতে উহা উঠিত না। সরকারের বেত্রাঘাত অথবা বিলাতী কাগজের লেখনীর আঘাতে উহার জন্ম হইত। বাংলা বিভাগ হইতে জালিয়ানাবাগ পর্য্যন্ত একই প্রথা। এ আন্দোলন তত দিনই চলিত, যত দিন না সরকার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেন; অথবা যত দিন না রসনা ক্লান্ত হইয়া পড়িত। বাহিরের উত্তেজনার অপেক্ষা না করিয়া অন্তর হইতে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার লাভের জন্য যে আন্দোলন—দেশবন্ধুই তাহার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এ আন্দোলন সাময়িক নহে, ইহা জাতীয় জীবনের চিরসহচর। প্রকৃত দেশাত্মবোধের প্রেরণায়

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্দীপনায় যে আন্দোলন, তাহা আত্মার প্রতি মুহূর্ত্তের সাধনা—তাহা জীবনের তপস্যা—তাহাতে বিশ্রাম নাই—ক্রমভঙ্গ নাই—সন্ধি নাই—সর্ত্ত নাই। চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধের সাধনা মানবতার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা লাভের জন্য তপস্যা, দাস জীবনের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য সাময়িক আন্দোলন মাত্র নহে। যিনি শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে সর্ব্বদাই অঙ্গে শৃঙ্খলভার অনুভব করিতেন, তাঁহার সাধনাকে রাজনীতিক আন্দোলন মাত্র বলিলে মানবাত্মার দৈবী প্রেরণারই অমর্য্যাদা করা হইবে। তিনি জানিতেন ভিক্ষায়, শাঠ্যে বা ভয় প্রদর্শনে ঐহিক ঋদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে, স্বরাজসিদ্ধি মিলিবে না।

তিনি জানিতেন, "স্বরাজ সুরু আত্মা হতেই আত্মাতে; তাই শক্তি চাই, মসীর বলে অসির বলে পেশীর বলে মুক্তি নাই।" তাই তিনি স্বরাজ চাহিয়াছেন স্বজাতিরই কাছে। তিনি স্বরাজ ভিক্ষা করিয়াছেন দেশের লোকের কাছে। পররাজ হাতে তুলিয়া স্বরাজ দিতে পারে না—স্বরাজ দেশের লোকের মনেই ভ্রূণাবস্থায় রহিয়াছে। দেশের লোক সমবেত শক্তি দিয়া ত্যাগ ও সংযমের সাহায্যে তাহাকে পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলুক—ইহাই দেশের কাছে ভিক্ষা। সরকারের কাছে প্রার্থনা,—তাঁহারা যেন আসন্নজন্মা জাতককে কংস বা হেরোদের চক্ষে না দেখেন।

কেহ কেহ বলেন—চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ সাধনার পথটি ঠিক নহে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান না বলিয়া দিলে কোনটি ঠিক পথ তাহা ধরা যে কঠিন তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে না। ঠিক পথটি কি জানিতে হইলে বেঠিক পথগুলি কি তাহাও জানিবার প্রয়োজন আছে। বেঠিক পথের সংখ্যা পরীক্ষার দ্বারা যত কমিয়া আসিবে, ঠিক পথের সন্ধান ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। ইহাকেই বলে 'তৎ—ন' 'তৎ—ন' সন্ধান। তৎ—ন, তৎ—ন, নেতি—নেতি করিতে করিতেই 'তদত্রে' পৌছান যাইবে। দেবতার প্রত্যাদেশ না পাইলে এই প্রথা ছাড়া গত্যন্তর কি? সে যত ভুলই করুক 'টিকিমুণ্ডে চড়িয়া' তার যত ভুলই ধরুক, মৃগ্যদ্রব্য সেই একদিন পাইবে যে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছে। "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"। ইহা ছাড়া স্বরাজলাভের পথটি তাঁহার ভুল হইতে পারে, কিন্তু স্বরাজলাভের দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষায় ও মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগাত্মিকা তপস্যায় ত আর ভুল নাই।

মুক্তিকে যাঁহারা তপস্যালভ্যা মনে করেন, তাঁহারা এই তপস্যাকে নিষ্ফল মনে করিতে পারেন না। প্রাণের যে ব্যাকুলতম মুমুক্ষুতা—দেশবন্ধু দেশের চিত্তে জাগাইয়া দিয়াছেন—তাহা ত ভ্রান্ত নহে—অসত্য নহে—স্বপ্ন বা মতিভ্রম নহে এবং ইহা ব্যর্থ হইবারও নয়। তাঁহার চেষ্টায়, চিন্তায় ও কার্য্যপ্রণালীতে যতই ভ্রান্তি থাকুক, তিনি সাধনার মন্ত্র দিয়াছেন ও দীক্ষিতগণের অনুসরণীয় করিয়া গিয়াছেন,—পথিকগণকে উৎসাহ দীপনা ও অনুপ্রাণনার সহিত যথেষ্ট পাথেয় দিয়া গিয়াছেন—প্রত্যাসন্ন স্বরাজের ভার বহন করিবার যোগ্য শক্তি তিনি বাহুতে বাহুতে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন।

শত্রুপক্ষ জিজ্ঞাসা করে, তাঁর আন্দোলনে কি লাভ হইয়াছে? দেশবন্ধুকে পরাজিত করিবার জন্য রাজপুরুষগণের উৎকণ্ঠা ও প্রাণপণ চেষ্টা, বিদেশী সংবাদপত্রের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও দেশের লোকের অপূর্ব্ব জয়োল্লাস হইতে বোঝা উচিত—কি লাভ হইয়াছে দেশবন্ধুর বিজয়ে। কিন্তু চিত্তের সাধনার ফল চিত্তলোকেই খুঁজিতে হইবে। বাঙালার চিত্তে আত্মবল, আত্মপ্রত্যয়, নির্ভীকতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কি বাড়িয়া যায় নাই? শূদ্রভাব, জড়তা, অবিশ্বাস, গতানুগতিকতা, অমূলক সঙ্কোচ ও ভয় কি অনেকটা দূর হয় নাই? বাঙালী বাক্য অপেক্ষা কর্ম্মকে বড় মনে করিতে, ঐক্য ও সংহতির মূল্য বুঝিতে, ব্রতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে, আদর্শের জন্য স্বার্থবলি দিতে—রাজপ্রসাদের প্রলোভন জয় করিতে—সংঘের ইচ্ছার শাসনে আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে—সত্যের জন্য পারিবারিক জীবনকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে—আপনাদের জাতীয় অধিকার ও মনুষ্যত্বের দাবী বুঝিতে ও সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলার মূল্য বুঝিতে শিখিয়াছে। বাঙালী যাহা পাইয়াছে তাহা তাহার ওজঃ তেজঃ রস ও রক্তে, জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে—পৃথক্ করিয়া তাহা দেখান যায় না।

স্বরাজ মিলে নাই বটে,—কিন্তু দেশবন্ধু স্বরাজের পথে আমাদের মনকে অনেকটা আগাইয়া দিয়াছেন। যদি কখনো স্বরাজের সরোজ ফুটে, তবে তাহা অনন্তশয়নে শায়িত চিত্তরঞ্জনের নাভিমৃণালেই ফুটিবে।

চিত্তরঞ্জন চিত্তলোকের সম্রাট হইলেন কিসে? কেবল

কি ত্যাগ বলে ? তাঁহার অদ্ভুত ধীশক্তি, ভূয়োদর্শন, নেতৃত্ব করিবার ও সম্প্রদায় গঠন-পরিচালন করিবার ক্ষমতা, বাক্‌পটুতা ও যুক্তিপরম্পরা, অসাম্প্রদায়িক উদারতা, অক্ষুণ্ণ সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, ওজস্বিতা ও মনস্বিতা, সংযম, ক্ষমা, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, দুঃখ বিপদে অবিচলতা, অধ্যবসায় সবই তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রভুত্বে তাঁর লোভ ছিল না—তাই প্রভুত্ব তাঁহাকে গুণমুগ্ধ হইয়া বরণ করিয়াছিল। তিনি যে হাল একবার ধরিতেন—তুমুল তুফানেও তাহা ছাড়িতেন না। তিনি ছিলেন সবার পথের সাথী—রথের রথী হইয়া নেতৃত্ব করেন নাই। বাতায়নে বসিয়া তিনি আদেশ দিতেন না—সকল অভিযানে তিনি থাকিতেন সবার আগে—প্রথম আঘাত লইতেন নিজে বুক পাতিয়া। তিনি "জাতির হরফের হারপরা," খেতাবের তাজপরা প্রতিনিধি ছিলেন না,—লোহার শিকলপরা, কাঁটার মুকুট পরা ধর্ম্মগুরু ছিলেন। Chillon কারাগারকে Bounivard যেমন তীর্থে পরিণত করিয়া ছিলেন,—দেবব্রত যেমন ধাবরের প্রাঙ্গণকে পুণ্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন—তেমনি তিনি কারার নরককে স্বর্গ করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও কারাচণ্ডীর পাষাণবেদীতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। চিরকলুষ-কলঙ্কিত দুষ্কৃতিপুঞ্জের আশ্রয়ভূমি কারা যেন পতিতপাবনের চরণ স্পর্শে শতযুগের পুঞ্জীভূত পাপ হইতে কিছুদিনের জন্য মুক্ত হইল। শাক্যসিংহের সহিত বস্ত্র বিনিময় করিয়া পশুবধ-কিনাঙ্কিত-হৃদয় কিরাত যেন দিব্যবিভূতি লাভ করিল।

সুভদ্রার সারথ্যে একবার পার্থ জয়ী হইয়াছিলেন। বাসন্তীদেবী অভিমনু-জননীর ন্যায়ই এই নবীন পার্থকে সহায়তা করিয়াছিলেন ; তিনি স্বামীর কেবল মাত্র সহধর্ম্মিণী ছিলেন না—মৈত্রেয়ীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহ-মর্ম্মিণী ছিলেন। দেশবন্ধুর দিগ্বিজয় আপন সংসার হইতেই সুরু হইয়াছিল।

'ভোগবতীর' কূলে বলিরাজের আধিপত্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার বৈতরণীর কূলে নূতন সিংহাসনের জন্য প্রচ্ছন্ন লোভও ছিল না। এইরূপ অসংখ্য কারণে চিত্তরঞ্জন জনচিত্তেশ্বর হইয়াছিলেন। জনমতের বত্রিশ পুতুল সহজে তাঁহাকে সিংহাসনে বসিতে দেয় নাই। জনসংঘ মতামত সম্বন্ধে বড়ই চঞ্চলমতি ও অবিবেচক এ অপবাদ, এ পরিবাদ প্রবাদের রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু জনসংঘ যখন বহুবার প্রবঞ্চিত হইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আপনাদের ভাগ্যকে—আপনাদের হৃদয়-মনকে নিঃসংশয়ে, নিঃসঙ্কোচে একজনের হস্তে সমর্পণ করে, তখন সে অশেষবিধ পরীক্ষা করিয়াই লয়। তাহাদের মহত্ত্ব-বোধের আদর্শের চরম সীমায় কোন মহাপুরুষ আসন পাতিয়া বসিলে, তাঁর সমক্ষে তাহাদের অবনত হইয়া পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে মহাপুরুষের নির্দেশমত সর্ব্বক্ষেত্রে চলিবার সাহস ও শক্তি তাহাদের না থাকিতে পারে, তবু তাহাদের চিত্তে ভক্তির গভীরতা আদর্শের তুঙ্গতার সমানুপাতেই জন্মিবে। অক্ষম যাহারা তাহারা শক্তির অভাবের জন্য আপনাদিগকেই ধিক্কার দিবে ; কিন্তু পূজা করিতে ছাড়িবে না। বাংলার জনমণ্ডলী চিত্তরঞ্জনকে স্বার্থের প্রেরণায় নেতৃত্ব দেয় নাই—প্রেমের প্রেরণায় বন্ধু বলিয়া, ভক্তির প্রেরণায় গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিল। ধর্ম্মগুরু যে ভাবে অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য লাভ করেন, দেশবন্ধুও সেইভাবে অসংখ্য মনের নায়কত্ব লাভ করিয়াছেন।

বিশ্বোদ্ভাসক সূর্য্যালোক জীব-মাংসপিণ্ডে নয়নের উদ্ভেদন করিয়াছে—মহাসমুদ্রের গর্জ্জন সেই পিষ্ট পিণ্ডে শ্রুতির বিকাশ সাধন করিয়াছে—দেশবন্ধুর বিরাট উৎসর্জ্জন—তাঁহার মহাতপস্যার দীপ্তিই কি ব্যর্থ হইতে পারে ?

এই জাতি যতই জড় অসাড় হউক—বহুযুগের অন্ধকূপের পঙ্কহিমে জ্ঞানগোচর যতই বিলুপ্ত হোক্—উদ্বোধকের দুর্নিবার শক্তির প্রভাবে সে জাগ্রত হইবেই—শ্মশানেও যাহা জীবন জাগায়—পাষাণেও যাহা চৈতন্য জাগায়, জীবদেহেই কি তাহার প্রভাব পরাস্ত হইবে ?

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫১

ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। মাতুলের বর্ণনাটাকে মূর্ত্তি-রূপে সম্মুখে পাইয়া, বিস্মিত ভাবে দ্বারের বাহিরে থামিয়া পড়িলাম। সকালের সেই যুবকদ্বয় বেদানা ছাড়াইতেছিল। বাবুটি আমার দিকে চাহিয়া যেন সঙ্কোচ-চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

"সঙ্কোচের কোন কারণ নাই—আমি আপনারি মত একজন" বলিয়া, ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"আমি বড় দুর্ব্বল, সহসা দাঁড়িয়ে উঠতে পারি না" বলিতে বলিতে বাবুটি দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন ও বসিতে দিবার একটা-কিছুর জন্য—ঘরের এদিক ওদিক্ চাহিতেই, আমি তাঁর শয্যায় বসিয়া পড়িলাম।

মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া তিনি বলিলেন—"দেখুন দিকি—এঁরা আমাকে গাছতলা থেকে তুলে এনে বেদানা খাওয়াবার তরে ব্যস্ত;—আমি কি করে মুখে তুলবো! আমার তরে এ ঐশ্বর্য্যের আয়োজন ক'রবেন না,—আমার"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নত নয়নে বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বুঝিলাম—কোনো গোপন স্থানে তাহা আঘাত করিতেছে। বলিলাম—"আপনাকে দেখে কে না বুঝবে আপনি পীড়িত; ওটা এখন তো ঐশ্বর্য্য নয়—আপনার ঔষধ। ওর সঙ্গে এখন তো অন্য কোনো ভাব মিশতেই পারে না। ঐশ্বর্য্য হ'লে কি মৃৎপাত্রে উপস্থিত হ'ত,—ও যে ওর সব অহঙ্কার ছেড়ে—মায়ের বুক থেকে স্নেহ-সরস হয়ে আসছে।"

তিনি মিনিট খানেক অবাক হয়ে আমার মুখের ওপর চেয়ে থেকে, শেষ একটি নিশ্বাস ফেলে যেন আবিষ্ট ভাবে বললেন—"দয়াময় তাঁর কৃপার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে চলেছেন। রোগ না হ'লে কত বড় অভাগ্য নিয়েই আমাকে যেতে হ'ত!—ক্ষমা করবেন,—আপনি কে?"

"আমি একজন অতি সাধারণ লোক,—অল্প কয়েক দিনের জন্য এখানে এসেছি। জয়হরির কাছে আপনার অসুখের কথা শুনে দেখতে এলাম।"

আবার তিনি আমার মুখে একদৃষ্টে চেয়ে সিক্ত কণ্ঠে বললেন—"আমাকে দেখতে এসেছেন! পথের জিনিস ছিলাম,—ঘর পেয়ে,—হৃদয় পেয়ে—আজ আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয়!" এই বলে একটা হতাশের নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বুকে হাত ঘষ্‌তে লাগলেন,—যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন।

বলিলাম—"এত হতাশ হচ্ছেন কেন',—আপনি সত্বরই ভাল হয়ে উঠবেন। আজ আর বেশী কথা কয়ে কাজ নেই,—একটু বিশ্রাম করুন।"

তিনি একটু সামলে বললেন—"এখন আমি ভাল আছি, এই সময় যতটুকু পারি বলি। আপনারা আমার শেষ সহায়—আপনাদের আর কবে পাব'!"

তিনি বাধার অবকাশ না দিয়া বলিয়া চলিলেন,—"প্রায় তিন বৎসর আমি ভয়ানক অজীর্ণে দিন দিন জীর্ণ হচ্ছিলাম। এখানে আসার তৃতীয় দিনেই আমি নিজেকে রোগমুক্ত অনুভব করলাম। অতবড় অজীর্ণ—যা আমাকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে' এই অবস্থায় এনেছে, তা যে কোন্ অলৌকিক শক্তি-সংঘাতে সরে গেল, বলতে পারি না! পাণ্ডাজি—যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁকে আমি বারবার বলেছিলাম,—"আমি একেবারেই নিঃস্ব, বাবার মন্দিরে পড়ে থাকতে এসেছি।"—বলা সত্ত্বেও তিনি আমাকে স্থান দেন; আর আমার রুগ্নাবস্থায় যা আহার ছিল—এক পয়সার সাবু আর এক পয়সার মিছরি, জলে সিদ্ধ করে দুইবারে খাওয়া—তাও তিনি দেন। এখন জানছি—তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। আমি যে আশাহীন নিঃস্ব তা বুঝতে পারেন নি;—আমার যে ভবিষ্যৎও নেই তা তিনি কি করে বুঝবেন! ভেবেছিলেন—পত্র লিখে টাকা

আনিয়ে নেবে,—তীর্থের ঋণ কোনো বাঙ্গালী ভদ্রলোক রাখেন না। যাক্,—পূর্ব্বে জল সাবুও আমার হজম হচ্ছিল না, ক্ষুধা একেবারেই ছিল না। এখানে আসার পর রোগমুক্তি আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ক্ষুধা—আমার মস্ত বিপদ হয়ে দেখা দিলে। আমি ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হ'তে লাগলুম,—পাথর খেলেও বোধ করি হজম্ হ'ত! কিন্তু সেই এক পয়সার সাবু খেয়েই থাকতে লাগলুম। আমি নিজে তো জানি—আমি কপর্দ্দকশূন্য নিরুপায়,—যা পাচ্ছি তা আমার ভিক্ষান্ন। নিঃস্বের ক্ষুধা যে উপদ্রবেরই নামান্তর! আমি ক্ষুধার কথা কি করে বলবো,—কা'কে বলবো, আমার কোন্ অধিকার আছে! কি করি—ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তিন দিন ছট্‌ফট্ করেছি,—নিকটে একটা নদী নাই যে অঞ্জলি পূরে আকণ্ঠ জল খাই।

"একটা কুকুর সেই গলিতে ঘুরে বেড়ায়,—আমারি মত কঙ্কাল হ'য়ে। যাত্রীদের খাদ্যাবশিষ্ট সামনে পড়লেও খেতে পায় না,—সে যে রুগ্ন, দুর্ব্বল! ক্ষুধার জ্বালায় সে ছুটে যায় কিন্তু অন্য কুকুর দেখলে এগুতে পারে না! তার সামর্থ্যের সঙ্গে যাবার দাবীও সে হারিয়েছে! তখন সে হতাশ বিষন্ন মুখে কুয়াতলায় গিয়ে কাদাজল খেয়ে, আমারি দেলের পাশে এসে শুয়ে পড়ে। সে রূপও হারিয়েছে—কেউ তার দিকে চেয়েও দেখে না। এমনি করেই কি মারতে হয় প্রভু!

"চতুর্থ দিনের বৈকাল পর্য্যন্ত সে-ই আমার মনটাকে দখল করে—অন্যমনস্ক করে রাখলে। কিন্তু আর তো পারি না! প্রাণ বলে' উঠ্‌লো—"বাবা তিন চারখানা দেলের পরেই তুমি রয়েছ, এই দেল ক'খানা কি তোমারো দৃষ্টির অন্তরায় হ'ল! তবে আর কে দেখবে! আমি—পেলে খাই, ও যে পেয়েও খেতে পাচ্ছে না ঠাকুর!"

"সামনের বট-গাছটায় দু'তিনটে চিলের বাস ছিল,—বাচ্ছা হয়েছিল। তাদের মায়েরা এক একবার এসে বাচ্ছাদের কিছু খাইয়ে যাচ্ছে,—দেখতে লাগলুম। মনে হ'ল,—আজ চারদিন ক্ষুধায় মরছি—মা তুমি কোথায়! আকাশের দিকে চাইলুম। শূন্য হ'তে একটা চিলের পা' থেকে একটা কি খসে—কুকুরটির মুখের কাছে পড়লো। চেয়ে দেখি—দু'খানা লুচি! নিমেষে চারদিক দেখে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি খেতে লাগলো। ঠিক্ অনুভব করতে লাগলুম—যেন আমিই খাচ্ছি! ভারি তৃপ্তি বোধ হচ্ছিল। এখন আর তো আমি মানুষ নই,—আমি তার মতই ক্ষুধা-পীড়িত প্রাণী। আমার কাছে আর তফাৎ ছিল না,—শেষ পর্য্যন্ত যেন না থাকে। এই মানুষের খোলটাই আমাকে অভিমান দিয়ে বড় কষ্ট দিয়েছে, বড় বঞ্চনা করেছে। ভদ্র মধ্যবিত্তের মত দুঃখী আর সহিষ্ণু দুনিয়ায় নেই,—তার বেশ, তার শিক্ষা, তার ব্যবহার—তার সত্যকে চেপে মেরেছে। এই আবরণ সে আমরণ বহন ক'রে আত্মসম্মানের দাসত্ব ক'রে চলেছে—তার কাছে সে জোড়হাত। সে আত্মমর্য্যাদার মুখচেয়ে মৃত্যু স্বীকার করে,—সত্যের মর্য্যাদা রাখতে পারে না।

"তখন ঘুমের আমার বড় দরকার, তাহ'লে ক্ষুধার জ্বালাকে কিছুক্ষণ ফাঁকি দিতে পারি—কিন্তু তা হয় না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, ভাবলুম এই তৃপ্তিটা নিয়ে শুয়ে পড়িগে—ঘুম আসতে পারে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলুন; পেছন থেকে কে আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে সামলে শুইয়ে দিলে। চেয়ে দেখি স্ত্রীলোক,—এদের বাড়ী দুধ দেয়,—আমার দিকে বিস্ময়-করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বল্‌লে 'তোমার শরীরে যে কিছু নেই! তোমার হাতটা ধরতে আমার মনে হ'ল এ কি মানুষের হাত! বড় ভয়ও হ'ল। তুমি দুধ খাও না কেন! তোমাকে দুধ খেতে হবে।" আমার মর্ম্মে যেন মায়ের কথার সাড়া এল,—আমার চোখের সামনে মাতৃমূর্ত্তি দেখলুম—আমাকে দুধ খেতে আদেশ করছেন। কোথায় গেল আত্মাভিমান! সত্য সহজেই বুক ছেড়ে মুখে বেরিয়ে এল—"মা, দুধ আমি কোথায় পাব,—আমার ত পয়সা নেই!" এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনের আত্মাভিমানের মড়্‌চে-ধরা ধর্ম্মটা খস্ করে খসে পড়ে গেল—আমি যেন তার দম্ভ-কর্কশ ধ্বনিটা পর্য্যন্ত শুনতে পেলুম।

"তিনি কেবল বললেন (ক্ষমা ক'রবেন, আমি তাঁকে তিনিই ব'লব) "আমার ছেলেরা দুধ খেয়ে যা বাঁচে তাই আমি বেচি। এখন একটু খাও—খেতে হবে।" এই বলে আমাকে আধসের-টাক্ দুধ খাইয়ে বল্‌লেন "আমি এই সময় রোজ খাইয়ে যাব।" তিনিই আমাকে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমার ক্ষুধার পক্ষে তা কিছুই নয়—ক্ষুধা ছিল তার সাতগুণ। দুবেলা দুটি ভাত পাবার তরে

ছট্‌ফট্‌ করেছি। গত ছু'দিন থেকে prostration এসেছে। আর দাঁড়াতে বসতে পারছি না। আমার বোধ হয়—"

জয়হরি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল—সহসা দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া বেদানার খুরিখানা লইয়া "আগে এই কটা খেয়ে ফেলুন তো" বলিয়া নিজে হাতে করিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিল। "সবগুলো খাওয়া চাই" বলিয়া একটি ছোকরার হাতে খুরীখানা দিয়া আবার দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

"যদি আঠার দিন আগে এই ভাইটি দিতেন!" বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে বলিলেন "ওঁর কথা রক্ষা না করলে আমার ওপারেও রক্ষা নাই। আমি এখন সব স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সকালে গাছতলায় অসহায় প্রাণটা যখন 'গেলুম গো' করে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ওই ভাইটির প্রাণও "গেলুম গো" বলে প্রতিধ্বনি পাঠিয়েছিল!"

বলিলাম "আপনাকে বড় বেশী কথা কওয়াচ্ছি—নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে,—আরও অবসন্ন হয়ে পড়বেন,—থাক্‌।"

"নীরবে বৎসর চলে গেছে,—কতকাল কথা কইনি। নিঃস্বকে দেখলে সবাই সরে যায়, আলাপে ভয় পায়। কারুর দোষ নেই, অভাব যে বড় ভয়ের জিনিস। তার উপর আমি পীড়িত। মানুষ আনন্দ চায়—শান্তি খোঁজে, অভাবের স্মৃতিটাও যে ও-দুটিকে নষ্ট করে। তাই কথার পথ বন্ধ করে দেখার পথ খুলে রেখেছিলুম। প্রকৃতি আমাকে তাঁর সকল দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। আজ আমার চারদিকে উন্মুক্ত হৃদয়—আমাকে কথা কইতে দিন।"

(৫২)

সিঁড়িতে লোক উঠিবার শব্দ হইল। পরে শুনিলাম জয়হরি বলিতেছে—"এই ঘর।" দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখি হ্যাট্‌-কোট্‌-পরা সৌম্যদর্শন একটি ভদ্রলোক—প্রায় প্রবীণ। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি—ইনি এখানকার নামী ডাক্তার। পশ্চাতে জয়হরি।

ঘরে ঢুকিয়া জয়হরি মুস্কিলে পড়িয়া গেল—কোথায় তাঁহাকে বসাইবে। তিনি বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন "ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, এটা ত তোমার বাড়ী নয়,—আর আমিও ত বাঙালী—রোগীর বিছানাই আমাদের বরাসন।"

রোগীকে আর নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইল না। তিনি স্বয়ং গিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। মিনিট কয়েক রোগীর দিকে নির্ব্বাক নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যাহা যাহা জানিবার তাহা শুনিয়া লইলেন।

জয়হরি চুপচাপ দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হার্টটা ভাল করে দেখতে হবে ডাক্তার বাবু। উনি বলছিলেন Prostration set in করেছে। আপনার তো এই সবে পনের মিনিট হয়েছে।

আমি অবাক্‌ হইয়া বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিলাম,—তার এই অভদ্র ইঙ্গিতটায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

ডাক্তার বাবু সেটা বোধকরি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন "পরীক্ষা করব বই কি! আমাকে ত এক ঘণ্টা থাকতেই হবে—তুমি ত তার আগে ছেড়ে দেবে না।"

শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলাম মাত্র।

ডাক্তার বাবু ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া জয়হরিকে বলিলেন "ওটা prostration নয়। বেশী রকমের weakness বটে—অন্য কোনও গোলমাল নেই। উনি যখন নিজেই বলছেন আর অনুভবও করছেন ওঁর আসল অসুখ সেরে গেছে···খুব সম্ভবও তাই! এখন ওঁকে দেখবার ভার তোমার রইল। আমি কেবল সুবিধামত এক একবার খবর নিয়ে যাব।"

জয়হরি বলিল, "আমি কি দেখব! আপনি ওষুধ দেবেন না?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "ওষুধের আবশ্যক নেই। ওঁকে দেওয়া চাই—সকালে আধসের দুধ, বেলা এগারটার মধ্যে মাছের ঝোল আর ভাত, বৈকালে আধসের দুধ আর রাত নটার মধ্যে মাছের ঝোল ভাত। এখন এক সপ্তাহ নিয়মিত এই চলবে। এ সপ্তাহটা উঠে হেঁটে বেড়ান নয়—পড়ে গেলে ভয়ের কারণ আছে। এই সব তুমি দেখবে—তোমার ভার—কেমন!"

জয়হরি বলিল "যে আজ্ঞে, সে আমি পারব। কিন্তু আপনারও রোজ আসা চাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে ত' বলেছি,—কিন্তু আমার কাজ করবে কখন?"

জয়হরি হাত জোড় করিয়া খুব বিনয়ের সহিত বলিল "আপনি যখন বল্লেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "কিন্তু এঁকে দেখবার ভার নিলে যে।"

জয়হরি চিন্তিত ভাবে বলিল, "ভোরে গেলে হয় না? আপনি যা বলেন!"

ডাক্তার বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তবে এ কয়টা দিন থাক—ইনি সেরে উঠুন। তার পর কিন্তু—"

সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "যে আজ্ঞে—সে আর বলতে হবে না,—এখানে আমার ত আর অন্য কোনও কায নেই।"

"বেশ—সেই কথাই ভাল, এখন ওঁর জন্যে যে একটু গরম দুধ দরকার।"

"এই যে" বলিয়াই জয়হরি দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

আমি বিমূঢ়বৎ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলাম; কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল উৎকণ্ঠা বাড়িতেছিল।

ডাক্তার বাবু আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছোকরাটি কে মশাই,—আপনার কেউ?"

"কেন বলুন দেখি, আমি ওঁর দাদাবাবু।"

"নাঃ—বেশ লোক! খাড়া warrant কথাটা শোনাই ছিল—এই দেখলুম। বলে—'দাদার বড় অসুখ, আপনাকে এখুনি যেতে হবে, তা নী ত অসহায় ব্রাহ্মণ বিদেশে মারা যাবেন—তাঁর স্ত্রীপুত্রও আছে।' বললুম—'দুজন লোক অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন, আগে ওঁদের রুগী দেখে আসি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরতে পারি ত যাব—ঠিকানা রেখে যান;—তানাত কাল সকালে।"

"বলে—'সে হবে না ডাক্তারবাবু—আমাদের দরকার আপনি বুঝতে পারছেন না।' বললুম—'ওঁদেরও ত দরকার—তানাত কেউ কি আসে,—না পয়সা দেয়!' তাতে বলে 'আপনার সে ভয় নেই ডাক্তার বাবু—আমি এক পয়সাও দেব না। ওদের পয়সা আছে—ওরা অন্য ডাক্তার নিয়ে যেতে পারবে।"

"যুক্তিটা যেমন সুন্দর তেমনই লাভের···। ভাবলুম—মাথার গোলমাল আছে,—হাঁকিয়ে দিই। কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে এসে বসেছিলুম—উঠতে ইচ্ছা করছিল না,—কথাগুলো মন্দও লাগছিল না,—একটু চলুক না—এই হিসেবে বললুম, 'পয়সা দেবে না, যারা পয়সা দেবে তাদের অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাবে—তুমি খুব লোক ত?' তখন কাতর হয়ে বললে, 'আমি মুখ্খু লোক—তাই আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না ডাক্তার বাবু, আমি কি বললে আপনি বুঝবেন তা যে আমি জানি না। যে পয়সা দিতে পারে না সে কি কিছুই দেয় না ডাক্তার বাবু!' এই বলে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেললে। এই বার আমি মুস্কিলে পড়লুম। বললুম 'ও কি হে, তুমি জোয়ান পুরুষ মানুষ, তুমি—' আমাকে শেষ করতে না দিয়ে হাত জোড় করে বললে, "হ্যাঁ তা আমি খুব পারি,—রাঁধতে, জল তুলতে, বাসন মাজতে, যা বলবেন আমি রোজ এসে করে যাব—আপনি কিন্তু দয়া করে চলুন।' আমার পরিবার বোধকরি পাশের কামরা থেকে সব শুনেছিলেন, তিনি দোরটা খুলতেই তাঁর দিকে চেয়ে বললে, 'আপনি একবার বলুন ত মা, আমাদের বড় বিপদ—তা উনি বুঝতে পারছেন না।' তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'উনি যাবেন বই কি—এক্ষুনি যাবেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে রেখো।'

'আমি এক ঘণ্টার বেশী রাখব না মা।'

'তাই রেখো, কিন্তু কাল আমাকে ডেকে খবর দিয়ে যেও—তোমার দাদা কেমন থাকেন!' এ কথাও বলে দিলেন, 'ওঁর সব কথাই বুঝতে একটু দেরী হয়—তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।' তার পর অনেক কথা!

"আমার আটচল্লিশ বছর বয়সে এমন একটি লোক দেখি নি—এরা সব কিছু করতে পারে, আবার অপরকেও সব কিছু করাতে পারে—পাগলের সঙ্গে এদের এই প্রভেদ। ভাল কথা—(রোগীর দিকে চাহিয়া) উনি আপনার কি রকম ভাই,—সহোদর?"

বাবুটি চক্ষু বুজিয়া বুকে হাত দিয়া ঘষিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "সহোদর ভাইএর স্নেহের সঙ্গে অজ্ঞাতে দেনা-পাওনার একটা দাবী থাকে—এঁর কেবল সেইটে নেই, অন্ততঃ পাওনার পরওয়া নেই। দীনেন্দ্র ছিলেন আমার সহোদর ভাই—ভগবান আমার বই পড়া ধারণাগুলোর ব্যর্থতা বুঝিয়ে দিতে তাকেই আবার মিলিয়ে দিলেন।"

ডাক্তারবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তা হ'তে পারে, কিন্তু বুকে অত' হাত বোলাচ্ছেন কেন? আমি কয়েকবার লক্ষ্য করলুম,—এটা কি অভ্যাস?"

"না ডাক্তারবাবু—অভ্যাস নয়। তিন বৎসরের ভাবনা চিন্তার তপ্তশ্বাসে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পুরে, জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে। চখে জল এলে একটু শান্তি পাই,—শুকিয়ে গেছে, সে আর আসে না! হৃদয়টা কিন্তু বাইরে এসে আত্মপ্রকাশ করতে চায়,—পারে না, আমাকে যন্ত্রণা দেয়। এই রকম করে' সামলাই।"

ডাক্তারবাবু তন্ময়বৎ শুনিতেছিলেন,—তাঁর একটা নিশ্বাস পড়িল। বলিলেন—"আপনার নামটা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আপনার কিছু কিছু আমার শোনা দরকার বলে মনে হয়। আপনি দেখছি শিক্ষিত লোক, ডাক্তারকে সাহায্য করবার মত' যেটুকু দরকার আপনি তা বোঝেন—"

বাবুটি বলিলেন—"বোঝাবুঝির শক্তি বোধ হয় না যে আর আমার আছে। যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁদের কাছে আমার কোনো সঙ্কোচ বা বাধা বোধ করবার মত' কিছুই নেই। তিন বৎসর প্রকাশের পথ না পেয়ে যারা আমাকে জীর্ণ করেছে' আর আমার মধ্যেই জীর্ণ হয়েছে, তারা মুক্ত হলে, আমি একটু হালকা হয়ে আরাম পেতে পারি।"

জয়হরি এক বাটী গরম দুধ লইয়া আসিল, এবং ডাক্তারবাবুকে বলিল—"এক ঘণ্টা হয়েছে—তা জানেন? আর দেরী করবেন না।"

"হ্যাঁ—এই উঠলুম বলে। একটা দরকারী কথা শুনে নিয়েই যাচ্ছি।"

"মাকে কিন্তু বলবেন—আমি এক ঘণ্টার বেশী থাকতে বলিনি, আপনিই দেরী করেছেন।"

আমি কেবল দেখিতে আর শুনিতে ছিলাম। সবটাই আমার কাছে আশ্চর্য্যবৎ ঠেকিতেছিল। রোগীর শয্যায় একখানা Wordsworth পড়িয়া ছিল, তাহাই নাড়াচাড়া করিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম—এই Wordsworthই জয়হরির কাছে মাইনর স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় স্বরূপে Word-book হইয়া থাকিবে! রোগীর সম্বন্ধে কিছু জানিবার ঔৎসুক্য যে না বোধ করিতেছিলাম এমন নহে। কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসার লজ্জাকর পরাজয়ে, সে প্রলোভন—আপনার মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গটা তুলিয়া আমাকে উৎকর্ণ করিয়া দিলেন।

ডাক্তার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জয়হরি বলিল—"তবে তামাক সাজি।"

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বলিলেন—"ও কাজটার কথা তো হয়নি;—আমি তামাক খাইনা।"

জয়হরি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনি তামাক খান না! তবে আপনার call (ডাক্) কি করে হয়! যে ডাক্তার তামাক খান—তাঁকেই তো লোক খোঁজে,—নাড়ী টিপেই গাড়ীতে পা বাড়াতে পারেন না। দুদণ্ড পাওয়া যায়।"

ডাক্তারবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"জয়হরির যুক্তিগুলি যেমন নূতন তেমনি অকাট্য! দেখছি ওঁদের গ্রামে আমার অন্ন হ'ত না!"

জয়হরি ছিল গুড়ুকের যম; তবে মাতুলের মত তোয়াক্কা ছিল না,—ভালমন্দ বাচিত না। তার টানে টানে ধূমাবতী মূর্ত্তিমতী হইতেন, কুয়াশার সৃষ্টি হইত! চাকরটা খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইত না, ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিত,—"বাবু ঘরে নাই!" সে আমার সামনে তামাক খাইত না, অথচ কি করিয়া যে বাঁচিয়া ছিল, সেটাও আমার একটা চিন্তার বিষয় ছিল। তাই দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার সিগারেটের টিন্‌টা আমাকে বৈঠকখানায় ভুলিয়া যাইতে হইত।

ডাক্তারবাবু যেন একটু ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—এইবার সংক্ষেপে বলে ফেলুন তো—রোগটা দেখা দেবার কিছু পূর্ব্ব থেকে;—যা আপনি নিজে উল্লেখযোগ্য মনে করেন।"

তিনি বলিলেন—"না ডাক্তারবাবু, আমার সে সব আর আসবে না। আপনারা আমার দৈবলব্ধ শেষ আশ্রয়, আপনাদের কাছে আমি যতটুকু পারি বলে যাই,—তাতে আমি শান্তি পাব। তবে আমার জীবনের কোনো কথাটার মূল্য আর আমার কাছে নাই। তারা কেবল—নিদ্রার দুঃস্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় সাজা। যা আমার জীবনটাকে সংক্ষেপ করে দিলে—তা আমি সংক্ষেপেই বলে যাব। তার অনেক কথাই ডাক্তারবাবুর কাজে আসবে না, কিন্তু না বললেও আপনাদের রহস্যের মধ্যে রেখে যেতে হবে,—তাই বলা। আমাদের বাড়ী ছিল খিদিরপুরে। বাবা সামান্য চাকরি করতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র প্রয়াস

ছিল আমাদের দুই ভাইকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া। মায়ের দেখা দিলে রক্তপিত্ত।—তিনি দ্রুত অপটু হয়ে পড়ায়, আমি বি-এ পাস্ করার পরই আমার বিবাহ দেওয়া হয়। এম্-এ পড়তে পড়তে ল-য়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। এই আমার অতিরিক্ত পরিশ্রমের আরম্ভ।

"আমিও এম্-এ পাস্ হলাম, মাও দেহত্যাগ করে রোগমুক্ত হলেন। বাবা এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না,—তিন মাসের মধ্যেই হৃদরোগে মারা গেলেন। আমাকে বল সঞ্চয় করতে হল। দুইটি প্রাইভেট্ টিউসনি স্বীকার করে ল-টা দিলুম,—পাস্ হলুম। আমার "অনাথ" তখন হয়েছে, মাস সাতেক পরে "মলিনা"ও হল। পত্নীর খাটুনির অন্ত নাই। ছোট ভাই দীনেন কিন্তু দিন দিন কেমন নীরব হয়ে এল',—নিভৃত খুঁজে বেড়ায়,—একান্তে থাকে! আমার পথদে' হাঁটে না—কি বাইরে কি অন্তরে!

"অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনেও আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আমাকে ঠেলে নিয়ে ছুটছিল,—দীনেন কিন্তু হাল্ ছেড়ে দিলে! উৎসাহের মধ্যে তার রইলো—তার বৌদিদিকে সাহায্য করাটা। দু'বছর সম্পূর্ণ করে' বি-এ আর দিলে না,—পড়া ছেড়ে দিলে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে—'কি হবে, পড়া তো হয়েছে, সবই এক কথা! তার চেয়ে ফি'র (fee'র) টাকায় আপনি একটা ঝি রেখে দিন—অনাথের বড় অযত্ন হচ্ছে!'

"এখন তাদের কে দেখছে ভাই! কেউ আছে কি নেই তাও তো জানিনা!" উদাস মৃদু কণ্ঠে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সামলাইয়া বলিলেন—"দীনেন্দ্রকে অনেক বোঝালুম, —কিছুতে উৎসাহিত করতে পারলুম না। সে বললে— "আচ্ছা—একবার দিন কতক ঘুরে আসি,—বাংলা দেশটা দেখে নি। শুধু বইয়ের মধ্যে দিয়ে দেখলে আর তারপর জীবনটা টাকা রোজগারে উৎসর্গ করলে কেবল পেছিয়েই পড়া হয়,—জন্মটা বিফল হয়ে যায়। ফল কথা—তরুণ বয়সের আঘাতগুলা তাকে উৎসাহহীন করে দিয়েছিল,—সে ভগবানের মধ্যে আশ্রয় বা আরাম খুঁজছিল। আমি মনে মনে হাসলুম—কারণ দুর্ব্বলেরাই ওই আশ্রয় খোঁজে;—ব্যথাও বোধ করলুম,—বাধা দিলুম না।

"মাস চারেক পরে সে জ্বর নিয়ে ফিরে এলো। আমার প্রাণটা দমে গেল। সে হেসে বললে—"ও কিছু নয়, পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়েছে। কষ্টে ক্লান্তিতে বিপদে তাঁর কৃপা চাক্ষুষ করেছি, তার বাড়া লাভ আর কি আছে,— শান্তি বোধ করেছি।" ইত্যাদি।

"এ সব বকে কি! শুনে আমার ভয় হল—মাথা খারাপ হ'ল নাকি! যাক্, আমি ল-টা পাস্ ক'রে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলুম, সেও শয্যা নিলে। ডাক্তারেরা বললেন—থাইসিসের সূচনা। তাঁরা যা যা বললেন তাই করলুম,—শেষ বাড়ী বাঁধা দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে রইলুম। যা ঘটবার তাই ঘটলো। ভাই গেল, বাড়ী গেল,—সর্ব্বস্বান্ত হয়ে আবার প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করলুম। তাতে চলে যাচ্ছিল। এইবার নিজের অজীর্ণ দেখা দিলে, অল্পদিনেই অপটু করে ফেললে। ডাক্তারেরা বললেন— সত্বর পশ্চিমে গিয়ে কোনো ভাল জায়গায় থাকা চাই— অন্ততঃ তিন মাস। হাতে মাত্র তিনশত টাকা জমে ছিল। অর্দ্ধেক স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে অর্দ্ধেক নিজে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম,—সে প্রায় তিন বছর পূর্ব্বের কথা। সে টাকায় কোনো প্রকারে পাঁচ মাস চালিয়ে ছিলাম;—তার পর আমাকে যে অবস্থায় পেয়েছেন সেই অবস্থায় কেটেছে। কোথাও রোগের উপশম হয় নাই। কি কি ভাবে কেটেছে—সে অনেক কথা। দুটি পয়সার অভাবে আজ নয় মাস কারুর সংবাদ নিতে পারিনি! এ শরীর নিয়ে ফিরেই বা ফল কি, যাবই বা কোথায়? শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। তখন আমি বহু দূরেও— টুণ্ডুলায়। তারপর—'এখানে এসেছি' বললে ঠিক বলা হল না,—'এখানে আনলেন।'

"কোথায় কি ভাবে আর কেমন করে' যে এই দীর্ঘ দিন কেটেছে, সেটা আমার নিজের কাছেই রহস্যময়। এত বড় অসম্ভব সম্ভব হওয়া আমি এখন নিজেই বিশ্বাস করতে বা মনে করতে পারি না। এই মাত্র স্মরণ আছে— চিন্তা, দৈন্য, অনশন, অনিয়ম, অনিদ্রা, অনিশ্চিতের উপর নির্ভর ও নির্ব্বাহ, যথা তথা যাপন, শরীর নিগ্রহ,—এরা আমাকে রোগের যন্ত্রণা আর স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা থেকে কোথায় সরিয়ে আড়াল করে' রেখেছিল!—সকলকেই বন্ধু ভাবে পেয়েছিলাম!

"আমার শিক্ষাই আমাকে সব চেয়ে ভুগিয়েছে। নিজের

জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে অস্বীকার করে, সহজে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিতে পারিনি। দীনেন্দ্র বলেছিল—"একটা ভুল না হয় করলেন,—তাতে বড় বেশী ঠক্‌তে হবে না।" আমার অহঙ্কার কিন্তু তাতে সায় দেয়নি,—শিক্ষিতের কাছে সেটা যে আত্মপ্রবঞ্চনা,—সে যে প্রমাণ চায়! কিন্তু আড়াই বছরের বৈচিত্র্যময় অবস্থা আমাকে কতই দুরূহ সমস্যা আর সঙ্কটের ভেতর দিয়ে টেনে এনেছে—বিচার বুদ্ধির মধ্যে যার সমাধান নেই! কাঁগাতকই বা তাদের accident বলে' মন শান্তি পায়! কিছু বুঝতে না পেরে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি শেষ লজ্জায় মাথা নুইয়েছে! দেখুন,—কি অবস্থায় যে মৃত্যু বলে' জিনিসটাকে পাওয়া যায় বলতে পারি না। আমি কতবারই সে সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছি বলে' মনে হয়!"

ডাক্তার বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার নামটি শোনা হয় নি।"

"গণেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

ডাক্তার বাবু পুনরায় বলিলেন—"দেখুন গণেনবাবু, আমি ডাক্তার, আমার উচিত আপনাকে বিশ্রাম দেওয়া; আপনার মত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের, কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ও রুগ্ন শরীরে, অপরিচিত অবলম্বনে প্রবাসে আড়াই বছর কাটানই একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! সে শোনবার ইচ্ছা আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু আজ নয়—আগে আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। আজ কেবল একটি মাত্র কথা শুনে উঠবো,—টুণ্ডলা থেকে বৈদ্যনাথ অল্প পথ নয়—এলেন্ কি উপায়ে? সেখানে ছিলেনই বা কোথায়?"

"এ ব্যাপারটার মধ্যে তেমন বিস্ময়কর কিছুই নেই। আর উপায় বা উপায় চিন্তা আমাকে কোনো দিনই নিজেকে করতে হয় নি,—কারণ সেটা সেই পারে যার কোনো একটা কিছুর উপর দাঁড়িয়ে ভাববার ভিত আছে। একটু আগে থেকেই বলতে হয়। এটোয়া খুব স্বাস্থ্যকর স্থান; কেবল স্থান আর আমাকে কতটুকু সাহায্য করবে! কোন' প্রকারে কিছুদিন কাটিয়ে কোনো ফল পেলুম না। কি করি,—কোথায় যাই! নিত্য ইষ্টেসনে এসে উদাস ভাবে ট্রেনের যাতায়াত দেখি, আর কত কি ভাবি। গার্ডেরা বোধ হয় লক্ষ্য করতো। সম অবস্থাই সমবেদনা আনে। একজন গার্ড একদিন নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন,—খুব মধুর ও করুণ তাঁর কথাগুলি! একজন খাঁটি ইংরেজ—আমাকে ডেকে এমন ভাবে কথা কচ্ছেন! আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমি কেন নিত্য উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি,—এর পশ্চাতে কোনো কঠিন আঘাত আছে কি? তাঁর দ্বারা যদি সামান্য সাহায্যও সম্ভব হয় তো তা বলতে আমি যেন সঙ্কোচ বোধ না করি। ইত্যাদি। এ কি!

"বহুদিন পরে আমার বেদনাতুর হৃদয়ে সহসা কে যেন শীতল প্রলেপ দিলে। আমি আমার এখনকার অবস্থা ও মনোভাব তাঁর কাছে একটুও গোপন করতে পারলুম না,—তারা সহজ পথ পেয়ে বেরিয়ে গেল,—সে যেন আত্মায় আত্মায় কোলাকুলি! তিনি বললেন—"টুণ্ডলায় অনেক বাঙ্গালী বাবু থাকেন—রেলে কাজ করেন; চল সেখানে তোমাকে পৌঁছে দি। কষ্ট হবে না,—স্থানও স্বাস্থ্যকর।" তাঁর সঙ্গে টুণ্ডলায় চলে এলুম। ইষ্টেসনে পৌঁছে—তিনি আমাকে সঙ্গে করে কেলনার কোম্পানার হোটেলে ঢুকে আমার জলখাবার ও আর যা যা দরকার হবে তার ব্যবস্থা করে—তাঁর নিজের নামে বিল্ করতে বলে দিলেন। তার পর আমার করমর্দ্দন করে বললেন—"তুমি কেন হতাশ হচ্ছ বন্ধু—তোমার ত সবই রয়েছে,—তুমি সেরে যাবে। আচ্ছা—আবার দেখা হবে",—বলেই—ট্রেনে উঠে ফ্ল্যাগ দেখালেন। ট্রেন চলে গেল। আমার যেন স্বপ্ন ভাঙলো! ট্রেনখানা চলার সঙ্গে আমার হৃদয়টাতে টান্ পড়তে লাগলো,—আমার যে কতখানি ওর সঙ্গে চলেছে!

"সবে তিন সপ্তাহ হল—গার্ড সাহেবের পত্নী বিয়োগ হয়েছিল। হৃদয়ের শূন্য স্থানটা কিছু দিয়েই তিনি পূর্ণ করতে পারছিলেন না, বেদনা-ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলেন,—কোনো কিছুই তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। নিজের দুঃখকষ্ট—অপরের দুঃখকষ্ট মোচনে কমে,—ত্যাগের মাধুরী তৃপ্তি দেয়। তাঁর শোকার্ত্ত হৃদয় আমার মুখে প্রতিচ্ছবি পেয়ে সমবেদনায় আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমি তো এই আকস্মিক ঘটনার অন্য কারণ খুঁজে পাই না।

* * * *

"অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবু এখানকার রেলে কাজ করেন। অনেকেরি দিনরাত পালা করে খাটুনি। কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টারে স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন। যাঁরা একক

তাঁরা ৩.৪ জনে মেস্ করে একটি কোয়ার্টারে কাটান। শুধু খাটুনি আর খাওয়া নিয়ে মানুষের থাকা কঠিন যদি আনন্দের অবকাশ না থাকে। সেটা তাঁরা করে নিয়েছেন। তাঁদের থিয়েটার, কন্সার্ট দুই-ই আছে আর তাতে খুব উৎসাহও আছে।

"যাঁরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন—তাঁদের কোয়ার্টারে স্থান পাওয়া সম্ভবই ছিল না। আর মেসে গান বাজনা অভিনয়ের মধ্যে আমার মত পীড়িত অকর্ম্মণ্যের থাকা কোনো পক্ষেরই সুবিধার নয়। ওয়েটিং রুমে রাত্রে রেলের ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারিদের অবিরাম আসা যাওয়া, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি। যাই কোথা। শীতবস্ত্র নেই,—একটু হাওয়ার আড়ালও পাই না। কখনো প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বেঞ্চে শুই, আবার উঠে এদিক ওদিক বেড়াই—না নিদ্রা, না স্বস্তি। এই ভাবে তিন দিন কাটলো, আরো দুর্ব্বল হয়ে পড়লুম, মাথা ঘুরতে লাগলো। যা একটু আশায় আলো ধরে বুঝছিলুম সেটুকু নিবে গেল। সেই দিন ভগবানের শরণ নিলুম—মানুষের শেষ অবলম্বন! দীনেন বলেছিল 'বড় বেশী ঠকতে হবে না।'

"শরীর মন তখন চিন্তা চেষ্টার বাইরে গিয়ে পড়েছে, আমি পরের জিনিসের মত একখানা বেঞ্চে পড়ে রইলুম। ক্লান্ত দুর্ব্বলদেহে সংজ্ঞা ছিল না। ঘণ্টার শব্দে আর লোকের গোলমালে ঘুম ভাঙলো। দেখি চার ঘণ্টা কেটে গেছে, একটু স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। এক্সপ্রেস আগের ইষ্টেসন ছেড়েছে, তাই যাত্রীদের এত চাঞ্চল্য। আমি যে বেঞ্চিখানিতে ছিলুম—তার আশে পাশে আর সামনে সস্ত্রাক একটি বাঙ্গালী বাবু ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে আর অনেকগুলি পোঁটলা পুঁটলি ট্রঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত,—কুলিরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটি ৩।৪ বছরের ছেলে—বেঞ্চির ওপর, আমার পাশেই বসে একটা বল আর একটা কমলানেবু নিয়ে একমনে খেল্‌ছে। এত গোলমালে তার কোনো দিকেই নজর নেই। গাড়ী যত নিকট হ'তে লাগলো—চাঞ্চল্যও সেই পরিমাণে বাড়তে লাগলো। কুলিরা বাবুটিকে বললে—"বাবুজি গাড়ী আজ বহুৎ লেট্ হায়—আধা ঘণ্টাসে উপর,—যাস্তি ঠ্যারেগা নেহি, জল্‌দি ঠিক্ ঠাক্ কর্‌লেনা।" বাবুটি আরো ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন। গাড়ী ইষ্টেসনে না দাঁড়াতেই চারজন কুলি মোট নিয়ে ছুটলো, বাবুটি স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে অনুসরণ করলেন।

"আমি সেইদিকেই চেয়েছিলুম। দু তিনবার ঘোরাঘুরির পর কুলিদের তাড়ায় একখান মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে তাঁরা উঠে পড়লেন, তারাও তাড়াতাড়ি মোটমাটগুলি নাবিয়ে দিলে,—প্রথম ঘণ্টার ঘাও পোড়লো। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলুম। তখন চোখ ফিরিয়ে দেখি সেই ৩।৪ বছরের ছেলেটি তখনো তার বল্ আর কমলা লেবু নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলছে। কি সর্ব্বনাশ—গাড়ী যে এখনি ছাড়বে! বললুম "খোকা তুমি যাবে না?" তার চট্‌কা ভাঙলো, এদিক ওদিক দেখে, নেবে পড়ে "বাবা-বাবা," করে উঠলো। আমার সামর্থ্য নেই—তাকে কোলে করে' ছুটে গিয়ে দিয়ে আসি। তবু উঠে পড়লুম—তার হাত ধরে গাড়ীর দিকে চললুম,—দ্বিতীয় ঘণ্টাও দিলে। প্রাণটা শিউরে উঠলো। যতটা পারি দ্রুত চললুম। আমার ডাক সে গোলমালে তাঁদের কাছে পৌঁচচ্ছিলনা। আমরা যখন দু হাত তফাতে তখন গাড়ীতে মোসন্ দিলে!

"আমি এখনো জানিনা কি করে সেই ছেলেকে তুলে নিয়ে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম। দোরের সামনে মাত্র একহাত স্থান ছিল—আর সব মোটমাটে ভরা। তাঁরা তখনো তাই নিয়ে বিব্রত। আমি থর্ থর্ করে কাঁপছিলুম—অন্ধকার দেখে সেই মোটের উপরেই ঘুরে পড়ি। আশ্চর্য্য—বাইরে পড়িনি! যখন কথা কইতে পারলুম—তখন এক ইষ্টেসন্ পার হয়ে এসেছি। তার পর যা স্বাভাবিক—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি। আমি বললাম,—"এখন আমাকে আগের ইষ্টেসনে নাবিয়ে দিন, আমার টিকিট নেই;—একটু সাহায্য করলেই হবে—বড় দুর্ব্বল বোধ করছি।"

"তবে! এ অবস্থায়!—সেখানে কি আপনার কেউ আছেন, না—টুণ্ডলায় ফিরে যাবেন?"

একটু হেসে বললুম—"আমার সব ইষ্টেসনই সমান,—সব লোকই আপনার লোক।"

ভদ্রলোকটি আমার অবস্থাটা বোধ হয় কতকটা অনুমান করে সহানুভূতির স্বরে বললেন—"যদি বাধা না থাকে তো জানতে পারি কি কোথায় গেলে আপনার সুবিধা হয়, বা কোথায় যাবার আপনার ইচ্ছা?"

"না,—কোনো বাধাই আর আমার নাই; সুবিধার চিন্তাও আমি ত্যাগ করেছি। তবে আজ দু'দিন মাঝে

মাঝে মনে হ'য়েছে—শেষটা বৈদ্যনাথের আশ্রয়ে গিয়ে পড়তে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হই,—তিনি যা হয় করুন। আর পারছিনা।"

বাবুটী বাধা দিয়ে সাগ্রহে বলে উঠলেন—"মাপ্ করবেন, আমি রেলওয়ে এজেণ্ট আপিসে কাজ করি, পাস্ নিয়ে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম, বাড়ী ফিরছি। আর দু'জনের আসবার কথা ছিল—তাঁরা আসতে পারেন নি। এতে আমার এক পয়সার খরচ নেই। আপনি অমত না করলে আমরা বড়ই শান্তি অনুভব করবো। তবে আপনার শীতবস্ত্রাদি বোধ হয় টুণ্ডুলায়"—

"না,—যা আমার গায়ে আছে এই আমার সব। তবে—ছোট একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে সামান্য দু একটা জিনিস ছিল,—সে গেলে কোনো ক্ষতিই নেই।" বাবুটি তাঁর স্ত্রীর দিকে চাইতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁদের মোটগুলির পাশ থেকে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ তুলে তাঁর স্বামীর হাতে দিতেই তিনি সেটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"এইটিই আপনার নয় তো? কুলিরা আমাদের পুঁটলি পাঁটলার সঙ্গে এটিও এনে ফেলেছে—ট্রেন ছাড়বার পর দেখতে পেলুম! তাই আলাদা করে রাখা হয়েছে।"

"আমি একটু হাসলুম, বললুম—'হাঁ—আমারি বটে। ভগবানের ব্যবস্থা এগিয়ে চলে, তিনি এখনো আমার খবর রাখছেন।" একটা নিশ্বাসও পড়লো। যাক্,—তার পর তিনি আমাকে যশেডি ইষ্টেসনে নাবিয়ে দিলেন। পাণ্ডারা যাত্রী ভেবে ঘিরেছিল, তাদের একজনকে বললেন—"তুমি এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিও—কষ্ট না হয়। ওঁকে কোন বিষয়ে পেড়াপিড়ি কোরো না—একটু দেখো।" তার পর আমার নিষেধ সত্ত্বেও তার হাতে কিছু দেন,—কত তা জানি না। তার নামটিও জেনে নেন। কম্বল কয়খানি কখন দিয়েছিলেন তা আমি জানতে পারি নি।

"এই ভাবে আমার বৈদ্যনাথের আশ্রয়ে আসা বা আমাকে তাঁর নিয়ে আসা।"

আমরা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। তেমনি অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, কাহারো মুখে কথা ফুটিল না।

গণেন বাবুই বলিলেন—"যাক্,—এখন কেবল একটি কথা নিবিড় হয়ে আজ কদিন প্রাণের মধ্যে জেগেছে, সেই আমাকে স্ত্রীপুত্রের কাছে অপরাধী করে রেখে নিয়ে চলল। সে ব্যথার ত রূপ নেই যে রেখে যাব।"

একটি ছোট নিঃশ্বাস পড়ল; তিনি চোখ বুজলেন। মিনিটখানেক নীরবে কাটবার পর তিনি বললেন "আর আমার বলবার কিছু নেই ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার বাবু নির্ব্বাক শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "কিন্তু আমার যে কিছু বলবার আছে গণেন বাবু।"

তিনি ধীরে ধীরে চাহিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আপনি নিজেই অনুভব করেছেন—আপনার রোগ সেরে গেছে। তার চেয়ে বড় প্রমাণ ডাক্তারের হাতে নেই। এখন কেবল স্ত্রী পুত্রের কাছে অপরাধী থেকে যাওয়াটাই আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে, এটাও রোগমুক্তির অন্যতম লক্ষণ—রোগে ও আশা কমই থাকে। আপনি সেরে গেছেন। আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—আপনি ও বৃথা চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিন—ওইটাই আপনার prostration এর কারণ। আমি আশা করি এক সপ্তাহেই আপনি বল পাবেন।" পরে জয়হরির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন এঁকে দেখা শোনা আর সময় মত খাওয়াবার ভার তোমার।"

জয়হরি সোৎসাহে বলিল—"সে আপনি দেখবেন আমি কি রকম খাওয়াই। আমি যেমন করে পারি—"

এইবার আমাকে বাধ্য হইয়া কথা কহিতে হইল। বলিলাম, "ডাক্তার বাবু, আহারের ওজন বোধটা জয়হরির খুবই কম। উনি যা করবেন ভাল ভেবেই করবেন বটে কিন্তু গণেন বাবু তা সইতে পারবেন কি না সন্দেহ।"

"তাই নাকি হে!"

"আজ্ঞে বিদেশে তেমন সুবিধে নেই, তবুও ভাল যা পাব যেমন করে হোক—তা দেখে নেবেন ওঁর কাছেই শুনবেন।"

"সর্ব্বনাশ!—তবে আর কাকে?" বলিয়া ডাক্তার বাবু সেই যুবকদ্বয়ের দিকে চাহিলেন।

জয়হরি কাতরভাবে বলিল, "আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন ডাক্তার বাবু—আমি আপনার ওখান থেকেও ত' আনতে পারি—কম খাওয়াব কেন? উনি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল পান—মাংস, হালুয়া"

গণেন বাবুর মুখে হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন, "ওঁর কথা আমি ঠেলতে পারব না ডাক্তার বাবু, ওঁকে আপনি ঠিক করে বুঝিয়ে বলে দিন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এখন এক সপ্তাহ মাগুর মাছের ঝোল আর পুরাতন চালের ভাত ডুবার খাবেন, আর ডুবার আধসের করে দুধ। সুবিধা হয় ত ফলের মধ্যে বেদানা আর নেবু—ব্যাস্। বুঝলে!"

"আজ্ঞে হাঁ, তা বুঝেছি, কিন্তু—"

"এখন এক সপ্তাহ কিন্তু টিফ্ নয়।"

সেই যুবকদ্বয় বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমরা তিনজন রইলুম, কোন রকম অনিয়ম কি অসুবিধা হবে না।"

"বেশ, তবে এখন উঠতে পারি জয়হরি!"

"আমি ত আপনাকে কখন উঠতে বলেছিলুম! আপনি তামাকের স্বাদ পেলে দেখছি ভোর হয়ে যেত। আমি কিন্তু মার কাছে মুখ দেখাতে পারব না।"

"না না—কাল তোমার যাওয়াই চাই। গণেনবাবুকে খাইয়েই যেও। আমি অপেক্ষা করব। ওইখানেই কাল খাবে, আর যদি কিছু কাজ থাকে,—বুঝলে!"

পরে দু এক কথার পর ডাক্তার বাবু উঠিলেন, আমিও উঠিলাম।

নামিয়া দেখি জয়হরি আমাদের পূর্ব্বেই নীচে নামিয়া অপেক্ষা করিতেছে! ডাক্তার বাবুকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক করে বলুন, কোনও ভয় নেই ত, ওঁর ছেলে মেয়ে আছে ডাক্তারবাবু!"

"রোগের জন্যে ত ভয় নেই, ভয় কেবল তোমার জন্যে। মঙ্গল ইচ্ছা আর পেট এ দুটো যে এক জিনিস নয় সেইটে মনে রাখলে ভয়ের কোনও কারণই নেই।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

রাস্তার ওপারেই আমাদের আস্তানা; আমরাও বাসায় পৌছিলাম।

জয়হরি জিজ্ঞাসা করিল "ডাক্তারবাবু কি বললেন বুঝতে পারলুম না।"

বলিলাম, "গণেনবাবুকে খাওয়ানো সম্বন্ধে খুব সাবধান হতে বললেন। যা ব্যবস্থা করে গেলেন ঠিক সেইটেই করা চাই। অন্য কিছু দেওয়া না হয়।"

বাণেশ্বর আসিয়া জয়হরিকে সংবাদ দিল, "সব হয়ে গেছে—মা ডাকছেন।" সে ভিতরে চলিয়া গেল।

দেখিতেছি ক্রমে আমি সাংখ্যের দ্রষ্টায় দাঁড়াইয়া গেলাম। জগতে অনেক জিনিসই দিন রাতের মত আসে—চাহিতে হয় না,—ভাবনাটাও তাহাদেরই একজন। আজ কিন্তু শরীর মন দুই-ই অবসন্ন হইয়াছিল। আমার অজ্ঞাতেই ভাবনার বাহিরে গিয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে ভাবিতাম আমার ভবিষ্যৎ বলিয়া যাহা ছিল তাহা চুকাইয়া ফেলিয়াছি, এখন কেবল স্রোতাধীন থাকা,—"রয়েছে দীপ না আছে শিখা"—আজ তাহাতে সন্দেহ আসিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

রস-তত্ত্ব

শ্রীঅনিলকুমার বসু এম-এ

সন ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' মাননীয় অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ মহাশয়ের 'রস-তত্ত্ব' শীর্ষক একটী জ্ঞানগর্ভ ও চিন্তাকর্ষক দার্শনিক প্রবন্ধ বাহির হয়। কিন্তু রচনায় যেরূপ মৌলিকতার পরিচয় আছে এবং সত্যসাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে, তদনুরূপ তাহার কোনও আলোচনা এতাবৎ বাহির হয় নাই বলিয়া, আজিকার এই আলোচনায় আমি কয়েকটী কথা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন, পরেশবাবু কর্তৃক উহার একটী আলোচনা বাহির হইয়াছিল; কিন্তু মূল প্রবন্ধ ও সমালোচনা পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে দেখা যায়, সমালোচক লেখকের প্রধান বক্তব্য বিষয় লইয়া বিশেষ কিছুই আলোচনা করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত সমালোচনা সম্বন্ধে আমি কোনও কিছু বলিব না। মূল প্রবন্ধই আমার আলোচ্য বিষয়।

এ কথা প্রথমে স্বীকার করিতেই হইবে, জটিল ও দুরূহ দার্শনিক তথ্য সরল ও সরস ভাষায় লিখিতে অধ্যাপক

মহাশয় অদ্বিতীয়। তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই নিমিত্তই পরম উপভোগের সামগ্রী হয়। সুতরাং সমালোচক যিনিই হউন না কেন, অধ্যাপক মহাশয়ের ভাষা ও লিখিবার ভঙ্গীর উপর তাঁহার বলিবার যে কিছুই থাকিতে পারে না, এ কথা না বলিলেও চলে। তবে মূল বক্তব্য লইয়া তাঁহার সহিত আমার দুই এক স্থানে মতভেদ আছে; তাহাই আমি এই আলোচনায় লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রবন্ধের মূল কথাগুলি প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। আমাদের মনের মধ্যে দুইটী প্রবাহ বহিতেছে—একটী জ্ঞান-প্রবাহ ও অপরটী রস-প্রবাহ। দ্রব্যে আমরা যে রসের কথা বলিয়া থাকি, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; সাহিত্যে যে রসের কথা বলি, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—মনের দ্বারা গ্রহণীয়। রস-প্রবাহ জ্ঞান-প্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাবও কল্পনা করা চলে না রস ও জ্ঞান যে মনের পৃথক বৃত্তি, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণেরও মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। Knowledge ও Feeling চিত্তের দুইটী পৃথক ধর্ম্ম। জ্ঞান বস্তু-গুণ-পরিচায়ক এবং Feeling অথবা অনুভূতি সুখ-দুঃখ-লক্ষণ। এই অনুভূতির দ্বারাই রসের আস্বাদন হয়। জ্ঞান ও বিচারের দ্বারা যতক্ষণ আমরা বস্তুর গুণ বিশ্লেষণ করি, ততক্ষণ আমরা রসের কোনই সন্ধান পাই না। কিন্তু এইরূপ করিতে করিতে কখন সেই জিনিষের মধ্যে একটী চাখিয়া দেখিলাম, আর অমনি প্রাণে রস-ধারার সঞ্চার হইল। পরিশেষে জ্ঞানের উপর নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা হইয়াছে। রস শুধু প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগায় না; ইহা আত্মাতে এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি আনাইয়া দেয়। জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ। বিচার, বিশ্লেষণ অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না; অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিক কোনও বিষয় সম্বন্ধে মন ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং শেষকালে নেতিবাদে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু রসের নিষেকে যখন মন সরস হয়, তখন তাহার অনুভূতির পরিধি অনেক দূর বিস্তৃত হয়। দার্শনিক যেখানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন,— কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তি-বলে প্রবেশ করেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, প্রবন্ধে লেখক মহাশয় একটী জ্ঞানতত্ত্বের (Theory of Knowledge) অবতারণা করিয়াছেন। দর্শন, তথা সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সত্য নিরূপণ অথবা সত্য উপলব্ধি করা। এই সত্য উপলব্ধি চিত্তের কোন্ বৃত্তির দ্বারা সাধিত হয়, তৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। সে সমস্ত মতের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা শুধু দেখিব, লেখক মহাশয়ের এতৎ সম্বন্ধে মত কি ও তাহা কতদূর সঙ্গত।

মনের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বিচার ও বিশ্লেষণ করি, জ্ঞান অর্থে তাহাই বুঝিতে হইবে—সুতরাং ইহাকে আমরা Intellect অথবা Understanding বলিব। চিত্তের যে বৃত্তি দ্বারা চরম সত্যের দর্শন লাভ হয়, তাহাকে 'রস' বলা হইয়াছে। অনুভূতি (Feeling) দ্বারা এই রসের আস্বাদন হয়।

বিচার ও বিশ্লেষণদ্বারা যে চরম সত্যের সাক্ষাৎ লাভ হয় না, এ কথা খুবই সত্য এবং এ সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমার মতদ্বৈধ নাই। এই তর্কজাল-বিস্তারক বৈশ্লেষিক বুদ্ধিবৃত্তির উপর নিন্দাবাদ শুধু যে ভারতীয় ঋষিগণই করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু পাশ্চাত্য বহু দার্শনিকও দেখাইয়াছেন, এই Intellect অথবা Understanding চরম সত্যে উপনীত হইতে একেবারে অসমর্থ। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া', 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' এ সব আমাদের দেশের পুরাতন ঋষিবাক্য। সেণ্ট বার্ণাড্ (St. Bernard), একহার্ট (Eckhart) প্রমুখ পাশ্চাত্য Mysticগণ এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। আদর্শবাদী কাণ্টের (Kant) 'Antinomies of the Understanding সুবিদিত; এবং তাঁহারই অনুসরণ করিয়া Bradley তাঁহার Appearance and Reality গ্রন্থে বৈশ্লেষিক বুদ্ধি বৃত্তির অক্ষমতা দেখাইয়াছেন। বের্গসঁ (Bergson) Intuitionএর পক্ষ লইয়া Intellectএর বিস্তর নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে লেখক মহাশয়কে আমরা Mystic বলিব, অথবা জ্ঞানবিরোধী (Anti-Intellectualist) Bergsonian বলিব? একটু প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে—Mysticগণ এবং জ্ঞানবিরোধী Bergson Intellectএর সম্বন্ধে যে সকল দোষ দেখাইয়া Intuitionism প্রচার করিয়াছেন, লেখক সেরূপ কোনও কথা বলেন নাই। বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্ব্বাসনে

দিয়া এক রহস্যময় সত্যের উপলব্ধি করা যায়, অথবা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল Realityকে বিকৃত করিয়া এক মিথ্যা জড়জগতের সৃষ্টি করে—এ সকল কোন মতই প্রবন্ধে নাই। রসের সীমা যে বুদ্ধি-বৃত্তির সীমাকে অতিক্রম করিয়া আরও অধিক দূর অবধি বিস্তৃত, এই কথাই এ প্রবন্ধে আছে।

তবে কি লেখক মহাশয়কে আমরা Kantian বলিব? Plato, Aristotle, Spinoza ইঁহারাও বিচারশীল Intellect অপেক্ষা সত্যদর্শনলাভে সমর্থ আর এক উচ্চতর বৃত্তির কথার উল্লেখ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ দার্শনিক Hegelও Understanding অপেক্ষা Reasonকে বড় বলিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের মতকে উহাঁদের মতের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করা যায় কি না? উত্তরে বলিতে হয়—না; এবং এইখানেই লেখক মহাশয়ের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। Plato, Aristotle এবং Spinoza, ইহাঁদের Intuition জ্ঞানাতিরিক্ত হইলেও জ্ঞান হইতে অভিন্ন নয়; উহা জ্ঞানেরই চরম পরিণতি। যাহা কিছু সাধারণ বুদ্ধির অগম্য তাহাই, বুদ্ধির পরিণতি যে Intuition, তাহা দ্বারা পাওয়া যায়—এই কথাই ঠিক। Understanding দ্বারাই চিত্তে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। সুতরাং যাহা কিছু সাধারণ জ্ঞানের উপরে তাহা ঐ Understandingএরই চরম পরিণতি দ্বারা পাওয়া যাইবে—ইহা স্বাভাবিক।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন—"জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ, অথবা রসনিষিক্ত মনের পরিধি জ্ঞান অপেক্ষা অনেকদূর বিস্তৃত।" ইহার অর্থ এই হয় যে, Intellect যাহা জানাইতে পারে না, রস তাহা জানায়। ইহার উত্তরে আমরা বলি—রসকে জ্ঞানের সাধন বলা যায় না। যাহার কাজ আনন্দ দান করা—তাহা অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিকের বার্ত্তা কিরূপে বহন করিয়া আনিবে? আর তাহাই যদি পারে, তাহা হইলে তাহাকে "জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র" এরূপ কথা বলা অনুচিত। আনন্দ জ্ঞানেরই পরিণতি—এই কথা বলা আরও যুক্তিসঙ্গত হইবে। বর্ত্তমান সমালোচনায় আমার এই দুইটী প্রধান বক্তব্য; সুতরাং ইহাদের একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

উপনিষদে ব্রহ্মকে চিদানন্দ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম চিন্ময় অথবা বিজ্ঞানঘন। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সেই জন্যই তিনি আনন্দ। পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দ একই কথা। তাই ব্রহ্মকে কখনও বা আনন্দময় বলা হয়। সুতরাং আনন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ স্বরূপ। আমাদের প্রাণের আনন্দ হইতে আমরা জানিতে পারি—আমরা সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; সেইজন্য উপনিষদে সত্যম্ এবং আনন্দম্ একই কথা। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়িয়া যদি কিছু না বুঝি, তবে আনন্দও কিছুই পাই না। যখন উহার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করি, তখন আনন্দও পাই। গণিত-বিজ্ঞানবিৎ নিউটন্ যখন মাধ্যাকর্ষণী শক্তি আবিষ্কার করিলেন, এবং Archimedes যখন জলের Specific gravity আবিষ্কার করিয়া, 'Eureka' 'Eureka' বলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের প্রাণে যে আনন্দের রসধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, উহা সম্যক্ জ্ঞানেরই পরিণত ফলস্বরূপ আনন্দ।

শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলিতেছেন—রস হইতেই আনন্দ আসে, রস না থাকিলে আনন্দ থাকিত না। তাহাই যদি হইল, তবে আবার তাহা হইতে অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিকের (Metaphysical) জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? এরূপ কথা বলায় অধ্যাপক মহাশয়ের Theory of Knowledgeএ দ্বিত্ব দোষ (Dualism in Theory of Knowledge) আসিয়া পড়ে—চিত্তে এক বৃত্তি আছে, যাহা শুষ্ক, নীরস, অসম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মায়; এবং আর এক "স্বতন্ত্র" বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা অতিজাগতিকের সরস আনন্দময় জ্ঞান হয়। অধ্যাপক মহাশয় হয়ত বলিবেন "রসের বিজ্ঞাপনী শক্তি আছে, অথবা রস জ্ঞানের সাধন এমন কথা আমি বলি নাই; প্রাণে রস থাকার নিমিত্ত নীরস জ্ঞান সরস হয়, এই কথাই বলিয়াছি।" তাহার উত্তর আমি বলি যে, তাহা হইলে "জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ...অতীন্দ্রিয় আতিজাগতিক বিষয় সম্বন্ধে মন ধারণা করিতে পারে না... কিন্তু রসের নিষেকে যে মন সরস হইয়াছে, তাহার অনুভূতির পরিধি অনেক অধিক। দার্শনিক যেখানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তি বলে প্রবেশ করে' এ সকল কথা পরিহার করা উচিত; কারণ এস্থলে রসের অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধে (metaphysical) বিজ্ঞাপনী শক্তি আছে এই কথা সূচিত হইতেছে।

'দার্শনিক যেথানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তির বলে প্রবেশ করিতে পারেন' এস্থলে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহাশয়ের কবি, শিল্পী ও ভক্তের উপর পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হইতেছে; কারণ তিনি কবি, শিল্পী ও ভক্তকে দিলেন 'দিব্যশক্তি' এবং গরীব দার্শনিককে Intuition হইতে বঞ্চিত করিলেন। আমরা বলি, একমাত্র দার্শনিকই এই দিব্যশক্তির (Intuition) অধিকারী; এবং কবি, শিল্পী ও ভক্তকে চরম সত্যের উপলব্ধি করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে দার্শনিক কবি, দার্শনিক শিল্পী ও দার্শনিক ভক্ত হইতে হইবে। জ্ঞানকে ফাঁকি দিয়া সত্য জানা যায়—ইহা আমার মন বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না। লেখক মহাশয় বলিতেছেন 'জ্ঞানী দেখেন ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ আবছায়া মাত্র এবং বাধ্য হইয়া অজ্ঞেয়তাবাদে আসিয়া উপনীত হন'। ইহারও উত্তরে আমরা ঐ একই কথা বলি। দার্শনিক যখন Intellectএর গণ্ডীর মধ্যে থাকেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল কথা ঠিক। কিন্তু তিনি যখন আমার পূর্ব্ববর্ণিত Intuitionএ আসিয়া উপনীত হন, তখন তিনি সত্যের সম্পূর্ণ বিগ্রহ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হন। একমাত্র দার্শনিকই এই আনন্দের অধিকারী। "জ্ঞানী গঙ্গার মোহানা খুঁজিতে গিয়া বরফে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন। কঙ্করোপলের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসেন; কিন্তু ভাবুক ব্যক্তি গঙ্গার শীকর-শীতল বাতাস খাইয়া গঙ্গাজল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া তৃপ্ত হয়েন"—আমরা বলি এই শীকর-শীতল বাতাস খাইবার ও গঙ্গাজল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিবার অধিকারী 'ভাবুক' ব্যক্তি নহেন, তৃষিত, কঙ্করোপলে ক্ষত-বিক্ষত জ্ঞানী।

মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, বলিলাম। পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমার মতামত যদি কোথাও ভ্রান্ত হয়, শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। আর আমার আলোচনা দুই এক স্থলে বিরুদ্ধ হইলেও, আশা করি, তিনি তাহাতে রুষ্ট হইবেন না. কারণ সত্যপিপাসু দার্শনিকগণ সকল মতবাদকেই সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

১

মৌন তুমি, তাই এরা এত মিথ্যা কহে!
জানে তব রুদ্রপাণি বজ্র নাহি বহে
দম্ভ দিতে দর্পিতেরে! তুমি সংজ্ঞাহারা
পাষাণ প্রস্তর শিলা, অন্ধকার কারা!
জীবের জীবনধারা—নির্ঝরিণী নদী
যে বক্ষে লভিয়া জন্ম নিত্য নিরবধি
করুণা অমৃতস্তন্যে বসুধা বাঁচায়,
তাহারে বাঁধিবে এরা জড়ত্ব খাঁচায়!
অনন্ত রত্নে খনি নিত্য যার দান,
সে হ'ল নির্জ্জীব নিঃস্ব—অহল্যা পাষাণ!
যোগী তুমি মৌনবাক্—এরা চাহে কথা,
সমাধি যে ভিত্তিহীনবর্ব্বর-বারতা!
দেবাত্মা কহে না কথা, মগ্ন সৃষ্টিকাজে—
বাড়িছে মিথ্যার ধূলা তাই বিশ্বমাঝে!

২

শঙ্কর করেন বাস সমুচ্চ কৈলাসে,
জগন্মাতা—জন্ম তাঁর শৈলরাজ বাসে
মেনকা মায়ের কোলে! স্পর্দ্ধা ত অল্প না!
কার্য্যক্লীব কবিদের অলীক কল্পনা।
সেই সত্য, এরা যারে সত্য বলি মানে
আপন সঙ্কীর্ণ দুটি দৃষ্টিমাঝখানে;
দুদিনের বিজ্ঞানের তথ্যে রাখে বাঁধা
বিশ্বের বিধানবার্ত্তা না মানিয়া বাধা
অন্তরের দিক্ হ'তে; আত্মার প্রলাপ
দুর্ব্বলের সৃষ্টি বলি দেয় অভিশাপ;
অর্থছাড়া নিরর্থক সকলি বিশ্বের,
নিখিল গৌরব বাঁধা যাহাতে নিঃস্বের।
সেই শিক্ষা শ্রেষ্ঠ যার যত আস্ফালন,
বাকী সব মিথ্যা মায়া, ভীরুর স্বপন!

প্রার্থনা

শিল্পী—মহম্মদ আবদার-রহমান চগ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১৯)

রেখা প্রিন্সিপ্যালকে বলিয়া, খুব ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাশে পড়াইবার ভার চাহিল। ভার পাইয়া সে আনন্দিত হইল। সে ভাবিল যে এই ছোট মেয়েরা তাকে দুই বছরেই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। আট নয় বৎসর করিয়া অন্ততঃ তারা থাকিবে। তা' ছাড়া ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিয়া, খেলিয়া, তাদের সব ছোট ছোট কান্না-হাসি, খেলা-ধূলায় যোগ দিয়া, সে মনের ভিতর এমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দের সন্ধান পাইল যে, সে আপনি অবাক হইয়া গেল। তার ছাব্বিশ বছরের যৌবনের তলায় যে তৃষিত মাতৃহৃদয় লুকাইয়া ছিল, সে এখন ঝাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল,—সে আকুল ভাবে শিশুদের কাছে আত্মসমর্পণ করিল।

এই ছোট মেয়েদের পড়াশুনার চেহারা ফিরিয়া গেল। স্কুল-গৃহ একটা খেলাঘর হইয়া দাঁড়াইল—আর রেখা তাদের খেলার সাথী। বড় কেউ যদি তাদের খেলায় যোগ দেয়, তাতে শিশুদের যে আনন্দ, তাহা বলিবার নয়। তাহারা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। এই খেলার ভিতর দিয়া রেখা যে তাদের কোন ফাঁকে কেমন করিয়া অনেকটা লেখাপড়া শিখাইয়া দিল, তাহা তারা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিল না। রেখা যখন কাহাকেও কোনও একটা জিনিষ পড়িতে বলিত, তখন সে চেয়ারে বসিয়া বেঞ্চের কাছে দাঁড়ান মেয়েকে পড়িতে হুকুম করিত না। হয় সে উঠিয়া সেই মেয়ের কাছে যাইত, না হয় সে মেয়েকে কাছে ডাকিয়া লইত। কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া শিশুর সেই কোমল মসৃণ গালের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া সে তাকে পড়িতে বলিত। শিশু আনন্দের নেশায় মশগুল হইয়া পড়িয়া যাইত। ক্লাশের আর সবাই ছটফট করিত, কখন রেখা তাহাদের ডাকিবে!

এক একটা মেয়ে বড় বোকা। অন্য শিক্ষয়িত্রীরা তাদের গালাগালি দেন বা অগ্রাহ্য করেন। রেখা তাদের কোলে টানিয়া লইয়া তার সঙ্গে আলাপ করিত। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে তার মনের সন্ধান লইত। তার ব্যর্থতার ব্যথায় রেখার নিজের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। ঠিক কোন-খানে তার বাধিতেছে সেই কথাটা আবিষ্কার করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। আর তাহার সন্ধান পাইয়া সে ঠিক সেইখান হইতে তার শিক্ষা আরম্ভ করিত। আর সে এমন করিয়া স্নেহ ও উৎসাহ দিয়া মেয়েটির অন্তর ভরিয়া দিত যে, তার চরিত্র একদম বদলাইয়া যাইত। সে শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইত, শিখিবার শক্তি পাইত।

রেখাকে এ মেয়েরাও আর সবার মত রেখাদি' বলিত। কিন্তু রেখা তাদের বলিল, তাকে মাসিমা বলিতে হইবে। সকলে তাহাকে মাসিমা করিয়া লইল। "মাসিমা"র ভিতর

যে "মা"টুকু ছিল, তার মাধুর্য্যেই তার অন্তরে অপূর্ব্ব সুধা বর্ষণ করিত।

রেখার জীবনে এখন আর কোনও কাজ ছিল না। স্কুলে ও বোর্ডিংএ সে এই মেয়েদের ভিতর ডুবিয়া তন্ময় হইয়া থাকিত—তার আর কোনও কাজ বা মন বসাইবার আর কোনও বিষয় ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে সে মনে করিত সৌরীনের কথা। সে কোথায়? কি করিতেছে? রেখার কথা তার একবারও মনে পড়ে কি না সে কথা ভাবিত। কিন্তু কোনও মতেই সে সৌরীনের কোনও সন্ধান পাইল না।

সুচরিতার বিবাহ পাটনায়ই হইল। রেখার তাতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেখানে গিয়া সে প্রসঙ্গক্রমে শুনিতে পাইল যে, দেশবিখ্যাত বাগ্মী নিত্যরঞ্জন বাবু এ বিবাহে আসিয়াছেন। বরটি না কি নিত্যরঞ্জনের খুড়তুত ভাই। অনেক পুরাতন কথা মনে উঠিল। নিত্যরঞ্জনের উপর তার অনেক দিনকার পুরাতন আক্রোশ ছিল; কেন না, নিত্যরঞ্জন ছিল সৌরীনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রেখার বিরুদ্ধাচারী। সে পুরাতন বিরাগ পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। সে দেখিতে পাইল, নিমন্ত্রিত সমস্ত মেয়েছেলের দল আকুল হইয়া নিত্যরঞ্জনকে সুধু একবার দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেল। জানালার কাছে ভিড় ঠেলিয়া ছুঁচও প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতে রেখা প্রাণের ভিতর দারুণ জ্বালা অনুভব করিল।

কিন্তু তার সমস্ত বিরোধ ছাপাইয়া উঠিল তার কৌতূহল। নিত্যরঞ্জন সৌরীনের যত বড় শত্রু হোক, সে যত তুচ্ছ ও নগণ্য হোক, সে সৌরীনের আত্মীয় ও সৌরীনের খবর রাখে। তার কাছে সৌরীনের খবর লওয়া যায় কিরূপে? সে ছটফট করিতে লাগিল।

বিবাহ হইয়া বরকন্যা যখন বাড়ীর ভিতর আসিল, রেখা তখন বরের সঙ্গে আলাপ করিল। প্রসঙ্গক্রমে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সৌরীন বাবুকে চেনেন?" জিজ্ঞাসা করিয়াই সে বুকের ভিতর দারুণ আন্দোলন অনুভব করিল। কি জানি এ কি বলিবে ভাবিয়া তার অন্তর কাঁপিতে লাগিল—যদি সৌরীনের কোনও অমঙ্গল সংবাদ পায় তাই ভাবিয়া সে ব্যাকুলও হইল।

বর বলিল, "কোন্ সৌরীন বাবু?"

তখন রেখার মনের ভিতর একটা নিদারুণ ক্ষোভ জ্বলিয়া উঠিল। সৌরীনকে যে এ চেনে না—বাঙ্গলা দেশের কোনও লোক যে সেই ত্যাগী মহাত্মাকে চেনে না—এ কথা তার অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল। আর কিছু না হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র বলিয়া ত সবাই তাকে চেনে,—যে Finance Departmentএর চাকরীর জন্য এ ব্যক্তি লালায়িত, সে চাকরী পাইয়া যে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাকে তো অন্ততঃ চেনে। সুতরাং "কোন্ সৌরীন?" এ প্রশ্নের ভিতর রেখা একটা স্পর্দ্ধাভরা অবজ্ঞার ছায়াপাত লক্ষ্য করিল—এ নিত্যরঞ্জনের ভাইয়ের যোগ্য বটে!

রেখা বলিল, "না, আপনি বোধ হয় তাঁকে চেনেন্ না,—তিনি আপনার পাঁচ ছ' বছরের সিনিয়ার,—আমাদের এক বছর আগে পাশ ক'রেছিলেন।"

বর বলিল, "ও সৌরীন-দা, তাঁকে চিনবো না কেন?"

রেখা বাঁচিল,—বরের উপর তার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন বলতে পারেন কি?"

"না; সাত আট বছর হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। দু বছর আগে তিনি গ্রামে এসে তাঁর সম্পত্তি বেচে গিয়েছেন শুনেছি। আমি তখন দেশে ছিলাম না।"

"সম্পত্তি বেচেছেন? কেন?"

"তা জানি না। বোধ হয় কিছু ব্যবসা করবেন। তা ছাড়া, শুনলাম, দেনা-পত্তরও না কি তাঁর হ'য়েছে। আপনি তাঁকে চেনেন?"

রেখা কষ্টে বলিল, "কলেজে থাকতে তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল।" আর কথা বলিতে তার সাহস হইল না। তার বুক ফাটিবার উপক্রম হইতেছিল। দারুণ উৎকণ্ঠা ও আবেগে তার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রেখা নিত্যরঞ্জনের কাছে চিঠি লিখিয়া তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। চিঠি পাইয়াই নিত্যরঞ্জন ছুটিয়া আসিল।

রেখা তার অন্তরের সব বিরুদ্ধতা কষ্টে দমন করিয়া বিশেষ সৌজন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে বড় কষ্ট দিলাম। অনেক দিন হ'ল আপনার বন্ধুর কোনও

খবর জান্‌তে পারি নি। কাল শুনলাম, তিনি না কি তাঁর সব সম্পত্তি বেচে ফেলেছেন। কেন হঠাৎ এমন ক'রলেন, আর তিনি কোথায় কি ক'রছেন, সেটা জানবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আপনি নিশ্চয় তাঁর খবর জানেন।"

নিত্যরঞ্জন অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিল, "আপনি যে আমাকে কি লজ্জা দিলেন, তা' আমি ব'লতে পারি না। সৌরীনের খবর আমার রাখা অত্যন্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু অনুতপ্ত হ'য়ে স্বীকার করছি যে, সে খবর আমি এত দিন মোটেই রাখি নি। আমার এ ত্রুটির কোনও ক্ষমা নেই। তা' আমি এবার গিয়ে সর্ব্বাগ্রে সমস্ত সংবাদ নিয়ে তার পর আপনাকে জানাব।"

"তিনি কি ক'রছেন বলে আপনার মনে হয়?"

"আমি কিছুই ব'লতে পারছি না। এ কথা আজ আপনার কাছে বলতে হ'চ্ছে যে কত লজ্জার সঙ্গে, তা' কি বলবো।"

রেখার প্রাণ এ কথায় যে সব দারুণ আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল, সেগুলিকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতেও রেখার ভয় হইতেছিল। এত দিন তবে সে মূর্খের মত সুধু চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে সৌরীনের উপর অভিমান করিয়া মাঝে মাঝে কাঁদিয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সে এই ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে যে, সৌরীনকে সে বাধামুক্ত করিয়া যে মহত্বের পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে, সে পথে সে পায় পায় অগ্রসর হইয়া হয় তো এত দিনে বিরাট কোনও কর্ম্ম করিয়া, নিজের অক্ষয় গৌরব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছে। সে স্বপ্ন এত মিথ্যা, যে, নিত্যরঞ্জনের মত বন্ধুও সৌরীনের কোনও খবরই রাখে না। তা' ছাড়া, এমন বিপন্ন সে হইয়াছে যে, তার পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছে। আর রেখা যে এত দিন ধরিয়া তার বেতনের প্রায় সমস্ত টাকা সঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে—কেবল সৌরীনের হাতে সমর্পণ করিয়া তার মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিবে বলিয়া। তার ব্যাঙ্কে আজ পোনেরো হাজার টাকা, আর সৌরীনকে বিপন্ন হইয়া তার ভদ্রাসন শুদ্ধ সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছে!—এ সব রেখার দায, সেই তো এমন করিয়া সৌরীনকে ছাড়িয়া দিয়াছে যে, সৌরীন তার ঠিকানা পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। হয় তো সে ঠিকানা জানিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। তাই তার এত বিপদের ভিতর সে রেখাকে কিছুই জানায় নাই।

নিত্যরঞ্জন চলিয়া গেলে, রেখা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সৌরীনের সংবাদ জানিবার জন্য সে এত ব্যগ্রতা অনুভব করিল যে, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। ঘরের এক পাশ হইতে আর এক পাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নানা রকম অদ্ভুত উপায় তার মনে হইতে লাগিল, কিন্তু কোনওটাতেই কোনও ফল হইবে মনে হইল না। অনেকক্ষণ অনবরত ছুটাছুটি করিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া সে শুইয়া পড়িল।

(২০)

লীলা ঠিক করিল, নিত্যরঞ্জন রেখার পুরাতন প্রণয়ী। অনেক দিন বিচ্ছেদের পর দেখা হইয়াছে, তাই রেখা এমন ব্যথিত হইয়াছে। সে আস্তে আস্তে রেখার মাথার কাছে বসিয়া, তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুমি এমন বিচলিত হ'চ্ছ কেন ভাই? কিসের দুঃখ তোমার?"

এ সহানুভূতির কথায় রেখার দুই চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে অনেকক্ষণ মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া শেষে বলিল, "আমার দুঃখ লোকের কাছে বলবার নয়।"

"আমার কাছেও নয়?"

রেখা অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "না ভাই, এ কারো কাছে বলবার নয়। কি বলবো? কেউ তো এ বুঝবে না। আমি একজনকে ভালবাসতাম, সে আমাকে বোধ হয় ভালবাসতো। আমাদের বিয়ে হ'ল না, দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়লুম। এ কথা শুনে লোকে এক-আধটু আহা উহু করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভাববে যে, এ তো সর্ব্বদাই হ'চ্ছে—এর জন্য এতটা বাড়াবাড়ি কেন? কেন না, এর তলায় যে সব বড় বড় কথা আছে, সে কথা তো লোককে বুঝান যাবে না।"

"তিনি কি অন্য কাউকে বিয়ে ক'রেছেন?"

কথাটায় রেখার অন্তর যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে জোরের সহিত বলিল, "না, সে অসম্ভব—তিনি তেমন হাল্কা লোক নন।"

"তবে তুমি ওঁকে বিয়ে কর না কেন?"

"সেই জন্যই তো বলছি ভাই, আমার কথা কেউই বুঝবে

না। এ কথা কাউকে বলবার জো নেই। বিধাতার এই বিধান লীলা, আমরা দুজন দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো, অথচ আমাদের মিলন হ'বে না।"

লীলা বলিল, "সত্যিই তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। তোমাদের বিয়ের অন্তরায়টা কি?"

"সে কথা শুনলে তুমি হাসবে। অন্তরায় সুধু এই যে, তাঁর অন্তরটা প্রকাণ্ড, আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র আধারে সে ধরে না।"

রেখাকে স্নেহালিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া লীলা সস্নেহে বলিল, "আমাকে সব কথা খুলে বলবে না ভাই? তোমার কথাগুলো যে হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে।"

রেখা কাঁদিয়া বলিল, "না ভাই, ক্ষমা করো। তাঁর ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য হ'য়েছি—তাঁর বিরাট অন্তর তিনি আমার কাছেই সুধু খুলে দেখিয়েছেন। আমি তাঁর গোপন কথা অন্যের কাছে বলে তাঁর সে মহত্বের অপমান করবো না। আর কেউ তো তাঁকে আমার মত বুঝবে না।"

"কিন্তু আমি বুঝবো, তুমি বল আমায়।"

"না ভাই, এ ব্যথা আমার গোপন সম্পদ, তোমার মত বন্ধুকেও এ বলবার জো নেই। তা ছাড়া, গুছিয়ে বলতে আমি পারবোও না। আমি যা জেনেছি তার বেশীর ভাগ আমার অন্তরের অস্পষ্ট অনুভূতি মাত্র; তা কথায় গুছিয়ে বলতে গেলে এত ভুল হয় তো হ'বে যে তুমি ভুল বুঝবে।"

"আচ্ছা, একটা কথা বল, বিয়েটা ভাঙ্গলে কে? তিনি না তুমি?"

"আমিই ভেঙ্গেছি লীলা। আর সেজন্য আমার সুধু দুঃখ নেই তা নয়। এতবড় ত্যাগ করতে পেরেছি বলে' আমার বেশ গর্ব্ব হয়।"

ইহার কিছু দিন পরে নিত্যরঞ্জন রেখাকে জানাইল, সে এখন পর্য্যন্তও সৌরীনের কোনও সংবাদ পায় নাই। সে নানা দিকে অনুসন্ধান করিতেছে। সব কাজ ছাড়িয়া সে তাহার সন্ধান জানিয়া রেখাকে জানাইবে।

ইহার দুই মাস পরে রেখা নিত্যরঞ্জনের আর এক চিঠি পাইল। তাহাতে সে লিখিল, সৌরীন ময়মনসিংহে কিছু দিন পূর্ব্বে জুতা ও কাপড়ের দোকান করিয়াছিল। সে দোকানের বাবদে অনেক দেনাপত্র হওয়ায়—সে কোথায় পলাইয়াছে, তার সন্ধান কেহ জানে না। তার নামে অনেক টাকার ডিক্রী লইয়া মহাজনেরা সন্ধান করিতেছে।

এ পত্র পড়িয়া রেখা একেবারে বসিয়া পড়িল। এই কি তবে তার সর্ব্বস্ব ত্যাগের ফল—এই সৌরীনের মহৎ ত্যাগ-ব্রতের পরিসমাপ্তি! এই কি সেই দেবতা, যাকে সে অন্তরে স্থাপন করিয়া দিনরাত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়াছে! রেখাকে বিবাহ করিলে জীবন সার্থক হইবে না বলিয়া যে রেখার কাছে মুক্তি লইয়া গেল, সে কি না তার পর একখানা কাপড়ের দোকান ফাঁদিয়া ব্যবসা করিতে বসিল, আর তার পর মহাজনদের ঠকাইয়া পলাইল!

কিন্তু তখনি তার মনে হইল, ইহা অসম্ভব। রেখাকে না হয় সৌরীন অশ্রদ্ধায় ছাড়িতে পারে। কিন্তু সে তো কাপড়ের দোকান করিবার জন্য Finance Departmentএর বড় চাকরী ছাড়িয়া দেয় নাই। আর প্রাণ গেলেও তার মত মহাপ্রাণ যুবক কখনও কাহাকেও ঠকাইতে পারে না। নিত্যরঞ্জন সব খবর পায় নাই। হয় তো সৌরীন অর্থকষ্টে বিপন্ন হইয়া মারা গিয়াছে, হয় তো সে বিপদে কেহ তাহাকে সাহায্য করে নাই। রেখার এত টাকা যার জন্য জমান রহিয়াছে, সে যদি অনাহারে, কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবে রেখার দুঃখ রাখিবার যে ঠাঁই থাকিবে না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া রেখা তার কর্ত্তব্য স্থির করিল। ক্রমে তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, সৌরীন ঋণজালে জড়িত হইয়া কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রেখা তো তার জীবিতকালে কিছুই করিতে পারিল না, এখন অন্ততঃ তার কলঙ্ক মোচন করিয়া তার কর্ত্তব্য পালন করিবে।

(ক্রমশঃ)

প্রথম বাঙ্গালী *

শ্রীহিমাংশুবালা ভাদুড়ী

১। হাইকোর্টের জজ প্রথম-বাঙ্গালী
রমাপ্রসাদ রায়

২। হাইকোর্টের চীফজাষ্টিস প্রথম বাঙ্গালী
স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

৩। হাইকোর্টের আই-সি-এস (অস্থায়ী) জজ প্রথম বাঙ্গালী
বিহারীলাল গুপ্ত

৪। এরোপ্লেনে উঠেন প্রথম বাঙ্গালী রমণী
রাণী মৃণালিনী

৫। হাইকোর্টের আই-সি-এস্ (স্থায়ী) জজ প্রথম বাঙ্গালী
স্যার বসন্তকুমার মল্লিক

৬। স্যার উপাধি পান প্রথম বাঙ্গালী
স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

৭। ডিভিসনাল কমিশনার প্রথম বাঙ্গালী
রমেশচন্দ্র দত্ত

৮। সার্জ্জন জেনারল প্রথম বাঙ্গালী (অস্থায়ী) কর্ণেল
মন্মথনাথ চৌধুরী আই-এম-এস্

৯। মুন্সেফ হইতে হাইকোর্টের জজ প্রথম বাঙ্গালী
স্যার প্রমদারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। পোষ্ট্ এণ্ড টেলিগ্রাফের অ্যাসিষ্ট্যান্ট্ ডিরেক্টার জেনারল
প্রথম বাঙ্গালী—রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর

১১। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল প্রথম বাঙ্গালী
মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য

১২। অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

১৩। ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব লাভ করেন প্রথম বাঙ্গালী
শিব ভাদুড়ী ও বিজয় ভাদুড়ী

১৪। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বার প্রথম বাঙ্গালী
স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

১৫। স্বরাজ্য নীতির প্রধান প্রবর্ত্তক প্রথম বাঙ্গালী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

১৬। আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

১৭। ইংরাজী কবিতায় যশস্বিনী হন প্রথম বাঙ্গালী মহিলা
তরু দত্ত

১৮। পদার্থ-বিজ্ঞানে কৃতিত্ব লাভ করেন প্রথম বাঙ্গালী
আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

১৯। বিলাতে লর্ড সভার সভ্য প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

২০। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রথম বাঙ্গালী
মধুসূদন গুপ্ত

২১। ভারতের বাহিরে নাট্যকলায় কৃতিত্ব দেখান প্রথম বাঙ্গালী
নিরঞ্জন পাল ও সীতা দেবী

২২। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মহিলা সভ্যা প্রথম বাঙ্গালী মহিলা
স্বর্ণকুমারী দেবী

২৩। মিলিটারী ফাইনানসিয়াল অ্যাড্ভাইসার প্রথম বাঙ্গালী
স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

২৪। ইংরাজী কাব্য লেখক প্রথম বাঙ্গালী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৫। রেভিনিউ বোর্ডের প্রথম বাঙ্গালী মেম্বার
স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

২৬। আধুনিক যুগের দয়ার সাগর প্রথম বাঙ্গালী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২৭। ষ্ট্যান্ডিং কাউন্সিল হন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

২৮। পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২৯। ভারতে দার্শনিক কবি প্রথম বাঙ্গালী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০। আধুনিক যুগের ত্যাগের আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রথম বাঙ্গালী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

৩১। ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রথম বাঙ্গালী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩২। অধ্যবসায় দ্বারা সামান্য চাকুরী হইতে চরম উন্নতির আদর্শ দৃষ্টান্ত
প্রথম বাঙ্গালী—স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

---

* এই তালিকায় প্রকাশিত মহোদয়গণের আলোক-চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ এই সংগ্রহ-কার্য্যে সহায়তা করিলে কৃতজ্ঞ হইব।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

৩৩। কেমব্রিজে স্মিথ প্রাইজ পান প্রথম বাঙ্গালী
ভূপতি সেন

৩৪। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এসসি প্রথম বাঙ্গালী
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

৩৫। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সভানেত্রী
সরোজিনী নাইডু

৩৬। পোষ্ট্ এণ্ড্ টেলিগ্রাফের ডিরেক্টার জেনারল প্রথম বাঙ্গালী
জ্ঞানেন্দ্রপ্রসন্ন রায়

৩৭। বিলাতের ক্যাবিনেটের সভ্য প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

৩৮। চীফ এঞ্জিনিয়ার প্রথম বাঙ্গালী
রাজেশ্বর মিত্র

৩৯। চীফ সেক্রেটারী প্রথম বাঙ্গালী
স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪০। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে নাইট উপাধি পান প্রথম বাঙ্গালী
স্যার বসন্তকুমার মল্লিক আই-সি-এস

৪১। ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের কর্ণেল প্রথম বাঙ্গালী
কে, পি, গুপ্ত

৪২। তিব্বত ভ্রমণকারী প্রথম বাঙ্গালী
রাজা রামমোহন রায়

৪৩। ডেপুটী কমিশনার অব্ পুলিস প্রথম বাঙ্গালী
রায় পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর

৪৪। ভারতের বাহিরে প্রথম হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বাঙ্গালী
স্বামী বিবেকানন্দ

৪৫। ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সমর্থক প্রথম বাঙ্গালী
রাজা রামমোহন রায়

৪৬। স্যানিটারী কমিশনার প্রথম বাঙ্গালী
কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত

৪৭। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন প্রথম বাঙ্গালী
নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

৪৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রথম বাঙ্গালী
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৯। কিংস কাউন্সেল হন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

৫০। ভারতের বাহিরে প্রথম বাঙ্গালী বাগ্মী
কেশবচন্দ্র সেন

৫১। সসম্মানে আই-সি এস পদত্যাগ করেন প্রথম বাঙ্গালী
সুভাষচন্দ্র বসু

৫২। ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় কৃতিত্ব লাভ করেন
প্রথম বাঙ্গালী—শশিকান্ত হেম

৫৩। ভারতের বাহিরে সৈনিক বিভাগে কৃতিত্ব লাভ করেন
প্রথম বাঙ্গালী—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

৫৪। ভারতের বাহিরে প্রাচ্য গীত বাদ্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন
প্রথম বাঙ্গালী মহিলা—সত্যবালা দেবী

৫৫। প্রাচ্য চিত্রকলার প্রবর্ত্তক প্রথম বাঙ্গালী
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬। গভর্ণর প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

৫৭। নোবেল প্রাইজ পান প্রথম বাঙ্গালী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮। কংগ্রেসের সভাপতি প্রথম বাঙ্গালী
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৯। বেলুনে উঠেন প্রথম বাঙ্গালী
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬০। ব্যারিষ্টারী পাশ করেন প্রথম বাঙ্গালী
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

৬১। আই-সি-এস, পরীক্ষায় শীর্ষস্থানীয় হন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬২। বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

৬৩। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী
র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু

৬৪। লর্ড উপাধি পান প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

৬৫। আই-সি-এস পরীক্ষা পাশ করেন প্রথম বাঙ্গালী
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬। রয়েল সোসাইটীর সদস্য প্রথম বাঙ্গালী
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এফ-আর-এস

অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে ও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; ভ্রম-প্রমাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। শেষোক্ত দশটী নাম ইতঃপূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ময়মনসিংহের মহিলা-কৃত্তিবাস

শ্রীচন্দ্রকুমার দে

বনে অনেক সময় এমন ফুল ফুটে, রাজোদ্যানেও যাহার তুলনা মিলে না। কিন্তু সে বনফুলের সৌরভ কেহ উপলব্ধি করিতে, কিম্বা সে সৌন্দর্য্য কেহ ভোগ করিতে পারে না। বনের ফুল বনে ফুটে, বনেই শুকায়। চন্দ্রাবতী এইরূপ একটি বনফুল। ময়মনসিংহের "নল খাগড়ার বন" আলোকিত করিয়া, এক সময়ে এই সুরভি কুসুম ফুটিয়াছিল।

বহু দিন পূর্ব্বে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশের কোনও অজ্ঞাতনামা পল্লীতে বসিয়া একজন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন—এ কথা ভাবিতে গেলেও প্রাণ আনন্দরসে ভরিয়া উঠে। বাস্তবিক সে দিনের কথা ময়মনসিংহের পক্ষে অতীব গৌরবের কথা। শুধু রামায়ণ নহে—কবি চন্দ্রাবতী নানাবিধ মেয়েলী সঙ্গীত, ছড়া ইত্যাদি রচনা করিয়া, অল্প বয়সে কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যাঁহার কবিতা লোকের প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে সর্ব্বদা প্রিয়জনের স্মৃতির ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া বেড়ায়,—ছোট-বড় নাই, স্থান-অস্থান নাই, ঘাটে-মাঠে, যেখানে-সেখানে যাঁহার সঙ্গীত সর্ব্বদা মানুষের মুখে মুখে ফেরে, তিনিই সাধারণের প্রাণের কবি। চন্দ্রাবতী পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের সর্ব্ব-সাধারণের প্রাণের কবি ছিলেন। বহু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি—সেই অপূর্ব্ব মন-প্রাণ-মাতান সঙ্গীত। মাঠে কৃষক-শিশুর মুখে, অঙ্গনে কুল-কামিনীর মুখে, ঘাটে-বাটে, যেখানে-সেখানে, মন্দিরে, প্রান্তরে, বিজনে, পুলিনে সেই সঙ্গীত—বিবাহে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে, ব্রতে, পূজায় সেই সঙ্গীত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাণে আসিয়া বাজে—মরমের ভিতর প্রবেশ করে। সেই সঙ্গীতের মুহূর্ত্তে শেষ চরণটিতে মহিলা-কবির স্মৃতিটি আনিয়া দেয়। প্রায়ই শুনি 'চন্দ্রাবতী ভণে' 'চন্দ্রাবতী গায়'। শ্রাবণের মেঘভরা আকাশ-তলে ভরা নদীতে যখন বাইকগণ সাঁঝের নৌকা সারি দিয়া বাহিয়া যায়—তখন শুনি সেই চন্দ্রাবতীর গান। বিবাহে কুলকামিনীগণ নববধূকে স্নান করাইতে—জল ভরণে যাইতেছে—সেই চন্দ্রাবতীর গান। তার পর স্নানের সঙ্গীত—ক্ষৌরকার বরকে কামাইবে তাহার সঙ্গীত—বর-বধূর পাশা খেলা—সে কত রকম!

এখন দেখা যাক—এই চন্দ্রাবতী কে? শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে—আজও যাঁহার গান, যাঁহার ছড়ায় মানুষ এমন ভাববিভোর হইয়া রহিয়াছে—তিনি কে? ময়মনসিংহের জন্য তিনি এমন কি করিয়াছেন যে, আজও তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ ময়মনসিংহবাসী তাঁহার চরণোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন? আজও ময়মনসিংহের ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-সকলে চন্দ্রাবতী-স্মৃতি বিজড়িত। সমস্ত পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ প্লাবিত করিয়া চন্দ্রাবতীর গান। সেখানে আনিয়া দেয় পৃথিবীর অপ্রাপ্য বস্তু—শীতল করে তাপিত প্রাণ।

চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের একমাত্র কন্যা—কল্পবৃক্ষের সুধাফল। চন্দ্রাবতীর পিতার পরিচয় অনাবশ্যক। ইনি প্রাচীন সাহিত্যের একটি সম্মানিত রত্নাসনের অধিকারী। প্রসিদ্ধ মনসা-ভাসান রচকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বংশীবদন কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, শুধু তাহাই নহে; মনসা-মঙ্গলের একজন প্রসিদ্ধ গায়কও ছিলেন। প্রবাদ আছে—তাঁহার গান শুনিয়া ভাটিয়ার নদী উজান বহিত—বনের পশুরা মুগ্ধ হইয়া পড়িত,—শাখের পাখীরা কাকলী বন্ধ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশ এই প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষের অন্ন-সংস্থান করিয়া দিতে পারিত না। কবি ভাসান গাহিয়া অতি কষ্টে জীবিকার্জ্জন করিতেন। চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণে তাঁহাদের বংশ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পারিবারিক দুঃখকাহিনী অশ্রুর অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃঃ দ্বিজ বংশীর মনসা-মঙ্গলের রচনা শেষ হয়। বংশীদাস—বৃন্দাবন, লোচন-

দাসের সমসাময়িক কবি। এই পদ্মাপুরাণে কবি চন্দ্রাবতীর অনেক ভণিতা দৃষ্ট হয়। পুরাণ রচনায় কন্যা পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপা ছিলেন। দেখা যায়, ১৫৫০ হইতে ১৫৭৫ খৃঃ মধ্যে চন্দ্রাবতী জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণের প্রারম্ভে বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘড়ণী
বাঁশের পালায় ঘড় ছনের ছাউনী
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়

*   *   *   *

দ্বিজ বংশীপুত্র হইল মনসার বরে
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে
ঘড়ে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি
চালকড়ি যাহা পান মনসার বরে
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে

*   *   *

বাড়াতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী
তার ঘড়ে জন্ম নৈল চন্দ্রা অভাগিনী

বন্দনায় চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন—

সুলোচনা মাতা বন্দুম দ্বিজবংশী পিতা
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা
মনসা দেবীরে বন্দি করি কর যোর
যাহার প্রসাদে হইল সর্ব্ব দুঃখ দুর
ব্রহ্মপুত্র নদ বন্দি সর্ব্বদেবময়
যাঁর জলে স্নানে নাহি পুনর্জ্জন্ম হয়

*   *   *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।

চন্দ্রাবতী তাঁহার আত্মজীবনী সম্বন্ধে স্বীয় বিরচিত রামায়ণে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত কি? কি কারণে পিতা তরুণী কন্যাকে রামায়ণ রচনার উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কবি নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। নয়ানচাঁদ ঘোষ নামক এক প্রাচীন পল্লীকবি মধুরাক্ষরা ভাষায় চন্দ্রাবতীর জীবনের এক অবলম্বন করিয়া মহিলা-কবির জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

নয়ানচাঁদের কাব্যের প্রারম্ভ—

"চারকোণা পুষ্কুণীর পারে চাম্পা নাগেশ্বর
ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তোল কে তুমি নাগর
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐ না নদীর পার
কি কারণে তোল কন্যা লো মালতীর হার"

চন্দ্রাবতী পিতার জন্য পুষ্প চয়নে আসিয়াছিলেন। উচ্চ-শাখায় স্তবকে স্তবকে চাম্পা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছিল। সাজি হস্তে চন্দ্রাবতী সেই ফুলগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। দৈবাৎ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন প্রতিবাসী জয়ানন্দ। চন্দ্রাবতী ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। জয়ানন্দ অগ্রসর হইয়া ফুল সমেত চাম্পাশাখা নত করিয়া ধরিলেন, চন্দ্রাবতী ফুল তুলিতে লাগিলেন। ফুল তোলা শেষ হইল; সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্ব্বিকার-হৃদয়া যোগ-শাস্ত তপশ্চারিণীর মনের মধ্যে, সাংসারিক প্রেমের সুখ দুঃখের একটা আকস্মিক লহরী বিদ্যুতের মত খেলাইয়া গেল। চন্দ্রাবতী ফুল তুলিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। জয়ানন্দও ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। কেহ কাহাকেও নিজ মনের ভাব বুঝিতে দিলেন না। কেবল তাঁহাদের উদাস দৃষ্টি ও অলস পাদবিক্ষেপ-প্রণালী দেখিয়া কতক বুঝিল ঐ আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথ, আর কতক বুঝিল পথিপার্শ্বস্থ মুক তরুলতা।

কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া পিতা বংশীদাস চিন্তিত হইলেন। চন্দ্রাবতী পরমা সুন্দরী। বয়সে তরুণ হইলেও তিনি অল্পকাল মধ্যেই কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার অনন্যসাধারণ রূপগুণের ব্যাখ্যা শুনিয়া বহু সম্ভ্রান্ত যুবক তাঁহার পাণিগ্রহণে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু চন্দ্রার প্রাণের দেবতা সেই জয়ানন্দ। সেদিনকার মিলনোদ্যানে সেই অযাচিত সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রাবতী তাঁহার হৃদয় দেবতার পদে সমস্ত জীবন-যৌবন উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছিলেন।

বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গেল। এমন সময় এক বিষম অনর্থ ঘটিল। অলক্ষ্য হইতে নিদারু

প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। সে বুঝিল না—কি অমূল্য রত্নই না সে হেলায় হারাইল !!!

অদৃষ্টের এই ঘাত-প্রতিঘাতে চন্দ্রার কোমল হৃদয়টি ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বহু দিন পরে মন স্থির করিয়া শিবপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। কন্যা স্নেহময় পিতার চরণে দুইটি প্রার্থনা জানাইলেন। একটি শিবমন্দির স্থাপন—অন্যটি তাঁহার চিরকুমারী থাকিবার বাসনা। কন্যাবৎসল পিতা উভয় প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন—সেই সঙ্গে দুহিতাকে সংসারের সুখ-দুঃখের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিলেন। পাছে অন্য চিন্তায় চন্দ্রার তরুণ হৃদয়ে কোনও ভাবান্তর ঘটে, সেই জন্য বংশীদাস কন্যাকে অবসর কালে রামায়ণ লিখিতে আদেশ করিলেন। চন্দ্রাবতী কায়মনোবাক্যে শিবপূজা করিতেন, ও অবসর কালে রামায়ণ লিখিতেন।

ইতোমধ্যে আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। চির-অনুতপ্ত চন্দ্রাবতীর সেই প্রণয়ী যুবক তুষানলে পুড়িয়া পুড়িয়া দুর্ব্বিষহ জীবনভার সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দ্রাবতীর নিকট একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ কামনা করিল। চন্দ্রাবতী পিতাকে সমস্ত জানাইলেন। পিতা অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুমি যে দেবতার পূজায় মন দিয়াছ, তাঁহারই পূজা কর। অন্য কামনা হৃদয়ে স্থান দিও না। চন্দ্রাবতী একখানা পত্র লিখিয়া যুবককে সান্ত্বনা করিলেন। এবং সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান শিবের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে উপদেশ দিলেন।

অনুতপ্ত যুবক পত্র পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাবতীর স্থাপিত শিবমন্দিরের পানে ছুটিয়া চলিল। চন্দ্রাবতী তখন শিবারাধনায় তন্ময়; মন্দিরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। হতভাগ্য যুবক আসিয়াছিল চন্দ্রাবতীর কাছে দীক্ষা লইতে—অনুতপ্ত দুর্ব্বিষহ জীবন প্রভুপদে উৎসর্গ করিতে—কিন্তু পারিল না। চন্দ্রাবতীকে ডাকিতেও সাহস হইল না। অঙ্গনের ভিতর সন্ধ্যামালতীর ফুল ফুটিয়াছিল; তারই দ্বারা কবাটের উপর চারিছত্র কবিতা লিখিয়া চন্দ্রাবতীর নিকট, বসুন্ধরার নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিল।

পূজাশেষে চন্দ্রাবতী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। আবার যখন দ্বার রুদ্ধ করেন, তখন সেই কবিতা পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়াই বুঝিলেন—দেব-মন্দির কলঙ্কিত হইয়াছে। চন্দ্রাবতী জল আনিতে নদীতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, সব শেষ—অনুতপ্ত যুবক তাঁহার নিকট হইতে জন্মের শোধ বিদায় লইয়া নদীস্রোতে জীবন-স্রোত মিলাইয়া দিয়াছে!

বনফুল শুকাইয়া উঠিল। তার পর এক দিন শিবপূজার সময় সহসা তাঁহার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। হতভাগ্য ময়মনসিংহ সেদিন অকালে যে মহারত্ন হারাইয়াছিল, আর তাহা ফিরিয়া পাইল না।

যদিও চন্দ্রাবতী তাঁহার জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে তৎকৃত রামায়ণের বন্দনায় কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই, তথাপি নিম্ন-ধৃত দুইটি পদ দ্বারা নয়ানচাঁদের বর্ণিত চন্দ্রাবতীর জীবন-কাব্যের সমর্থন করা যাইতে পারে—

"ধাড়াতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী—
তার ঘরে জন্ম নৈল চন্দ্রা অভাগিনী

প্রথম ছত্রটিতে দেখা যায়, চন্দ্রাবতী আজীবন পিতার গলগ্রহ হইয়া, তাঁহার দরিদ্র জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শেষ ছত্রে "চন্দ্রা অভাগিনী" এই একটি মাত্র কথায় সেই আজন্ম-দুঃখিনী মহিলা-কবি যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখে বঞ্চিত ছিলেন, আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। অল্প বয়সে সেই যোগশান্ত মনস্বিনী, হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ দুঃখভার চাপিয়া রাখিতে, অশ্রুকে নিরুদ্ধ করিতে—সুন্দর রূপে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-কাহিনীর আশা আমরা একেবারেই করিতে পারি না।

(চন্দ্রাবতীর রামায়ণ)

চন্দ্রাবতীর সম্পূর্ণ রামায়ণ সংগৃহীত হয় নাই। মাঝে মাঝে খণ্ডিত ভাবে যাহা পাওয়া গিয়াছে, আমরা তাহাই লইয়া আলোচনা করিব। ইহা কতিপয় মেয়েলী সঙ্গীতের সমষ্টিমাত্র। ময়মনসিংহের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ-উৎসবে সূর্য্যব্রতাদি উপলক্ষে ইহা সুরে গান করিয়া থাকেন। ইহার ভাষা পল্লীতটিনীর মত মৃদুমন্থর-গামিনী অথচ সতেজ কবিত্বপূর্ণ। কবিতাগুলির সারল্য ও অনাড়ম্বর মাধুর্য্য শ্রোতার মনকে অল্পেই অভিভূত করিয়া তোলে। ইহাতে কোনও অবান্তর কথা নাই, বাহুল্য বর্ণনা নাই। সরল সংক্ষিপ্ত কথায় রামায়ণের প্রত্যেকটি ঘটনাচিত্র কবি নিপুণ হস্তে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। অথচ তাহা এত উজ্জ্বল, এত সুন্দর, এত করুণ, এত মর্ম্মস্পর্শী যে, শরতের মুক্ত জ্যোৎস্নার মত নিজে ফুটিয়া দুরূহ গিরিশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রের

তলদেশ পর্য্যন্ত কোথায় কি আছে, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়।

চন্দ্রাবতীর সম্পূর্ণ রামায়ণের আলোচনার আমাদের স্থানাভাব। তাহার প্রয়োজনও নাই। অন্যান্ত প্রচলিত রামায়ণ হইতে, এই মহিলা রামায়ণের যেটুকু নূতনত্ব ও বিশেষত্ব, আমরা তাহাই লইয়া আলোচনা করিব।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত এই রামায়ণ সরল মিত্রাক্ষরে লিখিত। কেবল সুরে গীত হয় বলিয়া রচনায় একটুকু বৈলক্ষণ্য আছে। প্রায় প্রত্যেক ছত্রের মধ্যভাগে অথবা শেষভাগে গো লো রে প্রভৃতি বাহুল্য শব্দ পাওয়া যায়। সম্ভবত তাহা সঙ্গীত-সৌকার্য্যার্থে। এই সকল শব্দ তুলিয়া দিলে, সরল পয়ার ছন্দই অবশিষ্ট থাকে।

আদিকাণ্ড—এই কাণ্ডের অনেকাংশ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে রামচন্দ্রাদির জন্মে কোনও নূতনত্ব, বিশেষত্ব নাই। তাহা সর্ব্বাংশে প্রচলিত অন্যান্য রামায়ণেরই অনুরূপ। কিন্তু সীতার জন্ম ও নাম করণ সম্বন্ধে একরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা তাহাই লইয়া আলোচনা করিব।

সীতার জন্ম—পূর্ব্ব সূচনা। রাবণ রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমেই স্বর্গের দুয়ারে গিয়া হানা দিলেন। রাক্ষস সেনার প্রচণ্ড দাপটে স্বর্গের মনঃশিলা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে দেবতারা স্বর্গ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

তখন রাজা পারিজাত বৃক্ষ ছিল গো নন্দন কাননে
ডালে মূলে উপারিয়া গো লইল রাবণে
ঐরাবত হাতী নৈল গো উচ্চৈশ্রবা ঘোড়া
লইল পুষ্পক রথ গো শূন্যে দেয় ত উড়া
মনিমুক্তা নৈল কত গো না যায় গনন।
ঝাড়িয়া মুছিয়া নৈল গো ভাণ্ডারের ধন।"

তার পর সেই রাক্ষস-সৈন্যের দুর্জ্জয় অভিযান মর্ত্ত্যভূমি অভিমুখে অগ্রসর হইল। মর্ত্ত্যের রাজগণ অবনত মস্তকে রাবণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ভাণ্ডারের ধনরাশি বিজেতা রাক্ষস-রাজের চরণে ঢালিয়া দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। এইরূপে অন্তরীক্ষবাসী, পাতালবাসী, নাগ, যক্ষ সকলে বিনাযুদ্ধে পরিহার মাগিয়া রাক্ষসরাজের পদে শরণ লইল।

এইবার অরণ্যবাসী মুনিগণের পালা। মুনিগণের মধ্যে কেহ কৌপীন, কেহ কমণ্ডলু দিয়া রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইলেন। এ-ও সম্বল যাঁহাদের ছিল না তাঁহারা কুশাগ্রে চিরিয়া বুকের রক্ত রাজকর স্বরূপ প্রদান করিলেন। রাবণ সেই যোগ-সম্বল নিরীহ মুনিগণের রক্ত রত্ন কৌটায় ভরিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাক্ষসরাজ মুনি-রক্তপূর্ণ রত্নকৌটা মন্দোদরীর হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, ইহাতে তীব্র বিষ আছে। এ বিষে দেবতারও প্রাণ নষ্ট হইবে।

"সতত আমার বৈরী যত দেবগণ
অমর হইয়াছে তারা অমৃতকারণ—'
ইন্দ্র-যমে আনিয়াছি লঙ্কায় বান্ধিয়া
সবারে মারিব এই বিষ খাওয়াইয়া।"

রাণী মুনি-রক্ত-পূর্ণ রত্ন-কৌটা যত্ন-পূর্ব্বক ঘরে তুলিয়া রাখিলেন।

এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল জয় করিয়া রাজা নিঃশঙ্ক মনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কুবের হইল ভাণ্ডারী—একাদশ রুদ্র দেহরক্ষক—দ্বাদশ আদিত্য ছত্রধর—পবনের হাতে চামর।

বরুণ আসিয়া রাজার চরণ পাখালে
লঙ্কাপুরী পা'রা দেয় শমন কোটালে"

চিরযৌবনা দেব-গন্ধর্ব্ব-কন্যা সহ রাজা দিনরাত অশোক-কাননে বিহার করেন। এই অভিমানে রাণী মন্দোদরী—

"যে বিষ খাইলে মরে দেবতা অমর
আমি কেন নাহি খাই সেই কালজর"

প্রাণঘাতী বিষ ভাবিয়া রাণী মুনির রক্ত পান করিলেন।

"দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডানি
বিষ খাইয়া গর্ভবতী হইলেন রাণী;

দশ মাস দশ দিন অন্তে রাণী এক আশ্চর্য্য ডিম্ব প্রসব করিলেন। এই ডিম্ব প্রসূত হওয়া মাত্র রাজ্য জুড়িয়া প্রবল ভূমিকম্প হইল। কনক লঙ্কার বিরাট প্রাসাদ সকলের স্বর্ণ চূড়া সুবর্ণ কলস ও পতাকা সহ ভূলুণ্ঠিত হইল।

সমুদ্র-জল সকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার পাহাড়ে আগুন দেখা দিল; সিংহাসনের উপরে সিতঙ্গ ও ধ্বজদণ্ড সহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। রাবণ চিন্তিত হইয়া রাক্ষস জ্যোতির্ব্বিদগণকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা

গুণিয়া বলিল—এই ডিম্ব হইতে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, সে-রাক্ষস-বংশের-নিধন স্বরূপা হইবে—

"আর এক কথা শুন রাক্ষসের পতি—
কন্যার লাগিয়া বংশে না জ্বলিবে বাতি।"

তখন—

"কেহ বলে কাট ডিম্ব কেহ বলে ভাঙ্গ
অনলে পুড়াইয়া কেহ বলে কর সাঙ্গ।

এই সংবাদে অন্তঃপুরে রাণীর মন কাঁদিয়া উঠিল। হাজার হউক মায়ের প্রাণ। রাণী রাজাকে অনুরোধ জানাইলেন—

"না ভাঙ্গ না পুড় ডিম্ব গো মোর মাথা খাও
যদি নাহি রাখ ডিম্ব সায়রে ভাসাও॥

তখন রাণীর অনুরোধে—

"সোনার কটরা মধ্যে রূপার খিল দিয়া
সায়রে ভাসাইল ডিম্ব ভবাণী স্মরিয়া॥

প্রায় ছয়মাস পর—

ঘনাইয়া আসিল সন্ধ্যা রবি বৈসে পাটে—
এমন সময় লাগল ডিম্ব জনক ঋষীর ঘাটে,—

মিথিলা নগরে এক দরিদ্র জেলে-দম্পতি বাস করিত। "জাল বায় মাছ ধরে ঘাটে দেয় খেয়া"। এ ছাড়া তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের আর কোনও উপায় ছিল না। অতি কষ্টে তাহারা দুঃখের দিনগুলি গুণিয়া গুণিয়া কাটাইতেছিল।

পিন্ধনে কাপড় নাই পেটে নাই ভাত
রাত্র দিবা কান্দে সতা শিরে দিয়া হাত;

এক দিন মাধব জাল ফেলিয়া সেই রত্ন-কৌটা তুলিয়া ঘরে আনিল। সতা দেবতার দান ভাবিয়া, ধূপ ধুনা জ্বালিয়া, ধান্য-দূর্ব্বা দ্বারা সকাল-বিকাল সেই কৌটার পূজা করিতে লাগিল। ছোট-খাট করিয়া সেই কৌটার গায় পাঁচটি সিন্দুরের ফোঁটা আঁকিয়া দিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিন হইতে সতার সকল প্রকার দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান হইয়া গেল। সতাকে এখন আর মৎস্যের ঝাঁপি মাথায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে হয় না।

এক দিন সতা স্বপ্ন দেখিল, সহসা যেন চাঁদের আলোতে তাহার নবনির্ম্মিত ঘরখানি ঝলমল হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই কৌটা হইতে এক আশ্চর্য্য রূপসী বালিকা বাহির হইয়া সতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে—

"বাপ মোর জনকরাজা গো রাণী মোর মাও
কালুকা বিয়াণে লইয়া রাণীর কাছে যাও

পূর্ণিমার চাঁদের মত সেই রূপসী কন্যা এই বলিয়া আবার কৌটার মধ্যে প্রবেশ করিল। পর দিন সকালে সেই রত্ন-কৌটা অঞ্চলে বাঁধিয়া সতা মিথিলা রাজভবনে পাটরাণীর শয়ন-মন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

রাণী সতার কাছে সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নের কথা শুনিয়া রত্ন-কৌটা হাত পাতিয়া লইলেন, পরিবর্ত্তে—

"গজমতি হার এক পইড়ায় সতার গলে,

* * * *

ধামায় মাপিয়া দিলা রত্নাদি কাঞ্চন

কিন্তু সতা যোড়হাতে বলিল, আমি জন্ম-কাঙ্গালিনী—ধন-রত্ন কিছুই চাই না—তবে এক মিনতি—

"সপ্ন যদি সত্য হয় কন্যা জন্ম ইতে—
আমার নামেতে কন্যার নাম রাইখ সীতে"

সীতার নামকরণ। শুভ দিনে শুভক্ষণে রাজর্ষি জনকের ঘর আলোকিত করিয়া ডিম্ব হইতে এক কন্যা-রত্ন ভূমিষ্ঠ হইল।

"সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মী স্বরূপিনী—
মিথিলা নগরে উঠে জয় জয়ধ্বনি।

দেবের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কুলললনাগণের হুলাহুলিতে মিথিলার আকাশ ভরিয়া গেল। স্বর্গে মর্ত্ত্যে আনন্দ ধরে না—

"হইল লক্ষ্মীর জন্ম মিথিলাভবনে

যথাসময়ে তখন—

"সতার নামেতে কন্যার নাম রাখে সীতা—
চন্দ্রাবতী কহে কন্যা ভুবন বন্দিতা;

রাম বনবাস। তার পর হরধনুর্ভঙ্গ, রামের রাজ্যাভিষেক, বিবাহাদি উৎসবে বিশেষ কোনও নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। তবে বনবিদায়ের মাত্র দুই একটি স্থান আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

কাল অভিষেক, আজ অধিবাস। নগরীতে আনন্দ ধরে না। পুরনারীগণের মঙ্গল-গীত ও হুলুধ্বনিতে অযোধ্যার আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিতেছিল। দ্বারে দ্বারে পুষ্প-পল্লবের মালা। আম্রসার শোভিত তীর্থ-জলভরা পূর্ণ

কুম্ভ। রাজপথের দুই ধারে রোপিত রম্ভাতরু সকলে বিচিত্র পতাকা সকল উড়িতেছে। আর

"চালে চালে উড়িতেছে নেতের নিশান।"

তপ্তকাঞ্চন-বরাঙ্গী পুরনারীগণ পুষ্পস্তবক হস্তে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছেন। অযোধ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দীন, তাহারও পর্ণকুটীরখানি আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—পুষ্পমালায় শোভিত, উষার আলোকে ঝলমল—দুঃখ-দৈন্যের করুণ হাসিটির মত শোভা পাইতেছে। রাজ্যবাসিনিগণ কাল নিশীথে যুবরাজের মঙ্গল-কামনায় সরযূ-তরঙ্গে যে মঙ্গল-দীপ ভাসাইয়াছিলেন, দিবসের কূলে আসিয়াও তাহা নিভে নাই—জলজ নক্ষত্রের মত ঢেউয়ের উপর ডুবিয়া ভাসিয়া শোভা পাইতেছে।

ঝঞ্ঝা নাই, মেঘ নাই—অকস্মাৎ অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদ-শিরে এ কি বজ্রাঘাত! সকলের মুখে হায় কি হইল' শব্দ। এত আনন্দ, এত নৃত্যগীত, বাদিত্র,—সহসা সব নিয়তির নির্ম্মম অট্টহাসির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকগণের হাহাকারে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। কৈকেয়ী জটা-বল্কল লইয়া রামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ্যের প্রিয়দর্শন যুবরাজ রাজকীয় বসন-ভূষণ অঙ্গ হইতে খুলিয়া, ধীরে ধীরে জটা-বল্কল পরিধান করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া নগরমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

কুক্ষণে পোহাইল আজ অযোধ্যায় নিশি
কৈকয়ীকে গালি দেয় বলিয়া রাক্ষসী

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সীতা—হার-কেয়ূর-কুণ্ডলাদিশোভিতা—রত্নপুষ্পমালঙ্কৃতা রাজবধূ—কৈকেয়ীর নিকট হইতে একখানা বল্কল-বসন চাহিয়া লইলেন। সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া পুরবাসিগণ—

"হায় হায় বলিয়া কেউ শিরে কর হানে;
মূর্চ্ছিত হইয়া কেউ পড়ে ধরাসনে

এই স্থানে আর একটি করুণ দৃশ্য। এক কাঙ্গালিনী বহু আশায় বুক বাঁধিয়া অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসিয়া দেখে এই সর্ব্বনাশ! সীতা ধীরে ধীরে অঙ্গের রত্নালঙ্কার খুলিয়া কাঙ্গালিনীকে দিতে গেলেন।

"কাঙ্গালিনী ধরি কহে সীতার চরণ
পদছায়া দেহ দেবি! না চাই ভূষণ।"

ভিখারিণী চক্ষের জলে সীতার অলক্তক-রঞ্জিত পদযুগ ধুইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বল্কল-বসনা রাজবধূ, কৈকেয়ীর পদধূলি মাথায় করিয়া পাটরাণীর শয়ন-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

সীতার চম্পক-কোমল করস্পর্শে কৌশল্যা চেতনা পাইয়া উঠিলেন। তখনই আবার বল্কল-বসনা পুত্রবধূকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সীতা সম্বিতহারা পাটরাণীর পদধূলি মাথায় লইয়া—সুমিত্রাদি শাশুড়ীসহ পুরমহিলাগণকে বন্দনা করিয়া উর্ম্মিলার কাছে গেলেন।

উর্ম্মিলার নিকট বিদায় লইতে সীতা বলিতেছেন—

"দেবের দেবতা রৈল শ্বশুর-শাশুড়ী।
আমি গেলে দেইখ্যা তুমি অযোধ্যা নগরী॥
আমি গেলে দেইখ্য তুমি দাসদাসীগণে।
আমি গেলে দেইখ্য তুমি কাঙ্গাল-ব্রাহ্মণে॥"

এই স্থানে প্রচলিত অন্যান্য রামায়ণের সীতা অপেক্ষা চন্দ্রাবতীর সীতায় একটু বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। কৃত্তিবাসাদির সীতা স্বামী ধ্যান—স্বামী জ্ঞান—স্বামীই সব—স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্য দেবতা—স্বামী-সেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—সুতরাং আমি স্বামী সঙ্গে বনে যাইবেন বলিয়া নিজেই ত্বরান্বিতা হইয়া বনে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। শ্বশুর-শাশুড়ী কিম্বা অযোধ্যা-বাসীর কোন চিন্তা তৎকালীন কৃত্তিবাসাদির সীতার মনে উদিত হয় নাই। এই স্থানে সীতার ত্যাগ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, বনবাস-ক্লেশ স্পৃহা নিতান্ত পতিনিমিত্তক বলিয়া আমরা তাঁহার চরিত্রে যে সন্দেহটুকু করিবার অবকাশ পাইতাম, চন্দ্রাবতী তাহা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এইটুকু প্রভেদের কারণ,—পুরুষ কবিগণ স্ত্রী চরিত্র আঁকিতে গিয়া পুরুষের প্রতি স্ত্রী জাতির যতটুকু কর্ত্তব্য, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী নারী। যে মহতী সেবাপরায়ণতা-গুণে রমণী বিশ্বজননী রূপে পরিকীর্ত্তিতা, চন্দ্রাবতী সেই নারীর কর্ত্তব্য আরও একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই তাঁহার চক্ষে অযোধ্যার পশু পক্ষীটী পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। বিদায়কালে চন্দ্রাবতার সীতা, উর্ম্মিলার কাছে অযোধ্যার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য-ভার সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন।

চন্দ্রাবতীর উর্ম্মিলা—এই স্থানে বধূ উর্ম্মিলার কথা। নয়নে পলক নাই, অশ্রুও নাই—মুখে বাক্য নাই—সেই

চিরমৌনী রাজবধূ সীতাদেবীর সমর্পিত ভার নীরবে গ্রহণ করিলেন। ত্যাগেই তাঁহার শান্তি—দুঃখেই তাঁহার অভিরুচি—সংযমেই তাঁহার সুখ। উর্ম্মিলা যেন পরের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতেই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস—গৃহে বধূ উর্ম্মিলা না থাকিলে, সীতার বনবাস-সৌভাগ্য ঘটিত কি না সন্দেহ। উর্ম্মিলা সীতার বনযাত্রার পথস্বরূপ। শুধু তাই নয়—কুশ-কণ্টকাকীর্ণ বনপথের উপর দিয়া উর্ম্মিলা সীতার জন্য বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল কর্ম্মই নীরবে। বিশ্ব-সাহিত্যে এমন মূক চিত্র কোন কালের কোন কবি আঁকিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই উর্ম্মিলা-চিত্র অঙ্কনেই কবি-গুরুর সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব। সীতার সহস্র সহস্র অভিনব সংস্করণ বাহির হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উর্ম্মিলার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতে দেখিলাম না। সীতা বনে গিয়া বনবাসিনী—উর্ম্মিলা রাজভবনে থাকিয়াও বনচারিণী। বিশ্ববিজয়ী মহাকাব্য নানাবিধ রসের উৎস স্বরূপ। তন্মধ্যে সীতা করুণ-রসের নির্ঝর-ধারা। কিন্তু উর্ম্মিলা সমস্তখানি রামায়ণ-নিংড়ানো শেষ এক ফোঁটা প্রেমাশ্রু। কবি-গুরু এই মূক রাজবধূর কথা বেশী কিছু বলেন নাই। তাহার কারণ—উর্ম্মিলার প্রতি উপেক্ষা নহে—অথবা সীতার অশ্রুজলে উর্ম্মিলা ভাসিয়াও যান নাই। আমাদের বিশ্বাস কেবলমাত্র সীতার সমর্পিত ভার গ্রহণের জন্যই উর্ম্মিলার সৃষ্টি। তাই যখনই তিনি উর্ম্মিলার কথা বলিতে গিয়াছেন, আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক অনেক পালা গায়ক ও নাটকে গীতাভিনয়ে এই মূক চিত্রটিকে অতিমাত্র মুখরা করিয়া তোলা হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের মহিলা-কবি এই মূক রাজবধূর চিরন্তন মৌন ব্রতটী ভঙ্গ করেন নাই।

"কেউ করে হায় হায় কেউ হানে বুক।
উর্ম্মিলা চাহিয়া আছে সীতাদেবীর মুখ" ॥

বন-বিদায়—ইহার পর পৌরজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া জটা-বল্কল-পরিহিত যুবরাজ রথের উপর উঠিয়া বসিলেন। এক পার্শ্বে দিব্য ধনুক হস্তে সহচর লক্ষ্মণ, আর এক পার্শ্বে বল্কল-বসনা, শঙ্খালঙ্কৃতা, সিন্দুর-বিন্দুশোভিতা সীতাদেবী। রথ অযোধ্যাবাসীর বুকের উপর দিয়া সরযূর পরপারে চলিয়া গেল। হাট ভাঙ্গিলে লোক যেমন যে যার ঘরের দিকে ছুটিয়া যায়, অযোধ্যাবাসিগণ তেমনি রামশূন্য অযোধ্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কেউ বা সরযূর পরপারে কুটীর বান্ধিয়া যুবরাজের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রহিল। কেউ বা রথের পানে চাহিয়া চাহিয়া বহুদূর চলিয়া গেল। কেউ বা পথে আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইল। অযোধ্যায় আজ গ্রস্তোদয় চন্দ্রগ্রহণ। আর সে গ্রহণ দুচার দণ্ডের জন্য নহে—ইহার ভোগ কাল পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর।

পথে—গুহক চণ্ডালের সঙ্গে সখ্যতা সম্বন্ধযুক্ত কোনও ভণিতা চন্দ্রাবতীর রামায়ণে উদ্ধার পায় নাই। বনপথে চিত্রকূট গিরিশিখরে ভরত-মিলন। এই ব্যাপারে বিশেষ কোনও নূতনত্ব নাই। তবে এইমাত্র প্রভেদ—তপঃ-প্রভাবশালী মহামুনি ভরদ্বাজের যোগ-বলে চিত্রকূট পর্ব্বত দ্বিতীয় অমরাবতীতে পরিণত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে যেন অলকার বৈভবরাশি চিত্রকূট গিরিশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—সেই মণি-মুক্তা-সমুজ্জ্বল মহার্হ রাজপ্রাসাদ, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, সুরধামের অমৃত, রত্নখচিত গজদন্তের পালঙ্ক, তদুপরি অনন্ত-বসন্ত-যৌবনা গন্ধর্ব্ব-যুবতী—এ সমস্ত আমরা চন্দ্রাবতীর রামায়ণে দেখিতে পাইতেছি না। এখানে দীন যোগী ভরদ্বাজের অতিথি-সেবার উপকরণ অতি সামান্য—বনের ফল আর ঝরণার জল। (ক্রমশঃ)

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় বিবিধ চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে স্থির করিলো অনন্তকে বিলোপ যা শাস্তি দিবার তাহা তো দিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অনন্তকে কোনো শাস্তিই না দেয় তাহা হইলে সে যে স্বামী-কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে; অতএব অনন্তকে তাহারও কিছু শাস্তি দেওয়া নিতান্তই উচিত। এই সঙ্কল্প স্থির হইতেই সে অনন্তর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলো। সে অনন্তকে কিরূপে কি শাস্তি দিবে কিছুই স্থির না করিয়াই অনন্তকে ডাকিয়া একবার তাহার সহিত মুখোমুখি করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য উভয়ের বাড়ীর মধ্যস্থিত কপাটের খিল খুলিয়া ফেলিলো। সে দেখিলো দরজার কপাট ওপার হইতেও বন্ধ করা আছে। সে বাহির হইতে ঘুরিয়া যে অনন্তর বাড়ীতে যাইতে পারে এ কথা তাহার তখন মনে হইলো না, তাহার কারণ সে আগে থাকিতেই স্থির করিয়া লইয়াছিলো যে অনন্তকে যে শাস্তি দিবে তাহা সে গোপনেই দিবে—তাহার স্ত্রীর কাছে ও উভয়ের চাকর-দাসীদের সম্মুখে তাহার অপমান সে প্রকাশ হইতে দিবে না, কারণ তাহাতে তাহার নিজের পত্নী মৃদুলারও অপমান জড়িত হইয়া আছে। কপাট বন্ধ আছে দেখিয়া মলয় দরজায় জোরে জোরে ঘা দিতে দিতে ডাকিতে লাগিলো—মিষ্টার রয়! মিষ্টার রয়!

আহুতি দরজা খুলিয়া হাসিমুখে বলিলো—সুপ্রভাত মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি! এতো সকালেই মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির আঁচলের গাঁঠছড়া ছাড়িয়ে যে উঠে পড়েছেন!

আহুতির রসিকতা মলয়ের ভালো লাগিলো না। সে বলিলো—মিসেস চ্যাটার্জ্জি বাড়ীতে নেই, কাল সন্ধ্যাবেলাই তিনি পুরী চলে' গেছেন।......

আহুতি হাসিতে হাসিতে বলিলো—ও! তাইতে মিষ্টার রয়ও কাল সন্ধ্যাবেলা অতো তাড়াতাড়ি করে' রওনা হলেন দার্জিলিঙে—বল্‌লেন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে! একজন বলে' গেলেন যাচ্ছেন দক্ষিণে আর একজন বলে' গেলেন যাচ্ছেন উত্তরে! হয় তো তাঁদের পূর্ব্ব থেকেই পরামর্শ ঠিক'ছিলো যে তাঁরা মিলিত হবেন পশ্চিমে! মিষ্টার রয়ের বন্ধুটি যে কে এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি!

এই বলিয়া আহুতি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলো।

মৃদুলার চরিত্রের উপর আহুতির কলঙ্কারোপের ইঙ্গিতে মলয়ের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলো; অনন্তকে নাগাল না পাইয়া তাহারও উপরের ক্রোধ গিয়া পড়িলো আহুতির উপরে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনের উপর দিয়া তড়িৎগতিতে এই চিন্তা বহিয়া গেলো যে এই ব্যাপিকা রমণী ইঙ্গিতে মৃদুলার চরিত্রে যে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে সেই কলঙ্কের কালী উহার চরিত্রে লেপন করিয়া দিতে সে ইচ্ছা করিলেই পারে; এবং উহাকে কলঙ্কিত করিলে অনন্তকেও অপমানিত করিয়া তাহার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে; কিন্তু উহাকে কলঙ্কলিপ্ত করিতে গেলে সেও তো সেই কালীতে কলঙ্কিত হইয়া যাইবে! তখনই সে ইহাও স্থির করিলো যে সে কেবল মাত্র আহুতিকে তাহার নিকটে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া সেই লজ্জার পসরা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে উপেক্ষা ও ত্যাগ করিবে, সে নিজের শুচিতার হানি করিয়া মৃদুলার কাছে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধ কিছুতেই করিবে না। এই স্থির করিয়া মলয় হাসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলো—আজ আমাদের দুজনেরই যখন জোড়ভঙ্গ হয়ে গেছে তখন আমরাই যুগলমিলন কর্‌বো—মুখ বদ্‌লানো হবে!

এই কথা বলিয়াই কলুষ-স্পর্শের লজ্জায় ও গ্লানিতে মলয়ের মুখ কালো হইয়া উঠিলো, তাহার দেহ ও মন নোংরা সামগ্রী স্পর্শের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলো।

মলয়ের ভাবান্তর দেখিয়া আহুতি প্রসন্ন সরল হাস্যের সহিত সহজ ভাবেই বলিলো—আপনি এখনো নিতান্তই

ছেলেমানুষ আছেন দেখ্‌ছি। একটু ফ্লার্ট্ করতে গিয়েও এতো লজ্জা! আপনি তো দুপুরবেলা আপিসে যাবেন? আপনি আপিস থেকে এলে আমি আস্‌বো……না হয় আপনি বিকালে আমার সঙ্গেই চা খাবেন · দুপুরবেলাও আমার বাড়ী থেকেই খেয়ে আপিস যাবেন ··

মলয় স্থির করিয়াছিলো সে আজ আপিস কামাই করিয়া আহুতিকে লইয়া সমস্ত দিন যাপন করিবে এবং সমস্ত দিনের সহবাসের সুযোগে কোনো অবকাশে আহুতির দুর্ব্বলতা উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত প্রতিপন্ন করিয়া পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু আহুতির কথার পরে সে আর বলিতে পারিলো না যে সে আজ আপিস কামাই করিবে তাহাকে লইয়া সমস্ত দিন যাপন করিবার জন্য; সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিলো—না, আমার বামুন রয়েছে সেই আপিসে যাবার আগে রান্না করে' দেবে……

তখন আহুতি বলিলো—তবে আমার বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণ রইলো আপনার...আমি এখন স্নান করতে যাই, স্নান করতে বেলা হলে আমার মাথা ধরে···

আহুতি চলিয়া গেলো। মলয়ের মনে হইলো সে যেনো আপনার কাছেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র সামান্য হইয়া গেছে!

মলয় আপিসে সমস্ত দিন নিতান্ত অস্বস্তি ভোগ করিয়া বাড়ীতে ফিরিলো; অনন্তকে অপমানের প্রতিশোধ দিবার ইচ্ছা, আহুতির আত্মদানের ষোলো-আনা সম্ভাবনার উন্মাদনা এবং মৃদুলার কাছে অপরাধী হইবার আশঙ্কা ও নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্কোচ তাহাকে বিরুদ্ধ আবেগে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলো। সে বাড়ীতে পা দিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ভৃত্য তাহাকে সংবাদ দিলো—ও-বাড়ীর মেম-সাহেব তিন বার এসে আপনার খোঁজ করে' গেছেন! আপনি এলেই তাঁকে খবর দিতে বলেছেন……

মলয়ের বুকের রক্তপ্রবাহ চনচন করিয়া উঠিলো, আহুতির এই আগ্রহ তাহার রক্তে আগুন ধরাইয়া দিলো! সে ভৃত্যকে কিছু না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলো।

মলয় সিঁড়ির উপরের ধাপে পা দিয়াই দেখিলো আহুতি বারান্দা দিয়া সেই দিকে আসিতেছে; মলয়কে দেখিয়াই সে ঈষৎ হাসিলো। অমনি মলয়ের মনে হইলো আহুতি তাহার সহিত মিলনোৎসুকা বাসকসজ্জা নায়িকা—সে অভিসারিকা! আহুতি আপনাকে কামনা-হুতাশনে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, মলয় এখন একবার স্বস্তি-বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিলেই হয়! মলয়ের মুখ কামনার উত্তাপে ও লজ্জার আবেশে লোহিতাভ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলো।

আহুতি মলয়কে দেখিয়া হাসিয়া বলিলো—উঃ কতো দেরী করে' এলেন আপনি! আমি তিন তিনবার এসে খোঁজ করে' গেছি আপনার! নিন, শীগ্‌গির করে' হাত মুখ ধুয়ে আসুন, আমি চায়ের জল ষ্টোভে চড়িয়ে রেখে এসেছি···

মলয়ের মনে হইলো এমন আগ্রহভরে মৃদুলা তো তাহার জন্য কখনো অপেক্ষা করিয়া থাকে নাই! নবানুরাগের আবেগে তাহার কণ্ঠ যেনো রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলো; সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলো—আপনি চলুন, আমি এখনি আস্‌ছি···

আহুতি লীলাভঙ্গীর সহিত খসিয়া-পড়া আঁচলখানি কাঁধে তুলিয়া গ্রীবা দুলাইয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলো, মলয় লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলো; সে যে প্রতিহিংসার জন্য আহুতিকে অপমানিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলো তাহা আর তাহার মনে ছিলো না, এক পাপের উপলক্ষ্যে প্রশ্রয় প্রাপ্ত বৃহত্তর পাপের নেশায় তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া উঠিতেছিলো।

মলয় কাপড়-ছাড়া ও হাতমুখ-ধোওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের ঘরে গিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলো। সে ভাবিতে লাগিলো—তাহার এই আচরণ কি সঙ্গত হইতেছে? পরের ঘরে আগুন লাগাইতে গিয়া তাহার নিজের ঘরে আগুন লাগিয়া যাইবে না তো? যদি মৃদুলা জানিতে পারে? তাহাকে বলিবো তাহার নামে অপবাদ রটনার প্রতিহিংসা সাধনের জন্যই আমি এরূপ করিয়াছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হোক, পাপ তো সকল অবস্থাতেই পাপ! তা আমি তো নিজে চেষ্টা করিয়া কাহাকেও পাপে প্রলুব্ধ করিতেছি না, কেহ যদি স্বেচ্ছায় উপযাচক হইয়া পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে আমি তাহাকে কেমন করিয়া নিবারণ করিবো? কিন্তু আমিই তো সেই পাপের উত্তরসাধক হইতে যাইতেছি, আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তো উহার পাপে প্রবৃত্ত হইবার আর সম্প্রতি সম্ভাবনা থাকে না! কিন্তু উহারা যে মৃদুলাকে

অপমান করিয়াছে তাহার প্রতিবিধান হইবে কিসে? আর যাহাতেই হউক পাপানুষ্ঠানে হইবে না নিশ্চয়। মৃদুলাকে অপমান হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকে পুনর্বার অপমান করা তাহার পক্ষে তো নিতান্তই গর্হিত কর্ম্ম হইবে?......

"বেশ লোক তো আপনি! এখনো কাপড় চোপড় ছাড়েন নি! আহা কান্তা-বিরহ-বিধুর বিপ্রযুক্ত কবি!"

মলয় আহুতির কথায় চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলো আহুতি একটা কাঠের ট্রের উপর দুই পেয়ালা উষ্ণ ধূমায়িত চা ও দুই প্লেট সিঙাড়া-কচুরী ও মিষ্টান্ন রাখিয়া দুই হাতে ট্রের দুই প্রান্তের আংটা ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। আহুতিকে সেইরূপ ভাবে আসিতে দেখিয়া মলয় ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলো—আপনি আবার কষ্ট করে' বয়ে নিয়ে এলেন কেনো? আমিই তো যেতাম......

আহুতি টেবিলের উপর ট্রে নামাইয়া হাসিয়া মাথা দুলাইয়া বলিলো—কিন্তু কখন?...যান শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন। ভাবুকের পাল্লায় পড়ে' আমি যে বুভুক্ষায় মারা যেতে বসেছি তার দিকে হুঁশ আছে?

মলয় ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেলো—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আস্‌ছি......

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ও হাতমুখ ধুইতে ধুইতে মলয় ভাবিতেছিলো আহুতির এতো আগ্রহের অর্থ কি? তাহার উদ্দেশ্য তাহার কথায় ফাঁক দিয়া মলয়ের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে লাগিলো—আহুতি তাহাকে বিপ্রযুক্ত কবি বলিয়াছে, কিন্তু যেখান হইতে ঐ কথাটি ধার-করা সেই মেঘদূতে আছে "বিপ্রযুক্তঃ স কামী!" সে বুভুক্ষায় মারা যাইতে বসিয়াছে! মলয় আহুতিকে অতি সহজ শিকার বলিয়া ধারণা করিয়া এক দিকে উৎফুল্লও হইলো আবার ক্ষুণ্ণও হইলো—এতো সহজে যে পরাজয় স্বীকার করিবে তাহাকে জয় করায় পৌরুষই বা কোথায় আর আনন্দই বা কোথায়!

মলয় আহুতির নিকট সত্বর দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিলো। এবং দুইজনে এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলো।

আহুতি খাইতে খাইতে বলিলো—আজ আপনাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না; নতুন কি লিখেছেন আমায় সব শোনাতে হবে।

মলয় কুণ্ঠা কাটাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলো—হুকুম-বরদার হাজির আছে।

আহুতি গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া আবার আহারে প্রবৃত্ত হইলো। মলয় একবার নিবারণের বাসায় যাইবে মনে করিয়াছিলো, কিন্তু সে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ভাবাবেশের ঢং করিয়া বলিলো—আজ সমস্ত দিন কেবল এই পদটাই মনের মধ্যে গুঞ্জন করে' ফিরছে—

"কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে বুঝি ওরে
ভুলিবো না আর!"

আহুতি কৌতুকভরা হাসিমুখে বলিলো—কোনো কথা বেশী পেয়ে বসা ভালো নয়! শেষে চারুবাবুর গল্পের "ভেক-বদনী ধনী" পেয়ে বসার মতন দুর্দ্দশা ঘট্‌বে!

আহুতির এই বিদ্রূপে মলয়ের মুখ অপ্রতিভ হইয়া গেলো। সে মাথা নত করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিলো।

মলয়ের মনটা বিরুদ্ধ চিন্তায় ও আবেগে এমন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলো যে সে আর কথা বলিতে পারিতেছিলো না; আহুতিই মাঝে মাঝে এক একটা কথা বলিতে লাগিলো, কিন্তু মলয়ের বাক্যালাপে উৎসাহ না থাকাতে তাহারও আলাপ তেমন জমিতেছিলো না। অবশেষে মলয়ের আহার সমাপ্ত হইলে আহুতি বলিলো—এইবার চলুন বিছানায়......ভালো হয়ে বসে' আপনার লেখা শুন্‌তে হবে।

মলয়ের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিলো; তাহার মনে পড়িয়া গেলো অল্প দিন আগেই ঐ বিছানাতেই আহুতি তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া তাহার গল্প পড়া শুনিয়াছিলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে পড়িলো যে মৃদুলা আসিয়া তাহাদের তদবস্থ দেখিয়া ফেলিয়াছিলো। লজ্জার সঙ্কোচে ও কামনার আবেগে মলয়ের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিলো। সেদিন আহুতি যে তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলো তাহার জন্য সে মোটেই দায়ী ছিলো না, কেবল সে রূঢ় ভাবে একজন মহিলার আচরণের প্রতিবাদ না করিয়া সহ্য করিয়াছিলো; কিন্তু এই কথা সে যে তাহার স্ত্রীর নিকট উল্লেখ করে নাই, তাহাতেই ঐ

ব্যাপারটার সঙ্গে একটা গোপনতার প্রয়াস জড়াইয়া গিয়াছিলো; যেখানে গোপনতা সেখানেই রহস্য; তাই আজ তাহার মনের ভাবান্তর আশ্রয় করিয়া সেই রহস্য ঘনীভূত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিলো।

মলয় বিছানায় গিয়া বসিবার আগেই আহুতি তাহার বিছানায় উঠিয়া দুটা বালিস উপরি উপরি রাখিয়া আধ-শোওয়া রকমে বসিয়া মলয়কে বলিলো—কোথায় আপনার খাতা-পত্তর, নিয়ে আসুন…

মলয় আবেগ-কম্পিত চরণে খাতা লইয়া আহুতি হইতে যথাসম্ভব দূরে আড়ষ্ট হইয়া বসিলো।

আহুতি একটু নড়িয়া শুইয়া হাত দিয়া বিছানার একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলো—এইখানে কাছে সরে' এসে ভালো হয়ে বসুন…আমি তো আর আপনার সেকেলে ভাদ্রবৌ না যে আমাকে ছুঁলে নাইতে হবে!

মলয়ের বুকের মধ্যে রক্ত উদ্দাম হইয়া নাচ সুরু করিলো, তাহার নিশ্বাস ঘন ঘন জোরে জোরে বহিতে লাগিলো। সে সরিয়া এক রকম আহুতির কোলের কাছে গিয়া বসিলো।

আহুতি বলিলো নিন, এইবার আরম্ভ করুন…

মলয় পড়িতে আরম্ভ করিলো। কিন্তু পড়িতে তাহার গলা কাঁপিয়া যায়, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, কপাল কর্ণমূল উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সে কষ্ট ও চেষ্টা করিয়া অল্প একটুক্ষণ পড়িয়া আর পারিলো না, একটা খাপছাড়া জায়গায় কথার মাঝখানেই খাতা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিলো।

আহুতি তাহার ভাবাবেগ দেখিয়া বলিলো—পড়্তে ভালো লাগছে না, তবে থাক। আপনি একটু বেড়িয়ে আসুনগে……

এই বলিয়া আহুতি খাট হইতে মাটিতে নামিয়া পড়িলো।

আহুতি চলিয়া যায় দেখিয়া মলয় একেবারে আত্মহারা হইয়া খপ্ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলো ও বাষ্পভরা গাঢ় স্বরে অতি অস্ফুট ভাবে বলিলো—তুমি রাত্রে এসো, আমি দরজাটা খোলা রাখ্বো……

আহুতি কিছুমাত্র বিস্ময় বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ মধুর ভাবে একটু হাসিয়া লীলাভঙ্গীর সহিত ঘাড় দুলাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলো—আপনি কি ভুলে গেলেন যে মদন অনেকদিন হলো ভস্ম হয়ে অনঙ্গ হয়ে গেছে!

তাহার পর সে ধীরে ধীরে মলয়ের হাত হইতে আপনার হাত মুক্ত করিয়া লইয়া ঘর হইতে মন্থর পদে বাহির হইয়া চলিলো, যাইতে যাইতে একবার মুখ ফিরাইয়া মলয়কে দেখিলো, মলয় দেখিলো আহুতির মুখে প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্য তখনো বিরাজ করিতেছে! মলয়ের ইচ্ছা করিলো সে ছুটিয়া গিয়া আহুতিকে বাহুপাশে বন্দী করিয়া ফিরাইয়া লইয়া আসে; কিন্তু তাহার মুখের ঐ হাসি স্নিগ্ধ শান্ত হইলেও তাহার সঙ্গে একটু যেনো করুণা বিদ্রূপ নিষেধ মিশ্রিত হইয়া ছিলো, যাহার জন্য মলয়ের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসে কুলাইলো না। মলয়ও আহুতির পিছনে পিছনে থরথর-কম্পিত পদে ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া গিয়া দাঁড়াইলো; যখন সে দেখিলো আহুতি বাস্তবিকই চলিয়া যাইতেছে তখন সে আবার ব্যাকুল স্বরে আহুতিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়াই বলিলো—বলে' যাও তুমি রাত্রে আস্বে……

আহুতি নিজের বাড়ীতে যাইবার দরজার চৌকাঠ পার হইতে হইতে হাসি-মুখ ফিরাইয়া মাথা দুলাইয়া শান্ত অস্বীকার জানাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো—স্প্রিং-দেওয়া কপাট আপনি ফিরিয়া আসিয়া বন্ধ হইয়া গেলো, মলয় আহুতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়ীতে যাইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে গেলো, দেখিলো আহুতি দরজায় খিল দিয়া বন্ধ করিয়া গিয়াছে! মলয় সেই রুদ্ধ দ্বারের এপারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কামনার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিলো; যে পাপ-বাসনাকে সে প্রশ্রয় দিয়াছিলো পরকে শাস্তি দিবার জন্য তাহা প্রচণ্ড রূপে তাহাকেই শাস্তি দিতে লাগিলো। শত্রু নির্য্যাতন করিবার যে কুৎসিত অস্ত্র সে নির্ব্বাচন করিয়াছিলো তাহা এখন ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই নির্য্যাতন করিতেছে!

মলয় কোথাও বাহির হইতে পারিলো না, তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিলো আহুতি যদি ফিরিয়া আসে! তাহার কেবলই এই দুরাশা মনে উদয় হইতে লাগিলো আহুতি আসিবে—সে আসিবেই।

এই দুরাশায় মলয় সমস্ত রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারিলো না, প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হইতে লাগিলো এইবার আহুতি আসিবে! সে আহুতির আগমনের প্রতীক্ষায় ভালো করিয়া শুইয়া থাকিতেও পারিতেছিলো

না, অল্পক্ষণ শুইয়া থাকার পরই তাহার মনে হইতেছিলো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হইয়াছে, এইবার আহুতি হয়তো আসিতেছে ; অমনি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া দুই বাড়ীর মাঝের দরজা চোরের মতন সন্তর্পণে টানিয়া দেখিতেছিলো উহা আহুতি খুলিয়া দিয়াছে কি না ; যতোবারই সে দেখিলো ততোবারই দেখিলো দরজা নির্ম্মম ভাবে বন্ধ ! রাত্রি যতো গভীর হইতে লাগিলো তাহার অস্থিরতা ও অধৈর্য্য ততো বাড়িয়া চলিলো। কিন্তু বৃথাই সে ঘর ও বাহির এবং বাহির ও ঘর করিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইলো, অবরুদ্ধ-হৃদয় কপাট কিছুতেই খুলিলো না। ক্রমে কল্‌কাতার পথে জাগরণের সাড়া শোনা যাইতে লাগিলো—ধাঙড়েরা কোলাহল করিতে করিতে পথ ঝাঁট দিতেছে, ময়লা-ফেলা গাড়ী ঘটাং-ঘটাং শব্দ করিয়া আবর্জ্জনা কুড়াইয়া চলিয়াছে, রাস্তায় জল ছিটানো হইতেছে ; পাড়ারই যদু ঘোষ মাছের দালাল, রোজ হাবড়া ষ্টেসনে মাছ আনিতে ও ফিরিবার পথে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে যায়, ও পথ চলিবার সময় কৃষ্ণের শতনাম আবৃত্তি করে ; মলয় আজও তাহার কর্কশ কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিতে পাইলো—

"কৃষ্ণ যবে জন্ম নিলা দৈবকী-উদরে।
স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥"

পাড়ার রামকৃষ্ণ-আশ্রমের সন্ন্যাসীরা একঘেয়ে সুরে গানের কেবলমাত্র একটি পদ রোজ ঘণ্টা খানেক ধরিয়া উদ্দাম ভাবে আবৃত্তি করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাবের বিপরীত বিবিধ ভাবসঞ্চার করে, আজও তাহারা তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে "দেখ্ রে আমার কেমন মা ?" ক্রমে টীকে-ওয়ালার নিদ্রালস নাকি সুর পথে বাহির হইলো—চাই টিঁকে-এঁ……! তাহার দোহারের মতন অপর একজন ফেরিওয়ালা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিয়া উঠিলো—চাই তিলকুটো চন্দ্রপুলি ! ইহাদের সঙ্গে কাক ও চড়াই-পাখীর কলরব, ট্রামগাড়ীর ঠংঠং, মোটরের ভেঁপু মিলিয়া একটা অশান্ত দানবীয় কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলো।

যখন সকাল ফর্সা হইয়া গেলো তখন মলয় নিশ্চিত বুঝিতে পারিলো আহুতি কিছুতেই আসিলো না, সে যাহা বলিয়া গিয়াছিলো কার্য্যেও তাহা পালন করিলো। এই দিবালোকে তাহার নিষ্ফল প্রতীক্ষা তাহাকে অত্যন্ত লজ্জা দিলো, সে আপনার কাছেও নিতান্ত ছোটো হইয়া গেলো, সে নিজের কাছে অপরাধী হইয়া কুণ্ঠার সহিত তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া লুকাইলো।

মলয়ের প্রভাতেই স্নান করা অভ্যাস। সে সমস্ত রাত্রি জাগরণের ও পাপ-বাসনা মনের মধ্যে পোষণের গ্লানি কথঞ্চিৎ ধুইয়া ফেলিয়া আসিয়া যখন ভাবিতেছিলো এখন সে কি করিবে, তখন হঠাৎ তাহার পশ্চাতে আহুতির আহ্বান শুনিয়া সে চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইলো ; দেখিলো, কাল যেনো সে কোনো অনাচার করে নাই এমনি প্রশান্ত স্মিতমুখে আহুতি বলিতেছে—আপনার স্নান হয়ে গেছে ? আসুন তবে চা খাবেন।

আবার চা ! মলয় ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলো—আমাকে মাফ করবেন, আমাকে এখনই একবার নিবারণের বাড়ীতে যেতে হবে, তার ওখানেই চা খাবো…

এই কথা বলিতে বলিতেই মলয় আন্‌লা হইতে চাদর টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া চটি ছাড়িয়া এক জোড়া আল্‌বার্ট্ স্লিপারের মধ্যে পা ভরিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে প্রস্থান করিলো, আহুতির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তাহাকে মুখ দেখাইতে তাহার যেনো মাথা কাটা যাইতেছিলো। সে যে অভব্যের মতন আহুতি তাহার ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিতেও চলিয়া আসিলো সেদিকে তাহার খেয়াল রহিলো না, আহুতি এখন তাহার কাছে ভয়ঙ্কর লজ্জা ও আত্মগ্লানির রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে।

মলয় পথে বাহির হইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অনেকখানি পথ হাঁটিবার পর অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হইলো এবং সঙ্কল্প করিলো আজই সে রাত্রের গাড়ীতে পুরী রওনা হইয়া যাইবে এবং মৃদুলার প্রেম-দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইয়া পাপ-প্রলোভনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে। গত দিবসের নিজের লজ্জাকর আচরণের কথা সে ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারিতেছিলো না, তাহার অন্তরগ্লানি নিরন্তর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার দিয়া ফিরিতে লাগিলো সে বুঝিতে পারিলো পাপ-চিন্তাই কি ভয়ানক ! পাপের শাস্তি পাপ দ্বারা দিবার সঙ্কল্প করাতেই তাহার এতোদূর শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে !

মলয় চলিতে লাগিলো ; সে আহুতিকে বলিয়া আসিয়াছিলো যে সে নিবারণের বাড়ী যাইবে ; কিন্তু ঐ কথা হঠাৎ বলিয়া ফেলিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও সেখানে যাইবা

কোনো সঙ্কল্প তাহার মনের মধ্যে ছিলো না ; এবং এখন সে নিবারণের বাড়ীতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়াই সেই দিকেই অন্যমনস্কভাবে চলিয়াছিলো, নানান চিন্তায় আকুল চিত্ত গন্তব্য পথের দিকে লক্ষ্য না রাখিলেও সে নিবারণের গৃহ-দ্বারে গিয়া উপনীত হইলো।

নিবারণের গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া মলয়ের চৈতন্য হইলো যে সে নিবারণের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখনি তাহার মনে পড়িলো যে এই বাড়ীতে শ্রেয়সী আছে, যে একদিন তাহাকে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া বলিয়াছিলো—দাদা, তুমি পবিত্র নির্ম্মল শুচি! তুমি এই নরককুণ্ডে কেনো এসেছো! এখানে এমন একটু শুচি স্থান বা আসন নেই যেখানে বা যাতে তোমাকে বসতে দিতে পারি।" সেই পতিতা পাতকিনী এখন মুক্তিস্নান করিয়া পাতিব্রত্যের পূতজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে এখন অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া সতীদিগের সমকক্ষ ; তাহার পুণ্য গৃহস্থালির মধ্যে তাহার কলুষ-কলঙ্কিত চিত্ত ও চরিত্র লইয়া প্রবেশের অধিকার সে হারাইয়াছে, তাহাকে সাধ্বী প্রেমময়ী পত্নী মৃদুলার প্রেম-মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতে হইবে ; যতোদিন সে তাহা হইতে না পারিতেছে ততোদিন সে পতিত অস্পৃশ্য।

মলয় তাড়াতাড়ি নিবারণের বাড়ীর সম্মুখ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলো ; একবার সে মুখ ফিরাইয়া দেখিলো কেহ তাহাকে দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিলো কি না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়

(Foreign Exchange)

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, এফ্-আর-ই-এস্

যে উপায় দ্বারা আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, তাহার নাম ফরেন এক্সচেঞ্জ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয়, তাহার দেনা-পাওনা অনেক সময় আমদানী-রপ্তানীতে কাটাকাটি (Cancel) হইয়া যায়। আমদানী-রপ্তানীর অদল-বদল পরিষ্কার রূপে বুঝিবার জন্য একটা উদাহরণ দেখা যাউক।

ধরা যাউক, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা চলিতেছে। উভয় দেশের মুদ্রাই "টাকা" ধরিয়া লইলাম। উদাহরণটী সরল করিবার জন্য ব্যবসার কর্ম্মকর্ত্তা রূপে মোট চারিজন লোককে স্বীকার করা হইল ; ও আমদানী রপ্তানী মূল্য সমান অর্থাৎ ১০০৲ হিসাবে ধরা হইল। ভারতবর্ষ হইতে "ক" ইংলণ্ডে "খ" এর নিকট ১০০৲ মূল্যের গম রপ্তানী করিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে "গ" ভারতবর্ষের "ঘ" এর নিকট ১০০৲ মূল্যের বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছে। আমাদের হাটবাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই দেনা-পাওনার মীমাংসা করিতে হইলে, ইংরাজ খ ভারতবাসী ক-এর নিকট গমের মূল্য বাবদ ১০০৲ নগদ পাঠাইয়া দিবে ; ও ভারতবাসী ঘ ইংরাজ গ-এর নিকট বস্ত্রের মূল্য বাবদ ১০০৲ পাঠাইয়া দিয়া দেনা শোধ করিবে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে, উভয় দেশেই পাওনাদার ও দেনদার উভয়ই রহিয়াছে ; এবং এই জন্যই ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে নগদ টাকার আমদানী-রপ্তানী না করিয়া হুণ্ডী দ্বারা অতি সহজে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ হইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতবাসী ক ইংরাজ খ-কে পাওনাদার করিয়া ১০০৲ মূল্যের এক হুণ্ডী কাটিল। ভারতবাসী ঘ ইংলণ্ডের গ-এর নিকট হইতে বস্ত্র আমদানী করিয়াছে,—তাহার ১০০৲ পরিশোধ করিতে হইবে। সে ক-এর হুণ্ডী ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে তাহার পাওনাদার গ-এর নিকট পাঠাইয়া দিল। গ যথাকালে ক-এর লিখিত হুণ্ডী তাহার স্বদেশবাসী খ-এর

নিকট উপস্থিত করিয়া ১০০৲ সংগ্রহ করিল। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, দেশ হইতে দেশান্তরে কোন মুদ্রাই প্রেরিত হইল না, অথচ দেনা-পাওনা নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল। ব্যাপারটী নিম্নে অঙ্কিত টেব্‌ল্‌ হইতে আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে ঃ—

ভারতবর্ষ		ইংলণ্ড	
ক	ঘ	খ	গ
ইংলণ্ডে গম রপ্তানী করিয়াছে	ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আমদানী করিয়াছে	ভারতবর্ষ হইতে গম আমদানী করিয়াছে	ভারতবর্ষে বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছে
ক খ-এর উপর হুণ্ডী কাটিল	ঘ ক-এর হুণ্ডী ক্রয় করিয়া গ এর নিকট পাঠাইল	খ ক-এর হুণ্ডীর টাকা দিল	গ ক-এর হুণ্ডীর টাকা আদায় করিল

প্রকৃত ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমাদের মনগড়া উদাহরণটীর মত সঠিক কিছু হয় এরূপ কেহ যেন মনে না করেন। বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিভিন্ন; আমদানীকারক ও রপ্তানীকারকগণের মধ্যে আমাদের উদাহরণটীর মত পরস্পর চেনা-শোনা অসম্ভব; আর ব্যবসা হয় শতশত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে ও দশ বিশটা দেশ লইয়া। ইহা ব্যতীত বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাব আমাদের উদাহরণের মত সহজ, সরল ও সমান কখনই হইতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা পাওনা হুণ্ডীর (Bills of Exchange) দ্বারাই মিটিয়া থাকে। সোণা বা রূপার আমদানি বা রপ্তানী বড় একটা হয় না। যখন এরূপ হয় তখন বুঝিতে হইবে হুণ্ডী দ্বারা দেনা-পাওনার কতকটা মিটিয়া গিয়া বাকী ধাতু মুদ্রা দ্বারা পরিশোধ হইতেছে বা ধাতুগুলি সাধারণভাবে অন্যান্য দ্রব্যের মত আমদানী বা রপ্তানী হইতেছে।

বিনিময়ের সমতা

(Par of Exchange)

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিভিন্ন প্রকারের। মুদ্রা বিভিন্ন হইলেও যখন উহা একই ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন উভয় দেশের মুদ্রার মধ্যে একটা বিনিময়ের সমতা সম্ভব। কিরূপে মুদ্রা নির্ম্মিত হইবে, এ বিষয়ে প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন আইন (Mint Law) আছে। প্রত্যেক দেশেই মুদ্রায় কতটা খাঁটী ধাতু (সোণা বা রূপা) থাকিবে এবং কতটা খাদ (সাধারণতঃ তামা) মিশান হইবে, আইন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুদ্রা একই ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হয়, তখন উক্ত দেশসমূহের টাঁকশাল সংক্রান্ত আইন ধরিয়া বিনিময়ের সমতা বাহির করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে এই টাঁকশাল আইনের পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন উক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিনিময়ের সমতারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না—একই থাকে।

ইংলণ্ডের আইন মতে সভ্‌রেণের সোণার $\frac{11}{12}$ ভাগ খাঁটী ও $\frac{1}{12}$ ভাগ খাদ। একটা সভ্‌রেণ বা গিনিতে ৭·৯৮৮ গ্রাম্ সোণা আছে। এই সোনার ১১ অংশ খাঁটী সোণা এবং ১ অংশ তামা।

ফরাসী আইন অনুযায়ী এক কিলোগ্রাম (১০০০ গ্রাম) সোনা হইতে ৩১০০ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। এই এক কিলোগ্রাম সোণার ৯ ভাগ খাঁটী সোণা ও ১ ভাগ খাদ বা তামা। প্রকৃত প্রস্তাবে ফরাসীদেশে কোন সোণার ফ্র্যাঙ্ক নাই। রৌপ্য মুদ্রাই সেখানে চলিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশের মুদ্রার বিনিময়ের সমতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, উভয় দেশের আইন অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার যে সমতা, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে।

বিলাতী সভ্‌রেণের সহিত ফরাসী ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ের সমতা এইরূপে "শৃঙ্খল নিয়ম" দ্বারা বাহির করিতে হইবে।

কত ফ্র্যাঙ্কে ? = ১ সভ্‌রেণ

১ সভ্‌রেণ = ৭·৯৮৮ গ্রাম স্বর্ণ (.খাদ সহিত)

১২ গ্রাম স্বর্ণ (খাদ সহিত) = ১১ গ্রাম স্বর্ণ (খাঁটী

৯০০ গ্র্যাম
= ৩১০০ ফ্র্যাঙ্ক
খাঁটী স্বর্ণ

$$\frac{৭.৯৮৮ \times ১১ \times ৩১০০}{১২ \times ৯০০}$$

= ২৫.২২১৫

অর্থাৎ ১ সভ্রেণ = ২৫.২২১৫ ফ্র্যাঙ্ক।

ঠিক এইভাবেই আমেরিকার ডলারের সহিত ইংলণ্ডের সভ্রেণের বিনিময়ের সমতা বাহির করিতে হয়, যথা :—

কত ডলার ? = ১ সভ্রেণ

১ সভ্রেণ = ১২৩.২৭৪ গ্রেণ স্বর্ণ (খাদ সহিত)

১২ গ্রেণ স্বর্ণ
= ১১ গ্রেণ স্বর্ণ (খাঁটী)
(খাদ সহিত)

২৩২.২ গ্রেণ স্বর্ণ (খাঁটী) = ১০ ডলার

$$\frac{১২৩.২৭৪ \times ১১ \times ১০}{১২ \times ২৩২.২} = ৪.৮৬৬৫ \text{ ডলার}$$

অর্থাৎ ১ সভ্রেণ = ৪.৮৬৬৫ ডলার

এইরূপে বিনিময়ের সমতা বাহির করিলে নিম্নলিখিত দেশগুলির সহিত সভ্রেণ মুদ্রার সম্বন্ধ দাঁড়ায়—

১ সভ্রেণ = ২০.৪২৯ মার্ক (জার্ম্মাণি, যুদ্ধের পূর্ব্বে)
" = ১২.১০৭ ফ্লারিণ (নেদারল্যাণ্ডস্)
" = ২৪.০২ ক্রোণ (অষ্ট্রিয়া, যুদ্ধের পূর্ব্বে)
" = ১৮.১৫৯৮২ ক্রোনার (ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে)

বিগত মহাযুদ্ধে অনেক দেশের নিয়ম কানুন ও অবস্থার এত ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে যে, জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত এখন আর Mint Par বা বিনিময়ের সমতা বলিয়া কিছু নাই বলিলেই চলে; সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই বিনিময়ের সমতা জানিয়া লাভ কি? আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে এই আইনগত বিনিময়ের সমতার হারে কিছু দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ হয় না। তাহা না হইলেও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ে ইহার আবশ্যকতা কিছু কম নহে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে হুণ্ডীর ক্রয়-বিক্রয় একটা বড় কথা। যিনি মাল রপ্তানী করিতেছেন, তিনি হুণ্ডীর বিক্রেতা—অর্থাৎ তিনি তাঁহার বিদেশী পাওনাদারের উপর হুণ্ডী কাটিয়া, তাহার বিক্রয় দ্বারা নিজের দ্রব্যের মূল্য সংগ্রহ করিবেন। এই হুণ্ডী যদি বিদেশের মুদ্রায় কাটা হইয়া থাকে (drawn in foreign currency), আর বিক্রয় করিতে গিয়া যদি তিনি দেখিতে পান যে, বিনিময়ে তিনি স্বদেশীয় মুদ্রা (local currency) সংখ্যায় কম পাইতেছেন (অবশ্য বিনিময়ের সমতার হিসাবে), তখনই প্রশ্ন উঠিবে—হুণ্ডী বিক্রয় অপেক্ষা উহা বিদেশে পাঠাইয়া পাওনাদারের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা আমদানী করা লাভজনক কি না? অবশ্য ইহাতে কতকটা ঝঞ্ঝাট্ ও অতিরিক্ত খরচ আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহা হুণ্ডী বিক্রয় অপেক্ষা লাভজনক হইলে তাহাই করিতে হয়। যখন উভয় দেশের মধ্যে একটা বিনিময়ের সমতা থাকে, তখন ঐ দেশগুলির মধ্যে প্রকৃত মুদ্রা বিনিময়ের হার (actual rate of exchange) সাধারণতঃ একটা গণ্ডীর উপরে বা নীচে উঠিতে বা নামিতে পারে না। মুদ্রা বিনিময়ের হারের সহিত বিনিময়ের সমতার হারের বেশী তফাৎ হইলে, অবস্থানুযায়ী কখন স্বর্ণ রপ্তানী বা আমদানী হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে যখন কয়েকটী দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী বা রপ্তানীর প্রয়োজন সূচক অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল দেশের বাণিজ্য-ধারা ক্রমে ক্রমে একটী নূতন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং নূতন গতি হইতেই আবার স্বর্ণের আমদানী বা রপ্তানী থামিয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম-আর-এ-এস এবং লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত)

মুসলমান আমলের বঙ্গের চতুর্থ রাজধানী মুর্শিদাবাদের নাম বাল্যকাল হইতে ইতিহাসে পাঠ করিয়া আসিতেছি। মুর্শিদাবাদ সহরের ও উহার উপকণ্ঠের দর্শনযোগ্য প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দেখিবার বাসনা বহুকাল হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মুর্শিদাবাদে যাইয়া এক দিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ সহরের ও উহার উপকণ্ঠের কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু সেবার তাড়াতাড়িতে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই বলিয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল এবং তজ্জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। এবার ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে ইষ্টারের বন্ধে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। মকবরা—মির্জাফরের কবরশোভিত সমাধি

মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেবের সেক্রেটারী প্রমথবাবু আমার পরিচিত। তাঁহার সহিত ক্রমাগত কয়েক দিবস দেখা করিয়া অবশেষে ইহা স্থির করা গেল যে, আমরা তাঁহার মুর্শিদাবাদের খালি বাসা-বাটীতে থাকিব এবং নিজ ব্যয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া লইব,—তাঁহার ভৃত্য আমাদিগকে প্রয়োজন-মত সাহায্য করিবে। থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া, যাওয়ার আয়োজনে নিযুক্ত হইলাম। এবার ললিতা দাদাই একমাত্র সঙ্গী হইলেন।

২রা এপ্রেল হইতে ইষ্টারের বন্ধ আরম্ভ। আমরা তৎপূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১লা এপ্রেল বৃহস্পতিবার রাত্রে লালগোলাঘাটগামী ট্রেণে শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিলাম। ট্রেণে অত্যন্ত ভীড় হইয়াছিল, চারি দিনের ছুটা পাইয়া বহু প্রবাসী বাটী যাইতেছিলেন। ২।১ জন সহযাত্রীর চেষ্টায় সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কামরায় বেশী ভীড় হইতে পারে নাই। যথাসময়ে শিয়ালদহ হইতে ট্রেণ ছাড়িল। দমদমা, বারাকপুর, কাচড়াপাড়া, রাণাঘাট, বীরনগর (উলা), কৃষ্ণনগর, পলাশী, ও বহরমপুর প্রভৃতি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে মুর্শিদাবাদ ষ্টেসনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম। তখনও প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল।

রমজানের "রোজার জন্য প্রত্যূষে আহার সমাপন করিতে হয় বলিয়া এ দেশের মুসলমান মুটে ও গাড়োয়ান কোচোয়ান কেহই ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল না। এ কারণ যাত্রীদিগকে জিনিসপত্র লইয়া ষ্টেসনে বসিয়া থাকিতে হইল। আমরা উভয়ে ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে একখানি মাত্র ক্রহাম গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে উহা নবাব সাহেবের গাড়ী এবং উহা নবাব সাহেবের একাউন্ট্যান্ট বাবু আমাদিগের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা তখন গাড়ীতে দ্রব্যাদি উঠাইয়া লইয়া যাত্রা করিলাম। জেলখানার নিকট দিয়া অগ্রসর হইয়া প্রথমে নবাব সাহেবের অতি বিস্তৃত আস্তাবলের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া সামান্য দূর যাইয়া উক্ত আস্তাবলের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি দ্বিতল বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহাই

সেক্রেটারীমহাশয়ের খালি বাসা-বাড়ী। বাটীর রক্ষক দ্বার খুলিয়া দিয়া আমাদিগকে দ্বিতলের একটি প্রশস্ত ঘরে লইয়া গেল। তখনও প্রভাত হইতে ঘণ্টা বিলম্ব থাকায় কোচোয়ানকে বলিয়া দিলাম যে, আমরা ৬টার সময় বাহির হইব, সেই সময় যেন সে গাড়ী লইয়া আসে।

২রা এপ্রেল প্রাতে ৬৷৷০টার সময় গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমরা জলযোগাদি শেষ করিয়া বর্ত্তমান নবাব বাটী বা নিজামৎ কিল্লার দক্ষিণ দিক হইতে উহার পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। যাইবার সময় নিজামৎ কিল্লার পূর্ব্বদিকে স্থিত মনি-বেগমের চৌক মসজিদ ও নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর ত্রিপলিয়া দরওয়াজা দেখিয়া গেলাম; নিজামৎ কিল্লার বর্ণনা-স্থলে ইহাদের বিষয় বিবৃত হইবে।

নিজামৎ কিল্লা ছাড়াইয়া ক্রমে আমরা জাফরগঞ্জে প্রবেশ করিলাম। নবাব মির্জাফরের নামানুসারে এই স্থানের নাম জাফরগঞ্জ হইয়াছে। ইহা মুর্শিদাবাদ সহর ও নসীপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ৭৷০টার সময় সদর রাস্তার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত জাফরগঞ্জ মকবরা বা নিজামৎ মকবরা নামক মুর্শিদাবাদের নবাব-বংশীয়দিগের কবরস্থানে আসিলাম। কবরস্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। পশ্চিম

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। মির্জাফরের বাটীর দরওয়াজা

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। সিরাজউদ্দৌলার হত্যার স্থান

দিকের সদর দ্বার দিয়া কবরস্থানে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রকোষ্ঠ আছে, উহাতে লোকজন থাকে। এই বাটীর মধ্যে সম্মুখের উঠানে উন্মুক্ত আকাশতলে সারি সারি শান-বাঁধান কবর আছে। কোন কোন কবরের উপরে চারি পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের পাড় বা ধারি বসান আছে। দক্ষিণ দিকের কবরের সারির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে ইতিহাস-বিশ্রুত কীর্ত্তিমান্ ও স্বদেশদ্রোহী নবাব মির্জাফরের কবর আছে। কবরটি সাদা-সিধা, কিন্তু ইহার উপরিভাগে চতুঃপার্শ্বে কাল পাথরের পাড় বসান আছে। নবাব মীরকাশিমের পতনের পরে

ইংরাজদিগের দ্বারা মির্জাফর দ্বিতীয়বার নবাব নিযুক্ত হইলে কলিকাতায় ইংরাজদিগের ক্রমাগত পাওনার তাগাদায় দুর্ভাবনায় তাঁহার মৃত্যুর দিন দ্রুত ঘনাইয়া আসে; এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার কলঙ্ক-কালিমা-লিপ্ত জীবনের অবসান হয়। এই স্থানের সকল কবরে প্রস্তর-ফলকে মৃত ব্যক্তির নাম এবং জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় লিখিত আছে। এই স্থানে বর্ত্তমান নবাবদিগের পূর্ব্ব পুরুষ হুমায়ুন ঝার কবর আছে। উঠানের উত্তর দিকে একটি থক ঘেরা স্থানে বেগমদিগের কবর আছে, তথায় নবাব মির্জাফরের সহধর্ম্মিণী চৌক মসজিদ নির্ম্মাতা মনিবেগমের এবং অন্যান্য নবাবদিগের বেগমগণের কবর আছে। এই কবর স্থানের পশ্চিমের সদর রাস্তার পশ্চিমে তিন-গুম্বজ-বিশিষ্ট একটি বড় মসজিদ আছে। মসজিদটি পূর্ব্বদ্বারী, উহার প্রতি যত্ন নাই বলিয়া বোধ হইল।

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। মির্জাফরের দরবার-গৃহ

এই মকবরা ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর উত্তর দিকে যাইলে সদর রাস্তার

মুর্শিদাবাদ—মহিমাপুর। জগৎশেঠদিগের প্রাচীন বাটীর ভগ্নাবশেষ

পশ্চিম পার্শ্বে নবাব মির্জাফরের বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাকে জাফরগঞ্জের নবাব-বাটী বলা হয়। এই বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে নহবৎখানা-শোভিত একটি সুউচ্চ দ্বিতল দরওয়াজার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। দরওয়াজার দুই পার্শ্বে রক্ষীদিগের থাকিবার জন্য কয়েকটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠ আছে। দরওয়াজার মধ্যস্থ খিলান এরূপ উচ্চ যে অত্যুচ্চ হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইহার মধ্য দিয়া অনায়াসে যাওয়া যায়। মির্জাফরের বাটীতে এই প্রকারের আর একটি দরওয়াজা পশ্চিম দিকে ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ গতবারে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু এবার তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। মির্জাফর নবাবী মসনদে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে জাফরগঞ্জের এই বাটীতে বাস করিতেন। বিশ্বাসঘাতকদের বাসস্থান বলিয়া ইহাকে নিমকহারামী দেউড়ী কহে।

পূর্ব্বোক্ত দরওয়াজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক ডাইন দিকের পথ ধরিয়া যাইলে সম্মুখে একটি বৃহৎ একতালা হলঘর বা চাঁদনীর ন্যায় ঘর আছে। এই ঘরের প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুইটি চাকাযুক্ত সিংহের বদনমণ্ডল-শোভিত ক্ষুদ্র কামান আছে। কামান দুইটির উপরে ঢালাই-করা ইংরাজী অক্ষরে লিখিত আছে যে, উহাদিগের জন্মস্থান বার্মিংহাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উক্ত ঘরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, অনেকগুলি ছোট ঝাড়-লণ্ঠন টাঙ্গান আছে। ঘরটি দেখিতে একটি বড় বৈঠকখানার ন্যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই ঘরটিকে বৈঠক-খানা রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছিলাম। এবার আসিয়া ইহার সাজসজ্জা দেখিয়া বোধ হইল যে, ইহা বৈঠকখানা ও ইমামবাড়ী উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে। এই গৃহটি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।

মুর্শিদাবাদ—মহিমাপুর। সতীদাহের স্থান—সতী-চৌরা

এই গৃহের পার্শ্বে একটি পুরাতন দ্বিতল বাটী আছে। উহার পূর্ব্ব পার্শ্বের একটি প্রাচীর-বেষ্টিত ছোট বাগিচার উত্তর-পূর্ব্ব কোণার দিকে একটি ক্ষুদ্র নিম গাছ আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে একটি প্রকোষ্ঠ ছিল। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইবার

মুর্শিদাবাদ—কাটরা মসজিদের সম্মুখ। ডাইন দিকের প্রকোষ্ঠের নীচে মুর্শিদ কুলির কবর আছে।

পরে পলায়মান নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ধরিয়া আনিয়া এই প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে মির্জাফরের নিষ্ঠুর পুত্র মিরণের অনুমতিক্রমে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মহম্মদীবেগ বার বার তরবারির আঘাত দ্বারা সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিয়াছিল। মহম্মদীবেগকে তরবারি হস্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সিরাজ কহিয়াছিলেন "ইহারা কি আমাকে রাজ্যের কোন নিজ্জন স্থানে অতি দীন অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে দিতেও অসম্মত ?"

মুর্শিদাবাদ—কাটরার মসজিদের উপাসনা-গৃহ

এই স্থান হইতে ফিরিয়া পুনরায় পূর্ব্ববর্ণিত সদর দরওয়াজার নিকটে আসিলে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ আর একটি পথ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া পশ্চিম দিকে যাইলে বাম দিকে মির্জাফরবংশীয়দিগের আবাসবাটী এবং ভগ্ন অট্টালিকা আছে। উক্ত পথ ধরিয়া আর কিয়ংদূর পশ্চিম দিকে যাইলে একটি জনমানবহীন অবরুদ্ধ মহলে উপস্থিত হওয়া যায়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্টকের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, তখন দেখিয়াছিলাম যে, এই মহলের উঠানের দক্ষিণ দিকের বাটীগুলি লোক লাগাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল। এবার দেখিলাম যে সেই বাটীগুলির ভগ্ন দেওয়ালের কতকাংশ এখনও দণ্ডায়মান আছে।

এই মহলের উঠানের উত্তর দিকে মির্জাফরের স্তম্ভ-শোভিত বৃহৎ দেওয়ানখানা বা দরবার-গৃহের ছাদবিহীন ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান আছে। এই গৃহের সম্মুখভাগ দক্ষিণ দিকে। সম্মুখে বিস্তৃত সোপান-শ্রেণী ; তাহার উত্তরে খোলা রোয়াক, ও রোয়াকের মধ্যস্থলে একটি বড় চৌবাচ্চা আছে। এই রোয়াকের পশ্চাতে বা উপরে ৮টি বৃহৎ গোল থাম আছে। তন্মধ্যে ৪টি থাম দরবার-হলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দ্বিতল প্রকোষ্ঠদ্বয়ের সম্মুখ বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বাকী ৪টি থাম মধ্যস্থলের হলঘরের বা দরদালানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মধ্যস্থলের ৪টি থামের পশ্চাতে বা উত্তরে যে দরদালান আছে, তাহার পশ্চাতে আর একটি দরদালান আছে। তাহার পশ্চাতে আর একটি দরদালান এবং তাহার পশ্চাতে একটি দালান আছে। এই গুলির উপরের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এবং ইহাদিগের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল প্রকোষ্ঠগুলি আছে। এক দিকের প্রকোষ্ঠের ছাদ আছে, অপর দিকের ছাদ নাই। গৃহের দেওয়ালের এক স্থানে দস্তার পাতের উপর লিখিত আছে যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক ইহা সংস্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। এই গৃহের সম্মুখস্থ উঠানের পশ্চিম দিকে একসারি একতলা ঘর শুধুই পড়িয়া আছে।

এই বাটীতে পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে ওয়াটস সাহেব পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের বেশে রুদ্ধদ্বার পাল্কীতে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়া বিশ্বাসঘাতক মির্জাফরের সহিত শেষ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা জাফরগঞ্জের নবাববাটী ত্যাগ করিয়া মহিমাপুরে জগৎ শেঠের বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে চলিলাম। এই নবাববাটীর কিয়ংদূরে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে মহিমাপুর পুলিসের থানা আছে। উহা অতিক্রম করিয়া নসীপুর রাজবাটীর পশ্চিম দিকের সদর রাস্তা ধরিয়া

মুর্শিদাবাদ—তোপখানা। জাহানকোষা তোপ।

উত্তর দিকে চলিলাম। রাস্তার পার্শ্বেই সুবিস্তীর্ণ সোপান-শ্রেণী-শোভিত বৃহৎ রাজবাটী রহিয়াছে, উহার সম্মুখে শাস্ত্রীরা পাহারা দিতেছে। এই রাজবাটীতে এক্ষণে এডমণ্ড বার্ক-বর্ণিত অত্যাচারী দেবীসিংহের বর্ত্তমান বংশধরগণ বাস করেন। রাজবাটীটি এই বংশের কীর্ত্তিচাঁদ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন।

মহিমাপুর—জগৎ-শেঠের বাটী

এই স্থান অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর উত্তর দিকে যাইলে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে জগৎ শেঠের বর্ত্তমান বংশধরদিগের সুবিস্তৃত দ্বিতল বাটী ও একটি নব-নির্ম্মিত বৃহৎ জৈন মন্দির আছে। জৈন মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি পুরাতন কষ্টিপাথর সজ্জিত আছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া দেখিয়াছিলাম যে, ঐস্থানে একটি টিনে এইরূপ লিখিত ছিল যে, এই কষ্টি পাথরগুলি বিক্রয়ের জন্য আছে। দেখিয়া বোধ হইল যে জগৎশেঠের বর্ত্তমান বংশধর-দিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুন্ন হইলেও, ইহারা একেবারে নিঃস্ব নহেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভাগিরথী তীরস্থ প্রাচীন সৌধ ভাঙ্গিয়া গেলে, জগৎশেঠবংশীয়গণ এই স্থানে নূতন বাটী ও দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই বাটী ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর উত্তর দিকে যাইলে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে জগৎশেঠদিগের প্রাচীন ত্যক্ত বাটীর ভগ্নাবশেষ ও আম্রবাগিচা বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ডের উপর দণ্ডায়মান আছে। ইহা জগৎশেঠের বাটীর পূর্ব্বে কয়েক শত বিঘা ভূমি জুড়িয়া ছিল,—ইহার অনেকাংশ এক্ষণে

মুর্শিদাবাদ—কদম রসুল

ভাগীরথী-গর্ভে লীন হইয়াছে। এখনও যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড জুড়িয়া অট্টালিকাদির যে ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, বহুদূর জুড়িয়া জগৎশেঠের প্রাসাদ, দেবালয়, বহির্ব্বাটী, গদী ও অন্দরমহল অবস্থিত ছিল। গত বারে আসিয়া দেখিয়াছিলাম যে, পুরাতন বাটীর ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ইষ্টক তুলিয়া লওয়া হইতেছে। এবার দেখিলাম যে সে সকল স্থানে গভীর খাত বিদ্যমান আছে। শেঠদিগের প্রাচীন বাটীর বাম দিকে একটি দেওয়াল দণ্ডায়মান আছে, উহাতে সিন্দুর লিপ্ত একটি বৃহৎ হনুমানের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে শেঠ হরকচাঁদ কর্ত্তৃক ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত এনামেলকরা ইষ্টক-যুক্ত ৺গোপালজীউর মন্দির ছিল। উহা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে উহার ভগ্ন দেওয়াল, মেঝে এবং রোয়াক মাত্র অবশিষ্ট আছে। জগৎশেঠ হরকচাঁদ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জৈন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই স্থানে গোবিন্দজীউ নামক ৺কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই

মুর্শিদাবাদ—কদম রসুলের অভ্যন্তরস্থ মোদনা।

হইতে এতদ্বংশীয়গণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। ইহারই উত্তর পশ্চিমে সুখমহাল ও রংমহলের দেওয়াল। একটি শ্বেতবর্ণের বৃহৎ চৌবাচ্চা, ভগ্ন গৃহের দেওয়াল ও দক্ষিণ পশ্চিমে

মুর্শিদাবাদ—প্রাচীন সদর দেওয়ানী আদালত—বর্ত্তমান মবারক মঞ্জিল

জল যাইবার সুগভীর পাকা নালা প্রভৃতি এবং ঠাকুরবাটীর পশ্চিমে বৈঠকখানার ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত হনুমান-মূর্ত্তির দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মাটীর নীচে কয়েকটি খিলান-করা দ্বারবিশিষ্ট একটি গৃহ অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত ইন্দারা এখনও অভগ্ন ও মজবুত অবস্থায় আছে। এই ইন্দারার ব্যাস ১৪ ফিট; ভূমি হইতে ৩০ ফিট নীচে ইহার জল আছে। কিন্তু বহু দিন ব্যবহৃত না হওয়ায় ইহার জল অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া আছে। এই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে ভাগীরথী-তীরে যাইতে কতকগুলি প্রাচীন আম্রবৃক্ষ আছে। এই স্থানে জগৎশেঠের গদী ছিল। একটি পাকা-গাঁথনি-যুক্ত ইমারতের অতি বৃহৎ ভগ্নাবশেষ ঐরাবতের ন্যায় ভাগীরথীর জলে অর্দ্ধ-নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। গতবারে আসিয়া জগৎশেঠের বাটীর একটি ভগ্ন দেওয়ালের কার্নিসের উপরে নীলবর্ণের এনামেল-করা ইষ্টক দেখিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ ঐ ইষ্টকগুলি গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে আনীত; কারণ ঐরূপ ইষ্টক গৌড়ে দেখিয়াছি; এবং গৌড়েরই ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দ্বারা মুর্শিদাবাদ ও মালদহ প্রভৃতির অনেক বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এবার সে এনামেল-করা ইষ্টকের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিলাম না। জগৎশেঠের পুরাতন বাটীর ইষ্টকগুলি অতি পাতলা ও ছোট। ইমারতগুলির গাঁথনি সুরকী, গোয়া ও চূণ দ্বারা করা হইয়াছে। গাঁথনি আজিও বজ্রের ন্যায় মজবুত আছে। মাটীর ভিতর হইতে অতি গভীর পাকা বনিয়াদ গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল। এক্ষণে জগৎশেঠের প্রাচীন ভিটায় জনমানব নাই, শুধু বনজঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য হনুমান বাস করিতেছে। তাহারা মানুষকে ভয় করে না। জগৎশেঠদিগের "জগদ্বিশ্রাম" নামক বাগানবাড়ী ও টাঁকশাল ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল।

জগৎশেঠদিগের মহিমাপুরের প্রাচীন বাটীতে এককালে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। আলীবর্দ্দী খাঁর নবাবীর সময় মহারাষ্ট্রা বর্গরী মুসলমান অধিনায়ক মীর হবিব মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠ লুণ্ঠন-কালে জগৎশেঠের এই বাটী হইতে বহু ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই স্থানে পলাশী যুদ্ধের ... দিবস পরে ওয়াটস্ এবং ওয়ালস সাহেব রাজা রায়দুর্লভের ও মির্জাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা—দক্ষিণ দরওয়াজা

উক্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজদিগকে যে অর্থ দিবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল। এই স্থানেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন তারিখে ক্লাইব, ওয়াটস্, স্ক্রাফ্‌টন্, মির্জাফরের নিষ্ঠুর পুত্র মিরণ, রায়দুর্লভ এবং উমিচাঁদ যখন উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় ক্লাইব—উমিচাঁদের সহিত পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে যে কোন প্রকার সর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করেন। ইহার ফলে উমিচাঁদ ভগ্ন হৃদয়ে এই স্থান ত্যাগ করেন।

ওয়ালস্ সাহেব (History of Murshidabad District by Major J. H. Tull Walsh I. M. S. 1902) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই শেঠগণ রাজপুতবংশ-সম্ভূত। (কলিকাতার ওসওয়াল জাতীয় কোন কোন মাড়ওয়ারীর নিকট শুনিয়াছি যে জগৎশেঠগণ ওসওয়াল জাতীয় জৈন। ইহাঁদিগের কৌলিক উপাধি গেলড়া। ওসিয়া নগরের রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "ওসোয়াল" নামে বিদিত হন।) ইহাঁদিগের আদি বাসস্থান যোধপুরের নিকটস্থ নগর নামক স্থানে ছিল। অনুমান ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিরানন্দ শা পাটনায় আগমন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করেন। মাণিকচাঁদ নামক তাঁহার এক পুত্র বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করিতেন। ১৭০৩.৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করেন, এবং নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সুনজরে পড়িয়া তৎকর্ত্তৃক অর্থ-সরবরাহকারী ও মন্ত্রণাদাতা রূপে নিযুক্ত হন। ইনিই বঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহকারী হন এবং মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপন করেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফরকশিয়র তাঁহাকে "শেঠ" উপাধি প্রদান করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ফতেচাঁদ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি বলিয়া বিদিত হইলেন এবং ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট হইতে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ যখন মুর্শিদাবাদের নবাবী আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় তিনি ফতেচাঁদ জগৎশেঠের অনিন্দ্যসুন্দরী পুত্রবধূকে দেখিবার প্রবল বাসনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ফতেচাঁদ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সরফরাজকে সিংহাসন ও জীবন হারাইতে হইয়াছিল। জগৎশেঠদিগের এত অধিক ধন ছিল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সুতীর নিকটে ভাগীরথীর বিস্তৃত মোহানায় রৌপ্যমুদ্রা ঢালিয়া দিয়া উক্ত মোহানা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন—এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। এই সময় শেঠদিগের প্রায় ১০,০০০,০০০, টাকা

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—বর্ত্তমান নবাবের নূতন প্রাসাদের সম্মুখভাগ।

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—হাজার দুয়ারী বা প্যালেস

ছিল। ফতেচাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব রায় "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র স্বরূপচাঁদ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজদিগের সহিত নবাব মীরকাশিমের যুদ্ধারম্ভ হইলে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তদীয় সেনাপতি মহম্মদ তকী খাঁ জগৎশেঠ মাধবরায়কে এবং রাজা স্বরূপচাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে দুর্গের বুরুজ হইতে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। ইহার পর হইতে ইংরাজদিগের শাসন কালে জগৎশেঠবংশীয়দিগের প্রভাব প্রতিপত্তি কমিতে আরম্ভ হয়। নবাবী আমলে মীরকাশিমের সময় পর্য্যন্ত জগৎশেঠবংশীয়গণ রাজনৈতিক চক্রান্তসমূহে যে প্রধান নায়কের অংশ গ্রহণ করিতেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন।

নামক স্থানে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রাসাদ ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, মুর্শিদাবাদের নাম প্রথমে কুলুড়িয়া পরে মুকসুদাবাদ ও সর্ব্বশেষে মুর্শিদকুলী খাঁর নাম অনুসারে মুর্শিদাবাদ হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৩৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে এই স্থানে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া তিন বৎসর পরে নিজ নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন।

বেলা ৯টার সময় আমরা ই, বি, রেললাইন পার হইয়া নগরোপকণ্ঠের বনাকীর্ণ নির্জ্জন পথ ধরিয়া কাটরা মসজিদ দেখিতে পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। রাস্তাটি কাঁচা, অসমান এবং অপ্রশস্ত হওয়ায় অতি কষ্টে গাড়ী চলিতে লাগিল,—ভয় হইতে লাগিল বুঝি গাড়ী উল্টাইয়া যাইবে। এই নির্জ্জন পথের বাম পার্শ্বে এক স্থানে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি পুকুর আছে। উহার গভীর খাতে অতি সামান্য জল আছে।

মুর্শিদাবাদ নিজামৎ কিল্লা।—নবাবের নূতন প্রাসাদের দক্ষিণ দিক।

জগৎশেঠের প্রাচীন ভিটার কিয়দ্দূর উত্তর দিকে ভাগীরথী-তীরে যেখানে এক্ষণে বহু বাবলা গাছ ও বন জঙ্গল হইয়া আছে, ঐ স্থানকে "সতী চৌরা" কহে। ঐ স্থানে সতীদাহ হইয়াছিল। এখানে পিতলের চূড়া-শোভিত একটি বৃহৎ গোলাকার মন্দির ছিল। উহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথী-গর্ভে লীন হইয়াছে।

সতীদাহের স্থান দেখিয়া আমরা ফিরিয়া চলিলাম। অতঃপর আমরা নবাব-বাটী বা নিজামৎ কিল্লার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কুলুড়িয়া নামক স্থানে পথিপার্শ্বে যাদু সাহেবের ইমামবাড়ার একতলা নগণ্য কোঠা ঘর ও অপর পার্শ্বে বনের মধ্যে অযত্নে রক্ষিত তিন-গুম্বজ-শোভিত একটি প্রাচীন বড় মসজিদ দেখিলাম। কথিত আছে যে, কুলুড়িয়া

পুকুরের উত্তর পাড়ে একটি এক-গুম্বজ-বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদ আছে। উহার চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে, কিন্তু উপরে বড় বড় অশ্বথ ও বট গাছ হইয়াছে এবং গুম্বজটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই স্থান হইতে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া আমরা বৃহৎ কাটরা মসজিদের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইলাম। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন এই স্থানে কয়েকটি চালা ঘরে রাশিকৃত পিঁয়াজ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছিলাম,—এবার তাহা দেখিলাম না। যে ভূমিখণ্ডের উপর কাটরা মসজিদের বাটী দণ্ডায়মান আছে, উহার মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৮০।৯০ ফিট, এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৬৬ ফিট। মসজিদটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। ইহার সদর দরওয়াজা পূর্ব্ব দিকে

প্রস্তর-মণ্ডিত ১৪টি সোপান দিয়া দরওয়াজার ঘরে উঠিতে হয়। এই ঘরের নীচে একটি প্রকোষ্ঠ আছে; তথায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বংশাবতংশ করতলব খাঁ ওরফে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কবর আছে। ইঁহারই আমলে ইঁহার কর্ম্মচারী নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ বাকী রাজস্বের জন্য জমিদারদিগের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিত, তাহার বিবরণ "রিয়াজে" ও ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ইঁহারই আমলে জমিদারদিগকে তেকাঠায় পদদ্বয় দ্বারা ঝুলাইয়া বেত্রাঘাত, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা, শীতকালে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া হইত। বিষ্ঠা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ পূতিগন্ধময় "বৈকুণ্ঠ" বা "বেহেস্ত" নামক খাতে উহাদিগকে হাত ও পা বাঁধিয়া নিক্ষেপ করা
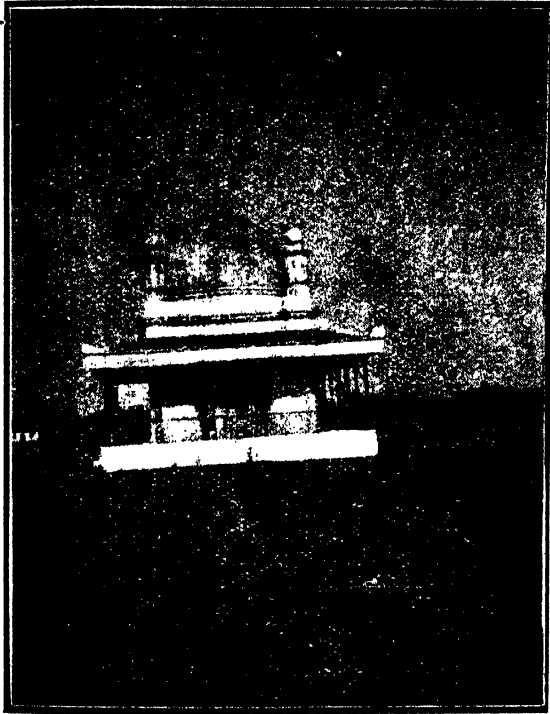
মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—সিরাজ উদ্দৌলার ইমামবাড়ার মেদীনা

হইত। কখন তাহাদিগের ঢিলা পায়জামার মধ্যে বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত; এবং কখন লবণ মিশ্রিত গো বা মেষদুগ্ধ পান করাইয়া তাহাদের উদরাময়ের সৃষ্টি করা হইত। মুর্শিদকুলী খাঁ মুসলমানদিগের নিকট পীরের ন্যায় সম্মানিত।

মুর্শিদকুলীর কবরটি অতি সাধারণ। কবরের উপর দিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসীগণ পদরজ দিয়া যাইবে বলিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই স্থান স্বীয় সমাধির জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সোপানশ্রেণী দিয়া দরওয়াজার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, দরওয়াজার ভিতর দিকে ৫টি ফোকর বা দ্বারের খিলান আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। দরওয়াজার উপরে দ্বিতলে নহবৎখানা আছে। ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে বিস্তৃত উঠান আছে। উঠানের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ১৮টি করিয়া ছোট ঘর পরস্পরের সহিত সংলগ্ন ছিল এবং প্রত্যেকের উপরে একটি করিয়া গুম্বজ ছিল। এই ঘরগুলির মধ্যে কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কতক আজিও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। উঠানের পশ্চিম দিকে ঐরূপ গুম্বজবিশিষ্ট ১৬টি ছোট ঘর আছে। উঠানের পূর্ব্ব দিকের মধ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত দরওয়াজা এবং তাহার উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে ৫টি করিয়া মোট ১০টি পূর্ব্বোক্তরূপ গুম্বজবিশিষ্ট ছোট ঘর আছে। এই ঘরগুলির প্রত্যেকের সম্মুখদেশে ৩টি করিয়া দ্বার আছে। তন্মধ্যে মধ্যের দ্বারটি পার্শ্বের দুইটি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বড়। এই ছোট ঘরগুলিতে মুসাফির ও ফকিরগণ থাকিতে পাইত। প্রকাশ আছে যে, এখানে ৭০০ কোরাণ পাঠকের স্থান হইত।

মসজিদবাটীর উঠানের মধ্যস্থলে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ৫ গুম্বজবিশিষ্ট একটি বড় মসজিদ আছে। দুইটি গুম্বজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাকী ৩টি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় আছে। মধ্যের গুম্বজটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। অর্দ্ধভগ্ন গুম্বজ তিনটির উপরিভাগে সবুজ বর্ণের এনামেল-করা চ্যাপটা ঘটীর ন্যায় মৃন্ময় চূড়া শোভা পাইতেছে। মসজিদের গুম্বজগুলি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মসজিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ৫টি বড় দ্বার আছে। তন্মধ্যে মধ্যের দ্বারটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার উপরিভাগে প্রস্তর-ফলকে ফার্সি ভাষায় লিখিত আছে যে, ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়, এবং "আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব, যে তাঁহার দ্বারের ধূলি কণা নহে তাহার শিরে ধূলি বর্ষিত হউক।" দ্বারগুলির চৌকাঠ কাল পাথরের। সম্ভবতঃ এগুলি গৌড়ের কোন প্রাচীন কীর্ত্তি হইতে খুলিয়া আনা হইয়াছিল। মসজিদের পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের বহির্দ্দেশে কার্ণিশের নীচে একসারি লৌহ বলয় বা কড়া আছে। উহাতে প্রয়োজনানুসারে পর্দ্দা বা চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইত। মসজিদের অভ্যন্তরের মাপ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৩৮ ফিট × পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ২৭' ফিট। দেওয়ালের স্থূলতা প্রায় ৬ ফিট। মসজিদাভ্যন্তরে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে যে উপাসনার প্রধান মিম্বর বা কুলুঙ্গীটি আছে, উহার উপরিভাগে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে সম্ভবতঃ কোরাণের বয়েত লিখিত আছে। এই মসজিদবাটীর সদর দরওয়াজা হইতে মসজিদে বা উপাসনালয়ে যাইবার জন্য উঠানের মধ্য দিয়া কাল পাথরের ৩´ ফিট প্রশস্ত একটি পথ আছে।

স্থানীয় লোকে কহিয়া থাকে যে, এই মসজিদবাটীর উঠানের নীচে পূর্ব্বে খিলান-করা ঘর ছিল—তাহা এক্ষণে বসিয়া গিয়াছে। উঠান বসিয়া গিয়াছে কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু মসজিদবাটীর পশ্চিম দিক যে বসিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া বুঝা যায়। মসজিদবাটীর বহির্দ্দেশে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার দিকে দুইটি ৭০।৭৫ ফিট উচ্চ অষ্ট-কোণ মিনার আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম দিকেরটির অবস্থা আজিও কথঞ্চিৎ ভাল আছে। ইহার উপরে উঠিতে হইলে ৬৯টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া (নিখিল বাবুর "মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে" ৬৭ সিঁড়ি লিখিত আছে।)

উঠিতে হয়। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকের বহু দূর পর্য্যন্ত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে মক্কার কোন মসজিদের অনুকরণে কাটরার এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ ১১৩৯ হিজিরায়=১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপূর্ব্বে ১১৩৭ হিজিরায়—১৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা কাটরা বা গঞ্জের মধ্যস্থ মসজিদ বলিয়া ইহার নাম "কাঠরা মসজিদ" হইয়াছে। এখানে এক্ষণে প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছোট হাট হয়।

কথিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ এই মসজিদ নির্ম্মাণের ভার মোরাদ ফরাস নামক এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। মোরাদ সর্ত্ত করিয়া লইয়াছিল যে ৬ মাস কালের মধ্যে সে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, কিন্তু তাহার কোন কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। পাষণ্ড মোরাদ জমিদারদিগের নিকট হইতে মিস্ত্রী, ছুতার, মজুর ও কারিকর প্রভৃতি বেগার ধরিয়া, হিন্দুর মন্দির ও আবাস গৃহাদি ধ্বংস করতঃ উহার মাল মসলা দ্বারা এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। হিন্দুর দেবালয়ের ইষ্টকের পরিবর্ত্তে নূতন ইষ্টক দিতে চাহিলেও তাহা গৃহীত হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে ৪।৫ দিনের পথ পর্য্যন্ত নদীতীরে কোন স্থানে মোরাদের অনুচরবর্গ হিন্দুর দেবালয় অভগ্ন রাখে নাই। "তারিখ বাঙ্গালায়" ইহার বিবরণ আছে। বর্ত্তমান কালের এদেশীয় ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ মন্দিরাদি ভাঙ্গার কথা অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহাতে অবিশ্বাসের কিছুই নাই। সম্ভবতঃ মোরাদানুচরগণ কিরীটেশ্বরীর কোন ক্ষতি করে নাই, কারণ উহা বাদশাহের ফার্ম্মাণ দ্বারা রক্ষিত ছিল। কাটরা মসজিদের সন্নিকটে কয়েক জন মুসলমানের খড়ুয়া ঘর আছে। মসজিদটি গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত।

কাটরা মসজিদের কিঞ্চিৎ দূরে পশ্চিম দিকে ফৌতি বা ফুটি মসজিদ আছে। সরফরাজখাঁ ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহা নিজামৎ কিল্লা হইতে ½ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ৫টি গুম্বজের মধ্যে ২টি আছে।

এই স্থান হইতে আমরা তোপখানা ও গোবরা নালা অভিমুখে চলিলাম। কাটরা মসজিদের অদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এই দুইটি অবস্থিত। মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদ নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এই স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভাগীরথীর যে শাখা প্রবাহিত ছিল, উহারই কোন স্থান গোবরানালা ও কোন স্থান ভাণ্ডারদহ বিল বলিয়া বিদিত। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা ও বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে তোপ, বন্দুক ও অস্ত্র শস্ত্র আনিয়া এই তোপখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিক দিয়াই রাজধানীর পূর্ব্ব দিকের প্রবেশ-পথ। তোপখানার পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বোক্ত গোবরা নালা বা কাঠরা ঝিল নামক সুপ্রশস্ত খাল অবস্থিত; ইহার স্থানে স্থানে গ্রীষ্মকালে সামান্য জল থাকে। এই খালের অদূরে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ আছে। উহার কাণ্ডের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ লৌহ কামান প্রবিষ্ট থাকিয়া ভূমি হইতে ৪´ ফিট উচ্চে শূন্যে ঝুলিতেছে। এক কালে এই কামানটি লইয়া যাইবার সময় ইহার চাকা এই স্থানে কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যায়। ফলে কামানটি পরিত্যক্ত হয়। তৎপরে এই স্থানে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটি জন্মিয়া কামানটিকে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করতঃ ক্রমশঃ উহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়াছে। কামানটি ১৭।০ ফিট দীর্ঘ। ইহার বেষ্টন তিন হস্তের অধিক, মুখের বেড় ১ হস্তের অধিক এবং রঞ্জুত ঘরের ব্যাস ১॥ ইঞ্চ। ইহার অঙ্গে কয়েকটি লৌহ-নির্ম্মিত বড় বলয় বা কড়া লাগান আছে। ইহার নাম "জাহান কোষা তোপ" অর্থাৎ ইহা জগজ্জয়ী। ইহার গাত্রে ৯টি পিতলের পাতে ফার্সি অক্ষরে কতকগুলি লিপি আছে। তন্মধ্যে ৩টি অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—ঘড়ী ঘর

লুক্কায়িত হইয়াছে। এই সকল লিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা শাজাহাঁ বাদশাহের রাজত্ব কালে যৎকালে (বঙ্গবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বনাশকারী) ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার রূপে ঢাকায় থাকিতেন, তৎকালে জাহাঙ্গীর নগরের (অর্থাৎ ঢাকার) দারোগা সের মহম্মদের অধীনে হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন নামক জনৈক কর্ম্মকার দ্বারা ১০৪৪ হিজরি ১১ই জমাদিয়সসানি (১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে) তারিখে এই কামানটি নির্ম্মিত হয়। ইহার ওজন ২১২ মণ। ইহাকে প্রত্যেক বার দাগিতে ২৮ সের বারুদ লাগে। ইহার উপরে নবাব ইসলাম খাঁর ও এই কামানের প্রশংসাবলী ফার্সি অক্ষরে লিখিত আছে। যে দেশে হিন্দু বাঙ্গালী কর্ম্মকার সামান্য সূচ হইতে এরূপ তোপ তৈয়ার করিতে

পারিত, সে দেশ বিলাতি দ্রব্য আমদানীর পর হইতে প্রায় কর্ম্মকার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কামান তৈয়ার করা দূরের কথা—অনেকে কামান চক্ষে পর্য্যন্ত দেখে নাই। কামানটি এক্ষণে দেবত্ব লাভ করিয়াছে,—সিন্দুর-লিপ্ত হইয়া পূজিত হইতেছে। এই তোপের সন্নিকটে একটি মুসলমান পল্লী ও অত্যন্ত বন জঙ্গল আছে।

অতঃপর আমরা কদমরসুল বা কদমসরিফ দেখিতে চলিলাম। ইহা কাটরা মসজিদের প্রায় সিকি মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে নবাব মির্জ্জাফরের প্রধান খোজা নবাব নাজরি ইহা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। এই বাটীর সদর দ্বার পশ্চিম দিকে। বাটীর

মুর্শিদাবাদ—খুসবাগ।—আলিবর্দ্দী ও সিরাজউদ্দৌলার কবর-শোভিত গৃহ। মধ্যের দরজার ভিতর দিয়া সিরাজের কবর দেখা যাইতেছে।

মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি উঠান আছে। উহার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কবর এবং মধ্যস্থলে একটি পানীয় জলের ইন্দারা আছে। উঠানের উত্তর দিকে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত উচ্চ মহল আছে। এই মহলের মধ্যস্থলে যে উঠান আছে, উহার পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের চারি কোণায় চারিটি মিনার আছে। এই উঠানের পূর্ব্ব দিকে একটি একতালা ঘর আছে। উহা ইমামবাড়া বলিয়া অভিহিত হয়। উঠানের উত্তর দিকে একটি এক-গুম্বজ-বিশিষ্ট ঘর আছে। উহার চারি কোণায় চারিটি মিনার আছে। এই ঘরের মধ্যে একটি বেদীর উপরে শ্বেত প্রস্তরে খোদিত একটি পদচিহ্ন আছে। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই কদমরসুলটি বসন্ত আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি দিয়াছিল। ইহা ছাড়া এক জোড়া কটা বর্ণের বেলে পাথরের পদচিহ্নও আছে। মুসলমানগণ কহিয়া থাকে যে, তাহারা পৌত্তলিক নহে; কিন্তু এখানে ও গৌড়ে দেখিলাম যে, ইহারা পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকে। কদমরসুলের বাটীতে চুণকাম হওয়ায় উহা দেখিতে অতি সুশ্রী হইয়াছে।

গৌড়ে যাইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তথাকার কাল কষ্টিপাথরের কদমরসুল নবাব সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে নবাব মির্জ্জাফর উহা পুনরায় গৌড়ে ফেরত পাঠাইয়া দেন। সিরাজ গৌড়ের কদমরসুল কোন্ স্থানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই।

কদমরসুল দেখিয়া আমরা মবারক মঞ্জিল বা হুমায়ুন মঞ্জিল দেখিতে চলিলাম। নবাব মির্জ্জাফরের অন্যতম পুত্র নবাব মবারকদ্দৌলা এবং নবাব হুমায়ুন ঝা'র নামানুসারে এই দুইটি নামকরণ হইয়াছে। এই মঞ্জিল বা বাগান-বাড়ী মতিঝিল হইতে অল্প দূরে উহার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। সম্মুখ দিকে বারান্দা ও স্তম্ভশোভিত একটি একতলা বড় দালান আছে। ইহারই অদূরে স্তম্ভশোভিত একটি উচ্চ বাটী আছে। উহা দেখিতে কতকটা কলিকাতার নিমতলা ষ্ট্রীটের ডাফ কলেজের (বর্ত্তমান যোড়াবাগান পুলিস কোর্টের) বাটীর ন্যায়। উহা ইংরাজের আমলে নির্ম্মিত। এককালে এই স্থানে ইংরাজ আমলের নিজামৎ আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালত অবস্থিত ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নবাব হুমায়ুন ঝা বাটীসহ এই জমি খরিদ করিয়া এখানে বাগান-বাটী নির্ম্মাণ করেন। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে বঙ্গের সুবেদারদিগের অভিষেকের জন্য কৃষ্ণপ্রস্তরের মসনদ ছিল। প্রস্তর-নির্ম্মিত এই মসনদ

বা বড় জলচৌকিটি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। মসনদটি সা সুজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা ক্রমে বঙ্গের চারিটি রাজধানীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে; যথা—রাজমহল হইতে ঢাকা, ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ ও মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা। বর্ত্তমান কালে এই স্থানটি জনশূন্য ও নির্জ্জন; গৃহগুলি পতিত ভূমিখণ্ডের মধ্যে অযত্নে দণ্ডায়মান আছে।

অতঃপর আমরা মতিঝিল দেখিতে চলিলাম। মতিঝিলের পূর্ব্ব দিকের ছায়া-শীতল রাস্তায় আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। কোথাও জনপ্রাণী নাই। রৌদ্রাধিক্যের জন্য কোথাও পক্ষীর শব্দ পর্য্যন্ত শুনা চারি কোণায় মিনার আছে। মতিঝিলের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে নবাব আলীবর্দ্দীর জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি ইমারত, একটি মসজিদ এবং সঙ্গী-দালান নামক একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই স্থানের বৃহৎ প্রাসাদ গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে সংগৃহীত কৃষ্ণবর্ণের কষ্টিপ্রস্তরের স্তম্ভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এক্ষণে এই স্থানে সঙ্গী-দালানের ভিতমাত্র অবশিষ্ট আছে, ও নওয়াজেসের সময়ের প্রাচীন মসজিদ, নবাব মির্জ্জাফর কর্ত্তৃক ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটি বারদ্বারী এবং প্রাচীন নগরতোরণের ধ্বংসাবশেষ আছে। এতদ্ব্যতীত একটি দ্বারবিহীন গৃহের ভগ্নাবশেষ
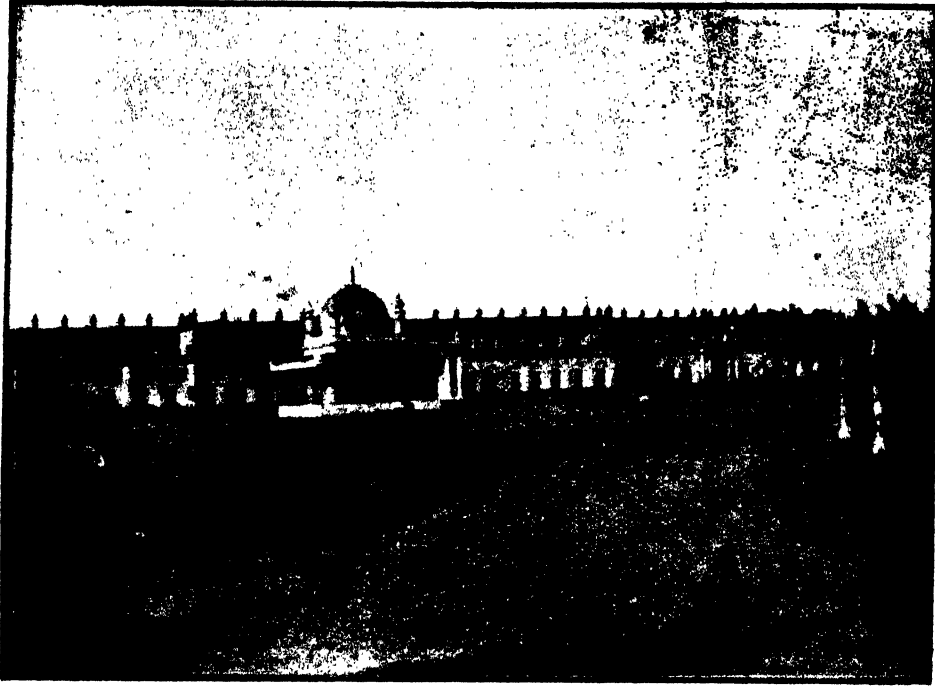
মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—ইমামবাড়া

যাইতেছে না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। নিজামৎ কিল্লা বা নবাব-বাটী হইতে ১॥০ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে মতিঝিল অবস্থিত। এই সরোবরের আকৃতি ঘোড়ার ক্ষুরের ন্যায়, কিন্তু আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, এই স্থান হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন ইহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা পূর্ব্বে ভাগীরথীর খাত ছিল। উক্ত পরিত্যক্ত খাত কাটাইয়া ঝিলে পরিণত করা হইয়াছিল। ইহার জলের উপরিভাগে ঘন পদ্মবনের মধ্যে জলপিপি ও পানকৌড়ি মহানন্দে জলকেলি করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্থান হইতে ঝিলের অপর পারে অর্থাৎ পশ্চিম পারে ইংরাজ আমলের একটি একতলা কোঠা ঘর আছে। শুনিলাম যে, উহা ইংরাজদিগের একটি পুরাতন কুঠীর ঘর। ঝিলের উত্তর প্রান্তে একটি তিন-গুম্বজ-বিশিষ্ট বড় মসজিদ আছে। উহার আছে। উহা ৬৫ ফিট দীর্ঘ, ২৩´ ফিট প্রশস্ত এবং ১২´ ফিট উচ্চ। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে, ইহার মধ্যে ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে। কিন্তু উহার সন্ধান করিতে গেলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। নওয়াজেসের মৃত্যুর পরে তদীয় রূপসী বিধবা পত্নী ঘেসেটী বেগম এই স্থানে বাস করিতেন। পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা ঘেসেটীকে এই স্থান হইতে বিদূরিত করিয়া তাঁহার ধনদৌলত আত্মসাৎ করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে নবাব মীরকাশিমের সৈন্যগণ ইংরাজ সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই স্থানে ঘেসেটী বেগমের ত্যক্ত প্রাসাদে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের বোর্ড অব রেভেনিউ আপিস ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই স্থানে নবাব নাজিম উদ্দৌলাকে মসনদে বসাইয়া তাঁহার দক্ষিণ দিকে চতুর ক্লাইব দেওয়ানরূপে

উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মতিঝিলের পূর্ব্বতীরে বৈষ্ণবদিগের তীর্থ কোঁয়ারপাড়া বা কুমারপুর অবস্থিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীব গোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া বৃন্দাবন হইতে এই স্থানে আসিয়া ৺ রাধামাধব বিগ্রহ ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে নব-নির্ম্মিত মন্দিরে বিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন। এখানে স্নান-যাত্রা উপলক্ষে মেলা হয়। কথিত আছে যে নবাব আলীবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ যখন মতিঝিলের পূর্ব্ব-তীরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, সেই সময় ৺ রাধামাধবের মন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা শব্দে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি এই স্থান হইতে বৈষ্ণব মোহান্তকে বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার নিকটে মুসলমানের খানা পাঠাইয়া দেন। উক্ত খানার আবরণ খুলিয়া সকলে দেখে যে, খানার পরিবর্ত্তে তথায় যূঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। মোহন্তের তপঃ প্রভাবে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে বুঝিয়া নওয়াজেস ঝিলের চারিদিকের ঘাটে মৎস্য ও পক্ষী বধ নিষেধ করিয়া দেন। এই স্থানের বর্ত্তমান মোহান্ত ঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ।

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—চকের নিকটস্থ ত্রিপলিয়া দরওয়াজা

বেলা অধিক হওয়ায় নবাব সাহেবের গাড়ীর ঘোটক এবং আমরা ক্ষুৎ পিপাসায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। নবাবের কোচোয়ান বৈকালে ২৷৷৹ টার সময় আবার গাড়ী আনিবে বলিয়া বিদায় লইল। এক্ষণে বেলা ১১৷৷ টা অতীত হইয়াছে। বাসার ভৃত্যকে রন্ধনের আয়োজন করিয়া রাখিবার জন্য প্রাতঃকালেই অর্থ দিয়া রাখিয়াছিলাম। সে সকল আয়োজন সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহে এত বেলায় রন্ধন করে কে? এত বেলায় বাঙ্গালীর খাদ্য ভাত ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগিবে না। অবশেষে ভৃত্যের সাহায্যে ললিতাদাদা দুইটি তাতে তণ্ড চড়াইয়া দিলেন। খাঁটি গব্য ঘৃত সহ মুগের ডাল ভাতে ও আলুভাতে ভাত এবং খাঁটি দুগ্ধ দ্বারা আহার সম্পন্ন করা হইবে, ইহাই সাব্যস্ত হইল। ভাত চড়াইয়া দিয়া আমরা নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে স্নান সমাপন করিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া আহার সমাপন করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

বেলা ৩টা হইল, কিন্তু নবাব সাহেবের গাড়ীর দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠিল না। তখন অগত্যা সন্নিকটস্থ ভাড়াটীয়া গাড়ীর আস্তাবলে যাইয়া এই দিন বৈকালের জন্য ও পরের দুইদিনের জন্য গাড়ীভাড়া এক সঙ্গে ফুরান করিয়াছিলাম। অতঃপর বেলা অনুমান ৩৷৷৹ টার সময় আমরা ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ সহরের বাকী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে চলিলাম। এই সকল দ্রষ্টব্য স্থানের অবস্থান অনুসারে তাহাদিগের বর্ণনা করা যাইতেছে।

যথেষ্ট রৌদ্র আছে এবং ফটোগ্রাফ লইবার সুবিধা হইবে বলিয়া বেলা ৩৷৷৹ টার সময় আমরা প্রথমেই বর্ত্তমান নবাব-বাটী বা নিজামৎ কিল্লা দেখিতে চলিলাম। এই স্থানে ও ইহার পূর্ব্ব দিকস্থ কুলুড়িয়া নামক স্থানে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সর্ব্ব প্রথম ইমারত ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিজামৎ কিল্লার দক্ষিণ দিকস্থ "দক্ষিণ দরওয়াজা" দিয়া আমরা নবাব-বাটীর এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই দরওয়াজাটি দ্বিতল। ইহার দুই পার্শ্বে শান্ত্রিগণের থাকিবার জন্য প্রকোষ্ঠ আছে। দরওয়াজা ছাড়াইয়া ভাগীরথীর পাড়ের উপরের রাস্তা দিয়া উত্তর দিকে যাইতে দেখা যায় যে, ডাইন দিকে নবাবের পুষ্পোদ্যান ও বাটী আছে, এবং বাম দিকে ভাগীরথীর একটি ঢালু স্নানের ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অতি সুশ্রী তিন-গুম্বজ-শোভিত ছোট মসজিদ আছে। এই স্থানে রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটি কাল পাথরের স্তম্ভ আছে। উহাদের শিখর দেশে পক্ষ বিস্তার করিয়া—যেন উড়িতে উদ্যত এইরূপ—দুইটি শ্বেত পারাবত বা পক্ষী শোভা পাইতেছে। এই স্তম্ভ দুইটি অতিক্রম করিয়া যাইতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে নবাবের নূতন প্রাসাদ (New Palace) আছে। ইহার সম্মুখভাগে বালির জমাটের উপর নানা প্রকার লতা ও পুষ্পাদি উৎকীর্ণ আছে। প্রাসাদটি শুভ্র বর্ণের। ইহার সম্মুখে ও পার্শ্বে ফুলবাগান আছে। ফুলবাগানের পশ্চিমে লালবর্ণের রাস্তা ও রাস্তার পশ্চিমে বাড়ীর খাতের মধ্যে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে নূতন প্রাসাদের সম্মুখে ভাগীরথীর পাড়ের ঠিক উপরে চতুর্দ্দিক খোলা একটি অতি সুশ্রী হাওয়াখানা বা বায়ু সেবনের ঘর আছে। হাওয়াখানার উত্তর দিকে ভাগীরথীর ধারে একটি অতি সুন্দর ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ঘাট আছে; এবং ঘাটের উপরের রাস্তার দুই পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত রূপ শ্বেত পক্ষী-শোভিত দুইটি মসৃণ কাল পাথরের (marble) স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ দুইটি ছাড়াইয়া ভাগীরথীর পাড়ের উপরের পথ ধরিয়া উত্তর দিকে যাইতে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে নকল পাহাড়

ও ঝিলাদি দ্বারা শোভিত নবাবের বিস্তৃত প্রমোদ-উদ্যান আছে। ইহারই সন্নিকটে ভাগীরথী-তীরে যাইবার জন্ত রাস্তার নীচে দিয়া একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ আছে। ইহা ছাড়াইয়া উত্তর দিকে যাইতে রাস্তার বাম বা পশ্চিম পার্শ্বে ভাগীরথীর পাড়ের উপরে একটি সুশ্রী তিন গুম্বজ-যুক্ত হরিদ্রাবর্ণের ছোট মসজিদ আছে; এবং রাস্তার ডাইন বা পূর্ব্ব পার্শ্বে বিখ্যাত "হাজার দুয়ারী" বা "আয়না মহল" বা "প্রাসাদ" (Palace) বা "বড়কোঠী" অবস্থিত আছে।

হাজার দুয়ারী অর্থাৎ প্যালেসটি ইটালীয় ধরণে নির্ম্মিত একটি বৃহৎ ত্রিতল বাটী। ইহা নবাব হুমায়ুন ঝাঁর সময় নির্ম্মিত হয়। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার কোরের জেনেরেল ডানকান ম্যাকলিয়ড ইহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে (ওয়ালস সাহেবের মতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) ইহার বনিয়াদের পত্তন করা হয় এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহার সম্মুখভাগ উত্তর দিকে এবং এই দিকে দ্বিতলে উঠিবার জন্ত ভূমি হইতে অতি প্রশস্ত ও একতলা সমান উচ্চ সোপানশ্রেণী (Grand Staircase) আছে। প্রাসাদের উপরে একটি গুম্বজ আছে। উহা এরূপ বৃহৎ বাটীর পক্ষে অতি ক্ষুদ্র ও বেমানান হইয়াছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে গুম্বজ আছে বলিয়াই বোধ হয় না। এই বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১৭ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

হাজার দুয়ারীর নীচের তলায় তোষাখানা, শেলেখানা (অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার ঘর) ও দপ্তরখানা (record room) আছে। শেলেখানাটি এই প্রাসাদের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এখানে নানা প্রকার প্রাচীন ও অদ্ভুত অস্ত্র, যথা—তরবারি, বল্লম, ছোরা, কামান ও বন্দুক প্রভৃতি আছে। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এখানে কারুকার্য্য-বিমণ্ডিত পিত্তল-নির্ম্মিত চাকাওয়ালা একটি কামান ছিল, উহা ৩' ফিট দীর্ঘ। ইহা দুই সের ওজনের গোলা নিক্ষেপ করিতে সমর্থ। কামানটির মুখ মনুষ্যের বদনমণ্ডলের ন্যায়, কিন্তু চোয়াল দুইটি কুম্ভীরের চোয়ালের ন্যায় এবং কর্ণ দুইটি খাড়া হইয়া থাকিত। ইহার গাত্রে নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত ছিল। ইহার উপরিভাগের মধ্যস্থলে যে লিপি ছিল, উহাতে "জয়কালী" শব্দ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম লিখিত ছিল। ইহার উপরের খোদাই কার্য্য রূপরাম চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিশোরদাস কর্ম্মকার এই কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কামানটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর ইহা নিজামত শেলেখানায় স্থান প্রাপ্ত হয়। এই মূল্যবান কামানটি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদিগের হয় নাই। নীচের তলায়, উপরের তলায় উঠিবার সিঁড়ির নিকটে কুম্ভীর ও অন্যান্য কয়েকটি মৃত জন্তু (Stuffed) সজ্জিত আছে। এইখানে সিঁড়ির সন্নিকটে একটি বেঞ্চির উপরে একখণ্ড অতি স্থূল বংশ-দণ্ড রক্ষিত আছে, ইহার বেড় প্রায় ২ ফিট ১ ইঞ্চ। এরূপ মোটা বংশ-দণ্ড পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। হাজার-দুয়ারীর দ্বিতলে বৃহৎ দরবার-কক্ষ, ভোজন-কক্ষ, বিলিয়ার্ড-কক্ষ ও বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগত দিগের জন্ত শয়ন-কক্ষ প্রভৃতি আছে। দ্বিতলের বিভিন্ন কক্ষে বহু প্রাচীন ও মূল্যবান চিত্র, হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত পালঙ্ক ও পুত্তলিকাদি এবং বিলাসের সাজ-সজ্জা আছে। কক্ষগুলির তলদেশ মূল্যবান প্রস্তরমণ্ডিত। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান আসবাব-পত্র দ্বারা সুসজ্জিত। দ্বিতলের দরবার-ঘরের উপরেই এই প্রাসাদের
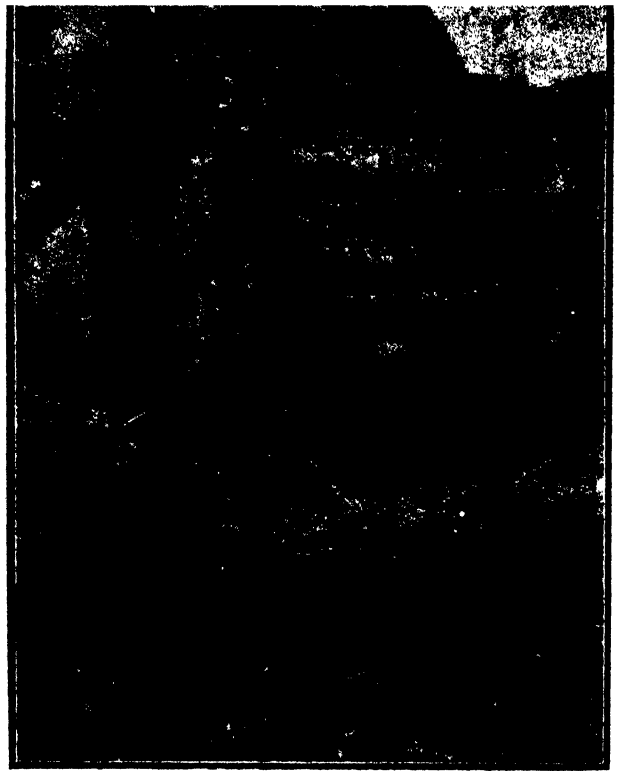
মুর্শিদাবাদ—ষ্টেসনের নিকটস্থ বেগম মসজিদ

গুম্বজটি অবস্থিত। উক্ত গুম্বজ ৬৩ ফিট উচ্চ ও উহার পার্শ্বে আলোক প্রবেশের জন্ত কাচ আচ্ছাদিত পথ (sky light) আছে। গুম্বজে নিম্নে ৭টি লোহার শিকল হইতে একটি মোটা লোহার শিকল নামি[illegible] আসিয়াছে। উহাতে একটি শ্বেতবর্ণের বেলোয়ারি কাচের বৃহৎ ঝাড় ঝুলিতেছে। উহার ১০১টি ডাল আছে। এই বৃহৎ দরবার-গৃহের চারি কোণায় চারিটি খিলান-করা প্রকোষ্ঠের ন্যায় স্থান আছে। ঐগুলি[illegible] মধ্যে এক একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। এই ঘরে মখমল-মণ্ডিত এ[illegible] বৃহৎ সিংহাসন আছে। দ্বিতলের বৃহৎ ভোজন-কক্ষটির মাপ ১৮[illegible] ফিট × ২১ ফিট। এই প্রাসাদের ত্রিতলে নাচঘর (ball room), পাঠাগার, চিনামাটীর আসবাব-পত্র ও দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর এ[illegible]

শয়নাগারসমূহ আছে। নাচঘরটি পূর্ব্বোক্ত ভোজন কক্ষের ন্যায় বৃহৎ। উহার মাপ ১৮৯ ফিট × ২৭ ফিট।

এই প্রাসাদের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন অস্ত্র, দলিল-পত্র, কোরাণাদি পুস্তক, মূল্যবান আসবাব-পত্র ও চিত্রাদি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখা হইয়াছে। ঐগুলি আর কখন এখানে ফিরিয়া আসিবে কি না কে জানে। এখানে মুর্শিদাবাদের নবাবদের নানাপ্রকার চিত্র (water-colour and oil-painting) আছে। একটি চিত্রে দেখিলাম যে, একজন নবাব (বোধ হয় হুমায়ুন ঝাঁ) ও তাঁহার একজন পেট-মোটা বয়স্য ইংরাজী ভাঁড়ের পোষাকে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। শুনিলাম যে, এই ঔদরিক বয়স্যটি প্রতিবারে ২৬ সের আহার্য্য উদরস্থ করিতে পারিতেন। এই সময়েই বোধ হয় নবাবগণ "নবাবের আনন্দে" পুষিতেন। এই হাজার-দুয়ারি প্রাসাদটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে নবাব সাহেবকে অনেকগুলি লোক নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে। ইহার "হাজার দুয়ারী" নাম অসার্থক নহে। কারণ, ইহার দরওয়াজা ও জানালাগুলি গণনা করিলে, উহাদিগের মোট সংখ্যা হাজার বা হাজারের কাছাকাছি হইবে। প্রাসাদটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ও হরিদ্রাভ। শুনিলাম যে, এই প্রাসাদটি এক্ষণে ইংরাজ সরকারের সম্পত্তি,—নবাব সাহেব ব্যবহার করিতে পান মাত্র।

মুর্শিদাবাদ—নিজামত কিল্লা।—হাজার-দুয়ারী বা প্যালেসের উত্তর পশ্চিমের মসজিদ

হাজার-দুয়ারীর সম্মুখে অর্থাৎ উত্তর দিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে বারান্দা-বেষ্টিত একটি সুশ্রী একতালা চতুষ্কোণ গৃহ আছে। ইহার নাম মেদীনা। এই স্থানে নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে বৃহৎ ইমামবাড়া ছিল, এই মেদীনাটি উহারই অন্তর্গত ছিল। অধুনা-লুপ্ত উক্ত ইমামবাড়া নির্ম্মাণ কালে কেবলমাত্র মুসলমান কারিকর নিযুক্ত করা হইয়াছিল—ইহা স্বজাতি-প্রীতির একটি নিদর্শন। নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভের প্রথম দিন সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং ইষ্টক ও চূণ সুরকী বহন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে ইহার বনিয়াদ পত্তন করিয়াছিলেন। উক্ত ইমামবাড়ার মধ্যস্থলে এই মেদীনাটি ছিল। যে ভূমিখণ্ডের উপরে ইহা অবস্থিত, উহার মাটী ৬ ফিট গভীর করিয়া খুঁড়িয়া ফেলিয়া সেই খাত মক্কা হইতে আনীত মাটীর দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল। উক্ত ইমামবাড়ার পূর্ব্ব দিকের পশ্চিম-দ্বারী ঘরে মজলিস হইত এবং পশ্চিম দিকের পূর্ব্ব-দ্বারী প্রকোষ্ঠগুলিতে ইমামদিগের কবরের স্বর্ণ, রৌপ্য, কাচ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত জবাব বা নকল ছিল। এই অংশে মহরমের সময় অহোরাত্র কোরাণ পাঠ হইত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে উক্ত ইমামবাড়ায় অগ্নি লাগিয়া উহার কতকাংশ পুড়িয়া যায়। পুনরায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে রাত্রি দুই প্রহরের সময় নবাবের প্রাসাদে সাহেবদিগের ভোজ উপলক্ষে যখন বাজী পোড়ান হইতেছিল, সেই সময় উক্ত ইমামবাড়ায় অগ্নি লাগিয়া এই মেদীনাটি ব্যতীত উহার সকল অংশ পুড়িয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই মেদীনাটি আজিও সুসংস্কৃত অবস্থায় আছে।

মেদীনার কিয়দ্দূর পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ তোপ আছে। উহার নাম "বাচ্চাওয়ালী তোপ"; অর্থাৎ ইহার শব্দ এরূপ ভীষণ যে, সেই শব্দে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইয়া থাকে। ইহা ১৫ ফিট দীর্ঘ। সহরের উপকণ্ঠ হইতে ইহাকে এই স্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

এই তোপের পূর্ব্ব দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত উচ্চ চিমনির ন্যায় দেখিতে একটি ঘড়ী-ঘর (clock-tower) আছে। উহাতে একটি ঘড়ী শোভা পাইতেছে। মেদীনা, বাচ্চাওয়ালী তোপ ও ঘড়ী-ঘর একই সারিতে অবস্থিত।

ইহাদিগের উত্তর দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ নূতন ইমামবাড়ার বৃহৎ বাটী বর্ত্তমান আছে। সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ইমামবাড়া পুড়িয়া যাইবার পরে এই নূতন ইমামবাড়াটী ১৮৪৭।৪৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান সৈয়দ সাদিক আলি খাঁর তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে স্থানে সিরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ইমামবাড়া ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে বর্ত্তমান

ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। নির্ম্মাণ শেষ হইলে রাজমিস্ত্রী ও মজুরদিগকে ছোট বড় নির্ব্বিশেষে শাল পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইমামবাড়া। ইহা চতুষ্কোণ। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৮০ ফিট। ইহা তিনটি মহলে বিভক্ত। মধ্যের মহলে ইহার মেদীনা অবস্থিত। এই বৃহৎ ইমামবাড়ায় অনেকগুলি বেলোয়ারি কাঁচের ঝাড় আছে। বাটীটি দ্বিতল, কিন্তু দ্বিতলে উঠিয়া দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্থানে আসিলে মুসলমানদিগের নানাবিধ বাধা নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। হিন্দুর অনেক জিনিস যেমন তথাকথিত হীন জাতির সংস্পর্শে কলুষিত হয়, সেইরূপ জাতিভেদহীন মুসলমানদিগেরও কোন কোন জিনিসে হিন্দুর সংস্পর্শ নিষিদ্ধ। অতএব সংস্পর্শ দোষটি শুধু হিন্দুর মধ্যেই আবদ্ধ নাই। ইমামবাড়ার উত্তর দিকে নহবৎ-শোভিত প্রধান প্রবেশ-দ্বার আছে। ইমামবাড়াটি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলির সময় নির্ম্মিত। ইনি নবাব হুমায়ুন ঝার পুত্র। ইমামবাড়ার পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর পাড়ের উপরে একটী হিন্দু মন্দির ছিল। ওয়ালস্ সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার স্থানে একটী দ্বিতল মসজিদ নির্ম্মিত হয়; এবং উক্ত মন্দিরের পরিবর্ত্তে ইছাগঞ্জে আর একটী হিন্দু মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ইমামবাড়ার পশ্চিম দিকে নিজামৎ কিল্লার একটী দ্বার আছে। তথায় দ্বারের পার্শ্বে প্রহরীদিগের থাকিবার ঘর আছে।

হাজার দুয়ারীর পূর্ব্ব দিকে নিজামৎ কিল্লার আর একটী দ্বিতল নহবৎ-শোভিত দরওয়াজা আছে। উহার নাম চৌক দরওয়াজা বা ত্রিপলিয়া নহবৎখানা। ইহাই নিজামৎ কিল্লার পূর্ব্ব দিকের প্রবেশ-দ্বার। ইহা নবাব সরফরাজ খাঁর পিতা নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক ১৭২৫ হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। এই দরওয়াজাটি চকে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে চৌক দরওয়াজা কহে। এরূপ বৃহৎ দরওয়াজা বঙ্গদেশে অতি বিরল।

এই দরওয়াজার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটী সুশ্রী মসজিদ আছে। উহার নাম চৌক মসজিদ। চকের বাজারের মধ্যে অবস্থিত থাকায় ইহার উক্ত রূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহা হাজার-দুয়ারীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। যেস্থানে এই মসজিদ আছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর চেহেল সেতুন বা চল্লিশটি স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ বা বারদুয়ারী বা দরবার-গৃহ ছিল। নবাব মির্জাফরের সহধর্ম্মিণী মণিবেগম ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্ম্মাণ করেন। সদর রাস্তার পশ্চিম দিকে মসজিদটি অবস্থিত। ইহার দ্বিতল দরওয়াজার দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচ্চ মিনার আছে। দরওয়াজার আলিসার উপরে এক সারি পিতলের চূড়া সূর্য্য-কিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পূর্ব্ব দিকের দরওয়াজার মধ্যস্থ সিঁড়ি দিয়া মসজিদ-বাটীর পাথর-বাঁধান উচ্চ উঠানে উঠিতে হয়। সম্মুখে উঠানের মধ্যে একটী পাথর দ্বারা বাঁধান চৌবাচ্চা আছে। উঠানটি পাথর দিয়া মোড়া। উঠানের পশ্চিম দিকে সপ্ত-গুম্বজ-শোভিত মসজিদ আছে। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি উচ্চ মিনার আছে। মিনার দুইটির ও মসজিদের গুম্বজগুলির উপরে চাকচিক্যময় পিতলের চূড়া শোভা পাইতেছে। মধ্যস্থলের গুম্বজটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহার দুই পার্শ্বের গুম্বজগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উঠানের দুই পার্শ্বে দুইটি একতলা ঘর আছে। উহাদের প্রত্যেকের সম্মুখ ভাগে তিনটি করিয়া ফোকর বা দ্বারের খিলান আছে। মসজিদটি নিত্য ব্যবহৃত হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মুর্শিদাবাদ—চৌক মসজিদ

এই গুলিই নিজামৎ কিল্লার প্রধান দর্শন-যোগ্য সামগ্রী। নবাব মির্জাফর শেষকালে মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া এই নিজামৎ কিল্লাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নিজামৎ কিল্লার বহির্দ্দেশে, বর্ত্তমান ইমামবাড়ার উত্তর দিকে চূড়াবিহীন একটি মাত্র গুম্বজ-শোভিত মাদ্রাসার দ্বিতল অট্টালিকা আছে। এতদ্ব্যতীত উত্তর দিকে আরও কতকগুলি দ্বিতল অট্টালিকা ও মসজিদাদি আছে।

মুর্শিদাবাদ রেল ষ্টেসনের কর্ম্মচারীদিগের আবাস বাটীর (Railway Quarters) সন্নিকটে উত্তর দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত চূণকাম-করা একটি ছাদবিহীন ছোট কবর আছে। ইহা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র বিলাসী নবাব সরফরাজ খাঁর কবর। কবরের প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে—"Nawab Sarfaraz Khan Bahadur, grandson

of Nawab Moorshid Coli Khan. Died in 1740 A. D." এই কবরটি পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের একমাত্র সরফরাজ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। হাজি আহম্মদ, রায় রাইয়াঁ আলমচাঁদ প্রভৃতি সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিলে, সরফরাজ রণক্ষেত্রে অগ্রসর হন। কথিত আছে যে, ইতিপূর্ব্বে সরফরাজ জগৎশেঠের সুন্দরী পুত্রবধূর রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে অন্ততঃ একবার দেখিবার জন্য জিদ ধরিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি এই ঘৃণিত প্রস্তাব জগৎশেঠের সম্মুখে উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি জগৎশেঠের পুত্রবধূকে স্বীয় প্রাসাদে আনাইয়া তাহার রূপ-সুধা পান করিয়া তাহাকে স্পর্শ না করিয়াই ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। ইহার ফলে উক্ত পুত্রবধূ পরিত্যক্ত হয় এবং জগৎশেঠ সরফরাজের পরম শত্রু হন।

যাহা হউক গিরিয়ার রণক্ষেত্রে রাত্রিকালে অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়াও সরফরাজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার বিশ্বাসী পার্শ্বচর বিজয় সিংহ তাঁহার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, বিজয় সিংহের নবম বর্ষ বয়স্ক পুত্র জালিম সিংহ পিতৃদেহ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। জালিমকে যখন আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় আলীবর্দ্দী তথায় উপস্থিত হইয়া বীর বালকের প্রাণ রক্ষা করেন। দেশের অতীব দুর্ভাগ্য বলিয়া জালিমের ন্যায় বীর বালক এ যুগে হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল হইয়া আসিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম চর্চ্চার আখড়ার পরিবর্ত্তে এক্ষণে সখের থিয়েটারের দল বসিয়া গিয়াছে।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল! যাহা বলিতে ছিলাম—সরফরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলে তাঁহার বিশ্বাসী মাহুত সকলের অলক্ষ্যে তাঁহার মৃতদেহ হস্তী-পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া গভীর রাত্রে মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রাত্রেই গোপনে সরফরাজের শব এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।

সরফরাজের নগণ্য কবরের কিয়দ্দূর উত্তর দিকে রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে আমবাগানের মধ্যে একটি অযত্নে রক্ষিত প্রাচীন মসজিদ আছে। উহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। মসজিদের উপরে ৩টি গুম্বজ আছে। গুম্বজগুলির উপরিভাগে সবুজবর্ণের এনামেল করা মৃন্ময় চ্যাপ্টা কলসের ন্যায় চূড়া আছে। এই এনামেল-করা চূড়াগুলি কাটরা মসজিদের চূড়ার ন্যায়। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করিয়া দ্বার আছে এবং ইহার সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে প্রস্তরের চৌকাঠ আঁটা তিনটি বৃহৎ দ্বার আছে। প্রস্তরের চৌকাঠ কয়টি গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। এই দ্বার কয়টির বহির্ভাগে উপরে খিলান-করা গোল আচ্ছাদনের ন্যায় আছে। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিমের দেওয়ালের মধ্যে তিনটি মিম্বর বা কুলুঙ্গী আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। মসজিদের ভিতরের মাপ উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫৭´ ফিট এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৩´ ফিট। ইহার দেওয়াল প্রায় ৩৲০ ফিট স্থূল। মসজিদের পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে তিনটি কাল পাথরের স্মৃতি-ফলক আছে। মসজিদটির নাম বেগম মসজিদ। কেহ বলেন যে ইহা নবাব সরফরাজ খাঁর মাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। অপর কাহারও মতে ইহা তাঁহার বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। যে স্থানে সরফরাজের কবর এবং এই মসজিদটি আছে, উহা একটি আমবাগান। এই স্থানকে নাখতা খালি বা ন্যাংটা খালি বা নাগিনীবাগ কহে। এই স্থানে সরফরাজের যে প্রাসাদ ছিল, তাহার কোন চিহ্ন নাই।

মুর্শিদাবাদ—খুসবাগ।—আলিবর্দ্দী ও সিরাজের গোরস্থানের মসজিদ। সম্মুখ ভাগ

রেল ষ্টেসন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে, ও নিজামৎ কিল্লার কিয়দ্দূর উত্তর দিকে প্রাচীর ও রেলিং দ্বারা ঘেরা একটি অতি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে নবাব সাহেবের সুবৃহৎ আস্তাবল আছে। এই ভূমিখণ্ডে কয়েকটি বড় বাড়ী আছে। এই স্থানে হস্তী, উষ্ট্র, ঘোটক ও গাড়ী থাকে। এরূপ বৃহৎ আস্তাবল পূর্ব্বে অন্য কুত্রাপি দেখি নাই। নবাবী কাণ্ডই আলাহিদা রকমের।

এই আস্তাবলের পশ্চিম দিকের সদর রাস্তা দিয়া সহরের লালবাগ নামক অঞ্চল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। আমরা ভাগীরথীর পরপারে অবস্থিত খুসবাগে নবাব আলীবর্দ্দী ও সিরাজদ্দৌলার কবর দেখিতে যাইতেছি। পথে ভাগীরথীর পূর্ব্ব পাড়ে অশ্বত্থ-ছায়া-শীতল একটি

খেয়াঘাট আছে। উহার সন্নিকটে একটি মিষ্টান্নের দোকান আছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মধ্যাহ্ন কালে আমরা এই খেয়াঘাটে পার হইয়া নদী-সৈকতের শ্মশান দিয়া পদব্রজে খুসবাগে গিয়াছিলাম। এবার তাহা না করিয়া আমরা গাড়ী করিয়া খুসবাগের সম্মুখস্থ পারঘাটায় যাইতেছি। ক্রমে ভাগীরথী-তীরের পথ ছাড়িয়া একটী পল্লীর ভিতর দিয়া চলিলাম। পল্লী অতিক্রম করিয়া পুনরায় ভাগীরথী-তীরের নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম যে, পথের পশ্চিম পার্শ্বে ভাগীরথী তীরে একটী বড় মসজিদ আছে। মসজিদটি তিন-গুম্বজ-বিশিষ্ট, ও উহার পূর্ব্বদিকে তিনটি দ্বার আছে।

এই মসজিদ ছাড়াইয়া আমরা যে স্থান দিয়া চলিলাম, উহা নির্জ্জন, জনমানবহীন। এইখানে ভাগীরথীর একটী পারঘাটা আছে। উহার নাম আমানিগঞ্জের ঘাট। লোকে গ্রীষ্মকালে এই ঘাটে যান বাহনাদি সহ হাঁটিয়া ভাগীরথী পার হইয়া থাকে। এই ঘাটে জলের গভীরতা ৩ ফিটের অধিক নহে। এই ঘাট হইতে সামান্য দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এক-গুম্বজ-বিশিষ্ট বৃহৎ কারবালা রহিয়াছে।

আমানিগঞ্জের ঘাটে জুতা খুলিয়া পদব্রজে ভাগীরথী পার হইয়া পরপারে খুসবাগের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়ের উপরে একটি অতি বৃহৎ ও প্রাচীন শিমূল গাছ আছে। উহার গাত্রের কাঁটাগুলি উঠিয়া গিয়া মসৃণ হইয়া গিয়াছে। উহার এই অবস্থা হওয়ায় সহসা দেখিলে উহা শিমূল গাছ কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৃক্ষটি অতি স্থূল,—শাখা-প্রশাখা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া যুগ যুগান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা এক্ষণে কয়েকটি অতি বৃদ্ধ শকুনীর আশ্রয় স্থল হইয়াছে। উহাদিগের বিষ্ঠায় নীচের আগাছাগুলির পাতা শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। শকুনী কয়টি অনিমেষ নয়নে বহুদূরে শান্ত দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছে। শিমূল গাছের পাদদেশ দিয়া একটা কাঁচা রাস্তা পশ্চিম দিকে খুসবাগের মকবরা বা কবর-স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই কবর-স্থানের পাদদেশ ধৌত করিয়া, ইহার পূর্ব্ব দিক দিয়া এক কালে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। উহার ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মকবরার সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এবার তাহার চিহ্ন দেখিলাম না। পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া এই মকবরায় প্রবেশ করিতে হয়। স্থানটি প্রাচীর-বেষ্টিত। দরওয়াজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, দরওয়াজার দুই পার্শ্বে প্রকোষ্ঠের ন্যায় আছে এবং পশ্চিম দিকে বিস্তৃত উঠান আছে। এই উঠানের উত্তর দিকে ১৭টি কবর আছে উঠানের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান আছে। উহার মধ্যে তিনটি কবর আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব দিকের দ্বারের নিকটের কবরটি নবাব আলীবর্দ্দীর মাতার। তাঁহার সমাধির জন্যই নবাব আলীবর্দ্দী এই খুসবাগ বা খোসবাগ প্রস্তুত করেন। প্রথমোক্ত উঠানের পশ্চিম দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত আর একটী ভূমিখণ্ড আছে। পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে উঠানের মধ্যস্থলে একটি একতলা কোঠা ঘর আছে। উহার প্রত্যেক দিকের মাপ প্রায় ২২ হাত। এই কোঠার চতুর্দ্দিকে ছাদযুক্ত বারান্দা আছে, এই কোঠার গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর, তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে নবাব সিরাজদ্দৌলার, তৎপূর্ব্ব পার্শ্বে তস্য ভ্রাতা মির্জামেহেদীর, সিরাজের পদতলে তাঁহার বেগম লুৎফুন্নিসার ও আলীবর্দ্দীর দক্ষিণে তাঁহার মহিষীর ও আর ২।৩টি কবর আছে। সিরাজকে হত্যা করার পরে তাঁহার মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে উঠাইয়া মুর্শিদাবাদের পথে পথে লইয়া বেড়ান হইয়াছিল এবং জনসাধারণকে ও সিরাজের শোকাভিভূত মাতা আমিনা বেগমকে দেখান হইয়াছিল। অসূর্য্যম্পশ্যা আমিনা পাগলিনীর ন্যায় রাজপথে বাহির হইয়া প্রাণাধিক পুত্রের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বিলাপ করিয়া সকলকে অশ্রুসিক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত মৃতদেহ এই স্থানে আনিয়া সমাহিত করা হয়। সিরাজের বেগম লুৎফুন্নিসা—যিনি তাঁহার সহিত রাজমহলে পলাইয়াছিলেন—তাঁহারই উপর এই সমাধি স্থানের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। ফরেষ্টার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে মোল্লা নিযুক্ত হইয়াছিল এবং সিরাজের বেগম মধ্যে মধ্যে এই স্থানে আসিয়া শোকপ্রকাশ করিয়া যাইতেন। আলীবর্দ্দীর কবরের উপরিভাগে কাল পাথরের পাড় দেওয়া আছে। সিরাজ ও তাঁহার বেগমের কবর অতি সাধারণ এবং সিমেণ্ট দ্বারা মাজা; কিন্তু কোন স্মৃতিফলক নাই। এই গৃহের পশ্চিম দিকের উঠানের পশ্চিমে একটি সুশ্রী তিন-গুম্বজ-শোভিত মসজিদ আছে। মসজিদের পূর্ব্ব দিকের খোলা রোয়াকে একটি চৌবাচ্চা আছে। খুসবাগের এই মকবরাটি এক্ষণে পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত। মকবরাটি অতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে চাষীদিগের পল্লী আছে। উহারা ভাগীরথী-তীরে প্রচুর পটল ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করিয়া থাকে। পল্লী বধূগণ এই মকবরার পার্শ্বস্থ পথ দিয়া ভাগীরথী হইতে জল আনিতে যায়।

খুসবাগের মকবরা দেখিয়া যখন আমরা ফিরিতেছি, তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, ৬৷৹ বাজিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। নির্জ্জন গোর স্থানের বৃক্ষগুলি হইতে সহসা পেচকের কর্কশ গুরুগম্ভীর নিনাদ চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আতঙ্কের সঞ্চার করিল, যেন উচ্চকণ্ঠে সতর্ক করিয়া কহিল "পথিক! চলিয়া যাও। নিশীথিনী আগতপ্রায়,—এ প্রেতের লীলাভূমিতে তোমাদিগের থাকিবার অধিকার নাই।" পেচকের ধ্বনি থামিতে না থামিতে শৃগালের করুণ ক্রন্দন চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া উঠিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা দ্রুত এই স্থান ত্যাগ করতঃ ভাগীরথী পার হইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। সে রাত্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধসহ জলযোগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন অর্থাৎ ৩রা এপ্রেল প্রাতে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত বড়নগর দেখিয়া নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে ফিরিবার সময় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে মনসুরগঞ্জ, হিরাঝিল এবং ফারুরাবাগ দেখিয়া সন্ধ্যাকালে আবাসে ফিরিয়াছিলাম। ইহার পরের দিন ৪ঠা এপ্রেল প্রাতে ৺কিরীটেশ্বরী দেখিয়া ফিরিবার সময় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ডাহাপাড়া ও নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদখাঁর সমাধি স্থান দেখিয়াছিলাম। কিন্তু পাঠকদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য বারান্তরে অগ্রে মুর্শিদাবাদ সহরের অতি নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বর্ণনা শেষ করিয়া পরে বড়নগর ও কিরীটেশ্বরীর বর্ণনা করিব।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

"নারায়ণঃ! ও কলি, একটু তামাক দে ত মা"—বলিয়া শ্রান্ত-কলেবর মাধব চক্রবর্ত্তী দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন, এবং সর্ব্বাঙ্গে ছোট-বড় সাদা-তালি-দেওয়া ছাতাটা দেওয়ালের গায়ে রাখিয়া কোমরে জড়ান একখানা আধময়লা গরদের চাদর খুলিতে খুলিতে একটু চাপা স্বরে বলিলেন, "যাক্, এখন নারায়ণের ইচ্ছেয় কাজটা শুভং শুভং মিটে যায় ত বাঁচি!"

নিকটেই দিগম্বরী ঠাকুরাণী বসিয়া পূজা করিতেছিলেন, কথা কয়টা তাঁহার কাণে গেল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে ঠাকুরকে নমস্কার করিবার সময় একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িলেন। প্রণামান্তে দাদার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে তুমি তাদের সঙ্গে একেবারে পাকাপাকি করে এলে দাদা?"

মাধব চক্রবর্ত্তী কোঁচার কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া কহিলেন, "হ্যাঃ—আবার দেরী করে? কি জানি—কোন্ ব্যাটা কখন ভাংচি দিক, আর এমন সম্বন্ধটা হাতছাড়া হয়ে যাক্! একেবারে ১৫ই দিন ঠিক করে এলুম।"

দিগম্বরী কোন কথা কহিলেন না। মাধব মুখ ফিরাইয়া কল্যাণীর উদ্দেশে একটু চেঁচাইয়া কহিলেন, "কই মা, একটু তামাক দিলি না?"

কল্যাণী বাম হাতে একটা থেলো হুঁকার মাথায় একটি কলিকা চড়াইয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফুঁ দিতেছিল। মামার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটে আসিয়া কহিল, "এই নাও, এখনও ভাল ধরেনি', টীকেগুলো ভিজে গেছে।"

মাধব কল্যাণীর হাত হইতে হুঁকা লইয়া একনিশ্বাসে ক্রমাগত ১৫।২০টা টানের পর ধূম বাহির করিল। কল্যাণী সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল,—কিন্তু নিজেকে অধিক দূরে সরাইয়া লইতে পারিল না। একটা আশঙ্কা, উদ্বেগ, দুঃখ, ব্যগ্রতা, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যেমন বেষ্টন করিয়া তাহার আপনার জনকে চারিপাশে ধরিয়া রাখে, এই বিবাহের প্রসঙ্গও কল্যাণীর পায়ে তেমনই বেড়া পরাইল। সে ঘরের ভিতর যাইয়া কপাটের আড়ালে হাত রাখিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধব কিছুক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তামাকু টানিয়া দেহটাকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইল। তার পর হুঁকো-কল্কে সরাইয়া রাখিবার অবকাশে একবার ভগ্নীর দিকে চাহিয়া দেখিল, দিগম্বরী হাঁটুদ্বয়ের উপর চিবুক রাখিয়া নতমুখে বসিয়া আছেন ও তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে! মাধব একটু করুণ অথচ উচ্চকণ্ঠে কহিল, "কেন ভাব্‌ছিস্ দিগে! ২৫ বিঘের উপর ভদ্রাসন, চক-মেলান বাড়ী, পুকুর, বাগান, অতিথিশালা, দরওয়ান, পাইক, লোক-লস্করই বা কত! আর কি অমায়িক ব্যবহার তা' আর একমুখে বলে উঠ্‌তে পারি না। জমীদার লোক, কত পয়সা—কিন্তু একটু গুমোর নেই,—একেবারে মাটীর মানুষ। বিয়ে ত এখনও হয় নি; কিন্তু এরি মধ্যে বাবাজী আমায় যে খাতির-যত্ন আর কিবা আপ্যায়িতটা করলেন, তা আর কি বল্‌ব! বল্লেন, 'কুলীনের মান কুলীন যদি না রাখে, তবে আর রাখবে কে?'—মাধব কোমরের কাপড়টা ঢিলা করিয়া দিতেই, মেঝের উপর কতকগুলা টাকা পড়িয়া গেল।

কল্যাণীর অধরে একটা ঘৃণার হাসি ফুটিয়া উঠিয়া, নির্ব্বাপিত-প্রায় দীপের শেষ ঔজ্জ্বল্যটুকুর মতই আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল!

দিগম্বরী ঠাকুরাণী পূজাকরা ফুলগুলি ধীরে ধীরে তুলিয়া পুষ্পপাত্রের উপর রাখিয়া কহিলেন, "সবই ত ভাল দাদা, কিন্তু বয়েসটা"—

মাধব চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "আরে কুলীনের আবার বয়েস? ৮০ নয়, ৯০ নয়—মাত্তর ৫০! এমনই বা কি বেশী বাপু? তখন যে গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে মালা বদল করে কুলীনের মেয়ের জাত রক্ষা হত—তা জানিস্ না!"

দিগম্বরী ক্ষুন্নস্বরে কহিলেন, "সেটা কি খুব ভাল কাজ করত দাদা? মেয়েটার সারা জীবন"—

মাধব বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দেখ্ দিগে, এত কষ্ট করে একটা ভাল সম্বন্ধ ঠিক করেছি। এটা যদি ভেঙ্গে দিস্, তা হলে তোর মেয়ের বিয়ের কথাতে আমি আর নেই—তা কিন্তু আমি বলে রাখছি"—

"এ যে দাদা তোমার অন্যায়"—

বাধা দিয়া মাধব দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই আমার অন্যায়। তোদের জন্যে প্রাণপাত করাটাই আমার অন্যায়!—বেশ, তোর মেয়ের বিয়ের কথাতে আমি আর যদি থাকি তবে আমি যাদব চকোত্তীর ছেলেই না—এই যা বল্লাম!" মাধব কাপড়ের খুঁট আঁটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এই যে খুড়ো, সকালেই ফিরেছ দেখ্ছি। এত চেঁচামেচি কিসের" বলিয়া ধীরু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই দেখ্ না ধীরু, কত কষ্ট করে শিরোমণির হাতে পায়ে ধরে—বুঝলি কি না ধীরু বাবা,—সেই সম্বন্ধটা পাকা করলাম, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেল, এখন বোন আমার গায়ের মাস টেনে ছিঁড়ছেন!—কালের ধর্ম্ম আর যাবে কোথায় রে!"

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি আর বলেছি দাদা, যে, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছ? পেটের মেয়ে, দশটা-পাঁচটা নয়—একটা মেয়ে! তাই বলছিলাম, পাত্রের বয়েসটা"—

মুখ বিকৃত করিয়া মাধব কহিল, "পাত্রের বয়েসটা, পাত্রের বয়সটা, একশ'বার ঐ কথা ধরে বসেছে। ব্যাটা-ছেলের আবার বয়েস কিরে?—তাতে আবার কুলীন! তোর মেয়ের বাবার ভাগ্যি যে জগদীশ-মুখুজ্যে জমীদারের হাতে পড়্ছে—এই জানিস!" রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মাধব চক্রবর্ত্তী বহির্বাটীতে চলিয়া গেল।

দিগম্বরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। কল্যাণী এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথাই শুনিতেছিল। ধীরু আসিতেই, সে বারান্দায় আসিয়া কোষাকুষি টাট্ প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম গুছাইবার অবকাশে নিম্নস্বরে বলিল, "চুপ কর মা!"

ধীরু আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। সকলেই নীরব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "তাহলে ওখানে কলির বিয়ে দিচ্ছ না পিসিমা?"

কল্যাণী পূজার সাজ লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দিগম্বরী হতাশভাবে বলিলেন, "আর না দিয়েই বা কি করি বাবা? যখন একটা কাণাকড়িও আমার সম্বল নেই, ভায়ের গলগ্রহ হয়ে আজীবন পড়ে আছি, তখন আর এত বাছতে গেলে চল্বে কেন? মেয়ের বরাতে যা আছে তাই হ'বে—কি করব?"

কথাগুলি ধীরুর প্রাণে বাজিল। কি জানি কেন—একটা দুঃখের বেদনা তাহার অন্তরকে পীড়ন করিল। কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া ধীরু কহিল, "পিসি, নিশ্চয় এ ভবিতব্য। আর আগে থেকে এমন খারাপটাই বা ভেবে নিচ্ছ কেন?"

সহসা আঘাত প্রাপ্ত একটা বিড়াল কাতর স্বরে "মিউ মিউ" শব্দে ঘর হইতে বাহিরে লাফাইয়া পড়িতেই, ধীরুর দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। ধীরু দেখিল, চৌকাঠের পাশে কপাটের এক পাল্লার আড়ালে হেলান দিয়া কল্যাণী বসিয়া আছে,—আর একটা রুদ্ধ অভিমান এবং প্রচ্ছন্ন বেদনা-মাখান অপলক দৃষ্টি স্থিরভাবে তাহার মুখের উপর ন্যস্ত! ধীরু চোখ ফিরাইয়া লইল।

দিগম্বরী কহিলেন, "এই মাসের ১৫ই দিন ঠিক হয়েছে। তাহলে এই কটা দিন ধীরু একটু কষ্ট করে খেটে খুটে সব জোগাড় করে ফেল বাবা!—দাদা একলা মানুষ—"

"কিন্তু আমি যে গাঁয়ে থাক্ছি না পিসি।"

দিগম্বরী বিস্মিত দৃষ্টিতে ধীরুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"সে কি রে? কোথায় যাবি?"

ধীরু উদাস কণ্ঠে কহিল, "যেখানে অদৃষ্ট আমায় টেনে নিয়ে যায়।"

"ক্ষ্যাপা ছেলে! আজ বাদে কাল কলির বিয়ে, তুই থাক্‌বি নে—কি করে কি হবে রে?"

ধীরু গম্ভীর ভাবে কহিল, "তাই ভাব্ছি!"

দিগম্বরী হাসিয়া কহিলেন, "তোর যত বাজে ভাবনা! ওসব খেয়াল ছাড়।"

ধীরু দিগম্বরীর দিকে চাহিয়া দৃঢ়ভাবে কহিল, "না পিসি, সত্যি! মেজদা আজ বলেছে—ও-বাড়ীতে আমার আর জায়গা হবে না।"

কল্যাণী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিল।

দিগম্বরী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "জায়গা হবে না কেন?"

"বাড়ী তাঁর—আবার কেন কি?—তাঁর বাড়ীতে তিনি থাকতে দেবেন না!"

দিগম্বরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাড়ী তাঁর একারই বা হ'ল কি করে, তা' ত জানি না!—আর তাই বলে কি মার পেটের ভাই হয়ে ভাইকে পথে বসাবে! তা এখন কি করবি মনে করেছিস?"

ধীরু হাসির ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, "যা হয় একটা কিছু করে নেওয়া যাবে। ও তুমি কিছু ভেব না পিসি! আমার ভাবনা আমি নিজেই কোন দিন ভাবিনি'—আর ভেবে কি মানুষ কিছু করতে পারে?"

কল্যাণী রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কিছু না—তার চেয়ে না ভেবে পরম নিশ্চিন্ত মনে লোকের অবজ্ঞা কুড়িয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ান ঢের ভাল।'

ধীরু কোন জবাব দিল না। কল্যাণীর কথাগুলোর মধ্যে শ্লেষ থাকিলেও, যে প্রচ্ছন্ন ব্যথাটা তার সঙ্গে জড়িত ছিল সেইটেই ধীরুকে বেশী আঘাত করিল। দিগম্বরী দুঃখের সহিত কহিলেন, "সত্যি ধীরু, তুই যদি বাবা এমন না হয়ে একটু মনোযোগ করতিস তা'হলে আজ ভাবনা কি ছিল? কলিকে কি তাহলে এমন ক'রে"—কল্যাণীর মুখ চোখ দিয়া আগুন ছুটিল,—সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ছুটিয়া যাইতেই, চৌকাঠে আঘাত লাগিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল। দিগম্বরী কল্যাণীর পানে চাহিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

ধীরুকে কে যেন সপাং করিয়া চাবুক মারিল! বিশ্বের সমস্ত বেদনা, পীড়ন একসঙ্গে দল বাঁধিয়া আসিয়া তাহাকে এমন ভীষণ ভাবে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, যাহার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজেকে এমন অসহায়, বিপন্ন আর কখনো সে অনুভব করে নাই। ধীরু তাহার সমস্ত শক্তি কণ্ঠে পুঞ্জীভূত করিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, "বাজে কথা ছাড়, এখন আমায় চা'টি ভাত দিতে পারবে?—বাড়ীতে খাব না, সেই জন্যেই তোমাদের বাড়ীতে এলাম!"

"বেশ করেছিস—এ কি তোর পরের বাড়ী? ও কলি, কলি"—

কল্যাণী ঘর হইতে উত্তর দিল, "কেন?"

দিগম্বরী কহিলেন—"ধীরু এখানে খাবে। একটু তেল আর গামছাখানা এনে দে মা, নেয়ে আসুক।"

ধীরু কহিল, "না, আমি আর নাইব না, আজ সকাল বেলাতেই গঙ্গাস্নান করেছি।"

কল্যাণী বাহিরে আসিয়া মুখে চোখে একটু প্রফুল্লতা আনিয়া হাসিয়া কহিল, "সেকি! আজ যে হঠাৎ বড় গঙ্গা নেয়ে পুণ্যি করে ফেল্লে? ও বালাই ত তোমার ছিল না—চিরকাল ত ঘোষেদের পচা পুকুরই তোলপাড় করেছ!"

ধীরু হাসিয়া কহিল, "তা সত্যি। তবে কাল রাতে ডোমপাড়ার মতি কাওরা কলেরা হয়ে মারা যায়! তোদের এখান থেকে ফেরবার সময় হরিবাগ্দির সঙ্গে দেখা। বল্ল—লোক জুটছে না। তাকে দাহ করতে গিয়েছিলাম।"

দিগম্বরী গালে হাত দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "সে কি রে! একে কলেরা হয়ে মরেছে, তাতে আবার কাওরার মড়া! তুই তা'কে অম্লান বদনে পুড়িয়ে এলি? এমনি গোঁয়ারতুমি করেই কোন্ দিন প্রাণটা হারাবি!"

ধীরু ম্লান হাস্যে কহিল, "আমার প্রাণের কোন দাম নেই পিসি! কাজেই সেটা গেলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই!"

কল্যাণী সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গেল।

মাধব চক্রবর্ত্তী পুনরায় আসিয়া কহিলেন, "তাহলে দিগে, আমি কাল ধীরুকে নিয়ে কল্‌কেতা যাই,—বিয়ের জিনিস-পত্তরগুলো সব কিনে আনি?"

দিগম্বরী কহিলেন, "হ্যাঁ দাদা, আর দিন কই? মাঝে ত মোটে ৫টা দিন আছে।"

মাধব দাওয়ার উপরে উঠিয়া কহিলেন, "বেশ কথা! তা' হলে একটা ফর্দ্দ করে ফেলা যাক—"বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা মেটে দোয়াত ও শরের কলম আনিয়া ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

কল্যাণী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠাঁই করিয়া ভাত বাড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "ভাত দিয়েছি।"

ধীরু ধীরে ধীরে গিয়া আসনে বসিল, এবং আহারের পূর্ব্বেই ঢক্‌ঢক্ করিয়া গেলাসের সবটুকু জল একেবারে নিঃশেষে খাইয়া ফেলিল। কল্যাণী বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া

কহিল, "একি, ভাত খাবার আগেই এক গ্লাস জল খেয়ে নিলে যে!"

ধীরু কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "যে তেষ্টাটাই পেয়েছিল!" ধীরু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

কল্যাণী কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল, এবং একখানা ছোট পাখা আনিয়া ধীরুর সম্মুখে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

ধীরু লজ্জাবিজড়িত ব্যস্ততা সহকারে কহিল, "থাক্, থাক, আর পাখার দরকার নেই,—গরম ভাত খাওয়া আমার অভ্যাস আছে।"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল, "তা থাক, কিন্তু মাছি খাওয়া ত অভ্যাস নেই,—দেখছ না চারিদিকে কত মাছি ভন্ ভন্ করছে"—

ধীরুকে খাওয়ান আজ যেন কল্যাণীর কাছে একটা নূতন কিছু বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সে কত দিন তাহাদের বাড়ীতে স্বেচ্ছায় অনাহূত অবস্থায় খাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এতখানি যত্ন করিবার প্রয়াস সে কোন দিনও করে নাই। আর আজ····· তার সুপ্ত বাসনা কোন্ এক অজানা ব্যর্থতার কঠিন স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে।

কল্যাণী কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "সত্যিই কি গাঁ ছেড়ে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ—যেতেই হচ্ছে!"······থালার ভাতগুলো নাড়াচাড়া করিতে করিতে ধীরু পুনরায় কহিল, "আজই যেতাম, কিন্তু বিয়েতে না থাকলে আবার"—

ধীরুর কথা শেষ করিতে না দিয়াই কল্যাণী কহিল, "ফিরবে কবে?"

অন্যমনস্ক ভাবে ধীরু কহিল, "জানি না।"

"তার মানে?"

ধীরু গম্ভীরভাবে কহিল, "বোধ হয় আর ফিরব না।" গলার ভাত বুকে বাধিয়া যাইতে সে তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমায় আর এক গ্লাস জল দাও ত!"

জলের পাত্র নিকটেই ছিল। কল্যাণী জল গড়াইতে গড়াইতে নতমুখে কহিল, "তা'হলে আমাদের মায়াও কাটালে?"

ধীরু জল খাইয়া গেলাসটা রাখিয়া দিল। গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াই উপস্থিত যেন তাহার সবচেয়ে বড় কাজ! একটা ত্যাগের শান্তি সহস্র দুঃখের ভিতর দিয়া তাহাকে সুখের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। সে আজ দৃঢ়, অবিচলিত। ধীরু আর খাইতে পারিল না, শুধু থালার ভাতগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কল্যাণী ধীরুর এতখানি উদাস ভাব জীবনে এই প্রথম লক্ষ্য করিল। কি যেন কিসের একটা তীব্র আঘাত তাহার ক্ষুদ্র অন্তরখানি বেদনায় ভরাইয়া দিল। সহস্র আবেগ-উৎকণ্ঠা একসঙ্গে আসিয়া তাহার বুক জুড়িয়া বসিল। সে কাঁদন-ভরা সুরে কহিল, "এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হ'লে ধীরুদা।"

ধীরু বিস্মিত হইয়া কল্যাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষু দুটী অশ্রুসজল। ধীরুকে শত বৃশ্চিক যেন একসঙ্গে দংশন করিল,—সে আসন ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িল।

উঠানের ওপার হইতে দিগম্বরী তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, "ও কি রে, উঠে পড়লি যে। বোস, বোস্, হরি গয়লার নতুন গাই বিইয়েছে,—তাই আজ একটু দুধ দিয়ে গেছে,—পাটালী দিয়ে খা। ম'কলি, এনে দে।"

ধীরু কহিল, "ভয়ানক পেট ভরে গেছে পিসি!—আর জায়গা নেই"—বলিয়া পুকুর ঘাটে হাত মুখ ধুইতে গেল। কল্যাণী কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি এঁটো থালা, বাটী, গেলাস লইয়া ধীরুর পশ্চাতে চলিল। ধীরু একবার পশ্চাতে চাহিয়া ঘাটে না গিয়া একটু দূরে আ-ঘাটায় নামিয়া মুখ ধুইতে লাগিল।

কল্যাণী ঘাটে আসিয়া, জলে থালাখানা ডুবাইয়া, ব্যথিত দৃষ্টিতে ধীরুর দিকে চাহিয়া কহিল, "ঘাটে হাত-মুখ না ধুয়ে, কাঁটা ভেঙ্গে ওখানে যাবার মানে?"

"অত কৈফিয়ত আমি দিতে পারি না" বলিয়া ধীরু নতবদনে চলিয়া গেল।

মানুষের মন এমনি করিয়াই মানুষকে দেখিতে পায়! ধীরেন তাহাদের কে? কেনই বা তাহার বিচ্ছেদজনিত দুঃখের চিন্তা তাহাকে এমন করিয়া পীড়ন করিতেছে? কেনই বা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এতখানি আগ্রহ, এসকল মানসিক প্রশ্নের জবাব কল্যাণী মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল একটা অব্যক্ত বেদনার কঠিন চাপ তাহার বুকে বসিয়া

রাজত্ব করিতে লাগিল। শাসনের তীক্ষ্ণ খোঁচায় সে তাহার কোমল প্রাণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিল। তপ্ত অশ্রু কিন্তু বাধা মানিল না,—দুই গণ্ড বাহিয়া পুকুরের শীতল জলে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িতে লাগিল—হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া এই নীরব ক্রন্দনের ভিতরেই কল্যাণী তাহার হাতের কাজ শেষ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিল।

৪

সকালে দিগম্বরী ঠাকুরাণী কল্যাণীকে বলিলেন, "আজ একাদশী। আমি গঙ্গা নেয়ে শ্যামের মন্দিরে যাচ্ছি কলি, তুই ততক্ষণ চার্‌টে চালে-ডালে মিশিয়ে তোর মতন খিচুড়ী করে খা—দাদা যদি ওবেলা আসে"—

কল্যাণী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত।"

কল্যাণীর মাতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "তবে ধীরেনদের বাড়ী থেকে বরং দুটো চাল ধার করে আনিস্"—

কল্যাণী বিরক্ত ভাবে বলিল, "আমি পারব না মা। না খেয়ে থাক্‌ব সেও ভাল, তবু ওদের বাড়ীতে আমি চাল চাইতে যেতে পারব না।"

"আচ্ছা, আমিই না হয় যাব'খন। তুই বাসন ক'খানা চট করে মেজে নিয়ে আয়।" দিগম্বরী ঠাকুরাণী তাঁহার জপের মালা-ছড়া হাতে করিয়া চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী তখন রকের উপর বসিয়া ছিল। বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়া খানিকটা রৌদ্র আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িয়াছে। তেঁতুলগাছের অন্তরাল হইতে একটী পাখী ডাকিয়া উঠিল, "চোখ গেল।" কল্যাণী বাঁশ-ঝাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, রৌপ্যোজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ গাছের উঁচু মাথা ছাপাইয়া এখানে সেখানে এক এক টুকরা প্রভাতের বৃন্তচ্যুত শেফালির মত মাটির বুকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কল্যাণী একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জীবনের পাতাগুলির উপর চোখ বুলাইয়া চলিল। ছেলেবেলা থেকে মামা মাধব চক্রবর্ত্তীকে আশ্রয় করিয়া মাতা-পুত্রীতে আজ ষোড়শবর্ষ এইখানে পড়িয়া আছে। পিতাকে সে কখনও দেখে নাই,—কেবল মার মুখে শুনিয়াছিল, তিনি না কি মহাকুলীন ও পণ্ডিত ছিলেন; এবং তাঁহার মৃত্যুতে ৮।১০টি নারী এক দিনে এক সঙ্গে হাতের নোয়া খুলিয়া, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া, কৌলিন্যের জয়ঢাক ভাল করিয়া বাজাইয়াছিল। তাহার মাতাও না কি ইহাদের মধ্যে একজন। কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তরভোগী মামা মাধব চক্রবর্ত্তী দু'চার ঘর যজমানের অনুগ্রহে যাহা কিছু সামান্য উপায় করিতেন, মোটা ভাত মোটা কাপড় তাহাতেই চলিয়া যাইত। মাধব অপুত্রক ও বিপত্নীক ছিল। কাজেই তাহার সমস্ত স্নেহটা ভাগ্নী কল্যাণীর উপরেই স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। কল্যাণীর বিবাহের কথা উঠিতেই মাধব চক্রবর্ত্তী ভগ্নীকে জোর গলায় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "এই গাঁয়েই পাত্র আমার ঠিক করা আছে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না বোন।" কল্যাণীর অধরে একটা মৃদু হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিত। কত দিন সে আনমনে কল্পনার পটে বাসনার তুলি দিয়া আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন্ ছবি আঁকিতে বসিত। কেমন করিয়া সে তাহার গৃহস্থালী পাতিবে—নিজের সমস্ত সত্তাটি ওই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে মিশাইয়া তাহার ভালমন্দ, শুভাশুভের সকল বোঝাই নিজের মাথায় তুলিয়া লইবে—ওই উদার, স্নেহশীল, সরল হৃদয়ের সমস্ত ম্লানিমা, সমস্ত গ্লানি সে তাহার ভালবাসা দিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিবে!

আজ কল্যাণীর অন্তরটা হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। যে সোণার স্বপনে মগ্ন হইয়া সে এত দিন প্রতীক্ষা করিতেছিল, বাস্তবের কঠিন আঘাতে আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। ভবিষ্যতের এক সন্ধ্যালোকের মাঝে নিজেকে লাল চেলী পরাইয়া একজন ৫০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের পাশে দাঁড় করাইতেই তাহার চারিধারের আলোক-রেখার উপর কে যেন একরাশ গাঢ় অন্ধকার ছড়াইয়া দিল। ওই স্থবির, কম্পমান বৃদ্ধের লালসার আগুনে তাহাকে আহুতি দিতে হইবে! দেহের অপমানে হৃদয় যখন ক্ষোভে, অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ওই লোকটা তখন তাহার কোনই খবর রাখিবে না,—পরম নিশ্চিন্ত মনে দিনের পর দিন তাহার দেহের উপর লালসার কালো ছাপ লেপিয়া দিয়া যাইবে। সে একটা কথাও বলিতে পারিবে না, বাধা দিতে পারিবে না! একটা অনুষ্ঠান ও গোটাকতক সংস্কৃত কথার জোরে ওই লোকটা তাহার সর্ব্বস্ব দখল করিয়া আজীবন বসিয়া থাকিবে! অথচ এই আত্মবিক্রয় সে নিজে হইতে করিতেছে না, এবং তাহার মত লওয়ার কেহ কোন প্রয়োজন বোধ করে না।—কিন্তু এই মরণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহাকে সারা জীবন জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে! কল্যাণীর চোখ দু'টা জ্বালা করিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

একটী মেয়ে এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কল্যাণীর পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল, "কি সই, বরের ভাবনায় এতই তন্ময় যে, রান্নাঘরে ঢুকে কুকুরে হাঁড়ি খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না।"

কল্যাণী শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "দেখছ না, ঘুম হচ্ছে না!—তার পর কবে এলি স্বর্ণ?"

স্বর্ণ কহিল, "এই ত কাল।"

কল্যাণী একটু হাসিয়া বলিল, "বর যে বড় ছেড়ে দিলে?"

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল, "পুরানো হলে কি আর ভাল লাগে?"

কল্যাণী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কি জানি ভাই, ওসব বুঝি না।"

"আহা হুঃখ কেন—হলেই জানবে" বলিয়া স্বর্ণ কল্যাণীর গাল টিপিয়া দিল।

"নে সর্—কত কাজ বাকী আছে দেখেছিস্।"

স্বর্ণ কহিল, "সত্যি, এত বেলা হ'ল, এখনও কাজপাট সারা হয় নি? রান্না চড়াস্ নি?"

"মার আজ একাদশী। তিনি শ্যামের মন্দিরে গেছেন। মামাও বাড়ী নেই। কাজেই আমার একার জন্যে আর রাঁধতে যাই কেন? যা হয় ব্যবস্থা হবে'খন।"

স্বর্ণ কল্যাণীর গলা জড়াইয়া বলিল, "তা ব্যবস্থাটা আমাদের বাড়ী করেই আমায় কৃতার্থ কর না কেন?"

"না ভাই, আমার শরীরটাও ভাল নেই—যা হয় শুকুন শাকনা খেলেই চল্‌বে।"

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল—"শরীর ত বেশই আছে দেখছি,—মনটাই কিছু গোলমাল বাধিয়েছে। ওসব শুন্‌ছি না, তোমাকে যেতেই হবে। বল ত মাসীমাকেও বলে যাচ্ছি।"

"না—না, তার দরকার নেই"—এমন সময়ে দিগম্বরী ঠাকুরাণী বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে কহিলেন, "হাঁা কলি, এত বেলা অবধি সব পড়ে আছে—কিছুই করিস্ নি!"

কল্যাণী হাসিয়া কহিল, "স্বর্ণের সঙ্গে গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেল মা!"

স্বর্ণ কল্যাণীর দিকে একবার চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "সত্যি মাসীমা, ওর দোষ নেই,—আমিই ওকে আটকে রেখে কাজ করতে দিইনি। ও এবেলা আমাদের বাড়ীতেই খাবে।"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল, "আজ থাক না ভাই, আর এক দিন না হয় খেলেই হবে।"

স্বর্ণ একটু অভিমান-ভরা গলায় কহিল, "শোন মাসীমা, কলি বলছে খাবে না—তা হলে আমি"—বলিয়া স্বর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী হাসিয়া কহিলেন, "দেখতে শুনতে কলি এখন একটু বড়সড় হয়েছে কি না, তাই আর কোথাও যেতে চায় না। তা তোরা ত আমার পর ন'স—ও যাবে'খন।" দিগম্বরী ঠাকুরাণী ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

স্বর্ণ কল্যাণীর গলা ধরিয়া কহিল, "কেমন—এখন ত হ'ল?" ইতিমধ্যে দিগম্বরী ঠাকুরাণী একবাটী মুড়ি ও কয়েকটা নারিকেল নাড়ু আনিয়া কহিলেন, "নে সোণা, এই জলপান ছুটো খা। এত দিন বাদে বিয়ের পর এলি—খালি মুখে যাবি? তা শ্বশুরবাড়ী থেকে কখন এলি?"

"কাল সন্ধ্যা বেলা" এই কথা বলিয়া স্বর্ণ দিগম্বরী ঠাকুরাণীর পায়ের ধুলা লইল।

"থাক্, থাক্—জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা" বলিয়া দিগম্বরী স্বর্ণর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "জামাই ভাল আছে ত?" স্বর্ণ ঘাড় হেলাইয়া মুখ নত করিল।

"কলির বিয়ের ঠিক হয়ে গেল মাসী?"

"হ্যাঁ বাছা।"

"ধীরুদার সঙ্গে ত।"

দিগম্বরী বাধা দিয়া কহিলেন—"ওখানে আর হল না, মা।"

"কেন?"

"ওরা মা বড়লোক,—তেমন গা করছে না। শাশুড়ী নেই, জায়ের সংসার। তার পর ভেবে দেখলুম, ওদের মেজবউ তেমন মানুষ ভাল নয়,—কাজেই আর এগুলুম না।"

কল্যাণী উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘর হইতে বাসনের গোছা লইয়া উঠানে নামিতেই, স্বর্ণ তাহার পশ্চাতে আসিল। ঘাটের চাতালে বাসনগুলো রাখিয়া কল্যাণী বলিল, "তুই ওই কাঠের গুঁড়ির উপর বোস্—আমি বাসন ক'খানা মেজে নি।"

স্বর্ণ কহিল, "আয় না, হুজনায় হাতাহাতি করে মেজে নি। তা'হলে শীগগির হবে।"

"না—তুই তোর গল্প বল্, আমি শুনতে শুনতে মেজে নি।"

স্বর্ণ কি বলিয়া তাহার স্বামীর কথা পাড়িবে, কোন্ দিনের কোন্ ঘটনা, কখনকার কি কথা আরম্ভ করিয়া সে তার গল্পের সূচনা করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। শ্বশুরবাড়ী, স্বামীব ঘর, আনন্দের সংসার—কত আশা-আকাজ্ঞায় ভরা সেখানকার প্রত্যেক বস্তুটী! রাশি রাশি কথা এলোমেলো ভাবে তাহার মনের মধ্যে পাক্ খাইয়া গেল! সেই মেটে-পাঁচিল-ঘেরা ঝকঝকে বাড়ী, ধবধবে উঠানের পাশে সারি সারি খড়ের টুপী-পরা গোল ধানের গোলা, পার্শ্বে তুলসীমঞ্চ, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ, ফুলবাগান······ ইত্যাদি তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। একটা অতিবড় সুখের চিন্তা তাহাকে মূক, অন্ধ এবং বধির করিয়া কত দূরে ভাসাইয়া লইয়া চলিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; শুধু একটা উদাস পলকহীন চাহনি বাহ্যজগতে পড়িয়া রহিল মাত্র।

স্বর্ণের এই ভাব-তন্ময় উদাস দৃষ্টি, পুলক-সঞ্চারিত মৃদু হাসির ক্ষীণ-রেখা চোখ-মুখে ফুটিতে দেখিয়া কল্যাণী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, যে কথা শুনিবার জন্য সে আজ এত ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, প্রাণের সমস্ত বাসনাকে একসঙ্গে বাঁধিয়া শ্রবণের দুয়ারে জড় করিয়া রাখিয়াছে, সে প্রসঙ্গ তাহার কাছে কত মধুর, কত লোভনীয়,—বিবাহিতা স্বর্ণ হয় ত তাহা বুঝিতে পারে নাই, বা বুঝিবার ইচ্ছাও তাহার নাই। তাই সে আপনার সুখ-চিন্তায় আপনিই ডুবিয়া রহিয়াছে।······ হায় স্ত্রীলোকের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এতখানি পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, এ কথা কল্যাণী কল্পনাও করিতে পারিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাতের আধমাজা বাসনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষুণ্ণস্বরে স্বর্ণকে কহিল, "তা ভাই, তুই কেন মিছিমিছি রোদে বসে কষ্ট পাস্, তুই বাড়ী যা।"

স্বর্ণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, না—রাগ করিসনি ভাই, সত্যিই আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।" তার পর সে বাসরঘর, ফুলশয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বাপের বাড়ী আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বরের কথা একে একে কহিতে লাগিল। স্বামীর আদর-যত্ন, ভালবাসার কত কথা, দিনের বেলায় ছুতানাতায় পান চূণ জল লওয়ার অজুহাতে যখন-তখন অন্দরে আসা-যাওয়া, কখনো বা ভুলক্রমে নববধূর ঘরে প্রবেশ ও তাড়াতাড়ি চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ ও হাসিয়া প্রস্থান, দূর হইতে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাতাইয়া তোলা এবং ঘন ঘন এ-কোণ সে-কোণে সচকিত দৃষ্টিপাত, মাথা-মুণ্ডহীন সমস্ত-রাত্রিব্যাপী গল্পগুজব, প্রাতে অনিচ্ছায় শয্যা-ত্যাগ...ইত্যাদি কত কথাই কহিতে লাগিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী স্বর্ণর স্বামীর কথা শুনিতে লাগিল—যেন তাহার মধ্যে কত মধু, কত মাদকতা। তার পর শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পাঁচজনের কথা উঠিল। কে কি দিয়া মুখ দেখিল, এই তারের বালা দুগাছা কে দিয়াছে, গলার হারছড়া ক'ভরির ইত্যাদি একের পর এক করিয়া ঘাড় হেলাইয়া, মুখ দোলাইয়া, চোখভঙ্গী করিয়া স্বর্ণ সমস্তই কল্যাণীকে কহিতে লাগিল। নিশ্চল প্রস্তর-প্রতিমার মত কল্যাণী স্বর্ণর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া সে সকল কথা শুধু কাণ দিয়া শুনিল না—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল।

সূর্য্য তখন ঠিক মাথার উপরে। কল্যাণীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে; বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তার মত চূর্ণ-অলক বাহিয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। পুকুর-পাড়ের ছায়ায় ঢাকা বাঁশঝাড়ের ভিতর হইতে একটা পাখী আপনার খেয়ালে থাকিয়া থাকিয়া হাঁক দিতেছিল—"বউ কথা কও, বউ কথা কও! বউ কথা কও।" হাসি, লজ্জা এবং আনন্দের ভিতর দিয়া গল্প বলা শেষ হইতেই স্বর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আঁচলখানি কোমরে জড়াইয়া কহিল "তিন ঘণ্টা ধরে ত ভাই গল্প করা গেল, বাসন কিন্তু একখানাও এ পর্য্যন্ত মাজা হল না।"

কল্যাণী একটু লজ্জিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, সত্যই গোছাভরা বাসন যেমনকার তেমনি পড়িয়াই আছে, একখানাও মাজা হয় নাই।

"দে দুখানা আমার কাছে, হাতাহাতি মেজে ফেলি, বেলা হয়ে গেছে" বলিয়া স্বর্ণ কল্যাণীর নিকটে আসিতেই, কল্যাণী ঘাড় নীচু করিয়া মাথা বাঁকাইয়া কহিল, "না, না—তোকে মাজতে হবে না, ভারী ত কখানা বাসন, এই ভাখ্ আমি দেখ্তে দেখ্তে মেজে ফেল্লুম বলে"—

স্বর্ণ একটু ক্ষুণ্ণভাবে কহিল, "যা খুসি কর, শীগ্গির নে।"—

কল্যাণী অতি ক্ষিপ্র হস্তে তাহার কাজ সারিয়া লইল; এবং কাপড় কাচিয়া বাসনের গোছা তাহার অর্দ্ধোত্থিত বাম হাতের উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিল—"বাস্, এই ত হয়ে গেল; চল এখন।"

উভয়ে চলিল। স্বর্ণ হাসিয়া কহিল, "আর তোকে পরের মুখে ঝাল খেতে হবে না কলি—তোরও ত ফুল ফুটে উঠেছে। বরের কথা বলবি ত?"

কল্যাণী অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল "বলব।" কিন্তু ভাবিয়া পাইল না—কি তাহাকে বলিতে হইবে। একজন ৫০ বৎসরের পলিত-কেশ, গলিত-বিবেক, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের সহিত তাহার প্রেমালাপ-কাহিনী! যে ব্যক্তি বয়স হিসাবে তাহার প্রায় চতুর্গুণ বড়, যৌবনকে যে প্রায় তিন যুগের পথে ফেলিয়া আসিয়াছে, বার্দ্ধক্য যাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার প্রেম, ভালবাসা, মিলন! কল্যাণীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে, রাগে তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া আগুন ছুটিল! যে সুখের কল্পনাকে সে এত দিন কত ভাবে চিত্রিত করিয়া সারা অন্তর ভরাইয়া রাখিয়াছিল, যাহার গঠন-কার্য্য শৈশব হইতেই মনের কোন্ গোপন কোণে আরম্ভ করিয়া আজ তাহাকে পূর্ণতা দিতে চলিয়াছে, তাহা কি এই! এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাহার নারী-জীবনের সার্থকতার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবেই! ইহার সঙ্গেই তাহার ইহকালের সুখদুঃখ, আর বুঝি পরকালের সম্বন্ধও জড়িত থাকিব! এই আড়ম্বর যে কতবড় মিথ্যা এবং ইহারই অন্তরালে একজনের যে কতখানি দুঃখের বোঝা সঞ্চিত আছে, তাহা ত কেহই বুঝিবে না! সত্যের মুখোস পরিয়া এই মিথ্যাটাই কর্ত্রী হইয়া আমরণকাল তাহার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে থাকিবে, সে একটা কথাও বলিতে পারিবে না,—ইহাই তাহার সুখের বিবাহিত জীবন!

কল্যাণীর দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। সে তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতেই, তাহার হাতের বাসনগুলি মাটীতে পড়িয়া গেল। ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া স্বর্ণ দেখিল, কল্যাণীর হাতের বাসন মাটিতে পড়িয়া গড়াইয়া যাইতেছে। সে ব্যস্তভাবে কহিল, "কি লো কলি, পড়ে গেলি নাকি?"

"না আমার লাগেনি, হঠাৎ হাত পিছলে বাসনগুলো পড়ে গেল।"

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল, "এই ত্যাখ্, কলি, তুই আমায় তখন বলছিলি বড়,—এখন দেখলি ত?—স্বোয়ামীর কথা ভাবতে গেলে মেয়েমানুষকে একেবারে কাণা, কালা, বোবা, পঙ্গু হয়েই ভাবতে হয়—নইলে তার সবটুকু ভাবা যায় না।"

কল্যাণী সে কথার আর কোন জবাব দিল না। বাসনগুলা গুছাইয়া পুনরায় তুলিয়া কহিল, "স্বর্ণ, তুই ভাই আর দেরী করিস্ না, বাড়ী যা—অনেক বেলা হয়ে গেল—"

স্বর্ণ গম্ভীরভাবে বাধা দিয়া কহিল, "তুই তা হ'লে যাবি না বল্?"

"না গেলে ত তখুনি বলতুম,—তোকে এতক্ষণ আটকে রাখব কেন?"

"তবে?"

"একটু দেরী হবে ভাই!"

স্বর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আরও দেরী! কেন?"

"ভিজে কাপড়খানা ত ছাড়তে হবে! আর মা পুজোয় বসেছেন—উঠলেই আমি যাচ্ছি,—তুই এগো!"

"আসিস্, নইলে কিন্তু এই—'ঘাড় বাঁকাইয়া একটা কীল দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্ণ চলিয়া গেল।

কল্যাণী গৃহে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)
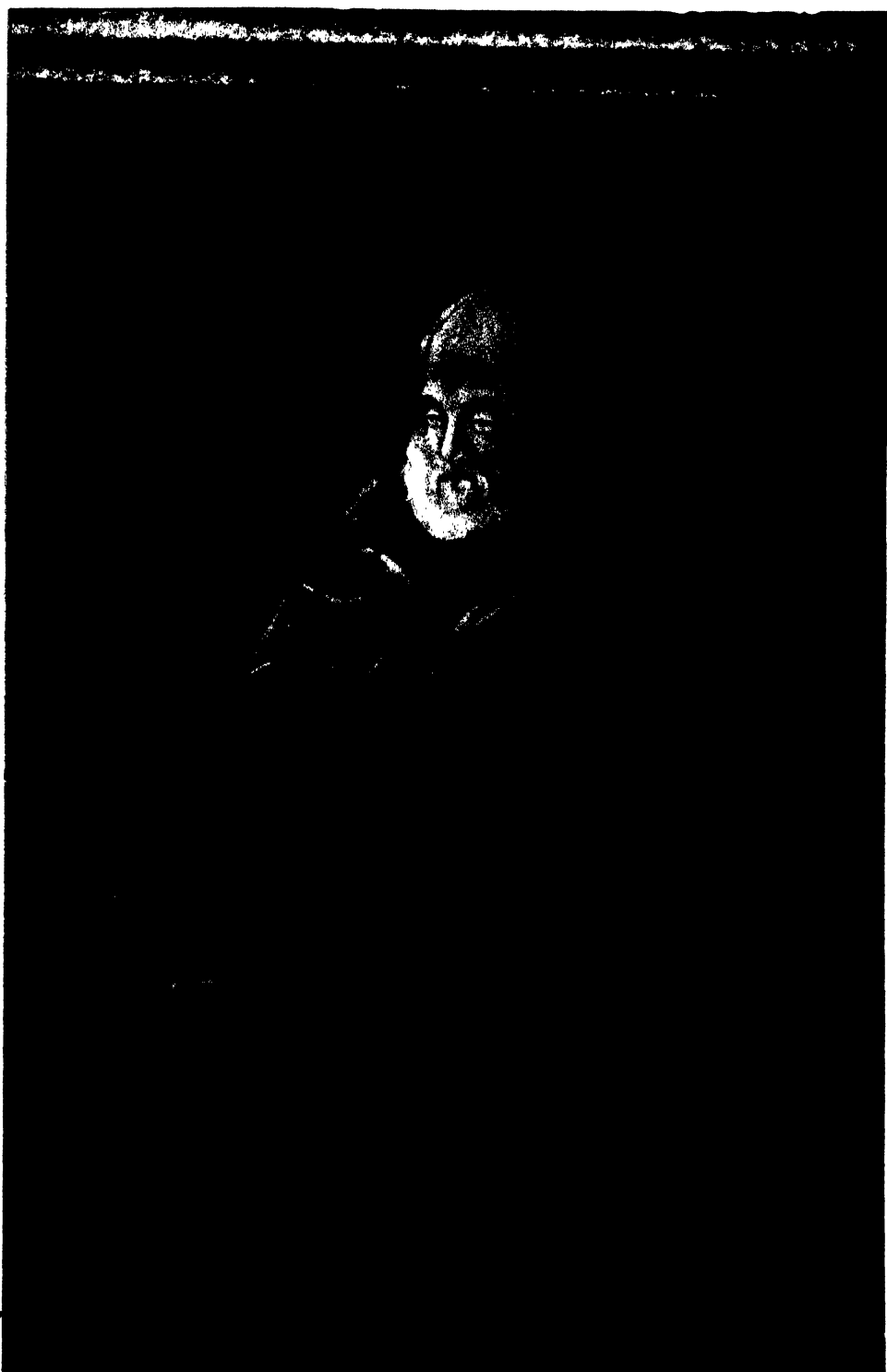
ওস্তাদজির সর্ব্বস্ব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

চরকা প্রচলনে নারীজাতির কর্ত্তব্য

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চরকার মত একটা জিনিস যে কেন দেশের সাধারণ লোক ধরিতে চাহিতেছেন না—এ একটা মস্ত রহস্যের মত। যে দেশের লোকের গড়-পড়তায় দৈনিক আয় কয়েক পয়সা মাত্র, সে দেশ হইতে বৎসরে বহু কোটি টাকা বিদেশী বস্ত্রের বিনিময়ে সমুদ্রপারে চলিয়া যাওয়া দেশের পক্ষে কত প্রাণঘাতক তাহা কি ভাবিবার কথা নহে? সকল বিদেশী পণ্যের হিসাব খতাইলে ঐ অঙ্কটা যে কোথায় উঠে তাহা ভাবিতে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। এ সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুবার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই সব বড় বড় কথা আমরা ঠিক্ ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কি না সন্দেহ। কারণ, তাহা হইলে এত দিন চরকা আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়া দেশকে শ্রীমন্ত করিয়া তুলিত। তবে এটা ত আমরা প্রতি দিনকার জীবনযাত্রায় বুঝিতেছি যে, অর্থানটনে পরিবারস্থ ছেলে মেয়েদের রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিতেছি না, নিতান্ত মুমূর্ষু না হইলে ডাক্তার কবিরাজের দ্বারস্থ হই না। অর্থের অনটনে সুচিকিৎসা বা পথ্যের অভাবে আত্মীয় পরিজন চক্ষের সম্মুখে ইহলীলার শেষ করিতেছে, সময় সময় পেট ভরিয়া অন্নও জুটিতেছে না। এ সকল যাচাই করার জন্য পাণ্ডিত্যের কষ্টিপাথরের আবশ্যক হয় না, বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়নের আবশ্যকতা নাই। এসব ব্যাপার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অহরহঃ চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এত সুস্পষ্ট যখন দেশের দারিদ্র্য তখন চরকা ধারণের যৌক্তিকতার জন্য অর্থ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইতে হইবে কেন? ক্ষেতের ধান, বাগানের তরী তরকারীতে কোনও মতে জীবন-ধারণ চলিতেছে। পেটের ভাতেও টান পড়িত না—যদি না বিদেশী কাপড় প্রভৃতির জন্য আমাদের গোলার ধান মহাজনের গোলায় বিকাইয়া দিতে হইত। এই ভীষণ অন্নসমস্যার সমাধান কোথায়—সে বিষয়েও আচার্য্য দেব যে ঐকান্তিক আলোচনা করিয়াছেন সেজন্য তিনি প্রণম্য। দেশের নূতন ধনাগমের পন্থা উদ্ভাবন কিম্বা দেশ হইতে ধনের বহির্গমনের পন্থারোধ—এই দুইটাতেই দেশে ধনের আধিক্য ঘটে। দেশে ধনবৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায়—চরকা। ইহাতে বিদেশী বস্ত্রের বিনিময়ে দেশের ধন বহির্গমনের পন্থা-রোধ করিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিলাতি কাপড় বর্জ্জনের চেষ্টা চলিয়াছিল; সে চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছে। দেশে অনেকগুলি দেশীয় কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত কাপড়ের কল বসিয়াছিল। তাহার অনেকগুলি আজিও বেশ চলিতেছে। দেশে ধনাধিক্যও ঘটিয়াছে। তবে সে ধন মাত্র কতকগুলি ধনীর ধনভাণ্ডারে স্তূপীকৃত, পুঞ্জীভূত হইতেছে। বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হইবার মুখে ছিটে-ফোঁটা মাত্র আমাদের ভাগ্যে জুটিতেছে। মন্দের ভাল এই যে টাকাটা সাগর পারে

যাইতেছে না। সাধারণ লোক ইহাতে ধনের সন্ধান পান নাই। বরং অনেক সময় বিলাতি কাপড়ের তুলনায় যখন মিলের বা দেশী কাপড়ের দর অধিক ছিল, তখন দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত দেশবাসী দেশী শিল্পের রক্ষাকল্পে—অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে দেশী কাপড় কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছেন। অবশ্য মালিক ধনীদের সদ্বুদ্ধি থাকিলে তাঁহাদের সঞ্চিত ধন অনেক সময় সার্ব্বজনীন মঙ্গলকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া জন সাধারণ উপকৃত হয়। আমাদের দেশে তেমন যে আদৌও হয় নাই তাহা বলি না, কিন্তু যেরূপভাবে এবং যত বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা হয় নাই। কতকগুলি কাপড়ের কল দেশে স্থাপিত হইয়া—দু'চার জন মোটা মাহিয়ানার চাকুরিয়াকে বাদ দিলে—সামান্য কতকগুলি শ্রমিক এবং কেরাণীদের কোনও মতে দিন গুজরাণ হইতেছে ছাড়া সাধারণ লোকে আর্থিক কোনও উপকার পায় নাই। চরকায় এই দিক দিয়া একটা মস্ত বড় সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। নিজের কাপড় নিজে বুনিয়া পরিব—যেমন নিজের ক্ষেতে ধান, বাগানে তরিতরকারী অর্জ্জাইয়া দিন গুজরণ করি—এও তাই। বাগ্‌বাগিচায় আবশ্যকমত দশ-বারটা তুলার গাছ অর্জ্জাইয়া লইতে ৩০।৪০টায় না হ'ক্ বড় জোর এক মুঠা তুলার বীচির আবশ্যক হয়। আর চরকা—তার উপকরণ ত একতাল মাটি! আর খান কয়েক বাঁশের ফালি বা চটি এবং হাত ১০।১২ পাটের দড়ি বা রশি। এই ত চাই মূলধন! সুতা কাটা শিখিতে ত দেখিতেছি দু'দিনের বেশী সময় লাগে না। এ অবশ্য মোটা সূতা, কিন্তু মোটা সূতারই প্রয়োজনীয়তা বেশী। সরুসূতা কাটিতে তুলা খুব ভাল করিয়া পিঁজিতে হয়; মোটা সূতায় তেমন—এমন কি আদৌ তুলা পিঁজিতে হয় না। মোটা সূতা যেখানে আট দশটী লাগিবে কাপড় বুননের সময় সরু সূতা সেখানে ১৫।২০টা লাগিবে, কি তাহার বেশী। মোটা সূতার গুণ বা দোষ—যিনি যেমন মনে করেন—কাপড় হয় মোটা! বিলাতি মিহি কাপড়ে যখন অভ্যস্ত ছিলাম, সেই স্বদেশী আমলের পূর্ব্বে—তার পর মিলের মোটা কাপড়ে প্রথম প্রথম অনেকের মন উঠে নাই। আনন্দের কথা যে মিলের মোটা কাপড়ে আজকে আর আমাদের দেহকান্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। ও একটা আমাদের অভ্যাসদোষ, বা তাই বা কি করে? যে বাবুর মোটা জিনের কোট্‌প্যাণ্টে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া অপিসের কার্য্য চালাইতে বা এমনি কিছু করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে বাহিরের মুক্ত বাতাসে খদ্দর যে কেন গাত্রদাহ উপস্থিত করি'ব বুঝি না। যা' হোক, মোটা সূতায় বুননের কাজ আগায় বেশী। সুতরাং সেই দিক থেকে আয়কর। আমরা ত কোনও বিদেশের বাজারে সূক্ষ্ম বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাইতেছি না। পরিষ্কার আমাদের ঘরোয়া কথা। যার ক্ষেতে প্রচুর বেগুন অর্জ্জায় তার দরজার গোড়ায় যদি আমেরিকা বা ইয়োরোপ থেকে বেগুনের জাহাজ আসিয়া পয়সায় একপণ কি এমনি কিছু দর লাগায় ত আমরা কি তাহাতে ফিরিয়া তাকাই! ক্ষেতে যার অগুন্তি বেগুন সে কেন ভিন্ দেশের বেগুনের জাহাজে লোলুপ দৃষ্টি দিবে? এমনি বিলাইয়া দিলেও আবশ্যক না থাকিলে তাহা আমাদের গৃহে স্থান পাইবে না। যাহা দরকারের বাহিরে তাহার তোয়াক্কা কে রাখে? চরকা বাদেও আর একটা জিনিস আমাদের দরকার। সে হল তাঁত। পাড়াগাঁয়ে এখনও তাঁতের বিশেষ অভাব হয় নাই—দুচারখানা দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য কিছু মজুরি দিলে তাঁতীর তাঁতেও কাপড় বোনাইয়া লওয়া চলে। তাহাতেও কাজ না হইলে গাঁয়ে গাঁয়ে অন্ততঃ একখানি করিয়া তাঁত থাকিলেও গাঁয়ের কাপড় বোনার কাজ চলিতে পারে। ধান ভানিবার ঢেঁকি ত গাঁয়ের অনেকের থাকে না; তাতে কি কাহারও চাউল ছাঁটাই আট্‌কাইয়া থাকে? একটী তাঁতের দামই বা কত? বড় জোর সাজ-সরঞ্জাম সমেত ২০৲।২৫৲ টাকা। আট দশ জন লোক যে পরিবারে, তার কাপড় জামায় বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০০৲।১২৫৲ টাকা খরচ হয়। বৎসর দুই ঐ টাকাটা অবসর সময় দু'এক ঘণ্টা চরকা ঘুরাইয়া বাগানের তুলায় সূতার কাপড় বুনিয়া লইয়া যদি বাঁচাইতে পারা যায়, ত ৫।৭ বৎসরে ঐ গৃহস্থের অবস্থায় যে কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বোঝা সহজ হয়! মোটা কাপড়ের কথা আদৌ উঠিবে না, যে দিন নিজের চরকার সূতায় কাপড় বুনিয়া নিজে বা আত্মীয় স্বজনে পরিধান করেন। তখন সত্যসত্যই মনে হইবে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" সে যে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, তা নিজে হাতে যিনি চরকা ঘুরাইয়াছেন, তিনি ছাড়া অপরকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার ভাষা নাই! একটু চিন্তা করিলে মনে হয়, চরকাই আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির একটা প্রধান উপায়। আপামর সাধারণ ইতর ভদ্র

সবাই ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে উপকৃত হইবেন। কাহাকেও, কাহারও দ্বারস্থ বা মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। যে ভিক্ষান্নেও জীবন যাপন করে তার কুটীরের পাশেও ৫।৭টা তুলা গাছের স্থানের অসংস্থান হয় না। এখনকার চরকার অস্তিত্বও তার ঘরে অসম্ভব হয় না, যদি সেটার তার চাহিদা থাকে। এমন সোজা সরল জিনিসটা, যাহাতে বিশেষ কোনও আড়ম্বর নাই, দেশের কোটী কোটী লোকের অর্থাভাব যাহাতে দূর হইবে, আর্থিক সচ্ছলতায় রোগে চিকিৎসা, পথ্য মিলিবে, কোমরে মোটা কাপড় পরিয়া পেটে দু মুঠা বেশী অন্ন দিতে পারিবে, অভাব-ক্লিষ্টের মুখে হাসির রেখা ফুটিবে—সেই জিনিসটাতে কেন যে দেশের লোক উন্মুখ হইয়া পড়িল না, এ কথা ভাবিলে মনে হয়, সত্য সত্যই আমরা কি একটা মৃত জাতি? আশা নাই! আকাঙ্ক্ষা নাই! উদ্যম নাই! চিরকাল অন্ধ তমসে নিমগ্ন হইয়া রহিব—এই কি জাতির গতি? আলস্যে কাটাইলে চলিবে না। বীর কর্ম্মীর ন্যায় নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, জীবনপণে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। মরণ আসে ত বীরের মরণ, বাঁচি ত বিজয়ী বীরের জয়-মাল্যে বক্ষঃ শোভিত হইবে। লক্ষ্য যখন দেখা যাইতেছে, কিন্তু পন্থা বা সুযোগের সন্ধান মিলিতেছে না, তখনই অতীতের ইতিহাস জাতির অবলম্বনীয় পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, বলে, এই পথেই এক দিন তুমি চলিয়াছিলে, এই পথই এক দিন তোমাকে চরমে পৌঁছিয়া দিয়া জয়যুক্ত করিয়াছিল—ইহাই তোমার গন্তব্য। ইতিহাসে ত ইহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে যে, এক দিন এই চরকার সূতায় তাঁতের কাপড়ে দেশের লোকের বস্ত্রাভাব দূর করিয়া দূর-দেশের চাহিদা যোগাইত। জগতের সঙ্গে সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের মসলিনই ছিল শ্রেষ্ঠ। ঐ চরকা বাহিরের কোনও দেশের লোক আসিয়া ঘুরাইয়া দিত না। আমরাই ঘুরাইতাম, বিশেষ করিয়া আমাদের জননী-কন্যারাই এ কার্য্যটা করিতেন। সূতাকাটা তাঁদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মোট-মুটী কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল—চরকা চালাইতেন মেয়েরা,তাঁত চালাইতেন পুরুষেরা। তাই মনে হয়—আজ নব জাগরণের দিনে বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া মেয়েদের চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকিবার দিন নহে। উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁদেরই এই চরকার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা বলি না যে চরকার সাফল্য চেষ্টায় পুরুষ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন। বলিতে চাই—চরকা-লক্ষ্মীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে নারীর। চরকার স্থান বাহিরে নহে। নারীর পশ্চাতে চরকা কখনও সচল হইয়া উঠিবে না। তাহার স্থান শুদ্ধান্তচারিণী নারীজাতির সম্মুখে! জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর। তাঁহারা কি দেখিতেছেন না—অর্থাভাবে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা হইয়া উঠিতেছে না, পেটে আবশ্যক মত অন্ন জুটিতেছে না? রোগে ঔষধ-পথ্য না পাইয়া কত সন্তান অকালে ইহলীলা সংবরণ করিতেছে! সকলেরই মূল অর্থাভাব। চরকায় বস্ত্রাভাব দূর হইয়া পরিবারে ধনাধিক্য ঘটিবে, ছেলে মেয়েরা ভাল খাইয়া দাইয়া হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়াইবে, সে কি আনন্দের বিষয় নহে? পুরুষরা নানা বাহিরের কর্ম্মভারে ভারাক্রান্ত। তাহাদের ভার লাঘব করুন—তবেই না আপনাদের জীবন ধন্য! আজ 'পল্লীসংস্কার পল্লীসংস্কার' রব দেশের সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে। বাস্তবিক পল্লীর দীনতার দিকে অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে,—শুভলক্ষণ। কার্য্যও কিছু কিছু হইতেছে। পল্লীসংস্কারের একটী প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত পল্লীজননী-দিগকে সজাগ করিয়া চরকা ব্রতে ব্রতী করা। পরিবারের পুরুষরা ত এ কার্য্যে অগ্রণী হইবেনই। কিন্তু সব থেকে সুসঙ্গত ও কার্য্যকরী হইবে, যদি দেশে জননীদের মধ্যে—যাঁহাদের জীবন আজ নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্নিগ্ধালোকে ধন্য হইয়াছে, যাঁহারা স্বজাতির হীনতায় কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের উত্থানের প্রচেষ্টায় অবহিত আছেন—তাঁহারা পল্লীর নারী-শক্তিকে জাগ্রত, উদ্বোধিত করিয়া চরকাব্রতে ব্রতী করেন। আজ তাঁদের সম্মুখে সব থেকে বড় পরীক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত। এ পরীক্ষায় সফলতা আসিলে নারীজাতির হীনতা আপনি স্খলিত হইয়া যাইবে। জাতির মুক্তির ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান পুরুষের সমপর্য্যায়ে আপনিই লিখিত হইয়া থাকিবে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপর একটি নির্জ্জন চত্বরে অসিত একা বসিয়া বেণীমাধবের গগনস্পর্শী ধ্বজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। নীচে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল। ওপারে বটবৃক্ষের অন্তরালে অপরাহ্নের সূর্য্য অস্তপ্রায়। সেই ম্লান রক্তিম কিরণ নদীর বুকে, ঘাটের পথে, গাছের পাতায় ঝরিয়া পড়িতেছিল। ঘাটের পথ জনবিরল, কেবল গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিতা স্নানার্থিনী কয়েকটি নারীর আলাপের ধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নদীতীরে একা বসিয়া অসিত তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা ভাবিতেছিল। উত্তর বাংলায় এক শান্ত শ্যামল পল্লীর মধ্যে তাহাদের সেই নিশ্চিন্ত সুখময় গৃহের চিত্র স্বপ্নের মত এখনো তাহার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে—মায়ের সেই প্রসন্ন সুন্দর মুখখানি—কত আদরে কত যত্নে যে মায়ের স্নেহের কোলে সে দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। প্রতি দিন ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের চুম্বনে জাগিয়া হাসিয়া উঠিত। তাহার পর সমস্ত দিন তাঁহার সকল কাজের মধ্যে সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত অশ্রান্ত গল্প, কত কথা ও হাসির মধ্যে তাহাদের দিন কাটিত। সন্ধ্যার সময় চাঁদের আলোয় সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্প শুনিত। সেই সুখের স্বপ্নের মত দিনগুলির অস্পষ্ট স্মৃতি এখনো তাহার মনে পড়ে। তাহার পর এক দিন কিসে কি যে হইয়া গেল, তাহা সে কিছুই জানিল না—তাহার মা তাহাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই তাহাকে সে কথা কিছু বলিল না—শুধু তাহার পিতা তাহাকে লইয়া তাহাদের গৃহ ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সেই হইতে তাহার দুঃখের জীবন আরম্ভ হইল।

আশ্রয়হীন, অর্থহীন, অসহায় অবস্থায় কত দিন পথে পথে তাহাদের জীবন কাটিয়াছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে কাতর হইয়া কত দিন মায়ের মুখ মনে পড়িয়া তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত,—অল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতি পিতার ভয়ে সে কাঁদিতে পারিত না,—নিঃশব্দে মনের ব্যথা মনে চাপিয়া নীরব রোদনে বক্ষ পূর্ণ করিয়া গুমরাইয়া থাকিত। কেহ তাহাকে একটি আদরের কথা বলিত না, কেহ তাহাকে যত্ন করিত না। একটু ভালবাসার জন্য, একটু স্নেহের স্পর্শের জন্য তৃষিত হইয়া তাহার দুঃখের জীবনের কত দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল।

তাহার পরে ক্রমে সে বড় হইল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পিতার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের তীব্র বেদনা ও প্রতিহিংসার জ্বালার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিল।

সে শুনিল, তাহাদের গ্রামের জমীদার গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষই তাহাদের সমস্ত দুঃখ ও অপমানের মূল কারণ। মণ্ডলগড় পরগণার নায়েবের অত্যাচারে প্রজারা উত্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। কর্ম্মচারীদের চক্রান্তে জমীদারের নিকট কোন কথা উঠিতে পারিত না। তাহার মহাপ্রাণ পিতা প্রজাদের পক্ষ লইয়া জমীদারকে সমস্ত ঘটনা সত্য ভাবে জানাইয়া উভয় পক্ষে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে জমীদারের রোষে পড়িয়া অনেক মিথ্যা মামলা-মোকর্দ্দমায়, নানা অত্যাচারে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল।

কিন্তু শুধু এই উৎপীড়নেই জমীদারের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল না। এক দিন তাহার পিতা কোন বিশেষ কার্য্যে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন,—দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য, কেহ কোথাও নাই। প্রতিবেশীরা সংবাদ দিল, গত রাত্রে জমীদারের লোকজন আসিয়া ঘরের দরজা ভাঙিয়া তাঁহার পত্নীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা জাগিয়া উঠিলেও ভয়ে

জমীদারের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সাহস করে নাই। শিশু অসিত উপস্থিত তাহাদের কাছেই আছে।

সেই দিন অপরাহ্ণে দীঘির জলে তাহার মাতার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল। দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সতী অভিমানে ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

তাহার পিতা জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া শুধু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ও এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। এই তাহাদের জীবনের ইতিহাস।

তাহার পর হইতে সেও তাহার পিতার মত তাহাদের বংশের অপমানকারী সেই প্রবল শত্রুর প্রতি তীব প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা নিজ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কোন দিন কৃতকার্য্য হয় নাই। পিতা-পুত্রের সম্মিলিত চেষ্টা কতবার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। অভাবে, দুশ্চিন্তায়, গুরুতর পরিশ্রমে ক্রমেই তাহার পিতার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। অবশেষে এক দিন জীবনের ঈপ্সিত কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতেই তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিল।

অসিতের মনে পড়িল—কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর তাহার পিতার মৃত্যুশয্যা। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শেষ-রাত্রে তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাবক্ষে সেই নির্জ্জন শ্মশানঘাটে এক মন্দিরের চত্বরে একা সে মৃতপ্রায় পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রাত কাটাইয়াছে। অর্থ, সম্পদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত থাকিতেও আজ পনের বৎসর ধরিয়া অসহ্য মর্ম্মবেদনায়, দারিদ্র্যে, অর্দ্ধাশনে, বিনা চিকিৎসায় তাহার পিতা মৃত্যুমুখে—নিতান্ত দীনহীনের মত, পথ-ভিখারীর মত অসহায় অবস্থায় ভূমিশয্যায় পতিত! একটা নিরুপায় হতাশা ও তীব্র তীব্র যাতনায় তাহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। উপযুক্ত পুত্র হইয়াও সে এক দিনের জন্য তাহার উৎপীড়িত, দুঃখী পিতাকে কোন স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিল না!

প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রামগোবিন্দ জাগিয়া উঠিলেন। একবার প্রাণ ভরিয়া স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করিলেন। তাহার পর উদ্দেশে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমার সময় হয়ে এসেছে অসিত! যা কিছু আমার বলবার ছিল, সে সবই তোমার জানা আছে। নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। এখন শুধু সেই সব কথাগুলোই তোমায় আবার মনে করিয়ে দিয়ে যাই…

তাঁহার মুখে রৌদ্র আসিয়া পড়িতেছিল। অসিত উঠিয়া নিজের গায়ের চাদরখানি রৌদ্র আচ্ছাদন করিয়া টাঙ্গাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি বলিলেন, আমার এই মৃত্যুশয্যায় তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, যে কাজ আমি অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাচ্ছি—তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় সে কাজ সুসম্পন্ন করবে? তোমার মায়ের সম্মান যে নষ্ট করেছে, আমাদের জীবনব্যাপী সমস্ত অপমান ও দুঃখের যে মূল, তাকে যেখানে যে কোন অবস্থায় পাবে, নির্ব্বিচারে হত্যা করবে। তার রক্ত ভিন্ন আমার আত্মা আর কিছুতেই তৃপ্ত হবে না। তোমার প্রতিহিংসা যেন তাকে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত অবিরাম অনুসরণ করে। বল, সে যেখানেই থাক, তাকে খুঁজে বের করবে?

অসিত সাশ্রুনয়নে পিতার মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

রামগোবিন্দের শুষ্ক অধরে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। শান্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরে কিছু দিন অসিত লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে বেড়াইল। কোন কাযে মন দিতে পারে না কোন কিছুই ভাল লাগে না, কি করিবে কোথায় যাইবে, তাহা কিছুই মন স্থির করিয়া ভাবিতে পারে না।

এই সময় বাংলায় বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল। চারিদিকে সভাসমিতি, বক্তৃতা, বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ইত্যাদিতে সারা বাংলা টলমল্ করিতে লাগিল। অসিত যেন সহসা অকূলে কূল পাইল। জীবনের পথে নূতন আলোর সন্ধান পাইয়া সেও নবীন আবেগে ও উত্তেজনায় এই আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার পর হইতে কিছু দিন অসিত দলের মধ্যে থাকিয়া বাংলার দিকে দিকে অক্লান্ত ভাবে ও কঠোর পরিশ্রমে বয়কট মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন আর তাহার নিজের কথা ভাবিবার সময় বা চেষ্টা রহিল না।

উত্তেজনার পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। কাযেই যখন

সরকার পক্ষ হইতে অত্যাচার, নির্য্যাতন, নানা নূতন আইনের নাগপাশের বন্ধন আরম্ভ হইল, তখন দলের মধ্য হইতে অনেকেই একে একে সরিয়া পড়িল। দেশভক্তির আতিশয্য আর তখন তাহাদের টানিয়া রাখিতে পারিল না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে আরো একটি দল ছিল, যাহারা প্রথম উত্তেজনার মুখে দেশসেবায় নামিলেও, ক্রমে তাহারা যথার্থ দেশকে চিনিয়াছিল, দেশকে ভালবাসিয়াছিল, দেশের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহারা উৎপীড়ন, নির্য্যাতনে টলিল না,—কোন প্রলোভন, কোন আতঙ্কই আর এই ঘরছাড়ার দলকে ঘরে ফিরাইতে পারিল না। বাংলায় দিকে দিকে এই ঘরছাড়ার দলকে লইয়া নানা বিপ্লব-সমিতি গড়িয়া উঠিল। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এই সব বিপ্লববাদীর দল নানা ভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

অসিতেরও আর ফিরিবার মন ছিল না। সে কিসের আকর্ষণেই বা কোথায় ফিরিবে! সংসারে তাহার কোন বন্ধন ছিল না। সে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়া বিপ্লববাদীদের দলে মিশিয়া গেল।

এই সমিতির দলভুক্ত হইয়া যখন সে নানা মতের মধ্য দিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া, নানা দিক হইতে দেশের মুক্তির অত্যুগ্র চেষ্টায় নিজের জীবনের কথা বিস্মৃত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় এক দিন পাটনার নির্জ্জন প্রান্তরে নিতান্ত অতর্কিত অবস্থায় তাহার জীবনের প্রবল শত্রুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অসিত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া তখন তটভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নদীর জলেও সেই আঁধার ছায়া। দূরে অরণ্যানীর অন্তরাল হইতে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ ঈষৎ উঁকি দিতেছিল। বেণীমাধবের মন্দির হইতে সন্ধ্যা-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ও পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধীর সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল। অসিত উঠিয়া চত্বরের এক কোণ হইতে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইল। তাহার পর যেন কাহার আসার আশায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ঘোষের সহিত দেখা হইবার পর হইতে কি দুর্নিবার চাঞ্চল্য ও উদ্বেগেই না সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল! এই সেই তাহাদের জীবনের প্রবল বৈরী! ইহারই হাতে তাহার মা অপমানিত হইয়া ঘৃণা ও ধিক্কারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইহারই অত্যাচারে তাহার পিতা আশ্রয়হীন, বিত্তহীন হইয়া পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরিয়া নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে অকালে মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার পিতৃমাতৃহন্তা সেই নারকী আজ তাহার আয়ত্তের মধ্যে! দেশের সহিত সমস্ত যোগ ছিন্ন করিয়া এত দিন সে সুদূর পশ্চিমের এক প্রান্তে আত্মগোপন করিয়া কাটাইয়াছে! তা[illegible] তাহারা এত সন্ধান করিয়াও তাহাকে কোন দিন বাহি[illegible] করিতে পারে নাই। কিন্তু এবার? এবার তাহার হস্ত হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

পৈশাচিক আনন্দে ও তীব্র প্রতিহিংসায় প্রথমে কিছুক্ষণ তাহার সমস্ত চিত্ত বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। সে সময় সে আর কোন কাজে মন দিতে পারিল না। ঘোর উত্তেজনা ও উদ্বেগে অধীর হইয়া সে কেবলই অশান্ত ভাবে ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার মনের সে ভাব ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার এত দিনের উগ্র প্রতিহিংসার পাত্র কি সেই সরলহৃদয় কন্যাগত[illegible] সদানন্দময় বৃদ্ধ? নির্ম্মলার কাতর করুণ মুখের দিকে চাহিয়া কি উদ্বেগ ও শঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে মিঃ ঘোষ সে দিন বসিয়া ছিলেন। সে কি স্নেহকাতর, মমতাময় দৃষ্টি! [illegible] হৃদয়হীন দাম্ভিক বর্ব্বরের অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের সুখের সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে, এ কি সেই [illegible] অসিত কিছুই বুঝিতে পারিল না। নির্ম্মলা একটু সুস্থ হইবার পর হইতে মিঃ ঘোষের সেই সরল, স্বচ্ছন্দ আলাপ, কথায় কথায়, কারণে অকারণে তাঁহার প্রাণখোলা উচ্চ হাসি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর তাহার পরিচয় পাইবার পর? অসিত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল!

তাহার পরিচয় পাইয়া কি ঘোর লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র জ্বালা মিঃ ঘোষের প্রসন্ন মুখে না ফুটিয়া উঠিয়াছিল? সেই অনুতপ্ত, কুণ্ঠা ও লজ্জায় নতশির বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাহার এত দিনের অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে হইবে! অসিতের তরুণ বীর-হৃদয় এ চিন্তায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিতে ছিল। নিজের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে সে কখনো পশ্চাৎপদ নয়, কিন্তু এ যে একেবারে মৃতের উপর অস্ত্রাঘাত! যে নিজেই তাহার কৃত কর্ম্মের অনুশোচনায়

মরিয়া আছে, তাহার উপর আবার সে কেমন করিয়া আঘাত করিবে! আর নির্ম্মলা? সে হয় ত এ সব বিষয়ের কোন কথা ঘুণাক্ষরেও জানে না; অথচ এ ব্যাপারের সমস্ত ফলাফল সেই নিরপরাধিনীর ভাগ্যেই অতর্কিত বজ্রাঘাতের মত এক দিন পতিত হইবে!

অসিত অনেক ভাবিয়াও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তাহাদের সমিতির আদেশে তাহাকে নিজের ব্যাপারের মীমাংসা স্থগিত রাখিয়া পাঞ্জাবে চলিয়া যাইতে হইল! সেখানে ও অন্যান্য স্থানে এই তিন চার মাস অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়া সে সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে আবার পশ্চিমে ফিরিয়া আসিয়াছে!

সেদিন দানাপুর হইতে ফিরিবার পথে সহসা নির্ম্মলার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে আবার তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার সহিত যে হৃদয়হানের মত নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এ কয় দিন তাহার সকল কাজের মধ্যে, সকল চিন্তার মধ্যে তাহা কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিয়া, তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। নির্ম্মলার সেবাপরায়ণ চিত্তের যে উদ্যত সেবা প্রত্যাখ্যান করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল, সেই অসমাপ্ত, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি, অনুক্ষণ তাহার অন্তরে বুভুক্ষিতের মত তীব্র দহনের জ্বালা জ্বালাইয়া রাখিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল। রৌদ্রকরদীপ্ত নির্ম্মল নীলাকাশে সহসা যেন কাহার ওই রক্তহীন, স্তব্ধ পাণ্ডুবর্ণ মুখের ছবি ফুটিয়া উঠে। অলস মধ্যাহ্নে ঝাউবনের মর্ম্মর ধ্বনির মধ্যে বাতাসে যেন থাকিয়া থাকিয়া কাহার আকুল আর্ত্তস্বর ভাসিয়া উঠে—দাঁড়ান! একটু দাঁড়ান! অসিত বাবু! কোথায় যান? এ কি তাহার হইল? কিসের এ ব্যথা? কিই বা সে এখন করিবে?

যাহার রক্তের জন্য সে তাহার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহার কথা মনে হইলেই এখন একটা অবাধ করুণার উচ্ছ্বাসে তাহার মনের জিঘাংসাবৃত্তি ডুবিয়া যাইতে চায়। অসিত প্রাণপণ বলে আপনাকে সংযত করিয়া পূর্ব্বের সেই কঠোর প্রতিশোধস্পৃহা জাগাইয়া রাখিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিল!

সেদিন সে মিঃ ঘোষের বাড়ীর আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া কি এমন অন্যায় কাজ করিয়াছে? যে তাহাদের বংশের শত্রু, তাহার মাতার সম্মান-অপহারক, তাহাদের সর্ব্ব দুঃখের মূল, সে কি নারীর মোহে পড়িয়া, সে-সব পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়া, কুকুরের মত তাহারই গৃহে, তাহারই অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? সে যাহা করিয়াছে, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য ও করণীয়। নির্ম্মলা অবশ্য এ ব্যাপারে নিরর্থক যন্ত্রণা পাইবে; কিন্তু তাহাতে অসিতের কি করিবার আছে? আজ সে নির্ম্মলার কথা ভাবিয়া এত ইতস্ততঃ করিতেছে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে সে যখন শিশু ছিল, তখন কি তাহার কথা ভাবিয়া কেহ তাহার নির্দ্দোষ মহাপ্রাণ পিতাকে এমন পৈশাচিক ভাবে উৎপীড়িত করিতে কোন দ্বিধা করিয়াছিল? তবে আজ তাহারই বা এ দুর্ব্বলতা কেন? নির্ম্মলার চিন্তাই বা কেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে? সে তাহার কে? নির্ম্মলার সঙ্গে তাহার কিই বা সম্বন্ধ? অসিত নির্ম্মলার কথা ভুলিয়া নিজের কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল!

এই কয় বৎসরের মধ্যে সমিতির আদেশে সে ত কতবার কত জনকে হত্যা করিয়াছে! তখন ত তাহার মনে কখনো কোন দ্বিধা হয় নাই,—হত ব্যক্তির পরিবার বা পুত্র-কন্যার অবস্থার কথা কোন দিন তাহার মনে উদিত হয় নাই! মিঃ ঘোষের বেলায় বা তাহার এত ভাবিবার কথা কি আছে? তাহার এত দুর্ব্বলতা, এত ভাবনা—এ কি কেবল নির্ম্মলার জন্যই নয়? নির্ম্মলার মোহ এই সামান্য কয় দিনে তাহাকে এমন অভিভূত করিয়াছে যে, সে স্বচ্ছন্দে তাহাদের এত দিনের এত দুর্দ্দশা, এত অপমান ভুলিতে বসিয়াছে! সে কি তাহার মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার শেষ আদেশ এত সহজে, এত অনায়াসে ভুলিয়া যাইবে! যে মায়ের স্নেহের কোলে সে এ পৃথিবীর আলো প্রথম দেখিয়াছিল, যে মায়ের হৃদয়ের রক্তধারায় সে এত দিন পুষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই স্নেহময়ী জননীর অতৃপ্ত আত্মা যে তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণামের প্রতিশোধের আশায় তাহারই প্রতি চাহিয়া আছে! এত বড় কুসন্তান সে! এত অনায়াসে সে তাহার মায়ের স্মৃতির অবমাননা করিতে বসিয়াছে!

অসিতের ধমনীতে খরবেগে রক্ত বহিল। ক্ষণিকের মোহ ও দুর্ব্বলতা ভুলিয়া সে আবার পূর্ব্বের মত সাহস ও শক্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—এ প্রলোভন যে তাহাকে জয় করিতেই হইবে! (ক্রমশঃ)

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

(২)

রেল ষ্টীমার ডাক টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি

প্রাচীন কালে জল, স্থল ও শূন্য-পথে, এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার জন্য, অথবা দূরস্থিত স্থানে সংবাদ বা পত্রাদি প্রেরণের জন্য রেল, ষ্টীমার, মোটর, টেলিগ্রাফ্ বা ইহাদের সদৃশ অপর কোন যানাদি অথবা আধুনিক ডাকের মত কোন ব্যবস্থা এ দেশে ছিল কি না, সে বিষয়ে গবেষণা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ দেশ বৃটীশ শাসনে আসার পর এখানে এই সকলের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে পুরাতন কথা, এবং ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তৎস্থলে যে সব ব্যবস্থা ছিল, তাহার কোন কোন কথা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা বলাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জলপথে নৌকা, পান্‌সি, স্লুপ, বজরা, এমন কি সমুদ্রগামী জাহাজের এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলন ছিল ও এখনও অনেক আছে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাষ্পীয় পোতের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার ঠিক পূর্ব্বে, যে কারণেই হৌক, এ দেশে এই নৌ-শিল্পের যে অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনকার মত বাষ্পীয় পোতের ব্যবহারের অনেক পূর্ব্বেও ভারত-সমুদ্রে ইয়োরোপীয় জাহাজের গমনাগমনের কথা জানা যায়।
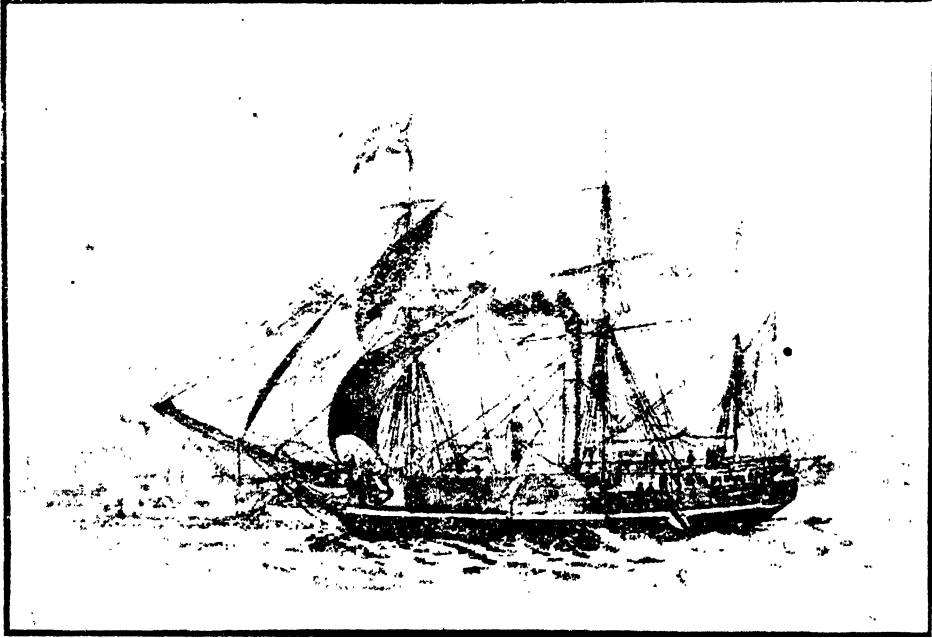
বাষ্পীয় জাহাজ—'এণ্টারপ্রাইজ'

(ইহাই প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ বিলাত হইতে এদেশে আইসে।)

খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহুদি দেশসমূহের সহিত

ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। তাহার পূর্ব্বে বাণিজ্য বিষয়ে ভারতের সহিত ইয়োরোপের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পোর্টুগীজ্ বণিকদের আগমনের বহু পূর্ব্বে রুষ দেশীয় বণিকগণ এ দেশ হইতে মূল্যবান রেসমী বস্ত্র, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্, শাল, মশলা ও ঔষধাদি লইয়া যাইত বলিয়া জানা যায়। (১) তৎপরে মিশর ও আরব বণিকগণের দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যার্থ আগমনের বিষয় জানা যায়। তাহাদের পণ্যও জাহাজে করিয়া যাইত।

আরও ২২ খানি জাহাজ আসিয়া পৌছে বলিয়া জানা যায়। (২)

প্রথম যে বৈদেশিক রণতরী ভারতে আইসে বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৃটিশ রণতরী। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টারের (Lancaster) অধিনায়কত্বে ৫ খানি রণতরী আসিয়াছিল। (৩) হুগলী নদীতে সুতানুটীর শেঠেদের সহিত ব্যবসা সম্পর্কে আরও পূর্ব্বে ইং ১৫৩০এ বৈদেশিক ব্যবসায়ী জাহাজ আসিত বলিয়া জানা যায়। (৪) সাম্প্রাও (Samprayo) নামক একজন পোর্টুগীজ ১৫৩৭

যে দিন প্রথম রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল খোলা হয় সে দিন বৰ্দ্ধমানে উৎসব দেখিবার জন্য লোক সমাগম

বা ৩৮ খৃষ্টাব্দে ৯ খানি জাহাজ লইয়া প্রথম হুগলীতে আইসে। (৫)

বঙ্গে প্রদেশে জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল এবং প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তথায়
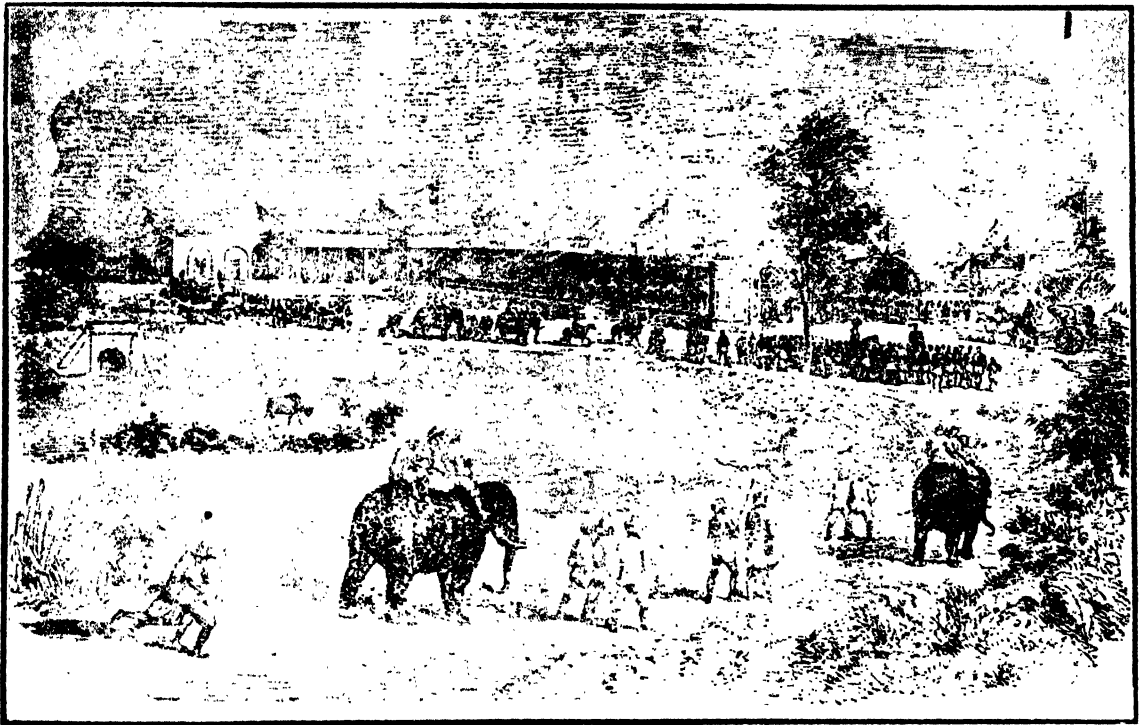
পোর্টুগীজ্ নাবিক ভাস্‌কোডি গামা ইংরাজি ১৪৯৮ সালে জলপথে মালবারে পৌছেন এবং কালিকাটে অবতরণ করেন। তাহার পর বৎসর পোর্টুগালের রাজা কর্ত্তৃক ক্যাব্‌র্যাল (Pedro Alvarez Cabral) এর অধিনায়কত্বে ১২০০ লোক সহ ১৩খানি জাহাজ প্রেরিত হয়। তাহার মধ্যে ৭ খানি মাত্র কালিকাটে আসিয়া পৌছায়। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে

(১) The Three Presidencies of India.

(২) Cassell's Illustrated History of India, vol. II.

(৩) The Three Presidencies of India.

(৪) The Calcutta Review 1891.

(৫) The Calcutta Review 1892.

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ডক্ নির্ম্মিত হয়। সুরাট্ ও ড্যামান নামক স্থানেও বিস্তর জাহাজ প্রস্তুত হইত। এই শেষোক্ত স্থান হইতেই প্রথম প্রথম বাঙ্গালায় বিশেষ লাভে জাহাজ সরবরাহ করা হইত। ১৭৯০ হইতে নাগাইদ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন বন্দরের জন্য ড্যামানে মোট প্রায় ১৬০০০টন ভারবাহী ৩১ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আরব ও অন্যান্য প্রদেশেও এই স্থান হইতে জাহাজ সরবরাহ করা হইত। এই সমস্ত জাহাজের নির্ম্মাতা ছিল একজন হিন্দু। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বোম্বাইয়ে যে ব্যক্তি এই শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি একজন

সেকালের ডাকবাহী ৩ ঘোড়ার গাড়ী

পার্শি। সামান্য সূত্রধর হইতে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জেমসেট্‌জি।

বাঙ্গলার ডক্ নির্ম্মাণের জন্য প্রথম প্রস্তাব হয় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮০তে উহার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হয়। ডকের নিকটেই একটি উইণ্ড্ মিল্ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আবরু নষ্ট হয় বলিয়া, স্থানীয় লোকেরা আবেদন করায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

কলিকাতায় প্রথম যে দুইখানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, উহা ১৭৬৯ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। কর্ণাটের দুর্ভিক্ষের জন্যই তৎপরতার সহিত জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্য বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম যে যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম নন্‌সাচ্ (Nonsuch)। উহা ৪৮৩ টন ভারবাহী, উহাতে ৩০টি কামানের স্থান ছিল। ইহার আট বৎসর পরে 'সারপ্রাইজ (Surprize) নামক আর একখানি ৩২ কামানের যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হয়। ইহা দেশীয় কারিগরদের দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছিল। (৬) সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক গ্রাঁপ্রী (Grandpre) ১৭৮৯।৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, কলিকাতায় খুব বেশী পরিমাণে সেগুন কাষ্ঠের জাহাজ নির্ম্মিত হইত; এবং উহা বিলাতি ওক কাষ্ঠের অপেক্ষা মজবুৎ হইত।

১৭৮১ হইতে নাগাইদ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ২৭খানি এবং তৎপরে ২১ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার সন্নিকটে মোট ২২৩ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হয়। উহারা মোট ১০১৯০৮ টন ভার বহন করিত। কলিকাতা ভিন্ন টিটাগড় ও অন্যত্রও জাহাজ প্রস্তুত হইত। এই সময় হেষ্টিংস্, কাসল, হান্টলি, ভান্সিটাট নামক কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জাহাজ ইংরাজ কোম্পানীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকলের উপাদান প্রধানতঃ শাল ও সেগুন কাষ্ঠ ছিল। (৭) নৌশিল্পের উন্নতির জন্য ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক আমদানী কাষ্ঠের উপর শুল্ক আদায় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সালিখায় যে ডক্ আছে উহা মিঃ বেকন নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রথম যে জাহাজখানি সংস্কৃত হয় তাহার নাম অরফিয়াস্। (৮) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কোন্নগরে একটি ডক্ ছিল, তথায়

(৬) The Hand Book of India.

(৭) The Good Old Days of Honourable John Company ও The Hand Book of India.

(৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

ছোট ছোট জাহাজ নির্ম্মিত হইত। (৯) রিষড়ায় সময় সময় ডেনিস্ জাহাজ লাগিত। (১০) মৌলমেনে জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্য ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ১ পিপা মদের ভাড়া ছিল ১৫ পাউণ্ড, এবং অন্য অধিকাংশ মালের ভাড়া টনপ্রতি ৩০ পাউণ্ড ১০ শিলিং ছিল। ঐ সময় আমদানী মালের উপর মাশুল টনপ্রতি ৭॥ পাউণ্ড এবং রপ্তানী মালের উপর মাশুল টনপ্রতি ২২॥ পাউণ্ড হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হয়।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ খিদিরপুরে এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম বাষ্পচালিত পোত চালান হয়। প্রথম দৈনিক যাত্রী ষ্টীমার ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত খোলা হয়। যে দুইখানি ষ্টীমার প্রথম চলাচল করিত, তাহাদের নাম কমেট্ (Comet) ও ফায়ারফ্লাই (Firefly)। তখন প্রতি আরোহীর ভাড়া ৮৲ টাকা লাগিত। রেলগাড়ি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ষ্টীমারের অধিকতর সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।

ইংরাজ সরকারের আদেশে প্রথম লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের সময় কলিকাতায় দুইখানি ষ্টীমার নির্ম্মিত হয়। উহা কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ৮০০ মাইল ৩ সপ্তাহে যাইত। এই সময়ই বিলাত হইতে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' (Enterprise) এদেশে আইসে। উহা ১৩০ দিনে ফালমাউথ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল। (১১)

সেকালের অর্থবানদিগের নরবাহী যানে গমনাগমন

এ দেশে রেলগাড়ি হইবার অনেক পূর্ব্বেও স্থানান্তরে চিঠি পত্র পাঠানর ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বে দেশে এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোকের চিঠি পত্র টাকাকড়ি ও সামান্য দ্রব্যাদি পৌঁছাইয়া দিত। তাহাদের কাসিদ বলিত। পশ্চিম বঙ্গেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব অধিক ছিল। (১২) ঘোড়ার গাড়িতে ডাক লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থাও স্থানে স্থানে ছিল। মিরাট হইতে দিল্লীতে প্রথম গাড়ি করিয়া ডাক লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে কানপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়িতে ডাক যাইবার প্রথম বন্দোবস্ত হয়। (১৩)

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইবের সময়েও এ দেশে ডাকের প্রচলন ছিল এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে উহার কিছু উন্নতি হয় বলিয়া জানা যায়। ১৮৩৭ সালের পর উন্নত প্রণালীতে ষ্ট্যাম্পের প্রচলন হয়। কলিকাতা টাঁকশালের কর্ণেল্ ফরবেসের (Colonel Forbes) প্রস্তুত আদর্শ মত সিংহ ও তাল তরু অঙ্কিত দুই আনা মূল্যের টিকিট প্রথম প্রস্তুত হয়। উহা পর বৎসর হইতে চলিতে থাকে। তৎপরে বিলাতের দে লা-রু কোম্পানী কর্ত্তৃক টিকিট তৈয়ারি হইয়া আইসে। ১৮৫৪ সালের মে মাস হইতে নাগাইদ ১৮৫৫ অব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় মোট ৪৭৭৩২৪৯৬ ডাক টিকিট প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন

(৯) Medical Gazether

(১০) Calcutta Review, Vol. iv 1845.

(১১) The History of India, Vol. III—Marshman.

(১২) The Bengal Magazine, Vol. II, 1873-74.

(১৩) The Good Old Days of Honourable John Company.

অৰ্দ্ধ আনার টিকিটের বর্ণ ছিল নীল, এক আনার লাল এবং চারি আনার লাল ও নীল ছিল। (১৪) এই সময় হইতেই সস্তা ডাকের এবং সর্ব্বত্র এক হারে টিকিটের প্রচলন হয় এবং বিলাতি চিঠির মাশুলও কম হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মোট চিঠিবিলির সংখ্যা পাওয়া যায় ৩২৯১৬১৮১১। (১৫)

বৃটিশ ভারতের সহিত বাহিরের প্রথম ডাকের সম্বন্ধ প্রবর্ত্তিত হয় বোধহয় বোম্বাই হইতে মসলিপটমে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বোম্বাই হইতে প্রতি পত্রের জন্য নিম্নলিখিত মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; যথা,—পুনা ২৲, ফজিলপুর ৩৲ ৫ পাই, হায়দ্রাবাদ ৩৲ ৮ পাই; মসলিপটম্ ৪৲ ১২ পাই, মাদ্রাজ ৬/২ পাই, গঞ্জাম্ ৮/৪ পাই, কলিকাতা ৫/৯ পাই। চিঠি ডাকে দিবার সময় এই মাশুল দিতে হইত। (১৬)

এ দেশ হইতে বিলাতে প্রথম ডাক যায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। তখন হইতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে একবার করিয়া ডাক যাইতে থাকে। তখন ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া অপেক্ষা বড় আকারের বা গালা মোহর করা পত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রেরকের স্বাক্ষর সহ সরকারের সেক্রেটারি মারফৎ উহা পাঠান হইত। মাশুলের নিয়ম ছিল সিকি তোলা দশ টাকা, অৰ্দ্ধ তোলা পনের টাকা এবং এক তোলা কুড়ি টাকা। এই ডাক মাশুল চিঠি বিলির সময় আদায় করা হইত। (১৭)

সে সময়ের বিলাতি চিঠির মাশুলের তুলনায় এখানে মাশুল অনেক কম ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাচ ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে আড়াই তোলা ওজনের চিঠির মাশুলের নিম্নলিখিত হার বিজ্ঞাপিত হয়; যথা,—বেনারস ।৴০, পাটনা ।/০, ব্যারাকপুর /০, রাজমহল ৶০, মুঙ্গের ।০, চট্টগ্রাম ।৶০, মাদ্রাজ ১৶১০, হায়দ্রাবাদ ৸০, পুনা ১।০, বোম্বাই ১৷৷/০, ঢাকা ৶০, ডায়মণ্ড পয়েণ্ট ৵০, কক্স দ্বীপ ।০, বাক্সার ।৵০, কটক ৶০, সুকসাগর ৵০, চন্দননগর /০, মুরশিদাবাদ ৵০, সিলেট ।/০ ইত্যাদি। (১৮)

সেকালের ডাক লইয়া যাইবার গাড়ি

(১৪) Bengal Past and Present, vol-x.

(১৫) Calcutta Review, vol-XI.

(১৬) Selections from Calcutta Gazettes of the year 1789—97.

(১৭) Selections from Calcutta Gazettes of the years 1798 to 1805.

(১৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

ভারতে তাড়িত-বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা বাষ্পীয় শকট প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বেই হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়। উহা তখন সরকারি কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। সাধারণের জন্য ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রথম তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ। (১৯) ইহার পর ক্রমেই ভারতের বহু স্থানে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে থাকে। জানা যায় ১৮৫৭ সালে ৪১৬২ মাইল; টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রায় চারি গুণ বৃদ্ধি পায়। (২০)

ভারতে তাড়িতবার্ত্তা প্রচলন বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম যিনি চেষ্টিত হন, তাঁহার নাম উইলিয়ম্ ব্রুক্ (Sir William Brooke O'shanghnessy M. D.)। তিনি বেঙ্গল আর্মিতে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনিই প্রথম কলিকাতা হইতে বেদ্‌গীরিতে টেলিগ্রাফ লাইন বসাইয়া পরীক্ষা দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বর্ম্মার সহিত যুদ্ধকালে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। (২১)

এদেশে রেলগাড়ি চলিবার পূর্ব্বে পাল্কি গাড়ি ও নৌকা প্রভৃতিতে কিরূপ ব্যয় হইত বা কত সময় লাগিত, তাহা এখনকার দিনে জানিতে কৌতূহল হয়। উড়িয়াদের এদেশে আসিয়া পাল্কির বেয়ারার কাজ করার প্রথা বহু দিন হইতেই প্রচলিত আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক ঠিকা উড়িয়া বেয়ারাদের পারিশ্রমিকের দৈনিক হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; ৫ জন ঠিকা বেয়ারা সিক্কা ১৲ টাকা, অর্দ্ধদিন ৷৷০। সূর্য্যোদয় হইতে ১২টা এবং ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অর্দ্ধদিন ধরা হইত। দূরত্ব হিসাবে ৫ মাইলের অনধিক দূর যাইবার মজুরি প্রতি বেয়ারা চারি আনা। ৮ মাইল একদিন ধরা হইত (২২) সেকালে পাল্কির মত দেখিতে অথচ চাকা বিশিষ্ট এক প্রকার ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল, উহাকে ডাক বলিত। (২৩)

দূরদেশে স্থলপথে যাইতে ঘোড়া ও হস্তী ভিন্ন পাল্কিই প্রধান অবলম্বন ছিল, কিন্তু উহা কিরূপ ব্যয়সাধ্য ছিল, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতা হইতে চন্দননগর ও গরুটী ২২৷৷ নাগাইদ ২৪৷৷ টাকা, কাশিমবাজার ও মুরশিদাবাদ ১৪৭৷৷ নাগাইদ ১৪৯৷৷ টাকা, রাজমহল ২৩৮৷৷ নাগাইদ ২৫৭৷৷, পাটনা ও বাঁকিপুর ৫০০৲ নাগাইদ ৫৪০৲, বেনারস ৭০৭৷৷ নাগাইদ ৭৫৪৲ টাকা পাল্কির ভাড়া ছিল। (২৪) এই সময়ে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া কিরূপ ছিল তাহা নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে জানিতে পারা যায়। ক্রিষ্টোফার্ ডেক্সটার্ (Christopher Dexter) নামক একজন ভাড়াটিয়া গাড়ির কারখানাওয়ালার ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারির একটি বিজ্ঞাপনে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। চারি ঘোড়ার গাড়ি প্রতি দিন ভাড়া ২৪৲, মাসে ৩০০৲। দুই ঘোড়ার গাড়ি প্রতি দিন ১৬৲ মাসে ২০০৲। ছয় মাসের জন্য মাসিক ১৫০৲। এক বৎসরের জন্য মাসিক ১৩৩/৪ পাই। কেবল মাত্র ২টি ঘোড়া প্রতি দিন ১০৲, মাসে ১৬০,৲ ছয় মাসে মাসিক ১১০৲ টাকা। বগি ও ঘোড়া প্রতি দিন ৫৲, মাসে ১০০৲, ছয় মাসে মাসিক ৮০৲, বৎসরে মাসিক ৬৪৲ টাকা। (২৫)

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জলপথে নৌকার ভাড়া ছিল, ৮ জন দাঁড়ির বজরা দৈনিক ২ টাকা, ১০ জনের ২৷৷০ টাকা, ১২ জনের ৩৷৷০ টাকা, ১৪ জনের ৫৲ টাকা, ১৬ জনের ৬৲ টাকা, ১৮ জনের ৬৷৷০ টাকা, ২০ জনের ৭৲ টাকা, ২২ জনের ৭৷৷০ টাকা, ২৪ জনের ৮৲ টাকা।

---

(১৯) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২০) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২১) Cassell's Illustrated History of India, Vol.—II.

(২২) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৩) The Hand Book of India.

(২৪) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৫) Selections from Calcutta Gazettes of the years 1798 to 1805.

৪ দাঁড়ির নৌকার মাসিক ভাড়া ২২৲ টাকা, ৫ দাঁড়ির ২৫৲ টাকা, ৬ দাঁড়ির ২৮৲ টাকা।

২৫০ মণের নৌকা ভাড়া ২৯৲ টাকা, ৩০০ মণের, (৭ দাঁড়ি) ৩৪৲ টাকা, ৪০০ মণের (৮ দাঁড়ি) ৪০৲ টাকা ৫০০ মণের (১০ দাঁড়ি) ৫০৷৷০ টাকা।

তখন জলপথে কলিকাতা হইতে বহরমপুর ২০, মুরসিদাবাদ ২৫, রাজমহল ৩৭, মুঙ্গের ৪৫, পাটনা ৬০, বেনারস ৭৫, কানপুর ৯০, মালদা ৩৭৷৷০, ঢাকা ৩৭৷৷০ দিন সময় লাগিত। সে সময়ে জলপথে মেসার্স হোমস্ এণ্ড এলেন্ (Messrs. Holmes and Allan) কোম্পানির মাল পাঠানর কাজ প্রায় একচেটিয়া ছিল। (২৬)

লর্ড ডালহাউসির শাসনকালে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ষ্টিফেন্সন্ (Mr. Rowland Macdonald Stephenson) সুপ্রিম গভর্ণমেণ্টের নিকট রেলগাড়ি চালাইবার জন্ত প্রথম আবেদন করেন। ইংরাজি ১৮৪৫-৪৬ সালের শীতকালে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত তিনি পরীক্ষার্থ একটা মোটামুটি সার্ভে করেন। তৎপরে তিনি বিলাত যাইয়া বোর্ট অব্ ডিরেক্টর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে তাঁহার প্রস্তাব বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করিলে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষার্থ কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। মধ্যের ৪৷৫ বৎসর কেবল মাত্র আলোচনা তর্ক বিতর্ক বাধা এবং মীমাংসা করিতেই অতিবাহিত হয়। ইহার সাফল্য সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট প্রথম বিশেষ সন্দিহান ছিলেন। এই সময়েই গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনেন্সুলা রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ ৫০ মাইল রেল চালাইবার অনুমতি পায়।

জর্জ্জ টার্ণবুল্ (George Turnbull) নামক প্রথম প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ষ্টিফেনসনের সঙ্গে সহকর্ম্মিরূপে থাকিয়া এ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। রেলপথের জন্ত জমি সংগ্রহের সুবিধা হয় এরূপ কোন আইন না থাকায় প্রথমে বিশেষ অসুবিধা হয়। ইংরাজি ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে জমি সংক্রান্ত নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই টার্ণবুল্ তাঁহার দুইজন সহকারীর (Messrs. Purser and Evans) সহায়তায় জমিদারদের নিকট হইতে তাঁহাদের জমির উপর রেলপথ নির্ম্মাণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।

ষ্টিফেনসন্ ও টার্ণবুলের অসীম চেষ্টা সত্ত্বেও নানাবিধ অসুবিধা বশতঃ আরও দুই বৎসর বিলম্বের পর ১৮৫৩ সালের শেষে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত গাড়ি চালাইবার উপযুক্ত রেলপথ প্রস্তুত হয়। কিন্তু গাড়ীর অভাবে এবং ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর মধ্যে পড়ায় শেষোক্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করিতে প্রায় তিন বৎসর সময় যায়। ১৮৫৪ সালের জুন মাসে প্রথম এঞ্জিনখানি আসিয়া পৌছে এবং ২৮শে তারিখে মিঃ হজসন্ (Hodgson) উহা পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন। তৎপরে এই বৎসরের ১৫ই আগষ্ট হুগলী পর্য্যন্ত, ১লা সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত এবং পর বৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পাকা রকম রেল খোলা হয়। এই বৎসর মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ৪, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮, তৃতীয় শ্রেণীর ১৭ এবং ওয়াগান্ ভ্যান্ প্রভৃতি মোট ৬৪খানি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩খানি গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার সমস্ত গুলিই কলিকাতার প্রসিদ্ধ গাড়াওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানি এবং সেটন্ কোম্পানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথম যে ইঞ্জিনখানি বিলাত হইতে আসিয়াছিল তাহার নাম 'ফেয়ারি কুইন্।'

যেদিন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম রেল খোলা হয়, সেদিন বিশেষ জাঁকজমক ও উৎসবের সহিত এই কার্য্য সমাধা হয়। এই নূতন বাষ্পীয় যান দেখিবার জন্ত বর্দ্ধমান ও অন্তান্ত বহু স্থানে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেলের শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা বশতঃ তিনি সমগ্র উৎসবটিতে যোগদান করিতে না পারিলেও হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম ভাড়া ধার্য্য হয় ১৸৵ এবং পৌছিতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টা।

ভারতে নব অভ্যুদয়ের মূল বাষ্পীয় যান ও রেল লাইন প্রতিষ্ঠার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার পর সিপাহী বিদ্রোহের জন্ত কিছু দিন কার্য্যের অসুবিধা হয়। তৎপরে দ্রুতগতিতে বিভিন্ন স্থানে রেলপথ ও আবশ্যক সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে থাকে। শোন নদের উপর যে সুপ্রসিদ্ধ সেতু আছে, তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য প্রথম রেল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়; কিন্তু বিদ্রোহ হেতু উহা শেষ হইতে ১৮৬২

(২৬) The Good Old Days of Honourable John Company,

সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় লাগে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে রেলপথের পরিমাণ মোট ৬৪৯৭ মাইল ছিল।

রেল খোলার পর অন্যান্য মালপত্রের সহিত কয়লা আমদানীর খুব সুবিধা হয়। পূর্ব্বে দেশীয় কয়লা এবং বিলাত হইতে জাহাজে আমদানী কয়লার দরের পার্থক্য বড় ছিল না। তখন গোযান ও নৌকাযোগে দামোদর হইয়া কলিকাতায় কয়লা আসিত। রেল খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের প্রথা তিরোহিত হইল; এবং রেলেই কয়লা আসিতে আরম্ভ হইল। ১৮৫৫ সালের ৩০শে মার্চ্চ ২৬খানি ওয়াগানে ১৪৭ টন কয়লাসহ প্রথম কয়লার গাড়ি হাওড়ায় পৌছায়। (২৭)

রেল ষ্টীমার ডাক টেলিগ্রাফ প্রভৃতির আদি কথা সংক্ষেপে বলা হইল। মোটরকার বা মোটর সংলগ্ন নৌকা বা ষ্টীমার এখানে প্রথম কোথায় এবং কাহার দ্বারা আনীত বা ব্যবহৃত হয়, তাহা জানিতে পারি নাই। আকাশ-পথে এরোপ্লেনে ভ্রমণ এদেশে ক্রমেই বাড়িতেছে। অদূর-ভবিষ্যতে ইহা সাধারণ যানের মত ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার সূচনা পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন প্রথায় বেলুনে উঠিয়া আকাশে বিচরণের কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ এদেশে সর্ব্ব প্রথম বেলুন উঠে। যে ব্যক্তি এই কার্য্য করেন তাঁহার নাম রবার্ট্সন্। (২৮)

(২৭) (1) Bengal Past and Present, Vol.—V.—The Early Days of the East India Company.
(2) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

বিচারের অধিকার

শ্রীরমাদাস হালদার বি-এস্‌সি

(এক)

সমস্ত রাত্রি তরুণী প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করল ..... শেষে জয়ী হল তার প্রেম ..... ।

আজ সকালেই সে নিজেকে সংসারে সব থেকে সুখী মনে করেছিল—আর এ সন্ধ্যায় তার চেয়ে বড় দুঃখী বোধ হয় আর কেউ নেই। একটু সুখের রেখা দেখিয়ে দিয়ে দুঃখ আবার তারে নিজের কোলে টেনে নিল।

সংসারে জ্ঞানের উন্মেষ হবার পর থেকেই সে নিজেকে দুনিয়ার বুকে একলা পেয়েছে; কেউ কোথাও তার আছে বা কখনও ছিল কি না মনে পড়ে না। যখন সে এই দুনিয়ায় ভাল করে চাইতে,—ভাল করে বুঝতে শিখলে—বোর্ডিংএর ছোট্ট ঘরখানাই সে নিজের ঘরকন্না রূপে পেলে,—আর পেলে মায়ের স্নেহের আশীস্-বাণীর বদলে মিস্ গুহর মুখস্ত-করা কায়দা-দুরস্ত উপদেশগুলো। স্কুলের অন্য মেয়েদের সঙ্গেও সে ঠিক মিশতে পারত না—মিশ খেত না; আর সে মিশতেও বড় একটা চাইত না। তাই তার এ নিঃসঙ্গ জীবনে তাকে সঙ্গ দিতেছিল—তার চক্‌চকে তক্‌তকে বাঁধান বইগুলো, আর এক দরদী সহপাঠিনী—ছায়া।

তাকে আপন বলে ডেকে নেবার কেউ ছিল না বটে, কিন্তু মাসে মাসে বোর্ডিংএর তার সমস্ত দরকারী খরচপত্র এসে পৌছত—ঠিক সময়মতই বোর্ডিংএর অভিভাবকদের কাছে কোনও একটা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে। এইটুকুই সে জানত—এইটুকুতেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কে যে তার এ গোপন দাতা—সে তার এতটুকু খোঁজ করে উঠতে পারে নি, যদিচ সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। মিস্ গুহও যে বিশেষ কিছু জানতেন তা নয়—আর যেটুকু বা তিনি জানতেন—তিনি নিজের কাছে গোপন রেখেছিলেন।

ছায়া ছিল তার সহপাঠিনী। সে থাকত বালীগঞ্জে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে;—স্কুলের বাসে চড়ে রোজ পড়তে

আসত। সে ছায়াকে আপন করে নিয়েছিল অল্প দিনের আলাপেই; আর ছায়াও তাকে পর ভাবত না। ছায়া রেখার ব্যথার স্থানটি জানত—আর সেইটেই সে সব সময়েই বাঁচিয়ে চলত…।

পুজোর ছুটি এসে পড়েছে—মেয়েরা সব বাড়ী ফিরে চলেছে—বাড়ী ফিরবার আনন্দে সমস্ত বোর্ডিং ভরে গিয়েছে—সবাই বাড়ীর কথা কইছে—সবাই আপন আপন স্নেহনীড়ে এ আগমনীর দিনে ফিরে যাবে। স্কুলের গাড়ী একদল মেয়েকে ষ্টেশন পৌঁছে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে—গাড়ীতে মেয়েদের জিনিষপত্র তোলা হচ্ছে। মেয়েদের পুলক-ছাওয়া চপল হাসি মাঝে মাঝে কাণে আসছিল—রেখা একলা ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে এ বিদায়-দৃশ্য দেখছিল—তার নিরালা সঙ্গহারা জীবনের সঙ্গে তুলনা করছিল—আর তার চোখ উপচে জল আসছিল…।

পেছন থেকে ছায়ার কৌতুকভরা কণ্ঠ শোনা গেল—"বাবা রে বাবা! তুই যেন কি! তোকে চারিধার খুঁজে ফিরছি—আর তুই এখানে দিব্যি একলাটি দাঁড়িয়ে আছিস্…"

রেখা চোখের জল গোপন করবার চেষ্টা করলে—পারলে না। ছায়া সত্যই তাকে ভালবাসত—তার চোখে জল দেখে তার মুখখানা সন্ধ্যার মত ম্লান হয়ে গেল। ছায়া রেখার মনের গোপন ব্যথা জানত—চোখের জলের কথা চেপে দিয়ে রেখার হাত আস্তে আস্তে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে—"একটা কথা আমার রাখবি ভাই?"

"কি ভাই?"

রেখার মলিন মুখের ওপর কাতর দৃষ্টি রেখে ছায়া বলে চলল—"আগে ভাই তোকে বলতে সাহস করি নি। মা বলে দিয়েছিলেন—মিস গুহরও হুকুম নিয়ে এসেছি—তোকে ভাই এ পুজোর ছুটিতে আমার কাছে থাকতেই হবে—এ পুজোর আনন্দে তোকে এখানে রেখে একলা আমি এতটুকুও আনন্দ পাব না—"

রেখা ছায়াকে দুহাতে বুকের মাঝে চেপে ধরলে—তার চোখের পাতা দুটো ভিজে উঠল—এ দরদীর সহানুভূতিতে। সে বেশ বুঝলে—ছায়া তাকে তার সঙ্গহারা জগৎ থেকে নিজেদের জগতে টেনে এনে, তার নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী ভোলাতে চায়……

যাবার সময়ে মিস গুহ আর একবার উপদেশের থলি খুলে দিলেন—বারে বারে সতর্ক করে দিলেন, যেন misbehaviourএর complaint তাঁকে না শুনতে হয়;—সেটা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবেন না—ইত্যাদি…।

(দুই)

সে একটা নূতন জগতের মাঝে এসে দাঁড়াল—যার স্পর্শ সে কখনও পায় নি—যা অনুভব করবার জন্য অন্তর তার মাঝে মাঝে কেঁদে উঠত। নেই এখানে তার সঙ্গহারা জীবন—না আছে এখানে মিস গুহর একঘেয়ে সতর্কতা-ভরা উপদেশ। সে একটা প্রীতির বাঁধনঘেরা স্নেহনীড়ে এসে এড়ল। ছায়ার মা তার মাথায় চুমু খেয়ে তাকে বুকের মাঝে টেনে নিলেন।

দশটি দিন—মাত্র দশটি দিন—সে এই স্নেহনীড়ে বাসা বেঁধেছিল—তার হারিয়ে-ফেলা জগৎকে সে এই দশটি দিনই মাত্র ফিরে পেয়েছিল;—তার পর—তার পর আবার তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল—তার বোর্ডিংএর দেওয়াল-ঘেরা ছোট্ট ঘরে তার একলার জগতে…।

এই নূতন জগতে কিন্তু তাকে ধরা দিতে হয়েছিল—। সে বোর্ডিংএ ফিরে গেল; কিন্তু তার ছোট্ট মনটাকে পাছু ফেলে।

ছায়ার দাদা তরুণ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা-গুলো শেষ করে, বইয়ের বোঝা ঠেলে ফেলে দিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিল। এই বিশ্রামে তাকে আনন্দ দিতে সাথী জুটেছিল দুটি—এক তার হাসি-মাখা চঞ্চল ছোট বোন ছায়া—আর দ্বিতীয় তার ছবি আঁকার বাই।

এই ছুটিকে নিয়ে ছিল সে ব্যস্ত ঠিক এমনি সময়ে রেখা তার নতুন-খোঁজা তরুণ চোখের সামনে এসে দাঁড়াল……।

রেখাকে ছায়া নিজেদের ঘরকন্না দেখান শেষ করে দাদার ঘরকন্না দেখাতে নিয়ে চলল। চুপি চুপি দরজার ভারী পর্দা সরিয়ে সে রেখাকে নিয়ে পা টিপে টিপে দাদার চিত্রশালায় প্রবেশ করলে—; তরুণ শিল্পী তখন দুয়োরের দিকে পেছন ফিরে বসে নিবিষ্ট মনে ক্যানভাসের ওপরের 'তরুণীর' মুখে তুলি চালিয়ে তার বুকের 'গোপন ব্যথা' ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। পা টিপে টিপে ছায়ার ঘরে ঢুকবার শব্দ যে তিনি পান নি তা নয়—এবং ছায়ার

কিছু নূতন দুষ্টুমিও বুঝতে পেরেছিলেন; কিন্তু তিনি মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে নীরবে নতমুখে তুলি আর রং নিয়ে কাজ করে যেতে লাগলেন।

দুয়োরের পাশে একটা ইজেলের ওপর সাদা ক্যানভাস্ চড়ান একটা বড় ফ্রেম দাঁড় করান ছিল। রঙ্গিন খড়ির দু একটা লাইন ছাড়া তার সব জমিটাই সাদা ছিল; এইটার সামনে চুপচাপ রেখাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ছায়া পা টিপে টিপে দাদার আসনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। শিল্পী গম্ভীর ভাবে তখনও তুলি চালিয়ে চলেছেন; ছায়া ছবিখানার ওপর চট্ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে উঠল—"চমৎকার!"

দাদার গম্ভীর মুখে সাফল্যের সলাজ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ঘাড় না ফিরিয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"ভাল হচ্ছে রে?"

কথা কেড়ে নিয়ে চটপট ছায়া উত্তর দিল—"ভাল বলে ভাল—Superb!—ক্ষুধার্ত্তের ভাবটা এর মুখে কি চমৎকারই না তুমি ফুটিয়ে তুলেছ!—"

তরুণ শিল্পীর হাত থেকে রংয়ের তুলি পড়ে গেল—সে হতাশ ভাবে সামনের ছবির পানে চেয়ে বসে রইল—ছায়ার এ অদ্ভুত শিল্পজ্ঞান দেখে সে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে উঠতে পারলে না। মনে কিন্তু তার বেশ একটু ঘা লাগল... মেয়েটা একটু আর্ট চিনলে না...শিল্পের একটু কদর জানলে না! কোথায় তরুণীর বুকের সমস্ত 'ব্যথা' তাব মুখে চোখে সে ফুটিয়ে তুলেছে, আর সেটা ছায়ার চোখে হ'ল কি না সামান্য পার্থিব পেটের ক্ষুধা!

দাদার এ ভাব পরিবর্ত্তনের দিকে এতটুকু লক্ষ্য না করেই ছায়া হঠাৎ চপল হাসিতে সমস্ত ঘরখান ভরে তুলে বল্লে—"ওমা—তাই ত! বেশ নামটিও যে দিয়েছ দেখছি—'তরুণীর ব্যথা'! এত ক্ষিদে পেয়েছে যে পেট ব্যথা কচ্ছে ......!"

তরুণ আর সহ্য করতে পারলে না। মাথা নীচু করে তুলিটি জমি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে, "ছায়া, দেখ, সব সময় তামাসা ভাল লাগে না। তোমাকে মানা করে দিয়েছি, শুনবে না; আমি যখন ষ্টুডিওতে ব্যস্ত থাকি—আমাকে বিরক্ত কর না।"

পেছনে দুয়োরের কাছে ক্যানভাসের ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে রুমাল চেপে মুখ টিপে টিপে রেখা হাসছিল—; চোখ, মুখ, কাণ তার চাপা হাসিতে রক্তাভ হয়ে উঠেছিল—সেদিকে চোখ পড়তেই ছায়া হাসি চেপে বলে উঠল—"যাই বল না দাদা—তোমার চেয়ে যে আমি ভাল ছবি আঁকি তার প্রমাণ আজ হাতে হাতে দেব। ঘাড়টা ফিরিয়ে একবার আমার ছবিখানা দেখ—নিশ্চয়ই তুমি তারিফ করবে।"

ছায়ার চিত্রবিদ্যার দৌড় তরুণের ভালরকমই জানা ছিল। এইবার সে ছায়াকে কোণঠাসা করতে পারবে—উৎসাহে ও আগ্রহাতিশয্যে সে ফিরে দাঁড়াল ও ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। রেখাও ভারী মুস্কিলে পড়ল তরুণের দৃষ্টির সামনে সে নত হয়ে পড়ল—চাপা হাসি চাপতে গিয়ে সে ঘেমে উঠল।—

তরুণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল বটে, কিন্তু পলকহীন চোখে সে চেয়ে রইল। তার শিল্পীর চোখ বলল—হাঁ, ছবি বটে! ক্যানভাসের বুকে একে যদি ঠিক এমনি ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পার তবেই তুমিই শিল্পী!

ছায়ার দুষ্টু হাসিতে তরুণের চমক ভাঙ্গল—; সে অপ্রতিভ হয়ে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে রং আর তুলি নিয়ে খেলতে সুরু করল। রেখাকে টেনে এনে দাদার হাত থেকে রং আর তুলি কেড়ে নিয়ে ছায়া তার পরিচয় দিল—"এ রেখা—আমার সহপাঠী ও একমাত্র সাথী।"

এই তাদের প্রথম দিনের পরিচয়; দশদিনে দুজনে ক্রমশঃ কাছে এসে পড়েছিল—এমনি সময়ে রেখার ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—রেখা বোর্ডিংএ ফিরে গেল।

(তিন)

স্কুলের বাসে করে ছায়ার স্কুলে যাওয়া বা বাড়ী ফেরা দাদার আর পছন্দ হ'ল না। হুকুম হ'ল—বাড়ীর 'কারে' করে যাবে; আর তরুণ নিজেই পৌঁছে দিয়ে আসবে ও ফেরত আনবে।

মা আপত্তি তুললেন—বললেন, "তুই কেন বাপু—বাড়ীতে সোফার বসে থাকতে—এত কষ্ট করবি? স্কুলের গাড়ীতে করে যাওয়া আসা তোর পছন্দ না হয়, বেশ ত সোফারকে বলে দিস—"

মার কথা শেষ হতে না দিয়েই তরুণ বুঝিয়ে দিলে—"তুমিও যেমন মা—এতে আর কষ্ট কি?—দেখছ না, চুপচাপ ঘরের কোণে বসে থেকে থেকে শরীর কি রকম হয়ে যাচ্ছে।

না কিছু খেতেই পারা যায়—ক্ষিধেই হয় না তার খাব কি।—এতে একটু বেড়ান হবে—শরীরটা হয়ত একটু ভাল হলে যেতে পারে—" ইত্যাদি।

তরুণ মায়ের দুর্ব্বল স্থানটিতে আঘাত করেছিল;—তিনি আর আপত্তি কল্লেন না—পুত্রের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনায় মালাছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ছায়া মুখ টিপে একটু হাসলে···।

স্কুলের ছুটির পর তরুণের সোজা ছায়াকে নিয়ে বাড়ী ফেরবার চাইতে রেখাকেও সঙ্গে নিয়ে, স্বাস্থ্যের কল্যাণে বেড়াতে যাবার সখটা ভয়ানক চেপে ধরল—আজ বোটানিকাল গার্ডেন্—কাল জু, এমনি করে সে সারা কলকাতা সহরটা চলে বেড়াতে লাগল।—

ছায়া প্রথম প্রথম আপত্তি তুললে না। দুচার দিন পরে হঠাৎ একদিন রেখাকে একটা টিপুনি দিয়ে আপত্তি তুলে বসল—"দাদার না হয় ক্ষিদে হয় না—শরীর ভাল নেই—স্বাস্থ্যের কল্যাণে এবং ক্ষিদে বাড়ানর জন্ম বেড়ানটা দরকার; কিন্তু আমরা দুটি প্রাণী যে স্কুল থেকে সোজা বেরিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাই—"

তরুণ লজ্জা পেলে। পর দিন থেকে দুজনের জায়গায় চার জনের খাবার ভরা টিফিন্-বাস্কেটটা সঙ্গে আনতে ভুল করত না। ছায়ার আর আপত্তির কোন কারণ রইল না।

যেদিন ছায়ার সঙ্গিনীর বেড়াতে যাওয়া হয়ে উঠত না, সেদিন তরুণের আর বেড়াতে যাবার এতটুকু উৎসাহ থাকত না; এদিক ওদিক দুটো রাউণ্ড দিয়ে তার মাথা ধরে উঠত—অমনি সে আবিষ্কার করে ফেলত তার পেট্রলও বড় শীঘ্র ফুরিয়ে এসেছে—সে সোজা বাড়ী ফিরত। ছবির ঘরে ঢুকে অযত্নে-ফেলে-রাখা ছবিগুলোর ধূলো ঝেড়ে সে আবার ছবি আঁকতে বসত—।

(চার)

এমনি করেই তাদের দিনগুলো কাটছিল···।

আজ সকালে রেখার নিরালা জীবনের সব থেকে শুভ মুহূর্ত্ত গিয়েছে—সে শিল্পীর প্রণয়-নিবেদন পেয়েছে; ঠেকিয়ে রাখবার মত তার আর কিছুই ছিল না। সে আগে থেকেই নিজেকে বিলিয়ে রেখেছিল—তাকে তার প্রিয়ের প্রণয়-পাশে ধরা দিতে হয়েছে...।

তার দুঃখের জীবনের দুঃখের বোঝা নেমে গিয়েছে—তার সুখের নদী আজ কানায় কানায় পূর্ণ—।

বিকেলে সে তার ছোট্ট আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছোট্ট মুখখানা বারে বারেই দেখছিল; আর তারই পাশে তরুণের মুখখানা কল্পনায় টেনে এনে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠছিল···দরজায় ঘা পড়ল—খবর এল, মিস্ গুহ ডাকছেন।

নেমে এসে সে মিস গুহর ঘরে গিয়ে ঢুকল। মিস্ গুহ গম্ভীর মুখখানাকে আরও কতকটা অস্বাভাবিক গম্ভীর করে, তাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তার পর অনেকখানি জবরদস্তি কেসে বিস্তর ভূমিকা করে দুখানা চৌকো মোটা লেফাফা তার দিকে ঠেলে দিয়ে জানালেন, তার সাত বৎসর বয়স থেকে তাঁরা তার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার পান—এত দিন পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ভাবেই তাঁরা তা পালন করে এসেছেন। সে এখন পূর্ণবয়স্কা ও সাবালিকা। আজ তাঁরা এটর্ণির অপিস থেকে পত্র পেয়েছেন ও সমস্ত হিসাবপত্র মিটিয়ে পেয়েছেন। এ দুখানা পত্রও তার জন্য সেখান থেকে এসেছে। সে এখন স্বাধীনা—ইচ্ছা করলেই সে বোর্ডিং থেকে চলে যেতে পারে। তবে তিনি আশা করেন—তাঁদের এত দিনের যত্নের শিক্ষা বৃথা যাবে না—সে এত শীঘ্র লেখাপড়া ছেড়ে চলে যাবে না। আরও তিনি আশা করেন, তার জীবনের সমস্ত ইতিহাস, যা জানবার জন্য সে এত উৎসুক, সমস্তই সে এই পত্র দুখানায় পাবে। সমস্ত পড়ে ভাল বুঝে সে তার কর্ত্তব্য স্থির করবে।

পত্র দুখানা নিয়ে সে ধীর পদে ওপরে চলে এল—ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রথম পত্রখানা—যেটাতে এটর্ণি আপিসের ছাপ-মারা, সেইটাই সে আগে খুললে। পত্রখানা ছোট—পড়তে তার বেশী সময় নিল না। পত্রে ছিল—

প্রিয় মহাশয়া,

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পুরাতন মক্কেল আপনার অভিভাবিকার নিকট হইতে আমরা আপনার এবং আপনার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির ভার পাই।—আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রভৃতি দেবার জন্ম আমরা অনুরুদ্ধ হই—এবং আপনি স্বাবালিকা হইলে যেন সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়—আমাদের উপর এইরূপই আদেশ ছিল। প্রথম অনুরোধ আমরা খুবই বিশ্বস্তভাবে পালন করিয়াছি—

আপনি এখন সুশিক্ষিতা এবং সাবালিকা। যত সত্বর সম্ভব সুবিধামত আমাদের আপিসে আসিয়া দেখা করিলে, আমরা দ্বিতীয় আদেশ পালন করিব—সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে বুঝাইয়া দিব।

আপনার এবং আপনার বিষয়-সম্পত্তির ভার নেবার প্রায় চার বৎসর পরে সঙ্গের পত্রখানি আমাদের হাতে আসে। আপনার অভিভাবিকা মৃত্যুশয্যায় পুরী হইতে ইহা আমাদের নিকট পাঠান। আমাদের উপর আদেশ ছিল—আপনি পরিণত বয়স্ক হইলে ইহা আপনাকে যেন দেওয়া হয়। আমরা আদেশ পালন করিলাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত
ইত্যাদি ইত্যাদি
এটর্ণিজ্-এট্-ল।

এই পত্রখানা খুলে পড়ে দ্বিতীয় পত্রখানা খোলবার তার সাহস চলে গেল। সে স্থানুর ন্যায় নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

পত্রখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ সে নাড়া চাড়া করলে। কেমন যেন একটা অজানা ভীতি তাকে ঘিরে ধরলে। এতে আছে তার অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস—তার হারিয়ে-ফেলা জগতের সঙ্গে বাঁধন—প্রায় আঠার বৎসর পরে তাকে কবর খুঁড়ে তোলা হচ্ছে···কিজানি···কি আছে···কে জানে।

অনেকবার মনে তার দ্বিধা এল—কাজ নেই—কাজ নেই···সে জানতে চায় না—সে নূতন জগৎ পেয়েছে—তাকে সে আঁকড়ে ধত্তে যাচ্ছে—পুরোনো হারিয়ে-ফেলা জগৎ তার হারানই থাক—কবর খুঁড়ে কঙ্কাল সে টেনে তুলতে চায় না······

এটাকে না পড়ে জ্বালিয়ে দিলেই তো তার পুরোনো জগতের সঙ্গে চিরদিনের আড়াল হয়ে যায়! সে দেশলাইয়ের কাটি জ্বাললে—কাটি জ্বলে জ্বলে তার আঙ্গুলে আগুনের তাত লাগতেই সে সেটাকে টেনে ফেলে দিলে—পুরোনো জগতের সঙ্গে তার একমাত্র বাঁধনকে সে আপন হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে না...।

ভেতর থেকে কে যেন তাকে ডেকে বললে—না—না,—তোকে জানতেই হবে—সত্যালোকে তোর স্বরূপ তোকে চিনতেই হবে—তোর প্রিয়ের—তোর বাঞ্ছিতের মঙ্গলের জন্য সত্যালোকে তোকে তোর চিনতেই হবে। সে তার অন্তরের বাণীই মানলে—তরুণের মুখখানা মনের চোখের সামনে রেখে পত্রখানা সে খুলে ফেললে। আট বৎসর আগের লেখা,···লেখা একটু মলিন হয়ে এসেছিল···কিন্তু পড়তে তার বিশেষ কষ্ট হ'ল না। সে পড়তে লাগল—

বঞ্চিতা অভাগি ছোট মা আমার!

কখন যে আমি তোকে লিখব তা ভাবিনি'—মা হয়ে মেয়ের কাছে নিজের কাহিনী যে কখন বলতে পারব তা ভাবিনি—সমস্তই আমি লুকুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ—আজ মরণ আমার শিয়রে—আমার দেবতা ঐ পরপারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছেন—আমার ভুলটুকু ক্ষমা করে তিনি আমায় ডাকছেন—তাই তোর জীবনটা একেবারে আঁধারে ঘিরে রেখে—সেখানে গিয়েও শান্তি পাব না জেনে—আজ মরণকে শিয়রে রেখে লিখতে বসেছি।—

জীবনে একটু ভুল করে বসেছিলাম বলে কতটা শাস্তি আমি যেচে নিয়ে সয়েছি—তা যদি জানতিস! ওঃ! সব থেকে বড় শাস্তি আমি নিয়েছি তোকে বুক থেকে ছিঁড়ে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে। কাছে রাখতে সাহস হ'ল না। নিজের নিশ্বাস নিজেরই বিষে ভরা মনে হ'ল; নিজেকে বিশ্বাস করতে আর পারলাম না। তার পর তুই বড় হলে তোর মুখের দিকে চাইতাম কি করে?—তাই এটর্ণি ডাকিয়ে তোর আর বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করে ফেললাম। আমরা তাঁদের পুরোনো মক্কেল—তাঁরা সমস্ত ভার নিলেন, আমারও সমস্ত ভাবনা চুকল।

যে ভুলে আমায় এতবড় শাস্তি সইতে হয়েছে, সেই ভুলের কথাটাই বলতে চাই। কিন্তু সত্যি, একটু ভেবে দেখিস মা—শাস্তি কি আমার যথেষ্ট হয় নি?

স্বামী ছিলেন আমার দেবতা—তিনি ছিলেন সংসারে একা—আমারও পিতৃকুলে কেউ ছিল না। বিবাহিত জীবনে আমার চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেউ ছিল না। বিয়ে হবার দুবছর পরে তোমায় তাঁকে উপহার দিলাম—মা হলাম—সে কি আনন্দ—কি সুখ—কিন্তু এত সুখ আমাদের সইল না। তোমার জন্মের প্রায় এক বৎসর পরে আমার বিবাহিত জীবন শেষ হ'ল—পরের দেশের ডাকে আমায় তোমায় ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হ'ল। তোকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আমি মাটিতে আছড়ে পড়লাম।

তোমার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ছিল অগাধ—জ্ঞাতি শত্রুও ছিল অগণ্য। এ অনাথা বিধবা আর শিশু সন্তানকে আশ্রয়-চ্যুত কর্‌তে সবাই উঠে পড়ে লাগল—; আমি চারিধার আঁধার দেখলাম।

তাঁর এক বাল্যবন্ধু ছিলেন;—তোমার পিতাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি এই বিপদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন—বন্ধুর স্ত্রী-কন্যাকে কেউ যাতে আশ্রয়চ্যুত করতে না পারে। আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

জ্ঞাতি-শত্রুরা এতে একটা নূতন ছল পেলে। আদালতে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেলে—আমি ভ্রষ্টা.....; বিষয়-সম্পত্তি আমাতে আর আমার কন্যাতে অর্শাতে পারে না···

তোমার পিতৃবন্ধু বড্ড দমে গেলেন—আমিও কিছু কম দমি নি'—কিন্তু জিদ আমার বেড়ে গেল—তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বল্লাম—বিষয় যে করেই হ'ক বাঁচাতেই হবে।

—এখন শুধু ভাবি—এ জিদটা যদি আমার না হ'ত; বিষয় যেত—যেত; তাহ'লে এতবড় ভুলটা হয়ে যেত না—জীবনভোর অনুতাপ করতে হ'ত না—বুক থেকে তোকেও ছিনিয়ে দূরে ফেলতে হ'ত না······

যাক্‌—বিষয় রক্ষা পেল; এই মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামে আমরা বড্ড কাছে এসে পড়েছিলাম; এই হলো আমার কাল। জীবনে সুখের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম—কিন্তু তৃপ্তি আমার হয় নি—মেয়ের কাছে বল্‌তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে···দুজনে আচমকা হঠাৎ খেলার ছলে, মুহূর্ত্তেকের অবিবেচনায় এমনি ভুল করে বসলাম যে, সে মুহূর্ত্তের ভুল আর শোধরাবার উপায় ছিল না। এমনি অবস্থার মাঝে এসে আমরা দাঁড়ালাম যে, তাঁর আমায় বিধবা-বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় রইল না।—

তিনি মুষ্‌ড়ে পড়লেন—বন্ধুর প্রতি এ বিশ্বাসঘাতকতায় তার অন্তর ভেঙ্গে পড়ল—; আর আমি—আমি—চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলাম্‌।

ঠিক হ'ল বিধবা-বিবাহ মতে আমায় বিয়ে করে রেখে তিনি চিরদিনের মত আমার পথ থেকে সরে যাবেন—একটু শান্তি খুঁজতে—প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু তা আর করতে হল না—আমাদের অনাগত অনাহূত তরুণ অতিথিকে বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে আনবার আগেই—বিধাতা বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে টেনে নিয়ে গেল—রেখে গেল আমায় শুধু প্রায়শ্চিত্ত করতে···।

আমাদের ভুলের অতিথিও একবার চোখ-মেলে পৃথিবীর আলো দেখে বিদ্রূপের হাসি হেসে ফিরে গেল···।

তার পর কতবার মরতে চেষ্টা পেয়েছি—তুই আমায় আঁকড়ে ধরেছিলি—মরতে পারিনি; তোকে কোথায়—কার কাছে ছেড়ে যাব? তুই যে তাঁর রক্তের একমাত্র প্রতিনিধি—তুই যে আমার বিশ্বের দেবতার একমাত্র দান···।

বছর চারেক পরে হঠাৎ এক দিন টের পেলাম আমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে—; মুক্তির আনন্দে প্রাণ ভরে উঠল। বিষয়-সম্পত্তি আর তোর বন্দোবস্ত আগেই করে রেখেছিলাম—তখনও ভেবেছিলাম—আমার সমস্ত জীবন তোর কাছে লুকিয়ে যাব।

পুরীতে চলে এলাম্‌—এইখানেই মরব বলে। আমার দেবতাকে এইখানেই আমি প্রথম পাই—আবার এইখানেই তাঁকে হারাই। নিত্য জগন্নাথ দেবের চরণ দেখছি—আর অঝোরে কাঁদছি; নিত্য সন্ধ্যার আঁধারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে সমুদ্রের কান্নার সঙ্গে নিজের কান্না মিশিয়ে দিচ্ছি—তবু কি মনের মলিনতা ধুয়ে যাচ্ছে না?

ডাক্তার বলছে আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে—খুব বেশী ধরলেও আর এক সপ্তাহ—সাত দিন—মাত্র সাত দিন! তার পর মুক্তি—মুক্তি! ওঃ! কি আনন্দ! কাল রাতে তাঁকে দেখেছি—তাঁর অভয় বাণী শুনেছি—আমায় ক্ষমা করেছেন—আমায় বুকে টেনে নিতে গেলেন—কোথা থেকে কারা যেন এসে তফাৎ করে দিলে। নিশ্চয়ই—এ সত্যি না! হাঁরে; এ কি হতে পারে?—তিনি আমায় ক্ষমা করলেও কি সত্যি আমার কাছ থেকে তারা তাঁকে তফাৎ করে দেবে?—

আর তুইও আমায় ক্ষমা করিস মা—এত দিন তোর কাছে সমস্ত লুকিয়ে রেখেছিলাম বলে। আমায় ঘৃণা করিস নি!—দুফোঁটা চোখের জল তোর এ অনুতপ্তা মায়ের উদ্দেশে ফেলিস্‌।

আঃ! এ মরণের আগে যদি আর একবার তোকে বুকে জড়িয়ে ধত্তে পাত্তাম—তেমনি করে আগেকার মত সমস্ত ভুলে গিয়ে—!

অনুতপ্তা মা।

একবার, দুবার, বারবার সে পত্রখানা পড়লে। চোখে তার একফোঁটা জল ছিল না। তার পর নতজানু হয়ে বসে পড়ল বুকের মধ্যে চিঠিখানা চেপে ধরে। বুক ভেঙ্গে তার বেরিয়ে এল—'মা—মা—অনুতপ্তা মা আমার।'—

তার পর সে জ্ঞান হারিয়ে সেই খানেই ঢলে পড়ল।

(পাঁচ)

চেতনা ফিরে পেয়ে সে সমস্ত রাত্রি প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করল—শেষে জয়ী হ'ল তার প্রেম।

সে মিথ্যার আড়ালে নিজেকে ঢেকে নিয়ে বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে ধরা দেবে না—দেবে না। নিজেকে সে প্রবঞ্চনা করবে না। তার প্রিয়কে সে সমস্ত কাহিনী বলে মুক্তি চাইবে—কাঁটা হয়ে চিরজীবন সে প্রিয়ের বুকে ফুটে থাকবে না।

বাতি জ্বেলে সে তরুণকে পত্র লিখতে বসল;—চোখ দিয়ে তার ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল। এই তার তরুণকে প্রথম এবং এই তার শেষ পত্র। তরুণকে লিখলে—

"আমি মুক্তি চাই—ওগো মুক্তি চাই।—এ সঙ্গে মায়ের সে পত্রখানা পাঠাচ্ছি—পড়লে সমস্ত জানতে পারবে। আমি নিজেকে যখন ধরা দিয়েছিলাম—বিশ্বাস করো—এ কাহিনী তখন আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আমায় ক্ষমা করো।

"আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না—কারণ দেখা পাবে না—আমি তখন বহু দূরে। আর দেখা হলেও শুধু কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। বিদায়! আমার দুঃখের জীবনে একমাত্র তুমিই যে সুখের রেখা ফুটিয়ে তুলেছিলে, হে দাতা, আমি তা ভুলব না। এই ক্ষণিক সুখের স্মৃতিই হবে আমার জীবনের সাথী।

রেখা।"

মায়ের কাহিনী আর পত্রখানা একখানা লেফাফায় বন্ধ করে সে বাতি নিভিয়ে ক্লান্ত দেহ বিছানায় লুটিয়ে দিলে শেষরাত্রে।—

সকালে ঘুম যখন তার ভাঙ্গল, তখন তার বন্ধ কপাটের পর দুমদাম ঘা চলেছে। দরজা খুলে দিতেই একমুখ হাসি নিয়ে ছায়া ঘরে ঢুকল। আনন্দের আবেগে সে রেখাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—"আমি বড্ড খুশী হয়েছি। দাদা আমায় সব বলেছে—" হঠাৎ সে রেখাকে ছেড়ে চমকে সরে দাঁড়াল—রেখার ছাইয়ের মত সাদা রক্তহীন মুখখানা চোখে পড়তেই।

রেখার হাত দুখানা চেপে ধরে মিনতির সুরে কান্না-ভরা কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হয়েছে ভাই!—আমায় বলবিনি—?"

রেখা বিছানায় বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল; একটা কথাও সে ছায়াকে জানাতে পারলে না। ছায়া অনুমানে বুঝে নিল সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে—দাদার সুখের নীড় বাঁধবার আগেই ভেঙ্গে পড়ে গেছে। সে কোন মতে কান্না চেপে দাদার পত্রখানা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

(ছয়)

তরুণ একখানা ছবি নিয়ে ব্যস্ত ছিল—সে রেখার। রেখা সেই প্রথম যেদিন তার ছবির ঘরের দুয়ারে ছবির মত এসে দাঁড়িয়েছিল—প্রেমিক শিল্পী সেইটিই ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তুলছিল। প্রায় শেষও করে এনেছিল। এইটিই তার রেখাকে তার প্রথম উপহার হবে বলে সে বেছে নিয়েছিল।

ছায়া ঘরে ঢুকল। আজ সত্যই শিল্পী এত তন্ময় ছিল—তার সর্বেন্দ্রিয়—তার অন্তর বাহির এতটা কাজে মগ্ন ছিল যে, সে সত্যই ছায়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। ছায়া ছবির দিকে একবার চেয়েই কেঁদে ফেললে। তরুণ চমকে পেছন ফিরতেই সে ছুঁড়ে পত্রখানা ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

লেফাফার ওপরে রেখার হাতের লেখা দেখে তরুণ ব্যাকুল আগ্রহে পত্রখানা খুলে ফেললে। রেখার পত্র! —তার প্রথম পত্র! এক নিশ্বাসে সে ছোট্ট পত্রখানা পড়ে ফেললে—ব্যথার দুঃখে মুখখানা তার ম্লান হয়ে গেল—টলতে টলতে সে সামনের আসনখানায় বসে পড়ল।

সে তার কর্তব্য মুহূর্তেকে স্থির করে ফেললে—তার মুখের ওপর একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠল। মুক্তি! মুক্তি!! নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তার মুক্তি চাইবার অধিকার?

রেখার মায়ের পত্রখানা খুলে পড়বার সে এতটুকুও প্রয়োজন আছে মনে করলে না। এতটুকু কৌতূহলও তার হল না। পত্র দুখানা পকেটে ভরে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নামছে—ওপর থেকে ব্যথাভরা কণ্ঠে ছায়া ডাকলে—দাদা!

"রেখাকে আনতে চললাম ছায়া" বলেই তরুণ মুখ না ফিরিয়েই বেরিয়ে গেল।

* * * * * * *

মিস গুহর শত অনুরোধ সত্ত্বেও রেখা বোর্ডিংএ আর একবেলাও থাকতে রাজী হল না। তার প্রিয় যে কোনও মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে—তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে। দুর্ব্বল নারী সে—তার ডাককে সে অবহেলা করতে পারবে না;—তার সংকল্প ভেসে যাবে—না—না—তার প্রিয়ের মঙ্গলের জন্য তাকে পালাতেই হবে।—

রেখাকে ষ্টেসনে পৌঁছুবার জন্য গাড়ী এসে গেছে—তার জিনিসপত্র ওঠান হয়েছে। রেখা ওপরে তার জগতের পরিচিত একমাত্র আশ্রয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল—তরুণ হর্ণ বাজিয়ে ফটকে ঢুকল।

রেখার জিনিস-বোঝাই গাড়ীর পাশে গাড়ী থামিয়ে পলকে সে ব্যাপারটা বুঝে নিল। মিস গুহকে বল্লে, "মিস বসুর জিনিসপত্র গুলো আমার গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে বলুন। ওঁকে আমার ষ্টেসনে পৌঁছে দেবার কথা ছিল—আমার দেরী দেখেই বোধ হয় অন্য গাড়ী ডাকিয়েছেন।"

নীচে নেমেই তরুণকে সামনে দেখে রেখার মুখ মড়ার মত ফেকাসে, রক্তহীন হয়ে গেল। সে তখন টলছিল—গাড়ী-বারান্দার একটা থাম ধরে সে কোন মতে সামলে নিল।

তরুণ গাড়ীর দরজা খুলে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে—"রেখা, উঠে এস।" এ ডাককে অগ্রাহ্য করবার শক্তি তার ছিল না। পা পা করে এসে কলের পুতুলের মত সে গাড়ীতে উঠে বসল।

—পথে দুজনেই অভিভূতের মত বসে রইল—কথা বলবার শক্তি দুজনেই হারিয়ে ফেলেছিল। মোড় ঘুরে গাড়ী যখন ছায়াদের ফটকের মধ্যে ঢুকছে—রেখা আপন কণ্ঠ ফিরে পেল—আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল—"এ তুমি কি কচ্ছ—কি কচ্ছ জান না—বুঝছ না—"

স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তরুণ উত্তর দিল—আমি যা করছি রেখা আমি ঠিক জানি—বেশ বুঝি।"

গাড়ী থামিয়ে রেখাকে টানতে টানতে সোজা তরুণ তার চিত্রশালায় ঢুকলে। রেখা তখন টলছিল—তার প্রিয়ের দৃঢ় বাহুপাশ তখনও তাকে খাড়া রেখেছিল।

রেখার অসম্পূর্ণ ছবির সামনে পৌঁছে রেখাকে গাঢ় কণ্ঠে তরুণ বল্লে—"রেখা! তুমি মুক্তি চাইছ—আমায় ছেড়ে যেতে চাইছ?—কোন্ অধিকারে?—নিজেকে একবার বিলিয়ে দেবার পর তোমার মুক্তি চাইবার তো কোন অধিকারই নেই।" তার পর পকেট থেকে পত্র দুইখানি বার করে বল্লে "এর মধ্যে আমার যেটা পড়বার ছিল—পড়েছি। তোমার মায়ের কাহিনী পড়বার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না—আমিও পড়িনি।"—তার পর মায়ের কাহিনী টুকরে টুকরো করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"এর দরকার আমার কাছে এর থেকে বেশী নয়; আর তোমার আমার মাঝে যা কিছু আসুক—তারও দশা হবে ঠিক এই রকম।"

আর্ত্তকণ্ঠে রেখা জমির ওপর লুটিয়ে পড়ল—"কি করলে? কি করলে! ওটা তোমার জানা দরকার ছিল - দরকার ছিল—ওতে আমার সত্য পরিচয় ছিল—আমার মা—"

রেখার মুখ চেপে ধরে—তাকে ধরে তুলে তরুণ বল্লে—"ঠিকই করেছি রেখা,—আমায় ভুল বুঝ না—ওতে আমার কোনই দরকার ছিল না—তুমি আমার প্রেমকে অতখানি নামিয়ে দিও না রেখা। মায়ের কর্ম্মের জন্য তুমি দায়ী নও—তার জন্য শাস্তি তুমি নিতে যাও কোন অধিকারে? আর তোমার মা—যাই হোন না তিনি—আমাদের গুরুজন, পূজ্য—তাঁর ভুল-চুকের বিচার করবার আমাদের কতটুকু অধিকার রেখা?"

রেখা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে জ্ঞান হারিয়ে তার প্রিয়ের বুকে লুটিয়ে পড়ল।

ছায়া ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে যাচ্ছিল—তরুণ হেঁকে বল্লে—"রেখাকে ফিরিয়ে আনলাম ছায়া!"

কথা ও সুর - শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন　　　　স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

পিলু সাওয়ান্ তেওড়া

ঝরিছে ঝর ঝর　　গরজে গর গর
স্বনিছে স্বর স্বর　　শ্রাবণ মা!
তটিনী তর তর　　সরসী ভর ভর
ধরণী থর থর　　শিকত গা!
বিরহী ধর ধর　　মানিনী সর সর
চাহিছে খর খর　　সুলোচনা
বালিকা দলে দলে　　চলিছে গলে গলে
বিটপী তলে তলে　　ঝোলে ঝুলা
কৃষক হলে হলে　　বলাকা জলে জলে
নাচিছে টলে' টলে'　　শিখীর পা
পরাণ পলে পলে　　পড়িছে ঢ'লে ঢলে'
উঠিছে বলে' বলে'　　"তুমি কোথা"!

|রা- রা|

৩　১　২　৩　১

II{ | সা সা রজ্ঞা | রা রা | রা জ্ঞা | রা রা মা | জ্ঞা রা | সা সা

ঝ রি ছে ঝ র ঝ র গ র জে গ র গ র

বা লি কা দ লে দ লে চ লি ছে গ লে গ লে

৩　১　২´　৩　১

সা র রা | র রা | পা মা | গা গা গা | রসা ।- | ন্সা রজ্ঞা। }

স্ব নি ছে স্ব র স্ব র শ্রা ব ণ মা — — —

বি ট পী ত লে ত লে ঝো লে ঝু লা — — —

২´ ৩ ১ ২´ ৩ ১
{ | রা রা রা | রমা মা | মগা মা | পা পা পা | পা পা | পমা ধপা ।
ত টি নী ত র ত র স র সী ভ র ভ র
কৃ ষ ক ছ লে ছ লে ব লা কা জ লে জ লে

২´ ৩ ১ ২´ ৩ ১ ২´
রা রা রা | রমা মা | মপা পা | মা ধপধা পা | মা া- | পরগা রা- } | রনা না না |
ধ র ণী থ র থ র শি ক - ত গা - — — বি র হী
না চি ছে ট লে' ট লে' শি খী - র পা - — — প রা ণ

৩ ১ ২´ ৩ ১ ২´ ৩
না না- | না ধা | পধা পধা পা | মা মা | মা রগা | সা সরা রা | রা রা |
ধ র ধ র মা নি নী স র স র চা হি ছে খ র
প লে প লে প ড়ি ছে ট লে' ট লে' উ ঠি ছে ব লে'

১ ২´ ৩ ১
রপা মা | গা গা গা | রসা া- | ন্‌সা- রজ্ঞা | II
খ র সু লো চ না — — —
ব লে "তু মি কো থা — — —

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অভিনব কাচ—

অষ্ট্রিয়াতে এক বৈজ্ঞানিক এমন এক প্রকার কাচের আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাকে ইচ্ছামত বেতের মত বাঁকান যায়। ছবিতে

অভিনব কাচ

দেখুন একজন এই অদ্ভুত কাচের তৈরী একটী ছড়িকে বেতের ছড়ির মতন বাঁকাইয়া ধরিয়াছেন। এইবার কাচকে নানাপ্রকার নতুন নতুন কাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে।

নতুন রকমের টেলিফোন—

আমরা সাধারণতঃ যে প্রকার টেলিফোন দেখি, তাহা হাতের সাহায্যে তুলিয়া কাণে লাগাইয়া কথা শুনিতে হয়। তখন আর অন্য

নতুন রকমের টেলিফোন

কোন কাজ করা যায় না। সম্প্রতি 'অডিয়ফোন' নামে এক প্রকার নতুন ধরণের টেলিফোন ব্যবহার হইতেছে। ইহা টেবিলের উপর, কাণের পাশে এবং হাতের কাছে থাকে। রিসিভারটি এমনভাবে তৈয়ারী যে একটু বাঁকিয়া বসিলেই তাহা কান স্পর্শ করিবে।

টেলিফোনের কথা শুনিতে শুনিতে হাতের অন্য কাজও বেশ চলিতে পারে। ছবি দেখিলে ব্যাপারটি বেশ ভাল বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের দেশে আপিস ইত্যাদিতে ইহার প্রচলন এখনও হয় নাই।

লুথার বুর্ব্যাঙ্কের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি

লুথার বুর্ব্যাঙ্কের নাম জগৎ-প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদ জগতে এই আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকে অদ্ভুত উপায়ে ইনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফলে পরিণত করিয়াছেন। গম, যব, বার্লি ইত্যাদি নানা শস্যকে তিনি আকারে এবং সারে বৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক অখাদ্য ফলকে সুমিষ্ট লোভনীয় ফলে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এক ইঞ্চি ফুলকে ৮ ইঞ্চি করিয়া প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। সামান্য কথায় ইহার সম্পূর্ণ কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করা যায় না। সম্প্রতি তিনি এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন, কেবল তাহারই কথা এই প্রসঙ্গে বলিব। তিনি একটি অতি ক্ষুদ্র গাছ দেখেন। গাছটি বোধ হয় লম্বায় এক ইঞ্চি—ইহাতে আবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলও ফুটিত। প্রত্যেকটি ফুল বোধ হয় $\frac{১}{৩০}$ ইঞ্চির বেশী হইত না। নানা প্রকার চেষ্টার পর তিনি এক ইঞ্চি গাছকে প্রায় ৬ ফিট লম্বা করিয়াছেন; ইহার পাতাগুলি প্রকাণ্ড হইয়াছে; ফুলগুলিও বড় বড় গোলাপের মত হইয়াছে। টবে এই গাছ রাখিলে অতি শোভনীয় হয়। ছবি দেখিলেই গাছটির পরিচয় পাইবেন। গাছের পিছনে লুথার বুর্ব্যাঙ্ক গাছের গুঁড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

লুথার বুর্ব্যাঙ্কের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি

বৃহত্তম তারকার কথা—

আমরা পৃথিবীর লোকেরা সূর্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এমন কতকগুলি নতুন তারকার আবিষ্কার সম্প্রতি হইয়াছে—যাহাদের তুলনায় আমাদের জীবনদাতা সূর্য্যকে নগণ্য বলিয়া মনে হয়।

একটি মোটরকারকে যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ক্রমাগত পৃথিবীর উপর দৌড় করান যায়, তাহা হইলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে তাহার সময় লাগিবে মোট ১৭ দিন ৮ঘণ্টা। এই প্রকারে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে লাগিবে প্রায় পাঁচ বৎসর। কিন্তু এণ্টারেস্ (Antares)

বৃহত্তম তারকা

নামক একটি নক্ষত্রকে এই মোটরকার কতদিনে একবার ঘুরিয়া আসিবে, তাহার কল্পনাও বোধ হয় অনেকে করিতে পারিবেন না। এণ্টারেসকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিবে—১,৩৭০ বৎসর মাত্র! ইহা হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে এই সুবৃহৎ তারকার ব্যাস ২৭৩,০০০,০০০ মাইলেরও বেশী—অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ৩০০ গুণেরও বেশী। এণ্টারেস্ ছাড়াও এই প্রকার অকল্পনীয় আকারের তারকা আছে।

"Betilgense" এবং "alpha Hercules"—ইহাদের মধ্যে দুইটি। ইহারা এত প্রকাণ্ড যে পৃথিবী সূর্য্যকে যে পথে প্রদক্ষিণ করে, সমস্ত পথ জুড়িয়াও একটিরও স্থান সংকুলান হইবে না।

এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগুনের গোলক আকাশে ভীষণ বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা কল্পনা করিলে মন অদ্ভুত বিস্ময়ে পূর্ণ হয়! এই প্রশ্ন মনে আসে যে তারকার আকারের এবং বৃহত্বের কোনো সীমা আছে কি না? বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক এ, এস্, এডিংটন্ (A. S. Eddington) নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক মাপ-জোকের দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সূর্য্যের যে "Mass"—অন্য কোনো তারকা তাহার ৫০ গুণ পর্য্যন্ত বড় হইতে পারে। তাহার বেশী বড় কোন তারকা আকাশে অটুট অবস্থায় থাকিতে পারে না। কোনো তারকা সূর্য্যের দশ গুণ বড় হইতে পারে, কিন্তু Mass অর্থাৎ তারকা-মধ্যস্থিত দ্রব্যসমূহের ওজনও যে সেই অনুপাতে বেশী হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। Volume অর্থাৎ প্রসার এবং Mass অর্থাৎ মধ্যস্থিত দ্রব্যসমূহের ওজন -আলাদা জিনিস। এণ্টারেস্ তারকার Volume সূর্য্যের ৩০০ গুণেরও বেশী, কিন্তু তাহার Mass সূর্য্যের Mass অপেক্ষা মাত্র ৫০ গুণ বেশী। সূর্য্যের Massএর ৫০ গুণ Massওয়ালা তারকা আকাশে থাকিতে পারে, তাহার বেশী হইলে সে আপনার বেগে কোটি কোটি ভাগে চূর্ণ হইয়া সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তাহাকে অটুট রাখিতে পারিবে না।

এডিংটন ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তারকার যেমন বৃহত্বের সীমা আছে, তেমনি তাহার ক্ষুদ্রত্বেরও একটা সীমা আছে। তাঁহার মতে যদি কোন তারকার "মাস্" সূর্য্যের "মাসের" ⅓ অন্ততঃ না হয়, তাহা হইলে সেই তারকা হইতে কোনো প্রকার আলো বা জ্যোতিঃ নির্গত হইবে না। কারণ কোন তারকার "মাস্" সূর্য্যের 'মাসের' ⅓ অন্ততঃ না হইলে তাহার তাপ ৫৪০০ (ফারেনহাইট) হইবে না এবং তাপ এই পরিমাণ না হইলে কোন তারকা দূর হইতে দৃশ্যমান হইতে পারে না।

ক্ষুদ্রকায় তারকাদের মধ্যে *alpha* Centauriর নাম করা যাইতে পারে। ইহার ব্যাস মাত্র ১৫৫,০০০ মাইল—সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৫,৩৫০ মাইল। এই তারকা হইতে যে জ্যোতিঃ বাহির হয় তাহা সূর্য্যের আলোর মাত্র ১/২০০০০ ভাগ। এই সূত্র ধরিয়া আরো একটি জিনিষ এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন। সূর্য্যের যৌবনকালে তাহার তাপ ছিল প্রায় ১৬,২০০ (এফ্.) কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার তাপ মাত্র ১০,৪০০ (এফ্.)। অতএব দেখা যাইতেছে যে সূর্য্য ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছে—এবং শীঘ্রই এমন দিন আসিতে পারে যখন সে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং আমরা সব জমিয়া বরফ হইয়া যাইব। তবে আমাদের খুব বেশী ভয় পাইবার কারণ নাই—কারণ বৈজ্ঞানিকেরা ভরসা দিতেছেন যে সূর্য্যের পৃথিবীর ক্ষতি করিবার মত ঠাণ্ডা হইতে এখনও কোটী বৎসরেরও বেশী সময় লাগিবে।

অভিনব দোলনা—

আপনা হইতেই দোল খাইতে পারে, এমন একটি দোলনা শিশুদের জন্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেড় দুই বছরের শিশুরা এই দোলনা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারিবে। দোলনার বসিবার জায়গায়
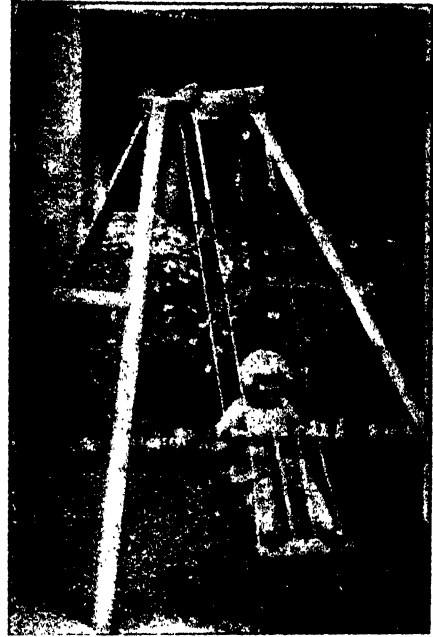
অভিনব দোলনা

যেরাটোপ দেওয়া আছে। শিশুরা নির্ভয়ে বসিতে পারিবে। কাছাকাছি কোনো পাহারা রাখিবারও বিশেষ দরকার নাই। একবার পায়ের ঠেলা এবং একবার হাতের ঠেলা দিলেই দোলনা দুলিতে আরম্ভ করিবে। দোলনায় যে বসিয়া থাকিবে, অন্য কাহারও সাহায্য না লইয়াই সে নিজে নিজেই ইহা করিতে পারিবে। আমাদের দেশে গৃহস্থ বাড়ীতে এই প্রকার দোলনার প্রচলন করিলে বাড়ীর মেয়েরা শিশুদের দোলনায় বসাইয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহকর্ম্ম করিতে পারিবে।

চেহারা সাদৃশ্য—

একই রকম দেখিতে দুইজন লোক আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই। চেহারা এক রকম হইলেই যে তাহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা বা রক্ত-সম্বন্ধ আছে—এ কথা আমরা মনে করি না। কিন্তু হল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Prof. Van Bemmelen বলিতেছেন দুইজন লোকের চেহারা একরকম হইলে তাহাদের মধ্যে রক্ত-সম্বন্ধ অবশ্য অতি সুদূর ভূতকালের হইতে পারে। বিভিন্ন দেশ এবং জাতির লোক হইলেও এই কথা খাটে। কারণ ইতিহাস খোঁজ করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে ৩০ পুরুষ বা তারো পূর্ব্বে এই বিভিন্ন জাতির অনেক লোক কোনো এক জাতির লোক ছিল। বহু লোকের রক্ত এবং রং নানা

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে পরীক্ষা করিয়া একজন রুশীয় বৈজ্ঞানিকও ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। কতকগুলি ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে অতি সামান্য কয়েকজন লোকের সহিত কয়েকজন জগৎপ্রসিদ্ধ লোকের কি অদ্ভুত চেহারার সাদৃশ্য আছে।

চেহারা সাদৃশ্য

বাইসাইকেল্-নৌকা—

ছবিতে যে নৌকা দেখিতেছেন—উহার মধ্যে একটি সাধারণ সাইকেল ফিট্ করা আছে। সাইকেলের প্যাডেলের সাহায্যে নৌকা চলে। এই অদ্ভুত নৌকার আর একটি বিশেষত্ব আছে। বাইসাইকেলের
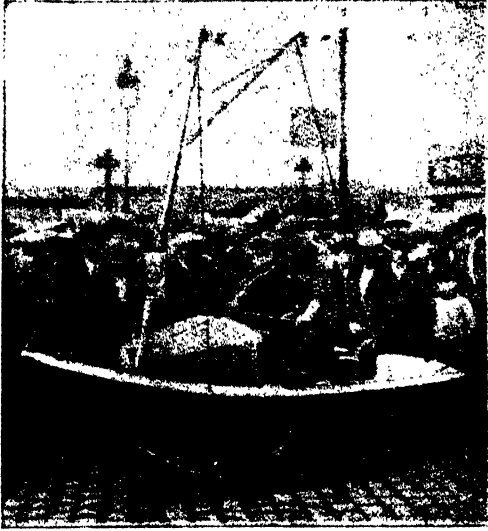
বাইসাইকেল নৌকা

গায়ে নৌকা এমন ভাবে তৈয়ারী যে ইহার ভারসমতা খুব সুন্দর এবং এই কারণেই বাইসাইকেলে বসিয়া নৌকাটীকে জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই চালান সহজসাধ্য হইয়াছে। এই নৌকার আবিষ্কর্ত্তা একজন ফরাসী ভ্রমণকারী—তাঁহার নাম মেরিয়াস্ ফেলি।

টুট্-আংখ্-আমেনের কফিন্—

ছবিতে, কিছুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত টুট্-আংখ-আমেনের কফিন এবং তাঁহার স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। কফিনটিও আগাগোড়া সোনার তৈয়ারী। টুট্-আংখ আমেনের স্বর্ণমূর্ত্তির খোদাই সেই সময়কার স্বর্ণকারদের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেকটি দাগ, প্রত্যেকটি টান পরিষ্কার—পাকা হাতের কাজ বলিয়া বোঝা যায়। স্বর্ণমূর্ত্তি সামান্য একটু ময়লা হইয়া গিয়াছিল—ইহাকে এখন আবার ভাল করিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। মূর্ত্তিতে যে পরিমাণ সোনা আছে, তাহার বর্ত্তমান দাম প্রায় ৭৫০,০০০ টাকা। মূর্ত্তিটি সোনার পাত পিটাইয়া গড়া হইয়াছে। ৬ ফুট লম্বা। টুট্-আংখ আমেনের কবরে যে সমস্ত আশ্চর্য্যজনক দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে—এই স্বর্ণমূর্ত্তি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
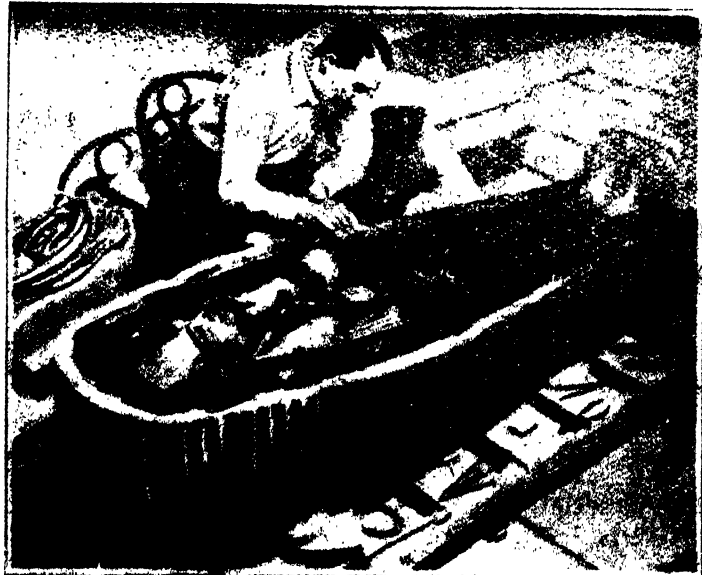
টুট্-আংখ আমেনের কফিন (২ খানি)

হাতের টিপ—

এল্‌, স্যামুয়েল মুর—বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। তাহার বাড়ী আমেরিকার এক সহরে (Newtonville—Mass)। সম্প্রতি সে তাহার হাতের আশ্চর্য্য টিপের এক নমুনা দেখাইয়া জগৎকে অবাক্‌ করিয়াছে। ক্রমাগত সাড়ে ৬ ঘণ্টাকাল ধরিয়া যে বন্দুক ছোড়ে—এবং এই সাড়ে ছয় ঘণ্টায় সে ২৫০০টি গুলি ছুঁড়িয়া ২,৯৯৯টি বুল্‌স্‌-আই মারিয়াছে। অর্থাৎ একটিমাত্র গুলি তাহার লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অক্ষম হয়। বন্দুক এত তাড়াতাড়ি ছোড়া হয় যে বন্দুকের লোহার

হাতের টিপ

অংশ গরম হইয়া স্যামুয়েলের হাতে ফোস্কা করিয়া দিয়াছে। এমন অদ্ভুত হাতের টিপের কথা খুব কমই শোনা গিয়াছে।

কলের দ্বারা প্যাক্‌-বাক্‌সে বোতল প্যাক্‌—

ঔষধ বা অন্য কোন দ্রব্য-পূর্ণ বোতল চালান দিবার সময় প্যাক করা বাকসে দেওয়া হয়। এই প্যাক করার কাজটি সাধারণত হাতের সাহায্যেই করা হইয়া থাকে। বোতল ভর্ত্তি করা কলের সাহায্যে বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি একজন মেক্‌সিক্যান যুবক একটি কল তৈয়ার করিয়াছে। এই কল ভর্ত্তি-বোতল প্যাক বাক্‌সে প্যাক করিবে। প্যাক করিবার জন্য আলাদা লোকের দরকার হইবে না। ভর্ত্তি করার কল হইতে বোতলগুলি পূর্ণ এবং ছিপি-আঁটা হইয়া একটি মঞ্চের উপর আসিয়া সারি সারি জমা হইবে। এই মঞ্চ হইতে বোতলগুলি একটি একটি করিয়া মঞ্চের নিম্নে স্থিত প্যাক বাকসে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইবে। প্যাক্‌-বাক্সটি বোতল-পূর্ণ হইবামাত্র নিকটস্থিত ঠেলা গাড়ির উপর চলিয়া যাইবে। সমস্ত ব্যাপার কলের দ্বারা হইবে—কেবলমাত্র একজন লোক দাঁড়াইয়া কল চালাইবে। এই কল প্যাকিং খরচ এবং সময় দুই সংক্ষেপ করিবে এবং আশা করা যায় বড় বড় কারখানায় এই কলের সমাদর অতি শীঘ্রই হইবে।

কলের দ্বারা প্যাক-বাক্সে বোতল প্যাক

৭১ বছর বয়সে ৪২০০ মাইল সাইকেল দৌড়—

এম, সি, প্লুমার, বোষ্টোন সহরের লোক। ইঁহার বয়স মাত্র ৭১ বছর। সম্প্রতি এই বৃদ্ধ-যুবক তাঁহার বাইসাইকেলে করিয়া বোষ্টোন হইতে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো পর্য্যন্ত দৌড় দিয়াছেন। দূরত্ব মাত্র ৪২০০

৭১ বৎসর বয়সে ৪২০০ মাইল সাইকেল দৌড়

মাইল! গড়ে প্রতি দিন ইনি ৯০ হইতে ১৫০ মাইল গিয়াছেন! সমস্ত দিনে রাতে ঘুমাইয়াছেন ৪.৫ ঘণ্টা। সবলকায় যুবকদের মধ্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

ঘোড়ার গ্যাস্ মুখোস—

অনেক যুদ্ধ-বিদের মতে ভবিষ্যতে যে মহাযুদ্ধ হইবে, তাহা বন্দুক কামান ইত্যাদি লইয়া হইবে না। এই লড়াই বিপক্ষদলের মধ্যে গ্যাসের লড়াই হইবে। উভয় পক্ষই চেষ্টা করিবে বিপক্ষ দলকে বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা নির্ম্মূল করিতে। এই গ্যাস আকাশস্থিত এরোপ্লেন হইতে নীচে শত্রুদলের সহর এবং কেল্লা ইত্যাদির উপর ফেলা হইবে। সৈন্যদলকে এই প্রকার বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার মুখোস আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুখোস পরিয়া অনায়াসে গ্যাসের মাঝখান দিয়া চলা-ফেরা করা যায়; নাকের মধ্যে গ্যাস কোনো রকমেই প্রবেশ করিবে না।

ঘোড়রে গ্যাস্ মুখোস

এখন জন্তুদিগকে, বিশেষতঃ যে সকল জন্তু এবং পাখী যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য মুখোস আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। এই কার্য্যে সফলতা লাভ হইয়াছে অনেকখানি। একটি ঘোড়াকে এই মুখোস পরাইয়া গ্যাসের মাঝখান দিয়া দৌড়ান হইয়াছে—ঘোড়ার কোনও প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। ঘোড়ার মুখোসটি দেখিতে অনেকটা তাহার দানা খাইবার ঝোলার মতই। মুখোসটি কাপড়ের তৈরী। অবশ্য এই কাপড়ে নানা-প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য মাখান থাকে, তাহাতে গ্যাস আট্‌কাইয়া যায়। ঘোড়ার ক্ষুর বিষাক্ত গ্যাসে নষ্ট হইয়া যায়—সেইজন্য ঘোড়ার ক্ষুরে চামড়ার আবরণ দেওয়া হইবে। কুকুরের জন্য যে মুখোস তৈরী হইয়াছে, তাহাতে তাহার সমস্ত মুখ এবং মাথা আবৃত থাকিবে। কুকুর অনেক সময় মুখ দিয়া নিশ্বাস টানে—সেইজন্য তাহার কেবল নাক ঢাকিলেই চলিবে না, মুখও গ্যাসের সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

পায়রার জন্য কোন প্রকার মুখোস এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—তবে তাহার খাঁচার জন্য গ্যাস্-প্রুফ্ ঢাকনি তৈয়ারী হইয়াছে। পায়রার পায়ে সংবাদ-লিপি বাঁধিয়া দিয়া, তাহাকে চট্ করিয়া খাঁচা হইতে বাহির করিয়া দিয়া আকাশের দিকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। গ্যাস তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিবার পূর্ব্বেই পায়রা সংবাদ লইয়া আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া যায়।

গ্যাস-মুখোস লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। দরকার হইলে হয়ত মানুষ এবং অন্যান্য জন্তুর সমস্ত শরীর আবৃত করিবার মত গ্যাস্-আবরণীর আবিষ্কার হইতে পারে; কারণ এমন গ্যাসও আবিষ্কার হইতে পারে, যাহা শরীরের চামড়ার যেখানে লাগিবে, সেইখানটাই পোড়াইয়া দিবে।

অভিনব আবাস—

(ক) প্রাচীন কালে কোন কোন জাতির লোকে গাছের উপর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আনন্দে বসবাস করিত। বর্ত্তমান কালে একজন অতিসভ্য নিউইয়র্কবাসী এই প্রকার একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বাড়ীখানি অবশ্য কেবলমাত্র গাছের উপর ভর করিয়াই নাই—ইস্পাতের থাম্বার সাহায্যও লওয়া হইয়াছে।

(খ) ইংলণ্ডের এক সহরে জল যোগাইবার জন্য একটি ওয়াটার টাওয়ার আছে। এই ওয়াটার-টাওয়ারে ৩০,০০০ গ্যালন জল থাকে।

এই টাওয়ার বা স্তম্ভের উপর মিসেস্ ম্যালকম্ ম্যাসন নাম্নী এক গল্প লেখিকা চমৎকার বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

(গ) অতি গরম দেশে এক পাহাড়ের গায়ে পাথর খুদিয়া একটি ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া এক সাহেব বাস করেন। ইহাতে বাহিরের গরমে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় না।

(ঘ) কালিফোর্নিয়ার একটি হাসপাতালের ছাতকে রোদের গরম হইতে বাঁচাইবার জন্ত ছাতের কয়েক ফুট উপরে আর একটি ছাত খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উপরের ছাতকে, ছাতের ছাতা বলিলেও চলে। ইহার ফলে হাসপাতালের ঘরগুলি গরম হয় না। রোগীরা আরামে নিদ্রা যাইতে পারে।
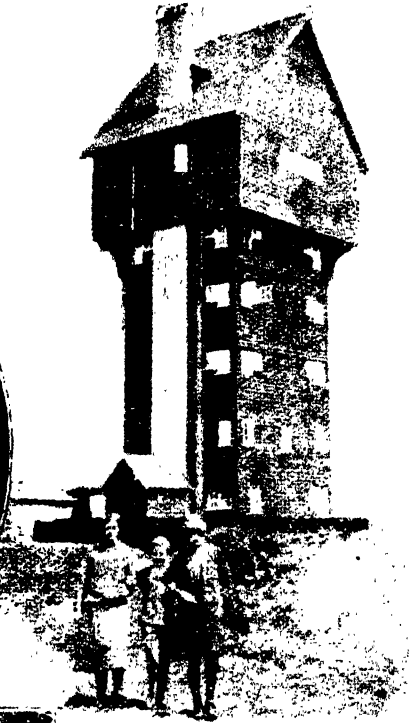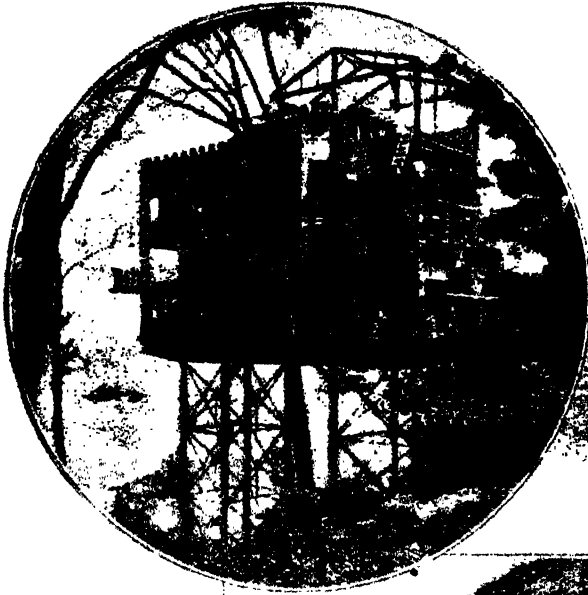
(ঙ) ইংলণ্ডে দারুণ গৃহসমস্যার দিনে সমুদ্র-তীরের এক সহরে একটি নৌকাকে দ্বিতল গৃহরূপে পরিণত করিয়া এক পরিবার বাস করিতেছে।

অভিনব আবাস

জনমানবহীন বরফ-দ্বীপ

কেপ হর্ণের দক্ষিণে কুমেরু-মহাসমুদ্রে কয়েকটি বরফাবৃত, জনমানববৃক্ষলতাহীন দ্বীপ আছে। তাহার মধ্যে একটি দ্বীপের নাম "Elephant Island" অর্থাৎ "হস্তী দ্বীপ"। নাম দেখিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে এখানে প্রচুর হাতী পাওয়া যায়, বা দ্বীপটি দেখিতে হাতীর মত। কাপ্তান হার্লে তাঁহার সহচরদের লইয়া এই দ্বীপে প্রায় আট মাস কাল বাস করেন। নতুন কোন দ্বীপ বা দেশ আবিষ্কার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই দ্বীপের কতকগুলি ছবি তুলিতে তাঁহারা সমর্থ হন। বরফের গুহা, বরফের জঙ্গল, বরফের স্তম্ভ ইত্যাদির দ্বারা এই দ্বীপটি পূর্ণ। এখানে যাহা কিছু আছে, সবই বরফের,—বরফ ছাড়া আর কিছু নাই—এ যেন বরফের রাজত্ব। ছবিতে বরফ-দ্বীপের কয়েকটি দৃশ্য দেওয়া হইল।
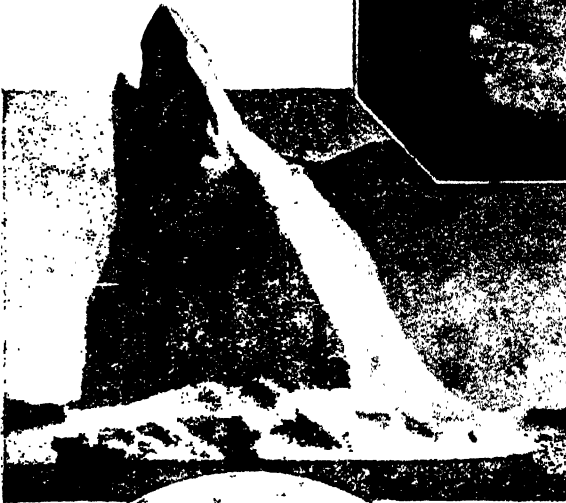
জনমানবহীন বরফ-দ্বীপ

জাঁতা-পাথরের অভিনব ব্যবহার—

আমাদের দেশে জাঁতার ব্যবহার বহু কাল হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু জাঁতা পুরান এবং অকেজো হইয়া গেলে আমরা জাঁতার পাথর ফেলিয়া দিই। কিন্তু এই সকল পাথর দিয়া শক্ত এবং সুদৃশ্য দেওয়াল নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই। ফিলাডেলফিয়া সহরের এক কারখানাওয়ালা এই সকল জাঁতা-পাথর সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কারখানার চারিদিকে লম্বা এবং দৃঢ় দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি সম্পূর্ণ গীর্জ্জাও এই অব্যবহার্য্য জাঁতা-পাথর দিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এক একটা জাঁতা-কলে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ জাঁতাপাথর নষ্ট হয়, তাহাতে সেই সকল পাথর দিয়া অনায়াসেই ছোট ছোট দু তিনটি বাড়ী তৈয়ার করা যায়।
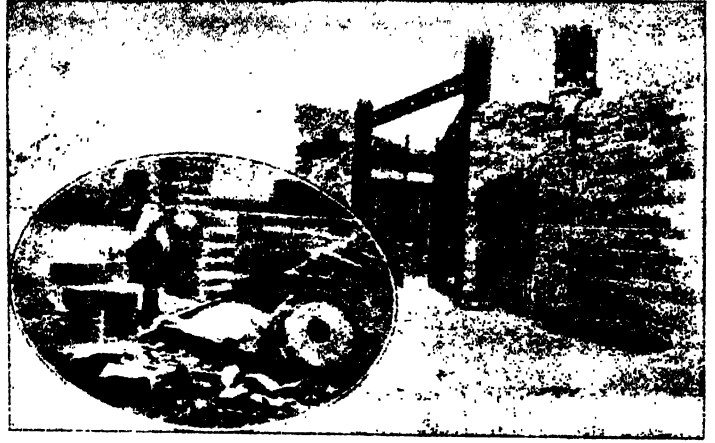
জাঁতার পাথরের অভিনব ব্যবহার

ব্রাহ্মণ

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

১

মাণিকপুরের কালী-মন্দির সে অঞ্চলের সকাম ও নিষ্কাম ভক্তির মূর্ত্তবিকাশের একমাত্র লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অমন জাগ্রত দেবতা বড় বড় তীর্থ-স্থানেও নাকি বড়-একটা দেখা যায় না। সেখানে ভক্তি-ভরে মানৎ করিয়া কেহ নাকি কখনও বিফলকাম হয় নাই।

বৃদ্ধ পদ্মনাভ দেবশর্ম্মা সেই মন্দিরের সেবায়েৎ অর্থাৎ মন্দিরের আয় হইতে তিনি নিজের সংসার বেশ সচ্ছলরূপে চালাইয়া কিঞ্চিৎ জমি-জমা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া খাটাইয়া লইতেছে বলিয়া সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাচ্য হিন্দু যে তার দেবতাকে পর্য্যন্ত খাটাইয়া লইবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না।

বৃদ্ধ পদ্মনাভ যে পরম নৈষ্ঠিক ছিলেন তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—পত্নী সত্বেও এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান জন্মে নাই। অজাত-সন্তান বলিয়া ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী কখনও দুঃখ প্রকাশ করিতেন না, বরং গৌরব করিয়াই বলিতেন "আমি যে মা কালীর 'দৃষ্টি পড়া' মেয়ে, তাই মা আমাকেও নিজের মত করেছেন"

বৃদ্ধ পদ্মনাভের কিন্তু মনে সুখ ছিল না। বার্দ্ধক্যের ভারে যখন তিনি একান্ত অপটু হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেবসেবার জন্য পূজারী ভাড়া করিতে হইল। কিন্তু ভাড়া-করা পূজারী তাঁহার মত পূজা-সামগ্রীর স্বল্পতা দেখিলে কেবল মন্ত্রচুরি করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, পরন্তু সেই সামান্য উপকরণেরও কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে আলস্য করিত না। সুতরাং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিত্যতা হেতু মন্দিরের আয় যতই হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল, বৃদ্ধ পদ্মনাভ ততই ত্রাস প্রাপ্ত হইয়া ঘন ঘন পূজারী পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গুটি-দুইচার পূজারী পরিবর্ত্তনের পর বিধি সদয় হইলেন—পদ্মনাভ একটী প্রকৃত সাধু-স্বভাব পূজারীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে সংগ্রহ করিলেন।

তাহার নাম সত্যশরণ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। তার যৌবনের দীপ্ত সুষমার প্রখরতা শুদ্ধচিত্ততার সংস্পর্শে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর—যেন শ্রাবণের সমেঘ মধ্যাহ্ন-আকাশ।

সত্যশরণ পিতৃমাতৃহীন। বাড়ী ঘর নাই বলিলেই হয়। সুতরাং সে পদ্মনাভের সংসারেই থাকিয়া. পদ্মনাভ ঠাকুরের 'দৈব ব্যবসায়' চালাইবে স্থির হইল। ইহাতে পদ্মনাভ ঠাকুর অনেকটা নিরুদ্বেগ হইলেন; ভাবিলেন—বাঁচা গেল, চুরিটা রক্ষে হ'ল।

দেবসেবার জন্য সত্যশরণ মাসিক দক্ষিণা কত চাহে জিজ্ঞাসা করায় সত্যশরণ কহিল—"মায়ের পূজা ক'রব, তাঁর প্রসাদ পাব—এই আমার যথেষ্ট—! ক'ন টাকাটা সিকেটা দরকার হয়—জানাব।"

পদ্মনাভ মনে-মনে বলিলেন—সোনারচাঁদ ছেলে একেই বলে! প্রকাশ্যে বলিলেন—"বেঁচে থাকো বাবা!… দীর্ঘজীবী হও!"

২

সত্যশরণকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়া পদ্মনাভ যতটা ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন ফলে কিন্তু ততটা হইল না। পূজার ফল মূল বা নৈবেদ্যের চাউলের পরিমাণ প্রায় পূর্ব্ববৎ, তবে দক্ষিণালব্ধ অর্থের পরিমাণটা কিছু বাড়িয়াছে সত্য। পদ্মনাভ একদিন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যশরণ বলিল—"আজ্ঞে যারা পূজা দিতে আসে তাদের প্রসাদ কিছু বেশী করে দিতে হয় কিনা, তাই এদিকে কিছু কম হয়, আর দক্ষিণার পয়সা থেকে তো তা কিছুই দিতে হয় না, তাই সমস্তটাই পান!"

বৃদ্ধ দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—"এঁ্যা…প্রসাদ বেশী-বেশী করে দাও?…কেন? এঃ! তোমায় অর্ব্বাচীন পেয়ে ব্যাটারা সব ঠকিয়ে নেয়!"

সত্যশরণ ধীরকণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞে, না, তারা প্রসাদের পরিমাণ নিয়ে কখনও কোন কথা বলেনি আমি নিজে থেকেই—"

বৃদ্ধ একবার চমকিয়া উঠিলেন—"এঁ্যা! নিজে থেকে তাদের বেশী করে দাও?…আরে ছ্যা! ছ্যা!—তুমি এত নির্ব্বোধ তা তো জানতুম না!…না, না, ভবিষ্যতে আর ও-রকম কোরো না! প্রসাদ দেওয়া এই বুঝেছ কিনা—যত কমে পার সারবে!"

বৃদ্ধের হৃদয়ের পরিচয়ে সত্যশরণের মনের ভিতরটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে কোন উত্তর করিল না।

বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন…"নৈবেদ্যর চালটার পরিমাণ তেমন বাড়ছে না কেন বল ত? তা' থেকে তো কোন খরচ হয় না!"

সত্যশরণ সশঙ্ক নম্র স্বরে বলিল—"আজ্ঞে তা হয় কিছু—এই সিকি পরিমাণ!

বৃদ্ধের যেন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এমনি ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বল কি?…প্রসাদের সঙ্গে নৈবেদ্যর চালও তুমি বিতরণ আরম্ভ করেছ!"

"আজ্ঞে প্রসাদের সঙ্গে নয়—"

"তবে কার সঙ্গে বাপু?"—পদ্মনাভের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ-বিমিশ্রিত।

"এই দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জ আতুর—এদের এক মুঠা এক মুঠা ভিক্ষে দিতে হয়!"

"ভিক্ষা দিতে হয়?…তার মানে?…যদি না দিই?—আমার মাথাটা কেটে নেবে তা'রা?…না, না, সত্যশরণ, এসব ভাল নয়! তুমি ছেলে মানুষ—তোমায় সৎ বলেই জানি…তা আমায় কোন জিজ্ঞেসবাদ না করে অতটা কর্ত্তৃত্ব কোরো না!" সত্যশরণের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে নীরবে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পদ্মনাভ সেইদিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে স্বগত বলিল—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ…কোন ব্যাটাকে আর বিশ্বাস করবার যো নেই!

৩

সত্যশরণের ভক্ত হৃদয় প্রত্যহ দেবীপূজার কালে যেমন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িত—এক দিন পূজা করিতে বসিয়া তেমন আর হইতেছিল না—সে কেবলই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল! তাহার মনে হইতে লাগিল—দেবী আজিকার পূজা যে গ্রহণ করিলেন না, তাহা বুঝাইয়া দিতেই যেন এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইলেন। প্রথমে তাহার সন্দেহ হইল সে কোনরূপ অশুচি অবস্থায় পূজায় রত হয় নাই ত? কিন্তু স্মৃতি সাহায্যে সবিশেষ সন্ধান করিয়াও সে তাহার দেহমনের শুচিতার ত্রুটি দেখিতে পাইল না। তখন সে পূজা-সামগ্রী কোন প্রকারে অপবিত্র হইয়াছে কিনা জানিবার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য-বাহকদিগকে একে একে

প্রশ্ন করিতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব নৈবেদ্যর শুচিতার সমর্থন করিতে গিয়া, কে কি মানসে পূজা মানত করিয়াছে, তাহাও বলিতে লাগিল। এক ব্যক্তি বলিল—"ঠাকুর, আমি কখনও মার পূজার জিনিস অপবিত্র করিতে পারি! তুমি তো জান না—মা আমায় কি কৃপা করেছেন"—এই বলিয়া সে যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তাহার শ্বশুরের বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র-সন্তান হওয়ায়, তাহার শ্বশুরের সম্পত্তি লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না; এজন্য সে মার নিকট তার শিশু শ্যালকের মৃত্যু-কামনা করিয়া পূজা মানত করিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে আজ দুই দিন হইল সেই শ্যালক হঠাৎ মারা গিয়া তাহার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছে।

এই ভীষণ মানতের কথা শুনিয়া ঘৃণা ও ক্ষোভে সত্যশরণের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে এতক্ষণে বুঝিল—কেন দেবী আজ পূজা গ্রহণ করেন নাই। সে বারেক মর্ম্মান্তিক বেদনাভরা দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির পানে তাকাইয়া তাহার নিবেদিত পূজার সামগ্রী সমস্ত তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে বলিল—"নিয়ে যাও তোমার জিনিস—এ পুজো মা গ্রহণ করেন নি!"

সে ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি অপরাধ হয়েছে ঠাকুর, যে, মা এ পুজো—"

পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে উত্তর হইল—"চলে যাও এখান থেকে!—পাপিষ্ঠ!"

সেইদিন হইতে সত্যশরণ পূজার মানস জিজ্ঞাসা না করিয়া পূজার ভার গ্রহণ করিত না। কথাটা পদ্মনাভের কানে পৌঁছিবার আগেই, এক দিন জমিদার বাটী হইতে এক বিপুল পূজার ভার উপস্থিত হইল। সত্যশরণ নব রীতি অনুসারে পূজার মানসের কথা জিজ্ঞাসা করিল। শুনিল, জেলা কোর্টে যে বড় উকীল তাঁহার বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চালাইতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর 'শুভ সংবাদে' এই পূজার অনুষ্ঠান!

সত্যশরণ সে পূজার ভার ফিরাইয়া দিল। জমিদারের লোক বলিল—"জমিদার বাবু কারণ জিজ্ঞেস করলে কি বলব?"

"বোলো—হিংসার পূজা মা গ্রহণ করেন না।"

৪

নবীন দত্ত দুরন্ত জমিদার। তবে, দুরন্ত জমিদার বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ছিলেন না। প্রজার ধনসম্পত্তি বা ঝি-বউড়ীর উপর তিনি কখনও লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিতেন না। প্রজা খাজনা তামাদি করিয়া দিলে তাঁর তত আপত্তি হইত না; কিন্তু তাঁহার প্রাপ্য 'রাজমান্যের' এক কড়া-ক্রান্তি কেহ হানি করিলে, তার আর নিস্তার থাকিত না। সুতরাং যখন শুনিলেন তাঁর পূজা ফেরত আসিয়াছে, তখন একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া হুকুম দিলেন—"শা—ভট্‌চার্য্যকো পাকাড় লেয়াও!"

পদ্মনাভ ঠাকুর তখন আহারান্তে আচমন করিয়া সবে মাত্র 'খড়কে ভক্ষণ' কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, এমন সময় জমিদারের ভোজপুরী দরোয়ান গিয়া উপস্থিত—"আপ্‌কো যানে হোগা!"

হঠাৎ জমিদারের এই জরুরী তলবে পদ্মনাভ ঠাকুরের প্রাণ চমকাইয়া উঠিল—বলিলেন "খবর ভাল তো সব—দরোয়ানজী!" দরোয়ানজী কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ভালা কি বুরা হাম কেয়া জানে—যানে কো সাব মালুম হোগা!"

দ্বারবানের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে পদ্মনাভ বুঝিলেন, ব্যাপার সুবিধার নয়। তিনি সত্যশরণকে ডাকিয়া সব বলিলেন। সত্যশরণ অনুমানে কতকটা বুঝিতে পারিলেও, তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিল—"কেন ডাকচেন, একবার শুনে আসুন..না হয় আপনি থাকুন, আমি শুনে আসিগে।"

পদ্মনাভ জমিদারকে চিনিতেন; সুতরাং নিজে না গিয়া বকলমে কাজ সারিতে ভয় পাইলেন,—বলিলেন "না—না, তা করে কাজ নেই,—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমিই যাই, তুমি না হয় আমার সঙ্গে এস।"

"তাই চলুন" বলিয়া সত্যশরণ পদ্মনাভের সহগামী হইল।

তাঁহারা গিয়া দেখিলেন জমিদারবাবু একমনে ঘনঘন গড়গড়ার নল টানিতেছেন। তাঁহার মুখখানা তখন উষ্মা-ভরা ধূমায়মান ইট পাঁজার মত গম্ভীর দেখাইতেছিল। দেখিয়াই পদ্মনাভ বুঝিলেন ব্যাপার সঙ্গীন! তিনি একবার ব্যাকুল চোখে সত্যশরণের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—সত্যশরণ নির্ব্বিকার।

পদ্মনাভ গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জমিদার তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও তাঁহার দিকে না তাকাইয়া আপন মনে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। আধঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পদ্মনাভ বলিলেন—"আমায় ডেকেছিলেন ?"

"হুঁ" বলিয়া জমীদার পূর্ব্ববৎ নিবিষ্টমনে ধূমপানে রত রহিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছিল। এই অবস্থায় আরও প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল—কোন কথা নাই। পদ্মনাভ আবার বলিলেন—"কি জন্যে ডেকেছিলেন ?"

পদ্মনাভের দিকে না তাকাইয়াই ধূমপান করিতে করিতে জমীদার বলিলেন—"তোমার কালী-মন্দিরের পাশে আমি একটা কালী-মন্দির স্থাপন করবার ইচ্ছা করছি··· তোমার কি মত ?"

কথার মর্ম্মটা পদ্মনাভ বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল—"আজ্ঞে, মায়ের মন্দির থাক্‌তে আবার নূতন মন্দির স্থাপনের প্রয়োজন তো—;"

"প্রয়োজন আছে বৈ কি!—তোমার ও কালী তো আর আমাদের মত পাপিষ্ঠ নরাধমের পূজা গ্রহণ করেন না!"

পদ্মনাভ ভাবিলেন—জমীদার রহস্য করিতেছেন···তাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি···পাপিষ্ঠ ?—নরাধম ?··· ছিঃ ছিঃ একথা বলবেন না!"

"আমি পাপিষ্ঠ—নরাধমই ত!···তা নইলে আমার পূজা ফিরে আসে ?"

পদ্মনাভ হতভম্ব হইয়া বলিলেন—"এঁ্যা··আপনার পূজো ফিরে এসেছে!···(সত্যশরণের দিকে চাহিয়া) এসব কি সত্যশরণ ?"

সত্যশরণ এতক্ষণ জমিদারবাবুর অগোচরে দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং সত্যশরণের নামোল্লেখে জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যশরণটা আবার কে ?"

"আজ্ঞে, আমার পূজারী।"

"তোমার পূজারী ?···সেই তাহলে আমার পূজো ফিরিয়ে দিয়েছে ?.. কৈ সে ?"

সত্যশরণ নির্ভীকভাবে আসিয়া জমিদারের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সেই শুচি সৌম্য তরুণ বদনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যে নবীন দন্তের মত দুরন্ত জমীদারও ক্ষণেকের জন্য কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার পূজো ফিরিয়ে দিয়েছিলে ?"

সত্যশরণ নির্ব্বিকার চিত্তে স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল—"হাঁ···আমিই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।"

"জান, তুমি পূজো ফিরিয়ে দিয়ে কার অপমান করেছিলে ?"

"সে পূজার সামগ্রী অশুচি বলেই আমি তা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছি·· কারুর অপমান করতে নয়।"

জমীদার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অশুচি ?' ধীর স্থিরকণ্ঠে সত্যশরণ বলিল—"হাঁ, অশুচি বৈকি!··· আপনি য' মানস করে পূজা মানত করেছিলেন তাতে পূজার সামগ্রী অশুচি হয়েছিল!"

জমিদার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"ব্যাটা আমার ভারি পণ্ডিত দেখছি ·"

সত্যশরণ এইবার ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল—"আপনি কথাবার্ত্তায় অভদ্র নহেন—এই আমার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভ্রান্ত; সুতরাং আর এখানে থাকা আমার কর্ত্তব্য নহে"—এই বলিয়া সত্যশরণ সেস্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, জমিদার গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"বরজলাল!"

"হুজুর!" বলিয়া এক দ্বারবান উপস্থিত হইল। জমিদারের আদেশ হইল—"মরিচখানা মে ইস্‌কো লে যাও।" মরিচখানার অর্থ যে কুঠরিতে দুরন্ত প্রজাদের পূরিয়া লঙ্কার ধোঁয়ার সাহায্যে শায়েস্তা করা হয়।

৫

পদ্মনাভ সত্যশরণের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখপ্রকাশ ও তাহার হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কিছুতেই জমিদারবাবুর ক্রোধের শান্তি করিতে পারিলেন না। জমিদারবাবু জেদ ধরিয়াছেন—সত্যশরণ যদি তার উদ্ধত ব্যবহার ও উক্তির জন্য তাঁহার উঠানে দশ হাত মাপিয়া নাকে খত দেয় তবেই তাহার নিস্তার। পদ্মনাভ অনেক কাকুতি-মিনতি করায় দণ্ডের পরিমাণ দশ হাত হইতে এক হাতে নামিয়াছিল। কিন্তু সত্যশরণের প্রকৃত পরিচয় পদ্মনাভের তেমন জানা

ছিল না ; তাই তিনি ভাবিয়াছিলেন, মরিচথানার দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের আশায় হয় ত সত্যশরণ অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তিটুকু গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবে না। যে ব্যক্তি সত্যশরণের নিকট এই লঘুকৃত শাস্তির বার্ত্তা লইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাপ্‌রে! এক ফোঁটা বামুন ছোক্‌রাটার কি তেজ!···দুদিন জলগ্রহণ করেনি···তায় দিন দুবার লঙ্কার ধোঁয়া···তবু কি মনের বল!···বলে কি না—বোলো তোমার জমিদারবাবুকে···আমি বশিষ্ঠের জাত···মরবার ভয় রাখি না!"

অবশেষে মনে মনে একরূপ পরাজয় স্বীকার করিয়াই জমিদার বাবু সত্যশরণকে ছাড়িয়া দিলেন। মুক্তিদান কালে কেবল এইটুকু তাহাকে বলিয়া রাখিলেন—"ভেব না —তোমায় মুক্তি দিলুম!"

সত্যশরণ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না—বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। পদ্মনাভের বাড়ী গিয়া শুনিল—তিনি আর এক নূতন পূজারী নিযুক্ত করিয়াছেন। গ্রামের জমিদারের বিষচক্ষে যে পড়িয়াছে, তাহাকে আশ্রয় দিয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিতে তিনি রাজী নহেন!

পরদিন শুনা গেল কালীমন্দিরে সিঁদ দিয়া চোরে দেবী-প্রতিমার সমূহ অলঙ্কার চুরি করিয়াছে।

ইহার দুই দিন পরে জমিদার বাবুর অর্থ বলে এবং পুলিস প্রভুদের মাহাত্ম্যে সত্যশরণ বমালসহ ধরা পড়িয়া থানায় আনীত হইল। বিচারে চুরি সপ্রমাণ হইয়া গেল। বিচারক সত্যশরণকে যথারীতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দোষী না নির্দ্দোষ?" উত্তরে সত্যশরণ ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া বলিল—তিনি জানেন।

বিচারক সত্যশরণের তরুণ বয়স ও এই তাহার প্রথম অপরাধ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি মাত্র এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ করিলেন।

কারাগারে যাইবার পূর্ব্বে সত্যশরণ একবার পদ্মনাভের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সময় জমীদার বাবুর বাটীতে স্বস্ত্যয়নের জন্য দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকায় দেখা করিতে পারেন নাই।

*　　*　　*　　*

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কাহারও পক্ষে যেন কত যুগ; আবার কাহারও পক্ষে যেন সেদিনকার কথা! সত্যশরণ জেল হইতে খালাস হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মাণিকপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কালীমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিতেছিল। সত্যশরণের স্থির বিশ্বাস ছিল যে—মন্দিরে সে নূতন বিগ্রহ দেখিবে···কেন না, যে বিগ্রহের পূজা সে করিত সে বিগ্রহ যে—মায়ের প্রাণ যেমন সন্তানের অকারণ লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইয়া গোপনে পরতে পরতে ফাটিয়া যায়—তেমনি নিশ্চয়ই ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মন্দির সম্মুখে আসিয়া সত্যশরণ দেখিল—তাহার ধারণা ভুল! যে প্রতিমার পূজা করিতে করিতে সে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলিত, যে প্রতিমাকে সে কোন দিন পাথরে-গড়া ভাবিতে পারে নাই, ভাবিতে গেলে নিজেকে বড় নিরাশ্রয় মনে হইত—সে প্রতিমা তো তেমনি রহিয়াছে···মানুষের বুকের ব্যথা স্বার্থের পাষাণ-ভিত্তি ভেদ করিয়া হৃদয়ান্তরে না পৌঁছিতে পারে, কিন্তু ভক্তের ব্যথা যে দেবতার বুকে গিয়া লাগে নাই—এই দৃশ্যে চোখের জলে সত্যশরণের বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল মন্দির-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ও! তুই তাহলে দেবী নস্···মানুষের হাতে-গড়া পাষাণের স্তূপ!···তাই তোরও মানুষের মত ব্যাভার······হা—হা—হা···" সহসা সেই ভগ্নকণ্ঠে বাতুলের অট্টহাস ফুটিয়া উঠিল। সত্যশরণ ঝড়ের মত কোথায় উধাও হইয়া গেল।

পরিচিতদের মধ্যে কে একজন বলিল—"সত্যশরণ না?"

"সেই রকম তো মনে হ'ল...দেখচি পাগল হয়ে গেছে—"

"তা হবারই ত কথা···দেবতার জিনিস চুরি করা কি যে-সে পাপ!"

পারসীকগণের গায়ত্রী

(অহুন-বইর্য্য)

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

বিধিনিষেধাত্মক পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থরাজিকে সমাশ্রয় করিয়াই জগতের যাবতীয় মহৎ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই শাস্ত্রগ্রন্থরাজি পুনরায় নিগূঢ়ার্থময় ও পবিত্রতর কতিপয় মন্ত্রের মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত। আবার এই মন্ত্রসমষ্টির কেন্দ্রস্থলে উহাদিগের মূলস্বরূপ একটি করিয়া নিগূঢ়তমতত্ত্বসম্পন্ন পবিত্রতম মন্ত্র প্রায় সকল ধর্ম্মেই বর্ত্তমান। ইহাই ধর্ম্মের প্রাণ—গায়ত্রী। উদাহরণ স্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈদিকী গায়ত্রী, খৃষ্ট-ধর্ম্মের **Paternoster**, ইস্‌লাম-ধর্ম্মের "বিস্‌মিল্লা অর্‌-রহ্‌মন উর্‌-রহিম" ইত্যাদি ও প্রাচীন পারস্যধর্ম্মের "অহুন বইর্য্যে"র নাম করিতে পারা যায়।

হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট হিন্দুর গায়ত্রী (বৈদিকী) সাধারণ সূর্য্যস্তুতি বলিয়া বোধ হইলেও, ভক্তিমান্ হিন্দুর (বিশেষতঃ দ্বিজাতির) নিকট যেমন ইহা সার ধন বলিয়া বিবেচিত হয়, জরথুষ্ট্রমতাবলম্বী ব্যতীত অপরাপর জাতির চক্ষুতে "অহুন বইর্য্য" সেইরূপ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যহীন (এমন কি কোন' কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রলাপ) বলিয়া বিবেচিত হইলেও, প্রত্যেক স্বধর্ম্মানুরাগী পারসীকের নিকট ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে পুণ্যশ্লোক জরথুষ্ট্রের উপদেশের সার মর্ম্ম এই মন্ত্রটির মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়; এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞ ধীমান্ অনুমান করেন যে, মন্ত্রটি উক্ত মহাপুরুষেরই রচনা।

ছন্দঃ ও স্বর অবিকৃত রাখিয়া শাস্ত্রীয় পাঠপদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রটির যথাযথ আবৃত্তি করিলে উচ্চ স্তরে (higher plane) যে "অপূর্ব্ব" (subtle effect) সমুৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাত্ম-ক্রিয়াকুশল থিয়সফিষ্টগণ তাহার প্রকৃত বিচারে সমর্থ। এ স্থলে কেবল সামান্যতঃ উহার অর্থ লইয়া আলোচনা করা

যাইবে। তবে ভূমিকা স্বরূপ এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, মন্ত্রটির অর্থ সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাবিধি উহার আবৃত্তি করিলে, সমগ্র অবেস্তা গ্রন্থ পাঠের ফললাভ হইয়া থাকে। অমূলক বাক্য বলিয়া কেহ যেন এই চিরপ্রচলিত জনশ্রুতিকে অবজ্ঞা না করেন। জরথুষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম ইহার অন্তরে নিহিত আছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহার পাঠে সমগ্র অবেস্তাপারায়ণের ফল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই জন্তই ইরাণীয়গণের যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্যে "অহুন বইর্য্য" আবৃত্তি করিবার বিধান। ইহা যে কেবল ইরাণীয়গণের গায়ত্রী স্বরূপ, তাহা নহে; ইরাণীয় মুমূর্ষুর পক্ষে ইহা তারক-ব্রহ্ম নাম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ও শ্রাদ্ধকালে ইহার বহুবার আবৃত্তি আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহলোকে ও পরলোকে এই মন্ত্রটিই ইরাণীয়গণের প্রধানতম অবলম্বন—শান্তির দ্বার। তাই বলা হইয়াছে—"অহুনেম্‌-বইরীম্‌ তনুম্‌ পাইতি,"—অহুন বইর্য্য তনুকে (আত্মাকে) রক্ষা করে।

কিংবদন্তী এই যে, জরথুষ্ট্র স্বয়ংই মন্ত্রটির রচয়িতা বা দ্রষ্টা। তাহার পর হইতে দেবতাগণ উহা তাঁহাদিগের প্রধান অস্ত্র-রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। নরাধিপ "প্রওষে"র ইহা প্রধানতম অবলম্বন।

তিন পাদে ও ত্রি-সপ্ত পদে মন্ত্রটি রচিত। শুনা যায় যে, প্রাচীন অবেস্তা গ্রন্থও একবিংশতি "নস্‌ক" বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আলেক্‌জাণ্ডার কর্ত্তৃক পারসিপোলিস্‌-নগরী-দগ্ধ হইয়া উহা বিনষ্ট হয়। (১) অনেকে অনুমান করেন যে, অহুন বইর্য্যের প্রত্যেক পদটি অবেস্তার প্রত্যেক নস্‌কের প্রতিরূপ মাত্র।

মন্ত্রটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এই স্থলে কিছু বলা আবশ্যক। নানা মুনির নানা মত চির দিনই লোকপ্রসিদ্ধ। অতএব মন্ত্রটির বিভিন্ন অনুবাদ, ভাষ্য, ব্যাখ্যা, টীকা ও টিপ্পনী প্রভৃতি যে সর্ব্বসাকল্যে ত্রিশটিরও অধিক হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী ইহাকে দুর্ব্বোধ, অসংলগ্ন ও অর্থহীন বলিয়া স্পষ্টবাদিতা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ সৎসাহস সকলের নাই বলিয়া মন্ত্রটির যথাসম্ভব সরল ও সংলগ্ন ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মদীয় অবেস্তা-শিক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক, মাননীয় ডাক্তার ইরাক্‌ জেহাঙ্গীর সোরাব্‌জী তারাপোরওয়ালা মহোদয় আমাকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারেই নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটি লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। মন্ত্রটি মোটেই দুর্ব্বোধ বা অসংলগ্ন নহে; পক্ষান্তরে উহা অতি সরল অথচ গভীরতম সত্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া মন্ত্রটির আলোচনা এখানে সম্ভব হইবে না। তবে আনুষঙ্গিক ভাবে যেটুকু না বলিলে নয়, তাহাই মাত্র বলা যাইবে।

ঋক্‌টি (২) তিন পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে আটটি, দ্বিতীয়ে ছয়টি ও তৃতীয়ে সাতটি পদ—সর্ব্বশুদ্ধ একবিংশতিটি। ছন্দঃ, গায়ত্রী। মন্ত্রটির প্রত্যেক পাদে গড়ে গায়ত্রীর দুইটি পাদ। মোটের উপর মন্ত্রটি দুইটি আর্ষী গায়ত্রী ঋকের সমান।

প্রথম পাদ (৩)—

যথা অহু বইর্য্যো॥ অথা রতুশ্‌ অষাৎ-চিৎ হচা॥,

[যথা—যেমন, যথা; অহু—অহু, গাথায় দীর্ঘ, অসু—পৃথিবীর অধিপতি; বইর্য্যো—√বৃ—বরণ করা, সর্ব্বশক্তিমান্‌ (যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ); অথা—তথা, তেমন; রতুশ্‌—ঋষি; অষাৎ—ঋতাৎ, ধর্ম্মহেতু; চিৎ—নিশ্চয়ই; হচা—সচা, সহ;]

যেমন নরপতি (এই পৃথিবীতে) সর্ব্বশক্তিমান্‌, তেমনি ঋষিও (ইহলোকে ও পরলোকে) ঋতপ্রভাব বশতঃ নিশ্চয়ই (সর্ব্বশক্তিমান্‌);

দ্বিতীয় পাদ—

বঙ্‌হেউশ্‌ দজ্‌দা মনঙ্‌হো॥

শ্‌ওথননাম্‌ অঙ্‌হেউশ্‌ মজ্‌দাই॥,

(১) এই জন্ত ইরাণীয়গণের নিকট Alexander he Great Alexander the Damned বলিয়া পরিচিত।

(২) আশা করি, এ নাম দেওয়াতে হিন্দু সম্প্রদায়ের কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। মহর্ষি জৈমিনির মতে তাহাই ঋক্‌, যেখানে অর্থবশে পাদ-ব্যবস্থা। এখানেও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটিয়াছে।—লেখক

(৩) অবেস্তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ বাঙ্‌লা বর্ণমালা দ্বারা দেখান সম্ভব নহে। অনুসন্ধিৎসুগণ Selections from Avesta and Old Persian (P. 152) দেখিতে পারেন। এখানে যতদূর সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণ দেওয়া গেল।

[বঙ্‌হেউশ্‌—বসোঃ, সৎ; দজ্‌দা—(বৈদিক) দত্তা, দত্তানি, দানানি, দানসমূহ; মনঙ্‌হো— মনসঃ, মনের;— বঙ্‌হেউশ্‌ মনঙ্‌হো—এখানে অবেস্তা-ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সমাস হইয়াছে—সদন্তঃকরণের; শ্যওথননাঁম্‌— √শ্যু—√চ্যু—(বৈদিক) চ্যৌতনানাম্‌(৪), কর্ম্মকারিগণের; অঙ্‌হেউশ্‌—অসোঃ, প্রাণের জীবিতগণের, প্রাণিরাজ্যের; মজ্‌দাই-মজ্‌দায়, মেধসে (Geldner)—প্রভুর নিমিত্ত;] ভূতনাথের (প্রজাপতির) নিমিত্ত যাঁহারা কর্ম্ম করেন, সদন্তঃকরণের দানসমূহ তাঁহাদেরই নিমিত্ত (রক্ষিত থাকে); অর্থাৎ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সদন্তঃকরণের দান পাইবার অধিকারী, অর্থাৎ তাঁহাদেরও চিত্ত পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে;

তৃতীয় পাদ—

ক্ষথ্রেম্‌-চা অহুরাই আ॥ যীম্‌ দ্রিগুব্যো দদৎ বাস্তারেম্‌॥ [ক্ষথ্রেম্‌—ক্ষত্রম, বীর্য্য,বল; চা—চ, গাথায় দীর্ঘ, এবং; অহুরাই—অসুরায়, অসুরস্য, ষষ্ঠী স্থলে চতুর্থী, অসুরের; যীম্‌—যম্‌, যাহাকে; দ্রিগুব্যো—দরিদ্রেভ্যঃ, দরিদ্রগণকে; দদৎ - অদদাৎ, দিয়া থাকেন,—অতীত কালের অর্থ ইহাতে নাই; বাস্তারেম্‌—সাহায্য।]

এবং অসুরের (পরমেশ্বরের) বল তাঁহারই জন্য, যিনি দরিদ্রকে সাহায্য দান করেন।

এই স্থলে "অসুর" (অহুর) শব্দটি লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। বৈদিক সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরুণ, সবিতা, ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সকলেই "অসুর" বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন। মৈত্রায়ণী সংহিতায় "অহুর" শব্দটিরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার অসুর শব্দের বহুবিধ ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন; তন্মধ্যে— অসুর (অসু র)=প্রাণদাতা—এই সমাধানই সর্ব্বাপেক্ষা সরল। ন+সুর=অসুর (দেব নহে—দৈত্য)—এ ব্যুৎপত্তি প্রাচীন বৈদিকী সংহিতায় পাওয়া যায় না। এখন কিন্তু এই শেষোক্ত অর্থই সাধারণের পরিজ্ঞাত। ইরাণীয় "অহুর" শব্দ বৈদিক "অসুর" শব্দের প্রতিরূপ মাত্র।

"রতু" ও "অষ" শব্দও সম্পূর্ণ নূতন। রতু বলিতে বুঝায় জ্ঞানী, নব নব দ্রব্যের আবিষ্কর্ত্তা, দ্রষ্টা বা সংস্কৃত পর্য্যায়ের ঋষি। ইনি অন্তর্জগতের প্রভু—অধ্যাত্ম-জগতে শক্তিমান্‌। আর "অহু" ঠিক ইহার বিপরীত—বহির্জগতের প্রভু—নরপতি। জরথুষ্ট্র স্বয়ং একাধারে রতু ও অহু— রাজর্ষি। উভয় জগতেই তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি রাজবংশীয়; অতএব অহুত্বে তাঁহার জন্মগত অধিকারও বিদ্যমান।

রতু ও অহুগণের মধ্যে রতুই সমধিক প্রভাবান্বিত। ইহার কারণ তাঁহার "অষ" বা "ঋত"। ভাষা-তত্ত্বের নিয়মাবলী অনুসারে অষ ও ঋত সমপর্য্যায়ভুক্ত। "ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটুকু সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। কবিবর Tennysonএর ভাষায় বলিতে গেলে—

"One God, one Law, one Element,
And one far-off Divine Event,
To which the whole Creation moves"
(In Memorium)

—ইহাই "অষ"। এই অষকে পরের যুগে আমরা দেবতা যোনিরূপে পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাই। অহুর মজ্‌দের ছয়জন প্রধান পার্শ্বচর-পার্শ্বচরী (৫)। ইঁহাদিগের সাধারণ নাম —"অমেষা স্পেন্‌তা" (পবিত্র অমরগণ)। ইঁহাদিগের অন্যতম "অষ-বহিশ্‌ত"—এই ঋতের রূপান্তর এবং স্বর্গস্থ অগ্নির অধিপতি। "বোহু-মনো" পশুগণের অধিপতি। "ক্ষথ্র-বইর্য্য"—ধাতুগণের অধিপতি। ইঁহারা তিনজনই পুরুষ, এবং যথাক্রমে উক্ত মন্ত্রটির পাদত্রয়ে উল্লিখিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর তিনজন স্ত্রী দেবতা আছেন;—"স্পেন্‌ত আর্‌-মইতি"—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও অষের সহ-যোগিনী। অপর দুইজন যমজ ভগিনী- "হউর্ব্বতাৎ" ও "অমেরেততাৎ" (অমৃততাৎ)—যথাক্রমে জল ও উদ্ভিদ্‌ জগতের অধিষ্ঠাত্রী। এই ছয়জনই প্রধান। এতদ্ব্যতীত নরাধিপ "স্রওষ"ও অহুরমজ্‌দের খুব প্রিয়। তিনি ভক্তির দেবতা। মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাঁহারই অধিকারে আইসে। "অষি" (আশীঃ)—একজন অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীদেবতা, অহুরের নিরতিশয়

(৪) ঋ. বে. সং.—১০।৫০।৪

(৫) প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা তাঁহার এক একটি aspectএর personification মাত্র—অনেকটা archangelগণের অনুরূপ।

প্রীতিভাজন। পরের যুগে ইনি সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী "শ্রী" বা "লক্ষ্মী" রূপে পরিণত হইয়াছেন। আর অহুর মজ্‌দের পুত্র হইতেছেন "আতর্"—স্বর্গীয় অগ্নি স্বয়ং। ইহাই হইল অহুরমজ্‌দ ও তদীয় ব্যূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রথম পাদে এই অষের কথা বলা হইয়াছে। অষের প্রভাবে রতু পরলোককে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন। অতএব ইহলোকের অধিপতি অপেক্ষা তিনি শতগুণে অধিক শক্তিমান্। সকল দেশেই ঋষির মহত্ত্ব একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। অষই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঐশী ইচ্ছা অনুসারে যে রতু চালিত হইয়া থাকেন, তিনি সকল অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত—ধর্ম্মশক্তিতে শক্তিমান্। তুচ্ছ পার্থিব শক্তি তাঁহার নিকট পরাজিত। ইহাই প্রথম পাদের সারমর্ম্ম।

দ্বিতীয় পাদে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সদন্তঃকরণের দান সমূহ তাঁহারাই প্রাপ্ত হ'ন। অর্থাৎ যাঁহারা সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া মানবজাতিকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যান, তাঁহারাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম করেন; এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ মার্জ্জিত হইতে মার্জ্জিততর, এবং ধীশক্তি পরিস্ফুট হইতে পরিস্ফুটতর হইতে থাকে। জ্ঞানের আলোকে তাঁহাদিগের চিত্ত উদ্ভাসিত হয়। তাঁহারা স্বয়ং যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, মানবজাতিকে উন্নত করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি ততই তাঁহাদিগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে "শ্যওথন" শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ইরাণীয় জাতি কর্ম্মমার্গের সাধক ছিলেন। যখন কোন পারসীক তাঁহার মেখলা (যজ্ঞোপবীত?) কটিদেশে বন্ধন করেন, তখন তাঁহাকে দুইবার 'অহুন বইর্য্য' আবৃত্তি করিতে হয়, এবং সম্মুখের গ্রন্থিদ্বয় "শ্যওথননাম" বলিয়া বন্ধন করিতে হয়—যেন তিনি কর্ম্ম করিবার জন্যই কোমর বাঁধিতেছেন। প্রকৃতির সহিত পুরুষের (জীবের) যে অবিশ্রান্ত সংঘর্ষ অহোরাত্র চলিতেছে, অবেস্তার দার্শনিক অংশে তাহারই রহস্য উন্মুক্ত হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক নরনারী এই সংঘর্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ; কিন্তু সকলে তাহার বিষয় অবগত নহে। অষের বিধানানুসারে ইরাণের প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ আপনাকে সদা সর্ব্বদা এই অনাদি অনন্ত মহাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত বলিয়া মনে করেন। বৈদান্তিকের মোক্ষ তাঁহাদিগের প্রার্থনীয় নহে; সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়:" ইহাই তাঁহাদিগের মূলমন্ত্র—ইহাই অষ। যাঁহারা এই বিধানের অনুকূলে যোগ দেন, জ্ঞানের আলোকে তাঁহাদিগের চিত্ত উদ্ভাসিত ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া থাকে; ক্রমে মোক্ষ নিকটবর্ত্তী হয়।

আদিযুগে অষের প্রাধান্যই সর্ব্বসম্মত ছিল, পরের যুগে (খুব সম্ভব অবেস্তা পুনর্লিপিবদ্ধ হইবার সময়ে) বোহুমনো তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। চিত্তগুহায় জ্ঞানের দীপ জ্বালিবার অধিকার বোহুমনোর। সুতরাং বোহুমনোকে জ্ঞানাধিষ্ঠাতা বলিয়া ধরিলে, অষকে ভক্তির অধিষ্ঠাতা বলা চলে। আর ক্ষথ্র হইলেন কর্ম্মাধিপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রটির মধ্যে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমুচ্চয় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় পাদে বলা হইয়াছে যে, দরিদ্রকে যিনি সাহায্য করেন, অহুরমজ্‌দের বীর্য্য তাঁহাকে বলান্বিত করে। দরিদ্র বলিতে শুধু অর্থহীন নহে। যীশু যাহাকে Poor (in spirit) বলিয়াছেন, এ সেইরূপ দরিদ্র। এ দরিদ্রের উন্নতির জন্য যে মহাপ্রাণ সর্ব্বদা চেষ্টিত, একাধারে জ্ঞান ও ঐশী শক্তি তিনি লাভ করেন।

ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম,—অচ্যুত, শঙ্কর, পদ্মযোনি,—অষ, বোহুমনো, ক্ষথ্র—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এ তিনের (Trinity) অপূর্ব্ব সমন্বয় এ মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিগুণের আধার, গুণাতীত অহুরমজ্‌দের বিধানের কথাও ইহাতে উল্লিখিত রহিয়াছে। দরিদ্রকে সাহায্য দান—অমরাভূমিতেও যে গুণের শতমুখে প্রশংসা—সেই স্বর্গীয় গুণের প্রশংসা ইহাতে বর্ত্তমান। বস্তুতঃ মহাপ্রাণ জরথুস্ত্রের উপদেশের সারমর্ম্ম ইহাতেই নিহিত আছে। এখন বুঝুন, পাঠক, এই মন্ত্রের সকৃদুচ্চারণে সমগ্র অবেস্তা-পারায়ণের ফললাভ হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায়, হর্ষে বিমর্ষে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ পারসীক আজিও এই মন্ত্রপাঠে অন্তরে অন্তরে শান্তির বিমল আনন্দ অনুভব করেন। বৈদেশিক পণ্ডিত-

মণ্ডলী ইহার সরল অথচ গভীর সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই মন্ত্রটিকে কদর্থিত করিতেছেন। এ মোহ হইতে পারসীকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিলে তাঁহাদিগের অদৃষ্টে কি আছে কে বলিবে?

একটি কথা! পারসীকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপর বর্ণ নাই। সুতরাং এ গায়ত্রী পাঠে পারসীক মাত্রেরই অধিকার। পারসীক গায়ত্রীর ইহাই বৈশিষ্ট্য।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

রক্তকরবী

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ

এই যে ফুল্ল-রক্ত-কুসুমের সম্ভার-সমন্বিত অপূর্ব্ব-সুন্দর সমৃদ্ধ রক্তকরবী বৃক্ষটী আমরা দেখিতেছি—ইহা একেবারে শূন্য আকাশ হইতে সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ উদার উদ্যানে সন্ধান করিলে নানা স্থানে ইহার বীজাঙ্কুর পাওয়া যাইবে। গ্রন্থের প্রারম্ভ-পৃষ্ঠার শিরোভাগেই দৃষ্ট হইতেছে—'এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে।'—পড়িলেই তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে রবিবাবুর 'রাজা' নাটক-খানির রাজার সেই প্রহেলিকাময় অন্ধকারের আবরণের আড়াল—তাঁহার সেই সঙ্গোপনে বাস—যাহাতে রাণী পর্য্যন্ত রাজার মূর্ত্তিখানি দর্শন করিতে পারেন না। * 'রাজা' ও 'রক্তকরবী'র সাদৃশ্য এইখানেই শেষ। এ রাজা একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার রাজা; সে রাজা শুধু সনাতন সত্যের রাজা নয়—স্বয়ং সত্য-স্বরূপ। আবার এক হিসাবে বলিতে পারি—'অচলায়তন' নাটকখানির একটী বৃহত্তর, উন্নততর, গভীরতর এবং মার্জ্জিততর সংস্করণ এই 'রক্তকরবী'। সেখানকার অচলায়তন বড় হইয়া এখানকার যক্ষপুরী হইয়াছে। সেখানে ছিল রক্ষণশীল হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রস্তরীভূত কাঠামখানি—অবশ্য কবির কল্পনায় যেরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল—আর এখানে জড়-ধর্ম্মী মানব-সংসার, অর্থাৎ এই বিশাল পার্থিব প্রতিষ্ঠান। এই ক্ষুদ্র বৃহতের পার্থক্য বাদ দিলে, দুইখানি নাটকের বহিরঙ্গ-সংস্থান একই কল্পনা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

রবিবাবুর একটী গল্প আছে—তাহার নাম—'একটা আষাঢ়ে গল্প'। তাহাতে হিন্দু-সমাজকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কৃত্রিম অপরিবর্ত্তনীয় নির্দ্দিষ্ট বিধি-বিধানের যে জটিল জালের বর্ণনা আছে, এবং সেই জালের যে পরিণাম প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা, আর এই রক্তকরবীর জটিল জাল, একই কল্পনার সুতায় গাঁথা এবং সেই সুতাও একই উপাদানের। কবির একটী কবিতা আছে—নাম 'মন্দির'। মন্দিরটীর মধ্যে বায়ু ও আলো প্রবেশের পথ নাই বলিলেই হয়। ঘোর অন্ধকার। এক ব্যক্তি সেই মন্দিরে অন্ধকারে দেবারাধনা করে—কিন্তু দেবতার দেখা পায় না। একদিন বজ্রাঘাতে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। লোকটীর প্রাণ রক্ষা হইল। সে দেখিল, যাহার প্রতীক্ষা করিয়া সে বদ্ধ অন্ধকারে বসিয়া ছিল, সে আকাশে বাতাসে আলোকে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। ঐ মন্দির আর এই যক্ষপুরী অনেকটা এক প্রকারের ইট-পাথরেই নির্ম্মিত। আর একটী কবিতা আছে—নাম 'শীতে ও বসন্তে'। তাহাতে অতি সুন্দর রঙ্গ-ভরে বর্ণনা করা হইয়াছে—বসন্তের চঞ্চল মধুর হাওয়া আসিয়া কবির সারা বৎসরের সঞ্চয় উড়াইয়া লইয়া গেল; এবং কবির চিত্তখানিও আকাশের মধ্যে ছড়াইয়া দিল। ফল কথা, যে সমস্ত কল্পনার রঙে রক্ত-করবী রঞ্জিত, তাহা কবির শিল্প-শালার সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—তবুও এই রক্ত-করবী নামক নাটকখানি এক অতি অ-পূর্ব্ব অভিনব মনোরম বস্তু। ইতিমধ্যে জ্ঞানিগণ, পণ্ডিতগণ, সাহিত্যের সমজদারগণ ইহার অনেক সমালোচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি খুব সাধারণ ও সহজ ভাবে বুঝিবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব। যদি ভুল বুঝি, তবে জ্ঞানিগণ কৃপা করিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন, এই ভরসা।

এই গ্রন্থখানি একখানি রূপক-নাটক। রূপকটা মুখ্য—নাটকটা গৌণ। কিন্তু গৌণ হইলেও নাটকই। কারণ ইহাতে অবস্থা পরিবেশের মধ্যে জীবনের ব্যাপার এবং প্রাণের ক্রিয়া এবং ইহাদের পারস্পরিক প্রভাব-পরিবর্ত্তনাদি সাক্ষাৎভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। জীবনের ও প্রাণের যতখানি ইহাতে আসিয়াছে-তাহা সত্যই; তত্ত্ব-বিশ্লেষণের শুষ্ক উদাহরণ মাত্র নহে। রূপকটী পরিত্যাগ করিয়া শুধু নাটকখানি বুঝিতে চেষ্টা করিলে পদে পদেই সম্মুখে একএকটী প্রহেলিকা বা ব্যাসকূট আসিয়া উপস্থিত হইবে—যাহা পাঠকের জ্ঞান-বিক্ষেপ ঘটাইবে এবং রসানুভবের বাধা উৎপাদন করিবে। কিন্তু

---

* 'রাজা' নাটকখানি পড়িলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হইবে—গ্রীক পুরাণের সেই Cupid and Psycheএর মনোহর উপাখ্যানটী।

রূপকের ভাব-সমন্বয়ে পড়িতে গেলে গ্রন্থখানি এক দিকে যেমন অপরিসীম আনন্দ দান করিবে, অন্য দিকে তেমনি চিত্তে অশেষ জ্ঞানও স্ফুরিত করিয়া তুলিবে। জীবনের গতি-বিধি ও ক্রিয়া-কলাপের আবরণে প্রত্যক্ষ ভাবে তত্ত্ব প্রকাশ করার নামই রূপক। যাহা আবরণ সুতরাং অপ্রধান—তাহাকেই প্রধান-রূপে বর্ণনা করা হয়। অথচ এমন ভাবে, যেন তাহাদের কথায় কথায় প্রতিপাদ্য যে তত্ত্ব, তাহার ইঙ্গিত অনিবার্য্য-রূপে আসিয়া পড়ে। রক্তকরবীর সর্ব্বত্রই এই প্রকার রচনার আদর্শ পরিলক্ষিত হইবে।

রক্ত-করবীতে দুইটী তত্ত্বের সংঘর্ষ এবং সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। একটী স্বর্ণ-বর্ণ, একটী রক্ত-বর্ণ। একটী সুবর্ণের রাশি, একটী রাগময়ী রক্তকরবী। কামিনী-কাঞ্চন কথাটীর কামিনী শব্দের প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থ ছাড়িয়া দিয়া, বৈষ্ণব-দর্শনের এবং মহাকবি গেটের অর্থটী গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব-দর্শনে কামিনী মানে ভগবৎ-প্রেমময়ী। কারণ 'প্রেমৈব গোপ-রামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং'। কাজেই প্রেমময়ী গোপ-রমণীরা সকলেই কৃষ্ণ-কামিনী। গেটে বলিয়াছেন—

> The eternal womanly
> Draws us above.* (Faust)

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে এক অনাদি কামিনী আছে, সে মানুষকে বৈকুণ্ঠের দিকে লইয়া যায়।

এই অর্থ—ইহাই প্রকৃত অর্থ—ধরিয়া বলিতে পারি, রক্তকরবীতে কাঞ্চনের সহিত কামিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই নাটকের রক্তকরবী এক প্রকার লাল রঙের ফুল, আর ইহা নন্দিনীর আদরের নাম। নন্দিনী এই নাটকের নায়িকা। এখানে রক্তকরবীকে একটী নিদর্শন রূপে—একটী অভিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। একটী Symbol—ইহা কিসের নিদর্শন? গ্রন্থে তাহা পরিষ্কার রূপেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নন্দিনী বলিতেছে—'আমার রঞ্জনের ভালবাসার রং রাঙা, সেই রং গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।' রক্তকরবী বুকের রঙের ফুল—প্রাণের ভালবাসা—অনুরাগ—প্রেম। লাল ফুল অনেকই আছে—রক্তজবা, রঙ্গন, অশোক, পলাশ, সন্ধ্যামণি, দুপুরচণ্ডী। রক্তকরবী নামটী বাছিয়া লইবার কারণ কি? রক্তকরবীতে অতি-পরিচয়ের মলিনতা নাই। যে সমস্ত লাল ফুলের নাম করিলাম, তাহাদের মধ্যে রক্তকরবীই সবচেয়ে সুদৃশ্য। তৃতীয় কারণ—রক্তকরবীর নামের মধ্যে ঐ অর্থপূর্ণ 'রক্ত' কথাটী রহিয়াছে। তবে রক্তজবা বলিলেই হইত। না, রক্তজবা অতি পরিচিত এবং উহার ভাবানুষঙ্গ—association কবির এখানকার উদ্দেশ্যের বিরোধী।

সুতরাং রক্তকরবীই যোগ্যতম নাম হইয়াছে। শুধু এই নামটীতেই একটু কাল্পলৌকিকতা—একটু romance আসিয়া গিয়াছে। আরো একটী কথা। করবী(র) ফুলের একটী নাম হরিপ্রিয়—আবার লক্ষ্মীর নাম হরিপ্রিয়া। কাঞ্চন শব্দের মানে সোনা আর লক্ষণায় ধন—বিষয়-সম্পত্তি-সম্ভারবান্ অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা-সমাকুল সংসার। রাজা হইলেন এই সংসারের নায়ক।—ইহার শক্তি-রূপী—সংসারী। সংসার হয় বিষয় লইয়া। বিষয় পাঞ্চভৌতিক—জড়াত্মক। ইহা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য। বিষয়-ভোগে—বিষয়-অর্জ্জনে পরিতৃপ্তি নাই। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। ভোগের নেশা কখনো কখনো শুধু অর্জ্জনের নেশায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই নাটকের রাজা যে বিষয়ের অধিপতি তাহা শুধু সাধারণ ধনার্জ্জন এবং স্বাভাবিক সম্ভোগাদি নহে। ইহা এক অসাধারণ অস্বাভাবিক উদগ্র উন্মত্ত সংকল্প—অপরিমিত বিত্তার্জ্জনের জন্য। এই রাজার কাহিনী প'ড়িতে পড়িতে পাশ্চাত্য পুরাণজ্ঞগণের মনে পড়িবে—ফ্রিজিয়ার রাজা মিডাসের কথা। অগণিত ধনরত্ন রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াও যখন তার ধন-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না, তখন সে দেবতার কাছে বর মাগিল—যেন তাহার স্পর্শমাত্র সমস্তই সোনা হইয়া যায়। দেবতা তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন। রাজা প্রথমতঃ খুব এক চোট কাঠ-পাথর ছাই-মাটী সমস্তই ছুঁইয়া ছুঁইয়া সোনা করিয়া লইল। পিপাসায় জল পান করিবে, ছুঁইতেই জলটা সোনা হইয়া গেল। মহা বিপদ। পিপাসায় প্রাণ যায়। একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা, তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্রই সে একখানি প্রাণহীন সুবর্ণ-প্রতিমায় পরিণত হইয়া গেল। তীব্র বেদনায়—নিদারুণ নিরাশায় রাজার চৈতন্য হইল। বুঝিল—এ যে আত্ম-ঘাতী লোভ! তখন সে দেবতার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া কহিল—দেবতা, তোমার এ সর্ব্বনেশে বর ফিরাইয়া লও। এই নাটকের রাজাও সেই রাজারই বংশধর। এবং ইহারও সেই প্রকার কিছু ব্যাপারেই চৈতন্য হইবে।

কবি যখন এই যক্ষরাজ এবং তাহার যক্ষপুরীর কল্পনা করিতেছিলেন, তখন খুব সম্ভবতঃ তিনি ভারতবর্ষের কথা ভাবিতেছিলেন না। ভাবিতেছিলেন ইয়োরোপ আর আমেরিকার কথা। বিষয়-সম্পদ অর্জ্জনের জন্য ঐ সমস্ত দেশেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা, বিপুল ব্যস্ততা, বিশাল কর্ম্ম-চঞ্চলতা। ইহাই আধুনিক সভ্যতা। সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, সমস্তই এই ধনোন্মাদ। বর্ত্তমান সভ্যতা ধনোপার্জ্জনের জন্য অনন্তবিধ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। শত শত রেলগাড়ী, সহস্র সহস্র জাহাজ, লক্ষ লক্ষ ফাক্টরি, মিল, মেসিন, কল-কারখানা—অন্ত নাই। বিদ্যুৎবেগে দেশ-দেশান্তে সংবাদ চলিয়া যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়লার খনি, লৌহ-খনি, স্বর্ণ-খনি, রৌপ্যের আকার, হীরকের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে—এবং অহোরাত্র কর্ম্ম-ব্যাপৃত রহিয়াছে। শূন্যে জাহাজ চলিতেছে। ভূ-গর্ভে রেলগাড়ী চলিতেছে। বাণিজ্য সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। শত শত লক্ষেশ্বর ও কোটীশ্বরের উদ্ভব হইতেছে।

---

* অনুবাদ ঠিক কি না বুঝিবার জন্য মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, ইহা প্রায় অক্ষরানুবাদ। মূলে আছে—

> Das Ewig—weibliche
> Ziecht uns hinan.

Heard the heavens fill with shouting and there rained a ghastly dew
From the nations' airy navies grappling in the central blue.
—(Tennyson)

আকাশে অই প্রতিবিম্ব—শুধু প্রতিধ্বনি নয় এই বাণিজ্যের উন্মাদনার। ভোগবিলাসিতা একটা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। সহস্র সহস্র বিমান-স্পর্শী বিরাট-কায় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। মহল্লার পর মহল্লা উঠিতেছে। মঞ্জিলার উপর মঞ্জিলা উঠিতেছে। বিজ্ঞান সেবা-দাসীর মত সহস্র প্রকারে অবিশ্রান্ত মানুষের আরামের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য বৃহৎ পাহাড় কাটিয়া আনা হইতেছে। কত মর্ম্মর—কত রি-ইন্‌ফোর্‌ট্‌ কংক্রীট্। স্তূপে স্তূপে লৌহ ভীষণ-দর্শন অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে বিগলিত হইয়া প্রথমতঃ জ্বলন্ত দ্রবময় স্রোতোময় রূপ ধারণ করিয়া পরে নানা আকারে নানা প্রকার গৃহ নির্ম্মাণের উপাদান সামগ্রীতে পরিণামিত হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র আকাশ ভেদ করিয়া ধ্বনি উঠিতেছে—অর্থ! অর্থ!—ভোগ চাই! কাম চাই! সে ত পরের কথা। না হয় না হবে। কিন্তু অর্থ চাই-ই—স্বর্ণ চাই-ই। সোনার ঘরে বাস করিব। সোনার খাটে শুইব। সোনা খাইব। সোনা পরিব।

Every door is barr'd with gold, and opens but to Golden Keys—

ইহা ত তুচ্ছ কথা।

এই যে বিকট-বিষয়-লোক্ত-মত্ততা ইহা যাহার, যে ইহার আশ্রয়, সেই পাষাণ-চিত্ত বিত্ত-লোলুপ প্রেম-গন্ধ-হীন কামান্ধ মানবই এই নাটকের রাজা। ইহাই হইল এক তত্ত্ব এই নাটকের। এই তত্ত্ব এখানে কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে তাহা আমরা যথাসময়ে দেখিব। এই তত্ত্বকে নানা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে ইহা বিষয় এবং সংসার—বৈষয়িকতা ও সাংসারিকতা। পাঞ্চভৌতিক ভোগোপায় এবং ভোগোপাদান ইহার দেহ। আর কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌-রিপু ইহার আত্মা। বিষয়ী মানুষ ইহার আশ্রয়। অপর তত্ত্বটী কি, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে 'ভাব'-নামে অভিহিত করিতে পারি। ইহার ইংরাজী নাম Spirit—ব্যাপকার্থে। বিষয়—Matter; ভাব—Spirit। ইহার আর একটী বাংলা নাম (সংস্কৃত নহে) 'প্রাণ'। 'মনে ও প্রাণে' বলিতে প্রাণ-শব্দে আমরা এই ভাব-বৃত্তি বুঝি। যাহাকে Spirit বলিলাম তাহাকে বিশেষার্থে Feelingও বলিতে পারি। তখন ঐ ভাবকে বাংলায় বলিব 'রস'। শুদ্ধ যে Feeling বিষয়-স্পর্শ-হীন, তাহাকে বলা হয় Sentiment। সকল রসের প্রাণ-স্বরূপ একটী মূল রস আছে। যে আদি-রস কথাটার অর্থ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ইহা সেই আত্ত আদি রস। ইহার প্রকাশ আনন্দে। সাধারণতঃ ইহাকে 'প্রীতি' বলা হয়, ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের 'ভালবাসা'। ইহারি রূপ-ভেদ স্নেহ, আদর, সোহাগ। এই যে প্রীতি ইহা সৌন্দর্য্যের জননীও, আবার কন্যাও। যাহা সুন্দর তাহাই ভালবাসি। যাহা ভালবাসি, তাহাই সুন্দর হয়। এই প্রীতিই গুরুত্ব লাভ করিলে 'প্রেম' হয়, নর-নারী সম্পর্কে ইহার নাম 'অনুরাগ'। ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ে ইহা 'ভক্তি'। এই যে বস্তুটীর কথা বলিতেছি ইহাই কাব্যে এবং সাধারণ সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া সাহিত্যকে নানা রূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। ইহা সঙ্গীতের সঞ্জীবনী-শক্তি। ইহাই সকল শিল্প-রচনার মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া মনোরম ললিত রূপ-গুলিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। রস-স্বরূপ ভগবানের যে হ্লাদিনী শক্তি তাহাই এই সমস্তের মূলীভূত কারণ। এই হ্লাদিনী মূর্ত্তিমতী হইয়া গোলোকে ও গোকুলে শ্রীরাধা—ভাবময়ী—প্রেমময়ী—প্রীতিময়ী। হ্লাদিনী শব্দের মানে নন্দিনী বা আ-নন্দিনী। এই নন্দিনীই রক্তকরবী-নাটকের সর্ব্বময়ী নায়িকা। ইহার আদরের নাম রক্তকরবী। রক্ত মানে রাগযুক্ত। করবী মানে কুসুম। অর্থাৎ অনুরাগের কুসুম। সৌরভময়ী সৌন্দর্য্যময়ী অনুরাগ স্বরূপিনী আমাদের এই রক্তকরবী নাম্নী মানবী দেবীটী। এক রন্‌জ-ধাতু হইতেই রাগ, রক্ত ও রঞ্জন শব্দ তিনটী উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ এই 'রাগময়ী' 'রক্ত'-করবী নাম্নী রমণীটী 'রঞ্জন' হইতে ভিন্ন নহে,—'রঞ্জনেরই' আ-'নন্দিনী' শক্তি। কবি যাহাকে রঞ্জন বলিতেছেন, তাহাকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রেই 'নন্দ-নন্দন' নামে অভিহিত করা হয়। এই নন্দ-'নন্দনের' প্রেমময়ী প্রেয়সী যিনি তিনিই ত 'নন্দিনী'—অর্থাৎ আ-'নন্দিনী' রাধা।

গোবিন্দা নন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী।—চরিতামৃত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, নন্দিনী বলিতেছে—'আমার রঞ্জনের ভালবাসার রং রাঙা, সেই রং গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।' শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনায় বৈষ্ণব-শাস্ত্র বলিতেছেন—

কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রের কলেবর।

আর—কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।

রঞ্জনের নন্দিনী 'রক্ত করবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে।' আর রাধারাণী—'কৃষ্ণকে করায় সোমরস-মধু পান।' 'ভক্তি রসামৃত-সিন্ধু' শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে ৫০টী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একটী গুণ হইল—তিনি লোকানুরঞ্জন।—'রক্ত-লোকঃ। নন্দিনীর প্রিয়তম যিনি তাঁহার নাম রঞ্জন। ইনি সেই—'সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন।' 'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দং'—এ সেই রঞ্জন। নন্দিনী বলিতেছে—'ছুটি কি করে' মধুতে ভরে' তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড় সুন্দর।' শ্রীভগবান্

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন। (চরিতামৃত)

যাঁহার 'সুবিলাস হাসং' আননখানি

নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ। (ভাগবত)

নন্দিনীর প্রাণ রঞ্জনময়। সর্ব্বদাই নন্দিনীর মুখে রঞ্জনের কথা।

'রঞ্জনের কথা উঠ্‌লে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না।' সবাইকে সে জিজ্ঞাসা করে—'কই রঞ্জন ত এল না।' রঞ্জনের প্রতীক্ষায়—রঞ্জনের পথ পানে সর্ব্বদা সে চাহিয়া থাকে। রঞ্জনের চূড়ায় পরাইয়া দিবে বলিয়া সে নীল-কণ্ঠ পাখীর পালক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখে। রঞ্জনের জন্ম তারই রক্ত-করবীর মালা। সে বলে—'রঞ্জনের জয়-যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে।' রঞ্জনের গৌরবে সে নিজকে গৌরবান্বিতা মনে করে। এ দিকে পাইতেছি—

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

নন্দিনী সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছে—রক্তকরবীর মালা। রক্ত-করবী রঞ্জনের ভালবাসা। এ দিকে—

কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-অবতংস কানে,
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে।

আবার, রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ সুগন্ধি উদ্‌বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ।

নন্দিনী রঞ্জনের আগমনের জন্ম উৎকণ্ঠিতা। বৈষ্ণব কবি বর্ণনা করিতেছেন, শ্রীমতী কৃষ্ণ-বিরহে পাগলিনী-প্রায় হইয়া যার তার পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'তোমরা দেখেছ তারে ?—বল না লো সই !'

আবার, 'যাও সহচরী, জানিয়া আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে !'

বিশ্বের সকল প্রেম-ব্যাপারের মুখ্য লক্ষ্য যিনি, যিনি সকল প্রীতি-ভালবাসার নিত্য সত্য বাস্তবিক বিষয়—তিনি রঞ্জন। সকল প্রীতি-প্রেমের প্রাণ স্বরূপিনী যিনি তিনি নন্দিনী।—ভাবময়ী ও রাগময়ী ! তাহা হইলে এই দ্বিতীয় তত্ত্ব হইল—ভগবৎ-ভক্তি বা ভগবৎ-প্রেম। রঞ্জন ও নন্দিনী—প্রেমের বিষয় এবং প্রেমের আশ্রয়। এই তত্ত্বকে সংক্ষেপে 'ভাব' বলিব। এই ভাবের অন্তর্গত সকল সৌন্দর্য্য ও সকল আনন্দ। সৌন্দর্য্য রঞ্জন, আনন্দ নন্দিনী। আনন্দ ও প্রেম পরস্পর ভাবান্তরিক। সৌন্দর্য্য ব্যতীত মানব মনোরঞ্জন জগতে আর কিছু নাই। তাহা হইলে রক্তকরবী-নাটকের প্রতিপাদ্য হইল—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত ভাবের প্রতিকূল ও অনুকূল নানা প্রকার সম্বন্ধ। এই বিষয় তত্ত্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইল—রাজা, সর্দ্দারগণ, অধ্যাপক, পুরাণ-বাগীশ, কাস্তলাল, গোকুল, চন্দ্রা প্রভৃতি। ইহাদের কেহ কেহ একটু আধটু ভাবের অনুকূল—অনেকেই প্রতিকূল। ভাব-তত্ত্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইল—নন্দিনী, রঞ্জন, বিশু, কিশোর। এইবার আমরা দেখিব এই তত্ত্ব দুইটী নাটকে কি ভাবে বিবৃত হইয়াছে এবং কি ভাবে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

নাটকের দৃশ্য-সংস্থান হইয়াছে যক্ষপুরী নামক নগরে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে ব্যাপ্রিয়মান সংসার এখানে যক্ষপুরীরূপে কল্পিত হইয়াছে। যক্ষপুরীর রাজ-প্রাসাদ জটিল জালাবরণে আচ্ছাদিত। রাজা সেই আবরণের অন্তরালে বাস করেন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিতে মানুষের অন্তরাত্মাটিকে পাঁচটী আবরণের ভিতরে গোপন করিয়া রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রে ইহাদিগকে বলে পঞ্চ কোষ—দেহ—প্রাণ—মন—জ্ঞান—আনন্দ। মানুষ আবার এই পঞ্চাবরণময় মানুষটীকে অন্ততঃ পঞ্চ শত কৃত্রিম জালে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অভ্যাসের জাল, অবস্থার জাল, আচারের জাল ব্যবহারের জাল, নীতির জাল, রীতির জাল, প্রথা-পদ্ধতির জাল, পোষাক-পরিচ্ছদের জাল—জালে জালে মানুষটী একেবারে শত পাকে জড়ান'—মাকড়সার জালে মাছিটীর চেয়েও শত গুণে বেশী। এ ত সব গেল ব্যক্তিগত জাল। ইহা ছাড়া জাতি-গত, সমাজ-গত, ধর্ম্ম-গত, ব্যবসা-বাণিজ্য-গত কত শত জাল আছে—মানুষের একেবারে গায়ে-লাগা না হইলেও চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—চিড়িয়াখানার পাখীর চারিদিকে—অথবা বেড়-জালের মাছের চারিদিকে যেমন থাকে। মানুষটীকে আর চিনিবার যো নাই। সে যে কোন্ গহনে—কোন্ গহ্বরে থাকে—তার আর সন্ধান পাবার উপায় নাই।

রাজা হইতেছেন এই সংসারী বিষয়ী শত-জাল-জড়িত মানুষের একান্ত প্রতিনিধি। কাজেই তিনি জালাবরণের অন্তরালে বাস করেন। এই জালাবরণ হইতে বাহির হইবার ব্যাকুলতায় নিরাশ-ভাবে কবি ম্যাথু-আর্নল্ড্ বলিয়াছেন,—

Nor will that day dawn at a human nod,
When, fursting through the *net-work* superposed
By selfish occupation, plot and plan,
Lust, avarice, envy—liberated man,
Shall be left standing face to face with God.

মানুষের ইচ্ছা মাত্রেই এই জটিল জাল ছিন্ন হইয়া মানুষের মুক্তি হইবে না, ইহা সত্য; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা মাত্রে ইহা সংসাধিত হইতে পারে। রক্তকরবী নাটকে এই জালাচ্ছাদন হইতে মানুষের মুক্তি সংসাধন প্রদর্শন করা হইয়াছে।

মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরম্ভ হয় তখনি, যখনি সে স্বভাবের ও প্রকৃতির পথ পরিত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ পথে চলিতে আরম্ভ করে। যক্ষপুরীর 'শ্রমিকদল মাটীর তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত।' জল বায়ু, জীব জন্তু, শস্য, ফল, মূল, পুষ্প, পত্র প্রকৃতি মানুষকে কতই দান করিয়াছে ও করিতেছে—মুক্তহস্তে—অজস্র। কিন্তু সে যাহা পৃথিবীর গহন গহ্বরে অন্ধকার গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছে—মানুষ প্রকৃতির স্নেহের দান ফেলিয়া দিয়া পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সেই গুপ্ত ধন আত্মসাৎ করিতে চায়। জীবন-ধারণের জন্ম এবং সুখ-সম্ভোগের জন্মও যাহা যথেষ্ট, তাহা লইয়াই তাহার নিবৃত্তি নাই। সে মত্ত হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া আছে অবিশ্রান্ত সঞ্চয়ের জন্ম। এক হাজার টাকা হয় ত তাহার সুখ-সম্ভোগের জন্ম যথেষ্ট ; কিন্তু সে দশ হাজার—লক্ষ—কোটি এবং তাহারো অধিকের জন্ম উন্মত্ত ভাবে প্রয়াস করিতেছে। সংগ্রহেই উৎকট আনন্দ ; ভোগেরও সময় নাই। ইহা জগতে সর্ব্বত্র। যক্ষপুরী সেই জগতের একটী আদর্শ

দৃশ্য। এখানকার শ্রমিকদলের মত মানুষ-মাত্রই সুড়ঙ্গ খুঁদিয়া সোনা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। নন্দিনীর বিচারে এই সোনা 'অনেক যুগের মরা ধন।' অধ্যাপক বলিতেছে--'আমরা সেই মরা ধনের শব-সাধনা করি।' ধনের সাধনা মৃত্যুর সাধনা। কারণ ধন মানুষকে অমৃতের পথ হইতে মৃত্যুর পথে ভুলাইয়া লইয়া যায়। অমৃতাৎ মৃত্যুং গময়তি। জড় সম্পদের চিন্তা করিতে করিতে মানুষের চিত্ত জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। জড়ত্ব মানেই মৃত্যু। তান্ত্রিক শব-সাধনা করিয়া অমৃতময়ী ভগবতীর সাক্ষাৎ লাভ করে অথবা অলৌকিক শক্তি লাভ করে। সংসারী সম্পদ্-শবের সাধনা করিয়া তমোময় অনাত্মস্বরূপে মৃত্যুলাভ করে। এই যক্ষপুরীর প্রকৃতি সম্বন্ধে এই নাটকের নানা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহার সমস্তই আমাদের এই বিষয় সংসার-সম্পর্কে কেমন করিয়া খাটিবে তাহাই আগে দেখিয়া লইব। বিষয়তত্ত্বটাই আরো একটু বিশেষভাবে বোঝা থাক্। এক একটা করিয়া কথা ধরিয়া আমরা তাহার প্রয়োগ দেখিব।

১। 'সব জিনিষকে টুকরো করে' আনাই এদের পদ্ধতি।'

সংসারে কোথাও সমগ্রতা নাই—কোথাও অখণ্ডতা নাই। সর্ব্বত্রই ব্যষ্টি, দ্বন্দ্ব, খণ্ড, ভাগ, ভগ্নাংশ। সমষ্টি কোথাও নাই। দার্শনিক বলিবেন—কারণ, অজ্ঞানাত্মক যে মায়া তাহার সমষ্টি হইল ঈশ্বরের উপাধি। আর তাহার ব্যষ্টিভাব-সমূহ হইল জীবের উপাধি। প্রথমেই ত জ্ঞেয় হইতে নিজেকে ভিন্ন করিয়া না লইলে জ্ঞানেরই ক্রিয়া আরম্ভ হয় না। তার পর কোনো পদার্থকে জানা মানেই অন্য পদার্থসমূহ হইতে তাহাকে ভিন্ন করিয়া দেখা তুলনার ভূমি হইতে। এ সব কথা দূরের। সাধারণ-ভাবে মানুষের জীবনের সবই খণ্ডশঃ—ক্রমশঃ। একটী মানুষ যখন আর একটী মানুষকে বুঝিতে চায়, তখন সে তাহার একটী দুটী গুণ বা দোষের হিসাব করিয়াই ক্ষান্ত হয়। সমস্ত মানুষটাকে বুঝিবার তার সময়ও থাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। আবার আমরা মানুষ চিনি না—ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী, গৌর-বর্ণ শ্যাম-বর্ণ, ইত্যাদি চিনি। আমার চাকরটী যখন সুস্থ, তখন তাহাকে চাই। যখন রুগ্ন, তখন তাহাকে চাই না। অন্য দিকে ফুলটী যখন দেখি, তখন গাছটীর কথা ভাবি না। গাছটী যখন দেখি, তখন শিকড়টীর কথা ভুলিয়া যাই। হলদে পাখাটীর সুন্দর রংটী যখন দেখি, তখন তার মধুর স্বরটী শুনি না। আবার স্বরটীতে যখন কান দিই—বর্ণটী তখন দেখি না। মুখখানা যখন দেখি, তখন আর কোনো অঙ্গের কথা মনে আসে না। মনে যখন থাকি তখন প্রাণ চিনি না। প্রাণে যখন থাকি তখন মন চাই না। ইহাই 'টুকরো করে' আনা। ইহাই খণ্ড করিয়া দেখা।

(২) 'আমরা নিরবকাশ গর্ত্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি।' সংসারে কাজের অন্ত নাই। অবকাশ কোথায়? প্রাণ-ধারণের জন্য আবশ্যক নিদ্রা। শুধু সেইটুকুই অবকাশ। তাও সকলের নাই। জনাকীর্ণ কোনো মহা-নগরীর রাজ-পথে প্রহর দুই তিন দাঁড়াইয়া থাকিলেই বোঝা যায় মানুষের অবকাশ কত। রাত্রি চারিটা হইতে সমস্ত দিন, এবং রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটিতেছে। নিশ্বাস ফেলিবারও সময় নাই। পল্লীগ্রাম হইতে প্রথম যে কলিকাতায় আসে, রাস্তায় দাঁড়াইলে তাহার মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে—মানুষগুলি এমন করিয়া পাগলের মত ছুটিতেছে কেন? কি হইয়াছে? জ্ঞানীর উত্তর—কি হইয়াছে জান না?—ঘরে আগুন লাগিয়াছে! তিনটী শিখা তিন দিক্ থেকে মানুষের নয়-দুয়ারের ঘর পোড়াইতেছে। তাই নিভাইবার জন্য সকলেই অমন করিয়া ছুটিতেছে। যে জলে নিভিবে—সে জল কোথায় পাওয়া যায় তাহা কেহই জানে না। ইহাই আধুনিক জীবন।

Modern life
With its sick hurry, its divided aims,
Its heads overtax'd, its palsied hearts.
এখানে আমরা— Glance, and nod and bustle by
And never once possess our soul,
Before we die. —M. Arnold.

কাজেই আমরা অবকাশের আকাশখানা—এই Soulটী হারাইয়া ফেলি। রাজার নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। নন্দিনী অধ্যাপককে বলিতেছে—'আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?' সে 'পুঁথির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়েই চলেছে।'

(৩) যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা' পুরী।'

সংসারে আনন্দের—হর্ষের—উল্লাসের নির্ম্মল সূর্য্যালোক কোথাও পাওয়া যায় না। অশান্তির ছায়া সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এখানে—

But to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs. (Keats)

(৪) 'সহজ কথাটাই আমার কাছে শক্ত।'

সরলতা ও স্বাভাবিকতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমরা সহস্র প্রকার কৃত্রিমতা সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের হাসি কান্না, চলা, বলা, খাওয়া, পরা—সবই ত প্রচলিত রীতি—রেওয়াজ—ফ্যাসান অনুসারে. কাজেই আমাদের রাজার কাছে সহজটা শক্ত—কারণ বহুকাল হইতে পরিত্যক্ত। আমাদের পদে পদে চিন্তা—'পাছে লোকে কিছু বলে।' ফলে আমরা সরল সহজটাকে ভুলিয়াই গিয়াছি।

(৫) 'অদ্ভুত তোমার শক্তি।' 'প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে' ফুলে' উঠছে।'

বিশেষতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে একগুণ শক্তি সহস্রগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই যুগেও বাবিলোন, নিনেভে, মেম্ফিসের মত বিশাল-শরীরা নগরী, পিরামিডের মত প্রকাণ্ড অক্ষয় সমাধি-মন্দির প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল যে শক্তি, এ যুগে নিউ-ইয়র্ক, প্যারী, লণ্ডনের মত শত শত রাক্ষসী নগরী, দুর্গম মরু-প্রান্তর পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়া সহস্র-যোজন ব্যাপী রেল-পথ, অগাধ সলিলা, ভীষণ-কায়া উচ্ছল-তরঙ্গময়ী স্রোতস্বিনীসমূহের উপর দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুদৃশ্য সেতু নির্ম্মাণ করিতেছে যে শক্তি, সগর্ব্বে অভ্রভেদী গিরি-শৃঙ্গ আরোহণ

করিতেছে, চির-তুষারাচ্ছাদিত মেরু-প্রদেশের সকল রহস্য আবিষ্কার করিতেছে যে শক্তি, জলে স্থলে আকাশে বাতাসে অনায়াসে অবাধে গমনাগমন করিতেছে, আবশ্যক হইলে দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া অরণ্য করিতেছে, আবার অরণ্য-কান্তার দেখিতে দেখিতে মানবের বাস-ভূমিতে পরিণত করিতেছে যে শক্তি, তাহা অদ্ভুত নিশ্চয়ই। হানিবল, আলেক্‌জাণ্ডার, নেপোলিয়ন যে শক্তির সন্তান, সে শক্তি অদ্ভুত নিশ্চয়ই।

(৬) 'কাণা রাক্ষসের অভিসম্পাত। খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।' সংসারে সর্ব্বত্র প্রাণধারণের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চলিতেছে অহর্নিশ। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একজন আর একজনের গলায় ছুরি দিতেছে। একজন আর একজনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। এই যে hard struggle for existence এবং cut-throat competition, এই যে জোরের সহিত জোরের জড়াজড়ি লড়াই, এই যে বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির কখনো বা মল্ল-যুদ্ধ কখনো বা লুকোচুরি ছল-প্রবঞ্চনা—ইহাই সংসারের নিয়ম। অন্ধ-ধন-লিপ্সা নামক কাণা রাক্ষসের উপাসনায় এই অভিসম্পাত লাভ হয়। দেবতার আদেশ—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনং।' ইহার বিরুদ্ধাচরণ যেখানে সেইখানেই এ অভিসম্পাত।

(৭) 'আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে' আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে' ত পরশমণি হয় না। শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছিনে না।'

মানুষের সম্পদ্ যতই বাড়ে, ততই উহা তাহার চিত্তের উপর পাথরের মত চাপিয়া বসে এবং ধীরে ধীরে তাহাকে নিষ্পেষিত করিতে থাকে। আনন্দ ক্রমশই দুর্লভ হয়। হর্ষ-হাসি অসম্ভব হয়। আনন্দ উল্লাস প্রীতি ইহাই যৌবন। ধন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই যৌবনের ক্ষয় হইতে থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদর্জ্জনের জন্য সমস্ত মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছে তাহার হৃদয় কঠোর হইয়া যায়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সরসতা ও তরুণতা থাকে না। ধনের অর্জ্জনে অশান্তি, রক্ষণে অশান্তি, ব্যয়ে অশান্তি। ধন যেখানে তার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত মনস্তাপ, মনোমালিন্য, অসন্তোষ।

ধনং তাবদসুলভং লব্ধং কৃচ্ছ্রেণ রক্ষ্যতে।
লব্ধ নাশো যথা মৃত্যু স্তস্মাদেতন্ন চিন্তয়েৎ।

সুতরাং 'সোনা' উথলে আনন্দ-আহ্লাদ প্রীতি প্রেম হর্ষ হাসি ভরা যৌবনে পৌঁছিতে পারে না।

(৮) 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি * * * তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়্‌ছে।'

মানুষের সুখ শান্তি, রূপ-মাধুর্য্য, জ্ঞান-বুদ্ধি সব দগ্ধ হইয়া যায় এই—'কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।' ইহা যে—'মহাশনো মহা-পাপ্মা।' কাজেই ইহাকে যে আশ্রয় করিয়াছে সে 'তপ্ত' 'রিক্ত' 'শ্রান্ত'। কাজেই—'তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে' নিয়েছে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়ছে।' কারণ—'মূঢ় গ্রাহেনাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ' তাহার জীবন যে মরুভূমি হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা তামসী তপস্যা।

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।

রাজা এই অসুর-জ্ঞান-যুক্ত। কাজেই তপ্ত রিক্ত। একটা 'ছোট্ট ঘাসের' আশাও তার নাই। ঠিক এই ভাব হইতেই শেলী সংসারের বর্ণনা করিয়াছেন—

How stern
And desolate a tract is this wide world !
How withered all the buds of natural good !
No shade, no shelter, from the sweeping storms
Of pitiless power.

এবং ইহার— Influence darts
Like subtle poison through the bloodless veins
Of desolate Society.

কার্লাইল্ বলিয়াছেন— O, the vast, gloomy, solitary
Golgotha and Mill of Death !'

(৯) 'সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে' নিজেকে পিষে ফেলে।'

ফরাসী বিদ্রোহের মত ভয়ঙ্কর বিশাল ধ্বংসময় ব্যাপার পৃথিবীতে যত সংঘটিত হইয়াছে, সমস্ত এই শক্তির নিজের ভারে নিজের পিষে যাওয়া। প্রকৃতির প্রতিশোধ। আভিজাত্য-শক্তি মদ-মত্ত হইয়া প্রজা-সাধারণের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া যে হৃদয়হীন অত্যাচার করিল, সেই অত্যাচারই প্রতিক্রিয়া বশে ফিরিয়া আসিয়া সে শক্তিকে চূর্ণ করিল। নেপোলিয়ান রুশের বিরুদ্ধে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ লক্ষ সৈন্য-সহকৃত সমরাভিযান লইয়া যাইয়া প্রায় সমস্ত সৈন্য * অনর্থ ধ্বংস করিয়া লইয়া যে ভাবে ফিরিয়া আসিল—তাহাতেও শক্তির নিজের ভারে নিজে পিষিয়া যাওয়া। বরদিনোর যুদ্ধে বিজয় লাভও পরাজয়ের চেয়েও সাংঘাতিক ভাবে তাহার পতনের পথ পরিষ্কার করিল। ম্যাক্‌বেথ্-নাটকেও ম্যাকবেথ যে শোণিত-সাগরে সাঁতার দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং যে ভাবে অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহাতেও এই তত্ত্বই দেখানো হইয়াছে। কার্লাইল বলিয়াছেন—

Mountains of encumbrance had been heaped over the spirit * * * it struggled and wrestled to be free * * * its prison mountains heaved and swayed

---

* চার লক্ষ সৈন্যের মধ্যে বিশ হাজার ফিরিয়াছিল। কতক মরিয়াছিল অনাহারে, কতক নিদারুণ শীতে বাতে তুষারে। কতক পথে স্থানে স্থানে রুষ-সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণে

tumultuously as the giant-spirit shook them to this hand and that and emerged into the light of heaven !

(Sartor Resartus)

ইহা এই একই সত্যের উপরকার দিক—মুক্তি-পরিণামের দিক্। রাজা শুধু নিষ্পেষণেই ভুগিতেছে—emergence into the light of heaver এর 'সুসমাচার' এখনো তাহার কাছে আসে নাই।

(১০) 'তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে' রেখে বঞ্চিত করেছ।' প্রাণ যখন নিজেকে বিলাইয়া দেয় তখনি তার চরিতার্থতা লাভ হয়। এই বিলানোতেই তার তৃপ্তি ইহাতেই তার আনন্দ। সংসারের স্বার্থলিপ্সতাই তাহার সকল দুঃখের কারণ। সে দিতে চায় না, কেবলি পাইতে চায়—কাড়িতে চায়। স্বার্থের অন্বেষণে সে নিজের সুখ নিজে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে। তন্নষ্ট যন্ন দীয়তে। ফুলের যাহা যায় তাহাই গন্ধ। যাহা সে দেয় না তাহা গন্ধ নয়—তাহা ব্যর্থ। মানুষ যাহা দেয় তাহাতেই তাহার সুখ; যাহা ধরে তাহাতেই তাহার দুঃখ।

(১১) 'দরকার বলে' পদার্থের শেষ আছে। * * * নেশার দরকার নাই। তার শেষও নাই।'

জীবনে যাহা দরকার---ভোগ-বিলাসটা ধরিয়া লইয়াও যাহা দরকার, তাহাই লাভ করিয়াই যদি মানুষ ক্ষান্ত থাকিত, তবে সংসারের এক হাজারের ৯৯৯ ভাগ অশান্তি কমিয়া যাইত। দরকারটা সংসারের একটা মিথ্যা অজুহাত। মূলে সংসার চলিতেছে নেশায়—অর্থাৎ নিরুদ্দেশ্য তৃষ্ণায়, কিছুতেই যাহার তৃপ্তি নাই।

'We pine for what is not.'

(১২) 'সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই ত এই কয়েদখানার চোরাই মদের উপর এমন ভয়ঙ্কর টান।'

মানুষের জন্য অফুরন্ত আনন্দ সাজানো রহিয়াছে প্রকৃতিময়—সর্ব্বত্র —দক্ষিণে বামে—উর্দ্ধে অধে। Joys in the widest commonalty spread। এই আনন্দ সুরা—ইহা সুধা। ইহাতে প্রাণের পুষ্টি হয়—হৃদয় সঞ্জীবিত হয়।

The rainbow comes and goes
And lovely is the rose.
The moon doth with delight
Look around her when the heavens are bare ;
Waters on a starry night
Are beautiful and fair,
The sunshine is a glorious birth (Wordsworth)

এই যে পবিত্র প্রাণপ্রদ মদ ইহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—অন্ততঃ ভুলিয়া থাকি। কিন্তু জীবনে মদের অর্থাৎ আনন্দের একান্ত আবশ্যক। কাজেই আমরা সর্ব্বনেশে মদের আশায় নেশাতেই মাতামাতি করি। ধন-লোভ এই মদ। ইহা অনন্ত অশান্তির প্রস্রবণ। কিন্তু প্রকৃতির আদরের দান যে মদ তাহা খাইলে চিত্ত-ভাবটী হয়—

No wish profaned my overwhelmed heart
Blest hour ! It was a luxury to be ! (Coleridge)

হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাইনা—কিছুর স্বর্গ শেষে
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা। (রবীন্দ্রনাথ)

প্রকৃতির ভাণ্ডারের মদ খাইলে এই প্রকার হয়। কিন্তু সংসারী এই সহজ-সুলভ অসীম আনন্দ-মদিরা ভুলিয়া থাকে। সহস্র প্রকারে আনন্দের কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য দিবা রাত্রি ব্যর্থ চেষ্টা করে।

(১৩) 'একটা মরা ব্যাঙ্। এই ব্যাঙ্ এক দিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে।' মানুষের অন্তরাত্মা যতদিন না জাগিয়া উঠিয়া আকাশের আলোকের জন্য আকুল হইয়া উঠে, ততদিন মানুষ মাত্রই সাংসারিক অবস্থা নামক এই যে 'পাথরের কোটর' ইহার মধ্যে প্রাণহীন প্রাণী যে শীতের ভেক—ঠিক তাহারি মত। ইহা টিঁকে থাকা—বেঁচে থাকা নয়।

(১৪) 'আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর।'

বিষয়-মদ-মত্ত যারা তাহাদের নিষ্ঠুরতার ত অন্ত নাই। সংসারী হৃদয় জিনিষটাকে ঘৃণা করে। হৃদয় যেখানে অবজ্ঞাত পদ-দলিত, সেখানে নৃশংসতা অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থসিদ্ধির রথ, সম্মুখে যাহা পড়ে, সমস্ত চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অন্ধ স্বার্থ অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে মানুষের বুকে শেল বিদ্ধ করিয়া দেয়। শত শত ছিন্ন মুণ্ডের আস্তরণের উপর লোকে সিংহাসন স্থাপন করে। যক্ষপুরীর রাজা ত নিষ্ঠুর হইবেই।

(১৫) 'জগতে যা কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করিতে চায়।'

মানুষের জানিবার যাহা শক্তি, জগতে যাহা জানিবার আছে, তাহার তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ, নগণ্য। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া জানিলেও জানা শেষ হইবে না। একটা ঘাসের পাতার মধ্যে যাহা জানিবার আছে, তাহাই জানিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আর জানা দ্বারা পাওয়া যায় না। পাওয়ার একমাত্র উপায় ভালবাসা। প্রাণে পাওয়া যায়—সত্যকার পাওয়া। জ্ঞানে পৃথক করে—দূরে রাখে। স্বার্থ যেখানে প্রবল—সেখানে প্রাণের গতি বন্ধ। কাজেই রাজা জানে না—'প্রাণ-পুরুষের অন্দরমহল কোথায়।'

(১৬) 'ধ্বজা-পূজা।'

বিষয়ী মানুষের যা ধর্ম্ম-কর্ম্ম তা শুধুই ধ্বজা-পূজা। বহির্নিদর্শনের,—বাহ্য প্রতীকের মিথ্যা অর্চ্চনা মাত্র হয়। যাঁহার নিদর্শন তাঁহার কোনো খোঁজখবর থাকে না। হাতে যখন ষোড়শোপচার অর্পণ করে, প্রাণ তখন ধনের ধ্যানে মগ্ন থাকে। ক্রুশের ধ্বজা ভুলিয়া যীশু-

ব্যথা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভক্ত নির্দ্দোষীর গলা কাটিতে যায়। হরি নামের মালা লইয়া হরি-ভক্ত পর-ধন হরণ করে।

এইখানে বিষয় মাহাত্ম্য শেষ করা যাক্। ষোলো কলা পূর্ণ হইল। এইবার ভাবের সন্ধান করিব। রাজার চরিত্রের কিছু কিছু বোঝা গেল। এইবার বিষয়ের বিচার ছাড়িয়া ভাবের অনুভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একবার নন্দিনীর মুখের পানে তাকানো যাক্। আর নন্দিনীর সম্পর্কে রাজার আরো কোনো তত্ত্ব পাওয়া যায় কিনা তাহাও দেখা যাক্। বারান্তরে তাহাই করিবার বাসনা রহিল।

জিনগণ্ড

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্

গত চৈত্রে কণ্ঠগণ্ডের বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য আর একটী গণ্ডের কথা ঐরূপেই আলোচনা করিব। এই গণ্ড নাসিকা মূলের কিছু পশ্চাতে এবং মস্তিষ্ক পদার্থের নিম্নে অবস্থিত। ইহা একটী মটর পিমুড়ির ন্যায়; ইহার বর্ণ শাদা ও পীত মিশ্রিত। ইহা প্রকৃত পক্ষে সংযুক্ত গণ্ড, অর্থাৎ দুইটি গণ্ড পরস্পর সংযুক্ত; একটি সম্মুখে ও অপরটি পশ্চাতে,—অশ্ব পৃষ্ঠের জীনের (Saddle) ন্যায় ইহার আকৃতি। এই নিমিত্ত ইহাকে জিনগণ্ড বলিব। ইংরাজিতে ইহাকে Pituitary gland বলে।

মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট সকল প্রাণীরই জিনগণ্ড আছে। এই গণ্ডের পূর্ব্বাভাস কীট প্রভৃতি নিম্নতম প্রাণিগণেরও দেখা যায়। সুতরাং ইহা সকল প্রাণীরই আছে। এই হেতু বশতঃ ইহাকে প্রাণিগণের চিরসঙ্গী বলা যাইতে পারে।

যে সকল কোষ দ্বারা এই গণ্ড গঠিত হইয়াছে, তাহারা নিরেট (solid)। এই সকল কোষ পাশাপাশি সজ্জিত। ইহাদিগের চারিদিকে রক্তবাহী কোষ সকল রহিয়াছে। এই কোষ সকলের রস ঐ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র যাতায়াত করে। ইহাদিগের রস তরল কিন্তু আঠার ন্যায় অথচ স্বচ্ছ। মস্তিষ্কের নিম্নভাগে কোরয়েড্ গণ্ড নামক আর একটি গণ্ড আছে। এই কোরয়েড্ গণ্ডের রস দ্বারা স্নায়ু মণ্ডল আর্দ্র থাকে। জিনগণ্ডের রসও ঐ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলকে বিশেষ ভাবে সিক্ত করে।

জিনগণ্ডের রস অস্থিসকলকে বর্দ্ধিত করে; এবং দেহের সংযোগ স্থানগুলির দোষ সকলকেও উত্তেজিত করে। এই রস হইতে রাসায়নিকগণ পিটুট্রিন্ (Pituitrin) নামক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পদার্থ পেশী সকলের ক্রিয়া নিয়মিত করে, এবং মলনালীর, মূত্র-কোষের ও গর্ভাশয়ের পেশী (Fibres) তন্তুগুলির উপরেও ক্রিয়া করে। জিনগণ্ডের রস দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, প্রস্রাব অধিক হয় এবং দুগ্ধক্ষরণও বৃদ্ধি পায়। সমুদ্র জলে যে মাত্রায় লবণ আছে, জন্তু দেহের রক্তমধ্যে সেই মাত্রায় লবণ স্থির রাখিবার প্রধান সহায়ক জিনগণ্ডের রস। কণ্ঠগণ্ডের রস যেমন রক্ত মধ্যে আইওডিনের মাত্রা সমুদ্র জলের ন্যায় ঠিক রাখে, জিনগণ্ডের রসও তদ্রূপ লবণের মাত্রা ঠিক রাখে। বহুকোষ জন্তুগণের আদি বাসস্থান সমুদ্র; এ কথা রক্তের লবণাংশ ও এবং আইওডিনাংশ বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে।

জিনগণ্ড দেহ হইতে বাহির করিয়া লইলে জন্তুগণ অলস হয়; তাহাদিগের ক্ষুধা থাকে না; তাহারা শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাদিগের দেহ শীতল হইয়া থাকে। এইরূপে দুই তিন দিন মধ্যেই তাহারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

জিনগণ্ডের সম্মুখের অংশ হইতে কিয়দংশ কাটিয়া লইলে জন্তুগণ এত মোটা হয় যে, তাহাতে দেহ নষ্ট হইবার মত হইয়া থাকে। যদি দেহ নষ্ট না হয় কিন্তু কেবল অধিক মাত্রায় স্থূল হয়, তবে অনেক সময় জন্তুগণের লিঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; অর্থাৎ স্ত্রী জাতীয় জন্তু পুং জাতীয় হয়, পুং জাতীয় জন্তু স্ত্রী জাতিতে পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত জিনগণ্ডের ঐ অংশ কাটিয়া লইবার ফলে জন্তুগণের দেহের চর্ম্ম শুষ্ক হয়, নিদ্রা থাকে না, কেশ উঠিয়া যায়; তাহাদিগের বুদ্ধি জড়বৎ হয় এবং অনেক সময় তাহারা মৃগী রোগাক্রান্ত হয়। যদি জন্তুগণের শিশুকালে এই গণ্ডের সম্মুখ ভাগ কাটিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে উহাদিগের অস্থি বাড়ে না; সেই হেতু ইহারা খর্ব্বাকৃতি হয়। জিনগণ্ডের সম্মুখ ভাগের অপূর্ণতা বশতঃ বামন আকার উৎপন্ন হইতে পারে। এই গণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিতরূপে একবার হ্রাস, একবার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এই হ্রাস-বৃদ্ধি কোন কোন জীবদেহে ঋতু-ভেদে হইয়া থাকে; স্তন্যপায়ী জীব-দেহে মাসিক হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখা যায়। এই নিমিত্ত এই শ্রেণীর জীবের স্ত্রীগণের মাসিক রজঃস্রাব হইয়া থাকে। যে সকল জীব শীত ঋতুতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং নিদ্রিত অবস্থাতেই সমস্ত শীত ঋতু কাটাইয়া দিয়া বসন্তে জাগরিত হয়, তাহাদিগের জিনগণ্ডের রস-ক্ষরণ শীতকালে হ্রাস হইয়া যায়; তাহাতেই ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে ভেক সর্প প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বহু প্রাণী শীতকালে নিদ্রিত হয়। এই দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রাকে হিম-নিদ্রা বলে। ফলতঃ জিনগণ্ডের রসক্ষরণ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মত এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে কমি বেশি হওয়াতে প্রাণিদেহের অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দৈনিক নিদ্রা, হিম নিদ্রা এবং যোগ নিদ্রা যে প্রকৃত পক্ষে একই অবস্থার ক্রম-বিকাশ তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি।* সুতরাং দৈনিক নিদ্রাও সম্ভবতঃ জিনগণ্ডের রসক্ষরণের অল্পতা হেতুই হইয়া থাকে এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। এই হেতু জন্তুগণের কখন কখন ধ্বজভঙ্গ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে পুরুষদিগের শুক্রে কীট থাকে না এবং স্ত্রীগণের ডিম্বাধারে ডিম্ব থাকে না। কাহারও বা স্বভাবতঃই এই গণ্ড কিছু কম মাত্রায় রস ক্ষরণ করে। যাহাদিগের এইরূপ হয়, তাহারা সর্ব্বদাই অলস এবং নিদ্রালু হইয়া থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে এই গণ্ডের রস ক্ষরণের আধিক্য হইলে জন্তুগণ শীর্ণ-

---

* নব্য ভারত ১৩২০ ভাদ্র। মানসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ।

দেহ হয়, তাহাদিগের অস্থি দীর্ঘ হয় এবং কখন কখন মস্তিষ্কের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে এই গণ্ড অধিক মাত্রায় রস ক্ষরণ করিলে অস্থি দীর্ঘ হয় না, কেবল হস্ত ও পদ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়া উঠে; নাসিকা, কর্ণ, ওষ্ঠাধর এবং চক্ষু বড় হয়, ভ্রূযুগল লোমশ হয়, এবং ব্যবহার উদ্ধত ও কলহপ্রিয় হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের এইরূপের আধিক্য হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে তাহাদিগের কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া হয়, সকল কার্য্যেই নিরুদ্যম ও নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হয়, ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল হয়; এমন কি এই কারণে স্ত্রীগণ অনেক সময় আত্মহত্যাও করিয়া থাকে।

বলিয়াছি, জিনগণ্ডের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ দুইটি গণ্ডের মত কার্য্য করে। তাহা হইলেও উহাদিগের সংযুক্তাবস্থা একটা গোটা গণ্ডের স্থায় ব্যবহার করে। এই গণ্ডের দুই অংশ পরস্পরের ক্রিয়া নিয়মিত করিয়া থাকে।

এই গণ্ডের উভয় অংশ পূর্ণাবয়ব থাকিলে এবং উহার রসক্ষরণ অধিকও-না অল্পও-না অর্থাৎ ঠিক পরিমাণ মত থাকিলে, জন্তুগণ শীর্ণদেহ ও দীর্ঘায়তন হইয়া থাকে, উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি অধিক হয়, বুদ্ধি, উদ্যম ও সহিষ্ণুতা উত্তম দেখা যায়। কিন্তু রস ক্ষরণ অল্প মাত্রায় হইলে জন্তুগণ মোটা, খর্ব্বাকার, বিশ্রী হইয়া থাকে। উহাদিগের বুদ্ধি অনেক কম, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান নিকৃষ্ট হয়। ইহারা মিথ্যাবাদী ও অসংযমী হয় এবং ইহাদিগের বিবেক অপরিস্ফুট থাকিয়া যায়।

কণ্ঠগণ্ডের (Thyroid gland) রস যেমন দেহের বহির্ভাগের ও ভিতরের আবরণগুলির উপরেই মুখ্য ভাবে কর্ম্ম করে, জিনগণ্ডের রস সেইরূপ প্রধানতঃ অস্থি ও স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। কণ্ঠগণ্ডের রসও গৌণ ভাবে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর উপর কর্ম্ম করে; কিন্তু জিনগণ্ডের রস সাক্ষাৎ স্বরূপেই এই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। কণ্ঠগণ্ডের রস শক্তি উৎপন্ন করিবার সহায়তা করে; কিন্তু জিনগণ্ডের রস ঐ শক্তিকে প্রয়োগ স্থান ভেদে যথাযোগ্য ভাবে কর্ম্মে পরিণত করে। শক্তিকে দীর্ঘকাল অবিচলিত ভাবে কর্ম্মে ব্যক্ত করা জিনগণ্ডের রসের ক্রিয়া। শক্তি উৎপন্ন করা কণ্ঠগণ্ডের কর্ম্ম হইলেও জিনগণ্ড রসের সহায়তা না পাইলে ঐ শক্তি অল্প কাল মধ্যে ক্ষয় হইয়া যায়; উহা হইতে কালব্যাপী চেষ্টা ও কর্ম্ম হইতে পারে না। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বিবিধ ভাবে উত্তেজিত হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত নানাপ্রকারে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দীর্ঘকাল কর্ম্মে পরিণত করিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমাদিগের ভাবে শক্তি আছে; কিন্তু আমরা শক্তিকে স্থির রাখিয়া দীর্ঘকাল কার্য্যে পরিণত করতঃ সফলতা লাভ করিতে পারি না। অল্প সময় মধ্যে আমাদিগের শক্তি নিরস্ত হয়, উদ্যম ও চেষ্টা থামিয়া যায়। সুতরাং আমরা কিছুতেই সফলতা লাভ করিতে পারিতেছি না। এ দুর্দ্দশার বহু কারণ আছে সত্য; কিন্তু জিনগণ্ডের রস ক্ষরণের অল্পতাও এই অবস্থার একটি প্রধান হেতু মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমাদিগের ধাতুতে পিটুট্রিন্ বোধ হয় অপেক্ষাকৃত কম। এই অবস্থায় উন্নতি করা অতীব আবশ্যক। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং জৈব রসায়নবিদ্‌গণ এই বিষয়ে যত শীঘ্র মনোযোগ দেন ততই মঙ্গল। কিন্তু আমরা বঙ্গীয়গণ এসকল কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার সময় পাইব কি?

সীতারামের শিলালিপি

শ্রীবিজয়নাথ সরকার বি-এ, সি-ই

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতবর্ষে' সীতারাম-প্রশস্তি নাম দিয়া রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গৃহে রক্ষিত রাজা সীতারাম রায়ের একখানি শিলালিপির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ছয় মাস পূর্ব্বে এই লিপিখানি সমিতির হস্তগত হয়, এবং তখনই ইহার পাঠ সমিতির ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় করিয়া দেন। আবার গত বৈশাখ মাসের প্রথমেই (১৩ই এপ্রিল তারিখে) প্রকাশিত সমিতির রিপোর্টে মজুমদার মহাশয়ের লিখিত এই লিপির পাঠ ও বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ দেওয়া আছে—

V. The following was presented by Babu Sarat Kumar Sarkar and his brothers (Rajshahi) :

(29) A stone inscription of the reign of Sitarama Raya (No. 679; di meter 10″; Muhammadpur, Dist Jessore).

The inscription was published by James Westland in 1871 in his *Report on the District of Jessore*, pp. 45-46. It appears to have originally belonged to the temple of Krishna at Muhammadpur, where it was put up 'on the top of the lowest arch of the tower,' and 'let into the face of the brickwork' (p. 45).

The text of the inscription, which is in Bengali characters, reads as follows :—

Line 1. বাণদ্বন্দ্বা (ন্দ্বা) ঙ্গচন্দ্রৈঃ

Line 2. পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষা-

Line 3. ভিলাসঃ (ষঃ) শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসো-

Line 4. স্তবকুলকমলোল্লাসকো ভানু-

Line. 5. তুল্যঃ। ভ্রাজছি (চ্ছি) ল্লোষযুক্তং রুচিরক্ত-

Line 6. চিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং শ্রীসীতা-

Line 7. রামরায়ো যদুপতিনগরে

Line 8. ভক্তিমান্থৎসসর্জ্জ (॥)

It records the erection of a temple of Krishna by Sitarama Ray who belonged to 'the illustrious family of Visvasakhasa', at Yadupatinagara, in the Saka year 1625, i. e, 1703 A. D. It will be seen that

Westland was successful in reading and interpreting the whole of the record correctly excepting that in line I, he read চন্দ্রে for চন্দ্রেঃ, in II. 2-3, তোষাভিলাষী for তোষাভিলাসঃ, in II. 3 4, ভাসোত্তব for খাসোত্তব and in I. 5 অজস্রং সৌদযুক্তে for ভ্রাজচ্ছিরৌঘবুক্তং.

N. G. MAJUMDAR.

Curator, Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi."

৬ই বৈশাখ তারিখের 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রে সমিতির "জনৈক সভ্য' কর্ত্তৃক এই পাঠ আলোচিতও হইয়াছে। এই সকল তথ্য প্রবন্ধ-লেখক ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় বিদিত আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি স্বীয় প্রবন্ধে তাহার উল্লেখমাত্র করেন নাই।

"পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-কাহিনী" হইতে বোধ হয় যে প্রবন্ধে প্রকাশিত পাঠ অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত অক্ষয়বাবুর এই লিপির পাঠের অশুদ্ধতার কৈফিয়ৎ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে: "অক্ষয়কুমার মৈত্র সি-আই ই মহাশয়ও এই ফলকখানি এতদিন স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়ায়, সম্ভবতঃ লোকপরম্পরায় শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া ও ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া তদীয় 'সীতারাম' নামক সাহিত্যে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে কয়েক স্থানে অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।"

'সাহিত্য,' ১৩০২ সাল, ৮১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অক্ষয়বাবুর নিজের উক্তি কিন্তু অন্যরূপ। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"এই মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত কবিতার যে ফলকলিপি নিহিত আছে, তাহা সহজে পাঠ করা যায় না। তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। * * * মন্দির ফলকে অবিকল এইরূপ লিখিত আছে:—"। ওয়েষ্টল্যাণ্ডের বই ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়, সুতরাং অক্ষয়বাবুর উক্ত লেখা তাহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে।

সে যাহা হউক, প্রবন্ধে যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও একটী গুরুতর অশুদ্ধি আছে। 'রুচিররুচি হরেকৃষ্ণগেহং' এর স্থলে "রুচির-রুচি-হরে কৃষ্ণগেহং" হইবে। "রুচিররুচিহরে" পদটি 'যশোহর' পদের মত নিষ্পন্ন এবং 'যদুপতি নগরের' বিশেষণ। 'কৃষ্ণগেহং' সম্বন্ধে ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাঁহার বইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

"Apparently a Curious error has arisen among some of the dwellers in the place, for they talk of the temple of Krishna as the temple of Harkrishna By that name I heard it almost always called, but the inscription plainly shews it is a temple of Krishna. I think it possible the mistake may be derived from an ignorant reading of one part of the inscription 'রুচির রুচিহরে কৃষ্ণ'. Some have read 'রুচির রুচি' as a sort of reduplication of the same word and left the 'হরে' to be tacked on to 'কৃষ্ণ', certainly the man who read it to me made that mistake. An adjacent village is called Harkrishnapur: no doubt from this mistake."

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় ওয়েষ্টল্যাণ্ডের বইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি কি তাহাতে এই কথা দেখেন নাই, না, যে ব্যাকরণ অনুসারে একাধিকবার 'অক্ষেযু বামাগতি' গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যাকরণ অনুসারেই বাঙ্গলা 'হরেকৃষ্ণ' সংস্কৃত শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন?

আর এক দিক দিয়াও 'হরেকৃষ্ণ গেহং' পাঠের অসঙ্গতি দেখা যায়। এই মন্দিরে যে বিগ্রহ ছিল, এখন তাহা দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীতে 'কৃষ্ণজী' নামে বিরাজ করিতেছে। অক্ষয়বাবু নিজেই এ কথা লিখিয়াছেন:—

"সীতারাম নাই, কিন্তু কানাই নগরে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীতে কৃষ্ণজী বিগ্রহ এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে" (সাহিত্য ১৩০২ সাল ৮০৫ পৃষ্ঠা)

"Dayaram retained only the image of God Krishaji (Sitaram's family idol) for himself."

(Dighapatiya Raj Family p. 1)

অতএব, বিগ্রহের নাম 'কৃষ্ণই' ছিল 'হরেকৃষ্ণ' নহে। 'ঐতিহাসিক তথ্য' আলোচনা করিতে গিয়া প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বদন্তী ও কল্পনার সাহায্যে সীতারামের উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার স্বাধীন ভাবে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য স্বদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের যশ কাহারও 'প্রশস্তি'র অপেক্ষা করে না। বলিতে কি, তাঁহার লিখিত উপন্যাস প্রকাশিত না হইলে বোধ হয় কেহই সীতারামের ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেন না। তাই সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ইতিহাসের সমালোচনায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"Next in importance to Pratap but at a great distance from him is another heroic son of Jessore... Raja Sitaram Rai (Circa 1660-1714) who played a humbler part in history but whom the genius of Bankim Chandra has invested with a halo of idealism and romance." (Modern Review, March 1923. p. 317)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে 'সীতারাম' উপন্যাসের মূল সত্য এই:—

ধ্যায়তো বিষয়ান্‌পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গীতা, ২।৬২ ও ৬৩

আমাদের মনে হয়, এইরূপ উপদেশের প্রচার, অথবা বৈতরণী নদীতটে স্থিত সপ্তমাতৃকার মণ্ডপ, বিরূপা নদী তটে স্থিত উদয়গিরি ও ললিতগিরির উপরের ভারতীয় কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বর্ণনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল উন্নত ভাব তাঁহার সীতারামে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে তাহার মূল্য কোনও ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা কম নহে।

অক্ষয়ানন্দের পারাভস্ম

শ্রীআদীশ্বর ঘটক

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, কালীঘাট অঞ্চলে অক্ষয়ানন্দ নামক এক অবধূত সন্ন্যাসী আসেন। সন্ন্যাসী বড় রূপবান ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জটা, গৌর বর্ণ, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে বাঘছাল, এবং সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম গুণ্ঠিত। চেহারা দেখিলে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর বোধ হইত। তাঁহার চিমটা এবং অবধূতের ঝুলি ছিল। এই সন্ন্যাসী বাঙ্গালী। শুনিয়াছি, ইঁহার জন্মস্থান গোবরডাঙ্গা।

অক্ষয়ানন্দ অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহীশূর অঞ্চলে সমুদ্র-তীর হইতে তিনি একটী ছোট দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পাইয়াছিলেন। সেই শঙ্খ দেখাইয়া সকলকে বলিতেন, "এই আমার লক্ষ্মী"। এই শঙ্খ পাওয়া অবধি তাঁহার কোনও অভাব ছিল না। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ প্রণাম করেন, এবং সামর্থ্য থাকিলে, কিছু প্রণামীও দিতে হয়। সন্ন্যাসী এই শঙ্খ দেখাইয়া পূজার জন্ম ভক্তদের নিকট যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন। অক্ষয়ানন্দ তন্ত্র মতে চলিতেন; সুতরাং 'ম' পঞ্চক তাঁহার প্রয়োজন হইত। এমন কি, দিনের বেলায়ও সুরার বোতল ও পানপাত্র লইয়া প্রকাশ্য পথে টলিতে টলিতে যাইতেন।

এই সময়ে কালীঘাটে "পূর্ণবাবু" নামক এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মাথায় কেশাদি ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারীর মত আচরণ করিতেন। তাঁহার একটি পুস্তকের দোকান ছিল। সেই দোকানের পশ্চিমভাগে তিনি আসন করিয়াছিলেন। এই আসনে কুড়ি পঁচিশ জনের বসিবার স্থান হইত; এবং প্রাতঃকালাবধি প্রায় শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত গঞ্জিকার ধূম উড়িত। নানাপ্রকার সাধু, অবধূত, যোগী, এবং ভৈরবীগণের এই স্থানে আগমন হইত, এবং পূর্ণবাবু সকলকেই যত্নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিতেন। অক্ষয়ানন্দ কালীঘাট ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এই পূর্ণবাবুর আসন (অর্থাৎ আড্ডা) আশ্রয় করিলেন।

অক্ষয়ানন্দ এই স্থানে নিজের ধর্ম্মমতে সাধনা করিতে থাকিলেন। কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, অপর একটী লোক এই আসনে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহস্থ, এবং ইংরাজি এবং সংস্কৃত জানিতেন। এই লোকটী পূর্ণ বাবুর পরিচিত, এবং কালীভক্ত বলিয়া সকলে ইঁহাকে আদর করিত। ইনি প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে কালীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দেবী দর্শন করিতেন। ঝড় হউক, জল হউক, এই ভদ্রলোক প্রতি দিন কালীঘাটে আসিতেন। বাটী ফিরিবার সময় পূর্ণবাবু ইঁহাকে ডাকিয়া আসনে বসাইতেন।

যে সময়ে অক্ষয়ানন্দ ঐ স্থানে ছিলেন, একদিন বড় ঝড়-বৃষ্টি হইতে-ছিল। কথিত ভদ্রলোকটি পূর্ণবাবু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঐ আসনে গিয়া দেখিলেন, আসনের উত্তর দিকে অক্ষয়ানন্দ বাঘছাল ইত্যাদিতে শোভিত হইয়া তন্ত্র এবং তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত ছিল, গঞ্জিকা এবং পান পাত্র পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। ভদ্রলোকটি এই সকল দেখিয়া প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে-ছিলেন; কারণ, তিনি কালীভক্ত হইয়াও বামাচারী ছিলেন না, গঞ্জিকার ধূম, অথবা সুরা পান করিতেন না। কিন্তু পূর্ণবাবুর অনুরোধে বৃষ্টির অবসান পর্য্যন্ত বসিতে স্বীকার করিলেন। এই সময়ে অক্ষয়ানন্দ উৎফুল্ল নেত্রে বলিয়া উঠিলেন,

"——আগমে পারা,
যো রাখে সো গুরু হামারা।"

সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের এ কথা বুঝিবার অসুবিধা হইবে; এজন্য ইহা বিশদ ভাবে লিখিলাম। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, পারা ভস্ম করিতে পারিলে, তাহা দ্বারা তাম্র ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া সুবর্ণ হয়। এই জন্য সন্ন্যাসীরা পারা ভস্ম করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারদ ধাতু বহ্নি সহযোগে ভস্ম না হইয়া জলের মত উবিয়া যায়। যিনি এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই ইহা জ্ঞাত আছেন।

পারদ ধাতু অগ্নিতে থাকিবে, আর উহার ওজন কম হইবে না, এই প্রকার করিতে পারিলে উহা ভস্ম হইবে; সেই ভস্মই স্পর্শমণির (পরশ পাথর) গুণ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এই কর্ম্ম বড় কঠিন। ইহা যিনি করিতে পারেন, তিনি গুরু নামের উপযুক্ত ব্যক্তি।

পূর্ণবাবু অক্ষয়ানন্দকে বলিলেন, "এই ভদ্রলোক পারা আগুনে রাখিতে পারেন।" অক্ষয়ানন্দ লোকটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি ঠাকুর, তুমি না কি পারা ভস্ম করেছ?"

ভদ্রলোক। "আমি ঠাকুর নই। রাজপুতদিগকেই ঠাকুর বলে। আমি ব্রাহ্মণ।"

অক্ষয়ানন্দ। "ভাল, ঠাকুর নাই বলিলাম,—তুমি বল দেখি, কি প্রকারে অগ্নিতে পারা রাখিতে পারা যায়?"

ভদ্রলোক। "পারদ ধাতুর অষ্ট কঞ্চুক আছে। শাস্ত্রে বলে,—

নাগবঙ্গৌমলোবহ্নিঃ চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরি।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষাঃ নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ॥

নাগ অর্থে সীস ধাতু, বঙ্গ রাঙ্গ, মল, বহ্নি (latent heat) চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি, এবং অসহ্যাগ্নি, এই আট দোষ পারদে থাকে। এক একটি করিয়া ঐ দোষ নষ্ট করিতে হয়। ঐ অষ্ট দোষ নষ্ট হইলে পারদ মূর্চ্ছিত (অর্থাৎ গুঁড়া) হইয়া যায়। তার পরে উহা অগ্নিতে রাখিলে, আর উবিয়া যায় না, ভস্ম হয়।"

অক্ষয়ানন্দ। "কত দিনে তোমার এই অষ্ট দোষ নষ্ট হয়?"

ভদ্রলোক। "এক একটি দোষ নষ্ট করিতে সাত দিন, মোট ছাপ্পান্ন দিনে পারদ দোষমুক্ত হয়।"

অক্ষয়ানন্দ। "সে তো বড় বিষম কথা। আচ্ছা আর কোনও উপায় তোমার জানা আছে?"

ভদ্রলোক। "আপনি কি চাহেন? পারাভস্ম?—না কেবল পারা অগ্নিতে রাখিতে চাহেন?"

অক্ষয়ানন্দ। "মারে ডাণ্ডা, ছাড়ে ভূত, তার নাম অবধূত! আমি অবধূত, আমি অত খাটা খাটুনির ধার ধারি না। আমি চাই, জোর করিয়া আগুনে পারা রাখিব। তুমি এমন কোনও উপায় জান কি না?"

ভদ্রলোক। "তাহাও হইতে পারে। একটা লৌহের গোলা ঢালাই করিয়া তাহার মধ্যে অল্প পারা রাখিয়া, লৌহময় ইস্ক্রু দ্বারা আঁটিয়া, সেই গোলার মধ্যগত করিয়া পারদে অগ্নি দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে কিন্তু পারা ভস্ম হয় না, যেমন পারা তেমনি থাকিবে। এই ক্রিয়া বিপজ্জনক।"

অক্ষয়ানন্দ। "কি বিপদ?"

ভদ্রলোক। "লৌহ গোলার যেটুকু সামর্থ্য, সেই পরিমাণ পারদ উহাতে থাকিতে পারে। অধিক পারদ হইলে, ঐ গোলা ফাটিয়া পারদ নির্গত হইবে। এই কার্য্য খুব নির্জ্জন স্থানে করিতে হয়।"

অক্ষয়ানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে বৃষ্টি থামিয়াছিল, সুতরাং ভদ্রলোকটি বিদায় হইলেন।

হায়! এই পারাভস্মের জন্য কত লোক কত প্রকার চেষ্টাই না করিয়াছেন! কত লোক পারা ভস্ম করিতে গিয়া, নিশ্বাস-পথে পারদের বাষ্প টানিয়া জন্মের মত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন! অক্ষয়ানন্দের মত স্বল্পবুদ্ধি মত্তপের দ্বারা কি এই কার্য্য সম্ভব? কখনই না। কিন্তু মদিরা অপেক্ষা ধনলালসা মানুষকে অধিকতর উন্মত্ত করিয়া থাকে। অক্ষয়ানন্দ এই কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কোনও লৌহ-ঢালাই কারখানা হইতে লোহার নিরেট গোলা ঢালাই করানো হইলে, ইস্ক্রু-কাটা লেদ্ যন্ত্রে তাহার মধ্যে ইস্ক্রু যুক্ত গর্ত্ত এবং তাহার ইস্ক্রু যুক্ত ছিপিও প্রস্তুত হইল। তাহার মধ্যে সাধারণ পারদ ভরিয়া ছিপি কাচের গুঁড়া দিয়া বন্ধ করা হইল।

যে কয় দিন এই সকল যোগাড়যন্ত্র হইতেছিল, সেই কয় দিন পূর্ণবাবুর আড্ডায় "ম" পঞ্চক খুব আড়ম্বরে চলিয়াছিল। পূর্ণবাবুর আড্ডা খুব জাঁকিয়া উঠিল। এক বাবাজী আসিয়াছেন, লোহার গোলা করিয়া পারাভস্ম হইবে। সেই ভস্ম এক রতি ও তামা ৫২ ভরি একত্র করিলে, ৫২ ভরি পাকাসোণা প্রস্তুত হইবে, এই সকল কথার জল্পনা হইতে লাগিল।

যে লোকটির নিকট অক্ষয়ানন্দ লৌহগোলকের কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদিন কালীঘাটে আসিলেও, এই ব্যাপার তাঁহার নিকট গোপন করা হইল। সত্য সত্যই যে অক্ষয়ানন্দ লৌহগোলকের মধ্যগত করিয়া পারদ ধাতু অগ্নিতে রাখিবেন, এ কথা অক্ষয়ানন্দ তাঁহাকে জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কোথায় ভস্ম করা হইবে? এই বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির হইল যে, টালিগঞ্জ পুলের দক্ষিণে তর্পণঘাটা নামে এক নির্জ্জন শ্মশান আছে,—সেই স্থানেই এ কার্য্য করিতে হইবে। সেই স্থানে "গোপাল গির্" নামক এক বৃদ্ধ অবধূত একটি ছোট আশ্রম করিয়া, কিছু দিন সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। গোপাল গির্ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলে, আশ্রম শূন্য পড়িয়া ছিল। অক্ষয়ানন্দ এবং তাঁহার বন্ধুগণ সেই স্থানেই সেই পারদপূর্ণ লৌহগোলককে অগ্নি দিবার সংকল্প করিলেন।

এই স্থলে পাঠকগণকে "পারদ ভস্ম" সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব। আমাদের কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে ইহা বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, পারদের ভস্ম দ্বারা তাম্রধাতুকে সুবর্ণ করা যায়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই বিদ্যা এখনও দেখা যাইতেছে। ইয়োরোপ মহাদেশেও এই বিদ্যা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারা বর্ত্তমান কালে র‍্যাডিয়ম্ তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা বলেন, র‍্যাডিয়মের নিকট কোনও ধাতু রাখিয়া দিলে, তাহা নিকৃষ্ট ধাতু হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ এই যে, সোণা রাখিলে রৌপ্য হইয়া যায়। তাম্র ধাতু রাখিলে তাহা সীস ধাতু হয়। এ অবস্থায় আমরা কি বুঝিব?—বাধ্য হইয়াই আমাদের বলিতে হইতেছে যে, শতাধিক বৎসরের পুরাতন Atomic Theory একেবারে নির্ভুল নহে। কোন অজ্ঞাত শক্তি এমন থাকিতে পারে, যদ্দারা ধাতু সকলের উন্নতিও হয়। পারদ ভস্মের সেই শক্তি আছে, ইহা সন্ন্যাসীরা বলেন। 'রসেশ্বর দর্শন' নামে এক শাস্ত্র আছে, তাহা কেবল এই পারদ লইয়া সাধন-পদ্ধতি। ইহা ছাড়া আমাদের তন্ত্র-শাস্ত্রেও পারাভস্ম করিবার বহু পদ্ধতি রহিয়াছে।

এতদ্দেশে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন, গহনানন্দনাথ, গোরক্ষনাথ, পরশ্‌নাথ প্রভৃতি যোগিরাজগণ এই বিষয়ে বহু শ্রম করিয়াছেন। কথিত আছে, উপরিউক্ত মহাপুরুষগণ সকলেই ইচ্ছামত সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

এই সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কিম্বদন্তিও আছে।—

(১) "তেরি গন্ধক মেরি পারা
নাগ্নাগিনীসে কর সঞ্চারা,
নাগ রসসে নাগিনী রস দেনা,
ঝট্‌পট্ কাঞ্চন কর্‌লেনা।

(২) "মুসাকাণি ছটফটিকা দুর্ব্বাতলে বাসা,
রস নিঙ্গাড়্‌কে বঙ্গ মে দিয়ে চাঁদি হোয়ে খাসা"

(৩) কহনা কেমনে সখি, রামকৃষ্ণ এক দেখি
রামকৃষ্ণ একতনু, এই তো শুনিয়াছিনু,
সুনীল মেঘের বর্ণ হবে দুর্ব্বাদল শ্যাম,
শ্রীরামের বামে সীতা লক্ষ্মীদেবী অনুপাম্।"

প্রথম কবিতার ব্যাখ্যা আমি করিতে পারি না। নাগ অর্থে সীসা, নাগিনীরস সর্পবিষ (?) অথবা কোন ধাতু হইতে পারে, সুতরাং ঐ কয়টি কথা গুরুমুখগম্য। দ্বিতীয় কবিতার অর্থ এই—মুসাকাণি এবং

ছটফটিকা নামে ছোট ছোট গাছ, যাহা দূর্ব্বা ঘাসের নীচে জন্মে, তাহার রস রাঙ্গ অথবা কাংসে দিলে, চমৎকার রৌপ্য হইয়া থাকে।

ঐ সকল কথার বিস্তার এ প্রবন্ধে করিব না, এক্ষণে অক্ষয়ানন্দের কথাই বলা আবশ্যক।

যে দিন অপরাহ্নে অক্ষয়ানন্দ দলবল লইয়া তর্পণঘাটা নামক শ্মশানে গিয়াছিলেন। সেই দিন ঐ ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া "পঞ্চমকার" * সংগ্রহ করা হইয়াছিল। অক্ষয়ানন্দের পূজার কালে ঐ "পঞ্চমকার" আবশ্যক হইবে, সুতরাং পারাভস্ম করিতে উহার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল।

হায়, শাস্ত্র-কথা সকলের কুব্যাখ্যার ফলে, তন্ত্রানুষ্ঠান সকল এক্ষণে অতি জঘন্য ভাব ধারণ করিয়াছে। অক্ষয়ানন্দের ন্যায় মূর্খেরা মনে করে, দেবতাকে মদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে কলিকালে তন্ত্রাদির উল্লিখিত অনুষ্ঠান আশু সিদ্ধি প্রদান করে। দেবতারা যেন মদ্য মাংসাদির জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন।

সেই নির্জ্জন শ্মশানের এক পার্শ্বে গজপুট † প্রস্তুত করিয়া, তাহার নীচে কাঠ-কয়লার অগ্নি রাখিয়া পুটের অর্দ্ধেক ঘুঁটিয়া দ্বারা পূর্ণ করা হইল; তাহার উপরে পারদ পূর্ণ লৌহ গোলক রাখিয়া তদুপরি আরও ঘুঁটিয়া দিয়া পুট পূর্ণ করা হইল। ক্রমশঃ ধোঁয়া হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই উপরিস্থিত ঘুঁটে ধরিয়া অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

অক্ষয়ানন্দ সেই সময়ে পঞ্চমকার সহকারে জপ করিতেছিলেন। এই সময়ে একজন সেই প্রজ্বলিত গজপুটের নিকট গিয়া দেখিল যে, লৌহ-গোলক অগ্নিবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে ব্যক্তি সেই কথা অক্ষয়ানন্দকে জানাইল—

"বাবাজী, গোলা লাল হইয়াছে।"

সেই কথা শুনিবামাত্র অক্ষয়ানন্দ চিম্‌টা লইয়া উঠিল। তখন মদের নেশায় তাহার পা টলিতেছিল। এই সময়ে সকলেই তাহাকে বলিল, ঐ অগ্নিবর্ণ গোলা উঠাইবার প্রয়োজন নাই। উহা শীতল হইলে, উহা হইতে ভস্ম লইবেন। কিন্তু মৃত্যু উপস্থিত হইলে, লোকে ভাল কথায় কর্ণপাত করে না, অক্ষয়ানন্দও করে নাই। চিম্‌টা ফাঁক করিয়া সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে গোলা উঠাইয়া তাহা নিকটে রাখিল। সেই অন্ধকার রাত্রিতে অগ্নিবর্ণ গোলার মূর্ত্তি দেখিয়া, এবং মাতাল সন্ন্যাসী তাহার উপর চিম্‌টার আঘাত করিবে, ইহা ভাবিয়া, সকলেই দূরে পলাইয়াছিল। নিকটেই একটা গভীর পয়নালা ছিল। অনেকেই তাহার নীচে নামিয়া বসিয়া ছিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই কামানের মত একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, এবং সেই স্থানে একটা শ্বেতবর্ণের ধূম দ্বারা সকল বস্তুই আচ্ছন্ন হওয়ায় প্রথমতঃ কিছু বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, সন্ন্যাসী গড়াইতে গড়াইতে গঙ্গার জলে গিয়া পড়িল। গঙ্গায় জল অল্প ছিল, হাঁটু ডুবে না। অক্ষয়ানন্দ জলের উপরেও পাক খাইতে খাইতে পূর্ব্বপারে একটা ছোট খড়ের গাদার উপর গিয়া পড়ে। সেইখানে কিছুকাল (২ মিনিট) হাত পা আছড়াইয়া স্থির হয়।

গঙ্গার পশ্চিম পারে যাহারা ছিল, সকলেই পলাইল। কেহ করুণাময়ীর মন্দিরাভিমুখে, কেহ কেহ কালীঘাটে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পর দিবস পুলিস প্রমুখ কতিপয় লোক যাইয়া এই অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর পেটে বিপুল ক্ষত, এবং পেটের মধ্যে সেই লৌহ গোলকের খণ্ড সকল দেখিতে পাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী পারা ভস্ম করিতে গিয়া মরিয়াছে, এই বুঝিয়া তাহার দেহের অগ্নিসৎকার করা হইয়াছিল।

হায় অক্ষয়ানন্দ! তুমি এত দিনে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসরের হইয়াছ। এ জন্মেও কি আবার ঐ বুদ্ধি মাথায় প্রবিষ্ট হইয়াছে? আবার কি পারা লইয়া ঘষা-মাজা চলিতেছে? আশা করি, এবার পারদ ধাতুকে দণ্ড দ্বারা মারিয়া বাধ্য করিবে না; এবার উহাকে শিবরূপে পূজা করিয়া দেখ, রসায়ন কল্প সুসিদ্ধ হয় কি না!

---

* পঞ্চমকার কি, তাহা তন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

† এক হস্ত ব্যাস এবং দুই হস্ত প্রমাণ গভীর গর্ত্তকে গজপুট বলে।

আমিনা বিবির আত্ম-কথা

রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর

একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একখানা বাড়ী, তাহার চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। বাড়ীতে চারি ভিটায় চারিখানি খড়ের ঘর ও মধ্যে উঠান। ইহা একজন মুসলমান কৃষকের বাড়ী হইলেও, সাধারণ কৃষকের বাড়ী অপেক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চাল-ঘরের মাটীর দাওয়াগুলি উত্তমরূপে নিকান। উঠানটিতে একটুও আবর্জ্জনা নাই, যেন ঝকঝক্ করিতেছে।

আমি এক দিন কার্য্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে গিয়াছিলাম। বেলা অনুমান ৩টার সময় নদী পার হইয়া ঘাটের নিকটে একটা বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম। সেই ঘাটের পশ্চিমেই ঐ কৃষকের বাড়ী। দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক কলসী কাঁখে করিয়া নদীতে জল আনিতে যাইতেছে। আমি দেখিয়া অবাক হইলাম, এরূপ তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা রমণী ঐ গরিব মুসলমান কৃষকের গৃহে কোথা হইতে আসিল? তাহার চেহারা দেখিয়া তাহাকে ভদ্রঘরের হিন্দু রমণী বলিয়া বোধ হইল। বয়স প্রায় ৩০ হইবে, বেশী লজ্জা-সরমের ধার ধারে না। সে জল লইয়া ফিরিবার সময় আমার ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ আছে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল,—

"আপনি কোথায় যাবেন? আপনার নাম কি?" আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলাম,—"আমার নাম রসিকলাল সেন, আমার বাড়ী নিশ্চিন্তপুর, আমি ঐ সদরপুর গিয়াছিলাম, এখন বাড়ী ফিরিতেছি। ও বাড়ী কার?" "ও বাড়ী তোরাপ ফকিরের। ফকির মারা গিয়াছে। আমি এখন দুইটি ছেলে নিয়ে ওখানে থাকি। আপনি তামাক খাবেন? আসুন, ঐ বাহিরের ঘরে বসিবেন।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাহিরের ঘরে একটা মোড়া ছিল ও তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম—হুঁকা, কল্কে প্রভৃতি ছিল। স্ত্রীলোকটি আমাকে সেখানে বসিতে বলিয়া জলের কলসী রাখিতে অন্দরে গেল, এবং একটা মালসায় আগুন লইয়া আসিয়া আমাকে তামাক সাজিয়া খাইতে বলিল।

আমি তামাক সাজিতে বসিয়া গেলাম। সে বলিল—"আমার ছেলে দুইটি স্কুলে গিয়াছে, বড়টির বয়স দশ বৎসর, ছোটটির বয়স সাত বৎসর। এ বাড়ীতে আমার এক বুড়া সতীন আছে, তার বড় ব্যারাম, ঐ ঘরে শোওয়া।"

আমি তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলাম,—"তোমার চেহারা দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তোমাকে হিন্দুর মেয়ে বলিয়া বোধ হইতেছে। তোরাপ ফকিরের সঙ্গে তোমার কিরূপে বিয়ে হ'লো? যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বল।"

সে কিছু দূরে অন্দরের দিকের দরজায় বসিয়া বলিল,—"আমার সেই দুঃখের কথা যখন আপনি শুনিতে চাহিতেছেন, তবে আমার বলবার কোন বাধা নাই। দেশশুদ্ধ লোক যাহা শুনিয়াছিল, যাহা লইয়া এক সময়ে মস্ত একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, সে কথা আপনাকে বলিব না কেন? আমি যথার্থই হিন্দুর মেয়ে, এক সময়ে হিন্দুর বৌ ছিলাম। হিন্দুর রক্ত এখনও আমার শরীরের মধ্যে আছে, তাই কোন হিন্দু ভদ্রলোক দেখিলে যাচিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা করে। আপনার কলিকার আগুনটা ধরিল না বুঝি—দেন কলিকাটা আমার হাতে, আমি ফুঁ দিয়া দিই।"

আমি বলিলাম—"না—এই আগুন ধরেছে—কলিকায় তামাক খাওয়া ত আমার অভ্যাস নাই—"

"কি করিব—এখানে যে হুঁকা আছে তা' আপনাকে দিতে পারিব না। আচ্ছা, একটু কলার পাতা আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া সে উঠিয়া একটুকরা কলার পাতা আনিয়া একটা ঠোঙ্গা করিয়া দিল। আমি তাহার মধ্যে কলিকা

বসাইয়া তামাক খাইতে লাগিলাম। তখন সে আবার বলিতে লাগিল—

"আমার বাপের বাড়ী ছিল লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রামে, আমার বিবাহ হইয়াছিল সনাতনপুর ঘোষেদের বাড়ী। আমার নাম ছিল মৃন্ময়ী, ডাক নাম মিনী,—তাহা হইতে হইয়াছে আমিনা। আমার বয়স যখন এগার বৎসর, তখন আমার বাবা মারা যান,—আমার মা আগেই স্বর্গে গিয়াছিলেন। তখন আমার কাকা হইলেন আমার অভিভাবক। সংসারে এক কাকীমা ভিন্ন আর স্ত্রীলোক ছিল না। তাঁহার দুইটি ছোট ছেলে ছিল। আমার একটি সহোদর ভাই ছিল, সে আমার ৩।৪ বৎসরের বড়। সে গ্রামের স্কুলে লেড়াপড়া করিত। আমার কাকার সব গুণ ছিল,—আমাকে আপন সন্তানের মত দেখিতেন; কিন্তু তাঁহার এক প্রধান দোষ ছিল, তিনি বড় মদ খাইতেন।

"আমার বিবাহের বয়স হইয়াছে দেখিয়া কাকা পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। সনাতনপুরের অমুক ঘোষ (এখনও তাহার নাম মুখে আনিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, সেজন্য নাম করিলাম না)—সে ছিল আমার কাকার মদের এয়ার। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা থানা ছিল, সে সেই থানায় কাজ করিত এবং প্রায়ই সন্ধ্যার পরে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাকার সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া মদ খাইত। নিজের রূপ-গুণের কথা নিজের মুখে বলা মহাপাপ। এখন যেটুকু দেখিতেছেন, তাহা হইতে অবশ্য বুঝিতে পারেন, সেই উঠন্ত বয়সে আমার রূপ ছিল,—তাহাই আমার কাল হইল। সেই ঘোষও দেখিতে বেশ সুপুরুষ ছিল; কিন্তু তাহার বয়স তখন ত্রিশের উপরে। আর তাহার প্রথম পক্ষের এক স্ত্রী ছিল; কিন্তু সে না কি দেখিতে কুৎসিত বলিয়া সে তাহাকে লইয়া ঘর করিত না। সে নিজের রূপের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কেবল সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইত। সে পুলিসের জমাদারী চাকরি করিত, সেই সুযোগে নিজের কুবাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগও পাইত।

"আমার কাকা যখন আমার বিবাহের পাত্র খুঁজিতে-ছিলেন, তখন সে আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া কাকাকে ধরিয়া বসিল। কাকা তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না; বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন, এ লোকটা একটা সরকারী চাকরি করিতেছে, বিষয়-সম্পত্তিও কিছু আছে; সুতরাং ভাত কাপড়ের কষ্ট হইবে না, আর টাকাও কিছু দিতে হইবে না। এইরূপে সেই ঘোষের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহের পরে সে আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ হইবে। সংসারে তাহার এক সৎমা ছিলেন। তাঁহাকে সে দেখিতে পারিত না। তিনি পৃথক হইয়া থাকিতেন। সেই অল্প বয়সেই আমার উপর সংসারের ভার পড়িল। আমি অনেক সময়ে তাহার মনের মত কাজ করিতে পারিতাম না, সে জন্য সে আমাকে মারধর করিত। ক্রমে আমার বয়স বাড়িল, কিন্তু তবুও তাহার মনজোগান আমার পক্ষে কঠিন হইত। সে মদ খাইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। এই ভাবে দুই বৎসর কাটিল। তখন ঘুস লওয়া অপরাধে তাহার পুলিসের চাকুরি গেল। তখন দেশে থাকিলে আর চলে না,—সে চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় গেল। আমাকে আমার কাকার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

"ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে কাকার মৃত্যু হইয়াছিল। সেখানে সংসারের অভিভাবক একমাত্র কাকীমা। আমার দাদা তখন গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া মহকুমার স্কুলে পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে কুসঙ্গে পড়িয়া তাহার স্বভাব খারাপ হয়। আমি তাহার নিকট কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, অধিকাংশ ছাপার বই পড়িতে পারিতাম। দাদা যখন বাড়ী আসিত, তখন সে কত বাঙ্গলা বই সঙ্গে আনিত। আমি সেগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িতাম। কিন্তু তাহার মধ্যে ভাল বই প্রায়ই থাকিত না। আমার বোধ হয় সেই সকল বই পড়িয়াই দাদা বেশী গোল্লায় গিয়াছিল। তবে, এ কথা পরে শুনিয়াছি, আমার স্বামীই না কি তাহাকে মদ খাওয়াতে হাতে-খড়ি দিয়াছিল।

"একটা কথা আছে, সৎসঙ্গে কাশীবাস—অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। আমার কোন সৎলোকের সঙ্গ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ঐ সকল খারাপ বই আমার অসৎসঙ্গের কাজ করিয়াছিল। ঐ সকল বই পড়িতে পড়িতে সময় সময় আমার রক্তে যেন আগুন ধরিয়া যাইত। কিছু দিন পরে আমার ফিট্ হওয়া আরম্ভ হইল। আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে নানা কারণে হিষ্টিরিয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে

সময়ে পাড়াগাঁয়ের লোকে এই রোগের প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, আমার উপ্‌র ভূতের দৃষ্টি হইয়াছে, কেহ বলিল কালীর ভর,—ইত্যাদি। কাকীমা সেই সকল লোকের পরামর্শে নানা প্রকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কেহ জলপড়া খাওয়াইল, কেহ মন্ত্র পড়িয়া হাতে লাল সূতা বাঁধিয়া দিল, কেহ মাথার চুলের সঙ্গে মাদুলি বাঁধিয়া দিল। আবার এক জনের ব্যবস্থা অনুসারে আমাকে এক শনিবার সন্ধ্যাকালে বিবস্ত্রা হইয়া বাগান হইতে একটা গাছের শিকড় আনিয়া গলায় ঝুলাইতে হইল। কিন্তু এত করিয়াও কোন ফল হইল না।

"আমার যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন এই বাড়ীর তোরাপ ফকির আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইল। এ ব্যক্তি চাষবাস করিত, আবার ফকিরামি করিয়াও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিত। ইহার নানা স্থানে অনেক শিষ্য ছিল। আমার কাকার বাড়ীর নিকটে ইহার এক শিষ্যবাড়ী ছিল,—সেখানে সে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিল। সে অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানিত,—অনেক লোক তাহার নিকট মাদুলী, কবচ, তেলপড়া, জলপড়া, সূতাপড়া লইতে আসিত। সে ভূর্জ্জপত্রে লাল কালী দিয়া কি সব মন্ত্র লিখিয়া দিত, লোকে তাহাই তামার মাদুলীতে পুরিয়া গলায় বা কোমরে ধারণ করিত। আপনি এখন যে ঘরে বসিয়া আছেন, এখানে বসিয়া এই সব কাজ হইত। কোন গ্রামে কলেরা হইলে, গ্রামী লোকেরা চাঁদা করিয়া তাহাকে লইয়া যাইত। সে যাইয়া গ্রামের চারি কোণে মন্ত্র পড়িয়া শিকড় পুঁতিয়া দিয়া আসিত, আর রোগীকে জলপড়া খাওয়াইত। এক গ্রাম হইতে কলেরা বা গরুর মড়ক অন্য গ্রামে তাড়াইয়া দেওয়ারও না কি তার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আমি এ সকল বিশ্বাস করি না।

"তাহার গুণ-জ্ঞানের কথা শুনিয়া আমার কাকীমা এক দিন তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। সে আমার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ইহার উপর কালীর "দেষ্টে" হইয়াছে,—আমি আস্‌ছে অমাবস্যা রাত্রে একটা ঘরে বসিয়া কালীর পূজা করিব, ইহাকে সেখানে আনিতে হইবে, ঘরে আর কেহ আসিতে পারিবে না, পূজাতে জবা ফুল, ধূপ ধুনা লাগিবে। কাকীমা সম্মত হইলেন, কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে একলা এক ঘরে বসিয়া থাকিতে প্রথমে স্বীকার করি নাই। কাকীমা নিতান্ত জেদ করিতে লাগিলেন—"তোর ভয় কি? আমি ত পাশের ঘরেই থাকিব, ও ফকিরের নাম ডাক আছে ভাল,—দেখি, তোর যদি ব্যারামটা সারাইতে পারে।" আমি অগত্যা সম্মত হইলাম।

সেই অমাবস্যা রাত্রে ফকির আমাদের বাড়ীতে আসিল। তাহার বয়স তখন প্রায় ৩০ বৎসর, চেহারা কালো কোলো, গড়ন খুব বলিষ্ঠ। আমাদের পশ্চিমদ্বারী খড়ো ঘরের মধ্যে তাহার আসন হইল। সে ঘরটা আগে পরিষ্কার করিয়া লেপান হইয়াছিল। ঘরে ধূপ ধুনা জ্বালা হইল ও আমাকে তাহার সম্মুখে একখানা আসনে বসাইয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন আমার ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু কাকীমা তাহার পাশে দক্ষিণদ্বারী ঘরে বসিয়াছিলেন, সেজন্য কিছু বলিলাম না। সে প্রথমে একটা ঘটিতে জল পড়িয়া সেই জল আমাকে খাইতে বলিল, আমি এক চুমুক খাইলাম। পরে আমার মাথায় একটা জবা ফুল বাঁধিয়া দিয়া আমাকে চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে বলিল। সে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল, এবং সময় সময় "আয় কালী আয়—কার আজ্ঞা? শিবঠাকুরের আজ্ঞা" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে লাগিল। সে আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এই রকম প্রায় এক ঘণ্টা থাকার পর আমার চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। তখন গভীর রাত্রি, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। আমাদের বাড়ীর চারিদিকে বাগান ও জঙ্গল,—কাছে আর কোন বাড়ী ছিল না। কাকীমা বোধ হয় তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ফকির আমাকে তখন বলিল—"দেখ, তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে, তুমি লজ্জা করিও না, কালী যেমন এক পা সামনের দিকে আর এক পা পিছনের দিকে দিয়া বিবস্ত্র হইয়া দাঁড়ান, তোমাকেও সেই ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। তোমার মধ্যে কালী আসিবেন, আমি তাঁহার পূজা করিব।" আমি তাহার এই লজ্জাজনক কথা শুনিয়া কিছুতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম না। পরে সে আমার মাথায়, কপালে ও চোখে হাত বুলাইয়া দিল,—তখন আমার চোখ যেন

দেখিয়া আমিনা বলিল—"ঐ দেখ্, উনি তোদের মামু—উঁকে সেলাম কর।"

শিশু দুটি আমার কাছে আসিয়া সেলাম করিল—আমি তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। আমিনা আমার জলখাবার বাতাসা আনিয়া দিয়া বলিল, "ঘরে ভাল পাকা কলা আছে, তাহার দুটা দিই?" আমি কলা আনিতে সম্মতি দিলাম।

আমি যখন উঠানে বসিয়া জলযোগ করিলাম, তখন সে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আমি যখন বিদায় হই, তখন সে তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাতে নেকড়ায় বাঁধা আর কতকগুলি কলা গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

"দাদা, এগুলি বাড়ী গিয়া ছেলেদের দিবেন।"

তাহার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমার চোখে জল আসিল। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই হরিবংশ। আবার অনেকে বলেন—বেদপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ। রামায়ণেও শ্রীকৃষ্ণ। এ ত গেল সংস্কৃতে। বাঙ্গলার লোক কি বলে? কানু ছাড়া গীত নাই। সেই শ্রীকৃষ্ণকে, সেই কানুকে একখানি নাটকের মধ্যে আনা সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। অনেকে বলিবেন, সামান্য ধৃষ্টতার কর্ম্ম নহে। সাহসই হোক আর ধৃষ্টতাই হোক, অপরেশবাবু আনার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আনিয়াছেন। ভগবানের সর্ব্বতোমুখ উদ্যম, সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা এবং সর্ব্বতোমুখী বিভূতিকে সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই উহাঁর একটীমাত্র বিভূতি ভূভারহরণকে বীজ করিয়া অপরেশবাবু এই অপূর্ব্ব নাটকের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

তেমনি এই শ্রীকৃষ্ণ নাটকেরও আদাবন্তে চ মধ্যে চ পৃথিবীভার হরণং সর্ব্বত্র গীয়তে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বড় একটা নাই। কেবল দানলীলা ও অক্রূর সংবাদ, ভূভার-হরণের সূচনা মাত্র। তার পর কংস-বধ, জরাসন্ধ-বধ, শিশুপাল বধ, কৌরব-বধ—সবই আত্মীয়-স্বজনের বধ। তার পর নিজ বংশ যদুবংশ ধ্বংস, তার পর আত্মনিপাত. নিজেরও ধ্বংস। এই ভূভার-হরণের শ্রীকৃষ্ণ অপরেশবাবু গাহিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকেই ভূমির ভার বোধ করিয়াছেন, তাহাকেই সরাইয়াছেন, তাহার বেলায় তিনি পক্ষপাতশূন্য। প্রথম মামা, তার পর মামার শ্বশুর, তার পর পিস্তুতা ভাই। তার পর কুরুকুল, সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণ, কর্ণ. ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, যুধিষ্ঠিরাদির পঞ্চপুত্র—সব সরাইলেন। শেষ সাত্যকি প্রভৃতি যদুবংশকে, শেষ নিজেকেও। কাহাকেও ছাড়েন নাই। তিনি নানা উপায়ে নানা দেশের নানা লোক বিনাশ করিয়া আপনাকেও ভার মনে করিয়াছিলেন,—তাই ব্যাধ-হস্তে নিজেও মরিলেন। বাঁচাইলেন কাদের—যাদের ভূভার বলিয়া মনে করেন নাই। যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভাই আর উত্তরার গর্ভস্থিত পরীক্ষিৎ। পঞ্চপাণ্ডব কি পাপিষ্ঠ নয়? না, কোন মতেই নয়। কারণ, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানিতেন; তাই তাঁহার হস্তে আপনাদের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে পাপ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, আদেশে এবং ধমকে। সুতরাং তাঁহারা ভূভার হইতে পারেন না। যাঁহারা ভগবানের কথাতেও অধর্ম্ম করিতে সঙ্কোচ করে, তাহাদের ভূভার বলিবে কেমন করিয়া?

ভূভার হরণ করিয়া ফল কি হইবে? যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক রাজার অধীন সব একচ্ছত্র হইয়া যাইবে। পৃথিবীর সুখসমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিবে। এই কথাই ত অপরেশবাবু শ্রীকৃষ্ণের মুখে বলাইয়াছেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তবে একচ্ছত্র রাজত্বগুলা ভাঙ্গে কেন? রোম ভাঙ্গিল কেন? মাকদন ভাঙ্গিল কেন? তিন চারিবার পারস্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল কেন? জেঙ্গিস খাঁর রাজত্ব ভাঙ্গিল কেন? তৈমুরের রাজত্ব ভাঙ্গিল কেন? মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল কেন? সেগুলাও সময়ে সময়ে ভূমির ভার হইয়া উঠে! তাই ভাঙ্গে। অথবা ভগবান্ ভাঙ্গিয়া দেন। যাক্, তা লইয়া অপরেশবাবুর সঙ্গে বা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিব না। তাঁহার যেমন ভাল বোধ হইয়াছে. তিনি তেমনি লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত ভারতে একচ্ছত্র সম্রাট্ করিয়া দিয়া আপনিও ভূভার-মধ্যে গণ্য হইয়া ব্যাধ-হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নাটকও ফুরাইল।

আজ বিংশ শতক,—দ্রুতযানের অভাব নাই। রেল হইয়াছে, ষ্টীমার হইয়াছে, উড়ো কল হইয়াছে, হাওয়া গাড়ী হইয়াছে, ক্রমে দ্রুতগতি আরও বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাটকের মত দ্রুতগতি কোথাও দেখি নাই। যেন স্পেশাল মেল ট্রেণ, রোড সাইড ষ্টেশন লক্ষ্যই করে না, সব মেল ষ্টেশনেও দাঁড়ায় না, একেবারে পাঁচ সাতটা মেল ষ্টেশন বাদে দাঁড়ায়। ভীষণ গতি। প্রায় একশত বৎসরের

বিপুল কাণ্ড আড়াই শত পৃষ্ঠায়। গ্রীকেরা হইলে অপরেশবাবুকে মারিয়াই ফেলিত; তাহারা এক নাটকের একই স্থান ও একই কাল চায়। আর এ নাটকে—এই মথুরায়, এই মগধে, এই হস্তিনায়, এই ইন্দ্রপ্রস্থে, আর এই দ্বারকায়। আর সময়ের ত ঠিকই নাই। শিশুপাল বধ আর কুরুক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৪ বৎসর তফাৎ, কুরুক্ষেত্র আর যদুবংশ ধ্বংসের অন্ততঃ ৫০ বৎসর। গ্রীকেরা যাই করুক, আমাদের ঋষিরা কি করিতেন জানি না, কারণ তাঁহারা অঙ্কগুলায় অন্ততঃ স্থান ও কালের ঐক্য চাহিতেন। এক নাটকে এক অঙ্কের কত স্থান ও কাল-বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখন হইয়াছে দৃশ্য। সে দৃশ্যগুলাও প্রায় এক একটা অঙ্কের মত। অপরেশবাবু এই শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভারতবর্ষটা দেখাইয়াছেন এবং তাহার এক শত বৎসরের ঘটনা দেখাইয়াছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রওয়ালারা একে নাটক বলিতেন কি না সন্দেহ। না বলুন, আমরাও না হয় না বলিলাম,—বলিলাম, শ্রীকৃষ্ণ বইখানা নাটক নয়। তাহাতে আসে যায় কি? সংস্কৃতে অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের দশ পনর রকম লক্ষণ করিয়া শেষ বলিলেন চমৎকৃতিমৎ কাব্যম্। যাহা পড়িয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া যায়, সেই কাব্য। আমরা না হয় বলিলাম চমৎকৃতিমৎ নাটকম্। যাহা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া যায়, তাহাই নাটক। শ্রীকৃষ্ণ নাটক চমৎকৃতিমৎ যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা ইহাকে নাটক বলিবেন; আর যাঁহারা বলিবেন না, তাঁহারা ইহাকে নাটকও বলিবেন না। কিন্তু কে সাহস করিয়া বলিবে শ্রীকৃষ্ণ নাটক চমৎকৃতিমৎ নয়?

অপরেশবাবু মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশ খুঁটিয়া যাহা কিছু পাইয়াছেন, সব সংগ্রহ করিয়া এই নাটকের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং চমৎকৃতিমত্ত্বের অভাব ইহাতে বিন্দুমাত্র নাই। কিন্তু সেই ভাল জিনিষগুলি বাছিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে। কারণ, ঐ তিনখানি পুস্তক তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইয়াছে। তার মানে দুই লক্ষ শ্লোক প্রায়। তাহার উপর আবার অপরেশবাবুর স্বখাত সলিল আছে। তিনি "কর্ণার্জ্জুনে" এই সকল পুস্তকের অনেক ভাল জিনিষ বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা ত আর তিনি 'রিপীট' করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে বেশ হুঁসিয়ার হইয়া বাছিতে হইয়াছে। সুতরাং এই নাটকে তাঁহার বাহাদুরী বাছা আর সাজানো। তিনি নিজে একজন ভাল অভিনয়কর্ত্তা ও একজন ভাল নাটককার; সুতরাং কেমন করিয়া সাজাইতে হয় তাহাতে তিনি সিদ্ধ। তাঁহার নাটকে বীজমন্ত্র ভূভারহরণ। বীজের সঞ্চার নাটকে গোড়াতেই করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থকার দাঁড়াইয়া তাহা বলিয়া দিতে পারেন না, কারণ তাহাতে "বেমজা" হইয়া যায়; সুতরাং পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া বাহির করিতে হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নানা কারণে ভূভার-হরণে যতই বাধা হইয়াছে, ততবারই বেশী জোরে ভূভার-হরণের কার্য্য হইয়াছে। তিনি বাঁচাইয়াছেন পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে আর নিজেকে, কিন্তু সেও শেষ পারিলেন না, ব্যাধের হাতে মরিলেন।

এই নাটকে কৃষ্ণের চরিত্র অতি অদ্ভুত। তিনি যেন কেহই নহেন, সকল কাজেই তিনি যেন উদাসীন, তিনি স্থির, তিনি ধীর, তিনি সাক্ষী মাত্র। সমস্ত কল চালাইতেছেন তিনি, অথচ তাঁহার আগ্রহ নাই, চিন্তা নাই, রাগ নাই, রোষ নাই; গম্ভীরভাবে স্থিরভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখিতেছেন, আর যেখানে বাধাবিঘ্ন হইবে, সেখানটা একটু সোজা করিয়া দিতেছেন। যখন দেখিলেন, সাত দিন যুদ্ধের পর দুর্য্যোধনের তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া ভীষ্ম পাঁচটী বাণ দেখাইলেন পঞ্চপাণ্ডবের বধের জন্য, তখন তিনি অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনের কাছে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মুকুটটী সংগ্রহ করিলেন; এবং সেই মুকুট পরাইয়া অর্জ্জুনকে বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট পাঠাইলেন; অর্থাৎ অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধন সাজাইয়া সেই বাণ পাঁচটী হরণ করিলেন। মহাভারতে দেখি, যখন কৃষ্ণ দেখিলেন, কর্ণের একাঘ্নীবাণে একজন না একজন পাণ্ডবের প্রাণনাশ সম্ভাবনা, তখন ঘটোৎকচকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। শেষ এমন দাঁড়াইল যে সে একাঘ্নীবাণ না খরচ করিলে সেইদিনই কুরু-সৈন্য ধ্বংস হয়। কর্ণ সে অমোঘ বাণ ঘটোৎকচে খরচ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন বাঁচিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন ত কথায় কথায় বলেন আর যুদ্ধ করিব না, আর জ্ঞাতি বধ দেখিতে পারিব না, আর ক্ষত্রিয় সংহার দেখিতে পারি না বলিয়া হতাশ হইয়া বসেন, তখন কৃষ্ণ শান্ত গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে বুঝান কে কাকে মারে এবং সব মরিয়া আছে। নিজের কর্ম্মদোষে মরিয়া আছে। তোমরা কেবল নিমিত্ত। আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, আমিই উহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি। এইরূপে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। এ নাটকেও বিশ্বরূপ দর্শনের চেষ্টা হইয়াছে। এবং সে চেষ্টা অনেকটা সফলও হইয়াছে। কিন্তু চিত্রে বা প্রতিমায় কেমন করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইতে হয়, বাঙ্গলা দেশে তাহার কোন নিদর্শন নাই। সে যায়গাটী যেমন জমা উচিত তেমনটা জমে নাই। মহাভারতে ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের পর ও জিনিষটা এতই চমৎকার হইয়াছিল যে, সকল পুরাণে ও অনেক তন্ত্রে উহার অনুকরণ হইয়াছিল এবং চিত্রে ও পাথরে সেইটা আঁকার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার কয়েকখানি চিত্র নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে আছে; আর প্রতিমাটী পশুপতি ও গুহ্যকালীর মধ্যে মৃগস্থলীতে জঙ্গ বাহাদুরের বিশ্বরূপ মন্দিরে আছে। এই সকলের একটা আবছায়া দেখাইলে যাহা হইত, শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতায় তাহার শতাংশের একাংশও ফুটিয়া উঠে নাই।

যেখানে সকলের চেয়ে বেশী কঠিন কাজ, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হস্তিনা দখল হইয়া গেল। পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে প্রণাম করিতে যাইতে হইবে। বড় শক্ত, বিশেষ পাণ্ডবদের পক্ষে,—চল সখা, তুমি সঙ্গে চল। কৃষ্ণ গেলেন। গান্ধারী আর্য্য নারী, তিনি সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিয়া ভগবানের লীলা বলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া আছেন। তিনি উহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন, সৎপরামর্শ দিলেন, কাজ চুকিল। তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র, বৃদ্ধ অন্ধ, শত পুত্রশোকে ক্ষিপ্ত-প্রায়। কৃষ্ণ সকলকে লইয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর ভীম। কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিলেন, যাইও না।

তাহার বদলে একটা লোহার ভীম দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনে সেটা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ ভীমকে বলিলেন দেখ্‌লে দাদা, তোমার কি ওখানে যেতে আছে?

এ নাটকে কৃষ্ণকে কেবল দুইবার নিজমূর্ত্তি ধরিতে অর্থাৎ নিজ হাতে কাজ করিতে হইয়াছে। একবার যখন শিশুপাল ক্ষেপিয়া রাজসূয় যজ্ঞটা পণ্ড করার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের পা ধোয়ার গাড়ু ফেলিয়া সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন। শিশুপালের মাথাটা কাটা গেল। সে সময় যদি যুদ্ধ হয়, দু' দলেই লড়াই করিতে কোমর বাঁধিবে, যজ্ঞ করিবে কে? সুতরাং ভগবান্‌কে নিজ বিভূতি প্রকাশ করিতে হইল। আর একবার যখন অষ্টম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরে অর্জ্জুন রথের উপর অজ্ঞান, পাণ্ডবের আর উপায় নাই, তখন কৃষ্ণ নিজ বিভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুদর্শনকে স্মরণ করিয়াছিলেন। তখন ভীষ্ম বলিয়াছিলেন, কেমন ঠাকুর, বড় যে বলেছিলে লড়াই করবে না, কেমন, এখন ত করতে হ'ল? এখন আমায় উদ্ধার কর' বলিয়া ধনুক ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ভীষ্মকে উদ্ধার করিলেন না। অবহার হইল।

ভীষ্মের শেষ দিনের যুদ্ধ অপরেশবাবু বর্ণনা করেন নাই। তাঁহাকে অনেকটা লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে সে যুদ্ধটা বড় জাঁকাল। শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া পিছন হইতে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতেছেন। শিখণ্ডী আগে স্ত্রী ছিল এখন পুরুষ হইয়াছে, সুতরাং স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, আর অর্জ্জুন শিখণ্ডীর পিছন হইতে তীর মারিতেছেন, আর ভীষ্ম প্রতি শরাঘাতেই বলিতেছেন "নৈতে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।" তার পর ভীষ্মের শরশয্যা। ভীষ্মের মাথার শরের বালিশ, সে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহ তৈয়ার করিয়া দিতে পারিল না। তাহার পর ভীষ্মের তৃষ্ণা, আর অর্জ্জুনের বাণে 'টিউব ওয়েলের' সৃষ্টি। এ সব বাধ্য হইয়া নাটককারকে ছাড়িতে হইয়াছে।

কৃষ্ণের আশ্চর্য্য স্বভাব; তিনি সুখে, দুঃখে, রণে, বনে, সভায়, মন্ত্রণায়, স্তুতি, নিন্দায়, বিপদে, সম্পদে, স্বদেশে, বিদেশে, সব অবস্থাতেই সমান; কোনরূপ চঞ্চলতা নাই, কোনও উত্তেজনা নাই, উন্মাদনা নাই। অথচ তিনি সমস্ত জগৎকে উত্তেজিত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন। কৃষ্ণের এই-ই স্বভাব মহাভারতে, কৃষ্ণের এই] স্বভাব শ্রীকৃষ্ণে।

অপরেশ বাবুর অপরূপ সৃষ্টি তাঁহার প্রাপ্তি আর অস্তি। দুটীই কংসের স্ত্রী, দুটীই জরাসন্ধের কন্যা; কিন্তু দুটির দুরকম স্বভাব—একেবারে স্বর্গ ও নরক। ভূভার-হরণের প্রথম আয়োজনেই কবি দেখাইলেন—ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। এক ব্যাখ্যা জগতের উপকার আর সত্যই ভূভার-হরণ—ইনিই অস্তি। আর এক ব্যাখ্যা, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি; কংসের মৃত্যুতে কংসের পতিব্রতা পত্নীর ক্ষতি—ইনিই প্রাপ্তি। সমস্ত বইখানা জুড়েই ইঁহারা দুজন আছেন। একজন আপনাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া জগতের মঙ্গলকার্য্য দেখিতেছেন; আর একজন জগতের মঙ্গলকে মধ্যস্থানে বসাইয়া সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন। একজন নিজেকে জগতের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন, আর একজন নিজের ওজনেই জগতের ওজন বুঝিতেছেন। দুজনেরই দল আছে। একজন দুর্য্যোধনকে নাচাইতেছেন 'কৃষ্ণকে আগে বধ কর, ঐ সব নষ্টের গোড়া'—আর একজন দ্রৌপদীর মুখ দিয়া বলাইতেছেন, 'গুরুপুত্র, তুমি আমার পাঁচটি ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরেছ, আমার ভাইকে মেরেছ, তোমায় ক্ষমা করিলাম; আমি যেমন পুড়িতেছি, তুমি মরিলে তোমার মাও তেমনি পুড়িবেন, তাঁহার জ্বালা নিবারণের জন্য তোমায় ক্ষমা করিলাম। তবে তোমার মাথার মণিটি দিয়া যাও।' শ্রীকৃষ্ণ ছুরি দিয়া সে মণি মাথা হইতে তুলিয়া লইলেন। অশ্বত্থামার সে ঘা কিন্তু তিনি অমর বলিয়া কল্পান্তস্থায়ী হইল। আর আমরা হিন্দুমাত্রেই তেল মাখার সময় ক'ড়ে আঙুলে তেল লইয়া প্রথমেই 'অশ্বত্থাম্নে নমঃ' বলিয়া অশ্বত্থামার মাথার ঘায়ে ছিটাইয়া দিয়া তবে তেল মাখিতে বসি, না দিলে অশ্বত্থামা মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া পড়েন। অস্তি ও প্রাপ্তির প্রভেদটুকু নাটকে বেশ ফুটিয়াছে, এটুকু নাটককারের খুব বেশী কৃতিত্ব।

সমস্ত মহাভারতখানা ২৫০ পাতায় পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনা যদি সংক্ষেপে আড়াই পাতায় করি, বিশেষ দোষ কেহ দিতে পারিবেন না।*

---

* শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

২

বাণিজ্যপ্রধান দেশে পরিণত হবার আগে জার্ম্মাণী ছিল একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান দেশ। তখন জার্ম্মাণীতে যে শস্য উৎপন্ন হ'তো…সমগ্র জার্ম্মাণীর প্রয়োজন পূর্ণ ক'রেও প্রতিবেশীদের জন্য তাদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো। এখনও কোটী 'একর' জমী চাষের জন্য ব্যবহৃত হ'তো! প্রায় সর্ব্ব প্রকার শস্যই জার্ম্মাণী তার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক'রতো! কিন্তু বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর ভূসম্পত্তি হ্রাস হওয়াতে কৃষি-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শস্যোৎপাদনও কমে গেছে। এখন জার্ম্মাণীকে নিজের প্রয়োজনের জন্য বাইরে থেকে শস্য আহরণ ক'রে আন্‌তে হচ্ছে।

চাষকর জমী ছাড়া জার্ম্মাণীর আর একটা প্রধান আয়ের পন্থা হ'চ্ছে তার ফলকর ভূমি। জার্ম্মাণীর দ্রাক্ষাক্ষেত্র তার একটা মস্ত সম্পদ। তা ছাড়া আপেল্, কুল, বাদাম, পীচ, চেরী প্রভৃতি অসংখ্য ফলের গাছ জার্ম্মাণীকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করে। জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র এমন কি বড় বড় রাস্তার ধারে ও অলিতে গলিতে পর্য্যন্ত এই সব ফলের গাছের ছড়াছড়ি। প্রত্যেক দিকের স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি এই সব ফলের গাছের মালিক। প্রতি-বৎসর এই সব ফলের গাছ, যে সবচেয়ে বেশী দর দিতে পারে তাকেই এক বছরের জন্য, বিলি করে দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণীর অধিকাংশ লোক এখনও কৃষিব্যবসায়ী। কারণ কৃষিকার্য্য এখনও সেখানে বেশ একটা লাভজনক ব্যবসাই হয়ে আছে। কেবলমাত্র মেক্‌লেনবার্গ ও পূর্ব্ব প্রাশীয়াই চাষের কাজে তেমন অগ্রসর হ'তে পারেনি বলে কৃষি-সম্পদে তারা আজও দীন হয়ে আছে। ফলে এতদুভয় অঞ্চলে শোচনীয় দারিদ্র্য ও তদনুষঙ্গিক নীতি-দৌর্ব্বল্যও অত্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বাভেরীয়ার গ্রাম্য নারী। (মুলা কাটছেন ছুরির সাহায্যে সুন্দর করে!)

জার্ম্মাণীর ধনাগমের একটা প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে তার কৃষি বিভাগ; তবে সেকালের মতন এখন আর কৃষিকার্য্যই জার্ম্মাণীর প্রধান উপজীবিকা নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর প্রায় সাড়ে তিন

জার্ম্মাণীর অরণ্যসম্পদ এদেশের একটা বিশেষত্ব। বনভূমিকে এরা যেমন করে ঐশ্বর্য্যের আকর ক'রে তুলেছে এমনটি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত অরণ্য-ভূভাগ এরা সযত্নে রক্ষা করে। কোন্ বনে কি কি গাছ কতগুলি ক'রে আছে জার্ম্মাণী তার হিসাব একেবারে নখদর্পণে রেখে দেয়। কোন্ জঙ্গল থেকে বার্ষিক কত আয় হওয়া সম্ভব, তারও তালিকা জার্ম্মাণীর অরণ্য-বিভাগের খাতায় নথিবদ্ধ করা আছে। অরণ্যের তত্ত্বাবধান করা জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'ন, তাঁরা আরণ্যবিদ্যায় বিশেষ ভাবে পারদর্শী হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবে এই বিভাগে নিয়োজিত হন। আরণ্য-বিদ্যার উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য বিশেষ বিভাগ আছে।
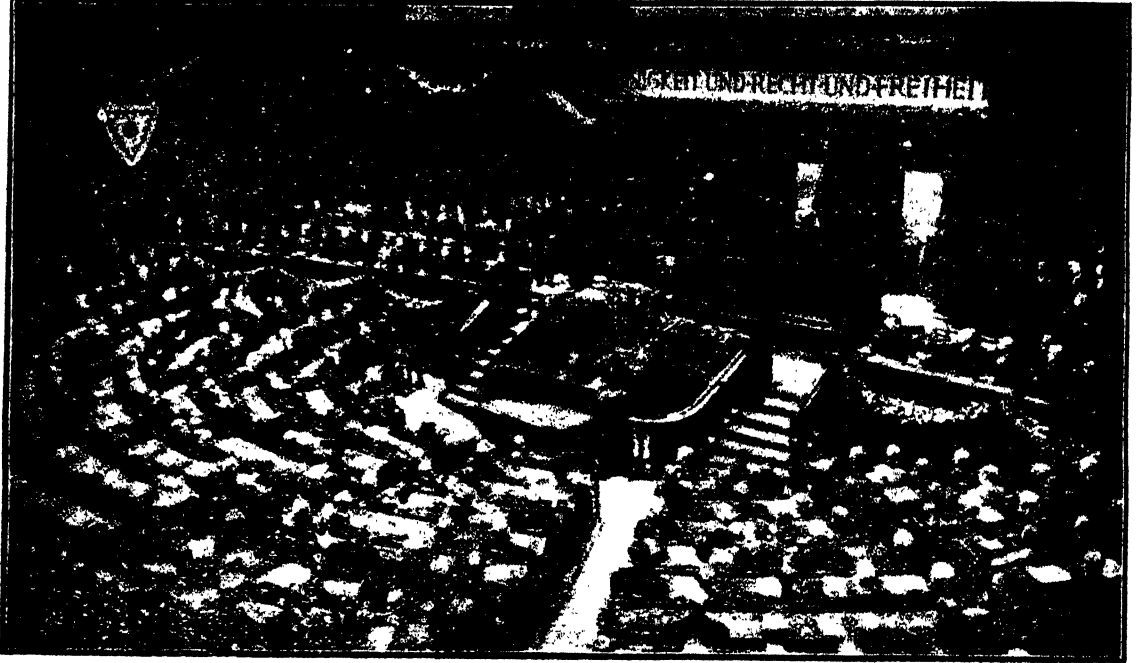
জার্ম্মাণীর নদী ও ঝর্ণাগুলি সবই প্রায় বৈজ্ঞানিকরা 'যন্ত্ররাজ বিভূতির' মতো বেঁধে ফেলেছেন। এক সুইট্‌জারল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশই তরঙ্গবেগকে এমন করে কাজে লাগাতে পারেনি। সেখানে জলের স্রোতের বেগে অনেক কলকারখানা চ'লছে। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্যই বিশেষ করে তারা অসংখ্য প্রবাহের গতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। জার্ম্মাণীর যে কোনও

রাইষ্টাগ্ (Reichstag) (জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসভার দৃশ্য)

শবযাত্রা (এঁরাও সকলে 'স্কেট' করে বরফের উপর দিয়ে শব নিয়ে চলেছেন।)

একটা গণ্ডগ্রামেও পথে পথে এবং পর্ণকুটীরেও "বিজলী বাতী" জ্ব'লছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

কুটীর-শিল্প অবলম্বনেও জার্ম্মাণীর অসংখ্য নরনারী

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থিনী ছাত্রীরা শিশুদের ওজন পরীক্ষা করছে।

তাদের জীবিকার সংস্থান ক'রছে। কৃষি ও কুটীর-শিল্প ছাড়া জার্ম্মাণরা কলকারখানার কাজে ও ব্যবসায় বাণিজ্যেও বিশেষ মনোযোগী হ'য়ে উঠেছে। বরং চাষের কাজের চেয়ে এই সব দিকেই সে দেশের লোকের ঝোঁক ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখা যায়। প্রাশীয়ার রাইন্‌ল্যাণ্ড ও ওয়েষ্টফেলিয়া প্রদেশ এবং স্যাক্সনী কলকারখানার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লৌহ ও ইস্পাতের বড় বড় কলকারখানা সমস্তই এই ওয়েষ্টফেলিয়া ও উত্তর সাইলেশীয়ায় অবস্থিত। উত্তর সমুদ্র ও বল্টিক্ সাগর-কূলে সুবৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণের একাধিক কারখানা আছে।

রাসায়নিক ও রঞ্জন (রং) বিদ্যার বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আজ সেখানে এই দুই বিভাগেরই আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হয়েছে।

তুলা ও পশমের কারবারে প্রাশীয়াই জার্ম্মাণীর অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রণী। সাদা কাপড়ের থান, ছিটের কাপড়, মোজা, গেঞ্জী, লেস্ এবং রেশমের কারবারেও জার্ম্মাণীর যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি। কাচ, চীনেমাটীর দ্রব্যাদি, ছোট বড় ঘড়ী, কাগজের মালমশলা ও অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা আর

স্কুলের মেয়েরা। (উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিত হ'য়ে চলেছে

খেলনা-পুতুল প্রভৃতি ছোট খাটো সৌখীন দ্রব্যাদি প্রস্তুতেও জার্ম্মাণী একেবারে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে।

কোনও দেশের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব এবং তাদের

সৈন্য পরিদর্শন (গণতন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হার্ ফ্রেডরীক্ এবার্ট জার্ম্মাণ বাহিনী পরিদর্শন করছেন।)

সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা যে সেই জাতির প্রাচীন ইতিহাসের ধারা অনুসারে গ'ড়ে ওঠে, এ কথাটা অনেকখানি সত্য হ'লেও, জার্ম্মাণীর বেলা কিন্তু এর একটু বিশেষত্ব দেখা যায়!—এ দুটোর সঙ্গে তাদের যেন একটু ভিন্নরূপ সম্বন্ধ! জার্ম্মাণদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কয়েকটি বিশেষ গুণই তাদের এই ব্যবসায়ের পথে আজ এতটা অগ্রসর করে দিয়েছে। ব্যবসায়-বুদ্ধি ও কাজের যোগ্যতা যেন এদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি!

১৮৭১ সালে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় একতা লাভের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ জাতকে দীর্ঘকাল ধ'রে একটা কঠোর অনুশাসনের ভিতর দিয়ে যেতে হ'য়েছিল। কয়েক শতাব্দী ধ'রে জার্ম্মাণীর ইতিহাস ছিল শুধু তার আভ্যন্তরীন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের এবং বিদেশীর আক্রমণ ও উৎপীড়নের। বারম্বার জার্ম্মাণী বিধ্বস্ত হ'য়েছে, তার জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছে—১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিরিশ বৎসর-ব্যাপী যে বিপুল যুদ্ধ চলেছিল তাতে জার্ম্মাণী একেবারে জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হ'য়েছিল। এই সর্ব্বনাশ থেকে একটু সাম্‌লে উঠ্‌তে না উঠতেই নেপোলীয়ানের সঙ্গে জার্ম্মাণীর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল। এর ফলে জার্ম্মাণীতে একটা জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়ে গেছল! জার্ম্মাণীর খণ্ড খণ্ড

জার্ম্মাণীর ডাক্তারখানা

রাজ্য ও বিভিন্ন জাতি একত্র হ'য়ে যখন একটা বড় জাতি ও অখণ্ড দেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন

বার্লিনের লাইপ্‌জিগার্‌ ষ্ট্রাসে (ষ্ট্রীট্‌)

অন্যান্য কতকগুলি দেশের চোখ টাটাল'। জার্ম্মাণীর ছিন্নভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকাটাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূল। তারা তাই জার্ম্মাণীর এই একতা লাভ ও সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টাকে প্রাণপণে বাধা দিতে উদ্যত হ'ল। ফলে হোয়েন্‌জোলার্ণদের অধীনে এক মহা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে জার্ম্মাণীকে আরও তিনটি যুদ্ধে নামতে হ'য়েছিল। এরূপ অবস্থায় কোনও জাত যখন বিপদকে কাটিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন দেখা যায়—হয় সে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, নয় সে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে! সৌভাগ্য-বশতঃ জার্ম্মাণী এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বেরিয়ে এসেছিল অধিকতর ক্ষমতাবান্‌ হ'য়ে! কিন্তু এই যে বেঁচে থাকবার জন্য, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য তাকে ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল এরই ফলে জার্ম্মাণী একটা বীর যোদ্ধার জাতে পরিণত হ'য়েছিল। রণশাস্ত্রে এরা তাই জনে জনে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও ঠিক এদের উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল না বলে এই নবীন জার্ম্মাণ জাতকে সেদিন প্রকৃতির সঙ্গেও অবিরাম যুদ্ধ ক'রতে হয়েছিল। কৃষি ছিল তখন এদের প্রধান সম্পদ—অথচ দেশের জলহাওয়া ছিল সে সম্পদের প্রধান বাধা! ক্ষণিকের নিদাঘ এবং সুদীর্ঘ ও সুকঠোর শীতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে এদের কৃষিকার্য্য ক'রতে হতো। এদের দেশের খনিজ-সম্পদও যৎসামান্য! জার্ম্মাণীর

চিত্রাঙ্কন। (বস্তু দেখে তার চিত্র আঁকতে শেখানো হ'চ্ছে।—এখানে আঁকবার বিষয়টি হ'চ্ছে গাড়ী ঘোড়া।)

উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে বিস্তৃত বালুকাময় ভূখণ্ড পড়ে আছে। অতি কষ্টে ও বহু পরিশ্রমে হয়ত এই বালিয়াড়ী থেকেই, মানুষ ও ঘোড়ার উপযুক্ত খাদ্য উৎপন্ন করা যেতে পারে। এ ছাড়া জার্ম্মাণীর মধ্য প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব হতে উত্তর-পশ্চিম পর্য্যন্ত যে পর্ব্বত-শৃঙ্খল বিস্তৃত রয়েছে, এ অংশেও চাষের বিশেষ অসুবিধা। শস্য উৎপাদন এ অঞ্চলে একেবারে দুঃসাধ্য না হ'লেও একান্ত কষ্টসাধ্য।

প্রাশীয়ার পার্ব্বণ দিনে। (ছেলেরা বাড়ী বাড়ী সিধে সেধে বেড়াচ্ছে।)

জার্ম্মাণীর যে লৌহ কারখানা আজ জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব'লে খ্যাত হ'য়েছে, তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং অন্যান্য কলকারখানা চালানোও জার্ম্মাণীর পক্ষে একদিন কঠিন হ'য়ে উঠেছিল—তাদের দেশে কাঁচা মাল মশলার অভাবে! নিয়ত অভাব ও অসুবিধার বাধা সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্ট লাভের জন্য জার্ম্মাণীর জিদ আরও বেড়ে উঠেছিল এবং সেই জন্যেই সে নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও বুদ্ধিবলে তার সকল প্রতিবন্ধক চূর্ণ করে এগিয়ে আসতে পেরেছে! এই শিল্প বিজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ জার্ম্মাণীকে আশাতীত উন্নতির শিখরে তুলে দিয়েছে। যথাকালে এদিকে সচেষ্ট না হ'লে জার্ম্মাণীকে আজ য়ুরোপের এক দীন দরিদ্র নগণ্য তুচ্ছ দেশ হ'য়ে পড়ে থাকতে হ'তো।

বার্লিন সহরের দৃশ্য (উণ্টার্ ডেন্ লিণ্ডেন্ নামক বিস্তৃত রাজপথ)

জার্ম্মাণদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি এই জাতকে আদর্শ গৃহস্থও ক'রে তুলেছে। প্রথমতঃ এদের প্রত্যেকেরই
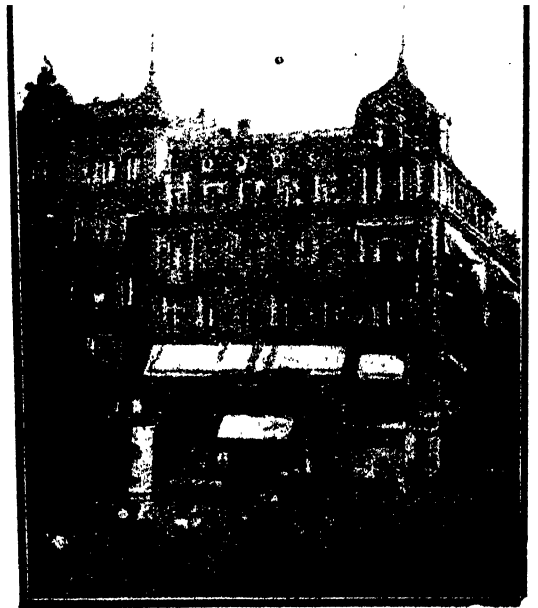
ঘরের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে যেটা এরা কিছুতেই লঙ্ঘন করে না। এদের মিতব্যয়িতা, আয়ের অনুপাতে হিসাব করে খরচা করা, এদের কথার ও কাজের কোনও দিন অনৈক্য না হওয়া, সর্ব্বদা বংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সম্মান বজায় রেখে চল্‌বার চেষ্টা—এই সকল সদ্‌গুণের জন্যই এরা জাতি হিসাবে এত শীঘ্র বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর পারিবারিক শৃঙ্খলা কিছু পরিমাণে ঢিলে হয়ে পড়লেও এখনও গৃহস্বামীর কর্ত্তৃত্বের অধিকার একেবারে লুপ্ত হয়নি। মোটের উপর য়ুরোপে আর অন্য কোনও দেশ নেই যেখানে গৃহস্থের জীবন এতটা সুস্থশান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত দেখতে পাওয়া যায়। একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে জার্ম্মাণীতে ধনী মধ্যবিত্তের কথা ছেড়েই দাও, মজুরদের মধ্যেও শিশু-রক্ষণের জন্য শিশুমঙ্গল ও শিশুকল্যাণকর নানা ব্যাপারের যেরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে জগতের অন্য কোনও দেশে তা নেই।

... স্কুলের ছাত্রগণ। (ক্লাশে বসে ছেলেরা ছবি আঁকা শিখছে।)

ছুটীর ঘণ্টায়। (টিফিনের সময় ছেলেরা মাঠে বসেই জলযোগ করছে।)

এ ছাড়া জার্ম্মাণীর আর একটা প্রধান গুণ হচ্ছে তারা অতি সচ্চরিত্র জাত! বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের দশটি আদেশের মধ্যে পঞ্চম আজ্ঞার প্রতি এদের মত শ্রদ্ধাবান খৃষ্টান জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না! এগুলো সবই জার্ম্মাণীর জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী ও গৌরবময় করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

জার্ম্মাণ মেয়েরা ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারা নোংরা বা ময়লা একেবারেই দেখতে পারে না! রাতদিন ঘরদোর ধোয়া মোছা ঝাড়া পরিষ্কার করা এই নিয়েই আছে।

ধাত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের মেয়েরা তাই জার্ম্মাণ মেয়েদের ঠাট্টা ক'রে বলে—ওরা 'এত' শুচি-বায়ুগ্রস্ত যে রাস্তার ধারের 'মাইল ষ্টোন্' (দূরত্ব নির্দ্দেশক শিলাখণ্ড) গুলো পর্য্যন্ত ধুয়ে রাখে!

পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে জার্ম্মানীর একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে—প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির রাজধানী তাদের অতিরিক্ত জাঁকজমক প্রভৃতি একাধিক দোষ সত্ত্বেও, শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি ও প্রসারের দিক দিয়ে জার্ম্মাণ জাতকে বড় ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করতো এবং করেওছে। 'ফ্রেডরীক 'দি গ্রেটের' সময় পটস্‌দামের দান, কার্ল আগষ্টের সময় "ওয়াই-মারের"—রাজা ম্যাক্সিমিলীয়ানের

জার্ম্মাণ জননী! (য়ুরোপে ছেলে মেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে ও যত্ন করতে জার্ম্মাণ জননীদের মতো আর কোনও জাতের মেয়েদের দেখা যায় না।)

গির্জ্জার পথে। (ওয়েষ্টিশ্‌ মেয়েরা সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য গির্জ্জাভিমুখে চলেছে।)

সময় 'মিউনিশের' প্রাধান্য প্রতিপত্তি খুবই ছিল। এই সব রাজসভা এবং ষ্টাট্‌গার্ট, ড্রেস্‌ডেন, কার্লশ্রু, ব্রান্স্‌উইক্‌ প্রভৃতি আরও অন্যান্য ছো'ট ব'ড় রাজধানীগুলি বরাবরই জ্ঞানের আলোক ও শিক্ষার উৎকর্ষের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই রাজধানীগুলি থেকেই শিল্প ও সাহিত্য, নাট্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি ললিত-কলার সৌন্দর্য্য ও স্বাদ সমগ্র জার্ম্মাণী উপভোগ করতে শিখেছিল।

কলেজের উৎসবে। (ছেলেরা সখের সৈন্যদলের পোষাক পরে—উৎসবে যোগদান করে আমোদ করছে।)

প্রাচীন জার্ম্মাণীতে যদি এই রকম বিশ পঁচিশটি পৃথক্‌ রাজ্য না থাক্‌তো, কেবল যদি একমাত্র রাজধানী সুদূর বার্লিন থেকেই শিক্ষা-সভ্যতা-জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ঢেউ আসবার অপেক্ষায় জার্ম্মাণীকে বসে থাকতে হ'তো, তাহলে সমগ্র জার্ম্মাণী আজও মানুষ হ'য়ে উঠতে পারতো কি না সন্দেহ! এ ছাড়া 'বার্লিন' যে সমগ্র সাম্রাজ্যের গুরুভারে একেবারে 'প্যারিস' মতো প্রপীড়িত হ'য়ে পড়ে নি, তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, এক অখণ্ড মহাসাম্রাজ্যে পরিণত হয়েও জার্ম্মাণী তার প্রাচীন অভ্যাস মতো নিজ নিজ প্রদেশগত স্ব স্ব প্রাধান্য ও বিশেষত্ব একেবারে পরিত্যাগ করে নি। কাজেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও
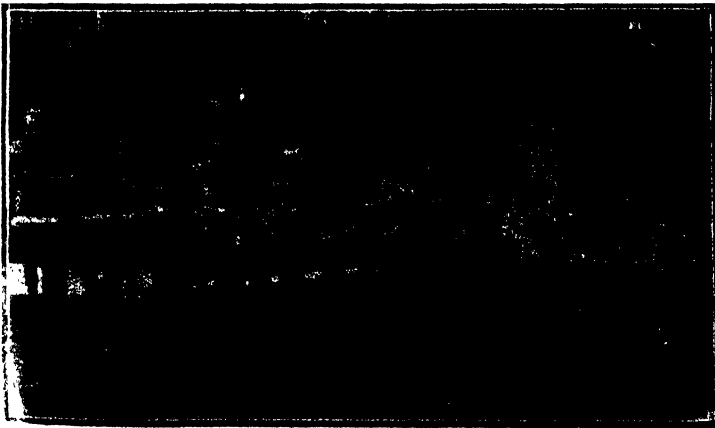
খোলামাঠে পড়া (গ্রীষ্মের দিনে ছেলেদের স্কুল ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে খোলা মঠে এনে পড়ানো হয়।)

শাসনের গুরুভার সবটাই বার্লিনের স্কন্ধে আসবার ফলে জার্ম্মাণীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সে সময়ে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব হবার কারণ ঘটেছিল। বুরোক্রেশীর সে বিষময় প্রভাবে তারা জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল। সর্ব্বরকমে রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকার দরুণ জার্ম্মাণরা তাদের স্বকীয় বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্যকারিকা শক্তি হারিয়ে ফেল্‌ছিল।

জার্ম্মাণীর সামাজিক অবস্থাও তখনকার দিনে এই রাজকীয় প্রভাবের হাত এড়িয়ে চলতে পারত না। রাজ-সরকার থেকে উপাধি ও খেতাব পেয়ে আভিজাত্যগৌরব লাভ করবার একটা প্রবল ঝোঁক সে সময় জার্ম্মাণদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যেতো। যারা বনিয়াদি পুরাতন সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যারা রাজসরকারের অনুগ্রহলব্ধ সম্মানে সুসজ্জিত হ'য়ে সম্ভ্রান্ত সাজতে চাইত, তারা দেশের যথার্থ বড়লোক হ'য়ে উঠতে পারতো না কোনও দিনই। লাভের মধ্যে শুধু প্রকৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে যে 'ভন্' (Von) শব্দটি ব্যবহার হ'তো, যেমন ফরাসীদের 'ডি' (De) শব্দটি ব্যবহার হয়, সেটি প্রায় সবার নামের পূর্ব্বেই দেখা যেতে লাগল।

পরিচ্ছন্নতার পরিচয়। (বার্লিনের একটি বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের আর্শী-চিরুণী ব্রুশ ও দাঁতমাজা ও মুখ ধোবার সরঞ্জাম এনে স্কুলে রাখতে হয়। একটি ঘরে তাকের উপর নম্বর দেওয়া সেগুলি ঝুলানো থাকে। ইস্কুলে এসে টিফিনের পর এবং বাড়ী যাবার সময় তাদের এগুলি ব্যবহার করতে হয়।)

এই জাত নূতনকে বরণ ক'রে নিয়ে যুগধর্ম্মের বর্ত্তমান গতির সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে চ'ললেও সে তার প্রাচীন ও পুরাতনকে একেবারে নিঃশেষে বর্জ্জন ক'রে দেয়নি। সাবেকের মধ্যে যা' যা' শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ছিল—যার মূল্য অক্ষয় এবং যার প্রয়োজন শাশ্বত কালের বলে সে বুঝতে পেরেছিল, তাকে সাগ্রহে ধ'রে রেখেছে।

জার্ম্মাণীর প্রাচীন ব্যবস্থার গুণও ছিল যেমন, তার দোষও ছিল তেমনি একাধিক। প্রত্যেক পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র রাজ্যের নরপতিগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ পায়নি।

বোটে বসে পড়া। (নৌকা ক'রে বেড়াতে বেড়াতে জার্ম্মান্ ছাত্রেরা অনেকে পাঠাভ্যাস করে।)

শুধু 'খেতাব' নয়, রাজ-সরকারে চাকুরী পাবার একটা বিষম প্রলোভনও তাদের মধ্যে এসে পড়েছিল; কারণ 'উপাধি" সংগ্রহ করবার ওইটেই ছিল তখন সোজা পথ। কাজেকাজেই জার্ম্মাণীর উপাধিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে গভর্মেণ্টের চাকুরের সংখ্যাই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। তৈলকীট যেমন কোনও দিনই পক্ষীপদবাচ্য হ'তে পারে না, তেমনি এই সব খেতাবলুব্ধ চাকুরে ও ব্যবসায়ীদের কোনও দিনই প্রকৃত সম্ভ্রান্ত হবার আশা ও সম্ভাবনা নেই।

অনেকে মনে ক'রেছিলেন যে দেশে জনমত প্রবল হ'য়ে উঠলে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে এই উপাধিব্যাধিগ্রস্তরা আরোগ্য হ'য়ে উঠবে! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রোগ আরও বেড়ে গেছে দেখা যাচ্ছে! এমন কি ওটা আজকাল ছোট-খাটো চাকুরেদের মধ্যেও সংক্রামিত হ'য়ে পড়ছে!

জার্ম্মাণীর কয়েকটা প্রধান প্রধান জাতির চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এইবার সমগ্র জার্ম্মাণ

লাইপ্‌জিগের মেলা। (বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের ঘটা!)

জাতির এমন কতকগুলি বিশেষ গুণের আলোচনা করা যাক্—যে গুণগুলি ওদের রাজারাজড়া থেকে আরম্ভ ক'রে জনসাধারণের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে, যেটা জাতির সভ্যতা, রাষ্ট্র-গোষ্ঠী, ইতিহাস, আবহাওয়া, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সম্প্রদায় হিসাবে গড়ে ওঠবার শান্ত সংযত বা উগ্র-উচ্ছৃঙ্খল গতি অনুসারে জন্ম লাভ করে। জার্ম্মাণদের সম্বন্ধে এক কথায় বলা হয় যে তারা খুব 'কাজের জাত'।

শিশু শিল্পীর দল (প্রকৃতির সৌন্দর্য্য থেকে ছাত্রেরা চিত্রাঙ্কন-শিল্প শিক্ষা ক'রছে)

অর্থাৎ মোটেই ভাবপ্রবণ নয়। কখনই আবেগে অধীর হ'য়ে ওঠে না এবং চপলতা কাকে বলে জানে না। তারা যেন সংযত ও নিরুদ্বেগ মানুষের আদর্শ। কিন্তু এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অধিকাংশ জার্ম্মাণ মোটেই সংযত ও নিরুদ্বেগ নয়। বরং তারা খুব স্ফুর্ত্তিবাজ আমুদে এবং ভাবের দিক দিয়ে তাদের হৃদয় একেবারেই উদাসীন নয়! তবে তাদেরই বিভিন্ন জাতের মধ্যে ওটার ওজন একটু কম বেশী হতে পারে।

মোটের উপর জার্ম্মাণরা বেশ একটা হৃদয়বান মরমী

সভাগৃহের সম্মুখে!
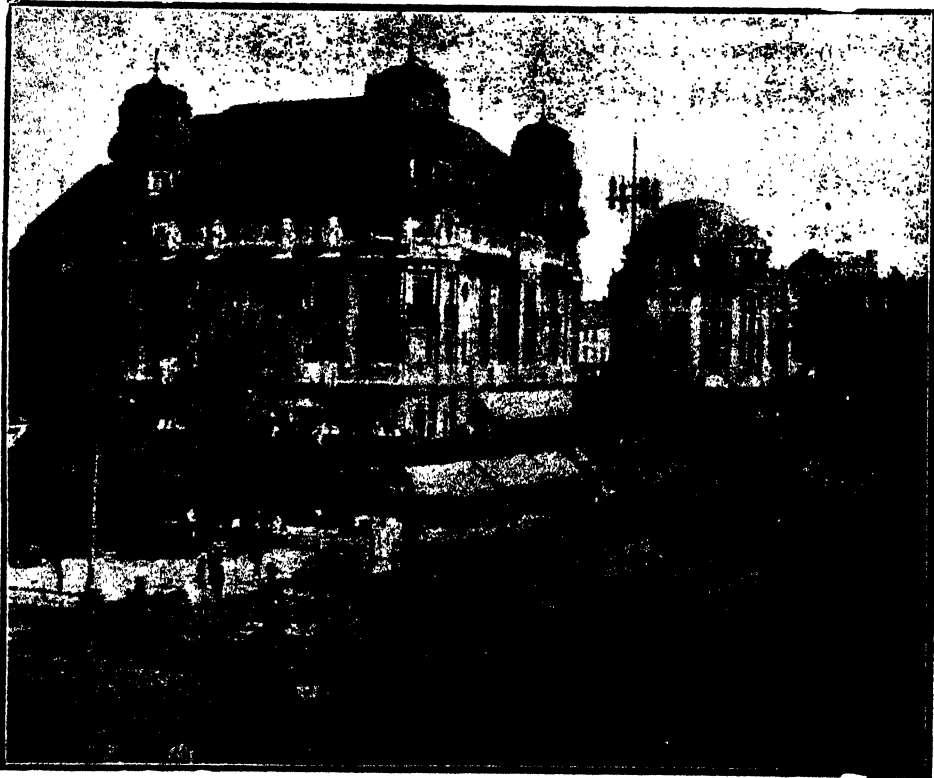
বার্লিনের "পটস্‌ডামারপ্লাট্‌জ" নামক চৌমাথা। (অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা এসে এখানে একত্র মিশেছে গাড়ী ঘোড়া ট্রাম মোটর ও লোকজনের ভিড় এখানে সদা সর্ব্বদা।)

ও দরদী জাত। শিল্পানুরাগী, সামাজিক সভ্যতার চরম উন্নতিকামী, মিশুক, অতিথিবৎসল, উদারচরিত, দয়াল, অজ্ঞাত অপরিচিতকে সাহায্য করতে কোনও দিনই সে পরাঙ্মুখ নয়। এ ছাড়া বন্ধুবৎসল জাত ও জার্ম্মাণদের মতো এমন খুব কমই দেখা যায়। সঙ্গীত ও নাট্যকলা যেন তাদের একটা নেশার মতো! সহরের কথা ছেড়ে দাও—এমন কোনও গ্রাম নেই, যেখানে একটা গাইয়ে-বাজিয়ের দল তাদের আখড়া বা আড্ডা খুলে বসেনি। বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যেই থিয়েটার-গৃহ, সঙ্গীত-ভবন, কলাভবন ও যাদুঘর প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক শহরেই নাট্যমন্দির আছে এবং সেখানে নিত্য অভিনয় হয়। জার্ম্মাণীর একটা অতি নগণ্য ক্ষুদ্র শহরেও এমন উচ্চ অঙ্গের অভিনয়কলা দেখতে পাওয়া যায় যে বিলাতের প্রধান শহর লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে তার তুলনা হ'তে পারে! জার্ম্মাণরা থিয়েটারকে কেবলমাত্র আমোদ উপভোগের স্থান ব'লে মনে ক'রে না। নাট্যাভিনয়কে তারা শিক্ষা ও সভ্যতায় উৎকর্ষ লাভের উপায় বলেও মনে করে। শেক্সপীয়ার প্রভৃতি একাধিক ইংরাজ নাট্যকারের রচিত নাটকাবলী জার্ম্মাণীতে এত বেশীবার অভিনীত হয়েছে এবং এখনও হয়, যা তাদের নিজেদের দেশে কখনও হয়নি এবং হবার সম্ভবনাও কম। জীবনের সামাজিক সম্ভোগের দিক থেকে হোটেল, চটি, পান্থনিবাস ভোজনালয়, পানশালা প্রভৃতি স্থানগুলি জার্ম্মাণীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে বিবেচিত হয়।

জার্ম্মাণদের নামে 'মাতাল' বলে যে একটা বদনাম রটেছে সেটাও সম্পূর্ণ অলীক। 'বীয়ার'টা তারা একটু বেশী পরিমাণে খেলেও তারা খুব কমই 'ব্র্যাণ্ডী' পান ক'রে। তাদের মতো ঠাণ্ডা দেশে 'বীয়ারটাকে' ঠিক মদ বলা চলে না; ওটা একটা নির্দ্দোষ পানীয় মাত্র!

জার্ম্মাণরা খুব উচ্চ শ্রেণীর বক্তা! তাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকারী, রাষ্ট্রসভার সভ্য, অধ্যাপক, ধর্ম্মপ্রচারক, পুরোহিত, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি এক একজন একেবারে বক্তার রাজা। একাদিক্রমে এরা ছয় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েও ক্লান্তিবোধ করে না।

জার্ম্মাণদের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, তাদের প্রকৃতির রূপশ্রীর প্রতি অনুরাগ! প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্য তাদের মনের উপর বেশ গভীর প্রভাব বিস্তার
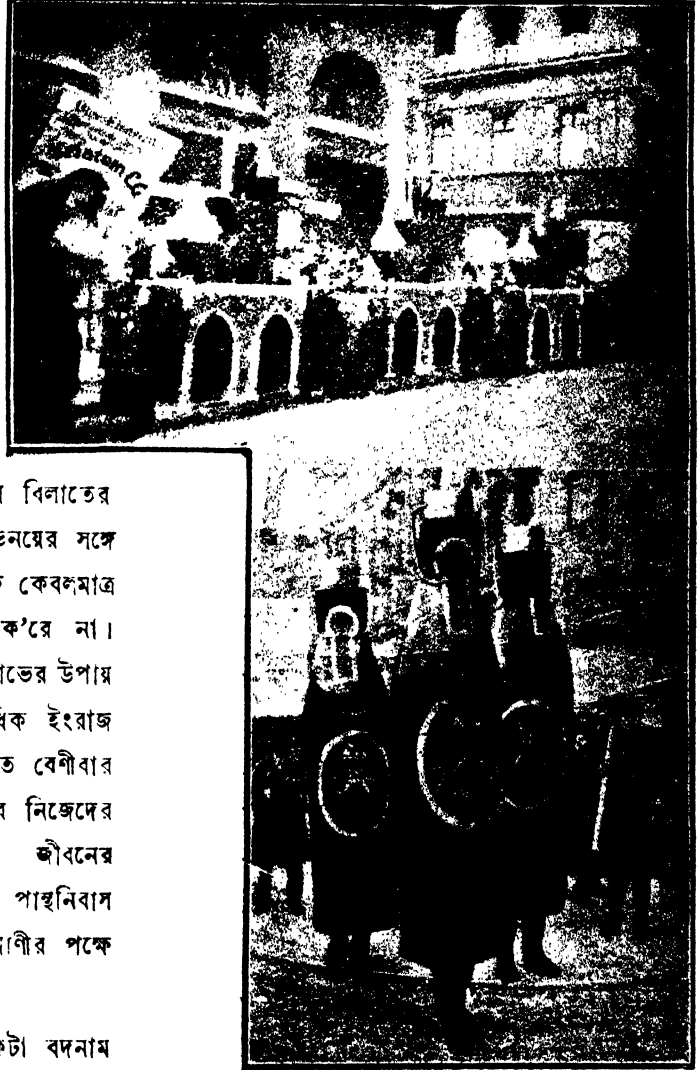
লাইপ্‌জিগের মেলায় (বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের ঘটা!)

করে। এই গুণেই জার্ম্মাণীর কাব্য-সম্পদ অতুলনীয় হ'য়ে উঠেছে! সকল জিনিস বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রবৃত্তিটা তাদের মধ্যে সহজাত বলে তারা গোঁড়া হয়েও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেয় না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসী হয়েও নাস্তিককে ঘৃণা করে না। একটা কোনও 'মত' ও 'পন্থার' পক্ষপাতী

হ'লেও কোনও 'মত' বা 'পন্থাকে' তারা ধ্রুব বলে মানে না। বিধি-বিধান মেনে চ'ল্‌লেও কোনও বিধি বিধানই তাদের আক্রমণের হাত এড়িয়ে যেতে পারে না। তাদের সংগঠন-শক্তি ও বুদ্ধির চেয়ে ধ্বংস ও চূর্ণ করার দিকেই ঝোঁকটা একটু বেশী দেখা যায়।

রসিকতা এরা উপভোগ করতে যতটা পটু, রস-রহস্য উদ্ভাবনে ততটা দক্ষ নয়। এ বিষয়ে ইংরেজরা এদের চেয়ে বড়। ইংলণ্ডের যে কোনও একখানা হাসি-তামাসার কাগজ নিয়ে জার্ম্মাণীর এই শ্রেণীর পত্রিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই এটা সহজে ধরা পড়ে। রগড় দেখা ও রগড় করায় অনেক তফাৎ। জার্ম্মাণদের মধ্যে জাতীয় গুণাবলির অনেক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও আচার ব্যবহারের বহু বিপরীত অনৈক্যও দেখা যায়। উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের

বাজারের পথে। (জার্ম্মাণীর 'স্প্রীওয়াল্ড' অঞ্চল শীতের দিনে বরফাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। এখানকার প্রত্যেক জার্ম্মাণ 'স্কেটিং' জানে। স্কেট করতে না জান্‌লে বরফে ঢাকা রাজপথে চলা অসম্ভব। একজন কৃষক 'স্কেট্' করে বগলে মাল নিয়ে বাজারে চলেছে।)

জার্ম্মাণীর কাঁচের কারখানা

ও পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চিমের অনেক বিষয়ে গরমিল আছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

জার্ম্মাণ সহরগুলিতে বড় বড় পাকা বাড়ী অসংখ্য আছে বটে, কিন্তু গ্রামের কৃষক অধিবাসীরা সবাই কুটীরবাসী। তাদের অধিকাংশ কুটীরই কাঠের তৈরী। কেউ কেউ শুধু কাঠের কাঠামো ও চালা রেখে, দেয়ালগুলি সব ইঁট ও বালি চুণের দ্বারা নির্ম্মাণ ক'রেছে। উত্তরাঞ্চলের কৃষকেরা সকলেই প্রায় তাদের ক্ষেতের ধারেই বাড়ী করে বাস করে। কিন্তু বাভেরীয়ার কৃষকরা গ্রামের মধ্যে বাস করতেই ভালবাসে। গ্রাম থেকে তাদের ক্ষেত অনেক দূরে হ'লেও তারা গ্রাম থেকেই ক্ষেতে যাওয়া-আসা করে।

এই কৃষি-জীবী জার্ম্মাণ অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য এত বেশী যে, তা খুঁটিয়ে বর্ণনা ক'রতে গেলে একখানি মহাভারত হ'য়ে পড়বে। ধর্ম্মসংক্রান্ত যে কোনও উৎসবের সময় সাজ-পোষাকের এই বৈচিত্র্য খুব বেশী চ'খে পড়ে। স্ত্রীলোকের ও পুরুষের পোষাকের পার্থক্য ছাড়া সেখানে বয়স হিসাবে, পদমর্য্যাদা হিসাবে এবং সামাজিক অবস্থা ও পোষাকের বিশেষ বিশেষ তারতম্য আছে। (ক্রমশঃ)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের অধোগতি

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করে' তৎসম্পর্কে দু'একটী কথা বলা কর্ত্তব্য মনে কচ্ছি ; কারণ ভারতবর্ষের প্রগতি বা অধোগতি বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-মাত্রই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

বসন্তবাবুর প্রবন্ধ পাঠে যতদূর বোঝা যায়, তা থেকে মনে হয়, প্রবন্ধটী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "শূদ্রধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের সমালোচনা ব্যপদেশে লিখিত এবং প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা। লেখক মহাশয়ের মতামত সম্বন্ধে আলোচনা কর্ব্বার পূর্ব্বে দেখা যাক, বিশ্বকবি তাঁর 'শূদ্রধর্ম্ম' প্রবন্ধে কি বলতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য সত্য সত্য যুক্তিসঙ্গত কি না। কবি বলেচেন "যে সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা' বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে' পারে তা ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হতেই পারে না ; যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয়, তাহলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে' গিয়ে বাইরের ঠাট্টাই বড় হয়ে উঠে। * * * * * আসল জিনিস মরে' যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে, জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়।" বিশ্বকবির কথাগুলি তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রণালীর ঘোরতর বিরোধী হলেও, যে মানব-সাধারণের স্বভাবসিদ্ধ এবং ব্যবহারিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই ; কারণ, আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান, বংশানুক্রমে চল্‌তে চল্‌তে তার অভ্যাসটা এরূপ পাকা হয়ে গিয়েচে এবং দাম্ভিকতা এতদূর প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েচে যে, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝতে পাচ্চি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আত্মা বহুকাল পূর্ব্বে তিরোহিত হ'য়ে অধুনা প্রেতাত্মা রূপে আমাদের জাতির স্কন্ধে চেপে বসেচে এবং নিরন্তর একটা অর্থশূন্য অভ্যাসগত ছুঁৎমার্গের বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে' সমগ্র জাতিকে নিয়ত নাস্তানাবুদ করে' ফেলচে। আমরা তর্কস্থলে এ কথা স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু প্রতিদিন যে আমরা আমাদের চোখের সম্মুখে এ ঘটনা দেখ্‌তে পাচ্চি, তা' অস্বীকার কর্ব্বার যো নাই। মহর্ষি মনু বলেচেন—

> যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্
>
> স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥

অস্যার্থ ;—যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করে' অন্যত্রে অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যালাভে যত্নবান্ হন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

তাহ'লে দেখা যাচ্চে—মনুর মতে আমরা জাতিশুদ্ধ সকলেই বহু দিন পূর্ব্ব শূদ্রত্ব লাভ করেছি। অথচ বংশগত ও জাতিগত সংস্কারহেতু তথাকথিত শূদ্র বা নিম্নস্তরের জাতিকে প্রাণপণে ঘৃণা করে' আসছি এবং শাস্ত্রমর্ম্মানুসারে আমরা শূদ্রাধম হয়েও নিম্নতর জাতিকে সমস্ত অধিকার হতে বঞ্চিত কর্ব্বার স্পর্দ্ধা রাখি। এ দেখেও কি বলা যায় না যে, এই দাম্ভিকতা, এই অন্ধ সংস্কার আমাদের জাতীয় জীবনপথের বিঘ্ন ঘটাচ্চে! বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যা সম্ভাব্য উপকার, বর্ত্তমানে তার একতিলও আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু অপকারগুলি আমরা পদে পদেই অনুভব কচ্চি। কাজেই বিশ্বকবির বাক্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তা' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তার পর বসন্তবাবুর কথা। তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নানা স্থানে নানা ভাবে যে কথাটী প্রকট হয়ে উঠেচে, সেটি হচ্চে কর্ম্মধারা বংশগত তথা জাতিগত হ'লে অনিষ্টের কোন কারণ ত নাই-ই, বরং উন্নতির কারণ যথেষ্ট আছে। যুক্তি-স্বরূপ তিনি দেখিয়েচেন "যে প্রকারের মতিগতি পিতামাতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, পুত্রেরও তদনুরূপ মতিগতি হইবার সম্ভাবনা বেশী।"

পূর্ব্বপুরুষের গুণাবলি যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্তান সহজভাবে কতকগুলি ব্রাহ্মণগুণ লাভ করে এবং ব্রাহ্মণেতর অপরাপর বর্ণীর পুত্র তত্তৎ বর্ণজ-গুণ লাভ করে, এ কথা অস্বীকার কর্ব্বার কোনও কারণ নাই; কিন্তু কর্ম্মগুণে এবং প্রকৃতিদত্ত প্রবণতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধনের দ্বারা ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয়-গুণসম্পন্ন ও ও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন, অথবা ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্রের গুণসম্পন্ন ও শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন যে হতে পারে না, এ কথা কি কেউ সত্য এবং ভূয়োদর্শনের মর্য্যাদা রক্ষা করে বলতে পারেন? সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের ইতিহাসও কি এই কথাই বলে না যে, জাতীয় কল্যাণ বা উন্নতির সহস্র সম্ভাবনা থাকলেও মানববিশেষকে তথা জাতিবিশেষকে জন্ম থেকে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগণ্ডীর ভেতর কোন কারণেই বেঁধে রাখা চলতে পারে না? "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্ণ-ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়েচেন, তার অভিপ্রায়ও কি এই তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধী নয়? অবশ্য গুণ ও কর্ম্ম অর্থে যদি লেখক মহাশয় বংশ ও জন্ম মনে করে থাকেন, তাহ'লে পৃথক্ কথা। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত লোক যে এরূপ মনে কর্বেন, তা' বিশ্বাস হয় না। গুণ কর্ম্ম অনুসারে মানুষের বর্ণ-নির্ণয় মাত্র হতে পারে; যেহেতু বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মের পরিচায়ক বা নির্দ্দেশ-সংজ্ঞা মাত্র। তাকে কোনরূপেই বংশ বা জন্মের অধীন করা চলে না। বর্ণ পরের জিনিষ এবং যোগ্যতা ও কর্ম্মের দ্বারা লভ্য। জন্ম-মাত্রেই কেহ কোনও বর্ণ-বিশেষ লাভ কর্ত্তে পারে না। মহর্ষি মনুও বলে গিয়েচেন "জন্মনা জায়তে শূদ্র ইত্যাদি।" কাজেই দেখা যাচ্চে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে যে প্রণালী নির্দ্ধারণ করে' গিয়েচেন, তাছাড়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বর্ণবিভাগ হতেই পারে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা কর্ত্তে গিয়ে এই কথাটাই আমরা প্রায়শঃ ভুলে যাই যে, বর্ণ অর্থে জাতি নয়। বর্ণ মানুষের গুণ ও কর্ম্মজ্ঞাপক সংজ্ঞা এবং জাতি জন্মগত পার্থক্য-বোধক পরিভাষা। যেমন, বর্ণ বলিতে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বুঝি এবং জাতি বলিতে মানবজাতি, গোজাতি প্রভৃতিকে বুঝে থাকি। আমরা যে জিনিষটীকে সমর্থন কর্ত্তে ও যার অপকারিতা এবং অনিষ্টকারিতা ঢাকবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে থাকি, সেটী হচ্চে "জাৎ",—বর্ণ বা জাতি নহে। এ জাৎ ছুঁলে যায়, কিন্তু বর্ণ বা জাতি ছুঁৎমার্গের বাইরে।

বসন্ত বাবু এক স্থানে লিখচেন, "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্মরণাতীত কাল হ'তে বংশগত।" এ কথার তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য হ'ল না। কারণ একমাত্র বৈদিক ভারতেই অর্থাৎ যে সময়ে ভারতবর্ষে নিছক বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রচলন ছিল, সেই সময়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল। লেখক মহাশয় এখানে যে যুগের কথা ইঙ্গিতে বলেছেন, সে যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলে কোন জিনিষ প্রকৃত পক্ষে ছিল না,—ছিল জাতিভেদ-প্রথা। একটু প্রণিধান কর্লেই তিনি বুঝতে পার্ব্বেন যে, কালক্রমে যে সময় হ'তে কর্ম্ম ও বৃত্তি বংশগত হ'য়ে দাঁড়াল, ঠিক সেই সময় হতেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তিরোধান এবং বৈদিক যুগের অবসান হ'ল। তার পর এল জাতিভেদের যুগ, যে যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সংজ্ঞা বংশ এবং জন্মজ্ঞাপক হ'য়ে উঠল। বৈদিক যুগে গুণ-কর্ম্মজ্ঞাপক বর্ণ-ভেদ ছাড়া কোনরূপ জাতিভেদ যে ছিল না, এ কথা, বোধ করি, লেখক মহাশয়কে বলে' দিতে হবে না। অতএব, কোন কালেই যে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বংশগত ছিল না এবং থাকতেও পারে না, এ কথা প্রামাণ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণধর্ম্ম এবং বক্ষ্যমান জাতিভেদ-প্রথা—যাকে আমরা চলতি কথায় 'জাৎ' বলি, এই দুয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েচে, তা দেখিয়েচি। এই তফাৎটাকে আমরা লক্ষ্যের মধ্যে আনিনে বলেই বর্ণধর্ম্ম-আদর্শের মহীরুহের আওতায় এই মহা অনিষ্টকারী জাতিভেদ প্রথারূপ আগাছা জন্মাতে পেরেচে, যা'তে করে' একটা বিরাট জাতির শোচনীয় স্বাস্থ্য-হানি ঘটেচে। যুগ-সঞ্চিত অন্ধ সংস্কার এবং অভ্যাসের ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নামে এই 'জাৎ'-প্রথা পাথরের মত হিন্দুজাতির বুকের উপর চেপে বসেচে বলেই এর অধোগতি হচ্চে—ইহা নিঃসন্দেহ।

স্থানান্তরে বসন্তবাবু লিখচেন, 'মুসলমান অধিকারের অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বংশগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম থাকা সত্বেও ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য, গণিত প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা এবং শিল্পে ভারতবর্ষ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। হিন্দু মনে করে—বংশগত ভাবে চর্চ্চা হয়েছিল বলেই এত উন্নতি হয়েছিল।' মানবজাতির সভ্যতার সেই অরুণ-

প্রভাতে ভারতবর্ষ এবং আরও দু'চারটী দেশ কেন যে এরূপ উৎকর্ষলাভ করেছিল—পৃথিবীর আদিম সভ্যজাতির ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই সে কথা জানেন; সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে' প্রবন্ধ বাড়াতে ইচ্ছা করি না। তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গুণেই যে এরূপ হয়েছিল, এ কথা বলাও যেমন সত্য, দুর্নীতিমূলক এই জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত না থাকলে, ভারতবর্ষ অধিকতর উন্নতির অধিকারী হ'তে পার্ত্ত, এ কথা বলাও তেমনি সত্য। কোন জিনিষ না থাকলে কি হ'ত বা কোন জিনিষ থাকলে কি হ'ত এ নিয়ে যুক্তি চলে না। বর্ত্তমানে যা' প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্চে সেইটী অবলম্বন করে' উন্নতি-অবনতির বিচার করা সমীচীন। এই জাতিভেদ-প্রথা যে আমাদের জীবন-পথের বিঘ্ন ঘটিয়েচে বা ঘটাচ্চে, তা' বর্ত্তমানকালে তার কুফল দেখেই বুঝতে পারা যায়। এইখানে একটা কথা উঠতে পারে, আমাদের স্বকৃত অধঃপতনের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তথা জাতিভেদ-প্রথাকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু কোন নীতি, নিয়ম বা পদ্ধতির ভাল-মন্দের বিচার কর্তে গেলেই, তার প্রভাব এবং ফলের দিকে নজর পড়ে। একটা চলতি কথা আছে "ফলেন পরিচীয়তে'; অর্থাৎ ফল দেখে বিষয়বিশেষের পরিচয় বা গুণাগুণ জানতে পারা যায়। এ থেকে এ কথা কি বলা চলে না যে, যে ধর্ম্ম তার নীতি-নিয়মের মধ্যে তার অনুসরণকারীদের চিরদিন ধরে রাখতে পারে নি, সে ধর্ম্ম তার অনুসরণকারীদের পক্ষে চিরদিন পর্য্যাপ্ত নয়? এক দিন যে অনুশাসন মানুষ মাথায় করে নিয়ে তার জীবনধারা সুনিয়ন্ত্রিত করেছিল, যুগ-পরিবর্ত্তন-প্রবাহে সেই মানুষই যদি সেই অনুশাসনের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করে তাহলে কি বলতে হবে না যে, সে ধর্ম্ম বা নীতি-অনুশাসন বিবর্ত্তন-ধর্ম্মকে অস্বীকার করেচে, অথবা তার নিজের মর্ম্মার্থ হারিয়ে ফেলেচে? মানবজাতির কোন অবস্থাবিশেষে বা কালবিশেষে কোন ধর্ম্ম, ধারা বা পদ্ধতি কার্য্যকরী হয়েছিল বলে' তা যে চিরকালই কার্য্যকর এবং হিতকর হবে এরূপ কথা বলার অর্থ—দেশ-কাল-পাত্র এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে গায়ের জোরে অস্বীকার করা। কোন কাল বা স্থানবিশেষে প্রয়োজ্য নীতি নিয়ম দিয়ে চিরকালের জন্য কোন মানুষ বা জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে না। জোর করে চালাতে গেলে মানব-প্রকৃতি বিদ্রোহের সূচনা করে। এই কথাটাই বোঝাবার জন্যে John St. Mill বলেচেন, "Human nature is not a machine to be built after a model, and set to do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develop itself on all sides according to the tendency of the inward forces which make it a living thing." এই জোর করে' চালানর ফলেই আমাদের সমাজের ভিতর জাতীয় শক্তিক্ষয়কারী অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েচে। বেদবিহিত উদার বর্ণধর্ম্মের মর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করে' আমরা গ্রহণ করেছি তার বিকৃত অর্থ এবং নাম দিয়েছি তার জাতিভেদ। এই জাতিভেদ প্রথার স্বপক্ষে যত যুক্তিতর্কই দেখাই না কেন, যত দিন সমাজের স্তরবিভাগ গুণকর্ম্মগত না হয়ে দৈবাধীন জন্মগত হয়ে থাকবে, ততদিন সে সমগ্র জাতির ভিতর ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি কর্তে থাকবে; যেহেতু, মানব-প্রকৃতি একমাত্র গুণ ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার নিকটই মাথা হেঁট করে; আর কোন অনুশাসন বা নীতি-নিয়মের কাছে সে অবনত হয় না। শাসন বা ভয়ের দ্বারা তাকে অবনত কর্লে সুযোগ পাওয়া মাত্র সে বিদ্রোহ সূচনা করে, ইহাই বিশ্বপ্রকৃতির সনাতন নিয়ম।

পুস্তক-পরিচয়

গীতালি।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই গীতালি ১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৩২৯ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, আর এই ১৩৩৩ সালে তৃতীয় সংস্করণ হইল। আমাদের দেশ যে কেমন রস-পিপাসু হইয়াছে, বারো বৎসরে গীতালির তিনটী সংস্করণই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গীতালির কবিতার পরিচয় শিক্ষিত, কাব্যরস-পিপাসুর কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া যাঁহারা দুঃখ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা গীতালি পড়িতে বলি। ইহার মধ্যে যতগুলি কবিতা আছে, তার সবগুলিই উঁচু সুরে বাঁধা—সে সুর অপার্থিব!

কৌতুক-যৌতুক।—শ্রীঅমৃতলাল বসু মুদ্রাঙ্কিত; মূল্য দুই টাকা।

অনেক দিন পরে রসরাজ বসু মহাশয় বাঙ্গালীর হাতে এই 'কৌতুক-যৌতুক' দিলেন; বাঙ্গালী যে পরম সমাদরে এই যৌতুক মাথায় করিয়া লইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও আমরা রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের জুড়ি খুঁজিয়া পাই না। লেখার এমন মুন্সীগিরি, এমন হাস্যরসের প্রবাহ, এমন তীক্ষ্ণ অথচ সরস ও বিদ্বেষ-লেশ শূন্য বিদ্রূপ বাঙ্গালীর মধ্যে রসরাজ ব্যতীত আর কাহারও হাত দিয়া বাহির হইতেছে না। তাই, তাঁহার এই যৌতুকের সকলগুলি প্রবন্ধই পূর্ব্বে পড়িলেও এখন দুই তিনবার পড়িয়াও আশা মিটে না। কোন্ দিক দিয়া বই শেষ হইয়া যায়, তখন মনে হয় ২৫৬ পৃষ্ঠা না দিয়া রসরাজ ৬৫৬ পৃষ্ঠা দিলেন না কেন? এই দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত দেশের লোক এই বইখানি পড়িয়া অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্য সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইবেন, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

বঙ্গে চালতত্ত্ব।—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্যরত্ন প্রণীত, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত শেঠ মহাশয় একজন পাকা ব্যবসায়ী; তিনি 'মহাজন সখা' 'মহাজনী হিসাব' প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই চালতত্ত্বও তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। বাঙ্গালা দেশে কোন্ কোন্ জেলায় কি কি রকমের চাউল জন্মে, কি পরিমাণে জন্মে, কোন্ জেলার কোন্ কোন্ হাটে কোন্ রকমের চাউল পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সন্তোষ বাবুকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। শুধু ব্যবসায়ী কেন, গৃহস্থ-মাত্রেরই ঘরে এই পুস্তকখানি থাকা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা তুলসীদাস।—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৷ টাকা।

মহাত্মা তুলসীদাসের নাম ভারতবাসী মাত্রেই জানেন; তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দীভাষী হিন্দুর অপূর্ব্ব সম্পদ। তাঁহার ন্যায় সাধকশ্রেষ্ঠের জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেরই বাসনা হয়; শ্রীযুক্ত শচীশ বাবু সেই বাসনা পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা তুলসীদাসের জীবন অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ; যাঁহারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা এ গ্রন্থ পড়িয়া সুখী হইতে পারিবেন না। শচীশবাবু অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন; তাই তিনি সেই ভাবেই বিভোর হইয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, যুক্তিতর্ক-বিচারের ধার দিয়াও যান নাই। তাহা হইলেও বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেরই এই মহাত্মার কাহিনী পাঠ করা কর্ত্তব্য। সুলেখক শচীশ বাবুর পরিচয় আর বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না।

শেষ প্রেয়া।—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণ তাঁহার 'কোষ্ঠীর ফলাফল' হইতে প্রতি মাসেই পাইতেছেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী, তাঁহার বাক্‌পটুতা, তাঁহার রহস্যক্ষমতা বাস্তবিকই অসাধারণ। এই 'শেষপেয়া' সেই পাকা হাতের লেখা একখানি উপন্যাস। আমরা এই বইখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই গ্রন্থের নবীনের চিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রসিদ্ধ শিল্পীর ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন। বইখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।

শ্রীরামকেলী ও শ্রীশ্রীরূপসনাতন।—শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদর্শ চরিত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমন মহাপুরুষ-দিগের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যে প্রকার ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার দরকার, গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয়ের যে তাহা প্রভূত পরিমাণে আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান। ভক্তশ্রেষ্ঠের জীবন-কথা ভক্তের মুখে যে কি সুন্দর শোনায়, তাহা এই বইখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

চীন যাত্রী।—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

এখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, অথচ ইহাতে চীনের কথা মোটেই নাই। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, সুলেখক কেদার বাবু শুধু পথের কথাই এই বইখানিতে লিখিয়াছেন, আর সে পথও স্থলপথ নহে, জলপথ; জাহাজে চড়িয়া চীন দেশে পদার্পণ করিয়াই কেদার বাবু কথা শেষ

করিয়াছেন ; অর্থাৎ তিনি যে কয়দিন জাহাজে ছিলেন, সেই কয়দিনের বিবরণ দিয়াই একেবারে ইস্তাফা দিয়াছেন। বইখানি পড়া যখন শেষ হইল, তখন বলিতে হইল 'ও বাঁড়ুয্যে মশাই, আর কৈ?" পাকা যাদুকর এই কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়,—তিনি ঠাট্টা তামাসা রহস্য করিয়া হাসাইতে হাসাইতে আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে চীনের বন্দরে উপস্থিত করিয়াই অমনি গা ঢাকা দিলেন। কাজটা কিন্তু তাঁহার মত ওস্তাদের উপযুক্ত হয় নাই, এ কথা যিনি এই বই পড়িবেন, তিনিই বলিবেন।

উপাসিকা-চরিত।—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কির জীবন-কাহিনী এই 'উপাসিকা-চরিতে' বিবৃত হইয়াছে। এই মহিয়সী মহিলার জীবন-কথা-প্রসঙ্গে ঘোষ মহাশয় তত্ত্ববিদ্যা-মণ্ডলীর উদ্দেশ্যও অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্যা-মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা। ম্যাডাম ব্যাভাট্স্কির অপূর্ব্ব গ্রন্থ Isis Unveiled ও Secret Doctrine, এই দুইখানি পুস্তকে তত্ত্ববিদ্যার সার আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করিলে যে শুধু থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রীরই জীবন-কথা জানিতে পারা যায়, তাহা নহে, উক্ত সোসাইটীর সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের লিপি-কুশলতায় পুস্তকখানি মনোরম হইয়াছে।

সন্ধ্যামণি।—শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয় এক সময়ে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমরা পরম আগ্রহে তাঁহার কবিতা পাঠ করিতাম। তাহার পর অনেক দিন তিনি নীরব ছিলেন; আমরা মনে করিয়াছিলাম বাৰ্দ্ধক্য প্রযুক্ত তিনি বাণীসেবা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই 'সন্ধ্যামণি' দেখিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। সুকবি নিয়োগী মহাশয়ের কবি-প্রতিভা এখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই, বরং আরও উজ্জ্বল, আরও প্রখর হইয়াছে। আমরা এই সংগ্রহ-পুস্তকের প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁহার কবি প্রতিভার প্রমাণ পাইলাম।

Raja Rammohan Ray's Misson to England.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। মোগল রাজ্যের নামমাত্র উত্তরাধিকারী সম্রাট মৈনুদ্দীন আকবর ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কোম্পানীর যে সকল সর্ত্ত হইয়াছিল, কোম্পানী তাহা রক্ষা করিতেছেন না বলিয়া তিনি এখানে দরবার করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া বিলাতে আবেদন করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় মহাশয়কে বিলাতে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে কোম্পানীর সহিত তাঁহার যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল এবং সরকারী দপ্তরে যে সকল কাগজপত্র ছিল, তাহার সন্ধান এতদিন কেহ পান নাই। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া সেই সকল অপূর্ব্ব-প্রকাশিত কাগজপত্র সরকারী দপ্তরখানা হইতে উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের একটী অবশ্য-জ্ঞাতব্য অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও একাগ্র অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়াই পারি না। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে ভবিষ্যতে ইতিহাসের আরও অজ্ঞাত উপকরণ সংগৃহীত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

মানস কমল।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

এখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ। গ্রন্থকার বিভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রিকাদিতে যে সমস্ত ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে এগারটী গল্প দিয়া এই 'মানস কমল' ছাপাইয়াছেন। এই গল্পগুলি যখন নানা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কয়েকটী 'ভারতবর্ষে'ও ছাপা হইয়াছিল, তখন অনেকেই গল্পগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র-বাবুর লেখার প্রধান গুণ এই যে, তিনি ছোট গল্প ছোটই করেন, অথচ সেই ছোটর মধ্যেই তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হয়। এই কারণেই আমরা নরেন্দ্রবাবুর গল্প পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। তাঁহার মানস-কমল' তাঁহার 'ষড়-অবতারে'র ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

গুরুগীতা।—শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ বিবৃত, মূল্য ছয় আনা।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে গুরু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যা এই পুস্তকে করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও গুরু সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে; গুরু শব্দের অর্থ, শিষ্যের কর্ত্তব্য, গুরুধ্যানের ফল প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই গুরুগীতা সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী হইয়াও প্রকৃত হিন্দু সাধকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তিই তাঁহাকে এই গুরুগীতা সম্পাদনে প্রণোদিত করিয়াছে।

সাহিত্যিকা।—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত—দাম দেড় টাকা।

গ্রন্থকারের ১২টি সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি যখন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখনই এগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং পড়িয়া গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতায় এবং বিশ্লেষণ শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাংলা সাহিত্যে সত্যকার সমালোচনা দুর্লভ। ভিতরে যে পাণ্ডিত্য থাকিলে সমালোচনা সাহিত্যে গঠনের রসদ যোগায়, সেই পাণ্ডিত্য লইয়া খুব কম লোকই আমাদের সাহিত্যের আসরে যোগ দেন। বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য, এদেশে যাঁহারা পড়েন তাঁহারা লেখেন না, যাঁহারা লেখেন পড়ার সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প। সেই জন্যই আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা হয় অত্যন্ত হাল্কা হইয়া পড়ে, না হয় ব্যক্তিগত গালিগালাজের চাপে অপাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়। নলিনীবাবু এই দোষ হইতে মুক্ত। তাঁহার লেখা পড়িয়াই বোঝা যায়, তিনি লেখেন বটে কিন্তু লিখিবার আগে পড়াশুনা করিয়া বনিয়াদটা পাকা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মনও রস-পিপাসু।

সুতরাং সমালোচকের যে কাজ—রসের পরিচয় দেওয়া, সত্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো, সৌন্দর্য্যকে উদ্ঘাটন করা—এগুলির অজস্র পরিচয় এই গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মত অবশ্য সর্ব্বত্র আমাদের কাছে যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু এখানে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। সে আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রাখিয়াও এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় যে, তাঁহার 'সাহিত্যিকা' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রন্থের ভাষাও ভাব প্রকাশের উপযোগী। তবে স্থানে স্থানে রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত শিথিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ দোষ যে অক্ষমতার জন্য নহে অনবধানতার জন্য—তাহাও বুঝিতে দেরী হয় না। তাহা হইলেও এ দোষ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কারণ pefect যে রচনা তাহা সমস্ত রকমের দোষের হাত হইতেই মুক্ত।

সপ্তস্বরা।—শ্রীসুকুমার দত্ত প্রণীত—দাম পাঁচ সিকা।

এখানি গল্পের বই। সাতটি গল্পের ভিতর দিয়া, লেখক প্রাচীন ভারতের তীর্থ স্থানগুলির ভিতর ভোগের যে অগ্নিশিখার ছবি দেখিয়াছেন, তাহাকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। শব্দের দ্বারা ছবি আঁকায়, বর্ণনার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে লেখকের বেশ ভালো হাত আছে। কল্পনা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে; সুতরাং অতীত যুগের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার পক্ষে অনেক স্থলেই অসম্ভব হয় নাই। তাঁহার ভাষা ঐশ্বর্য্যময়; কিন্তু অতিরিক্ত রকমে ভারি এবং সংস্কৃতবহুল। কিন্তু তাহা হইলেও গ্রন্থখানির কাব্যমাধুর্য্য আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে—বইখানি পড়িয়া আমরা খুসী হইয়াছি।

ভারতের দাবী।—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রণীত। দাম বারো আনা।

এখানি রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই। ইহাতে সাতটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি সমস্তই সুলিখিত। লেখক বর্ত্তমানের কোনো রাজনৈতিক গণ্ডীর ভিতর পড়িয়া 'সেই' হারাইয়া ফেলেন নাই। তাই অনেক সমস্যা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার অবকাশ তিনি লাভ করিয়াছেন। আর সেই জন্যই প্রবন্ধগুলি সমস্ত রকমের গোঁড়ামীর ছাপ হইতে মুক্ত। তাহার লেখার ভিতরেও জোর আছে, যুক্তির ভিতরেও জোর আছে। তিনি দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যও চাহিয়াছেন জোরালো শক্ত মানুষ—"যে মানুষ টলে না, গলে না, ভোলেও না—যে নমে না, নামে না, থামেও না, অবশ্যম্ভাবী হইলে ভাঙ্গে।" গ্রন্থের ভিতর লেখকের দেশ-প্রীতির পরিচয়েরও অভাব নাই। এ যুগের ভাবপ্রবণ রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বহিবারণও ভারি চমৎকার হইয়াছে।

কোরাণ-তত্ত্ব (তৃতীয় খণ্ড)।—শেখ রছুল, মৌলবী মোবিনুদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

মৌলবী সাহেব কোরাণ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা আজ কেবল তাঁহার প্রণীত কোরাণ তত্ত্বের তৃতীয় খণ্ডের কথাই বলিব। এই খণ্ডে তিনি শেষ রছুল হজরত মহম্মদের জীবনী সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। আদর্শ পুরুষের জীবনী আলোচনা করিলে তাহা হইতে এমন সমস্ত জিনিষ জানা যায়, যাহা পার্থিব জগতের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সাম্প্রদায়িক বাক্ বিতণ্ডার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আদর্শ মহাপুরুষগণের উক্ত অনেক কথাই ঠিক ভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে না, যদি তিনি স্বীয় জীবনে সেই উক্তিগুলি কিরূপে কার্য্যকরী করিয়াছেন তাহা জানা না যায়। কোরাণ সরিয়ত প্রভৃতি নানা কথার নানা রকম ব্যাখ্যা নানাজনে করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যাখ্যাগুলি লইয়াই পৃথিবীতে নানা মতামত সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু যদি আমরা একবার বিবেচনা করিয়া দেখি যে, হজরত মহম্মদ স্বীয় জীবনে সেই কথাগুলি কি ভাবে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বাকবিতণ্ডা হ্রাস পাইবে। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, আদর্শ পুরুষগণের জীবনী আলোচনা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। মৌলবী সাহেব তাঁহার এই পুস্তকে হজরত মহম্মদের জীবনী যেরূপ সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখক বলিয়াছেন ঐহিক বা আত্মসুখ লাভ কখনও তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। ধর ধামে অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনা প্রতিষ্ঠা, পাপনিমজ্জিত জগতের উদ্ধার সাধন, মানবসমাজে একেশ্বরবাদ, সাম্যবাণী, ভ্রাতৃভাব বিস্তার এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানদ্বার তাঁহার জীবনের মুলমন্ত্র ছিল। উপসংহারে লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "হজরত মহম্মদ মোস্তফার শ্রেষ্ঠতম বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিরূপে একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত, এক পরিবার অন্য পরিবারের সহিত ও এক জাতি অন্য জাতির সহিত শান্তিতে বাস করিতে পারে এবং কিরূপে জগতের পরস্পর-বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, তাহার বিশদ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হজরত মহম্মদের জীবনীকে এই ভাবে অন্য লেখক দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। পুস্তকখানির ভাষা অতি সরল ও সুন্দর। সাধারণ লেখাপড়া জানা ব্যক্তিরা অক্লেশে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৩]

অগ্রহায়ণ মাস। কয়েক দিন হইতে খাড়া পাশ্চমা বাতাস দিতেছে বলিয়া শীতের প্রকোপ বেশ একটু বাড়িয়া উঠিয়াছে। সরমা তাহার এক বৎসর বয়সের শিশু-পুত্রটিকে স্তন্য-পান করাইয়া বারাণ্ডায় রৌদ্রের পার্শ্বে শুয়াইয়া নিকটে বসিয়া ছিল। শিশুটি রুগ্ন, শীর্ণ; অজীর্ণতার জন্য যথোচিত বৃদ্ধি নাই, এবং প্রত্যহ শেষ রাত্রি হইতে দশ বার ঘণ্টা যকৃত-জনিত জ্বর ভোগ করে। এত স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যেও মুখখানি কিন্তু হিমস্নাত ফুলের মত কমনীয়!

পুত্রের বিশীর্ণ মুখের উপর অপলক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সরমা নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। স্নেহ-শঙ্কা মথিত হৃদয়ের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা তাহার সকরুণ নেত্রদুটি ভেদ করিয়া অপরূপ মমতায় পুত্রের উপর বিকীর্ণ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সহসা মনে হইল, 'আসিয়াছে ত',—কিন্তু যদি চলিয়া যায়!' দুই ফোঁটা অশ্রু কোথায় আল্‌গা হইয়া ছিল—ঝরিয়া পড়িল! ভয়ার্ত্ত পক্ষী-জননী যেমন ত্রস্তভাবে পক্ষী-শাবককে নিজ পক্ষপুটের মধ্যে ঢাকিয়া লয়, সেইরূপে সরমা নত হইয়া দুই ব্যগ্র বাহুর মধ্যে পুত্রকে বেষ্টিত করিয়া ধরিল। তাহার পর পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া হাততালি দিয়া শিশুকে হাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; মাতার আদর উৎপীড়নে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শিশু হাসিতে লাগিল।

পুত্রের মুখে হাসি দেখিয়া সরমার মন হইতে অমঙ্গল-চিন্তা অপসৃত হইল; সে সযত্নে দুই হস্তের উপর পুত্রকে তুলিয়া লইয়া নত হইয়া মুখ চুম্বন করিল; তাহার পর বাহুদ্বয় এবং বক্ষের মধ্যে পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে দুলিতে দুলিতে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, 'ধন, ধন, ধন, ধন, সাত শ' রাজার ধন! এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন!'

হঠাৎ কি মনে হইয়া সরমা পিছন ফিরিয়া দেখিল নিঃশব্দ পদে রমাপদ কখন পশ্চাতে আসিয়া সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া আছে!

পুত্র-স্নেহের এই অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি অপরে দেখিয়াছে সেই লজ্জায় সরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে শিশুকে শয্যায় শুয়াইয়া দিয়া বলিল, "ভারী অন্যায় কিন্তু!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "কি ভারী অন্যায়?"

"এই রকম চোরের মত এসে চুরী করে দেখা।"

রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "চোরের মত না এলে কি চুরী দেখতে পেতাম?"

রমাপদর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সরমা ফিরিয়া চাহিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "চুরী আবার কি দেখলে?"

পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে রমাপদ বলিল, "চুরী নয়? খাসা চুরী! কেমন নিঃশব্দে এই ক্ষুদে চোরটি আমার কাছ থেকে তোমাকে চুরি করে নিচ্ছে!"

এ অভিযোগের কোনো মৌখিক প্রতিবাদ না করিয়া সরমা শুধু একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, 'চুরী নয় বাটপাড়ী! চুরী ত আমাকে তুমিই প্রথমে করেছ!"

"আচ্ছা সরমা, একটা কথা বলবে?"

"কি কথা?"

"তুমি খোকাকে বেশী ভালবাস, না আমাকে বেশী ভালবাস?"

এক মুহূর্ত্তেই সরমা ভাবিয়া দেখিল প্রশ্ন সহজ নহে; তাই কঠিন সমস্যা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সে রমাপদকে পাল্টা প্রশ্ন করিল; বলিল, "তুমি কাকে বেশী ভালবাস, আমাকে, না খোকাকে?" সে আশা করিয়াছিল দুরূহ সমাধানের ভার রমাপদর উপর পড়ায় অতঃপর সে এ আলোচনা পরিত্যাগ করিবে।

কি এ কৌশল একেবারে ব্যর্থ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া অকুণ্ঠিত স্বরে রমাপদ বলিল, "আমি তোমাকে। তুমি ?"

ইহার পর সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল! একবার সরমা বলিতে চেষ্টা করিল 'আমিও তোমাকে।' কিন্তু দ্বিধায়, লজ্জায়, সন্দেহে সে কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না; বিমূঢ়ভাবে সে রমাপদর দিকে চহিয়া রহিল। কিন্তু রমাপদ যখন তাহার উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া বলিল, "আমি জানি তুমি খোকাকেই বেশী ভালবাস।" তখন সে আর কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া সজোরে বলিতে লাগিল, "কখ্খনো না! কখ্খনো না! ভুল কথা।"

"কিন্তু তুমি নিজেই ত' সে কথা বলছিলে।"

"আমি বলছিলাম ?—কখন আমি বল্ছিলাম ?" গভীর বিস্ময়ে সরমা ঔৎসুক্যের সহিত রমাপদর দিকে চাহিয়া রহিল।

"একটু আগে ত' তুমি বলছিলে, এ ধন ঘরে না থাক্‌লে তোমার জীবন বৃথা হ'ত; অবশ্য আমি থাকা সত্বেও।"

ভ্রূকুঞ্চিত পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সরমা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ওঃ, তাই বলা হচ্ছে? কিন্তু সে ত' আর আমার নিজের কথা নয়; ছড়ার কথা।"

রমাপদ বলিল, "তোমার নিজের কথা না হলেও, তোমার জাতের কথা। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মায়ে ওই ছড়া কেটেছে; কেউ মুখে, কেউ বা মনে। আসল কথা কি জান সরমা? এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ হচ্ছে এই যে মেয়েদের প্রথম দৃষ্টি থাকে ফলের উপর, আর পুরুষদের থাকে মূলের উপর।"

সরমা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ তুমি অন্যায় কথা বলছ!"

রমাপদ বলিল, "কিচ্ছু অন্যায় বলছিনে, ঠিকই বলছি। এ জন্যে তোমার দুঃখিত বা লজ্জিত হ'বার কোনও কারণ নেই, কারণ তোমার এ হৃদয়-বৃত্তির জন্য যদি কিছু দায়ী হয় ত' সে ভগবানের সৃষ্টিতত্ত্ব। ইতর প্রাণীদের মধ্যে তুমি এই বৃত্তিটা আরো স্পষ্ট এবং স্থূল ভাবে দেখতে পাবে। সন্তান রক্ষণের আগ্রহ অনেক স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে এমন প্রবল ভাবে আছে যে কোনো কোনো সময়ে—"

সৃষ্টিতত্ত্ব এবং প্রাণীতত্ত্বের কাহিনী শেষ করিবার সময় হইল না, গৃহদ্বারে ডাক-ওয়ালা হাঁকিল, "চিঠ্‌ঠি লিজিয়ে!"

রমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া একখানা চিঠি লইয়া পড়িতে পাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি এল ?"

পত্র পাঠ করিতে করিতে রমাপদ বলিল, "সু-খবর সরমা! বুধবারে কাশী থেকে নরেশবাবু আর তোমার দিদি আসছেন।"

দিদি অর্থাৎ সরমার একমাত্র সহোদরা সুকুমারী; এবং নরেশবাবু সুকুমারীর স্বামী। ইহাঁর পুরা নাম শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিবাস কলিকাতা। কাশীতে বাড়ী আছে; প্রতি বৎসর শারদীয় পূজার পর চার পাঁচ মাস তথায় অতিবাহিত করেন।

"দিদি আসছেন! কই চিঠি দেখি।" বলিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে সরমা পত্রের জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মুখ হইতে আনন্দের দীপ্তিটুকু অপসৃত হইল; চিন্তিতমুখে সে বলিল, "সু-খবর বড় নয়!"

"কেন ?"

মৃদু হাসিয়া সরমা বলিল, "গরীবের বাড়ী বড়লোক কুটুম্ব আসা সুবিধার কথা কি ?"

সরমার দুঃখ অনুভব করিয়া রমাপদ মনের মধ্যে গভীর ভাবে ব্যথিত হইল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "তা হ'ক সরমা, আমাদের সাধ্যমত আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি যাতে না হয় সে বিষয়ে আমাদের একান্ত দৃষ্টি রাখতে হবে। তার পর যা কিছু, তার জন্য আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাঁরা যে আসছেন তা সু-খবর নিশ্চয়ই!"

যুক্তি-তর্কের দ্বারা সু-খবর প্রতিপন্ন করিয়াও সু-খবরের দুশ্চিন্তায় রমাপদ মনে মনে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ধনশালী বিলাসী শ্যালিপতিকে এই জীর্ণ কদর্য্য গৃহে কেমন করিয়া স্থান দিবে তাহা ভাবিয়া তাহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল না! দীর্ঘ ব্যবহারে সে গৃহ ক্রমশঃ সহনীয় হইয়া আসিয়াছিল, আজ এই নূতন প্রয়োজনের পরিকল্পনে তাহার দীনতা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ফুটিয়া বাহির হইল। যে দিকেই রমাপদ চাহিয়া দেখিল, দৈন্য এবং দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু পীড়িত হইল। বিবাহের পর কলিকাতায় উপস্থিতি-কালে একবার সে নরেশচন্দ্রের গৃহে নিমন্ত্রিত

হইয়াছিল। সেই সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকার কথা স্মরণ করিয়া তাহার এ বাস-গৃহকে সে-গৃহের গো-শালার উপযুক্তও মনে হইল না। রাত্রে আহারের পর শ্যালিকা সুকুমারী আঁচমনের জন্য তাহাকে বাথ-রুমের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়; সেই বিজলী-দীপোজ্জল, বৃহৎ চিনামাটির বাথ-সংযুক্ত, নানাবিধ সাবান গন্ধদ্রব্য দর্পণ এবং অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য দ্বারা সজ্জিত প্রশস্ত স্নানাগারের কথা মনে পড়িল। তৎস্থলে এই গৃহে সুকুমারীকে স্নান করিতে হইবে অদূরবর্ত্তী উঠানের কলতলায়; উপরে আচ্ছাদন নাই, চতুর্দ্দিকে যথোচিত আবরণ নাই, তিনদিকের টাটির বেড়া জীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! নিবিড় অশান্তিতে রমাপদর চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল! নিজের জন্য সে ততটা বিচলিত হইল না যতটা হইল সরমার কথা ভাবিয়া! দুই ভগিনীর অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য! সরমা লজ্জিত হইবে! সরমা অবনত বোধ করিবে!

চিঠি শেষ করিয়া রমাপদকে ফিরাইয়া দিতে গিয়া রমাপদর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ দেখিয়া সরমা বলিল, "অত ভাবছ কেন? আমাদের পক্ষে এ ব্যাপার একটা ছোটখাট বিপদেরই মত বটে; তবে দু-তিন দিনের কথা বই ত নয়, এক রকম করে চলে যাবে।"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদর বিষণ্ণ চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল; সে বলিল, "তা যাবে জানি,—আমি সে কথা তত ভাবছিনে। আমি ভাবছি তোমাকে আমি কি অবস্থায় রেখেছি সেটা তাঁরা বেশ ভাল করেই দেখে যাবেন!"

সরমাও কিছু পূর্ব্বে কতকটা এইরূপই কোনো কথা ভাবিতেছিল; কিন্তু স্বামীর মুখ হইতে এ কথা শুনিয়া সে নিমেষের মধ্যে সমস্ত দুঃখ এবং লজ্জার চিন্তা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "তা দেখে যান ত' দেখে যাবেন! সকলেই নিজের নিজের অবস্থায় যেমন আছে ভাল আছে। কিন্তু তা'ও বলি, শুধু বাইরের অবস্থা না দেখে ভিতরের অবস্থাটাও যদি একটু দেখে যান তা হলে তুমি আমাকে যে অবস্থায় রেখেছ তা দেখে আমার জন্যে দুঃখিত হয়ে যাবেন না তা' নিশ্চয়!"

রমাপদ একটু হাসিল; বলিল, "এ রকম বাইরের অবস্থা দেখলে ভিতরের অবস্থা দলীল-পত্রে লিখে সই করে রেজেষ্ট্রী করে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না সরমা!"

সরমা বলিল, "দলীল-পত্র লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু চোখ থাক্‌লে লোকে দেখতে পাবে। জামাইবাবুর চোখে পড়বে কি না বলতে পারিনে, কিন্তু দিদির চোখ এড়াবে না তা নিশ্চয়। তোমরা পুরুষেরা বাইরে নিয়ে থাক বলে বাইরেটাই তোমরা বেশী করে দেখ; আমরা ভিতর নিয়ে থাকি, তাই ভিতরের অবস্থাটা আমাদের চোখে সহজে পড়ে।" বলিয়া সরমা হাসিতে লাগিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া সরমা পুনরায় বলিতে লাগিল, "তোমাকে আমি আগে অনেকবার বলেছি, এখনও বলছি, আমাদের এ দরিদ্র অবস্থার জন্যে আমার নিজের কিছুমাত্র কষ্ট নেই। আমার কষ্ট হয় তোমার জন্যে, আর খোকা হওয়ার পর থেকে খোকার জন্যে। মাসে মাসে বাড়ী-ভাড়া থেকে বারো টাকা পাওয়া যাচ্ছে—তা ছাড়া মাঝে মাঝে তুমি কিছু-না-কিছু উপার্জ্জন করছই; তাতে ত' আমাদের একরকম ভালই চলে যাচ্ছিল। খোকা হওয়ার পর থেকে টাকার কথা একটু একটু মনে হয়। মনে হয় টাকা-কড়ির একটু সুবিধা হলে ওর একটু ভাল খাওয়া-পরা, একটু ভাল সেবা-চিকিৎসা হতে পারে। তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

"তা ছাড়া যে আর কিছু নয় তা' ত যে দিন থেকে তুমি সংসারের ভার নিয়েছ সেই দিন থেকেই দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু আমারও ত' সাধ হয় সরমা!"

সরমা শান্ত মুখে বলিল, "বেশ ত' সময় হলে সে সাধ মিটিয়ো। এখন উপস্থিত দিদিরা যে আসছেন সে বিষয়ে কি করবে বল?"

তখন, ধনী অতিথিগণের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে হইবে তদ্বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ আরম্ভ হইল। কিরূপ হইবে তাহা কতকটা সহজেই স্থির হইয়া গেল, কারণ রূপ এমন বস্তু যাহা কল্পনার সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে হইবে তাহা লইয়া গোল বাধিল। সরমা বলিল, "ভাড়াটের কাছ থেকে এক মাসের বাড়ী-ভাড়া আগাম নাও না?"

রমাপদ বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি? মাসকাবারের পর আধা-মাস দু-বেলা তাগাদা করে যার কাছে ভাড়া পাওয়া যায় না, সে আগাম ভাড়া দেবে? তার চেয়ে না হয় রহিম বক্স কাবুলীর কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা ধার নেওয়া যাক্।"

সরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আবার সেই টাকায় ছ-আনা সুদে কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া! না, সে কিছুতেই হবে না। সেবার কুড়ি টাকা ধার নিয়ে কত টাকা সুদ দিতে হয়েছিল তা মনে আছে?"

রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "মনে আছে; কিন্তু এ কথাও মনে আছে যে, সে টাকা না হলে তোমাকে হয় ত' বাঁচাতেই পারতাম না। সে টাকার সুদ দিয়ে আমার মনে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি!"

প্রসবের পর সরমার প্রবল জ্বর হওয়ায় চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য রমাপদ রহিমবক্স কাবুলীর নিকট কুড়ি টাকা ঋণ করিয়াছিল।

সরমা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি জানতে পারলে কাব্‌লীওয়ালার কাছ থেকে কখনও তোমাকে টাকা ধার নিতে দিতাম না। একবার কোনো রকমে সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আবার কেউ সাধ করে তাতে পা দেয়? তার চেয়ে মুদীর দোকানে বাকি রেখে যে-কদিন তাঁরা থাকেন চালিয়ে নোব, সে বরং ভাল।"

রমাপদ বলিল, "শুধু মুদীর দোকানই ত' নয় সরমা! কিছু কাপড় সেমিজও ত কিনতে হবে।"

"কাপড় সেমিজ কি হবে?"

"কাপড় সেমিজ না কিনলে কি করে তাদের সামনে তুমি দাঁড়াবে এই ছেঁড়া আর তালি নিয়ে?"

অবলীলা ভরে সরমা বলিল, "সে আমি বেশ দাঁড়াব, তুমি কিছুমাত্র ভাবিত হয়ো না। কিন্তু কাব্‌লীওয়ালার কাছ থেকে তুমি কিছুতেই টাকা ধার করতে পাবে না! কিছুতেই না, বুঝ্‌লে?"

চিন্তিতমুখে রমাপদ বলিল, "তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু কিছু টাকার যোগাড় ত' করা চাই; তা কেমন করে হয়?"

রমাপদর উদ্বেগ দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল; বলিল, "আচ্ছা, এ এমনই কি গুরুতর ব্যাপার যার জন্যে তুমি এতটা ভাবতে লাগলে? টাকার যোগাড় হয়, তোমার কুটুম্বদের তুমি পোলাও কালিয়া খাইয়ো; আর টাকার যোগাড় না হয় ত' আমার কুটুম্বদের আমি ডাল ভাত খাওয়াব। কেমন, তা হলে হবে ত?"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদও হাসিতে লাগিল; বলিল, "তা হলে একরকম মন্দ হয় না; তবে ভয় হয় তোমার কুটুম্ব ডাল ভাত খেয়ে আমার নিন্দে না করে!"

সরমা সহাস্যমুখে বলিল, "তোমার কুটুম্ব পোলাও কালিয়া খেয়ে আমার সুখ্যাতি করতে পারে সে ভয়ও ত' আছে!"

"হ্যাঁ, তা'ও ত' আছে! এ দেখছি উভয় সঙ্কট!" বলিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল।

[১৪]

রবিবারের অপরাহ্ণ। ভাগলপুরের প্রধান বাণিজ্য-পল্লী সুজাগঞ্জে "ভাগলপুর সিল্ক ষ্টোরের" প্রসিদ্ধ দোকান জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রেতা, বিক্রেতা, তন্তুবায়, দালাল, দোকানদার, চালানদার, সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য লইয়া ব্যস্ত; দোকানের মধ্যস্থলে বসিয়া ব্যবসায়ের অংশীদার এবং পরিচালক শ্রীযুক্ত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ স্বরে কর্ম্মচারিগণকে খরিদ-বিক্রয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। আগন্তুকদের মধ্যে কেহ অনুযোগ করিতেছে, কেহ অনুনয় করিতেছে, কেহ আদান করিতেছে, কেহ প্রদান করিতেছে। তারাচরণ সহাস্যমুখের সুমিষ্ট বাক্যে সকলকেই সন্তুষ্ট করিতেছেন।

রমাপদ ধীরে ধীরে দোকানে প্রবেশ করিয়া ভীড় দেখিয়া দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল।

তারাচরণ দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এস রমাপদ, দাঁড়ালে কেন? এই দিকটায় এসে বোস।"

একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া রমাপদ বলিল, "অন্য সময়ে আসব; এখন আপনি কাজের ভীড়ে রয়েছেন।"

"তোমাদের পাঁচজনকে নিয়েই ত' ভাই কাজের ভীড়। এস, এস, বোস। আমারও তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

আর ইতস্ততঃ না করিয়া রমাপদ তারাচরণের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল।

একজন ক্রেতার সহিত অসমাপ্ত কথা শেষ করিয়া রমাপদর দিকে ফিরিয়া তারাচরণ কহিলেন, "এবার বল কি খবর; তোমার কথাই আগে শুনি।"

দূরদেশের গ্রাহকবর্গের সহিত পত্র-ব্যবহারের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে তারাচরণ একজন লোক খুঁজিতেছিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণে দোকানে আসিয়া প্রয়োজনীয় চিঠি-পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। অন্যত্র অপর কাজ করিয়াও এ কাজ করা চলে বলিয়া মাসিক পারিশ্রমিক মাত্র পনের টাকা। তারাচরণ রমাপদকে এ কাজের জন্য একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু বেতন অল্প বলিয়া তখন রমাপদ স্বীকৃত হয় নাই। রমাপদ জানাইল এখন সে সম্মত আছে; তবে বিশেষ কোনও প্রয়োজনের জন্য দুই মাসের বেতন সে অগ্রিম চাহে।

শুনিয়া তারাচরণ কহিলেন, "সে কাজে ত' একজন লোক বাহাল হয়েছে, অকারণে তাকে ত' ছাড়াতে পারিনে। তবে আমি এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা তোমার করে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে অন্য একটা কথা তোমাকে জানাতে চাই। আমাদের কারখানার সিল্ক প্রচার করবার জন্যে আমি একজন উপযুক্ত লোককে বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং অন্যান্য অঞ্চলে পাঠাতে চাই। উপস্থিত বেতন মাসিক চল্লিশ টাকা দোব, রাহাখরচ আর খাইখরচ অবশ্য স্বতন্ত্র। তা' ছাড়া সে নিজের চেষ্টায় আর পরিশ্রমে যে কাজ করবে তার লাভের তিন আনা অংশ দোব। আমার মনে হয় এ নিতান্ত মন্দ কথা নয়। তুমি রাজী আছ?"

একটু চিন্তা করিয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দ কথা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কত দিন বাইরে থাকতে হবে?"

"যতদিন বাইরে থাকা লাভজনক হবে ততদিন। উপস্থিত প্রথমবার ত' তিন মাসের কম নয়।"

রমাপদ বলিল, 'আপনি ত' জানেন আমার বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষমানুষ কেউ নাই; এত দিন বাইরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না তাই ভাবছি।"

রমাপদর কথা শুনিয়া তারাচরণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন—তাহার পর ঈষৎ প্রবলভাবে বলিলেন, "এ কিন্তু অন্যায় রমাপদ! তোমাদের মত লেখাপড়া-জানা যুবকেরা যদি (রাগ ক'রো না) এমনি আঁচল-বাঁধা হয়ে বাড়ী বসে থাকে, তিন মাসের জন্যে বাইরে যেতেও ভয় পায়, তা হলে তোমাদের নিজের উন্নতিই বা কেমন করে হয়, আর দেশের উন্নতিই বা কেমন করে হয়! বেরিয়ে পড় রমাপদ, বেরিয়ে পড়! বাধা-বন্ধন কেটে-কুটে বেরিয়ে পড়! দূর দূরান্তরে দেশ-দেশান্তরে চলে যাও! দেখবে তাতে বাড়ীর অকল্যাণ হবে না, কল্যাণই হবে।"

একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তারাচরণ বলিলেন, "বউমাকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে রমাপদ বলিল, "সে হয় না;—সেখানে বিমাতার উপদ্রব।"

"তোমার বাঁধন তা হলে শক্ত দেখছি!" বলিয়া তারাচরণ মৃদু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, উপস্থিত তোমার অন্য একটা ব্যবস্থা বোধ হয় আমি করতে পারি। আমার একটি বিহারী বন্ধু আছেন, নাম দেওকীলাল চৌধুরী—ভারী চমৎকার লোক—সাধুপ্রকৃতি। তাঁর একটি ছেলে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা পর্য্যন্ত একজন শিক্ষকের জন্য তিনি আমাকে বলছিলেন। উপযুক্ত লোক হলে তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছেন। আমি তোমার কথা বলেছি। তুমি রাজী আছ কি?"

উৎফুল্লমুখে রমাপদ বলিল, "নিশ্চয়ই আছি!"

"তা হলে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি এখনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলিয়া তারাচরণ একটা চিঠি লিখিয়া রমাপদর হস্তে দিয়া দেওকীলালের গৃহের সন্ধান বুঝাইয়া দিলেন।

রমাপদ কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া তারাচরণ বলিলেন, "এক মাসের বেতন আজই তোমাকে আগাম দিতে আমি লিখে দিয়েছি—তাতে হবে ত'?"

কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দে রমাপদর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; সে বলিল, "হবে। আপনি যে আমার কতটা উপকার করলেন তা আর আমি কি বলব!"

তারাচরণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কে কার উপকার করে রমাপদ! একমাত্র গুরুকৃপা ভিন্ন কেউ কিছু করতে পারে না। যাও, আর দেরী ক'রো না।"

দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রমাপদ তারাচরণের নির্দ্দেশ অনুসারে অনতিবিলম্বে দেওকীলালের গৃহ-সমীপে উপস্থিত হইল। পথে কয়েকজন বিহারী বালক-বালিকা খেলা করিতেছিল। রমাপদ তাহাদিগকে দেওকীলাল চৌধুরীর গৃহের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

এই আকস্মিক ব্যাঘাতে খেলা বন্ধ হইয়া গেল। একটি পনের যোল বৎসরের বালক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "চৌধ্রীজীকা মক্—কান? উয়ো কিয়া হ্যায়, পীপরকে পেড়কে পাশ?"

রমাপদ চাহিয়া দেখিল অদূরে পথপার্শ্বে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার উত্তরে একটি পাকা বাড়ী। গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ। কৌতূহলী বালক-বালিকার দলও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া জুটিয়াছিল।

রমাপদ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এহি মকান?"

পূর্ব্বোক্ত বালক কহিল, "হাঁ, পুকারিয়ে জোর সে!"

রমাপদ উচ্চ স্বরে ডাকিল, "চৌধুরী জী হৈঁ?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

বালকেরা বলিল, "আউর্ জোরসে পুকারিয়ে!"

রমাপদ উচ্চ কণ্ঠে দুই তিন বার ডাকিল—কিন্তু কোনো ফল হইল না। না কেহ উত্তর দিল, না কেহ দরজা খুলিল। বালক বালিকার দল পুলকিত হইয়া হাসিতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে অনুচ্চস্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

রমাপদর সন্দেহ হইল তাহারা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। সে ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে একটি বালককে বলিল "ঠীক বোলো, ইয়হ্ দেওকীলাল চৌধুরী জীকা মকান হৈ য়া নহি!"

"জরুর হ্যায়! আপ তো জোরসে পুকারতে হি নহি।"

এ অভিযোগ অসমীচীন বোধ করিলেও অগত্যা রমাপদ আরও উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "দেওকীলাল বাবু ঘর মে হৈঁ?"

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু এবার দ্বার-পার্শ্বের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং তাহা দিয়া ঘরের ভিতর হইতে দশ এগার বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে পথে বালক-বালিকা-পরিবেষ্টিত রমাপদকে দেখিয়া যথেষ্ট কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল।

রমাপদ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেওকীলাল বাবু হৈঁ?"

প্রশ্নের উত্তর দিবার কিছুমাত্র উপক্রম না দেখাইয়া বালিকা রমাপদর দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

পথের ছেলেদের মধ্যে একজন বলিল, "দেওকী বাবু উ কা হৈঁ, খটিয়া পর বৈঠল?"

রমাপদ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কক্ষের ভিতর খাটিয়ার উপর বসিয়া একটি গৌরবর্ণ বৃদ্ধ কৌতুকোদ্ভাসিত মুখে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল! একবার ভাবিল দুই চারিটা কটুবাক্য বলিয়া প্রস্থান করে; কিন্তু মনে পড়িল গরজ তাহারই! তাহা ছাড়া, ব্যাপারটা যে প্রতারণা নহে, একটা কোনো রহস্য ইহার সহিত জড়িত আছে, এ কথা তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছিল।

এই কৌতুক অভিনয়ের উপভোক্তা কেবলমাত্র পথের বালক-বালিকার দল এবং কক্ষের বৃদ্ধ এবং বালিকাই ছিল না। পথের অপর দিকের গৃহ-গবাক্ষ দিয়া একদল রমণী সোৎসুক নেত্রে এই প্রহসন দেখিতেছিল। তন্মধ্যে একটি যুবতী রমাপদর দুর্দ্দশায় দয়াপরবশ হইয়া উচ্চাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আরে শিউপরকাশ, বাবুকো বহুৎ দিক্ মৎ কর্—বতা দে, বতা দে!"

শিউপর্কাশ সে আদেশ অমান্য করিল না; বলিল, "বাবু, উপ্পর্ দেখিয়ে।"

রমাপদর ধৈর্য্য বিচ্যুতির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল; সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কিয়া উপ্পর্ দেখেঁ!" কিন্তু হঠাৎ সদর দ্বারের উপর দেওয়ালে দৃষ্টি পড়ায় সে সকৌতূহলে দেখিল বড় বড় দেবনাগর অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

সীতারাম বোলে, তব কিবাড়ী খুলে।

পথ দিয়া একজন বিহারী ভদ্রলোক যাইতেছিলেন; অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া তিনি রমাপদকে বলিলেন, "বাবুজী, সীতারাম না বললে এ বাড়ীর দরজা খোলে না। আপনি একবার সীতারাম বলুন না, দরজা তখনি খুলে যাবে।"

এত কাণ্ডর পর এ অনুজ্ঞা পালন করিতে রমাপদর মনে ক্রোধ, লজ্জা, বিরক্তি, সঙ্কোচ, সমস্ত এক সঙ্গে আসিয়া দেখা দিল;—কিন্তু তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন এ সকল বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সীতারাম!" রমাপদ মনে মনে হাসিয়া বলিল, "গরজ বড় বালাই!"

নিমেষের মধ্যে ঘরের ভিতরের বালিকাটি দ্বার উন্মুক্ত করিল, এবং সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দেওকীলাল হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ছমা কিজিয়ে বাবুজী! আপকো বহুৎ কষ্ট দিয়া। পরন্তু নাম জী তো হো গিয়া;

ইৎনাহি আনন্দ হোয়! অব্ আজ্ঞা দিজিয়ে আপ্‌কী কৌন্সী সেবা করঁ।"

পথের বালক-বালিকার দল তিনবার সজোরে সীতারাম বলিয়া মহোল্লাসে প্রস্থান করিল।

ক্রোধ এবং বিরক্তি অনেকটা অন্তর্হিত হইলেও তখনও মনের যা বিচিত্র মিশ্র অবস্থা ছিল তাহাতে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ পকেট হইতে তারাচরণের চিঠিখানি বাহির করিয়া দেওকীলালের হস্তে দিল।

চিঠি পড়িয়া বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; বলিলেন, "তব্ তো আউর্ আনন্দ হুয়া! হররোজ আপকো মজকুরন্ এক বারে সীতারাম বোলনা পড়ে গা!" বলিয়া উচ্চ স্বরে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "পচ্চীশ্ রূপয়ে লাও।"

নরেশচন্দ্র এবং সুকুমারী প্রস্থান করিলে যাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ হয় সেই আন্দাজে রমাপদ কয়েক দিন পিছাইয়া লইল।

টাকা পাইয়া রমাপদ একটা রসীদ লিখিয়া দিবার কথা তুলিল।

দেওকীলাল হাসিতে লাগিলেন, "নহী, নহী বাবুজী, রসীদ মৎ লিখিয়ে। জিৎনী লিখাপড়ি—জিৎনে দস্তাবেজ—উৎনাহী বখেড়া!"

সন্ধ্যার পর রান্না চড়াইয়া সরমা তাহার পুত্রকে ঘুম পাড়াইতেছিল, রমাপদ আসিয়া তাহার নিকট একটা বাণ্ডিল ফেলিয়া দিল।

বাণ্ডিলটা হাত দিয়া নাড়িয়া সরমা বলিল, "এ এত কি আনলে?"

"কিছু জামা কাপড়।"

একটু ব্যগ্রভাবে সরমা বলিল, "রহিম বক্সের কাছে ধার করে না ত?"

উৎফুল্ল মুখে রমাপদ বলিল, "এবার আর রহিম নয় সরমা—এবার স্বয়ং রাম!" বলিয়া আদ্যোপান্ত 'সীতারাম' কাহিনী সরমাকে শুনাইল।

শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল। তাহার পর প্রশান্ত-মুখে বলিল, "এইবার দেখো, সীতারাম তোমার অর্থের দরজা খুলে দেবেন!"

রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, আলিবাবার সীসেমের মত!"

পরদিন রমাপদ রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া সমস্ত বাড়ী চূণকাম আরম্ভ করিয়া দিল, মজুর দিয়া জঙ্গল কাটাইল, বিশুয়ার সাহায্যে আসবাবপত্র যথাসম্ভব ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল। দোকানে গিয়া সাবান, তোয়ালে, সুগন্ধ তৈল, মাজন প্রভৃতি কিনিয়া আনিল। চটি মেরামত করাইল, শেওলা ঘষিয়া উঠাইল, এবং আরো কি করিতে হইবে সে জন্য সরমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। (ক্রমশঃ)

দরদী

বন্দে আলী মিয়া

এই রোদেরি বিদায় চাওয়া দীর্ঘ রাঙা মায়া
এতক্ষণে মোদের আঙিনাতে
জটলা করে দাঁড়িয়ে গেচে—ফেল্‌চে তাদের ছায়া
দখিণ মুখী পুবদুয়ারী ছাতে।
পুকুর পাড়ে যেখানটাতে পতিত জমি আছে
কেওড়া ঘেরা সারি কয়েক বাঁশের ঝোপের কাছে,
মা বুঝি মোর একলা বসে বিকাল এমন ক্ষণে
আমার কথা নানান্ ভাবে ভাব্‌চে আপন মনে।
হয়তো রোদে পিঠ পুড়িচে মাথায় আঁচল নাই
একের বাদে ফাঁকা সকল ঠাঁই।
একটি ছেলে তাহারে তাও বিদেশে দিয়ে হায়
দিবস-রাতি কাটুতে নাহি চায়।

চলে এলাম বিদায় লয়ে চোকের ভেজা পাতায়
কুয়াশ-ঢাকা শীতের সকাল বেলা—
মা' যে আমার গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে তখন ঠায়
কাঁদন চেপে কেবল একেলা।
আজ বিদেশে পড়াশুনায় সকল কাজের মাঝে
কর্ণপুটে স্নেহভরা ডাকটি তাহার বাজে,
করুণ অতি বেদনা-মাখা ভুল্‌তে সে মুখ নারি
জননী মোর দেবীর দেবী—অমৃত ক্ষীর-ঝারি।
হয় গো মনে সকল ফেলি পালাই তাহার বুকে
আঁচল কোণে রাখি আমায় লুকে,
ওমা তোমার দুষ্টু ছেলে শান্ত এখন বড়ো,
একলা কাঁদি ক্ষমা আমায় করো।

চরকার প্রভুত্ব

সেদিন এক খবরের কাগজে পড়লাম, একজন লিখেছেন—

"এত জিনিষ থাকৃতে চরকাকে সকলের উচ্চে স্থান দেওয়া হো'ল কেন? চরকা প্রত্যক্ষভাবে যেমন বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করে, তেমনি ঢেঁকি আমাদের ও যাঁতা পশ্চিমের লোকের অন্ন-সমস্যার সমাধান করে থাকে। অন্ন-সমস্যাই মানুষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা তার পরে। সর্ব্বোচ্চে স্থান দিতে হোলে ঢেঁকিকে বা যাঁতাকেই দেওয়া উচিত— চরকাকে নয়!"

বিষয়টা নিয়ে চিন্তা না করে থাকৃতে পারলাম না।

* * * * *

অন্ন-সমস্যাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আগে যখন বাঙ্গলার প্রতি ঘরেই ঢেঁকি ছিল, তখন আমাদের অন্নের কোনই অভাব ছিল না। এখন আমরা সেই ঢেঁকির আদর না করেই অন্নকষ্টে পড়েছি। আমরা যদি নিজেদের বাঁচাতে চাই, স্বরাজ লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের আশু কর্ত্তব্য প্রতি ঘরে ঢেঁকির প্রচলন করা। আমরা অনর্থক দ্বিগুণ দাম দিয়ে চাল কি‑ছি, অথচ অর্দ্ধেক দামে ধান কিনতে পাওয়া যায়। বাড়ীতে ঢেঁকিতে সেই ধান একটু পরিশ্রম করে ভেঙ্গে নিলেই আমাদের প্রধান খরচ—চাল কেনার খরচ—অর্দ্ধেক কমে যায়। আসল খরচটা কমে সারতে পারলে, কাপড় বা অন্য জিনিসের জন্য খরচ একটু বেশী হলেও বড় এসে-যায় না। কথা উঠতে পারে—ঢেঁকি হোল, ধানও এলো, এখন ভাঙ্গবে কে? আমি বলি, সকলেই ভাঙ্গবে! অনেক দিন অভ্যাসটা ছেড়েছি বলে' প্রথম একটু কষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু সে জন্য পিছোলে চলবে না। অন্ন-সমস্যা'র সমাধান করতে হলে, তথা স্বরাজের পথ পরিষ্কার করতে হলে, ধান ভাঙ্গা চাই-ই। প্রত্যেক দিন পনের মিনিট করে ধান ভাঙ্গলেই চলতে পারে, তাতেই যে চাল তৈরী হবে, তা এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট।

সেকালে বাঙ্গালীর মেয়েরা সকলেই ধান ভাঙ্গতে পারত, তাদের সকলের স্বাস্থ্যও সেজন্য খুব ভাল ছিল। আজকাল যেমন বাঙ্গলার সর্ব্বত্র নারী-নির্য্যাতন ঘটছে, তখনকার দিনে তা ঘটবার সম্ভাবনাই ছিল না। কথায় আছে "লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে?"—ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গতে রীতিমত লাথির চালনা করতে হো'ত। ধানভাঙ্গা পায়ের অভ্যস্ত লাথির ভয়ে দুর্ব্বৃত্তরা নারীদের কাছে অগ্রসর হতেই সাহস করত না। এখন যদি ঘরে ঘরে আবার ঢেঁকির প্রচলন করা যায়, তাহলে নারী-নির্য্যাতনের সম্ভাবনাও দূর হয়ে যাবে।

সেকালে কেবল নারীরাই ধান ভাঙ্গত, এখন কিন্তু নার পুরুষ দুজনকেই ধান ভাঙ্গতে হবে। কারণ দুজনেরই স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়া সমান দরকার। আজকাল প্রায়ই বিদেশী লোকের জোর লাথিতে আমাদের দেশের লোকের পীলে ফাটতে দেখা যায়। আমরা যদি ধান ভেঙ্গে লাথির জোর করে নিতে পারি, তাহলে তারা উল্টা লাথি খাবার ভ আর ও-কাজটা করতে সাহস পাবে না।

ঢেঁকিতে অন্ন-সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য লাভ ত হবেই, অধিকন্তু ঢেঁকি গৃহস্থকে চোর, ডাকাত, দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকেও রক্ষা করবে! বীর আশানন্দ ঢেঁকি যে কি করে ঢেঁকির সাহায্যে ডাকাত তাড়িয়েছিলেন, সে কথা আমাদের দেশের কারও আর অজানা নেই।

ঢেঁকি থাকলে অর্থাৎ অন্ন-সমস্যা না থাকলে, ভগবানকে পাওয়াও সহজ হয়ে যাবে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, দেবর্ষি নারদ ঢেঁকিতে চড়ে ত্রিভুবনে হরিগুণ গান করে বেড়াতেন। এত বাহন থাকতে তিনি ঢেঁকিতে চড়তে গেলেন কেন? এটা রূপক মাত্র। আসল অর্থ এই যে, তাঁর ঘরে যথেষ্ট অন্ন ছিল, তাঁকে সে জন্য ভাবনা করতে হোত না, তিনি নির্ভাবনাতেই ভগবানের নাম করে বেড়াতেন। আমরাও যদি ঢেঁকিকে বাহন করতে, অর্থাৎ ঢেঁকির সাহায্যে অন্ন-সমস্যার সমাধান করতে পারি, তা হলে আমরা নির্ভাবনায় দেবর্ষি নারদের মতই হরিগুণ গান করে সময় কাটাতে পারবো।

সকল দিক দিয়ে ভাল করে বিবেচনা করে দেখলে, ঢেঁকিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া এবং যাতে ঘরে ঘরে তার প্রচলন হয় সেজন্য সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা অবশ্য করা কর্ত্তব্য।

আমাদের কাছে যেমন ঢেঁকি, তেমনি পশ্চিমে যাঁতা। যাঁতাতেই গম ভেঙ্গে পশ্চিমের লোক অন্ন-সমস্যার সমাধান করে থাকে। আগে সেদিকে ঘরে ঘরে যাঁতা ছিল, লোকে অর্দ্ধেক খরচেই ইচ্ছামত আটা ময়দা তৈরী করে নিত। এখনকার মত দ্বিগুণ দাম দিয়ে সাদা মাটি বা নরম পাথর গুঁড়া মিশান অখাদ্য কিনে খেতে হোত না। যাঁতার আদর কমেই পশ্চিমের লোকদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের এখন নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে হোলে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে স্বরাজের দিকে সমানভাবে অগ্রসর হতে হোলে, অচিরেই ঘরে ঘরে যাঁতার প্রচলন করা উচিত।

বাঙ্গালী নারীরা ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গছেন

মেয়ে পুরুষ উভয়েরই প্রতিদিন পনের মিনিট করে

যাঁতা ঘোরান উচিত, তাতে নিজের খোরাকের মত গম ভাঙ্গা ত হবেই এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ও হাতে খুব জোর হবে। হাতের জোর হলেই যাঁতাও ক্রমশঃ খুব জোরে ঘুরতে থাকবে। "যাঁতা ঘোরে হাতের জোরে" এই সার কথাটার সত্য উপলব্ধি করতে তখন আর কারও কষ্ট হবে না। যাঁতা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতা দূর হয়ে গিয়ে লোকে নূতন জীবন লাভ করবে।

দেবর্ষি নারদ ঢেঁকি চড়ে শূন্যপথ দিয়ে যাচ্ছেন

পশ্চিমে যাঁতাই যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারী এবং ঘরে ঘরে এখনই যে যাঁতার প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে কোনই দ্বিমত থাকতে পারে না।

চরকা বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করে বটে, কিন্তু সেটা অন্ন-সমস্যার সমাধানের পরের কথা। অন্ন-সমস্যার সমাধান করতে পারলেই, ক্রমশঃ অনেক অন্য সমস্যার সমাধান আপনা হতেই হয়ে যাবে। পনের মিনিট করে চরকা কাটলে খানিকটা সূতা তৈরী হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে ব্যায়াম বা হাতের জোর কিছুই হবে না। আমরা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি; আমাদের এখন উচিত, যাতে আমরা স্বাস্থ্যবান ও সবল হতে পারি সেই রকম একটা কিছু অবলম্বন করা। ঢেঁকি বা যাঁতার সাহায্যেই এই উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে। চরকা কাটা যেন নিষ্কর্ম্মার বা দুর্ব্বলের (যার দ্বারা ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গা বা যাঁতায় গম পেশা সম্ভব নয়) কাজ। ওটাতো পুরুষের উপযোগী কাজই নয়, সেকালে মেয়েরাই অবসর সময়ে একটু আধটু করতো। কথায় আছে, "হয় ছেলে ধর, নয় চরকা কাট্!"—অর্থাৎ অবসর সময়ে ছেলেকে ধরতে বা চরকা কাটতে হোত।

সেকালে যারা অন্য কিছু কাজ করতে পারতো না, তারাই নেহাৎ চুপ করে বসে না থেকে সূতা কাটতো। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে তাদের শরীরও ক্রমশঃ সূতার মত পাকিয়ে যেত। অন্ন-সমস্যার সমাধান না করতে পেরে আমরা ত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়েছি, এর ওপর যদি আমরা আবার চরকা ধরি, তা হলে সেকালের কাটু-নিদের মতই আমাদের শরীর পাকিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ স্বরাজের আশাও আকাশ-কুসুম হয়ে দাঁড়াবে।

ঢেঁকি ঘুরিয়ে বা যাঁতার পাথর দুখানা ছুড়ে মেরে সেকালে যে কত যায়গায় দুর্ব্বৃত্তদের তাড়ান হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। চরকার দ্বারা কিন্তু এরকম কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। ছুড়ে মারা ত দূরের কথা, অসাবধানে

ধাক্কা লাগ্‌লে বা পড়ে গেলেই চরকার টুক্‌রো কাঠগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তখন সেগুলো জ্বালানি করা ছাড়া আর কোন কাজেই আসে না।

মাথার গোল ঘটে না থাকলে লোকে চরকাকে কিছুতেই ঢেঁকি বা যাঁতার ওপরে স্থান দিতে পারে না!

* * * * *

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সব সরল হয়ে এসেছে। কাল যা স্থির করেছিলাম, সে সবই ভুল। ঢেঁকি বা যাঁতাকে কিছুতেই উচ্চে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। চরকাকে যে সকলের উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে, সেইটাই ঠিক হয়েছে।

পেটে অন্ন পড়েছে কি না সে কেহই দেখ্‌তে যায় না, কিন্তু অঙ্গের বস্ত্রের দিকে সকলেরই প্রখর দৃষ্টি থাকে। এখনকার দিনে আমাদের যতই বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হবে, ততই আমরা সভ্যতার পথে, তথা স্বরাজের পথে অগ্রসর হতে থাক্‌বো। চরকাই আমাদের অগ্রসর করে দেবে, ঢেঁকি বা যাঁতা কিছুতেই এ কাজ সাধন করতে পারবে না।

আমাদের দুর্ব্বল শরীর ক্রমশঃ আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়লেও স্বরাজ পাবার কোন বাধা হবে না। কারণ, চরকা ঘোরাতে কোন রকম বলের দরকার করে না। শরীরে ম্যালেরিয়া, অম্বল বা যক্ষ্মা যে কোন রোগই থাক না
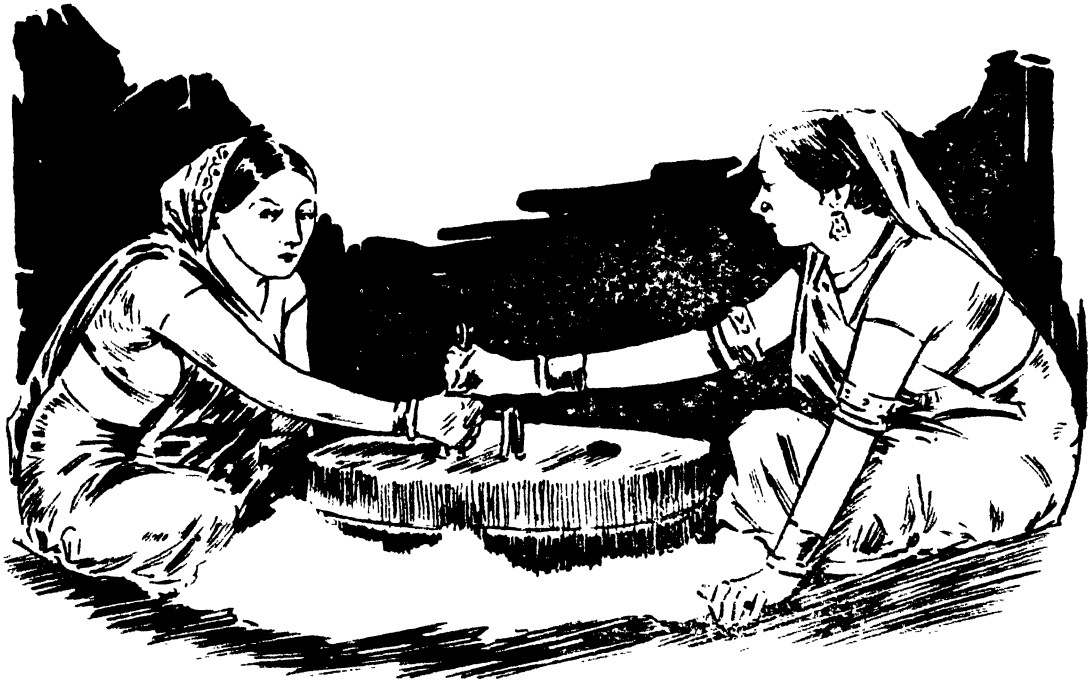
পশ্চিমা নারীরা যাঁতা ঘোরাচ্ছেন

অসভ্যতার যুগে অন্ন-সমস্যাই প্রধান সমস্যা থাকলেও এখন এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে তা আর নেই। বস্ত্র-সমস্যাই এখন সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করতে সভ্য মানুষে একবারে অস্থির হয়ে পড়েছে। আগেকার যুগে বস্ত্র না পেলেও মানুষে কিছু অসুবিধা ভোগ করতো না, তখন পেট ভরে খেতে পেলেই সকলে সন্তুষ্ট থাকতো। এখনকার দিনে অন্ন না জুটলেও বস্ত্র চাই-ই। বস্ত্রই সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। যে জাত যত বেশী বস্ত্র পরিধান করে, সেই জাত তত বেশী সভ্য।

কেন লোকে বসে বসে স্বচ্ছন্দে চরকা কাটতে পারবে। বিশেষতঃ অনাহারে উপবাসে মাথাটা হাল্‌কা হয়ে থাকলে, হাতে সূতাও খুব সূক্ষ্ম হয়ে বের হবে! দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে চরকা যেন ভগবানের দেওয়া অমোঘ অস্ত্র—এই অস্ত্রের জোরেই জয় অবশ্যম্ভাবী।

ঢেঁকি বা যাঁতা কোনটিকেই উচ্চে স্থান দেওয়া, অথবা দুর্ব্বল অধীন জাতের মধ্যে তাদের প্রচলন হওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। দুর্ব্বল শরীরে ঢেঁকি বা যাঁতার ব্যবহার আরম্ভ করলেই আমরা ক্রমশঃ আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়বো।

বিশেষতঃ একালের নারীরা ও দুটীর প্রচলনের কথা শুনেই মূর্চ্ছা যেতে পারেন, এ রকম সম্ভাবনাও আছে।

ঢেঁকি বা যাঁতা প্রচলনের চেষ্টায় আরও বিপদ আছে। আমরা অধীন জাত, ও দুটো মারাত্মক জিনিষ চালনা করতে গেলে হয় ত বা অস্ত্র আইনের আমলে পড়ে যাবো। কারণ, ওদের সাহায্যে আত্মরক্ষা বা যুদ্ধ যে করা যেতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। চরকাতে কিন্তু সে ভয় কিছুই নেই, যত ইচ্ছা নাড়াচাড়া কর অস্ত্র আইন কাছ দিয়ে আগাতেও পারবে না।

চরকার আরও সুবিধা যে তাকে বড় মাঝারি, ছোট বা ফোল্ডিং নানা আকারের করা যায়। পকেট্ এবং ট্র্যাঙ্ক্ চরকাও যে দুদিন পরে দেখ্‌তে পাবো এ রকম আশা খুবই আছে। কিন্তু ঢেঁকি বা যাঁতার বেলা এ-সব একেবারেই অসম্ভব। নানারকম সুবিধা আছে বলেই, আজ মহারাজা মহারাণী থেকে মজুর মজুরণী সকলের হাতেই সমান ভাবে চরকা ঘোরা সম্ভব হয়েছে।

চরকার সুন্দর আকৃতিই তাকে সকলের চিত্তজয়ী করে তুলেছে। 'আজ এই কারণেই আমরা নিশানের ওপরে,

সুসভ্যা সুসজ্জিতা নারী ড্রয়িংরুমে বসে চরকা কাট্‌ছেন

ঢেঁকি বা যাঁতা প্রচলনের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা, ও-দুটার আকৃতি ও প্রকৃতি বড় অসভ্য ধরণের। ওদের চালনার সময় সভ্যতা বজায় রাখা অসম্ভব। চরকাতে সে দোষ কিছুই নেই, বেশ সভ্য ও সৌখীন ভাবেই চরকা চালনা করা যায়। সভ্যা নারীরা ড্রয়িং বা বেড্‌রুমে, চেয়ারে, সোফায় বসে, ভাল শাড়ী জ্যাকেটে সুসজ্জিতা অবস্থায় অবলীলাক্রমে চরকায় সূতা কাট্‌তে পারেন। চরকা একটু ভাল করে তৈরী করালে, সেটা একটা সুন্দর আসবাবে পরিণত হয়ে ঘরের শোভা বৃদ্ধিও করে থাকে।

চিঠির কাগজ বা খামের মাথায়, ডিজাইনে, ট্রেড মার্কে চরকা অঙ্কিত হতে দেখ্‌ছি। নারীদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী অলঙ্কারের মধ্যেও চরকা নিজের স্থান করে নিয়েছে। সোনা, রূপা বা জড়োয়ার চরকা-ব্রোচ্ নারীরা আদরে অঙ্গে ধারণ করছেন। তাঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরুষেরাও আজকাল ঘড়ির চেনে চরকা-লকেট্ ঝোলাতে আরম্ভ করেছেন।

চরকায় যে আজ সকলের ওপর প্রভুত্ব করছে, সে তার নিজের নানা গুণের জোরেই। এত গুণ যার, সে ত প্রভুত্ব করবেই—তখন এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানই বৃথা!

শোক-সংবাদ

৺রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর

দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর বিগত ১৭ই জুন ১৯২৬, ২রা আষাঢ়, ১৩৩৩ বৃহস্পতিবার রাত্রি একটার সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে অপার শোক-সাগরে ভাসাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান

৺রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর

করিয়াছেন; এই নিদারুণ সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। অতি অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই দুই অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গেলেন,—রাজসাহী প্রদেশের দুই অত্যুজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ও পার্শ্ববর্ত্তী দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ আবাল্য বন্ধু ছিলেন, পরস্পরের সুখ দুঃখের সঙ্গী ছিলেন। তাই বুঝি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা প্রমদানাথ অল্পদিনের ব্যবধানেই প্রিয় বন্ধুর অনুগমন করিলেন। কিছুদিন হইতেই রাজা বাহাদুরের শরীর অসুস্থ ছিল; কিন্তু এত শীঘ্রই যে তিনি চলিয়া যাইবেন, ৫৩ বৎসর বয়সেই যে তাঁহার ভবের খেলা শেষ হইবে, ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজা প্রমদানাথ যখন বেদনা-কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন "যাও মহারাজ, আমিও আস্‌ছি" তখন আমরা তাঁহার এই কথা বন্ধু-বিয়োগ-কাতরতার মর্ম্মোচ্ছ্বাস বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বিধাতা যে অলক্ষ্যে বসিয়া রাজার এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন, তাহা ত ভাবি নাই। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর, সদাশয়, অমায়িক, দানশীল মহাত্মাকে হারাইয়া উত্তরবঙ্গ কেন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না। রাজা প্রমদানাথ দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, অসহায়ের সহায় ছিলেন; রাজসাহী অঞ্চলের সকল দেশ-হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় পরলোকগত কুমার হেমন্তকুমার, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার ও শ্রীযুক্ত কুমার বসন্তকুমার রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গড়িয়া তুলিয়াছেন; এই সমিতির জন্য তাঁহারা অকাতরে অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন। রাজা প্রমদানাথ কাউন্সীল অব ষ্টেটের সদস্য ছিলেন; সেখানে সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতেন; তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, তাঁহার অমায়িক ভদ্র-ব্যবহার তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। ধনী-দরিদ্র সকলের জন্যই তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন তাঁহার জন্মভূমিতে সৎকার করা হয়। তাঁহার সে অন্তিম বাসনা পূর্ণ করা হইয়াছে। আমরা স্বামী-শোক-কাতরা রাণী মহোদয়া, সানুজ কুমার প্রতিভানাথ, রাজা বাহাদুরের ভ্রাতৃদ্বয় ও অসংখ্য আত্মীয়-বান্ধবগণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺কুমার বিজনেন্দ্রনাথ রায়

দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথের পরলোক-গমনের পর দ্বাদশ দিন যাইতে না যাইতেই তাঁহার প্রাণাধিক দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিজনেন্দ্রনাথ পূজনীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন; দিঘাপতিয়া রাজভবনে পুনরায় হাহাকার ধ্বনি উঠিল, কুমার বাহাদুরের আত্মীয়গণের

৺কুমার বিজনেন্দ্রনাথ রায়

শোক-কাতর ক্রন্দনরবে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কুমার বিজনেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিলেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া এবং নিজেও অসুস্থ হইয়া বিলাতের চিকিৎসকগণের উপদেশ মত বিগত এপ্রিল মাসে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিন মাসের মধ্যেই পিতাপুত্র দুইজনেই ১২ দিনের ব্যবধানে শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। মৃত্যু সময়ে কুমার বিজনেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৯ বৎসর হইয়াছিল। ঐ নিদারুণ শোকের সান্ত্বনা নাই! ভগবানের বিধান অবনত মস্তকে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ত নাই!

৺চিররঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন পিতার পরলোক গমনের পর এক বর্ষ পূর্ণ না হইতেই অকস্মাৎ হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পুত্র-শোকাতুরা মাতা বাসন্তী-দেবীকে এ সময় আমরা কি বলিয়া প্রবোধ দিব? একমাত্র সন্তানের বিয়োগে বিধবা মায়ের প্রাণে যে কি বিষম বেদনা লাগে, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। দেশবন্ধুর পরলোকগমনে তিনি অধীরা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীর অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি হৃদয়ে অমিত বলের সঞ্চার করিয়াছিলেন; প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য তিনি বিস্মৃত হন নাই। এখন একমাত্র পুত্রের বিয়োগে তাঁহার উপর আবার একটী সংসারের ভার পড়িল, চিররঞ্জনের তিনটী শিশু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে বল-সঞ্চয় করিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় মহিয়সী মহিলাকে আমরা আর কি সান্ত্বনা দিব; তাঁহার এক পুত্র গিয়াছে, শতসহস্র পুত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

৺নিমাইচন্দ্র বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্ণী নিমাইচন্দ্র বসু মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; পুত্র পৌত্র, দুহিতা, দৌহিত্র, বহু আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়া অন্তিমে হরিনাম করিতে করিতে বসু মহাশয় চলিয়া গেলেন। এ মরণ ত সুখের; ইহার জন্য

শোক করিতে নাই। নিমাই বাবু কলিকাতার একজন গণ্যমান্য নাগরিক ছিলেন; এটর্ণীর কার্য্যে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং যেমন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি অকাতরে দুই হাতে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত এটর্ণীর কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরে দেশ হিতকর ও সকল অনুষ্ঠানেই নিমাই বাবু যোগদান করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার অমায়িকতায় সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্ম্মক্ষম ছিলেন। হাই-কোর্টের ব্যবহারাজীবগণ এবং বিচারপতিগণ নিমাই বাবুকে তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য বিশেষ সম্মান করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া, পিতার ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।
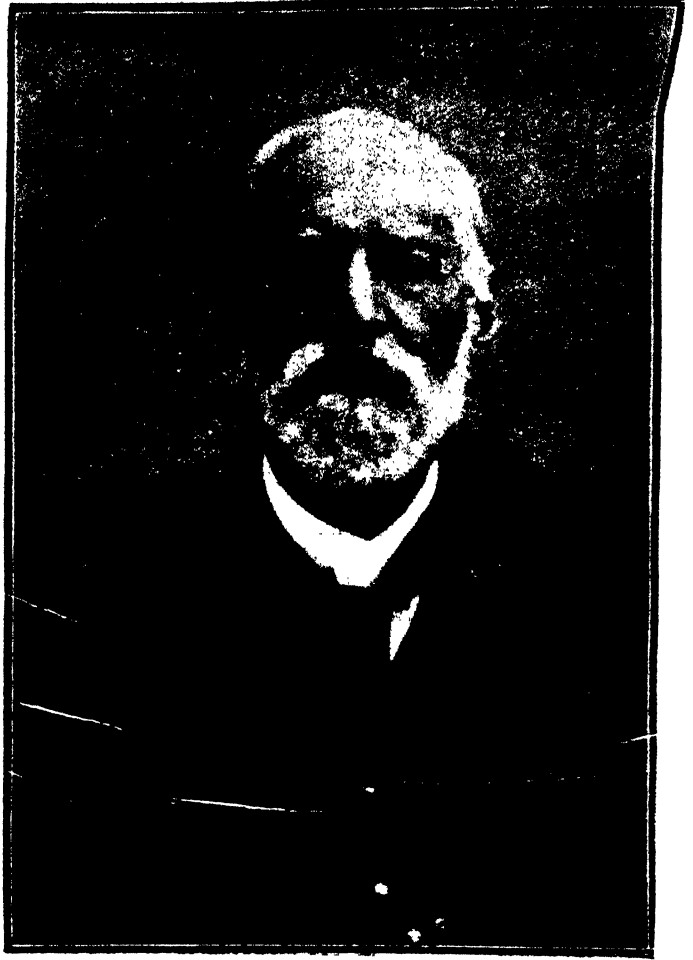
৺নিমাইচন্দ্র বসু

সাময়িকী

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল, তাঁহার নাম সকলের জানা থাকিলেও, অনেকে এই ধীমান পণ্ডিতের সম্যক্ পরিচয় অবগত নহেন। এই কারণে আমরা পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের জীবন-কথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী শুঁড়ার এক প্রাচীন মিত্র পরিবারে রাজেন্দ্রলাল ১২২৮ সালের ফাল্গুন মাসের ৬ই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলাল জন্মেজয় মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বাল্যকালে সেকালের প্রথা অনুসারে পল্লীর পাঠশালায় তাঁহার হাতে-খড়ি হয়। তাহার পর ১২৩৮ সালে তিনি ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং ১২৪১ সালে উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র বসাকের বিদ্যালয়ে যান। সেকালে ক্ষেম বসুর স্কুল ও গোবিন্দ বসাকের স্কুলই কলিকাতার দুইটী প্রসিদ্ধ ইংরাজী বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া রাজেন্দ্রলাল ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি মেডিকেল কলেজে

ব্যাস্‌লি, গুডিভ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও অধ্যাপকগণের বিশেষ স্নেহ লাভ করেন। ক্যামেরণ নামক একজন সাহেব রাজেন্দ্রলালের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এই সাহেব তাঁহাকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন বিলাত গমনের আয়োজন করেন, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি মেডিকেল কলেজের পাঁচজন উৎকৃষ্ট ছাত্রকে নিজের ব্যয়ে বিলাতে লইয়া গিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া আনিবেন। সেই সময় তিনি রাজেন্দ্রলালকে এই কয়জনের অন্যতম নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু, পিতার অমত হওয়ায় রাজেন্দ্রলালের বিলাতে যাওয়া হয় না। ইহার কিছুদিন পরেই মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় রাজেন্দ্রলাল উপাধি গ্রহণ না করিয়াই মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং অল্পদিন পরেই আইন পড়িতে আরম্ভ করেন এবং যথাসময়ে আইনের পরীক্ষাও দেন; কিন্তু সেবার পরীক্ষার উত্তরের কাগজ চুরী যাওয়ায় তিনি পাশ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে ডাক্তার উসায়নেসি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ভবিষ্যতে তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে যে অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন, এইখানেই তাহার সূচনা হয়; সুতরাং ডাক্তার বা উকিল হইলে আমরা আর রাজা রাজেন্দ্রলালের ন্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক পাইতাম না। এই সময় হইতে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে গভীর গবেষণামূলক ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং বিপুল অধ্যবসায়-বলে অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারস্য, উর্দ্দূ, হিন্দী, গ্রীক্‌, লাটিন, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তখন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মোট ১২৮ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে ১০খানি সংস্কৃত, ১৩খানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত; অবশিষ্ট সমস্তই ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রকৃতি-ভূগোল, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণ-প্রবেশ, রহস্যসন্দর্ভ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজির জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্রলালকে ডি-এল্‌ (Doctor of Law) উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহার সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্র সে সময়ের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত বুদ্ধ-গয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনত্ব বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় রাজেন্দ্রলালকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রায় বাহাদুর, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সি-আই-ই এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উপাধি পান। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলালই সর্ব্বপ্রথম এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি হন। ইনি পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনেরও সভাপতি হন। কলিকাতার Wards Institution নামক নাবালক জমিদারদিগের আবাস ইঁহারই কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই (১২৯৮, ১১ই শ্রাবণ) রাজেন্দ্রলাল পরলোকগত হন। এই মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট সুশোভিত করিয়া আমরা এই পণ্ডিত-প্রবরের স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

২৯শে জুন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্গারোহণের দিন। প্রতি বৎসর এই দিন প্রাতঃকালে কলিকাতাবাসী কবি ও সাহিত্যিকগণ মাইকেলের সমাধি-পার্শ্বে সমাগত হইয়া মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও উক্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় যে সেদিন মহাকবির সমাধি-পার্শ্বে ত্রিশ চল্লিশ জনের অধিক ভদ্রলোকের সমাগম হয় নাই। তবে, সেই দিন অপরাহ্নকালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে মাইকেলের স্মৃতি-সভার যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহাকবির স্মৃতি-পূজার জন্য প্রতি বৎসর এই দিনে যাহাতে মাইকেলের জন্মভূমি যশোহর সাগরদাঁড়িতে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেখানে কোন প্রকার সভা-সমিতি

না করিয়া যদি একটা মেলা বসাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে এই উৎসবটী স্থায়ী হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার কবি ও সাহিত্য-সেবকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

গত ১১ই জুন লণ্ডনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সদস্যগণ এক প্রীতিভোজে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বর্দ্ধনা করেন। লর্ড লী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের মানব-হিতকর কার্য্যের ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসা করেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে উদ্ভিদ জগতের ডারবিন আখ্যা দেন। আচার্য্য বসু বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলেন—"ভারতের মত বিস্তৃত দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে; কিন্তু এই দুই কার্য্যের উন্নতি একমাত্র বিজ্ঞান দ্বারাই সম্ভবপর। দারুণ অর্থ কষ্টই ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির কারণ। প্রতি বৎসরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু ছাত্র বিজ্ঞানে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহারা কার্য্য করিবার মত উপযুক্ত কোনরূপ কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছে না। ভারতের এই আসন্ন অর্থ কষ্ট দূর করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের রীতিমত ভাবে সাহায্য করা দরকার।"

বিগত ১১ই ও ১২ই আষাঢ় শনিবার ও রবিবার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে মূল সভাপতি হইয়াছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ন্যায় এই সম্মেলনেও চারিটী শাখার অধিবেশন দ্বিতীয় দিনে হইয়াছিল। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইবার কথা ছিল বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের, কিন্তু, তিনি উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত আসন গ্রহণ করেন; দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইবার কথা ছিল 'হিতবাদী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের; কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছিল, অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু, বঙ্কিম সম্মেলনে শাখা-সভার অধিবেশনের পক্ষপাতী নহি; বঙ্কিম-সম্মেলনে দেশের সাহিত্যিকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই শোভন হয়; অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। ভরসা করি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলনের উৎসাহী অনুষ্ঠাতৃগণ আমাদের প্রস্তাবটী সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং যাহাতে এই সম্মেলনে সাহিত্যিকগণ অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন, তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গ্রীভ্স্ মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যানসেলর। তিনি আগামী আগষ্ট মাসে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে যাইতেছেন। হাইকোর্টের বিচারাসন লইয়া কোন গোলই হয় নাই, হইবার কথাও নহে; কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যানসেলরের পদ লইয়া মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর এই পদে লোক নিয়োগের কর্ত্তা। লর্ড লিটন বাহাদুর চারি মাসের ছুটীতে বিলাত গমনের পূর্ব্বেই পাটনা কলেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সি-আই-ই মহোদয়কে উক্ত পদে মনোনীত করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এই নিয়োগের সংবাদ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বিশেষ দলাদলি কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলিতেছেন, অধ্যাপক সরকারকে নির্ব্বাচিত করিয়া লাট সাহেব উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন; অপর দল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সদস্য অধ্যাপক সরকারের নিয়োগের বিরুদ্ধবাদী। তাঁহারা বলেন, অধ্যাপক যদুনাথের নিয়োগ আইন-সঙ্গত হয় নাই, কারণ চ্যান্সেলর মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদিগের মধ্য হইতেই যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। অধ্যাপক যদুনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নহেন, এবং ফেলোদিগের

মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর অনেক ব্যক্তি আছেন। এ অবস্থায় যোগ্যতর ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা করিয়া, যিনি ফেলো নহেন এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করা আইন-বিরুদ্ধ এবং যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, লর্ড লিটন বাহাদুর পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যে লজ্জাজনক পরাজয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় তথা আশুতোষের ঘোর বিরোধী ও কঠোর সমালোচক অধ্যাপক যদুনাথকে এই পদে বসাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্টের করতলগত রাখিবার জন্যই এই চাল দেওয়া হইয়াছে। শুনিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অস্থায়ী গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই মনোনয়ন রদ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সার ষ্টিফেন্‌সন বাহাদুর লর্ড লিটনের মনোনয়নে হস্তার্পণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। আরও শোনা যাইতেছে, এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে বিলাতে লর্ড লিটনের নিকটও না কি আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অধ্যাপক যদুনাথের মনোনয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক যদুনাথ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা সার আশুতোষের কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; তিনি যে বিশ্বপণ্ডিতদিগের অনেককেই প্রীতির চক্ষে দেখেন না, বরঞ্চ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করেন, এ কথাও তাঁহার সমালোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নিয়োগে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই প্রতিবাদ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক; এবং অধ্যাপক যদুনাথ ভাইস-চ্যান্সেলর হইলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক খ্যাতনামা সদস্য ও অধ্যাপকের সহানুভূতি ও সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাও নিশ্চিত। আমরা বলিতে পারি যে, অধ্যাপক যদুনাথ গবর্ণমেণ্টের হাতের পুতুল হইবেন বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; অধ্যাপক যদুনাথ সে প্রকৃতির লোকই নহেন। তাহার পর, তাঁহার কঠোর সমালোচনার কথা; সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক; এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বাহির হইতে কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করা, দোষ ত্রুটী দেখান সহজ কাজ; কিন্তু হাতে-কলমে সেই বিপুল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালন করিতে বসিলে তখন আর সে কঠোরতাও থাকে না, সে সমালোচনাও থাকে না, তখন সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে কার্য্য সুপরিচালিত হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক যদুনাথের মধ্যে এই বিজ্ঞতার অভাব আছে বলিয়া অনেকে মনে করিলেও আমরা করি না। তবে, এ কথাও বলি যে, বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সিনেট যে ভাবে গঠিত এবং যে প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সফলকাম হওয়া অধ্যাপক যদুনাথ কেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী, অধিকতর কার্য্যকুশল ব্যক্তির পক্ষেও সম্পূর্ণ অসম্ভব; সুতরাং অধ্যাপক যদুনাথের নিয়োগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য অধিকতর বিশৃঙ্খল হইবারই সম্ভাবনা; সুধু দলাদলি, বাগ্‌বিতণ্ডাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ব্যয়িত হইবে, প্রকৃত উন্নতি ও সংস্কার সুদূরপরাহত হইবে।

বিগত ১২ই আষাঢ় রবিবারে চন্দননগরের অধিবাসী, দানশীল, সুলেখক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার জননীর নাম চির-স্মরণীয় করিবার জন্য 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে'র দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে একটী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। চন্দননগরের বিচারপতি মহোদয় এই উৎসব সভার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া মন্দির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। মাতৃ-ভক্ত দাতা হরিহরবাবু যে শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা সত্যসত্যই 'মন্দির' নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া হরিহরবাবু এই সুদৃশ্য শিক্ষা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষার জন্য চন্দননগরে যে 'নৃত্যগোপাল পাঠাগার' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এবং তাঁহার মাতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির' সুধু চন্দননগরেই কেন, বাঙ্গালা দেশের অনেক প্রসিদ্ধ নগরেও দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিহর বাবুর মাতৃপিতৃ-ভক্তি প্রকৃতপক্ষেই আদর্শস্থানীয়। ধনী ব্যক্তিরা নানা ভাবে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু হরিহর বাবু যেমন একদিকে আড়ম্বরশূন্য সদাশয় সাহিত্য-সেবক, আর এক-দিকে তিনি অর্থের সদ্ব্যবহারও করিতে জানেন। চুঁচুড়ায়

যে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন হইতেছে, হরিহর বাবু তাহারও সাফল্যের জন্ত দেড়লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা হরিহর বাবুর ন্যায় পিতৃমাতৃভক্ত, সদাশয়, দানশীল মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ঢাকা	৯০৯১	৩২১৭৭৯	৯০৯০	৩২৬৫১৪
চট্টগ্রাম	৫৬৭৯	২০৯১১৭	৫৯১০	৩২৫৫২৮
রাজসাহী	৬৯৭৪	২১৮০৩৪	৬৮৯২	২২৩১৫৭
মোট	৩৬৫৭৮	১২৫৫৯০৪	৩৭০৭১	১৩০৯৫৫৬
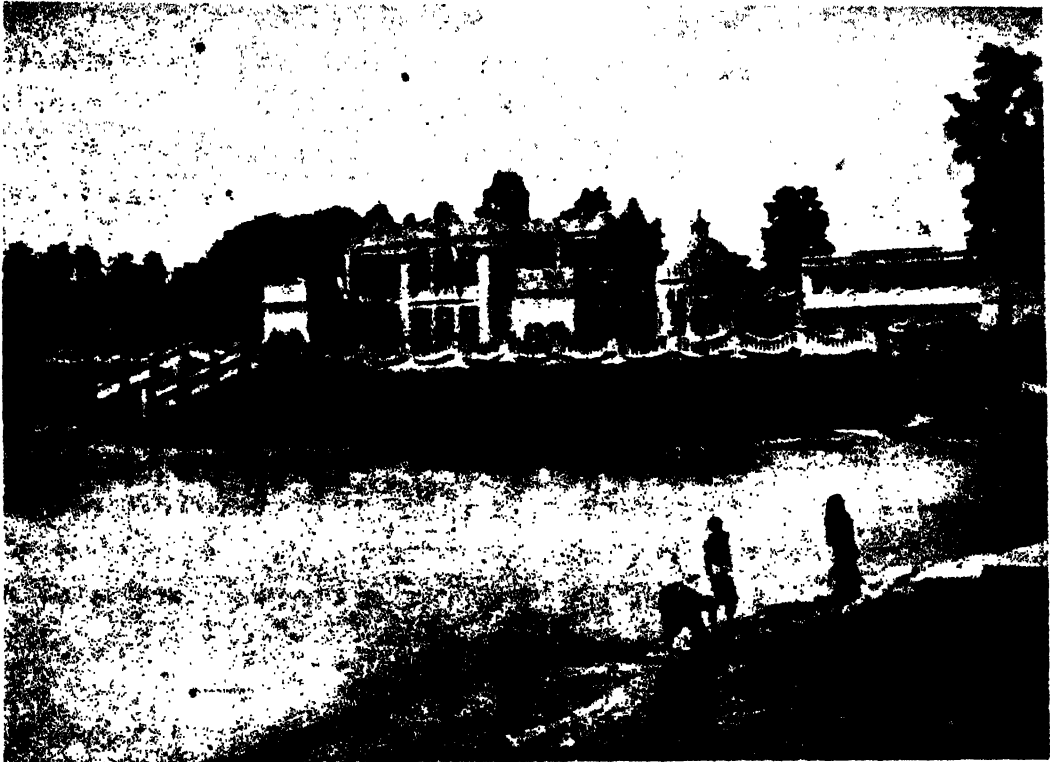
কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির। চন্দননগর শিক্ষালয় ও ছাত্রী-নিবাস।

১৯২৪-২৫ সালে বঙ্গদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা অপেক্ষা ৪৯৩টি বাড়িয়া মোট ৩৭০৭১ হইয়াছে। বঙ্গের কোন্ বিভাগে প্রাথমিক বিদ্যালয় কত ছিল এবং আলোচ্য বর্ষে কত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিভাগ।	১৯২৩-২৪ সাল।		১৯২৪-২৫ সাল।	
	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
বর্দ্ধমান	৮২৭৩	২৫৯০৮৪	৮৪৫৮	২৬৮২৮৬
প্রেসিডেন্সি	৬২১৫	২২৭৩৬৩	৬৩১১	২৩১১৫৯
কলিকাতা	৩৪৬	২০৫২৭	৪১০	২৪৯২২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা দুইটি নূতন অধ্যাপক পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই আশুতোষ অধ্যাপক নামে পরিচিত হইবেন। প্রত্যেক পদের বেতন ৬০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা; প্রত্যেক দুই বৎসরে ৫০৲ বৃদ্ধি হইবে। সেনেটে ইচ্ছা করিলে, বিশেষজ্ঞ বুঝিয়া, প্রথমেই ৬০০৲ টাকার অধিক বেতনেও লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশুতোষ ভবনের নিম্নতলায় যে সকল ঘর দোকানদারদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার আয় হইতে অধ্যাপকদিগের বেতন প্রদান করা হইবে। ইহাতে টাকার অকুলান হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল হইতে টাকা দিয়া তাহা পূরণ করা হইবে।

আর যদি উক্ত দোকানঘরগুলির আয় হইতে অধ্যাপকদ্বয়ের বেতন দেওয়ার পরেও টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই টাকায় একটি স্বতন্ত্র তহবিল সৃষ্টি করা হইবে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে; কার্য্যকাল অতীত হইলে ইঁহারা পুনঃ নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অধ্যাপকদ্বয়ের একজন সংস্কৃত এবং অপর জন ইসলাম সাহিত্য শিক্ষা দিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে ইঁহারা নিজ নিজ বিষয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিবেন। ইঁহাদিগকে নিজেদের অবলম্বিত বিষয়ের গবেষণাকার্য্যও পরিচালন করিতে হইবে। প্রতি বৎসর জুলাই মাসে, প্রত্যেক অধ্যাপক পূর্ব্ব বৎসরে কি গবেষণা কার্য্য করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে কি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রদান করিবেন।

ভারত-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ভারত-সচিবের সম্মতি লইয়া স্থির করিয়াছেন যে, ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ঔষধের প্রয়োজন ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে অহিফেন রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। এই দশ বৎসরে ক্রমে ক্রমে রপ্তানী হ্রাস করিয়া দেওয়া হইবে। গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী আর্ল উইণ্টারটন কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারত-সরকার ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি অনুসারে এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবেন। তিনি সে সময়ে বলিয়াছিলেন, কোন্ সময়ের মধ্যে অহিফেন রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইবে, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই; যাহারা অহিফেনের চাষ করে, তাহাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা হইবে। ভারত সরকারের এই নূতন নীতি ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও নিখিল-ভারত ব্যবস্থা-পরিষদ পর্য্যায়ক্রমে গত ১৬ই ও ১৮ই মার্চ্চ তারিখে অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমশঃ ঔষধের প্রয়োজন ব্যতীত, অহিফেন রপ্তানী বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ হারে হ্রাস করা হইবে। তাহা হইলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর আর উহা রপ্তানী হইবে না। এই ব্যবস্থানুসারে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল হইতে কলিকাতায় অহিফেনের নীলাম বন্ধ করা হইয়াছে।

সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে ২৩ কোটি ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২ শত ৫০ জন কৃষিজীবী কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক শিল্পের সেবা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুটীর-শিল্পের সেবা করে। ইহাদের আনুমানিক হিসাব মোট অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় সাড়ে দশ জন। ইহা ভিন্ন ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬ শত ২২ জন অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মোট অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে শতকরা পৌনে ৬ জনের কম লোক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি করিয়া থাকে। সরকারী চাকুরী, পুলিস ও সেনাবিভাগে ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৪ শত ৭৯ জন। অর্থাৎ সমগ্র লোক-সংখ্যার মধ্যে শতকরা দেড় জনেরও কম লোক এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। ৫০ লক্ষ ২০ হাজার ৫ শত ৭১ জন উচ্চ অঙ্গের বৃত্তিসেবা এবং পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্য করে। তন্মধ্যে ব্যবহারাজীবের সংখ্যা ৩ লক্ষ সাড়ে ৩৬ হাজার।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগকে ইংরেজি সাহিত্য ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহাতে ছেলেদের ইংরেজির জ্ঞান কমিয়া যাইবে কি না। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে ছেলেরা অধ্যয়নের বিষয়গুলিতে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে এবং তাহাদের স্বাধীন চিন্তার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, এদিকে মাতৃভাষার জ্ঞানও উৎকৃষ্টতর হইবে, তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মাতৃভাষা প্রচলন করার মত স্থির হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ইংরেজি ভাষা জ্ঞান কমিয়া না যায়, ইহাও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকেরই মত এই যে, ছেলেদের ইংরেজি ভাষা জ্ঞানও যাহাতে উৎকৃষ্টতর হয় তাহা করিতে হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হইলে ইহার ফলে ছেলেদের ইংরেজি ভাষা জ্ঞান কিরূপ দাঁড়াইবে

তৎসম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার অধিবেশনে ম্যাট্রিক পরীক্ষার বিধি পরিবর্ত্তন বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা উঠিয়াছিল এবং সদস্যগণ বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নব বিধি অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী-দিগকে ইংরেজিতে পাশ করিতে হইলে মোট নম্বরের মধ্যে শতকরা ৪০ নম্বর ইংরেজি প্রশ্নপত্রে রাখিতে হইবে।

দক্ষিণ ভারতে এবং প্রধানতঃ মহীশূর রাজ্যেই চন্দনকাষ্ঠের কারবার চলিয়া থাকে। সেখানে বিস্তৃত চন্দন-বন রহিয়াছে। কৈয়ম্বাটোর ও কুর্গ জেলাতেও এই বনের পরিমাণ মন্দ নয়। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্য মাদ্রাজ গবর্মেণ্টের সহিত একযোগে চন্দন কাঠ কাটিয়া বিদেশে পাঠাইতেন; দেশে আর সেগুলিকে "রিফাইন্" করা হইত না। পূর্ব্বোক্ত তিন জায়গার চন্দন কাঠ—মহীশূরে ২৫০০ টন, কৈয়ম্বাটোর ও কুর্গে ৫০০ টন—একুনে বৎসরে প্রায় ৩,০০০ টন হইত। তাহার মধ্য হইতে ৭৫০ টন স্বস্থানে এবং ২৫০ টন ভারতের অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হইত। আর অবশিষ্ট ২,০০০ টন যাইত জার্ম্মাণিতে। বিগত যুদ্ধের সময় মহীশূরের এই চন্দন কাঠ রপ্তানীর ব্যবসা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ, জার্ম্মাণি তখন পৃথিবীর মধ্যে একঘরে। চন্দনতেল নির্ম্মাণের জন্য ১৯১৬ সালে মহীশূরে একটি এবং বাঙ্গোলোরে আর একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৭ সাল হইতেই কারখানা দুইটির কাজ ভালমত আরম্ভ হয়। এখন প্রতি বৎসর এখানে ২,০০,০০০ পাউণ্ড তেল উৎপন্ন হয়। আরো বেশী হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশা করেন। মহীশূর আজ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চন্দন তৈল যোগাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া ও সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দ্বীপে চন্দন তৈল তৈয়ারি হয়। কিন্তু মহীশূরের তৈল অপেক্ষা সে তৈল নিকৃষ্ট। এই মাল প্রচুর পরিমাণে আমেরিকায় যায়। জাভা ও সুমাত্রার "মাকাশার তৈল" মহীশূরের নিকৃষ্ট শ্রেণীর তৈলের সমান। তাহাও আমেরিকা এবং ইয়োরোপে যায়। মহীশূরের তৈল প্রধানতঃ জাপানে গিয়া থাকে। সেখানে ঔষধের জন্য উহা ব্যবহৃত হয়।

পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জননী জগৎতারিণী দেবীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে কিছু টাকা দিয়া গিয়াছেন। সেই টাকার সুদ হইতে বাঙ্গালা দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যোগ্যতর ব্যক্তিকে প্রতি বৎসর একটী স্বর্ণ-পদক প্রদানের ব্যবস্থা সার আশুতোষ করিয়া গিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারে একটী কমিটিও গঠিত করিয়া গিয়াছেন। সেই কমিটী প্রথম বৎসরে বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথকে এই স্বর্ণ-পদক প্রদান করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় বৎসরে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই স্বর্ণ-পদক দিয়াছিলেন। এবার তৃতীয় বর্ষে উক্ত কমিটি রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে এই স্বর্ণ-পদক প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। রসরাজ বসু মহাশয় সর্ব্বাংশেই এই সম্মানলাভের উপযুক্ত। বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকগণও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কৃপণতা করেন নাই; নৈহাটীতে যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে বসু মহাশয়কে সাহিত্য শাখার সভাপতির পদে বরণ করা হইয়াছিল। তাহার পর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিগত বীরভূম অধিবেশনে তাঁহাকেই মূল সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছিল। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে—শুধু বাঙ্গালা দেশেই বা বলি কেন—সমগ্র ভারতবর্ষেই মুসলমান ও অ-মুসলমান (বর্ত্তমান সময়ে 'হিন্দু' বলিয়া কোন জাতি সরকার বাহাদুর স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভারতবর্ষে মুসলমান ও অ-মুসলমান, এই দুই জাতিরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন) এই দুই জাতির মধ্যে গোলযোগ ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বে মুসলমানগণের ইদ্ পর্ব্বোপলক্ষে কোরবানি লইয়াই নানা স্থানে মধ্যে মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হইত, ছোট বড় দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইত; আর কোন ব্যাপার লইয়া সামান্য মতান্তর থাকিলেও সে সকল উপলক্ষ করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তারক্তি হইত না। এখন দেখিতেছি সেই কোরবাণি লইয়া কোন

গোলমাল হইতেছে না। এই সেদিনও মুসলমানের ইদ্-পর্ব্ব হইয়া গেল; তদুপলক্ষে বিশেষ কোন গোলযোগ কোথাও হয় নাই। কিন্তু, এখন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল ঢাকের বাদ্য। এখন প্রধান বচসা হইতেছে মস্জিদের সম্মুখে বাদ্যভাণ্ড লইয়া শোভাযাত্রা উপলক্ষ করিয়া; এবং তাহারই জন্য বড় বড় সহরে মাত্র নহে, গ্রাম-পল্লীতে পর্য্যন্ত মারামারি, কাটাকাটি, শান্তিভঙ্গ, নারী-নির্য্যাতন, লুণ্ঠন প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এ কথা কোন মুসলমান বা অ-মুসলমানের মনেও উঠে নাই; এখন তাহাই হইল প্রধান ব্যাপার। কলিকাতা সহরে যে এমন ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গেল, তাহা এই ঢাকের বাজনা লইয়াই। চড়কপূজায় যে ঢাকের বাদ্য মোটেই শোনা গেল না, বড়বাজারের রাজরাজেশ্বরী যে বাহিরে আসিয়াও শেষে ঘরে প্রবেশ করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনের শুভদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, তাহারও কারণ এই বাদ্যভাণ্ড, এই শোভাযাত্রা, এই ঢাক!

—

মুসলমান ও অ-মুসলমানের এই অপ্রীতিকর মনোমালিন্য এবং তাহার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রতীকার এই দুই দল মিলিয়া আপোষে করিয়া উঠিতে পারিলেন না, পারা অসম্ভব হইল। মুসলমান বলেন, তাঁহাদের মস্জিদগুলিতে অষ্ট প্রহরই উপাসনা হয়, সুতরাং দিবারাত্রির কোন সময়েই কোন বাদ্যভাণ্ড মস্জিদের সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। হাজি গজনবী প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করিতে চান যে, মুসলমানের উপাসনা-স্থানের সম্মুখ দিয়া কেহ কখন ঢাক বাজাইয়া শোভাযাত্রা লইয়া যান নাই, অতএব অ-মুসলমান-গণের দাবী বাতিল ও নামঞ্জুর। অ-মুসলমানেরা বলেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে দেশের সর্ব্বত্র মস্জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ শোভাযাত্রা চলিয়াছে, কখনও কোন আপত্তি হয় নাই; এখন সে আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য; তাঁহারা নাগরিকের অধিকার কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না। এ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি একেবারেই অসম্ভব। কাজেই, তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন।

—

সুতরাং যাঁহারা দেশের শাসনকর্ত্তা, যাঁহারা দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য, সেই সরকার বাহাদুরকেই তৃতীয় পক্ষরূপে একটা রফা নিষ্পত্তি করিতে অগ্রসর হইতে হইল। বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লিটন উভয় পক্ষের মাতব্বরদিগকে একত্র করিয়া যখন শালিস করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজেই এ ভার গ্রহণ করিলেন এবং কলিকাতা সহর সম্বন্ধে এক আদেশ জারি করিলেন যে, কলিকাতা নাখোদা মস্জিদের সম্মুখ দিয়া কোন সময়েই বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা চলিবে না। অন্যান্য মস্জিদসম্বন্ধে তিনি কলিকাতার পুলিস কমিশনর বাহাদুরের উপর ব্যবস্থার ভার দিলেন। মফস্বলের হাকিমেরা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য মনে করিবেন, তাহাই করিবেন। লাট বাহাদুরের এই আদেশে মুসলমান ও অ-মুসলমান কেহই সন্তুষ্ট হইলেন না; নানা স্থানে প্রতিবাদ সভাও হইল, হাঙ্গামাও চলিতে লাগিল। কলিকাতা ঠাণ্ডা হইল বটে, কিন্তু এই আগুন পূর্ব্ব-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল; ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হইল, নিরীহ হিন্দুরা নির্য্যাতন ভোগ করিতে লাগিল; দেবমন্দির ও দেবতার দুর্দ্দশা হইতে লাগিল। সম্প্রতি পাবনা জেলাতে ভীষণ ভাবে এই আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে নারী নির্য্যাতনের সংবাদও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে; সেদিনও নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া হইতে গুণ্ডা কর্ত্তৃক নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ আসিয়াছে।

—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা সহরের শোভাযাত্রার ব্যবস্থার ভার সহর-কোতোয়ালের উপর লাট সাহেব ন্যস্ত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেদিনের টাউনহলের সভার সভাপতি মহাশয়ের কথায় বলিতে হয়, সরকার কোতোয়ালকে কাজির আসনে বসাইয়া দিয়াছেন। সেই সহর কোতোয়াল অর্থাৎ কলিকাতা পুলিশের কমিশনার বাহাদুর আপাততঃ এই জুলাই মাসের জন্য যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পুলিশের হুকুম

গত ৫ই জুনের ৫৭২১পি নং গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুযায়ী কলিকাতার পুলিশ কমিশনার অনেক অনুসন্ধান করিবার পর কলিকাতার মুসলমানগণের নমাজের সময় নির্দ্দেশ করিয়া

দিয়াছেন এবং ঐ সময় ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কোন মসজিদের সম্মুখ দিয়া কেহ গান বাদ্য সহ মিছিল লইয়া যাইতে পারিবে না।

• ভোর ৪-৩৯ মিনিট হইতে ৫-২৪ মিনিট পর্য্যন্ত। মধ্যাহ্ন ১ ঘটিকা হইতে ১-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত (শুক্রবার ১২-৪৫ মিনিট হইতে মধ্যাহ্ন ১-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত।)

অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিট হইতে ৫-০টা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা ৬-৪৫টা হইতে ৭-১০ মিনিট পর্য্যন্ত। রাত্রি ৮-৩০ মিনিট হইতে ৯-১০টা পর্য্যন্ত। এই সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে শুধু কলিকাতার সময়।

ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন যে সময় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য দরকার কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সেই সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

পুলিশ কমিসনার বাহাদুর ত হুকুম দিয়া থাকাস; কিন্তু এমন চমৎকার হুকুম কেমন করিয়া যে প্রতিপালিত হইবে, তাহাই ভাবনার কথা। এই আদেশে একেবারে ঘণ্টা মিনিট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেকেণ্ড পর্য্যন্ত বলিয়া দিলে আরও ভাল হইত। পুলিশের আদেশে দেখা গেল যে, মস্‌জিদের উপাসনার সময় ভোর ৪-৩৯ মিনিট হইতে রাত্রি ৯-১০ মিনিট পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাদ আছে। এই সময়ের মধ্যে যাহার যাহা শোভাযাত্রা আছে তিনি তাহা করিতে পারিবেন, অথবা রাত্রি ৯-১০ মিনিটের পর হইতে ভোর ৪-৩৯ মিনিট পর্য্যন্ত যথেষ্ট সময় আছে; সেই সময়ের মধ্যে পিতামহীর গঙ্গাযাত্রা, শব-যাত্রা, বিবাহ-যাত্রা, প্রতিমা-বিসর্জ্জন প্রভৃতি করিবার বিধান হইল। এখন গোল বাধিল ঘড়ি লইয়া। কলিকাতায় ত দেখিতে পাই, একটা ঘড়ির সহিত আর একটা ঘড়ির মিল নাই, দুচার মিনিট তফাৎ থাকেই। এদিকে পুলিশের আদেশ ৪-৩৯ মিনিট—আটত্রিশও নয়, চল্লিশও নয়—ঠিক উনচল্লিশ। কোন মস্‌জিদের ঘড়ি যদি ঠিক না থাকে, আর সেই সময় যদি শোভাযাত্রা যায়—তবেই আর কি——!

এই সুন্দর ব্যবস্থার প্রতিবাদের জন্য সেদিন কলিকাতা টাউন-হলে অ-মুসলমানগণের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে; অর্থাৎ আবহমানকাল সুশীল ও সুবোধ বালকেরা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি এই—

(১) গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি রাস্তার শোভাযাত্রা সম্পর্কে যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী।

(২) যাহারা আইন ভঙ্গ করে, গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন।

(৩) যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট, মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ও দিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট মসজেদের সমক্ষে বাজনা বাজান সম্পর্কে যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাহার বিপরীত ইস্তাহার প্রকাশ করায় এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(৪) এই সভা সমগ্র হিন্দুজাতিকে বিধিসঙ্গত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই সমস্ত অনাচারের প্রতীকার করিতে অনুরোধ করিতেছে।

সভা হইল, সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবও পাশ হইল। তাহার পর? সেদিনের সভায় শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয় সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন —

"প্রতিবাদের পর কি হইবে? সরকার যদি আমাদের সঙ্গত প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে ন্যায়সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত করেন, তবে হিন্দু কি করিবে? টাউন-হলের সভায় বক্তার পর বক্তা বলিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকারের আদেশ বে-আইনী; কেন না, বাঙ্গালা সরকার আইনের বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং সে কাজ কেবল আদালতের অধিকারগত। কাজেই জিজ্ঞাস্য— যাঁহারা বাঙ্গালা সরকারের আদেশ বে-আইনী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সে আদেশ অমান্য করিতে—সে আদেশ ভঙ্গ করিয়া তাহার আইন বহির্ভূত প্রকৃতি প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? তাঁহারা পরীক্ষার জন্য নাখোদা মসজেদের সম্মুখ দিয়া কীর্ত্তনের দল লইয়া গাহিতে গাহিতে যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না? রথের সময় কলিকাতার সহর-কোতোয়াল যদি চিরাগত প্রথার পরিবর্ত্তন করেন— —যদি রথযাত্রার রাস্তা বাঁধিয়া দেন,—তবে সে আদেশ

লঙ্ঘন করিয়া রথ লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের এই প্রশ্নাবলির উত্তরে কে কি বলিয়াছিলেন তাহা সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয় নাই এবং যাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরও কর্ণগোচর হয় নাই; বোধ হয় এ সকল কথায় কর্ণপাত করা এবং সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা নিরাপদ নহে; তাই সকলে নীরব ছিলেন, আমরাও তাই নীরব থাকিলাম।

সেদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় নূতন হাওড়া সেতু নির্ম্মাণ সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সিলেক্ট কমিটি হাওড়া সেতু সম্বন্ধে যে বিল গঠন করিয়াছেন, সভায় তাহা আলোচিত হয়। হাওড়া-সেতু-নির্ম্মাণ-কমিটি যে ভাবে গঠন করা হইয়াছে, কর্পোরেশন তাহাতেও এই মর্ম্মে আপত্তি করেন যে, ঐ ভাবে কমিটি গঠিত হইলে তাহাতে করদাতাগণের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। কর্পোরেশনের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় এবং সিলেক্ট কমিটি হাওড়া সেতু সম্পর্কে যে বিল তৈয়ার করিয়াছেন উহা আলোচিত হয়।—(১) কর্পোরেশন এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, কাউন্সিলের বর্ত্তমান অধিবেশনে হাওড়া সেতু সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া উহা অর্থনৈতিক দিক্ হইতে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্ত সিলেক্ট কমিটিতে পুনরায় অর্পণ করা হউক এবং নূতন কাউন্সিল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শীতকালের প্রারম্ভে ঐ প্রস্তাব কাউন্সিলে উত্থাপন করা হউক। যদি ঐ প্রস্তাবানুযায়ী কাজ না করাও হয়, তাহা হইলেও যেন, ঐ সম্পর্কে কর্পোরেশনের নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়—(ক) কর্পোরেশন প্রাদেশিক রাজস্ব কমান প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং প্রস্তাব করিতেছে যে রাজস্ব কমাইয়া কলিকাতার করবৃদ্ধি করা কখনই সম্ভবপর নহে। হাওড়া সেতু ও পোর্টট্রাষ্ট সম্বন্ধে কর্পোরেশনের সুপারিশ যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলেই কর্পোরেশন শতকরা সিকি ভাগ হারে কর বৃদ্ধি করিতে রাজি আছেন। (খ) কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বৃদ্ধির নামে আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত হাওড়া সেতু সম্বন্ধে সভায় আরও কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। লেঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বলেন, অল্প মূল্যের সেতু হইলে সরকার উহার নির্ম্মাণ কল্পে কোন সহায়তা করিবেন না, সরকারের এই যুক্তি ছেলেমি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন অল্প ব্যয়ের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ ১৬ লক্ষের মধ্যে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। মিঃ ষ্টুয়ার্ট স্মীথ বলেন, কর্পোরেশন সেতু কর্ত্তৃপক্ষ কমিটিতে বেশী আসন লইবার জন্ত এত ব্যস্ত কেন বোঝা কঠিন; কেন না প্রকৃতপক্ষে কাজ যাহা কিছু তাহা ইঞ্জিনিয়ারগণই করিবেন। বক্তা বলেন, হাওড়া সেতুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিকতর। এই কার্য্যে আমাদিগকে অধিক মাত্রায় অর্থব্যয় করিতে হইবে। আর কিছুকাল আলোচনার পর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের সহযোগী 'আর্থিক উন্নতি' ভারতে বীমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—১৯১২ সালের ভারতীয় বীমা-বিষয়ক আইনটা শোধরাইয়া নতুন আইন কায়েম করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিগত আগষ্ট মাস হইতে এই আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভার নিকট পেশ আছে। এই আইন পাশ হইলে কতকগুলা নতুন প্রণালীতে বীমা ব্যবসায়ীরা কার্য্য চালাইতে বাধ্য হইবে। (১) নতুন কোনো কোম্পানী স্থাপিত হইবামাত্রই তাহাকে গবর্মেন্টের নিকট মোটা হারে টাকা কড়ি আমানত রাখিতে হইবে। এখনও আমানত রাখিতে হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্ত হার বাড়িয়া যাইবে। (২) আজকাল বিলাতী বীমা কোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ ভারত-গবর্মেন্টের নিকট টাকা জমা রাখিতে বাধ্য নয়, কিন্তু নতুন আইনে তাহারাও স্বদেশী কোম্পানীর মতনই বাধ্য থাকিবে। (৩) জীবনবীমা ছাড়া আগুন-বীমা, দৈববীমা বা অন্তান্ত বীমা-ব্যবসায়ে যে-সকল কোম্পানী লিপ্ত, তাহাদিগকেও টাকা আমানত রাখিতে হইবে। আজকাল যে নিয়ম আছে তাহাতে একমাত্র জীবন-বীমা-ব্যবসায়ীরাই বাধ্য। (৪) বিলাতী বীমা-কোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ এতদিন ভারত-সরকারের নিকট ভারতীয় ব্যবসা হইতে পাওয়া টাকার স্বতন্ত্র হিসাব দিত না। নতুন আইন তাহাদিগকে ভারতীয় বীমাকারীদের নিকট হইতে পাওয়া

টাকার পৃথক হিসাব রাখিতে এবং তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে। (৫) জীবনবীমা এবং মজুরদের ক্ষতিপূরণ-বীমা এই দুই ব্যবসার জন্ত প্রত্যেক কোম্পানী স্বতন্ত্র খাতা-পত্র রাখিতে এবং হিসাব প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) কোন বীমা-কোম্পানীর কাজ-কর্ম্ম অসন্তোষজনক হইলে তাহার দুয়ার বন্ধ করাইবার ক্ষমতা বীমাকারীদের হাতে কিছু কিছু থাকিবে। অধিকন্তু, জনগণের স্বার্থ-রক্ষা করিবার জন্ত গবর্মেণ্টের একতিয়ার বাড়িয়া যাইবে। (৭) কোনো বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে তাহার ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট বা অন্ত কোনো উচ্চপদস্থ কিম্বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী কখনো কোনো কর্জ্জ লইতে পারিবে না। (৮) প্রত্যেক বীমা-কোম্পানী পাশ-করা "অ্যাকচুয়ারি" বা হিসাব-পরীক্ষককে দিয়া নিজ আর্থিক অবস্থা যাচাই করাইয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। ভারত-গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে জীবন-বীমা-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দুই লাখ টাকা পর্য্যন্ত আমানত আদায় করিতে অধিকারী থাকিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদেশী কোম্পনীর শাখা সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটিবে। তবে যে সকল কোম্পানী ভারতেই গঠিত হইবে,—সেইগুলা স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক,—এই দুই লাখ টাকা এক বৎসরের ভিতর পাঁচ কিস্তিতে দিতে পারিবে। কিন্তু প্রথম কিস্তিতে এক লাখ দিতেই হইবে। আজকাল যে নিয়ম আছে তাহাতে প্রথম কিস্তিতে পঁচিশ হাজার টাকা দিলেই চলে। আগুন, সমুদ্র, মোটরকার অথবা অন্তান্ত বিষয়ে যেসকল কোম্পানী বীমা-ব্যবসা চালায়, তাহাদের নিকট হইতে গবর্মেণ্ট প্রত্যেক দফায় আমানত দাবী করিতে অধিকারী। এইখানে জানিয়া রাখা মন্দ নয় যে, বিলাতে যে আইন আছে তাহাতে গবর্মেণ্ট যে কোনো বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে ২০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ আড়াই-তিন লাখ টাকা পর্য্যন্ত আমানত দাবী করিতে অধিকারী।

দেশবন্ধুর পরলোকগমনের পর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল! সেদিনের কথা এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে, যেদিন দেশবন্ধুর শবদেহ দার্জিলিঙ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। ইহার মধ্যেই একটা বৎসর কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গেল! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বর্ত্তমান থাকিলে এই এক বৎসরে দেশের কত কাজই না হইতে পারিত! স্বরাজ-লাভের পথে দেশ কতই না অগ্রসর হইতে পারিত! সি, আর, দাশের gesture লইয়া ভারতের এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ এবং বিলাতের বহু রাজনীতিক কতই না উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন! অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, মনে হইয়াছিল—ভারত-সচিব মহোদয় আমাদের হাতে চাঁদ ধরিয়াই দেন বা! কিন্তু ভগবান আমাদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ, তাই তিনি নিতান্ত অসময়ে একান্ত অকস্মাৎ তাঁহার প্রিয় সন্তানকে কাছে ডাকিয়া লইলেন—ভারত অনাথ হইল! চিত্তরঞ্জনের কত সাধের প্যাক্ট! এই প্যাক্টের কল্যাণে ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্যগণের ক্ষমতা কতই না বাড়িয়া গিয়াছিল! আর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আজ সেই প্যাক্টের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে—হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে কামড়া-কামড়ি করিয়া মরিতেছে। সি, আর, দাশ বর্ত্তমান থাকিলে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ কখনই বাধিত না; বাধিলেও, এতটা প্রবল হইতে পারিত না! তাঁহার ন্যায় চতুর, বহুদর্শী, সুবুদ্ধিমান রাজনীতিক কোন না কোন একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়া অঙ্কুরেই বিরোধের অবসান ঘটাইতে পারিতেন। তাই আজ তাঁহার বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিনে আমরা তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আর কি তিনি বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিবেন না? কিম্বা অপর কোন রাজনীতিক কি তাঁহার তুল্য মনীষার অধিকারী হইয়া বাঙ্গলা দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না?

নিরুদ্দেশের যাত্রী

শ্রীবীণাপাণি রায় (মিসেস্ এন্-সি রায়)

নীল-সাগরের ওই পারেতে বাস করে কোন্ সন্ধানী,
আড়াল থেকে দেখ্‌চে আমায় গোপনে,
কিসের ব্যথায় এমন ক'রে ভাঙ্‌চে আমার বুকখানি
দীর্ঘ বেলা কাট্‌চে শুধুই রোদনে ?
পথটি যে এই পারে চলার—ক্রমেই ধীরে বাড়্‌চে রে
বন্ধুর যে—বাজ্‌চে আমার চরণে,
লুকিয়ে থেকে মেঘের আড়ে দেখ্‌চে শুধুই হাস্‌চে যে
বাজে না তার প্রাণটি—আমার বেদনে ?
বাদল-সাঁঝে চায় বিরহী পেতে আপন বন্ধুরে—
কেয়ার বাসে মনটি যে তার উন্মনা,
বন্ধু কোথায়—পাই না দেখা—বাস করে সে কোন্ দূরে
অকরুণের পায় সন্ধান কোন্ জনা ?
ঝর্‌চে বাদল আজ অবিরল নীপের বনে ঘুম-হারা
মিটিয়ে পিয়াস উল্লসিতা চাতকী,
আজ বকুলের গন্ধে—আমার প্রাণে কিসের দেয় সাড়া,
বাঞ্ছিতেরে সাম্‌নে আমার পাব কি ?
রইতে নারি, ভেঙে আগল বাহির হ'লেম পথটিতে
নিরুদ্দেশের পথের আমি যাত্রী গো ;

খুঁজ্‌বো তারে জীবন-পণে কেমন গো সন্ধানী সে
মানব না ওই নিকষ-কালো রাত্রি গো।
প্রাণের মাঝের বেদনগুলি ফুলের মত ঝর্‌চে যে,
কখনো কি পোড়্‌বে না তার চরণে ?
হোমানলের ভীষণ-শিখা প্রাণের তলে জ্বল্‌চে রে,
জ্বল্‌বে না সে সেই শিখারই দহনে ?
ওই যে অসীম গগন-তলে হাজার তারা উঠ্‌চে গো,
সেই দিঠি কি জ্বল্‌চে না তার মাঝারে ?
অশ্রু-সাগর মথন কোরে বিন্দুগুলি ফুট্‌চে গো.
গাঁথুন সাথে ধ'রবে না মোর মালা রে ?
সাম্‌নে যে ওই নীলাম্বুধি, রাত্রি এল ঘনায়ে
পার হব তায় একলা আমি কেমনে ?
এই ত ছিল তরী তোমার, ফেল্‌লে কোথা লুকায়ে
হেথা আমায় আস্‌তে দেখে গোপনে ?
নাই বা খেয়া রাখ্‌লে তুমি—আমার তরে যতনে,
ঝাঁপ দেব এই অতল সাগর-মাঝারে,
আজ্‌কে আমার প্রাণ মেতেছে পেতে অরূপ রতনে
শঙ্কা কিসের ?—ভাস্‌ব অকূল-পাথারে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস 'যুগমানব'; মূল্য—৩
শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় প্রণীত 'অগ্নিশিখা' ; মূল্য—১।০
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'কাদিনী' ; মূল্য—১
শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষ প্রণীত 'পল্লীসতী' ; মূল্য—১
স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রণীত 'বর্ণাশ্রম' ; মূল্য—।০
শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'নারীর ঠাকুর' ; মূল্য—১।০
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মমতার ফাঁসি' ; মূল্য—১
শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বক্সী প্রণীত 'হিন্দুনারী' ; মূল্য—১।০
শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'আফ্রিকার সর্পদেবতা' ; মূল্য—৸০
ও 'সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র' ; মূল্য—৸০

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

দোটানা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার   [Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভাদ্র, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

রস-কীর্ত্তন

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

পাবনার কীর্ত্তন গোষ্ঠী সম্মিলনে আমাকে কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে। ঐ সম্মিলনে যে সকল বিষয় আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহারও একটি ফর্দ্দ কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল সমস্যার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না; আমি সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। সে বিষয়টি এই—বর্ত্তমানে কীর্ত্তনগানের অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ইহা বিশেষ ভাবে সম্মিলনে আলোচিত হওয়া আবশ্যক মনে করি।

কীর্ত্তনে যে চৌষট্টি রসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সবগুলি এক্ষণে উদ্ধার করিতে পারা যায় কি না, ইহা ভাবিবার বিষয় হইলেও ইহা ঠিক যে ঐ রস হইতে গোটাকয়েক বাদ গেলেও তত বেশী ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কার্ত্তনই যে লোপ পাইতে চলিল; তাহার কি? কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে এক দিন যে কীর্ত্তনে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল, আজকাল তাহার গায়ক বিরল। যে সকল প্রসিদ্ধ গায়কের নাম বঙ্গে পল্লীতে পল্লীতে লোকমুখে ফিরিত, সে শ্রেণীর গায়ক নাই বলিলেও অন্যায় হইবে না। ঈশ্বরেচ্ছায় যাঁহারা এখনও স্বীয় প্রতিভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলির দ্বারা গণনা করা যায়। শ্রীযুক্ত অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজি, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস, সুরেন আচার্য্য, ফটিক চৌধুরী, বিষ্ণুদাস, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজনের নামই শুনিতে পাওয়া যায়। আমি নিজের অজ্ঞতাবশতঃ যাঁহাদের নাম করিতে পারিলাম না, তাঁহারা কৃপাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। যাঁহাদের নাম করিলাম, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনসূর্য্য অস্তাচলোন্মুখ। ইঁহাদের অবর্ত্তমানে কীর্ত্তনের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ লোক ত দেখিতে পাই না। সম্মিলনে সুধীমণ্ডলী এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

যে সকল ভাবুক, রসজ্ঞ, ভজনশীল ও সঙ্গীতে পারদর্শী মহাজনগণ সাধনার ফলে কীর্ত্তন সুরের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তরাধিকার কালক্রমে স্থান বিশেষে ও গায়ক বিশেষে বর্ত্তাইয়াছিল। ঐ সকল স্থানের সমৃদ্ধিলোপ ও গায়কগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গীতধারাও লোপ পাইয়াছে। অনেক সময়ে গায়কগণের অতিমাত্র রক্ষণ-(গোপন ?)শীলতার জন্যও সুরগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র (?) শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর যখন পদামৃত-সমুদ্র সংকলন করেন, তখনই পদাবলীর পদ-লোপ সুরু হইয়াছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী যে স্থলে সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সে স্থলে প্রভুপাদ রাধামোহন রচনা করিয়া পাদপূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গীত কর্ত্তৃণাং কদাচিৎ গান-পোষকং
ন লভ্যতে যত্র গীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদং ॥
দাস্যামি রচনং কৃত্বা তত্র তেষাং কৃপাবলৈঃ।

পদামৃত-সমুদ্র।

"দুর্ভাগ্য বশতঃ যেখানে কোনও একটি গীত, গীতার্দ্ধ বা এক পাদ না প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেখানে আমি রচনা করিয়া সে সকল যোজনা করিব (যোজয়িষ্যামি)। অদোষদর্শী শ্রোতৃবৃন্দ আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" পঃ সঃ টীকা।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্দ্ধশতাধিক বর্ষ পরেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির সমগ্র পদাবলী অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু রাধামোহন গোস্বামীপ্রভুর এক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ভাল ভাল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের মুখে মুখে এই মহাজনের পদগুলি চলিত। গীতশাস্ত্র হইতে এবং কীর্ত্তনীয়াদিগের অনুসরণ করিয়া তিনি পদামৃত-সমুদ্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আলোক্যগীতশাস্ত্রাণি সন্তক্তানাং কৃতানিতু
সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি কীর্ত্তনস্যানুসারতঃ ॥ পঃ সঃ

কীর্ত্তনের উৎকর্ষ সে সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পদামৃত-সমুদ্রের সুর-তাল-বিন্যাস হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আজকাল পদকল্পতরু বা আধুনিক পদ-সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়, গানের উপরিভাগে বড় বড় তাল, বড় বড় রাগিণীর উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান কালে ঐ সমস্ত রাগ-রাগিণী বা তালের অধিকাংশেরই প্রচলন নাই। তথাপি গতানুগতিকতার বশবর্ত্তী হইয়া রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পদামৃত-সমুদ্র রচনা কালে যে এরূপ ছিল না, তাহার প্রচুর প্রমাণ রাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত সংস্কৃত টীকায় পাওয়া যায়। কেদার, ভৈরব, মঙ্গল, গৌরী, বরাড়ী, বিভাস প্রভৃতি যে সকল রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহার রূপ ও ধ্যান বিশেষ যত্ন সহকারে গোস্বামীপাদেরকৃত 'মহানুভাবানুসারিনী' টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ প্রণালী তখনই সম্ভবে, যখন সঙ্গীতের একটা জীবন্ত অভিব্যক্তি সমাজে বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গীত যখন যন্ত্রবদ্ধ হইয়া, একটা অসাড় প্রণালীমাত্রে দাঁড়ায়, তখন রাগরাগিণীর বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

সে কালে যে লুপ্ত পদের স্থলে কোনও কোনও মহাজন পদ-যোজনা করিয়া দিতেন, তাহার কারণ এই যে রস পরিপুষ্টির জন্য প্রাচীন পদের প্রয়োজন হইত। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় একই পদসমূহ সকল কীর্ত্তনীয়া গান করেন। পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গোষ্ঠবিহার, উত্তরগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, দান, রাস, ঝুলন, হোলি, বিরহ প্রভৃতি কয়েক পালা মাত্র সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারও সকল পালা সকল গায়ক জানেন না। কেহ কলহান্তরিতা, কেহ গোষ্ঠ, কেহ বিরহ ভাল গায়িতে পারেন, অন্য পালা তাঁহার তেমন অভ্যস্ত নাই। এইরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পালায় যে সকল গান প্রচলিত আছে, তাহার বাহিরে প্রায় কীর্ত্তনীয়া যাইতে চাহেন না। ঐ সকল গানের সংখ্যা বড় বেশী নহে; কিন্তু পূর্ব্বে যখন কীর্ত্তনের দেশব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা ছিল, তখন নিশ্চয়ই এমনটি ছিল না। তাহা থাকিলে, এত নূতন নূতন পদ সৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব পদাবলী এমন বিরাট সাহিত্যে পরিণত হইত না; এত নূতন নূতন সুর ও তালের সৃষ্টি হইত না। প্রচলিত বৈঠকী রীতি হইতে পৃথক একটি নিজস্ব সত্ত্বা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য এমন মনোমুগ্ধকর একটি নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে কীর্ত্তনকে কি অসাধারণ পরিশ্রম ও প্রতিভার প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং

কীর্ত্তনের যখন অপ্রতিহত প্রভাব ছিল, যখন জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, নরোত্তমদাস প্রভৃতি সুললিত ছন্দে পদাবলী রচনা ও গান করিয়া দেশ মাতাইতেছিলেন, তখন রস-পোষণের জন্ত নূতন নূতন পদের প্রয়োজন হইত। কীর্ত্তন তখন নানা ভাবোন্মেষে মূর্ত্তিমান, উজ্জ্বল, জীবন্ত হইয়া উঠিত। আমরা বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দের শ্রীপদ-কল্পতরুতে একটি বারমাস্যা অর্থাৎ শ্রীমতীর দ্বাদশমাসিক বিরহের পদ পাই; এই পদ সম্বন্ধে বৈষ্ণব দাস নিজে বলেন যে প্রথম চারিটি কলি বিদ্যাপতির, দ্বিতীয় কলিদ্বয় গোবিন্দ কবিরাজের ও শেষের ছয় কলি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কৃত। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

এ সকল প্রমাণের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে কীর্ত্তনের সেই সোণার যুগে যে জীবন-প্রবাহ বহিত, তাহা শুধু নূতন পদ সৃষ্টি করিয়াই সন্তুষ্ট হইত না; পুরাতন পদের নষ্টপাদ পূরণ করিয়া তাহাতেও জীবন সঞ্চার করিত। এই যুগেই কীর্ত্তনের প্রসিদ্ধ সুরগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল; এই যুগেই নূতন নূতন ছন্দে ভাবের অভিব্যক্তির প্রয়োজন হইতে নূতন নূতন তালের জন্ম হইয়াছিল। এই সকল ছন্দ ও তাল চিরদিন সঙ্গীতজ্ঞগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। কারণ মহাজনগণ শুধু সঙ্গীতের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য করেন নাই; সঙ্গীত যাহাতে ভজন-সাধনের অনুকূল হয়, আহ্নিকের মত যাহা নিত্য উচ্চারিত হইয়া ধ্যান ধারণার সাহায্য করে, তাহার জন্ম তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে যে তাঁহাদের কাব্য-প্রতিভা বা সঙ্গীতকলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে; তাঁহাদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিকতারও চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। গরাণহাটীই হউক, মনোহরসাহীই হউক, কীর্ত্তনের প্রধান অবলম্বন এই আধ্যাত্মিকতা। আজকাল কবি, রসিক বা ভাবগ্রাহী লোকের অভাব নাই; কিন্তু সে আধ্যাত্মিকতা এখন আর নাই। হরিস্মরণে মন সরস হয় না, শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলায় কৌতূহলই বা হয় কই? সুতরাং গান হিসাবেও কীর্ত্তনের আদর কমিয়া গিয়াছে। মহাপ্রভুর ভাষায় বলিতে গেলে

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

ইহাই হইল কীর্ত্তনের উপজীব্য। গোবিন্দ-বিরহে যাহার মন ব্যাকুল হয়, কীর্ত্তন গাহিবার ও শুনিবার সেই অধিকারী। কিন্তু সে ভাব কোথায়? তাহার শতাংশের একাংশই বা কোথায়? তাই আজ কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিতে যুক্তিজালের অবতারণা করিতে হয়। আজকাল লোকের মন দুর্ব্বল, অন্নচিন্তা-চমৎকারে কাতর, সময় অত্যন্ত অল্প, সাধনার একান্ত অভাব; কাজেই কীর্ত্তনীয়া 'রঙ' গাহিয়া, আবৃত্তি করিয়া, বক্তৃতা ফলাইয়া, নাচিয়া কুন্দিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে বাধ্য হয়েন। কষ্ট করিয়া গান শুনিবার লোকের অভাব, কাজেই কষ্ট করিয়া গান শিখিবার লোকেরও অভাব। স্বর সাধনা করিয়া, রাগরাগিণীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ছন্দের আভিজাত্য রক্ষা করিয়া কত জন লোকে কীর্ত্তন শিখেন? কাজেই রস-কীর্ত্তন আর তেমন রস জোগাইতে পারে না; বুভুক্ষু আত্মার খোরাক সরবরাহ করিতে পারে না।

যে যুগে কীর্ত্তনের এই ক্ষমতা ছিল, সেই যুগেই সুরের 'চাল' অনুসারে দুইটি প্রসিদ্ধ শাখার জন্ম হয়। রাজসাহী জেলায় গড়েরহাট পরগণায় গরাণহাটীর জন্ম; রাঢ় অঞ্চলে মনোহরসাহী 'চালের' জন্ম। গরাণহাটী কীর্ত্তনের স্রষ্টা বোধ হয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তমদাস ঠাকুর। ঠাকুর মহাশয়কেই অনেকে এই প্রণালীর স্রষ্টা বলিয়া মনে করেন। স্তবামৃত লহরীতে আছে:

স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে নরোত্তম দাসই গড়ের হাটী বা গরাণহাটী প্রণালীর উদ্ভব-কর্ত্তা। মনোহরসাহীর উদ্ভব-কর্ত্তা কে তাহা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, গোবিন্দ দাস জ্ঞান দাস নরহরি প্রভৃতি হইতে মনোহরসাহী গানের উদ্ভব। সে কালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডই মনোহরসাহী কীর্ত্তনের জন্মস্থান ছিল ইহাই আমি মনে করি। এই শ্রীখণ্ডেই নরহরি সরকার ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার সম্বন্ধে নরোত্তম দাস বলিয়াছেন:

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥

ইনি গৌরাঙ্গ লীলায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরও মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। জ্ঞানদাসও শ্রীখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ গোবিন্দ দাস (কবিরাজ)ও শ্রীখণ্ডের সহিত সংসৃষ্ট। এই সকল কারণ হইতে মনে হয় যে, মনোহরসাহী গানের আকর-

স্থল সম্ভবতঃ শ্রীখণ্ড। পরে ময়নাড়াল এই প্রণালীর কীর্ত্তনের জন্ত বিখ্যাত হয়। এ সম্বন্ধে আমার মত যে অভ্রান্ত, তাহা মনে করিতে সাহস হয় না। সুধিগণ বিচার করিবেন।

গরাণহাটী ও মনোহরসাহী-কীর্ত্তনের এই উভয় রীতিই শ্রেষ্ঠ। উভয় সুরেই গাম্ভীর্য্য আছে। সুর-বিন্যাসে উভয় প্রণালীই তুল্য নিপুণতার দাবী করিতে পারে। শিল্প-প্রতিভায় ও কোনটি কম নহে। আমার মনে হয় গরাণহাটী রীতি সরলতা ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট; মনোহরসাহী সুরের কারিগরিও মাধুর্য্যবিশিষ্ট। গরাণহাটীতে যেরূপ বিলম্বিত ছন্দ আছে, তাহা মনোহরসাহীতেও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে গরাণহাটী গানেই বিলম্বিত লয়ের ও দীর্ঘ ছন্দের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনোহর-সাহী অপেক্ষাকৃত লঘু গতিতে শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ। গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানের ছন্দ দুইটি বহু কাল পৃথক ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু উপযুক্ত সাধকের অভাবে এক্ষণে তাহাদের পৃথক সত্ত্বা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পূজনীয় পণ্ডিত অদ্বৈতদাস বাবাজি প্রভৃতি এক আধ জন ব্যতীত এ ঢঙের কীর্ত্তন আর কাহারও নিকটে শুনিতে পাওয়া যায় না। একবার পরলোকগত নাটোরাধিপ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভবনে পণ্ডিত বাবাজির কীর্ত্তন শুনিয়াছিলাম। পণ্ডিত বাবাজি গানের পূর্ব্বে মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ আমি জানি আপনি গুণগ্রাহী, আপনার সঙ্গীত-প্রতিভা সর্ব্বজন-বিদিত; এরূপ গুণীর সমাজে গান করিতে পারা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যদি অনুমতি করেন দুই একটি উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন গাই। আমি কিছুই জানি না; যাহা জানি, তাহাও শুনাইবার লোক বিরল।" মহারাজ অনুমতি করিলে তিনি গান ধরিলেন। মহারাজ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতির অধিক পুরস্কার দিয়া খুসী করিয়া দিলেন; কিন্তু আমাকে বলিলেন: "আমি ধ্রুপদ, খেয়াল ভাল ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি; সে গান ধরিতেও পারিয়াছি। কিন্তু বাবাজীর এ গান আমার মাথার উপর দিয়া গেল। এরূপ বিলম্বিত লয়ের ও আয়াস-লভ্য সুরের কীর্ত্তন পূর্ব্বে আমি কখনও শুনি নাই।" সঙ্গীতে দক্ষ, পাখওয়াজে সিদ্ধ-হস্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ যেখানে প্রবেশ করিতে অক্ষম, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা যে কত কঠিন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মনোহরসাহীর প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও, ইহাতেও যে ভেজাল মিশিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তীকালে যে রেণেটী ও মন্দারিণী নামে দুইটি সুরের সৃষ্টি হয়, তাহা মনোহরসাহীর সহিত মিশিয়া সুরকে অত্যন্ত পাতলা করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েকটি চপল, লঘু সুর সংযোজিত করিয়া কীর্ত্তনকে যে শ্রুতিমধুর করা যায়, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঢপ কীর্ত্তনে যেমন মধুকান, ও গোবিন্দ অধিকারীর সুর মিশিয়া সমস্ত সঙ্গীতকে হালকা করিয়া ফেলিয়াছে, তেমনি রেণেটি ও মন্দারিণী বা মান্দারিণী সুরের মিশ্রণে মনোহরসাহী কীর্ত্তন হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছে। মনোহরসাহী হইতে এই সুর পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মনোহরসাহী প্রণালীর অধিকাংশ গায়ক আজকাল রেণেটি ও মন্দারিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দুইটি সুরের ধারা একটু চেষ্টা করিলেই ধরা পড়িতে পারে। কীর্ত্তনগোষ্ঠী সম্মিলনে, আশা করি, এমন বিশেষজ্ঞ অনেকে উপস্থিত হইবেন, যাঁহারা রেণেটি মন্দারিণী হইতে মনোহরসাহীর ভেদ সুর যোগে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। সচরাচর যাহাকে রেণেটির সুর বলিয়া মনে করা হয়, তাহা যে অত্যন্ত তরল এবং সঙ্গীতের হিসাবে মনোহরসাহী অপেক্ষা নিম্নস্তরের, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে সেই সুরকে বর্জ্জন করিতে হইবে, আমি এমন কথা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে সঙ্গীতের দিক দিয়া সব রকম সুরের ধারা ও স্বরূপ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে কোনও সুরেরই প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। ঝিঁঝিট ও খাম্বাজ মিশাইয়া গান করা দোষের নহে, কিন্তু ঝিঁঝিট গায়িতে গিয়া অজ্ঞাতসারে খাম্বাজের বা খাম্বাজ গায়িতে গিয়া ঝিঁঝিটের পরদা লাগাইলে, তাহা সঙ্গত হয় না। বিশুদ্ধ মনোহরসাহী আজকাল শুনিতে পাওয়া কঠিন। রেণেটীও খাঁটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাঁহারা বেণী দাসের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে খাঁটি রেণেটী সুর কেমন মিষ্ট ছিল। এখন যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনোহরসাহীর মধ্যে অনেকটা রেণেটীর ছাপ আসিয়া পড়িয়াছে। আমার বোধ হয়, মনোহরসাহীর তথা কীর্ত্তনের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে এই সুরগুলির পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

এক দিকে গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানেরও যেমন দৈন্য দশা উপস্থিত, তেমনি বাজনারও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তরল গানে তরল তাল বাজাইয়া বাহবা লইতে বেশীক্ষণ লাগে না। কিন্তু গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানেরও যেমন গাম্ভীর্য্য ও ছন্দ-বৈচিত্র্য, বাজনারও তেমনি তাল মাত্রা পৃথক ছিল। গীত অনুযায়ী বাদ্য। গীতের আশ্রয় ব্যতীত বাদ্য যেমন টিঁকিতে পারে না, বাদ্যের অভাব ঘটিলেও গীত খোলে না। গীতবাদ্যের পরস্পর সমঞ্জসীভূত শিল্প-চাতুর্য্যে রসের বা আনন্দের সৃষ্টি হয়। গায়কের অভাবে বাদকের অভাব ঘটিতে বাধ্য। আগে যে সকল প্রসিদ্ধ বাদকের নাম শুনা যাইত, সে শ্রেণীর বাদক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। গোলকদাস, মহানন্দ, ভারতদাস, নিকুঞ্জ বাউতী, নিকুঞ্জ মিত্র, কুঞ্জদাস, রামকল্প গৌরদাস ব্রজবাসী প্রভৃতির নাম এখনও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়। ইহাঁদের অনেকেই গরাণহাটী, মনোহরসাহী, রেণেটী মন্দারিণী এই চারি ঘরের বাজনাই জানিতেন। খাঁটি গরাণহাটী ও খাঁটি মনোহরসাহী গানের ধারাবদ্ধ লয়বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন বাদ্য, যাহাতে আনন্দের তরঙ্গ উঠিত, আসর টলমল করিয়া উঠিত,—তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখনকার কীর্ত্তনে যে বাজনা সাধারণতঃ চলে, তাহা অনেক সময়ে ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া মিষ্টত্বের দিকে ধাবিত হয়। ফলে এই হয় যে তাল মাত্রা বলিয়া যে বৈজ্ঞানিক জিনিষটি আছে, তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া যায়। তাল মাত্রা যে গানে ঠিক নাই, তাহা সঙ্গীতের অভিনয় মাত্র; তাহাতে প্রকৃত সঙ্গীত অত্যন্ত কম। গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানের প্রণালী-ভেদে যে বাজনারও প্রণালীভেদ আছে, ইহা হয়ত অনেকেই জানেন না। কিন্তু আমি ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাধারণতঃ যাঁহারা বাদ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এমন বাদকও প্রণালী মত গান করিলে তাহার লয় করিতে পারেন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রত্যেক প্রণালীর অনুসারী বাজনা স্বতন্ত্র ভাবে নিরলস সাধনার দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। গরাণহাটী গানের শ্রেষ্ঠ (সম্ভবতঃ একমাত্র) গায়ক পণ্ডিত বাবাজি যখন নাটোর রাজবাড়ীতে গান করিলেন, তখন তাহার সঙ্গত শুনিলাম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর নিকট। যেমন গান, তেমনি বাজনা। উভয়ই অসামান্য সাধনার দ্বারা অর্জ্জিত। সে দিন যেরূপ 'সঙ্গত' শুনিয়াছি, পণ্ডিত বাবাজির গানের এরূপ লয় আর কখনও শুনি নাই। সে 'সঙ্গত' আর যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাও আমার এই মতের অনুমোদন করিবেন, আশা করি।

গায়কেরা স্বীকার করিবেন যে শ্রোতার গুণে গান। শ্রোতা যেমন চাহেন, গীতবাদ্য তাহার অনুরূপ হইতে বাধ্য। শ্রোতার রুচির আদর্শ উচ্চ না হইলে, গীতবাদ্যের উৎকর্ষ আশানুরূপ হওয়া সুদুষ্কর। কিন্তু আবার ইহাও ঠিক যে সঙ্গীত বা শিল্পের আদর্শ উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শ্রোতাদিগের রুচিরও অবনতি ঘটে। কীর্ত্তনের অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা বাঙ্গালীর একটি জাতীয় দায়িত্ব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কারণ শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী যদি জগৎকে বড় কিছু দান করিয়া থাকে, তবে তাহা এই কীর্ত্তন। এক্ষণে অধিকারী, অনধিকারী, অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ কিছুই ভাবিবার সময় নাই। মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ লইয়া রস-আস্বাদন করিবার কথা বলিয়াছেন সত্য। এখনও আমরা দেখিতে পাই, অন্তরঙ্গ নহিলে কীর্ত্তন জমে না, সব ভাসিয়া যায়। রসের দানা বাঁধে না। সুতরাং অন্তরঙ্গ চাই। কিন্তু অন্তরঙ্গ বলিব কাহাকে? সে দিকে মহাপ্রভু দিগ্‌দর্শনও করেন নাই। আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা শুধু সঙ্গীতের হিসাবেই। ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়াও ইহাকে বিচার করিতে পারা যায় এবং সেখানে অন্তরঙ্গ নহিলে আর কোনও রূপেই চলে না। কীর্ত্তনের যাহা কাব্যসম্পদ্ তাহা ছাপাখানার প্রসাদে সকলেরই অধিগম্য। তাহার মধ্যে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ নিরাকরণের অবকাশই নাই। সঙ্গীত হিসাবে অন্তরঙ্গ বা অধিকারী তাঁহারাই, যাঁহারা কীর্ত্তনের গানে আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা তাহাতে আনন্দ পান না, রাগরাগিণীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জঞ্জাল করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া যাঁহারা কীর্ত্তনের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা বহিরঙ্গ। ইহাঁদের লইয়া আস্বাদন ভাল হয় না। ধর্ম্মের দিক দিয়া যাঁহারা যুগলের উজ্জ্বল রসে মোহিত না হন, তাঁহারা বহিরঙ্গ। তাঁহাদিগকে লইয়া লীলা আস্বাদন করা চলে না। তাঁহারা প্রার্থনা, নিবেদন, বা নাম কীর্ত্তন শুনিবার অধিকারী হয়ত হইতে পারেন। ইহাই মহাপ্রভুর বাক্যের অর্থ বলিয়া বোধ হয়। লীলারও

আবার বিভিন্ন রস-পর্য্যায় আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন রসাস্বাদনের অধিকারী। কেহ সখ্য রসে ভরপুর, গোষ্ঠে তাঁহাদের বড় আনন্দ। কেহ বাৎসল্যে আনন্দ পান; কেহ বা রসশিরোমণি-মাধুর্য্যের পথিক। সকল রস সকল স্থানে গান করা বিধেয় নহে। এখানে সঙ্গীত ও কাব্যের অধিকার ব্যতীত, ভজনের অধিকারও গণনা করিতে হইবে। স্কুল কলেজের ছাত্র যেখানে বেশীর ভাগে শ্রোতা, সেখানে রসালস বা কুঞ্জভঙ্গ ইত্যাদি গান করা উচিত নহে। এ স্থলে তাহারা অন্তরঙ্গ নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লীলাগানের ক্রম আছে এবং সাধারণ শ্রোতার নিকট গান করিতে হইলে অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া, অবহিত হইয়া গান করা একান্ত আবশ্যক।

'অন্তরঙ্গ' শব্দের আমি যে ব্যাখ্যা দিলাম, তাহা সকলে গ্রহণ করিবেন কি না জানি না। আমি মনে করি যে মহাপ্রভুর উক্তিতে যে অন্তরঙ্গ লইয়া রস আস্বাদন করিবার কথা আছে, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়াই বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। 'বংশী শিক্ষায়' প্রেমদাসও এই কথা বলিয়াছেন :—

অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে
রসরাজ-উপাসনা করিলা অর্পণে॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু অধিকারী ভেদে দ্বিবিধ উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। স্মরণ রাখিবেন, এখানে উপাসনার কথা হইতেছে। সাধারণ অধিকারীর পক্ষে নাম-কীর্ত্তন বা নামজপ। অন্তরঙ্গ, মরমী অধিকারীর জন্য রসরাজ উপাসনা।

ইহা ব্যতীত অধুনা যে কীর্ত্তন গান প্রচলিত আছে, তাহা যে কেবল দুই চারিজন ভক্ত লইয়া গোপনে (অর্থাৎ বহিরঙ্গের অগম্য স্থানে) উপভোগ করিতে হইবে, এমন কথা মহাপ্রভু বলেন নাই। এরূপ ব্যাখ্যা করিলে, কীর্ত্তন গানের যাহাও বা আছে তাহাকেও বধ করাহইবে। শাস্ত্র বলেন :

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ক্রিয়তে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভগবল্লীলা শুনিবার অধিকার সকলেরই আছে; কারণ ঐ লীলা শুনিয়াই মন শ্রীহরির পাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়।

কীর্ত্তনে যে চৌষট্টি রসের উল্লেখ আছে, তাহার একটি তালিকা বহরমপুরের প্রকাশিত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া আছে। তাহা এই : পূর্ব্বরাগে যথা সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, ভাট মুখে শ্রবণ, দূতী মুখে শ্রবণ, সখী মুখে শ্রবণ, গুণিজনের গানে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ (৮); মান যথা : সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, মুরলীধ্বনি শ্রবণ, বিপক্ষগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন, গোত্রস্খলন, স্বপ্নে দর্শন, অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন (৮); প্রেম বৈচিত্ত্য যথা : শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজপ্রতি ঐ, সখীর প্রতি ঐ; দূতীর প্রতি ঐ, মুরলীর প্রতি ঐ, বিধাতার প্রতি ঐ, কন্দর্প প্রতি ঐ, গুরুজন প্রতি ঐ (৮); প্রবাস যথা, ভাবী, মথুরাগমন, দ্বারকা গমন, কালীয় দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ, কার্য্যানুরোধ, রাসে অন্তর্দ্ধান (৮); সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ যথা : বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠে গমন, গোদোহন, অকস্মাৎ চুম্বন, হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, বর্ত্ম রোধন, রতিভোগ (৮); সংকীর্ণ সম্ভোগ যথা : মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচুরি, নৌকাবিলাস, মধুপান, (৮); সম্পন্ন সম্ভোগ যথা : সুদূর দর্শন, ঝুলন, হোলী, প্রহেলিকা, পাশা খেলা, নর্ত্তক রাস, রসালস, কপট নিদ্রা (৮); সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ যথা : স্বপ্নে মিলন, কুরুক্ষেত্র, ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজন কৌতুক, একত্রে নিদ্রাবস্থা, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা (৮)

বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত ক্ষণদাগীত চিন্তামণি গ্রন্থের সূচীপত্রে কোন্ রসের কোন্ পদ, তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে। কিন্তু তাহা হইতে চৌষট্টি রস কোন্ গুলি তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় পথে পথে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া আপিসে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলো। উপরে গিয়াই সে দেখিলো তাহার ঘরে বিলোপ বসিয়া আছে। বিলোপকে দেখিয়াই মলয় জিজ্ঞাসা করিলো—তুমি কখন এলে?

বিলোপ বলিলো—অনেক্ষণ। আমি এসেই শুন্‌লাম তুমি তখনই বেরিয়ে গেলে।

তুমি তা হলে বরাবর ষ্টেসন থেকে এখানেই এসেছো?

হাঁা।

আচ্ছা, মৃদুল অতো ব্যস্ত হয়ে চলে' গেলো কেনো তার কি কিছু কারণ জান্‌তে পেরেছো?

কতক কতক জেনেছি। কোথাও কিছু একটা বোঝ্‌বার গণ্ডগোল ঘটেছে, এবং সেটা আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমি যদি তোমাকে খুব ভালো রকম না জান্‌তাম তা হলে আমারও মনে মৃদুলা দেবীর মতন একটা খট্‌কা লাগতে পার্‌তো।

মলয় উৎকণ্ঠিত ও উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—আমার কিছু অপরাধ ঘটেছে বলে' মৃদুলা রাগ করে' চলে' গেছে? আমি তো জ্ঞানতঃ কোনো অন্যায় করি নি।

বিলোপ পকেট হইতে কতকগুলা কাগজপত্র বাহির করিতে করিতে বলিলো—ঐটে তো আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এবং ঐটে বোঝ্‌বার জন্যেই তো আমি ছুটোছুটি তোমার কাছে এসেছি···এইগুলো পড়ে দেখো···

বিলোপ দুখানা পুরাতন চিঠি খামে-ভরা মলয়ের হাতে দিলো। মলয় দেখিলো খামের উপর তাহারই হাতে লেখা শ্রেয়সীর নাম ঠিকানা। ইহা দেখিয়াই মলয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?

—মৃদুলা দেবী আমাকে দেখ্‌তে দিয়েছিলেন; আমি তোমাকে দেখিয়ে ব্যাপার কি জান্‌বো বলে' নিয়ে এসেছি।

মলয় বুঝিতে পারিলো যে অনন্ত এই চিঠি দুখানি ডাকে না দিয়া মৃদুলাকে দিয়াছিলো, এবং এই জন্যই শ্রেয়সী এই চিঠি দুখানি পায় নাই। মলয় বলিলো—এ ঐ···

মলয় বলিতে যাইতেছিলো পাজী অনন্ত, কিন্তু সে নিজেকেও উহারই তুল্য দুশ্চরিত্র মনে করিয়া পাজী বিশেষণটি উচ্চারণ করিতে পারিলো না, সে কেবল বলিলো এ ঐ অনন্তটার কাজ! মৃদুর মনে আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ সঞ্চার করে' তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর্‌তে পার্‌বে মনে করেছিলো!

বিলোপ জিজ্ঞাসা করিলো—কিন্তু তুমি থিয়েটারের নর্ত্তকীকে প্রেমপত্র লিখেছিলে কেনো?

মলয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলো—প্রেমপত্র! শ্রেয়সী আমার বোন, নিবারণের স্ত্রী রমা। রমাকে নিবারণ আদর করে' নাম দিয়েছিলো শ্রেয়সী। সে নিবারণকে

ছেড়ে চলে' এলেও নিবারণ তাকে ভুলতে পারে নি; তাকে ফিরে ঘরে আন্‌বার জন্তে নিবারণ ব্যাকুল হয়ে আমাকে বলে রমাকে অনুরোধ কর্‌তে তাই আমি তাকে চিঠি লিখে নিবারণের কাছে ফিরে আস্‌তে বলেছিলাম। সেই চিঠি হলো প্রেমপত্র!

মলয়ের কৌতূহল ও সন্দেহ হওয়াতে সে খাম হইতে পত্র বাহির করিয়া দেখিলো যে পত্রের সম্বোধন শ্রেয়সী স্থানে প্রেয়সী হইয়াছে, এবং মাঝে মাঝে দু-একটি শব্দ কালী দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখিয়াই মলয় বলিয়া উঠিলো—দেখেছো কী শয়তান!

অতঃপর মলয় নিবারণ ও শ্রেয়সী-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার এবং অনন্ত কি উপায়ে পত্রগুলিকে হস্তগত করিয়া ও বিকৃত করিয়া মৃদুলার মন বিষাক্ত করিয়াছে তাহা বিলোপকে বিবৃত করিয়া বলিলো। এই-সমস্ত বলিতে বলিতে অনন্তর উপর ক্রোধে মলয়ের মন পূর্ণ হইয়া উঠিলো এবং উহাকে খুব করিয়া শাস্তি দিবার বাসনা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিলো; কিন্তু তখনই তাহার মনে হইলো যে সে উহাকে শাস্তি দিবার অধিকার হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে। তাই সে সমস্ত বৃত্তান্ত বিলোপকে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলো—সেদিন তুমি ওটাকে বেশ করে' শিক্ষা দিয়ে দিয়েছিলে তো?

বিলোপ বলিলো—ভদ্রলোকে অপর একজন ভদ্রমন্য লোককে যেমন শিক্ষা দিতে পারে তা আমি দিয়েছিলাম। ......এ ব্যাপারটার তো একটা মীমাংসা হয়ে গেলো। কিন্তু আর একটা গুরুতর জটিল সমস্যা আছে......

মলয় উৎসুক: ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বিলোপের মুখের দিকে চাহিলো। বিলোপ বলিতে লাগিলো—মৃদুলা দেবী স্বচক্ষে নাকি দেখেছিলেন অনন্তর স্ত্রী·....

মলয় ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াই বলিলো—হ্যাঁ। কিন্তু সেটাতেও আমার কোনো দোষ নেই··· সম্ভবতঃ আহুতি দেবীরও মনে তেমন কোনো দুষ্ট ভাব ছিলো না, আমি তাঁকে আমার একটা লেখা পড়ে' শোনাচ্ছিলাম, তিনি হঠাৎ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়্‌লেন। এ কাজটা তাঁর ঠিক উচিত হয় নি; হয়তো তিনি বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা দেখাবার অথবা একটু ফ্লার্ট্‌ কর্‌বার জন্তে ওরূপ করে' থাকবেন। তাঁর চরিত্র যে কতো দৃঢ় তা আমি টের পেয়েছি···শিক্ষিতা মেয়েদের রঙ্গ রসিকতা লীলা পদ্মপত্রের জলের মতন, তাদের অধিকতর লোভন ও শোভন করে, কিন্তু তাদের অঙ্গ স্পর্শ করে না।

এই বলিয়া মলয় অকপটে নিজের অন্যায় অসঙ্গত আচরণের কথা বন্ধুকে বলিলো এবং শেষে বলিলো—এ কথা আমি নিজেই মৃদুলাকে বল্‌বো। মৃদুলা আমার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে এমন মনের উদার প্রসার তার আছে।

বিলোপ বলিলো—আঃ বাচ্‌লাম! আমার বড়ো ভয় হয়েছিলো যে মৃদুলা দেবীর চাক্ষুষ সাক্ষীর অভিযোগের সমাধান হয়তো কিছু হবে না। আমি আজ আগে ফিরে যাই, গিয়ে তাঁর মনের সংশয় আর রোষ দূর করি। আমি টেলিগ্রাম কর্‌লে তুমি যেয়ো।

মলয় মৃদুলার রোষের সংবাদে চিন্তিত ও বিলোপ তাহার মনের ক্ষোভ দূর করিতে পারিবে এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলো—তা তুমি যা ভালো বোঝো তাই কর্‌বো।

বিলোপ বাসায় চলিয়া গেলো ও মলয় আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলো।

মলয় বিকালে আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার ভৃত্য বলিলো—ও-বাড়ীর মেম-সাহেব আপনার জলখাবার কর্‌তে বারণ করেছিলেন, তাঁর বাড়ী থেকেই আপনার জলখাবার পাঠিয়ে দেবেন।

আবার আহুতির চায়ের নিমন্ত্রণ! মলয়ের ইচ্ছা হইলো তখনই সে বাড়ী হইতে পলায়ন করে। কিন্তু আপিস থেকে আসিয়া স্নান করিতে না পাইলে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হয় বলিয়া সে স্থির করিলো স্নানটা সত্বর সারিয়া লইয়াই সে সরিয়া পড়িবে।

মলয় স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিলো প্রফুল্লবদনা আহুতি অপেক্ষা করিতেছে। সে আর পলায়নের পথ পাইলো না। সে অপ্রস্তুত ভাবে আহুতিকে বলিলো—আপনি আবার আমার জন্য কষ্ট করে'......

আহুতি হাসিয়া বলিলো—এতে আর কষ্ট কি! মৃদুল এখানে নেই, আপনাকে যত্ন করা তো আমার' কর্ত্তব্য। আমি খান্‌সামাকে বলে' এসেছি, সে চা আন্‌লো বলে'......

বলিতে বলিতেই খান্‌সামা চা ও জলখাবার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলো।

মলয় নীরবে আহারে মনোনিবেশ করিলো। আহার করিতে করিতে ক্ষণকাল পরে সে মাথা নত করিয়া মৃদু অনুতপ্ত স্বরে বলিলো—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন .....

আহুতি অত্যন্ত স্বচ্ছ লঘু হাসি হাসিয়া বলিলো—কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে হবে? লেখক লোকেরা অমন একটু সেন্টিমেন্ট্যাল হয়েই থাকে! মৃদুলের কোনো চিঠি-টিঠি পেলেন? সে কবে আস্‌বে?

মলয় সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে একবার আহুতির মুখ দেখিয়া লইয়া বলিলো—আমি দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁকে আনতে যাবো।

আহুতি বলিলো—উনি এখানে থাকলে আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে পুরী বেড়িয়ে আস্‌তে পারতাম।

আহুতির এই কথায় মলয়ের মনের সঙ্কোচ অনেকখানি কমিয়া গেলো। সে তথাপি অপ্রতিভ ভাবে কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে বলিলো—তা হলে তো বেশ হতো।

তাহার কণ্ঠস্বরে কোনো রকম উৎসাহ বা আগ্রহ প্রকাশ পাইলো না।

ইহা বুঝিতে পারিয়া আহুতি জিজ্ঞাসা করিলো—এখন আপনি কোথায় যাবেন?

—একবার বিলোপের কাছে যেতে হবে।

—তিনি তো পুরী গিয়েছিলেন?

—আজ ফিরে এসেছেন; আজই আবার যাবেন।

আহুতি একটু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলো—আজকে এসেই আবার আজকেই যাবেন যে?

মলয় অপ্রস্তুত ভাবে বলিলো—একটু বিশেষ দরকার আছে।

আহুতি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলো—ও! তা হলে আর আপনাকে ধরে' রাখ্‌বো না। আমি তা হলে যাই......

আহুতি এই কথা বলিতেই তাহাকে বিদায় দিবার জন্য মলয় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলো।

আহুতিও চেয়ার হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলো।

মলয় বিলোপকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য বিলোপের নিকট রওনা হইলো।

* * * *

পরদিন বিকালবেলা মলয় বিলোপের টেলিগ্রাম পাইলো—ট্রিম্ ওভার, কোস্‌ট্ ক্লিয়ার, ষ্টার্ট্ টু-ডে'জ্ এক্‌সপ্রেস্।

মলয় উৎফুল্ল হৃদয়ে পুরী যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলো।

* * * *

পরদিন প্রভাতে মলয় পুরীতে গিয়া পৌঁছিলো। তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেসনে আসিয়াছিলো মৃদুলা ও বিলোপ।

মলয় ও মৃদুলার দৃষ্টি সম্মিলিত হইতেই তাহাদের উভয়েরই মুখ লজ্জায় ও বিচ্ছেদের পর মিলনের আনন্দে আরক্তিম হইয়া উঠিলো ও চক্ষুর দৃষ্টি প্রেমাবেশে মদির হইয়া উঠিলো। গাড়ী একেবারে থামিবার পূর্ব্বেই মলয় হাসিমুখে লাফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলো। মৃদুলা ও বিলোপ চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে মলয়ের কামরার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার চেষ্টায় চলিতেছিলো; মলয় তাহাদের কিঞ্চিৎ অগ্রে অবতরণ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলো, মৃদুলার মুখেও মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিলো।

বিলোপ তাহাদের ভাবাবেশ দেখিয়া মলয়কে বলিলো—তোমরা দুজনে সমুদ্রের ধার দিয়ে এগোও, আমি তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে মুটে করে' নিয়ে যাচ্ছি......

মলয় ও মৃদুলা উভয়েই বিলোপের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আবার লজ্জা পাইয়া লাল হইয়া উঠিলো; এ যেন তাহাদের নূতন প্রেম-পরিচয় ঘটিতেছে! তাহাদের উভয়েরই মনে পড়িলো বিলোপ এমনই করিয়া এই পুরীতে তাহাদের প্রথম মিলন ঘটাইয়াছিলো এবং এখন আবার পুনর্মিলন ঘটাইতেছে। উহারা উভয়ে কৃতজ্ঞতাভরা স্নিগ্ধ লজ্জিত দৃষ্টিতে বিলোপের দিকে একবার তাকাইয়া নীরবে ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া চলিল।

তাহদের অপস্রিয়মান যুগলমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বিলোপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাসিলো এবং আপনাকেই অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিলো—আমি কেবল দুজনের মিলনের হাইফেন হয়েই রইলাম!

সমুদ্রবেলায় উপনীত হইয়া মৃদুলা মলয়ের পাশে পাশে চলিতে চলিতে লজ্জাকুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিলো—আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমি তোমার প্রেম আর চরিত্রকে

সন্দেহ করে' অন্যায় করেছি·········তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো······

মলয় সুখাবেশে অভিভূত হইয়া বলিলো—তুমিও আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসী হতে গিয়েছিলাম······

মৃদুলা বলিলো—থাক ওসব কথা······বিলোপ বাবু আমাকে সব বলেছেন······মানুষের জীবন ভুল ভ্রান্তিতে ভরা······আমি ভুল করে' আহুতির কাছে অপরাধী হয়ে আছি, ফিরে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে·········

মলয় নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া আবেগভরে মৃদুলার হাত চাপিয়া বলিলো—তা হলে তুমি সব শুনেছো! আমাকে ক্ষমা করেছো! তোমার প্রেমমন্দাকিনীতে স্নান করে' অশুচিতা থেকে মুক্ত হলাম!

মৃদুলা প্রণয়রসে আপ্লুতা হইয়া আপনার হাত ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া হাসিয়া বলিলো—আমার হাত ছেড়ে দাও লোকে দেখ্‌ছে!

মলয় এবার উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলো—দেখুক গে! আমার আরো যা ইচ্ছে কর্‌ছে তা ওদের দেখিয়ে দেবো নাকি?

মৃদুলা সুখভরা স্মিত মুখে সুন্দর ভ্রূকুটি করিয়া বলিলো আঃ কী বলো যে তার ঠিক নেই।

মলয়ের মুখ পরিপূর্ণ মিলনের সুখের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলো। জোয়ারে উচ্ছ্বসিত সাগরের একটা উদ্বেল তরঙ্গ ফুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া সূর্য্যকরোদ্ভাসিত বালির উপর ফেনহাস্যে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলো। সমাপ্ত

অসি ও মসি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

অসি এবং মসি, দুই জনাতে বসি,
কে বড় তাই নিয়ে করে ঝগড়া দিবা যামি'
কেউ যে কোন মতে, চায়না ছোট হতে,
অসি বলে আমিই বড়,—মসি বলে আমি।
বলছে অসি ডাকি, শক্তি এত রাখি,
একটী দিনে শ্মশান করে দেশটা দিতে পারি।
আমার গায়ের জোরে, পৃথিবীটাই ঘোরে,
সেইটা পরের নিইনা যেটা ইচ্ছা করে কাড়ি।
এমনি আবার খোঁচা, শক্ত বড়ই মোছা,
অনল ছুটাই গিরি টুটাই রক্তে নদী ভরি।
দেশটা আমি শাসি, শত্রুগণে নাশি,
ভোগ যে আমি করছি ধরা গায়ের জোরে ধরি।
মসি বলেন বাহা, বীরত্ব কি আহা,
শত্রু তুমি নাশার চেয়ে বৃদ্ধি অনেক কর।
কেই বা তোমায় পুছে, নামটী যেত মুছে,
ঘাতক ঘরের শোভা তোমায় আমিই করি বড়।
আমি দেশের প্রাণ, করি আলোক দান,
বুকের ব্যথা যশের গাথা অমর করে রাখি।
আমার হাতের রেখা, বিধির দারুণ লেখা,
আমি যে দিই আবার দাগা উল্কী দিয়ে আঁকি।
আমি নিয়ম গড়ি, রাখি শোভন করি,
নইলে তোমার ছিল কেবল হত্যাগারে বাসা।
আমি দেশের আশা, ভক্তি ভালবাসা,
কার্য্য তোমার সাম্য এবং ভ্রাতৃভাবে নাশা।
ঝগড়া শুনে আসি, বলেন বিধি হাসি,
অসির চেয়ে সবাই জানে বড় বটেন কালী,
অসি কেবল ভয়, মসি বর অভয়,
অসি তোমার উচিত চলা মসির আদেশ পালি'।

প্রকৃতি-পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ

প্রকৃতি = প্র—কৃ + ক্তি। প্র = আরম্ভ বা আদি, এবং প্রকৃষ্ট; কৃতি = করণ বা কার্য্য বা সৃষ্টি অথবা কারণ; অর্থাৎ যাহা হইতে এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে তাহাই প্রকৃতি। এবং যাহা প্রকৃষ্টরূপে কৃত বা সঞ্জাত বা সমস্ত চরাচররূপে ব্যক্ত তাহাও প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতি কার্য্য-কারণ-রূপা। কার্য্যরূপে সে ব্যক্ত এবং সর্ব্বসাধারণের অনুভবযোগ্য। আর কারণরূপে সে অব্যক্ত এবং বাক্য-মনের অগোচর, অথচ যোগিধেয় এবং স্বানুভবগম্য। এজন্য নারায়ণ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।"

—হে বৎস, প্রকৃতির লক্ষণ বলিতে কেই বা সমর্থ? এই কারণরূপা প্রকৃতিকে মূলকারণ, স্বভাব, আদ্যা, প্রধান, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে ক্রমে বিবিধ কৃতি (কার্য্য বা সৃষ্টি) সম্পন্ন হওয়ায় ঐ প্রকৃতি বিকৃতি (বি = বিবিধ + কৃতি = কার্য্য) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগতের যাহা আদিকারণ তাহাকে আদ্যাশক্তি বলে। তাহাই প্রকৃতির পরম রূপ। ইহা বাহ্য বা অন্তরেন্দ্রিয়ের স্পষ্ট অনুভবযোগ্য নহে। তবে ইহার আভাস আমরা নিম্নোক্তরূপে লাভ করিতে পারি। আমি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, তখন বলি 'আমার হাঁটিবার বা কথা বলিবার শক্তি নাই।' আমি যখন বধির হই, তখন বলি 'শোনবার শক্তি নাই।' এইরূপ 'নড়বার শক্তি নাই, বোঝবার শক্তি নাই, ধরবার শক্তি নাই' প্রভৃতি কথা প্রকাশ করি। অথচ ঐ শক্তি যে কি জিনিষ তাহার কোনই ধারণা হয় না। কাজেই উহা অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয়। অবশ্য ইহার পূর্ব্বেও প্রকৃতির দুই অবস্থা আছে। এক সিসৃক্ষা বা সৃজন করিবার ইচ্ছা; দ্বিতীয় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। শ্রুতিতে আছে সোঽকাময়ত. একোঽহং বহু স্যাম্"—সেই অপ্রত্যক্ষ অব্যক্ত পুরুষ কামনা করিলেন 'আমি এক আছি, বহু হইব।' এই ইচ্ছার উদ্রেকের পর প্রকৃতি নাম্নী শক্তির বিকাশ হয়। আমরাও দেখিতে পাই, কোন কাজ করিতে প্রথম ইচ্ছা জন্মে, তৎপর শক্তির জাগরণ ও প্রেরণা হয়। যাহা হউক, এই ইচ্ছাশক্তি কিঞ্চিৎ ঘনাকার ধারণ করিয়া সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তখন ত্রিগুণের ধর্ম্ম—সুখ প্রকাশ, কর্ম্ম, দুঃখ ও

মোহ এই ভাব সকলের সমন্বয়ে অর্থাৎ অপৃথক্‌রূপে প্রকৃতি এক অব্যক্তভাবে পরিণত হয়েন। তৎপর প্রকৃতি ত্রিগুণের বৈষম্যাবস্থায় পরিণত হয়েন। ইহা পূর্ব্বোক্ত পরম রূপ। ইহাকে মহান্ বলে। প্রকৃতির এই স্বরূপে, 'আনন্দানুভব করিতে হইবে' ও 'জানিতে হইবে', 'কর্ম্ম করিতে হইবে' এবং 'জানিতে না হইবে' ও 'দুঃখ অনুভব করিতে হইবে' এই তিন আকারে ক্রমান্বয়ে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ পায়। তদনন্তর প্রকৃতি 'অহং'ভাবে পরিণত হয়েন। তখনই তিনি কার্য্যোন্মুখী হয়েন। সিসৃক্ষা, ত্রিগুণসাম্যাবস্থা ও ত্রিগুণবৈষম্যাবস্থা এই তিন রূপে প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় ও অস্পষ্টভাবে থাকেন। 'অহং' ভাব ধারণ করিয়াই তিনি কার্য্যে উদ্যোগী হয়েন। আমরা ইহার স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি। 'অহং'ভাব অর্থাৎ 'আমি করিব', 'আমি জানিব', ইত্যাদি যে কোন কার্য্যের পূর্ব্বে আমিত্ব ভাবের উদয় না হইলে চেষ্টা আরম্ভ হয় না। যে 'আমি করিব' এই ভাব গ্রহণ না করে, সে সাক্ষিরূপে নিষ্ক্রিয় থাকে। এই 'অহং' ভাবকে জীবমাত্রেই শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্বনিতে সূক্ষ্মরূপে অনুভব করিয়া থাকে। যাহা হউক, ত্রিগুণের বৈষম্যাবস্থায় সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, মোহ প্রভৃতি ক্রিয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তা ছিল না। তৎপর প্রকৃতি অহংকারে পরিণত হইয়া উক্ত ক্রিয়া সমূহের 'অহং' এই কর্ত্তা হইলেন। তদনন্তর বিচার হইল কিরূপে ঐ ক্রিয়াসমূহ সাধিত হইবে। তখন প্রকৃতি পঞ্চতন্মাত্রায় পরিণত হইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রকৃতি ভাব বা গুণ মাত্র রূপে অবস্থিত ছিলেন, এখন তিনি দ্রব্যরূপে বিকাশ পাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ অবকাশ দিবার জন্য এবং ভাবী সৃষ্ট বস্তুসমূহের ধারণ করিবার জন্য প্রকৃতি আধাররূপে আকাশস্বরূপ (space) হইলেন। তৎপর পরস্পর ভাব-বিনিময়ের জন্য আকাশ শব্দময় হইল। তদনন্তর চলন চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া সাধনের জন্য আকাশ বায়ুরূপে পরিণত হইল। ভাবী সমস্ত বস্তু প্রকাশের জন্য বায়ু তেজোরূপে প্রকটিত হইল। আবার অপ্রকাশ ও আবরণের জন্য তেজঃ জল ও ক্ষিতির আকার ধারণ করিল। প্রকৃতির আকাশাদি পঞ্চস্তরে পরিণতি অতীব সূক্ষ্ম হইতে অতীব স্থূল পর্য্যন্ত ক্রমসাধিত। ইহার প্রথম স্তরকে পঞ্চতন্মাত্র বলে। ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। (তন্মাত্র =লক্ষণ। তৎমীয়তে জ্ঞায়তে অনেন ইতি। যেমন, শব্দতন্মাত্র=শব্দ লক্ষণ অর্থাৎ শব্দ দ্বারাই যাহার স্বরূপ জানা যায়।) ইহারা এত সূক্ষ্ম যে ইহাদিগকে গুণস্বরূপ বলা যায়। প্রকৃতির এই পঞ্চ রূপ সাধারণের অবোধ্য। অব্যক্ত নাদ, অব্যক্ত স্পর্শ, অব্যক্ত রূপ, অব্যক্ত রস, অব্যক্ত গন্ধ, অব্যক্ত আনন্দ ও প্রকাশ, অব্যক্ত প্রাণক্রিয়া এবং অব্যক্ত দুঃখ ও মোহরূপে ইহারা বিশিষ্টমনাঃ ব্যক্তি ও সিদ্ধ যোগীর দ্বারা অনুভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত অহংভাব ও এই পঞ্চতন্মাত্র রূপকে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম রূপ বলা যায়। এই পঞ্চতন্মাত্র তদনন্তর পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ ঘনাকারে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতে পরিণত হয়। ইহাই সমস্ত দৃশ্য বস্তুর মুখ্য উপাদান। এই পঞ্চমহাভূত প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপ। সিদ্ধি দ্বারা উপনীত যোগী অন্তরে নানাবিধ নাদ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি রূপে ইহাদের অনুভব করে, এবং সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক দৃশ্য বস্তুর সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের স্বীয় স্বীয় অণুতে উপস্থিত হইয়া ইহাদের মর্ম্ম অবগত হয়। তৎপর সর্ব্বসাধারণের পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূত ও তদ্‌বিকার যাবতীয় দৃশ্য বস্তু অর্থাৎ প্রপঞ্চ (প্র + পঞ্চ। প্র = প্রকৃষ্ট = স্থূল; পঞ্চ = পঞ্চভূত) প্রকৃতির স্থূলরূপ।

অতএব দেখা যাইতেছে, সিসৃক্ষা, ত্রিগুণসাম্যাবস্থা, ত্রিগুণবৈষম্যাবস্থা, অহংভাব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও প্রপঞ্চ এই কয়েকটী প্রকৃতির স্বরূপ। তন্মধ্যে সিসৃক্ষা হইতে অহংভাব পর্য্যন্ত অবস্থা চতুষ্টয়ে প্রকৃতি ভাবাত্মিকা বা গুণস্বরূপা। এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত প্রকৃতি দ্রব্যাত্মিকা।

আমরা আরও জানি, জীবের স্বভাবকে প্রকৃতি বলে। যার যেরূপ প্রকৃতি তার কার্য্যাবলীও তদনুরূপ হয়। জীবের এই স্বভাব প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপের দ্বারা সংঘটিত। জীবের সেই প্রকৃতিই সূক্ষ্ম রূপে তাহার স্থূল শরীরকে চালায়। এইরূপ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের ঘটনাবলীও এক সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং যে অব্যক্ত শক্তি এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ উৎপন্ন করে এবং তৎস্বরূপ হয় তাহাকেই প্রকৃতি বলে।

প্রকৃতি ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, সিসৃক্ষা হইতে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত প্রকৃতির

যে ক্রমিক বিকার সম্পন্ন হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক অংশ অবিকৃত ও কতক অংশ বিকৃত হইয়াছে। প্রত্যেকে সর্ব্বাংশেই বিকৃত হয় নাই। কারণ অবিকৃত অংশেরও পৃথক্ অনুভব হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা এখন প্রকৃতিকে দ্রব্যময়ত্ব ও গুণময়ত্ব (Concrete and abstract) রূপে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ইহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ কোন বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই দুইটী বিষয়ের সম্যক্ অবগতি হওয়া প্রয়োজন। যেমন, একটী উজ্জ্বল আলো দেখিলাম। প্রথমতঃ উহার উজ্জ্বলতা গুণ দেখিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। তৎপরে বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম 'গ্যাস্' এই দ্রব্যে উহা প্রদীপ্ত। আবার, দুর হইতে দেখিলাম ক্যারার মত কি একটা প্রকাণ্ড জিনিষ দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে যাইয়া শুনিলাম উহাকে ট্রেণ বলে। যখন উহা চলিতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, উহার বহু লোক বহন করিবার ও দ্রুত চলিবার গুণ আছে। এইরূপ কখন গুণ দেখিয়া দ্রব্য বুঝি, কখন বা দ্রব্য দেখিয়া গুণ বুঝি। এই দুইটাই বস্তুর তত্ত্বোপলব্ধির হেতু, অর্থাৎ কোন বস্তুর তত্ত্ব জানিতে হইলে তাহার গুণ ও উপাদান জানা আবশ্যক।

দ্রব্যময়ী প্রকৃতি

কোন অনুসন্ধিৎসু পুরুষ প্রথমে দেখিতে পায়, উপরে ও চতুর্দ্দিকে এক বিশাল অবকাশ বর্ত্তমান, এবং এই অবকাশের মধ্য দিয়া একের শব্দ অন্যের শ্রুতিগোচর হয়। ইহা দ্বারা ক্রমে তাহার আকাশের ধারণা হয়। তৎপরে দেখিতে পায়, আকাশে মেঘসমূহ সঞ্চালিত হইতেছে, গাছের পাতা সকল নড়িতেছে, ধূলিকণা সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সুখস্পর্শ অদৃশ্য এক চঞ্চল বস্তু তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া সন্তপ্ত শরীরকে শীতল করিতেছে। এই সকলের দ্বারা ক্রমে তাহার বায়ুর জ্ঞান জন্মে। তদনন্তর রাত্রির অবসানে দেখিতে পায়, পূর্ব্বাকাশে এক বিশাল জ্যোতিষ্ক পদার্থ উদিত হইয়া ক্রমে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করতঃ সকল প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার উষ্ণতা দ্বারা সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাত্রে পাষাণের বা দীপ শলাকার ঘর্ষণে এক উজ্জ্বল উষ্ণ পদার্থ উৎপাদন করিয়া সে তাহার শৈত্য নিবারণ এবং নিকটবর্ত্তী বস্তু প্রকাশ করিতে পারে; হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত গরম হয়; এইরূপে ক্রমে তাহার অগ্নি বা তেজের বোধ জন্মে। তৎপর নদী, খাল, সমুদ্র প্রভৃতিতে এক দ্রব পদার্থ দেখিতে পায়, উহাতে স্নান করিয়া বা উহাকে পান করিয়া সে শীতল হয়। আকাশ হইতে এক তরল পদার্থের ধারা পতিত হইয়া সকলকে সিক্ত ও শীতল করে; বৃক্ষাদির পত্র প্রভৃতি পেষণ করিলে এক দ্রব পদার্থ নির্গত হয়; এইরূপে ক্রমশঃ তাহার জলের ধারণা হয়। তদনন্তর সে দেখে যে, পাষাণ, মৃত্তিকা, বৃক্ষ প্রভৃতি অনেক-বিধ কঠিন পদার্থ চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে, কোনটা গন্ধ দিতেছে, কোনটী অন্য কোনটীকে ধারণ করিতেছে, কোনটী বা ভারী বোধ হইতেছে; এই ভাবে ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষিতি জ্ঞান জন্মে। এবম্বিধ ক্রমিক অনুসন্ধানের ফলে তাহার একটা মোটামুটি এই ধারণা হয় যে, যাহা কিছু দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু অবকাশ ও শব্দবত্তা, শীতোষ্ণাদি স্পর্শ ও চঞ্চলতা, উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা, শৈত্য ও দ্রবতা এবং কাঠিন্য ও গন্ধবত্তা বিদ্যমান; অর্থাৎ সকলই পাঁচ প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত।

তৎপরে যখন দেখে যে, অধিকাংশ গ্রাম্য বা বন্য এবং ফলপ্রসূ পুষ্পেরই পাঁচ পাপড়ী, মনুষ্যাদি কোন কোন জীবের হাতে বা পায়ে পঞ্চ অঙ্গুলি এবং তাহাদের দুই হাত, দুই পা ও মুখ্য দেহ-ভাগ এই পাঁচ অংশে দেহ নির্ম্মিত, চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয় সমস্ত পদার্থের জ্ঞান-সাধক, এবং দেহেও পূর্ব্বোক্ত কাঠিন্য, শৈত্য, উষ্ণাদি বিদ্যমান, তখন তাহার আরও কৌতূহল জন্মে, 'তবে কি ইহারা পূর্ব্বাবধারিত পঞ্চ পদার্থেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে?'

ইহার পর সে যখন নিজের ধারণা স্থির ও দৃঢ় করিবার জন্য আপ্ত-বাক্যের অনুসন্ধানার্থ প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তখন দেখিতে পায়, "পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বম্।"—সমস্তই পাঁচে তৈয়ারী। "পঞ্চভূতাত্মকং সর্ব্বম্"—সমস্তই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। এ জন্যই দৃশ্য জগৎকে প্রপঞ্চ (প্র+পঞ্চ) বলে। এই পঞ্চভূতের নাম হইল ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌-ব্যোম।

তদনন্তর সে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের লক্ষণ কি? যাহারা এই দৃশ্য জগতের মূল

উপাদান, তাহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষণ জানিয়া তৎপর বিশেষ বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব্বে মুনি-ঋষিরা নিজ নিজ দেহ-যন্ত্রটী যোগ সাহায্যে সুগঠিত ও পরিস্কৃত করিয়া বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতেন। কখনও বা স্থূলদর্শীকে বুঝাইতে বাহ্যযন্ত্রেরও আবিষ্কার করিতেন। কিন্তু ইহাতে সংশয়াক্লিষ্ট দ্রষ্টা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। উদ্ভিদাদি স্থাবর জীবের প্রাণ ও অন্তঃসংজ্ঞা আছে, ইহা বহু প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে। এ যাবৎ যাহাদের চিত্ত ও দেহ নির্ম্মল ছিল, কেবল তাহারাই ইহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিত। কিন্তু সার্ জগদীশ অধুনা ক্রেস্কোগ্রাফ্ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া এই তত্ত্ব সাধারণকে বুঝাইতেছেন সত্য, তথাপি দুই একজনে দেখিয়াও দেখিতেছে না। এইরূপ যদি কেহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উক্ত পঞ্চভূতের বিশ্লেষণে যত্নপর হয়, তবে অনায়াসেই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত যে সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান তাহা বোধগম্য হইবে। যন্ত্রের অভাবে শাস্ত্রবচনের লক্ষণ ও সংজ্ঞা মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা স্থূলাংশ বিচারে মাত্র প্রবৃত্ত হইতে পারি। অতএব শাস্ত্র যাহাদিগকে পঞ্চভূত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছে, তাহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষণ লইয়া আমরা দেখিব যে, এই পঞ্চভূতই মূল উপাদান। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু উপাদান হইতে পারে না।

পঞ্চভূতের সংজ্ঞা ও লক্ষণ

গর্ভ-পৈঙ্গলাদি উপনিষদে, মহাভারতে ও ভাগবতাদি অনেক পুরাণে পঞ্চভূতের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং স্বকীয় গবেষণায় যে সমস্ত উপলব্ধি হইয়াছে, তদবলম্বনে পঞ্চভূতের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইল।

১। শব্দতন্মাত্র = আকাশ; গুণ—অবকাশ ও শব্দবত্তা (= শব্দোৎপাদন-ক্ষমতা)।

২। স্পর্শতন্মাত্র = বায়ু; গুণ—চঞ্চলত্ব ও স্পর্শবত্তা (= স্পর্শজ্ঞান জন্মানর ক্ষমতা)।

৩। রূপতন্মাত্র = তেজঃ; গুণ—উষ্ণতা ও রূপবত্তা (= আকার-প্রদান-ক্ষমতা)।

৪। রসতন্মাত্র = জল; গুণ—শৈত্য ও দ্রবতা (= তরলতা ও রসোৎপাদন-ক্ষমতা)।

৫। গন্ধতন্মাত্র = ক্ষিতি; গুণ—কাঠিন্য ও গন্ধবত্তা (= গন্ধোৎপাদন-ক্ষমতা)।

এই পঞ্চতন্মাত্র প্রথমতঃ পরস্পর অবিমিশ্রিত ছিল। তৎপর পঞ্চীকৃত বা পরস্পর মিশ্রিত হইল। এই মিশ্রণে যে ভূতের ভাগ যাহাতে অধিক, তাহার গুণই ইহাতে প্রবল হইল। তথাপি অন্যের গুণসমূহ অল্প পরিমাণে রহিল। ইহার অণুসমূহকেই স্থিরচিত্ত যোগীরা অনুভব করিয়া থাকেন এবং ইহাদের দ্বারাই স্থূল দৃশ্য-প্রপঞ্চের সৃষ্টি। অতএব এখন এই পঞ্চীকৃত মহাভূতের বিষয়ই আলোচ্য। এই পঞ্চীকৃত মহাভূতকেই মূল উপাদান বলে।

প্রথমতঃ যত পরিমাণ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি পঞ্চতন্মাত্রায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করা হইল। প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশ পৃথক্ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশকে সমান চারি ভাগে ভাগ করা হইল। সুতরাং এই চারি ভাগের এক এক ভাগ প্রত্যেক ভূতের অষ্টমাংশ হইল। এখন প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশের সহিত অপরাপর চারি ভূত হইতে প্রত্যেকের অষ্টমাংশ গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করা হইল। ইহাতেই পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চীকৃত অবস্থা হইল। যথা—

[নিম্নোক্ত সাংকেতিক চিহ্ন—প. = পঞ্চীকৃত। ত. = তন্মাত্র।]

১। প. আকাশ = ত. আকাশ $\frac{1}{2}$ + ত. বায়ু $\frac{1}{8}$ + ত. তেজ $\frac{1}{8}$ + ত. জল $\frac{1}{8}$ + ত. ক্ষিতি $\frac{1}{8}$ = ১প. আকাশ।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই মিশ্রণে আকাশের ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত আকাশে শব্দ এবং অবকাশ এই দুই গুণই প্রধান। বায়ু, তেজ, জল এবং ক্ষিতির গুণও অল্প পরিমাণে ইহাতে আছে।

২। প. বায়ু = ত. বায়ু $\frac{1}{2}$ + ত. আকাশ $\frac{1}{8}$ + ত. তেজ $\frac{1}{8}$ + ত. জল $\frac{1}{8}$ + ত. ক্ষিতি $\frac{1}{8}$ = ১প. বায়ু।

এই মিশ্রণে বায়ুর ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত বায়ুতে চঞ্চলত্ব ও স্পর্শগুণ প্রধান, আকাশাদি অন্য চারিভূতেরও স্ব স্ব গুণ অল্প অল্প বিদ্যমান।

৩। প. তেজঃ = ত. তেজ $\frac{1}{2}$ + ত. আকাশ $\frac{1}{8}$ + ত. বায়ু $\frac{1}{8}$ + ত. জল $\frac{1}{8}$ + ত. ক্ষিতি $\frac{1}{8}$ = ১ প. তেজঃ।

এই মিশ্রণে তেজের ভাগ অধিক থাকায়, সমষ্টি পঞ্চীকৃত

তেজে উষ্ণতা ও রূপগুণ অধিক। তথাপি অন্য চারি ভূতের গুণও অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান।

৪। প. জল = ত. জল $\frac{১}{২}$ + ত. আকাশ $\frac{১}{৮}$ + ত. বায়ু $\frac{১}{৮}$ + ত. তেজ $\frac{১}{৮}$ + ত. ক্ষিতি $\frac{১}{৮}$ = ১ প. জল।

এই মিশ্রণে জলের ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত জলে শৈত্য, তরলতা ও রসগুণ অধিক। বাকী চারি ভূতের গুণ অল্প।

৫। প. ক্ষিতি = ত. ক্ষিতি $\frac{১}{২}$ + ত. আকাশ $\frac{১}{৮}$ + ত. বায়ু $\frac{১}{৮}$ + ত. তেজ $\frac{১}{৮}$ + ত. জল $\frac{১}{৮}$ = ১ প. ক্ষিতি।

এই মিশ্রণে ক্ষিতির ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত ক্ষিতিতে কাঠিন্য ও গন্ধগুণ অধিক। অন্যান্য ভূতের গুণ অল্প।

পঞ্চীকৃত আকাশাদিতে তন্মাত্র আকাশাদির গুণের প্রাবল্য থাকায় মিশ্রিত আকাশাদিতে আকাশাদির নামই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মিশ্রণের দ্বারা আমরা ক্ষিত্যাদির অণুর তত্ত্ব অবগত হইতে পারিব। দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন্ মিশ্রিত করিয়া জলোৎপাদন করিলে আমরা যেমন সিদ্ধান্ত করি জলের প্রত্যেক অণুতে (molecule) দুইটী হাইড্রোজেন্ পরমাণু (atom) এবং একটী অক্সিজেন্ পরমাণু (atom) আছে, অতএব জল H_2O, সেইরূপ ক্ষিত্যাদির অণ সম্বন্ধেও বিবেচ্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

১ প. ক্ষিতি = $\frac{১}{২}$ ত. ক্ষিতি + $\frac{১}{৮}$ ত. জল + $\frac{১}{৮}$ ত. তেজ + $\frac{১}{৮}$ ত. বায়ু + $\frac{১}{৮}$ ত. আকাশ।

= $\frac{৪}{৮}$ ত. ক্ষি + $\frac{১}{৮}$ ত. জ + $\frac{১}{৮}$ ত. তে + $\frac{১}{৮}$ ত. বা + $\frac{১}{৮}$ ত, আ।

অর্থাৎ প্রত্যেক তন্মাত্র ক্ষিতিকে ৮ ভাগ করিয়া তার ৪ ভাগের সহিত অন্য চার ভূতের প্রত্যেকের এক এক ভাগ লইয়া সমষ্টি পঞ্চীকৃত ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, একটী পঞ্চীকৃত ক্ষিতির অণুতে ৮টী পরমাণু আছে। তন্মধ্যে ৪টী ক্ষিতির, ১টী জলের, ১টী তেজের, ১টী বায়ুর ও ১টী আকাশের। অর্থাৎ

১ পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যণু = ৪ ত. ক্ষিতি পরমাণু
+ ১ ত. জল „
+ ১ ত. তেজ „
+ ১ ত. বায়ু „
+ ১ ত. আকাশ „

অপরাপর ভূতের অণু সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই যে পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের অণু রচিত হইল, ইহারা যাবৎ সৃষ্টি থাকিবে তাবৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। প্রকৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা কেবল স্থূলাংশে। সূক্ষ্ম অণুসমূহ অবিকৃত থাকে। এবং এই অণুসমূহই যখন সৃষ্টির মূল উপাদান, তখন এই অণুসমূহকে পরমাণু বলা যাইতে পারে। অতএব পরমাণ বলিতে এখন পঞ্চীকৃত ভূতের অবিধ্বংসী সূক্ষ্মতম অংশকেই বুঝিতে হইবে। এখন পঞ্চীকৃত ক্ষিতি পরমাণুর ধারণা কিরূপে লাভ করিতে পারি দেখা যাউক।

গবাক্ষের ছিদ্র পথে সূর্য্যরশ্মি পাত হইলে অসংখ্য রেণুকে দশদিকেই গমনাগমন করিতে দেখা যায়। তন্মধ্যে যেগুলি কেবল ঊর্দ্ধদিকেই ধাবিত হয়, কিন্তু ভূমির দিকে আসে না, তাহাদিগকে ত্রসরেণু বলে। বৈদ্যক পরিভাষা মতে ১ ত্রসরেণু = ৩০ পরমাণু। অতএব এক ত্রসরেণুর ত্রিশভাগের একভাগ লইলে ক্ষিতি পরমাণুর ধারনা হয়।

এখন দেখিতে হইবে হিন্দু শাস্ত্রে পঞ্চভূতকে যে মূল পদার্থ বলা হইয়াছে, তাহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি।

১। যাহা অবকাশ প্রদান করে এবং যাহা দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বা ব্যোম কহে। সুতরাং উপরিভাগে যে বিশাল আকাশ দেখা যায়, তাহাই কেবল পদার্থ আকাশ নহে। ইহার অণুর বর্ণ ধূম্রাভ।

২। যাহা স্বয়ং চঞ্চল ও যাহা অন্যের চঞ্চলতা উৎপাদন করে, এবং যাহা দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে তাহাকে বায়ু বা মরুৎ কহে। সুতরাং অক্সিজেন্ হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি গ্যাস্-সমূহও বায়ু সংজ্ঞার অন্তর্গত। ইহার অণুর বর্ণ নীল।

৩। যাহা স্বয়ং উষ্ণ ও যাহা অন্যের উষ্ণতা উৎপাদন করে, এবং যাহা দ্বারা রূপ জ্ঞান জন্মে তাহাকে তেজঃ বা অগ্নি বলে। সুতরাং দীপের বা কাষ্ঠ প্রভৃতির অগ্নিকেই কেবল মৌলিক অগ্নি বলে না। ইহার অণুর বর্ণ লোহিত।

৪। যাহা স্বয়ং শীতল ও দ্রব এবং যাহা অন্যের শৈত্য ও দ্রবতা উৎপাদন করে, এবং যাহা দ্বারা রসজ্ঞান জন্মে তাহাকে জল বা অপ্ বলে। সুতরাং তৈল, বৃক্ষনির্য্যাস প্রভৃতি জল সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ইহার অণুর বর্ণ শ্বেত।

৫। যাহা স্বয়ং কঠিন ও ভারী এবং যাহা অন্যের কাঠিন্য ও গুরুত্ব সম্পাদন করে, এবং যাহা দ্বারা গন্ধজ্ঞান

জন্মে তাহাকে পৃথিবী বা ক্ষিতি বলে। সুতরাং পাষাণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি ক্ষিতি সংজ্ঞার অন্তর্গত। ইহার অণুর বর্ণ পীত।

পূর্ব্বোক্ত অণুর বর্ণসমূহ যোগীরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকৃত দশায়ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সূক্ষ্মাকারে বিরাজমান থাকে। তাহারা যখন দৃশ্য-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তখন তাহারা অসংখ্য অসংখ্য ভাগে পরস্পর বিমিশ্রিত হইয়া কঠিন, তরল, বায়বীয় প্রভৃতি অসংখ্য স্থূল পদার্থের সৃজন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক পদার্থেই পঞ্চভূতের বিদ্যমানতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা এখন তাহারই অনুসন্ধান করিব।

১। ক্ষিতি পরীক্ষার্থ একখানা চন্দন কাষ্ঠ গ্রহণ করা যাউক। (১) একটা পেরেক লইয়া ইহাতে বিদ্ধ করা হইল। পেরেক বিদ্ধ হইবার কালে বিপ্রকৃষ্ট অণুগুলি পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া পেরেককে ভিতরে স্থান দিল। অতএব দেখা যাইতেছে, কাষ্ঠের অণুগুলির মধ্যে অবকাশ ছিল। কাষ্ঠকে আঘাত করিলে একরূপ শব্দ হয়। এই শব্দ যখন তাম্রকাংস্যাদি বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন রকম, তখন অবশ্যই ইহাদের মধ্যে আকাশ থাকিয়া স্বস্ব অণুর যোগে বিভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। সিদ্ধযোগীর কর্ণে বিনা আঘাতে কাষ্ঠান্তর্গত আকাশের শব্দ গোচর হয়। এরূপ কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে ত কথাই নাই। কাষ্ঠের এক অংশে শব্দ উৎপন্ন হইলে অন্য অংশে শুনা যায়। ইহাতেও অবকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যাহা হউক, উক্ত প্রকারে অবকাশ ও শব্দ গুণ থাকায় কাষ্ঠে আকাশের অস্তিত্ব নিরূপিত হইল।

(২) কাষ্ঠখণ্ডের অণুসমূহের চতুর্দ্দিক্ বায়ুণু দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া কাষ্ঠখণ্ড কঠিন কি নরম, শীতল কি উষ্ণ, এই স্পর্শজ্ঞান আমরা লাভ করি, যোগী-দৃষ্টিতে বা অত্যন্ত শক্তিমান্ যদি কোন অণবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করা যায় তবে জানা যায় যে, ঐ বায়ুণুগুলি নীলবর্ণ এবং নিজেরাও যেমন চঞ্চল সেইরূপ কাষ্ঠের স্পৃষ্ট অণুগুলিকেও চঞ্চল করিতেছে।

(৩) কাষ্ঠখণ্ড যতই কেন শীতল হউক না, উহাতে কিছু না কিছু উষ্ণতা অনুভূত হইবেই। উত্তাপের পরিমাণ যখন অত্যন্ত অল্প হয় তখন প্রভূত শক্তিশালী তাপমান্ যন্ত্রের সাহায্যে বা যোগীর অনুভবে ঐ অল্প তাপ অনুভূত হইতে পারে। পরন্তু এই তেজঃকণা কাষ্ঠে বিদ্যমান আছে বলিয়াই উহা লোহিত, পীত, বা পিঙ্গলবর্ণ রূপে দৃষ্ট হয়। তেজের পরিমাণের তারতম্যই বর্ণভেদের কারণ।

(৪) কাষ্ঠ যতই শুষ্ক হউক না কেন, উহাতে কিছু না কিছু শীতলতা থাকিবেই। কাষ্ঠ যখন দগ্ধ হয়, তখন অত্যন্ত শুষ্ক কাষ্ঠ হইতেও অন্ততঃ কিছু না কিছু বাষ্প বিনির্গত হয়। ইহাতে কাষ্ঠে জলের বিদ্যমানতা প্রকাশ করে। অধিকন্তু কাষ্ঠের তিক্ত মিষ্ট প্রভৃতি আস্বাদও জল-কণা থাকার পরিচায়ক।

(৫) কাষ্ঠের মধ্যে ক্ষিতির অংশ থাকায় উহা কঠিন বোধ হয়। সকলেই চন্দনের ঘ্রাণ পায় এই জন্য চন্দন কাষ্ঠ পরীক্ষার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য কাষ্ঠে বা কঠিন বস্তুতে একটা না একটা গন্ধ পাওয়া যায়; তবে কোন কোনটীতে উহা এত সূক্ষ্ম ও অনির্দ্দিষ্ট যে সাধারণের পক্ষে উহা ধরা অসম্ভব। যোগীর ঘ্রাণে বা কোন গন্ধমাপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে উহার অনুভব হইতে পারে। যাহা হউক, কঠিনতা ও গন্ধবত্তা থাকার জন্য কাষ্ঠ ক্ষিতি সংজ্ঞায় অভিহিত।

ক্ষিতি সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই কাষ্ঠখণ্ডকে ক্ষিতির আদর্শ স্বরূপ ধরা হইয়াছে। ক্ষিতি বলিতে কেবল মাটিকেই বুঝায় না। ইষ্টক, কাষ্ঠ, কাচ, অস্থি, পাষাণ, বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা প্রভৃতি কঠিন বস্তু মাত্রকেই পার্থিব পদার্থ বলা হইয়া থাকে। কারণ, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কঠিনতা এবং গন্ধবত্তা প্রবল; যেহেতু মিশ্রিত পঞ্চভূতের মধ্যে পার্থিবাংশ ইহাতে বেশী। তবে যাহাকে মৌলিক পার্থিব পদার্থ বা ক্ষিতি বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা ক্ষুদ্রতম পার্থিব পরমাণুই লক্ষিত হইতেছে। যত কাল এই দৃশ্য জগৎ থাকিবে, তত কাল এই পরমাণুর ক্ষয় নাই; কাজেই ইহাকে মৌলিক পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মৌলিক পদার্থে সাধারণের অনুভবযোগ্য সূক্ষ্ম অণুর এক দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। মনে করুন, গৃহে একটি মৃগনাভি বা গোলাপপুষ্প আছে—দূর হইতেই আমরা ইহার সুগন্ধ পাই। কাছেও ঐ একরূপ গন্ধই পাই। কাজেই দৃষ্ট না হইলেও, অনুমান করিতে হইবে, উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বায়ু দ্বারা চালিত

হইয়া আমাদের নাসিকাপথে আনীত হইলে পর, আমাদের গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিছুকাল পরেই মৃগনাভি নিঃশেষিত হয় এবং পুষ্পেরও আর ঘ্রাণ থাকে না। ইহাতে বুঝা যায়, ক্রমে উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে বিভক্ত হইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে। বিষ্ঠা সম্বন্ধেও এইরূপ। কিন্তু মৌলিক পার্থিব অণু ইহা হইতেও অতিশয় ক্ষুদ্র।

অতএব যাহা অতি অল্পমাত্রও কঠিন এবং যাহা অতি অল্পমাত্রও গন্ধ দান করে তাঁহাই মৌলিক ক্ষিতি বা পৃথিবী (element of earth)

২। জল বিশ্লেষণার্থ একবাটি পরিস্রুত জল পরীক্ষা করা হউক। (১) একটি অতি সূক্ষ্ম সূচীর অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া দিলে, উহা অনায়াসে জলে প্রবেশ করে। ইহাতে বুঝা যায়, জলে অবকাশ আছে। পুনশ্চ, যদি একবাটি পরিস্রুত জলকে ৪° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত লওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, ক্রমেই উহার আয়তন কমিয়া যাইতেছে অথচ ওজন ঠিকই আছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জলের অণুগুলির মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা ক্রমে হ্রাস হওয়ায় উহারা খুব সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে। অতএব জলের মধ্যে অবকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ হস্ত দ্বারা জলের উপর আঘাত করিলে একরূপ শব্দের উৎপত্তি হয়। আর স্বতঃও যে জলের মধ্যে শব্দ হইতেছে তাহাও যোগিবোধগম্য বা যন্ত্রবিশেষে গ্রাহ্য। সুতরাং জলে অবকাশ আছে।

(২) জলের অণুগুলি যে চঞ্চল এবং উহার মধ্যে যে মৎস্য বাস করে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়—জলের মধ্যে বায়ু আছে। অনেকে বলেন, জলে অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রিত (oxygen dissolved) থাকে বলিয়াই জলে মৎস্য বাঁচে। কিন্তু জল যখন ৪° ডিগ্রিতে (4°C) যৎসম্ভব সঙ্কুচিত হয়, তখন অবশ্য ইহার পূর্ব্বে জলের অণুগুলির মধ্যে অবকাশ ছিল এবং এই অবকাশ বাহ্য বায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় তাহাতে বায়ু ছিল। বায়ু ব্যতিরেকে কোন প্রাণীই বাঁচে না। জলে মৎস্যের জীবন রক্ষার অবশ্য উভয় কারণই বিদ্যমান। অতি গভীর স্থানে জল নীলবর্ণ দেখায়—তাহার কারণও বায়ু; কারণ, বায়ুর বর্ণ নীল। পরিষ্কার আকাশে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে উহা যেমন নীলবর্ণ দেখায়, গভীর জলেও আলো প্রবেশ করাইলে উহা নীলবর্ণ দেখায়। এই নীলিমা জলের নহে। কারণ জলের বর্ণ শ্বেত। জল যদি নীলবর্ণ হইত, তবে ক্ষুদ্রাংশেও নীলিমা থাকিত। হাতে করিয়া একটু জল লইয়া ছাড়িয়া দিলে জলের শ্বেতবর্ণই দেখা যায়। উহার কারণ কেবল সূর্য্যালোক নহে। কারণ, সূর্য্যালোকেও সাতটি রং আছে; পরন্তু ঘনীভূত জল অর্থাৎ বরফ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। জলের অণু শ্বেত বর্ণ না হইলে বরফ কখনই শ্বেতবর্ণ হইত না। যোগীরা জলকণা শ্বেত বলিয়াই প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। যাহা হউক, জলে বায়ুর পরিমাণ অল্প বলিয়াই অল্প জলে উহার নীলিমা সাধারণ দৃষ্টিতে অনুভূত হয় না। জল গভীর হইলে দৃষ্টির পরিমিত স্থানে বায়ুকণা প্রভূত পরিমাণে থাকে, তাহাতেই উহা নীলবর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। অতএব যাহারা জলকে নির্ব্বর্ণ (colourless) বা কিঞ্চিৎ হরিদ্বর্ণ মিশ্র নীলবর্ণ (Greenish blue) বলে, তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত। আর জলাণু বায়ুণু দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে বলিয়া জলে স্পর্শজ্ঞান হয়। অতএব জলে বায়ু আছে।

(৩) জল যতই কেন শীতল হউক না, উহাতে কিছু না কিছু উষ্ণতা থাকিবেই। তাপমান যন্ত্রের দ্বারা ইহার অনেকটা নিরূপণ হয়। আর জলের বর্ণ যে শ্বেত, তাহার কারণ তেজ। যেহেতু তেজই রূপবিধান করে।

(৪) জল যতই কেন উষ্ণ হউক না, উহাতে কিছু না কিছু শৈত্য থাকিবেই; অতি উষ্ণ জল দ্বারাও অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। জলটি দ্রব পদার্থ। একটু জল লইয়া আস্বাদন করিলে কেমন একটা স্বাদ অনুভূত হইবে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা দুরূহ। কারণ আমরা প্রধানতঃ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়—এই ছয় রসের অনুভব করি; এবং অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে সে উহা বুঝিতে পারে। আবার এই সমস্ত রসের পরস্পর মিশ্রণে ৫৭টি রস অনুভূত হয় বলিয়া বৈদ্যক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রসেরও অন্ত নাই। কারণ, পঞ্চভূত অসংখ্য অসংখ্য ভাগে মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ রসের উৎপাদন করে। যথা, আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, "পৃথিব্যম্বুগুণ বাহুল্যাৎ মধুরঃ। তোয়াগ্নিগুণ বাহুল্যাৎ অম্লঃ। পৃথিব্যাগ্নিগুণ বাহুল্যাৎ লবণঃ। বায়ুগ্নিগুণ বাহুল্যাৎ কটুকঃ। বায়ুাকাশগুণ বাহুল্যাৎ তিক্তঃ। পৃথিব্যনিলগুণ বাহুল্যাৎ কষায়ঃ।" এইরূপ রসের উৎপত্তির কারণ নিরূপিত থাকিলেও উপাদানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। মধুরত্ব প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইবার উপাদানের পরিমাণ নিশ্চয়ই আছে। তাহার

তারতম্যে বিভিন্ন রসের উৎপত্তি হয়। জিহ্বা দ্বারা আমরা রসগ্রহণ করি। অতি পরিষ্কার পরিস্রুত জল জিহ্বায় লাগিলেই একটা স্বাদের অনুভব হয়। তাহা যদি নাম দ্বারা অন্যের নিকট বলিতে না পারি, (কারণ উক্ত ছয় রস হইতেও অনেকবিধ রস থাকিতে পারে) তবে জলকে নিঃস্বাদ (tasteless) বলা সঙ্গত নহে। অতএব জলের মধ্যে জলাণু আছে।

(৫) জলের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দিলে হাত কিছু বাধা প্রাপ্ত হয় এবং হাতে একটু কঠিনত্ব বোধ হয়। প্রখর ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবের নিকট জলের গন্ধ প্রতিভাত হয়। যথা, উষ্ট্র বহুদূর হইতে জলের গন্ধ পাইয়া থাকে। মানবে পায় না বলিয়া জলের গন্ধ নাই বলা চলে না। যোগিগণও জলের গন্ধ উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে জল নির্গন্ধ (odourless) তাঁহারা ভ্রান্ত। অতএব জলে ক্ষিতি আছে।

জলসম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

যাহা আমরা পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং যাহা অক্সিজেন্‌ ও হাইড্রোজেন্‌ গ্যাস্‌দ্বয়ের মিশ্রণে নির্ম্মিত, তাহাই কেবল জল নহে ; পরন্তু যে কোন পুষ্প-পত্রাদির রস, তৈল, বৃক্ষনির্য্যাস, জল প্রভৃতি অপ্‌ বা জল নামে খ্যাত। ইহাদের সূক্ষ্ম অণু, যাহা অল্পমাত্রও শীতল, দ্রব এবং আস্বাদযুক্ত তাহাই মৌলিক জল (element of water)।

৩। তেজ পরীক্ষার্থ কাষ্ঠের প্রজ্বলিত অগ্নি ধরা যাউক।

অরণিকাষ্ঠ, দীপ্তিশলাকা (দিয়াশলাই), বা প্রস্তরের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়া কাষ্ঠ জ্বালাইলাম। কাষ্ঠ জ্বলিতে লাগিল। কাষ্ঠের নিকট শ্বেত বর্ণ জ্বালা, তৎপর লোহিত বর্ণ জ্বালা, তদনন্তর কৃষ্ণাভ ধূম দেখা দিল। ইহারা যথাক্রমে জল, তেজঃ ও ক্ষিতির পরিচায়ক। সূক্ষ্মতা হেতু সাধারণ দৃষ্টি দ্বারা অগ্নির সম্যক্‌ বিচার করা অসম্ভব। শুনিতে পাই, অগ্নিকে তরল করা যায়। যদি তরল অগ্নি (liquified fire) পাওয়া যায়, তবে ইহা হইতে অগ্নিতে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অগ্নির উষ্ণতা ও রূপবত্তা প্রত্যক্ষ। অতএব যাহা অল্পমাত্রও উষ্ণ এবং রূপবান্‌ তাহাকেই মৌলিক তেজঃ (element of fire) বলে।

তেজ সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

তেজ বা তাপ 'বস্তু কি বস্তুর অবস্থা' ইহা বিচার্য্য। এই উভয় মতেরই সমর্থক আছে। (১) বস্তুবাদ (theory of substance, a subtle imponderable fluid) ; (২) স্পন্দনবাদ (theory of undulation) অর্থাৎ বস্তুর অণুসমূহের স্পন্দনে তাপ জন্মে এই মত ; এবং (৩) চালনবাদ (theory of propagation, i. e., the ry of elastic imponderable ether) অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক লঘুতম একরূপ পদার্থ তাপকে বস্তু হইতে বস্ত্বন্তরে চালন করে, এই মত বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচলিত। পাশ্চাত্য মতে শেষোক্ত মত বিশিষ্ট। প্রাচ্য মতে প্রথমোক্ত মত গ্রাহ্য। তেজের পরীক্ষায় আমরা যে ঘর্ষণ দ্বারা দৃশ্য অগ্নিজ্বালা পাইলাম, তাহা বস্তুর অবস্থা নহে, বস্তুই। তবে উহা তেজঃকণার রূপান্তর মাত্র। কাষ্ঠ, প্রস্তর বা দীপ্তি-শলাকার ঘর্ষণে যে অগ্নি দৃষ্ট হইল, তাহা কাষ্ঠে, প্রস্তরে বা দীপ্তিশলাকার ফস্‌ফরাসে যে অগ্নিকণা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহারই প্রকাশ হইল। শীতল জলকণা-সম্ভূত মেঘের ঘর্ষণ বা মিলনেও বিদ্যুৎ নামক অগ্নির উৎপত্তি দেখা যায়। ঘর্ষণার্হ দুই বস্তুর তেজঃকণা মিলিয়া এক নূতন দৃশ্য তেজের আবির্ভাব হইল। আবার একখণ্ড রজ্জুর এক দিকে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা যেমন ক্রমে অন্য দিকে চালিত হয়, তদ্রূপ অদৃশ্য তাপকণাও সন্নিকৃষ্ট তাপকণাকে ক্ষোভিত করিয়া উত্তাপ বিকীরণ করিতে পারে। প্রজ্বলিত অঙ্গারে জল ঢালিয়া দিলে, যেমন জলকণা অঙ্গারে চালিত হইয়া তপ্ত অঙ্গারকে শীতল করে, তেজঃকণাও সেইরূপ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হইয়া দ্বিতীয় বস্তুকে সন্তপ্ত বা প্রজ্বালিত করিতে পারে। সুতরাং তেজঃ বস্তু, কিন্তু কেবল অবস্থা নহে।

৪। বায়ু পরীক্ষার্থ এক অন্ধকারময় অবরুদ্ধ শ্বেতবর্ণ ইষ্টকালয়স্থ এক প্রকোষ্ঠের বায়ু, এবং একপ্রান্ত বদ্ধ এক সুদীর্ঘ কাচের নল গ্রহণ করা যাউক।

উক্ত গৃহটীতে একজন অতীব সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোক বসিয়া দেখিতে পাইবে যে, অসংখ্য নীলাভ সূক্ষ্ম বায়ুকণা ইতস্ততঃ চঞ্চল গতিতে ভ্রমণ করিতেছে। ইহা দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব হইলে

পরোক্ষভাবে বুঝিতে হইবে। মনে করুন, পূর্ব্বোক্ত কাচনলের বায়ুটুকু তরল পদার্থে পরিণত (liquified) করা হইল। তখন ইহাতে নীলবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। তখন ইহাতে কিছু না কিছু উষ্ণত্ব ও শৈত্য এবং কোন না কোনরূপ গন্ধ ও আস্বাদ অনুভূত হইবে। ইহারা তেজ, জল ও ক্ষিতির পরিচয় প্রদান করে। বায়বীয় (fiuid) অবস্থায় তরল বায়ুর অণুগুলি অতি সূক্ষ্মদশায় পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট ছিল। কাযেই সাধারণের ইন্দ্রিয়ে উহাদের অনুভূতি হয় নাই। আর প্রথম অবস্থায় নলটী ভরাই বায়ু ছিল। তরল হওয়ার পর ইহার আয়তন (volume) অতি অল্পই হইল। কিন্তু ওজন ঠিকই আছে। ইহাতে অনুমান হয় বায়ুর অণুগুলির মধ্যে অবকাশ ছিল। তাহাতে আকাশের অস্তিত্ব বুঝা যায়। তরল বায়ুতে স্পর্শ-জ্ঞানের একটা বিশেষত্ব এবং বিশেষ চঞ্চলত্ব আছে বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং যাহা অল্প মাত্রও চঞ্চল এবং স্পর্শ-জ্ঞান-বিধায়ক তাহাই মৌলিক বায়ু (element of air)।

(৫) অতীব সূক্ষ্মতাহেতু আকাশ পরীক্ষা করা কঠিন। যদি কোন অমিতেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন যোগী কোন বায়ু-নিষ্কাশিত প্রকোষ্ঠে বসিতে পারে, তবে সে অতীব সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে পায়। এবং উহাদের রূপাদিও অনুভব করিতে পারে। ইহাতে কয়েকটী আপত্তি উঠিতে পারে—প্রথমতঃ, শূন্য স্থানে (in vacuo) শব্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ বায়ুনিষ্কাশিত স্থানে জীব থাকিতে পারে না ; কারণ বায়ুতে অক্সিজেন্ থাকে ; উহা ভিন্ন জীব বাঁচে না। কিন্তু যোগ বলে ইহা অসাধ্য নহে। তাহার অনেক প্রমাণ আছে। শূন্যস্থানে (in vacuo) যে শব্দ হয় না, তাহা স্থূল শব্দ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাত স্থানে অতি সূক্ষ্ম শব্দ শ্রুত হয় ; ইহা সাধারণের কর্ণে গ্রাহ্য নহে। তৃতীয়তঃ বায়ু ভিন্ন শব্দ হয় না। কিন্তু বায়ুকণা শব্দ-চালনের সাহায্য করে মাত্র, পরন্তু উৎপন্ন করে না। যাহা হউক, যাহা শব্দ উৎপাদন এবং অবকাশ প্রদান করে, তাহাকেই মৌলিক আকাশ (elements of sky) বলে।

যাহা হউক, উপরিউক্ত পরীক্ষাসমূহ দ্বারা আমরা মোটামুটি এই বুঝিলাম যে, যাহা প্রত্যক্ষ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ তাহাই মৌলিক পদার্থ নহে। ইহাদিগের প্রত্যেককেই বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটীতে অপরাপর চারি ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এবং ইহাদের প্রত্যেকটীতে স্বীয় স্বীয় গুণ প্রধান, অপরাপর ভূতের গুণ অত্যল্প ; অর্থাৎ স্বীয় গুণের চারি ভাগের এক ভাগ। সুতরাং ইহারা প্রায় সুপ্ত। পরন্তু জগতের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ইহাদের ধ্বংস হয় না বলিয়া এবং পঞ্চীকৃত অবস্থার বিযোজন বা পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া ভূতসমূহের পঞ্চীকৃত অণুকেই মৌলিক পদার্থ বলা হয়।

এখন পাশ্চাত্য মতের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত। তন্মতে অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ (gas) স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু (metals), গন্ধক (sulphur), দারমুজ (arsenic) ইত্যাদি প্রায় ৭০টী পদার্থই মৌলিক পদার্থ (elements), কিন্তু এ মত ভ্রান্ত।

(১) ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা সকলেই অনুভব করে। কিন্তু উপরিউক্ত ৭০টী পদার্থের মধ্যে কয়েকটী মাত্র জীবন ধারণের উপযোগী। অন্যগুলি না থাকিলেও চলে। সুতরাং ক্ষিত্যাদিই মূল পদার্থ।

(২) পাশ্চাত্যেরা বলেন গন্ধক (sulphur) প্রভৃতির অণু (atom) এক জাতীয়। ইহা হইতে অন্য পদার্থ বাহির করা যায় না। কাজেই ইহা মূল পদার্থ (elements)। পরন্তু জলের (water) অণ (molecule) বিভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ এক ভাগ অক্সিজেন্ ও দুইভাগ হাইড্রোজেন্ এই দুই মূল পদার্থে নির্ম্মিত। কাজেই জল যৌগিক পদার্থ। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রাচ্য মনীষিগণ গন্ধক, অক্সিজেন্ প্রভৃতিতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটীই দেখিতে পান।

পাশ্চাত্য মত নিরাকরণার্থ তথাকথিত মৌলিক অক্সিজেন্ (oxygen) গ্যাস্ ধরা যাউক।

পাশ্চাত্য মতে—

(১) ইহা বায়বীয় পদার্থ (gas)।

(২) ইহা বর্ণহীন (Colourless)।

(৩) ইহা স্বাদহীন (tasteless)

(৪) ইহা গন্ধহীন (odourless)।

(৫) যাহাতে ইহা তরল পদার্থে পরিণত হয় ইহার এমন তাপ পরিমাণ (Critical temperature)—

১১৮·৮০। অর্থাৎ ইহাকে অত্যন্ত শীতল করিয়া ৩৭৫ সের বায়ুর চাপ দিলে ইহা তরল পদার্থে পরিণত হয়। [one atmospheric pressure = 15 lbs ∴ 50 atmospheric pressures = 50 × 15 lbs = 375 seers nearly]

(৬) তরল অবস্থায় অক্সিজেনের রঙ, ইস্পাতের ন্যায় নীল বর্ণ (steel-blue)।

(৭) ইহা চঞ্চল তরল পদার্থ (mobile liquid)।

কিন্তু প্রাচ্য মতানুযায়ী পরীক্ষা করিলে জানা যায়—অক্সিজেন্ স্বাভাবিক অবস্থায় কেবল গ্যাস। কিন্তু যখন (৫) সংখ্যোক্ত তাপ পরিমাণ ও চাপ ইহাতে সংযোজিত হয়, তখন ইহা দ্রব পদার্থে পরিণত হয়। বিশেষতঃ এই দ্রব অবস্থা দ্বারাই ইহার প্রকৃত স্বরূপ স্থূলতঃ অনুভব করা যাইবে।

(১) অক্সিজেন্ (oxygen) বর্ণহীন (colourless) নহে। কারণ যখন ইহার অণুসমূহ পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া তরল পদার্থে পরিণত হইল, তখন ইহার নীলাভ রূপ দেখা দিল। কাজেই অণুসমূহের বিপ্রকৃষ্ট অবস্থায় ইহার রূপ নাই এমন বলা যায় না। তবে গ্যাস্ অবস্থায় ইহা অতীত সূক্ষ্ম হওয়ায় সাধারণের দৃশ্য হয় না। পরন্তু (৭) সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে তরল অবস্থায় ইহা চঞ্চল (mobile) সুতরাং গ্যাস্ অবস্থায় অণুগুলি অধিকতর চঞ্চলই হইবে। ইহার নীলবর্ণ ও চঞ্চলতা দ্বারা ইহাতে বায়ু আছে প্রমাণিত হয়। আর ইহার নীলবর্ণ রূপের দ্বারা এবং অন্ততঃ কিছু উষ্ণতার দ্বারা তেজের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়। কারণ তেজের ধর্ম্ম রূপ-প্রকাশ করা ও তাপ দেওয়া। তেজের সত্তাতেই রংয়ের জ্ঞান হয় এবং বায়ুর অণুর বর্ণ নীল বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(২) ইহা স্বাদহীন (tasteless) নহে। যখন ইহা তরল পদার্থে পরিণত হয় তখন অবশ্যই ইহার কোন অনির্দ্দিষ্ট স্বাদ থাকিবে। তবে অম্ল-মধুরাদি কোন বিশিষ্ট স্বাদ না থাকায় ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ না করা যাইতে পারে। অতএব অক্সিজেনের বায়বীয় অবস্থায় অণুসমূহ বিপ্রকৃষ্ট থাকায় উহাতে যে স্বাদ নাই ইহা বলা চলে না। তবে উহা অতীব সূক্ষ্ম। আর তরল অবস্থায় ইহাতে কিছু না কিছু শৈত্যও আছে। কাজেই এই সকল ইহার অণুতেও বোধ্য। সুতরাং রসাস্বাদ ও শৈত্য থাকায় অক্সিজেনে জলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

(৩) অক্সিজেন গন্ধহীন (odourless) নহে। ইহার তরল অবস্থায় একটা না একটা অন্ততঃ অনির্দ্দিষ্ট গন্ধ অবশ্যই থাকিবে। কাজেই গ্যাস্ অবস্থায়ও তাহা আছে। তবে অণু বিকীর্ণ থাকায় গন্ধ সূক্ষ্ম হয়। তৎপর তরল অবস্থায় ইহাতে হাত দিলে প্রতিঘাত স্বরূপ কিছু কঠিনতা বোধ হইবে। গ্যাস্ অবস্থায় অণুসমূহ বিপ্রকৃষ্ট থাকায় স্থূলতানুভব হয় না। সুতরাং অক্সিজেনে ক্ষিতি আছে।

(৪) অক্সিজেন্‌কে যখন তরল পদার্থে পরিণত করা যায়, তখন গ্যাস্ অবস্থায় অণুগুলির মধ্যে অবশ্যই অবকাশ ছিল। কারণ তরল অবস্থায় ইহার আয়তন কম হয়। কিন্তু ওজন ঠিক থাকে। ইহা দ্বারা অক্সিজেনে আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, যে অক্সিজেন্ গ্যাসকে পাশ্চাত্যগণ মৌলিক পদার্থ বলিয়া থাকে, তাহাও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে প্রস্তুত। পূর্ব্বোক্ত চন্দন কাষ্ঠ পরীক্ষার ন্যায় স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতিতেও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বর্ণ রৌপ্য সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতির মত মনীষিগণের গভীরতম গবেষণার যোগ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"অগ্নির্বৈ বরুণানীং রকাময়ত।"

"অগ্নেঃ সুবর্ণমিন্দ্রিয়ং বরুণানীনাং রজতম্।"

মনুস্মৃতি বলিয়াছেন—

"অপামগ্নেশ্চ সংযোগাদ্ধৈম-রূপ্যঞ্চ নির্ব্বভৌ।

তস্মাৎতয়োঃ স্বয়োন্যৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ॥"

অগ্নি জলকে কামনা করিল।

অগ্নি—সুবর্ণের এবং জল রৌপ্যের প্রধান উপাদান।

জল ও অগ্নির সংযোগে স্বর্ণ ও রৌপ্য উৎপন্ন হইয়াছে। সেই হেতু নিজ উৎপত্তিস্থান (উপাদান) জল ও অগ্নি দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের শুদ্ধি (স্পর্শদোষ ও মল সংযোগ হইলে তাহার শোধন) করিলে বিশেষ ভাল হয়। সাধারণ জল ও অগ্নি অবশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপাদান নহে। কারণ অগ্নিসংযোগে জল ঘনীভূত না হইয়া বাষ্পাকারেই

পরিণত হয়। কাজেই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা জানিতে হইলে জল ও অগ্নিকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার মৌলিক পদার্থ স্বরূপেই ধরিতে হইবে। স্বর্ণে তেজের ভাগ অধিক থাকায় ইহা রক্তবর্ণ। (স্বাভাবিক ভূমিজ স্বর্ণ লাল) তেজের বর্ণ লোহিত। বিশেষতঃ তেজঃ-প্রধান দ্রব্যের যে যে গুণ আছে, স্বর্ণেও সে সব গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। রৌপ্যে জলের ভাগ অধিক থাকায় ইহার বর্ণ শ্বেত। জলের বর্ণও শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, বহিঃ প্রকৃতি ছাড়িয়া আমাদের দেহরূপ অন্তঃ-প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করিলেও পঞ্চভূতকেই মূল পদার্থ বলা যায়। এই পঞ্চভূতের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইলে মনুষ্যের আপন আপন প্রকৃতি ও দেহের অবস্থাকে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। তখনই দেহ ও মনকে সুস্থ রাখিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। ইহাই পঞ্চভূতের তত্ত্ব আলোচনার প্রকৃষ্ট ফল।

অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে বাহ্যপ্রকৃতির দ্রব্যময় স্বরূপ অবগত হওয়ার পর অন্তঃপ্রকৃতির দ্রব্যময়ত্ব এবং এই উভয়ের ত্রিগুণময় স্বরূপ আলোচনা করিলেই প্রকৃতির সম্যক্ তত্ত্ব অবধারিত হইবে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩০)

সহসা দূরে উৎকট ঝিঁঝি পোকার ডাকের মত সুতীব্র শিশের শব্দে নির্জ্জন গঙ্গাতট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অসিতের চিন্তাজাল সেই শব্দে ছিন্ন হইয়া গেল। সেও চকিত হইয়া উঠিয়া কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া উচ্চরবে শিশ দিয়া পূর্ব্বের শব্দের প্রত্যুত্তর দিল।

তাহার কিছু পরেই পরেশ ও সুধীর তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—'অসিতদা ?'

অসিত বলিল—এস, আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের অপেক্ষায় এখানে একলা বসে আছি। তার পর ?—খবর কি সব ?

'খবর ভালই, চলো—একটু বসা যাক্—তার পরে ক্রমে সব বলছি।'

তিন জনে আসিয়া ঘাটের উপরের সেই চত্বরে বসিল। সুধীর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, অসিতদার কি আজকাল এইখানেই স্থিতি না কি ? তা জায়গাটি চমৎকার বাছা হয়েছে। এখানে কিছুদিন একা একা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

চত্বরের এক প্রান্তে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পরেশ সেইখানে শুইয়া পড়িল। তাহার ঠিক মাথার উপর একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। জনমানবহীন নীরব তটভূমিতে গঙ্গার মৃদু জলোচ্ছ্বাসের শব্দ সমতানে বাজিতেছিল।

শীতল ঝিরঝিরে বাতাসটুকু উপভোগ করিতে করিতে পরেশ বলিল—তা কাটিয়ে দেওয়া যায় বটে, তবে কি না··শুধু চাঁদের আলো আর হাওয়া খেলেই ত পেট ভরে না—দেহটা এক বিষম স্থূল পদার্থ কি না, কাজেই ওটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে কিছু বাস্তব দ্রব্যের—

অসিত বাধা দিয়া বলিল, বাস্তব দ্রব্যের জন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। এখানে আমি খোদ বেণীমাধবের মন্দিরে অতিথি—দুবেলা প্রচুর আহারের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে রাত্রেও থাকবার জন্যে আমি একটি ঘর পেয়েছি—সেবা যত্নের কোন ত্রুটী নেই। তবে দিনের বেলাটা বড় গোলমাল। তাই দিনটা কাটাবার জন্য এই জায়গাটা বের করা গেছে। এখন কাজের কথা বল।

পরেশ বলিল—বাঁচালে দাদা! এতক্ষণে ধাত এল! তুমি যে রকম দার্শনিক মানুষ, খাবার কথা পাড়তে গেলেই হয় ত এক বিষম ধমক দিয়ে উঠবে, বলবে—এত বড় গুরুতর কাযের সময় আবার ও-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? তাই ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল। যাই হোক—এখন তোমার এদিককার কি খবর? ওদিকে ত সব প্রস্তুত—শুধু বাংলায়···বাবু বলছিলেন, যে, যদি দিনটা আর কিছু পেছিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তাঁরা আরো কিছু সময় পেয়ে প্রস্তুত হতে পারেন,—টাকা-কড়িও আরো কিছু সংগ্রহ হতে পারে।

অসিত শুনিয়া বলিল, সে কথা আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে, যে, সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে, আর বিলম্ব করা চলে না। আমি যখন পঞ্জাব থেকে ফিরে আসি, তখনই দেখে এসেছি—সেদিকের সমস্ত সিপাহীরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এত দিন চেপে রাখা গিয়েছিল, কিন্তু আর তারা এ ভাবে থাকতে চায় না। বলে, তোমাদের সময় আসতে আসতে আমাদের যদি ইউরোপের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়, তা হলে ত সবই পণ্ড হয়ে যাবে। উত্তর-পশ্চিম আর বিহারের সমস্ত ব্যারাকে আমি নিজে ঘুরেছি, এখন পর্য্যন্ত তারা সকলেই আমাদের মতে চলতে রাজি আছে,—কিন্তু আর বেশি দিন টেনে রাখা তাদেরো চলবে না। সেই জন্যে আমি ভাবছি—যখন সবই প্রস্তুত, তখন আর সময় নষ্ট না করাই ভাল।

পরেশ বলিল—তা হলে আমার মতে তুমি একবার এখান হতে বেরিয়ে পড়। ওঁরা অনেক দূরে থাকেন, আর বাংলার বাইরের দিকে বেশি খবর রাখেন না বলে এ-সব দিকের অবস্থা ঠিক বোঝেন না। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বললে তাঁরা মত পরিবর্ত্তন করতে পারেন। আমি বাংলার ভিন্ন ভিন্ন দলে এবার ঘুরে দেখে এসেছি—সঙ্ঘ-গঠনের শৃঙ্খলা ও শক্তি ওদিকে যেমন গড়ে উঠেছে, আমার মনে হয় আর কোথাও তেমন হয় নি। তুমি একবার গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

সুধীর এতক্ষণ নীরবে ছিল, সে এখন বলিল, কিন্তু এখন যদি তোমায় বাইরে যেতে হয়, তা হলে এই সব দিক থেকেই সাবধানে বেরিয়ে যেও,—কাশীর ভিতরে এখন যাবার চেষ্টা করো না। পাটনায় আজকাল খুব ধর-পাকড় সুরু হয়েছে। নলিন গ্রেপ্তার হবার পর তার কাছ থেকে কি কাগজপত্র পেয়ে এখন কাশীতেও চারদিকে খানা-তল্লাসীর ধুম পড়ে গেছে। তুমি যে দুখানা বাড়ীতে কাশী গেলে থাক, সে দুখানাই ওরা সার্চ্চ করেছে। আজ দেখে এলুম, দুটো বাড়ীতেই পুলিশ পাহারা।

অসিত মৃদু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তারা ভেবে রেখেছে, আমি যখন বাইরে আছি. তখন কাশীতে এসে দুটো বাড়ীর একটাতেও 'অন্ততঃ যাব, আর ওরা তখন অনায়াসে তখনি আমায় ধরে ফেলবে। এখন কিছুদিন বেচারারা সেই সুখের স্বপ্নে ভোর হয়ে থাক্, আমি ততক্ষণ এদিকের কিছু কিছু কাজ গুছিয়ে আসি। ওরা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছে—যে আমি ওদের চোখের সামনে দিয়ে দুটো বাড়ীতেই ঘুরে এলাম? দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের কাজ সেরে আমি যেদিন কাশীতে আসি, পর পর দুখানা বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখি—ঐ ব্যাপার। আমার অবশ্য তখন সন্ন্যাসীর বেশ,—কেউ ফিরেও দেখলে না। আমি ফিরে এসে তখন এইখানে আস্তানা নিয়ে তোমায় খবর দিলুম। যা হোক্, এখন আমায় যদি কিছু দিনের জন্য আবার বাইরে যেতে হয়, তা হলে এখানে তোমরা দুজন থাকৃছ ত?

পরেশ বলিল, বেশ তো! তুমি যত দিন ফিরে না আসছ, এদিককার যা কিছু কাজ, সে সব আমরাই চালাব।

অসিত বলিল, কাজ নতুন করে করবার মত এখন কিছু নেই। শুধু মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা, আর পাঁচ রকম কথা বলে তাদের উৎসাহটা বজায় রাখা—এইটুকু হলেই এখন চলবে। অমৃতসর থেকে খবর এসেছে—সেখানেও একবার যেতে হবে। সেদিকের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা দিন স্থির করে না ফেললে আর চলবে না। আমি তা হলে আগে বাংলায় গিয়ে কথাবার্ত্তা স্থির করে তার পরে অমৃতসরে চলে যাব। এবার সেখানে যাওয়ার মানেই—এ ব্যাপারের চরম সিদ্ধান্ত করা। তার পর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, যদি এতদিন পরে সত্যই ভারতের ভাগ্যে যুগ-যুগান্তরের অধীনতা ঘোচাবার সময় এসে থাকে, তা হলে দেখবে—হয় ত আর দু'সপ্তাহের মধ্যেই এক বিরাট ব্যাপারের মধ্যে ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে।

শেষের কথাগুলি অতি ধীরে-ধীরে গভীর স্বরে উচ্চারণ করিয়া অসিত স্বপ্নাভিভূতের মত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল; যেন সেই সুদূর গ্রহতারাখচিত নীল নভোমণ্ডলে ভারতবর্ষের অনিশ্চিত ভবিতব্য কি, তাহাই সে একমনে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অসিতের সেই গভীর কণ্ঠস্বরে তাহার সঙ্গীদের অন্তরেও সহসা এক তীব্র ভাবের আবেগ ও এক বিচিত্র অনুভূতির বিদ্যুৎ-স্পন্দন বহিয়া গেল। পরেশ তাহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রিয়তা ভুলিয়া অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সুধীর কল্পনায় সারা ভারতব্যাপী বিরাট বিপ্লবের ভীষণ রক্তের খেলার উত্তেজনার মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিল।

এত দিন ধরিয়া তিলে তিলে, অতি গোপনে, অতি সন্তর্পণে যে দেশব্যাপী বিষম আয়োজন করিয়া তোলা হইয়াছে,—এবার তাহার সাফল্য পরীক্ষা করিবার দিন আগতপ্রায়,—অনিশ্চিত উদ্বেগ ও সন্দেহে সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিতেছিল।

এত দিনের এত আশা, এত আয়োজন—সত্যই কি তবে সফল হইবে? সকল দিক বজায় রাখিয়া, সকল দিকে শৃঙ্খলা রাখিয়া এ বিরাট যজ্ঞ সমাধা করিতে পারিব কি? শেষ রক্ষা হইবে কি? তিনজনের অন্তরেই এই ভাবের শত শত প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল।

নির্জ্জন নদী-সৈকতে মৃদুতান তুলিয়া গঙ্গার জল অশ্রান্ত ভাবে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে ছুটিতেছিল। ক্ষুদ্র লহরীগুলি নাচিতে নাচিতে আসিয়া তটভূমিতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে—ছল্-ছলাৎ—ছল্-ছলাৎ। কদাচিৎ কোনো নিশাচর পাখীর অস্পষ্ট স্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। রজনীর সুগভীর স্তব্ধতার মাঝে তাহারা এই ভাবে কতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় কাটাইয়া দিল।

বহুক্ষণ পরে ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির নীরবতাকে সচেতন করিয়া পরেশ ডাকিল—অসিতদা?

অসিত চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল—কেন ভাই?

'তোমার বিশ্বাস হয়?' পরেশ তাহার আগ্রহে ভরা দৃষ্টি অসিতের প্রতি স্থির রাখিয়া বলিল—এই যে একটা বিপুল আয়োজন এত দিন ধরে করে তোলা হল, এর সাফল্যের ওপর তোমার স্থির বিশ্বাস আছে?

'নিশ্চয়ই! বিশ্বাসের উপরেই এত বড় দেশযোড়া কাণ্ড গড়ে উঠেছে। এক দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছাড়া আর আমাদের কি সম্পদ আছে ভাই?'

'তবে কেন প্রাণে এত সংশয় জাগছে?'

অসিত বলিল, ও কিছু নয় পরেশ! সব বড় কাজের আগেই কর্ম্মীদের মধ্যে ও-রকম একটা সংশয়ের ভাব, একটা উদ্বেগ আসেই,—সেটা কোন কাজের কথা নয়। ওটাকে ঝেড়ে ফেলে, দৃঢ় বিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে। এই বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ই যুগে যুগে মানুষকে বড় করে তুলেছে—বাধা-বিঘ্নের মাঝ দিয়ে, মানুষকে বড় বড় কাযে নামিয়ে, তাকে সাফল্যে মণ্ডিত করে তুলেছে,—আমাদের বেলাই বা তার অন্যথা হবে কেন?

পরেশ আর কিছু না বলিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিল। অসিতও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, যে যাই বলুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—এই পথেই ভারতের জাতীয় উন্নতি, তার স্বাধীনতা সবই ফিরে আসবে। এই যে এত লোকের জীবন পণ করে একনিষ্ঠ সাধনা, এ কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে? আমাদের মধ্যে কেউ নামের জন্যে, যশের জন্যে এ পথে আসে নি,—কারুর প্ররোচনা শুনে, কোন লোকের বক্তৃতা শুনে, ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে এসে এ দলে যোগ দেয় নি। শুধু তারা নিজেদের অন্তর থেকে যে প্রেরণা পেয়েছে,—নিজের জীবন দিয়ে যে সত্যকে তারা অনুভব করেছে,—তার প্রতিষ্ঠা, তার সাধনার জন্যে তারা সমস্ত উৎপীড়ন, নিগ্রহ, সমস্ত দুঃখকে সাদরে বরণ করে নিয়ে, এই বিপদ-সঙ্কুল জটিল পথে এগিয়ে চলেছে। এই যে তাদের অন্তর-দেবতার প্রত্যাদেশ, এই যে দেশের একদল লোকের মন প্রাণ সুরে-বাঁধা যন্ত্রের মত একই সুরে কাঁপছে,—এ কি সবই মিথ্যা হতে পারে? সে হয় না, সে হবে না। এই পথেই তার মুক্তি। তুমি আমি হয় ত অনন্ত কাল-সাগরে লীন হয়ে যাব,—হয় ত সে দিন দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে উঠবে না। কিন্তু এই দেশের বুকের ভিতর থেকেই আবার এক দল উঠবে, যারা দেশের মুক্তির জন্যে তাদের হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত হাসতে হাসতে

উৎসর্গ করবে। এমন প্রাণব্যাপী একাগ্র সাধনা কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে ?

অসিত কথা শেষ করিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। পরেশ ও সুধীরের মনে হইল—যেন অসিতের কথার রেশ সেখানকার আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অসিত আবার বলিল, ভেবে দেখ, আজ আমাদের কি শোচনীয় অবস্থা! শুধু তোমার আমার কথা বলছি না,—দেশের নামে যারা যারা এ পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সকলের কথাই বলছি—ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় এসে পড়া গেছে, যেখানে সহায় সম্পদ নেই, আশ্রয় নেই, কোনখান থেকে একটু সহানুভূতি বা দুটো স্নেহের কথা শোনবার আশা নেই। আত্মীয়-স্বজন আশ্রয় দিতে ভয় পায়,—বন্ধু-বান্ধব দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়,—পাছে কোন বিপদে পড়তে হয়। ঘরে স্থান পাবার উপায় নেই,—পথে দাঁড়ালে পুলিশ পিছু নেয়,—বনের জন্তুর মত ঝোপ-ঝাড়ে, মাঠে-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাতে হয়। দুঃখের অবধি নেই, তবু ত কেউ ফিরতে চায় না। সকল দুঃখ-কষ্ট মাথায় করে নিয়ে তারা নিজেদের লক্ষ্যপথে অবিরাম ছুটছে—একদিন দুদিন নয়—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এত বড় ত্যাগ, এত সহিষ্ণুতা, এত বড় মহৎ প্রেরণা তারা কোথা থেকে পেয়েছে ? এ কি ভগবানেরই আদেশ নয় ? যাদের দিয়ে তিনি এই মহৎ কায সম্পাদন করবেন, তাদের এই অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনিই মানুষ করে তুলছেন। আমি বিশ্বাস করি—এবার ভারতে একটা যুগান্তর নিশ্চয়ই আসছে!

পরেশ বলিল, বিশ্বাস আমিও করি। তবে মাঝে মাঝে যেন কেমন একটা সংশয় জাগে,—হবে কি হবে না—এমনি একটা উৎকণ্ঠা। যাক্—তুমি উপস্থিত আমাদের অবস্থার কথা যা বল্লে, সেটা যে কত সত্য—এবার বাংলায় ঘুরতে ঘুরতে পথে, ঘাটে, ট্রেণে সর্ব্বত্র তার পরিচয় পাওয়া গেছে। যেখানেই যাই, প্রায় একই রকম কথা,—সর্ব্বত্রই একটা বিষম উৎকণ্ঠা একটা উপেক্ষার ভাব। ফেরবার সময় ট্রেণে জনকতক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক এ দলের ওপর এমন সব মন্তব্য করতে লাগলেন—'দেশের বুকের উপর বসে দেশের লোকের উপরেই ডাকাতি! একে খুন, তাকে খুন! দেশে যত অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করা! এদের উৎপাতে দেশের শান্তি—শৃঙ্খলা সব পণ্ড হবে। গবর্ণমেণ্টের উচিত সব ধরে ধরে কঠোর শাস্তি দিয়ে এ সব দল নির্ম্মূল করা' ইত্যাদি। আমি শুনে শুনে ভাবলুম—মন্দ নয়! আমরা তবে কার জন্যে প্রাণপাত করে এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে মরি ? দেশের স্বাধীনতা বলতে ত আর সত্যি দেশের বন জঙ্গল পাহাড় নদীর কথা বোঝায় না,—দেশবাসীর সুখ স্বাধীনতাই ত আমাদের কাম্য বস্তু। তা দেশের লোকের ত আমাদের ওপর টান খুব প্রবল দেখছি। সুধীর বেচারা ছেলেমানুষ,—চেয়ে দেখি, দুঃখে অভিমানে ও-বেচারার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে! আমি ভাবলুম, কেঁদেই ফেলে বা! বলিয়া পরেশ সকৌতুকে সুধীরের দিকে তাকাইয়া হাসিল।

অসিত সস্নেহে বলিল, সত্যি সুধীর? ও-সব কথা শুনে সত্যিই তোমার এত কষ্ট হয়েছিল ? ও-সব দিকে আমাদের কাণ দিতে নেই। ভাই, এ দিকে আসতে হলে, মনকে খুব উঁচু সুরে বাঁধতে হবে। আমরা যা সত্য বলে, নিজেদের কর্ত্তব্য বলে বুঝেছি, তাই এক মনে করে যাব। তাতে নিন্দা বা প্রশংসা কিছুতে কাণ দেব না। এই হচ্ছে মোট কথা। গীতার উপদেশ মনে নেই ? অনাসক্ত—

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, সে সব আমার খুব মনে আছে অসিতদা! তবে তুমি পরেশদার সব কথা বিশ্বাস কোরো না,—ও বড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। এটা সত্যি যে, ও-সব কথা শুনে তখন আমার একটু আঘাত লেগেছিল। তারা যে রকম গাল দিয়ে বলছিল—তুমি যদি শুনতে একবার! যাদের জন্যে আমরা এত করে মরছি, দুটো সহানুভূতির কথা ত তাদের কাছে পাওয়াই যাবে না; উল্টে গালাগালি! অসিতদা, যেদিন দরকার হবে, সেদিন আমিও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বুকের রক্ত দেব, এটা ঠিক। কিন্তু ভাই! তোমার মত অত মনের বল আমার নেই। আমি মানুষ—সাধারণ মানুষের মতই এখনো আমার মনটা সুখ-দুঃখের অতীত হয়নি।

অসিত গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি ঠিক বলেছ সুধীর! আমরা মানুষ। মানুষ সুখে-দুঃখে আশায়-আকাঙ্ক্ষায় হাবুডুবু খায়,—আবার এই মানুষই জ্ঞানযোগে যুক্ত হয়ে একদিন সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে পরম শান্তি লাভের

অধিকারী হয়। যদি মানুষ হয়ে জন্মেছি, তবে সাধারণের মত ছোট গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যাব কেন ভাই? আকাঙ্ক্ষা মহৎ, উঁচু হওয়াই ভালো। আর দেশের লোক ত ও-কথা বলবেই। আমরা ব্যাপারটা যে ভাবে দেখছি, ওরা ত এখনো সে ভাবে দেখতে শেখে নি। ওরা শুধু ভাবে—আমাদের কাজের ফলে ওদের এই নিশ্চিন্ত আরামটুকু লোপ পাবে,—একটা ছন্নছাড়া কাণ্ড হবে। এই ভয়েই তারা আমাদের ওপর খড়্গহস্ত। আর দেশের লোকের কথা ছেড়ে দাও,—ক্রমে আত্মীয়-স্বজনও আমাদের ছাড়তে বাধ্য হবে। তুমি এখনো ঘরের মধ্যে আছ,—দুদিন পরে এমন সময় আসতে পারে, যখন ঘরে আর তোমার ঠাঁই হবে না। আমাদের আপন-পর কোথাও কিছু নেই ভাই, আছেন শুধু মাথার ওপরে ভগবান্—আর নীচে আমাদের এই দেশ। এই দুটির মধ্যে আপনার জনের কথা ডুবিয়ে দাও,—দেশের লোক-মতের কথা বৃথা ভেব না; তা হলেই শান্তি পাবে। পরেশ, তোমার সেই গানটা সুধীরকে একবার শুনিয়ে দাও ত।

তখন সেই নীরব নির্জ্জন গঙ্গাতট মুখরিত করিয়া, নিস্তব্ধ সুপ্ত নৈশ প্রকৃতিকে সচকিত করিয়া পরেশের উচ্চ মধুর স্বর চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না!
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে—
হয় তো রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

(ক্রমশঃ)

ময়মনসিংহের মহিলা-কৃত্তিবাস

শ্রীচন্দ্রকুমার দে

(২)

অরণ্য-কাণ্ড। তার পর পঞ্চবটী বন। যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া নাগ শাল তাল তমাল প্রভৃতি বনস্পতিগণের সারি। কোথাও পিতৃতুল্য স্নেহশীল বন-তরুগণ সুরসাল ফল-সম্ভার, শান্তি-শীতল ছায়া লইয়া বনবাসীগণের রক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান; কোথাও মাতৃ-করুণার মত অবিরামবর্ষী নির্ঝর-ধারা; কোথাও সপুষ্প বনলতা একান্ত প্রেমশীলা সঙ্গিনীর মত বনতরুর কাণ্ডে হেলিয়া পড়িয়াছে—অধরে পুষ্প-হাসি ধরে না। অদূরে গদগদনাদী গোদাবরী যেন প্রেমে নাচিয়া সোহাগে হাসিয়া পঞ্চবটীর পাদদেশ ধৌত করিয়া অবিরাম কুলু ধ্বনিতে ছুটিয়া যাইতেছে।

পঞ্চবটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য পরম রমণীয়। এই স্থান সীতার অতিমাত্র প্রীতিপ্রদ বলিয়া, তথায় তাঁহারা বনবাস কালযাপন করিবেন স্থির হইল। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ-মুখ বাণ দ্বারা সরল কাষ্ঠ সকল ছেদন করিয়া, তদুপরি লতায়-পাতায় নির্ম্মিত একখানি সুন্দর কুটীর প্রস্তুত করিলেন। লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে বনের ফল, ঝরণার জল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। কুরঙ্গ-কুরঙ্গী তাঁহাদের প্রতিবেশী। মৃগশিশুগণ নিত্য নূতন অতিথি-রূপে কুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইত। সীতা শিশুর মত যত্ন করিয়া গাছের কচিপাতা সকল তাহাদের মুখে তুলিয়া দিতেন। দেবদারু-শাখায় নৃত্যশীলা ময়ূরীগণ সীতার করতালিতে কুটীর-দ্বারে উড়িয়া আসিত। এই সকল অবসর-সঙ্গিনীগণকে পাইয়া বনদম্পতি অযোধ্যার রাজভবনের কথা ভুলিয়া গেলেন।

এই পঞ্চবটী প্রাকৃতিক সম্পদে যতই রমণীয় হউক না কেন—ইহা মায়াবী রাক্ষসগণের বিহার-ভূমি—একরূপ মায়া-কানন বলিলেই চলে। এই দুর্গম পঞ্চবটী বনে

আসিয়া রাক্ষস মায়ায় শুধু রাম লক্ষ্মণ সীতা নহেন—রামায়ণ-রচক কবিগণের অনেকেই অল্লাধিক পরিমাণে প্রতারিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। সীতা-চরিত্র-চিত্রণে হস্তক্ষেপকারিগণ মাত্রেরই এই স্থানে অতিমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় সকল কবিই এই দুর্গম বনপথে আসিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কৃত কবি-গুরুর কথা ছাড়িয়া দিয়া, বাঙ্গালা কবিগুরু হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক পালা-গায়কগণ পর্য্যন্ত কেহই সীতা চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অন্যান্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা প্রাচীন কবিগুরু ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির দু'একটী কথা লইয়া আলোচনা করিব।

বনভূমির শ্যামলতার উপর বিদ্যুৎ খেলাইয়া স্বর্ণমৃগ চলিয়া গিয়াছে। রাম ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অকস্মাৎ দূরে রামতুল্য কাতরধ্বনি। ভয়ত্রস্তা সীতা দেবী লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সীতাকে বনে একাকিনী রাখিয়া কেমন করিয়া যাইবেন, অথচ না গেলেও নয়। উভয়বিধ বিপদে পড়িয়া লক্ষ্মণ বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার সেই হা—হা-কার। সীতার একান্ত অনুনয়ে লক্ষ্মণ এবারও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। ধনুর্দ্ধর রাম অপেক্ষা সহায়হীনা মাতা জানকীর চিন্তাই লক্ষ্মণের মনে বেশী করিয়া জাগিতেছিল। এইবার তিরস্কারের পালা—

আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির সীতা এই স্থানে বলিতেছেন—

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে
ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী * *

এই স্থানে ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনীর মত সীতাই লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিয়াছেন। এ আক্রমণ যেমন অসঙ্গত, তেমনি অন্যায়। আমাদের বিশ্বাস, কবি এই স্থানে তাঁহার চির-স্বাভাবিক বীররসের প্রাধান্য বজায় রাখিতে যতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন, সীতা-চরিত্রের সুশীলতা, কোমলতা রক্ষা করিতে ততটুকু যত্ন করেন নাই।

ততোঽধিক অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী আমাদের গৌড়জন-নমস্ত-বাঙ্গালা কবিগুরু কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের সীতা বলিতেছেন

"ভরত লইল রাজ্য, তুই নিলি নারী"

এই ছত্রটী পড়িয়া আমাদিগকে অতিমাত্র ঘৃণায় "ছি" বলিতে ইচ্ছা করে! কৃত্তিবাসী রামায়ণে শুধু এই স্থানে নয়, রাম-বনবাসের কালেও সীতাদেবী স্বামীকে বুঝাইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া না গেলে

"পেয়েছিলা রাজ্য রহিল যেই জন
স্ত্রী লইতে তাহার বিলম্ব কতক্ষণ।"

যে ভরত রামশূন্য অযোধ্যার রাজ্য-প্রাপ্তিকে অভিসম্পাতের মত মনে করিয়া মাতাকে রাক্ষসী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, রাজ্যে রাজভবনে থাকিয়া যিনি বনচারী যোগী—রাম-পদচিহ্নিত পাদুকা মাত্র সিংহাসনে রাখিয়া যিনি ছত্রধারী রূপে দাঁড়াইয়াছেন, একদিন যাঁহার অশ্রুজলে চিত্রকূট গিরিশৃঙ্গ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই ভ্রাতৃ-প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক রাজযোগী ভরতকে সীতা কি করিয়া এমন ধিক্কার দিতে পারেন! আর লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণের কথা আমরা বেশী কিছু বলিব না। পাঠক তাহা মনে মনে উপলব্ধি করিবেন। এমন যে ভ্রাতৃ-প্রেমের মূর্ত্ত অবতার—রাম সীতার পদবিদ্ধ কুশাঙ্কুর উন্মোচন—তাঁহাদের ক্ষুধার ফল, তৃষ্ণার জল যোগানই যাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই কর্ত্তব্যের প্রেরণাই যাঁহাকে সুখময় রাজত্ব, যুবতী ভার্য্যা—সব ছাড়িয়া বনে আনিয়াছে, যাহা নিজের সুখ, দুঃখ, আশা, তৃষা, ভোগ-লালসা ভ্রাতৃ-প্রেমের একটা উচ্ছ্বসিত ধারার মত রাম-রূপ মহাসাগরে যাইয়া বিলীন হইয়াছে,—নিজের কোন পৃথক সত্তা রাখে নাই—সেই লক্ষ্মণের চরিত্রে সীতা কেমন করিয়া এমন একটা অমূলক সন্দেহ আনিতে পারেন! সত্য বটে সীতা বিপদ-বিহ্বলা—কিন্তু আমরা মনে করি, অতিমাত্র ভয়ে, অতিমাত্র বিপদে—অতিমাত্র ক্রোধে—কিম্বা বিরাগে মাতা পুত্রকে যতটুকু বলিবার ততটুকুই বলিতে পারেন,—কার্য্যকারণ-বশে তিনি যতই অসংযত, অসহিষ্ণু হন না কেন, কিছুতেই গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন না। এই স্থানে লক্ষ্মণের অমল-ধবল চরিত্রের উপর সীতার এই ক্রুর কটাক্ষ অতিমাত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। লক্ষ্মণ

দুইবার শক্তিশেলে পড়িয়াছিলেন—একবার পঞ্চবটীতে সীতাবাক্যরূপ বজ্রাগ্নি-বাণে, আর একবার রণ-ক্ষেত্রে রাবণ-নিক্ষিপ্ত শক্তি-বাণে। আমাদের মনে হয়, প্রথমোক্ত শক্তিশেলের ঘা'ই লক্ষ্মণের বুকে বেশী বাজিয়াছিল।

তবে আমাদের বিশ্বাস—এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য আমাদের চির-নমস্য কবি কৃত্তিবাস দায়ী নাও হইতে পারেন। হয় ত কৃত্তিবাসের নামের অন্তরালে কোন কাণ্ডহীন অসামাজিক কবি অক্ষম হস্তে তুলি-চালনা করিয়া নমস্য কবিকে উপহাস্য করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি সীতা চরিত্র আঁকিতে গিয়া এইরূপ রাক্ষসীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভুবন-বন্দিতা সীতা-চরিত্রে এই দুরপনেয় কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া কবি যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের বাস্তবিকই দুঃখ হয়। এই কথা কয়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই আমাদের মনে হয়, মহাকবি কৃত্তিবাসের লেখনী হইতে এমন কথা বাহির হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

দেখা যাক, এই স্থানে আমাদের কবি চন্দ্রাবতী কি করিয়াছেন। প্রথমেই সেই বনদম্পতির একটি মনোজ্ঞ চিত্র। অদূরে পর্ণ-কুটীর! শাল-বৃক্ষতলে পত্র-শয্যায় সীতার কোলে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধশায়িত নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ রাঘব। শিয়রে বসিয়া কুটীর-লক্ষ্মী সীতা চম্পকোপম অঙ্গুলি দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জটাভার সঞ্চালন করিতেছিলেন। তীক্ষ্ণ-মুখ বাণ দ্বারা লক্ষ্মণ রাম-পদবিদ্ধ কুশাঙ্কুর উন্মোচন করিতেছেন। এমন সময় বনভূমির শ্যামলতায় বিদ্যুৎ খেলাইয়া সোণার হরিণ চলিয়া গেল। কৌতূহলাক্রান্তা সীতা বলিলেন—দেব দেব, দেখ, কি সুন্দর হরিণী।

"হরিণী ধরিয়া দেহগো পালিব ইহারে
যতনে বান্ধিয়া রাখব কুটিরের দুয়ারে
সোণার হরিণ অঙ্গে গো বিজলীর ঝলা
ইহারে ধরিয়া দেও গো পাতিবাম সহেলা

মুগ্ধা প্রিয়ার মনোরঞ্জনার্থ রাম তৎক্ষণাৎ ধনুকে নাগপাশ অস্ত্র যুড়িয়া হরিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই বনের ঘনশ্যামলতায় নবঘনশ্যামরূপ মিশিয়া গেল। এর মধ্যে "সীতাদেবী করিলেন কুটিরে প্রবেশ।" কুটীরের অদূরে শাল বৃক্ষের কাণ্ডে হেলিয়া ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ দূর বনে—রামের করুণ আর্ত্তনাদ! ভয়-বিহ্বলা সীতা দেবী চকিতের মত দৌড়িয়া কুটীরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ সেই আকস্মিক রোদন-ধ্বনি শুনিয়া

"ধনুকে যুড়িয়া বীর অগ্নিসম বাণ
লম্ফ দিয়া ধায় বীর গো সিংহের সমান ;"

সুপ্ত সিংহ ত্রস্তে জাগিয়া উঠিলে তাহার গ্রীবাদেশের কেশর সকল যেমন নাচিয়া উঠে, লক্ষ্মণের জটা-কলাপ সেইরূপ নড়িয়া উঠিল।

"দুই পাও গিয়া লক্ষ্মণরে ফিরিয়া দাড়ায়"

... ...

এই স্থানে লক্ষ্মণের সজাগ চিত্রটি খুব সুন্দর হইয়াছে। রামেব আহ্বান শুনিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যের জন্য ধাবিত হইতেছিলেন। লক্ষ্মণের দশেন্দ্রিয় রাম-সেবায়, রামকার্য্যে কিরূপ উন্মুখ হইয়া থাকিত, এই দুইটি মাত্র ছত্রে তাহা কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! পরক্ষণেই আবার সীতার চিন্তা-রূপ নির্ঝর-ধারা যেন সহসা শৈলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া দাঁড়াইল। সীতা লক্ষ্মণের মানসিক ভাব বুঝিলেন ; বলিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না,—বনে তরু লতা পশুপক্ষী আছে, তারা আমায় রক্ষা করিবে। লক্ষ্মণ তখনও অবিচল, চিত্রাপিত পুত্তলির মত দণ্ডায়মান। আবার সেই ধ্বনি! সীতা বলিলেন "বনেতে বসইয়া যত বনের দেবতা
বিপদের কালে তারা রক্ষিবেন সীতা।"

কিন্তু ইহাতেও লক্ষ্মণের প্রবোধ হইতেছে না। বিশাল ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে রাখিয়া নতমুখে তেমনি অচঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যৈষ্ঠ মাসের রক্ত-জবার মত লাল হইয়া উঠিল।

এদিকে কাতর আর্ত্তনাদ ক্রমে বাড়িয়া চলিল। সীতা তখন সংযত ভাবে লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"যদি আমি সতী হই পতি পদে মতি
আকাশের দেবতাগণ খণ্ডাবেন দুর্গতি।"

আর যদি তা না হয়—

"যদি অমঙ্গল ঘটে ধর্ম্ম বিদ্যমানে,
কি করিবে লক্ষ্মণ তোমার অগ্নিবাণে"

বলিতে বলিতে সীতার মুখমণ্ডল শুকতারার মত জলিয়া উঠিল।

ইহাই সন্তানের প্রতি মায়ের উপযুক্ত বাণী। ঘোর বিপদে এমন সংযত শান্ত মূর্তি একমাত্র সীতা দেবীতেই সম্ভবে। এই স্থানে চিরশান্ত কোমল সীতা-চরিত্রের যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, অন্য রামায়ণে তাহা বড় দেখা যায় না। আর লক্ষ্মণ—ধর্ম্মপ্রাণা সতী তাঁর সত্যধর্ম্মে নির্ভর করিয়াছেন; সুতরাং লক্ষ্মণের আর কিছু বলিবার নাই। এই সত্যধর্ম্মের কাছে শত লক্ষ্মণের অগ্নিবাণও ছার! লক্ষ্মণ আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্যান্য কবির চিত্রিত সীতা অপেক্ষা চন্দ্রাবতীর সীতার এই উৎকর্ষতার কারণ, আমাদের বিশ্বাস, পুরুষ যেস্থানে নারী-চরিত্র আঁকিয়াছেন, সেইখানে পুরুষোচিত দর্প দম্ভ সকল প্রকার অসংযতভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু নারী নারীর চরিত্র-অঙ্কন-কালে তাঁহার স্বভাবসংযত হস্তে লজ্জা, বিনয়, ধর্ম্মশীলতা, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি নারীর স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলিকে যথাযথ ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে পঞ্চবটীর দুর্গম অন্ধকারে রাক্ষস-মায়ায় প্রতারিত সীতাকেও আমরা প্রকৃত সীতারূপে দেখিতে পাই। আরও একটি কথা—কবির কাব্য একরূপ দর্পণ স্বরূপ। তবে সাধারণ দর্পণে ও কাব্য-দর্পণে এইটুকু প্রভেদ,—সাধারণ দর্পণে বাহ্য প্রতিকৃতির ছায়া মাত্র পড়ে, কিন্তু কাব্য-দর্পণে কবির অন্তর-প্রকৃতির ছায়াই বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়। আমরা এই স্থানে সেই যোগশাস্ত্রা, একান্ত শুদ্ধচারিণী ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা-কবির স্বরূপটি বুঝিয়া লইতে পারিতেছি।

সীতাহরণ। পথে মহাপ্রাণ জটায়ুর অস্থিদান। এ সব ব্যাপারে কোনও নূতনত্ব, বিশেষত্ব নাই। মহাশূন্য ভেদ করিয়া পুষ্পকরথ লঙ্কাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। রথচক্রের ঘর্ষণে ও সীতার আকুল আর্ত্তনাদে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।

জনশ্রুতি। সীতা লঙ্কায় পদার্পণ করিবামাত্র একটা আকুল জনরব সহস্র মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সীতা রাবণের কন্যা! লঙ্কার গোঠে-মাঠে ঘাটে-পথে যেখানে-সেখানে পর্ব্বতে-পুলিনে বনে-বিপিনে বাজারে-বন্দরে অন্তঃপুরে-দরবারে কেবলই এই কথা। সাগরের জলোচ্ছ্বাসে, পাখীর কাকলীতে, বৃক্ষের মর্ম্মরে কেবলই এই কথা। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে কেবলই এই কথা। স্বামী-স্ত্রীতে, সই-সঙ্গিনীতে, ভ্রাতায়-ভগ্নীতে, পিতায়-পুত্রে কেবলই এই কথা। রাজপথে গৃহে যেখানেই জনতা, সেই স্থানে সহস্র মুখে কেবল এই কথা লইয়াই আন্দোলন!

এ সংবাদ কে আনিল, কোথা হইতে আসিল, তাহার কোনও উত্তর নাই। অথচ সহস্র মুখে এই জনরব প্রচারিত হইতেছে। রাবণ চিন্তিত হইয়া শুক-সারণকে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া জনরবের মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। উদ্দেশ্য—যদি সীতা প্রকৃতই রাবণ-কন্যা হন, তবে কনক-লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজত্বসহ রামের সীতা রামকে অর্পণ করিবেন; সমুদ্রোপকূলে মানুষে-রাক্ষসে একটা মেলামিলি কোলাকুলি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু দুরদৃষ্ট রাবণের সে সাধ পূর্ণ হইল না। পথে ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রাগ্নিতে পুড়িয়া শুক-সারণ ভস্ম হইয়া গেল। তাহা না হইলে রাবণ-বধ হয় না।

সুগ্রীব-মিলন। এই ব্যাপারেও কোন নূতনত্ব নাই। উভয়ে সমদুঃখভাগী, স্ত্রী-রাজ্য-হারা। যজ্ঞকাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া রাম ও সুগ্রীবে সখ্যতা স্থাপিত হইল। সাক্ষী রহিল—এই ঋষ্যমুখ গিরি—আর মাথার উপরে চন্দ্র সূর্য্য!

অভিযান। দুরদৃষ্ট রাবণের সুখের নিশি ধীরে ধীরে পোহাইতেছিল। এদিকে শুক-সারণ ফিরিয়া আসিল না। এমন সময় এক দিন নৈশ রজনীর বিপুল অন্ধকারের মধ্য দিয়া বানর-সেনা লঙ্কার চারিদিক ঘেরাও করিয়া বসিল। লঙ্কাবাসিগণ সহসা সুপ্তোত্থিতের মত সভয়ে সুখ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিল, লঙ্কার গাছে-গাছে, ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়, প্রাসাদ-শিখরে, গৃহচূড়ে অসংখ্য কপি-সৈন্যের সারি। আষাঢ়ের মেঘের মত কোথা হইতে আসিয়া—এই এক রাত্রে লঙ্কার আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছে—মহাসাগর নিজ বুকের উপর দিয়া তাহাদের গন্তব্য পথ খুলিয়া দিয়াছে।

লঙ্কাকাণ্ড। চন্দ্রাবতীর লঙ্কাকাণ্ডে তুরী ভেরী রণ-দামামার ঘোর রোল, সৈনিকগণের আস্ফালন—এ সব আড়ম্বর বড় বেশী নাই। এত বড় লঙ্কাকাণ্ডটা কবি যেন এক

লক্ষ্মণ
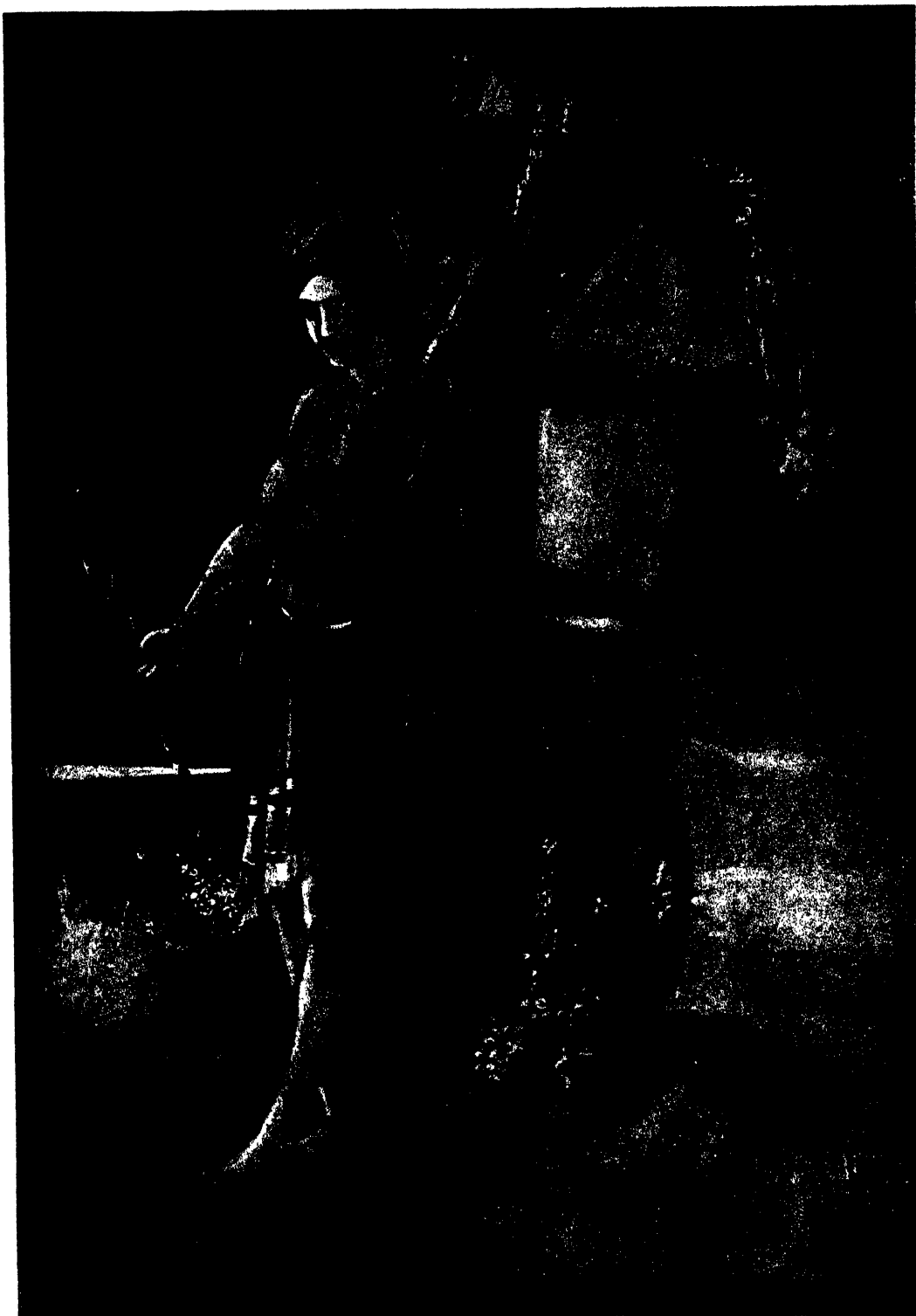
শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। রাক্ষস-বীরগণের মধ্যে একদিন যে যুদ্ধে গিয়াছে, সে আর ফিরিয়া আসে নাই।

ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে; একটী—চন্দ্রাবতী নারী—ভয়াবহ রণক্ষেত্রের বর্ণনা ততটা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। আর দ্বিতীয় কারণ—হয় ত উপেক্ষা করিয়াও যাইতে পারেন। রাম রাবণের যুদ্ধ, ধরিতে গেলে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের অভিযান। অত্যাচারীর দর্পোন্নত শিরকে নমিত করিয়া শান্তি তাহার বিজয়-পতাকার ধ্বজ-দণ্ড প্রোথিত করিতেছেন। পুণ্যের আলো ফুটিয়া উঠা মাত্র পাপের তিমির নিমেষে নাশ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য মহিলা-কবি বোধ হয় যুদ্ধ-বর্ণনার বাহুল্য দেখাইতে ইচ্ছা করেন নাই। কপিল মুনির একমাত্র অগ্নিদৃষ্টিতে যেমন সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র নিমেষে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ সতীর একটী মাত্র দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে বিশাল রাক্ষসপুরী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। রাক্ষস-বংশে দীপ জ্বলিবার এক বিন্দু তৈল কিংবা সলিতার অংশটুকু অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিতে পায় নাই। কিন্তু চন্দ্রাবতী যেটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত হইলেও, তাহা যুদ্ধ-বর্ণনা; আমরা তাহার একটুকু স্থান তুলিয়া দেখাইতেছি।

"আজি রণে আইল বীর গো বীরবাহু নাম
রাবণের পুত্র সেই বীরবাহু নাম
দশ বাণ রামচন্দ্র গো ধনুকেতে জুড়ে
ভস্ম হইয়া বীরবাহু গো আকাশেতে উড়ে"

এই চারি ছত্রে বীরবাহু-বধ শেষ। ইন্দ্রজিৎ রাবণ সকলেই এইরূপ অল্পেতেই শেষ হইয়াছেন।

প্রভেদ। এই স্থানে আর একটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাঙ্গালার অন্যান্য পালা-গায়কগণের রামায়ণ বৈষ্ণব-কবিগণের হস্ত-প্রক্ষেপে একখানা অভিনব ভাগবতে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত কবিগণের অতিমাত্র ভক্তি ও প্রেমাশ্রুতে কৃত্তিবাস অতি দূরে ভাসিয়া গিয়াছেন। লঙ্কার রণভূমি সংকীর্ত্তন-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। রণভূমিতে বীরবাহুর দিব্যজ্ঞান, রাম-শরে হত না হইলে রাক্ষস-দেহের উদ্ধার নাই, রামের অগ্নিবাণ তরণীর গলে পুষ্প-মালার আকার ধারণ, রাবণ কর্ত্তৃক রামের স্তব, বিংশতি লোচন হইতে দরদর প্রেমাশ্রু বহিয়া রণক্ষেত্রে যমুনা নদী প্রবাহিত হওয়া, ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া রামের অভিমান করিয়া বসা, তিনি ভক্তকে মারিয়া সীতা উদ্ধার ত করিবেনই না পরন্তু অযোধ্যায়ও ফিরিয়া যাইবেন না,—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় প্রক্ষিপ্তকারী বৈষ্ণব কবিগণ মস্ত একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা যদি রামকে কানাই, লক্ষ্মণকে বলাই, সীতাকে প্রেমময়ী রাই সাজাইয়া, রাবণকে কংসে পরিণত করিয়া, রামায়ণ নাম মুছিয়া ফেলিয়া তদ্দ্বারা একখানা অভিনব ভাগবত রচনা করিয়া যাইতেন, ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা প্রেমভক্তির অশ্রুর বন্যায় কৃত্তিবাসকে দূরে অতি দূরে ভাসাইয়া দিতে পারিতেন;—করেন নাই কেন? কবিগুরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হার হইবে বলিয়া কি? আমাদের বিশ্বাস, রাজপ্রাসাদ হইতে মুদির দোকান পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বৈষ্ণব কবিরই জয়ধ্বনি করিত—ভোটে কবিগুরু নিশ্চিত হারিয়া যাইতেন।

কবির কাব্য সাময়িক দর্পণস্বরূপ। তাহাতে যুগে যুগে সমাজ ও জাতীয় জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। রামায়ণ যে যুগের কাব্য, তাহা শৌর্য্য-বীর্য্যের যুগ। বালক রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসীর নিধন—হরধনুর্ভঙ্গ—দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে অভিযান—এ সবে বীরত্বেরই আদর সূচিত হইতেছে। অনুবাদের যুগে দেখা যায়—বাঙ্গালী পুরুষোচিত শৌর্য্য-বীর্য্য হারাইয়া তাহার স্বভাবের অর্জ্জিত অতিভক্তি ও প্রেমাশ্রু লইয়া ঘরে বসিয়াছিল। তাই অন্যান্য জাতির যাহা রণক্ষেত্র, বাঙ্গালীর তাহা মৃদঙ্গ-মুখরিত কীর্ত্তন-ভূমি। অন্যান্য জাতির অস্ত্র তীর তরোয়ার, বাঙ্গালীর ব্রহ্মাস্ত্র ভক্তি আর চক্ষের জল! কিন্তু সকল মানুষই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নহেন যে, কেবল প্রেমাশ্রুতে জয়লাভ করিবেন; আর সকল দস্যুই জগাই মাধাই নহে যে কেবল মাত্র চক্ষের জলে গলিয়া যাইবে। এই কালে বাঙ্গালী যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া আপন জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তখন জাতীয় সাহিত্যের আদর্শকে এইরূপ খাটো করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রভেদের কারণ। শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণ নহে—ময়মনসিংহের প্রচলিত অনেক পালা-গায়কগণও গঙ্গাজলে এইরূপ যমুনার ধারা মিশাইয়াছেন। সম্ভবতঃ লোক-মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-কবিগণের নিকট হইতে এইরূপ ধার করিতে হইয়াছে। কারণ সেকালে রামায়ণ-গান গায়কগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায় ছিল।

কিন্তু চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ময়মনসিংহের কুলললনাগণের অঞ্চলের ধন। তাহাকে আসর-গানের মুখাপেক্ষী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় নাই। তাই খাঁটি জিনিষে ভেজাল মিশিতে পায় নাই।

অন্যতম ঘটনা। রাবণ-বধের পর দুইটী প্রধানতম ঘটনা। একটী রাবণের নিকট রামচন্দ্রের রাজনীতি-শিক্ষা; দ্বিতীয়টি সীতার অগ্নি-পরীক্ষা। এই দুইটী ঘটনাই চন্দ্রাবতীর রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। রাজনীতি-শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিয়া অগ্নি-পরীক্ষার কথাই বলিব। এইরূপ পরীক্ষা শুধু রামায়ণে নহে—পৌরাণিক যুগে অধিকাংশ কাব্যেই এইরূপ অগ্নিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই। বোধ হয় দেশ জুড়িয়া তখন এই ভাবের একটা বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। যে গরীয়সী নারী জীবনের পর-পার হইতে ধাতার নিয়তি খণ্ডন করিয়া আনিয়াছিলেন—লৌকিক পরীক্ষার হাত হইতে তিনিও অব্যাহতি পান নাই। বনবাসে ছেলী চড়াইবার অপরাধে পতিব্রতা খুল্লনাকেও এইরূপ অগ্নিদগ্ধ হইতে দেখিতে পাই। কবিগুরুর রামায়ণেও সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা জমকালো ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে! তবে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে তাহা নাই কেন?

কারণ—বোধ হয় একমাত্র রাবণের অশ্রুজল। রাম-শরে নিপতিত ছিন্নমূল মহাদ্রুমের মত রাবণ-দেহ সাগর-সৈকতে পড়িয়া লুটাইতেছে। ব্রহ্মাস্ত্রে ক্ষত বক্ষস্থল হইতে রক্তোৎসের ধারা বহিয়া সাগর-তরঙ্গকে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। কুড়ি চক্ষু স্থির। মুখে শব্দ নাই। বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গের মত অচঞ্চল—কেবল মাঝে মাঝে একটা মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। হৃদয়ে এক জ্বালা। সে জ্বালার কাছে ব্রহ্মাস্ত্রের ঘাও নির্ঝর-ধারার মত শীতল। রাক্ষসগণ ভীমবাহু লঙ্কানাথের চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাবণ তাহাদিগের পানে চাহিয়া অতি কষ্টে বলিতেছেন

"আজও যদি শুকসারণরে তারা আসিত ফিরিয়া
অর্পিতাম রামেরে সীতা অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া।"

কুড়ি চক্ষে শ্রাবণের ধারা বহিল। বক্ষের রক্তোৎস অকস্মাৎ থামিয়া গেল। ত্রিলোকের শঙ্কাস্বরূপ দুর্জ্জয় দেবদৈত্য-বিজয়ী বীর জন্মের মত চক্ষু মুদিলেন।

এই স্থানে অনুতপ্ত রাবণের অন্তিম অশ্রুজলে সীতা-চরিত্রের সমস্ত সন্দেহ কলঙ্ক নিশ্চিহ্নে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসাদি রামায়ণে সীতা-চরিত্রের এই সন্দেহ অপনোদন জন্য রাবণের রম্ভাবতী-হরণ প্রভৃতি অনেক অবান্তর গল্প-ঘটায় কাব্য-কলেবর অসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তা ছাড়া, কবিগণ আরও অনেক অসার আড়ম্বরপূর্ণ কথায় পাঠকের হৃদয় হইতে সীতা-চরিত্রের সন্দেহ-কালিমা মুছিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক স্থানে দেখা যায়, কৃত্তিবাসের সীতা বলিতেছেন—

"বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে
স্পর্শ নাহি করিয়াছি পুরুষ ছাওয়ালে"

এই সব ছত্রে তদানীন্তন ছোঁয়াচে-রোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ধারণা উত্তমরূপে প্রকটিত হইতেছে। এইরূপ উদ্ভট কল্পনায় গড়া নারীর সতীত্বের উপকরণ, আমাদের মনে হয়, দুর্ব্বলচিত্ত বাঙ্গালীর সেই ভাবাবেশ ও অশ্রুজল। সন্দিগ্ধচিত্ত কবিগণ পরের মনের সন্দেহ ঘুচাইতে গিয়া নিজের মনকেই বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের মহিলা-কবি অনুতপ্ত রাবণের এই কথার পরেও সীতাকে পুনরায় অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিয়া, অবিচারিত পরছন্দানুবর্ত্তিতা-দোষে দোষী হন নাই। এইটুকু চন্দ্রাবতী রামায়ণের নিজস্ব। এই মহিলা-কবির কাছে যাহা সত্যধর্ম্ম, তাহা চিরকাল অক্ষত ও নির্ম্মল বস্তু। তাহা পার্থিব মণিমুক্তা বা স্বর্ণ নহে যে, অগ্নিতে পুড়াইয়া বিশুদ্ধ করিতে হইবে। ইহা অপার্থিব, ইহা দেবতার দান!

আরও একটী কথা—বিশ্ব-সাহিত্যের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমার্জ্জনীয় মহাপাপী—পরাক্রমী, পরস্বাপহারী, পরদারগ্রাহী, একান্ত-ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, দুরাচার, দুর্ব্বিনীত রাক্ষস—যাহার জন্য অন্ততঃ আমাদের আহা বলিবার অধিকারটুকু নাই—সেই অনুতপ্ত রাবণের শেষ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চন্দ্রাবতী তাহার জন্য আমাদিগকে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবারও অধিকার দিয়াছেন; আমরাও তাঁহার প্রসাদে এই শান্তিটুকু লইয়া ঘরে ফিরিতে পাইতেছি।

উত্তরকাণ্ড অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন। রাবণ-বধের পর পুষ্পকা-রোহণে রাম সীতা চৌদ্দ বৎসরের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া

গেলেন। রামের অযোধ্যা রামকে পাইয়া আবার পূর্ণশ্রীতে ভরিয়া উঠিল। অযোধ্যার সে আনন্দ অবর্ণনীয়। বশিষ্ঠাদি কুলপুরোহিত ও পাত্রমিত্র সকলে মিলিয়া আবার অভিষেকের আয়োজন করিলেন। পূর্ব্বাভিষেকে যে আনন্দ অর্দ্ধাবয়বে বিকাশ পাইয়া শরতের উষার মত অকাল-মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল—আজ তাহা দ্বিগুণ শোভা ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল। কলস্বরা সরযূ আবার গিরি-বনের কাণে কাণে রাম-সীতার আগমন-বার্ত্তা গাহিয়া গদগদ নাদে উজান বহিল। সরযুর যে রেখাটি রাজ-অন্তঃপুরের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত, সীতার অলক্তক-রঞ্জিত পদের নূপুর-শিঞ্জিনী ও স্পর্শসুখ হারাইয়া আজ চৌদ্দ বৎসর অভিমানে তাহা শুকাইয়া গিয়াছিল,—সহসা তাহা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল। উল্লসিতা অযোধ্যাবাসিনিগণ রাম সীতার মঙ্গল-কামনায় সরযূ-তরঙ্গে আবার দীপ ভাসাইয়া দিলেন।

সীতার বারমাসা। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে ইহা একটী কবিত্বময় অধ্যায়। সীতা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে গত জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী সখিগণের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন।

"সাত পাচ সখি বৈসে জোড় মন্দির ঘরে
এক সখি কহে কথা জিজ্ঞাসে সীতারে
তুমি যে গেছলাগো সীতা অশোক বন বাসে
কোন কোন দুঃখ পাইলা কোন মাসে
আমার দুঃখের কথা শুনিতে কাহিনী
কহিতে কহিতে উঠে জ্বলন্ত আগুনী—"

এই বারমাসী বর্ণনায় কেবল অশোক-বনের কথা নহে। হরধনুর্ভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বনবাস ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী কবি নিজ চক্ষের জলে সহজ সুললিত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রাবতীর সমস্ত রামায়ণ অপেক্ষা এই অংশটিই অধিক পরিমাণে গীত হইয়া থাকে। উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারায় এই বারমাসীতে কবির অনেক পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। হইলেও তাহা মহিলাগণের কাছে অত্যন্ত আদরের সামগ্রী।

অশোক-বনবাসের দুঃখপূর্ণ দিনগুলি বন্দিনী সীতা কিরূপ উৎকণ্ঠায় কাটাইয়াছেন, আমরা তাহার দুই একটী পদ মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। এই বারমাসী ধরিতে গেলে একটি খণ্ড-রামায়ণ। স্থানাভাবে ইহার নূতনত্ব সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিলাম না।

বৈশাখমাসে—

"রাঙ্গা না অশোক পুষ্প ফুটিয়াছে ডালে
এত দুঃখ অভাগিনী গো সীতার কপালে
আমার কান্দনেরে ভাসে অশোক বন
বৃক্ষডালে বইসা কান্দে পবন নন্দন"

এত দুঃখের পর আবার যুদ্ধের চিন্তা—কি জানি কি হয়—

"আজি শুনি ইন্দ্রজিতরে যাইবেক রণে
প্রভু রামে কে রাখিবে রাক্ষসার বাণে"

পাশাখেলা—ইহাতে সীতার বনবাসের পূর্ব্ব-সূচনা আনিয়া দিতেছে। এই পাশাখেলা চন্দ্রাবতী রামায়ণে একটি অভিনব ঘটনা।

"সুখবসন্তের কথা শুন সখীগণ।
রতণ মন্দিরে রে কৌশল্যানন্দন॥
উপরে চান্দোয়া টাঙ্গায় গো নাচে শীতলপাটি।
রাম সীতা বসিলেন হাতে সোণার কাটি॥
সুবর্ণের গুটিতে গো ঘড় সাজাইয়া।
রামচন্দ্র খেলে পাশা সীতারে লইয়া॥
লক্ষ্মীর সহিত পাশা গো খেলায় নারায়ণে।
ইন্দ্র যেন খেলায় পাশা শচীরাণীসনে॥
মদনের সহিত যেমন গো পাশা খেলায় রতী।
হরের সহিত পাশা খেলায় পার্ব্বতী॥

অশোক কিংশুক চাম্পা সম্ভার-শোভিত শীতল মন্দির হাস্য-পরিহাসে জয়-মঙ্গলগীতে নূপুর-রুণুতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। চটুলা সহচরিগণ সোণার বাটায় পান-গুয়া লইয়া— "চান্দেরে ঘেড়িয়া যেন তারার মণ্ডলী।"

পাশাখেলা আরম্ভ হইল। রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন খেলায় সীতার জয় হইলে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন।

"পড়িল পাশার দান খেলিতে খেলিতে
হারিলেন রামচন্দ্র সীতাদেবী জিতে"

সীতা রামের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। সে বর আর কিছুই নহে—

"বহুদিন হইতে গো মোর আশা ছিল মনে।
আর বার যাইতাম আমি গো মুনি তপোবনে।

তমসা নদীর কথাগো সদা পড়ে মনে
রাজহংস খেলা করে কমলের বনে
প্রতি নিশি স্বপ্নে দেখিগো মুনির কন্যাগণে
তোমার সঙ্গেতে যেন বেড়াই বনে বনে"

পঞ্চবটীর সেই কেকাধ্বনি-নিরত নৃত্যশীল ময়ূর-ময়ূরী, হরিণ-হরিণীকে সীতা তখনও ভুলিতে পারেন নাই। গোদাবরী-তরঙ্গে সন্তরণশীলা রাজহংস সকল ও পদ্মবনের শোভা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে চিত্রপটের মত বিলম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। স্বামীর হাত ধরিয়া অটবী-গুল্ম-পার্শ্বে বিচরণকারিণী সীতা অযোধ্যার রাজভবনে আসিয়াও প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। বনসঙ্গিনীদের কথা রহিয়া রহিয়া সীতার মনে পড়িতেছিল।

সীতা তখন অন্তঃসত্ত্বা। এ অবস্থায় তাঁহার কোন কামনা অপূর্ণ রাখিতে নাই। রাম প্রিয়তমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

"চন্দ্রা কহে দৈবের দুঃখ আর না যায় খণ্ডানি
কি বর মাগিলে হায় জনকনন্দিনী!"

সীতার বনবাস। যে উত্তরকাণ্ডে সীতাচরিত্র চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, অনেকের মতে তাহা কবিগুরুর লেখনী-প্রসূত নহে। উত্তরকাণ্ডের যে অংশটি কবিগুরুর নামে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সীতা-চরিত্রে সন্দেহ-বশে রামকে তেমন বিচলিত হইতে দেখি না। "তিনি জগৎ মধ্যে শুদ্ধা। তিনি আমার প্রতি প্রীতা হউন" এই বলিয়া রাম ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাকাব্যের নায়কের উপযুক্ত কথা বটে। সাগর পর্ব্বত অনন্ত আকাশ এ সব একরূপ স্বভাবের মহাকাব্য। এই সকল মহাকাব্যের স্রষ্টা বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং। এই সকল স্বাভাবিক মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্য-বিরচিত যে গ্রন্থ, তাহাই মহাকাব্য। যিনি এই মহাকাব্যের নায়ক তাঁহাতে থাকিবে মহাসাগরের মত অতলস্পর্শ বিশ্বপ্রেম; তিনি হইবেন পর্ব্বতের মত অটল অচল—দৃঢ়চেতা উন্নত। তাঁহার হৃদয় হইবে ঐ অনন্ত আকাশেরই মত উদার-উন্মুক্ত। সাধারণ মানুষ হইতে তিনি থাকিবেন একটু স্বতন্ত্র। তিনি বীর অথচ আশ্রিত-পালক, সাহসী অথচ ধর্ম্মভীরু, দণ্ডদাতা অথচ ক্ষমাশীল। কিন্তু সীতা-নির্ব্বাসন-দাতা রামচন্দ্র সেই মহাকাব্যের নায়কের আসন হইতে স্খলিত-পদ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতনই অল্পতেই বিচলিত, সন্দিগ্ধমনা, লঘুচেতা।

বনচারিণী সীতা। কিন্তু এই রাম-চরিত্রকে দোষদুষ্ট করিয়া যিনি বনবাসিনী সীতার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কবিগুরুর মতনই আমাদের চক্ষে নমস্য। সীতা-চরিত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; একটি—পতি-সঙ্গে বনচারিণী সীতা; অপরটি পতি-পরিত্যক্তা বনবাসিনী সীতা। প্রথমটি অঙ্কিত করিয়াছেন—কবিগুরু স্বয়ং। দ্বিতীয়টি অঙ্কিত করিয়াছেন—তাঁহার কোনও লুপ্তনামা প্রতিভাশালী শিষ্য! যদি তাই হয়, তবে বলিতে হইবে—গুরুর সীতা অপেক্ষা শিষ্যের সীতা কাব্যাংশে বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধরিতে গেলে বনচারিণী সীতা দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়ার মত কায়ার অনুবর্ত্তিনী—হাস্য-ক্রন্দনশীলা। তাঁহার নিজের কোন সত্তা নাই। সুখদুঃখ-বোধ নাই—তাঁহার আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগশীলতা সাধারণ নারীরই মত। তাহাতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। পতিকে বনবাসে দিয়া কোন নারীই রাজ্য-সম্পদ লইয়া নিশ্চিন্তমনে ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে পারেন না। এ স্থানে অতি সাধারণ নারী যাহা করিতেন, সীতা তদপেক্ষা বেশী কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বিশেষ এই তমসা-গোদাবরীতটবিহারিণী চিরহাস্যময়ী সীতা—যিনি বনচারী পতির গলে বনমালার মত শোভা পাইতেছেন, যিনি পুষ্পাভরণভূষিতা বনদেবীর মতন সকৌতুকে বনহরিণী ও নৃত্যশীলা ময়ূরীগণকে সখীভাবে কোল দিতেছেন, বনলতা ও বনপুষ্পকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তরুগুল্মপার্শ্বে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার সেই বনবাস-সুখের কাছে অযোধ্যার রাজসুখ অতি তুচ্ছ। এই বনচারিণী সীতাকে দেখিয়া আমাদের মনে ত একটুকুও দুঃখ হয় না। তবে অশোক-বনবাসের কথা—তাহাও বিরাট যুদ্ধোদ্যমের কোলাহলে কাটিয়া গিয়াছে। এ সময়টা আমরা বন্দিনী সীতার দিকে ততটা মনোযোগ করিতে পারি নাই। বনবাসিনী সীতা,—এই তুলনা-রহিত নারী-চিত্রটি আমরা কোথায় পাইলাম? ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, ধর্ম্মশীলতা, পতিপ্রাণতা প্রভৃতি যে সকল গুণের উপর নারীর নারীত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহার সবগুলি ফুটিয়াছে ঐ বনবাসিনী সীতাতে। তিনি

নিরপরাধে পতিকর্ত্তৃক বনবাস-পরিত্যক্তা হইয়াও বিসর্জ্জনের প্রতিমার মত অবিকৃতা। পতিপ্রেমশীলা সূর্য্যমূখীর মত একমাত্র রামচন্দ্রের মুখপানেই চাহিয়া আছেন। তাঁহার বিদ্বেষ নাই, বিরক্তি নাই, উপেক্ষা নাই, অভিমান নাই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই। এই শান্ত সংযত বনবাসিনী সীতার চরিত্র যিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কবিগুরুর উপযুক্ত শিষ্য; এবং তাঁহারই সঙ্গে একাসনে বসিয়া আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য। উত্তরকাণ্ড রচিত না হইলে যে কেবল রামায়ণ অসম্পূর্ণ থাকিত তাহা নহে, সীতা-চরিত্রের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ অবিরচিত থাকিয়া যাইত। বনচারিণী সীতা বর্ণাত্মক, আর বনবাসিনী সীতা হৃদয়াত্মক। কবিগুরু অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা দ্বারা সীতামূর্ত্তি গড়িয়া তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়—যদ্দারা মানুষ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র আসনে স্থান পাইয়া থাকে, সেই হৃদয়টুকু গড়িয়াছেন আমাদের উত্তরকাণ্ডের লুপ্তনামা কবি।

বনবাসিনী সীতা সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের কিংবদন্তী।—

গুরুর সীতা অপেক্ষা শিষ্যের সীতা মানুষের হৃদয়ে সমধিক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া লইয়াছে। এই জন্যই বনবাসিনী সীতার মূর্ত্তি ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কবি—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়িয়া পূজার মন্দিরে স্থান দিয়াছেন। বনবাসের কারণ সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। পালা-গায়ক ও কথক-ঠাকুরদিগের মুখে নানারূপ শাখা-প্রশাখা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গঠিত হইয়াছে। বনবাসিনী সীতার চরিত্র-মাধুর্য্য-পূর্ণ নারীত্বই বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের কবি চন্দ্রাবতী অগ্নি-পরীক্ষার কথা বাদ দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বনবাসিনী সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই। চন্দ্রাবতী রামায়ণে বনবাসের কারণ যেটুকু ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম।

চন্দ্রাবতীর সীতার বনবাস—

পাশাখেলার পর রামচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। তিনি সীতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তপোবন-দর্শনাভিলাষিণী সীতার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য আজ দিনমানের মধ্যে তাঁহাকে সমস্ত আয়োজন ঠিক করিতে হইবে। স্বয়ং তিনিও সীতার সঙ্গে যাইবেন। এদিকে—

"শয়ন-মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী
সোণার পালঙ্ক' পরে গো ফুলের বিছানী
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল
নানা জাতি ফুল আছে গো গন্ধেতে রসিয়া
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখিরা আনিয়া
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল
অল্পেতে অবশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল
উপকথা সীতারে শুনায় আলাপিনী
এমন সময় আসল তথা কুকুয়া ননদিনী"

কুকুয়ার পারিচয়—

কাল সাপিনী কুকুয়া গো কাল কূটে ভরা
সীতার সুখ দেখতে নারে গো এমন কপাল পোড়া
কুরূপা কুৎসিতা সে যে গো দুরন্ত মুখরা
শিখাইয়া পালিয়া বড়গো কইরাছে মন্থরা
কৈকয়ীর কন্যা সে যে ছোট ভরতের
রাজার ঘরে বিয়া হইয়া গো কপালের ফের

* * * * * *

বাতাসে করিয়া ভর গো পাতায় কোন্দল
ঔষধ খাওয়াইয়া করছে স্বামীরে পাগল

এই কুকুয়ার চিত্র দেখিয়া লঙ্কার কালাগ্নি-রূপিণী সূর্পণখার কথা আমাদের মনে পড়ে। কুকুয়া ধরিয়া বসিল—বধূ দয়া করিয়া রাবণের চিত্রটি আঁকিয়া দেখাও।

কুকুয়া বলিছে বধূ গো মম বাক্য ধর
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি রাবণের ঘর
দেখি নাই রাক্ষসে গো শুনিতে কাঁপে হিয়া
দশ মুণ্ড রাবণ রাজা—দেখাও আকিয়া।
মূর্চ্ছিতা হইলা সীতা গো রাবণ নাম শুনি
কেহ বা বাতাস দেয়, কেহ মুখে পানি
সখিগণ কুকুয়ারে করিল বারণ
অনুচিত কথা তুমি গো বল কি কারণ
রাজার আদেশ নাই গো বলিতে কু কথা
তবে কেন ঠাকুরাণীর গো মনে দেও ব্যথা
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী
বার বার সীতারে বলায় সেই বাণী

সীতা বলিলেন—আমি সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের পানে কখনও মুখ তুলিয়া দেখি নাই; কি করিয়া তাহার পাপ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিব? কিন্তু কুকুয়াও ছাড়িবার পাত্রী নহে। শেষে এই স্থির হইল হরণকালে সীতা সাগরজলে প্রতিবিম্বিত রাক্ষসের যে ছায়া একবার বিদ্যুতের মত দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ছায়া আঁকিয়া দেখাইবেন।—

তখন এড়াতে না পারে সীতা গো পাখার উপর
আকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলি দিল।

প্রিয়তমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম তপোবন-যাত্রার উদ্যোগ লইয়া একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় দর্পিতা কুকুয়া আসিয়া বলিল—দাদা, তুমি কাকে ভালবাস—যে তোমার চোখের তারা, বুকের নিধি, সে কি না আজ দশমুণ্ড রাবণ পাখাতে আঁকিয়া বুকে করিয়া ঘুমাইতেছে। যদি বিশ্বাস না হয় স্বচক্ষে দেখিতে পার;

ধীরে ধীরে রাম শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—
পঞ্চমাসের গর্ভ সীতাগো অলসে ঘুমায়
তর্জ্জনী হেলায়ে কুকুয়া রামেরে দেখায়।

রঘুকুলকমলিনী তখন অলসভাবে ফুল-শয্যার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহার বুকের উপর দশমুণ্ড চিত্রিত পাখা! হায়, হায়—জানকী জানিতেন না যে, কুকুয়া কালসাপিনী এইরূপে তাঁহাকে শিয়রে বসিয়া দংশন করিবে।

তারপর সীতার বনবাস। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—এই সীতা-নির্ব্বাসনের কারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। জৈন রামায়ণে সীতার সতিনী তাহাকে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কাশ্মীর রামায়ণেও এই ধরণের কথাটা আছে। উড়িষ্যা অঞ্চলে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ একটা বিশ্বাসের আবহাওয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে দেখা যায়—সীতা তালের পাখাতে রাবণের চিত্র অঙ্কিত না করিয়া শাড়ীর অঞ্চলে আঁকিয়াছিলেন,—এইমাত্র প্রভেদ।

এর পর চন্দ্রাবতীর কোনও ভনিতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর চন্দ্রাবতীর কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি রামায়ণখানা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

কবি কৌশল্যা সুন্দরী

এর পর হইতে পাই কৌশল্যা সুন্দরীর ভনিতা। এই কৌশল্যা সুন্দরী কে? আমরা বহু চেষ্টায় তাঁহার জীবনের কোন একটি লহরী খুঁজিয়া লইতে পারি নাই। "কৌশল্যা সুন্দরী কান্দে সীতা বনে দিয়া" এই চরণটি দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম ইনি হয়ত রামের মা কৌশল্যা হইবেন। কিন্তু আর একটি চরণে দেখিতে পাই—

"রাম ভজ রাম চিন্ত রামপদে আশ
কৌশল্যা সুন্দরী গায় সীতার বনবাস"

নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম যে, ইনিও একজন মহিলা-কবি। কৌশল্যা সুন্দরী যে কেবল সীতার বনবাসের শেষাংশটুকু রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে; খুব সম্ভব রামায়ণের অন্যান্য ঘটনা অবলম্বনেও তিনি গীত রচনা করিয়াছিলেন। সংগ্রাহিকা মহিলাগণ চন্দ্রাবতীর গানের শেষাংশটুকু কৌশল্যার ভনিতা দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। হয় ত ইহার অনেকাংশ চন্দ্রাবতীর ভনিতার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। উভয়েই মহিলা-কবি, উভয়েই অনন্য-সাধারণ কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর কবিতার মত কৌশল্যার কবিতাও অমৃতের অলকানন্দা। সারল্যে, কারুণ্যে, উচ্ছ্বাসে তেমনি কূল-প্লাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোন অজানিত দিবসে ময়মনসিংহের জলাভূমিতে এই মহিলা-কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার কোন অজানিত দিবস-রজনীর মাঝখানে তিনি মায়িক সংসারের খেলা-ধূলা শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। দুই একটি কবিতার শেষ চরণে মাত্র তাঁর অশ্রুময় স্মৃতিটুকু দেখিতে পাইতেছি। কবিগুরুর মতনই তাঁর জীবন-স্মৃতি কোন নিশীথ বিজনের অন্ধকারে বিস্মৃতির বল্মীক-স্তূপে জন্মের মত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। একটা প্রচলিত প্রবাদ কিংবদন্তী হইতেও আমরা তাঁহার জীবনের একটি লহরী খুঁজিয়া লইতে পারিলাম না।

কৌশল্যা-কৃত সীতার বনবাসের শেষাংশ

স্বামী-বিরহ-বিধুরা উন্মাদিনী কখনও অতিমাত্র দুঃখে রোদন করিতেছেন, কখনও অতিমাত্র শোকে মূক ভাবে বসিয়া অশ্রু-মার্জ্জনা করিতেছেন। শিশিরাপ্লুত বনলতিকার মত তাঁহার সেই দুঃখশান্ত ক্ষীণ মূর্ত্তিটি দেখিয়া বনের পশু-পক্ষী

রোদনশীল হইয়া উঠিতেছে। উন্মাদিনীর মত কখনও নদীর তীরে ছুটিয়া গিয়া হা নাথ বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন। সঙ্গিনী মুনি-কন্যাগণ সেই সম্বিতহারা অলস-বিবশ তনুটিকে আনিয়া কুশশয্যার স্থান দিতেছে। হায়, অযোধ্যার সোণার পালঙ্কে কুসুমশয্যায় শুইয়াও যে দেহ কষ্ট অনুভব করিত, আজ তাহার শয্যা কি না ক্ষুরধার কুশদল! কুশ-কণ্টকে সীতার পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা অলক্তকের মত শোভা পাইতেছে। হায়! এবার ত লক্ষ্মণ সঙ্গে নাই—কে এই কুশ-কণ্টক উন্মোচন করিবে।

পঞ্চবটীতে স্বামীর বাহুমূল উপাধান করিয়া যে সীতা প্রত্যহ রজনীতে শয়ন করিতেন, আজ সেই আশ্রয়হীনা ব্রততী একাকিনী ভূতল-শয্যায় শায়িতা। সীতা কখনও বনভূমির শ্যামলতার পানে চাহিয়া চাহিয়া সেই নব-দূর্ব্বাদল শ্যাম রূপ চিন্তা করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করেন—কখনও বা বনলতা হইতে শ্যামল পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া রাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। পত্রদলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অপরাজিতায় কেশ, নীলোৎপলে নীল নয়ন। অবিচয়িত পত্রপুষ্প চক্ষের জলে কলঙ্কিত হইয়া যায়। রজনীর সঙ্গে সঙ্গে সেই মলিন বাসি ফুলগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই স্রোত-পতিত পুষ্পাঞ্জলির পানে অনিমেষে চাহিয়া থাকেন। সহসা অনুসন্ধান-নিরতা মুনি-কন্যার ডাকে সীতার চমক ভাঙ্গিয়া যায়,—বিরহ-বিহ্বলা বনবাসিনী অলস পাদক্ষেপে সঙ্গিনীগণ সহ বনকুটীরে ফিরিয়া আসেন;—আবার ভোরে তেমনি ভাবে নূতন পত্র-পুষ্পদল সংগ্রহ করিয়া অনন্যমনে রাঘবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন।

লবের জন্ম।—এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। দশ মাস অন্তে সীতা এক পুত্র প্রসব করিলেন। নামাকরণের দিন বাল্মীকি স্বয়ং নাম রাখিলেন লব। পুত্র সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হইল। বনবাসের অতিমাত্র দুঃখে এই নবজাত শিশুর মুখ দেখিয়া সীতাদেবী বনবাস-ক্লেশ ভুলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে একটা চিন্তা প্রসূতির মনে আসিত বটে—হায়! এ বালক যদি বনে না জন্মিয়া অযোধ্যার রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিত! কিন্তু সীতা এর অধিক বেশী কিছু ভাবিতে পারিতেন না।

কুশের জন্ম।—প্রচলিত অন্যান্য রামায়ণে আছে—সীতা যমজপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন; কিন্তু কৌশল্যাকৃত রামায়ণে দেখিতে পাই—সীতা একমাত্র পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কুশের কথাও আছে, কিন্তু অন্যরূপ।

মহর্ষি বাল্মীকি বালক লবকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অস্ত্রবিদ্যায় লব ক্রমে রামতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সীতা মাথার দিব্য দিয়া লবকে সর্ব্বদা মানা করিতেন যেন সে বনের পশু পক্ষীর প্রতি বাণ নিক্ষেপ না করে।

একদিন বালক লব মুনির জন্য বনফল আহরণ করিতে চলিয়াছে। তাহার অব্যর্থ লক্ষ্যে বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখাস্থিত ফলটিও বৃন্তচ্ছিন্ন হইয়া কোলে আসিয়া পড়িতেছে। অকস্মাৎ বনভূমি-প্রান্তে এক সিংহ কোনও আসন্নপ্রসবা হরিণীর প্রতি ধাবিত হইল। তাহার লোল জিহ্বা, করাল-মূর্ত্তি দেখিয়া আর্ত্ত হরিণী প্রাণভয়ে বন ভাঙ্গিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছিল। লব কিছুমাত্র না ভাবিয়া ধনুকে নাগপাশ অস্ত্র যুড়িয়া তৎক্ষণাৎ সেই সিংহের প্রতি ধাবিত হইল।

এদিকে সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসে—সীতা লবের অদর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মুনি-কন্যাগণ, যাঁহারা সীতা-সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও মধ্যে কেহ লবের বার্ত্তা দিতে পারিলেন না। মহর্ষিও চিন্তিত হইয়া শেষে লবের অন্বেষণে ছুটিলেন। বন-পথের এক স্থান রুধিরাক্ত দেখিয়া ভয়ে মুনির মন বিচলিত হইল। ব্যর্থমনোরথে তিনি যখন আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, ঘন তমসায় বনভূমি-মুখ প্রায়াচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল;—মুনি ত একাকী কুটীরে ফিরিতেছেন। সীতা যখন লবের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন উত্তর কি! কি বলিয়া বনদুঃখিনী মাকে সান্ত্বনা করিবেন!

"সাত পাঁচ ভাবি মুনি গো কোন কার্য্য করে।
পঞ্চ গাছি কুশ মুনি লইলেন তোলে॥
কুশেতে পুত্তলা এক করিলা নির্ম্মাণ।
মন্ত্র পড়ি মহামুনি গো দিলা সে জীবদান॥"

মুনি-মন্ত্রে কুশ-পুত্তুলি লবের সম্পূর্ণ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে তৎপশ্চাৎ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিল। মহামুনিও আশ্বস্ত হইলেন।

এই নাও মা তোমার দুরন্ত ছেলে—সমস্তটা বন উহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছি। এই বলিয়া যাই মুনি কুশকে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন—অমনি পশ্চাতে দাঁড়াইয়া লব—মা', মা বলিয়া ধনুর্ব্বাণ মাটিতে রাখিয়া

মুনির চরণে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—তাহার সঙ্গে একটি পাশবদ্ধ সিংহের শবদেহ। সীতা অবাক্। মুনি টিপি টিপি হাসিয়া বলিলেন—মা, আজ হতে তুমি যমজ পুত্রের জননী।

"কুশেতে গড়িলা শিশু নাম থুইলা গো কুশী—"

লব কুশী মায়ের কোল যুড়িয়া বসিল। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল—বালকদ্বয় উপযুক্ত গুরুর শিক্ষাধীনে অল্পদিন মধ্যে সর্ব্ব-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মহামুনি তাহাদিগকে পবিত্র রামায়ণ গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বীণার ঝঙ্কারের সহিত সেই পবিত্র রাম-গুণগান শুনিতে শুনিতে বর্ষার মেঘের মত কত কথা সেই তপোবন তরুতলবাসিনী সীতার বুকের মধ্যে জমিতে থাকিত। অশ্রু যখন অসংবরণীয় হইয়া উঠিত, তখন মুক্তাবিন্দুর মত গড়াইয়া কুটীর-প্রাঙ্গণের দূর্ব্বাদলকে সিঞ্চিত করিয়া দিত। সীতা তখন বল্কলাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা পাইতেন—পাছে লবকুশী দেখে।

কিন্তু লব কুশীর চোখ কিছুতে এড়াইতে পারিতেন না। সময় অসময় নাই—দুই ভাইয়ে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, মা, সব সময় তুই এমনিধারা কাঁদিস্—বল্ না মা, তোর কি দুঃখ—আমরা দুই ভাইয়ে তোর দুঃখ দূর করে দেব। সীতা লবকুশীকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু নিজে প্রবোধ পাইতেন না।

"তোরা পুত্র থাকৃতে বাছারে মোর কিসের দুখ
বলিতে কহিতে গো সীতার শুকাইত মুখ"

এক দিন মাকে কাঁদিতে দেখিয়া লবকুশী বলিল, মা, আমরা রামায়ণ গাইতে শিখিয়াছি। মুনি বলিয়াছেন এই গান যে শুনে, তার শোক তাপ জ্বালাযন্ত্রণা কিছুই থাকে না। শিশুদ্বয়ের যুগল বীণা মায়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য যখন ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, সেই সঙ্গে মিশিত তরুণ করুণ কণ্ঠ দুটি। অভাগিনী তখন আর চক্ষের জল সামলাইতে পারিত না।

"লব বলে কুশী ভাইরে আর গান গা
এই গান শুনিলে কান্দে অভাগিনী মা"

কারণ কি! এক দিন কুশী স্পষ্টাক্ষরে মাকে জিজ্ঞাসা করিল —আমরা যে রামায়ণ গান করি, তাহাতে আছে—অযোধ্যার মহারাজ রামচন্দ্র বিনাদোষে সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠিয়েছেন! তোর নামও ত সীতা,—হাঁ মা, তুই কি সেই সীতা? বাষ্পবিজড়িতকণ্ঠে সীতা 'না' বলিতে যাইতেছিলেন —মুখে কথা ফুটিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ইহার কিছুদিন পরই অযোধ্যা হইতে রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ আসিল। এই স্থানে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। কি কারণে জানি না—মেয়েলী সঙ্গীতে আমরা কোথাও লবকুশের যুদ্ধ-বৃত্তান্তের উল্লেখ পাইতেছি না। এই পিতা-পুত্রের যুদ্ধের কথা অনেক রামায়ণেই আছে। পালা-গায়কগণ এই কাহিনীটি লইয়া বাল্মীকির আশ্রমের অনতিদূরে একটা বিরাট লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়াছেন; তাহাতে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বিভীষণাদি সকলে শিশুরণে নিপতিত। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের যে দশা,—এ যুদ্ধে রামচন্দ্রাদিরও সেই দশা।

এই পিতা-পুত্রের যুদ্ধ শেষে সংক্রামক ব্যাধির মত, পরবর্ত্তী পুরাণ সকলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। লবকুশের অস্থিমজ্জা লইয়া মণিপুরের অর্জ্জুন-বিজয়ী বভ্রুবাহনের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক কোন পুরাণে শ্রীরাধিকার যমজ পুত্রদ্বয়ের হস্তে নারায়ণী সেনাসহ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে পরাজিত বিধ্বস্ত হইতে দেখিতে পাই। খুঁজিলে এরূপ অনুকরণ হয় ত আরও অনেক মিলিতে পারে।

এর মধ্যে এক দিন মুনি আসিয়া সীতার কাছে লবকুশকে ভিক্ষা চাহিলেন—

"দে মা তোর পুত্র দুটি সঙ্গে লইয়া যাই"

মুনির ইচ্ছা, তিনি বালকদ্বয়কে যে রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছেন, অযোধ্যার রাজসভাসদকে তাহা শুনাইয়া আসেন। কিন্তু সীতা সহসা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার দুনয়নের মণি বুকের নিধি দুর্ল্লভ লবকুশীকে দিয়া কি লইয়া ঘরে থাকিবেন! এই দু'টি শিশু—যাদের মুখ চাহিয়া সীতা বনবাস দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে পাশরিতেছিলেন! তিনি মহর্ষির চরণে কাঁদিয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা অন্ততঃ একজন কাছে থাক্। লব বলিল, আমি মা'র কাছে থাকি, কুশী যাক্। সীতা বলিলেন—আচ্ছা তাই হউক, লব থাক্, কুশীকে আপনি সঙ্গে লইয়া যান।

চট্‌পটে কুশী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে বলিল, মা, আমরা রামায়ণ গাই। তাতে আছে রামের মাতা কৈকেয়ী ভরতকে রাজ্য দিবার জন্য রামকে চক্রান্তক্রমে বনে পাঠাইয়াছিলেন। আজ দেখ্‌ছি আমার ভাগ্যেও সেই দশা!

"যেমন বন হইল অযোধ্যা গো রাম হইলাম আমি।
ভরত হইল লব দাদা আর কৈকেয়ী হইলা তুমি॥"

ষাট্ বলিয়া সীতা কুশকে টানিয়া কোলে নিলেন—তাঁহার দুই চক্ষের জলে কুশীর জটাভার ভিজিয়া গেল। স্থির হইল—দুইজনেই মুনির সঙ্গে যাইবে।

তার পর শিশুদ্বয়ের অযোধ্যায় গমন—সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ—এ সবে কোনও নূতনত্ব বিশেষত্ব নাই।

আমরা যথাসাধ্য চন্দ্রাবতী ও কৌশল্যাকৃত মেয়েলী সঙ্গীতের আলোচনা করিলাম। কৃত্তিবাসাদি বঙ্গীয় সাহিত্য-কল্পতরুগণের পার্শ্বে এই পুণ্য তুলসী দুটি কোথায় স্থান পাইবে, তাহার নির্দ্দেশ বিশেষজ্ঞের হাতে।

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(২১)

নিত্যরঞ্জন চলিয়া গেলে, অনেক দিন পর্য্যন্ত রেখা তার কোনও চিঠি পাইল না। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া রোজ ডাকের চিঠি আসিলে ছুটিয়া যাইত নিত্যরঞ্জনের একখানা চিঠির আশায়—রোজ সে নিরাশ হইয়া ফিরিত।

শেষে সে হতাশ হইয়া পড়িল। সে স্থির করিল, নিত্যরঞ্জন সৌরীনের কোনও সন্ধানই করিতে পারে নাই—কোনও সন্ধান তার পাওয়া যাইবে না। এ কথা ভাবিতে তার জীবনের নিদারুণ নিঃসঙ্গতা যেন তার চারিদিক দিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল।

ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার তৃষ্ণায় তার অন্তর ছট-ফট করিতেছিল, সে আকুল অনুসন্ধানে বিশ্বের ভিতর এমন বস্তু খুঁজিয়া পাইল না যে, তাহার এই তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে। মনের তলা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সে দেখিতে পাইল যে, তার সমগ্র জীবন, সমস্ত অন্তর একটা আদি-অন্তহীন বিরাট অতিকায় শূন্য,—তার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। তার জীবনের এ শূন্যতাবোধে তার শক্তি অবসন্ন, সংবিৎ অচল হইয়া পড়িল।

এমন সময় তাকে চিত্তের আসন্ন পক্ষাঘাত হইতে রক্ষা করিল একটি ছোট্ট শিশু। হাঁসপাতালে একটি নারীর মৃত্যু হইয়াছিল—তার কেউ ছিল না, ছিল কেবল একটি দুগ্ধপোষ্য কন্যা। মেয়েটি যেন স্বর্গভ্রষ্টা পরী! রেখা এ মেয়েটির সন্ধান পাইয়া ছুটিয়া গেল। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দের সহিত এই মাতৃহীনা কন্যাকে রেখার হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেন।

রেখার অন্তরের সকল নিরুদ্ধ প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া এই ছোট্ট মেয়েটির উপর বন্যার মত ছুটিয়া পড়িল। তার বঞ্চিত মাতৃ-হৃদয় আকুল আবেগে এই শিশুটিকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। কোনও জননী বুঝি তার গর্ভজাত সন্তানকে এত ভালবাসে নাই, এমন আপনার করিয়া দেখে নাই।

সে তার নাম রাখিল লতা। লতার মত এই শিশুটি তার সমস্ত চিত্ত বেষ্টন করিয়া তার শুষ্ক কাণ্ড এক অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত করিয়া দিল। পত্নী হইবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া রেখা মাতৃত্বে তার চরম সার্থকতা উপভোগ করিল।

ইহার দুই মাস পরে রেখা নিত্যরঞ্জনের পত্র পাইল। নিত্যরঞ্জন লিখিয়াছে যে সৌরীন ময়মনসিংহে গিয়া কাপড় ও জুতার কারবার করিয়াছিল এবং তাহাতে অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়া সে ফেরার হইয়াছে। তার নামে দশ হাজার টাকার ডিক্রী হইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া রেখা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সৌরীন গভর্ণমেণ্টের এত বড় চাকরী ছাড়িয়া গিয়া ময়মনসিংহে জুতা ও কাপড়ের দোকান করিবে, এবং শেষে পাওনাদারদিগকে ঠকাইয়া পলায়ন করিবে, তাহা তার কাছে একেবারেই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু ক্রমে তার মনে হইল যে, কথাটা হয় তো সত্য হইতেও পারে। না হইলে নিত্যরঞ্জনের তাহাকে অযথা এ মিথ্যা সংবাদ দিবার কোনও হেতু নাই। যদি সত্য হয়, তবে কি ভয়ানক কথা এ! এমন একটা প্রকাণ্ড চরিত্রের এই নির্ম্মম পরিণতি! তার মনের ভিতর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সৌরীনের অপহৃত জীবনের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ, তার আশা-ভঙ্গের নিদারুণ জ্বালা। মনে হইল, সৌরীনের এ পরিণতির জন্য দায়ী সে নিজে। সে যদি দারুণ অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া না উঠিয়া সৌরীনকে আপনার করিয়া লইত, তবে তো সে মরিয়া হইয়া এমন ভাবে আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারিত না। রেখা যে প্রেমে

অভিষিক্ত করিয়া তাহার চিত্ত শান্ত করিয়া রাখিতে পারিত, তার ভিতরকার আশার দীপ নিয়ত উৎসাহ দানে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিতে পারিত। সৌরীনের সকল ভার গ্রহণ করিয়া গৃহপত্নীর অধিকার প্রচার করিয়া সে তাহাকে অভীষ্টসিদ্ধির পথে পরিচালিত কেন করিল না!

ব্যথায় তার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিদারুণ আত্ম-তিরস্কারের কশাঘাতে সে ছটফট করিতে লাগিল। তার সমস্ত হৃদয় সৌরীনের মানস-মূর্ত্তির পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া অনুশোচনায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

প্রথমে সে হতাশায় ডুবিয়া গেল। পরে তার মনে হইল এখনো তো তার কর্ত্তব্য আছে, এখনও হয় তো সৌরীনকে পাওয়া যাইতে পারে। দশ হাজার টাকা সৌরীনের দেনা। সে দশ হাজার টাকা তো রেখা সঞ্চয় করিয়াছে—ঋণ মুক্ত হইলেই সৌরীন ফিরিয়া আসিবে—আবার নূতন উদ্যমে সে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে!

যাহা হউক, এখন সৌরীনের সন্ধান করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া, কেবল শান্ত ভাবে বসিয়া মেয়েদের পড়া শিখান তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তার ব্যথিত ব্যাকুল চিত্ত প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিল ময়মনসিংহে সৌরীনের কর্ম্মক্ষেত্রে।

* * * *

নিত্যরঞ্জন কলিকাতায় থাকে তার সেবাসঙ্ঘের কর্ম্মীদের সঙ্গে। তেতলার একখানা ছোট ঘর, তার ভিতর আসবাবের ভিতর আছে শুধু একখানা তক্তপোষ ও একটা পাইন কাঠের টেবিল ও দুখানি চেয়ার। বিছানা কি আসবাব কোনও কিছুর মধ্যেই কোনও সৌষ্ঠব সম্পাদনের কোনও চেষ্টাই তার নাই।

অনেক টাকা তার হাত দিয়া আনাগোনা করে; কিন্তু তার একটি পয়সাও নিত্যরঞ্জন নিজের সুখ-সুবিধার জন্য খরচ করে না। তার নিজের যা টাকাকড়ি আছে, তাহাও সে সম্পূর্ণ নিজের কাজে খরচ করে না। অভাব যথাসাধ্য কমাইয়া, নিজে অত্যন্ত দীনভাবে থাকিয়া, সে তার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে তার সঙ্ঘের কাজে। কিন্তু তার এই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভিতর একটা প্রকাণ্ড অহঙ্কার আদ্যোপান্ত জড়াইয়া আছে। সে যে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, ইহাই তার প্রধান অহঙ্কার,—এ কথা বলিয়া এবং ভাবিয়া সে পরম আনন্দ লাভ করে।

নিজের বেশ-ভূষা সম্বন্ধেও সে একান্ত উদাসীন। তিন দিন তার ক্ষৌর-কার্য্য করা হয় নাই। লম্বা লম্বা চুলগুলির ভিতর চিরুণী-বুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এমনি বাহ্য দীনতা ও অপরিচ্ছন্নতার ভিতর তার অন্তরে বিরাজ করে একটা বিশ্বব্যাপী বিরাট অহঙ্কার!

সেদিন নিত্যরঞ্জন তার ঘরটিতে বসিয়া সঙ্ঘের কাজ করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি কর্ম্মীর সঙ্গে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল রেখা।

চমকিত হইয়া নিত্যরঞ্জন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তার গৃহের দৈন্য ও অশোভনতা তাকে লজ্জায় যেন অভিভূত করিল। তার বৈরাগ্যের অহঙ্কারের ভিতর তার সে কোনও আশ্রয় লাভ করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই দীনতার আবেষ্টনের ভিতর ওই গৌরবময়ী নারী-মূর্ত্তিকে সে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে পারিল না,—সে রেখাকে বসিতে বলিতেও কুণ্ঠিত হইল।

রেখাও লজ্জিত ভাবে তার আবেগভরা শুষ্ক মুখখানি নীচু করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যে কর্ম্মী যুবক তাহাকে এ ঘরে লইয়া আসিয়াছিল, সে চেয়ারখানা বাড়াইয়া দিল,—রেখা তাহাতে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল।

নিত্যরঞ্জন দেখিতে পাইল যে, এই কয় দিনের মধ্যে রেখা যেন শুকাইয়া আধখানা হইয়া গিয়াছে। নিত্যরঞ্জনের মনটা ইহাতে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তার চিঠি পাইয়াই যে রেখার এ দশা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে নিত্যরঞ্জনের বিলম্ব হইল না। রেখার এ করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাই তার বড় অনুতাপ হইল—কেন সে এই কোমল-হৃদয়া নারীকে এ মর্ম্মান্তিক সংবাদ জানাইতে গিয়াছিল? সে কিছু না লিখিলে তো রেখা ইহার চেয়ে স্বস্তিতে থাকিতে পারিত!

অনেকক্ষণ পর রেখা প্রথম কথা কহিল। বাগ্মী নিত্যরঞ্জনের রসনায় যেন কে পাথরের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিল।

রেখা বলিল, "আমি আপনাকে আবার কষ্ট দিতে এলাম।" বলিতেই তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। টস্

টস্ করিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

নিত্যরঞ্জনের হৃদয়ে একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যথার আক্ষোভ আরম্ভ হইল। অপূর্ব্ব লাবণ্যমণ্ডিত এই নারীর এ দুঃখ দেখিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। তার যেন মনে হইল যে, ইহার দুঃখ দূর করিবার জন্য সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ব্যস্ত হইয়া নিত্যরঞ্জন বলিল, "বলুন, কি ক'রতে হ'বে আমায়।"

"আপনি যদি দয়া ক'রে একবার আমার সঙ্গে ময়মনসিংহে যান তবে—"

তার আর কিছু বলা হইল না,—মনে হইল, যেন আর কথা বলিতে গেলে সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

নিত্যরঞ্জন বলিল, "বেশ তো, চলুন। কবে যেতে হ'বে?"

"আমি আজই যেতে চাই, যদি আপনার সুবিধা হয়।"

নিত্যরঞ্জন বলিল, "আমার সব সময়েই সুবিধা। ভব-ঘুরে মানুষ আমি— ঘুরে বেড়ানই আমার ব্যবসা।"

তার পর সেই রাত্রেই ময়মনসিংহ যাত্রা করা স্থির করিয়া রেখা নিত্যরঞ্জনের কাছে বিদায় গ্রহণ করিল। নিত্যরঞ্জন নীচে গিয়া গাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত তার প্রত্যুদ্গমন করিল।

গাড়ীতে বসিয়া ছিল আয়ার কোলে লতা। রেখাকে দেখিয়া সে হাত বাড়াইয়া তাকে মা বলিয়া ডাকিল। রেখা তাকে কোলে করিয়া চুমো খাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

নিত্যরঞ্জনের মুখ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া উঠিল। রেখার মেয়ে! তবে কি তার বিবাহ হইয়াছে?—না—? ভাবিতে নিত্যরঞ্জনের মাথার ভিতর হঠাৎ আগুন ছুটিল। তার ভয়ানক রাগ হইল রেখার উপর। এই সে! আর ইহারই উপর নিত্যরঞ্জনের এত করুণা হইয়াছে!

নিত্যরঞ্জন মনে মনে স্থির করিল—রেখার বিবাহ হইয়াছে, এবং লতা তার গর্ভজাত সন্তান। ইহাতে তার রাগ হইবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই, তবু তার রাগ হইল। কেন হইল, তাহা নিত্যরঞ্জন তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল না! সুধু তার রাগ হইল; তার মনে হইল—এই নারীর সৌরীন সম্বন্ধে এই আগ্রহ একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী।

আসল কথা এই যে, রেখার এই বিষাদ-ক্লিষ্ট মূর্ত্তি নিত্যরঞ্জনের বঞ্চিত নিষ্পেষিত যৌবনকে হঠাৎ জাগাইয়া তুলিয়া, তাহার সেবায় একাগ্র ও উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। এই সেবার আকাঙ্ক্ষার তলায় যে সুগুপ্ত প্রেমের প্রথম নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার উপর এই ক্ষুদ্র শিশুটি দারুণ আঘাত করিয়া নিত্যরঞ্জনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু নিত্যরঞ্জন তাহা বুঝিল না। সে সুধু রাগে ফুলিতে লাগিল!

সেই দিন রাত্রে সে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া রেখার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই প্রতীক্ষার ভিতর যে একটা চঞ্চলতা ছিল, তাহা নিত্যরঞ্জনের পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক। রেখার বিলম্ব দেখিয়া সে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, আর ক্রমেই রেখার উপর রাগ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন রেখা হঠাৎ আসিয়া একটা করুণ ম্লান হাসি হাসিয়া কৃতার্থতার সহিত বলিল, "এই যে আপনি এসেছেন।" তখন তার হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা ও উদ্বেগ দূর হইয়া সহসা সমগ্র অন্তর যেন জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

রেখা একলা আসিয়াছে—তার মেয়েটি সঙ্গে নাই।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশের মেয়ে কামরায় তাকে উঠাইয়া দিয়া নিত্যরঞ্জন বলিল "আপনার মেয়ে কোথায়? তাকে নিয়ে এলেন না?" এ প্রশ্নটা তার মনের ভিতর গোড়া হইতেই খোঁচা দিতেছিল,—কিন্তু কিছুতেই সে এতক্ষণ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না।

রেখা বলিল, "তাকে মার কাছে রেখে এলাম। ক' দিনই বা হ'বে আমাদের?"

—তবে তাই ঠিক। এটি তবে রেখারই মেয়ে! রেখা বিবাহিতা! কিন্তু কি বেহায়া! আর এর স্বামীটা কি ভেড়া। সে তার যুবতী স্ত্রীকে এমনি একলা পথে ছাড়িয়া দিয়াছে,—আর সে নিঃসঙ্কোচে একটা পরপুরুষের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর ঘুরিতেছে। এই পাশ-করা মেয়েদের ক্ষুরে নমস্কার। এরা সব করিতে পারে!—এমনি সব কথা অত্যন্ত অসংলগ্ন ভাবে নিত্যরঞ্জনের মনে হইতে লাগিল, আর সে রাগে ফুলিতে লাগিল।

(২২)

ময়মনসিংহে গিয়া রেখা জানিতে পারিল, নিত্যরঞ্জন কেবলই একটা উড়ো খবর পাইয়া সৌরীনের নামে মিথ্যা

কলঙ্ক দিয়াছে। সৌরীনের দোকানের প্রকৃত অবস্থা শুনিয়া তার অন্তর আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। সৌরীন দুঃখ পাইয়াছে, নিরাশায় হয় তো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তার গৌরবের আসন হইতে এক ধাপও নামিয়া যায় নাই। ইহাতে সে এতটা তৃপ্তি লাভ করিল যে, সে নিত্যরঞ্জনের উপর রাগ করিতে ভুলিয়া গেল।

সৌরীনের দেনার খবর লইয়া জানা গেল যে, তার নামে যে দশ হাজার টাকা ডিক্রী হইয়াছে, তার বেশীর ভাগই ভুয়া—যাদের টাকা সৌরীন সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছে, তাহারাও তার নামে একতরফা ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছে। তার প্রকৃত দেনা মায় সুদ প্রায় হাজার দুই টাকা। সে টাকা সে তার নিজের একজন দেনদারকে বরাত দিয়া গিয়াছিল, সে ফেরার হইয়াছে।

নিত্যরঞ্জন ময়মনসিংহে আসিয়াই তার ও সৌরীনের এক বন্ধু উকীলের সন্ধান করিয়াছিল। সেই উকীলটি অনেক খাটিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধানাদি করিয়া সমস্ত ডিক্রী আড়াই হাজার টাকা দিয়া মিটাইয়া দিল।

ব্যাপার শেষ হইলে নিত্যরঞ্জন তার উকীল বন্ধুটির সামনে একদিন রেখাকে বলিল, "আমার বিশ্বাস ছিল যে, উকীল জাতটা সমাজের একটা অনাবশ্যক ব্যাধিবিশেষ,—এখন দেখা গেল যে তাদের দিয়াও লোকের উপকার হয়।"

উকীল বন্ধু বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার নিজের কোনও দিন আবার নূতন ক'রে এ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে না হয়।"

এই সব ব্যাপারে তাদের প্রায় পোনেরো দিন কাটিয়া গেল। এ কয়দিন রেখা ডাক-বাঙ্গলায় ছিল,—নিত্যরঞ্জনকেও কাজেই সেইখানেই থাকিতে হইয়াছিল।

এই পোনেরা দিন দুইজনে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিল—সৌরীনের ব্যাপারটা পরিষ্কার করিবার জন্য। সব সময় তারা সেই আলোচনায় আর সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধানে এত তন্ময় ছিল যে, তাদের আর কিছু ভাবিবার অবসর ছিল না।

যখন এ বাসা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইল, তখন নিত্যরঞ্জনের মনের ভিতরটা একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বেদনা অনুভব করিল। এত দিন নিত্যরঞ্জন তার সেবা-সজ্জ লইয়া মত্ত হইয়া ছিল,—সেই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান—সেই তার তপস্যা। কিন্তু এ পোনেরো দিন তার সঙ্গের কথা একবারও মনে হয় নাই, কিম্বা এই কাজে এক ফোঁটা ক্লান্তি সে বোধ করে নাই। একটা আনন্দের স্বপ্নের ভিতর দিয়া তার এ কটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ এ সুখস্বপ্নের আসন্ন ভঙ্গের সময় তার মনটা আকুল হইয়া উঠিল।

সে আর এ কথাটা নিজের কাছে গোপন করিতে পারিল না যে, এই পোনেরো দিনের নিরন্তর সাহচর্য্যে সে রেখাকে একান্ত ভাবে কামনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কাজটির অবসরে রেখার পেলব হৃদয়ের সব কটি কোমল পাপড়ি এমন পরিপূর্ণ রূপে খুলিয়া তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল যে, তার পক্ষে রেখাকে ভাল না বাসিয়া উপায় ছিল না। তাই আজ আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় নিত্যরঞ্জন চঞ্চল হইল। কিন্তু সে চঞ্চলতা প্রকাশ হইল আত্মনিপীড়নের একটা প্রচণ্ড নিদারুণ চেষ্টায়। রেখাকে সে একান্ত ভাবে কামনা করে বলিয়াই যেন সে তাকে ঘৃণা করিতে লাগিল,—তাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে বলিয়াই সে আপনাকে তাহা হইতে যথাসম্ভব তফাৎ রাখিতে লাগিল। পাছে কথার কোনও ফাঁকে তার মনের কোমলতা প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় রেখার প্রতি তার বাক্য ও ব্যবহার প্রায় রূঢ় হইয়া উঠিল।

বৈকালে রেখা গিয়াছিল তার এক নারী-বন্ধুর কাছে—সে ময়মনসিংহ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী; ফিরিতে তার সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিত্যরঞ্জন একা বসিয়া তার প্রতীক্ষা করিতে করিতে ছটফটাইয়া উঠিল। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই তার অন্তর রেখার উপর সম্পূর্ণ অহেতুক ভাবে চটিয়া উঠিতে লাগিল। যখন রেখা ফিরিয়া আসিল, তখন সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

রেখাও ভয়ানক উন্মনা ভাবে আসিয়া বসিল। নিত্যরঞ্জন তাহাতে আরও চটিয়া উঠিল। সে যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল—রেখা আসিয়া ভয়ানক ব্যাকুল ভাবে তার বিলম্বের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিবে—রেখা সেরূপ করিলে সে অত্যন্ত মহানুভবতার সহিত সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। কিন্তু তার কিছুই হইল না। রেখা যেন আজ তাকে গ্রাহ্যই করিতেছে না।

সে ভাবিল, এই তো মেয়ে-লোকের স্বভাব—ভীষণ স্বার্থপর। যত দিন নিত্যরঞ্জনকে দিয়া তার প্রয়োজন ছিল,

তত দিন তার সঙ্গে কথার অন্ত ছিল না,—আজ সে প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, আজ সে একটা অনাবশ্যক আবর্জ্জনা বই কিছুই নয়। নিত্যরঞ্জন তার এই কল্পিত অবহেলায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

রেখা উন্মনা ভাবে এটা ওটা বাজে কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কোনও কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে নিত্যরঞ্জনই কথা বলিল। সে বলিল, "যাক, এখন তো আপনার কাজ হ'য়ে গেছে, এখন আমার ছুটি।"

রেখা খুব বিব্রত ভাবে বলিল, "বাস্তবিক, অনেক দিন অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনার কাজেরও বোধ হয় বড্ড ক্ষতি হ'ল। আর আপনাকে এখন কষ্ট দেব না। আপনার কাছে আমার দেনার অন্ত নাই।"

এই কথা শুনিবার জন্য নিত্যরঞ্জন কথাটা পাড়ে নাই। সে ছুটি চাহিল বলিয়াই রেখা তাকে এমনি করিয়া গলাধাক্কা দিবে—এ আশা সে করে নাই। তার অভিমান তাহাকে বলিয়াছিল—রেখা তাদের এ আসন্ন বিচ্ছেদে নিদারুণ ব্যথা বোধ করিবে এবং তার কথায় ও ব্যবহারে সে ব্যথার কতকটা প্রকাশ হইবে। তা নয়—এ কি?

সে বেশ ঝাঁঝের সহিত বলিল, "হাঁ, আমার অনেকটা ক্ষতি হ'য়ে গেছে। চলুন তবে কাল সকালেই যাওয়া যাক।"

রেখা বলিল, "হাঁ, আপনি কালই যান। আমি কলকাতায় গেলে আপনার সঙ্গে আবার দেখা ক'রবো—কিছু উপদেশ নেবার জন্য। আমায় আরও কয়েক দিন এখানে থাকতে হ'বে।"

নিত্যরঞ্জনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সে কোনও রূপ ভদ্রতার আচরণ পর্য্যন্ত না রাখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

রেখা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার আরও কিছু কাজ আছে।"

নিত্যরঞ্জনের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল! এই তবে তার পুরস্কার! তার কাছে রেখা তার মতলবটা প্রকাশ করিতেও প্রস্তুত নয়! এত অবিশ্বাস!—

ক্রমে নিত্যরঞ্জন সাব্যস্ত করিল, এর ভিতর কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে। রেখার যে প্রয়োজন সেটা প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। সে গোপন কাজটার পক্ষে নিত্যরঞ্জন অন্তরায় হইবে বলিয়া তাকে তাড়াইবার এই নির্লজ্জ আয়োজন! কিন্তু কি সে? কোন্ হতভাগ্য পতঙ্গকে এই পাপিষ্ঠা আপনার মোহের আগুনে আকৃষ্ট করিতেছে! তিন চার জনের কথা মনে হইল। তাদের সঙ্গে সৌরীনের ব্যাপার উপলক্ষে রেখার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাদের সঙ্গে রেখার ব্যবহারটা নিত্যরঞ্জনের কাছে বরাবরই বিসদৃশ মনে হইয়াছে। বেশ! বেশ!

ভয়ানক বিরক্ত হইয়া নিত্যরঞ্জন তার ঘরে গেল। তার পর সে রেখার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করিল না।

সারারাত্রি সে ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল। পরের দিন সকালে সে অত্যন্ত সংক্ষেপে রেখার কাছে বিদায় হইয়া চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

ময়মনসিংহে সৌরীনের যে কয়জন শিষ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে রেখা একত্র করিল। দুই একজন লোক সৌরীনকে বেশ শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রেখা তাঁহাদের হাতে সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়া তাঁহাদের দ্বারা সৌরীনের অসমাপ্ত কাজ আবার আরম্ভ করিয়া দিয়া গেল। মাসে মাসে সে টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া গেল।

রেখার যে নারী-বন্ধু ময়মনসিংহে চাকরী করিত, তার সঙ্গে যুক্তি করিয়া এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সে স্থির করিল যে, বাঙ্গলা ও বিহার উভয় গভর্ণমেণ্টকে সম্মত করিয়া সে তার বন্ধুটির সঙ্গে চাকরী বদল করিয়া লইবে।

এই সব ব্যবস্থা স্থির করিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। সেখানে গিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। তার পর পাটনায় যাইবার আগে সে নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিল।

নিত্যরঞ্জনকে যখন রেখা তার ময়মনসিংহের কাজের বিবরণ প্রকাশ করিয়া জানাইল, তখন নিত্যরঞ্জন একটু তৃপ্তিলাভ করিল এই ভাবিয়া যে, রেখাকে পাপীয়সী ভাবিয়া সে যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার কোনও হেতু নাই। কিন্তু তার চেয়ে রাগ তার বেশী হইল। এই যদি তার প্রয়োজন ছিল, তবে সে কাজে সে নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করিল

না, তাকে সে কাজের ভাগ দিল না কেন? তাকে এমন করিয়া গলহস্ত দিল কিসের জন্য?

রেখার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সে বিশেষ ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারিল না।

(২৩)

রেখার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সে পাটনা হইতে ময়মনসিংহের স্কুলে চাকরী লইয়া আসিয়াছে এবং নিজে "সৌরীন্দ্র আশ্রমের" কাজে অনেকটা সাহায্য করিতেছে।

সৌরীন্দ্র দীর্ঘ সাধনায় যে নিষ্ফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা হইল তার পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের সফলতার ভিত্তি। সৌরীন যে সব ভুল করিয়াছিল পরবর্ত্তীরা সে সব ভুল ক্রটি সংশোধন করিয়া কাজ করিতে লাগিল। কাজ বেশ চলিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যে চার পাঁচটি গ্রামে বেশ সুন্দরভাবে কাজ হইতে লাগিল। সেখানকার তাঁতি, জোলা, মুচি প্রভৃতি শ্রমজীবীদের অবস্থা ফিরিয়া গেল। তাই দেখিয়া অন্যান্য গ্রামের শ্রমিকেরা সৌরীন্দ্রের আশ্রমের দুয়ারে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। রেখার সর্ব্বস্ব সে এ কাজে ব্যয় করে—তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। সৌরীন্দ্র-আশ্রম সফলতা ও প্রতিষ্ঠায় দেশের মধ্যে একটা আদর্শ-স্থানীয় হইয়া উঠিল।

রেখা ইহাতে তৃপ্ত হইল। সে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সৌরীন্দ্র-আশ্রমের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিত। তার এ কাজে না ছিল ক্লান্তি, না ছিল তুষ্টি—একটা বৃহৎ কর্ম্মস্রোতের ভিতর গা ঢালিয়া দিয়াই সে তৃপ্তি পাইত।

লতা তার বুকের পুরাতন স্নেহবুভুক্ষা প্রচুর পরিমাণে তৃপ্ত করে। সে যতই বড় হইতে লাগিল, ততই তার ভিতর নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তার কাজ-কর্ম্ম, কথাবার্ত্তার ভিতর রেখা নূতন নূতন অমৃত-প্রস্রবণের সন্ধান পাইতে লাগিল। তার ভিতর সে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়া দিল।

তবু তার অন্তরের ভিতর একটা দারুণ শূন্যতা হাহাকার করে—তার তরঙ্গের আঘাতে তার হৃদয় বেদনায় লুটাপুটি খায়। মাতালের মত সে কাজে ডুবিয়া থাকে,—লতাকে লইয়া, সৌরীন্দ্র-আশ্রম লইয়া সে আপনাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখে—মনের সঙ্গে সে মুখোমুখী হইতে চায় না;—যখন না হইয়া উপায় থাকে না, তখনই তার ভিতর এই অন্ধকার বিরাট শূন্য একটা হিংস্র গর্জ্জনে তার অন্তর ফাটিয়া ছিঁড়িয়া ছারখার করিয়া ফেলে।

ময়মনসিংহে প্রথমবার আসিয়াই সে সৌরীনের খোঁজ করিবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করিয়াছে—নানা সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, কিন্তু দুই বৎসরের ভিতর সে তার কোনও সন্ধানই পায় নাই। সৌরীন ময়মনসিংহ হইতে কিছুদিন পরে ঢাকায় গিয়াছিল। সেখানে কিছু দিন প্রাইভেট টিউশনি করিয়াছিল—এ সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু তার পর যে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তার আর কোনও সন্ধান কেউ বলিতে পারিল না।

এত দিনে সৌরীনের কোনও সংবাদ না পাইয়া রেখা মনে মনে স্থির করিল, সৌরীন বাঁচিয়া নাই—যদি থাকিত, তবে কি সে রেখার শত শত করুণ মিনতিপূর্ণ বিজ্ঞাপন অগ্রাহ্য করিতে পারিত? সৌরীন্দ্র-আশ্রমের লম্বা লম্বা বিবরণ রেখা সব কাগজে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তার আশা ছিল যে, এ বিবরণ সৌরীনের দৃষ্টিতে পড়িলে, সে একবার তার এই কীর্ত্তি দেখিবার জন্য না আসিয়া পারিবে না,—যে স্বপ্নের সাধনায় সে আপনাকে নিঃস্ব করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিল, তারই প্রেমের উদ্দীপনায়, তারই আদর্শের অনুপ্রেরণায়, তারই একান্ত প্রিয়তমা রেখা যে সেই স্বপ্ন সফল করিয়া তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এটা দেখিবার লোভ সৌরীন কখনও সম্বরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন সৌরীন ইহার কোনও সংবাদই লইল না, তখন রেখা হতাশ হইয়া স্থির করিল সৌরীন বাঁচিয়া নাই।

এ কথা ভাবিতে তার অন্তরের সেই শূন্যতা একেবারে প্রাণের ভিতর তাণ্ডব নৃত্য লাগাইয়া দিল—রেখা অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সৌরীন যদি বাঁচিয়া না থাকে, তবে কিসের জন্য তার এ চেষ্টা;—তার সাধনার সফলতা যদি সৌরীন আসিয়া না দেখিল, তবে কেন এত নিষ্ফল আয়োজন? সে নিদারুণ হতাশায় ছটফট করিয়া উঠিল—জীবনের সমস্ত সাধ তার ফুরাইয়া গেল—শুধু লতা তাকে এ জগতের সঙ্গে একটি মাত্র সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধিয়া রাখিল।

ইহার পর রেখার জীবনে একটা মত্ত কর্ম্মোন্মাদ ও

একটা নিদারুণ অবসাদ পর পর তাকে আলোড়িত করিতে লাগিল। কিছু দিন সে পাগলের মত কাজ করে, বাহ্যজ্ঞান তার লোপ পায়, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সে কাজ করে—অনুভব করে যে এই কাজেই তার জীবনে একমাত্র সার্থকতা, একমাত্র সিদ্ধি। তার পর আসে অবসাদ, সমস্ত তিক্ত বিস্বাদ হইয়া উঠে, জীবনের বা কর্ম্মের আর তার কাছে কোনও মানে থাকে ন, কেবল লতাকে মানুষ করিয়া তোলা ছাড়া আর তার কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা সে খুঁজিয়া পায় না।

এক দিন সে এই অবসন্নতার অতল গহ্বরে পড়িয়া নিস্পন্দ হইয়া তার ঘরে বসিয়া ছিল। তার আয়া আসিয়া খবর দিল, নিত্যরঞ্জন আসিয়াছে। সে তার অবসন্ন দেহ কোনও মতে টানিয়া তুলিয়া নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

তার সে মূর্ত্তি দেখিয়া নিত্যরঞ্জনের বুকের ভিতর ছুরী বিঁধিয়া গেল। রেখার বেশভূষা কিছুই ছিল না। সে বেশভূষা আর করে না। পাড়ওয়ালা সাড়ীও পরে না। ঠিক বিধবার বেশ না করিলেও সে পরে সুধু নরুণ-পেড়ে একখানা ধুতি ও সাধা একটি ব্লাউজ—তাও খুব মোটা কাপড়ের। হাতে দুগাছা সূতার মত সরু চুড়ী। কেশের প্রসাধন সে বহু দিন ছাড়িয়া দিয়াছে। তার মুখ শুকাইয়া আম্‌সী হইয়া গিয়াছে—তাতে তার বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় হইয়া উঠিয়াছে—আর সমস্ত মুখখানিকে এক অপরূপ করুণ লাবণ্যে ভূষিত করিয়াছে।

নিত্যরঞ্জন মনে অনেক ক্ষোভ লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু সব ক্ষোভ তার মিলাইয়া গেল এক করুণ মর্ম্মবেদনায়।

রেখা যখন পাটনায় ফিরিয়া যায়, তখন নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, কিন্তু নিত্যরঞ্জন তাকে অতিরিক্ত রূঢ়তার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিল। সেই জন্ত তার পর রেখা আর তার সঙ্গে দেখা করে নাই বা তার কাছে কোনও সংবাদই দেয় নাই। একবার তার মনে হইয়াছিল যে, সৌরীন্দ্র-আশ্রমের পরিচালনা বিষয়ে নিত্যরঞ্জনের সাহায্য ভিক্ষা করে। কিন্তু তখন তার মনে হইল—সৌরীনের সঙ্গে নিত্যরঞ্জনের সেবা বিষয়ে মতামত ও কর্ম্মপ্রণালীর কত গুরুতর প্রভেদ ছিল। মনে পড়িল যে, নিত্যরঞ্জন সৌরীন্দ্রকে সেবাকার্য্য লইয়া বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা করিয়াছিল, এবং তার স্তায্য সম্মান হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল। সে স্থির করিল সৌরীনের স্মৃতিরক্ষা ও তার কর্ম্মানুষ্ঠানকে সফল করা বিষয়ে নিত্যরঞ্জনের সহায়তা লইলে সে সৌরীনের কাছে অপরাধী হইবে। সৌরীনের কি আদর্শ তাহা রেখা যেমন জানিত তেমন আর কেউ জানিত না। তার কর্ম্ম-পদ্ধতি ময়মনসিংহের অনুষ্ঠানের ভিতর পরিস্ফুট। সেই আদর্শ ও সেই পদ্ধতি রেখা একা, নিত্যরঞ্জনের সহায়তা না লইয়া, অনুসরণ করিবে, ইহাতে সে সফল হউক বা না হউক।

তাই নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে রেখার আর দেখা শোনা বা কোনও রকম সম্ভাষণই হয় নাই।

কিন্তু নিত্যরঞ্জন রেখাকে ভুলিতে পারে নাই। যতই তার রেখার উপর রাগ হইতেছিল, ততই সে তাকে কামনা করিতেছিল। আর যত কামনা করিতেছিল, ততই নির্ম্মম ভাবে আপনাকে নিষ্পেষিত করিতেছিল।

রেখার সংবাদ সে প্রায়ই পাইত। খবরের কাগজে তার সৌরীন্দ্র-আশ্রমের সংবাদ সে আগ্রহের সহিত পড়িত। পড়িয়া মুগ্ধ হইত, বিরক্ত হইত। রেখার অসামান্ত চরিত্র-গৌরব তাহাকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিত—তার সফলতায় তার মনে প্রশংসা ও আনন্দ সঞ্চারিত করিত—কিন্তু সে ঠিক সেই পরিমাণে বিরক্ত হইত এই ভাবিয়া যে, রেখার এই যে বিশাল আয়োজন, ইহার সঙ্গে তার কোনও যোগই নাই। রেখা তার কাছে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করে নাই। ইহাতে তার অন্তর অভিমানে ভরিয়া উঠিত। ইহাই যদি তার অভিপ্রায় ছিল, তবে সে কেন নিত্যরঞ্জনের নীরস শুষ্ক জীবনপথে রসের জীবন্ত মূর্ত্তির মত নামিয়া আসিয়াছিল—সুধু পোনেরটি দিন সে কেন তাকে সঙ্গী ও সহচর করিয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া—একপ্রাণ, একলক্ষ্য লইয়া কাজ করিয়াছিল! কোনও দরকার তো ছিল না। রেখার মত মেয়ে একা ময়মনসিংহে গিয়া নিজেই সব কাজ করিতে পারিত—নিত্যরঞ্জনকে সঙ্গে লইবার, তাকে সাহায্য করিবার অধিকার দিবার কোনও দরকার ছিল না।

শুধু তাই তো নয়—সে পোনেরো দিন তো তারা সুধু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করে নাই—তারা যে অন্তরঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। অন্ততঃ নিত্যরঞ্জনের মনে হইয়াছিল যে, রেখা তার সঙ্গে খুব বেশী সহৃদয়তা—বুঝি বা স্নেহ, বুঝি বা একটু প্রেম—দেখাইয়াছিল। রেখার

হাসি, অশ্রু, তার আলাপ, সম্ভাষণ—সকলের ভিতর নিত্যরঞ্জন দেখিতে পাইয়াছিল অনেক জিনিষ—দেখিয়াছিল নিত্যরঞ্জনের উপর তার একান্ত নির্ভরতা! নিত্যরঞ্জনের কাছে সে প্রাণ খুলিয়া বলিত তার সব সুখ-দুঃখের কথা, আশার কথা, নিরাশার কথা। তার কাছে সে হাসিত, তারই কাছে কাঁদিত—আর নিত্যরঞ্জনের মনে হইত, যেন এ হাসি কান্নার ভিতর দিয়া সে ঢালিয়া দিত তার সমগ্র অন্তর।

কিন্তু যেই তার কাজ শেষ হইয়া গেল, অমনি রেখা হঠাৎ যেন নিত্যরঞ্জনের হাতের মুঠা হইতে পিছলাইয়া গেল, আর সে তার নাগাল পাইল না। সে তখনি শম্বুকের মত কঠিন খোলের ভিতর ঢুকিয়া নিত্যরঞ্জনকে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল—কথায় নয়, ব্যবহারে।

কেন এমন হইল? একবার নিত্যরঞ্জন ভাবিত, এ কেবল রেখার খামখেয়ালী—তার নারীসুলভ চাতুরী! তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রেখা নিত্যরঞ্জনকে তার নারী-চরিত্রের সব ছলা কলা দিয়া ভুলাইয়াছিল। তার কাজ ফুরাইয়া গেলে তাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। এ কথা ভাবিতে তার অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু আবার সে ভাবিত যে, রেখা তো কোনও তুচ্ছ প্রয়োজনে তাকে ডাকে নাই, কোনও তুচ্ছ সুখের লালসায় তো সে নিত্যরঞ্জনকে বর্জ্জন করে নাই—সে যে একটা মহৎ কর্ম্মে আপনাকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন করিয়াছে, একটা দুরায়াসলভ্য আদর্শের অনুশীলনে আত্মনিবেদন করিয়াছে। সে তো তুচ্ছ নারী নয়, সে মহীয়সী! যারা খামখেয়ালী, খেয়ালের বশে পুরুষের হৃদয় লইয়া ছিনি-নি-নি খেলে, সে মেয়ে তো রেখা নয়! এ কথা ভাবিতে নিত্যরঞ্জনের দিব্যচক্ষু খুলিয়া যাইত। সে দেখিতে পাইত, রেখা সৌরীনের প্রেমে সন্ন্যাসিনী—নিত্যরঞ্জনকে সে কোনও দিন এক ফোঁটা স্নেহ করে নাই, সুধু সৌরীনের বন্ধু বলিয়া সে তাকে তার কাজের একটুকু ভাগ দিয়াছিল।

ঐ কথা ভাবিতে নিত্যরঞ্জনের সুখ হইত না—হইত একটা নিদারুণ হিংসা, একটা অসহনীয় জ্বালা! সৌরীন কী এমন, যার জন্য রেখা এমন করিয়া নিত্যরঞ্জনকে তুচ্ছ করে! দুইটা পরীক্ষায় সে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল সত্য, কিন্তু জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে কোথায় সৌরীন আর কোথায় নিত্যরঞ্জন! তবু রেখার কাছে কি না সেই অপদার্থ সৌরীনই সব, আর নিত্যরঞ্জন কিছুই না,—ছটো কথা কহিবারও যোগ্য নয়।

তা ছাড়া তার সৌরীনের উপর আরও বেশী রাগ হইত এই ভাবিয়া যে, রেখা সেই অপদার্থটার জন্য এমন ভাবে আপনাকে বিনাশ করিতেছে,—জীবনটাকে তুচ্ছ করিয়া দুই হাতে উড়াইয়া দিতেছে। আর নিত্যরঞ্জন তার প্রেম লইয়া সে জীবন সার্থকতায় ভরিয়া দিবার জন্য তাহার দুয়ারে বৃথাই ঘা মারিতেছে! এ রেখার একটা অন্যায় বাড়াবাড়ি। নিত্যরঞ্জন যদিও চির দিনই বড় গলায় হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে, তবু এক অলভ্য দূরগত পুরুষের প্রতি এ ঐকান্তিক নিষ্ঠা তার চোখে আজ ভাল লাগিল না। রেখার বেদনা তাহার অন্তরকে পীড়ন করিল—তার নিজের জীবনের ব্যর্থতা-বোধ তাহাকে অন্ধ করিয়া দিল। সে রেখার ত্যাগ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর প্রশংসা করিবার বা আনন্দ দিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না—সে দেখিল, ইহার ভিতর শুধু একটা নিরর্থক আত্মপীড়ন।

অনেক বার তার মনে হইয়াছে যে, একবার রেখার সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া এ কথা আলাপ করিয়া সৌরীনের প্রতি তার এই অদ্ভুত নিষ্ঠা হইতে তাহাকে বিরত করে। মনে মনে রেখার কল্পনা-মূর্ত্তি চক্ষের সামনে স্থাপন করিয়া সে অনেক দিন তার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রচণ্ড তর্ক করিয়াছে, রেখার সকল যুক্তি বার বার করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু, খুব বেশী আকৃষ্ট হইয়াও সে একবারও রেখার কাছে উপযাচক হইয়া যাইতে সাহসী হয় নাই। তার প্রথম কারণ রেখার উপর অভিমান—সে কেন একবার ডাকে না। তা ছাড়া একটু সঙ্কোচ, একটু ভয়ও ছিল। সে যদি রেখার সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে দেখা শোনা, আলাপ সালাপ করিতে যায়, তবে রেখা নিশ্চয় ভাবিবে, তার মতলব ভাল নয়—হয় তো সে তাকে ঘৃণা করিবে। এ পর্য্যন্ত রেখা নিত্যরঞ্জনকে মোটের উপর ত্যাগী, চরিত্রবান পুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধাই করিয়া আসিয়াছে। রেখার প্রেমলাভ করিবার অনিশ্চিত—প্রায় অসম্ভব আশায় সে এই শ্রদ্ধাটুকু হারাইতে সাহস করে নাই। তাই অনেকবার ময়মনসিংহে যাইবার জন্য তল্পীতল্পা বাঁধিয়াও নিত্যরঞ্জন শেষ মুহূর্ত্তে তার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে।

শেষে এক দিন সে সত্য সত্যই ময়মনসিংহে গিয়া রেখার গৃহে গিয়া দেখা দিল।

অনেক কথা সে তৈয়ার করিয়া আসিয়াছিল, অনেক তর্ক-যুক্তি সে সংগ্রহ করিয়াছিল,—রেখার পক্ষে অনেক উত্তর কল্পনা করিয়া তাহা নিরস্ত করিবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু রেখার করুণ উদাস মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার সে সব অতল জলে ডুবিয়া গেল,—তার বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল শুধু একটা নিবিড় বেদনার অসহ্য আলোড়ন—একটা নাম-রূপ-শূন্য অনির্দ্দিষ্ট কান্নার সুর!

রেখাকে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "এ কি, তোমার এ কি মূর্ত্তি?"

এত দিন মনের নিভৃত কন্দরে রেখার সঙ্গে অভিসার করিয়া সে তাকে এমন আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে ভুলিয়া গেল যে, রেখাকে সে বরাবর 'আপনি' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছে, এবং তাই তার করা উচিত।

রেখা তার চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া সুধু বলিল, "কেন? কি হ'য়েছে?"

"কি হ'য়েছে!—একেবারে যে আম্‌সী হ'য়ে গেছ।"

আবার একটু হাসিয়া রেখা বলিল, "আমার চেহারা তো কোনও দিনই সুন্দর ছিল না।"

"সুন্দর!—যা'ক, সে কথা বলে আর তোমার অভিমান বাড়াব না। কিন্তু রূপের কথা বলছি না। বলছি, তুমি এমনি করে আপনাকে মেরে ফেলবে স্থির ক'রেছ না কি?"

"তাই যদি হয় তাতে ক্ষতি কি? মেয়ে মানুষের জীবন যত বড় হয় ততই দুঃখ।"

"এ কথা তোমার মুখে শুনবো আশা করিনি—এই আপনার মুখে!"

এতক্ষণে নিত্যরঞ্জনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তার পক্ষে রেখাকে 'তুমি' সম্বোধন যে অত্যন্ত অশোভন এ কথা খেয়াল হইতে নিত্যরঞ্জন ভয়ানক লজ্জিত হইয়া উঠিল।

রেখাও একটু লজ্জিত হইল। সে বলিল, "আপনি আমাকে 'তুমি'ই ব'লবেন—আপনি যে আমার দাদা।"

কথাটায় যেন নিত্যরঞ্জনকে চাবুক মারিল। সে কিছুক্ষণ কথা কহিল না। গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

রেখা বলিল, "আপনি ভাল আছেন?"

নিত্যরঞ্জন অনেক মুশাবিদা করিয়া স্থির করিল, এই প্রশ্ন ধরিয়া সে ক্রমে আসল কথাটা পাড়িবে। তাই সে হাসিয়া বলিল, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভাল মন্দের খবরে কার কি প্রয়োজন বলুন।"

রেখা বলিল, "সে কি? আপনার ভাল মন্দে যে দেশের সবার প্রয়োজন আছে।"

এইবার নিত্যরঞ্জন একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তার প্রেম ব্যক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু ঠিক সেই সময় লতা আসিয়া রেখার কোল জুড়িয়া বসিল। এই মেয়েটা নিত্যরঞ্জনের ভাবনা চিন্তা সব এলোমেলো করিয়া দিল। নিত্যরঞ্জনের বক্তৃতা আর করা হইল না। সে স্থির করিল, রেখাকে প্রেম নিবেদন করিবার পূর্ব্বে এই লতার ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে হইবে।

সুতরাং কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর রেখা বলিল, "পোড়াকপাল আমার! আমি দিব্যি বসে আপনাকে বকাচ্ছি,—আপনার নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া হয় নি।"

নিত্যরঞ্জন বলিল, "না—কিন্তু সেজন্য ব্যস্ত হ'বেন না, আমি সুপতির ওখানে যাচ্ছি"—

"না না, সে কি! আপনি যে দুদিন আছেন, এখানেই থাকুন। আমাদের আশ্রমটা একবার দেখে শুনে যাবেন।"

এ নিমন্ত্রণে নিত্যরঞ্জন প্রীত হইল। সে রেখার বাড়াতেই রহিয়া গেল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নিত্যরঞ্জন রেখার কাছে লতার প্রকৃত বিবরণ শুনিল। তার মন হইতে একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। ইহার পর সে তার অবসর খুঁজিতে লাগিল।

রেখা যে বাড়ীতে থাকিত, সেটা তার আশ্রমেরই বাড়ী। একতলায় আশ্রমের আফিস ও কতক কারখানা আছে। দুই চারজন কর্ম্মীও বাস করে, দোতলায় থাকে রেখা ও তার সঙ্গী দুটি নারী-কর্ম্মী। নিত্যরঞ্জন তাদের এই উপরের গৃহস্থালীর ভিতর স্থান পাইয়াছিল।

রেখার সঙ্গে তার দেখা-শোনা খুব বেশী হয় না, আর যাও বা হয় তাহা নির্জ্জনে নয়। স্কুলের কাজের অবসরে যেটুকু সময় রেখা পায়, তার সবটুকুই সে আশ্রমের লোকজন লইয়া আশ্রমের কাজে ব্যয় করে। কাজেই নিত্যরঞ্জনের অবসর পাইতে কিছু বিলম্ব হইল।

কিন্তু তার এ আশ্রম ছাড়িয়া যাইবার বিশেষ তাড়া না থাকায়, একদিন তার সুযোগ জুটিয়া গেল।

রেখা সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সকলকে বিদায় দিয়া তার বসিবার ঘরে একা উদাস প্রাণে বসিয়া ছিল। বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া সে একটা সোফার উপর এলাইয়া পড়িল।

তার অন্তর জুড়িয়া ছিল তখন একটা ব্যর্থতার হাহাকার—ক্ষুধাতুর শূন্য হৃদয়ের তীব্র শুষ্ক আর্ত্তনাদ। সে ইহা সহিতে পারিল না, ক্রমে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিত্যরঞ্জন বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিতে পাইল রেখার এই দীন মূর্ত্তি। এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে রেখার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তার গায় হাত দিতে তার ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ হইল—কিন্তু তার বুক ঠেলিয়া একটা আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চালাইয়া লইল,—এই বেদনার মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া সঙ্কোচের বাধা কাটিয়া গেল। সে রেখার হাতখানি ধরিয়া মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কাঁদছো তুমি রেখা?" তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড বেগে হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

রেখা নিত্যরঞ্জনের এ স্পর্দ্ধায় রাগ করিল না, বরং বিশাল সীমাশূন্য অস্নেহের সাগরে পড়িয়া সে নিত্যরঞ্জনের এই সহানুভূতিটুকু পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কোনও কথা কহিল না।

নিত্যরঞ্জন বলিল, "রেখা, কেঁদো না, আমার কাছে বল, তোমার কিসের ব্যথা—আমাকে তোমার দুঃখের ভাগ দেও।"

রেখা কতকটা সংযত হইয়া উঠিয়া বসিল। নিত্যরঞ্জন বিনা নিমন্ত্রণেই তার পাশে একটু তফাতে বসিল। রেখার হাতখানা তার হাতেই রহিল।

নিত্যরঞ্জন বলিল, "শোন রেখা, অনেক দিন হ'ল তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি, ব'লতে সাহস পাই নি। আজ না বলে পারি না। ধৃষ্টতা হয় তো ক্ষমা করো। তুমি এমনি ক'রে নিজেকে ব্যথা দিচ্ছ, এমন ক'রে আপনার মূল্যবান জীবন নষ্ট ক'রছো, এ আমি সইতে পারি না। তোমার কথা ভাবতে আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যায়। কেন এমন ক'রছো? কেন তুমি আত্মহত্যা ক'রছো? জীবনে তোমার সুখ নেই ভেবেছ? ভুল ভেবেছ। সুখ তোমাকে দুই হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রতে চাচ্ছে, তুমি সুধু কঠোর প্রতিজ্ঞা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখছো। কি এতে লাভ? কেন এ ক'রছো। সন্ন্যাস ভাল কথা, কিন্তু নিরর্থক আত্মপীড়ন তো সন্ন্যাস নয়। নইলে আত্মহত্যার চেয়ে বড় ধর্ম্ম জগতে থাকতো না।"

রেখার মনে কথাগুলি অনেক দীর্ঘ চিন্তা-সূত্রের সৃষ্টি করিল। সেগুলি অনুসরণ করিতে গিয়া সে কথা কহিবার অবসর পাইল না। নিত্যরঞ্জন আবার বলিল, "তুমি যে কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছ জীবনে, তা' আমি তোমায় ছাড়তে বলি না, কিন্তু সে কাজ এমন ক'রে করলে তো চলবে না—সে কাজ ক'রতে হ'বে আনন্দের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে,—তাতে জীবনের সার্থকতা-বোধ থাকা দরকার। এমন ক'রে আপনাকে পীড়ন ক'রে তো সে ধর্ম্ম-সাধন করা যাবে না।—তোমায় সুখী হ'তে হ'বে"—

রেখা সুধু বলিল, "সে আর এ জীবনে নয়!"

নিত্যরঞ্জন বলিল, "এই জীবনেই হ'বে। এমন ক'রে তোমায় আমি নষ্ট হ'তে দেব না। আমাকে সুধু ভার দেও রেখা, আমি তোমার দুঃখের বোঝা বই, তোমাকে সুখী করি। তোমার এ ব্যথা দেখে আমার জীবন মরুভূমি হ'য়ে যাচ্ছে—আমি কাজের শক্তি হারিয়েছি, উৎসাহ হারিয়েছি। কেবল তোমার ঐ ব্যথাতুর মুখখানি আমার দৃষ্টির ক্ষেত্র আচ্ছন্ন ক'রে র'য়েছে। আমাকে রক্ষা কর রেখা, আপনাকে রক্ষা কর!"

রেখা হাত টানিয়া লইয়া সংযত হইয়া বসিল। তার বুকের ভিতর টিপ টিপ করিতে লাগিল। তার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল অনেক দিনের পুরাতন চিত্র—সৌরীন যখন তার পাশে বসিয়া এমনি করিয়া প্রেম নিবেদন করিত। তার মনের ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় মিশ্রভাবের সৃষ্টি হইল। সৌরীনের সেই প্রিয় স্মৃতি তাহাকে ব্যথিত করিল। অথচ তার উদাস স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ে নিত্যরঞ্জনের প্রীতি যেন মরুভূমে বারির মত বর্ষিত হইয়া তার অন্তর স্নিগ্ধ করিয়া দিল। একটু লোভ হইল, তার চেয়ে বেশী হইল ভয়। তার চঞ্চল চোখের ভিতর ফুটিয়া উঠিল ত্রস্তা হরিণীর ভাব।

কিন্তু সে সরিয়া গেল না, নিত্যরঞ্জনকে তিরস্কারও করিল না, সুধু বলিল, "কি ব'লছেন আপনি ?"

নিত্যরঞ্জন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি বলছি বুঝতে পারছো না রেখা ? বুঝতে হবে তোমায়। বলছি আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমার সুখ দুঃখের ভার বইতে চাই। আমি পারি না তোমাকে তোমার জীবন এমনি ক'রে নষ্ট ক'রতে দিতে।"

রেখা স্তব্ধ ভাবে পাথরের মূর্ত্তির মত নিত্যরঞ্জনের দিকে সুধু চাহিয়া রহিল। তার বোধশক্তি চলিয়া গেল, কোনও কিছু ভাবিবার শক্তি তার রহিল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা তার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে সুধু বসিয়া রহিল।

নিত্যরঞ্জন আর একটু অগ্রসর হইল। হাত বাড়াইয়া রেখার একখানা হাত টানিয়া লইল। রেখা বাধা দিল না—তার মনের অসাড় নিস্পন্দতার উপর দিয়া যেন একটা তৃপ্তির মৃদু সমীরণ-স্পর্শ খেলিয়া গেল। নিত্যরঞ্জন বলিল, "হাঁ রেখা, আমি তোমায় ভালবাসি। বল রেখা, আমাকে বিমুখ ক'রবে না—আমাকে ভার দেবে তোমাকে সুখী করবার ?"

রেখা চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তার বুকের ভিতর দুম দাম শব্দ হইতে লাগিল। সহসা কি একটা তুমুল পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের বন্যা তার পাথর-চাপা হৃদয়ের ভিতর দিয়া বহিয়া তাহাকে নাচাইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

নিত্যরঞ্জন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া মেঝের উপর রেখার পায়ের কাছে বসিয়া রেখার দুই হাত চাপিয়া ধরিল—

এমন সময় বাহিরে কে বলিল, "আমি আসতে পারি।"

যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শে চমকিত হইয়া রেখা উঠিল। সে ছুটিয়া দুয়ারের কাছে গেল।

দ্বারের কাছে যাকে দেখিল, তাহাকে দেখিয়া রেখা এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে তার মুখের দিকে চাহিল। সে একটা দীন বেশী ভিক্ষুক। পরিধানে তার ছিন্নবাস। মাথার চুলে জটা ধরিয়া গিয়াছে। অযত্ন-রক্ষিত দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকিয়া গিয়াছে। রোগে জীর্ণ-শীর্ণ সে মূর্ত্তি—তবু অপূর্ব্ব দ্যুতিমান তার চক্ষু।

আগন্তুক রেখার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে ডাকিল, "রেখা !"

রেখা এতক্ষণে নিশ্চয় জানিল—সে সৌরীন !

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মুর্শিদাবাদ

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোকচিত্র—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম-আর-এ-এস্ এবং লেখককর্ত্তৃক গৃহীত)

(২)

মুর্শিদাবাদ সহরের উপকণ্ঠের উত্তর দিকে স্থিত জিয়াগঞ্জের দিক হইতে নৌকা-যোগে ভাগীরথী দিয়া আসিতে পূর্ব্বপারে জাফরগঞ্জ ও উহার বিপরীত দিকে পশ্চিম পারে নবাব সিরাজদ্দৌলার মনসুরগঞ্জ ও হীরা ঝিল প্রাসাদের স্থান আছে। ৩রা তারিখে অপরাহ্নে বড়নগর হইতে জলপথে ফিরিবার সময় আমাদিগের তরণী হীরাঝিলের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে ভাগীরথীর এই দিকের পাড় অত্যন্ত খাড়া এবং বর্ষাকালে তরঙ্গাঘাতে এই দিকের পাড় ভাঙ্গিয়া থাকে। ভাঙ্গা পাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের ও হীরা ঝিলের প্রমোদ-উদ্যানের ইমারতগুলির বজ্রের ন্যায় মজবুদ, ও অতিশয় স্থূল ভিতের গাথনিগুলি পাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাড়ের উপরে বন জঙ্গল হইয়াছে। স্থানটি নির্জ্জন, এক স্থানে ভগ্ন পাড়ের নীচে নদী-সৈকতে দুইজন মুসলমান নমাজ পড়িতেছে। নদী-সৈকতে নির্জ্জনে ভগবানকে ডাকিবার এমন সুন্দর স্থান অধিক মিলে না। আমরা ও এই দুইটি প্রাণী ছাড়া আর কাহাকেও এই স্থানে দেখা গেল না।

পাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিব বলিয়া মাঝিকে নৌকা লাগাইতে বলিলাম। সে তীরের সন্নিকটে নৌকা আনিয়া জলের দিকে তাকাইতে কহিল। আমরা দেখিলাম যে, ইষ্টক-নির্ম্মিত ইমারতের অতি বৃহৎ পাকা গাথনির ভগ্ন অংশ জলের মধ্যে পড়িয়া আছে। মাঝি কহিল, ঐ

গুলির সহিত যদি তাহার নৌকার ধাক্কা লাগে, তবে নৌকা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু তথাপি সে আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিল না; কারণ, ইতিপূর্ব্বে, তাহার প্রার্থনা অনুসারে, নৌকাসহ তাহার একখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। সে উক্ত ফটোগ্রাফের একখানি পাইবার প্রত্যাশা করে বলিয়া, বিপদ তুচ্ছ করিয়া, অতি সন্তর্পণে তীরে নৌকা লাগাইল। আমরা তখন ঢালু পথ দিয়া পাড়ের উপরে উঠিলাম। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, দুই পার্শ্বে শান-বাঁধান অতি বিস্তৃত উচ্চ মেঝের ন্যায় আছে। উহার স্থানে স্থানে আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষাদি আছে।

রোসনী-বাগ—সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সমাধি-গৃহ

এই জনমানবহীন নির্জ্জন স্থানের মধ্য দিয়া আমরা পদব্রজে কিয়দ্দূর দক্ষিণ দিকে যাইয়া দেখিলাম, একটি পরিত্যক্ত বেগুণের ক্ষেত্র ও তাহার পশ্চিম প্রান্তে নিম্ব-ফলাকৃতি পিতলের ধ্বজশোভিত একটি পূর্ব্বদ্বারী একচূড়, অর্দ্ধভগ্ন পরিত্যক্ত শিবমন্দির আছে। মন্দিরটির চতুষ্পার্শ্বে কাঁটা-গাছ হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে একটি শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছেন। কোন ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি—উক্ত মন্দির জনৈক সাধু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কোন কোন ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি—এই মন্দিরটি এবং মুর্শিদাবাদের সন্নিকটস্থ অনুরূপ অপর কতকগুলি মন্দির লালাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের ও হীরা ঝিলের আর কিছুই দেখিবার নাই। গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া এই স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে—এই স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সিরাজদ্দৌলা তাঁহার মাতামহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে প্রাসাদ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আলীবর্দ্দী উহা দেখিতে আসিলে, সিরাজ তাঁহাকে কৌশলে একটি গৃহে বন্দী করেন; এবং সমাগত জমীদারগণ অর্থ দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তিনি আলীবর্দ্দীকে মুক্তি দিবেন না—ইহা প্রকাশ করেন। অগত্যা জমিদারবর্গ যথেষ্ট অর্থ দিয়া আলীবর্দ্দীর উদ্ধার সাধন করেন। এই স্থান হইতেই সিরাজ পলাসীর যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন; এবং পলাসীর প্রাঙ্গণে পরাজিত হইয়া তিনি এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভগবানগোলা অভিমুখে পলায়ন করেন। এই স্থানেই ক্লাইব মির্জাফরকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়াছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মির্জাফর এই স্থানের প্রাসাদে বাস করিতেন। এই স্থানেই সিরাজের ধনাগার ছিল। হীরাঝিলের ঝিল ও প্রাসাদ ভাগীরথী-গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। "রিয়াজে" লিখিত আছে—এই স্থানটি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বহুদূর-বিস্তৃত পরিত্যক্ত স্থানের উত্তর দিকে "ফাররাবাগের" ধ্বংসাবশেষ ও ডাহাপাড়া নামক হিন্দুপল্লী অবস্থিত। এই অঞ্চলে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হিন্দুদিগের শ্মশান আছে। এই স্থানে সিক্ত সৈকতের মৃত্তিকা খনন করিয়া নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ শবদেহ প্রোথিত করিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সেগুলিকে শৃগাল ও কুকুর খুঁড়িয়া বাহির করিয়া আহার করে। এখানে ভাগীরথী-সৈকতে যত্র-তত্র ছিন্ন বস্ত্র ও শয্যাদি, বংশদণ্ড, নরকঙ্কাল ও নরমুণ্ডাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া পথিকের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে।

যে স্থানে "ফাররাবাগ" উদ্যানের চিহ্নমাত্র অবস্থিত আছে, ঐ স্থানটি নবাব সাহেবের বর্ত্তমান প্রাসাদের বিপরীত দিকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই স্থানে মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজস্ব-সংগ্রাহক অত্যাচারী নাজির আহম্মদ একটি উদ্যান-বাটিকা রচনা করিতে আরম্ভ করে। বাকী রাজস্বের জন্য নাজির আহম্মদ জমিদারদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। এ কারণ নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া, এই বাগানটি স্বয়ং সুসজ্জিত করিয়া উহা প্রমোদ-কাননে পরিণত করেন এবং ইহার নাম "ফাররাবাগ" বা "সুখ কানন" রাখেন। বিলাসী নবাব এই রমণীয় উদ্যানে রমণীগণ সহ জলকেলি করিতেন এবং হোলি উৎসবের সময় তাহাদিগের সহিত আবির ও কুঙ্কুম লইয়া ক্রীড়া করিতেন। এই স্থানে ভাগীরথীর জলে অতি বৃহৎ পাকা ইমারতের ভগ্নস্তূপ ঐরাবতের মত পড়িয়া আছে। ফাররাবাগের অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইয়াছে।

ফাররাবাগের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ডাহাপাড়া নামক প্রাচীন হিন্দুপল্লী অবস্থিত। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে লইয়া আসেন, সেই সময় উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ মিত্রবংশ-সম্ভূত কানুনগো দর্পনারায়ণ ও অন্যান্য হিন্দু কর্ম্মচারীগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই মুর্শিদ কুলী খাঁর মুস্তৌফী দপ্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী উলা'র মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মিত্র মুস্তৌফী ঢাকা হইতে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। তৎপরে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শিবরাম তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়া এইখানেই বাস করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঢাকা হইতে আগত হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা এখানে যে ঢাকা-পাড়া প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, 'ডাহাপাড়া' তাহার অপভ্রংশ মাত্র। দর্পনারায়ণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী বহু হিন্দু জমিদার এই স্থানে স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ বংশীয় "বঙ্গাধিকারী"দিগের এই স্থানে প্রাধান্ত ছিল। এই পল্লীতে আজিও বহু প্রাচীন কোঠা বাড়ী ও বহু হিন্দুর বাস আছে। এখানে বাজার ও পোষ্টাফিস আছে। কিরীটেশ্বরী এই পোষ্টাফিসের অধীন।

ফাররাবাগের দক্ষিণে "রোসনীবাগ"। এই স্থানে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত কবর স্থানের বা মকবরার উঠানের মধ্যস্থলে একটি একতলা কোঠা আছে। উহার মধ্যস্থলে নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর উচ্চ ও বৃহৎ কবর আছে। ১১৫১ হিজরি ১৩ই জেলহজ্জ বা ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বিলাসী কিন্তু বিনয়ী, দাতা ও উচ্চমনা নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। এই মকবরার মধ্যে আরও কয়েকটি কবর আছে। এই সমাধি-স্থানের প্রবেশ-দ্বার উত্তর দিকে। ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ডাইন বা পশ্চিম প্রান্তে একটি তিন-গুম্বজ-শোভিত মসজিদ আছে। উহা দেখিতে সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্ববর্ণিত খুসবাগ মকবরার মসজিদের ন্যায়। উঠানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণায় একটি চতুষ্কোণ ছোট ঘর এবং উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় একটি অষ্টকোণ ছোট ঘর আছে। বর্ত্তমানে এই মকবরাটি পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে।

মকবরার বহির্ভাগে উত্তর দিকে একটি এক-চূড় মন্দির আছে। উহার ধ্বজ এতদঞ্চলের হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বজের ন্যায় পিতল-নির্ম্মিত। ইহা শিব অথবা গণেশের মন্দির হইবে। এই স্থানে জনমানব নাই।

এইগুলি ব্যতীত মুর্শিদাবাদ সহরের উপকণ্ঠে পূর্ব্বে বর্ণিত মবারক-মঞ্জিলের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে নিশাত বাগ নামক স্থানে নবাবদিগের একটি প্রমোদ-উদ্যান ছিল,—বর্ত্তমানে তথায় একটি গোপপল্লী মাত্র আছে।

পূর্ব্বে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বেই মুর্শিদাবাদ সহর অবস্থিত ছিল। বহু পূর্ব্বে ভাগীরথীর উভয় পারে ইহার দৈর্ঘ্য ১ মাইল ও বেড় ৩০ মাইল ছিল। পলাসীর যুদ্ধের সময় প্রকৃত সহর ভাগীরথীর উভয় পারে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ২॥০ মাইল প্রশস্ত ছিল বলিয়া শুনা যায়। মুর্শিদাবাদের অধঃপতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই স্থানের অভিজাতবর্গের মধ্যে—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে—ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অবৈধ প্রণয়াদির প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। সার উলিয়ম হাণ্টার (Hunter's "Rural Bengal") করুণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গ দেশ জুড়িয়া যে মহাকাল-রূপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, যাহার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "আনন্দমঠে" করিয়াছেন,—উহা মুর্শিদাবাদের যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করিয়াছিল শুধু দুর্ভিক্ষ নহে, উহার সহিত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সে সময় মুর্শিদাবাদের যত্রতত্র লোক মরিয়া শৃগাল কুকুর ও শকুনীর ভক্ষ্য হইয়াছিল। এই সময় হইতে মুর্শিদাবাদের পতন আরম্ভ। তৎপরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই স্থান হইতে সর্ব্ব প্রধান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত উঠাইয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়ায় ও অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস যাবতীয় দপ্তর কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া যাইবার পর হইতে, ইহা অবনতির চরম সীমায় পঁহুছিয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাবের পূর্ব্ব-প্রতাপের কিছুই অবশিষ্ট নাই। মির্জাফর হইতেই প্রতাপ কমিয়া আসিতেছিল, নবাব নাজিমের সকল ক্ষমতা ইংরাজদিগের গবর্ণর জেনারেল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নবাবকে চিরতরে রাজ্যশাসনের দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। অনেক দিন হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে ভাতা পাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান নবাব মুর্শিদাবাদের ইন্দ্রভবন-তুল্য সুসজ্জিত বৃহৎ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করিয়া থাকেন।

রোসনীবাগ—গণেশের মন্দির

মুর্শিদাবাদের বাসন, রেশমী বস্ত্র, বালাপোষ, মৃন্ময় কুঁজা ও হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে যে সকল উৎসব হয়, তন্মধ্যে "ব্যারা" উৎসব বিশেষ বিখ্যাত। এই উৎসবটি হিন্দু-মুসলমান সকলেই পালন করেন। শুনা যায় যে, এই উৎসবটি নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। দরিয়ার পীর বা জলদেবতা খোজা খিজিরের সম্মানার্থ এই উৎসবের সৃষ্টি। উৎসবটি এই—বৎসরে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে মুর্শিদাবাদের আপামর জনসাধারণ সন্ধ্যাগমে কলার ভেলার উপরে কাগজের নৌকায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া ভাগীরথী-বক্ষে ভাসাইয়া দেয়। এই দিন নবাব-বাহাদুরের একটি বৃহৎ কলার ভেলা আলোক-মালায় সজ্জিত করিয়া ভাগীরথী-বক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। উহা ৪০ ফিট দীর্ঘ ও উহার

গঠন বজরার ন্যায়। সর্ব্বশেষে নানাবিধ আতসবাজি পোড়াইয়া এই উৎসব করা শেষ হয়।

বড়নগর।

৩রা এপ্রেল প্রাতে ৬টার সময় আমরা উত্তর দিকে বড়নগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। নিজামৎ কিল্লা, জাফরগঞ্জ, নসীপুর, জগৎশেঠের পরিত্যক্ত ভিটা ও সতীচৌরা অতিক্রম করিয়া নির্জ্জন পথ ধরিয়া গাড়ী ছুটিল। ৭টার সময় ই, বি, রেলের মালগাড়ী চলাচলের শাখা লাইন অতিক্রম করিয়া চলিলাম। মালগাড়ী যাতায়াতের জন্য এই অস্থায়ী লাইনটি জিয়াগঞ্জ হইতে ভাগীরথী-বক্ষের অস্থায়ী কাষ্ঠনির্ম্মিত পুলের উপর দিয়া পরপারে ই, আই, রেলের আজিমগঞ্জ ষ্টেসন পর্য্যন্ত গিয়াছে। অবশেষে আমরা জিয়াগঞ্জ সহরের মধ্য দিয়া ভাগীরথী-তীরে নিমতলা নামক ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ঘাট বলিতে এখানে কিছুই নাই, একটি নিম গাছ আছে বলিয়া ইহার "নিমতলা" নামকরণ হইয়াছে। ঘাটের নিকটেই ধনবান মাড়োয়ারীদিগের বড় বড় বাড়ী ও ২।৩টি জৈন মন্দির আছে। ঘাটের সন্নিকটেই বালুচর বাজার, তথায় রেসমের বস্ত্র, বাসন ও মিষ্টান্নাদির অনেকগুলি দোকান আছে। ঘাটে আসিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। মাঝির সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, সে আমাদিগকে বড়নগরের ঠাকুর বাটী, সাধুর বাগ ও পূর্ব্ববর্ণিত হীরাঝিল প্রভৃতি দেখাইয়া মুর্শিদাবাদে বাসার নিকটস্থ ঘাটে নামাইয়া দিবে।

বড়নগরের ভাগীরথীবক্ষে আমাদের তরণী

নৌকা উত্তর দিকে বড়নগর অভিমুখে চলিল। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে জিয়াগঞ্জ ও বালুচর এবং পশ্চিম পারে আজিমগঞ্জ সহর। আজিমগঞ্জ সহরটি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে রাঢ় দেশে অবস্থিত বলিয়া অধিক বন জঙ্গল নাই। সহরটি দেখিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ছবির ন্যায়। কিন্তু জিয়াগঞ্জ ও বালুচর ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে বাগড়ী দেশে অবস্থিত বলিয়া বন জঙ্গল আছে; এবং দেখিতে আজিমগঞ্জের ন্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নহে। ভাগীরথীর উত্তর পারে জিয়াগঞ্জে ও আজিমগঞ্জে ওসোয়াল জাতীয় ধনী মাড়োয়ারী জমিদার ও ব্যবসাদারদিগের বাসস্থান আছে। আজিমগঞ্জ সহরের দক্ষিণ প্রান্তে কাঁকা মাঠের মধ্যেই ই, আই, রেলের আজিমগঞ্জ জংসন ষ্টেসন অবস্থিত। ভাগীরথীর বক্ষে অস্থায়ী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া ই, বি, রেলের মালগাড়ী যাতায়াতের অস্থায়ী লাইনটি বর্ষার কয়মাস বন্ধ থাকে। তখন ভাগীরথী-বক্ষের অস্থায়ী সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এতদঞ্চলে ভাগীরথী-গর্ভে জলের গভীরতা স্থান বিশেষে ২।২॥ ফিট হইতে ২৫।৩০ হাত পর্য্যন্ত আছে। যেখানে জল অত্যন্ত কম, সেখানে মাঝি অতি সন্তর্পণে লগি ঠেলিয়া নৌকা চালাইলেও, জল-মধ্যস্থ চড়ায় ঘন ঘন নৌকা বাধিয়া যাইতে লাগিল। জিয়াগঞ্জ ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর উত্তর দিকে যাইলে, আজিমগঞ্জে ভাগীরথী-তীরে যে স্থানে ধুধুরিয়াদিগের বাটী আছে, উহার পাদদেশে ভাগীরথী-গর্ভে ২৫।৩০ হাত গভীর জল আছে। জল নীলবর্ণ ও পুষ্করিণীর জলের ন্যায় স্থির। জলের উপরিভাগ অত্যন্ত অপরিষ্কার। আজিমগঞ্জের ভাগীরথী-তীরবাসী মাড়োয়ারীগণ ভাগীরথী জলে অপরিষ্কার বস্ত্রাদি ধৌত করায়, উহার ময়লা জলের উপরে সরের ন্যায় ভাসিতেছে। এই স্থানের গভীর জলে অসংখ্য মৎস্য আছে; কারণ, জৈনগণ এই স্থান বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া মৎস্য ধরা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রচুর মৎস্য আছে বলিয়া এই স্থানে কুম্ভীরও আছে। শুনিলাম, কিছুকাল পূর্ব্বে এই স্থান হইতে একটি বালককে কুম্ভীরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। আজিমগঞ্জে যে স্থানে ধুধুরিয়াদিগের বাটী আছে, উহার পাদদেশে ভাগীরথী-বক্ষে স্থানীয় মাড়োয়ারী বা কাঁইয়া ধনীদিগের জল-ভ্রমণের জন্য কয়েকখানি মাঝারি ও ছোট বোট বা বজরা এবং একখানি ছোট মোটর বোট ভাসিতেছে।

আজিমগঞ্জ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে যাইতে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে যেখানে, উচ্চ পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তথায় ভাঙ্গা পাড়ের ধারে কোথাও কূপের পাট, কোন স্থানে উনান ও পাকা বাটীর ভিত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এককালে এই নির্জ্জন পাড়ের উপরে মনুষ্যের বাস ছিল—ইহা তাহারই নিদর্শন। সে সকল লোক নাই; কিন্তু তাহাদিগের পরিত্যক্ত স্মৃতিচিহ্ন আজি পথিকের মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছে। এই স্থানে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে লোহাগঞ্জ নামক স্থানে পাড়ের উপরে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট লাল বর্ণের ছোট শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণ-দ্বারী, ইহার সম্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকের উপর নানাবিধ মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য খোদিত আছে। মন্দিরমধ্যে

একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ আছেন, উহার চারি পার্শ্বে চারিটি ও উপরিভাগে একটি নরমুণ্ড খোদিত আছে,—অর্থাৎ শিবলিঙ্গটি পঞ্চানন। মন্দিরের পশ্চিম দিকের খোলা রোয়াকের উপরে তিনটি কাল পাথরের সরু শিবলিঙ্গ মেঝেয় গাঁথা আছে। দেখিলাম—২১১টি ফুল দিয়া পূজা সম্পন্ন করা হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে বড়নগর হইতে আজিমগঞ্জ যাইবার সরকারি কাঁচা রাস্তা আছে। উহার পশ্চিম পার্শ্বে জটাজুট-শোভিত একটি প্রাচীন ও বৃহৎ বটগাছ আছে। মন্দিরের

বড়নগর যাইবার পথে লোহাগঞ্জের বাঙ্গালা শিবমন্দির

উত্তর-পশ্চিম দিকে রাস্তার পরপারে ৺গোপীনাথ ঠাকুরের মোহান্তের শুভ্রবর্ণের বৃহৎ অট্টালিকা আছে। মোহান্ত মহাশয় হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব। নৌকা হইতে তীরে নামিয়া খাড়া উচ্চ পাড়ে আরোহণ পূর্ব্বক উক্ত শিবমন্দিরটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া পুনরায় নৌকা খুলিয়া দিয়া বড়নগর অভিমুখে চলিলাম।

অল্প দূর যাইয়াই ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বড়নগরের কাছারী-ঘাটে উপস্থিত হইলাম। নাটোর বড় তরফের রাজ-কুমারের বড়নগর জমিদারীর অন্যতম কর্ম্মচারী ও পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বে আমার পত্র পাইয়া বড়নগর পর্য্যন্ত আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই ভরসায় বড়নগরে আসিলাম। যখন বড়-নগরের ঘাটে পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় ৮৷৷৯টা। পাড়ের উপরে উঠিলেই ডাইন দিকে একটি হরিদ্রাভ ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। অদূরে বামে ভগ্ন গৃহের স্তূপ এবং সম্মুখে নাটোরের রাজ-কাছারি ও কয়েকটি মন্দির আছে। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া পূর্ণবাবু আমাদিগের নিকটে আসিয়া পরিচয় লইলেন এবং সঙ্গে করিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে চলিলেন।

ঘাটের উপরেই যে ছোট শিবমন্দিরটি আছে, উহা অল্পকাল মধ্যে ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। মন্দিরটি রাণী ভবানী কর্তৃক নির্ম্মিত। এই প্রকারের শিবমন্দির বীরভূম জেলার শিউড়ীতে দেখিয়াছি। ভাগীরথীর পাড়ের উপরে যে রাস্তা আছে, উহার পশ্চিমে, নাটোরের বড় তরফের মহারাজার একতলা কাছারীবাটী আছে। উহারই একটি প্রকোষ্ঠে বড়নগরের ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস বিদ্যমান। কাছারী বাটীর সম্মুখের ভূমিখণ্ডে ভগ্ন গৃহাদির স্তূপ আছে।

কাছারীর পশ্চিম দিকে একটি অত্যুচ্চ অষ্টকোণ শিবমন্দির আছে। উহার নিম্নভাগ দেখিতে নদীয়া জেলার শিবনিবাসের ৺রাজরাজেশ্বর শিবের বৃহৎ অষ্টকোণ মন্দিরের নিম্নভাগের ন্যায়। এই বৃহৎ মন্দিরটির ঊর্দ্ধদেশ দেখিতে একটি বৃহৎ ধুতুরা ফুলের ন্যায়—যেন একটি ধুতুরা ফুল উপুড় করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দির চূড়া লৌহ-ত্রিশূল-শোভিত। মন্দির-গাত্রে মিহি সুরকীর জমাটের উপরে সপুষ্প লতিকা, পুষ্প-মালিকা, পদ্মপুষ্প, কানাই বলাই ও সিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খোলা রোয়াক আছে, রোয়াকে অযত্নে কাঁটা নটের গাছ ও আগাছা জন্মিয়াছে। রোয়াকের পশ্চাতে গর্ভ-মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট বারান্দা আছে। এই

বড়নগর ভাগীরথীতীরে একটি শিবমন্দির

বারান্দার ৮টি ফোকর বা খিলান-করা দ্বার আছে। বারান্দাটি বহু দিনের পক্ষীর বিষ্ঠায় অপরিষ্কার হইয়া আছে। এই বারান্দা বেষ্টিত

যে গর্ভমন্দিরটি আছে, উহা অষ্টকোণ। দক্ষিণ দিকে ইহার প্রবেশ-দ্বার। এই দ্বারের উপরে যে শিলালিপি ছিল, তাহা বর্ত্তমানে নাই। গর্ভ-মন্দিরের উপরিভাগে আলোক ও বায়ু-প্রবেশের জন্ত ৮টি ঘুলঘুলি বা ক্ষুদ্র গবাক্ষের স্থান ছিল। তাহা পরে ইষ্টক দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরতলে মধ্যস্থলে একটি কাল পাথরের অষ্টকোণ বেষ্টনী বা গণ্ডী আছে। তাহার মধ্যস্থলে একটি কাল পাথরের বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছেন। এই শিবলিঙ্গটি শিবনিবাসের ৺রাজরাজেশ্বর শিব অপেক্ষা অনেক ছোট। ইঁহার নাম ৺ভবানীশ্বর। ইঁহার মস্তক ও গাত্র ফাটিয়া গিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইল না যে ইঁহাকে কোন যত্ন করা হয়। আমাদের দেশে আমাদের নিজের বাটীর ও অপর ব্যক্তিদিগের শিব সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়াছি যে, প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গাদিতে নিয়মিত তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ বা জল না পড়িলে, উহা ফাটিয়া যায় এবং ফাটিয়া গেলে বিসর্জ্জন দিতে হয়। এখানে দেখিলাম যে, ফাটা ঠাকুরেরও পূজার অভিনয় চলিতেছে। 'বিশ্বকোষ' লিখিয়াছে যে, রাণীভবানী ১৬৭৫ শকে কাশীধামে ভবানীশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ; এবং সেই বৎসরেই বড়নগরে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এক্ষণে রাণী ভবানীর গুরুবংশীয়দিগের সম্পত্তি। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একতলা ভোগের ঘর ছিল ; উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিলাম যে, রাণী ভবানীর গুরুকুলের বর্ত্তমান বংশধরগণ বাৎসরিক কয়েক সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু শিব ও শিবমন্দিরের অবস্থা দেখিয়া আদৌ বোধ হইল না যে এগুলির প্রতি কোন যত্ন লওয়া হয়।

এই শিবমন্দিরের পশ্চিম দিকে নাড়ুগোপালের দোল ও রাসমঞ্চের একতলা কোঠা ঘর আছে। ইহারই পশ্চিম দিকে নাড়ুগোপালের পূজাবাটী আছে, ইহার সদর দ্বার পূর্ব্বদিকে। দ্বারের দুই পার্শ্বে তারেশ্বর শিবের দুইটি একচূড় মন্দির আছে। উহাদের সম্মুখ-দেশে বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট খিলান-শোভিত প্রবেশদ্বার মন্দির-গাত্র হইতে পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই শিবমন্দিরদ্বয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া সন্দেহ হইল যে, এই দুইটি মন্দিরও বোধ হয় রাণী ভবানীর গুরুকুলের দখলে আছে।

শিবমন্দিরদ্বয়ের মধ্যস্থ দরওয়াজা দিয়া নাড়ুগোপালের একতলা চকমিলান বাটীতে প্রবেশ করিলে, উত্তর দিকের দক্ষিণ-দ্বারী ৫ ফোকর-শোভিত একতলা কোঠায় কাল পাথরের সুশ্রী নাড়ুগোপাল অধিষ্ঠিত আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। উঠানের দক্ষিণ দিকে আর একটি ৫ ফোকর শোভিত একতলা কোঠা আছে, এবং পশ্চিম দিকে ৩ ফোকরযুক্ত আর একটি একতলা কোঠা আছে। কোঠাগুলির গাত্র মিহি সুরকী দিয়া মাজা। এই নাড়ুগোপাল বিগ্রহটি রাণী ভবানীর কন্যা তারা দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নাড়ুগোপালের স্মৃতি ফলকে যাহা লিখিত আছে, তাহা অতি কষ্টে এইরূপ পাঠ করা যায়—

"খ শূন্য মিত্র শকে শ্রী
ভবানী তনু সম্ভবা
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা
শ্রীমদ্গোপাল মন্দিরম্॥"

বড়নগর ঠাকুরবাড়ীর দৃশ্য

শুনিলাম—বর্ত্তমানে রাণী ভবানীর পৌত্রবধূ রাণী জয়মণির দত্তক-বংশীয়গণ এই বিগ্রহের সেবাএত নিযুক্ত আছেন। নিত্যসেবার জন্ত নাড়ুগোপালের বাটীতে একজন পূজারি, একজন পাচক ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত আছে।

নাড়ুগোপালের বাটীর উত্তর দিকে একটি নবসংস্কৃত রক্তবর্ণের শান-বাঁধান বেদী আছে। ইহা রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র বিখ্যাত সাধক রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ড আসন। শুনা যায় যে, রাজা রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনার সহায় উত্তর সাধক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করিয়া এই বড়নগরে ভাগীরথী তীরে এই বিখ্যাত গীতটি রচনা করিয়াছিলেন—

"ভোলা! মন যদি মোর ভুলে
তবে বালির শয্যা কালীর নাম
দিয়ো কর্ণমূলে।

এ দেহ আপনার নয়, রিপুসঙ্গে চলে,
দেরে ভোলা জপের মালা
ভাসাই গঙ্গা-জলে ॥
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে" ॥

এই পঞ্চমুণ্ডাসনের পশ্চিম দিকে একটি ত্যক্ত পুষ্করিণীর খাত ও বন জঙ্গল আছে। ইহাই গোপাল পুষ্করিণী।

উক্ত নাড়ুগোপালের বাটীর দক্ষিণ দিকে দশভুজার একতলা কোঠা আছে। এই বাটীর প্রবেশদ্বার উত্তর দিকে। বাটীটি সম্প্রতি সুসংস্কৃত হইয়াছে। বাটীর মধ্যস্থ বিস্তৃত উঠানের উত্তর দিকের একতলা ঘরে উচ্চ বেদার উপরে তিনটি পিত্তলের বা অষ্টধাতুর ছোট বড় দশভুজা মূর্ত্তি আছে। এগুলির গঠন-প্রণালী যশোহর জেলার মহম্মদপুরে স্থিত বিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের (যাহা এক্ষণে নাটোরের বড় তরফের রাজকুমার শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র রায়ের অধিকার আছে) দশভুজা মূর্ত্তির ন্যায়। গৃহমধ্যে পূর্ব্বদিকে স্থিত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মূর্ত্তির নাম ৺করুণাময়ী। ইঁহার পশ্চিম দিকে স্থিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আর দশভুজার নাম ৺জয়দুর্গা, এবং তাহার পশ্চিমদিকে স্থিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দশভুজার নাম ৺রাজরাজেশ্বরী। মূর্ত্তি কয়টিই অতি সুশ্রী। প্রত্যেক মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া অপ্সরা বা স্ত্রী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা আছে। ৺রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিটি রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ৺জয়দুর্গা মূর্ত্তি রাজা রামজীবন কর্ত্তৃক স্থাপিত, এবং ৺করুণাময়ী মূর্ত্তি রাণী ভবানীর পিত্রালয় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রাম হইতে আনীত। দেবোত্তর সম্পত্তি সহ এই মূর্ত্তিগুলি নাটোরের বড় তরফের রাজকুমারের তত্ত্বাবধানে আছে। বিগ্রহ কয়টী সযত্নে রক্ষিত এবং ইঁহাদিগের নিত্যপূজার ব্যবস্থা ভাল বলিয়াই বোধ হইল। নাটোরের বড় তরফের কর্ত্তৃত্বাধীনে মহম্মদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের বিগ্রহ ও মন্দিরগুলির যে অবস্থা দেখিয়াছি, এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। এই ঠাকুরবাটীতে একজন পূজারি, দুইজন পাচক ও ভৃত্যাদি আছে। দুর্গা ও বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বিশেষ ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে।

দশভুজার বাটীর পূর্ব্ব দিকে আর একটী পৃথক প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র মহলের মধ্যস্থ উঠানের উত্তর দিকে একটি ছোট একতলা কোঠা ঘরে স-রাধিকা দারুময় বৃহৎ ৺মদনগোপাল মূর্ত্তি আছেন। অতি সুশ্রী মূর্ত্তি, দেখিতে ঠিক যেন মহম্মদপুরে স্থিত রাজা সীতারাম রায়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দারুময় ৺হরেকৃষ্ণ মূর্ত্তির ন্যায়। এই উভয় মূর্ত্তির মধ্যেই সজীবতা ও দেব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ঘরের মধ্যে স্ফটিকের ও প্রস্তরের কয়েকটি বাণলিঙ্গ শিব, একটি প্রস্তরের নাড়ু-গোপাল মূর্ত্তি, একটি প্রস্তরের প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি, একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ও দুইটি অষ্টধাতু-নির্ম্মিত সুশ্রী দশভুজা মূর্ত্তি আছেন। মদনগোপাল মূর্ত্তিটি রাজসাহী জমিদারীর প্রাচীন অধীশ্বর বড়নগর-অধিপতি রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রাজসাহী জমিদারী ও বড়নগর নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁর কৃপায় নাটোর রাজবংশের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে উদয়নারায়ণ এই সকল জমিদারীর অধীশ্বর ছিলেন। উদয়নারায়ণের জমিদারীর সহিত তাঁহার বিগ্রহগুলিও নাটোরের রাজবংশের হস্তগত হয়। এই গৃহে যে কয়টি বিগ্রহ আছে, তাহার কোনটিই বোধ হয় নাটোরের রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। সম্ভবতঃ এগুলি সমস্তই রাজা উদয়নারায়ণের বা অপর কোন লোকের বিগ্রহ, এবং সেই জন্যই বোধ হয় এগুলিকে একটি পৃথক ক্ষুদ্র ঘরে রাখিয়া একই স্থানে বিভিন্ন বিগ্রহের পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই গৃহে হয়গ্রীব নামক একটি মূর্ত্তি আছে; উহা কুসুমগোলার কুসুমেশ্বরের

বড়নগর—ভবানীশ্বর শিবের বৃহৎ অষ্টকোণ মন্দির

বিগ্রহ। দুই প্রহরের সময় আমরা এই মদনগোপালের বাটীতে অন্ন-প্রসাদ পাইয়াছিলাম। এই ঠাকুর-বাটীতে নিত্য সেবার জন্য একজন পূজারি, পাচক, ভৃত্য ও পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। ঠাকুর-বাটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে একটি করিয়া দ্বার আছে।

এই ঠাকুর-বাটীর পূর্ব্ব-দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ভাগীরথীর দিকে যাইতে পথের দুই পার্শ্বে মন্দির ও গৃহাদির ইষ্টকময় ভগ্নস্তূপ আছে। স্তূপগুলির পূর্ব্বদিকে একটি ঠাকুর-বাটী আছে। উহার নাম দ্বাদশ শিবের চারিবাঙ্গালা মন্দির। উহা রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর-বাটীর মধ্যস্থলে একটি উঠান আছে। উঠানের চারি দিকে কারুকার্য্য-খচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট চারিটি শিবমন্দির আছে। উঠানের উত্তর দিকের মন্দিরটির সম্মুখভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কারুকার্য্য আছে। মন্দিরটি তিন-ফোকর-বিশিষ্ট। মধ্যের ফোকরের

উপরিভাগে দুই পার্শ্বে রাম-রাবণের যুদ্ধ উৎকীর্ণ আছে। রাম হনুমানের স্কন্ধে চাপিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, আর রাবণ অস্ত্রাদি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া যোড় হস্তে রামের স্তব করিতেছেন। পার্শ্বস্থ একটি ফোকরের উপরিভাগে কৃষ্ণ-বলরাম-মূর্ত্তি ও শিশুপাল-বধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা উৎকীর্ণ আছে। পার্শ্বের অপর ফোকরটির উপরিভাগে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্ত্তিগুলি অতি মসৃণ। অতি মিহি সুরকীর সহিত অতীব পরিষ্কৃত চুণ মিশাইয়া মসলা বানাইয়া উহা জমাইয়া এই মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত করিয়া মাজিয়া মসৃণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে খোলা রোয়াক ও তৎ পশ্চাতে মন্দিরাভ্যন্তরে তিনটি কাল পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। মধ্যস্থলের শিবটির চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের বেষ্টনী বা গণ্ডী দেওয়া আছে। মন্দিরের ছাদের উপরিভাগে তিনটি ধ্বজ আছে। প্রত্যেক ধ্বজে তিনটি করিয়া পিতলের নিম ফলের ন্যায় পদার্থ আছে ও তদুপরি বৃহৎ ত্রিশূল আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব-দিকের গাত্র হইতে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের ন্যায় গাঁথনি বাহির হইয়া আছে। উহার ছাদ বাঙ্গালা ঘরের চালের ন্যায়, এবং উহার সম্মুখদেশ খোলা। ইহার মধ্যে একটী অতি বৃহৎ ও সুশ্রী হস্তপদ-বিশিষ্ট মহাদেব-মূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। ইহার একটী হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি সুরকী ও পরিষ্কৃত চুণ মিশাইয়া মসলা প্রস্তুত করিয়া উহা দ্বারা গড়িয়া পরে মাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরের সন্নিকটস্থ একটী বৃক্ষের ডালে প্রকাণ্ড এক মৌচাক হইয়া আছে। মন্দির-গাত্র হইতে এরূপ বাহির-করা মন্দির ও তন্মধ্যে এরূপ বৃহৎ ও সুশ্রী সজীববৎ মহাদেব আজ পর্য্যন্ত অন্য কুত্রাপি দেখি নাই। বড়নগরের যাবতীয় মন্দির-মধ্যে কারুকার্য্য হিসাবে এই মন্দিরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর মিহি চুণ-সুরকী জমাইয়া নির্ম্মিত পুত্তলিকাদি এই ঠাকুরবাটীর আর একটী বাঙ্গালা শিবমন্দিরের সম্মুখভাগে দেখিয়াছি এবং কালনায় বর্দ্ধমানের মহারাজার ঠাকুরবাটীতে (৺লালজীর বাটীর সম্মুখস্থ) প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী কর্ত্তৃক ১২৫৩ সালে নির্ম্মিত শিবমন্দিরের গাত্রে ও হুগলী জেলার সুখড়িয়া গ্রামে মুস্তৌফীদিগের ৺আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর মন্দিরের সম্মুখভাগে দেখিয়াছি, অন্য কুত্রাপি দেখি নাই।

বড়নগর—রাজরাজেশ্বরী দশভুজা

এই ঠাকুরবাটীর উঠানের পশ্চিমে যে বাঙ্গালা মন্দির আছে, উহা পূর্ব্ব-দ্বারী। উহাও তিন-ফোকর-বিশিষ্ট। উহার মধ্যের ফোকরের উপরিভাগে পূর্ব্বোক্ত রূপ মিহি ও পরিষ্কৃত চুণ-সুরকী জমাইয়া নির্ম্মিত রাম-রাবণের যুদ্ধ ও অন্যান্য পৌরাণিক ঘটনা ও মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটির সম্মুখে খোলা রোয়াক ও তৎপশ্চাতে গর্ভমন্দিরে তিনটি কাল পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটির চতুর্দ্দিকে কাল পাথরের গণ্ডী দেওয়া আছে। মন্দিরের উপরে তিনটি ত্রিশূল আছে।

উঠানের দক্ষিণ দিকের তিন-ফোকর-যুক্ত বাঙ্গালা মন্দিরের সম্মুখ-দেশে সামান্য কারুকার্য্য ও পদ্মপুষ্পাদি ইষ্টকে খোদিত আছে, কিন্তু কোন পুত্তলিকা নাই। মন্দিরমধ্যে পূর্ব্বোক্ত রূপ তিনটি শিবলিঙ্গ আছে ও মধ্যের লিঙ্গটির চতুর্দ্দিকে গণ্ডী আছে। মন্দিরের উপরিভাগে তিনটি ত্রিশূল আছে। উঠানের পূর্ব্ব দিকে একটি তিন ফোকরযুক্ত বাঙ্গালা মন্দির আছে। উহার গাত্রে সুরকীর জমাট করিয়া তাহার উপরে বালির জমাটে সপুষ্প লতিকাদি ও যৎসামান্য কারুকার্য্য আছে।

এই চারি-বাঙ্গালা মন্দিরের আনুমানিক মাপ সম্মুখদেশে ২৯॥ ফিট × পার্শ্বে ১৫॥ ফিট। মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝের মাপ ২৪ ফিট × ১০' ফিট, দেওয়ালের স্থুলতা ৩॥ ফিট। মন্দিরের সম্মুখের রোয়াক ৬॥ ফিট প্রশস্ত। এই চারিটি মন্দিরের প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া ফোকর বা দ্বার আছে। এই দ্বারগুলির চৌকাঠ স্থুল কাল পাথরের। এই পাথরগুলি গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই সুন্দর চারিবাঙ্গালা মন্দিরের বর্ত্তমান সেবাএত তাঁহার গুরু-বংশীয়গণ। দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যে, মন্দির ও বিগ্রহ-গুলির যত্ন লওয়া হয় না। মন্দির কয়টি ভাল মালমসলা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া, অযত্নে থাকা সত্ত্বেও আজিও ঝঞ্ঝাবাতকে উপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে। শিবগুলির উপরে ২।১টি অর্দ্ধ-শুষ্ক পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া বুঝা গেল যে আজিও কোন প্রকারে পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরগুলির একটিরও কবাট নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে দেবোত্তর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও রাণীভবানীর অমূল্য মন্দির ও বিগ্রহগুলি এই প্রকার অযত্নে রহিয়াছে। এই দেবালয়গুলি সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরবের সামগ্রী, এগুলি নষ্ট হইলে আর হইবে না।

চারিবাঙ্গালা ঠাকুর-বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে, আজিমগঞ্জ যাইবার

পথের দুই পার্শ্বে জটাজুট-শোভিত তিনটি অতি বৃহৎ ও প্রাচীন বটবৃক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত বিশাল ডালপালা বিস্তৃত করিয়া ছায়া-শীতল করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ঠাকুরবাটী ও এই বটবৃক্ষগুলির দক্ষিণ দিক দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি প্রশস্ত খালের খাত আছে। এই খালটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিরীটেশ্বরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। জপতপের জন্য শীঘ্র নৌকাযোগে কিরীটেশ্বরী যাইতে পারিবেন বলিয়া সাধক রাজা রামকৃষ্ণ বড়নগর হইতে কিরীটেশ্বরী পর্য্যন্ত এই খালটি কাটাইয়াছিলেন।

উক্ত চারিবাঙ্গালা ঠাকুরবাটীর উত্তর দিকে একটি অসম্পূর্ণ গৃহের কয়েকটি দ্বারের খিলান দণ্ডায়মান আছে। স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির নিকট শুনিলাম, যে, রাজা রামকৃষ্ণের পুত্র বিশ্বনাথের হস্তপরগণার অসম্পূর্ণ কাছারীর ইহাই স্মৃতিচিহ্ন।

আর একটি বাঙ্গালা ঘর আছে। মন্দিরটির সম্মুখদেশে নানাবিধ নক্সা ও মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরমধ্যে তিনটি শিবলিঙ্গ আছেন, ইঁহাদিগের নাম গঙ্গেশ্বর। রাণী ভবানী বাটী ও বিগ্রহসহ এই মন্দিরটি গুরুকে গঙ্গাবাসের জন্য দিয়াছিলেন। এই মন্দিরে পূজার ভাল ব্যবস্থা আছে বলিয়া বোধ হইল। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে একটী উচ্চ একচূড় শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে রাণী ভবানীর মাতা কস্তুরী দেবীর নামানুসারে কস্তুরীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন। রাণী ভবানীর মাতার অপর নাম জয়দুর্গা।

শুনা যায় যে রাণীভবানী বড়নগরে ১০৮টী শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ২৮টী শুদ্ধ প্রাপ্ত হন। শিবগুলির দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকাংশ কাশীতে ছিল, কিন্তু ইংরাজের কৃপাকটাক্ষে সে সকল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হয়। রাণীভবানীর গুরুর নাম রুদ্রানন্দ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদিগের আদিবাস রাজসাহী জেলার পাকুড়িয়া নামক স্থানে। গুরুবংশের বর্ত্তমান বংশধর জনৈক যুবক এখানে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার ভূসম্পত্তির বাৎসরিক আয় কয়েক সহস্র মুদ্রা। উক্ত যুবক কহিলেন যে, তিনি সত্বর রাণীভবানীর শিব-মন্দিরগুলির (যাহা এক্ষণে ইঁহার দখলে আছে) সংস্কার করিয়া বিগ্রহগুলির পূজার সুব্যবস্থা করিবেন।

কস্তুরীশ্বর শিবমন্দিরের কিয়দ্দূর উত্তর দিকে একটি কালীবাটী আছে। উহার উঠানের মধ্যস্থলে বারান্দাবেষ্টিত চাঁদনী আছে। চাঁদনীর উত্তর দিকে একটি একতালা কোঠা ঘরে ৺করুণাময়ী নামক প্রস্তর-নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি আছে। একটি মাত্র অখণ্ড প্রস্তর কুঁদিয়া শিব ও কালীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। শিবমূর্ত্তিটি শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে' লিখিত আছে যে, এই মূর্ত্তিটি রাজা রামকৃষ্ণের পরম মিত্র ব্রহ্মানন্দ নামক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত। পুষ্করিণী খননকালে মূর্ত্তিটি উত্থিত হয়। রাণীভবানীর গুরুবংশীয় তারিণীশঙ্কর ইহার মন্দিরের সংস্কার করেন। এখানে নিত্যসেবা হইয়া থাকে। এই মন্দিরের উত্তরদিকে নাটোর রাজ-বংশের দেওয়ান ও দিঘাপতিয়ার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম একটি গোপালমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

বড়নগর—নাড়ুগোপালের বাড়ী ও শিবমন্দির

পূর্ব্বোক্ত নাড়ুগোপালের বাটীর ও রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডীর কিয়দ্দূর উত্তর দিকে একটি বড় দ্বিতল বাটী আছে। উহা রাণী ভবানীর গঙ্গাবাসের বাটী ছিল বলিয়া শুনা যায়। উহা এক্ষণে বিশ্বনাথের প্রথমা সহধর্ম্মিণী রাণী কমলমণির দত্তক পুত্রের বংশধরগণের দখলে আছে। এই বাটীর উত্তর দিকে একটি একতলা কোঠায় গণেশ ও কালীমূর্ত্তি আছে। গণেশটী পাষাণময় ও অষ্টভুজ, ইহাই গ্রামদেবতা।

উক্ত গণেশ ও কালীর কোঠার কিয়দ্দূর উত্তরদিকে মঠবাটী নামক একটি বাটী আছে। ইহার উঠানের পূর্ব্বদিকে একটি পশ্চিম দ্বারী চারবাঙ্গালা মন্দির আছে। বড়নগরে চারিবাঙ্গালা ঠাকুর-বাটীতে যে কয়টি বাঙ্গালাঘরের আকৃতিবিশিষ্ট মন্দির আছে, সেগুলি যোড়া নহে—এক বাঙ্গালা মন্দির,—কিন্তু এই মন্দিরটি যোড়বাঙ্গালা—অর্থাৎ একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার পশ্চাতে ঐরূপ

এইগুলি ব্যতীত বড়নগরে অন্য কোন মন্দিরাদি দেখিতে পাইলাম না। বড়নগর আজিমগঞ্জ রেল-ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ উত্তর দিকে এবং মুর্শিদাবাদ সহর হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় বড়নগর রাজসাহী জমিদারীর তদানীন্তন অধিবাসী রাজা উদয়নারায়ণের রাজধানী ছিল। রাজা

উদয়নারায়ণ রাঢ়ীশ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় (বন্দ্যোপাধ্যায়) ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সহিত উদয়নারায়ণের শত্রুতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবার পরে মুর্শিদ কুলী খাঁ উদয়নারায়ণকে ও তদ্বংশীয়দিগকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সাহায্যকারী ও প্রিয়পাত্র নাটোরের রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনকে উদয়নারায়ণের সম্পত্তি ও রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন। উদয়নারায়ণের রাজসাহী জমিদারী পাওয়া অবধি নাটোরের রাজবংশ রাজসাহীর রাজা বলিয়া বিদিত। রাজসাহী অধিপতি উদয়নারায়ণের ও ভূষণার অধিপতি সীতারাম রায়ের জমিদারীর উপর নাটোরের রাজাদিগের জমিদারীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। নাটোরের রাজা রামকান্তের সহধর্মিণী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানী ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১১৫৩ সালে) বিধবা হইবার পরে তাঁহার বিধবা কন্যা তারাসহ এই স্থানে বাস করেন ও তাঁহার জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। ইংরাজের শোষণ-নীতির ফলে তাঁহার মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতে একে একে তাঁহার জমিদারী সকল বাজেয়াপ্ত হইয়া অর্থের অনাটন হইয়াছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের দরখাস্তে তিনি অতি করুণ ভাষায় স্বীয় অনাটনের কথা মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল অব রেভেনিউর গোচরীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (Petition of Ranny Bowanny d 16.9.1771 and letter d/ 16.9.1771 from the Council of Revenue at Murshidabad to Mr. C. W. Boughton Rous. supevisor of Rajeshahy—Vide Records of the Government of Bengal—Proceedings of the Controlling Council of Reverue at Murshidhbad. Vol VII (A) । অনুমান ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বড়নগরেই তিনি গঙ্গালাভ করেন।

একদা জলভ্রমণ কালে নবাব সিরাজদ্দৌলা এই বড়নগরের প্রাসাদোপরি আলুলায়িতকেশা রাজকুমারী তারাকে দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়নগরের অপর পারের অধিবাসী মগুরাম বাবাজী বাউলিয়ার প্রভাবে যেরূপে ইন্দ্রিয়পরায়ণ সিরাজকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন। এই বড়নগরেই রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র সাধক রাজা রামকৃষ্ণ কঠোর সাধনা করিতেন। রাণী ভবানীর মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তৎপরে রামকৃষ্ণের পুত্র বিশ্বনাথ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। বিশ্বনাথ কৌলিক শাক্ত মত ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব মত গ্রহণ করায়, তাঁহার ভার্য্যা রাণী জয়মণি বড়নগরে আসিয়া রাণী ভবানীর নিকটে বাস করেন। ভবানী দানপত্র দ্বারা জয়মণিকে সকল দেবোত্তর সম্পত্তি অর্পণ করেন। উক্ত দানপত্র লইয়া জয়মণির পোষ্যপুত্র ও নাটোর রাজ-বংশীয়দিগের মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। বিচারফল বাহির হইলে উক্ত সম্পত্তি তিনভাগ হয়—নাটোর রাজ-বংশ ৺রাজ-রাজেশ্বরী বিগ্রহের, জয়মণির দত্তক বংশীয়গণ ৺নাড়ুগোপালের। এবং মঠবাটীর ঠাকুরেরা অর্থাৎ রাণী ভবানীর গুরুবংশীয়গণ শিবলিঙ্গগুলির সেবায়েত নিযুক্ত হন।

রাজা উদয়নারায়ণের সময় হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্য্যন্ত বড়নগর সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে ইহার নাম বৃহৎ অক্ষরে লিখিত আছে। ইহা পূর্ব্বে এরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল যে অন্যান্য জাতি বাদে একমাত্র কাঁসারী জাতীয় ৩৫০ ঘর লোকের বাস ছিল। এককালে বড়নগরে একটী প্রকাণ্ড গঞ্জ ছিল। ইংরাজের আমলে বঙ্গের জমিদারবর্গের তথা মুর্শিদাবাদ সহরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত

বড়নগর—রাজা উদয়নারায়ণের ৺মদনগোপাল

বড়নগরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই স্থানে মাত্র ২৫।৩০ ঘর লোকের বাস আছে। বিদ্যালয়াদির মধ্যে পূর্ব্বে একটী পাঠশালা ছিল, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। ভাগীরথী-তীরে যে অংশে রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবালয়াদি আছে সেই অংশ বাদে বড়নগরের বাকী অংশে ব্যাঘ্র-সমাকুল নিবিড় অরণ্য আছে এবং তৎসহ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এতদঞ্চলের অধিবাসীদিগের ডাক্তারের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

বড়নগরের পাদদেশে ভাগীরথীর জল অপরিষ্কার দেখিয়া আমরা পরপারে নৌকা লইয়া গিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। তৎপরে রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৺মদনগোপাল বিগ্রহের কিঞ্চিৎ অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেলা ১ টার সময় বড়নগর ত্যাগ করিয়া নৌকারোহণে পরপারে চলিলাম।

সাধুর বাগ।

বড়নগর ত্যাগ করিয়া পরপারে সাধুর বাগ উদ্দেশে যাইবার সময় দেখিলাম—এই স্থানে ভাগীরথী পূর্ব্ব দিক হইতে বড়নগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় আসিয়া মোড় ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ভাগীরথী পার হইয়া বড়নগরের পরপারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, ভাগীরথীর বাঁধের এক স্থানে কয়েকটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির আছে। মন্দিরগুলি একচুড় ও অযত্নে রক্ষিত। আমরা এই মন্দির সমষ্টির উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রামটিতে বৈষ্ণব ও নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস দেখিলাম। গ্রামের মধ্যে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিয়া একটী পরিত্যক্ত বনজীর্ণ উচ্চ পথের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলাম। স্থানটি বনজীর্ণ ও নির্জ্জন। কাঁটা গাছের মধ্য দিয়া পুষ্করিণীর জলের ধারে যাইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। পুষ্করিণীটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। ইহাতে সামান্য জল আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে শান-বাঁধান উচ্চ পোস্তার ন্যায় গাঁথনি আছে। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকে একটী আম ও লিচুর বাগান আছে। বাগানের মধ্যে কতকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত ইমারতের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান আছে। এই স্থানে একটী ঠাকুরবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। একটী উঠানের চারিদিকে চারিটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। উঠানের দক্ষিণ দিকে একটী বৃহৎ মন্দির অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। উহার গর্ভমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ছাদে কড়িবরগা দেওয়া যে বারান্দা ছিল, উহার ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বারান্দার বহির্দ্দেশ দিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে রোয়াক ছিল, উহা উত্তর দিক বাদে অন্য সকল দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই বারান্দা প্রায় ৬ ফিট প্রশস্ত। প্রত্যেক দিকের বারান্দার সম্মুখে তিনটি করিয়া অপ্রশস্ত বা সরু ফোকর অর্থাৎ দ্বারের খিলান আছে। এই ফোকরগুলি ২॥ ফিট প্রশস্ত। উত্তর দিকের বারান্দার সম্মুখে যে তিনটি দ্বারের ফোকর আছে, উহাতে ৪ জোড়া গোল থাম আছে। অপর দিকের বারান্দাগুলিতে চতুষ্কোণ থাম আছে। গর্ভমন্দিরের চারি দিকে একটি করিয়া দ্বার আছে। ইহার অভ্যন্তরে পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণার দিকে একটি ইষ্টকের বেদী ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু মন্দিরের উপরের খিলান অত্যন্ত মজবুত আছে। বড়নগরের মন্দিরগুলির ন্যায় এই মন্দিরের গাত্রে মিহি সুরকী ও চুণ-মিশ্রিত মশলা দ্বারা জমাট করিয়া তাহার উপরে চুণকাম করা হইয়াছিল। গর্ভমন্দিরের দেওয়াল ৩॥ ফিট স্থূল। ইহার বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৩॥ ফিট। উত্তর দিকই এই মন্দিরের সম্মুখভাগ। এই দিকে মন্দিরের উচ্চ রোয়াক হইতে উঠানে নামিবার কয়েকটি সিঁড়ি আছে। মন্দিরটি নবচূড়। গর্ভ-মন্দিরের উপরিভাগে মধ্যস্থলে যে উচ্চ চূড়া আছে, তাহার চারি কোণায় চারিটি ক্ষুদ্রতর চূড়া আছে। তদ্ব্যতীত মন্দিরের বারান্দার ছাদের উপরে চারি কোণায় আর চারিটি চূড়া আছে। অর্থাৎ মন্দিরে উপরে মোট ৯টি চূড়া আছে। মন্দিরের বারান্দার বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ২৮ ফিট। এই মন্দিরে রামচন্দ্র বিগ্রহ ছিলেন।

বড়নগর—রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন

এই বৃহৎ মন্দিরের উত্তর দিকে অর্থাৎ ঠাকুরবাটীর মধ্যস্থলের উঠানের অপর তিন দিকে একটী করিয়া ছোট পঞ্চচূড় মন্দির ছিল। তন্মধ্যে কেবল মাত্র উত্তর দিকেরটি আজিও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় আছে। এই মন্দির মধ্যে একটী বেদী মাত্র আছে। এই মন্দিরগুলি মস্তরাম আউলিয়ার বা মস্তরাম বাবাজীর আপড়া।

এই ঠাকুরবাটীর উত্তর দিকে আম-বাগানের মধ্যে ভগ্ন দ্বিতল অট্টালিকা ও পায়খানা আছে। এইখানে আখড়ার মোহান্ত ও বৈষ্ণবগণ বাস করিতেন। চতুর্দ্দিকে আম ও লিচুবাগান থাকায় স্থানটি দিবসে অন্ধকার হইয়া আছে। এখানে জন-প্রাণী নাই—চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। এই স্থানের অদূরে ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে; তাহা এই স্থান হইতে দেখা যায়। শুনা যায় যে, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মস্তরাম আউলিয়া বাবাজী নামক জনৈক সাধু এই আখড়া স্থাপন করেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ সিরাজদ্দৌলা রাণী ভবানীর কন্যা আলুলায়িত-কেশা তারাকে দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিলে মস্তরাম তাঁহাকে রক্ষা করেন। প্রবাদ আছে যে, মস্তরাম তপঃপ্রভাবে ভাগীরথীর জলের উপর দিয়া খড়ম পায়ে দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন। মস্তরামের এই আপড়ার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কালে সম্ভবতঃ রাণী ভবানী বিবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। জরাদি ব্যাধির জন্য কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই আখড়ার মোহান্ত এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, এই স্থানে রথযাত্রা উপলক্ষে সমারোহ হয়।

বেলা ১টা ৩৫ মিনিটের সময় আমরা মস্তরামের ত্যক্ত আখড়া

দেখিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। যখন নৌকা জিয়াগঞ্জে পঁহুছিল, তখন অপরাহ্ন ২টা ৪৫ মিনিট হইয়াছে। ১লা এপ্রেল মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার মাতৃহীন বালক পুত্র বায়না ধরিয়া বলিল যে, আমার সহিত মুর্শিদাবাদ দেখিতে যাইবে, কিরীটেশ্বরী কালীকে পূজা দিবে এবং প্রয়োজন হইলে ২।৩ ক্রোশ পথ অবলীলাক্রমে আমার সহিত হাঁটিয়া যাইবে, একবেলা আহার না জুটিলেও কাতর হইবে না। অনেক কষ্টে বুঝাইয়া ক্রন্দমান বালককে নিরস্ত করিয়া আমার মাতৃদেবীর নিকট রাখিয়া আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, মুর্শিদাবাদ হইতে তাহার জন্য ভাল সিল্কের চাদর আনিব। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ জিয়াগঞ্জের ঘাটে ক্ষণিকের জন্য নামিয়া সন্নিকটস্থ বালুচরের বাজারে সিল্কের চাদর কিনিতে চলিলাম। ইত্যবসরে মাঝিগণ ভাত খাইয়া লইবে স্থির করিল। বালুচরের বাজারটি বড়। এখানে নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারের অনেক দোকান আছে। আমরা কয়েকটি দোকান ঘুরিয়া, মনোমত সিল্কের চাদরাদি কিনিয়া আনিয়া, নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা খুলিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পাড়ি জমাইল। জিয়াগঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তে পূর্ব্ব-বর্ণিত ভাগীরথী-বক্ষে ই, বি, রেলের অস্থায়ী কাঠের সেতুর নীচে দিয়া নৌকা চলিল। অদূরে ভাগীরথীবক্ষে একটী ফ্লাট বাঁধা আছে। উহাতে জল পম্প করিবার যন্ত্রাদি আছে। এই স্থান হইতে আজিমগঞ্জ ষ্টেসনে জল সরবরাহ হয়। ক্রমে বাম দিকে সতীচৌরার স্থান ও জগৎশেঠের ত্যক্ত ভিটা ফেলিয়া রাখিয়া, ভাগীরথী-বক্ষে যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, উহার বাম দিকে জাফরগঞ্জ ও ডাইন দিকে পূর্ব্বে বর্ণিত মনস্থরগঞ্জ ও হীরা ঝিলের পরিত্যক্ত স্থান আছে। পাড়ে উঠিয়া মনস্থরগঞ্জ হীরাঝিলের স্থান দেখিয়া যখন মুর্শিদাবাদ লালবাগে আমাদের বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন ভাগীরথী-বক্ষ হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলোকে নবাব সাহেবের প্রাসাদাদির নয়ন-বিমোহন ছবি দেখিয়া মোহিত হইলাম। নবাব-বাড়ী ছাড়াইয়া যখন আমাদের বাসার সন্নিকটস্থ ঘাটে তরণী হইতে অবতরণ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইল। মাঝি বিদায় লইবার সময় প্রার্থনা জানাইল যে, নৌকা সহ তাহার যে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে, উহার একখানি তাহাকে ডাকযোগে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ললিতা দাদা তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিলে পর আমরা বাসায় উপস্থিত হইলাম। গত রাত্রের ন্যায় এরাত্রেও রক্তম যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দুধ ও মিষ্টার উদরস্থ করিয়া শয্যা গ্রহণ করা গেল।

কিরীটেশ্বরী।

পরদিন ৪ঠা এপ্রেল প্রাতে ৫॥টার সময় আমাদিগের বাসাবাটীর নিকটের ঘাটে নৌকা-যোগে ঘোড়াগাড়ী সহ ভাগীরথী পার হইয়া পরপারে ডাহাপাড়ার নিকটস্থ পারঘাটে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কিরীটেশ্বরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা পূর্ব্ব-বর্ণিত রোসনী-বাগের মকবরার নিকট দিয়া চলিলাম। এই মকবরার উত্তর ও পশ্চিম দিকে প্রাচীন হিন্দুপল্লী ডাহাপাড়া অবস্থিত। ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা ডাহাপাড়া গ্রামের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে কিরীটেশ্বরী অভিমুখে চলিলাম। ডাহাপাড়া হইতে কিরীটেশ্বরী প্রায় ১॥ ক্রোশ। ৬টার সময় আমরা ই, আই, রেলের লাইন পার হইলাম। এই স্থানে যদি ই, আই, রেলের একটী ষ্টেসন হইত, তাহা হইলে কিরীটেশ্বরী ও সম্ভবতঃ ডাহাপাড়া যাইবার অনেক সুবিধা হইত। রেল লাইন পার হইয়া আমরা জনমানব-শূন্য প্রান্তর মধ্যস্থ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। পথের দুইপার্শ্বে স্থানে স্থানে বড় বড় বৃক্ষ ও আগাছার ঝোপ আছে। তন্মধ্যে শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল ফুটিয়া থাকায় প্রভাত-সমীরণ অনেক দূর হইতে তাহার সুবাস বহিয়া আনিতেছে। কোথাও আলোকলতা, কোন ঝোপের উপরিভাগ স্বর্ণ-সূত্রের জালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। চারি দিকের দারুণ নিস্তব্ধতা বিহগদিগের প্রভাত-কাকলীতে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এই অভিনব দৃশ্যে মন প্রাণ আনন্দে ভাসিয়া উঠিল। আমার স্বগ্রাম উলার প্রান্তভাগের নির্জ্জন পথগুলি দিয়া এমন দিনে এমন সময় যতবার গিয়াছি, ততবার দেখিয়াছি যে, বনফুল ও কাঠ-

বড়নগর—রাণীভবানী চারিবাঙ্গালা মন্দিরের একটি মন্দির
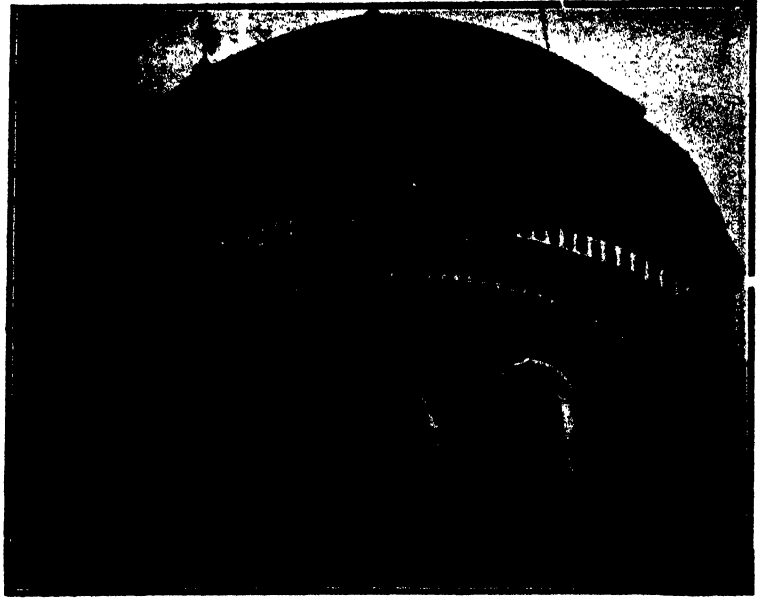
মল্লিকার সুবাসে আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে, আর বিহঙ্গকুল পাগল হইয়া চারিদিকে গান জুড়িয়া দিয়াছে। এদেশ ও সেদেশে বিশেষ পার্থক্য নাই।

ই, আই, রেল লাইন পার হইয়া কিয়ৎ দূর যাইলে দেখা যায় যে, আজিমগঞ্জ হইতে একটী কাঁচা রাস্তা আসিয়া এই রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। রাস্তার উত্তর পার্শ্বে একস্থানে একটী পুষ্করিণী ও আর এক স্থানে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত পরিত্যক্ত বৃহৎ সেতুর ন্যায় গাঁথনি আছে। সম্ভবতঃ ইহা কানুনগো দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কিরীটেশ্বরী যাইবার পথের সেতু। ৬টা৩৫ মিনিটের সময় ভবানী স্থান নামক গ্রামে প্রবেশ করিলাম। ভবানী স্থান বা ভবানী থান গ্রাম এবং কিরীটেশ্বরী বা কিরীট কণা গ্রাম একই। বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ রায় কানুনগোর পিতার খুল্লতাত বজ্রবিনোদ রায় ...শ্বরের নিকট হইতে যে সকল দেবোত্তর ও নিষ্কর ভূসম্পত্তি ...ইয়াছিলেন, কিরীটেশ্বরী তাহার অন্তর্গত ছিল এবং ভবানী থান নামে ...ক্ত ছিল। এখানে পথের দুই পার্শ্বে কয়েকটী অর্দ্ধশুষ্ক পুষ্করিণী ও ...স্ততঃ বহু তালগাছ শূন্য ভেদ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ...ছে। দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি ভূত বায়ুভরে কেশপাশ ...াইয়া দিয়া কিরীটেশ্বরীর প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রহরীর কার্য্যে ...যুক্ত আছে।

ইহার পরে আমরা কিরীটেশ্বরীর সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, ...ং কিরীটেশ্বরীর ঠাকুরবাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। তাল-...চ ও পুষ্করিণীর প্রাচুর্য্য ও বন-জঙ্গল কম দেখিয়া মনে হইল যে ...িয়া রাঢ় দেশের কোন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছি।

তালগাছ-শোভিত একটী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ভূমির পশ্চিম দিকে কতকগুলি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির ও ভগ্ন স্তূপ পরিবেষ্টিত বটচ্ছায়া-শীতল স্থানে ৺কিরীটেশ্বরীর কোঠা ঘর বা মন্দির রহিয়াছে। ঠাকুর-বাটীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণার নিকটে কিরীটেশ্বরীর বাটীর প্রবেশ-দ্বারের ভগ্নাবশেষ আছে। ঠাকুরবাটীর মধ্যস্থ উঠানের পূর্ব্ব দিকে ৺কিরীটেশ্বরীর একচালা মন্দির বা কোঠা ঘর আছে। কেহ কেহ বলেন যে, কানুনগো দর্পনারায়ণ এই কোঠাটি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দেখিয়া মনে হয় না যে, ইহা তত দিনের প্রাচীন। গর্ভগৃহ বা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে থামযুক্ত বারান্দা আছে, উহা ৬ ফিট প্রশস্ত। কিরীটেশ্বরীর ঘরের সম্মুখ-ভাগ পশ্চিম দিকে। গর্ভগৃহের পশ্চিম দিকের প্রধান দ্বারের সম্মুখে একটী দরদালানের ন্যায় আছে। উহার মাপ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৯ ফিট × পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৬ ফিট। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার ছাদ খিলান করা।
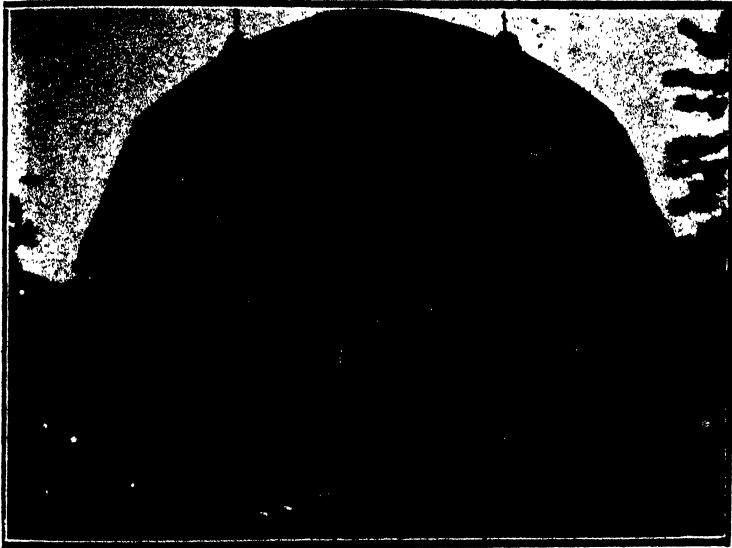
বড়নগর—রাণীভবানীর চারি বাঙ্গালা মন্দিরের আর একটি মন্দির

গর্ভগৃহের দক্ষিণ দিকে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। গৃহতল কাল মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। গৃহ মধ্যে পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন একটী বেদী আছে। বেদীর উপরে দেওয়ালের গাত্রে প্রতিমার পশ্চাতের চালের ন্যায় দেখিতে একটী স্থান আছে, উহাতে লতা, পাতা ও নক্সা খোদিত আছে। গৃহমধ্যে যথেষ্ট আলোক না থাকায় এই পদার্থটি কি, তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম যে, এই পদার্থটি প্রতিমার চালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একখানি প্রস্তর মাত্র। আমার মনে হয় যেন এই প্রকারের শিলা গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপে দেখিয়াছি। শিলাটির পুরোভাগে (উক্ত বেদীর উপরে) গাত্রে-শিরতোলা কিন্তু দেখিতে কতক কমল পুষ্পের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর রহিয়াছে। উহা দেখিয়া মনে হয়, যেন উহা কোন মূর্ত্তির পাদপীঠ ছিল,—মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু পাদপীঠটি রহিয়া গিয়াছে। এই স্থানেই ৺কিরীটেশ্বরীর পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত পাদপীঠ দেখিয়া এবং কিরীটেশ্বরীর কোন মূর্ত্তি নাই দেখিয়া মনে হয়, যেন পূর্ব্বে এই পাদপীঠের উপর কোন মূর্ত্তি ছিল, পরে উহা মুসলমানদিগের অনুগ্রহে হউক বা কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে হউক নষ্ট হইয়াছে। এই ঠাকুর-ঘরে প্রত্যহ পাঁচ ছটাক চাউলের কাঁচা নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হয়। কিরীটেশ্বরীর কোঠার বহির্দ্দেশের মাপ—পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪০´ ফিট × উত্তর-দক্ষিণে ৩৬´ ফিট। দেবী বিমলা নামে বিদিতা। সেবার পুরীধামে যাইয়া আর একটি বিমলা মূর্ত্তি দেখিয়াছি। কিরীটেশ্বরীর ঘরের সম্মুখের উঠানে একটি হাড়িকাঠ প্রোথিত আছে, উহাতে ছাগ বলি হয়।

কিরীটেশ্বরীর কোঠার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি শুষ্ক অশ্বথ বৃক্ষের কাণ্ড মাত্র দণ্ডায়মান আছে। উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-খচিত কষ্টিপাথরের শীতলা, বিষ্ণু, মঙ্গলচণ্ডী, ৪টি শিবলিঙ্গ ও কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। বৃক্ষকাণ্ড পচিতে আরম্ভ হওয়ায় এই মূর্ত্তিগুলি ক্রমে বাহির হইয়া পড়িতেছে। কিরীটেশ্বরীর গৃহের পশ্চাৎ দিকে দুই পার্শ্বে ৫।৬টি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির আছে, এতন্মধ্যে দ্বারের পার্শ্বের একটি বড় শিবমন্দির ও আর একটি শিবমন্দির রাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই শিবমন্দিরগুলির পশ্চাৎ বা পূর্ব্বদিকের গলি পথের পূর্ব্বপার্শ্বে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে আর এক সারিতে ৬।৭টি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন সশিব শিবমন্দির আছে। একটি মন্দিরের উপরে বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষ হইয়াছে, উহার ডালে দুইটি মৌচাক ঝুলিতেছে।

কিরীটেশ্বরীর কোঠার সম্মুখস্থ উঠানের পশ্চিম দিকে একসারি ইষ্টকের ভগ্নস্তূপ ও একটি অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির আছে। যে স্থানে এই ভগ্নস্তূপগুলি আছে, উহার মধ্যভাগে পূর্ব্বকালে কিরীটেশ্বরীর তোষাখানা ছিল। তথায় দেবীর পোষাকী ও নিত্যব্যবহার্য্য যে সকল অলঙ্কার ও আসবাবপত্র ছিল, উহার মূল্য অনুমান তিনলক্ষ মুদ্রা। বলা বাহুল্য, দেবীর অলঙ্কার ও আসবাবপত্রাদি এখন আর কিছুই নাই। নানাদেশ ঘুরিয়া দেখিয়াছি যে, হিন্দুর দেব-মন্দিরাদি ও দেবতার অলঙ্কারাদি রক্ষার বিশেষ কোন সুব্যবস্থা নাই। অধিকাংশ স্থলে দেবতার মূল্যবান সামগ্রী ও প্রণামী প্রভৃতি সেবাএত, মোহান্ত ও পূজারীগণ লুঠিয়া খায়। ফলে মন্দিরাদির সংস্কার ও দেবতার নিত্য পূজার সুব্যবস্থা হইয়া উঠে না,—মন্দির সংস্কারের প্রয়োজন হইলে সাধারণের নিকটে চাঁদা চাহিতে হয়। হয় ত কিরীটেশ্বরীর বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও আসবাবপত্র এইরূপে সেবাএত ও রক্ষকদিকের কুক্ষিগত হইয়া বা চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া আজ কিরীটেশ্বরীর চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। দেবায়তনের এরূপ দুর্দ্দশা হিন্দুদিগের পক্ষে অতীব কলঙ্কের কথা। উক্ত তোষাখানার পার্শ্বে কিরীটেশ্বরীর নহবৎখানা ছিল, উহাতে প্রহরে প্রহরে সুমধুর নহবৎ বাজিত। এক্ষণে নহবৎখানার ধ্বংস স্তূপে কাঁটাবন হইয়া আছে।

উঠানের উত্তর দিকে এক সারিতে ভগ্ন স্তূপ ও কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের ফোকর সহ দেওয়াল ও একটি শিব মন্দির আছে। এই স্থানের ভগ্নস্তূপগুলি পূর্ব্বে শিবমন্দির ছিল বলিয়া মনে হয়। উঠানের উত্তর দিকে প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের যে দেওয়াল দণ্ডায়মান আছে, উহা কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর প্রাচীন গুপ্ত পীঠের মন্দির। কথিত আছে যে, এই প্রাচীন মন্দিরটির বন-জঙ্গল কাটাইয়া কানুনগো দর্পনারায়ণ ইহার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভগ্ন মন্দিরের বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ১৬ ফিট। পশ্চিম দিকে দুইটি ফোকর বা খাঁজকাটা দ্বারের খিলান আছে; উহার মাপ ৬।০"×৫৮০ ফিট। ইহার দেওয়ালের স্থূলতা প্রায় ১৮০ ফিট. দেওয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে (সম্ভবতঃ) পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত একটি প্রকোষ্ঠ বা গর্ভগৃহের ন্যায় আছে, কিন্তু উহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই গর্ভ-গৃহটি দক্ষিণদ্বারী। গর্ভগৃহমধ্যে উত্তর দিকের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন উপর্য্যুপরি কয়েকটি শিলা সাজাইয়া বেদীর ন্যায় করা আছে। এই বেদীর উপরে কোন হিন্দু বিগ্রহের চালের ধারির ন্যায় একটি প্রস্তরের পাড় আছে—ইহা দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, ইহা কোন প্রস্তর-নির্ম্মিত বিগ্রহের পশ্চাতের শিলাময় চাল ছিল; বিগ্রহটি নষ্ট হওয়ার পরে ভগ্ন চালের

বড়নগর—গোড়বাঙ্গালা শিবমন্দিরের সম্মুখ ভাগ

উপরিভাগ মাত্র পড়িয়া আছে। হয় ত অধুনালুপ্ত প্রাচীন কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পশ্চাৎদেশের চালের ইহাই শেষ চিহ্ন। কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর গুপ্ত কিরীট পূর্ব্বে এই মন্দিরে ছিল। পরে উহা কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান পশ্চিমদ্বারী কোঠাঘরে লইয়া যাওয়া হয়; এবং পরে তথা হইতে গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণার দিকে নব-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র একতলা কোঠা ঘরে রাখা হইয়াছে। ইহাকে গুপ্ত পীঠের গুপ্ত মঠ কহে। কিরীটেশ্বরীর এই ভগ্ন মন্দিরের দক্ষিণ দিকের একমাত্র প্রবেশদ্বারের বাহিরে বাম পার্শ্বে একটি প্রস্তর দেখাইয়া স্থানীয় লোকে কহে যে, উহা নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের জপের আসন ছিল। রাজা রামকৃষ্ণ বড়নগর হইতে অনেক সময় অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্রের ছদ্মবেশে নগ্নপদে কম্বলমাত্র গায়ে দিয়া কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দিরে আসিয়া জপতপ করিয়া সমাগত যাত্রী ও সাধুসন্ন্যাসীদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। ছদ্মবেশী নরপতি দেবীকে প্রণাম

করিবার সময় অন্যমনস্ক ভাবে মোহর দিয়া ফেলিতেন বলিয়া অনেক সময় তাঁহার ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিরীটেশ্বরী তান্ত্রিক সাধক রাজা রামকৃষ্ণের অতি প্রিয় সাধনার স্থান ছিল।

কিরীটেশ্বরীর বাটীর ভিতরে উঠানের দক্ষিণ দিকে একসারি শিবমন্দির ছিল; এক্ষণে তাহার ভগ্ন স্তূপগুলি মাত্র আছে। দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত ভগ্ন রোয়াকের উপরে এই তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলার বা কিরীটেশ্বরীর ভৈরব—সম্বর্ত্ত ভৈরব—নামক একটী শিবলিঙ্গ উন্মুক্ত আকাশতলে অযত্নে পড়িয়া থাকিয়া রৌদ্র ও ঝঞ্ঝাবাতের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; এবং বিলাসী ও আত্মসুখী হিন্দুর অধোগতির সাক্ষ্য দিতেছেন। এই ভগ্ন রোয়াকের উপরে আরও কয়েকটি ছোট বড় শিবলিঙ্গ অযত্নে ঘাস ও আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া আছে, কেহ তাহাদিগের যত্ন লয় বলিয়া বোধ হইল না। কিরীটেশ্বরীর বাটী হইতে বাহির হইবার জন্য দক্ষিণ দিকে একটী দ্বার ছিল; তাহার চিহ্ন আজিও আছে। উক্ত সারির পশ্চাৎ বা দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটী গলি পথ ছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই গলি-পথের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে আর এক সারি শিবমন্দির ছিল; তন্মধ্যে ৫।৬টি ভগ্ন ও অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন দুরদৃষ্টের ও হিন্দুর স্বধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার পরিচয় দিতেছে। দক্ষিণ দিকের বহির্দ্দেশের এই মন্দির সারির পূর্ব্ব দিকে একটী পশ্চিমদ্বারী অভগ্ন শিবমন্দির আছে, উহার পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন একটী কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর বেদীর উপরে কাল পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি উপবিষ্ট আছেন। জীবহিংসা-বিরোধী বুদ্ধদেব এখানে হিন্দুর হাতে পড়িয়া কালভৈরব উপাধি লাভ করিয়া পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বুদ্ধদেব ওরফে কালভৈরবের পশ্চাতের দেওয়ালে ও অন্য তিন দিকের দেওয়ালের জমাটে ভল্লুকাদি মূর্ত্তি ও লতা-পুষ্পাদি অঙ্কিত আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকের ভিতের গাত্রে কাল পাথরের উপরে অতি সুশ্রী লতা, পাতা, পুষ্প ও অন্য কারুকার্য্য খচিত আছে। এই প্রকারের কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তর গৌড়ের রামকেলি ও অন্যান্য স্থানে দেখিয়াছি। এগুলি যে গৌড়ের কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই মন্দিরের বহির্দ্দেশের মাপ উত্তর-দক্ষিণে ১২ ফিট + পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১১½ ফিট। দেওয়ালের স্থূলতা ২ ফিট।

বড়নগর—জয়মঙ্গী কালী

এই মন্দিরের পশ্চিম দিকে কালীসাগর নামক পুষ্করিণীর ঘাটে যাইবার যে পথ আছে, উহার পশ্চিম পার্শ্বে একটি পূর্ব্বদ্বারী ছোট শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখদেশে ললাটের স্মৃতিফলকে যাহা লিখিত আছে তাহার শুদ্ধ পাঠ এই:—

শাকে সপ্তাষ্ট কালেন্দু
সংখ্যে সত্তু প্রিয়া পুরে
সভারাম সুতে চক্রী
চন্দ্রনাথো মঠং শুভং।

দক্ষিণ দিকের বহির্দ্দেশের এই মন্দির-সারির দক্ষিণে কালীসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার মধ্যে দাম, দাস ও নল-খাগড়ার বন হইয়া আছে। কিরীটেশ্বরীর বাটীর দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া এই পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ের যে ঘাট যাত্রীগণ ব্যবহার করিত, উক্ত ঘাট গৌড়ের ধ্বংস স্তূপ হইতে সংগৃহীত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল, আজিও তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। বঙ্গাধিকারীবংশীয় কানুনগো দর্পনারায়ণ এই পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। পুষ্করিণীটির পূর্ব্ব দিকে কয়েকটি অতি বৃহৎ ও প্রাচীন জটাজূটশোভিত বটবৃক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত ডালপালা বিস্তৃত করিয়া সগর্ব্বে যুগযুগান্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া কিরীটেশ্বরীর অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসিতেছে।

কিরীটেশ্বরীর বাটীর গঠন, ভগ্ন স্তূপ ও শিবমন্দিরগুলির অবস্থান দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্বে এই ঠাকুর-বাটীর ভিতরের অংশে উঠানের চতুর্দ্দিকে একসারি করিয়া মন্দির ও গৃহ ছিল এবং অন্ততঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে এক একটি করিয়া দরওয়াজা ছিল—পশ্চিম দিকে নহবৎখানা ছিল। এই ভিতরের অংশের বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিক দিয়া একটি গলিপথ ছিল। এই গলিপথের বহির্দ্দেশ দিয়া চতুর্দ্দিকে আর

এক সারি শিবমন্দির ছিল। কিরীটেশ্বরীর বাটীর ভিতরের অংশের বহির্দ্দেশের মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৫২ ফিট × উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১১২ ফিট।

কিরীটেশ্বরীর বাটীর সন্নিকটে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণার দিকে দুইটি শিবমন্দির আছে। এই মন্দির দুইটি আজিও অভগ্ন অবস্থায় আছে। কিরীটেশ্বরীর বাটীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত কালীসাগর পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকের সদর রাস্তার পূর্ব্ব দিকে, কিরীটেশ্বরীর বাটীর প্রায় ২। রসি দূরে ৺বাঁকাভবানীর উচ্চ মন্দির ও সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট-মন্দিরের গঠন-প্রণালী নূতন ধরণের। পূর্ব্বাংশে একটি উচ্চ একচূড় শিবমন্দির আছে। মন্দির-মধ্যে একটি শ্বেত প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রস্তরের গণ্ডীর মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ভগ্নশিবের পার্শ্বেই হোমের কুণ্ড রহিয়াছে। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার পশ্চিম দিকে। এই শিবমন্দিরের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া ইহার পশ্চিম দিকে বহুকোণবিশিষ্ট একটি নাটমন্দিরের ন্যায় আছে, উহার পূর্ব্বদিক ব্যতীত অন্য তিন দিকে কতকগুলি পিলান-করা গবাক্ষের ন্যায় আছে। এই নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে গুম্বজ-শোভিত একটি গোলাকার গর্ভগৃহ আছে। উহার ব্যাস প্রায় ৯½ ফিট। এই গোলাকার গর্ভগৃহ মধ্যে ৺বাঁকাভবানী নামক প্রস্তরময়ী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কান্দীর নিকটস্থ জজানিয়া নামক গ্রামে আছে। উক্ত গোলাকার গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকে ৮টি গোল থাম শোভা পাইতেছে। ইহার দেওয়ালের স্থূলতা ২।০ ফিট। ইহারই চতুর্দ্দিকে বহুকোণবিশিষ্ট পিলান-করা ছাদ-যুক্ত সরু বারান্দা আছে, উহা ২½ ফিট প্রশস্ত। নাট-মন্দিরের পশ্চিম দিকে সিঁড়ি আছে এবং পশ্চিম দিকই ইহার সদর। নাটমন্দির-শোভিত বাঁকাভবানীর মন্দিরের বহির্দ্দেশের মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪৬' ফিট × উত্তর-দক্ষিণে ২৮ ফিট। মন্দিরটি এক্ষণে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে যে বড় পুষ্করিণীটি আছে, উহার পশ্চিম পাড়ে শান-বাঁধান ঘাট আছে। কিরীটেশ্বরী গ্রামের অধিবাসীগণ এই পুষ্করিণীর জল পান করে।

৺কিরীটেশ্বরীর বাটী হইতে প্রায় ৭ রসি উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৺কিরীটেশ্বরীর গুপ্ত পীঠের বর্ত্তমান বাটীতে যাইতে পথের বাম দিকে ৬টি পরিত্যক্ত অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে দুইটি পঞ্চচূড় ও বাকীগুলি একচূড়া-বিশিষ্ট। স্থানীয় এক ব্যক্তি কহিলেন যে, এই ছয়টি মন্দির রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই মন্দির কয়টি ছাড়াইয়া সামান্য দূর যাইলে গুপ্তপীঠের প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র বাটীতে উপস্থিত হওয়া যায়। বাটীর মধ্যে একটী একতলা ছোট ঘরে রক্তবর্ণ চেলির বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত একটী বেদীর ন্যায় আছে। উহাই ৺কিরীটেশ্বরীর গুপ্তপীঠ বলিয়া বিদিত। লোকের ধারণা এই যে, উক্ত গুপ্তপীঠের মধ্যে বিষ্ণু-চক্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভগবতীর কিরীট নামক অলঙ্কারের কণা আছে। পূর্ব্বে এই গুপ্তপীঠ ৺কিরীটেশ্বরীর বাটীতে উত্তর দিকের প্রাচীন মন্দিরে ছিল, তৎপরে উহা ৺কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান পশ্চিমদ্বারী মন্দিরে ছিল। সর্ব্বশেষে উহা তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। প্রত্যহ বেলা ১১টার সময় গুপ্তপীঠকে মন্ত্র-স্নান করাইয়া দেড়সের চাউলের অন্নভোগ দেওয়া হয়। ৺কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে এবং এই গুপ্তপীঠে প্রত্যহ মোট সোয়া আট আনা মূল্যের তণ্ডুলাদি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর মহাষ্টমীর দিন পূজারী গৃহদ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া গুপ্তপীঠকে স্নান করাইয়া থাকেন, ও তৎপরে উহার উপরে ঘাঘরার ন্যায় করিয়া কুঁচাইয়া একখানি চেলির কাপড় ঢাকা দিয়া দেন। মহাষ্টমীর দিন গুপ্তপীঠে একটী ছাগ বলি হয়। সেদিন এখানে ৩০, টাকার উপকরণ দ্বারা ভোগ দেওয়া হয় এবং যাত্রীদিগকে প্রসাদ দেওয়া হয়। গুপ্তপীঠের ঘরের মধ্যে কয়েকটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ এবং বুদ্ধ, বিষ্ণু ও দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে। এই সকল রত্নাবৃত মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ অপরিষ্কার অবস্থায় আছে। ইহাদিগের নিত্য সেবা কিরূপ চমৎকার হয়, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জনৈক ধন-কুবেরে অষ্ট্রিয়ান যুবক ভিয়েনা হইতে কলিকাতায় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় খুলিবার জন্য আসিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার সহিত আমি দেখা করিতে গেলে, তিনি আমাকে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত পিতল ও প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর ছোট ছোট কতকগুলি মূর্ত্তি দেখাইলেন। অবশেষে দুঃখের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার একটি প্রাচীন দুর্গামূর্ত্তি আবশ্যক—তজ্জন্য তিনি ২০০,।১০০০, টাকা ব্যয় করিতেও রাজি আছেন। কিন্তু তিনি

সাধুর বাগ—মস্তরাম বাবাজীর ত্যক্ত পুকুর ও উহার দক্ষিণ পার্শ্ব

এরূপ মূর্ত্তি চান যাহা প্রাচীন ও যাহার পূজা হইয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম যে গৃহদেবতা হিন্দুর স্বীয় পরিজনবর্গের সামিল, কেহই আপন গৃহদেবতাকে বিক্রয় করিবে না। সাহেব সে কথা স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি চেষ্টা করিবার জন্ম আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখানে এই মূর্ত্তি কয়টির ও অন্যান্য স্থানে আরও
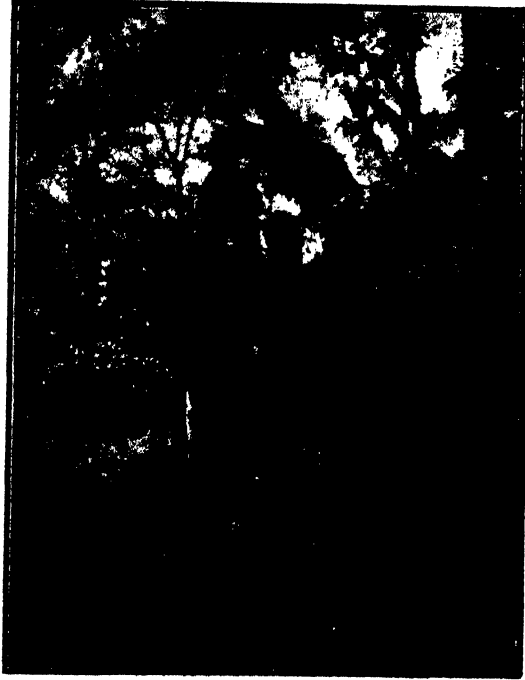
সাধুর বাগ—মন্মুরাদের ভাঙ্গা আংড়ার নবচূড় মন্দির

কতকগুলি দেবমূর্ত্তির যে দুর্দ্দশা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে মনে শঙ্কা হয় যে, এই সকল বিদেশী সৌখীন সাহেব যদি এই সকল মূর্ত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অর্থ-বলে বিগ্রহগুলিকে সম্ভবতঃ হস্তগত করিতে পারেন।

গুপ্তপীঠের বাটীর পার্শ্বে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিভিন্ন আকৃতির ছয়টী একচূড় শিবমন্দির ও ধ্বংসস্তূপ আছে। স্থানীয় কোন ব্যক্তি কহিলেন যে এই মন্দির কয়টি রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কিরীটেশ্বরী গ্রামের যাবতীয় শিবলিঙ্গের দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধ হয় না যে তাহাদের পূজা হয়।

কিরীটেশ্বরী গ্রামে আর কিছুই দেখিবার নাই। এই গ্রামের প্রকৃত নাম কিরীটকণা, কিন্তু ৺কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর নামানুসারে লোকে এই গ্রামকে কিরীটেশ্বরী বলে। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলা এবং তাঁহার ভৈরব সম্বর্ত্ত বলিয়া বিদিত। তন্ত্রচূড়ামণির মতে বিষ্ণুচক্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবতীর কিরীট এই স্থানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া দেবীকে কিরীটেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা হয়ঃ—

"ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা॥"

কিরীটেশ্বরী একটি মহাপীঠ।

মহানীল তন্ত্রে লিখিত আছে:—

"কালীঘাটে, গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।
কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গাখ্যে লিঙ্গ বাহিনী॥"

কেহ কেহ মনে করেন যে এককালে কিরীটেশ্বরী বা কিরীটকণা গ্রামের নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। আমার স্বগ্রাম উলা নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রাচীন পদ্যগ্রন্থ "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে" লিখিত আছে:—

"মুক্তির নিকট গঙ্গা আইল ফিরিয়া।
চলিল কিরীটকোণা দক্ষিণে রাখিয়া॥"

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে পাল ও সেন রাজাদিগের রাজত্ব কালের পূর্ব্বে, অনুমান খৃষ্ট পূর্ব্ব চারি শত বৎসরের পর হইতে ৺কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে কিরীটেশ্বরীর পীঠে কোন মূর্ত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়, পরে উহা কোন প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে।
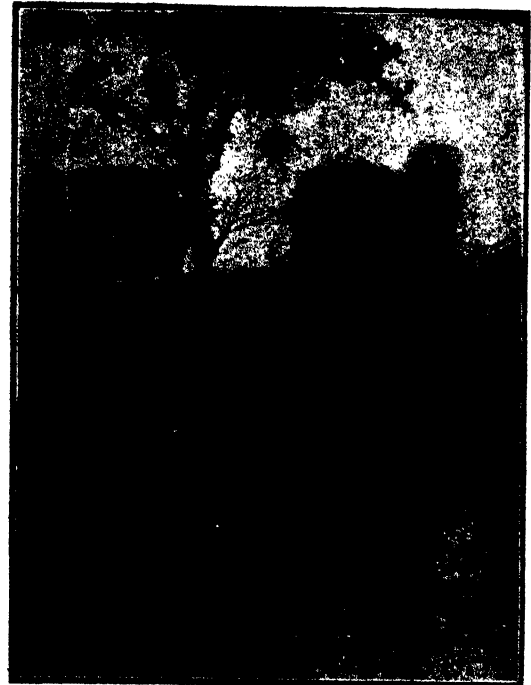
৺কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া আনেন, সেই সময় "বঙ্গাধিকারী"বংশীয় প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ ৺কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরাদির সংস্কার, দেবীর নূতন মন্দির এবং ভৈরবের মন্দির ও অপর কয়েকটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ

ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া কিরীটেশ্বরীর উন্নতি করেন। বঙ্গাধিকারীবংশীয় ভগবান রায় মোগল বাদশাহের নিকট হইতে কিরীটকণা গ্রামটি নিষ্কর (দেবোত্তর) জায়গীর রূপে প্রাপ্ত হন। দর্পনারায়ণের পরেও বঙ্গাধিকারীবংশীয়গণ এই স্থানের অনেক উন্নতি সাধন করেন। জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যের জন্ত বঙ্গের জমিদারদিগকে বঙ্গাধিকারীদিগের শরণাগত হইতে হইত। এই সকল জমিদার কিরীটেশ্বরীতে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া এই স্থানের উন্নতি কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গাধিকারীদিগের অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ করিলে কিরীটেশ্বরীরও দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। তৎপরে মুর্শিদাবাদের গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটেশ্বরীর সমৃদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। নাটোরের সাধক রাজা রামকৃষ্ণের নিকট কিরীটেশ্বরী অতি পবিত্র সাধনার স্থান ছিল। তিনি এক কালে এই স্থানের মন্দিরাদি সংস্কার করাইয়াছিলেন—ইহা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" হইতে জানা যায়। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, নবাব মির্জাফর যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, সেই সময় রোগ আরোগ্য কামনায় দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমারের পরামর্শ অনুসারে তিনি ৺কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন।

৺কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান গৃহ

পূর্ব্বে এই গ্রামে ১৭২ ঘর শুধু কিরীটেশ্বরীর পাণ্ডার বাস ছিল। এতদ্ব্যতীত কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক, তাকরা, বাগ্দী ও মাল প্রভৃতি জাতীয় বহু লোকের বাস ছিল। সর্ব্বদা কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খ-ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত হইত। তখন গ্রামে টোল, পাঠশালা ও বাজার ছিল। বর্ত্তমানে গ্রামে মাত্র ৪ ঘর পাণ্ডা ও ১ ঘর ভট্টাচার্য্য আছে। এতদ্ব্যতীত ১৪।১৫ ঘর ভুঁইয়া, ১১।১২ ঘর মাল ও ২।৩ ঘর বাগ্দী আছে। পাণ্ডাদিগের মধ্যে বৃদ্ধা কুমুদকামিনী দেব্যা কিরীটেশ্বরীর বহু পুরাতন কাহিনী অবগত আছেন। রোগের জন্ত ডাক্তার বৈদ্য, শিক্ষার জন্ত একটী পাঠশালা পর্য্যন্ত গ্রামে নাই। বাজার নাই, দুইখানি মাত্র মুদীর দোকান আছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিলাম যে, কিরীটেশ্বরী মহালটি বর্ত্তমানে কান্দীর নিকটস্থ বহরালের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের জমিদারীভুক্ত। ৺কিরীটেশ্বরীর ও গুপ্তপীঠের আজিও প্রত্যহ যে সামান্ত ভোগ হয়, তাহা ইঁহারই ব্যয়ে হইয়া থাকে। যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে ৺কিরীটেশ্বরীর সম্মুখে মানসিক করিয়া ছাগ বলি দিতে পারেন। পৌষ মাসের প্রথম মঙ্গলবার বাদে অন্ত তিন মঙ্গলবারে এখানে মেলা হয় ও বহু লোক সমাগম হয়। কানুনগো দর্পনারায়ণ এই মেলার সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বে কিরীটেশ্বরীর জমিদারী, বাগান বাগিচা, বহুমূল্য অলঙ্কার ও আসবাবপত্র ছিল, বর্ত্তমানে তাহার কিছুই নাই। এক্ষণে চতুর্দ্দিকে ধ্বংস ও দৈন্তের করাল ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ও গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। আজি এ অভিশপ্ত স্থানে দেবতা নিদ্রিত, পূজারী নির্ব্বংশ। যাতায়াতের অসুবিধার জন্ত ও লোকের ধর্ম্মভাবের অভাব হওয়ায় এক্ষণে প্রত্যহ যাত্রী সমাগম ঘটিয়া উঠে না। গ্রামটি জেলা মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার ও ডাহাপাড়া পোষ্টাফিসের অধীন।

বেলা ১০টার পূর্ব্বে দেবীর পূজা হয় না শুনিয়া, পূজারির নিকট নামধাম ও গোত্রাদি লিখিয়া দিয়া ও পূজার ব্যয় দিয়া বেলা ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় আমরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। ফিরিবার-পথে পূর্ব্বে বর্ণিত রোসনীবাগের মকবরা বা কবর স্থান দেখিয়া লইয়াছিলাম। তৎপরে খেয়া নৌকায় ভাগীরথী পার হইয়া বেলা ১১৷৷০ টার সময় বাসা বাটীতে পঁহুছিলাম এবং পূর্ব্ব দিনের স্থায় অতিসংক্ষেপে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার শেষ করিয়া বৈকালের ডাউন কৃষ্ণপুর— রাণাঘাট লোকাল ট্রেণে স্থান সংগ্রহ করতঃ মুর্শিদাবাদে ত্যাগ করিলাম। এই ট্রেণে যাইলে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি প্রায় ১২টার সময় কলিকাতা পঁহুছিতে হয়। পথে যখন পলাশী ষ্টেসনে ট্রেণ দাঁড়াইল, তখন কলিকাতা হইতে আগত ট্রেণের লোকের মুখে শুনিলাম যে, আর্য্যসমাজীদিগের বাৎসরিক শোভাযাত্রা লইয়া কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে। ইহা শুনিয়া কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত রাখিয়া উলা—বীরনগর ষ্টেসনে ট্রেণ আসিলে ললিতা দাদাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া পড়িলাম এবং নিজ বাটীতে গমন করিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। এইরূপে এবারের মত মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ শেষ করিলাম।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত দেহের অবসাদ লইয়া ম্লানমুখে সূর্য্য তখন ধূসর আবিল পশ্চিম গগনের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। দয়াদেবী মালার থলে হাতে জপ করিতেছিলেন; আর এক-একবার উৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন—বোধ করি কাহারও আগমন-প্রতীক্ষায়। এমন সময় মেজবাবুর কোঁচান ধুতি হাতে লইয়া নবীন খানসামা অন্দরে প্রবেশ করিতেই দয়াদেবী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে নবনে, দেখতে পেলি কোথাও ছোটবাবুকে?"

নবীন ঘাড় নাড়িয়া শুষ্কমুখে কহিল "না।"

দয়াদেবী নবীনের স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন; কাজেই তাহার কথায় ততটা আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, তিনি একটু বিরক্ত ভাবেই কহিলেন, "বলি কোথাও খুঁজতে গিয়েছিলি, না ঘরে পড়ে ঝিমুচ্ছিলি?"

নবীন একটু অপ্রস্তত ভাবে মাথা চুলকাইয়া কহিল, "তা আজ্ঞে সকল দিক ভাল করে খোঁজা হয়নি!" সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে দোতালার সিঁড়িতে মেজবাবুর জুতার শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল। দয়াদেবীও আর কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না।

নবীনকে কাপড় হাতে দয়াদেবীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দেবেন বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কি—এতক্ষণে বাবুর ঘুম ভাঙ্গল না কি? হারামজাদা দিন দিন পাজীর ধাড়ী হচ্ছে! যেদিন দূর করে দেব, সেইদিন টের পাবে। যা—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে, হাত মুখ ধোবার জল দে!"

নবীন চলিয়া যাইতেই দেবেন চোখ রগড়াইয়া কহিল, "কি পিসী, আজ তোমার একাদশী না কি? সারাদিন ধরে যে মালাই জপছ?"

দয়াদেবী হাসিবার ভঙ্গীতে কহিলেন, "একাদশীটা তোদের পাঁজীতে মাসে দুটো না হয়ে বোধ হয় দশ পনেরটা হলে তোদের বড় ভাল হত—না রে দেবু?"

দেবেন হাসিয়া কহিল, "রাগ করছ কেন পিসী? ভাল কথাটাও যদি ভাল ভাবে না শোন, তবে আর আমার দোষ কি? সাধে কি বলি 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'।"

নবীন এক গাড়ু জল ও গামছা আনিয়া হাজির করিল। দেবেন হাত মুখ ধুইয়া উঠানে নামিতেই, কল্যাণীর মা দিগম্বরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"এই যে, এস পিসী, কলির বে ঠিক হয়ে গেছে শুনলুম" বলিয়া দেবেন বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দিগম্বরী নিতান্তই সেকেলে ধরণের; কাজেই মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, জাত রক্ষা করতে ত হবে? এই ১৫ই দিন ঠিক হয়ে গেছে,—এখন নির্ব্বিঘ্নে সাত পাক ঘোরে ত বাঁচি।"

দিগম্বরীকে দেখিয়া দয়াদেবী জপের মালা তিনবার কপালে ঠেকাইয়া দেয়ালের পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিলেন; এবং ঘরের ভিতর হইতে একখানা আসন আনিয়া বারান্দায় পাতিয়া দিয়া কহিলেন, "বস দিদি,—শুনি, বিয়ের কি রকম কি করছ...কি দিতে থুতে হচ্ছে...কদিন থেকেই একবার যাব যাব ভাবছি,—বোস সব শুনি।"

দিগম্বরী বসিলেন। সত্যবালা একটু অন্তরালে দাঁড়াইল।

দেবেন একটু গম্ভীর ভাবে মুরুব্বিয়ানা চালে কহিল, "তা তোমার যা অবস্থা পিসী, সে হিসেবে কলির যা বে দিচ্ছ, সে খুব ভালই দিচ্ছ। মল্লেনপুরের জগদীশ মুখুজ্যের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার মত অবস্থা ত আর সত্যি তোমার নয়—মেয়েটার নেহাৎ বরাত-জোর তাই!" দিগম্বরীকে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া দেবেন একটু থামিয়া কহিল, "এ

অঞ্চলের ভেতর আজকাল জগদীশ বাবুর অবস্থাই সব চেয়ে ভাল। আর তার স্বভাবও শুনেছি ভালই।"

দিগম্বরী একটু দুঃখিতভাবে কহিলেন "কিন্তু বয়েসটা"—

দেবেন বাধা দিয়া বলিল, "তা এখন সব দিক খতিয়ে দেখতে গেলে চলবে কেন পিসী! আর তা না হলে সে তোমার মেয়েকেই বা বিয়ে করবে কেন? দেশে কি আর সুন্দরী মেয়ে নেই? ওসব কিছু ভেবো না পিসী! ও যার ঘর, সে ঠিক গড়ে-পিটে নেবে।" দেবেন একবার আড়-চোখে সত্যবালার দিকে চাহিল। কথাগুলি সত্য হইলেও সহায়হীনা দরিদ্রা জননীর কাণে তাহা শ্রুতিমধুর ঠেকিল না। দিগম্বরী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"মেয়ের বরাত।"

দয়াদেবী কল্যাণীর মার মনের কষ্ট বুঝিলেন, এবং স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "বিয়ে-থাওয়া হচ্ছে দিদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! যার সঙ্গে যার লেখা—তা হবেই। দেখ—এখন মেয়ের অদেষ্ট। কি দিতে থুতে হচ্ছে?"

দিগম্বরী ক্ষুন্ন ভাবে কহিলেন, "কি আর আছে আমার যে তাই দেব। দাদার যা অবস্থা তা ত তোমরা সবই জান। তবে তারা কিছু নেবে না বলেছে। কিন্তু তাই বলে ত সত্যি আর মেয়েকে কিছু খালি হাতে বিদেয় করতে পারব না। যা হোক্ করে দাদাকেই কিছু দিতে হবে বৈকি!"

দয়াদেবী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "তা ত সত্যিই!"

"তা ছাড়া গ্রামের দু-পাঁচজন এয়োকে আর স্বজাতিকেও ত ডাকতে হবে।"

দেবেন বাধা দিয়া কহিল, "ওসব হাঙ্গামায় তুমি যেও না পিসী! তোমার যা অবস্থা, তাতে সেজন্যে তোমায় কেউ কিছু বলবে না!"

নবীন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, "মহিম গোঁসাই এসেছেন!"

"বিদ্যেবাগীশকে বসতে বল্—যাচ্ছি!"

দিগম্বরী দেবেনকে কহিলেন, "যেও বাবা, একটু দেখা শোনা করো, তোমরাই আমার ভরসা!"

দেবেন তাহার গোঁপের ডগায় পাক দিয়া কহিল, "তা আর বলতে হবে কেন পিসী? সেজন্যে তুমি কিছু ভেবো না,—আমরা ত পাঁচজন আছি,—যা হোক্ করে এ কাজ উদ্ধার করতেই হবে।" দেবেন বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল। সত্যবালাও একখানা গামছা কাঁধে ফেলিয়া পুকুরঘাটে গা ধুইতে গেল!

দিগম্বরী দয়াদেবীকে নিম্নস্বরে কহিলেন, "ধীরুর সঙ্গে দেবুর আজ নাকি ঝগড়া হয়েছে?"

দয়াদেবী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া কহিলেন, "ধীরু ত ঝগড়া করবার ছেলে নয় বোন! দেবুই আজ সকালে তাকে গালাগাল দিলে। বাছা আমার না খেয়ে বাড়ী থেকে চলে গেছে,—সারাদিন গেল, এখনও ফেরে নি। আর আমি হাপিত্যেশে পথের দিকে চেয়ে আছি!" দয়াদেবী চক্ষু মুছিলেন।

"ধীরু আমাদের বাড়ী খেয়েছে। কিন্তু আহা, তোমার মুখে এখনও বুঝি জলটুকুও পড়ে নি!"

দয়াদেবী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "খেয়েছে? যাক্, বাঁচালি বোন্! সেই থেকে আমি ভেবে সারা হচ্ছি! সে আমার বড় অভিমানী ছেলে! কেবলই মনে কু-গাইছিল,—বুঝি বা ঘেন্নায় কিছু করে বসে বা কোথাও চলে যায়।"

"বোধ করি তা যেত! অনেক করে বলতে সে কলির বিয়ের কদিন থাকতে রাজী হয়েছে! তার পর না কি কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় বিদেশে যাবে। পড়াশুনো আর করবে না।"

দয়াদেবী ভগ্নস্বরে কহিলেন, "আহা, ভগবান তার সুমতি দিন! সে তোকে আমার চাইতেও মানে, তাই তোর কথা ঠেলতে পারেনি। আর কলিকে ও কি ভালই বাসে··· যদি আজ দাদা থাকত······"

দিগম্বরী কহিলেন, "সে কথা আর বলতে!···আমারও ত বড় সাধ ছিল······কি করব সবই বরাতে করে!"

দয়াদেবী কহিলেন "সে কথা বলে আর কি করব দিদি! আমারও বড় ইচ্ছা ছিল······কিন্তু না হয়েছে ভালই! সংসারের অবস্থা ত দেখতে পাচ্ছ? কলিকে তা'হলে হাত-পা-বেঁধে আগুনে ফেলে দেওয়া হত! এ ত তবু"······ দয়াদেবী আর বলিতে পারিলেন না!

পুকুরঘাট হইতে সত্যবালা ভিজা কাপড়ে দালানে উঠিয়া আলনা হইতে একখানা কাপড় টানিয়া লইল।

দিগম্বরী কহিলেন, "মেজ বৌমা, কালকে তোমাকে একবার যেতে হচ্ছে যে মা। ছিরী গড়তে হবে; বরণডালা

রাঙ্গিয়ে রাখতে হবে……পরশু কলির গায়ে হলুদ, এয়োতীর কাজ-কর্ম্ম আছে।"

সত্যবালা দড়িতে ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে কহিল, "কেন—বড়গিন্নীকে নিয়ে যাও না, সব ত জানে শোনে।"

"হ্যাঁ, বড় বউমাও যাবে,—তবে তোমাকেও যেতে হবে! সব কাজই যে সধবাদের করতে হয় মা।"

"দেখি, যদি পারি ত যাব।" সত্যবালা আপনার ঘরে চলিয়া গেল। দয়াদেবী হাতের আঙ্গুল চিবুকে ঠেকাইয়া কহিলেন, "দেখলে দিদি, ওর রকমখানা, কথাবার্ত্তার ছিরি! হাড় জ্বালিয়ে দিলে! ধীরুর এ সর্ব্বনাশটা ত ওই করলে। নইলে দেবু ত এদ্দিন……যাক্ ওপরে ধর্ম্ম আছেন, তিনি ত সবই দেখছেন।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া দিগম্বরী কহিলেন, "আজ দেখছি তোমার বরাতে আর বকনো চড়লো না!" দয়াদেবী তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, "না হকগে—আমার ধীরু যে দুটো খেয়েছে, এতেই আমার পেটের অনেকখানি ভরে গেছে; বাকীটুকু জল দিয়ে ভরিয়ে রাখলেই হবে! এমন বরাতও করেছিলুম, পোড়া মরণ ত হয় না!"

রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রী একগোছা ধোয়া বাসন হাতে লইয়া ভিজা কাপড়ে উঠানে আসিতেই, দিগম্বরী ঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইয়া, বারান্দায় বাসনের গোছা নামাইয়া, মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া দিগম্বরীকে প্রণাম করিল। দিগম্বরী রাজলক্ষ্মীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন! "এস মা, তোমার জন্যেই বসে আছি! কলির বে এই মাসের ১৫ই,—পরশু গায়ে-হলুদ! আমার ঘরে ত আর কেউ নেই—তোমাদেরই করতে কম্মাতে হবে!" রাজলক্ষ্মী হাসি-মুখে ঘাড় কাত করিল এবং দয়াদেবীর দিকে চাহিল।

দয়াদেবী কহিলেন, "ও যাবে'খন, আমি রাজুকে বলব! যাও, তুমি ভিজে কাপড় ছাড়গে বড় বৌমা!"

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে দয়াদেবী কহিলেন, "ওর দিদি কোন বালাই নেই, মাটির মানুষ!"

"তাহলে আসি দিদি, সন্ধ্যে হয়ে এল!"

"এস।"

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন। দয়াদেবী মালার থলে হাতে ঠাকুর-ঘরের দিকে সন্ধ্যাদীপ ও বৈকালী ভোগ দিবার জন্য দু এক পা যাইতেই, সত্যবালা সম্মুখে আসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "ও মাগির কাছে আমার নামে কি এতক্ষণ ধরে ফিস ফিস করে লাগানো হচ্ছিল শুনি!"

দয়াদেবী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি মেজ বৌমা!"

সত্যবালা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "তা বটেই ত, আমি আর কিছু শুনি নি কি না! যত পাড়ার মাগী আমার বাড়ীতে আসবে, আর উনি করবেন তাদের কাছে আমার কেচ্ছা! বলে—যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!"

দয়াদেবী সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বলে থাকি বেশ করেছি, তুই যা করতে পারিস করিস! এমন ছোট লোকের ঘর থেকে মেয়ে এনেছিলুম যে সংসারে আগুন জ্বেলে দিলে গা!"

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িলে যেমন প্রচণ্ড ভাবে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সত্যবালাও তেমনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল "দেখ, মুখ সামলে কথা কও,—ভাল হবে না বলছি।—বাপ-মা তুলে কথা! আজন্ম রাঁড় হয়ে সাতকুল খেয়ে ভাইপোদের দোরে পড়ে আছেন, আবার দেমাক কত! আমার হিংসেতেই মলেন, আমি যেন বুকে ভাতের হাঁড়ী চাপিয়েছি!"

সমস্ত দিন অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় দয়াদেবীর শরীর মন দুই ই অবসন্ন ছিল,—সত্যবালার কথায় দুঃখে, অভিমানে, রাগে তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল! বিকৃত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখ্, অত তেজ ভাল নয়,—ওপরে ধর্ম্ম আছেন, সইবে না, কখনও সইবে না!" দয়াদেবী কম্পিত চরণে সে স্থান কোন প্রকারে ত্যাগ করিয়া ঠাকুর-ঘরে গেলেন এবং সাক্ষীগোপালের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "নারায়ণ, তোমার মনে এতও ছিল!" চোখের জল ধারা বহিয়া ঠাকুরের বেদী স্পর্শ করিল! সে গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিল না, বৈকালী নিবেদন হইল না, গাঢ় অন্ধকার বিগ্রহ এবং ভক্তকে ঢাকিয়া রাখিল!

রাজলক্ষ্মী দয়াদেবীর কান্নার শব্দে বারান্দায় আসিতেই দেখিল, সত্যবালা ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে! ঘরের দীপের আলো তাহার মুখের উপর পড়ায় রোষ-দীপ্ত মুখখানা আরও লাল দেখাইতেছিল!

"কি হয়েছে মেজ বৌ?"

সত্যবালা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তোমার অত খবরে দরকার কি গা!"

রাজলক্ষ্মী অপ্রস্তত ভাবে কহিল "পিসীমার কান্নার শব্দ পেলুম কি না তাই"—

সত্যবালা বাধা দিয়া কহিল, "তা আমায় কেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করগে না! দরদ দেখাতে এসেছেন! অমন ন্যাকা-কান্না ঢের দেখেছি! আমায় যে এত শাপ-শাপান্ত, মা-বাপ তুলে গাল দিলে, তা বুঝি কাণে গেল না—তখন সবাই কাণের মাথা খেয়েছিলে!"

রাজলক্ষ্মী আর কোন কথা না বলিয়া ঠাকুর-ঘরের দিকে যাইতেই সত্যবালা কহিল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

রাজলক্ষ্মীর পায়ে শিকল পড়িল! সে ধীরে ধীরে কহিল, "পিসীমা আজ সারাদিন—"

বাধা দিয়া সত্যবালা কহিল, "বড় যে দরদ দেখছি?"

"দরদ নয় মেজ বৌ,—সংসারের ত একটা মঙ্গল-অমঙ্গল দেখতে হয়?"

সত্যবালা ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "ওগো আমার দরদী, সংসারের মঙ্গল দেখছেন? এতদিন ছিলে কোথায়? তখন ত বিদেশে সব সুখ করছিলে, আর এই বাঁদী তোমাদের সংসার চালিয়েছে! আজ ত তোমরা সব ভাল, আমি মন্দ হবই!"

রাজলক্ষ্মী মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমি ত তা বলিনি মেজ বৌ!"

"আবার কি করে বলতে হয় তা ত জানি না! সকলে মিলে দশের কাছে আমায় খেলো করছো! তা কর, ভগবান ত দেখছেন!"

"আমি কি করলুম মেজ বৌ?"

"কেন? এই যে সকালে রাগী পুরুষ রাগ করে না খেয়ে বাড়ী থেকে চলে গেছেন, কই, ভাল ভাজ সব, ডাকিয়ে এনে খাওয়াতে পার নি? আমি ত মন্দ, তিনি আমার মুখ দেখবেন না! ওই যে পিসী ভাইপোকে বল্লেন 'থাকিসনি ধীরু, এখানে থাকিসনি, যেখানে দুচোখ যায় চলে যা'—কই তার বেলা কেউ একটা কথা বলতে পেরেছিলে? আমিই তোমাদের সংসার ভাঙ্গছি, না?"

মোক্ষদা ঝী আসিয়া কহিল, "পুরুত মশাই এসেছেন বৌদি!" রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেল!

সত্যবালা বলিল, "কি পাষাণ রে বাবা! কি না কি একটা কথা দাদা বলেছে, অমনি ঠেকার করে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া হল, আর আসা হল না! ওই শাশুড়ী মাগী কি কম শত্তুর ছিল, মোক্ষদা,—মরবার সময় সত্যি করিয়ে নিলে 'মা, ধীরুকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, তোমার ছেলের মতন দেখো!' এখন আমি কি করি তোরাই বল্?" চক্ষে বসনাঞ্চল দিয়া সত্যবালা কাঁদিতে লাগিল!

মোক্ষদা বলিল, "তা ত বটেই বৌদি! হাজার হক ছেলের মতন মানুষ করেছ, ছোটবাবু যে মানুষ খারাপ, তা ত নয়। তবে ওই এক দোষ—ভারী একগুঁয়ে, সেটি ধরবে সেটি করবে! আরও পাঁচজনে মন্তনা দিয়ে লাগিয়ে ছোটবাবুর মনটি ভাঙ্গিয়েছে বৌদি!"

"তা আর জানি না মোক্ষদা, সবই জানি! ১০ বছরের বেলায় এদের বাড়ীতে এসেছি, আর ৩০ বছর এখানে কাটালুম, সকলকে চিনেছি। আমি বলে মেয়ে, তাই সকলকে নিয়ে মানিয়ে এতদিন একসঙ্গে ঘর করছি। বড় গলা করে বলছি, কোন্ বাপের বেটী এ রকম পারে আমায় দেখিয়ে দিক্!"

"ও বৌদি, মেজদাদা-বাবু আসছেন!" স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সত্যবালা আঁচলে চোখ মুছিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "বেশ ত, আমি মন্দ, আমায় আজই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিক্! আমার জন্য ওঁর ভাই বাড়ী ছাড়বে, পিসী উপোস করে হত্যে হবে, এর ত কোন দরকার নেই!" বলিয়া সত্যবালা আপনার ঘরে চলিয়া গেল!

৬

বিবাহের পর কল্যাণী মল্লেনপুরে স্বামীর ঘরে আসিয়াছে আজ প্রায় মাস খানেক হইল,—খুড়দার কোন খবরই সে জানে না। সে শুনিয়াছিল, ধীরু গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বিদেশে যাইবে,—গিয়াছে কি না তাহার কোন খবর পায় নাই। এখানে আসিয়া সেই খবরটা জানিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইতেই, সে তাহার নির্লজ্জ মনকে ভর্ৎসনা করিয়া দাবিয়া রাখিল। 'ধীরুর সহিত আমার কি সম্বন্ধ? সে তাহার জীবনটা যে ভাবে চালাইয়া নিয়া যায় যাক না কেন, আমার কি? সে কি কখনও আমার কথা কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছে? ইচ্ছা করিলে সে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিত না? না, সে আমার কেউ নয়!' কিন্তু

পরক্ষণেই মনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া কি জানি কেন তাহারই কল্যাণ চায়···প্রাণটা কাঁদিয়া বলে, "ঠাকুর, তুমি তাহাকে দেখিও, সে চিরদিন আপনার সম্বন্ধে উদাসীন! আমার যাহা হইবার হইয়াছে, হউক,—কিন্তু সে যেন সুখে থাকে।"

এখানে জগদীশ বাবুর বিধবা ভগিনী কাদম্বিনী তাহাকে যত্ন করে, স্নেহ করে। বৃদ্ধ জগদীশ বাবু প্রাণের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া কল্যাণীকে তুষ্ট করিবার জন্য যাবতীয় সুখের ভাণ্ডার সম্মুখে ধরিলেন। কল্যাণী সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না! খাঁচায়-পোরা বনের পাখীর মতন সে হতাশ ভাবে এক কোণে সরিয়া নির্জ্জীব অবস্থায় ছটফট করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার মুক্ত বাতাসে ছাদে বসিয়া কল্যাণী আজ তার জীবনের লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিতেছিল। বর্ত্তমান অন্ধকারময়—ভবিষ্যতের কোন অস্তিত্বই নাই,—তাই অতীতের মধুর স্মৃতি তাহার মনের কোণে মাথা উঁচু করিল। বাল্যের খেলা-ধূলার মধ্যে গঠিত হইয়া উৎসাহ-আনন্দ লইয়া একটি গন্ধসিক্ত ফুলের কুঁড়ীর মতন যে কল্পনা তাহার কুমারী জীবনকে প্রফুল্লিত রাখিয়াছিল, কৈশোরের যে উন্মাদনা মনকে টানিয়া লইয়া কোন্ দৃষ্টির অগোচরে একটা পরিপূর্ণ সার্থকতাময় সুন্দর বিশ্বের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিল, আজ বাস্তবের কঠিন আঘাতে স্বপ্নের মত তাহা মিলাইয়া গিয়াছে! সত্য জগতের এক কোণেও তার একতিল অস্তিত্ব আজ নাই। কেন এমন হইল? সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা কি এমনই দুর্লভ ছিল? হয় ত বা তাই! এই না-পাওয়ার দুঃখটা অন্তরের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিলেও, সেই চাওয়ার মধ্যে যে সুখটুকু প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, কল্যাণী আজ সেইটুকুই বুকে চাপিয়া ধরিল।

হতাশ ভাবে তাহার সজল দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখে, অদূরে এক গৃহস্থ-বাড়ীর মাটির দাওয়ার উপর কতকগুলি ছোট মেয়ে অবাধ আনন্দে খেলা করিতেছে, যুবতী বধূ হাসিমুখে তার গৃহকর্ম্মে নিরতা, স্বামী প্রশংসমান চক্ষে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া আছে। কল্যাণী দৃষ্টি ফিরাইল, তাহার চোখের কোণ দিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

পশ্চাৎ হইতে কাদম্বিনী আসিয়া কহিল, "এ কি বৌদি, তুমি কাঁদছ?"

কল্যাণী কোন উত্তর করিল না, আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিল।

"মার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?...ছিঃ, কাঁদে না, সকলেই ত শ্বশুরবাড়ী যায়! যতদিন বিয়ে না হয় ততদিনই বাপ-মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ, বিয়ে হলে স্বামীর ঘরই হচ্ছে আপনার। আর সত্যি ভাই, তুমি ত ছেলেমানুষ নও; এস নীচে এস, চুল বাঁধবে।" কল্যাণীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কাদম্বিনী বিরক্তস্বরে কহিল, "আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"তবে এস আমার সঙ্গে।"

কল্যাণী ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "আমায় একটু নিরিবিলি বসে থাকতে দেখলেও তোমাদের সয় না?"

"ও কি কথা বৌদি······চুপ করে একাটি বসে আছ···"

"আমার ভাল লাগে তাই"······

"তাই থাক"···বলিয়া কাদম্বিনী বিরক্তভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল। জগদীশ বাবুর দূর সম্পর্কীয়া মামী সৌদামিনী ঠাকুরাণী নীচের বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন; কাদম্বিনী মুখভার করিয়া নীচে আসিতেই সত্ব ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে লা কাদি?"

"বৌ একাটি ছাদে বসে রয়েছে দেখে বললুম, 'এস তোমার চুল বেঁধে দিই'—তা আমায় ঝঙ্কার করে উঠল!"

"কই, যাই দেখি একবার নবাবের বেটিকে দেখি! জগুকে তখন পই পই করে বারণ করলুম—অমন তিনকুল-খেগো হা-ঘরের মেয়ে এনে কাজ নেই। বাপ মিন্সে জন্ম দিয়েই খালাস, মা মাগীর উদ খেতে ক্ষুদ নেই...এক মামা, সেও ত শুনি গেঁজেল···দুচার ঘর যজমানরা দয়া ধর্ম্ম করে যা দেয় তাই দিয়েই দিনপাত···তাদের মেয়ের এত দেমাক কিসের শুনি? জগুর যেমন কাণ্ড···না দেখলে তার ঘর-সংসারের হাল, না শুন্‌লে তার রাশ নক্ষত্তর, না করলে তার বয়েসের বিচার,—রূপসী দেখে ঘুরে পড়ল! রূপ ত কত? পাঁকাটির মতন গড়ন, সাদা ফেকফেকে রং, যেন শ্বেবা হয়েছে। বুড়ো শালিক কখনও পোষ মানে? এই কি বিয়ের কনে? ওই বয়সে আমার "মেনী" "ভবি" হয়ে মরেছে, "খুকনী" পেটে···না ছাই কি বলছি—খুকনী তখন ১৪ মাসের···"আন্না" পেটে···হ্যাঁ তাই বটে···"আন্না"ই পেটে। তা মা-মাগীকেও বলি—অত বড় থুবড়ো মেয়ে ঘরে রেখেছিলি কি করে?...গলায় ভাত আটকাত না?...

আমাদের হলে অমন মেয়ের গলা টিপে এমনি করে···উহু... হু···হু ..গেছি রে···"বলিয়া সদু ঠাকরুণ তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলী চাপিয়া ধরিয়া যাতনার অনুভূতি-সূচক অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিলেন। গয়লা বৌ কহিল "আহা-হা আঙ্গুলটা কেটে ফেল্লে বুঝি? তোমারও যেমন কাজ···বুড়োমানুষ, গেছ···তরকারী কুটতে, বাড়ীতে কি আর মানুষ নেই? এস, আঙ্গুলটা তেল নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিই!" গয়লা বৌ একটা নেকড়া রেড়ীর তেলে ভিজাইয়া সদু ঠাকরুণের আঙ্গুলে বাঁধিয়া দিল!

বঁটিখানা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া সদু ঠাকরুণ কহিলেন "শত্তুরদের জ্বালায় আর তেষ্টাবার যো নেই। রাতদিন মনে মনে রিষ করবে আর গাল দেবে···আর আমার এই দশা হবে। থাকছি না আর এখানে···আজ জগু এলে বলছি, দিক আমায় বিন্দাবনে পাঠিয়ে···থাকুক সে তার ধিঙ্গী বৌ নিয়ে,···দেখতেও আসব না, বলতেও আসব না।"

গয়লা বৌ কহিল "তা হক্ কথা বলুব মামী, নতুন বৌদি ত আর ছোটটি নন, দৈবি সৈবি এক আধ দিন ত কুটনোটাও কুটতে পারে? এই ত বড় গিন্নী থাকতে কত কাজ করেছেন ..আমরা যদি বলেছি, তা হলে বলতেন... তোদেরও ত মানুষের শরীর! আহা, সতী লক্ষ্মী মানুষ সগ্গে গেছেন···তার নামে মিথ্যে বলব না!"

সদু ঠাকরুণ হতাশভাবে কহিলেন, "তার মায়াতেই ত আজও এই মাটি কামড়ে পড়ে আছি, ..বলি, তার রাজ্যি-পাটে ছুঁচোর কেত্তন হবে মা?"

গয়লা বৌ একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া নিম্নস্বরে কহিল, "কি দেমাক, মা, কি দেমাক! সেদিন বড়মুখ করে বললুম 'নতুন বৌদি, বাবুকে বলে আমায় বিশ গণ্ডা টাকা দিইয়ে দাও, আমার নেড়ার জন্যে পাশের ধানজমীটা কিনি, তোমাদের এখানে গতর খাটিয়ে শোধ করব'···তা বল্লে কি জান, 'তুমি বাবুকে বল, আমি পারব না' দুঃখী গরীবের প্রতি একটু দয়া নেই। সদাই মুখখানা হাঁড়ী করে আছেন। না আছে একটু হাসি, না আছে দুটো মিষ্টি কথা!"

"কি বলুব বল্, তোরাই দেখ! কিছু বলি না মা, পাছে জগু কিছু মনে করে! জগু ত আজকাল অন্দর থেকে এক পা নড়তে চায় না, কাছারীতেও রোজ বসে না। আগে তবু দু' একবার মহালে যেত, এখন তাও না! জগুকে যেন কি তুক করেছে। যাক্‌গে, সন্ধ্যে হয়ে এল, দুধ নিয়ে আয়···আর দেখ্ কাদী পূজোর-জোগাড় করলে কি না!"

গয়লা বউ চলিয়া গেল। সদু ঠাকরুণ ছাদে আসিয়া দেখিলেন, কল্যাণী আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কহিলেন—"বলি বউ, তোমার আক্কেলখানা কি গা? সন্ধ্যেকালে ছাদের ওপর দিব্বি তুমি মাথার কাপড় ফেলে হাঁ করে চেয়ে আছ? এ ত আর বাছা তোমার মামার বাড়ী নয়, যে, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ধেই ধেই করে পাড়ায় পাড়ায় নেত্য করবে! ওমা, সোমত্ত বউ এমন বেহায়া হয়? ওই হারু ঘোষের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওরা হল আমাদের সাত পুরুষের পেরজা···একটা কোন কথা রটলে তখন আমার জগুর মুখখানা থাকবে কোথায়? তোমার মামী কি তোমায় বাছা এটাও শেখায় নি?···ছ্যা ছ্যা কি ঘেন্না···কি ঘেন্না!"

লজ্জায় দুঃখে কল্যাণীর চোখ দিয়া জল বাহির হইল। একটা রুদ্ধ ক্রন্দন বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া সজোরে ধাক্কা মারিতে লাগিল! আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কল্যাণী ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সদু ঠাকরুণ পশ্চাতে নামিতে নামিতে কহিলেন, "বল্লেই ত বাছা রাঙ্গা চোখের পানি ফেল,—কিই বা এমন বলেছি ..আবার পার ত জগুর কাছে সাতখানা করে লাগিও,···মামীকে বিদেয় করে দশ হাত বার করে খেও।" বলিয়া সিঁড়ীর নীচে নামিয়া জগদীশ বাবুকে অদূরে আসিতে দেখিয়া কল্যাণীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "জল-খাবার নেবে এস বউমা, সেই কখন চারটি ভাত মুখে করেছ"······বলিয়া তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কল্যাণী একাকী জানালার পাশে গিয়া বসিল এবং আঁচলে চোখ মুছিয়া দূরে অন্ধকার-পূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি জীবন্ত সমাধি তার! এ-রকম করিয়া কত দিন চলিবে? একে একে তাহার

ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল! কি সুখের জীবনই ছিল!···তার পর প্রহেলিকাময় নব জীবনের উন্মেষ! দেহ মনে সাড়া দিয়া হঠাৎ কে আসিয়া যেন চোখ দুটির উপর কিসের কাজল পরাইয়া দিয়া গেল! সারা জগৎ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল! আকাশে নূতন রূপ, পুষ্পগুচ্ছে নূতন রূপ! যেন কোথাও কোন দুঃখ দৈন্য নাই—আনন্দের অবাধ একটানা স্রোতে জগতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে,—কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, জানে না···শুধু এইটুকু জানে যে, এই যাওয়ার মধ্যেই সমস্ত চাওয়া পাওয়ার পূর্ণ সার্থকতা কোন্ দূরে অপেক্ষা করিতেছে! কিন্তু এ কি হইল? সে স্বপরাজ্য সূর্য্যকরপাতে তুষারের মতন কোথায় অদৃশ্য হইল? কল্যাণীর ইচ্ছা হইল, মার কোলে ফিরিয়া যাই...কিন্তু সে স্বাধীনতাই বা তাহার কোথায়! তাহাকে এখন একজনের বিধান মানিয়া চলিতে হইবে, এমনি ভাবে জীবন কাটাইতে হইবে। বিবাহিতা বলিয়া তাহাকে সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে, চক্ষের জলে প্রাণের ব্যথা ডুবাইয়া রাখিতে হইবে; বুদ্বুদের মত দুঃখবিম্ব আপনি ভাসিবে, আপনি ভাঙ্গিবে, আপনি মিলাইয়া যাইবে,—কেহ দেখিবে না, জানিবে না, শুনিবে না। যাহাকে সে কল্পনাতেও কোন দিন চাহে নাই, যাহাকে সে কোন দিনও ভালবাসিতে পারিবে না, তাহারই সঙ্গে তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে! তাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া, সময় অসময়ে তাহার দেহটাকে লইয়া শকুনীর মত টানিয়া ছিঁড়িয়া যথেচ্ছাচার করিবে,—কোন প্রতিবাদ করা চলিবে না, ইহাই সতীত্ব! অত্যুজ্জল স্বর্ণরেখায় সতী-ধর্ম্মের পাথর বুকে এই নির্ব্বিরোধ নির্ম্মম অত্যাচার হয় ত খুব বড় হইয়া অঙ্কিত থাকিবে, কিন্তু সত্যকে একটা এত বড় মিথ্যা দিয়া গোপন রাখিয়া তাহার সত্যিকার নারীধর্ম্ম নিষ্ফল করিলে কি পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই, কল্যাণী চোখ মুছিয়া বারান্দা পার হইয়া ঠাকুর-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

কলিকাতার সম্পদ

(৩)

এক্ষণে কলিকাতা "City of Palaces" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় নগরী আজিকার কলিকাতার শ্রী দেখিয়া দুই শত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা কল্পনা করাও দুরূহ। তখন তথায় অর্দ্ধশতখানি পাকা বাড়ী ছিল বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সব প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সুবৃহৎ মনোহর সরকারী ভবনাদি, বর্ত্তমানে এই সহরকে এতাদৃশ শোভা ও সম্পদ-সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের কথা বলি। বর্ত্তমান দুর্গ যে স্থানে অবস্থিত, পুরাতন দুর্গ তথায় ছিল না। লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে এক্ষণে কাষ্টম্ হাউস্, কলেক্টরি অফিস, জেনারেল্ পোষ্ট অফিস্ আছে, দুর্গ তথায় ছিল। উহার নির্ম্মাণ-কাল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইলেও, জানা যায়, ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। তৎপূর্ব্বে তিন চারি বৎসরের মধ্যে উহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দুর্গের

বাহিরের মাপ মোটামুটি ২১০ গজ লম্বা ও ১২০ গজ চওড়া ছিল। (১) এই দুর্গ মধ্যেই অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে জানা যায়।

গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বর্ত্তমান দুর্গের পত্তন হয়। এবং ১৭৭৩ তে শেষ হয়। (২) ইংলণ্ডেশ্বর ৪র্থ উইলিয়মের নামে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে মোট ব্যয় হয় দুই মিলিয়ন্ ষ্টার্লিং। তন্মধ্যে কেবল গঙ্গার ধার বাঁধিতে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যে সময় উহা নিৰ্ম্মিত হয়, তৎকালে উহার ভিতরে চারি সহস্র লোকের থাকিবার মত স্থান করা হইয়াছিল। সে সময়ে ফরাসীদের দ্বারা কলিকাতা আক্রমণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া উহার নিৰ্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বিবিধ বাধা প্রযুক্ত অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। (৩)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর যে সব প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও তজ্জন্য অট্টালিকা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতাল, মাদ্রাসা, সুপ্রিম্ কোর্ট, ফ্রী স্কুল, লাটভবন, এক্সচেঞ্জ বাটী প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাসা,—তৎকালীন আদালতের প্রচলিত আরবি ও পারস্য ভাষা এবং মুসলমান আইন শিক্ষার উদ্দেশ্যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠা-কাল কেহ কেহ ১৭৮১ও বলিয়াছেন। (৪) মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। (৫) ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইহাই বোধ হয় এদেশের প্রথম বিদ্যালয়। হেষ্টিংসের নিজ ব্যয়ে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬)

প্রথম কোন্ স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাই নাই। ইহার বর্ত্তমান ভবন দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হয় এবং ইংরাজি ১৮২০সালে এই আবাসে স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজি বিভাগ খোলা হয়। (৭)

ফ্রি স্কুল,—খৃষ্টান বালক-বালিকাদের জন্য ইহা প্রথম ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জানবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওল্ড্ ক্যালকাটা চ্যারিটি এবং ফ্রি স্কুল্ সোসাইটির তহবিলের ৩ লক্ষ টাকার উপর ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল। জান্‌বাজারে প্রথম যে জমি ও বাড়ী খরিদ করা হইয়াছিল, উহার মূল্য ২৮০০০৲ টাকা। পর বৎসর একটি মেয়েদের বিদ্যালয় খোলা হয়। বর্ত্তমানে উহা যে বাড়ীতে আছে, উহা, পুরাতন বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ার পর, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। (৮)

জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশন্ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই ডাক্তার ডফ্ (Dr. Alexander Duffs) কর্ত্তৃক প্রথম চন্দননগরের ফিরিঙ্গি কমল বসু মহাশয়ের অপার চিৎপুর রোডের বাটীতে স্থাপিত হয়। (৯) সর্ব্বপ্রথম মাত্র ৫টি বালক লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহারা কেহ বেতন দিত না; বরং তাহাদের বিদ্যালয়ে আগমন মিশনারিদের নিকট অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইত। বসু মহাশয়ের বাটী হইতে উঠিয়া গিয়া কতিপয় বৎসর ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে স্কুল বসিতে থাকে। তৎপরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ডেভিড্ ম্যাক্‌ফারলেন্ কর্ত্তৃক কর্ণওয়ালিশ্ স্কোয়ারের বর্ত্তমান ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং পর বৎসর গৃহ-নিৰ্ম্মাণ শেষ

(১) Echoes from old Calcutta.

(২) The Good Old Days of Honourable John Company, vol—I এবং The Early History and Growth of Calcutta.

(৩) The Good old days of Honourable John Company. Vol—I

(৪) The Good Old Days of Honourable John Company. vol. I.

(৫) The Early History and Growth of Calcutta.

(৬) The Hand Book of India.

(৭) The Good Old Days of Honourable John Company, vol.—I

(৮) The Good Old Days of Honourable John Company, vol.—I

(৯) বসু মহাশয়ের প্রকৃত নাম রামকমল বসু, তৎকালে তিনি চন্দননগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ছিলেন। ফিরিঙ্গীদের সহিত জাহাজে মাল দেওয়া লওয়ার কার্য্য করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ফিরিঙ্গী কমল বলিত।

হইলে তথায় বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। তখন ইহার ছাত্র-সংখ্যা সাত শতেরও অধিক। (১০)

ডাক্তার ডফের চেষ্টাতেই ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন্ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা উপরিউক্ত বিদ্যালয়ের শাখা স্বরূপ প্রথমে নিমতলায় একটি ভাড়াটীয়া বাটীতে স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৮৫৭ সালে নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যায়। উহার নির্ম্মাণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ডাক্তার ডফ্ একটি অনাথ আশ্রম, একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ও নর্ম্মাল স্কুলও স্থাপিত করিয়াছিলেন। (১১)

প্রসঙ্গে তাঁহার মনে এই কল্পনার সুত্রপাত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাবান উদারপ্রাণ হিন্দু তাঁহাদের পুত্রদিগকে ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার মানসে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ রূপে ইচ্ছুক হন। তৎকালীন সুপ্রীম্ কোর্টের চিফ্ জাষ্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ (Sir Edward Hyde) এই বিষয়টির বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন ও কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসাহিত করেন। তৎপরে ৪ঠা মে তাঁহার বাটীতে লর্ড ময়রার সভাপতিত্বে হিন্দু সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের

প্রাচীন কলিকাতা

সেণ্ট্ জেভিয়ার্ কলেজ প্রথম পার্ক্ ষ্ট্রীটে খোলা হয়। ন উহার নাম ছিল সেণ্ট্ জনস্ কলেজ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রার বারু (Rev. Dr. Barew) ৪০০০০ টাকা মূল্যে লজের বর্ত্তমান বাড়ীটি খরিদ করিয়াছিলেন। (১২)

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বপ্রথম ডেভিড্ হেয়ারের উদয় হয়। রাজা রামমোহন রায়ের বাটীতে আলোচনা

একটি সভা হয়। এই সভাতেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই স্থানেই ১১৩১৮ পাউণ্ড চাঁদা উঠে। কোন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন জাতীয় উন্নতির জন্য দেশীয়দের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। (১৩)

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারি অপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে স্কুল প্রথম খোলা হয়। তৎপরে

(১০, ১১, ১২) প্রধানতঃ The Good old Days of Honorable John Company, vol. I হইতে গৃহীত।

(১৩) The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II.

পূর্ব্বোক্ত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ীতে স্কুল উঠিয়া যায়। প্রথম দিন ২০ জন ছাত্র হয় এবং ৩ মাসের মধ্যে এই সংখ্যা ৭০তে পরিণত হয়। হিন্দু কলেজের বাড়ীর জন্য প্রথম ১২০০০০৲ টাকা এবং পরে আরও ৫০০০০৲ টাকা হয়। উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে। সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ খোলা হইলে এই বিদ্যালয়টি
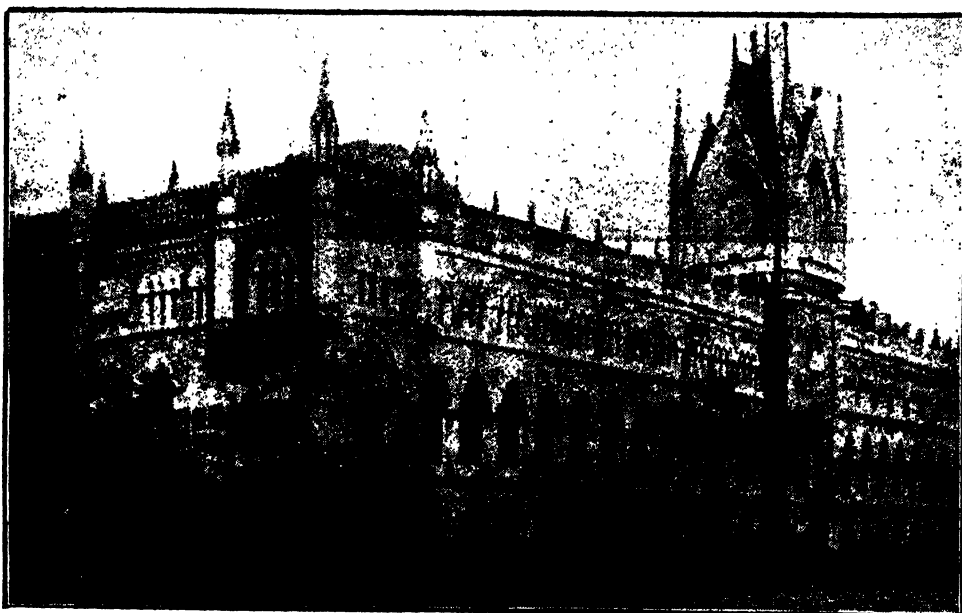
কাষ্টম হাউসের পূর্ব্বাংশ ও অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ

হাইকোর্ট

ন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষণে সে হিন্দু কলেজ আর নাই; সেস্থানে হিন্দুস্কুল হইয়াছে। (১৪)
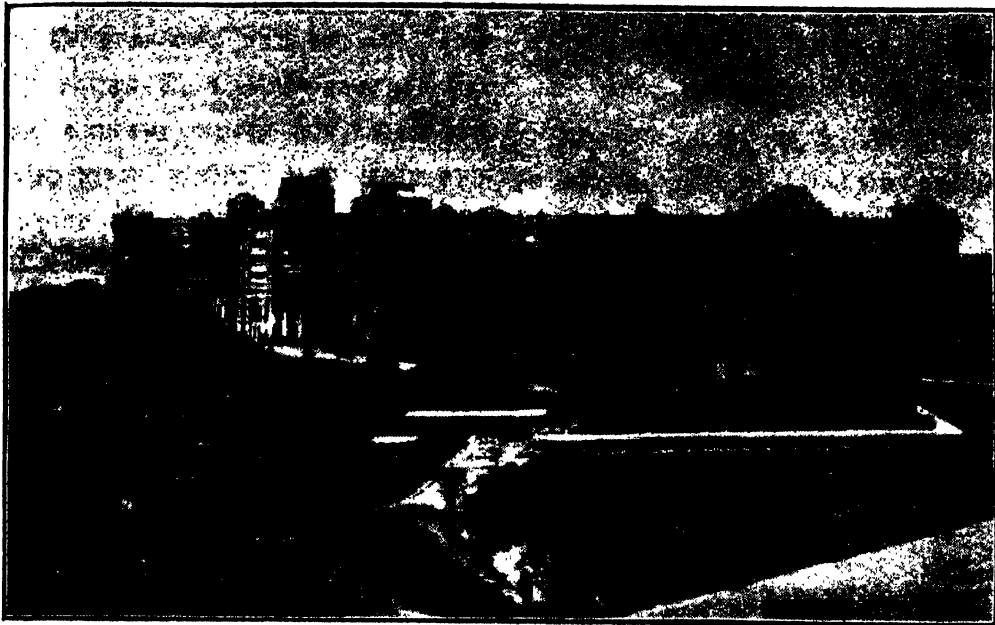
প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতাল
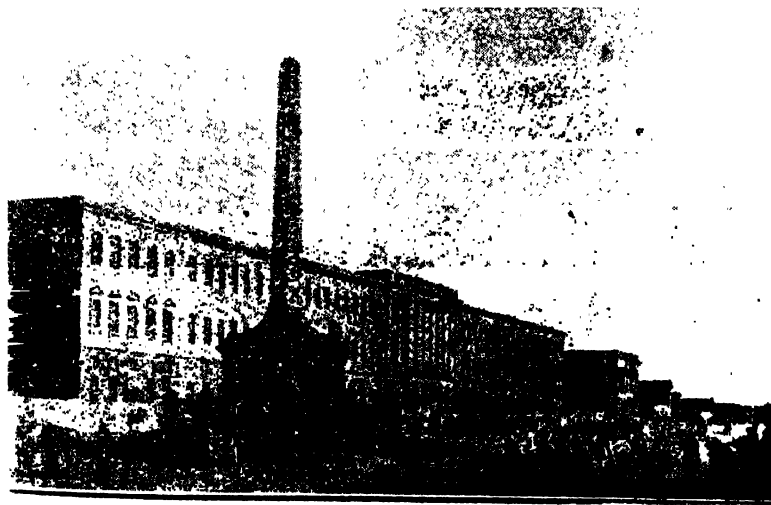
পুরাতন রাইটার্স বিল্ডিং

কলিকাতার লা মার্টিনারও একটি পুরাতন শিক্ষামন্দির। জেনারেল্ ক্লড্ মার্টিনের (General Claude Martin) এর উইলের সর্ত্তানুসারে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। বিদ্যালয় পরিচালন জন্য তিনি আরও দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। উহা ইংরাজি ১৮৪৬ অব্দ ১লা মার্চ খোলা হয়। প্রথম এখানে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে উভয়ই পড়িত। উহার নামকরণ মার্টিনের অভিপ্রায়ানুসারেই হইয়াছে। (১৫)

মেডিক্যাল্ কলেজ ভবন লর্ড্ বেন্টিঙ্কের সময় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং পর বৎসর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। হাঁসপাতাল পরে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুরাতন এবং নূতন জ্বরের হাঁসপাতালের ও লটারি কমিটির তহবিলের বাকি টাকা ও রাজা প্রতাপসিংহের ৫০০০০৲ টাকা চাঁদা হইতে প্রধানতঃ

(১৪ক) The Bengal Magazine, Vol. II (1873–74)
(খ) Calcutta Review, Vol. X (1848)
(গ) The Early History and Growth of Calcutta.
(ঘ) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.
(১৫) The Early History and Growth of Calcutta ও The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

নির্ম্মিত হয়। ঐ বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর মারকুইস্ অব্ ডালহাউসির দ্বারা উহার ভিত্তি-প্রস্তর সংস্থাপিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে রোগীদের লওয়া আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম ৫০০ রোগীর স্থান করা হইয়াছিল। বাটীর নক্সা প্রস্তুত ও নির্ম্মাণ-কার্য্য কলিকাতার মেসার্স বার্ণ্ কোম্পানির দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপ সিংহের চাঁদা ভিন্ন শ্যামাচরণ লাহা, মিঃ এজ্রা ও কলুটোলার শীলেদের দানও উল্লেখযোগ্য।

কাটেন, সে দিন দুর্গ হইতে তোপধ্বনি করা হইয়াছি মধুসূদনের ছবি আজিও কলেজের গৃহে সজ্জিত আ প্রথম বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৬০টি মড়া কাটা হ ছিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথম বৎসর ৬টি দ্বিতীয় ব ১২টি এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৫০০টি মড়া কাটা হইয়াছি প্রথম ছাত্রদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ দে নামক একটি যুব নামও পাওয়া যায়। শেষোক্ত বৎসরে ভোলানাথ গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্র
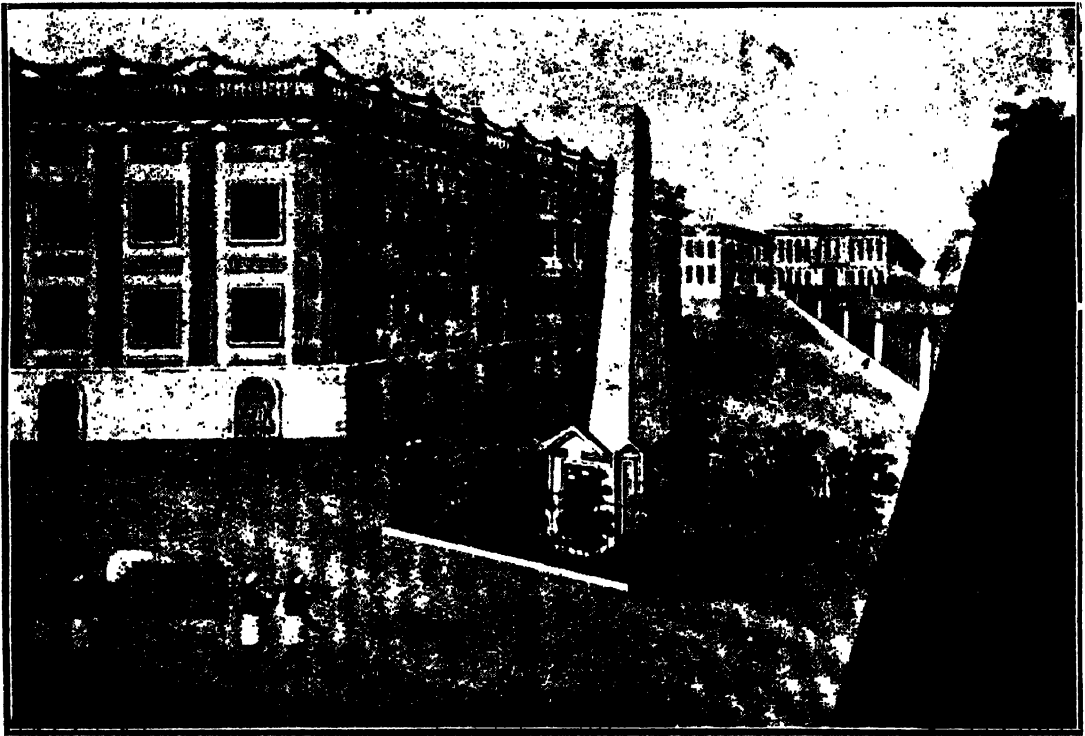
(১) অন্ধকূপহত্যার পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ

(২) পুরাতন দুর্গ (৩) পুরাতন রাইটাস বিল্ডিং (৪) সহরের মধ্যস্থ বৃহৎ জলাশয় (একখানি পাল্কী)

কলেজ স্থাপনকালে লর্ড্ বেণ্টিঙ্ক বিশেষ সন্দিগ্ধ ছিলেন যে, কোন বাঙ্গালী যুবক মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতে স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সে সন্দেহ অমূলক হইয়াছিল। সে বিষয় কোন আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। অচিরে দেশীয় ছাত্রগণ এই কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল।

মেডিক্যাল্ কলেজে যে যুবক প্রথম মড়া কাটেন, তাঁহার নাম মধুসূদন গুপ্ত। যে দিন প্রথম বাঙ্গালী যুবক মড়া

প্রথম ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বেণ্টিঙ্ক নামক জাহাজে ডা গুডিবের (Dr. Goodeve) সহিত বিলাত করেন। (১৬)

মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার বহুকাল দেশীয় লোকদের জন্য একটি হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়া উহা সাধারণের চাঁদার দ্বারা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সে

(১৬) (ক) The Administration of the East Company.

হইয়াছিল। ইহাই দেশীয়দের জন্য প্রথম হাঁসপাতাল। ইহা কোন্ স্থানে ছিল তাহা জানা যায় না। কেবল মাত্র সাহেবদের জন্য প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতাল নামে আর একটি হাঁসপাতালের উল্লেখ পাওয়া

পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ
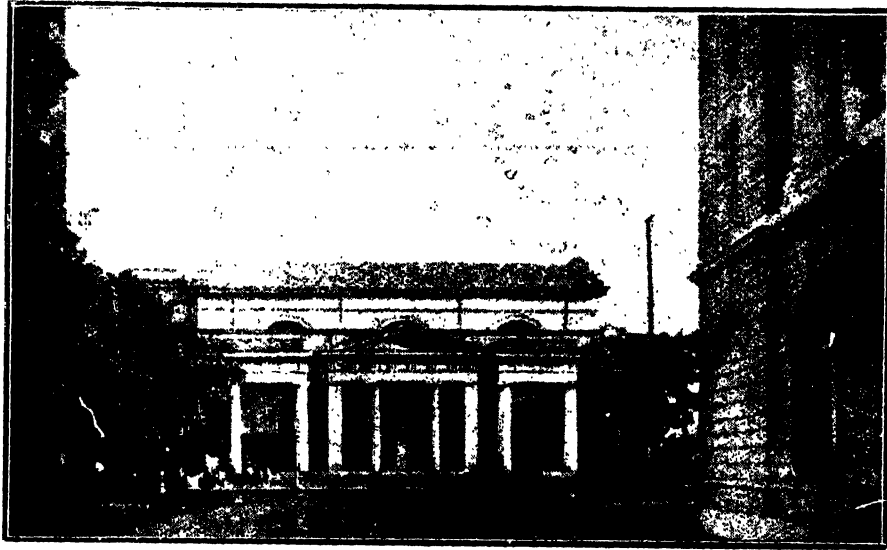
ডালহাউসি ইনষ্টিটিউট্

সাহেবদের জন্য প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতাল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও বহুকাল পূর্ব্বে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে যায়। উহা বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি জেলের দক্ষিণে ছিল। (১৭)

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ্ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ম্মচারি-

(খ) The Early History and Growth of Calcutta.
(গ) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.
(ঘ) সুবর্ণবণিক সমাচার—অগ্রহায়ণ ১৩২৯ সাল।

(১৭) প্রধানতঃ The Early History and Growth of Calcutta নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

দের বাঙ্গালা শিক্ষার সুবিধার জন্তই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ফ্রিচার্চ্চ অরফেনেজ্ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৫টি ছাত্রী লইয়া প্রথম আরম্ভ হয়। বসাক্ ষ্ট্রীট্, বৈঠকখানা এবং ইটালির
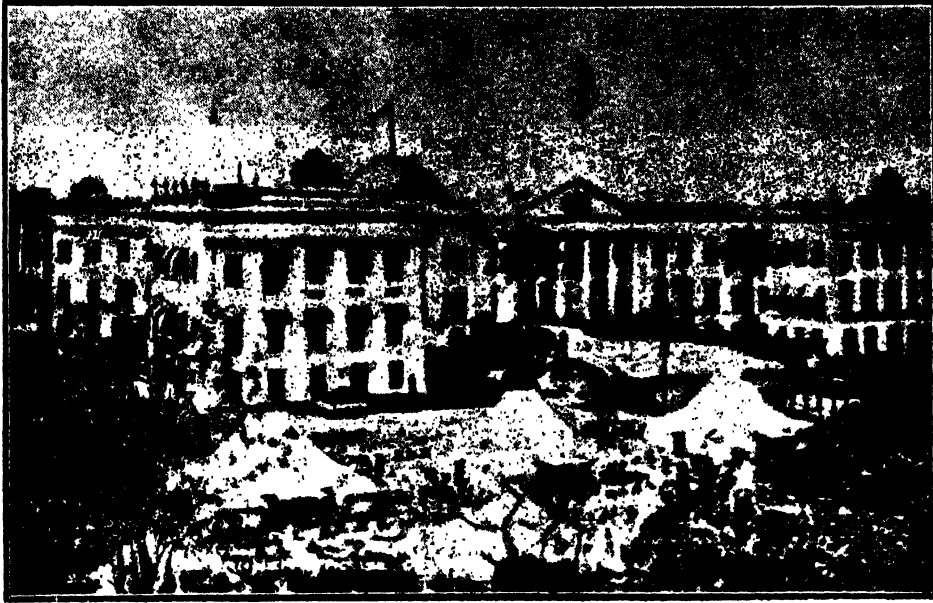
লাট সাহেবের বাড়ী
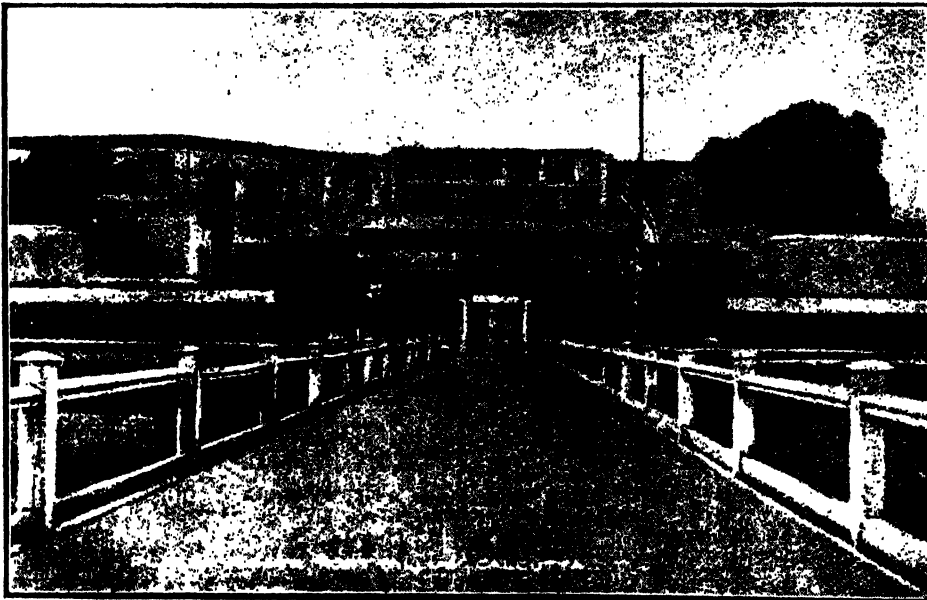
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—পলাশি গেট

বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং

এইস্থানে পূর্ব্বে অন্ধকূপ-হত্যা ঘটিয়াছিল
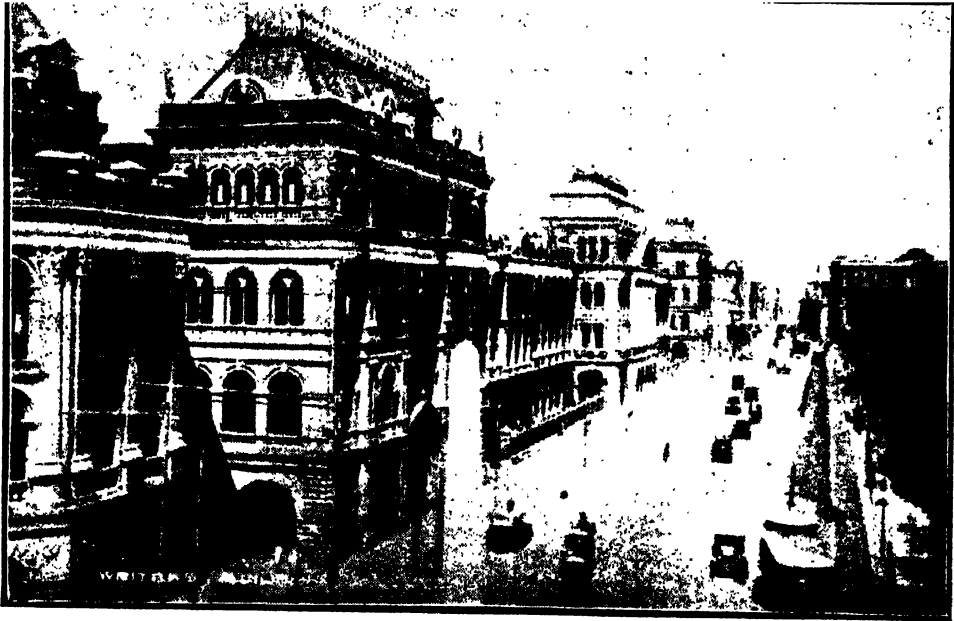
ক্যানাল্ ষ্ট্রীটে এই স্কুলটি অনেক দিন অবস্থিতির পর, ১৮৭৪ সালে বিডন্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন স্যার জর্জ্জ ক্যাম্প্‌বেল্। (১৮)

বেথুন্ কলেজ, বেথুন্ (J. E. D. Bethune) সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্থাপিত হয়। ডেপুটি গভর্ণর স্যার্ জন্ লিটলার্ (Hon'ble Sir John Littler) কর্ত্তৃক মহা ধুমধামের সহিত ভিত্তি প্রস্তর সংস্থাপিত হয়। (১৯)

আর্টস্কুল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৌবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন মসিয়ে রিগড্ নামক (Mons. Rigaud) একজন ফরাসী ভদ্রলোক। এখানে চিত্রবিদ্যা, খোদাই ও ঢালাই শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৬৩ সালে গভর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করেন। (২০)

কলিকাতার পুরাতন ও সুপ্রসিদ্ধ কলেজের কথা বলিতে হইলে, গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি, রামমোহন রায়ের ইণ্ডিয়ান্ একাডেমি, মতিলাল শীলের শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ্, বিশপ্ কলেজ্ প্রভৃতি, অথবা হাঁসপাতালের কথায় ক্যাম্বেল্ হাঁসপাতাল, য়্যাল্‌বার্ট্ ভিক্টর হাঁসপাতাল্ প্রভৃতির প্রসিদ্ধি অল্প নহে। রাজধানীর শ্রীর হিসাবে কতকটা বাহিক শোভার দিকে লক্ষ্য করিয়া বাহুল্য ভয়ে এ সবের বিবরণ দেওয়া হইল না।

কলিকাতার অন্যতম সম্পদ অক্টারলনি মনুমেণ্ট স্যার ডেভিড্ অক্টারলনির (Sir David Ochterlony) স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে নির্ম্মিত। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কথার সূত্রপাত হয়। উহার জন্য ৩০০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য তলদেশে ৮২টা ১০ ইঞ্চ চৌকা ২০ ফুট্ লম্বা সালের চকোর প্রোথিত আছে। তদুপরি মোটা সেগুন কাঠের ফ্রেম্ আছে এবং তাহার উপর ৮ ফিট্ নিরেট গাঁথনির উপর স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার উচ্চতা ১৬৫ ফিট। (২১)

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট্-হাউস্ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, ষ্ট্রাণ্ড্ রোডের উপর, যেখানে এক্ষণে বান্ হাউস্ আছে, ঐ স্থানে

টাউন হল

(১৮) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

(১৯) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

(২০) The Farly History and Growth of Calcutta.

(২১) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

পূর্ব্বে গভর্ণরের বাড়ী ছিল। সিরাজ্ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের দ্বিতীয় রাত্রে উহা অগ্নিসাৎ হয়। তৎপরে যে স্থানে বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ অবস্থিত, তথায় একটি বাটী প্রস্তুত হয়।•

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট্-হাউস্ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মারকুইস্ অব্ ওয়েলেসলি প্রথম সঙ্কল্প স্থির করেন এবং কাপ্তেন ওয়াট্ (Captain Wyatt) স্থপতি নিযুক্ত হন। এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ১৭৯৯এর ৫ই ফেব্রুয়ারি এবং সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। মোট ব্যয় হয় প্রায় ১৫০০০০ পাউণ্ড। জমি খরিদ করিতে ৮০০০০ টাকা লাগিয়াছিল। বাটীর আসবাবপত্র খরিদ করিতে অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। লাট-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন মিঃ হিকি। ইং ১৮০৩ সালের জানুয়ারী মাসে লর্ড্ ভেলেনসিয়া (Lord Valentia) কলিকাতায় পদার্পণ করিলে তাঁহার সম্মানার্থ এই স্থানে প্রথম এক উৎসব ও বড় ভোজ হইয়াছিল। রাজার জন্মদিনের উৎসবও এ স্থানে সম্পাদিত হয়। ইহার পূর্ব্বে থিয়েটার ভবনে সরকারী উৎসব সকল সম্পন্ন হইত। (২২)

বর্ত্তমান টাউনহল নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওল্ড্ কোর্ট্ হাউসে টাউন্‌হল্ ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে

অন্ধকূপ হত্যার ঘর (কাল্পনিক চিত্র); লোহার গরাদে দেওয়া জানলা দেখা যাইতেছে

কলিকাতার অধিবাসীদের অর্থে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান টাউন্‌হল্ নির্ম্মিত হয়। পর বৎসর আরও ৪০০০০ টাকা ব্যয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়। উল্লিখিত অর্থের মধ্যে পাঁচলক্ষ সিক্কা টাকা লটারির দ্বারা তোলা হয়। এই লটারির জন্য ১৮০৫ সালের ১৮ই জুলাই গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন। ২৩)

মেট্‌কাফ্ হল্ স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফের (Sir Charles Metcalfe) স্মৃতি রক্ষার্থ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর মহাসমারোহের

দুর্গের নিকট হইতে কলিকাতার দৃশ্য

(২২) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I. ও The Early History and Growth of Calcutta নামক গ্রন্থ হইতেই প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে।

(২৩) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

সহিত আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৪ সালে শেষ হয়। ইহা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এক সাধারণ সভার দ্বারা কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপনের কল্পনা স্থির হয়। পর বৎসর কতকগুলি ব্যক্তির উপহার প্রদত্ত পুস্তক ও গভর্ণমেণ্টের ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজ হইতে প্রদত্ত বহু সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ লইয়া উহার কার্য্য আরম্ভ হয়।

অক্টারলনি মনুমেণ্ট্

[মেটকাফ্ হলের নক্সা প্রস্তুত করেন মিঃ রবিসন্ (C. K Robison) এবং বাটী নির্ম্মাণ করেন মেসার্স বার্ণ কোম্পানি। সাধারণের চাঁদা, এবং এগ্রিকালচারল্ ও হর্টিকালচারল্ সোসাইটির ও কলিকাতা পাবলিক্ লাইব্রেরির তহবিল হইতে নির্ম্মাণের ব্যয় সম্পন্ন হয়। ইং ১৭৭০ অব্দে ফোর্ট্ উইলিয়মে একটি সাধারণ পুস্তকাগার ছিল। (২৪)

ডাল্‌হাউসি ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয় ৪ঠা মার্চ্চ ১৮৬৫। মহাসমারোহের সহিত এই কার্য্য হইয়াছিল। বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্ণর এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণের চাঁদা ও অন্যান্য তহবিলের টাকা হইতে ইহা নির্ম্মিত হয়। এজন্য প্রথম ৩০০০০্ টাকা চাঁদা উঠে। (২৫)

এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল্, স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্সের (Sir William Jones) দ্বারা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি যাদুঘরের কল্পনার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। তখন হইতেই লোকের কাছ হইতে সময় সময় কৌতুকাবহ ও আশ্চর্য্য দ্রব্য সমূহ জমিতে থাকে। একটি স্বতন্ত্র বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সকল দ্রব্য রক্ষা করিবার কথা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থির হয় এবং চাঁদা তুলিবার চেষ্টা হয়। ১৮০৮এর আগে পর্য্যন্ত ফলে কিছুই হয় নাই। পরে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত জমিতে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি বাড়ী প্রস্তুত হয়। ছয় বৎসর পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ঠিকমত একটি মিউজিয়ম্ প্রতিষ্ঠার বিষয় স্থির হয় এবং ডাক্তার ওয়ালিচ্ (Dr. Nathianal Wallich) নামক একজন দিনেমার উদ্ভিদবেত্তার যত্নেই উহার কাজ আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার মূল্যবান সংগ্রহ সমস্ত প্রদান করেন এবং নিজে অবৈতনিক অধ্যক্ষ রূপে কাজ করিতে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকেই মিউজিয়মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। ওয়ালিচের পর বেতনভুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়। তাঁহার বেতন মাসিক ৫০্ হইতে ২০০্ পর্য্যন্ত ধার্য্য হয়। যাদুঘরে

(২৪,২৫) প্রধানতঃ The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I. হইতে গৃহীত।

দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ কার্য্যে দেশীয় লোকদের মধ্যে রামকমল সেনের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। (২৬)

বর্ত্তমান টাঁকশাল্ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সেণ্ট্ জর্জ্জ গির্জ্জার পশ্চিমে একটি টাঁকশাল ছিল। উহাতে প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে। ১৭৭৩ সালের পূর্ব্বে তামার পয়সা প্রস্তুত হয় নাই। তখন এ দেশে কড়ি বিশেষ প্রচলিত ছিল। ১৭৮০সালে স্মিথ্ (Mr. Smith) নামক একজন বিশেষজ্ঞ বাৎসরিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে টাঁকশালের অধ্যক্ষ রূপে বিলাত হইতে আগমন করেন।

৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া মোট ৩১০০০০ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। কথিত আছে পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাঁকশাল। (২৭)

রাইটার্স্ বিল্ডিং নামক যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা এক্ষণে লালদীঘির উত্তর দিকে অবস্থিত রহিয়াছে, এই স্থানে পূর্ব্বেও এতাদৃশ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল, কিন্তু তাহার বহিঃসৌন্দর্য্য অনেকাংশে হীন ছিল। লর্ড ওয়েলেস্লি যখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন তিনি সিবিলিয়ন যুবকদের প্রথম এদেশে আসার পর এক বৎসর ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ডালহাউসি ব্যারাক্
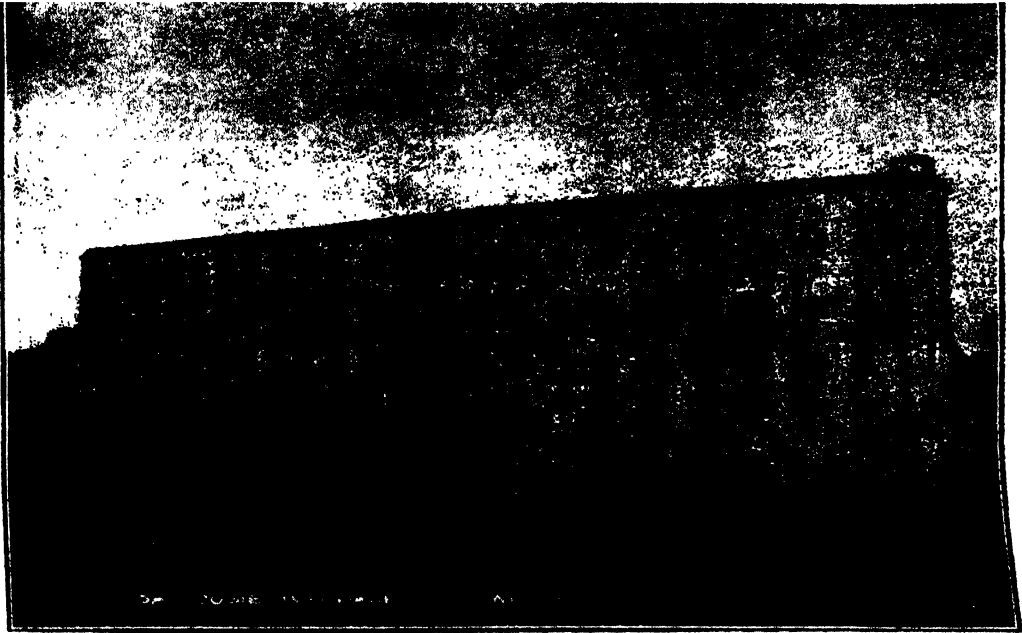
বর্ত্তমান টাঁকশালের নির্ম্মাণ কার্য্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আরম্ভ হয়। মেজর্ ফরবেস্ (Major Forbes) উহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা নির্ম্মাণ করিতে এক লক্ষ বাইট হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। উহাতে যে কলকারখানা বসান হয়, তাহার তখন মূল্য ১০০০০ পাউণ্ড ছিল। এই বাটীর মেজের ২৬ ফিট নীচে হইতে বনিয়াদ তোলা হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে টাকা, আধুলি ও সিকি, সুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে মোহর, এবং তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হইত। দিনে

উপযুক্ত পণ্ডিত ও মুন্সির নিকট ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল সিবিলিয়ন যুবকে সুখ সুবিধার জন্যই প্রথম এই ভবনগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে উ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। তখন স্থির হয়, সিবিলিয়ন্ ছাত্র তাঁহাদের সুবিধা ও ইচ্ছামত অন্যত্র থাকিতে পারিবে

(২৬) The History of the Indian Museum—The Calcutta Review 1914.

(২৭) *The Early History and Growth of Calcutta* ও *The Good Old Days of Honourable John Company*

ইহার পর সাধারণের বাসগৃহ রূপে এবং গুদাম রূপে ব্যবহারের জন্য ঐ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। (২৮)

কলিকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সুপ্রীম্ কোর্ট নামে একটি আদালত ছিল। উহা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ বুশিয়ে (Mr. Bouchier) নামক এক সওদাগরের বাটীতে এই আদালতের কার্য্য হইত। এই বাটীকেই কোর্ট হাউস বলিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী প্রস্তুত হয়। পরে এই বাটী ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান হাইকোর্ট-ভবন প্রস্তুত করেন। ইপ্রেসের টাউনহল্ হইতে ইহার নক্সার পরিকল্পনা আইসে। সদর দেওয়ানি আদালত নামে দুর্গের দক্ষিণে আর একটি আদালত ছিল। ঐ বাটী এক্ষণে মিলিটারী হাঁসপাতাল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। (২৯)

বর্ত্তমান কাষ্টম্ হাউস্ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ঐ বৎসরের ১২ই ফেব্রুয়ারি মহা ধুমধামের সহিত বাটীর ভিত্তি-প্রস্তর বসান হয়। যে স্থানে এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা পুরাতন দুর্গের উত্তর সীমা। পূর্ব্বে দুর্গের দক্ষিণ সীমায় কয়লা ঘাটে কাষ্টম্ হাউস্ ছিল। (৩০)

সৌধসম্পদে কলিকাতা অতুলনীয় নগরী। পূর্ব্বে বর্ণিত স্কুল, কলেজ, চিকিৎসাগার, বিচারালয় ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভিন্ন সেণ্ট্রাল্ টেলিগ্রাফ্ অফিষ, জেনারেল্ পোষ্ট অফিষ, ছোট আদালত, রেলওয়ে অফিষ প্রভৃতির অনেক উৎকৃষ্ট সৌধাদি কলিকাতায় বিদ্যমান আছে। এ সকলই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গির্জ্জা, মন্দির বা মসজিদ্ প্রভৃতির কথাও এ প্রবন্ধে বলা হয় নাই।

জেনারেল পোষ্ট আফিস্

(২৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৯) The Early History and Growth of Calcutta.

(৩০) The Good Old Days of Honourable John Company.

লাখ টাকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

চরিত্র

ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী	...	দিলদরিয়া মেজাজের তরুণ যুবা
লক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	ফক্কারামের মাসতুতো ভাই
রক্তবীজ	...	হুঁশিয়ার এটর্ণি
বেয়াক্কেলে	...	ফক্কারামের পুরানো খানসামা
ধড়ীবাজ	...	বেয়াক্কেলের ভ্রাতুষ্পুত্র
চঞ্চলা	...	ফক্কারামের স্ত্রী
ভুজঙ্গিনী	...	পতি-পাগলিনী বিরহিণী
জমাদার্ণী	...	চঞ্চলার ঝি
খোন্তা মাসী	...	নিঃসম্পর্কীয়া

পাওনাদারগণ, বিষ্কম্ভক

প্রস্তাবনা

নান্দী

ওগো টাকা, রূপোর টাকা...

কোন্ গহনের কোন্খানে গো,

কোন্ অতলের কোন্ তলে

হয় সে তোমার থাকা!

(মোরা) চোদ্দ ভুবন ঘুরচি, শুধু ঘুরচি—যেন ঘানি গাছের চাকা!

কোন্ পাতালে আছিস রে তুই, কোন্ পাহাড়ে ঢাকা!

ওরে আমার টাকা!

চাকরি করে তোমায় ধরা...সে যে আশার বার!

(তাই) ডাব্বি খেলে তুলবো ঘরে, চাইছি সাগর-পার!

এধার ওধার ছিপ ফেলি,...হায়, দেখি রে সব ফাঁকা!

ওরে আমার মন-ভোলানো, ওরে আমার টাকা!

ফন্দী-ফিকির যতই আঁটি—সব সে মাটী, ভুয়ো!

যেমন দূরে তেমনি আছো...খাচ্ছি কেবল ঘুয়ো!

ভার হলো যে, চোখ চেয়ে আর খালি স্বপন আঁখা!

ওরে আমার সাধের খেয়া, ওরে আমার টাকা!

প্রথম অঙ্ক

[দৃশ্য—ফক্কারামের গৃহ; রোয়াক-সমেত উঠান দে
যাইতেছে। দুইজন কাবুলী পাওনাদার ধীরে ধীরে গৃ
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে; বেয়াক্কেলে তাদের দ্বার অব
অগ্রসর করিয়া দিল। কাবুলীরা চলিয়া গেলে পিছন দি
হইতে পা টিপিয়া সন্তর্পণে ফক্কারাম আসিয়া দাঁড়াইল,
নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিল; পরে বেয়াক্কেলের পি
মৃদু টোকা মারিল। বেয়াক্কেলে ফিরিল।]

ফক্কা। (নিম্নস্বরে) গেছে...?

বেয়া। গেছে।

ফক্কা। খুব ফিকির করে তাড়িয়েছিস, বটে!

বেয়া। তুমি যাও না—চুপ মেরে পড়ে থাকো গে
ওরা এখন এক হপ্তা আর এদিকে ঘেঁষচে না!

ফক্কা। (সখেদে) কিন্তু ওরা তো ঐ একটিই নয়
একেবারে পঙ্গপাল!...বেটারা কি ছোট লোক, বল্ দিখি
না হয়, কিছু ধারই করেচি,...তা বলে রোজ রোজ তাগা
করবি!

বেয়া। পয়সা দেখেনি কখনো!...দু'পয়সা ধ
দিয়েছিস্, বেশ তো দুদিন পায়ে পা দিয়ে বসে থাক্
বাপু,—সুদে বাড়চে!...না, রোজ রোজ ঘ্যান্-ঘ্যান্!

ফক্কা। হ্যাঃ, একটু সুস্থির হতে দেবে না! আ
পয়সার অভাব হয়েছিল বলেই না ধার করেছিলুম!

বেয়া। এই...! অভাব না হলে কি আর মা
ধার করে!

ফক্কা।...যখন পয়সা হবে, শুধে দেবো, ব্যস্! (এক
ভাবিয়া, আত্মগতভাবে) যদিও কি করে এ পয়সা হ
তার কিছুই বুঝতে পারচি না!

বেয়া। কেন ভাবচো মিছে! তুমি যাও না, নেখাপ
কি করছিলে, কর'গে...

ফক্কা। হ্যাঁ, যাই।...কিন্তু ভাখ্ বেয়াক্কেলে...

বেয়া। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) পালাও…(ফক্কারামকে ঠেলা দিল) পালাও…

ফক্কা। (ভীত ত্রস্তভাবে) কেন রে ?

বেয়া। ঐ আর একজন আসছে এদিকে…পাওনাদারই বুঝি,…যাও, যাও, পালাও…

ফক্কা। তা একে কি বলবি ?

বেয়া। সে ঠিক বলবো'খন। আমার মাথা আছে বেশ। তুমি যাওনা…

ফক্কা। যাই। (প্রস্থান)

বেয়া। ন্তাও—আবার একজন! সবাই যদি একসঙ্গে আসে তো একটা মুটীস দিয়েই সেরে দি,—তা তো আসবে না! সকাল থেকে কত নোককেই যে তাড়ালুম…

একজন পাওনাদারের প্রবেশ

পাওনাদার। কি হে, ফক্কারামবাবু বাড়ী আছেন ?… না, নেপালে গিয়েছেন কাঠের কড়ি-বরগা গুণে নিতে ? আজ কি জবাব আছে হে… ?

বেয়া। (হাস্য)

পাওনা। কি হে, হাসচো কেন ? হলো কি! (বেয়াক্কেলের ভীষণ হাস্য) ইস্, হেসে যে গড়িয়ে পড়লে! ব্যাপার কি ?

বেয়া। আপনার কি বুদ্ধি… (উচ্চ হাস্য)

পাওনা। হ্যাঁ বুদ্ধি…তা অত হাসি কেন ?…

বেয়া। (ভীষণ হাস্য)

পাওনা। ওতে আর চলবে না। আজকে সাফ জবাব চাই, সত্যি জবাব…আমার পাওনাটা মনে আছে ?

বেয়া। সেইতো, তিনশো সাঁইত্রিশ টাকা, এগারো আনা, সাত পাই…

পাওনা। না, ঠিক অতটা এখনো হয়নি। এই যে ফর্দ্দ, দেখে বলচি (পকেট হইতে ফর্দ্দ বাহির করিয়া দেখিয়া)…এই, ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী…দুশো উনিশ টাকা, তিন আনা, দু'পাই…আজকের এই বেলা বারোটা অবধি সুদ কষে…

বেয়া। এঃ—তবে সামান্যই…! তা এর জন্যে এত হাঁটাহাঁটি নাগিয়েচো—আর বুঝি কোনো কাজ নেই ?

পাওনা। হ্যাঁ বাপু, সামান্য লোক, পাওনাটাকে এখনো অসামান্য করে তুলতে পারিনি! তা, পাওনা তো শুনলে, …এখন জবাব ?

বেয়া। হাঁা, তা বাবু এবার আপনার টাকাটা শুধে দেবেনই, ঠিক করে ফেলেচেন!

পাওনা। তোমার বাবুর অনুগ্রহ!

বেয়া। আজ্ঞে, তা আপনাদের অনুগ্রহর মত অতটা নয়। এ'ও ঐ সামান্যই…

পাওনা। বেশ, তা কবে শোধ দিয়ে এ অনুগ্রহটুকু প্রকাশ করবেন, শুনি…

বেয়া। আজ্ঞে, এই বলচি। তা আপনার নামটা কি ছাই…

পাওনা। ছাই নয়…চশমখোর চাকলাদার। বারবার ভুলে যাও কেন ?…নিত্যি আসচি যে হে…

বেয়া। কি করি, বলুন—আমার তো সবে এই একটি মাথা! আপনাদের তো আর ঐ একটি নাম নয়, ও যে তেত্রিশ কোটী!

পাওনা। যাক বাবা, এখন জবাবটি দাও…

বেয়া। আজ্ঞে হাঁা, জবাব এই যে বলি।…শুনুন… শুনলে অঙ্গ জল হয়ে যাবে একেবারে!…বাবু তো বহু সন্ধানে পোস্তা থেকে মশায়, তিন বস্তা তেঁতুল-বিচি কিনেচেন। কিনে লরী ভাড়া করে তাতে সেই বিচির বস্তা তুলে তিনি হোই সেই পাবনার ওধারে গেছেন…সেই যে, যেখানে খুব বড়-বড় মাঠ আছে…বুঝচেন না ?

পাওনা। না, বুঝচি না…

বেয়া। এঃ, দেনদারের বাড়ী ছাড়া পিরথিমীর আর কোনো জায়গার খপরও রাখো না বুঝি!…আঃ, সে কি সব মাঠ…পেল্লায় পেল্লায় মাঠ—আর, সে যে কত বড় পেল্লায়—দাঁড়ান, তার কালি কষা হয়ে গেছে! কি ভালো, কি ভালো…

পাওনা। মাঠের কালি রেখে তুমি খালি জবাবটুকু দাও, বাবা। তার পর, কি হবে, বল—

বেয়া। বেশ, তবে কালি রাখলুম। তা সেই সব মাঠ ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে…

পাওনা। ঘোরাটা একটু থামাও না বাপু, আমার মাথা-শুদ্ধ ঘুরে উঠচে যে তোমার ঘোরার চোটে…

বেয়া। আজ্ঞে, তা, সে-সব পেল্লায় পেল্লায় মাঠ

ঘুরতে মাথা ঘুরবে বৈ কি! তা সেই সব মাঠ তো ঘুরে, জমি বেছে নিয়ে সেই জমিতে সেই সব বিচি তো তিনি পুঁতবেন। তার পর সেই বিচি থেকে গাছ হবে কত, ওঃ, ভাবুন একবার। আর সেই সব গাছে তেঁতুল, ওরে বাপ্‌রে, দেশ ছেয়ে যাবে তেঁতুলে, একেবারে। তার পর সেই তেঁতুল না গাছ থেকে পটুপটু করে ছিঁড়ে লরি ভরে কল্‌কাতায় চালান্! আর কলকাতা থেকে সেই সব তেঁতুল চালান যাবে বিলেত, জার্ম্মান…এমনি সারা পিরথিমীময়! ব্যস্, টাকা আসবে বস্তা, বস্তা! আপনার টাকা মবলগ্ শোধ হয়ে যাবে দু'দিনের মধ্যে।

পাওনা। বাঃ—টাকা তাহলে এবার আমার ঘরে এসে পৌছুবে নিশ্চয়, এ্যাঁ?

বেয়া। পৌছুবে কি! পৌছে গেছে, ধরে নিন্। কর্‌করে ঝন্‌ঝনে টাকা! নোট চান্ নোট, টাকা চান্ টাকা, মোহর চান্ মোহরই,—অর্থাৎ যা চাইবে। সত্যি, বাবুও তিতিবিরক্তি হয়ে গেছে। নিত্যি এই পাওনাদারের তাগাদা! তিনি বলেছেন, কারো পাই-পয়সা তিনি আর বাকী রাখবেন না! নিত্যি যে তাঁর দরজায় এসে তোমরা কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করবে, সে জোটি আর থাকবে না। তাঁর দিগদারী ধরে গেছে বেজায়!

পাওনা। তুমি তো খাসা বুঝিয়ে দিলে! তেঁতুলবিচি, পাবনা, পেল্লায় মাঠ, লরি, বিলেত, জার্ম্মানি, ইস্তক কুকুর বলে গাল অবধি বাদ রাখলে না! তা, ও-সবে ভুলচিনে আমি। আমি জবাব চাই, সাফ জবাব!

বেয়া। আজ্ঞে, জবাব চাও, তা মস্ত জবাবও তো দিলুম এই!… হাঁ করে ভাবচেন কি? টাকাটা কি করে নিয়ে যাবেন? তা ভাবনা কি? আপনি যাও না, থলে জোগাড় করে আনো না! ঐ আবার কারা আসচে, দেখি! বাড়া খুঁজচে!…এরা নতুন লোক, তাগাদা সবে সুরু করেচে! বাড়ীটা এখনো ঠিক সড়গড় হয়নি! তা আপনি যাও,—আর ঝামেলা বাড়িয়ো না। এরাও পাঁচজন ভদ্দর নোক আশা করে আসচে তো! এরাও জবাব চাইবে এখনি।

পাঁচজন পাওনাদারের প্রবেশ

২। এইটেই তো…৩৭ নম্বর বাড়ী?

৩। ঠিক তো? দেখেচো ঠিক? শেষে যেন আর কার বাড়ী ঢুকে ট্রেশপাশের চার্জ্জে না পড়তে হয়। থানা-পুলিশকে হুঁসিয়ার!

৪। এই যে, কে দাঁড়িয়ে! হ্যাঁ হে, ফক্কারাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ী তো এইটে?

৫। ডাকা যাক্ না! (উচ্চৈঃস্বরে) ফক্কারাম বাবু বাড়ী আছেন? বলি, ও মশায়, ও ফক্কাবাবু…

বেয়া। আজ্ঞে, আপনারা…?

২। পাওনাদার।

বেয়া। এই এতগুনি…সব্বাই…?

৩। হ্যাঁ, সব্বাই।

বেয়া। ও বাবা,—দলে যে বেশ পুরুষ্টু আপনারা…তা…

৪। এই তো সেই ন্যাকা চাকরটা! চেনোনা বাপু, সাতশো দিন ভাঁড়িয়ে আসচো—কাল, কাল, কাল! আজ এই দোর চেপে বসলুম,…থাল না হলে নড়চি না! (বসিল)

৫। আমারো ঐ কথা!…(বসিল)

১। বাবা, লেওনস্ত কালে মিষ্ট-মধু বাণী…আর দেওনস্ত কালে বড্ড টানাটানি…! ও আর চলছে না!

২। শুধু বসে থাকলেও চলবে না! চ্যাঁচাও, দারুণ বিভীষিকা জাগিয়ে তোলো,…গগনভেদী চীৎকার তোলো… (উচ্চৈঃস্বরে) ফক্কারামবাবু, বলি ও ফক্কারামবাবু, ও মশায়, হয় বেরিয়ে আসুন, নয় সাড়া দিয়ে বলুন যে, বাড়ীতে নেই… বুঝলেন?

বেয়া। আজ্ঞে, তা আমি থাকতে আপনারা গলা ফাটাফাটি করে মরচো কেন?

২। তুমি কে?

বেয়া। আজ্ঞে, আমিই সব। তার মানে, আমার হাতেই আপনাদের, তোমাদের জীয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি!

সকলে। (মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া) এ বলে কি হে?

৪। শোনাই যাক্…

বেয়া। বলি, আপনারা তো ট্যাকা পাবে?

৩। হ্যাঁ,…

১। বাবা, লেওনস্ত কালে মিষ্ট-মধু বাণী…আর দেওনস্ত কালে বড্ড টানাটানি,—চলবে না, আগেই বলে রাখচি।

২। আঃ, থামো না, ওকে বলতে দাও…

বেয়া। তা, আমার দস্তুরী?

৪। দস্তুরী কিসের?

৫। হ্যাঁ, কিসের ?

বেয়া। নগদ টাকা পাবে, আর দস্তুরী ছাড়বে না ?

৪। যা বলেচো !…এ কি ছেলের হাতে মোয়া !

৫। টাকাটা খোলামকুচি…!

৩। না, তার কোনো দাম নেই !

বেয়া। তবে চ্যাঁচাও বাবুরা। আজ চ্যাঁচাও, কাল চ্যাঁচাও, পরশু চ্যাঁচাও, রোজ রোজ ঐ অমনি করে চ্যাঁচাও !.. টাকা আমার এই ট্যাঁকে ! (গমনোদ্যত)

সকলে। (মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া) কি হে ? কি বল ?

২। পাগল !

১। বাবা, নেওনস্ত কালে মিষ্টমধু বাণী…আর দেওনস্ত কালে বড্ড টানাটানি বটে !

৩। নগদ গুণে দিয়েছি, বাবা, কাটছাঁট বাদ রাখিনি…

বেয়া। তাহলে বসে বসে এখন সে নগদের সুদ গোণো গে। পরাণটা ঠাণ্ডা থাকবে। চাই কি, শুভঙ্করীটেও রপ্ত হতে পারে। আমি তাহলে আসি,…চ্যান করবার সময় হলো ! (পুনরায় গমনোদ্যত)

সকলে। (বেয়াক্কেলেকে ধরিল) ব্যাপারখানা খুলে বল দিকি বাপু…

বেয়া। তবে শুনবে ?

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ,…নিশ্চয় শুনবো, আলবৎ শুনবো !

বেয়া। তবে শোনো বাবুর সম্বন্ধীর খুড়শ্বশুরের সেই ভায়রাভাই আছে না…? সেই যে…

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ…

বেয়া। তা তেনার ছেলেপিলে নেই কি না ! তাই পুষ্যিপুত্তুরের নুটীশ ছাপিয়ে দেছে, বাবু সেই পুষ্যিপুত্তুরী চাকরি নেবার জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। সেইটে পেলেই… ব্যস্.. আপনারা এসে একেবারে গঙ্গামণ্ডল তালুকখানায় চেপে বসবে—আর সুদে-আসলে সব চুকিয়ে নিয়ে যাবে।… চাই কি, কারবার ফ্যালাও করতে আরো দশ-বিশ হাজার চাও সব তো তাও পেয়ে যাবে !…কেমন, এবার নিশ্চিন্তি হলে তো ? যাও…হাসিমুখে এখন বাড়ী ফিরে যাও…। আমি এবার চ্যানে চললুম…(গমনোদ্যত)

আরো তিনজন পাওনাদারের প্রবেশ

নূতন দলের ১। যেয়ো না বাবা, যেয়ো না ..আমাদের কথাটা…

বেয়া। আজ আর সময় নেই,—হবে না বাবুরা। দেরী করে ফেলেচো ! এঁরা আগে এসেচে— নিজেদের সব বুঝে নিয়ে কেমন হাসি-মুখে ফিরচে !…একটু আগে আসতে হয় !

নূতন দলের ২। তা বাবা, একটু দয়া কর—নিদেন একটু আশা…

বেয়া। ও ! আপনারা আশা চাও…বড্ড নতুন,… না ? তা আশা দিচ্ছি…পাবে, গো ট্যাকা সব পাবে…এই মাসকাবারে…

নূতন ৩। ও কথা শুনেচি বাপু…

বেয়া। ওঃ, এটা পুরোনো কথা ! তা কি করবো, বাবু ! আজ ক্রেমাগত নতুন কথা এত বলেচি যে নতুন আর বাকী নেই ! আর একদিন সকাল-সকাল এসো,… বেশ মনের মত নতুন কথা শোনাবো'খন !…আমার এখন খিদে-তেষ্টার সময়, আর জ্বালিয়ো না।

নূতন ১। বাবা, আজ ছ'মাস হাঁটাহাঁটি করচি…এক জোড়া নতুন জুতোই হাঁটাহাঁটির চোটে ছিঁড়ে গেল !

বেয়া। তাই না কি ! তা এমন কাজও করে ! ধার-দেওয়া টাকা আদায় করতে তাগাদায় আসে মানুষ নতুন জুতো পায়ে দিয়ে !…সে তো ছিঁড়বেই। শুনুন, কথায় বলে, বড় নোকের বাড়ী নেমন্তন্ন যেতে আর টাকার তাগাদা করতে নতুন জুতো পায়ে দিয়ে কখনো বেরুবে না… বেরুলেই পস্তাতে হবে !

নূতন ২। ভারী মজার লোক তো !…খালি বাজে গল্প…

বেয়া। আপনাদের দেখে একটা পুরোনো গপ্প মনে পড়চে…

৫। থামো, তোমার গল্প শোনবার আমাদের সময় নেই…

বেয়া। আজ্ঞে, তা যদি বললেন তো ভালো কথাই বললেন। আমারো আর গপ্প বলার ক্ষ্যামতা নেই—পেটের ক্ষিধে বড্ড জানান্ দিচ্ছে ! তোমাদের নাবার খাবার টাইম না থাকতে পারে, আমার আছে।…এখন বেরোও দিকি… মানুষের সহ্যি করবারো একটা সীমা আছে ! ..

সকলে। এসো হে, চলে এসো…আর তাগাদা নয়…

৫। একদিন পথে পাই তো গলায় গামছা দিয়ে ধরি…

৩। উঁহুঁ—শেষে পুলিশ-কেশে পড়বো ..

২। চলে এসো···একটা যা হয় কিছু করা যাবে।

১। বাবা, লেওনন্ত কালে মিষ্ট-মধু বাণী...আর দেওনন্ত কালে বড্ড টানাটানি।

(সকলের প্রস্থান)

বেয়া। আপদগুলো গেছে। বারোটাও বাজে! এখন আর কোনো ভদ্দর নোক তাগাদায় আসবে না! আজকের মত পালা শেষ হলো। যাই, এবার চ্যানের যোগাড় দেখি গে!···সদরে খিলটা দিয়ে যাই!

(প্রস্থান)

অধীরভাবে চঞ্চলার প্রবেশ ; পিছনে ফক্কারাম

ফক্কা। প্রিয়ে চঞ্চলে, আর রাগ করো না, ধরি অঞ্চলে!

চঞ্চ। সত্যি, ভালো লাগে না নিত্যি এই পাওনাদারের তাগাদা···

ফক্কা। তাই তো বলচি, তার ওপর তুমি যদি রাগে চঞ্চলা হও, তাহলে গরিব আমার যে দিন চলা ভার হয়ে ওঠে!

চঞ্চ। খালি কথা! কথার ভটচায্যি!

ফক্কা। দোহাই তোমার, ভটচায্যি নই,···চক্করবর্ত্তী।

চঞ্চ। একটা কিছু উপায় কর—

ফক্কা। সেই চেষ্টাই তো করচি।

চঞ্চ। ছাই করচো! ·

ফক্কা। নয়? ত্যাখো, প্রথম সুরু হলো হোটেল খোলা···

চঞ্চ। নিজে আর পাঁচটা বন্ধুতে মিলে তার হাড়-কাঁটা-গুলো অবধি চিবিয়ে খেলে!

ফক্কা। তা খদ্দের আসছিল না, খাবারগুলো পাছে নষ্ট হয়, কাজেই—

চঞ্চলা। কাজেই!—রাগ ধরে, হাসিও পায়!

ফক্কা। কি বলবো প্রেয়সী, চেঁচিয়ে তোড়ে হাসতে পারচি না—ব্যাটারা যদি এখনো কাছাকাছি থাকে! আমি যে এখন বাড়ী নেই!

চঞ্চ। বাড়ী নেই কি রকম?

ফক্কা। বেয়াক্কেলে এক-পাল পাওনাদারকে তাই বলে এইমাত্র তাড়ালে না!

চঞ্চ। সং!

ফক্কা। তারপর ধর,—নিখিল-মিষ্টান্ন ভাণ্ডার! জয়নগর থেকে মোয়া, কেষ্টনগর থেকে সরভাজা-সরপুরিয়া, বর্দ্ধমান থেকে সীতাভোগ মিহিদানা, নাটোর থেকে রাঘবসাই, মানকর থেকে খাজা, কাশী থেকে বালুশাই, মিহিজাম থেকে জিলিপী-বোঁদে—ওঃ, কি দোকানই ফাঁদলুম ··

চঞ্চ। তা'ও তো ঐ নিজের আর বন্ধুদের পেটেই গেল!

ফক্কা। ঐ এক কারণ! খদ্দেরের অভাব! যত লোক সব ছোলাভাজার কাঙাল! এক পয়সার ছোলা-মটর আর এক পয়সার এক পেয়ালা শুক্‌নো পাতা-সেদ্ধ চা—এই তো সব জলখাবার! ও-সব মিষ্টান্নের দিকে নজর উঠবে কেন?··· তার পর ঐ এক পয়সা দামের থিয়েটার বলে সাপ্তাহিক কাগজখানা বার করলুম—

চঞ্চ। তার ফলে রাতে বাড়ী ফেরা নেই! মিনি পয়সায় থিয়েটার দেখা আর তাদের ধামা ধরায় তো ভারী লাভ! ছাপাখানার বিল শুধলুম্ এতগুলি!

ফক্কা। বরাত! লক্ষ্মীকে বাঁধবার জন্য কসরৎটা কি কম করেচি! তিনি ধরাই দিতে চান্‌না, তা বাঁধবো কি!... তা, এর মানেও বুঝেচি!

চঞ্চ। কি মানে, শুনি?

ফক্কা। কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন! অর্থাৎ স্ত্রীই লক্ষ্মী! তা লক্ষ্মী তো চঞ্চলাই, তার উপর তুমিও নামে চঞ্চলা—কাজেই এই দুই চঞ্চলার মাঝে পড়ে আমি একদম্ স্খলদঞ্চলা হয়ে গেলুম। তাই ভাবচি, এবার এমন ব্যবসা ফাঁদবো···

চঞ্চ। ওগো, ব্যবসা ছাড়ো দিকি। বামুনের কপালে ব্যবসা ফলে না। তার চেয়ে একটা চাকরির চেষ্টা ত্যাখো···। সত্যি, নিত্যি এই পাওনাদারের কথা সয়ে আর থাকাও যায় না! কোনো সুখ নেই!

ফক্কা। দুঃখটাই বা কি!···শুধু তো কথা···গায়ে ফোস্কাও পড়ে না, চোটও লাগে না। এক কাণ দিয়ে শোনো, আর-কাণ দিয়ে বার করে দাও—পয়সা-খরচ নেই! ...তবে হ্যাঁ, রোজ রোজ ওদের সঙ্গে কাঁহাতক এক কথা কই, তাই আর কি নিজে গা ঢেকে থেকে বেয়াক্কেলেকে সামনে ধরে দি। তা, ও ব্যাটা খুব চালাক আছে...যা ভণিতে দিয়ে কথা কয়!...তার পর এ তাগাদাও এই বেলা বারোটা অবধি···বড় জোর সাড়ে বারোটা! ঐ সময়টা

পর্দ্দানশীন হয়ে থাকা—তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে তারাও গিয়ে বিশ্রাম করে, আমারো তাই!

চঞ্চু। কিন্তু পেট চালাবার পয়সা ত চাই! এমনি নিত্যি হাত পেতে ধার করা…

ফক্কা। তাতেও সুবিধা বৈ অসুবিধা দেখিনে তো! হাত পেতে ঐ ধার করা—শুধতে ঘাড় কাৎ করতে হবে না…

চঞ্চু। কিন্তু নিত্যি ধার দেবে কে, বল তো…? চাল-ডাল, নুন-তেল এগুলোও তো চাই!

ফক্কা। হায় রে,—ধার দেবে কে?

ধরণী বিপুল প্রিয়ে, মূর্খ কত লোক…
মুখের চটুল বাণী,—স্তব আর স্তোক,
প্রচণ্ড সুদের মোহ,—গেঁজিয়াটি খুলি
অকাতরে দেবে অর্থ ধার বলে' তুলি!

তার পর চাল-ডাল নুন-তেল—এটা স্রেফ economics-এর কথা—এসো, বুঝিয়ে দি। এই সহর কলকাতা তার বিশাল দেহ নিয়ে পড়ে আছে, আর আমার মত পোড় খায়নি এমন বহু লোক নিত্যি কারবারের ফাঁদে রূপচাঁদ পাবার আশায় কত ব্যবসাই ফাঁদছে। কিন্তু পুরোনো যারা বাজারে আছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে তো! কাজেই গোড়ায় তারা ধারে জিনিষ দেবার জাল পেতে খদ্দের ধরবার জোগাড় করে। তোমার জমাদার্ণীকে সে হদিশও বাৎলে দিছি। এমন সুখ আর কোথাও নেই! ঘী-ময়দা চাল-ডাল নুন-তেল যা চাই, নতুন দোকানে যাও, হাতচিঠি ফ্যালো আর আনো। তারা ভাবচে, খদ্দের পাকড়েচি, টপাটপ জিনিষ দেবে। খদ্দের ভাবচে, কি দাঁওই মারচি!…তার সঙ্গে কষে দিন-কতক কারবার চললো, তার পর যেমনি সে জোর তাগাদা সুরু করবে, বলবে, টাকা না পেলে জিনিষ দেবো না,—ব্যস্, চলে যাও আর-এক দোকানে হাতচিঠি নিয়ে…

চঞ্চু। যা বলেচো! তার পর চারদিকে সব নালিশ করে ছেঁকে ধরুক!

ফক্কা। ক্ষেপেচো প্রিয়ে,—কত লোকের নামে তারা নালিশ করবে! তুমি ভাবচো, তুমি একা এই হাতচিঠির খদ্দের! রামচন্দ্র! ঘর-ঘর, ঘর-ঘর! আর এ না করলে চলে কি করে, বল? নিত্যি বাজারের দর চড়ছে…মানুষ পারবে কি করে? কাজেই, এই শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি দোকানদারও বোঝে। বুঝে তারা ঐ নগদ খদ্দেরদের ওপর দিয়ে এই সব হাতচিঠির খদ্দেরের পাওনা পুরোপুরি আদায় করে নেয়। ফুর্ত্তি আমাদেরই…মরতে মরে ঐ আহাম্মক নগদ-খদ্দেরের দল!

চঞ্চু। তা এখন কি করবে, ঠাওরেচো?

ফক্কা। ভাবচি, এবার বই লিখবো। ঘর থেকে টাকা বার করা নয়…স্রেফ ফাঁকির মূলধন নিয়ে কারবার! এ ব্যবসাটাই এখন চলছে খুব। চারিদিকে নতুন নতুন পাবলিশার গজাচ্ছে। লোকে দেখি ভারী পণ্ডিত হয়ে উঠেচে! সবাই বই পড়চে, বই কিনচে খুব—

চঞ্চু। তুমি বই লিখবে কি গো?

ফক্কা। হ্যাঁ, আমিই বই লিখবো। কেন লিখবো না? আমাদের সেই পরীক্ষিৎ কর্ম্মকার,—জানো না…সেই যে পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, 'তালা-চাবি সারানো' বলে হেঁকে ফিরতো, তা সে এখন সেই তারে-বাঁধা চাবির তাড়া ফেলে রাশ-রাশ বই লিখচে, আর কশাইটোলার সাহিত্য-সংহার-মন্দির রঙ-বেরঙের ছবি দিয়ে সেই সব বই ছেপে নগদ এক টাকা মূল্যে বিক্রী করচে!…ট্রামে চড়, রেলে যাও, দেখবে, ঐ কশাইটোলার লোক সেই বই নিয়ে ছেঁকে ধরবে।

চঞ্চু। সত্যি…?

ফক্কা। সত্যি না তো কি মিছে!…আমার সেই ছেলেবেলার লেখা কবিতাগুলো নিয়ে বাজারেও একবার আমি ঘুরে এসেচি।…একজায়গায় এক মোটা বাবু চেয়ার ঠেসে বসে আছে—শুধোবে কথাই কইলে না,…তারপর গেলুম, আর এক দোরে…এক বেঁটে মটকু ছোকরা বসে আছে। সে হেসেই উড়িয়ে দিলে, বললে, রাবিশ ঘাঁটবার তাদের ফুরসৎ নেই। তার পর তেসরা দরজায়…তারা বললে, নামজাদা লিখিয়ে নইলে তারা বই ছাপে না কারো।…তখন শেষ গেলুম সেই কশাইটোলার সাহিত্য-সংহার-মন্দিরে। হ্যাঁ, ভদ্দর লোক, সিগারেট দিলে, পাণ খাওয়ালে…আর বললে, এ-সব ছেড়ে খুব বিদিকিচ্ছি গোছের একখানা অপিন্যাস লিখে দিন দিকি…

চঞ্চু। অপিন্যাস?

ফক্কা। ঐ আমরা যাকে উপন্যাস বলি, তাকেই তারা

বলে, অপিন্তাস !···সাহিত্য-সংহার-মন্দির যে···তারা বললে, অপিন্তাসটা আজকাল চলছে খুব।

শশব্যস্তে জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমাদার্ণী। (বিষম অঙ্গভঙ্গী-সহকারে) নচ্ছার ব্যাটা, পাজী মিন্সে, হাড়হাবাতে, ড্যাকরা, হারামজাদা···

চঞ্চ। কি রে ? কি হয়েচে ?

জমাদার্ণী। বিট্‌লে, ইল্লৎ মিন্সে, অলপ্পেয়ে, পোড়ারমুখো···

ফক্কা। ব্যাপার কি রে জমাদার্ণী···?

জমাদার্ণী। থামো, আগে আমায় রাগ সামলাতে দাও। ···লক্ষ্মীছাড়া, অনামুখো, হতচ্ছাড়া···মার কোল্ খালি কর্, —নিপাত যা, নিপাত যা···শ্যাল-শকুনে ছুই চোখ তোর খুবলে থাক্ ! হতচ্ছাড়া মিন্সে···তোর ভিটেয় ঘুঘু চরুক, ব্যবসায় ছারপোকা নাগুক্, প্যাঁচা চ্যাঁচাক, সর্ব্বের ক্ষেত বোন্ হতভাগা···

চঞ্চ। কি রে জমাদার্ণী···কি হয়েচে ?

জমাদার্ণী। বলে কি না, সেদিনের মুনের দাম তিন পয়সা না পেলে ধারে জিনিস দেবে না আর···

ফক্কা। কে রে ? কার এ দুর্বুদ্ধি হলো ?

জমাদার্ণী। কার আবার ! ..ঐ যে চিড়ের মত চ্যাপ্‌টা মুখখানা···ঐ যে কাটা ধানের গোড়ার মত খোঁচা গোঁফ···কি বাহারই মরি, মরি !···ন্যাথাপড়ার পাশ সেরে মুদির দোকান খুলেচে ! নিপাত যা, নিপাত যা··· তোর চালের বস্তায় উই ধরুক্, তোর চিনির থলে জলে গলে যাক্, উনুনমুখো মিন্সে··· আমি চমু জমাদার্ণী···হাবু জমাদারের বোন্ ! আমায় চিনিস্ নে, বেরাল-চোখো মিন্সে··· ? [প্রস্থান

[ফক্কারাম ও চঞ্চলা কৌতুক-ভঙ্গী করিল। ফক্করাম তারপর কি ভাবিতে ভাবিতে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাহিরে পথে চোখ পড়িতেই সে শিহরিয়া থামিল ; পরে কম্পিত কলেবরে চঞ্চলার কাছে আসিয়া তার আঁচল চাপিয়া ধরিল।]

ফক্কা। প্রিয়ে চঞ্চলে···

চঞ্চ। কি হলো ?

ফক্কা। একটা মোটা-সোটা ভবিষ্যুক্ত লোক···এদিকেই আসচে। বোধ হয়, অনেক টাকা পাবে। পোষাক আর হোঁৎকা চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে।···এদিক-পানে তাকাতে-তাকাতে আসচে। বেয়াক্কেলে তো চান্ করতে গেছে...তা একে হঠায় কে এখন ?

চঞ্চ। তাই তো !···এ কি রকম মানুষ ! বেলা বারোটার পরও তাগাদায় আসে ! ভদ্দর লোক···?

ফক্কা। চেহারায় তাই মনে হচ্ছে বটে !···ব্যবহারে নয়। তা শোনো,···তোমার জমাদার্ণীকে একবার তোয়াজ করে পাঠাও।···আমার অসুখ, ভারী অসুখ ··নাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে। ওরে বাবা, হি-হি-হি-হি-হি··(কম্পিতভাবে গিয়া একটা লেপ টানিয়া মুড়ি দিয়া) আমি সরে পড়লুম, তুমি উপায় ছাখো···

[প্রস্থান

চঞ্চ। তাই তো, রোজ রোজ হরঘড়ি আর পারাও যায় না !···দেখি,···ওরে, ও জমাদার্ণী···

(নেপথ্যে জমাদার্ণী। কেন ?···)

চঞ্চ। একবার শুনে যা ভাই, লক্ষ্মীটি, দিদিটি···

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। কেন ? ডাকচো কেন ?

চঞ্চ। একজন পাওনাদার আসচে।···তা বেয়াক্কেলে তো নাইতে গেছে,···তুই ওকে তাড়া···

জমা। কেন ? আমি কেন তাড়াবো !···এ তো বেয়াক্কেলের কাজ।

চঞ্চ। ওরে, এ তার ক্ষ্যামতায় কুলোবে না···এ মোটা-সোটা বিদিকিচ্ছি মানুষ···তুই না হলে হবে না।

জমা। ও,—শক্ত নোক, সে পারবে না ?···তা আচ্ছা, আমি দেখচি···আমার নাম বলে,···জমাদার্ণী, হাবু জমাদারের বোন্···আমার হাঁকে বলে, হাঁ··· [প্রস্থান

চঞ্চ। ···দেখি, এখন কি করে তাড়ায় !···(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কি গো তুমি শুয়েচো···? হি-হি-হি-হি-হি··· বড় অসুখ, উহুহু ! (হাস্য) না ?

[নেপথ্যে জমাদার্ণীর আর্ত্তনাদ ; ও পরমুহূর্ত্তে নেপথ্যের দিকে সক্রোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে উত্তেজিতভাবে স্থূল বপু লইয়া রক্তবীজের প্রবেশ। তার হাতে লাল ফিতায় বাঁধা নানা কাগজ ; পিছনে উড়িয়া বয়ের হাতে ব্রীফ-ব্যাগ, জলের কুঁজো গ্লাস প্রভৃতি]

নেপথ্যে জমাদার্ণী। নিকালো মিন্সে···

রক্তবীজ। চোপরাও মাগী···(রক্তবীজকে দেখিয়া চঞ্চলা

দ্রুত পদক্ষেপে পলায়নোদ্যত ; রক্তবীজ ফিরিয়া দেখিবামাত্র সাশ্চর্য্যে কহিল)—কে···? খেঁদি !

চঞ্চলা। (থমকিয়া ফিরিল ; পরে বিস্ময়ে হাসিয়া) পিসেমশায়···

রক্তবীজ। তুই···এখেনে···?

চঞ্চ। এই তো আমার বাড়ী।

রক্ত। তাহলে ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী···?

চঞ্চ। আমার স্বামী।

রক্ত। বটে,—তা বেশ, বেশ !

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। তবে রে মিন্সে !···আমি বনু্ম, বাবুর ভারী ব্যামো, বুঝি মরে !···আর তুই আমায় ঢুঁসুনি মেরে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকলি !···(আক্রমণোদ্যত)

রক্ত। চোপরাও, চোপরাও...(ঘুষি বাগাইতে লাগিল)

চঞ্চ। করিস্ কি জমাদার্ণী···ন্যাকা মাগী ! (তাকে ধরিল) এ যে পিসেমশায় রে···

জমা। কে···পিসেমশায় ?

চঞ্চ। ঘটী দিদির বাপ···

জমা।···ও···আমার জ্বালা পিসিমার পিসেমশায় !

চঞ্চ। আঃ, কি যে বলিস্ !

জমা। বুঝেচি, বুঝেচি, আর বলবো না।···তা পিসেমশায়, কিছু মনে করোনা গো, চিন্‌তে পারিনি। যে দুশ্‌মন্ চেহারা করেচো বাপু !···তা গড় করি গো···(প্রণাম ও প্রস্থান)

রক্ত। একখানা চেয়ার আনিয়ে দে রে—মোটা মানুষ ! দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হাঁফ ধরে। (চেয়ার আনাইয়া দিলে বসিল) ফক্কারামের ভারী অসুখ...?

চঞ্চ। (কাঁচুমাচু ভাবে) বড্ড। দিন কাটে তো রাত কাটে না পিসেমশায়,···রাত কাটে তো দিন কাটে না।

রক্ত। তাইতো, তাহলে তার সঙ্গে আর দেখা করবো না ! আমার আবার তাড়া আছে। (ঘড়ি দেখিয়া) বেলা দুটোয় আসবে কিরুমিলাল, স'দুটোয় মশারাম, আর ঠিক আড়াইটেয় আসবে দালাল ব্লডহাউণ্ড সাহেব।...তা, আমি যে একটা টাকার ব্যাপারে এসেছিলুম রে খেঁদি···

চঞ্চ। (দুঃখিত ভাব দেখাইয়া) ওঁর বড় অসুখ, পিসেমশায়,···বড় অসুখ ! কি যে হবে ! (দীর্ঘশ্বাস)

রক্ত। হুঁ।···তা কে দেখচে ?

চঞ্চ। ...অমন যে বিম্বরাজ ডাক্তার, তা সে'ও কিছু করতে পারলে না, ফেলে রেখে গেল। এখন দেখচে ঐ নিমতলার কৃতান্ত কবিরাজ।

রক্ত। তা, কৃতান্ত কবিরাজের হাতযশ আছে।··· নিমতলাটা তারি জোরে জাঁকিয়ে আছে।...তা, তোকেই তবে বলি, মন দিয়ে শোন্। টাকার ব্যাপার কি না··· জরুরি ব্যাপার, নিজেই তাই এলুম।···তা ভালোই হলো··· তোকে দেখতে পেলুম।...

চঞ্চ। (প্রসন্নভাবে চারিধারে চাহিল)

রক্ত। (কাগজের বাণ্ডিল খুলিতে খুলিতে) ঘুঘুরাম চক্রবর্ত্তীর নাম শুনেচিস্?···শুনিস্ নি···? আমার এক মক্কেল, ভারী-ঈ মক্কেল, মস্ত পয়সাওলা মক্কেল !

[চঞ্চলা অবাক হইয়া রক্তবীজের পানে চাহিল ; অদূরে দ্বারপ্রান্তে অন্তরালে লেপ মুড়ি দিয়া ফক্কারাম উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। চঞ্চলা তার পানে চাহিয়া একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল]

রক্ত।···তা সে আবার তোর এই ফক্কারামের কি-রকম সম্পর্কে দাদামশায় হতো। অর্থাৎ ফক্কারামের মাতামোর পিসতুতো সম্বন্ধীর ভায়রাভাই...

চঞ্চ. (কৌতূহলীভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল) তাহলে খুব নিকট-সম্পর্ক, বল পিসেমশায় !

রক্ত। হ্যাঁ,—তা সে তো এখানে নানান্ জ্বালায় জ্বলে একদিন দুত্তোর বলে চলে গেল, একেবারে সেই কাবুল···

চঞ্চ। কা—বু—ল ! ওরে বাবা···

ফক্কা। (বিস্ফারিত চক্ষে বিস্ময়ের ভঙ্গী প্রকাশ করিল)

রক্ত।...সেখানে গিয়ে সে অমন মস্ত একটা পাহাড়ই ইজারা নিয়ে ফেল্‌লে। তারপর সেই পাহাড় কেটে দিব্যি মাখমের মত নরম জমি বার করে তাতে সব বীচি ছড়িয়ে দিলে,···কিসের, জানিস্...? ইয়া-ইয়া বাদাম-পেস্তা-আখরোটের,···ইয়া ইয়া আপেল, নাশপাতি, আঙুর, খেজুর, আর চীনের বাদাম !···তাতে ফসল যা ফল্‌লো, ওঃ, সারা কাবুল তা দেখে একেবারে চুলবুল্ করে উঠলো !...আর সেই ফসল দেশ-বিদেশে সে চালান্ দিতে লাগলো। এই করে পাঁচ বছরে সে কত টাকা কর্‌লে, জানিস্···? (কাগজ

দেখিয়া) চার কোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতান্নো হাজার ন'শো বাইশ !

চঞ্চ। ওরে বাবাঃ !

(ফক্কারাম বিস্ময়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিল ; চঞ্চলা তার পানে কটমট্ করিয়া চাহিল)

চঞ্চ।···তাই বুঝি পিসেমশায়, এঁদেরও ঐ ব্যবসার দিকে এত ঝোঁক! ইনিও তো সেই সেদিন তেঁতুলবীচি কেনবার মতলব করছিলেন।

রক্ত। তাই না কি ?

চঞ্চ। তা না তো কি ! আর সেই তেঁতুলবীচির জন্তে পোস্তায় ঘুরে ঘুরেই না এই বিদিকিচ্ছি ব্যামো···

রক্ত। বটে ! তা ভালো !···বুঝলি, ব্যবসাতেই লক্ষ্মী ! তারপর যা বল্‌ছিলুম···তা ঘুঘুরাম বেচারী অল্পভোগী···ভোগ করতে পেলে না !···

চঞ্চ। কেন ?

রক্ত। আর কেন !···যত ব্যাটা গোঁয়ার কাবুলী-পেশোয়ারীর চোখ টাটালো ! তারা মামলা করে তার সে মাথমের জমিটুকু ছিনিয়ে নিলে ! সতেরো বচ্ছর সেখানে সতেজে মামলা চালিয়ে হেরে দেশে আসবে বলে ঘুঘুরাম কড়ি গুণে দেখে, ঠিক একলাখ চারশো তিপ্পান্ন টাকা সাড়ে বারো আনা বাকী পুঁজি।···তা, চারশো তিপ্পান্ন টাকা সাড়ে বারো আনা পথের খরচ বলে আলাদা ব্যাগে রেখে লাখ টাকাটা গেঁজের ভরে সে তো দেশে ফিরছিল···

চঞ্চ। তারপর···?

রক্ত। (ঘড়ি দেখিয়া) তাড়াতাড়ি সারতে হবে রে খেঁদি।...বেচারী এলো লাহোর অবধি···এসে এক চটিতে উঠলো—সেখেনে হলো তার অসুখ !···তাড়াতাড়ি লাখ টাকাটা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে সে তো এক উইল করলে। উইলটি করা, আর হার্টটি ফেল্ করে মরা !···এই সে উইল···

চঞ্চ। তা এ উইল···আমি···তা···

[বেয়াক্কেলের প্রবেশ ; সে একধারে দাঁড়াইয়া রহিল]

রক্ত। আরে এই সে উইল—খেঁদি। এই স্তাখ্,—বাঙলায় লেখা···(উইল পাঠ) ··কস্ত উইলপত্র কার্য্যঞ্চাগে আমি শ্রীঘুঘুরাম চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম ৺গ্যাঁড়ারাম চক্রবর্ত্তী··· এ সব বাঁধি গৎ···তা (কাগজে হাত বুলাইতে বুলাইতে)—এ'ও ঐ বাঁধি গৎ, এ'ও বাঁধি, বাঁধি, বাঁধি, বাঁধি···আসল কথা—এই যে···(পাঠ) আমার অবর্ত্তমানে এই লাখ টাকা আমার জ্ঞাতিভ্রাতা বকাসুর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কাগুকুজ্ঝা দেবীর পুত্র আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ফক্কারাম চক্রবর্ত্তীকে···(ফক্কারাম "এ্যাঃ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল)···কে ?

চঞ্চ। (অপ্রতিভ হইল ; ফক্কারামের পানে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল) ও কলতলায় কে চ্যাঁচালে !

রক্ত। তাই ভালো।···আমি চম্‌কে উঠেছিলুম। তার পর শোন্ (উইল দেখিয়া) এই যে,—ফক্কারাম চক্রবর্ত্তীকে তার জীবিত-কাল অবধি এই মর্ম্মে দিলাম যে আসল টাকার উপর তার কোন অধিকার থাকিবে না, এই টাকার সুদমাত্র সে যথেচ্ছা ভোগ করিবে। তাহার অবর্ত্তমানে এবং শুধু অবর্ত্তমানে মাত্র এই লাখটাকার নির্ব্যূঢ় সত্বে ষোল আনার মালিক হইবে, উক্ত ৺বকাসুর চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা বজ্র-সুন্দরীর পুত্র শ্রীমান্ লক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (উইল রাখিয়া) অর্থাৎ বুঝলি— ফক্কারাম যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, ঐ লাখ টাকার সুদ সে পাবে, আর যে-ভাবে খুশী, সেই সুদ সে খরচ করবে ! আর সে বেঁচে থাক্‌তে এ লাখ টাকায় বা তার এক পাই সুদে লক্কাচন্দ্রর কোনো অধিকার থাকবে না। তবে ফক্কারাম মারা গেলে ঐ লাখ টাকাটা পুরোপুরিই পাবে লক্কাচন্দ্র।···তা ফক্কার যে-রকম অসুখ·· এখানে দেরী করে কাজও হবে না কিছু। লক্কাচন্দ্রর খোঁজ করা দরকার—আমার প্রোফেসন্ তাই বলে। শুনচি নাকি, আসামের ওদিকে চেরাপঞ্জিতে লক্কাচন্দর কমলানেবুর ক্ষেত করেছিল, তার পর নাকি আসামী মেয়ে বিয়েও করেছিল। দু'জনে বনতো না। একদিন ঝগড়ার মুখে সেই স্ত্রী লক্কাচন্দরের মাথায় কষে লাঠি মারে, তাতেই সে মরে গেছে।···তবু খোঁজটা একবার নেওয়া দরকার। কাগজে-কাগজে নোটীশ ছাপিয়ে···(ফক্কারাম রক্তবীজের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ; রক্তবীজ দেখিল, দেখিয়া চমকিয়া উঠিল)···এ কি ! এ···?

ফক্কা। আজ্ঞে আমিই···

রক্ত। তুমিই...?

ফক্কা। ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী।

রক্ত। তবে যে শুনলুম, তোমার খুব অসুখ, নাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে···

ফক্কা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ছাড়ছিল বটে, তবে সম্প্রতি নাড়ী

আবার ঠিক এঁটে গেছে...(লেপ ফেলিয়া দিল) বলেন কি, মশায়, আঁটবে না ? ওঃ, লাখ টাকা ..ওরে বাস্‌রে ..

রক্ত। কিন্তু লাখ টাকা তো তোমার নয়, বাপু···তুমি তো পাবে শুধু সুদ...

ফক্কা। তাই কি কম না কি! দেয় কে, মশায় ?··· ওরে বাবা, লাখ টাকার সুদ !

রক্ত। (ঘড়ি দেখিয়া) তাহলে আসি। আর এক সময় আসবো রে খেঁদি—professional man···ভারী busy. (প্রস্থান)

ফক্কা। প্রিয়ে···

চঞ্চ। নাথ···

বেয়া। বাবু ..

ফক্কা। চোপ্ ব্যাটা—যাঃ, ফাজিল কোথাকার! (বেয়ারেকেলের প্রস্থান) প্রিয়ে···

চঞ্চ। ওরে বাবা, লাখ টাকা···

ফক্কা। ভাবো একবার...ডার্ব্বিতে নয়, উইলে...

চঞ্চ। দেনাগুলো এইবার শুধে দাও···আপদের শান্তি হোক্ !

ফক্কা। ক্ষেপেচো! দেনা শুধবো কি।

চঞ্চ। কেন ..?

ফক্কা। রাম বল। দেনা কি মানুষ করে শোধবার জন্যে না কি ?

চঞ্চ। এঁ্যা···!

ফক্কা। তাই। ওটা ভাবচি, উইল করে যাবো। কোথায় কে ওয়ারীশন বসে আছে, কত আশা করে। তা কিছুই পাবে না ? এই দেনাগুলি উইল করে তাকেই দিয়ে যাবো। বেচারী তবু নেড়ে-চেড়ে খাবে, আর দু'বেলা নাম করবে!···

চঞ্চ। হ্যাঁ গা, তা এই লাখ টাকার সুদ—এ কবে পাবে ?

ফক্কা। যেদিনই পাই···লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা! ওঃ···

গান

লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা!

চঞ্চ। দায় হলো যে গো ভার তারি আর সয়ে থাকা!
কতগুলি···? ও সে কতগুলি···? ওগো কতগুলি ?

ফক্কা। চুপ, ওরে চুপ, চুপ চুপ চুপ! বাপ্স, ব্যাগ, কি ভরি থলি ?

চঞ্চ। যদি চুরি যায়···! যদি উড়ে যায়! খুব সাবধানে চাই রাখা!

ফক্কা। পথ জুড়ে আছে হতভাগা পাজী যত ব্যাটা ছোটলোক—
পাওনাদারের মত জন্ত, অতীব ক্ষুদ্র চোখ!

চঞ্চ। বলে, শুধে দাও···টাকা শুধে দাও!

ফক্কা। ···ইস্, তাই নাকি! নই আমি ন্যাকা!

ফক্কা। (মহাহর্ষে) লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা!···(পরিক্রমণ)

চঞ্চ। (হঠাৎ চিন্তায় মলিন হইল) ওগো...

ফক্কা। (অধীরভাবে) লাখ টাকা, লাখ টাকা, লাখ টাকা···

চঞ্চ। আঃ, কি ছেলেমানুষের মত নাচছো গা?··· শুনচো···?

ফক্কা। কি···?

চঞ্চ। তুমি লাফাচ্ছো কি মিছিমিছি! লাখ তো লক্কার, তোমার মাসতুতো ভাইয়ের—তোমার তো শুধু সুদ!···মাছ তার, কাঁটাখানা শুধু তোমার···

ফক্কা। এঁ্যা!···তাই নাকি? লক্কা লাখ, আর ফক্কা···ফাঁক!

চঞ্চ। হ্যাঁ। ওগো, লক্কাই যে ··

ফক্কা। ···শা···লা···

চঞ্চ। তুমি কি পাগল হলে! কাকে কি বলচো?··· সে যে তোমার ভাই···

ফক্কা। কভি নেহি।···সে শালা···

চঞ্চ। আহা, তুমি যদি লক্কা হতে গো···

ফক্কা। লক্কা আবার কে। আমিই লক্কা, আমিই ফক্কা···

চঞ্চ। আহা, তা যদি হতো গো···

ফক্কা। সে তো মরে গেছে আসামের জঙ্গলে···

চঞ্চ। ওগো, ঠিক, ঠিক, ঠিক ..

ফক্কা। কি ঠিক ?

চঞ্চ। এ লাখ টাকা তুমিই পাবে, যদি এক কাজ কর...

ফক্কা। কি কাজ ?

চঞ্চ। তুমি মর···

ফক্কা। (চমকিয়া) মরবো কি রকম ? ..মরবো কি! মরে আবার টাকা পাবো—বাঃ!

চঞ্চ। হ্যাঁ গো, মরেই টাকা পাবে। তুমি মর…মর গো মর তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মর…

ফক্কা। বাঃ, তুমি তো খাসা স্ত্রী! আমি মরবো! বাঃ! জলজ্যান্ত বেঁচে আছি, অমনি মরবো…ব্যামো না, কিছু না…বাঃ!

চঞ্চ। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তোমায় মরতেই হবে! মরা ছাড়া কোন উপায়ও তোমার দেখচি না!…ওঃ, আমার মাথায় মতলব যা এসেচে! তুমি মরবে, কি রকম জাঁকিয়ে আমি শ্রাদ্ধ করবো, কেত্তন দেবো, কত লোক যে খাওয়াবো—আঃ! তুমি মরগো, মর…লক্ষ্মীটি!

ফক্কা। (শিহরিয়া স্তম্ভিত হইল) এই তোমার ভালোবাসা, প্রেয়সী!…আমি মরবো, আর তুমি? ওঃ, বুঝেচি, লক্কাচন্দ্র আর লাখ টাকা…

চঞ্চ। ওগো, তা কেন! আমি সে মরা মরতে বলচি না,—যাতে দাঁত-মুখ সিঁটকে মড়া হয়ে লোকের কাঁধে চড়ে পুড়তে যেতে হয়, 'হরিবোল' বোলে—সে মরা নয় গো, সে মরা নয়…

ফক্কা। তবে আবার কি রকম মরা…?

চঞ্চ। ওগো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে মরা। আহা, বুঝচো না?

ফক্কা। না!

চঞ্চ। অর্থাৎ এই,…এই…তুমি মরবে…

ফক্কা। হ্যাঁ। আর তুমি…?

চঞ্চ। আমি? আমি খুব কাঁদবো, তারপর কাঁদতে কাঁদতে তোমার শ্রাদ্ধর জোগাড় করবো, তারপর মাছ খাবো না, একাদশী করবো…

ফক্কা। উঃ, থামো, থামো। অমন করে বলোনা প্রিয়ে…আমি যে আঁৎকে উঠচি। এক একবার মনেও হচ্ছে, বুঝি, মরে গেছি! আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসছে যেন!

চঞ্চ। উঃ, কত লোক খাবে, কেত্তন যা দেবো…আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি…

ফক্কা। আর আমি?

চঞ্চ।…তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকলে, পনেরো-কুড়ি দিন পরে তুমি বাড়ী আসবে লক্কাচন্দর হয়ে। এসে লাখ টাকার মালিক হবে পুরোপুরি রকমে। তোমার পাওনাদারের দলও সঙ্গে সঙ্গে ফর্সা…কেমন হবে, বল দিকি?

ফক্কা। বুঝেচি, বুঝেচি। বাঃ, খাসা মতলব বার করেচো, প্রিয়ে! অর্থাৎ আমি যেন মরেচি, লোকে জানবে। আমি গা-ঢাকা হয়ে থাকবো। তারপর সব চুকলে লক্কা সেজে আসবো। বাঃ, বাঃ—চমৎকার মতলব ঠিক করেচো।…কিন্তু তুমি…?

চঞ্চ। আমার জন্যে ভেবো না…

ফক্কা। ভাববো না কি রকম?…তুমি হবে বিধবা ভাজ, আর আমি মাসতুতো দ্যাওর,…তাহলে কি আমাদের মধ্যে ফারখৎ হয়ে যাবে?

চঞ্চ। ন্যাকা! তা কেন? আমি অবীরা, শোকে অধীরা, নয়ন-জলে সসেমিরা…তুমি হালের মতে বিধবা-বিবাহ করবে আমায়। লাখ টাকার জোর থাকলে সব চলে যাবে স্বচ্ছন্দে… কিছু ভেবো না।

ফক্কা। ঠিক বলেচো! সাবাস্! বরাত তাহলে এবার খুললো, দেখচি। চঞ্চলা, মন-চলা, প্রাণ-টলা প্রেয়সী আমার…কি বুদ্ধি তোমার!…তা, এখন মরা যায় কি করে বল দিকি? (পরিক্রমণ)

চঞ্চ। কেন…বিষ খেয়ে…

ফক্কা। ওরে বাবা…যদি সত্যি মরে যাই!…তা ছাড়া তাতে পোষ্ট-মর্টেম না হলে মরা তো সাব্যস্তই হবে না!

চঞ্চ। মোটর গাড়ী চাপা…

ফক্কা। উঁহু! হাত-পা ভাংবে, চেহারার দফা গয়া হয়ে যাবে একেবারে! তার ওপর মোটরের ঘা খেয়েও যদি-বা প্রাণটা বেঁচে থাকে, তা ঐ পুলিশ কোর্টে সাক্ষী আর জেরার গুঁতোয় মোচ্‌কে বেরিয়ে যাবে।

চঞ্চ। তাহলে জলে ডুবে…

ফক্কা। ওরে বাবা, পেট ফুলে জয়ঢাক হয়ে উঠবে, দম্ বন্ধ হয়ে যাবে—হাঁপিয়েই মারা যাবো।

চঞ্চ। এ নয়, ও নয়, তবে মরবে কিসে?

ফক্কা। তাইতো! এ যে দিশেহারা হয়ে উঠচি।…তা, বিছানায় শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে দিব্যি নাক ডাকাতে ডাকাতে মলে হয় না?

চঞ্চ। না। তুমি ক্ষেপেচো! বিছানায় শুয়ে মলে পাঁচটা পাড়ার লোক জুটে খাটে করে তুলে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে তবে ছাড়বে!

ফক্কা। ওরে বাবা, তাহলেই তো গেছি।…কি করা

যায় তবে? কি করে মরি...? আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

চঞ্চ। কি...?

ফক্কা। এই রেলে চড়ে পশ্চিমে যাচ্ছি বলে বেরুবো—বেয়াকেলে সঙ্গে যাবে। তার পর একটা ষ্টেশনে নেমে জামা-কাপড় ছেড়ে দেবো—বেয়াকেলে নিয়ে এসে বলবে যে বাবু রেলে কাটা পড়ে মরে গেছে!

চঞ্চ। কি যে বল! এ মরার ব্যাপারে আর কেউ সাক্ষী থাকবে না, অর্থাৎ কেউ ভেতরের আসল কথাটা জানবে না। শুধু তুমি আর আমি! ব্যস্!...এ কি পাঁচ কাণ করে! বলে, বেয়াকেলে! শেষ আজীবন তাকে ঘুষ দিয়ে মরি—পাছে সে ফাঁস করে!

ফক্কা। ওঃ—ঠিক বলেচো! কি বুদ্ধি তোমার, প্রেয়সী! শুধু তোমার বুদ্ধিতেই টেঁকে আছি। না হলে এত দেনা করে এমন আয়েসে থাকতে পারতুম!...এক এক সময় ভাবি, চারিদিকে এত দেনা এর মধ্যে করে তুললুম কি করে! আশ্চয্যি হয়ে যাই!

চঞ্চ। বুদ্ধি হবে না? আমি যে উকিলের মেয়ে! পাবনার মাঠে তেঁতুলবিচি-পোঁতা কি কাবুলের পাহাড়ে মেওয়া-চাষের বংশ নয় তো!

ফক্কা। যাক—তাহলে মরি কি করে, এখন তাই বল! ওরে বাবা, লাখ টাকা, লাখ টাকা...ও যে পুরোপুরি চাই আমার!...এ্যা...

চঞ্চ। ত্মাখো, আমি ঠাওরেচি...ঐ জলে ডোবাই ঠিক! ওতে লাস না পেলেও চলে—ভাববে, লাস ভেসে গেছে!...কালই চল, দু'জনে গঙ্গায় নাইতে যাচ্ছি বলে বেরুই। তারপর আমি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফিরবো, ফিরে বলবো, ঐ যেমনি তুমি ডুবটি দেছ, অমনি কোথায় যে তলিয়ে গেলে—কাঁদবো আর মূর্চ্ছা যাবো...সেরা প্রমাণ হয়ে যাবে।

ফক্কা। আর আমি...? থাকবো কোথায়? থাবো কি?

চঞ্চ। দিনের বেলাটা ঘুরে গা ঢেকে থাকবে কোন-মতে। তারপর রাত্রে সব নিশুতি হলে এসে দোরে তিনটি টোকা মারবে। আমি গিয়ে দোর খুলে দেবো। তুমি এসে উঠবে একেবারে ছাদের কোণে ঐ চিলের ঘরে! সে সব বন্দোবস্ত করে রাখবো'খন!...সব পাবে, প্রিয়ার অধর-সুধাটুকুও বাদ যাবে না!...এমন মরণ মরেচে কেউ! খাওয়া-দাওয়ারো কোন কষ্ট হবে না। সব আমি চালিয়ে যাবো। তবে হ্যাঁ, খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কোনো দিকে উঁকিটি পাড়বে না...বুঝলে!

ফক্কা। বুঝেচি, বুঝেচি, খুব বুঝেচি!...কি আর বলবো প্রিয়ে,...এ যে মেরে আমায় বাঁচালে তুমি! তোমার গুণে সত্যিই আমার মরতে সাধ হচ্ছে।

চঞ্চ। এখন এসো দিকি—আরো ঢের কথা আছে। আগে খাওয়া-দাওয়া সারো...

ফক্কা। চল, চল...

[উভয়ের প্রস্থান

বিষ্কম্ভক

গান

এ পথে, ঐ পথে গো,
চলেছি নিয়ে জাল এ...
যদি ঐ লাখ টাকাটা
মিলে যায় এই কপালে!
চেয়ে থাকি রাত্রি-দিবা—
লাখ টাকাটা পাই যদি-বা!
ছুটে যাই চাঁদের পানে,
যদি পাই হাত বাড়ালে!
চুরি হোক্, জুয়োচুরি হোক্
কিছুতেই ভয় করি না!
ধার মাছ ডাঙায় থেকে...
গায়ে জল, তা'ও ডরি না!
যত সব বোকা গাধা
টাকা পায় গাদা-গাদা...
চোখে সব লাগিয়ে ধাঁধা,...
পাই যদি সে এ কাকতালে!

পাওনাদারগণের প্রবেশ

১। তাইতো, মরে ফাঁকি দিয়ে গেল!

২। এখন কি ধরে নেবে?

৩। কেন, ঐ লাখ টাকা...

২। সে তো লব্ধার—ও তো শুধু সুদটকু পেয়েছিল...

৩। এই বাড়ীখানা! সবাই মিলে ডিক্রী নিয়ে ক্রোক দি যদি?

১। হুঁঃ! বাড়ী তো ওর পরিবারের নামে। না হলে আর ভাবনা কি ছিল!

৪। আমাদের বরাতেই গেল! নাহলে দু'দিন বেঁচে টাকাটা পেলে হয়তো কিছু আদায় হতো!

৫। আশ্চয্যি মরণ! গঙ্গায় নাইতে গেল, অমনি টুপ্ করে ডুবে তলিয়ে গেল!

৩। ঠিক যখন ঐ কোন্ মাতামোর উইলে টাকাটি পেলে।

২। মোদ্দা, কথায় যে বলে, ধারে কাটে···তা এ ঐ ধার করেই জীবনটা কাটিয়ে গেল, বেশ!

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

বেয়া। কি গো বাবুরা? এখনো জবাব চাই? এখন জবাব পেতে হলে অন্য জায়গায় যেতে হবে।···দেখুন··· রাজী আছেন? (সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল) তা তো নন্···? তবে আর এখানে ঝামেলা করেন কেন?··· তাগাদার চোটে জলজ্যান্ত মানুষটাকে মারলেন···আপনাদের ক্ষ্যামতা বটে, খুব! তা, এখন মশায়রা বাড়ী যাও···

১। এসো হে, চলে এসো···

২। যাবো না তো আর দাঁড়িয়ে থাকবো কি আশায়?···তবে বিপদের কথা শুনলুম,···তাই এসেছিলুম আর কি!

৩। তা হ্যাঁ হে বাপু, একটা সত্যি কথা বলবে?

বেয়া। আজ্ঞে, সত্যি কথাই আমি কই চিরদিন, তবে আপনাদের কেমন বেয়াড়া কাণ—তা মিথ্যে হয়ে বাজে!

৩। তবে যে তুমি বলছিলে, বাবু তেঁতুল-বিচির বস্তা নিয়ে পাবনায় গেছেন চাষ করতে···

বেয়া। আজ্ঞে, আর তেঁতুলবিচি নিয়ে মিছিমিছি কিচিমিচি করেন কেন! যিনি চাষ করতেন, তিনি তো··· লাস হয়ে ভেসে গেছেন!

৪। হ্যাঁ হে, এ গঙ্গায় ডোবাটা ঠিক তো? না, চুনারে যাওয়ার মত···?

বেয়া। আজ্ঞে, বিশ্বেস না হয়, গঙ্গায় গিয়ে দেখতে পারো···

৫। সত্যিই তিনি মারা গেছেন?

বেয়া। আরে মশায়, তাঁর বাঁচবার জো কি আর আপনারা রেখেছিলে!···যে রকম কড়া তাগাদা, এতে গঙ্গায় কি, মানুষ যে নর্দ্দামায় ডুবে মারা যায়!···এখন, যাও বাবুরা···

[সকলের প্রস্থান

[চঞ্চলা ও আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত ফক্কারামের প্রবেশ; চঞ্চলার বাম মণিবন্ধে রুমাল বাঁধা]

ফক্কা। মশার কামড় সয়ে চিলকোঠায় আর তো পড়ে থাকতে পারি না, প্রিয়ে···

চঞ্চ। আমাকেও কত সাবধানে সব দিক বজায় রেখে চলতে হচ্ছে, জানো? ওপরে চিলকোঠায় যাই, জমাদার্ণী কেবলি মানা করে,—ওগো সোঁদা বিধবা তুমি, একা যেয়ো না।···তা আমি বলি, ওরে, আমায় নিশ্চিন্তি হয়ে তোরা একটু কাঁদতে দে···আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েচে, তা তোরা কি বুঝবি!

ফক্কা। তোমার হাতে ও হলো কি? পটি বেঁধেচো যে!

চঞ্চ। কি আবার হবে! নোয়াগাছটা ওরা দেখবে যে, তাই। জমাদার্ণী জিজ্ঞাসা করছিল, কি হলো? আমি বললুম, টিন থেকে ঘী বার করতে কেটে গেছে!

ফক্কা। তা, এবার লক্কা হয়ে বেরুলেই তো হয়।··· শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ চুকে গেল—মরা তো প্রমাণ হয়ে গেছে দস্তরমত!

চঞ্চ। তাই করতে হবে। বেশ,···তাহলে আজই ঠিক করে ফেলা যাক।···সত্যি, আমিও ঠিক সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারচি না।···কাল ভুলে জমাদার্ণীকে বললুম কি, জানো? বললুম, ওরে বাজার থেকে একটা ভেট্‌কি মাছ আর দুটো ডিম আনিস্ তো!···সে তো হাঁ করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আমার পানে চেয়ে।···আমি তাড়াতাড়ি জিভ্ কেটে বললুম, এ দশা যে হয়েচে আমার, তা মনেও থাকে না রে! বলে দু' চোখ রগড়ে জল বার করলুম। জমাদার্ণী ডুকরে উঠলো, তুমি মাছ খেতে পাবে না, এ'ও আমায় দেখতে হলো! আমি বললুম, চুপ, চুপ! হিঁদুর ঘরের বিধবা আমি···আমার সামনে মাছের নামও করিস্ নে—জাত যাবে।

ফক্কা। ওরে বাস্‌রে—তুমি মাছ খাচ্ছ না, তাহলে?

চঞ্চ। কি করে খাবো, নাথ? আমি যে হিঁদুর ঘরের বিধবা! মাছ খেলে কি চলে!···তোমার খাবারটা যে কি করে জোগাড় করি!···ওদের বলি, বিধবা হয়ে আমার

এত খিদে বাড়্‌লো কি করে রে জমাদার্ণী···ছটী লোকের খোরাক না হলে চলে না! তাই নিয়ে বসে ওদের বলি, তোরা দোতলা থেকে যা···তোরা শুদ্দুর, আমি বামুনের বিধবা···আমার খাবার সময় দোতলায় আসিস্ নে! ছোঁয়া-দোষ লাগবে শেষে!···তারপর টিফিন-বাক্সে তোমার খাবার ভরে এককোণে রাখি, রেখে নিজে খেয়ে নি। ওরা খেতে বসলে তখন আমি তোমার খাবার নিয়ে ওপরের ঘরে আসি।

ফক্কা। কিন্তু আমি তো মাছ খাই···

চঞ্চ। সে যে কি করে আনি!···ওদের ভাগের মাছ··· চুরি করি। ওরা চ্যাঁচালে, আমি বকি, বলি, বেরালকে দিয়ে রোজ রোজ মাছ খাওয়াবি? বেরাল তাড়াতে পারিস্ না?···সত্যি, এভাবে কাঁহাতক আর চলে, বল! তাই বলচি, আজ তুমি সরে পড় সন্ধ্যার সময়, তারপর কাল একেবারে লক্কা হয়ে এসো···

ফক্কা। বেশ···

চঞ্চ। কিন্তু একখানা চিঠি চাই তাঁর আগে···কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—তুমি পালাও, পালাও···কে আসচে, বুঝি! আমি কাগজ আর দোয়াত-কলম নিয়ে যাবো'খন একটু পরে।···পালাও শীগগির···

[চঞ্চলার প্রস্থান

[ফক্কারাম গমনোদ্যত, জমাদার্ণীর বাসন লইয়া প্রবেশ-উদ্যোগ—দুজনে চোখোচোখি। ফক্কা দ্রুত অন্তর্হিত; জমাদার্ণীর হাত হইতে বাসন পড়িয়া গেল; সে কাঁপিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। কি রে···কি হয়েচে?

জমা। দিদিমণি গো···(কম্পন)

চঞ্চ। কি রে...?

জমা। দাঁড়াও গো, দম্ নিতে দ্যাও! এখনো দাঁতে দাঁতে নেগে আছে! (কম্পন)

চঞ্চ। মর্ বুড়ো মাগী। তবু কাঁপে!···বলি, হয়েচে কি?

জমা। জা—মা—ই—বা—বু..

চঞ্চ। (বিচলিত হইল) এ্যাঁ···?

জমা। সত্যি গো দিদিমণি, সত্যি! কোন্ গতরখাকী মিথ্যে বলচে!

চঞ্চ। জামাইবাবু···! ইনি !

জমা। হ্যাঁ গো দিদিমণি!···তোমার বাসনগুলো মেজে নিয়ে আসচি, আর দেখি·· ও বাবা...

চঞ্চ। এ্যাঁ···?

জমা। সত্যি দিদিমণি, সত্যি! দেখি, জামাইবাবু... সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া···শুধু মুখটি খোলা···অমন যে চোখদুটী, তা হাঙরে খুবলে খেয়েছে···এমনি এমনি গর্ত্ত...তোমার ঘরের দিকে উঁকি না মেরে ঝট্ করে ঐ ছাতের সিঁড়ির বাগে চলে গেল!...উঃ,...এই দ্যাখো, দিদিমণি, এখনো আমি কাঁপচি—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেচে। এতখানি বয়স হলো তো—কত রেত-বিরেতে পাড়াগাঁয়ে মাঠে-ঘাটে বেড়িয়েচিও...এমনটি কখনো হয়নি গো! সত্যি দিদিমণি,·· এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি গো, সত্যি···

চঞ্চ। (ভাবিত হইল)

জমা। তাহলে বলি দিদিমণি···ঐ নোক-খাওয়ানোর দিন...ভাঁড়ারে এ্যাত নুচি বেঁচেছিল না? তা ভাবনু, বেয়াক্কেলে মুখপোড়া এখনি চুরি করে খাবে...তা মরুক গে, বাঁচাই তার হাত থেকে—তাই সেগুলি ছাদে নিয়ে গিয়ে ঐ চিলকোঠায়...

চঞ্চ। (সভয়ে) চিলকোঠা..?

জমা। হ্যাঁ গো—বেশ নিরিবিলি, না? তা ঐ চিলকোঠায় রাখবো ভেবে যেমনি তার চৌকাঠে পা দিছি··· অমনি, বললে না পেত্যয় যাবে গো দিদিমণি...অমনি শুনলুম্, ঘরের মধ্যে জামাইবাবুর গলা...গুণ-গুণ করে গান গাইচে! আমি তো নুচিমুচি ফেলে পড়ি তো মরি, দে ছুট্!···তার পরে, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি গো দিদিমণি, ঘণ্টাখানেক পরে চুপিসেড়ে গিয়ে দেখি, সিঁড়ির ওপর শুধু কলাপাতখানা পড়ে আছে...আর সেই দশ-বারো গণ্ডা নুচি আর পাঁচ গণ্ডা সন্দেশ তার চিহ্নও নেই! এ কি মানুষের কাজ! সেই অবধি আর ছাতের দিকেও ঘেঁষি না!...সাধে তোমায় বারণ করি ছাতের দিকে যেতে!

চঞ্চ। তোর ও মিছে ভয়!···দূর, এ'ও কি হয়, কখনো!

জমা। না গো দিদিমণি,···মিছে বলচি নে। আমি

হয় জমাদার্ণী, হাবু জমাদারের বোন্! সত্যি-ভয়ে পেছ্-পা হই না—আর মিছে ভয়ে হঠ্‌বো আমি।··তা বাপু, আশ্চর্য্যিও তো নয়। বলে, অপঘাতে মরণ···

চঞ্চ। আচ্ছা, যা তুই দিকি!···কিন্তু তোর কথা শুনে চিলকোঠায় যেতে আমার ভারী সাধ হচ্ছে রে! যদি দেখা পাই! যাবি?

জমা। ওরে বাবা, মেরে ফেললেও নয়!

চঞ্চ। তবে আমিই একবার যাই...

জমা। অমন কথা বলুনি দিদিমণি—এমন কাজও করে! বলে, জ্যান্তে যত ভালোবাসাই থাক্, এখন পেলেই ঘাড়টি মট্‌কে দেবে!

চঞ্চ। তাতেও আমার কি সুখ, তা তুই কি বুঝ্‌বি, জমাদার্ণী!

জমা। অমন কাজ করুনি, দিদিমণি, অমন কাজ করুনি গো···আঁড় হয়েছ, তাতে কি। ঐ মাছটা খেতে পাবে না, এই তো···! তা, লুকিয়ে খাও না, কেউ না জান্‌লেই হলো!···তাছাড়া এতে যে স্বাধীন বেপরোয়া হয়েচো...নিজেই নিজের কর্ত্তা!

চঞ্চ। তুই আর জ্বালাস্ নে, বাপু···আমি যাই ছাদে, যদি দেখা পাই···(দীর্ঘশ্বাস)

জমা। তুমি শুনবে না···? তা দাঁড়াও, আমি আগে নীচে পালাই!···বাপ্‌রে, কি দুর্জ্জয় গোঁ, একটা বিদিকিচ্ছি কাণ্ড না করে আর তুমি ছাড়বে না, দেখ্‌চি···

(উভয়ের প্রস্থান)

বেয়াক্কেলে ও ধড়ীবাজের প্রবেশ

বেয়া। বরাত আর কাকে বলে, বল্! লাখ টাকা পাবে, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আরামে ভোগ করবে, না, জলে ডুবে মারা গেল!

ধড়ী। কিন্তু তোমার ঐ লঙ্কা দাদাবাবু লাখ টাকা পাবে, বলছিলে না?

বেয়া। তাতে কি! উকিলবাবু বললে যে, উইলে আছে, ফক্কাদাদাবাবু মারা গেলে লঙ্কাদাদাবাবু লাখ টাকা পাবে। তা তার তো কোনো পাত্তাই নেই—আজ দশ বচ্ছর দেশছাড়া। উকিলে এাও বললে, আসামের জঙ্গলে সে মারা গেছে।

ধড়ী। (আগ্রহান্বিতভাবে) মারা গেছে?

বেয়া। নিঃযুশ মারা গেছে। উকিলের কথা কি মিথ্যে হয়? আইনের ব্যাপার যে রে। তাই ভাবচি, কি বিদিকিচ্ছি কাণ্ডই না হলো! লাখ টাকা এলো, আর দু'ছুটো ভাইই গেল!···ভালো কথা, তুই আজই চললি? দু'দিন আরো থেকে গেলে পারতিস্!

ধড়ী। না খুড়ো, আজই যেতে হবে। দেশে চাষ-বাসের কি যে হলো,—না দেখলে নয়।

বেয়া। কলকাতায় আর থাকবিনে তাহলে?···তোর সে কারবার?

ধড়ী। ঐ এলাচি খেলা! না, পুলিশ যে রকম পেছনে লেগেছে, ও আর বেশীদিন চল্‌ছে না। শেষে কি জেলে যাবো?...তা তোমার লঙ্কাদাদাবাবু ঠিক মরেচে তো খুড়ো? দেখো, শেষ—

বেয়া। হ্যাঁরে, হ্যাঁ, মরেচে!...তা তোর সে খোঁজে এত কি দরকার?

ধড়ী। না, দরকার নয়। তবে বলছিলুম, লাখ টাকাটা পেতো—আহা!

বেয়া। বরাত! ঐ লাখ টাকা এখন কার বরাতে নাচছে—কে জানে!

ধড়ী। তাইতো খুড়ো...না,...ভালো কথা, তোমার ঘরে আমার ছাতাটা আছে—আমায় এখনি বেরুতে হবে, না হলে ট্রেন পাবো না···

বেয়া। ঘরে চাবি দিয়ে এসেচি—দাঁড়া, এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

ধড়ী। বলে, লাখ টাকাটা কার বরাতে নাচছে!—হুঁঃ, ও এই আমার বরাতে নাচছে।···এ্যামেচার থিয়েটারে রাজা-উজীর সেজে কত পালাই এ্যাক্ট করেচি—তার উপর এলাচি খেলায় জমিদার সেজে কত বাছাধনকে ঘাল করলুম! আর এই লঙ্কাদাদাবাবু সেজে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারবো না! তাই করা যাক্—লঙ্কাদাদাবাবু সেজেই এসে বসা যাক্।···একটা গালপাট্টা দাড়ী আর সাজ-পোষাক!···মারি তো হাতী, লুট তো ভাণ্ডার! একদম লাখোপতি! সেই ভালো। আসাম?···বহুৎ আচ্ছা!···এই যে খুড়ো...

ছাতা হাতে বেয়াক্কেলের প্রবেশ

হ্যাঁ, এই ছাতাটাই। তা'হলে চললুম খুড়ো।

বেন্না। চ', আমিও মোড় অবধি যাবো। বিড়ি ফুরিয়ে গেছে, আন্‌তে হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

গান

ওগো, সুখের দিনের আমরা সাথী যে, নাচি খেলি কত রঙ্গে !
ফাগুনের অলি, মধু দেখে চলি, গুঞ্জনে লীলা-ভঙ্গে !
সুখে মাতামাতি, করি কোলাকুলি, জড়াজড়ি সুখ-স্বপনে—
কত সে কালের প্রাণের দোসর—আঠা দিয়ে সাঁটা জীবনে !
সুখপাখী যেই উড়ে চলে যায়,—মোরা চলে যাই সঙ্গে !
সুখের দিনেতে কোথা থেকে আসি, ঘিরে থাকি সারা চিত্ত···
প্রেয়সী, বঁধুয়া, বন্ধু, সাথী গো—ভালোবাসি বড় বিত্ত !
দুখ-দুর্দিনে ছায়ার মিলাই—ডাকিলে পাবে না বঙ্গে !

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। এধারকার পরামর্শ তো চুকলো!···মোদ্দা, অবাক হচ্ছি—ঐ অতগুলি লুচি আর মিষ্টি একনিমেষে শেষ করে দিলে!···ভাগ্যিস্, অসুখ-বিসুখ হয় নি, তা'হলেই মুস্কিল বেধে যেতো আর কি! ভূতকে দেখাবার জন্যে তো আর ডাক্তার আনাতে পারতুম না!···

জমাদার্ণী ও খোন্তা মাসীর প্রবেশ

জমা। এই ন্যাও গো, তোমাদের খোন্তা মাসী এসেছেন কোথা থেকে···

চঞ্চ। খোন্তা মাসী···!

খোন্তা। চিন্‌তে পার্‌চো না, বৌমা?...আমার অদেষ্ট! না'হলে তোমার এই দশা দেখতে আসি!... উদ্দেশ তো নিলি না মা, কোনোদিন!···আমার প্রাণ যে কেঁদে উঠলো!. থাকতে পারলুম না. কিন্তু এসে এ কি শুনলুম! ও বাবা ফক্কারে ..ফক্কা···ও বাবা, এ কি করে গেলি বাবা ..(কান্না ও কথার মধ্যে ক্রমাগত নাক-ঝাড়া) এমন সীতে ছেড়ে কোথায় গেলি বাবা...

চঞ্চ। থামো গো, থামো···

খোন্তা। থামবো কি বাছা! তুমি ইস্তিরী, পরের মেয়ে বৈ তো না! দু'দিন শুধু ঘর করেচো! তোমার কি নাগবে এত বাছা! আমার যে সে নাড়ী-ছেঁড়া ধন, আমার যে বোন্‌পো! বলে, মা-মাসীর তুল্যি আর আছে কেউ! আমি সেই মাসী!···ওরে, আমায় কাঁদতে দে বাছা, কাঁদতে দে! ও ফক্কা, ফক্কা বাবা, কোথায় গেলি বাবা!··· এ মাসীকে কাঁদিয়ে, কোথায় গেলি বাবা! আমার এ কি করে গেলি রে···(বিনাইয়া ক্রন্দন ও নাকঝাড়া)

চঞ্চ। আঃ, থামো না মাসী! কাঁদলে কি ফিরবে?

খোন্তা। তা তো জানি রে বাছা। তা বলে কাঁদবো না? এ যে আমাদের চিরকেলে রীত, বৌমা, এ যে শাস্তর! মলে ডাক ছেড়ে কেঁদে যে পাড়ায় জানান্ দিতে হয়! নাহলে মরাই যে মিথ্যে মা'! একালে সহরে থেকে তোমরা বাঙালার শাস্তর ভুলে গ্যাচো মা!· আমরা সেকেলে মানুষ—মড়া-কান্না কি ভুলতে পারি! ও যে চাই আমাদের! ও বাবা ফক্কারে, বাবা আমার···কোথায় গেলি রে···(কাঁদিতে কাঁদিতে কথা; কথার সঙ্গে নাকঝাড়া; চঞ্চলার নানা ভঙ্গীতে কখনো নিষেধ, কখনো বিস্ময়, কখনো বিরক্তি, কখনো-বা কৌতুক প্রকাশ) তা কিছু কি রেখে গেছিস্ বাবা, তোর গরিব মাসীর জন্যে? হ্যাঁ বৌমা, মাসহরা-টরা, ছেঁড়া কাপড়? শাল? আমার ভাগুরপো একটা ফ্যালানালের জামা চেয়েছিস যে—তা কিছু না? ও বাবা ফক্কারে···(জমাদার্ণী বিরক্তভাবে চলিয়া গেল) সেই এতটুকুটি তোকে কোলে করে মানুষ করেচি যে বাবা! তা গরিব মাসীকে মরার সময় ভুলে গেলি বাবা! ছ্যাদ্দট্যাদ্দ সব চুকে গেছে বৌমা? নোক খাওয়ানো? সব চুকে গেছে? ও বাবা! গেঁত-ভোজন অবধি?—ওরে, আমায় ছোলার ডাল খাওয়াবি, এ যে তোর বড় সখ ছিল, বাবা! হ্যাঁ বৌমা, আমায় কি নোক-খাওয়ানোর সময়ও খপর দিতে নেই? ওগো, ছ্যাদবাড়ীর লুচি, ছোলার ডাল আর ছক্কা খেতে যে আমি বড় ভালোবাসি! ও বাবা ফক্কারে, তা সব দিকেই মাসীকে ফাঁকি দিলি!

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। ভালো কথা, তুমি কে গো বাছা! খোন্তা মাসী না মোক্তা পিশি,—গাওয়া ঘী তো কোনো দোকানে পেলুম না বাপু···

চঞ্চ। গাওয়া ঘী কি হবে?

জমা। কেন, উনি যে বাড়ীতে পা দিয়েই নুটীশ দিয়েচেন, বেলা তিনটে বাজলেই ওঁর লুচি চাই। তা'ও আবার ভরসা ঘীয়ে ভাজা লুচি উনি খাবেন না—খেলে অম্বল
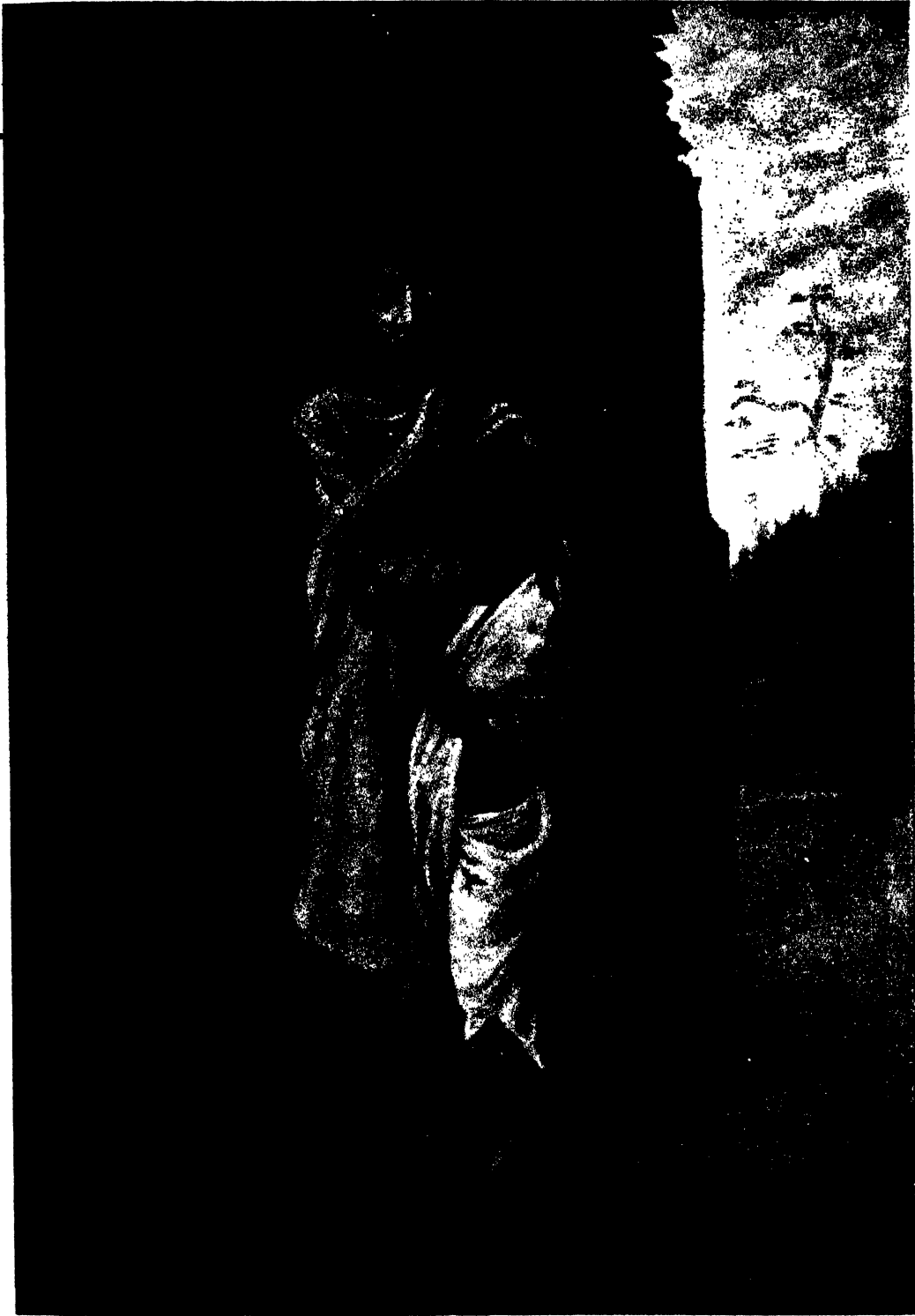
অবলম্বন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত ।

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

হয়। গাওয়া ঘীয়ে ভাজা লুচি না হলে ওঁর খাওয়াই হবে না।

খোন্তা। তা ছাখো বৌমা, কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে মা! গাওয়া ঘীটুকু আমার চাইই!—ভয়সা ঘী…মাগো, সে নাকি আবার মানুষে খায়!…ওয়াক্!…

চঞ্চ। একেবারে খনেদি চাল!

খোন্তা। হ্যাঁ মা, চুলো গেলেও এই চালটুকু বজায় রেখেই কোনমতে টেঁকে আছি।

চঞ্চ। (আত্মগত) নাঃ, যে রকম মাসী-পিসা আসতে সুরু হলো—লক্কা না এলে আর চলছে না!

জমা। তা হাঁ গা, ও নোন্তা পিশি,…না, না, খোন্তা মাসী,…তা গাওয়া ঘী যদি না পাই, খাঁটি গোবরে চলবে না? সে'ও তো পবিত্তি, আর গুরুন্দ্ খুব…এঁ্যা?

(চঞ্চলা ও জমাদার্ণী চুপি-চুপি কি কথা কহিতে লাগিল)

খোন্তা। এরা কি সল্ল করচে!…কেমন করে করবে! এতকাল তো এই মাসী-পিসি হয়েই কাটিয়ে এলুম। কি করি, বয়স গেছে, এর বেশী হতেও যে ছাই পারি না!…নাহলে… বৌটো যেন কেমন-কেমন! সস্ত রাঁড় হয়েছিস, নাকের জলে চোখের জলে মুখ গুঁজে পড়ে থাক্—ভাঁড়ারের চাবিটে আঁচলে তুলি! তা না, ভারী টৌন্‌কো!

[জমাদার্ণীর প্রস্থান]

তা হাঁ বৌমা…যা শুনচি, তা কি সত্যি?

চঞ্চ। কি?

খোন্তা। কর্ত্তাদের কি না কি উইল বেরিয়েচে—আমার ফক্কা বাবা মারা গেলেও দুঃখু নেই—যা কিছু পাবে, আমার নক্কা বাবা…?

চঞ্চ। শুনচি তো!

খোন্তা। তা আমার নক্কা-ফক্কা কি আলাদা, মা! আমার যে দুই সমান, দুইয়েই যে আমি এক দেখি।…তা, তোমার তো এখন উচিত বৌমা,…তোমার যা-হোক চুকে বুকে গেল তো সব—আমার নক্কাকে এনে থিতু করা…আর কেন মা…আসল যা, তাই যখন গেল, তখন আর এ মাটি কামড়ে পড়ে থাকা কেন! আমার নক্কা বাবাকে এনে সব বুঝিয়ে দিয়ে তুমি কাশী যাও, রামেশ্বর যাও, কি মগের মুল্লুক যাও…যাবার সময় ভাঁড়ারের চাবিটি মোদ্দা দিয়ে যেয়ো। আমি মাসী আছি, তোমার কোনো ভাবনা নেই…

চঞ্চ। মাসী…!

খোন্তা। আমি নেয্য কথাই বলচি মা!…আহা, নক্কাকে আমি হাতে করে মানুষ করেচি, তার মা তো ঐ বিইয়েই খালাস!…আমার নক্কা-ফক্কা কত সাধের ধন, যেন এক কাঁদির দুটী কলা!…

চঞ্চ। তা সে'ও তো মারা গেছে…

খোন্তা। অমন অলুক্ষুণে কথা বলুনি বাছা!…কলির বৌ, পরের মেয়ে আর কাকে বলে!…ছ্যা, একেলে কি সবই আলাদা!…আমি কোথায় ভরসা করে এনু যে, আমার ফক্কা গেছে, যাক্—আমার নক্কা তো আছে!

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। ছাও, আবার একজন!

চঞ্চ। কে রে?…

জমা। একটি মেয়ে-নোক…একটা গাড়ী করে এসেচে! গাড়ীর মাথায় বাক্স-বিছানা…

খোন্তা। কোনো আপন-জন!

চঞ্চ। তোমার সঙ্গে এসেচে না কি…?

খোন্তা। না মা! আমি একলা মানুষ, কোথায় কাকে পাবো? হেঁটেই এসেচি…গাড়ীই বা কোথায় পাবো, বল?

চঞ্চ। তবে?

জমা। ওগো, খিষ্টেনী রকমের কাপড় পরা, পায়ে জুতো! এসেই কলঘরে ঢুকলো! আমি বলি, এ ম্যাষ্টার্ণী আবার এলো কোত্থেকে! কলঘরে ঢুক্‌চে, ছিষ্টি ছোঁবে! তা বললে, খিষ্টেন্‌নীও নয়, ম্যাষ্টার্ণীও নয়, আপনার জন!… ছাও, এখন সামলাও।—এ যে দেখচি, জামাই বাবু একা মরেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে মারলেন! কোথা থেকে এ পাল-পাল আপনার নোক আসতে নাগলো গো…এ্যাদ্দিন সব ছেলো কোথায়!…তা এর গাড়ী ভাড়া দিতে হবে গো, পাঁচ সিকে। ঐ বেয়াক্কেলের মাথায় বাক্স চাপিয়ে আসচে!…সব শুনবে'খন। আমি যাই বাপু, কাজ পড়ে রয়েচে!

[প্রস্থান

খোন্তা। ঝীটি মা তোমার একটু মুখোলো…

চঞ্চ। হ্যাঁ, মুখের ওপর সত্যি কথা কয়—ঐ কেমন ওর দোষ! মোদ্দা, কে এলো?…

খোন্তা। যাক্—এখন একটু কাঁদি তা হলে...কে আবার এলো...তাকে তো মায়াটা জানান্ দেওয়া চাই। ও বাবা ফক্কা আমার···আমায় ফেলে কোথায় তুমি গেলে বাবা···(ক্রন্দন ও নাকঝাড়া)

ট্রাঙ্ক-মাথায় বেয়াক্কেলের ও সেই সঙ্গে

ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

চঞ্চ। কে? (ভুজঙ্গিনী আকুল নেত্রে চাহিল; চঞ্চলার বিস্ময়ে নির্ব্বাক ভাব)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—ফক্কারামের গৃহ]

চঞ্চলা, ভুজঙ্গিনী, খোন্তামাসী ও বেয়াক্কেলে।

বেয়া। গাড়ীর ভাড়াটা বৌদি, পাঁচসিকে—

ভুজ। আর দু' আনা বখশিস সেই সঙ্গে···ওকে আশা দিয়েচি!

চঞ্চ। কে···?

ভুজ। কে!···

গান

সই কি আর বলিব আমি!
নাথের লাগিয়া ঘুরি পাগলিনী
অকুলা দিবস-যামি!
এ-ঘরে ও-ঘরে যে-ঘরে তাকাই,
নাথ সে সবারি আছে!!
আমার কপালে বজর পড়িল,
নাথ না আইল কাছে!
সই, কি মোর কপালে লেখ!
এ-পথে ও-পথে কত পথে ঘুরি,
নাথ না মিলিল এক!
(ঐ, যে-নাথ নারীরে জোগায় গহনা
ব্লাউশ-শাড়ী সে দামী!)
মোটরে-টেরামে চলিছে কত-না,
পথে কত জনা চলে!
এ রূপ-মাধুরী যৌবন হেরি
কারো না মানস টলে!
সখি, মিলাও আমারে স্বামী···
মিলাও, মিলাও, মিলাও গো,
নারীর পিয়াসা-তিয়াষা-হরা মিলাও, একটি স্বামী!

চঞ্চ। কে আপনি?

ভুজ। কে আমি! ওঃ (দীর্ঘশ্বাস) কি আর বলবো বোন্···আমি চির-অভাগিনী···

চঞ্চ। তার মানে?

বেয়া। বুঝচো না বৌদি? বহুরূপী সেজে এসেচে।

ভুজ। আমি বহুরূপী নই! আমি···আমি নাথ-হীনা, অতি-দীনা...

চঞ্চ। আপনার নাম?

ভুজ। কি আর বলবো দিদি? সে যে দীর্ঘ কাহিনী, প্রকাণ্ড দীর্ঘ-নিশ্বাসে ভরা। তা শোনার ধৈর্য্য আছে? শুনবে?···সে কাহিনী শুনলে তোমার চোখে অশ্রুর সাগর উথলে উঠবে, বুকের মাঝে বেদনার হিমালয় মাথা ঠেলে দাঁড়াবে, শিরার প্রতি রক্তবিন্দু তুষার কণায় পরিণত হবে! সে কাহিনী এমনি দীর্ঘনিশ্বাসে ফুলে ফেঁপে আছে যে তা ছেপে বার করলে যে-কোনো পাবলিশার চার টাকা মূল্যে হাজার হাজার কাপি বেচে ফেঁপে উঠবে!

বেয়া। আহা, ভদ্দর নোকের মেয়ে পাগল হয়ে গেছে গো বৌদি!

ভুজ। পাগল! হাঁ, পাগলই আমি হয়েচি বোন্।

খোন্তা। তা ভয় নেই, বাছা। আমার শ্বশুর-বাড়ীর দেশে আশ্চয্যি শেকড় আছে, সে ছুঁলেই পাগলামি সেরে যায়। বললে না পেতায় যাবে গো—একটা ক্ষ্যাপা কুকুর রাজ্যির নোককে কামড়ে বেড়াচ্ছিল—একদিন তাড়া পেয়ে কোথা দে গিয়ে সেই শেকড়ে যেমন পা দিয়েচে, অমনি দিব্যি ধপধপে এক বিলিতি কুকুর হয়ে গেল। নিজের চোখে দেখা মা···আর নাটসাহেবের মেম না নিজে এসে তাকে বুকে তুলে নিয়ে গেল!

বেয়া। আর যাদের যাদের কামড়েছিল?

খোন্তা। তারা দল বেঁধে ঐ গোঁদল-পাড়ায় যাচ্ছিল না—তা তারা অমনি পথ থেকেই সেরে হুমকি-চুমকি হয়ে দেশে ফিরে এল!

বেয়া। তা' তোমাকে পাগলা কুকুরে কামড়েচে নাকি গো? সেই শেকড় ছোঁয়াও শীগগির। দেশ-ভুঁই ছেড়ে এই যে থার্ড কেলাশ গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, সে গাড়ী ছেড়ে নিজের বাড়ী ফিরে বাঁচবে।

চঞ্চ। ও সব কথা থাক্! আসল কথাটা কি বল দিকি? কে তুমি? কি চাও?

ভুজ। কি চাই! (সুরে) আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!

চঞ্চলা (বাধা দিয়া) আসল কথা?

ভুজ। (দীর্ঘশ্বাস) আসল কথা তবে বলি, শোনো··· তুমি বোধ হয়, ফক্কারাম্ বাবুর স্ত্রী? যিনি উইলে লাখ টাকার সুদমাত্র পাবেন শুনে বিপুল সুখে গঙ্গায় ডুবে মারা গেছেন?

চঞ্চ। হ্যাঁ। আর তুমি?

ভুজ। আমি হচ্ছি সেই লাখ টাকার আসল মালিক লক্কাচন্দ্রর স্ত্রী···

চঞ্চ। লক্কাচন্দ্রর স্ত্রী? তবে যে শুনেচি, লক্কাঠাকুরপো আসামী বিয়ে করেছিল! তা এতদিন আসো নি যে?

ভুজ। দরকার বুঝিনি, বোন্···

চঞ্চ। বটে, তা আজ দরকারটা কি, শুনি?

ভুজ। উইলে তার পরের কথাটা জানতে এসেচি।

চঞ্চ। তার পরের?

ভুজ। এঁরা দুজনেই যদি মারা যান্, তাহলে আমরা দুই বোনে ঐ লাখ টাকা পাবো কি না...

চঞ্চ। ওঃ!···তা কৈ, পরের কথা তো জানি না কিছু···

ভুজ। জানো না?···তা উইলের লেখক কি এমন নিষ্ঠুর হবেন!

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। তোমার নক্কার স্থাওর এসেচে গো দিদিমণি···

চঞ্চ। এসেচে! লক্কাঠাকুরপো এসেচে!···চ'রে চ বেয়াক্কেলে, ওলো জমাদার্ণী···

[বেয়াক্কেলের প্রস্থান

(চঞ্চলা দ্বার অবধি গিয়া ফিরিল)

জমা। লাখ টাকার গন্ধ কি সহজ গা—কত মড়া এখন বেঁচে ওঠে, স্থাখো···

[জমাদার্ণীর প্রস্থান

ভুজ। (স্বগত) তবে যে শুনেছিলুম, লক্কাচন্দ্রও মারা গেছে। তাই তো! না, যখন এসেচি, তখন পেছুনো নয়। লাখ টাকা! একবার ভালো করেই দেখতে হবে। এ'ও যদি ঐ লাখ টাকার গন্ধ পেয়ে এসে থাকে! হাল ছাড়চিনে···কিছুতে না। (প্রকাশ্যে) এসেচেন! তিনি এসেচেন! এ অসহ্য আনন্দে যে আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দিদি, দিদি, ধর, আমায় ধর···

খোস্তা। ও বাবা নক্কারে, এলি বাবা···

চঞ্চ। থামো মাসী···লোকটা কতদূর থেকে তেতে-পুড়ে আসচে।

খোস্তা। হ্যাঁ স্থাখো বৌমা, তোমার দরদ একটু কমাও তো বাছা! ও হলো আমার পেটের বোন্‌পো! কোথাকার কে পরের মেয়ে তো তুমি বাছা···

ভুজ। প্রিয়তম, আমার প্রিয়তম···তুমি এসেচো! আঃ—(মূর্চ্ছার ভাবাভিনয়)

ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লক্কাবেশী ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। হ্যাল্লো বৌদি···তারপর, আছো কেমন?

(দ্রুত আসিয়া শেক্-হ্যাণ্ড করিল)

চঞ্চ। এই যে মাই-ডিয়ার ঠাকুরপো···এলে ভাই!

ফক্কা। এলুম বৌদি...তা স্থাখো, এলুম বটে! কিন্তু ফক্কা দাদার জন্যে প্রাণটা আমার ফেটে যাচ্ছে! কি আমুদেই ছিল! তা ছাড়া দাদা আমার লক্কা বল্‌তে অজ্ঞান হতো! আরো তো ঢের মাসতুতো ভাই ছিল আমাদের—টক্কাচরণ, মক্কানাথ, অক্কাকান্ত, হিক্কারাম, ছিক্কালাল—তা দাদা চাইতো খালি এই লক্কাকে!—আমি ভাবচি, দাদার একটা মস্ত মার্ব্বল্-ষ্ট্যাচু করে এই বাড়ীর ফটকে বসাবো। তার অর্ডারও দিয়ে এলুম···একটু দেরী হয়ে গেল তাই! আর এ-বাড়ীর নাম রাখবো, ফক্কা-ধাম।

চঞ্চ। তা তুমি তো এলে—তোমার জিনিষ-পত্তর?

ফক্কা। জিনিষ-পত্তর! সে যে এক গঙ্গা, বৌদি। আনতে একটা পুরো গুড্‌স্ ট্রেণ লেগেছে—তা কলকাতার বাড়ী, এতে ধরবে কি না এই ভেবে, গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলের দোতালাটাই আড়াগোড়া ভাড়া নিয়ে সেইখানে রেখে আসছি।

চঞ্চ। তা সেখান থেকে কি আনলে ভাই, আমাদের জন্যে? শুনেচি, তোমার কমলা নেবুর ব্যবসা ভারী জমে উঠেচে।

ফক্কা। একেবারে কুলপী বরফ!—লেবুটি গাছে ধরেছে কি অমনি কুলপী বরফ!

চঞ্চ। বল কি, ঠাকুরপো?

ফক্কা। আর বলা!—পুঁতলুম তো লেবুর গাছ—ইয়া তেঁতুল গাছের মত খাড়া উঠে গেল—তারপর দেখা দিলে, সবুজ লেবু—যেমনি দেখা দেওয়া, অমনি পরের দিন সকালে গিয়ে দেখবে, ধপ্‌ধপে সাদা মালাইয়ের কুলপী!

চঞ্চ। তা ভাই, পাঠাতে হয় আমাদের কিছু—

ফক্কা। পাঠাবো কিসে, বৌদি! সে কি এখেনে!—অর্থাৎ গাড়ী কি ছাই মেলে?—যদিও বা মেলে, রেলে চুরি! পাঠালুম লেবু—এখানে পৌঁছুলে দেখবে, ঝুড়ি ঠিক আছে, লেবু নেই—তার বদলে শুধু চিবুনো ছিবড়েগুলো! খোলা-বিচি অবধি চুরি হয়!...হবেই তো! খোলাগুলো যে আজকাল বিলেতে পড়তে পায় না—মেমেদের পমেটম তৈরী হয়! আর বিচি যায় জার্ম্মাণীতে—তা থেকে তারা মুক্তো তৈরী করচে!—(খোন্তা ও ভুজঙ্গিনীকে দেখিয়া) এঁরা...? চেনা বলে তো মনে হচ্ছে না!

ভুজ। (প্রেম-ভাব-অভিনয়)

খোন্তা। (ফোক্‌লা দাঁতে হাস্য বিকাশ করিল)

ফক্কা। বাঃ—(আশ্চর্য্য হইল)

চঞ্চ। ওঁরা কে, তা ওঁদের মুখেই এখনি ব্যক্ত হবে'খন।...ইটি তোমার স্ত্রী...

ফক্কা। স্ত্রী...?

চঞ্চ। স্ত্রীই তো! আর ইনি তোমাদের খোন্তা মাসী।

ফক্কা। খোন্তা মাসী! খোন্তা মাসী আবার কে?...ধেৎ, খোন্তা মাসী বলে আমাদের কস্মিন কালেও কেউ ছিল না!

খোন্তা। ও কি, ও কথা বলো না নক্কা-ধন! তুমি যে আমার কোলেই মানুষ, বাবা...আমি না খাইয়ে দিলে খেতে না! আর মনে নেই, সেই কাগা-বগার গপ্প, সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গপ্প? যতক্ষণ না সে গপ্প শুনবে, ততক্ষণ ঘুমোবে না! তার পর সেই নাউ-নাটা!...তা, আমার বরাত বাবা —না হলে তুমি সে নাউনাটা ভুলে গেলে! খোন্তা মাসীকে মনে পড়ে না!

ফক্কা। খোন্তা মাসী! খোন্তা মাসী!—না, খোন্তা মাসী কেউ ছিল না,—বরং...

চঞ্চ। নোন্তা পিশির কথাই তো জানি! কতবার এসেছেন-গেছেন! আর এলেই চোখে নোনা পাণি বার করে কি দরদ না দেখিয়েছেন!

ফক্কা। এই!...নোন্তা পিশিই বটে, ছিল এককালে...

খোন্তা। ও বাবা, সেই রে বাবা, সেই! ঐ খোন্তা মাসিও যে, নোন্তা পিশিও সে-ই! কথায় বলে, মাসি-পিশি... তা ও একই কথা, বাবা!

ফক্কা। বটে! তা সে নোন্তা পিশি তো সে-বছর মারা গেছে! সেই যে, যেবার নুনের ওপর টেক্স বসলো! নুনের দর চড়বে এই ভেবে ভেবে নোন্তা পিশি জ্বোরে মরে গেল —সেই যে বৌদি, মনে নেই? যেবার চাটগাঁয় ইলিস মাছের মড়ক লাগলো—আঃ, খপরের কাগজে পড়ো নি?

চঞ্চ। বটে, বটে—ঠিকই তো।

খোন্তা। হ্যাঁ বাবা নক্কা...

ফক্কা। থামো, পরে ভেবে দেখা যাবে। বংশ-তালিকা আছে তোমার? দেখিয়ো, প্রমাণ করো...এখন সর, সর...

[খোন্তার প্রস্থান

তার পর তুমি? (ভুজঙ্গিনীর পানে চাহিল) তুমি কে, বাপু? চেহারা তো খুব চটকদার করে তোলবার চেষ্টা করেচো, দেখচি...

ভুজ। (ভঙ্গী সহকারে) আমায় চিন্‌তে পারলে না? (দীর্ঘশ্বাস) সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!... আমায় চিনছো না?

ফক্কা। না!

ভুজ। আমি যে তোমার চিরপ্রিয়া ভুজঙ্গিনী! মনে পড়ে না নাথ, সেই নির্ম্মল নীল আকাশ, সেই ফাগুনে ফুলের বনে কোকিলের ঝঙ্কার, সেই থরথর-কম্পিত বিদায়ের মুহূর্ত্ত, সেই নয়নের বিগলিত ধারা...? আমি তোমার সেই পতি-পাগলিনী, বিরহিণী...

ফক্কা। বাবা (সবিস্ময়ে একবার ভুজঙ্গিনীর পানে, পরক্ষণে চঞ্চলার পানে চাহিল)

ভুজ। গান

বসন্তে এই চিত্ত-বনে
ফুলের মেলার মাঝখানে
সেই যে এলে...! মাধবী-রাত
উঠলো ভরে কী গানে!
সেই যে কত স্বপন বোনা,
কত কথার আনাগোনা...
মধুর ফাগুন-সমীরণে

কি সুখ দোলা দেয় প্রাণে !

হায় বঁধু, সব গেলে ভুলে !

ফক্কা। ···ছেঁদো কথা রাখো তুলে···

চলবে না চাঁদ, ও চাল। যাও,—

চলছে যেথা···সেইখানে !

ভুজ। তুমি যে আমায় অবাক করে দিলে, প্রিয়তম ! আমি তোমার স্ত্রী···

ফক্কা। স্ত্রী ! তা, তা···তা (চঞ্চলার পানে চাহিল ; চঞ্চলার বিস্ময়ের ভাব)

ভুজ। হাঁ, চেয়ে ছাখো দিকি এই মুখের পানে···এই চোখ, এই কেশের রাশি, এই বাহু···মনে পড়ে না ?

ফক্কা। (মৃদু হাসিয়া) মনে...মনে পড়চে বটে ! তা, তা, তাই তো প্রিয়তমে, তুমি এত বড় হয়েচো ! বাঃ !

ভুজ। এই যে চিনতে পেরেচো···তোমার সেই ভুজঙ্গিনী···

ফক্কা। ভুজঙ্গিনী ! আরে, বাস্‌রে ! তা, তুমি এখন কি চাও ভুজঙ্গিনী ?

ভুজ। ঐ কণ্ঠ···বাহুর বাঁধনে ঘিরতে চাই, প্রিয়তম, (অগ্রসর হইল) লতা যেমন সহকারকে বেষ্টন করে !

চঞ্চ। (বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিল)

ফক্কা। এঁ্যা ! অর্থাৎ ?

ভুজ। এ অর্থাৎ নয়, নাথ, এ নির্ঘাৎ ! (সুরে)

বঁধু, মিটাবো মিলন-আশা !

প্রাণের প্রিয় হে কেটেচে বিরহে

দীরঘ বরষ-মাসা ! (কণ্ঠালিঙ্গন)

চঞ্চ। কিন্তু···(সরোষ ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া থমকিয়া থামিল)

ফক্কা। বৌদি, এ যে বিপদে পড়লুম এখানে এসে···

ভুজ। বিপদ কি, নাথ ! মনে নেই, জ্যোৎস্না-রাত্রে মিলনের সেই নিবিড় রাগিণী, সেই অফুরাণ, অহরহ···

ফক্কা। অহহ ! অহহ ! বৌদি, বাঁচাও, আমায় বাঁচাও বৌদি, অনেক দূর থেকে তেতে-পুড়ে আসচি। এখনো জিরুতে পাইনি !

চঞ্চ। (চিন্তিতভাবে চাহিল ; পরে হাসিয়া) কিন্তু এ যে প্রেমের বন্ধন, ঠাকুরপো ! এ বন্ধনে ক্রন্দন তো সাজে না, আনন্দ কর। ছি !...এই যে, পিসেমশায়···

রক্তবীজের প্রবেশ

ইনিই আমার পিসেমশায়—সেই এটর্ণি বাবু···

রক্ত। আমারি নাম রক্তবীজ ! তা খেঁদি, একখানা চেয়ার এগিয়ে দে রে—মোটা মানুষ, দাঁড়াতে পারি না—হাঁফ ধরে। (চঞ্চলার কথাবৎ কার্য্য) ইনি ?

চঞ্চ। আমার মাসতুতো স্থাওর—শ্রীমান্ লঙ্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রক্ত। তুমিই লঙ্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ? তা বেশ, বেশ··· উইলের খপর জানো ?

ফক্কা। (রক্তবীজকে নিরীক্ষণ করিতেছিল ; উঠিয়া তার কাছে গিয়া রক্তবীজের হাত টিপিল, গা টিপিল) আপনার শরীরে তাহলে হাড়-মাষ আছে ! নাম শুনে আমি ভেবেছিলুম, জোঁকের মত একটা জীব হবেন, ভেতরটা খালি মক্কেলের রক্তে ভরে ফেঁপসে ফুলে উঠেচে !

রক্ত। (অপ্রতিভ ভাবে হাসিল)

চঞ্চ। আঃ, কি বল ঠাকুরপো ! উনি আমার পূজ্যপাদ পিসেমশায় যে, গুরুজন, প্রণাম কর।

ফক্কা। ওঃ—(প্রণাম করিল)

রক্ত। তারপর ? তুমি তাহলে মর নি ! তবে যে শুনেছিলুম, তোমার আসামী স্ত্রী একটি লাঠির ঘায় তোমার পিত্তি ছরকুটে মেরে ফেলেচে।

ফক্কা। আজ্ঞে, আসামী স্ত্রীরা তাই করেন বটে, তবে আমি বেঁচে গেছি কোনমতে। মরে ছিলুম বৈ কি ! জীবনে মানুষকে দরকার হলে অমন ঢের মরতে হয়, মশায় ! তবে কাজ পড়লে আবার বাঁচাও চাই তেমনি !

চঞ্চ। সব সময়ে তোমার মস্করা, ঠাকুরপো !—স্বভাব আর গ্যালো না ! আহা পিসেমশায়, এইটিই এখন আমাদের শিবরাত্রির সল্‌তে ! এটি যে আছে, ভাগ্যি বলতে হবে ! ·· না হলে উইলের লাখ টাকার কি যে গতি হতো !

রক্ত। তা ভয় ছিল না ! উইলে আছে, এই স্থাখ্ না— (উইল বাহির করিয়া দেখাইল) লঙ্কাচন্দ্রর অবর্ত্তমানে, প্রিয় দৌহিত্র ফক্কারাম যদি বিবাহ করিয়া মরিয়া থাকে, তাহা হইলে তার সেই স্ত্রী—বিধবা বা পুত্রহীনা হইলেও—এই লাখ টাকার মালিক হইবে, ষোল আনা মালিকানি-সত্ত্বে, সর্ব্ব-প্রকারে সত্ত্ববতী হইয়া······

ফক্কা। এঁ্যাঃ ! (চীৎকার-শব্দে লাফাইয়া উঠিল)

চঞ্চ। (চীৎকার করিয়া) পিসেমশায়···

রক্ত। কি রে খেঁদি—তোরা চেঁচিয়ে উঠলি কেন, দু'জনে!

চঞ্চ। এ কথা আগে বলতে হয়! দেখ দিকি, এত কাণ্ড…

ফক্কা। জ্যান্তে মরা…

রক্ত। কি রে, জ্যান্তে মরা…কাণ্ড…এ-সব কি কথা রে!

চঞ্চ। না, তাই বলছিলুম, তাহলে এঁর ছ্যাদ্দটা আরো একটু জাঁকিয়ে করতুম! আমুদে মানুষ ছিল…লাখ টাকার বলটা পেতুম কি না!

ফক্কা। বটেই তো! তা যাক্ গে, মরুক্ গে, আমার টাকাটা কবে পাচ্ছি, বলুন তো?

রক্ত। এই যে লাহোরের চীফ কোর্ট থেকে প্রোবেট বার করতে হবে কিনা…তোমার একটা সই চাই! প্রোবেট না হলে তো টাকা বেরুবে না!…তা টাকাটা বেরুবো-বেরুবো হয়েছে! আমি টেলিগ্রামে দরখাস্ত পাঠাচ্ছি যে!

চঞ্চ। এ্যাঁ, টাকাটা এখনি পাবে না! আহা, ঠাকুরপো কত আশা করে এলো…

ফক্কা। বাসা-টাসা তুলে…

রক্ত। এ যে আইন রে খেঁদি—আদালতের ব্যাপার যে! এতে চট্‌পট্ কিছু হয় না। এক-পুরুষ দরখাস্ত পেশ করে, তার পর তার ছেলেরা তদ্বির চালায়, তার পর নাতিরা এসে মামলার পাকা ফলটি হাতে পায়!

ফক্কা। তাই তো, তা এখন খরচ-পত্তর চালাবো কি করে? আমি যে আসবার সময় আমার ক্ষেতটেত, মায় কমলালেবুর কচি ফুলগুলো পর্য্যন্ত সেখানে দান পত্তর করে দিয়ে এলুম…

রক্ত। দান-পত্তর?

ফক্কা। আজ্ঞে হ্যাঁ!…সে বড় ঝক্কি, মশায়…

রক্ত। কেন, সে তো খুব ফ্যালাও লাভের কারবার শুনেচি…

ফক্কা। তা ঠিকই শুনেচেন! লাভ ষোল আনাই—তবে ঐ যা বললুম,—ঝক্কি ঢের! অত গাছ থেকে একটি একটি করে লেবু পাড়া,—হাতে কাঁটা না ফোটে! ওঃ! তারপর সে-সব লেবু রাখি কোথায়, বলুন! অত-বড় ঝুড়িও কোনো মুলুকে পাওয়া যায় না!

রক্ত। কেন, গোলা-গুদোম—

ফক্কা। তা আর নেই! বলে, সমস্ত আসামটাই গোলা আর গুদোমে ভরিয়ে দিছি—এক একটা যেন লাটসাহেবের বাড়ীর মত…ইয়া কমলালেবু রঙের নিশেন উড়চে! কিন্তু তাহলে হবে কি—ইঁদুরের উৎপাত ভয়ঙ্কর!

রক্ত। কেন, ইঁদুর-মারা কল—

ফক্কা। তা আর নেই! বলে, বিলেত থেকে সাত লাখ ইঁদুর-মারা কল আনিয়েচি, মশায়।

রক্ত। তবে?

ফক্কা। (হতাশভাবে) সে আপনারা বুঝবেন না, মশায়। আসামের ইঁদুর—বিশেষ চেরাপঞ্জির ইঁদুর! বলে, দু'মাস যদি শ্রেফ ভালো ছোলা খাইয়ে রাখতে পারেন, আর-কিছুতে মুখ দেবে না, তাহলে ইয়া-ইয়া ওয়েলার ঘোড়া হয়ে ওঠে!…লাল হয়ে যাবেন। তা পারা যায় না—ব্যাটারা ভারী চঞ্চল! পড়েন নি ছেলে-বেলায়? উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার, যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার! লাগাম লাগাবেন কি—কেটে ছারখার করে দেবে!

রক্ত। বল কি হে!

ফক্কা। আর বলি কি! একবার যাবেন, যাবেন, বেড়িয়ে আসবেন। আমি একবার নিয়ে যাবো সকলকে। কাজ চুকুক্ না! হুঃ—

রক্ত। তাহলে আজ উঠি, বাবা…আসি রে খেঁদি। Professional man, ভারী busy! ওদিকে আবার মক্কেল ক্যাক্যাছয়া-জী এসে আপিসে বসে আছে—তার বৌয়ের ব্রত আছে, আমায় ফর্দ্দ করে বাজার করে দিতে হবে—আমি তার একেবারে constituted attorney কি না!—(ঘড়ি দেখিয়া) তা এঁরা? এঁদের তো নতুন দেখচি। তোমার সঙ্গে এসেচেন না কি?

ফক্কা। আজ্ঞে না,—আমিও এই এসে দেখচি!

চঞ্চ। ওঁরা এঁর আসার আগেই এসেচেন—যেমন ফাগুন আসবার আগেই প্লেগ-বসন্ত আসে না!

রক্ত। তা?

ভুজ। (হাবভাব-সহকারে) আমি এঁরই।…

রক্ত। এঁরই…?

ভুজ। প্রাণ-কান্তা!

রক্ত। তবে যে তোমার আসামী স্ত্রীর কথা শুনেছিলুম

ফক্কা। আজ্ঞে, আমিও তাই জানতুম—তা এসে দেখচি, তিনি ফরিয়াদী হয়ে উঠেচেন।

রক্ত। তা, ভদ্দর লোকের মেয়ে—কেতা-মাফিক কাপড়-চোপড়ও পরতে জানেন—ওঁর মনে কষ্ট দিয়ো না হে! নিয়ে নাও, বাবাজী। আসামীর লাঠি সামলানো একটু শক্ত হয়…তা স্ত্রী-রত্ন…ফেলতে নেই! তাহলে আসি রে বৌদি—(গমনোদ্যত)।

ফক্কা। ও মশায়, শুনুন! বিজ্ঞাপন দিয়ে আমায় যে আনালেন…আমিও তাড়াতাড়ি চলে এলুম—তা আমার টাকাকড়ি তো সেই চেরাপঞ্জি ব্যাঙ্কে—খরচ-পত্র চলে কি করে? আমি আবার একটু ষ্টাইলে থাকি।

রক্ত। ভাবনা কি! আমি এটর্ণী আছি, যখন যা দরকার হবে, দেবো—পাঁচশো, সাতশো, হাজার! লাখ টাকাটা তো আমার হাতে দিয়েই আসবে—তখন ফর্দ্দ মাফিক কেটে নেবো। তোমায়-আমায় সম্পর্কটা যে ভারী মধুর হে—attorney client তার জন্যে ভেবো না, আমরা এটর্নি মানুষ—টাকা পাঠাতেও যেমন পারি, গুটোতেও তেমনি। (প্রস্থান)

চঞ্চ। তাহলে এসো ঠাকুরপো ওপরের ঘরে! কত বছর নিরুদ্দেশ—আমার আদরের ঠাকুরপোটি! এসো!—ওরে বেম্নাকেলে, তোর লক্কাদাদাবাবুর বিছানা-পত্তর যা এসেচে, তা দোতলায় আমার পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি—বুঝলি?

ভুজ। তাহলে আমার বিছানাটাও সেই ঘরে নিয়ে যাও…

(ফক্কারাম বিস্মিতভাবে চঞ্চলার পানে চাহিল; চঞ্চলাও সেইভাবে ফক্কারামের পানে চাহিল)

এসো নাথ, দীর্ঘ বিরহ-অবসানে (ধরিল)

ফক্কা। ও বৌদি—এ যে টানে!

চঞ্চ। কি করচো—আমার আদরের দ্যাওর…

ভুজ। আমার প্রিয়তম নাথ…

ফক্কা। এ যে মুস্কিলে পড়লুম!

খোন্তা মাসীর প্রবেশ

খোন্তা। ও বাবা, নক্কা—আমার ঘরে এসো বাবা—বাতাসা ভিজিয়ে রেখেচি…এসো বাবা—

ফক্কা। আঃ! করি কি!

চঞ্চ। এসো, ভিতরে এসো—(টানিয়া ফক্কাকে লইয়া প্রস্থান)

ভুজ। প্রিয়তম… (প্রস্থান)

খোন্তা। ও বাবা নক্কা রে…(প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

গান

ঐ টাকা…যেমনি সে আসে, মোরা তারি সাথে আসি!
রামী-বামী খুড়ী-জেঠি…আর পিসি-মাসি!
আমরা জেঠাই, কোথা কিবা পাই! হাই তুলি, আর কেবলি ঘুমাই…
পিসি মাসি মোরা…ঐ আহারে রুচি…শুধু খেতেই ভালোবাসি।
(ক্ষীর সর ননী ছানা!)
আমরা খুড়ো দিয়ে তুড়ি, যাহা কিছু পাই, মোরা ফাঁকতালে সরাই!
রামী-বামী মোরা এসে দুঃখ বিলাই—মোরা তামাকু-পিয়াসী!
মোরা খুসী হতে জানিনেকো, চটিয়া আছি।
যখন যাহা পাই, তাহা লুটিলে বাঁচি!
জানিনে আশীষ, সদা দিই গালি-বিষ—
হারি চোটে ভিটে-মাটী সকলি নাশি!

ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। বিপদে পড়া গেল, দেখচি। ভাবলুম, ফক্কা-জন্ম ঘুচিয়ে লক্কা হয়ে লাখ টাকার গদিতে চেপে প্রিয়ে চঞ্চলার সঙ্গে আরামে জীবনটা কাটানো যাবে, তা না, এ আবার কোথা থেকে এক স্ত্রী-রত্ন এসে উদয় হলো! অধিকন্তু ন দোষায় কথাটা স্ত্রীর সম্বন্ধে মিঠে লাগলেও, সম্প্রতি তার লক্ষণ কিছু বোঝা যাচ্ছে না! এ স্ত্রীটি চব্বিশ ঘন্টা পিঠে-সেঁটে থাকতে চান্—তাতে আমারো যে দম বন্ধ হয়ে আসবার জো হয়! তার ওপর এঁর এই সৃষ্টিছাড়া অনুরাগ আর অন্তরঙ্গতায় প্রেয়সী চঞ্চলার অঙ্গ যে রকম রেগে তেতে ওঠে, তা তাঁর চোখের ভ্রূকুটি-ভঙ্গেই দেখতে পাচ্ছি! তা ছাড়া প্রেয়সী চঞ্চলাকে বক্ষলগ্ন করতে প্রাণ আমার কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠচে—সদ্য বিধবার বেশে প্রেয়সীর এমন পাগল-করা রূপ ফুটেচে! কিন্তু এই ভুজঙ্গিনী, কাল-ভুজঙ্গিনীর মত ঘিরে আছে। কে জানে, কে এই ভুজঙ্গিনী! হয়তো লক্কা এই ভুজঙ্গিনীর আলিঙ্গনের নিবিড় আঘাতেই অক্কা-লাভ করেচে—কিম্বা এও ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েচে! নিজে জাল বলে পরকে জাল বলে উড়িয়ে দিতে পাচ্ছিনে! কি জানি, হয়তো একে জাল বলে উড়িয়ে দিতে গেলে নিজেই

জাল ছিঁড়ে উড়ে যাবো!—এ যে বিষম সমস্যায় পড়া গেল! মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই! অথচ চঞ্চলা বলচে, এই-খানটাতেই তার বাধচে ভারী। এই যে ভুজঙ্গিনী-প্রিয়া আসচেন—খুব তালে সয়ে যেতে হবে! কি করি, উপায় যখন নেই···

ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজ। নিষ্ঠুর—(ঝাঁপাইয়া আসিয়া ধরিল)

ফক্কা। উঃ, গেচি, গেচি—বাস্‌রে—

ভুজ। কি হয়েচে?

ফক্কা। লেগেচে—হাতখানা ঝনঝনিয়ে উঠলো! কি জানো, অর্থাৎ এই অনেক দিনের অনভ্যাস কি না, তোমার প্রেম আর আদরটা একটু সইয়ে নিতে হবে!

ভুজ। প্রিয়ার প্রেমে অনভ্যাস!

ফক্কা। অর্থাৎ কি জানো, চাষাভুষোর সঙ্গে বড্ড মেলা-মেশা করা গেছে কি না—তাই থেকে-থেকে তোমায় কেমন পর-স্ত্রী, পর-স্ত্রী বলে মনে হচ্ছে—এই আর কি! তা ও নাইতে-খেতে ক্রমেই বরদাস্ত হয়ে যাবে—বুঝলে কি না! তা, বৌদি কোথা গেল?—আমার আদরিণী চঞ্চলা বৌদি?

ভুজ। আমি তোমার কেউ নই?—বৌদিই সব?

ফক্কা। আহা, কি জানো, বৌদি···তায় সন্ত বৈধব্য-যাতনায়-কাতরা, পতিহারা—

ভুজ। আর আমি···!

ফক্কা। তারি চোখের সামনে পতিকে ফিরে পেয়েছ! এতে তাঁর মনে বেদনাটা একটু বেশীই লাগবে না? বিশেষ তাঁর পতি না মারা গেলে তো আর তোমার পতি ফিরে আসতো না!

ভুজ। নাথ··

ফক্কা। আহা, বুঝচো না, ফক্কাদাদা না মারা গেলে তো আর তোমার লক্ষ এ লাখ টাকা পেতো না!

ভুজ। তুচ্ছ টাকার কথা তুলে আমার এ তৃষিত পিয়াসী প্রেমের অপমান কর!

ফক্কা। টাকায় প্রেমের অপমান! আহা, তুমি তাহলে কিছুই বোঝো না, ভুজঙ্গিনী-প্রিয়া! টাকায় প্রেম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—টাকার ঝনঝনির মাঝে প্রেম যেন খঞ্জনীর তালে নৃত্য করতে থাকে!—টাকা না থাকলে প্রেম! সে যেন, যেন...পেট-রোগা ছেলের সামনে মাংসর বাটী!

ভুজ। ওগো, এসো, আমার দীর্ঘ দিনের পথ-চাওয়া অতিথি, আমার তপ্ত চিত্তের শ্রান্তি-হরা ওগো—(টানিল)

ফক্কা। টেনোনা, টেনোনা—পড়ে যাবো। আমার দুই পায়ে বাত—চেরাপঞ্জির বাত! কোনমতে এই উইলের মালিশে খাড়া আছে—টানাটানি করলে, এখনি মচকাবে!

ভুজ। এই বাহুর মালা তোমার গলায় পরিয়ে, তোমারি মুখের পানে চেয়ে বসে থাকবো নাথ সারা দিন, সারা রাত! (কণ্ঠালিঙ্গন)

ফক্কা। ওঃ—ওরে বাবা···

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। ঠাকুরপো···

ফক্কা। ছাড়ো, ছাড়ো—বৌদি। (ছাড়াইয়া চঞ্চলার কাছে আসিল) এসেচো বৌদি—আঃ!

চঞ্চ। এতদিন পরে স্বামী এলো, তা খালি এই আলিঙ্গন আর চুম্বন পেয়ে ও বাঁচবে কেন, বোন্? জলখাবার, পাণ, এ-সব আনো - নিজের হাতে খাওয়াও · তবে তো বাঁধন-কাটা দুর্দান্ত স্বামী আবার বশে আসবে। যাও···

ভুজ। যাই। ওঃ (দীর্ঘশ্বাস) (প্রস্থান)

চঞ্চ। কি, এ তো ঐ বিরহিণী পতি-পাগলিনীর প্রেম-সমুদ্রের ছোট্ট একটি মৃদু ঢেউ···

ফক্কা। তাহলে উত্তাল তরঙ্গও আছে? এঁ্যা! প্রিয়ে চঞ্চলে, আদরিণী বৌদি,—আমায় রক্ষা কর! (চঞ্চলার হাত ধরিল)

চঞ্চ। হুঁ!

ফক্কা। লাখ টাকার লোভে লক্কা সেজে এসে এ যে সত্যি এবার অক্কা পেতে হবে, প্রিয়ে! তোমার চোখের সামনে, তুমি স্ত্রী হয়ে এই প্রেমোচ্ছ্বাস স্থির হয়ে দেখবে! তুমি কি সত্যিই এমন পাষাণী?

চঞ্চ। না,—এ আমি সহ্য করবো না, সহ্য করতে পারবো না। আমিও নারী—লাখ ছেড়ে কোটী টাকার জন্যেও না!

ফক্কা। তাহলে উপায়? আমার যে মুস্কিল হলো, দেখচি! লাখ টাকা রাখতে হলে একেও নিতে হয় তোমায় ছেড়ে · আর একে ছাড়তে হলে, এর সঙ্গে সঙ্গে লাখও ফস্‌কায় যে!

চঞ্চ। তা ফসকায়! তারপর সঙ্গীন মুহূর্ত্তও আসচে। সামনে রাত্রি···

ফক্কা। ওরে বাবা,—তাই নাকি! তবেই গেছি! মেয়ে-মানুষের বুদ্ধিতে এ কি বিপদ ডেকে আনলুম, বল তো! তুমি কোন্ খপরটা দিয়েছিলে···তাহলে যে লঙ্কা গেরুয়া পরে বাড়ী আসতো। ইনি কাছে ঘেঁষতে এলে বলতুম, আমি সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক স্পর্শ করি না!

চঞ্চ। ও এমন অসময়ে এলো যে, খপর দেবার সময় পেলুম কৈ!

ফক্কা। তাহলে···

চঞ্চ। কিন্তু লঙ্কাই থাকতে হবে তোমায়, নাহলে লাখ টাকা ফস্কায়! হাতের কাছে এসেচে—

ফক্কা। তা তো ঠিক! আমিও তাই ভাবছিলুম।

চঞ্চ। কিন্তু আমি···?

ফক্কা। তুমি! ওগো, আমি তাও ভাবছিলুম। তোমার জন্যেই তো ভাবনা! নাহলে আমার কি—একরকম পুষিয়ে যেতো···

চঞ্চ। কি? (রাগত-ভাব)

ফক্কা। ঐ তো, ঐখানেই তো আমারো বাধচে! এক সঙ্গে এতদিন দুটীতে ঘর করে এলুম, তারপর তোমারি বুদ্ধিতে মরে লঙ্কা হয়ে টাকা পাচ্ছি—তার উপর স্ত্রী নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাবো, আর তুমি বেচারী পতি-বিরহে নির্জ্জনে বসে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলবে! উঃ, এ কথা মনে হলে যে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই!

চঞ্চ। শুধু তাই!—আমার চোখের সামনে আর এক-জনকে নিয়ে এ আনন্দ!

ফক্কা। আরে ব্যস্ রে—তা কি হয়!—তাহলে, তাহলে—

চঞ্চ। একটা উপায় কর গো...আমি মেয়েমানুষ, আগে এত বুঝিনি! তোমায় আমি পরের হাতে এমন করে বিলিয়ে দিতে পারবো না,···প্রাণ গেলেও না···(চোখ আর্দ্র হইল)

ফক্কা। কেঁদো না, প্রিয়ে! আহা, ভেবেছিলুম, টাকা পাবো, পেয়ে তোমায় বিধবা বিবাহ করবো···তা আমিও যে কোন উপায় দেখচি নে, প্রিয়ে ওদিকে নইলে যে লাখে ফাঁক!

চঞ্চ। (সজল চোখে ফক্কার গায়ে ঢলিয়া পড়িল)

জলখাবারের রেকাবি-হস্তে ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজঙ্গিনী। (হতাশ দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিল; তার হাত হইতে রেকাবি পড়িয়া গেল। সে-শব্দে চঞ্চলা ও ফক্কা চমকিয়া চাহিল ও সরিয়া দাঁড়াইল) নাথ··· নির্দ্দয়···

(পতন ও মূর্চ্ছা)

ফক্কা। আঃ, জল, ওগো, জল আনো...

(চঞ্চলার প্রস্থান)

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

তাই তো, কি করি! মরে গেল না কি রে, বাবা! হাতে দড়ি পড়বে না কি···!

[বেয়াক্কেলে প্রথমে দূর হইতে ফক্কারামকে নিরীক্ষণ করিল; পরে কাছে আসিয়া নিরীক্ষণ; ফক্কা তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু সে নড়িল না]

ফক্কা। (গালে চড় মারিয়া) ব্যাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখচিস্! যা'না ব্যাটা, দেখচিস্ নে? এখানে মেয়েমানুষ একটা···থুড়ি বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ মূর্চ্ছো গেছে···জল নিয়ে আয়—শীগগির!

বেয়া। (হতাশভাবে চাহিয়া প্রস্থান)

ফক্কা। (ভুজঙ্গিনীর পানে উঁকি মারিয়া অধীরভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিল)

ভুজঙ্গিনা ধীরে-ধীরে চক্ষু মেলিল।

ভুজ। (দুই হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া) নাথ···

ফক্কা। জেগেচে, জেগেচে, কথা কয়েচে! প্রিয়ে (জিভ্ কাটিয়া) বৌদি···

ভুজ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফক্কার কাঁধে ভর দিল; পরে তার বুকে মাথা রাখিয়া) প্রিয়তম···(ফক্কা আড়ষ্ট)

(জল লইয়া চঞ্চলার প্রবেশ। সে-দৃশ্য দেখিয়া তার হাত হইতে জলের গ্লাস পড়িয়া গেল। চঞ্চলা মূর্চ্ছিতা হইল)

ফক্কা। জল, জল, জল—আঃ, জল গো···(চঞ্চলাকে তুলিয়া ধরিয়া নিজের হাতে রক্ষা করিল)

ভুজ। (আঁটিয়া ফক্কাকে ধরিল) না···

চঞ্চ। আঃ! (ফক্কার বক্ষলগ্ন হইয়া তার পানে চাহিল)

ভুজ। না···(ফক্কাকে ধরিল)

চঞ্চ। ছাড়ো . (ভুজঙ্গিনীর হাত ছাড়াইয়া ফক্কাকে বেড়িয়া ধরিল)

ভুজ। না। আমার স্বামী . (আঁকড়াইয়া ধরিল)

ফক্কা। হ্যাঁ, স্বামী···(হেলিল)

চঞ্চ। আমার দ্যাওর···(ফক্কার হাত ধরিল)

ফক্কা। হ্যাঁ, দ্যাওরই তো...(হেলিল)

ভুজ। স্বামী...

চঞ্চ। দ্যাওর ..

ভুজ। কতদিন পরে স্বামীকে পেয়েচি! আমার স্বামী···

চঞ্চ। কতদিন পরে দ্যাওরকে পেয়েচি—আমার দ্যাওর...

ফক্কা। ভালো জ্বালা! ধেৎ তেরি! [আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান; চঞ্চলা ও ভুজঙ্গিনী অবাক হইয়া পরস্পরের পানে চাহিল, অত্যন্ত হতাশভাবে। পরে

গান

উভয়ে। ঐ যাঃ!

পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে রে!

ভুজ। আমার স্বামী···

চঞ্চ। ··· ...আমার দ্যাওর...

ভুজ। আমার...

চঞ্চ। ... ... ···আমার সে!

উভয়ে। আকুল দুটী নয়নে হায়, আমায় চেয়েছে!

ভুজ। কতদিনের আশার মুকুল ফুটিয়ে তুলেচি!

চঞ্চ। সদ্য-পতি-মরার জ্বালা হায় গো, ভুলেচি!

ভুজ। তোমার তরে...

চঞ্চ। ... তোমার তরে

উভয়ে। ... (পাখী) শেকল কেটেচে!

ভুজ। যৌবনেরি সাথী আমার, তরুণ পথিক ও...

চঞ্চ। কনে-বোয়ের বন্ধু, দ্যাওর, ভাই প্রাণাধিক গো...

উভয়ে। দোটানাতে পড়ে কোথায় ভেসেছে সে রে!

[উভয়ে উভয়ের পানে সাভিমানে চাহিল; পরে উভয়েই প্রস্থান করিল]

বিষ্কম্ভক

গান

পকেট যখন ভর্ত্তি থাকে, ফুর্ত্তি তখন ভারী—
রঙীন সারা দুনিয়াটা, বেজায় মনোহারী!
কুসুমে পাই মধুগন্ধ, ঝরে পাখীর গানে ছন্দ,
প্রিয়ার মেজাজ খাসা মিঠে, কথা সরস তাঁরি!
সদাই বহে বসন্ত-বায়, সবাই সেলাম জোগায় এ পায়···
ধরণী হয় শুধু সুখের, বন্ধুরা দেন সারি—
পকেট যখন ভর্ত্তি থাকে ফুর্ত্তি তখন ভারী!

পকেট যখন হা-হা করেন, একেবারেই খালি...
ফাগুনে হায়, জষ্টি আসে, চাঁদে ঢালা কালি!
মেজাজ ভারী তিক্ত .. পকেট যখন রিক্ত...
প্রিয়া ঝেঁজে আছেন, তাঁর কথায় ঝরে গালি!
বন্ধুহীন গেহ, হায়, কোথাও নাই কেহ!
বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে শুধুই ভস্মে ঘী ঢালি!
পকেট যখন হা-হা করেন, একেবারেই খালি!

একখানি চিঠি হস্তে চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। চিঠি কার এলো আবার! ইংরিজীতে ঠিকানা লেখা। আমার নামে! থাম! দেখি···

লক্কাবেশী ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। রাত্তিরটা তাহলে কি পথে-পথেই কাটাতে হবে?

চঞ্চ। তা কেন! তুমি ওর সামনে যেমন বললে, বায়োস্কোপে যাচ্ছ, তেমনি বায়োস্কোপ দেখবার নাম করেই বেরোও; তারপর আমি ওর সঙ্গে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা কয়ে একধারে ওকে আটকে রাখবো'খন। সেই ফাঁকে তুমি এসে চিলকোঠাতে উঠো...তারপর অবসর বুঝে আমি তোমায় এ-ঘরে নিয়ে আসবো।

ফক্কা। এমন করে কতদিন চালাবো?

চঞ্চ। ঐ টাকাটা যতদিন না হাতে আসে!

ফক্কা। যাক্, মিছে আর মাথা ঘামাই কেন! তাহলে যাত্রাই করি। ও চিঠি কার, তোমার হাতে?

চঞ্চ। পড়িনি। দেখি...(পত্র পাঠ; পাঠান্তে চিন্তায় শিহরিয়া উঠিল)

ফক্কা। কি গো? আঁৎকে উঠলে যে!

চঞ্চ। পড়ে দ্যাখো! এ যে সর্ব্বনাশে চিঠি! এ্যাঁ, কি হবে এখন?

ফক্কা। তুমিই পড়—আমি শুনি।

চঞ্চ। তবে শোনো···(পত্র-পাঠ)

"শ্রীচরণেষু,- বৌদি-ঠাকুরাণী, অতঃপর ফক্কাদাদার অকস্মাৎ এই অর্থলাভের সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি

দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তবু একটা আনন্দের কথা এই যে দাদার আমার সজ্ঞানে ও সশরীরে গঙ্গালাভ হওয়ায় সদ্গতি হইয়াছে। তা, আপনার এই দুঃখে কি বলিয়া আর সান্ত্বনা দিব! শীঘ্রই আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইতেছি। চেরাপঞ্জিতে ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। ইতি আপনার স্নেহের লক্ষণ-স্থাওর শ্রীলক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

ফক্কা। এঁ্যা...

চঞ্চ। এখন উপায়?

ফক্কা। খেয়েচে! তাহলে তো এ-লক্কার বায়োস্কোপ থেকে আর ফেরা চললো না! এই নাও প্রিয়ে, তোমার দাড়ি আর গোঁফ! (কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ খুলিয়া চঞ্চলার হাতে দিল)

চঞ্চ। এখনি না···পর গো পর। কেউ যদি এসে পড়ে! (ফক্কাকে দাড়ি-গোঁফ প্রত্যর্পণ)

ফক্কা। (দাড়ি-গোঁফ আঁটিয়া) এখন আমার উপায় কি হবে, শুনি? কোথায় যাবো, কি যে করবো, কিছুই বুঝতে পারচিনে।

চঞ্চ। কেন, তুমি এতে ভড়কাচ্ছো কেন! তুমি যেমন লক্কা আছ, তেমনিই থাকো। যে-লক্কা আসচে, আসুক সে! আমরা বলবো, সে জাল, এ-ই আসল।

ফক্কা। তা অমনি বললেই হলো! ভুজঙ্গিনী বৌ রয়েছে···

চঞ্চ। তা...(চিন্তা) গ্যাখো, ওকে আমি চিনে নিয়েছি। ওকে তাহলে দলে নিতে হবে। তুমি ওর সঙ্গে মেশো, একটু মাখামাখি কর! আমার একটু বাজবে, তা বাজুক গে! কি আর হবে! লোকে যে সতীন নিয়ে ঘর করে— আমারো নয় তাই...ভাববো! তবু এ তো চিরকালের জন্যে নয়!

ফক্কা। যা বলেচো! তোমরা আনন্দ কর, মরতে হয় মরি আমি! একদিকে ঐ ভুজঙ্গিনী-স্ত্রী, আর একদিকে জাল-জালিয়াতির ব্যাপারে আদালত, পুলিশ! গেছি আর কি! ডাইনে-বাঁয়ে খালি ছোবল! ..মোদ্দা, তুমি কি করলে বল দিকি! দুদিন না দেখে শুনে একেবারে টুপ্ করে আমায় গঙ্গায় ডুবিয়ে মারলে! তার ওপর শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে দিয়েচো, বাঁচবার আশাটিও রাখো নি! সাধে বলে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

চঞ্চ। আহা, ব্যস্ত হচ্ছো কেন! দাঁড়াও না—মতলব একটা ঠাউরে ঠিক করচি এখনি··· .

ফক্কা। ঠাওরাও, ঠাওরাও, শীগগির ঠাওরাও···আমার তো হাড়ে অবধি কাঁপুনি ধরেচে!

চঞ্চ। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক!

ফক্কা। কি ঠিক?

চঞ্চ। তুমি মর...

ফক্কা। মরবো! বেশ, নয় মলুম আবার! মরে এবার কি হবো, শুনি? লক্কার সেই কাবুল-ফেরৎ ঠাকুর্দ্দা?

চঞ্চ। হলে মন্দ হয় না···কিন্তু এটর্ণির চোখে ধরা পড়ে যাবে।

ফক্কা। তবে? একটু ভেবে-চিন্তে ঠাওরাও প্রিয়ে, ফস্ করে একটা-কেউ হইয়ে দিয়ো না এবার।

চঞ্চ। (চিন্তা করিয়া) না, ও যেমন লক্কা আছো, তেমনি থাকো। একটা ফ্যাসাদ দেখলে সে-ও তো রফা করতে পারে। পড়ে-পাওয়া লাখ টাকা বৈ তো না!

ফক্কা। না প্রিয়ে, আমি ঐ আদালত-ফাদালতকে ভারী ভয় করি। ভূত হয়েও মাঝে মাঝে গা ছম্-ছম্ করতো ঐ পুলিশের ভয়ে—ভূত আছে শুনে যদি কোনোদিন খোঁচাতে আসে!...তা ভূত হয়ে তবু একটা আরাম কি জানো?

চঞ্চ। কি?

ফক্কা। ভুজঙ্গিনীর ভুজ-দংশন থেকে মুক্তি পেতুম···

চঞ্চ। তা বটে! আহা, বেচারী! যে-ভাবে তোমায় ও গ্রাস করে, দেখলে দুঃখ হয়, বটে! তা ছাড়া ঐ সময়টায় আমার মনও যেন জলতে থাকে! নাঃ, চারি ধারেই সমস্যা!

ফক্কা। এর আর মীমাংসা নেই।

চঞ্চ হাসিও পায়! ভুজঙ্গিনী যদি সত্যিই লক্কার স্ত্রী হবে, তো তোমায় দেখে একেবারে ধেই-ধেই করে নেচে ওঠে কি বলে?—এঁ্যা! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ! সাবাস্ মেয়ে বটে!

ফক্কা। ইংরীজিতে একটা সেই কথা আছে না... any port in storm, অর্থাৎ ঝড়ের সময় যেখানে পাই ঢুকে আশ্রয় নি,—তাই আর কি! কতকাল স্বামী-বিরহে জ্বোরে আছে, এখন দ্বিধা কি সন্দেহের কথা তুললে যদি

এ্যাণ্ড ফক্কার—কাজেই যে আসে, তাকেই নি! এই আর কি মোদ্দা কথাটা!

চঞ্চ। কার পায়ের শব্দ…না? ঐ যে সুর-ভুজঙ্গিনী আসচেন। পালাও, পালাও তুমি বায়োস্কোপে গেছ যে! তারপর ফাঁকতালে আমার ঘরে গিয়ে থেকো…এর পরে কথা কওয়া যাবে…(ফক্কারামের প্রস্থান)

নেপথ্যে ভুজঙ্গিনী। (সুরে) ও আমার তরুণ পথিক,

ও আমার প্রাণের আলো…

ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজ। বায়োস্কোপ কখন ভাঙ্গবে, দিদি?

চঞ্চ। কি জানি, বোন্! তবে শুনছিলুম, আজ কি না কি পরব আছে, সারা রাতই বায়োস্কোপ চলবে!

ভুজ। এ্যাঁ!…তাহলে আজ রাত্রে আর জ্যোৎস্না উঠবে না, কোকিল গাইবে না, প্রাণ জাগবে না!…যাবার বেলায় বিদায় নিয়েও গেল না, দিদি! নির্ম্মম, অকরুণ .

চঞ্চ। কিন্তু সে কি আর ফিরবে?

ভুজ। দিদি…(তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল)

চঞ্চ। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, ভাই।…নাহলে এত দিন পরে বিদেশ থেকে এলো, আকুলা স্ত্রীকে একাকিনী ফেলে মানুষ বায়োস্কোপে যেতে পারে কখনো!…

ভুজ। দিদি, আমি চির-অভাগিনী, পতি-পাগলিনী, বিরহিণী…

চঞ্চ। সে জাল, নির্ঘাৎ জাল। ধরা পড়ার ভয়ে বায়োস্কোপের নাম করে সরে পড়েছে।

ভুজ। না, না,—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!…অমন নিষ্ঠুর কথা বলো না! তুমি পতিহারা বলে…

চঞ্চ। তা নয়, ভাই। এই ত্থাখো চিঠি…

ভুজ। কি হবে দিদি? পেয়ে নিধি আবার হারালুম!

চঞ্চ। আহা, চিঠিখানা পড়োই না…(পত্র প্রদান)

ভুজ। (পত্র পাঠ; চঞ্চলা তাকে নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; চিঠি পড়িয়া স্বগতঃ) যা ভেবেছিলুম, জালই সে! এখন আবার একজন! আর এক পর্ব্ব!…এই চালেই—চলবো…ভড়কালে হবে না। লাগে তাক, না, লাগে তুক্। (প্রকাশ্যে) দিদি…

চঞ্চ। কি?

ভুজ। এ যে আমারি প্রিয়তম! এ যে তাঁরই মূর্ত্তি জল্-জল্ করে ফুটে উঠচে, চিঠির এই কালো অক্ষরগুলোর মধ্য থেকে!

চঞ্চ। হাতের লেখা, নাম-সই…?

ভুজ। সব ঠিক—সব ঠিক, দিদি! এ যে, এ আমার বুকের নিধি…(পত্র বক্ষে স্পর্শ করিল ও পত্রচুম্বন)

চঞ্চ। তুমি অবাক করলে, বোন্…

ভুজ। কেন?

চঞ্চ। এই যদি আসল, তাহলে যে এসেচে…?

ভুজ। জাল, সে জাল!…না হলে ত্থাখোনি, আমি যত কাছে কাছে ফিরি, সে তত দূরে দূরে সরে? তখনি আমি বুঝেচি, এ তিনি নন্! নাহলে বায়োস্কোপের নাম করে সরে!

চঞ্চ। আর—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ,…তা…?

ভুজ। ভুল, মোহ!

চঞ্চ। আর তার পেছনে পেছনে ঘুরে তার গায়ে সেঁটে ল্যাপটানো…?

ভুজ। কি করবো, দিদি! আমি যে পতি-পাগলিনী, চির-বিরহিণী…

চঞ্চ। বাঃ, বেশ!

ভুজ। আর জাল নয়, আর ভুল নয়! পেয়েচি, আমার তাকে পেয়েচি! ওগো বঁধু, ওগো আমার প্রিয়তম, নাথ, হৃদয়-বল্লভ, ছোট্ট চিঠির হাতের লেখা…(পত্র বুকে লইয়া) এ তো চিঠি নয়!

গান

এ যে প্রাণের দ্বারে পাখী রে!
এই যে গোটা হরফ ক'টা
এ যে তারি আঁখি রে!
লিখেচে সে কোন্ বিদেশে,—
কালির আখর! চিঠির শেষে
এই যে তারি নাম লেখাটি—
এইটি বুকে রাখি রে!
ওরে আমার চিঠির লেখা,
মূর্ত্তি হয়ে দাও গো দেখা!
আমার প্রাণে স্বপন-রেখা
হাসির ছাঁচে আঁকি রে!

গীতশেষে লম্বাবেশী ধড়ীবাজ প্রবেশ করিল।

ভুজ। এসো, এসো প্রিয়তম… (পরে বিহ্বলভাবে দুই হাত অভ্যর্থনাচ্ছলে প্রসারিত করিয়া দিল; ধড়ী ভড়কাইয়া সরিয়া গেল)

ধড়ী। এ আবার কি! (চঞ্চলার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত)

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—ফক্কারামের ঘর

[লম্বাবেশী ধড়ীবাজ; তার গায়ের কামিজ খুব লম্বা ও বড় মাপের; কামিজের উপর গলা-খোলা কোট, অত্যন্ত টাইট্ ছিল; পেটের বোতাম সে কষিয়া আঁটিতেছিল; এবং ধড়ীবাজের পিছনে ট্রাঙ্ক ও বিছানার মোট মাথায় বেয়াক্কেলে; চঞ্চলার সন্দেহ-কৌতূহলে-ভরা দৃষ্টিতে ধড়ীবাজকে নিরীক্ষণ। ভুজঙ্গিনী থমকিয়া স্থির দৃষ্টিতে ধড়ীর পানে কিছুক্ষণ চাহিল; পরে বিহ্বল হইল; এবং পরক্ষণে একেবারে ঝাঁপাইয়া গিয়া ধড়ীর বক্ষে পড়িল। ধড়ী উৎফুল্ল। বেয়াক্কেলে হতভম্ব]

ভুজ। নাথ…প্রিয়তম…দয়িত…

ধড়ী। (একবার ফন্দী-ভরা দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল; তার পর মৃদু হাসিয়া)…এই যে জীবিতেশ্বরী, নাথ তোমার হৃদয়-তলে!—"হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,

প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন!
চন্দ্রাননি,
বদন তুলিয়ে হেসে কথা কয়ে
প্রবীরের জুড়াও তাপিত প্রাণ।"
আচ্ছা, তারপর আরো শোনো, প্রিয়তমে,—
"কর লো প্রত্যয়,
তোমা বিনা আমি কারু নয়!
চোখে চোখে রব, তোমারে দেখিব,
কারু পানে ফিরে নাহি চাব।
হৃদি-সিংহাসনে
যতনে তোমারে দিব স্থান।
যা আছে আমার, সকলি তোমার,
আমি লো তোমার, ধনি!"

চঞ্চ। (বিস্ময়ে নির্ব্বাক ভঙ্গীতে চাহিয়া রহিল)

ভুজ। (হর্ষোৎফুল্ল ভাবে) এতদিনে মনে পড়লো…?

ধড়ী। শুন প্রিয়ে, নহি অপরাধী,
কাজের তাড়নে বরাননে
ঘরে ফেলে পলাইনু।
জানো তুমি,—
স্বেচ্ছায় কি যেতে পারি তোমা ছেড়ে?
ওয়ারীশন-বেশে ফিরিয়াছি দেশে,
তোমারে দেখিতে প্রিয়ে ..

ভুজ। কি দারুণ বিরহে—

ধড়ী। এ তনু কি দহে…
বলো না, বলো না আর!

ভুজ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ! এ কি ভোলবার! এ যে প্রাণে প্রাণে গাঁথা—

ধড়ী। নামাবলীর হরফের মত তোমার মুখও আমার এই বুকের ভেতর ছাপা আছে, প্রেয়সি…

চঞ্চ। তাইতো, এ যে অবাক করে দিলে! তবে কি দুজনেই ঠিক? না, দুজনের আগে থেকেই ষড় ছিল? তা, ভগ্না ভুজঙ্গিনী, একটা কথা বলছিলুম—

ভুজ। আর কথা নয়, কথা নয়! আমি পেয়েছি, আমার তাকে পেয়েছি—

চঞ্চ। ও তো সেবারও বলেছিলে।

ভুজ। ভুল, ভুল—

চঞ্চ। আর এবারে ঠিক, ঠিক…?

ভুজ। একেবারে ঠিক।

চঞ্চ। আহা, পতি-পাগলিনী বিরহিণী—

ভুজ। আর তা নয়,—এখন পতি-পায়িনী, সম্মিলনী!

বেয়া। তা এ বাক্স কি মাথায় করেই দাঁড়িয়ে থাকবো বৌদি? দোতলায় সেই পাশের ঘরে রাখি গে?

চঞ্চ। না, না, দোতলায় কেন! এই এর ঘরে, তোমাদের এই নতুন বৌদির ঘরে রাখো গে—এর আবার জিজ্ঞেস-পড়া কি!

বেয়া। না, সে নক্কাদাদাবাবু, এলে দোতলায় পাশের ঘরে রাখতে বলেছিলে কি না, তাই শুধুচ্ছিনু, সে-ও নক্কাদাদাবাবু, এ-ও নক্কাদাদাবাবু তো!

চঞ্চ। আরে মন্, এ আবার তর্ক করে!—একবার ঠকেছি, ঠকে শিখেছি, আবার ঠক্‌বো!

বেয়া। না গো, এবারে আর ঠকা নয়, এবারে পাকা! চিনতে পারচো না, সেই বাঁশীর মত নাক…

ভুজ। সেই কাঁশির মত গলা…

ধড়ী। আর এই ফাঁসির মত স্ত্রী…

চঞ্চ। এখনো তবু মাসী বাকী!

ভুজ। (সুরে) এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর,
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর!
সুন্দর হে সুন্দর!

বেয়া। (ধড়ীকে নিরীক্ষণান্তে) এ কি রকমটা হলো! এ নকাদাদাবাবুর চালচলনে কথায়-বার্ত্তায় যেন ধড়ী-ধড়ী আদল আসচে না! ব্যাপার কি? একটু পরখ করে দেখি।—(কাছে আসিয়া জামা ধরিয়া টানিল; ধড়ী তাহা লক্ষ্য না করিয়া ভুজঙ্গিনীর পানে চাহিয়া তার গানে তাল দিতেছিল; বেয়াকেলে তাকে মৃদু ধাক্কা দিল)

ধড়ী। চোপরাও (বলিয়া বেয়াকেলের গালে চড় দিল)

বেয়া। না, সে নয়। সে হলে কি আমার গালে এমন করে চড় মারতে পারে!

চঞ্চ। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা না ওগুলো নিয়ে—

বেয়া। এই যে যাই! (প্রস্থান)

ভুজ। এবারে খাঁটী স্বামী পেয়েচি—আর তো ছাড়বো না, চোখের আড়ও করবো না আর—

ধড়ী। আমিও নড়বো না। মাথায় চাঁটিই পড়ুক আর লাঠিই ঝাড়ুক, এই মাটী আঁকড়ে থাকবো—

ভুজ। গান

আর তো তোমায় ছাড়বো নাকো
ওগো প্রিয়, কান্ত হে—
অনেক আশার ধন তুমি যে,
পেয়েচি! প্রাণ শান্ত হে!
পথের পানে চেয়ে-চেয়ে
কেটেচে রাত, কতই দিন!
আমার মনের হাহাকারে
জীর্ণ তনু, শরীর ক্ষীণ!
সবার পানেই চেয়েছি গো,
পথের যত পান্থ সে!
তাকিয়ে বটে গেছে তারা,—
থমকে হা, কেউ থামেনি!
আমার আঁখি পলক-হারা—
এক নিমেষও নামেনি!
তবু সে যে তোমায় পাবো—
মন এ কথা মানতো হে!

[ধড়ীবাজ গানের সময় হাসিয়া মাঝে মাঝে সায় দিতেছিল]

ভুজ। নাথ…(আদর কাড়াইবার প্রত্যাশায় চাহিল)

চঞ্চ। (তাকে টানিয়া সরাইয়া) একটু সরো দিকি—দু-একটা কথা কইতে দাও আমায়। কে এলো কোথা থেকে, জানি আগে…

ভুজ। জানবার দরকার নেই আমার—

চঞ্চ। ভালো জ্বালা! তা, হ্যাঁ ঠাকুরপো, খপর সব ভালো তো?

ভুজ। নিষ্ঠুর, একখানি চিঠিও লিখতে নেই? ছোট একখানি চিঠি?

চঞ্চ। অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? আসচো কোথা থেকে?

ভুজ। আমায় ভুলে কি করে ছিলে নাথ…!

চঞ্চ। একেবারে এমন বদলে গেছ! চেনা যায় না মোটে!

ভুজ। কিন্তু আমি তোমায় চিনেছি নাথ…পলকে! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!

চঞ্চ। জবাব দিচ্ছ না কেন?

ধড়ী। (পূর্ব্বোক্ত বিবিধ প্রশ্ন-কালে নানা ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল) ফুরসৎ মিলচে কৈ! যে-রকম তোড়ে দু'জনে জিজ্ঞেস করছেন, সামলাতে পারচি না!

চঞ্চ। আচ্ছা, আগে আমার কথার জবাব দাও…

ভুজ। আমার আগে…

চঞ্চ। আমি বড় ভাজ…

ভুজ। আর আমি স্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গিনী…

চঞ্চ। বেশ তো, তোমার জিনিষ তোমারই থাকবে ভাই—চিরদিন রাখো…আমি তো ক্ষণেকের অতিথি!

ভুজ। হ্যাঁ, আর-বারে একটু দখল নিতে দাওনি!

তা পেলে কি সে যেতে পারে কখনো, আমার হাত পিছলে···!

চঞ্চ। (হাসিয়া) কিন্তু সে তো জাল—তার জন্তে আর ব্যথা কিসের! এই তো খাঁটী!

ভুজ। বুঝি দিদি, সব। তুমি বিধবা, একা, পতি-পাগলিনী, বিরহিণী···কিন্তু সে তো এই ক'দিন—তার আগে···? আমি যে আগে থেকেই এই···পতি-পাগলিনী, বিরহিণী! এখন একটু সুখের আশা হয়েছে, তাতে কেন এমন বাদ সাধচো, দিদি!

চঞ্চ। বাদও সাধিনি, হিংসেও করিনি! এই ত্যাখো, দূরে দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদের কাছেও ঘেঁষিনি! ছুটো কথা কইতে দাও শুধু···আপন-জন আমারো তো—

ধড়ী। নিশ্চয়!

চঞ্চ। তাও এই দূরে থেকেই কথা কবো! আমার যেমন, তেমনি তোমারো তো একবার বাজিয়ে নেওয়া দরকার—বিশেষ যখন একটা অমন হয়ে গেল! শেষে এ'ও যদি জাল হয়ে চলে যায়, তুমিই ঘাল হবে, আমি না।··· তা হাঁা ঠাকুরপো, তবে যে শুনেছিলুম, তুমি আসামী স্ত্রী বিয়ে করেচো!

ধড়ী। (বিস্ময়ে) আসামী! না, আসামী কি! তবে ···ওঃ, বুঝচো না বৌদি···সে এক সময় বলবো'খন। হাঁ্যা!··· তা বিয়ে করেচি বটে!

ভুজ। নাথ···(বিষণ্ণ)

ধড়ী। এই যে! এ কি আসামী! ইনি কি আসামী? হয়েছিলেন কখনো···?

চঞ্চ। বছর পাঁচেক হলো, তোমার মাথায় সে লাঠি মারে···

ধড়ী। বছর পাঁচেক! লাঠি! যা বলেচো বৌদি···! তুমি দেখছি, সব জেনে ফেলেচো!

চঞ্চ। হাঁ্যা!

ধড়ী। বছর পাঁচেক আগে···হাঁ্যা, আমি তো তখন জেলে, লাঠি মারায় নয়, একটা cheating caseএ! (জিভ্ কাটিয়া) থুড়ি, কি বলচি! রেলে, রেলে, রেলে চড়ে আসামে যাচ্ছি তখন!

খোস্তা মাসীর প্রবেশ

খোস্তা। এই যে নক্কা, বাবা আমার, এলি রে—ভেজাল নোস্—খাঁটী নক্কা আমার! গরিব মাসীকে মনে পড়লো বাবা? (কান্না ও নাকঝাড়া)

ধড়ী। আঃ! (সরিয়া গেল)

চঞ্চ। মাসী। নমস্কার কর···(ধড়ী প্রণাম করিল)

ধড়ী। (প্রণামান্তে) এঁ্যা, মাসী! তাইতো, তারপর মাসী···

চঞ্চ। যে-সে মাসী নয়, খোস্তা মাসী।

ধড়ী। খোস্তা মাসীই তো বটে! তা, খোস্তা মাসী, আমার নোড়া মামা ভালো আছে তো? গামলা দিদি? শীল দাদা? দাঁতের ব্যথা সেরেচে তার? জাঁতা মাসী··· এখনো তেমনি ঘুরতে পারে? কাৎলা দিদির কান্‌কো ফুলে জ্বর হয়েছিল, সেরেচে?···বাঁটলো মামার সেই কাণ-চটা? ..আর হাতা মাসীর হাতের বাত?

খোস্তা। (অবাক হইয়া শুনিল; পরে অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) এঁ্যা, এঁ্যা, তা, হাঁ্যা বাবা, সব ভালো, বাবা, সব ভালো—

ধড়ী। তোমার জন্তে কি মন কেমনই করতো, মাসী! আহা, তোমার হাতের সেই নারকোল নাড়ু! ওঃ, নারকোল গাছ দেখেচি, আর কেঁদেচি যে আহা, মাসী আমার কাছে থাকলে ঐ গাছ কি রাখতো! তার আগাপাস্তলা একেবারে নাড়ুর মুণ্ডমালা ঝুলিয়ে দিত।

খোস্তা। মনে আছে বাবা, মনে আছে রে নক্কামণি?

ধড়ী। মনে আর নেই! বলে, তোমার সেই আদরে বপুখানি কেমন আছে, দেখচো, একটু টস্কায় নি! এই দ্যাখো, জামার বোতাম আঁটে না!

খোস্তা। আহা, বাছা আমার, বেঁচে থাক্—মোটা হাতী হয়ে থোড়-মোচার বংশ নির্ব্বংশ করে গরাণের খুঁটী হয়ে বসে থাক্ বাবা! তোর ভাবনা কি! কত খাবি, খা'না! তোর নাথ টাকা ঘরে এসেচে, তোর সে মাসী বেঁচে আছে, তোর খাবার ভাবনা, বাবা! বলে, মার্ বোন্ মাসী,—খাওয়ায় তপ্ত-বাসী!

চঞ্চ। এরা তো বেশ জমিয়ে তুললে, দেখচি! সব ষড় ছিল, না, এরা সব সত্যি? এ যে অবাক করে তুললে!

[প্রস্থান

ভুজ। এসো নাথ···(ধড়ীকে ধরিয়া আকর্ষণ)

খোস্তা। আঃ, ছাড়ো না বাছা! একালে কি সবই

উল্টোচ্ছিরি! আমি বলে, মাসী রয়েচি যত্ন করতে! না, উনি এলেন চ'দিনের বৌ, আদর জানাতে!—(টানিল)

ভুজ। নাথ···(টানিল)

খোন্তা। এমন বেহায়াপনাও তো দেখিনি, বাছা—! বৌ-মানুষ...স্বোয়ামী নিয়ে মাসশাশুড়ীর সঙ্গে লড়াই করতে লজ্জা করে না! ওমা, ছি ছি· আমি যেন সতীন!... গলায় দড়ি! এসো বাবা লক্কা! (টানিল)

ভুজ। কখনো না। (টানিল)

ধড়ী। ওরে বাবা, আমি যে যাই এদিকে!

খোন্তা। ছাড়ো বৌমা, বাছাকে জিরুতে দাও! এলো, দুদণ্ড বাছা আমার জিরুক! দরদ ওঁর উথলে উঠলো! আজ দিদি বেঁচে থাকলে আর এমন হয়! ওগো দিদিগো, কোথায় গেলে গো···!

ধড়ী। আঃ, জামা সামলে নাক ঝেড়ো...মাসী কি যে-ই হও···

খোন্তা। আয় বাবা...(টানিল)

ভুজ। এসো নাথ···(টানিল)

(উভয়ের টানাটানিতে ধড়ীর বিব্রত আধ-ঝুলন্ত অবস্থা; এবং এইভাবেই ধড়ীবাজ, ভুজঙ্গিনী ও খোন্তা মাসীর প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

গান

যদি কেল্লা ফতে করতে হয়!
যাও বাজিয়ে তুড়ি, হুমকি চালে—
কাঁচু-মাচু মোটেই নয়! (ওগো)
সকল কাজে ধেয়ে যাওয়া,
কীর্ত্তি নিজের কেবল গাওয়া,
কারো পানে নয়কো চাওয়া—
নিজেই মস্ত সর্ব্বময়!

জানোনা যা, তাতেও জোরে
বাজাও গলা,—সাহস কোরে!
তাক্ লাগিয়ে হকচকিয়ে
চলবে,···কারে নাইকো ভয়!

সকলকে গো বানিয়ে বোকা,
কথার ঝড়ে লাগিয়ে ধোঁকা···
চলবে তোফা কথা দিয়েই···
কথায় হবে বিশ্ব জয়!

চঞ্চলা ও বস্ত্রাবৃত ফক্কারামের প্রবেশ

চঞ্চ। আমি কিছু বুঝতে পারচি না। এর চালচলন ভারী জোরের। সত্যিই তবে এলো! কি হবে?

ফক্কা। আমি কি করি, বল! আমি যে এক দফায় মরেচি, ফিরে দফায় ভেগেচি!

চঞ্চ। তার মানে?

ফক্কা। নয়? ফক্কা-আমি মরেচি, আর লক্কা-আমি জাল সাব্যস্ত হয়ে সরে পড়েচি।

চঞ্চ। তবে উপায়? কি করে বোঝা যায়? তুমি নাহলে হবেও না যে! আমি হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো···

ফক্কা। সে কথা কি আমি অস্বীকার করচি!

চঞ্চ। ছাখো, ঐ লক্কা হয়েই এসো আবার। এসে বলো, এক বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হলো, সে ধরে নিয়ে গেছলো, কাজেই আসতে পারো নি!

ফক্কা। তারপর? যে এসেচে, এ যদি সত্যি লক্কাই হয়? ধরে পুলিশে দিলেই তো লক্কা আবার ফক্কা হবে, আর ফক্কা হয়ে একেবারে ছাঁকা অক্কা, পাকা অক্কা! ভূত হয়ে বাঁচবারো উপায় থাকবে না।

চঞ্চ। ও বললেই হলো যে, তুমি জাল লক্কা? তুমি জোর গলায় বলবে, তুমি লক্কা···! আমি তোমার দিকে।

ফক্কা। আর ওর দিকে ভুজঙ্গিনী-প্রিয়া, খোন্তা মাসী—

চঞ্চ। তা বটে! কিন্তু তা বলে ওকেই ভালো করে না দেখে-শুনে একেবারে লক্কা বলে মেনে নিতে হবে! যে লাখ টাকার জন্তে তুমি মলে, তা পাবে না! মাঝে থেকে বেঁচে-মরে একটা বিদিকিচ্ছি কাণ্ড হয়ে থাকবে···এই বা কি, বাপু!

ফক্কা। এ তো নতুন নয়, প্রিয়ে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে স্বামী চলেচে, সেই তো এমনি বেঁচে মরে আছে!

চঞ্চ। এখন ন্যাক্‌রার সময় নয়, সত্যি...

ফক্কা। একে ন্যাক্‌রা বল? নিজের বাড়ীতে নিজে ভূত, না, চোর হয়ে থাকা!···তুমিই তো ফ্যাসাদ বাধালে! লাখ টাকার সুদ পেয়ে একরকমে চলে যেতো। লাখ টাকায় লোভে পড়ে আমিও মলুম, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটাও মুসাফির-খানা হয়ে উঠলো!

চঞ্চ। না বাপু, আমার কিছু ভালো লাগচে না! ও জাল, নির্ঘাৎ জাল!

ফক্কা। এক কাজ করা যাক্ প্রিয়ে…

চঞ্চ। কি ?

ফক্কা। তাকে নয় একবার ডাকাও। এই ভূত হয়েই একবার আলাপ করে দেখি। তেমন বুঝি, চেপে ধরবো !

চঞ্চ। কি করবে, শুনি ?

ফক্কা। তুমি তাকে ডেকে এনে জেরা সুরু কর না ! তারপর দেখো, কি করি।

চঞ্চ। বেশ, তুমি তাহলে একটু আড়াল হও ! আমি তাকে আনচি… [প্রস্থান

ফক্কা। মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে ফস্ করে মরে ভালো করিনি ! দু'দিন সবুর করে দেখলে হতো !…সবুর করতে দিলে না আরো ঐ পাওনাদারগুলো ! যেমনি শুনেচে, কার উইলে কি টাকা পাবো, অমনি একেবারে এই বাড়ীতেই বসতি করে তুললে !—এ-রকম অভদ্রতায় মানুষ বাঁচতে পারে কখনো ! যাই, কি হয় দেখি। একটু গা ঢাকা দি…

[বস্ত্রাবৃত অবস্থায় সন্তর্পণে প্রস্থান

লক্কাবেশী ধড়ীবাজকে লইয়া চঞ্চলার প্রবেশ ; ধড়ীবাজের পিছনে ভুজঙ্গিনী, চিন্তায় কাতর, উদাস তার মূর্ত্তি।

চঞ্চ। শোনো, তুমি যে লক্কা ঠাকুরপো হয়ে এলে, আর বাড়ীর মধ্যে চলেও বেশ গেলে, বিশেষ তোমার এই বৌয়ের কাছে। তা ও যেন তোমার বৌ, ও যেন তোমায় মেনে নিলে, কিন্তু আমরা অত চট্ করে তোমায় মানবো কি করে, বল ! বিশেষ যখন লক্কা হলে লাখ মিলবে !

ধড়ী। তা মিলবেই তো…

চঞ্চ। তা আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন কর আগে… (ভুজঙ্গিনীর ভাবাভিনয়)

ধড়ী। বেশ, কি প্রমাণ চাই ?

চঞ্চ। তোমার মার নাম, বল ?

ধড়ী। ওঃ, এই ! ৺বঙ্গসুন্দরী দেবী…বকাসুর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্তা…

চঞ্চ। আচ্ছা, এ কথা উইলেই লেখা আছে। উইলের লাখ টাকার খপর যে জানতে পারে, এ জানাও তার কাছে সহজ। বাপের নাম ?

ধড়ী। কোন্ বাপ্ !

চঞ্চ। কোন্ বাপ আবার কি !

ধড়ী। শাস্ত্রমতে বাপ যে অনেকগুলি হয় মানুষের… অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, যস্ত কন্তা বিবাহিতা…তা আমায় অন্ন জুগিয়েচে বরাবর নিধে উড়ে, কেননা, তার হোটেলেই আমার পাত পড়েছে বিশ বছর !…তারপর ভয়ত্রাতা…? সে বাপ আমার পুলিশ কোর্টের তিন উকিল,—সিনিয়ার উকিল রায় বাহাদুর দীননাথ সাঁতরা, মাঝারি ষড়ানন পাঁজা, আর জুনিয়ার বাঞ্ছারাম পরামাণিক ! আর যস্ত কন্তা বিবাহিতা ? সে তো এই সামনেই এক্‌জিবিট্ রয়েচে।

চঞ্চ। বেশ, এর বাপের নামই বল !…ভুজঙ্গিনী, তুমি মিলিয়ে নাও—বল।

ভুজ। না, বলো না, বলতে হবে না !—স্বামী, নাথ… তাঁকে আবার প্রমাণ দিতে হবে চেনাবার জন্ত ! আমার মন বলে দেবে না যে, ওরে, এই সে …তোর চির-জীবনের ওগো !

ধড়ী। ঠিক তো ! এর ওপর আবার প্রমাণ ? মিথ্যে সাক্ষী না হলে বুঝি প্রমাণ হয় না ? বাপ ব্যাচারী কবে মারা গেছে—প্রমাণ চাইলে তাকে আনবো কি করে ! সে মুলুকে আবার সফিনেও পাঠানো যায় না !

চঞ্চ। আচ্ছা—বেশ, বল, একে বিয়ে করেচো তো— বিয়ে কোথায় হয়েছে, আর বিয়ে করে বৌ নিয়ে উঠলে কোথায় ? কদ্দিন আগেই বা বিয়ে হয়েছে ?

ভুজ। আবার !—না নাথ, তুমি জবাব দিয়ো না ! এ যে প্রেমের অপমান !

ধড়ী। দস্তরমত !—একটু ভুল হলেই,—বুঝলে কি না, (ভুজঙ্গিনীর প্রতি) তুমিও গেছ, আমিও গেছি !— হুঁ, কত দিনের কথা—বলে, মাথার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তাতে বিয়েই ভুলে যেতে হয়, তায় এ তো সেই বিয়ের সাল-তারিখ খুঁটী-নাটী !

চঞ্চ। কিন্তু আমি যে আমাদের বিয়ের সব কথা বলতে পারি, প্রত্যেক খুঁটী-নাটীটি—

ধড়ী। তবে আর মেয়ে-মানুষে পুরুষ-মানুষে তফাৎটা কি রইলো, দিদি ! আমরা কাছা-কোঁচা দিয়ে কাপড় পরি— আপনারা—তোমরা তা পরো ? তবে—? ও কথা বরং এই আমার ইস্তিরীকে জিজ্ঞাসা কর, ও একেবারে নামতা মুখস্থ বলে যাবে'খন।

চঞ্চ। বটে !

ফক্কা। পোষ্টকার্ড! কার চিঠি? (চিঠি লইয়া) বৌদি-ঠাকুরাণী! ঘ্যাখো, আবার কে আসে!

চঞ্চ। (পত্র লইয়া পাঠ; পাঠান্তে ভ্রূভঙ্গী-সহকারে ধড়ীবাজের পানে চাহিল)

ফক্কা। কি গো, কার চিঠি?

চঞ্চ। এই শোনো…(পত্র পাঠ) "পরে বৌদি, ফক্কা-দাদার অকাল-মৃত্যুতে বড়ই দুঃখ হইল। কি করিবে, সবই ভগবানের হাত! আমি সোমবার সকালে পৌছিব। ইতি স্নেহের দেবর শ্রীলক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

ফক্কা। আবার লক্কা! (ধড়ীবাজের প্রতি) কি হে, শুনচো তো?

ধড়ী। আজ্ঞে শুনলুম। তা বলুন, আমায় কি করতে হবে?

ফক্কা। তুমি যে একেবারে সবিনয় নিবেদন হয়ে গেলে হে! তা হলে তুমি জালই?

ধড়ী। আজ্ঞে, বলেচি তো! ভদ্দর লোকের এক কথা!

ফক্কা। তোমায় তাহলে পুলিশে দেবো?

ধড়ী। ঐটি করবেন না শুধু! পুলিশকে আমি কেমন সহ্য করতে পারি না। তা-ছাড়া তাতে আপনারো কিছু মুস্কিল হবে।

ফক্কা। আমার আবার মুস্কিল কি!

ধড়ী। আজ্ঞে, আধাআধি বখরা নিতে রাজী হয়েচেন কি না!

ফক্কা। তাতে কি?

ধড়ী। আমার যদি ছ'মাস জেল হয়—তা হলে আধা-আধি বখরায় আমার তিন মাস, আপনার তিন মাস। তা ছাড়া—

ফক্কা। তা ছাড়া আবার কি!

ধড়ী। পুলিশ-কোর্টে সাক্ষী দিতে যেতে হবে তো!

ফক্কা। হুঁ! তা হলে কি করবে, বল দিকি…

ধড়ী। আজ্ঞে, অনুমতি করেন যদি তো আপাতত বিদায় নি।

ফক্কা। তার পর?

ধড়ী। আজ্ঞে, যিনি আসচেন, তাঁকেও দেখুন, বুঝুন। তাঁকে সরাতে পারলে খপর দেবেন,—সই-মাফিক বখরা নিতে আসবো তখন!

ফক্কা। বটে! আর যদি তিনি…

ধড়ী। না সরেন, অভদ্রতা কোরে। তা হলে এই পর্য্যন্ত। বিষয়ান্তরে মন দিতে হবে। তবে একটা কথা বলে যাই মশায়, যিনি আসচেন, তাঁর পিছনে যদি এই খোস্তা মাসী আর নোস্তা স্ত্রীকে এমনি লেলিয়ে তুলতে পারেন, তা হলে তিনি দু'দিন টেঁকতে পারবেন না। লাখ টাকা বেশ লোভনীয়, কিন্তু তার দোরে এই দুই মূর্ত্তি! থানার পুলিশ কোথায় লাগে! আমি নেহাৎ ধড়ীবাজ, তাই ওদের নিয়ে খেলছিলুম! তা আপাততঃ চললুম,—দেখবেন, বেইমানী করবেন না…আধা-আধির বখরাদার! তা হলে, নমস্কার! (প্রস্থান)

চঞ্চ। দেখলে, সরলো। গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এ জাল!

ফক্কা। তা তো দেখলুম। মোদ্দা আবার চিঠি! আবার লক্কা! কথায় বলে, বারে-বার তিনবার। তা দু'বার ফক্কা হলো, এবারের লক্কা যদি টক্কা হয়ে ওঠে?

চঞ্চ। বেশ তো, তার সঙ্গেও এই আধাআধি বখরার সর্ত্ত কর! সেও যখন দেখবে, তুমি বেঁচে আছ, মরোনি, তখন কবে সেই লাখ টাকা পাবো বলে বসে না থেকে সগু অর্দ্ধেকে রাজী হতে পারে তো! আর যদি জাল হয়…

ফক্কা। কিন্তু আমি তো বেঁচে নেই, প্রিয়ে…

চঞ্চ। কি রকম?

ফক্কা। তার পর বাঁচাও শক্ত এখন। জলজ্যান্ত জলে ডুবে মরেচি, পাঁচজনে শ্রাদ্ধয় লুচি ছোলার ডাল খেয়ে গেছে, তারা তো আর জাল নয়, তারা আমার আবার বাঁচা মেনে বেইমানী করবে কি করে, বল?

চঞ্চ। তাইতো (চিন্তা)! তা এক কাজ করলে হয় না? না—তা—আচ্ছা, ভেবে দেখি।…যেমন ফস্ করে মরে ছিলে, তেমনি ফস্ করে বাঁচা চাই! পরামর্শ করা যাবে এখনি।…এখন এ চিঠির কথা পিসেমশায়কে একবার জানাই। এবারকার লক্কার সঙ্গে তিনি এসে বোঝাপড়া করুন।

ফক্কা। বেশ। তা হলে ভূতেরও এবার গয়া!

চঞ্চ। হ্যাঁ, এখন সর, কারা আসচে।

(উভয়ের প্রস্থান

লক্কবেশী ধড়ীবাজ ও ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

গান

ধড়ী। ছাড়ো, আমায় ছাড়ো!
লাখের উপর বাহুর এ পাক—সইতে ভাঙ্গে হাড়ও!
(প্রিয়ে, বইতে ভাঙ্গে ঘাড়ও)
তার ওপরে ভূতের বাসা……

ভুজ। … … … … এই বুকে হে রাখবো থাসা!
নিদয় হয়ে কেমন করে এমন কথা পাড়ো!
বঁধু কেমন করে পাড়ো!

ধড়ী। তোমায় নিয়ে? ওরে বাবা!…আঁৎকে জীবন যাওয়া!

ভুজ। ভয় কি হে নাথ, আমার প্রেম এ, কোমল মধু হাওয়া!

ধড়ী। যাও না চলে মধুপুরে…প্রেমের তাঁবু গাড়ো…
সেথা ও প্রেমের তাঁবু গাড়ো!

খোন্তা মাসীর প্রবেশ

খোন্তা। আমায় ছেড়ে যাবি কোথায়, ওরে বাবা নক্কা রে—
ভেঙ্গে বাদাড় এলুম হেথা…এসে দেখি মক্কা এ!
(নাক ঝাড়া)

ধড়ী। মক্কা-কাশী, যাও না মাসী,…সরে গে নাক ঝাড়ো!
মোদ্দা, সরে গে নাক ঝাড়ো!
(সকলের প্রস্থান)

চঞ্চলা ও লক্কাচন্দ্রের প্রবেশ

লক্কা। ক্ষেপেচো বৌদি, লেবুর চাষ! বাইরে থাকলেই দেখি, লম্বা গল্প রটে এখানে! কে যে রটালে এ কথা! চেরাপুঞ্জিতে লেবুর চাষ! হুঁঃ, বলে, ঘুরে ঘুরেই জীবনটা কাটলো, কিছু করতে পারলুম না! যেমন লক্ষ্মীছাড়া, তেমনি লক্ষ্মীছাড়াই আছি!…দেশে এককাঁড়ি দেনা রেখে গেছি, ফেরার উপায় রাখিনি, তাই ফেরার!

চঞ্চ। দেনা! এঁর সঙ্গে বেশ মিলচে যে! কথায় বলে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! তা—

লক্কা। হ্যাঁ। মোদ্দা আমি শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি, এর মধ্যে দু'জন লক্কা এসে আসরে দেখা দিয়ে গেছে…

চঞ্চ। বল কেন! ঐ যে উইলে আছে, লাখ টাকা পাবে লক্কা।

লক্কা। আমি কি ছাই জানতে পেরেছিলুম! চাটগাঁয় এক ব্যাটা পাহারাওলাকে ঠেঙিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলুম! একদিন ক্ষিদের জ্বালায় এক পয়সার মুড়ি কিনি। তা মুড়ি দিলে তারা একটা কাগজের বগলিতে। মুড়ি খেয়ে সেই কাগজখানা হঠাৎ পড়ে দেখি, একটা বিজ্ঞাপন। ফক্কা দাদা জলে ডুবে মারা গেছে, আর তার মাসতুতো ভাই লক্কাচন্দ্র লাখ টাকা পাবে—কি না কি কার উইল বেরিয়েছে! পড়ে আমি তো অবাক! তাই তোমায় একটা পোষ্টকার্ড লিখে বেরিয়ে পড়লুম।

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

চঞ্চ। তোমায় চিনতেও কষ্ট হলো না তো! কিছু বদলাও নি!…আপনার লোক, সত্যি! না হলে ক্রমাগত এই লক্কার পর লক্কা এসে এমন হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছিল যে, আমারো অক্কা পাবার জো হয়েছিল!

লক্কা। এটর্ণিকে একখানা পোষ্ট কার্ড আমি লিখে দিয়েছি। কাগজটায় এটর্ণির নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল কি না! মোদ্দা, সুখ হচ্ছে না, বৌদি। ফক্কা দাদা নেই? আচ্ছা, তা জলে যে ডুবলো মানুষ…অনেক সময় এমন পাওয়াও তো যায়! কতদূরে ভেসে গিয়ে চড়ায়, কি কারো নৌকোয় ওঠে!…যদি কোনো চড়াতেই উঠে থাকে?

চঞ্চ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার বরাতে তা কি হবে, ভাই! যাক্, এবার বৌয়ের সঙ্গে দেখা কর!

লক্কা। বৌ!

চঞ্চ। হাঁা, বৌ! তোমার আসার আগেই এদিকে মাসী এসেছিলেন, বৌ এসেছে। তা মাসী চলে গেছে, বৌটি এখনো আছে! ভুজঙ্গিনী গো…

লক্কা। ভুজঙ্গিনী! বৌ! তুমি যে অবাক করলে বৌদি! আমি বিয়েই করিনি মোটে…

চঞ্চ। আর ভাই, অবাক কি! বিশ্বাস না হয়, ঐ ম্যাখো…

বেয়া। ম্যাও! এই বারে ঠিক বোঝা যাবে।

ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজ। (প্রথমে দূর হইতে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া, পরে) এলে…! নাথ…(আগাইয়া আসিয়া লক্কার হাত ধরিল)

লক্কা। (লাফাইয়া সরিয়া) এ্যাঁ…

ভুজ। (সহাস্য ভঙ্গীতে) প্রাণেশ্বর…

লক্কা। আপনি ভুল করচেন, সরও নই, ননীও নই, আমি জলো দুধ!

ভুজ। প্রাণনাথ…

লক্কা। …না, এবারে কাৎ!

ভুজ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!

চঞ্চ। দু'বার ঐ বলে ঠকেচো বোন্! এবারে যাত্রা বদলাও!

ভুজ। বারে-বার তিনবার! এবার আর ভুল নয়, মোহ নয়···

চঞ্চ। এবারে খাঁটী···না?

ভুজ। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর···

লঙ্কা। আরে দুর, কি এ! শুনুন তবে, সুন্দরী, আমি কস্মিনকালেও বিয়ে করিনি।

ভুজ। কমলা লেবুর তীব্র গন্ধে এ কি বিস্মৃতি, নাথ!

লঙ্কা। শব্দশাস্ত্রে ভুল হচ্ছে। বিস্মৃতি নয়, বিস্ময়, বেবাক বিস্ময়! কমলালেবুর চাষ যিনি করেচেন, তাঁকে চান্ যদি তো আসামের ক্ষেতে সন্ধান করুন গে।

ভুজ। সেই পরিহাস, সেই ব্যঙ্গ!

লঙ্কা। ব্যঙ্গ নয়! আপনার রঙ্গ দেখে, অঙ্গ আমার ভয়ে শিউরে উঠচে!

ভুজ। নাথ···

লঙ্কা। আবার! আচ্ছা, ফিরিস্তি দি, শুনুন! দশ বছর তো আমি দেশ-ছাড়া। প্রথম বছরে ঘুগনিদানার ব্যবসা করে দু'শো সাতান্ন টাকা লোকসান, আর বাজারে তিনশো বারো টাকা দেনা করে সরে গেলুম শিবপুর। সেখানে বাইসিক্ল-সারাবার দোকান ফাঁদি, এগারোটি টাকা মূলধন নিয়ে। দু'খানা চোরাই সাইক্লের গন্ধে পুলিশ এলো, ভাঙা বেড়া টপকে আমি লম্বা দিলুম·· হুগলিতে। পকেটে ছিল, এক টাকা সাত আনা তিন পয়সা। তাতেই ষ্টেশনারীর দোকান খুললুম। একদিন চুরি হলো। দোকানের পাপোষের তলায় সাড়ে তিনটে পয়সা পড়ে ছিল, চোর-ব্যাটাদের নজর পড়েনি! তাই ট্যাকস্থ করে গেলুম সহর বর্দ্ধমান। সেখানে পুরোনো বইয়ের দোকান খুললুম। সেখানেও এক চোরাই হাঙ্গামে পড়লুম! মবলগ তিন টাকা সাড়ে সাত পয়সা নিয়ে বর্দ্ধমান ছাড়লুম। ছেড়ে চলে এলুম টালায়···

চঞ্চ। টালায়!

লঙ্কা। টালায় এসে কয়লার দোকান খুললুম, এক অংশীদার নিয়ে। বনছিল না। মাল আনবো বলে দোকানের চারশো টাকা নিয়ে লম্বা দিলুম। দিয়ে উঠলুম গিয়ে যশোর। সেখানে এক স্বদেশী ইনসিওরেন্সের এজেণ্ট হয়ে নানা দেশ-ভুঁই ঘুরে পয়সা-কড়ি আদায় করে খেয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এই ঘুরতে-ঘুরতেই শেষ আসি চাটগাঁয়। সেখানে পুলিশ ঠেঙিয়ে অজ্ঞাতবাস করার সময় ঐ মুড়ির ঠোঙায় এটর্ণির নোটীশ দেখলুম!···বল তো বাপু, এর মধ্যে বিয়ের ফুরসুৎ পেলুম কখন্!

চঞ্চ। সত্যি, তাহলে তোমার তো আর এখানে কোনো আশা দেখচি নে!

ভুজ। ওঃ! (দীর্ঘশ্বাস)

চঞ্চ। আর ত্থাখো ঠাকুরপো, আর-কিছুতেও যদি তোমায় এঁর মাসতুতো ভাই বলে না চিনতুম, তোমার এই ব্যবসার বাতিকে ঠিক চিনে ফেলতুম যে, হ্যাঁ, এ আর নতুন নয়, এঁরি চিরকেলে পুরোনো সুযোগ্য মাসতুতো ভাই!

লঙ্কা। বটেই তো! (ভুজঙ্গিনীর প্রতি) তাহলে আর মিছে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন! বিশাল সহর কলকাতা··· আর কেউ না হোক্—মাসিক-পত্রে কবিতা-লেখা কবির অভাব নেই···চেষ্টা করুন···তারা লুফে নেবে'খন! আমার দ্বারা কোনো সাহায্য হবে না। মাপ করবেন।

ভুজ। হা রে হতভাগিনী, পতি-পাগলিনী বিরহিণী! কি যে বেদনা বক্ষে···

চঞ্চ। জমাদার্ণীকে বলে একটু চুণ আর একটু হলুদ চেয়ে নাও গে—দুটোয় মিশিয়ে প্রলেপ দাও...সেরে যাবে।

ভুজ। ওঃ তায় পরিহাস! দরদ নাই!···যাই। ওঃ!··· তা আমায় একটা গাড়ী আনিয়ে দেবেন তাহলে, আর ভাড়াটা···

লঙ্কা। এই যে ভাড়া আমি দিচ্ছি। (দুইটি টাকা ফেলিয়া দিল) আর গাড়ী? (বেয়াকেলেকে দেখিয়া) এই যে—কে রয়েচে! যা তো বাবা, চটপট্ একটা গাড়ী দেখে দে!

বেয়া। (ফন্দী-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল)

ভুজ। ওঃ! আঃ! (সুরে)

মাধব, পরিণাম নিরাশা!
বিফল এ রূপ হারে, তনু-মন্-যৌবন,
বিফল, বিফল ভালোবাসা! [প্রস্থান

[বেয়াক্কেলের তৎসঙ্গে প্রস্থান।

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। পিসেমশায় গো দিদিমণি—সেই জালা পিশির···

চঞ্চ। এইখানে পাঠিয়ে দে। (জমাদার্ণীর প্রস্থান) সেই এটার্ণ। আমার আবার পিসেমশায় হন্! এই যে···

এক বাণ্ডিল কাগজ হাতে রক্তবীজের প্রবেশ

রক্ত। একখানা চেয়ার রে, থেঁদি—মোটা মানুষ, দাঁড়াতে পারি না, কেমন হাঁফ ধরে!

চঞ্চ। (চেয়ার আগাইয়া দিল; রক্তবীজ বসিল) এই আমার লঙ্কা ঠাকুরপো, পিসেমশায়। আর জাল নয়, আদি, অকৃত্রিম লঙ্কা একেবারে!

রক্ত। প্রমাণ?

লঙ্কা। ওঃ, ইনি আবার প্রমাণ চান্! আইনের ব্যবসা করেন কি না!—তা কি প্রমাণ চান্, বলুন? ব্যবসার বাতিক, দেনা, ফেরার···আরো চান্?

রক্ত। (নিরীক্ষণ করিয়া) নাঃ, ফক্কারামের মাসতুতো ভাই তুমি ঠিক! বকাসুরের বংশ, ঘুঘুরামেরই নাতি বটে! ৺গ্যাঁড়ারামের পুত্র ঘুঘুরাম

চঞ্চ। আরো সেরা প্রমাণ আছে, পিসেমশায়···সেই গায়ে-হ্যাপ্‌টানো ভুজঙ্গিনী বৌটি একে দেখে ছিটকে সরে গেছে!

রক্ত। ভালো, ভালো। তা উইলের খপর সব জানো?

লঙ্কা। এসে বৌদির কাছে শুনেচি সব।

রক্ত। বেশ কথা! তবু সে শোনা কথা! শোনা কথার আইনে কোনো দাম নেই! এই উইল, নিজেই পড়··· (উইল দিল)

লঙ্কা। দিন্! (উইল পাঠ)

নেপথ্যে গান

হরি বল মন-রসনা!
পয়সা-কড়ি পায়ের দড়ি, বাঁধা পড়ার ধিক বাসনা!

চঞ্চ। (সচকিত ভাবে) ঠাকুরপো···পিসেমশায়··· (রক্তবীজকে ধরিল; রক্তবীজ চমকিয়া চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল) আহা-হা, ওঠো পিসেমশায়, এখন পড়বার সময় নয়! (তুলিল; রক্তবীজ চেয়ারে বসিল)

রক্ত। কি হয়েচে রে থেঁদি?

চঞ্চ। ঐ—ঐ—ঐ—(নেপথ্যে উক্ত গান; চঞ্চলার চঞ্চল-ভাব) ডাকো, ডাকো—

লঙ্কা। কাকে? কাকে বৌদি?

রক্ত। কাকে রে, থেঁদি?

চঞ্চ। ঐ—ধিক্-ধিক্ ধিক্-ধিক্—ধিক্ বাসনাকে! আমার প্রাণ ধিক্-ধিক্ করচে! ঠাকুরপো, পিসেমশায়—

লঙ্কা। ধিক-বাসনা!

রক্ত। সে আবার কি রে!

চঞ্চ। ওগো, ঐ যে গো—ওগো, সেই ভীষণ গলা, সেই বীভৎস সুর যে গো—

লঙ্কা। কার?

নেপথ্যে গান

ওরে, বাঁধা পড়ার ধিক বাসনা!

চঞ্চ। ঐ যে গো, ঐ—ডাকো ডাকো—

ছিন্নবস্ত্রে মলিন বেশে ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। দুটী ভিক্ষে পাই বাবু—

চঞ্চ। এঁ্যা,—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলা, সেই চলা—ওঃ! তুমি, তুমি, তুমি—(রক্তবীজকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল)

ফক্কা। হ্যাঁ—সেই খোঁপা, সেই শাড়ী, সেই বপু,—সেই-সেই-সেই···তুমি, তুমি, তুমি···

(লাফাইয়া লঙ্কাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল)

[রক্তবীজ ও লঙ্কাচন্দ্র বিস্ময়ে হতভম্ব! চঞ্চলা ও ফক্কা উভয়েই খাড়া হইল]

ফক্কা। আমি···আমার সব মনে পড়েচে। সেই বাড়ী, সেই পাওনাদারের নিত্যি আসা তারপর এই এটর্ণি পিসেমশায়, রক্তবীজ, উইল—এই প্রিয়ে চঞ্চলে—আর এই আমি ফক্কা!

রক্ত। ফক্কা! এঃ, তাইতো হে!—তা এ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?

চঞ্চ। হ্যাঁ, ছাখো দিকি—শ্রাদ্ধশান্তি সেরে, পাঁচ ভূত খাইয়ে খরচের ছরকোট—

রক্ত। তাহলে অক্কা নও তুমি?

ফক্কা। না, অক্কা নই,—ফক্কা···ফক্কা···

লঙ্কা। আর আমি তোমার সেই মাসতুতো ভাই, দাদা, জাল নই, আদি ও অকৃত্রিম লঙ্কা, লঙ্কা···

রক্ত। তাই তো! তা তোমার প্রমাণ? এ্যাদ্দিন...

ফক্কা। তবে শুনুন সকলে—আমি তো ডুবটি দিলুম, অমনি টুপ করে তলিয়ে গেলুম! তারপর গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঠেকলুম একেবারে সেই হুগলির পোলের থামে! মাঝ গঙ্গার সেই মোটা থাম্! বেয়ে ওপরেও উঠতে পারি না, ভেসে পারেও লাগতে জানি না। এমনি ভাবে থেকে থেকে ভিরমি গেলুম। জ্ঞান হলে দেখি, একটি ঢেউয়ের উল্টো ঠ্যালায় একেবারে নৈহাটীর ঘাট! কাদা মেখে উঠলুম,—অমনি সব ভুলে গেলুম! ভিক্ষে করে দিন চালাতে চালাতে চালাতে চালাতে আজ এই এখানে হাজির! তারপর যেই দেখলুম সেই বাড়ী, তার ওপর সেই প্রিয়ে-চঞ্চলে, আর সেই এটর্ণি পিসেমশায়—সেই কাগজের বাণ্ডিল···অমনি সব মনে পড়লো!

রক্ত। ওঃ, ভাগ্যিস সব একত্তর ছিলুম!

ফক্কা। না হলেই গেছলুম আর কি!—তারপর, লঙ্কা ভাই, উইল পড়েচো ভাই?

লঙ্কা। পড়েচি, দাদা—

ফক্কা। ভাখো, রাজী আছো? বখরা আধাআধি? না হলে কতদিন এখন বাঁচবো। বিশেষ একবার মরার পর—রাজী?

লক্কা। রাজা। ভাইরে, ব্যবসায় আমি ফতুর—

ফক্কা। এঁ্যা, ফতুর···! তুমিও—

লক্কা। দেনায় আতুর—

ফক্কা। তুমিও?

লক্কা। পাওনাদারের তাগাদায় হাড়-চুর!

ফক্কা। তুমিও!—উঃ, ভাইরে আমার, এ যে আগাগোড়া মিলে যাচ্ছে। এত মিলের পর মাসতুতো ভাই ছাড়া তুমি যে আর কেউ হতে পারো না ভাই!

লক্কা। তোমার মাসতুতো ভাইই তো আমি। দাদা আমার—

ফক্কা। ভাই লক্কা! (উভয়ের আলিঙ্গন)

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

বেয়া। এঁ্যা—বাবুই তো। বাঁচলুম! যে রকম লক্কার পর লক্কা আসছিল, প্রাণটা গেছলো সকলের!

চঞ্চ। তাহলে পিসেমশায় গো—সব যখন সুরাহা হয়ে গেল, তখন উইলের টাকাটা আর পড়ে থাকে কেন!

রক্ত। না—ও এবার পাকা! তাই তো এসেচি আমি!···অনেক হাঙ্গাম পোয়াতে হয়েছে! আদালতের ব্যাপার কি না! সেই পাঞ্জাবের চীফকোর্ট, আর কাবুলের কাজীখানা। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দরখাস্ত, লোকের পর লোক লাগানো—ওঃ, সমারোহ ব্যাপার! তারপর এ নিয়ে লাট-সাহেবের সঙ্গে আমীরের অবধি চিঠি-চাপাটি! হুলস্থূল বাধিয়ে দিছলুম। টাকার কতক ছিল আমাদের রাজা মার্কা, আর কতক কাবুলের আমারের মুখ-ছাপা। কাবুলের কারেন্সির সঙ্গে লাহোরের কারেন্সির লড়াই যা চলেছিল···ওঃ, এ একেবারে Testamentary Jurisdic- tion-এ ভারী Ruling হয়ে রৈল—তোমাদের দু'ভাইয়ের নামও সেই সঙ্গে অমর!

ফক্কা। কাজের কথা কও—পিসেমশায়!

রক্ত। এর একটি কথা বাজে নয় রে, বাবা! খরচ যেমন হয়েচে, তেমনি ভবিষ্যতের জন্যে আইনের রাস্তা পাকা বাঁধিয়ে দেছ একেবারে! পরে আর কাকেও বেগ পেতে হবে না—সিধে পথে চলে যাবে।—তা, এই নাও, সে-সবের নকল···এই একটা বস্তা—তাহলেও সব মিলিয়ে পাবে! এই আমার বিল—ও আউট-পকেট, ফীজ,—আগাম যা দিয়েচি, সব আছে এতে, সুদ-সমেত।···সব খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও লাখ টাকাটা ঠিকই পুরোপুরি পাওয়া গেছে। তা থেকে খরচ-খরচা বাদ গেলে, এই ভাখো, তোমাদের হিসেবে পাওনা থাকে···থোক্ এই—(কাগজ দেখাইয়া) নগদ, তেরো আনা সাড়ে দশ পাই!

চঞ্চ। এঁ্যা,—পুরোপুরি চোদ্দ আনাও নয়?

রক্ত। না—এ আবার এটর্ণির অ্যাপিসের বিল, ট্যাক্স করা। এর এক পাই এদিক-ওদিক হবার জো নেই!

(ফক্কা ও লক্কা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল)

ফক্কা। লক্কা—ভাই!

লক্কা। দাদা—(উভয়ের হতাশভাব ও এক সঙ্গে মূর্চ্ছা)

রক্ত। শোনো, এখন মূর্চ্ছার সময় নয়—ওঠো—(উভয়ে খাড়া উঠিয়া দাঁড়াইল) তা, এই তেরো আনা সাড়ে দশ পাই—তোমাদের মধ্যে আধাআধি বখরা হচ্ছে না? তা, তার একটা দলিল লেখাপড়া হওয়া দরকার তো! তা তার খরচা—

চঞ্চ। পিসেমশায়—

রক্ত। থাম্‌রে খেঁদি—Professional man আমি, প্রোফেসন আগে,—তারপর আর সব।···attorneyর cost

চঞ্চ। তাই তো বলচি পিসেমশায়,—সে কষ্ট থাক্ আর। আপনার পান-চুরুটের মূল্য বাবদ ওটা আপনিই নিন্।

রক্ত। বেশ, বেশ! তাহলে চুকে গেল হিসেব। লাখ টাকা পেলে? তার এই রসিদটা তবে সই করে দাও। আমিও এই বিলটা সই করে দি—ব্যস্! এই যে ফাউণ্টেন পেন্ আছে! (সকলের তথাকরণ) তাহলে এখন চললুম রে খেঁদি। আপিসে আবার মক্কেল থাটমল্ এসে বসে আছে! কঞ্জুষরামের সঙ্গে তার একটা পার্টনারশিপের দলিল লেখাপড়া হচ্ছে কি না! কি করবো, professional man, ভারী busy! (প্রস্থান)

বেয়া। যা বাবা—সব ফর্শা। আবার সেই পুরানো চাকরি···পাওনাদার তাড়াই···

চঞ্চ। হ্যাঁ গা ওগো,—ও ঠাকুরপো—(লক্কা ও ফক্কার নিরুপায় হতাশভাব)

লক্কা। দাদারে, এই লাখ টাকা?

ফক্কা। লক্কারে, এই লাখ টাকা!

[দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া বেকুবের মত পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল; চঞ্চলা দুইজনের পানে দুইবার চাহিয়া চোখে আঁচল চাপিল]

ভরত-বাক্য—গান

দেখো গো, দোষ ধরো না, রোষ করো না···আর কিছু না,···একটু হাসি!
দিইনে কারো মানে কালি, নয় এ গালি, রং-তামাসা···তার পিয়াসী!
জীবনে দুঃখ আছে, মানিগো তা...তাই বলে কি
দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশে কাটাবে দিন নিরবধি!
বাঁচো তো সত্যি বাঁচো! বাজিয়ে চল প্রাণের বাঁশি!
তাগাদা পাওনাদারের, আপিসে বকুনিটে···
আছে তো···বয়ে গেল!···সে তো ঐ একটু ছিটে,—
এত বড় জীবনটা এ···ফুর্ত্তি রাশি-রাশি!
ফেলে সব গোম্‌ড়া-মুখে বসে থাকা ঘরের কোণে···
বোকামি মস্ত যে সে···হাঁদারাম গাধা বনে'!
হবে কি? কাল হবে সে!···আজ কেন বেঘোরে ভাসি!

যবনিকা

বর্ণাশ্রমধর্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সমাদ্দার মহাশয় শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা পড়িলাম। তিনি যে কষ্ট করিয়া আমার প্রবন্ধটি পড়িয়াছেন এবং আমার ভুল দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন, এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তর্ক দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিতেছি না। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে আমাদের উভয়েরই সত্য নির্ণয়ে কিছু সাহায্য হইতে পারে, এই ধারণায় আমি আরও কিছু বলিতে উদ্যত হইতেছি।

যাঁহারা কিছুই মানেন না, তাঁহাদের সহিত তর্ক করা কঠিন। সৌভাগ্যক্রমে প্রসন্নবাবু সেরূপ নহেন দেখিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহা শিরোধার্য্য করেন বলিয়া বোধ হইল। অপরিসীম জ্ঞানের আধার এবং সর্বভূতহিতেরত মহর্ষি মনুর প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে দেখা যায়। কিন্তু মনুসংহিতা পড়িলে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, মনু জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিবার বিধান দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন যে, জন্মের পর দশম বা দ্বাদশ দিবসে সন্তানের নামকরণ করিতে হয়। কিরূপ নাম রাখা উচিত, এ বিষয়ে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন,

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥২।৩১

ব্রাহ্মণের নাম মঙ্গলসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলসূচক ইত্যাদি হইবে। যদি জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিয়া স্বভাব চরিত্র দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে জন্মের পর দশম বা দ্বাদশ দিনে কিরূপ নাম রাখা যাইবে? পরবর্ত্তী শ্লোকে মনু বলিয়াছেন,

শর্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা থাকিবে ইত্যাদি। জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না হইলে এই নিয়ম কি করিয়া অনুসরণ করা যাইবে?

উপনয়ন সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥২।৩৬

গর্ভের বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে, একাদশে ক্ষত্রিয়ের, দ্বাদশে বৈশ্যের। জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিলে অষ্টম বৎসর বয়সে বালকের স্বভাব চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সে ব্রাহ্মণোচিত গুণযুক্ত হইবে কি না নির্ণয় করা সম্ভব হয় কি? ক্ষেত্রবিশেষে মনু আরও অল্প বয়সে উপনয়নের বিধান দিয়াছেন।

ব্রহ্মবর্চস কামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে ॥২।৩৭

যদি ব্রহ্মতেজ ইচ্ছা করা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পঞ্চম বৎসর বয়সে উপনয়ন দিবে ইত্যাদি। জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিলে ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়?

বিবাহ প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ৷৩।১২

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির বিবাহে সমান বর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করা প্রশস্ত। স্ত্রীর বর্ণ যদি জন্ম দ্বারা নির্দ্ধারণ করা না হয়, তাহা হইলে কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? এরূপ নিয়ম ত হওয়া অসম্ভব—যে স্ত্রী বেদ পাঠ করিবে তাহার বর্ণ ব্রাহ্মণ হইবে, যে যুদ্ধ করিবে তাহার বর্ণ ক্ষত্রিয় হইবে; বিশেষতঃ যখন মনু অষ্টম বা দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহের বিধি দিয়াছেন (মনু ৯ অধ্যায় ৯৪ শ্লোক)। এই সকল দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মনু জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিবার বিধান দিয়াছেন। যদি তথাপি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে দশম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক দেখিলে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সে শ্লোক এইরূপ—

সব বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ ক্ষতযোনিষু।

আনুলোম্যেন সংভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥১০।৫

সকল বর্ণ সমান বর্ণের স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপাদন করে তাহারা পিতামাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিয়া স্বভাব চরিত্র দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিতে হইলে, অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে—কে এই ভাবে বর্ণ নির্ণয় করিবে? রাজা, না, কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি, না, কোন সমিতি? কত বয়সে এইরূপে বর্ণ নির্ণয় করা হইবে? এই ভাবে বর্ণ নির্ণয় করিবার কথা কোথাও শোনা যায় না। প্রত্যুত মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে আপদ্ধর্মের ব্যবস্থা দেখিয়া বোঝা যায় যে, কোন বর্ণ অপর বর্ণের কর্ম করিলেও তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইত না।

প্রসন্নবাবু বলিয়াছেন, "জন্ম মাত্রেই কেহ কোনও বর্ণবিশেষ লাভ কর্ত্তে পারে না। মহর্ষি মনুও বলে গিয়েচেন "জন্মনা জায়তে শূদ্র" ইত্যাদি।" আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে জন্মমাত্রই মানুষ একটা বিশেষ বর্ণলাভ করে—মহর্ষি মনু এ কথা খুব স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" এই শ্লোকটি মনুসংহিতাতে খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রকৃতিবাদ অভিধানে "দ্বিজ" শব্দের নীচে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখিলাম:

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।

বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥

এ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ হয়; কিন্তু উপনয়ন সংস্কারের পূর্বে দ্বিজ হয় না। সুতরাং এই শ্লোক প্রসন্নবাবুর মত সমর্থন করে না।

অতঃপর দেখা যাউক, বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ অভিমত। শ্রীকৃষ্ণের মতে কি মনুষ্যের বর্ণ তাহার জন্ম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং সেই বর্ণের বিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিবে? না, তিনি বলেন যে, মনুষ্যের প্রবৃত্তি এবং যোগ্যতার দ্বারা তাহার বর্ণ নির্দিষ্ট হইবে। মহাভারতের সময় এবং তাহার পূর্বে রামায়ণের সময় যে জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রথা যে নিন্দনীয়, শ্রীকৃষ্ণ কোথাও এ কথা বলেন নাই। ভগবদ্গীতার মূল কথা এই—অর্জুন ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধ করাই তাহার কর্ত্তব্য,—ক্ষত্রিয়ের কর্ম যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের কর্ম ভিক্ষাবৃত্তি তাহার গ্রহণ করা উচিত নহে। শাস্ত্রবিহিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রবিহিত ধর্মের রক্ষাকর্ত্তা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। গীতার নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক হইতে তাহা বোঝা যায়।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

১৬ অধ্যায় ২৩, ২৪ শ্লোক

"যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে সে সিদ্ধিলাভ করে না, সুখ পায় না, এবং মোক্ষলাভ করে না। কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের বিধান জানিয়া তোমার কর্ম করা উচিত।"

সকল শাস্ত্রেই আছে যে জন্ম দ্বারা বর্ণ নিদিষ্ট হয়। সকল স্মৃতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনুসংহিতা হইতে শ্লোক তুলিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, মনু এ কথা স্পষ্ট ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ

সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।১৮।৪৮

"হে অর্জুন, জন্মের সহিত যে কর্ম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না। অগ্নি যেরূপ ধূম দ্বারা আবৃত থাকে সেইরূপ সকল কর্ম দোষ দ্বারা আবৃত থাকে।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের জন্ম দ্বারা তাহার বর্ণ নির্দিষ্ট হইবে ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত। কারণ, এই শ্লোকে তিনি বলিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের যে কর্ম কর্ত্তব্য, তাহা তাহার জন্মের সময়ই ঠিক হইয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম কি, তাহা তিনি পূর্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের কর্ম শম দম তপস্যা ইত্যাদি, ক্ষত্রিয়ের কর্ম যুদ্ধ, বৈশ্যের কর্ম কৃষিবাণিজ্য এবং শূদ্রের কর্ম দ্বিজাতি সেবা। এখন এই সকল কর্ম যদি মানুষের জন্মের সময়ই নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের বর্ণও জন্মের সহিত নির্দ্ধারিত হয় বলিতে হইবে। জন্ম দ্বারা যদি বর্ণ নির্দ্দেশ করা না হয়, তাহা হইলে কে প্রত্যেক মানবের স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে,—রাজা, না কোন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ?—

এ কথা শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কিছু বলেন নাই। দ্রোণাচার্য্য এবং তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধ-ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব জন্ম দ্বারা যদি তাঁহাদের বর্ণ নির্দেশ না করিয়া স্বভাবের দ্বারা বর্ণ নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া ক্ষত্রিয় বলা উচিত। কিন্তু অশ্বত্থামা যখন গুপ্তভাবে শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে হত্যা করেন এবং অর্জুন যখন তাঁহাকে কি শাস্তি দিবেন এ কথা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে কখনও বধ করা উচিত নয়। উহার মাথার মণি কাটিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও।" শ্রীকৃষ্ণ ত এমন কথা বলিলেন না যে অশ্বত্থামা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়, তাহাকে বধ করিতে পার। গীতার ৩য় অধ্যায় ২৪ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যা ইমা প্রজাঃ॥

"আমি যদি কর্ম না করি তাহা হইলে পৃথিবী উৎসন্ন যাইবে; বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং প্রজারা নষ্ট হইবে।" জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দেশ না করিলে বর্ণসঙ্করের কথাই উঠিতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রীর বর্ণ ভিন্ন হইলে সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা যায়। স্বামীর বর্ণ জন্ম দ্বারা নির্দেশ না করিয়া তাঁহার কর্ম দ্বারা নির্দেশ যেন করা গেল; কিন্তু স্ত্রীর বর্ণ কর্ম দ্বারা নির্দেশ করা যায় না ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দেশ না করিলে ইহা বলা যায় না— অমুক লোকের ইহা নির্দিষ্ট এবং কর্ত্তব্য কর্ম। প্রসন্নবাবু বলিয়াছেন, যাহার যা ইচ্ছা কর্ম করুক; সেই কর্ম দ্বারা প্রত্যেকের বর্ণ নির্দেশ করা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলিয়াছেন, যাহার যে বর্ণ সেইরূপ কর্ম করা তাহার উচিত। এজন্য চারি বর্ণের কর্ম নির্দেশ করিয়া ভগবান বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥ ১৮।৮৭

"পরের ধর্ম (বা কর্ত্তব্য কর্ম) ভাল করিয়া করা অপেক্ষা, নিজের ধর্ম খারাপ করিয়া করাও ভাল। নিজের স্বভাব দ্বারা যে কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে সে কর্ম করিলে পাপ হয় না।"

তাহার পরেই ভগবান বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমে নাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

(অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে)

জন্ম আকস্মিক ঘটনা নহে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্ম এবং প্রবৃত্তি অনুসারে জন্মলাভ করে, ইহা বিশ্বাস করিলে জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দেশ হওয়া অনুচিত মনে হইবে না।

এই সকল কথা যদি মনে রাখা যায়, তাহা হইলে প্রসন্নবাবু গীতার যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ সহজেই গ্রহণ করা যায়।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।" গুণ এবং কর্মের বিভাগ দ্বারা ভগবান চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ প্রধান; তাহার কর্ম শম দম তপ আদি। ক্ষত্রিয়ের সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণ প্রধান; তাহার কর্ম যুদ্ধ। বৈশ্যের তমোমিশ্রিত রজোগুণ প্রধান; তাহার কর্ম কৃষি, বাণিজ্য। শূদ্রের রজোমিশ্রিত তমোগুণ প্রধান; তাহার কর্ম শুশ্রূষা। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম কোনও মনুষ্যের কীর্ত্তি নহে। স্বয়ং ভগবান এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিয়াছে। এখানে ভগবান স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না বটে যে, যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি সে সেইরূপ জন্মলাভ করে, এবং সেই জন্ম দ্বারা তাহার বর্ণ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ভগবান অন্যত্র যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্য কোনরূপ অর্থ করা যায় না। ফলতঃ, প্রসন্নবাবু বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং জাতিভেদের মধ্যে যে পার্থক্য কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ কোন পার্থক্য নাই। ভারতবর্ষে কখনও কোনও কালে যে বর্ণ জন্ম দ্বারা নির্দিষ্ট হইত না, জন্মের কথা বিবেচনা না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব এবং কর্ম দ্বারা বর্ণ নির্ধারিত হইত, ইহা আমাদের জানা নাই। প্রসন্নবাবু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রসন্নবাবু বলেন, জাতিভেদ প্রথার ফলে সমাজের উচ্চ জাতি নিম্ন জাতিকে ঘৃণা করে। কিন্তু ঘৃণার কথা জাতিভেদের মধ্যে কোথাও নাই। নিষ্ঠাবতী বিধবা রমণী আহার করিবার সময় আত্মীয় বালককেও স্পর্শ করেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বালককে ঘৃণা করেন না। কোন

কোন ইংরেজ জাতিভেদ মানেন না ; নিম্ন জাতীর কুলির হাতে জল খাইতে কাহারও আপত্তি নাই ; কিন্তু কুলি পাখা টানিতে শৈথিল্য করিলে পদাঘাতে প্লীহা ফাটাইতে ইতস্ততঃ করেন না এমন ইংরেজ প্রভুও দেখা যায়। রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহের লেখায় এই যুক্তিটি পড়িয়াছিলাম। তিনি দেখাইয়াছিলেন, আহার বিষয়ে সংযমবিধি ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। যথেচ্ছ আহার বিহার না করিয়া সকল বিষয়ে বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে চরিত্রবল দৃঢ় হয়। অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা আহার বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করা বেশী প্রয়োজনীয়। জাতিভেদের দোহাই দিয়া যেখানে ঘৃণা এবং অত্যাচার প্রচলিত হইয়াছে, সেখানে সেই ঘৃণা এবং অত্যাচার উঠাইয়া দেওয়াই সমীচীন ; কিন্তু এ কারণে জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নহে। মহাত্মা গান্ধীও এইরূপ পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে নিম্নশ্রেণীর উপর যে অত্যাচার হয়, তাহার জন্য জাতিভেদ দায়ী নহে। জাতিভেদ প্রথার মূল কথা এই যে, চারি বর্ণ ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই মূল কথা মানিলে কোন বর্ণকে ঘৃণা করা চলে না। মনুও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, চারি বর্ণ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ নাই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এই চারি বর্ণ ছাড়া এক "পঞ্চম" বর্ণের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপর সামাজিক অত্যাচার হইয়া থাকে। শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রের উপর অত্যাচার করা যায় না ; এই জন্যই দক্ষিণ ভারতে অশাস্ত্রীয় পঞ্চম বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দক্ষিণ ভারতে নিম্নজাতির উপর যে অত্যাচার হয়, তাহার জন্য জাতিভেদকে দায়ী করা যায় না। যে দেশে জাতিভেদ নাই, সেখানেও এরূপ অত্যাচার হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে জাতিভেদ নাই, কিন্তু সেখানেও কৃষ্ণবর্ণের উপর অত্যাচার হয়, এবং সে অত্যাচার দক্ষিণ ভারতে নিম্নশ্রেণীর উপর যে অত্যাচার হয় তাহা অপেক্ষা বেশী গর্হিত এ কথা মহাত্মাজি বলিয়াছেন।

প্রসন্নবাবু লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদের ফলে "আমাদের সমাজের ভিতর জাতীয় শক্তিক্ষয়কারী অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েচে।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধ আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদের ফলে আমাদের সমাজে শান্তি আছে এবং জাতিভেদ নাই বলিয়া পাশ্চাত্য সমাজে সর্বদা অন্তর্বিপ্লবের চেষ্টা চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, সমাজে কতকগুলি লোকের হীনবৃত্তি অবলম্বন না করিলে চলে না, এবং কে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিবে তা' "রাজ-শাসনে যদি পাকা করা হ'ত তা হ'লেও তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকৃত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থামৃত না", "আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম শাসনের অন্তর্গত ক'রে দেওয়াতে এ রকম অসন্তোষ এবং বিপ্লব চেষ্টার গোড়া নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে" "তা'তে মানুষকে শান্ত করে "

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৩)

উৎসব ও পার্ব্বণ উপলক্ষে জার্ম্মাণীর স্ত্রীপুরুষেরা সবাই বেশ সুরঙ্গীন বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'য়ে আমোদ প্রমোদে যোগদান করে। এ বিষয়ে সহরের লোকদের সঙ্গে গ্রামের লোকদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই,—তারতম্য যা কিছু সে কেবল প্রমোদ-সূচীর তালিকা ও রঙ্গরসের সরেশ বা নিরেশ 'রকমের' উপর নির্ভর করে। গীতবাদ্য ও নৃত্য তাদের আনন্দ-উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। রাজপ্রাসাদ ও ধনীর অট্টালিকা থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রামের কুঁড়ে ঘর ও গ্রামপ্রান্তের নির্জ্জন ক্ষেত্র বাড়ীটিতেও যে-কোনও একটা কিছু উপলক্ষে নাচের আসর বসতে দেখা যায়। নাচের প্রতি এ জাতটারই এমন একটা প্রবল অনুরাগ যে অনেক সময় প্রভু ভৃত্য বা দাসী ও কর্ত্রীর সম্বন্ধের ব্যবধান পর্য্যন্ত দূরে ঠেলে রেখে এরা একত্রে নৃত্যানন্দ উপভোগ করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। বিশেষ 'নবান্ন' বা

'নোতুন ধানের উৎসবের দিন' ত মজুর মনিব, উচ্চ নীচ বা ধনী দরিদ্রের কোনও পার্থক্য রাখা এদের নাচের আসরে একেবারেই নিষেধ!

জন্ম, শুদ্ধি (Baptism) নামকরণ (Christenings) বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি—এর কোনও অনুষ্ঠানটা থেকেই নাচটা বাদ পড়ে না। বিবাহ উপলক্ষে ত' একেবারে সপ্তাহকাল ধ'রেই নৃত্য চলে। জার্ম্মাণীর গ্রাম্যসমাজে এখনও এমন কতকগুলি প্রাচীন নিয়ম প্রচলিত আছে, যা সহর থেকে বর্ত্তমানে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। যেমন আগে নিয়ম ছিল প্রত্যেককেই পত্নী ক্রয় ক'রতে হবে! এ যুগে আর কোনও পিতাই কন্যা বিক্রয় করেন না বটে, কিন্তু সেই চিরাচরিত প্রথাটি একেবারে লোপ পায়নি। গ্রামের মধ্যে এখনও নিয়ম আছে—বরকে বিবাহের দিন বধূর হাতে কিঞ্চিৎ অর্থ উপহার দিতে হবে! বর্ব্বর যুগে প্রথা ছিল যে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেবার সময় তার নিজের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যাদি তার সঙ্গে সমাধিস্থ ক'রতে হবে! আজ আর সে প্রথা নেই বটে, কিন্তু তার কঙ্কালসার অস্তিত্বটুকু এখনও চোখে পড়ে! এখন দেখা যায় যে, মৃতের কোনও না কোনও একটি প্রিয় সামগ্রী তার সঙ্গে আজও শবাধারে স্থাপন করা হচ্ছে! কোথাও বই, কোথাও তাশ, কোথাও খেলবার ব্যাট ; কোথাও লেখবার কলমটি বা আঁকবার তুলিটি—এইরকম।

রুগ্ন ছাত্রদের পাঠশালা। (পাইন কুঞ্জের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে অসুস্থ ছেলে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে জার্ম্মাণীর শিক্ষা বিভাগ।)

ভোজনের পর।
(মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'চ্ছে তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই ক'রতে শেখে। আহারের পর ছেলেমেয়েরা তাদের ভোজন-পাত্র পরিষ্কার করছে।)

কোন কোন অঞ্চলে আবার প্রত্যেক মৃতের সঙ্গে আশী চিরুণী সাবান ও তোয়ালে দেওয়া একেবারে একটা অপরিহার্য্য নিয়মের মধ্যে গণ্য হয়। মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর লিখিত প্রেমপত্রগুলি কবরে দেওয়া এবং মৃত স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহরাত্রের পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি সমাধিস্থ করাও স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বা মৃতের পরকালকে সৌভাগ্য-মণ্ডিত করবার কল্পনায় তার মুখের মধ্যে একখণ্ড স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা রেখে দেওয়া হয়। অনেক স্থলে আসন্ন-

মৃত্যু রোগীর ঘরের জানালা দরজা সমস্ত দিনরাত খুলে রেখে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে, রোগীর আত্মা-বিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ছেড়ে যাতে গন্তব্য লোকে বেশ অবাধে ও অনায়াসে যেতে পারে!

খৃষ্টের জন্মদিনের উৎসব সর্ব্বত্রই প্রায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। তাছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক ছোটখাটো ধর্ম্ম-পার্ব্বণেও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত আছে। যেমন 'সেণ্ট্ জনে'র পর্ব্বদিন উপলক্ষে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যা

গির্জ্জার পথে। (গ্রাম্য চাষার মেয়েরাও প্রতি রবিবার দল বেঁধে ভাল পোষাক পরে নিয়মিতভাবে গির্জ্জায় যায়।)
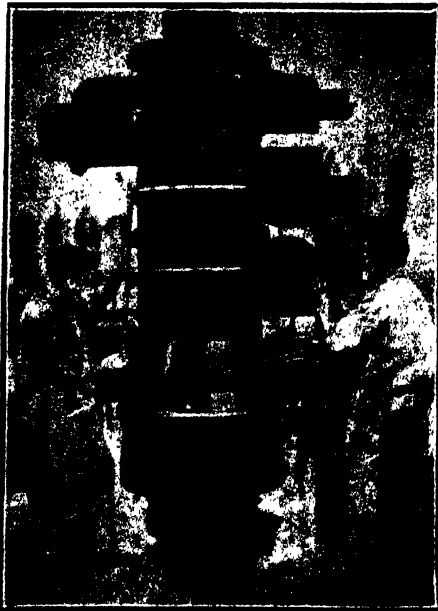
লোহা ঢালাই করবার জন্য ছাঁচ তৈরী হচ্ছে।

চুরুটের কারখানায় তামাক পাতার পাট।

পর এক একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হয়; এবং সেই সেই পাড়ার আসন্ন বিবাহোন্মুখ যুবক যুবতী বা প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদের যুগলে মিলে সেই অগ্নিকুণ্ড উল্লঙ্ঘন করে যেতে হয়! এই তামাসা দেখবার জন্য পাড়ার ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সবাই এসে সেই উৎসব-মণ্ডপে সমবেত হয়।

এই দুরন্ত সভ্যতার যুগেও জার্ম্মাণী থেকে কুসংস্কার এখনও একেবারে বিদূরিত হয়নি। তুকতাক্ প্রভৃতি ভৌতিক ও

বেতের চেয়ার তৈরি হচ্ছে।

বার্লিনের পথে বেতের তৈরী জিনিসের ফেরি।

অলৌকিক ব্যাপারের উপর আজও তাদের সম্পূর্ণ আস্থা দেখতে পাওয়া যায়। আজগুবী গল্প-গাথা ও নানা বিচিত্র বিস্ময়কর রূপকথার প্রচলন জার্ম্মাণীতে যেমন আছে, তেমনটি আর য়ূরোপের কোথাও নেই। বিশ্ববিশ্রুত জার্ম্মাণ গীতিনাট্যকার 'ওয়াগনারের' একাধিক রচনার ভিত্তি-উপাদান এই সকল প্রাচীন উপকথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সকল গল্পের অধিকাংশেরই মূলে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে,—সবগুলি একেবারেই নিছক কাল্পনিক কাহিনী নয়। এছাড়া জার্ম্মাণীর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে তার 'কবির গান'! এ অনেকটা আমাদের দেশের বাউল গানের মতো! এই গানগুলি থেকে এদের জীবনযাত্রা, চিন্তার ধারা, ভাব ও কল্পনা, আনন্দ ও বেদনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এ গানের অধিকাংশই যুদ্ধ-বিগ্রহের বীরত্ব-গাথা, রণজয়ের কীর্ত্তিকাহিনী, জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক বহু বিখ্যাত ইতিকথা, মৃগয়া, অরণ্য, পর্ব্বত, উপত্যকা, নদনদী, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সুরা ও

বেত শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সুন্দরী, পারিবারিক রহস্য, পাপ পুণ্য প্রেম, প্রতিহিংসা, পশু, পক্ষী, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

বেতের চেয়ারের কারখানা।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, গণতন্ত্রমূলক শাসনের অধীনে এলেও জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক বিভাগ অনেকটা সেই পূর্ব্বের বিভাগই মেনে নিয়েছে। জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান প্রদেশ-গুলির মধ্যে পাঁচটিই সর্ব্বপ্রধান। কি লোক-সংখ্যার অনুপাতে, কি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সমৃদ্ধির হিসাবে প্রাশীয়া, বাভেরীয়া, স্যাক্সনী, উর্টেম্বার্গ ও বেডেনই হ'চ্ছে জার্ম্মাণীর গর্ব্ব করবার মতো পাঁচটি প্রদেশ! জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় উচ্চ মন্ত্রণা-পরিষদে ৬৬ জন সভ্যের মধ্যে পঞ্চাশজন প্রতিনিধি আছেন কেবল এই পঞ্চ প্রদেশের। এই পাঁচটি প্রদেশ সম্বন্ধে একটু পৃথক পৃথক পরিচয় দিলেই বোধ হয় জার্ম্মাণী সম্বন্ধে সব কথা বলা হ'তে পারে।

বেডেন—বেডেনকে অনেকে বলে কৃষ্ণারণ্য ভূমি (the land of the black forest)। বেডেন আকারে প্রায় ইংলণ্ডের ওয়েল্‌স্‌ প্রদেশের সঙ্গে সমান। অধিবাসীদের মধ্যে একটা ধর্ম্মগত পার্থক্য খুব বেশী পরিমাণে থাকলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে বা ধর্ম্ম নিয়ে এই দুই বিভিন্ন সম্প্রদায় কোনও দিনই দাঙ্গা ক'রে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত করেনি। পরস্পর

সদ্য-প্রস্তুত 'পণীর' পাকাবার জন্যে 'ছাঁচ' থেকে তুলে তাকের উপর সাজিয়ে রাখা হচ্ছে।

উভয় সম্প্রদায়কে সম্মান করে এসেছে খাতির করে এসেছে, এবং সব চেয়ে দ্রষ্টব্য ব্যাপার হচ্ছে—তারা পরস্পরের দুর্ব্বলতা পর্য্যন্ত সহ্য করে এসেছে।

চাষের কাজ এখানে খুব বিস্তৃতভাবে কেউ না করলেও, ছোটখাটো ক্ষেতের মালিক এখানে অনেক আছে। তাদের চাষের কাজ অল্প-স্বল্প ও যৎসামান্য হ'লেও

শিক্ষানবীশদের 'পণীর' প্রস্তুতপ্রণালী শেখানো হচ্ছে।

তারা কিন্তু নানান রকমের ফসল উৎপাদন করে! অবশ্য তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে ধান ও আলু। আঙুরের চাষও এখানে প্রচুর; কারণ এইখানেই আঙুর থেকে অতি সুমিষ্ট ও সুপেয় সুরা প্রস্তুতের কারখানাও আছে। তামাকের চাষও এখানে নিতান্ত অল্প নয়।

বেডেনের মতো একটি ছোট প্রদেশেও কিন্তু এমন একাধিক শহর আছে, যার নাম পৃথিবীর লোক জানে! 'কার্লশ্রূ' এখানকার প্রধান শহর। এই শহরের রাজপ্রাসাদটি একটি দর্শনীয় বস্তু। নিন্দুকেরা প্রায়ই বলে বটে

তামাক পাতা শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকবে বলে 'পনীর' ছাঁচের মধ্যে লবণাক্ত করা হচ্ছে।

যে শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এ শহর একেবারে বাসের অযোগ্য! কিন্তু সেটা সত্য কথা নয়।

আরও উত্তরে রাইনের তীরে এর দ্বিতীয় প্রধান শহর 'ম্যানহিম্' পৃথিবীর লোকের পরিচিত, কারণ এটি একটি শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়-প্রধান স্থান। এই শহরটি প্রথমে নির্ম্মিত হ'য়েছিল 'শত্রুঞ্জ' খেলার ছকের মতো আকারে। সোজা সোজা রাস্তা চলে গেছে আড়া-আড়ী ভাবে পরস্পরকে অতিক্রম করে এবং তারই মাঝে মাঝে ছকের ঘরের মতো চৌকো ভূখণ্ডে একই ছাঁচের ভবন-শ্রেণী নির্ম্মিত হ'য়েছিল, নগর-চত্বর আকারে। পথ-নির্দ্দেশের ব্যবস্থা হয়েছিল বর্ণমালার হিসাব অনুসারে। কিন্তু আজ আর 'ম্যানহিম্' সেইটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নেই, আজ সে তার সেই 'শত্রুঞ্জ' নক্সা ছাড়িয়ে আরও চারিদিকে বিস্তৃত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে! ম্যানহিমের একাধিক গৃহের স্থাপত্য-শিল্পও অতি সুন্দর।

রাইণ ও নেকার নদীর সংযোগস্থলের সন্নিকটে স্থাপিত 'হাইডেল্‌বার্গ' শহর তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে পড়েছে। শিক্ষার্থী ছাত্রের দল এই শহরটিকে খুবই

পাঁচটি মেয়ে নিয়ে চাষা-বউ বেড়াতে বেরিয়েছে।

ভালবাসে। বহুকালের একটি প্রাচীন দুর্গ এই শহরের একটা মস্ত সম্পদ। দূর অতীতে কোন্ এক ফরাসী রাজা নাকি এই দুর্গ আক্রমণ ক'রেছিল, তার কামানের আঘাত-চিহ্ন এর অঙ্গে এখনও বর্ত্তমান! বিক্ষত-দেহ হলেও এ দুর্গের শোভা ও সৌন্দর্য্য মনোহর। কৃষ্ণারণ্যের পাদমূলে আর একটি শহর গড়ে উঠেছে 'ফ্রাইবার্গ'। এটিকেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শহরই বলা যেতে পারে। এই অঞ্চলে ধাতুঘটিত রাসায়নিক গুণসম্পন্ন বহু ঝর্ণার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়!

বেডেনের প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে যে উর্টেম্বার্গ শহরের সঙ্গে এও শ্বোয়ার্জওয়ল্ড বা কৃষ্ণারণ্যের (Black Forest) অংশীদার! কার্লস্রুর দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে বরাবর একেবারে ফ্রাইবার্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই বিশাল বন বিস্তৃত হয়ে আছে!

বাভেরীয়া—বাভেরীয়া স্কটল্যাণ্ডের চেয়ে আকারে ঈষৎ ছোট হ'লেও লোকসংখ্যায় সে স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্‌কে ছাড়িয়ে গেছে। বাভেরীয়ার অধিকাংশ অধিবাসীই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে স্বার্থপর, আত্ম-সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতি-প্রয়াসী প্রদেশ হচ্ছে এই বাভেরীয়া। নিজের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকার—কি সামাজিক—কি রাষ্ট্রীয় দুই রক্ষা করে চলবার একটা সতর্ক চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা যায় এই বাভেরীয়ার অধিবাসীদের সকলেরই। বাভেরীয়া ও প্রাশীয়ার মধ্যে একটা বিষম রেষারেষির ভাব দেখতে পাওয়া যায়। পরস্পর কেউ কাউকেই চক্ষে দেখতে পারেন না। বাভেরীয়া প্রাশীয়াকে হিংসা করে তার বৃহত্তর আকারের জন্য, তার অমিত শক্তির জন্য, ও তার বিপুল সম্পদের জন্য; এবং প্রাশীয়া বাভেরীয়াকে দেখতে পারে না তার ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য, তার গ্রাম্য রূঢ়তার জন্য ও সহজ সচ্ছলতার জন্য। উভয় প্রদেশেরই যথেষ্ট ঔদ্ধত্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে এক দল প্রাচুর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত, অন্য দল অভাবের অহঙ্কারে উদ্ধত!

জার্ম্মাণ চাষী মজুরদের চমৎকার বাড়ী।

তৈরী 'পনীর' ছাঁচে ফেলা হচ্ছে।

বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে এক মেক্লেনবার্গ শোয়েরীন্ ছাড়া বাভেরীয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশকেই কৃষিজীবী বলা যেতে পারে। প্রচুর শস্য উৎপাদন করা ছাড়া এখানকা

প্রধান ব্যবসায় হ'চ্ছে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত "বিয়ার মদ" প্রস্তুত করা। এই বাভেরীয়াই সমস্ত জার্ম্মাণীকে "হপ্‌লতা" সরবরাহ করে। এই 'হপ্‌লতা' অনেকটা আমাদের দেশের চিরতার মতো, এবং 'বিয়ার' মদের উহাই সর্ব্বপ্রধান উপাদান। পুরাকালে এদেশের ঋষিরা এরই নাম সোমলতা রেখেছিলেন কি না, তা ঠিক বলা যায় না। বীয়ারের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও সুস্বাদু মদও বাভেরীয়া দিতে পারে, কারণ এখানে আঙুর ক্ষেতেরও অভাব নেই।

বৈদ্যুতিক উপায়ে ধাতব দ্রব্যাদি কলাই করা হ'চ্ছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য। পর্ব্বত হ্রদ তড়াগ ও নদী কাননাদি পরিবেষ্টিত স্বভাব-শোভায় বাভেরীয়া সুন্দরতম প্রদেশ। এর সর্ব্বপ্রধান শহর মিউনিক্ একটি জগদ্বিখ্যাত নগর। এই নগরের সংস্থাপক নৃপতি ম্যাক্স্ পণ করেছিলেন যে তিনি এমন শহর নির্ম্মাণ করাবেন যে কেবল সেই শহরটি দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে জার্ম্মাণীতে লোক আসবে! তাঁর সে আশা অনেকটা সফল হয়েছে বটে,—জার্ম্মাণীতে গিয়ে মিউনিক্ না বেড়িয়ে এলে জার্ম্মাণী দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ন্যুরেম্বার্গও বাভেরীয়ার একটি উল্লেখযোগ্য শহর। স্কুলের ছেলেরা এই শহরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত; কারণ তাদের লেখবার লেড্ পেন্সিল বা উড্‌পেন্সিল এইখানেই তৈরী হয়। এ শহরটিও দেখতে অতি সুন্দর।

বাভেরীয়ার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত ইতি-কথার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ব'লে এখানকার প্রাচীন শহর 'হাম্বার্গ' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

গেঁয়ো বাভেরীয়া বহির্জগতের গতি ও উন্নতির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে আপনার সঙ্কীর্ণ চতুঃসীমানার মধ্যে আপনার প্রাচীন রীতি নীতি ও দৈনন্দিন জীবন-যাপন-প্রথার ইচ্ছানুরূপ অনুসরণ করে চলেছে। এখানকার বড় বড় কৃষিব্যবসায়ীরা বৈজ্ঞানিক চাষবাসের আধুনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও বেশ উন্নত সুসমৃদ্ধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ভারতের লোকসংখ্যা বনাম দারিদ্র্য

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল্

আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখে অনেক দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার বিলাত-যাত্রার পথে তাঁহার কোনও সহযাত্রী ইংরাজ সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে না কি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রজাসংখ্যা-বৃদ্ধিই তাহার এই বর্ত্তমান দারিদ্র্যের প্রধানতম কারণ। বন্ধুবর না কি এই অপবাদ ইতঃপূর্ব্বে স্থানে স্থানে শুনিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে এমন কোনও প্রমাণ ছিল না, যাহা দ্বারা তিনি এই অপবাদ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে পারেন। কাজেই তিনি নিরুত্তর রহিয়া গেলেন এবং সিভিলিয়ানপ্রবর মুক্তির উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন—"প্রজা-বৃদ্ধি রহিত করিবার চেষ্টা কর।" এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে,তাঁহার সহযাত্রী ইংরাজ সিভিলিয়ানটী বয়সে প্রবীণ হইয়াও অবিবাহিত ছিলেন।

কথাটা এতই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে যে, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হইয়া সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে; অথচ তাহাদের অন্ন-সংস্থানের জন্ত তাহাদের নিজেদের কোনও চেষ্টা নাই। এ অবস্থায় দারিদ্র্যের পীড়ন অবশ্যম্ভাবী। এই লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কতখানি সম্পর্ক এবং কতখানিই বা অসম্পর্ক, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গ-ক্রমে এতৎ সম্পর্কীয় অন্যান্ত কথাও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

"দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য বাড়ে না" এই নিয়মটী ম্যালথাস্ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিৎ আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্থনীতিতে ইহাকে ম্যালথাসের নিয়ম বলে। কথাটা খুবই খাঁটী। তিনি দেখাইয়াছেন যে বিধাতার সৃষ্টি ও সংহার-লীলা আশ্চর্য্য রকমে সামঞ্জস্য রাখিয়া পৃথিবীর মানবগণের মরণ-বাঁচন প্রশ্নের অনেকটা সমাধান করিয়া দিতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, জাহাজডুবি, নৌকাডুবি, রেলওয়ে-সংঘর্ষণ ইত্যাদি সবই এই মরণ-বাঁচন-রহস্য লইয়া। তবু এই দারিদ্র্যের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত মানবসমূহকে সর্ব্বদাই নিজের চেষ্টার দ্বারা নানা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। এই উপলক্ষে নানা পন্থা খুঁজিতে যাইয়া তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ করিতে এবং জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া সংসারী লোকের পক্ষে সংযম অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। পরিপূর্ণ জীবন এবং পরিপূর্ণ সমাজ লইয়া বাঁচাই প্রকৃত বাঁচিয়া থাকা। এই ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবনের পূর্ণতার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেহ এবং মন উভয়কেই শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সোণার পাতে মোড়া জিনিষ ও খাঁটি নিরেট সোণার জিনিষ উভয়েরই বহিরবয়ব এক প্রকারের; কিন্তু ওজন করিলেই উভয়ের প্রকৃত মূল্য ধরা পড়ে। সেইরূপ মানব-সমাজ "প্রকৃত মানুষের সমাজ" হইলেই তাহার যথার্থ সার্থকতা হয়। ধনে, সম্পদে, মনের শক্তিতে—সকল দিক দিয়াই সে যথার্থ ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে। কথাটী চিরন্তন সত্য। সকল দেশ ও সকল জাতির পক্ষেই এই সত্যটী তুল্য মূল্যবান; কিন্তু আক্ষেপ এই যে, ভারতবর্ষ লইয়াই যত কথা উঠিতেছে, অন্ত দেশ লইয়া তত নয়। এ জাতের যেন কোনও দায়িত্ববোধ নাই—এই হইতেছে যত বিদেশীয় পণ্ডিতগণের দুঃখ।

এখন এই সম্বন্ধে একটু হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা যাক্। ১৯১১ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩১৫,১৫৬,০০০ ছিল। ১৯২১ সালে এই লোক-সংখ্যা বাড়িয়া ৩১৮,৯৪২,০০০ তে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং গত দশ বৎসরে মাত্র ৪,০০০,০০০, লোক অথবা লোক-সংখ্যা শতকরা ১'১ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্ত দেশের তুলনায় এই বাড়তি যে একান্তই নগণ্য তাহা একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইতে পারে। ঠিক ঐ সময় মধ্যে ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে শতকরা ৪.৮ এবং আমেরিকাতে ১৪.৯ করিয়া বাড়িয়াছে। জাপানে ১৮৯৬—১৯২০, এই ২৪ বৎসরে শতকরা ৮৩ জন এবং রুসিয়াতে ১৮৯০—১৯১৪ এই ২৪ বৎসরে শতকরা ৫০ জন লোক বাড়িয়াছে। ১৯০১—১৯১১ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৯১১—১৯২১ এই পরবর্ত্তী দশ বৎসরে তাহার এক ষষ্ঠাংশ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের এই লোক সংখ্যা-বৃদ্ধির হার এত অস্বাভাবিক রকমে কম যে, এই সামান্ত বৃদ্ধির হারের জন্ত আশঙ্কান্বিত না হইয়া বরং এই ক্রমঃক্ষয়ের জন্ত প্রত্যেক ভারত-হিতার্থীর চিন্তিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক বর্গ-মাইল প্রতি বেলজিয়ামে ৬৫৮, ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ৬৪৯, হলাণ্ডে ৫৩৬, ইটালীতে ৩১৬, জার্ম্মেনীতে ৩১১, জাপানে ৩২০, সুইজারল্যাণ্ডে ২৩৭ এবং ভারতবর্ষে ১৭৭ জন লোকের বাস। দেশের আয়তন, লোক-সংখ্যা এবং উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণের তুলনা করিলে এক ভারতবর্ষ ব্যতীত ইহাদের প্রত্যেক দেশকে লোক-সংখ্যা-ভার-প্রপীড়িত দেশ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌স নিজেদের জন্ত যে পরিমাণ খাদ্য যোগাড় করিতে পারে, তাহার তুলনায় তাহাদের লোকসংখ্যা অসম্ভব রকম বেশী। এক রকম সম্পূর্ণ ভাবে

বিদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য আমদানী করিয়া তাহাদের এই লোকদের প্রতিপালন করিতে হয়। এই সব সত্ত্বেও কোন কোনও বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন।

কলকারখানার প্রবর্ত্তনে জগতের অন্যান্য জাতি যখন ধীরে ধীরে তাহাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়া যুগের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, ভারতবর্ষ তখন বিদেশজাত সুলভ পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতি পদে ব্যাহত হইয়া নিতান্ত অসহায়ের মত সাহায্য খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রবর্ত্তিত বাণিজ্য-নীতি অসহায় ভারতীয় বাণিজ্যকে আরও অসহায় অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী মাল রপ্তানি হওয়ার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ শুধু কাঁচামাল রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। হাজার হাজার কারিকর অভ্যস্ত কাজ ছাড়িয়া পেটের দায়ে গ্রামে গ্রামে অন্ন-সংস্থানের জন্য নানা পন্থা অবলম্বনের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। দেশের সর্ব্বত্র আয়-ব্যয়ের হিসাবে একটা অসম্ভব গোলমাল হইয়া গেল। মহামতি রাণাড়ে দেশের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ভারতে ইংরাজ-বাণিজ্য-নীতির ব্যভিচারের কথার উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে শতকরা ৯.৫ জন, ইংলণ্ডে ৭৮ জন, আমেরিকাতে ৫১.৪, ফ্রান্সে ৪২.২ এবং জার্ম্মেণীতে শতকরা ৪৫.৬ জন লোক সহরে বাস করে। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের লোক যে প্রায় সবই গ্রামে বাস করে, তাহা বেশ বোঝা যায়। ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৩০,০০০ হাজার গ্রাম আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ক্রমে ক্রমে দেশে সহরবাসী লোকের সংখ্যা বাড়িতে পারে; কিন্তু তাহা এত মন্থর গতিতে চলিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে গ্রামপ্রধান বা কৃষিপ্রধান দেশ বলিলে একটুও অতিরিক্ত বলা হয় না। এ দেশের লোকের ভিতর শতকরা প্রায় ৭২ জন লোক শুধু জোত-জমির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। ফ্রান্সে, আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে যথাক্রমে ঐ স্থলে শতকরা ৪২, ৪৪ এবং ১০ জন লোক শুধু চাষবাস করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া শতকরা ১৮.৫৬ জন, ফ্রান্সে ৪৪, আমেরিকায় ৩৮ এবং ইংলণ্ডে ৭৪ জন লোক নিযুক্ত আছে। চাকুরী এবং অন্যান্য ব্যবসায় ইত্যাদি লইয়া ভারতবর্ষে শতকরা ৯, ফ্রান্সে ১৪, আমেরিকাতে ২০ এবং ইংলণ্ডে ১৬ জন লোক পড়িয়া আছে। অবশ্য কার্য্যোপযুক্ত লোকদের হিসাবই শুধু উপরিউক্ত তালিকায় ধরা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষ শুধু কৃষি লইয়াই বাঁচিয়া আছে এবং কৃষিকার্য্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপজীবিকার পন্থার উন্নতি-অবনতির উপর ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ভারতবর্ষের আয়তন ১,৭৭৩ ০০০ বর্গ মাইল। আয়তনে ইহাকে একটা মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১৯—২০ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই বিস্তৃত আয়তনের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ, ২৩ ভাগ চাষ-আবাদের যোগ্য হইলেও নানা কারণে পরিত্যক্ত; ১৮ ভাগ চাষ আবাদের উপযুক্ত অথচ পতিত, ৯ ভাগ আবাদ হইয়াও পড়িয়া আছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৩৬ ভাগ জমিতে মাত্র চাষ-আবাদ হইয়া ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বন-জঙ্গলাবৃত স্থানসমূহ এবং চাষ-আবাদের যোগ্য অথচ নানা কারণে পরিত্যক্ত স্থানসমূহ বাদ দিলেও, আরও শতকরা ২৭ ভাগ জমিতে অনায়াসে ফসলাদি উৎপন্ন করা যায়। তাহা হইলে ফসলী জমি শতকরা ৩৬ ভাগ হইতে বাড়িয়া ৬৩ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। ভারত-বর্ষকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার পক্ষে এই পরিমাণ জমি অত্যন্ত অতিরিক্ত। ইহার উপর ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় সার ইত্যাদি দ্বারা জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন এবং অনভিজ্ঞ। তাহারা শুধু জমির পর জমি চাষ করিয়া যাইতেছে; কিন্তু পরিশ্রম হিসাবে অর্থলাভ করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষের এক একর জমিতে যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয়, জাপানে সেই পরিমাণ জমিতে তাহার দ্বিগুণ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রতি একরে ১২৫০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়, তৎস্থলে ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতে ইংলণ্ডে ১৯৭৩, সুইজারল্যাণ্ডের মত পাহাড়ের দেশে .৮৫৪ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। বার্লি আমাদের প্রতি একরে ১৩০০ পাউণ্ড মাত্র উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডে সেই স্থলে ২১০৫, বেলজিয়মে ২৯৩৫ এবং সুইজারল্যাণ্ডে ২১৯৮ পাউণ্ড বার্লি উৎপন্ন হয়। আমাদের এক একরে ১ টন, জাভায় ৪ টন এবং হাউইতে ৪½ টন চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ সব দেশের মৃত্তিকার অবস্থা এবং ফসল উৎপন্ন করিতে কৃষকদের যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়—ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এতৎসঙ্গে আমাদের দেশের জমির অস্বাভাবিক উর্ব্বরতা এবং কৃষকদের কৃষি-বিজ্ঞানে বিপুল অজ্ঞতা মনে পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখ হয়। রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যাদি বিশেষ কষ্ট না করিয়া বর্ত্তমান পরিমাণের দ্বিগুণ ত্রিগুণ উৎপন্ন করা যায়। জাপান ১৭০ লক্ষ একর জমি চাষ করিয়া ৫৬০ লক্ষ লোককে খাওয়াইয়া বাঁচাইতেছে; আর ভারতবর্ষ ২২২০ লক্ষ একর জমি চাষ করিয়াও ৩০০০ লক্ষ লোককে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না! আমাদের দেশে এক একর জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্য গড়ে ২৫৲ এবং জাপানের ১৫০৲, ঠিক ছয় গুণ তফাৎ! যেটুকু জমি এখনও বিনা চাষে পড়িয়া আছে অথচ যেখানে চাষের কোনই বাধা বিঘ্ন নাই, শুধু সেই জমি টুকু চাষে আনিলে ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান লোক সংখ্যার ত্রিগুণ লোককে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।

জমির কৃষিকার্য্য ব্যতীত মাছের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা, খনির কাজ ইত্যাদিতে এখনও যথেষ্ট লোকের স্থান আছে। রয়েল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশন এই সব আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, "দেশে জমি-জমায় চাষ-আবাদ ছাড়া আরও অসংখ্য লাভবান ব্যবসা পড়িয়া আছে। দেশের মহাজন সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। বিদেশীয় মহাজনদের অর্থে এই সব ব্যবসা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষ শুধু কাঁচা মাল সরবরাহ লইয়াই পড়িয়া আছে। সেই সব মালে তৈয়ারী জিনিষই

আবার উচ্চমূল্যে এদেশে বিক্রীত হইবার জন্ত চলিয়া আসে।" ব্যবসায় ও চাকুরীতে মোট শতকরা ৫ জন ভারতবাসী নিযুক্ত আছে। এ স্থলেও আরও অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর এখনও সংস্থান হইতে পারে। এই রকম ভাবে একটু তলাইয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যার তুলনায় তাহার লোক প্রতিপালনের সংস্থান প্রচুর পরিমাণে আছে।

১৯২২ সালের ভারতীয় ফিস্কাল কমিশন তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও গম রপ্তানি হইয়া থাকে। বিদেশীয় বণিকগণ বৎসর বৎসর এই সব মাল কিনিয়া লইয়া যায়। দেশে খাদ্য দ্রব্যের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে; কিন্তু ভারতের লোকে দরিদ্র বলিয়া অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না। যদি দেশে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু দারিদ্র্য বশতঃ লোকে তাহা ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে লোক-ভার-প্রপীড়িত দেশ কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। কেন না লোকসংখ্যা কমাইয়া দিলেও যদি দেশের দারিদ্র্য না ঘুচান যায়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা ঐ একই ভাবে আসিয়া দাঁড়ায়। ইংলণ্ডে লোকসংখ্যার তুলনায় উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব। তাহার উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যে ৩ ভাগের এক ভাগ মাত্র লোকের অন্ন-সংস্থান হয়। কিন্তু সেখানের অধিবাসীবৃন্দ যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। বিদেশ হইতে খাবার কিনিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; কিন্তু তাহাতে ইংলণ্ডকে কোন সুধী ব্যক্তি লোক-ভার-নিপীড়িত দেশ বলিবে না। দেশে যথেষ্ট খাবার আছে, কিন্তু কিনিয়া খাইবার মত অর্থ নাই, এ বড় ক্ষোভের বিষয়। এই বিরাট ভারতীয় দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান এবং তাহা মোচনের চেষ্টা না করিয়া তাহার লোক বাঁচাইবার জন্ম তাহাকে লোকসংখ্যা কমাইবার যুক্তি দেওয়া যেমন ধৃষ্টতা-পরিপূর্ণ তেমন নির্ব্বোধের সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্রিটিশ ভারতের বাৎসরিক আয় ১৯১৩-১৪ সালের রিপোর্ট অনুসারে মোট ১,২১০,২৭,৯৭,০১০ টাকা। ইহা হইতে প্রতি বৎসর নানাভাবে ১২৩,০০,০০,০০০, টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, যাহার পরিবর্ত্তে আমরা একরকম কোনই উপকার পাইতেছি না। আয় হইতে ব্যয় বাদ দিলে ১,০৮৭,২৭,৯৭,০১০ আমাদের 'নিট' বাৎসরিক আয়। ১৯১১ সালে যে লোকসংখ্যা ছিল, তাহাদের মধ্যে এই আয় ভাগ করিয়া দিলে মাথাপিছু বৎসরে ৪৪৲ অথবা মাসে ৩৸৶৹ পাই করিয়া পড়ে (২ পা ১৯শি ১ পে)। অন্যান্য দেশের তুলনায় দেখা যায়, আমেরিকা মাথাপিছু বৎসরে ৭২, ইংলণ্ড ৫০, অষ্ট্রেলিয়া ৫৪, কানাডা ৪০, ফ্রান্স ৩৮, জার্ম্মেণী ৩০, ইটালী ২৩, স্পেন ১১ এবং জাপান ৬ পাউণ্ড আয় করে। এইখানে দেখিতে পাই আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের লোকের বাৎসরিক আয় আমাদের দেশের আয় অপেক্ষা যথাক্রমে ২২ ও ১৬ গুণ বেশী। ইহা দ্বারাই আমাদের দেশের বিপুল দারিদ্র্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়পড়তা মাথাপিছু যাহা আয়, তাহা দ্বারা যদি শুধু খাদ্য দ্রব্যই কেনা হয়, তবে তাহাতে জেলের কয়েদীদের যাহা খাইতে দেওয়া হয় তাহারও ৮১ ভাগ মাত্র খাদ্য ঐ আয়ে ক্রয় করা যায়। বাড়ী ভাড়া, কাপড়, জামা এবং অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ কিনিবার মত অর্থ তাহার থাকে না। এ অবস্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ খাটাইয়া আয় বৃদ্ধি না করার অপবাদ বিদ্রূপের মতই প্রাণে আঘাত করে।

আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর হারের সহিত ইংলণ্ড এবং আমেরিকার জন্ম ও মৃত্যুর হার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাজারে আমেরিকায় মৃত্যুর উপর জন্ম-সংখ্যা ১৭.৭ এবং ইংলণ্ডে ১০ বেশী। সে স্থলে ভারতবর্ষে মাত্র ৫.৪ বেশী। এইরূপে যত রকম ভাবে আলোচনা করা যাউক না কেন, লোক-সংখ্যা প্রপীড়িত ভারত বলিয়া যে অখ্যাতি রটিয়াছে, তাহার কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না।

দেশব্যাপী এই দারিদ্র্যের সহিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক যে আদৌ নাই, এ কথা বোধ হয় আমরা এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারি। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বড় বড় ব্যাঙ্ক সবই বিদেশী মূল ধনে পরিচালিত। লাভের টাকা সবই প্রায় বৎসর বৎসর বিদেশে চলিয়া যায়। ইহার যেমন প্রতীকার আবশ্যক, গবর্ণমেণ্টের শাসন ও বাণিজ্য-নীতিরও তেমনি পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কম বলিয়া যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি কম, তাহা নহে। উপযুক্ত শিক্ষা, অর্থ, পরিশ্রম, সার, ভাল বীজ, কৃষি যন্ত্রাদি ইত্যাদির অভাবে আমরা জমির উৎপাদিকা-শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। তার পর যতখানি জমি অনায়াসে ইচ্ছামত চাষে আনা যাইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেকে মাত্র চাষ ও ফসল উৎপন্ন হইতেছে। যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহাও দেশে রাখিবার মত অর্থ নাই। এই অতিরিক্ত লোক-সংখ্যার অপবাদ সম্বন্ধে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ মিঃ দাদাভাই নৌরজীর তদানীন্তন ভারতীয় সেক্রেটারী অব ষ্টেটের সহিত ব্যবহৃত পত্রাবলী বেশ যুক্তিপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ দেশের অর্থ সুযোগ ও সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবার পরই শুধু এই অপবাদ বিচারযোগ্য, অন্যথা নহে।

রক্তকরবী

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ

(২)

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখিলেও, একটু আলোর রেখা, একটু হাওয়ার স্পর্শ কেমন করিয়া কোন ফাঁকে যেন প্রবেশ করে। বিষয়ীর মনের মধ্যেও তেমনি করিয়া কদাচিৎ একটু আধটু ভাবের আলো, রসের হাওয়া প্রবেশ করে। ক্ষণেকের জন্য ভাব জিনিষটা কখন কি ভাবে প্রাণে আসে, বলা যায় না। একটু আলোকে, একটু বাতাসে, একটু সুরে, একটু পাখীর গানে, একটু কথায়, একটু চাহনিতে, একটু

অচেনা বুকের মুহূর্তের দেখায়, কখনো না কখনো কঠিন প্রাণের উপরও পলকের পুলক-স্পন্দন আনিয়া দিয়া যায়। এই একটা কথা এখানে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। আর ভাবের একটা মোহিনী শক্তি আছে। বিষয়ের তামস-তপস্যায় রত যারা, সময়ে সময়ে তাহাদের উপরও ভাবের প্রভাব বর্ত্তে এবং তাহাদিগকেও আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহারা এই ভাব লাভ করিবার উপায় জানে না, আর এই লাভই যে সকল লাভের সেরা—'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—ইহা তাহারা জানে না। সাধারণ জীবনেও দেখা যায়—মিস্ত্রী মশায় একটু দাশরথির 'কবিতা' পড়িতেছেন, মুদির বেটা দুপুরবেলা একখানা বটতলার নভেল খুলিয়াছেন, মোক্তার বাবু রবিবারের দিন একখানা ছেঁড়া জ্ঞানদাস বাহির করিয়াছেন, রামধনী চাকর সন্ধ্যাবেলা রামা-হো বলিয়া রাগিণী টানিতেছেন। এই সব সাময়িক ভাবের প্রভাব—নন্দিনীর রূপের আভাসের মোহ। বাহির হইতে এই যে আলোর কণা, রসের ছিটা ঘরে ঢোকে,—এই আলো, এই রস ঘরের দুয়ার খুলিয়া কেহ ঘরে নেয় না। লাভের ধন বুকে বাঁধিয়া একটু ভাব দেখা মন্দ নয়। কিন্তু লাভ ফেলিয়া দিয়া কেহই ভাব বুকে ধরিতে চায় না। একটু আধটু রস রসনায় দিতে কাহারো আপত্তি নাই—কিন্তু জীবনে তাহা কেহ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না। ঘর-ভরা তপ্ত কাঞ্চন,—নন্দিনী নাম্নী স্নিগ্ধ রমণীকে বসাইবার স্থান নাই। মোহরগুলি, টাকাগুলি, লোহার সিন্দুকটা, খাট-পালঙ্, দেরাজ-আলমারী, ইঁট কাঠের বাড়ী—এসব সত্যকার জিনিষ—প্রত্যক্ষ বাস্তব—Solid Substantial। কিন্তু এই ভাবটা যে শুধু হাওয়া! না হয় আলোই হইল,—উহা ত মুঠার মধ্যে পাওয়া যায় না! দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। ছায়া-ছায়া কুহেলিকা! ওই জিনিষের ভরসায় একেবারে বাস্তব পদার্থগুলি কি করিয়া ত্যাগ করা যায়! ভাবটা এম্‌নে বেশ একটু ভালই লাগে। কিন্তু চাঁদের আলোয় ত পেট ভরে না! পেট ভরাতে হইলে টাকা দিয়া চাল-ডাল কিনিতে হয়। ভাবের প্রতি মানুষের ভাবটা এই প্রকার। এই কথাগুলি মনে রাখিলে রক্তকরবীর কতকগুলি বিষয় বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

(১) নন্দিনী বলিতেছে—'তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।'

রাজা বলিতেছে—'না, ঘরের মধ্যে না; যা বল্‌তে হয় বাহিরে থেকে বল।'

বিষয়ী ভাবিনীর সহিত দূর থেকে দুটো কথা বলিতে পারে; তার রূপের একটু তারিপও করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে ঘরের ঘরণী করিতে পারে না। ঘরণী তার সোনা-রাণী। সোনা-রাণীর হাত-পাগুলি একেবারে লোহার চেয়েও শক্ত; বুকখানি নিরেট; অন্তরে বাহিরে কোথাও রস নাই। কিন্তু তবু তাহাকে বাস্তবিক রূপে বুকের মধ্যে পাওয়া যায়। সে যে বুকে বসিয়া বুক পিষিয়া দেয়—তবু ঐ হেম-বরণীর রূপের মোহ টুটে না। এ যেন দ্রৌপদী-রূপী ভীমের প্রতি কীচকের মোহ।

(২) নন্দিনী রাজাকে কুঁদ ফুলের মালা পরাতে চায়। বলছে 'কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি'। রাজা বলছে—'নিজে পরো।'

রাজার গলায় সোনার শৃঙ্খল। মণিমুক্তার মালার জাল। তার কাছে কি ফুলের মালা? সোনার হার এক রাজ্যের জিনিষ—ফুলের মালা অন্য রাজ্যের। এক স্থূল ধনৈশ্বর্য্য—আর সুকুমার রূপ-মাধুর্য্য। একটা বিষয়ের কঠিন বিলাস—আর একটা রসের কোমল লীলা। মুক্তা-ফলে যাহার লোভ, শিশির-বিন্দু তাহার কাছে অতি তুচ্ছ! রাজার কাছে ফুলের মালার কোনো মূল্য নাই। ভাবুকের ও রসিকের বিচার স্বতন্ত্র। অন্য এক রাজা কবির 'কাব্য আলোচনায়' মুগ্ধ হইয়া যখন কবিকে কহিল—'যাহা কিছু আছে রাজ-ভাণ্ডারে, সব দিতে পারি আনি,'—কবি ধন-রত্ন, মণিমুক্তা কিছুই চাহিল না—শুধু কহিল, 'কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে অই ফুলমালাখানি।' আর আমাদের রাজা নন্দিনীর প্রীতির দান—ফুলের মালা প্রত্যাখ্যান করিল। ইহাই বিষয়ীর আর রসিকের প্রাণের পার্থক্য।

(৩) নন্দিনী রাজাকে দেখিতে বলে—'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটীর আঁচলে।' শুনিতে বলে—'মাঠের বাঁশী শুনে' শুনে' আকাশ খুসি হ'ল।' কিন্তু রাজা ভাবে এ সব যে অলীক কল্পনা। এরি জন্য কি সে নিজেকে মণি-কাঞ্চন হইতে বঞ্চিত করিবে? কিন্তু নন্দিনী-রূপী ভাব যাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহার কাছে নিত্য নিত্য রোদের সাথে সত্য সত্যই সোনার প্লাবন আসে, আর জ্যোৎস্নার সাথে আসে, রূপার বান। সে দেখে—

> বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে
> কোন্ সে ভিখারী
> ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
> দু'হাত বিথারি?
> আঁচল ভরে' সোনা দিতে
> ছাপিয়ে পড়ে পৃথিবীতে
> একি নেহারি। রবীন্দ্রনাথ)

(৪) 'যাও, যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।' রস কখনো কখনো বিষয়ীর মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিতে চায়। তখন বিষয়ীর মন তাড়াতাড়ি উহা ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে-দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। রস যে তাহার সময় নষ্ট করে। রসে ত অর্থ আসে না। এই জন্যই আমাদের গ্রামের কোটীশ্বর প্রামাণিক মহাশয় কখনো আসরে বসিয়া কীর্ত্তন শোনেন না। একটু দূরে দাঁড়াইয়া শোনেন। যখন ভাবখানি বেশ ঘনীভূত হইয়া আসিতে থাকে—তখন আস্তে আস্তে কখন সরিয়া পড়েন, কেহ টের পায় না।

(৫) 'নন্দিনী, তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকে রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে' রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর মধ্যে পেতে চাচ্ছি। কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখ্‌তে চাই। না পারি ত ভেঙ্গে চুরে ফেল্‌তে চাই।'

নন্দিনী হইল ভাব, রস, আনন্দ, সৌন্দর্য্য। এ-সব বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। এ-সব অতীন্দ্রিয়। তবে যে সৌন্দর্য্য দেখি? যাহা দেখি তাহা শুধু জড়-পদার্থ। ঐ পদার্থে যাহা সুন্দর তাহা নয়ন দেখে না। তাহা প্রাণের মধ্যে যায়। প্রাণ তাহার মধ্যে যায়। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করে। ঐ মেয়েটা গৌরবর্ণা। উহাকে কখনো শ্যামবর্ণা দেখি না। ও পাতলা ছিপ্‌ছিপে। উহাকে কখনো মোটা-সোটা দেখি না। কিন্তু একদিন উহাকে আশ্চর্য্য সুন্দর দেখিয়াছিলাম। এখন দেখি বিশ্রী। কিন্তু উহার সবই তেমনি আছে। কিন্তু যে 'রূপের মায়ার আড়াল' উহাকে 'অপরূপ' করিয়া রাখিয়াছিল, সেই মায়াটি আর নাই। কাজেই উহার অপরূপতা চলিয়া গিয়াছে। সুন্দর বস্তু এবং আনন্দকর বস্তু মাত্রেরই এক অপরূপ রূপের মায়া আছে। সাধারণতঃ উহা ক্ষণিক বা সাময়িক। কিন্তু নন্দিনী যে সুন্দর বস্তু, যে আনন্দকর বস্তু তাহার মন-মাতানিয়া মায়ার এবং তাহার অপরূপত্বের শেষ নাই।

নন্দিনীকে রাজা করামলকবৎ করের মধ্যে পাইতে চায়। তাহাকে ধরিতে চায়। উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে চায়। কিন্তু নন্দিনী আকাশের আলোকের মত ব্যাপক বস্তু—কখনো সীমার মধ্যে আসে না। তাহার পরিমাণ হয় না। গণনা হয় না। রাজা তাহাকে মুঠোর মধ্যে কি করিয়া পাইবে? তাহাকে ধরা যায় না। তাহার মধ্যে ধরা পড়িতে হয়। তাহাকে উল্টে পাল্টে দেখা যায় না। তাহার মধ্যে ডুবিয়া উলোট-পালোট করিয়া সাঁতার দেওয়া যায়। তাহাকে ভেঙ্গে চুরে ফেলানো যায় না। সে আনন্দঘন অখণ্ড বস্তু। সৌন্দর্য্য প্রাণ দিয়া অনুভবের জিনিষ, জ্ঞান দ্বারা বুঝিবার নয়। প্রাণ দিয়া—অর্থাৎ দান করিয়া। ধরিয়া পাইয়া নয়। বুঝিতে গেলে সৌন্দর্য্য মিলাইয়া যায়—কোথায় লীন হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য বোঝা মানে সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস করা। কীট্‌স্ ল্যামিয়া কাব্যখানিতে ইহা দেখিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌-সোয়ার্থ্‌ বলেন—We murder to dissect—অর্থাৎ we spoil to understand। ঐ যে রাজার মুখে 'মুঠোর ভেতর' ধরার কথা শুনিয়াই নন্দিনী তাড়াতাড়ি বলিতেছে—'আজ নাই।' ঐ যে 'আমি জানতে চাই' শুনিয়া সে বলিতেছে—'তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।' কারণ নন্দিনীকে জানা মানেই নন্দিনীকে বিনাশ করা। নন্দিনী তা বোঝে। তাই ভয়। নন্দিনী যখন রাজাকে তাহার খুসির কথা বলিতে আসিল তখন রাজা বলিল—'আমার সময় নাই, একটুও না।' রাজা যখন নন্দিনীকে ধরিতে চাহিল তখন নন্দিনী পলাইতে চায়। জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধের ইহাই ইঙ্গিত।

এইখানে তত্ত্বের রূপকের সঙ্গে নাটকের রূপের একটু গরমিল হইয়া গিয়াছে। নন্দিনী নিজেই রাজার ঘরে ঢুকিতে চায়। রাজা বলিল—'না, ঘরের মধ্যে না। যা বলতে হয়, বাইরে থেকে বল।' ইহার তাৎপর্য আমরা দেখিলাম। নন্দিনীকে ঘরে ঢুকিতে দিবে না, অথচ—'ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর মধ্যে পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি না।' তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার বেশ মানে হয়। জ্ঞান দিয়া ধরা মানেই প্রাণের ঘরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া। কিন্তু বাস্তব জগতে তুমি আমার ঘরে আসিতে চাও, আমি তোমাকে বাহিরে রাখিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকি—অথচ তোমাকে ধরিবার জন্য ছট্‌ফট্ করি—ইহা অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত—absurd। এইখানে রূপকের একটিবার পতন হইয়াছে। "আমার অনবকাশের উজান ঠেলে' তোমাকে ঘরে আনতে চাই না।'—ইহাতে বোধ হয় পতন রক্ষা হয় না।

(৬) 'কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ছে। ঝড়ের আগেকার মেঘের মত, দেখে' আমার মন নাচে।'—(নন্দিনীর কথা—রাজার প্রতি।)

এই যে অমন বৈচিত্র্যময় অসীম জটিলতাপূর্ণ সুবিশাল সাংসারিক বাস্তবিক জগৎটা এবং ইহার মধ্যে যে একটা দুর্দ্দমনীয় দানবিক শক্তি অহোরাত্র ক্রিয়া ও ক্রীড়া করিতেছে, ইহা এমনি এক বিস্ময়কর বিষয় যে ইহা আলোকন করিয়া ভাবের প্রাণও চমৎকৃত হয়। ইহার বিচিত্রতা, বিশালতা, জটিলতা এবং অসীমশক্তিমত্তা এক অদ্ভুত-রসাত্মক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। এই জন্য ইহা দেখিয়া ভাবময়ী নন্দিনীর 'মন নাচে।' যক্ষরাজকে দেখিয়া নন্দিনীর মন নাচে বলিয়াই রসাত্মক ও ভাবাত্মক কাব্য নাটক ও উপন্যাস-সাহিত্যে যক্ষপুরীর—অর্থাৎ এই পার্থিব বৈভবময় সংসারের রাশি রাশি বর্ণনা। নন্দিনীর এই আনন্দ আছে বলিয়াই—সেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্য-কাব্য, কার্লাইলের ফরাসীবিদ্রোহ, ভিক্‌টার হিউগোর লা-মিজারেব্‌ল্‌, ডুমার মন্টি-ক্রি আর টলষ্টয়ের সমর ও শান্তি প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। আর নন্দিনীর এই আনন্দ হইতেই রবীন্দ্রনাথের এই রক্তকরবীরও সৃষ্টি হইয়াছে।

(৭) 'রাজা। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—'

'নন্দিনী। সে কথা থাক্। তোমার ত সময় নেই।'

নন্দিনী রাজার কাছে রঞ্জনের কথা বলিতে চায় না। বিষয়ী প্রাণে কোনো ক্ষণে রসের উদয় হয়। কিন্তু তাহা তাহাকে ভগবচ্চেতনার দিকে লইয়া যায় না। কারণ এই রস বুঝিতে পারে যে এই ব্যক্তির চিত্ত বিষয়ে ব্যাপৃত। ইহাতে রসময়ের বসিবার স্থান নাই।

(৮) 'আমার মধ্যে জোরই আছে। রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।' বিষয়ের সেবক এইটুকু বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রাণের মধ্যে কখনো কখনো যে মধুর ভাব জাগিয়া উঠে, তাহার স্বরূপ বিষয়-নিষ্ঠ স্বরূপের সঙ্গে সেই ভাবের সম্পূর্ণ অমিল—একেবারে বিরোধ। সেই ভাব এই বিষয়-কলুষিত স্বরূপকে একটুও পছন্দ করে না। সে আরো এইটুকু বুঝিতে পারে যে বিষয় পরিহার করিলে তাহার যাহা থাকিবে, সেই ভাবময়ী তাহাই চায়, এবং তাহারি গলে বর-মাল্য দিতে পারে। বিষয়-ত্যাগী মানুষের মাধুরী-জয়া। সে বল-প্রয়োগ জানে না। এই মাধুর্য্য তাহার জাদু। সেই জাদুই নন্দিনীকে বাঁধে—জোর নয়। রাজার কেবলি জোর। মাধুরীর জাদু নাই।

রাস

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

(৯) 'নন্দিনী। আমার মধ্যে কি দেখেছ?'

'দেখেছি। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে, সেই ছন্দ।'

এইখানে নন্দিনীর অন্তরতম স্বরূপটী প্রকাশিত হইয়াছে। Matter বা পদার্থ জিনিষটী হইতে স্থাবর—ভারী—inert পাহাড় পদার্থের উদাহরণ। হাওয়াও অবস্তু পদার্থ। কিন্তু মানুষের সংসার যে-সব পদার্থে গঠিত—বাঁশ-কাঠ, ইট-পাথর; সোনা-রূপা-লোহা—তাহা স্থাবর কঠোর কঠিন। ঠেলিয়া অতি কষ্টে সরাইতে হয়। হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ, প্রভৃতি যে-সব ভাব-বস্তু তাহা এই পদার্থের ঠিক বিপরীত। তাহা 'চঞ্চলা'—অর্থাৎ কেবলি চলে। ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিয়া চলে। তাহা প্রবহমান—বহিয়া ঢেউ তুলিয়া চলে। মহাপ্রভু কখনো কোনো ওস্তাদের কাছে নাচ শেখেন নাই। মহাপ্রভুর নৃত্য স্বচক্ষে দেখিয়া বহুলোকে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মনে হয়—অমন সম্মোহন নৃত্য পৃথিবীর কোনো নৃত্য-নিপুণা নর্ত্তকী কখনো দেখাইতে পারে নাই। ইহার প্রধান সাক্ষী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভুর নাচ দেখিয়া তাঁহার শুষ্ক সন্ন্যাসীর প্রাণ ব্রজগোপীর ভাবরসে মত্ত হইয়া গেল। কেন এমন হয়? মহাপ্রভুতে মহাভাবের বিকাশ হইয়াছিল। তিনি 'বিশ্বের' প্রাণ যিনি তাঁহারি 'বাঁশী' শুনিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রাতুল চরণে মনোমোহন 'নাচের ছন্দ' বাজিয়াছিল। কবি মধুর-ভাবাবেগে মাতোয়ারা হইয়া যাওয়াতেই তাহার ভাষা ছন্দোময়ী নৃত্যশীলা।

সংসারেও দেখি, আমি এক মাইল পথ হাঁটিতে পারি না। আবার সাত মাইল পথ পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে অতিবাহন করিলাম। কারণ আমার একটী বাঞ্ছিত বস্তু আমার সঙ্গে চলিয়াছে। সে-ই, এই যে স্থবির প্রায় আমি, আমাকেও তরঙ্গায়িত করিয়া নাচের ছন্দে চালাইয়া দিয়াছে। তুমি 'কুটাগাছ ছিঁড়িয়া দুই খান' কর নী। আজ সারাদিন ভরিয়া উল্লাস করিয়া কাজ করিলে। কারণ আজ এক ব্যক্তি এক বৎসর পরে তোমার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়াছে। কাজেই তুমি আজ ছন্দোবদ্ধ। ভাব-রস নৃত্যশীল তরঙ্গায়মান। উহা যাহার উপর 'ভর' করে তাহাকে নাচাইয়া তরঙ্গাইয়া দেয়। তাহার জড়ত্ব দূর করিয়া চিন্ময়ত্ব আনিয়া দেয়। ভগবান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে এক সুবিপুল ভাবছন্দে বাঁধিয়া চিরন্তন-গতি-শক্তি সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছেন। তাই—'গ্রহ-নক্ষত্রের দল ভিখারী নট বালকের মত আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে।' বিজ্ঞান Gravitationএর কল্পনা দ্বারা এই বিশ্বছন্দ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে কবির 'বিশ্ব-নৃত্য' কবিতাটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। শেলীর ভাষার নন্দিনী—

Blithe light and music
Vanquishing dissonance and gloom

এবং Indeed
With love and live and light and deity
And motion which may change but cannot die

আবার An antelope
In the suspended impulse of its lightness
were less ethereally light.

শেলীও যাহার সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, সেও এক নন্দিনী। আমাদের নন্দিনীও তাই।—'সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী তুমি এত সহজ হয়েছ।'

(১০) 'রঞ্জন যে ছুটি বয়ে' নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে' রাখে কে আমি কি জানি না?'

রঞ্জনের যে সবই ছুটি। তার ত কোনো কাজ নাই! সে কাজ করবে কিসের দুঃখে? সে যে পূর্ণ। 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।' তবে সে খেলাটা ভালবাসে। আর পূর্ণতার মধ্যেও একটা অভাব সে সৃষ্টি করিয়াছে। সে প্রেম চায়। এইটা তার নেশা। ভক্তির চেয়েও প্রেমে বেশী সন্তুষ্ট।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন
দেব-স্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন।

তবে নন্দিনীর মত প্রেম দিতে কেউ জানে না। কাজেই—

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।

নন্দিনীর প্রেম ঐ রক্তকরবীর মধু। অর্থাৎ হরিপ্রিয়-মধু। করবীর একটি নাম হরিপ্রিয়—পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনুরাগ' আর 'মাধুর্য্য' নন্দিনীর ভাণ্ডারে অফুরন্ত।

And from her lips, and from a hyacinth full
Of honey-dew, a liquid murmur Drops.

—Shelley.

ইহাই রক্তকরবীর মধু। * এই মধু না হইলে রঞ্জনের ছুটি কাটে না। এই মধু পান করিয়া ছুটি কাটাইবার জন্যই ত রাধিকা-রঞ্জনের গোলোক আর বৃন্দাবন।—প্রকৃতির অতীত—বিরজার পারে।

(১১) 'আমার অনবকাশের উজান ঠেলে' তোমাকে ঘরে আনতে চাই না।' 'এখনো সময় হয় নি।'

আনন্দ-রস-রূপিনী যে নন্দিনী তাকে ঘরে আনিবার সময় মানুষ পায় না। রোজকার রোজগারের কাজটা আগে কি না? সে কাজ যে ফুরোয় না। অবসর-সময়ে একটু ভাবাবেশ আসে ক্ষতি কি? কিন্তু ভাবের অর্থাৎ কাজের জন্য বাজের ক্ষতিটা অবৈধ। যুগ-যুগান্তেও এ অবসর আসে না। নন্দিনী বাহিরেই থাকিয়া যায়। কাজের ফাঁক দিয়া নন্দিনীর সঙ্গে দেখা-শোনা একটু হয় এই মাত্র।

---

* রক্তকরবীকে red oleander না বলিয়া যদি hyacinth বলি তবে Botanyর হিসাবে যতই দোষ হোক্—সাহিত্যের হিসাবে অনেক বেশী সুন্দর হয়। গ্রীক-পুরাণানুসারে সঙ্গীত-সৌন্দর্য্যের দেবতা এপলোর অতি প্রিয় হায়েসিন্থ নামক একটি বালকের শোণিত হইতে এই ফুলের উদ্ভব।

বাল-ভাদাদের রত্নার স্তূপের মধ্যে বসিয়া অন্ত-মনে কখনো কখনো একটু সুর দিয়া বলা—'অপরূপ পেখলু বালা !'

(১২) 'ছুটি কি করে' মধুতে ভরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড় সুন্দর।'

রঞ্জনের যে অমৃত-ঘন রস-রাজ রূপ। 'লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধ-মনন্তসিদ্ধং—দৃগ্‌ভিঃ পিবন্তি নার্য্যো নরাশ্চ।'

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো

মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিমেতদহো

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। (শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত)

এই রূপ-মধুর আস্বাদনের উল্লাসেই ত ঋষি গাইয়াছেন—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

আর এই মধুময় রূপানুভূতির আবেশেই কবিও গাহিয়াছেন—

মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব !

মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়।

মধুর মধু-পানে তটিনী বয়ে' যায় !

সে বড় সুন্দর—বড় সুন্দর ! অনন্তদেব সহস্র মুখে তার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া শোধ করিতে পারেন না। এক দিকে—'কিং বর্ণয়া মস্তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ।'

'ঈষৎ-সহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র

বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি-কান্তং।' (চণ্ডী)

আর এক দিকে—'প্রসন্ন-বক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণং।' তাহাকে যে একবার দেখিয়াছে—'ত্রুটি যুগায়তে ত্বমপশ্যতঃ।' অন্তের কা কথা ?

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণাঙ্গম। ভাগবত।

কাহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে

সব লোক করে আপ্যায়িত। চরিতামৃত।

সুতরাং সে রঞ্জন।

(১৩) 'যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এত কাল মনে হ'ত জীবন হইতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি।'

Matter and space—পদার্থ আর আকাশ। আকাশকে বদ্ধ করিয়াই পদার্থ থাকে। পদার্থ বন্ধন—অবরোধক এবং অবরোধ—অত্যন্ত স্থাবর। সাংখ্যের গুণ-তত্ত্ব দ্বারা এই বিষয়টী বেশ বোঝা যাইবে। যক্ষপুরীতে আকাশ দুর্লভ। অতি সত্য কথা। সত্ত্ব রজ তম—এই তিন গুণের মধ্যে যক্ষাগারে সত্ত্ব নাই। এখানে শুধু তম-র আচরণের মধ্যে রজ-র অন্ধ ক্রিয়া। ইহাই জড়াত্মক বিষয়-রাজ্যের বিশেষত্ব।

সত্ত্ব = প্রকাশ। রজ = প্রবৃত্তি। তম = স্থিতি—inertia অর্থে।

সত্ত্ব = প্রীতি। রজ = অপ্রীতি। তম = বিষাদ।

সত্ত্ব—লঘু উজ্জ্বল ও প্রিয় ভাব। রজ—অনিয়ত ক্রিয়াশীল ভাব। তম—গুরু আবরক ও অচলভাব।—অর্থাৎ একটা ভারি-ভারী অন্ধকার-অন্ধকার ভাব।

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্। উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।

গুরু বরণকমেব তমঃ। সাংখ্যকারিকা। ১৩।

ইহাদের আর একটা বিশেষত্ব হইল—ইহা পরস্পরকে অভিভূত করিয়া অর্থাৎ প্রক্ষীণ করিয়া প্রবৃত্ত হয়।

অন্যোন্যাভিভববৃত্তয়ো গুণাঃ।

সত্ত্ব মানে প্রকাশ। প্রকাশ মানে আলো। আলো মানে আকাশ। কারণ আকাশের তরঙ্গ ব্যতিরেকে আলোকের আবির্ভাব হয় না। এই আলোক-ভরা আকাশের অধিষ্ঠাত্রী—আনন্দ-কিরণ-ঘন-মূর্ত্তি আমাদের নন্দিনী। অবকাশ—অর্থাৎ আকাশ—না হইলে নন্দিনীকে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই ত রাজা বলিতেছে—'আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই না।'—চায়ও না, পারেও না। যক্ষ-নগরে 'আকাশ' পাওয়া যায় না—কাজেই আলোকও পাওয়া যায় না। কারণ তমোময় যক্ষপুর। তম মানে অন্ধকার। কিন্তু অবিশ্রান্ত কাজ চলিতেছে। কারণ সেখানে রজ প্রবল। সত্ত্ব ও তম অন্যোন্যাভিভব বৃত্তী। সেই জন্যই ত নন্দিনীর প্রতি যক্ষদের—বিশেষতঃ যক্ষ-বালা চন্দ্রার এত বিদ্বেষ। চন্দ্রা যে তমোময়ী। নন্দিনী সত্ত্বময়ী। তাই বিশু বলিতেছে-'এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের পানে এমন করে' চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম, আমার মধ্যে এখনো আলো আছে।'

(১৪) 'ওগো দুখ জাগানিয়া।'

এই পৃথিবীতে যে আনন্দ দুঃখ জাগায় না—সে আনন্দ আনন্দই নয়। একটা ক্ষণিকের মত্ততা মাত্র। কারণ আনন্দের প্রত্যেকটা তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের মত আমাকে দেখাইয়া দিবে—আমি কি দুঃখের পাথারের মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। কি অমৃত হারাইয়া কি বিষ লইয়া মাতিয়া রহিয়াছি। ছাই খাইতে খাইতে হঠাৎ একবার একটু চিনি মুখে গেলে কি ছাই-খাওয়ার দুঃখটা জাগিবে না ? চির-অন্ধকারে বাস করিয়া একটু আলোর রেখা দেখিলে অন্ধকার কি পীড়া দিবে না ?

মানুষের দুঃখ-কষ্টের অন্ত নাই। ক্ষণেকের আনন্দলাভে দুঃখের নিবিড় অনুভূতি হয়। কখনো আবার চির-কাল দুঃখের ঘর করিতে করিতে দুঃখের সহিত এমনি মিল হইয়া যায় যে, আমারা আনন্দের কথা ভুলিয়াই যাই; এবং যাহা আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা আদৌ আনন্দ নয়। সুখ,—দুঃখের যমজ ভাই। এই মিথ্যা সুখের মধ্যে খানিক আনন্দ প্রবেশ করিয়া দুঃখ জাগাইয়া দিয়া যায়। তাই বিশুর নন্দিনী দুখ জাগানিয়া।

শেলীর – Our sweetest songs are those that tell

Of saddest thought—এর ইহাই প্রকৃত অর্থ।

(ক্রমশঃ)

জয়দেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

(৪)

প্রথম শ্লোক

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্ব কুঞ্জ দ্রুমং
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তী যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

কবি জয়দেব এই রহস্যময় শ্লোকে তাঁহার অপার্থিব প্রেম-গীতি-কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের অবতারণা করিয়াছেন। কাব্যে তিনি বাসন্ত-রাসের বর্ণনা করিতেছেন,—সরস বসন্তে ব্রজ-বনভূমি নন্দন-নিন্দিত কান্ত-সৌন্দর্য্যে মধুময় শ্রী ধারণ করিয়াছে। যমুনাস্নাত সুরভি মলয়ের মন্দ আন্দোলন, বিটপীকুঞ্জে ব্রততী-বিতানে পুষ্পিত সোহাগের পুলকোল্লাস, কুসুমে কুসুমে মধুকরনিকরের ঝঙ্কার-কোলাহল, শাখায়-শাখায় কোকিল-কোকিলার কল-কাকলী, আকাশে-বাতাসে মাধুরীর মেলা, স্বর্গে-মর্ত্ত্যে মিলনের লীলা,—প্রকৃতির এই উৎসব-সমারোহের মধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের অভিসার, বিরহ, মান, মিলনের সুমধুর রঙ্গাভিনয় নিত্য নবভাবে অভিনীত হইতেছে। ইহাই হইল তাঁহার কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু প্রথম শ্লোকে কবি বর্ণনা করিতেছেন—আকাশ মেঘে ঢাকা, বনভূমি শ্যামল-তমালে আচ্ছন্ন, তাহার উপর আবার রাত্রিকাল, অপরাধ-ভীত শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া—হে রাধে, তুমি গৃহে যাও। এইরূপে নন্দ-নিদেশে কুঞ্জতরুতলে-প্রস্থিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যমুনা-কূলের বিজন কেলী জয়যুক্ত হউক।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-লীলা, বর্ষায় তাহার সূচনা হইল কি প্রকারে? অনেকেই এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। আধুনিক কেহ কেহ কাব্যের সঙ্গে এই শ্লোকের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্তও বলিয়াছেন। প্রশ্ন আজিকার নহে, হয় তো কবির সম-সময়েই এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। টীকাকারগণ প্রত্যেকেই প্রশ্নটী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; এবং একজনের পর আর একজন আপন আপন মতানুযায়ী ইহার সমাধানেরও চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু মানব-মনকে কে কবে সংশয়হীন করিতে পারিয়াছে? অগণিত হৃদয় আজিও জিজ্ঞাসা করিতেছে—কেন? কেন কবি এই শ্লোকে তাঁহার কাব্যের মুখবন্ধ করিয়াছিলেন? কে এই জিজ্ঞাসার নিরসন করিবে? কে বলিতে পারে, অতীতের কোন্ স্মরণাতীত দিবসে নব বরষার প্রথম আষাঢ়ে জলভারাবনত বারিধরের স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি উজ্জয়িনীর শীপ্রা-শীকর-চুম্বিত কাণ্যোদ্যানে কবি-হৃদয়ে কোন্ বেদনার মূর্চ্ছনা জাগাইয়াছিল? কে বলিতে পারে—কেন সেই নবজলকণসিক্ত কূটজ-কুসুম-গন্ধবাহী মন্দ সমীরণে মন্দাক্রান্তার মধুচ্ছন্দে লীলায়িত বিরহ-সঙ্গীতের তরঙ্গ বহিয়াছিল? তেমনি, কে জানে—তাহার বহুশত বর্ষ পরে সেই বরষায় মায়াময় স্নিগ্ধ, এক স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল রাত্রি, অজয়ের কূলে কেন্দুবিল্বের বিজন কুঞ্জ-কুটীরে কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের মন কি নবভাবে ব্যাকুল করিয়াছিল? কবির অভিপ্রায় কি ছিল জানি না, কোনোরূপ সিদ্ধান্ত রচনাও আমাদের অভিপ্রেত নহে; আমরা এখানে কয়েকটী বিভিন্ন মতবাদের (সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও মত মাত্র) উল্লেখ করিয়া এই বক্তব্য শেষ করিব। সহৃদয় পাঠকগণ সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার করিবেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের একটী সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের কোনো লিখিত গ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু ব্যাখ্যা যাহা শুনিয়াছি, সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ব্যাখ্যাকারের মতে শ্রীগীতগোবিন্দে দুইটী সঙ্কেত-বাণী পাওয়া যায়—একটী শ্রীমতীর উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে কথিত শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক। অপরটী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রেরিত শ্রীমতীর সঙ্কেত-বাক্য—কাব্যের ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ নামক ষষ্ঠ সর্গের সমাপ্তি ভাগে উল্লিখিত—

"কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণ ভোগীভবনে ভাণ্ডীর ভূমিরুহে
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দ নন্দাস্পদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগ মুখান্নন্দান্তিকে গোপ
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি প্রাশস্ত্য গর্ব্বাগিরঃ॥"

প্রথমটীর ব্যাখ্যা এইরূপ—

"মেঘমেদুর অম্বর, তমালে আচ্ছন্ন বনভূমি এবং রাত্রি একত্র মিলিত হইয়া নিখিল দৃশ্য শ্যামময় করিয়া তুলিয়াছে। হে রাধে, কেন ভীতা হইতেছ? এই তো তোমার অভিসারের উপযুক্ত সময়, এস গতিবেগ বাড়াও কুঞ্জগৃহে তোমার মিলন-মন্দিরে প্রবেশ কর। এই (নন্দ-নিদেশ) মুরলী-সঙ্কেত-চালিতা অভিসারিকা শ্রীমতী পথিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিলেন। যমুনা-কূলের প্রতি কুঞ্জে এই সম্মিলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিজন-ক্রীড়া জয়যুক্ত হউক।" ব্যাখ্যাকার বলেন—ইহা সেই চিরন্তন আহ্বান-বাণী, যাহা অনাদি কাল ব্যাপিয়া অমৃতের সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে। যাহা সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে—হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগ সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই বিশ্বশরণেরই শরণ গ্রহণে ইঙ্গিত করিতেছে। ইহাই ব্রজের কানুর বেণুর গান, ইহাই শ্রীমতী রাধিকার—তথা নিখিল জীব-জগতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী মন্ত্র—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"ভাই পথিক, কালসর্পের আবাসস্থল এই ভাণ্ডীর তরুতলে কেন দাঁড়াইয়া আছ? অদূরে ঐ আনন্দময় নন্দালয় দেখিতেছ, ওখানে কেন যাও না? এ সংসার কুটিল কালের ক্রীড়াক্ষেত্র,—এখানে দাঁড়াইও না, কালের খেলায় মজিও না। ঐ দেখ আনন্দধাম, একমাত্র গন্তব্যস্থল,—যাও, অগ্রসর হও। অথবা এ সংসার সেই শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাভূমি। এখানে তিনিই একমাত্র ভোক্তা। এখানকার যাহা কিছু সব তাঁহারই জন্ম। এই কর্ম্মভূমি তোমার বিশ্রামের স্থান নহে,—আলস্য-বিলাসে মজিয়া মোহের আঁধারে ডুবিয়া এখানে পড়িয়া

থাকিত না। যাও, তাঁহার লীলারহস্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া মনুষ্যত্বের পথে জয়যাত্রা কর। এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া লীলাময়ের নিত্য-লীলাভূমি আনন্দ-নিকেতন নন্দব্রজে যাও। শ্রীকৃষ্ণ পথিকের মুখে শ্রীমতীর এই সঙ্কেত-বাণী শুনিয়া নন্দের নিকট প্রকৃত অর্থ গোপন পূর্ব্বক পথিকের উদ্দেশে যে প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল-গাথা জয়যুক্ত হউক।" ব্যাখ্যাকার বলেন, ইহাই শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণের সঙ্কেত-বাণী—তথা নিখিল জীব-জগতের মাঝে শ্রীভগবৎ অবতারণের অমৃত-মন্ত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা। তবে ব্যাখ্যাতা এই শ্লোক দুইটীর প্রতি শব্দের অর্থ লইয়া যেরূপ সুকৌশলে ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহার এতটুকুও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। বাহুল্য ভয়ে এখানে সেই বিবৃতি বিস্তারের লোভ সম্বরণ করিলাম। আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম হইতেই পাঠক শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বাঙ্গালার এক অতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ের আভাষ পাইবেন।

টীকাকারগণের মত কিন্তু অন্যরূপ। উদাহরণস্বরূপ, এ দেশে প্রচলিত টীকা হইতে সুপ্রসিদ্ধ পূজারী গোস্বামীর এবং মেবারের রাণা কুম্ভের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। পূজারী গোস্বামী বলেন, নন্দ অর্থে আনন্দজনক সখী-বাক্য—"নন্দয়তীতি নন্দ।" ভীরু অর্থে "* * * ত্বৎ কৃত বহু নায়িকা বল্লভতো রোপনাশঙ্কী।" গৃহং প্রাপয় অর্থে 'মঞ্জুতরেত্যাদি বক্ষমানং কেলীসদনং প্রাপয়।" অথবা "ত্বয়েবায়ং গৃহিণী মানস্থিত্যর্থ।" ইহাঁর মতে লীলা-বিলাসের অনুকূল সময়ের জন্য মেঘমেদুর অম্বর এবং রাত্রির অবতারণা করা হইয়াছে। এই শ্লোকটী একাধারে নমস্কার এবং বস্তুনির্দ্দেশবাচক। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে, শ্রীরাধা মাধবয়োঃ রহঃ—কেলয়োইএ প্রতিপাদ্যাঃ, ত্যতো বস্তু নির্দ্দেশোঽপি। "রসিকপ্রিয়া"কার রাণা কুম্ভ শ্লোকের প্রথম দুই চরণকে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি "নন্দ নিদেশতঃ" পদের অর্থ করিয়াছেন "নন্দের নিকট হইতে"। "ভীরু" অর্থে তাঁহার মতে "এভির্ভয় হেতুভি স্মরাহতাঃ সোঢ়ুমসমর্থঃ"। তিনি মেঘাদিকে উদ্দীপন বিভাব, শ্রীরাধাকে আলম্বন বিভাব, এবং শ্রীকৃষ্ণের ভীরুতাকে অনুভাব রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদক বৈষ্ণব কবি রসময় দাস শ্লোকের প্রথম দুই চরণকে নন্দবাক্য ও সখী বাক্য উভয় প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বর্ণিত বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত আছে—

"একদা গোপরাজ নন্দ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া বৎস-গাভী সহ গোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ভাণ্ডীর বনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ নিবিড় মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। মেঘ-গর্জ্জন, করকাপাত, ঝঞ্ঝা-প্রবাহ বনমধ্যে দারুণ দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিল। গোপরাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মেঘ ও বৃষ্টি যেমন অন্তর্হিত হইয়া গেল, অমনি দুর্য্যোগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রসন্ন হাস্যের মত অপরূপ রূপময়ী কিশোরী শ্রীমতী রাধিকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ—

"আদ্যা শক্তিস্ত্বং দেবী ত্বমেব বিশ্বরূপিণী।
গোলকবাসিনী ত্বংহি ত্বমেব শ্রীহরিপ্রিয়ে॥"

ইত্যাদি রূপ স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার কোলে অর্পণ করিলেন। তখন—

"ক্রোড়ে কৃত্বা তু শ্রীকৃষ্ণং শ্রীমতী রাধিকেশ্বরী
জগাম গুপ্ত ভাবেন নিবিড় গহনং বনং।"

সেখানে রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর নটবর বেশ ধারণ করিলেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মা আসিয়া কিশোর কিশোরীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।" রসময় দাসের মতে এই বিবাহ ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই জয়দেব তাঁহার কাব্যের ঐ সূচনা-শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রে এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

এইবার আমাদের কথা বলিব। আমরা কি ভাবে শ্লোকটী বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই কথাই বলিব। কোনোরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এবং বলা বাহুল্য, লেখকের সামর্থ্যের অভাবও তাহার একতম কারণ। মাত্র আলোচনার সুবিধার জন্যই, অর্ব্বাচীন হইলেও, এই সঙ্গে আমাদের মতেরও উল্লেখ করিলাম। আমাদের মতে এই বিবাহ ব্যাপার শ্রীগীতগোবিন্দের পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। কবি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহার মধ্যে বিবাহাদি লৌকিকতার বর্ণ-বিন্যাসের অবকাশ না থাকিবারই কথা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুরাণ-প্রসিদ্ধ লীলা-বিলাসের কোনো প্রসঙ্গ না রাখিয়া—এমন কি শ্রীবৃন্দাবন-লীলারও অপর সমস্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র শুদ্ধ মাধুর্য্যকেই তিনি মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই শ্রীগীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত ব্রজের মধুর ভাবেই ওতোপ্রোতঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যবস্তু, তাঁহাদের লীলা নিত্যলীলা, অনাদি কাল হইতে শাশ্বত আনন্দধামে এই মহারাস-লীলার নিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাই কবি অপর কোনো প্রসঙ্গেরই অবতারণা না করিয়া, সেই লীলারই জয়গান করিয়াছেন "জয়ন্তি যমুনা কূলে রহঃ কেলয়ঃ"।

শ্রীগীতগোবিন্দের বৃন্দাবন—কবি-মানসের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—সত্যই সেই চিরন্তন আনন্দ-লোকের—কবি-হৃদয়ে প্রতিফলিত এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি। তুলনা করিব না,—বিষয় বস্তু পৃথক বলিয়া, পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মের বলিয়া, তুলনা করা সমীচীনও হইবে না; তথাপি এই সৃষ্টি-গৌরবে আদি কবির গৌরব স্পর্দ্ধী মহাকবি কালিদাসের নাম কবি জয়দেবের সঙ্গে প্রায় সমান মর্য্যাদায় উচ্চারিত হইতে পারে। "মেঘদূতে" কবি যেমন এক অপূর্ব্ব জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন,—যথায় ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহ জরা মৃত্যু নাই, রজত-শুভ্র শিব নিবাস কৈলাসাচলের এক প্রান্তে সেই সুখ-নিকেতন কুবের-পুরী মহানগরী অলকা। কবি অলকার বর্ণনা করিতেছেন—

১

বিদ্যুদ্বন্তং ললিত বনিতা সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহত মুরজাঃ স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষম্
অন্তস্তোয়ং মণিময় ভূবস্তুঙ্গমভ্রং লিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতু মলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ।

* * * * *

৩

যত্রোন্মত্ত ভ্রমর মুখরাঃ পাদপা নিত্য পুষ্পা
হংসশ্রেণী রচিত রসনা নিত্য পদ্মা নলিন্যাঃ
কেকোৎকণ্ঠা ভবনু শিখিনো নিত্য ভাস্বৎ কলাপা
নিত্য জ্যোৎস্না প্রতিহত তমোবৃত্তি রম্যা প্রদোষাঃ।

৪

আনন্দোত্থং নয়ন সলিলং যত্র নান্যৈ নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপো কুসুম শরজাদিষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ
নাপ্য নস্মাৎ প্রণয় কলহদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ
বিত্তেশানাং নচ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।

* * * * *

৬

মন্দাকিন্যা সলিল শিকরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভিঃ
মন্দারানা মনুতটরুহাং ছায়য়া বারি তোষ্ণাঃ
অন্বেষ্টব্যৈঃ কণক সিকতামুষ্টি নিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মনিভি রমর প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ

(মেঘদূত—উত্তর মেঘ)

এমনই সে দেশ, যেখানে যৌবন ভিন্ন বয়স নাই, আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রু নাই, প্রণয় কলহ ভিন্ন কলহ নাই। তাপ একটু আছে, তাহাও মদনশরজ এবং "ইষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ"—বেশী প্রখর হইবার উপায় নাই; কারণ, শিবধাম বলিয়া সেখানে মদনও খুব সঙ্গোপনেই যাতায়াত করেন। আশ্চর্য্য দেশ, কিন্তু দেশের লোকে দিনযাপন করে কিরূপে? অন্য কবি হইলে কি করিতেন জানি না, তবে কালিদাস পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন—তিনি সে দেশের লোকেরও কার্য্যের তালিকা দিয়াছেন। সে দেশের লোকেও কাজ করে—কেহই বসিয়া থাকে না। সে দেশের নর নারী স্বর্গ-গঙ্গার মনোহর সৈকতে মণি লুকাইয়া রাখিয়া তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে—এই কাজ। শ্রান্তিবোধ হইলে—পার্শ্বেই পুষ্পস্তবক-ভূষিত মন্দার-তরু—তাহারা তাহারই ছায়ায় গিয়া খেলা করে, আর মন্দাকিনী-স্নাত সুরভি পবনে তাহাদের সকল ক্লান্তি দূর হইয়া যায়—এই কাজ! কখনো কখনো পুরুষেরা বরাঙ্গনাগণ সহ বৈভ্রাজ পুরীর বহিরোদ্যানে গিয়া কিন্নরদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করে—এই কাজ! কবি জয়দেবেরও এইরূপ একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মাধুর্য্যের দেশ—শ্রীবৃন্দাবন। দেশের নায়ক চির-কিশোর, নায়িকা চির-কিশোরী, সখা-সখিগণও তাঁহাদেরই অনুরূপ। এদেশের লোকও ঈর্ষা-দ্বেষ জানে না—অধিকন্তু সুখ-দুঃখাদি নিজেদের ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম বলিতেও তাহাদের কিছু নাই—ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষত্ব। এ বনের একমাত্র নায়ক শ্রীকৃষ্ণ; ব্রজবাসী কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বাঞ্ছা পূরণের জন্যই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে, বনবাসী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের রসস্বরূপ, শ্রীমতী তাহাদের মহাভাবময়ী,—এই রসরাজ মহাভাবের খেলাতেই তাহারা ভোর হইয়া আছে। সখা-সখিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়াই চির সুখী, কৃষ্ণ সেবার জন্যই তাহারা বাঁচিয়া আছে, কৃষ্ণদর্শনই তাহাদের জীবন, কৃষ্ণ-বিরহই তাহাদের মরণাধিক। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া রসভাবের বিভূতি-বিলাসই তাহাদের জীবনী-শক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাই এ দেশেও কলহ আছে—প্রণয়-কলহ, কিন্তু বড় গুরুতর, আরম্ভ হইলে সে কলহ শীঘ্র শেষ হইতে চাহে না—"দেহি পদ পল্লব মুদারম" শ্রীবৃন্দাবনে এমন কিছু বেশী কথা নহে! এ দেশের নায়ক-নায়িকার নিত্য কার্য্য মধুর বিলাস।

সে লীলা নিত্য-নূতন, কখনো পুরাতন হয় না, লীলার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই, লীলারস পান করিয়া দেশ চির-নবীনতা লাভ করিয়াছে—অমর হইয়া গিয়াছে,—দেশবাসী তাই মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করে। কেবল মিলনে রসের বিকাশ হয় না, পুষ্টি-সাধন হয় না,—তাই কবি তাঁহার নায়কনায়িকানুগত ব্রজবাসিগণের দিন যাপনের একটী চিত্র দিয়াছেন। তাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন—অভিসারে, বাসক-সজ্জায়, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধায়, খণ্ডিতায়, মানে, কলহান্তরিতায় দিন রাত্রি অবিচ্ছেদে এই লীলা চলিতেছে। আমাদের মনে হয়, লীলার এই নিত্যতা রক্ষার জন্যই কবিকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে।

লৌকিক জগতে প্রচলিত কতকগুলি লীলা-পর্ব্বের মধ্যে শয়ন, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও উত্থান-যাত্রা অন্যতম। ভবিষ্যৎ পুরাণ বলেন—"নিশি স্বপ্নো দিবোত্থানাং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনং" নিশিতে শয়ন দিবাতে উত্থান, ও সন্ধ্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু নিত্য-লীলার দেশে তো এ সব থাকিবার কথা নহে। শ্রীগীতগোবিন্দের আখ্যান-বস্তু ভারতের বহুজনসম্মানিত হিন্দুর চিরপূজ্য পুণ্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত, সুতরাং ভক্ত কবি পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া—লৌকিক জগতের ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাধা নিরসন জন্যই সূচনা শ্লোকে বর্ষার আভাষ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকেই জানেন—আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে শয়ন-যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং শারদীয় মহা-রাস-পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশীতে উত্থান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কয় মাস সাধারণতঃ "হরি-শয়নের" কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরি-শয়ন স্বীকার করিয়া লইলে নিত্য-লীলা বাধা প্রাপ্ত হয়, অথচ পৌরাণিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিবারও উপায় নাই। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতই কবির প্রধান অবলম্বন, তথাপি অন্যান্য পুরাণ হইতেও কবি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরাধার প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। সুতরাং কবিকে পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া এক্ষেত্রে সুকৌশলে নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে স্মৃতি যখন নিবেদন করিতেছেন—

"পশ্যন্ত মেঘান্যপি মেঘশ্যামং।
ত্বাপাগতং সিচ্যমানাং মহীমিমাং॥
নিদ্রাং ভগবান গৃহ্ণাতু লোকনাথ।
বর্ষা মিমাং পশ্যতু মেঘবৃন্দং॥"

কবি তখন বলিতেছেন—

* * প্রত্যধ্ব কুঞ্জদ্রুমং—
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তী যমুনা কূলে রহঃ কেলয়ঃ

কবি-বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি—হে শ্রীরাধামাধব, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের হৃদয়-বৃন্দাবনে তোমাদেরই নিত্যলীলা চির জয়যুক্ত হউক।

রোঁদ*

শ্রীঅমলচন্দ্র সেন

কুমার বাহাদুর! মহারাজ প্রতাপ সিংএর পক্ষ হ'তে আমাদের এই প্রাচীন দুর্গে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা করছি। আপনি এখানে কয়েক দিন থাকবেন জেনে আমরা বাস্তবিকই নিজেদের অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। মহারাজা বাহাদুর নিজে এসে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে না পারায় বড়ই দুঃখিত ও লজ্জিত। কিন্তু আপনি ত জানেন যে, মহারাজা বাহাদুর নির্জ্জনে থাকতেই ভালবাসেন এবং সেই জন্য আপনার ন্যায় মাননীয় অতিথির সম্বর্দ্ধনার ভার আমাদের উপরেই দিয়েছেন।

আমি ভাল বাংলা বলতে পারি না সেজন্য—আপনি হিন্দুস্থানি জানেন?—তা হো'ক কুমার বাহাদুর! আপনি যখন আমাদের অতিথি, তখন আপনার মাতৃভাষাতেই যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করব। এঁরা কারা জিজ্ঞেস করছেন? ইনি হচ্ছেন বলবন্ত সিং, মহারাজা বাহাদুরের কোষাধ্যক্ষ; আর ইনি মহাতপ সিং, কার্য্যাধ্যক্ষ। আপনি তা হ'লে প্রতাপগড়ে যাচ্ছিলেন, আমাদের বিজয়-গড়ের নাম শুনে কয়েক দিনের জন্য এসেছেন? বেশ, আপনার ন্যায় মাননীয় অতিথিকে এ রকম অযাচিতভাবে পেয়ে আমরা যে কত আনন্দিত হয়েছি, তা আমার এ ভাঙা বাংলায় প্রকাশ করতে পারছি না। একটা সিগার ইচ্ছা করুন! এবং আপনারই বাড়ী বলে মনে করবেন, কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করলে মহারাজা বাহাদুর বড়ই দুঃখিত হবেন।

আপনি এই রাজ-প্রাসাদের স্থাপত্য-কলা দেখে খুসী হয়েছেন? আপনি মনে করেন যে, ইহা অন্ততঃ হাজার বৎসর আগেকার তৈরী? সম্ভব, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা একমত নই। ওহে মহাতপ! গড়গড়ার নলটা কুমার বাহাদুরকে এগিয়ে দাও। হাঁ, আমাদের এই রাজপ্রাসাদ যে এক কালে কি রকম গম্‌গমে ছিল, তা আপনি এখনকার এই অবস্থা দেখে ধারণাও করতে পারবেন না। হায় কি কুক্ষণেই,—ভয় নেই বলবন্ত, আমি কোন পারিবারিক কথা বেফাঁস করব না, এটুকু বুদ্ধি এখনও আমার আছে। আমার দিকে চোখ ইসারা না ক'রে, তুমি বড় আতরদানটা কুমার বাহাদুরকে এগিয়ে দাও। এটা একেবারে খাঁটি পারস্য দেশের আতর, কুমার বাহাদুর,—আপনি বরং পরীক্ষা ক'রে দেখুন। হাঁ, আমি কি বলছিলাম? ঠিক! এক শত বৎসর আগে বিজয়গড়ের রাজপ্রাসাদ যে দেখে নি, তা'র জীবনটাই বৃথা গেছে। আপনি নিশ্চয় প্রতাপগড়ের ঐশ্বর্য্য ও দিলদারনগরের সৌন্দর্য্যের কথা শুনেছেন। বিজয়গড়ের তুলনায় এ'দের নিতান্তই অসার বলে মনে হয়।

আপনি আজ যে ঘরে শয়ন করবেন, এক দিন ঐ ঘরে স্বয়ং সম্রাট আকবর শাহ শয়ন করেছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে ৫০০ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এই প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। আমাদেরই বাল্যকালে যখন মহানুভব সম্রাট সাজাহান এখানে আসেন, তখন ৩০০ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে এই প্রাসাদে থাকতে দেখেছি। আহা! সম্রাট সাজাহান পুত্রের হাতে বন্দী হ'য়ে যখন প্রাণ হারালেন, তখন আমাদের তখনকার মহারাজা কি শোকটাই প্রকাশ করেছিলেন! তিনি তাঁর সমস্ত প্রজাকে শাদা পাগড়ী পরিয়ে একমাস কাল শোক প্রকাশ করিয়েছিলেন! এই জন্য তাঁর বাইশ লক্ষ পাগড়ী তৈয়ার করতে হয়েছিল।

বুঝেছেন কুমার বাহাদুর! আমাদের এই রাজ্য তখন এই রকমই সমৃদ্ধিশালী ছিল। আপনি বোধ হয় আপনার সামনে ঐ জানালার মধ্য দিয়ে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু আপনার

---

* একটী ফরাসী গল্পের অনুসরণে।

সামনে এই প্রকাণ্ড প্রাসাদের অর্দ্ধেকেরও বেশী পড়ে রয়েছে। আমি আপনাকে শপথ ক'রে বলতে পারি যে, আমি যে সময়কার কথা বলছি, তখন এমন একটা দিনও যেত না, যেদিন সন্ধ্যা হ'তে সকাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাসাদখানি আলোয় না ঝলমল করত। আর মহারাজা বাহাদুরের ঘোড়াশালা! সেও একটা দেখবার জিনিস ছিল। এ বিষয়ে অবশ্য আমার চাইতে আমার বন্ধু মহাতপ ভাল বলতে পারেন। তবে আমি এ কথা জোর করে বলতে পারি যে, বিলাতে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছেলেরা যে আদর-যত্নে পালিত হয়, মহারাজা বাহাদুরের ঘোড়াদের তার চাইতে কম যত্ন নেওয়া হ'ত না।

খাওয়ার আয়োজন বেশী করা হয়েছে? ও কথা বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না। আপনার মতন সম্ভ্রান্ত অতিথি ও এই প্রাচীন রাজবংশের উপযুক্ত কিছুই হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বিশেষ কোন কারণে মহারাজা বাহাদুর,—ভয় নেই বলবন্ত আমি সে কথা বলছি না। * * * আপনি ঠিকই বলেছেন যে গুরু-ভোজনের পরই শয়ন করতে যাওয়া ঠিক নয়। কি খেলবেন, তাস? বেশ! কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, এখন তাস খেলার জন্য চার জন লোক পাওয়া যাবে না। * * ঠিক, আপনি ঠিকই ঠাওরেছেন! বাস্তবিকই বাঙ্গালীদের মত বুদ্ধিমান জাতি আর কোথাও দেখা যায় না। আজ্ঞা হাঁ, কুমার বাহাদুর, রাত্রি প্রায় নটা হ'ল,—বলবন্ত ও মহাতপের এখন মহারাজা বাহাদুরের কাছে যেতে হ'বে। রাত নটা হচ্ছে রোঁদে বেরোবার সময়। বুঝলেন না? তবে বলি শুনুন,—ওহে বলবন্ত, তুমি চোখ পাকিয়ে ও ভুরু কুঁচকে আমাকে ভয় দেখিও না। পারিবারিক রহস্য যে গোপন করা উচিত, তা আমার জানা আছে। ঐ দেখ, মহারাজা বাহাদুরের খাস খানসামা তোমাদের ডাকতে এসেছে। মহারাজা বাহাদুরকে বোলো যে কুমার বাহাদুর বলছেন যে, তিনি বেশ আরামেই আছেন এবং তাঁর কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। আর দেখ, একটু সকাল সকাল ফিরতে চেষ্টা কোরো। যদি দশটার মধ্যে তোমাদের রোঁদ হয়ে যায়, তা'হলে হয়ত কুমার বাহাদুর একটু তাস খেলতে ইচ্ছা করবেন।

আঃ কি ঠাণ্ডা,—এরা আবার দরজাটা খুলেই রেখে গেল! না, না, আপনি উঠবেন না। যদিও আমার বয়স ষাট পেরিয়েছে, উঠে দরজাটা বন্ধ করবার শক্তি ভগবান এখনও আমার রেখেছেন। কি করা যায় বলুন ত? ওদের ফেরা পর্য্যন্ত একটু দাবা খেলবেন কি? আচ্ছা, আসুন তবে।

* * . এই কিস্তী? বেশ মুস্কিলেই ফেললেন দেখছি! আচ্ছা এই ঘোঁড়া,—ও কি? আপনি ওদিকে কি দেখছেন? ওঃ! আমাদের সামনে প্রাসাদের জানালাগুলিতে আলোর খেলা দেখে আপনি একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন দেখছি। একটু আগেই আমি আপনাকে যা বলছিলাম,—এই দৈনিক রোঁদ আরম্ভ হয়েছে। আজ বিশ বৎসর ধরে আমি রোজ ঠিক এই সময়ে এই রোঁদ দেখে আসছি।

আচ্ছা, এই জানালার কাছে আসুন। একটু পরেই না হয় আমাদের খেলা ফের আরম্ভ করা যাবে। ঐ দেখুন, সবার আগে লণ্ঠন হাতে একটা লোকের ছায়া,—ইনি হচ্ছেন বলবন্ত; তার পরেই মহাতপ, আর সবার পিছনে ঐ যে দীর্ঘ মূর্ত্তির ছায়া দেখছেন, একটু যেন নুয়ে পড়েছে,—উনিই হচ্ছেন আমাদের মহারাজা বাহাদুর! মহারাজা বাহাদুরের চেহারা ভাল করে দেখে নিন, কারণ আর ত দেখতে পাবেন না! কেন দেখতে পাবেন না? বেই ত মুস্কিলে ফেললেন দেখছি! আপনি পরশু প্রতাপ-গড়ে যাবেন বলছিলেন না? সেখানে আমার বন্ধু ডাক্তার বিক্রম সিং বোধ হয় এ বিষয়ে আমার মত দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। আপনি তাঁর কাছেই সব শুনতে পাবেন। কিন্তু, দ্বিধাই বা কেন? মহারাজা বাহাদুর সম্বন্ধে কোন গোপন কথা অপরের কাছ থেকে শোনার চাইতে আমার মতন তাঁর আজীবন ভৃত্যের কাছে শোনা ভাল নয় কি? ক'টা বাজল? সাড়ে ন'টা? ওদের ফেরবার এখনও দেরী আছে, এর মধ্যেই আমি বলতে পারব। কিন্তু বলবন্ত সিং ভয়ানক চটে যাবে; আপনি কথা দিন যে,—না, না, আপনার কথাই যথেষ্ট, আর শপথ করতে হবে না। হাঁ, কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনি মহারাজা বাহাদুরের দেখা পাবেন না, কারণ,—কারণ,—আঃ, কি বলি, ঠিক কথাটা যে মনেই হচ্ছে না,—যাকগে, কারণ, মহারাজা বাহাদুর পাগল।

পাগল বটে, কিন্তু তিনি চিরকাল এ রকম ছিলেন না।

আমি যে সময়কার কথা বলছি, তখন মহারাজা বাহাছরের মত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক এ অঞ্চলে আর একটিও ছিল না। সে প্রায় পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। আমাদের মহারাণী পদ্মিনী দেবী ঠিক পদ্মিনীরই মত সুন্দরী ছিলেন। উঁহাদের তিন বছরের একটী মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার মীরা। সে ছিল ঠিক তার মায়ের মতই সুন্দরী। ঐ যে দূরে ছোট্ট নদীটি দেখছেন,—সবুজ মাঠের মধ্য দিয়া এঁকে বেঁকে চলেছে,--এক দিন হোল কি, তার পরিচারিকা ঐ নদীর ধারে মীরাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ওই অলক্ষণা নদী মীরাকে গ্রাস করল। খানিকক্ষণ পরে অবশ্য নদী মীরাকে ফিরিয়ে দিলে,—কিন্তু অসাড়, নিস্পন্দ।

আমাদের এই বিজয়গড়ের আগেকার অবস্থা যে দেখেছে এবং এখনকার এই শোচনীয় অবস্থা যে অনুভব করতে পেরেছে, সেই কেবল বুঝতে পারবে এই দুর্ঘটনার জের কতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছে। বেশী কথা বলবার সময় নেই,—তিন মাসের মধ্যেই দারুণ মনোকষ্টে মহারাণী মারা গেলেন। আর মহারাজা বাহাছর! তাঁরও বোধ হয় ঐ শোকে মৃত্যু হ'লেই ভাল ছিল। আজীবন মহারাজা বাহাছরের নিমক খেয়েছি,—কি দুঃখেই যে কথা বলছি, সহজেই বুঝতে পারেন। মহারাণীর শোকে মহারাজা বাহাছর উন্মাদ হয়ে গেলেন। এখন পর্য্যন্ত সেই উন্মত্ত অবস্থাই আছে,--তবে তার গতিটা অন্য পথে চালিত হয়েছে। কি রকম করে হল শুনুন।

কুমার বাহাছর, আমি অবশ্য নিশ্চয় বুঝি যে, নিজের কথা নিজের মুখে বলা শোভা পায় না; কিন্তু দুই একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি,—আশা করি, এজন্য আমাকে দাম্ভিক মনে করবেন না। একজন হোমরা-চোমরা না হলেও, ডাক্তারী-শাস্ত্রটা আমি ভাল করেই অধ্যয়ন করেছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুপ্তকে জানেন! আমি তাঁরই ছাত্র। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন এবং খুব যত্নের সহিত আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আঃ, কি দিনই গিয়েছে! যাক্, আপনি কি আর একটী সিগার নেবেন? আমি কিন্তু সিগারের চাইতে সিগারেটই বেশী ভালবাসি।

হাঁ, কি বলছিলাম? মহারাজা বাহাছরের পাগলামীর কথা! আপনি বোধ হয় স্বীকার করবেন কুমার বাহাদুর, যে সব পাগলামীর মধ্যেই কিছু না কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। বুঝতে পারলেন না? অর্থাৎ আমরা তার যে পথে চলা উচিত বা যা করা উচিত মনে করি, অনেক সময় সে ঠিক তার উল্টা করে বসে। এর মধ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নেই? ঠিকই ত,—কারণ এর মধ্যে পাগলামী নেই। আমাদের মহারাজা বাহাছরের পাগলামীর মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই ছিল যে, যে ঘটনার দরুণ তিনি পাগল হলেন, তাঁর পাগলামীর মধ্যে সে ঘটনার একটু গন্ধও ছিল না। মহারাজা বাহাছর তাঁর তিন বছরের মেয়ে মীরাকে অবশ্য খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি মহারাণী পদ্মিনীকে তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। আর মহারাণীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর থেকেই মহারাজা বাহাছরের উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু, আপনি শুনে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হবেন যে, তাঁর উন্মত্ত প্রলাপের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর আদরিণী কন্যা মীরার স্মৃতিই তাঁকে কষ্ট দেয়। মহারাণীর জন্য তাঁকে শোক করতে এ পর্য্যন্ত আমরা কেউ দেখিনি। মহারাণীর মৃত্যুর কথা তিনি খুব ভাল করেই জানেন,--এমন কি তাঁর মৃত্যুকালীন চেহারার বর্ণনা ও মহারাণীর মুখের শেষ কথা মহারাজা বাহাছরের মুখে অনেকবার শুনেছি। তাঁর মেয়ে মীরার মৃত্যুর কথা মহারাজা বাহাছরের কাছে বলবার উপায় নেই,—তাঁর ধারণা যে, মীরা এখনও বেঁচে আছে,—কেবল আমি, বলবন্ত ও মহাতপ ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কষ্ট দেবার জন্য মীরাকে লুকিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বেচারা তাঁর কন্যার মৃতদেহ শ্মশানে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত তাঁর বুকে চেপে রেখেছিলেন এবং মহারাণীর মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত এমন একটা দিনও যায় নাই, যেদিন না মহারাজা বাহাছর নিজের হাতে তাঁর মেয়ের চিতাশয্যার উপর একগাছি যুঁই ফুলের মালা চোখের জলে ধুয়ে রেখে এসেছেন। এখন সে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে,—এখন মহারাজা বাহাছরের ধারণা যে, মহারাণী সত্যই মৃত, কিন্তু মীরা এখনও বেঁচে আছে, আর আমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছি। এ অবস্থায় আপনি কি করতেন? বোধ হয় আমি যা করেছি আপনিও তাই করতেন। আমি দেখলাম যে, এ রকম ঘোর উন্মত্ত

অবস্থা থেকে একেবারে রোগ-মুক্তির চেষ্টা করা বৃথা ; কিন্তু পাগলামীর প্রকোপটা বোধ হয় চেষ্টা করলে কমান যেতে পারে। * * বাঃ, আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন। মহারাজা বাহাদুরের পাগলামীর প্রকোপ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে, আমি এক দিন আমার মতলব বলবন্তকে খুলে বল্লাম। অবশ্য বলাই বাহুল্য, বলবন্ত খুব আনন্দের সহিতই রাজি হ'ল, এবং আমরা দুজনে আমাদের মতলব কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টায় থাকলাম। আচ্ছা কুমার বাহাদুর! আপনি বলতে পারেন মতলব আঁটার চাইতে কাজ করা এত শক্ত কেন ?

আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, আমাদের মতলব ছিল— একটী তিন চার বছরের সুন্দরী মেয়ে খুঁজে এনে মহারাজ বাহাদুরের কাছে তাঁর মেয়ে মীরা বলে দাঁড় করান। এতে অবশ্য আমাদের ভয়ের কিছুই ছিলনা, কারণ এ সময়ে মহারাজা বাহাদুরের পাগলামীর প্রকোপটা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তার আরও বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা ছিল না। অপর পক্ষে, আমাদের আশা ছিল যে, আমাদের মতলব মত কাজ করলে হয়ত একটু উপকার হতে পারে। বাস্তবিকই উপকার হয়েও ছিল, আর সেটা এত বেশী পরিমাণে যে, আমরা তাহা স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি। কিন্তু আমরা যে নিজেদের জালে কি রকম জড়িয়ে পড়েছি, তা আপনি বোধ হয় ধারণাও করতে পারবেন না। এটা যে আমার বন্ধু বলবন্তের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই ; আর এই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকবার ঝগড়াও হয়ে গিয়েছে।

ঘটনাটা দাঁড়াল এই যে, একটী তিন চার বছরের ছোট্ট মেয়ের দরকার এবং সেজন্য বলবন্ত ও মহাতপকে খোঁজে পাঠান হল। কয়েক দিন পরে তারা একটী মেয়েকে নিয়ে এসে হাজির হল। * * চুরি করে ? না, না, চুরি করে নয়, ক্রয় করে! আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন ; কিন্তু এ কথা শুনলে আরও আশ্চর্য্য হবেন যে, যখন বলবন্ত মেয়েটীর বাপের কাছে প্রস্তাব করলে যে মেয়েটী পছন্দ না হ'লে তা'কে অর্দ্ধমূল্যে ফেরৎ দিবে, এ প্রস্তাবে কিছুতেই তাকে রাজি করান গেল না। মেয়েটী ছিল বেদের মেয়ে। হাঁ, কুমার বাহাদুর, বেদের মেয়ে, এবং এইটেই হ'ল বলবন্তের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। নকল মীরা বাস্তবিকই খুব সুন্দরী ছিল ; এবং আসল মীরার সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্যও ছিল,— কেবল তার চুলগুলি ছিল একটু কটা। বুঝেছেন কুমার বাহাদুর! আমরা যেদিন এই নকল মীরাকে বেচারা কন্যাহারা পিতার নিকটে উপস্থিত করলাম, সেদিনকার সেই দৃশ্য বর্ণনা করবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের অবশ্য একটা মিথ্যার রচনা করতে হ'ল,—আমরা বললাম যে, মীরাকে বেদেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, আর এক বৎসরের চেষ্টার ফলে আমরা তাকে খুঁজে বার করেছি। মহারাজা বাহাদুর খুব দরাজ হাতেই আমাদের পুরস্কার দিলেন, কিন্তু চকচকে সেই মোহরগুলি ঠিক তপ্ত অঙ্গারের মতই আমাদের হাত পুড়িয়ে দিল।

আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন কুমার বাহাদুর, যে একটা বেদের মেয়ে না এনে যদি বলবন্ত একটী ভদ্রঘরের মেয়ে খুঁজে আনত, তা'হলে আমাদের আজ এ দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না। এই নকল মীরাকে আসল বলে চালাতে গিয়ে, আমরা যে কি কষ্ট পেয়েছি, তা আপনাকে বলতে পারি না। কত উৎপাতই যে তার আমরা সহ্য করেছি। একদিন ত সভার মাঝে রাজগুরুর টিকি ধরে টেনে তাঁকে ফেলে দিলে,—এক দিন গোয়াল-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ; আর একদিন,—যাক্, আর কত বলব ?

মহারাজা বাহাদুরের কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হল ; আমাদের মতলব সফল হল, তাঁর পাগলামী সেরে গেল। কিন্তু বিশ বৎসর ধরে তাঁকে এই মিথ্যার আবরণে ঢেকে রাখা যে আমাদের কাছে কতদূর কষ্টসাধ্য হয়েছিল, তা আপনি সহজেই বুঝতে পারেন। আমাদের সর্ব্বদাই ভয় হ'ত, কবে বা এই তাসের ঘর কোন অদৃশ্য অদৃষ্টের নির্ম্মম ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া যায়। ঠিক এই সময়ে আমাদের মহারাজা বাহাদুরের দৈনিক রোঁদ,—যা আপনি একটু আগেই দেখলেন,—আরম্ভ হল। আপনার বোধ হয় মনে আছে, কুমার বাহাদুর, যে আমরা মহারাজা বাহাদুরকে বুঝিয়েছিলাম যে, মীরাকে বেদেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। পাছে বেদেরা তাঁর আদরিণী কন্যাকে আবার চুরি করে, এই ভয়ে মহারাজা বাহাদুরের ঘুম হ'ত না। এই চিন্তা ছাড়া তাঁর মনে অন্য কোন চিন্তা ছিল না। সন্ধ্যা হতে না হ'তেই রাজপ্রাসাদের ফটক বন্ধ হ'য়ে যেত, এবং মহারাজা বাহাদুর নিজে ও আমরা তিনজনে মুক্ত তরবারি হস্তে সমস্ত প্রাসাদ

ঘুরে পাহারা দিতাম। ঐ দেখুন, মহারাজা বাহাদুর নিজে লণ্ঠন-হস্তে পাহারা দিচ্ছেন। ঐ দেখুন, কেমন তিনি প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক কোণটি পর্য্যন্ত পরখ করে দেখছেন। এখন তিনি মীরার ঘরের সামনে যাবেন, এবং দরজায় কাণ লাগিয়ে, হয়ত বা সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখবেন যে, ঘরের মধ্যে সব ঠিক আছে কি না।

বাস্তবিকই কুমার বাহাদুর, এর চাইতে মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার আমি কখনও দেখিনি বা শুনিনি। কিন্তু আরও আছে,—ঐ ঘর, মীরার ওই ঘর এখন আবার শূন্য। কেমন করে হ'ল? তা শুনে আর কি হ'বে? * * কা'র দোষে? বলবন্ত বলবে মহাতপের, মহাতপ বলবে আমার, আমি বলব বলবন্তের। পাজি নচ্ছার বেটী বোধ হয় কোন রকমে আমাদের গোপন কথাটা টের পেয়েছিল। যাই বলুন না কেন, কুমার বাহাদুর, মানুষের কাজ ত? যতই ভাল হোক না কেন, তা'তে কিছু না কিছু গলদ থাকবেই।

বলবন্ত ও মহাতপের ফেরবার সময় হ'ল, আসুন আমাদের খেলাটা শেষ করা যাক্। দেখবেন, আপনাকে যা বললাম—ওরা যেন টের না পায়। আর আপনি ত পরশুদিন প্রতাপগড়ে সবই শুনতে পাবেন। * * হাঁ, এবার এই নৌকার কিস্তি সামলান ত? আপনি আর কি শুনতে চান? মেয়েটীর কি হ'ল? এক দিন এই প্রাসাদের কাছে একদল বেদে এসে তাঁবু ফেলেছিল। আমরা অবশ্য তাদের তৎক্ষণাৎ চ'লে যাবার হুকুম দিলাম। তারা চলেও গেল; কিন্তু তার পরদিন থেকেই নকল মীরার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আর মহারাজ বাহাদুর? যেদিন তিনি নকল মীরার অন্তর্ধানের সংবাদ পেলেন, সেদিন থেকেই তাঁর পাগলামী আবার ফিরে এল। কিন্তু এবারকার পাগলামী বড়ই করুণ! তিনি মনে করেন, মীরা এখনও আগেকার মতন এখানেই আছে। যখন আমরা রোঁদে বেরিয়ে তার দরজার সামনে দিয়ে যাই, তখন মহারাজা বাহাদুরের হুকুম অনুসারে সকলকেই অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যেতে হয়,—পাছে মীরার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এই যে, এঁরা আসছেন। এবার আপনার চাল কুমার বাহাদুর—!

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

চার্লস হফ্

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ইয়োরোপে বোধ হয় চার্লস হফের মত দৌড়-লাফ, ঝাঁপ ইত্যাদি সকল প্রকার খেলাতে সুনিপুণ খেলোয়াড় আর নাই। "পোল-জাম্পে" ইনি পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমেরিকাতে এক খেলা-প্রদর্শনীতে হফ্ ১৩ ফিট ৯¼ ইঞ্চি পোল জাম্প করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এত উঁচু লাফ আর কেহ দিতে পারে নাই। তাঁহার সঙ্গে আর যে সকল আমেরিকান এবং অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়েরা লাফ দিতেছিল, তাহারা প্রায় সকলেই ১২ ফিটের ঘরে আসিয়াই থামিয়া যায়। চার্লস হফ যে কেবল পাকা খেলোয়াড় তাহা নহে,—বাদ্য, লেখাপড়া, সঙ্গীত ইত্যাদি বিদ্যাতেও ইনি কাহারো অপেক্ষা কম যান না। নরওয়ের এক বিখ্যাত কাগজের ইনি ক্রীড়া-বিভাগের সম্পাদক। নানা প্রকার চমৎকার প্রবন্ধ তিনি ঐ কাগজে লিখিয়া থাকেন।

বাল্যকালে হফের শরীর অত্যন্ত কৃশ ছিল। কিন্তু তিনি কেবল মনের জোরে এবং অধ্যবসায়ের ফলে নিজের শরীরের উন্নতি করিয়াছেন। যে পোল-জাম্পের জন্য চার্লস হফের পৃথিবী ব্যাপিয়া নাম—তাহা এক সময় তিনি একপ্রকার অসাধ্য বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি কেমন করিয়া পোল-জাম্পার হইলেন, তাহার সম্বন্ধে তিনি বলেন:—

"আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি গরীব, সেইজন্য সকল বিদ্যালয় ক্রীড়া-শিক্ষক রাখিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় একজন করিয়া খুব ভাল ক্রীড়া-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তিনি সকল বিদ্যালয়ে সময়মত গমন করেন এবং ছাত্রদের নানা প্রকার ক্রীড়া শিক্ষা দেন। আমাদের ওস্লো বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ক্রীড়া-শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-শিক্ষক বলা যায়।

চার্লস হফ্

আমি গ্রাজুয়েট্ হইবার পর এক দিন তিনি আমাকে বলিলেন, চার্লস, তুমি খুব ভাল পোল-জাম্প দিতে পার। আমি কথাটা শুনিয়া অবাক হইয়া যাই। পূর্ব্বে কখনও পোল-জাম্প দি নাই। সেই সময় হইতে পোল-জাম্প অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন দশ মাস পরে ১৯২২ সালে ১৩ ফিট ৬ ইঞ্চি লাফ দিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গিলাম।"

চার্লস হফ তাঁহার নিজের দেশে ১৯২৩ সালে ১১ ফিট ৬ ইঞ্চি উঁচু পোল-জাম্প করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ ফিট লাফ দিবেন—এবং ইহাই পৃথিবীর রেকর্ড জাম্প হইয়া থাকিবে।

ব্যায়াম এবং ক্রীড়া আয়ু বৃদ্ধি করে

একদল লোকের ধারণা আছে যে যাহারা অতিরিক্ত খেলা, লাফ, দৌড় ইত্যাদি করে, তাহাদের আয়ু কমিয়া যায়। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কতকগুলি অতি বৃদ্ধ, অর্থাৎ ৭০ বছরের বেশী বয়সের লোকের বাল্য এবং যুবক বয়সের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহারা প্রায় সকলেই ফুটবল ইত্যাদি খেলা খুব বেশী রকমই খেলিত। ফুটবল খেলাই বোধ হয় মানুষের শরীর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃঢ় করে। লম্বা দৌড়ে যাহারা খুব দক্ষ, তাহাদের আয়ুও খুব লম্বা হয়—ইহাও পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে।

রোগা হইবার সহজ উপায়

প্যারিসের বিখ্যাত ডাঃ জি, লেভেন মোটা মানুষদের রোগা হইবার এক সহজ উপায় অনেক পরীক্ষাদি করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উপায় অতি সহজ,—ইহাতে কোন ঔষধাদি খাইতে হয় না। এমন কি বিছানায় শুইয়া শুইয়া এই উপায়ে শরীর পাতলা করা যাইতে পারে। উপায়টি এই:—নিশ্বাসের সঙ্গে খুব কম হাওয়া ভিতরে লইয়া তাহা খুব জোরের সঙ্গে বাহির করিয়া দিতে হয়। প্রতি আধ ঘণ্টায় এইরূপ নিশ্বাস-প্রশ্বাস পাঁচবার করিয়া করিতে হইবে। দিনে পনের হইতে কুড়িবার এইপ্রকার করা দরকার। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে।

এই উপায়ে একজন অতি মোটা ব্যক্তি ২০ দিনে ১৫ পাউণ্ড ওজন কমাইয়াছে। আর একজন ৬ মাসে ৬০ পাউণ্ড কমাইয়াছে। আমাদের দেশে অতি কদাকার দেখিতে মোটা লোক প্রচুর আছে,—তাহারা এই প্রথায় চিকিৎসা করিলে ফললাভ করিতে পারে। অন্ততঃ একবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারে।

ব্যায়াম এবং ক্রীড়া আয়ু বৃদ্ধি করে।

মোটর-বাড়ী

বার্লিন সহরে এক দিন সকলে দেখিল—একখানা ছোটখাট বাড়ী সহরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাড়ীখানি একটি মোটরকারের উপর তৈরী। দূর হইতে দেখিলে মোটরকার বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। গাড়ীখানি যদি কোথাও দু-একদিন থাকে, তবে তাহার পাশে অয়েলক্লথ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। অয়েলক্লথ এমন-ভাবে রং করা,—ঠিক ইট বলিয়া ভ্রম হয়।
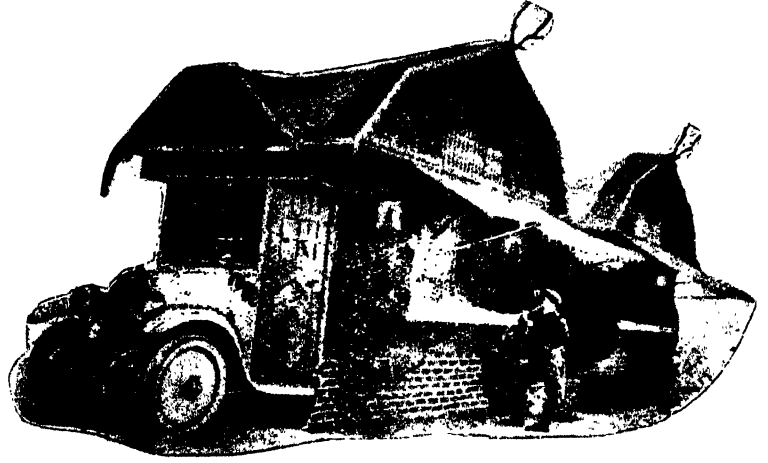
মোটর-বাড়ী

অভিনব বেশ

"ফ্যান্‌সি-ড্রেস" নাচের সময় সাহেবরা নানা প্রকার অদ্ভুত এবং কিম্ভুত কিমাকার পোষাক পরে। ছবিতে একটি অদ্ভুত মুখ দেখুন। দাবার বোর্ডের মতন মনে হইতেছে। ইহা

অভিনব বেশ

মুখোস নয়। মুখে রং লাগাইয়া এই প্রকার দাগ কাটা হইয়াছে। পোষাক, টুপী ইত্যাদি সবই এইপ্রকার চৌকা ঘর-কাটা ছিল। এই অপরূপ বেশ দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়।

ক্ষুদ্রতম বাঁদর

ছবিতে দেখুন ছোট ছেলেটির মাথায় একটি জন্তু বসিয়া আছে। উহা একটি বাঁদর। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা

ক্ষুদ্রতম বাঁদর

ক্ষুদ্র বাঁদর। ইহা ব্রেজিল দেশ হইতে আনীত এবং লণ্ডন চিড়িয়াখানাতে আছে। বাঁদরটি ছোট ছেলের মাথার অর্দ্ধেকের সমানও নয়।

রেল লাইন এবং গাড়ী ইত্যাদির ছোট মডেল

স্যার এড্ওয়ার্ড তাঁহার নাতি-নাতনিদের আনন্দ এবং আমোদ দিবার জন্য তাঁহার কামরাতে একটি ছোটখাট রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই রেলওয়ের সবই আছে। রেলগাড়ী, ইঞ্জিন, ষ্টেশন, ব্রিজ, পাওয়ার হাউস, সিগ্ন্যাল-ঘর, সিগ্ন্যাল ইত্যাদি সবই আছে। প্রায় ৫০০ ফিট রেল লাইন আছে। ইঞ্জিনগুলি ষ্টিম্ বা বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলে। কোনোটি বা ঘড়ির কলের মত দমে চলে। এই রেলওয়ে দেখিয়া বড় যে কোনো রেলওয়ের সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা করা যাইতে পারে।

রেল লাইন এবং গাড়ী ইত্যাদির ছোট মডেল

এক্সিডেণ্ট বাঁচাইবার উপায়

আজকালকার দিনে মোটরকারের জন্য কোনো রাস্তাই সাইকেল-চালকের পক্ষে নিরাপদ নহে। দিনের বেলাতেই ভয়ের অন্ত নাই, রাত্রিবেলার কথা স্বতন্ত্র। সাইকেলের পিছনের বাতিতে বিশেষ লাভ হয় না। মোটরকারের জোর আলোতে তাহা এত ম্লান হইয়া যায় যে, মোটর-চালকের চোখে তাহা পড়ে না বলিলেই হয়। সাইকেলকে পিছন হইতে মোটরকারের ঠোক্কর হইতে বাঁচাইবার এক সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিছনের মাড্-গার্ডটিকে যদি শাদা রং লাগাইয়া শাদা করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহা কম জোর এবং বেশী জোর, উভয় প্রকার আলোতেই মোটর চালকের চোখে পড়িবে এবং সাইকেলের ঘাড়ে না পড়িয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সময় পাইবে। একটু দূর হইতেই ইহা চোখে পড়িবে।
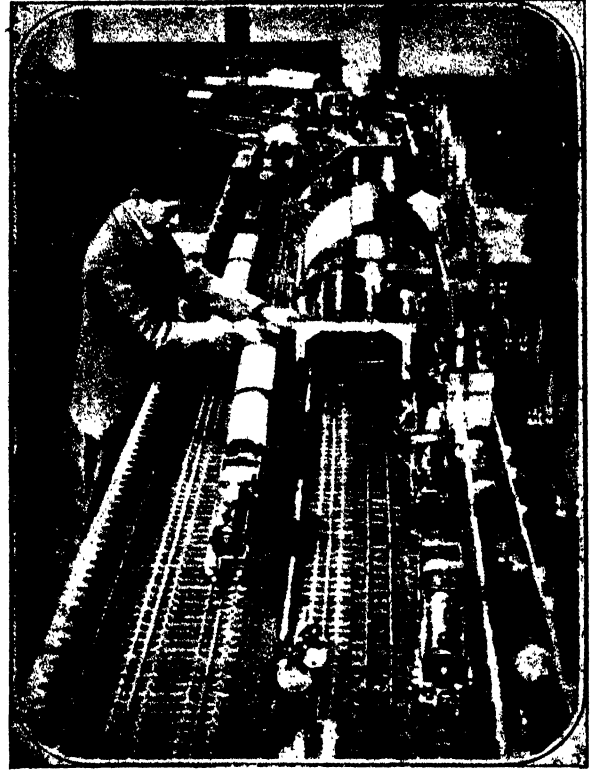
এক্সিডেণ্ট বাঁচাইবার উপায়

লম্বা জিরাফ

নিউ ইয়র্কের চিড়িয়াখানায় জিরাফ এবং অন্যান্য বড় বড় জন্তুদের মাপ লওয়া হয়। ছবিতে দেখুন—একটি জিরাফের মাপ লওয়া হইতেছে। একজন রক্ষক একটি মইএর উপর দাঁড়াইয়া জিরাফটিকে খাবার দেখাইতেছে—জিরাফটি খাবার মুখে লইবার জন্য যতদূর সম্ভব গলা বাড়াইয়া আছে। মইএর এক একটি ধাপ এক ফুট অন্তর আছে। মইএর কোন্ ধাপ পর্য্যন্ত জন্তুর গলা উঠিল তাহা দেখিলেই তাহা

উচ্চতা বা লম্বত্বের পরিমাণ সহজেই পাওয়া যায়। ছবির জিরাফটি আসলে পায়ের ক্ষুর হইতে নাকের ডগা পর্য্যন্ত মাত্র সতের ফিট লম্বা!
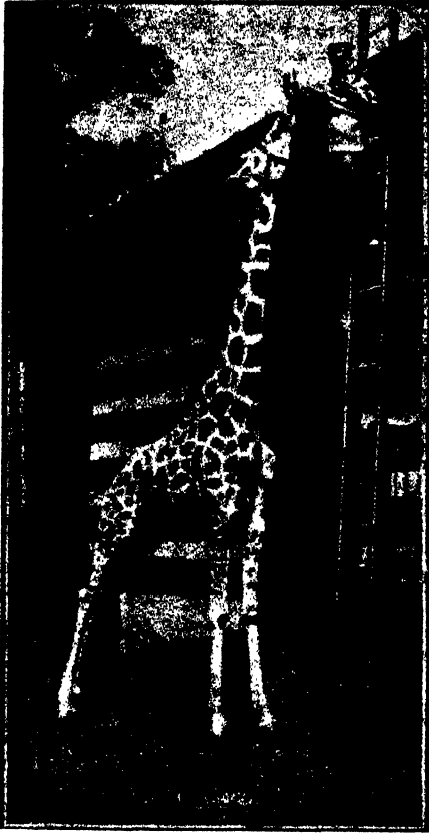
লম্বা জিরাফ

স্বহস্ত-নির্ম্মিত নৌকায় পৃথিবী ভ্রমণ

হ্যারি পিজিয়ন (Harry Pidgeon) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোক। তাঁহার বয়স ৫৭ বছরেরও বেশী। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার নৌকায় করিয়া পৃথিবী-ভ্রমণ করিবার সখ হয়; এবং তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বহস্তে মনের মত করিয়া একটি নৌকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নৌকা নির্ম্মাণ শেষ হইল। নৌকার নাম রাখা হইল "আইল্যাণ্ডার"। ৩৫ ফিট লম্বা। মাস্তুল, পাল, হাল ইত্যাদি সব নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর তিনি নৌকাটির কার্য্যক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য হাওয়াই দ্বীপ পর্য্যন্ত নৌকাতে যান এবং প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরীক্ষায় নৌকার কার্য্যক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তখন হ্যারি সাহেব পৃথিবী-ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নৌকাতে একটিমাত্র কামরা ছিল, তাহাতে খাওয়া, শোয়া, ভাঁড়ার ইত্যাদি সকল রকম কাজই চলিত। হ্যারি সাহেবের পক্ষে এই প্রকারে পৃথিবী-ভ্রমণ করিবার চেষ্টাকে অসমসাহসের কাজ বলা যাইতে পারে; কারণ, তিনি পূর্ব্বে কোনো দিন সমুদ্র-ভ্রমণ করেন নাই, এবং তাঁহাকে নেহাৎ ডাঙার মানুষ বলা যাইতে পারে। নৌকায় করিয়া পৃথিবী-ভ্রমণ হ্যারি সাহেবের পূর্ব্বে আর একজন লোক করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কাপ্তান যশুয়া স্লোকাম্, কিন্তু কাপ্তান স্লোকাম্
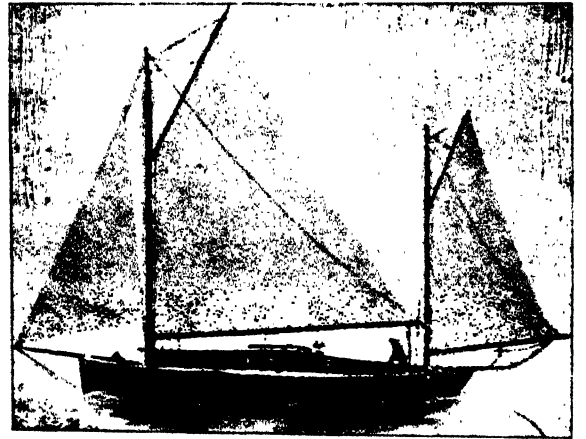
স্বহস্ত-নির্ম্মিত নৌকা

পাকা নাবিক ছিলেন এবং তাঁহার নৌকাটি হ্যারি সাহেবের নৌকা অপেক্ষা অনেক বড় ছিল।

অবশেষে হ্যারি সাহেব ১৯২১ খৃঃ অব্দের ২১এ নভেম্বর পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা প্রকার বিপদ আপদের ভিতর দিয়া তিনি প্রায় ৩৫,০০০ মাইল সমুদ্র-ভ্রমণ করেন। অনেক সময় ঝড়ের এবং ঢেউএর দাপটে তাঁহার নৌকাখানি যায় যায় হইয়াছে, কোনো রকমে রক্ষা পাইয়াছে। নানা প্রকার ভীষণ ভীষণ জলজন্তুও কম উৎপাত করে নাই। অনেক সময় হ্যারি সাহেব হাঙরের হাত হইতে সামান্য এক ইঞ্চির জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। বড় বড় জাহাজের ঠোক্কর হইতে তাঁহার সামান্য ভেলার মত নৌকাখানিকে বাঁচাইতে তাঁহাকে বড় কম বেগ পাইতে হয় নাই। বিশেষ করিয়া একজন বৃদ্ধের পক্ষে এই প্রকার কার্য্য যে কতখানি মনের

জোরের পরিচয় দেয়, তাহা বলা যায় না। হ্যারি সাহেবকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে, "নতুন কিছু করিবার এবং দেখিবার ইচ্ছাই আমাকে এই কার্য্য করায়। সেই ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, আমি তাহাকে দমন করিতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সংসারে আমার কোনো বন্ধন নাই, আমি বিবাহ করি নাই, কাজেই চুপচাপ এবং নিরাপদ ভাবে ঘরে এবং ডাঙ্গায় বসিয়া থাকিবার কোন হেতু আমি দেখিতে পাই নাই। আমার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হইল, আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।"

সাত সমুদ্রের মানচিত্র

একাকী সাত সমুদ্র ভ্রমণ

হ্যারি সাহেবের কথাবার্ত্তায় মনে হয় যে তিনি আবার কোথাও বাহির হইয়া পড়িবার মতলব করিতেছেন। মতলব স্থির হইলেই যে তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। হ্যারি সাহেবের এই নৌকায় করিয়া পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সমস্ত বিবরণ এখনও আমাদের হাতে পড়ে নাই,—হাতে পাইলেই তাহা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইবে।

এক হাতে ১৩টি বল

জর্জ্জ এগুটার নামক একজন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় এক হাতে ১৩টি টেনিসবল রাখিতে বা ধরিতে পারে। খেলিবার সময় ঐ পাকা খেলোয়াড় হাতে ৯টি বল রাখিতে পারে। হাতে বল রাখা বিষয়ে তাহার সমকক্ষ আর কেহ নাই।

এক হাতে ১৩টি বল

সার্কাসওয়ালার কেরামতি

ছবিতে দেখুন—একজন লোক কেমন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। আমরা ওঠা নামা করি পা দিয়া, ছবির লোকটি করিতেছে মাথা দিয়া—সামান্য তফাৎ। লোকটি
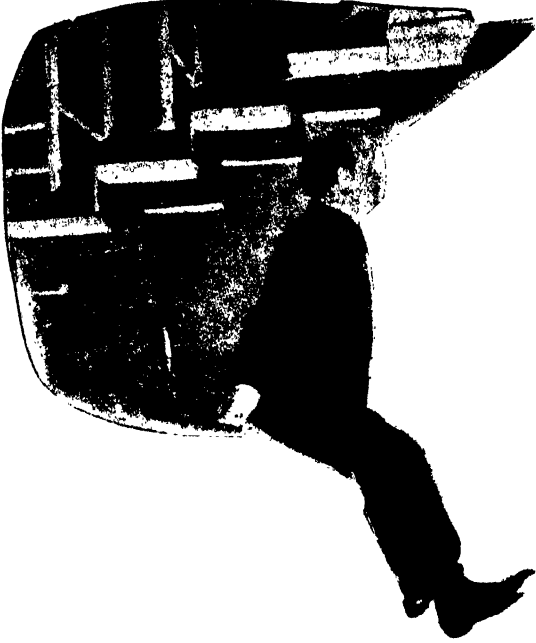
সাকাসওয়ালার কেরামতি

প্যারিসের একজন বিখ্যাত সার্কাসওয়ালা, নাম, আলেক্জাণ্ডার প্যাটি। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত খেলোয়াড় আর আছে বলিয়া শোনা যায় না।

গরম দিনে শরীর ঠাণ্ডা রাখিবার উপায়

গরম জলে স্নান করিয়া গরম কোন পানীয় পান করিলে দারুণ গরমে শরীর অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা হয়। ইহার কারণ গরম জলে স্নানের ফলে শরীরের লোমকূপগুলি পরিষ্কার হইয়া খুলিয়া যায়। এবং তাহার পর গরম পানীয়ের ফলে ঘাম হয়। ঘাম হইলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, ইহা সকলেই জানেন। অবশ্য স্যাঁতসেঁতে হাওয়াতে ঘাম হইলে আরাম অপেক্ষা বে-আরাম ঢের বেশী হয়। গরমকালে অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে অনেক সময় লোমকূপগুলি সঙ্কুচিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং ঘাম উপযুক্ত পরিমাণে বাহির হইতে পারে না। সেই সঙ্গে শরীরের ভিতরের গরম অনেক পরিমাণে শরীরের ভিতরেই থাকিয়া যায়। ফলে এই হয় যে স্নানের পর গরম না কমিয়া আরো যেন বাড়িয়া যায়। শুক্‌নো গরমে শরীর যত ঘামে ততই

উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ

ভাল, কারণ ঘামের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ঠাণ্ডা হইবে, শুকনো গরমে ঘামও তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়, গা পচ-পচ করে না। স্যাঁতসেঁতে গরমে অর্থাৎ ভাপ্‌সা বা পচা গরমে ঘাম হইলে ফল উল্টা হয়।

নির্জ্জনে চিন্তা করা

পোষাক পরিচ্ছদ এবং খাওয়ার উপর গরম অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। হালকা রংএর জামা কাপড় গরমকালে আরামদায়ক। ঘোর রংএর জামা কাপড়

শরীরকে অত্যন্ত গরম করে; কারণ ঘোর রং তাপ অতি সহজেই গ্রহণ করিয়া রক্ষা করিতে পারে।

ভিজা পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া ঘর ঠাঁণ্ডা রাখা

গরমকালে বেশী খাওয়া ঠিক নয়, তাহাতে শরীর কষ্ট পায় এবং গরম বৃদ্ধি পায়। শাকসব্জী এবং তাজা ফল গরম কালের পক্ষে খুব ভাল; কারণ, ইহারা শরীরের তাপ বৃদ্ধি করে না। মাংস এবং মিষ্টান্ন যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। ঠাণ্ডা যায়গায় ভ্রমণ বা দৃশ্যাদির চিন্তা গরমকালে মন এবং শরীর অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা করে। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় শরীর ঠাণ্ডা করিবার পক্ষে খুব ফলদায়ক।

১। লোমকূপ যাহাতে বন্ধ না থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

২। শাকসব্জী এবং অন্যান্য ঠাণ্ডা ফলমূল ভক্ষণ।

৩। মিষ্ট পানীয় বর্জ্জন।

৪। হালকা রংএর ঢিলা পোষাক পরিধান।

৫। ভিজা পরদা বা খস্‌খস্‌ টাঙ্গাইয়া ঘরের হাওয়া ঠাণ্ডা রাখা।

৬। হাওয়ার চলাচল যেন বন্ধ না হয়।

৭। মন ঠাণ্ডা রাখা, এবং কোনো বিষয়ে উত্তেজিত না হওয়া, ঠাণ্ডা দেশ, দৃশ্য এবং বিষয়ের চিন্তা করা।

৮। অলস হইয়া না থাকা—সদা কোনো কাজে রত থাকিলে গরমের কথা মনে থাকিবে না।

৯। কব্জী পর্য্যন্ত দুটি হাতকে কলের তলায় চার পাঁচ মিনিট পাতিয়া রাখিলে শরীর বেশ ঠাণ্ডা হয়।

খায়্‌বার-কাহিনী

শ্রীরমাদাস হালদার বি-এস্‌সি

এবার কলেজের গরমের ছুটীতে পশ্চিম-ভারতের কিছু কিছু দেখতে বেরিয়েছিলাম। এই বেড়ানোটা আমার মজ্জাগত বাই। যে কোন ছুটিই পাই না কেন, ছোট হোক আর বড়ই হোক, কোথাও ঘুরে আসা আমার চাই-ই চাই। তাই কলেজে দীর্ঘ ছুটির নোটীস ঝুলতে না ঝুলতেই, বাইরের ডাক আবার আমায় ডাকতে লাগল। ছুটি ত লম্বা—প্রোগ্রামটাও তাই মনের মতই লম্বা করে বাঁধলাম্। সমস্ত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আর কাশ্মীর এই ছুটির তিন মাসের ভেতরেই সেরে ফেলব,—আর বাকী ছুটিটায়, ভ্রমণ শেষে শিমলা শৈলে গ্রীষ্মবাস করব স্থির করি। সাথী জোটাবার চেষ্টা করলাম্। হয়ে উঠল না। তাই তল্পীতল্পা গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের শুভেচ্ছার ভেতর দিয়ে যাত্রা করলাম্ এলাহাবাদ থেকে ২৯এ মার্চ্চ তারিখে।

প্রথম আসা হল দিল্লীতে। এই দিল্লী থেকে সুরু করে সারা পাঞ্জাব ঘুরে ১লা মে তারিখে পেশোয়ার পৌঁছুলাম্। ছেলেবেলায় ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার পর থেকেই—খায়্‌বার পাশকে দেখবার এবং চেনবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। এই পেশোয়ারে এসেই আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আজ তারই কাহিনী লিখতে বসেছি।

ভারতের ইতিহাসে খায়্‌বার চিরস্মরণীয়। পশ্চিম থেকে

কাবুলের ভেতর দিয়ে ভারতে আসবার এই-ই একমাত্র স্থলপথ। ভারতের বুকের ওপর দিয়ে যত বৈদেশিক ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত স্মরণাতীত কাল থেকে চলে এসেছে, তাদের মূলে এই খায়বার। হয়ত আজ খায়বার না থাকলে ভারতের ইতিহাস অন্য ভাবেই লেখা হ'ত।

খায়বার পাশের ভৌগোলিক বিবরণ সবাকারই জানা। শ্রেণীবদ্ধ শৈলমালা আফগানিস্থান ও ভারতের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের মাঝের যে সংকীর্ণ পথ এই দেশ দুটোকে কোনও রকমে জুড়ে রেখেছে, তারই নাম খায়বার পাশ বা খায়বার গিরিসঙ্কট।

খায়বারের দূরত্ব (লাণ্ডিখানা ক্যাম্প পর্য্যন্ত) পেশোয়ার থেকে মোট ৩৪ মাইল। এইখানেই আফগানিস্থানের সীমা। এখনও পর্য্যন্ত এ পথে যাবার দুটি মাত্র উপায় আছে—হয় মোটর, নয় টাঙ্গা। তবে টাঙ্গাতে কেউ বড় একটা যায় না। এটা যথেষ্ট বিপদজনক; কারণ, পথটা একেবারেই পাহাড়ের মাথায় মাথায় আর শুধু চড়াই আর উৎরাই। আর কিছুদিন পর থেকে সারা পথটাই রেলে যাওয়া যাবে; রেলের লাইন ফেলা হয়ে গেছে—অল্প দিনেই যাত্রী-চলাচল সুরু হবে।

খায়বার-যাত্রীর আর একটা কথা জানা দরকার। পাশ দেখতে যেতে হলে খায়বারের পলিটিকাল এজেণ্টের অনুমতি পত্র (permit) চাই—নচেৎ অনর্থক পয়সা নষ্ট করে এবং হাঙ্গামা পুইয়ে ফিরে আসতে হয়। আমার ভাগ্যে প্রথম দিন এই রকমই হয়েছিল; এ ব্যাপার জানা না থাকায়, পেশোয়ার থেকে ১০ মাইল দূরে জামরুদ টোল আপিসে আমায় মোটর থেকে নামিয়ে নেয়; এবং অনেক হাঙ্গামা ও বিস্তর সওয়াল জবাবের পর পুলিস সঙ্গে দিয়ে, জামরুদ ষ্টেশন থেকে আমাকে রেলে চাপিয়ে পেশোয়ার ফেরত পাঠায়। পরদিন আবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে আমায় পাশ দেখতে যেতে হয়।

এ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা বিশেষ কোনও হাঙ্গামার ব্যাপার বা কষ্টসাধ্য নয়। খায়বারের পলিটিক্যাল এজেণ্টের দপ্তরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনুমতি-পত্রের দরখস্ত পেশ করতে হয় এবং সাধারণতঃ তাইতেই 'পারমিট' পাওয়া যায়।

আগের দিন (৫ই মে) ফিরে এসেছি, আজ (৬ই মে) দেখতে যাওয়া স্থির। পাশও তৈরী মোটরেরও বন্দোবস্ত করা আছে। চাকরে খুব ভোরেই ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। উঠেই প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সেরে নিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি করে প্রাতরাশ সেরে টিফিন বাস্কেটে কিছু রুটি, মাখন, কেক্, আর মিষ্টি খায়বারের রসদ (provision) স্বরূপ ভরে নিলাম্। থারমাস ফ্লাস্কে কিছু গরম চা নিতেও ভুলিনি। এগুলো এখানে জানান দেবার উদ্দেশ্য এই যে, অনুমতি-পত্রও যেমন দরকারী—খায়বার-যাত্রীর কাছে এগুলোও তার থেকে কিছু কম নয়। নচেৎ ক্ষুধায় সেখানে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা। দোকান-পত্র যে সেখানে নেই বা চেষ্টা করলে যে কিছু মেলে না তা নয়, তবে তৈরী হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ সঙ্গে আরও একটা কথা আছে। এখানে বাঙ্গালীর ধুতি-চাদর ছেড়ে বিলাতী পোষাকে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ পোষাকের মাহাত্ম্যে অনেক রকম সুবিধা পাওয়া যায়। তাছাড়া বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য ধুতি-চাদরকে সবাই সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকে।

এতো তাড়াতাড়ি করেও বেরুতে বেরুতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। যখন মোটর ছাড়ল—তখন ঘড়ীতে বাজছে ৮টা।

মোটর ছাড়ল—ক্রমশঃ সহরের রাস্তা পেছনে ফেলে খায়বারের দিকে এগুতে লাগল—আর আমার চোখের সামনে ছায়াচিত্রের মত একের পর এক যে ছবি ফুটে উঠতে লাগল—সে বিরাট, সে মহান—আমার ক্ষুদ্র ভাষা-ভাণ্ডারের বর্ণনার বাইরে। রাস্তার দুধারে দূরে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; দূর থেকে আকাশেরই বুকে তাদের পাঁশুটে রংয়ের চেহারাগুলো যেন বিরাট জমাট বর্ষার চাপ মেঘেরই মত দেখাচ্ছে; পেঁজা তুলোর মত দু এক টুকরো পাতলা ছোট ছোট মেঘ পাহাড়ের দু একটা উঁচু চুড়োয় ভর করে ঝুলছে; প্রভাত-সূর্য্যের সোনালি আলো তাদের ওপর পড়ে চিক্‌চিক্ কচ্ছে—সে দৃশ্য বিরাট—সে দৃশ্য মহান!

এমনি ভাবে আমরা এগুতে লাগলাম্। ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ "ইসলামিয়া কলেজ" আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। এটা পথের পাশেই পড়ে—পেশোয়ার থেকে ৮ মাইল দূরে। পেশোয়ার থেকে জামরুদ পর্য্যন্ত যে রেল লাইন আছে, তার একটা ষ্টেশন এখানে আছে। কলেজের নামানুসারে

ষ্টেশনেরও নাম-করণ হয়েছে "ইসলামিয়া কলেজ।" তবে ষ্টেশনটি আকারে ছোট এবং ওপর খোলা। ইসলামিয়া কলেজ পেশোয়ারে এসে একটা দেখবার জিনিস্। ইমারত বেশ সুন্দর তৈরী—ছাত্রাবাসও সংলগ্ন। এখানে পড়াশুনাও বেশ ভাল হয় শুনলাম্।

এ পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারে যথেষ্ট গাছপালা আছে; বসতিও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। রাস্তার দুধারে দিশী, বিলিতি সৈন্তেরা কুচ-কাওয়াজ কচ্ছে দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত পেশোয়ারের Suburbএর অন্তর্গত; কিন্তু এই ইসলামিয়া কলেজের পর থেকে পাথরের টুকরো (pebble) বিছান স্থাড়া রাস্তা চলে গেছে—তাতে গাছ পালা নেই। এখান থেকে জামরুদের রেল লাইন প্রায়ই চোখে পড়ে। রাস্তার বেশ কাছ দিয়ে গিয়েছে—কখনও এপাশে, কখনও ওপাশে—কখনও বেশ কাছে, কখনও আবার একটু দূরে।

এমনি ভাবে রেল লাইনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তা রেল লাইন পার হয়ে বাঁ দিকে বেঁকে চলে গেছে জামরুদে। প্রথমে থামা হ'ল আমাদের এখানে—টোল আপিসের সামনে। আগের দিন এখান থেকে আমাকে নামিয়ে নিয়ে পুলিস সঙ্গে দিয়ে পেশোয়ারে ফেরত পাঠিয়েছিল।

এই জামরুদে টোল আপিসে সব গাড়ীকেই থামাতে হবে যাবার এবং ফিরবার বেলা। এখানকার 'পারমিট' দেখা এবং গাড়ী একজামিন শেষ হলে অনুমতি পেলে তবেই গাড়ী খায়বার যেতে পারে বা পেশোয়ার ফিরতে পারে।

আগের দিনের অফিসারের সঙ্গে দেখা হ'ল। একটু মুচকে হেসে বল্লে "তাহলে তুমি অনুমতি-পত্র পেয়েছ?" কাল তার ব্যবহারে ভয়ানক রাগ হয়েছিল—কতকটা রুক্ষ ভাবেই জবার দিলাম—"না পাবার মত কোন কারণ কি কাল ঘণ্টাখানেকের সওয়াল-জবাবেও তুমি আমার মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিলে?" ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বল্লে, "তুমি মিষ্টার আমার ওপর অনর্থক রাগ করছ। আমি আমার কর্ত্তব্য মাত্রই করেছিলাম্।"—আমিও একটু অপ্রস্তুত হলাম্। তবে দুজনের মধ্যে অল্পক্ষণেই আলাপ বেশ জমে উঠল। লোকটিকে বেশ ভদ্র বলেই মনে হ'ল।

যাক্। অনুমতিপত্র একজামিন হবার পর খেরোবাঁধান মান্ধাতার আমলের তৈরী একখানা লম্বা-চওড়া রেজিষ্টারে নাম-ধাম, বংশপরিচয়, জাতি, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি বিস্তারিত লিখে, তার পাশে তারিখ দিয়ে নাম দস্তখত করবার পর আমাদের মোটর খায়বারের ছাড়পত্র পেয়ে যাত্রা করল। অনুমতি-পত্রখানা ফেরত দিয়েছিল। তবে জানান দিলে, ফিরবার পথে এটা টোল আপিসে জমা দিতে হবে। মনে মনে বল্লাম—তথাস্ত।

আপাততঃ রেল লাইন এই জামরুদ পর্য্যন্তই আছে। এখান থেকে লাইন ফেলে, খায়বার রেলপথ তৈরী হয়েছে—আফগান-সীমান্ত লাণ্ডীখানা (Landikhana) পর্য্যন্ত। কিছুদিন পর থেকে মুসাফির লরীর ঝাঁকানির হাত থেকে বেঁচে যাবেন।*

জামরুদের চারিধার কাঁটাদার লোহার জাল (Barbed Wire Fencing) দিয়ে ঘেরা; এটা আফ্রিদিদের নৈশ আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত। কারণ, এ সীমান্ত প্রদেশের ব্যাপার বড়ই গোলমেলে। এই লোহার জালের বাইরেই আফ্রিদি খাঁনদের (Afridi Chiefs) স্বাধীন খণ্ডরাজ্য—ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত নয় এবং এরা অনেক সময়ে গোলমাল পেলে সহজে ছাড়ে না।

জামরুদের টোল আপিসের ঠিক সামনেই জামরুদ কেল্লা। মাটীর তৈরী (mud built)—বিশেষ বড় নয় এবং দেখতেও বিশেষ মন্দ নয়। সব সময়েই এখানে এক আধটা সেনাপল্টন (Regiment) থাকে।

জামরুদ রেল ষ্টেশন থেকে খায়বার রোপ ট্রানসপোর্ট লাইন (Khyber Rope Transport Line) সুরু হয়েছে। রেল লাইন ফেলার আগে পর্য্যন্ত খায়বারে মাল পাঠানর এইই একমাত্র উপায় ছিল। রেল লাইন ফেলা থেকে এই উপায়ে মাল চালান বন্ধ হয়ে গেছে। এখন থেকে মালগাড়ী ভর্ত্তী হয়েই মাল চালান যাবে।

এ একটা ভারী সুন্দর ব্যাপার। জামরুদ রেল ষ্টেশন থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা লোহার মজবুদ খুঁটি পাহাড়ের মাথায় মাথায় সোজা চলে গেছে খাইবারে লাণ্ডীখানা পর্য্যন্ত।—প্রত্যেক খুঁটির মাথার দুধারে ঘূর্ণ্যমান চাকার ওপর দিয়ে খুব মোটা আর মজবুদ তারের দড়া (Rope) চলে গেছে। এই সব দড়ার ওপর পুলি (pulley) দেওয়া মস্ত মস্ত মাল বোঝাই মালগাড়ী ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর

* সম্প্রতি এই রেল লাইন মহাসমারোহে খোলা হয়েছে। এবং লোক চলাচল করছে। অনেক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হয়ে এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।—ভাঃ সং।

তাড়িৎ শক্তি দ্বারা এই দড়া টানা হয় ;—সঙ্গে সঙ্গে মাল বোঝাই গাড়ীও এই দড়ার ওপর দিয়ে চলতে থাকে। এমনি ভাবে মাল পাহাড়ের মাথায় মাথায় চলে। এ দেখতে ভারী সুন্দর।

এই জামরুদে প্রায় আধঘণ্টা দেরী করার পর গাড়ীতে জল ভরে নিয়ে গাড়ী আবার ছাড়ল। এখন থেকে একটু একটু করে গাড়ী চড়াই উঠতে লাগল এবং দূরের পাহাড় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে কাছে আসতে লাগল। এখন থেকেই সাবধানে গাড়ী চালান সুরু হ'ল—যদিচ খায়বার পাশের প্রবেশ-পথ তখনও অনেক দূরে ; তবে চড়াই উৎরাই সুরু হয়ে গিয়েছিল। গাড়ী চালানর সতর্কতাসূচক সাইনবোর্ড এখান থেকেই আঁটা সুরু। প্রথমে যেটা চোখে পড়্‌ল সেটা অবিকল তুলে দিলাম। লেখা আছে বড় বড় ইংরিজি হরফে দিশী ভাষার পাশাপাশি—Stop, Look, Listen (থাম, দেখ, শোন)।

এখান থেকেই রাস্তা দুটো ভাগ হয়ে গেছে ; তবে দুটোই অবশ্য সোজা গেছে একই লক্ষ্যের উদ্দেশে।

খায়বারের পুরোনো চেহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে পড়ে বদলে গেছে খুবই। ঠিক পাশ বা গিরিসঙ্কট বলতে যে ব্যাপারটা বোঝা যায়—ছেলেবেলায় ভূগোলে যা পড়া গেছে, তা আর এখন নেই। অনেক নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে। তাছাড়া পুরোনো রাস্তাও সব মোটর-চলাচলের জন্য চওড়া করা হয়েছে, যাতে বিপরীতগামী গাড়ী পাশ কাটাতে পারে। তাছাড়া খায়বার এখন সহজগম্যও হয়েছে খুবই। অবশ্য এ নতুন রেলপথ ফেলাতে পাশ হিসাবে এর সৌন্দর্য্য অনেকটা কমে গেছে। তবু একবার দেখলে মনের উপর এ যে ছায়া ফেলে যাবে তা মুছে যাবার নয়।

আরও কয়েক মাইল চড়াই উৎরাইয়ের পর আমরা পাহাড়ের পায়ের কাছে পৌছে গেলাম্। সামনে চেয়ে দেখলাম। যতদূর দৃষ্টি গেল দেখা গেল, পথের কোন চিহ্নমাত্র নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় শুধু পথজুড়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে আফগান ও ভারত-সীমান্তের মাঝখানে। হঠাৎ ছোট একটা মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দড়ীর মত একটা রাস্তা এঁকে-বেঁকে সাপের মত চলে গেছে। কালকা-শিমলা রেলপথের মত এখানকার রাস্তাটা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের পাশে পাশে ধীরে ধীরে উঠে গেছে। এক এক জায়গায় নীচের পানে চাইলেই মনের মাঝে যথেষ্ট ভয় হয়। এক দিকে সোজা খাড়া পাহাড়, অন্য দিকে পাহাড়ের গভীর 'খাদ'। রাস্তার ধারে খাদের দিকে কিছু কাঁকর ফেলা ছাড়া সব জায়গায় দেওয়াল বা লোহার রেলের বেড়া আছে ; তবু চালকের একটু অসাবধানতা, পাহাড়ের একটু ধাক্কা বা ষ্টীয়ারিংয়ের একটু গোলমাল মানেই ৫০০ ফিট নীচের গভীর খাদ।

রাস্তাটা সব জায়গাতেই যে শুধু পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে উঠেছে তা নয় ; পুলও তৈরী করতে হয়েছে অনেক। আর খারাপ মোড় (Sharp Turning) খুবই বেশী। এই চড়াই বা Uphill work অতি ধীরে ধীরে এবং খুবই সাবধানে করতে হয় অনবরত গিয়ার বদলাতে বদলাতে। গাড়ী চালাবার লোক খুবই সুদক্ষ হওয়া দরকার। গাড়ী এ রাস্তায় অধিকাংশ সময়ই কাত হয়ে চলে।

দূর থেকে পাহাড় গাঢ় নীল রংয়ের দেখাচ্ছিল। তাদের কোলের মধ্যে প্রবেশ করে দেখা গেল—পাহাড়-গুলো একেবারে ন্যাড়া (barren) গাছপালাহীন। শুধু যতদূর চোখ যায়—নগ্ন পাথর। এর মাঝে মাঝে পাহাড়ের মাথায় মাথায় দু এক জায়গায় সান্ত্রী পাহারার ঘাঁটী (Sentry Picket Post) দেখা গেল।

এখানকার পাহাড়ের রাস্তা এত বেশী বেঁকে ঘুরে উঠেছে যে, দেখতে ভারী সুন্দর। মোটর থেকে দেখা যায় ওপরের ব্যাক্ ঘুরে, ওপর দিয়ে বা নীচের রাস্তা দিয়ে অন্য মোটর উঠছে বা নামছে। এরই মধ্যে গাড়ীতে আরও দুবার রাস্তা থেকে জল ভরতে হয়েছিল—তবু ইঞ্জিন মাঝে মাঝে অসহ্য গরম হয়ে উঠছিল।

এমনি ভাবে কখনও ৫০ হাত ঘুরে, দেড় চক্কোর (round) দিয়ে তিন হাত উঠি, কখনও আবার ৫ হাত নামি। এমনি করে ধীরে ধীরে গাড়ী এগুতে লাগল। মাঝে মাঝে প্রায়ই নতুন তৈরী খায়বার রেল-পথের দর্শন পাওয়া যাচ্ছিল। এ রেল লাইন না দেখলে বোঝান শক্ত। এটা অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে। এ শুধু পুল করে আর টানেল কেটে মোটরের রাস্তার অনেক ওপর দিয়ে—পাহাড়ের প্রায় মাথা দিয়ে চলে গেছে। অনেকটা কালকা-শিমলা রেলপথের অনুরূপ—তবে অ

থেকে বেশী মাথা খাটিয়ে আর পয়সা খরচ করে একে তৈরি করতে হয়েছে। কি ভয়ানক সব টানেল—না দেখলে বোঝান অসম্ভব। এ টানেলের শেষ নেই—একটার পর একটা চলেই চলেছে

এখানে এই রকম চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়ের প্রায় মাথার কাছে পৌঁছে অনেকখানি উৎরাই পাওয়া গেল।—তারপর থেকে আবার সেই চড়াই আর উৎরাই—এর আর কমি নেই। এমনি ভাবে আমরা "আলী মসজিদ্" পৌছুলাম্। তখন ১০টা বেজে গেছে। এখানে এসে মোটরের চাকা বিগড়াল। মেরামত হতে পুরো একটি ঘণ্টা লাগল; সুতরাং এক ঘণ্টা এখানে আটকা পড়ে থাকতে হ'ল।

এই "আলী মসজিদ্" প্রায় মাঝ-রাস্তায়। এও একটা সেনা-বারিক;—দু একটা পল্টন এখানে থাকে। যেখানে আমাদের মোটর বিগড়াল সেইটাই হ'ল সেখানকার বাজার মোট ৪।৫খানা ছোট দোকান মিলিয়ে। একখানি মণিহারীর দোকান, একখানা সবজী ও তরকারীর, একখানা মুদিখানা, ও একখানা কামারের দোকান এই নিয়েই বাজার। এই দোকানগুলোর ঠিক পেছনেই ছোট একটা হলদে-সবুজ মিশোনো রংয়ের মসজিদ আছে। এই মসজিদের নামই "আলী মসজিদ্"। আলী নামক একজন মুসলমান সাধক ফকির এইখানেই তাঁর আস্তানা গেড়েছিলেন;—তাঁর দেহ রাখবার পরে তাঁর চেলারা এই মসজিদ নির্ম্মাণ করে এবং এই মসজিদের নাম থেকেই জায়গারও "আলী মসজিদ" নামকরণ হয়েছে—এই কিম্বদন্তি শুনলাম্।

ঠিক দোকানগুলোর সামনেই রাস্তার পাশে একটা "রোপ্ ট্রানস্পোর্ট ষ্টেশন" (Rope Transport Station) আছে—কাঁটাদার জাল দিয়ে ঘেরা। এইখানে আলী মসজিদের লেবেল আঁটা মাল নামিয়ে নেওয়া হ'ত। ডান-দিকে উঁচু পাহাড়ের গায়ে পল্টনের ব্যারাক্-ঘর সব তৈরী দেখ্‌লাম। খায়বার রেল লাইন তার পাশ দিয়ে গেছে।

এখানে রাস্তা বেশ নীচু দিয়ে গেছে; আর দুধারে শুধু উঁচু পাহাড়। এখানে তবু অনেকটা পাশের আইডিয়া পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে মোটর মেরামত হয়ে গিয়েছিল৹ এক ঘণ্টা দেরীর পর ফের রওনা হওয়া গেল। এখানে তত বেশী চড়াই নেই, তবে রাস্তা ভারী ঘুরে ফিরে গেছে। খানিকটা এগিয়ে খায়বারের 'ওয়াটার ওয়ার্কস্' (Water Works) চোখে পড়ল। তার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হ'ল।

এখান থেকে ক্রমশঃ আমাদের নামতে হ'ল। ক্রমাগতঃ আমরা পাহাড়ের বুকচেরা ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে চলেছি এবং দুপাশের পাহাড় ক্রমশঃ অল্প অল্প করে সরে গেছে; এবং রাস্তাটা ক্রমশঃ অল্প অল্প চওড়া আর একটু একটু করে ঢালু হয়ে গেছে। এই রকমে আমরা ক্রমশঃ পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় নেমে এলাম্। এ উপত্যকা খুব চওড়া না হলেও মন্দ নয়। এবং দু'এক জায়গায়, দেখলাম, জমীতে চাষবাস সুরু হয়েছে। চাষার ক্ষেত দেখতে ভারী সুন্দর লাগল; অনেকক্ষণ পরে একটু সবুজ দেখে চোখ জুড়াল।

এতক্ষণ গাড়ী ঢিমে তেতালা চালেই এগুচ্ছিল—এবার ফাঁকা উপত্যকার রাস্তা পেয়ে জোর পেয়ে বেশ জোরেই ছাড়ল। পথের মাঝে মাঝে কাঁধে রাইফেল ঝুলান স্বাধীন আফ্রিদিদের সঙ্গেও দেখা হ'ল! এদের দেখলেই মনে কেমন একটা আতঙ্ক হয়। ছোট ছোট ছেলেরাও বিনা রাইফেলে বেরোয় না এবং এদের সবাকারই লক্ষ্য অব্যর্থ। সামান্য সুযোগেও এরা বন্দুক চালাতে দ্বিধা করে না; এবং অনেক সময়েই এরা সুযোগ, বিনা-সুযোগের ভেতর থেকেই, তৈরী করে নেয়। এদের নিজেদের বন্দুকের কারখানা আছে শুনলাম্; এবং প্রত্যেক নবজাত আফ্রিদি শিশুর জন্য, শিশুর পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজন তার ভবিষ্যৎ স্বাধীন জীবনের হাতিয়ার 'রাইফেল' প্রথমেই বাছাই করে রাখে।

শুধু খায়বারের রাস্তাটা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে—তাই 'পারমিটে' লেখা আছে, এবং সবাই পুনঃ পুনঃ জানান দেয়, যেন কোনক্রমে রাস্তা ছেড়ে পাশের মাঠে পা না দেওয়া হয়।

গভর্ণমেণ্টের জলের বন্দোবস্ত রাস্তার পাশে পাশে দূরে দূরে আছে। তা থেকে আফ্রিদি মেয়েরা সব জল নিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল। রাস্তা থেকে আফ্রিদিদের মাটীর বাড়ীও অনেক চোখে পড়ে—উঁচু উঁচু মাটির টাওয়ার (Watch Tower) দেওয়া।

এখানকার রাস্তা বেশ ভাল। এই উপত্যকার আরম্ভ ১৬।১৭ মাইল পর থেকে। কখনও একটু উঠি, কখনও একটু নামি,—এমনি করে এই বাকী ১২।১৩ মাইল রাস্তা

পার হয়ে, মোড় ফিরেই লাণ্ডিকোটাল (Landikotal) চোখে পড়ল অনেকখানি নীচে; দূর থেকে যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবি বলেই মনে হ'ল।

এই ১২।১৩ মাইল উপত্যকায় খায়বার রেল লাইন আর মোটরের রাস্তা প্রায় পাশাপাশি গেছে; কখনও এপাশে, কখনও ওপাশে, কখনও কাছে, কখনও দূরে।

সোজা ঢালু উৎরাই রাস্তাটা লাণ্ডিকোটালে নেমে গেছে। লাণ্ডিকোটালের লোহার ফাটক যখন পার হলুম্, ঘড়ীর ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলাম,—দুটো কাঁটাই ১২টার ঘর পার হয়ে গেছে। এখানে যে ছবি আমার চোখের পর্দ্দায় পড়ল তাকে বিশদরূপে এ লেখ্য ভাষার ভিতর দিয়ে ধরে রাখা অসম্ভব। তা শুধু অনুভব করবার—প্রকাশ করবার নয়। চারিধার গগনস্পর্শী পাহাড়ে ঘেরা—মাঝে গোলাকার উপত্যকাভূমি চারিধারে কাঁটাদার তারের বেড়া ঘেরা—ব্যারাকের শাদাশাদা ঘরগুলি লাইন বেঁধে সোজা চলে গেছে—আর পরিষ্কার রাস্তাঘাট দূর থেকে দড়ার মত সোজা সোজা পড়ে আছে, আর দেখাচ্ছে—ভারী সুন্দর।

কাল জামরুদ আসবার পথে লাণ্ডিকোটালের একজন ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে মোটর থামল গিয়ে একেবারে তাঁর ডাক্তারখানার দরজায়। ডাক্তার সাহেব আমায় দেখতে পেয়ে খুবই খাতির করে বসালেন।

লাণ্ডিকোটাল প্রায় খায়বার পাশের আফগান-সীমান্তে। এখান থেকে ৫ মাইল দূরে লাণ্ডিখানায় আফগান-সীমান্ত—এদিকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত—ওদিক আফগান অধিকারভুক্ত। আফগানিস্থানের পাশপোর্ট না থাকলে এ সীমানা পার হয়ে আফগান রাজ্যে পা ফেলতে দেয় না। এখানকার খুব বেশীরকম কড়াকড়ি। এ সীমার বাইরে যাওয়া আদতেই বারণ। মস্ত বড় সাইনবোর্ড দেওয়া আছে—"It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory." (এই সীমা পার হয়ে আফগান রাজ্যে যাওয়া একদম বারণ।)

এখানে যাবার অনুমতি আমি বিস্তর লড়ালড়ি করেও পাইনি। সুতরাং আমায় ৫ মাইল দূরে লাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত এসেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। শুনলাম, এ রাস্তায় অনেক জায়গায় ছবি নেওয়াও বারণ। মস্ত মস্ত নোটিশ টাঙিয়ে এটা জানান দেওয়া আছে। চুরি করেও কেউ ছবি নিতে পারে না; কারণ, সান্ত্রীর ঘাঁটী সব এমন জায়গায় আছে, যেখান থেকে সবাকার গতিবিধি দেখতে পায়।

এবার লাণ্ডিকোটালের কথা। ডাক্তার সাহেবের দোকানে আধঘণ্টাটাক বিশ্রাম করে, টিফিন বাস্কেট ইত্যাদির বোঝা সেখানে নামিয়ে, বেড়াতে বেরুলাম্। প্রথমেই চোখে পড়ল—নাম হিসেবে এ জায়গাটাকে বিলেতের একটা ছোট খাট সংস্করণ করে তোলা হয়েছে। Victoria Street, (ভিকটোরিয়া ষ্ট্রীট), White Hall (হোয়াইট হল), Jermyn Street (জার্মিন ষ্ট্রীট) Pall Mall (পল মল্), Trafalgar Square (ট্রাফলেগার স্কয়ার) Strand (ষ্ট্রাণ্ড) ইত্যাদির ছড়াছড়ি—অভাব কোনটারই নেই। Charing Cross (চেয়ারিং ক্রশ) নামটা অবশ্য পাঞ্জাবের এদিকে অনেক জায়গায় পেয়েছি—যেমন লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, চাক্‌লালা ইত্যাদি। কিন্তু এতো বেশী বিলেতের অনুকরণে অদ্ভুত নামের ছড়াছড়ি এই প্রথম চোখে পড়ল।

এটা থেকে সবাই যেন মনে না করেন যে, জায়গা হিসেবে এটা বড় একটা 'কেউ কেটা' নয়। বরঞ্চ ঠিক তার উলটো। জায়গাটি ছোট,—রাস্তাঘাট অবশ্য বিশেষ মন্দ নয়, তবে ছোট ছোট এবং ভয়ানক পাথর ওঠা, আর সরু সরু। চারিধারই শুধু সেনাবারিকে ঘেরা। জামরুদের মত লাণ্ডি-কোটাল ক্যাম্পও ফাটক থেকে চারিধার কাঁটাদার লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। ছোট খাট দোকান পশার মিলিয়ে একটা মাঝারি গোছের বাজার আছে। নিতান্ত দরকারী জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সৈন্য সামন্তের জিনিসপত্রের আদতেই অভাব নেই। পেশোয়ারেরই অনেকগুলি দোকানের ছোট-খাট ব্রাঞ্চ আছে দেখলাম্। এখানে বিজলী বাতি জলে এবং রাস্তাতে জলের কলের বন্দোবস্ত আছে।

সুইস্ উপত্যকার (Swiss Valley) ছোট ছোট গ্রামের চেহারা ছবিতে যেমন দেখা যায়, এ জায়গাটা দেখতে অনেকটা সেই রকমের। সৈন্য-সামন্তের আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তও আছে। White Hallএর (হোয়াইট্ হলের) ওপর একটা বায়স্কোপের ঘর থেকে এটা বুঝতে পারা যায়। বায়স্কোপটির নাম দেওয়া হয়েছে "Frontier Cinema"। রেট দেখলাম লেখা আছে, দু'টাকা, একটাকা,

বার আনা আর ছ' আনা। ছ' আনার ওপর বড় বড় করে জানান দেওয়া আছে, "For Indians Only" (কেবল ভারতবাসীর জন্য)।

এখানে ভারতবাসীর সংখ্যা বিশেষ বেশী না। কারণ, এখানে যারা আছে, তাদের নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে। তারা বেশীর ভাগ সৈন্য-বিভাগের চাক্‌রে। আর বাকী যারা দুচার জন আছে, তারা ব্যবসায়ী এবং তারা কেউ মেয়ে ছেলে এখানে আনে না। বাঙ্গালী কেউ আছে কি না খবর নিলাম; শুনলাম, আজ-কাল কেউ নেই।

এখানে একটা ছোট কেল্লা আছে—গভর্ণমেণ্টের তৈরী। এখানে ঢুকতে হলে আবার নতুন পাশ চাই; সেটা শুনলাম্ লাণ্ডিকোটালের পলিটিক্যাল তসিলদারের কাছ থেকে পাওয়া যায়। আমার সময়ও ছিল না এবং সেটা আমি যোগাড় করেও উঠতে পারি নি। তাই ডাক্তার সাহেব বলে দিয়েছিলেন—বৃথা চেষ্টা, ঢুকতে পারবেন না। আমিও ভাবলাম হয়ত হবে না—তবু মনে করলাম্, চেষ্টা করে দেখি। যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।

দোকান-পশার ইত্যাদি দেখা সেরে কেল্লার দিকে যাত্রা করলাম। কেল্লাটা ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের ওপর। দূর থেকে কেল্লার মাথা থেকে ব্রিটিশ ইউনিয়ান জ্যাক্ (British Union Jack) উড়ছে, দেখতে পেলাম্। কেল্লার ফটকে পৌছে দেখলাম্, ব্রিটিশ সান্ত্রীরা বন্দুক কাঁধে ফটক পাহারা দিচ্চে। মাথার টুপিটা একটু চোখের ওপর টেনে দিয়ে গম্ভীর ভাবে হনহন করে সোজা ফটক পার হলাম্—কারও মুখের পানে না তাকিয়ে বা ইতস্ততঃ না করে।

যাক্। দোকানে বসে ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে কেল্লার খবর কিছু জেনে নিয়েছিলাম্; সেটা এখন আমায় সাহায্য করলে। ফটক নির্ব্বিবাদে পার হয়েই, বাঁ-হাত ঘুরে প্রথমেই কেল্লার ডাকখানায় ঢুকলাম্। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবের দোকানে বসে বাড়ীর এবং বন্ধু-বান্ধবের উদ্দেশে কিছু চিঠি-পত্র লিখেছিলাম। সেগুলো এই কেল্লার ডাকখানাতেই ছেড়ে দিলাম্। তারপর ডাকখানার পাশের রাস্তা দিয়ে কেল্লার এক কোণের দিকে চলে গেলাম্।

এবার মনের আনন্দে দেখতে সুরু করলাম্। কেল্লাটি ছোট—বিশেষ কিছু নেই। এটাকে হাসপাতাল বললেই চলে। ছুটো নীচু বিনিতায় টেলিগ্রাফের খুঁটিও ভেতরে আছে—তবে তারা কাজ দেয় না শুনলাম্। ভেতরেও যথেষ্ট ব্যারাকস্‌ও আছে। ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি, দেখব আর কি, এমন সময়ে কি জানি কেন সান্ত্রীদের কোনও রকমে সন্দেহ হয়েছে; তারা একজন সার্জ্জেণ্ট পাঠিয়েছে আমার খোঁজে। আমি মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতে চলেছি—সার্জ্জেণ্ট এসে হাজির। আমার পাশ দেখতে চাইলে। দুষ্টুমি করবার এমন একটা সুযোগ আর ছাড়তে পারা গেল না। গম্ভীরভাবে খাস্তবারের অনুমতিপত্রখানা বার করে তার নাকের ডগার সামনে একবার ঘুরিয়ে পকেটে পুরতে গেলাম। সে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সেটা হাতে চাইলে। অগত্যা বাধ্য হয়ে সেটা তার হাতে দিলাম। সে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেরত দিয়ে বল্লে "এ নয়—; কেল্লার পাশ চাই।" কতকটা বে-অকুবের ভান করে তাকে আমিও জিজ্ঞাসা করলাম—"সে আবার কি বস্তু?" সে আমায় ব্যাখ্যা করে জানালে "ফোর্ট দেখবার জন্য আলাদা পাশ চাই।" আমি তাকে বললাম্ "আমি তো সেটা জানতাম না—আমি পরদেশী মুসাফির—জমাদার সাহেব।"—জমাদার সাহেবটা দুষ্টমি করেই বল্লাম্। সার্জ্জেণ্ট সাহেব ভয়ানক চটে গেল। বল্লে—"আমি জমাদার নই, কম্পানি সার্জ্জেণ্ট (Company Sergeant)। আমি কতকটা অপ্রস্তুত ভাবে বললাম—"ওঃ—তা-তা জমাদা—I mean—সার্জ্জেণ্ট সাহেব—আমি দুঃখিত। কিন্তু বাপু আমার কাছে পাশ-টাশ নেই। তোমরা আমায় ফটকে আটকাও নি কেন?" সার্জ্জেণ্ট সাহেব জবাব দিল,—"তোমার সাহসী চলন (Bold Steps) দেখে আমরা ভাবলাম, বোধ হয় পাশ আছে।" আমি বললাম্—"তোমাদের এরকম ভাবাটাই ভুল—আর প্রথমে যখন এরকম ভেবেছ তা এখনও ছাই-তাই ভাব না কেন। তুমিও তোমার পথ দেখ—আমিও আমার দেখি।"

যাক—আরও ৫।৭ মিনিট এই রকম হাস্যকর বাদ-প্রতিবাদের পর, তাদের নিজেদের দোষ বুঝতে পেরে, আমাকে বাইরের রাস্তা দেখিয়ে দিলে।

কেল্লার বাইরে বেরিয়ে মনের আনন্দে একচোট প্রাণ-খোলা হাসি হেসে নেওয়া গেল। ৫।৭ দিনের মধ্যে এরকম দুষ্টুমি করা হয় নি। তারপর লাণ্ডিকোটালের

বাকী যদি কিছু দেখবার থাকে তারই সন্ধানে বেরুন গেল।

ফোর্টের পর পাহাড়ের নীচে একটা সরাই (Caravan Serai) আছে, সেটা একটা দেখবার জিনিস্। কাবুল থেকে' পেশোয়ার যাত্রী মাল-বোঝাই উটের ক্যারাভান এখানে বিশ্রাম করে' পেশোয়ার যায়। শুনলাম, কাল একটা বিরাট ক্যারাভান চলে গেছে। কপাল খারাপ, কাল মাঝ রাস্তা থেকে না ফিরে যেতে হলে এটা দেখতে পাওয়া যেত। এ একটা দেখবার জিনিস্।

এখানে আর বিশেষ কিছু দেখবার নেই। ডাক্তার সাহেবের ডেরায় ফিরলাম। ঘুরে ঘুরে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং পাহাড়ী হাওয়ায় ক্ষুধা এত বেশী পেয়েছিল যে মনে হচ্ছিল সারা দিনই কিছু খাই নি। সুতরাং ফিরেই প্রথম এবং প্রধান কাজ হ'ল ডাক্তার সাহেবকে কেল্লার 'এডভেঞ্চার' (adventure)। বলতে বলতে, সঙ্গে আনা ও ডাক্তার সাহেবের সযত্নসংগৃহীত খাবার-গুলোর সদ্ব্যবহার করা।

তারপর খায়বারের অনুমতি-পত্রের একটা নকল তুলে নিলাম ; কেন না, ফিরতি পথে জামরুদ টোল অফিসে এটাকে ফেরত দিতে হবে। অনুমতি-পত্রের নকল এখানে অবিকল তুলে দিলাম :—

No 376 Dated 5th May 1925

Permit to visit the KHYBER PASS.

Mr. R. Halder

Has permission to visit the Khyber Pass on the 6th May procceding as far as Landikotal and returning the same day. Visitors are not allowed to proceed beyond the Landikotal wire for very special reasons which must not be stated.

(Sd) R. Garrette.
Political Agent KHYBER

This permit is issued subject to the conditions noted on the reverse.

CONDITIONS.

1. This permit must be handed in at the Khyber Tolls Office at Jamrud on the return journey. Visitors must write their names in the Register at Jamrud on the way up the Pass.

2 Visitors must arrange to leave Jamrud on the outward journey not later than 11—30 A. M.

3. Visitors should leave LANDIKOTAL on the return journey not later than 3 P. M.

4 Visitors are not allowed to enter the Block houses or defence works or to leave the road.

5. This permit is current only for the date and persons specified.

6. Visitors should travel in Tum Tums or Motor Cars. They should not proceed on foot, horse back or cycles.

ডাক্তার সাহেবকে যথাসাধ্য ধন্যবাদ দিয়ে যখন ফিরতি মোটর নিলাম তখন ৩টা বাজছে। ফেরত যাত্রায় নতুন কিছু বলবার নেই। সারা দেহে গাড়ীর ঝাঁকানির ব্যথা নিয়ে, ক্লান্ত দেহটাকে যখন পেশোয়ারে টেনে নামালাম, তখন দূরের গির্জ্জার ঘড়িটায় ৬টার ঘণ্টা বেজে শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দিকশূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৫]

বুধবার প্রাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া রমাপদ সমস্ত আয়োজন এবং প্রয়োজন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর ষ্টেশনে যাইবার জন্য বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া সরমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি চল্‌লাম সরমা।"

সরমা তখন রান্নাঘরে সন্দেশ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিল, স্বামীর প্রতি একবার ত্বরিত নেত্রে চাহিয়া দেখিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, "এরি মধ্যে চল্‌লে, সময় হয়েছে না কি ?"

সময় তখনো বাস্তবিক হয় নাই, আরো অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইলেও যথেষ্ট চলিত, কিন্তু পাছে নিজে ষ্টেশনে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ট্রেন কোনো প্রকারে পঁহুছিয়া যায়, সেই অসম্ভাব্য দুর্ঘটনার অহেতুক আশঙ্কায় এত সময়ও রমাপদর বেশী সময় বলিয়া মনে হইতেছিল না। সে ব্যগ্র হইয়া বলিল, "সময় হয়েছে বই কি! পথখানিই কি কম? পাকা দু মাইল।" তাহার পর সন্দেশের পাক পাত্রে দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "সন্দেশ করছ, নিমকি করছ না যে ?"

স্বামীর অসঙ্গত ব্যগ্রতা দেখিয়া সরমা পুলকিত হইয়া বলিল, "করব পরে। বেশী আগে করলে মিইয়ে যাবে।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার তাড়া দেখে মনে হচ্ছে বাড়ীতে যেন ছোটলাটই আসছে না বড়লাটই আসছে!"

একটু যে অনাবশ্যক উত্তেজনার প্রবাহে চলিয়াছে সরমার কথায় তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাপদ মনে মনে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। প্রকাশ্যে সেটুকু ঢাকিয়া লইবার অভিপ্রায়ে নিজেকে যথাসম্ভব সহজ ধারার মধ্যে লইয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "ছোটলাট বড়লাট হলে এত তাড়া থাকৃত না; এ যে তারো বাড়া!"

"তাই দেখছি!" বলিয়া সরমা হাসিতে লাগিল।

রমাপদ যখন ষ্টেশনে পৌছিল তখনও ট্রেন আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া ঘড়ী দেখিয়া সে বিরক্তি বোধ করিল। এত আগে পৌছিয়াছে! তাহা হইলে এত ব্যস্ত না হইলেও চলিত। কিন্তু উপায় কি? প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পাদচারণা করিয়া করিয়া, ঘড়ী দেখিয়া দেখিয়া, আরোহিগণের চলা-ফেরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, টিকিট ঘরের ক্রয় বিক্রয়ের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রমাপদ সময় কাটাইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যতই সে এই প্রকারে সময়ের পৃষ্ঠে চাবুক মারিতে লাগিল, সময়ের গতি ততই যেন অবাধ্য ঘোড়ার মত মন্থর হইয়া উঠিল। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সশব্দে ট্রেন যখন কলরব-চকিত জনাকীর্ণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল রমাপদ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের মধ্যস্থলে আসিয়া এক জায়গায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার গবাক্ষ দিয়া মুখ বাড়াইয়া নরেশচন্দ্র এবং সুকুমারী উৎসুক নেত্রে জনমণ্ডলীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; নিশ্চয় তাহারা রমাপদকেই খুঁজিতেছিল। বিবাহের পরে মাত্র দুই তিন বার দেখা সাক্ষাত হওয়ার পর বহুকাল অদর্শন হেতু সুকুমারী এবং নরেশের আকৃতি রমাপদর স্পষ্ট মনে ছিল না; কিন্তু সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীর ভিতর দুইজন স্ত্রীপুরুষকে এইরূপ পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া রমাপদর চিনিতে আর কোনও অসুবিধা হইল না। সে ব্যগ্রোৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি চলন্ত গাড়ীর হাতল চাপিয়া ধরিয়া পা-দানীর উপর উঠিয়া পড়িল, তাহার পর দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

বহু লোকের মধ্যে রমাপদকে নিঃসন্দেহরূপে চিনিয়া লইবার পক্ষে একটু যে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া নরেশ এবং সুকুমারী ভয় করিতেছিল অতঃপর তাহারও আর কোনও কারণ রহিল না। সবলে রমাপদর দুই হস্ত দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রফুল্লমুখে নরেশ বলিল, "ভাল আছ ভায়া?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "আছি। আপনি?—আপনারা?"

"আমি ভাল আছি। কিন্তু আমরাও ভাল আছি কি না সে খবর ত' তুমি অন্যত্র নিতে পার। সব খবরই যে আমি দোব তার কি মানে আছে?" বলিয়া নরেশচন্দ্র হাসিতে লাগিল।

রমাপদর মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। অপ্রতিভ নেত্রে সুকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন দিদি?"

একজন চতুর এবং একজন লাজুক ভায়রা-ভাইয়ের বাক্যালাপ শুনিয়া সুকুমারী পুলকিত হইয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; বলিল, "আছি। কিন্তু তুমি অমন কাজ করলে কেন ভাই? চলন্ত গাড়ীতে অমন করে উঠতে আছে কি? দৈবর কথা কিছু ত' বলা যায় না, হঠাৎ যদি হাত ফস্কে যেত!"

এই সুমিষ্ট ভ্রাতৃ-সম্বোধনে এবং স্নেহ-সুরভিত উদ্বেগ প্রকাশে রমাপদর চিত্ত এক অননুভূত-পূর্ব্ব মধুর রসে ভরিয়া উঠিল। সে হর্ষোজ্জ্বল নেত্রে সুকুমারীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি যখন উঠেছিলাম গাড়ী তখন প্রায় থেমে এসেছিল।"

"এবার থেকে একেবারে থেমে গেলে উঠো। বুঝলে?"

সুবোধ ছেলের মত ঘাড় নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা।"

নরেশচন্দ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "সুকু, গাড়ী থেকে আগে নাম, তারপর যা করতে হয় কোরো। গাড়ী থেকে নামবার আগেই অমন করে শাসন আরম্ভ করলে বেচারা ঘাবড়ে যাবে!"

সুগঠিত ভ্রূযুগল অর্থময় ভাবে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া

সুকুমারী নীরবে জানাইল রমাপদর সমক্ষে এমন করিয়া আদরের নামটি ধরিয়া এত শীঘ্র না ডাকিলেও চলিত। প্রকাশ্যে বলিল, "গাড়ীর বিষয়ে শাসন গাড়ীতে না করলে চলবে কেন ?"

নরেশ হাসিয়া বলিল, "তাও ত' বটে! জুরিসডিক্শনের কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম !"

কথায়-বার্ত্তায় যে কথাটা রমাপদ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল সহসা তাহা মনে পড়িয়া সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কুলি কুলি করিয়া ডাকিতে লাগিল।

নরেশ রমাপদকে বাহু ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিল, "ব্যস্ত হয়ো না ভায়া! ঈশ্বর যখন আমাদের সহায় আছেন তখন ও-কাজটা বাকী নেই, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।" বলিয়া নরেশ প্লাটফর্ম্মের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

রমাপদ চাহিয়া দেখিল তিন-চারিজন কুলির সাহায্যে একজন সুসজ্জিত আরদালী গাড়ী হইতে সুটকেস, ষ্টীল-ট্রঙ্ক, ক্যাসবাক্স, হোল্ডল, অ্যাটাসি কেস, টিফিন কেরিয়ার প্রভৃতি বিবিধ আসবাব-পত্র প্ল্যাটফর্ম্মের উপর নামাইয়া রাখাইতেছে। তাহার মস্তকের সুসম্বদ্ধ শুভ্র শিরস্ত্রাণের মধ্যস্থলে রৌপ্য-নির্ম্মিত উজ্জ্বল B অক্ষর দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল তাহা নরেশচন্দ্রের ব্যানার্জ্জী পদবীর আগুক্ষর। নরেশ, সুকুমারী এবং রমাপদ তিনজনে প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইল।

ভৃত্যের পরিচ্ছদের বহর দেখিয়া রমাপদ প্রভুদের পরিচ্ছদের প্রতি মনোনিবেশ করিল। প্রভুর পরিচ্ছদ এমন কিছু বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল না; সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীর যেমন হয় প্রায় সেইরূপই—তবে পায়ের জুতা হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ের আলোয়ান পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিসের মধ্যেই স্বচ্ছলতার একটা ছাপ পরিস্ফুট। প্রভু-পত্নীর সৌখীন পরিচ্ছদ কিন্তু অনাড়ম্বর হইলেও প্রাচুর্য্যের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে বহন করিতেছিল। শুভ্র কাশ্মীরী শালের মূল্যবান শাড়ী, কাশ্মীরী শালের টাইট্ ব্লাউস্, রেশমের সাদা ষ্টকিং, বক্স্কিনের সাদা জুতা এবং মুক্তা-খচিত সুদৃশ্য দুই চারিখানি অলঙ্কার সুকুমারীর দেহকে আশ্রয় করিয়া ছিল। ইহার তুলনায়—রেলপথে ব্যবহার্য্য সুকুমারীর পক্ষে সম্ভবতঃ এই সামান্য পরিচ্ছদের তুলনায়—রমাপদর মনে পড়িল সরমার দীন বেশের যৎকিঞ্চিৎ সম্বল! অথচ দুইজন সহোদরা ভগ্নী!

শুধু পরিচ্ছদই নয়! পরিচ্ছদ দেখিবার সময়ে রমাপদর চক্ষে পড়িল সুকুমারীর অপরিম্লান সুস্থ যৌবন-শ্রী। সাতাশ বৎসর বয়সে সে যেন সতেজ সবুজ ডাঁটার উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম; আর আঠার বৎসর বয়সেই সরমা যেন ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে! সরমার সৌন্দর্য্যের মধ্যে হয় ত' সন্ধ্যার নিবদ্ধ মাধুরী আছে, কিন্তু প্রত্যুষের এই প্রাণখোলা প্রসন্নতা তাহার মধ্যে কোথায়! টাকা! টাকা! ষ্টেশনের কল-কোলাহলের মধ্যে, নিজের উপস্থিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া, রমাপদ টাকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কিছু টাকা হাতে আসে কেমন করিয়া! খুব বেশী নয়, অন্ততঃ—! রমাপদ ভাবিয়া পাইল না সে-অন্ততঃ কত যাহাতে এ দুঃখ যায়!

কিন্তু সুকুমারীর এই সুনিবদ্ধ স্বাস্থ্য-সম্পন্নতার মূলে শুধু অর্থের রস-সিঞ্চনই ছিল না। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরে সন্তান প্রসব কালে তাহার জীবন সংশয় হয়, এবং তৎকালীন গুরুতর অস্ত্রোপচারের ফলে ভবিষ্যতে সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করে। ফুলগাছের ডাল কাটিয়া কাটা জায়গা গালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে ডালের রস সহজে শুকাইতে না পারিয়া যেমন ডালটাকে বহুক্ষণ তাজা রাখে, ঠিক সেইরূপে মাতৃত্বের অনিবার্য্য অপচয় হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুকুমারীর স্বাস্থ্য এবং যৌবন কিছুদিন হইতে প্রায় একই স্থানে বাধিয়া গিয়াছে। যৌবন-বন্যা সর্ব্বোচ্চ রেখায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই ভাঁটার মুখে পলি পড়িয়া গভীর জল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল ফলিবার উপায় নাই বলিয়া প্রাণ-রসের অতি সঞ্চয়ে ফুল যেন চতুর্গুণ হইয়া ফুটিয়াছে।

"কি রমা, তন্ময় হয়ে এত কি ভাবছ বল দেখি? হঠাৎ বড় বেশী রকম হাঙ্গামায় পড়ে গিয়েছ; না?"

অসঙ্গত অন্যমনস্কতা হইতে সহসা জাগিয়া উঠিয়া সুকুমারীর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া রমাপদ বলিল, "না, না, কি আশ্চর্য্য! হাঙ্গামা আবার কি? হাঙ্গামা কিছুই নয়! বরং খুবই—খুবই আনন্দের কথা!" তাহার পর নরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "নরেশদা, আপনি

দিদিকে নিয়ে আসুন, আমি গিয়ে একখানা গাড়ী ভাড়া করে ফেলি।"

প্রস্থানোদ্যত রমাপদর বাম বাহু দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নরেশ বলিল, "এ কাজটাও ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও ভাই। এ-সব কাজ ও তোমার চেয়েও ভাল করবে আমার চেয়েও ভাল করবে। অতএব আমাদের দুজনের মধ্যে কারো অনর্থক ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই।"

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, "ও! ঈশ্বর তা হলে আপনার চাকরের নাম?"

নরেশ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা নয়ত তুমি কি ভেবেছিলে আমি অপ্রামাণিক নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলছিলাম?"

রমাপদ তাহাই ভাবিয়াছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি নরেশের এমন সহজ বিশ্বাস এবং ভক্তি দেখিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়াছিল। মৃদু-স্মিত মুখে বলিল, "আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি!"

নরেশ গম্ভীরমুখে বলিল, "কিছুই বুঝতে পার নি! আমি বলছিলাম আমাদের এই সাকার প্রামাণিক ঈশ্বরের কথা। এ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর কার্য্যকারিতার প্রমাণ আমি এত বেশী পাই যে অন্য ঈশ্বরকে ভাববারই সময় পাই নে। তোমার দিদি আশা করেন তাতেও আমি ফল পাব। তিনি বলেন অপ্রামাণিক ঈশ্বর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মত;—বিশ্বাস না করে খেলেও জ্বর ছাড়ে!"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "শুনো না ওঁর কথা রমা! আমি ও-সব অ্যালোপ্যাথিক্ হোমিওপ্যাথিক কোনো কথা বলি নি! যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা নিজে বানিয়ে বানিয়ে অপরের নাম দিয়ে বলবেন!"

নরেশ বলিল, "আমার ক্ষমতা আছে তাই আমি বানিয়ে বানিয়ে নি; তোমাদের ক্ষমতা নাই তাই তোমরা বানিয়ে বলতে পার না। কিন্তু আমার বানান কথা তোমাদের নাম দিয়ে যে বলি তার দ্বারা আমার সহৃদয়তাই প্রকাশ পায়! কি বল ভায়া, ঠিক্ কি না?"

রমাপদ হাসিতে লাগিল।

প্ল্যাটফর্ম্ হইতে বাহিরে গাড়ীবারাণ্ডায় আসিয়া রমাপদ দেখিল ঈশ্বর একখানা গাড়ীতে দ্রব্যাদি উঠাইয়া আগাইয়া দিয়াছে—এবং অপর একখানা গাড়ী আরোহীগণের জন্য সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে।

নরেশ বলিল, "ওঠ রমাপদ।"

ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া রমাপদ বলিল, "আপনারা দুজনে না হয় এ গাড়ীতে আসুন। ও গাড়ীতে জিনিষপত্তর রয়েছে—আমি ও গাড়ীতে যাই।"

"এঃ—ঈশ্বরের শক্তির উপর তোমার এখনো একটুও বিশ্বাস হল না দেখছি! ওঠ! ওঠ!" বলিয়া নরেশ রমাপদকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল, তাহার পর সুকুমারীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়া নিজে উঠিয়া বসিল।

রমাপদর মনে সামান্য খট্‌কা বাধিল। সুকুমারী এবং নরেশচন্দ্রের প্রতি তাহার আচরণ ঠিক কিরূপ হইতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিতে গিয়া ধনশালীর প্রতি আর কিছু প্রকাশিত হইতেছে কি না সেই আশঙ্কায় সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আর যাহাই হউক না কেন সে যে ঠিক সংযত শোভন ব্যবহার করিতে পারিতেছিল না তাহা তাহার নিঃসন্দেহে মনে হইতেছিল, অথচ নিজেকে সংযত করিতে গিয়া পাছে শিষ্টাচারে ব্যাঘাত পড়ে সে ভয়ও মনে-মনে কম ছিল না।

গৃহে পৌঁছিয়া সরমার আচরণ লক্ষ্য করিয়া রমাপদ পরিমিত আচরণের কতকটা আন্দাজ পাইল। নিজের প্রতি সরমার অবজ্ঞার লেশমাত্র ছিল না, অভ্যাগতেরও প্রতি তাহার সমাদরের অভাব ছিল না। সে তাহার সংসারের সুপ্রতিষ্ঠিত আসন হইতে নরেশ এবং সুকুমারীকে সযত্নে আহ্বান করিল এবং তদুপলক্ষে যাহা কিছু দীনতা এবং দৈন্য প্রকাশ করিল তাহার মধ্যে হীনতার কোনো সংস্পর্শ পাওয়া গেল না—মায় রমাপদ সকলেরই চক্ষে তাহা বিনয় এবং ভদ্রতার রংএ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রমাপদ দেখিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরমা তাহাকে অতিক্রম করিয়া সকলের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত নিরবসর 'মাসিমা' 'মাসিমা' সম্বোধনের দ্বারা যতটা মনোযোগ সরমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছে—তাহার অর্দ্ধেক তাহার প্রতি প্রদর্শন করিতেছে না বলিয়া তাহার মনে হইল।

ইহাতে রমাপদ দুঃখিত হইল না—প্রসন্ন হইল।

(ক্রমশঃ)

কথা—শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　সুর—শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাস

সুরট—ঢিমাত্রিতালী

নিশিদিন মোর অন্তর কোণে
জাগিয়া থাকে কার আঁখি রে ?
সকরুণ গীত করে মুখরিত পবনে
অন্তর মাঝে নির্জ্জন গোপনে
উঠিতেছে সদা বাজি রে !
হৃদয়ের শত ক্ষতে
শান্তি-সুধা-স্রোতে
কে যেন নিতি দেয় ঢালি রে !
আপন মনে বসি বিজনে
বক্ষ গুমরি' উঠে কাঁদনে,
দ্বারে কাছে মোর কে যেন ডাকে
ঘন তিমিরে !
শূন্য মনে ব্যথা চাপিয়া
(থাকি) মলিন বসনে দেহ ঢাকিয়া
এ দীন অঙ্গে মম কে যেন পরায়
মুকুতা মণি রে !

সুরট—ঢিমাত্রিতালী।

ঠাট ণ ন, সম্পূর্ণ জাতি, বাদী র, সংবাদী প, সময় রাত্রি ২য় প্রহর।

০				১				+				৩			
রমা	রা	মা	পা	-া	না	র্সা	-া	নর্সা	র্রা	ধা	ণা	ধণা	র্সণা	ধা	পা
নি	—	শি	দি	—	ন	মো	র্	অ	ন্	ত	র	কো	—	—	ণে
-া	মা	গা	রা	পধা	মধা	মগা	রা	সরা	মপা	ধণা	ধপা	মপা	মগা	মগা	রসা
—	জা	গি	য়া	ণা	ণা	ণধা	পা	মপা	ধা	মা	পা	ধমা	গমা	গরা	সা
				থা	কে	কা	র্	আঁ	—	—	-খি	রে	—	—	-II

রা রা পা পা ধমা পা মগা মরা -া মমা গা রা রগম-া রা সা -া
স ক রু ণ গী ত ক রে — মুখ রি ত প ব নে —
রা ধা ধা ণা ধণা র্সণা ধা পা মপধ-া মপা মা গা রা পা পা -া
অ ন্ ত র মা — — ঝে নি র্ জ ন গো প নে —
-া র্রা র্রা র্সা র্না -া র্সা র্সা নর্সা র্র্সা ণধা পধা মধা পমা গরা সা
— উ ঠি তে ছে — স দা বা — — জি রে — — —II

(র্মর্গা র্মা র্র্সা না)

মা পা না না র্সা র্সা র্সা র্সা নর্সা র্রা ণা মা পা র্রা র্রা র্রা
হৃ দ য়ে র শ ত ক্ষ তে শা ন্ তি সু ধা — স্রো তে
-া ধা ণা মা পা র্সনা র্সা -া র্মর্গা র্র্সা নর্সা র্র্সা ণধা পধা মগা রসা
— কে যে ন নি তি দেয় — ঢা — — -লি য়ে — — —II

সা রা রা পা মপা মগা রা রা -া গমা পা মা গরা গা রসা রা
আ প ন্ ম নে — ব সি — বি — জ নে — — —
শূ — ন্ম ম নে — ব্য থা — চা — পি য়া — (থা কি)
-া সরা মগা রা ণ্া ণ্া ধ্া প্া প্া রা মগা রা সা -া রা -া
— ব ক্ষ শু ম রি উ ঠে কাঁ — — দ নে — — —
— মলি ন ব স নে দে হ ঢা — — কি য়া — — —
মা পা -া না -া না র্সা -া নর্সা র্রা ণধা মা পা র্রা র্রা র্রা
ছা রে র্ কা — ছে মো র্ কে — যে ন ডা — কে —
এ দী ন অ — ঙ্গে ম ম কে — যে ন প — রায় —
র্সা নর্সা র্রা ণা ধপা ধা পমা পা মপা নর্সা র্ধা ণধা পমা ধপা গমা রসা
ঘ — — ন তি — মি — রে — — — — — — —
মু কু তা — ম — ণি — রে — — — — — — —II

গানটি জলদ্ লয়ে গাহিবার সময় ঠুংরীতে সঙ্গত্ করিতে হইবে।

—

পুস্তক-পরিচয়

"হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসক"। প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক ক্ষেত্রে ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষরূপে পরিচিত। তাঁহার "সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব", "সদৃশ বিধান চিকিৎসা" প্রভৃতি পুস্তকে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ সমুন্নতি হইয়াছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের বহুদর্শনের ফল এই 'গৃহচিকিৎসক' পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ায়, ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ হইয়াছে। স্বর্গীয় ডাক্তার সরকার মহোদয়ের সঙ্গে বহুকাল রোগী দেখিয়া তাঁহার বহুদর্শন জন্মিয়াছে, তদুপরি তিনি প্রসিদ্ধ ডাঃ হেরিং সাহেবের অত্যুৎকৃষ্ট. "Domestic Physician" পুস্তকখানির সাহায্য লওয়াতে পাশ্চাত্য বহুদর্শনের ফল এতৎসহ সংযোগ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

পুস্তকখানি প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত হইয়াছে। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ স্বর্গীয় যদুবাবুই প্রথমে এই পথ দেখান। শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক সুন্দর ভাবে মীমাংসা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। পুস্তকখানির উপক্রমণিকা ভাগে,—হোমিওপ্যাথির মূল সত্যগুলি এবং রোগের কারণতত্ত্ব. রোগ কোথায় হয়, কাহার হয়, কেন সূক্ষ্মমাত্রায় আশ্চর্য্য ক্রিয়া হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ঔষধ সমূহ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, মহাত্মা হানিমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং নূতন চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারে সমগ্র পৃথিবীর সকল চিকিৎসার পরিবর্ত্তন, বিশেষ করিয়া সমালোচিত হইয়াছে। কিরূপে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কি করিয়া নিজে নিজে ঔষধ প্রস্তুত করা যায়, কিরূপ রোগে কিরূপ ঔষধের কিরূপ শক্তি দিতে হয় তাহা এই পুস্তকে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। তৎপরে চিকিৎসাভাগের প্রথমেই কিরূপে রোগ পরীক্ষা করিতে হয়, নাড়ী-পরীক্ষা জিহ্বা পরীক্ষা, মলমূত্র পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা নূতন যন্ত্র "ফনেনডোস্কোপ", শক্তি নির্ণয়ের "ইনামোমিটার" যন্ত্রের কথা বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিতে সরল চিকিৎসার একটু বিশেষত্ব আছে অর্থাৎ প্রত্যেক পীড়ায় ঔষধের মধ্যে যেগুলিতে অনেকস্থলে ফল দিয়াছে, সেইগুলিই সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। "বেরি বেরি", "কালাজ্বর", প্রভৃতির নূতন নূতন ঔষধের কথা লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষভাগে—আকস্মিক দুর্ঘটনা, অগ্নিতে পোড়া, কাটা, পচা, বন্দুকের গুলি লাগা, অস্থিভাঙ্গা, সর্পদংশন এবং বিষ-ভক্ষণাদির আশু প্রতিকার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে পরিশিষ্টে,—অত্যাবশ্যক ঔষধগুলির গুণসমূহ লিখিয়া দেওয়াতে, একাধারে—মেটেরিয়া মেডিকা ও প্রাক্‌টীশের কাজ হইয়াছে। আমরা যতদূর বুঝিলাম তাহাতে পুস্তকখানি যে কেবল ছাত্র ও চিকিৎসকগণের পক্ষে ভাল, তাহা নহে, ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গৃহ-পঞ্জিকার মত কাজ করিবে। শিক্ষিতা মহিলাগণ নিজ নিজ সন্তানের পীড়া এবং তাঁহাদের নিজেদের অনেক পীড়া, যাহা আত্মীয়-স্বজনের নিকট বলিতে কুণ্ঠিতা হন, তাহাতে আপনারা নিজে নিজে ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইবেন। অসহায় দরিদ্র প্রতিবেশীগণ সহসা কোনও বিপদে পড়িয়া তাঁহাদিগকে জানাইলে,—এতৎসাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকারের সঙ্গে আমরাও একবাক্যে স্মরণ করিতেছি, যে ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই সত্য—"বর্ত্তমান সময়ে অর্থ-সামর্থ্যে, খাদ্যদ্রব্যে প্রভৃতি নানা অভাবে দিন দিন দুর্ব্বলদেহী বঙ্গবাসীর পক্ষে তেজস্কর উগ্রবীর্য্য ঔষধের অপেক্ষা, সুখসেব্য স্বল্পমাত্রাযুক্ত অথচ সুখপ্রদ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই সম্পূর্ণ সময়োপযোগী।"

প্রসূতি-পরিচর্য্যা।—ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই পুস্তকখানির বিষয়, প্রসূতি-পরিচর্য্যা বা পোয়াতি-রক্ষা। লেখক—প্রথিতযশা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়—সুতরাং এই পুস্তকের পরিচয় প্রদানই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া বাস করেন, যাঁহাদের ঘরে পোয়াতির অসদ্ভাব নাই, তাঁহারা বিপদে পড়িলে যে বামনদাস বাবুর শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, তিনিই এই পোয়াতি-রক্ষা বইখানি লিখিয়াছেন; সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ইহাতে পুঁথিগত বিদ্যার স্থান হয় নাই, বহুদর্শী প্রসূতি-চিকিৎসক পোয়াতির বন্ধু বামনদাস বাবু সুদীর্ঘকাল পোয়াতির চিকিৎসা করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা সোজা ভাবে, সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বইখানি যে কেবল ডাক্তারদেরই কাজে লাগিবে তাহা নহে, যাঁরা চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহারাও এই বইখানির সাহায্যে অনেক পোয়াতীর কষ্ট লাঘব করিতে পারিবেন এবং যাহাতে পোয়াতি কোন প্রকার কষ্ট না পায়, পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এই বইখানি নূতন পঞ্জিকার মত প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে থাকা উচিত। সকলেই এই বইখানির পরিচয় নিজে গ্রহণ করিবেন, অন্তঃপুর-চারিণীদিগকে গ্রহণ করিতে বলিবেন।

মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার।—শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। বাঙ্গালা দেশে, শুধু বাঙ্গালা দেশে কেন, ভারতবর্ষে এমন কোন শিক্ষিত লোক নাই বলিলেও হয় যিনি বরিশালের অশ্বিনী বাবুর নাম ও তাঁহার অতুলনীয় কার্য্যাবলী ও স্বদেশ-প্রাণতার কথা না জানেন। অশ্বিনী বাবু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবদান অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। অশ্বিনী বাবুর প্রিয়তম ছাত্র, শিষ্য ও সেবক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরুর জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্যের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, কি গুণে অশ্বিনী বাবু দেশের লোকের, বিশেষতঃ দেশের যুবক ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। অশ্বিনী বাবু যেমন আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না, একেবারে সাদাসিদে মানুষ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত শিষ্য শরৎ বাবুও তেমনি বিনা আড়ম্বরে, সরল ও সহজ ভাষায় অশ্বিনী বাবুর পবিত্র ও মহান জীবন-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা বইখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই, এমনই সুন্দর ভাবে এই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'মহাত্মা অশ্বিনী কুমার' যে জনাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

বিসর্জ্জন।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; মূল্য বার আনা। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জনে'র পরিচয় নূতন করিয়া দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মনে করি; যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা কবিবরের বিসর্জ্জনের নাম শুনিয়াছেন, অনেকে হয় ত নানা রঙ্গমঞ্চেও এই নাটকখানির অভিনয়ও দেখিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বের কথা,—ভারত-সঙ্গীত-সমাজ যখন এই নাটকখানির অভিনয় করেন, তখন কবিবর স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাদের মনে আছে। তেমন অভিনয় আর কখন দেখি নাই। সেই হইতে এই নাটকখানি যখনই হাতে আসিয়াছে, তখনই পড়িয়াছি, কোন বারই পুরাতন মনে হয় নাই। এক্ষণে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় এই সর্ব্বজন-প্রশংসিত নাটকখানির পুনর্মুদ্রণ করিয়া সাহিত্যসেবী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শোধ-বোধ।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য বার আনা। এখানি কবিবরের রচিত নাটক; আমরা ইহাকে প্রহসন বা অন্য কোন নামে অভিহিত করিতে চাই না। উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নাটকের যাহা উপাদান, তাহা এই ক্ষুদ্র নাটকখানির মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। আজকালকার ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের একখানি অত্যুজ্জ্বল আলোকচিত্র। এ চিত্রের অনেক মুখ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। কবিবর কিন্তু কোথাও শ্লেষ করেন নাই, দীর্ঘ 'সারমণ' দেন নাই, হাসিতে হাসিতে রঙ্গ করিতে করিতে যে চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাতে অনেক ভাবিবার কথা আছে, বুঝিবার কথা আছে, উপদেশ আছে। রঙ্গালয়ে যাঁহারা এই বই খানির অভিনয় দেখিতেছেন, তাঁহারা কি মহাকবির কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন?

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস।—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ৩ টাকা। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহোদয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধাবলী 'ভারতবর্ষে' অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুগণের চেষ্টায় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বরিশাল শঙ্কর-মঠ স্বামীজীর অমূল্য প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা দেশে দার্শনিক সাহিত্যের প্রচেষ্টার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ। বেদান্ত-দর্শনের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা এবং প্রাঞ্জল আলোচনা আমরা ইদানীং দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়; অবশ্য কালে হয় ত ইহা অপেক্ষাও গবেষণাপূর্ণ এ জাতীয় গ্রন্থ জন্মিবে; কিন্তু সরস্বতী মহাশয় যে ইহার পথ-প্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে শাঙ্কর-দর্শনের যে বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ গবেষণাপূর্ণ। অনেকে মনে করেন, শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আমরা যতদুর জানি, তাহাতে শঙ্করকে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা ঠিক নহে; তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌরপাদাচার্য্য অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। তবে শঙ্কর অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্বামীজিও, দেখিলাম, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। আমরা জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ব্যুৎপত্তি মালা।—শ্রীহরিনাথ তর্করত্ন সঙ্কলিত; মূল্য—একটাকা। এখানিকে সংস্কৃত অভিধানের ক্ষুদ্র-সংস্করণ বলা যাইতে পারে। সচরাচর যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিশেষ কাজে লাগিবে।

কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য।—শ্রীকামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত; মূল্য আড়াই টাকা। এক সময় ছিল যখন কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহোদয়ের 'স্বপ্ন বিলাস' 'রাই উন্মাদিনী' সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গকে প্লাবিত করিয়াছিল; আমরাও বাল্যকালে স্বপ্ন বিলাসের যাত্রা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম; এখনও তাহার কত গান আমাদের কণ্ঠস্থ আছে। গোস্বামী মহাশয় নদীয়া জেলার লোক হইলেও ঢাকাতেই জীবনের অধিক কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহার অতুলনীয় গীতাবলী পূর্ব্ববঙ্গেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঠিক কথাই বলিয়াছেন—"'কৃষ্ণকমল' বৈষ্ণব-গীতি-পুনরুত্থান কালের শ্রেষ্ঠ কবি।" আমরা বলি, বৈষ্ণবগীতি-সাহিত্যের পুনরুত্থান কালের তিনিই শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। গোস্বামী মহাশয়ের স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনীর পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। যখন লোকে ছাপা বই বড়-একটা পড়িত না, সেই সময় গোস্বামী মহাশয়ের "স্বপ্ন বিলাস" 'রাই উন্মাদিনী'র কুড়ি হাজার সংখ্যা দেখিতে দেখিতে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, ইহাই এই গ্রন্থের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এক্ষণে গোস্বামী মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার গোস্বামী মহাশয় উক্ত গীতিকাব্যের একখানি সুন্দর সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই শোভন সংস্করণও দেখিতে দেখিতে বিক্রয় হইয়া যাইবে।

দূরের আলো।—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি এল্, প্রণীত মূল্য; দুই টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নরেশবাবুর এই উপন্যাসখানি আমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তিনি যে কয়েকটী চিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উপেন্দ্রের মত যুবকের পরিচয় আমরা সর্ব্বদা পাইয়া থাকি; কিন্তু স্বদেশ-নেতা নবীন চক্রবর্ত্তীর মত পাজী লোক যে স্বদেশ-সেবক-নামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে আছেন বা থাকিতে পারেন, তাহা আমরা জানিতাম না; অথচ নরেশবাবু যে ভাবে এই দেশ-নেতা জীবটীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে যে একটা জীবন্ত আদর্শ রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কুমুদিনী ও চিত্রার চরিত্র লেখক মহাশয় তাঁহার আদর্শ অনুসারেই অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বইখানি পড়িতে বিশেষ আগ্রহ জন্মে এবং পড়িয়া তৃপ্তিবোধও হয়। নরেশবাবু সুলেখক; তাঁহার রচনাভঙ্গী, সরস বর্ণনার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না।

দেশের কথা

নাগপুরে লর্ড আরউইন—

গত ২২শে জুলাইয়ের নাগপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ৫০ জন কৃষিবিদ বড়লাটকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন।

বেরার ও মধ্যপ্রদেশের কৃষিবিদগণ বড়লাটকে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলেন:—"ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমি বড়লাটরূপে আমার কর্ত্তব্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া ও প্রথমেই এইরূপ এক গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কৃষি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ, এই বিষয়ে আমি বহু চিন্তা করিয়াছি এবং দেশের শত শত কৃষিজীবিগণের মত আমিও জানি, এই বিষয়ে কি আনন্দ, কি উত্তেজনা ও সময়ে সময়ে কি নৈরাশ্যই হইয়া থাকে! দেশের অধিবাসীগণের ন্যায় আমিও আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সময় যাপন করিয়াছি। প্রকৃতি অনেক সময়ে এই কৃষিজীবীদিগের সহিত কত না বাদ সাধে! কিন্তু তবুও প্রকৃতির মাধুর্য্যে আমাদিগকে গ্রামের দিকেই টানে। সহরের অপেক্ষা প্রকৃতির কোলে পালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু তাহাই নহে, গ্রামের এই কৃষককুলই দেশের আশা ভরসা, উন্নতির একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ। সহরের—তথা দেশের সর্ব্বমানবকেই জীবন, উন্নতি ও সর্ব্ববিষয়ে নির্ভর করিতে হয়—এই কৃষিজীবিগণের উপর।

আপনাদিগের এই কৃষিসম্বন্ধীয় সকল বক্তব্যই, সকল অসুবিধা ও বাধা প্রভৃতির কথাই আমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি এবং এই সকলের মধ্যে কয়েকটি বিষয় বেরার ও মধ্যপ্রদেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং বাকী সকল বিষয়ই যথাসময়ে ভারতীয় কৃষিবিষয়ক "রয়াল কমিশনে" আলোচিত ও বিবেচিত হইবে।

আপনাদিগের এই প্রদেশ কৃষিবিষয়ে বিখ্যাত। এইখানে ভারতের তিনটি প্রধান চাষের সমন্বয় হইয়াছে—গম, চাউল ও তুলা; এবং এই স্থানের কৃষিপ্রণালী পূর্ব্ব নিয়ম হইতে বহু সমুন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত। কৃষি-বিষয়ে উন্নতি-সাধন করিতে হইলে কৃষি বিদ্যা ও বিজ্ঞান জ্ঞান একান্তই প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বীজ নির্দ্ধারণ, উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি, বৈজ্ঞানিক প্রকারে জমীকর্ষণ ও সারপ্রদান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ও আধুনিক যুগে তাহা একান্তই আবশ্যক।

চাষবাস ও কৃষিকার্য্যে দুইটি বিষয় আবশ্যক। প্রথম—বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও নূতন নূতন আবিষ্কার এবং দ্বিতীয়তঃ তৎসমুদায় পরীক্ষা করা ও কার্য্যে পরিণত করার জন্য উপযুক্ত কৃষকের প্রয়োজন। অর্থাৎ চাই এক জনের মস্তিষ্ক ও অপর জনের হাতেহেতেরে কার্য্য করা। আপনারা একটা বিষয় বলিয়াছেন যে, কর্ষণের জমী বৃদ্ধির সঙ্গে পশুচারণার ক্ষেত্রসমূহ কমিয়া যাইতেছে। আমি জানি, আপনাদিগের সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টিপ্রদান করিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে মহাত্মা—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত আগামী আগষ্ট মাসে যে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে, সেই সম্পর্কে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন:—

ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে এক কমিশন আসিবেন এবং উক্ত কমিশনে ডাক্তার ম্যালান এবং মিষ্টার ডানকান থাকিবেন ইহা মঙ্গলের চিহ্ন। বৈঠকের অধিবেশন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় হইবে, ইহাও শুভ। যাঁহারা উচ্চপদস্থ এবং যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা যে এই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাও সুখের বিষয়। আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত। এ সম্বন্ধে যতই আলোচনা ও গবেষণা করা যায়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের দাবীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইলে এবং সাধারণ্যে ইহা সুপ্রচারিত হইলে আমাদের কোন ক্ষতিই হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তিগণ ভারতের বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলিয়াই মিটমাটের পথে প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। স্বার্থপর শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা কি চাহেন, তাঁহারা কেবল তাহাই জানেন। ভারতীয়দের পক্ষের কোন কথাই তাঁহারা জানেন না, বলিলেই চলে। যদি এই বৈঠকে ভারতীয় সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয় তাহা হইলে ভারতীয়দের (ঔপনিবেশিক ভাবে) দক্ষিণ আফ্রিকা দখল করিয়া লইবার কথা অথবা ভারতীয়গণের ঔপনিবেশিক ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া শ্বেতাঙ্গদের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইবার কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে ভুয়া এবং বাজে বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

জেনারল হার্টগের বক্তৃতা ও উক্তি গোলমেলে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের প্রতি সুবিচার করা হইবে এরূপ ধারণা আমি করিতে পারি না। ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের প্রতি শ্বেতকায়দের মনোভাব বিদ্বেষমূলক। সেই কারণে যদি আদিম অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয়দের প্রতি যে সুবিচার করা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। আমরা যদি এ সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে চিন্তা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে এক জনের প্রতি অবিচার করিয়া অন্যের সম্বন্ধে সুবিচার ক্রয় করা যায় না।

বীর হিন্দু নারী—

পার্কার জিলার সজ্বর সহর হইতে ৩ জন হিন্দু রমণীর বীরত্ব-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি ৬টার সময় তাহাদের বাড়ীতে কয়েক জন চোর প্রবেশ করে। চোরেরা মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় রমণীত্রয়ের নিদ্রা ভাঙ্গে। প্রাচীর টপকাইয়া পলায়ন কালে একটি চোরকে তাহারা ধরিয়া ফেলে। অন্য এক চোর তাহার সঙ্গীর উদ্ধারার্থ আসে। তখন রমণীত্রয় ও চোর দুই জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়। এক জন চোরের নিকট ছোরা ও আর এক জনের নিকট লাঠী ছিল। একজন চোর পলায়ন করে, কিন্তু রমণীগণ অপর চোরটির সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল মারামারি করিয়া তাহার হাত হইতে ছোরাটি কাড়িয়া লয় এবং শেষে তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে। তৎপরে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। প্রকাশ, মোট তিন জন চোর আসিয়াছিল। বাড়ীটি সহরের নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত বলিয়া কোন লোক সাহায্যার্থ আসিতে পারে নাই,—রমণীগণকে তাহাদের নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তাহাদের এই বীরত্বে সহরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

কেনিয়ায় ভারতীয় কর্ম্মীর দেহত্যাগ—

কেনিয়ার ভারতীয় কর্ম্মী এম, এ, দেশাই বুকোবা সহরে দুরন্ত হৃদরোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতবাসীদিগের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ও কেনিয়ার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে আফ্রিকার এক জন প্রসিদ্ধ কর্ম্মীর অভাব ঘটিল। ঐ দিন ঐ অঞ্চলের ভারতবাসী সকলেই দোকানপাট বন্ধ করিয়াছিলেন।

নূতন মন্দির আবিষ্কার—

সম্প্রতি বাঙ্গালার পাহাড়পুরে ভূগর্ভে একটি নূতন ধরণের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুর ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের জামালগঞ্জ ষ্টেশন হইতে প্রায় সাড়ে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। এই স্থান বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে খনন করিতেছিলেন। কিছুদিন এই খননকার্য্য স্থগিত ছিল। গত ডিসেম্বর মাসে ইষ্টার্ণ সার্কেলের আর্কেলজিকেল সার্ভের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি তথায় একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এবং নবম শতাব্দীতে উহার বিশেষভাবে সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে নির্ম্মিত এবং ইহার গাঁথুনি কাঁচা। এই কাঁচা গাঁথুনীর মন্দির ৬০ ফিট উচ্চ হইলেও আজ ১৩ শত বৎসর উহা অটুট রহিয়াছে, দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেছেন। ইহাতে পাতর অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মন্দিরটি একটি গর্ভচৈত্য। ইহাতে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে, বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।

মালবীয়ার নমঃশূদ্র-প্রীতি—

নমঃশূদ্র ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান।—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অনিলধারায় অবস্থানকালে বেণারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থী পাঁচটি নমঃশূদ্র বালককে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তিদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। আরও নমঃশূদ্রদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গা হিন্দু সম্মেলন—

২২শে জুলাই দ্বারভাঙ্গা জিলা হিন্দু সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত বজরংদত্ত শর্ম্মা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, হিন্দু অত্যন্ত ভীরু। তাহারা তাহাদের জননী, ভগিনী ও পত্নীদিগকে দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের ভীরুতা এখন সংক্রামক ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বানিয়াসীর কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ প্রস্তাব করেন—এই সভা মত প্রকাশ করিতেছেন যে, হিন্দু জাতিকে, হিন্দু ধর্ম্মকে এবং হিন্দুর মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সংগঠন বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে হিন্দুসভা পাঠশালা সংস্থাপন এবং ব্যায়ামচর্চ্চার জন্য মল্লক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

শ্রীযুত দামোদরনারায়ণ চৌধুরী প্রস্তাব করেন, অস্পৃশ্যদিগকে কূপ ও ইঁদারা হইতে জল লইবার, বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার এবং দেবালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

ইহার পর শ্রীযুত গঙ্গাধর মিশ্র শুদ্ধি সম্পর্কে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

ডাক্তার মুঞ্জে প্রস্তাব করেন, (১) হিন্দু মহিলাদের ভিতর হইতে পর্দ্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহিলাদিগকে অস্ত্রাদি দেওয়া হউক।

(২) মসজেদের সম্মুখে বাজাদি বন্ধ করিবার জন্য মুসলমানগণ সম্প্রতি যে নূতন দাবী করিতেছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার জন্য এবং দেশে শান্তিসংস্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হউক।

(৩) সংপ্রতি রাজরাজেশ্বরী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা লইয়া মুসলমানগণ কলিকাতায় হিন্দুদের উপর যেরূপ অনাচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া এবং পাবনা ও কুষ্টিয়ার হিন্দুদের উপর মুসলমানগণ যেরূপ অনাচার করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া ডাক্তার মুঞ্জে আর এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

প্রত্যেক প্রস্তাবই সভায় সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

পাটের চাষ—

গত ১৪ জুলাই বুধবারে কোম্পানী বাগিকে সরকার এ বৎসরকার যে সংশোধিত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম এই তিন প্রদেশে আনুমানিক ৩,৬০৫,০০০ একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে ; অর্থাৎ গত বৎসরাপেক্ষা ৪৮৯,৮০০ একর অধিক জমীতে পাট বপন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক বাঙ্গালা দেশে ৪,৪১,৪০০ একর অধিক জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে। সেইরূপ আসামে ৩১,৬০০ একর এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৬৮০০ একর অধিক জমীতে উহার আবাদ হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে যে বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহা পাটের আবাদের পক্ষে অনুকূল এবং বর্ত্তমানে মোটের উপর পাটের অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। বিহার ও উড়িষ্যায় পাটের জন্য এখনও বৃষ্টির আবশ্যক আছে বটে, তথাপি উহার বর্ত্তমান অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। আসামে এরূপ সময়ে পাটের অবস্থা সচরাচর যেরূপ থাকে, সেইরূপই আছে।

বাঙ্গালা দেশে একমাত্র পাবনায় বৃষ্টির অভাব ও পোকা লাগাতে পাটের কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সেইরূপ ময়মনসিংহে কতকটা অনিষ্ট হইয়াছে।

পাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞের অভিমত—

আগুড়ি মুঞ্জরিত

এ বৎসর যে পরিমাণ জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে, তাহাতে জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করেন যে, এ বৎসর প্রতি একরে (৩ বিঘায়) গড়ে তিন গাঁট বা ১৫ মণ পাট উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে মোটের উপর এক কোটি গাঁট বা পাঁচ কোটি মণ পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেন, এই পাটের বার আনা অংশ কলিকাতা আসিবে কি না সন্দেহ। তিনি বলেন, উহার কারণ এই যে, মফঃস্বলে এতাধিক পাট স্থানান্তরে চালান দিবার সুযোগ নাই। গত বৎসর সমস্ত জিলায় ১ কোটি ৫ লক্ষ গাঁট পাট জন্মিয়াছিল, কিন্তু মাত্র ৮৩ লক্ষ গাঁট কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহার উপর এবার কোন জিলায় পুরাতন পাট মজুত নাই বলিলেই হয়। ইহাতে এ বৎসর যে পাট হইবে চাষীরা তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে। গত মরশুমে চাষীরা প্রায় সর্ব্বত্রই পাটে বেশ লাভ করিয়াছে এবং সেই জন্য তাহারা মহাজনের নিকট ঋণী নহে। সুতরাং এখন পাটের বাজার যেরূপ নামিয়াছে, তাহাতে পাট ধরিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

ভারতের কয়লা—

গত ১৯২৫ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খনিসমূহ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে :—আসাম ৩১৭৯৯৭ টন, বেলুচিস্থান ২২১০৭, বাঙ্গালা ৪৯১৩৮৫২, বিহার ও উড়িষ্যা ১৩৯৩১২৪৪, ব্রহ্মদেশ ২৫, মধ্যপ্রদেশ ৭০৮৫৫৩, পঞ্জাব ৭৬৬৬২, মোট ১৯৯৬৯০৪১ টন।

কাবুলীর কবল—

বাঙ্গালাদেশে কাবুলী চেনেন না এমন লোক বোধ হয় বিরল; সুদূর মফস্বলের বালক বালিকারা পর্য্যন্ত এই লাঠিপাগড়ীধারী মূর্ত্তিগুলির সহিত পরিচিত। কিন্তু ইহারা দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা সুস্পষ্ট নহে। সম্প্রতি রঙ্গপুরের "বার্ত্তা" পত্রে 'কাবুলীর কবল' নামক প্রবন্ধে একটী তালিকা আছে তাহার কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা হইতে কাবুলীদিগের কার্য্যাবলীর কতকটা ধারণা জন্মিবে।

খাতকের নাম	ঋণের পরিমাণ	সুদ যাহা দেওয়া হইয়াছে।
শিবচরণ হাড়ি	১৫৲	২২৫৲
বিরাশীয়া হাড়ি	৮৲	৮০৲
মলহারী হাড়ি	১২৲	৭২৲
দারোগী হাড়ি	৪০৲	৭২০৲
অনেশ্বরী হাড়িনী	১০৲	১৫০৲
তিলেশ্বর ডোম	৬০৲	৯০০৲
যোগীয়া ডুমনী	:৮৲	২৮৲
কাল্লু হেলা	৪০৲	৬০৲
পরমেশ্বর হাড়ি	১০০৲	১৫০০৲

জগতের উৎপন্ন চাউল—

১৯১৪ সালে ভারতে মোট ৮৯৩২৮০০০ একর জমিতে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর হইতে ইহাতে শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সালে মোট ৩৯০৯৭০০০ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯২৫ সালে জগতের মোট ধান্য উৎপন্নের জমির এবং উৎপন্ন চাউলের দাম নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	জমি (হাজার একর)	চাউল (হাজার সেণ্টল) (১ সেণ্টল = ১৮০ পাউণ্ড)
ইউরোপ	৪৯৪,২	২০১৪.৩৩
আমেরিকা যুক্ত রাজ্য	৯০৩.৯	১৫২৪১.৮
সিংহল	৮০৩,১	৫৫১৯.৬
ভারতবর্ষ	৮১৪৩১.০	১০৪৭১৯৯.৬
ইণ্ডোচীন	১২৫১৩.৪	১২৭০৩০৮
জাপান		
কোরিয়া গং	১২৭৫১.৬	৩২২৯৯৭.৫
ফিলিপাইন	৪২০০ ৯	২৮২১৯,৩
শ্যামদেশ	৬৬৭১,৯	১০৯৯৬৯,৯
জাভা	৮৯৭২,৪	১০৫০৫৫,০
মাড়াগেচকার	১২৮৫,৬	২২৯২৮.২
	৯২৯৫৭৮,৪	১৮০৪২৫৯,৭

ভারতে অহিফেন—

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" বলেন, ভারত সচিবের দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে ১০ বছরের মধ্যে ঔষধের প্রয়োজন ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে অহিফেন রপ্তানী বন্ধ করা হইবে। ইহা ক্রমে ক্রমে করা হইবে। ১৯২৭ খৃঃ হইতে এই কার্য্য আরম্ভ হইবে—এবং হিসাবমত ১৯৩৭ এর পর অহিফেন আর বাহিরে রপ্তানী হইবে না, এ আশা আমরা করিতে পারি। ইতিমধ্যেই কলিকাতার অহিফেন নীলাম বন্ধ করা হইয়াছে।

দেশী লবণ—

বাঙ্গালা দেশে যে লবণ আসে তাহার বেশী ভাগ এডেন ও পোর্ট সৈয়দে জন্মিয়া থাকে। সম্প্রতি কাথিওয়ারে লবণ প্রস্তুতের কারখানা বসিয়াছে। কিন্তু পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় তাহা বঙ্গদেশে আসে না। বিশেষতঃ যে জাহাজে বোম্বাই হইয়া লবণ চট্টগ্রাম ও কলিকাতা বন্দরে আসিবে, ফিরিবার সময় যদি মাল বোম্বাই না পাওয়া যায়, তবে প্রতিযোগিতার কাথিওয়ার টিকিতে পারিবে না। বোম্বে চেম্বার সে জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন।

একজন বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন যে বাঙ্গালা হইতে কয়লা নেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে সরকারী সাহায্য ছাড়াও কাথিওয়ারের লবণ এই দেশে চালান দেওয়া যায়। এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় লবণেই ভারতবর্ষ চলিবে. তজ্জন্য লিবারপুলে বা এডেনে যাইতে হইবে না। কিন্তু চট্টগ্রামে কয়লা পাওয়া যায় না। এখান হইতে পাট, কার্পাস. চা, কাঠ, বস্ত্রের সওদাগরেরা গ্রহণ করিলে এই দেশের অসুবিধাও দূর হইতে পারে।—ব্যবসা ও বাণিজ্য

কচুরি-পানার ছাউনী—

কচুরী-পানা শুকাইয়া তাহার দ্বারা ঘর ছাওয়া যায়। মার্চ্চমাসে ঢাকায় যে শিল্প-প্রদর্শনী বসিয়াছিল তাহাতে কচুরী বা টাগইয়ের ঘর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কচুরীর ছাউনি না কি একসঙ্গে জলকেও কলা দেখায় আর আগুনেরও তোয়াক্কা রাখে না। "পঞ্চায়েৎ" (ঢাকা) বলিতেছেন :—"দেশে বর্ত্তমানে যেরূপ ছনের অভাব এবং টিনের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে গরীব লোকের মাথা বাঁচাইবার উপায় হইতেছে—কচুরি-পানা।—ব্যবসা ও বাণিজ্য।

প্রচ্ছদ-পট

ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের নাম এখন অনেকে না জানিলেও, যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে পরলোকগত সেন মহাশয় উক্ত যুগের একজন যশস্বী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ ছিলেন। যে কয়েকটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বঙ্কিমচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ছিলেন, ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহাদের অন্যতম। সেন মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে বজ্জ কায়স্থ বংশে ১২৫২ শালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৪৫ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺লালমোহন সেন। লালমোহন সেন মহাশয় ঐ অঞ্চলের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার ছিলেন। রামদাসবাবু তিন বৎসর বয়সের সময় পিতৃহীন হন। ইনি প্রথমে বাড়ীতেই গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন; তাহার পর বহরমপুর কলেজে প্রবিষ্ট হন। বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধানের ভার

অল্প বয়সেই ইহাঁর উপর ন্যস্ত হওয়ায় ইনি কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অধ্যয়নের সময় হইতেই ইনি ইতিহাস আলোচনায় নিবিষ্ট হন এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইহাঁর জ্ঞান সঞ্চয়ের বাসনা বিশেষ বলবতী হয় এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহুবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ইনি নিজ গৃহে একটী প্রকাণ্ড পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুস্তকালয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য রামদাসবাবু কি বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। সে সময় বঙ্গদর্শনের আমল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে রামদাসবাবু উক্ত পত্রে ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত-রহস্য, রত্ন-রহস্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন এবং পরে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতীত কুসুমমালা, কবিতালহরী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করেন। ইহাঁর প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ইটালীর ফ্লরেন্স নগরের ওরিয়েন্টাল একাডেমি ইহাঁকে 'ডাক্তার' উপাধি ভূষিত করেন। সে সময় এ সম্মান-লাভ বড় সহজ ছিল না। ১২৯৪ শালের ৩রা ভাদ্র (১৮৮৭ খৃঃ ১৯শে আগষ্ট) ইহাঁর দেহান্তর হয়। আমরা এবার ভারতবর্ষের প্রচ্ছদপটে এই প্রথিতনামা ঐতিহাসিকের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিলাম এবং তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ," মূল্য ৩৲

ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্র ত "হোমিওপ্যাথী গৃহচিকিৎসক" মূল্য ২৷

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "বেলমতিয়া" মূল্য ২৷৵৹

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "দূরের আলো" মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'দাদার কথা'—"স্যার্ রাসবিহারী ঘোষের জীবন-কথা" মূল্য ২৲

শ্রীমতী পূর্ণশশী দাসী প্রণীত "মধুমিলন" মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত "রক্তের সম্বন্ধ" মূল্য ১৲

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহরায় প্রণীত নূতন নাটক 'সমাজ শাসন' মূল্য ১৲

ডাঃ আশুতোষ পাল প্রণীত "হিতকথা" মূল্য ৸৹

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রণীত "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা" মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত "রমলা" (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ১৸৹

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "নারীলিপি" (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ১৷৹

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয়ের নূতন উপন্যাস 'বিবি বউ' যন্ত্রস্থ; পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

যশোদা দুলাল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ,
মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত।

Bharatvarsha H lfton & Printing Works.

আশ্বিন, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

প্রার্থনা

পরশুরাম

ওহে অনন্ত বিশাল বিপুল নিখিলের অধিপতি,
বিশ্বে তোমার না পাই নাগাল মোরা অতি মূঢ়মতি।
মহাজগতের বিরাট ধান্দা ছেড়ে বারেকের তরে
অতি ছোট হয়ে ধরা দাও আজ মোদের ক্ষুদ্র ঘরে।
ভেবেছ এ ঘর বেশ ত সাজানো কিসের অসদ্‌ভাব,
হায় হায় প্রভু, বুঝিলে না এ যে ভাড়া করা আস্‌বাব।
অন্তর্যামী আঁতের খবর কিছুই জানিলে না কি ?
কোনো মতে ঠাট বজায় রেখেছি, ভিতরে সকলি ফাঁকি।
এই যে দেখিছ রোগা রোগা যত অমৃতের সন্তান,
দারুণ দৈন্য লজ্জার চাপে কণ্ঠে আগত প্রাণ।
কবে কোন্ যুগে খেয়েছিনু মোরা দুই চার ফোঁটা সুধা,
হজম হইয়া গেছে কোন্ কালে, পেয়েছে বিষম ক্ষুধা।
হাজার বছর সবুর করিয়া লভিয়াছি এই জ্ঞান—
নিজে হতে তুমি নাহি দিবে কভু ছাপ্পর-ফোঁড়া দান।
ওহে হৃদিস্থ হৃষীকেশ, তাই সকলে তোমার কাছে
জবরদস্তি করিব আদায় যা কিছু অভাব আছে।

দশ বিশ কোটি নাছোড়বান্দা মোরা ছাড়িব না কভু,
তুমি যে একলা পড়িয়াছ ধরা, কোথায় পালাবে প্রভু ?
ওঠো নারায়ণ, জাগো জাগো ওহে অচেতন শালগ্রাম,
এ নয় তোমার ক্ষীরোদ-সিন্ধু, এ যে গরীবের ধাম।
ওহে দামোদর দশ বিশ কোটি টানিছে তোমার রশি,
ওঠো নারায়ণ, আজি যে তোমার উত্থান-একাদশী।

অল্পে তুষ্ট দস্যু আমরা, বেশি কিছু নাহি চাই,
অর্দ্ধরাজ্য, রাজার কন্যা— এ সবেতে রুচি নাই।
ইন্দ্রের পদ, কুবেরের ধন, স্বর্গের ভোগ যত
মুক্তি মোক্ষ নির্ব্বাণ আদি তোলা থাক আপাতত।
দেশে দেশে যাহা দিয়েছ দেদার তাই দাও আমাদের—
একটি কেবল ছোট খাটো বর, তাতেই হইবে ঢের।

খোলো হে শীঘ্র খোলো হে তোমার শক্তির ভাণ্ডার,
দাও হে মাথায় হৃদয়ে শক্তি বাহুতে শক্তি আর।
কর হে কোমল কুসুমের মত, তাতে আপত্তি নাই,
দরকার হলে বজ্রের মত কঠোরতা যেন পাই।
তৃণের চেয়েও কর হে সুনীচ, তরুর চেয়েও ধীর,
শত্রুর কাছে উঁচু যেন হয় হিমালয়-সম শির।
যত খুশি দাও ক্ষমা অহিংসা অন্তরে মোর ভরি,
একটি কেবল মনের বাসনা বলে রাখি হে শ্রীহরি—
দুর্জ্জন অরি এক চড় যদি লাগায় আমারে কভু,
তিন চড় তারে কসাইয়া দিব, মাপ কর মোরে প্রভু !
একটি কাণের বদলে তাহার দিব দুই কাণ কাটি,
একটি দাঁতের বদলে তাহার উপাড়িব দুই পাটি।
ইষ্টানিষ্ট না ভাবিব কভু, শত্রু করিব টাইট—
ক্ষম অপরাধ ওহে গদাধর, আমি নরকের কীট।

এইটুকু বর লইয়া তোমায় আপাতত দিব ছুটি,
নিজ নিজ ঘর লব গোছাইয়া যত পারি মোটামুটি।
তার পরে যদি আসে হে সুদিন, আর যদি বেঁচে থাকি,
ভাল ভাল বর করিব আদায় যা কিছু রহিল বাকি—
মান-সম্ভ্রম, মোটা রোজগার, চারতলা পাকা বাড়ি,
লোক-লস্কর, রূপসী বণিতা, আট-সিলিণ্ডার গাড়ি।

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(২৪)

ময়মনসিংহ হইতে বিদায় হইয়া সৌরীন ঢাকা জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সেবাকার্য্য করিয়া বেড়াইল। তিন বৎসর এমনি করিয়া ঘুরিয়া সে এই সত্য নিবিড় ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিল যে প্রচুর অর্থবল না থাকিলে কেবল নিষ্ঠার দ্বারা বিশেষ কিছুই কাজ করিতে পারিবে না। অর্থের জন্য সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিল—যাহা পাইল সে কিছুই নয়।

নিদারুণ হতাশায় সে স্থির করিল—এ ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সে আর জীবন ক্ষয় করিবে না। অবশিষ্ট জীবন সে লেখা-পড়া করিয়া কাটাইবে। বিদ্যার অনুশীলনে জীবনে যেটুকু সার্থকতা লাভ করা যায় তাই সে করিবে।

তাই সে ঢাকায় ফিরিল। চেষ্টা করিয়া গোটা দুই প্রাইভেট টুইশন জোগাড় করিল।

এমনি করিয়া সে ছয়মাস কাটাইয়া দিল। তার জীবনের দারুণ নৈরাশ্য তাহার দেহ ও মনে এমন একটা অবসন্নতা আনিয়া দিয়াছিল যে, সে কেবল চুপচাপ করিয়া দিন কাটাইয়াই গেল। তার যে বৃহৎ চিন্তা ও কল্পনার শক্তি ছিল, তার চিত্তের যে অসীম সহানুভূতি ও পরদুঃখ-কাতরতা ছিল তাহা যেন হঠাৎ শীতে-জমিয়া-যাওয়া পার্ব্বত্য প্রস্রবণের মত নিষ্ক্রিয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া রহিল। সে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ও নিরুপদ্রব ভাবে তার প্রাইভেট টিউটার-জীবন কাটাইয়া চলিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি লইয়া সে সেখানকার লাইব্রেরীতে পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমে তার চিত্তের জড়তা কাটিয়া গেল, তার ভিতরকার চিরদিনের জ্ঞান-বুভুক্ষা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল। নানা বিষয়ের আলোচনায় সে তার প্রদীপ্ত কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

একদিন আমেরিকা হইতে প্রকাশিত একখানা ত্রৈ-মাসিক পত্র তার হাতে পড়িল। পত্রিকাখানি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক। তাহাতে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ ছিল—তাহা সে অনন্যমনা হইয়া পড়িয়া গেল। সে প্রবন্ধে লেখক সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ ও সমাজের অভ্যুদয়ে ব্যক্তির ও ব্যক্তির অভ্যুদয়ে সমাজের সহায়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি গোড়ায় ধরিয়া লইয়াছেন যে, সমাজের এমন কোনও অনুষ্ঠানই নাই, যাহা চিরদিন অচল আছে বা অচল থাকিবে। সমাজের ও ব্যক্তির অভ্যুদয় সাধনই সকল অনুষ্ঠানের একমাত্র প্রয়োজন, এবং সেই মানদণ্ডে পরিমাণ

করিয়া নিয়ত সামাজিক অনুষ্ঠানের সংস্কার বা পরিবর্জ্জন করাটাই সামাজিক স্বাস্থ্যের নিদর্শন। এই মূল সূত্র ধরিয়া তিনি অর্থ, ভূস্বামিত্ব, শ্রেণী-বিভাগ, শাসন-প্রণালী প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁর বক্তব্য এই, সমাজের প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর সর্ব্ববিধ শক্তি বৃদ্ধি, এবং সুনিয়ন্ত্রিত সংযোগ দ্বারা তাহাদের সমবেত শক্তি বৃদ্ধি। যাহাতে ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে সমাজের সর্ব্ববিধ শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ হয়, সেই ব্যবস্থাই একমাত্র অনুসরণীয়। যাহা সেই শক্তি সমবায়ের পক্ষে কম অনুকূল তাহা বর্জ্জনীয়।

এই প্রবন্ধে আমেরিকার সমাজ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছিল। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে সৌরীনের মনে হইল তার নিজের দেশের ও সমাজের কথা—মনে হইল আমরা কত দূরে কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি এই আদর্শ হইতে। আমাদের সমগ্র সমাজ-বন্ধন ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তির প্রতিকূল—শক্তি বৃদ্ধি নয়, শক্তি দমনই ইহার একমাত্র ফল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে তার কত কথা মনে হইল। কত দিক দিয়া সমাজের কত সংস্কার, কত অনুষ্ঠানের আমূল উৎপাটনের প্রয়োজন আছে; মানুষকে প্রথমে মানুষ করিবার জন্য একটা কত বড় বিপুল চেষ্টার প্রয়োজন আছে, সে কথা মনে হইল।

তার পর তার এতদিনকার লুপ্ত জীবন ও চিন্তার ধারা আবার তার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। কি অসীম স্পর্দ্ধার সহিত সে তার জীবন নিবেদন করিয়াছিল সমাজের এই সেবায়, সে কথা মনে হইল। সে যে কত বড় ঘা খাইয়াছে, কত দুঃখে সে পথ ছাড়িয়াছে সে কথা তার এখন মনে হইল—মনে হইল, সে ভীরুর মত তার কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

মনে পড়িল কত বড় স্পর্দ্ধা, কি বিপুল শক্তি ছিল তার সেই পরিত্যক্ত স্বপ্নের ভিতর। তার জোরে সে সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ করিয়াছে। আপনার শক্তিতে অসীম শ্রদ্ধা লইয়া সে কোনও বাধাই গ্রাহ্য করে নাই, কোনও ত্যাগই ত্যাগ বলিয়া মনে করে নাই। মস্ত বড় চাকরী পাইয়া ছাড়িয়া আসিয়াছে—রেখাকে ছাড়িয়াছে!

রেখা!—রেখাকে হারাইয়া সৌরীন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়াছে। আর—বঞ্চিত রেখার সারা জীবন সে ছারখার করিয়া দিয়াছে। সে এতটা করিয়াছিল তার যে শক্তির স্পর্দ্ধায়, রেখাকে হারাইয়াও যে সেবাধর্ম্মের উৎসাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল—সে স্পর্দ্ধা এখন কোথায়, সে সেবাধর্ম্ম সে অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছে। ব্যথিত রেখা ভগ্ন হৃদয় লইয়া চলিয়া গিয়াছে—তার পর সে আর দেশে ফিরে নাই, সে সংবাদ সৌরীন জানিত। না জানি কি নিদারুণ পরিণতি তার হইয়াছে—কেবল সৌরীনের এই মিথ্যা স্পর্দ্ধার ফলে! আর সৌরীন কি না আজ তার সেই স্পর্দ্ধিত ধর্ম্ম অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া লাইব্রেরীর বই পড়িতেছে। ভাবিতে তার হৃদয় জ্বালায় পুড়িয়া গেল! অনুশোচনায় তার অন্তর ভরিয়া গেল। সে বার বার আপনাকে বলিল, "কোনও অধিকার নাই তোমার জীবনে একটু আরাম পাইবার। রেখার জীবনে যে অভিশাপ দিয়া তাকে বিদায় করিয়াছ, সে অভিশাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তোমার সেই বড়-স্পর্দ্ধার সেবা-ধর্ম্মের অনুশীলনে জীবন ত্যাগ করিয়া।"

এক মুহূর্ত্তও আর সে স্থির হইতে পারিল না। তক্তপোষের উপর শুইয়া সে ভাবিতেছিল—তার সে সুখ-শয্যা তার গায়ে যেন কাঁটা বিঁধাইয়া দিল। সে উঠিল। অবিলম্বে গিয়া তার চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া ছুটিল। ঢাকা সহর ত্যাগ করিয়া সে গেল একটা ক্ষুদ্র দীন পল্লীতে—সেইখানে একখানা পরিত্যক্ত চালায় সে আশ্রয় লইল। স্থির করিল, এইখানে বসিয়া, ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, ইহাদের মঙ্গল-চেষ্টায় সে জীবন ক্ষয় করিবে।

এ গ্রামটি ছোট্ট—ইহার বাসিন্দা সকলেই ঋষি বা মুচি। প্রায় ত্রিশ ঘর লোকের বাস এ গ্রামে। চার-পাঁচ ঘর অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, তাদের ভাল ঘর-বাড়ী আছে, দুই একখানা জমিও আছে, তা ছাড়া তারা চটি জুতা তৈয়ার করিয়া মহাজনদের কাছে জলের দরে বেচিয়া কথঞ্চিৎ উপায় করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সবাই নিতান্ত হীন দরিদ্র। ইহাদের পুরুষেরা মরসুমের সময় সস্তা চটি জুতা তৈয়ার করে, পূজা পার্ব্বণে বাজনা বাজায়, আর অবশিষ্ট সময় ভিক্ষা করে। মেয়েরা সবাই ভিক্ষা করে—কেউ বা তার উপর বন-জঙ্গল হইতে শাক-পাতা কুড়াইয়া বেচিয়া দুই পয়সা রোজগার করে। ইহাদের যে ঘর তার ভিতর

কোনও মতে কায়-ক্লেশে মাথা গুঁজিয়া থাকা যায়—কিন্তু ঝড়জলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় না।

সৌরীন দেখিল, সেবার যদি কারও প্রয়োজন থাকে, তবে ইহাদের। ইহাদের সেবার জন্য কি প্রয়োজন, তাহা তাহার জানা ছিল,—তার অভাব ছিল সুধু সম্বলের। এ ছয় মাস প্রাইভেট টুইশন করিয়া তার হাতে প্রায় দুইশত টাকা জমিয়াছিল—সেই টাকা দিয়া সে কাজ আরম্ভ করিবে স্থির করিল।

গ্রামের ভিতর ঘুরিয়া সে সবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিল। তার পর সে ছেলেদের লইয়া পাঠশালা করিয়া বসিল। পরের দিন গিয়া সে কিছু টাকার চামড়া কিনিয়া আনিল; এবং নিজের সামনে বসাইয়া, কতকটা নিজে শিখাইয়া, সে অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোকদের দিয়া জুতা তৈয়ার করাইল। জুতা লইয়া সে নিজে ঢাকার বাজারে বেচিয়া কর্ম্মীদিগকে সমস্ত লাভের পয়সা দিয়া দিল। তারা অবাক্ হইয়া গেল। মহাজনের কাজ করিয়া তারা সারাদিনে বড় জোর তিন আনা পারিশ্রমিক পায়। সৌরীনের কাছে দুই দিনের পরিশ্রম করিয়া তারা পাইল প্রত্যেকে দেড় টাকা।

তখন সৌরীনের কাছে কাজ করিবার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। কিন্তু এতগুলি লোককে চামড়া হাতিয়ার প্রভৃতি জোগাইয়া কাজ করান তার পক্ষে সম্ভব হইল না। তাই সে যে কয়জনকে পারিল কাজে লাগাইল, বাকী লোককে আশা দিয়া রাখিল, ছয় মাসের মধ্যে সে তাহাদিগকে কাজে ভর্ত্তি করিয়া লইবে। সেজন্য সে লাভের টাকা হইতে কিছু কিছু টাকা কাটিয়া মজুত করিতে লাগিল, এবং ক্রমে কারখানা প্রসারিত করিতে লাগিল।

গ্রামের মেয়েদের জন্য সে একটা কাজ স্থির করিল, ধান ভানা ও ডাল ভাঙ্গা। সে কিছু ধান ও ছোলামটর কিনিয়া মজুত করিল; এবং বহু কষ্টে অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়া মেয়েদের সেই কাজ করিতে নিযুক্ত করিল। এ কাজ তত সহজ হইল না; কেন না, ভিক্ষা করিয়া করিয়া ইহাদের স্বভাব বিগড়াইয়া গিয়াছিল—খাটিয়া খাইতে ইহারা বড় নারাজ। দশ বাড়ী ঘুরিয়া তারা যতই ঝাঁটা-লাথি খাক, খাবারটা মোটের উপর সংগ্রহ করে। আর তার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘোরা ছাড়া অন্য পরিশ্রম তাদের করিতে হয় না। তাই তারা কাজে পরাঙ্মুখ। তবু অনেক ধরিয়া পাড়িয়া সৌরীন তাদের দিয়া কাজ করাইতে লাগিল—কিন্তু এ কাজে সে বেশী লাভ পাইল না।

তবু জুতার কাজে এমন প্রচুর লাভ হইতে লাগিল যে, ছয় মাসের মধ্যে গ্রামের চেহারা ফিরিয়া গেল। তখন সৌরীন ইহাদিগকে চামড়া পাকাইবার বিলাতী প্রণালী (Chrome tanning) শিখাইবার উদ্যোগ করিয়া লইল। তার পাঠশালার তিন চারিটি ছাত্রকে সে এ কাজ শিখাইল। ভেড়ার চামড়া পাকাইয়া তারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল।

সৌরীনের কার্য্যের এই সফলতায় মহাজনের দল চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ গ্রামের কারিগরদের মহাজনেরা ছিল জুতার কারবারী। তাহারা ইহাদের দিয়া সস্তা বাজে চটীজুতা জলের দরে তৈয়ারী করাইয়া লইত। সেজন্য তারা টাকা অগ্রিম দিত। কথা থাকিত এই যে, ক্রমে ক্রমে কাজ করিয়া মুচিরা টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু কাজের পারি-শ্রমিক তারা এত কম পায় যে, তাতে উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়া আর তাদের ধার শোধ করিবার উপায় থাকে না। তাই মহাজনের দেনা যেমন তেমনি থাকে—তারা কেবল খাটিয়া খাটিয়া বড় জোর সুদ পরিশোধ করে। ইহাতে মহাজনদের তাদের উপর আধিপত্যের অন্ত নাই—তারা জলের দরে মাল নেয় এবং লাভ করে।

সৌরীনের কাছে সব কারিগর কাজ করিতে আসিলে এই মহাজনদের সমূহ ক্ষতি। তাই তারা কারিগরদের উপর ধমকাধমকি ও নানারকম অত্যাচার করিতে লাগিল। যে দেনা পরিশোধের জন্য তারা কোনও দিন কোনও চেষ্টা করে নাই এবং যার কোনও হিসাব কিতাব এ গরীব মূর্খ খাতকের কাছে ছিল না, সেই দেনা পরিশোধের জন্য তারা জোর তাগাদা লাগাইতে লাগিল; এবং আইন-আদালতের কোনও উপদ্রব না করিয়া, নিজের ইচ্ছামত যার কাছে যাহা পাইল, ঋণের ওজুহাতে কাড়িয়া লইতে লাগিল।

সৌরীনের এইবার কারখানা ফেলিয়া এই লোকগুলির সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করিতে হইল। সে ইহাদের পক্ষে আদালতে কয়েকটা নালিশ করাইল, এবং তার তদ্বির করিতে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল। মহাজনেরা তাহাকে

খুন করিবার ভয় দেখাইল, সে পুলিশে এতেলা দিয়া দুই চার নম্বর ফৌজদারী মামলা করিল। তাহাতে মহাজনেরা কতকটা কাবু হইয়া তাহাকে ঘাঁটান ছাড়িয়া দিল।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে সৌরীন কাজ করিতে লাগিল। নিজে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে থাকিয়া সে ইহাদের পেটে অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিল। আর দিন রাত সে আপনাকে ইহাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিল।

তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সৌরীন যখন তার কাজকর্ম্ম প্রায় অনেকটা গুছাইয়া আনিয়াছে এবং গ্রামের লোকের ভিতর কয়েকটি কাজের লোক গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই সময় সে ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। গ্রামবাসিগণ তাহাকে হাঁসপাতালে পৌঁছাইয়া আসিল।

(২৫)

দীর্ঘকাল কষ্ট সহিয়া সৌরীনের শরীর একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, জীবনী-শক্তি একেবারে নিভিবার মত হইয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল সে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে হাঁসপাতালে পড়িয়া রহিল। তাহার সৌভাগ্যক্রমে তার ব্যাধি ছিল উৎকট এবং সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। একটা নূতন এবং বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক রোগী বলিয়া হাঁসপাতালের একাধিক চিকিৎসক বিশেষ যত্ন ও একাগ্রতার সহিত তার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ছয়মাস চিকিৎসার পর সে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ সাব্যস্ত হইল, কিন্তু তখনও তার উঠিয়া যাইবার শক্তি ছিল না বলিয়া তাহাকে হাঁসপাতালেই রাখা হইল।

ডাক্তারেরা তাহাকে পড়িবার জন্য বই ও সংবাদপত্র দিতেন; সৌরীন শুইয়া শুইয়া তাই পড়িত। এক দিন পড়িতে পড়িতে সে ময়মনসিংহ সৌরীন্দ্র আশ্রমের বার্ষিক সভার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িল। যাহা পড়িল, তাহাতে ব্যাপারটা সম্যক বুঝা গেল না; কিন্তু ইহা যে একটা লোকসেবার অনুষ্ঠান এবং ইহার প্রধান কার্য্য যে গ্রামের শ্রমজীবীদের দ্বারা কুটীর-শিল্পের সমৃদ্ধি-সাধন, তাহা সে বুঝিতে পারিল। ইহার নামটাই তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিল। "সৌরীন্দ্র আশ্রম!" সে তো তার নিজের আশ্রম বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তার পর কি তার কোনও শিষ্য তার নামে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কাজ করিতেছে? সে নানা কথা ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে তার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ও সার্থকতার ভাব জাগিয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যখন সৌরীন হাঁসপাতাল হইতে ছুটি পাইল, সে তখন তার কর্ম্মস্থানে না ফিরিয়া একেবারে ময়মনসিংহে গিয়া উপস্থিত হইল। এই সৌরীন্দ্র-আশ্রম দেখিবার উৎসাহে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

পথে রেলে ময়মনসিংহবাসী একটি লোকের কাছে সৌরীন্দ্র আশ্রমের সম্বন্ধে সে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাইল। এ আশ্রম কে প্রতিষ্ঠা করিল, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সদুত্তর সে পাইল না। কিন্তু আশ্রমের প্রধান কর্ম্মীদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কয়েকটি পুরুষ কর্ম্মীর নাম শুনিল; আরও শুনিল, ময়মনসিংহ বালিকা-বিদ্যালয়ের কয়েকটি শিক্ষয়িত্রীও ইহার মধ্যে আছেন। সৌরীন্দ্র-আশ্রম নাম কেন হইল, তাহাও সে লোকটি বলিতে পারিল না। এই লোকটির কাছে সৌরীন আশ্রমের আফিসের ঠিকানা জানিয়া, সোজা সেখানে উপস্থিত হইল।

আফিসে প্রবেশ করিয়া সে একজন কর্ম্মীর কাছে অনুরোধ করিয়া আশ্রমের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী সংগ্রহ করিল। তার ভিতর দেখিতে পাইল এ আশ্রমের ইতিহাস, —দেখিল, তার নিজের কীর্ত্তির কথা বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। আর দেখিল, এ আশ্রম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় একজনের উদ্যোগে ও অর্থে—সে রেখা সান্ন্যাল। এবং রেখাই ইহার প্রধান কর্ম্মী।

আনন্দে সৌরীন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। রেখা—তার রেখা আসিয়া তার জীবনের সব নিষ্ফলতা ধুইয়া ফেলিয়া তার কার্য্য এমন গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে! এ "সৌরীন্দ্র আশ্রম" রেখার অলোকসামান্য প্রেমের মূর্ত্তি—তার লোকাতীত প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষমতার পরিচয়! সৌরীনের মনে হইল, এই রেখাকেই সে তার সেবা-কার্য্যের অন্তরায় বলিয়া—একটা বোঝা বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল! দর্পহারী ভগবান তার সে বিপুল স্পর্দ্ধার কি মনোরম শাস্তি দিয়াছেন! সে তার স্পর্দ্ধা ও শক্তি লইয়া যে কাজে পাইয়াছিল সুধু নিষ্ফলতা ও লাঞ্ছনা, রেখা তার প্রেম, নিষ্ঠা ও পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তির দ্বারা সেখানে লাভ করিয়াছে অশেষ গৌরব, অসামান্য সফলতা। এ যেন সৌরীনের স্পর্দ্ধার মুখে খাড়া চাবুক! কিন্তু কি মিষ্টি এ চাবুক—কি

সুমধুর করুণাময় এ শাস্তি! এ শাস্তি পাইয়া ও ইহার স্বরূপ অনুভব করিয়া সৌরীনের হৃদয় অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও পুলকে ভরিয়া গেল। অনেকক্ষণ সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদ ভাবে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। চিরদিনকার তার প্রেমসাগর তার অন্তরের ভিতর উদ্বেলিত হইয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল;—রেখার গৌরব, রেখার মাধুর্য্য, রেখার প্রেম সে তন্ময় হইয়া ধ্যান করিতে লাগিল।

তার বড় ইচ্ছা হইল, রেখার সঙ্গে সে দেখা করিবে। কিন্তু ভয়ানক সঙ্কোচ আসিয়া তার হাত-পা চাপিয়া ধরিল। সে তার দীন বেশের দিকে চাহিল,—স্মরণ করিল যে, সে এখন রেখাকে লাভ করিবার যোগ্য নয়; কোনও দিনই হয় তো ছিল না—আজ ত মোটেই নয়। এক দিন মোহে অন্ধ হইয়া সে আপনাকে রেখার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া রেখাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও করিয়াছিল! কিন্তু আজ তার সে স্পর্দ্ধা একেবারে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে,—সে আজ বুঝিয়াছে রেখা দেবী, রেখা মহীয়সী—তার পদনখের যোগ্য সে নয়। তাই তার কাছে যাইতে তার সাহস হইল না। তবু তাকে একবার দেখিবার —তার পায়ে একবার লুটাইয়া পড়িয়া তার পূজা নিবেদন করিবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার হইল। যে সৌরীনকে রেখা ভালবাসিয়াছিল সে নাই—আছে এক দীন ভিখারী —অকর্ম্মণ্য নিস্ফলতামণ্ডিত এক দরিদ্র, নিঃসম্বল, আশাহীন, উৎসাহহীন সামান্য ব্যক্তি। রেখা কি তাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে,—চিনিতে পারিলেও কি তার দিকে ফিরিয়া চাহিবে, কথা কহিবে?

অনেকক্ষণ দ্বিধার পর সৌরীন রেখার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা স্থির করিল। আফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানিল রেখার সঙ্গে সাক্ষাতে কারও বাধা নাই,—উপরে তার বসিবার ঘরে সকলের অবারিত-দ্বার—বিশেষতঃ দীন দরিদ্রের।

সে উঠিয়া গেল। দ্বারের সামনে আসিয়া দ্বিধায় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল "আমি আস্‌তে পারি?"

যখন রেখা ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তখন সৌরীনের চিত্ত দারুণ আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। রেখা এখন তাকে দেখিয়া ঘৃণা করিবে কি? অবহেলার সঙ্গে তাকে দুয়ার হইতে ফিরাইয়া দিবে;—ভক্ত সেবক দেবীর পদপ্রান্তে আসিয়াও কি পূজা নিবেদন করিতে পারিবে না?

হৃদয়ের সমুদায় শক্তি সংহত করিয়া সৌরীন সুধু একবার ডাকিল "রেখা।"

এক মুহূর্ত্তমাত্র রেখা সংশয়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রথম ডাক শুনিয়াই সে সৌরীনের কণ্ঠ বলিয়া চিনিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল;—কিন্তু এ মূর্ত্তি দেখিয়া সংশয়-স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ ডাকের পর আর সংশয় রহিল না।

উত্তেজিত কণ্ঠে রেখা বলিল, "এসেছ! তুমি এসেছ!"

সে ছুটিয়া সৌরীনের কাছে অগ্রসর হইয়া তার পদপ্রান্তে অচেতন হইয়া পড়িল।

* * * *

রাত্রে রেখার জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তাকে বিছানায় শোয়াইয়া সৌরীন তার শুশ্রূষা করিতেছিল। ডাক্তার পাশের ঘরে বসিয়া ছিলেন।

জানালা দিয়া শারদ-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রেখার পাণ্ডুর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

রেখা চক্ষু মেলিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিল। সৌরীন তার মুখের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল।

রেখা ধীরে ধীরে হাত তুলিয়া সৌরীনের একখানা হাত লইয়া বুকের উপর রাখিল। অনেকক্ষণ সে চক্ষু বুজিয়া হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া রহিল, ক্রমে তার দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল।

সৌরীনের চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। সে পরম স্নেহে তার দুই চক্ষু মুছাইয়া বলিল, "কেঁদ না রেখা, লক্ষ্মী আমার, আমাকে ক্ষমা কর।"

রেখা বলিল, "বল তুমি আর যাবে না?"

সৌরীন বলিল, "কোথায় যাব রেখা? অনেক বিপথে ঘুরে পথভ্রান্ত পথিক তার শাশ্বত আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। কোথায় যাব?"

"দেখ, আমি বাঁচবো তো? আমার বড় বাঁচবার সাধ হ'চ্ছে এখন।"

"কোনও চিন্তা নেই রেখা। তোমার কিছুই হয় নি, হয়েছে সুধু অবসাদ। তুমি কালই সেরে উঠবে।"

রেখা সৌরীনের হাতখান আরও চাপিয়া বুকের ভিতর ধরিয়া সুধু বলিল "আঃ!"

তার পর চাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। না? ঠিক চকোর-চকোরীর মিলনের দিন।"

সৌরীন বলিল, "তফাৎ এই যে, এ মিলন আমাদের আর ভাঙ্গবে না। আজ আরম্ভ হ'ল আমার জীবনের চিরপূর্ণিমা, তুমি তার ক্ষয়হীন পূর্ণচন্দ্র—রেখা!"

সৌরীন রেখাকে চুম্বন করিল, অপূর্ব্ব সার্থকতার আনন্দে রেখার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সৌরীনের মাথাটা বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল।

* * *

নিত্যরঞ্জন সেই দিন সন্ধ্যায়ই ময়মনসিংহ ছাড়িয়া গেল।

সমাপ্ত

উড়ো চিঠি

শ্রীঅনুরূপা দেবী

১

অমিয়াবালা রায় ইন্দ্রনাথ রায়ের বড় মেয়ে—এবৎসর আই-এ পরীক্ষায় ইউনিভারসিটির মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করায় ছাত্রমহলে বেশ একটুখানি আন্দোলন চলিতেছিল। মেয়েটী কোন স্কুলের ছাত্রী নয়, প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া দুই দুই বারই শত সহস্র ছাত্রদলকে পরাভব করিতে পারিয়াছে,—এজন্য কেহ কেহ তাহার বাহাদুরীকে তারিফ দিতেছিল, আবার অনেক অপমানিত-চিত্ত এই বলিয়া আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করিয়া মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছিল যে, প্রাইভেট পড়ান হইলে তাহারাও অমন সাতবার করিয়া ফার্ষ্ট হইতে পারিত। স্কুলে কলেজে কি আর ভাল করিয়া পড়ান হয়? আর মেয়েরা যখন বিদ্যা শিক্ষা করে, তখন তাহারা পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ককে ঘুচাইয়া ফেলে; ছেলেদের বেলায় তো আর সেটী হয় না! মায়ের 'সেড' মিলাইয়া উল কেনা, বাবার টেবিল ঝাড়িয়া রাখা, ছোট ভাইয়ের পেন্‌সিল কাটিয়া দেওয়া, এমনধারা কত কাজই তাদের ঘাড়ে পড়ে। মেয়েদের কেহ কিছু বলুক দেখি, অমনি তারা ফোঁস করিয়া উঠিবে, কারণ তারা নতুন কিছু করিবে, পাশ দিবে—ছেলেদের মতন তো আর মেয়েদের পাশ দেওয়াটা পুরাতন হইয়া যায় নাই!

কিন্তু আসলে অমিয়ার পড়া-শোনা অত নির্ব্বিবাদে ঘটিতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথ রায় পূর্ব্ববঙ্গের লোক। পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা পশ্চিম-বঙ্গীয়দিগের অপেক্ষা অনেকখানি বেশি আধুনিক হইলেও ইন্দ্রনাথের মধ্যে একালত্বের গণ্ডী খুব বেশি শিথিল ছিল না। মেয়েরা গায়ে সেমিজ ব্লাউস পরিবে, কতকটা লেখা পড়া শিখিবে, আর হাড় ভাঙ্গিয়া ঘর-সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্মই করিবে, এই রকমই তাঁর মতটা ছিল। লেখা পড়া যেটা শিখিবে, সেটার সবটুকু সুযোগই কিন্তু তার সংসারকে দেওয়া চাই। অর্থাৎ বাজারের, দুধের ও ধোপার হিসাবের জন্য অঙ্ক শেখা, ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট মাষ্টারের পয়সা বাঁচানোর জন্য পড়াশুনা। বই বা খবরের কাগজ বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকা বুকে তুলিয়া চার-চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া থাকা তাঁর দুটী চক্ষের বিষ! স্ত্রী উমাশশীকে এজন্য অনেকবারই তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। অবশেষে বাংলা সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতির প্রবেশ নিষেধ করিয়া প্রকাশ্য কলহটা বন্ধ হইয়াছে, তবে প্রাতিবেশীর ঘর হইতে গোপনে গোপনে ওসব জিনিষের আমদানী একেবারেই ছিল না তা অবশ্য বলা যায় না।—তবে কথা এই যে, চোরাই মাল লোকে চুরি করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে।

মেয়ে যখন বড় হইতে লাগিল, মায়ের কাছেই তার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। যোগ-বিয়োগ গুণ শিখিয়া মেয়ে ভাগ শিখিতে চাহিলে মা বলিলেন "ভাগ শিখে কি করবি?

ও কোন কাজে লাগে না, আমি জানতুম ভুলে গেছি। তার চেয়ে এইবার সেলাই শেখ যে টেঁপি, মিন্টু, খুকি এদের ছেঁড়া-খোঁড়াগুলো জুড়ে-তেড়ে দিবি, ফ্রকগুলো সেমিজ-গুলো করতে পারবি—আমার একটু উপকার হবে।"

অমিয়া বলিল—"তা আমি শিখ্ছি, কিন্তু অঙ্ক আমায় আরও শেখাতে হবে। আমার বড় ভাল লাগে।"

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"অঙ্ক ভাল লাগে! বলিস কি রে! ভালা পড়া-পাগলা মেয়ে তুই!"

কর্ত্তাকে বলিলেন—"অমাই আরও বেশি পড়তে চায়, ওকে ইস্কুলে দাও না।"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ইস্কুল! ইস্কুলে দিলে মেয়েটার কাঁচা মাথাটা যে কামড়িয়ে খাওয়া হয়ে যাবে, তার কি? ইস্কুলে দিয়েছ কি মেয়েটা গ্যাছে!"

উমাশশী কহিলেন—"কেন গা! এই যে রাজ্যি-শুদ্ধ লোকের মেয়ে ইস্কুলে যাচ্চে, এরা সবাই কি বিগড়ে গ্যাছে? না তোমারই মেয়ে এত মন্দ যে সে ইস্কুলে গেলে অম্নি খারাপ হয়ে যাবে!"

ইন্দ্রনাথ রায় পৃথিবীতে যে সকল বিষয়কে অসহ্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তাহার ভিতর প্রধানতম অসহনীয় ব্যাপার মেয়েমানুষের মুখের তর্ক। তিনি ঈষৎ বিরক্তির স্বরে উত্তর করিলেন—"তার্কিক তো খুব হয়ে পড়েছ দেখছি! ওসব মেয়ে যে বেগ্ড়াবে না, নিজেদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করে স্ফূর্ত্তির জীবনকে আদর্শ করবে না, সাফ্রিগেট হবে না—তার কিছু গ্যারান্টি পেয়েছ বলতে পার?"

বাস্তবিকই তো আর উমাশশী সে বিষয়ে কোন গ্যারান্টি পান নাই, কাজেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

কিন্তু যেটা ঘটিয়া উঠিবার সেটা যেমন করিয়াই হউক কোথা দিয়া না কোথা দিয়া ঘটিয়া উঠে।

ইন্দ্রনাথ ঘোড়া হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিলেন ও সেই পায়ের খাতিরে পুরা ছয় মাসের ছুটী লইতে হইল। দিন রাত বিছানায় পড়িয়া সবারই সঙ্গে খিটিমিটি করিতে করিতে যখন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, সেই সময় এক দিন অমিয়া বুকে সাহস বাঁধিয়া একখানা স্লেট হাতে তাঁর সামনে বসিয়া পড়িয়া মিনতিভরা চোখে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"বাবা! আমায় একটু অঙ্ক শেখাবেন?"

ইন্দ্রনাথ এই প্রশ্নে প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন—"অঙ্ক শিখে কি করবি? তোদের মাথায় কি অঙ্ক ঢোকে যে অঙ্ক শিখবি!"

অমিয়া সবিনয়ে প্রশ্ন করিল—"কেন ঢোকে না বাবা? আমরা কি?"

ইন্দ্রনাথ গম্ভীর ঔদাস্যে উত্তর দিলেন—"তোরা যে মেয়ে মানুষ রে! মেয়ে মানুষদের যে ব্রেণ নেই!"

অমিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল—"একেবারেই নেই? কারুরই থাকে না? তবে যে কোন কোন মেয়ে বি-এ, এম-এ পাশ করেচে? তাদের?"

ইন্দ্রনাথ আরও গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন—"তারা হচ্চে মেয়েমানুষের ব্যতিক্রম! সে আর ক'জন? নে' আচ্ছা আয় দেখি—কি অঙ্ক শিখতে চাস্?"

মেয়েকে অঙ্ক কষাইতে বসিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, মেয়ে-জাতির মস্তিষ্ক যতই স্বতশূন্য হউক না কেন, বুদ্ধি বড় মন্দও নাই; অনায়াসেই তাহাকে অঙ্কটা শেখান গেল। নিজের মতের বিরুদ্ধ প্রমাণে মন কাহারও খুব খুসী হয় ত হয় না, ইন্দ্রনাথেরও হইল না, তথাপি একটু কৌতুহল জাগ্রত হইল। মেয়েকে বলিয়া দিলেন, "রোজ এই সময়ে আসিস—অঙ্ক শেখাবো।"

এম্নি করিয়া পা ভাঙ্গার শনি ঘাড়ে চাপিয়া অমিয়ার অঙ্ক শিক্ষা, তার সঙ্গে ইংরাজীটাও খানিকদুর অগ্রসর হইয়া গেল এবং মেয়ের বুদ্ধির ধার দেখিয়া বাবার ভোঁতা তর্ক পরাভব স্বীকার করিল। পায়ের বেদনা সারিয়া গিয়া চাকরীতে যোগ দিলেও ইন্দ্রনাথ আর অমিয়ার পড়ার ভার একেবারেই ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিতে পারিলেন না, অবসর কালটুকুকে সে এমন করিয়া গণ্ডী দিয়া লইল, যে, ইচ্ছা না থাকিলেও সেটুকুকে আর কোন কাজে লাগাইয়া ফেলিবার যেন কোনই উপায় রহিল না।

এম্নি করিয়া নিজের প্রবল চেষ্টায় ও বাপের অল্প সাহায্যে সে পরীক্ষা দিয়া পাশও করিল এবং সকলকে বিস্মিত করিয়া সোনার মেডেল ও স্কলারশিপও আয়ত্ত করিল।

তা বলিয়া ঘর-সংসারের কাজের বোঝা ও ভাই-বোনদের মাষ্টারী করার হাত হইতে সে এক দিনের জন্যও নিষ্কৃতি পায় নাই। ইন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া উহাকে দিয়াই

নিজের কাজগুলি করাইয়া লইতেন এবং সর্ব্বদা খবর রাখিতেন যে রান্না, বাটনাবাটা, শেলাই—এ সকল সে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে কি না; অবসর মত নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে তিনি ত্রুটী করিতেন না।

২

পাশের বাড়ীতে যোগীন মল্লিক সপরিবারে বাস করিত। যোগীন এক সময় বড়-লোকের ছেলে ছিল, সেই ওজুহাতে সে লেখাপড়া বিশেষ শেখে নাই, কাজকর্ম্ম কিছুই করে না; পরন্তু ধনী-সন্তানরূপে মর্ত্তভূমিতে আগত হওয়ার দাবীতে ভাল খাওয়া পরা থাকা এবং ইচ্ছামত মদ্যপানের সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্যের অধিকারটাকে সে সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার করিয়া থাকে এবং নিজের সেই স্বত্ব সকলের উপরেই সাব্যস্ত করিতে চায়। এই লইয়া তাদের পারিবারিক অশান্তির আর সীমা ছিল না। ভাইয়ে ভাইয়ে সর্ব্বদা কলহ চলিতেছিল। মা কখন এ-ছেলের সপক্ষে, কখনও ও-ছেলের বিপক্ষে দুর্ব্বল যুক্তি দেখাইতে গিয়া লাঞ্ছিত ও এমন কি প্রহৃতও হইতেন। আর সব চেয়ে দুঃখ ছিল সেই যোগীন মল্লিকের সুন্দরী ও তরুণী পত্নীর। মেয়েটী কোন ভাল ঘরেরই মেয়ে। দেখিতে ফুটফুটে—যেন ছবিখানি! যৌবনের জোয়ারে সর্ব্বদেহ তার ভরা নদীর মতন যেন টলটল করিতেছে। মনে সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা সকলই সেই সঙ্গে ভরপুর। কিন্তু কপালটাই শুধু শূন্য! স্বামী-রত্নটী কখনও মাথায় তুলিয়া নাচিতেছেন, আবার কখনও পা দিয়া মড় মড় করিয়া মাড়াইয়া ভাঙ্গিতেছেন! সোহাগ এবং নির্য্যাতন যেন একত্র হাত-ধরাধরি করিয়া তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছে। এই দেখ—শৈলবালা এলো খোঁপায় মল্লিকা ফুলের মালা জড়াইয়া শ্যাওলা রংয়ের সাড়ী পরিয়া স্বামীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে; তখনি শোন—কানের ইয়ারিং দুটী কান হইতে খুলিয়া দিতে বিশেষ আপত্তি করার দোষে পতিদেবতা তাহাকে নির্দ্দয় হস্তে প্রহার করিতেছেন ও সেও করুণ চীৎকারে প্রতিবেশী-দের অস্থির করিয়া তুলিতেছে। স্বামী যখন স্ত্রীকে প্রহার করে, সে সময়ে বাধা দিবার কোন অধিকারই তো আর অন্য প্রতিবেশীদিগের নাই। বরং জোর করিয়া বাড়ী ঢুকিতে গেলে ট্রেস্‌পাসের নালিশ চলে। কাজেই পাঁঠা-বলি দেখার মত করিয়াই তাঁদের উহা সহ্য করিতে হয় এবং কালে ক্রমশঃ সহিয়াও আইসে।

অমিয়া মাকে বলিয়া বলিয়া কোন উপায় করিতে পারে নাই; সেদিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া বাপকে গিয়া বলিল—"রোজ রোজ মেয়েমানুষকে ওম্‌নি করে মারবে, আর আপনারা কোন কিছুই আপত্তি করবেন না?"

ইন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—"ওর বউকে ও মারবে,—তোমার মা-মাসীকে ত আর মারতে আসেনি, যে, আমি তার বাড়ী চড়াও হয়ে আপত্তি করতে যাব? আর করলেই বা সে শুনবে কেন?"

"তার স্ত্রী বলে সে কি মানুষ নয়! বিপন্নকে রক্ষা করা তো সকল মানুষেরই কর্ত্তব্য।"

পিতা কহিলেন—"ও তো নিজেকে তত বিপন্ন বোধ করচে না, তুমি যত তাকে বিপন্ন বোধ করচো? মার তো সর্ব্বদাই খায়,—প্রতিকারের কোন্ চেষ্টা কবে করেছে?"

অমিয়া বাপের এই কড়া যুক্তিতে একটু থতমত খাইয়া গেল,—ভাবিয়া দেখিল, কথাটা খুব হাল্কাও নয়। বাস্তবিকই তো সে কই কোন দিন তার এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাও করে নাই! আবার সময় সময় দুজনে বেশ হাসিখুসী করিতেও দেখা গিয়া থাকে!

এমন কি করিয়া হয়? এই নির্য্যাতন অপমান সহিয়া আবার সেই স্বামীরই সহিত হাসিতে, কথা কহিতে, ঘর করিতে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়? সে যেন এ কথাটা ধারণা করিয়াই উঠিতে পারিল না। তার পর তার যেটা মনে পড়িল, সেইটাই সে বলিয়া ফেলিল—"কিন্তু মার খেতে খেতে যদি ও মরে যায়? তাতে আমাদেরও তো পাপ হয়?"

ইন্দ্রনাথ রাগ করিয়া বলিলেন—"তাই বা কেন হতে গেল? ওর স্বামীর ওকে মারবার, কাটবার, সব করবার অধিকার আছে। ওর ঘরে ওর স্ত্রীকে ও মারবে, আমি আইনতঃ ওর বাড়ী গিয়ে তাতে বাধা দিতে পারি নে,—এর জন্য আমার পাপ হবে? আর তাই যদি হয় তো তাতে আর কি করচি বল? মাঝে থেকে তুমি ওর মাথায় যেন তোমার ও-সব কুতর্ক ঢোকাতে যেও না। সংসারে এই রকমই হয়ে থাকে, স্বামী খেতেও দেয়, আবার মারেও দু'ঘা,—স্ত্রীরা চিরদিন এসব সহ্যও করে যায়, এ কিছুই

বিচিত্র নয়। এই সব আদর্শ ছিল বলেই দেশটা ঠাণ্ডা ছিল। এখন এই তোমাদের মতন তার্কিক মেয়ে সব জন্মে, দেশের আদর্শটা নষ্ট করে ফেলচে। এই জন্তেই বেশি লেখাপড়া শেখাতে চাই নি। এখন যাও দেখি, এক গ্লাস খাবার জল আর গোটাকত পান সেজে নিয়ে এস। আমার কাজ আছে—তোমার সঙ্গে বাজে কথা নিয়ে তর্ক করবার সময় নেই।"

অমিয়া বাপের হুকুম পালন করিতে চলিয়া গেল, কিন্তু তার মনের ভিতরটা বিদ্রোহী হইয়া রহিল। এর নাম আদর্শ স্ত্রীত্ব? মাতাল স্বামী মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিলেও পাড়া-প্রতিবেশীর বাধা দিবার অধিকার নাই; এবং স্ত্রীরও এমন ক্ষমতা নাই যে, এই অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচে? দাসত্ব-প্রথা আর এর চেয়ে বেশি কি কঠোর ছিল? আইনে মাতাল কুচরিত্রদের বিবাহ বন্ধ করে না কেন? বাপ-মায়েরা মেয়ে দেওয়ার সময় এই দিকটাকেই বা প্রধান ভাবে দেখে না কেন? মেয়েরাই বা প্রথমাবধি মাতাল স্বামীর ঘর করিতে আপত্তি করে না কি জন্য? যদি তারা স্বামীদের চরিত্র জানিতে পারামাত্রেই তাহাদের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে পুরুষানুক্রমিক কুরোগের অত্যাচারের ও পাপের বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাসই হইতে থাকে। পাঁচটী সন্তান লইয়া জড়িত হইয়া পড়ার পর যখন ঐ অত্যাচারী ও মাতাল স্বামী তাহাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়া দিয়া হয় মরে, না হয় পলায়, আর না হয় ত জেল খাটিতে যায়, তখন দুর্দ্দশা যা' হইবার সে ত হইয়াই থাকে! তবে আগে হইতে সাবধান হইলে সেটা অমন করিয়া চরমে গিয়া পৌঁছায় না।

অবশ্য এর জন্য মেয়েদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন করার চেষ্টা মা-বাপেদেরও করা চাই। পশু-প্রকৃতির স্বামীর বাসনানলে ইন্ধন হওয়ার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যার দৃঢ় বিশ্বাস মনের মধ্যে আছে, তাহাকে তাহার বাহিরে লইয়া যাইতে চাহিলেও সে তাহা চাহিবে না। কারণ সে জানে যে 'পতি পরম গুরু।' গরুর মতন ব্যবহার পাইলেও তার গুরুত্বের অপহ্নব হয় না।

অমিয়া এক দিন তার মাকে গিয়া চুপিচুপি বলিল, "মা, আমার বিয়ে দিও না।"

উমাশশী ছোট খুকির জন্য আলুই পাকাইতেছিলেন,—চমকিয়া মুখ তুলিয়া মেয়ের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিলেন। আনমনে কি একটা আন্দাজ করিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিচাপা সুরে জবাব দিলেন—"বিয়ে ত দিতেই হবে মা, বড়টী তো হয়েছ। ভাল তেমন পাচ্চি না ত, পেলেই দোব।"

মায়ের কথার উদ্দেশ্য বুঝিয়া মেয়ে ঘোর রক্তবর্ণ মুখে —"ধেৎ, আমি তাই বল্‌ছি বুঝি?" বলিয়া সবেগে বাধা দিল। তার পর পুনশ্চ শুষ্ককণ্ঠে মিনতি ভরিয়া কহিল—"সত্যি করে তোমায় বলছি মা, বিয়ে আমার তুমি দিও না, বিয়ে হলে আমি সুখী হ'তে পারবো না। যদি ঐ ওদের বাড়ীর ছেলেদের মতন হয়, তাহলে তক্ষনি আমি মরে যাব।" বলিতে বলিতে সে যেন সেই সম্ভাবনার ভয়েই সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল "লক্ষীটী মা! পায়ে পড়ি, আমার বিয়ে দিও না—"

উমাশশী মেয়ের গভীর মানসোদ্বেগ লক্ষ্য না করিয়াই মৃদু হাসিয়া সান্ত্বনার সহিত সস্নেহে কহিলেন —"ওদের বাড়ীর ছেলেদের মতনই বা হবে কেন? ওরকম সংসারে ক'জনই বা আছে। আর আমরা দেখে-শুনে দোব, ভালই হবে। মিথ্যে ওসব খারাপ ভাবনা ভাবতে নেই।"

মায়ের মুখের এই স্নেহ-সান্ত্বনায় অমিয়ার মনের ভিতরকার জমাট আতঙ্ক একটুখানি যেন সরল হইয়া আসিলেও তাহা একেবারে বিদূরিত হইল না। বয়স বাড়িতেছে, বিবাহের কথা-বার্ত্তা চলিতেছে। সময় যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, তার মনের ভিতর ততই প্রবলবেগে একটা ভীষণ ঝটিকা বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিবাহের কথা মনে করিতে গেলেই, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ঐ ছবিখানিই চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। সুন্দর টুকটুকে পাতাকাটা রুজ-পাউডার-মাখা মুখখানি, কাণে চুনির দুল, কপালে টায়রার মুক্তাগুলি দুল দুল করিয়া দুলিতেছে, মসৃণ ললাটে তাহা যেন শুক্তি-গর্ভশায়ী মুক্তার মতই শোভমান হইয়াছিল। বেনারসী শাড়ীর পাড়গুলি বিদ্যুতের আলোয় জলজল করিতেছে, হাতে গলায় মুক্তার কলার .মুক্তার তলা। ভোজের বাড়ী যেন রূপের ও অলঙ্কারবস্ত্রের প্রভায় ঝলসিয়া দিয়া এক দিন ঐ মেয়েটী সকলকার চোখের দৃষ্টিকে তারই পানে টানিয়া আনিয়াছিল। আর আজ? শীর্ণা, অকালবৃদ্ধা, কুৎসিত-ব্যাধিক্লিষ্টা রূপলাবণ্যহীনা রুগ্ন ক্ষুধিত পাঁচসাতটী সন্তানে পরিবৃতা নারী নিজের শরীর মনের বেদনায় অধিক্লিষ্টা হইয়া

লোক-লোচনের অন্তরালে আপনাকে লুকাইতে ব্যস্ত। হাতে তার গাছকতক কাঁচের চুড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তথাপি শাসনের শাস্তির আর শেষ হয় না।

উঃ! অমিয়ারও যদি ঐ রকমটা ভাগ্যে ঘটিয়া যায়? সে কোন মতেই এ অত্যাচারের তলায় মাথা নীচু করিবে না,—নিশ্চয়ই না।

কিন্তু কাজই বা কি এমন বিবাহে?—যার এমন কটু তিক্ত ফল ফলিলেও ফলিতে পারে?

৩

অমিয়ার বাপ যদিও মল্লিক-বাড়ীর বধূদের আধুনিক তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া উঁহাদের আদর্শ পত্নীত্ব খর্ব্ব করিয়া দিতে মেয়েকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং অমিয়াও যথাসাধ্য পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া চলিত, তথাপি, মধ্যে মধ্যে যেদিন মল্লিকবাড়ীর বাবুদের একটু ঠাণ্ডা মেজাজ বুঝা যাইত, সেদিন সে হয় সে বাড়ীতে গিয়া বধূদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিত, না হয় ঐ বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকাইয়া আনিয়া একটু আদর যত্ন করিতে চাহিত।

সেজ বধূ বিন্দুমতীর পাঁচটী ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে দুটী নিতান্তই শিশু, একটী একটু বড় হইয়াছে, তার দুটী খুব কাছাকাছি, দেখিলে যমজ বলিয়াই মনে হয়। একটী ছয় ও একটী সাত বৎসরের। অমিয়া এদের দুটীকে আনিয়াই একটু আধটু বর্ণপরিচয় করাইত, গল্প বলিত, ছবিটা খাবারটাও না দিত তা নয়। এক দিন সে তাদের একটা গল্প বানাইয়া বলিল—তাহাতে একটী দুষ্ট ছেলে পরের গাছে উঠিয়া আম চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাতে গাছের মালিক আসিয়া তাকে পুলিসে ধরাইয়া দেয়। ইত্যাদি বলিয়া চৌর্য্যের অপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল।

গল্পটী খানিকটা শোনা হইতেই হিতেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা পুলিস এসে যখন ধরলে, তখন তার সব আমগুলো খাওয়া হয়ে গেছলো, না খেতে বাকি ছিল—বল ত?"

অমিয়া বলিল—"না, তখনও সব খাওয়া হয়ে উঠে নি, গোটাকত আম তার হাতে ছিল, সেই শুদ্ধ ধরা পড়লো।"

মেয়েটীর নাম অম্বুজা। অম্বুজা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কাঁচা আম না পাকা আম সেগুলো?"

তার পর নিজেই মীমাংসা করিয়া লইল যে, নিশ্চয়ই সেগুলা কাঁচা আমই ছিল, সেইজন্যই খাইয়া উঠিতে পারে নাই,—পাকা হইলে পুলিস আসিয়া ধরিতে না ধরিতে খাওয়া হইয়া যাইত।

হিতু সহানুভূতিসূচক চুক্ করিয়া একটা শব্দ করিয়া কহিয়া উঠিল—"আহারে! গাছে উঠ্‌লো, সব করলো, মাঝে থেকে খেতেই পেলে না! আমি হলে কিন্তু যেমন করেই হোক, খেয়ে নিতুম।"

অমিয়া কোপপ্রকাশ পূর্ব্বক ধমকাইয়া কহিল—"ছিঃ হিতু! পরের জিনিষ কি চুরি করে খেতে আছে?"

হিতে বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল—"কেন থাকবে না? আমার বাবা বলে নির্ব্বোধের চাইতে চোরেরাও ভাল। তাদের বুদ্ধি খরচ করে খেতে হয়। বুদ্ধি থাকলেই লোকে সেটা খরচ করে থাকে, তা' সে হোক ভাল কাজে, হোক মন্দ কাজে।"

অম্বুজা ভাইয়ের কথার সমর্থন করিয়া বলিল—"শুধু তাই কেন? বাবা তো এ কথাও বলে যে 'দেখছিস্, কাজ-কর্ম্ম কিছুই তো করি না, তবু তোদের কেমন ভাল খেতে পরতে দিচ্চি? কি করে জানিস? যুক্তি খাটিয়ে। দেখে শেখ।' তা হিতু, তুই বড় হলে বাবার মতন টাকা ধার করবার ফন্দি করতে পারবি না?"

হিতু এই কথায় ধাঁ করিয়া বোনের গালে একটা চড় কসাইয়া দিয়া মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল—"'পারবি না' কিরে? আমি বাবার চাইতে বেশিই তো পারবো। আমার বুদ্ধি কি বাবার চেয়ে কিছু কম না কি? সেদিন কেষ্টা মুদি টাকার তাগাদা করতে এলো, তুই তো আর একটু হলে বলেই ফেলেছিলি যে বাবা বাড়ী আছে, আমিই না তাকে বাবা বাড়ী নেই, চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়েচে ব'লে বিদায় করি? বল্ ত কে বিদায় করেছিল? হুঁহুঁ—আমায় তেম্‌নি বোকা পেয়েছিস কি না—হাপলার মতন!"

অম্বুজা ভাইএর দত্ত মার সুদশুদ্ধ ফিরাইয়া দিয়া হাঁকিয়া উঠিল—"মুখপোড়া ছেলে এক্ষনি মরুক! শুধু শুধু আমায় মারলি কেন?"

হিতেন্দ্র অম্বুজার চুল ধরিয়া টানিয়া গাছকতক ছিঁড়িয়া আনিল—"আমি কেন মরবো, তুই মর।"

অম্বুজার আক্রমণে এবার তার কাণ ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেই অম্বুজা ফস করিয়া নিজের আঁচল ছিঁড়িয়া সেই

আহত কাণের শোণিতপাত বন্ধ করিল, এবং অনুতপ্ত স্নেহভরে ভাইকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল—"আহা হা! রক্ত পড়ে গেল রে! না ভাই, আমার সঙ্গে আর মিথ্যে মিথ্যে লাগতে আসিস্ নি। চল একটু জল দিয়ে দিই।"

হিতেন্দ্র ক্রোধভরে বোনের হাতটা ঠেলিয়া দিল—"যা যা, আর আদর দেখাতে হবে না। পাজি ছুঁচো, ছোট লোকের মেয়ে!"

অনুজা গর্জ্জিয়া উঠিল—'কি! তুই আমায় ছোট লোকের মেয়ে বল্লি? তোর মরণ-বাড় হয়েছে দেখতে পাচ্চি!"

হিতেন্দ্রও ইহার উত্তর সমান তেজের সহিত প্রদান করিল—"বলেছি ত হয়েছে কি? বাবা যদি মাকে ছোট লোকের মেয়ে বলতে পারে—তাহলে আমি তোকে বলতে পারি নে? তুই কি খড়দার মা গোঁসাই না কি?"

অমিয়া অবাক আড়ষ্ট থাকিয়া ইহাদের বিবাদ-বিতণ্ডা দেখিল এবং শুনিল। এতখানি বয়সের মধ্যে সে যে-সব কথা কখনও কাণেও শুনে নাই, ইহাদের সেই সকল কথা ব্যবহারে বিশেষ অভ্যস্ত দেখিয়া গভীর বিস্ময় অনুভব করিতে গিয়াও সহসা সে চকিত হইয়া স্মরণ করিল, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই বড় বর্ত্তমান নাই। নিজের বাড়ীতে মা বাপের মধ্যে যে ব্যবহার ইহারা লক্ষ্য করিতেছে তাহাই শিখিয়াছে মাত্র। নূতন করিয়া কোথাও হইতে বিচিত্র কিছুই তো শিখিয়া আইসে নাই! এই দুইটী সরল শিশু-জীবনকেও ইহারই ভিতরে এই যে গরল-মণ্ডিত করিয়া তৈরী করা হইতেছে, এর জন্ত দায়ী ইহাদের মহাপাপিষ্ঠ দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য পিতা। এবং—এবং শুধুই পিতা কি? ইহাদের মাতাও কি এর জন্ত অংশতঃ দায়ী নহে? অমিয়ার চিত্ত সেই নির্ব্বিরোধে ও নির্ব্বিচারে পাষণ্ড স্বামীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ-কারিনী বঙ্গ-বধূর প্রতি ঘোর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমনই কি সহিষ্ণুতা, যে ঐ দুরন্ত-প্রকৃতির স্বামীর সহিত লাঞ্ছিত জীবন বহন করিবার তুচ্ছ লোভটুকুও দমন করিতে পারে না? বৎসর বৎসর এই সকল অভাগা নীতিজ্ঞানহীন সন্তানের সৃষ্টি করিয়া সংসারে দারিদ্র্য ও পাপের বংশ বৰ্দ্ধিত করার চেয়ে এমন কি মরণকে বরণ করাও শ্লাঘনীয় ছিল না কি? নাঃ, অত্যাচারী স্বামীর ঘর করিতে স্ত্রীকে বাধ্য করার মত পাপ কিছুই নাই। ইহা ত শুধুই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সমস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ যে এর উপর পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া আছে। মদ্যপ, ব্যাধিগ্রস্ত, কুচরিত্র এ সকল লোকের বিবাহে সামাজিক বাধা কেন থাকিবে না? অত্যাচারীর স্ত্রীকে সমাজ কেন রক্ষা করিবে না? এ করিতে সে বাধ্য! আর তাহা করাইবার ভার নারীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সকল মেয়েই এই পণ করে, নিশ্চয়ই এই অবিচারের প্রতিকার-চেষ্টা দেখা দেয়। সহ্য করিয়া করিয়া স্ত্রীরাই স্বামীদের এরূপ পিশাচে পরিণত করিতেছে।

অমিয়া মনে মনে দৃঢ় করিয়া বলিল—"আমার যদি কখন তেমন দুর্ভাগ্যও ঘটে, আমি কিছুতেই কিন্তু সহ্য করবো না। এর জন্ত প্রাণ দিতে হয় তাও দোব, তবু মাতাল বা কুচরিত্রের সন্তান দিয়ে ভারতের ভার বৃদ্ধি হ'তে দেবো না। সাক্ষী থাক অন্তর্যামী ভগবান! আর তুমিই আমায় সে বিপদে রক্ষা কোরো।"

৪

সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব ছিল; বর্ষার বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশে বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা বিচিত্র বর্ণে ও বিবিধ আকারে নিজেদের গঠিত ও সজ্জিত করিতে ব্যস্ত ছিল। ইন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে ছোট্ট একটুখানি বাগান; তাহাতে বাঁশের মাচায় তোলা জুঁইএর লতায় রাশি প্রমাণ ফুল ফুটিয়া রাস্তাশুদ্ধ যেন মাতাইয়া তুলিয়াছে। এক পাশে একটা কচি শ্যামল পাতা ও রাঙ্গা ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ায় বোধ হইতেছিল, যেন আকাশের লালের খানিকটা আচমকা খসিয়া পড়িয়াছে।

অমিয়া কতকগুলি জিনিয়া ফুলের বীচি আনিয়া বৃষ্টি-আর্দ্র মাটীতে পুঁতিতেছিল। পাশের বাড়ী হইতে দেখিতে পাইয়া হিতেন্দ্র ও অনুজা তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। দুজনেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল "আমায় চারটি বীচি দিন্ না—আমাদের বাড়ী আমরাও বাগান করবো।".

অমিয়া গোটা কয়েক বীজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিল—"বাগান তো করবে, কিন্তু যা' তোমাদের বাড়ী ছাগল চরে,—ফটকটা ভেঙ্গে গেছে—গাছ কি থাকবে!"

অনুজা তৎক্ষণাৎ বীজ কয়টী হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—"ঠিক কথা! যে আমাদের বাড়ীর দশা, বাগান করে কি হবে? নাঃ—করবো না বাগান।"

হিতেন্দ্র অমনি চট করিয়া বলিয়া উঠিল—"কেন করবি না? খুব করবি! বাবা তো আর অমর হয়ে জন্মায় নি,—বাবা মরে গেলে বাবার ভাগটা তো আমার হবে? আমি তখন ফটক মেরামত করবো কি না। যে মদ খাচ্ছে, দেখ্ না, কোন দিন মরে পড়ে বলে।"

অনুজা তাড়াতাড়ি বীজ কুড়াইতে কুড়াইতে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"আহা, এমন দিন কি হবে! তা' হলে মাও বাঁচে, আমরাও বাঁচি,—মার খেতে হয় না আর।"

অমিয়া উহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। তার হাত যেন আর চলিতে চাহিল না। একটা গভীর বিতৃষ্ণায় মনটা তার যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। বীজ বপন ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিয়া তাড়াতাড়ি তার মার কাছে চলিয়া গেল। মা তখন রান্নাঘরের দালানে তোলা-উনানে ছেলেদের জন্য খাবার করিতেছিলেন,—মেয়েকেই বোধ করি খুঁজিতে-ছিলেন। তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"দে তো মা লুচি ক'খানা বেলে। মেঘে মেঘে একেবারে সন্ধ্যে হয়ে গ্যাছে!"

অমিয়া লুচি বেলিতে বসিয়া খানকতক বেলিয়াই ডাকিল—"মা!"

মা গরম ঘিয়ে দুখানা করিয়া লুচি ফেলিয়া ত্রস্ত করে তাহাদের টানিয়া তুলিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, তৎকার্য্য-নিযুক্ত থাকিয়াই উত্তর দিলেন—"কি রে?"—তার পর বলিলেন—"উষা, বিভা, শচীন্, ওদের ডাক দে' দেখি, খেতে বসুক!"

"ডাকচি"—বলিয়া পুনশ্চ একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"মা!—একটা কথা বলবো?"

মা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত লুচি-ভাজা বন্ধ রাখিয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

"কি বলবি বল্ না?" পরে তাহাকে নীরব দেখিয়া পুনশ্চ কহিলেন—"তার অত ভূমিকা করছিস কেন?"—বলিয়া পুনশ্চ এক এক করিয়া দুখানা বেলা লুচি ঘিয়ের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। আধ মিনিটের অমনোযোগে গরম ঘি অজস্র ধূমোদ্গীরণ আরম্ভ করিয়া জ্বলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়া-ছিল,—তাড়াতাড়ি কড়াখানা নামাইয়া ফেলিতে হইল।

অমিয়া এই সময় ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, সত্যি মা, আমার বিয়ে দিও না।"

একে ছেলেদের খাবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তারা খাইতে পায় নাই, তার উপর কড়ার ঘি ধরিয়া গিয়া লুচি দুখানার কালো জামের রং হইয়া গেল, মায়ের মন খুবই সুপ্রসন্ন থাকা সম্ভব নয়। তার উপর অত বড় মেয়ের যখন তখন এই অসঙ্গত আবদারে খুসী হইয়া উঠিবারই বা কতটুকু আছে। কড়ার ঘিয়েরই কাছাকাছি তাতিয়া উঠিয়া মা পরুষ কণ্ঠে বকিয়া উঠিলেন—"ফের সেই ভূতে ধরেছে! কি যে পাগলামী করিস! ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে বিয়ে না করে কি নার্স হবি না কি? জ্বালা তোকে পাশ দিইয়ে মাথা বিগড়ে দেওয়া গ্যাছে। নে'—এখন ওগুলোকে খেতে দিবি, না দিবি না, তাই বল্ তো দেখি?"

অমিয়া একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া বিষণ্ণ মুখে আদিষ্ট কর্ম্মে মনোযোগী হইল।

অমিয়া তার মনের সেই ভয় ভাবনা লইয়া সর্ব্বদা যেন ত্রস্ত হইয়া রহিল। মা বাপের মুখে যদি তার বিবাহের কোন কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়, অমনি তার বুকের মধ্যে ধড়্-ফড় করিয়া উঠে। পৃথিবীর সকল পুরুষকেই যেন মল্লিক-বাড়ীর সেজ-বাবুর ছায়া বলিয়া একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়া তার মনকে তাদের উপর বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহের কথা মনে হইলেই তার একটা তীব্র আতঙ্কের সহিত মনে হইত—যদিই দৈবাৎ তার স্বামী-রত্নটী ওই সেজ-বাবুর মতন তার প্রতি ব্যবহার করে, তার সন্তানগুলিও হিতু-অনুজের মতও তো হইতে পারে! অমনি পায়ের তলা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চুলের গোড়াগুলো অবধি তার আতঙ্কে কাঁপিয়া স্থির হইয়া যাইত।

৫

কিন্তু চিরদিন ঠিক এক ভাবেই কাহারও দিন যায় না। পক্ষী-শাবক তার পুরাতন নীড়টীকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসে বটে, তথাপি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু সেইটুকুকেই সে আর যথেষ্ট মনে করিতে পারে না। অমিয়ার বাপ যখন তার পড়াশুনা চুকাইয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া তাহার বিবাহের জন্য ঘটক নিযুক্ত করিলেন এবং সেই ঘটক ঠাকুরও আজ একজন কাল একজনের খবর লইয়া আসা যাওয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন নিশ্চিত বিপদকে বরণ করিয়া লইতেই হইবে বুঝিয়া

যম্নি অমিয়া নিজের মনকে কতকটা প্রস্তুত করিয়া লইল, অমনি সেই ফাঁকে ফাঁকে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণায় একটা কৌতূহল ও আগ্রহও যেন তার সেই বিবাহ-বিদ্বিষ্ট চিত্তকে ভিতুরে ভিতরে পাইয়া বসিল। প্রথম প্রথম ঘটকের খবর আসিলেই সে মনে মনে রাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইত। তার পর ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া তার মনের মধ্যে ঐ বসন্ত-দূতের সংস্পর্শে আগত-প্রায় বসন্তের একটা সাড়া পাওয়া গেল। এখন লুকাইয়া চুরি করিয়া সে তার ভবিষ্য বরের কথা কাণ দিয়া শুনিয়া লয় ও মনে মনে বিচার করিয়া দেখে।

ইতিমধ্যে দু' জায়গা হইতে তাহাকে কনে দেখিয়া গিয়াছে। বরের অভিভাবক এত বড় বয়সের মেয়ে দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অপর স্থলে মেয়ে পছন্দ হইয়াও দেনা-পাওনায় বাধা প্রাপ্ত হইল। বরের পিতা বলিয়া পাঠাইলেন যে, মেয়ে দুইটা পাশ করিয়াছে বলিয়া তো আর তাহাকে চাকরী করাইতে পারিবেন না। অতএব গহনাপত্র ও বিবাহের ব্যয়টা কোথা দিয়া আসিবে? ইত্যাদি, অতএব—

উমাশশী বলিলেন—"হ্যাঁগা! তবে যে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালে বিয়েতে বেশি টাকা লাগে না?"

ইন্দ্রনাথ বিরক্তচিত্তে বলিলেন—"ও-সব বাজে কথা,—টাকা মেয়ে জন্মালেই দণ্ড লাগে, তার উপর রূপগুণ, বিদ্যেবুদ্ধি—ওগুলো সবই ফাউ।"

অমিয়া তার পুঁথিপত্র জড় করিয়া পড়াশুনায় মন দিয়াছিল, কিন্তু মন সে আর ভাল করিয়া দিতে পারে নাই। বইএর খোলা পাতার পর পাতায় তার চোখের দৃষ্টি ভ্রমিয়া ফিরিলেও, মন তার আর সেদিক দিয়া পথ চলে না। কাজেই উহারা তার দৃষ্টি-সীমাতেই আবদ্ধ থাকে, মাথার ভিতর প্রবেশের কোন পথ পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বইখানা কোলের উপর মেলিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া সে বসিয়া থাকে। কল্পনা তার উড়ন্ত মনকে লইয়া তখন কতই না খেলা করিয়া বেড়ায়। কখন একটী অচেনা অজানা গৃহের মধ্যে গৃহকর্ত্রীরূপে নিজেকে সে অপূর্ণ অজ্ঞাত এক পুরুষের পাশে কার্য্যরতরূপে কল্পনা করে, কোলে কখন একটী ননীর পুতলী শিশু; আবার বিপরীত দর্শনে কখনও বা শিহরিয়া তার স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায়।

এক দিন হেমন্তের হিমস্নাত প্রভাতে ভোরের বেলাই অমিয়া জাগিয়া উঠিয়া তার খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মনে হইল, সেদিনকার ভোরের পাখীর কণ্ঠে যেন কি এক নূতন সুর ধ্বনিত হইতেছিল। শিশিরে-ভেজা শেফালি ও কনক-চাঁপার মিশ্র সুবাসেও যেন একটা নূতন গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। বাতাস আলো সবই যেন নূতন নূতন। দূরে আকাশের গায়ে ছবি আঁকিয়া যে সব চির-পরিচিত বাড়ী-ঘর সে আজন্মকাল ধরিয়াই দেখিয়া আসিতেছে, সেগুলা শুদ্ধ যেন তার আজ নূতন ঠেকিল। কিসের যেন একটা অজ্ঞাত পুলকে মনটা তার সহসা সেই নূতন হাওয়ায় পাল তুলিয়া দিয়া কোন্ নবীন আনন্দের সাগরে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য যেন উন্মুখ হইয়া উঠিল। অকারণে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া সর্ব্বপ্রথম মনে হইল, আজ যেন তার জীবনে খুব বড়-রকমের একটা শুভ ঘটনা ঘটিবে।

নিজেকে আগতপ্রায় মঙ্গল লাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়া সে শয্যাত্যাগ করিল। যেদিক দিয়া গেল, চার দিকেই চাহিয়া দেখিল, তার বোধ হইল, সকলেই যেন তাহাকে সানন্দ পুলকে সুপ্রভাত জানাইয়া দিতেছে। মনের সে বিপুলতর উচ্ছ্বাস ও পরিপূর্ণতা লইয়া সে যেন আপনাকে গোপন রাখিতে পারিতেছিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া ছোট ভাইবোনগুলিকে কোলে তুলিয়া, বুকে টানিয়া আদরে চুম্বনে ভরাইয়া দিল। মা বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, বালিকার মত ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে তাঁকে জড়াইয়া ধরিল।

মা রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"দিন দিন তুই খুকি হচ্চিস না কি অমিয়া? এক্ষনি দুজনেই যে কেটে মরতুম!"

অমিয়া মার পিঠের উপর মুখ ঘষিতে ঘষিতে হাসিমুখে কহিল—"না মা, কিচ্ছু হতো না মা! লক্ষীটী, আমায় আজ বকো না।"

উমাশশী সস্মিতমুখে মেয়ের মাথায় হাত দিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন রে, আজ তোর কি?"

মেয়ে মায়ের সেই স্নেহস্পর্শটুকুর তলায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া দিয়া সুখোৎফুল্ল মুখে স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল—"কি জানি মা, কি! কিন্তু আজকে আমার বড্ড ভাল লাগচে।"

সারা দিনটা যথাপূর্ব্বই কাটিয়া গেল। অমিয়া দিনের প্রথমাংশটা হাসিয়া লাফাইয়া ছোটদের সঙ্গে খেলিয়া মায়ের কাজের সাহায্য করিয়া কাটাইয়া দিল। ভাইবোনদের স্নানের সময় ভাল করিয়া সাবান দিয়া স্নান করাইল, তাদের পোষাক পরানো, চুল আঁচড়ানো, ভাত খাওয়ানো, পড়া বলা সব কাজেই আজ সে তার যথাসাধ্য যত্ন লইয়া সমস্তই সুসম্পন্ন করিয়া তুলিল। তার পর যে যাহার কাজে স্কুলে কাছারীতে সবাই বাহির হইয়া গেলে, সেও আহারাদি সারিয়া একলা ঘরে বই খাতা লইয়া বসিয়া পড়িল।

অমিয়ার একখানি ছোট নীল-মলাট-দেওয়া নোটবুক ছিল। মধ্যে মধ্যে সে এইখানিতে গোপনে কবিতা লিখিত। আজ সেখানা খুলিয়া বসিয়া লিখিল—

আজিকে কি দিবে দেখা হে প্রিয় আমার!
এই যে আনন্দ ধ্বনি, এ কি তব আগমনী?
তুমিই কি দে'ছ খুলে এ শোভা-ভাণ্ডার?
পুলকে কম্পিত হিয়া, আছি পথে দাঁড়াইয়া,
সঁপিতে চরণে তব, হৃদি ফুলহার,—
আজিকে কি পাব দেখা হে প্রিয় আমার!

কবিতা লেখা শেষ হইল না,—চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরে একটী ভদ্রলোক আসিয়া বাবুকে খুঁজিতেছিলেন,—বলিলেন, বাড়ীর ভিতর হইতে খবর লইয়া এস, ক'টার সময় তিনি বাড়ী ফিরিবেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে।

অমিয়া বিস্মিত হইল। এমন সময়ে কে তার পিতাকে খুঁজিতে আসিল! নিশ্চয়ই কোন অজানা লোক হইবে। সে চাকরের মুখে উত্তর পাঠাইয়া দিয়া, নিজে উঠিয়া জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে বাড়ীর সাম্‌নেটা দেখা যায়। দাঁড়াইবামাত্র তার চোখে পড়িয়া গেল,—সদর দরজার কবাট ধরিয়া একটী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া উৎসুক নেত্রে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছেন। সে দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার উর্দ্ধোত্থিত ব্যগ্র দৃষ্টির সহিত তাহার সকৌতুক দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। অমনি লজ্জারক্ত মুখে সে ত্রস্তপদে সরিয়া আসিল।

সরিয়া আসিল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। কি জানি কিসের ঝোঁকে সে তার স্বভাব-বহির্ভূত কার্য্য করিল। জানালার কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া উহারই ফাঁকের ভিতর হইতে সে সেই অপরিচিত আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল; এবং দেখিতে গিয়াই তার মনে হইল—এমন রূপ সে পুরুষের মধ্যে আর কখন দেখে নাই!

বাস্তবিকই কি সেই অপরিচিত পুরুষ এতই সুরূপ? কিন্তু কোন্ মুহূর্ত্তে যে কাহার জন্য দেখা দেয়, এবং কোন্ অজ্ঞাত কুহকী তার মোহনীয় কুহকের সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করিয়া বইসে, কেহই জানে না। সেইক্ষণে সমীপাগত যে কোন রূপকেই অপরূপ ও যে কোন সুদূরাবস্থিতকে নিকটতম আত্মীয়তম বলিয়া মনে হয়। সেই মোহের কাজল চোখে লাগান ছিল বলিয়াই সহসা ঐ অজ্ঞাত পুরুষকে দেখিয়াই অমিয়ার বোধ হইল, ঐ যে তাদের দ্বারে আসিয়া আজ ঐ অচেনা অতিথি দাঁড়াইয়াছে,—এ যেন কোন্ দূরদূরান্তর হইতে ছুটিয়া তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে,—এ যেন শত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাহারই প্রতীক্ষাকারী,—একমাত্র তাহারই। এই কথা মনে হইবামাত্র তার সমস্ত দেহ-মন যেন সেই ভোরের বেলার পুলক-স্মৃতিতে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত দেহ যেন সুখাবেশে শিথিল হইয়া আসিল। সে নিজেরও অজ্ঞাতে সেই অজানা অতিথির উদ্দেশে যুক্তকরে মনে মনে প্রণাম-নিবেদন জানাইল। মনে মনে বলিল—নিশ্চয়—নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রতি দেবতার দান! আমি যে তাঁকে প্রাণপণে ডেকেছিলেম, তাই তিনি হয় ত আমার জন্য তোমায় বেছে দিয়েছেন!

৬

আফিষ হইতে ফিরিয়াই, সেই আফিষের পোষাকেই ইন্দ্রনাথবাবু প্রায় ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলেন—"ছোট-বৌ! বলি শুনচো?"

শ্বশুরবাড়ীতে উমাশশী ছোটবৌ হইয়াই প্রবেশ করিয়াছিল। বড় মেজ জায়েরা স্বতন্ত্র থাকিলেও তার ছোট-বৌ পদটা ঠিকই আছে।

উমাশশী রান্নাঘর হইতে সাড়া দিয়া বলিলেন—"এই যে আমি এখানে, কি বলচো?"

ইন্দ্রনাথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন—"যতীন এসে যে সারাদিন বাইরের ঘরে বসে রয়েছে, সে অমিয়াকে বিয়ে করতে চায়, নিজেই কনে দেখবে। শীগ্‌গির উঠে এসে মেয়ে সাজিয়ে দাও দেখি।—"

এই খবর শুনিয়াই ময়দা-মাখায় নিযুক্তা অমিয়ার মুখ

একেবারে জবাফুলের মতন টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা তার যেন কি একটা বিপুল উল্লাসের তরঙ্গে তালে তালে দোল খাইতে লাগিল। তবে তো তার ধারণায় ভ্রান্তি নাই! নিশ্চয়ই সে দেবতার দান!

উমাশশী কিন্তু এ সম্বাদে প্রমাদ গণিলেন। একে এখন কাজকর্ম্মের সময়—তার উপর মেয়েও বড় সোজা নয়। কনে দেখা দিবার জন্য কতই না তাকে ভালকথা মন্দকথা কহিয়া দেড় দুঘণ্টা বুঝাইয়া সমজাইয়া তবে তো রাজী করিতে হইবে! সে কি অল্পে বশ হয়! কাঁদিয়া কাটিয়া মুখ চোখ ফুলাইয়া গম্ভীর বিরক্ত মুখে কনে-দেখা দিতে গেলে, কেহ কি কোন জন্মে কনে পছন্দ করিতে পারে? এই জন্যই তো দেখিতে ভাল হইলেও তাকে কোন দিনই কেহ পছন্দ করিতে পারিবে না। মেয়ে বলে 'আমি কি শাক না মাছ, যে, আমায় যে-সে এসে নেড়ে-চেড়ে দেখে যাবে!' আরে বাপু, তুই এটা বুঝিস্ না যে, শাকমাছের চেয়েও তুই অধম,—তুই মেয়েমানুষ। মাছটা পচা হ'লে পয়সা ক'টাই জলে যায়, আবার একটা কেনা চলে; কিন্তু তোকে বদলাইয়া আর একটা কিনিতে গেলে তো একটু হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে। আজকালের বাজারে আর আগের দিনের মতন সহজে সেটা হইবে না।

কিন্তু উমাশশীর বিস্ময় আজ সীমা অতিক্রম করিল। একবার মাত্র ডাক দিতেই নেহাৎ ভালমানুষটীর মতন অমিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিল; এবং মা যেমন ইচ্ছা সাজাইয়া দিলেও সে এতটুকু প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না। শুধু মা যখন জমকালো দেখিয়া নিজের একটী বেনারসী সুট বাহির করিয়া পরিতে বলিলেন, তখন সে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, 'ওটাতে বড্ড বড় দেখায় না মা! তার চেয়ে আমার বাসন্তী রংয়ের পাতলা মাদ্রাজীটা পরবো?"

মা ঈষৎ বিস্মিত আনন্দে মেয়ের মুখের দিকে চাহিতেই, সে লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ নত করিল। মা বলিলেন, "তা বটে! আচ্ছা, তা'হলে তাই পর।"

যতীন বলিয়া ইন্দ্রনাথ যাহার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেটী ইন্দ্রনাথের বহুদিনের পাঞ্জাব-প্রবাসী বাল্যবন্ধু যোগীন্দ্রনাথের ছেলে। ইহারা সে দেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তা কয়, তাহাতেও কিছু পাঞ্জাবী টান বোঝা যায়। ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি সেইখানেই সব। শুধু বিবাহটাই বাংলার সহিত সম্বন্ধটাকে বজায় রাখিয়াছে। বাঙ্গালী এইটুকুই কেবল ছাড়িতে পারে না। যতীন বাপের মৃত্যুর পর তাঁর কাঠের গোলা চালাইতেছে। কন্ট্রাক্‌টারীও সে করে, রোজগার মন্দ হয় না। বিষয়-আশয় বেশ আছে। বয়স তার আনুমানিক বছর ত্রিশ-বত্রিশ—এম্‌নি হইবে। চেহারা বেশ জঙ্গী জোয়ানের মত। পাঞ্জাবী ধরণ কতকটা। গায়ের রং বেশ ফরসা, মুখের রং রোদে ঘোরার জন্য কতকটা তামাটে হইয়া আসিলেও ফরসা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতায় এক জায়গায় বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। পরের দ্বারায় কথাবার্ত্তা হয়। বিবাহ করিতে আসিয়া দেখা গেল—মেয়ে নিতান্ত ছোট,—বড় জোর এগার বৎসর বয়স—তার চেয়ে অন্ততঃ কুড়ি বৎসরের ছোট। রাগ করিয়া বিয়ে ভাঙ্গিয়া এবার নিজেই সে কনে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। দৈবক্রমে অমিয়ার সন্ধান পায় ও তৎক্ষণাৎ একাই এ বাড়ীতে চলিয়া আইসে। বাপের পুরাতন চিঠি-পত্রের ফাইলে ইন্দ্রনাথের চিঠি ও বাড়ীর ঠিকানা তার চোখে পড়িয়াছিল এবং মনেও ছিল,—ছেলেটির স্মরণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ, পড়াশুনাও মন্দ ছিল না। বি-এ অবধি পড়িয়াছিল,—কিজন্য জানা নাই, পরীক্ষা না দিয়াই পড়া ছাড়িয়া দেয় এবং বাপের কারবারে ঢুকিয়া পড়ে।

কনে দেখা হইয়া গেল। কনে অপছন্দের মতন নয়, অপছন্দ হইলও না। দু'একটা কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াই যতীন ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওঁকে ভেতরে যেতে বলুন,—এইবারে আপনাকে দু' একটা কথা বলে আমি আজকের মতন উঠবো।"

অমিয়া এই অবসরে একবার চুরি করিয়া চকিত চক্ষে তাহার দ্রষ্টাকে দর্শন করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্তরালে মা দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানে আসিয়া মার বাহুতে মুখ লুকাইল। মনটা তার আনন্দে, লজ্জায় এমনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, মায়ের সামনে সহজ ভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। মা কিন্তু তার এই মুখ লুকানোর সত্য অর্থটাকে না বুঝিয়া বরং বিপরীতই অনুমান করিয়াছিলেন। ঈষৎ বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে অথচ অন্যের অশ্রাব্য চাপা সুরে তিনি কহিয়া উঠিলেন—"অমন করে

রৈলি যে! কেন—খাসা দেখতে তো, তোর কি মনে ধরলো না না কি? কি চাস্ তুই?"

অমিয়া লজ্জায় জড়াইয়া মায়ের গায়ের মধ্যে আরও ঠেসিয়া গিয়া মৃদুতর কণ্ঠে কোনমতে জবাব দিল—"কে বলছে মন্দ?"

"তবে আবার কি? দেখতে ভাল, পয়সা আছে, বয়সও তেমন কিছু বেশি নয়। দেখ, মিথ্যে কোন মতবাদ তুলে বসো না যেন! যদি ও তোমায় পছন্দ করে থাকে, তুমি তাই যথেষ্ট মনে করো।"

অমিয়া মার মুখের দিকে বারেক চাহিয়াই নত চক্ষে ত্বরিৎস্বরে কহিয়া উঠিল—"আমি কি বলেছি—আমার পছন্দ হয়নি। তুমি আমাকে কি যে মনে কর।"

বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেল। উমাশশীর মুখ এই কথায় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে একটুখানি সকৌতুক হাসি হাসিলেন,—এই না মেয়ে বলতেন যে, বিয়ে করবেন না! যাক্—বাঁচা গেল!

৭

অমিয়ার বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। বর যতীন জানাইল যে, বিবাহ করিয়াই সে তার স্ত্রীকে লইয়া লাহোরে চলিয়া যাইবে। এই প্রস্তাবটাতে ইন্দ্রনাথ বাবুর মনটা কিছু দমিয়া গিয়াছিল। তাঁর মনে হইল—হয়ত উমাশশী এবং অমিয়া নিজেও এটা পছন্দ করিবে না। এত শীঘ্র বহুদিনের জন্য বহুদূরে আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে সুকঠিন,—তা যতই কেন সে বড় হোক না, আর যত লেখা পড়াই শিখুক।

কিন্তু অমিয়াকে যখন তিনি নিজে অনেক করিয়া বুঝাইয়া আস্তে আস্তে খবরটা দিলেন, তখন সে চুপ করিয়া রহিল, ভালমন্দ কোন জবাব করিল না। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রনাথ বাবু ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এতে কোন আপত্তি আছে?"

তখন ক্ষণকাল মাত্র নীরব থাকিয়া অমিয়া আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেও খুসী হইলেন। উমাশশী অসন্তুষ্ট না হইলেও অন্তরের মধ্যে হয়ত একটুখানি আহত হইলেন, এবং বলিলেন—"মেয়ে পরের জন্যেই হয় যে বলে, তা' ঠিক!"

বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সময় খুব কম—একমাসও নয়। ইহার ভিতর সবই তো করিতে হইবে। সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউস, জ্যাকেট, বডি—সবই মায়ে ও মেয়েতে দিন-রাত কল চালাইয়া তৈরি করিতে লাগিয়া গেল। বর নগদ ও দান-সামগ্রী কিছুই লইবে না—শুধু সামান্য বরাভরণ ও মেয়ের যা কিছু। উমাশশী তাই মেয়ের জন্য কাপড় জামাটাই বেশি করিয়া করিতে লাগিলেন। গহনা পাঁচসাতখানি একটু কায়েমী দেখিয়া গড়াইতে দেওয়া হইল। যতীন নিজে যাহা দিবে, তাহার একটা ফর্দ্দ দিয়াছিল। দেখা গেল, তাহাতে কান রতনচূর পর্য্যন্ত সীঁথিপাটী ফুলঝুমকা সবই মজুদ আছে। সেগুলি তার মায়ের গায়ের গহনা। যতীন মায়ের এক সন্তান, তাই সবই তিনি যতীনের বউকে দিয়া গিয়াছেন।

মা বলিলেন—"গহনার তো গাদা আছে দেখছি। তবে ও-সব সেকেলে হয়ে গ্যাছে, কেউ আর পরে না। তা' এর পর সব নূতন করে গড়িয়ে নিস।"

পাকা-দেখায় যতীন কনেকে একটী মুক্তার মালা পাঠাইয়া দিল। প্রতিবেশিনীরা জিনিষ যাচাই করিয়া মন্তব্য করিলেন—"হ্যাঁ, পছন্দ ভাল! তা' জিনিসটারও দাম আছে। হাজার দুইএর কমে আর হয়নি।"

কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অত হবে না, হাজারখানেক হয়ত ঢের!"

উমাশশী এক দিন স্বামীকে বলিলেন—"দেখ, অমিয়া একটা কথা বলছিল,—সে বলে, অত দূরের লোক, এত বয়স অবধি বিয়ে করেনি, স্বভাবচরিত্র ভাল তো? ভাল করে একটু খবর নিলে হতো না।"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন —"বিদুষী হয়ে মেয়ে বাপের ভুলগুলো তবু ধরে দিচ্ছে! ওরে বাপু, তা কি আর আমি নিই নি? কলকাতায় যেখানে ও আছে, তার কাছেই নগেন ঘোষের বাড়ী। তিনি লাহোরে তিনবচ্ছর ছিলেন, ওদের খুব ভাল করেই জানেন। তিনি বল্লেন—মেয়ের ভাগ্যে থাকলেই এমন বরে পড়বে।"

উমাশশী নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া মেয়েকেও খবরটা দিলেন, ইহা শুনিয়া অমিয়ার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। বাবা মা তাকে কি বেহায়াই না ভাবিলেন! দেবতার দানকে, সে এম্নি অবিশ্বাসী যে, এত করিয়া যাচাই করিতেছে! নাঃ,

এ লোক কখনই মন্দ হইতে পারে না। ভগবান নিজেই যে আগে হইতে জানাইয়া ইহাকে তার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ-রাত্রে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং পূর্ব্বপরিচিত নগেন ঘোষের বাড়ীর লোকেরা বরযাত্র আসিয়াছিল। বিবাহে সকল রকমেই খরচপত্র কম করিতে হওয়ায়, ইন্দ্রনাথ তাঁর নব জামাতার উপরে অত্যধিক পরিমাণেই সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। একে ত নিজে যাচিয়া আসিয়া বিবাহ করিল,—তার উপর খরচপত্রও বেশি করিতে হইল না,—আবার বরযাত্রীর উপদ্রবও সহ্য করিতে হইল না! নাঃ—নমিতা ও সমিতাকেও দু'একটা পাশ করাইয়া রাখিতে হইবে।

বিবাহরাত্রেই কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া বর-কনে বাসর ঘরে গেল। বর বধূকে যে লজ্জাবস্ত্র প্রদান করিলেন, সেখানা দেখিয়া বাসরঘরে অনেক মেয়েই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আইবুড় ভাতে একখানা সোনার তারের শাড়ী—তা যেন না হয় পাইল। কিন্তু লজ্জাবস্ত্র আবার রূপার তারের শাড়ী-জ্যাকেট দিয়া কে দেয়? নাঃ—জামাইএর হাতটা আছে! তা' হবে না কেন? কণ্ট্রাক্টরের আমাপা পয়সা!

অমিয়ার হাত যখন তার বাপ যতীনের হাতে তুলিয়া দিলেন, তখন গভীর সুখে তার সারা দেহ যেন শিথিল হইয়া আসিল।

বাসরঘরে যতীনকে অনেকেই গান গাহিতে বলিলে, যতীন একজনের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের বিদুষী কনে নিশ্চয়ই গাইতে পারেন,—তিনিই একটা গেয়ে শোনান্ না অনুগ্রহ করে।"

জিজ্ঞাসিতা এবং তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া আরও জনকয়েক মহিলা হাসিয়া উঠিয়া জবাব দিলেন—"সে ভাই তুমি নিজেই বলে-কয়ে শুনে নিও, আমরা তো ওর গলা থেকে এতটুকু হুঁহু পর্য্যন্ত কোন দিনই শুন্‌তে পাই নি। এখন তুমি নিজেই একটা গাও দেখি।"

যতীন বিস্তর আপত্তি করিল বটে, কিন্তু শেষটায় একটা গজল্ গাহিল। গানটা যদিচ কাহারও বোধগম্য হইল না, এবং মুখভঙ্গী ও হাত পা নাড়ার ধরণে মেয়ে-মহলে একটা হাস্যরসের উদ্রেকও করিল, তবু অমিয়ার মনে হইল—কেন, মন্দটা কি? বেশ ত ওস্তাদী গান।

অমিয়ার সখীদের মধ্যে দু'একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল—"মা গো! যেমন কাটখোট্টাদের দেশের মানুষ—তেম্‌নি কি বিতিকিচ্ছি গান শিখেছ! যেন ড্রিল মাষ্টারের-ড্রিল করান,—গান গাওয়া ত নয়!"

অমিয়া মনে মনে সখীর উপর একটু বিরক্তি বোধ করিল। মা গো! মুখের উপর কি অমন করিয়াই নিন্দা করিতে হয়! ওঁর বর তো তবু একেবারেই আনাড়ী!—

বিবাহের পরদিন পাঞ্জাব মেলে বর-কনে রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিবে। এইবার অমিয়ার বিবাহের প্রচুর আনন্দ বিচ্ছেদের গভীরতর বেদনায় কোথায় যেন ঢাকা পড়িয়া আসিতেছিল। সকালে উঠিয়াই সে মায়ের কোলের উপর পড়িয়া খুব খানিক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল ছোট ভাই-বোনগুলিও তাহাকে ঘেরিয়া যত কাঁদে, সেও তাদের কোলে করিয়া বুকে টানিয়া ততই কাঁদিয়া ভাসায়। বাপ-মা, প্রতিবেশী বুঝাইয়া কান্না থামাইতে পারে না।

বিকালের ডাকে অমিয়ার নামে একখানা চিঠি আসিল। সে সময় সে তার স্বামীর সহিত যাত্রা করিবার জন্য কন্যাসজ্জা করিতেছিল। বরের ইচ্ছানুসারে তাহাকে বিবাহের দামী বেনারসীর বদলে একখানি হাল্কা দেখিয়া লাল শাড়ী পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গহনা গায়ে সামান্যই দেওয়া হইয়াছিল। কনের চিহ্নের মধ্যে লাল ওড়নার সঙ্গে বাঁধা বরের চাদরখানা গায়ে জড়ানো রহিল; আর কপালে চন্দন না পরাইয়া মায়ের মন সরিল না। বর সাদাসিদা পোষাক—এমন কি, সাহেবী পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইল। ইহাতে উমাশশীর মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও মুখে তিনি কোন আপত্তি তুলিলেন না। আর পাঁচজনে একটু নিন্দা করিল এবং বলিল—"কনেকেই বা আর আলতা দেওয়া কেন, পায়ে মোজা জুতো দিলেই হতো।"

সাজ শেষ করিতেই কন্যা-বিদায়ের পালা পড়িল। ইহারই ভিতরে অমিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল এবং পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিখানার খানিকটা পড়িয়াই তার মুখখানা হঠাৎ সাদা ফ্যাকাসে হইয়া গেল; এবং সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্যগ্র-আগ্রহে সেখানা শেষ করিয়াই, সেটা রুমালে বাঁধিয়া জ্যাকেটের বুকের মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে বলিয়া তখন তাহাকে সকলেই ব্যস্ত হইয়া ডাকাডাকি বাধাইয়া দিল।

মা বাপ চোখের জলে ভাসিয়া বরের হাতে মেয়ে সঁপিয়া দিলেন। উমাশশীর চোখের জলে দুজনের হাত ভিজিয়া গেল, কিন্তু অমিয়ার চোখে এককোঁটা জলও আর দেখা দিল না। সে শুষ্কনেত্রে মা-বাপের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে আসিয়া গাড়িতে বরের পাশে উঠিয়া বসিল। ভাই-বোনগুলি কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল,—সে তাদের দিকে একবার চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখিল না। যেন এই কোথায় একটুখানি বেড়াইয়াই আবার এক্ষনি ফিরিয়া আসিবে—তার ভাব দেখিয়া এই রকমই মনে হইতে লাগিল।

অনেকেই মনে করিল—"ধেড়ে মেয়ে করে ঘরে রাখা,—বর পেয়ে বর্ত্তে গেছে। মা গো! কত দিনের মত অত দূরে চল্লো—তার মনে এতটুকু কষ্টও কি নেই! খুব মেয়ে দেখলুম বাবু,—অমিয়া!"

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিতেই যতীন একটা শ্বাসগ্রহণ পূর্ব্বক আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"যাক বাঁচা গেল!"

অমনি অমিয়া চমকিত হইয়া তার দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিল। হঠাৎ তার মনে হইল, এই লোককে তার অত সুন্দর মনে হইয়াছিল কেমন করিয়া? সৌন্দর্য্য এর কোন্‌খানটায় আছে? যণ্ডামার্কর মতন চেহারা, গম্ভীর মুখ, আর এই যে কথাটা সে বলিল, এর মানে এই যে, নির্ব্বিঘ্নে এ বিবাহ হইয়া উঠিবে, এ রকম আশাও হয় ত তার মনে ছিল না!

অমিয়ার বুক ঠেলিয়া একটা আর্ত্ত চীৎকার যেন সবেগে তার গলা চিরিয়া বাহির হইবার জন্ত তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। প্রাণপণে সেটাকে দমন করিতে করিতে সে ক্ষণপূর্ব্বের বৃষ্টি দ্বারা কর্দ্দমাক্ত রাজপথের উপরে তার চোখ দুইটাকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। যে তাহাকে প্রবল প্রবঞ্চনা দ্বারা জন্মের মতই মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কাপড়ের অংশটুকু পর্য্যন্ত সে যেন দেখিতে পারিতেছিল না।

ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিতেই টক্ করিয়া যতীন নামিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল,—এই সম্ভাষণে—"এস অমি,—নেমে এস—"

"অমিয়ার শরীরের মধ্যে যেন একটা প্রবল বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়া গেল। সে সেইখানে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া শুধু দৃঢ় স্বরে কহিল—"বড্ড ভিড় যে।"

যতীন কহিল—"তবে তুমি বসো, আমি লাগেজগুলো রেখে আসি, আর দেখে আসি রিজার্ভ দিয়েছে কি না।" এই বলিয়া সে কুলির সাহায্যে মালপত্র লইয়া প্লাটফর্ম্মের ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

পাঞ্জাব মেল দাঁড়াইয়া আছে, সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় দুখানা বার্থ রিজার্ভ দেওয়া রহিয়াছে। যতীন তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া ডাক দিল—"এস অমিয়া!"

গাড়ির ভিতর কেহই নাই! কোচম্যান ভাড়ার জন্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যতীন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কই, মাইজী কাঁহা?"

কোচম্যান উত্তর দিল—"মাইজী তো আপকা পিছাড়ি চলা গিয়া সাব্।"

যতীন মনে করিল, একলা থাকিতে ভয় পাইয়া অমিয়া তাহার সঙ্গেই গিয়াছিল,—ভিড়ের মধ্যে সে অত লক্ষ্য করে নাই। গাড়িওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল, এমন কি, সেই বার্থ-রিজার্ভ-করা কামরার ঢুকিয়া পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিল; কিন্তু অমিয়ার কোন অস্তিত্বই কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। বিস্মিত যতীন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেও, তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ছুটিয়া তার হারানো জিনিষ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। পাঞ্জাব মেল ছাড়িবার আর বেশি বিলম্ব নাই।

লম্বা গাড়িখানার প্রত্যেক কামরায় উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সমস্ত প্লাটফর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া কোথায়ও অমিয়াকে পাওয়া গেল না। তখন ঘোর দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া যতীন গাড়ি হইতে তাদের মাল নামাইয়া লইল এবং পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তার বিশ্বাস হইল, কোন দুর্ব্বৃত্ত লোক নিশ্চয়ই তাহাকে কোনরূপে সরাইয়া ফেলিয়াছে।

একটী কুলি হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম মেয়েমানুষকে আপনি খুঁজছেন বলুন দেখি? একটী রাঙ্গা-শাড়ী-পরা কনে-বউ একটা ভাড়াটে গাড়িতে উঠে হুগলী যেতে বলে দিলে আমি দেখেছি।"

প্রশ্ন করিয়া করিয়া যতীন বুঝিল, সেই কনে-বউটাই তার স্ত্রী অমিয়া। কিন্তু এ কি প্রহেলিকা! হঠাৎ অমিয়া এমন অদ্ভুত ভাবে তাহাকে ছাড়িয়া লুকাইয়া পলাইয়াই বা

যাইবে কেন? ইহার কারণ কি? হয়ত বাড়ীর লোকদের ছাড়িয়া আসিয়া তাদের জন্ত মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া তাহাকে এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে! মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্তি বোধ করিতে থাকিলেও যতীনের সেই সম্ভনীড়ভ্রষ্টা বিরহ-বিধুরা কিশোরীর প্রতি একটু করুণাও যে মনের মধ্যে না জাগিল, তাহা নহে। সে মনে মনে বলিল, হয়ত ওঁরা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করেই পাঠাচ্ছিলেন, তা না করে আমায় বল্লেই হতো। তবে আমি তো এ কথা আগেই বলেছিলুম! অনর্থক হায়রান, কতকগুলো টাকারও শ্রাদ্ধ।

হুগলী যাওয়ার কথা শুনিলেও সে সেটা খেয়াল না করিয়া চুঁচুড়ায় নিজের পিত্রালয়েই অমিয়ার ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় করিয়া সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৮

বর-কনে বিদায়ের পরই আত্মীয়-কুটুম্বগণ প্রায় সকলেই যে যার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। কেবল উমাশশীর বড় ভাজ ও ইন্দ্রনাথের ভগিনী উমাশশীর কান্নায় গলিয়া বাড়ীর বাহির হইতে পারেন নাই। মেয়ে পাঠাইয়া দিয়া উমাশশী বড় বেশি রকমই কাঁদাকাটা করিতেছিলেন।

ইন্দ্রনাথেরও মনটা ভাল ছিল না,—বাহিরের ঘরে চুপটী করিয়া বসিয়া থাকা ভাল লাগিতেছিল না,—উপরে যাইবেন বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় একখানা গাড়ি দাঁড়াইবার শব্দ হইল ও একটু ক্ষণমাত্র পরেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল যতীন্দ্র।

"এ কি—তুমি! ফিরে এলে যে?"—বলিয়াই ইন্দ্রনাথ কিছু ভীত বিস্মিত চমকিত ভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন—অমিয়ার কি কোন অসুখ করিল না কি?

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—"অমিয়া এখানে ফিরে এসেছে?"

ইন্দ্রনাথের মুখ সাদা হইয়া গেল—"অমিয়া এখানে ফিরে আসবে? এ কথার মানে কি যতীন?"

যতীনকে এইবার একটু বিপন্ন দেখাইল। সে উত্তর করিল—"যদি সে এখানে না এসে থাকে, তাহলে এর মানে যে কি, তা আমি নিজেও তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

ইন্দ্রনাথবাবুকে ভূতাহতের মতই দেখাইল। তিনি থর-থর করিয়া কাঁপিয়া একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তভাবে কহিয়া উঠিলেন—"কি হলো কি, কেন তুমি তাকে একলা ফেলে চলে এলে? কোথায় গেল সে? ও যতীন! কি করলে তুমি তাকে?"

যতীন যতটুকু জানিত, সেইটুকুই সে বলিল। শুনিয়া ইন্দ্রনাথবাবু যেন ঝড়ে-ভাঙ্গা গাছের মতই হেলিয়া পড়িলেন।

"তাহলে কি হবে! কি করি এখন?"

যতীন শ্বশুরের মত অধীরতা দেখাইল না, সে স্থিরভাবে কহিল—"আপনি একবার ওঁকে ডাকুন দিকি, মা হয়ত এর কোন কারণ খুঁজে পেতে পারেন।"

তাহাই হইল। কিন্তু উমাশশী ব্যাপার শুনিয়া যেরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া দায় হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হয়ত তাকে চোরে ডাকাতে মন্দ লোকে ধরে নিয়ে গিয়ে এতক্ষণে মেরেই ফেল্লে! কি বলে তুমি তাকে অমন করে একলা ছেড়ে চলে গ্যালে। কেন মরতে আমি সঙ্গে লোক দিলুম না।"

স্বামীকে বলিলেন—"তোমারই বা কি আক্কেল যে বিয়ের কনে নিয়ে যাচ্ছে, তুলে দিতে সঙ্গে গেলে না বা একটা চাকর পাঠালে না,—হ্যাঁগা, সে ওয়েটিংরুমে বসে নেই ত?"

যতীন ঘাড় নাড়িল। তার পর বলিল—"না—সে আমি সব দেখেছি। তাছাড়া কুলি যে তাকে গাড়ি ভাড়া করে হুগলীর দিকে আসতে দেখেছে।"

উমাশশী কাঁদিয়া বলিলেন—"ঐ কুলিই যে ডাকাতদের কেউ নয়, তাই বা তোমায় কে বল্লে? সে কি না সেই মেয়ে যে নিজে গাড়ি ভাড়া করে চুপি চুপি পালিয়ে আসবে।"

ইন্দ্রনাথবাবু চিন্তাগম্ভীর মুখে মন্তব্য করিলেন—"তাও অসম্ভব নয়। আজকাল তো কত রকমই শোনা যায়।"

উমাশশী কাঁদিতে কাঁদিতে জামাইকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা সেই কুলিটা কি মুসলমান? ওরে অমিয়া মা রে! ওরে তোর কি দুর্দ্দশা হলো রে মা—" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, ইন্দ্রনাথবাবু তাঁহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন,—"করচো কি! এক্ষনি লোক জড় হয়ে যাবে যে!—"

এই সময়ে যতীন কিছু কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনারা কি তাকে তার অমতে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন? আমায় কি তার পছন্দ হয় নি?"

ইন্দ্রনাথ কি উত্তর দিতে গেলেন, তাহার পূর্ব্বেই উমাশশী কান্না থামাইয়া সবেগে বলিয়া উঠিলেন—"এ কথা তুমি কেন মনে করচো যতীন! তোমায় সে খুব খুসী হয়েই বিয়ে করেছিল। বরং অনেক দূরে নিয়ে যাবে বলে আমরা ইতস্ততঃ করেছিলুম,—তোমার শ্বশুর নিজেই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'তোমার কি কোন আপত্তি আছে?' তাতে দিব্যি হাসিমুখেই ও জবাব দেয় যে, 'না—না—না'। সে তুমি ভেবো না, তোমায় ওর খুবই পছন্দ হয়েছিল। আহা, মায়ের আমার মুখে আনন্দ যেন খেলা করে বেড়াচ্ছিল। তোমায় দেখবার আগে বরং যত সম্বন্ধ এসেছে, বিয়ে করবো না বলে হাঙ্গামা করতো।"

যতীন এতক্ষণের পর এইবার একটু অধীরতা প্রকাশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"তাহলে, ব্যাপারটা যে কি ঘটলো, আমি যদি এর একটুও কিছু বুঝতে পারচি! হয়ত এর মাঝখানে আর কেউ—আর কোন লোক—"

ইন্দ্রনাথবাবু রোষ-গম্ভীর স্বরে বাধা দিলেন—"আমার ফুলের মতন পবিত্র মেয়ের সম্বন্ধে ও ভাবে কথা বলো না যতীন! সে আমার দেবতার মতন শুদ্ধ,—"

উমাশশী অস্ফুটস্বরে পুনশ্চ কাঁদিয়া উঠিলেন—"ওরে মা আমার! কেন তোকে আমি বিয়ে দিলুম; কোথায় গেলি আমার মা?"

যতীন্দ্রনাথ ফাঁপরে পড়িয়া নত-মস্তকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তার এক দিনের সম্পর্কে সম্পর্কিত শ্বশুর-শাশুড়ীর রাগ দুঃখ নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। ব্যাপারটা যা দাঁড়াইয়াছে,—তাহাতে নিরপরাধেও তাহাকেই যেন অপরাধী হইতে হইয়াছিল।

এই সময় বাহিরে বাইসিকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ও টেলিগ্রাফ পিয়ন ডাকিয়া বলিল—"তার হ্যায়।"

ঘরের মধ্যেকার কয়জনেই চমকিয়া উঠিলেন ও যতীনই প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া সই দিয়া টেলিগ্রামটা লইয়া আসিল। ইন্দ্রনাথবাবুর নামেই সেটা আসিয়াছিল। সে তাঁহার হাতেই উহা প্রদান করিল।

ইন্দ্রনাথবাবু কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া সেটা পাঠ করিলেন। উমাশশী চোখ মুছিতে মুছিতে অধীর কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"কোথাকার তার? কে কি লিখেছে? অমিয়ার কোন খবর এলো কি? কোথায় আছে সে? পড়ো না কি লিখলে?"

"তুমি একটু থামলে তবে তো পড়বো" বলিয়া ক্রোধভরে ইন্দ্রনাথবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বিরক্তি-কঠিন স্বরে পড়িতে লাগিলেন—

"Have received information ab ut J's charac ter and past life. I am upset. Don't be anxious about me."

যতীন্দ্রনাথ সবেগে বলিয়া উঠিল—"আমার চরিত্র ও গত জীবন সম্বন্ধে সংবাদ পেয়েছে কেন? আমার চরিত্রের কি অপরাধটা হলো? কি আমি করলুম?"

উমাশশী কহিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়ই সে পাগল হয়ে গ্যাছে!"

ইন্দ্রনাথবাবু টেলিগ্রামখানা চার-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া, টুকরাগুলাকে পাকাইয়া ফেলিয়া দিয়া, ঘরটার এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত পাইচারী করিয়া আসিলেন ও তার পর স্ত্রীর সামনে আসিয়া মুখ খিঁচাইয়া—"কেমন! মেয়েদের আর লেখাপড়া শেখাবে?—পাশ করাবে না?—"ভীষণ স্বরে এই কথাটা বলিয়াই আবার ঘরটার আর এক মুড়ায় চলিয়া গেলেন। এর চেয়ে বেশি কোন কথা বলিবার মত শক্তি তাঁর মধ্যে তখন ছিল না।

উমাশশী বলিলেন—"তারটা কোথা থেকে করেছে? নৈহাটী থেকে? তাহলে যতীন! এক্ষনি তুমি একবার বাবা! নৈহাটীতেই না হয় চলে যাও,—সেখানে গেলে নিশ্চয়ই একটা কোন সন্ধান টন্ধান পাওয়া যেতে পারবে, —আর তাহলে—"

ক্রোধে ক্ষোভে ও বিরক্তিতে অধীর-প্রায় হইয়া উঠিয়া জামাতা যতীন শাশুড়ীর এই সৎযুক্তির বিরুদ্ধে নিতান্ত রূঢ়বাক্যেই প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—"আমি যাব না, আমি আপনাদের মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথাতেই আর থাকতে চাই নে,—তাকে বিয়ে করে আমার যথেষ্ট সুনাম বেরিয়েছে,—আমি চল্লুম!"

জামাইএর মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্রে উমাশশীর সমস্ত দুঃখ চিন্তা ও ভয় অশ্রু আর একটা আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরতর আশঙ্কা ও লজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কাতর মিনতির

সহিত সাতঙ্কে কহিয়া উঠিলেন—"অমন কথা বলো না যতীন! সে তোমার প্রথম দেখেই মনে মনে তোমায় পছন্দ করেছিল; তুমিও তাকে দেখে শুনেই বিয়ে করেছ। নিশ্চয়ই কোন মন্দ লোক এর ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে,—হয়ত তোমাদের বেরুবার আগের সেই চিঠিখানাতেই এই খবর সে পেয়েছে। নিশ্চয়ই তাই! সেই জন্যেই যাবার সময় সে যেন কেমন একরকম হয়ে গেছলো! তার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না। এখন আমি বুঝতে পারছি—সেই চিঠিই এই কাজ তাকে করিয়েছে।"

এই বলিয়া স্বামীর দিকে ফিরিলেন—"হ্যাঁ গা, তুমি তো জানো, মন্দ স্বভাবের উপর তার কি বিষম ঘৃণা! বিয়ের আগে সে আমাদের কতবার করেই এই কথা বলেছিল!"

ইন্দ্রনাথবাবুর মনের মধ্যে তখন ক্রোধ লজ্জায় বিমিশ্র যে বিচিত্র ভাব বর্ত্তমান, স্ত্রীর এই সাক্ষী মানাতে তাহাতে যেন স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত হইল! তিনি বারুদের স্তূপের মতই ফাটিয়া পড়ার ভাবে তাহার দিকে ফিরিলেন—"গোল্লায় যাও তুমি, আর গোল্লায় যাক্ তোমার সেই পিউরিটানীক মেয়ে! বেটী লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়ে উঠেছেন! সত্যপীর ঠাকুরের মেয়ে!"

উমাশশী স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া ও সম্ভাষণ শুনিয়া একেবারে আকাট্ হইয়া রহিলেন। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কি জন্যে যে "গোল্লায়" যাইতে বাধ্য হইলেন,—এই প্রশ্নটা তাঁর মনে জাগিলেও মুখের দিক দিয়াও আসিল না। চোখে শুধু খানিক জল আসিল।

৯

অমিয়ার বিবাহের পরদিন,—রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজে,—অমিয়ার ছোট মাসি পূর্ণিমাদেবী তখনও তাঁর জপের মালা হাতে লইয়া পূজার ঘরের জানালাটীর কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। জপ সমাধা হইয়া গিয়াছিল, উঠি উঠি করিয়া তখনও উঠিয়া পড়া ঘটিয়া উঠে নাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির সহিত একটু জোর বাতাসও থাকাতে, পূর্ণিমার ছোট্ট বাগানটীর গাছপালাগুলি একটু এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে। মালতি-লতাটা ফটকের মাথা ছাড়িয়া তার আসে পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। নেবুগাছের কতকগুলি পাকা নেবু—ছিঁড়িয়া পড়িয়া মাটী-মাখা হইয়া রহিয়াছে। আর তুলসী-কুঞ্জটীরও কতকটা দুর্দ্দশা ঘটাইয়া দিয়াছিল। পূর্ণিমা জানালার ভিতর দিয়া সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিলেন,—সকালবেলা পূজা পাঠ শেষ করিয়াই এই গুলিকে ঠিক করিয়া ফেলিতে যাইবে।

এমন সময় একখানা ট্যাক্সিগাড়ি আসিয়া তাঁর ফটকের সাম্নে দাঁড়াইল।

এমন সময় কে আসিল, বুঝিতে না পারিয়া তিনি তখন তাড়াতাড়ি মালা তুলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিলেন! বাড়ীতে বেশি লোকজন তো নাই। বিধবা পূর্ণিমাদেবী স্বামীর স্মৃতিভরা গৃহটীর মায়া ছাড়িতে না পারিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরও এইখানেই বাস করিতেছেন। কাছে থাকে তাঁর একটী ভাসুর-পো। ছেলেটী বি-এস্‌সি পড়ে। রাত্রি অধিক হওয়ায় সে এখন উপরের ঘরে নিদ্রা যাইতেছে। যে ঝি আছে, সেও ঘুমাইতেছে। শুধু পূর্ণিমাদেবীই একা সন্ধ্যা পূজা জপ পাঠ লইয়া জাগিয়া থাকেন,—আজও আছেন। নিদ্রাহীন শয্যাতলে পড়িয়া কেবল দুশ্চিন্তায় কাতর হওয়ার চেয়ে মনস্থির রাখিবার একান্ত উপায়রূপেই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দরজা খুলিয়া দিতেই ছুটিয়া আসিয়া একটী মেয়ে তাঁহাকে দুহাতে সবলে জড়াইয়া ধরিল। অমনি বিস্মিতা পূর্ণিমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি! এ কি! অমিয়া তুই! তুই আজ এখানে কেন?" তাঁহার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল…"কি হয়েছে? কি হলো রে অমিয়া! তুই কেন এমন করে এখানে চলে এলি!"

অমিয়া মাসীকে ছাড়িয়া দিয়া সহজভাবেই জবাব দিল—"কিছুই হয়নি মাসিমা! সমস্ত পৃথিবীর আক্রমণ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার একটুখানি জায়গার দরকার হয়েছিল, তাই সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কত্যাগী তোমার কথাই মনে পড়ে গেল,—আমায় থাকতে দেবে মাসিমা?"

আকস্মিক এই অভাবনীয় সাক্ষাতের একান্ত দুশ্চিন্তা-জড়িত বিস্ময়ের আঘাত হইতে পূর্ণিমা দেবী তখনও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার বুকের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন চলিতেছিল, তাহার প্রভাবে তাঁহার গলা কথা কহিতে গিয়া স্পষ্টই কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি যথাসাধ্য সংযমের চেষ্টা করিয়া তিনি

কহিলেন "থাকো না মা! কিন্তু তোমার যে কাল বিয়ের দিন ছিল অমিয়া! কি হলো? বিয়ে কি হয়েছে? ওই না…সিঁথিতে তোমার সিঁদুর লেপা! তবে, এ কি?"

"তবে এস মাসিমা! সব কথা না শুনলে তুমি কিছুতেই স্থির হতে পারবে না। চল, একটা ঘরে চল। আমিও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারচি না, একটু শুয়ে পড়বো।"

স্তব্ধ নির্জ্জন ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়া উভয়ে একটা জনহীন কক্ষের মধ্যে আসিয়া বসিল। সে ঘরে একখানা তক্তাপোষের উপর একটা বিছানা পাতা ছিল। অমিয়া আসিয়া তার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। পূর্ণিমা দেবী উৎসুক ও উদ্বিগ্নচিত্তে তার মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া গভীর ভাবে একটা শ্বাস টানিয়া লইলেন,—এ মেয়ের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া তাঁর যেন প্রাণ উড়িয়া যাইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"হরি! আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে ভাল লাগে না বলে যে ওর বিয়েতে আমি যাই নি, এ কি তারই শোধ আমায় দিতে ওকে এমন অদ্ভুত ভাবে আমার কাছে এনে দিলে!…"

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া তিনি আর ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিলেন—"অমিয়া!"

"এই যে মাসিমা! এই দেখ—এই চিঠিখানা পড়ে দেখ,—দেখে তার পর আমার বিচার করো। এই চিঠি আমি বাড়ী থেকে বেরুবার সময় পাই। পেয়ে সারাপথ ধরে কেবল ভেবেছি,—এই রাক্ষসের হাত থেকে কেমন করে মুক্ত হবো! মাকে কিছু বলিনি,—জানতুম, বলে কোনই ফল নেই। মা জানেন, মেয়েরা পুরুষের পদসেবার অধিকার মাত্র নিয়ে এ পৃথিবীতে জন্মাতে এসেছে। তাদের ছাগল তারা যদি ল্যাজের দিক দিয়ে কাটে, আপত্তি করবার কি আছে? কিন্তু না, আমি তা' সইতে পারবো না। কুচরিত্র মাতাল স্বামীর স্ত্রী হয়ে চিরকাল ধরে জলে মরবার সাধ আমার মোটেই নেই! তার চেয়ে আমি একবার মাত্র মরতে রাজী আছি। মরবোই ভেবেছিলুম, হঠাৎ বাঁচতে সাধ গেল,… আর তোমার কথা মনে পড়লো।…তাই চলে এলুম…"

পূর্ণিমাদেবী চমকিয়া সভয়ে অমিয়ার মাথায় হাত দিয়া "হরি দীনবন্ধু!" উচ্চারণ পূর্ব্বক, সস্নেহে উত্তর করিলেন—"সে বেশ করেছিস মা!…কিন্তু এমন না করে তুই…"

অমিয়া তাঁহাকে মাঝখানেই বাধা দিল—"না মাসিমা! তা বলো না, এ ছাড়া আমার পথ ছিল না। সেই চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে সুদূর রাজ্যে চলে গিয়ে আর আমার মরণ ভিন্ন মুক্তির কি উপায় ছিল?"

এ যুক্তি অকাট্য! পূর্ণিমা চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"কিন্তু মা! হিন্দুর ঘরের মেয়ে তুমি, স্বামীর পূর্ব্ব চরিত্রের খুঁৎ নিয়ে যদি জন্মের মতন স্বামীর সঙ্গে কাটা-ছেঁড়া করে ফেলো, তাহলে তোমার এ জন্মটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে! লোকে এতে তোমাকেই নিন্দে করবে। ছেলে মানুষ এখন বুঝতে পারচো না,—মনের ঝোঁকে এত-বড় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে চিরজীবন ধরেই হয় ত অনুতাপ করে খুন হবে।"

এ কথা শুনিয়া অমিয়া উঠিয়া বসিল। তার সমস্ত অবসাদ যেন এক মুহূর্ত্তে চলিয়া গেল। সে সবেগে বলিয়া উঠিল—"আর যা বলো তা বলো মাসিমা,—অন্যায় কাজ এটাকে তুমি বলো না! তুমি কি নিজে জানো না যে, আমি কিছু অন্যায় করি নি! আমাদের দেশের সতী-স্ত্রীরা আমারও খুব শ্রদ্ধার পাত্রী, কিন্তু তাঁরা নিজেরা খুব বড় হলেও তাঁদের স্বামীদের তাঁরা নেহাৎ যে ছোট করে রাখেন, সে পাপ তাঁদের নিশ্চয়ই বিধাতার দরবারে ক্ষমার্হ হয় না। তা যদি হতো, তাহলে পরলোকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, ইহলোকেই একটু প্রকাশ্যভাবে তাঁরা তাঁদের অতবড় মহত্ত্বের একটুখানি ফল লাভ করতে পারতেন। তা' না হয়ে চিরদিন ধরে দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দান করে লাথি জুতো ভিন্ন তাঁদের আর কি জুটেছে? কতকগুলি রোগগ্রস্ত নীতিজ্ঞানশূন্য সন্তান নিয়ে দুঃখকষ্টে অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত হয়ে পলে পলেই মরার বাড়া হয়ে তাঁদের সহিষ্ণুতার পুরস্কার তাঁদের লাভ করে যেতে হয়। এই পাপের অত্যাচারের প্রশ্রয় দানই যদি সতীধর্ম্ম হতো, তাহলে এরকমটা ঘটতো কি? তার পর ঐ সমস্ত মন্দ লোকদের সন্তান হয়ে মন্দ লোকের সংখ্যা, রুগ্নর সংখ্যা বর্দ্ধিত করা, সেও কি একটা কম পাপ না কি? না মাসিমা! লোকে আমার নিন্দা করে করুক, ওরকম জীবন যাপন করতে হলে, আমার নিজের বিবেকই আমার এই সব লোকদের চাইতে ঢের বেশি বেশি নিন্দা করতো। নিজের ওপরে আমার ঘৃণার আর অন্ত থাকতো না। সেটা থেকে তো বেঁচে থাকবো।"

"আকুল হইয়া বনে বনে ঘুরি—
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম" রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী— শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

পূর্ণিমা বোনঝির যুক্তির সহিত পারিয়া না উঠিয়া শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি জানি মা!…"

অমিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"কেমন করে জানবে মাসিমা! মন্দ লোকের হাতে তো তুমি পড়ো নি। তুমি জানবে কিঁ করে, কি তার জ্বালা! মেসমশাই আমার খুবই ভাল ছিলেন, আজও তাঁর স্মৃতিতে তোমার বুক ভরা। তাঁর ছবি, তাঁর খড়ম তুমি নিত্য পূজা করো দেখে গেছি। তুমিই বল দেখি, এ যদি তুমি না পারতে, তাহলে তোমার আজ কি হতো?"

পূর্ণিমা পুনশ্চ যুক্তিহারা হইয়া গিয়া ছাড়াছাড়া ভাবে আরম্ভ করিলেন—"কিন্তু চিরদিন ধরে হিন্দু সতীর এই নির্ব্বিচার আত্মসমর্পণের জন্য তার গৌরবের অন্ত নেই। স্বামীকে দেবতা ভেবেই স্ত্রী তার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে যে তৃপ্তি যে আনন্দ লাভ করতো, এত যুক্তি-তর্ক-বিচারে কি সেটুকু আর পাবে? দেখ—শাস্ত্রে আছে, কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীর অসদিচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য সতী স্ত্রী তাকে নিজে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল—"

অমিয়া তীব্র কঠিন কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"সেই দিনই সে তার সমস্ত জাতের সর্ব্বনাশ করেছিল মাসিমা! সেই দিনেই সে সব মেয়েদের মেরে রেখে গ্যাছে! অতবড় নির্লজ্জ পাষণ্ড স্বামীর পাশবিকতাকে সমর্থন করে সে না হয় নিজের সমস্ত ইজ্জতকে নষ্ট হতে দিলে, দিক, কিন্তু সেই অভাগা স্বামীটারই বা এতে কি উপকার সে হতে দিলে বল ত? মহানির্ব্বাণতন্ত্রের কতকগুলি শ্লোক আমি পড়েছিলুম। তাতে বলেছে—

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাৎচুদ্ধরতেবিলাৎ।
তদ্বদ্‌ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে।

সাপুড়ে যেমন সাপকে জোর করে গর্ত্ত থেকে টেনে বার করে আনে, তেমনি করে স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে তার সহিত আনন্দে যাপন করে। এতে তো কই বল্লে না যে, স্বামীর সঙ্গে গর্ত্তের ভিতর সর্পধর্ম্মী হয়ে দুজনে বাস করে। না, মাসিমা! সতীধর্ম্ম একে বলে না যে, অসৎ স্বামীকে তার পাপে প্রশ্রয় দিয়েও তার সঙ্গে ঘর করা। এই করে করেই এ দেশের মেয়েরা পুরুষদের এতখানি উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে,—এ কি তুমিই 'না' বলতে পার?"

বাস্তবিকই পূর্ণিমা দেবী ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। অমিয়া যাহা বলিতেছে, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার তাহার সমর্থন করিতে গেলেও ভীষণ সামাজিক বিপ্লব। অসতী স্ত্রী লইয়া স্বামী ঘর করিতে নারাজ। বহু স্থলে নিতান্ত বাল্য-পাপের জন্য চিরজীবনের মতই অভাগিনী স্ত্রী স্বামীত্যক্তা হইয়া জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। তার সারা জীবনের প্রায়শ্চিত্তে সে পাপের সংশোধন ঘটে না। অপর পক্ষে নষ্ট-চরিত্র একান্ত অসৎ স্বামীর সকল অত্যাচার স্ত্রী যদি নির্ব্বিবাদে না সহিতে চাহে, তাহা হইলে সমাজও তাহার প্রতি খাঁড়া উঁচাইয়া খাড়া হয়। অন্যে ত ইহার প্রতিকার-চেষ্টা করেই না, সে নিজে করিতে গেলেও দোষী হয়। অমিয়া যাহা বলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। তথাপি, লোক-নিন্দাকেও তো তুচ্ছ করা যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কহিলেন—"কিন্তু অমিয়া! সে যখন মন্দ ছিল, তখন সে ত তোমায় জানতো না। তুমি এখন চেষ্টা করে তাকে ভাল করে নিতেও তো পার! আমার মনে হয়, আমার স্বামীকে যদি আমি কোন রকমে ফিরিয়ে পেতুম, তিনি যদি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পাপীও হতেন, আমি ক্ষমা করতে পারতুম। স্বামী হারানই সবচেয়ে কষ্ট,—তার কাছে আর কোন কষ্ট, কষ্টই নয়।"

অমিয়া একটুখানি সকরুণ হাসি হাসিল—"মাসিমা! ওটা তুমি ভাবের মুখে বলচো, আর অভিজ্ঞতা নেই বলেই বলচো। আর ঐ যে বল্লে ভাল করে নিতে, তা' মন্দকে ভাল করা কি বড় সোজা কথা? কখন কি কেউ তা পারে? তার পর সম্পূর্ণরূপে তার হাতে গিয়ে পড়লে তখন কি আর ভাল করবার কোন পথ থাকে? তাছাড়া, পাপের আর ভূত ভবিষ্যৎ নেই,—যে পুরনো পাপী সে কি সম্পূর্ণরূপে তার অভ্যাসকে ছাড়তে পারে? সুযোগ পেলেই আবার কুপ্রবৃত্তি জোর করে, যদি না ভিতর থেকে নিজেই অনুতপ্ত হয়। আরও দেখ, পরে ভাল হলেও তার চরিত্রের মন্দটা তার ছেলেদের মধ্যে যে দেখা দেবে না, তা তো বলা যায় না।"

এবার পূর্ণিমা দেবী সহজেই বলিলেন—"তা কি বলা যায়! কত মন্দ লোকের ভাল ছেলে, আবার কত ভাল লোকেরও মন্দ ছেলে হয় যে।—"

অমিয়া কহিল—"খবর নিলেই জানতে পারবে যে, ঐ ভাল লোকের শ্বশুরবাড়ীর দিকটা মোটেই ভাল নয়। মন্দ

লোকের বেলাও তার পিতৃবংশ বা মাতৃবংশে বিশেষ ভাল লোকের সংস্পর্শ দেখতে পাবে। শুধু ভাল থেকে মন্দ বা শুধু মন্দ থেকে ভাল হয় না।"

হার মানিয়া পূর্ণিমা কহিলেন—"আচ্ছা যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে। এখন শুধু ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের চিঠির উপর নির্ভর করে তো এত বড় কাণ্ডটা বাধালে হবে না। আমি ভোরে উঠেই মৌলীকে দিয়ে একটা তার করে দেওয়াবো। জামাই নিজেই যদি একবার এখানে আসেন, সেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হবে। তাকেও তো একটা জবাবদিহি করতে দিতে হবে আমাদের।"

অমিয়া মাসির কাছে সভয়ে সরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল—"আমায় জোর করে নিয়ে যেতে দেবে না বলো? আমি এইটুকু আশা করে শুধু তোমার কাছে এসেছি। না হলে মার কাছেই যেতুম।"

পূর্ণিমা তাঁহার গায়ে জড়ানো ভীত ত্রস্ত পাখীটির মত ভয়ার্ত্ত বালিকাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া প্রতিজ্ঞা-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"যদি তুমি নিজে যেতে না চাও, আমি নিয়ে যেতে দোব না, কথা দিলুম।"

১০

টেলিগ্রাম ইন্দ্রনাথ বাবুকে পাঠানো হইল, এবং উমাশশীকে পত্র লেখা হইল। পরদিন পত্রোত্তর আসিল। উমাশশী পূর্ণিমার পত্রের উত্তর দিয়া সেই সঙ্গে অমিয়াকেও লিখিয়াছেন।—

কল্যাণবরেষু

তোমায় যে কি বলিয়া পত্র লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না! এমন মেয়ে তোমাকে আমি গর্ভে ধরেছিলাম যে, লোক-সমাজে আমার মুখ দেখানই দায় হইয়া উঠিবে। এ কথা আর ক'দিন চাপা থাকিবে! তার পর লজ্জায় অপমানে তোমার বাপ পাগল হইয়া যাইবেন, আর আমি আত্মঘাতী হইব। তোমার বোনেদের কোন ভদ্রলোকেই আর বিবাহ করিতে ভরসা করিবে না। কে এমন নির্লজ্জ আছে যে, স্ত্রীর হাতে এমন করিয়া অপমানিত হইতে চাহিবে?

তুমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী হইয়াছ; নির্ব্বোধ বা শিশু নও। হিন্দু বিবাহ যে ফিরাইয়া লওয়া যায় না, তাহা ভালই জানো। আর জানো, তোমার স্বামী ইচ্ছা করিলেই কালই আবার আর একজনকে বিবাহ করিতে পারেন। তবে জানিয়া শুনিয়া নিজে জন্মের মতন দুর্ভাগা হইবার ব্যবস্থা করিতেছ কেন? এখনও মাথা বুদ্ধি স্থির করিয়া ভালয় ভালয় ফিরিয়া এস। হয়ত এখনও যতীনকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করাইতে পারিব। যত দেরি হইবে, তোমার ভবিষ্যৎ ততই বেশি সঙ্কটাপন্ন হইতে থাকিবে, ইহা নিশ্চিত জানিও। তখন তোমার মা বাপ ছাড়িয়া স্বর্গের দেবতারা নামিয়া আসিলেও আর তোমার অদৃষ্ট ফিরাইতে পারিবেন না। চিরদিনটা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেই জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে। হয়ত তুমি বলিবে—লেখাপড়া শিখিয়াছ, চাকরী করিয়া খাইবে। চাকরী ত ভারি,—বড় জোর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় টিচারী করিবে, এই বৈ ত নয়? তাই বা কত চাকরী কে লইয়া বসিয়া আছে!

তার চেয়ে অমিয়া, এখনও কথা শোন,—নিজের নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধির জন্য অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর কাছে ক্ষমা চাও। সে লোক ভালই, এখনও হয়ত ক্ষমা করিতে পারে। তোমার বাপ বলেছেন,—যতীন তোমায় ক্ষমা না করিলে তিনিও করিবেন না, তোমার মুখ জীবনে আর কখন দেখিবেন না, এই বুঝিয়া কাজ করিও। —তোমার মা

চিঠি পড়িয়া অমিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ অনড় হইয়া বসিয়া রহিল। এ চিঠির প্রতি বর্ণে তার মায়ের নয়, বাপের প্রচণ্ড শাসন মাত্র প্রকটিত হইতেছে। যে প্রতারক মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহার নারীজন্মটাকে বৃথা করিয়া দিল,—সমস্ত সহানুভূতি সেই তাহারই উপরে! আর সেই প্রবঞ্চকের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতেছে বলিয়া সে-ই হইল মহা অপরাধী! সমাজ আমাদের এই রকমই বটে! সে কারণ দেখে না, দেখে কার্য্য! কিন্তু তার ফল দেখে না! ভগবানের নৈষ্ফল্যের বাণী এই রকম করিয়াই হয়ত পালন করে।

পূর্ণিমা আসিয়া চিঠি পড়িলেন ও বলিলেন—"তাহলে কি করবে? দেখচো ত তোমার বাবা কি রকম রাগ করেছেন?"

শুষ্ককণ্ঠে অমিয়া উত্তর করিল—"বাবা যে রাগ করবেন, সে ত আমি জানতুমই। তবে আমার মাকে দিয়ে যে সেটা প্রকাশ করবেন, সেটা আমি ভাবিনি। কিন্তু এইটেই আমাদের দেশের পক্ষে স্বাভাবিক! মায়েরাও তো মেয়েদের এই শিক্ষা পরম্পর দিয়ে এসেছেন। যতই লাঞ্ছনা করুক,

স্বামীর পাদোদক পান না করে জলগ্রহণ করবে না, কারণ, পতি পরম গুরু !"

পূর্ণিমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—"ছি ! অমিয়া ! এক জনের দোষে তুমি জাতিগত ভাবে এরকম বলো না।"

অমিয়া কিছু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল—"তা তো আমি বলি নি মাসিমা! তবে আমি বলছি, আত্মসম্মান জিনিষটাকে কি এমন করে জড় মেরে দিতে হয় ? যেমন পুরুষরা অসতী বর্জ্জন করে চলে, মেয়েদের বেলাও সেরকম বিধান থাকা কি অসঙ্গত ?"

পূর্ণিমা কহিলেন—"পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মন ক্ষমা ও স্নেহপ্রবণ ; সেই জন্যই তারা সইতে পারে।"

অমিয়া দুঃখের ক্ষুব্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, "বেশ ত, যাদের তেমন ভাল মন, তারা সহ্য করুক ; যাদের তা' নয়, তাদের প্রতি জোর করবার দরকার কি ?"

মায়ের পত্রের উত্তরে সে তার সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিল। শেষে লিখিল, "পাশের বাড়ীতে যে অভিনয় নিত্য দেখিতেছ, তা' দেখিয়াও তোমাদের মাতাল কুচরিত্রের হাতে মেয়ে দিতে ভয় হয় না মা! তাই যদি না হয়, তবে মেয়ে মরিলেও হয় ত দুঃখ না হইতেও পারে। মনে করিও—তোমার অমিয়া মরিয়া গিয়াছে। জীবন্মৃত থাকিয়া হীনের সহিত হীন হওয়ার চেয়ে, সে দুঃখও আমার সহ্য হইবে! আমি কত দিন হিতু-অনুজাকে তাদের অত্যাচারী বাপের মৃত্যুকামনা করিতে শুনিয়াছি। শান্ত সহিষ্ণু মল্লিকদের সেজ বউকে বলিতে শুনিয়াছি—'এমন স্বামী থাকার চেয়ে বিধবা হওয়া ভাল!' না, মা! আমার আর ঐ দেখা দৃশ্যের পুনরভিনয়ে প্রবৃত্তি নাই। এখন আমি একটা মানুষ—ত্রিশ চল্লিশ ছেড়ে কুড়িটা টাকা হলেও আমার চলে যাবে। না হয়, তাঁত বুনিতে শিখিব, সুতা কাটিব। আমার শতকোটী প্রণাম তোমরা জানিও। আর যদি পার, তবে আমার এই মুখরতার জন্য আমায় ক্ষমা করিও।"

অমিয়া সেদিন যে চিঠি পাইয়াছিল তাহা এই—

মহাশয়া ! নিতান্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি যে, অর্থলোভে আপনার মা বাপ যাহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতেছেন, তিনি মনুষ্যনামের নিতান্তই অযোগ্য ! আপনার মত বিদুষী পুণ্যবতী নারীর পবিত্র প্রেমের তিনি একেবারেই উপযুক্ত পাত্র নহেন। অধিক আর কি লিখিব, তিনি মদ্যপ ও অতিশয় কুচরিত্র। তার চরিত্রহীনতার জন্যই এতদিন বিবাহ হয় নাই। পরিচিত কেহই অতবড় অপাত্রে কন্যাদানে সম্মত হইতে পারে কি ? সেইজন্যই এত তাড়াতাড়ি করিয়া এখানে নিজে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া গেল, ইহাতেই ব্যাপারটা বুঝুন! রাওলপিণ্ডিতে এই লোকটীর যেরূপ সুনাম, তাহা ষ্টেশনে পদার্পণ করিলেই জানিতে পারিবেন। ইহাঁর একটী বাইজী পোষ্য আছে, তাহার সহিত বনাইয়া চলিতে পারিবেন ত ? কর্ত্তব্যের খাতিরে অপ্রিয় সত্য প্রচার করিতে হইল—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হ্যাঁ তবে, ঐশ্বর্য্য ধন এই লোকটীর প্রচুর আছে। গহনার বাক্সটী পাইয়াছেন কি ? অন্ততঃ দশ পনের হাজার টাকার গহনা, মোটর গাড়িও চার-পাঁচ খানা আছে। স্বামী না পান, ধনসুখ পাইবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অবশ্য যদি না বাইজী সুন্দরীর পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পিত হয়। তবে ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে দিয়া বিষয়টা নিজের নামে লিখাইয়া লইতে পারেন।

কোন হিতৈষী।

এই চিঠির নকল পূর্ণিমাদেবী তাঁর বোনকে দিতে চাহিলে অমিয়া বলিল, "এবারটাও থাক। তাঁরা যদি দেখতে চান, তখন পাঠাবো। দেখা দরকার বলে তো তাঁরা মনেও করেন নি! কিন্তু মাসিমা! তোমার কি মত ?"

পূর্ণিমা কহিলেন—"আমি আগে তোমার স্বামীর মুখে এর উত্তর শুনতে চাই, তার পর মত দোব। তা'ছাড়া রাওলপিণ্ডিতে আমার একটী ভাগনে আছে। নিজে সে অতি সৎ। তাকেও আমি লিখবো। তারা অনেক দিনের বাসিন্দে। সে নিশ্চয়ই ঠিক খবর দেবে। আজই লিখে দিচ্ছি।"

১১

আকাশে মেঘ করিয়া থাকিয়া দিনটাকে স্যাঁৎসেঁতে করিয়া রাখিয়াছিল। বৃষ্টি নাই, রৌদ্র নাই, এতটুকু হাওয়াও নাই। যেন একটা বিরাট দুশ্চিন্তার ভারে স্তব্ধ থমথম করিতেছে—এমনি একখানা নিরানন্দ মুখ মেলিয়া সে চুপ করিয়া তাকাইয়া পড়িয়া আছে। না আছে তাহাতে একটু হাসি, না আছে কান্নার লেশ। শুধু জমাট ক্রন্দনের রুদ্ধ চাপ বুকে ভরিয়া লইয়া বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে।

অমিয়ার মনের ভিতরটাকে বাহ্য প্রকৃতির এই নিরানন্দতা

যেন আরও বেশি করিয়াই চাপিয়া ধরিয়াছিল। মন তার যেন নানারকম চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই চিন্তা-জর্জ্জরিত চিত্ত তাহার যেন বিদ্রোহের তাপে তাতিয়া রহিয়াছিল। নিজের সমস্ত অবস্থাটা স্মরণে আসিলেই, লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে রাগে তাহার মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। যে সুখের কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সে তাহাকে লইয়া কত মতেই গঠিত করিয়াছিল, যাহাকে সে পূর্ণ বিশ্বস্ত চিত্তে দেবতার দান বলিয়া দেব-নির্ম্মাল্যের মত মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, সেই বিশ্বাসের মূল্য সে কি, এম্নি করিয়াই লাভ করিল? এই চরিত্রহীন লঘুচেতা, যে একটা ঘৃণ্যা নারী লইয়া জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাহারই সঙ্গে তাহাকে ইহজীবন তো বটেই, আবার বুঝি পরকালেরও সুখদুঃখের আশা কল্পনার সকল সম্বন্ধই স্থাপন করিতে হইবে! হীন-সঙ্গে অভ্যস্ত সেই ব্যক্তি—সে কি তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে? নারীকে যে বিলাসের পুত্তলি-রূপে পাইয়াছে, সে কি তাকে আর দেবতার অংশ-সম্ভূতারূপে সম্মানের চক্ষে দেখিবে?

বিশেষতঃ, মদ্যপ যে, তার মধ্যে নিজেরই মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে, সে না কি অন্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ! আর এই লোকের মধ্য দিয়া তাহাকে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া লইতে হইবে! উঃ! কি বিড়ম্বনার সে জীবন! না—না, অমিয়া তাহা পারিবে না. সে জীবন বহন করা তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব! আর কেনই বা? নারীজীবন কি এতই তুচ্ছ যে, একজন হীনচরিত্র মদ্যপের খেয়ালের খেলানা না হইতে পারিলেই তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল! সে কুমারীর মত থাকিয়া দেশের কাজে দশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিবে! বিবাহ তো কোন দিনই তার ঈপ্সিত ছিল না, হয়ত তাকে কোন মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেই—অদৃষ্টের এই অভিযান!

পূর্ণিমাদেবী তাঁর স্বাভাবিক ধীরপদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—"অমিয়া. তোমার বাবা তার করেছেন যে, তোমার স্বামী একবার তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চান। তিনি হয়ত এক্ষনি এসে পৌছবেন, তুমি তৈরি হয়ে থেকো।"

এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র অমিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল—"মাসিমা! আমায় জোর করে নিয়ে যেতে আসচে না ত'? তাহলে কি হবে মাসিমা!"

পূর্ণিমাদেবী সুগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক আশ্বাস দিবার ভাবে ধীর কণ্ঠে কহিলেন—"তা কি পারে মা? কেন ভয় পাচ্চো? সে কি বলতে চায়, সেটাও তো শুনতে হবে!"

"কিন্তু যদি জোর করে ত তুমি কি করবে? ঐ বুঝি মাসিমা! এলো!"

সদর দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। একটু পরেই উৎকর্ণ মাসি-বোনঝির কাণে একটা জুতা পায়ের মস্‌মস্‌ শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিল। অমনি অমিয়া ছুটিয়া আসিয়া পূর্ণিমাদেবীকে জড়াইয়া ধরিল—"কি হবে মাসিমা! মাসিমা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমায় এই রাক্ষসের সঙ্গে পাঠিও না।"

পূর্ণিমা দৃঢ়-হস্তে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া শান্ত অথচ স্থির স্বরেই উত্তর দিলেন—"আমি তো তোমায় আগেই কথা দিয়েছি।"

এদিকে সেই জুতা পায়ের শব্দটা ক্রমশই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—জানা যাইতে লাগিল। সহসা পরিচিত কণ্ঠ হইতে একটা স্বর শুনিতে পাওয়া গেল—"কই, এঁরা কোথায়?"

অমনি অমিয়া নিজেরও অজ্ঞাতসারে সহসা খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, আর বুকের মধ্যে ভয়ে সংশয়ে যেন ধপাধপ্‌ ধপাধপ্‌ করিয়া ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল। একটা বিষম মুহূর্ত্ত যে তার সাম্‌নে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল।

ঘরে আসিয়া ঢুকিল যতীন। তার মুখ স্তব্ধ গম্ভীর, বিরক্তির চিহ্নে সুস্পষ্টই চিহ্নিত।

পূর্ণিমাদেবী মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরাইতেই, তাঁর মুখ দিয়া একটা আশ্চর্য্যসূচক ধ্বনি নির্গত হইয়া গেল—"এ কি! ভুলু তুই? তুই কবে এলি রে? আমি যে তোকে এই আজই চিঠি লিখলুম।"

যতীন পূর্ণিমার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া উত্তর করিল—"কেন মাসিমা! আমার শ্বশুর তো তোমায় তার দিয়েছিলেন যে আমি আসচি! তুমি কি পাও নি?"

অতিমাত্র বিস্মিত পূর্ণিমাদেবী কহিয়া উঠিলেন—"তোর শ্বশুর! তুই তো বিয়েই করিস্‌ নি, তা শ্বশুর তোর

কোত্থেকে এলো শুনি! ওঃ—আচ্ছা! হাঁা রে! তাই কি! তাহলে কি তুই-ই—"

যতীন একবার তাহাদের হইতে অদূরবর্ত্তিনী আনতমুখী অমিয়ার পাথরের মত কঠিন ও তেমনি ভাবলেশ শূন্য মুখের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার হতবুদ্ধি-প্রায় মাতুলানীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—"হ্যা মামি মা! আমিই সেই অভাগা!" বলিয়া সে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল; কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ একটু বিদ্রূপের হাসিকেও সে যেন সযত্নে গোপন করিয়া লইল বলিয়াই পূর্ণিমার মনে ঈষৎ সন্দেহ জন্মিল।

তখন যেন শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় রুদ্ধ কণ্ঠকে সবলে দমন করিয়া লইয়া পূর্ণিমাদেবী বলিতে গেলেন—"তবে এসব কি ব্যাপার ভুলু! স্বর্গ থেকে দেবতা এসে সাক্ষ্য দিলেও যে আমি তা তোমার সম্বন্ধে—"

"মামিমা! যখন এসে পড়েছি, তখন ধীরে-সুস্থে সব কথাই হতে পারবে; তোমার হাতেই আমার বিচারের ভার আমি তুলে দিয়েছি। কিন্তু আপাততঃ দয়া করে আমার লাগেজগুলোর কোন উপায় করিয়ে দিয়ে এস তো মা! ওরই সঙ্গে এঁর এবং আমার মায়ের সমস্ত গহনা-গুলোও আছে। তুমি তো জানো—কত সাধ করে তিনি সেগুলি তাঁর পুত্রবধূর জন্য রেখে গেছেন!"

পূর্ণিমার মনটা দ্বিধার মধ্যে দোল খাইতে থাকিলেও, তাঁর মনের উপর হইতে সহসা যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গিয়াছিল। এই ভুলু, তাঁর ভাগিনা ভুলু, একে যে তিনি তাঁর স্বামীর প্রতিবিম্ব বলিয়াই জানেন। ইহাকে যে তাঁহারই পরে তিনি সৎ বলিয়া, মহৎ ভাবিয়া, শ্রদ্ধা করেন। সেই স্বার্থত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত সুচরিত্র ছেলের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ! নাঃ! নিশ্চয়ই এ তার কোন শত্রু-পক্ষীয়ের কাজ। কিন্তু অমন মানুষের এত বড় মহা শত্রু থাকিতে পারে! মেয়েটা যদি পলাইয়া না আসিয়া সেদিন ঘৃণায় দুঃখে মরিয়াই যাইত!

প্রকাশ্যে তিনি শুধু এইটুকু বলিলেন—"জানি বই কি! আমিই যে কতবার তাঁর ফরমাসি গহনা গড়িয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আমি তাহলে সব তুলিয়ে রেখে আসছি"—বলিয়াই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অমিয়ার সম্বন্ধে যে কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইবার আছে, সে কথাটা তাঁর স্মরণেও আসিল না। মনের ভিতরটা তাঁর এখন শুদ্ধ একটা নিছক বিস্ময়ের বিহ্বলতায় কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দুশ্চিন্তাটা এর ফাঁকে ফাঁকে কোথা দিয়া যেন সরিয়া পড়িয়াছিল।

১২

কিন্তু অমিয়া তার মাসিমাকে এই ভাবে তাহাকে ইহার সহিত একা রাখিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া খুব নিশ্চিন্ত ছিল না। সেও মাসিমার সঙ্গে সঙ্গেই এঘর হইতে বাহির হইয়া পলাইবে ভাবিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইল, ঠিক দরজার সাম্‌নেই দ্বারের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে চাহিয়া আছে। আর সেদিকে অগ্রসর হইবার সাহস তার মনের মধ্যে দেখা দিল না, বরং সে পিছন দিকেই যতটা পারিল সরিয়া গেল; এবং উহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উত্তরে সেও তেম্‌নি সহজ কঠিন নেত্রে উহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে গেল বটে, কিন্তু বুকের ভিতরকার অস্থির আলোড়নে তার চোখের দৃষ্টি এম্‌নি এলোমেলো হইয়া পড়িল যে, সে অতবড় জলজ্যান্ত মানুষটাকেও বেশ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছিল না। যতীন্দ্রনাথ স্থির সহিষ্ণুভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল। একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে এবার তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা কহিল। অনুত্তেজিত সহজ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি তাহলে একেবারেই কোন আশা নেই অমিয়া?"

অমিয়া এই প্রশ্নে একান্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া উঠিলেও, সঙ্গে সঙ্গেই তার এতক্ষণকার অবসন্নতাটা এক মুহূর্ত্তেই যেন আহত হইয়া সরিয়া গেল। সে গভীর বলে রুদ্ধপ্রায় শ্বাসক্রিয়াকে দমনে আনিয়া উর্দ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল--"না—না, একেবারেই না,—আমায় আর ওসব কথা বলবেন না। আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণরূপেই ঠিক করে ফেলেছি।"

অমিয়ার মতন নির্ভীক, জেদী, একগুঁয়ে মেয়ে তাহার সান্নিধ্য প্রাপ্তেই যে ভয়ে শুকাইয়া গুটাইয়া কোণঠাসা হইয়া গিয়াছিল, সে দৃশ্যটা হয়ত যতীনের পুরুষ-প্রকৃতিকে একটু-খানি বেশ কৌতুক প্রদানও করিয়া থাকিবে; কিন্তু সেই ভীত জড়িত মূর্ত্তির মধ্য হইতে যখন স্বর বাহির হইয়া আসিল, তাহা যেন বজ্র দিয়া গড়া দুইটা তীক্ষ্ণ তীরের ফলা! যতীন্দ্রনাথ একটু বিস্ময়ের সহিত সেই খাটের সঙ্গে মিশিয়া

দাঁড়ানো ক্ষুদ্রকায়া নারীমূর্ত্তিটিকে স্থির দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তারপর ঈষৎ নম্রকণ্ঠে কহিল—"অমন করে দাঁড়িয়ে থাকা কেন, এদিকে এসে বসো না। এ বিষয়ে আমাদের একটু কথাবার্ত্তা কওয়াও তো দরকার।"

এই প্রস্তাব শ্রুতমাত্রেই অমিয়া সভয়ে একটা অর্দ্ধব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল—"মাসিমা!"—তার পর সে আরও দু পা পিছাইয়া গিয়া ঘরের দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইল। তার মধ্যের একজন ভীরু দুর্ব্বল নারীত্ব—সে এই সবল দৃঢ়কায় এবং তাহার পরিণেতা পুরুষের সান্নিধ্যকে অত্যন্ত ভয়ের ও সন্দেহের সহিত দেখিয়া ক্রমাগতই পিছু হটিতেছিল; আর একজন—সে মানুষের মধ্যবর্ত্তী, তার প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তার জমাটবাঁধা শক্তিরাশি—সে নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তায়র সর্ব্বক্ষমতায় অটুট সাহসে নির্ভীক বীরত্বে তার প্রবল আততায়ীর সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় নাই! এই দুইজন দুই প্রকারের মানুষ তার মধ্যে একত্র কার্য্য করিতেছিল বলিয়া, বাহিরে তাহাকে যতই অসহায় মনে হইতেছিল, ভিতর হইতেও আবার ততই কঠিন উত্তরও বাহির হইতে লাগিল।

যতীন তার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হয়ত হাসিল, কিন্তু বাহিরে খুব সহজ দয়ার্দ্র কণ্ঠেই কহিল—"ভয় করো না, ভয়ের কিছুই নেই। আচ্ছা, আমি তাহলে এই সিন্দুকটার উপরেই বসি। এখন আমার যা বলবার আছে বলি শোন। তুমি কার কাছ থেকে কি চিঠি পেয়ে আমায় এমন করে ত্যাগ করে যে পালিয়ে এলে, এর ফলে আমি যদি তোমায় কখন না নিই, যদি আবার বিয়ে করি, তখন তুমি আমায় আর দোষ দিতে পারবে না কিন্তু।"

এই ভয়ানক লোকটাকে নিজের অত্যন্ত নিকটে উপস্থিত দেখিয়া অমিয়া যতখানি ভয় পাইয়াছিল, ইহার মুখের এই একটা কথাতেই সেটা যেন এক মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। এ' তবে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে আসে নাই, মাত্র নিজের সাফাই গাইতে আসিয়াছে! এই লোককেই সে ঈশ্বর-প্রেরিত বোধে কি আগ্রহেই—যাক্, কিন্তু এবার ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন! ভাগ্যে সময় থাকিতে সেই চিঠিখানা সে পাইয়াছিল! নতুবা ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইতেও বিলম্ব ঘটিত।

স্বামীর প্রশ্নোত্তরে সগর্ব্ব দৃষ্টি সে তাহার মুখের উপর সন্নিবিষ্ট করিয়া অকুণ্ঠস্বরে উত্তর করিল—"সেজন্ত নিশ্চিন্ত থাকবেন—জন্মে কখন আমার নামও আপনি আর শুন্‌তে পাবেন না। এখন অনুগ্রহ করে একটু পথ দিন, আমি যাই।"

এই বলিয়া সে দৃঢ়পদে একটুখানি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, তার মুখের শ্বেত-বিবর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া, উত্তেজনায় তাহা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মনের বলের সহিত শরীরেও এখন তার খানিকটা বল দেখা দিয়াছে।

যতীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। পথ না ছাড়িয়া বরং পা দুইটা আরও একটুখানি সামনের দিকে মেলিয়া দিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সব্যঙ্গ হাস্যে সে কহিল—"তবে আমিও একটা কথা বলি অমিয়া! মন্দ হলেও আমি তা বলে এত বেশি খারাপ নই যে, তোমার গায়ে কোন দিন হাত-টাত তুলবো! তাছাড়া টাকা-কড়ি যদি উড়িয়ে দিই বলে ভয় করো, তা হলে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমি তোমার নামে না হয় লিখে দিতেও রাজী আছি। তুমি যদি আমায় ত্যাগ করো, তাতে দুদিক থেকেই একটা লোক-লজ্জা আছে ত। তার চেয়ে যদি আমার সঙ্গে চলো, অসুবিধা তোমার কিছু হবে না। সুখে স্বচ্ছন্দেই থাক্‌বে।"

যতীন্দ্রনাথ এইটুকু বলিতেই আবার সে সভয়ে কিছু হটিয়া গিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"ওসব কথা কেন তুলছেন! আমি কোন কিছুতেই যাবো না। লোকলজ্জার চাইতে নিজের লজ্জা আমার কাছে ঢের বেশি বড়। চরিত্রহীনের ঘর আমি করবো না।"

যতীন কহিল—"তাহ'লে তোমার মত আর বদলাবে না? কিছুতেই না?"

অমিয়া দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

"আমি তাহলে ফিরে যেতে পারি? এখনও ভেবে দেখ! তুমি না যাও তো এই মাসেই আমি বিয়ে করবো কিন্তু। তোমার আশাপথ চেয়ে যে জীবন কাটাবো, সে আমার দ্বারায় হবে না, তা'বলে দিচ্ছি।"

এই কষ্টকর আলোচনা চালাইতে অমিয়ার যেন বুকে খিল ধরিয়া যাইতেছিল। সে এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"যে মুহূর্ত্তে সেই চিঠি আমি পড়েছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সব-কিছু ভাবা শেষ হয়ে গ্যাছে। আজ আবার নূতন করে আমি কি ভেবে দেখতে যাব? ভাবনায় আমার কিছু

নেই। আমি ও-রকম লোকের—না—আমি যাবো না। আপনি এক্ষনি চলে যান।"

যতীন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয়ার ক্রোধের ক্ষোভের অপমানের উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাসভরে কম্পিত দেহ, আরক্ত মুখ ও আহতা ফণিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব শুদ্ধ জড়াইয়া তার মধ্যের একটা নূতনতর তীব্র আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্য সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া লক্ষ্য করিল। তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া শান্ত উদাসস্বরে ধীরে ধীরে কহিল—"আচ্ছা, আমি তাহলে চল্লুম,—" বলিয়া পিছন ফিরিয়া দু পা অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ সে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"ভাল কথা! যে চিঠিখানা তুমি পেয়েছিলে, সেখানা কি ঠিক এই রকম? এইখানার সঙ্গে সেইখানা একবার একটু কষ্ট করে মিলিয়ে দেখবে কি?"—এই বলিয়া এবার সে অসঙ্কোচে চলিয়া আসিয়া অমিয়ার ঠিক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ভাঁজ খুলিয়া একখানি চিঠি তার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক নিমেষমাত্র তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়াই অমিয়া সরোষ বিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"এ কি! আমার চিঠি কেমন করে চুরি—পেলেন আপনি! দিন আমার চিঠি দিন!"

যতীন্দ্র চিঠিখানা তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে দিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"এখানি সত্যি বলচি,—আমি চুরি করি নি। তোমার খানা তুমি কোথায় রেখেছ খুঁজে দেখে দুটোয় মিলিয়ে নাও। তা হলেই তো সব সন্দেহ যাবে।"

অমিয়া চিঠিখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া গিয়াই পুনশ্চ ঘোর অবিশ্বাসের সহিত কহিয়া উঠিল—"এ সেই চিঠিই। সেই 'ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি' মটো-লেখা একই কাগজ—সেই পুণ্যবতী লিখিয়া "ী" টা কাটিয়া দিয়া "ি করা পর্য্যন্ত সমস্তই এক। নিঃসংশয় রূপেই এক হাতের লেখা এবং সেই চিঠিই—"

অমিয়া ঘোর অবিশ্বাসের সহিত মুখ তুলিল—"এ চিঠি আপনার হাতে কেমন করে যে গেল আমি কিছুই বুঝতে পারচি না!"

যতীন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"আমিও না। কিন্তু সেখানা তুমি কোথায় রেখেছিলে?"

"ওঃ এই ঘরেই তো—" বলিয়া সে খাটের গদীর দিকে চাহিল।

যতীন তাহার অর্থ বুঝিয়া একটু জায়গা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"বেশ'ত, দেখ না সেটা ওখানে আছে কি না—!"

"নেই, দেখতেই পাচ্চি—"বলিয়া সরোষে অমিয়া গদীর খানিকটা উল্টাইতেই খামশুদ্ধ চিঠিখানা যেমন ছিল বাহির হইয়া পড়িল। সেই একই রকম খাম, এক হাতেরই ঠিকানা লেখা। শুধু ডাকের ছাপটা নাই।

"এ কি! তবে এ আবার কি করে এলো!" বলিয়া দুখানা চিঠিই পাশাপাশি খুলিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সেই সময় মুখ তুলিলেই সে দেখিতে পাইত যে, তার পরিত্যক্ত স্বামীর চোখে-মুখে কি বিপুল কৌতুক হাস্যের উচ্ছ্বাসই ফাটিয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল!

"হ্যাঁরে হনুমান ছেলে! এ তোর কি কাণ্ড বল্ দেখি? তাই প্রথম থেকেই আমার যেন হাতের লেখাটা খুব চেনা-চেনা বোধ হয়েছিল! তোকে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হলো—ও চিঠি যে তোর হাতেরই লেখা! এই তো—ঠিক তাই! এই দেখ তোর চিঠি আমার কাছে ছিল,—কই সে চিঠি অমিয়া! বার কর তো মা! ওমা! এই যে! দেখ তো! দেখ অমিয়া! হতভাগা ছেলের কীর্ত্তিটা এখন দেখ! উঃ! কি রে তোরা—ডাকাত না খুনে রে।"

পুর্ণিমাদেবী তাঁর স্বভাব-বিগর্হিত উত্তেজনা-চঞ্চল হইয়া প্রায় ছুটিয়া আসিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে তিন-চারখানা পুরাতন পত্র খুলিয়া খুলিয়া তার লেখার সহিত ঐ অজ্ঞাতনামার লিখিত পত্র ও তাহার নকলের সহিত মিলাইয়া দেখাইতে লাগিলেন। আর ক্রমাগত অসম্বরণীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্ষুদ্র বালিকাটির মতন হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই দেখ অমিয়া! এই দেখ মা—কোন একটা অক্ষরে এতটুকু অমিল আছে? এই দেখ এর 'ম' এই দেখ ওর 'ম'—তালব্য 'শ'—বর্গীয় 'জ'—সব দেখ এক রকম।" ওর হাতের লেখা ঠিক যে ওর মেজ মামার মতন! তিনিই যে ওকে প্রথম লিখতে পড়তে শেখান, ওর স্বভাবে তিনি যে ওকে বড় ভালবাসতেন। কিন্তু এমন অন্যায় খেলা কেন খেলতে গেলি বাবা! মেয়েটা যদি আত্মঘাতী হতো, কি সেদিন পথে একটা বিপদে পড়ে যেত? কি হত বল দেখি তখন!"

যতীন্দ্রনাথ মামিমার এই নির্ভুল আবিষ্কারে ও ভর্ৎসনায় যুগপৎ প্রফুল্ল ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া অপরাধীভাবে মৃদু-

কণ্ঠে উত্তর করিল—"এতটা যে ও করবে, তা' আমি ভাবতেই পারি নি মামিমা! বিয়ের আগের দিনই নগেন ঘোষদের বাড়ীতে শুনলুম,—আমার যিনি শ্বশুর হবেন, তিনি তাঁদের কাছে আমার চরিত্র সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ নিয়ে গেছেন। বলেছেন—তাঁর মেয়ের প্রতিজ্ঞা—স্বামীর চরিত্রে কোন দাগ থাকলে তার ঘর সে কিছুতেই করবে না। সেই শুনে একটুখানি পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই—তা' মামিমা! শিক্ষাটা আমারও বড় মন্দ হলো না! সেদিন ষ্টেশনে গাড়ি শূন্য দেখে বাস্তবিক খুবই ঘাব্‌ড়ে গেছলুম! তখন মনে মনে কি আপ্‌শোষই যে করেছি। তা'পর ওঁর মা বাবার সাম্‌নে গিয়ে,—সে যেন আমার মরার বাড়া হলো। মনে মনে ত জান্‌চি যে আমিই এর জন্য দায়ী! তা'পর টেলিগ্রামটা দেখে অনেকখানি সুস্থ হলেম,—বুঝতে পারলেম যে, তাহলে নেহাৎ মরে নি এবং একেবারে ভেঙ্গে পড়ে যাবার মতন মেয়েও এ নয়!"

এই বলিয়া সে তখন কৌতুক-হাস্যে-ভরা গভীর দৃষ্টিতে অদূরবর্ত্তিনী প্রস্তরীভূতা অমিয়ার দিকে চাহিল।

পূর্ণিমা দেবী কাছে আসিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে মাথায় হাতটী বুলাইয়া তাহার শিথিল দেহ নিজের স্নেহনিবিড় বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন—"মা আমার! কত দুঃখই পেয়েছিলি! ভগবান যে হঠাৎ এমন করে এটাকে এমন অদ্ভুতভাবে শেষ করে দেবেন এ' যে আমাদের আশার অতীত! যতীন! অমিয়া তোমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল বলে তুমি কিন্তু ওকে একটী কথাও বলতে পাবে না, দোষ তোমারই বেশি। বিয়ের কনেকে অমন করে ভয় দেখালে, সে ভয় না পেয়ে কি করবে বাছা?"

যতীন্দ্রনাথ এইবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণখোলা হাঁসি হাসিয়া উঠিয়া সেই হাসির মধ্যেই বলিতে লাগিল—"ভয়ই পাক, আর যাই করুক মামিমা! আপনার বোনঝিটী কিন্তু এবার সব পরীক্ষার চাইতেই শ্রেষ্ঠ খুব মস্ত.বড় পরীক্ষায় ফাষ্ট হয়ে পাশটা করে নিলে। নাঃ! তোমারও পরে ভক্তি তে চির দিনই অপর্য্যাপ্ত আছেই,—আজ আবার আর এক দিক দিয়ে ইনিও আমার নারীজাতির উপরে সেই শ্রদ্ধাকে দ্বিগুণিত করে দিলেন। এই তো চাই মামিমা! ওই চিঠি পেয়ে ও যদি নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে আমার সঙ্গে আমার ঘরে ঘর করতে চলে যেত, আমি আমার স্ত্রীকে আর যাই করি, জন্মে কখন আর শ্রদ্ধা করতে পারতুম না,—এটা খুব সত্যি।"

পূর্ণিমা দেবীর দু'চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি বিবশা অমিয়াকে টানিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিয়া তাহার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলেন—"মা! এইবার তুমি তোমার স্বামীকে প্রণাম করে, তার পায়ের ধূলো নাও। অনেক মন্দ কথাই তার সম্বন্ধে ভেবেছ হয়ত। ভুলু! আমার কাছে আয়। তোদের দুটিকে দুপাশে নিয়ে একবার বসি। আহা! কি সুন্দর মানিয়েছে দেখ দেখি! আজ যদি তোর মা বাবা আর তোর মেজ মামা বেঁচে থাকতেন!"

মনের মতন

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমি ত রচেছি বিশ্ব মনের মতন,
নাহি অন্ধ অভিলাষ, বাসনা-বিকার।
অন্তরে বাহিরে করি আশীস্ বর্ষণ,
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত প্রেম-পারাবার।
পৃথিবীর লক্ষ আশা লক্ষ দিকে ধায়,
হেথা সব বাঁধা আছে সোনার শৃঙ্খলে।
পৃথিবীর সফলতা সুদূরে মিশায়,
হেথা সব দূর আসে নিকটেতে চ'লে।
ধরায় সবাই রাজা, সবে চাহে কর,—
প্রাণ চাহে পরিতোষ, প্রেম চাহে সুখ,
তৃষিত চেতনা চাহে হইতে অমর,
সব বুকে ধরা দিতে চায় যেন বুক।
হেথায় মনের রাজ্য অনন্ত বিস্তার,
প্রেম ছাড়া আর কারো নাহি অধিকার

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

শ্রীনগর

শ্রীনগর তো শ্রীনগরই—নগরের শ্রী সত্যই অপূর্ব্ব! চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর,—নগরের বুক বয়ে ঝিলাম সর্পগতিতে এঁকে-বেঁকে চলেছে, দুই তীরের কাছে হাউস-বোটে কত জাতির লোক যে বাস করছে! পথ-ঘাট প্রশস্ত। পথের ধারে বিলাতী ছবিতে যেমন সব কটেজের দেখা মেলে, তেমনি ঘর-বাড়ী। পপ্‌লার ও চেনার গাছ শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ফুল-ফলের রকমারি বাহার··· প্রকৃতির আদরের দুলালটি যেন!

আমাদের হাউস-বোট

আমাদের হাউসবোট ছিল চেনার-নালায়। মহল্লার নাম চেনার-বাগ। চেনার-নালা নালাই বটে! ঝিলাম থেকে কাটা খাল জমিকে অমন শতভাগে বিভক্ত করে এদিকে-ওদিকে চলে গেছে—স্রোত অত্যন্ত মৃদু, জল কম, তাছাড়া সে জলও অত্যন্ত নোংরা। চেনার-নালার আকার অনেকটা কলকাতার টালার খালের মত। এই নালায় হাউস-বোটের সংখ্যা নেই বললেও চলে। আড়াআড়ি করে নালায় যতগুলি ধরে, তত আছে! শুধু মাঝখান দিয়ে একখানা কি দুখানা হাউস-বোট যেতে পারে, এমনি জায়গা খালি আছে। আমরা হাউস বোটে জিনিষপত্র তুলিয়ে স্নানাহারের আয়োজনে ব্যস্ত হলুম। আয়োজন পাকা করতে হবে। কেননা, এখানে তো ক্ষণেকের অতিথি হয়ে থাকা নয়, কিছুদিনের জন্য আস্তানা পাতা!

বোট থেকে বাসন-মাজা চাকর, জলতোলা ভিস্তী—দুখানি বোট, কাজেই—দুজন করে মিললো! তাছাড়া মেথরও দুজন নিযুক্ত হলো। ভৃত্যকে পয়সা দিয়ে কতকগুলি কলসী আনানো হলো। চেনার-নালা বা ঝিলামের জল স্নান-পানের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ—কলের জল আনাতে হবে, তাতেই স্নান-পান-রন্ধন সব চলবে। ঝিলামের জলে বাসন মাজা অবধি নিষেধ। এ নিষেধ অবশ্য রাজাদেশে নয়।

শিকারা

যাঁরা পূর্ব্বে শ্রীনগর ঘুরে গেছেন, এমনি বন্ধু ও আত্মীয়ের দল আমাদের পূর্ব্ব হতেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এ জলে হেন রোগ নাই, যার ব্যাসিলি মিলবে না! কাজেই সর্ব্ব কার্য্যে আমাদের কলের জল চাই,—বোটের ভৃত্যদের

কাশ্মীরী বাড়ী

সে আদেশ জানানো হলো। কারণ, কাশ্মীরীরা ঝিলামের জলে স্নান করেন—বিশেষ, হাউস-বোটের মাঝি মাল্লার দল এই জল পানের জন্য ও রন্ধনের জন্য ব্যবহার করে।

জল এলে সেই জল গরম করিয়ে স্নানের ব্যবস্থা করলুম। প্রতি বোটে তিনটে বাথরুম,—বাথ-টব প্রভৃতির সরঞ্জাম আছে। স্নান করে গরম জামা-কাপড়ে শরীর ঢেকে বোটের বাহিরে এসে চেনার-বাগে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করা হলো; ওদিকে ঠাকুর ততক্ষণে রান্না চাপিয়ে দেছে।

সন্ধ্যার অনতিকাল পরে আহারের তলব পড়লো। আহার হবে ডাইনিং-রুমে। আসন পাতা নয়—চেয়ারে বসে, টেবিলে ভাতের থালা রেখে খাওয়া! আহারাদি করে বোটের ড্রয়িংরুমে বসে খানিক বই পড়া গেল। ড্রয়িংরুমে ছোটখাট লাইব্রেরীও আছে—বিজলীর আলোয় আলো-করা ড্রয়িং-রুম অপূর্ব্ব ভূষায় সজ্জিত। তারপর রাত দশটা বাজলে শয়ন-পর্ব্ব। শীত খুবই প্রচণ্ড—গায়ে সাদা গেঞ্জি তদুপরি গরম গেঞ্জি ও ফ্লানেল-সার্ট, এবং সর্ব্বোপরি একখানি করে ধোশা ও কম্বল মুড়ি দিয়ে শোওয়া হলো। কিন্তু মাঝ-রাত্রে হি-হি শীতে ঘুম ভেঙ্গে গেল! ধোশা-কম্বলে বেশ করে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত অনড়ভাবে পড়ে রইলুম—তারপর এমনি অবস্থাতেই রাত্রি কাবার।

সকালে বাথরুমে ঢুকে দেখি, ভৃত্য গরম জল রেখে গেছে। প্রাতঃকৃত্যাদি-সমাপনান্তে চা পান। তারপর বেলা আটটায় ওভারকোট প্রভৃতিতে আবৃত হয়ে বাজার-অভিমুখে সদলে রওনা হলুম।

কি শীত! বুকের মধ্যটা ঝন্‌ঝন্ করছিল, হাত অসাড়! দুই পকেটের মধ্যে হাত দুখানিকে পুরতে হলো। তবু কি শীত কমে!

ঝিলামের তীরে ঘাট ও বাড়ী

বাজার শাক-সব্জী, আনাজ-তরকারীতে ভরা। আর কি শস্তা দাম! আলুর সের এক আনা; এক পয়সা বা দেড় পয়সায় এক সের বেগুন; চার আনায় একটি কুমড়ো

মিললো, তার ওজন প্রায় আধমণ। একটি বড় লাউ এক পয়সা। মাংসর সের ছ'আনা। এক রকম শাক পাওয়া গেল, কপির পাতার মত, তার নাম কড়ম শাক। আর লঙ্কা? সে যেন এক-একটা বড় বেগুনের মত! অঢেল— কত

ঝিলাম। তীরে মহারাজ রণবীর সিংহের বেদী

চাই! সরু চাল—টাকায় আট সের। বাজার করছি, বিস্তর মাঝি এসে ছেঁকে ধরলো,—'শিকারা সাব্! শিকারা'! 'শিকারা'র মানে, সেই ছোট ছিপের মত হালকা নৌকো! আনাজ-তরকারী নিয়ে শিকারায় চড়া গেল। ঝিলামের বুক বয়ে গিয়ে চেনার-নালায় ঢুকলুম। সাম্নে ঝিলামের বুকের উপর থেকে দীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী উঠেছে! সে যেন ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বসে ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করছেন! চেনার-নালার প্রবেশ-পথের অপর তীরে মহারাজার প্রাসাদ। এটি মহারাজার গ্রীষ্মাবাস। শীত-কালে মহারাজা সপারিবার জম্মুর প্রাসাদে বাস করেন।

বোটে ফিরে দেখি, দলে-দলে শিকারা বেয়ে দোকানী-পশারীর দল আনাজ-তরকারী থেকে সুরু করে শাল-দোশালা, কাঠের খেলনা, জুয়েলারি প্রভৃতি নিয়ে ভিড় জমিয়েছে। এখানে এমনিভাবেই এরা ব্যাসাতি করে। তবে পরদেশী ক্রেতা পেয়ে দাম হাঁকে চতুর্গুণ! আমরা সদ্য এসেছি, মন সংশয়ে আচ্ছন্ন, তাদের কাজেই বিদায় দিতে হলো, দর-দস্তুর জানিনা—পাছে বেজায় ঠকি!

বৈকালে মোটরে করে বেড়াতে বেরুনো হলো। পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা প্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে মহারাজ হরিসিংয়ের প্রাসাদ, পথের ধারে মহারাজার ফলের বাগান—প্রকাণ্ড বাগান, আপেল-নাশপাতি গাছ ফলন্ত! দূরে বহুদূরে পাহাড়ের শ্রেণী—আগাগোড়া এমনি প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে—দেখলে মনে হয়, ওদিকে যাবার কোনো উপায় নেই! হঠাৎ মনে হলো, কোথায় নিজের দেশ ছেড়ে এসেছি—ফিরে যাবার পথ ওর মধ্যে খুঁজে পাবো কি!

বেড়িয়ে বোটে ফেরবার মুখে ওখানকার ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। এঁর আতিথ্যের খ্যাতি ভারত-বিস্তৃত। যে-কোনো

চেনার-নালা

বাঙালী এখানে আসেন, তাঁর বোট ঠিক করে দেওয়া থেকে সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া ললিতবাবুর ব্রত! এতটুকু বিরক্তি নাই! সদাপ্রসন্ন মুখ! কাশ্মীরে দীর্ঘকাল বাস করেও ভদ্রলোকের

গায়ে তেমন মাংস লাগে নি কিন্তু! ললিতবাবুর গৃহে যত বড়-বড় বাঙালী-অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো! শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই গৃহে সভাপতির মত বসে, আর বহু বাঙালী—প্রোফেসর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সমুপস্থিত। সকলে নানা গল্পে-আলোচনায় ব্যাপৃত। আমাদের কাছে এলাহাবাদের ললিতবাবুর লেখা পরিচয়পত্র ছিল, বন্ধু-মহাশয়ের নামে! পত্র দিতে তিনি অভ্যর্থনার ধূম বাধিয়ে তুললেন—চা, বিস্কুট, বাদাম প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়িত করলেন! পরিচয় হলো। এখানকার বাঙালীরা দেশ ছেড়ে এত দূরে থাকলেও মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন

শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বত-শিখর হইতে ঝিলামের গতি-দৃশ্য

করেন্ নি। 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলি নেন, পড়েন, কাজেই সে-সব পত্রে মাঝে-মাঝে কলমের যে-সব আঁচড় টানি, তারও পরিচয় রাখেন! তখন 'ভারতবর্ষে' আমার 'পিয়ারী' উপন্যাস ধারাবাহিক-ভাবে বেরুচ্ছে—সে-সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। 'পিয়ারী'র অদৃষ্ট-চক্র ঘুরে কোথায় দাঁড়াবে, সে-প্রশ্নও তুললেন। বাংলা দেশে থেকে হাজার মাইল দূরে এমন মিশুক দরদী প্রাণের পরিচয় পেয়ে বিমুগ্ধ হলুম। ঋষিবরবাবু বললেন,—ধুতি পরে বেরুবেন না, এ কলকাতা নয়। ঠাণ্ডা লাগবে, নিউমোনিয়া হতে পারে। আমি বললুম,—কিছু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছে না তো! ঋষিবর বাবু বললেন,—কাশ্মীরী পট্টুর ব্রীচেস (breeches) পরে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরুবেন। পট্টু কিনতে বললেন। আমি বললুম,—তাই হবে। ললিতবাবু আমাদের আস্তানার সন্ধান নিলেন,—তার পর কতকগুলি উপদেশ দিলেন। আমরাও বিদায় নিলুম।

শ্রীনগর কাশ্মীরের ঠিক মাঝখানে—ঝিলামের দু'ধারে কাশ্মীরীদের বাস; ছোট-ছোট বাড়ীগুলি, ছাদ মাটী লেপা। শ্রীনগরে ঝিলামের উপর সাতটি পুল। পুলগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহারাজ প্রবরসেনের আমলে তৈরী হয়। প্রথম পুলটি পাকা। বারামুলা থেকে শ্রীনগরে আসতে বাজারের পরই এই পুল পার হতে হয়। অপর ছটী পুল কাঠের পাইল্‌স্-এর উপর, তার উপর দিয়ে এক্কা চলে, মোটর বা ভারী গাড়ী যেতে পারে না। সহরে ঢুকতেই সর্ব্বাগ্রে চোখ পড়ে, নগরের বুকে এক পাহাড়ের মাথায় একটি মন্দির। এ মন্দিরের নাম, তখ্‌ত্-ই-সুলেমান। এ পাহাড়টি নগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। পাহাড়টি এক হাজার ফিট উঁচু। মন্দিরটি একেবারে পাহাড়ের মাথায়। মন্দিরের চূড়ায় বিজলী-আলো দেওয়া হয়েছে—তার ভিতর বেশ কৌশল আছে। আলোটুকু বহু-বহু দূর থেকে রাত্রে পথ-প্রদর্শকের কাজ করে। এ আলোটি বহু অর্থব্যয়ে বসিয়েছেন মহীশুর-রাজ। পূব দিক দিয়ে নদী ঝিলাম বয়ে চলেছে—

এবং এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চেনার-নালা-পথে ডাল হ্রদে এসে মিশেছে। ডাল মানেই হলো হ্রদ। হ্রদের গা ঘেঁষে পাহাড়ের শ্রেণী। ডালের তীরে খানিকটা জায়গায় হাউস-বোট আছে বিস্তর। হ্রদের জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—এমন পরিষ্কার যে তলার নুড়ি-পাথর সুস্পষ্ট দেখা যায়; তাছাড়া মাছ ভেসে খেলা করছে, তাও চোখে পড়ে। তখ্‌ত্‌-ই-সুলেমানের নীচে নার্শিং হোম্; এখানে আটজন য়ুরোপীয় রোগীর বাসের ব্যবস্থা আছে। তখ্‌ত্‌-ই-সুলেমানের উপরে মন্দিরে যাবার পথ আছে। সংস্কার করে মন্দিরে মহাদেব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহটির নাম জ্যেষ্ঠেশ্বর। যে শিবলিঙ্গ আছে, সেটি মানুষ-ভোর উঁচু, আর তার বেড় বিশাল বটগাছের মত।

এখানে মন্দির প্রভৃতির প্রাচীনতা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, কাশ্মীর বহু প্রাচীন যুগ থেকেই আপনার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আসছে। কাশ্মীরের উদ্ভব সম্বন্ধে যে-গল্প বহু পূর্ব্ব কাল থেকে চলে আসছে, তাতে পুরাণের শীল মারা—আর সে গল্প ভারী মজার! গল্পটি এই,—হিমালয়ের বুকে সুদীর্ঘ হ্রদ ছিল, তার নাম সতীসর। এই সতীসরে

ডাল হ্রদ—কমলবন

এ-পথে ঘুরে মন্দিরে চড়া একটা সখের কাজ! ভক্তি যাঁদের আছে, তাঁরা তো যাবেনই—সে বেশী কথা নয়! তবে য়ুরোপীয় যাত্রীর দলও পাহাড়ে চড়ে মন্দির দর্শন করেন। খুব মোটা বয়স্কা মেম-সাহেবকেও দু'জন তরুণের কাঁধে ভর দিয়ে পাহাড়ে চড়তে দেখেছি। এ পাহাড়ের অপর নাম শঙ্করাচার্য্য পাহাড়। এ মন্দির প্রথম তৈরী করেন জালক। জালক ছিলেন বৌদ্ধ। মন্দিরটি প্রথম তৈরী হয় ২০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব সালে। তার চিহ্নও নাকি লুপ্ত হয়ে যায়। পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা গোপাদিত্য এর পার্ব্বতী মাঝে মাঝে নৌ-বিহারে আসতেন। কিছুকাল পরে অকস্মাৎ এই সতীসরে এক দৈত্যের আবির্ভাব হলো। দৈত্যের অত্যাচারে সতীসরের তীর-প্রদেশের অধিবাসীর দল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তারা যাগযজ্ঞ করে দৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেবতাদের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হলো। এবং যেমন হয়ে থাকে, তাদের তপে তুষ্ট হয়ে এলেন ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপমুনি। তিনি অধিবাসীদের মুখে দৈত্যের কথা শুনে দৈত্যকে বধ করার আয়োজন করলেন! দৈত্য নানা জলচর জন্তুর রূপ ধরে সতীসরের

জল তোলপাড় করে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। সতীসরের জল ঘোলা করছে এক দুরন্ত দৈত্য—পার্ব্বতী দেবীর কাছে খপর গেল। তিনিও অন্তরীক্ষে এসে দাঁড়ালেন। কশ্যপমুনি তখন মন্ত্রবলে সতীসরের জল শোষণ করতে লাগলেন—দৈত্যের পক্ষে তখন আত্মগোপন অসম্ভব হলো। সে তো এক জায়গায় আশ্রয় নেবার জন্ম উঠে দাঁড়ালো, অমনি কশ্যপমুনি অস্ত্র ধরলেন। তাতেও দৈত্যকে এঁটে ওঠা যায় না! পার্ব্বতী দেবী তখন তারণ করতে এলেন। হিমালয়ের একাংশ হাতে উপড়ে নিয়ে তিনি দৈত্যকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন! আর সে যায় কোথায়! দৈত্য সেই পর্ব্বতখণ্ডের ঘা খেয়ে পঞ্চত্ব পেলে। সেই পর্ব্বতখণ্ড হলো এখনকার হরিপর্ব্বত। হরিপর্ব্বত শ্রীনগরের একান্তে অবস্থিত। তার মাথায় কেল্লা আছে। কেল্লাটি আকবর বাদশাহ তৈরী করান। আজো সে কেল্লা জীর্ণ হলেও সশরীরে খাড়া আছে, এবং তাতে কাশ্মীর মহারাজার ফৌজ থাকে। আর দৈত্যের পালিয়ে বেড়ানোর দাপটের দরুণ পায়ের চাপে যে-সব নানা ঢিপির সৃষ্টি হয়, সেগুলো ছোট-খাটো পর্ব্বতশৃঙ্গ হয়ে গেছে। কশ্যপ জল শুষে নেওয়ায় উপত্যকা-ভূমি বেরিয়ে পড়ে। সেই উপত্যকাই হলো শ্রীনগর। সতীসরের একটা শীর্ণ ধারামাত্র ঝিলাম বা বিতস্তা নদীতে পরিণত হয়েছে! দৈত্য যেখানে নিহত হয়, সে জায়গা হলো আধুনিক বারামুলা। হরিপর্ব্বতে শ্রীদুর্গার মূর্ত্তি আছে—আজো তাঁর নিত্যপূজা হয়।

পুরাণের গল্পে লোকের মন যত সন্দিহান্ থাকুক, কাশ্মীরের প্রাচীনতার বিবরণ ইতিহাস-পাঠে জানা যায়। ঐতিহাসিক যুগে কাশ্মীর-রাজ্য ভারতের হিন্দুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম। শ্রীনগরের পত্তন হয় খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, রাজা অশোকের রাজত্ব-কালে। কহ্লন এই কথা বলেন। পরে মহারাজ প্রবরসেন (২য়) হরিপর্ব্বতের চারিদিক ঘিরে শ্রীনগর রাজধানী গড়ে তোলেন। ঝিলাম বা বিতস্তার উপর তিনিই প্রথম সেতু নির্ম্মাণ করান। কাশ্মীরে যে-সব প্রাচীন মন্দির আছে, তাদের সংস্কার এবং অনেকগুলি নূতন মন্দির গঠন, এ তাঁরই কীর্ত্তি। শ্রীনগরের তখন নাম ছিল প্রবরপুর।

ডাল হ্রদ—ভাসমান ক্ষেত

তার পর ১০১০ খৃষ্টাব্দে ঝিলামের দ্বিতীয় সেতুর কাছে

প্রাধান্যের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে সুদৃঢ়ভাবে মোগল-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পূর্ব্বে একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর মাহ্‌মুদ গজনীর করতলগত হয়—এবং দুরাণী রাজগণ কাশ্মীরে প্রভুত্ব করেন। তার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল কাশ্মীর দখল করে। এই মোগল-আমলেই কাশ্মীর শোভায়-শ্রীতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সহজ সুষমায় মানুষের হাতের কারিগরি ফোটে!

ডাল হ্রদ—গাগ্‌রি বল্‌

নদীর তীরে প্রাসাদ তৈরী হয়। কাশ্মীরের হিন্দু রাজারা সকলেই শৈব ছিলেন। কাশীর মত শিব-মন্দিরের এখানে সংখ্যা নেই। মন্দিরের গড়ন কিন্তু সম্পূর্ণ কাশ্মীরী কলানুযায়ী। এই সব মন্দিরের সবিশেষ পরিচয় পরে দেবো। হিন্দু-

কাশ্মীরী নারীর ধান কোটা

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ কাশ্মীর অধিকার করেন। তিনি প্রায়ই কাশ্মীরে বেড়াতে আসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও বেগম নুরজাহান কাশ্মীরে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে আসতেন্। তাঁদের আমলে বহু উদ্যান, বহু প্রাসাদ তৈরী হয়, বহু সরাই রচিত হয় এবং বিস্তর পথঘাটও তাঁরা তৈরী করান। এখনকার এই ঝিলাম-ভ্যালি রোড তখন থেকেই আছে—কিন্তু সে পথ তখন খুবই দুর্গম ছিল। বহু রাজার নির্দ্দেশে বহু শিল্পীর হাত পেয়ে এখন অপেক্ষাকৃত সুগম হয়েছে।

তার পর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর শিখদের হাতে আসে অধীশ্বর হন। রণবীর সিং রাজত্ব করেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; তাঁর মৃত্যু হলে মহারাজা স্যর প্রতাপসিং রাজ্যেশ্বর হন। গত ৎসর (১৯২৫ খৃষ্টাব্দ) প্রতাপসিংহের মৃত্যু হয়। মহারাজ হরিসিং এখন কাশ্মীরের অধীশ্বর। কিন্তু এ ইতিহাসের কথা পরে বলবো। আজ শুধু কাশ্মীরের যে বৈচিত্র্যটুকু আমাদের চোখে পড়েছিল, সেই কথাই বলি।

শ্রীনগরে আসবার পূর্ব্বে নানা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে ধারণা জন্মেছিল, কাশ্মীরে শুধুই পাহাড়, পাহাড়ের কোলে সরু পথ, আর নদী! গাড়ী চলে এমন প্রশস্ত রাজপথ এখানে নেই! কিন্তু এসে দেখি, তা মোটেই নয়। চারিদিকে দীর্ঘ প্রশস্ত পথ—তবে

চেনার-বাগ, কাশ্মীর

এবং রাজা রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীর শিখ-হস্তেই থাকে।

এই সময় জম্মুরাজ গোলাপসিং বহু দেশ জয় করেন এবং লাদাক, স্কার্দো, গিলগিট প্রভৃতি জম্মুরাজ্যভুক্ত হয়। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করা কঠিন। এই জন্যই ইংরাজ সন্ধি-সর্ত্তে জম্মুরাজের হাতে কাশ্মীর তুলে দেন, নিঃস্বত্বে। জম্মুরাজ তখন সুবিস্তীর্ণ কাশ্মীর-রাজ্যের অধিপতি হন। গোলাপ সিংএর মৃত্যু হয় সিপাহী-বিদ্রোহের সময়; তাঁর ফৌজ বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে। গোলাপ সিংয়ের পর তাঁর পুত্র রণবীর সিং কাশ্মীর-রাজ্যের

ঝিলাম নদী ও তার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা (চেনার নালা নামে প্রসিদ্ধ) আছে। এই চেনার-নালায় হাউস-বোটের সংখ্যা নেই। এই সব হাউস-বোটে বেশীর ভাগ বিদেশীর বাস। বিদেশী মানে যাঁরা বড় চাকরি করছেন, বা দীর্ঘকালের জন্য বেড়াতে এসেছেন। পর্য্যটকের অভাব এখানে কোনকালেই নেই। অনেক ইংরাজ আছেন; তবে তাঁদের 'বিষহীন ফণী' বলে মনে হয়! সে রক্তচক্ষু বা পথে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেশী লোক দেখলে ঘৃণায় সিঁটকে ওঠা—এ দৃশ্য শ্রীনগরে দেখিনি কোনো দিন! শ্রীনগরের প্রশস্ত লনে দেশী ও বিলাতী নর-নারী বেড়াচ্ছেন, অকুতোভয়ে, অসঙ্কোচে, সকালে-

সন্ধ্যায়, পাশাপাশি! কোথাও দেশী লোকের পদার্পণ নিষেধ—এ-রকম সাইনবোর্ড নেই! এই সুস্থ আবহাওয়াটুকু সব-আগে চোখে পড়ে! আমরা সেখানে থাকতে থাকতে এক কাশ্মীর-প্রবাসী পাঞ্জাবী দোকানদারের সঙ্গে কি অ-বনিবনা হওয়ায় এক লাল রঙের সাহেব দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে তাকে যা-তা বদ গাল দেন। পাঞ্জাবী তাকে সতর্ক করেন, খবর্দ্দার, গাল দিয়ো না! তাতে সাহেব না ভোড়কে দেশীর স্পর্দ্ধা দেখে আবার সেই বদ্ গালের পুনরুক্তি করেন! যেমন গাল দেওয়া, অমনি পাঞ্জাবী যুবার প্রচণ্ড ঘুষি সাহেবের নাকে পড়া! সাহেব এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি টাল সামলে নিয়ে পাঞ্জাবীকে মারেন, পাঞ্জাবীও তার চতুর্গুণ শোধ দেন। সাহেব ছেঁড়া কোর্ত্তায় রক্তাক্ত কলেবরে রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে নালিশ করেন। তিনি বলেন, থানা আছে, কোর্ট আছে, নালিশ করগে। আমার কাছে কেন? সাহেব থানায় গিয়ে নালিশ লেখান্—তারপর কোর্টে যাবার পূর্ব্বেই বোধ হয় তাঁর চেতনা হয়, এখানে সাদায়-কালোয় পার্থক্য তো নেই! তখন ছেঁড়া কোর্ত্তা খুলে গায়ের রক্ত ধুয়ে-মুছে সাহেব নিজের কাজে মন দেন্। এ হলো গত সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা।

তারপর দ্বিতীয় বৈচিত্র্য এবং সেইটেই প্রধান বৈচিত্র্য যা চোখে ঠেকে, সে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য! পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, ফুল-ফল……এর প্রাচুর্য্যের আর সীমা নেই! পাহাড় চতুর্দ্দিকে,—কিন্তু তার একঘেয়ে ভাব কোথাও নেই। আকারে-প্রকারে পদে পদে এত পার্থক্য, বর্ণের বিচিত্র সুষমায় এমনি উজ্জ্বল যে বিস্ময়ে এই গিরিমালার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে যায়! চিত্রকরের তুলির রেখায় ফুটিয়ে তোলবার মতই মহান্ সে দৃশ্য, সুন্দর সে দৃশ্য! উত্তর দিকে চাও, পাহাড়ের সাগর যেন! মাথায় তুষারের শুভ্র কিরীট, সাগরের তরঙ্গের মতই ফেনিল! উত্তরের এ পর্ব্বতের নাম নাঙ্গা পর্ব্বত। পূর্ব্বদিকে চাও, গম্ভীর মূর্ত্তিতে উচ্চ-শিখর গিরিরাজি সিন্দ্-উপত্যকাকে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণে মহাদেও পর্ব্বত, শ্রীনগরের পানে তাকিয়ে অচল দাঁড়িয়ে আছে! মহাদেও পর্ব্বতের পাশে অমরনাথ পর্ব্বত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পীরপাঞ্জাল, আর পশ্চিমে ফার্ ও দেওদারের ঘন জঙ্গল পঞ্চনদকে চোখের আড়াল করে পুঞ্জিত রয়েছে! পাহাড়ের গা ফেটে অসংখ্য ঝর্ণা ঝরে পড়ছে। জলের এখানে অপ্রতুল নেই। পান করবার জন্য কলের জল আছে। পথে জল নেবার জন্য অসংখ্য হাইড্রাণ্ট, আর খুব তোড়ে তাতে দিবারাত্রি জল পাওয়া যায়। এই জল আসচে হারবন থেকে। সেখানে পাহাড়ের উপর লেক্ আছে।

উলার হ্রদ

পাহাড়ের জল সেই লেকে অজস্র ধারে জমা হচ্ছে। লেকটি খুব হুঁশিয়ার প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে, কেউ না স্পর্শ করতে

শালও পরিষ্কার কাচা হয়। যেখানে শাল কাচা হয়, সে অংশের নাম গাগ্রিবল। গাগ্রিবলের দৃশ্য চমৎকার। ডালের

শঙ্করাচার্য্য পাহাড়

পারে। হারবন দেখার অনুমতি নিতে হয় রাজ-সরকার থেকে। অনুমতি-পত্র ছাড়া হারবনের গণ্ডীর মধ্যেও কেউ প্রবেশ করতে পারে না।
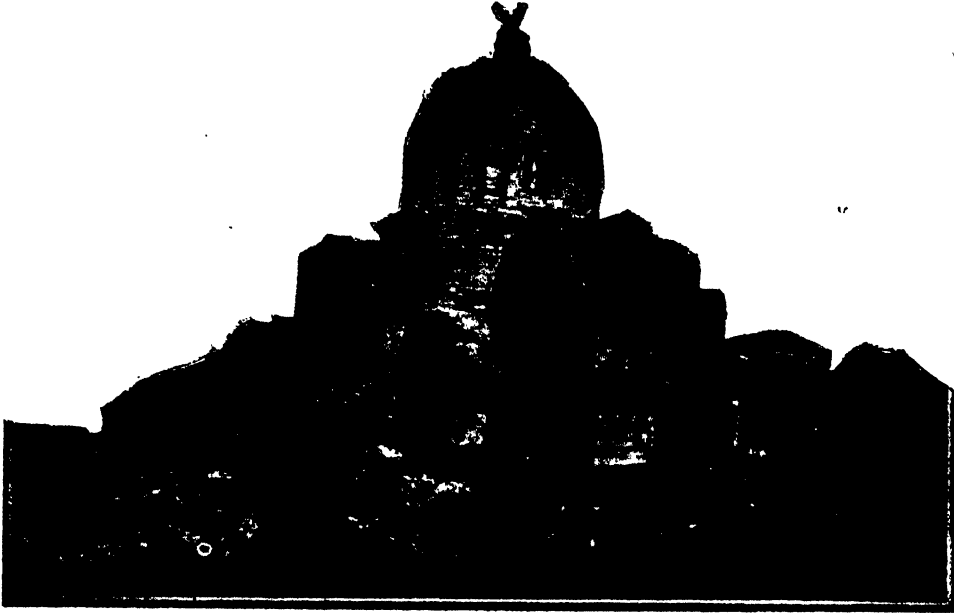
পরিধি হলো লম্বে পাঁচ মাইল, চওড়ায় দু' মাইল। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের নীচেই। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা, আর পাহাড়ের বুকে মাঝে মাঝে হালের বাংলা-বাড়ী,—

নদী—ঝিলাম্। নাম বিতস্তা। কাশ্মীরীরা বলেন ভেট্। বারামুলা-অঞ্চলে ঝিলামের নাম কাশুর দরিয়া; তারপর ডোমেলের কাছে যেখানে কিষণগঙ্গ নদীর সঙ্গে কাশুর দরিয়া মিশেছে, সেই অঞ্চল থেকে ঝিলাম নামেই প্রসিদ্ধ।

শ্রীনগর—প্রাসাদ

তার পর হ্রদ। কাশ্মীরে অসংখ্য হ্রদ। শ্রীনগরে ডাল্ হ্রদ। খুব স্বচ্ছ জল, আর এত পরিষ্কার যে জলের নীচে মাছগুলো খেলা করে বেড়াচ্ছে, দেখা যায়—এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। ডালের অর্থই হ্রদ। ডালের জল এত পরিষ্কার যে এর একটি জায়গায় শাল কাচা হয়। জল খুব soft; তাতে খুব মিহি

ও সেকালের 'পরীমহল', 'চশ্‌মা-সাহী'। ছবির মত দেখায়!

কাশ্মীরের বিখ্যাত উলার হ্রদ হলো বন্দীপুরের কাছে গিল্‌গিট যাবার পথে। উলারের অর্থ গুহা (cave)।

উলারের বিস্তার ১৫ মাইল। জল খুব গভীর—ঝড়ের সময় উলারে বিপদের ভয় খুব বেশী। বড় বড় হাউস-বোট ঢেউয়ের তোরে ত.রে এসে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ে; এবং এ ঝড় খুবই আচম্বিতে ও অকস্মাৎ নামে! উলারে বেড়াতে যেতে হলে সকালে আসতে হয়—বিকালের দিকেই ঝড় ওঠে। উলা-রের মাঝিরা ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারলে তখনি হুঁশিয়ার হয়ে চটপট্ বোট তীরে নিয়ে আসে। উলারের পাশে মস্ত পাহাড়; তার নাম বাবা শফরুদ্দিন। এই পাহাড়ের মাথায় এক পীরের আস্তানা আছে।
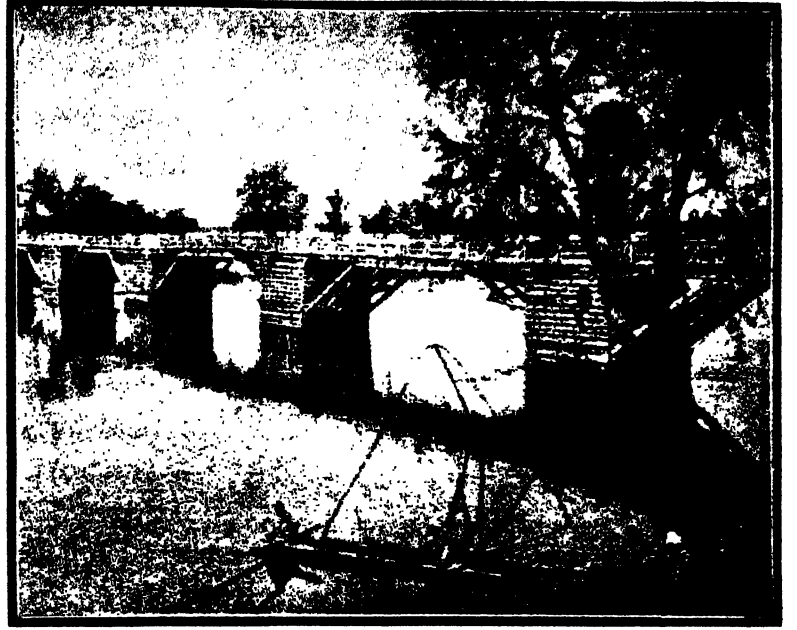
ঝিলামের বুকে পঞ্চম সেতু

কাশ্মীরের সাধারণ গৃহের নমুনা

কাশ্মীরে কলেরা, বসন্ত, এই দুটী রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। কাশ্মীরীরা যে-অঞ্চলে থাকে, সে-অঞ্চলে অত্যন্ত সরু গলি,—কাশীর গলি তো তার কাছে চৌরঙ্গী! এই গলি-ঘুঁজির মধ্যে ছোট ছোট ঘেঞ্জি বাড়ী-ঘর—আর লোকগুলিও তেমনি নোংরা। দেহে ভগবান অজস্র রূপ ঢেলে দিলে কি হবে—এ রূপের তারা তোয়াজ জানে না। মেয়েদের স্নানের ভঙ্গী ভারী অদ্ভুত। মাথায় কবে সে কোন্ সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে বেণী যা বেঁধেছে—সে বেণী খোলে ওনি, কোনোদিন! স্নানের সময় জলে মাথা ভেজায় না—সারা দেহ নগ্ন করে জলে ডুবিয়ে সে জল না মুছেই ঘাগরা

ঝুলিয়ে দেয়। বাড়ী গিয়ে জল মোছা সম্ভব! কিন্তু জলশুদ্ধ ভিজে গায়ে শুকনো ঘাগরা ঢাকা দেওয়া—এ একেবারে তাজ্জব দৃশ্য!

রোগ ছাড়া ভূমিকম্প এবং আগুন লাগার বিপত্তিও বড় অল্প নয়। ভূমিকম্পের জন্য বাড়ী সব কাঠের তৈরী। বিলাতী কটেজের মত—মাথায় চিমনি। চিমনি না থাকলে শীতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া শক্ত।

কাশ্মীরীদের ভাষা প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত; ভাষার নাম কাশুর। এবারের মত কাশ্মীরী ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বিদায় নেওয়া যাক্। এদের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার কতক মিল আছে—সেটুকু উপভোগ্য।

Boatকে কাশ্মীরীরা বলে, নাও; Green সব্জ্; White শ্বৎ; Copper ত্রাম্; Court-yard আঙ্গন; Cross তরণ্; Dance নৎসন; Day দো; Drink সেওন্; Lake ডাল্; Eye আথ; Forest ওয়ান্; Fowl কুকর্; Grand-father বুড়ীবাপ; Meat মাষ্; Milk দোধ্; Name নাও; Pigeon কোতর্; Right side দখণ; Snake সরফ্; Sunshine তাপ্; Washerman ধোব্; Wind আওয়া; Blood রত্।

দুটী প্রবচনের নমুনা দি—

"গ্র-স্ত হস্ত"—এর মানে "চাষা, না হাতী!"

"বাতা ইয়ার বে-রোজগার"—এর মানে, "পণ্ডিত বন্ধু হয়, যখন তার রোজগার বন্ধ থাকে।"

কাশ্মীরের আরো বিশেষ কথা পরের বারের জন্য মুলতুবি রইলো।

শরৎ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

আবার এলে নূতন হয়ে
নূতন করে আবার এলে।
বনে মনে ফুটায়ে ফুল
এলে কমল নয়ন মেলে।
এলে নদীর কলস্বনে,
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে,
এলে রূপের রূপালিতে
বুকের ভাঙ্গা মৃণাল ঝেলে।

অতীতে আজ আন্‌লে ডেকে
চিরনূতন শানাই গানে।
শৈশবেরি নিমন্ত্রণ হায়
ভগ্ন গৃহের দরদালানে।
তোমার পানে নয়ন তুলে,
যাই যে বয়স যাই যে ভুলে,
'সরস্বতী'র রুদ্ধ বুকে
জোয়ার ভাটা আবার খেলে।

এলে মোদের বনশ্রীতে
গৃহশ্রীতে আবার তুমি,
মলিন আকাশ সুনীল করে
সবুজ করে কানন-ভূমি।

এলে শত যুগের স্মৃতি
এলে মধুর মিলন প্রীতি,
এলে ধূসর বালুর বেলায়
জোৎস্নারি সোহাগ ঢেলে।

আনো তোমার গজের পিঠে
মহামায়ায় আবার আনো,
স্নেহের অধিবাসের বাসর
মায়ের মায়া ভালই জানো।
আনো সম্বৎসরের আশা
আলিঙ্গন আর ভালবাসা
পুরানো ঘট আবার ভরি'
আনো নূতন চোখের জলে।

চিরনবীন চিরকিশোর
সবুজ হিয়ার তুমিই সাথী,
দিবস তোমার আলোয় ভরা
সুধায় ভরা শারদ রাতি।
চিরশ্যামল তোমার পথে
চাই যে আমি পথিক হতে
বুকের দীঘি পদ্মে ভরে
তোমার সরস পরশ পেলে।

পাকাদেখা

শ্রীনির্ম্মল দেব

আজ আমার বয়স সাতাত্তর বছর। তিন-কুড়ি সতেরোটা শরৎ-বসন্ত এই জীবনের রাঙা-মাটির পথ দিয়ে আনাগোনা ক'রেছে—রেখে গেছে স্মৃতির ধূলি-রেখায় তা'দের পায়ের চিহ্ন! সেই এক দিন সকাল-বেলায় বুনেছিলুম বীজ, তা'রই ফসল ব'সে ব'সে কাট্‌ছি আজ এই গোধূলি-বেলায়! আর বেশী দেরী নেই, বেলা প'ড়ে গেছে,—এখনই অন্ধকার হ'য়ে আস্‌বে। তা'র আগেই আমার এ ধানের আঁটি তুলে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌তে হবে—সাতাত্তরটা বছরের হাসি-কান্নার আল্‌পনা-আঁকা আঙিনায়। তা'র পর এই নতুন ধানে আমার নবান্নের উৎসব হবে, কিন্তু তা' ওই অন্ধকারের এপারে নয়, ওপারে,—নব-জীবনের অরুণ-আলোয়!

এই দীর্ঘ সাতাত্তরটা বছর আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে কত ফুল ফুট্‌লো, কত ফুল ঝ'রে গেল, কত সুর বাজ্‌লো, কত সুর থেমে গেল! কিন্তু সব ফু'টে ওঠা—ঝ'রে যাওয়া, বেজে ওঠা—থেমে যাওয়ার মাঝখানে যে জিনিষটি আমার সারা-জীবন ঘিরে অক্ষয়-অমর হ'য়ে আছে,—যা'র পাপ্‌ড়ি কোনো দিন ঝ'রবে না, যা'র ঝঙ্কার কোনো দিন থাম্‌বে না,—আজ এই সন্ধ্যা-বেলা একলা ব'সে সেইটিকে নিয়েই নাড়্‌ছি-চাড়্‌ছি—ছোট বালিকার খেলা-ঘরের পুতুলের মতন!

যৌবনের সকাল-বেলাতেই সেই যে না-বুঝে একটা প্রকাণ্ড ভুল ক'রে ফেলেছিলুম, সেই একটিমাত্র ভুলেরই জের চ'লেছে কত বিচিত্র রেখায় এই দীর্ঘ জীবনের পথ বেয়ে। আজ এই নিঃসঙ্গ জীবনের সুদূর সীমান্তে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটাই বার-বার মনে হ'চ্ছে—সে ভুল কি আমার, না আমার অলক্ষ্য অদৃষ্টের! সেই ভুলটুকুই আজ আমার একমাত্র সম্বল—আমার পারের কড়ি! তখন মনে হ'তো—এই যে আমার যৌবন-প্রভাতে আশোয়ারীর রেশটুকু মিলোতে-না-মিলোতেই পূরবীর কড়ি-মধ্যম কেঁপে উঠ্‌লো, আমার জীবন-দেউলে বোধনের মন্ত্র থাম্‌তে-না-থাম্‌তেই বিসর্জ্জনের বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো,—কেন এমন ভুল ক'রে ফেল্‌লুম! তখন সে ভুলের জন্যে কত-না কেঁদেছি, কত-না দুঃখ পেয়েছি! তখন তো বুঝি নি যে, ভুল ক'রে দুঃখ পাবার অনুভূতি যিনি দিয়েছেন, না-বুঝে ভুল কর্‌বার মূর্খতাও তো তাঁ'রই দেওয়া,—আমি কে! তাই আমার সব ভুল ভ্রান্তির হিসাব-নিকাশের ভার, মানুষের ভুল ভ্রান্তির মালিক যিনি, তাঁ'রই হাতে তুলে দিয়ে, আজ চুপ্‌টি ক'রে ওপারের পানে চেয়ে ব'সে আছি—খেয়ার প্রতীক্ষায়!

* * * *

তখন আমার বয়স তেইশ বছর,—সেই বয়স, যে বয়সে পূর্ণিমার চাঁদ ডুব্‌তে চায় না, পাখীগুলো গান গেয়ে-গেয়ে হাঁপিয়ে পড়ে না, শেফালি-যূথিকা-চামেলির গন্ধ দখিণা বাতাসে দিবা রাত্র ভেসে-ভেসেও ফুরিয়ে যায় না! পাশের পড়ার দোহাই দিয়ে মা'কে বরাবর ঠেকিয়ে রেখে, শেষে এক দিন যখন মা আবার সেই কথা পাড়্‌তে আর সে পুরোনো দোহাই না দিয়ে চুপ ক'রে রইলুম, তখন মা আমার মৌন সম্মতিতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কোমর বেঁধে ঘর-আলো-করা বৌ খুঁজ্‌তে সুরু ক'রে দিলেন। সে যেন একটা সুন্দরী-স্বয়ম্বর যজ্ঞ লেগে গেল! দুনিয়ার যেখানে-যেখানে সুন্দরী কুমারী ছিল, তা'দের খুঁজে বা'র কর্‌বার জন্যে ঘটক-ঘট্‌কীদের মধ্যে একটা তুমুল সাড়া প'ড়ে গেল। শেষে সকলের সৌন্দর্য্য যাচাই ক'রে নির্ব্বাচিত হ'লো আমাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। পণের হাঙ্গামা ছিল না, তাই কেবলমাত্র রূপের জোরেই পাত্রী ঠিক হ'য়ে গেল।

তরুণ জমীদার আমি। সাত-শ টাকা দামের হীরের দুল দিয়ে মামা পাকা দেখে এলেন। সঙ্গে গেছ্‌লো সুনীল—আমার আজন্ম-সুহৃৎ। সে ছিল কবি—রূপ চিন্‌তে পাকা জহুরী! তাই তা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসার লোভ সাম্‌লাতে না পেরে তা'কে মামার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

দিন-পনেরো পরে বিয়ের দিন ঠিক হ'য়ে গেছে।

সন্ধ্যাবেলা বাগানে নদীর ধারে ঝাউ-গাছের তলায় একটা ইজি-চেয়ারের ওপর এলিয়ে প'ড়ে ভাব্‌ছিলুম—এই পনেরোটা দিন ফুরোতে কতদিন লাগ্‌বে!—কবে আস্‌বে

সে-দিন, যেদিন জ্ব'লে উঠ্‌বে সেই রূপের প্রদীপ-শিখা আমার এই দীপহীন দেউলে,—কবে এক দিন সানাইয়ের বাঁশীর সুরে চেলী-চন্দনে সেজে, সিঁদুরের রাঙা রাগে সে এসে দাঁড়াবে তা'র রক্ত-চরণ ফেলে, আমার এই অন্তর-জোড়া তরুণ-যৌবনের-কল্পনা-চিত্রিত পিঁড়িখানির ওপর—মূর্ত্তিমতী উষার মতন!

সুনীল এসে আমার পাশে ঘাসের ওপর ব'সে প'ড়লো। মনের নিবিড় কৌতূহল গোপন ক'রে, বাহ্যতঃ নিস্পৃহভাবে তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কেমন দেখ্‌লি রে সুনীল?"

সুনীল ব'ললে—"চমৎকার! কিন্তু ভাই—"

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কিন্তু কি?"

সুনীল একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললে—"তা'র পিঠে বোধ হয় ভাই, একটু কুঁজ আছে!"

বুকের ভেতরটা ধ্বক ক'রে উঠ্‌লো। আকণ্ঠ উদ্বেগ অতি কষ্টে চেপে সহজভাবে তা'কে ব'ললুম—"দূর! তুই ভুল দেখেছিস্! বোধ হয় সে লজ্জায় একটু সাম্‌নে ঝুঁকে প'ড়েছিল, তুই তা'ই কুঁজ ভেবেছিস্।"

সুনীল তা'তেও নিশ্চিন্ত না হ'য়ে ব'ললে—"না ভাই, আমার মনে হ'লো পিঠের ওপর কি যেন উঁচু হ'য়ে আছে! সে নিশ্চয়ই কুঁজ!"

সূর্য্যাস্তের গৈরিক আভাটুকু সন্ধ্যার আকাশ হ'তে যেন পলকের মধ্যে আমার চোখের সাম্‌নে নিভে গেল! যেখানে-সেখানে, যখন-তখন তা'র অপূর্ব্ব রূপের খ্যাতি শুনে-শুনে আমার যৌবনের কল্পলোকে নীরবে নির্জ্জনে ব'সে তা'র যে বিচিত্র মানসী-মূর্ত্তি ধীরে-ধীরে গ'ড়ে তুলেছিলুম, আজ একটা নিমেষে সে মূর্ত্তি যেন ভেঙ্গে-চূরে গুঁড়িয়ে গেল! আর কিছু ব'লতে পারলুম না। সুনীলের মনে সংশয় জেগেছে, নিশ্চয়ই কোনো একটা বিশেষ রকম গোলমাল আছে!

রাত্রে মা ভাঁড়ার-ঘরে ব'সে মামার সঙ্গে বিয়ের আয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিলেন, আমি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তাঁ'দের সাম্‌নে গিয়ে ব'ললুম—"মা, আমি বিয়ে ক'রবো না!"

মা ব'ললেন—"কেন রে, আবার কি হ'লো?"

আমি ব'ললুম—"না, আমি বিয়ে ক'রবো না!"

মা ব'ললেন—"সে তো বুঝলুম, কিন্তু কারণটা কি বল না!"

আমি কোনো ইতস্ততঃ না ক'রে সোজাসুজি ব'লে ফেললুম—"শেষে তোমরা কোত্থেকে একটা কুঁজো মেয়ে ঠিক ক'রেছো!"

মা বিস্মিত-চক্ষে আমার শুষ্ক মুখের পানে চেয়ে ব'ল্‌লেন "সে কি রে! এত লোক এত বার দেখে এলো, আমি নিজেও দেখে এসেছি, সকলেই একবাক্যে মরি, মরি ব'ললে, কারুর চোখে কোনো খুঁত প'ড়লো না, আর তুই আজ ব'লছিস্ কি না সে কুঁজো! এ বাজে খবর তুই কোত্থেকে পেলি? আর তা' ছাড়া সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে—পাকা-দেখা পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে, এখন এ সম্বন্ধ মিছিমিছি ভেঙ্গে দেওয়া কতখানি অন্যায় হবে বল্ দিকিন! তা'রা গরীব হ'লেও এতখানি অভদ্র ব্যাপার কি করা উচিত?"

আমি তবু অবিচলিতভাবে ব'ললুম—"না, ও মেয়ে আমি বিয়ে ক'রবো না!—বিয়েই ক'রবো না!"

মা উদ্বিগ্ন-চিত্তে ব'ললেন—"আচ্ছা, আমি বন্দোবস্ত ক'রছি, তুই নিজে গিয়েই একবার দেখে আয়! তা'র পর এসে বলিস্।"

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

* * * *

হাতীতে চ'ড়ে, লোক-লস্কর নিয়ে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ক'রে মামার সঙ্গে মেয়ে দেখ্‌তে গেলুম। এক জীর্ণ কুটীরের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতেই, একটি স্নিগ্ধ-সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে, আমাদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে, ভেতরে নিয়ে গিয়ে মাটির দাওয়ার ওপরে স্বহস্তে একখানা মাদুর পেতে সস্মিত মুখে দু'টি হাত বাড়িয়ে আমাদের ব'সতে ব'ললেন। আমাদের ধন-দৌলতের খ্যাতি ও-অঞ্চলে লোকের মুখে-মুখে ফিরতো। সেই ধনী জমীদার-বংশের একমাত্র দুলাল আমি—আমি যে তাঁ'র সামান্য পর্ণ-কুটীরে এসে ব'সেছি, আমার যোগ্য সমাদর যে কিছুই হ'চ্ছে না—সেজন্যে কোনো কুণ্ঠার ছায়ামাত্রও বৃদ্ধের হাবে-ভাবে ভাষায়-ভঙ্গিমায় প্রকাশ হ'লো না! জীবনে সেই একটি দিনমাত্র বিস্মিত হ'য়ে দেখেছিলুম—দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্যের সামনে কেমন ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ায়!

মামা বৃদ্ধের সঙ্গে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি বিষয়ে রঙ-বেরঙের গল্প জুড়ে দিলেন। আমি নিঃশব্দে ব'সে তাঁর ঘর-দোরের ওপর চোখ বুলোতে লাগ্‌লুম। পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন দেওয়াল, মেজে ; আঙিনার সর্ব্বত্রই একটি কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর দরদী হাতের পরশ যেন ফুলের মতন ফুটে র'য়েছে! ছোট আঙিনার এক প্রান্তে শিউলি-গাছের তলায় একটি তুলসী-মঞ্চ,—ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলে মঞ্চটির চার পাশ ছেয়ে গেছে। ধনীর প্রাসাদে ভোগ-ঐশ্বর্য্যের নিত্য সমারোহের মধ্যে আজন্ম-বর্দ্ধিত আমি—আজ এই সুন্দর, সুশ্রী দারিদ্র্যের রিক্ত, শুভ্র, তাপস মূর্ত্তি আমার চোখে বৈচিত্র্যের হিসাবে বড় ভাল লাগ্‌লো!

খানিক পরে মামার কথার ইঙ্গিতে বৃদ্ধ মেয়েকে আন্‌বার জন্যে উঠে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃদ্ধের সঙ্গে একটি মেয়ে এসে আমাদের আনত প্রণাম ক'রে ধীরে ধীরে আমাদের সাম্‌নে একটু দূরে গিয়ে ব'স্‌লো।—আসতে আস্‌তে উদ্দাম লজ্জায় তার পা-দুটো জড়িয়ে গেল না,—আমাদের সাম্‌নে ব'সে অকারণ কুণ্ঠায় তার মাথাটা কোলের কাছে ঝুঁকে পড়লো না,—সহজ সরল ভাবে অসঙ্কোচে সে আমাদের পানে দুটি কালো চোখের অকুণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে চাইলে। আমি সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে, লজ্জার জড়িমা জোর করে কাটিয়ে ফেলে, উৎসুক চোখ তুলে তার দিকে তাকালুম। খানিকক্ষণ আমার চোখের পলক পড়লো না!—সুন্দরী বললে তার কিছুই বলা হয় না,—রূপসী বললেও তার বেশীর ভাগ না বলাই থেকে যায়! সে ভোরের শুকতারার অঞ্চল আলো, স্তব্ধ-গভীর নিশীথে দূর বেহাগের মূর্চ্ছনা, শরতের স্বচ্ছ নীল সন্ধ্যাকাশে সূর্য্যাস্তের গৈরিক আভা!—তেম্‌নি নিবিড়, তেম্‌নি গভীর, তেম্‌নি মহান! না, না,—সে এসবকে ছাপিয়েও আর কিছু! সে যে কি—তা আমি জানি না!—সেদিন জানি নি, পরে জানি নি,—এই বিচিত্র দীর্ঘ জীবনের কোনো দিন জান্‌তে পারি নি! সে তাই—যা দেখে বিস্মিত পুলকে, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়;—"কী সুন্দর!" বল্‌বার চেতনাটুকুও দেহের মধ্যে থাকে না। মঞ্জরিত যৌবনের বসন্তোৎসব তার দেহের মাধবী-কুঞ্জ সুরু হয়ে গেছে, কিন্তু সে উৎসবের বাঁশরী-ধ্বনি যেন তার কাণে গিয়ে এখনও পৌঁছয়নি,—এখনও যেন তার শিশুকালের মনটি পড়ে আছে সেই খেলাঘরের পুতুলেরই দিকে! কিন্তু এমন একটা সস্মিত গাম্ভীর্য্য তার নধর মুখখানির ওপরে মাখানো যে, মুখ দেখে তার বয়স পাঁচ কি পঁচিশ তা ঠিক করা একটা দুরূহ ব্যাপার!

আমি চুপ করে বসে মনে মনে স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করতে লাগলুম। ভবিষ্যৎ জীবনের কত রঙীন কল্পনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আমার চিত্ত-সৈকতে শত ধারে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বেলা পড়ে আসছিলো; বিদায়মান সূর্য্যের একটা পথহারা রশ্মি শিউলি গাছের ফাঁক দিয়ে তার অকম্পিত মুখের ওপরে এসে পড়েছিলো—দেবী-প্রতিমার মুখে সন্ধ্যারতির পঞ্চ-প্রদীপের আলোর মতন!

কতক্ষণ আমার এমন মুগ্ধ বিহ্বল ভাবে কেটে গেছলো, সে খেয়াল আমার ছিল না। চমক ভাঙলো—যখন মামা আমার গায়ে হাত রেখে একটু নাড়া দিয়ে বললেন—"কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও তো করো।"

আমি লজ্জা পেয়ে শুধু বললুম—"না।"

বৃদ্ধ স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন—"ভালো করে দেখে নাও বাবা, পিঠে কোনো দোষ আছে কি না,—মনের কোণে কেন একটা অকারণ সন্দেহ থেকে যায়!"

মাথাটা আমার নিদ্রিতের মাথার মতন মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লো,—মনে মনে নিজেকে শত ধিক্কার দিয়ে আমি নির্ব্বাক হয়ে রইলুম।

তেম্‌নি সশ্রদ্ধ প্রণাম করে সে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল—গোধূলি বেলায় দিনান্তের শেষ আলোটুকুর মতন,—আমাদের সাম্‌নটা অন্ধকার করে!

আরও খানিক ক্ষণ এ-কথা সে-কথায় কেটে গেল। আমরা উঠবো-উঠবো করছি, এমন সময়ে ভেতর থেকে একটা স্নিগ্ধ আহ্বান এলো—"বাবা!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠে "এখনই আসছি!" ব'লে চ'লে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ফিরে এসে একটা ভেল্‌ভেটের কোটো আমার হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও বাবা।"

আমি চেয়ে দেখলুম—সেই হীরের দুল, যা দিয়ে মামা পাকা দেখে গেছলেন। বৃদ্ধের কথার অর্থ কিছুই বুঝতে না পেরে সেটাকে হাতে ধরে আমি অভিভূতের মতন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম! বৃদ্ধ বললেন—"দেখে নাও বাবা, ঠিক আছে কি না; ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমার মেয়ে চির-কুমারী থাকতে চায়!"

মামা প্রগাঢ় বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন?"

শান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন—"কেন তা' তো জানি না;

তার কোনো কাজের 'কেন' আমি কখনো জিজ্ঞাসা করি নি, জিজ্ঞাসা করবার দরকারও কোনো দিন হয় নি। কারণ, দারিদ্র্যের শূন্য কোলেই সে আজন্মকাল মানুষ হয়েছে, তাই সে যা' বলে, সব দিক ভালো ক'রে ভেবে-চিন্তে, স্থির-সঙ্কল্প হ'য়ে বলে।"

মামা ব'ললেন—"এটা কি ভালো হচ্ছে বেয়াই মশাই?"

বৃদ্ধ মৃদু হেসে ব'ললেন—"ভালো-মন্দর বিচার সত্যিই আমি এতদিনেও ক'রতে জানি না ভাই! তবে শুধু এইটুকু জানি—মানুষ তার নিজের সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের পানে চেয়েই জগতের ভালো-মন্দর বিচার করে। যদি অপরের অন্তরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে সে বিচার ক'রতো, তা' হ'লে ভালো-মন্দর রঙ্‌ ব'দলে যেতো।"

* * * * *

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১

কিরণের সহিত সেদিনের সাক্ষাতের পর হইতে দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আর লীলার সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই।

কিরণ অধীর চিত্তে লীলার আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু তাহাকে ডাকিবার কথা মনে হইলেই লীলা কাঁপিয়া উঠিত। সেদিনের পর হইতে তাহার সহিত আগের মত সহজ ভাবে দেখা করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিরণও আর পূর্ব্বের মত অকুণ্ঠ ভাবে তাহার কাছে আসিতে পারিত না।

দীর্ঘ দুই মাসের পর সেদিন লীলা বৈকালে ড্রয়িংরুমে নামিয়া আসিয়া বসিয়াছিল। বীণা তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিল, ও মধ্যে মধ্যে অধীর ভাবে জানালার মধ্য হইতে পথের দিকে চাহিতেছিল।

সুস্থ হইবার পর হইতে লীলা বীণার মধ্যে একটা অত্যন্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত। তাহার পূর্ব্বের সে চাঞ্চল্য ও কৌতুকপ্রিয়তা অনেকাংশে ঘুচিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহার চোখে-মুখে যে একটা ভোগ-বিলাসের ও অসার দম্ভের প্রখর দীপ্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিত, তাহা লুপ্ত হইয়া একটি কোমল মধুর ভাব তাহার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লীলার রোগের সময় হইতে সে তাহার সমস্ত আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—সাধ্যমত তাহার সেবা করিত। লীলা অনুতপ্ত মুগ্ধচিত্তে ভাবিত, এই বীণাকে সে এতদিন হৃদয়হীনা অসার-প্রকৃতি বলিয়া কত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, কত অবহেলা করিয়াছে।

দুই ভগিনীর আলাপের মধ্যে কুমার গুণেন্দ্রভূষণ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

'এই যে! আপনি আজ নেমে আসতে পেরেছেন!' কুমার অত্যন্ত বিনম্রভাবে লীলাকে নমস্কার করিয়া বীণার পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। পরে লীলাকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলিলেন—কি চেহারাই হয়ে গেছে আপনার—ঠিক যেন ছোট পাখীটির মত; যাহোক্‌ ভালো হয়ে উঠেছেন যে, সেইটাই লাভ! যে ভয় আমাদের হয়েছিল!

লীলা একটু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল!

কুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বীণার মুখ আগ্রহে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—জানো লিলি, তোমার অসুখের সময় ওঁর যে কি ভাবনা আর কি ভয়, সে যদি দেখতে! বাড়ীতে স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না, সকালে চা খেয়েই এখানে এসে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বসে থাকতেন। আবার ফিরে গিয়ে নাওয়া খাওয়া সেরে সেই যে চলে আসতেন, একবারে রাত দশটা পর্য্যন্ত! কতদিন বাড়ী যেতেই চাইতেন না,—মা কত বুঝিয়ে, কত করে পাঠিয়ে দিতেন। সারাক্ষণ ভেবে ভেবে অস্থির!

—ভাবনা হবে না? সে কি সহজ কাণ্ডটি হয়েছিল বীণা? আর তা ছাড়া, আমি এ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তোমাদের সুখ-দুঃখ ঠিক তোমাদের মতই সমান ভাবে

আমি অনুভব করি। বাইরের লোকের মত একবার এসে খোঁজ খবর নিয়ে চলে গেলে ত আমার মন বুঝতো না! কুমার অত্যন্ত কোমল স্বরে বীণাকে কথাটা বলিয়া লীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত আমার কিসে লেগেছিল জানেন? কেবলি আমার মনে হত যে, যে দিনই আমার সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হলো, তার দু' ঘণ্টা না যেতে যেতেই কি সেইখানে সঙ্গে সঙ্গে এমন শক্ত অসুখ? তখনো ভাল করে একটা কথা পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে কইতে পারি নি, অথচ পিসীমার কাছে আপনাদের কথা শুনে পর্য্যন্ত আলাপ করবার জন্য এত আগ্রহ এত ইচ্ছা কতদিন থেকে মনে রয়েছে। নানা কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে. আসা আর হয়ে উঠছিল না। তা যদি বা অনেক কষ্টে কোন মতে আসা হলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপার—কি জানি তখন কেমন আমার মনে হত যে, আমার সঙ্গে দেখা না হলে হয় ত আপনার এমন অসুখ হতো না। অবশ্য এ কথাটার কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। তবু সে সময় খালি ঐ কথাটা মনে হয়ে কেবলি আমার নিজের উপর বড় রাগ হতো!

কুমারের সঙ্গে লীলার পরিচয় কেবল দু' তিন মিনিটের মাত্র, তবু তিনি এমন নম্র মৃদু ভাবে, এমন আত্মীয়তার ভঙ্গীতে কথাগুলি বলিলেন যে, লীলা অপরিচিতের এত ঘনিষ্ঠতার অধিকার লওয়ায় বিরক্ত হইতে পারিল না।

সে বলিল—আপনি আমার কথা ভেবে এত দিন কষ্ট পেয়েছেন, আমি তার কিছুই জানতুম না। সংসারে বন্ধুবান্ধব অবশ্য অনেক পাওয়া যায়, তবে প্রকৃত ব্যথার ব্যথী বন্ধু লাভ অনেক সৌভাগ্যের কথা। আপনাকে অকৃত্রিম বন্ধু রূপে পেয়ে আমিও খুব সুখী হলুম। এখন এখানেই ত থাকবেন কিছু দিন?

—সেই রকম ইচ্ছেই ত আছে। অবশ্য আবার সেখানে বিশেষ দরকার যদি না পড়ে। তা আপনি এখন বেশ সুস্থ আছেন ত মিস রায়? আর ত কোন রকম অসুখ নেই?

লীলা বলিল—অসুখ বিশেষ কিছু নেই,—এখন গায়ে আর একটু বল পেলেই বাঁচা যায়। অসুখের চেয়ে এই ঘরের মাঝে বন্দী হয়ে থাকাটা যেন আরো কষ্টকর হয়ে উঠেছে! কতকাল যে বাড়ী থেকে বেরোই নি, তা মনেই পড়ে না! মনে হচ্ছে যেন আজন্মকাল এমনি ঘরে বসেই কেটেছে।

—সত্যি! বাড়ীতে বসে বসে এমনি অস্বস্তিই ধরে বটে! আমি ত কাজকর্ম্মের সময় ছাড়া এক মুহূর্ত্ত বাড়ীতে বসে থাকতে পারি না। বড়দিনের সময় আমরা সকলে মিলে শিকারে যাব স্থির হয়েছে। এখানে শিকার আর কি—এই একটু বেড়ানো, আমোদ আহ্লাদ, আর দু' একটা পাখী মারা এই আর কি! মেয়েরাও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে যাবেন ঠিক হয়েছে। তত দিনে আপনি যদি আর একটু সারেন, তা হলে আমাদের সঙ্গে বেরোবেন—আপনি ত খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারেন শুনেছি। খুব বেড়ানো হবে সমস্ত দিন—আপনার বেশ ভালোই লাগবে।

—দেখা যাক্, যদি পারি, নিশ্চয়ই যাব—ফাঁকা হাওয়ায় যাবার জন্যে আমার মন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

লীলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিরণ মিসেস রায়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে প্রতি দিনই এই সময় তাঁহাকে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরাইয়া দিতে আসিত। প্রতি দিনই তাহার আশা হইত, যদি লীলার সঙ্গে দেখা হয়। আজ তাহাকে দেখিয়া সে তাহার পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল।

মিসেস রায় কুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—এই যে গুণেন্দ্র! তুমি এখানে! ক্লাবে সকলে আমায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল! ওরা বলছিল তুমি যে ক্লাবে যাওয়া, সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করা, সবই ছেড়ে দিলে—ব্যাপারটা কি! তা আর যাও না যে?

কুমার বলিলেন—গিয়ে কি হবে বলুন? আমার ও-সব সঙ্গ আর ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গ মন থেকে ভাল লাগে, সেইখানেই ঘুরে-ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়, সেইখানে বসেই সময় কেটে যায়—পাঁচ জায়গায় যাবার সময়ই বা কোথা? কথাটা বলিয়া কুমার হাসিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিলেন।

—তা বেশ বাছা! যেখানে ভাল থাক সেখানেই থেক। লীলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে? বলিয়া মিসেস রায় প্রীতি-প্রফুল্লমুখে বলিলেন—গুণেনের সঙ্গে আলাপ করো লীলা! অমন গুণের ছেলে আর হবে না! কিরণ, বসো তোমরা, আমি কাপড় ছেড়ে এখনি আসছি।

মিসেস রায় চলিয়া গেলে, লীলা কুমারের উদ্দেশে বলিল—আপনারা বসুন, ঠাণ্ডা পড়ছে, আমি এবার ঘরে যাই।

কিরণ তখন বলিল, তুমি বেড়াতে যাবার কথা বলছিলে না? কবে একটু বাইরে যেতে পারবে বলো? তা হলে আমি বিকেলে এসে তোমায় নিয়ে যাব!

লীলার মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস জমিয়া উঠিল! কিরণের সঙ্গে একা বেড়াইতে যাইবার কথায় আজ আর সে সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বীণা বলিল—আজ সকালে বাবা বলছিলেন, কাল থেকে আমাদের ক্লাবে ছেড়ে দিয়ে তিনি লিলিকে সন্ধ্যেবেলা একটু করে বেড়িয়ে আনবেন। ডাক্তার মত দিয়েছেন। তার পর সে একটু হাসিয়া আবার বলিল—জান্‌লেন কিরণ বাবু! অসুখের পর থেকে বাবার যত টান সব লিলির উপর! আমার কথা আজকাল তাঁর একবারও মনে পড়ে না!

কিরণ হাসিয়া বলিল—তাই না কি? এটা ত তাঁর বড় অন্যায় পক্ষপাত বলতে হবে! আচ্ছা! এবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি এ কথা বোলবো তাঁকে। তা হলে আমি কাল বেলা চারটের সময় এখানে আসবো কি লিলি? যেতে পারবে ত?

লীলা বলিল—তাই এসো! বাবাকে আমি বলে রাখবো, তিনি তাতে খুসি হবেন। আমি এখন কতকটা বল পেয়েছি। গাড়ীতে তোমার সঙ্গে যেতে কষ্ট হবে না বোধ হয়।

রাত্রে একা বিছানায় পড়িয়া লীলা নিজের ভাবনা আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। কিরণের সঙ্গে যখন তাহার কোন সম্বন্ধ হইবার উপায় নাই, তখন আর এ ভাবে তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিয়া মনকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। এ কয়দিন সে নিজের সঙ্গে অনেক দ্বন্দ্ব করিয়াছে, কিরণের কথা ভুলিয়া অরুণকে ভাবিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সবই বৃথা! কিরণের সেই আবেগময় কণ্ঠস্বর, তাহার সেই অনুরাগদীপ্ত অনিমেষ দৃষ্টি, প্রেমপূর্ণ মধুর কথা লীলা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। কিরণের একাগ্র প্রশান্ত দৃষ্টি তাহাকে বলিয়া দিত, সে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু লীলা যে নিশ্চিতই জানে তাহার এ অপেক্ষা বৃথা—অরুণের উপর সবই নির্ভর করিতেছে। অরুণ ত কোন দিনই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। কিরণের জন্য বেদনায় দুঃখে অনুক্ষণ তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল। যাহার সঙ্গে মিলন তাহার কাছে স্বর্গ-সুখেরও অধিক প্রার্থনীয়, কর্ত্তব্যের খাতিরে তাহাকে ছাড়িয়া হয় ত অরুণকে বিবাহ করিতে হইবে,—অরুণের সাধ্বী সেবাপরায়ণা পত্নী হইতে হইবে!

কিন্তু তবু যখন তাহার সেদিনের কথা মনে পড়ে, তখন যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা পুলকের শিহরণ তড়িতের মত বহিয়া যায়! তাহার অন্তর দুর্নিবার আনন্দের বন্যায় ভাসিয়া যায়! কিরণ—কিরণের মত অসাধারণ—লোক তাহাকে ভালবাসে!

মনের এই অদম্য আবেগ ভুলিয়া কিরণকে পূর্ব্বের মত কেবলমাত্র বন্ধু ভাবে ভাবিবার জন্য লীলা প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝিতেছিল। সে অপরের নিকট বিবাহ-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ—কিরণের প্রতি মনের এ ভাব তাহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত—এই চিন্তা তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিত্তকে নিয়ত পীড়া দিত, অথচ সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ একা ঘরে পড়িয়া পড়িয়া সে এ চিন্তা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

সেদিন ক্ষান্ত একটু সকাল সকাল শুইতে আসিল। লীলাকে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল—এই যে তুমি এখনো জেগে আছ? আমি তাই একটু সকাল করে এলুম—বলি—তুমি যদি আবার ঘুমিয়ে পড়!

লীলা বুঝিল—ক্ষান্ত আজ কোথা হইতে নূতন কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সে বলিল—কেন—এত রাত্রে তোর আবার আমার সঙ্গে কি দরকার পড়লো?

দরকার এই যে বলি! বলিয়া ক্ষান্ত সেইখানে বসিয়া পড়িল—তাহার পর বিষম উত্তেজিত ভাবে আরম্ভ করিল—হাঁ্যা গা দিদিমণি! তোমাদের এ কেমন ধারা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড বল দেখি? একে ত এই সব সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে দিবে রাত্তির যত পুরুষমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেচে বেড়ানো! তার উপর ওই যে সব মড়ুইপোড়ারা এখানে ধেই ধেই করে নাচতে আসে, তাদের একটু দেখে শুনে খবর নিয়েও কি আনতে নেই? যে সে এসে ঘরে ঢুকলেই হলো? গড় করি বাছা! তোমাদের পায়ে আর তোমাদের মা বাপের পায়ে! এমন কাণ্ড আমার বাবার জন্মে কখনো দেখিও নি—দেখবোও না—ছি! ছি! ছি! লজ্জায় ঘেন্নায় আমার যে মরতে ইচ্ছে করছে!

লীলা বলিল—এই! আজ আবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে

দেখছি! কি হয়েছে কি? সেইটা আগে বল্ না—মরতে ইচ্ছে হয়, তার পরে মরিস এখন! অমন করে বকে মরছিস কেন?

—বকে মরছি কেন? তোমাদের যা সব রীত্ চরিত্তির হচ্ছে— তাই দেখে দেখে থাকতে পারি নি—বকে মরি—বলি—আজ বিকেলে তোমাতে আর বড় দিদিমণিতে বসে যার সঙ্গে গল্প করছিলে—সেই যে গো—খুব টক্‌টকে রং—দু হাতে হীরের আংটি জ্বল জ্বল করছে—সেই মুখপোড়া মিন্সে এখানে এসে ভাল মানুষের মত কোথা থেকে জুটলো বল ত? বদমাইসের ধাড়ি—শয়তানের বাচ্ছা—ঘাটের মড়া—সাত-ঘর মজিয়ে—

লীলা ক্ষান্তর গালাগালির উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া অত্যন্ত রাগিয়া বলিল—আরে মর! তোর যে বড় বাড় বেড়েছে দেখছি! মুখ সামলে কথা বলতে পারিস না? যত কিছু না বলি—ততই আস্পর্দ্ধা দিন দিন বেড়ে উঠছে! ভদ্রলোকের ছেলেকে তুই অমন করে গাল দিস্ কোন আক্কেলে?

—ভদ্দর লোক! ওর সাত-পুরুষে কেউ ভদ্দর লোক নয়! পয়সা থাকলেই কি ভদ্দর লোক হয় গা? ও ওমনি করে লোকের ঘর মজিয়ে বেড়ায়! সেই যে গো—তোমায় বলি নি? ওই মুখপোড়াই ত সেই ডেপুটি বাবুর ভাইয়ের বউকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে! এখন সে ছুঁড়ীর খোয়ারের অন্ত নেই! তার দিকে একবার ফিরেও চায় না—সে দাসীদের মহলে দাসীদের কাছে পড়ে আছে।

লীলা চমকিয়া উঠিল! ক্ষান্ত এ কি বলিতেছে! কুমার শুভেন্দ্রভূষণ! কুমার সেই শোচনীয় কুৎসিত কাণ্ডের নায়ক? অকস্মাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে নিজে কুমারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয় বটে, তবে যেটুকু সে তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানের পাত্র বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। আর আজ সন্ধ্যার সময় সে তাহার নিজের বাড়ীতে কুমারের যে আদর ও মান্য দেখিয়াছে, তাহাতে তাহার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। কুমার যে-কোন ভদ্র-পরিবারে এ ভাবে মিশিবার উপযুক্ত পাত্র, তাহার এ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষান্ত তাঁহার সম্বন্ধে এ সব কথা কি বলে? সে কিছু বুঝিতে পারিল না, অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিল—তুই এ কথা জানলি কি করে? উনি আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু, সম্প্রতি কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন—উনি ত এখানে থাকেন না। ওঁর নামে এ সব কথা কে বলেছে তোকে? আর জোছনাকে যে নিয়ে এসেছে—তুই কি তাকে চিনিস্ যে এ কথা বলতে এসেছিস?

ক্ষান্ত হাত নাড়িয়া বলিল—আমি তাকে চিনবো কোথা থেকে? আমাদের সাতপুরুষে কেউ কখনো অমন দুষমণের ছায়া মাড়ায় না। আমার ধারে এলে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে গায়ের ছাল চামড়া তুলে দেবো না? বয়েস যখন আমার অল্প ছিল, তা গউর বন্ন না হই—কালো কোলোতে একটা ছিরি ছিল ত? মাথায় এই এক মাথা মিশ কালো চুল হাঁটুতে এসে পড়তো, তা গাঁয়ের এক মিন্‌সে গয়লা—

লীলা ধমক দিয়া বলিল—ফের! ওই সব আষাঢ়ে গল্প বানাতে বসলি? যা বলছি—এক কথায় তার জবাব দে! একটি বাজে কথা নয়! বল্—তুই ওঁকে চিনলি কি করে?

—বাবা! মেয়ে যেন ঘোড়সওয়ার! মেজাজ অষ্ট পহর তেরিয়া হয়েই আছে! বলি—আমি ওকে চিনবো কোত্থেকে গা? আমি যদি চিনতুম, তা হলে এই যে তোমার অসুখের সময় থেকে ও এসে এখানে জমিয়ে বসেছে, যখন-তখন আসছে যাচ্ছে, বড় দিদিমণির সঙ্গে দিবে-রাত্তির ফুস-ফুস গুজগুজ করছে, এ সব কি হতে পারতো? মা ত একেবারে ওর নামে গলে পড়ছে। বড় দিদিমণিও তাই! আমি বলি কে না কে—বড়দিদির সঙ্গে বিয়ে হবে বুঝি? আজ না কি আমার বোন—সেই যে গো—যে জোছনার কাছে আছে—সে সহরে এসেছিল—তা একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখে—না—বাইরের ঘরে তোমাদের সঙ্গে সে দিব্যি বসে গল্প করছে! বামা তো দেখে অবাক্! বলে—এ শয়তানটা আবার তোদের এখানে জুটলো কি করে? ভয়ে সে তো আর দাঁড়ালো না, তোমাদের ওই রাজপুত্তুর যদি বামাকে এখানে দেখতে পেতো, তা হলে কি আর ওকে জোছনার কাছে থাকতে দিত? বাড়ী গিয়েই হয় তাকে দেশছাড়া করতো, না হয় আটক করে রাখতো—কথা জানাজানি হবে বলে!

লীলা স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। কুমারের সহিত বীণার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা আজ সে বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য

করিয়াছে। তাহার পিতা মাতা কখনো এ সম্বন্ধে বাধা দিবেন না। তাহার নিজেরও এ ঘটনা কিছু বিসদৃশ ঠেকে নাই। কিন্তু ক্ষান্তর বর্ণিত ব্যাপার যদি সত্য হয়, সত্যই যদি বাহ্যিক ভদ্রতা ও শীলতার আবরণের ভিতরে কুমারের এইরূপ জঘন্য চরিত্র হয়, তাহা হইলে বীণাকে সময় থাকিতে সাবধান করা উচিত,—এ ঘনিষ্ঠতা আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়! এখন কুমারের সম্বন্ধে আরও ভালরূপে সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

লীলাকে নীরব দেখিয়া ক্ষান্ত আবার বলিল—বলি, সংসারটা কি কেবল পাজি বদমাইসদেরই আড্ডা গো দিদিমণি? দয়া ধর্ম্ম বলে কি একটা জিনিস নেই? দিন রাত্তির এখনো সত্যি-যুগের মতই হচ্ছে! এখনো চন্দর্ সূয্যি উঠছে! মুখপোড়ারা কি ভাবে যে চার পোয়া কলির রাজত্বি আরম্ভ হয়েছে? অমন কচি মেয়েটা—কোন চুক্ষু জানতো না—কিছু বুঝতো না—হেসে খেলে বেড়াত—তাকে তার ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে এই খোয়ার! ছুঁড়ি এখন খায় না—নায় না—শুকিয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে—আর দিবে-রাত্তির অঝোর ঝরে কাঁদছে! সে আর কদ্দিনই বা বাঁচবে বল ত?

লীলা সহসা অন্তরে দারুণ আঘাত বোধ করিল। অভাগিনী জোছনা! তাহার কি পরিণাম হইবে! বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কুমার এখন তাহার সম্বন্ধে এমন উদাসীন হইয়াছে—তাহা সে বুঝিল। জোছনার সম্বন্ধে লীলার পক্ষে উদাসীন থাকা অসম্ভব—কিন্তু লীলা তাহার কি ভাল ব্যবস্থা করিতে পারে?

লীলা বলিল—সে লোকটা কি জোছনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না?

—ওরা আবার কোন্ কালে ভাল ব্যাভার করে গা? ওদের আদর এই দুদিন। সে বাড়ী থাকেই বা কখন? এই দু' মাস ত দেখছি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এখানেই কাটাচ্ছে! আমার বোন বলে—রাত্তিরে কতকগুলো এয়ার বন্ধু নিয়ে অদ্ধেক রাত ইস্তিক বাইরের ঘরে মদ খেয়ে হল্লা করে, তার পর সেইখানেই ঘুমোয়! সে ছুঁড়ির ধারেও যায় না কোন দিন। ওর বউ ওর জ্বালায় বিষ খেয়ে মরেছে, এই জোছনাও মরে কোন্‌দিন! আরো কত জায়গায় কত কীর্ত্তি করেছে—তা কে জানে? এবার আমাদের বড় দিদিমণিকে নিয়ে পড়েছে!

লীলা শিহরিয়া উঠিল! কুমারের হাতে পড়িলে বীণারও এই পরিণাম অনিবার্য্য! সে আর কিছু ভাবিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি বলিল—তুই চুপ কর ক্ষান্ত! এ সব কথা আর মুখে আনিস নি। আমি ওদের সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা ভাল ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোর যে রকম স্বভাব—তোকে বারণ করে দিচ্ছি—খবরদার যেন এ সব কথা কোথাও গল্প করে বেড়াস নি। যা করতে হয়—সব আমি নিজে কোরবো। কারু কাছে এ কথা এখন প্রকাশ না হয়।

ক্ষান্ত বলিল—না গো না! আমার অমন হালকা স্বভাব নয়—যে যাকে তাকে সব কথা গল্প করে বলতে যাব। সে সব আক্কেল আমার যথেষ্ট আছে। তুমি কিন্তু দিদিমণি—যেমন করে পার—ঐ লোকটাকে এখান থেকে তাড়াও। ওর ছায়া মাড়ালে পাপ হয়। আর যদি পার, তো—সে ছুঁড়ির একটা হিল্লে করো। বামা তাকে হাতে করে মানুষ করেছে—তার দুর্গতি দেখে এখন সেও তার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে। (ক্রমশঃ)

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দয়াদেবী যখন শুনিলেন যে ধীরু কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া ধীরুর কাছে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু সে কোথায়, কোন্ দূর দেশে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য ছুটিয়া গিয়াছে, সে কথা কেহই তাঁকে বলিতে পারিল না। তিনি কথা-প্রসঙ্গে যদি কখনও দেবেনের কাছে তাহার কথা পাড়িতেন, দেবেন মুখভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপ স্বরে কহিত, "তিনি বিবাগী হয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন।" সত্যই যখন দেবেন কিংবা রাজেন্দ্রনাথ কেহই আর ধীরুর কোন অনুসন্ধান করিল না, এবং সে সম্বন্ধে সকলেই যেন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে দিনপাতের সঙ্গে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে লাগিল, তখন দয়াদেবী বুঝিলেন হতভাগ্য ধীরুর জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেও এ সংসারে কেউ নাই। মনকে বুঝাইলেন—সে ব্যাটাছেলে, যেমন করেই হোক্ আপনার পথ আপনি করে নেবে। কিন্তু হতভাগা যদি একবার বলে যেত কোথায় যাবে, কি করবে—তাহলেও হত। যুক্তি, তর্ক, মীমাংসা কোন কিছুই দয়াদেবীর দুর্ব্বল স্নেহ-কাতর মনকে সুস্থ করিতে পারিল না। দিনের পর দিন তাঁহার শরীরও ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। এ সংসারে ধীরুই যেন তাঁহাকে এতদিন জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বাঁধন ছিঁড়িয়াছে—তাই আজ তাঁহার মন এক মুহূর্ত্তের জন্য এখানে থাকিতে চাহিতেছে না—মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে।

দেবেন ইদানিং দয়াদেবীর সঙ্গে বড় একটা সদ্ভাব রাখে নাই। তাহার প্রধান কারণ—ধীরু-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উভয়ের মত-পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ—ধীরুর গৃহত্যাগ।

আজ বৈকালে দেবেন বেড়াইতে বাহির হইবে এমন সময় দয়াদেবী তাহাকে কহিলেন—"তাহলে কাল বাদে পরশু দিনই আমি কাশী যাওয়া স্থির করলাম।" দেবেন তাহার ভ্রূদ্বয় কপালে টানিয়া কহিলেন—"কি হল কথাটা? কাশী যাচ্ছ—বেশ ভাল কথা।" দেবেন গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইল। দয়াদেবী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"হাঁ বাবা, এ দিকের দিনও ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। তাই বাকি কটা দিন।"

দেবেন বাধা দিয়া কহিল—"তা কি করতে হবে?"

"তুই যে বলেছিল কাউকে সঙ্গে দিবি।"

"—কে যাবে?—লোক নেই।"

"দু-দিনের জন্য গিয়ে নবীনও ত রেখে আসতে পারে! সে ত চেনে, জানে—সেখানেও সেই সেবার অর্দ্ধোদয় যোগের সময়—।"

দেবেন মাথা বাঁকাইয়া বিরক্ত ভাবে কহিল—"না—না, পা'রবে না যেতে। কাজকর্ম্ম দেখে কে? তুমি চলে গেলে সংসারের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, কিন্তু সে না থাকলে আমার ঢের ক্ষতি।"

দয়াদেবী দেবেনের কাছে এতখানি রূঢ় জবাব প্রত্যাশা করেন নাই। রাগ, দুঃখ, অভিমানের চিহ্ন তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাব জোর করিয়া চাপা দিয়া তিনি কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"তবে তোমাদের ইচ্ছা কি আমায় এই বুড় বয়সে এখানে ফেলে পিষে মারা! এত কাল তোমাদের সংসারে ঝি চাকরাণীর অধম হয়েও থেকেছি, এখন যদি আমার গতর আর না বয়, বাবা"—দয়াদেবীর কণ্ঠ কে যেন সজোরে চাপিয়া ধরিল।

দেবেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল—"দেখ পিশি, ইদানিং তোমার কথার ধরণ-ধারণ একটুও ভাল নেই বলে আমি তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই এক রকম ছেড়ে দিয়েছি। কে তোমাকে এখানে পায়ে শিকল বেঁধে আট্‌কে রেখেছ বল? বেশ, কাশীই যদি যেতে চাও সরকার মশায় গিয়ে রেখে আসবেন। কারুর জন্য কারুর কিছু আট্‌কায় না পিশি, বুঝলে?"

দয়াদেবী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন—"আমি তা ত বলিনি বাবা!"

"হাঁ তাই বলছি। তুমি মনে করেছ যে তুমি চলে গেলে আমার সংসার অচল হয়ে যাবে? তা নয় পিশি! রাজা

মরলেও রাজ্যি চলে। আর ধর তাই-ই যদি হয়, তা হলেই বা কচ্ছি কি।"

দয়াদেবী ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—"বালাই, সংসারে অমঙ্গল কেন হবে বাবা! তোমরা সব বড় হয়েছ—ছোট ছোট বউরা এখন গিন্নী হয়েছে—আপনার সংসার আপনি বুঝে নিয়েছে—এখন ত আর আমাকে দিয়ে কারুর দরকার নাই। ধীরে হতভাগাটাই ছিল আমার পায়ের বেড়ী, তা সেও ত"……।

দেবেন বাধা দিয়া হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল—"হাঁ—হাঁ, তা আর জানি না—সবই জানি পিশি! সেই ত হ'ল রোগের গোড়া! আর এই ধীরের জন্যই তোমার যত আক্রোশ পড়েছে আমাদের ওপর। সব বুঝি পিশি—নেহাৎ কাঁচা ছেলে আমি নই।……তা বেশ, তোমার যেখানে খুসী যাও বাপু,—এত হাঙ্গামা আমার ভাল লাগে না। তোমার টাকা-কড়ি আমি হিসেব ক'রে ফেলে দেব'খন।" মুখখানা গম্ভীর করিয়া দেবেন চলিয়া গেল।

সত্যবালা এতক্ষণ রেলিংয়ের উপর ঝুঁকিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিল। দেবেন চলিয়া যাওয়ার পরই দয়াদেবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দয়াদেবী তখন দেয়ালে ঠেশ দিয়া মালা-হাতে শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন—আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহিতেছে। "তুমি দেখছি এ বাড়ীতে একটা অমঙ্গল না ডেকে এনে আর কোথাও এক পা নড়ছ না!"

দয়াদেবী আশ্চর্য্য ভাবে কহিলেন "সে কি মা! ষাট্, তোরা বেঁচে থাক, সুখে থাক। আমি কেন অমঙ্গল ডাকব? তোরা কি আমার পর?"

সত্যবালা কহিল "তা নয় ত কি? রাত নেই, দিন নেই সন্ধ্যা-সকাল বাদ নেই, সব সময়ে চোখের জল ফেলা। তাতে কখন গেরস্থর ভাল হয়? যাবে যাও তোমার কপাল নিয়ে। কেউ ত আর তোমায় তাড়াচ্ছে না—তবে এত কেন?"

"ত সত্যি মেজ বউমা, আমি আমার কপাল নিয়েই যাচ্ছি। দেবুর আমার বাড়-বাড়ন্ত হোক।"—

সত্যবালা বাধা দিয়া কহিল—"ওঃ, তার জন্যে আর ভাবনায় ঘুম নেই! রাত দিন বুক চাপড়াচ্ছ, কপাল ঠুকে শাপ দিচ্ছ, তাড়িয়ে দিল বলে গাঁ-ময় ঢোল পেটাচ্ছ। আর তোমার দরদে কাজ নেই মা!"

দয়াদেবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"বল্ মা তোর প্রাণে যা চায়! এতদিন সইলাম, আর কি একটা দুটো দিন সইতে পারব না,—খুব পারব!"

রাজেন্দ্রের গলার আওয়াজ পাইয়া সত্যবালা চলিয়া গেল। "কি পিশি, পরশু দিনই কাশী যাচ্ছ না কি?"

দয়াদেবী মুখ তুলিয়া কহিলেন—"হাঁ; বাবা বিশ্বনাথ নেহাৎ টেনেছেন।"

"নিজেই যাচ্ছ, আর দোষটা বিশ্বনাথের ঘাড়ে চাপাও কেন বাপু। কিন্তু কাজটা ভাল করলে না" এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেল।

দয়াদেবী চাহিয়া দেখিলেন, আকাশ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। একটা গভীর নিরুৎসাহ বুকে করিয়া সন্ধ্যা আগতপ্রায়। জপের মালাছড়া কপালে ছোঁয়াইয়া পেরেকে তুলিয়া রাখিয়া দয়াদেবী ধীরে ধীরে বারান্দার কোণে আসিয়া উৎসুক, কাতর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেউড়ির দিকে চাহিয়া থাকিলেন। টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল মাটিতে পড়িল, একটা হতাশ করুণ অস্ফুট শব্দ সন্ধ্যার বাতাস তাঁহার মুখ হইতে টানিয়া লইয়া বিশ্বের কোলাহলের মধ্যে মিলাইয়া দিল। দয়াদেবী ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

৮

মানুষের এমন এক একটা সময় আসে, যখন দুঃখ জিনিষটাকে চিনিয়া জানিয়া অনুভব করিয়াও, লোকে সেইটাকেই আবার ব্যগ্র হৃদয় দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। চক্ষের জলে মুখ ভাসিয়া যায়, বুকের ভিতর টন্ টন্ করিয়া উঠে; কিন্তু তবুও সেই অতীত জীবনের স্মৃত ও বিস্মৃত ঘটনাগুলি লইয়াই সে নাড়াচাড়া করিতে থাকে,—যেন তাহাতেই সে শান্তি পায়।

ধীরুও আজ তাই। যখন ঝরিয়ায় একটা কয়লা কুঠির ধারে নদীর চড়ায় বসিয়া ছিল, তখন তাহার মনটা বাংলাদেশের এক সুদূর পল্লীগ্রামের মাঝে উদাসীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেই পরিচিত পথ-ঘাট, পদ্মফুল-ভরা ঘোষেদের পুকুর, পার্শ্বে শ্যামের মন্দির, আম, কাঁঠাল, নারকেল গাছ-ঘেরা তাদের সাদা বাড়ী…সেই বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ,…উঠানের পাশেই তুলসীমঞ্চ…যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় পিশিমা প্রদীপ জ্বালিয়া মালা জপ করিতেন। পিশিমার কথা মনে আসিতেই ধীরুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

...হায় সেই স্নেহময়ী পিশিমা আজ তাহারই মতন আজন্মের পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন... না জানি কত কষ্টই তাঁহার ভোগ করিতে হইতেছে! ...ধীরু তাহার জামার পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিল। পত্র পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু পত্রের উপর পড়িল। ধীরু সযত্নে পত্রখানি মুড়িয়া তাহার জামার পকেটে রাখিয়া দূরে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল...আজ যদি সে উপার্জ্জনক্ষম হইত, তাহা হইলে...একটা রঙ্গীন ছবি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। হয়ত পাঁচজনের মতন সেও...জমাট অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় একখানি মুখ মনের কোণে উঁকি মারিতেই.. ক্ষোভে দুঃখে সে নিজেকে জর্জ্জরিত করিল। ঠিক এই কথাটাই সেদিন দিগম্বরী তাহাকে বলিয়াছিলেন...আর কল্যাণীও তাহার সজল দৃষ্টির ভিতর দিয়া বুঝি ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছিল......ধীরু আর ভাবিতে পারিল না নিজের অক্ষমতা আজ তাহাকে নির্ম্মম ভাবে পীড়ন করিল। তাহার বন্ধু "মণির" একদিনের একটা কথা আজ কাঁটার মতন তাহার বুকে খচ্ করিয়া উঠিল। "ভবঘুরে না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ্ ধীরু, দাদাদের উপর অতখানি ভরসা রাখিস্নি; চিরদিন কেউ তোকে দেখ্বে না।" সেদিন ধীরু তাচ্ছিল্য ভাবে কথাটা উড়াইয়া দিয়া ভাবিয়াছিল, তাও কি কখনো সম্ভব? মার পেটের ভাই ভাইকে দেখবে না! এ বলে কি? মানব-চরিত্রের কুটিলতা তখনও তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কল্পনার রঙ্গীন তুলি দিয়া সে তাহার মনের গায়ে রংয়ের পর রং ফলাইয়া চলিয়াছিল। মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন ইচ্ছা অবাধ আনন্দে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াছে...... কিন্তু আজ?—ধীরু আর ভাবিতে পারিল না;...সে যেন একটা স্বপ্ন; বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, হয় তো কোন কালেও ছিল না। সে কেবল জোর করিয়াই এতদিন একটা এতবড় মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া নিজের সঙ্গে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি তাহার বন্ধু মণি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে এই কয়লার খাদে না পাঠাইত, যদি মণির মামা দিনু ঘোষাল তাহাকে একটু স্থান না দিত, তবে হয় ত অনাহারে কোন গাছতলায় তাহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইত; অথবা চির প্রশ্রয়-প্রাপ্ত দুরন্ত অভিমান তাহাকে আত্মহত্যার উপায় করিয়া দিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিত।

মণির মামা দিনু ঘোষাল এখানে রেজিং কন্ট্রাক্টার। ধীরু তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিতেছে। বেতন উপস্থিত কিছুই ধার্য্য হয় নাই—সামান্য কিছু হাত-খরচা পাইবে মাত্র। তবে টিকিয়া থাকিতে পারিলে ধীরুর মত পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী লোক ভবিষ্যতে যে বেশ উন্নতি করিতে পারিবে, সে কথার "ঘোষাল মশাই" খুব জোর গলায় ধীরুকে আভাস দিয়াছেন।

ধীরু "ঘোষাল মশায়ের" বাসায়ই খায় ও সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে কাজ করিতে থাকে। কর্ম্ম অবসানে আপনার ছোট্ট নির্জ্জন ঘরখানির ভিতর আসিয়া বসিয়া থাকে; আর ভাবে, কতদিনে তাহার এই দুঃখের দিন ঘুচিবে। সে খাদের অন্যান্য বাবুদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না; কারণ, এখানকার বাবুদের সঙ্গ তাহার ভাল লাগে না। তাহারা সকলেই প্রায় নিত্য সন্ধ্যায় দল বাঁধিয়া মদ খায়, নানাপ্রকার কুৎসিত আলোচনা করে এবং প্রায়ই একটা ভাঙ্গা তবলা ও অল্পদামের হারমনিয়ম সংযোগে নানা ভঙ্গী সহকারে বেসুরো কর্কশ আওয়াজে চীৎকার করিয়া তাহাদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সান্ধ্য আমোদ উপভোগ করে।...কিন্তু কি করিয়াই বা ধীরু এমন ভাবে সুধু আপনাকে লইয়া আপনি এই বিদেশে মন বসাইয়া থাকিতে পারিবে...তা ত সম্ভব নয়...তবে?

পশ্চাতে শব্দ হইল "এ ছোটা বাবু"—ধীরুর চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিল "ঘোষাল মহাশয়ের" পাঁড়ে ঠাকুর তাহাকেই ডাকিতেছে। ধীরু উঠিয়া নিকটে যাইতেই সে ভাঙ্গা হিন্দি আধ-বাংলায় মাথা ঝাঁকাইয়া চোখ মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিল—"দিদিমণি বল্লে, চা তোয়ারি হোইয়ে গেল...আপ্নে খাবে এস।"— "চল"—বলিয়া ধীরু "ঘোষাল মহাশয়ের" বাসার দিকে চলিল।

ধীরুকে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী জগত্তারিণী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিলেন—"জল না খেয়েই কোথায় গেছলে ধীরেন?"

ধীরু অপ্রস্তুত ভাবে কহিল, "আজ আর তেমন ক্ষিদে নেই মামিমা। তাই নদীর ধারে বসে ছিলাম।"

জগত্তারিণী হাসিয়া কহিলেন—"সেই ত কখন দুটি ভাত মুখে দিয়েছ, এখনও ক্ষিদে হয় নি? তুমি বাপু বড্ড লজ্জা করছ। একে ত মাছ তরি তরকারি তেমন ভাল মেলে না; তার ওপর যদি লজ্জা কর, তাহ'লে কিন্তু দু দিনেই শরীর আধখানা হয়ে যাবে।...আর মণি এসে বলবে মামি তার বন্ধুকে না খেতে দিয়েই এই হাল করেছে!"

ধীরু ঘাড় হেঁট করিয়া হাসিয়া কহিল—"আজ্ঞে না, লজ্জা ক'রব কেন, যখন এখানে থাকতে হবে, তখন ক'দিন লজ্জা......"

জগত্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"হাঁ বাবা, লজ্জাটজ্জা ক'রো না। মণি যেমন ছুটীতে বেড়াতে এসে, চেয়ে চিন্তে নিয়ে আপনার বাড়ীর মত খায়-দায় থাকে, তুমিও তেমনি ক'রো। তুমি তার বন্ধু—মণির মতনই আমাদের ঘরের ছেলে......দেখ কথায় কথায় বুঝি চা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল ..ও রাধি···তোর ধীরুদাকে···ওমা "ধীরুই" মনে পড়ে ·· তোর ধীরেন দা'কে চা আর খাবার দিয়ে যা।"

ধীরু হাসিয়া কহিল—"আমাকে সকলে ধীরু বলেই ডাকে, আপনিও তাই বলেই ডাকবেন।"

জগত্তারিণী হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা।—কিন্তু ছেলেরা বড় হ'লে আবার ছেলে-বেলার "ডাকনাম" পছন্দ করে না।"

একটি ১৮।১৯ বছরের শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারার মেয়ে একরাশ এলো চুলের বোঝা পিঠে ফেলিয়া কটা রেকাবির উপর এক বাটি চা ও কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। জগত্তারিণীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"চা'টা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মা।"

"তাহলে গরম করে আনলি না কেন, ঠাণ্ডা চা মানুষে খেতে পারে? মেয়ে যেন সং!"

রাধিকা একটু অপ্রস্তুত ভাবে ধীরুর দিকে চাহিতেই, ধীরু বলিয়া উঠিল—"থাক্, থাক্, দেখি, ঠাণ্ডা হয়'নি বোধ হয়।"

রাধি ধীরুর হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়া খাবারটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। খানিকটা খাইয়া ধীরু বলিল—"না, ঠিক আছে! কিন্তু খাবার আমি খেতে পারব না, ওটা তুমি নিয়ে যাও।" বলিয়া সে রাধিকার দিকে চাহিল। রাধিকা দেয়াল ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরুর কথার প্রত্যুত্তরে সে কি বলিল, ধীরু তাহা শুনিতে পাইল না. শুধু দেখিল একটা অভিমানভরা দৃষ্টি আর উভয় ওষ্ঠের মৃদু কম্পন।

জগত্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"না···না···আবার নিয়ে যাবে কি? ভারি ত জিনিষ···দুখানা নিমকী আর একটু হালুয়া। নাও খেয়ে বাপু, ওতে আর অসুখ করবে না, ঘরের জিনিষ···"

ধীরু ইতস্ততঃ ভাবে কহিল—"না, তার জন্য নয়··· তবে···"

ধীরুকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া জগত্তারিণী কহিলেন—"সত্যি বাপু·· আর আমি এত পর পর ভাবা ভালবাসি না।" ধীরু এই স্নেহের তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া জলপানান্তে কহিল—"সত্যি, আমার বিকেলে জল খাওয়া অভ্যেস নেই···দুবেলা পেটভরে দুটো ভাত খেলেই···ব্যস নিশ্চিন্ত!"

ধীরুর এই স্বল্প কথায় জগত্তারিণী তাহার সরল মনের পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু একটু ব্যথাও অনুভব করিলেন সেইখানে, যেথা নারীধর্ম্ম সহানুভূতি-গলিত তরল ধারায় অন্তরের অন্তস্তল ধৌত করিয়া সমস্ত বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছ। জগত্তারিণী রাধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"যা দুটো পাণ এনে দে। দাঁড়িয়ে আছে ত দাঁড়িয়েই আছে!"

রাধি লজ্জিতভাবে চলিয়া গেল। ধীরু একটু সঙ্কুচিত-ভাবে কহিল—"আচ্ছা মামীমা, একটা বিষয়—"

ধীরুকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জগত্তারিণী ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"কি কথা বাবা?"

"আচ্ছা, আপনারি জামাই কি অন্য কোথাও কাজ-কর্ম্ম করেন?

জগত্তারিণী বাম হস্তে কপালে এক চাপড় মারিয়া কহিলেন—"পোড়া কপাল আমার—সে কথা বলব কি বাবা...এই মেয়েটা হয়েছে আমার কাল্। সাতটা নয় পাঁচটা নয় পেট-ধোয়া এই একটা মেয়ে...অত টাকা-পয়সা খরচ করে বে দিলুম···তা এমন বরাত, জামাইটা একেবারে মানুষ নয়। তার ওপর শাশুড়ী মাগী দজ্জাল, জ্বালা দেয়·· মেয়েটার আমার......"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল—"জামাই কি করেন?"

তুলসীদাস

শিল্পী—মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

জগত্তারিণী বিরক্তভাবে কহিলেন—"ছাই, তার মাথা আর মুণ্ডু করে! খায়-দায় আর নেশা ভাং করে। তার বাপ মিন্‌সে ছিল হাড়-কেপ্পন, চুরী-চামারী করে লোককে ঠকিয়ে কিছু যায়গা-জমী রেখে গেছে, তাই মা-বেটার চলছে।"

"এখানে সে আসে না?"

জগত্তারিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"পোড়া কপাল, এ পথ মাড়ায় না। শুনবে কি বাবা, মাগী নাকি বেটার আবার বিয়ে দেবে।...জামাইটাও নির্ব্বোধ গেঁয়ারের এক শেষ...ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ—সেও আবার তাতেই মত দিয়েছে।"

ধীরু ঘৃণাব্যঞ্জক বিরক্তি সহকারে কহিল—"আচ্ছা ত?"

রাধি পাণের ডিবায় কয়েকটা পাণ আনিয়া ধীরুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

জগত্তারিণী কহিলেন—"পাণ কটা রেখে ঘরদোরগুলো পরিষ্কার করে ফেল মা!"

রাধিকা পাণের ডিবাটা ঠকাস করিয়া মাটিতে রাখিয়া বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

জগত্তারিণী রাগতভাবে কহিলেন—"কাজের ছিরী দেখলে গা জ্বলে যায়! আর একটু হলেই ত পাণগুলো সব মাটিতে পড়ে যেত। যেমন বরাত...তেমনি বুদ্ধি-শুদ্ধি!...হ্যাঁ, যা বলছিলাম...কর্ত্তা রাগী মানুষ, জামায়ের কথা পাড়লেই বলেন 'তার নাম আমার কাছে করো না, আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে, জামাই মরেছে'।"

ধীরু হাসিয়া কহিল—"সে কি একটা কথা হল!"

"বল ত বাবা, সত্যিই ত আর তাই নয়। তবে মেয়ে ছেলে যদি সোয়ামীর ঘর না করতে পেলে, তাহলে তার জন্মই যে বৃথা।"

"তা ত বটেই!" ধীরু ভাবিতেছিল, রাধির দুঃখের জীবনটা, তার স্বামীর নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার কথা! রাধির দুরদৃষ্ট ধীরুর নির্ম্মল সরল চিত্তের উপর শারদাকাশের গায়ে কাল রেখার মত একটা মলিন দাগ আঁকিয়া দিল। সে অন্যমনস্কভাবে কহিল—"তা বটে! আমায় যে একটু চুণ দিতে হবে! এ দেশের পাণগুলো বড় ঝাল।"

"পাণে চুণ কম দিয়েছে বুঝি? ও রাধি...রাধি... ধীরুকে একটু চুণ দিয়ে যা! আচ্ছা না হয় আমিই দিচ্ছি—" বলিয়া জগত্তারিণী তাঁহার স্থূল দেহ বাঁকাইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেই, রাধিকা একটা পাণের বোঁটার মাথায় চুণ আনিয়া ডিবার উপরে রাখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ধীরু কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া একমনে এতক্ষণ পূর্ব্বকথাই ভাবিতেছিল, হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে কহিল—"আমি ভাবছি, ছেলেটাই বা কোন্ হিসেবে রাজী হল?...তারও ত একটা কর্ত্তব্য..."

বাধা দিয়া জগত্তারিণী কহিলেন—"এই যে চুণ দিয়েছে। দেখ্‌ত রাধি বামুন ঠাকুর উনুনে আঁচ দিলে কি না! আজকাল পাঁড়ে কাজকর্ম্মে বড্ড গা ঢিল দিয়েছে বাপু!"

রাধিকা এক পাশে দাঁড়াইয়া তখন দেয়ালের গায়ে আঁচড় কাটিতেছিল। একটা মুখভঙ্গী করিয়া সে বিরক্তভাবে কহিল —"হ্যাঁ গো, দিয়েছে।"

"তবে এক কাজ কর্। মুনীয়া কর্ত্তার সঙ্গে হাটে গেছে, ফিরতে ত দেখছি দেরী হচ্ছে। তুই ততক্ষণ আলোগুলোতে তেল ভরে ঠিক করে রাখ্, সন্ধ্যে ত হয়ে এল!"

বিরক্তভাবে রাধি কহিল—"এক দণ্ডও মা মানুষকে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না...এটা কর্...সেটা কর্...আমি পারব না এত...ভারী কি না হ্যাঁ!" মুখভার করিয়া রাধি দুপদাপ শব্দে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

জগত্তারিণী ধীরুকে কহিলেন—"দেখলে বাবা, আস্ত পাগল! কি যে ওকে নিয়ে করব, তা আর ভেবে পাই না!"

ধীরু একটু হাসিল, কোন কথা কহিল না।

মুনীয়া চাকর মাথায় ঝাঁকা, হাতে তেলের বোতল লইয়া উঠানে আসিয়া হাঁকিল—"মাইজী!" পশ্চাতে ঘোষাল মহাশয় একটা ময়লা নেকড়ায় বাঁধা মাছের পুঁটুলী হাতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"কই গো"—

জগত্তারিণী মাথার কাপড়টা খানিকটা টানিয়া দিয়া দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়া উঠিলেন; এবং উঠানে নামিতেই, ঘোষাল মহাশয় বিরক্তভাবে কহিলেন—"তোমার নড়তে চড়তেই আধঘণ্টা—এই নাও...মাছ আর মেলবার উপায় নাই—হাটে গেলেই কি আর না গেলেই কি...মিছে পয়সা খরচ।"

জগত্তারিণী কহিলেন—"কি আনলে?"

"গোটাকতক মাগুর" বলিয়া ঘোষাল মহাশয় মাছের পুঁটুলীটা জগত্তারিণীর হাতে দিয়া ঘরের দিকে যাইতেই

জগত্তারিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"দাঁড়াও, হাতে একটু জল দিই······"

ধীরু এতক্ষণ চুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল—"আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি, আপনি যান্।"

"ওমা, তুমি দেবে কি! অঃ রাধি! মেয়েটার যেন ভীমরতি হয়েছে।" জগত্তারিণী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে যাইতেই, ঘোষাল মহাশয় বিরক্তভাবে কহিলেন—"মেয়েটা কোন্ চুলোয় গেল? অ-রাধী ··রাধী···"

ভিজা কাপড়ের এক প্রান্ত দ্বারা যৌবনোন্নত বক্ষ ঢাকিয়া থপ্থপ্ শব্দে রাধি ঘোষাল মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া কহিল···"কি? আমি গা ধুচ্ছিলাম।"...তার এলাইত চুল পিঠের উপর ছাপাইয়া পড়িয়াছে, আর্দ্র বসনের ভিতর দিয়া তাহার পরিপূর্ণ দেহের পূর্ণ শ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! রাধি একবার অবনত দৃষ্টিতে আড়চোখে ধীরুর দিকে চাহিয়া তাহার সমুন্নত বক্ষের উভয় পার্শ্বের কাপড় টানিয়া দিল!

ঘোষাল মহাশয় বিরক্তভাবে কহিলেন—"এতক্ষণ সময় পাসনি···আমায় একটু জল দে হাত পা ধুতে।"

"দিচ্ছি, ওই ত বারান্দায় বালতীভরা জল রয়েছে!"

রাধিকাকে উঠান হইতে বারান্দায় উঠিতে দেখিয়া ধীরু একটু কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। রাধি জল লইয়া যাওয়ার সময়, বর্ষাশেষে বিদ্যুতের মত তাহার চঞ্চল চক্ষের একটা অগ্নিবাণ ধীরুর দিকে হানিয়া দিয়া গেল। বেচারা ধীরু পেরেকে ঠোকা ছবির মত দেয়াল ঠেশ দিয়া নতমুখে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘোষাল মহাশয় হাত পা ধুইয়া বারান্দায় আসিলেন; এবং ধীরুকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন—"দাঁড়িয়ে কেন ধীরেন, বোস! চা খেয়েছ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কেমন লাগছে হে তোমার এ যায়গা?"

"মন্দ নয়, তবে—"

বাধা দিয়া ঘোষাল মহাশয় তাঁহার টাক-মাথায় জলের হাত বুলাইয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, একটু রুক্ষ বটে! পাহাড়ে যায়গা কি না···কিন্তু স্বাস্থ্য বেশ ভাল, কি বল?"

ধীরু মুখ না তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল—"তা ভালই!"—

মুনীয়া এক হাতে একটা হেরিকেনের আলো, অপর হাতে হুঁকা কলিকা লইয়া বারান্দায় আসিতেই, ঘোষাল মহাশয় সাগ্রহে কহিলেন—"দে বাবা, একটু তামাক খাওয়া যাক। আজ বড্ড পরিশ্রম হয়েছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে ধীরেন, বোস, একটু গল্প করা যাক্!"

ধীরু বড় বিপদের মধ্যেই পড়িল! অনেকক্ষণ হইতেই যাইবে যাইবে ভাবিয়াও এতক্ষণ কেন যে যাইতে পারে নাই ইহার স্পষ্টতর মীমাংসা সে করিতে পারিল না। উপস্থিত যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও ঘোষাল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে ধীরুকে পুনরায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসিতে হইল! দীনু বাবু এক রাশ ধূম ছাড়িয়া কহিলেন—"তা বাবাজী, তোমার স্বভাব চরিত্র দেখে আমরা বড়ই খুসী হয়েছি! তোমার মামীমা বলেন, এমন নম্র ধীর ছেলে আর হয় না। তোমার নামটা তোমার স্বভাবের পরিচয় বটে!"

ধীরু নতমুখে তাহার নখের কোণ দাঁতে কাটিতে লাগিল!

দীনুবাবু পুনরায় কহিলেন—"শুনতে পাই তুমি না কি বড় লজ্জা কর···লজ্জাটজ্জা আমার এখানে তোমার করতে হবে না বাপু!"

মৃদু হাস্যে ধীরু কহিল—"আজ্ঞে না—লজ্জা কি?"

"না, তাই বলছি! আর কাকে দেখেই বা লজ্জা করবে?···রাধি একরত্তি মেয়ে···ওকে আবার···হ্যাঁ!" বলিয়া হুঁকায় টান দিলেন। পরে কহিলেন—"আর যে কাজ তুমি করছ, যদি উন্নতি চাও, তাহলে চক্ষুলজ্জাটা একেবারে ভুলে যেতে হবে বাপু! দেখতেই ত পাচ্ছ, যত সব ছোট-লোক কুলী মজুর নিয়ে কারবার! ওদের দিনরাত চাবুকের ওপর রাখতে হবে, না হলে কাজে ফাঁকি দেবে। ওদের মেয়ে-মদ্দ সব পাজী! আর এদেশের লোক—এই যত সব খাদ-মুনীস দেখছ, এদের বিশ্বাস নেই! বেটারা মাইনে পায় ২০ টাকা, কিন্তু হলে কি হয়, মাসে ২০০৲ টাকা চুরী করে। আর বছরে একটা করে ধান জমী কিনছেই!"

ধীরু ঈষৎ হাসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের মুখের পানে চাহিল।

"হ্যাঁ, থাকতে থাকতেই তুমি দেখতে পাবে! তাই বলি, সব দিকে নজর রেখে মন দিয়ে যদি খাট আর টিঁকে থাক, তাহলে তোমার উন্নতি ঠেকায় কে? তবে প্রথমটা একটু কষ্ট স্বীকার করে পরিশ্রম করা, কাজকর্ম্মগুলো ভাল করে শেখা দরকার!"

ধীরু আঙুল মটকাইতে মটকাইতে কহিল—"আজ্ঞে, তা ত বটেই!"

রাধি এক পেয়ালা চা ও জলখাবার আনিয়া দীনুবাবুকে দিতেই, তিনি কহিলেন—"খাবারটা নিয়ে যা মা, এখন কিছু খেলে রাত্রে আর খেতে পারব না!"

রাধি মৃদু হাসিয়া কহিল—"আজ দেখছি, তোমাদের সকলেরই পেটে ক্ষিদে-কম! কি যে এমন ওবেলা খেয়েছ, তা ত জানি না বাপু! খাবারগুলো মিছেই করা হল।"

ঘোষাল মহাশয় চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ সরাইয়া কহিলেন—"কেন ধীরেনও খায় নি না কি?"

"সে না খাওয়ারই মতন!" উদাসভাবে কথা কয়টা বলিয়াই রাধি ধীরুর দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল! ধীরু বুঝিল, আবার একটা কৈফিয়ৎ দিবার সময় উপস্থিত! কাজেই ঘোষাল মহাশয়ের প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া সে নিজে হইতেই বলিল, "সকালে কি বিকেলে কোনও দিনই আমার জল খাওয়ার অভ্যেস নেই!"

ঘোষাল মহাশয় চায়ের পেয়ালা নামাইয়া কহিলেন—"কিন্তু বাপু, এখানে তা করলে চলবে না। যেমন খাটতে হবে, খেতেও হবে তেমনি। না হলে শরীর টেঁকবে কেন? এই যে দেখছ, এত বয়সেও আমার শরীর খাড়া আছে, সে কেবল খাওয়ার জোরে!"

রাধিকা পাণের ডিবায় পাণ দিয়া গেল। একসঙ্গে ২।৩টা পাণ মুখে পুরিয়া দীনুবাবু কহিলেন—"নাও হে, পাণ খাও ধীরেন!"

"আজ্ঞে, পাণটা আমার বেশী খাওয়া অভ্যেস নেই, আমি খেয়েছি।"

"চূণ দিতে ভুলে গিছলুম" বলিয়া রাধি এক টুকরা ছেঁড়া পাণের উপর খানিকটা চূণ রাখিয়া গেল। পাণ চিবাইতে চিবাইতে দীনুবাবু কহিলেন, "দেখ ধীরেন, মানুষের অদৃষ্ট যে কখন ফিরে যায়, তা সে নিজেও বুঝতে বা জানতে পারে না!"

ধীরু কহিল—"নিশ্চয়!"

"আজ হয়ত তুমি মনে করছ যে রোদে পুড়ে কয়লার ময়লা ঘাঁটাই সার হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়! এতে তোমার যা জ্ঞান হচ্ছে, তার দাম ঢের বেশী। ছমাস বাদে বুঝতে পারবে—তোমার কদর কত বেড়ে গেছে। আমি জোর করে বলতে পারি—ভবিষ্যতে তোমার যথেষ্ট উন্নতি হবেই হবে। কদিনই বা এসেছ এখানে, এর মধ্যে তোমার কাজ-কর্ম্ম দেখে আমি ভারী খুশী হয়েছি। আমি সে কথা "মণি"কেও লিখে দিয়েছি। আর না হবেই বা কেন? যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছ, বেশ চালাক চতুর বুদ্ধিমান, একবার দেখলেই তোমরা যা শিখতে পারবে, আমাদের পাঁচবারেও তা হবে না! আর বাপু...আমারও বয়েস হয়েছে...কাজ-কর্ম্মগুলো যদি শিখে নিতে পার..." দীনুবাবু আর একটা পাণ মুখে দিয়া ডাকিলেন—"ওরে মুনীয়া, আর এক কলকে তামাক দিয়ে যা।"

"আজ্ঞে হাঁা, তা ত বটেই" বলিয়া ধীরু উঠিয়া দাঁড়াইতেই, দীনুবাবু কহিলেন—"কি—যাচ্ছ না কি? আর রাত্তির করে এখন কোথায় যাবে?"

ধীরু উঠানে নামিয়া কহিল—"কোথাও না...এইখানেই একটু"...বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল!

জগত্তারিণী এতক্ষণ পাঁড়ে ঠাকুরকে রন্ধন ব্যাপারে উপদেশ দিতেছিলেন; আসিয়া দেখিলেন ধীরু নাই। একটু বিস্মিতভাবে ঘোষাল মহাশয়কে বলিলেন—"ধীরেন চলে গেছে? কখন গেল?"

"এই ত... কেন?"

"না...এমনিই...বেশ ছেলেটি কিন্তু; যেমন কথাবার্ত্তায়, তেমনি স্বভাব-চরিত্রে। এই কদিনের ভেতরই ওর ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। জামাই হতচ্ছাড়ার কথা শুনে কত দুঃখ করতে লাগল। বল্লে, এমন সহায় থাকতে সে কি না চুপ করে বসে থাকে—"

ঘোষাল মহাশয় মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"বলবে না? সৎবংশের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে...বুদ্ধি শুদ্ধি আছে...তা বলবে না? এখানে এসেছে না হয় বাড়ী থেকে রাগ করে... নানা ঝঞ্ঝাটে...কিন্তু বড়ঘরের ছেলে ত বটে!" জগত্তারিণী আর কোন কথা কহিলেন না। ঘোষাল মহাশয় উঠিয়া ঘরে গেলেন এবং জামাটা গায়ে দিয়া, আলমারীর ভিতর হইতে একটি ছোট বোতল জামার ভিতর লুকাইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই জগত্তারিণী কহিলেন—"আবার এখনই বেরোনো হচ্ছে? একদিনও ফাঁক যাবার যো নেই...বুড়ো হলে, মরতে বসেছ, আর কেন? সকাল সকাল ফিরো!" দীনুবাবু ততক্ষণে লম্বা পা ফেলিয়া একেবারে বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

৫

প্রাশীয়া

প্রাশীয়া সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রায় তিনভাগের দু'ভাগ জুড়ে বসে আছে। লোকসংখ্যাও এই অঞ্চলেরই সবচেয়ে

ড্রেসডেন্ শহর

বেশী এবং এরা সকলেই প্রায় প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সীমান্ত স্পর্শ করে প্রাশীয়া বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে উত্তর য়ুরোপ ঘুরে নব পোল্যাণ্ডের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত! দক্ষিণে একে বেষ্টন করে আছে জেকোশ্লোভাকায়', আষ্ট্রীয়া, এবং সুইস্‌জার্ল্যাণ্ড! উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বাঞ্চলের বিশাল বালুভূমি অরণ্যময়; কিয়দংশ শস্য উৎপাদন ও আলুর চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেকালের দাঙ্গাবাজেরা এই অঞ্চলেরই লোক ছিলেন এবং একালের দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণ সৈনিকদের জন্মভূমিও হচ্ছে এই প্রাশীয়া!

প্রাশীয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে কতকটা পার্ব্বত্য-প্রদেশ বলা যেতে পারে। এই অঞ্চলই হচ্ছে জার্ম্মাণীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান। কয়লার খনি এবং লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপার এইখানেই দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে আঙুরের চাষ, আখ এবং বীটপালঙের চাষ ও বীটচিনির কারখানা আছে। সমুদ্রের ধারে জলের উপর একদল জেলে তাদের বড় বড় ডিঙীতে বাস করে। এরা খুব কষ্টসহিষ্ণু জাত। উত্তর সাগর ও বল্টিক সমুদ্র মন্থন ক'রে এরা এদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যের আবর্ষণও প্রাশীয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ আছে। রাইণের উপত্যকা স্বভাবের শোভার জন্য বিখ্যাত! ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কলকারখানার সংশ্রব থাকা সত্ত্বেও ওয়েষ্টফেলিয়া তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যটুকু এখনও হারায় নি।

ন্যুরেম্বার্গ শহরের বাজার

সাক্‌সেন্‌ওয়াল্ডও নৈসর্গিক্ দৃশ্যবৈভবে নিতান্ত দীন নয়। জগদ্বরেণ্য মনিষী বিসমার্ক এই স্থানে বহুদিন যাপন করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে 'হার্জ' পর্ব্বতমালা। খুব বেশী উঁচু না হ'লেও এই পর্ব্বত-শ্রেণীর বিবিধ মনোহর বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়! স্থানে স্থানে মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবী আপন হাতে চমৎকার উদ্যান রচনা করে রেখেছেন

বার্লিণের সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক

চাষাদের 'বর কনে' ও তাদের সঙ্গী এবং সহচরীরা

এই পর্ব্বতের প্রীতিভরা শান্ত সুন্দর অন্তঃপুরে! নিদাঘ তাপ হ'তে জুড়াবার জন্য ধনী জার্ম্মাণ পরিবারেরা এইখানে আসেন বায়ু সেবন করতে!

পোষাক পরিচ্ছদ পরে, সেই পুরাতন আচার ব্যবহার মেনে চলে ও সেই সাবেক ভাষাতেই কথা কয়!

প্রাশীয়ার প্রধান শহর 'বার্লিন' একেবারে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত বলে এর মধ্যে বিজ্ঞানকেই দেখতে পাওয়া যায় চারিদিকে, কাব্যকে খুঁজে পাওয়া শক্ত! প্রাশীয়ার প্রাচীন শহরগুলিই সুন্দর। আধুনিক শহরগুলি একেবারে নেহাৎ যেন কলের তৈরী! তথাপি হিল্ডেশাইম্, ম্যারীয়েনবার্গ, ও ড্যানজিগ্ প্রভৃতি শহরগুলি প্রসিদ্ধ শুধু প্রাশীয়ার নয়, সমগ্র জার্ম্মাণীর গৌরব স্বরূপ! হাম্বার্গ, ব্রেমেন ও ল্যুবেক্, জার্ম্মাণীর এই তিনটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহরও প্রাশীয়ার অঙ্গসংলগ্ন।

আঁশের কাপড় বোনা

আরও দক্ষিণে শাইলেশীয়ার 'জায়েন্ট' পর্ব্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এরই চারিদিকে যেসব বনরাজি-বিভূষিত বহু-তটিনী-সেবিত অসংখ্য উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়, তারা এক-একটি যেন কোন দক্ষ চিত্রকরের তুলিতে আঁকা দৃশ্যপটের মতো সুন্দর! এখানে ওয়েণ্ডিশ্ বলে লুপ্তপ্রায় বহু প্রাচীন জার্ম্মাণ জাতির অস্তিত্ব আজও দেখতে পাওয়া যায়। এরা এখনও তাদের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের

গাছের আঁশ ছাড়ানো

স্যাক্সনী

জনসংখ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রলেও স্যাক্সনী আকারে জার্ম্মাণীর এক-পঞ্চম ভাগেরও কম। স্যাক্সনীও জার্ম্মাণীর একটি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কলকারখানা-প্রধান স্থান। লৌহ প্রভৃতি খনিজ ধাতুর ব্যবসায়, সূতা, মোজা, গেঞ্জি, ছিটের কাপড় ও অন্যান্য বিবিধ বস্ত্রশিল্পের কারখানা এবং চীনেমাটির ও কাঁচের জিনিসের কারবারই এখানে খুব বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

মিউনিক্ শহরের এক অংশ
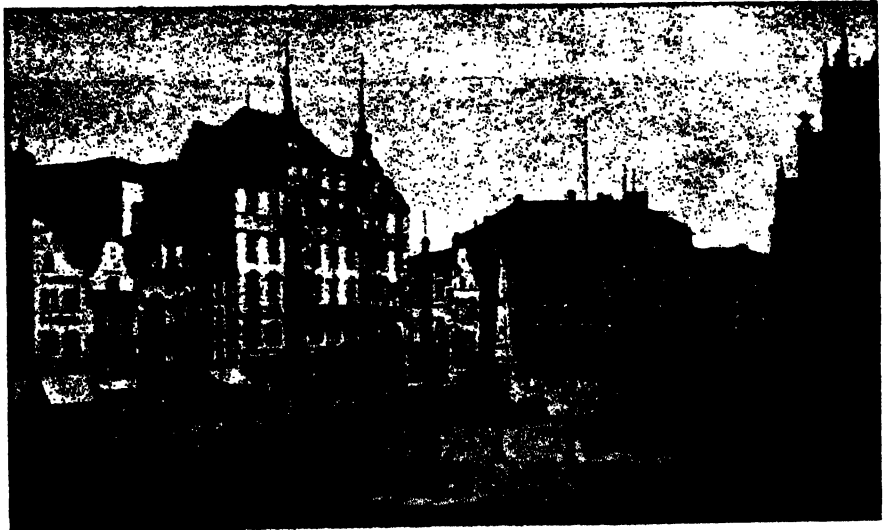
এখানকার অধিবাসীরাও অধিকাংশই প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মাবলম্বী; তবে দীর্ঘকাল-ধরে' সমাজতন্ত্র বা সমষ্টি-বাদের প্রবল আন্দোলনের প্রভাবে এরা উপস্থিত প্রায় সর্ব্ব ধর্ম্মেই অনাস্থাবান হ'য়ে উঠেছে। স্যাক্সনীর লোকের অবস্থা বেশ সচ্ছল। এরা উপার্জ্জনও করে বেশী এবং খরচও ক'রে বে-দরদে! কেবলমাত্র 'ওর' পর্ব্বতস্থ পল্লীটি চাষবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত বলে এখানে কুটীর-শিল্পের প্রচলন খুব দেখতে পাওয়া যায়। এস্থানটি অত্যন্ত জনাকীর্ণ বলে দারিদ্র্যের দারুণ অভাবও এখানে বিদ্যমান। শিক্ষার উন্নতির দিক দিয়ে স্যাক্সনী অন্য সকল প্রদেশকে এগিয়ে গেছে। এখানে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার অতি সুন্দর সুব্যবস্থা আছে। জার্ম্মাণীর এই যন্ত্র-শিল্প-শিক্ষালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। এই সকল শিক্ষালয়ের ছাত্রেরা ব্যবসায় সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার শিল্প-বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ পারদর্শী হ'য়ে ওঠে।

বীথোভেনের জন্মভূমি 'বন্' শহর

স্প্রীওয়াল্ডের সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী

ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট্‌ শহরের একদিক
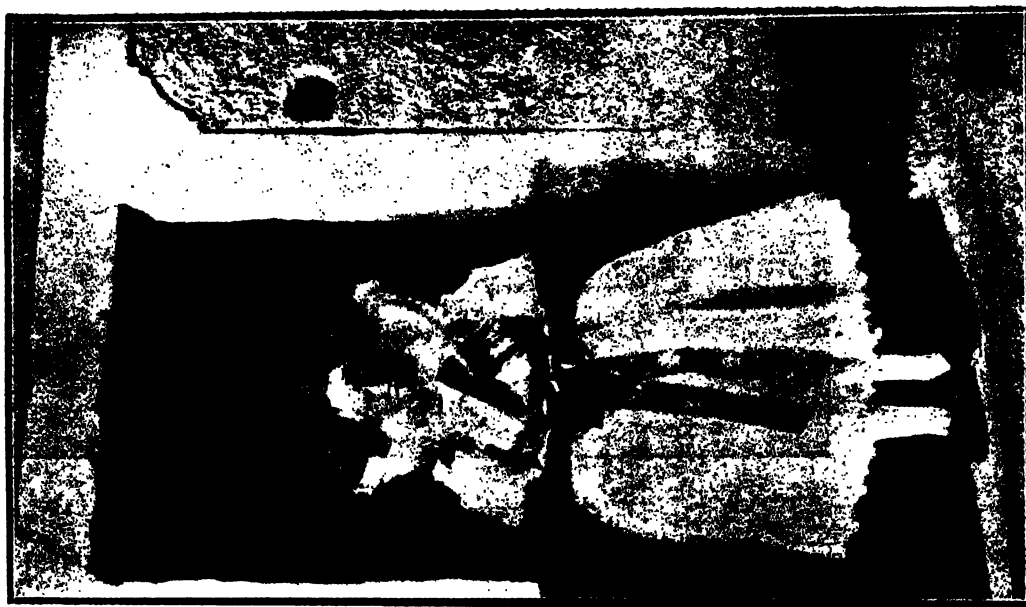
স্যাক্সনীর প্রধান শহর 'ড্রেস্‌ডেন'। এখানে প্রবাসী ইংরেজ ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের সংখ্যা জার্ম্মাণদের চেয়েও বেশী। কিছুদিন ড্রেস্‌ডেনে থাকলে আর ড্রেস্‌ডেন ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না।

উৎসব দিনের বাদকেরা

স্যাক্সনীর আর একটি প্রধান শহর হ'চ্ছে—লাইপ্‌জিগ। ড্রেসডেন্ শ্রেষ্ঠ শহর হলেও লাইপ্‌জিগের লোকসংখ্যা অনেক বেশী। এখানে একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পুস্তক মুদ্রণ প্রকাশ ও বিক্রয় সংক্রান্ত এমন কি বই বাঁধাইয়ের কাজের জন্যও লাইপ্‌জিগের প্রসিদ্ধি আছে। এছাড়া জার্ম্মাণীর সকলের চেয়ে যে বড় আদালত বা 'হাইকোর্ট' তা' লাইপ্‌জিগেই অবস্থিত।

এখানে ইংরেজ ছেলে-মেয়েদের পড়বার জন্য একাধিক ইংরাজী ইস্কুল স্থাপিত হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের আগে এই সব প্রবাসী ইংরেজ ও আমেরিকানরা অনেকেই জায়গা জমী কিনে বাড়ী ঘর তৈরী করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করে দিয়েছিল। সমস্ত জার্ম্মাণ রাজ্যে কোথাও ড্রেসডেনের মতো এমন সর্ব্বরকমে সুন্দর শহর আর দেখতে পাওয়া যায় না। এমন একটা সূক্ষ্ম শ্রী এই শহরের আছে যা মানুষকে তার অজ্ঞাতসারে একান্ত মুগ্ধ করে ফেলে!

উৎসব-প্রাঙ্গণে নৃত্যাভিলাষিণীগণ (নৃত্যের পূর্ব্বে তাদের স্ব স্ব জাতীয় পোষাক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে কি না তার পরীক্ষা হচ্ছে !)

উট্রে স্বার্গ্

আকার ও লোকসংখ্যার অনুপাতে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে উট্রে স্বার্গ তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। এটি একটি আরামপ্রদ পাহাড়ী দেশ। কন্স্টান্স্ হ্রদের উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত! দুর্ম্মুখ-স্বভাব কিন্তু সুজন শোয়াবীয়ানরা এইখানকারই অধিবাসী। এরা বড় প্রত্যুৎপন্নমতি ও ধূর্ত্ত লোক, অথচ এদের মতো এত ভাবপ্রবণ জাতও আর দেখা যায় না। সৎকার্য্যে এরা সর্ব্বদাই অগ্রণী।

আঁশের পাত্র

উট্রে স্বার্গের অধিবাসীরা সকলেই যোদ্ধা। এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আপনাদের বীর্য্যবলে ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে এসেছে। এ স্থানটিকে কবি ও ঔপন্যাসিকের কল্পিত কাহিনীর মতো স্বপ্নমাধুরীময় বলে মনে হয়। এখানে এমন একটি ছোটখাটো পাহাড় নেই যার উপরে একটি দুর্গ বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় না! হোহেন্ষ্টাউফেন্ পর্ব্বতের শিখরদেশে যে জার্ম্মাণ পরিবার যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর জয়শ্রী বরণ করে সুখ-সমৃদ্ধিতে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠেছিল—যারা স্বধর্ম্মাশ্রিত পুণ্য রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে একটির পর একটি ক'রে সব অসামান্য সম্রাট যুগিয়ে এসেছিল, যারা জার্ম্মাণীকে বহু বিভক্ত করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছিল, যারা বিশ্বরাজ্যের দুঃস্বপ্ন দেখে ইটালীকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলেছিল, তারাই এখানকার মানুষ! সে যাই হোক—তাদের সর্ব্বদোষ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ওই উট্রে স্বার্গের অধিবাসীদের যে চারিত্রিক বিশেষত্ব—সেই ছিল জার্ম্মাণীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রধান উৎস। তাদের রাজসভা—কি সুদূর দক্ষিণ ইটালী, কি সিসিলী—সর্ব্বত্রই শিক্ষা সাহিত্য ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থান হ'য়ে উঠে এমন একটা নবীন আলোক জ্বেলে দিয়েছিল যে তার কিরণচ্ছটায় সমগ্র য়ুরোপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আবার সেই মশালের আলোক-শিখাতেই তারা য়ুরোপে আগুন ধরিয়েও দিয়েছিল।

কবি শীলারের বাসগৃহ

'জোলার্ণ' পর্ব্বত-শৃঙ্গের বেলেপাথরের বেদীর উপর যে নব-নির্ম্মিত বিরাট ও বিস্ময়কর দুর্গ এরই ক্রোড়ে জগদ্বিখ্যাত হোহেন-জোলার্ণ রাজবংশের সম্রাটেরা লালিত-পালিত হয়েছিল। আজ ভাগ্যচক্রের দুর্নিবার দুর্বিপাকে তারাও অধঃপতিত। অদ্ভুত রণদক্ষতা ছাড়াও শ্বোয়াবী-য়ানরা অন্যান্য দিকেও তাদের প্রতিভার বিকাশ দেখিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করেছে। দর্শন-বিজ্ঞানের গবেষণা ও অনুসন্ধানেও তাদের সুযশ বিশ্বব্যাপী। Albertus Magnus, Paracelsus, প্রভৃতি মনীষীরা এই শ্বোয়াবীয়ানদেরই পুত্র। এই দেশেই Kepler, Hegel, Schelling প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদেরই কবি ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত Schiller, Wieland ও Uhland. বীরত্ব-গৌরবের দিনে জার্ম্মাণ তরবারীর মুখে তীক্ষ্ণধার স্বরূপ ছিল এরাই এবং দিগন্তবিস্তৃত জ্ঞান বিস্তারের এরাই ছিল বাহন।

উর্টেম্বার্গের প্রাচীন উল্ম্ শহর

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

১

তব অপরূপ রূপ যে জেনেছে মনে,
সে তোমারে আত্মদান করেছে গোপনে—
নিশ্চয় নিশ্চিত ইহা। বাহিরের চোখে
কতটুকু দেখা যায় আঁধার-আলোকে,
কতটুকু যায় চেনা ? তাই ত সকলে
তোমারে, হে প্রিয়তম, হিমাচল বলে।
সৃষ্টির মঙ্গল-মূর্ত্তি দধিপাত্র শিরে
শিবেরে করিয়া কোলে পালিছ পৃথ্বীরে ;
বহাইয়া সুরধুনী পুণ্য বক্ষসুধা
পিয়ায়ে নিখিল জীবে পুষিছ বসুধা ;
রুক্ষ কাঠিন্যের বর্ম্ম দেখিয়া নয়নে
সে তোমার বাহ্য-রূপ সমাধি-শয়নে
সর্ব্বকালজয়ী দেহ! শৃঙ্গবাহু তুলি'
ডাকিছ সন্তানে তব স্বর্গদ্বার খুলি'।

২

কমঠ-কঠিন অঙ্গ প্রস্তর আকার,
তবু তার প্রাণ আছে করে তা স্বীকার
শিশুছাড়া সর্ব্বজনে যেবা চক্ষুষ্মান
যদিও আপাত-দৃশ্যে সে শুধু পাষাণ।
আরো বড় হবে যবে মানব-শৈশব
দৃষ্টি-অন্তরালে যবে শিখি অনুভব
হেরিবে নূতন চক্ষে অন্তর্দৃষ্টি খুলি'
সেদিন তব এ বাহ্য আবরণ ভুলি'
স্বরূপ দেখিবে তব ভবিষ্য-মানব ;
ধ্যানমূর্ত্তি হেরি তব হইবে নীরব
আজিকার অবিশ্বাসী ; বন্দিবে বিস্ময়ে
তোমার ও পাদদেশ ভক্তিভরা ভয়ে।
হে তাপস হে সুন্দর হে চিরমঙ্গল,
সেদিনের কথা ভাবি চোখে আসে জল।
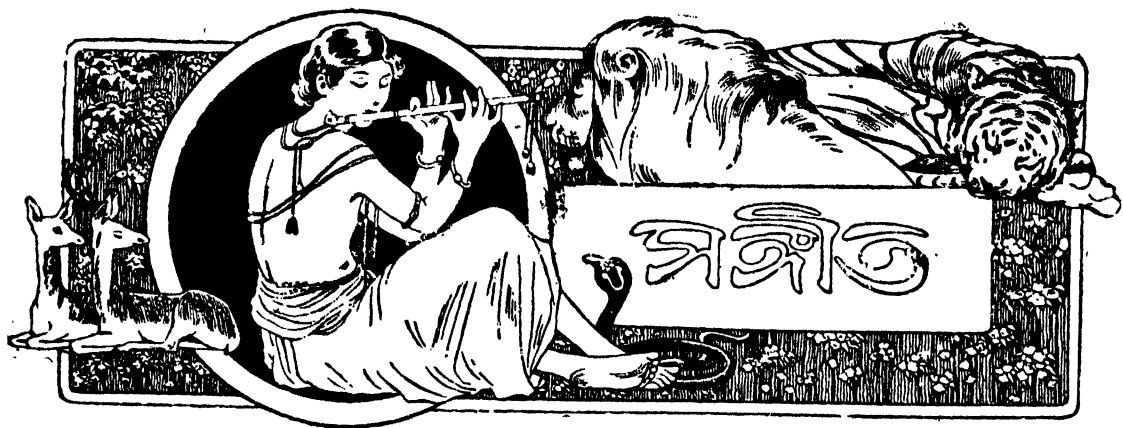
কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিশ্র ভৈরবী—ভৈরোঁ—তেতালা।

গিরি গোবর্দ্ধন কুঞ্জনচারী
হৃদি বৃন্দাবন বসো মুরারী।
দেবাকাঙ্ক্ষিত অতুলিত শোভা
হে চিরবাঞ্ছিত জগমনলোভা!—
প্রকট সোই তব নবঘন মূর্ত্তি
মম প্রার্থন অব কীয়ো পূর্ত্তি।
রূপ ধিয়ানে চিত্ত উদাসী
আবো প্রাণে প্রেম বিলাসী;
আশা করত হুঁ তব পদ মাগি
পিয়াস বুঝাউঁ সব সুখ ত্যাগি।
তব মূরত স্মর ন কছু সুহাবে
বিনতি তাপ হর আশ মিটাবে;
তরসত তন মন যাত হুঁ বারি
হৃদি বৃন্দাবন্ বসো মুরারী॥

II ধ্‌া ণ্‌া ণ্‌া সা | সা -া সা সা | সা -া রা সন্‌া | সরা গা মা -া |
গি রি গো - ব - র্দ্ধ ন কু - ঞ্জ ন চা - রী -

গা মা গরা গা | সা -া রা গা | সা রা গা মা | গরা গা রসা -া | I
হৃ দি বৃ ন্‌ দা - ব ন ব সো - মু রা - রী -

সা ঋা সঋা জ্ঞমা | মা -া মা মা | মপা মদা পমা জ্ঞরা | জ্ঞা রা মজ্ঞা রজ্ঞা |
দে - বা - কা - ঙ্ক্ষি ত অ তু লি ত শো - ভা -

সা রা সণ্‌া সা | সরজ্ঞা মপদা পমা জ্ঞরজ্ঞা | ঋা সা ঋা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া |
হে - চি র রা - ঞ্ছি ত জ গ ম ন লো - ভা -

[মা -া মা -া]

{ ণ্‌া সা সা সদা | পা পা পা পা | পা দা পা মা | মপণা দপমা জ্ঞরা জ্ঞা | }
প্র ক ট সো - ই ত ব ন র ঘ ন মূ - র্ত্তি -

গা মা গঋা সা | সা ঋা গা মা | গমা পা মগা মা | গঋা গঋা সা -া | II II
ম ম প্রা - র্থ ন অ ব কী - য়ো - পূ - র্ত্তি -

সা -া সা দা | পা -া পদা ণর্সা | ণপা ণা দপা দা | পমা পা মা -া |
রূ - প ধি য়া - নে - চি - ত্ত উ দা - সী -

জ্ঞা রা মজ্ঞা রজ্ঞা | সঋজ্ঞা মপদা দা -া | জ্ঞসা -া ঋা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া |
আ - রো - প্রা - ণে - প্রে - ম রি লা - সী -

সা -া ণা -া | দা দা পা পা | পা ধা পধণা ধপা | মা গা পমা গমা |
আ - শা - ক র ত হুঁ ত ব প দ মা - গি -

গমা গা ঋা সা | সা ঋা গা মা | মা পা মগা মা | গঋা গঋা সা -া | II II
পি য়া - স বু ঝা - উ স ব সু খ ত্যা - গি -

সা সা সর্সা -া | ণা দা পা পা | ণা দা পা মা | মপা দপা মজ্ঞা রজ্ঞা |
ত ব মূ - র ত স্ম র ন ক ছু সু হা - রে

সা ঋা সণ্‌া সা | -া ঋা জ্ঞা মা | ঋা মা জ্ঞা মা | জ্ঞঋা জ্ঞঋা সা -া |
বি ন তি তা - প হ র আ - শ মি টা - রে -

সা সা সা সা | ণ্‌া সা ণ্‌দ্‌া ণ্‌া | সা মা মা মা | গমা ঋা মা -া |
ত র স ত ত ন ম ন যা - ত হুঁ রা - রি -

গা মা গা ঋা | সা ঋা গা মা | মা গপা মমা গা | ঋা -া সা -া | II II
হৃ দি র্‌ ন্‌ দা - র ন র লো - মু রা - রী -

তক্ষশিলা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ

প্রথম অধ্যায়

পথে

শ্রাবণ মাসের ২৯শে তারিখ শুক্রবার রাত্রি ৮টার সময় হাওড়া হইতে পাঞ্জাব মেলে স্বাস্থ্যলাভোদ্দেশ্যে তক্ষশিলা অভিমুখে রওনা হইলাম। তক্ষশিলার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর, শুনিয়াছি। আমার তৃতীয় মাতুল মহাশয় সরকারী প্রত্নবিজ্ঞান-বিভাগের কার্য্য-ব্যপদেশে তক্ষশিলায় অবস্থান করেন। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন; এখন সপরিবারে পুনঃ কর্ম্মস্থানে যাইতেছেন। সেই সঙ্গে আমিও যাইতেছি।

প্রথম রাত্রি

যথাসময়ে পাঞ্জাব মেল তাহার 'মোহন বাঁশী' বাজাইয়া, ঘর্ঘর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, রাশি রাশি ধূম্রকুণ্ডলী উদ্গীরণ করিতে করিতে বিশাল দেহ লইয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিল। বাহিরে জমাট অন্ধকার, মনের মধ্যেও অন্ধকার; প্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সমস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া—কে জানে কত দিনের জন্য, অথবা চিরদিনের জন্যই না কি—ভারতের সুদূর প্রান্তান্তরে চলিয়া যাইতেছি। জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে মনের উপর যে কতটা আঘাত লাগে, তাহার অভিজ্ঞতা-লাভ জীবনে ইতিপূর্ব্বে আরও একবার ঘটিলেও আঘাতের পরিমাণটা এইবারই যেন কিছু বেশী বোধ হইল। সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে আর এক দিন বাঙ্গলার কোন্ সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট বিদায় লইয়া যখন নৌকাযোগে ধীরে পল্লী-নদীর বক্ষ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, তখন অন্যূন পঞ্চাশৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—প্রবল বারিপাতের মধ্যেও তীরে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায়—সজলনেত্রে আমাদের নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে করুণ বিদায়-দৃশ্য আজ থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতে লাগিল। এ দৃশ্য বাঙ্গালী-মনের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইতে পারে, সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ।

মনের এইরূপ চঞ্চল অবস্থায় চোখে ঘুম বড় আসিল না। কিছুক্ষণ উন্মুক্ত জানালা দিয়া উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দুই পাশে অন্ধকার বিজড়িত বিটপী-শ্রেণী, তাহার ফাঁকে ফাঁকে কখন জোনাকির মত দুই একটা আলোক, আর মাঝে মাঝে এক একটি আলোকোজ্জ্বল ষ্টেশন,—চলচ্চিত্রের মত চোখের সম্মুখ দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রাদেবীর সঙ্গে কচিৎ কখন দেখা-সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। এই অর্দ্ধ জাগ্রত, অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় কখন্ যে বাঙ্গালার সীমানা ছাড়াইয়া বিহারের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহা হৌক, রাত্রির শেষ দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ভোরে জাগিয়া দেখি, পাটনা সিটী ষ্টেশনে আসিয়াছি। ইত্যবসরে মনটাও তাহার প্রাথমিক চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া সুস্থির হইয়া আসিয়াছে। রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দিতে গলার গোড়াটা বড় ছম্-ছম্ করিতেছিল। কথা কহিতে যাইয়া দেখি, কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিছু গরম চা পান করিয়া গলাটা একটু ঝালাইয়া লওয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন

পাটনা ছাড়াইলেই দুই দিকে কেবল দিগন্তবিস্তৃত বিশাল মাঠ,—তাহাতে বাঙ্গলার মত ধান-পাট নাই। অধিকাংশ জমিতেই কেবল গম ও ভুট্টার চাষ। মাঝে মাঝে সারি সারি অসংখ্য ঊর্দ্ধশীর্ষ তালবৃক্ষ। স্থানে স্থানে মাটীর দেওয়ালোপরি নির্ম্মিত খোলার ঘর সমন্বিত এক একখানি ছোট গ্রাম। ক্রমশঃ বৃহৎ বৃহৎ আম্রবাগান চোখে পড়িতে লাগিল। স্থানে স্থানে দেখিলাম, বহুবিস্তীর্ণ ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানি করিয়া রোপা ধানের ক্ষেত; তাহাতে চারিদিকে আল বাঁধিয়া জল রাখা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের মত বর্ষা-প্লাবিত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র একখানিও দৃষ্টিগোচর হইল না।

দেখিতে দেখিতে বৃহৎ শোণ নদ অতিক্রম করিলাম। শোণ নদের উপরিস্থ সেতুটি সুবিখ্যাত সাড়া-সেতুর ন্যায় আড়ম্বরবহুল না হইলেও দৈর্ঘ্যে বোধ হয় কম হইবে না। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ, স্ফীত-যৌবন বিশাল শোণ নদের ঈষৎ আবিল জলরাশি উভয় কূল প্লাবিত করিয়া ধীর-মন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে নদের মধ্যখানে একখানি গ্রাম,—ঠিক যেন দ্বীপের মত জলের উপর ভাসিতেছে—মনোরম দৃশ্য!

এইরূপে দক্ষিণে ও বামে নানা বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা ৯টায় মোগলসরাই জংশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের টিকেট—ভায়া মোগলসরাই—সাহারাণপুর; কাজেই মোগলসরাইতে পাঞ্জাব মেল বদল করিয়া আউধ-এণ্ড-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িতে মিনিট কুড়ি দেরী—আহারের জন্য কিছু ডালপুরী, তরকারী ও কুঁজো ভরিয়া জল লওয়া গেল। ৯৷৷০ টায় গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মোগল সরাইয়ের পরের ষ্টেশনই ৺কাশীধাম। এইবার বিহার ছাড়িয়া ক্রমশঃ যুক্তপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হইতেছি। মিনিট পনেরর মধ্যেই গঙ্গার উপরিস্থ সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম। মরি, মরি, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!—জীবনে আর কখন দেখি নাই, দেখিবও না। বর্ষা-সমাগমে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত উত্তরবাহিনী ভাগীরথী কাশীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া তর-তর বেগে বহিয়া যাইতেছে। তটোপরি নবোদিত সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত অসংখ্য বিচিত্র সৌধমালা। তন্নিম্নে শত শত অর্দ্ধমগ্ন দেউলের গর্ব্বোন্নত চূড়া। মাঝে মাঝে সুরম্য সোপানাবলী,—তদুপরি স্নান-রত অসংখ্য নরনারী,—যেন শিল্পীর সযত্ন-অঙ্কিত একখানি ছবি—অপরূপ দৃশ্য! সমগ্র নগরীটি যেন গঙ্গার মধ্য হইতে উঠিয়াছে। এ কি যথার্থই বাস্তব জগতের স্থূল দৃশ্য, না কল্পনালোকের কোন অলীক চিত্র! হে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! হে ভারতের তীর্থ বারাণসী! হে জগতের ঈশ্বর বিশ্বনাথ!—তোমাদের শত শত প্রণাম!!

কাশী ষ্টেশনে গাড়ী মাত্র দুই মিনিট থামিলেও গঙ্গাজল স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল,—অবশ্য জনৈক পাণ্ডার কৃপায়। পরের ষ্টেশন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে আর কিছু পানীয় জল ও কাশীর উৎকৃষ্ট আমের আচার লইয়া তৎসহ মোগলসরাইয়ের ডালপুরী ও নিভাঁজ কুমড়ার তরকারীর সদ্ব্যবহার করা গেল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গাড়ী অপেক্ষা আউধ-এণ্ড-রোহিলখণ্ডের গাড়ী অনেক অনুন্নত। অল্পবিস্তর ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে ও কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে শুনিতে হিন্দুস্থানের বিশাল প্রান্তর-বক্ষ ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিলাম। আমাদের কামরায় আর একজন বাঙ্গালী,—মোগলসরাইতে উঠিয়াছেন,—লাক্‌সারে গাড়ী বদল করিয়া দেরাদুন যাইবেন।

প্রতাপগড়ে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা ১২টা। অত্যধিক গরম বোধ হইতে লাগিল। চলন্ত ট্রেণে বাতাস পাওয়া যায়; কাজেই ততটা কষ্ট বোধ হয় না। গাড়ী হইতে নামিয়া পানিপাঁড়ের প্রদত্ত জল দ্বারা মাথাটা ধুইয়া ফেলিয়া কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলাম। এই গ্রীষ্মের দিনে রেলকর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ষ্টেশনেই জল দিবার অতি সুবন্দোবস্ত করিয়া যাত্রীসাধারণের, বিশেষতঃ দূরগামী যাত্রীদের, বড়ই উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক ষ্টেশনেই পানিপাঁড়েরা "বাবুজি, পানিমে সুরাই ভরকে লিয়ে" বলিয়া সাধিয়া সাধিয়া জল দেয়; দুই একটা পয়সা দিলে খুসী হইয়া চলিয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের কোন রেল ষ্টেশনেই এমন সুবন্দোবস্ত নাই। প্রতাপগড়ে বেশ সস্তা ছোট ছোট আম পাওয়া গেল,—প্রতিটা মাত্র ৵৫ পয়সা। এবার বাঙ্গলায় আম অত্যন্ত মহার্ঘ। কিছু আম এবং ছোট খোকাটির জন্য কিছু গরম মহিষ-দুগ্ধ ক্রয় করিয়া লইলাম। গরুর দুধ মিলিল না!

প্রতাপগড়ের পর কয়েক ষ্টেশন ছাড়াইলে দেখিতে লাগিলাম, স্থানে স্থানে গাছের সঙ্গে সারি সারি কুব্জপৃষ্ঠ, বৃহদাকার উট বাঁধা রহিয়াছে;—কোথাও মাঠের উপর দীর্ঘ-গ্রীব সারস পাখীগুলি ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতেছে; আবার কোনখানে স্থূলকায় মহিষগুলি দলে দলে কর্দ্দমাক্ত জলের মধ্যে শরীর নিমজ্জিত করিয়া মাত্র নাসিকাগ্র বাহির করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে মাঠের শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা ৩৷৷০টায় লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ওয়াজেদ আলী শার লক্ষ্ণৌ,—মানস-নয়নে কত দৃশ্য দেখিলাম, মনে কত ইতিহাস জাগিল।

"কগতা ধরণীপালাঃ সসৈন্য বল বাহানাঃ।
বিয়োগ সাক্ষিনী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি ॥"

সমস্ত দিন এক ভাবে বসিয়া থাকিতে কোমর লাগিয়া

আসিয়াছিল। ষ্টেশনে নামিয়া কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া শরীরটা একটু ঝাড়িয়া লইলাম।

লক্ষ্ণৌ ছাড়াইলে আবার দুই ধারে কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত অকর্ষিত ভূমি; মাঝে মাঝে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের ঝোপ মিলিয়া সমগ্র প্রান্তর ভরিয়া জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। একখানিও শস্যক্ষেত্র দেখিলাম না। কচিৎ কোথাও বিশাল মাঠের কোন প্রান্তে দুই একখানি গ্রাম অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। এমনি মাঠের উপর দিয়া ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল।

দ্বিতীয় রাত্রি

সাহাজানপুর যখন পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তার পর, জানি না কখন, একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম,—ফেরিওয়ালাদের চীৎকারে জাগিয়া দেখি, মোরাদাবাদে পৌঁছিয়াছি। রাত্রি তখন ১০টা। 'ঠাণ্ডি পাণি', 'গরম চা', 'সোডা লেমনেড্', 'ডাল-রুটী-পুরী',—আর তৎসহ 'হিন্দু ওয়াস্তে,' 'মুসলমান ওয়াস্তে',—ইত্যাদি চীৎকার, এবং মিঠাইওয়ালা, ফলওয়ালা, চুড়িওয়ালা, ছুরী-কাঁচিওয়ালা, খেলনাওয়ালা, ঘটি-বাটিওয়ালা, প্রভৃতি ফেরিওয়ালাদের বিবিধ প্রকার স্বর মিলিয়া এক অভিনব ঐক্যতান-বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কান ঝালাপালা করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এক একজন ফেরিওয়ালা নানাবিধ মনোহারী দ্রব্য-সামগ্রীতে সাজাইয়া ঠিক যেন এক একখানা প্রতিমার চালীশুদ্ধ কাঠামো মাথায় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও নানারূপ সুরতানলয়ে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করিতেছে। সে কাঠামোয় দুনীয়ার কি যে আছে, আর কি যে নাই, বলা কঠিন। বাসনওয়ালারা নিকেলের কলাইকরা ঝক্‌ঝকে ছোট ছোট পিতলের ঘটি, বাটি, গ্লাস, থালা প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া অনবরত হাঁকিয়া যাইতেছে। জিনিষগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর,—ঠিক রৌপ্য-নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয়। এই মোরাদাবাদী বাসনের খুব প্রসিদ্ধি আছে। মিঠাই-বিক্রেতারা মিঠাই-বোঝাই এক একখানা গাড়ী ঠেলিয়া ঠেলিয়া ট্রেণের কামরার কাছে আনিতেছে। তাহাদের মুখোচ্চারিত নাম শুনিয়া, অথবা চাক্ষুষ দেখিয়াও দুই একটি ব্যতীত কোন মিঠাইয়েরই 'কুলশীল' বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হৌক্, একটা বিষয় খুবই লক্ষ্য করিলাম। এক একজন ফেরিওয়ালা যেরূপ গুরুভার বোঝা মাথায় করিয়া, অথবা গাড়ী ঠেলিয়া বৃহৎ ট্রেণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনবরত যাওয়া-আসা করিতেছে, সেরূপ বোঝা আমাদের বঙ্গদেশের পাঁচজনেও লইয়া যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ। মোরাদাবাদে আবার এক প্রস্থ ডালপুরী-তরকারী কিনিয়া লইয়া রাত্রির আহার কার্য্য সমাপ্ত করা গেল।

মোরাদাবাদের পর হইতে অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গরমটা একটু কম বোধ হয় বটে, কিন্তু কোন ষ্টেশনে থামিলেই কেমন একটা গরমের গুমোট চারিদিক হইতে যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এই ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ইচ্ছা ছিল, সাহারানপুরের পর গাড়ী যখন যমুনা অতিক্রম করিবে, তখন জাগিয়া থাকিয়া সে দৃশ্য দেখিব। কিন্তু কখন্ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, জাগিয়া দেখি, সাহারানপুর ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়াছি; রাত্রি তখন ৪টা। ৩টায় গাড়ী সাহারানপুর ত্যাগ করিয়াছিল।

সাহারানপুর হইতেই গাড়ী নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের লাইনে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার যুক্তপ্রদেশের সীমানা ছাড়িয়া পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল।

তৃতীয় দিন

আম্বালা ক্যান্টন্‌মেন্টে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতিরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শিশির-সিক্ত সবুজ গম ও ভুট্টা-ক্ষেত্রগুলি নানা প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষের সমবায়ে চতুর্দ্দিকেই বেশ একটা সজীবতার সৃষ্টি করিয়াছে। আম্বালায় পৌঁছিয়াই দেখি, পূর্ব্বদিনের মোগলসরাইয়ে পরিত্যক্ত পাঞ্জাব মেল এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী, প্রভৃতি হইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আধঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর পাঞ্জাব মেল সোজা উত্তর দিকে, শিমলার পথে, কাল্‌কা-অভিমুখে চলিয়া গেল; আর আমরা ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আম্বালার পরেই সুপ্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ আমাদের

চোখে পড়িল। কখন সমান্তরালভাবে, কখন বা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আবার আসিয়া এই ইতিহাস-বিশ্রুত প্রাচীন পথটি সমস্ত রাস্তাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল, অথবা আমরাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিলাম। ক্রমে শিমলা-শৈলের দক্ষিণ-দিকস্থ অস্পষ্ট পর্ব্বতাবলী দৃষ্টিগোচর হইল। আম্বালার পর হইতে গাড়ীতে একটু একটু করিয়া ভিড় হইতে লাগিল।

গাড়ী ক্রমশঃ উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। কয়েকটি বন্য হরিণ চলন্ত ট্রেণ দেখিয়া মাঠের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটি সুদৃশ্য নীলকণ্ঠ ময়ূর পুচ্ছ মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইবার একটি একটি করিয়া পাঞ্জাবের পঞ্চ নদ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় লুধিয়ানা ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ পরেই সর্ব্বপ্রথম সাতলেজ (শতদ্রু) পার হইলাম। রেলওয়ে সেতুর পাশাপাশি কিয়ৎ দূরেই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সেতু। তাহার উপর দিয়া মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া, গরু, সমস্তই যাতায়াত করিতেছে।

বেলা ৯টায় জলন্ধর সিটী ষ্টেশনে পৌছিয়া আবার সেই ডালপুরী-তরকারী দিয়া ভোজন-কার্য্য সমাধা করা গেল। জলন্ধরের কয়েকটা ষ্টেশন পরে বিয়াস ষ্টেশনের অদূরে বিয়াস (বিপাশা) নদী উত্তীর্ণ হইলাম। এখানেও গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড্ পূর্ব্বের মতই পাশাপাশি সেতুর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গরম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায়ই কখন্ একটু ঘুম আসিয়াছিল; জাগিয়া দেখি, অমৃতসরে আসিয়া পৌছিয়াছি। বেলা তখন ১০টা। অসহ্য গরম বোধ হইতে লাগিল। আজ দুই দিন স্নান হয় নাই, রাত্রিতে ঘুম হয় নাই, অভ্যস্ত আহার হয় নাই। এঞ্জিনের ধূমে স্বেদ-সিক্ত মুখমণ্ডল, জামা, কাপড়,—সমস্তই কালিময় হইয়া গিয়াছে। শারীরিক ও মানসিক একটা বড় অস্বাভাবিক ভাব বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, একটা পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়ি। কিন্তু এত আর দেশ-ঘর নয় যে, পুকুর মিলিবে! কাজেই "যস্মিন দেশে যদাচার"—এই নীতি-বাক্যই শিরোধার্য্য করিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া ষ্টেশনের একটা কলের নীচে মাথাটা রাখিয়া সেই ধূলি-কালি-কয়লা-মাখা রুক্ষ চুলগুলি ধুইয়া কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া একরূপ সজল মাথা লইয়াই গাড়ীতে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম।

অমৃতসরের পর হইতে ভিড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃহদাকার পাঞ্জাবিগণ, বিশেষতঃ দীর্ঘ-শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত আকালী শিখেরা মাথায় বৃহৎ পাগড়ী, গায়ে সার্ট, ওয়েষ্ট্ কোট, কোট, পরিধানে ঝুলমুল ঢিলা পাজামা, পায়ে বৃহৎ জুতা, ও কটিতে কোষবদ্ধ কৃপাণ লইয়া আরও বৃহদাকার হইয়া এক একজন একাই পাঁচজনের স্থান জুড়িয়া বসিতে লাগিল, এবং নিজেদের মধ্যে অবিশ্রাম অবোধ্য ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদের কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিল। ইহাদের আলাপ-প্রলাপের উৎস কি কেবল রেল-গাড়ীতে আসিলেই খুলিয়া যায়? আমরা তাহাদের কথাবার্ত্তায় বিরক্ত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহারা বীরের জাতি। এই সেদিনও ইহারা ধর্ম্মের জন্য, স্বাধিকারের জন্য সম্পূর্ণ অহিংসভাবে যেরূপ অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কেবল দুর্ল্লভ নহে—তুলনাশূন্যও বটে। শ্রদ্ধায় ইহাদের প্রতি মস্তক অবনত হইতে লাগিল।

অমৃতসরের পর হইতে আবার সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ মাঠ,—দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। ইহারই মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত, মাটীর গৃহ-পরিপূর্ণ দুই একখানি গ্রাম কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

বেলা ১২টায় লাহোরে পৌছিলাম। আর সেই যথাপূর্ব্ব 'ঠাণ্ডিপানি,' 'সোডা লেমনেড্,'—'গোস্ত্ রোটী,' 'ডাল-পুরী,' 'আলু-ছোলে'—'হিন্দু ওয়াস্তে,' 'মুসলমান ওয়াস্তে,' ইত্যাদি চীৎকার। আমাদের কামরার নিকট দিয়া একজন অল্পবয়স্ক ফেরিওয়ালা বিকৃতস্বরে ডাকিয়া যাইতেছে, "মিঠা সেউ—পেছে পেছে।" "পেছে পেছে" কিরে বাপু? হরি হরি, পয়সা পয়সা!

পাটনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাস্তায়ই ফেরিওয়ালাদের চাৎকারে বুঝিলাম,—এই সব স্থানে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে হিন্দু এবং মুসলমানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। ইহাতে একটা বিষয় খুবই লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে এখনও সামাজিক ব্যবস্থায় ততটা শৈথিল্য আসে নাই; বোধ হয়, এই সব প্রদেশে এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গলাদেশের মত অলিতে গলিতে তথাকথিত

সাম্যবাদী এবং উদারনৈতিকের উদ্ভব ও উপদ্রব হয় নাই। দেখিয়া মনে একটু আনন্দই হইল। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া সামাজিক আচার-ব্যবহারে বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলিয়া যাইবে, ইহা যেমন কখনও সম্ভবপর নহে, তেমনি, বোধ হয়,—কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয়ও নহে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলাদেশের সাম্যবাদী ও উদারনৈতিক দল কেবল রসনার তৃপ্তির জন্ম অস্পৃশ্য অখাদ্য ভোজনে পটু,—কিন্তু বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায় সাম্য ও উদারনীতি অবলম্বন জন্ম প্রকৃত মনুষ্যত্ব,—সৎসাহস এবং তেজস্বিতা আবশ্যক হইলেই তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শনে তৎপর; তখন সঙ্কীর্ণতা এবং কুসংস্কার তাহাদিগকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলে!

লাহোর ছাড়িয়াই যখন রাবি (ইরাবতী) নদী পার হইলাম, তখন দেখিলাম, নদীতে বন্যা হইয়া লাহোরের উত্তরাঞ্চল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে; রাস্তা-ঘাট-মাঠ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে; অনেক দালান-কোঠার মধ্যে জল গিয়াছে; বহু গো মহিষ মৃতাবস্থায় জলের উপর ভাসিতেছে। বন্যা তখন কিছু কমিয়া আসিয়াছে, তাহা জলের দাগ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। লাহোর ষ্টেশনে একখানা খবরের কাগজ কিনিয়াছিলাম; তাহাতে দেখিলাম, কয়েক দিন পাঞ্জাবে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়াতে এই বর্ণা হইয়াছে। পাঞ্জাবে এত অধিক বৃষ্টি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আর হয় নাই।

লাহোরের পর হইতে গাড়ী ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন্যার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া চলিয়াছি। গরমটা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। রাস্তা যেন আর ফুরাইতে চাহে না। যাহা হোক্, বেলা ২টায় ওয়াজীরাবাদের পর চেনাব (চন্দ্রভাগা) নদী উত্তীর্ণ হইলাম।

খড়িয়ান নামক একটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া আসিতেই দুই ধারে নিকটে ও দূরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু পাহাড় চোখে পড়িতে লাগিল। বেলা ৪টার পর ঝিলাম ষ্টেশনের নিকট ঝিলাম (বিতস্তা) নদী অতিক্রম করিলাম। আমাদের সঙ্গী গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ পূর্ব্ববৎই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ঝিলাম সহরটি এই অঞ্চলের একটি বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর। সহরের নীচে দিয়াই নদীটি প্রবাহিতা। নদীতে বড় বড় বোঝাই নৌকা; জলের মধ্যে বহু বৃহৎ বৃহৎ পার্ব্বতীয় কাষ্ঠ ভাসমান রহিয়াছে।

ঝিলামের পর কিছুদূর পর্যন্ত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র। তার পর যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, দূরবর্ত্তী পাহাড় সকল ততই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ক্রমে বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক অথচ সুগভীর পার্ব্বত্য নদী ও গহ্বর সকল পার হইতে হইতে চলিলাম। তারপর,—তারপর কেবল পাহাড়, পাহাড়, পাহাড়! সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে কেবল উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরমালা। এইবার গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা' ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। হয়ত কিছুক্ষণ আগে যে স্থান দিয়া আসিয়াছি, একটু পরেই আবার ঘুরিয়া ঠিক সেই স্থানের কিছু উপরে উঠিয়াছি। দুইধারে উত্তুঙ্গ পাহাড়-শ্রেণী,—মধ্য দিয়া রাস্তা কাটিয়া লাইন বসাইয়া গিয়াছে; ইহারই উপর দিয়া পাহাড়ের ক্রোড় ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া গাড়ী কখন পশ্চিম, কখন দক্ষিণ, কখন পূর্ব্ব, কখন উত্তরমুখী হইয়া ধীর অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। ক্রমে পর পর পাহাড় মধ্যস্থ ছোট ছোট দুইটা সুড়ঙ্গ (টানেল) পার হইলাম। তখনও বেলা আছে; কিন্তু সুড়ঙ্গের মধ্যে জমাট অন্ধকার, —পাঁচটা অমাবস্যা রাত্রি একত্র করিলেও বোধ হয় এত অন্ধকার হয় না। এই বিজন, দুর্গম, বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যেও গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ আমাদের পরিত্যাগ করে নাই। কখন পাহাড়ের গা' ঘেঁসিয়া, কখন বা পাদদেশ দিয়া সমান্তরাল ভাবে, বা রেল লাইন অতিক্রম করিয়া এদিক ওদিক আঁকিয়া-বাঁকিয়া যাইয়া আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে এক একখানি ছোট গ্রাম,—যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী শৈল-ক্রোড় হইতে সযত্নে কাটিয়া বাহির করিয়াছে। ভাষায় সে দৃশ্য বর্ণনা করিয়া বুঝান অসম্ভব। পাহাড়-বেষ্টিত উপত্যকার মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ষ্টেশন। এই নির্জ্জন শৈলস্তূপরাশির মধ্যে কোথা হইতে যে যাত্রী আসিয়া এই সব ষ্টেশনে সমবেত হয়, বুঝিতেই পারিলাম না।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। দূরে দূরে শৈল-ক্রোড়স্থিত দুই একখানি পল্লী-কুটীর হইতে কোন পাঞ্জাবী বধূর প্রজ্জলিত সান্ধ্যদীপশিখা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সে অস্পষ্ট আলোক হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যাইয়া প্রবেশ করিল, —প্রিয় জন্মভূমির মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া গেল। কোথায়

শস্য-শ্যামল বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্র ; আর কোথায় প্রস্তরময়, বন্ধুর, নীরস, উত্তুঙ্গ শৈলস্তূপরাশি! ইহারই মধ্য দিয়া, আগত-প্রায় অন্ধকার রাত্রি সম্মুখে করিয়া যেন নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত কোন্ অজ্ঞাত দেশে ছুটিয়া চলিয়াছি! এ যাত্রার পরিসমাপ্তি কোথায়—কতদুর?

তৃতীয় রাত্রি

মান্দ্রা নামক পার্ব্বত্য জংশন ষ্টেশনটিতে যখন পৌছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আর কয়েকটি ষ্টেশন পরে রাওলপিণ্ডি। মান্দ্রার পর হইতে গাড়ী পাহাড়রাশি ছাড়াইয়া সমতল উপত্যকার বক্ষ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার,—দুই চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। তথাপি জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলাম। কেবল দূরে দূরে গর্ব্বোন্নতশীর্ষ শৈলস্তূপরাশি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আছে, অনুমানে বুঝিয়া লইতে লাগিলাম। রাওলপিণ্ডি যখন পৌছিলাম, তখন রাত্রি ৮টা। রাওলপিণ্ডিতে গাড়ী দুই ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিবে। গাড়ীর মধ্যে প্রাণ ছটফট্ করিতেছিল। গাড়ী থামিতেই নামিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি যাইয়া পাথর-কুচি-আচ্ছাদিত প্লাট্‌ফর্মের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম,—বড় আরাম লাগিল। একটু পরেই আহার্য্যের অন্বেষণে উঠিয়া পড়িলাম! কিন্তু ক্রমাগত দুই দিন ডালপুরী খাইয়া ভেতো বাঙ্গালী মুখটা যেন ভাত-ভাত করিতেছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, চা' প্লেটের এক প্লেট করিয়া ভাত ।/০ আনায় পাওয়া যায়। ঐরূপ পাঁচখানা প্লেটের ভাতেও বোধ হয় একজনের উদরের এক কোণাও ভরিবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া আবার সেই ডালপুরীর শরণাপন্নই হইতে হইল।

রাত্রি ১০॥টায় রাওলপিণ্ডি ত্যাগ করিয়া আবার সেই পাহাড়বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। পিণ্ডির পরের ষ্টেশন গোলরা। গোলরা এই অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ পার্ব্বত্য ষ্টেশন। সমুদ্র-বক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা ২০০০ ফিট। কাজেই এই গোলরা পর্য্যন্ত চড়াই, অর্থাৎ ক্রমশঃ উচ্চ ভূমি ; তৎপর হইতেই উৎরাই,—ক্রমশঃ নিম্ন ভূমি। রাওলপিণ্ডি হইতে গোলরা মাত্র নয় মাইল। অথচ চড়াই ঠেলিয়া এই পথ অতিক্রম করিতে কলিকাতা মেলেরও প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। আর একটা ষ্টেশন পরেই ট্যাকশিলা (তক্ষশিলা)।

গোলরার পর হইতে গাড়ী অধিকতর দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। যথা সময়ে পরবর্ত্তী ষ্টেশন সাংজানি ছাড়াইলাম। আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই ট্যাক্‌শিলা পৌছিব। গাড়ী কখন উপত্যকার উপর দিয়া, কখন উপত্যকা-মধ্যস্থিত গভীর খাতের ভিতর দিয়া অপেক্ষাকৃত প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, গাড়ী পাহাড়-নিম্নস্থ একটা সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিতেছে। মিনিট খানেক লাগিল ; কাজেই সুড়ঙ্গটি নেহাৎ ছোট নহে, মনে হইল। সুড়ঙ্গ পার হইয়া মিনিট দশেকের মধ্যেই তক্ষশিলায় আসিয়া পৌছিলাম,—অকূলপাথারে কূল পাইলাম। রাত্রি তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে।

ট্যাক্‌শিলা ষ্টেশনে গাড়ী ১০ মিনিট থামে। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। মিউজিয়মের অফিস হইতে আগেই লোক আসিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। কাজেই জিনিষপত্র, লটবহর লইয়া আমাদের আর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। ষ্টেশন হইতে অফিস অর্দ্ধ মাইলেরও কম। সুতরাং সে রাত্রির মত আর পল্লী মধ্যস্থ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে না যাইয়া অফিস-সংলগ্ন গৃহেই রাত্রি যাপন করিব,—এই ইচ্ছায় জিনিষ পত্র ও কুলি এবং অন্যান্য লোকজনসহ আমরা ষ্টেশন ছাড়িয়া সেই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে দীপালোকে পথ দেখিয়া দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আজ তিন দিন ক্রমাগত গাড়িতে চড়িয়া প্রায় দেড় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করার পর পদব্রজে এই পথটুকু ভ্রমণ বড়ই আরামপ্রদ লাগিল। কিন্তু শরীর তখনও ঝিম্‌-ঝিম্ করিতেছে,—মনে হইল যেন গাড়িতেই চলিতেছি। মিনিট পনেরর মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া তাড়াতাড়ি বিনা বাক্যব্যয়ে শুইয়া পড়িলাম। সেই পশ্চিমদেশীয় কঠিন, ইতস্ততঃ গ্রন্থিবিশিষ্ট, অনাচ্ছাদিত খাটিয়া ('মঞ্জি') আজ কুসুম শয্যাপেক্ষাও কোমল বলিয়া বোধ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি, আমরা চতুর্দ্দিকে পাহাড়-পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত এক অতি মনোহর উপত্যকায় আসিয়া পড়িয়াছি।

(ক্রমশঃ)

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

"বউ মা—"

"যাই বাবা—"

বধূ বাসনগুলা রন্ধনগৃহে গুছাইয়া রাখিতেছিল, তখনও সিক্ত বসনখানা ছাড়িতে পারে নাই। শ্বশুরের আহ্বান কাণে আসিবামাত্র সে বাসনগুলি তেমনি অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া বাহির হইল।

শ্বশুর উপেন্দ্রনাথ বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের আসনে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। পুত্রবধূ তখনও সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করে নাই দেখিয়া তিনি রুদ্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন— "এখনও কাপড় ছাড় নি মা? এমনি করে শেষটায় একটা গুরুতর অসুখ না বাধিয়ে দেখছি ছাড়বে না। নিজে তো ভুগবেই, আমাকেও ভুগিয়ে মারবে।"

বধূ লজ্জিতা ও কুণ্ঠিতা হইয়া উঠিল; মুখখানা নত করিয়া ধীর সুরে বলিল, "এই যে বাবা, এখনি গিয়ে ছাড়ছি, আপনি ডাকছেন শুনে তাড়াতাড়ি করে—"

বাধা দিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না মা, আমার দরকারটা এমন বিশেষ কিছু জরুরী নয় যে, তোমায় ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়েই তা শুনতে হবে। আমি ভেবেছিলুম, তোমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাই কয়েকটা কথা বলব বলে ডেকেছিলুম। যাও, তুমি আগে ভিজে কাপড়-খানা ছেড়ে এসো, তার পরে কথা হবে এখন।"

ধীরপদে দেবী চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে সিক্তবস্ত্র ছাড়িয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া শ্বশুরের কাছে ফিরিয়া আসিল।

আজ প্রথম এই বুঝি শ্বশুরের দৃষ্টি বধূর বহুতালি-যুক্ত বস্ত্রখানার উপর পড়িল। তাই তিনি বিস্ময়ে সেই দিক পানেই চাহিয়া রহিলেন,—হাতের হুঁকা হাতেই রহিয়া গেল।

তাঁহার সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া দেবী আরও বেশী রকম কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল; দুই একটা তালি লুকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে সে বলিল, "না বাবা, ভাল কাপড়ও আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়া কি না,—এইটেই হাতের কাছে পেলুম, তাই পরলুম।"

অতিধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উপেন্দ্রনাথের বক্ষ চিরিয়া বাহির হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, "তাই হোক মা, তোমার কথাই সত্য হোক, ভগবান যেন সেই আশীর্ব্বাদই করেন।"

কথাটার মধ্যে কি ছিল তাহা দেবী বেশ বুঝিতেছিল। যত লজ্জার বোঝা তাহার মাথায় আসিয়া চাপিল। জানিয়া শুনিয়া সে এত বড় একটা জীবন্ত মিথ্যাকে অনায়াসে সত্য বলিয়া চালাইয়া দিল। আর তাহার অমন জ্ঞানী শ্বশুরও সে কথা মিথ্যা জানিয়াও সত্য বলিয়া অতি সহজেই মানিয়া লইলেন। কিন্তু জোর করিয়া মিথ্যাকে সত্য বলায় যে একটা বেদনা অনুভব করা যায়, সেটা তাঁহার কণ্ঠস্বরে ঝরিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কেন ডেকেছিলেন বাবা?"

সেই মনের কোণে হঠাৎ-লুকাইয়া-পড়া কথাটীকে স্মরণ করিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, সে একটা কথা আছে মা। এখন এখানে একটু বসতে পারবে কি,—এতটুকু ছুটি তোমার হবে কি?"

বধূ উত্তর দিল, "পারব বাবা, এখন আমার তেমন বিশেষ কাজ কিছু হাতে নেই।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে একটু বসো। এই পত্র-খানা আজ এসেছে, পড় দেখি।"

পত্রের পানে তাকাইয়াই বধূর মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

উপেন্দ্রনাথ বধূর সে ভাব লক্ষ্য করিলেন,—শান্ত সুরে বলিলেন, "নাও মা, পত্রখানা বেশ করে একবার পড়। তারপর আমার যা কথা তা আমি পরে বলব এখন।"

দেবী কম্পিতহস্তে পত্রখানা তুলিয়া লইল।

উপেন্দ্রনাথ বেদনাভরা হাসি হাসিয়া ব্যথাভরা সুরে বলিলেন, "আর কেন মা চেষ্টা কল্যাণী, ছেঁড়া তার আর

কি জোড়া লাগে? যে তার একবার কেটে গেছে, তাকে হাজার জোড়া দাও সে আবার কেটে যাবেই। তুমি মা মঙ্গলময়ী—সংসারের মঙ্গলই তোমার ইচ্ছা। তোমার এই মঙ্গলেচ্ছা তোমায় যে একেবারে অপমানের নিম্নস্তরে ফেলে দিচ্ছে, সেটা কি বুঝতে পারছ না মা, সেটা কি দেখতে পাচ্ছ না? কাকে তুমি আপন করতে যাচ্ছো মা? যে সব বুঝেও অবুঝের ভাণেছলে গেল, তাকে? আমি তোমাকে যে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে বউ মা?"

দেবী পত্রখানা ভাঁজ করিয়া তাঁহার চরণোপান্তে রাখিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কেন বাবা, বুঝে উঠতে পারছেন না কেন?"

উপেন্দ্রনাথ হতাশ দৃষ্টিতে শুধু পুত্রবধূর অনিন্দ্যসুন্দর সরল পুণ্য-মণ্ডিত মুখখানির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দেবীর কণ্ঠে অনেকখানি জড়তা আসিয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আমার অপরাধ হয়েছিল বাবা, আপনার আদেশ না শুনে আমি দিদিকে পত্র দিয়েছিলুম; কিন্তু এ অপরাধ কি এতই গুরুতর হয়েছে বাবা, যে মার্জ্জনা করতে পারবেন না? আপনার মুখ দিনরাত বিষণ্ণ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝি কত দুঃখ করে—এই সব দেখে আমার মনে হল, আমিই আপনাদের মিলনের সেতু হই না কেন। তাঁরা আপনার কাছে আসুন, আপনার ছেলের সঙ্গে আবার আপনার মিলন হোক। বড়দি এসে বসুন, আমি তাঁর সেবার ভার আমার হাতে নেব, ছেলেপুলে দেখব, এই আনন্দ কল্পনা করে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলুম। এ আমি আমার ক্ষুদ্র মেয়েবুদ্ধিতেই করেছিলুম বাবা, আমি জানতে পারি নি যে এতে—"

বাধা দিয়া ধীর সুরে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না মা, এ তোমার অসৎবুদ্ধি-প্রণোদিত নয়, সৎবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়েই তুমি এ কাজ করেছ,—এর ফল যে কি হবে অতদূর তুমি বুঝিতে পার নি। কিন্তু জানো কি মা, শ্রীবৎস রাজার ঘরে যখন শনির কোপদৃষ্টি পতিত হয়েছিল, তখন চিন্তারাণীর হাত হতে পোড়া শোলমাছটাও পালিয়েছিল। আমার এখন শনির দশা, সোণা ধরব—হয়ে যাবে ছাই; শক্ত করে বাঁধন দিতে গেলে উল্টে সেই বাঁধন নিজের গলায় আসে। আমার নামে এখন যা করতে যাবে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

দেবী বলিল, "কিন্তু বাবা, রাজা শ্রীবৎসও তো আবার সুসময় পেয়েছিলেন, যা তাঁর হারিয়েছিল সবই আবার পথ চলার সময় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, আপনি কেন আপনার সেই হারান দিনটীকে কুড়িয়ে পাবেন না? মানুষের চিরদিন যে সমান যায় না এ কথা আপনিই তো বরাবর বলে আসছেন বাবা। আপনারই কি এমনি দিন যাবে? আশা রাখুন, হঠাৎ কোন দিন সেই শুভক্ষণটী এসে পড়তে পারে—যেদিন আপনার বড় ছেলে স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে আপনার এই পর্ণ-কুটীরেই ফিরে আসবেন— আপনার এই শূন্য গৃহ পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

উপেন্দ্রনাথ গম্ভীর হাসিলেন—"বালিকার অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র। জানো মা, যদি তারা আসতেও চায়—"

তিনি থামিয়া গেলেন, মুখ ফিরাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবী উৎসুক হইয়া বলিল,—"তবে কি বাবা?"

উপেন্দ্রনাথ তেমনি হাসিয়া বলিলেন, "আর কি এ ঘরে তাদের জায়গা দিতে পারব মা?"

ব্যগ্রকণ্ঠে দেবী বলিল, "কেন তাদের জায়গা দিতে পারবেন না বাবা?"

সে কথার উত্তর না দিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তারা এখানে আসতে চাইবেও না মা। কলিকাতার সেই বাড়ী-ঘর, জাঁক-জমক ফেলে তারা আসবে এই পল্লীগ্রামে, এই কুঁড়ে ঘরে? এ যে ঘুমিয়ে স্বপ দেখা বউ মা, এ কখনও কি সম্ভব হতে পারে?"

তর্ক করা দেবীর স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষ যদি ননদিনী হইত, সে দু'কথা বলিলেও বলিতে পারিত; কিন্তু এ যে পূজনীয় শ্বশুরের কথা। সে উত্তর না দিয়া তাঁহার কথাই মানিয়া লইল। মনের মধ্যে জাগিতেছিল—জগতে অসম্ভবই বা কি। যাহা একেবারে অচিন্তনীয়, তাহাও যখন ঘটিয়া যায়, তখন তাহাদের দেশে ফিরিয়া আসা তো অসম্ভব নয়।

একটুখানি নীরব থাকিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এদিকে সংসারের অনাটন নিত্য বেড়ে চলেছে,—সত্যকে পড়াতেও তো আর পেরে উঠছি নে। খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে,—কি যে করি, তা কিছু ঠিক করতে পারছি নে।"

স্বামীর প্রসঙ্গে দেবীর মুখ একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। সে মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া অনাবশ্যক অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া হাতের শাঁখার ময়লা পরিষ্কারে ব্যাপৃতা হইল।

চিন্তিতমুখে উপেন্দ্রনাথ কেশশূন্য মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "এই যে তার মাস গেলে বারটা করে টাকা—এ আমি দিই কোথা হতে? যদিও সে একটা টিউশানি যোগাড় করে কিছু উপায় করছে—তাতে তো কলকাতায় মেসে থেকে পড়া চলে না। এই—মাস গেলে বারটাকার ভাবনা আমার আগে, মাসের প্রথম দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি সামনে অন্ধকার—টাকা কোথায় পাব? এই টাকার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার দেহ গেল। তাই ভাবছি, ওকে আর পড়াব না। আর পড়িয়েই বা লাভ কি, কি বল মা?"

দেবীর গৌরবর্ণ মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল। অথচ উত্তর না দিলেই নয়। যতক্ষণ না উত্তর দেওয়া যাইবে, উপেন্দ্রনাথ এমনি জিজ্ঞাসুভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিবেন। তাই সে থামিয়া কাসিয়া উত্তর দিল, "তা বই কি।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপনে ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বি-এ পাশ করেছে, এম-এ না হয় নাই পড়লে। একটা বছর পড়েছে,—ধরলুম, সে টাকাটা আমার জলে ফেলাই হয়েছে। আর একটা বছর বাকি আছে একজামিন দেবার। এই একটা বছর মাত্র মাসে বার টাকা করে দেওয়ার অভাবে তার পড়াটা মাটী হয়ে গেল।"

পুত্রের বিষণ্ণ মুখখানার কথা কল্পনা করিয়া পিতার স্নেহকোমল বুকটা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তখনই তিনি সে করুণ ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "তা হোক, আমার মত গরীব পিতার সন্তান যখন সে—জীবনে এমন অনেক ক্ষতিই তাকে সইতে হয়েছে, আরও সইতে হবে। তার বাপ যখন অপারগ, তখন তার না পড়াই ভাল। সামনে পূজো আসছে, এই ছুটিতে সে বাড়ী এলে তাকে আমি এই কথাটা বুঝিয়ে বলে দেব। সে আমার বাধ্য ছেলে, আমার কথা রাখতে সে তার জীবনে খুব বড় ক্ষতিও সহ্য করতে পারবে বলেই জানি,—সে জিতেন নয়।"

কথায় কথায় সেই সংসার ও সমাজত্যাগী ছেলের কথাই মনে পড়ে। যতই তাহাকে দূরে রাখিতে চান, সে ততই সকলের মাঝে স্ফুট হইয়া উঠে।

যে কাছে থাকে তাহার জন্য মন তত অধীর ব্যগ্র হইয়া উঠে না—যতটা যে একেবারে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যায়, তাহার জন্য মন তত বেশী অনুভব করে। কাছে যে থাকে সে সহজলভ্য, না ডাকিতেই সাড়া দেয়, কাছে আসে। কিন্তু দূরে যে চলিয়া যায়, সে সাড়া দিবে না, কাছে আসিবে না, তাই মনও অবিশ্রান্ত তাহাকেই পাইতে চায়।

দেবী উঠিবার কোন একটা ওজোর খুঁজিতেছিল। উপেন্দ্রনাথ তাহার সে অকারণ ব্যস্ততার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিলেন, "পূজোর পর হ'তে সত্য একটা কোনও কাজের ঠিক করে নিক, নইলে আমার দ্বারা আর সংসার চালানো সম্ভবপর নয়। চোখে ভাল দেখতে পাই নে,—লোকের বাড়ী পূজো করা যা অভ্যেস হয়ে গেছে, তা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আর করতে পারি নে। আর এ কাজও যে বেশী দিন করতে পারব তা বোধ হয় না, দেহ ক্রমেই অপটু হয়ে পড়ছে। বয়েস যাচ্ছে বই ঘুরে তো আসছে না মা! আর কি এখন খাটতে পারা যায়? তোমার অদৃষ্টও এ সংসারে এসে মন্দ ফলই দিলে মা, কোথায় তোমায় আনলুম—"

নিজের প্রসঙ্গে দেবী সজাগ হইয়া উঠিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলবেন না বাবা; আপনি আমার অদৃষ্ট মন্দ বলছেন, আমার অদৃষ্ট যেমন এমন আপনি আর কারও দেখান দেখি। আপনার মত শ্বশুর যার, ঠাকুরঝির মত ননদ যার, তার অদৃষ্ট মন্দ এ কথা বলা সাজে না।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়াছিল—আর তাহার স্বামীর মত স্বামী যার, কিন্তু ছিঃ, সে কথা কি বলা যায়?

শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি পুত্রবধূর মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া উপেন্দ্রনাথ একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, "যাও মা, তোমার অনেক কাজ আছে এখনও, আর তোমায় দেরী করাব না, অনেকক্ষণ তোমায় বসিয়ে রেখেছি, এতক্ষণে হয় ত তোমার সব কাজ হয়ে যেত।"

দেবী উঠিতে উঠিতে বলিল, "কাজ করতে আর এমন বেশীক্ষণ কি লাগে বাবা। ভারি তো কাজ, কখন শেষ হয়ে যায়, সারাদিনটা কেমন করে কাটবে ঠিক পাই নে।"

সে রন্ধনগৃহের দিকে চলিয়া গেল।

(২)

বহুকাল পূর্ব্বে উপেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য করিয়া গৃহলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। তখন জ্যেষ্ঠপুত্র জিতেন্দ্রনাথ সপ্তদশ-

বর্ষীয়, সত্যেন্দ্র পঞ্চম বর্ষীয় ও কন্যা ভবানী এক বর্ষ বয়স্কা মাত্র!

তখনও এই পরিবারের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি, বাগান, পুষ্করিণী, বাড়ীতে ধানের গোলা, ঢেঁকিশালা, গোয়ালভরা গরু সবই ছিল। ইহা ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে উপেন্দ্রনাথ পুরোহিত ছিলেন; ইহাতেও তাঁহার লাভ হইত বড় কম নয়।

সুতরাং পত্নীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের অনেক বিবাহ সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইলেন না। কন্যাদায়গ্রস্তেরা যেমন আশান্বিতভাবে আসিয়াছিল, তেমনি নৈরাশ্য লইয়া তাহাদের ফিরিতে হইল। উপেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞা অচল অটল রহিল, তিনি কিছুতেই তাঁহার মৃতা পত্নীর ত্যক্ত আসনে কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না।

জিতেন্দ্রনাথ যে সময়ে আই-এ পড়িতে গেলেন, সেই সময়ে ঢাকা জিলার একটী জমিদারের একমাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এ বিবাহে সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলেন।

জমীদার মহাশয় সপরিবারে কলিকাতাতেই বাস করিতেন, দেশের সহিত সম্পর্ক তাঁহার খুবই কম ছিল। বিশেষ সুবিধা হইল—জিতেন্দ্রনাথ সেখানে থাকিয়া কলেজে যাতায়াত করিতে পারিতেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় জামাতার সকল ভার লইয়াছিলেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যও তিনি দায়ী ছিলেন।

জিতেন্দ্রের স্ত্রী মায়া যখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, সেই সময় উপেন্দ্রনাথ তাহাকে একবার নিজের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। সঙ্গে দুইজন পরিচারিকা আসিয়াছিল। ইহাদের বনিয়াদী ধনী চালে উপেন্দ্রনাথ শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভবানী তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, বাড়ীতে অন্য মেয়ে আর কেহই ছিল না। তিনি নিজেই সমস্ত কাজ সত্য ও ভবানীর সাহায্যে কোনরূপে সারিয়া লইতেন। মায়া রন্ধন করা দূরে থাক, সামান্য কোন কাজও জানিত না। যদিও সে শিশু ননদ বা বালক দেবরের কাজ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কোন কাজে হাত দিতে যাইত, দাসী দুইটী হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িত। বাধ্য হইয়া উপেন্দ্রনাথকে নিজে রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করাইতে হইত। যে আরামটুকু পাইবার জন্য তিনি পুত্রবধূকে লইয়া আসিয়াছিলেন, সে আরাম পাওয়া দূরে থাক, এ যেন আরও অশান্তিকর হইয়া উঠিল। এত করিয়াও তিনি তবু কম কথা, কম নিন্দা শুনেন নাই।

মায়া এখানে এক সপ্তাহের বেশী থাকিতে পারে নাই। এখানকার জল বাতাস তাহার মোটে সহ্য হইত না, দিনরাত গায়ে জামা আঁটিয়া, পায়ে জুতা ষ্টকিং দিয়াও সে সর্দ্দির হাত এড়াইতে পারে নাই। এক সপ্তাহের মধ্যে একটা দিনও তাহার মাথাধরা ছাড়ে নাই; কাজেই জিতেন্দ্রনাথ পিতাকে বলিয়া স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর মায়া বয়স্থা হইলে উপেন্দ্রনাথ আরও একবার তাহাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়ার পিতা সুবিনয় বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি জানেন বেহাই, মায়ার মত মেয়ে আপনাদের ওই নোংরা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মোটে টি'কতে পারবে না। কেবল ওরই জন্যে আমি আমার জন্মভূমির মায়া পর্য্যন্ত ছেড়েছি। একবার নিয়ে গিয়ে দেখেছেন তো, তার শরীর ভারি খারাপ হয়ে যায়। আর যে কাজকর্ম্মের জন্যে নিয়ে যাবেন, তাও জানে না সে,—কিছু করতে পারে না। ঝাঁটা কি করে ধরতে হয়, উনান কি করে ধরাতে হয়, এ শিক্ষা যার নেই, সে আপনাকে রেঁধে ভাত খাওয়াবে, এ মনেও ঠাঁই দেবেন না। পাড়াগাঁয়ে গেলে তার চেহারা যেন আধখানা হয়ে যায়। সে ধাক্কা সামলাতে তার ছয়মাস সময় লাগে। তাই আমি ভাবছি, তার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। ভগবান করুন, জিতেন মানুষ হোক, এখানে কাজকর্ম্ম করুক, আপনারাও এখানে থাকবেন, মায়াও গিয়ে আপনাদের কাছে থাকবে। আরও একটা কথা, সে এখন পড়ছে, এবার ম্যাট্রিক দেবে, এই সামনে তার একজামিন। এখন কোথাও একটা দিনের জন্যে গেলে, ওর একটা বছর একেবারে মাটি হবে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস অতি কষ্টে রোধ করিয়া ছেলের পিতা ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবেন না। সত্যর বিবাহ তিনি গরীবের ঘরেই দিবেন, যে মেয়ে সর্ব্বাংশে তাঁহার ঘরের উপযুক্ত হইতে পারিবে।

জিতেনের পড়ার খরচ যোগাইতে ইতিপূর্ব্বে জমীজমা সবই গিয়াছিল। পুত্রের বিবাহে তিনি একটী পয়সা পণ লন নাই; সুতরাং বন্ধকী জমীগুলা একেবারেই হাতছাড়া

হইয়া গেল। আশা ছিল, ছেলেটী মানুষ হইবে, দুই পয়সা ঘরে আনিবে, তাঁহার সংসারে অনাটন-ক্লেশ কথনই হইবে না। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিলেন না,—পিতা যখন বাড়ী আসিবার জন্ম পত্র দিতেন, তখন একটা না একটা ওজর করিতেন।

এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল—জিতেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। সুবিনয়বাবু কন্যা-জামাতাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্ম এক বন্ধুর সহিত বিলাত পাঠাইয়া দিয়া, তাহার পর বেহাইকে একখানা পত্র দিয়াছেন, ও এই কার্য্যের জন্ম বারবার ক্ষমা চাহিয়াছেন।

এই পত্রখানা উপেন্দ্রনাথের বক্ষে বজ্রের সমান বাজিল। তিনি বদ্ধদৃষ্টিতে শুধু সেই কালসম পত্রখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন,—এ কথা যে সত্য, ইহা যেন তাঁহার বিশ্বাসও হইতেছিল না।

ইহার বৎসরখানেক আগে জিতেন্দ্রনাথের একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। উদাসীন উপেন্দ্রনাথ পৌত্রী মুখ দর্শন করিতে যান নাই, অথবা তাহাদের কোন সংবাদাদিও নেন নাই। যখন শুনিলেন, পুত্র-পুত্রবধূ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্ম ইউরোপে চলিয়া গিয়াছে, তখন সে মেয়েটী কোথায় আছে জানিবার জন্ম তাঁহার মনে কৌতুহল জাগিয়া উঠিল।

গোপনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন সে তাহার দাদামণি ও দিদিমার কাছে রহিয়াছে। এই সময় পৌত্রীটিকে একবার দেখিবার বাসনা তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল; অনেক ভাবিয়া তিনি মনের ইচ্ছা মনেই রাখিলেন।

ভবানীকে অষ্টম বৎসরে তিনি গৌরীদান করিয়াছিলেন। ভগবানের একটা নিয়মে যাহার এক দিক ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার একে একে সকল দিকই ধ্বসিয়া পড়ে। উপেন্দ্রনাথেরও হইয়াছিল তাই। ভবানীর এ বিবাহে সুধা উঠে নাই, উঠিয়াছিল গরল। ভবানীর স্বামী সংস্কৃত টোলে পড়িয়াছিল, ইংরাজিও জানিত। চেহারাটা তাহার সুন্দর ছিল, সংসারে মা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। অবস্থা তাহাদের বেশ উন্নতই ছিল। গৃহস্থ ঘরে সচরাচর এইরূপ দেখিয়াই লোকে কন্যাদান করে। সব রকমেই ছেলেটী বাহির হইতে দেখিতে ভাল ছিল। তথাপি উপেন্দ্রনাথ সুখী হইতে পারিলেন না; কারণ, জামাতার যে চরিত্র-দোষ ছিল, তাহা তিনি বিবাহের পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। জামাতার চরিত্র অল্প বয়সেই দূষিত হইয়া গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুশ্চরিত্রতা আরও বাড়িতেছিল বই কমে নাই। শাশুড়ী বালিকা বধূকে নির্য্যাতন করিতেন বড় কম নয়। তাহার অপরাধ—সে তাহার দুশ্চরিত্র স্বামীকে সৎপথে ফিরাইতে পারে নাই। এই অপরাধে ভবানী শাশুড়ী কর্ত্তৃক বিতাড়িতা হইয়া দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল।

এই মেয়েটীর মুখের পানে তাকাইয়া স্নেহময় পিতা উপেন্দ্রনাথ অনেক সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তিনি তাহাকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার শাশুড়ী কিছুতেই এই দুর্বিনীতা অপয়া বধূকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। ইহার মূলে একটী সত্য গোপন ছিল। তিনি আরও কিছু অর্থ পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; কিন্তু উপেন্দ্রনাথের আর অর্থ দিবার সামর্থ্য ছিল না। এই কন্যাটীর বিবাহ উপলক্ষে তাঁহাকে বাগান পুষ্করিণী সবই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল,—বাস্তভিটাখানা ছাড়া আর তাঁহার কিছুই ছিল না।

কেবলমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রটীকে লইয়াই তিনি সুখে ছিলেন। সত্য যথার্থই এ পর্য্যন্ত পিতার খুব বাধ্য হইয়া চলিতেছিল,—কখনও পিতার অমতে সে কোন কাজ করে নাই। পাছে তাহার কোনও ব্যবহারে পিতার বুকে আঘাত লাগে, এই ভয়ে সে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত।

কিছুকাল আগে তাহার কলেজের প্রফেসর শান্তিময় বাবু নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে চাহিয়াছিলেন,—সত্য পিতার মত না পাইলে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিবে না জানাইয়াছিল। তাহার অমতের কারণ জানিতে পারিয়া শান্তিময় বাবু উপেন্দ্রনাথের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ মলিন হাসিয়া শুধু মাথা নাড়িলেন, এ বিবাহ হইতে পারে না।

এ বিবাহে সত্য অনেকটা সাহায্য পাইত, এবং যথার্থ কথা বলিতে কি, সে শান্তিময় বাবুর কন্যা নলিনীর প্রতি কতকটা আকৃষ্টও হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পিতার অমত জানিতে পারিয়া—যখন শান্তিময়বাবু আসিয়া তাহাকে বিবাহের কথা বলিলেন, তখন সে স্পষ্টই অস্বীকার করিল।

শান্তিময়বাবু বলিলেন, "এ রকম ঘটনা প্রায়ই হচ্ছে যে,

ছেলে বাপকে না জানিয়েই বিয়ে করে,—বাপও কিছুকাল পরে ছেলেকে ক্ষমা করেন। তুমি বিয়েটা করে ফেল,—তোমার বাপ্ এখন একটু মনোকষ্ট পেলেও, পরে তোমায় তাঁকে ক্ষমা করতেই হবে।"

কিন্তু তথাপি সত্য রাজি হইতে পারিল না। সে বেশ জানিত, তাহার স্থিরবুদ্ধি, জ্ঞানবান পিতা মুখে কিছুই বলিবেন না, কিন্তু অন্তরটা তাঁহার এ আঘাতে একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। পিতার অন্তরে যাহাতে ব্যথা লাগে, তাহা করিতে সে মোটেই সম্মত ছিল না। তাই সে স্পষ্টতঃই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল।

ইহার কিছুদিন পরেই তাহার দেবীর সহিত বিবাহ হইল।

দেবী উপেন্দ্রনাথের জনৈক বাল্যবন্ধুর কন্যা। তাঁহার অবস্থাও অনেকটা উপেন্দ্রনাথের সমান ছিল; তাই বিনা আপত্তিতে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

দেবী নামে শুধু দেবী নয়, কার্য্যেও সে দেবীই ছিল। সে যদিও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ছিল, গৌরাঙ্গিনী ছিল না, তথাপি তাহার মধ্যে অসীম সৌন্দর্য্য ছিল। তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য মুখে ফুটিয়া উঠিত; তাই তাহার মুখ এত সুন্দর।

সে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়াই সকলকে তাহার আপনার করিয়া লইয়াছিল। শ্বশুর, স্বামী, ননদিনী সকলেই তাহার গুণে বশ হইয়া পড়িয়াছিল। পাড়ার লোকে শতমুখে এই বউটার সুখ্যাতি করিত।

কর্ম্মে আলস্য তাহার এতটুকু ছিল না। যদিও সে পিত্রালয় হইতে গা-সাজানো গহনা পাইয়াছিল, তথাপি এক দিনের জন্য তাহা তাহার গাত্রে উঠে নাই। শুধু দুইগাছি লাল শাঁখা তাহার প্রকোষ্ঠ দুটি শোভিত করিতেছে। সত্য এক দিন স্ত্রীকে অলঙ্কার পরিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। দেবী অন্যের কাছে যেমন এ কথা হাসিয়া চাপা দিয়া যাইত, সত্যের নিকট তাহা পারে নাই। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, "এখন আমায় গহনা পরতে অনুরোধ করো না। যখন সে দিন আসবে তখন আমি গহনা পরব।"

এই একটা কথাতেই সত্য নীরব হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, "তাই ভাল দেবী, গহনা পরার সময় আগে আসুক, তার পর তুমি গহনা পরো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, সে দিন যেন শীঘ্র আসে,—আমি যেন খুব ভাল হয়েই এম-এ পাসটা করতে পারি।"

তাহার একান্ত লক্ষ্য ছিল এম-এ পাসের দিকে। সে তাই প্রাণপণ যত্নে লেখাপড়া করিতেছিল। (ক্রমশঃ)

প্রবাসী

শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী

ভাই প্রদোষ,

বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে যখন বাংলা মায়ের শান্তিপ্রিয় নন্দদুলাল ছেলের নাম ঘুচিয়ে যোদ্ধৃবেশে বেরিয়ে পড়লুম, তুমি বোধ হয় তখন মোটেই আশ্চর্য্য হও নি। আশ্চর্য্য হ'বার কিন্তু কোন কথাই নেই, কারণ, আমার অন্তরের সব গোপনতম চোরাগলির খোঁজ তুমি জান। আমার এ তিরিশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কেমন ক'রে আমায় চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, তা' তো তুমি বেশ জানো। মনে পড়ে, গ্রামের ইস্কুলের পণ্ডিতমশাইএর ক্লাশ পালিয়ে, ঘোষালদের চণ্ডীমণ্ডপের পেছনের আমগাছটার উপর উঠে, সারাদিন বসে থাকা, নষ্টচন্দ্রের দিন যদুখুড়োর বাড়ীর আকগাছ কাটতে গিয়ে ধরা পড়া, আর মনে পড়ে, নন্দখুড়োর মেয়ে চন্দনার কাছ থেকে নুন চেয়ে নিয়ে কাঁচা পেয়ারা চিবান। সে অতি বাল্যের স্বপ্নময় সুখ-স্মৃতির কথা মনে করে এখনো এ মরু-প্রান্তরের পর্ণকুটীরে বাঙ্গালার শ্যামলসুষমাবর্দ্ধিত সন্তান চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। কোথায় আমার সেই ক্ষুদ্র পল্লীভবন, এখনো যখন ধূলিকিপ্ত বেলাশেষ-ছায়ায় রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—মনে পড়ে আমার বাংলার

তুলসীতলার সে ক্ষুদ্র প্রদীপ, সে সায়াহ্নের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, সে শান্ত-শীতল গৃহাঙ্গনে ঠাকুরমার বেঙ্গমাবেঙ্গমীর গল্প। বাংলার মাঠের সে শ্যামলিমা, রসদাত্রী বাংলা মায়ের সে অফুরন্ত শস্যসম্ভার, ঝাউগাছের আড়ালে কোকিলের সে অন্তরস্পর্শী গীতরস, দীঘির বুকে বুকে পদ্মপাপড়ীর আকুলীব্যাকুলী খেলা, মাঠে মাঠে শান্ত-সন্ধ্যার সে মেদুর বায়ুপ্রবাহ—সব আমার কাছে স্বপন-মায়ার মতো! কিন্তু সে কি শুধু স্বপ্ন? আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই তো সে শ্যামল সুষমার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি।

সেদিন সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। ইস্কুলের পণ্ডিত মশাইকে বই ছুঁড়ে মেরেছিলাম বলে কাকার কাছে যথেষ্ট মার খেলাম। হাত-পাগুলো যেন ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। বৈঠকখানার ঘরে এক কোণে বসে বসে ভাবছিলাম—কেমন করে পণ্ডিতের টিকিটা একেবারে সমূলে তুলে নিয়ে আসা যায়। আঠার বছরের ষণ্ডা ছেলে আজ এমনি করে মার খেয়ে নিজের অপমানের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরছিলুম। মনে হচ্ছিল—যেন সবগুলো শিরার ভিতর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তধারা ছুটে বেরুতে চাচ্ছিল। দূর—কি হ'বে এ গাঁয়ে থেকে। বেরিয়ে পড়লুম,—দক্ষিণপাড়ার রাস্তাটা ধরে ইষ্টিসানের দিকে রওনা হলুম। রাতের আঁধারে চারদিক যেন ধ্যানীবুদ্ধের মতো মৌন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক এ মৌন নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিচ্ছিল। দুলে-পাড়ার পাশের রাস্তাটায় পড়তেই দেখলুম, কেরোসিনের ডিপেটা হাতে করে কে যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভাবলুম বুঝি চক্কোত্তি মশাই তাঁর দৈনিক আহার্য্যের খোঁজে বেরিয়েছেন। সাম্‌নে এগুতেই দেখলুম চন্দনা। আমার মাথার বিদ্রোহী রক্তচাপ যেন তালে তালে নেচে উঠ্‌ল, এ দশবছরের মেয়েটার কাছে আমার অপমানিত কৈশোর যেন ক্রুদ্ধ অপমানে গর্জ্জে উঠ্‌ল। মনে হচ্ছিল, নিজেকে নিজেই থেঁৎলে মাটীর ভিতর সেঁদিয়ে দিয়ে চন্দনার কাছে থেকে নিজেকে লুকুই।

"রবিদা, তুমি? এ রাত্রে চল্লে কোথায়?"

কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ কর্‌লাম। চন্দনা আবার ডেকে বল্লে, "ও রবিদা, শুন্‌চ, এ রাত্তিরে বুঝি মামীমাকে ভাঁড়িয়ে তাস পিটাতে চল্লে?" বুঝ্‌লাম, আমার অপমানের কথা সে জানে না। বল্লুম, "কে চল্ল, এই যে তোর কাছেই যাচ্ছিলুম। সেই যে কাল তোর কাছে টাকাগুলো রেখেছিলাম দিতে পারিস্? বড্ড দরকার রে!"

অনেক কথার পর চন্দনাকে বুঝালাম যে ষ্টেশনে কলিকাতা-যাত্রী কারুর কাছে পাড়ার ছেলেদের জন্যে একটা ফুট্‌বল আন্‌তে দেওয়ার জন্য টাকা চাচ্ছি। বল্লুম, "ত্যাখ তুই ভাবিসনে, কালই আবার ব্যাঙ্কের টাকা ফিরিয়ে দোব।"

"বেশ তো তুমি, দিলুম আর কি না ঠাট্টা? তোমার জিনিস তুমি নেবে, আমার ভা—রী তো বয়ে গেছে!"

সেই দিন কলিকাতা চলে এলুম। ভোরের বাতাসে যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, বাইরে তাকিয়ে দেখি, কোথায় আমার দূর-প্রসারী শ্যামলমাঠ, কোথায় আমার চণ্ডীমণ্ডপ, কোথায় আমার বেতসকুঞ্জ। এ যে সব নূতন—ভয়ানক নূতন। সব কথা মনে পড়ল। পল্লীমায়ের ক্ষীর-সমুদ্রের সুধা-ধারায় আমার জন্ম, পল্লীমায়ের স্নেহ-সরস প্রেমধারায় আমি বর্দ্ধিত, কলিকাতার তীব্র উত্তেজনা আমায় পাগল করে দিলে। শেয়ালদায় নেমে পড়লুম, কই কাউকেই তো দেখ্‌তে পেলুম না। আমার ছোট্ট গ্রামটীতে তো ভোর বেলা উঠেই চাটুজ্জে মশাই, গোপালখুড়ো, দুলে-পাড়ার যাদব—সবাইর পরিচিত মুখ দেখ্‌তে পেতাম। সবাইর সাথে দু'চারটে কথা বল্‌তে বল্‌তে পুকুর-ঘাটে মুখ ধু'তে যেতাম। কই, এখানে তো সে স্নেহ-সরস কুশল-প্রশ্ন নেই। এ তো বড্ড নূতন। আমার কান্না এল,—যে রাগের মাথায় সব ভুলে বসেছিলুম, এখন সব মনে হ'তে লাগ্‌ল। ভয়ে শিউরে উঠ্‌লুম। কান্নায় চোখে জল ভরে এল। * * *

* * * তার পর দু'বছরে জীবনের কত পরিবর্ত্তন হ'ল, কেমন করে বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিলুম, সে কথা আমার নিজেরই মনে নেই—কেবল এক দিন শুন্‌লুম মেসো-পোটেমিয়ায় যেতে হ'বে।

* * *

* * * *

করাচী থেকে জাহাজটা ছাড়লে। হ্যাভার-স্যাক থেকে চুরুটটা বের করে ধরিয়ে ডেকে এসে দাঁড়ালুম। পাশে একটা সাহেব হাট্‌টা তুলে বল্লে, "হাউ স্পেল্‌নডিড্।" সত্যি, সন্ধ্যার এত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য কোন দিনই দেখি নি। বাংলার

সবুজ ঘাসের শিশির-ভেজা বুকের উপরে রূপার স্রোতের মতো জোছ্‌নার অপূর্ব্ব মাধুরী দেখেছি, কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের উকিঝুঁকি, আর সে জোছনার মাঝে ছোট্ট ছোট্ট কুটীরের আলো দেয়ালীর আলোকমালার মতো ফুটে উঠতে দেখেছি। কিন্তু সে যেন মায়ের হাসির মতো স্নিগ্ধ, তরুণীর দৃষ্টির মতো স্বচ্ছ, শিশুর হাসির মতো মধুর। সাগরের এ নিবিড় সৌন্দর্য্য আমার কাছে চির-নূতন। বহুদূর পর্য্যন্ত সার্চ্চলাইটের আলোয় ভ'রে গেছে, ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলির উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। আলো-আঁধারে, আকাশে-সাগরে সে এক বিরাট আলিঙ্গন।

ল্যান্স-নায়েক অপূর্ব্ব এসে পাশে দাঁড়াল, বল্লে, "মিষ্টার, জোছ্‌না দেখেছ এমনি কোথাও?" বল্লুম, "বাংলার জোছ্‌না দেখেছি—সেও তো অম্‌নি।" "বটে! সমুদ্দুরের বুকের উপর চাঁদের আলো—তা'র চেয়েও সুন্দর?" চারদিক্ থেকে হুহু করে বাতাসের ঝাপটা আসছিল, সাহেবটা ম্যাকিন্‌টস্ জড়ায়ে চুরুট ফুঁকছিল, আর মাঝে মাঝে শিস্ দিয়ে বুঝি বা কোন প্রেমিকার উদ্দেশে সুর নিবেদন করছিল।

বাস্‌রায় পৌঁছুলুম—সে দিন শুক্রবার। দূর থেকে মস্‌জিদের গম্বুজ, মিনার দেখা যাচ্ছিল। ছোট্ট ছোট্ট অপ্রশস্ত গলি। দু'ধারে প্রকাণ্ড জোয়ান আরবী লোক-গুলোর আঙুর, আপেল, বেদানার দোকান। তাদের ঢিলা পা'জামা, তার উপর লম্বা কুর্ত্তা। কোমরে লম্বা ভোজালী। শীর্ণ বাঙ্গালী দেখা যাদের অভ্যাস, এ পৌরুষমূর্ত্তি তা'দের কাছে একটু নূতন বলেই মনে হ'ল। মার্চ্চ করে সহরের বাইরে ক্যাম্পে যাচ্ছিলাম,—দূরে ইউফ্রেটীসের রূপালী জল-রাশি প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে চিক্‌চিক্ করছিল। ইউফ্রেটীসের ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের খেজুর-গাছের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাতা-গুলি রুদ্ধ আক্রোশে যেন গর্জ্জে উঠছিল। অপূর্ব্ব বল্লে, "বাস্‌রায় এলাম, বাস্‌রাই গুলাবই দেখ্‌লুম না এ পর্য্যন্ত!" প্রাইভেট অমর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অতি ধীরে বল্লে, "বটেই তো, ভাবছিলাম কোথায় "শিরিষপুষ্পাধিদৌ সৌকুমার্য্যৌ বাহু তদীয়ৌ" দেখ্‌ব—না দেখ্‌লুম, কতকগুলি শালকাঠের মতো বিরাট বাহু; বাঃ বাঃ—ওর এক চাপড়েই যুদ্ধতৃষ্ণা একেবারে Freezing pointএ।"

* * * দু'বছর কেটে গেছে। আমরা তখন বাগদাদের পাঁচ মাইল দূরে একটা গাঁয়ে—টাইগ্রীসের তীরে। প্রথম যখন এ মরুপ্রান্তরে পদার্পণ করে এর শুষ্ক প্রাণধারা দেখেছিলাম, তার পর থেকে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। এখন রীতিমত আরবীতে পরিষ্কার কথা বল্‌তে পারি। জ্যাক্‌সন্ সাহেব তাই আমায় দোভাষি বলে ডাকেন। কাজ-কর্ম্মও এখন নেই তেমন—কারণ, বিলেতে না কি এখন শান্তির চেষ্টা হচ্ছে—যুদ্ধও থেমে এল। তাই নিত্যি বিকেলে টাইগ্রীসের তীর ধরে বেড়াই, দূরে খেজুর-পাতার ফাঁকে ফাঁকে মস্‌জিদের মিনার বৈকালিক সূর্য্যের আগুন-রাঙ্গা কিরণে ঝল্‌সে উঠে। দলের পর দল উট-আরোহী যাত্রী বাগ্‌দাদের পথ ধরে চ'লে যায়। বহুদিন পর প্রবাসী পথিক শান্ত-শীতল গৃহকোণের অপূর্ব্ব মাদকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কত কথা বলে যায়। কেউ বা মুসাফের দেখে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে, কেউ বা দুনিয়ার ফেরদৌস হিন্দুস্থানের বাসিন্দা দেখে মেহেরবাণী করে বিদেশবাসের জন্য সহানুভূতি জানায়।

সেদিন আকাশে-বাতাসে আকুলী-ব্যাকুলী খেলা। টাইগ্রীস যেন তা'র পূর্ণ যৌবন-গরিমায় স্ফীত হয়ে উঠেছে,—তালগাছের মাঝ দিয়ে যেন সহস্রশীর্ষ সাপের ক্রুদ্ধ আস্ফালন। বাতাসে ধুলোয় মিশে মস্‌জিদের আকাশস্পর্শী মিনারটাকে ছেয়ে ফেলেছে। পায়ে চলার পথের ধারে গুচ্ছেগুচ্ছে আঙ্গুর-ভরা ক্ষেত। থোপা থোপা আঙুরের গুচ্ছ বাতাসে কেঁপে কেঁপে গাছের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছিল। ক্যাম্পে ফেরবার জন্য হোঁচোট খেতে খেতে পা চালিয়ে চল্‌ছিলাম; ধুলোময় বাতাসের ঝাপ্‌টা নাক মুখ ভরিয়ে দিলে। মাঝে মাঝে টাইগ্রীসের দম্‌কা হাওয়ার স্নিগ্ধ সুবাস। রাস্তা ছেড়ে একটা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম—অদূরেই একটী ছোট্ট কুটীর, ভাবলুম্ একটু দাঁড়াই—বাতাসটা থেমে যাক্।

ওয়াটার-প্রুফটা কাঁধে ফেলে গাছটার নীচে বসে পড়্‌লাম। কাছেই আরবী কুটীর। পেছনে ছোট্ট একটু বাগান,—আঙুর, ডালিম প্রভৃতি ফলের গাছে ভরা। পাশে ছোট্ট একটুখানি কূয়া। দক্ষিণে ছোট্ট গাছের সাথে একটা উট বাঁধা—আর পাশে সতেরো আঠারো বছরের একটী আরবী মেয়ে। উট্‌টা শুধুই মাটীতে শুয়ে পড়্‌তে চাচ্ছিল; আর সে মেয়েটি কেবলই তাকে দাঁড় করাবার জন্য গলার দড়িটা ধরে টান্‌ছিল।

ঠোঁট উল্‌টিয়ে মেয়েটা পরিষ্কার আরবীতে বল্লে, "দূর কম্‌বখ্‌ত, উঠ্‌ঠে দাঁড়া লক্ষ্মীছাড়া জানোয়ার কোথাকার।" জানোয়ারটা কিন্তু শুধুই মুখ মাটিতে থুবড়ে পড়ে রইল। মেয়েটা তার মিঠে গলায় চেঁচিয়ে গৃহাভ্যন্তরের মাকে ডেকে বল্লে, "আম্মা, এ হুষ্‌মণটা কিন্তু এক্ষুণি মার খাবে, এই ছাখো, এটা কেবলি বৃষ্টিতে ভিজ্‌বে।" বৃষ্টির জলে সুন্দরী তরুণীর রুক্ষ বিপর্য্যস্ত কেশরাশির মাঝ দিয়ে জলের ধারা পড়্‌ছিল, আর রাগে তার শুভ্র নিটোল গণ্ড লাল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্লে, "উঠ্‌বিনে ফেরব্বাজ, রাখ্‌—" ঘরের ভিতর থেকে দুর্ব্বল কণ্ঠে মা ডেকে বল্লে, "রোশেনা, খোদার কশম্‌, মারিস্‌নি কিন্তু ওকে।"

চোখ ফিরাতেই মেয়েটীর দৃষ্টি আমার দিকে পড়্‌ল। লজ্জায় তার মাথাটা নুয়ে রইল; আর মাঝে মাঝে সে উট্‌টাকে তোল্‌বার জন্য মুখের দড়িটা ধরে টান দিতে লাগ্‌ল। আমার মাথায় কি যেন ঢুক্‌ল—আমি এগিয়ে গেলুম। মেয়েটা আমায় দেখে সরে দাঁড়াল। আমার যুদ্ধ-সজ্জা দেখে সে ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিলে। আমি বল্লুম, "উট্‌ কি আর এম্‌নি টেনে তোলা যায়—?" হাতের batonটা দিয়ে উট্‌টাকে দুটা আঘাত করতেই সেটা উঠে দাঁড়াল। সেটাকে টেনে নিয়ে আমি একটা ছোট চালা ঘরে বেঁধে দিলুম। মেয়েটা তার কুন্দফুলের মত মুখটা তুলে, আড়চোখে কৃতজ্ঞনেত্রে আমায় দেখে নিল। বল্লে—"বহুৎ তক্‌লিফ্‌ দিচ্ছিল এ বেয়াদপ জানোয়ারটা—দুষ্‌মণ।" তার পর ঢোঁক গিলে সরমজড়িত স্বরে বল্লে, "সাহেব, আপনি কি লড়াইতে এসেছেন, লড়াইর খুনখারাবী বড্ড ভয়ানক।" বল্লুম, "লড়াই তো থেমে এসেছে, বেহুদা খুনও থেমে এল আর কি!"

"আপনার ঘর?"

"হিন্দুস্তান, পাঞ্জাব মুলুক, মেরা নাম মীর হবিব।"

* * * *

সেদিন নওসেরা থেকে ৭০ নম্বর রাজপুত রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছুবার কথা। আমি ও অপূর্ব্ব ভোর-বেলা বেরিয়ে পড়্‌লুম,—কাজকর্ম্মও নেই কিছু,—প্যারেড করাও হ'য়ে গেছে। ভোরের বাতাস আরবের শুক্‌নো মাটীর উপর লুটোপুটী খাচ্ছিল,—দাড়িম-পাতার ফাঁকে সূর্য্যের অগ্নিবৃষ্টি। অপূর্ব্ব তা'র সাহেবী কায়দায় বার্ম্মা চুরুটের ধুঁয়া কেবলি আমার মুখের উপর দিচ্ছিল। বল্লুম, "ছাখো, এবার কিন্তু বাংলা-মুখো মন টান্‌চে।"

অপূর্ব্ব বল্লে, "বটে, বড্ড একা পড়ে গেছ,—এবার বুঝি সংসারী হ'তে চাও, Old boy, তাই বল—"

"Nonsense, বাড়ী ছেড়েছি কি আজ? সেও তো কতদিন হ'ল! আর লড়াই ফড়াই ভালো লাগে না।"

"কিন্তু যাই বল, আমার কিন্তু বেশ লাগছে! কেমন কঠোর উদ্দাম জীবন, জীবনের সব মধুই যেন পাচ্ছি, অবশ্যি——"

ধমক দিয়া বল্লুম, "Shut up"; অপূর্ব্বের মুখ থেকে একবার কথা আরম্ভ হ'লে তা'কে থামান মুস্কিল।

রাস্তার মোড় ঘুরে আমরা রোশেনাদের কুটীরের কাছে এসে পৌঁছুলাম। দেখ্‌লাম—রোশেনা কুয়া থেকে জল তুল্‌ছে। তার রুক্ষ কেশপাশ বাতাসে উড়ে উড়ে মুখ ছেয়ে পড়েছে। ক্ষীণ দেহলতা কলসীর ভারে বেতস-পত্রের মত নুয়ে পড়েছে। অপূর্ব্ব সাথে আছে বলে রোশেনার পরিচয় গোপন কর্‌বার জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটা আরম্ভ করে দিলুম। কারণ, অপূর্ব্ব যদি বুঝ্‌তে পারে—এ তরুণী আমার পরিচিতা, তবে ক্যাম্পে গিয়ে সে নিশ্চয়ই একটা গোলমাল বাধাবে। কিন্তু আমার এ হঠাৎ তড়িৎগতি অপূর্ব্ব যেন বুঝ্‌তে পার্‌লে; বল্লে, "কি হে, হঠাৎ যে একেবারে double march, বলি একটু ধীরেই হাঁটো না বাপু—এতো আর কুট-এল্‌-আমরাতে যেতে হচ্ছে না"—হঠাৎ একটু থেমেই রোশেনাকে দেখে অপূর্ব্ব চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "রবি, eyes front"। আমি যেন কিছুই বুঝি নি ভাব দেখিয়ে একটু তিক্ত স্বরে বল্লুম, "কি আবার হলো, কোথায়? কি যে বল্‌চ।"

"ন্যাকা আর কি! ছাখই না বাপু একটু চোখটা মেলে, তা'র পর তো হাঁ করেই থাক্‌বি জানি।"

রোশেনার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বল্লুম, "ছাখো, এ কিন্তু বাংলা মুলুক নয় যে মেয়ে দেখ্‌লেই হাঁ করে থাক্‌বে। অসভ্যতা করেচ কি আরবীদের হাতে একেবারে শেষ।"

"রোসো, হাজার জঞ্জালের মাঝে একটী বাস্‌রাই গুলাব—তা'ও বুঝি তোমার সইছে না! বেশ আছ যা হো'ক্‌ তুমি!"

আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে রোশেনার দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়্‌ল। দেখ্‌লুম, মুখের আনন্দ-উৎফুল্ল সে ভাব আর

নেই। কি চিন্তায় যেন সে অনুপম মুখকান্তি মলিন হ'য়ে গেছে। একরাশ শিউলীর মত শুভ্র পেলব সে মুখখানি ছুনিয়ার কোন ভাবনায় যেন মুস্‌ড়ে গেছে। দেখ্‌লুম, সে যেন কিছু বল্‌তে চায়—কিন্তু আমরা যে অনেক এগিয়ে গেছি। অপূর্ব্ব মাঝে মাঝে পেছন ফিরে চাইছিল ও আপন মনে অনবরত ব'কে যাচ্ছিল।

এগারোটায় সে দিন ক্যাম্পে ফিরে এলুম। নওশেরা থেকে বাঙ্গালী বন্ধুরা আমাদের জন্ম অনেকগুলো রুমাল পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে রুমালের বাণ্ডিলগুলো খুল্‌ছিলাম আর বাংলার কথা ভাব্‌ছিলাম। জানি এ সমুদ্র পেরিয়ে দেশে কোন বন্ধনই আমার নেই। আরবের ধূধূ করা মাঠ ও বাংলার অনন্ত-প্রসারী শ্যামলিমা আমার কাছে সব সমান। কিন্তু তাই ব'লে কি সেটা ভোলা যায়? এক একটী রুমাল খুলে বের কর্‌ছিলুম, আর আমার বাংলার ছবি চোখের উপর ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল। সে রুমালগুলির উপর হয়তো বাংলার স্নেহপ্রবণ কত তরুণ-তরুণীর হস্তস্পর্শ পড়েছে, তা'দের অঙ্গ-সুষমা এখনও যেন সেগুলোর গায়ে গায়ে জড়িত রয়েছে। প্রবাসী বন্ধুদের জন্ম এ স্নেহের দানে তা'দের স্নেহশীতল স্পর্শ যেন আমি বুক দিয়ে অনুভব কর্‌ছিলাম। পাইপটা ফুঁকতে ফুঁকতে অপূর্ব্ব এসে দাঁড়াল—প্যাণ্টের পকেটে হাত ছুটো ঢুকিয়ে। পেছন ফিরে পবিত্র তা'র বৌদির চিঠি পড়্‌ছিল। ঠাকুরপো বাংলার মধুময় গৃহকোণ ছেড়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অগ্নিবুকে আশ্রয় নিয়ে আপন মনের মানুষটী এখনো খুঁজে পেলে কি না—বৌদি তাই জান্‌তে চাইছেন। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে পবিত্র বল্লে, "অপূর্ব্ব, বৌদি কি লিখেছে জানিস্ Right girl খুঁজে পেলুম কি না"——

অপূর্ব্ব বল্লে,"আর তুমি পেয়েছ! কেবলই থাক্‌বে কোণ-ঠাসা হ'য়ে ঘরে বসে।—ত্যাখ্—রবিকে জিজ্ঞেস্ কর, আজ কি ক'রে এলুম!"

পবিত্র জিজ্ঞাসুভাবে আমার পানে তাকাল। যে জিনিষটা গোপন রাখ্‌তে চাই, সেইটেই যেন সব কথার ভেতর দিয়ে কেবল আত্মপ্রকাশ কর্‌তে চায়;—আমি বড্ড মুস্কিলে পড়ে গেলুম; বল্লুম, "আমি ভাই গৃহহীন, সব-হীন—লাভ জিনিষটে আমার কুষ্ঠীতে নেই, তাই আমি কিন্তু আজ অপূর্ব্বের মতো কিছুই লাভ কর্‌তে পারি নি।"

"বটে, মরুভূমির ভেতর একটী ওয়েসিশ্—তা'ও তোদের চোখে পড়ে না—শুক্রাচার্য্যই বটে," এই বলে অপূর্ব্ব একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স টেনে নিয়ে বসে পড়্‌ল। পবিত্র চিঠিটা পকেটে পুরে অপূর্ব্বর হাত থেকে পাইপটা নিয়ে বল্লে, "কি দেখেছিস্ মিটার, বল্ না, আঙ্গুর? বেদানা? —না বাস্‌রাই গুলাব—"

অপূর্ব্ব যথেষ্ট রং ফলিয়ে রোশেনাকে দেখার কথা বল্লে। আমি চুপ করে রুমালগুলো ভাঁজ করা আরম্ভ করে দিলুম। মাঝে মাঝে রোশেনার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানির ছবি চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। হয় তো বা তা'র কোন বিপদ-আপদ হয়েছে, রুগ্ণা মা হয় তো আরও কাতর হয়ে পড়েছে। রোশেনার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে এমনি কত কথা ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। পবিত্র অপূর্ব্বের কথা শুনেই চেঁচিয়ে উঠে বল্লে, "ইউরেকা, ইউরেকা—আরে তোদের তো একটা কথা বল্‌তেই ভুলে গেছি! কাল যখন দিলোয়ারা থেকে ফিরে আসি, তখন দেখ্‌লুম, একটী মেয়ে ঠিক অমনি একটী জায়গায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখ্‌ছিল। চুলগুলি তার সে কি কালো! আমায় দেখে মেয়েটী হঠাৎ বল্লে, 'সাহেব, তুমি কি হিন্দুস্তানের লড়াইর ফৌজ?' আরবী তো আর রবির মতো জানি নে, তাই একটু ঘাব্‌ড়েই গেলুম। মেয়েটী আমার উত্তর পেয়ে জিজ্ঞেস করলে যে, পাঞ্জাব মুলুকের মীর হবিবকে আমি চিনি কি না। তোরা চিনিস্? ও নামের কাউকে তো চিনি নে! ভাব্‌লুম, হয় তো হবিব সাহেব ৬০ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের হবেন। বল্লুম, তা'কে চিনি নে। মেয়েটী বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমায় সেলাম করে চলে গেল। হবিব নিশ্চয়ই ওর স্বামী। এটী নিশ্চয়ই তোদের সেই মেয়েটী—আচ্ছা, চোখ্ ছুটো কি তার খুব ডাগর? হাত ছুটী একেবারে খালি—নয়?" অপূর্ব্ব উৎসুক ভাবে বল্লে, "সত্যি, তাই—সেই মেয়েটীই বটে।" আমার দিকে ফিরে বল্লে, "কি বলিস্ রবি, অম্‌নি চেহারা নয়?"

আমি যদিও রোশেনাকে সব চেয়ে বেশী চিনি, তবু চুপ করে রইলুম। আমার বুকের ভেতর কি যেন একটা খোঁচা দিয়ে উঠ্‌ল। সরলা একটী মেয়ের কাছে নিজের নাম ও জাতি ভাঁড়িয়ে তার হয় তো বিশ্বাসের উপর দাবী করেছি। হয় তো কোন অজানিত বিপদে পড়ে মেয়েটী সকাল-সন্ধ্যায়

আমার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। জীবনে কোন দিন কারুর স্নেহ পাইনি। মাঠে মাঠে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, ছোট-বেলা থেকেই কারুর একটী আদরের ডাক, স্নেহের স্পর্শ পাই নি। দেশের রম্য উৎসবানন্দের আবেষ্টন ছেড়ে যখন বিদেশের অগ্নিলীলার মাঝে ঝাঁপ দিলুম—তখন হয় তো একটী লোকও আমার কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নি, কেউ একটী মুখের কথা দিয়েও খোঁজ করে নি। এ কোন্ অজানা তরুণী তা'র স্নেহস্পর্শে আমায় টেনে নিতে চাইছে? বিধাতার সৃষ্টির বেদনা যাকে স্নেহহীন করে সৃষ্টি করেছে, এ ক্ষুদ্র প্রেমের সিংহাসনে সে বস্‌বে কোন্ সম্বল নিয়ে? ভাব্‌লুম, আজ বিকেলেই যাব সেখানে। কিন্তু রোশেনার কথা এ বিলাসী যুবকদের মধ্যে যে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, সেটা থেকে নিজেকে গোপন রাখ্‌তে হবে। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, যে মুহূর্ত্তে এ তরল-বুদ্ধি বিলাসীদের কাছে প্রকাশ হবে যে রোশেনা আমার পরিচিত, সেই মুহূর্ত্তেই জ্যাকসন সাহেব জান্‌তে পারবেন;—তার পরিণাম ভাব্‌তেই আমি শিউরে উঠ্‌লুম।

পরদিন ভোর বেলা প্যারেডের পরেই একটু জ্বর জ্বর অনুভব কর্‌ছিলাম। কিন্তু শরীর অসুস্থ হ'লেও যেন রোশেনার কথা ভুল্‌তে পারছিলুম না। বুঝ্‌লাম্, নীড়হীন মুক্ত পাখী আজ স্নেহের খাঁচায় বদ্ধ হ'তে চলেছে। বেরিয়ে পড়্‌লুম—তখন বেলা আট্‌টা। ঝিকিমিকি দিয়ে রোদের চোখ-ঝল্‌সান আলো প্রভাতের শিশির-ভেজা ধূলোকে প্রাণ-বান্ করে তুল্‌ছিল।

কুটীরের পাশে এসে দাঁড়াতেই মনে হলো, বিধাতার কোন অভিশাপের রুদ্রলীলা যেন এ ক্ষুদ্র কুটীরের শান্তি হরণ করে নিয়ে গেছে। আঙুর-গাছের আঙুর-গুচ্ছ পেকে পেকে মাটিতে ঝরে পড়েছে, পাকা দাড়িম-ফলগুলো ফেটে গেছে—তাদের রাঙ্গা রাঙ্গা দানাগুলি রসে টপ্‌টপে হয়ে আছে। উট্‌টা যেন কত দিন খেতে না পেয়ে স্তব্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ। আমি গলাটা ঝেঁকে রোশেনার নাম করে ডাক দিলুম, কোন উত্তর পেলুম না। হাতের ছড়িটা রেখে আমি একটু ভেবে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। প্রদীপ্ত প্রায়াহ্নের রশ্মিরেখাও গৃহাভ্যন্তরের আঁধার দূর কর্‌তে পারে নি। ক্ষুদ্র গৃহাভ্যন্তর যেন দারিদ্র্যের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সে দারিদ্র্যের বিলাসশূন্য উপকরণের মাঝেও যেন কোন শান্তিময় কল্যাণ-শ্রীহস্তের চিহ্ন সব জায়গায় দীপ্যমান। মাটী দিয়ে তক্তপোষের মত উঁচু করা হয়েছে—তার উপর মলিন শয্যা। দেয়ালে একটা বহু পুরান তরবারী ও বড় একটা ভোজালী। আমি শঙ্কাকুল চিত্তে এ প্রাণহীন গৃহশয্যা দেখ্‌ছিলুম, ঘরের কোণ দিয়ে রোদের একটু ঝিকিমিকি আভা গৃহকোণের অন্ধকারাচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যকে স্ফুটতর করে তুলছিল। হঠাৎ দেখ্‌লাম, শয্যার এক প্রান্তে এলায়িত পল্লবের মতো রোশেনা মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তার বিস্রস্ত বসনাঞ্চল ভেদ করে অঙ্গের দীপ্ত আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। একরাশ কেশগুচ্ছ সে সুকুমার নগ্ন কণ্ঠকে ঢেকে শয্যাপ্রান্তে লুটোপুটি খাচ্ছিল। তার অঙ্গ-সুষমা যেন এ কঠোর অযত্নে আরও বেড়ে উঠেছে। কোন্ সৃষ্টিকরের যাদুমন্ত্রের অমোঘ বলে যেন এ মূর্ত্তিমতী কুসুম প্রাণবতী হ'য়ে মরুপ্রান্তরে ফুটে উঠেছে। ডাক্‌লুম, "রোশেনা!"—রোশেনা হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌ল। এলায়িত কেশপাশ তার মুখ ঘিরে যেন কৌতুকহাস্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সে ত্রস্তগতিতে উঠে আমার হাঁটু জড়িয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। বিস্ময়ে আমি যেন স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম। মাটির উঁচু বেদীটার উপর বসে আমি তাকে বুকে তুলে নিলুম। পৃথিবীর শ্যামল বুকের উপর যেদিন থেকে বাসা বেঁধেছি, সেই দিন থেকে যে অবলম্বন পাই নি, আপনার বলে কাউকে পাইনি, বিদ্রোহীর মতো, উচ্ছৃঙ্খলের মতো তাণ্ডব হাস্যে সবভাঙ্গা বীরের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি—আজ যেন আমার বুকের কাছে কোন যুগযুগের আপনার জন পেলুম। জীবনের এ নৃত্যদোদুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আজ যেন ক্লান্তিহারা, শ্রান্তিহারা কোন অমৃতময়ীর কোমলস্পর্শে আমার অন্তর-তলের শুষ্ক হৃদয়টা প্রাণরসে তাজা হ'য়ে উঠ্‌ল। বহুদিন পরে আমার রিক্ত, সবুজ চিত্ত কোন্ মায়াবিনীর মধুস্পর্শে সব-পেয়েছির দেশে এসে উপস্থিত হ'ল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রোশেনা বল্লে যে, তা'র মা নেই। এ পৃথিবীতে তার অবলম্বন আর কেউ নেই। এ মরুভূমির উষ্ণ প্রান্তরে, এ তরুণী সাহারার বুকে ওয়েশিসের মতো পৃথিবীর নির্ম্মম উষ্ণতায় জ্বলে পুড়ে মর্‌বে। সে বল্লে—কেমন করে সে আমার কত খোঁজ করেছে। যেদিন সে কূয়ো থেকে জল তুল্‌ছিল, সেই দিনই তো তা'র মার অসুখ আরো বেড়ে

ওঠে। আমজাদ্ এসে বলে যে, এ-যাত্রা আর মা বাঁচবে না—তবে খোদার মর্জ্জী। তার পর তো সে আমায় কত খুঁজেছে; কই, মীর হবিবের কথা তো কেউ বল্‌তে পার্‌লে না। কেঁদে কেঁদে আমার বুকে মুখ রেখে রোশেনা বল্লে—কেমন করে সে এ দুনিয়ার জঞ্জালের ভেতর থাক্‌বে?

বাংলার রবি—আজ আরবের মীর হবিব। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। জীবনের ঐ যে এক স্বপ্নময় রঙ্গীন অধ্যায় মিথ্যার আবরণে আরম্ভ হ'ল—কোথায় শেষ হ'বে এর বিচিত্র পরীক্ষা। অতীত, ভবিষ্যতের সহস্র ছবি চোখের উপর দিয়ে ছায়াচিত্রের মতো ভেসে গেল। যতদূর চোখ যায়, ভবিষ্যৎকে একটু ভেবে নিতে চেষ্টা কর্‌লুম,—কিন্তু কই, মিথ্যার স্থান তো তা'তে নেই! মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে ঢাকতে পারি, কিন্তু অপরিসীম সত্যকে তো মিথ্যার তন্তুজাল দিয়ে ঘিরে রাখ্‌তে পার্‌ব না। একবার ভাবলুম যে অসহায়া বালিকাকে বুঝিয়ে দি যে, আমি মুসলমান হবিব নই,—আমি বাংলা মুলুকের হিন্দু যুবক রবি মিত্র। বুকের মধ্যে যেন কিসের খোঁচা অনুভব করছিলুম,—কে যেন বল্‌ছিল, নিজে হাতে যে স্বর্ণশৃঙ্খল বেঁধেছি —তা' কি নিষ্ঠুরতার ছুরিকাঘাতে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া যায়—তার চেয়ে যে মরণও ভাল। রোশেনাকে কিছু বল্লুম না, বাজে কথায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ভেবে সে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌ছিল! স্থির কণ্ঠে ডাক্‌লুম, "রোশেনা!"—উদ্বেল অশ্রু গোপন করে সে তার স্নিগ্ধ চোখ দুটী আমার উপর স্থাপন কর্‌ল। বল্লুম "রোশেনা,আমিই তো আছি—কি ভয়?" রোশেনা আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্লে, "সত্যি? আমার যে আর কেউ নেই। আমি কাউকে ছাড়া কেমন করে আমজাদ্, উমেদ্ এদের কবল থেকে মুক্তি পাব!" বুঝলাম—মাতৃহীন হ'য়ে কেন এর এত ভয়! "আমিও তো বড্ড একা, রোশেনা; এ দুনিয়ায় আমারও তো কেউ নেই—তোমায় আমিই নিলুম, নিত্যি এসে তোমায় দেখে যাব।"

"সে আর কদ্দিন, লড়াইর শেষে তো তোমারও যেতে হ'বে—"

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পলকে চোখের উপর আবার ভেসে উঠ্‌ল। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী পৃথিবী যেন চোখের উপর শত সৌন্দর্য্যে জ্যোতির্ম্ময়ী হ'য়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্তে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিলুম। রোশেনার কোমল হাত দুটী চেপে ধরে বল্লুম, "বেশ, তখনো আমি তোমারই থাক্‌ব।"

বিপদের অকূল সমুদ্রে যেন রোশেনা একটা অবলম্বন পেল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "সাচ্চা? মেরা দিল্—মেরা জান্—"আর কিছু সে বল্‌তে পারলে না, শুধু ধীর স্নেহে হাতের তামার আংটিটি আমার হাতে পরিয়ে দিল। তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করে—আবার আস্‌ব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বাইরের মুক্ত বাতাস আমার বন্ধন-গরিমায় আমায় অভ্যর্থনা করে নিলে। সে বাতাস ভেদ করে শুন্‌লাম্, "রবি মিত্র—চমৎকার!" হতাশ বিস্ময়ে দেখ্‌লুম—অদূরে—অপূর্ব্ব!

* * * * * *

প্রদোষ! এর পরের ইতিহাস তোমার কাছে কি লিখব ভাই? আমার জীবনের ঘটনা-বহুল ইতিহাসের রক্তরাঙ্গা পৃষ্ঠা উল্টাতে আমার নিজেরই যে ভয় হয়! আচ্ছা, ভগবানের সৃষ্ট জীব সবাই শুনেছি মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করতে চায়,—কেন বল্‌তে পার? আমার মনে হয় একবার অন্তর্যামীর পা' ধরে বলি, "প্রভু, এ মানব-জীবনের ক্রূর অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি দাও। পশুত্বও যে এর চেয়ে ঢের ভালো! ভগবান মানুষ যখন সৃষ্টি করেছেন, তাকে কেন মানুষই রাখ্‌লেন না, পশুত্বকেও কেন মানবতার সজ্জায় পৃথিবীর বুকের উপর ছেড়ে দিলেন। পৃথিবীর কলহাস্যময়ী সৌন্দর্য্য-সুষমার ভেতর তো পশুর স্থান নেই, ভগবানের সৃষ্টির সেটা যে হ'বে বিরাট অসামঞ্জস্য। সেদিন ক্যাম্পে ফিরে যে অবস্থায় পড়্‌লুম, তার ইতিহাস তোমায় দিতেও শিউরে উঠি। অপূর্ব্ব তার বন্ধুত্বের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে একটা নূতন ইতিহাস তৈরি কর্‌লে। মানুষের চাপা হাসির লাঞ্ছনায়, কদর্য্য ইঙ্গিতের আঘাতে যেন আর স্থির থাক্‌তে পারছিলুম না! যে দায়িত্বের গুরুভার বিদ্রোহী মাথাটা আপনার উপর চাপিয়ে নিলে, তার ভারেই যে আমি অস্থির! এ আঘাত আমি সইব কেমন করে? যাক্—সে দিনই খুব গুরুতর জ্বরে বিছানায় পড়লুম। একমাস চেতনা অচেতনার মাঝে জীবনের দোলা দুলছিল—কিন্তু সে শিথিল বন্ধন ছিঁড়ে ভেঙ্গে পড়েনি। বেঁচেই

মরার প্রতীক্ষায় রইলুম। রোগের দুরন্ত আক্রমণের মাঝে যখন চেতনা নেই, তখন সে অচেতন ঘোরে মনে হো'ত যেন বোর্‌খা-ঢাকা একখানা শুভ্র কুন্দফুলের মতো মুখ আকুল আগ্রহে আমার মুখের উপর ঝুঁকে বসে থাকৃত। তার হাতের স্পর্শে মনে হোত—যেন এক রাশ শিউলীর বোঝা। কিন্তু জ্ঞান হ'তেই দেখ্‌তুম—মাটীতে পড়ে আছি, রাগ্‌টা জড়ান, খাকী সার্ট গায়ে। এক মাস রোগ-ভোগের পর disabled হ'য়ে ফৌজ ছেড়ে চ'লে এলুম। জ্যাকসন সাহেব বিদায়ের বেলা গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন, "মিটার, তুমি আমার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করেছ, তুমি মিলিটারীর অনুপযুক্ত—কারণ সেটা নারীর প্রেম নয়। All right, good boy." এমন করে আমার কর্ম্মজীবনের যবনিকা-পাত হ'ল। আমার চলে আসার পরদিনই আমাদের রেজিমেণ্ট মার্চ্চের হুকুম পেয়ে কুট্‌-এল-আমারায় রওনা হ'ল। রোশেনা ছাড়া আরবের মরুভূমিতে আমার চেনা আর কেউ রইল না। অতি কষ্টে নিজকে টেনে রোশেনাদের কুটীরের পাশে এসে পৌঁছুলাম। আকুল আগ্রহে রোশেনা আমায় বুকে টেনে নিলে। শত প্রশ্নে আমায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্লে, বল্লে, "আমি ভাব্‌লুম, তুমি বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলেই গেছ! ইঃ—কি চেহারা হয়েছে! বেমারীর কথা তো আমায় জানাও নি?"

"তোমায় কেমন করে জানাই বল তো? আমার কলিজার ভেতর ঢুক্‌তে পার, তা' বলে কি ফৌজের ক্যাম্পে ঢুক্‌তে পারবে?" সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, "ভাখো, তোমাদের ফৌজের কয়টা দুষ্‌মণের অত্যাচারে এমনি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম!" তার মাথাটার উপর হাত দিয়ে কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম। সে করুণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "এ বেমারীতে কে তোমায় দেখ্‌বে শুন্‌বে—আর তো তুমি যাবে না—"

"না রোশেনা, আর তোমায় ছেড়ে যাব না, এবার পাখীর নীড়েই যে বাসা বাঁধ্‌লুম।"

হাসি-কান্নায় তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

দুটী বছর আমি বেদুইনের মতো মরুর বুকে বাসা বাঁধলুম। সকাল সাঁঝে দুটী কোমল হাতের স্নেহের স্পর্শে আমায় মনে করে দিয়ে যায় যে, এ দুনিয়ার বুকে আমি একা নই। সে স্নেহের মধুর স্পর্শে আমার চিত্ত-শতদল যেন দলে দলে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু মনে শান্তি কই? ভবিষ্যতের কথা মনে হতেই, যেন প্রাণটা কি একটা অজানা আবেগ-আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ত। এ দুর্নিবার মিথ্যার জাল শেষ করে দিতে চাইছিলুম; কিন্তু রোশেনাকে হারাবার ভয়ে পেছিয়ে গেলুম। এ ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যাহ্ন-গরিমায় যখন একটী অবলম্বন পেয়েছি—কেমন করে তার বন্ধন ছিঁড়ে আবার পৃথিবীর বিরাট বুকে একা এসে দাঁড়াই। এ দোদুল দোলায় মনটা ও শরীরটা যেন একই সাথে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এক-একবার বাংলা মায়ের স্নেহ-আহ্বান আমায় পাগল করে দিত, আর এক-একবার এ মরু-কুসুমের দুর্নিবার আলিঙ্গন আমায় বেঁধে ফেল্‌ত। এ মরু-প্রান্তরে জীবনের যা' কিছু সম্বল, তা প্রায় এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে—তাই নির্ম্মম ভবিষ্যৎটা আরও কঠোর হ'য়ে চোখের উপর ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এ দ্বন্দ্বদোলায় রোশেনার স্নেহ-রসই আমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌ছিল।

ঘুস্‌ঘুসে জ্বরটা যেন সে দিন বেড়ে উঠ্‌ল। রোশেনা আমার এ রোগ-ক্লান্তি দেখে যেন মুসড়ে গেল। বল্লে, "তোমার মতো লোকের কি আর ফৌজে যাওয়া পোষায়? ভাখো তো কেমন জেরবার হ'য়ে এসেছ?" সে আমার আঙ্গুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ কর্‌লে। খানিকক্ষণ পরে বল্লে, "আচ্ছা, উট্‌টা বেচে ফেলা যায় না? কি বল?"

চম্‌কে উঠে বল্লুম, "কেন? কি হয়েছে?"

রোশেনা চুপ করে মাথা নীচু করে রইল। আবার বল্লুম, "কি হয়েছে বল তো? উট্‌ বিক্রী কেন?"

"তুমি কেবলই ভুগ্‌ছ, দাওয়াই-পত্তরও নেই কিছু—তুমি কেমন করে বাঁচবে—"

"পাগল আর কি? একটু জ্বর, তা'তে কি ছেলেমীটাই আরম্ভ করেছ!"

ক্রমশঃই দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম—রোশেনা যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। আর তেমনি করে সাঁঝে-সকালে সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে না—সে কেমন যেন সংসারী হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় তাকে ডেকে পাই নে—কোথায় যেন সে যায়। সে পুলকময়ী প্রতিমা আর যেন সে নেই—এখন সে গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছে। চিন্তা ও পীড়াতে মনটা যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ছিল। তার পর এ সব দেখে আমার মাথা যেন

কেমন হ'য়ে গেল। নিজেই বুঝতে পারলুম না—কেমন করে খিটখিটে হয়ে গেছি। সে দিন ঘরের দাওয়ায় বসে আঙ্গুরের গুচ্ছ থেকে আঙ্গুর ছাড়াচ্ছিলাম, দেখলুম—রোশেনা আমার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে। হঠাৎ সামনে এসে বল্লে, "বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে গেছ, এখন একটু শুয়ে পড় দিকিনি!" সাঁতা ভাল লাগ্‌ছিল না—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। রোশেনা একবার এসে আমায় দেখে গেল। মনে মনে কত কথা ভাবছিলুম, তার আদি-অন্ত নেই। হয় তো রোশেনা জান্‌তে পেরেছে যে, আমি ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতক—তা'র সর্ব্বনাশ করেছি! হয় তো বা এ মরুর দুলালী খাঁচা ভেঙ্গে উড়ে যেতে চাইছে।

হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসলুম। ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখলুম—আমজাদ্‌কে রোশেনা যেন কি বল্‌চে—চোখ-মুখে তার একটা ব্যগ্র আশঙ্কার ভাব। হাতে তার সে পুরান তরবারিটা। আমার চোখের সামনে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা সৃষ্টির অতলে তলিয়ে গেল। বুকের রক্তধারা খর-প্রবাহে শিরা-উপশিরা ভেদ করে যেন রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে ফুটে বেরুতে চাচ্ছিল। চোখের উপর অতীত ভবিষ্যৎ যেন ঘুলিয়ে গেল। বুঝলাম্‌—রুগ্ন আমাকে স্নেহের ভান করে ঘরে পাঠিয়ে, বিশ্বাসঘাতিনী আজ আরব যুবকের কাছে প্রণয়-নিবেদন করছে। মরুর বুনো পাখী আর খাঁচায় থাকতে চাইছিল না কেন—আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রদোষ! তার পর আমি যেন ভাই পাগল হয়ে গেলুম। আমার যা' কিছু সম্বল, সব যেন অতলে তলিয়ে গেছে—ভেবে আমি উন্মাদ হয়ে উঠ্‌লাম। জীবনের শুষ্ক কম্প-প্রবাহের মধ্যে কে আমাকে আর এমনি ক'রে বুকে টেনে নেবে। কত অসহায় আমি! দুনিয়ার যা' ঘাটের কড়ি তা'ও যেন আমার হারিয়ে গেল—কি সম্বল নিয়ে এ জীবনের যাত্রা-পথে রইব আমি?

রোশেনা যেন আমার অবস্থা দেখে কেমন হ'য়ে গেল। কত আকুল প্রশ্নে আমার শরীরের অবস্থা জানতে চাইত, কিন্তু সে প্রশ্নে মন যেন আমার বিষিয়ে উঠ্‌ত। নিষ্ফল রোষে আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌তাম। রোশেনার পাণ্ডুর মুখের উপর কে যেন কালি লেপে দিত।

সে সন্ধ্যায় রোশেনা বাড়ী নেই। আমি হিংস্র রোষে যেন পাগল হ'য়ে গেলুম। রিভলভারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পায়ে চলার পথের উপর ধীরে ধীরে পায়চারী কর্‌তে লাগ্‌লুম। সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝ দিয়ে তালগাছের মর্ম্মর ধ্বনি কাণে এসে পৌঁছুচ্ছিল। মনে আমার যেন আগুনের খেলা। চাইছিলুম আমি সব ভুলতে, কিন্তু—পারি কই? বনের পাখী আজ আমার হৃৎপিণ্ড টেনে তুলে নিয়ে গেছে—আমি বাঁচব কি দিয়ে? ধীরে হেঁটে বাড়ী-মুখে ফিরছি—স্তব্ধ মরুর বুকে সন্ধ্যার আঁধার জমাট হয়ে আছে।

বাড়ীর কোণের ডালিম গাছটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালুম,—দেখলুম, মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমজাদ ও রোশেনা। আমজাদের হাত থেকে কি একটা জিনিষ যেন রোশেনা তু'লে নিলে। আমি পাগল হ'য়ে গেলুম! রুগ্ন, 'ক্লান্ত, চিন্তাদগ্ধ মাথা সবকটা শিরা যেন টন্ টন্ করে ছিঁড়ে গিয়ে মাথার ভিতর একটা তাণ্ডব উল্লাস আরম্ভ করেছে, চোখের তারা-গুলো যেন আগুনের ফিন্‌কা হ'য়ে ছুটে বেরুতে চাচ্ছে। পারলুম না আমি,—হাতের ভারী রিভলভার বের করলুম। কোন্ দানবের পিশাচলীলায় যেন এ ক্ষুদ্র মরুপ্রান্তর কেঁপে উঠ্‌ল, সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকার যেন স্তব্ধ বিস্ময়ে গর্জ্জে উঠ্‌ল—ঘোড়ায় টিপ পড়ল—ওঃ!! * * * * *

* *　　　* *　　　* *

প্রদোষ! আমারই রোগশান্তির জন্য বনের পাখিটী আমার তরবারী বিক্রী ক'রে আমজাদকে দিয়ে বাগ্‌দাদ থেকে ওষুধ আনিয়েছিল! সে দিন সন্ধ্যায় সে ওষুধটাই নিচ্ছিল সে। কেন জান? আমার এ দগ্ধ-জীবনটাকে আবার প্রাণরসে বাঁচিয়ে তুলতে। অচ্ছা, প্রদোষ, হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে কি বাঁচা যায়? কেন? আমি তো বেঁচেই আছি! * *

এখনো সাঁঝের আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে—সে ছোট্ট কবরটীর উপর একটী আলো জ্বেলে দিয়ে বসে থাকি। ধূসর সন্ধ্যা আমার আশে পাশে জমাট হ'য়ে থাকে। বুক দিয়ে আমি কবরের ভেতর তা'র বুকের স্পন্দন অনুভব করি। লোকে জানে আমি পাগল সৈপাই মীর হবিব—বাগ্‌দাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই; কিন্তু আমি জানি যে আমি বাংলারই প্রবাসী ছেলে—রবি মিত্র!

তোমার
রবি

একজামিনের পর

শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়

দুই মাস খুব কঠিন পরিশ্রম করে পড়া গেল। সারা দুটো বছর ধরে কি করেছি তারই হিসাব নিকাশ করতে হ'বে। দেখতে দেখতে একজামিনের দিন ঘনিয়ে এল। ১০ই মার্চ্চ একজামিন্ আরম্ভ হ'ল। দশদিনে শেষও হ'য়ে গেল। যতটা আশা করেছিলাম তা হ'ল না।
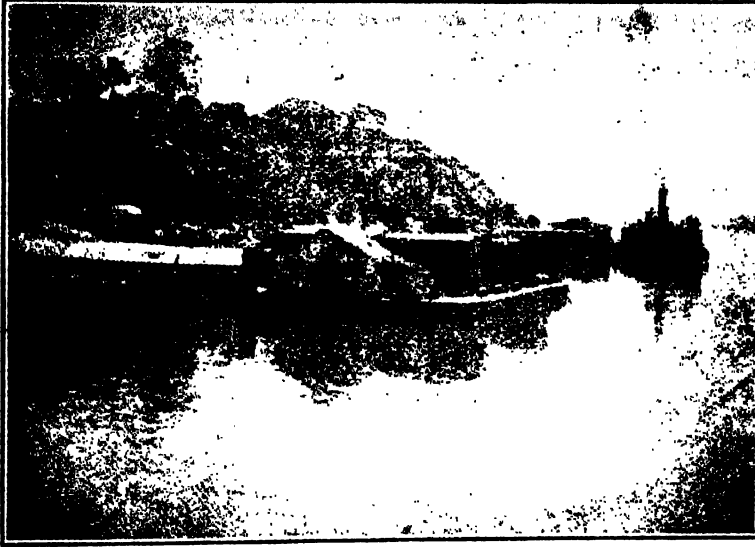
এইবার বইগুলিকে আল্‌মারির মধ্যে ইন্‌টারণ ক'রে, কি করে সময়ের সংহার করতে হ'বে তারই উপায় চিন্তা করতে বসা গেল। শেষে ঠিক করলাম, কেবল খাওয়া, বেড়ান আর নিদ্রা। কিন্তু, ও সঙ্কল্প বেশী দিন টিক্‌লো না।

কলকাতায় গরম বেশ বাড়তে আরম্ভ করল। খেয়ে, শুয়ে, বেড়িয়ে যেন দিন কাটতে চায় না। তখন একটা ঠাণ্ডা জায়গায়

আমিন গাঁয় ষ্টীমার

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা সত্যি সত্যিই ভয়ানক। ম্যাট্রিকে এত বেগ পেতে হয় নি। ছোট ছোট বই বেশ সহজেই তৈরী হ'য়ে যেত। একে পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া, আবার তার মুখোমুখি দুই একজন আত্মীয়ের বি'য়ে হ'য়ে গে'ল। তা'তে যে'তে পারলাম না ব'লে অনেকে অনেক কথা শোনালেন। কেউ বল্‌লেন, "এবার প্রথম হ'তে হ'বে।" আবার কেউ বল্‌লেন, "স্কলার-সিপ্ না পে'লে দেখে নেবো।" মাথা হেঁট করে সব চুপ্ করে শুনে গেলাম। বোবার শত্রু নেই।

পাণ্ডুঘাট।

পালাব এই ঠিক কর্‌লাম। সুযোগও যথেষ্ট ছিল। একজন আত্মীয় থাকেন দারজিলিংয়ে; আর একজন

থাকেন শিলংয়ে—দুইই বেশ ঠাণ্ডা স্থান, আর মনোরমও বটে। কোথায় যাই এই নিয়ে একটা সমস্যা বাধ্‌ল। শিলংয়ে গত বছর গিয়েছিলাম; সেইজন্য এবার দার্জ্জিলিং যাবার বড় ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু, শেষে শিলং যাওয়াই স্থির হ'ল। ঠিক সেই সময় কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হ'ল। দাঙ্গা একমাস ধরে চল্‌ল্। আমার যাওয়াও বন্ধ থাকল। কলিকাতায় ব'সে ব'সে কত কি যে দেখলাম্, কত গুলির আওয়াজ শুন্‌লাম, তার ঠিকানা রাখে কে? তার পর দাঙ্গা একটু থাম্‌লে, ১৩ই মে শিলংয়ে রওনা হলাম্।

নংপো

"নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ তালে বাতাসের শন্ শন্ শব্দ সুর দিচ্ছে"

শিলং মেল ৩-২৪ মিনিটে শিয়ালদহ ছাড়ে। তার আগেই গুরুজনদের প্রণাম করে ৩-১৫ মিনিটে শিয়ালদহ ষ্টেশনে হাজির। একটা ট্রাঙ্ক, আর একটা বিছানা নিয়ে গাড়িতে চড়ে বস্‌লাম্। ঠিক সময় গাড়ী ছাড়্‌ল। বিলাতী কায়দায় রুমাল উড়িয়ে, ষ্টেসনে যাঁরা বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁ'দের কাছে বিদায় লইলাম।

গাড়ী হু হু শব্দে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। সঙ্গে একটা

বৃষ্টির পর

বিলাতী মাসিক পত্র ছিল। তার দু'চারটে পাতা ওলটাবার পর আর পড়তে ইচ্ছে হোলো না। চারিদিকে যেন
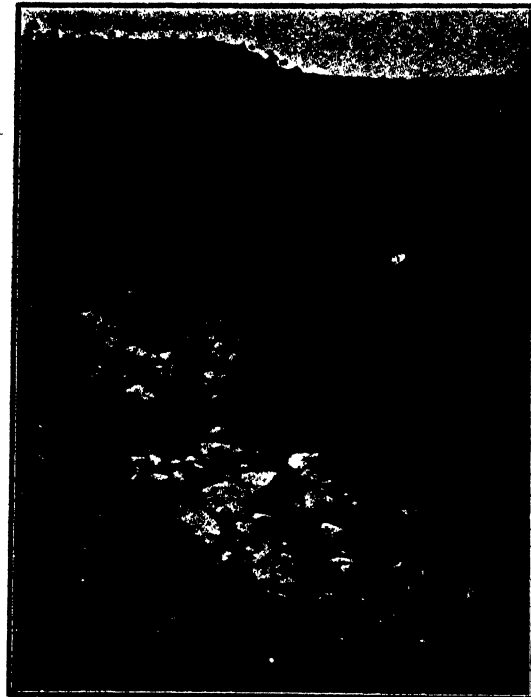
বাজারের দিনে

দুইধারে সবুজ ঢালু পাহাড়ের মধ্যে আঁকা বাঁকা নদী

পাইনের মধ্যে
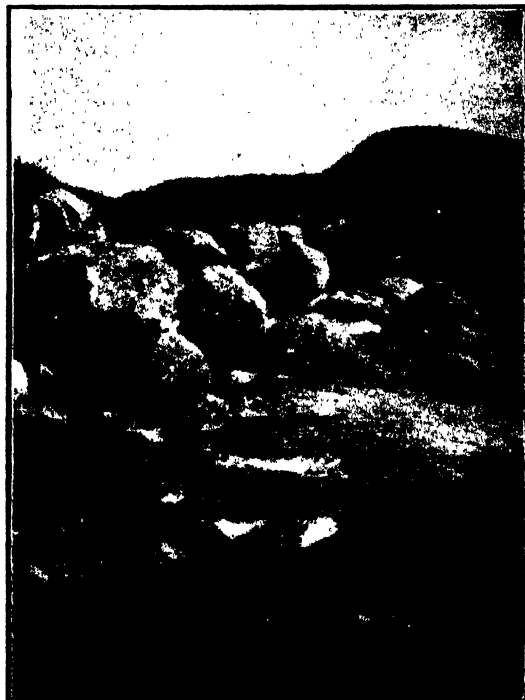
নদীর আর একটী দৃশ্য

অগ্নিবৃষ্টি হ'চ্ছে। যেন লু চল্‌ছে। গাড়ীর কাঁচ উঠিয়ে দিলাম।

প্রায় ৫টার সময় গাড়ী রাণাঘাটে এ'সে উপস্থিত।

বাগানের মধ্যে—বৃষ্টির পর

বাজারের দিনে—খাসিয়াদের চায়ের দোকান

রাণাঘাটে দুই একটি ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছিল। একটু ঠাণ্ডা ব'লে বোধ হ'ল। রাণাঘাট ছাড়বার পর দুই এক পশলা বৃষ্টি পাওয়া গেল। ঠাণ্ডা হাওয়াও বইতে লাগ্‌ল। ধড়ে প্রাণ এ'ল। খোলা মাঠের পানে চেয়ে মনে অনেক কবিত্ব-ভাব জাগ্‌তে লাগ্‌ল। তখন সন্ধ্যার ছায়া আস্তে আস্তে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়্‌ছে। দিনান্তের ক্লান্ত রবি সুদূর প্রান্তরের পশ্চিম কোণ দিয়ে ডুবে যাচ্ছে। Now fades the glimmering landscape on the sght" —লাইনটা চট্ ক'রে মনে এ'ল। কৃষকরা গরুগুলিকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে কত কথা মনে হোতে লাগ্‌লো।

পথের ধারে—pineএর মধ্যে পরিত্যক্ত কুটীর; ডানদিকে Hydroelectricএর shwice gole.

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হ'য়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। চারিদিকে একটা এমন সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ্‌ল, সে আর কি বল্‌ব। বহু দূরে একেবারে দিগন্তের

কাউন্সিল্ হাউস্—Council House.

শিলা টর

মোটর ষ্টেশন

বাজার

শেষ প্রান্তে গাছ পালার সারি দেখা যাচ্ছিল। "সেখানটা এখন মায়াময় হ'য়ে উঠ্‌ল। নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া

বাজারের পথে

হ'য়ে এ'লো, মনে হ'লো—ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ী, ঐখানে গিয়ে সে আপনার রাঙ্গা আঁচলটী শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ—ঠিক অশ্রুজল নয়, একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো।—"

গাড়ীও খুব জোরে চলেছে। সূর্য্যদেব অস্ত গেছেন। দিনের আলো মিট্‌ মিট্‌ ক'রে তখনও পৃথিবীর পা'নে চেয়ে আছে; যেন মায়া কাটাতে পারছে না। এমন সময় গাড়ীটা সাড়ার হার্ডিং পুলের উপর উঠ্‌ল। নীচে পদ্মা। প্রকাণ্ড নদী। "কলকলস্বনে নবীন নীরদ-কান্তি নিন্দি নীল নীরে তরঙ্গ বিভঙ্গে নাচি সমীরণ সনে" বহিতেছে। নৌকাগুলি দলবদ্ধ হ'য়ে পারে নঙ্গর করে রয়েছে। দুই একটা এদিক সেদিক পাড়ি দিচ্ছে। মনে পড়্‌ল একদিন কবি প্রাণের আবেগে এই সময় গে'য়ছিলেন —

কুটীর
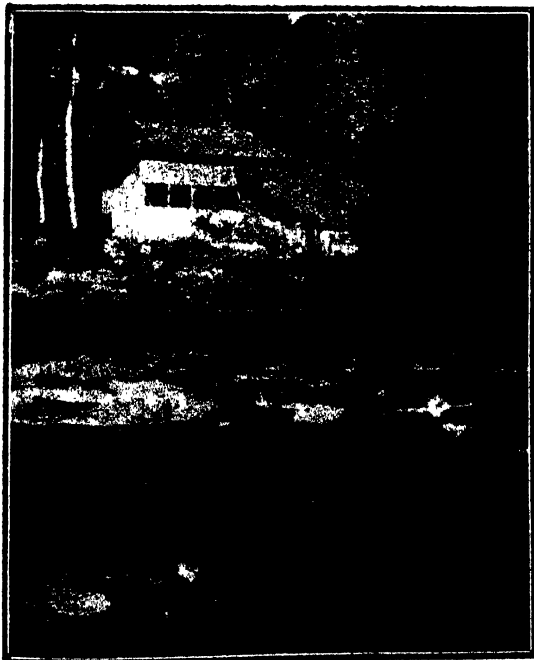
পথের ধারে

"সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ওপার হ'তে একটানা
একটী ছুটী যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে চিন্‌ব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
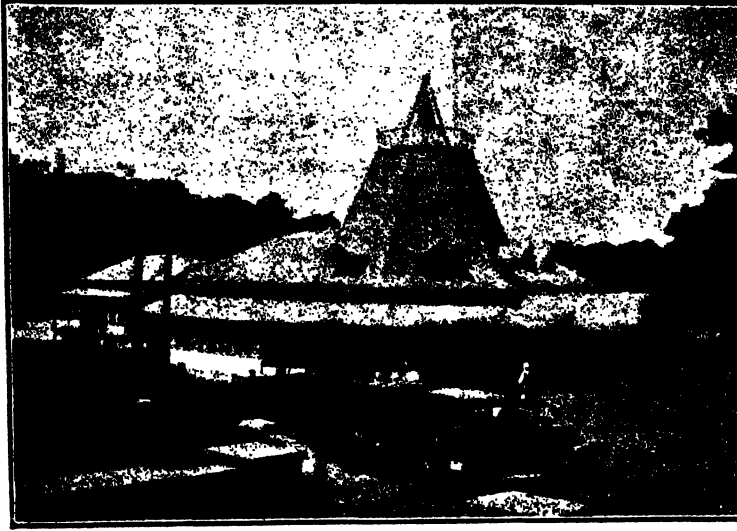
জামাতুল্লার প্রসিদ্ধ দোকান

* * * *

ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়।"

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই গাড়ী পুল পার হ'য়ে গেল। সময়ও আস্তে আস্তে কাট্‌তে লাগল। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় গাড়ী সান্তাহার ষ্টেশনে এ'সে দাঁড়ালো। এই স্থানে আমাদের গাড়ী বদল করতে হোলো। তাড়াতাড়ি কুলি ডেকে জিনিসপত্র নামিয়ে প্ল্যাটফরমের অপর পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। এক দফা ওঠা-নামার পর্ব্ব শেষ হোলো। সেই দু-পহরে আহার হয়েছিল; আর এখন রাত নটা বেজে গেছে। সুতরাং ক্ষুধার আর অপরাধ কি? তাড়াতাড়ি কুলিকে পয়সা দিয়ে মুখ ধুলাম। তার পর জঠরাগ্নিকে ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়্‌লাম। একটু পরে গাড়ী ছাড়্‌লো। বেশ একটু ঠাণ্ডা বোধ হ'ল। তার পরই ঘুমে বিভোর।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখি, ভোরের আলো গাড়ীর মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। একটু পরেই পূব্‌ দিকটা রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল। বড় সুন্দর সে দৃশ্য। গাড়ী এসে গোলোকগঞ্জ ষ্টেশনে দাঁড়ালো। একটু পরেই গোলোকগঞ্জ ছাড়িয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুট্‌লো। শীতের চোটে গরম জামা আর মোজা চড়াতে হ'ল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ চল্‌ল; সেটা ছাড়িয়ে খানিকটা যাওয়ার পর ছোট ছোট পাহাড় দেখা দিল। কেউ বা নেড়া আর কেউ বা জঙ্গল-ভরা। দূরে উত্তরে মেঘের মত এক পর্ব্বত-শ্রেণী দেখা যাচ্ছিল; সেটা বোধ হয় গিরিরাজ হিমালয়। সেই পর্ব্বতশ্রেণী অনেকক্ষণ দেখ্‌লাম; শেষে বেলা হ'য়ে গেল; আর দেখা গেল না। অনন্তের কোলে মিলিয়ে গেল।

শাবাণের দৃশ্য

"পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।"

নদীর শেষ পরিণাম

সাড়ে আটটায় গাড়ী সরভোগে এসে থাম্‌ল। সেখানে একটা ছোট-হাজিরি করা গেল। কিন্তু হাজার হোক ব্রাহ্মণ মানুষ; ও সব বিলাতী ভোজে তৃপ্তিও হয় না, পেটও ভরে না।

গাড়ী ছাড়্‌ল। ক্রমে ক্রমে আমরা পাহাড়ের রাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে লাগ্‌লাম। পাহাড়গুলি বেশ কাছে কাছে, আর জঙ্গলে ভরা। না জানি তার মধ্যে কি না আছে। বেলা প্রায় বারটার সময় গাড়ী আমিনগাঁতে এসে ঢুক্‌ল। এইখানে ই-বি-আরএর লাইন শেষ। সামনেই ব্রহ্মপুত্র। ও-পারে পাণ্ডু। এখানে একটা ফ্লাট আছে; সেইটা যাত্রীদের ও-পারে নিয়ে যায়। ইতিপূর্ব্বে দুই চারজন আত্মীয়ের সহিত এখানে দেখা হ'বার কথা ছিল ও একসঙ্গে শিলং যাব এই স্থির ছিল। তাঁদের সহিত ফ্লাটে দেখা হ'ল। এটা দোতলা। ওপোর থেকে প্রকৃতির দৃশ্য বড় সুন্দর। নদীটার দুইদিকে পাহাড়। দূরে নদীর বাঁকে গৌহাটীর ছোট ছোট বাড়ীগুলি বেশ দেখা যায়। উর্ব্বশী ঘাটের কতকটা নেত্রপথে পড়ে। গতবার ফিরবার পথে গৌহাটী ও ৺কামাখ্যা ধাম দেখে আসি। সে সময় এই উর্ব্বশীঘাট দেখি। ঘাটটী বড় সুন্দর। সেখানে একটা গোঁ গোঁ শব্দ সর্ব্বদা শোনা যায়। নদীর তলে পাহাড়ের গায় স্রোতের ধাক্কায় এই শব্দ উঠে। স্রোতও এইখানে ভয়ঙ্কর। নদীর মাঝে একটা ছোট দ্বীপ। দ্বীপের উপর ৺উমানন্দের মন্দির।

বেলা ২-৩০ মিনিটের একটু পরেই আমরা পাণ্ডুতে এলাম। এখান থেকে ৬৮ মাইল মোটরের পথ। পাণ্ডু থেকে শিলং যেতে হ'লে দুইটী উপায় আছে। এক হয় প্রথম শ্রেণীতে, না হয় মেল গাড়ীতে। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রত্যেকের ২৪৲ টাকা; অন্যটীর ভাড়া ১০৲ টাকা। 1st. classগুলি Wyllis Knight car। কোনটা 5 Seater, আর কোনটী 7 Seater। আমাদের জন্য একখানি গাড়ী পূর্ব্বেই রিজার্ভ ছিল। সঙ্গে দুই একটা ছোটখাট জিনিষ নিয়ে অন্যগুলি লগেজে দিয়ে গৌহাটীর দিকে রওনা হওয়া গেল। একটু পরেই মোটর-

পুলিশ বাজার

আফিসে উপস্থিত হওয়া গেল। সেইখানে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। ম্যানেজারবাবু সব কাজ ফেলে

পাহাড়ের মাঝে

Ward's Lake—ওয়ার্ড লেক্-শিলং

প্যারেডের দৃশ্য—সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে

পার্ব্বত্য নদী
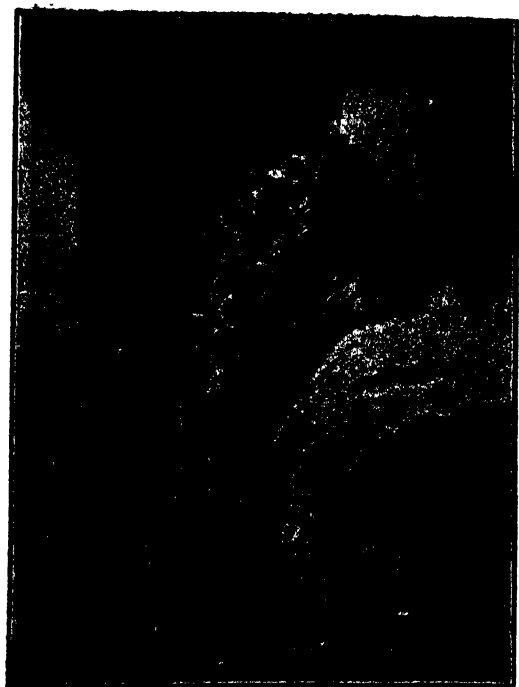
আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌তে এত যত্নবান হ'লেন যে আমাদের বিশেষ লজ্জিত হ'তে হ'য়েছিল। আহারান্তে ম্যানেজারবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে শিলংয়ের দিকে চল্‌লাম।

টেলিগ্রাফ আফিস্

তখন বেলা দেড়টা। মোটরের রাস্তাটা গৌহাটী থেকে একেবারে সোজা ৭ মাইল গিয়ে পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে। চারিদিকে খোলা মাঠ ধূ ধূ করছে। ৮কামাখ্যা পাহাড়ের চূড়া থেকে রাস্তাটা বড় সুন্দর দেখায়—যেন একটা মাথার তেড়ি কাটা রয়েছে। ৭ মাইল এসে আমরা P. W. D. Time-keeper-এর গেটে উপস্থিত হ'লাম। একটু শীঘ্র এসে-ছিলাম বলে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল। শেষে সময় হ'ল। Time keeper বাবু একটা চালানে সহি দিলেন। গাড়ী ছাড়্‌ল।

এইবার আমরা ঠিক পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে আরম্ভ কর্‌লাম। রাস্তাটা আঁকাবাঁকা, আর চড়াইও বেশ আছে। এক একটা বাঁক ছাড়াই, আর খানিকটা করে উঠে যাই। কিন্তু রাস্তা খুব চমৎকার; আমাদের রেড রোডের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। চারিদিকে পাহাড়; সেই পাহাড় গভীর জঙ্গলে ঢাকা। আমাদের একটু আধটু শিকারের সখ আছে, তা বোধ হয় গাড়ীচালক জান্‌ত। এক জায়গায় একটু ব্রেক ক'সে সে বল্‌ল যে, সেইখানে কিছুদিন আগে গাড়ীর সাম্‌নে একটা বাঘ পড়েছিল। তার কথাটা মিথ্যা ব'লে ওড়ান যায় না। কারণ সে যে জঙ্গল, তাতে বাঘের চেয়ে আরও অনেক বড় বড় মহারাজের আড্ডা থাকতে পারে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমরা বার্ণিহাটে এ'সে থাম্‌লাম্। এখানে আরও তিনটা গাড়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল। চালানে টাইমকিপারের সহি নিয়ে চালক মালা শিং গাড়ী ছাড়্‌ল।

জঙ্গল আরও ঘন হ'তে লাগ্‌ল। এক এক স্থান এমন যে সেখানে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ কর্‌তে পারে না। স্থানে স্থানে কুলিরা রাস্তা মেরামত কর্‌ছে। কেউ বা পাথর ভাঙ্গছে, কেউ বা পাহাড় ফাটিয়ে পাথর বাহির কর্‌ছে। রাস্তায় একটু গর্ত্ত হ'লেই তারা সেটা মেরামত করে। এই রকম যত্ন করা হ'য় বলেই রাস্তাটা আছে। শুনেছি না কি মোটর কোম্পানীকে প্রতি বৎসর এই রাস্তায় গাড়ী চালানোর জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা দিতে হ'য়। পল্লীগ্রামের জেলাবোর্ডের রাস্তা হ'লে শিলংয়ে যাওয়া এক ভয়ানক সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌ত।
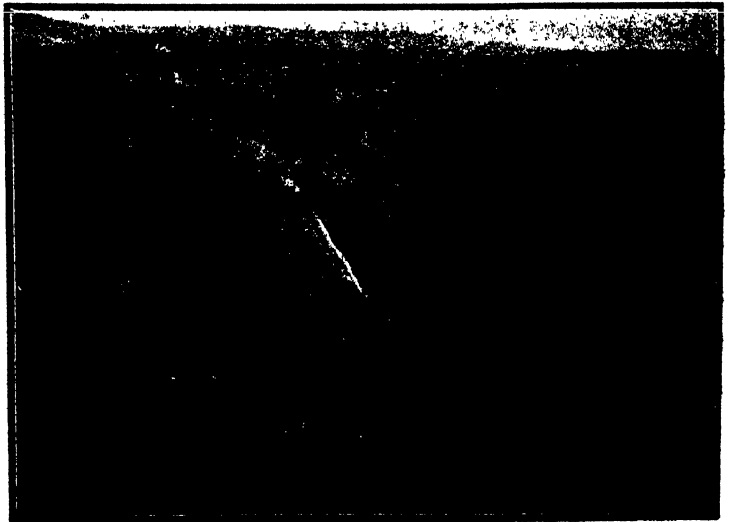
প্রকৃতির কোলে—একটী জলপ্রপাতের দৃশ্য

Bishop's Fall

বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা Nongpohতে এ'লাম। Nongpoh শিলং ও গৌহাটীর একটা মাঝামাঝি জায়গা।

ঋষির পল্লী (সম্মুখে পুরাতন স্বাস্থ্য নিবাস)

এইখানে খানাপিনার ব্যবস্থা আছে। ডাক ও তার আফিসও নূতন খোলা হ'য়েছে। এখানে গাড়ী প্রায় ১৫।২০ মিনিট দাঁড়ায়। দুই একটা লেমোনেড খেয়ে একটু এদিক্‌-সেদিক্‌ বেড়ান গেল। একটু পরেই আবার গাড়ী ছাড়ল।

Nongpoh ছেড়ে খানিকটা যাওয়ার পর ইংরাজিতে যাকে বলে Zigzag Road—সেই রকম আঁকা-বাঁকা রাস্তা আরম্ভ হ'ল। মোড়ে মোড়ে লেখা "Caution Z"। চড়াইও আগেকার চেয়ে বেশী। রাস্তার এক দিকে পাহাড়, আর এক দিকে ১০০।১৫০ ফুট পাহাড়ের ঢাল নেমে গিয়েছে। নির্ঝরের ঝর্‌-ঝর্‌ তানে বাতাসের শন্‌ শন্‌ শব্দ সুর দিচ্ছে। তার মধ্যে এদিক-সেদিক থেকে দুই একটা পাখীর আওয়াজ এ'সে সে তাল কেটে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমাদের সারথি মালা শিং তাঁর গুরুগম্ভীর স্বরে সেই সুরে সুর মিলাচ্ছেন্‌। এর মধ্যে হঠাৎ একটা নূতন সুর কাণে গেল। ফিরে দেখি, আমার দাদা ভৈরবী আলাপ আরম্ভ করেছেন। শ্রীমান্‌ শৈ—-ও আবার তাঁর সঙ্গে যোগ দিবার মতলব করছেন। নাঃ! আর থাকা গেল না। এ সময় চুপ করে থাকা নেহাৎ গন্তের চিহ্ন। আমিও আস্তে আস্তে মীরা-বাইয়ের "মেরে গিরিধর গোপাল, দুসরণ কোই" আরম্ভ করলাম্‌। দুই লাইন গাওয়ার পর সুর ভুল হ'য়ে গেল। অনেক মাথা নাড়া দিলাম; হাতে তাল্‌ দিলাম; সুর আর মনে এ'ল না। কিন্তু চুপ করে থাকা হ'বে না। গাড়ীতে সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী তখন পূর্ণমাত্রায় চলেছে। কি আবার আরম্ভ করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ বিজয়বাবুর 'দুই চরণ মনে পড়ে গেল। আমিও আরম্ভ করলাম—

"কি সুখে ডাকরে পাখী
দুপুরের রোদে,
থাম তুমি বাছা মোর
খেতে দিব বোঁদে।"

দুই লাইন গান—এক সুরে অনেক-ক্ষণ গাওয়া যায় না। সেইজন্ত আমি সব সুরেই দুই একবার গাহিতে লাগলাম্‌।

পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য

গাহিতে গাহিতে Umranএ এ'সে উপস্থিত। তখন বেলা প্রায় ৫টা। এখানে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। দৃশ্য

দেখা দূরে থাকুক্ সকলের গান বন্ধ হ'য়ে গেল। একেবারে ঝমাঝম বৃষ্টি। হুড লাগিয়ে দিয়ে কোন রকমে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা গেল। কিন্তু যে রকম চট্‌পট্‌ ধ্বনি হচ্ছিল,

খাসিয়াদের ধনুর্বিদ্যায় প্রতিযোগিতা

তা'তে হুড ফুটো হ'য়ে যা'বার একটু আশঙ্কা হ'য়েছিল। প্রায় চার মাইল যাওয়ার পর বৃষ্টি থাম্‌ল। মালা শিং গাড়ী থামিয়ে পাশের পর্দ্দা খুলে দিল। চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রকৃতির ছবি বদ্‌লে গেছে। আর সে নিবিড় অরণ্য নাই। চারিদিকে তৃণাচ্ছাদিত পাহাড়। কোনটার গায় মেঘ জড়িয়ে আছে; কাহারও বা মাথাটা মেঘে ঢাকা, আর সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে লাল রাস্তা চলেছে। পাহাড়-গুলির উপর বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। তাদের গা দিয়ে টিপ্‌ টিপ্‌ করে জল ঝর্‌ছে।

খানিকটা পরে আমরা বরপানি ব'লে একটা জায়গা আছে সেইখানে এ'লাম। এখানে মোটরের থামবার কথা নাই বটে, কিন্তু চালকরা দুই এক মিনিট এখানে দাঁড়ায়। বরপানি একটা দুধের আড়ত। এখান থেকে শিলংয়ে দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি যায়। মোটরের এর রাস্তা দিয়ে শিলংয়ে গেলে ৯ মাইলের পথ। কিন্তু ওদেশের লোকেরা পাহাড়ের উপর দিয়া অনেক পাকডাণ্ডী করে নেয়।

বরপানির ছোট সেতুটা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নেড়া পাহাড়ের দেশ ছেড়ে পাইনের রাজত্বে ঢুক্‌লাম। এখন যেদিকে চাই সেইদিকেই পাইন। তখন বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। হাওয়াতে পাইনের শন্ শন্ গীত বেশ সুমধুর লাগ্‌ছিল।
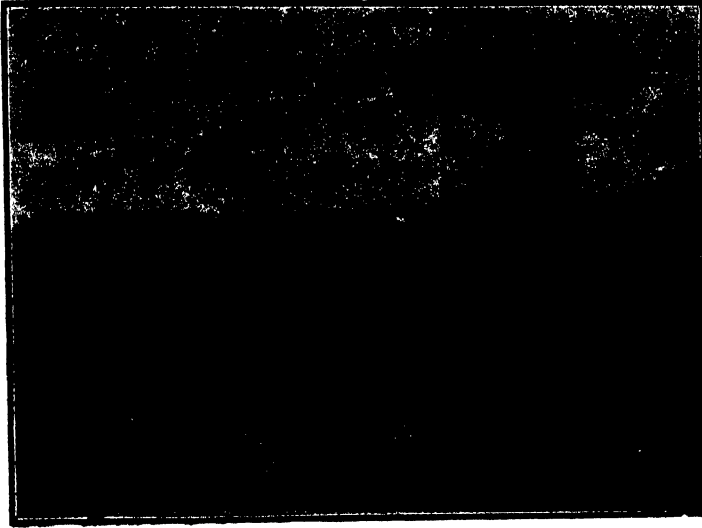
"নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, আর তা'রই মাঝখানে একটী সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা,—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত পাহাড়ের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোম্‌টা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্ব্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তের কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লান নেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ ক'রে আস্‌ছে।"

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপর ছড়াতে লাগ্‌ল। পাহাড়গুলি কাল কাল হ'য়ে গেল। পশ্চিম দিকের উঁচু পাহাড়ের পিছন দিকটা রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল। গাড়ী শিলংয়ের St Carrierএ এ'সে দাঁড়াল।
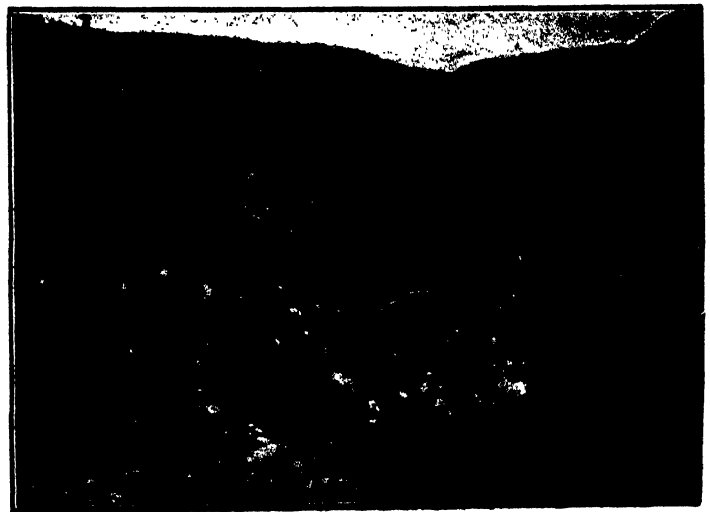
উপত্যকার মাঝে

টাইম-কিপার বাবুর সহি নিয়ে আমরা শিলংয়ের মধ্যে দিয়ে চল্‌লাম্। এক বছর কেটে গেছে, কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌লাম না। চারিদিক্ দেখ্‌তে লাগলাম,

আর পুরান স্মৃতি সব আমার মনে জেগে উঠতে লাগ্‌ল।

গোধূলি যায় যায়, রাত্রির তিমির পৃথিবীকে ক্রমে

বাজারের দৃশ্য

অচেতন করে করে, এমন সময় গাড়ী শিলং ষ্টেশনে এ'সে দাঁড়াল। অনেক দিনের পর আবার সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল। মনের আহ্লাদে সকলে বাড়ী গেলাম।

শিলংয়ের দৃশ্যের বর্ণনা করে কথাটা শেষ করলেই ভাল হোতো; কিন্তু আমি কবি নই, সুতরাং কাব্যি করা আমার দ্বারা পুষিয়ে উঠবে না। এক্‌জামিনের পর হাত-পা ছড়িয়ে পাহাড়ের মধ্যে বিশ্রাম করতে এসেছিলাম; এখানে এসে তাই করছি। যাঁরা তবুও শিলংয়ের কিছু দেখতে চান, তাঁরা, এই লেখাটার সঙ্গে যে সব ছবি দিলাম, তাই দেখে শিলংয়ের পরিচয় নেবেন। তাতেও যাঁদের মন উঠবে না, তাঁরা একবার আলস্য ত্যাগ করে এই পূজার বন্ধে শিলং পাহাড়টা দেখেই আসুন না—এই ত কাছেই। আর এ উপলক্ষে যা ব্যয় হবে, শিলংয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তা যে পুষিয়ে যাবে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে ব'লে দিতে পারি।

দাক্ষিণাত্য

৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই

১৯১৫ অব্দের জুলাই মাসে যখন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের জন্ত আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিদায় প্রার্থনা করি, তখন, ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির ইতিহাসোদ্ধারের তীব্র ও উৎকট বাসনা মনকে একটুও চঞ্চল হইতে দেয় নাই। তখন বহু দিনের গুপ্তবাসনা সার্থকতা লাভ করিবে এই চিন্তায় মন হর্ষগর্ব্বভরে প্রফুল্ল ছিল। শুদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ও ভারতের বিরাট জাতিকে দেখিব, এই বাসনা লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলাম; স্বর্ণখনি যে দেখিতে যাইব এ বাসনা ক্ষণেকের জন্ত মনে স্থান পায় নাই। স্বর্ণের উপর আমি চিরকালই বিগতস্পৃহ, বা স্বর্ণ আমার উপর চিরকালই বিমুখ। এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের দিনে এ কথা ব্যক্ত করা বিবেচকের কার্য্য নহে। কাঞ্চনের সহিত কামিনীর চিন্তাও মন হইতে দূরে পলাইয়াছিল; কেন না, যাত্রা করিবার সময় বা পূর্ব্বে সকলকে প্রণাম আলিঙ্গন করিয়া একজনের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। যাহা হউক, তজ্জন্য বিশেষ গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই। কেন না, শুনিয়াছি যে, আমি এক বিকৃত-রুচি-সম্পন্ন, নীরস, কবিত্বহীন, "ঢিট্রকেল" মানুষ; সুতরাং আমাকে কিছু বলিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু কেহ যদি সে সময় আমার হৃদয় পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই দেখিতেন যে, কবিত্বের একটা ঐকতানিক প্রবাহে

আমার কোথায় আসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, কবি হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতাম,

"দক্ষিণ পবন
সেদিন জাগায়েছিল চঞ্চল পরশে
মোর কুঞ্জবন;
মুখরিত চারিদিক
ওগো উঠেছিল পিক,
নবীন মুকুল ঘিরি ছিল অনিবার
মধুপ ঝঙ্কার,
হে প্রিয় আমার!"

কবির প্রিয় কে তাহা জানি না; আমার প্রিয়ের পরিচয় জানিবার আবশ্যকতা নাই। সাধনা ভিন্ন শুদ্ধ পরিচয়ে কোন ফল নাই!

সে যাহা হউক, দুই মাস কাল দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালোরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে ফিরিয়া আসিয়া শিব-সমুদ্রমের জলপ্রপাত ও বৈদ্যুতিক কারখানা দেখিয়া আসিলাম। সেখানে বন্ধুবর শিল্পী শ্রী—বাবুর সহিত দেখা; তাঁহাকে লইয়া এবারে কোলারের স্বর্ণখনি দেখিতে যাত্রা করা গেল।

কোলারে যাইবার জন্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটির রেজিষ্ট্রার (Registrar, Co-operative Credit Societies) তাঁহাদের ভক্ত মিঃ নারায়ণ আয়াঙ্গারকে জানাইলেন; আয়াঙ্গার মহাশয় চিঠি লিখিলেন ও তারযোগে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সে সময় সকলকে দেখিবার অনুমতি দিত না; এবং যাঁহাদিগকে দেখিবার আদেশ দেওয়া হইত, তাঁহাদিগের নিকট ৫ টাকা ফি লওয়া হইত। ইহা War-fundএ জমা হইত। এ কথা মন্দ নয়।

নারায়ণ আয়াঙ্গার মহাশয় মহীশূরস্থ মহাজনী যৌথ-কারবার-সমূহের রেজিষ্ট্রার। ইহার পূর্ব্বে ইনি যুবরাজের গৃহশিক্ষক ছিলেন। ইনি ডেপুটি কমিশনার বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সমশ্রেণীস্থ কর্ম্মচারী। ইঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। মানুষটা যেন মাংসপেশী দিয়েই তৈরী; sentiment বা ভাবগর্ভ জাতের বড় ধার ধারেন না; ইনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ভক্ত। ইঁহারই অনুগ্রহে আমাদের কোলারে যাইয়া খনি কর্ম্মচারীদের বিশ্রাম ও আহার করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছিল; না বলিয়া আমাদের দু'জনের ফিও তিনি পূর্ব্বেই জমা দিয়াছিলেন। অবশ্য আমরা তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। অপরের জন্য এরূপ সুবিধা বড় কেহ করিয়া দেয় না। আমার সঙ্গে স্বামী অম্বিকানন্দেরও যাইবার কথা ছিল; তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি যাইলেন না। এদিকে বন্ধুবর শ্রী-বাবুও যাইতে ইচ্ছুক। আমরা দু'জনে যাত্রা করিলাম।

কোলারে যাইতে হইলে মান্দ্রাজের লাইনে বাউরিংপেট (Bouringpet) পর্য্যন্ত যাইয়া গাড়ি বদল করিতে হয়। সেখান হইতে খনির দিকে এক লাইন গিয়াছে; ইহা দৈর্ঘ্যে ১০মাইল। বাউরিংপেটে দেখি যে Co-operative Credit Societyর একজন ইন্‌স্‌পেক্টর আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন। তিনি স্বামী অম্বিকানন্দকে না দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। এ দেশের লোকে রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত সাধুদের বড়ই শ্রদ্ধাভক্তি করে। শুধু সচ্চরিত্রের জন্য ইঁহাদিগকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না; ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলে ইঁহাদের চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয় না এমন লোক বিরল। ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় আমাদের প্রাতরাশের জন্য যথেষ্ট খাবাবুঁদি, লাড্ডু, নান্‌খাটাইর মত বিস্কুট আনিয়াছেন। খাবাবুঁদি বড় উপাদেয়; ইহা লবণাস্বাদযুক্ত বোঁদের মত মিষ্টান্ন। ইনি ঘটপূর্ণ করিয়া উত্তপ্ত করিয়া লইলেন। আমরা গাড়িতে আহার করিতে করিতে খনিস্থান বা Mining Districtএ আসিয়া পঁহুছিলাম। লাইনের দুই পার্শ্বে মাঝে মাঝে Hoisting Machine বা মানুষ বা ধাতু-প্রস্তরবাহী খাঁচা বা বাক্স উঠাইবার ও নামাইবার কল দেখা গেল। কুলিদিগের বাসস্থানগুলি কেমন শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে দেখা গেল; কিন্তু এগুলি দৈন্যের ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। খনিস্থ কর্ম্মচারী-গুলির বাসস্থান, গির্জ্জাগৃহ, ঔষধালয় সমস্তই নয়নগোচর হইল। রেল লাইনের দুই পার্শ্বে উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ দেখা গেল। এগুলি হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্বর্ণ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। এগুলি কেহ লইয়া যাইতে পারে না; লওয়া আইন-বিরুদ্ধ; কেন না, স্বর্ণখনির পরিচালকেরা আশা করিতেছেন যে, রসায়ন-শাস্ত্রের আরও উন্নতি হইলে, নূতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই মৃত্তিকাস্তূপ হইতে

আহৃত স্বর্ণাবশেষ উদ্ধার করা যাইবে। বাস্তবিক এই প্রকার আশা-প্রণোদিত না হইলে বৈজ্ঞানিক বা ব্যবসায়ীর এক দণ্ড চলে না। পরবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় বালক-বালিকারা আমাদের গাড়ি পূর্ণ করিয়া দিল। ইহারা Champion R ef Stationএর বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছিল। আমাদের গাড়িটা যেন পাঁচ ফুলের সাজী; বালকবালিকাগুলির বেশ ভূষা ও গাত্র-বর্ণের মধ্যে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রতা বর্ত্তমান। তুষার-শুভ্র বর্ণ হইতে কৃষ্ণবর্ণের নানা শ্রেণীর বালক-বালিকা কেমন উচ্চ হাস্য ও গল্পে সমস্ত গাড়িটাকে মুখরিত করিয়া চলিতেছে; তাহাদের সঙ্গে তাহাদের কিশোরী ভগ্নীরাও বিদ্যালয়ে চলিতেছে। বোধ হইতেছিল যেন মেষযূথের সঙ্গে মেষপালক রহিয়াছে। বাস্তবিক বালকবালিকাগুলির স্মিতহাস্যে কোন বিদ্বেষের ভাব নাই; তাহারা মেষের ন্যায়ই নিরীহ প্রকৃতি; কিন্তু ভারতবর্ষের কেমন জলবায়ুর দোষ যে, এই কিশোরীগুলির ভাবে, ভাষায়, ইঙ্গিতে ভবিষ্যৎ জীবনের বিদ্বেষ যেন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতেছিলাম—কেন এমন হয়! আমাদের পথপ্রদর্শক বন্ধুটি বালকদিগকে বিস্কুট খাইতে দিলেন। তাহারাও অম্লানচিত্তে ও বেশ আনন্দের সহিত সেগুলি নিঃশেষ করিয়া দিল। এরা আমাদের দেশের ছেলেদের মত লাজুক নহে, এবং প্রাণস্পন্দন মস্তকের কেশাগ্র হইতে পদের নখাগ্র পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আমাদের গন্তব্য ষ্টেসনটি লাইনের সর্ব্বশেষে। পঁহুছিয়া দেখি যে, ষ্টেসনে সহকারী খনিপরিদর্শক মহাশয় আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহার নাম মিষ্টার সূর্য্যনারায়ণ রাও। মানুষটি বেশ সাধাসিধে ও ভদ্র-স্বভাব। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নিরাপদ খনিতে আমাদিগকে লইয়া চলিলেন। ইহার নাম মাইসোর মাইন্ (Mysore Mine)। এই বন্দোবস্ত হইল যে, প্রথমেই খাদের কার্য্য দেখিয়া আহারাদির পর স্বর্ণ নিষ্কাষণের প্রক্রিয়া দেখিতে যাইব। এক এক খনির মধ্যে অনেকগুলি খাদ বা shaft আছে। সর্ব্বোত্তম খাদ দিয়া নামিবার বন্দোবস্ত হইল; ইহার নাম এড্‌গারস্ সাফ্‌ট্ (Edgar's shaft)। কিন্তু যখন শুনিলাম যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে নামিবার সময় এই খাদে এক সঙ্গে ৪২ জন লোকের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল, তখন মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, এ কথা গোপন করিলে চলিবে না। এই খাদের গভীরতা প্রায় ৪,০০০ ফিট। আমরা সার্দ্ধ দ্বিসহস্র ফিট্ নিম্নে যাইব, এই স্থির হইল।

আমরা এঞ্জিন-ঘরের নিকটবর্ত্তী হইলে মিঃ সূর্য্যনারায়ণ রাও খাদের তত্ত্বাবধায়ক একজন য়ুরোপীয় এঞ্জিনিয়রের হস্তে আমাদের সঁপিয়া দিলেন। আমার মনে তখন Edgar shaftএর ভয় ছিল; সেই জন্য মিঃ রাওকে আমাদের সঙ্গে থাকিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে যখন বলিতেছেন, চলুন, একসঙ্গে খাদের মধ্যে যাওয়া যাক্।" তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল যে, আমরা যে খাঁচায় নামিব, তাহাতে যেন অধিক লোককে অবতরণ করিতে না দেওয়া হয়। এঞ্জিনিয়ার সাহেব অতিশয় ভদ্র; বলিলেন, সেজন্য ভাবিবেন না। আমাদের ন্যায় দর্শক থাকিলে খাঁচা ধীরে ধীরে নামাইবার আদেশ আছে। তিনি এঞ্জিন-চালককে বলিয়া দিলেন, যেন অতিশয় বেগে এঞ্জিন চালান না হয়। এঞ্জিনিয়ার মহাশয় অল্প ও মৃদুভাষী এবং ধীর। তিনি আকৃতিতে শালপ্রাংশু, মহাভুজ; কিন্তু বৃষস্কন্ধ নহেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ঠিক শ্রমজীবী কুলীর ন্যায়; মস্তকে এক প্রকার বিচিত্র টুপী, হস্তে এক এসিটিলিন লণ্ঠন।

আমরা খাঁচায় উঠিলাম। ইহা দ্বিতল। প্রত্যেক তলে ২৫টি করিয়া লোক ধরে। মিঃ রাওকে লইয়া আমরা চারিজন লোক নামিলাম। এঞ্জিনিয়ার সাহেব অবতরণ করিবার পূর্ব্বে খাঁচার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দ্বারের বিপরীত ধারে দাঁড়াইতে বলিলেন। প্রথমে শরীর খুব শিহরিয়া উঠিল; পা একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলে শিহরণের ভাবটা একটু অল্প বোধ হয়; তাহার পর আর সে ভাব রহিল না, বোধ হইল উপরে উঠিতেছি। জিজ্ঞাসা করিলে, এঞ্জিনিয়ার সাহেব বলিলেন যে, আমরা ১২।১৪ মাইল বেগে নামিতেছি। খাদের ধারি বা দেওয়াল ইষ্টকে নির্ম্মিত; আমাদিগকে দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল; কেন না আপেক্ষিক গতির জন্য আমরা যে অতিশয় বেগে অবতরণ করিতেছি এরূপ মনে হইবে। আমরা প্রথমে দুই সহস্র ফিট নামিলে, এঞ্জিনিয়ার সাহেব খাঁচা থামাইয়া তাহার দ্বার খুলিলেন; আমরা সোজা পথে খনির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এ স্থলে খনি-খনন ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে ভাল হয়। খনি-খননের পূর্ব্বে স্থানটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, ব্যবসায়ে দাঁড়াইতে পারে এরূপ মূল্যের ধাতু-প্রস্তর বা Ore আছে কি না, এবং কত নীচে আছে ইত্যাদি। এই পরীক্ষার নাম prospecting। এই পরীক্ষায় ধাতু-প্রস্তরবাহী স্তর কোন্ দিকে, কিরূপ ভাবে প্রসারিত তাহার একটা নক্সা প্রস্তুত করা হয়। পরে খাদ খনন আরম্ভ করা হয়। ব্ল্যাষ্টিং (blasting) বা বারুদ বা বিস্ফোরক দ্বারা পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া দেওয়া হইলে, প্রস্তরগুলিকে কাটিয়া বাহির করিতে হয়। কাটিতে কাটিতে, জল প্রায়ই উৎসাকারে বহিতে থাকে—দেখা যায়। কতদূর ও উচ্চ প্রদেশ হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বাহিয়া আসিতে আসিতে খাল পাইলেই জল বাহির হইয়া পড়ে। সেইজন্য খনন করিবার সময় পাম্প্ (pump) ব্যবহার করিয়া জল তুলিয়া ফেলিতে হয়। পাছে খাদের পার্শ্বদেশ ধ্বসিয়া পড়ে, তজ্জন্য কাষ্ঠের তক্তা প্রভৃতি দ্বারা ইহার গাত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরিভাষা timbering ; যাহারা এই কার্য্য করে তাহাদের নাম timber-men। তৎপরে কাষ্ঠগুলি আস্তে আস্তে সরাইয়া ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে brick lining বলে। দেওয়ালের গাত্রে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত রাখা হয় ; তথা হইতে ঝির ঝির করিয়া জল প্রবাহিত হয়। সঞ্চিত জল দ্বারা পাছে কোন স্থান ধ্বসিয়া যায়, বা আর কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, এই জন্য এই সব গর্ত্ত রাখিবার ব্যবস্থা। আমাদের সহযাত্রী এঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, প্রত্যেক ফুট খাদ খনন করিতে ও ইষ্টকের ধারি বাঁধিতে খরচ ২০ পাউণ্ড বা ৩০০ টাকা ; ইহা ১৯১৫ অব্দে। এখনকার খরচ ইহার অনেক অধিক। আমরা যে খাদটিতে অবতরণ করিয়াছিলাম তাহা ৪০০০ ফিট গভীর। সুতরাং একটা খাদ খননে কত টাকা যে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

খাদের ভিন্ন ভিন্ন তল হইতে ইহার সহিত সমকোণ করিয়া সমপৃষ্ঠ বা horizontal খাদ কাটা হয় ; ইহাদের নাম cross cut। প্রত্যেক cross cutএর নম্বর আছে। ইহারা যেন খনির এক একটি তল বিশেষ। Edgar shaftএ ৫২টি তল আছে। ধরাপৃষ্ঠ বা উপর হইতে প্রত্যেক cross cutএর সহিত টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক cross cutএর মুখের কাছে এক একটি দ্বার আছে। দ্বারদেশের সম্মুখে খাঁচা থামিলেই দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন খাঁচা হইতে লোকজন প্রবেশ করে। Cross cut হইতে উপরে টেলিফোন করিলে খাঁচা উপরে উঠে বা নীচে নামে ; একটুকুও ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক cross cutএ এক একজন কর্ম্মচারী আছেন ; ইঁহারা উপর বা নীচের সহিত যোগাযোগ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এক একটি cross cut হইতে নানাদিকে সঙ্কীর্ণ পথ গিয়াছে ; ইহাদের নাম গ্যালারি (gallery)। গ্যালারির উপর লাইন পাতা ; ইহার উপর দিয়া মাল বোঝাই গাড়ি বা truckগুলি কুলীরা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

গ্যালারিগুলির ভিতর বেশ সোজা হইয়া হাঁটিয়া যাইতে পারা গেল। গিরিডির কয়লার খনি সন্দর্শন করিবার সময়, মনে আছে, আমাদের নীচু হইয়া যাইতে হইয়াছিল। গ্যালারিগুলিতে প্রায়শঃ বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত আছে। অনেক নূতন গ্যালারিতে আলোকের বন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া এঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের হস্তে বর্ত্তিকা দিলেন। দেখিলাম, গ্যালারিগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। দুই তলের cross cutএর মধ্যে তির্য্যক ভাবে খাদ কাটা হয়। এই খাদগুলিতে মাল কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় ; ইহারা গড়াইয়া গড়াইয়া নীচের লাইনে অবস্থিত ট্রাকে গিয়া পড়ে। ইহার আর একটি প্রয়োজনীয়তা আছে ; খাঁচায় করিয়া এক cross cut হইতে অপর cross cutএ যাইতে সময় লাগে ও অন্যান্য কার্য্যের অসুবিধা হয় ; এই জন্য কুলীরা এই সকল তির্য্যক পথে নাচেকার cross cut হইতে উপরকার cross cutএ যাতায়াত করে। ভিতরে উত্তাপের আধিক্য বলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। শুনিলাম যে উত্তাপ বশতঃ কুলীদিগের পান করিবার জলে বরফ দেওয়া হয়। ভিতরের তাপ এত অধিক যে, জল ইহাতে বিশেষ শীতল হয় না।

খনির উপর ভূমি-পৃষ্ঠে রেলপাতা আছে। খাদের ভিতর হইতে ধাতু-প্রস্তর তোলা হইলে, ট্রাকে করিয়া সেগুলিকে যেখানে ভাঙ্গা হয় সেইখানে লইয়া যাওয়া যায়। প্রস্তরগুলিকে পেষণ-যন্ত্র বা crusher দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে

ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় ; তাহার পর সেগুলিকে একটি বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে খুব মিহিভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে প্রবাহিত জল দ্বারা এই প্রস্তর-ধূলিগুলি তির্য্যকভাবে অবস্থিত এক তাম্র-ফলকের উপর পতিত হয়। এই ফলকের উপর পারদের প্রলেপ থাকে। ইহার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত পিষ্ট প্রস্তর-ধূলি হইতে স্বর্ণ আকৃষ্ট হইয়া পারদের প্রলেপযুক্ত তাম্রফলকে আটকাইয়া যায়, এবং ধূলি-মিশ্রিত জল নীচে গিয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় সমস্ত স্বর্ণ নিষ্কাশিত হয় না বলিয়া ধূলি-মিশ্রিত জল তাম্রফলক হইতে নীচে নামিয়া পড়িবার সময় একখণ্ড কম্বল, চর্ম্ম বা এই প্রকারের কোন বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হয় ; ইহা দ্বারা অবশিষ্ট স্বর্ণের বৃহদংশগুলি কম্বলাদিতে আটকাইয়া যায়। শতকরা প্রায় ৭০ অংশ হইতে ৮০ অংশ স্বর্ণ নিষ্কাশিত হয় ; অবশিষ্ট ২০ হইতে ৩০ অংশ ধূলি-মিশ্রিত জলের সহিত প্রবাহিত হইয়া পয়ঃ-প্রণালী দিয়া প্রকাণ্ড জলাধারে পতিত হয়। অনেকগুলি পরস্পর-সংযুক্ত জলাধার শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত। সর্ব্বপ্রথম জলাধারে বৃহৎ স্বর্ণকণা থিতাইয়া পড়ে। এই বৃহৎ কণাগুলির নাম tailings। পরবর্ত্তী জলাধারগুলিতে খুব মিহি স্বর্ণকণা-মিশ্রিত ধূলি বা কর্দ্দম থিতায় ; ইহার নাম battery slimes ; এগুলিরও tailings হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ বাহির করা হয়। কাষ্ঠের জলাধারের মধ্যে এক থাকে পাট বা নারিকেল দড়ির মাদুর বিস্তৃত করিয়া রাখা হয়। পূর্ব্বোক্ত ধূলি বা কর্দ্দমযুক্ত জল তাহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হয় ; জলাধারে পটাসিয়াম্ সায়ানাইড মিশ্রিত জল থাকে। জলাধারটিতে সায়ানাইড মিশ্রিত কর্দ্দম থিতাইলে জল বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং কর্দ্দমগুলিকে আর এক পাত্রে লইয়া যাওয়া হয়। এই অবস্থায় পটাসিয়াম সায়ানাইড ও স্বর্ণে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার রাসায়নিক নাম Double cyanide of gold and potassium (Au K Cy)। ইহা হইতে দস্তার সাহায্যে স্বর্ণ নিষ্কাশিত করা হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতেও কিছু স্বর্ণ থাকে ; সমস্ত স্বর্ণ বাহির করিতে পারা যায় না। এই অবশিষ্ট স্বর্ণ-মিশ্রিত ধূলির স্তূপ কোলারে আসিবার সময় লাইনের পার্শ্বে দেখিয়াছিলাম বলিয়াছি।

যখন আমরা স্বর্ণ নিষ্কাশিত করিবার ঘরে পৌঁছিলাম, তখন এত ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইতেছিল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়। বাস্তবিক ভিতরে গিয়া দেখিলাম যে, যে-সব য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা এক একটি তাম্র-ফলকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা পাছে বধির হইয়া যান, এইজন্য কর্ণে তুলা দিয়াছেন ও কর্ণের চারিধার বাঁধা রহিয়াছে। এ ঘরে য়ুরোপীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। আমাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল ; অনুমতি-পত্র পাইলে ভিতরে যাইতে পারা গেল।

স্বর্ণ নিষ্কাশন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে ; অতি সংক্ষেপে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বলা গেল। এক্ষণে কেহ যদি জানিতে চাহেন যে যথাক্রমে তাম্রফলকের সাহায্যে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কত স্বর্ণ নিষ্কাশিত হয়, তাঁহার অবগতির জন্য মহীশূর ভূতত্ত্ব-বিষয়ক রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। এ বিবরণটি ১৯১৪ অব্দের প্রথম ৬ মাসের। ঐ সময়ে ৫টী খনি হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ ও মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল—

	স্বর্ণের ওজন	স্বর্ণের মূল্য
যন্ত্র সংযোগে প্রাপ্ত……	২,১৩,০৬৬ আউন্স	৯০৫৬৫৮ পাউণ্ড
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত…	৩৭,৮৩৫ ঐ	১৬৫০৪৯ পাউণ্ড

স্বর্ণের ধাতুপ্রস্তর বা ore সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলিয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিব। স্বর্ণ সাধারণতঃ অবিমিশ্র অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহীশূরের ধাতু-প্রস্তরে pyrites বা গন্ধক-মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ বিশেষ বিরল। ইহা কোয়ার্টজ (quartz) প্রস্তর সহিত মিলিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায় ; প্রস্তরের মধ্যে স্বর্ণ চিক্‌চিক্ করিতেছে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

মহীশূর রাজ্যের খনিজ সম্পৎ যথেষ্ট ; ইহার মধ্যে স্বর্ণই প্রধান। তন্নিম্নে অভ্র, মাঙ্গানিজ (Manganese), ম্যাগনেসাইট (Magnesite), তাম্র, লৌহ, এস্‌বেস্টস্ (Asbestos), কারাণ্ডাম্ (Corundum), ক্রোম্‌ধাতুপ্রস্তর (Chrome Ore) উল্লেখযোগ্য। রাজসরকারও এই সকল খনিজ পদার্থের পরীক্ষা ও ব্যবসায় হিসাবে যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছেন, এবং অধিকতর উন্নতির চেষ্টায় আছেন। সম্প্রতি (২২শে অক্টোবর) মহীশূরে যে প্রতিনিধি-সভা (Representative Assembly) আহূত

হইয়াছিল, তাহাতে দেওয়ান বাহাদুর রাজ্যের খনিজ সম্পদের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহা দ্বারা যে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। মহীশূর গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে এখন ঢালাই করিবার লৌহও (Pig iron) প্রস্তুত হইতেছে।

মহীশূর প্রদেশ প্রকৃতই স্বর্ণপ্রসূ। নানা বিলাতী কোম্পানীরা খনি জমা লইয়া স্বর্ণ বাহির করিতেছেন। ১৯১৩ অব্দে যে স্বর্ণ বা স্বর্ণের ইষ্টক তৈয়ার করা হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৫২ সহস্র ৮৯৫ টাকা। রাজসরকার শতকরা প্রায় ৫ টাকা হারে খাজনা পাইয়াছেন; অর্থাৎ এই বৎসর তাঁহারা রাজস্ব হিসাবে পাইয়াছেন কেবলমাত্র ১৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই সকল কোম্পানী ১৮৮২ অব্দ হইতে ১৯১২ অব্দ পর্য্যন্ত ৫৭ কোটি টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন এবং অংশীদারদিগকে ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন; লভ্যাংশের পরিমাণ ৪৭.৬; আর মহীশূর রাজসরকার—যাঁহারা এই সকল খনির মালিক—ত্রিশ বৎসরে এই সকল কোম্পানীর নিকট খাজনা বা সেলামী হিসাবে পাইয়াছেন প্রায় তিন কোটি টাকা। আমি অনেক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সরকার হইতে খনি চালান হয় না কেন। তাঁহারা বলিলেন, অত টাকা সরকারের নাই। কিন্তু মহীশূর রাজ্যের খনি-সংক্রান্ত ১৯১৩—১৪ বৎসরের কার্য্য-বিবরণী বা Mining Report পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, পরীক্ষা বা Prospecting সংক্রান্ত জমা বাদ দিয়া যে ১০টি খনির কার্য্য চলিতেছিল, তাহাদের মূলধন সর্ব্বসাকল্যে ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা, এবং এক বৎসরেই অর্থাৎ ১৯১৩ অব্দে এই সকল খনিতে ৩ কোটি ২২লক্ষ টাকার স্বর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল। সমগ্র মূলধন অপেক্ষা এক বৎসরের আয় অধিক। মহীশূর রাজ্যের আয় পূর্ব্বোক্ত মূলধন অপেক্ষা অধিক হইলেও এবং রাজকোষে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলেও, এত টাকা একেবারে বাহির করা অসম্ভব। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সরকার অনায়াসে ৩ বা ৪টি খনি চালাইতে পারেন। এই প্রকারে অচিরেই সমস্ত খনিগুলি চালাইবার ক্ষমতা হইবে। মহীশূর-রাজ নিঃস্ব নহেন। কেন না, তাহা হইলে কাবেরী বাঁধিবার প্রস্তাবে হাত দিতেন না; ইহাতে ব্যয় হইয়াছে কোটি টাকার উপর। ইঁহারা আরও কত শত বড়-বড় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজ্যের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত এবং বিভাগীয় কর্ত্তারা এমন অভিজ্ঞ যে, ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে যখন আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, এমন কি ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টেরও যখন এই অবস্থা, তখনও মহীশূর-রাজ্যে গত বৎসর ৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। দেওয়ান বাহাদুর বলিয়াছেন যে, বর্ষারম্ভে তাঁহারা আয়ব্যয় নির্দ্ধারণ করিবার সময় অনুমান করিয়াছিলেন, আয় অপেক্ষা ২২ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। তাহা না হইয়া সরকারী তহবিলে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আয় হইয়াছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, ব্যয় হইয়াছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

এই সকল কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খনি জমা করেন; আমার বোধ হয় এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার পর জমার মেয়াদ বৃদ্ধি করা উচিত নয়। অবশ্য এ কথা বলা সহজ; কেন না, এই সকল কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা বিলাতের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; কোনও কোনও অবসর-প্রাপ্ত রেসিডেণ্টও কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া বিলাত হইতে খনি চালাইতেছেন। ইহাতে রাজসরকার বা দেওয়ান বাহাদুরের নিজের ইচ্ছা কতটা বলবতী হইবে, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আমার কিন্তু এসব দেখিয়া বিশেষ কষ্ট হইল। এইসব দেখিলে আমার সেই প্রসিদ্ধ গীতটির নিম্নলিখিত কথা মাত্র মনে পড়ে :—

সারা শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা, ভুষি শেষে।

ইহাতে আমাদেরই দোষ ষোল আনা; আমাদের ব্যবসায় বা বিষয়বুদ্ধি আদৌ নাই, নৈতিক বলেরও অভাব। যৌথ কারবারের বিষয় না জানিলে এ সব কখনই কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না।

পূর্ব্বে যে ১০টি খনির কথা * বলিলাম, তাহাদের মধ্যে একটি ভিন্ন সমস্তগুলিই বিলাতী। দেশী কোম্পানীর পরিচালিত খনিটির নাম Ahmed's Block। ইহার পরিচালক নিজামরাজ্যস্থ দুইজন মুসলমান। স্বত্ব লইয়া ইহাদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল বলিয়া সমস্ত কার্য্য স্থগিত দেখিলাম। কোম্পানীটি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে; ইতোমধ্যে খনিটিও জলে প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর

* আমি যে সময় অর্থাৎ ১৯১৫ অব্দে মহীশূর যাই, সেই সময়েরই আমার মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য।

একটি খনির নাম বেটারায়স্বামি ব্লক্ বা Betarayaswamy Block। ইহার মালিক পল্ নাইট এবং রবার্ট নাইট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল কোম্পানীর মূলধন বিদেশ হইতে প্রাপ্ত, কর্ম্মকর্ত্তা বিদেশী; খনিগুলি যাঁহারা চালাইতেছেন সেই সকল এঞ্জিনিয়ারও য়ুরোপীয়। প্রস্পেক্টিং বা পরীক্ষা কার্য্যের জন্য ২।১ জন দেশী ভদ্রলোক জমা লইয়াছেন; ইঁহাদের একজনের নাম মিঃ ডি, শ্যামরাও।

কোলার হইতে কয়েক মাইল দূরে কাবেরী নদীতীরে শিবসমুদ্রম্ নামক গ্রাম হইতে কোলারের খনিসমূহের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ করা হয়। ইহার জন্য রাজসরকার হইতে ফি বা মূল্য আদায় করা হয়, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা খনিগুলি জমা দেওয়ার চুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। শিবসমুদ্রমে কাবেরীর রুদ্ধ জলপ্রবাহ দ্বারা টারবাইন্ নামক "জলচক্র" যন্ত্র চালাইয়া ডাইনামো নামক তাড়িতশক্তি জননকারী যন্ত্রের দ্বারা বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপন্ন করা হয়। আমি যে সময় কোলারের খনি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম সে সময় তথায় ৮৩টি মোটর চলিত; ৭০টি দ্বারা আলোক উৎপাদন, যন্ত্রচালন প্রভৃতি কার্য্য এবং অবশিষ্ট ১৩টি দ্বারা খনির উত্তোলন প্রভৃর্তি কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ইহার জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হইত তাহার পরিমাণ ৫৩০৯ হর্স্ পাওয়ার বা অশ্ববল, এবং ইহার জন্য যে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রীত হইত তাহার পরিমাণ ৪৯৫১৩১৯ মাত্রা বা বোর্ড অফ্ ট্রেড ইউনিট্। কাবেরী নদীর বাঁধ বা ড্যামের (Dam) কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই বলিয়া শিবসমুদ্রমে মার্চ্চ হইতে জুনমাসের মধ্যে যথেষ্ট জলপ্রবাহ পাওয়া যাইত না; এইজন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ তড়িৎশক্তিও উৎপন্ন করা যাইত না। ১৯১৪ অব্দের এপ্রিল মাসে কোলার খনিতে শিবসমুদ্রম্ হইতে যে শক্তি পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে দুই সহস্রের অধিক হর্স্ পাওয়ার (2000 H. P.) বল উৎপন্ন করিতে পারা যায় নাই। কাবেরীর বাঁধ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই শিবসমুদ্রম্ হইতে প্রায় ৯,০০০ হর্স্ পাওয়ার উৎপাদনকারী বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া গিয়াছে। এখন ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি পাওয়া যায়; তাহার পরিমাণ আমি অবগত নহি।

রাজসরকার কোলার স্বর্ণখনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার জন্য মাত্রা বা unit প্রতি গড়ে ৬ পয়সা লইতেন; এখন বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প ফি লয়েন। কলিকাতায় এক্ষণে মাত্রা প্রতি ৪ আনা লওয়া হয়। আমার যতদূর স্মরণ আছে—১৯১৫ অব্দে কলিকাতায় আলো ও পাখার জন্য মাত্রা বা unit প্রতি যথাক্রমে ৮ ও ৪ আনা লওয়া হইত। অবশ্য যথাসময়ে মূল্য দিলে উপরিকথিত হারের সিকি অংশ হ্রাস (rebate) করিয়া দেওয়া হইত।

এখানে বলিয়া রাখি যে ১৯১৫ অব্দে মহীশূরস্থ ব্যাঙ্গালোর নগরে বৈদ্যুতিক মাত্রার মূল্য দশ পয়সা ধার্য্য ছিল। উপরিলিখিত হারে গণনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, মহীশূর রাজসরকার কোলার স্বর্ণখনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার জন্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকার অধিক আদায় করিয়াছেন।

আমি যে সময় কোলারে যাই সে সময় প্রায় ২৬ হাজার লোক খনি খনন, প্রস্তরোত্তোলন ইত্যাদি ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে ৫২৫ জন য়ুরোপীয়, ৩৩৬ জন এ দেশী ফিরিঙ্গী এবং অবশিষ্ট সমস্ত লোক এ দেশবাসী। এই ২৬ হাজার লোকের মধ্যে ১৫ হাজার লোক খনির মধ্যে কার্য্য করে, এবং অবশিষ্ট লোকেরা খনির উপরে বা Surface workএ নিযুক্ত। এতগুলি লোকের মধ্যে প্রায় ২৫০ জন লোক প্রত্যেক বৎসর গুরুতরভাবে আহত হইয়া বিকলাঙ্গ হইয়া যায়; প্রায় ৫০ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বার সহস্র লোকের মধ্যে ১০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। খনিতে পাথর কাটিবার সময় প্রস্তর পড়িয়া অনেকে আহত হয়। খনির মধ্যে অবরুদ্ধ বায়ুর আকস্মিক প্রসারণে প্রস্তর ভাঙ্গিয়া খননকারীদিগের উপর পতিত হয়; ইহাতে সময় সময় তাহারা যে শুদ্ধ আহত হয় এমন নহে, অনেক সময় প্রস্তরখণ্ডে প্রোথিত হইয়া অনেকে জীবন্ত সমাধি লাভ করে। বিস্ফোরক বা explosive ব্যবহার করিবার সময়ও এই প্রকার বহু দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯১৩ অব্দের মাঝামাঝি এড্গার্ শ্যাফ্ট্ (Edgar Shaft) নামক খনিতে এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই খনিতেই আমরা নামিয়াছিলাম, সে কথা বলিয়াছি। দুর্ঘটনাটি কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খাদে কি করিয়া নামা হয়, তাহার

কথা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। মনুষ্যবাহী বাক্স বা খাঁচার সহিত যে লোহার দড়ি বাঁধা থাকে, তাহা একটা ২০ ফিট্ ব্যাসযুক্ত কাটিম বা reelএ জড়ান থাকে। এঞ্জিনের সাফ্‌টের (Shaft) সহিত যুক্ত একটি লৌহচক্রের সহিত ক্লাচ্ (clutch) দ্বারা এই কাটিমটির সংযোগ আছে। ক্লাচের পিন্‌টি কোন অজ্ঞাত কারণে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কাটিমটি ইঞ্জিন সাফ্‌ট্ বা পূর্ব্বোক্ত লৌহচক্র হইতে বিচ্যুত হয়। এই ক্লাচের সাহায্যে কাটিমটাকে যথেচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ইহার গতির হ্রাসবৃদ্ধি বা গতিরোধ করা যাইতে পারে। ক্লাচ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ব্রেক্ কসা সত্ত্বেও কাটিমটার গতিরোধ করিতে পারা যায় নাই। এই খাঁচাটি সবেগে নীচে পড়িয়া যায়। ইহাতে অনেকগুলি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৪২টি লোক লইয়া একটি দ্বিতলযুক্ত খাঁচা বা বাক্স প্রায় ১০০ ফিট নামিবার পর ক্লাচের পিনটি ভাঙ্গিয়া যায়। এঞ্জিনচালক ব্রেক্ কসিতে থাকেন ও এঞ্জিন থামাইবার জন্য ইহার ষ্টীম্ আসা বন্ধ করিয়া দেন; তাহাতেও কাটিম থামাইতে পারা যায় নাই। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন খাঁচাটি মিনিটে ১২০০ ফিট বা ঘণ্টায় ১৪ মাইল বেগে নামিতেছিল। এত জোরে ব্রেক্ কসা হইয়াছিল যে, ঘর্ষণে ব্রেকের গাত্রস্থিত কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া এঞ্জিন ঘরটি ধূমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তথাপি কাটিমের গতিরোধ করিতে পারা যায় নাই। যে খাঁচাটি লোক লইয়া উপরে উঠিতেছিল, তাহার কাটিমটির গতিরোধ করিতে পারা গেল, কিন্তু যে কাটিম হইতে খাঁচাটি নামিতেছিল, তাহার গতিরোধ করিতে পারা গেল না। খাঁচাটি প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র ফিট যাইয়া সবেগে তলদেশে পতিত হইল ও মুহূর্ত্তের মধ্যে ৪২ জনেরই মৃত্যু হইল। এই ৪২ জনের মধ্যে ৬ জন ইটালি দেশবাসী, ২ জন দেশী ফিরিঙ্গি ও ৩৪ জন এদেশবাসী।

এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪ জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করেন; তাহার সভাপতি হইলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ ওয়ালেস্ সাহেব। এই চারিজনের মধ্যে দেশী লোক ১ জন; ইনি মহীশূর রাজ্যের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্ পোলিস। এই কমিটির রিপোর্ট আমি পাঠ করিয়াছি। কমিসন-কমিটিতে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, অর্থাৎ কোন কারণই নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই; তবে ভবিষ্যতে যাহাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা না থাকে তাহার কতকগুলি উপায় নির্দ্ধারিত হইল। *

* এই প্রস্তাবের লেখক সোদরোপম স্নেহভাজন মনোমোহনের অকালে পরলোক গমনের জন্য প্রস্তাবটী অসম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশিত হইল; মনোমোহনের অভাব বড়ই অনুভূত হইল।—ভারতবর্ষ সম্পাদক

জীবনের নিত্য-স্রোতে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

কোনো উপায় ছিল না বলে পাঁচটা পয়সা খরচ ক'রে ট্রামে চড়তে হয়েছিল। হেঁটে-হেঁটে পায়ে ফোস্কা উঠেছিল। সেই কোথা কয়লাঘাট, আর কোথায় শ্যামবাজার, তার ওপর সারাদিন চীনেবাজারে টো টো ক'রে ঘোরা।

কিন্তু ট্রামে চড়েই ভাবতে হয়েছিল, এ পয়সা কটা কেমন করে উসুল করা যায়। যত রকমের কৃচ্ছ্রসাধন হ'তে পারে, নিজের সম্বন্ধে তার সবরকম ভেবেও কোনো উপায় দেখা গেল না। টিফিনের বালাই নেই, কোনোরকম নেশারও দাসত্ব করি না। প্রাণে কোনো সখের আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করি না, তবে কেমন করে এ অন্যায় খরচের দাবী মিটাবো?

মানুষের চিন্তা না কি স্বয়ং-ক্রিয়, তাই দেখি, সময়ের ফাঁক পেলেই আর বিশ্রাম নেই। যতক্ষণ ট্রামে বসে ছিলাম, ততক্ষণই যত রাজ্যের চিন্তা মনটাকে ছেয়ে ফেলেছিল।

ট্রাম থেকে নামতেই দেখা—রাখালবাবুর সঙ্গে। আমাদেরই আপিসের কেরাণী, আমারই সমান মাইনে পান। জিজ্ঞাসা কর্লেন—কি দাদা, ট্রামে যে!

বল্লুম—পায়ে ফোস্কা উঠেছে।

—ও, আমি বলি, কোথা থেকে আল-টপ্‌কা টাকা পেলে বুঝি। নইলে কেরাণীর প্রাণে সখ্। রাখালবাবু নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন—তাই নয় কি ভাই?

রাখালবাবুর কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম।

বাড়ী ফিরতেই প্রতিদিনকার মতো খোকা কলরব করে উঠল। সুশী তার কর্ম্মশ্রান্ত মুখশ্রীতে একটা হাসির আবরণ টেনে এসে দাঁড়াল।

খোকা আনন্দ করে একটা কিছুর প্রত্যাশায় হাত বাড়াল। কোনো দিন ত কিছু দিতে পারি না। তবুও প্রত্যহই পকেট হাত্‌ড়ে বলি—কিছু নেই। খোকা হাত ঘুরিয়ে বলে—নেই, নেই। আজও অভ্যাসমতো পকেটে হাত দিয়ে দেখি, ট্রামের টিকিটখানি,—খোকার হাতে দিলাম। খোকন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে গাল ফুলিয়ে দেখতে লাগল—এটা খাবার কি না।

সুশী আমার আটপৌরে কাপড়খানি এগিয়ে দিতে গিয়ে ট্রামের টিকিট দেখে প্রশ্ন করলে—শরীরটা কি ভাল নেই? ট্রামে এলে যে?

কথাটায় একটু হাসি এল, যেন ট্রামে চড়া ব্যাপারটা একটা অসাধারণ কিছু। অবশ্য ব্যাপারটা অসাধারণ নয়, কিন্তু কেরাণীর পক্ষে বটে! এই নিয়ে দু'বার। রাখাল-বাবু আর সুশী, দুয়ের একই প্রশ্ন! যাক্। শুধু বললুম—পায়ে ফোস্কা পড়ল বলে ট্রামে এলাম।

সুশীর মুখের হাসি ফিরে এল। বললে—ট্রামের টিকিট দেখে আমার ত ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছল। ট্রামে এসেছ বেশ করেছ,—তবু যা হোক সকাল সকাল ঘরে ফিরেছ ত।

হেসে বললুম—একেই বলে শাপে বর। কিন্তু পাঁচটা পয়সা খরচ না করে ত হাতে করে জুতোটা নিয়ে আসতে পারতুম। এখন এই বাজে খরচের—

আমাকে বাধা দিয়ে সুশী বললে—ভারী কটা পয়সা খরচ করে ফেলেছ নিজের জন্যে, তার জন্যে তোমায় অত ভাবতে হবে না।—

সুশীর কটাক্ষের স্নেহ ও প্রেমের উৎস আমাকে সিক্ত করে দিল। কতখানি অন্তর দিয়ে সে আমার ব্যথা বোঝে।—

একটা আনন্দে আমার হৃদয় ভ'রে গেল। হেসে বললুম—যে কটা টাকা পাই, তার মধ্যে ত বাজে খরচের জন্যে কিছু থাকে না। কাজেই একটা বাড়্‌তি খরচ হয়ে গেলে, তার জন্যে একটু ভাবতে হয় বৈকি।

—তোমার জন্যে খরচটাকে বাড়্‌তি খরচ বোল না। ধর, যদি পাঁচ পয়সার খোকনের জন্যে অষুধই আনতে হত। বলতে নেই—খোকনটী আমার এত বড় হয়েছে, কিন্তু কোনো দিন এক পয়সার ডাক্তার-বদ্যি খরচ তার জন্যে হয়নি।—

এতখানি বলেই হঠাৎ সুশীর মনে পড়ল—আজ খোকার জন্ম-বার—তার উৎসাহ-উজ্জ্বল মুখখানি তখনই যেন ম্লান হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে খোকনকে তার বুকে টেনে মাতৃ-স্নেহাশীর্ব্বাদের অক্ষয় কবচে তাকে ঘিরে দিলে।

কিন্তু তবুও সে যেন তৃপ্ত হল না। একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ছোঁয়াচে সে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বললুম—ফোস্কাটা কিন্তু ছিঁড়ে গেছে।

সুশী একরকম জোর করে তার চিন্তাধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বললে—ছিঁড়ে গেছে? আর খুঁটো না, ঘা হয়ে যেতে পারে। আমি পরিষ্কার নেকড়ার ফালি এনে দিচ্ছি, বেঁধে রাখ।

পায়ে নেকড়ার ফালি বাঁধ্‌তে গিয়ে ফোস্কার অবস্থা দেখে সে বললে—এত বড় ফোস্কাটা ছিঁড়ে গেল! সমস্ত পা-টা কী রকম গরম হয়েছে!

তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম—ও কিছু নয়!

সুশী তার উচ্ছ্বসিত বেদনাকে সংযত করে বললে—নিজের বেলায় সব তাতেই তোমার উড়িয়ে দেওয়া। এ আমার ভাল লাগে না। আমাদের—

সুশী প্রায় কেঁদে ফেলবার যোগাড় করেছিল। মনের সমস্ত রস ত একেবারে শুকিয়ে যায় নি। তাই সুশীকে টেনে নিয়ে বললুম—পাগ্‌লীর মতো এ আবার কি? এই বুড়ো বয়সে আর কি এ সবের দিন আছে?—কথাটা শেষ করে নিজের মনে নিজেই হেসে উঠলুম। বয়স যাই হোক, মনে যেন কেমন পাক ধরেছিল। তাই কোনো আবেগের তীব্রতা আর অনুভব কর্ত্তে পারি না।

সুশী তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নিল। তার পর কথার সুর ঘুরিয়ে বললে—আজ বুঝি বড্ড ঘুরেছো। ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে।—

ঘোরা, হাঁ ঘোরার ত কামাই কোনো দিন নেই, এর শেষও নেই,—এর মধ্যে ক্লান্ত হ'লে চলবে কেন? কথার সুরে নৈরাশ্যের বেদনা যেন আপনিই বেজে উঠল।

হ্যাঁ—তোমার যত সব—কী যে ছাইভস্ম বকো!—সুশীর কথাগুলো কত অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কত স্নিগ্ধ!

সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্তিতে বললুম—খাবার হল কি?

ওমা—বলে নিজেই অপ্রতিভ হ'য়ে সুশী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। তার পর আমাকে নিমিত্তের ভাগী করে বললে—এ কথাটা এতক্ষণ মনে করিয়ে দিতে নেই?

খোকাকে নিয়েই সুশী যাচ্ছিল। বললুম—খোকাকে দিয়ে যাও, নইলে কাজ করার অসুবিধে হবে যে।

না, না, এই সবে আপিস্ থেকে হা-ক্লান্ত হ'য়ে এলে। খোকাটা এখন খালি বিরক্ত কর্ব্বে। তুমি একটু ব'স। আমরা মায়ে-পোয়ে চট্ করে সব তৈরি করে আনছি।

খোকাকে নিয়েই সুশী চলে গেল।

পরের দিন, সকাল বেলা। ঘুম ভেঙেছিল, কিন্তু তখনও বিছানা ছেড়ে উঠি নি। এটুকু বিলাস এখনও বাকী ছিল।

সুশী বিছানা তুলতে এসেছিল; আমাকে তখনও শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—মশারীটা তুলে দিয়ে যাবো কি?

বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম—তখন প্রায় সাতটা বাজে।

তাড়াতাড়ি উঠে বললাম—বাজারের পয়সা দাও!

মশারী তুলতে তুলতে সুশী বললে—বাজারের পয়সা আমার আঁচলেই বাঁধা আছে। তুমি মুখ ধুয়ে এসো। হ্যাঁ, খোকার গাটা একবার দেখো ত, কেমন যেন ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ কর্চ্ছে মনে হল।

খোকা মাছুরে বসে খেলা কচ্ছিল। ছিন্ন ফ্রকটা তুলে গায়ে হাত দিলাম। কিছু মনে হল না। বললাম—না, কই, গা ত' গরম মনে হচ্ছে না।

'তা হ'বে; আমি তখন জলের হাতে দেখেছিলুম। আমাকে এই ভাবে স্তোক দিয়েও সে নিজেই একবার খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলে। একটা সংশয়ের ছায়া-পাতে, মনে হল, যেন তা'র মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। কিন্তু তখন ওদিকে নজর দেবার মতো সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি পয়সা নিয়ে বাজারে চলে গেলাম।

সকালের বাকী সময়টুকু আর কিছু দেখবার অবসর থাকে না। কোনো রকমে সেদিনের বাজার সেরে, নাকে-মুখে দুটী অন্ন গুঁজে আপিসে যেতে হয়। কিন্তু আমার এই অনবসর সময়টুকুর মধ্যেও একটী জিনিষ আমার চোখ এড়াল না।

রান্নাঘরে চড়া আঁচে কড়ার ওপর কি একটা ভাজা হচ্ছিল। খোকা সেই রান্নাঘরের কোণে একটা ছেঁড়া মাছুরে বসে কুটনোর খোসা নিয়ে খেলা কচ্ছিল। হঠাৎ কি কারণে খোকা কেঁদে উঠল। সুশী তাড়াতাড়ি কড়া নামিয়ে খোকাকে শান্ত করতে ছুটে এল। খোকা একবার তার মাকে জড়িয়ে ধরল।

'কী হয়েছে খোকন আমার! ছিঃ, এখন কাঁদতে নেই' বলে কুটনোর থালা থেকে এক টুকরো আলু খোকার খেলার রাজত্বে ফেলে তাকে সমৃদ্ধ করে সে আবার তাড়াতাড়ি তার কাজে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে খোকাকে শান্ত করার ছলে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তার সংশয়ের মীমাংসা করতে ভুলল না।

আমিও একবার তাড়াতাড়ি খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। সময়ও আর বেশী নাই। সুশী আমাকে জানিয়ে দিলে—না, ও কিছু নয়। আমারই ভুল; এখন ত বেশ ঘাম হচ্ছে।

সুশীর কথায় সায় দিলাম। মনকে যাহোক একটা প্রবোধ ত' দিতে হবে। তার পর আপিস, নিত্য-কর্ম্ম।

সারাদিন সুশীর কেমন ক'রে কেটেছিল জানি না, কিন্তু আমার কথা?

বাঙালী, যাঁরা ভদ্রলোকের উপযোগী অন্ন মাহিনার দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজেদের বন্দী করে রাখেন, তাঁদের হৃদয়-বৃত্তি বলে জিনিষটাকে আপিসের বন্দীশালার দরজায় বাহিরে রেখে আসতে হয়। ও জিনিষটী আপিসের মধ্যে শুধু যে অদরকারী তা নয়,—অনিষ্টকর।

এমন অনিষ্টকর জিনিষ নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। কী

জানি কখন হৃদয়হীনতা ও অবিচারের আঘাতে সে উত্তেজিত হয়ে নিজের আখেরই খুইয়ে বসে।

যখন বড় বাবুকে গিয়ে বললাম—সার্, আজ একটু সকাল সকাল ছুটী পাব কি? বাড়ীতে খোকার অসুখ দেখে এসেছি।

বড়বাবু ধমক দিয়ে বললেন—তোমাদের বাপু খালি ছুটী নেবার ফন্দি। একটা না একটা অছিলা আছেই। আর সে সব অছিলা এমন যে মানুষ তাতে ছুটী না দিয়ে পারে না।—তোমরা বাপু সকাল সকাল পালাও, আর তার হ্যাপা সাম্‌লাতে হয় আমাকে—কাঁহাতক আমি সাম্‌লাই বল ত?—

বড় বাবুর বক্তৃতা হয়ত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু আমি তা শেষ হবার পূর্ব্বেই মৃদুস্বরে বললুম—কিন্তু সার্—

—আচ্ছা তুমি যাও এখন, একটু পরে জানাব। বড়বাবু বড় সায়েবের ঘরের দিকে চললেন। আমি ফিরে এলাম নিজের কাজে।

একটু পরে জবাব এল। পিয়নের হাতে একটা শ্লিপে বড় বাবুর হুকুম—সকাল সকাল যেতে পার, কিন্তু তার আগে এই সঙ্গের 'ফাইল' শেষ করে যাওয়া চাই। পিয়ন একটা মাঝারি গোছের ফাইল আর শ্লিপটা আমায় দিয়ে গেল।

একটু ভেবে দেখলাম—সকাল সকাল যাওয়া সম্ভব কি না। সম্ভব অসম্ভব ভেবে লাভ নেই; 'ফাইল' ত আগে শেষ কর্ত্তে হবে।—

বাড়ী ফিরে দেখি—সুশী উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে আমার অপেক্ষা কর্চ্ছে। আমাকে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—এসো, আমি বড় ভাবছিলাম। এত দেরী হল যে?

তার এ অভ্যর্থনার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, ছিল না আনন্দ। চোখে তার সে কী নির্ভরতা।

তার কথার উত্তরে হাসির বেদনায় বুক টন্‌টন্ করে উঠল। কপালে আঙুল দিয়ে বললাম—আজই বেশী কাজ পড়ে গেল। খোকা কেমন আছে?

খোকার সামান্যই জর হয়েছে; এখন ঘুমুচ্ছে। সুশীর কথার মধ্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হল।

বললাম—তাই ত; খোকাটার জর হ'ল—

'জর হয়েছে, ছেড়ে যাবে'খন্, অত ভাববার কী আছে? জর ত বেশী হয়নি, গাটা একটু গরম হয়েছে মাত্র—'

খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। না, জর বেশী নয়। সুশীকে জিজ্ঞাসা করলাম—সর্দ্দি নেই ত।

না—সুশীর স্বর শুষ্ক।

একটু স্তব্ধতার পর সুশী বললে—কথায় যে বলে মা না ডাইনী—মা'র কথা ছেলের স'য় না। কালই বলছিলুম না, যে খোকার আমার অসুখ বিসুখের বালাই নেই।

মাতৃ-হৃদয়ের ব্যথার কতখানি সান্ত্বনা ও ধিক্কার এই কথা ক'টীর মধ্যে লুকানো!

সে রাত খোকা বেশ শান্ত ভাবেই ঘুমিয়েছিল, কিন্তু ঘুম ছিল না খোকার মায়ের। ঘুমোবার ভান করে সে যে শুয়েছিল এ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম তার শোবার ভঙ্গীর আড়ষ্টতা দেখে। সারারাত সে এই ভাবেই কাটিয়েছিল, অথচ এই সুশী এত ঘুম-কাতুরে ছিল যে, এজন্যে অনেক সময় আমিই বিরক্ত হ'য়ে উঠতুম। কিন্তু খোকা আসবার পর থেকে এ বিষয়ে সুশীর কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটেছিল।

প্রভাতে ঘুমন্ত খোকাকে আমার কাছে রেখে সারারাত্রি অনিদ্রার কলঙ্ক প্রাতঃস্নানের প্রলেপে মুছে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সুশী তার দৈনন্দিন কাজ সুরু করে দিল।

ভাবছিলুম সুশীর কথা। কী অশ্রান্ত কর্ম্মকুশলতা। হয়ত এটা অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু তবুও সুশীর এই কর্ম্ম-কুশলতায় তার প্রশংসায় আমার ম ভরে উঠল।

খোকা জেগে' কেঁদে উঠল।

আমি খোকাকে শান্ত কর্ব্বার প্রয়াস পেতে না পেতে সুশী এসে, তাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে স্নেহচুম্বন বর্ষণে অভিষিক্ত করে দিল। তার পর বললে—দেখ, খোকার গাটা এখনও ত ঠাণ্ডা হ'ল না। একটু অষুদ্ বিষুদ দিলে হত না?

হ্যাঁ, আচ্ছা দাও দেখি খোকাকে, পাশের বাড়ীর কবিরাজকে নয় দেখিয়ে আনি।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে সে তাকে আমার কোলে তুলে দিল। তারপর কি মনে করে খোকার হাতের একটা আঙুল কামড়ে দিয়ে বললে—তোমার জানা কেউ ডাক্তার নেই?

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

—জানা ডাক্তার আছে, একটু ঘুরে, সেখানে ত খোকাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আজ আপিস থেকে ফেরবার পথে নয় তাকে একবার বলে আসব। এখন তবু কবিরাজ মশায়কেই দেখিয়ে আসি। দেখি কি বলে!

সুশী আর দ্বিরুক্তি করলে না।

কবিরাজ খোকাকে বেশ যত্ন ক'রেই দেখলেন। বললেন—হুঁ, নাড়ীটা কিছু চঞ্চল বটে, কিন্তু কোনো জটিলতা নেই। জ্বর হয়েছে আজ ক'দিন?

—কাল সকাল থেকে। একই ভাবে জ্বর রয়েছে, কমেও নি, বাড়েও নি।

—হুঁ, তা উপস্থিত চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে কি না কাল—অর্থাৎ ষষ্ঠীতে জ্বর হয়েছে, একটু ভোগাবে এই যা—

ফিরে এসে সুশীকে প্রশ্ন করলাম—খোকার জ্বর হয়েছে কবে থেকে? কাল সকাল থেকে, না পরশু রাত্তিরেই টের পেয়েছিলে?

সুশী উৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করলে—কেন বল ত।—কই রাত্তিরে তত বুঝতে পারিনি। সকালে খোকাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মনে হ'ল যেন গা'টা একটু বল্ বল্ কচ্ছে।

ভেবেছিলুম, ষষ্ঠীর দিনের কথা বলব না। কিন্তু না বলেও পারলুম না। সুশীকে শান্ত করতে গিয়ে বলে ফেললুম—কব্‌রেজ মশায় বললেন—চিন্তার কিছু নেই। তবে—'ষষ্ঠী'তে জ্বর হয়েছে, সারাতে একটু সময় নেবে।

সুশীর চোখের দীপ্তি যেন একেবারে নিভে গেল। মুখে রক্ত-হীনতার বিবর্ণতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুশী নিজেকে সংযত করে নেবার পূর্ব্বেই, অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললাম—ও 'ষষ্ঠী' তিথি কিছু না। তবে এখন হাওয়া বদ্‌লাবার সময়, একটু সাবধান হওয়া ভাল।

সুশী কোন কথা বললে না। শুধু আপিসে যাবার সময় একবার জানিয়ে দিল—ফেরবার পথে, তোমার জানা ডাক্তারকে যদি পার ত খোকার কথা জানিয়ে এস।

তিথি বা ক্ষণ আমি বিশ্বাসই করি না। তবু কথাটা শুনে মনটা যেন কেমন দুলে ওঠে। তিথি বা ক্ষণের প্রকোপে কী শুভাশুভ ঘটনা আমার জানা আছে তার তালিকা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

সারাদিন এই ভাবেই কাটিয়ে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম। আজ আর ভাল লাগছিল না। মন এত দ্রুত যেতে চায়, যে তত দ্রুত চলা অসম্ভব। হিসাব না করেই ট্রামে চড়লাম।

পথে ডাক্তার বন্ধুর খোঁজ করে গেলাম। দেখা হ'ল না। বাড়ী ফেরবার জন্যে উদ্‌গ্রীব মন নিয়ে অপেক্ষা করতে পারলাম না।

খোকাকে কোলে নিয়ে সুশী বসে ছিল। আমাকে দেখে শুধু মৃদুস্বরে বললে—এসো।

সে স্বরে কতখানি ভয় ও নির্ভরতা!

আমি মৃদু ভয়কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করলাম—খোকার জ্বর কি খুব বেশী?

সুশী একবার ঘাড় নেড়ে বললে—জ্বর এত যে গায়ে হাত রাখা যায় না। তার ওপর দুবার বমিও করেছে। সারা দুপুর মাথার যন্ত্রণায় বাছা আমার ছটফট্ করেছে।

উদ্‌গত অশ্রু রোধ ক'রে সে সংযমের প্রতিমার মতো বসে ছিল। সুশীর এই মৌন শান্ত স্থৈর্য্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। আবার ডাক্তার বন্ধুর সন্ধানে বা'র হ'লাম।

বন্ধু তখন বাইরে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন—কি নরেন, খবর কি? মুখ এত শুক্‌নো যে?

মুখে একটা হাসির ছলনা টেনে আনবার চেষ্টা করে বললাম—শুক্‌নো হবে না? সারাদিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, তার উপর খোকার অসুখের ভাবনা।—

'খোকার অসুখ!—কী অসুখ করেছে?' একটা কৃত্রিম ঔৎসুক্যের ভাব তার মুখে।

এ ভাব লক্ষ্য করলেও উপেক্ষা করে বললাম—বড্ড জ্বর হয়েছে, গায়ে হাত রাখা যায় না। তার উপর আবার দুবার বমিও করেছে। একবার দেখে যাবার সুবিধে হবে কি?

—'যাওয়া'—রিষ্টওয়াচটার দিকে লক্ষ্য করে একটু হিসাব করে সে বললে—সাড়ে সাতটায় থিয়েটার আরম্ভ, এখন দেখছি সাতটা কুড়ি—আর ত দেরী করা চলে না।—আচ্ছা জ্বর আর দুবার বমি করেছে।—ও কিছু নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা—একটা অষুদ লিখে দিচ্ছি—দু ঘণ্টা অন্তর এক দাগ। একটা স্লিপ্ নিয়ে ফস্‌ফস্ করে সে প্রেসকৃপসান লিখে দিল। তার পর সেটা আমার হাতে দিতে দিতে বললে—কিছু মনে

করিস নি ভাই। বড্ড তাড়াতাড়ি, নইলে যেতুম।—আর ভাল কথা—জ্বরের ওপর দুধটুদ্ যেন দিস নি। একটা এলেনবেরীস্ ফুড নম্বর ওয়ান নিয়ে যাস্। হাঁা, আর কাল সকালে খবর দিস্ কেমন থাকে।

কোনো রকমে শিষ্টাচারের গণ্ডী ঠিক রেখে ঘাড় নেড়ে এই অপমান-বর গ্রহণ ক'র্ত্তে হ'ল।

কিন্তু এইবার!

হাত পাতলেই পাব, এমন কোনো বন্ধুর নাম আমার মনেই এল না। তবুও অনেক আশায় নিজেকে সংযত করে, এক বন্ধুর উদ্দেশে পাড়ি দিলাম। কিন্তু তত দূরও যেতে হল না। প্রায় মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। আর সেই মোটর থেকে নেমে এলেন—রাখাল বাবু, আমাদের আপিসের কেরাণী।

প্রেসক্রপসানখানা পকেটে রাখবার কথা মনেই হয়নি, সেখানা হাতেই ছিল। রাখাল বাবু বললেন—আরে ছ্যা ছ্যা, দাদা যে—কি ওখানা, প্রেসক্রপসান না কি? কার অসুখ?

সম্ভ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে তখনও সুস্থ হতে পারি নি। কোনো রকমে বললাম—আমার ছেলের।

রাখাল বাবু এক রকম জোর করে আমায় তার গাড়ীতে তুলে নিয়ে বললেন—ডিস্পেনসারীতে ত?

অত্যন্ত মাথা ঘুর'ছিল। তাই ঘাড় নেড়ে বললাম— হাঁা।

রাখাল বাবু ট্যাক্সিওয়ালাকে সেই মতো আদেশ দিলেন।

আমি ভাব'ছিলুম আমার এই নিষ্পর্দ্ধকতার কথা কেমন করে বলি। অনেক চেষ্টা করে বলতে যাচ্ছি, এমন সময় রাখালবাবু হেসে বললেন—কী, আমায় ট্যাক্সিতে দেখে ভায়ার মুখে যে আর কথা নেই। আমি কী ট্যাক্সি চড়ি? রেস্, ভাই, রেস্। আজ বেশ কিছু মোটা রকম পাওয়া গেল। ভাবলুম একটু আরাম ক'রে নিই। দুঃখ কষ্ট ত জীবনে আছেই রে ভাই। তবে আরাম কর্ব্বার যেটুকু সুযোগ পাই ছাড়ি কেন?

আমার মন আমার অবস্থাটুকু জানাবার জন্তে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনি সে কথা বলা সুষ্ঠু হবে কিনা ভেবে শুষ্কস্বরে বললাম—তবে—

আমার কথা আরম্ভ না হতেই রাখালবাবু বললেন—ও তবে টবে নেই ভাই। 'নগদ্ যা পাও হাত পেতে নাও' এই হচ্ছে আমার 'মটো'—

রাখালবাবুর 'মটো' জানবার জন্তে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। মোটরও ডিস্পেনসারীর কাছে এসে পড়েছিল। তখন মরিয়া হ'য়ে বলে ফেললুম—রাখালবাবু, অষুদের জন্তে কটা টাকা—

মোটর ততক্ষণে ডিস্পেনসারীর সামে এসে দাঁড়াল। রাখালবাবু আমায় বাধা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, সে সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বস গাড়ীতে।

রাখালবাবু প্রেসক্রপসানখানা নিয়ে বললেন—আর কিছু?

'এলেনবেরী একটা'—

'আচ্ছা, নিয়ে আসছি।

অষুদ ও ফুড় নিয়ে রাখালবাবু ফিরে এসে বললেন—এই নাও।

তারপর কি ভেবে বললেন—আচ্ছা চল, তোমার বাড়ী দেখে আসি।

ট্যাক্সিওয়ালাকে পথ বুঝিয়ে দিলাম।

রাখালবাবু খোকাকে দেখে ফেরবার সময় আমাকে ডেকে বললেন—ছিঃ ছিঃ ভায়া, আমাদের বলতে লজ্জা! নিজেদের অবস্থার কথা আমরা জানি না? যা মাইনে পাই তাতে হয়ত কোনো রকমে খাই-খরচ চলে। ব্যস্। তার বাইরে একটা খরচ এলে চক্ষু চড়কগাছ! টাকা ভারী দরকারী জিনিষ—বুঝলে।

পকেট থেকে একখানা নোট বার করে, আমার হাতে গুঁজে দিয়ে, রাখালবাবু তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন।

রাখালবাবুকে একটা ধন্তবাদ দিতে ভুলে গেলাম। এত বড় হৃদয়ের দানের প্রতিদানে শুষ্ক কথার ধন্তবাদ দেবার প্রবৃত্তি তখন ছিল না।

মনটা বড় খুসী হ'য়ে উঠল। ঘরে এসে অত্যন্ত সহজ ভাবে সুশীকে নোটটা দিলাম। সুশী জিজ্ঞাসু ভাবে আমার দিকে তাকাল।

আমি স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বলবার চেষ্টা করলাম। ধীরভাবে সমস্ত ঘটনা শুনে সুশী নোটটা আমার দিকে দিয়ে বললে—ওঁর এই দয়ার ঋণ আমরা কোনকালে

শোধ কর্ত্তে পার্ব্ব না। কিন্তু এই জুয়ার টাকা ত আমার খোকার জন্যে খরচ কর্ত্তে পারি না। এ টাকা তুমি ওঁকে ফিরিয়ে দাও।

আমি আশ্চর্য্য ভাবে সুণীর দিকে তাকালাম। তারপর যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। কি যে এই মেয়েদের ভাবপ্রবণতা বুঝি না।

অগত্যা আবার বুার হয়ে ছলনা করে সেই টাকাই নিয়ে ফিরলাম। এবার সুণী পূর্ণ বিশ্বাসে এ টাকা গ্রহণ করলে।

সুণীর এই বিশ্বাস এবারে আমাকে দোলা দিল। আমি আমার মনকে যথেষ্ট শাসন করেও এই সামান্য অশান্তির হাত এড়াতে পারলাম না। মনে হ'ল—এ টাকা ঘুরিয়ে এনে না দিলেই ভাল হত। যদি এতে খোকার ভালমন্দ একটা কিছু হয় তা' হ'লে আমার যে আপশোষের সীমা থাকবে না।

রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারলাম না। চিন্তার দাহে সে রাত্রির অশান্তির তুলনা হয় না।

প্রভাতে উঠে দেখি, সুণীর মুখের আভা ফিরে এসেছে। সে হেসে বললে—খোকার জ্বর ছেড়ে গেছে।

আমার মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। য'ক্, তা হলে ও টাকা আর খোকার জন্যে খরচ কর্ত্তে হবে না। কিন্তু কিছু বললাম না।

সুণী বললে—তুমি খোকার কাছে একটু বস; আমি ক্ষুদটা তৈরি করে নিয়ে আসি। কাল সারাটা দিন খোকার পেটে একরত্তি জলও পড়েনি।

এক দিনের জ্বরেই খোকা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে নিস্তেজ ভাবে শুয়ে রইল। আমাকে তার পাশে দেখে তার মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল। আমার স্নেহ সম্ভাষণ সে মুদিত নেত্রে উপভোগ করলে। মনে মনে অতি আবেগে বললাম—খোকা, খোকা আমার।

খোকাকে সুস্থ দেখে মন আমার অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গিয়েছিল। গত রাত্রির ছলনার কণ্টকটুকু তখনও তার অস্তিত্ব ভুলতে দেয় নাই। সেটা তখনও মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করছিল।

সুণী খোকাকে খাইয়ে গেল। আমাকে বাজারের পয়সা বুঝিয়ে দিলে; কিন্তু টাকাটা ফেরাবার কথা মুখেও আনলে না।

ভাবনা হল কেমন করে টাকাটা চেয়ে নিই?

সেদিন রবিবার, কোনো রকমে কাটিয়ে দিলাম। পরের দিন আফিসে যাবার সময় দেখি—খোকা বসে বসে খেলা করছে—তখন বেশ সাহসে একটু বুক বেঁধে সুণীকে বললাম—ওগো, আর বোধ হয়, ও দিনের নোটটায় দরকার হবে না। দেনা যত শীগ্‌গির শোধ হয় তত ভাল। ওটা ফিরিয়ে দি, কি বল।

সুণী ঘাড় নেড়ে বললে—সেই ভাল, আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম।

সুণী নোটটা এনে দিল।

নিজের দুর্ব্বলতা অপ্রকাশিতই র'য়ে গেল। সেজন্যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু এখন টাকাটা ফেরাই কি বলে?

আপিসে এসে প্রথমই দেখা রাখালবাবুর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলেন কি ভায়া, খোকা কেমন, ভাল ত?

ঘাড় নেড়ে বললাম—আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালই আছে। তার পর পকেটে হাত দিয়ে বেশ একটু সাহস করে বললাম—দাদা, টাকাটা আর খরচ করবার দরকার হয়নি। তাই—

—ফিরিয়ে দিতে চাও। দাও। দেনা শোধ করে ফেলাই ভাল। টাকা বড় দরকারী জিনিষ। রাখালবাবু হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে পকেটে পুরলেন। তার পর আমার দিকে একটা দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন। কোনও কথা বললেন না।

আমার একবার, কি জানি কেন, মনে হল, রাখালবাবু কি রাগ করলেন?

আগমনী—আশীষ

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ,বি-এল, বি-সি-এস্

১

আশ্বিনে আজ আশীষ মায়ের
মেঘ-ভাঙা ঐ নীল গগনে
ছড়িয়ে গেল— ধানের শীষে,
কাশের ক্ষেতে, কমল-বনে!
বর্ষা বিদায় মাগ্‌ল,
শরৎ হেসে জাগ্‌ল,
শতদলের অরুণ আভাস আঁখির কোণে লাগ্‌ল।

২

ইন্দ্রপুরীর পারিজাতের
পাপ্‌ড়ি খসে' পড়্‌ল কি রে?
নন্দনেরি ভাণ্ড হ'তে
ঝর্‌ল সুধা ধরার তীরে?
অশ্রু-বাদল টুট্‌ল,
খুসির কুঁড়ি ফুট্‌ল,
কেয়ার রেণু অঙ্গে মাখি' মৌমাছিরা ছুট্‌ল।

৩

ভাঙা ঘরের আঙিনাতে
শিউলী ফুলের শুভ্র হাসি—
ভাঙা বুকের গোপন কোণে
আগমনীর বাজ্‌ল বাঁশী।
হারানিধি ফির্‌ল,
মায়ের কোলে ভিড়্‌ল,
মূর্চ্ছা ভেঙে মৌন আশা গুঞ্জরিয়া ঘির্‌ল।

৪

মর্ম্মতলের নিবিড় নীরে
হয় তো ছিল সুপ্ত সাধ—
মাথায় করি' নিলাম তুলি,
জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ!
দিগ্‌বধূরা হাস্‌ল,
জমাট আঁধার নাশ্‌ল,
ভরা পালে জোয়ার জলে মনের তরী ভাস্‌ল।

৫

তোমার দানের মোহন মোহে
তোমায় যেন না যাই ভুলি'—
দেওয়া-নেওয়ার চিত্র আঁকে
নানান্ টানে তোমার তুলি।
সুখে অটল রইতে,
দুখের বোঝা বইতে,
শক্তি দিয়ো বর্ষা-শরৎ নির্ব্বিকারে সইতে!

পল্লীরাণী

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

বসন্তের মৃদুহিল্লোল, থাকিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধ পল্লীখানার বুকের উপর শান্তির অমিয়ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। গাছে-গাছে কোকিলের কুহুতান, ঝোপের আড়ালে দয়েল, পাপিয়ার কমনীয় কণ্ঠ, চৈত্রের অপরাহ্ণটীকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। বারোয়ারীতলায় ছেলের দল একটা থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। তাহারই অদূরে একটা প্রাচীন বটগাছের নীচে, একটা ভাঙ্গা আটচালার ছারপোকাওয়ালা তক্তপোষের উপর বসিয়া গ্রাম্যদেবতাগণ নানাবিধ পরনিন্দারূপ সদালাপে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের গভীর গবেষণার বিষয় ছিল, কাহার স্ত্রী কি ভগ্নী দুশ্চরিত্রা, কাহাকে সমাজে আটক দেওয়া যায়, কাহার বাপের শ্রাদ্ধে গোয়ালাকে গোপনে ডাকিয়া জিনিস দিতে নিষেধ করিয়া

দেওয়া যায়, ইত্যাদি। আটচালার পাশ দিয়া গ্রামের ছোট নদীটী, তাহার ছোট সম্পদ বুকে লইয়া অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে; কারণ এখন বসন্ত, বর্ষা নহে। বটগাছের দক্ষিণ দিকে একটা পুরাতন জীর্ণ ঘাট্‌লা, শেওলাতে পিচ্ছিল হইয়া, কত যুগের জীর্ণস্মৃতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, কে বলিবে?

একঘর বনেদী সেকেলে গৃহস্থ, যেমন প্রায় প্রতি গ্রামেই থাকে, এখানেও ছিল। এদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে এরা প্রায়ই গর্ব্ব করিয়া বলিত—"কীর্ত্তিনাশা যখন রাজনগরের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া লইয়া যায়, তখন তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ, রাজা রাজবল্লভের খুল্লতাত, এইখানে আসিয়া বসতবাটীর ভিত্তি স্থাপন করেন। নবাবী আমোলের খান্দানীর ঠাট্‌-বহর স্বরূপ, তাহাদের সদর দেউড়ীতে একটা নহবৎ, বৈঠকখানায় দু'চারখানা মরিচাপড়া ঢাল, তলোয়ার; আর এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দরোয়ান, পাকা দাড়িতে দড়ি বাঁধিয়া হিন্দী রামায়ণ পড়িত। গল্প উঠিলে সে বলিত—"আরে বাপ্‌রে বাপ্‌, রাজা রাজবল্লভ সাড়ে পাঁচ হাত জোয়ান পুরুষ ছিল" ইত্যাদি।

হরনাথ সেন, বহুদিন হইল সবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন পূর্ব্বপুরুষের ভগ্নাংশ জমীদারীর মুনাফার তদ্বির-তদারকে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত,—"সেন ম'শায়, কাশী যাবেন কবে?" উত্তর হইত, "আরে ভাই, যমুনার বিয়েটা, আর এই চৈতন্যপুরের হাঙ্গামাটা মিটিয়েই লম্বা দেব!" কিন্তু কাজে আর তাঁহার কাশী যাওয়া হইত না। দু'একজন বন্ধু পীড়াপীড়ি করিলে হরনাথ বলিতেন—"আরে ভাই, কিসের কাশী, গয়া? কলিতে হচ্ছে কি জান "হরের্নামৈব কেবলম্‌।" হরনাথ কতকগুলি খতখাতার মকর্দ্দমার কাগজপত্র, তলব বাকীর লিষ্টি, নিরিখবৃদ্ধির ফিরিস্তি, সুমারের গোসরা এবং আমলার মাসহারা লইয়া নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়াছিলেন, এমন সময়ে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—"দিদিরাণী ডাকছেন।" দিদিরাণীর কথাটা শুনিয়াই হরনাথ তাহার সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। এই মেয়েটীকে না কি দু'বৎসরের রাখিয়া হরনাথের স্ত্রী পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এই মেয়ের নামই যমুনা।

যমুনাকে আদর করিয়া কেহ দিদিরাণী, কেহ পল্লীরাণী, কেহ বা রাণী বলিয়া ডাকিত। বসন্তের রাণীর মত রূপের নদীতে যমুনার পূর্ণ যৌবনের বিকাশ হইয়া আসিতেছিল। পল্লীর স্নিগ্ধ, শান্ত কোলে এই নববসন্তেই যমুনা আপন মনে বসিয়া গাহিত—

"একলি মন্দিরে, অনিদ লোচনে
জাগি সাগর রাতিয়া॥"

যমুনা রূপবতী, গুণবতী; কিন্তু যমুনার আজিও বিবাহ হয় নাই। কেহ বলিত, হরনাথ মেয়ের বিবাহ দিয়া একটী ঘরজামাই রাখিতে চায়। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা আর ঘরজামাই থাকে না। কেহ বলিত, কি জানি ভাই, যমুনার মা না কি পাঞ্জাবে ছিল,—কি যেন কি ভাই, বড় ঘরের ছাই ভস্ম দিয়ে কি দরকার? ইত্যাদি। সেদিন গাঁয়ের ছেলে অমল দেওঘর হইতে যমুনাদের বাটীতে আসিয়াছিল—যমুনার জন্মতিথির নিমন্ত্রণ। কত বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়াছে। যমুনা একখানা ফিরোজা রংএর বারাণসী পরিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। বাসন্তী সন্ধ্যায়, বসন্তের রাণী যমুনার দিকে সকলেই হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল। পল্লীর বন্ধুরা পল্লীরাণীর জন্য কুসুমের মালা, কুসুমের হার সাজাইয়া আনিয়াছিল। আর সুদূর নগরের প্রবাসী বন্ধুগণ তাহার জন্য নগরের নিত্য নূতন বিলাস-সামগ্রী উপহার পাঠাইয়াছিল। পল্লীরাণী যমুনা আজ ফুলের মালা ফুলের হার পরিয়া সত্যিই "পল্লীরাণী" সাজিয়াছিল। যমুনা কাহাকে বা মিষ্টি কথায়, কাহাকে বা অর্গানের সাহায্যে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিতেছিল। অমল আসিয়া অর্গানের সামনে বসিল। যমুনা গান ধরিল—"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো" মুগ্ধ দর্শক এবং স্ত্রীলোকগণ সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল। সকলেই বুঝিয়া গেল—অমলই যমুনার বর।

অমল এ গাঁয়ের ছেলে হলেও তা'রা দেওঘরেরই পাকা বাসিন্দা। পূর্ব্বপুরুষের ছটাক-নটাক তালুক-মুলুক, ভাঙ্গা দালান-কোঠা, যখন সাত-শরিকের দেনার দায়ে নিলাম হইয়া গেল, তখন অমলের দাদা সবেমাত্র বি-এ পাশ করিয়া এম-এ আর "ল" পড়িতেছিল। তখন হঠাৎ তাহার পিতৃদেব দেওঘরে স্বর্গারোহণ করিলেন। অমল গাঁয়ের কাছে শেষ বিদায় লইয়া ভাইটীর হাত ধরিয়া দেওঘর চলিয়া গেল। তাহার বাবা সেখানে একখানা মেটে কোঠা আর

হাজার দু'চার টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই দিয়া দু' ভাই বেশ একটা ছোটখাট সংসার পাতিয়াছিল। কিন্তু, পল্লীর মায়াটা সে একেবারে কাটাইতে পারে নাই। কারণ, পূর্ব্বপুরুষের পুরোন ভাঙ্গা বাড়ীটা, তার পেছন দিকের বাঁশ ঝাড়, আর নারিকেল-কুঞ্জের আড়ালে পিক-বধুর মনোহর কাকলি; সর্ব্বোপরি, বাল্যসাথী যমুনার স্নেহ ভালবাসা-মাখা মধুর স্মৃতি-বিজড়িত কচি কোমল হস্তের লিপিখানা, তাহার জন্মতিথির দিনে তাহাকে কোন্ সুদূর হইতে যেন পল্লীর মাঝে, পল্লীরাণীর হৃদয়-মন্দিরের পূজার দেবতার সাজে সাজাইয়া আনিত। সবদিকের সমস্ত কাজ ফেলিয়া অমলকে বৎসরের নববসন্তের বধুর মধুর জন্মতিথিতে পল্লীরাণীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতে হইত।

বসন্ত চলিয়া গেল, বর্ষা আসিল। মানবের জীবনেও ত এম্নি কত বসন্ত চলিয়া গিয়া কত বর্ষা আসে, কে তার খোঁজ রাখে? কীর্ত্তিনাশা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। বিশাল, বিপুল, অনন্ত তরঙ্গের প্রচণ্ড লীলা, বিশ্বপ্রকৃতির বুকে একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। অদূরে রাজনগরের দু'একটা শেষ গরিমার শেষ নিদর্শন, তখনও ঘনবিন্যস্ত বনানীর অন্তরাল হইতে, বর্ষার গুরু গুরু শিহরণের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল—মাঝে-মাঝে যেমন প্রাচীন স্মৃতি আজিও কীর্ত্তির ডালা সাজাইয়া, মানবের অতীত গরিমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রচণ্ড তরঙ্গ-সমাকুলা কীর্ত্তিনাশা, রাজবল্লভের অসীম কীর্ত্তি গ্রাস করিয়া শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—অগ্নিদেব যেমন খাণ্ডব দাহন করিয়া শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। এবার অমল অনেক দিন থাকিয়া গেল। সবুজ বন, নারিকেল-কুঞ্জ, বর্ষার পূর্ণ জোয়ার, ভেকের রব, এগুলি যেন তার এবার নূতন করিয়া ভাল লাগিতেছিল। বর্ষার ভরাবুকে একখানা পান্‌সি ছুটিয়াছিল। পান্‌সি, ভরা জোয়ারের বুকে যমুনার পূর্ণ যৌবনতরী বহন করিয়া ছুটিয়াছিল,—সঙ্গে ছিল তার চিরদিনের সঙ্গী—অমল।

অমল—কি সুন্দর যমুনা, আজ যেন কীর্ত্তিনাশা তাহার সমস্ত কীর্ত্তিমেখলা লইয়া প্রাচীন ধ্বংসের বুকে নূতন কিছু একটা সৃষ্টি করিতে যাইতেছে।

যমুনা—আমারও মনে হয় অমল, আজ যেন কীর্ত্তিনাশা নূতন সাজে সাজিয়াছে। কিন্তু এ কি ধ্বংস না সৃষ্টি, প্রলয় না স্থিতি, কি ক'রে বল্‌ব।

অমল—আমি আর কতকাল আশায় আশায় ঘুর্‌ব যমুনা? আমি ত তোমার সব কথাই রেখেছি।

যমুনা—অমল, আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর; তার পর যদি তোমার প্রাণের যমুনার জন্য সত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, সব ত্যাগ কর্ত্তে পার, তাহলে সে তোমারই।

অমল—কেন যমুনা! সত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, ত্যাগ কর্ত্তে হবে কেন? অমল যমুনার হাতখানা নিজের হাতে তুলিয়া লইল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। যমুনার দেহলতা অমলের কোলে লুটাইয়া পড়িল। ঘাটের নৌকা ঘাটে ফিরিয়া আসিল।

যমুনার পত্র—

প্রিয়তম,

পাঞ্জাবে বাবা এক বাঈজিকে বিবাহ করেন। আমি সেই বাঈজি-মায়ের গর্ভজাত সন্তান। সমাজের বুকে দাঁড়াইয়া আজিও আমি সমাজকে ধ্বংস করি নাই, কলুষিত হইতে দিই নাই। নইলে যমুনার বুকে কতজনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিয়াছে। প্রিয়তম, সুধু দুটো পুরুতের মন্ত্র না হলে কি বিবাহ হয় না?। বাবা, মা চিরদিনই স্বামী, স্ত্রী ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা পাগল হ'য়ে দেশে ছুটে এলেন। আমি বাবার বুকে আশ্রয় পেলাম। কীর্ত্তিনাশা তাঁদের বংশের সমস্ত কীর্ত্তি ধ্বংস করেও প্রাচীন বংশ-গৌরবের স্মৃতি-চিহ্নটুকু মুছে ফেলে নাই। প্রিয়তম, জীবনসর্ব্বস্ব আমার, এখন দেখ্‌ব তুমি যমুনাকে কত ভালবাস।

যমুনা

সন্ধ্যার আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে! অমলদের পুরোন দালানে এক বৃদ্ধা পিসিমা আজিও শালগ্রাম শিলার সেবাযত্ন করিত। অমল আসিয়া পিসিমাকে প্রণাম করিল। পিসিমা আশীর্ব্বাদ করিলেন "—বাবা, সনাতন ধর্ম্মে যেন মতি থাকে।" অমল যমুনার বাড়ীর দিকে চলিল। তাহার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। যমুনা অমলকে দেখিয়া তেমি ছুটিয়া আসিল। অমল যমুনাকে সাম্‌নের চেয়ারে বসিতে বলিল মাত্র। যমুনার রুদ্ধ অভিমান ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। আকাশে "গুরু গুরু দেয়া" গর্জ্জিয়া

উঠিল। কীর্ত্তিনাশা ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল। রাজবল্লভের শেষ কীর্ত্তির ধ্বংসের শব্দে গ্রামবাসীরা চমকিয়া উঠিল। প্রলয়ের পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিল।

যমুনা—ওগো নিষ্ঠুর, ওগো পাষাণ, এই কি পুরুষের ভালবাসা ?

অমল—তা নয় যমুনা; ভাবৃছি একটা কথা। কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও কীর্ত্তিনাশা ভীষণা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে গ্রামখানিকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। সাম্‌নে ছিল তাদের পল্লীরাণী। যমুনাকে অনেকেই পল্লীরাণী বলিত।

চাঁদের ভরাবুকে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ খেলিতেছিল; আর তটিনীর বুকে অনন্ত গর্জ্জন থাকিয়া-থাকিয়া পল্লীবাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া দিতেছিল। নদীর তীরে তখন কেবলমাত্র অমল আর যমুনা দাঁড়াইয়া ছিল। অমলের বুকের মধ্যে কেবলই রহিয়া-রহিয়া বাজিতেছিল—"ওগো নিষ্ঠুর! ওগো পাষাণ!" কোথা হইতে একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া যমুনাকে কীর্ত্তিনাশার বুকে টানিয়া লইল। অমলও সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত তটিনীর বুকে—'রাণী, রাণী, পল্লীরাণী' বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। নৈশ গগনে তখনও প্রতিধ্বনি হইতেছিল—"পল্লীরাণী!"

মুক্তির পথ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত

ভারতবর্ষ পুরাতন সভ্যতার ধারা হারাইয়া ফেলিয়া এখন মোহাবিষ্টের মত চলিতেছে। এত বড় একটা বিরাট দেশ, বেদনার বোধশক্তি পর্য্যন্ত আজ তাহার নাই। সাধারণ লোকের সহিত সাম্রাজ্য পরিচালনের ব্যবস্থার যোগ ভারতবর্ষে বরাবরই কম ছিল। কি উদ্দেশ্যে কোন্ অনুশাসন হইতেছে তাহা প্রজাসাধারণ প্রায়ই জানিত না। ব্যবহারিক শুভাশুভ ব্যবস্থার জন্য রাজার উপরই তাহারা নির্ভর করিয়া থাকিত। ইহা আজিকার কথা নয়, ইহা চিরাচরিত। রাজা প্রজার এই সম্বন্ধ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন প্রার্থনাতেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। স্বস্তি প্রজাভ্যঃ—প্রজার শুভ হউক, পরিপালয়ন্তাং ন্যায্যেন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ—রাজারা ন্যায্য পথে রাজ্য পালন করুন। প্রজার সহিত রাজার ধর্ম্মের দিক দিয়া যোগ থাকায় এই ব্যবস্থাতে শুভই হইত। রাজার ধ্যানই ছিল প্রজার হিতসাধন করা।

কিন্তু আজ এ ব্যবস্থার অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ বিদেশী শাসন ভারতবর্ষের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। এই শাসকদিগের উদ্দেশ্যই হইতেছে ভারতবর্ষের শাসন দ্বারা ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডবাসীকে লাভবান্ করা। রাজার প্রত্যেক প্রচেষ্টার মধ্যেই আজ এই স্বার্থের চেহারাটাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যেখানেই ভারতীয় স্বার্থের সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থের সংঘাত বাধে, সেই স্থানেই ভারতবর্ষের স্বার্থ বলি দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন করা হইত। ইংরাজের স্বার্থে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প নষ্ট করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতবর্ষে প্রচলিত করা আবশ্যক হইয়াছিল। রাজশক্তির সাহায্য লইয়া ইংরাজেরা এই অনিষ্টপাত করিয়াছেন।

ঐ একটি কেন্দ্রীয় শিল্প নষ্ট করার পর আমাদের একটির পর একটি শিল্প বলি দেওয়া হইয়াছে। সে জোলা-তাঁতীর ব্যবসা তো গিয়াছেই—সে কামার-কুমার, সে তামা-পিতল-কাঁসার বাসনওয়ালার ব্যবসাও নাই। ছুতারের বড় ব্যবসা ছিল নৌকা তৈরী করা। রেলের জন্য নৌকা লোপ পাইয়াছে। সে ছুতারের জাত আজ লুপ্তপ্রায়। যানবাহন ও যানবাহনের সমস্ত উপকরণ আজ বিদেশীর হাতে।

এক দিক দিয়া এমনি করিয়া যেমন দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া দেশ নির্ধন হইতেছে, অপর দিকে আবার তেমনি দেশের ভিতর নানা অনাবশ্যক বিলাতী দ্রব্যের প্রবেশ ও ব্যবহারের পথ খুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার

পরিপন্থী নীতিসূত্র সকল কৈশোরেই শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করে। বিলাসোপকরণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি এবং বিলাতী দ্রব্য দ্বারা সেই অভাবের পূরণ—এই কর্ম্ম সুনিপুণ ভাবে প্রতিনিয়ত চলিতেছে। সেই জন্যই জাতি আজ মোহাবিষ্ট। যাঁহারা দেশের জন্য ভাবিবেন তাঁহাদের সেই ভাবনার উৎসই বিকৃত। ফলে ভারতবাসী পুরাতন সভ্যতার ধারা দিনদিনই হারাইয়া ফেলিতেছে। অথচ এই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্বই এই জাতিকে নানা যুগে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আলেকজান্দার উত্তর-ভারত আক্রমণ করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও বিশাল বটবৃক্ষের দুই চারিটি পল্লব কাটিয়া ফেলিলে যেমন তাহা পরবৎসরই পরিপূরিত হয়, আলেকজান্দারের অনুষ্ঠিত ক্ষতি—কয়েক লক্ষ লোকক্ষয়, তাহা দুই এক বৎসরেই পূরণ হইয়াছিল। আলেকজান্দার ভারতের প্রাণস্পর্শও করিতে পারেন নাই—ভারতের সভ্যতার উপর এতটুকুও আঘাত করিতে পারেন নাই। লোকক্ষয় দ্বারা ভারতবর্ষকে মরণাহত করা যায় না—এ সত্যের পরিচয় মুসলমান-যুগেও পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান আক্রমণ ও ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেও ভারতবর্ষের আর্থিক হানি হয় নাই এবং সভ্যতার পরিবর্তনও ঘটে নাই।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। ইংরাজ বাণিজ্য ব্যপদেশে আসিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসে ভারতবর্ষের প্রাণ-পদার্থেরও সন্ধান লইয়াছে। ইংরাজ জানিয়াছে যে, ভারতীয়কে অভারতীয় করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে চিরদিন বিদেশী শাসন অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব। মানুষ যেমন গো-জাতিকে কিঞ্চিৎ আহার দিয়া তাহাদিগকে নিজেদের শত প্রয়োজনে আনে, ভারতে ইংরাজশাসন-পদ্ধতি তেমনি ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রয়োজনে সমস্ত ভারতবাসীকে ব্যবহার করিবার জন্য সচেষ্ট। কেহ কেরাণী, কেহ ডেপুটি, কেহ মুন্সেফ হইয়া শাসন অথবা শোষণ যন্ত্র পরিচালনা করিয়া এক দিক দিয়া ভারতের অর্থ বিলাতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন; অপর দিকে গ্রামবাসী ভারতীয়গণ কেবলমাত্র কৃষিজাত দ্রব্য, তুলা, পাট, ধান, গম উৎপন্ন করিয়া তাহা বিলাতে পাঠাইয়া তৎপরিবর্তে বিলাতজাত বস্ত্র ও শত শত অন্য আবশ্যক ও অনাবশ্যক দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতেই ভারতের ক্ষেম, ইহাই ভারতের উপযোগী—এমনি বিশ্বাস লোকের মনে গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতবাসীর অভাবের বোধ বাড়াইলেই বিলাতের পণ্য ভারতের বাজারে বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডকে ধনশালী করিবার পথ হয়। সেই চেষ্টাতে ভারতবর্ষের অন্নে সন্তুষ্ট থাকার যে একটা মনোবৃত্তি, একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই মোহাবিষ্ট অবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় জনসেবা। সেবা দ্বারা কলহ নিবারণ করা, সেবা দ্বারা জনসাধারণকে ধর্ম্মাধিকরণের মন্ত্রচক্র হইতে বাহির করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান দান করা, ভারতবাসীকে তাহার আত্মিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা আজ দেশকে মোহমুক্ত করার শ্রেষ্ঠ পথ। সাহস, বীর্য্য ও সহন ক্ষমতা সমস্তই সেবাধর্ম্মের ভিতর দিয়া জাতির মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। সাময়িক ঘটনায় অথবা কোনও মর্ম্মন্তুদ ও আপাত-অসহনীয় ব্যথায় যখন শাসন-পদ্ধতির দুষ্টতার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনও সাধারণতঃ সাময়িক ও উত্তেজনামূলক পথই একমাত্র প্রতিকারের পথ বলিয়া মনে হয়। উত্তেজক পন্থার দ্বারা জনগণের চিন্তাশক্তি উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে, জাগ্রত করা যাইতে পারে; কিন্তু পরে অভীপ্সিত ফললাভের চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহার জন্য নিষ্ঠা ও সাধনা চাই। কেবলমাত্র ভাবোন্মাদমত্ততা আমাদিগকে ক্ষণেকের জন্য মহত্ত্বের চরম স্তরে পঁহুছাইয়া অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত করিতে পারে; কিন্তু তাহার পশ্চাতে সাধনা ও সেবা না থাকিলে অচিরেই এবং অল্প বাধাতেই উত্তেজনা দারুণ অবসাদে পরিণত হয়। পার্ব্বত্য নদী যেমন এক দিনের বৃষ্টিতে উদ্বেলিত হয়, পাহাড়ের সানুদেশের বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিয়া বিপুল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইতে থাকে, আবার অতি অল্পকালের মধ্যেই শীর্ণা ও ক্ষীণতোয়া হইয়া বালুকাপ্রান্তরে প্রায় অন্তর্হিত হয়, তাহার গতিবেগ আছে কি না উপলব্ধি করা যায় না—সাময়িক উত্তেজনাও তেমনি অবসাদের বিস্তীর্ণ বালুকায় অল্পকালেই অন্তর্হিত হয়। যে স্থান ক্ষণকালপূর্ব্বে তরঙ্গায়িত, উচ্ছ্বাসময় ও আবর্ত্তমান ফেনিল জলরাশিতে পূর্ণ ছিল, দুই দিনের বৃষ্টিপাত বন্ধ হইলেই সেই স্থানের তপ্ত বালুকারাশি যেমন পূর্ব্বস্ফীতিকে পরিহাস করিতে থাকে, রাজনৈতিক উত্তেজনাও ঠিক তেমনি যখন অন্তর্হিত হয়, তখন আর তাহার পরিচয় মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে বিপুল জনতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় নিদ্রিত। শহরে, বন্দরে, গঞ্জে আর সেই বৈদ্যুতিক আবহাওয়া নাই, উদ্বেগ ও চিন্তাকুল আকাঙ্ক্ষা, স্বরাজ-প্রাপ্তির ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হয় না—পল্লীগ্রামে ততোধিক অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করিতেছে। এই প্রকারই হইবার কথা। ইহার অন্যথা হইলেই আশ্চর্য্য হইবার কারণ হইত। বৃহৎ উত্তেজনার পর বৃহৎ অবসাদ। যদি সেই উত্তেজনার মুখে আমাদের স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটিত তাহা হইলে জন-সমাজে মহত্ব পরিবর্দ্ধমান বেগে প্রবাহিত হইয়া কোনও সাম্প্রদায়িক বাধাকেই আর গণ্য করিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই, সেই জন্য জনতা হইতে অধিক পরিমাণে মহত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে। সেই জন্যই আজ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এমন উগ্র হইয়া কাঁটার মত বিঁধিতেছে। যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন না হইলে ভারতে স্বরাজ হইবে না বলিয়া সকলের ধারণা ছিল, সর্ব্ব প্রযত্নে যে মিলন আশুলব্ধ হইয়াছিল, আজ অবসাদের দুর্দ্দিনে সে মিলন স্বপ্নবৎ মিলাইয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে হিংসা ও বিদ্বেষের নরককুণ্ড আবর্ত্তিত হইতেছে। যে পরাধীনতার ব্যাধি এই সকল সাময়িক সামাজিক বিদ্বেষের উপসর্গরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ভুলিয়া আমরা আজ সাময়িক প্রতিকারেই সর্ব্বপ্রযত্নে মন নিযুক্ত করিয়াছি।

দেশের মুক্তির পথ জনসেবাতেই আছে, উত্তেজনায় নাই। কিন্তু সেবার জন্য সাধনার আবশ্যক। এ সাধনা নানা সূত্র অবলম্বন করিয়া হয়। মহাত্মা গান্ধীজী এই সাধনার পথ চরকাতেই পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজ দৈন্যে পীড়িত। এই দৈন্য নিবারণের উপায় দেশের বস্ত্রশিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা—৮০ কোটি টাকা—যাহা প্রতি বৎসর বস্ত্রের জন্য দেশের বাহিরে চলিয়া যায়—তাহা যাহাতে দেশে থাকে, তাহার চেষ্টা করা। তাই তিনি চরকার দ্বারা সমগ্র দেশকে সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন:

ইংলণ্ডের যত ঐশ্বর্য্য তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষে বস্ত্র ব্যবসায় করিয়া লব্ধ। আর ভারতের দৈন্যের একটা বড় হেতু বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার। যে শিল্পে বাৎসরিক ৮০ কোটি টাকা দেশে থাকে, তাহা ত সাধারণ নহে। এই অসাধ্য সাধন করিবার জন্য অসামান্য সাধনা আবশ্যক। এই সাধনার জন্য যে যন্ত্র আবশ্যক, তাহা কিন্তু অতি সাধারণ। একমাত্র চরকার সাহায্যেই এই বিপুল কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ইংরাজ আসিয়া আমাদের শিল্প নষ্ট করিবার পূর্ব্বে যেমন ঘরে ঘরে চরকা অবসর সময়ে চলিত, আর তাহার দ্বারাই দেশের বস্ত্রের অভাব মিটিত—পুনরায় সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনার দ্বারাই এ সমস্যার সমাধান করা যায়। নূতন কিছুই করার আবশ্যক নাই। যাহা ছিল, তাহারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, প্রাণনাশকারী অলসতা হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া জীবনদানকারী শিল্পে হস্তক্ষেপ করাই ভারতের মুক্তির উপায়।

কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা ভদ্র তাঁহাদিগকেই উদ্বুদ্ধ হইয়া জাগ্রত হইয়া এই কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষিত সমাজের পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই আজ সূতা কাটা আবশ্যক হইবে। বস্তুতঃ তাঁহাদের সম্মুখে আজ নিজে সূতা কাটা ও অপরকে সূতা কাটানো, নিজে খদ্দর ব্যবহার করা ও অপরকে খদ্দর ব্যবহার করানোর এক পরম কর্ত্তব্য উপস্থিত। যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় চরকা গ্রহণ করেন, তবে অপামর সাধারণকেও চরকা গ্রহণ করাইতে সাহায্য করা হয়। নিজে যদি কেবলমাত্র খদ্দর ব্যবহার করি, অন্য সমস্ত বস্ত্র ত্যাগ করি, তাহা হইলেই খদ্দর দ্বারা জনসেবার পথ চলিতে পারিবে। বাংলার একদল কর্ম্মী যশখ্যাতি সম্পদের সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া এই সাধনার পথই গ্রহণ করিয়াছেন—তাহারই ফলে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আজ অল্পবিস্তর চরকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের শিক্ষিত সমাজ যদি এই সাধনা গ্রহণ করেন, দীনতার দ্বারা গর্ব্বকে জয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে যদি তাঁহারা গণের সহিত মিলিত হন, তবে এমন দিন আসিবে, যখন তরঙ্গায়িত ভাদ্রের গঙ্গার মত জাগ্রত গণশক্তি চরকা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক কাম্য পথে বর্দ্ধিতবেগে ছুটিয়া চলিবে।

তাই যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিষ্ঠুর আঘাতে সমাজ-দেহ ক্ষত করিতেছে, তখনও খাদি কর্ম্মীর চরকা-সেবায় একনিষ্ঠ থাকিবার হেতু ও আবশ্যকতা আছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দুদিনের; কিন্তু ভারতের একান্ত হিত কল্পে এই দৈনিক দুঃখ নিবারণের ভার অন্য কর্ম্মীর উপর দিয়া খাদি-কর্ম্মীকে একনিষ্ঠ থাকিতে হইবে। খাদি কর্ম্মে সম্প্রদায় নাই—প্রাদেশিকতা নাই। ইহা নিখিল সমাজের ও নিখিল

ভারতের। আজ সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের দিনে যেন ভগবানের নাম স্মরণ করিয়াই যদি কর্ম্মীগণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির সামান্য মাত্র ত্যাগের দ্বারা যে মহৎ ফললাভ হইতে পারে, চরকাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাই চরকার দ্বারা যে সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথ আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা অনুপম। স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে নবযুবকগণ জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া দুরূহ দুর্গম পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সে সকল পথে যুবকগণেরই বিশেষ কৃতিত্ব ও অধিকার। কিন্তু চরকার দ্বারা দেশ-সেবা করিবার অধিকার সবল দুর্ব্বল, নরনারী, ধনী নির্ধন সকলেরই আছে। তাই অন্য সকল পথের তুলনায় আজ এই চরকা দ্বারা দেশসেবার পথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গান্ধীজী গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকলকে এই পথে আসিতে প্রেমভরে ডাকিতেছেন। কতবড় মহৎ সুযোগ, কি আনন্দের সংবাদ যে দেশের মুক্তি-কামনায় প্রত্যেকেই প্রতি দিনই কিছু না কিছু কাজ করিতে পারে। শারীরিক শ্রম দিয়া অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারে। চৈতন্যদেব প্রেমের বন্যায় বাংলা মাতাইয়া ছিলেন, গান্ধীজী প্রেমের বন্যায় আজ ভারতবর্ষ মগ্ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ঋষিদের তপস্যার ভিতর দিয়া প্রেমের আদর্শই চিরকাল জয়যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং চরকার এই আন্দোলনও যে এক দিন জয়যুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং তাহার ফলে নষ্ট শিল্পের তো উদ্ধার হইবেই, তাহা ছাড়া যে সভ্যতা হারাইয়া সে আজ ইয়োরোপের হীন অনুকরণে নিঃস্ব, রিক্ত—সে সভ্যতাও আবার ফিরিয়া আসিবে। আবার আত্মার বলে, ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া ত্যাগের রথে চড়িয়াই ভারতবর্ষ পৃথিবীতে জয়যাত্রার পথে বাহির হইবে।

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

(৪)

বালি হইতে ত্রিবেণী (১)

কলিকাতার পর হুগলী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে যে সব নগরী আছে, তাহাদের প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধি বাঙ্গালার অন্যান্য বহু গ্রাম সকলের তুলনায় অধিক। তদ্ভিন্ন পাশাপাশি এতগুলি গণ্যমান্য গ্রাম ও নগরী অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। দেশ বৈদেশিক শাসনাধিকারে আসার পূর্ব্বের কোন কথাই প্রায় জানিতে পারা যায় না। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা পুঁথিতে মাত্র কতিপয়ের নাম পাওয়া যায়। সে সকল পুঁথির মধ্যে "কবিকঙ্কন চণ্ডী" ও বিপ্রদাস কৃত "মনসা মঙ্গলের" নাম করা যাইতে পারে। "পাণ্ডব দিগ্বিজয়" বা "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থেও (২) বহু প্রাচীন গ্রাম ও নগরের কথা পাওয়া যায় এবং স্থানে স্থানে উহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া আছে; কিন্তু উহা সব ভাগীরথী-তটবর্ত্তী স্থান নহে।

এই সকল স্থানের যে সব ঐতিহাসিক বা অন্যান্য পরিচয় আছে, তাহার সমস্ত কথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নহে। মাত্র যে কিছু পুরাতন বিশেষ কথা, বা যাহার জন্য স্থানের প্রসিদ্ধি তাহার মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহাই অতি সংক্ষেপে বলা উদ্দেশ্য।

বালি বৈদেশিকগণের আগমনের বহু পূর্ব্বের সহর। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ইহার উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্ব ছিল। যে অষ্ট স্থান হইতে পূর্ব্বে বাঙ্গালা পঞ্জিকা প্রকাশিত হইত, বালি তাহার অন্যতম। শ্রীরামপুর এই খ্যাতি ইহার পরে অর্জ্জন

(১) এই প্রবন্ধের অনেক কথা Calcutta Review, vol. iv, 1845, notes on the Right Bank of the Hooghly নামক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

(২) ইহা প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহা ব্রাহ্মণ-প্রধান নগরী। কথিত আছে, সংস্রাধিক ঘর ব্রাহ্মণের এখানে বাস ছিল। বালির উত্তর প্রান্তস্থিত ছোট দুইটি মন্দির বিশপ্ হিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

হুগলী নদী—দশম শতাব্দীর নক্সা

বিপ্রদাসকৃত মনসামঙ্গলে লিখিত—স্থানগুলি দেখান আছে।

বালিতে খালের উপর যে সেতু আছে উহা প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কাপ্তেন গুড্উইন (Captain Goodwin) নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় বাঙ্গালায় এরূপ সুদৃঢ় ও সুন্দর অন্য কোনও সেতু কোথাও ছিল না। কিঞ্চিৎ ন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দেশী চিনির কাজ প্রবল ছিল।

এখানকার উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়-বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বংশের প্রথম গৌরব। তিনি প্রথম রেজিমেন্টের একজন কেরাণীরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া পরে প্রচুর ধনসঞ্চয় এবং তাহার অনেক অংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। উত্তরপাড়া কলেজ ও লাইব্রেরি তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। এই পুস্তকাগারের ন্যায় বড় ও মূল্যবান পুস্তকাগার বাঙ্গলায় খুব কমই আছে। এখানকার সকল প্রকার সমৃদ্ধির মূলে মুখোপাধ্যায়-বংশের বদান্যতা বিরাজিত। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩)

কোন্নগরও একটি পুরাতন স্থান। ইহাও পূর্ব্বে বেশ ধনজনপূর্ণ ছিল। তখন একটি ডক্ ছিল, উহা দ্বাদশ মন্দির ও ঘাটের উত্তরে অবস্থিত ছিল। উক্ত ঘাট ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম হরসুন্দর দত্ত। উল্লিখিত ডক্‌টি বাঙ্গালায় বৃটীশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে।

রিষড়ার সমৃদ্ধিও এখনকার তুলনায় পূর্ব্বে অধিক ছিল। এখানে সময় সময় দিনেমারদের জাহাজ লাগিত। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটি সাহেবদের বড় ছাপা কাপড়ের কারখানা ছিল। এই কারখানা দীর্ঘকাল ধরিয়া একে একে বহু ইয়োরোপীয়ের হস্তান্তরিত হওয়ার পর বিশ্বম্ভর সেন নামক এক ব্যক্তির হাতে আইসে। এই ব্যক্তি মাসিক ৮৲। ০৲টাকা বেতনে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষে এই কার্য্যের দ্বারাই প্রভুত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিলাতি কলের বস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার এই ব্যবসা ক্রমে লোপ পায়। পরে উহার পরিবর্ত্তে রেশমি রুমাল ছাপার কাজ এই স্থানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়।

এখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের একটি পল্লীনিবাস ও তৎ-

(৩) District Gazetteers—Hughly.

সংলগ্ন সুন্দর উদ্যান ছিল। ইহাকে "রিষড়া হাউস্" বলিত। কথিত আছে, হেষ্টিংসের তথায় অবস্থানকালে তদীয় পত্নী স্বহস্তে এই উদ্যানে বহুসংখ্যক আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আজিও তথায় হেষ্টিংস ঘাট নামে একটি ঘাট দৃষ্ট হয়। কোন্নগর ও রিষড়ার নাম বিপ্রদাসের পুঁথিতে উল্লিখিত আছে।

মাহেশও একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও এই নামে এই নগর ছিল বলিয়া জানা যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরও এইরূপ পুরাতন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরীর পর এই জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য যেরূপ প্রচারিত, বোধ হয় অন্যত্র এরূপ নহে। কিংবদন্তী এইরূপ যে পুরী হইতে জগন্নাথদেব গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তদবধি এই দেব-প্রতিষ্ঠা হইয়া তাহা স্মরণার্থ প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহা ধুমধামের সহিত স্নানযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী পুরীতীর্থে গমন করিলে মাহেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরে বালুকার মধ্যে অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং উঁহাদের প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু দিন পরে এক দিন মুরশিদাবাদের নবাব ভাগীরথীবক্ষ দিয়া গমনকালে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ হওয়ায়, দেবসেবাইৎগণ তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়ায়, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া সেবাইৎকে অধিকারী উপাধি ও একখণ্ড নিষ্কর জমি দান করেন। এই সময় হইতেই মাহেশের মন্দিরের নাম প্রচারিত হইতে থাকে। মাহেশের যে রথ সুপ্রসিদ্ধ তাহার প্রথমখানি এক মোদক দান করিয়াছিলেন। (৪)

হেষ্টিংস ঘাট—রিষড়া

মাহেশের নিকট বল্লভপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লভদেবের জন্য প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, চাতরার রুদ্র পণ্ডিত দেবাদিষ্ট হওয়ায় তাঁহার দ্বারা গৌড়ের রাজপ্রতিনিধির ভগ্ন প্রাসাদ হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা এই দেবমূর্ত্তি গঠিত হয়। এই প্রস্তর গঙ্গায় ভাসিয়া বল্লভপুরের ঘাটে আসিয়াছিল। উহা প্রথম যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তথা হইতে পরে স্থানান্তরিত হইয়া, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক বংশের কোন মহাত্মার দ্বারা নির্ম্মিত বর্ত্তমান মন্দিরে আনীত হন। রাধাবল্লভজী ও উঁহার মন্দির সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ রাধাবল্লভজীর একজন প্রধান

(৪) District Gazetteers—Hughly.

ভক্ত ছিলেন এবং তিনি এই দেবসেবাদির জন্ম বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্রবেই শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার গঠনমূলে শ্রীরামপুরের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। অন্যান্ত বহু স্থানের ন্যায় এখানকার প্রাচীন ইতিহাসও অজ্ঞাত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া হইতে দিনেমারদের এখানে আগমনের প্রসঙ্গেই উহার কথা জানা যায়। কার্য্যের সুবিধার জন্ম মুরশিদাবাদের ফরাসী এজেন্ট মসিয়ে ল' (Mons. Law)র চেষ্টায় নবাবের করেন। সে সময় তাঁহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ সোয়েৎম্যান্ (Mr. Soetman)। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা এখানে অব্যাহতভাবে ব্যবসাকার্য্য চালাইয়া সবিশেষ উন্নতিলাভ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডের সহিত ডেন্‌মার্কের যুদ্ধ হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে প্রথম বাধা প্রাপ্ত হন। এই সময় ব্যারাকপুর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া শ্রীরামপুর দখল করে এবং ইহা ইংরাজদের হস্তগত হয়। পরে ইয়োরোপে শান্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উহা দিনেমারদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। এই সময় কোম্পানীর
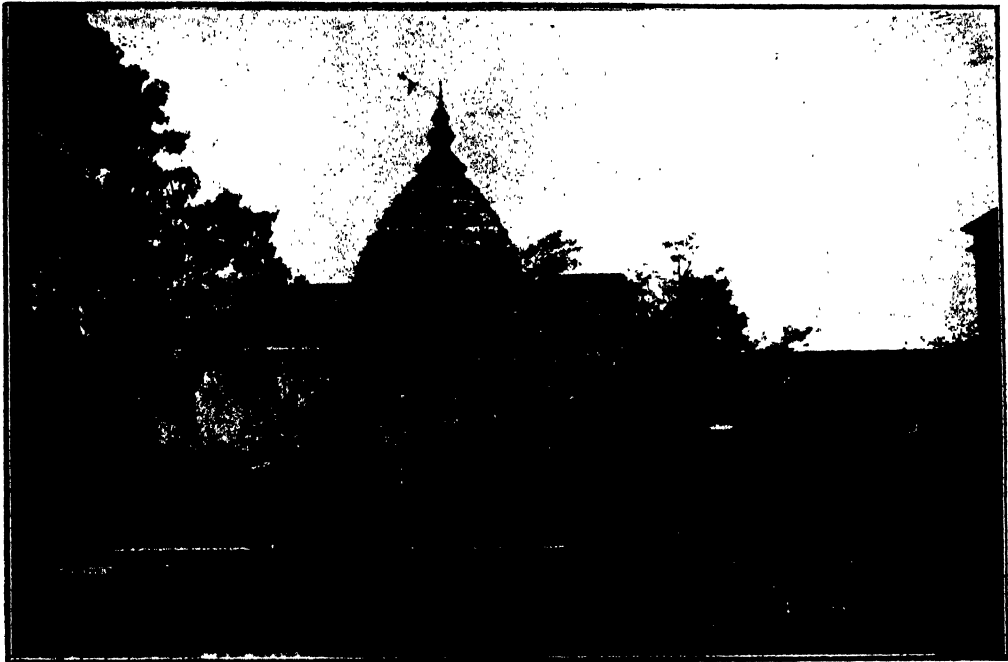
জগন্নাথ মন্দির—মাহেশ

নিকট হইতে তাঁহারা এই স্থান প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসরের ৮ই অক্টোবর তারিখে শ্রীরামপুরে দিনেমার পতাকা প্রথম উড্ডীন হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্ম চারিজন জমাদার নিযুক্ত করা হয়। নবাবের নিকট হইতে ফরমান পাইতে ও জমি সংগ্রহ করিতে মোট ১৬ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছিল। দিনেমাররা মোট ৬০ বিঘা জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিনেমাররা এখানে প্রথমে একখানি চালাঘর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাহা মাটির প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া কুঠির কার্য্য আরম্ভ আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়। ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমাগত নৈরাশ্যজনক হওয়ায়, ডেনমার্কের রাজা উহা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয়ের কল্পনা করেন; এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর শ্রীরামপুর ও ট্রানকোয়েবার, ঠিক ৯০ বৎসর ৩ দিনের পর ১২০০০ পাউণ্ডে হস্তান্তরিত হয়। শ্রীরামপুরকে ডেনমার্কের রাজার নামানুসারে তৎকালে ফ্রেড্রিক্‌নগরও বলা হইত।

১৭৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম খৃষ্টান্ মিশনারীরা আগমন করেন। তৎপরে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্শম্যান্,

ওয়ার্ড্ ও তাঁহাদের দুইজন মিশনারী বন্ধু এখানে আগমন করেন। তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি তাঁহাদিগকে ফরাসী গুপ্তচর বিবেচনায় প্রথম দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করেন। পরে ডেভিড্ ব্রাউনের (Rev. David Brown) চেষ্টায় এই ভ্রম সংশোধিত হয় এবং তাঁহারা এখানে বসবাসের আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় মত মালদহে ডাক্তার কেরির নিকট যাওয়ার চেষ্টায় তাঁহারা বাধা প্রাপ্ত হন এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরের মধ্যেই বসবাস করিতে বাধ্য হন। কয়েক সপ্তাহ পরেই কেরি হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম বিষয় গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ এখান হইতে তাঁহারাই প্রকাশ করেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই প্রথম বাঙ্গালায় মিশনারী ছাপাখানা স্থাপিত হয়। মিশনারী মিঃ ম্যাকের চেষ্টায় প্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র বাঙ্গালা অক্ষরে নাম সহ প্রকাশিত হয়। (৫) বৈদেশিকভাবে প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহারাই করিয়াছিলেন। প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মার্শম্যান সম্পাদিত "সমাচার দর্পণ" ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। (৬) Friend of Indiaও এই স্থান হইতে প্রকাশিত

ব্যারাকপুর পার্ক হইতে শ্রীরামপুর

এখানে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। এই তিনজনে মিলিয়া শ্রীরামপুর মিশনের সৃষ্টি করেন। এই মিশন, উহাদের মধ্যে শেষ মিশনারী মার্শম্যানের মৃত্যুকাল অর্থাৎ ১৮৩৭ সাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল।

এই মহাত্মাত্রয়ের সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিবার স্থান এখানে নাই। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় যেমন বাঙ্গালায় দেশীয়দের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তেমনই তাঁহাদের পরিশ্রমে বঙ্গভাষারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইত। এতদ্ভিন্ন ভারতে প্রথম ষ্টীম্ এঞ্জিন্ শ্রীরামপুরের কাগজের কলেই আনীত হয়। প্রথম বাঙ্গালী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষালাভ করে এই স্থানে। খৃষ্টানী মতে বাঙ্গালীর বিবাহ হয় প্রথম এইখানে। বর্ত্তমান শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেনের প্রতিষ্ঠার মূলও শ্রীরামপুরের ডাক্তার কেরি।

(৫) The Life and Times Carey, Marshman and Ward, vol. II.

(৬) A return of the names and writings of 515 persons connected with Bengali Literature—Long.

শ্রীরামপুর কলেজ মিশনারীদের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। এখানকার গোরস্থানে এই তিন মহাত্মার সমাধি আজিও দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত মিশনারীগণ ভিন্ন এখানে মিঃ ম্যাক্, ডেভিড্,

দিনেমার গভর্ণরের বাটী—শ্রীরামপুর ; এক্ষণে কাছারীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ব্রাউন, মার্টিন্, কুপ্‌, বুকানন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মিশনারীগণও বাস করিতেন। তাঁহাদের বহু নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানকার মিশন চার্চ্চ, ডাক্তার কেরি ও তাঁহার

শ্রীরামপুরের গির্জ্জা

সহযোগীদের দ্বারা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের বাসভবনের সংলগ্ন জমির উপর নির্ম্মিত হয়। রোম্যান ক্যাথলিক্ গির্জ্জা সর্ব্বপ্রথম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদ্রাকারে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান সুন্দর গির্জ্জাটি ১২৩৮৬৲ টাকা ব্যয়ে ইং ১৭৭৬ সালে প্রস্তুত হয়। লুথেরান গির্জ্জা ১৮০৫ অব্দে ১৮৫০০৲ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। কনভেণ্ট্‌টি অপেক্ষাকৃত নূতন, উহার নির্ম্মাণকাল ১৮৪০এর পর।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে চন্দ্রের পুত্র ধরাধর গোস্বামী-বংশের আদিপুরুষ। বর্দ্ধমান জেলার পাটুলি গ্রামে ইঁহাদের আদি বাস ছিল। সেওড়াফুলি ও বংশবাটীর রাজাদের আদি বাসস্থানও এই স্থানে ছিল। গোস্বামীদের প্রকৃত উপাধি চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী শান্তিপুরের গোস্বামী বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামগোবিন্দ মাতুলের জমিদারী ও অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায়, তিনিই প্রথম গোস্বামী নামে খ্যাত হন। কথিত আছে, একদা নৌকা জলমগ্ন হইলে তিনি সন্তরণ করিয়া শ্রীরামপুরে উঠেন এবং তদবধি এই স্থানে বাস করেন। সুতরাং তাঁহাকেই প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তিনি বাসের জন্য সেওড়াফুলির রাজাদের নিকট হইতে জমি প্রাপ্ত হন এবং বিষ্ণুপুরের রাজা কর্ত্তৃক

শ্রীশ্রী রাধামোহন, গোপাল ও রাধিকা এই তিন দেব-দেবীর সেবাইৎ নিযুক্ত হন ও তৎসহিত উক্ত রাজার প্রদত্ত নিষ্কর দেবোত্তর জমি প্রাপ্ত হন। এখনও এই তিন
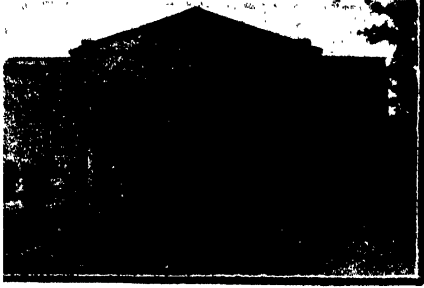
শ্রীরামপুর কলেজ

দেব দেবী গোস্বামীবংশের গৃহদেবতা রূপে বিরাজ করিতেছেন।

রামগোবিন্দের পুত্র হরিনারায়ণ দিনেমার কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন এবং প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উহা খরিদ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন নাই। (৭)

এখানকার দে-বংশও খুব প্রাচীন ও সম্পদশালী। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দমদমার নিকটবর্ত্তী গাঁতি নাম গ্রামে ইঁহাদের আদিম বাস ছিল। তৎপরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রিষড়ায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র দে ব্যবসায় উপলক্ষে শ্রীরামপুরে উঠিয়া আইসেন। উক্ত দে মহাশয়ের একখানি মুদির দোকান ছিল। তাঁহার পুত্র সাথলীরাম তুলার ব্যবসা ও দিনেমার কোম্পানীর আনীত বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র। তিনি কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের লবণের কাজে শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করিয়া, শেষে নিজ চেষ্টা ও কার্য্যদক্ষতায় লবণের ব্যবসা দ্বারা বিপুল সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং উপার্জ্জিত

ডাক্তার কেরির সমাধি-স্তম্ভ—শ্রীরামপুর

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনাথও পামার কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি হইয়া, এবং ব্যবসা কার্য্যের দ্বারা বিস্তর ধন সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ডেন্‌মার্ক্-অধিপতি যখন শ্রীরামপুর বিক্রয়ের অভিলাষ করেন, তিনি দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রায় অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যবহারও করিয়াছিলেন। ১২৩০ সালে আষাঢ় মাসে রামচন্দ্র পরলোকে গমন করেন। তাঁহা

(৭) District Gazetteers· Hughly.

নিস্তারিনী-কালীমন্দির—সেওড়াফুলি

নিমাইতীর্থের ঘাট—বৈদ্যবাটী

সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়া এই বংশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

এই দে-বংশ পূর্ব্বাপর অত্যন্ত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। শ্রীরামপুরস্থ যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহই প্রায় ইঁহাদের অর্থসাহায্য আছে। শ্রীরামপুরে শ্রীশ্রী৺কালী-মাতার পূজার জন্য এক সুবৃহৎ মণ্ডপ ও কাশীতে শ্রীশ্রী৺শিব স্থাপন ইঁহাদের অন্যতম কীর্ত্তি। (৮)
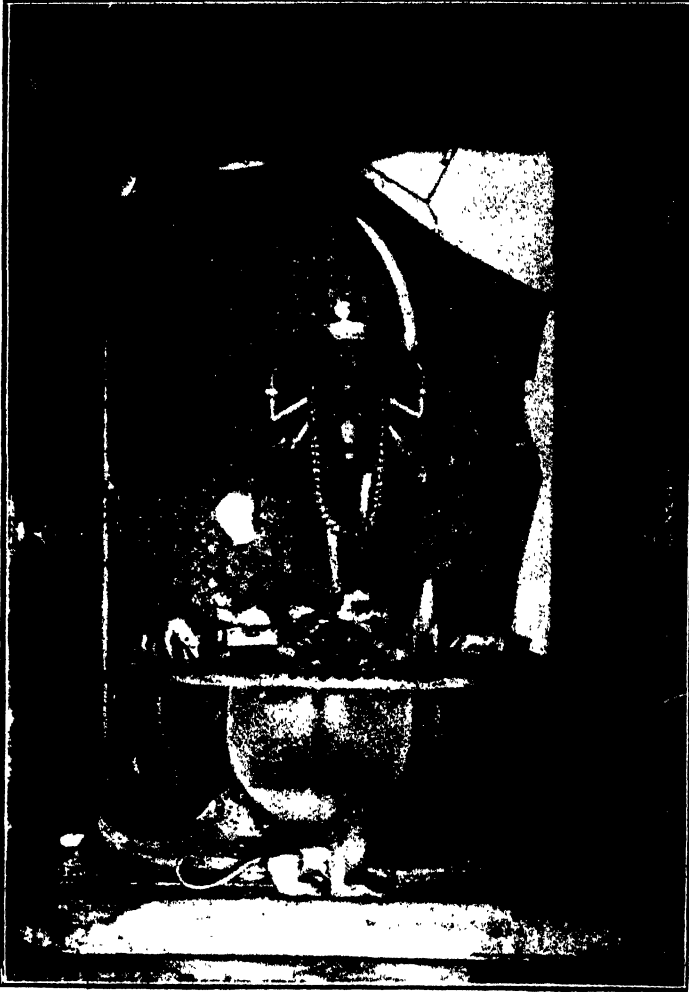
শ্রীশ্রীনিস্তারিনী কালী—সেওড়াফুলি

শ্রীরামপুরের পর চাতরা। এখানে উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। তৎপরে সেওড়াফুলি। এখানকার হাট ও কালীবাটী প্রসিদ্ধ। এই উভয়েরই প্রতিষ্ঠাতা সেওড়াফুলির রাজারা। বৈদ্যবাটীর পুরাতন ও সমৃদ্ধ হাটের প্রচুর আয় দৃষ্টে উক্ত বংশের প্রধান হরিশ্চন্দ্র প্রতিযোগিতা করিয়া এই বাজার স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বোক্ত নিস্তারিণী নামে এক অতি সুগঠিত কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির ও মূর্ত্তি গঠন কার্য্যে তাঁহার দশ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই কালী দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সেওড়াফুলির রাজারা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইঁহাদের আদি বাস ছিল কাটোয়ার অনতিদূরে পাটুলি নামক গ্রামে। মুসলমান রাজত্বকালে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর রায় কোন ব্রাহ্মণ জমিদারকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা করার জন্য, মুরশিদ কুলিখাঁর সময়ে নবাব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বংশগত "সুদ্রমনি" উপাধি প্রদান করেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা এই উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। এমন বিখ্যাত মন্দির এ অঞ্চলে কমই আছে, যাহা কখন না কখন তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াছে। মাহেশের জগন্নাথদেবের সেবার্থ জগন্নাথপুর নামক পল্লী তিনি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

সেওড়াফুলির উত্তরে বৈদ্যবাটী। পূর্ব্বে এই স্থানে বহু বৈদ্যের বাস থাকায় বৈদ্যবাটী নামের উৎপত্তি। বৈদ্যবাটীর যে প্রসিদ্ধ হাট আজিও বর্ত্তমান আছে, পূর্ব্বোক্ত সেওড়াফুলির বাজার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটে পাট ও তরিতরকারীর এতাদৃশ হাট আর কোথাও ছিল না। এখনও কলা ও কুমড়ার এতাদৃশ হাট এ অঞ্চলে আর আছে কি না সন্দেহ। এখানকার শ্রীশ্রীভদ্রকালী অতি প্রাচীন দেবতা। সুপ্রসিদ্ধ নিমাই তীর্থের ঘাটটিও

(৮) বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকা, ১৩৩২ সাল।
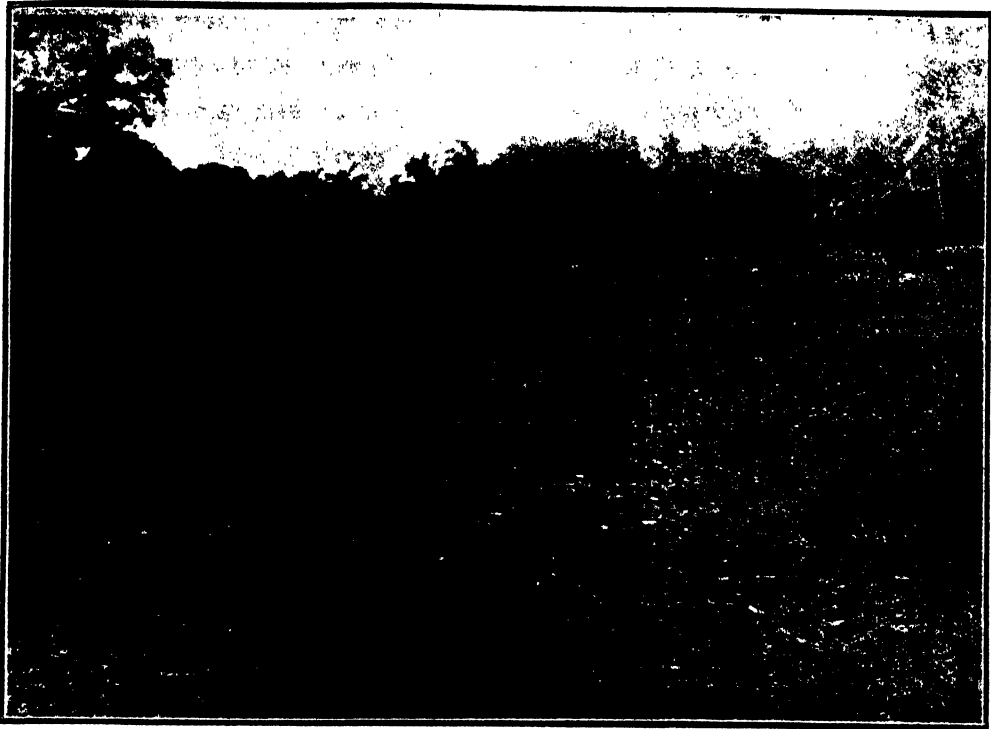
চাঁপদানীর মাঠ —কথিত আছে—এই স্থানে ছাউনি ছিল।
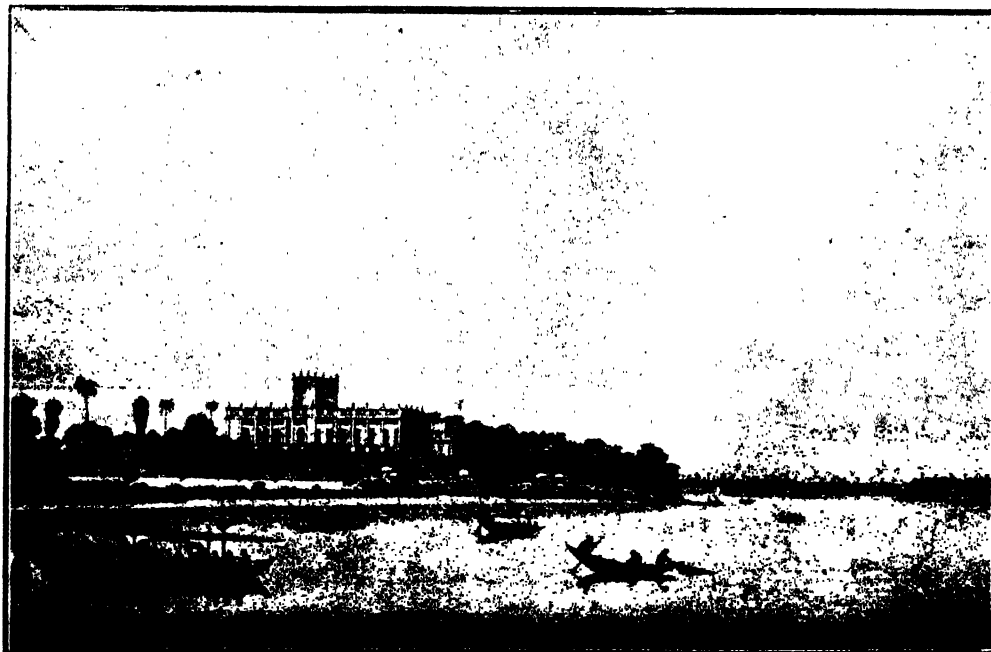
গরুটি প্রাসাদ

খুব প্রাচীন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে জগন্নাথ দর্শনার্থ যাইবার কালে গঙ্গাতীরে এই ঘাটে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার আদেশে ঘাট সান্নিধ্যে নিম্বতরু রোপিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবনচরিতে এবং অন্য বাঙ্গালা কবিতায় এরূপও লেখা আছে—এই নিমগাছ-ঘটিত ব্যাপার হইতে তাঁহার অন্য নাম নিমাই হইয়াছে। (৯)

এখানকার পুরাতন ঘাটটি পরে সংস্কৃত করা হয় এবং উহার উপর চাঁদনী নির্ম্মিত হয়। পৌষ-সংক্রান্তি ও বারুণীর সময় এখানে দুইটি বড় মেলা হইয়া থাকে। উক্ত চাঁদনী প্রভৃতি চন্দননগরের স্বনামধন্য কাশীনাথ কুণ্ডুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্যে পথিকদের জন্য ডাক্-বাঙ্গালা সর্ব্বপ্রথম এই বৈদ্যবাটীতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১০) বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের সহিত এই স্থানের সম্পর্ক আছে। (১১)

বৈদ্যবাটীর পর চাঁপদানী। এই ক্ষুদ্র গ্রামের প্রসিদ্ধি তেমন না থাকিলেও ইহা একটি প্রাচীন স্থান এবং বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত ইহার একটু সম্পর্ক আছে। মনসা মঙ্গলে ইহারও উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালার নবাবনাজিম মিরজাফরের নিকট হইতে প্রধান সেনাপতি কর্নেল্ কুট্ (Sir Eyre Coot) ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাইদার আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রেরণ জন্য, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে প্রেরিত সৈন্যের অবশিষ্ট সৈন্য পরিদর্শনার্থ হেষ্টিংস্ এই স্থানে আসিয়াছিলেন। (১২) পূর্ব্বকালে এই স্থান ডাকাতি ও খুনের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল।

এই স্থানের পর গৌরহাটী। ইহার কতক অংশ বৃটীশ এবং কতক অংশ ফরাসী দ্বারা অধিকৃত। এই স্থানকে গিরটি, গিরেটা, আবার কেহ বা গরুটি বলিয়াছেন। ফরাসগঞ্জ নামেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১৩) বোল্টের ম্যাপ, জোসেফ্ সার্ভে ম্যাপ প্রভৃতি পুরাতন মানচিত্রে এই স্থান ফ্রেঞ্চ্ গার্ডেন বলিয়া উল্লিখিত
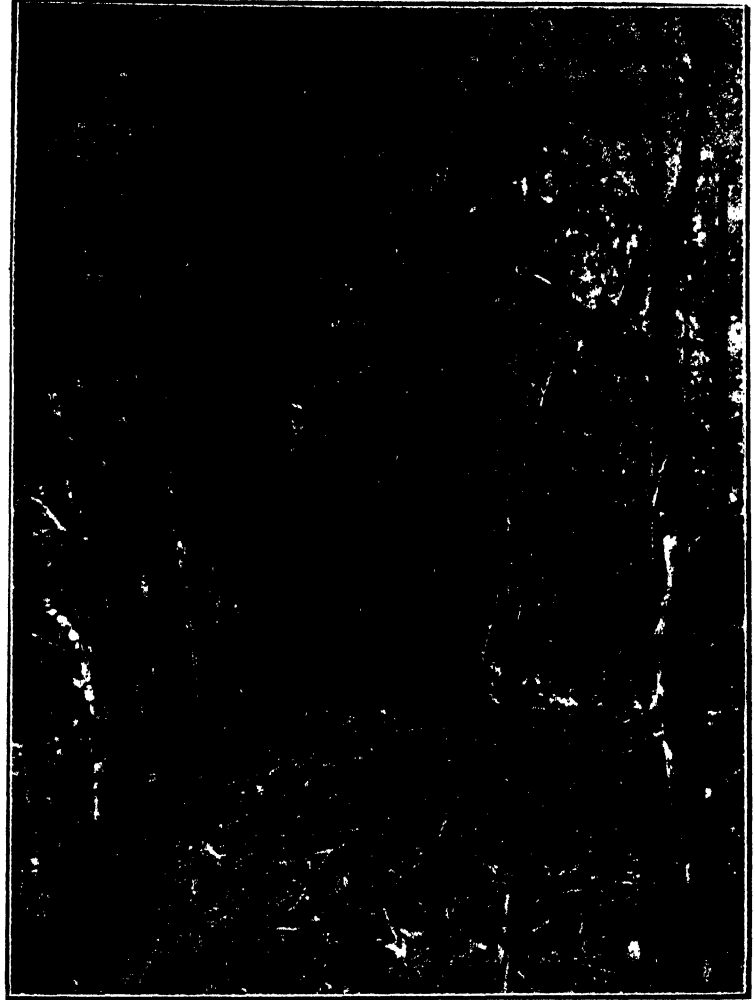
গরুটি প্রাসাদের শেষ চিহ্ন

আছে। সচরাচর লোকে ইহাকে গরুটি বলিয়া থাকে।

এই স্থানটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। ইহা এক সময় চন্দননগরের ফরাসা গভর্ণর

(৯) District Gazetteers—Hughly.
(১০) Rural Life in Bengal.
(১১) District Gazetteers—Hughly.
(১২) District Gazetteers—Hughly.
(১৩) District Gazetteers—Hughly.

স্তূপের একটি রম্য উদ্যানভবন বা পল্লীবাস ছিল। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে গভর্ণরের নিমন্ত্রণে ক্লাইব, ভিন্সাবলেন্ট, হেষ্টিংস, স্যর উইলিয়ম্ জোন্স, ফিলিপ ফ্রান্সিস্ প্রমুখ চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার ইয়োরোপীয় সৌখিন নরনারীগণের সর্ব্বদা সম্মিলন হইত। প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত বৃক্ষবীথিকা সময় সময় নিমন্ত্রিতগণের শতাধিক যানাদিতে পরিপূর্ণ থাকিত। (১৪) এই ভবন যেমন আনন্দ আড়ম্বরে সদা মুখরিত থাকিত, সেই রূপ রাজ্য-সংক্রান্ত পরামর্শ দিবার জন্য মিলনেরও ইহা স্থান ছিল।

এই প্রাসাদের মধ্যে একটি এতবড় হল ছিল, যাহার মধ্যে একসঙ্গে একশত নরনারী স্বচ্ছন্দে পান-ভোজন করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ৩৬ ফিট ছিল। এই সুসজ্জিত বিচিত্র গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে অকস্মাৎ ভার্সেইএর কোন কোন সম্ভ্রান্ত পল্লীনিবাসের কথা মনে হইত। এমন কি, এই পল্লীকে কেহ কেহ পূর্ব্বের ভার্সেই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রাঁপ্রি (১৫) (Grandpre) ও কুরি (১৬) (Right Rev. Daniel Currie) এই প্রাসাদকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবন বলিয়াছেন। যে দেশে তাজমহল আছে, যে দেশের দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি নগরে মুসলমান বাদশাহদের অনুপম প্রাসাদ সকল অবস্থিত, যাহার স্থাপত্যের স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য সকলেরও উপর বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সেখানে অবশ্য এ কথার কোন বিশেষ অর্থ আছে মনে হয় না। মনে হয়, লেখকের বলিবার উদ্দেশ্য, তৎকালীন ইয়োরোপীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত এ দেশের ইয়োরোপীয় ধরণের অট্টালিকা সমূহের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পল্লী-আবাসের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া ঐতিহাসিক মার্শম্যান্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ ও মসজেদ সমূহ দর্শনে দর্শকের

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির—তেলিনীপাড়া

(১৪) Selections from unpublished Records of Government for the year 1748 to 1767.

(১৫) A voyage in the Indian Ocean and Bengal undertaken in the years 1789 and 1790.

(১৬) Heber's journey through the upper Provinces of India.

মনে উহার পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উদিত হইয়া যে একটা গভীর দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যদি এরূপ দুঃখের নিদর্শন বঙ্গে আর কোথাও থাকে, তবে তাহা ফরাসী গভর্ণরের ভগ্ন-প্রাসাদ-পূর্ণ এই গরুটীর বাগান।

বিশপ হিবার ভারত-ভ্রমণ কালে এই পরিত্যক্ত অসংস্কৃত প্রাসাদের সুন্দর সোপান, বৈচিত্র্যময় ভগ্নপ্রায় উচ্চ স্তম্ভ সকল, বিবিধ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট বোর্ডিংমণ্ট প্রভৃতি দেখিয়া বিলাতের শ্রপসায়ারের ধ্বংসপ্রায় মোরেটন করবেট (Moreton Corbet) নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, এই প্রদেশের মধ্যে ইহাই পতনোন্মুখ উন্নতির একমাত্র (১৭) নিদর্শন। ফরাসী গভর্ণর মসিয়ে শেভালিয়ে (Mons Chevelier) ইহার প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্য ইহাকে একবার সুসংস্কৃত করিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা আক্রান্ত হইলে তিনি এই স্থান হইতেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন।

গোরহাটীর পূর্ব্ব কথা, এমন কি কিরূপে তাহা ফরাসীদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার কিছুই জানা যায় না। মোটামুটি পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদের সহিতই ইহার ইতিহাস বিজড়িত। তদ্ভিন্ন ক্লাইবের সময় বাঙ্গালার সৈন্যদলের অধিক অংশ সময় সময় এই স্থানে থাকিত বলিয়া জানা যায়। ষ্ট্রাভোরিনস্ (Stravorinus) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সহস্রাধিক লোক থাকিতে পারে ইংরাজদের এমন একটি মিলিটারি দুর্গ দেখিয়াছিলেন। ইংরাজি ১৭৫৭ অব্দের মে জুন মাসে মিরজাফরের সহিত গোপন সন্ধির উদ্দেশ্যে ক্লাইব এই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১২ই জুন তিনি এই স্থান হইতেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া পলাশী প্রাঙ্গণে জয়লাভ দ্বারা ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। (১৮)

বর্ত্তমান গরুটি

প্রাচীন কালের গৌরবময় যুগে এই স্থানে ফরাসীদের একটি নাট্যশালা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গী কবি আণ্টুনি সাহেব এক হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই বাস করিতেন।

(১৭) Heber's journey through the upper Provinces of India .

(১৮) District Gazetteers—Hughly. The Musnud of Murshidabad ও অন্য কোন কোন গ্রন্থে ১৩ই জুন লেখা আছে।

এই পল্লীর পরই ভদ্রেশ্বর। বিপ্রদাসের কবিতায় ভদ্রেশ্বরের নাম পাওয়া যায়। শ্রীশ্রী৺ভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও ভদ্রেশ্বরের বাজারের জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। এই দেবতার নাম হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। বুদেসি নামেও এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কালনা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে এত বড় বাজার আর কোথাও ছিল না। কলিকাতা ও ভদ্রেশ্বরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ ক্রোশের সকল স্থানের ধান চাউল এই স্থান হইতে সরবরাহ হইত। পাটের ব্যবসাও এখানে যথেষ্ট ছিল। ভদ্রেশ্বর দেবের উৎপত্তির বিবরণ অজ্ঞাত। সাধারণের বিশ্বাস—ইনি কাশীর বিশ্বেশ্বর, দেওঘরের বৈদ্যনাথ দেবের ন্যায় স্বয়ম্ভু। এই স্থানে এক সময় সংস্কৃত শিক্ষার চর্চা যথেষ্ট ছিল এবং শিক্ষার জন্য ১০টি টোল ছিল। (১৯)

ভদ্রেশ্বর অতিক্রম করিয়া চন্দননগরের মধ্যে তেলিনী-পাড়া নামক একটি ছোট গ্রাম আছে। এখানকার পুরাতন কথা বা প্রসিদ্ধির বিষয় কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা মন্দির প্রসিদ্ধ। এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই এই বংশের উন্নতি হয়।

ক্রমশঃ—

(১৯) Adam's Report on vernacular education in Bengal.

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর   মধুলুব্ধ
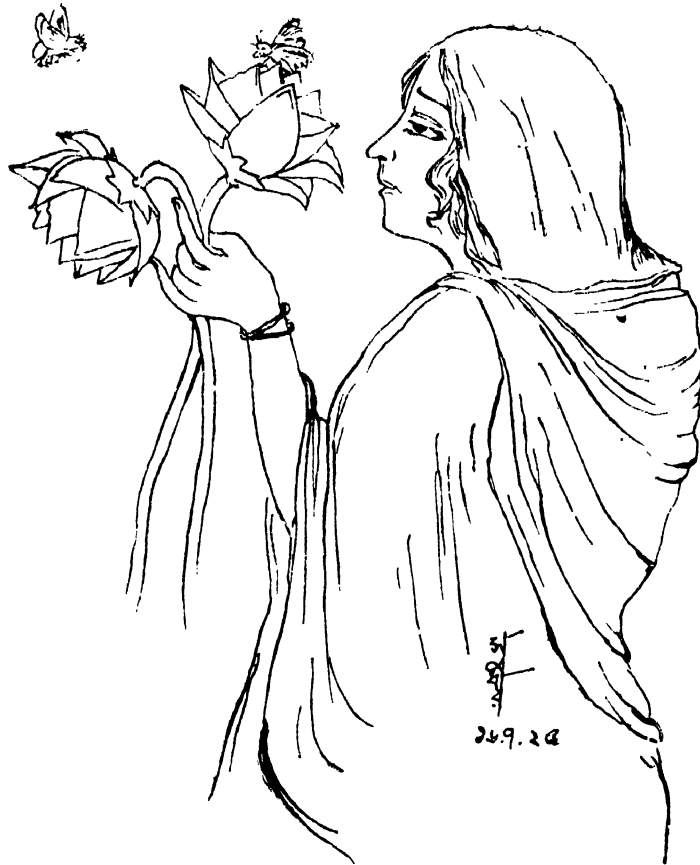
তিন অঙ্ক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম

রঙ্গালয়,—নাটকের প্রথম অঙ্কের পরে তখন যবনিকা পড়েছে।

'কন্সার্ট' বাজছিল—সপ্তপাতালভেদী ভীষণ নিনাদে! ত্রেতাযুগে বোধ করি বাংলা রঙ্গালয়ের 'কন্সার্ট'র অস্তিত্ব ছিল না, কারণ তাহ'লে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গের জন্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণকে নিশ্চয়ই বেশী আয়াস স্বীকার করতে হ'ত না!

চারু বললে, "ওহে চন্দর, এখানে তো আর ব'সে থাকা অসম্ভব! চল, বাইরে পালাই চল!"

চন্দ্র একটি 'বক্সে'র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললে, "চারু, আমি যেদিকে চেয়ে আছি, সেইদিকে একবার তাকাও দেখি, 'কন্সার্টে'র অস্তিত্ব আর তোমার মনেও থাকবে না!"

চারু সেইদিকে তাকালে। যা দেখলে, তাতে তার চোখ হয়ে গেল একেবারে নিষ্পলক!

'বক্সে' এক সুন্দরী ব'সে আছে—যদিও ব্যাপারটা খুবই সাধারণ! তবে এর মধ্যে যদি অসাধারণতা কিছু থাকে, তবে তা আছে ঐ সুন্দরীর সৌন্দর্য্য!

পৃথিবীতে সুন্দরী আছে অনেক, কিন্তু সকলেই কি সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার করতে জানে?

ইতিহাস বলে, মিসরে ও রোমে এমন সুন্দরী ছিল অসংখ্য, ক্লিওপেট্রা যাদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য ছিল না। কিন্তু ক্লিওপেট্রার রূপ বার বার দিগ্বিজয় করেছিল সেই মিসরে এবং রোমেই!

দেহকে কি-ক'রে চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা যায়, সে হচ্ছে এক অদ্ভুত আর্ট!

চারু যার দিকে এমন পলক-হারা চোখে তাকিয়ে আছে, এই দুর্লভ আর্ট সে জানে!

চারু মোহিত স্বরে বললে, "চন্দর, এযে আশ্চর্য্য রূপ! এ কে ভাই?"

চন্দ্র বললে, "ডাইনি কিরণ।"

চারু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ডাইনি কিরণ?"

—"হাঁ, কলকাতার এক বিখ্যাত বিলাসিনী। এর নৈশ নিকেতনে আজ পর্য্যন্ত কত হৃদয় ভগ্ন হয়েচে, তার হিসাব কেউ রাখতে পারে-নি!"

—"এমন সুন্দরীর এমন নাম!"

—"হ্যাঁ, কারণ এর আঁচল একবার যার পায়ে জড়িয়েচে, সে আর কখনো মুক্তি পায় নি। আমি অন্তত দশজন এমন বিখ্যাত ধনীকে জানি, এর জন্যে যারা আজ পথের ভিখারী! লোকে বলে, ডাইনি কিরণের বুকের তলায় হৃদয় ব'লে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই।"

—"কিন্তু ওর পিছনে ব'সে আছে ও কে?"

—"কুমার নরেন্দ্রনাথ রায়—ডাইনি কিরণের নতুন শিকার।"

—"খুব ধনী বুঝি?"

—"হাঁ, কিন্তু ও ধনদৌলৎ আর বেশীদিন থাকবে না, ইতিমধ্যেই কুমারের লোহার সিন্ধুকে বোধ হয় ভাঙন ধরেচে।"

"কেন, কুমারকে সাবধান করবার কেউ কি নেই?"

—"সাবধান ক'রে ফল হয় নি। পতঙ্গ যে সজ্ঞানেই আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দেয়! কুমার বিবাহ করেচেন, তাঁর সংসারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবই রয়েচে, কিন্তু তিনি তাদের দিকে ফিরে চেয়ে দেখবার অবকাশ পান না।"

—"কি অন্যায়!"

—"তুমি শুন্‌লে অবাক হবে যে, অর্থাভাবে কুমারের স্ত্রীর কষ্টের আর অবধি নেই। নিজের আর ছেলে-মেয়ের জন্যে স্বামীর কাছ থেকে তিনি তো একটি কানাকড়িও পান না, কাজেই তাঁকে ধার করে খরচ চালাতে হয়!"

—"কেন, কুমারের স্ত্রীর কি কোন আত্মীয় নেই?"

—"এক ধনী খুড়ো আছেন, মধুবাবু। তাঁর অনেক টাকা, তিনি বিবাহ করেন নি। শুনতে পাই, তাঁর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হচ্ছেন না কি কুমারের স্ত্রী।"

—"তবে ?"

—"কিন্তু মধুবাবুর কাছ থেকে কুমারের স্ত্রী এখন পর্য্যন্ত কোনই সাহায্য পান-নি।"

—"তুমি এত কথা কি ক'রে জান্‌লে চন্দর ?"

—"কুমার যে আমার প্রতিবেশী।"

চারু আর একবার 'বক্সে'র দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সর্ব্বাঙ্গে রূপ, রত্ন আর বিচিত্র বর্ণের চমক নিয়ে সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে; তার মুখে অতি-মৃদু হাসির লীলা! চারু, লিওনার্ডো ডা ভিন্সির আঁকা মোনালিসার প্রসিদ্ধ ছবি দেখেছিল। তার মনে হ'ল এ হাসি সেই মোনালিসার হাসির মতই রহস্যের আবরণে ঢাকা!

ঠিক পিছনেই ব'সে আছেন, কুমার। চারিদিক থেকে শত শত নেত্র যে আগ্রহ-ব্যাকুল হয়ে তাঁর সঙ্গিনীর দিকে ছুটে আসছে, এজন্যে তাঁর মন গর্ব্বে আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল! কারণ কুমারের বিশ্বাস, এই যে সার্ব্বজনীন দর্শন-লালসা, এটা মৌন বিস্ময়ে তাঁরই পছন্দের তারিফ করছে!

চারু ভাবতে লাগল, ইউরিপাইড্‌সের মতই ঠিক। মনুষ্য সৃষ্টির ভিন্ন একটা উপায় ক'রে ভগবানের উচিত, দুনিয়া থেকে স্ত্রীজাতিকে একেবারে লুপ্ত ক'রে দেওয়া!

দ্বিতীয়

একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে শুয়ে আছে, কিরণ। টুক্‌টুকে 'স্লিপার'-পরা পা দুখানি রয়েছে ঘরের মেঝেতে ছড়ানো একখানা বাঘের ছালের উপরে। একটা লোমশ কুকুর তার পায়ের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে, নিজের পেটের ভিতরে মুখ গুঁজে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।

দ্বারবান এসে কিরণের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

কিরণ খামখানা চোখের সাম্‌নে ধ'রে দেখলে, শিরোনামার লেখা স্ত্রীলোকের হাতের। লেখাটাও অচেনা।

"পুরুষের চিঠিই বরাবর পাই। এ চিঠি কে লিখলে ?"—ভাবতে ভাবতে সে খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করলে। তার পর পড়তে লাগল,

"শ্রীমতী কিরণমালা,

আমরা কেউ পরস্পরকে দেখি-নি, কিন্তু আমরা দুজনেই বোধ হয় দুজনের নাম জানি। আপনি কুমার"—" বাবুর প্রিয়তমা, আর আমি হচ্ছি তাঁরই উপেক্ষিতা, অভাগিনী সহধর্ম্মিণী।"

চিঠি থেকে মুখ তুলে কিরণ খানিকক্ষণ কি ভাবলে। তারপর আবার চিঠির উপরে দৃষ্টিপাত করলে—

"মনের কি অবস্থা নিয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি, ভগবান তা জানেন। হয় তো আপনিও তা কিছু-কিছু বুঝতে পারবেন, কারণ নারীর মন বোধ হয় নারীর কাছে লুকানো থাকে না।

আমার স্বামীকে মুক্তি দিন—পৃথিবীতে আরো অনেক পুরুষ আছে!

তাঁর সম্পত্তির প্রায় সবই গেছে, যা আছে তাও যেতে বসেছে। তাঁকে এখনো না ছেড়ে দিলে পুত্র-কন্যার হাত ধ'রে আমাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

আমার এই কাতর ভিক্ষায় যদি আপনার মনে দয়ার সঞ্চার হয়, তাহ'লে আপনি যাহাই হোন—আপনাকে আমি চিরদিন দেবী ব'লে মনে করব।

আর কিছু আমি বলতে চাই না। ইতি—

নিবেদিকা

শ্রীমতী কনকলতা দেবী।"

কিরণ আবার ভাবতে লাগল.........মনের ভিতরে লজ্জা ও ধিক্কারের কত-বড় আঘাত নিয়ে যে একজন পতিব্রতা সতী তার মত কোন নারীকে এমন পত্র লিখতে পারেন, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা কি তার আছে ?.........

নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল। অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সবে সে যৌবনে পা দিয়েছে। রাতের পর রাত কেটে গেছে, তার স্বামী বাড়ীতে ফেরেন নি, তার চোখে ঘুম নেই। যেদিন স্বামীর দেখা পেয়েছে, সেদিন তার কি নির্য্যাতন! একে একে তার সমস্ত গহনা কোন্ উপদেবীর পূজার জন্যে অদৃশ্য হয়েছে, তবু সে স্বামার মন পায় নি।

তারপর আর সইতে না পেরে, একদিন সে গৃহত্যাগ করলে,—মনের ভিতরে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে, জগতের কোন পুরুষকে আর সে ক্ষমা করবে না!.........

কিরণ হঠাৎ নিজের মনে উচ্চ-স্বরে হেসে উঠল !

পিছন থেকে শোনা গেল—"ও কি, পাগল হ'লে না কি, অত হাস্‌চ কেন ?"

কিরণ মুখ ফিরিয়ে দেখলে, কুমার নরেন্দ্রনাথ কখন্ ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে !

সে হাসতে হাসতেই বললে, "তোমার স্ত্রীর চিঠি প'ড়ে হাসচি।"

নরেন ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লে, "আমার স্ত্রীর চিঠি ?"

—"হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী আমাকে চিঠি লিখেচে।"

—"বটে, এত-বড় আস্পর্দ্ধা ! কৈ, দেখি !"

—"না, এ চিঠি তোমার দেখবার কোন অধিকার নেই।"

—"কিন্তু কি লিখেছে সে ?"

—"তাও আমি বল্‌ব না।"

নরেন নীরবে নিজের ওষ্ঠ দংশন করলে।

কিরণ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "শুন্‌চি তোমার বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা না কি বড়ই খারাপ হয়ে পড়েচে ?"

নরেন গর্জ্জন ক'রে বললে, "কে বললে এ কথা? নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী চিঠিতে—"

বাধা দিয়ে কিরণ অধীর স্বরে বললে, "আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও !"

—"না, না, সমস্ত মিছে কথা ! তুমি বিশ্বাস কোরো না কিরণ !"

—"বেশ, তোমার অবস্থা যদি এতই ভালো, তাহ'লে কাল দোকানে যে মুক্তার মালা দেখে এসেছি, সেই ছড়া আজ আমাকে কিনে দাও !"

নরেনের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "তার যে অনেক দাম !"

—"দাম ! দামের খোঁজে আমার দরকার কি ! সে মুক্তার মালা আমার পছন্দ হয়েচে, তাই-ই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?"

—"কিন্তু এই গেল সপ্তাহেই আমি যে তোমাকে দশ হাজার টাকার জিনিষ কিনে দিয়েচি। তুমি একটু বিবেচনা ক'রে দেখ !"

কিরণ আবার হা হা ক'রে হেসে উঠে বললে, "বিবেচনা ? আমি ও-সবের ধার ধারি না—বুঝেছ ? তাই তো আমার নাম ডাইনি কিরণ ! দয়া-মায়া-বিবেচনার দরকার থাকে তো অন্য যায়গায় যাও, ডাইনি কিরণের কাছে সে-সব কোনদিনই পাবে না !"

তৃতীয়

চন্দ্র ও চারু দুই বন্ধু মিলে পুজোর ছুটিতে পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছে। হাওড়ায় এসে তারা ট্রেণে উঠল। গাড়ী ছাড়তে তখনো দেরি ছিল। চারু জানলায় মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনের জন-সমারোহ দেখতে লাগল।

একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর হাত ধ'রে একজন পুরুষ ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দিকে তাকিয়েই চারুর চোখ সচকিত হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ডাকলে, "চন্দর, চন্দর ! শীগ্‌গির দেখে যাও !"

চন্দ্র জান্‌লার ধারে এসে সেদিকে চেয়ে বেশ সহজ ভাবেই বললে, "হুঁ, ডাইনি কিরণ যাচ্ছে !"

চারু বললে, "কিন্তু সঙ্গের লোকটি কে ?"

—"ডাইনির নতুন শিকার।"

—"কুমার কোথায় গেল ?"

—"তুমি শোনো নি বুঝি ? কুমার যে এখন দেউলে ! কাজেই আর রুধির মিলবে না ব'লে ডাইনি তাকে চিবুনো মাছের মুড়োর মত পরিত্যাগ করেচে।"

—"কি নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক !......তবে কুমারের মত লোকের এমনি শাস্তি হওয়াই উচিত ! কুমার এখন আবার তার অভাগী স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে তো ?"

—"তা গেছে। কিন্তু কুমারের স্ত্রীকে আর অভাগী ব'লে ডেকো না। তাঁর এখন অনেক টাকা।"

—"সে কি ! এই যে বললে, কুমার এখন দেউলে।"

—"হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে সেদিনই তো বলেছিলুম, কুমারের স্ত্রীর এক ধনী খুড়ো আছেন, মধুবাবু। ব্যাপারটা হয়েছে ঠিক উপন্যাসের মতন। মধুবাবু হঠাৎ তাঁর স্বভাবসুলভ উদাসীনতা ত্যাগ ক'রে কুমারের স্ত্রীকে এত অর্থদান ক'রেচেন যে, তাঁকে আর এ জীবনে টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না! কুমারকে এখন একটি পয়সার জন্যেও স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাত পাত্‌তে হয়। স্ত্রীর একান্ত অনুগত হওয়া ছাড়া এখন আর তাঁর অন্য উপায় নেই !"

—"অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস !"

—"হুঁ।……কিন্তু মধুবাবুর এই আকস্মিক উদারতায় সন্দিগ্ধ হয়ে আমি তলে তলে কিছু খোঁজ নিয়ে আর একটি আশ্চর্য্য আবিষ্কার করেচি!"

—"কি আবিষ্কার?"

—"মধুবাবুকে মধ্যস্থ রেখে আর একজন গোপনে কুমারের স্ত্রীকে এই অর্থ দান করেচে। কুমার বা তাঁর স্ত্রী এ-কথার কিছুই জানেন না।"

—"সে কি হে?"

—"হ্যাঁ। এ একটা বিচিত্র খেয়াল, না মৌলিক রসিকতা, না অনুতপ্ত পাপীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতা, তা আমি বলতে পারি না। তবে স্বামীকে ভিখারী করেচে সে স্ত্রীকে রাণী করবার জন্যেই!"

—"এ আবার কি রহস্য! কে সে?"

—"ডাইনি কিরণ।"

"ওয়াটার সাইকেল বোট"

শ্রীউমাপতি ঘটক

প্রায় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার একখানি সংবাদ-পত্রে নিম্নের চিত্রের ন্যায় একটী চিত্র সহ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে ঐ নূতন রকম জলযানের নির্ম্মাতাকে উহার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় ও ঐ যানের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ও লিখিত হইয়াছিল।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, আমার যতদূর মনে হয়, আর একখানি পত্রিকায় ঐ প্রকার আর একটী ছবি দেখিয়াছিলাম

ওয়াটার সাইকেল বোট

ও তাহার নির্ম্মাতাও একজন বিদেশী। কিন্তু আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে, ঐ সাইকেল বোট আমাদের দেশে একজন বাঙ্গালী প্রথম উদ্ভাবন করিয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহার কোনই সংবাদ রাখি না, বরং উহা নির্ম্মাণের প্রশংসা একজন বিদেশীকে দিয়া দিলাম।

এই যে বাঙ্গালীর প্রত্যেকের কত আদরের সামগ্রী যে "চাউল", তাহাও প্রস্তুত করিবার কল একজন বাঙ্গালীই উদ্ভাবন করেন, কই আমরা কয়জন তাহার খবর রাখি? খবর রাখিতাম—যদি তিনি বিলাত যাইয়া তাঁহার আবিষ্কার ঘোষণা করিতেন।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণ চেৎলা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সরকারী উকিল ৺কাশীশ্বর ঘটক মহাশয়ের পুত্র ২৪ পরগণা বেহালানিবাসী জগদীশ্বর ঘটক ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঐ ওয়াটার সাইকেলের আবিষ্কার করেন।

এই জলযান দেখিতে অতি সুন্দর ও ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা জলে ডুবিয়া যায় না, বা তুফানে উল্টাইয়া যায় না। ইহার নির্ম্মাতা স্বয়ং ইহাতে আরোহণ করিয়া পদ্মানদী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

ইহার সুন্দর গঠন ও জল-ভ্রমণের নির্ভয়তা উপলব্ধি করিয়া রাজা জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর, সাজাহানপুরের মহারাজ ও মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান বাহাদুর প্রত্যেকেই একখানি করিয়া ঐ জলযান খরিদ করিয়া নির্ম্মাতার উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। *

---

* লেখকের আক্ষেপ একেবারে অসঙ্গত না হইলেও, সম্পূর্ণ সঙ্গতও নয়। এই ওয়াটার সাইকেল বোট পুরাতন "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এক্‌জিবিশন", "মোহন মেলা" প্রভৃতি শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হইয়াছিল, সংবাদপত্রেও আলোচিত হইয়াছিল। নূতন আবিষ্কারের গৌরব হইতে আবিষ্কারককে বঞ্চিত করা হয় নাই। সে সময়ে সেই বোট আমরাও দেখিয়াছিলাম, পত্রান্তরে তাহার প্রশংসাও করিয়াছিলাম। তাই বলিয়া বিদেশী কোন আবিষ্কারের পরিচয় লইতে পারা যাইবে না, এমন কোন কথা নাই। আমাদের নিজ-দেশের আবিষ্কার যে উপেক্ষিত হয়, তাহা আমাদেরই ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবের পরিচায়ক; সেজন্য বিদেশীকে দোষী করা যায় না। লেখক আমাদের কাছে উহার বিবরণ পাঠাইবামাত্র আমরা উহা প্রকাশ করিলাম। আবিষ্কারক নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিলে অপরে কি করিতে পারে?

—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৬

অনতিবিলম্বে সুকুমারীর মনোযোগ অপর সকল বিষয়ে হ্রাস পাইয়া সরমার পুত্রের উপর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে তাহাকে কোলে তুলিয়া, বুকে ফেলিয়া, আদর করিয়া, চুমা খাইয়া, হাসাইয়া, কাঁদাইয়া, নাচাইয়া, অস্থির করিয়া দিল। তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ের গোপন ক্ষুধা, দীর্ঘকালের অপরিতুষ্টিতে যাহা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরে অগোচরে বাস করিতেছিল, সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া কিছুতেই যেন পরিতৃপ্তি মানিতেছিল না। নিজের গাছে যে ফল একবার মাত্র ফলিয়া ভবিষ্যতে পুনরায় ফলিবার সম্ভাবনা চিরদিনের জন্ম অপহৃত করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সুমিষ্ট ফলের রসাস্বাদে সুকুমারীর অবরুদ্ধ মাতৃত্ব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার গভীরতম সংক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, যে-অক্ষমতা মাতৃত্বের পূর্ণতা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছে সে-অক্ষমতা লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে নাই! বিধাতার হস্তে সে যাহা পাইয়াছিল মানুষের হস্তে তাহা হারাইয়াছে!

রান্নাঘরে সরমা রান্নার যোগাড় করিয়া লইতেছিল, সুকুমারী খোকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "এমন সুন্দর ছেলে কিন্তু এত রোগা কেন রে?"

"অসুখ যে দিদি। রোজ শেষ রাত্রে লিভারের জ্বর হয়।"

"চিকিৎসা করাস নে?"

"করাই। ডাক্তার বলেছেন শীতটা একটু বেশী চেপে পড়লে জ্বর ছাড়বে।"

"সে ত' সময়ের গুণে ছাড়বে—ওষুধের গুণ তাহলে কি হল? খাওয়াস কি?"

"খাওয়াই দুধ সাবু। জ্বর না থাকলে কিম্বা কম থাকলে চারুটি করে দুধ-ভাত দিই।"

"কি দুধ খাওয়াস? ভঁয়সার দুধ না ত? ভঁয়সার দুধ ছেলেকে কখনো খাওয়াস নে!"

সরমা বলিল, "কিন্তু ভঁয়সার দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে খুব উপকার হয় দিদি।"

সুকুমারী বলিল, "ভঁয়সার দুধ হজম করতে পারলে শরীর যেমন মোটা হয় বুদ্ধিও তেমনি মোটা হয়। গরুর দুধ বেশী করে না খেলে বুদ্ধি গরুর মত হয় তা জানিস নে?"

সুকুমারীর এই অদ্ভুত মন্তব্যে হাসিতে হাসিতে সরমা বলিল, "না, তা' ত জানি নে!"

"হয়। দুধ-সাবু আর দুধভাত ছাড়া আর কি দিস খেতে?"

"আর ত কিছু দিই নে।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুকুমারী বলিল, "সর্ব্বনাশ! এই খাইয়ে তুই ছেলে মানুষ করবি! গয়লা বাড়ীর দুধ আর বাজারে কেনা সাবু, যা মোটেই সাবুদানা নয়, তাই খেয়ে তোমার ছেলের জ্বর সারবে?"

সুকুমারীর কথায় চিন্তিত হইয়া সরমা বলিল, "কিন্তু জ্বরের উপর আর কি দেবো দিদি?"

"যা দিলে শরীরে একটু রক্ত আর মাংস হয়ে জ্বরটাকে তাড়াতে পারে জ্বরের উপর তাই দিতে হবে! এখন এর প্রধান দরকার হচ্ছে শরীরে একটু পুষ্টি হওয়া; সেই জন্যে ভেবে চিন্তে যা-কিছু পুষ্টিকর অথচ হাল্কা খাওয়া সব একে খাওয়াতে হবে। পেটে যখন লিভার রয়েছে তখন বেশী করে ফলের রস দিতে হবে। ডালিম, বেদানা, আঙুর, কমলালেবু, পাতিলেবু এ সব ফলের রস এর পক্ষে আহার আর ওষুধ দুইয়ের কাজ করবে। তারপর দুধের সঙ্গে টাটকা ডিমের কুসুম, মশুর ডালের জুস্, কই-মাগুর মাছের স্যুপ্, মটন ব্রথ্, একটু করে টাট্‌কা মাখন, কোনো দিন বা একটু বার্লি-সিদ্ধ-করা রুটি, এ-সব দেওয়া দরকার। ছ মাসে ভাত হয়েছে সে আজ ছ মাস হতে চল্ল, এক মুখ দাঁত বেরিয়েছে—এখন একে না খেতে দিলে চলবে কেন? এ বুড়ো মানুষ নয় যে উপোস দিইয়ে জ্বর ছাড়াবি। এ জ্বর দুর্ব্বলতার জ্বর—অপুষ্টির জ্বর। বেশী দিন এ জ্বর লেগে থাকলে কঠিন সব রোগ এসে জুটবে। ছোট ছেলেদের প্রথম

বনেদটা ভারী শক্ত হওয়া দরকার। দু বছরের মধ্যে যে ছেলে স্বাস্থ্যবান না হল, কোনো রকম করে প্রাণে বেঁচে গেলেও, চিরজীবন সে রুগ্ন আর দুর্ব্বল হয়ে থাকবে। ছেলেকে অযত্ন করিস নে সরো!"

ছেলেকে সরমা অযত্ন নিশ্চয়ই করে না; কিন্তু সুকুমারীর এই সুদীর্ঘ খাদ্য-তালিকা আবৃত্তির পর ছেলেকে কেবল মাত্র দুধ-সাঁগু এবং ভাত খাওয়াইয়া রাখা যে অযত্ন করা নহে, এ কথা বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়, তাই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সুকুমারীর কথায় তাহার মনের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল। সে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল সুকুমারীর তালিকার কত দফা তাহার সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব।

সুকুমারী বলিল, "শুধু খাওয়াই নয়। পরার বিষয়েও বিশেষ মন দেওয়া দরকার, বিশেষতঃ এ সব শীতের দেশে। যথেষ্ট জামা কাপড়ের অভাবে ছেলেদের যে কত ক্ষতি হয় তা বলবার নয়। ঠাণ্ডা লেগে গেলে শুধু যে সর্দ্দি কাসি আর পেটের অসুখ হতে পারে তাই নয়, উপযুক্ত গায়ের কাপড়ের অভাবে শরীরের উত্তাপ নষ্ট হয়ে শরীর মোটা হতে পারে না।"

এবার সরমা মৃদুভাবে একটু তর্ক তুলিল; বিশেষতঃ তাহার পুত্র যে সজ্জা পরিয়া ছিল তদ্বিষয়ে তেমন কিছু অনুযোগ করিবার ছিল না বলিয়া এ কথাটা সাধারণ ভাবে আলোচিত হইবার পক্ষে সেরূপ বাধা ছিল না। সে বলিল, "কিন্তু দিদি, তা হলে গরীব দুঃখীদের ছেলেপিলে বাঁচে কেমন করে? তারা যা খাইয়ে-পরিয়ে ছেলে মানুষ করে দেখেছ ত?"

সুকুমারী বলিল, "দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যেমন পৃথক ধাত আছে, প্রত্যেক জাতেরও তেমনি পৃথক ধাত আছে। দেহ খাটিয়ে যাদের খেতে হয় তাদের ধাত, আর মাথা খাটিয়ে যাদের খেতে হয় তাদের ধাত কখনো এক হয় না। এক মণ বোঝা মাথায় নিয়ে যে এক মাইল পথ চলে যেতে পারে তার ছেলে যা খেয়ে মানুষ হবে, এক খানা বড় উপন্যাস এক রাত্রি জেগে যে পড়ে ফেলতে পারে তার ছেলে তাই খেয়ে মানুষ হতে পারে না। তাই বিশুয়ার ছেলে যখন ছোলা খাবে তোর ছেলেকে মাখন খেতে হবে। গয়লা বাড়ীর দুধ দিয়ে মুদিখানার সাবু খাওয়া দুজনের মধ্যে কারো পোষাবে না। তা ছাড়া তোর ছেলের যা অসুখ আর আকৃতি—খাওয়া-পরার বিশেষ ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন?"

সরমা আর তর্কে অগ্রসর হইল না; হাসিতে হাসিতে বলিল, "দিদি তুমি এত কথা জানলে কি করে?"

সুকুমারী সবিস্ময়ে বলিল, "এত কথা আবার কি রে? এ সব মামুলী কথা না জানলে ছেলে মানুষ করবি কি করে? নিজেরি আমার নেই, কিন্তু তাই বলে কি চোখে দেখি নি? আমার ননদের বড় জায়ের দৌত্তুরকে পাড়াগাঁ থেকে নিয়ে এল জরাজীর্ণ—জলবার্লি খাইয়ে খাইয়ে একেবারে জলবালির মত চেহারা করে দিয়েছে। তার দিদিমা তাকে ছ মাস বেদানার রস খাইয়ে বেদানার মন চেহারা করে পাঠিয়ে দিলে। ভাল জিনিস খাওয়ালে যদি ভাল চেহারা না হত তা হলে সাহেবদের ছেলেদের অমন চাঁদের মত চেহারা হত না।"

এ অকাট্য যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ নজীরের বিরুদ্ধে সরমার কিছুই বলিবার ছিল না। সে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে চুপ করিয়া রহিল। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে কয়টা বেদানায় একদিন পান করিবার মত রস হয়, এবং তাহার মূল্য কত; কিন্তু পাছে উত্তর শুনিয়া বেদানার রসের দ্বারা পুত্রকে সুস্থ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই বলিয়া জানিতে পারে সেই আশঙ্কায় সরমা সে কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

দুই হস্তে খোকাকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার নাসিকায় নিজ নাসিকা ঘষিয়া ঘষিয়া সুকুমারী আদর করিতেছিল; হঠাৎ সুবিধা পাইয়া খোকা অতর্কিতে সুকুমারীর নাসিকাগ্র বার দুই চুষিয়া দিল।

সুকুমারী বলিল, "তোর ছেলে শুধু দুধ-সাবু আর দুধ-ভাতই খায় না সরো, আরো একটা জিনিস খায়!"

কাজ করিতে করিতে ফিরিয়া চাহিয়া সরমা বলিল, "আবার কি খায়?"

"মাসির নাক খায়!"

সরমা হাসিয়া বলিল, "মাসি যে রকম বেদানা আর ডালিমের গল্প করছিল, মাসির টুক্‌টুকে নাক দেখে ভেবেছে ডালিম কিম্বা বেদানাই বা হবে!"

শিশুকে আদর করিতে করিতে সুকুমারী বলিল, "চুষে দেখলে মাকাল ফল। ছেলের নাম কি রেখেছিস রে?"

মৃদু হাস্য করিয়া সরমা বলিল, "শ্রীপদ।"

সুকুমারী বলিল, "রমাপদর সঙ্গে মিলিয়ে শ্রীপদ? এ নাম কে রাখলে? রমা, না তুই?"

সরমা কিছু বলিল না। স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"শ্রীপদ ত' পোষাকী নাম; ডাক-নাম কিছু রাখিস নি?"

"ডাক নাম ঘিণ্টু।"

"ঘিণ্টু? তা বেশ নাম! শ্রীপদর চেয়ে ভাল।" বলিয়া ঘিণ্টুর সহিত সম-ধ্বনিত আরও চার-পাঁচটি অর্থ-বিহীন শব্দের দ্বারা আদর করিতে করিতে ঘিণ্টুকে বুকের উপর ফেলিয়া সুকুমারী প্রস্থান করিল স্বামী সমীপে। (ক্রমশঃ)

ভোরের শিউলী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

শরৎ-আলোর অরুণ-চুমায় ঝরা
আমি তরুণ করুণ শেফালী,
ঘাসের বুকে মনের দুখে মরা—
সরম আমার নয়গো সে খালি!
ভোরের হাওয়া, তুইত' আমার কাণে
কইলি,—"জাগো ঊষার আলোর গানে
আস্‌ছে দয়িত!" বিহ্বল আমার প্রাণে—
আশার মোহন স্বপ্ন দেখালি!

রূপের ঠমক, গন্ধ-গমক নাই
চমক যা' দেয় গোলাপ-বাগানে,
রঙীন পরিমল পাবে না ভাই
তোমার প্রেমের গুঞ্জন তানে;
পঙ্কজিনীর মর্ম্মকোষের মধু
পিয়াল-পরাগ নাইক' হেথায় বঁধু!
কিশোরী এই শিউলী সই'য়ের শুধু
সুবাস মৃদু—বিলাস না জানে!

কোথায় ভ্রমর, কোথা গো অবন্ধ?
বক্ষে মধু নাই যে পিয়াবো,
একটু ছিল ঈষৎ সুগন্ধ,
আর কত'খন তায় বা জীয়াবো?
আস্‌ছে প্রভাত মরণ-দূতী মোর,
চক্ষে ঘনায় ঝাপ্‌সা ঘুমের ঘোর,
শেষ-কামনা কুসুম-চিত্ত-চোর
তোমার গলার গান শুনি যাবো!

হলুদ্-বোঁটা ব্যথায় বিবশ তার
হানলে আলোক—আঁধার—নয়নে!
মৃত্যু-শিথিল দলগুলি একবার
কাঁপ্‌ল' যেন কালের চয়নে!
নীড়ের পাখী গাইল উদাস স্বরে
তরু-লতার অশ্রু শিশির ঝরে
শিউলী যখন সজল তৃণের' পরে
মুদ্‌ল আঁখি মরণ-শয়নে।

কলির দাতাকর্ণ

শ্রীনন্দি শর্ম্মা

দাতারাম্ পড়তো যখন আগড়্পাড়ার ইস্কুলে,
পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খায়নি সে কভু ভুলে।
পোষাক্ পরিচ্ছদের প্রতি ছিল না তার কিছুই টান্,
দানাপুরী জুতো পায়ে;—দিলেও খেত'নাক' পান্।
চুলের সঙ্গে চিরুণীরও ছিল না কভু সাক্ষাৎ,
লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতো কেবল দিনরাত।
সন্ধ্যা-আহ্নিক্ করত' খুবই, সেটায় ছিল খুবই আটা;
বিতেষ্টা তার ছিল মাছে,—কখন সে খায়নি পাঁটা।
পাড়ার ছেলের বড়ই মুস্কিল্,—সবাই দিত উদাহরণ,
"ছেলে যদি হয় কারো ত, হয় যেন সে দাতার মতন।"
প্রাইজ্ পেতো, মেডেল্ আন্‌তো, চারদিকে তার হ'ত নাম,
সবাই ব'লত "গ্রামের ছিরি, বাহবা ছেলে দাতারাম!"
লেখাপড়া শেষ ক'রে সে হ'ল একজন্ প্রফেসার্,
একেবারে একশ' টাকা মাসোহারাও হল' তার।
কর্ত্তা হয়ে খরচটার সে করলে এমন কড়াকড়ি,—
ডাল্ ভাত, আর কুমড়া কচু, শাকপাতার এক চচ্চড়ি।
আম্‌ড়া, না হয় আমরুল দিয়ে,—খোসার একটা জোঁদা টক্,
বারোমাসই একটানা, এই আহারের তার বাড়লো সখ্।
বছরে চারখানা সাড়ী,—ন'হাত হলেই,—তাই প্রমান্,
পুরুষদের বরাদ্দ হল,—এক থানে হবে ছ'খান।—
স্বতন্ত্র গজ্খানেক ক'রে পাবে সবাই আলাদা,—
কোঁচার স্থানে কুঁচিয়ে সেটা গুঁজে নিতে কি বাধা?
কাচ্‌লেই হল' মাঝে মাঝে, একটাতেই তার চল্‌বে বেশ,
আবার একটা নতুন পাবে—বছরটা যেই হবে শেষ।
কামিজপরা ছেলেগুলয়—বাড়ীর সবাই হয়ে' বাম্,—
সদাই ব'লত, "দেখে আয়গে—কিবা ছেলে দাতারাম।"
সংসার-বাবদ চল্লিশ রেখে—ষাট যেত' তার ব্যাঙ্কের খাতে,
খেতে প'রতে আট্‌টি, তবু খেলাফ্ কভু হয়নি তাতে।
বলা ছিল—"যে যা পারবে ও-থেকে বাঁচাতে যা,—
আমি আর চাইনা সেটা,—তারি হবে সে লাভটা!"
শুনে সবাই জ্বলে যেতো,—কেউ বা হাসত' পাগল্ ভেবে,
বুঝ্‌ত' সবাই,—ম'রে গেলেও—এক পয়সা না অধিক্ দেবে।
বল্‌লে একদিন বোন্‌কে ডেকে—"ফেন্‌টা তোরা কি করিস্!
ওই'টেই ত' আসল্ জিনিস্,—কেউ না খায় ত' আমায় দিস্।"
"ওটা যে দাদা, গরুকে দি—দুবেলার সব ক'রে জড়;"
"আজ থেকে আমাকে দিবি, গরু বড় না আমি বড়?
জানিস্ না সব বিলেতেতে ও জিনিসটার কত দাম্।"
সবাই বল্লে, "ধন্য ধন্য, ছেলে বটে দাতারাম!"
বরাবরই দাতারামের ঝোঁক্‌টা ছিল দানের দিকে,
মেডেল্ এনেছিল একবার—ঐ বিষয়ে "এসে" লিখে।
কথা পড়লেই বল্‌ত তখন,—"দুনিয়ার যা বড় কিছু—
ধর্ম্ম বলো কর্ম্ম বলো,—দানের কাছে সবই নীচু।
না খেয়ে না পোরে, আর নিত্য পাঁচকোশ্ হেঁটে চোলে—
টাকাটা যে বাঁচাই, কেবল—ওই নেশাটা আছে বোলে!
খাওয়া-পরায় বৃথা জেনে—ঐটেই আমি করেছি সার্,
আনন্দ, কি সুখ শান্তি,—ঐটেতেই সব হয় আমার।
দানটা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বটে,—অপাত্রে না পড়ে কিন্তু;
মহাপাতক হয় তাহাতে, পুণ্য তাতে নাই এক বিন্দু।"
অবাক্ হয়ে শুনতেছিল—সহপাঠী ঘনশ্যাম,
লাফিয়ে উঠে বল্লে শেষে—"ক্যাবাৎ ভায়া দাতারাম!"
সংসার বাড়লো বছর্ বছর্,—বেতনটাও বাড়লো ক্রমে,
খরচ কিন্তু বাড়লো না তার,—এক পয়সাও, ভুল, বা ভ্রমে!
মায়ের জ্বালা বাড়লো বটে,—লুকিয়ে ফেলেন চোখের জল,
ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি—অনুনয়েও হয় না ফল।
গোপনেতে গয়না-গাঁটি—বাঁধা রেখে চালান তিনি,
অভাগিনীর কি যে কষ্ট,—জানেন অন্তর্য্যামী যিনি।
কাট্ ফুরুলে বেড়া ভেঙে,—লুকিয়ে তিনি উনুন ধরান্,
দশমীতেও জল খান্ না, শিশুদের তায় খাবার আনান্।
চাল কেঁড়ে, তার খুদ্‌গুলি নে'—নিজে রাঁধেন স্বতন্তর,
পুজোর তত্ত্ব, কাপড়, নিয়ে ফি-বছর হয় মনান্তর।
"দাতা" বলে—দানটা আগে,—তার পরেতে অন্য কাম্,
সবাই বলে, "ভাগ্যবতী,—বিইয়েচে যে দাতারাম।"
ছেলে পড়িয়ে দাতারামের—টাকা ষাটেক্ তাতেও আসে,
এ টাকা সে রাখে, কোনো দুঃখীর মেয়ের বিয়ের আশে।
গৃহ-হীনে ক'রে দেওয়া ঘর,—অনাথ ছেলের শিক্ষার ভার,
আতুরেরে অন্ন দেওয়া,—সখের মধ্যে ছিল তার।

অন্ধ খঞ্জ দেখে পথে—বড়ই কষ্ট হ'ত প্রাণে,—
বলতেন তিনি—"এরাই আমার দানের দিকে প্রাণটা টানে।"
জননী তার দেবতার কাছে—কাঁদতেন কেবল মৃত্যু চাই।
খাওয়া-পরার কষ্টে শেষে—চুরি বিদ্যে শিখলে ভাই!
ঘটিবাটি যা পেত' সে—লুকিয়ে নিয়ে আসত' বেচে,—
কাপড় কিনে, খাবার খেয়ে,—একরকমে থাক্‌তো বেঁচে।
দান-খাতেতে জমার অঙ্ক বাড়্‌তে লাগল অবিশ্রাম্,
দেখে সবাই চোম্‌কে উঠে, বল্লে—"সাবাস্ দাতারাম্!"
সহপাঠী বল্লে একদিন,—"দয়ায় বটে শরীর গড়া,—
কিন্তু তোমায় দেখিনি ত' দিতে কারোয় একটি কড়া!"
দাতা বল্লে—"বলো কি হে—করলেই হল' দান্‌টা বুঝি?—
অপাত্রে দান ক'রে, শেষে—পাতক্ নিয়ে আমি যুঝি।"
"অন্ধ খঞ্জ আতুর যারা—তারা ত অপাত্র নয়?"
"তুমি আমি বল্লে কি আর—সে-কথাটা প্রমাণ হয়?
বিশিষ্ট কেউ বড় ডাক্তার,—সাহেব কিন্তু হওয়া চাই,—
পরীক্ষান্তে বলেন যদি,—তাতে মোর আপত্তি নাই।—
তবু কিন্তু ধোঁকা থাকে;—ভাল রকম সন্ধান বিনা,—
কি পাপে হয়েছে অমন—সেটাও আবার কুৎসিত কিনা;—
কথাটা আমার বুঝেছ ত?—ভাব্‌তে হয় ত' পরিণাম?"
"তা ত' বটেই" বল্লে বন্ধু,—"তুমিই সত্য দাতারাম!"
"ধর'না কারুর চোখ গেলে' দে—অন্ধ হয়ে থাকে যদি,
কিম্বা কারুর ঠ্যাং ভেঙ্গে' দে—নিজের পায়ের এ দুর্গতি।
অথবা কারেও সবংশেতে মেরে, এবার হয় অনাথ,
কাঙ্গাল হয়ে থাকে যদি,—কারুর টাকা আত্মসাৎ
ক'রে কোনো জন্মেতে সে;—কিম্বা কারুর মুখের অন্ন,—
কেড়ে খেয়ে, এবার আতুর—হয়েছে সে মতিচ্ছন্ন;—
দয়ায় অন্ধ হয়ে আমি—তাদের যদি দানটা করি,—
ভাবতেও তা, শিউরে উঠি,—রক্ষা আমায় করেন হরি!
তা না ত', এ সব টাকাই ত' দানের তরেই রাখাটা মোর,
পাত্র কিন্তু পাই না খুঁজে,—এইটেই তো আপশোষ্ ঘোর।
সদাই ভাবি—দূর ক'রে দি—দুঃখ হতে ধরাধাম্;
বন্ধু বল্লে—"অমর হয়ে—বেঁচে থাক ভাই দাতারাম!"
"ধর না আবার, টাকাটা নিয়ে—করে যদি কেউ অসদ্ব্যয়,
কাজের চেষ্টা না করে, আর কুড়ের মত' ব'সে রয়,
অথবা মদ্ খেয়ে বসে,—কিম্বা যদি খায় সে গাঁজা,
সে সব পাপে আমাকেই ত' নিতে হবে কড়া সাজা;
ঘরে আগুন দিছলো কারুর, হয়েছে তাই গৃহ-হারা,
তাদের দানটা করে কি শেষে—পাপে আমি যাব' মারা?
অন্নের তরে টাকাটা দিলুম,—সে যদি গে খায় কচুরী,
নিজে মজ্‌লুম, তারে মজালুম,—মিছেই আমার সব মজুরী।
পাপ শেখাবার তরেই লোকে, হয় যদি মোর দানটা করা,
বলো দিকি বাড়বে কি না—হু হু ক'রে পাপের ভরা।
তার চেয়েতে, তাদের পাওনা থাকুক্ না আমারই কাছে,
মনে মনে দিয়েইচি ত';—তার চেয়ে আর সুখ কি আছে!"
বন্ধু বল্লে—"এ ভাবটা ভাই, একদমই খাঁটি নিষ্কাম্,—
দান ক'রবে ত' এই রকমই,—বাহা রে বাহা দাতারাম!"
"ক'নের পাত্র জোটে বরং—হাজার পাঁচেক যদি বর্ষে,
দানের পাত্রের বড়ই অভাব,—বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে।
কথাটা বেশ বুঝেছ ত',—বড়ই কঠিন দানের প্রশ্ন,
রয়েছি হয়ে দানেই ফতুর,—দানের তরেই এত যত্ন।"

* * * *

অনেক জ্বলে মা মরেছেন,—জায়াও গেছেন হাড় জুড়িয়ে,
দানের তরে দাতারাম কিন্তু,—আজো আসছেন টাকা কুড়িয়ে।
সাধ আহ্লাদ মেলা-মেশা—না আছে বন্ধুবান্ধব,
ভয়টা, পাছে কইলে কথা—গুড়ুক খেতে আসে সব!'
ফ্যান্ খেয়ে আর ডাঁটা চিবিয়ে—ধোরলো শেষে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া,
খায় সে এখন সাত সের জল,—বলে'দিছলো কোন্ এক মিয়াঁ।
ব'লতো "এটা জ্যান্তো ওষুদ,—পেয়েছি এতে খুবই আরাম"।
সবাই বল্লে "তা ত বটেই,—সন্দেহ তায় নাই দাতারাম।"
পাত্রাভাবে দাতারামের দান করা না হলো এবার,
পাই-পয়সা রইলো মজুদ্,—সুদে বাড়তে লাগ্‌লো দেদার।
সহপাঠী ছিল যারা সব—বল্লে তারা অবশেষে,—
"এমন দাতা জন্মায়নি কেউ,—জন্মাবেনাও কোন দেশে।
দুঃক্ষু,—মা বাপ্ ম'রে গেছেন,—দেখাতে পারলুম না কারে,
দাতারামের উন্নতিটা,—উদাহরণ দিতেন যারে!"
মৃত্যুকালে দেখলে গুণে,—জমা মজুদ্ আটাশ হাজার!
ছেলেয় ডেকে, পা ছুঁইয়ে,—মতলবটা (তার) করলে প্রচার—
"মধুমিস্তিরের বিধবার ওই জমীদারিটে নেওয়াই চাই,—
অনেকদিনের ঝোঁকটা আমার,—টাকাগুলো রেখেছি তাই;
সুদে আসলে গোণাই আছে,—এই চোতেতেই হবে নিলাম,
আর যা লাগে দিয়ে দিও,—শেষ কথাটা বলে গেলাম।"
ঠাকুরদের নাম করতে বলায়,—কষ্টে বলে "গন্ধমাদন,"
"ভস্মলোচন্" বল্‌তে গিয়ে—ছিঁড়ে গেলো ভবের বাঁধন!
দেশ শুদ্ধ, অবাক শুনে, সবাই ঝুঁকে করলে প্রণাম্,
বল্লে "কলির দাতাকর্ণ—সরে পড় ভাই দাতারাম!"

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকার প্রথম বৈজ্ঞানিক—

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ হাবার্ট জে, স্পিন্ডেন Guatemala এবং Honduras নামক স্থানের কয়েকটি ভাঙ্গা মন্দিরাদি হইতে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শিলালিপি-গুলি ২৫০০ বছরেরও পূর্ব্বের লেখা। এই শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিখ্যাত মায়াজাতির আমেরিকা আবিষ্কার করিবার বহু পূর্ব্বে তাহারা এই দেশে বাস করিত। তাহাদের সভ্যতা প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীন, কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। প্রস্তর-খণ্ডের উপর খোদিত তাহাদের যে Timepiece বা ঘড়ি ছিল, তাহার দ্বারা বর্ত্তমান জগতের ঘড়ির কাজ খুব সহজে এবং ঠিকভাবে চলিত, অধিকন্তু এই ঘড়িতে সূর্য্যের গতিবিধি এবং ঋতু পরিবর্ত্তন বেশ বুঝিতে পারা যাইত। স্পেনের

আমেরিকার প্রথম বৈজ্ঞানিক

লোকেরা এই প্রাচীন মায়া-সভ্যতার বহু নিদর্শন ধ্বংস করিয়াছে। যে সময়-নিরূপণকারী প্রস্তর-খণ্ডের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার খানিক অংশও তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। বিশপ লাণ্ডার এই সকল ধ্বংস-লীলার কর্ত্তা ছিল। মায়া-সভ্যতার সময়ের অনেক প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদিও বিশপ লাণ্ডার নষ্ট করে।
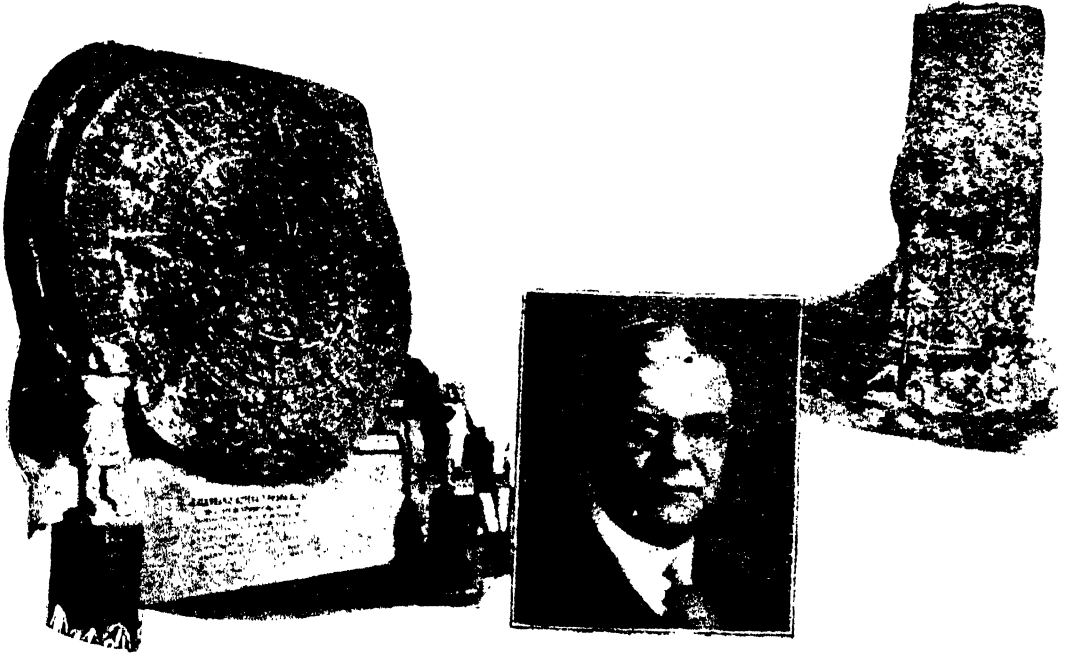
কোন পণ্ডিত এই লিপি রাখিয়া গিয়াছেন। এই লিপি-গুলিতে অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি সুকঠিন নিয়মের অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যা সাধারণ পণ্ডিতের কাজ নয়। অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার না থাকিলে ইহা করা অসম্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্রের কতকগুলি বিষয় এই সকল শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

মায়াজাতি আমেরিকার আদিম অধিবাসী। কলম্বাস

ডাঃ স্পিন্ডেন বলেন, "যে ব্যক্তি এই সকল আশ্চর্য্য

শিলালিপির লেখক এবং আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহাকে পারস্যের জোরোয়াষ্টার এবং ভারতবর্ষের বুদ্ধের সহিত এক আসনে বসানো যাইতে পারে।"

মায়াজাতির সভ্যতার পতন যে কেমন করিয়া হইল, তাহা কোনো বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন না। কিন্তু ইহাদের পতন যে পৃথিবীর পক্ষে একটি মহৎ ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়াজাতির লোকসংখ্যা প্রায় দেড়কোটি ছিল। তাহাদের বংশধর বলিতে এখন প্রায় ৪০০০ লাল মানুষ মাত্র (Red Indians) আছে।

প্রাচীন শিলালিপি

আমেরিকার ডাকঘরের কথা—

ডাকঘরের ডেড্‌লেটার আপিসে যে কত প্রকার অদ্ভুত চিঠিপত্র পার্শেল আদি আসিয়া জমা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকার ডেড্‌লেটার আপিস এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। ওয়াশিংটন শহরে এই ডেড্‌লেটার আপিস অবস্থিত। চিঠিপত্র, পার্শেল আদি ছাড়া নানা প্রকার বন্দুকাদি, মদ, কোকেন, মারাত্মক বোমা ইত্যাদি নানা প্রকার ভয়ানক ভয়ানক জিনিষপত্র এখানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে। সামান্য একটা প্যাকেটের মধ্যে হয়ত ডিনামাইট ভরা আছে। ইহা কোন প্রকারে ফাটিয়া গেলে, একটা প্রকাণ্ড বাড়ীকে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে। অতি বিষাক্ত জীবন্ত সাপ, মশা আদি, পোকা-মাকড়, বিছা ইত্যাদিও পার্শেলের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দিন ৬০,০০০এরও বেশী পথভ্রান্ত চিঠিপত্র এই আপিসে আসিয়া হাজির হয়। গত বৎসর ওয়াশিংটনের ডেড্‌লেটার আপিসে ২১,০০০,০০০ চিঠিপত্র এবং ৮০৩,০০০ পার্শেল আসিয়া জমা হয়। ইহার মধ্যে ১০০,০০০ শাদা খামের চিঠি—কোন ঠিকানা লেখা নাই, কেবল মাত্র টিকিট লাগাইয়া পোষ্ট করা হইয়াছিল। অনেক শাদা খামে হাজার বা তাহা অপেক্ষাও বেশী টাকার নোট ভরা থাকে। বছরে এই রকমে প্রায় ১৬৫,০০০ টাকা পাওয়া যায়।

ডাকে নিষিদ্ধ বস্তু

প্রত্যেক বছর নীলাম করিয়া ডেড্‌লেটার আপিস হইতে মালপত্র বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। নানারকম গয়না,

বাজনা, পুস্তকাদি নীলাম হয়। নীলাম হইতে প্রায় ১২০০০০০ টাকা আসে।

দীর্ঘজীবী হইবার উপায়—

যাঁহারা খুব বেশী দিন বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাল্য এবং যৌবন সম্বন্ধে খোঁজ লইলে দেখা যায় যে, তাঁহারা বরাবর নিয়ম করিয়া কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়াছেন। এইখানে কয়েকজন লোকের বিষয় লেখা হইল, যাঁহারা সকলেই দীর্ঘজীবী, এবং তাহার একমাত্র না হইলেও প্রধান কারণ তাঁহারা নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিয়াছেন।
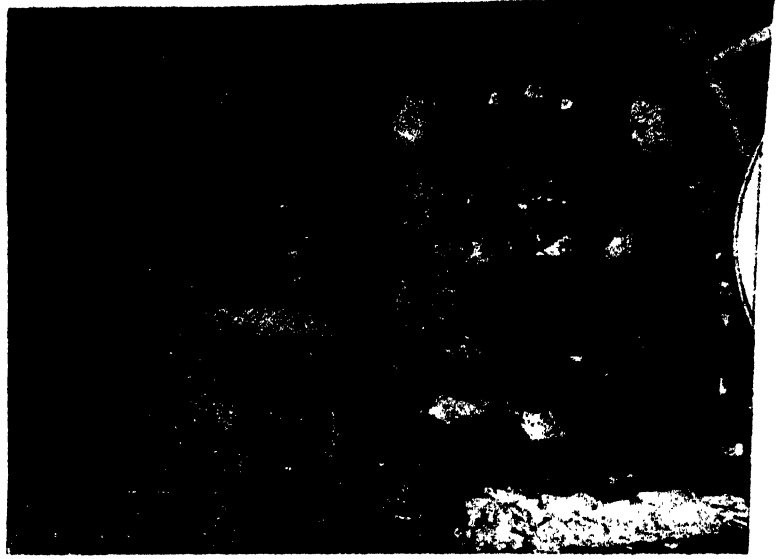
ডেড্‌লেটার আপিসে সঞ্চিত মালপত্রের নিলাম

ডেড্‌লেটার আপিসে নিষিদ্ধ বস্তুর সমাবেশ

একেবারে ব্যায়াম না করা কিম্বা অত্যধিক ব্যায়াম করা উভয় প্রকারেই শরীর নষ্ট হইয়া মানুষের পরমায়ু ক্ষয় হয়।

(১) লুই মারকুইট্—বয়স ৬৮। ইনি সকল ঋতুতে এবং প্রত্যহ সমুদ্রে স্নান করেন। শীত, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি কিছুই ইঁহার স্নান বন্ধ করিতে পারে না।

(২) জর্জ্জ এফ, বেকার—বয়স ৮৫। ইনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি, ব্যাঙ্কার এবং রেলওয়ালা। ইনি প্রত্যহ সকালে গল্‌ফ্ খেলিয়া থাকেন।

(৩) আব্রাহাম ফার্ষ্ট—বয়স ৯০। ইনি গত ৭৫ বছর ধরিয়া শিকার করিবার লাইসেন্স বা পরওয়ানা লইয়া থাকেন। খরগোষ শিকারে ইঁহার প্রধান আনন্দ।

পালোয়ান নারী—

ছবিতে দেখুন একজন মহিলা কেমন একটা প্রকাণ্ড পিপাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইঁহার নাম মিসেস ফ্রান্‌সেস্‌কা। ইনি গত বৎসর বোষ্টোন সহরের
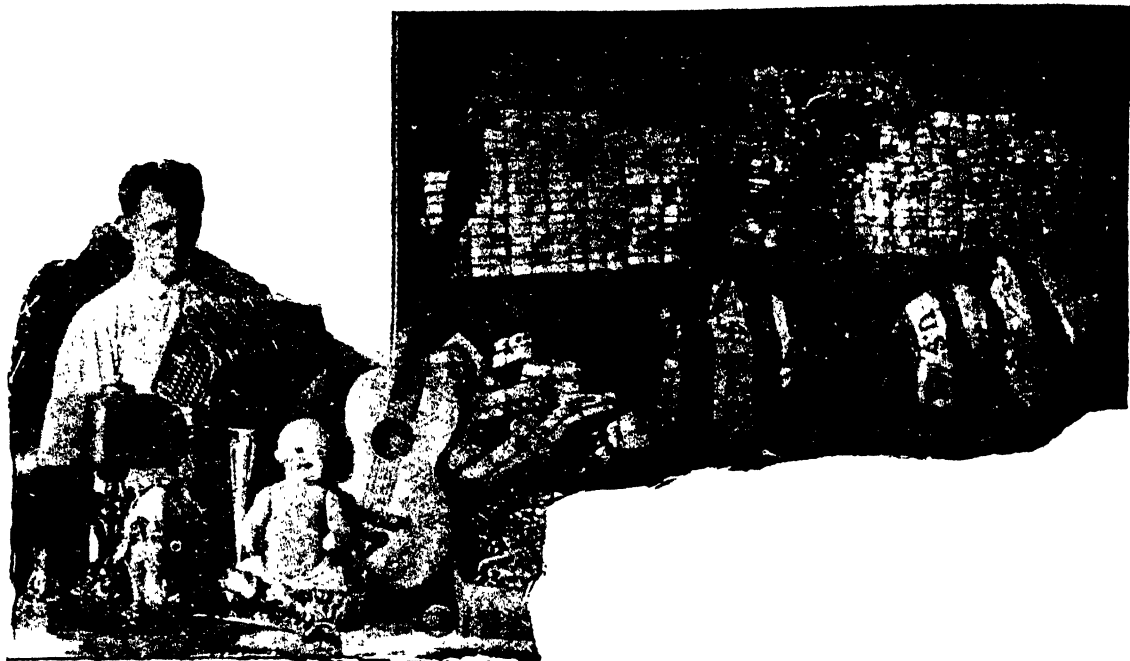
ডেড্ লেটার আপিসে সঞ্চিত পার্শেল

দীর্ঘজীবীর নিত্যস্নান

দীর্ঘজীবী গোল্‌ফ্ ক্রীড়

৯০ বৎসর বয়স্ক শিকারী

এক পিপার কারখানায় কাজ করিতেন। ইহাঁর মত শক্তিমতী নারী খুব কম আছে।

পালোয়ান নারী

অভিনব ঢাল—

পুরাকালে যোদ্ধারা সর্ব্বাঙ্গ লোহার বর্ম্মে আবৃত করিত। নিউইয়র্কে পুলিস বর্ত্তমান সময়ে বর্ম্ম ব্যবহার করে না, তাহারা একপ্রকার ঢাল ব্যবহার করে। এই ঢাল গলার সঙ্গে বাঁধা থাকে এবং সমস্ত মাথা বুক পেট আবৃত করিয়া রাখে। দুই হাত খালি থাকে, তাহাতে ইচ্ছামত অ ব্যবহার করা যায়। চোখের কাছে গোল করিয়া কা

অভিনব ঢাল

আছে—তাহাতে মোটা কাঁচ আটা। পুলিস তাহার সামনে সব জিনিস দেখিতে পায়।

অভিনব ট্যাক্‌সি মোটর—

সম্প্রতি প্যারিসের এক রাস্তায় একটি অভিনব ট্যাক্‌ দেখা দেয়। এই ট্যাক্‌সিতে চালকের বসিবার স্থান গাড়ী

অভিনব ট্যাক্‌সি মোটর

পিছন দিকে উপরে। গাড়ীতে যাহারা বসিয়া থাকে, তাহা সামনের সব কিছু বেশ বিনা বাধায় দেখিতে পায়। ব্যবসায়

বা অন্যান্য যে কোন লোক গাড়ীতে বসিয়া তাহাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপন কথাবার্ত্তা এই ট্যাকসিতে বসিয়া বলিতে পারিবে—ড্রাইভার কোনো কথা শুনিতে পাইবে না। চালকও উঁচুতে বসিয়া রাস্তার বহুদূর ভাল করিয়া দেখিতে পায় এবং ভাল করিয়া গাড়ী চালাইতে পারে।

মাথার কেরামতি—

ছবিতে দেখুন, একজন লোকে মাথায় কতগুলি ঝুড়ি পর পর বসাইয়া বহন করিতে পারে। এই ভদ্রলোকের
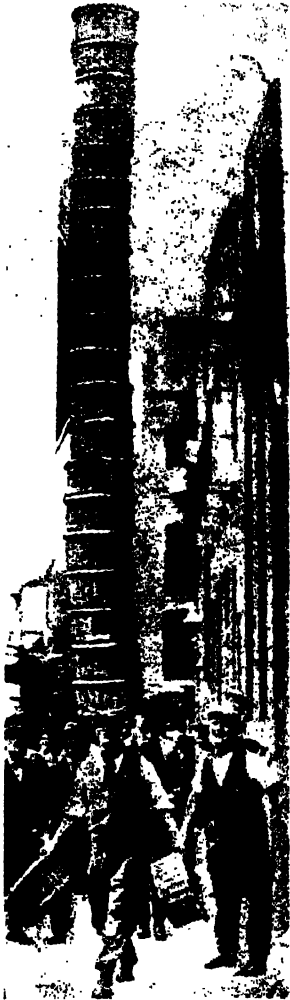
মাথার কেরামতি

নাম জেম্‌স সেন্‌স্‌বারি। এতগুলি ঝুড়িকে পর পর বসাইয়া মাথায় করিয়া চলিতে পৃথিবীতে আর কেহ পারে না। এই বিষয়ে সেন্‌স্‌বারি অদ্বিতীয়।

কুকুরের খরগোষ ধরার দৌড়—

বিলাতের লোকেরা পোষা গ্রেহাউণ্ড কুকুর দ্বারা খরগোষ ধরার দৌড় করিতে ভালবাসে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ কুকুরকে সারিবন্দি করিয়া ধরিয়া দাঁড় করায়, তাহার পর কিছু দূরে একটি খরগোষকে ছাড়িয়া দিয়া সেই সঙ্গে কুকুরগুলিকেও ছাড়িয়া দেয়। যাঁহার কুকুর প্রথমে গিয়া খরগোষকে ধরিয়া ফেলে সেই বাজি মারে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বার দৌড়ের জন্য একটি করিয়া নিরীহ
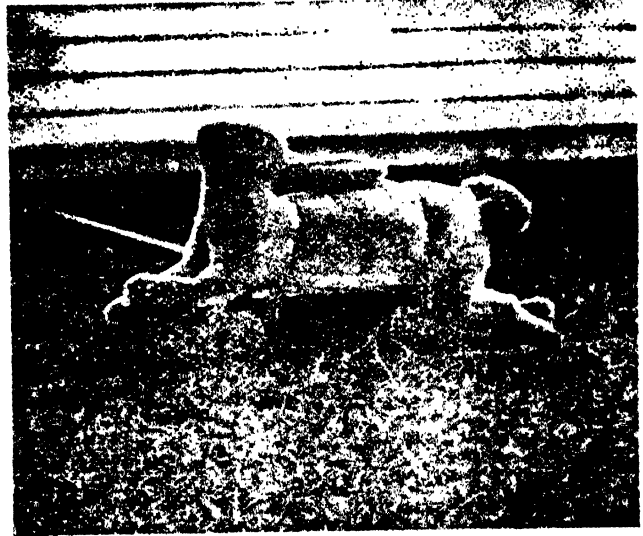
কলের খরগোষ

খরগোষ মারা যায়। কুকুরের দল তাহাকে ছিঁড়িয়া শতটুকরা করিয়া খায়। হঠাৎ সাহেবদের মনে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তাহারা আর জীবন্ত রক্তমাংসের খরগোষ দৌড়ের সময় ব্যবহার করে না। এখন কলের খরগোষ ব্যবহার করা হয়। এই খরগোষ বিদ্যুতের জোরে দৌড়ায়। কলের খরগোষের একখানি ছবি দেওয়া হইল।

প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক যুগের ভালুক—

প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি. কে, এ্যাব্‌সোলোন সম্প্রতি চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রেড্‌মোষ্ট নামক স্থানে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের (২০,০০০ বছরেরও আগের) বৃহদাকার ভালুকের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ভালুকগুলি ১২ ফিটেরও বেশী লম্বা

হইত। সেই সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেমন করিয়া খাদ্যের জন্ত এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভালুক শিকার করিত

প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের ভালুক

তাহার একখানি চিত্র দেওয়া হইল। চিত্র দেখিয়া ভালুকের দেহের আকারের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই ভালুকরা অত্যন্ত অসমসাহসী এবং বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি চিরকাল জন্তুদের অপেক্ষা বেশী বলিয়া সেই সময়ের ভালুকরা সেই সময়ের মানুষদের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না।

খবরের কাগজ

কপিঞ্জল

(নক্সা)

জ্ঞানই শক্তি। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগৎপতির পুত্র এই মানব-জাতি একান্ত জ্ঞান পিপাসু। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হইবার স্পৃহা তাহার অস্থিমজ্জাগত। বিপুল পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, সুবৃহৎ মানব-পরিবারের কোথায় কি ঘটিতেছে, ইহা জানিবার জন্য তাহার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। সে অনন্ত পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই খবরের কাগজের সৃষ্টি। সুতরাং ইহার আধ্যাত্মিক মূল্য বার্ষিক মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। খবরের কাগজ শিক্ষার একটী সচল বাহন। ইহা রাজাকে উপদেশ দেয়, মূককে বাচাল করে, মূর্খকে পণ্ডিত করে, শান্তকে হুজুগে করে। ইহা পরমানন্দ মাধবের কৃপা বই আর কিছুই নহে।

এহেন খবরের কাগজ প্রকাশ করা সহজ-সাধ্য রহিল না। যদি ইহার বিলোপ হয়, এমন ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। রাজদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার নবকলেবরের একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত দোষ পরিহার করিয়া কিরূপে ইহা চলিতে পারে, তাহার আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে। খবরের কাগজের খবরই প্রাণ। যদি নূতন খবর না থাকিল তাহা হইলে উহা ফুটানো সোডা ওয়াটারের ন্যায় বিস্বাদ।

অনেক চিন্তা করিয়া কতকগুলি চিরন্তন সত্য সংবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। এ সকল প্রকাশ করিলে, রাজদ্রোহে পড়িবার সম্ভাবনা কম। ইহা পাঠ করিলে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হইবে, পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, এমন কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভেরও সম্ভাবনা। ভগবানের লীলা যেমন নিত্য, সংবাদগুলিও তেমনি নিত্য।

আদর্শ।

(Reuter)

নাগলোকে বেঙের অভাব হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ফরাসী দেশ হইতে খাদ্যসম্ভার লইয়া কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি রওনা হইয়াছেন। সুন্দরবনের অজগরগণ সভা করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন; কিন্তু চাঁদা তোলার চেষ্টা করেন নাই।

মহাচীনে একটী কদলীবৃক্ষ তিনছড়া দগ্ধ কদলী প্রদর্শন করিয়াছে। এই কলা লইয়া একটা আন্তর্জাতিক কলহ না বাধিলেই মঙ্গল।

লঙ্কাদ্বীপে একপ্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পাতা সবুজ, এবং ফল মিষ্ট। তাহাতে লাভজনক ব্যবসায় চলিতে পারে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যা হইতে অনেকগুলি বিশেষজ্ঞ লম্ফ যোগে রওনা হইয়াছেন।

উচ্ছন্ন নামক নবাবিষ্কৃত দেশটীকে বসবাসের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার মধ্যেই দোকান, রেষ্টোরাঁ, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আড়ত খোলা হইয়াছে। একা বাঙ্গলা হইতেই প্রায় দুই হাজার যুবক সেখানে যাইবার জন্য এবং উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তুত।

মিঃ গালিভার ভারত পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের সহিত লিলিপুটের অনেকটা মিল আছে।

মিঃ গাউট সি-আই-ই এবার স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তা হইলেন। অনেকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করিবেন।

তুতঙ্কামন মিশরের রাজা হইলেন।

বরুণপুরে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছে। ইন্দ্ররাজার নিকট আবেদন করায় বিষময় ফল হইয়াছে, তিনি জলকর বসাইয়া দিয়াছেন। মৎস্যের চাষ চলিতে পারে কি না

পরীক্ষা করিবার জন্য মৎস্য বিভাগের কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আসিয়াছেন।

দশের কথা।

মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; শকুন্তলা সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা করিবেন।

* * * * *

লর্ড সদাশিব কৈলাস ত্যাগ করিয়াছেন, দক্ষযজ্ঞ দর্শন করিয়া তথায় অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। তার পর তারকেশ্বরের এলোকেশী ও মহান্তের ডেপুটেশন গ্রহণ করিয়া কামাখ্যা রওনা হইবেন।

* * * *

সাধু জরদগব ১৩৩৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১লা এপ্রিল তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গিয়াছে।

* * * *

নিউটন নামে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া এবার নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

* * * *

কালিদাস নামক বাঙ্গালী কবি উজ্জয়িনীর রাজকবি হইয়াছেন। বাঙ্গালী বীর দুর্গাদাস রাজপুতানায় এবং বাঙ্গালী যুবরাজ লিওনিদাস গ্রীসের থার্মোপলিতে অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখাইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করিয়াছেন।

* * * *

খলিফা হারুণ অল্ রসিদ বাগদাদের বিখ্যাত নাবিক-সদাগর সিন্দবাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন।

* * * *

আলাদীন তাঁর আশ্চর্য্য প্রদীপটা তিনকোটী টাকায় বীমা করিয়াছেন।

* * * *

বাগদাদের খলিফা গুণের বড়ই পক্ষপাতী। তিনি একজন বাঙ্গালী মুসলমানকে মন্ত্রীত্ব দিবার বাসনা করিয়াছেন। চারিদিকেই বাঙ্গালীর জয়জয়কার। আমরা ভাবী মন্ত্রীকে অভিনন্দিত করিতেছি—

'জয়যাত্রায় যাওহে উঠ জয়রথে তব'

* * * *

মহাবীর আলেকজণ্ডার শুদ্ধি লইয়া হিন্দু হইয়াছেন। তাঁহার নূতন নাম হইল অলীকচন্দ্র শর্ম্মা। বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন।

* * * *

সেখ সাদী তাঞ্জিমের সেক্রেটারী হইলেন।

আইন আদালত।

নারদ নামে একটী স্বামীর উপর সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক কলহ বাধাবার জন্য ১৪৪ ধারা জাহির হইয়াছে। তিনি আর ভারতের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে পারিবেন না। তাঁহার ঢেঁকীটা ক্রোক করা হইয়াছে। সেটী কুমীর হয় কি না দেখিবার জন্য লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। পুলিশ অগত্যা গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। ৪৯ জন লোক ধৃত ও বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

জাষ্টিস্ পাইলেটের এজলাসে যীশুখৃষ্টের বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

সক্রেটিসের মামলা এক মাসের জন্য মূলতুবী রহিল।

ভিনিসে Antonioর বিচার হইয়া একটা দারুণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

মিঃ লাঙ্গলচরণ আচোর এজলাসে মুরগী-চুরির গুরুতর অভিযোগে এক নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য্য অভিযুক্ত হইয়াছেন। সুযোগ্য বিচারক মামলাটীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা সেসন্ সোপরদ্দ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ৫২৬ করিয়াছে। হাইকোর্ট রুল জারি করিয়াছেন। হাকিমের অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রশংসনীয়।

সৈয়দ ইস্মার মহম্মদ এবার কালীপূজার রাত্রিতে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করেন। কয়েকজন প্রাচীন ধর্ম্মান্ধ মুসলমান বাধা দেওয়ায় সদনুষ্ঠান হইতে পায় নাই। মামলা রুজু হইয়াছে।

হাজি শমসউদ্দীনের দৌহিত্র তাঁহার নামাজের সময় টুমটুমি বাজানর জন্য পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। বালক

শুদ্ধির ভয় প্রদর্শন করায় ব্যাপারটী আপোষে মিটিয়া গিয়াছে।

নারী-নিগ্রহ।

রামচন্দ্র নামক একজন বিদেশী যুবক পঞ্চবটীতে সূর্পনখা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত মহিলার নাসিকা ছেদন করায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রোহিনী নাম্নী ব্রাহ্মণ বিধবার কেশ কর্ত্তন করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়াছেন। জমিদারের অত্যাচার আর কতদিন লোকে সহ্য করিবে? রায়ত সভা কি করিতেছেন?

মহিলার কাণ্ড।

পুতনা নামে এক সুন্দরী যুবতী স্তনে বিষ মাখাইয়া বহু দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণনাশ করিয়া বেড়াইত। এবার গোকুলনগরে তাহার কাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। গৃহলক্ষ্মীরা সাবধান!

বিধবা-বিবাহ।

মন্দোদরীর সহিত বিভীষণের বিধবা বিবাহ রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। কিস্কিন্ধ্যার অনুসরণে বিধবা বিবাহ রাক্ষস-সমাজে এই প্রথম।

অসবর্ণ-বিবাহ।

ভীমসেন শ্রীমতী হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। অসবর্ণ বিবাহ বিল কবে পাস হইবে!

মহারাজ শান্তনু মাহিষ্য-কন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ভারতে নবযুগের উদ্বোধন করিলেন।

সমাজ-শাসন।

চণ্ডীদাস একঘরে হইয়াছেন। এক নকুল পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহার সঙ্গে পংক্তি-ভোজন করেন নাই। চণ্ডীদাস বোধ হয় বিলাত-প্রত্যাগত।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম।

গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ হইয়াছে। পিণ্ড দিবার জন্য লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বলীরাজা বামনকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন।

লোমশ মুনি হরিনাম করিতে করিতে অকালে স্বইচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজী সন বা বাঙ্গালা শকাব্দায় তাঁহার বয়সের পরিমাণ হইবে না বলিয়া কত বয়স জানা গেল না।

চুরি-ডাকাতি

গরিবপুরের স্যাংটেশ্বর বাবু জমিদারের গৃহে দিনদুপুরে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। থানায় সংবাদ দেওয়ায় পুলিশ আসিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি নিজের হেপাজতে লইয়া তাঁহার চৌর্য্য-ভয় নিবারণ করিয়াছেন। স্যাংটেশ্বর বাবু এইবার নিশ্চিন্ত মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তজ্জন্য একটী লোটার দরকার। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সদাশয় ডাকাত দল ডাকযোগে তাঁহাকে একটী সুন্দর কটকী লোটা পাঠাইয়া দিয়াছে। দস্যুরও ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয়।

স্যমন্তক নামক মণিটী সম্প্রতি অপহৃত হইয়াছে—অনেকে মথুরেশকে সন্দেহ করিতেছে। কু লোকে বলে বাল্যকালে তিনি সৎস্বভাবের ছিলেন না। দেখা যাক ব্যাপার কি দাঁড়ায়। শেষে হোলকারের মত না হয়।

খুন!

ভাস্বরক সিংহকে কে খুন করিয়া কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ড্যালিলা স্যাম্‌সনকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

সঙ্কট আইন।

আমোদ ও রসিক নামে দুই গুণ্ডা সঙ্কট আইনে বাঙ্গলা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মন্দির-ধ্বংস।

মামুদ গজনী নামক একটী লোক দাঙ্গা করিয়া সোমনাথের মন্দিরটী ধূলিসাৎ করিয়াছে। সংবাদদাতা একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তথাপি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার উত্তর না আসা পর্য্যন্ত ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

মসজিদ ভাঙ্গিয়া গুরুদ্বার।

শিখেরা অমৃতসরে একটী মসজিদ ভাঙ্গিয়া গুরুদ্বার তৈয়ার করিয়াছে এইরূপ গুজব। সোমনাথের ঢেউ ওখানে পঁহুছিয়াছিল না কি?

বাজার দর।

সায়েস্তা খাঁ দুদিনেই দেশ সায়েস্তা করিয়া দিয়াছেন। টাকায় ৪ মণ চাউল বিকাইতেছে।

ভোটের জন্ম সর্ষপ তৈলের দর অত্যধিক চড়িয়াছে। খেঁসারি মুগের দরে এবং ভেড়া ঘোড়ার দরে বিক্রীত হইতেছে।

স্বর্গে পম্‌ফ্রেড মৎস্যের দর চড়িয়াছে।

বাজারে নূতন সরিষা ফুলের আমদানী হইয়াছে। দেখিবার জন্ম বাঙ্গালীদেরই সর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহ।

সেয়ারের বাজার।

শ্রীশ্রীঘণ্টেশ্বরী টি কোম্পানী লিমিটেডের সেয়ার ২ টাকা চড়া মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

বৈতরণী নাভিগেশন কোম্পানীর সেয়ার দশটাকা ধরাট দিয়াও লোক পাইতেছে না।

চুলো একস্‌প্যানসান ষ্টীম কোম্পানীর সেয়ার প্রায় সব বিক্রয় হইয়া গেল—৫০৲ টাকা above par.

কর্ম্মখালি।

এবার চিত্রগুপ্তের দপ্তরে বিশহাজার কর্ম্মচারী আবশ্যক। ভারতবর্ষ হইতেই শতকরা ৮০ জন লওয়া হইতেছে। Indianisation of service ওখানে একটা খেয়াল দাঁড়াইয়াছে। এক বাঙ্গলা হইতেই লওয়া হইয়াছে শতকরা ৪৯ জন। তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৭৫টী চাকুরী বাঙ্গালীর জন্ম রক্ষিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই লইয়া হিন্দু মুসলমানে এখানে বিবাদ না বাধে!

মাসিক দশটাকা ভাতায় দশজন ম্যাট্রিক পাস শিক্ষা-নবীশ আবশ্যক। গাভী পরিচর্য্যাদি সম্বন্ধে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহাদের আবেদন অধিক আদরণীয় হইবে।

মাসিক একশত টাকা বেতনে ভদ্র অন্তঃপুরে নৃত্যগীত শিখাইবার জন্ম একজন আদর্শচরিত্রা নটীর প্রয়োজন।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে দেবতার ভোগ রন্ধনের জন্ম একজন নিষ্ঠাবান বাবুর্চ্চি আবশ্যক। বেতন গুণানুসারে।

জাহাজী খবর।

মিঃ বেরিবেরি কলিকাতা বন্দরে নামিয়াছেন।

মহামায়ার ভ্রাতা, হিমগিরির পুত্র শ্রীমান মৈনাক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় সাগরে গা ঢালিয়াছেন, যেন পরজন্মে পাস করিতে পারেন।

* * * *

ডিঙ্গা মধুকর তুষার-ক্ষেত্রে ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হইতেছে।

বেহুলার মন্দাশ ফিরিয়াছে। লখিন্দর সাগর-বায়ু সেবন করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন। গাঙ্গুর নদীতে এবং চম্পাই নগরে আনন্দের উৎসব-বন্যা বহিতেছে।

বৈজয়ন্তধামের প্রমোদালয়ে পঞ্চানন্দের 'বিহারে বেঘোরে চড়িনু একা' ও পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের 'বাজে কাজে মিনুসেকে আর যেতে দিব না' নামক প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত দুখানি রেডিও বেতারে গীত হইয়াছিল। শ্রোতা দেবগণ ভক্তিভরে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আবার গঙ্গার উদ্ভব হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

সমালোচনা

ফষ্ট :—জার্ম্মাণ কবির এ পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। ইহা একটী ভোজের বিবরণ—কি কি সন্দেশ হইয়াছিল তাহারও তালিকা আছে। কথাটা ফিষ্ট। জার্ম্মাণ উচ্চারণ পৃথক।

জুলিয়াস সিজর :—সেক্সপীর-জীবনীখানি বেশ সুপাঠ্য। লেখকের হাত কাঁচা, তবে অনুশীলন করিলে উন্নতি করিবেন।

যোগদর্শন :—পতঞ্জলি। এইরূপ গাঁজাখুরী পুস্তক এ-যুগে অচল। এই ভাবে বুজরুক তৈয়ার করিলে দেশ উৎসন্নে যাইবে। ইউরোপ হইলে গ্রন্থকারকে পুড়াইয়া মারিত। চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে।

চার্ব্বাক :—ইহা একখানি তথাকথিত দর্শন। বাস্তবিক ইহা একটী ঘৃতের দোকানের পুরস্কার-রচনা। কৌশলে ইহাতে ঘৃতের কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ বলিয়া গ্রাহকগণকে প্রলোভিত করা হইয়াছে। ককোজেম, ভেজিটেবল ঘি, বাদামের তৈল প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ এক সাহিত্যিক অভিযান।

কুন্তলকণ্টক তৈল :—ইহা পুস্তক নহে, কেশ তৈল। শ্রীযুক্ত কৃতান্তমোহন কবিরাজ এই মহোপকারী তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন। একবার মাখিলে আর মাখিতে হয় না। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কেশদাম উঠিয়া গিয়া মস্তক বেশ মসৃণ করে। এই তৈলের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

বাদসাহী ভেঁপু :—তানসেন কোম্পানী ইহার নির্ম্মাতা। ইহাতে সারে গামা সাধা চলে, সাধিলে তিনদিনে কালোয়াৎ হওয়া যায়। তানসেন স্বয়ং এই ভেঁপু বাজাইয়া আকবর শাহকে মোহিত করিয়াছিলেন।

বালকরঞ্জন বিড়ি :—হেল কোম্পানী লিমিটেডের প্রস্তুত। ইহার তামাক বেশ মিঠে-কড়া,—বালকদের উপযোগী; অধিক কাসিতে হয় না। আমরা শুনিলাম, কলিকাতার সেনেট সভা ইহার প্রচারের বিরুদ্ধবাদী! হায় রে ইংরাজী শিক্ষা,—বিলাতী না হইলে কোনো জিনিষ মনে ধরে না।

সরস্বতী হুইস্কী :—আমরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি, তথাপি সাহ মহাশয়ের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি ইহার সহিত সরস্বতীর নাম সংযোগ করিয়া দীনা বাণাপাণিকে গৌরবান্বিতা করিয়াছেন। হিন্দু মাত্রেই তজ্জন্য কৃতজ্ঞ। হুইস্কী ও ব্রাণ্ডির বিজ্ঞাপন আমাদের সাময়িক পত্রগুলিকে সুশোভিত করিতেছে।

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি

জয়ন্ত :—নন্দনভিলা :—আপনার প্রবন্ধে উর্ব্বশীর নাচের যে সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ মুন্সীয়ানা আছে। আপনি সালোম নাচ প্রভৃতির যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সমজদারের উপভোগ্য। আমরা উহা আগামী সংখ্যায় ছাপিব।

বৃহস্পতি :—আপনার প্রবন্ধটী নিতান্ত অসার। উহাতে না আছে জ্ঞান, না আছে গবেষণা, না আছে ভূয়োদর্শন। এমন কি শব্দ-জ্ঞানেরও পরিচয় উহাতে নাই। আপনি বোধ হয় শিশু। 'শতংবদ মা লিখ' কথাটী স্মরণ রাখিবেন।

লুলু—হনলুলু :—আপনার অঙ্কিত চিত্রের ব্লক এদেশে কেহ প্রস্তুত করিতে পারিল না।

ভুশণ্ডি—পানেশ্বর :—ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আমরা ছাপি না। এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় পাঠাইবেন।

সমাপ্ত

প্রথম বাঙ্গালী *

(দ্বিতীয় তালিকা)

গত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন, লর্ড সিংহ।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রথম প্রেসিডেন্ট, নবাব সার সামসুল হুদা।

রেজিষ্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটী, রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর।

ইন্‌স্পেক্টার জেনারল অফ্‌ রেজিষ্ট্রেশন রায় টি, কে, ঘোষ বাহাদুর।

বড়লাটের কাউন্সিলের পার্মেনেন্ট মেম্বর স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র (অস্থায়ী)।

সৈনিক বিভাগে এরোপ্লেন ডিপার্টমেন্টে কিংস কমিশন পান মিঃ রায়।

মধ্যপ্রদেশের জুডিসিয়াল কমিশনার স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু।

একাউন্টেন্ট জেনারল, সেন্ট্রাল রেভিনিউজ মিঃ উপেন্দ্রলাল মজুমদার সি আই-ই।

বিদেশে এঞ্জিনিয়ারিংএ যশোলাভ করেন মিঃ বীরেন্দ্রকুমার দে।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ও পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় হরচন্দ্র ঘোষ (১৮৫২)।

চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট (অস্থায়ী) নবাব সৈয়দ আমীর হুসেন সি-আই-ই (১৮৯২)।

কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের জজ হরচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮)

স্মলকজ কোর্টের প্রধান জজ (অস্থায়ী) এ হাসান।

কলিকাতার করোনার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৭৭)

কলিকাতার কালেক্টর কৈলাসচন্দ্র দত্ত (১৮৫৫)

কলিকাতার ইনকমট্যাক্স কালেক্টর পি, কে, বসু (১৮৮৮)

ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল, রেজিষ্ট্রেশন নবাব সৈয়দ আমীর হুসেন (১৮৯২) (অস্থায়ী)।

কুমার গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব (১৮৯৮) (স্থায়ী)।

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৪)।

সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর (১৯০১)।

বাংলা সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী।

কলিকাতা হাইকোর্টের লিগ্যাল রিমেম্ব্রানসার বিহারীলাল গুপ্ত।

ডিরেক্টর জেনারেল অব পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস মিঃ জি, পি, রায়।

আবগারী বিভাগের কমিশনার স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই-সি-এস।

প্যারিসের ডি-লিট্ ডাঃ কালিদাস নাগ।

আমেরিকার কলেজে অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রিন্স উপাধিধারী দ্বারকানাথ ঠাকুর।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যাঃ প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ জাষ্টিস যতীশরঞ্জন দাশ।

চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ডাইরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ মিঃ ডি, সি, গুপ্ত।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভানেত্রী প্রথম বাঙ্গালী মহিলা শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী।

আইন পরীক্ষোত্তীর্ণা প্রথম বাঙ্গালী মহিলা রেজিনা গুহ।

চীন দেশ হইতে সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস্‌সি ডাঃ পি, কে, রায়।

ইংরেজী ভাষায় কবিতা লেখেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

নাইট উপাধি বর্জ্জন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালাভাষায় রেখাক্ষর প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বাঙ্গলা মাসিক পত্র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী।

---

* গত শ্রাবণ (১৩৩৩) মাসের ভারতবর্ষে "প্রথম বাঙ্গালী"র তালিকা প্রকাশিত হইবার পর শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী "প্রথম বাঙ্গালী"র দ্বিতীয় তালিকা প্রেরণ করিয়াছেন ; এবং আরও অনেকে এক একটী করিয়া তালিকা প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীমতী হিমাংশুবালার দ্বিতীয় তালিকা অবলম্বন করিয়া, এবং তৎসহ অন্যান্য তালিকায় লিখিত প্রথম বাঙ্গালীর নামগুলি যোগ বিয়োগ করিয়া একসঙ্গে এই দ্বিতীয় তালিকা প্রস্তুত হইল। অন্যান্য প্রেরকগণের নাম, যথা, স্বামী শুদ্ধানন্দ, শ্রীবিজয়কুমার বড়াল, শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস বি-এ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামানুজ কর, শ্রীবলাইচাঁদ দে, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, শ্রীভুজঙ্গভূষণ ঘোষ, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত, শ্রীবিভূতি রায় চৌধুরী প্রভৃতি।—

গত বারের তালিকায় একটী মারাত্মক ভুল ছিল। বেলুনে উঠেন প্রথম বাঙ্গালী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন।

অভিনয়োপযোগী নাটক-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার।

সংস্কৃত অভিধান-সঙ্কলয়িতা স্যার রাধাকান্ত দেব।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জগদীশনাথ রায়।

ভারতের বাহিরে কুস্তীগীর পালোয়ান যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর)।

বঙ্গভাষায় অমিত্র ছন্দ প্রবর্ত্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতার সেরিফ দিগম্বর মিত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাতে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা তরু দত্ত।

লাহোর চীফ কোর্টের জজ সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ ও অস্থায়ী প্রধান জজ সার আবদর রহিম।

বিলাতে হাই কমিশনার সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র (অস্থায়ী) ; সার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (স্থায়ী)।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ সার প্রমদারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাটনা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান জজ সার বসন্তকুমার মল্লিক।

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ আমীর আলি।

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার রাজা দুর্গাচরণ লাহা।

দেশের কাজে জেল খাটেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে-সি-এস-আই উপাধি পান সার রাধাকান্ত দেব।

এম-এ পাশ করেন প্রথম বাঙ্গালী মহিলা চন্দ্রমুখী বসু।

এফ-জেড্-এস উপাধি পান সত্যচরণ লাহা।

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পি, কে, রায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-ভাইস-চ্যান্সেলার যদুনাথ সরকার।

ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্ণর হৃষীকেশ লাহা।

বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহের আন্দোলনকারী রাজা রাজবল্লভ।

বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রথম বাঙ্গালী কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয়)।

বিলাত যাত্রা করেন রামমোহন রায়।

ষ্টাটুটারী সিবিলিয়ান সূর্য্যকুমার অগস্তি।

বিলাতে ডাক্তারী পাশ করেন গুডিভ চক্রবর্ত্তী।

সখের সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করেন ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

London Universal Races Congressএর সভাপতি আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে, International Laws and Politicsএ পিএইচ্-ডি তারকনাথ দাস।

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের জজ স্যর আশুতোষ চৌধুরী।

Meteorological officer প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

রুড়্কী এঞ্জিনিয়ারীং কলেজের পাশ করা এঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র।

ধাত্রী বিদ্যায় পাশ্চাত্য জগতকে চমৎকৃত করেন—ডাঃ কেদার দাস।

বড় লাটের কাউন্সিলের আইন সদস্য স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

ডক্টর অব্ সায়ান্স উপাধি পান অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বার্লিনের ডি-এস্‌সি প্রথম বাঙ্গালী মহিলা—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।

শিক্ষাবিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টার ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বিদেশে মিউজিক ডক্টর উপাধি অর্জ্জন এবং ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার করেন দিলীপকুমার রায়।

উচ্চ শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনীর সভাপতি কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়।

ওয়াশিংটন লেবার কনফারেন্সে প্রতিনিধি স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইম্পীরিয়াল কনফারেন্স ও লীগ অব নেশন্‌সে প্রতিনিধি লর্ড সিংহ

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভাইস প্রেসিডেণ্ট স্যার কে, জি, গুপ্ত

ইম্পীরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে প্রতিনিধি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটক উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বভারতীর প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উদ্ভিদে জীবনের অস্তিত্ব প্রমাণকারী স্যার জগদীশ বসু।

প্রতীচ্য বিজ্ঞানে বিশেষ নিয়মের আবিষ্কর্তা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও বাঙ্গলার (অস্থায়ী) ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব সিবিল হস্পিট্যালস ডাক্তার আর, সি, চন্দ্র আই-এম-এস।

বিলাতী এম-ডি ডাক্তার ভোলানাথ বসু।

ইন্টারন্যাসন্যাল্ ফিলজফিক্ কংগ্রেসে প্রতিনিধি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

আই-এম-এস্'এ প্রথম বাঙ্গালী রসিকলাল দত্ত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সরকারী সভাপতি (অস্থায়ী) গোপাললাল মিত্র।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বেসরকারী সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নবাব নবাবআলি চৌধুরী ও স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার্ জি, এন্, চক্রবর্ত্তী।

দেশীয় রাজ্যে বিখ্যাত মন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

বাংলা ভাষার সর্ট্‌হ্যাণ্ডের প্রবর্ত্তক দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।

লণ্ডনের রয়েল ইকনমিক সোসাইটির সদস্য—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়াল ঐতিহাসিক সোসাইটির সদস্য—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

চিতোর

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এ

রাত্রি ১০ টার সময় আজমীর হইতে ট্রেণ ছাড়িল। সকালে ৬টার সময় চিতোরগড় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া দুইটি টাঙ্গা ভাড়া করিলাম এবং চিতোরগড় পাহাড় অভিমুখে চলিলাম। ষ্টেশনের নিকট ডাক-বাঙ্গলো, কয়েকটি দোকানঘর এবং একটি পুলিসের থানা আছে। থানা হইতে গড় দেখিবার জন্য অনুমতি-পত্র (pass) পাইলাম। দুইটি টাঙ্গার জন্য ।০ আনা করিয়া ॥০ মাত্র লাগিল। তাহার পর প্রান্তরের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। পলাশ-বৃক্ষের পত্রহীন শাখাগুলি লাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। অদূরে পূর্ব্বগগনে চিতোর পাহাড় দেখা যাইতেছিল। পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে মন্দির বা প্রাসাদ-শীর্ষ দেখা যাইতেছিল। আমাদের পথ কিছুদূর পর্য্যন্ত উত্তর দিকে গিয়া তাহার পর পূর্ব্বদিকে চলিল। একটি ক্ষুদ্র নদী পার হইলাম। নদীর নাম গমেরা। কোথাও বালুকাময় নদী-সৈকতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও নদীর কাল জলে তীরস্থ বৃক্ষ-রাজির এবং নীল আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। রাজপুত রমণীগণ কলসীকক্ষে নদীতে জল আনিতে যাইতেছিল। পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি বড় গ্রাম। গ্রামের নাম তলহাটি। গ্রামটি চারিদিকে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। দ্বারপথে একজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া ছিল। আমাদের পাশ দেখিয়া সে যাইতে দিল। দুই পাশে দোকান, মধ্যে পথ। একটি সীতারামের মন্দির ও ডাকঘর দেখিলাম। অবশেষে আমরা পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি বৃহৎ দরজা পাহাড়ে উঠিবার পথ রক্ষা করিতেছিল। দরজার প্রকাণ্ড কপাট বহুসংখ্যক লৌহ-শলাকা দ্বারা রক্ষিত। হাতী যাহাতে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য ধাক্কা দিতে না পারে সেজন্য এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। দরজার বাহিরে পাহাড় অত্যন্ত খাড়া। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পাথর। পাহাড়ের নিম্নভাগ জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলে হরিণ, বাঘ, এমন কি পূর্ব্বে সিংহও থাকিত। পাহাড়ে উঠিবার পথটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের উপরিভাগে কাঙ্গড়া (battlement)। পথটি দুইবার ফিরিয়া ইংরাজী z অক্ষরের আকারে উপরে উঠিয়াছে; এবং পাহাড়ের উপরিভাগ সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত করিয়া যে প্রাচীর আছে সেইখানে গিয়া শেষ হইয়াছে। প্রাচীর এবং কাঙ্গড়া সম্প্রতি মেরামত করা হইয়াছে। কাঙ্গড়াগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। রাজপুত কবিগণ এই কাঙ্গড়া-সমলঙ্কৃত প্রাচীরকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুকুট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দূর হইতে ইহা মুকুটের মতই দেখায়। ফটক পার হইয়া আমরা পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। পথের একপাশে প্রাচীর, অপর পাশে পাহাড়; পাহাড়ের উপর ধাও গাছের জঙ্গল। প্রাচীরে সংলগ্ন একটি প্রস্তর-বদ্ধ বিস্তৃত উচ্চ পথ রহিয়াছে। দুর্গ রক্ষা করিবার সময় সৈনিকগণ এই পথে চলাফেরা করিত এবং প্রাচীর-নিহিত অন্তরালের মধ্য দিয়া শত্রুদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত বা অস্ত্র নিক্ষেপ করিত। পাহাড়ে উঠিবার সময় মাঝে মাঝে প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী দেখিতে পাইলাম। বেদীর উপর সুন্দর কারুকার্য্য। এগুলি ইতিহাসের অতীত ঘটনার স্মৃতি-চিহ্ন। আমরা একে একে সাতটি সুদৃঢ় দরজা পার হইলাম। তাহাদের নাম পটলপোল, ভৈরবপোল, হনুমানপোল, গণেশপোল, জোড়লাপোল, লক্ষ্মণপোল ও রামপোল। পথটি প্রায় একমাইল দীর্ঘ। চিতোরগড়ে প্রবেশ করিবার ইহাই সর্ব্বপ্রধান পথ। ইহা পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিবার ইহা ছাড়া আরও দুইটি পথ আছে। একটি পূর্ব্বদিকে, অপরটি উত্তর দিকে। রামপোলের নিকটেই দরিখানা; বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রাজপুত সর্দ্দারগণ এখানে মিলিত হইতেন। প্রবাদ এই যে, আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পূর্ব্বে এখানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়া রাণাকে বলিয়াছিলেন "ম্যা ভুঁখা হুঁ" (আমার ক্ষুধা পাইয়াছে)।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চিতোর পাহাড়ের উপরি-

ভাগ প্রায় সমতল। ইহা প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ এবং আধ মাইল প্রস্থ। পাহাড়ের উপর ভাল রাস্তা আছে। তাহাতে গাড়ী চলে। আমরা পাহাড়ে উঠিয়া একজন পথ-প্রদর্শক লইলাম। লোকটি জাতিতে হিন্দু দর্জ্জি। পাহাড়ের অধিকাংশ ভগ্নস্তূপে সমাচ্ছন্ন। কয়েকখণ্ড জমিতে চাষ হয় দেখিলাম। পথে একটি ক্ষুদ্র দেবীর মন্দির রহিয়াছে। দেবীর নাম তুলজা ভবানী। মন্দির পার হইয়া আমরা গোমুখী গঙ্গা নামক স্থানে চলিলাম। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, মীরাবাঈয়ের মন্দির, উদয়পুরের রাণার নূতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে গাড়ী হইতে নামিয়া দুইচারি মিনিট ভগ্ন গৃহ এবং দেবালয়ের পাশ দিয়া চলিয়া আমরা নীচে নামিবার প্রশস্ত সুগঠিত সোপানশ্রেণী পাইলাম। সোপানশ্রেণী সম্প্রতি সুন্দর ভাবে মেরামত করা হইয়াছে। উদয়পুরের আধুনিক রাণাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিবার এই চেষ্টা প্রশংসার্হ। সিঁড়ি দিয়া কিছুদূর নামিয়া আমরা একটি কুণ্ড বা ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিতে পাইলাম। কুণ্ডটি খুব প্রাচীন। ইহার জল কিয়ৎ পরিমাণে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটি পাহাড়ের এক প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে দুর্গ-প্রাচীর। কুণ্ডটির পূর্ব্বদিকে একটি শিবালয় আছে। শিবালয়ের মধ্যে একটি ছোট ঝরণা আছে। ঝরণার জল অতি পরিষ্কার এবং পান করিবার উপযোগী। এই জল কুণ্ডের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এখানে একটি সুড়ঙ্গের মুখ আছে। এই সুড়ঙ্গ না কি এখান হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই শিবালয়ের উপর একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। তাহার মধ্যে আমরা জিনিষপত্র রাখিলাম এবং নিকটে একটি উন্মুক্ত স্থলে বৃক্ষতলে রাঁধিবার উদ্যোগ করিলাম। পাচক ও ভৃত্যকে এখানে রাখিয়া আমরা শীঘ্র দর্শনীয় স্থান সকল দেখিতে চলিলাম; কারণ, ক্রমশঃ রৌদ্রের তেজ প্রখর হইতেছিল। এখান হইতে গাড়ী করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। পশ্চিমে পুত্ত ও জয়মল্লের বাসভবন দেখিতে পাইলাম। নিকটে একটি সরোবর দেখাইয়া পথ-প্রদর্শক বলিল, ইহা সূর্য্যকুণ্ড,—আকবরের সহিত যুদ্ধের সময় এখান হইতে প্রত্যহ যোদ্ধৃবর্গ সহিত রথ নির্গত হইত। অবশেষে মুসলমানগণ গোরক্ত দ্বারা ইহা অপবিত্র করিয়া দিল। তাহার পর আর রথ বা যোদ্ধা উঠিল না। টডের রাজস্থানে কিন্তু উল্লেখ আছে যে, মেওয়ারের রাণাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাসস্থান গুজরাটের নিকটবর্ত্তী বল্লভীপুরে একটি সূর্য্যকুণ্ড ছিল; এবং বল্লভীপুর যখন বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়, সেই সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সূর্য্যকুণ্ডের নিকটে আরও দুই একটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ পাহাড়ের উপর ৩২টি পুষ্করিণী এবং একটি ঝরণা আছে। এ কারণ পাহাড়ের উপর জলকষ্ট হইত না। সূর্য্যকুণ্ড পার হইয়া একটি মন্দিরের নিকট আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। মন্দির-প্রাঙ্গণটি পথ হইতে খুব উচ্চ; অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। শুনিলাম, ইহা কালীর মন্দির। বিগ্রহটি সাদা পাথরের। কেবল মুখটি দেখা যায়, অবশিষ্টাংশ লাল কাপড় দিয়া ঘেরা। মূল মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। চারি সারি স্তম্ভের উপর নাটমন্দিরের ছাদটি অবস্থিত। মন্দিরে পুরোহিত আছেন, এখনও পূজা হয়। (১) কালীর মন্দির দেখিয়া আমরা পদ্মিনীর প্রাসাদ দেখিতে চলিলাম। কালীর মন্দির এবং পদ্মিনীর প্রাসাদের মধ্যে বীরবর চণ্ডের স্মৃতি-মন্দির ("Vaulted cenotaph of Chonda") আছে বলিয়া টড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের ইহা দেখা হয় নাই। পদ্মিনীর প্রাসাদটি এখনও সম্পূর্ণ অভগ্ন এবং ব্যবহার-যোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে যখন আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, তখন চিতোরের সকল গৃহ এবং দেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন - কেবল পদ্মিনীর প্রাসাদ ভাঙ্গেন নাই (২)। পদ্মিনীর

(১) The shrine of Kalika Devi esteemed one of the most ancient of Chitor, existing since the time of the Mori, the dynasty prior to the Gubilot—(Tod's Rajasthan). Erskine সাহেবের মতে ইহা পূর্ব্বে সূর্য্যের মন্দির ছিল।

(2) Alla remained in Chitor some days admiring the grandeur of his conquest; and having committed every act of barbarity and wanton dilapidation which a bigotted zeal could suggest, overthrowing the temples and other monuments of art, he delivered the city in charge to Maldeo, the chief of Jhalor whom he had conquered and enrolled amongst his vassals. The palace of Bheem and the fair Padmini alone appears to have escaped the wrath of Alla.—Tod's Rajasthan, p. 222.

সময় প্রাসাদের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার পর কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। চিতোরে উদয়পুরের রাণার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে রাণারা চিতোরে আসিলে পদ্মিনীর প্রাসাদেই বাস করিতেন। এজন্য প্রাসাদটি সম্পূর্ণ বাসযোগ্য অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। এখানে কিছু কিছু আসবাবও আছে। প্রাসাদটি একতলা এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র মহলে বিভক্ত। প্রত্যেক মহল চারিধারে উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। এক একটি মহলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের পাশে কয়েকটি করিয়া ঘর। কোন মহলে বৈঠকখানা, কোনটিতে বসিবার ও শুইবার ঘর, বা পূজার ঘর। ঘরগুলি আকারে ছোট। একটি ঘরে একটি বৃহৎ আয়না একটি টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার দেখিলাম। মনে পড়িল সেই আয়নার কথা, যাহার মধ্যে আল্লাউদ্দিনকে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখান হইয়াছিল। প্রাসাদের পার্শ্বেই জলাশয়। জলাশয় গভীর, বহু নিম্নে সামান্য জল রহিয়াছে দেখা গেল। জল ধরিয়া রাখিবার যখন বন্দোবস্ত ছিল, তখন জলাশয়টি প্রচুর জলে পূর্ণ থাকিত বোধ হইল (৩)। অদূরে জলাশয়ের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম (৪)। শুনিলাম, জলাশয় যখন জলপূর্ণ থাকিত, তখন উভয় প্রাসাদের মধ্যে নৌকা চলিত।

পদ্মিনীর প্রাসাদ চিতোরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পর আর বড় একটা ঘরবাড়ী বা তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। (৫) স্থানটি কতকটা সহরতলির (Suburb) এর মত। পদ্মিনীর প্রাসাদে দাঁড়াইয়া পদ্মিনীর কাহিনী মনে হইল। দীর্ঘ অবরোধের পরও চিতোর অধিকার করিতে না পারিয়া আলাউদ্দিন প্রথমে বলিলেন, পদ্মিনীকে পাইলেই তিনি চলিয়া যাইবেন; শেষে বলিলেন, পদ্মিনীকে একবার দেখিতে পাইলেও তিনি চলিয়া যাইতে প্রস্তুত।

আল্লাকে বলা হইল, আয়নার মধ্যে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখান হইবে। আল্লা তাহাতেই রাজি হইলেন। চিতোর প্রবেশ করিয়া পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া আল্লা ফিরিয়া যাইতেছিলেন, ভীমসিং ভদ্রতা করিয়া আল্লার সহিত পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে আগাইয়া দিতে গেলেন। কিন্তু তিনি যখন দুর্গের বাহিরে গেলেন, অমনি আল্লা ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন। আল্লা বলিয়া পাঠাইলেন পদ্মিনীকে পাইলে ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পদ্মিনী তাঁহার পিতৃব্য গোরা এবং ভ্রাতা বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আল্লার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার সহিত ৭০০ শিবিকায় সখীরা যাইবে। এই ৭০০ শিবিকা যখন মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হইল, তখন প্রস্তাবমত ভীমসিং চিতোর অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আল্লা তাঁহাকেও ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই ৭০০ শিবিকা হইতে ৭০০ যোদ্ধা বাহির হইল। শিবিকার ২৮০০ বাহকেরাও যোদ্ধবেশ ধারণ করিল। বাদল ও গোরার নেতৃত্বে এই ৩৫০০ রাজপুত অলৌকিক বীরত্ব সহকারে অগণিত মুসলমান সেনার সহিত যুদ্ধ করিল। ভীমসিংহ এই অবসরে ক্ষিপ্র গতিতে অশ্বারোহণে চিতোর প্রবেশ করিলেন। রাশি রাশি মুসলমান নিহত করিয়া রাজপুতগণ প্রায় প্রত্যেকে প্রাণত্যাগ করিল। গোরা মারা গেল। রক্তাক্ত দেহে বাদল ফিরিয়া আসিল। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীর সকল মারা গেল। আল্লা বিফল-মনোরথ হইয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আল্লা চিতোরের সম্মুখে আবার দেখা দিলেন। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরগণ পূর্ব্বের যুদ্ধে মারা গিয়াছিল। এবার চিতোর রক্ষা করা দুর্ঘট হইল। পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের কিয়দংশ আল্লা অধিকার করিয়াছিলেন। রাত্রে দুশ্চিন্তায় রাণা লক্ষ্মণ সিংহের নিদ্রা হয় নাই। এমন সময় চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেখা দিলেন, বলিলেন, "মাঁ, ভুখা হুঁ" (আমার ক্ষুধা পাইয়াছে)। রাণা বলিলেন, "রাক্ষসি, আমার ৮০০০ জ্ঞাতি

(৩) Todএর "রাজস্থানে' পদ্মিনীর প্রাসাদের যে চিত্র আছে তাহাতে দেখা যায়, সরোবর জলপূর্ণ রহিয়াছে।

(৪) আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, জলাশয়ের মধ্যের প্রাসাদও পদ্মিনীর প্রাসাদ। Tod সাহেবের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, ইহা চিতোরের প্রাচীন পুয়ারবংশীয় রাজা চিত্রং মোরির প্রাসাদ।

(৫) Tod লিখিয়াছেন যে, পদ্মিনীর প্রাসাদের দক্ষিণে একটি পাথরের দেওয়াল ঘেরা স্থান আছে। এখানে কুম্ভ মালবরাজকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চিতোর পাহাড়ের নিকটেই দক্ষিণে (১৫০ গজ দূরে) আর একটি পাহাড় আছে। তাহার নাম চিতোরী। এই পাহাড়ের উপর হইতে আল্লা চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, আল্লা যখন ১২ বৎসর ধরিয়া চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন মাটি ফেলিয়া এই পাহাড় বা ঢিপি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

খাইয়াছ, এখনও ক্ষুধা মিটে নাই ?" দেবী বলিলেন, "আমি রাজবলি চাই। মুকুটপরা ১২ জন প্রাণ না দিলে চিতোর আর তোমাদের হাতে থাকিবে না।" রাণার ১২ জন পুত্র। সকলেই আগে প্রাণ দিতে উৎসুক হইল। একে একে ১১ জন গেল, প্রত্যেককে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল, রাজদণ্ড হাতে দেওয়া হইল, মাথায় ছত্র ধরা হইল, চামর দোলান হইল। তিন দিন সে রাজা রহিল। চতুর্থ দিনে দুর্গের বাহিরে গিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিল। যখন একে একে ১১ রাজপুত্র এইভাবে প্রাণ দিল তখন অবশিষ্ট পুত্রকে রাজা জোর করিয়া যাইতে দিলেন না,—তাহাকে সুড়ঙ্গ পথে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর জহর ব্রত হইল,—সহস্র সহস্র রাজপুত রমণী একজনের পর একজন প্রজ্বলিত অনলে প্রাণ আহুতি দিলেন। সকলের শেষে পদ্মিনী। তাহার পর দুর্গের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। রাজপুতগণ শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল, রাণাও প্রাণ দিলেন। আল্লা চিতোর অধিকার করিলেন। এই প্রথম চিতোর ধ্বংস।

পদ্মিনার প্রাসাদ দেখিয়া পুত্তের প্রাসাদ দেখিলাম। আকবর যখন চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন, ভীরু রাণা উদয় সিং তখন কোন ছলে চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন চিতোর রক্ষা করিবার ভার প্রথমে লইলেন চন্দাবৎবংশীয় সহিদাস। সূর্য্যপোল নামক পূর্ব্ব দ্বারে যুদ্ধ করিতে করিতে ইনি প্রাণ দিলেন। তখন নেতা হইলেন পুত্ত। পুত্তের বয়স তখন ১৬। পুত্তের পিতা পূর্ব্বেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। পুত্ত মাতার একমাত্র তনয়। বীরমাতা পুত্রকে গৈরিক বস্ত্র পরাইয়া চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে অনুমতি করিলেন; নিজেও অস্ত্রধারণ করিয়া প্রস্তুত হইলেন। শুধু তাহাই নহে; পুত্তের বালিকা বধূর হস্তে বর্শা দিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। রাজপুতগণ দেখিল পুত্ত, তাহার মাতা ও পত্নী সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পণ করিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিস্ময়জনক ঘটনা আর না পাইয়া Tod লিখিয়াছেন—

Like the Spartan mother of old she commanded him to put on the 'sapprон robe' and to die for Cheetore; but surpassing the Grecian dame she illustrated her precept by example and any soft compunctions visiting for one dearer than herself might dim the lustre of Kailwa she armed the young bride with a lance, with her descended the rock, and the dependants of Cheetore saw her fall, fighting by the side of her Amazonian mother (Annals of Mewar, p. 266.)

পুত্তের মৃত্যুর পর নেতা হইল রাঠের বীর জয়মল্ল। দুর্গ-প্রাচারের উপর সেনা-সমাবেশ করিবার সময় জয়মল্লের গায়ে একটী গোলা লাগিল। দূর হইতে শত্রুর গোলার আঘাতে মরিতে হইবে এই চিন্তা জয়মল্লের অসহ্য হইল। আবার জহর ব্রত করিয়া রাজপুত রমণীগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর অবশিষ্ট ৮০০০ রাজপুত দুর্গদ্বার খুলিয়া সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ করিল (৬)। নয়টি রাণী, পাঁচটি রাজকন্যা, দুইটি শিশু এবং যাবতীয় সর্দ্দারদের পরিবারবর্গ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, নয় অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিল। মন্দির এবং প্রাসাদ ধ্বংস বিষয়ে আকবর আলাউদ্দিন, অপেক্ষা কম বর্ব্বরতার পরিচয় দেন নাই। Tod বলিয়াছেন, The third sack of Cheetore was marked by the most illiterate atrocity, for every monument spared by Alla or Bayazeed was defaced, which has left an indelible stain on Akbar's name as a lover of the arts, as well as of humanity.

চিতোরের রাজচিহ্ন সকল বিলুপ্ত করিবার জন্য আকবর অশোভন ব্যগ্রতা দেখাইলেন। রাণাদের চিতোর প্রবেশ বা চিতোর ত্যাগ করিবার সময় বৃহৎ নাকাড়া (drums) ধ্বনিত হইত, চারিদিকে কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত সে শব্দ শোনা যাইত,—আকবর সেগুলি লইয়া গেলেন। এগুলির ব্যাস ৮।১০ ফিট হইবে। দেবীর মন্দির হইতে ঝাড়লণ্ঠন লইয়া গেলেন; দরজা দুইটিও উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

---

(৬) চিতোর দুর্গে উঠিবার পথে হনুমানপোলের নিকট একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-বেদী আছে। এখানে জয়মল্ল মারা গিয়াছিলেন। নিকটে আর একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাহার উপর বর্শাহস্তে একটি অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এইখানে পুত্ত নিহত হন। নিকটে রঘুদেবেরও একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। রঘুদেব চণ্ডের ভ্রাতা। ইনি ঘাতকহস্তে নিহত হইয়াছিলেন; রাজপুতরা ইঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করে

পুত্তের প্রাসাদটি দুই তিনটি মহলে বিভক্ত। কোনটি বহির্ব্বাটী, কোনটি অন্তঃপুর। বাটীটি রাজপথ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। বাটীটি এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা ত্রিতল ছিল বলিয়া বোধ হইল। একটি কক্ষে একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পুত্তজির বিগ্রহরূপে পূজিত হয়। রাজপুতগণ সিন্দুর মাথাইয়া মূর্ত্তিটি রক্তবর্ণে পরিণত করিয়াছে। পাশে আর একটি কক্ষে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তিও পূজিত হয়। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, উহা কঙ্কালী মাতার মূর্ত্তি। আমার মনে হইল, উহা পুত্তজির মাতার মূর্ত্তি হইতে পারে। পুত্তজির প্রাসাদের নিকটে দুর্গ-প্রাচীরের পার্শ্বেই জয়মল্লের গৃহ। আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিল, পুত্তজি জয়মল্লের ভগিনীপতি ছিলেন। Tod লিখিয়াছেন—

The names of Jeimul and Putta are, as household words, inseparable in Mewar and will be honoured while the Rajpoot retains a shred of his irhertance or a spark of his ancient recollections.

জয়মল্লের বীরত্ব সম্বন্ধে Tod লিখিয়াছেন—

"Abul Fazl, Herbert, the Chaplain to Sir T. Roe, Bernier all honoured the name of Jeimul."

যে গুলিতে জয়মল্ল মারা যান, আকবর বলেন, তিনি নিজে সে গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন। আকবর সে বন্দুকের নাম দিয়াছিলেন 'সিংগ্রাম'। আকবর পুত্ত এবং জয়মল্লের বীরত্বের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাসাদের দ্বারদেশে হস্তীর উপর উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। Bernier ১০০ বৎসর পরে আসিয়া এই মূর্ত্তি দুইটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"These two great elephants, together with the two resolute men sitting on them do at the first entrance into this fortress make an impression of I know not what greatness and awful terror."

ইহা উদ্ধৃত করিয়া Tod বলিয়াছেন—

Such was the impression made on a Parisian, a century after the event; but far more powerful the charm to the author of these annals, as he pondered on the spot where Jeimul received the fatal shot from the Singram, or placed flowers on the cenotaph that marks the fall of the son of Chonda (সহিদাস) and the mansion of Putta whence issued the Seesodia matron and her daughteer. Every foot of ground is hallowed by ancient recollecetions.

যুদ্ধক্ষেত্রে যত রাজপুত প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, আকবর না কি তাহাদের যজ্ঞোপবীত একত্র করিয়া ওজন করিয়া দেখিয়াছিলেন ৭৪½ মান হইয়াছিল। চার সেরে এক মান হয়। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া চিঠির উপর ৭৪½ লিখিয়া দিলে এখনও লোকে তাহা খুলিতে ভয় পায়,—চিঠি খুলিলে চিতোর-ধ্বংসের সময় যত রাজপুত মারা গিয়াছিল, ততগুলি রাজপুত-হত্যার পাপ স্পর্শ করিবে।

আকবর চিতোর অধিকার করিয়া যে ধ্বংস করিয়াছিলেন, সে ধ্বংসের আর কখনও পূরণ হয় নাই।

পুত্ত এবং জয়মল্লের বাড়ী দেখিয়া আমরা আবার গাড়ী করিয়া চলিলাম। বহু দূর পর্য্যন্ত পুত্তর প্রাসাদ এবং তাহার ঝরোকাগুলি আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এখান হইতে আমরা দুর্গের পূর্ব দ্বার দেখিতে গেলাম। রাণার নূতন প্রাসাদের পাশ দিয়া চলিলাম। নূতন প্রাসাদটি বেশ বড়; সমস্তটি চুণকাম করা। চিতোরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে অনেক শিকার পাওয়া যায়। রাণা শিকার খেলিবার জন্য প্রায়ই উদয়পুর হইতে আসেন এবং এই প্রাসাদে থাকেন। পূর্বদ্বারের নিকট নীলকণ্ঠের মন্দির (৭) দেখিলাম। মন্দির মধ্যে সুবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ ও বেদী রহিয়াছে। পূজারী আমাদিগকে মিশ্রির প্রসাদ দিলেন। এই মন্দির দেখিয়া আমরা পূর্বদিকের দরজা দেখিতে গেলাম। আকবরের চিতোর আক্রমণের সময় এখানে সহিদাস দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। একটি প্রস্তরময় বেদী সেই ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। সূর্য্যপোলটিও খুব বড়। এখান হইতে একটি পথ পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন এখানে সংস্কার কার্য্য হইতেছিল।

সূর্য্যপোল দেখিয়া ফিরিবার সময় আমরা একটি জৈন মন্দির এবং স্তম্ভ দেখিলাম। মন্দির এবং স্তম্ভের চারিধারে বহুসংখ্যক পাথরের মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। স্তম্ভটি রাণা

(৭) এই মন্দিরটি Tod কুক্কুরেশ্বর মহাদেবের মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হইল। রাণা কুম্ভ ইহা নিমাণ করিয়াছিলেন।

কুম্ভের জয়স্তম্ভের অনুরূপ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট। এই স্তম্ভটির নাম খোয়াসিন স্তম্ভ। ইহা ৭৫ ফিট উচ্চ। Tod সাহেব এখানে ৮৯৬ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাইয়াছিলেন। এই মন্দির এবং স্তম্ভ জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের নামে উৎসর্গ হইয়াছিল।

এখান হইতে আমরা প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। ইহা লখ রাণার প্রাসাদ নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন রাণা রায়মল্ল ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রাসাদটি সুবিস্তৃত। ইহা দুই তিন তলা উচ্চ ছিল; এক্ষণে অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে কোন প্রাচীর বা প্রকোষ্ঠের অভগ্ন অংশ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রাসাদের চারিদিকে প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের মধ্যে দেবজীর মন্দির। এই দেবজী ভোজ নামে একজন চৌহানবংশীয় রাজপুত যোদ্ধা ছিলেন। রাজপুতগণ ইহাকে অবতার বলিয়া মনে করেন। ইনি না কি রাণা সঙ্গকে একটি কবচ দিয়াছিলেন। ঐ কবচের প্রভাবে রাণা সঙ্গ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। একজন আধুনিক রাণা প্রাচীন প্রাসাদটি পুনঃ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংস্কার কার্য্য কিয়দ্দূর মাত্র করিয়াই উহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে এই প্রাসাদ হইতে গোমুখী গঙ্গা পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাড়ীর মেয়েরা সেই পথে স্নান করিতে যাইতেন। এই সুড়ঙ্গের মুখ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আলাউদ্দিন যখন চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, তখন পদ্মিনী এবং অন্য সকল রাজপুত রমণী এইখানে জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের পথ-প্রদর্শক আমাদিগকে বলিয়াছিল। কিন্তু Tod বলিয়াছেন যে, গোমুখী গঙ্গার নিকট সুড়ঙ্গের মধ্যে আল্লাউদ্দীনের সময় জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিল, আকবরের সময় যে জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা গোমুখী গঙ্গার নিকট অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শুনিলাম, এখন সুড়ঙ্গের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাসাদের বাহিরে একটি ছাদযুক্ত বেদী আছে। এখানে না কি রাণাদের মেয়েদের বিবাহ হইত। ইহা পার হইয়া আমরা এক প্রাচীর-বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম নওলক্ষা ভাণ্ডার। নওলক্ষা ভাণ্ডারে রাজকোষ থাকিত এইরূপ অনুমান হয়। কেহ কেহ বলেন, বনবীর যখন চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন এখানে বাস করিতেন।

তাহার এক পার্শ্বে একটি গৃহে অনেক তোপ আছে। তাহার নাম তোপখানা। ইহার নিকটেই ভামশা মন্ত্রীর বাড়ী। রাণা প্রতাপসিংহ যখন নিরাশ হইয়া মেওয়ার পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন এই ভামশা তাঁহার পিতৃপুরুষ-সঞ্চিত বহু অর্থ প্রতাপের নিকট স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

নওলক্ষা ভাণ্ডারের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি মন্দির আছে। তাহার নাম শিঙ্গারচৌরী। ইহা একটি জৈন মন্দির। ১৪৪৮ খৃঃ কুম্ভ রাণার কোষাধ্যক্ষের পুত্র ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বেলা অধিক হইয়াছিল। আমরা এখান হইতে গোমুখী গঙ্গার নিকট চলিলাম। সেখানে ঝরণার জলে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল। আহার্য্যও প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা ভোজন সমাধা করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম।

আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন এই গোমুখী গঙ্গার ধারে জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে হইল, ইহা একটি পবিত্র তীর্থ। যে স্থানের সহিত কোন পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত আছে, যেখানে আসিলে মন পবিত্র হয়, তাহাই তীর্থ। আপনি একবার এখানে আসিয়া বসুন, সেই জহর-ব্রতের কথা স্মরণ করুন,—দেখুন, মন পবিত্র হয় কি না। একবার মানস-নেত্রে চাহিয়া দেখুন—ঐ সহস্র সহস্র রাজপুত রমণী শ্রেণী বাঁধিয়া একটির পর একটি আসিতেছে, ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে একটির পর একটি প্রবেশ করিতেছে! কি সুন্দর সুললিত রূপ, মুখে কি পবিত্র ভাব। ঐ দেখুন, সুন্দর, কোমল দেহখানি ভস্মরাশিতে পরিণত হইল! একটি নয়, দশটি নয়, একশত নয়, সহস্রের পর সহস্র। ঐ মাটির যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেই ভস্ম এখনও পাওয়া যাইত; মন্দিরের দেওয়ালে, দুর্গ-প্রাচীরের গাত্রে সেই ধূমকণা এখনও লগ্ন হইয়া আছে। একবার এখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করুন—সুখ বড়, না, ধর্ম্ম বড়? ভোগ বড়, না, ত্যাগ বড়?

জীবন বড়, না, মৃত্যু বড়? জীবনের সুখভোগ সকলই ফুরাইয়া যাইবে, কিন্তু মহত্ত্বের কথা, ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গের কথা চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

আমরা এখানে বসিয়া সম্মুখের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার মধ্য দিয়া চিতোর হইতে উদয়পুরের রেলওয়ে লাইন প্রসারিত রহিয়াছে। ঐখানে আকবরের উর্দ্দু বা শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। পণ্ডৌলি হইতে বুশি পর্য্যন্ত প্রায় দশ মাইল ইহা বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সৈন্যের বিরুদ্ধে কয়েক সহস্র মাত্র রাজপুত সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যদি মুখের কথা একবার মাত্র বলে—"আকবর, আমরা তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিতেছি" তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকে না, আকবর সৈন্য লইয়া দিল্লী ফিরিয়া যান, রাজপুতরা স্ত্রী-পুত্র লইয়া জীবনের সকল সুখ ভোগ করিতে পারে। কিন্তু রাজপুতরা স্থির করিয়াছিল, কিছুতেই ঐ কয়টি কথা বলা হইবে না। জীবনের সকল সুখ চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়, তাও স্বীকার; প্রাণ যায়, তা'ও স্বীকার; প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্ত্রী ও কন্যাবা স্তন্যপায়ী শিশু ক্রোড়ে করিয়া, আগুনে পুড়িয়া মরে, তা'ও স্বীকার। আকবর কিছুতেই ইহাদিগকে এই কয়টি কথা বলাইতে পারিলেন না। রাগ করিয়া তিনি ঘরবাড়ী মন্দির ভাঙ্গিয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। ইতিহাস লেখে, রাজপুতরা হারিয়া গেল; আকবর জিতিলেন। আমরা ত দেখি,—আকবর হারিলেন; রাজপুতরা জিতিল। আকবর চাহিয়াছিলেন, রাজপুতদিগকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করাইবেন। তি'ন তাহা পারেন নাই। রাজপুতরা বলিয়াছিল, কিছুতেই আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করিব না। একজন রাজপুতও বাঁচিয়া থাকিতে, মোগলকে চিতোরে ঢুকিতে দিব না; রাজপুতরা তাহাদের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিয়াছিল। তাহারা মরিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা ত প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, তাহাবা চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। আকবরও ত এক দিন মরিয়াছিলেন।

তাই বলি, চিতোর হিন্দুর মহাতীর্থ। হিন্দু একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াও, অতীতের কথা স্মরণ কর। তাহার পর জিজ্ঞাসা কর, সংসারের সুখ-দুঃখকে তোমার ধর্ম্মের পথে, তোমার কর্ত্তব্যের পথে বাধা দিতে দিবে কি? তুমি দুর্ব্বল হইতে পার, তুমি দরিদ্র হইতে পার; কিন্তু তুমি যদি ধর্ম্মকে, কর্ত্তব্যকে সকলের উপর তুলিয়া ধর, তাহা হইলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পার।

চৈত্রের অপরাহ্ণের ঈষৎ তপ্ত বাতাস সম্মুখের আম্র-বৃক্ষের পত্র এবং পুষ্প কাঁপাইয়া, কুণ্ডের জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তুলিয়া অনবরত উদাস ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। মনের মধ্যে কেবল সেই গানের পদগুলি জাগিতেছিল—

দেখরে জগৎ মেলিয়ে নয়ন,
দেখরে চন্দ্রমা দেখরে গগন,
স্বর্গ হতে সবে দেখ দেবগণ,
জলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন তোরাও দেখরে,
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে।

গোমুখ গঙ্গার পাশে একটি কক্ষে কয়েকটি মূর্ত্তি পূজিত হয়। দুইটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মধ্যে উপবিষ্ট ধ্যানী মূর্ত্তি। অপর একটি মূর্ত্তি একটি সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কক্ষের এক পার্শ্বে দেওয়ালের গায়ে একটি রমণী-মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিতে কেবল মুখ ও বক্ষ আছে। বাম হস্তে দর্পণ, দক্ষিণ হস্তের এক অঙ্গুলি ওষ্ঠের উপর, এক অঙ্গুলি চিবুকের উপর। সুগঠিত নাসা, আয়ত চক্ষু, চারু বঙ্কিম ওষ্ঠ। প্রসন্ন মুখশ্রী। গলায় হার, হাতে বালা, মাথায় মুকুট। মূর্ত্তিটি সুবৃহৎ—চিবুক হইতে কপাল পর্য্যন্ত এক হাতের চেয়ে বড়। মাথার মুকুট শুদ্ধ প্রায় দুই হাত। দর্পণের পশ্চাদ্ভাগের আকার মৃণালযুক্ত পদ্মের ন্যায়। ওষ্ঠের কিয়দংশ একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এজন্য মনে হইল মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইতে পারে। ইহা কি পদ্মিনার মূর্ত্তি?

রৌদ্রের তেজ মৃদু হইলে আমরা জয়স্তম্ভ দেখিতে গেলাম। মালব ও গুজরের মিলিত সৈন্য পরাস্ত করিয়া রাণা কুম্ভ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাণা কুম্ভ মালবরাজ মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু কোন রূপ নিষ্ক্রয়-মূল্য লওয়া দূরে থাকুক, মামুদকে উপঢৌকন দিয়া কুম্ভ ছাড়িয়া দিলেন। জয়স্তম্ভটি একটী প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীর উপর নির্ম্মিত। ইহা ১২২ ফিট উচ্চ; অতএব মনুমেণ্ট বা কুতবের চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু ইহার গঠন-নৈপুণ্য

অতি সুন্দর (৮)। ইহা চতুষ্কোণাকারে গঠিত এবং নয়টি তলাতে বিভক্ত। তলাগুলি বেশী উচ্চ নহে। স্তম্ভটিতে আরোহণ করিবার সময় ভিতরে কোথাও আলোক বা বাতাসের অভাব হয় না। বালকও অনায়াসে ইহাতে আরোহণ করিতে পারে। ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের অতিশয় মসৃণ প্রস্তরে স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতি তলে চারি পার্শ্বে চারিটি বড় মূর্ত্তি এবং বহুসংখ্যক ছোট ছোট মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি অতিশয় সুগঠিত। এখানে একটি বিশেষত্ব দেখিলাম—প্রত্যেক মূর্ত্তির নীচে দেবনাগরী অক্ষরে মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়া আছে (৯)। অধিকাংশ মূর্ত্তি দেবদেবীর,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি। বৈতালিক, সূত্রধার প্রভৃতির কয়েকটি মূর্ত্তিও দেখিলাম। সর্ব্বোচ্চ তলায় শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলীর ছবি এবং রাণাদের বংশাবলি লিখিত আছে। অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। Tod এখানে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন।

স্তম্ভটির উপরে উঠিলে চারিদিকের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখায়। এই জয়-স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করিতে না কি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এখান হইতে আসিয়া আমরা মীরা বাঈয়ের মন্দির দেখিতে গেলাম। প্রাচীর-বেষ্টিত উচ্চ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দির মধ্যে তিনটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি ও দুইটি পুরুষ-মূর্ত্তি। একটি বালিকা আমাদিগকে মন্দির দেখাইতেছিল। সে বলিল, বিগ্রহ তিনটি কৃষ্ণ, মীরা বাঈ এবং লক্ষ্মণের। ইহা যথার্থ বলিয়া বোধ হইল না। সে সময় পূজারী উপস্থিত ছিল না বলিয়া সঠিক জানা গেল না। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরটিও বেশ বড়। এই মন্দিরের পাশে আর একটি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। তাহা রাণা কুম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। চিতোর হইতে তিন ক্রোশ দূরে নাগরী নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে উপাদান আনিয়া এই মন্দির দুইটি নির্মিত হইয়াছিল।

মীরা বাঈয়ের ভক্তিপূর্ণ জীবন-কাহিনী এবং তাঁহার ভজন-সঙ্গীতের সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। মীরা বাঈ মাড়বার-রাজের কন্যা এবং রাণা কুম্ভের রাণী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমে ব্যাকুল হইয়া তিনি সকল সুখ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পদব্রজে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মীরা বাঈ মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বেদী হইতে নামিয়া মীরা বাঈকে আলিঙ্গন করেন। সেই ক্ষণেই মীরা বাঈয়ের প্রাণ বাহির হইয়া যায়, এইরূপ গল্প আছে। তাঁহার সঙ্গীত পুস্তকের নাম রাগগোবিন্দ। জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও তিনি একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

এই মন্দির দুইটির নিকটে দুইটি প্রস্তর-নির্মিত বৃহৎ জলাধার (Reservoir) আছে। এগুলি ১২৫ ফিট দীর্ঘ, ৫০ ফিট প্রস্থ, ৫০ ফিট গভীর। কথিত আছে, রাণা কুম্ভের কন্যার বিবাহের সময় এগুলি নির্মিত হইয়াছিল। একটি ঘৃতে পূর্ণ করা হইয়াছিল, একটি তৈলে পূর্ণ করা হইয়াছিল। কুম্ভ রাণার কন্যা অসাধারণ রূপবতী ছিলেন; তিনি এজন্য "লাল মেওয়ারী" ("Ruby of Mewar"—Tod) নামে পরিচিত ছিলেন। জৈসলমীরের ভট্টি-বংশীয় রাজা জেঠের সহিত ইঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু জেঠ চিতোরের নিকট আসিয়া, দুইবার অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়া, ইঁহাকে বিবাহ না করিয়া, অপর একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। তখন রাণা কুম্ভ গগরাঁয়ের খিচিবংশীয় বিখ্যাত রাজপুত্র অচলদাসের সহিত খুব ধুমধাম করিয়া ইঁহার বিবাহ দেন।

ইহা ব্যতীত চিতোরে অন্নপূর্ণার মন্দির এবং আরও অনেক মন্দির আছে। অপরাহ্নে আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এই প্রান্তরে কতবার যুদ্ধ হইয়াছে, কত সহস্র রাজপুত প্রাণ দিয়াছে, রাজপুত রমণীর বক্ষের রক্তে এখানকার মৃত্তিকা সিক্ত হইয়াছে। কিন্তু আবার যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই

---

(৮) Tod বলিয়াছেন, The only thing in India to compare with this is the Kutab Minar at Delhi; but though much higher it is of a very inferior character.

(৯) Vincent Smith তাঁহার History of Fine arts in India and Ceylon গ্রন্থে ইহাকে বলিয়াছেন an illustrated dictionary of Hindu mythology.

Tod বলিয়াছেন, It is one mass of sculpture; of which a better idea cannot be conveyed than in the remark of those who dwell about it that it contains every object known to their mythology.

সহস্র সহস্র বীরপুরুষ এবং বীররমণীর আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক বারের বীরত্বের কীর্ত্তি যেন পূর্ববারের বীরত্বকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কথাটি যদিও একটু অদ্ভুত শোনায় তথাপি প্রকৃতপক্ষে যে কয়বার চিতোর শত্রু কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল, সেই কয়বারের কাহিনীই চিতোরের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কাহিনী।

চারণ কবিরা বলেন, সাড়ে তিনবার চিতোর ধ্বংস হইয়াছিল। একবার আলাউদ্দিন ধ্বংস করেন, দ্বিতীয়বার গুর্জরের সুলতান বাহাদুর, তৃতীয়বার আকবর। আলাউদ্দিন যেবার ভীমসিংহকে বন্দী করেন এবং ৩,৫০০ শ্রেষ্ঠ রাজপুত ভীমসিংহকে রক্ষা করিতে প্রাণ দেয়, তাহাকে অর্দ্ধেক চিতোর-ধ্বংস বলা হয়; কারণ সেবার শ্রেষ্ঠ রাজপুত বীরগণ মারা যায়। আলাউদ্দিন এবং আকবরের আক্রমণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাহাদুর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন রাণা ছিলেন বিক্রমজিৎ। তিনি তখন চিতোরে ছিলেন না। রাঠোরবংশীয় রাণী জও আহির বাই স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করেন এবং বর্ম পরিয়া একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজ-বলি না হইলে চিতোর রক্ষা হইবে না—চিতোরে এইরূপ একটি ধারণা ছিল। দেওলার রাজা বাগ্‌জি বলিলেন—রাণাবংশের রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত,—তাঁহাকে বলি দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাকে সিংহাসনে বসান হইল, মাথার উপর রাজছত্র ধরা হইল। আবার জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান হইল। প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছিল, চিতা রচনা করিবারও সময় ছিল না, জলাধার এবং বারুদখানার মধ্যে বারুদের স্তূপ করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। রাণী কর্ণবতী সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। ১৩০০০ রাজপুত রমণী স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিল। তাহার পর দুর্গদ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট রাজপুত সৈন্য লইয়া বাগ্‌জি শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। এইবার ৩২০০০ রাজপুত চিতোরের জন্য প্রাণ দিয়াছিল।

যে সমতল ভূমির উপর চিতোর পাহাড় অবস্থিত, তাহার উচ্চতা ১৩০০ ফিট। ইহার উপর পাহাড়ের উচ্চতা আরও ৪০০।৫০০ ফিট। চিতোরের প্রাচীন নাম চিত্রকূট। 'খুমান রাসা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র এখানে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্র বাস করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণতঃ অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। এলাহাবাদ হইতে ঝাঁসি যাইবার পথে চিত্রকূট নামে একটা ষ্টেশন আছে,—ইহাই প্রাচীন চিত্রকূট বলিয়া পরিচিত। গিলোটবংশের পূর্বে চিতোরে প্রামারবংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। বাপ্পা প্রামারদের নিকট হইতে চিতোর কাড়িয়া লইয়া এখানে গিলোটবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রামার-রাজ বাপ্পাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে চিতোর কাড়িয়া লওয়া বাপ্পার অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছিল। সেই পাপে কি তাঁহার বংশধরগণকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল?

অপরাহ্নে রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার চিতোরের পাহাড় এবং চারিদিকের বিশাল প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। একটা সুগভীর বিষাদের ভাব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। এত সহস্র সহস্র রাজপুত বীর এবং রাজপুত রমণী দেশের জন্য প্রাণ দিল, কিন্তু তথাপি দেশ রক্ষা করিতে পারিল না। তখন মনে হইল, তাহারা দেশ রক্ষা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু দেশের চেয়েও বড় ধর্ম—রক্ষা করিয়াছিল, আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, জগতে তাহার তুলনা নাই। তাহারা আমাদের জন্য হিন্দুরাজ্য রাখিয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু যাহা রাখিয়া গিয়াছে তাহা চিরস্থায়ী।

বিভ্রাট

শ্রীসত্যভূষণ সেন

১

এক একটি লোক থাকে, যাহারা যেখানেই যায়, সেখানেই সকলের ভালবাসার পাত্র হইয়া ওঠে। দীনেশ ছেলেবেলা হইতেই পিসিমার বাড়ীর সংস্রবে থাকার দরুণ, সে-বাড়ীর সকলের সহিতই তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া ছিল। পিসিমার শ্বাশুড়ী ছিলেন তাহার দিদিমা। পিসিমার ছেলেরা সম্পর্কে তাহার ভাই হইলেও নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সহিত বন্ধুর মত ব্যবহারই চলিত। পিসিমা দীনেশকে শুধু ভালই বাসিতেন না—তাহার চরিত্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল যথেষ্ট। ছেলেবেলায়ও দীনেশের কোন অপরাধ পিসিমার চোখে পড়িত না। পড়াশুনার কথা উঠিলে পিসিমা দীনেশকে দেখাইয়া বাড়ীর সব ছেলেকে জব্দ করিয়া রাখিতেন। এক দিন বাড়ীর ছেলেরা বলিয়া বসিল, কালকে ছুটির দিনে আমরা পড়ব না। পিসিমা বলিলেন, কেন রে, ছুটীর দিন পড়া বন্ধ করতে হবে কে বলেছে? ছেলেরা বলিল, দীনেশও ত বলেছে কাল পড়বে না। পিসিমা অমনই বলিয়া বসিলেন, দীনেশের সঙ্গে তোদের তুলনা কিসে—দীনেশের মত ছেলে এক দিন না পড়লে কিছু এসে যায় না। তাই বলে' কি সবারই ঐ কথা বলা সাজে।

সে অনেক দিনের কথা। পড়াশুনার কাল চলিয়া গিয়াছে। এখন পিসিমার ছেলেরা সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত,—কেহ উকীল, কেহ ডাক্তার, কেহ কেরাণী। আর একজন দারোগা—তাহার নাম ধনেশ। ইহারা সংসারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই যে ইহার মধ্যে অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল চলিয়া গিয়াছে এমন নয়। বিলাতে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে সকলেই সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার অবকাশ উপভোগ করিবার অবসর পায়। ডাক্তার ডাক্তারী করিবার পূর্ব্বে, উকীল কোর্টে যাইবার আগে, কেরাণী কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হইবার অবকাশে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া একবার দুনিয়াটা দেখিয়া আসে। আমাদের দেশটা বিলাত হইতে এখনও অনেক বাকী; কাজেই ও রকম সখের প্রোগ্রাম এখানে চলে না। এখানে পড়া শুনা শেষ করিয়া অবকাশ উপভোগ করা দূরে থাক্, লেখা পড়া শেষ করাই অনেকের অদৃষ্টে ঘটিয়া ওঠে না। যে কয়জন সৌভাগ্যবান লেখা পড়া শেষ করিতে পায়, তাহাদের মধ্যেও এরূপ অতি-সৌভাগ্যবান খুব কমই থাকে, যাহার উপার্জ্জনের প্রতীক্ষায় দুই চার দশ জন বসিয়া নাই।

দীনেশ ছিল এইরূপ একজন অতি-সৌভাগ্যবান। পিসিমার ছেলেরা যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত, দীনেশ ছিল সেইরূপ কৃতবিদ্য। কলেজের পড়া শেষ করিয়া তাহাকে ঘরে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সে হুজুগে মাতিয়াছে এবং দামোদরের বন্যায় লোকের সেবায় দেশের কাজ করিয়াছে।

২

দীনেশ অবসর খুঁজিয়া অনেক দিন পরে পিসিমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। অনেক দিন পরে দীনেশ আসাতে পিসিমার বাড়াতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। পিসিমা এতদিন পরে দীনেশকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন। দুই মাস পূর্ব্বে ধনেশের বিবাহের সময় দীনেশ না আসিতে পারায় পিসিমা যে কতটা নিরাশ হইয়াছিলেন, এখন বর্ত্তমানের আনন্দে তাহাও ভুলিয়া গেলেন। ছেলেরা আসিয়া সব আড্ডা জমাইয়া বসিল। দিদিমা আসিয়া বলিলেন—

ওরে দীনু, ধনেশের বউ দেখেছিস্?

দীনেশ। কি করে দেখ্ব, দিদিমা, আমি যে সম্পর্কে ভাসুর।

দিদি-মা। তা আছিস ভাসুর, ভাসুরের মতই দেখ্‌বি—আমি এনে দেখাচ্ছি।

দীনেশ। কি করে দেখাবেন—বউ এসে দাঁড়াবে,

আপনি ঘোমটা তুলে ধরবেন, আর সে বেচারী চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, এই ত ?

দিদিমা। তা নয় ত কি তোর সাম্‌নে বউ এসে নাচ্‌তে থাকবে ?

উকীল-ভায়া। দিদিমার ত বড় একরোখা কথা দেখ্‌ছি। একজন লোক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকবে না বলেই একেবারে ন্যাচ্‌তে থাক্‌বে এমন কি কথা।

দিদি-মা। আচ্ছা বেশ, তোরা এখন বড় হয়েছিস্, যা খুসী তাই কর। আমি বাপু ওসব খৃষ্টানীপনা করতে পারব না।

দিদিমা চলিয়া গেলেন।

ধনেশ। দিদিমা খুব চটে গেছেন।

ডাক্তার-ভায়া। তুমিও তো কম একরোখা নও হে দীনু! না হয় তুমিই দিদিমার কথায় সায় দিয়ে যেতে।

দীনেশ। সায় দিয়ে যাওয়া যেত অবশ্যই। কিন্তু প্রতিপদে সমাজকে এরূপ সায় দিতে দিতেই এখন এমনই দশা হয়েছে যে সমাজ এখন বৃথা আচার-নিয়মের বন্ধনে জর্জ্জরিত। প্রথম প্রথম এ-সব দেখে হাসি পেত, এখন কান্না পায়।

ডাক্তার ভায়া। এর মধ্যে এমন জর্জ্জরিতের কথা কি এল। আচার-নিয়ম সব সমাজেই আছে।

দীনেশ। তা থাক্। কিন্তু ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ দেখি। ভাসুর এবং ভাদ্রবউদের মধ্যে এতটা অনাবশ্যক ব্যবধান থাকাতে গৃহকর্ম্মের যে কত প্রকার অসুবিধা হয়, তা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু একজন লোক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, আর একজন এসে তার ঘোম্‌টা তুলে ধরলে তবে আমি তাকে দেখ্‌ব—এটা একজন মানুষের স্বাধীন সত্ত্বার প্রতি কত বড় একটা আঘাত—একবার ভেবে দেখেছ কি ?

ধনেশ। যেন লাট-সাহেবের Statue unveil করা!

দীনেশ। Statue ত একবার unveil করলে সবাই দেখ্‌তে পায়। একটি বউ দেখাতে হলে তাকে প্রতি বার unveil করে আবার তাকে ঘোমটা পরিয়ে রাখ্‌তে হয়। যেন সোনা-রূপার বাসনপত্র—পাড়া-পড়শীরা যতবার দেখতে চাইবেন, তত বারই সিন্দুক খুলে দেখাতে হবে, আবার সিন্দুক বন্ধ করতে হবে।

ধনেশ। আমার পকেট-ঘড়িটার মত—যতবার সময় দেখা দরকার, ততবারই ডালা খুলতে হবে।

উকীল-ভায়া। বাস্তবিক এ-সব ভেবে দেখলে হাসিই পায়।

দীনেশ। আমারও প্রথম প্রথম হাসি পেত,—এখন কান্না পায়।

ইহার পরে আর কথা চলে না।

৩

বিকাল বেলা বাড়ীতেই চায়ের আড্ডায় বসিয়া গল্প হইতেছিল। দিদিমা বসিয়া সকলকে খাওয়াইতেছিলেন—পিসিমা খাবার আনিয়া দিতেছেন।

দিদিমা বলিলেন—কিরে দীনু, তুই না কি এই শনিবারেই চলে যাবি ?

দীনেশ। হ্যাঁ, দিদিমা, স্নান উপলক্ষে গঙ্গাসাগর মেলাতে যেতে হবে—সেখানে কাজ আছে।

দিদিমা। মেলাতে আবার তোর কি চাকুরী জুট্‌ল ?

চাকুরীর কথা শুনিয়া ভায়ারা সকলে হাসিয়া উঠিল।

দীনেশ। না, দিদিমা, চাকুরী নয়—

দিদিমা। তা বেশ ত, না হয় স্নান করতেই যাবি। আর আমরাও সব যাচ্ছি যখন—সবাই এক-সঙ্গেই যাওয়া যাবে। আমাদেরও ত তুই-ই নিয়ে যেতে পারিস!

উকীল। না দিদিমা, তোমাদের এত সব লটবহর নিয়ে যাওয়া ওর মত সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নয়।

কেরাণী। না—না, ও-সব কিছু নয়; তোমাদের ধনেশের সঙ্গে যাওয়াই ঠিক।

ধনেশ। তা ঠিকই আছে। আমার বজরা ত রয়েছেই। কনেষ্টবলদের জন্য একটা বড় নৌকাও যাচ্ছে। তাতে আমাদের মালপত্র অনেক দেওয়া যাবে। কনেষ্টবলও যাচ্ছে সঙ্গে দশজন।

কেরাণী। দশজন! বা, তবে ত গ্র্যাণ্ড্। এবার আর কিছু ভাবতেই হবে না। দশজন কনেষ্টবল সহায় থাকলে ত যা খুসী তাই করা যায়। আর যাই বল—পুলিশ ফোর্সের কাছে কেউ নয়—ওসব ভলান্টিয়ার-ফলান্টিয়ারের কর্ম্ম নয়।

উকীল। না হে, ভলান্টিয়াররা এবার দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা আর তুচ্ছ নয়—ওরা বেশ কাজ করে।

কেরাণী। তা করুক, কিন্তু—আমারও তাই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আমি এক-দিন আমাদের বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন যে ওসব কিছু নয়। সাহেব যখন বলেছেন, তখন তার উপরে ত আর কথা নাই—ওদের চেয়ে ত আর আমরা কিছু বেশী বুঝতে পারি না।

এমন সময় অদূরে সাহেবের বেয়ারাকে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া, কেরাণীবাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। বেয়ারা নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে খবর কি?

বেয়ারা। খবর আর বেশী কুছু নেই আছে বাবুজি।

কেরাণী। সাহেব চা-টা খেয়ে বেরিয়ে গেছেন টেনিস্ খেল্‌তে?

বেয়ারা। হাঁ বাবু, গেয়েছেন। যাবার সময় হামাকে বলে গেল বেবীর জন্মদিনের কোথা। এহি সোমবারে হোবে কি দোস্‌রা সোমবারে—হামি ঠিক বুঝতে পারল না।

কেরাণী। তা এ-সব তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা কর না কেন—আমি তোমাকে বলে দেব। আমার ডায়েরীতে সব লেখা আছে।

বেয়ারা। লিখা আছে বাবুজী?

কেরাণী। হাঁ সব আছে। বেবীর কবে জন্ম হল, কোন্ তারিখে সাহেবের বিয়ে হল, বিয়ের পরে মেমসাহেব কবে এসে এ বাড়ীতে উঠলেন—সব লেখা আছে।

৪

দীনেশ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইয়া সাগরসঙ্গমের মেলাতে আসিয়া ভলান্টিয়ারের দলে যোগ দিল। এদিকে ভায়ারা কেহই ছুটী পাইল না,—কাজেই ধনেশকে একাই পরিবারের সমস্ত বাহিনী লইয়া বাহির হইতে হইল। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের বজরা ছাড়িল—সঙ্গে এক-নৌকা কনেষ্টবল। দুই নৌকাতেই সরকারের নিশান সগর্ব্বে উড়িতেছিল। তীর হইতে যাহারা দেখিল, তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এ নিশ্চয়ই কোন দারোগার নৌকা। অন্যান্য নৌকার যাত্রীরা একবার বলিয়া লইল যে, ইহারা কেমন নিরাপদে নির্ভাবনায় চলিয়াছে—যদিও এ-পথে কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। সরকারী নিশানের উপরে যখন ভলান্টিয়ারদের দৃষ্টি পড়িল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, সরকারের মান-মর্য্যাদায় ত আর সে দিন নাই; এখন এ-সব বাহ্যাড়ম্বর কি সরকারের পক্ষ হইতে আশ্রিত-বাৎসল্যের পরিচয়, অথবা আশ্রিতদের পক্ষ হইতে সরকারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন? জেলে-নৌকারা একবার সরকারী নিশান দেখিয়া আর ভরসা করিয়া সেদিকে ফিরিয়া চায় না। ইহাদের মধ্যে সত্যসত্যই যাহাদের ডাক পড়ে, তাহারা মাছ লইয়া যায় সশঙ্কচিত্তে, এবং ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে মনে করে, মাছের দাম লইয়া ফিরিয়া আসিলে পর।

এইরূপে তাঁহারা বেশ একটু সম্ভ্রম এবং অনেকটা সমালোচনার প্রসঙ্গ হইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে চলিয়াছেন। হঠাৎ একটা জাহাজের বাঁশীর শব্দে সমস্ত নিশ্চিন্ততার তাল কাটিয়া গেল।

জেলার পুলিশ সাহেব তাঁহার নিজের জাহাজে সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছিলেন। তিনি ধনেশের অনুচরদের মধ্য হইতে পাঁচজন কনেষ্টবল লইয়া চলিয়া গেলেন। ধনেশের সঙ্গে রহিল বাকী পাঁচজন। যথাসময়ে সকলে আসিয়া সাগর-সঙ্গমে পৌঁছিল। ধনেশ যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের সহিত থাকিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার অনুচরের সংখ্যা অর্দ্ধ পথে দ্বিখণ্ডিত হওয়াতে, সে অপেক্ষাকৃত অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে পাঁচজন মাত্র কনেষ্টবল; তাহাদের নির্দ্ধারিত কাজ ভাগ করিয়া দিলে দেখা গেল যে, ধনেশের পরিবারের জন্য কাজ করিবার অবসর তাহাদের অতি সামান্যই থাকে। তবু ইহারই মধ্যে তাহারা যথাসাধ্য ধনেশের সাহায্য করিতে লাগিল।

কিন্তু দীনেশের আর এ পর্য্যন্ত দেখা পাওয়া যায় নাই। পাইবার কথাও না, কারণ দীনেশের কার্য্যকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল একটু দূরে। সমস্ত ভলান্টিয়ার-সঙ্ঘ দলে দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের কাজ ছিল স্নানের ঘাটে তদারক করা। তাহাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেওয়া, অথবা আত্মীয়-স্বজনদের অভিভাবকত্বে থাকিলে তাহাদের সুবিধা সৌকর্য্যের জন্য সাহায্য করা; নির্দ্দিষ্ট সময়মত মূল হাসপাতালে গিয়া সেবা শুশ্রূষার কার্য্যে যোগদান করা এবং অবসরমত মাঝে মাঝে তদন্ত অফিসে গিয়া খোঁজখবর

লওয়া। এই তদন্ত অফিসও ইহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। তদন্ত অফিস সমস্ত দিন এবং রাত্রিরও অনেকটা সময় পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। কয়েকজন ভলান্টিয়ার নিরবচ্ছিন্নভাবে এখানকার কাজের জন্যই নিযুক্ত ছিল। তাহারা সকল প্রকার খবরাখবরের আদান-প্রদানে যাত্রীদের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছিল। অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া অভিভাবকদের সঙ্গ-বিচ্যুত হইয়া পড়িত। তখন ভলান্টিয়ারদের কাজ ইহাদের কুড়াইয়া আনিয়া তদন্ত অফিসের জিম্মা করিয়া দেওয়া। তদন্ত অফিসে ইহাদিগকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় প্রদানেরও বন্দোবস্ত ছিল।

দীনেশ ৩নং কেন্দ্রে কাজ করিতেছিল। পিসিমাদের নিয়া ধনেশের যে স্থানে আসিয়া থাকিবার কথা, সেটা ছিল ২নং কেন্দ্রের অন্তর্গত। দীনেশ উহাদের সহিত সাক্ষাৎ লাভের একমাত্র উপায়ের নির্দ্দেশ পাইয়া দলপতির নিকট আসিয়া হাজির হইল। দলপতির নিকট নিবেদন করিল, আমাকে ২নং কেন্দ্রে বদলী করিতে আজ্ঞা হয়, সেখানে একজন পুলিশের দারোগা বিপন্ন। তাহাদের একজন সহযোগী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দীনেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দলপতি দীনেশের দিকে চাহিয়া স্বজাতিসুলভ সহানুভূতিতে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার মধ্যে অবশ্যই একটা রহস্য আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—দারোগাটি কে?

দীনেশ। আমার পিসতুতো ভাই, নাম ধনেশ।

দলপতি। তাঁর বিপন্ন অবস্থাটা কি রকম?

দীনেশ। অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁর সঙ্গী, অভিভাবক তিনি একা।

দলপতি। তাঁর অভিভাবক সমস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি,—তার জন্য ভাবনা কি!

দীনেশ। ভাবনা নাই?

দলপতি। ভাবনা আছে বই কি। এসব ক্ষেত্রে রাজশক্তির কর্ম্ম নয়। আচ্ছা তা' হলে তুমি ২নং কেন্দ্রে যাও। সেখানকার দলপতিকে আমার নাম করে ব'লো—তিনি যেন তাঁর একজন লোককে এখানে বদলী করে দেন।

এইরূপে অনুমতি পাইয়া দীনেশ অবিলম্বে ২নং কেন্দ্রের জন্য রওনা হইল। ২নং কেন্দ্রের সীমার মধ্যে আসিয়া দেখিল, এক স্থানে প্রকাণ্ড একটি ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। ভিড়ের ভিতরে দেখিল—একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক—তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই ভিড় জমিয়াছে! খবর লইয়া জানিল যে, যুবতীটি ভদ্র ঘরের স্ত্রী, পথ চলিতে চলিতে ভিড়ের মধ্যে সঙ্গীহারা হইয়া পড়িয়াছে। দীনেশ পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া খবর পাইল যে, স্ত্রীলোকটি এখানকার ভলান্টিয়ারদের হাতে পড়িয়াছে—তাহারা উহাকে তদন্ত আফিসে লইয়া যাইবে।

দীনেশ ভলান্টিয়ারের দলে থাকিয়া কার্য্যতৎপরতা শিক্ষা পাইয়াছিল। যখন দেখিল যে স্ত্রীলোকটি ভলান্টিয়ারদের হাতে পড়িয়াছে, তখন সে বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান ছাড়িয়া নিশ্চিন্তমনে চলিয়া যাইতে পারিল। যাইবার সময় স্ত্রীলোকটির চেহারার একটা মোটামুটি বিবরণ মনে মনে টুকিয়া লইল—বয়স বিশ বৎসরের নীচে, রং ফরসা, চেহারা লম্বা, শরীরে কৃশাঙ্গী। নাক চোখা, চোখের গড়ন সাধারণ, চোখের প্রায় এক ইঞ্চি নীচে একটা আঁচিল, মুখের ছাঁদ লম্বা। এসবও দীনেশের ভলান্টিয়ারের দলে শিক্ষার ফল।

দীনেশ ২নং কেন্দ্রের দলপতির নিকট হাজিরা দিয়া যথাসময়ে পিসিমার পর্দাবাসে আসিয়া পৌছিল। আসিয়াই দেখে এক বিভ্রাট। স্নান হইতে আসিবার পথে ধনেশের বউ যূথভ্রষ্ট হইয়া কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। কথাটা শুনিয়াই দীনেশের মনে পড়িল—পথে-দেখা সেই সঙ্গীহারা যুবতীর কথা। সেই যুবতীর চেহারার যে বিবরণ দীনেশ দাখিল করিল, বাম চক্ষুর নীচে আঁচিলটি পর্য্যন্ত—তাহাতে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ হইল যে, এই যুবতীটাই ধনেশের বউ। দিদিমা বলিলেন—তুই যখন দেখলি, তখন বউকে নিয়ে এলি না কেন একেবারে?

দীনেশ। আমি কি করে জান্‌ব যে আপনারা এত লোক থাক্‌তে—আর সঙ্গে পুলিশ দারোগার প্রহরা—তার মাঝখান থেকে বউ হারিয়ে যাবে। আর জান্‌লেই বা কি হত, আমি কি ওকে কোন দিন দেখেছি যে পথে দেখা হলেই চিন্‌তে পারব?

দিদিমা। তুই না হয় চিন্‌তে নাই পেরেছিস,—বউও কি তোকে দেখ্‌তে পেলে না?

দীনেশ। কি করে দেখ্‌বে এত লোকের মধ্যে।

দিদিমা। বাঃ, তুই কি করে দেখ্‌লি এত লোকের মধ্যে ?

দীনেশ। আমি দেখ্‌ব না ?—তখন সমস্ত লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ওর উপরে। আর আমি ছিলাম হাজার লোকের মধ্যে একজন—আমাকে বউ কি করে দেখবে। আর আমাকে দেখলেই বা কি হত—বউ কি আমাকে বলতে পারত যে আমি ধনেশের বউ—আপনি আমার ভাসুর—আমাকে নিয়ে যান।

দিদিমা। তোরা কি দাঁড়িয়ে তর্কই করবি শুধু—বউকে আনতে যাবি না।

দিদিমার নিকট অগত্যা পরাজিত হইয়া দীনেশ ও ধনেশ তদন্ত অফিসের দিকে রওনা হইল।

শোক-সংবাদ

৺কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

বাঙ্গালার একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে অক্লান্তকর্ম্মী, স্বদেশবৎসল, দানবীর কবিরাজ

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

যামিনীভূষণ রায় আর ইহজগতে নাই। গত ২৬শে শ্রাবণ তিনি কর্ম্মময় জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে না করিতেই সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে যামিনীভূষণকে চিনিতেন না, এমন লোক বিরল। তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা একদিনও আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার পক্ষপাতি হইয়াছেন। যামিনীভূষণ সংস্কৃতে এম-এ ছিলেন, ডাক্তারীতে এম-বি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়' 'কুমারতন্ত্র' 'প্রসূতিতন্ত্র' 'শালক্যতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কলেজের জন্য যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার জন্য যামিনীভূষণ একাকী সত্তর হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি যে সকল সম্পত্তি এই কলেজের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন, তাহারও মূল্য হইবে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা। কবিরাজ যামিনীভূষণের অকাল মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার সহজে পূরণ হইবে না। আমরা প্রস্তাব করি, কলিকাতা বিদ্যাপীঠ ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ একত্র মিলিত করিয়া কবিরাজ শ্যামাদাস ও কবিরাজ গণনাথ যদি এই সম্মিলিত কলেজের পরিচালন ভার গ্রহন করেন, তাহা হইলেই 'পরলোকগত' যামিনীভূষণের প্রকৃত স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত হইবে, তাঁহার নাম বাঙ্গালা দেশে স্মরণীয় হইয়া রহিবে।

পুস্তক-পরিচয়

দাদার কথা।—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা। 'দাদার কথা' পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের জীবন-কথা ; লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সার রাসবিহারীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পুস্তকখানির নামকরণ অতি সুন্দর হইয়াছে, কারণ সুরেশবাবু এই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া নিজে, বলিতে গেলে, কোন কথাই বলেন নাই ; পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তাঁহার এই প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতার কাছে যখন যে কথা বলিয়াছিলেন, সুরেশবাবু তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কথাগুলি একত্র সংবদ্ধ করিয়া এই 'দাদার কথা' লিখিয়াছেন ; সুতরাং এই বইখানি আদ্যোপান্ত দাদারই মুখের কথা। অথচ, এই 'দাদার কথা'তে সার রাসবিহারীর জীবন-কথা যেমন সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, অন্ত কোনভাবে লিখিলে তাহা কিছুতেই হইত না। বইখানি এমনই সুন্দর যে পড়িতে বসিলে ক্রমেই আরও জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে। সার রাসবিহারী ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সুরেশবাবু বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ জীবন-চরিত-লেখকের জন্য অনেক অমূল্য উপকরণ একত্র রাখিয়াছেন। আমরা শতমুখে এই বইখানির প্রশংসা করিতেছি। ইহা যে বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই মনোরঞ্জন করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

দম্পতি।—ডাক্তার শ্রীশশিকুমার সেন বি, এ এল্ এম্ এস্, প্রণীত। মূল্য ২।০ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতা বলিয়াছেন "সংক্ষেপ তো ক্রিয়া যোগো নিদান পরিবর্জ্জনং।" রোগ-কারণ দূর করাই সংক্ষেপ চিকিৎসা।" যে রোগের বিষে বাঙ্গালার অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত, বাঙ্গালী ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার কারণ দূর করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। যুবকগণ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, যুবতীগণ স্ত্রীরোগে আক্রান্ত, বাঙ্গালার শিশু সন্তানগণের অকালমৃত্যু,—এই সকলের কারণ ও প্রতীকার সম্বন্ধে, গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া দাম্পত্য জীবনের পক্ষে গ্রন্থখানি অতি উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্ত গ্রন্থের নাম-নির্দ্দেশও সার্থক হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি, বিবাহিত জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় পাঠ্য, বিশেষতঃ নববিবাহিত যুবক-যুবতীগণের পক্ষে। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন মানুষের স্বভাবজাত সংস্কারের বিষয় উপদেশের প্রয়োজন কি ? তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত উদ্ধৃত করিলেই ইহার সমাধান হইবে। গ্রন্থকার তাঁহার উপক্রমণিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন,......শিক্ষা না পাইলেই (সুশিক্ষাই হউক কুশিক্ষাই হউক) যৌনতত্ত্ব তাহার নিকট প্রায় সমস্তই অপরিজ্ঞাত থাকে। আবার এমন চিকিৎসকও আছেন যাঁহারা দাম্পত্য ব্যবহার সম্বন্ধে আংশিক অনভিজ্ঞ। "শেষ জীবনে যে জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহা যদি দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে লাভ হইত, তবে অত্যন্ত সুখের ও মঙ্গলের হইত, এইরূপ খেদও কেহ কেহ করিয়া থাকেন।" আমাদের মনে হয় এইরূপ খেদ কেহ কেহ কেন অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। বিবাহিত জীবনকে সংযমের মধ্যে নেওয়া, উচ্ছৃঙ্খল যৌবনকে শৃঙ্খলিত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া যুবক যুবতীগণ সেইরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দাম্পত্য জীবন মঙ্গলময় শান্তিময় সুখময় হইয়া উঠিবে।

দেশবন্ধু স্মৃতি।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত ; মূল্য তিন টাকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পবিত্র জীবন-কথা যিনি যেমন করিয়াই লিখুন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই আদরে বরণ করিয়া লইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যিনি এই স্মৃতির লেখক তিনি দেশবন্ধুর শেষ জীবনে অথবা রাজনৈতিক জীবনে ছায়ার ন্যায় সহচর ছিলেন, ভক্তের ন্যায় অনুগত ছিলেন ; সুতরাং হেমেন্দ্র বাবু যে এই জীবন-স্মৃতি লিখিবার সর্ব্বতো ভাবে উপযুক্ত, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লেখকের চিত্তরঞ্জনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকট হইয়াছে এবং ইহারই জন্য এই জীবন-স্মৃতি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে ; এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী মাত্রেরই ভাল লাগিবে।

যুগমানব।—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল্ ; মূল্য তিন টাকা। এখানি ডায়েরী বা রোজনামচা। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রবাবু যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর এই ডায়েরি ; বন্ধুর পরলোকের পর তিনি ইহা সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু, এ কথায় নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না ; তাই এই 'পরিচয়ে' পুস্তকখানি তাঁহার 'প্রণীত' কি 'সম্পাদিত' তাহা বলিলাম না। কথা এই, বীরেন্দ্রবাবু নিজেই গ্রন্থকর্ত্তা হউন, বা তাঁহার পরলোকগত বন্ধুই প্রণেতা হউন, এই ডায়েরিতে পড়িবার ও ভাবিবার অনেক কথা আছে। অবশ্য, ডায়েরির মন্তব্যের আগাগোড়া সামঞ্জস্য নাই, থাকিবার কথাও নহে ; লেখকের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, যে পুস্তক বা যে লেখকের সম্বন্ধে তাৎকালিক যে মনোভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই অকপটে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; সেগুলি বিচারসহ কি না, সমীচীন কি না, তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজনই তখন অনুভূত হয় নাই। আমরাও সেই জন্ত লেখকের কোন মন্তব্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। তবে, এইমাত্র বলিতে পারি, এই ডায়েরীখানি পাঠ করিলে অনেকেরই চিন্তার খোরাক জুটিবে। ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

আলো।—রায়-সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিতে হইবে না। বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব সরল ও সহজ ভাষায়

ছাত্রগণের নিকট বিবৃত করিতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার 'বৈজ্ঞানিকী' 'প্রাকৃতিকী' 'গ্রহনক্ষত্র' 'বিজ্ঞানের গল্প' 'পোকামাকড়' 'গাছপালা' 'পাখী' 'শব্দ' প্রভৃতি পুস্তক শিক্ষার্থীমহলে যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে; বর্ত্তমান পুস্তকখানিও তেমনই সমাদরে গৃহীত হইবে। আলো সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এমন সুন্দর পুস্তক পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না; বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিতই হয় নাই। রায় মহাশয় ছেলেদের জন্ত এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন; কিন্তু আমরা, বুড়ারাও এই পুস্তকখানি পড়িয়া লাভবান হইলাম। এই সকল পুস্তকের দিকে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি কতদিনে আকৃষ্ট হইবে?

জহান্-আরা।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য বার আনা। জহান্-আরা সম্রাট শাহ্জাহানের দ্বিতীয় কন্তা; জগৎ-বিখ্যাত তাজমহল যাঁহার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিয়াছে, সেই মুমতাজ-মহল জহান্-আরার জননী! এই মহীয়সী, গরিয়সী মহিলার জীবন-কাহিনী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয় ঢালিয়া দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি ঐতিহাসিক; তিনি নির্ম্মমভাবে সত্য বাছিয়া লইয়া এই জীবন-চরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সেই নির্ম্মম সত্যকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। ভাষার ঝঙ্কারে, শব্দবিন্তাসের চাতুর্য্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অনেক নাটক নভেল অপেক্ষাও সুপাঠ্য হইয়াছে, অথচ তাঁহার হৃদয়াবেগ কখন কঠোর সত্য হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ইহাই গ্রন্থকারের প্রতিভার পরিচয়, ইহাই তাঁহার পুস্তকখানিকে এমন সুষমামণ্ডিত করিয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীশ্রীবিজয়-মঙ্গল।—শ্রীবরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ সঙ্কলিত, মূল্য ১।৵০। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একাধিক জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক ভক্ত শিষ্য এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তবুও আমরা শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল পরম আগ্রহে, পরম ভক্তিভরে পাঠ করিয়াছি এবং পরম শান্তি পাইয়াছি। এখানি ঠিক জীবন-চরিত নহে; গোস্বামী মহাশয় যখন যে সকল অমূল্য কথা বলিয়াছেন, যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং ইহা জীবন-কথা অপেক্ষাও উপাদেয় হইয়াছে; কারণ ইহাই ত তাঁহার প্রকৃত জীবন-কথা। তাঁহার ভক্ত শিষ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। তত্ত্ব-পিপাসু ভক্তমাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থের আদর হইবে।

মানব-গীতা।—কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি-এ বিরচিত; মূল্য ১।০ আনা। এখানি পারমার্থিক কাব্য। 'নিবেদনে' সুলেখক, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই এই 'মানব গীতা'র পরিচয় পাওয়া যাইবে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন "আর্থিক তত্ত্বের আলোচনায় পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে লোকের ঔদাসীন্য জন্মিয়াছে। সংসারে অর্থ ও পরমার্থ উভয়েরই প্রয়োজন আছে, ইহা বুঝাইবার জন্তই আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।" কবিভূষণ মহাশয়ের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই; তিনি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বিশেষ প্রণিধান-পূর্ব্বকই দ্বাদশ অধ্যায়ে এই গীতা সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এই মানব-গীতা পাঠ করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি।

বিবি বউ।—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত; মূল্য সাতসিকা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও গল্প-লেখক। এই 'বিব বউ' তাঁহার কয়েকটী ছোট গল্পের সংগ্রহ। ইহাতে বিবি বউ, কলঙ্কিণী, ঝি, শুকতারা, মন্দের ভালো, নন্-কো-অপারেটার, পথি নারী বিবর্জ্জিতা ও ভক্তের ভগবান, এই আটটী ছোট গল্প আছে। গল্পগুলি সবই সুন্দর; যেমন আখ্যান-ভাগ, তেমনই বর্ণনা-কৌশল; আর সরস কৌতুক—তাহাতে ত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। গল্প কয়টী বেশ ঝরঝরে। পূজার বাজারে এই বিবি বউ বিকাইবে, এ আশা আমাদের আছে।

সাময়িকী

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট যে মহাত্মার প্রতিকৃতি-শোভিত হইল, তিনি স্বনামখ্যাত দানবীর সার তারকনাথ পালিত মহাশয়। সার তারকনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধানতম বারিষ্টার ছিলেন। স্বর্গীয় বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের ন্যায় ইনিও অনেক বিপন্ন ব্যক্তির মামলা বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। বারিষ্টারী ব্যবসায়ে ইনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের যে কি ভাবে সদ্ব্যয় করিতে হয়, সার তারকনাথ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি এ দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার উন্নতির জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তাঁহার দীর্ঘ জীবনের উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পনর লক্ষ টাকা ও পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষের প্রদত্ত অর্থে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সারকুলার রোডে যে বিজ্ঞান-কলেজ স্থাপনা

করিয়াছেন, তাহাই দানবীর সার তারকনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ইঁহার এই দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯১৩ অব্দের ১লা জানুয়ারী ইঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। আমরা এই দানবীরের প্রতিকৃতি 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

এবার সাময়িকীর প্রথম কথা হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ। কি কুক্ষণেই যে এ বিরোধ এমন তীব্র হইয়া উঠিল, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছিনা। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান সুদীর্ঘকাল সম্প্রীতে পরস্পরের সুখ দুঃখে সহানুভূতি ও সাহায্য করিয়া বসবাস করিতেছিল; হঠাৎ কি এমন হইল, যাহার জন্য এই প্রীতির শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া গেল, মিত্রতার স্থানে ঘোর শত্রুতা দেখা দিল। কারণ যাহাই হউক, এই অসদ্ভাব যে উভয় পক্ষেরই অহিতকর, তাহা কি কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না? হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমান এ দেশে বাস করিতে পারেন না, আবার মুসলমানকে বাদ দিয়াও হিন্দুর চলে না। এ অবস্থায় এমন ভাব কতদিন চলিবে, বা চলিতে পারে? আমরা কোন পক্ষের দোষত্রুটীর বিচার করিব না; যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, অতীতের অপ্রীতিকর স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, হিন্দু-মুসলমানের যিনি পরম দেবতা তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া সকলে আবার একত্র-বদ্ধ হউন, এই আমাদের প্রার্থনা। ঢাকায় কি হইয়াছে, পাবনায় কি হইয়াছে, খিদিরপুরে কি হইল, সে সকল আলোচনার প্রয়োজন নাই—তাহাতে মিলন হয় না।

এবার দেশের বড়ই দুর্দ্দিন! কলিকাতা সহরে ত ঘরে-ঘরে বেরি-বেরি; চিকিৎসকেরা বলিতেছেন এ রোগের কারণ এখনও অবিসম্বাদিত ভাবে নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং ঔষধও তেমন স্থির হইতেছে না। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, যত দোষ পুরাতন চাউলের। পুরাতন চাউল খাইয়াই এই রোগ হইতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৈলের ত্রুটী ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, চাউল ও তৈল বদ্‌লাইয়াও ত এ রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতেছে না। প্রথমে এই রোগ তেমন সাংঘাতিক হয় নাই; দু'দশদিন ভুগিয়াই লোকে ঝাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন মধ্যে মধ্যে উক্ত রোগে মৃত্যুর সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।

তাহার পর বন্যা! সেদিনের জলপ্লাবনে মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমা ব্যতীত আর সমস্ত স্থান জলে ডুবিয়া গিয়াছে! লোকের কষ্ট বর্ণনাতীত। বাড়ী ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, গরু বাছুর কোথায় চলিয়া গিয়াছে; চারিদিকে সুধু জল; লোকের আশ্রয়-স্থান মিলিতেছে না, দিনান্নের ব্যবস্থা হইতেছে না। সারা জেলারই এই অবস্থা। অসংখ্য নরনারীর হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। আমাদের দেশের আর্ত্তসেবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহারা সকলেই মেদিনীপুরের এই বিপদ সময়ে অগ্রসর হইয়াছেন, নানা স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দেশ-সেবকগণ অক্লান্ত ভাবে আর্ত্তের সেবা করিতেছেন; কিন্তু, এ দুর্দ্দশা ত এক আধখানি গ্রামের লোকের নহে, বলিতে গেলে সমগ্র মেদিনাপুর জেলার লোকে বিপন্ন। ইহাদের উপযুক্ত সাহায্য করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। সর্ব্বত্র চাঁদা তোলা হইতেছে। আমরা আশা করি দেশবাসীগণ মুক্ত হস্তে এই পীড়িত নরনারীদিগের সেবার জন্য দান করিবেন। মহামায়া অন্নপূর্ণা আসিতেছেন বড় দুর্দ্দিনে; এ সময় যেন তাঁহার নিরন্ন সন্তানগণের সেবা করিয়া তাঁহার পূজা সম্পন্ন করা হয়।

এবার আশ্বিন মাসের শেষেই দুর্গোৎসব হইবে। সেই জন্য আমরা কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ' আশ্বিনের তৃতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বেই প্রকাশিত করিব। যাহাতে পূজার অবকাশের পূর্ব্বেই গ্রাহকগণ কার্ত্তিকের সংখ্যা কাগজ পান, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।

বোধন-বেদন

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়

শরতের শ্বেত-শিশুগুলি
গগনের আলিসায় বসি
নাড়ে যবে কনক-কেতন
ব্যথা মোর বুকে উঠে শ্বসি।

সুধাসনে তোরা মিছে আর
সে করুণ কাহিনী আমার,
পূজা এলে ভয়ে মরি পাছে
ফেলি কা'রে হারায়ে আবার।

শেফালীর দীপালী-উষায়
বোধনের বাজিলে সানাই,
আঁখিজল বাধা নাহি মানে
বুকে মোর বড় ব্যথা পাই ;

মনে পড়ে বাজায়ে বাজনা
সবাই আসিল ঘট ভরি'—
আমি একা এসেছিনু ফিরি
ভরা-ঘট মোর খালি করি।

কলা-বৌ ফিরে এল নেয়ে,
রাঙা-পাড় আঁচল উড়ায়ে ;
আমি এনু শাদা থান পরি'
শ্মশানের বিভূতি কুড়ায়ে।

গৃহতলে পড়িনু লুটায়ে
ব্যথানত কথাহীন মুখে,
প্রতিবাসী পতিহীনা কেহ
শিশু মোর তুলে দিলে বুকে।

তার পর একে একে ঘুরে
কত পূজা এল গেল ফিরে,
শিশু মোর বুঝে ব্যথা যত
আমি তত ভাসি আঁখি-নীরে।

কতদূর—গ্যাছে তার পিতা
কত খোঁজ করে মোর কাছে ;
লিখে দিতে করে অনুরোধ
আমাদের ভুলে কেন আছে ?

বাছা মোর মনে হয় আজ
কা'রো কাছে শুনি' দুখ-বাণী
আভাষে বুঝেছে এতদিনে
কত একা মোরা দুটী প্রাণী।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

দুর্গাচরণ রায় প্রণীত সচিত্র 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন', অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ—৩৲।
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, পথের দাবী—৩৲।
শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, হাইফেন—২৲।
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত নূতন উপন্যাস, হিমাদ্রি—২৲।
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস, কাগজের ফুল—১৲।
শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী সঙ্কলিত, বঙ্গনারীর ব্রতকথা—৸৹।
শ্রীমৎ কুমারানন্দ সরস্বতী প্রণীত জ্ঞান বল্লরী—২৲।
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত শান্তির পথে ১।৹।
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, নারীরাজ্যে—।৹।
শ্রীযুক্ত মর্ণীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত ঢেউয়ের যাত্রী—১৲।
শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, স্বপের স্বপন—১।৹।
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটী বৈজ্ঞানিক কারণ—২৲।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

ভগ্ন মন্দির

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দাস্তিদার

কার্ত্তিক, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

দুর্গামঙ্গল

অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আলোচনার যোগ্য অনেক বিষয় আছে। সেই অতি পুরাতন যুগে বাঙ্গালীর সামাজিক চিত্রের পরিচয়, আমরা সেকালের সাহিত্যের ভিতরেই পাই। যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন, তাঁহারা সেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতরে হাজার বছর আগের বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাইবেন। "বৌদ্ধ গান ও দোহা" "ডাকের বচন", "খনার বচন", "শূন্য পুরাণ", "মাণিকচন্দ্রের গান", "গোবিন্দচন্দ্রের গীত", "ময়নামতীর গান", "সূর্য্যের গান", "চণ্ডীকাব্য" প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে সে-কালের বাঙ্গালীর ধর্ম্মগত ও সমাজগত যে উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল্য সামান্য নহে। কবিত্ব-মাধুর্য্যেও এই সকল লেখা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার একান্ত সমাদরের যোগ্য।

আজ আমরা একজন জন্মান্ধ কবির কাব্যের পরিচয়, আপনাদিগের কাছে উপস্থাপিত করিলাম। এই কবির নাম—ভবানীপ্রসাদ কর রায়। ইহাঁর প্রণীত "ভবানী-মঙ্গল" গ্রন্থ 'দুর্গা-মঙ্গল' নামে ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদকত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিয়াছেন,—

"ইংলণ্ডের অন্ধ-কবি মিল্‌টনের অস্তিত্বে ইংলণ্ডের যে গৌরব, জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কারে বঙ্গদেশের সেরূপ গৌরব কতকটা যে হইবে না, তাহা ত বলিতে পারি না! মিল্‌টনের মৌলিক রচনা জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য—'Paradise Lost' কাব্যজগতে যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে, ভবানীপ্রসাদের "ভবানী মঙ্গল" (দুর্গামঙ্গল) সে আসন পাইতে পারে না, কিন্তু সে জন্য

উভয় কবির অবস্থাগতিকে গৌরবের বিশেষ তারতম্য না হওয়াই উচিত।"—(২৮৵০ পৃঃ)

ইংলণ্ডের মিল্‌টনের স্থায় ভবানীপ্রসাদের বঙ্গে সমাদর দূরের কথা, এইরূপ একজন জন্মান্ধ কবি যে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়াও আমরা অনেকে তাহার সন্ধান রাখি না।

"ভবানী-মঙ্গল" গ্রন্থখানি প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'চণ্ডী' অবলম্বনে লিখিত। অনেক স্থানে ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় শক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশক অনেকগুলি 'চণ্ডী' কাব্য দেখা যায়। মাণিকদত্ত বোধ হয় এইরূপ চণ্ডী কাব্যের প্রথম রচয়িতা। মাণিক দত্তকে অনেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন [বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়", ৩০০ পৃঃ]। পরে হরিরাম, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ অনেকে দেবী-মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের "ভবানী-মঙ্গলে"র বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক পৌরাণিক কথা অনুসৃত হইয়াছে এবং গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে গ্রন্থকার রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও আগমনী-বিজয়ার কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন।

কবি ভবানীপ্রসাদ প্রধানতঃ চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেও গ্রন্থের আরম্ভভাগে সুকৌশলে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও গৌরীর পিতৃগৃহে যাত্রার কথা বর্ণন করিয়াছেন। বাল্মীকীয় রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের উল্লেখ না থাকিলেও এ ঘটনা যে পুরাণ-সম্মত,

> "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
> অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।"

ইত্যাদি "কালিকাপুরাণে"র বচনই তাহার প্রমাণ।

কবি ভবানীপ্রসাদ এই ভাবে গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন যে, রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রতীরে ধনুর্ব্বাণহস্তে বসিয়া আছেন, চারিদিকে সুগ্রীবাদি বানরেরা উপবিষ্ট—

> "চৌদিকে বানরমধ্যে বৈসে রঘুবর।
> নক্ষত্রবেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
> রামচন্দ্র বসিয়াছে পাতি মৃগছাল।
> বীরগণ বসিলা ভাঙ্গিয়া বৃক্ষডাল॥"

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সমুদ্রবন্ধনের কোনই আয়োজন হয় নাই। তাই,—

> "সুগ্রীবের স্থানে রাম জিজ্ঞাসে বচন।
> সমুদ্র তরিতে মিতা করহ যতন॥
> দুরন্ত সমুদ্র ঘোর নাহি কূলস্থল।
> যথা দৃষ্টি চলে তথা দেখি মাত্র জল॥
> দেবরথ নাহি চলে যাহার উপর।
> কি মতে তাহাতে পার হইবে বানর॥
> সমুদ্র নহিবে বান্ধা রাবণ সংহার।
> করিতে না পারি আমি সীতার উদ্ধার॥
> রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিতে নারি।
> অবশ্য ত্যজিব প্রাণ অনলেতে পড়ি॥
> কোন্ মুখে যাব আমি অযোধ্যা নগরে।
> কি কথা কহিব গিয়া ভরত গোচরে।"

—এই ভাবে রামচন্দ্র অনেক বিলাপ করিলেন। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—

> "পূর্ব্ব সূর্য্যবংশে ছিল সগর রাজন।
> সমুদ্র তাঁহার কীর্ত্তি জানে সর্ব্বজন॥
> তদন্তরে জন্মেছিল ভগীরথ নাম।
> গঙ্গা আনি পৃথিবী করিলা পরিত্রাণ॥
> অপরে জন্মিল গাধি রাজার নন্দন।
> ক্ষত্রিয় শরীরে তেঁহো হইলা ব্রাহ্মণ॥
> পৃথিবী বিখ্যাত সেহি বিশ্বামিত্র ঋষি।
> তপোবলে চণ্ডালীকে কৈলা স্বর্গবাসী॥
> দশরথ মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে।
> শনিকে করিলা জয় নিজ বাহুবলে॥
> সেহি বংশে জন্মিলাম মুই কুলাঙ্গার।
> নারী রাখিবারে শক্তি না হৈল আমার॥"

রামচন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

সুগ্রীব নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল; কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না।

> "হেন কালে জাম্বুবান্ কহে আগ হইয়া॥
> যোড় হাত হৈয়া জাম্বুবান্ কহে বাদ।
> নিবেদন করি প্রভু শুন রঘুনাথ॥
> যে মতে সমুদ্র প্রভু হইবে দমন।
> যে মতে হইবে রাম রাবণ নিধন॥

যে মতে করিবা তুমি সীতার উদ্ধার।
মন দিয়া শুন প্রভু রঘুর কুমার॥"—

মহামুনি অগস্ত্য এক অঞ্জলিতে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আনিয়া সমুদ্র শোষণের ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে অনায়াসে লঙ্কায় গিয়া রাবণকে বধ করিতে পারিবেন এবং সীতার উদ্ধার হইবে।

"স্মরণ করহ মুনি আসিবে নিশ্চয়॥"

অগস্ত্য মুনি আসিলে রাম তাঁহাকে সীতাহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া সীতার উদ্ধারের জন্য আর একবার সমুদ্র পান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুনি বলিলেন,—

"পুনঃ পুনঃ নীর পান উচিত না হয়।
অপরাধ বিনে কিছু পুণ্যনাশ হয়॥"—

আপনি অম্বিকার পূজা করুন, তাহাতেই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।—

"শুন রাম অভয়ার চরণ কর সার।
রাবণ বধিয়া কর সীতার উদ্ধার।"

রামচন্দ্র তখন দুর্গার মাহাত্ম্য ও পূজার বিধিব্যবস্থা জানিতে চাহিলেন।

মুনি, পূজার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিলেন,—

"বসন্তে করিল পূজা সুরথ রাজন।
সেহি মতে কর পূজা অকাল আশ্বিন॥
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী রূপধারী।
সেহি মতে কর পূজা তুমি নরহরি॥
কৃষ্ণপক্ষ নবম্যাদি দশপঞ্চ দিনে।
প্রতিপদ্ আদি করি পূজে কোন জনে॥
ষষ্ঠী আদি কল্প আছে পূজার বিধান।
তিন মত পূজা আছে শুনহ শ্রীরাম॥
প্রতিমা করিয়া পূজা করে কোন জন।
কেহ কেহ করে পূজা কুম্ভেতে স্থাপন॥
পত্রিকা স্থাপিয়া কেহ পূজে নারায়ণী।
তিন মত পূজা এহি শুন রঘুমণি॥"

অগস্ত্য ইহার পর দক্ষকর্ত্তৃক শিব-অপমানে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের গৃহে তাঁহার জন্ম, বিবাহ ও কৈলাসে অবস্থিতির বর্ণন করিয়া বলিলেন,—

"একদিন নিশিশেষে মেনকা সুন্দরী।
স্বপনে দেখিলা রাণী শিয়রে প্রাণগৌরী।"

এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে কবি ভবানীপ্রসাদ 'আগমনী'র উপাখ্যান উত্থাপন করিয়াছেন।

রাণী মেনকা স্বপ্নে কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে হিমালয়ে আনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। পিতামাতার আজ্ঞায় মৈনাক, ভগিনীকে আনিবার জন্য কৈলাস যাত্রা করিলেন।

মৈনাক শিবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া বলিলেন,—

"বিবাহের সূত্র করে গৌরী আল্যা তব ঘরে
না দেখিয়া মরে হিমগিরি॥
না দেখিয়া চাঁদমুখ বিদরে মায়ের বুক
গৌরী ছাড়ি দেও শূলপাণি।
যদি নাহি কৃপা কর শুন প্রভু মহেশ্বর
তবে মরে জনক জননী॥"

গৌরীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে শিবের দক্ষযজ্ঞের সেই অরুন্তুদ ঘটনা মনে পড়িল। তাই তিনি মৈনাকের অনুরোধ শুনিয়া নীরবে রহিলেন।—

মৈনাকের স্তব শুনিয়া মহেশ্বর।
মৌন হইয়া রহিল কিছু না দিল উত্তর॥"

গৌরী অদূরেই ছিলেন, তাঁহার—

"ভাইক দেখি মনে পৈল জনক জননী।
মৈনাকের হাতে ধরি বলে প্রিয়বাণী॥
কহ ত মৈনাক ভাই কহ সমাচার।
কুশলে আছেন পিতা জননী আমার॥"

মৈনাক বলিলেন,—

"———— দেবি কি কহিব আর।
তোমা বিনে গিরিপুর হইয়াছে অন্ধকার॥"

তাই তিনি গৌরীকে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন,—এমন কি, শেষে বলিলেন,—

"যদি না যাইবা তুমি আমার ভুবন।
তোমা বিনে বাপ মায় তেজিবে জীবন॥"

পিতামাতাকে দেখিবার জন্য গৌরীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিলেও তিনি স্বাধীন-প্রকৃতি রমণীগণের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিলেন না—

"পার্ব্বতী বোলেন ভাই শোন সমাচার।
আমার হইল ইচ্ছা মাতা দেখিবার॥
শঙ্করের বিনা আজ্ঞা যাইব কি মতে।"

পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি পাইবার জন্য গৌরী শঙ্করের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু—

"শঙ্কর বোলেন তোমায় না দিব বিদায়।
দক্ষ-অপমান দেখি মোর মনে ভয়॥
আর বার যাইতে চাহ বাপের ভুবন।
কৈলাস ছাড়িবা বুঝি হেন লয় মন॥"

দেবী কহিলেন,—

"———শুন প্রভু করি নিবেদন।
পূজা লহিবার যাই পিতার ভুবন॥
তথা থাকি ত্রৈলোক্যের লইব পূজন।
যাওয়ার কারণ এহি শুন পঞ্চানন॥
ষষ্ঠী আদি কল্প করি নবমীর দিনে।
কৈলাসে আসিব পুন দশমী বিহানে॥"

এইভাবে শিবকে বুঝাইয়া কেবল চারিদিনের জন্য দেবী উমা বিদায় লইলেন। তখন—

"শিখিপৃষ্ঠে কার্ত্তিক মূষিকে গজানন।
জয়া বিজয়া আদি যত সখীগণ॥
চলিলা ডাকিনী আর যতেক শাখিনী।
সঙ্গতি চলিলা তবে চৌষট্টি যোগিনী॥
নাচিয়া গাইয়া চলে বেতাল ভৈরব।
গাল বাজাইয়া করে হর হর রব॥"

ইহার মধ্যে একজন আসিয়া হিমালয়ে সংবাদ দিল যে, মৈনাক, উমাকে লইয়া আসিতেছে। মেনকা পথ চাহিয়াছিলেন, কাজেই—

"গৌরী আইল হেন কথা মেনকা শুনিয়া।
আরোপিল পূর্ণ কুম্ভ দূর্ব্বা ধান্য লইয়া॥
প্রতি ঘরে আলিপন সুগন্ধি চন্দন।
সুগন্ধি ষড়ঙ্গ ধূপে কৈল আমোদন॥
ঘরের উপরে সব নেতের পতাকা।
দেখি (য়া) আনন্দ বড় হইল মেনকা॥
ষোড়শী বয়সী যত পর্ব্বতকুমারী।
থরে থরে দাঁড়াইল হইয়া সারি সারি॥
কার হাতে আছে (শ্বেত) চন্দনের খুরী।
কাহার হাতেতে জ্বলে রতন দিয়ারী॥"

গৌরীর শুভাগমনে এইভাবে হিমালয়, উৎসবে পরিপূর্ণ হইল। অনেক দিন পরে সন্তানের দেখা পাইয়া মেনকার অন্তঃকরণ, বাৎসল্য-রসের সুধা-ধারায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"বহুদিনে দেখিলাম গৌরীর বদন।
নির্জ্জীব শরীরে যেন সঞ্চারে জীবন॥
যে অবধি হর নিকেতনে গেলা চলি।
তদবধি আছি মাগো মা ডাকের কাঙ্গালী॥
পুন যদি দয়া করি আসিলা অভয়া।
জনম সফল করি ডাক মা বলিয়া॥
এত বলি গৌরীকে লইয়া নিজ ঘরে চলে।
খট্টাতে বসিয়া চাঁদমুখ নেহালে॥"

গৌরী শঙ্করের নিকট বলিয়া আসিয়াছিলেন,—

'পূজা লইবারে যাই পিতার ভুবন॥
তথা থাকি ত্রৈলোক্যের লইব পূজন।'

তা'ই,—

"কত কত দশভুজা হইলা পার্ব্বতী॥
হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রৈলোক্যের পূজা॥
দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধরি।
স্বর্গমর্ত্ত পাতালে চলিলা মহেশ্বরী॥"

এইখানে শ্রীরামচন্দ্র, অগস্ত্য মুনিকে প্রশ্ন করিলেন,—

"দশভুজা মূর্ত্তি দেবী হইলা কি কারণ॥
... ...
কেমন মহিমা তাঁর কি মত আচার।
বিশেষিয়া কহ মুনি করিয়া বিস্তার॥"

মুনি কহিলেন,—

চারি বেদে আগমে পুরাণে গুণ গায়।
ব্রহ্মা আদি দেবে যার অন্ত নাহি পায়॥
বিধি বিষ্ণু অগোচর ত্রিগুণ-জননী।
নিরঞ্জন নিরাকার সাকাররূপিণী॥
মনোভূত দর্পহরি (?) দিতে নারে সীমা।
কি কহিতে পারি আমি তাঁহার মহিমা॥
যে মত শুনেছি রাম মার্কণ্ড পুরাণে।
সেহি কথা কহি কিছু তোমা বিগুমানে॥"

এইভাবে উপক্রম করিয়া কবি ভবানীপ্রসাদ অগস্ত্য মুনির মুখে সমস্ত "চণ্ডীর" ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুবাদের মধ্যেও মাধুর্য্য আছে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

ইত্যাদি দেবীস্তুতির অনুবাদে অন্ধ ভক্ত কবি লিখিয়াছেন,—

"যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
... ...
জাতিরূপে জাতিভেদ করে যেহি জনে।
তিনবার নমস্কার তাঁহার চরণে॥"

দেবী-মাহাত্ম্য প্রকাশক 'চণ্ডী' শুনিয়া—

"যোড়হাতে পুছে রাম মুনির গোচর।
কি কার্য্য করিব এখন কহ মুনিবর॥"

তখন—

"অগস্ত্যে বোলেন রাম কর অবধান।
কহিনু তোমাকে যেহি পূজার বিধান॥
মৃন্ময়ী দশভুজা করিয়া নির্ম্মাণ।
ভক্তিতে করহ পূজা সিদ্ধি হবে কাম॥
... ...
সমুদ্র হইবে বান্ধা রাবণ সংহার।
হেলায় করিবা রাম সীতার উদ্ধার॥"

কিন্তু এক সমস্যা উপস্থিত হইল, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে কে? সুগ্রীব বলিলেন, নল নীল, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র;—

"তাহারা করিতে পারে প্রতিমা গঠন।—
আমি সবে করি অন্য দ্রব্যের আয়োজন॥"

নল নীল যে দেবী প্রতিমা গড়িল, কবি তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"বদন শারদ ইন্দু কি মোহন শোভা।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের আভা॥
মৃগমদ চর্চ্চিত তিলক বিন্দু বিন্দু।
হেরিয়া লজ্জিত তাহে শরতের ইন্দু॥
খগচঞ্চু নাসাতে বেসর মুক্তাফল।
রতন নূপুর পদে করে ঝলমল॥
শ্রুতিমূলে কর্ণফুলে তপ্ত হেমচাকী।
নীলপদ্মে স্বর্ণভৃঙ্গ করে ঝিকিমিকি॥
চাচর কেশের বেণী পবনে দোলায়।
নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
... ...
অতসী কুসুম জিনি অঙ্গের বরণ।
নিম্মাইল দশভুজ মৃণাল যেমন॥
... ...
মহিষের স্কন্ধে বামপদ আরোহণ।
সিংহের পৃষ্ঠেতে দিল দক্ষিণ চরণ॥
... ...
বামহাতে ধরে দেবী অসুরের চুল।
দক্ষিণ হস্তেতে বুকে হানিছে ত্রিশূল॥
... ...
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
মস্তক উপরে নিলা বৃষে পশুপতি॥
ডাহিনেতে গণপতি বামে ষড়ানন।
ময়ূর বাহনে অতি দেখিতে শোভন॥
এহি মতে করিলেন প্রতিমা গঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল যত দেবগণ॥"

প্রতিমা গঠিত হইলে—

"বানরেরে আজ্ঞা দিলা কমল লোচন।
আনিল পূজার দ্রব্য করি আয়োজন॥
তবে পূজা আরম্ভিলা রাম নরহরি।
পুরোহিত হৈলা ব্রহ্মা হাতে কুশ করি॥"

তা'রপর বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের রীতিতে ষষ্ঠীতে বোধন, বিল্ববরণ, অধিবাস, সপ্তমীতে পত্রিকা প্রবেশ, মাষভক্তবলি, মহাস্নান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, গণেশাদি দেবতার পূজা, অঙ্গন্যাসাদি ধ্যান, মানসোপচারে পূজা ও পুনর্ব্বার ধ্যানের পর—

"মূলমন্ত্র উচ্চারণ করি রঘুমণি।
ষোল উপচারে পূজা করে নারায়ণী।"

ষোড়শ উপচারের ক্রমও কবি সুন্দর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন;—

"রজত আসন পূর্ব্বে দিলা রঘুনাথ।
স্বাগত বচন কহে করি প্রণিপাত॥

পুন আচমনী দিয়া করাইলা স্নান।
বিচিত্র বসন দিলা কাঞ্চনে নির্ম্মাণ॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত জত দিলা আভরণ।
সুগন্ধি চন্দন রাম কৈলা সমর্পণ॥
লক্ষ লক্ষ নীল পদ্ম চন্দনে মাখিয়া।
অভয়ার পদে রাম দিলা সমর্পিয়া।"

এইভাবে ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নিবেদনান্তে প্রতিমাস্থ দেবতার পূজা, আচরণ পূজা করিয়া—

"পূজা সমাপিলা রাম সপ্তমীর দিনে॥"

সপ্তমীর ন্যায় অষ্টমী নবমীতেও বিধিমত পূজা হইল। তিন দিনই ছাগ মহিষাদি বহু বলির ব্যবস্থা ছিল। বলির অন্তে—

"সমাংস রুধির রাম করে সমর্পণ।"

পূজা সাঙ্গ করিয়া রাম হোম আরম্ভ করিলেন—

"নবীন শ্রীফল-পত্র ঘৃতেতে মাখিয়া।
অগ্নিমধ্যে দিলা তাক মূল উচ্চারিয়া॥"

রামচন্দ্রের এই পূজারূপ তপস্যায় দেবী তুষ্ট হইলেন। দেবী বর দিতে প্রস্তুত হইলে রামচন্দ্র বহু স্তুতি করিয়া কহিলেন,—

"যদি বর দিবা তুমি নিবেদন করি আমি
বর দেহ কাটি দশস্কন্ধ।
পার হইয়া যাই তথা, উদ্ধার করিব সীতা
হেলায় সাগর হয় বন্ধ॥"

দেবী বর দিলেন। রামচন্দ্র আর একটী বর প্রার্থনা করিয়া লইলেন,—এই অকাল আশ্বিন মাসে—

"ভক্তি করি এহি পূজা করিবে যেহি জন।
যার যেহি বাঞ্ছা সিদ্ধি হইবে তখন॥"

দেবী অন্তর্হিত হইলে রাম বিজয়া দশমীর প্রাতঃকালে নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজা করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন।

এইবারে কবি আবার কৌশলে বিজয়ার অবতারণা করিয়াছেন।

"নবমী যামিনী যদি হৈল অবসান।
কৈলাসেতে উচ্চাটন শঙ্করের প্রাণ॥"

মহাদেবের আজ্ঞায় নন্দী বৃষ সাজাইয়া আনিল। শিব তাহাতে আরোহণ করিয়া নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া গৌরী আনিতে হিমাচলে চলিলেন। শঙ্কর সপারিষদে হিমালয়ে উপস্থিত হইলে—

"মেনকার দেখি শিব উড়িল জীবন।
গৌরী নিতে আইল শিব বুঝিলা তখন॥"

রাণী মেনকা কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। গিরিরাজ অস্থির হইয়া উঠিলেন। 'আবার এক বৎসর পরে অবশ্য আসিব'—

"এহি বলি বাপ মাএ করিয়া আশ্বাস।
শিবের সঙ্গেতে দেবী চলিলা কৈলাস॥"

গিরিপুর অন্ধকার হইল।—সংক্ষেপে গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু এইরূপ।

গ্রন্থকার ভবানীপ্রসাদ, জন্মান্ধ, ইহা তিনি এই গ্রন্থ মধ্যেই একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।—

"ভবানীপ্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
"জন্ম অন্ধ ভগবতি কৈরাছ আমায়।"—(১১৩ পৃঃ)
"জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর পরিচয় নাহি লিখিবার তরে॥"—(১৩৭ পৃঃ)
"ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল॥"—(১৫৪ পৃঃ)
"জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥"—(২০০ পৃঃ)

কবি অন্ধ হইলেও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি, তাঁহাকে গ্রন্থ রচনায় প্ররোচিত করিয়াছিল। ভক্ত কবি লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন বটি জন্ম অন্ধ।
শরীরে ত নাহি মোর শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ভাল মন্দ দোষগুণ নাহিক বিচার।
স্বপনে কহিলা মাতা ভাষা রচিবার॥
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিনু আমি অন্য নাহি জানি॥"—(১৪ পৃঃ)

ইহা প্রকৃত বিদ্বানের বিনয়-বাণী—যথার্থ ভক্তের আত্ম-নিবেদন। কবির অক্ষর-পরিচয় না থাকিলেও শাস্ত্র-শ্রবণ ছিল। এই 'শ্রবণের' পর তিনি যে অনন্যচিত্তে 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসন' করিয়াছিলেন, সে পরিচয়, গ্রন্থের অনেক স্থানেই আছে। কবি যে ভাবে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ও পূজাপদ্ধতির যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক বলিয়াই মনে হয়।

প্রত্যেক দেশের সাহিত্য পাঠ করিলে সেই দেশের জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য, সমাজের

দর্পণ। বৈদেশিক সাহিত্যের প্লাবনের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালীর জাতীয় প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়াছে, স্বীকার করিলেও তাহা যে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আজও বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে রামায়ণ মহাভারতের কথকতা, চণ্ডীর গান, পদাবলীর কীর্ত্তন সিংহাসন পাতিয়া বসিয়া আছে। যাঁহারা এই সকল সাহিত্যকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া তিরস্কার করেন, তাঁহাদিগকে কবি রবীন্দ্রনাথের—

"শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্র বর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাযথের সীমা কোন্ খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।......প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রকৃত।"—[প্রাচীন সাহিত্য]

—এই উক্তি স্মরণ করিতে বলি।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সেকালের আগমনী-গীতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ফলতঃ যদি প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষার রীতির নমুনা দেখিতে হয় তাহা হইলে দু পাঁচজন পুরাতন গ্রন্থকারের রচনা ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না।......একটি গান আমার মুখস্থ আছে, সেটি হাটে বাজারে ভিখারীরা গাহিয়া দু' এক পয়সা উপার্জ্জন করে। সেই ১০।১২ পংক্তির মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গালা রীতির এত নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার তর্জ্জমা করা আধা ইংরাজী লেখা যাঁহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের সর্ব্বদা সেই ১০।১২ পংক্তি চক্ষুর সম্মুখে রাখা মন্দ নহে।......এমন সরল ভক্ত খাঁটী বাঙ্গালী কবি এখন আর জন্মে না কেন?"—[পুরাতন প্রসঙ্গ]।

তবে কি বাঙ্গালা সাহিত্য চিরকালই এক ভাবে থাকিবে? বিদেশ হইতে বৈভব সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিপুষ্টির চেষ্টা কি অসঙ্গত? ইহার উত্তরে বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, "প্রবন্ধ-পঞ্চক" পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুক্তি করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"......পরিবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি এক জিনিষ নয়। যে সকল বাহ্য উপকরণের দ্বারা সাধারণতঃ শরীর পরিপুষ্ট হয়, অন্তর্হিত শক্তি রূপান্তরিত হইলে সেই উপকরণগুলিই আবার অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যের জন্য বাহ্য উপকরণগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য স্তূপীকৃত করিলেই তাহারা নিজ হইতে রক্ত-মাংসে পরিণত হইতে পারে না। যে আভ্যন্তরীণ শক্তিটী এই পরিণতির মূল কারণ, সেই শক্তি যত দিন অটুট থাকে, তত দিনই বাহ্যবস্তু মঙ্গলের আকর হয়। কিন্তু যখন অনভ্যস্ত বৈদেশিক বস্তুর চাপে ঐ সমীকরণী শক্তি নষ্ট হয়,—তখন সেই বস্তুই অনিষ্টের মূল হইয়া পড়ে। তেমনই সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টিসাধনের জন্য বহির্জগতের সঙ্গে আদান প্রদানের দ্বার উন্মুক্তই রাখিতে হইবে; কারণ, বদ্ধ মন্দিরে রস-লহরীর বিচিত্র লীলার অবসর হয় না। কিন্তু কেবল বৈচিত্র্য-লালসায় রস-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে সেখানে আর জাতীয় সাহিত্যের প্রাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যকে চণ্ডীদাস বা দাশরথির ছাঁচে ঢালা সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে, বৈদেশিক পদ্ধতির অনুকরণ করিলেই তাহা বঙ্গসাহিত্য হইবে না; বিদেশী সাহিত্যের বাঙ্গলা সংস্করণ ও বিদেশী ভাবে পরিপুষ্ট বঙ্গসাহিত্য এক জিনিষ নয়। যখন আমরা বঙ্গ-দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া সাহিত্যকে বিশ্বক্ষেত্রে টানিয়া লইতে চাই, তখন এ কথাটী মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, বাঙ্গালা বিশ্বের বাহিরে নাই, ব্যষ্টির বিশিষ্টতাকে নষ্ট করিয়া যে বিশ্বের রচনা করা হয় তাহা সঙ্কীর্ণ বিশ্ব অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক।"—[বঙ্গসাহিত্য ১ম বর্ষ ৩য় খণ্ড]

"দুর্গামঙ্গলে"র কবি ভবানীপ্রসাদের পিতার নাম নয়ন কৃষ্ণ রায়। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য, উপাধি কর রায়। আটিয়া পরগণায় কাটালিয়া গ্রামে কবির নিবাস। পিতা মাতা কবির অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হন। এই সকল কথা তিনি গ্রন্থের নানা স্থানে নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

কবি জন্মদুঃখী ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা কালীনাথ তাঁহাকে আদর-যত্ন করিতেন; কিন্তু কালীনাথের পুত্র দুইটী—বিশেষতঃ কনিষ্ঠ পুত্রটী স্বীয় দুশ্চরি-ত্রতার জন্য জন্মান্ধ পিতৃব্যের প্রতি বড়ই অসদ্ব্যবহার করিত। সে ব্যবহার এতই অসহনীয় হইয়াছিল যে, কবি

গ্রন্থে পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করিয়া ইষ্টদেবীর কাছে জানাইয়াছেন,—

"এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়।
তোমার চরণ বিনা না দেখি উপায়॥
দুষ্ট হাত হৈতে কালি কর অব্যাহতি।
তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার।
এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥
আমি অঙ্গক্রিয়াহীন না দেখি উপায়।
শরণ লৈয়াছি মাতা তব রাঙ্গা পায়॥"

(২০১—২ পৃঃ)

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখক তাঁহার এই স্বজাতি কবির প্রতি সুবিচার করেন নাই। তাঁহার লেখার ভাবে মনে হয়, তিনি অন্ধ কবির এই আক্ষেপোক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার ধারণা, "কবি স্বীয় পারিবারিক বিদ্বেষ বশতঃ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিবার সুযোগ লইয়া অপরের গ্লানি" করিয়াছেন। "তজ্জন্য তাঁহার প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাত্মাকে রুষ্ট করা সুরুচির পরিচায়ক কিংবা ভূতযোনিতে বিশ্বাস করিলে নিরাপদ হইবে না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৪৫ পৃঃ) অর্থাৎ ভূতের ভয় না থাকিলে লেখক অন্ধ কবির প্রতি আরও শ্লেষ-বাক্যের প্রয়োগ করিতেন। তথাপি লেখক, কবিকে একেবারে রেহাই দেন নাই,—তাঁহার পদ্যের মিলের দোষ ধরিয়াছেন। অন্ধ কবি, "কথা" ও "বৈরতা" "রাজন" ও "পরাক্রম" "শ্রীরাম" ও "জাম্বুবান্" "অনুপম ও "প্রজাগণ" ইত্যাদি মিল করিয়াছেন। কিন্তু এই অধম মিলের জন্য অন্ধ কবিকে দোষ দিতে হইলে প্রাচীন প্রায় সমস্ত কাব্যকেই দুষ্ট বলিতে হয়। "কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্য কোন কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় নাই।" এ নির্দ্দেশও আমরা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না।

গ্রন্থের প্রথম আবিষ্কারক রসিকচন্দ্র বসু—

"চন্দ্র মুনি * * আর দিক্ নিয়া সাথে।
রচিল পুস্তক রায় প্রকাশ করিতে॥"

গ্রন্থশেষোক্ত এই প্রমাণ অনুসারে ১০৭১ সন বাহির করিয়া কবি ভবানীপ্রসাদকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের প্রবন্ধে দুইশত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছিলেন। "বঙ্গভাষা সাহিত্যে"র লেখকও সম্ভবতঃ এই প্রমাণ অনুসারে লিখিয়াছেন,—"ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন"; (৪র্থ সংস্করণ) কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "চন্দ্রমুনি—" শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"এই কবিতার প্রথম চরণে দুইটী বর্ণের লোপ হইয়াছে। আদর্শ পুঁথিতে ঐ স্থান গলিত বা পোকায় কাটা থাকায় রসিক বাবুর প্রতিলিপিতে ঐ স্থানে তারা-চিহ্ন দেওয়া আছে।.........রসিকবাবু ১০৭১ সন ধরিয়া কবিকে দুই শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক ধরিয়াছেন; কিন্তু সন কি শকাব্দ, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় তারা-চিহ্ন স্থানে কোন অঙ্কবোধক শব্দ ছিল বলিয়া ধরিয়া লইলে উহাকে শকাব্দের অঙ্ক না বলিয়া পারা যাইবে না।"

—এই ভাবে আলোচনা করিয়া ব্যোমকেশ বাবু কবিকে ১৪৭১ শকাব্দার লোক স্থির করিয়া তাঁহাকে চৈতন্য যুগের প্রথম শতাব্দার কবি বলিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শিত শ্লোক হইতে ১৪৭১ শকাব্দা কিরূপে বাহির হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তা'রপর "চন্দ্রমুনি"—ইহার পর অঙ্কবোধক শব্দ ছিল স্বীকার করিলে ১০৭১ বা ১৪৭১—এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সময়ই বাহির হইতে পারে না। তবে গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণে 'চৈতন্য-বন্দনা' দেখিয়া তিনি চৈতন্য যুগের পরবর্ত্তী কবি, এইমাত্র জানিতে পারা যায়।

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতীদেবী সরস্বতী

(৩)

পূজা আসিয়া পড়িল। সারা বঙ্গ মায়ের আগমনের সাড়া পাইয়া পুলকে ভরিয়া উঠিল। ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর—সব স্থানেই আনন্দ বিরাজ করিতে লাগিল। আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষে সকলের মরা প্রাণে জীবন-সঞ্চার হইল। রোগী রোগ-যাতনা ভুলিল, শোক-কাতর শোক ভুলিল।

মৃত বাংলার বুকে জীবন-সঞ্চারের সময় এই। তাই এ সময় পথে-ঘাটে প্রফুল্ল-মুখ নর-নারীকে দেখিতে পাওয়া যায়। চিররুগ্ন যে, জীবন বহন করা যাহার পক্ষে একেবারেই দুর্ব্বিষহ, সেও এ সময়ে রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়,—এক বৎসর পরে জগজ্জননী মাতৃমূর্ত্তি দেখিবার আশায় সেও ব্যগ্র হইয়া উঠে।

প্রবাসী এ সময় দেশে ফিরিয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিয়া বিদেশবাসের সকল কষ্ট বিস্মৃত হয়। তাহার হৃদয়ে এ সময় বিরাজ করে সুবিমল শান্তি, মুখে ফুটিয়া উঠে আনন্দের দীপ্তি।

মা আসিতেছেন, তাই আকাশ আজ সুনীল। মাঝে মাঝে অতীত বর্ষার স্মৃতি সম দুই-এক খণ্ড শ্বেতাকার মেঘ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া আবার ভাসিতে ভাসিতে বহুদূরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই চোখে আসিয়া পড়ে প্রভাতের শান্তস্নিগ্ধ তরুণ তপনের তরুণ আলোর একটু রেখা,—নির্ম্মল বিপুল আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে।

পাখীরা শরৎ-গীতি গাহিয়া সেই নীলাকাশের গা ঘেঁসিয়া দলে দলে উড়িয়া যাইতেছে। গৃহের পার্শ্বে শেফালী ফুলগুলি ফুটিয়া সারারাত মধুর গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া এখন প্রভাত-বায়ু-স্পর্শে ঝরিয়া মাটিতে পড়িতেছে,—ঝরাফুলের গন্ধে এখনও চারিদিক প্লাবিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মহানন্দে ফুল কুড়াইয়া বেড়াইতেছে। ছোট পুষ্করিণীর ওধারে ঘন বাঁশবন—তাহার মধ্যে অন্য গাছও আছে। পাখীর দল সেই বাঁশবনে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে। প্রভাতের তরুণ সূর্য্যের আলো বাঁশঝাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল, পাতাগুলি চিকমিক করিতেছিল। ঘন পাতার ফাঁক দিয়া সে আলো এখনও ভিতরে পড়িতে পারে নাই,—ভিতরটা ছায়াপূর্ণ সুশীতল। একটা সরু বাঁশের আগায় গুটিকত কচি পাতা বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝি বসন্ত-সমাগম-ভ্রমে একটা পাপিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল, চোখ গেল; বহুদূর হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছিল।

চিরবসন্ত এই স্থানটীতে বিরাজমান। তেমনি শ্যামল লতা-পাতায় জড়াজড়ি, মাতামাতি খেলা ; তেমনি পাখীর গান ; তেমনি মৃদুমন্দ বহমান বাতাস। পুষ্করিণীর কালো জলে একটীও পানা ছিল না। বাতাসে পুষ্করিণীর স্থির জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছিল। তাহার উপর সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িয়া ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতেছে। পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত কলাগাছের সারি ; তাহার ছায়া জলে পড়িয়া তরঙ্গের আঘাতে কাঁপিতেছে।

সত্য একটা ছিপ লইয়া মাছ ধরিবার উদ্দেশ্যে ছোট ঘাটের উপর বসিয়াছিল। বাগান ও পুষ্করিণী বিক্রয় করিয়া দিয়াও উপেন্দ্রনাথ এ গুলি জমা লইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার খিড়কিতে এই পুষ্করিণীটি থাকায় সকল কাজের সুবিধা ছিল। বাড়ীর ঠিক সম্মুখে পথের ধারে একটী বড় ও পরিষ্কার পুষ্করিণী ছিল। তাহাতে যাইতে গেলে সকল লোকের সম্মুখ দিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কাজেই সে পুষ্করিণীতে সদাসর্ব্বদা যাওয়া দেবীর পক্ষে বড় কষ্টকর ছিল। এই পুষ্করিণীটী খিড়কিতে থাকায় দেবীর সকল দিকেই সুবিধা ছিল, প্রকাশ্যে বাহির হইবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না। এই পুষ্করিণীটি পথ হইতে দেখা যায় না।

মাছ যে কতবার টোপ খাইয়া পলাইল, তাহার ঠিক নাই। অন্যমনা সত্য চাহিয়া ছিল সেই চিরবসন্তের লীলা-ভূমি বাঁশবনের দিকে। কত নামজানা পাখী, কত অজ্ঞাত-নামা পাখী সেখানে উড়িতেছে, নাচিতেছে, গান গাহিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দৃশ্য দেখিতে বিভোর হইয়া সে ছিপখানা জলে ফেলিয়াই বসিয়া ছিল, অন্য দিকে তাহার মোটে খেয়ালই ছিল না।

পিছনে ঝন্‌'ৎ করিয়া চাবীর শব্দ হইল। সত্য চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, একগোছা বাসন দুই হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেবী। মুখখানা তাহার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, দুই হাত বাসনে যুক্ত থাকায় সে মুখের উপরে অবগুণ্ঠন নামাইয়া দিতে পারে নাই। প্রভাতের তরুণ তপনের কিরণ মুক্ত ভাবেই তাহার সুন্দর মুখখানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। মৃদু বাতাসে তাহার চূর্ণ অলকগুচ্ছ ললাটের উপর অসংযত ভাবে পড়িয়া নাচিতেছিল। অঞ্চলটা যে পিছনে পায়ের তলায় পড়িয়া লুটাইতেছিল, সেদিকে তাহার মোটে খেয়াল ছিল না।

মাথার উপর দিয়া একটা পাপিয়া ডাকিয়া উড়িয়া গেল। তাহার চীৎকারে মোহমুগ্ধ সত্যর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে একটু হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া বলিল, "ঘাটে নামবে, তা নাম। ওই বাসনের গোছা নিয়ে অমন ভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ,—কষ্ট হচ্ছে না ?"

একটু হাসির রেখা দেবীর মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ অবনত করিয়া ঘাটে নামিয়া বাসন নামাইয়া রাখিল।

সত্য বঁড়শিতে টোপ গাঁথিতে গাঁথিতে বলিল, "কিন্তু বড় বেমানান হয়ে গেল দেবী, জীবন্ত কাব্যটা গড়ে তুলতে তুলতে হঠাৎ মাটী হয়ে গেল। পেছন হতে যদি বাসনের গোছা না নিয়ে আসতে, হঠাৎ যদি পুকুরের ওধারকার বনজঙ্গল ফাঁক করে ওই সাদা জায়গাটায় এসে দাঁড়াতে, ওপরের ওই ফুলভরা লতাগুলো ঝুলে যদি তোমার মাথায় বুকে বাহুতে লুটিয়ে পড়ত, তবেই ঠিক হতো,—ঠিক যেন বনদেবী আমার মৌন তপস্যায় বিচলিতা হয়ে উঠে আর থাকতে না পেরে আমার সামনে ভেসে উঠত।"

দেবী নত হইয়া বাঁ হাতটা ধুইয়া মাথার কাপড়টা একটু নামাইয়া ললাট পর্য্যন্ত দিতে দিতে বলিল, "আমারই ভুল হয়ে গেছে, তোমার মনের খবরটা জানতে পারি নি। তুমি যে বনদেবীর মূর্ত্তির কথা ভাবছিলে, তা যদি জানতে পারতুম, তা হলে এদিক দিয়ে না এসে ওদিক দিয়ে এসে ঠিক তোমার নির্দ্দেশিত জায়গাতেই দাঁড়াতুম।"

সত্য বিমুগ্ধনেত্রে তাহার সুন্দর মুখখানার পানে তাকাইয়া বলিল, "ঘোমটা আবার টানছো কেন দেবী ? দিনের বেলা খোলা মুখ তো কখনই দেখতে পেলুম না ! আজ যদিও বা হঠাৎ একটুখানি দেখতে পেলুম, তাও আবার দেড়হাত ঘোমটা টেনে ঢেকে ফেলছো।"

দেবী একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, "দেড় হাত ? মিথ্যে কথা বলো না, এই তো মাত্র চোখ পর্য্যন্ত নামিয়েছি।"

সত্য বলিল, "ও-টুকু এখন না দিলেই বা কি ক্ষতি হতো ? কেউ তো এখানে নেই যে দেখতে পাবে ?"

দেবী বলিল, "এখনই ঠাকুরঝি আসবে যে। সে বলে দিলে—আমার খানকতক বাসন মাজা হলেই সে নিয়ে যাবে।"

"ওঃ, তবে আর একটু বেশী করে ঘোমটাটা দাও, নইলে ওইটুকু ঘোমটা থাকলে সে তোমায় একেবারে বেহায়া

বলে ডাকবে—” বলিয়া সত্য যেন একটু রাগ করিয়াই নিবিষ্টচিত্তে মাছধরার দিকে দৃষ্টি করিল।

কিন্তু ফাতনার দিকে তাহার দৃষ্টি বড় বেশীক্ষণ নিবদ্ধ রহিল না,—একটু পরেই দৃষ্টি ঘুরিয়া দেবীর সুগৌর সুগোল কমনীয় হাতখানার উপর গিয়া পড়িল। হা ভগবান! এমন হাত দুখানি কি শুধু সংসারের কাজ করিবার জন্তই সৃজিত হইয়াছে? সত্যর কি এমন ক্ষমতা হইবে না যে এই হাত দুখানিকে এই সব দাসীযোগ্য কাজ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অত্যন্ত কোমল স্বরে ডাকিল, “দেবী—”

অন্তমনস্কা দেবী এ আহ্বানের জন্ত প্রস্তুত ছিল না, তাই সে চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল; দেখিল, স্বামীর করুণ নেত্র দুইটী তাহারই মুখের উপর পতিত। দেবীর চোখ লজ্জাভরে নত হইয়া পড়িল। মুখখানা নত করিয়া সে নিবিষ্টমনে বাসন মাজিতে মাজিতে অন্যমনস্কার মত উত্তর দিল “কি বলছো?”

সত্য করুণ সুরে জিজ্ঞাসা করিল, “বাসন মাজতে খুব কষ্ট হয়, না?”

স্বামীর এ প্রশ্নের অর্থ দেবী কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বাসন মাজা হইতে বিরত হইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

সত্য গভীর সুরে বলিল, “এমন দিন চিরদিন থাকবে না দেবী. চিরকাল তোমায় এ কষ্ট সইতে হবে না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি যদি একটা মানুষ হতে পারি, তবে আমাদের সকল কষ্ট ঘুচবে। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না?”

তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। দেবী শান্ত সুরে বলিল, “চাইবেন না এমন কথা হতে পারে না, চাইবেন বই কি। মনের মধ্যে বিশ্বাস রেখো—তিনি তোমায় মানুষ করে দেবেনই। তোমার যা কাজ তাই তুমি করে যাও, তার ফল অবশ্যই পাবে। আমার কষ্ট ভেবে কাতর হচ্ছো,—এতে আমার কষ্ট এতটুকু নেই। আমি মিথ্যে কথা বলছিনে,—তুমি স্বামী. দেবতা, তোমার সামনে মিথ্যে কথা বললে আমার নরকেও স্থান হবে না জানি। এই কাজ করতে আমি যে কত আনন্দ পাই, তা তুমি জানতে পার না বলেই মনে কর আমার কষ্ট হচ্ছে। কাজ আমায় করতে না দিলে আমি মরে যাব—কাজ ছাড়া আমি একদণ্ড থাকতে পারি নে। দুদিন মাত্র অসুখ হয়েছিল, তার জন্তে ঠাকুরঝি আমায় চার পাঁচ দিন কাজ করতে দেয় নি, রাঁধতে দেয় নি; আমার তখন যা অবস্থা হয়েছিল, তা আর তোমায় কি বলব। শেষে সত্যিই যখন কেঁদে ফেললুম—”

বলিতে বলিতে সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই সরল হাসিমাখা মুখখানা দেখিয়া সত্য সব বেদনা ভুলিয়া গেল, সে তন্ময় হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

দেবী হাসি সামলাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, “আমার কথা ছেড়ে দাও,—আমি বেশ আছি, এতটুকু কষ্টও আমার নেই। তুমি যা করছ কর, আর একটা বছর বই তো নয়। তার পর পাশটা দেওয়া হলেই একটা কাজ নিশ্চয়ই করবে। তখন ইচ্ছে করলে একটা ঝি রাখা যেতে পারবে।”

সত্য মুখ ফিরাইয়া বেদনাভরা কণ্ঠে বলিল, “তা আর কি করে হবে দেবী, আমার পড়া যে একেবারেই বন্ধ হচ্ছে।”

দেবীর মনে চকিতে শ্বশুরের সেই কথাগুলা জাগিয়া উঠিল। সে অন্তমনা হইয়া বলিল, “কেন?”

“বাবা আর খরচ চালাতে পারছেন না।” বলিয়া সত্য আবার নিবিষ্ট মনে বঁড়শিতে টোপ গাঁথিতে লাগিল। দেবীও নীরবে বাসন ধুইতে লাগিল।

সূতা জলে ফেলিয়া সত্য দেবীর পানে চাহিল; বলিল, “আর পড়াশুনা হবে না, এবার চাকরীর চেষ্টায় বেরুতে হবে। বাবা বললেন, চাকরী না করলে আর সংসার চলছে না, তিনি অপারগ হয়ে পড়েছেন। তবে কি করে আর পড়াশুনা চলবে দেবী, কিন্তু—”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসকে সে আর কোনমতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না, অতর্কিতে দেবীর সম্মুখেই বাহির হইয়া পড়িল। সে বলিল—“মাত্র একটা বছরের জন্তে পড়াটা আমার বৃথা হয়ে গেল। এই পাশটা দিতে পারলে একটা মানুষ হওয়ার আশা থাকত,.বড় কাজও পেতে পারতুম; কিন্তু কিছুই হল না দেবী, আমার আশা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল। বাবা মাসে বার টাকা করে দিতেন, বাকি টাকা টিউশানী করে যে কষ্টে যোগাড় করতুম, তা কোন দিনই বলি ৷ দেবী। বড় আশায় আমি কোন কষ্টকে কষ্ট

বলে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নি। যেমন তেমন করে যদি আর একটা বছরও পড়াটা চালাতে পারতুম,—"

সে আর কথাটা শেষ করিল না।

দেবী ধীরে ধীরে বলিল, "একটা কথা বলব, শুনবে?"

সত্য একটু হাসিল, বলিল, "কি রকম কথা, একটা বছর আমার পড়ার খরচ তুমি চালাবে?"

দেবী কথার উপর একটু জোর দিয়া বলিল, "যদিই চালাই সেটা তো নিন্দনীয় কাজ নয়। তোমার এক বছরের পড়ার খরচ যা লাগে, তা আমি দেব, তুমি পড়। এত বড় একটা ক্ষোভ তোমার মনের মধ্যে থেকে যাবে, সেটা আমার বড় অসহ্য।"

সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি আছে তোমার যা দেবে?"

দেবী অবনত মুখে বাসন ধুইয়া সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "আমার তো কয়েকখানা গয়না আছে।"

"তোমার গয়না?" বিস্ফারিত চোখে সত্য দেবীর পানে চাহিল।

দেবী মুখ তুলিল, যুগল নয়নের স্থিরদৃষ্টি সত্যর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমার গয়না। কি হবে সেগুলো অনর্থক তুলে রেখে—বল তো? আমি সেই বিয়ের সময় ছাড়া সেগুলো আর পরি নি, এখন পরবও না। বাক্স সাজিয়ে মন ঠাণ্ডা করে তুলে রাখবার জন্যে তো গয়নার সৃষ্টি হয় নি, সৃষ্টি হয়েছে আপদে-বিপদে পড়লে রক্ষা করবার জন্যে। সামান্য টাকার জন্য তোমার এতকালের আশা, এত কষ্ট স্বীকার সবই মাটী হবে, আর সে গয়না আমি যক্ষের ধনের মত বাক্স ভরে আগ্‌লে বসে থাকব, এও কি কখনও হতে পারে?"

সত্য অপলকনেত্রে স্ত্রীর সুন্দর সরল পবিত্র মুখখানার পানে চাহিয়া ছিল, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, তা হয় না দেবী।"

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হয় না?"

সত্য উত্তর দিল, "কেন হয় না, এর কারণও তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে? আজ দুই বছর বিয়ে হয়েছে—একটী দিনের জন্যেও তোমায় সুখী করতে পেরেছি কি? তোমার হাতের কাজ একটী দিনের জন্যে তোমার হাত এড়াতে পেরেছে কি? পরণে একখানা ভাল কাপড় দিতে পারিনি, একখানা গয়না এ পর্য্যন্ত তোমায় দিতে পারি নি। তোমার বাপের বাড়ীর দেওয়া যে গয়না কখানা রয়েছে, অবশেষে তাও কেড়ে নেব? ছিঃ, এমন স্বার্থপর আমি এখনও হই নি দেবী, তোমার গায়ের গয়না নেবার প্রবৃত্তি এখনও মনে আসে নি।"

দেবী একটু হাসিল, বলিল, "স্বার্থপরের কথাই বটে। কি যে বল তার ঠিক নেই। গয়না আমার না তোমার? আমার বাবা গয়না আমায় দিয়েছেন না তোমায় দিয়েছেন? এ কি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? না হয় মনে কর—তোমার দরকার পড়েছে তাই গয়না কখানা আমার কাছ হতে ধার নিচ্ছ। যখন তোমার সুসময় হবে, তখন আমার জিনিস আমাকেই ফেরত দেবে। বরং না হয় কিছু সুদ হিসাব করে দিয়ো।"

সত্য চিন্তাবিষ্টের মতন খানিক বসিয়া রহিল। দেবী বলিল, "এতে এত ভাবনার যে কি দরকার, তা আমি বুঝতে পারছি নে। আমার কথা শোনো, সংসার এখন যেমন চলছে এমনি চলুক। তুমি আর একটা বছরে পাশ করে বার হও। তার পর এমন দিন যে থাকবে না সে জানা কথা। সংসারের জন্যে তোমার এখন একটুও ভাবতে হবে না।"

সত্য একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "আর উপায় যখন নেই, অথচ পড়াটা এখন ছাড়তেও যখন আমার মন সরছে না, তখন বাধ্য হয়েই তোমার টাকা আমায় নিতে হল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তোমায় এর ডবল গয়না দিতে পারি।"

ছার গহনা,—দেবীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার হাতের শাঁখা লোহা ও সিঁথার সিঁদুর বজায় থাক। শাঁখা যত গৌরব দিতে পারে সোণার চুড়ি তত দিতে পারে না। সোণা যে-সে পরিতে পারে; কিন্তু শাঁখা আয়ুষ্মতী ব্যতীত আর কেহই পরিতে পারে না।

তথাপি স্বামীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সে বলিল, "সে কি আর একবার করে প্রার্থনা করব? দামোদরের কাছে আমি প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করি—তিনি যেন তোমার ভালই করেন।"

সত্য উৎসুক ভাবে বলিল, "আর তোমার?"

দেবী হাসিল, "তোমার হলেই আমার হবে। তুমি যদি বড় কাজ পাও, আমায় তার ভাগ তো দিতেই হবে।"

সত্যর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, "তাই বটে, তুমি যে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমার সহধর্ম্মিণী।"

দেবী বাঁসন তুলিতে তুলিতে বলিল, "আর যদি মরে যাই তা হলে—"

"আবার ওই কথা দেবী!" সত্য রাগ করিল।

ত্রস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া দেবী বলিল, "চুপ কর, ঠাকুরঝি আসছে।"

সত্য বিরক্তভাবে বলিল, "আঃ, তাকে আবার লজ্জা? ভবানী আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, তাকে আবার আমি লজ্জা করতে যাব?"

শান্তমূর্ত্তি ভবানী পিছন হইতে ছোড়দার উক্তি শুনিল, একটু হাসিয়া বলিল, "কিসের লজ্জা ছোড়দা?"

সত্য বলিল, "দেখ্ না, তোর বউদি আমায় শিখিয়ে দিচ্ছে,—ঠাকুরঝি আসছে, একটু লজ্জা অনুভব করতে শেখ।"

"আচ্ছা, এর জন্যে বউদিকে শাস্তি দেওয়া যাবে। অতগুলো বাসন নিয়ে যেতে পারবে না বউ, আমার হাতে কতকগুলো দাও। সব তাতেই তোমার জোরের কাজ ভাই! বললুম আমি বাবাকে তাঁর বই খাতা দিয়ে আসছি, তুমি কথা না শুনেই চলে এলে।"

কতকগুলা বাসন লইয়া ভবানী ভ্রাতৃবধূকে লইয়া চলিয়া গেল।

(৪)

পূজার পরে সত্যর কলেজ খুলিবার সময় হইয়া আসিল।

উপেন্দ্রনাথ সেদিন পুত্রকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলুম, আর এই একটা বছরের জন্যে তোমার পড়াটা বন্ধ করে দিয়ে, তোমায় যে-কোন একটা চাকরীতে ঢুকানো আমার পক্ষে অন্যায় কাজ হয়। বাপের কর্ত্তব্য ছেলেকে লেখাপড়া শিখানো। ভগবান জানেন, আমি কোন দিন আমার কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করি নি। তবে যে এখন শেষ এই একটা বছর তোমায় পড়াতে পারলুম না, তার কারণ সবই তো জানতে পারছ। ঘরে খাওয়া তবু একরকমে চলে যায়, কিন্তু মাস গেলে এই যে সামান্য বারটা টাকা কোথায় পাব, কি করে পাঠাব, তাই ভেবে আমি পাগল হয়ে যাই।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমি অনেক ভেবে দেখলুম, "এই একটা বছর যেমন করেই হোক তোমার এই বারটা করে টাকা আমার যোগাড় করতেই হবে,—তোমার খরচটা কোনক্রমে আমায় চালাতেই হবে। কিন্তু জানো বোধ হয়—আমার হাতে একটা পয়সা নেই, এই—"

বাধা দিয়া সত্য বলিল, "আপনি অত ভাববেন না বাবা। আমি এই একটা বছর পড়ার মত খরচ যোগাড় করেছি!"

উপেন্দ্রনাথের শুষ্ক মলিন মুখখানাতে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, "যোগাড় করেছ—! কোথায় পেলে?"

সত্য মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া উত্তর দিল, "আপনার ছোট বউ তার গয়নাগুলো সব দিচ্ছে,—তা থেকে আমার আর একটা বছর পড়া, একজামিনের ফি দেওয়া, সব হয়ে যাবে।"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক উপেন্দ্রনাথ পুত্রের মুখপানে শুধু চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণভাবে বলিলেন, "তুমি বলছ কি!"

সত্য স্পষ্ট সামনাসামনি মুখ ফিরাইতে পারিল না, আস্তে আস্তে উত্তর দিল, "সে দিতে চেয়েছে।"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া পিতা বলিলেন, "সে বলেছে বলেই তুমি নেবে?"

সত্য তেমনি নরমে অথচ সংযতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু না নিলেও যে উপায় নেই বাবা।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "উপায় নেই বলে স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে সেই টাকায় তুমি পড়বে! ধিক অমন পড়ায়! অমন লেখাপড়া না শেখাই ভাল বলে আমি মনে করি। তুমি পুরুষ, ইচ্ছানুসারে তুমি উপার্জ্জন করতে পারবে, কারও উপর ভর দিয়ে তোমায় দাঁড়াতে হবে না। সে নারী, তোমার উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে—কে জানে অদূর-ভবিষ্যতে সে তোমার কাছ হতে কতখানি পেতে পারবে, তুমিই বা তাকে কতখানি দিতে পারবে! তারই আশা দিয়ে তার কাছ হতে গয়নাগুলো নেওয়া পুরুষের উচিত কাজ নয়। হয় তো এর পরে তার এমন দিনও আসতে পারে, যে দিন একটা পয়সার দরকারও তাকে পীড়ন করবে।"

সত্যর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি এ গয়না

কিছুতেই নিতে চাইনি বাবা, সে জোর করে আমায় নিতে বাধ্য করেছে। আপনারই ছেলে আমি,—এমন নীচ হৃদয় আমার নয়, এমন নীচ শিক্ষা আমি পাই নি যে, কারও কিছু জোর করে বা ছলনা করে নেব।"

উপেন্দ্রনাথের উগ্র কণ্ঠ নিমেষে কোমল হইয়া গেল। তিনি পুত্রের মাথায় হাতখানা রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তা জানি সত্য,—আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মন এমনই সত্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। ছোট বউমা স্বেচ্ছায় দিতে পারেন—কারণ, মায়ের অন্তর যে কত উচ্চ, কত উদার, তার পরিচয় আমি নিয়ত পাচ্ছি। এক এক সময় মাকে আমার ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিতে চাই, এক এক সময় মায়ের অসীম জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। বড় পুণ্য আমার ছিল, তাই আমি যথার্থ লক্ষ্মীকে বরণ করে ঘরে আনতে পেরেছি। মায়ের জিনিস আমি কিছুতেই নিতে দিতুম না তোমায়, কিন্তু—"

তাঁহার বেদনাভরা কণ্ঠ অকস্মাৎ নীরব হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি আবার কথা বলার শক্তি লাভ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে কলকাতায় যাচ্ছো?"

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সত্য উত্তর দিল, "পরশু সকালে যাব।"

"পরশু?" বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন। একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভবানীর একটা উপায় করে গেলে না? সুরেশের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে ভাল হতো না?"

সত্য বলিল, "গেল বারে বাড়ী এসে তো দেখা করতে গিয়েছিলুম বাবা,—জানেন তো, আমার সঙ্গে সে মোটে দেখাই করলে না,—বাড়ীর মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে তার মাকে বলে দিলে—বলে দাও আমি বাড়ী নেই। আবার তার বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করতে কোন্ মুখ নিয়ে যাব বাবা? আপনার আদেশ হলে অবশ্যই আমায় যেতে হবে। কিন্তু শুধু মেয়ের দিকে তাকিয়েই কথা বলবেন না বাবা, আমাদের মান-অপমানের দিকে তাকিয়ে আদেশ করুন।"

উপেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "সবই বুঝেছি সত্য, মেয়েটার দিকে চাইতে যে বড় কষ্ট হয়, মনে ভাবি—এমন করেও তাকে জলে ফেলে দিলুম?"

সত্য শান্ত কণ্ঠে বলিল, "সে কথা যথার্থ বাবা! আবার নিজেদের মানসম্ভ্রমের পানেও একটু চাইতে হয়। আপনার অর্থ নেই, আপনি বড়লোকই নন; কিন্তু পাণ্ডিত্যে এদিকের মধ্যে আপনার মত মান তো আর কারও নেই। আপনার মান রেখে তারা কি কথা বলতে পেরেছে? আপনাকে তারা যা না তাই বলেছে। আমরা সব সহ্য করেছি; কেন না, আমাদের মেয়ে বলে আমাদের না কি সব সয়ে যেতেই হবে। এত অপমান সয়ে—অত কষ্ট সহ্য করতে আপনি যে এখনও ভবানীকে আবার শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে চান, এই আশ্চর্য্যের কথা। এখানে থাকলে কি ক্ষতি হবে? আপনি মনে ভাবেন—ঝাঁটা খাক, লাথি খাক, হাজার কথা নিত্য শুনুক, তবু মেয়েদের সেই শ্বশুর-বাড়ী পড়ে থাকতে হবে।"

সত্য ভারি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমটায় সে শান্ত সুরে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেও, শেষটায় উগ্র সুরে তাহার কণ্ঠ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেশের মেয়েদের কষ্ট, বিশেষ তাহার ভগিনীর এই কষ্টের কথা ভাবিয়া সে ভারি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মেয়েদের সকল অবস্থাতেই শ্বশুর-বাড়ী পড়ে না থাকা ভিন্ন আর উপায় কি?"

সত্য বলিল, "উপায় ঢের আছে। ধরুন, ওরা যদি ভবানীকে নাই নেয়, এখানে যদি ভাই-বউদের সঙ্গে মিলে মিশে না থাকতে পারে, তখন ওর উপায় কি হবে?"

ক্লিষ্ট কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দাসীর মত থাকলে সকলেই দয়ার চোখে দেখবে।"

সত্য উষ্ণকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, এই ধারণাটা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে বলেই বরাবর এইটেই ঘটে আসছে। অর্থাৎ যারা স্বামিত্যক্তা অথবা বিধবা, তারা পরের সংসারে মুখ বুজে দাসীর মতই কাজ করে যায়,—তবু যদি তারা তাদের অনর্থক একটা গলগ্রহ না ভাবত। এরা শ্বশুর-বাড়ীর আদর হতে বঞ্চিত। বাপ মা মরে গেলে বাপের বাড়ীর সঙ্গে যাদের সব সম্পর্কই ফুরিয়ে যায়, তাদের শেষ উপায় আত্মীয়ের সংসারে দাসীর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে থাকা। হ্যাঁ, দাসীর চেয়ে অধম বই কি—কেন না দাসীর যেটুকু কথা বলবার ক্ষমতা আছে, এদের তাও নেই। এক বাড়ীতে না বনলে দাসী অন্য বাড়ীতে কাজ করতে যায়,—এদের সে ক্ষমতা নেই; কারণ এদের অপমান-বোধ নেই। আত্মীয়ের বাড়ীর শত লাঞ্ছনাও এদের সয়ে থাকতে হয়

গোপনে চোখ মুছে ফেলে,—সামনে চোখের জল ফেলাও মহা অপরাধ বলে গণ্য হয়। আপনি রাগ করবেন না বাবা, মনে করে দেখুন, আমি ঠিক কথাই বলছি কি না।"

উপেন্দ্রনাথ অধৈর্য্য ভাবে বলিলেন, "তবে কি করতে বল তুমি? যে সব মেয়েদের শ্বশুর-বাড়ী নেই, বাপের বাড়ীও নেই, তারা তবে যাবে কোথায়? আমার বিবেচনায়—তবে এ সকলের হাত এড়াতে এদের—বিশেষ করে ভবানীর, মরণই ভাল।"

সত্য একটু হাসিল, বলিল, "না বাবা, এ কথাটা বলা ঠিক হলো না। মরণ যার হলো সে তো বেঁচে গেল বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ জগতের কোনও ধাক্কা তাকে সইতে হল না। মরে না তো সকলেই—কারণ মরার কথাটা যেমন চট করে বলতে পারা যায়, মরতে সাহস ততদূর হয় না। ভবানীকে আমায় দিন না কেন, ওকে আমি ভাল করে লেখাপড়া শিখানোর ভার নেব—যাতে সে নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে।"

উপেন্দ্রনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সত্য ভারি লজ্জিত হইয়া পড়িল। পিতা যে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী তাহা সে জানিত, সেই জন্য সে তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইতে পারিল না।

গম্ভীর মুখে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি কি এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে পড়াতে চাও?"

সত্য উত্তর দিতে যাইতেছিল,—উপেন্দ্রনাথ দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমার কথা শোনো সত্য, আমি এতে কখনই সম্মতি দিতে পারব না। সুরেশ তাকে নিক বা না নিক, সে সুরেশের ধর্ম্মপত্নী,—তার ওপরে তোমার বা আমার কোন অধিকার এখন নেই। হিন্দুশাস্ত্র স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে, সম্প্রদান হয়ে গেলে সে তখন স্বামীরই স্ত্রী, স্বামী তার ওপর যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। তুমি জানো আমি ব্রাহ্মণ, পুরোহিত,—আমার কাছ হতে অনেক লোকে ব্যবস্থা নিয়ে যায়। তাদের শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা দেব, আর আমার মেয়ের বেলাতেই যে আমি অশাস্ত্রীয় নীতির মর্য্যাদা রাখব, তা কখনও হতে পারে না। আমার কাজ শাস্ত্র দেখা, আমার শিক্ষা সেকালের। তোমাদের আধুনিক প্রাচ্য পাশ্চাত্যে মিলিয়ে শিক্ষা আমার হয় নি। সেই জন্যেই—আমি নিজে গিয়ে সুরেশের মার হাতে ধরে ভবানীকে সেখানে রেখে আসব। এতে মান অপমান আমার কিছু নেই সত্য, কারণ, মেয়ের বাপ যাই হোক না, সে সেই মেয়ের বাপই থাকে, তার ত্রুটী জামায়ের বাড়ী পদে পদে। মেয়ের বাপ যতই দিক তবু পাণ হতে চুণ খসলেই তাকে অপমান সইতে হবে—এই চিরন্তন নিয়ম।"

সত্য খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিতার কথার উপর কথা কহিবার ক্ষমতা তাহার আর ছিল না। পিতা অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিতেই, সে আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল এবং বাড়ী মধ্যে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তাহার বিবর্ণ মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া ভবানী সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, "কি হয়েছে দাদা? বাবা কিছু বলেছেন না কি?"

সত্য একটু হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিল, "না, কিছু বলেন নি, এমনিই সব কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।"

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তোমার মুখখানা ওরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

সত্য অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "শুকনো আবার কোথায় দেখলি? বাবা সংসারের সব সুখ-দুঃখের কথা বলছিলেন, তাই শুনছিলুম।"

সে একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বারাণ্ডার একধারে বসিয়া পড়িল। ভবানী তরকারী কুটিতেছিল, দেবী রান্না-ঘরের মধ্যে রন্ধন চড়াইয়া দিয়াছিল। এতক্ষণ ননদিনী ও ভ্রাতৃবধূতে বেশ গল্প চলিতেছিল,—স্বামীর আগমনে দেবীকে সরিয়া পড়িতে হইয়াছিল।

ভবানী একটা বৃহৎ কুমড়া দুইখানা করিয়া ফেলিবার জন্য খানিকক্ষণ হইল চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ব্যর্থতা দেখিয়া দেবী ঘরের মধ্যে ছটফট করিতেছিল। সত্য না আসিয়া পড়িলে, সে এতক্ষণ কায়দায় ফেলিয়া কুমড়াটাকে চার খণ্ড করিয়া দিতে পারিত।

সত্য তাহার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিতেছিল; বলিল, "সর, আর যোগ্যতা দেখাতে হবে না, আমি দুখানা করে কেটে দিচ্ছি।"

ভবানী একটু হাসিয়া বঁটি ছাড়িয়া দিল। সত্য কুমড়াটি দুইখানা করিয়া কাটিয়া দিল। ভবানী তাহাকে সরাইয়া

দিয়া নিজে কুমড়া কুটিতে কুটিতে বলিল, "আচ্ছা ছোড়দা, একটা কথা বলব ?"

সত্য বলিল, "কি কথা ?"

ভবানী বলিল, "রাগ করবে না ?"

সত্য বলিল, "রাগ করবার কথা না হলে রাগ করব কেন ?"

ভবানী একটু থামিয়া বলিল, "আমি অনেক দিন হতেই এ কথাটা জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলুম, কিন্তু—তুমি কি বলবে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি নি। কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, বড়দার সঙ্গে তোমার দেখা হয় কি না তাই—"

বলিতে বলিতে সে মুখ তুলিয়া সত্যর পানে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল।

হাসি আসিতেছিল, তাহা চাপিয়া ফেলিয়া সত্য বলিল, "এতকাল পরে হঠাৎ বড়দার কথাটা জিজ্ঞাসা করলি যে ? এতকাল বুঝি বড়দার কথা মনে পড়ে নি ?"

ভবানী উৎসাহিতা হইয়া বলিল, "মনে পড়ে রোজই, সে কথা কি ভোলা যায় ছোড়দা ? ওই যে বলছি—ভয়ে তোমায় জিজ্ঞাসা করতে পারি নি।"

"কিন্তু ওইটুকু ভয় না করে যদি আগে হতেই তাদের কথা জানতে চাইতিস, তা হলে আমি সত্যি ভারি খুসী হতুম ভবানী। তোর কথার উত্তর দিই—দেখা হয় বই কি। তবে ভাই বলে পরিচয় দিতে আমার যতটা আনন্দ হয়—যতটা গৌরব বাড়ে, ততটা তাঁর যে হয় না, সে জানা কথাই। তিনি এখন ধনী, নামজাদা লোক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। আর আমি কোথাকার কে—তাঁর সঙ্গে আমার পার্থক্য কতদুর, সেটা ভেবে দেখ। তাদের বাড়ীর মধ্যে বিথী ছাড়া আর কেউ তেমন আন্তরিকতা দেখায় না!"

ভবানী উৎসুক হইয়া বলিল, "সে কত বড় হয়েছে দাদা ?"

সত্য বলিল, "তা বেশ বড় হয়েছে বই কি,—বছর পনের ষোল তার বয়েস হল।"

ভবানী সবিস্ময়ে বলিল, "এখনও বিয়ে হয় নি ?"

সত্য একটু হাসিল, "এখনি কি বিয়ে হবে ? এই তো সবে সে ম্যাট্রিক দেবে। দাদা তাকে শেষ পর্য্যন্ত পড়াতে চান। তার পর শুনেছি তাকে শিক্ষার জন্যে—অর্থাৎ বেশী রকম জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্যে বিলেতে পাঠাবেন।"

ভবানী গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক্ করলে বাবা! তা হলে সে মেয়ের বিয়েই দেবে না বলে জানা যাচ্ছে। ছিঃ ওরা সব কি—মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না, খালি পড়াতেই চায়। পড়িয়ে যে কি হবে তা তো বুঝতে পারি নে।"

সত্য একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোরাই মানুষ—তাই সার চিনেছিস বিয়ে, আর কিছু নয়। বিয়ে করলে মানুষ কি রকম জড়িয়ে পড়ে তা তো জানিস নে। তাই মনে ভাবিস, বিয়ে করলে চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া গেল। এই তো তুইও বিয়ে করেছিস,—কি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করতে পেরেছিস শুনি ?"

তাহার নিজের কথায় ভবানী একেবারে নিভিয়া গেল, কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমার কথা কেন ছোড়দা, আমার কথা ছেড়ে দাও।"

সত্য বলিল, "কেন ছাড়ব ? আগে তোর কথাটাই ধরব, তারপরে অন্য সকলের কথা বলব। এই যে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল,—এ বিয়েটা না দিলে কি হতো না ? বিয়ে দিয়ে মস্ত বড় লাভ হয়েছে,—সামান্য সামান্য খুঁত ধরে তোকে বিদায় করে দেছে,—আমাদের পর্য্যন্ত নাম এতটুকু রইল না, —তাদের যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছে। এর চেয়ে বিয়ে যদি না হতো, তা হলে কেমন থাকৃতিস বল্ দেখি ? কারও ভাল-মন্দের সঙ্গে তোর অদৃষ্ট মিলানো থাকত না,—বেশ লেখাপড়া শিখতে পারতিস,—একটা মানুষ হয়ে যেতিস।"

ব্যগ্র ভাবে ভবানী বলিল, "এখন কি আর লেখাপড়া শেখা যায় না ছোড়দা ?"

ছোড়দা গভীর অবজ্ঞার সুরে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, তোদের আবার লেখাপড়া শিখানো ? বই নিয়ে বসলেই তোদের চোখে ঘুম নেমে আসে। জাগলে পরে হঠাৎ মনে পড়ে যায়—রান্নাঘরে কি আলগা পড়ে আছে, কোথায় কে কি বলছে, কোথায় কি শব্দ হল। অশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের দোষ পদে-পদে। তাদের টেনে তুলতে পারা যায় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে—আর সেটা উভয় পক্ষেরই থাকা চাই; নইলে এক পক্ষের চেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।"

দারুণ অবজ্ঞাভরে একবার ভবানীর পানে, আর একবার রান্নাঘরের পানে তাকাইয়া সত্য বাহির হইয়া গেল। তাহাকে শুনাইবার জন্যই ভবানী অনুচ্চস্বরে বলিল, "দাদা ভারি বোকা,—জানে না যে অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে বলেই আজ গায়ের গয়নাগুলো খুলে দিতে পেরেছে। শিক্ষিতা মেয়েদের চোখে না দেখলেও তাদের গুণপণা শুনেছি তো,—কেঁদে লুটিয়ে পড়লেও একটি কিছু বার করে দিত না।"

দেবী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু ছোড়দার কানে কথাগুলো পৌছাইবার আগেই সে বাহির হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাজে কথা

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

সামান্য একটু ছাপার ভুলে 'কাজের কথা' 'বাজে কথা'য় দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে তাহা হয় নাই, ইহা নাতিদীর্ঘ একটা ভূমিকায় বলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কারণ আজ কাল 'কাজের কথা' যথা তথা। এমন কি খুব আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপনেও বিশেষ করিয়া বলা হইয়া থাকে, 'বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিবেন না।' একথা পড়িয়া আমাদের হাসি পায় বই কি? কিন্তু হাসি, আর যাই করি, বিজ্ঞাপনের বহর বাড়িয়াই চলে। আমরা হাসিতে হাসিতে জিনিষ কিনি। আবার ঠকিয়া ঠকিয়া হাসিয়া সারা হই। বিজ্ঞাপনের বাজার পূর্ব্বমতই বজায় থাকে।

'কাজের কথা'ও সেই রকম। কাজের কথা না হইলে কেহ শোনে না। বাজে কথা শুনিবার অবসর আছে কাহার? কাজের সময় বাজে কথা কহিতে নাই। কথায় কথায় বেলা বাড়িয়া যায়, আজে বাজে বকিয়া কি লাভ আছে বলিতে পার? তবুও বাজে কথা কমে না। বাজে কথা নহিলে আসর জমে না। অন্ততঃ কাজের কথার পূর্ব্বে দুটো বাজে কথা কহিয়া ভূমিকা করিতে হয়।

কাজের কথা কহে ব্যবসাদার। তাহারা সময় বাজে নষ্ট হইতে দেয় না। তাহাদের ঘড়ির কাঁটা টাকা সিকি আধুলির ঝুম্‌ঝুমি বাজাইয়া চলে। ট্রামগাড়ীতে, কালীঘাটে, রেস খেলার মাঠে 'কাজের কথা'র তুবড়ি ছোটে, আর নোট, প্রো-নোট, হুণ্ডির 'তারা' কাটিয়া পড়ে। ইহাঁদের হিসাবে যত কাব্য নাটক, নভেল উপন্যাস, প্রবন্ধ নিবন্ধ সব বাজে কথা। কেবল কথার ঝুড়ি। তা' লেখক যিনিই হউন না। রবিই হউন, আর বঙ্কিমই হউন, শরৎই হউন আর বর্ষাই হউন! এ সব বাজে কথা পড়েন, যাঁদের বাজে নষ্ট করিবার মত সময় আছে। স্কুল কলেজের ছেলের দল, ভবঘুরে উমেদারের দল, আর যে সব কুললক্ষ্মীরা মেজেয় পা দেন না, আল্‌তা মুছিয়া যাইবার ভয়ে, তাঁরাই পড়েন এই সব বাজে কথা। কিন্তু উপায় কি? বাজে কথা না হইলে যে কাব্য হয় না। সেই কোন্ দিন রামগিরির আশ্রমে ১লা আষাঢ়ের নবাম্বুদের বপ্রক্রীড়া দেখিয়া বিরহী যক্ষের মনে যে প্রিয়াবিরহের শোক উথলিয়া উঠিয়াছিল, সেই কথা—সেই আষাঢ়ে গল্প ঘুণের মত আমাদের অস্থি-পঞ্জরে প্রবেশ করিয়া একেবারে প্রাণের গোড়ায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এমনই কাঁচা কাঠে আমাদের ধাতু। কবে কোন্ দিন বনভূমি মেঘ-মেদুর আকাশের কালো ছায়ায় আর ঘননিবদ্ধ তমাল পল্লবের অন্ধকারে শ্যামায়মান হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সব নিতান্ত অ-কেজো কথায় আমাদের কাব্য ভরা। সুতরাং আশা নাই। কিন্তু আমাদের কবিবর কিঞ্চিৎ চতুর আছেন। তিনি কাব্যের বাজে কথার মধ্যে বোধ হয় একটু কাজের কথার 'পুর' দিয়া দিয়াছিলেন, তাই নোবেল প্রাইজের লাখ টাকা পাইয়া গেলেন! কাজের কথার মহাজন ঘেসে-রাম সদ্দার, রূপচাঁদ বিড়াল প্রভৃতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুঃখ হইল, এত দিন পাটের দালালী না করিয়া দুটো কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিলে মন্দ হইত না!

রাজ্যের বাজে কথা না হইলে কাব্য হইবে কেমন করিয়া? নববধূ যখন দুরু দুরু হিয়া নিয়া আসে তাহার অচেনা, অজানা বরের কাছে, তখন শুধু থাকে মনের গোপন কোণে আধ ভয়, আধ বিস্ময়, আধ কৌতূহল, আধ আনন্দের পরিমল; তখন তাহাদের মধ্যে হয় বাজে কথা। বাজে কথার মৃদুল বায়ে প্রেমের আধ ফুটন্ত ফুল ফোটো ফোটো হইয়া উঠে। বাজে কথার জোর হাওয়া যত দিন বয়, তত দিনই প্রেমের তুফান ছুটে। তার পর একদিন নববধূ যখন গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন আর বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবার উপায় থাকে না! প্রেমের ঠাকুরটি তখন তাঁহার পক্ষ দু'টি মেলিয়া প্রজাপতির মতো শূন্যে উড়িয়া যান, আর

স্বামী নামক পদার্থটি তখন উধাও হইয়া পড়েন। কালে ভদ্রে যখন তাঁহার দর্শন ঘটে, তখন 'কাজের কথা' ভিন্ন বাজে কথার অবসর থাকে না।

"ওগো মেয়েটি যে বড় হয়ে উঠ্‌ছে, চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছ না—"

"পটলা যে দুদিন না খেয়ে না দেয়ে পড়ে রয়েছে, তাকে এবার পূজোয় একখানা সাইকেল কিনে না দিলে সে যে জলগ্রহণ করবে না, বল্‌ছে; একবার ছেলেটার মুখের দিকে তাকাও—"

"মেজ যায়ের বাপের বাড়ী থেকে তার ভাইপোর অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করে গেল; কিন্তু যাব কি, যে সব পোড়া ছাঁচের গয়না, তা পরে কি আর ভদ্দর লোকের বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে?—"

স্বামী বেচারী এই সব শুনিয়া ভাবে, হায় রে বাজে কথা। সে এক দিন ছিল। কোথায় সেই মধুময় যৌবন, কোথায় সেই প্রেম, কোথায় সেই কারণে অকারণে মান, আর কোথায় সেই বাজে কথায় নিশি ভোর! তবু পোড়া মন বুঝে না, বাজে কথায় মন দিবার সময় নাই।

বন্ধু মহলেও দেখি ঐ বাজে কথারই পশার। সেখানে 'কাজের কথা'র প্রবেশ নিষেধ! 'Talking shop' বড়ই বে-আদবী। যতই জরুরী কাজ থাক্ না, বন্ধুর বৈঠকে সে সব ভুলিতে না পারিলে সবই বৃথা, সবই বাজে। ঐ যে দুদণ্ডের বিস্মরণ, দুদণ্ডের সময় হরণ, ও-যেন বাদল রাতে চাঁদের কিরণ। দুঃখ শোক ভুলাইয়া দেয় ঐ বাজে ক'টা কথায়। বাঁচিয়া থাকা যে নেহাৎ মন্দ নয়, তা বুঝি যখন কথায় কথায় হাসির তরঙ্গ ছোটে, কথায় কথায় রসের স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু হায়, এত বাজে কথাও কহিতে আছে!

"ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"—

"ও: বেশ! বেশ! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। বসুন। মশায় একটু তামাক ইচ্ছে করেন?—"

ইহাই হইল আলাপের সনাতনী প্রথা। আজকালকার ইংরেজি ফ্যাসনে:—

"অত্যন্ত সুখী হ'লাম আপনাকে দেখে। আজ দিনটা বড় চমৎকার! নয়?—"

এর বদলে যদি 'কাজের কথা' সুরু করা যায়, তা হলে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

"কি কাম করেন? বেতন কত পান? পড়া শুনা কতদূর?" ইত্যাদি যেখানে আলাপের আলম্বন, সেখানে 'নটের বেগে প্রস্থান'ই প্রশস্ত। কাজের কথায় যখন প্রাণ আই ঢাই করিয়া উঠে, তখন মন ছুটিয়া যায় একটু সৎসঙ্গের জন্য; একটু কাব্যরসের জন্য।

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদঃ আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ।

বঙ্কিমবাবু এই কথাটি ভুল বুঝিলেন; তিনি বিষবৃক্ষের ফল করিলেন দুইটি:—সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী। সে ফলের একটি গেল স্বর্গে; আর একটি জ্বালাইবার জন্য রহিয়া গেল মর্ত্ত্যে। কুন্দনন্দিনী জ্বলিল, অহিফেনের গরলে; আমরা জ্বলিতেছি কেরোসিনের অনলে।

সজ্জনের সঙ্গে আলাপ করিবার সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। কাজের কথায় কালক্ষেপ করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের পক্ষে সজ্জনের সঙ্গ লাভ করিবার সম্ভাবনা কোথায়?—যে সজ্জন সঙ্গতি ক্ষণমাত্র হইলে নাকি পৃথিবী রূপ solid অর্ণব চট্ করিয়া পাড়ি দেওয়া যায়!

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।

এই মহাজন বাক্যে আমার অশ্রদ্ধা কিছুমাত্র নাই। তবে ঐ সকল মহাজনের তিরোভাবের পর অনেক জল হাওড়া পোলের নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ কিনা বহুকাল অতীত হইয়াছে। এখন বড় বড় three decker জাহাজ না হইলে কোনও অর্ণব পাড়ি দিবার কল্পনাই করা যাইতে পারে না। নৌকায় করিয়া পাড়ি দিবার চেষ্টা করিলে ডুবিয়া মরা অনিবার্য্য—বিশেষতঃ আমাদের luggage অর্থাৎ পাপের বোঝা যে বেজায় ভারি! সেকালের লোকের আর কিছু থাক না থাক, ওজন ছিল কম; অনেক সময় পাতায় বা ভেলায় ভাসিয়া সাগর পার হওয়া অসম্ভব ছিল না। তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন:—

হে মাধব,

তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।

'পল্লব' যদি তেমন নিরাপদ মনে না হয়, তবে পাঠান্তর করিয়া 'পলব' (অর্থাৎ প্লব=ভেলা) করিয়াও লইতে পারেন, কিন্তু সাহসে কুলাইবে কি?

আমাদের কাজ এত বেশী এবং সময় এত কম যে সাধু সঙ্গের প্রসঙ্গই বাজে বলিয়া মনে হয়। কাজও কি এক রকম? এত রঙ বিরঙের কাজ অছে যে আমাদের অ-কাজ যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কোনও একখানি সংবাদপত্রে মোটা মোটা অক্ষরে দেখিলাম 'কাজের কথা'। ভাবিলাম এতদিন পরে দুটো কাজের কথা শোনা যাইবে! বাজে কথায়ই ত সময় বহিয়া যায়। পড়িয়া দেখিলাম তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা সম্বন্ধেই মন্তব্য বেশীর ভাগ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হিন্দু মুসলমানের বিরোধ কি একটা কাজের কথা? মন্দির মস্‌জিদ্‌ ভাঙ্গা কি কোনও কাজের কথা? যঃ শৃণোতি সোঽপি পাপভাক্‌—এ সব কথা শুনিলেও পাপ হয়। মাথা ফাটাফাটি রক্তারক্তি যদি কাজের কথা হয়, তাহা হইলে সেটা যত কম হয়, ততই ভাল নহে কি? এমন কাজের কথার চেয়ে বাজে কথা ঢের ভাল।

অন্যের বাজে কথায় আমরা যত অসহিষ্ণু হই, নিজেদের বেলায় কিন্তু সেরূপ নহি। আমার মনে হয়, ইহাতে বিনয়ের বড় অভাব রহিয়া যায়। ঐতিহাসিক যখন বলেন, যে সতের জন ঘোড়সওয়ার লইয়া মহম্মদ বিন্‌ বখতিয়ার বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপে আসিয়া রাজ্যটা ধাঁ করিয়া জয় করিয়া ফেলিলেন, তখন অন্য লোকে যে সেটা বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, এ বিনয়টুকু থাকিলে ভাল হয়।

দার্শনিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ। অগ্রেম এক সৎ আসিয়া জুটিলেন। কিন্তু কোথা হইতে যে আসিলেন তাহার ঠিকানা নাই। কারণ অসৎ থেকে সৎ হয় না, বালুকা হইতে কি তৈল পাওয়া যায়? আকাশ থেকে কুসুম পড়ে?—যদিও মাঝে মাঝে পুষ্পবৃষ্টি না হইলেই বা চলে কৈ? যাহা হউক, সৎ যে আগে ছিলেন, সে সম্বন্ধে একরূপ স্থির হইয়া গেল। কিন্তু অসতের অপরাধ কি? অসৎ নাই অথচ সৎ ছিল, এ কি কোনও কাজের কথা? কালোর কোলে আলো নইলে কি মানায়?

নিশীথের বুকের মাঝে ঐ যে অমল
উঠ্‌লো ফুটে স্বর্ণ কমল—

বলিলেন কে?—না, কবি। বৈজ্ঞানিক একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—ও সব বাজে। আমার কাছে এস, খাঁটি নির্য্যাসটুকু পাইবে। এই দেখ মারিলাম টোকা এখানে, আর ঐ বে-তারে বাহিত হয়ে চলে গেল খবর কাঁহা কাঁহা মুলুক! একবার যন্ত্রটি কানে পরো, শুনবে ছয় রাগ চৌষট্টি রাগিণী জলের পানার মত বাতাসে (কি ঈথরে) ভেসে ভেসে আস্‌ছে। কিন্তু সাধারণ লোকে বলিল,—বাজে, ও-সব বাজে! বে-তারে সুর আসে, সঙ্গীত আসে, সঙ্কেত আসে, তা'তে কিছু আসিয়া যায় না। অন্ন-সমস্যা ত মিটে না। বে-তারে খবোর আসিবে কবে? এই হইল কাজের কথা। টেলিফোনে লোকের কথা আসিতেছে, গান আসিতেছে, হাসি আসিতেছে, এবারে আবার ছবি আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে লোক অপর প্রান্তে কথা কহিতেছে, এ প্রান্তে তার ছবি দেখা যাইবে। তা' ত হইল, মনের ভিতরকার 'ছাপ' কোনও গতিকে আসে না? কথায় মানুষ ধরা যায় না, চেহারাও অনেক সময় ঠকায়। অন্তরের কথাটি ধরিতে পারা যায় না, কোন কৌশলে? নইলে, সব বাজে।

কাজের কথা যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠাও কি কম শক্ত? মনের ঠিক আসল কথাটি ত ধরিবার উপায় নাই। চাণক্য বলেন কাজের কথা কিছু কহিও না;

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা না প্রকাশয়েৎ।

কাজের কথা মনে মনে চিন্তা করবে। মুখে কাউকে বলো না। বল্‌লে সব ফেঁসে যাবে, সব বাজে হবে।

ভাবুক একটু হাসিলেন। বলিলেন, মুখে বলিলেই বা কি? বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। তুমি বল তোমার মতো, যাকে বলো সে বুঝে তার নিজের মতো। তুমি বলিলে 'বেলা যে গেল।' আমি বুঝিলাম আজকার মতো কাজ হলো শেষ। প্রণয়ী বুঝিলেন, 'অভিসারে'র সময় হয়ে এলো। লালাবাবু বুঝিলেন, সংসারে মজে' আছি, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বেলা যে গেল, সব ছেড়ে যেতে হবে আজই —চলো, ওগো চলো। সুতরাং তোমার বলিতে কিছু বাধা নাই। রাম উল্টা বুঝিবে নিশ্চয়। সুতরাং সব্‌ সে ভালা চুপ; কবীর ঠিকই বলিয়াছেন। গর্গিয়াস্‌ও অনেক তর্কের দ্বারা এই কথাটিই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন: কথা না বলাই ভাল, কেন না বলিলে কেহ বুঝে না।

এক রকম কথা আছে, যাহা কাজেরও নয়, বাজেও নয়। শুধু কথা। সে কথা শুনিতে অনেকের ভাল

লাগে। অনেকবার এই 'কথা' শুনিতে গিয়া আমাকে বাড়ীতে কত যে কথা শুনিতে হইয়াছে, তা'র ঠিকানা নাই। যে কথা প্রাণে বাজে, সে কথা কাজের নয় বলিয়া নিতান্ত উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। তাহা হইলেও মনে হয়, কথা না শুনিলে যেন প্রাণ বাঁচে না। বড় মধুর লাগে সে কথা; সংসার-বিরাগী শুকদেব পর্য্যন্ত বলেন "স্বাদু স্বাদু পদে পদে।" যে কথায় কৃষ্ণ কথা নাই, সে কথা কথাই নয়, এই কথা বলেন গোস্বামিপাদেরা। সে যাহাই হউক, অমন মিষ্ট আর কিছুই হয় না।

যা শ্রীকৃষ্ণ গুণানুবাদনকরী মনোহারী সা মাধুরী মাধুরী। শুধু সুন্দরী হইলে হয় না, পতিব্রতা হইলেই তাহাকে বলে কামিনী। মেঘ পরিশূন্য পূর্ণচন্দ্র-শোভিত হইলেই তাহাকে বলে যামিনী, নইলে ত শুধুই রাতি। আর যে কথায় শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন আছে, সেই কথাই মধুর কথা। তা কাজের কথাই হউক, আর বাজে কথাই হউক।

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] অর্ঘ্য

ব্যথার দান

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

"ও নারাণী, মন্দিরে যাবি?"

"যাব পিসীমা, একটু দাঁড়াও না" একটা তেরো বছরের ফুটফুটে মেয়ে এক গোছা কালো চুল পিঠে দুলাইয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া দয়া দেবীর নিকট আসিল।

যদুবাবু এই বাড়ীর মালিক। মেয়েটা যদু মুখুজ্যের কন্যা। ইহাদের বাড়ীর একখানা ঘর দয়াদেবী ২৲ টাকায় ভাড়া করিয়া কাশীবাস করিতেছেন! যদুবাবুর সংসারের মধ্যে এই একমাত্র কন্যা নারায়ণী! যদুবাবুর বয়স ৬০ এর কাছাকাছি। ৩০ টাকা পেন্‌সন পান, তাহাতেই সংসার চলিয়া যায়।

নারাণী গামছায় বাঁধা দয়াদেবীর কাপড় ও কমণ্ডলু এক হাতে লইয়া অপর হাতে দয়াদেবীর হাত ধরিয়া পথে বাহির হইল। দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া দয়াদেবী স্নানে নামিলেন।

ঘাটে আরও কতকগুলি যুবতী ও প্রৌঢ়া স্নান করিতেছিলেন। পুরুষদের ঘাটে কতকগুলি হিন্দুস্থানী বালক জলে সাঁতার কাটিতেছিল এবং একজন ৫৮ বৎসর বয়স্ক লোক একমুখ দাড়ী ও মাথায় জটা লইয়া গামছা দিয়া গা রগড়াইতেছিল এবং মেয়েদের ঘাটের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আপনমনে উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছিল, "ওঁ কালভৈরব ডেকে নিলে না বাবা! এমন করে আর যে চলে না।" তাহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া দুই একটা যুবতী হাসিল দেখিয়া লোকটা তাহাদের দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল "তোর দয়া কি হয় না রে।"

স্নান সমাপনান্তে দয়াদেবী নারাণীর হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিশ্বনাথের ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে পূজা সারিয়া উভয়ে গৃহে ফিরিলেন।

চৌকাঠের কাছে একখানা খাম পড়িয়া ছিল। নারাণী চিঠিখানা কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তোমার চিঠি পিসীমা।"

দয়াদেবী প্রফুল্লমুখে চিঠিখানা লইয়া ঘরে আসিয়া কহিলেন, "চিঠিখানা পড়ে শোনা ত মা!" পত্র ধীরুর নিকট হইতে আসিয়াছে। ধীরু লিখিয়াছে সে ভাল আছে, বেশ কাজ করিতেছে। মনি অর্ডারে ২৫ টাকা অদ্য প্রেরণ করিল। পিসীমা যেন তাহার জন্য না ভাবেন।

পত্রপড়া শেষ হইলে পিসীমা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। নারাণী মুখে চোখে বিস্ময় আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাঁদছ কেন পিসী, চিঠিতে ত ভাল খবরই আছে।"

"না মা সেজন্য কাঁদিনি। আজ আমার কত আনন্দ! সেই ধীরু আমায় রোজগার করে টাকা পাঠিয়েছে। বাছা আমার কি ঘেন্নায় যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে তা আর কি বলব মা! বিদেশে আছে; কেই বা তাকে যত্ন-আত্তি করছে! সে এমন আপন-ভোলা, তাকে ডেকে খাওয়াতে হ'ত মা! পরের জন্যেই ছিল তার যত মাথা-ব্যথা! কার মড়া পোড়াতে হ'বে, কার ডাক্তার ডাকতে হবে, কে খেতে পায় না, এই সব খুঁজে বেড়ান ছিল তার কাজ। রাত নেই দিন নেই, দুর্যোগ নেই, এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। এই জন্যই ত ওর দাদারা ওকে দেখতে পারত না।"

"কেন পিসী, এতে তাঁরা ওঁর উপর রাগ করতেন?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দয়াদেবী কহিলেন, "কেন যে রাগ করত, সেকথা আর কি করে বোঝাব মা। সংসারে ত সবাই এক রকমের হয় না; যে যার স্বার্থ নিয়ে চলে।"

নারাণী উদাসভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া দয়াদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ও নারাণী" যদুবাবু গামছায়-বাঁধা বাজার লইয়া আসিয়া কহিলেন, "বাজারে জিনিস সব দিনকার-দিন যা দুর্মূল্য হয়ে উঠছে, আর কিছু কেনা যাবে না। যত সব কলকাতার বাবু ভায়ারা এখানে বেড়াতে এসে জিনিসের দর বাড়িয়ে দিলে। একটা বেশ বড় কচি বেগুনের দাম করছি এক

পয়সা, পাশ থেকে টেড়ী-কাটা এক ছোঁড়া বলে উঠল 'এই তিন পয়সা দিচ্ছি দে।' বগুনটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেলরে!"

নারাণী হাসিয়া কহিল, "তা যাকগে, কালকের বেগুন আধখানা আছে বাবা! তাইতেই আজ হবে।"

"আরে তা যেন হ'ল। বেগুন ত নিল। ছোঁড়াটার আক্কেলের কথা বল্‌ছি।"

বাইরে কড়া নাড়িয়া পিয়ন হাঁকিল, "মনি-অর্ডার হায়"; যদুবাবু বিস্ময়ে কহিলেন "মনি-অর্ডার কার এল।" নারাণী হাসিয়া কহিল "পিসীমার।" "ওঃ" বলিয়া যদুবাবু বাহিরে যাইয়া মনি-অর্ডারের কাগজ আনিয়া দিলে, দয়াদেবী বলিলেন "সই দিয়ে নাও দাদা।"

যদুবাবু দয়াদেবীর নাম স্বাক্ষর করিয়া ২৫ টাকা তাঁহার হাতে দিয়া কহিলেন "এই ত দিদি, তুমি ভেবে সারা হচ্ছিলে। দেখ, তোমার ধীরু খবর দিয়েছে, আবার টাকা পাঠিয়েছে।"

দয়াদেবী নারাণীর হাতে টাকা দিয়া কহিলেন "তুলে রাখ ত মা, তোর বাক্সয়।"

নারাণী হাসিয়া কহিল, "বাঃ গো, আমি কি সবাইকার তবিল নাকি। বাবা পেন্‌সনের টাকা এনে বলবেন 'নারাণী, টাকাগুলো রাখত মা।' তুমিও তাই বলছ। বেশ ত?"

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন "টাকা ত তোরই পাগলি, কেবল আমি আর দিদি যে কটা দিন বাঁচব তুই আমাদের চারটী চারটী খেতে দিস্‌।"

"তা বৈকি! আর লেখবার ভুলে যখন একটা টাকার গরমিল হয় তখন কে বলে, আমার টাকা কর্‌লি কি? দে বেটী হিসেব দে।"

দয়াদেবী হাস্যমুখে বলিলেন, "আমি কিন্তু তোর কাছে হিসেব চাইব না।"

"সে তুমি না চাও, হিসেব আমি ঠিক রেখে যাব। যিনি টাকা পাঠিয়েছেন তিনি এলে তাঁকে আমি হিসেব বুঝিয়ে দেব। তুমি ত আর হিসেব বুঝবে না বাপু।"

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "দিদি—হিসেব বোঝেন না।"

নারাণী হাসিয়া কহিল "সেদিন চান করে আসবার সময় একসের আলোচাল কিনে পিসীমা দোকানীকে একটা টাকা দিলেন। সে পনের পয়সা দাম কেটে নিয়ে এগার আনা এক পয়সা দিল। উনি ত চলে আসছিলেন। শেষে আমি পয়সা গুণে বল্লুম, এক আনা কম দিয়া কাহে। তখন সে পয়সা দিয়ে বলে গল্‌তি হুয়া থা।"

দয়াদেবী হাসিয়া কহিলেন, "বিশ্বনাথের জায়গায় কেউ কি ঠকাতে পারে দাদা? ও হয় ত তার ভুল হয়ে থাকবে। নে তরকারীগুলো কুটে ফেল নারাণী, আমি বোক্‌নো চড়িয়ে দিই।"

নারাণী বঁটি লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল, দয়াদেবী চাল ধুইয়া হাঁড়িতে দিলেন। যদুবাবু তেল মাখিতে লাগিলেন। এমন সময় একটী বৃদ্ধলোক বাহির হইতে ডাকিলেন "মুখুজ্যে মশায় বাড়ী আছেন না কি।"

"হ্যাঁ, এস।"

দরজা খুলিয়া দিলে লোকটী ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তারা বিকেলে মালক্ষ্মীকে দেখতে আসবে বলেছে। আপনি বিকেলে বেরুবেন না, বাড়ীতে থাকবেন।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা না হয় থাকলুম। কিন্তু তাদের যে বেজায় খাঁই শুনেছি হে! পেরে উঠব কি?"

লোকটা কাসিয়া কহিল "সে কথাও ছেলের মার সঙ্গে হয়েছে; দু'হাজারের ভেতরই হয়ে যাবে।"

বিস্মিতকণ্ঠে যদুবাবু কহিলেন, "বল কি? দু হাজার! তবেই হয়েছে! আমার সম্বলের মধ্যে এই বাড়ীখানি আর ৩০টি টাকা পেন্‌সন। তা'হলে মেয়ের বিয়েতে আমার ভিটে বেচতে হয়।"

লোকটী দয়াদেবীর পানে চাহিয়া কহিল, "আপনিই বলুন ত দিদি, মেয়ের বিয়ে কি বিনা-খরচায় হয়?"

দয়াদেবী হাসিয়া কহিলেন, "তা ত হয় না, কিন্তু যাদের অবস্থায় কুলায় না এত দিতে, তারাই বা কি করে বলুন?"

"তাও বটে! আচ্ছা, আগে তারা মেয়ে দেখে যাক্‌ ত, তার পরে তাদের সঙ্গে কথাকথি করা যাবে।"

দয়াদেবী নারাণীর অবনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, লজ্জায় তাহার গাল দুটী রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কহিলেন, "মেয়ে দেখে তারা অপছন্দ করতে পারবে না, এমন প্রতিমার মত মেয়ে কটা মেলে? এমন সোনারচাঁদ যাদের দোষ তাদের কি আবার টাকা দিতে হবে নাকি। পোড়া কপাল।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ঠিক বলেছ দিদি, অত টাকা

আমার নেইও, আর আমি তা দোবও না। পছন্দ ক'রে কেউ অমনি বিয়ে করে, তবেই মেয়ের বিয়ে দেব, না হলে মেয়ে আমার চিরকাল কুমারী থাকবে, যেমন সব সেকালে থাকত।"

দয়াদেবী কহিলেন, "ওমা! তাই বা কেন?"

"যাই হোক, বিকেলে থাকবেন। আমি তা হলে এখন আসি; একটু দরকারী কাজ আছে।"

"আচ্ছা।"

লোকটী চলিয়া গেল। ভিতরে আসিয়া যদুবাবু নারাণীকে বলিলেন, "গামছা কাপড় দে মা, আমি নেয়ে আসি।"

"এত বেলায় আবার গঙ্গায় নাইতে যাবে বাবা? আজ বাড়ীতেই নেয়ে ফেল।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন "না রে কাছে মা-গঙ্গা থাকতে আর বাড়ীতে নাব না! তুই দেখ্ না, আমি এই চট করে এলুম বলে।"

নারাণী গামছা কাপড় দিয়া কহিল "মন্দিরে যেও না কিন্তু, তা হলে ফিরতে বেলা তিনটা বেজে যাবে। আর তোমার পিত্তি পড়বে।"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আমি এখনই আসছি।"

নারাণী দয়াদেবীকে বলিল "তোমার ভাত হল পিসীমা?"

দয়াদেবী বলিলেন, "কেন? উনুনটা নিবি?"

নারাণী সহাস্তে কহিল, "হ্যাঁ, এই উনুনে ডাল চাপিয়ে ও-উনুনে তরকারী চাপাব। বড্ড বেলা হয়েছে, না হলে বাবার খেতে দেরী হয়ে যাবে।"

"তোর ভাত হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, ভাত সকালেই হয়ে গেছে।"

"নে, তবে উনুনটা; কিন্তু রান্না হয়ে গেলে উনুনটায় একটু গোবর বুলিয়ে দিস মা।"

"সে বলতে হবে না পিসীমা, আমি জানি।"

"জানবে বই কি মা! হিঁদুর ঘরের মেয়ে আচার বিচার মানবে, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি করবে, তবেই না লক্ষ্মীশ্রী হয়। তবেই না শ্বশুর বাড়ীতে সকলে ভালবাসে।"

নারাণী উনানে ডাল চাপাইয়া দয়াদেবীর নিকটে বসিলে দয়াদেবী বলিলেন, "খেয়ে-দেয়ে ধীরুকে একটা চিঠি আমার জবানীতে লিখে দিস্ ত মা! লিখবি যে, টাকা পেয়েছি, আমি ভাল আছি। সে যেন তার শরীরের যত্ন করে, আর যেন একবার ছুটী নিয়ে পূজোর সময় আমার কাছে আসে। বাছার চাঁদমুখখানি আজ কতকাল দেখিনি।" দয়াদেবীর স্বর রুদ্ধ হইল, তিনি বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। কি জানি কেন নারাণীর বড় বড় কাল চোখদুটিও অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। সে নতমুখে হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল। দয়াদেবী নারাণীর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের মতন একটা কথা তাঁর মনে আসিতেই তিনি নারাণীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "আমার ধীরুর বৌ হবি মা, দুজনে আমার বুক জুড়ে থাকবি।"

নারাণীর বুকখানা কি এক অজানা আনন্দের তালে দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। মাতৃহারা বালিকা সে; বুঝিতে পারিল না কিসের এ আনন্দ, এতদিন কোথায় লুকাইয়া ছিল, আজ হঠাৎ স্নেহময়ী মায়ের মতন তাহাকে বুকে তুলিয়া নিল। দয়াদেবীর স্নেহের বন্যায় ভাসিয়া কতদূর চলিতেছিল তাহার খেয়াল ছিল না। আর দয়াদেবী তাঁহার অন্তরের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করিয়া লইতেছিলেন।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল কাহারও খেয়াল নাই। যদুবাবু দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিলেন নারায়ণী দয়াদেবীর বুকে মাথা রাখিয়া আছে, দয়াদেবী তাহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া আছেন; দুজনেরই মুখে হাসি, দুজনেরই চক্ষে জল। তিনি হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১০

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু কল্যাণী কিছুতেই স্বামীর সংসারে মন বসাইতে পারিল না। "ভবিতব্য" "অদৃষ্ট" "বিধিলিপি" ইত্যাদি যুক্তিতর্ক-বিরহিত শাস্ত্রীয় প্রবোধ-বচনগুলি কিছুতেই তাহাকে সান্ত্বনা দিল না। একটা অতিবড় দুঃখের আক্রমণে তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অভাব-অভিযোগশূন্য সচ্ছল সংসার, এত বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি কিছুই কল্যাণীর মনকে আকৃষ্ট করিল না। জগদীশবাবুর আন্তরিক চেষ্টা ও ভালবাসিবার আগ্রহ, বিধবা ননদিনী কাদম্বিনীর যত্ন ও স্নেহ সমস্তই তাহার নিকট ফাঁকা-ফাঁকা, অন্তঃসারহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল;—এ যেন ভান, সত্যের বাহিরে। কল্যাণী বুঝিল

না, বুঝিতে চাহিল না, নারী-জীবনের সার্থকতা কোথায়; কতখানি আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠে।

আজ বৈকালে শূন্য ঘরের খোলা জানালার পাশে বসিয়া এই কথাটাই কল্যাণী মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছিল, জগদীশবাবু তাহাকে বিবাহ করিল কেন? কেন সে তাহার জীবনটা এমন করিয়া অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল? এই অলঙ্কার, এই ঐশ্বর্য্য, ইহার বিনিময়েই কি তাহার নারী-জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা? এই বৃদ্ধ স্বামী, কি চায় সে? প্রেম, ভালবাসা? কল্যাণী এত দুঃখেও হাসিল। হায়, সে যদি তাহার বুকখানাকে চিরিয়া দেখাইতে পারিত, তাহার অন্তর জুড়িয়া একটা কত বড় সাহারা পড়িয়া রহিয়াছে; সেখানে একবিন্দু জল নাই, শুষ্ক তপ্ত মরুভূমি, একটা সীমাহীন শূন্যতা, আর ইহারই পশ্চাতে ছুটিয়াছে স্বামী তৃষাতুরের তীব্র পিপাসা লইয়া। তাহা হইলে কি তাহাকে ইহারা মুক্তি দিবে না? না, ইহজীবনে আর তাহার মুক্তি নাই! তাহাকে বাঁধা হইয়াছে শাস্ত্রের শৃঙ্খল দিয়া, শুধু দেহের ক্ষুধা মিটাইয়া লইবার জন্য,—তার বেশী নয়। ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় ঘৃণায় কল্যাণীর অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। পশ্চাতে একটা চাপা হাসির শব্দে মুখ ফিরাইতেই দেখে জগদীশবাবু হাসিমুখে তাঁহার প্রকাণ্ড ভুঁড়িটার উপর হাত বুলাইতেছেন। কল্যাণী মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইল। জগদীশবাবু কহিলেন, "চুপ করে একলাটি এখানে বসে যে?" কল্যাণী কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কি আমি আসতেই অমনি বুঝি পালানো হচ্ছে? আচ্ছা, বল ত নতুন বৌ, আমি বাঘ না ভাল্লুক, যে আমাকে দেখলেই পালাতে চেষ্টা কর!"

কল্যাণী মাটির দিকে চাহিয়া আঙ্গুলে আঁচলের প্রান্ত জড়াইতে জড়াইতে কহিল "আমি ত তা বলিনি!"

"মুখে বল না বটে কিন্তু—" জগদীশবাবু কল্যাণীর পিঠের উপর হাত রাখিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিলেন "কিন্তু সত্য করে বলত নতুন বৌ, আমাকে তোমার—"

কল্যাণীর চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে জগদীশবাবুর হাতখানা সরাইয়া দিয়া কহিল "আমি যাই, কাজ আছে" কল্যাণী ত্রস্তপদে সেথান হইতে চলিয়া গেল। জগদীশবাবু মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন "ওরে নেতা, নেতা!"

চাকর নেত্যধন ছুটিয়া আসিতে জগদীশবাবু কহিলেন "দেখছিস না বেটা, সন্ধ্যে হয়ে এল, যা আমার আফিমের কৌটাটা নিয়ে আয়…"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া নেতা চলিয়া গেল!

জগদীশবাবু উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া দূরে গোধূলির ম্লানিমাপূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে যাইয়া বসিলেন এবং মনের সঙ্গে নানা তর্ক জুড়িয়া দিলেন! এ কি অভিমান, বিরক্তি, লজ্জা, না ঘৃণা? না, ও বোধ হয় কিছুই নয়, আর কিছুদিন গেলে এই সঙ্কোচের ভাবটা নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে! কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া বলি? এই ত আজ আট মাসের উপর কাটিয়া গেল, কল্যাণী ত এক দিনের তরেও তাহার সঙ্গে কক্ষণও যাচিয়া কথা বলে নাই? যদি "হাঁ" ও "না" এই দুটো কথায় মিটিয়া যায় তাহা হইলে সে অধিক কথা পর্য্যন্ত কহে না। তবে কি আমার বয়স বেশী বলিয়া সে আমায় আন্তরিক ঘৃণা করে? কই তাহারও ত কোন লক্ষণ দেখি না! প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে সে আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হয়! ইহা ত আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া কতদিন দেখিয়াছি! আর আমার বয়স এমনই বা কি বেশী? আমার চেয়ে বেশী বয়সেও সেবার হরি মুখুজ্যে তৃতীয়বার বিবাহ করিল! একটি ছেলেও তাহার হইয়াছে; দেখিলে মনে হয় বেশ শান্তিতেই আছে! তবে আমার অদৃষ্টে পরিপূর্ণ সুখ নাই কেন? হায়, আজ যদি সে বেঁচে থাকৃত! অতীত-স্মৃতি প্রাণের উপর কশাঘাত করিল, তিনি শূন্য দৃষ্টিতে ব্যথিত অন্তঃকরণে আকাশের দিকে চাহিলেন। বিরাট অন্ধকারের কালো পরদা তখন পৃথিবীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, আর তুষার-ধবলমণ্ডিত মেঘের আড়াল হইতে গুটিকয়েক তারা বহুদূরে বসিয়া মিটমিট করিয়া চাহিয়া হাসিতেছিল!

জগদীশবাবুর বিধবা ভগ্নী কাদম্বিনী পশ্চাত হইতে ডাকিল "দাদা, দুধ এনেছি।"

"ও কাদু, দুধ এনেছিস্? আচ্ছা ঘরে আয়।" জগদীশবাবু উঠিয়া ঘরে গেলেন! এক ডেলা আফিম মুখে ফেলিয়া, এক ঢোক জল খাইয়া, দুধ পান করিয়া মুখ মুছিলেন!

কাদম্বিনী মৃদুকণ্ঠে কহিল "দাদা, রাঙ্গা-ঠানদি, পূজার সময় কাশী যাচ্ছে; তাই আমিও মনে করছি এইবার ঘুরে আসি! এখানে মামী রইল, আর বৌ রইল, সে ত সব এতদিনে জেনেশুনে নিয়েছে!"

জগদীশবাবু ম্লান হাস্যে কহিলেন, "তবেই হয়েছে রে? তোদের বৌ এই এত বড় সংসার চালাবে? আর মামীর হাতে সংসারের ভার পড়লে চাকর বামুন যে যেখানে আছে সবাই পালাবে, আর আমাকে উপোষ করে মরতে হবে! আমাকে দেখবার কেউ থাকবে না!"

কাদম্বিনী হাসিয়া কহিল "তোমার কেমন এক কথা দাদা! বৌ রইল কি করতে? তোমাকে দেখবে না?"

"এই ত এতদিন হল তোদের বৌএর সঙ্গে ঘর করছিস, এ সংসারের ওপর ওর কত মায়া মমতা দেখিস নি?" বলিয়া জগদীশবাবু হাসিতে লাগিলেন!

"কি যে বল দাদা, তার ঠিক নেই! সংসারের কত কাজ বউ করে তা জান? তা ছাড়া, এই পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ওর কাছে দুপুরবেলা পড়তে আসে, ও-বাড়ীর জেঠাইমা আসেন; তাঁকে রামায়ণ পড়ে শোনাতে হয়, ঠানদি তার নাতির জন্যে বৌদিকে দিয়ে গলাবন্ধ তৈরী করাচ্ছে। কেমন মিশুক, আমুদে; সকলেই বৌদির সুখ্যাতি করে, আর তুমি কেবল নিন্দে—"

জগদীশবাবু হাসিয়া কহিলেন "আমার নিন্দে করা স্বভাব! যাক্‌গে; তোদের বৌ, তোদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেই হল, আমার আর কদিন—গঙ্গামুখো পা হয়েছে—নেহাৎ মামী কান্নাকাটি করলে, তুই ধরে বসলি, বল্লি, বাপের বংশ লোপ হবে; তাই এ বয়সেও আবার ভালই হক, আর মন্দই হক, একটা কাজ করে ফেলা গেল! না হলে আমার সুখ শান্তি তার সঙ্গে চলে গেছে রে! তোদের নতুন বৌএর কাছে আমি কিছুরই প্রত্যাশা রাখি না।"

কাদম্বিনী জগদীশবাবুর দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া দেখিল কল্যাণী বারান্দার রেলিংটা ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে! কাদম্বিনী কহিল "অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন বৌ, আমায় কিছু দরকার আছে?"

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল "পুরুত মশাই এসেছেন, ঠাকুরের বৈকালীর সব যোগাড় হয়েছে—"

"তা তুমিই দাও না, আমি দাদার সঙ্গে কথা কয়ে যাচ্ছি!" কল্যাণী চলিয়া গেল।

জগদীশবাবু কহিলেন "চল্, তা হলে তোদের সঙ্গে আমিও না-হয় দিনকতক ঘুরে আসি! বৌকে ওর মামার বাড়ী পাঠিয়ে দে, বাড়ীতে মামী থাকলেই হবে! আর খাজনাপত্তর ত সব আদায় করা হয়ে গেছে, নায়েব মশাই থাকবে, সব দেখবে শুনবে!"

"তুমি যাবে দাদা? তাহলে বেশ হবে! চল এইবার যাবার পথে গয়ায় বাবার কাজ সেরে যাবে! তারপর কাশীতে যাওয়া যাবে! সেখানে তোমার গুরুদেব আছেন, তাঁর সঙ্গে ত তোমার কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই!"

জগদীশবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সেই ভাল, চল্ বেরিয়ে পড়া যাক্। আর বয়স ত হল, কবে আছি কবে নেই, বাবার কাজটা সেরে আসি। গুরুদেবকেও একবার দেখে আসি!"

"তোমার গুরুদেব আমায় লিখেছেন যে 'তোমাদের খুব সুলক্ষণা লক্ষ্মী বউ এসেছে, ওর পুণ্যে তোমার দাদার শ্রীবৃদ্ধি হবে, তোমার বাপের বংশ রক্ষা হবে!' গুরুবাক্য কখনও মিথ্যে হয় না দাদা! তাহলে আমি মামীকে বলে যাবার সব যোগাড় করছি!" বলিয়া কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

জগদীশবাবু ধীরে ধীরে বাহিরের বৈঠকখানার দিকে চলিলেন; তাঁহার কাণের কাছে কাদম্বিনীর শেষ কথাটা তখনও ধ্বনিত হইতেছিল। "গুরুবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না দাদা!" জগদীশবাবু উদ্দেশে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। (ক্রমশঃ)

শুভ-বিবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সেদিন রাত্রে যখন নীলাম্বর
প্রিয়-পত্নী মনোরমার শ্রীহস্তের সুপাচিত আহারাদির পর
ছড়িয়ে দিয়ে হাত-পাগুলো, লম্বা হ'য়ে কোমল শয্যা-তলে
চক্ষু মুদে গুড়গুড়িটে আপনমনে টান্‌ছে কুতুহলে,
সুবাসিত তামাকটি তার তপ্ত তাওয়ায় জ'মে
শ্রান্তি-হরা, তৃপ্তি-ভরা ঘন সুনীল ধোঁয়া পরিবেষণ করছে তাকে ক্রমে,
এমন সময় মনোরমা ঘরের ভিতর এসে,
নীলাম্বরের ধূম্র পানের রকমখানা দেখে—উঠল ভারি হেসে!
তারপরে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ব'সল স্বামীর কাছে
মিষ্টি গলায় বললে "হাাঁগা, খবর ওদের আর, নোতুন কিছু আছে?"
মিহি জরীর কাজ-করা সেই রেশমী-চিকণ লক্ষ্ণৌয়ী নল
আবৃলুপি তা'র অধর স্পর্শে নীলু তখন হর্ষে বিহ্বল,
স্বপ্নলোকের অজানা কোন্ অচিন্-পুরে যাচ্ছে ভেসে
কুণ্ডলীময় ধোঁয়ার রাজ্যে—আবছায়া এক মায়ার দেশে,
মিলিয়ে গেছে মন থেকে তার দুর্ভাবনার দুঃখ যত
জুড়িয়ে গেছে সংসার-তাপ বাদল বায়ে রোদের মত
ঘুম নেমেছে আঁখির পাতায় আল্‌বোলাটির খেয়াল গানে,
পৌঁছল না মনোরমার কথাটা তাই মোটেই কানে।
"শুনছো ওগো!" ডাকলে আবার গা ঠেলে তার মনোরমা
"এর মধ্যেই' ঘুমিয়ে কাদা?—অবাক ক'রলে তুমি ওমা!
খেয়ে উঠেই প'ড়লে শুয়ে? শুন্‌ছো ওগো, ধোঁয়ার নবাব,
বলি, আমার কথার একটা যা-হোক কিছু দাও না জবাব।
বাদশাহী ওই তামাক টানা একটু এবার যদি, ভালয় ভালয় না দাও তুমি ছেড়ে
মুখ থেকে ওই নলটা আমায় নেহাৎ দেখ্‌ছি তবে, নিতেই হবে কেড়ে!"
নীলু তখন আকাশ ছোঁয়া প্রচুর ধোঁয়ায় উড়িয়ে ফুঁ
তেমনি ভাবে চক্ষু মুদেই ব'ল্‌লে শুধু ছোট্ট "হুঁ!"
অধীর হ'য়ে মনোরমা, ছিনিয়ে নিলে উঠে, নীলুর মুখের নল,
ব'ললে "দাঁড়াও, ক'লকেটাতে দিচ্ছি ঢেলে খানিক্ ঠাণ্ডা কুঁজোর জল—!"
শশব্যস্তে নীলাম্বর দেখলে এবার চোখ দুটি তার মেলে,
তাই ত, এ কি! পত্নী যে তার সত্য করেই সমুদ্যত জল দিতে আজ ঢেলে

একটি গেলাস ভ'রতি ক'রে গড়িয়েছে সে জল,

নয়ত' এটা প্রিয়ার মুখের—মিথ্যা কেবল তবে ভয় দেখানোর ছল !

'হাঁ হাঁ' করে নীলাম্বর একেবারে বসল' তখন উঠে,

ব্যাপার দেখে ফুটলো এবার, ফুলের মতো হাসি—মনোরমার মধুর অধর-পুটে !

নামিয়ে রেখে গেলাসটাকে, ব'ললে অধর টিপে "আচ্ছা এবার করছি তোমায় মাপ,

কিন্তু দেখো আর যেন ফের্ ঘটিয়োনাকো মোর অকারণে এমন মনস্তাপ !

—কর্ম্মনাশা নলটা যদি আবার দেখি তুমি মুখে নিয়েছো তুলে,

তাহ'লে ওই তামাক-টিকে আজ থেকে রোজ দেখো রাখবো জলে গুলে !"

"ব্যাপারটা কি ? কী হয়েছে ?" হাসতে হাসতে ব'ল্লে নীলাম্বর,

"তামাক ত নয় সতীন তোমার, তবে এমন রাগ হঠাৎ কেন প'ড়ল এটার' পর ?"

মাথাটি' তার হেলিয়ে লীলায় দু'চার বার ডাইনে থেকে বাঁয়ে

মনোরমা জোড় ক'রে হাত বললে "তোমার পড়ছি দু'টি পা'য়ে,

বন্ধ করো বাজে কথা মাথার দিব্যি ওগো, কাজের কথা দু'একটা আজ কও,

'অনু'র বিয়ের জন্য হেথা—একটি দিনের তরে চিন্তিত কেউ দেখ্‌ছি মোটেই নও।

কি বল্‌লেন, সেদিন যাঁরা এসেছিলেন দেখ্‌তে আমার মেয়ে ?

তাঁরাও বুঝি সুন্দরী চান আরও একটু জবর অনুরূপার চেয়ে ?"

নীলু ব'ল্‌লে "ক্ষেপ্‌লে মনু, অনুর চেয়ে সুন্দরী আর

বাঙ্‌লা দেশের মেয়ের হাটে হাজারে এক পাওয়াই ভার।

আমাদের এই দুঃখী জাতের সব মেয়েরই রূপের অভাব,

কিন্তু জেনো তোমাদের এই মিষ্ট মধুর শান্ত স্বভাব ।

তুচ্ছ করে দিয়েছে আজ—রূপের গর্ব্ব যেন—বিশ্বমাঝে ধূলার চেয়েও হীন,

বাঙ্‌লা দেশের শ্যামলা মেয়ের হৃদয় মণির আলোয় সুন্দরীদের রূপের জ্যোতি দীন !

করুণ হেসে মনোরমা বললে তখন "থামো, তোমাদের এই মিথ্যে কথার জালে

রেখোনা আর এমন করে ভুলিয়ে আমাদের ; চুণকালি যে দিচ্ছে লোকে গালে !

রূপের চেয়ে গুণের শোভা সত্যি যদি লাগতো চ'খে ভালো,

বাছতে না' আর এমন ক'রে ছেলের বিয়ের বেলা পাত্রী কেমন ? সুন্দরী না কালো ?

লজ্জা ক'রে আমার, যখন নির্ল্লজ্জ পুরুষগুলো এসে—জিনিস কেনার মতো—

মেয়েটাকে নেড়ে চেড়ে বাজিয়ে দেখে যায় ;—অপমানে বুকখানা হয় ক্ষত !

মুখে তোমরা যতই বলো আমরা দেবী—লক্ষ্মীরূপা—এ সংসারের রাণী,

পুরুষ জাতির সুখ সুবিধার যন্ত্র ছাড়া আর—নই যে বেশী কিছু—স্পষ্ট এটা না মানলেও অন্তরে তা জানি !"

নীলু এবার গুণ্‌লে প্রমাদ মনোরমার চ'খে—নির্য্যাতিতা নারীজাতির ক্ষোভের অনল দেখে।

তাড়াতাড়ি ও-প্রসঙ্গ চাপা দেবার তরে ব'লে উঠলো হেঁকে—

বর-ক'নেতে মাঝখানে তার লজ্জাভ'য়ে উঠছে ঘেমে ;
    ব্যাপার শুনে মেয়ের দলও এসে পড়েছেন নীচেয় নেমে।
নানান্ লোকের বাক্‌বিতণ্ডায় বেড়ে উঠছে গণ্ডগোল,
    অম্বিকা বোস্ হাঁকছে কেবল "সুরো উঠে আয়, চেলী খোল্"।
সামনে ছিল চুণী মিত্তির, পাড়ার সে এক মস্ত ধনী,
    হেসে বল'লে "বোস্‌জা মশাই, মেয়ের বাপ কি টাকার খনি ?
ইচ্ছে মতো কুপিয়ে নেবেন পণ পাওনার দাবী দিয়ে,
    ভদ্রলোকের এ ব্যবহার দেখিনি আর, ব্যাপার কী এ ?—
আসেননি ত' বেচ্‌তে ছেলে, নিতে এসেছেন পুত্রবধূ
    দেখুন দেখি মায়ের আমার কান্তি কেমন স্নিগ্ধ-মধু !
যা হোক্, এখন হুকুম করুন—শেষ হ'য়ে যাক্ সম্প্রদান—
    আমিই দিচ্ছি বাড়্‌তি টাকা—আপনি যেটা লুটতে চান !"
শুনে সবাই 'ধন্য ধন্য' করে উঠল চতুর্দ্দিকে
    "—এই ত' হলো ব'নেদী চাল, বড় লোকের কাজ ত' ঠিক এ !"
পাঁচশো টাকার পাঁচখানা নোট চুণী মিত্তির দিলে গুণে ;
    আনন্দে সব মেয়ের দল উলু দিয়ে উঠলো শুনে !

৩

চল্‌ল'আবার সম্প্রদানটা যথারীতি মন্ত্র প'ড়ে ;
    বরযাত্রীর কাছে গিয়ে চুণী মিত্তির করজোড়ে
বল্‌লে তখন ; "চোখের উপর দেখলেন ত' ব্যাপার আজ,
    ছেলের বে'তে ভদ্রলোকের এই কি মশাই উচিত কাজ ?
লগ্ন যদি থাকতো আজ আর—তবে নিশ্চয় এটার ঘরে—
    দিতাম নাকো নীলাম্বরকে মেয়ে দিতে এমন ক'রে !
বলেন যদি আপনারা সব—বোস্‌জাটাকে শিক্ষা দিই,
    যে টাকাটা ঠকিয়েছে সে, কায়দা ক'রে ফেরত নিই !"
শুনে সবাই সমুৎসাহে ব'ললে "অমত নাইক' কারো,
    জব্দ করো ইতরটাকে যেমন ক'রে তোমরা পারো !"
চুণী মিত্তির গিয়ে তখন বরের বাপকে ব'ললে ডেকে—
    "এই এতজন ভদ্রলোককে ধ'রে এনেছেন কোথা থেকে ?
এঁদের তো কেউ আমরা গিয়ে ক'রে আসিনি নিমন্ত্রণ ;
    এ বাড়ীতে হয়নি এঁদের আহারাদির আয়োজন।
আপনি যখন ডেকে এনেছেন, আপনারই এ তখন ভার—
    কি খাওয়াবেন এই রাত্রে—ব্যবস্থাটা করুন তার !"
অম্বিকে বোস বললে রেগে—"এ সব কথার মানেটা কি ?

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা যা, করবে সে তো মেয়ের বাপ ;
এ যে দেখছি আমার ওপর দিতে চাইছেন উল্টো চাপ !"
চুণী মিত্তির বললে হেসে "যা বল'ছেন খুবই ঠিক ;
কিন্তু, আমার ইচ্ছেটা আজ—বজায় রাখতে উভয় দিক,
আড়াই হাজার কথা ক'য়ে,—আর পাঁচশ' নিলেন ধরে,
বর তুলে নে' চলে যাবার ভয় দেখালেন গায়ের জোরে ;
এতো লোকের খাওয়া-দাওয়ার ক'রতে হ'লে আয়োজন
বুঝতে কি আর পারছেন না—অনেক টাকার প্রয়োজন ?
আপনি যেটা নিলেন বেশী, সে টাকাটা থাকলে হাতে
ভালমন্দ যা হোক্ কিছু দিতে পারতেম এঁদের পাতে ;
কিন্তু যখন খরচটা তার নগদ আপনি নিলেন চেয়ে,
আমরা ওসব পারবো না আর ; আপনি শুধু যাবেন খেয়ে !"
শুনে আগুন অম্বিকে বোস ব'ললে "তোমরা অতি ইতর !"
"সেটা তুমিই" কে একজন বলে উঠল' ভীড়ের ভিতর !

৪

স্ত্রী-আচার ও সম্প্রদানটা ইতিমধ্যেই গেছে চুকে'
বধূর রূপে মুগ্ধ সুরেন বাসর-ঘরে হাসছে সুখে ;
এমন সময় শুনতে' পেলে নীচে থেকে হাঁক্‌ছে পিতা—
"সুরো, এখনি আয় নেমে আয়, চাইনি এমন কুটুম্বিতা !
ছোটলোকের এ মেয়েকে যাবই না আর আমি নিয়ে—
এই মাসেতেই দেবো আবার ছেলের আমার অন্য বিয়ে !"
মলিন হ'য়ে উঠল শুনে নববধূর ইন্দুমুখ— !
মিলিয়ে গেল কোন্ আঁধারে বাসর-ঘরের দীপ্তিটুক্ !
রোষে ক্ষোভে অভিমানে সুরেন এল নীচেয় নেমে,
লজ্জিত সে পিতার কার্য্যে, উত্তেজনায় উঠ্‌ছে ঘেমে,
বাপ ব'ললে "বেরিয়ে চলো, হাজির আছে বাইরে গাড়ী,
এই কাপড়েই আমার সঙ্গে এখনই আজ ফিরবে বাড়ী—"
রুক্ষভাবে ব'ললে সুরেন—"চলুন, কিন্তু কাজটা খারাপ—
একি আপনার অত্যাচার !—সইবে কেন এত পাপ ?
দাদার বে'তেও এই কাণ্ড করেছিলেন কুড়ুল গ্রামে,
ফিরিয়ে দিন সব টাকাকড়ি নিয়েছেন যা আমার নামে—"
বলতে বলতে ছিনিয়ে নিয়ে বাপের হাতের টাকার তোড়া
ব'ললে—"আমি চাইনে এ-সব, যত নষ্টের এই ত গোড়া !"
চুণীবাবুকে ব'ললে ডেকে "ফিরিয়ে নিন্ এই টাকাকড়ি,
এই আপনার হীরের আংটি, এই দেখে নিন সোনার ঘড়ী—

বাপকে ডেকে বললে—"আমি, সাক্ষী রেখে নারায়ণ—
অগ্নি ছুঁয়ে বেদমন্ত্রে—পত্নীরূপে আপনি গ্রহণ
করেছি আজ সভায় যাকে,—সঙ্গে তাকে নে'যেতে চাই,
নিরপরাধ সে বালিকায় কোন্ বিধানে ত্যাগ করে যাই ?"—
ভীষণ চটে অম্বিকে বোস ব'ললে "তবে থাক্ এখানে,
আজ থেকে তুই ত্যজ্যপুত্র, স্থান পাবিনি আর সেখানে।"—
বলতে বলতে বেরিয়ে গেল, মুখ ক'রে তার—কালো—আঁধার,
বাইরে থেকে শুনতে পেলে—উঠছে ছেলের—'জয় জয়কার।"
চুণী মিত্তির জড়িয়ে বুকে ব'লছে—"বাবা থাক্ বেঁচে থাক্।"
ঘন ঘন উঠছে উলু,—মেয়ে-মহলে বাজছে শাঁখ!

তক্ষশিলা *

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবস্থান এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য

তক্ষশিলা জেলা রাওলপিণ্ডি সহরের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, এবং সীমান্ত প্রদেশান্তর্গত পেশাওয়ার নগরের ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তর পারে অবস্থিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম General Cunningham প্রাচীন লেখকদের প্রদত্ত অবস্থান-নির্দ্দেশ বিচার করিয়া এই স্থানকে তক্ষশিলা বলিয়া অনুমান করেন। তৎপর এখানে আবিষ্কৃত কতিপয় প্রাচীন লিপির মধ্যে তক্ষশিলার উল্লেখ দৃষ্টে, এই স্থানই যে তক্ষশিলা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ট্যাক্শিলা জংশন হইতে মূল লাইন পশ্চিম দিকে পেশাওয়ার অভিমুখে, এবং শাখা লাইন উপত্যকার প্রান্তর-বক্ষ ভেদ করিয়া উত্তর দিকে, কাশ্মীরের পথে, হেভেলিয়াঁ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্র-বক্ষ হইতে এই উপত্যকার উচ্চতা প্রায় ১৭০০ ফিট।

তক্ষশিলায় পৌঁছিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমরা যেন পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক-ছিন্ন, জনসমাগম-বিরল এক পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। চতুর্দ্দিকেই উত্তুঙ্গ শৈলরাজির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর এই রমণীয় উপত্যকাটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া ঠিক যেন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সযত্নে ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। উত্তরে সীমান্ত প্রদেশস্থ হাজরা জেলার বিশাল-গর্ভ পাহাড়; পূর্ব্বে মারি-শৈলের শাখা-প্রশাখা; দক্ষিণে বিখ্যাত মারগালা পাহাড়; পশ্চিমে বহুবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ শৈলস্তূপ শ্রেণী,—ইহারই মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন বৈদেশিক ও স্বদেশী নরপতিবৃন্দের ক্রীড়াভূমি, ইতিহাস-বিশ্রুত, কীর্ত্তি-বহুল, প্রকৃতির রম্য লীলা-নিকেতন তক্ষশিলার সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা।

উপত্যকার উত্তর দিক দিয়া হারো নাম্নী পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিতা। হারো হইতে আনীত বহুসংখ্যক কৃত্রিম জল প্রণালী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়া শস্যক্ষেত্র সমূহের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী মারগালা পাহাড়ের পাদনিম্নস্থ একটি ঝরণা হইতে 'কালা' নামক জলস্রোত বাহির হইয়া পশ্চিমাভিমুখে বহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের শৈলমালা হইতে বহুসংখ্যক কঠিন প্রস্তরময় উর্দ্ধ-শীর্ষ পাহাড়রাশি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া উপত্যকার পূর্ব্ব অংশ কোণাকুণি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই শৈল-শ্রেণীর পশ্চিমাংশ 'হথিয়াল' নামে পরিচিত। উত্তর ভাগের উপর দিয়া পুণ্ডী নালা নামক হারো নদীর একটি ক্ষীণকায় উপস্রোত অন্যান্য বহুবিধ প্রশাখা সহ প্রবাহিত। দক্ষিণাংশের উপর দিয়া, হথিয়ালের পশ্চিম পাদদেশ ধৌত করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তম্রা বা তম্রা নালা বহিয়া গিয়াছে। এই অংশের স্থানে স্থানে বহু গভীর গহ্বর

---

* [এই প্রবন্ধান্তর্গত তক্ষশিলার প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিত্র, প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ (Director General of Archaeology) Sir John Marshall অনুগ্রহ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।—লেখক]

ও কঠিন প্রস্তরময়, উদ্ভিদাদিশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের স্তূপ অবস্থিত। পরিউক্ত নদী এবং নালাগুলি বৎসরের অধিক সময়ই জলশূন্য থাকে; াদের তলমধ্যস্থ শ্বেত উপলখণ্ড রাশির স্তর দূর হইতে ঠিক রৌপ্যের ায় প্রতীয়মান হয়।

মোটের উপর স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম—উদ্ধে স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশের নীল চন্দ্রাতপ, চতুর্দ্দিকে বিচিত্র-বর্ণ শৈলরাজির াচীরবৎ পরিবেষ্টন, অধোদেশে নিম্নভূমে অথবা শৈল-অঙ্কে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্ররাজি, স্থানে স্থানে ঘনপত্র-সমন্বিত ফলাই এবং সোনাথা বৃক্ষের

তক্ষশিলার মানচিত্র

বীথিকা, দূরে দূরে সমতল ভূমি অথবা পাহাড়োপরিস্থ এক একখানি মনোহর পল্লী, মাঝে মাঝে রজতশুভ্র অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর স্তত: বক্র গতি-রেখা, আর সর্ব্বোপরি সমগ্রের মধ্যে বিরাজিত টা ধীর, স্থির, সৌম্য, শান্ত, গম্ভীর, পবিত্র ভাব,—ভাবুকের ভাগ্য!

উল্লিখিত দ্বিধা-বিভক্ত ভূখণ্ডের মধ্যে, স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তর-পূর্ব্বে বিনষ্ট-সমৃদ্ধি তক্ষশিলার প্রাচীন কীর্ত্তিরাজির ধ্বংসা- অবস্থিত থাকিয়া আজ তাহার বিগত গৌরব-মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তক্ষশিলার গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার পর হইতে এতাবৎকাল অধিকাংশ ধ্বংস-স্তূপই কৃষকগণের শস্য ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কতকগুলির উপর গ্রাম বসিয়া গিয়াছে; আর কতকগুলি পাহাড় উপরিস্থ সৌধের ভগ্নাবশেষ নানাবিধ বৃক্ষলতা ও মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়া একরূপ নিশ্চিহ্নই হইয়া আসিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বিগত কয়েক বৎসর অবধি ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগ হইতে এই সমুদায় স্থান খনন করিয়া কতিপয় প্রাচীন নগর ও মন্দির, বহুসংখ্যক বৌদ্ধ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম বা বিহার, এবং তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য পুরাতন দ্রব্য সামগ্রী আবিষ্কার করা হইতেছে। প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ (Director General of Archaeology) সুপণ্ডিত Sir John Marshall মহোদয় অনুসন্ধিৎসু দর্শকবৃন্দের সুবিধার্থে উক্ত প্রাচীন দ্রব্যাদি স্থানীয় অফিস-সংলগ্ন একটি গৃহে অস্থায়ীভাবে রক্ষা করিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

আবাল্য-শ্রুত তক্ষশিলায় পৌঁছিয়াই এই সকল কীর্ত্তিরাজি দর্শন করিয়া বহু দিনের সযত্ন-সঞ্চিত গোপন আশা তৃপ্ত করিতে লাগিলাম।

আমরা ক্রমে ক্রমে উল্লিখিত নগর ও অন্যান্য সৌধাবলীর বিশদ বর্ণনা প্রদান করিব। তৎপূর্ব্বে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তক্ষশিলার ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

তক্ষশিলার বিভিন্ন নাম।—প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তক্ষশিলার বিভিন্ন নাম পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পুস্তকাদিতে "তক্ষশিলা" নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "তক্ষশিলা"র অর্থ Dr. Wilsonএর মতে "কর্ত্তিত শৈল"; Sir John Marshallএর মতে "কর্ত্তিত শিলার নগরী"; Prof. Buhlerএর মতে "নাগরাজ তক্ষকের শৈল।" কোন কোন গ্রন্থে "তথশিলা" দেখা যায়। একখানি তাম্রশাসনে ইহার পালি নাম "তক্খশিলা" উৎকীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, "তক্ক" জাতি কর্ত্তৃক এই নগরী স্থাপিত বলিয়া ইহার নাম "তক্কশিলা"। রামায়ণে দেখা যায়, ভরত তাঁহার পুত্র তক্ষের নামানুসারে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন "তক্ষশিলা।" প্রবাদ এই—ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্ব এক জন্মে এইখানে নিজ মস্তক অপরকে কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তক্ষশিলা "তক্ষশির" অর্থাৎ খণ্ডিত বা কর্ত্তিত মস্তক নামে উক্ত হইয়াছে। এই অর্থে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ইহার নামকরণ করিয়াছেন "চু ষা-ষি-লো"—"খণ্ডিত মস্তক।" তক্ষশিলায় প্রাপ্ত একখানি খরোষ্ঠি লিপিতে ইহার নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে "তছশির।" তিব্বতীয় ভাষায় ইহার নাম "rdo-hjog" অর্থাৎ ক[illegible] শিলা। গ্রীক এবং রোমের লেখকগণ লিখিয়াছেন, "ট্যাক্সি[illegible]" (Taxila)। বলা বাহুল্য, অধুনা প্রচলিত ইংরাজী ন[illegible] "ট্যাক্শিলা।" এখানকার স্থানীয় লোকে বলে "টেশ্‌কিলা।"

পাহাড়োপরিস্থ টেরিসাহী গ্রাম

তক্ষশিলার প্রাচীনতা।—অতীতের জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্র[illegible] নবাগত আর্য্যজাতি-অধ্যুসিত পঞ্চনদ প্রদেশের একদা-সমৃদ্ধি-শ্রেষ্ঠ [illegible] পুরাতন নগরটির প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। তথাপি যে সেই [illegible] অতীতে, সেই নবীন প্রভাতের নবীন আলোকে উদ্ভাসিত গগনের [illegible] পঞ্চনদ ভূমি তথা সমগ্র ভারতের বক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তক্ষশি[illegible] গৌরব-দুন্দুভি নিনাদিত হইত, এবং তাহার গৌরবোন্নত শীর্ষে বি[illegible] বৈজয়ন্তী উড়িত,—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। খীস্তজন্মের [illegible] অনূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলার প্রাচীনতম নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল—বর্ত্তমান আবিষ্কার তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। (১)

প্রাচীন সাহিত্যে তক্ষশিলার উল্লেখ। ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ।—ভা[illegible] প্রাচীন সাহিত্যেও তক্ষশিলার ভূরি ভূরি উল্লেখ তাহার প্রাচী[illegible] প্রমাণ দিতেছে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—আমরা [illegible]

---

(১) The foundation of the earliest city goes [illegible] to a very remote age, at least to the second, if n[illegible] to the third, millenium before our era."—Sir John [illegible]shall (Annual Report of the Director Gene[illegible] of Archaeology, 1912—13, p. 5).

লেখ করিয়াছি—ভরত তাঁহার পুত্র তক্ষ এবং পুষ্কলের নামানুসারে গন্ধর্ব্ব ও গান্ধার প্রদেশে যথাক্রমে তক্ষশিলা এবং পুষ্কলবত নামক দুইটি নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুত্রদ্বয়কে তথাকার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রকৃতিপুঞ্জের ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য স্থান দুইটির সমৃদ্ধি ছিল। সারি সারি পণ্য-বীথিকা, সুরম্য অট্টালিকা, সপ্ততল সৌধ, মনোহর মন্দির এবং তাল-তমাল বকুল-তিলক প্রভৃতি বৃক্ষরাজি নগরদ্বয়ের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিত। ভরত তথায় পাঁচ বৎসর বাস করেন। (২) মহাভারতে দেখা যায়, রাজা জন্মেজয় তক্ষশিলা জয় করার পর তথায় তাঁহার বৃহৎ সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞের সময় সমস্ত মহাকাব্যখানি পঠিত হইয়াছিল। বায়ু পুরাণে তক্ষশিলা

তম্রানালার এক দৃশ্য

...পের রাজধানী এবং রমণীয় নগরীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নি-পুরাণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণেও তক্ষশিলা "...... রম্যা তক্ষশিলা পুরী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (২) এতদ্ব্যতীত, পাণিনি, রঘুবংশ, বৃহৎসংহিতা, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য-গ্রন্থেও তক্ষশিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র।—খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে তৎপরবর্ত্তী ...ক শতাব্দী পর্য্যন্ত বিশাল শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশিলার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বহিঃস্থিত মিশর, ব্যাবিলন, সিরীয়া, আরব, চীন, তিব্বত প্রভৃতি সুদূর দেশ হইতে আগত বহু শিক্ষার্থী তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। এই বিদ্যালয়ে "তিন বেদ, অষ্টাদশ বিদ্যা" শিক্ষা দেওয়া হইত। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ্ পাণিনি এবং কুশাগ্র-বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য এখানে শিক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন। (৪) বৌদ্ধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ জাতকাদিতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশিলা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ধম্ম পদট্-ঠ-কথায় দেখা যায় কোশলাধিপতি পসেনদী তক্ষশিলায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিনয় পিটক নামক পুস্তকানুসারে মহারাজ বিম্বিসারের সভা-চিকিৎসক প্রসিদ্ধনামা জীবক তক্ষশিলায় ভেষজ এবং শল্য-বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের যুবরাজগণ এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এক স্থানে দেখা যায়, লালহ দেশের (লালহ=রালহ=হুগলী জেলা) জনৈক যুবক বিদ্যালাভার্থ তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন। বহু সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এখানে বাস করিতেন। একখানি জাতকে তৎকালীন ছাত্রজীবনের একটি অতি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বারাণসী-অধিপতির জনৈক পুত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করেন। তিনি অধ্যাপকের দক্ষিণা-বাবদ এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সঙ্গে লইয়া যান। সেই সময় দুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল—প্রথম, যাহারা তাহাদের অধ্যাপনার জন্য দক্ষিণা প্রদান

(১) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা প্রণীত "Historical Gleanings."

(২) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা প্রণীত "Historical Gleanings."

(৪) ভারতী, ১৩৩২।

অব্দ হইবার পর অশোক বহুসংখ্যক তক্ষশিলা-বাসীকে নির্ব্বাসিত করেন; উহারা চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত খোটান নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

অশোকের মৃত্যু।—মৌর্য্য সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা,—তক্ষশিলার স্বাধীনতা ঘোষণা।—খৃঃ পূঃ ২৩১ অব্দে ভারতগৌরব রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিছিন্ন হইতে আরম্ভ করে। এই সময় তক্ষশিলা এবং তৎসন্নিহিত অন্যান্য রাজ্য-সমূহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক অধিকার।

ঈদৃশ অরাজকতা দর্শনে পার্শ্ববর্ত্তী ব্যাক্‌ট্রিয় রাজ্যের (১৫) গ্রীকগণ ভারতের দিকে লোলুপ দৃষ্টি করিতে থাকে। অনুমান খৃঃ পূঃ ১৯০ অব্দে ব্যাক্‌ট্রিয়ার চতুর্থ রাজা ডেমিট্রিয়াস সর্ব্ব প্রথম তক্ষশিলায় আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি কাবুল উপত্যকা, পশ্চিম পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশে সৈন্যচালনা করিয়া উক্ত দেশসমূহ নিজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। ডেমিট্রিয়াসের পর তৎপুত্র প্যান্টালিয়ন এবং এগাথোক্লেশ যথাক্রমে তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। (১৬) তৎপরে খৃঃ পূঃ ১৭৫-১৭০ অব্দে ইউক্রেটাইডেশ নামক আর একজন গ্রীক বীর প্রথমতঃ ডেমিট্রিয়াসের ব্যাক্‌ট্রিয় রাজ্য, এবং পরে তক্ষশিলাসহ তদীয় ভারত-অধিকারের কতকাংশ নিজ করতলগত করেন।

উক্ত দুই নরপতি হইতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ইঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পরের রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে থাকেন। তৎপর খৃঃ পূঃ ১৬০-১৫৬ অব্দে (৭) গ্রীক বীর মেনান্দর, এবং খৃঃ পূঃ ১৫৬-১৪০ অব্দে (৭) এপলোটোডাস তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। ইঁহারা উভয়েই ডেমিট্রিয়াসের বংশধর। মতান্তরে, এপলোটোডাস ইউক্রেটাইডেশের পুত্র ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতাকে জনসাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করতঃ তাঁহার হত্যাসাধন পূর্ব্বক পিতৃরক্তে রঞ্জিত পদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৭) মেনান্দর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। খৃঃ পূঃ ১৪০-১৪০ অব্দে ( ) এন্টিয়ালকিডাস নামক একজন গ্রীক বীর তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। ইনি ইউক্রেটাইডেশের বংশসম্ভূত। এন্টিয়ালকিডাস তক্ষশিলা হইতে হেলিওডোরাস নামক একজন গ্রীককে রাজদূতরূপে মধ্য ভারতস্থ বিদিশা বা বেশ নগরের অধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। হেলিওডোরাস বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গোয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত ভিলসা নগরের অদূরস্থিত উক্ত বেশ নগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সুবিশাল পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আরও অনেক গ্রীক অধিপতি রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের জ্ঞান অতীব সঙ্কীর্ণ। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ নৃপতি তক্ষশিলায় শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সহিত উল্লিখিত দুইটি রাজবংশের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, অথবা আদৌ ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না।

ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকগণ অনধিক এক শত বৎসর তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ অথবা প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক অধিকারের লোপ হইয়াছিল।

পার্থিয় এবং শিথীয় বা শক অধিকার। (১৮)

অনুমান খৃঃ পূঃ ১৩৮ অব্দে পার্থিয়া রাজ্যের গ্রীক অধিপতি মিথ্রিডেট্‌স্ বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া ভারতসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক তক্ষশিলা রাজ্য অধিকার করিয়া তদীয় রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার এই অধিকার মোটেই স্থায়ী হইতে পারে নাই। (১৯) ইহার অনেক বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর প্রথমভাগে পার্থিয় এবং সিথীয় বা শকগণের সম্মিলিত আক্রমণ হয়; তজ্জন্য ভারতবর্ষ হইতে গ্রীকরাজত্বের মূলোচ্ছেদ ঘটে।

শক নামধারী অসভ্য তুরেণীয়গণ তাহাদের বাসস্থান মধ্য এসিয়া (শকদ্বীপ) হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমতঃ ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক গ্রীকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাহারা তাহাদের জ্ঞাতিশত্রু ইউচিগণ কর্তৃক নবলব্ধ রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া (২০) নিকটবর্ত্তী পার্থিয়ার উপরাজ্য সিস্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল তথায় বসবাস করে, এবং পার্থিয়দের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে মেলামেশা ও বিবাহাদি করিতে থাকে। তৎপর সিস্থান হইতে তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী আরাকোসিয়া বা কান্দাহার রাজ্য এবং অন্যান্য জনপদ সমূহ আক্রমণ করে। ইহাদের একদল ভনোনেস নামক জনৈক পার্থিয়ের অধিনায়কত্বে কান্দাহারেই আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক বসবাস করিতে থাকে; আর একদল মৌয়েস নামক একজন শক বীরের নেতৃত্বে ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করতঃ তক্ষশিলা রাজ্য অধিকার করে। মৌয়েশ সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৯৫ অব্দে কান্দাহারে প্রবল হইয়া উঠেন, এবং ইহার ১০ কি ১৫ বৎসর পরে তক্ষশিলায় উপস্থিত হন। মৌয়েসের পর খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে অথবা তাহার সমসময়ে এজেস তক্ষশিলার অধিপতি হন। এজেস ভনোনেসের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে পার্থিয় এবং

---

(১৫) সেলিউকাস প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য উদ্ভূত হয়, তন্মধ্যে দুইটির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিল; একটির নাম ব্যাক্‌ট্রিয়া, অপরটির নাম পার্থিয়া।—লেখক।

(১৬) Vincent Smith.

(১৭) প্রাচীন রাজমালা।

(১৮) মধ্য এসিয়ার বিবিধ শ্রেণীর তুরেণীয়গণ পুরাকালে ভারতবর্ষে একমাত্র শক নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের বাসস্থান শকদ্বীপ নামে কথিত হইত। পারস্যের ইতিহাসেও তাহাদিগকে একমাত্র সিথীয় নামে অভিহিত করা হইয়াছে।—লেখক।

(১৯) Vincent Smith.

(২০) প্রাচীন রাজমালা।

শক—উভয় জাতীয়রূপেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এজেসের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না ; তবে তাঁহার রাজত্ব যে সুদীর্ঘ এবং উন্নতিশীল ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ তিনিই যমুনার তীর পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতে শকরাজ্য বিস্তৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজ-শাসন ব্যাপারে তিনি সত্রপ (ক্ষত্রপ—প্রতিনিধি) কর্ত্তৃক শাসন প্রথা (ইহা প্রাচীন পারসীক প্রণালী) অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই প্রথা বহুকাল পঞ্জাবে প্রচলিত ছিল। এজেসের পরবর্ত্তী এজিলাইসেস (অঃ ১৫ খৃঃ পূঃ) এবং ২য় এজেসও (অঃ ৫ খৃঃ পূঃ) এই প্রথার অনুসরণ করেন। ইঁহাদের প্রতিনিধি, শকবংশীয় সত্রপ উপাধিধারী লিয়াক-কুসুলক (১৭ খৃঃ পূঃ), পাতিক (১০ খৃঃ পূঃ—১০ খৃঃ) এবং জিহুম (১০ খৃঃ) তক্ষশিলায়, ও রাজুভুল এবং সুদাস মথুরায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

২য় এজেসের মৃত্যুর পর খৃঃ ২০-৩০ অব্দে তক্ষশিলা এবং কান্দাহার এই দুই রাজ্য পার্থিয় অধিপতি গণ্ডোফারনেস কর্ত্তৃক এক-শাসনভুক্ত করা হয়। গণ্ডোফারনেস অতি প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহার যশোরাশি পাশ্চাত্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেণ্ট্ টমাস নামক প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক তদীয় রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি—গণ্ডোফারনেসকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। (২১)

তক্ষশিলা এবং কান্দাহার রাজ্যদ্বয় এক-শাসনভুক্ত করিবার পর গণ্ডোফারনেস কাবুলাধিপতি শেষ গ্রীক রাজা হারমিয়াসকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার এই সম্মিলিত রাজ্য মোটেই স্থায়ী হইতে পারে নাই ; কারণ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন প্রদেশের সত্রপগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে গণ্ডোফারনেসের বিশাল রাজ্য বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এব্ডাগেস পশ্চিম পঞ্জাব, অর্থাগ্নেস এবং তৎপর পাকোরেস্ কান্দাহার ও সিন্ধুদেশ লাভ করেন ; এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতির হস্তগত হয়। ইঁহাদের মধ্যে সাসান, সাপাডেনেস এবং শতবস্ত্রের নামাঙ্কিত মুদ্রা তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পার্থিয় রাজত্বের কালে, সম্ভবতঃ ৪৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের অন্তর্গত টিয়ান নগরের অধিবাসী, পিথাগোরাস সম্প্রদায়ের দর্শনবিদ্ এপলোনিয়াস তক্ষশিলা পরিদর্শন করেন। তদীয় জীবনী-লেখক ফিলোষ্ট্রেটাস লিখিয়াছেন, এই সময় ফ্রাটোস নামক জনৈক পরাক্রমশালী অধিপতি তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সমগ্র গান্ধার প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। এপলোনিয়াস উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া তক্ষশিলায় প্রবেশ করিয়া নগর-প্রাচীরের সম্মুখস্থ একটি মন্দিরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। খুব সম্ভব এই মন্দিরই বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত জণ্ডিয়ালের মন্দির। তাঁহার মতে তখন তক্ষশিলা নগরী আয়তনে নাইনেভ নগরের সমান, এবং গ্রীসের সহরগুলির ন্যায় সুশৃঙ্খলভাবে সুরক্ষিত ছিল। রাস্তাগুলি এথেন্সের রাস্তার ন্যায় সঙ্কীর্ণ এবং শৃঙ্খলাহীন ছিল ; গৃহগুলি বাহির হইতে দেখিতে একতল বলিয়া মনে হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকানিম্নে ভিত্তি-প্রকোষ্ঠ-সমূহ নির্ম্মিত ছিল। নগরের মধ্যে একটি সূর্য্যমন্দির, এবং আড়ম্বরবিহীন, সাদাসিদা একটি রাজপ্রাসাদ ছিল। ফিলোষ্ট্রেটাস-লিখিত বিবরণ স্থানে স্থানে কল্পনাপ্রসূত হইলেও মূলতঃ সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

কুষান অধিকার

গণ্ডোফারনেসের মৃত্যুর পর তদীয় বহুধা-বিভক্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এই সুযোগে কাবুলের সিংহাসন-চ্যুত অধিপতি হারমিয়াস তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় বিশেষ সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি কুষানগণের পর ক্রমশালী নেতা কজুল কদফিসের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক, প্রথমত তাঁহার সাহায্যে কাবুল রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, এবং পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া গান্ধার এবং তক্ষশিলা অধিকার করিতে সমর্থ হন।

উক্ত কুষানগণ চৈনিক ঐতিহাসিকদের নিকট ইউচি নামে পরিচিত। খৃঃ পূঃ ১৭০ অব্দের সমসময়ে ইহারা ইহাদের আদি বাসভূমি সুদূর উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ ব্যাকট্রিয়া এবং অকসাস্ রাজ্য, তৎপর কাবুল উপত্যকা, এবং পরিশেষে উত্তর-ভারত অধিকার করে। কজুল কদফিস এবং হারমিয়াস সম্ভবতঃ ৫০ বা ৬০ খৃষ্টাব্দে পার্থিয়দের নিকট হইতে কাবুল ও তক্ষশিলা জয় করেন। অনুমান ৭৮ খৃষ্টাব্দে কজুল কদফিস মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তৎপুত্র বিম কদফিস সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিম কদফিস তাহার রাজ্য সমধিক বিস্তৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দৃষ্টে Sir John Marshall এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়া অধুনা Vincent Smithও, বিম কদফিসকেই শকাব্দের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিম কদফিসের পর সম্ভবতঃ ১০০-১১০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে "সোটের মেগস" (Soter Megas—মহান ত্রাণকর্ত্তা) রূপে পরিচিত জনৈক নামবিহীন রাজা তক্ষশিলায় রাজত্ব করেন। (তক্ষশিলায় "সোটের মেগস"-অঙ্কিত কতিপয় রাজমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।) "সোটের মেগসে"র পর খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১২০—১২৫ অব্দ মধ্যে) প্রসিদ্ধনামা মহারাজ কনিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনিষ্ক পুরুষপুরে অর্থাৎ আধুনিক পেশওয়ারে তাঁহার শীতকালীন রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজ কনিষ্ক ভারতবর্ষের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ; তিনি মধ্য এসিয়া হইতে বঙ্গদেশের সীমানা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত দেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কনিষ্ক সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরাধিক কাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। তৎপরে ক্রমে তদীয় পুত্র হুবিষ্ক এবং বাসুদেব রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাসুদেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই কুষান রাজ্যের অবনতি হইতে থাকে। (তক্ষশিলায় অনেক সাসানীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, কুষান রাজ্যের অবনতির সময় পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশে পারস্ত দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত সাসানীয় রাজবংশের আক্রমণ হয়, এবং তজ্জন্য কুষান রাজ্য দ্রুতগতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে।) এই অবস্থায় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে হূন জাতির আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ;শুধু পঞ্জাব প্রদেশে কুষান রাজত্ব বিদ্যমান থাকে।

খৃঃ ৪০০ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তক্ষশিলায় উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন সৌধাবলী পরিদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তৎসমুদায়ের কোন বিবরণ রাখিয়া যান নাই। তবে তাঁহার লিখিত ভারতের অন্যান্য স্থানের বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তদীয় পর্য্যটনকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতস্থ বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ অতিশয় সৌষ্ঠবশালী ছিল।

অতঃপর খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে অসভ্য শ্বেত হূনগণ অসি ও অগ্নি হস্তে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত সংখ্যায় দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করতঃ গান্ধার হইতে কুষান রাজত্বের মূলোচ্ছেদ করে, এবং তৎপরে তক্ষশিলায় প্রবেশ পূর্ব্বক নির্ব্বিচারে ও নির্ম্মমভাবে বিবিধ সৌধসমূহের ধ্বংস সাধন করিয়া আপনাদের বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

এই আকস্মিক বিপদ্পাত হইতে আর তক্ষশিলার উত্থান হয় নাই। তার পর ৬৩০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, ও পরে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সঙ তক্ষশিলা পরিদর্শন করেন, তখন তিনি দেখিতে পান, তক্ষশিলা কাশ্মীর রাজ্যের অধীন একটি ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র ; স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণ পরস্পর কলহে মগ্ন, এবং অধিকাংশ বিহারই জনহীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। (ক্রমশঃ)

(২১) প্রাচীন রাজমালা।

কথা ঃ—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানাদেবী

মিশ্র সাহানা—দাদ্‌রা

হরিহে তুমি আমার সকল হবে কবে ?
(আমার) মনের মাঝে ভবের কাজে
মালিক হয়ে রবে (কবে ?)
(আমার) সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরব বুকে
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে।
কিনব যাহা ভবের হাটে
আনব তোমার চরণ বাটে
তোমার কাছে হে মহাজন
সবই বাঁধা রবে (কবে ?)
স্বার্থ প্রাচীর করে' খাড়া
গড়ব যখন আপন কারা
বজ্র হয়ে তুমি তারে
ভাঙ্‌বে ভীষণ রবে !
পায়ে যখন ঠেল্‌বে সবাই
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই
জগতের সকল আপন
হ'তে আপন হবে (কবে ?)
(শেষে) ফিরব যখন সন্ধ্যা বেলা
সাঙ্গ করে' ভবের খেলা
জননী হ'য়ে তখন
কোল বাড়ায়ে লবে !

II { জ্ঞা | রা সা রা | ন্‌া সা রা | রা রা -া |
হ রি হে - তু মি - আ মা র

সা রা -া | পা মপা ধপা | মপা মজ্ঞা মজ্ঞা | মজ্ঞা (মজ্ঞা মজ্ঞা | মা -া) }
স ক ল হ বে - - ক বে - - - - - -

মা মা | মপা পা -া | পা পা -া | পা পা ধা | পা পা ধপা |
আ মার ম নে র মা ঝে - ভ বে র কা জে -

মপা মগা -া | -া গা গা | গা মা -া | মপা মরা মা | জ্ঞা -া II
মা লি ক - হ' য়ে র বে - ক বে - - -

মা মা | { মা পা -া | না না -া | না র্সা -া | র্সনা র্রর্সা নর্সা |
১ আ মার স ক ল সু খে - স ক ল দু খে -
২ আ মি স্বা - র্থ প্রা চী র ক' রে - খা ড়া -
৩ আ মি ফি র ব য থ ন স - ন্ধে বে লা -

ণধা ণা -া | ধা ণা -া | ধা র্সা র্সণা | ধা পা ধা | }
১ তো মা র চ র ণ ধ র ব বু কে -
২ গ ড় ব য থ ন আ প ন কা রা -
৩ সা - ঙ্গ ক' রে - ভ বে র খে লা -

{ পমা পা পা | পা পা -া | পণা ণা -া | ধা পা ধপা |
১ ক - ণ্ঠ আ মা র স ক ল ক থা য়
২ ব - জ্র হ' য়ে - তু মি - ত খ ন
৩ - জ ন নী - হ' য়ে - ত খ ন

মা মা -া | পা মপা ধপা | মপা মজ্ঞা -া | (মা মা) }
১ তো মা র ক থা ই ক বে - ও গো
২ ভা ঙ্‌ বে ভী ষ ণ র বে - ও গো
৩ কো ল বা ড়া য়ে - ল বে - ও গো

মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা | মা -া II
- - - - -
- - - - -
- - - - -

II { সা -া সা | সা সা রা | ন্‌া সা রা | রা রা -া |
১ প্র ভু কি ন ব যা হা - ভ বে র হা টে -
২ ও গো পা য়ে - য খ ন ঠে ল্‌ বে স বা ই

+	০	+	০	
রগা রগমা মা	মা মা গা	রা রগরা মগা	গরা সন্া সা	}
১ আ ন্ ব	তো মা র	চ র ণ	বা টে -	
২ তো মা র	পা য়ে -	পা ই ব	ঠাঁ - ই	
+	০	+	০	
সা সা -া	সা সা রা	ণ্সা ণ্সরা সা	ণ্ধ্া ণ্ধ্া প্া	
১ তো মা র	কা ছে -	হে - ম	হা জ ' ন	
২ - - জ	গ তে র	স ক ল	আ প ন	
+	০	+	০	+
সা রা পা	পা মপা ধপা	মপা মজ্ঞা মজ্ঞা	রা সা -া	-া -া II
১ স ব ই	বাঁ ধা -	র বে -	ক বে -	- -
২ হ' তে -	আ প ন	হ বে -	ক বে -	- -

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২

পরদিন বৈকালে কিরণ মোটরে করিয়া লীলাকে তুলিয়া লইতে আসিল। লীলা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া ছিল,—কিরণের আগমন সংবাদ পাইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল ড্রয়িং-রুমে—বীণা ও কুমার গুণেন্দ্রভূষণ!

কুমার লীলাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসিলেন। সহাস্যে নমস্কার করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—আজ আপনাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। খানিকটা বেড়িয়ে এলে শরীর আরো সুস্থ বলে মনে হবে!

লীলা কোন উত্তর না দিয়া একটু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল। আজ দিনের আলোয় কুমারের প্রতি সে একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত চাহিয়া দেখিল—তাঁহার আকৃতি যথার্থ ই মনোরম—আচরণ ব্যবহার অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রতাপূর্ণ—কিন্তু তাঁহার চক্ষের দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল—লীলা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

গাড়ি ক্রমশঃ সহরের সীমা ছাড়াইয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিল। বহু দিন পরে মুক্ত বাতাসে ও প্রকৃতির নয়নাভিরাম মুগ্ধকর হরিৎ দৃশ্যে লীলার দেহ মন যেন জুড়াইয়া গেল। সে উৎফুল্ল নেত্রে কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি সুন্দর সব মনে হচ্ছে আজ!

কিরণ তাহার প্রীতিফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তাহলে রোজ এমনি সময় আমরা এদিকে বেড়াতে আসবো, কেমন? সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে যাবো, যাতে তোমার ঠাণ্ডা না লাগে। তাহলে আর কেউ বারণ করবেন না।

তাই আসা যাবে! আঃ! এত ভাল লাগছে! মনে হচ্ছে, যেন এমন ফাঁকা হাওয়ায় জীবনে আর কোন দিন বেরোই নি! বলিয়া লীলা একটু থামিয়া বলিল—কিরণ! কুমারকে তুমি ভাল রকম চেন কি? ওঁকে তোমার কি রকম লোক বলে মনে হয়?

কিরণ একটু ভাবিয়া বলিল—আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ নেই—সামান্য পরিচয় আছে মাত্র। অবশ্য ভদ্রলোকের সম্বন্ধে না জেনে-শুনে কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে আমার কি জানি কেন ওঁকে বড় একটা ভাল লাগে না—মনে হয়, যেন সর্ব্বদাই লোকটা একটা মুখোস পরে বেড়াচ্ছে!

লীলা বলিল—তুমি ঠিক ধরেছ কিরণ! কুমার লোক

মাটেই ভাল নয়। আমি অসুখ থেকে উঠবার পরে দেখছি—বীণা তার সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় মিশছে! মাও তাকে খুব প্রশ্রয় দিচ্ছেন! বীণার জন্য আমার এত ভাবনা হচ্ছে!

লীলা কিরণকে জোছনার কথা ও কান্তর মুখে কুমার সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছিল, সমস্তই একে একে বলিয়া গেল।

তাহার পর বলিল, এখন সে মেয়েটার কি দশা হবে বলো? ও যে রকম লোক, তাতে আর দুদশ দিন পরে হয় ত তাকে রাস্তায় তাড়িয়ে দেবে। তখন তার কি গতি হবে? আমি ত এ কথা শুনে পর্য্যন্ত তার জন্য ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছি! বীণার সঙ্গে কুমারের দেখা-শুনো বন্ধ করে দিলেই চলবে, কিন্তু জোছনার কি করবো?

কিরণ সমস্ত শুনিয়া বহুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—এ সব অত্যন্ত কুৎসিত বিষয় লিলি! এর মধ্যে তোমার নিজের গিয়ে কাজ নেই। এ সব ব্যাপার সংসারে অহরহ ঘটছে। তুমি এ সব কিছু জান না—নতুন একটা আজ শুনেছ—তাই মনে এত লাগছে। ও নিয়ে বৃথা ভেবে কি হবে?

লীলা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—এটা কিন্তু তোমার উপযুক্ত কথা হলো না কিরণ! তুমি এ কথা বলবে—আমি তা আশা করি নি। একটা নিতান্ত অল্প বয়সের মেয়ে,—যে সংসারের ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না—তাকে একটা পাষণ্ড জোর করে টেনে এনে রাস্তায় দাঁড় করালে—তার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে; এক—আত্মহত্যা করে মরা; আর এক আরও অবনতির পথে নেমে যাওয়া। আমি নিজে নারী হয়ে নারীর এই চরম দুর্গতি দাঁড়িয়ে দেখবো, অথচ তার জন্য কোন কিছুই করতে পারবো না—এ আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। আজ সকালে বাবার কাছে এ কথা পেড়ে মেয়েটার বিষয় কি করা যায়, জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও ঠিক তোমার মতই বিরক্ত হয়ে বল্লেন—এ সব লজ্জাকর বিষয় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? একটা মানসম্ভ্রম নেই? সত্যি—তোমাদের কাণ্ড দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি!

কিরণ লীলার অভিমানপূর্ণ কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া গেল! সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—তুমি কিছু মনে করো না লিলি! এই সব ইতর কাজের মধ্যে তোমার কোথাও কোন সংস্রব আছে, এ চিন্তা পর্য্যন্ত আমায় বড় আঘাত করে। সেই জন্য তোমাকে বারণ করেছিলুম। আর তা ছাড়া, তুমি তার জন্য কিই বা করতে পারো? তার আত্মীয়স্বজন, এমন কি তার মা বাপ পর্য্যন্ত, এ ঘটনার পর আর তাকে ঘরে স্থান দেবে না। তুমি নিজে তাকে এনে তোমার ঘরে রাখতে পারবে না; কারণ, তাহলে তোমাদের সমাজেও অত্যন্ত কুৎসিত চর্চ্চা আরম্ভ হবে,—তোমাদের সঙ্গে কেউ তাদের মেয়েদের মিশতে দেবে না। সুতরাং বুঝতেই পারছো, সাধ করে একটা অনর্থ ঘটাবার জন্য তোমার মা, কিম্বা আর কেউ তাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হবেন না। তার পর আমাদের দেশে এ রকম মেয়েদের জন্য, এখনো সে রকম কোন আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, যেখানে এই সব লাঞ্ছিতা নারীরা আশ্রয় পাবে। তা-হলে বল, তুমি তার জন্য আর কি করতে পারো?

লীলা অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া নিরাশ ভাবে বলিল, তবে কি তার কোন উপায়ই হবে না কিরণ? এই ভাবে মেয়েটা তবে কি একেবারেই অকূলে ভেসে যাবে?

কিরণ বলিল—কেবল একটি মাত্র উপায় আছে। এখানে খ্রীষ্টান মিশনরিদের মেয়েদের জন্য যে মিশন আছে, যদি তাকে সেইখানে দিয়ে আসতে পারো, তা হলে তাদের কাছে সে আশ্রয় পাবে। সেখানে তারা তাকে ভাল ভাবে রাখবে, লেখাপড়া বা অন্য যে-কোন রকম শিল্প কাজ, যা সে শিখতে চায়, তাই তাকে শিখিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করে দেবে। যতদিন সে নিজের খরচ নিজে উপার্জ্জন করে চালাতে না পারে, ততদিন তার সমস্ত ভার মিশনের উপর থাকবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমি ত আর কিছু দেখতে পাই না। তোমার সঙ্গে ত সেখানকার বড় মেমের আলাপ আছে?

লীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে বলিল—তা যেন আছে। কিন্তু এটা কি রকম কথা হলো? আমাদের নিজেদের সমাজে, আমাদের ঘরের মেয়েরা অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে পথে পথে ফিরবে, মানসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে পেটের দায়ে হীন ব্যবসা করতে বাধ্য হবে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো, অথচ তাদের মুখে এক মুঠো অন্ন বা একটু আশ্রয় দিতে চেষ্টা করবো

না, আর সেই ব্যবস্থা করবে কি না—একদল বিদেশী বিধর্ম্মী সম্প্রদায়—যাদের সঙ্গে তাদের কোন দিক থেকে কোন সম্বন্ধ, কোন যোগাযোগ নেই? কি চমৎকার ব্যবস্থা! আমি কোন্ মুখে সেখানে গিয়ে মিস নেল্‌সনকে এ কথা বোলবো?

কিরণ গম্ভীর মুখে বলিল—এটা আমাদের পক্ষে বাস্তবিক বিষম লজ্জার কথা লীলা! কিন্তু যা সত্য কথা—তা তো বলতে হবে? শুধু এই একটা কেন—এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। আমাদের দেশের—যাদের আমরা ইতর বলে, অস্পৃশ্য বলে ঠেলে সরিয়ে রেখেছি, দুর্জ্জয় গলিত ব্যাধিগ্রস্ত বলে যাদের কাছে এলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দি, ওরা সেই সব অশিক্ষিত বর্ব্বর জাতকে সুশিক্ষিত করে উন্নত করে তোলবার জন্য কি পরিশ্রম, কি চেষ্টাই যে করছে, সেই সব সংক্রামক রোগগ্রস্তদের জন্য আশ্রম স্থাপন করে, তাদের সুস্থ করবার জন্য, একটু আরামে রাখবার জন্য কি যে জীবনব্যাপী চেষ্টা ও যত্ন করছে, সে কথা বলবার নয়। কিন্তু যাক এ কথা। তোমায় আমি বলছি—যদি সত্যই সে মেয়েটিকে একটা ভাল জায়গায় রাখতে চাও, তবে তাকে মিস নেল্‌সনের কাছে দিয়ে এসো।

লীলা বলিল—তাই যাব। যখন এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই, তখন যেতেই হবে। বেলা পড়ে এলো—এস আজকের মত বাড়ী ফেরা যাক্।

ফিরিবার মুখে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিরণ বলিল—অরুণ তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লিলি! আর তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে রাখতে পারছি না। এর মধ্যে যাবে এক দিন তার কাছে?

লীলা বলিল—আমি আর দু এক দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি তাকে বোলো। আর এবার গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বোলবো স্থির করেছি। তার পর সব শুনে সে যা বলবে—

লীলা কথাটা শেষ না করিয়া মুখ নত করিল। কিরণ ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—আমার আর কিছুই বলবার নেই লীলা। তোমার অসুখের এই দুমাস নিয়ত তার কাছে থেকে থেকে আমি বুঝেছি—সে তোমায় কি আত্মহারা হয়ে ভালবেসেছে। তোমায় হারালে সে বুঝি আর প্রাণে বাঁচবে না! সে আমার বড় প্রিয়, বড় আদরের বন্ধু। তার উপর এখন সে অসহায় অন্ধ। আমি বরং দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ দেব, তবু তোমায় তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবো না। তবে যদি সে নিজে—যাক্‌গে—সে কথা ভেবেই বা আর কি হবে। আমি ত সে দিন আমার সব কথাই তোমাকে বলেছি। আমার জীবন সম্পূর্ণ ভাবে তোমার। তোমাকে পাই, না পাই, এর পরিবর্ত্তন কোন দিনই হবে না।

দুই দিন পরে রাত্রি এগারটার সময় লীলার শয়নকক্ষে লীলা ও বীণা কথা বলিতেছিল। বাড়ীর সকলেই তখন নিদ্রিত, কেবল ক্ষান্ত সেদিন তখনো শুইতে আসে নাই।

বীণা বলিতেছিল—কথাটা তোমার কাছে না বলে থাকতে পারছিলুম না লিলি! আমি যে মনের মধ্যে সব সময় কি একটা আনন্দ, কি তৃপ্তি বোধ করছি, সে তোমায় বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে পারবো না ভাই! তাঁকে ভালবেসে মন আমার শান্তিতে আনন্দে ভরে গেছে! যখন তিনি কাছে না থাকেন, ততক্ষণ আমি আর কোন বিষয় ভাবতে, কোন কাজে মন দিতে পারি না। কেবল তাঁর কথাই থেকে থেকে মনে পড়ে—আর অধীর হয়ে উঠি। কিন্তু যখন তিনি আসেন, আমার যেন তখন সব কথা হারিয়ে যায়,—তাঁর মধ্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তিনি কথা বলেন—আমি শুধু অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কেবল শুনি, আর মনে হয়, তাঁর কথা যেন শেষ না হয়। এ যে কি তীব্র সুখ—সে আমি তোমায় কি করে বোঝাবো? তুমি সুখী হয়েছ লিলি?

লীলা উত্তর দিতে পারিল না। বীণার প্রেমে পুলকে ঝলমল মুখখানির দিকে একবার ব্যথিত ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া চক্ষু নত করিল।

বীণা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের মনেই বলিতে লাগিল—কুমারকে দেখবার আগে আমি কোন দিন কারুকে ভালবাসি নি ভাই! চিরকাল সকলকে নিয়ে কেবল খেলা করে, আমোদ করে বেড়িয়েছি। তুমি ত সবই জান, আমি চঞ্চল স্বভাবের বলে তুমি কতদিন আমাকে কত কথা বলেছ, কত বুঝিয়েছ। তখন শুধু পুরুষদের ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই আমার প্রধান আমোদ ছিল। আমি নিজে কোন দিন কারুকে ভালবাসি নি। এখন সে

সব কথা মনে হলে লজ্জা হয়। একটা বড় জিনিস মনের মধ্যে পেয়ে, আমার আগেকার সব চাঞ্চল্য, সব ক্ষুদ্রতা কেটে গেছে ভাই! আমি যেন মনে প্রাণে নতুন মানুষ হয়ে গেছি। তাই আমি ভাবতুম, কত দিনে তুমি ভাল হয়ে উঠবে—কত দিনে তোমায় এ সব কথা খুলে বলতে পাব। মা বলেছেন—শীঘ্রই আমাদের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট হয়ে যাবে। তুমি খুশী হয়েছ লিলি?

লীলা এবার বলিল, আমি যদি খুসী হতে পারতুম,—অন্তর্যামী জানেন, তার চেয়ে সুখের বিষয় আমার কাছে আর কিছু থাকতো না দিদি!

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কেন লিলি—ও কথা বল্লে কেন ভাই? কি হয়েছে?

লীলা বলিল—আমার বলবার অনেক কথা আছে দিদি! কিন্তু কি করে যে বোলবো, আমি সারাক্ষণ সেই কথাই ভাবছি। আমি তোমাকে বড় ব্যথা দিতেই এসেছি ভাই!

বীণা সভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া তাহার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

লীলা ম্লান মুখে আবার বলিল—কিন্তু সে কথা যে বলতেই হবে—দিদি! তুমি বড় প্রতারিত হয়েছ—কুমার মোটেই ভাল লোক নয়! সে চরিত্রহীন, লম্পট, মাতাল। সে তোমার সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত নয়—

বীণা ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ও কথা বোল না লিলি! কুমার—ওঃ! অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি তাঁকে জানো না—তাই ও কথা বলতে পারলে! কে এ সব তাঁর নামে মিছে করে রটালে?

মিছে নয় ভাই! সব সত্য! তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়ে কি আমি তোমার কাছে এ কথা বলতে পারি? আমি খুব ভাল করেই সন্ধান নিয়েছি। ওর স্ত্রী ওর অত্যাচারের জ্বালায় বিষ খেয়ে মরেছে—

বীণা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওর স্ত্রী? কুমার কি তবে বিবাহিত?

লীলা বলিল—শুধু বিবাহিত নয়—ওর যে এ-রকম আরও কত কীর্ত্তি আছে—তা বলা যায় না। এবার থেকে আর তুমি ওর সঙ্গে দেখা কর না। যদি আসে, তা হলে যা বলবার—তা আমিই বলে দেবো। কোন ভদ্রসমাজেও লোকটা মেশবার উপযুক্ত নয়। ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত—

বীণা উন্মাদিনীর মত আকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—না! লিলি! না—এমন করে তাঁকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না—আমি মরে যাব তা হলে! সত্যই মরে যাব! আমি নিজে তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবো! আমি যে এ সব কথা বিশ্বাস করতে পারছি না! এ কি কথনো হতে পারে? আমি দুমাস ধরে নিয়ত তাঁকে দেখছি যে! লিলি! নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে কিছু,—তিনি কখন এমন হতে পারেন না!

লীলা গম্ভীর মুখে বলিল—ভুল যদি হতো, তা হলে আমি যে কত সুখী হতুম, তা তুমি জান না। আমারও ত তাকে খুব ভালই লেগেছিল। কিন্তু তা ত নয়! এই সম্প্রতি ও একটি ছোট মেয়ের কি সর্ব্বনাশ করেছে—শোন—

লীলা জোছনার কথা একে একে সবিস্তারে বলিয়া গেল। তাহার পর বামা এখানে আসিয়া কি করিয়া তাহাকে চিনিয়া গেল, সব বলিয়া শেষে বলিল—এখনো কি কিছু অবিশ্বাসের কারণ আছে? বামা তার বাড়ীতে থেকে রোজ দেখছে—সে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত মাতাল হয়ে কাটায়। আর এর চেয়ে কি প্রমাণ চাও? বল ত ক্ষান্তর বোনকে ডেকে তোমার সামনে সব জিজ্ঞাসা করি।

বীণা সমস্ত শুনিয়া সর্পাহতের মত বিবর্ণ মুখে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

লীলা বলিতে লাগিল, আমি যখন প্রথম এ কথা শুনলুম, তখনি জানি যে এ ঘটনায় তোমার কত বড় আঘাত লাগবে। তাই আমি কোন কথা প্রকাশ না করে, ভাল করে তার বিষয় সন্ধান করেছি। তোমায় যে সব কথা বলেছি, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এর পর আর তোমার তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কাল বিকেলে তুমি ড্রয়িংরুমে নেমে যেও না—অন্ততঃ সে আসা পর্য্যন্ত তোমার ঘরেই থেকো। আমি তার জন্য নীচে অপেক্ষা করবো। সে এলে, যা বলবার সব আমিই বলে, এ অপ্রীতিকর বিষয় একবারে শেষ করে ফেলবো। আমি চাই, আর যেন তোমার সঙ্গে তার দেখা না হয়।

বীণা আবার অস্থির হইয়া উঠিল—সে কিছুতেই লীলার এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না। সে বলিল—সে কিছুতেই

হবে না লিলি! যদি বলতেই হয় এ কথা, তা হলে আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। আমারই তাঁকে বলবার একমাত্র অধিকার। তুমি এর মধ্যে কোন কথায় থেকো না। তুমি যে রাগী, হয় ত কি কথায় কি বলে বসবে, আর তিনি কখনো এ-মুখো হবেন না। যদি এ সব কথা সত্যই হয়, তা হলেও আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটবার পর আর যে তিনি এ পথে কখনো যাবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে। আমায় তিনি সত্যই অত্যন্ত ভালবেসেছেন।—তুমি ত জান লিলি! মানুষ ভালবাসলে তার মধ্যে কত বড় বড় পরিবর্ত্তন হয়ে যায়, আর তিনি বদলাবেন না এ কি কখনো হতে পারে?

লীলা বলিল, তিনি তোমার মত আরো অনেককেই ভালবেসেছেন, আরো অনেককে বাসবেন,—তার জন্য কোন চিন্তা কোর না। উপস্থিত তোমার সম্বন্ধে আমি যা বলছি, এইটিই সবচেয়ে ভাল কথা। এতে কোন গোলযোগ হবে না, তোমারও মর্য্যাদার কোন হানি হবে না, কারণ আমার বিশ্বাস আমার মুখ থেকে কোন কথার আভাস পাবামাত্র সে নিজের মানের দায়েও এখান থেকে সরে পড়বে। সে বিদেশী লোক, তার এ রকম চলে যাওয়ায় কেউ কিছু মনেও করবে না। কথাটা চাপা পড়েই যাবে। অবুঝের মত কথা বোলো না। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ, তা হলেই সব বুঝতে পারবে।

বীণা কিন্তু লীলার কোন যুক্তি শুনিল না। ইহার মধ্যে ভাবিয়া দেখিবার কি আছে, তাহাও সে বুঝিল না। সে কেবল অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—লিলি! তুমি বড় নিষ্ঠুর, তোমার প্রাণে একটু দয়ামায়া নেই। আমি তোমায় সত্যই বলছি, আমি কিছুতেই কুমারকে ছাড়তে পারবো না। তাঁকে ছাড়তে হলে আমি আর বাঁচবো না। তুমি ত কোন দিন কারুকে ভালবাসনি,—তুমি আমার অবস্থা বুঝবে কি করে? সংসারে ভাল মন্দ সব রকম লোকই থাকে,—সকলেই কি একবারে দেবচরিত্র সাধু পুরুষ হয়ে জন্মায়? যদি তাঁর কিছু দোষ থাকে—নিশ্চয় তিনি তা শুধরে নেবেন। আমি কালই তাঁকে এ সব কথা বোলবো।

লীলা বলিল—বেশ! তোমার যা ইচ্ছা, তাই করো। তবে এটা নিশ্চয় জেন যে, আমি তোমার এই সব অযথা খামখেয়ালির প্রশ্রয় দিতে পারবো না। তোমার যদি নিজের সামান্য কিছু বুদ্ধি থাকতো, তা হলে তুমি নিজেই এ বিষয়টা ভাল করেই বুঝতে। তোমার ভালর জন্য তোমাকে সাবধান করে দিলুম,—তার চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তার সমস্ত দোষ তোমার চোখের উপর ধরে দিলুম,—তোমার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মাতাল, লম্পট, বদ্‌মাস—যা খুসি হোক্, তবু তাকে তোমার চাই-ই। চমৎকার কথা! আজ সে তোমায় নিয়ে দুদিন খেলা করে' শেষে জোছনার মত রাস্তায় তাড়িয়েই দিক্—কিম্বা সখের খেয়ালে আজ বিয়ে করে বাড়ীতে তোমায় ফেলে রেখে নিজে যা খুসি করেই বেড়াক্—কিছুতে তোমার আপত্তি নেই। শুধু তার সঙ্গে বিয়ে হলেই হল। ধন্য তোমরা! আর ধন্য তোমাদের ভালবাসা! আমি কিন্তু কালই বাবার কাছে কুমারের বিষয় সব বোলবো!

বীণা পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিত। লীলার রাগ দেখিয়া ও পিতার নামে সে অত্যন্ত দমিয়া গেল। বলিল…তুমি বড় একটুতেই রেগে যাও লিলি। হঠাৎ বাবার কাছে এ সব কথা বলে একটা হৈ-চৈ বাধান কি ভাল? যাই হোক, কুমার নিজে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক,—তাঁর নামে এ রকম একটা কুৎসা রটান, চারিদিকে তাঁর বদনাম করা কি ভাল হবে? আমাদের নিজেদেরও ত মান সম্ভ্রম আছে—

লীলা বাধা দিয়া বলিল, তা আর তুমি বুঝছো কই? যাতে আমাদের বা তার সম্বন্ধে কারু মনে কোন কথা না ওঠে, সেইজন্যই ত আমি তোমায় তার সঙ্গে দেখা করতে বারণ করছি। আজ যদি বাবার কাণে এ কথা ওঠে, আর তিনি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন, তা' হলে সমাজে একটা সোরগোল পড়ে যাবে। তুমি এ দুমাস ধরে তার সঙ্গে যে ভাবে মিশছো, মা তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে যে রকম ঘনিষ্ঠতা করছেন, সে কি আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এ ভাবে এত মেশার পর হঠাৎ তাকে তাড়িয়ে দিলে, লোকে তোমার আর তার সম্বন্ধে কি ভাববে.—আর তার পর ঘরে ঘরে তোমার নামের সঙ্গে তার নাম যোগ করে কি রকম চর্চ্চা চলবে, সেটা একবার ভেবে দেখো। তাই যদি তুমি চাও, বেশ—তাই হবে।

বীণা ছোট বয়স হইতেই নিজে একটি সামাজিক জীব,—এ সব ব্যাপার ও এই সব কুৎসিত আলোচনার গুরুত্ব সে ভাল করিয়াই বোঝে। লীলার এ কথার পর সে সহসা আর কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া লীলা আবার বলিল—এই ত সে দিন অরুণকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল, এখনো সবাই সে কথা ভাল করে ভোলে নি। তারপর দুমাস যেতে না যেতেই আবার এই নতুন একটা কাণ্ড—লোকে বলবে নাই বা কেন? সকলের ঘরেই আমাদের মত বড় বড় মেয়ে আছে, কিন্তু কারুকে নিয়ে কোন দিন কোন চর্চ্চা ত শুনি নি! আমাদের বেলাতেই বা লোকে চর্চ্চা করবার অবসর পায় কেন? যা হোক, তুমি এখন কি স্থির করলে, বলো—আমি কালই এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা করে ফেলতে চাই।

বীণা চোখ মুছিয়া বলিল—আমি এত ঘড়ীর কাঁটার মত চলতে পারবো না। সব তাতেই তোমার তাড়াতাড়ি। আজকার রাত্রি আমায় ভাল করে ভাবতে দাও। কাল সকালে যা হয়, তখন হবে। (ক্রমশঃ)

গোস্বামী-বন্দনা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

তোমরা উদাসী—গৃহী নহ প্রভু, চরণে প্রণাম করি ;
মনকে তোমরা করিয়াছ বন—কুঞ্জ দিয়াছ গড়ি।
বুঝিতে পারিনে ভিখারী কি ধনী,
কানু লাগি আনো ক্ষীর, সর, ননী,
তাঁহারি সেবায় গোটা দিন যায় কেটে যায় বিভাবরী।

২

তোমরা জ্ঞানের পাষাণ-ভূমিতে মৃদুল মালতী ফুল,
উষর মরুর ধূসর বালুতে যমুনার কুলুকুল।
হাটের মাঝারে মধু মৃদঙ্গ,
কঠোর কারায় সাধুর সঙ্গ,
সঙের আসরে মনোহরসাহী পদাবলী মধুকরী।

৩

দেহ মন সব হরিরে সঁপেছ তিল ও তুলসী দিয়া,
কালা কলঙ্কের গরব ধরে না—ভোর হয়ে আছে হিয়া।
সব কাজ তব তাঁরি আরাধনা,
তাঁরি দেওয়া সুখ, তাঁহারি বেদনা,
সংসার তাঁর সুমুখে রেখেছ তাঁরে নিবেদন করি।

৪

মুক্তি চাহ না মুক্তি বিতর তোমরা ভক্তিকামী,
কৃষ্ণ-সেবার অধিকার তব মোক্ষের চেয়ে দামী।
হেরি নবঘন ঝরে আঁখি তব,
ভকতির কথা অধিক কি কব,
অনুরাগ-ফাগে ভুবন রাঙ্গালে এ কি প্রেম হরি হরি!

৫

কেন গো পরুষ পুরুষের বেশে ভ্রমিছ অবনীতলে,
নবনীর মত হৃদি তোমাদের প্রেমের পরশে গলে।
ভ্রমিতেছ গোপী-চন্দন লেপি'
শ্যাম-সোহাগিনী যেন ব্রজগোপী
বঁধুর মধুর নামে ঝরে আঁখি দেখিয়া কাঁদিয়া মরি।

৬

নামে এত রুচি, এমন পীরিতি ভুবনে মেলা যে ভার,
দেবতারে কর প্রেমের পুতুল, তুলনা যে নাহি তার।
বিপুল পৃথিবী গৃহ পরিজন,
কেহ যেন তব নহেক আপন,
গরবী নাগরী শ্যামের সোহাগে নিয়েছ গাগরী ভরি।

৭

তমালের তলে তোমাদের গৃহ, যমুনার কূলে বাসা,
অনুরাগী কর রসের বেসাতি, যেচে দাও ভালবাসা।
বাঁশরীর স্বরে উদাস পরাণ,
হরিণীর মত কর আনচান,
গোরা-গরবিনী তোমাদিগে আমি পুরুষ বলিতে ডরি!

৮

রূপের জহুরী বুকেতে ধরেছ সব-সেরা নীলমণি,
দু'হাতে ভক্তি মুক্তি ছড়াও অক্ষয় ধনে ধনী।
হে দয়াল প্রভু, তব কৃপা যাচি,
অতি দীন হেথা দাঁড়াইয়া আছি,
কড়িহীন এই অনাথ পথিক পাবে না কি পদতরী!

ইয়োরোপের পত্র

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু এম-এ, বার-এট্-ল

ইংলণ্ডের হ্রদের দেশে

(English Lake District)

বন্ধুবরেষু,

ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তভাগে ওয়েষ্টমুরল্যাণ্ড (Westmorland) ও ক্যামারাল্যাণ্ড (Cumberland) এই দুই কাউন্টি জুড়ে ছোট ছোট পাহাড়ের মালা-ঘেরা যে সতেরোটি সুন্দর হ্রদের সারি আছে, সেই জায়গাটিকে ইংলিস লেক্ ডিষ্ট্রিক্ট বলে। এই Lake District তোমার মত মত কোলরিজ, সাদে, শেলী—কত কবি, কত সাহিত্যিকের স্মৃতি জড়ান। ইংরাজী কাব্যের রোমান্টিক পর্ব্বের সোণার সিংহদ্বার যেখানে উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সেই পাহাড় ও হ্রদের মালাগুলি ইংরাজি কাব্য-ইতিহাসে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে আছে,—ইংরাজি কাব্যরসিকের চিত্ত চিরকাল আকর্ষণ করবে।

Windermere উইন্ডারমেয়ার হ্রদ।

ইংরাজী সাহিত্যানুরাগীর, কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ভক্তের চিত্তে অপ্রমেয় ছায়া বিস্তার করে আছে। এ জায়গাটি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে নিশ্চয় তোমার মন খুব খুসি হবে। তাই এ হ্রদগুলির মধ্যে আমার একটি দিনের ভ্রমণের কথা তোমায় জানাচ্ছি।

Lake District ! এই কথাটির সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতির যে বিশেষ রূপে চিত্রগুলি দেখেছি, প্রকৃতির সেই রূপটি দেখবার জন্যে এবা এডিনবরা থেকে লণ্ডনে যাবার পথে লেক ডিষ্ট্রিক্টে এলু Windermere হচ্ছে এই হ্রদগুলির মধ্যে সবচেয়ে হ্রদ,—লম্বায় দশ মাইল, চওড়ায় এক মাইল। এই হ্রদের তী Windermere সহরে এসে হ্রদগুলি দেখব ঠিক করলু

সকাল প্রায় ছ'টার সময় ট্রেণ Windermere ষ্টেসনে এসে পৌছাল। তখন চারিদিকে সুন্দর প্রভাতের আলো। তখন গ্রীষ্মকাল। তার পর এই পাহাড়ে জায়গায় এত উত্তরে খুব শীঘ্র সূর্য্যোদয় হয়।

আমার সুটকেস ও ছোট ব্যাগটি ষ্টেসনের ক্লোকরুমে (cloak room) রাখলুম। এ দেশে ষ্টেসনে রেল-কোম্পানীর চার্জ্জে মালপত্র রাখবার ব্যবস্থাটি বড়ই সুন্দর, বিশেষতঃ ভ্রমণকারীদের পক্ষে বড়ই সুবিধের। এ ব্যবস্থা যদি না থাকত, তাহলে আমার মালপত্র নিয়ে কোন মন বিক্ষিপ্ত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের সহরের মধ্যে কখনও এরূপ শান্ত শুদ্ধ প্রভাত দেখি নি। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে জীবনের কর্ম্মকোলাহলের পর যে পরমা শান্তির আস্বাদ আছে, সেই শান্তির একটু স্পর্শ এই প্রভাতে পেয়ে বড় তৃপ্ত হলুম।

সাজান দোকানের সারির মাঝ দিয়ে বড় রাস্তা পার হয়ে লেক রোড দিয়ে নেমে হ্রদের তীরে এসে পড়লুম। নীল জল প্রভাতের আলোয় ঝলমল করছে। চারি দিক শান্ত, স্নিগ্ধ। ওপারে নীল পাহাড়ের মালার ছায়া জলে এসে

Ambleside আম্‌বেল সাইড্।

হোটেলের সন্ধানে বাহির হতে হত। কিন্তু এই জিনিষ রাখার ব্যবস্থা থাকাতে, আমি জিনিষগুলি ষ্টেসনে রেখে নিশ্চিন্ত মনে সমস্ত দিন টো-টো করে বেড়াব। তার পর সন্ধ্যার গাড়ীতে জিনিষগুলি নিয়ে চলে যাব,—আমার হোটেল চার্জ্জ কিছুই লাগবে না।

ষ্টেসনে হাত্মুখ ধুয়ে সহর দেখতে বাহির হলুম। দেখি, এখনও কেউ জাগে নি,—বাড়ীগুলি সব নিদ্রিত, নিঝুম। ছোট ঘুমন্ত সহরটি সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় বড় সুন্দর লাগল। ইংলণ্ডের যে-কোন সহরেই গেছি, সেখানে তার জনতা, কর্ম্মকোলাহল, মোটরের ভকভক্ ও গতির ব্যস্ততায় পড়েছে। এপারে ব্লুবেল ও ক্যাটবেলের নীলে, ফক্সগ্লাভের লালে সবুজ পাড় রঙীন হয়ে উঠেছে,—যেন রঙীন পাড়-ওয়ালা নীল অঞ্চল ঝলমল করছে। দু'চারটি পাখী মৃদু কলরব করে উড়ে গেল। একটি পাথরের ওপর বসলুম। Prelude-এর একটি প্রভাতের বর্ণনা মনে পড়ল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্বের একটি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

দেখলুম, দুটি যুবক হ্রদের তীরে বেড়াচ্ছে। বেশভূষার বাহার নেই, মাথায় টুপি নেই, চুল বাতাসে উড়ছে। এক-জন একটু খর্ব্বাকৃতি, তার প্রশস্ত কপোল প্রথমে চোখে

পড়ে। মুখ রেখাঙ্কিত প্রৌঢ়ের মত সব সময় যেন চিন্তিত। তীক্ষ্ণ চক্ষু ছুটি প্রকৃতি-গ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করে দেখছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যেমন করে কোন প্রাচীন শিলালিপি পড়ে, তেম্নি মনোযোগ করে প্রকৃতির শোভা দেখছে। জলের একটু ঝিকিমিকি, ফুলের একটু দোলা, ঘাসের একটু কাঁপন, পাখীর একটু গান, দূর পাহাড়ের নিস্তব্ধতার একটু ভাঙন, প্রকৃতির প্রতি রং ও ছবি ও চাঞ্চল্য তাহার চিত্ত স্পর্শ করে ছবির মত মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। আর একজন একটু লম্বা; তার গতি চঞ্চল,—তরুণ মুখ প্রতিভায় জলজল করছে। চোখ ছুটি স্বপ্নময় প্রকৃতির এ রঙীণ অবগুণ্ঠন ভেদ করে যেন কোন

Grasmere গ্রাসমেয়ার হ্রদ।

অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধানে আছে; মাঝে মাঝে সে হাতে ভঙ্গী করে প্রভাতের শান্তিভঙ্গ করে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। তার জলজল চোখের দিকে চাইলে মন মুগ্ধ হয়। একজন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আর একজন কোলরিজ। ফরাসী-বিপ্লবক্ষুব্ধ উনবিংশ শতাব্দীর সোণার স্বপ্নময় প্রত্যুষে ইংরাজীকাব্য-সরস্বতীকে যাঁরা রোমান্টিক পর্ব্বের স্বর্গদ্বার খুলে প্রথম আবাহন করেছিলেন, সেই কবিদ্বয় হয় ত এম্নি কোন নির্ম্মলোজ্জ্বল প্রভাতে এই হ্রদের তীরে Lyrical Balladsএর আইডিয়া করেছিলেন।

ঘণ্টাদেড়েক পরে যখন Windmereএ ফিরলুম, তখন সহরটি জেগে উঠেছে। তখনও দোকান সব খোলে নি; তবে পথে গাড়ী, লোকজন চলছে। Royal Mail-লাঞ্ছিত ডাকগাড়ী প্রথমে চোখে পড়ল। তার পর দুধওয়ালার গাড়ী, রুটিওয়ালার গাড়ী বাড়ী বাড়ী ঘুরছে। এ দেশে গৃহস্থদের প্রতিদিন বাজারে গিয়ে বাজার করার বড় হাঙ্গামা নেই। জিনিষপত্তর প্রায় সবই বাড়ীতে দিয়ে যায়। কিছুদিন হল গবর্ণমেণ্ট গৃহিণীদের জন্য আরও সুবিধার্থ ব্যবস্থা করেছেন। এখন পোষ্টাফিসের সাহায্যে রুটি মাখন ইত্যাদি কেনা যেতে পারে। কোন গৃহিণীর হয় ত চিনি ফুরিয়ে গেছে, তিনি তাড়াতাড়ি কোন চিনির দোকানদারের কাছে টেলিফোন করে দিলেন, তাড়াতাড়ি কিছু চিনি পাঠিয়ে দিতে। দোকানদার এক প্যাকেট চিনি কাছের পোষ্টাফিসে দিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে পোষ্টাফিসের পিয়ন চিনির প্যাকেট নিয়ে হাজির,—সে বাড়ীতে দিয়ে দাম নিয়ে যাবে। শুধু বই বা জামা-কাপড় নয়—এখন চিনি ময়দা ইত্যাদি জিনিষও ভি-পিতে কেনা যাবে। তাতে দোকানদার ও গৃহস্থের খুব সুবিধা।

ধীরে ধীরে দোকানপাট খুল্ল। একটি ছোট মনোহারী দোকান—তার সঙ্গে একটি ছোট রেস্তোরাঁ চোখে পড়লো। দোকানের সামনে একটি বড় বোর্ডে কোন্ খাবারের জিনিষের

কত দাম—লেখা রয়েছে। বেশ পেটভরে খেয়ে নেওয়া গেল, সমস্ত দিন আর না খেলেও যেন চলে ; কারণ, বিদেশে ভ্রমণের সময় খাবার জিনিষ পেলে বেশ পেটভরে খেয়ে নেওয়া উচিত। আবার কখন খাবার জুটবে তার নিশ্চয়তা নেই। এ দেশে অবশ্য সব জায়গাতেই হোটেল বা রেস্তোরাঁ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এই পাহাড় ও হ্রদের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে হয় ত কোন হোটেল পাব না, এই ভাবনাও ছিল।

তার পর বেড়ানোর ব্যবস্থা করতে বাহির হলুম। এরূপ বেড়াবার জন্য সব যায়গাতেই মোটর টুর কোম্পানী আছে। তাদের বড় মোটর গাড়ীতে শস্তায় বেশ আরামে বেড়ান যায়। এখানেও কয়েকটি কোম্পানী আছে। তাদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে ঠিক করা গেল—আজ সমস্ত দিন তাদের মোটরে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে,—প্রধান প্রধান হ্রদগুলির পাশ দিয়ে লেক ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যভাগটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। দাম দশ শিলিং।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় Windermere ষ্টেসনের পাশ দিয়ে যাত্রা করা গেল। বেশ বড় মোটর কোচ, চারটি প্রশস্ত বেঞ্চি, মোটরচালক নিয়ে আমরা পনের জন যাত্রী। তার মধ্যে ছ-জন মহিলা। এ দেশে একা কেহ ভ্রমণ করে না, সঙ্গে বান্ধবী বা আত্মীয়া বা স্ত্রী থাকে। প্রতি যাত্রীর সঙ্গে কোন মহিলা আছেন। শুধু একটি ইংরাজ ও আমি একা। আমি একটি বোটের সিট দখল করে বসলুম, ইংরাজটি আমার পাশেই বসল। দুজন আমেরিকান, দুজন ক্যানেডিয়ান, দুজন অষ্ট্রেলিয়ান, দুজন স্কচ্. আমি ভারতীয়, তাছাড়া সব ইংলিশ। কন্‌টিনেণ্ট থেকে বড় কেউ ইংলণ্ডে বেড়াতে আসে না। এলেও লণ্ডন দেখেই চলে যায়। কোন ফরাসী বা জার্ম্মাণের সহিত ইংলণ্ড-ভ্রমণে বড় দেখা হয় না।

আমার পাশের প্রৌঢ় ইংরাজটি আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ সুরু করলেন। আমায় প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন, আমি Lake Districtএ আগে এসেছি কি না। আমি 'না' বলাতে, তিনি বল্লেন, তিনি দু'বার জায়গাগুলি দেখে গেছেন,—এই তাঁর তৃতীয় বার। কোন আফিসে কাজ করেন। এখন গ্রীষ্মের দু'সপ্তাহ ছুটি উপভোগ করে বেড়াচ্ছেন। ইংলণ্ডের হ্রদ দেখে স্কটলণ্ডের হ্রদ দেখতে যাবেন। আমি বল্লুম, আমি স্কটলণ্ডের হ্রদ দেখে আসছি, Lock Lomond ভারি ভাল লাগল। শুনে খুব খুসি হয়ে উঠলেন।

Dove Cottage ডোভ কটেজ।

এদেশে গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক কাজের লোক ১৫ দিন বা এক মাস ছুটি পায়। আফিসের কেরাণী থেকে হাস্পাতালের ডাক্তার—সবাই পালা করে এক-একজন করে কিছু দিনের জন্য ছুটি নেয়। এই সময়টা বেড়াবার ও রৌদ্র উপভোগ করবার সব চেয়ে সুন্দর সময়। কোন সমুদ্রতীরে বা পাহাড়ে বা স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে মুক্ত বাতাস ও রৌদ্র উপভোগ করে দেহের স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার কিছু বাড়িয়ে নেওয়াই হচ্ছে এ ছুটির উদ্দেশ্য। আমার সঙ্গী প্রৌঢ় ইংরাজটিও এইরূপ ছুটি পেয়ে এসেছেন।

Windermere সহর ছাড়িয়ে Windermere হ্রদ পার হয়ে আমরা উত্তর দিকে চলেছি। কিছু দূর গিয়ে Ambleside বলে একটি ছোট পুরাতন সহরে এসে পড়লুম। আমার কাছে গাইড বই ছিল, কিন্তু তার কিছু দরকার হল না। আমার পাশের ইংরাজটি আমার গাইড হয়ে সব বলে যেতে লাগলেন। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা সুন্দর ছোট সহরটি। ছোট ছোট বাড়ী, পথঘাট বেশ পরিষ্কার। একটি ধূসর রংএর পাথরে-তৈরী চার্চ্চের পাশ দিয়ে গাড়ী গেল। ইংরাজটি বল্লেন, এর একটি রঙীন-মূর্ত্তিময় কাচের জানলা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্তেরা তাঁর স্মৃতিচিহ্নরূপে দান করেছে।

Ambleside ছাড়িয়ে আবার খোলা রাস্তায় বাহির হলুম। চারিদিকে সবুজে সবুজ; মাঝে মাঝে এক এক ঝাঁক মারগারেট ফুল শিশুর হাসির উচ্ছ্বাসের মত ফুটে বাতাসে দুলছে। মাঝে মাঝে রোডোডেন্‌ড্রোন (Rhododendron) ফুলের ঝাড় সবুজ কাপড়ে আবীরের ছোপের মত জ্বলজ্বল করছে। উপত্যকার মাঝের পথ দিয়ে আমরা চলেছি।

ইংরাজটি দূরে বাম দিকে একটি বাড়ী দেখিয়ে বল্লেন, ওটি হচ্ছে, Knoll। ওখানে Harriet Martineau থাকতেন।

Keswick Road ধরে আমরা Rydal হ্রদের দিকে চলেছি। প্রথমে Rydal hall চোখে পড়ল—অতি পুরাতন সুন্দর কাঠের বাড়ী, Flemingsদের পুরাতন বসতবাড়ী। তারপর Rydal Mount,—এটি Wordsworthএর শেষ বসতবাড়ী। জীবনের শেষ চল্লিশ বছর তিনি এখানে ছিলেন। সুন্দর একটি ছোট বাড়ী—দোতলা, আকাশের নীল ও গাছের সবুজের ফ্রেমে আঁটা কাঠ ও কাঁচের কুটীর। প্রকৃতির উপাসক প্রকৃতির কবির উপযুক্ত বাসগৃহ। মার্থা ও মেরীর মত দুই ভক্তিমতী নারীর প্রেম ও সেবার মধ্যে প্রকৃতির কোলে এইখানে তিনি তাঁর সহজ সরল জীবনের দিনগুলি কাটিয়েছেন।

Thirlmere থিরল্‌মেয়ার হ্রদ।

পথ এঁকেবেঁকে চলেছে। সহসা একটি ছোট হ্রদ রূপার পাতের পর্দ্দার মত উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। এটি হচ্ছে Rydal water। খুব ছোট হ্রদ, লম্বায় এক মাইলও হবে না, চওড়ায় আধ মাইলের চেয়েও কম,—আমাদের দেশের বড় দীঘির মত। কিন্তু ভারি সুন্দর মনে হল। স্থির, নির্ম্মল জলের সরোবর সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্তিতে জলরাশির মধ্য থেকে একটা দ্যুতি বাহির হচ্ছে,—যেন সবুজ পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা একখানি কাঁচের আয়না,—তাতে সূর্য্য আপনার মুখ দেখছে।

হ্রদের ধারের পথ দিয়ে আমরা চলেছি। একটি ছোট টিপির কাছে মোটরচালক তার মোটর একটু থামাল। ইংরাজটি বল্লে, এটি হচ্ছে Wordsworth's seat। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে একটি উঁচু যায়গায় ওঠা যায়। ওই স্থান কবির বড় প্রিয় ছিল।

ডান দিকে Nab Scar পাহাড়ের চূড়া উঠে গেছে। বাম দিকে Rydal waterএর জল ঝকঝক করছে। মাঝখানের পথ দিয়ে আমরা চলেছি। হ্রদের ধারে একটি ছোট কুটীরের সামনে আবার মোটর থামল। এই কুটীর হচ্ছে Nab। ডি-কুইন্‌সি এই বাড়ীতে অতিথি হয়ে কিছুদিন ছিলেন। এই বাড়ীর অধিকারী বুড়ো Simpsonএর মেয়েকে শেষে বিয়ে করেন। Confession of an Opium-Eater এর লেখক তরুণ যৌবনে এইখানে তাঁর প্রেমের লীলা করে ছিলেন। তাঁর প্রেমের স্মৃতিভরা বাড়ীটি ভারি সুন্দর লাগল। তার পর Hartley Coleridge এই Nab কুটীরে বাস করেন। এইখানে তাঁর মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর শবদেহের পেছনে যাত্রা করেছিলেন।

Rydal Water ছাড়িয়ে চলেছি। দুধারে ঘন গাছের সবুজ। সহসা সে সবুজ পর্দ্দা ভেদ করে আবার হীরার মত জলের ঝিলমিলানি। ইংরাজটি দীপ্তমুখে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,—ওই Grasmere, Grasmere! আমেরিকান মহিলাটি বাইনেকুলার (ছোট দুচোখো দূরবীণ্‌) লাগিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলেন।

Keswick কেস্‌উইক্‌।

হ্রদটি মাঝারি রকমের—এক মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া। মাঝে একটি ছোট দ্বীপ রূপার থালে নীলকান্তমণির মত ঝিকমিক করছে। দেখতে খুব সুন্দর বোধ হল না, কিন্তু এই হ্রদটি এক দিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিক্ষুব্ধ চিত্তে যে শান্তির প্রলেপ বুলিয়েছিল, তারি গুণে তিনি আনন্দময়ী কবিতাকে আবার জীবনে বরণ করতে পেরেছিলেন। এই

'Peaceful Vale'র রসভাণ্ডার হতে শান্তি ও সৌন্দর্য্যরস সঞ্চয় করে কবি তাঁর ভাষা ও ছন্দের বন্ধনে বেঁধে সাহিত্যরস-তৃষিতের জন্ত চিরকালের তরে দান করে গেছেন।

হ্রদের ধারে ধারে রাস্তা দিয়ে আমরা চল্লুম। Grasmere হ্রদে আর ঢুকলুম না। ইংরাজটি একটি পথ দেখিয়ে বল্লেন, এ দিক দিয়ে একটু গেলেই Dove Cottageএ যাওয়া যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ওই বাড়ীতে ১৭৯৯ থেকে ১৮০৮ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন।

Grasmereএর শান্তিময় উপত্যকা দিয়ে চলেছি। পথ এবার ধীরে ধীরে উঠছে। একটা পাহাড়ের ওপর উঠছি,—যেন সূর্য্য-ঝলমল নীলাকাশের দিকে আমাদের যাত্রা। খুব খাড়াই পথ,—মোটর ইঞ্জিনের ঝক ঝক শব্দ কাণে বড় বাজছে। দুধারে পাহাড়ের সারি,—তলায় সুন্দর উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গা দিয়ে রূপার সূতার মত ঝর্ণা-ধারা বয়ে আসছে। তলায় একটি গিরি-স্রোতস্বিনী রূপালি সর্পের মত চলেছে। দূরে 'পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে। কত অদ্ভুত, কত বিচিত্র তাদের মূর্ত্তি। একটি পাহাড়ের রূপের সঙ্গে আর এক পাহাড়ের মিল নেই।

Honister Pass হনিষ্টার পাস্।

দুধারে সবুজ গাছের সারি। গাছগুলি পাতায় পাতায় ভরা। মাঝে মাঝে অতি মিষ্টি গন্ধওয়ালা সাদা ফুলের ঝাড়, মারগারেটের বন, ডেসির কুঞ্জ, রোডোডেনড্রনের সারি। রৌদ্র-উজ্জ্বল নীলাকাশে সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। তাহার ছায়া সবুজ মাঠে পড়ছে। পাহাড়ের মাথা দিয়ে মেঘ উড়ে চলেছে। পাহাড়ের তলায় মেষ চরছে, গরু চরছে। মাঝে মাঝে দু'একটি পাখী উড়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্যের মাঝ দিয়ে আমাদের প্রকাণ্ড মোটরের দ্রুতবেগে যাত্রা কিছু বেমানান হলেও চারিদিকের শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

আরও উঁচুতে উঠে চলেছি; এই খাড়াইকে Dunmeril Raise বলে। সমুদ্রতীর থেকে ৭৮৩ ফিট উঁচু। বামে Helm Crag (১২৯৯ ফিট) বলে একটি পাহাড়ের চূড়া চোখে পড়ছে। একটা পাহাড়ের চূড়া,—সম্মুখ থেকে দেখাচ্ছে, যেন একটা সিংহ থাবা মেলে বসে আছে, ওই হ্রদটার ওপর লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু পাহাড়টির আর এক পাশে আসতেই মনে হল, কোথায় সেই সিংহ,—এ যে একটি বৃদ্ধা অর্গান বাজাচ্ছে! বড় অদ্ভুত এই পাহাড়ের শিখরমালা।

আমরা Westmorlandএর সীমা পার হয়ে Cumberlandএ এসে ঢেকেছি। পথ নেমে চলেছে,—গড়গড়িয়ে নেমে

যাচ্ছে। রূপালি ঝর্ণাধারাগুলি যেখানে নদী হয়ে মিলেছে, নদীধারাগুলি যেখানে হ্রদে গিয়ে পড়েছে, সেইদিকে তলায় নেমে চলেছি। দু'পাশের পাহাড়ের মালা উঁচু আরও উঁচু হয়ে উঠছে।

আর একটি হ্রদের পাশে এলুম। Thirlmere হ্রদ। চাইলে মনে হয়, ওই সামনের পাহাড়ের কোলে হ্রদটি শেষ হয়েছে; কিন্তু পাহাড়টি পার হলেই আবার দেখা যায়, দীর্ঘ হ্রদ পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে অনেক দূর চলে গেছে—যেন কোন বারুণী-কন্যা পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পালাচ্ছে,—তার রূপালি অঞ্চলটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে। হ্রদটি যখন শেষ হল, সমস্ত হ্রদটি বড় সুন্দর দেখাল,—যেন কোন রাজকন্যা নীলাঞ্চল ফেলে এ নির্জ্জন প্রান্তরে সুদীর্ঘ অঙ্গ এলিয়ে রবিকর পান করছে, আর তার চারদিকে পর্ব্বতের প্রহরী-দল দৈত্যের সারির মত গুম হয়ে বসে আছে।

The Devi s Elbow ডেভিলস এলবো

হ্রদের জলরেখা আবার পাহাড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। পথ আবার উঁচুতে উঠে চলেছে। দুধারে পাহাড়-সারি বৃহৎ রুক্ষ রুদ্র হয়ে উঠছে। একটি খুব উঁচু জায়গায় এসে মোটর থামল। চারিদিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। পেছনে Thirlmere নীলকান্তমণি গড়া আলোর মত পড়ে,—সামনে Keswick উপত্যকা,—একটি ছোট্ট হ্রদের জল দেখা যাচ্ছে,—পার্ব্বত্যকন্যার নীল চোখের মত Derwent water আহ্বান কচ্ছে। হ্রদের ধারে একটি ছোট সহর এক সার রঙীন তাসের ঘরের মত দেখাচ্ছে। আরও দূরে একটি হ্রদের জল ঝিকমিক করছে। তার পাশে Skiddaw (৩,০৫৩ ফিট পর্ব্বতচূড়া রৌদ্র পরিপূর্ণ নীলাকাশে উঠে গেছে।

মোটর-চালক মোটর থামাতে, কোন দ্রষ্টব্য জায়গা এসেছে ভেবে, এই হ্রদটী আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। খুব বড় নয়,—লম্বায় সাড়ে তিন মাইল; কিন্তু চওড়ায় আধ মাইল। দুধারে পাহাড়ের সারি, তার মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে হ্রদটি গেছে। হ্রদের বাম ধারে রাস্তা দিয়ে আমাদের মোটর চলল। সামনে আমেরিকান ভদ্রলোকটি তাঁর নভেল হতে চোখ তুলে একবার চাইলেন, বলে উঠলেন, বা, কি সুন্দর! আমেরিকান মহিলাটি চোখে বাইনেকুলার লাগাতেন। অষ্ট্রেলিয়ান মহিলাটি গাইড বুকের ম্যাপ খুলে দেখলে

লাগলেন—জায়গাটা কোথা। আমার পাশের ইংরাজটি বল্লেন, ওই দূরে Keswick সহর। কানেডিয়ান ভদ্রলোকটি জায়গাটার একটা খসড়া ম্যাপ এঁকে হ্রদ ও সহরের নাম সব ডায়েরীতে লিখতে লাগলেন।

পথ নেমে চলেছে। গড়গড়িয়ে আবার নেমে চলেছি। Derwent water বামে রেখে Keswick সহরে এসে পড়লুম। মোটর-চালক মোটরের গতি কমালো। বিশেষতঃ সহরে ঢুকেই সামনে school বলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন লেখা থাকাতে খুব সাবধানে চালাতে লাগল।

মোটর-চালকদের জন্য ও পথের লোকেদের রক্ষার জন্য এ দেশে অনেক সুব্যবস্থা আছে। যেখানে এক রাস্তা আর এক রাস্তার ওপর দিয়ে গেছে, এরকম প্রতি চৌমাথার একটু আগে Cross-Road—Danger বলে একটি চিহ্ন থাকে। যেখানে রাস্তা খুব এঁকে বেঁকে ঘুরে গেছে, সেই বেঁকের মুখে, রাস্তাটা কি রকম ভাবে বেঁকেছে তার চিহ্ন দেওয়া থাকে। আর প্রতি স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে Safety First বা School এই রকম লেখা একটি ছোট ত্রিভুজ চিহ্ন লোহার দাণ্ডায় বসান থাকে। এই রকম অনেক চিহ্ন দেখে বিধি-ব্যবস্থা মেনে এ দেশে মোটরকার
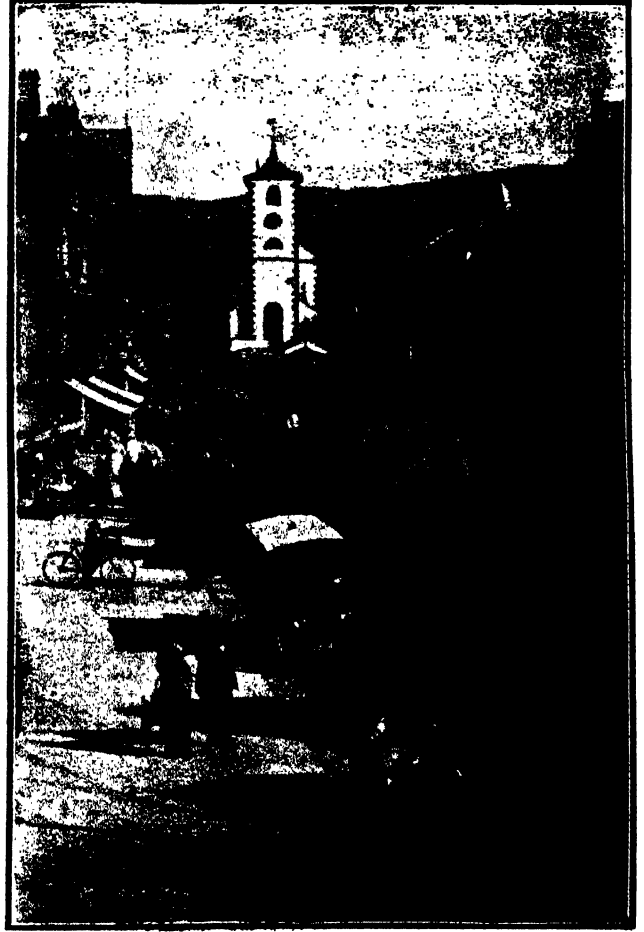
কেসউইক—মেন ষ্ট্রীট বা বড় রাস্তা

লকলোমন্ড (স্কটল্যান্ড)

চালাতে হয়, এ বিষয়ে লোকের সাবধানতা ও ব্যবস্থা বড় সুন্দর।

Keswick একটি ছোট সুন্দর সহর। বেশ সুন্দর বেড়াবার জায়গা। তার দুদিকে দু'টি সুন্দর হ্রদ, চারিদিকে পাহাড়ের মালা। ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় পাহাড় Scawfell Pike (৩২১০ ফিট) একদিক আড়াল করে আছে। এতক্ষণ ধূসর স্তব্ধ সবুজ পাহাড়ের সারি ও শান্ত নীল হ্রদের জলের ঝিলমিলানির পর এই মৃদু-কলরব-মুখর শান্ত সহরের নানা রংএর ছোট বাড়ীর সারি বড় সুন্দর মনে হল।

সন্ধ্যায় ড়িব্ ওয়েষ্ট ওয়াটার

Main street পেরিয়ে পুরাতন বাজারের ভেতর দিয়ে Greta নদীর পাশ দিয়ে সহর ছাড়িয়ে আমরা আবার উদার উপত্যকায় পড়লুম। সুন্দর মাঠের মাঝ দিয়ে পথ। অদূরে Derwent নদীর জল ঝিকমিক করছে। মাঝে মাঝে মারগারেট ফুলের বন, বাতাসে দুলছে, শিশুর মুখের সাদা হাসির মত। আরও দূরে নীল পাহাড়ের মালা। তাদের ওপর সাদা মেঘ উড়ে চলেছে। চারিদিক রৌদ্রে ঝলমল করছে।

আর একটি হ্রদের পাশে এসে পড়লুম। দীর্ঘ লম্বা হ্রদ—Bassenthwaite Lake প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা, কিন্তু আধ মাইল চওড়া। স্থির স্বচ্ছ জল টলমল করছে।

হ্রদের তীরে তীরে কিছুদূর গিয়ে আমরা বামে ঘুরলুম। এতক্ষণ উত্তর-পশ্চিম মুখে যাচ্ছিলুম, এখন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হ্রদের স্নিগ্ধ নীল জল ছাড়িয়ে ধূসর পাহাড়ের দিকে মোটর চল্ল।

পাহাড় ও প্রান্তরের মাঝ দিয়ে পথ উঠে নেমে এঁকেবেঁকে চলেছে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা ছোটনাগপুরের মত মনে হল। কিন্তু ছোটনাগপুরের লালমাটি বা রুক্ষ পাহাড় বা ঘন জঙ্গল নেই। চারিদিকে সবুজে সবুজে ভরা। শরতে বঙ্গপ্রকৃতির মধ্যে যে পরিপূর্ণতা দেখা যায়, তার আভাস রয়েছে—ঝর্ণা ধারা ঝরে পড়ছে, নদীগুলি জলে টলমল করছে, বাঁশবনের মত ম্যারগারেট ফুলের ঝাড় বাতাসে দুলছে, মেঘ চরছে,—ছোটনাগপুরের রুদ্র পার্ব্বত্য শোভার সঙ্গে বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামলতা-জড়ান প্রকৃতিশ্রী রৌদ্রে ঝলমল করছে।

কখন উঠে কখন নেমে মাইলের পর মাইল মোটর চলেছে। আর একটি হ্রদের তীরে এসে পড়লুম—Crummock Water। হ্রদটির তীরে তীরে প্রায় আড়াই মাইল গিয়ে আবার একটি প্রান্তর পার হয়ে আর একটি ছোট হ্রদের তীরে এসে পড়লুম। হ্রদটি খুবই ছোট; কিন্তু দূর থেকে বড়ই সুন্দর লাগল। এই হ্রদটির তীরে গাছের ছায়ায় একটি হোটেলের সামনে মোটর এসে থামল। ঘড়িতে দেখলুম দেড়টা বেজেছে, ল্যাঞ্চের

এই সময়। হোটেলে ল্যাঞ্চ খাবার জন্যে মোটর থামল।

সকলে ল্যাঞ্চ খেতে হোটেলে ঢুকল। আমার খাবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং হ্রদটা দেখতে ও সম্মুখে পাহাড়ে একটু উঠতে বিশেষ ইচ্ছা হ'ল। তা' ছাড়া পকেটে কিছু Sandwich ও চকোলেট রসদ এনেছিলুম।

সুন্দর ছোট হ্রদটি। লম্বায় দেড় মাইল হবে, চওড়ায় আধ মাইলের কিছু ওপর, কিন্তু বড়ই সুন্দর। তিন দিক প্রায় পাহাড়ে ঘেরা। ওপারে কয়েকটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া। এপারের একটি ছোট পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলুম। ৫০০।৬০০ ফিট উঁচু হবে। বন জঙ্গল কিছু নেই, শুধু বুনো বড় ঘাসে ভরা। কিছুদূর একটি ছোট সরু পথ দিয়ে উঠে গেলুম। তার পর, ঘাসের মাঝ দিয়ে উঠে যেতে হল। মেষ চরছে, আমায় দেখে পথ থেকে সরে গেল। পাহাড়ের মাথার দিকটা বড় খাড়াই। সেখানে পায়ে হেঁটে ওঠা যায় না, ঘাস ধরে ধরে উঠতে হল। কোন কীটপতঙ্গ নেই। শুধু যতই ওপরে উঠতে লাগলুম, একদল বন্য পাখীর কলরব বাড়তে লাগল।

পাখীগুল অনেকটা চিলের মত দেখতে,—ঈগল জাতীয় হবে। তাদের বাসভূমি পাহাড়ের মাথায় এক মানুষকে,

গ্রাসমেয়ার উপত্যকা

বিশেষতঃ কালো মানুষকে আসতে দেখে, তারা পাশের পাহাড়ের মাথায় বসে কিছুক্ষণ কলরব করলে। তার পরে মানুষের অসমসাহসিকতা দেখে উড়ে চলে গেল।

কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ

পাহাড়ের ওপর উঠে চারিদিকের শোভায় মুগ্ধ হয়ে গেলুম। Green Gable, High Crag, High stile, Red Pike ইত্যাদি পাহাড়ের মালা-ঘেরা Buttermere বা মাখন-সরোবরটি বড়ই সুন্দর লাগল,—যেন দৈত্যপুরে কোন বন্দিনী রূপসী রাজকন্যা।

একটি পাথরের ওপর বসে sandwichগুলি ধ্বংস করে ধীরে নামলুম। দেখলুম পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামাটাই শক্ত।

নেমে হোটেলে ঢুকলুম। Victoria Hotel। দরজায় ঢুকেই দেখি—কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হাতের লেখা একটি বাঁধান প্রশংসাপত্র টাঙান রয়েছে। একটা লেমনেড খেয়ে কিছু ছবি কেনা গেল।

হ্রদের পাশে গিয়ে বসলুম। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ঝলমল হ্রদটি সিন্ধুনীল দিবাস্বপ্নের মত মনে হল। যেন একটি নীল স্ফটিকের পেয়ালা সবুজ পাহাড়ের অন্তরঙ্করিত সুধারসে

টলমল করছে। এই পেয়ালার রস পাণ করে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবি-চিত্ত ছন্দিত হয়ে উঠেছিল।

মোটরের ভক্ ভক্ শব্দে চমকে উঠলুম। ফেরবার সময় হয়েছে, যাবার ডাক এল। Windermere থেকে অনেক দূরে এসেছি। সন্ধ্যে ছটার মধ্যে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

ডোভ কটেজ—বাগান

যে পথ দিয়ে এসেছিলুম ঠিক সেই পথ দিয়ে ফিরছি না। Devil's Elbow পেরিয়ে Honister pass দিয়ে একটু ঘুরে চলেছি।

Keswickএ এসে মোটর থামল। চা খাবার সময়। আমি ছোট সহর ও আসপাস দেখতে বেরুলুম। এখানে দুটি প্রধান দেখবার জিনিষ আছে। সহবের প্রান্তে Greta নদীর কাছে Greta Hall—পাহাড়ের কোলে ছোট একটি সুন্দর বাড়ী। এখানে কবি কোল-রিজ কিছু দিন বাস করেছিলেন। তার পর কবি সাদেও ছিলেন। কবি শেলীকে যখন Oxford থেকে চলে আসতে হয়, তখন তিনি তাঁর তরুণী বধূকে নিয়ে এই বাড়ীতে ছিলেন। বিকেলের আলোয় সেই বাড়ীর দিকে চেয়ে শেলীর জীবনের কথা ভেবে মন বেদনায় ভরে এল।

সহর ছাড়িয়ে Derwent হ্রদের দিকে চল্লুম। হ্রদের তীরে Friar's Crag বলে একটি ছোট সুন্দর পাহাড় আছে। তার তীরে রাস্কিনের একটি ছোট সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ। পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে সমস্ত হ্রদটি ও চারিদিকের পাহাড়ের মালা বড় সুন্দর দেখায়। রাস্কিন জায়গাটিকে বলেছেন, "one of the three most beautiful prospects in Europe." সন্ধ্যার সময় জায়গাটি বাস্তবিক অপরূপ হয়,—যখন অস্তগামী সূর্য্যের রাঙা আলোয় হ্রদের জল গলিত সোনার মত টলমল করে। তার পর পাহাড়ের পাশে সূর্য্যের শেষ স্বর্ণরেখা মিশে যায়, শুব্ধ শান্ত জলে পাহাড়ের ছায়া পড়ে, তার ওপর রঙীন মেঘের মায়া ভাসে, সন্ধ্যার গম্ভীর ছায়া ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে, দূরে ঝর্ণার গান বাজে, গোধূলির আলোয় চারিদিক স্বপ্নময় দেখায়। তার পর অন্ধকার পটে রজত-প্রদীপের মত পাহাড়ের কোলে চাঁদ ওঠে, তারার মালা জলে ঝিলমিল করে, বনের অন্ধকার রহস্যময় হয়, তখন জায়গাটি সত্যই অপরূপ।

রিডাল মাউট

[illegible] Keswick ছেড়ে মোটর চলল। St John Vale পার হয়ে Thirlmereএর পাশ দিয়ে Grasmereর দিকে চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য্যের বিদূরিত আলোয় চারিদিকের পাহাড়ের মালা, বনের সারি, হ্রদের জল নবরূপ নিয়েছে। যাবার সময় দুপুরের আলোয় তাদের যে রূপ দেখেছিলুম, ফেরার পথে গোধূলির আলোয় তাদের নবরূপ দেখলুম, এক স্বপ্নময় ছায়া জড়ান। আমার ঠিক পেছনে এক নব-বিবাহিত ইংরাজ-দম্পতী বসেছিলো। সমস্ত পথ তাদের গল্প, মৃদু-গুঞ্জরণের বিরাম ছিল না। এখন তারা স্তব্ধ হয়েছে, মাঝে মাঝে অতি মৃদুস্বরে গান গেয়ে উঠছে, একটি ইতালীয়ান অপেরা হতে একটি duet আরম্ভ করেছে। গানটা কি মনে নেই—কিন্তু সে গানের সুরটা ভুলতে পারি নি। এখনও সন্ধ্যার আলোয় একটু চুপ করে বসলে, সেই সুরটি কানে বেজে ওঠে এবং পাহাড়ের কোলে সোনার পাতের মত একটি হ্রদের ছবি চোখে ভাসে।

ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের সমাধিক্ষেত্র

Grasmereএর Dove cottageর সামনে মোটর থামল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ভক্তদের এই কুটীর একটি তীর্থ। সাদা দোতলা একটি ছোট বাড়ী, অতি সহজ সরল নির্ম্মল—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, ডি, কোয়েন্সে—কত জনের স্মৃতি জড়ান। বাড়ীর বাহিরটি যেমন, বাড়ীর ভিতরটিও তেম্নি সাদা ঝরঝরে, কোথাও উপকরণবাহুল্য, আড়ম্বর নাই।

বসবার ঘর (ডোভ কটেজ)

বসবার ঘরটিতে ঢুকলে মনটা দুলে উঠে। মনে হয় যেন কাদের ছায়া বসে আছে। ১৭৯৯ সালের এ বাড়ীর এক সন্ধ্যার ছবি চোখে ভেসে উঠে। জানলার পাশে তরুণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বসে। তখনও তিনি শান্ত সমাহিত প্রকৃতির ঋষি হন নি। ফরাসী বিপ্লবের বহ্নির ধূমে তাঁর চিত্ত তখনও অন্ধকার। এক ফরাসী তরুণীর সঙ্গে তিনি যে প্রেমলীলা করে এসেছেন, তার দুঃস্বপ্নময় স্মৃতিতে অন্তর চঞ্চল ব্যথিত। তাঁর পাশে তাঁর ভগ্নি শান্ত হয়ে বসে। সম্মুখে চেয়ারে তরুণ কোল-রিজ,—স্বপ্নময় চোখ দুটি জলজল করছে, Rhyme of Ancient Mariner পড়ে শোনাচ্ছেন—

He prayeth best who loveth best.
All things soth great and small.

Wordsworthএর মুখ আশায় আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল। বাড়ীতে Wordsworthএর অনেকগুলি জিনিষ আছে। তাঁর সব কাব্যের প্রথম-সংস্করণ বইগুলি এক জায়গায় সংগ্রহ

করা রয়েছে। তাঁর কতকগুলি হাতে-লেখা কবিতা রয়েছে, বাড়ীর আসবাবপত্র প্রায় সব ওয়ার্ডসওয়ার্থের সময়ের। তিনি যে খাটে শুয়ে মরেছিলেন, সে খাটটিও রয়েছে।

ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের শয়ন-গৃহ

কিন্তু Dove Cottageএর দিকে চেয়ে Wordsworthএর কথা নয়, আফিম-সেবী De Quinceyর কথা পর পর মনে পড়তে লাগল। Wordsworthএর পর তিনি এ বাড়ীতে বহু দিন ছিলেন। Wordsworthকে আমি ভক্তি করি, কিন্তু Confessions of an Opium Eaterএর লেখক আমার অন্তরে প্রীতি ও বেদনা জাগায়। সেই আফিম-ভক্ত তাঁর বিচিত্র চঞ্চল বেদনাময় জীবনে এই শান্ত কুটীরে কিছু শান্তি পেয়েছিলেন। তাঁর যা পাণ্ডিত্য, যা বাক্‌শক্তি, যা অত্যাশ্চর্য্যকর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল, তার জন্যে তাঁর বন্ধুরা তাঁর কাছে যা আশা করেছিলেন, তা তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু বন্ধুদের আশাকে পূর্ণ করতে পারে। তাহলেও ইংরাজী সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভার দান অক্ষয় হয়ে আছে—খামখেয়ালী আফিম-মোহগ্রস্তের ছন্নছাড়া জীবনের কথা।

Grasmere গ্রামের মধ্য দিয়ে মোটর চলল। চার্চ্চের সামনে এসে একটু থামল। এই গির্জ্জার সমাধি-ভূমিতে Wordsworth ও Colerideg এর সমাধি আছে। তার পর একটি ছোট গেটের কাছে মোটর আবার থামল। এটি wishing gate,—সবাই মনে মনে কিছু ইচ্ছা করে। আমি মনে মনে ইচ্ছা করলুম,—আবার যেন এই সুন্দর হ্রদের দেশে আসি,—একা নয়, বন্ধুদের নিয়ে আসি।

Grasmere হ্রদের ধার দিয়ে নীলকান্ত-মণির মত Rydal water পার হয়ে Ambleside ছাড়িয়ে যখন Windermere ষ্টেসনে এসে পৌঁছুলুম তখন প্রায় সাড়ে ছ'টা। সবাইএর কাছে বিদায় নিয়ে মোটর থেকে নামলুম।

যে রেস্তোরাঁতে সকালে খেয়েছিলুম, সেইখানে খাওয়া গেল। তার পর আবার হ্রদের দিকে চললুম। পাহাড়ঘেরা হ্রদের জল আমায় যেন মোহগ্রস্ত করেছে।

সূর্য্য ডুবে গেছে, কিন্তু চারিদিকে স্নিগ্ধ মৃদুমধুর আলো। এই twilightএর সময়টি বড় সুন্দর। আমাদের দেশে সূর্য্য ডুবে গেলে, গোধূলির আলো চঞ্চলা বধূর মত এক নিমেষের

পাঠাগার (ডোভ-কটেজ)

মধুর চাউনি দিয়ে চলে যায়, চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু এ দেশে গোধূলির আলো অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে। স্কটলণ্ডে দেখেছি—রাত বারোটা

পর্য্যন্ত সুন্দর আলো, বেড়াবার বড় সুন্দর সময়। আরও উত্তরে নরওয়েতে গেলে, সেখানে সারা রাত আলো থাকে।

হ্রদের ধারে এসে দাঁড়ালুম। দূরে পাহাড়ের বনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, তার ছায়া জলে পড়েছে। দীঘির কালো জলের মত হ্রদের জল টলমল করছে, আকাশে গোধূলির আলো আধ-ঘুমন্ত আধ জাগা শিশুর চাউনির মত। দিনের আলোয় প্রকৃতিকে দেখেছিলুম যেন কল্যাণময়ী কর্ম্মরতা নারী, কিন্তু এ আলো-অন্ধকারের অবগুণ্ঠনতলে প্রকৃতিকে দেখলুম রহস্যময়ী সৌন্দর্য্যময়ী প্রিয়া। হ্রদটি বড় অপূর্ব্ব বোধ হল। মনে হল, যেন একে আগে দেখি নি.—এ যেন রূপকথার মায়া সরোবরের মত;—কখন্ রাজপুত্র সাপের মাথার মণি নিয়ে আসবে, সেই মণি হাতে করে অতল জলে ডুবে ঘুমন্ত রাজকন্যার সাতমহলা সোণার পুরীর সন্ধান পাবে, তার জন্য হ্রদটি স্তম্ভিত হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

এই হ্রদের দেশের শোভ দিনের আলোয় সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায় না, দেখলুম, রাতের বেলা তার রহস্য, তার অপূর্ব্বতা, তার স্তব্ধতা মনকে অভিভূত, মুগ্ধ করে। বিশেষতঃ ঝড়ের রাতে মন মোহগ্রস্ত হয়।

পাহাড়ের মাথায় একটি তারা মণির মত জ্বলজ্বল করে উঠল। এই হ্রদের দেশের কবির কথা মনে পড়ল। রূপকথার রাজকন্যার মত এই হ্রদের দেশের সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিকে তাঁর কল্পনার মণি দিয়ে জাগিয়ে তার রূপকথা তিনি চিরকালের জন্যে লিখে গেছেন। তাঁর কথা স্মরণ করে সুন্দর হ্রদের দেশের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তিনি আর এক ইংরাজ কবি সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, সেই কথাগুলি তাঁর সম্বন্ধেও মনে পড়ল—

"Thy soul was like a star and dwelt apart
Thou hadst a voice whose sound was
like the Sea.
Pure as the naked heavens, majestic free."

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] প্রণাম

পথের কাহিনী

শ্রীনিরুপমা দেবী

ট্রেণ চলিতেছে। মেয়েদের ইণ্টার্ ক্লাশে ভয়ানক ভীড়। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে গাড়ীখানা বিলক্ষণ তাতিয়া উঠিয়াছে। গতির বেগে কামরার মধ্যে যে বাতাস বহিতেছে, তাহা কিছুমাত্র সুখস্পর্শ নয়। গরমে ছোট ছোট ছেলেরা কাঁদিয়া মায়েদের অস্থির করিয়া তুলিতেছে। ষ্টেশনে যে সময় গাড়ী দাঁড়াইতেছে, সে সময়টা যেন আর যাইতে চাহে না। যাঁহারা নামিতেছেন বা উঠিতেছেন, তাঁহারা একটা উত্তেজনার মধ্যে সে সময়টা কাটাইতেছেন। বাকি লোকেরা তখন একেবারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে।

ক্রমে বেলা একটু পড়িয়া আসিল। ষ্টেশনের হরেক রকম ফেরির সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের দালালগণও বইয়ের বোঝা বা ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া বড় বড় ষ্টেশনগুলায় ফেরি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নব নব পাব্লিশারদের চার আনা, ছয় আনা, আট আনা, দশ আনা, এক টাকা প্রভৃতি সংস্করণের চক্‌চকে—ঝক্‌ঝকে ছবিওলা বই হাতে তাহারা হাঁকিতে লাগিল—"রূপের নির্ঝর" পাব্লিশারের ছাপা, চমৎকার উপন্যাস—দাম এক টাকা! "বাসরের বর" বারো আনা সংস্করণ! "চন্দ্রের লেখা" ছয় আনা! অন্য দল হাঁকিতেছে "পাষাণের রেখা!" "অজানার দেখা!" "হীরকের শাঁখা!" আট আনা—আট আনা! তার পরে "পথিক বঁধু" "ফুলের মধু" "কোণের বধূ" এমন কত অদ্ভুত নামই কানে যাইতে লাগিল।

গাড়ীর এক কোণে কয়েকটি তরুণীতে মিলিয়া নিজেদের একটি দল গঠন করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার মধ্যে একজন তরুণী একটি বালিকার দ্বারা একটা বৈওলাকে ডাকিয়া, অনেকগুলা চক্‌চকে বৈ লইয়া, খানিকক্ষণ দাম-কষাকষি এবং বই ফেরাফেরি করিয়া, শেষে কোন'খানাই তাঁহার মনঃপূত না হওয়াতে সবই ফেরত দিলেন; এবং মন্তব্য করিলেন—"এসব বৈ-ই আমার আছে। যে বইটা খুঁজছি—এদের কাছে নেই!"

"কি বই মা—নামটাই বলুন না, খুঁজে দেখি, যদি থাকে।"

"না, না বাপু, সে বৈ তোমাদের কাছে নেই, সে খুব ভাল বৈ। মলাটটা তার এত সুন্দর—একেবারে সোণালা। আর তার মধ্যে একটা পরী উড়ছে"—বলিতে বলিতে সঙ্গিনীদের পানে চাহিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"তার ভেতরের যা সব ছবি,—একটি যুবতী আর—"

ক্যাবিনের বাহিরে তখনো অনেক লোক চলাফেরা করিতেছে—সেটা হঠাৎ মেয়েটির হুঁস্ হওয়ায়—অর্দ্ধপথে কথাটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"এ সব বৈ আমাদের সব আছে। আমাদের নিজেদের প্রাইভেট্ লাইব্রেরী আছে কি না—আল্‌মারী ভর্ত্তি ভর্ত্তি এই রকম কত সব বই,—আমি, আমার জা, ননদ সব আমরা দিন-রাতই পড়্‌ছি! যে বই নতুন যখন উঠ্‌ছে, তখনি তা আমাদের কেনা হচ্চে।"

একজন সহযাত্রিনী তরুণী—সম্প্রতি যিনি উক্তা বিদুষীর সখীদল-ভুক্তা,—প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ ভাই, সংসারের কিছু কাজ কর্ত্তে হয় না বুঝি তোমাদের?"

"তা হয় বৈ কি! সে অমনি যেমন-তেমন ক'রে সেরে আমরা বই নিয়ে পড়ি! "রূপের হাসি" ব'লে বৈখানা যেদিন প্রথম এল—"

একজন মধ্যবয়সী নারী তাহাদের কতকটা কাছাকাছিই স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানা বাংলা 'দৈনিক' মোড়া অবস্থায় রহিয়াছে,—বোধ হয় সঙ্কোচে অথবা ভিড়ের জন্য সেখানা তিনি মেলিয়া দেখিতে পারিতেছিলেন না। আমাদের বিদুষী তরুণীটির সেই দিকে নজর পড়িবামাত্র, নিজের বক্তব্য শেষ না করিয়াই, ছোঁ মারার মত করিয়া তিনি সেখানা হাতে তুলিয়া লইলেন। বারেক সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাচ্ছিল্য ভঙ্গীতে বলিলেন—"ও, খবরের কাগজ? এ আমরা ছুঁই না। কি হবে মিছে সময় নষ্ট

করে? কেবল কে কার ঘটি চুরী করলো—কাকে ধরে জেল্ দিলো—কোন্ গ্রামে কে মলো—কার বৌকে ধ'রে কোন্ শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদে, স্বামীতে মারলো (সে সময়ে "নারী নির্য্যাতন" শীর্ষক প্যারাগ্রাফে বঙ্গবধূদিগের এই সংবাদই বাংলা খবরের কাগজে বেশীর ভাগ প্রকাশ পাইতেছিল। এখনকার হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সঙ্গে জড়িত হইয়া ইহার বীভৎসতা তখনো এতটা বৃদ্ধি পায় নাই।) যত সব বাজে আর মিথ্যে গুজবে কাগজওলাদের দিন গুজরাণ করা বইতো না"—বলিতে বলিতে তিনি কাগজখানির মালিকের কোলে সেখানি প্রায় ছুঁড়িয়াই ফেরত্ দিলেন।

মহিলাটি একটু হাসিয়া বলিলেন—"না মা, এগুলো যে সত্যি কথা, আমাদেরই ঘরের কথা। এসব না জেনে, যে সব বইয়ের কথা বলছ, সেই সব মিথ্যা গল্পে দিন কাটানোই কি ঠিক্?"

"ঐ সব বানানো কথা সত্যি? কে বল্লে আপনাকে? আর সত্যি হলেও, ওতে তো কেবল মন খারাপই হয়। নভেল পড়্লে মন কত ভাল হয়! আপনি উপন্যাস কখনো পড়েন নি বুঝি? এখন যে কত সস্তায় কি সুন্দর সুন্দর বই সব পাওয়া যায়, পড়ে দেখবেন দেখি। 'চাঁদের আলো' বলে একখানা—"

"হ্যাঁ মা, তা এই 'চাঁদের আলো' 'রূপের হাসি' এইসব বই-ই কি কেবল পড়? বাংলায় ভাল নভেলেরও তো অভাব নেই! কত বড় বড় লেখকের ভাল ভাল বই আছে—সে সবের তো একখানারও নাম করছ না! কেবল এই 'চাঁদের রেখা' 'রূপের লেখা'দেরই নাম করছ? বঙ্কিম বাবুর, রবি বাবুর, কি শরৎ বাবুর বই পড় না কি? মেয়ে লেখিকাও এখন আমাদের কিছু কিছু হয়েছেন,—তাঁদের বই—"

"সব পড়েছি আমি—সব্বারি সব—কিছু আমার পড়তে বাকি নেই।"

"এক-আধখানার নাম করতো বাছা—রবি বাবুর কি অন্য কারো—"

"সে কি বলা যায়? দু'চারখানা প'ড়লে তবে মনে থাকে। বই পাচ্চি আর পড়ছি।" বলিয়া সঙ্গিনীদের পানে সগর্ব্বে চাহিয়া তিনি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিলেন।

মহিলাটি তবুও ক্ষান্ত হইলেন না; বলিলেন, "এমন অনেক বই আছে, যা যত বই-ই পড় মা, কিছুতেই তাদের ভুলতে পারবে না। যে বই পড়ে ভুলেই যেতে হয়, সে সব বই পড়ার নামই সময় নষ্ট। যা মনে কোন দাগ দিতে বা ভাব জন্মাতে পারে না, তার নাম কি বই? এ সব না প'ড়ে অন্ততঃ খবরের কাগজ পড়লেই ভাল হয়! তাতে—"

এইবার তরুণী খুব উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"খবরের কাগজে থাকে কি পড়ার মত বলুন দেখি। যত সব মিথ্যে কথা আর তিলকে তাল ক'রে বানিয়ে বানিয়ে লেখা" বলিয়া তিনি সদম্ভে সঙ্গিনীদের পানে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মজা শোন ভাই! তাদের মিথ্যে কথার প্রমাণের একটা গল্প বলি শোন! আমার স্বামীর এক বন্ধু—তার বৌটী ভাই ভারি বজ্জাত। তার বজ্জাতির দায়ে স্বামীটীকে মাঝে মাঝে তাকে শাসন করতে হ'তো! তা করবে না ভাই? স্বামী যে রকম ভালবাসে, তেমনি তো হতে হবে? তা সে মোটেই মানবে না। স্বামী বলবে দক্ষিণ তো সে উত্তরে হাঁটবে। তাই তার বর এক দিন তাকে মারছে, আর সেই সময়ে তার বাপ না ভাই কে এসে পড়েছিল—এই সে তখুনি গিয়ে পুলিশে জানালে! বাড়ীতে পুলিশ এল। কাগজে এই নিয়ে কত কেলেঙ্কারী বেরুলো। শেষে প্রমাণ হল বৌটারই দোষ! বৌটাকে সেই স্বামীর কাছেই 'থোঁতা মুখ ভোঁতা' ক'রে পড়ে থাকতে হ'ল। বাপ মোকর্দ্দমায় হেরে মুখ চূণ ক'রে ফিরে গেলেন। সে বৌকে কি কেউ ভাল চক্ষে দেখতে পারে? এখন মার খাচ্চেন, আর প'ড়ে আছেন সেই বরেরই দুয়োরে। সব চেয়ে রাগ ধরে কাগজওলাদের ওপরে—ঘরে লোকের কত কি হয়, তোদের বাবু এত মাথাব্যথা কিসের? তোরা কেন—"

মহিলাটি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কাগজওলাদের মিথ্যে বলাটা এতে তো প্রমাণ হচ্চে না মা!"

"হচ্চে না? আপনি সব জানেন কি না! সে যে কত বাড়িয়ে কত কি-ই তারা লিখেছিল। শাশুড়ীতে সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, ননদে চুল কেটে নিয়েছে—স্বামী—"

"হ'তে পারে, কথা কিছু বেড়ে গিয়েছিল—কিন্তু মূল কথা তো সত্যি!"

"সত্যি ? তিলকে তাল করার নাম সত্যি বলেন আপনি ?"

বেঞ্চের কোণে আর একটি বিধবা মধ্যবয়সী মহিলা বসিয়া ছিলেন। তিনি এতক্ষণ ইঁহাদের এই বাদানুবাদ একমনে শুনিতেছিলেন। তিনি এইবার উত্তর দিলেন—"বাছা! তিল তাল হয়েছে বলে রাগ করছ—কত জায়গায় যে তাল তিলের মত অস্তিত্বও জগৎকে জানাতে পারে না! জগতে এমন কত অবিচার অত্যাচার যে লোকে নিঃশব্দে সয়ে যাচ্চে, লোকলজ্জার ভয়ে ওষ্ঠাগ্রে আন্‌ছে না, তা কি জান মা? কারো কথা হয় ত একটু বেশী হ'য়ে গেছে,—তেমনি কত মেয়ের দুঃখ যে জগৎ জানেই না। তাদের কথা মনে করে এটুকুতে রাগ করতে নেই। বিশেষ তোমাদেরই কথা এ যে, তোমরা যদি নিজেদের জাতের দুঃখের কথায় এমন উদাসীন হবে, তবে অন্যেরা হবে না কেন ?"

বিরুদ্ধবাদিনী মেয়েটি এইবার যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া "ও বাপু আমরা বিশ্বাস করি না। অত কষ্ট স্বামীতে যে দিতে পারে—"

"হতে পারে মা তুমি সৌভাগ্যবতী, তোমার আত্মীয়ারাও ভাগ্যবতী। কিন্তু জগতে ভাগ্যহীনা কেউ নেই এমন কথা বল্‌তে পার কি ?"

তরুণী তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "না, তাই বল্‌ছি, যা জানি না—যা দেখি নি, তা কি করে—"

"কেন মা, ঐ যে সব বই পড়্‌ছ, তাতেও তো এ রকম গল্প ঢের পাও। সেগুলো সত্যি ব'লে চোখের জল ফেল, আর কাগজওলারা যা লেখে তাকে মিথ্যে ভাব। মা, জগতে এমন সত্যও আছে যে, বই বা কাগজওলারা তার সন্ধানও জানে না,—অনেকে কল্পনাও করতে পারে না!"

এ তর্কের এইখানেই এইবারে শেষ হইল। এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কেহ বাদানুবাদে অগ্রসর হইল না। কেবল সেই মধ্যবয়সী মহিলা দুইটিই ক্রমে ক্রমে উভয়ের নিকটস্থ হইয়া মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রথমার নিকটে আন্তরিক সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বিতীয়া বিধবা মহিলাটি ধীরে ধীরে যে কাহিনী আরম্ভ করিলেন, তাহার কিয়দংশ আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

ঐ একটী মেয়ে নিয়েই বিধবা হয়েছিলাম। সেই মেয়ের এমন দুরবস্থার খবরে কি যে কল্লুম দিদি—যেন ভেবেই কূল পাচ্ছিলাম না। বড় সাধ করে বারো বছরে পড়তেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। জামাইটিও রূপে ধনে কুলে সব তাতেই মনের মত হয়েছিল। সেই সাধে এমন বাদ বিধাতা সাধ্‌লেন! মোটে চৌদ্দ বছরের মেয়ে—তাকে এই নির্য্যাতন—এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

বিধবার মেয়ে, ছোট থেকে পরের অনুগ্রহেই প্রতিপালিত। যে মেয়ে আমার মুখ তুলে কখনো কারও অন্যায়ের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করতে জানত না,—দূর সম্পর্কের দেওরের ঘরে থাকি,—তারা পর্য্যন্ত যে মেয়ের গুণে তাকে নিজেদের মেয়ের মত করেই যথেষ্ট দিয়ে-থুয়ে ভাল পাত্রে বিয়ে দিয়েছে। সে মেয়ে যে কোন অন্যায় করে এই অবস্থায় পড়েছে, এও কারুরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। দেওর, দেওরপো—তাঁরা বলেন, এখনি গিয়ে নিয়ে আসি, অনিকে কি আমরা দুটো খেতে দিতে পারব না? আমিই কিছুদিন তাঁদের হাতে পায়ে ধরে থামাতে লাগলাম যে একটা কিছু ক'রে ফেল্‌লে সে আর জন্মে মুছবে না! বিধবার মেয়ে একটু কষ্ট সহ্য করতে শিখুক—সইলেই তাদের দয়া হবে। পরে হয় ত বাড়িয়ে লিখেছে,—মেয়ে তো এ পর্য্যন্ত এক কলমও লেখে নি। তখন কি জানি দিদি, যে, তার এক কলম লেখারও উপায় নেই! আর মেয়েও আমার সয়েই দেখ্‌ছিল দিদি, যে, মানুষের মন থেকে কি দয়া মায়া একেবারেই মুছে যেতে পারে? মানুষ যে বাঘ-সিংহের চেয়েও ভয়ানক তা পরে দেখ্‌লাম। বাঘ-সিংহ তো পশু, তারা আহারের চেষ্টায় প্রাণী-হত্যা করে। আর মানুষ যে বিনা কারণে মাত্র একটা খেয়ালে এমন ক'রে একটা শিশুহত্যা করতে পারে, এ আমারই জানা ছিল না,—তা সে তো একটা কচি মেয়ে, সে সংসারের কিই বা দেখেছে।

শেষে সেই চিঠিও এল। মেয়েই শেষে লিখ্‌লো "মাগো, তোমায় হয় ত আর দেখ্‌তে পাব না,—পার তো আমায় নিয়ে যাও!" এ চিঠি পেয়ে দেওর আর একদণ্ডও আমায় ভাবতে দিলেন না—ছেলে সঙ্গে দিয়ে আমাকেই মেয়েকে আন্‌তে পাঠিয়ে দিলেন। এর আগে দুবার আন্‌তে গিয়েও সে ছেলে ফিরে এসেছিল। আমার মুখ চেয়ে চল্ল আবার আমার সঙ্গে। আমি যেতে

তাদের কিন্তু খুব অবাক্ বোধ হল না,—তারাও যেন এই রকম প্রতীক্ষা করছিল। প্রথম দিন তো মেয়ে কোথায় জান্তেই পার্‌লাম না। জমীদার-বাড়ীর চাকর-দাসীরা তো কথাই কয় না। শেখানো কি না জানি না,—মেয়ের কথায় বলে আমরা জানি না। বেহান্, যেন্ কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে খানিক ভদ্রতার ভাষায় "কি সৌভাগ্য আমাদের—আপনি পায়ের ধূলো দিয়েছেন" ইত্যাদি ব'লেই অন্তর্ধান কর্‌লেন। কেউ জল খেতে দিতে আসে, কেউ "স্নান কর" বলে,—মেয়ের কথা কেউ বলে না। মেয়ে কি তবে আমার নেই? শেষে গিন্নির একটা মেয়ের হাত জড়িয়ে ধর্‌তে, সে বল্‌লে "বৌ তো এখানে নেই, আমার দিদির বাড়ীতে আছে।" "সে কতদূর? আমাদের ঠিকানা দাও, আমরা যাই। না যদি বল, আমরা জল গ্রহণও কর্‌ব না, তোমাদের বাড়ী ধন্না দিয়ে বসে থাক্‌ব।" তথন বল্লে "আন্‌তে লোক গেছে, কাল আস্‌বে।"

সেই 'কাল' এল, তবু মেয়ের খোঁজ পাই নে। শেষে বাড়ীর অন্য একটী বৌ, আমার অবস্থা দেখে, নিঃশব্দে এসে আমায় হাতছানি দিয়ে একটী মহলে ডেকে নিয়ে গিয়ে, একটী ঘর দেখিয়ে দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে পালালো। সেই ঘরের দিকে যেতেই শুন্‌তে পেলাম, ঘরের ভেতর কার ওপর কে যেন তর্জ্জন কর্‌ছে, আর অতি ক্ষীণ শব্দে কে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে। প্রাণ আমার বুকের ভেতর যেন ধড়ফড় ক'রে উঠল—এই কি আমার বিধবার একমাত্র ধন, অনির গলা?

জোরে দুয়ারে ধাক্কা দিতেই দরজা হাট্ হ'য়ে খুলে গেল—সামনেই বেয়ান! "তুমি এখানে কেন—এখানে কেন" বলে সে যেমন দুয়োর আটকাতে আস্‌বে, আমি অমনি পাগলের মত একছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়্‌লাম! দেখি একটী মরঘাটিতে প'ড়ে থাকার মত বিছানায় তেমনি কালো কাপড়ে ঢাকা আমার অনিলা পড়ে কাঁদছে! তার কাছে আমি বসে পড়তেই—আর আমার মুখ দিয়ে বাক্ সর্‌লো না। এই কি আমার অনি? দুঃস্বপনেও তার এমন চেহারা যে কল্পনা করতে পারি না। আর কপালে গালে মুখে সর্ব্বাঙ্গে সে কি কালো কালো দাগ—যেন কাল্‌শিরে পড়ে গেছে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে আমিও নির্ব্বাক্—আর মেয়েও যেন অজ্ঞান হয়েই গেল। মাগী তো আর কথা না ক'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত দিন মেয়ে কোলে ক'রে বসে রইলাম। শেষে আমার ওপর হুকুম এল—"গেরস্ত বাড়ী, থাবে তো খাও; নৈলে মেয়ে নিয়ে এখনি বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে।" মনে হ'ল, একেবারে নিয়েই বেরিয়ে যাব। মেয়ের মুখে শুন্‌ছি—জামাই এর মধ্যে নেই। সে একেবারে যাকে বলে 'ভাল ছেলে'! মার কাজের ওপর, কথার ওপর কথা কইবে, তেমন "স্ত্রী-বশ" নয়! এ শুনেও একবার মনে হ'ল, হয় ত সে এত কাণ্ড জানেও না—জমীদারের ছেলে,—বাইরে থাকাই দেখ্‌ছি এদের রীতি। যদি তাকে সব জানিয়ে বুঝিয়ে মেয়ের অবস্থা একটুও ফেরাতে পারি। নিয়ে গেলে যদি জামাই জন্মের মতনই ত্যাগ করেন! মেয়ের মা আমি—এতে যে মেয়ের মরণ সমান অবস্থা করেই নিয়ে যাব! মান-অপমান দূরে রেখে সেই চণ্ডালের অধমদের বাড়ী জলগ্রহণও কর্‌লাম দেওরপোর অমতে! তার পরে দুদিন ধরে জামায়ের সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য, একটি কথা কবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। যারা মেয়ের এই অবস্থা আমাদের জানিয়েছিল, তাদের হাতে পায়ে ধর্‌তে লাগ্‌লাম,—তারা এ সাহস কিছুতে কর্‌তে পার্‌লে না! বল্লে, "নিতান্ত মেয়েটি ম'রে যায়, তাই কোন রকমে তোমাদের জানিয়েছি। নিজের সন্তান চাও তো নিয়ে পালাও, ঘর-বরের আশা ক'র না। গিন্নি জানতে পার্‌লে আমাদের জ্যান্তে পুত্‌বে।"

মেয়ের অপরাধের মধ্যে মেয়ের রং একটু শ্যামলা—তা তারা দেখেই তো নিয়ে গিয়েছিল! গিন্নি সুন্দর বৌ আন্‌বেন বলেই না কি এই পীড়ন ধরেছেন। কর্ত্তাও আগে এর মধ্যে ছিলেন না, এখন ক্রমে গিন্নির পরামর্শে এই মতেই এসেছেন। শেষে যেদিন প্রকাশ্যে আমি জামাইকে ডেকে দেবার জন্য একজনকে বল্লাম, তথনি হুকুম এল, আপনারা আপনাদের মেয়ে নিয়ে চলে যেতে পারেন। মেয়ে সেই দুদিনে মায়ের কোল্ পেয়েই বোধ হয় একটু সাম্‌লেছিল। তথন দুরন্ত বর্ষা,—মেয়ের ওপর হুকুম হয়েছিল, নীচে থেকে জল তুলে ওপরের জালা ভর্‌তে! মেয়ে ভিজে কাপড়ে ভিজে মাথায় তাইই কর্‌ছিল! আঁচলে মুখ ঢেকে বল্‌লে 'মা, তুমি চ'লে যাও, আমি যাব না।' আমিও "তাই ভাল" ব'লে চোখ্

ঢেকে সেখান থেকে স'রে এসে দেওরপোকে গাড়ী আনতে বল্লাম।

গাড়ী এলে উঠতে যাচ্চি—এমন সময় দেখি, দুটো দাসী দুহাত ধরে অনিকে প্রায় টেনেই এনে আমার কোলে ফেলে দিল। প'ড়ে গিয়ে ঠোঁট মুখ কপাল সব কেটে গেছে—রক্তে কাপড় মাথামাথি! ওপর থেকে গিন্নির গর্জ্জন কানে আসছে—মাকে দেখে সোহাগ ক'রে পড়া হ'ল! নিয়ে যাক্, এক্ষুনি বিদেয় হোক ও কাল্ পেত্নি! দাও ওকে গাড়ীতে তুলিয়ে,—খবর্দ্দার যেন আমার বাড়ীতে আর মুখ না দেখায়। মেয়ের মুখে হাত দিয়ে দেখি—ঠিক যেন অজ্ঞান। আমার ইচ্ছে যে একটু জ্ঞান করে রেখে তবে আসি। দেওরপো বল্লে "হয় অনিকে নিয়ে চল, নয় ত এখনি গাড়ীতে ওঠ,—এ যন্ত্রণা আর দেখ্তে পারি না।" অগত্যা কোল থেকে তার মাথা নামিয়ে ওপরের দিকে বেহানের উদ্দেশে যোড় হাত করে বল্লাম—"মারতে হয় রাখ্তে হয় তোমার জিনিষ তুমিই রাখ" বলে গাড়ীতে উঠ্লাম। তখনো দেখছি—ঝি দুটো গিন্নির হুকুম মত অনিকে ছেঁচ্ড়াতে ছেঁচ্ড়াতে গাড়ীতে তুলে দিতে আস্ছে; আর মেয়ে তাদের পা চেপে ধর্ছে আর বল্ছে "আমি যাব না, আমি যাব না।"

আমি গাড়ীর বার্ বন্ধ করতে যাচ্চি, এমন সময়ে দেখি জামাই, বোধ হয় তার মায়েরই আদেশ মত, আমার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে এসে, নিতান্ত ভাল-মানুষটির মত গাড়ীর বার্ ধরে দাঁড়িয়ে "আপনি যাচ্চেন! আমার প্রণাম করা হয়নি!" বলে আমায় প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিতে হেঁট হচ্চে! আমি তখন একেবারে পাগলের মতই "নরেশ, নরেশ—এতক্ষণে তোমার আমার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে হ'ল? একেবারে সম্বন্ধ শেষ হবার সঙ্গে? তোমারই হাতে যে আমার বিধবার একমাত্র ধনকে দিয়েছি। তুমি তাকে রাখ—তাকে ত্যাগ কর না—বল তোমার মাকে—"ব'লে চীৎকার করে কেঁদে উঠ্লাম! আর আমার বুকে যে যন্ত্রণা ধরছিল' না!

দেওরপো আমার মুখ চেপে ধ'রে চুপ্ চুপ্ করতে লাগল। আর জামাই, একবার আমার দিকে, একবার 'হাড়কাঠে পড়া পাঁঠার মত' অনির দিকে তাকিয়েই ছিট্‌কে কোন্ দিকে যে পালিয়ে গেল, আর তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরে তারা ধরাধরি করে কখন্ যে অনিকে গাড়ীতে আমার কাছে তুলে দিয়েছে, তা জানি না। গাড়ী থেকে যখন ট্রেণে উঠ্‌ছি, বেহাইয়ের একটা লোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে বল্লে, "বৌয়ের হাতে আমাদের দেওয়া চুড়ি আছে, সেগুলো খুলে দেন্।" দেওরপো গাড়োয়ানের হাতের চাবুক কেড়ে নিয়ে তাকে ক' ঘা চাবুক কস্তেই সে ছুটে পালালো। আমি বল্লাম, "দিলে না কেন চুরি ক'গাছা।" দেওরপো ধমক্ দিয়ে বল্লে, "সে আমি বুঝ্‌ব!"

বাড়ীতে পৌঁছুলে দেওর বল্লেন "মোকর্দ্দমা আন্‌ব।" আমি বলি "না না, আমরা তো কিছু করি নি, তারাই জোর করে তুলে দিয়েছে। জামাই এখন স্বাধীন নয়,—যদিই ভবিষ্যতে সে স্ত্রীকে মনে করে—মোকর্দ্দমা কর্‌লে আর তো তা সম্ভব হবে না,—মোকর্দ্দমায় কাজ নেই।" এই গোলমালে কদিন গেল। ওমা দেখি, তারাই উল্টো চার্জ্জ এনেছে, "মেয়ে জোর্ করে উঠিয়ে আনা, মায় তাদের দেওয়া গয়না সুদ্ধ।" দেওর বল্লেন "দেখ্‌লেন বৌঠাক্‌রণ, আপনার বুদ্ধিতে অনিকে আমরা যে দুহাজার টাকার গয়না দিয়েছি, তা, আর তার খোর্‌পোষের দাবীর আশাও গেল।"

মোকর্দ্দমায় আমাদের বড় কিছু করতে পারলে না; তবে তাদের সেই চুড়ি ক'টা ফেরৎ দিতে হল—আর আমাদের মোকর্দ্দমা করারও উপায় রইল না। মেয়ের সর্ব্বস্বই যখন গেল, তখন ক'টা চুড়ি আর এমন কি—আর তা আমার বিষের মতই লাগ্‌ছিলো—স্বচ্ছন্দে খুলে তা ফেলে দিলাম। কিন্তু সে চামাররা তখন বল্‌লো কি—মেয়ের হাতে সোনা-বাঁধানো লোহা আছে, সে গাছিও দিতে হবে—নরেশের নতুন বৌয়ের হাতে পরাতে হবে।

অনি হঠাৎ জেদ্ ধরে বস্‌লো—"লোহাটা আমি কিছুতেই দেব না—এর বদলে আমার দু হাজার টাকার গয়না দিয়ে দিলাম।" এত ব্যাপারে যে মেয়ে মরার মতই এক ধারে পড়ে ছিল—একটি কথাও যে কয় নি, সে এই লোহা দেবার কথায় বাঘের মতন গর্জ্জন করে উঠ্‌লো! কিছুতেই তাকে লোহাগাছ খোলাতে পার্‌ না। অন্য লোহা এনে সামনে ধরি—সে নিজের হাত বুকের মধ্যে চেপে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে!

তার এই কাণ্ড দেখে বাড়ী সুদ্ধ লোক কেঁদে আকুল। কিন্তু সে পাষাণদের প্রাণ গল্‌লো না! তারা কেবলই দেওরকে উত্যক্ত করতে লাগ্‌লো। দেওর খুব কঠিন ধাতের পুরুষ। তিনি শেষে জোড়হাত ক'রে তাদের বল্লেন "আপনারা ঐ সোনার দাম নিয়ে আমায় ওগাছি ভিক্ষে দেন্—মেয়েটা আমাদের মরেই যাবে দেখ্‌ছি। এই দয়াটুকু করুন।" শেষে তারা এমন অপমান তাঁকে করতে লাগ্‌লো যে, দেওর তখন ছুটে এসে বল্লেন "অনি—ছি—তোর ঘেন্না হচ্চে না? এই চামারদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে তুই এমন করছিস্? জানিস্ সীতার মত সতীও এত অপমান স'ন্ নি? তুই কি সতীর মেয়ে সতী নস্?"

অনি এইবার আস্তে আস্তে উঠে বসে তার হাতের লোহা গাছটা খুলে তার কাকার হাতে দিলে। তার পরে আস্তে আস্তে আঁচল দিয়ে সিঁদুর ঘ'ষে তুলে ফেললে। আমি হাত ধরতে যাচ্চি—এমন ভাবে হেসে সে আমার মুখপানে চাইলে—উঃ দিদি, সে মুখ বুঝি জন্মে ভুলব না! বল্লে "কেন মা আবার হাত ধরছ? তাদের সম্বন্ধ যখন তারা খুলেই নিয়ে গেল, তখন কেন আর এ চিহ্ন?"—তার পর আমার বুকে প'ড়ে বল্লে "কেন মা কাঁদছ? আমি তোমার সেই দুবছর আগের অনি! আইবড় অনি। সেই হতে আর সে সিঁদুর পরে না—আল্‌তা পরে না—চুল বাঁধে না—পাণ খায় না। তার কাকিমা যদি বলে "আইবুড় মেয়ে কি এসব করে না?" সে কেবল একটু হাসে।

শোকবিধুরা মাতা একটু থামিয়া যেন দম লইলেন। যিনি শুনিতেছিলেন, তিনি অনুভূতির অশ্রু মুছিয়া বলিলেন "মেয়ে এখন কোথায় দিদি?"

"আমাদেরই কাছে। তার কাকা আর দাদা তাকে পরের অনুগ্রহে চিরজীবন কাটাতে দেবেন না বলে' নিজেরাই ঘরে ম্যাট্রিক্ পর্য্যন্ত পড়িয়ে পাশ দিইয়ে বি-টি পাশও করিয়েছেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় হ'তে। সে পাশ্ দিয়েই বেশ ভাল কাজও পেয়েছিল;—আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ২।৩ যায়গায় মেয়ে স্কুলের মাষ্টারীও সে করলে। কিন্তু তার শরীর ভাল নয়। কি যে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে তার, এই বারো বছরেও তার আর সংশোধন হ'ল না। আর আমারও এখন তীর্থস্থানে থাকৃতেই মন চায়। অনিও টিচারীতে সুখ পেল না। বলে "মা এতেও যায়গায় যায়গায় বিব্রতে পড়্‌তে হয়। আমরা হিন্দু-সমাজের ভেতরই আছি, অথচ এরকম স্বাধীন জীবিকা নিয়েছি—এ যেন আমাদের দেশের লোক এখনো বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে না! সমালোচনার বক্র ইঙ্গিত ছাড়াও, পুরুষরা যেন বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে আসেন। যাঁদের সমাজে এটি চলেছে—যেমন ব্রাহ্ম বা খৃশ্চান মেয়েদের—তাঁদের বোধ হয় এ ভোগ ভুগতে হয় না। তোমায় নিয়ে কাশীতেই থাকি চল। সেখানেও এ কাজ করতে পারব। না হয় আমাদের যা আছে তাতেই মায়ে ঝিয়ের চ'লে যাবে। বেশী টাকার দরকার কি আমাদের?" তাই আজ দুবৎসর কাশীতেই আছি। পশ্চিমে গিয়ে মেয়ের শরীরটাও একটু ভাল হয়েছে; আর তার বিদ্যেও অসার্থক হয় নি। কাশীর থিয়জফি সোসাইটিতে যে মেয়ে-ইস্কুল আছে, তার কর্ত্রী মিস্ আরেগুলের সঙ্গে কলকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর খুব পরিচয়। তিনি অনিকে খুবই ভালবাসতেন। মিস্ আরেগুল্‌কে লিখে তিনিই অনির সেখানে শিক্ষকতা জুটিয়ে দিয়েছেন। সোসাইটীর গাড়ীতে মেয়েদের মধ্যেই অনি যায় ও আসে। সেখানের বন্দোবস্তও খুব ভাল। দু একজন ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা পর্য্যন্ত ইচ্ছে করে সেখানে বাংলা সংস্কৃত এসব পড়ান। আমার খুড়শাশুড়ী—দেওরের মা—তিনিও আমার কাছে কাশী বাস করছেন; আমরা তিনজনে বেশ শান্তিতেই ছিলাম দিদি—কিন্তু এটুকুও আমরা বোধ হয় পাবার যোগ্য নই—তাই ভগবান তাতেও অশান্তি ঘটালেন।"

"কেন দিদি, সেখানে আবার কে তোমাদের এ স্বস্তিটুকুও নষ্ট করলো?"

"যারা আমার আর অনির জীবনের ধূমকেতু—তারাই। সেও এক বিধির আশ্চর্য্য যোগাযোগ। নিজের মেয়ের কথা নিজের মুখে কি বলব দিদি—সকলের সেবা করে তার যেন তৃপ্তি হয় না! আমি, আমার খুড়শাশুড়ী—আমাদের কথাও যদি ছেড়ে দিই,—যারা ওর কাছাকাছি থাকবে, তাদেরই সে এত যত্ন আর নানারকমে সেবা করবে যে, সকলে অনিলা বল্‌তে অস্থির হয়ে উঠ্‌বে। আমাদের পল্লীটায় যত বাড়ী আছে—সবারি সঙ্গে অনির কি যে ভালবাসা—তার আর ছোট বড় নেই। কাশীবাসিনী কত বুড়ী যে এই দুবছরে অনির চেনা হয়ে গেছে, কত ছেলে মেয়েরই যে সে মাসি

পিসি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে পাড়াখানির তা কি বল্‌ব! অনিকে দুদিন না দেখতে পেলে তারা বার বার খোঁজ নিতে আস্‌বে। ইস্কুলের মেয়েদের, আর অনির সহকর্ম্মী যাঁরা তাঁদের, তো কথাই নেই। মেম্‌রা পর্য্যন্ত কি যে ভালবাসেন! যাক্‌' এসব বলে আর কথা বাড়াব না দিদি—আসল কথাটা বলি।

একদিন রবিবারে অনি খুড়িমার সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গেছে, এমন সময়ে মোটা থপ্‌থপে মতন একটী বিধবা মেয়েমানুষ সিঁড়ি থেকে গড়াতে গড়াতে অনির সামনেই আর একটু হলেই জলে পড়ে যাচ্ছিল। আপনার প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সে মেয়ে কি করে যে তাকে সাপটে ধরে তাকে জলে ডুবে মর্‌তে দেয় নি—সে কথা বল্‌তে গিয়েও খুড়িমা শিউরে ওঠেন। অনি সুদ্ধ আর এক চুলের জন্য জলে পড়ে নি। ঘাট সুদ্ধ লোক হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লো,—এমন কাজও করে!—ঐ পড়ন্ত অত বড় লাশকে আটকাতে গিয়ে, একফোঁটা মেয়ে—তুমি যে বাছা কুটোটির মতই পিষে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুব্‌তে! কিন্তু মেয়ে সে সব কথা, কি নিজের আঘাতের দিকে নজরও না করে (মেয়েরও বড় কম লাগে নি ত! সর্ব্বাঙ্গে কালশিরে পড়ে গিয়েছিল সেই লাশকে আটকাতে গিয়ে, আর তার পড়ার বেগের সঙ্গে নিজেও দু তিন উল্টান খেয়ে।), সেই মেয়েমানুষটিকে নিয়েই একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লো! তার মাথা কোলের মধ্যে নিয়ে "ভয় কি মা, আর ভয় নেই" বলে ভরসা দেয়, আর মুখে-চোখে জল দেয়—ঘাটোয়ালের কাছ থেকে পাখা চেয়ে নিয়ে বাতাস করে। ঘাটের লোকও তখন অনির সাহায্য করে। শেষে ডুলি আনিয়ে কত কাণ্ড ক'রে তাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দেয়। মাগীর পুণ্যি এই ছিল যে, হাত পা মাজা ভাঙেনি। কিন্তু মাথায়ও আঘাত লেগেছিল খুব, আর গতর চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

বাসাতেও তার আপনার লোক কেউ নেই, কেবল ঝি চাকর আছে দেখে, অনি তখনি সেইখানে বসে ডাক্তার আনিয়ে তার সেবা শুশ্রূষার, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তো মাগীর তেমনি জ্বর এসে তাকে যেন অজ্ঞানই করে দিল। তার মধ্যেই সে অনির গলা ধরে "মা আমার অন্নপূর্ণা—আমায় ছেড়ে তুমি যেয়ো না—আমায় খ্রিষ্টানের জল খাইও না—যদি বাঁচালে তবে এটুকুও বাঁচাও" বলতে লাগ্‌লো। মাগীর পয়সা আছে বুঝে নার্সের ব্যবস্থা হচ্ছিল; কিন্তু তার কাতরোক্তির দায়ে অনিই দু চারদিন দেখ্‌তে রাজী হ'ল। ডাক্তার এই বলে ভরসা দিচ্ছিল যে, "বিপদের আশঙ্কা নেই—এ একটী শক্।"

অনি তো তার মাথার কাছে দিব্যি আসন গেড়ে নার্স হ'য়ে বস্‌লো! খুড়িমা তখন তার ঝি চাকরের কাছে তার পরিচয় শুনে, কাঁপতে কাঁপতে এসেই আমায় বল্লেন, "ও বৌমা, এ কাকে অনি বাঁচিয়েছে? যে তার সর্ব্বনাশের মূল, তাকেই! এ যে অনির শ্বাশুড়ী!" বারো বছর দেখা নেই—আর অনিও তখন ছেলেমানুষ—মাগীরও তখন সধবার অন্য রকম ছিরি ছিল,—অনি চিন্‌তে পারে নি। সন্ধ্যাবেলা তাঁর সঙ্গে আমিও গিয়ে তাকে দেখে চেহারায় তেমন কিছু চিন্‌তে পার্‌লাম না! পারবই বা কেন? যেদিন তার সঙ্গে আমার দেখা, সেদিনের দেখা যেমন বাঘের আর ছাগলের দেখা! ছাগল কি তখন তার চেহারার দিকে কোন লক্ষ্য রাখ্‌তে পারে? আমার তখন এই দ্বন্দ্ব মনে চল্‌তে লাগ্‌লো যে, অনিকে চিনিয়ে দিই কি না! শতবার মনে হচ্ছিল তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নিয়ে আসি,—থাক্ মাগী অমনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে! আবার ভাবি, বিশ্বনাথের ধামে এসে এমন হীন কাজ কর্‌লে তাঁকে কি জবাব দেব?

রাত্রিটা তো অনির জন্য আমারও থাক্‌তে হ'ল সেখানে। সেই বারো বছর আগে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ক'রাত্তির থাকার কথা মনে পড়ে রাত্রে ঘুম আর হল না! সমস্ত রাতই মাগী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, আর অনিকে দেখে—"মা অন্নপূর্ণা মা আছে আমার শিয়রে বসে! মা জল দাও" এমনি করে। সকালে ডাক্তার এসে যখন বল্‌লে—"এঁর আপনার লোক কেউ থাকে তো খবর দিতে হয়,—ব্যাপারটা সহজে কাটবে ব'লে মনে হয় না।" তখন অনি "আপনার কে আছে" জিজ্ঞাসা করায়, সে তো "আমার কেউ নেই, আমার বিশ্বনাথ আছেন, আর অন্নপূর্ণা মা এই যে তুমি আছ" এই রকম আধ বেঠিক রকমের কথা কইতে লাগ্‌লো। ঝি চাকরকে ডেকে তখন অনি পরিচয় নিতে বস্‌লো! আমি উঠে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে গিয়ে বস্‌লাম! পরিচয় শুনে অনির কি রকম মুখ হবে, সে আমি যে চোখে দেখ্‌তে পারবো না! খানিকক্ষণ পরে শুন্‌লাম, অনি চাকরের হাতে টেলিগ্রাম লিখে পাঠালো। আর যা যা

করবার—বেশ সহজ ভাবেই ক'রে যেতে লাগ্‌লো! আমার ক্রমে তখন কেমন একটা অসহ্য ভাব আসায় ঘরে গিয়ে বল্লাম—"ইস্কুল কামাইও করতে হবে না কি এঁর জন্যে?" অচলস্বরে অনি বল্‌লো "হ্যাঁ, যতক্ষণ না এঁর আপনার লোক কেউ আসে। একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি মা, ঝিকে দিয়ে ইস্কুলের গাড়ীর কোচ্‌ম্যানকে দিইও,—আর দুপুরে তাকে পাঠিও, তার সঙ্গে গিয়ে খেয়ে আস্‌ব।"

আরও দিন-দুই দিনরাত আমাদের এই রকম ভোগেই কাট্‌লো। গিন্নির অবস্থা একই রকম। সেদিন সকালে খুড়িমা অনিকে রাত্রে আগ্‌লে চলে আসার খানিক পরেই দেখি, অসময়ে অনি চলে এসেছে।

"এখনি এলি যে! রোগী কেমন আছে?"

"আজ তো একটু ভালই দেখাচ্ছে, ডাক্তারও তাই বল্লে।"

অনিকে ইস্কুলে যাবার জোগাড় করতে দেখে বল্লাম—"আজ ইস্কুলেও যেতে পার্‌বি না কি? ওখানে কে থাক্‌বে?"

"রোগিনীর ছেলে বৌ এসে পৌঁছেছেন!" আর আমি কথা কইতে পার্‌লাম না। অনি কিন্তু অবিকৃত মুখে খেয়ে-দেয়ে স্কুলে চলে গেল। বিকেলে দেখি, তাদের ঝিয়ের সঙ্গে একটি গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড়-পরা বৌ এসে দাঁড়াল। আমরা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছি দেখে ঝিই বল্লে—"গিন্নিমা যে আপনার জন্তে ভারী অস্থির করছেন দিদিমণি-সবাইকে বল্‌ছেন খিরিশ্চান্। অন্নপুন্নো মার হাতে নৈলে দুধ খাব না, জল খাব না—এই বলে জেদ্ ধরে মুখ টিপে আছেন। আপুনি না গেলে তো গিন্নিমা মারা পড়েন। দাদাবাবু তাই বৌ ঠাক্‌রুণকে আপনাকে ডাক্‌তে পেঠিয়ে দিলেন। বল্লেন এত করে যখন আপুনি বাঁচিয়েছেন তখন আরও দুদিন দেখে তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যান। গিন্নিমাকে কিছুতেই খাওয়াতে পারা যাচ্চে না, সেই আপুনি আসার পর থেকে দাঁতে দড়ি দিয়ে আছেন।"

রাগে তখন আমাদের শরীর জ্বলে উঠল। মনে হল বলি দুকথা। কিন্তু তখনি মনে পড়্‌ল, তাহলে আমরা কে, তা যে এখনি ধরা পড়্‌বে। সে যেন আমাদের পক্ষে বড়ই ঘৃণার, বড়ই লজ্জার কথা—এমনি মনে হল। কি বলি কি করি ভাব্‌ছি—এমন সময়ে দেখি, দিব্যি অম্লান মুখে অনি সেই ইস্কুলের ফেরত্‌ একটু জলও মুখে না দিয়ে তাদের সঙ্গে উঠে চল্‌লো। খুড়িমা গোঁ গোঁ করে বলে উঠ্‌লেন "মলো হতভাগী—মুখে একটু জল দে।" অনি—তাঁর কথা পাছে তাদের কানে যায়—এমনি ভাবে জোরে বলে উঠলো—"ঘণ্টা খানেক পরেই ঝিকে পাঠিও মা! ওঁকে খাইয়েই ফিরে আস্‌ছি।"

ঘণ্টা দুই পরে অনি ফিরে এলো। এসেই মুখ হাত ধুয়ে "শীগ্‌গির খেতে দাও মা, উঃ, যে ক্ষিদে"—বলে শুয়েই পড়্‌লো প্রায়। খুড়িমা গজ্‌গজ্‌ করতে করতে খাবার দিতেই শুয়ে শুয়েই সে খেতে লাগ্‌লো। আমি কেবল তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম! খুড়িমা বলে উঠ্‌লেন "এইবারে এ দেবসেবায় ইতি দাও—বুঝেছ গো সেবাব্রতা? লজ্জা করছে না, ঘেন্না হচ্চে না তোর?" "ঘেন্না হবে? কেন?" খেতে খেতে অনি উত্তর কর্‌লো। "কেন?" "তা না তো কি! দেবসেবা না হোক্ নরসেবা তো বটে।" "খিশ্চানের সেবা! পেত্‌নির সেবা!" "আহা কেন মিছে বক ঠাকুমা,—আজ দুদিন পা টিপে দিতে পাই নি,—সন্ধ্যে করা হয়েছে—এইবার ছুঁতে পারি তো? চল তোমার পদসেবার ছলে তোমার বিছানায় গড়িয়ে নিইগে ঠাকুমা!"

খুড়িমা যত রেগে রেগে ওঠেন। অনি এমনি করে সব উড়িয়ে দেয়। শেষে তিনি তাকে আঁটতে না পেরে, উঠে যেতেই, অনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি একটিও কথা কইতে পার্‌ছি না—অনি বুঝেছিল। প্রথমটা সহজ সুরে বল্লে "মা, ঠাকুমা আর তোমার ফলটল আনানো আছে? এ দু' তিন দিন আমি তো কিছুই খোঁজ রাখি নি। কাপড় ছেড়ে এসে ঠাকুমার জলখাবার জোগাড় কর্‌ছি, তুমি সন্ধ্যা সেরে নাও।" তবুও আমি উত্তর দিতে পারি না দেখে তখন আমার কাছে বসে পড়ে অনুনয়ের সুরে অনি বল্‌লো—"মা, তুমিও ঠাকুমার মত অবুঝ হয়ো না। এসব মানুষের কোথায় মনে আসে? যেখানে কোন সম্বন্ধ থাকে? একটা মানুষ আমার সামনে পড়ে মারা যাচ্ছিল—আমার হাত দিয়ে ভগবান তাকে বাঁচিয়েছেন! সে রোগী বিকারের ঘোরে আমার একটু সেবা চাচ্ছে—আমি সেটুকু দিতে তাকে বাধ্য। সকালে বিকেলে এই রকম আরও দু চারদিন আমায় যেতে হবে। এর জন্ত কেন মন খারাপ কর্‌তে হবে? ছিঃ!"

বিরহী শিব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

একটু পরে বল্লাম—"অনি, তুই এ কথা বল্‌তে পারিস্—কিন্তু আমি যে পার্‌ছি না।" "ওকথা বলো না মা, শুন্‌তেও আমার কষ্ট হবে। আর ওদের ঝিটি মাঝে মাঝে আস্‌বে। যদি আমাদের পরিচয় টের পায়, সেই হবে বড় লজ্জার কথা! মন থেকে ও-কথাটি এতদিনে কেন মুছ্‌তে পার নি মা? ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? ভুলে গেছ কি সব? যাক্—আমি দিনকতক গিন্নিকে না দেখ্‌লে অমনুষ্যত্ব হবে মা। বিশেষ সত্যিই উনি আমার হাতে ছাড়া খাচ্ছেন না।" "অনি—অনি! অথচ ওই যে তোর শনি? ওই যে—ভগবানের এ কি খেলা!" "তাই-ই না হয় মনে কর মা! উনি একটা নিরপরাধ প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন—ভগবান তাই এইটা ঘটিয়েছেন। শুধু তাই না। সেই বৌ নিয়েও ওঁর সুখ নেই। ছেলে-বৌর ওপর রাগ করেই উনি এভাবে একা তীর্থবাস করছেন! প্রায়শ্চিত্ত মনে কর তো অনেকটা তাঁর হয়েছে বৈ কি। তবে আমাদের এ সব কিছুই মনে না করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব মা।" আমি থাকতে পার্‌লাম না—"এইটুকু-মাত্র ওর প্রায়শ্চিত্ত অনি? কখনই নয়! একটা জীবনকে শুধু যন্ত্রণা দিয়েছে মাত্র ও? একেবারে নিষ্ফল করে হত্যা করে দিয়েছে যে! অকারণে শিশুর মত নির্দ্দোষ প্রাণকে হত্যা করার পাপের ওর এইমাত্র প্রায়শ্চিত্ত?"

"একেবারে অজ্ঞান, একেবারে শিক্ষাহীন আমাদের দেশের মেয়েরা মা! তাই তাদের দ্বারা এ-রকম ঘটে! তাদের এ জ্ঞানের অভাব আমাদেরই কলঙ্কের কথা মা! এর কুফলের অংশ এমনি করেই আমাদের কারও ভাগ্যে পড়ায় তাকে তা বহন করতে হচ্ছে। জীবন বিফল কি বলছ? ভগবানের করুণা থাকলে মানুষের শত অত্যাচারেও সে জীবনের সার্থকতা কেউ নষ্ট করতে পারে না। ওঠ মা তুমি, আমরা মানুষের মত হই যেন। এ আলোচনা আর না।"

দু' তিন দিন পরেই শুন্‌লাম, গিন্নি এ যাত্রা বেঁচে গেল। তার ছেলে বৌ তখন বোধ হয় দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত,—মতলব, অনি তার মার কাছে থেকে তাকে দেখে-শুনে। তারা শুনেছে—অনি ইস্কুলে পড়ায়। নিশ্চয় আমাদের অভাব আছে—অতএব এমন স্থলে এ কথাটা পাড়া শক্ত কি? আমাদের সমাজের এমনি ধারণা, এমনি শিক্ষাদীক্ষা। তাই এক দিন—অনি তখন ইস্কুলে—গিন্নির ছেলে সেই—কি বল্‌ব, তার নাম ধর্‌তেও ইচ্ছে করে না যে—এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে অনির তো শত সুখ্যাতি,—"তিনি দেবী, নৈলে নিজের প্রাণের পর্য্যন্ত আশঙ্কা না রেখে এমন করে পরকে বাঁচান্। আর তাঁর সেবারই কি সুন্দর ক্ষমতা—কোন নার্সকেও এমন সেবা করতে দেখি নি। আমার মা যে তাঁর 'অন্নপূর্ণা' নাম দিয়েছেন—এ একেবারে জলন্ত সত্য! আমার মা, যিনি নিজের ছেলে-বৌর হাতেও আচারের জন্যে জলগ্রহণ করতে চান্ না, সেই মা ওঁর হাতের পথ্য ভিন্ন কিছু মুখে করছেন না—এমনি দেবীর মতই পবিত্র ওঁর চেহারা। সেই জন্যই বল্‌ছিলাম কি এত দয়া যখন আপনারা করেছেন"—ইত্যাদি অনর্গল যখন বলে চলেছে,—আমি তো ঘরের ভেতরে কাঠের মত হ'য়েই অনির জীবনের পরম দুর্ভাগ্যের মুখে এই সব কথা শুনে যাচ্চি—কিন্তু খুড়িমা আর সইতে পার্‌লেন না! সাপের মত ফণা তুলে বলে উঠ্‌লেন "কি বলছ তুমি নরেশ? কাকে এ কথা বল্‌ছ? তার ইস্কুলের কাজে দুমাস ছুটি নিয়ে তোমার মাকে দেখ্‌বে,—আর সে ক্ষতি তুমি ডবল করে পুষিয়ে দেবে? তার ক্ষতি তোমরা পুষিয়ে দিতে পারবে? এমন ক্ষমতা আছে কি তোমাদের? জানো সে কে? কে তোমার মাকে সেদিন বাঁচিয়েছে? তারপর পরিচয় জেনেও সত্যিই দেবতার মতই কর্ত্তব্যই সে করে যাচ্চে? কোন দেবতাও কি এমন করে তার পরম শত্রুকে দেখ্‌তে পেরেছে? কোন পুরাণ-ইতিহাসেও এমন কথা নেই বোধ হয়। তাকেই তুমি পারিশ্রমিক দিয়ে মাইনে দিয়ে তোমার মার সেবা করাতে চাও? জানো সে কে?"

আমি তো একেবারে জমে যেন পাথর হয়ে গেলাম। খুড়িমা কর্‌লেন কি! অনির এ কি লজ্জা ঘটালেন তিনি? নরেশ কিন্তু একেবারে যেন স্তম্ভিত হয়েই তাঁর কথাগুলো শুনে গেল। তার পরে খুব ব্যগ্রভাবে বারে বারে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল—"কে তিনি? বলুন কে তিনি?" খুড়িমা দ্বিগুণ গর্জ্জন করে বলে উঠ্‌লেন—"কে তিনি? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর গে যাও! জগতে সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ কারও যদি তোমরা মায়ে-বে . ক'রে থাক, তো তার কথা মনে ক'রে দেখগে। যাও, তুমি শীগ্‌গির চলে যাও, অনির আস্‌বার সময় হয়েছে। তোমাদের পরিচয় দেওয়া হ'য়ে গেছে—সে এ কথা শুন্‌লে হয় ত এখনি আমাদের

কাশীবাসের শান্তিটুকুও ঘুচে যাবে। যা হয়েছে—এত দিন অজানতে যা করেছ, করেছ—এখন তো জানলে—অনি কে! এখন যাও, আর এসো না।"

নরেশ তো নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। খানিক পরেই অনি এলো। আমি চাপ্‌তে পার্‌লাম না, বলে ফেল্লাম সব কথা। সে শুনে খানিক চুপ ক'রে থাক্‌লো মাত্র, বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করলে না। তারপরে একটু জিরিয়েই সংসারের কাজে লেগে পড়্‌লো—যেন কিছুই হয় নি। আমি মা—আমারই আশ্চর্য্য লাগ্‌ছিলো তার অম্লান পরিবর্ত্তনহীন মুখের ভাব দেখে।

দিন দুই পরে—অনি তখন ইস্কুল থেকে এসে মুখ-হাত ধুচ্চে,—দেখি, নরেশ এসে একেবারে খুড়িমার পায়ের কাছে আছ্‌ড়েই পড়্‌লো—"আমাদের মত কাজ আমরা করেছি! এখন আপনাদের মত কাজ আপনারা করুন। কাল মা আমার কাছে এই কথা শোনার পর থেকে সেই যে দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে অছেন—কেউ একবিন্দু জলও খাওয়াতে পারছি না। এই সবে ভাল হয়ে উঠ্‌ছেন—এই চব্বিশ ঘণ্টার অনাহারে কতক্ষণ বাঁচ্‌বেন! আমায় মাতৃহত্যার পাপ থেকে বাঁচান্।" খুড়িমা তাকে দেখে আবার চটে উঠে বল্লেন—"তোমার এ কথা বল্‌তে লজ্জা কর্‌ছে না?" সে আবার বল্লে—"না। তবে আমায় পাপ থেকে বাঁচান—এ কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। আপনারা যে প্রাণী এক-বার বাঁচিয়েছেন, তাকে আবারও বাঁচান্—এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।" খুড়িমা তখন একটু নরম হ'য়ে বল্লেন —"এ কথা তুমি তাকে বল্‌তে গেলে কেন?" "ইচ্ছে করে বলি নি—তাঁর জিদে বাধ্য হয়েই বল্‌তে হয়েছে। তিনি—"

এই সময়ে অনি তাকে আর কথা কইতে না দিয়ে বলে উঠ্‌লো "আপনি যান্,—আমরা যাচ্চি একটু পরে।" নরেশ তো মাথা গুঁজে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে চলে গেলো। আর আমরা আবারও একটু অবাক্‌ই হলাম। সত্যই কি অনি জীবন থেকে ওদের কথা এমনি ক'রে মুছে ফেল্‌তে পেরেছে? নরেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ-বোধটাও কি তার মনে আসে না একবার? সে তো মাথায় কাপড়ও তুল্‌লো না,—একটু সঙ্কোচ কি বেদনার একটু আভাসও তো তার মুখে বা ব্যবহারে প্রকাশ পেল না? অথচ আমাদের এই হিন্দু ধর্ম্মের বিয়ে—এ তো 'নয়' ব'ল্লেই 'না' হয়ে কিছুতেই তো যায় না! সমাজে আইনে কোথাও তো এর ছেদ নেই,—ধর্ম্মে তো নেই-ই! আমরা রাগ ক'রে স্বীকার না কর্‌লেও,—নরেশ তো অনির স্বামী,—এর তো নড়চড় নেই, অনি কি তা জানে না? তবে সে এমন উদাসীন হ'ল কি করে? সত্যি দিদি, আমি যেন এতেও সুখী হচ্ছিলাম না। অনিকে একটু বিষণ্ণ বা বিমনা দেখ্‌লেই যেন ব্যাপারটা সঙ্গত বলে আমার মনে হ'ত! তার এ অস্বাভাবিক ভাব আমারও কোথায় যেন বাধ্‌ছিল। যে মেয়েকে আমার মায়ের মনও আদর্শ মেয়ে বলে বুকে ধরে, সেই বুকে যেন কোথায় কি বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। অনি ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে, খুড়িমা রেগে উঠে গিয়ে তাঁর আহ্নিকের আসনে বস্‌লেন। "ঝির সঙ্গে কি গেলে কি ভাল দেখাবে মা?" আমি নিঃশব্দে তার সঙ্গে বেরুচ্ছি—দেখি, খুড়িমা তখন মুখ ভার করে উঠে চাদর গায়ে দিলেন। আমিও বেঁচে গিয়ে ঘরে এসে ঢুক্‌লাম।

ঘণ্টা খানেক পরেই দুজনে ফিরে এসে নিজের নিজের যায়গায় ঢুকলো। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তেও ভাল লাগ্‌ছিলো না; কিন্তু খুড়িমা যেন হজম কর্‌তে পাচ্ছিলেন না। নিজেই খানিক খানিক ক'রে বলে যেতে লাগলেন "কি কাণ্ড—ওঃ! সত্যি মাগী যেন মর্‌বে বলে সঙ্কল্প করেছে! কিছুতেই খাবে না, অনিও ছাড়্‌বে না! বলে—'তাহ'লে ডাক্তার আর নার্স আনিয়ে জোর ক'রে নল্ দিয়ে আপনাকে খাওয়াবো। কিছুতেই আপনি আত্মহত্যা কর্‌তে পাবেন না।' এই যে তখন মাগীর কান্না! 'কেন মা আমায় বাঁচাচ্ছো? আমি যে তোমার পরম শত্রুরও বেশী! ভগবান তোমারি হাতে আমায় এমনি ক'রে বাঁচিয়ে শেষ প্রায়শ্চিত্তও করাচ্ছেন! তোমাকে তাড়িয়ে নতুন বৌ ঘরে এনে, সে পাপের ফলও হাতে হাতে ফলেছে। পাঁচ বছর না যেতে স্বামী গেল,সোণার প্রতিমা মেয়ে বিধবা হল—বছর না ঘুর্‌তে সেও গেল। তার পরে, এই বারো বছরের মধ্যে, সাজানো ঘরকন্না, ছেলে, বৌ, নাতি, নাতনি—সব থাকতেও অনাথার মত কাশীতে পড়ে আছি। সেই ছেলে পর হ'য়ে গিয়েছে। শেষে, যার আমি সর্ব্বনাশ করেছি, সেই তুমিই কি না কাশীতে অন্নপূর্ণা হয়ে আমারই জন্যে বসেছিলে? এ মুখ আমি আর কারুকে দেখাব না মা,—আমায় কেন খেতে জোর কর্‌ছ? বিশ্বনাথ কেন আমার ক্ষমা করালেন? কেন

আমি সেই সিঁড়ি থেকেই পতিত-উদ্ধারিণী মা গঙ্গার কোলে লুকুতে পেলাম না? তোমার কাছে—তোমার মা-ঠাকুমার কাছে—আমায় মুখ দেখাতে হ'ল?' মাগী যত কাঁদে, আমি তত মনে মনে বলি, বৌমা—'বেশ হয়েছে! তোমার এটুকুও বিশ্বনাথ করবেন না? এ তো লঘু দণ্ডই হয়েছে।' কিন্তু অনি তাকে কি বলতেই দেয়? বল্লে 'হয় আপনি খান, নয় আমি নার্স আর ডাক্তার আনতে পাঠাই!' মাগী তখন আর কি করে—ঐ-সব ব'লে ব'লে কাঁদে, আর ঢক্ ঢক্ ক'রে অনির হাতে দুধ খায়! জল খায়! অনি তার এত কথায় না রাম না গঙ্গা একটী উত্তরও দিলে না,—যেমন খাওয়া শেষ হল, আর অমনি উঠে বললো 'আমি সমস্ত দিন মেয়ে ইস্কুলে পড়াই, সময় আমার বড্ড কম। আপনি যদি নিজে না খান্, তাহলে রোজ আমায় ইস্কুল থেকে ফিরে কি ইস্কুল যাবার আগে এমনি ক'রে এসে আপনাকে খাইয়ে যেতে হবে। এতে আপনারও কষ্ট, আমারও কষ্ট! এ-রকম আর করবেন না দয়া করে, বুঝলেন? আমি এখন আসি।' এই বলে অনি মাগীর হাউ হাউ কান্নার মধ্যেই উঠে এসে আমায় বল্লে 'চল ঠাকুমা।' আর জানো বৌমা—বাড়ীতে তার ছেলে কি বৌ কাউকে দেখতে পেলাম না। ঝি চাকর সবাই জেনেছে দেখ্‌ছি। বুড়ো ঝিটা হাত দিয়ে ইসারা ক'রে দেখালে—বৌ ঐ ঘরে দুয়োর বন্ধ করে আছে সমস্ত দিন না কি। মাগী ইসারা ক'রে আরও কি বললে বুঝতে পারলাম না ঠিক,—বরের সঙ্গে রাগারাগি কাঁদাকাটিও চলছে বুঝি—"

আমি আর সইতে পারলাম না—"চুপ করুন খুড়িমা, অনি শুনতে পেলে রাগ করবে।" বলে তাঁকে বাধা দিলেও, তিনি আরও একটু না বলে উপসংহার করলেন না—"মানুষ এমন অমনিষ্যিও হয়! তা যেমন সংসারে পড়েছে! এই নিয়েও তোর হিংসা করতে লজ্জা করলে না? আমরা বেরিয়ে চলে আসছি—তখন দেখি, তোমার জামাই বাড়ী ঢুকছে।" আমার জামাই! খুড়িমা এ কি বলছেন? অনি সম্বন্ধ স্বীকার করছে না ব'লে মনে লাগছিলো; কিন্তু খুড়িমার এ কথাটা কাণে তপ্ত শূলের মত বিঁধবামাত্র, অনির কথাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন অনুভব করতে পারলাম।

যাক্—মাস খানেক্ আমাদের আবার নিরুপদ্রবেই কাটলো। আকস্মিকের এই অশান্তিকর ঘটনাকে আবার আমরা আস্তে আস্তে ভুলতে আরম্ভ করেছি—এমন সময়ে মনে আছে, একটা রবিবারে একখানা পাল্কী এসে আমাদের দুয়ারে থামলো। তার মধ্য হ'তে নরেশের মা একটী ঝিয়ের কাঁধে ভর দিয়ে নামলেন। আমরা কি যে করব, ভেবে পাই না। বাড়ীতে যে মানুষ এসেছে, তার সঙ্গে অমানুষের ব্যবহারও করা যায় না। আবার কি ক'রে যে তাকে আগ্রহ করে হাত ধরে এনে বসাই—সে যেন মহা সমস্যাই হ'ল আমাদের। তবুও তা করতেই হ'ল; কেন না, মানুষটা ঝির কাঁধে ভর দিয়েও টলছিলো। তখনো সে যে সম্পূর্ণ সবল হয় নি, তা বেশ বুঝা গেলো। কিন্তু যার জন্য তার সঙ্গে আমার এ সম্পর্ক—সে'ই সব সমস্যার সমাধান ক'রে দিলে। অনি তাকে 'আসুন' বলে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে আসন পেতে বসালো।

"এখনো সম্পূর্ণ সারেন নি দেখ্‌ছি, এখনি কেন বেরিয়েছেন" বলে তাকে অনুযোগ করতেই, অনির হাত ধরে মাগীর যে কান্না, সে একেবারে পাগলের মতই। অনেক করে অনি তাকে থামাতে লাগলো। আর আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলাম যে, একটী পথের পথিক এমন ক'রে কাঁদলে অনির চোখে জল ধরতো না—আর এই মানুষটার এত কান্নায়ও যে পাষাণ মেয়ের চোখে এক-ফোঁটা জলও এল না? সত্যি কথা যদি বলি—আমাদেরও মুস্কিল লাগছিলো তার দুঃখে চোখে জল আসায়। তবু জল না এসে কি থাকে? সে যা'-ই করে থাক,—মানুষ তো? মানুষের কান্নাটা তো মিথ্যা নয়!

যাক্—তার পরে সে অনিকে একেবারে কোলে টেনে নিয়ে এই জেদ্ ধরলো—"মা আমার কাছে চল! আমি যা করেছি তার তো সব প্রায়শ্চিত্ত করা আর আমার হাতের মধ্যে নেই,—তবু আমার সেই মরা মেয়ে রাণী হয়ে তুমি আমার কোলে থাকবে চল। আমি নরেশকে আবার আনিয়ে আমার যত স্ত্রী-ধন সব লেখাপড়া করলাম তোমার নামে। কর্ত্তা আমায় পয়সার অভাব তো দিয়ে যান্ নি। তোমার মত দেবতা মেয়েকে যেমন আমি বধ করেছি, তেমনি ভগবান আমায় সাজা দিয়েছেন। এবার যাকে এনেছি, সে আমার উপযুক্ত বৌই এসেছে। আর সেই ছেলে কি না বৌয়ের পক্ষ হয়ে আমায় বলে—"এটাকেও

কি তেমনি করতে চাও না কি ? এবার আর তা হবে না।" সেই রাগে আমি আমার সোণার রাজত্ব ফেলে একা কাশীতে এসে আছি। আজ আমার মনে হচ্ছে ছেলে কিছু অন্যায় কথা বলে নি। যখন এ বৌর সঙ্গেও বনলো না, তখন এবার আমারই সরা উচিত বৈ কি। তোমাকে এমন করার দুঃখ ছেলের মনে নিশ্চয়ই আছে,—নৈলে ও-কথা বলবে কেন। উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে—মাথার ওপরে আমাদের মত ডাকাত মা বাপ,—তাই বোধ হয় ভয়ে ভয়ে আবার বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। এখন আমার মনে পড়ছে—সে বিয়ের সময় ছেলের একটুও ফুর্ত্তি দেখি নি। কিন্তু তখন—রাক্ষুসী আমি তাকে চেয়েও দেখেছিলাম! এখন আমি ডাকতেই ছুটে এসে হাসিমুখে সব ঠিক্ করে দিলে! সঙ্গের পুরোনো চাকরটার মুখে শুনলাম—বৌ এটুকুতেও না কি—"

রেলের মতই গিন্নির কথার আর এতক্ষণ শেষ হচ্ছিল না, —এইবার গলার স্বরের একটু মন্দা প'ড়ে আসতেই আমি এতক্ষণে কথা ক'য়ে বললাম "আপনি এ-সব এখন আর কেন করছেন ? আমার মেয়েকে আপনারা চেনেন্ না। সে মানুষের কর্ত্তব্যটুকুই মাত্র করেছে,—আপনার বিষয়ের জন্যও নয়,—কিম্বা আপনারা বলেও নয়! আপনাকে সে চিনতোও না। একটা পথের পথিক এমন অবস্থায় পড়লে সে যা করতো তাহাই মাত্র করেছে।"

গিন্নি আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে "তা কি আমি বুঝি নি বেয়ান্, না, নরেশই বোঝে নি ? আমরাও কি ঐ হাড়হাবাতের মেয়ের মত ভাববো, যে, এ সব জেনেশুনে মন ভোলাবার জন্যই বৌমা করেছেন ? উড়ে এসে জুড়ে বসে সর্ব্বস্বের মালিক হয়েও তার এমনি হিংসুক আর নীচ স্বভাব। বৌমা যদি আমায় চিনতে পারতো তাহলে বোধ হয় আমায় তখন হাত দিয়েও ছুঁতো না, আমি জলে পড়েই মরতাম!"

খুড়িমা এ কথাও সইতে পারলেন না; বল্লেন, "তাও মনে ক'র না,--অনি তেমন ধাতের মেয়েও নয়। তাহলে কি তোমার পরিচয় জেনেও তোমার কাছে দু তিন দিন রাত কাটিয়ে তোমার ছেলেকে টেলিগ্রাম করিয়ে আনিয়ে তবে তোমার বিছানা থেকে ওঠে! একটা পরের জন্যও সে যা করতো, এখানেও তাই করেছে।"

"কিন্তু মা পরে তো তার এমন সর্ব্বনাশ করে নি, তাদের উপকার সে করতে পারে। কিন্তু আমি যে তার পরম শত্রু। আমায় কেন সে তখনি ফেলে রেখে উঠে এল না ? কেন আমার ছেলেকে খবর দিয়ে, সেবা-যত্নের সব ব্যবস্থা করে তবে এলো ? কেন আমায় অনাথার মত মরতে দিল না ? আমি এখন তো আর ছাড়্ব না তাকে, আমার কাছে তাকে থাকতেই হবে।"

অনি মাথা হেঁট করে একভাবেই চুপ করে বসে ছিল,—আমিও তার এখনকার মনের ভাব বুঝতে পারছিলাম না; তবু নিজের আত্মমর্য্যাদাতেই আমি বললাম "তা আর সম্ভব নয়।"

"তুমিও এ কথা বলো না বেয়ান্! আমার রাণী চলে গিয়েছে, আমার এখন আর কেউ নেই। আমায় অনাথ বলে দয়া কর।" বলতে বলতে মাগী আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। আমারও আর তখন বাক্ সরলো না। মনে হল, দুঃখের আগুনে খাদ পুড়ে গিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব এমনি করেই সোণার মত খাঁটি হয়। অনি কিন্তু এক ভাবেই চুপ ক'রে মাথা হেঁট করে রইলো। শেষে গিন্নি একটু সামলে নিতে, বললে "আপনি আজ বাড়ী যান। আমার যা বলবার আছে কাল বলব।"

গিন্নি যেন একটু খুসি হ'য়ে বললো "কাল বলবে কি মা, কাল আমি তোমায় কোলে করে নিয়ে যাব। বেয়ান্—মা, আপনারাও আমার ওপর একটু দয়া করবেন। আর বেশী কি বলব—বলবার আমার মুখ কোথায়!" আর বেশী উত্তেজনা সে বেচারা বোধ হয় সইতেও পারছিলো না। উঠে পড়ে আমাদের আড়ালে ডেকে বললে "কাল নরেশই এসে নিয়ে যাবে। আপনারা আগে থাকতে কিছু বলবেন না যেন বৌমাকে!"

কি আর বলব! একবার ভাবছিলাম, অনিকে বলি, আমার মনে হচ্ছিল দুই বিয়ে তো আমাদের ধর্ম্মেও অচল নয়। যদি ওরা এমনি ধরপাকড় ক'রে অনিকে খানিকটা সংসারী করে করুক! আমরা কি চিরদিনই বেঁচে থাকব ?

পরদিন সকালে অনেকটা বেলা হ'তেও অনি ঘর থেকে বেরুচ্ছে না দেখে ডাকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি নরেশ! আর আমায় অনিকে ঘর থেকে ডাকতে যেতে হ'ল না। অনি আপনিই ঘর থেকে বেরিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো! এ কে ? এই কি আমার অনি ? একেবারে খালি হাত—

চুড়ি ক'গাছাও হাতে নেই! থান-পরা, মায় চুলগুলো পর্য্যন্ত ছেঁটে ফেলেছে। আমি "অনি এ কি রে?' ব'লে চেঁচিয়েই প্রায় কেঁদে উঠ্‌লাম। অনি এসে আমার মুখে হাত দিয়ে বললে "ছি মা, চুপ্ কর, এখনি লোক জমে যাবে। যে দিন ওঁরা আমার লোহাগাছি পর্য্যন্ত খুলে নিয়েছিলেন, সেই দিনই আমার এই রকম বেশ করা উচিত ছিল, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল আমি কুমারী। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি—না, আমি বিধবা!" তার পরে নরেশের দিকে অকুণ্ঠিত মুখে চেয়ে বললে "আপনি গিয়ে আপনার মাকে বলুনগে। তিনি যেন বৃথা দুঃখ আর না করেন।" নরেশ একটা কথাও না ক'য়ে, খানিকক্ষণ ধরে অনির সেই বিধবার চেহারার দিকে চেয়ে থেকে, শেষে তেমনি ভাবেই চলে গেল। আমি তো অনিরই মা—তবু আমার প্রাণের ভেতরও নরেশের সেই মুখটা কিছুদিন ধ'রে যেন কিছুতেই মুছছিলো না।

যাক্। আমার যে নতুন করে কতখানি যন্ত্রণা বাড়্‌লো, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝ্‌বে। অনি যে স্বামী থাক্‌তেও বিধবা—এ দৃশ্য পর্য্যন্ত সে নতুন ক'রে আমার চোখের ওপর ধর্‌লো। আমার কষ্ট দেখে সে জোড় হাত ক'রে বললো—"মা, আমায় মাপ কর। তোমায় আমি অনুপায় হ'য়েই এ কষ্ট দিলাম। এ-ছাড়া এ অসম্মান আর অন্যায়ের হাত হ'তে আমার বাঁচার অন্য পথ দেখ্‌ছি না।" আমি একটু প্রতিবাদ করতে গেলাম। অমনি মেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লে "অন্যায় নয়? তাদের বৌয়ের কথা যেটুকু শুন্‌লে, বুঝ্‌লে না তাতে? আর এ তো অসম্ভব নয়, তার মনে এ তো হবারই কথা। আর আমার কি তোমাদের অন্যায় ও অসম্মান এতে তো আগাগোড়াই মা!"

আর আমি কিছু বল্‌লাম না; কিন্তু তবুও তারা নিবৃত্ত হল না। নরেশ আর এলো না বটে, কিন্তু তার মা তবুও হাল্ ছাড়্‌তে চায় না। বিরক্ত হ'য়ে তখন অনি বল্‌লে—"ভেবেছিলাম, যে মেয়ে বিধবার সাজ পরেছে, তাকে আর জীয়ন্ত ছেলের বৌ ভাবতে ওঁর সাহস হবে না। কিন্তু উনি তাঁর সেই বিধবা মেয়ে রাণীর অনুকল্পের ইচ্ছা তবুও এখনো ছাড়্‌তে পারছেন না। মা, আমায় কাশী থেকে যেতে হলো তাহলে—অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও। আমি কাকা কাকিমার কাছে যাই—উনি তাহলেই এইবার ঠাণ্ডা হবেন।"

অনিকে ছেড়ে কাশীবাস আমাদের সাধ্য হল না। তিনজনেই দেশে চলে এলাম। কত যে কাঁদলে অনির জন্য পাড়ার লোকেরা—অনিও তাদের জন্য চোখের জল ফেল্‌ছে! আমি আশ্চর্য্য হয়েই তার সে চোখের জল দেখ্‌ছিলাম। এই তো অনির মধ্যে সবই আছে,—কেবল ওদের সম্পর্কেই সে এমন পাথর কি করে হল? আমার এমন মমতাময়ী মেয়ের এমন জীবনের প্রধান দিক্‌টাই এমন ক'রে শুকিয়ে কে দিলে? মানুষেই তো করল! মানুষে শুধু তার অকারণ হিংসাবৃত্তির উত্তেজনায়ই তো এই কাণ্ডটা করেছে! শ্বাশুড়ী যে বৌকে দেখ্‌তে পারে না, এর কারণ কি সেই বৌই এক দিন শ্বাশুড়ীর আসনের অধিকারিণী হবে বলে? কিম্বা তার প্রিয়তম পুত্রের সব চেয়ে সে প্রিয় হচ্চে বলে সেই হিংসায়? আবার অনেক স্থলে বৌ যে ক্ষমতা পেলেই শ্বাশুড়ীর প্রতি বিদ্বিষ্টা হয়, সেও কি তার বর্ত্তমান পদের তিনিই অতীত অধিকারিণী ছিলেন—এই ঈর্ষার বশে? কিন্তু এতে হিংসার কি আছে দিদি, তাই যে ভেবে পাই না! এই তো প্রাকৃতিক নিয়ম। পুরানো গাছ মরে যায়—নতুন চারা তার জায়গায় রাজত্ব করে। ওষধি গাছগুলো তো কেবল ফলের জন্যেই সৃষ্ট হয়। ছেলে মেয়ে বৌ এদের জীবন গঠন করা, তাদের আর সে সংসারের মূল যাঁরা—সেই অতীত কর্ত্তা বা কর্ত্রীর, শান্তির আর সুখের ব্যবস্থা করা—এরই তো নাম সংসার। এ অযথা হিংসা কেন শ্বাশুড়ীর মনে বা বৌয়ের মনে আসে দিদি? তবে নিজের ছেলেও নেই—বৌও হয় নি, আবার শ্বাশুড়ীও মায়ের বাড়া—সোণার শ্বাশুড়ী পেয়েছিলাম—তাই জগতের এ রহস্য আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

এর পরে জামাই অনিকে একখানা চিঠিও লিখেছিল দিদি। লিখেছিল যে, তোমার স্বামী মরে গিয়েছে,—তুমি বিধবা, কুমারী নও—এটুকু যখন স্বীকার করেছ, তখন সেই মরা স্বামীর সম্পর্কের অধিকারে মৃত শ্বাশুড়ীর স্বেচ্ছায়-দেওয়া ধনে তোমার চির-অধিকার রইলো। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ যখন তোমায় দেব, তখন তুমি এ সম্পত্তির অধিকার নিও। তোমার সেই মরা স্বামীই তোমায় এইটুকু মিনতি জানাচ্ছে।"

অনি এর একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না,—চিঠিখানা

পড়েই টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। তার কাকা পর্য্যন্ত এ নিয়ে তাকে দু এক কথা বল্‌লে অনি উত্তর দিলে, "কাকা, আপনিই না আমায় সতীর মেয়ে সতী হ'তে বলেছিলেন? সম্পূর্ণ পরের জিনিষে লোভ বা অধিকার নেওয়া কি ও-নামের সঙ্গে খাপ খায়? আপনিও ও-কথা আর আমায় বল্‌বেন না।"

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে ঘটাং করিয়া থামিতেই উভয়ে দেখিলেন, কামরা প্রায় জনশূন্য। আপন আপন পথে সকলেই চলিয়া গিয়াছে এবং বক্তৃ মহিলাটির নামিবার স্থানও একেবারে সম্মুখে। ট্রেণের গতি বিরামের সেই স্বল্প অবসরে তিনি জিনিষপত্র নামাইয়া নিজে নামিতে না নামিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইল কি না—শ্রোতৃ মহিলাটি এই পথের কাহিনীতে তাহার আভাষ না পাইয়া, বিমূঢ় ভাবে শুধু রেলপথের পার্শ্বস্থিত মাঠের মধ্যের দিগন্তে বিলীন পথের দিকেই চাহিয়া রহিলেন!

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর] দিদি

দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, স্থূলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সট্‌কার মাথায় অনির্ব্বাণ বাড়বানল,—সবই তাঁর ছিল। আর ছিল—তাস, পাশা, অহিফেন, আর সান্ধ্য মজ্‌লিস,—এই চতুর্ব্বেদ চর্চ্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন,—সাতসের দুধে দু'ভরি আফিং সুপক্ক হলে, তার সরখানি তিনি ভোগ লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্ষদদের মধ্যে অধিকারী-মত বণ্টন হ'ত।

ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল,—গো সেবা, দুগ্ধ প্রস্তুত আর কল্‌কে বদ্‌লে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল সেটি সে দুধ জ্বাল দিতে দিতেই সেরে রাখতো। কথাবার্ত্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত। চৌধুরী মশায় কখনো কখনো আন্দাজে বল্‌তেন—"নন্দা, ঝিমুচ্চিস বুঝি! খবরদার বেটা, গেরস্তোর দোর-গোড়ায় বসে ঝিমুলে অকল্যাণ হয় জাননা পাজি—দূর করে দেব।" নন্দা চোখ বুজেই বলতো—"আপনি দেখলেন কখন হুজুর!"

কথাটা ঠিক! শুনে চৌধুরী মশাই খুসাই হতেন। বড়-লোকের, বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়,—লোকসেনে লক্ষণ।—প্রজা-বেটারা চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে—বাঁধি ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়,—মতলব হাসিল করে নেয়। এটা ছিল তাঁর পিতৃ-বাক্য। চোখ চাওয়ার তরে রয়েছে ভস্মলোচনরা - নায়েব, গোমস্তা। যাক্।

চৌধুরী মশায়ের পেয়ারের নাতী ইন্দুভূষণ আজ বেজায় ব্যস্ত। সে লেখাপড়া ছেড়ে এখন লায়েক হয়েছে। এক-খানি নাটক লিখে ফেলেছে—"লক্ষ্মণের শক্তিশেল"। তার রিহার্সেলও চলেছে,—পূজায় নবমীতে অভিনয়। ইন্দু নিজেই ম্যানেজার আর লক্ষ্মণ—দুই। হনুমানের পাট সে খুব জমাটি করে লিখে ফেলেছে। সে বলে—কি করে যে এমন ফ্লো (Flow) বেরিয়ে গেছে, সে তা নিজেই জানে না। লেখক-দের নাকি ঝোঁকের মাথায় Feeling (ভাব) এসে ওরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অনেক ঘটিয়ে দেয়।

বীর রসের কথা এলে তার ধমনীগুলো একসঙ্গে ধড়্‌ফড়্ করতে থাকে, মনের ভাবগুলোকে ঠেলে বার করে দেয়। লেখাটা ভারি লাগ্‌মাফিক বেরিয়ে যাওয়ায় ইন্দুর মনে বড় একটা আপশোষও রয়ে গেছে—অমন পার্টটা সে নিজে নিতে পারলে না—কেবল হনুমান নামটার জন্যে। বাল্মীকি এত বড় কবি হয়ে একটা ভাল নামও খুঁজে পাননি!

নেপা হনুমানের পার্ট খুব উৎসাহে সখ করেই নিয়েছে,—করেও ভাল। তার ওপর সে ইস্কুলের খেলায় সে-বচর Long jump আর High jumpএ (লাফালাফিতে) পদক পুরস্কার পাওয়ায়—হনুমান সাজবার দাবীও তার এসে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে ইন্দুকে বড় বিচলিত করে দিয়েছে। নেপার বিধবা পিসি খড়দায় থাকেন; তাঁর সঙ্কট অসুখ শুনে নেপাকে সেথায় চলে যেতে হয়েছে। আবার—তাঁর শেষ না দেখে তার ফেরবারও জো নেই—হাবাতে মাগীর টাকা আছে। অভিনয়ের সবে আর সাতটি দিন বাকি,—এর মধ্যে কি মাগী সরবে! পাকা হাড়—খাসই টানতে পারে সাতদিন! আপদ দেখ না!

ইন্দু দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। পড়বারই কথা। উত্তরপাড়া একটি উন্নত সমাজ-যায়গা,—সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে অভিনয়। এখনো প্রহসনের প্লটই সে ঠিক্ করতে পারে নি—সেই চিন্তায় মাথা ভরে রয়েছে, তার ওপর নেপার পিসির এই ব্যবহার! তাই সে দলের মাতব্বরদের ডেকে পিসি-সঙ্কট হতে উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করবার জন্যে মিটিং কল্ (meeting call) করেছে।

২

চৌধুরী মশাই সপ্তাহকাল কস্ত করে, আজ মরিয়া হয়ে গা তুলে, নিকটস্থ জমিদারিতে দর্শন দিতে বেরিয়ে পড়েছেন—প্রজাদের কাছ থেকে পূজার পার্ব্বনী আদায়ের জন্যে।

ফিরতে—সন্ধ্যার পূর্ব্বে নয়। এই সুযোগ পেয়ে—মিটিংটা আজ তাঁর বৈঠকেই বসেছে;—প্রধান উদ্দেশ্য,—নেপার একজন ডুপ্‌লিকেট্‌ (duplicate) ঠিক্‌ করে ফেলা, যে, নেপার অনুপস্থিতিতে তার পার্ট যোগ্যতার সহিত করতে প্যারে। ভুবন পারে,—অন্তরায় কেবল ওই হনুমান নামটি।

নেপা সম্বন্ধে সন্দেহের কথা আলোচনার পর, সকলে একবাক্যে বললে—"ডুপ্‌লিকেট নিশ্চয়ই চাই।"

ইন্দু বললে—"চাই তো বটেই, কিন্তু ও-পার্ট করবার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে! বইখানির মধ্যে ওই পার্টটিই আমার প্রাণ ঢেলে লেখা, কারণ হনুমানের মত অমন ভক্ত, অতবড় বীর, আর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রেতায় কেউ জন্মাননি। মহাপুরুষের কৃপায় লেখাটাও বেরিয়ে গেছে তেমনি। নেপা সাগ্রহে লুফে নিলে, তাই তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারিনি। অবশ্য সে করেও মন্দ নয়। কিন্তু ও-পার্ট যখন অর্দ্ধেক লেখা হয়েছে, তখন থেকে আমার নজর ছিল ভুবনের ওপর। আমাদের মধ্যে ও-ই ছাত্রবৃত্তি পাস, আবৃত্তি করেও তেমনি, কারণ তার সঙ্গে অর্থবোধ থাকে কি না—পাখীর মত মুখস্থ বলা তো নয়। কিন্তু নেপাকে তখন ক্ষুণ্ণ করতে পারলুম না। এ-কথা সতীশকে privately (গোপনে) বলেও ছিলুম—মনে নেই সতীশ?

সতীশ বললে—"মনে খুবই আছে, আমি তখুনি তোমাকে বলেছিলুম—এটা তোমার দুর্ব্বলতা।"

"কি কোরব ভাই, আমাকে তোমরা ম্যানেজার করেছ,—সব দিক দেখতে হয়। ভুবন কিছু মনে করে তো—সামান্য ইঙ্গিতেই কারণটা সে বুঝতে পারবে। দেখলে না—তাই তাকে অন্য কোনো ছোটো পার্ট দিতেই পারলুম না, promptingএ রাখতে হ'ল, কারণ promptingএর ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আর ওর মত' motion দিয়ে accent ঠিক করে (ঝোঁক দিয়ে সরু মোটা খেলিয়ে) prompt করতে পারতই বা কে?"

নরেশ বললে—"কথা যখন ফাঁশ্‌ হয়েই গেল—আজ তবে বলি—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কম মতভেদ হয়নি;—সকলেরি ইচ্ছা ভুবন ও-পার্টটি করে, তা হলে একাই মাৎ করে দেবে, আমাদের actingএর দোষটোস্‌ সব ঢাকা পড়ে যাবে। ইন্দুর লেখাটা ভুবন একাই সার্থক করে দেবে। কিন্তু ইন্দু যখন হাতজোড় করে বললে—"চক্ষু-লজ্জায় ভুলটা যখন হয়ে গেছে ভাই—এবারটি মাপ করো—দ্বিতীয় opening থেকে ও-পার্ট ভুবনেরই রইলো। এখন change করতে গেলেই একটা মনোমালিন্য ঘটাই সম্ভব।" কথাটাও ঠিক্‌। নেপা যে রকম মেতে রয়েছে, ও আর এ দিক মাড়াতো না। তাই আমরা চেপে গেলুম। যাক্‌—এখন দেখছতো বাবা—দশের ইচ্ছা কি বিফল হয়,—হুঁ হুঁ—যাদৃশী ভাবনা যস্য—"

শরৎ বললে—"আর ও-সব দুশ্চিন্তা কেন বাবা,—পিসি তো পথ করে দিয়েছে, এখন তিনি গুটি গুটি দশমীতে চোখ বুজুন, আর নেপা টাকার তোড়া নিয়ে এসে জোড়া পাঁটা ঝেড়ে আমাদের Garden party দিক,—এই প্রার্থনা করি। ভুবন—লেগে যাও ভাই,—তোমার তো সব পার্টই খাড়া মুখস্থ। আমাদের তো memory নয়—সব শাক্তিগড়! বাংলায় বাপের নামটাও মনে রাখতে পারি না—পেছনে prompter চাই! যাক্‌—একেই বলে যোগ্য পাত্রে কন্যা দান। কি বল সব!"

সকলে সহাস্যে শরতের প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করলে। একটা আনন্দ-কলরোল পড়ে গেল। তিন পাক্‌ হুয়রে ঘুরে গেল! সকলের চক্ষু ভুবনের মুখের ওপর চম্‌কাতে লাগলো।

ভুবন হাতজোড় করে সবিনয়ে বললে—"আর যা বল, সব করতে রাজি আছি ভাই, কেবল ওই কাজটি ছাড়া। কারে পড়ে—নাপার্য্যমানে একজনের বদ্‌লী-খাটার বিড়ম্বনা আমায় দস্তুর-মত ভোগা হয়ে গেছে! মাপ্‌ করো দাদা,—ওতে আমি আর নেই।"

শুনে সকলে সহসা যেন চোট্‌ খেয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইলো। ইন্দু ব'সে পড়লো। শেষ—ক্ষুব্ধ রোষে বললে—"আমি এখনি 'হনুমান' নামটা কেটে 'মহাবীর' নাম বসিয়ে দিচ্ছি ভাই। যা হয়েছে হয়েছে, এই নাকে কাণে খৎ—রামায়ণ যদি আর ছুঁই। এবারটি মান রক্ষা করে দাও দাদা। ও-পার্ট আর কারুর দ্বারাই ঠিক্‌ ঠিক্‌ হবে না।"

"না ইন্দু, ও-কারণে নয় ভাই। আর নয়ই বা কেন,—গ্রামের যে-সব ছেলে তাদের কাছে তো চির-দিনই ওই নাম বাহাল থেকে যাবে। পরিবার থাকলে সেও মুখ পুড়িয়ে সত্যিকার হনুমান বানিয়ে দিতো। ছেলে থাকলে তার সঙ্গীরা তাকে মর্কট্‌ সাজাবার

দাবী রাখতো,—একপুরুষে মিট্‌তো না। যাক্—তার জন্যে বলছিনা। তোমরা তো জানো—পাশের গ্রামেই আমার মামার বাড়ী, সেইখানেই থাকতুম। সেখানেও সখের যাত্রার ভারি ধুম। দু'বচর আগেকার কথা,—তখন আমাদের রিহার্সেল্ খুব জোর চলেছে,—পালাটা "সীতা হরণ"। সীতা কি রাম লক্ষ্মণ সাজবার মত' চেহারা নয়,—গাইতেও পারি না, সুতরাং সেখানেও আমি ছিলুম "প্রম্‌টার্"। হরিদত্ত সাজবে হরিণ। অভিনয়ের দুদিন আগে—তার হ'ল জ্বর,—কথাটি তো সামান্য নয়—সে যেন রাজপুত্তুরের কলেরা। অবস্থা বুঝতেই পারছো,—সকলেই মহা চিন্তিত।

"ম্যানেজার এসে আমাকে ধরে বসলেন—"তোমাকে "স্বর্ণমৃগ" সাজতে হবে ভুবন।" কেউ আর তখন "হরিণ" বলে না,—সবাই শোনায় "স্বর্ণমৃগ"! অর্থাৎ—খুব সম্মানের পার্ট।

বললুম—"ও-পার্ট্, তো যে-সে একবার ওই সোণালী বসানো খোল্‌টায় ঢুকে করে আস্‌তে পারে, ওতে তো আর কথাবার্ত্তা নেই।"

সবাই চক্ষু কপালে তুলে গাঢ়স্বরে বলে উঠলো,—কি বলচো ভুবন! কথাবার্ত্তা নেই অথচ সে অভাবকে ভাবে ভরে দিতে হবে,—সে কি যার তার কাজ—না হরিদত্তর কাজ। তোমার ওপর তাই বরাবরই আমাদের নজর,—intelligent লোক না হলে ও-পার্ট্ ঠিক্ ঠিক্ করা কি তামাশার কথা। পারেন এক মুস্তফি সায়েব,—আর পার' তুমি,—এ তোমার সামনে বলা নয়।"

ম্যানেজার বললেন—"হরি দত্ত দশ টাকা ঝাড়্‌লে, বললে—তার পরিবার দেখতে আসবে, তাকে একটা কিছু সাজা চাই-ই। কি করি, চক্ষুলজ্জায়ও বটে, আর হারমোনিয়ামটা সারাবারও দরকার, তাই দিতে হয়েছিল।" ইত্যাদি।

"শেষ হরিদত্তর খোলোস্ আমার স্কন্ধেই চাপলো। বড়লোকের বাড়ী অভিনয়,—বনেদী ব্যবস্থা,—বিপুল আয়োজন। আলোয়, ছবিতে, ফুলের মালায় আসর হাসছে। সে পঞ্চবটী দেখলে রাজার ছেলেরও বনে যেতে সখ্ চাপে। আসরে—আতরদান, গোলাপপাস্, রূপোর থাল্ ভরা পান; ট্রে ভরা—বেদানা, মিছরির টুকরো, আদার কুচি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বচ প্রভৃতি, আর সুগন্ধ ছড়িয়ে সধূম চায়ের যাতায়াত, চামচের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ। এতদ্দ্বারা অভিনেতা আর গাইয়েরা গলা বজায় রাখবেন,—আর বাড়ীওলার সম্মান বজায় থাকবে।

"ব্যবস্থা সবই সুন্দর; সকলে গালে দিচ্ছেনও সুন্দর—অর্থাৎ মুটো মুটো—এস্তোক বনবাসী রাম লক্ষ্মণ সীতা,—মায় কন্‌সার্ট পার্টি! অসুন্দর কেবল হরিণের সে-দিকে নজর দেওয়াটা! এক টুকরো মিছরি, দুটি বেদানা, এক কুচি আদা, একটা পান কি এক চুমুক চা, তার ছোঁবার জো নেই, কারণ—সে যে হরিণ! আর intelligent হবার মানেই—স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা, সেটা কেবল হরিণকেই রাখতে হবে। কিছুতে হাত বাড়ালেই—সবাই—হাঁ হাঁ করে ওঠে! তার কাজ কেবল—ছোটা, লাফানো, হাঁপানো, শেষ তেউড়ে পঞ্চত্ব পাওয়া! হোলোও তাই। হরিদত্ত জ্বর হয়ে বাঁচলো,—আর নীরোগ জলজ্যান্তো আমি তার খোলে ঢুকে—সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে মলুম!" Intelligent পশু সাজায় সেলাম্ বাবা!"

হাসির হাউই ছুটে গেল। সবাই বললে—"Bravo ভুবন, এমন বর্ণনা আর কে শোনাতে পারতো! ও পার্ট ভাই তোমাকেই করতে হবে—তা না তো প্লে একদম্ মাটি,—তা লিখে রাখো।"

শেষটা দলের সকলের একান্ত অনুরোধে, আর ইন্দুর কাতর অনুনয়ে ভুবনকে রাজি হতে হল। ইন্দুর দুশ্চিন্তা দূর হল। হুররের্ হল্লায় সভাও ভঙ্গ হল।

৩

চৌধুরী মশাই আজ বেলাবেলি জমিদারি থেকে ফিরেছেন,—মেজাজ্ খুব খুস্। পার্ব্বনী আদায় হয়েছে পূজার খরচের দেড়া। তাই কাপড় না ছেড়েই সর্ব্বাগ্রে—প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম সেরে, বৈঠকে ঢুকেছেন। নন্দা সট্‌কা ধরিয়ে চট্‌কা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল।

ইন্দুভূষণ পাশের কামরায় বসে—প্রহসনের প্লট্ ভাবছে। মাথায় বোমা মেরেও কিছু পাচ্ছেনা। মাঝে আর পাঁচটি দিন মাত্র। পিসির পাল্লা পেরিয়ে শেষ প্রহসন যে মাথায় হুতাশন জেলে দিলে! অন্যমনস্কে পেন্‌সিলটে কামড়ে কামড়ে দাঁতনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্লটের কিন্তু পাত্তা লাগছেনা।

চৌধুরী মশায় আজ মেজাজ্ "সরিফ্"। ইন্দু তাঁর পেয়ারের নাতী। চৌধুরী মশার মেজাজ্ মশ্গুল থাকলে ইন্দুকে ডেকে কিছুক্ষণ রহস্যানন্দ উপভোগ করতেন। আজো তার ডাক্ পড়্লো।

ইন্দুকে উঠে আসতে হল,—কিন্তু বিরক্ত ভাবে।

চৌধুরী মশাই একবার মুখ তুলে চেয়েই—চোখ বুজে সহাস্যে বললেন—"বিকেল বেলা হাতে দাঁতন যে বড়,—রোজা রাখছিস নাকি!"

ইন্দু তাঁর কথাটা আগে বুঝতে পারেনি, পেনসিলটায় নজর পড়তেই বুঝলে। বললে—"আপনি যখন মুক্ত-কচ্ছ হয়েছেন, তখন আমাকে তো ধর্ম্মরক্ষা করতে হবে!"

চৌধুরী মশাই উপভোগের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভুলটা সেরে নিয়ে,—"জিত" বলেই বালিশের তলা থেকে একখানা দশটাকার নোট বার করে ইন্দুর হাতে দিলেন।

* * * *

তখনকার ন্যাসানাল থিয়েটারে "দুর্গেশনন্দিনীর" প্রথম অভিনয় রজনী। আয়োজনের অন্ত নেই। জগৎসিংহ নাকি ঘোড়ায় চড়ে appear হবে। গ্রামের দ্বালে দ্বালে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, বাগানের ফটকে ফটকে—বড় বড় অক্ষরে সোনার জলে ছাপা "পোষ্টার",—তাতে লেখা—

কে না জানে বঙ্গে রঙ্গে বঙ্কিম লেখনী,
কে না জানে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী
ইত্যাদি।

যাতায়াতের সময়, উঁচু নীচু গ্রাম্য পথে গাড়ি যতবার টক্কর খেয়েছে—ততবারই চৌধুরী মশাই—"খেলে কচু পোড়া" বলেছেন আর চেয়েছেন। সেই সময় ঝক্‌ঝকে হরপের "পোষ্টার"গুলোও এক একবার নজরে পড়েছে,—এক একটা কথা পড়েও ফেলেছেন, সবটা সাপ্টাতে পারেননি। তবে—আন্দাজে আর বুদ্ধির জোরে ব্যাপারটা সমঝে নিয়েছেন।

ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দুর্গেশনন্দী" লোকটা কে হে? দোকানটা কোথায়—বরানগরে বুঝি? বেজায় বেড়ে উঠেছে দেখছি। মেয়ের বিয়েতে সোনার জলে হেঁয়ালি ঝেড়েছে দেখলুম। তেল বেচে,—না? তা না তো এতো তেল!"

ইন্দু হেসে বললে—"নন্দী" কোথায় দেখলেন,—"দুর্গেশ নন্দিনী।"

"ঐ হোলো,—বাংলা বুঝিনারে শা—। না হয় দুগো-নন্দির মেয়ে,—এই তো?"

"না—না, ও একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা। অমন বই পড়েন'নি। তার একটু যদি দেখেন, নাওয়া খাওয়া ঘুরে যাবে,—সবটা না দেখে ছাড়তে পারবেন না, অবাক্ হয়ে যাবেন!"

"থাম্ থাম্—নন্দির মেয়ে দেখে ওঁর দাদামশার নাওয়া খাওয়া ঘুরে যাবে,—হ্যাংলার: মত অবাক্ হবে দেখবে! ইষ্টুপিড্। সে বটে "গোলে বকালী", আলবৎ—কেতাব বটে।"

"কি বলচেন দাদা মশাই,—বইখানা যুগান্তর এনে ফেলেছে।"

"অ্যাঁঃ—কলি প্রবেশ হয়ে গেছে তাহলে!"

"না দাদামশাই, অমন সুন্দর বই বাংলা ভাষায় আর বেরয়নি। পড়বার তরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।"

"বলিস্ কি! "মজনুর" চেয়েও ভাল?"

"কিসে আর কিসে! সে না দেখলে আপনি আইডিয়াই করতে পারবেন না। অমন একটি আয়েসা দুনিয়া ঢুঁড়ে বার করতে পারবেন না।"

"এটা কি মাস র‍্যা?"

"কেন?—আশ্বিন?"

"কাত্তিকটের আর বাতিক বৃদ্ধি করে মাথা খারাপ করিস নি। কটা দিন কোনো রকমে কাটিয়ে দে ভাই। অঘ্রাণের তেরোটা দিন বাদ দিয়ে তোর মুখ বন্ধ করছি রোশ্।"

"আপনি তো শুনবেন না! কি ঘটনা-বিন্যাস,—সে না শুনলে—"

"বটে! লেখকের বাড়ী কোথায়,—যাত্রার দল আছে বুঝি?"

"না—না,—মস্ত বিদ্বান, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বাড়ী কাঁটালপাড়ায়।"

"বলিস কি—ডেপুটি? ওঃ—বুঝেছি, আইন আকবরির তর্জ্জমা করেছে! যাঃ আর জ্যাঠামী করতে হবে না। আগে দেখ, শোন, শেখ।—ওই জামতাড়া, নারকেলডাঙ্গা,

ডুমুর-দ, বেলঘরে, বেলগেছে, কলাগেছে, কাঁটালপাড়া— ও সব জায়গায় লোক কলহরি ঠাকুরের ফলোয়ার (follower)—তারা আবার বই লিখবে! লিখলে,—আমলকী কি বয়ড়া বানিয়ে বসবে। আর কি ভারতচন্দ্র আছে,—এক কেতাবে খেতাব বেরিয়ে গেল ; বুঝলি।"

শেষ বললেন—"আচ্ছা—আজ সন্ধ্যের পর শোনাস্ দিকি,—সে সময় পাঁচজন পাকা সমঝদারও থাকবে, বোঝা যাবে কেমন কেতাব।"

"আপনি তো তখন ঢোলেন।"

"অজ্ঞান তো হই না রে,—একটু চেঁচিয়ে পড়িস্ ;— আমি হুঁ দিলেই তো হ'ল।"

* * * *

সন্ধ্যার পর চৌধুরী মশার সমঝদার পারিষদেরা একে একে সব উপস্থিত হলেন। তাকিয়া ঠেশ দিয়ে তামাক চলতে লাগলো। ভৃত্য নন্দা—দোরের বাইরে আসন নিলে। তার কাজও ঢোলা, আর মাঝে মাঝে কল্‌কে বদলে দেওয়া।

ইন্দু বই হাতে করে উপস্থিত হতেই, চৌধুরী মশাই বললেন—"বুঝলে বিশ্বম্ভর—ইন্দু আজ আমাদের একখানা বই শোনাবে বলে বায়না ধরেছে। কাঁটালপাড়ার কে ডেপুটি টঙ্কনাথ বাবু নাকি লিখেছেন—"

"আজ্ঞে—বঙ্কিম বাবু।"

"ঐ হল,—আসল অক্ষর তো বাদ দিইনি, 'ঙ'য়ে 'ক'য়ে তো বজায় রেখেছি রে। আচ্ছা—সুরু কর্"—

হরদেব খুড়ো তাস পেড়েছিলেন, অনিচ্ছায় তুলে রাখলেন। শম্ভু বাঁড়ুয্যে বেজার মুখে—একটা আকর্ণ-বিস্তৃত হাই তুলে, দেল ঠেশ দিলেন।

ইন্দু আরম্ভ করলে, চৌধুরী মশারও ঢুলুনি এল'।

ইন্দু যেই বলেছে—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ—

চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল মেরে আসছিলেন,—চোখ বুজেই বলে উঠলেন—"বাস্ করো—গলতি হায়। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কখনো হতেই পারেনা,—এই সব বই লেখা! মানসিংহ লোকটাই বা কে—কার পুত্র, কাদের দরোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে। তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন—যে, সবচিন্ লোক। আবি কেটে দাও। লেখো—ওল্‌সিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্য পুত্র কচু সিংহ, তেকার পুত্র ঘেঁচু সিংহ, তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও-পাড়ার মেনকা ঠান্‌দি মেয়েমানুষ হলে কি হবে—সেটা তাঁর অদৃষ্টের দোষ, তাঁরও এ সব জ্ঞান আছে। মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নাম লক্ষ্মী! খুঁট্ ধরলেই পটাপট্ তিনপুরুষ আপ্‌সে বেরিয়ে আসে। বই কি লিখলেই হল! কি বল' হরদেব?"

"বলবো আর কি,—আর কি দেবীবর আছেন। তিনি থাকলে এসব যথেচ্ছাচার ঘটতে পেতনা।" এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

কালীপ্রসন্ন রায় বললেন—"ছেড়ে দাওনা, ও-কথা আর বাড়িওনা। আমাদের মহাদেব খুড়োর ছেলের নামকরণ হয়েছে "মেঘনাদ"। সতী সাধ্বী বিন্দু খুড়ির কলঙ্কটা একবার বোঝো! তিনি লজ্জায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিয়েছেন। যাক্—ও পাপ কথা ছেড়ে দাও।"

চৌধুরী মশার তে-ভাঁজ থুতনিটা তখন বুকে ঠেকে থেবড়ে ছিল। সেটা ঈষৎ চাগিয়ে বললেন—"ছেড়ে দাও কি রকম,—আমরা জিতা থাকতে জাতটা চোখের সামনে বর্ণসঙ্কর মেরে যাবে নাকি। কাল মহাদেবকে ডাক্ দাও। বুঝলে?"

যাক্, ইন্দুকে অনেক করে সে ধাক্কা সামলে সুরু করতে হল। চৌধুরী মশার থুতনি আবার তাঁর বুকের ওপর থেবড়ে বসলো। সটকার নলটা হাত থেকে খসে পড়লো। এক একবার চমক্ আসে আর বলেন—"হুঁ—তার পর।"

ইন্দু তখন এগিয়েছে,—"বিমলা আর তিলোত্তমা তখন শৈলেশ্বরের মন্দির মধ্যে ; বাইরে—ভয়ঙ্কর ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাৎ"—

চৌধুরী মশাই চম্‌কে দুবার 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করে ভৃত্যকে বলে উঠলেন—"নন্দা ঢুলছিস বুঝি,—দেখছিস না হারামজাদা, মাথার ওপর কী প্রলয়কাণ্ড! গরুগুলো বাইরে নেই তো,—শীগগির তুলে ফেল। উঠলি?"

ইন্দু থামেনি,—"রমণীদ্বয় ভয়ে জড়সড়।"

শুনেই চৌধুরী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—"কোনো ভয় নেই মা—এ ভদ্রলোকের বাড়ী। নন্দা—গিন্নিকে বল্—চট্ ওঁদের বাড়ীর মধ্যে নে' যান। গেলি?"

ইন্দু ছাড়েনি,—"এমন সময় জগৎসিংহ মন্দির-দ্বারে

পাঁকের ফুল

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

দীর্ঘ দিন পরে স্বদেশের বুকে পা দিয়েই দেখি, সারা বাংলা এক শিল্পীর গৌরবগাথায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। দেশের কবি তাকে যশের জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছেন, তরুণের দল তাকে বরণ ক'রে নিয়েছে প্রীতি-পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়ে, নারীদের মনের মহলেও দেখ্লুম তার প্রতিপত্তির অন্ত নেই। অকস্মাৎ এমনি ক'রে ধূমকেতুর মতো বাংলার নিঃসাড় মনকে নাড়া দিয়ে যে সচেতন ক'রে তুলেছে, তার শিল্প-সৃষ্টি দেখ্বার জন্ম মনের ভেতর একটা অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি হ'ল।

আমি যখন সাগরের পারে পাড়ি জমিয়েছিলুম, বাংলার সাময়িক পত্রিকাগুলোতে তখন ছবি দেওয়ার রেওয়াজ সুরু হয় নি—ভারি ভরাট প্রবন্ধে তাদের কলেবর ভ'রে উঠ্‌ত। এখন সে প্রবন্ধের গৌরব লঘু হ'য়ে গেছে এবং তার জায়গায় উড়ে' এসে জুড়ে' বসেছে পটুয়াদের পট। সুতরাং এই তরুণ শিল্পীর শিল্প-লক্ষ্মীর পরিচয় পেতে বেশী দেরী হ'ল না। বড় একখানা মাসিকের পাতা ওল্টাতেই তার ছবির নমুনা আমার চোখের সামনে ফুটে' উঠ্‌ল।

ছবি দেখে খুশী হ'তে পার্‌লুম না। আর্টের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ভাবাভিব্যঞ্জনার কোন ছাপই তার ভেতর নেই—একটা অতি স্থূল লালসার ক্লেদে ছুপিয়ে ছবিগুলোকে রঙ্‌-চঙ্‌এ ক'রে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি স্থানের রূপদক্ষদের রূপের লেখায় চোখ্ দুটো তখনো মশ্‌গুল হ'য়ে ছিল। বাংলা দেশ হঠাৎ এমন তালকানা হ'য়ে গেছে ভাবতেও মনটা খানিকটা খিঁচে গেল। অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েই বন্ধু নীতীশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—এ লোকটার শিল্প-বিদ্যার নমুনা যদি এই হয়, তবে একে তোমরা মাথায় ক'রে এত নাচ্ছ কেন?

নীতীশ বল্‌লে—মামুলী ধরণের ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের চোখে চাল্‌সে ধরেছে, তাই শক্তির ছাপ যেখানে আছে তাকে তোমরা বুঝ্‌তেও পারো না—সইতেও পারো না। ধোঁয়ার সৃষ্টি ঢের হয়েছে, এখন কিছুদিন সেটা না হয় যাক্। মানুষ যখন রক্ত-মাংসের জীব, তখন তাদের কাছে দুনিয়াটাকে দুনিয়া ক'রেই যদি কেউ দেখাতে চেষ্টা করে, তবে সে মহাভুল করেছে এ কথা মনে কর্‌বার কোনো কারণ নেই। তোমাদের মতো রুচিবাগীশেরাই তো আর্টটাকে জাহান্নমে দিতে বসেছে। জান তো অস্কার-ওয়াইল্ডের সেই কথা—'It is better to be beautiful than to be good.' সাধু এবং শিল্পীর স্বপ্নের ভেতর ঢের তফাৎ! এই যে শিল্পী—একে যদি দেখ্‌তে, এর ছবি যেমন অফুরন্ত প্রাণের উৎস, এর জীবনটাও তেমনি উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহে পরিপূর্ণ—যেমন চঞ্চল—তেমনি সুপ্রচুর!

আমি হেসে উত্তর দিলুম—এই অস্কারই আবার বলেছেন, 'It is better to be good than to be ugly.' রুচির দিক থেকে যা কুৎসিত, যা বীভৎস, সত্যকার শিল্প-জগৎ তাকেও প্রশ্রয় দেয় না। তোমার বন্ধুর ভেতর যদি অফুরন্ত প্রাণের উৎস থাকে, সে ভালো কথা। কিন্তু, প্রাণের পরিচয় যদি তোমাদের ঐ ছবিগুলো হয়, তবে সে প্রাণ কারো ভিতর না থাকাই ভালো।

তর্কের খাতিরে প্রাণকে তো উড়িয়ে দিলুম। কিন্তু সে প্রাণ যে আমার বুকেই মৃত্যুবাণ হেনে, তারি রক্ত পান ক'রেই রাঙা হ'য়ে উঠেছে তা কি জান্‌তুম!

* * *

মিনতি ছিল আমার প্রতিবেশী। ছোট-বেলা থেকে তার সাথে একসঙ্গে খেলা করেছি। তারপর বড় হ'য়েও তাকে পেয়েছিলুম, কিন্তু সে আর এক ভাবে। তাই যাবার সময় যখন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম, চোখের জলে বান ডাকিয়ে সে বল্‌লে—যত শীগ্‌গির পারো, ফিরে এসো সমীর-দা, মনে রেখো, তোমার হাতের স্পর্শ ছাড়া আমার চোখের ধারার এ সোতা কখনো শুকোবে না।

বিদেশের শুষ্ক মরুভূমিতে মিনতির চোখের জলের সেই

ঝর্ণাই ছিল আমার সব আনন্দ, সব সান্ত্বনা। ভবিষ্যতের গাছে যত সোনার ফল ফলিয়েছি, হীরের ফুল ফুটিয়েছি, তাদের সবাইকে তাজা ক'রে রেখেছিল সেই চোখের জলের ঝর্ণাটা। কিন্তু কল্পনার সে স্বর্গটাও আমার অকস্মাৎ একদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভেঙে, টুটে, রেণু-রেণু হ'য়ে পথের পাশে পায়ের ধূলোর তলেই লুটিয়ে পড়্‌ল। ফিরবার প্রায় সময় হ'য়ে এসেছে, হঠাৎ এক দিন মিনতির চিঠি পেলুম—'আমায় মাফ ক'রো সমীর-দা, অন্য জায়গা থেকে আমার ডাক এসেছে ভাই, আমি তোমার জন্য সবুর কর্‌তে পার্‌লুম না। আমার হৃদয় যেভাবে নিজেকে তোমার পায়ে বিলিয়ে দেবে ব'লে শপথ নিয়েছিল, সে শপথ তার ভেঙে গেল। যদি পারো, তোমার এই চঞ্চল-চিত্ত বোনটাকে ক্ষমা ক'রো। হৃদয়টাকে ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে যে ভুল হয়েছিল, জানি, সে ভুলের জের টেনে চলাকে তুমি অপমান ব'লেই মনে কর্‌বে। তোমার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারি, কিন্তু তাকে অপমান কর্‌বার সাহস আমার নেই।'

এ চিঠির উত্তর দেবার কোনো দরকার ছিল না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আস্‌বার দরকারটাও ক'মে গিয়েছিল। তারপর দু'টি বছর ছন্নছাড়ার মতো বিদেশের পাহাড় পর্ব্বত বন-জঙ্গলে ঘুরে' মনের দিক্ দিয়ে সর্ব্বরিক্ত এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পুরো মাত্রায় নাস্তিক হ'য়ে বাংলার বুকে ফিরে এসেছি বটে, কিন্তু মিনতিদের বাড়ীতে এখনো পা দিতে পারি নি। যে মিনতি আঠারোটি বৎসরের সম্বন্ধ একখানা চিঠির মারফৎ শেষ ক'রে দিতে পারে, তার কাছে দাঁড়াবার সাহস আমারও ছিল না, যে আমি সাহসে ইউরোপের বে-পরোয়া পাহাড়ীদেরও পরাজিত ক'রেছিলুম।

কিন্তু মিনতির সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার কারবার যে শেষ হয় নি, সে কথা ভালো ক'রে বুঝ্‌লুম সেই দিন যে-দিন মিনুর চিঠি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এক তাড়া কাগজ এসে আমার কাছে হাজির হ'ল। সে লিখেছে—'যাবার বেলা আবার তোমার কাছে মাফ চাইছি সমীর-দা। এবার আমার আহ্বান এসেছে কোনো মানুষের কাছ থেকে নয়, পরপারের অজানা লোক থেকে।—যদিও জানিনে সে লোকের মালিক ভগবান না শয়তান! তুমি যে আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারো নি, তা তখনি বুঝেছি যখন দেশে পা দিয়েও তোমার মিনুর কাছে ছুটে' আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। পাপটা যে আমার ছোট তা বল্‌ছিনে। কিন্তু যদি জান্‌তে ভাই, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কি ভাবে কর্‌তে হয়েছে! ধ্রুব আশ্রয়কে পরিত্যাগ ক'রে যে আলেয়ার পেছনে ছুটে' চলে, মরণ ছাড়া তার গতি নেই। সেই মরণের স্পর্শই প্রতিমুহূর্ত্তে আমি নিজের ভেতরে অনুভব কর্‌ছি। সে স্পর্শ তুষার-শীতল। কিন্তু যার বুকে রাবণের চিতা তার কাছে তুষারের রক্ত-জমানো ঠাণ্ডা স্পর্শও তো অবাঞ্ছনীয় নয়! হয়তো মরণটা এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে না আস্‌লে আমার অশ্রু-সজল জীবনের কাহিনীটি তোমার কাছে ছাপাই থেকে যেত। কিন্তু আমার জীবনে সবচেয়ে যে বড় আনন্দ এবং সবচেয়ে যে বড় শত্রু, মরণেও তার কথাটা আমি ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। পত্র লিখে সব কথা জানিয়ে যাব সে শক্তিটাও আমার নেই। জীবনের হাসিকান্নাগুলো সময় সময় খাতার ওপর এঁটে রাখ্‌বার অভ্যাস তোমার কাছেই পেয়েছিলুম। সেগুলো যাবার বেলা আবার তোমার পায়েই উপহার দিয়ে গেলুম। তোমার মিনুর জীবনের পানপাত্রটা কোন্ অমৃত-রসে ভ'রে উঠেছিল তার আভাস এর ভেতর থেকেই পাবে। হয়তো যে দুঃখ আজ না হোক্, দু'দিন বাদে তুমি ভুল্‌তে পার্‌তে, তার পথেও কাঁটা পড়্‌ল। কিন্তু এ ছাড়া আমার যে আর কোনোই উপায় ছিল না ভাই! এত বড় রিক্ততা নিয়ে মরণের পথে আর বুঝি কেউ আমার আগে পা বাড়ায়নি—ইতি।

তোমার মিনু।'

চিঠি শেষ ক'রে খাতার পাতাগুলো খুলে' বস্‌লুম। একে ঠিক ডায়েরী বলা যায় না। এলোমেলো-ভাবে কয়েকটা দিনের মনের ইতিহাস এর বুকে ধ'রে রাখা হয়েছে মাত্র। মাঝে মাঝে ভেতরে অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া। প্রথম তারিখটা প্রায় দু'বছর আগের। বুভুক্ষু ভিক্ষুক যেমন ক'রে খাদ্যের পাত্রটার পানে ঝুঁকে পড়ে, আমার দীর্ঘ দিনের উপোসী চোখ দু'টো তেমনি ক'রে খাতার পাতাগুলো পড়্‌তে সুরু ক'রে দিলে:—

* * *

ডায়েরী লিখ্‌বার অভ্যাস নেই। কিন্তু জীবনের আজকের ঘটনাটা না লিখে রেখেও তো পার্‌ছি নে। ফাল্গুন শেষ হ'য়ে গেছে, বসন্তের পালা ফুরিয়ে এল।

তাকে না দেখলে হয় তো সে কথাটাও কখনো বিশ্বাস করতুম না।

এই জীবনেই তো আরো একটি দৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সে দৃষ্টি যেমন শান্ত, তেমনি মধুর, তেমনি ত্যাগের আনন্দে পরিপূর্ণ। এতদিন আমার জীবনের ওপর সেই দৃষ্টিই তো ধ্রুবতারার মতো আলো দিয়েছে। কিন্তু এর ক্ষুধিত শাণিত লালসা-তপ্ত দীপ্ত দৃষ্টি যে তার জ্যোতিকেও ম্লান করে দিলে। আপনাকে বিলিয়ে দেবার শক্তি যত বড়ই হোক্ না কেন, মানুষকে জয় করে তারাই, যারা জোর ক'রে কেড়ে নেয়। সভ্যতার এই পরিপূর্ণতার যুগেও মানুষ তার অসভ্য মনটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলতে পারেনি!

আলিপুরে বেড়াতে গিয়ে সেদিন একটা সিংহ দেখেছিলুম। সেটা নাকি সদ্য সদ্য ধ'রে আনা হয়েছে। তার গতি আমার ভারি ভালো লেগেছিল। কিন্তু সেই কাউকে-কেয়ার-না-করা সিংহের গতির সঙ্গে এর গতির একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। হেসে গেয়ে কথা ব'লে সে চলে গেল। তার সে হাসি-গান-কথার ভেতর শিল্পীর যোগ্য সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ হয় তো কিছুই নেই। তবু তার রেশ অক্ষয় হ'য়ে জেগে রইল আমার কানে—আমার বুকের মাঝখানে।

* * *

কাল রাত্রিতে হঠাৎ বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। যে আকাশ তার আগুনের ধারায় ধরণীর তরুণ সৌন্দর্য্যের ওপর ম্লান পাণ্ডুরতার রেখা টেনে দিয়েছিল, মেঘের চুম্বন ঢেলে সেই আবার তাকে স্নিগ্ধ শ্যামল ক'রে দিলে। পৃথিবীর এই স্নাত শুভ্র সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে আজ আবার চোখ জুড়িয়ে যায়।

আজ যে পয়লা বৈশাখ, সে কথাটা আমাদের কারো মনে ছিল না। শিল্পী এসে তার নববর্ষের অভিবাদন জানিয়ে সে কথাটা আমাদের মনে পড়িয়ে দিলে।

রীতি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—

"Now the New year reviving old Desires
The thoughtful soul to solitude retires."

দিদি, তুমি কোন্ নিভৃতে লুকোবে বলো?

শিল্পী ধীরে ধীরে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আমার একটা পুরনো ইচ্ছা যদি পূর্ণ করেন!

আমি বল্লুম—কি?

শিল্পী বল্‌লে—আজ আমাকে আপনার ছবি আঁকবার অনুমতি দিন!

একটা আচম্‌কা আনন্দের বন্যায় বুক ভ'রে গেল। কোনো রকমে সে ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লুম—না, থাক।

একটু ম্লান কণ্ঠে সে বল্‌লে—বৎসরের প্রথম দিনটাতে আমাকে বিমুখ কর্‌বেন না আপনি। জানেন, সব শিল্পীরই একটা সংস্কার আছে, বৎসরের প্রথম দিনটা যদি ব্যর্থ হয় সারা বৎসর তার চলতে থাকে সেই ব্যর্থতার জের টেনে।

আর আপত্তি করা চল্‌ল না। বসবার জায়গাটা ঠিক ক'রে দিতেই খানিকটা দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে সেই খানটাতে ব'সে পড়্‌লুম। একটু পরেই শিল্পী ডুবে' গেল তার তুলি রং আর ক্যানভাসের ভেতর। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম, আগুনের শিখা কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলোকে ঢেকে ফেলেছে।

আমের মঞ্জরীর সুরভিতে বাতাস ভরপুর। পাখীগুলোর অকারণ কূজন গুঞ্জনে স্তব্ধ বনতল মুখরিত। রৌদ্রের ভেতর দিয়ে ঝরে' পড়্‌ছে প্রকৃতির তরুণ যৌবন—রূপের নেশায় ভরা, সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যে উচ্ছল—চঞ্চল। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখেও স্বপ্নের ঘোর ঘনিয়ে আস্‌ছে।

চুলের একটা গোছা হঠাৎ বাতাসে উড়ে' এসে আমার মুখের ওপর পড়্‌তেই হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে—ভারি সুন্দর হয়েছে আপনার Poseটা। কিন্তু আমি পার্‌ছিনে এত সৌন্দর্য্য আমার তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুল্‌তে। রূপের পূজা আমার ব্যবসা, কিন্তু সে রূপ কি ক'রে ধ্যান করব যার সীমা নেই—শেষ নেই। ব'লেই তুলিটা ছুড়ে' ফেলে দিয়ে সে উঠে' দাঁড়ালো।

আমি হেসে বল্লুম—আমার নিজের দৈন্যটা মিথ্যে প্রশংসা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। আমি তো গোড়াতেই মানা করেছিলুম আপনাকে,—এ ছাই চেহারা না কি আবার ছবিতে তোলায়!

বিস্মিত বিহ্বল চোখ দু'টো আমার মুখের পানে তুলে' ধ'রে সে বল্‌লে—জানেন, আপনি কি বল্‌ছেন! আমার নিজের শক্তি যে কত বড় তা আমি জানি এবং এ শক্তির দীনতা এর আগে এমন ভাবে আমি আর কখনো অনুভব

করিনি! কিন্তু এ পরাজয়ের জন্ত আমার এতটুকু লজ্জা নেই। বিদ্যুতের শিখার কতটুকুই বা কোন্ শিল্পী ফোটাতে পেরেছে!

ফেলে-দেওয়া তুলিটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে সে আমার ছবি আঁক্‌তে সুরু ক'রে দিলে। তার মুগ্ধ ক্ষুধিত দৃষ্টি, ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে আমার মুখের ওপর খ'সে-পড়া উল্কার আলোর মতো ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল! সে আলো আমার বুকে কি রোস্‌নাই জ্বালালো কে জানে!

শিল্পী তার তুলির খেলা বন্ধ ক'রে আবার ব'লে উঠ্‌ল—আপনি মুহুর্মুহু এত বদলাচ্ছেন কেন বলুন তো? সেই জন্তই তো আমার আরো খেই হারিয়ে যাচ্ছে! আপনার মুখটা হঠাৎ কি লাল হ'য়ে উঠেছে দেখেছেন! ও লালকে ফুটিয়ে তোল্‌বার উপযুক্ত রঙ্‌ তো আমার ভাণ্ডারে নেই। আঃ, যদি আগুনটাকে আমার রঙ্‌এর ভাণ্ডারের ভেতরে পেতুম! তার পরেই উঠে' এসে হঠাৎ তার হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে আমার দু'টো হাত একেবারে তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে বল্‌লে—তুমি শিল্পীর সাধনার জিনিষ—শিল্পী তো তোমাকে ছাড়্‌তে পারে না। হয় তো আই-সি-এসএর মোহ আজও তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে আছে। কিন্তু কলা-লক্ষ্মী কুবেরের ভাণ্ডার থেকে উঠে' আসেনি, তাকে নিখিল সৌন্দর্য্যের ভেতর থেকে তিল তিল ক'রে চুইয়ে নিয়ে রূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে শিল্পী। এই তিলোত্তমা তো শিল্পীরই একমাত্র সম্পদ। সে অর্থ চায়নি, মান চায়নি, সুখও সে চায়নি—কেবল চেয়েছে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিটুকু। কে সে সমীর সেন, যে কেবলমাত্র শক্তির দম্ভে তোমাকে কেড়ে নেবে তোমার সত্যকার যেখানে সার্থকতা সেই সার্থকতার সিংহাসন থেকে। এই যে অপরূপ আগুনের খেলা চলেছে তোমার চুলের আগা, নাকের ডগা, হাতের আঙুল, বসনের প্রান্ত ঘিরে, যে আগুন আমার মনকে নতুন নতুন রহস্যের সন্ধান দিয়ে নব নব সৃষ্টির পুলকে বিহ্বল ক'রে তুলছে, সে কি কোনো দিন এই সব রহস্য-লোকের সন্ধান পাবে? তবে তোমার ওপর তার কিসের জোর? কেন সে তোমাকে নেবে, তোমার ওপর সত্যকার যার অধিকার তাকেই বঞ্চিত ক'রে?

উত্তেজনায় তার দেহ থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। আর তারি একটা ঢেউ চারিয়ে গেল আমার সমস্ত দেহ মনে, আমার রক্তের কণাগুলোর ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে তার কথার অস্পষ্ট ইঙ্গিতটাও যেন মূর্ত্তি ধ'রে উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

দৃষ্টি যে কথা কয়—মানুষের ভাষার চাইতেও জোরালো ভাষায় দাবীর আর্জ্জি পেশ করে, তার পরিচয় পেলুম সেদিন সেই শিল্পীর দৃষ্টির ভেতর দিয়ে। তার হাত দু'টো হাতের মুঠোর মধ্যে জোরে চেপে ধ'রে বল্‌লুম—বন্ধু, আগুনের রথে চ'ড়ে তুমি জয়-যাত্রার পথে বেরিয়েছ। তোমার গতি কে রোধ কর্‌বে? তোমার তূণের বাণ তো ফাল্গুনের বাণের চেয়ে কম জোরালো নয়!

জয়ের উচ্ছ্বসিত হাসিতে শিল্পীর অধর ভ'রে গেল। তার পর সেই অধর ধীরে ধীরে নেমে এল, আমার বিস্রস্ত বিক্ষিপ্ত চুলের অরণ্যে, বিস্ফারিত ললাটের তটে, লজ্জারক্ত অধরের ওপরে। সে তো চুমো নয়, সে যেন তড়িতের রেখা, অপরূপ সুন্দর অথচ বজ্রের জ্বালায় জ্বালাময়!......

দিনের আলোতে পার্‌লুম না, রাত্রির অন্ধকারে সমীরদাকে লিখে দিলুম আমার কবুল জবাব। চলেছি—ছুটে' চলেছি কে জানে কোথায়—নরকের অন্ধকারে কি স্বর্গের আলোকের পথে। আমার চোখের সাম্‌নে জাগ্‌ছে কেবল দুটি বড় বড় চোখের দৃষ্টি! সে দৃষ্টি সুন্দর কি কুৎসিত জানিনে; শুধু জানি সে অপরূপ, আর তার মোহ কাটিয়ে ওঠ্‌বার শক্তি আমার নেই!

* * *

ছ'টা মাস কোথা দিয়ে যে উড়ে' গেল কিচ্ছু টের পেলুম না। এ ছ'টা মাস আমার দেহের সমস্ত অণু পরমাণু ঘিরে' যেন বসন্ত জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল—তার শোভা নিয়ে, তার সৌন্দর্য্য নিয়ে, তার অপূর্ব্ব মাদকতার বন্যা নিয়ে। যৌবন যে হঠাৎ বাঁশীর শব্দ শুনে জেগে ওঠে, এত দিন এ কথা নিছক কল্পনা ব'লেই মনে কর্‌তুম; কিন্তু শিল্পীর বাঁশী যখন আমাকে ডাক দিলে, চেয়ে দেখি, আমার দেহের ভেতরেই তা সত্য হ'য়ে উঠেছে। তার একটা ডাকেই আমার ক্ষুধার্ত্ত বুভুক্ষু যৌবন পরিপূর্ণতার প্লাবনে চারিপাশের খানিকটা টল্‌কে ছল্‌কে দিয়ে মনের অরণ্য ভেদ ক'রে যেন অকস্মাৎ বেরিয়ে এল আমার দেহের দুয়ারে;—সদ্যোজাত গরুড়ের মতোই তার অসীম শক্তি, বিজয়ী বীরের মতোই তার বিপুল স্পর্দ্ধা, ভোগের সুরায় তার পানপাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্ত সমস্ত বাড়ীর ভেতর আমার খ্যাতিই ছিল সব চাইতে বেশী। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সেই সংযমের আবরণটা খ'সে পড়তেই মা বিস্মিত ও শঙ্কিত হ'য়ে আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন—মিনু, যে মাত্রায় তুই ছুটে' চলেছিস্ এ বাড়ীর পক্ষে তা কিছু নতুন জিনিষ নয়। কিন্তু আমি তো তোকে জানি, এ যেন তোর ধাতের সঙ্গে মোটেই খাপ খাচ্ছে না। আর এ তোর পক্ষে স্বাভাবিক নয় ব'লেই তোর সম্বন্ধে আমার ভয়ও তো ভাঙ্চে না মা!

আমি হেসে তাঁকে উত্তর দিলুম—আমার জন্ত তুমি কিছু ভেবো না মা। কলা-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য-শতদলের দলগুলো ফোটাবার ভার যার ওপরে, বসন্তের হাল্কা হাওয়াই যে তার বাহন।

মা আমার কথা বুঝলেন কি না জানিনে। কিন্তু ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি চ'লে গেলেন।...

মার আর একটা দিনের কথাও আজ মনে পড়ছে। স্নেহের দাবী এমনি অন্তর্যামী যে, যে বিপদের আশঙ্কা কোনো দিন আমার মনেও স্থান পায়নি, মার কাছে তাই প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। আকাশে সেদিন জ্যোৎস্নার সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে। তারি ঢেউগুলো গড়ের মাঠের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে-পড়া গাছগুলোর মাথায় জল্ছিল। চাঁদের আলোর সেই বন্তায় আকাশের তারাগুলিও যেন ভেসে এসে ছিট্‌কে পড়েছিল দূরে দূরে রাস্তার ধারে ধারে যে গ্যাস পোষ্ট-গুলি আছে তাদেরি কাচের জালে ঘেরা খাঁচার ভেতরে। সব জিনিষই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়—সবই আবছায়া। এই আবছায়াই মনের রাজ্যে মায়ালোকের সৃষ্টি করে। শিল্পীর সঙ্গে সারা সন্ধ্যা এই মায়ালোকের মধ্যে কাটিয়ে বাড়ী ফিরে আস্তেই দেখি, মা আমার ঘরের ভেতর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বল্লেন—ভারি ভাবিয়ে তুলেছিলি মিনু। এত রাত একা একা বাইরে তো থাক্তে নেই মা!

হেসে বল্লুম—একা ছিলুম না—শিল্পী সঙ্গে ছিল। মাঠে যা জ্যোৎস্না মা, যদি দেখ্তে, তোমারও ফির্তে ইচ্ছা হ'তো না।

আমার মুখে কি ছিল জানিনে, সেই মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মা বল্লেন—শিল্পী সঙ্গে থাক্লেই একা থাকার দোষ যে কাটে না, এটা বোঝার মতো বয়স তোমার হয়েছে বাছা। তা ছাড়া, সমীর এগুলো পছন্দ হয়তো না-ও কর্তে পারে।

সমীরদার সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সব সম্পর্ক যে একখানা চিঠির মারফৎ চুকিয়ে দিয়েছি, সে কথাটা মনে হ'তেই বুকের ভেতরটাতে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্ করে বিঁধ্ল। একটু ম্লান হেসে বল্লুম—সমীরদা কিছু মনে কর্বেন না মা। কিছু মনে কর্‌বার অধিকার আর তাঁর যে আমার ওপর নেই, চিঠি লিখে সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি।

চেয়ে দেখ্লুম, মার সেই চিরহাস্যোজ্জ্বল মুখ এক মুহূর্ত্তে একটা বেদনার আঘাতে ম্লান হ'য়ে কালো হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ তিনি স্তব্ধ হ'য়ে সেই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর বল্লেন—চিঠি লিখে দিয়েছ—আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসাও কর্‌লে না?

মার সে রকমের মুখ আমি আর কখনো দেখি নি। সেই কাতর-বিহ্বল মুখের চেহারাটা আমার বুকখানাকে যেন হাতুড়ির পর হাতুড়ির ঘা দিয়ে পীড়ন কর্তে লাগল। আমি মার বুকের পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বল্লুম—অপরাধ হয়েছে মা, আমাকে মাফ করো। কিন্তু সমীরদাকে আর একটা দিনও মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে রাখা যে আমার অন্তায় হ'তো!

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আমার চুলগুলো আঙুল দিয়ে চিরে দিতে দিতে মা বল্লেন—মার ব্যথা, মার ভয় ভাবনা—এ যে কি রকমের তা তো জানিস্ নে! তোকে সমীরের হাতে দিতে পার্লেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু তা যখন হ'লোই না, আমি তোর বিয়েটা শীগ্‌গির সেরে ফেল্তে চাই। তুই না পারিস আমি কাল শিল্পীকে বল্‌ব।

লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠে মাকে বল্লুম—তোমাকে কিছু কর্তে হবে না মা, আমিই সব ঠিক ক'রে নেবো।...

পরের দিন শিল্পী আস্তেই হেসে বল্লুম—মা তোমাকে পাকাপাকি ভাবে বাঁধ্‌বার চেষ্টায় আছেন, অতএব সাবধান!

বড় বড় চোখ দু'টো আমার মুখের ওপর বিস্ফারিত ক'রে দিয়ে শিল্পী বল্লে—অর্থাৎ—

আমি বল্লুম—অর্থাৎ আমাকে যদি তোমার সত্যিকার প্রয়োজন থাকে, তবে তার আগে আমার ওপর তোমার

দাবীর অধিকারটা পাকা ক'রে নিতে হবে—এই হ'লো মার আদেশ!

মনে হ'লো শিল্পীর চোখের চেহারাটা এক মুহূর্ত্তের জন্ত যেন বদ্‌লে গেল। কিন্তু তার পরেই হাত দু'টো আমার দিকে বাড়িয়ে বললে—মার কি আদেশ জানিনে, জান্‌বার প্রয়োজনও নেই আমার। তোমার আদেশ, সেই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট।

তার প্রসারিত হাত দু'টোর ভেতর আপনাকে ফেলে দিয়ে বল্‌লুম—ফুল যে কেন বিকিয়ে দেবার জন্ত আপনাকে বিকশিত ক'রে তোলে তোমাকে দেখেই তার কারণ বুঝ্‌তে পেরেছি বন্ধু। নারীর তো সঞ্চয় ক'রে রাখবার অধিকার নেই!

* * * *

আরো কয়েকটা মাস ঝড়ের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। পেছনের দিকে তাকানো নেই। কেবল সামের দিকে ছুটে চলা—কি উদ্দাম তার গতি, কি উন্মাদ তার ভঙ্গী! রক্তের ভেতর যখন আগুন ধরে, তখন তার বাষ্প দেহটাকে ঝড়ের ভেতর দিয়ে এমনি ক'রেই টেনে নিয়ে যায়। মনের ইঞ্জিন—সংযত ক'রে রাখা যার কাজ, সেও মাতাল হ'য়ে উঠে' দু' হাত দিয়ে হাততালি বাজিয়ে রাশটাকে শ্লথ ক'রে দিয়ে অট্ট হাসি হাস্‌তে থাকে।

কিন্তু ঝড়ের দোলাও থামে। আমার মনের ঝড়ের দোলা যখন থাম্‌ল, চেয়ে দেখি আমার সমস্ত দেহ রিক্ততায় ভ'রে গেছে—কোথাও নিজের ব'লে আর এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এ রিক্ততার জন্ত কোনো ক্ষোভ নেই আমার। নারী তো আপনাকে রিক্ত ক'রে দিয়েই সার্থক!

কিছু দিন থেকে শিল্পীর ভেতরেও একটা পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছি। তার চুমোর ভেতরে যেন সে আবেশ আর নেই। আলিঙ্গন তার ব্যগ্র ব্যাকুল দুঃসহ অথচ মধুর বিদ্যুতের স্পর্শটাকেও যেন হারিয়ে ফেলেছে। হয় তো তার পিপাসা মিটে গেছে—কিন্তু আমি!—পিপাসায় যে এখনো আমার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আছে! হায় নারী, তুমি যখন রিক্ততার নেশায় মেতে ওঠো, পুরুষের মনে তখন চল্‌তে থাকে আপনাকে ভরাট ক'রে নেবার সাধনা। তবু এই পুরুষকেই নারী চিরকাল তার সর্ব্বস্ব অর্পণ করে এসেছে।

ব'সে ব'সে ভাবছি—মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে' বল্‌লেন,—মিনু তোর বিয়ের দিন এই মাসেই ঠিক ক'রে ফেল্‌লুম।

আমি হেসে উত্তর দিলুম—বিয়ের মালিক তো আমি একলা নই মা।

মা বললেন—সে তো জানি,আর সেই জন্তই তো আমার আজ ভয়েরও অন্ত নেই! আজ ক'দিন তাকে দেখ্‌ছি নে। এখন মাঝে মাঝেই এরকম হচ্ছে। তাঁর চোখের দিকেও তাকিয়ে দেখেছি, যে নেশার রং তরুণ তরুণীর চোখে আলোর ঝর্ণা ঝরায় তা যেন ফুরিয়ে গেছে। এ কথাটা কি তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস নে? আমাকে লজ্জা করিস্ নে মিনু, জানিস্, মার বাড়া বন্ধু মেয়ের আর দ্বিতীয় নেই!

মার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে' নিয়ে বল্‌লুম—আমার মার মতো মা যে পেয়েছে সে কথা কি তাকেও ব'লে দিতে হবে মা! কিন্তু বোঝাবুঝির হিসেব-নিকেশের কোনো খোঁজই যে আমি রাখি নি।

চেয়ে দেখ্‌লুম চিন্তার রেখা ধীরে ধীরে মার মুখে একটা কালির প্রলেপ টেনে দিয়ে ঘনিয়ে উঠ্‌ল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে তিনি বল্‌লেন—মিনু, তুই তার 'ষ্টুডিও' চিনিস্?

আমি বল্‌লুম—হ্যাঁ চিনি।

মা বল্‌লেন—দুপুরে আজ আমাকে নিয়ে তার 'ষ্টুডিও'তে তোকে যেতে হবে।

আমি বল্‌লুম—আচ্ছা।

আষাঢ় মাসের পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে, তবু পৃথিবীর গায়ে এক ফোঁটা জল ঝর্‌ল না। বন্ধ্যা প্রকৃতির চেহারাটা তৃষ্ণায় যেন চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়েছে। তাপমান-যন্ত্রে এবার কল্‌কাতার উত্তাপ ১০৯ ডিগ্রি। রাস্তা ঘাট প্রায় রাত্রির মতোই নির্জ্জন। সেই নির্জ্জন রাস্তা ঘাটের ওপরেই শুভ্র রৌদ্রের হাসির টুক্‌রোগুলো জল্‌ছিল রুদ্র রূপের মশাল জালিয়ে। রূপের নেশা যে ধ্বংসের পথকেও আলো ক'রে চলে, আজকার রৌদ্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ রৌদ্রের দিকে তাকালে চোখ জালা করে, কিন্তু তবু চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

রাস্তায় দেখলুম একটা মোষের গাড়ীর ওপর একটা

ছোট-খাট দুনিয়াকে চাপিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান নিশ্চিন্ত মনে চাবুক চালাচ্ছে। উপরের চাপে গাড়ীর চাকা, ঘোষের পা রৌদ্রে-গলা পিচের রাস্তার ওপর ব'সে পড়ছে, সে দিকে আজ আর তার নজর নেই। কারণ সে ঠিকই জানে যে এই আগুনের প্রাচীর ডিঙিয়ে আধা জলচর আধা স্থলচর জীব-গুলোর খবরদারী কর্‌বার জন্ম C. S. PC. A.র বাবুরা কেউ আজ বেরিয়ে আস্‌বে না। একখানা ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া আমাদের চোখের সাম্‌নেই হুঁচুট খেয়ে মুস্‌ড়ে পড়ল। গাড়ীর ছাদটা খসখসের ভেজা পর্দা দিয়ে ঢাকা। যারা আরামে আছে দুনিয়ার আরামের পান-পাত্র প্রতি মুহূর্ত্তে তাদেরি মুখের সম্মুখে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে; কিন্তু তৃষ্ণায় যাদের বুকের ছাতি ফেটে যায়, এক ফোঁটা জলও তাদের কাছে দুর্লভ।

মাকে নিয়ে শিল্পীর ষ্টুডিওতে ঢুকে' পড়্‌লুম। দেখি ইলার পা'র কাছে সে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে আছে। দু' জনার মুখেই একটা স্বপ্নের নেশা জড়ানো। ইলা আমার বন্ধু। মাস-খানেক আগে শিল্পীর সঙ্গে আমিই তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম।

উভয়ে ত্রস্ত হ'য়ে উঠে' বস্‌তেই মা বল্‌লেন—মনে করেছিলুম ঘরে তুমি একা আছ, তাই খবর না দিয়ে ঢুকে পড়েছি, কিছু মনে ক'রো না বাবা। কিন্তু তোমার সঙ্গে একলা যে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

ম্যাটিংএর ওপর ছড়িয়ে-পড়া তুলি কাগজ পেন্সিলগুলো কুড়ুতে কুড়ুতে শিল্পী বল্‌লে—মিস্‌ রায়, আজ আর আপনার ছবি নেবার হয়তো সুবিধে হবে না, কাল দুপুরে যদি একবার পায়ের ধুলো দেন এখানে। কোন্‌ পাটুনীর কাঠের নৌকো অন্নপূর্ণার পায়ের স্পর্শে নাকি সোণার নৌকোতে পরিণত হ'য়েছিল। এর ভেতর কতটুকু সত্য আছে জানিনে, কিন্তু শিল্পীরা যে আপনাদের পায়ের ধুলোর স্পর্শ পেয়েই কাগজের গায়ে সৌন্দর্য্যের সোনা ঝরায়, তার খবর আমিই জানি। চলুন আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

ইলা আমার দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাকে চুপি চুপি বল্‌লুম—মা ফিরে চলো। দুঃখ যা পেয়েছি তাই ঢের, এর পর আর অপমান কুড়িও না।

ধীরে ধীরে আমার মুখের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মা বল্‌লেন—অপমান যদি অদৃষ্টে লেখাই থাকে মিনু, আমি এড়াতে চাইলেও তো তাকে এড়াতে পার্‌বো না। তুই বরং তার চেয়ে গাড়ীতে গিয়ে বোস্‌, আমি এদিককার বোঝা-পড়াটা শেষ ক'রে নিয়েই ফিরে আস্‌ছি।......

গাড়ীতে কতক্ষণ ব'সে ছিলুম মনে নেই। হঠাৎ চেয়ে দেখি সকার মাকে গাড়ীর দরজা খুলে' দিচ্ছে। দুর্দ্দিনের ভারি জমাট কান্নাভরা মেঘে তাঁর সবটা মুখ আচ্ছন্ন।

* * * *

মা গো মা, কি অসহ্য গুমোট! বুকের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এ কি ঘোলাটে থম্‌থমে পাংশুবর্ণ মেঘের গাদায় ভ'রে গেছে! দু' ফোঁটা জল ঝরে না! এই মুহূর্ত্তে বাষ্পের বেগে বুকটা ফেটে যদি চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যায় বেশ হয়।

হঠাৎ কিসের লোভে এই লবণ-সমুদ্রের মাঝখানটায় যে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, আজ ভেবেও তার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে। তখন যে জিনিষটা মুগ্ধ ক'রেছিল, আজ দেখ্‌ছি সেটা তো ক্লেদে কাদায় ভরা—বীভৎস—কুৎসিত। দেহে তার যে আলো জ্বল্‌ছে, সে আলো তো সর্ব্বনাশের আলো—সে আলোতেও মানুষের মন ভোলায়!

চিরকাল মনে মনে Cultureএর একটা গর্ব্ব ক'রে এসেছি, কিন্তু সে গর্ব্ব আমার কোথায় রইল!

আজ তার ভেতরের অজস্র বৈষম্যের দিকে নজর পড়্‌ছে আর নিজের পায়ে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটা থেঁৎলিয়ে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বার জন্ম মন মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ছে! আশ্চর্য্য হচ্ছি, এগুলো এর আগে আমাকে ঘা দিতে পারেনি কেন! তার উচ্চ হাস্য, তার কথা, তার গান, এমন কি তার শিল্প-রচনা—এ সমস্তর ভেতর দিয়ে যে একটা বীভৎস বর্ব্বরতার ইঙ্গিত সঙ্গীনের মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো লুকোবার জিনিষ নয়। মানুষের সহজ সামাজিক আবেষ্টনের ভেতর দিয়ে যে Culture গ'ড়ে ওঠে, তার চলা-ফেরা, তার আকার-ইঙ্গিতের ভেতর তারও তো কোনো দাবী ছিল না। তবু সে আমাকে জয় ক'রে নিলে—এক নিমেষের জন্ম ভাবতেও দিলে না কোথায় নিয়ে চলেছে—কিসের উদ্দেশে! যার ছদ্মবেশ ধরা যায় না, সে

যদি এসে ফুলের পথে টেনে নিয়ে যায়, সে হয়তো সহ্য হয়। কিন্তু এ আমি কি ক'রে সহ্য করব ?...

ঘরের ভেতর মনের গাঢ় অন্ধকারটাকেই চোখের সাম্‌নে বিছিয়ে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি, মা এসে বল্‌লেন—মিনু, ওর সঙ্গে আমার সে-দিন যে কথাগুলো হ'য়েছিল তা তোর শোনা দরকার।

মা হয়তো ভাব্‌ছেন, তার মোহের নাগপাশটা এখনো আমার কাটেনি, তাই তার ধ্বংসের জন্ম শেষ অস্ত্র এই গরুড় বাণটাই নিক্ষেপ করতে হবে! আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লুম—কিচ্ছু দরকার নেই মা। আমি সেদিন তোমার মুখ দেখেই সব কথা বুঝে' নিয়েছি।

মা বল্‌লেন—কিছুই বুঝিস্‌নি তুই। মানুষের স্পর্দ্ধা তার হৃদয়হীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে মিশে যখন ভাষা পায়, সে যে কত বড় বীভৎস ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে না শুন্‌লে তার ধারণা করা অসম্ভব। সে বর্ব্বরতার ছবি আমি হয়তো হুবহু আঁক্‌তে পার্‌ব না—তবু শোন্।

তোকে তো ঘর থেকে বা'র ক'রে দিলুম—দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় সে ঘরে ঢুকেই বল্‌লে—এইবার কি চান আপনারা আমার কাছে বলুন।

আমি বল্‌লুম—তোমার কাছে এসেছি বাবা, মিনতির বিয়ের দিনটা স্থির ক'রে ফেল্‌বার জন্ম। আর তো দেরী করা চলে না।

সে বল্'ল—তার জন্ম রৌদ্রের এই অগ্নিদাহ মাথায় নিয়ে এখানে আস্‌বার তো কোনই প্রয়োজন ছিল না আপনাদের।

আমি বল্‌লুম—কিন্তু তোমার সুবিধে যে কবে হবে সে কথার তো কিছুই আমাকে জানাও নি।

সে বল্‌লে—আমার সুবিধে অসুবিধেতে কি আসে যায় আপনাদের ? বিয়ে হবে আপনার মেয়ের, আমার নয়।

তড়িৎ স্পৃষ্টের মতো বিস্মিত বিহ্বল চোখ্ তুলে' তার মুখের পানে চাইতেই সে আবার বল্‌লে—আমার সঙ্গে যদি তার বিয়ে দেবার কল্পনা আপনারা ক'রে থাকেন, সে ইচ্ছা আপনাদের পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। আমি চিরকুমার থাক্‌বার ব্রত নিয়েছি।

আমি বল্‌লুম—কিন্তু আমার মেয়ে যে কুমারী, সে কথাটাই বা তুমি তবে ভুলে গেলে কেন ? তুমি তাকে বিয়ে কর্‌বে এই প্রতিশ্রুতি দিতেই তো আমি তোমার সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশায় কোনো রকমের বাধার সৃষ্টি করিনি।

সে বল্‌লে—প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম কি না মনে নেই। দিয়ে থাক্‌লে ভুল করেছিলুম। কিন্তু তখন যে তাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন ছিল। শিল্পীর ধর্ম্ম অনেকটা প্রজাপতির ধর্ম্মের মতো। ফুলের বুক থেকে সে তার শোভা-সৌন্দর্য্যই তো চয়ন ক'রে নেয়—ফুলের ভাণ্ডারে কোথায় কোন হানি হ'ল তার দিকে তো তার তাকাবার অবসর নেই। মানুষের ভেতরের এই ফুলগুলোকে মালার মতো গলায় জড়িয়ে নিয়েই শিল্পী তার কলালক্ষ্মীর জন্ম সৌন্দর্য্যলোকের স্বপ্ন রচনা করে। তারপর যদি কোনো ফুলের সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, মালা থেকে সে তো ঝ'রে পড়্‌বেই।

দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মাকে বল্‌লুম—থামো মা, থামো—আর আমি শুন্‌তে চাই নে।

ধীরে ধীরে আমার মাথাটা তাঁর কোলের উপর তুলে' নিয়ে মা বল্‌লেন—কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে মা, আমার মেয়েকে সে কিসের জোরে জয় ক'রে নিলে!

মার বুকের ভেতরে মুখ লুকিয়ে ভাঙা গলায় বল্‌লুম—মা সর্ব্বনাশের Siren যখন কানের কাছে বাঁশী বাজাতে থাকে, মানুষের উচ্ছৃঙ্খল মন তো এমনি করেই তার হাতে ধরা দেয়। আগুনের আঁচের স্পর্শ পাখার ওপর লাভ ক'রেও তো পতঙ্গ ফির্‌তে পারে না। আমার ভেতর দুর্ব্বলতার যে কুশ্রী ক্লেদটা জমে ছিল, তার উচ্ছৃঙ্খলতার সবল কীট-গুলো তারি ভেতর বাসা বেঁধে শক্তি সঞ্চয় করেছে। সাবধান হ'তে পারিনি, তাই এ কদর্য্যতার গ্লানির হাত হ'তেও আমার মুক্তি হ'ল না।

মুখটা বুকের ভেতর চেপে ধ'রে রেখে, আস্তে আস্তে চুলগুলোর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে মা বল্‌লেন—সমীরের কিছু খবর রাখিস মিনু—সে কোথায় আছে ?

মার কোলের ভেতর হ'তে দেহটা তুলে' নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মাকে বল্‌লুম—আমি জানিনে মা, তুমিও জান্‌তে চেষ্টা করো না। এই বিশ্রী নোংরা পাঁকের ভেতর যদি তাঁকে টান্‌তে চেষ্টা করো, আমি আত্মহত্যা করব।

মাকে তো বল্‌লুম—কিন্তু সেই একটি লোকের কথাই

তো আজ দুলে' উঠছে আমার চিত্তকে মথিত ক'রে, আমার সমস্ত চিন্তার ভেতর। আনন্দের আলোকের দিনে দেবতাকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে দুঃখের বজ্র যখন গর্জাতে থাকে তখন দেবতার কথাই তো সকলের আগে মনে পড়ে।

জীবনের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে ঘৃণ্য দুর্ব্বলতাকে জয় কর্‌তে পারিনি; কিন্তু এ দুর্ব্বলতাকে জয় কর্‌ব। আলোকের ভেতর যদি দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে না পেরে থাকি, অন্ধকারের ভেতরেও তাঁকে টেনে আন্‌তে চেষ্টা কর্‌ব না।

* * * *

ওরে আমার বাছা, ওরে আমার মাণিক, তোর নাম আমি রাখ্‌লুম পঙ্কজ। যখন অনাগত ছিলি, অথচ তোর আসার সম্ভবনায় সমস্ত দেহ মন ভ'রে উঠেছিল, সে দিন কেউ তোকে চায়নি, আমিও তোকে প্রাণপণেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিলুম। সেদিন তোর আহ্বানের মন্ত্র ছিল অশ্রু আর অভিশাপ। কাদায় যার সমস্ত রাস্তা ভরা, গ্লানির ভেতর দিয়ে যার উদ্ভব, গ্লানি আর কুণ্ঠা ছাড়া সে যে আর কিছু দিতে পারে সে কথা তো একবারও মনে হয়নি। কিন্তু যখন তুই এলি—একি অমৃতে সমস্ত মন ভ'রে গেল! কোথায় রইল গ্লানি, আর কোথায় রইল তোর মার সঞ্চিত পুঞ্জিত পাপের বোঝা! সব হাল্‌কা ক'রে দিয়ে, পঙ্কের সমস্ত দীনতাকে জয় ক'রেই তুই যে ফু'টে উঠেছিস অম্লান সৌন্দর্য্যে তোর মার অন্তর-সরোবরের মাঝখানটাতে। দুর্গন্ধ-দুষ্ট ক্লেদের ভেতর থেকে পদ্ম যে কেমন ক'রে অত শুভ্র সৌন্দর্য্য নিয়ে ফু'টে ওঠে, তার রহস্য তোকে পাবার আগে বুঝ্‌তে পারি নি। তোকে পেয়ে তবে আজ তা আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কি গভীর পাঁক জ'মে রয়েছে আমার দেহের শিরায় শিরায়, মনের আনাচে-কানাচে। আমার সেই সমুদ্রের মতো অপার অগাধ পাঁককে নির্ম্মল শুচিতায় ভ'রে দিয়ে আজ তুই চোখ মেলেছিস্, তাই তো তোর নাম রাখ্‌লুম পঙ্কজ।

তোকে পাবার আগে প্রতিদিন মনে হয়েছে—যে পথ মৃত্যুর দরিয়ার দিকে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে, সে পথ ফুরোয় না কেন? আজ মনে হচ্ছে পথটা আর একটু বেড়ে গেলেও মন্দ হ'ত না। তা হ'লে হয়তো তোকে ফুটিয়ে তুলে' রেখে যাবার অবকাশ পেতুম। কিন্তু সে তো আর হয় না—প্রতি মুহূর্ত্তে পরপারের আহ্বান আমার চোখের সামনে আলোর ভেতর অন্ধকারের জাল রচনা ক'রে চলেছে। এই দণ্ডেই মৃত্যুর দূত যদি এসে বলে—তাঁবু তোল, যাত্রার বোঝা ঘাড়ে নাও, তাতেও আমি বিস্মিত হব না।

এত দিন আপনার ভাবনা নিয়েই মত্ত হ'য়ে ছিলুম; কিন্তু আজ নিজের কথা আর এতটুকুও মনে আসছে না। আজ আমার সব ভাবনা হারিয়ে গেছে একা তোর ভাবনার মাঝখানে। যাবার সময় তো ঘনিয়ে এল, কিন্তু ওরে আমার মূক মৌন অসহায় মেয়ে, তোকে কার কাছে রেখে যাব, কে তোকে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে মায়া দিয়ে ফুটিয়ে তুলবে? জানি, আমার মার কাছে তোর আদর যত্নের অভাব হবে না, কিন্তু এ কথাও জানি, তিনি তোকে প্রসন্ন হাসির সঙ্গেও কখনো গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বেন না। যে তাঁর মেয়ের মাথার ওপর দুঃসহ কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে সে তো তাঁর মনকে কাঁটার খোঁচার মতো ক'রেই বিঁধবে। কিন্তু ফুলকে যে ফুটিয়ে তোলে, আদর যত্নের চের বড় জিনিষ তাকে দিতে হয়। মাটির মনের রসেই বসন্তের মুখে হাসির রেখা ফুটে' ওঠে—তার বুকে পরিপূর্ণ বিকাশের প্লাবন জাগে!

আজ আবার নতুন ক'রে সমীরদার কথা মনে পড়ছে। মানুষের মনের পশু যখন জাগে, তখন সম্মুখের আলোর দীপ্তিটাও তার চোখে পড়ে না। ভুল যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, সমীরদা হয়তো তা বুঝতেন। তাই পঙ্কের ওপরে তার কোনো লোভ না থাকলেও পঙ্কজকে তিনি হয়তো উপেক্ষা করতে পার্‌তেন না। ফিরে এস সমীরদা, তুমি ফিরে এস। এ জীবনে যে ভার নামাতে পার্‌লুম না, অজানা পথ-যাত্রায় সেই ভারটা অন্ততঃ একটু হাল্‌কা ক'রে দাও ভাই—আমি বেরিয়ে পড়ি!

* * * *

ডায়েরীর পাতাগুলো এইখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু সে যা বেদনার অশ্রু ঝরিয়ে গেল, তার তো শেষ নেই। মিনতিকে পাই নি; সে যে আমার কত বড় বেদনা তা আমিই জানি। তবু তাকে পেয়ে যে তাকে বঞ্চিত করিনি সেইটেই ছিল আমার পরম গর্ব্ব-সুগভীর সান্ত্বনা। কিন্তু আজ মনে

হচ্ছে জোর ক'রে তাকে লাভ করবার চেষ্টা করি নি কেন? এতদিন পরে আজ মনের ভেতর স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্ছে—কেবলমাত্র ভালোবাসাতেই প্রেম সার্থক হয় না—প্রেমাস্পদকে প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করাও প্রেমের ধর্ম্ম। এই মুহূর্ত্তে যদি সেই কাপুরুষটাকে হাতের কাছে পেতুম!

মিনতির আহ্বান আমার কাছে বেলা-তটের ওপর সমুদ্র যেমন ক'রে কেঁদে ফেটে লুটিয়ে পড়ে তেমনি ক'রে লুটিয়ে পড়্তে লাগল। কাগজগুলো গুটিয়ে বুকের পকেটে ফেলে পথে বেরিয়ে পড়লুম। পায়ের তলায় তো বিদ্যুতের গতিকে টেনে দিয়েছি, তবু পথ ফুরোয় না কেন?......

চোখের সাম্নে জেগে আছে সৃষ্টি-প্রভাতের প্রথম পদ্মটির মতো মিনুর মুখ—সৌন্দর্য্যের বন্যায় ভরা—লাবণ্যের প্রভায় অপরূপ! প্রভাতের রূপ বদ্‌লে গেছে, আকাশের বুক প্রলয় ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে স্তম্ভিত। সমুদ্র তারি তালে তালে ক্ষ্যাপার মতো অসম্বৃত স্পর্দ্ধায় দুল্‌ছে। পৃথিবী কাঁপ্‌ছে—তারা খস্‌ছে, কেবল স্থির হ'য়ে আছে সৃজন-প্রভাতের প্রথম পদ্মটি, যার মুখ আমার মিনতির মুখের মতো;—একটি দল তার খসে নি—একটি কেশর তার ঝরে নি!

হঠাৎ চেয়ে দেখি পায়ের গতি থেমে গেছে আঠারো বৎসরের পরিচিত পথটার মাঝখানে—মনুদের বাড়ীর সম্মুখে! মানুষ ভোলে, কিন্তু মানুষের পা তার চিরন্তনের অভ্যাস্ ভুল্‌তে পারে না।

ভেতরে ঢুকে' চিরদিনের পরিচিত ঘরটার সম্মুখে দাঁড়াতেই শুন্‌তে পেলুম, ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে মিনতি বল্‌ছে—রীতি, দেখ্‌তো ভাই, বাইরে কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। ও পায়ের শব্দ যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের চেনা।

ভেতর হতে রীতি বল্‌লে—ও কিছু নয় দিদি, তুই একটু ঘুমো।

মিনতি বল্‌লে—না রে তুই বুঝতে পার্‌ছিস্‌নে—আমি ঠিক চিনেছি ও আমার সমীরদার পায়ের শব্দ।

ওরে অভাগী, আমার পায়ের শব্দটাকেও এমন ক'রে চিনে রেখেছিস্! চোখ ফেটে জলের ঝরণা নেমে এল। কোনো রকমে তাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে, মুখে একটু হাসির রেখা টেনে ঘরে ঢুকে' বল্‌লুম—হাঁা মিনু, তোমার সমীরদাই বটে। কিন্তু তার পায়ের শব্দটাকে আজও ভুলে' যাওনি ভাই?

রীতি ধীরে ধীরে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। মিনতির হাত দুটো হাতের ভেতর টেনে নিয়ে আমি তার মাথার কাছে ব'সে পড়লুম।

মিনতি বল্‌লে—ওখানে নয় সমীরদা, এইখানটায় স'রে ব'সো, আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছিনে।

স'রে এসে পাশে বস্‌তেই তার হাত দুটো আমার হাতের ভেতর ছেড়ে দিয়ে সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে রইল। তার দেহের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা একেবারে হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল। পরিপূর্ণ নিটোল দেহটা ভেঙে টোল খেয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। গোলাপফুলের পাপড়িগুলো দেহের বোঁটা থেকে ঝ'রে প'ড়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে তার চিহ্নটুকুও নেই। কূলে কূলে ভরা চোখের কোণ কোটরের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। সেখানে একটা অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বলতা চক্ চক্ কর্‌ছে। কেবল মুখের দীপ্তিটা এখনও নিভে যায় নি। প্রভাতের শুক-তারাটা ভোরের আকাশে যেমন দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে, তার মুখের ভেতরেও তেমনি একটা ঝ'রে পড়ার দীপ্তি জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠ্‌ছিল।

মিনতি আমার কথার জের টেনে বল্‌লে—পায়ের শব্দটা মনে আছে দেখে বিস্মিত হচ্ছ সমীরদা; কিন্তু বিস্মিত হবার তো কোনো কারণ নেই। মনটাকে যদি খুঁজে দেখ, দেখ্‌তে পাবে, তার ভেতর থেকে এক ফোঁটা জিনিষও তোমার হারিয়ে যায় নি। এই মনটাকে খুঁজে দেখিনি ব'লেই তো আমি নিজেও জ্বল্‌লুম, তোমাকেও জ্বলিয়ে গেলুম। তোমার বুকে যে কি দাগা দিয়েছি তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তবু তোমাকে যে দুঃখ দিয়ে গেলুম, জানি, সে তোমার সইবে। কিন্তু আমার বুকের ওপরে যে পাথরের বোঝা নিয়ে গেলুম, সে বোঝা আমার ইহকালে তো ঘুচ্‌লোই না, পরলোকেও ঘুচ্‌বে কি না কে জানে!

যে ঝরণাটাকে বাইরে রোধ ক'রে এসেছিলুম সে ঝরণাকে আর রোধ করতে পার্‌লুম না, ঝর্ ঝর্ ক'রে তা মিনতির হাতের ওপরেই ঝ'রে পড়তে লাগ্‌ল। ধারার স্পর্শ পেলে যূথীর দলগুলো যেমন হঠাৎ আচম্‌কা ফুটে' ওঠে, তেমনি একটু মিষ্টি হেসে মনু বল্‌লে—ছিঃ সমীরদা, আমার যাওয়ার পথটাকে আর ভিজিয়ে দিও না ভাই। যে শক্তি

নিয়ে মানুষ পিছল পথে পা বাড়ায় সে শক্তি যে আমার নিঃশেষেই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

অসম্বৃতের মতো সেই অদ্ভুত অপূর্ব্ব হাসিটির ওপর উত্তপ্ত ব্যগ্র ঠোঁটের একটা স্পর্শ ঢেলে দিয়ে বল্লুম—তোমার তো যাওয়া হবে না মিনু। একলা এখানকার মরুভূমিতে আমি থাকতে পারব না। দেখছ তো বিনা রোগেই তোমার সমীরদা কেমন শুকিয়ে উঠেছে!

তার চোখের সেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর ফেলে মিনু বল্লে—পাঁকের ভেতর যে ফুল ঝ'রে পড়ে তা দিয়ে তো কখনো দেবতার পূজা হয় না। একটু আগে যে স্পর্শটা তুমি আমার ক্লেদ-ক্লিন্ন অধরের ওপর ঢেলে দিয়েছ সেই আমার ঢের। আমার পরপারের অন্ধকার পথ তারি আলোকে আলোময় হ'য়ে উঠেছে। এর বেশী আমিও চাইনে, তুমিও চেয়ো না সমীরদা।

শীর্ণ দেহটাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লুম—কাদা হয় তো কিছু তোমার গায়ে লেগেছিল মিনু। কিন্তু কাদা তো অত্যন্ত ক্ষণিকের জিনিষ। সে কাদা তো কবে ধুয়ে' মুছে' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে উঠে গেছে। তা ছাড়া সোনার ভেতরের খাদকেই যদি শুধরে নিতে না পারবে তবে প্রেমের আগুন রয়েছে কেন?

ধীরে ধীরে আমার আলিঙ্গনের ভেতর থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে মিনতি বল্লে—তা হয় না সমীরদা, পাঁককে পরিষ্কার করতে গেলে সে যে পরিষ্কার জলকেও ঘোলা ক'রে তোলে। দিনও তো আমার ফুরিয়ে এসেছে ভাই, ঐ শোনো, বীণাতে আজ বিদায়ের সুরই বাজছে, মিলনের কোনো রাগিণীই তো এর সঙ্গে খাপ খাবে না।

তার পর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে প'ড়ে থেকে তার শুভ্র শীর্ণায়মান হাত দুটোর ভেতর আমার হাত দু'টোকে টেনে নিয়ে সে আবার বল্লে—পৃথিবীর আলো আমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে সমীরদা। আমি যেতে চাই—কিন্তু যেতে পারছিনে।—কেন জানো? পিছন থেকে আমাকে টানছে আমার ঐ নাম-গোত্রহীন মেয়েটা। তার ভার তুমি নাও ভাই, নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও। পাঁকের ভেতর সে জন্মেছে বটে, কিন্তু পাঁকেই তো পঙ্কজও জন্মে। ঐ দোলার ভেতর সে ঘুমিয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, তার মা'র গ্লানি তার দেহকে এতটুকু স্প[র্শ] করতে পারে নি।

আস্তে আস্তে মিনতির মাথাটা বালিশের ওপর নামি[য়ে] দিয়ে দোলার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলুম, একটি রক্ত মাংসের শতদল, শুভ্র শয্যার বুকটা আলো ক'রে ফুটে রয়েছে। দুর্য্যোগ রাত্রির পরে ভোরের মুখে যে হাসি ফুটে' ওঠে, তার মুখেও তেমনি একটি স্নিগ্ধ হাসির রেখা। ঘুমন্ত শিশুটিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বল্লুম—এ যে একেবারে তোমার ছেলেবেলার চেহারাটাকেই ফিরিয়ে এনেছ মিনু!

ম্লান হেসে মিনতি বল্লে—আশীর্ব্বাদ করো সমীরদা, আমার মতো দুর্ভাগিনী না হয়। ওকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। ওর রক্তের ভেতর যে দোষটা থাকল, তোমার হাতের স্পর্শে তারও গ্লানিটা যেন ওর ঘুচে' যায়।

পঙ্কজকে কোলে নিয়ে মিনতির কাছে ফিরে এসে বল্লুম—তোমার আমার জন্য না চাও, এই নিষ্কলঙ্ক শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে, দু'দিনের জন্য হোক, এক দিনের জন্য হোক্ তুমি আমার ঘরে চলো। একে এমন ক'রে নাম গোত্রহীন ক'রে রেখে যেও না ভাই।

মিনতির তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টির ভেতর হঠাৎ যেন একটু বিহ্বলতার আমেজ জেগে উঠল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পরেই দেখি, তার চোখে আগুনের মতো সেই আলোটা আবার ফিরে এসেছে, যার সামনে কোনো অন্ধকারই টিকতে পারে না। সেই দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বল্লে—মিথ্যার দ্বারা ওর মায়ের কলঙ্ক ঢেকে ওকে সুখী করতে পারবে না সমীরদা। তার চেয়ে ও যা ওকেও তাই জানতে দিও, জগৎকেও জানতে দিও। দুঃখের আগুনে পুড়েই যে মানুষ সোনা হয় তার পরিচয় আমার এই জীবনেই আমি পেয়েছি।

মিনতির চোখের আগুন তখন আমার বুকের ভেতরে আলোর রেখা এঁকে দিয়েছে। সে আলোকে সত্যের রূপটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতেই আমি বল্লুম—বেশ তাই হবে মিনু। যে দুঃখের বজ্র বুকে নিয়ে তুমি সত্যকে লাভ করেছ, তার গৌরব হ'তে তোমার মেয়েকেও আমি বঞ্চিত করব না। মানুষের জীবনে যে দুর্ব্বলতা প্রতিদিনকার ঘটনা, তাকে গোপন ক'রে অনেক

অনাচার সমাজের ভেতর বেড়ে উঠেছে। তোমার মেয়েকে দিয়েই যদি তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করতে চাও, আমি তাকে সেই যুদ্ধের উপযোগী ক'রেই গ'ড়ে তুলব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ভাই, ওর ভার আমি নিলুম।

চেয়ে দেখি মিনতির মুখ একটা আকস্মিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। সে দীপ্তিতে ঝরার গানের কথাই লেখা, কিন্তু সে ঝরার গানের ভেতর হ'তে বেদনার রেখাটাও নিঃশেষে মুছে গেছে।

* * * *

এর কয়েক দিন পরে নীতীশ তার বন্ধু সমীরের কাছ থেকে যে চিঠি পেলে তাতে লেখা ছিল—

এই-মাত্র মিনতির শ্মশান থেকে ফিরে আস্‌ছি, কাপড় বদ্‌লানো হয় নি। টেবিলের ওপর আমার টোটা-ভরা রিভলভারটা প'ড়ে আছে অদৃশ্য আগুনের তড়িৎ স্পর্শটাকে ধূমায়িত ক'রে তোল্‌বার জন্য। তোমার শিল্পী বন্ধুকে সাবধান ক'রে দিও। তাকে ব'লো—সমীর সেন বিলাতে গিয়ে লেখা-পড়া যতটুকু শিখে এসেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ক'রে শিখে এসেছে জানোয়ারকে শায়েস্তা কর্‌তে। পশুর চেয়ে বড় জানোয়ার যে মানুষের মধ্যেই আছে সে কথা তোমার এই বন্ধুটি যেমন জানে আর কেউ তেমন জানে না।

আল্‌পসের গুহায়, আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে বড় বড় শিকারীদের হাত হ'তে বন্দুক যখন খ'সে পড়েছে—যার তা'ক তখনো ব্যর্থ হয়নি, সেই আবার নতুন ধরণের পশুর রক্ত-লোলুপতায় মেতে উঠেছে। আমার রিভলভারটি তার তারাহীন চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি হেনে বল্‌ছে, এবারেও ব্যর্থ হবে না।

আমার এ চিঠির মর্ম্ম তুমি বুঝ্‌বে কি না জানিনে, কিন্তু তোমার বন্ধুর কাছে এর অর্থ ধরা পড়্‌তে একটুও দেরী হবে না। তাকে ব'লো, মিনতির মেয়েকে নিয়ে আমি বিলেতে চল্‌লুম। যোগাড়-যন্ত্র করে বেরিয়ে পড়্‌তে যে কয়দিন দরকার, জীবনের প্রতি যদি তার মায়া থাকে তবে সে কয়দিনের ভেতর যেন আমার চোখের সাম্‌নে ধরা না দেয়।......

চিঠি পেয়ে নীতীশ বিহ্বলের মতো খানিকক্ষণ ব'সে রইল। তারপর নিজের মনে মনেই বল্‌লে—সমীরের মাথাটা দেখ্‌ছি একেবারেই বিগ্‌ড়ে গেছে!

পদব্রজে সুন্দরবন

শ্রীসরোজেন্দ্র গুহ

যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেলের ছাত্র আমরা একদিন বিকাল-বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। হঠাৎ আমাদের মাথায় এক খেয়াল চাপিল—এই শিবরাত্রির বন্ধে কোথাও বেড়াইয়া আসা চাই। তখন আমরা ঠিক করিলাম—ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত ট্রেনে যাইয়া তারপর পদব্রজে সুন্দরবনের সাগর-দ্বীপ ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন করিয়া আসিব।

ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে হয় ত আমাদের এই অভিযানের কোন মূল্য নাই। কারণ, রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীর কৃপায় অনেকেই অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াইয়া আসিতে পারেন; এবং তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনী হয় ত শুনিতে খুবই সুন্দর লাগিতে পারে। তবে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ অঞ্চলে বনের পথে কোন ভ্রমণকারী গিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। সুন্দরবন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অনেক রকম অদ্ভুত ধারণা আছে। অনেকে হয়ত মনে করেন, এখানে কেবল বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুই থাকে, লোকের বসতি নাই। সেই জন্যই, প্রত্যক্ষ ভাবে এই জায়গাটার পরিচয় পাইতে, এবং—সমুদ্র দেখিতে পাইব, তাহাও কম লোভনীয় নহে,—তা আমরা সাগরদ্বীপ যাওয়াই ঠিক করিলাম। নির্দ্ধারিত দিনে (১১ই ফেব্রুয়ারী) আমরা সাত জন রাত্রি ৯-৪২ মিনিটের গাড়ীতে যাদবপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার রওনা হইলাম। সঙ্গে আমাদের জিনিস-পত্র বিশেষ কিছুই ছিল না,—এক একখানা করিয়া কম্বল, একটী জলের ফ্লাস্ক, রৌদ্র নিবারণের জন্য টুপী এবং কয়েক-খানা মোটা বড় লাঠি। সুন্দরবন ও সাগরদ্বীপের ফটো

তুলিয়া লইব মনে করিয়া আমরা একটা ক্যামেরাও সঙ্গে লইয়াছিলাম।

১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১১টায় আমরা ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছি। যাদবপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। ষ্টেসনে নামিয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে সমুদ্রের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, সে তো পাঁচ মিনিটের রাস্তা এখান থেকে, অর্থাৎ সমুদ্র বলতে মাষ্টার মহাশয় গঙ্গা নদীকেই বুঝিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে গঙ্গাসাগরের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন সে অ—নেক দুর। তাঁহার নিকট হইতে আমরা কোন আশ্বাস ও সাহায্যের বাণী পাইলাম না। ষ্টেসনে আমাদের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি ঐ অঞ্চলে কিছু দিন ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা খবর পাইলাম। তিনি আমাদিগকে ডায়মণ্ড-হারবার হইতে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন এবং এই পথটা নৌকায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই পথটা খুব খারাপ এবং ৫।৭ মাইল কেবল জলের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। তাঁহার পরামর্শই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে তাঁহার এই খবর যে অমূলক, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

নৌকাঘাটে আসিয়া কচুবেড়ে (কাকদ্বীপের অপর পার) পর্য্যন্ত যাইবার জন্য নৌকা ভাড়া করা গেল। নৌকায় ওঠা—সে এক মজার ব্যাপার। আমাদের সহযাত্রী নলিনীর দেহের দৈর্ঘ্য এবং নৌকার উচ্চতা এমনি একটা গোল পাকাইয়া দিল যে, বেচারীর তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া মুস্কিল হইল—আমাদের সাহায্য লইয়া বেচারী নৌকায় উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। রাত্রি ১—১৫ মিনিটে নৌকা ছাড়া গেল। তখন নদীতে ভাঁটা ছিল। নৌকা পাল তুলিয়া চলিল। নৌকার চেহারা এক ভিন্ন রকমের। উচু গাদা বোট —পিছনে একটা হাল ও দুইটা দাঁড় মাত্র আছে। আমরা নৌকায় উঠিয়া নানা গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম। সঙ্গীদের মধ্যে দুই একজন গানও ধরিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবী আসিয়া গান ও গল্প দুই-ই বন্ধ করিয়া দিলেন।

ভোরে উঠিয়া সূর্য্যোদয় দেখিলাম। নদীর কোল হইতে

পদব্রজে যাত্রা আরম্ভ (নৌকা হইতে অবতরণ)

সূর্য্য ক্রমে ক্রমে উঁকি মারিয়া আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠিতেছে,—পূর্ব্বাকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে। প্রথমে আমরা যে গ্রাম পাইলাম, তাহার নাম কচুবেড়ে। গ্রামটী ঐ অঞ্চলের তুলনায় বেশ বর্দ্ধিষ্ণু বলিয়াই মনে হইল, এবং তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ মনোহর। অনেকগুলি গরু মাঠে চরিতেছিল এবং কতকগুলি গরু নদীর ধারে আসিয়া বুক পর্য্যন্ত কাদায় ডুবাইয়া ঘা'স খাইতেছিল।

ভোর সাতটার সময় জোয়ার আসিল এবং আমাদের নৌকার গতিও মন্দীভূত হইয়া পড়িল। তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া নৌকা ত্যাগ করিয়া ডাঙ্গায় নামিতে হইল। ৮-৪৫ মিনিটের সময় আমরা হাঁটা-পথে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কতক্ষণ চলিবার পর মরিগঙ্গার হাটে আসিয়া কয়েক দিনের আন্দাজ খাবার কিনিয়া কাঁধে বাঁধিয়া রওনা হইলাম।

ভাটায় খাল জলশূন্য, কাদায় ভরা। বাম হইতে দক্ষিণে :—মনোরঞ্জন, সরোজ, নীহার, দ্বিজেন, পথপ্রদর্শক অমূল্য

এইবার সাগরদ্বীপের ইতিহাস একটু বলা যাক্, নইলে ভ্রমণ বৃত্তান্তই যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া সাগরদ্বীপ গঠিত। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই দ্বীপপুঞ্জকে "সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটী" নামক এক কোম্পানীকে পত্তনি দেন। এই কোম্পানীতে ইয়োরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয় শ্রেণীর লোকই ছিলেন। তাঁহারা এখানে লোকজন বসাইয়া চাষ-আবাদে কিঞ্চিৎ সফলও হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৬২ ও ১৮৭২ সালে সাগরদ্বীপে ভীষণ বন্যা হইয়া সমস্ত দ্বীপ বন্যাজলে বিধৌত হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেক প্রজার প্রাণহানি হয়। "সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটী"ও ফেল হইয়া যায়। কোম্পানীর যাঁহারা ট্রাষ্টী ছিলেন তাঁহারা দ্বীপকে ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চাষ আবাদ ও লবণের কারবার করিতে লাগিলেন। সাগরদ্বীপের দক্ষিণ দিক লইয়াছিলেন পামার কোম্পানী ও উত্তর দিক লইয়াছিলেন ম্যাকিণ্টস ও হাণ্টার কোম্পানী। সাহেব কোম্পানী ফেল হইবার পর protective tank * এর সৃষ্টি করিয়া সমস্ত দ্বীপ পুনরায় বিলি করা হয় ও এবং তখন হইতে ইহা

* Sea level হইতে ৬০।৭০ ফিট উচ্চ একটু জায়গায় পুকুর এবং তাহার চারিদিকে লোক থাকিবার উপযুক্ত জায়গা। সমতল ভূমি হইতে উচ্চ স্থানে উঠিতে চারিদিকে রাস্তা আছে। বন্যা হইলে প্রজারা সেখানে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইতে পারে।

দেশীয় লোকের দখলে আসে। দ্বীপের দক্ষিণাংশ ধবলাট ৺অদ্বৈতচন্দ্র দত্ত, এবং উত্তরাংশ রাজা প্যারীমোহন মুখাৰ্জ্জি ও কালীকুমার মণ্ডল মহাশয় জমা লয়েন। এখন তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সমস্ত জায়গায় চাষ আবাদ করাইয়া জমিদারী ভোগ করিতেছেন। বাকী যে সমস্ত জমি ছিল তাহা গভর্ণমেণ্ট অন্য লোককে বিলি করেন; কিন্তু

আলোক-ঘর ও Manual সাহেবের বাড়ী

সর্ত্ত অনুসারে protective tank করিতে না পারায়, বছর দশেক হইল তাহাদের জমি বাতিল করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নিজেরাই জঙ্গল কাটিয়া খুচরা প্রজা পত্তন করিতেছেন।

সাগরদ্বীপের দক্ষিণদিকে একটী বাতিঘর (light house) আছে। সমুদ্রে গমনকারী জাহাজ সকল তাহার আলোতে পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারে। এই দ্বীপের নিকটে গঙ্গাসাগরে প্রত্যেক পৌষ সংক্রান্তিতে একটী বড় মেলা হয়; তাহাতে ভারতবর্ষের নানাদেশ হইতে যাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হয়। লক্ষাধিক লোক এই মেলায় সমবেত হয়। এখানে ৺কপিলমুনির আশ্রমও আছে।

এই দ্বীপেরই দক্ষিণ দিকে ধবলাটে ৺ বিশালাক্ষী দেবী বড় প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত দেবতা। সাগরস্নানের নৌকাযাত্রীরা পথে ৺ বিশালাক্ষী দেবীকে দর্শন ও পূজা করিয়া যায়।

দ্বীপের উত্তরাংশে Mud-point (ঘোড়ামারা), এবং বাতিঘর হইতে কলিকাতায় টেলিগ্রাফ করা যায়। সমস্ত দ্বীপের মধ্যে কেবল মরিগঙ্গায় একটী থানা এবং মনসাদ্বীপ ও মরিগঙ্গায় ২টী পোষ্ট আফিস আছে। সাগরদ্বীপের কচুবেড়ে হইতে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রত্যহ জোয়ারের সময় একবার করিয়া খেয়া নৌকা লোককে পারাপার করে ও মেদিনীপুর কাঁথির পেটুয়া ঘাট হইতে এই দ্বীপের ফুলডুবী ঘাটে একদিন অন্তর ষ্টীমার আসে। সাগরদ্বীপে কচুবেড়ে হইতে মগরার ভিতর দিয়া ধবলাট পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের একটী রাস্তা আছে।

সাগরদ্বীপের বনজঙ্গলে কৃপাল, সুন্দরী, গড়ান, বগরা, হেতাল, গেঁয়ো, ফলিসা ইত্যাদি নানা জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুন্দরী বৃক্ষই খুব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। দ্বীপের অনেক অংশই এখন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। এই সকল জঙ্গলে এখন বড় বড় বাঘ, বন্য বরাহ ও হরিণ এবং ময়াল, ঢোঁড়া, রানা প্রভৃতি বড় বড় সাপ পাওয়া যায়। খুব বিষাক্ত সাপ এখানে নাই; কারণ নোনা জলে সাপের বিষ থাকিতে পারে না। শস্যাদির মধ্যে এখানে কেবল ধানই প্রচুর পরিমাণে জন্মে; অন্য কোন ফসল হয় না।

সাগরদ্বীপের প্রায় পনের আনা লোকই মেদিনীপুরের অধিবাসী। ইহাকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত না বলিয়া

মেদিনীপুরের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গরীব চাষা হইতে লাটদার পর্য্যন্ত সকলেই এক দেশের। খুব অল্প সংখ্যক বুনো কোল, ভীলও এখানে আছে।

এইবার আবার ভ্রমণ-কথা আরম্ভ করা যাক্। হাঁটিতে হাঁটিতে বেলা ১২টায় আমরা কয়লাপাড়া পঁহুছিলাম। এইখানে আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলপান করিয়া শান্ত ও সুস্থ হইলাম। পুনরায় যাত্রা করিব, এমন সময় স্থানীয় কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদিগকে বলিল যে, এই অঞ্চলে ভয়ানক মারিভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং আমরা যেন যে-সে জায়গায় জল এবং খাবার না খাই। অধিকন্তু আমাদের সহিত যে খাবার ছিল, তাহাও এখানে খাইয়া শেষ করিয়া কিম্বা ফেলিয়া যাইতে বলিল। তাহাদের এই কথার কোন তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। যাহা হউক, আমরা তাহাদের পরামর্শমত খাবার ফেলি নাই; ফেলিয়া গেলে আমাদিগকে বেশ মুস্কিলে পড়িতে হইত।

বেলা ১২-১৫ মিঃ কয়লাপাড়া হইতে রওনা হইলাম। এবার আমরা শিকারপুরের ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম। চলিবার পথে আমাদের সহিত এই অঞ্চলের সেটেল্‌মেণ্ট আফিসার মিঃ আর সেনের দেখা হইল। উনি তখন সাইকেল কাঁধে করিয়া একটা খালের উপরের ভাঙ্গা বাঁশের পুল পার হইতেছিলেন। তাঁহাকে রাস্তা ঘাটের সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করায়, পকেট হইতে মানচিত্র বাহির করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এখান হইতে মনসাদ্বীপ (তাঁহার ক্যাম্প) ৮ মাইল এবং সেখান হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ১০ মাইল,—এই মোট ১৮ মাইল রাস্তা। তিনি আমাদিগকে আরও বলিলেন যে, গঙ্গাসাগরে বাস করিবার মত কোন জায়গা নাই; এবং আমরা কেন গঙ্গাসাগরে যাইতেছি তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা আমাদের অভিযানের কথা বলিলে তিনি আমাদিগকে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া ধবলাট (মনসা দ্বীপ হইতে ৪ মাইল দূরে সমুদ্রতীরস্থ একটী স্থান) যাইতে বলিলেন; কারণ সেখানে গেলে আমাদের সমুদ্র দেখাও হইবে এবং সুন্দরবনেরও একটা ধারণা জন্মিবে। তাঁহার যুক্তিই সমীচীন মনে করিলাম। গঙ্গাসাগর যাওয়াই যে আমাদের উদ্দেশ্য, তাহ নহে; কারণ আমরা তীর্থ করিতে যাইতেছি না।

বনের ভিতর পথ

দুপুর রৌদ্রে আমরা পথ চলিতেছি। চারিদিকে ছোট ছোট জঙ্গল। মাঝে মাঝে হেতাল গাছের কুঞ্জ দেখা যাইতেছিল। মনে হয় কে যেন ইহা রোপণ করিয়াছে। চারিদিকে জন-মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই। যাহারা এ

অঞ্চলে বাস করিত, তাহারা মারিভয়ে পলাইয়াছে। আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দিবার জন্য একজন লোকও পাইলাম না। ভাগ্যিস মিঃ সেন সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিলেন! তাঁহার সাইকেলের চিহ্ন দেখিয়া আমরা রাস্তা চলিতে লাগিলাম। মিঃ সেনকে খুব ভাল আরোহী বলিতে হইবে। ঐ পথে কেহ যে সাইকেল চালাইতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। রাস্তার কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, কোথাও আধ হাত চওড়া আর কোথাও বা ৪ আঙ্গুল মাত্র পথ—খুব সাবধানের এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সাইকেল চালাইতে হয়।

কারণ আমাদিগকে পার করিতে পারিলে তাহার প্রায় এক মাসের রোজগার হইবে। এ অঞ্চলে কোন লোকের বিশেষ যাতায়াত নাই। কাজেকাজেই উহার মাসিক রোজগার ৫।৬ আনার অধিক হয় না; তাই বেচারীর আমাদিগকে দেখিয়া মহা আনন্দ।

আমরা নৌকায় উঠিব—তাহাও এক ঝঞ্চাটের ব্যাপার। খানিক গভীর কাদা মাড়াইয়া যাইয়া নৌকায় উঠিতে হইল; কারণ, তখন ভাঁটা আরম্ভ হইতেছিল। নৌকায় যে আমরা একটু আরাম করিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িব, তাহারও জো ছিল না। কারণ নৌকা বেশ ছোট ও ভয়ানক নড়াচড়া করে। তাই

কপিলমুনির আশ্রম ও টুণ্ডেল দেরাজতুল্লা

বেলা প্রায় ২-৪৫ মিঃ চেঁওয়াগাড়ী খালের ধারে আসিয়া উপস্থিত হই। এই খাল পার হইলেই মনসা দ্বীপ। কচুবেড়ে হইতে মনসা দ্বীপ প্রায় ২০ মাইল হইবে। দুর হইতে ঐ পারে সেটেলমেণ্ট অফিসারের ক্যাম্প দেখিতে পাইলাম। কিন্তু খেয়াঘাট খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল; কারণ খেয়া নৌকা এপারে ছিল না। ঐ পার হইতে খেয়া মাঝি আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া খুব উৎসাহ সহকারে নৌকা লইয়া আমাদের কাছে আসিল;

খোলের ভিতর গুটিশুটি মারিয়া চুপ করিয়া বসিতে হইল, —একটু নড়িলে চড়িলেই নৌকা ডুবিবার বিশেষ ভয়। খালটী ছোট নহে, খুব বড় এবং ঢেউও তাতে বেশ আছে।

অতি কষ্টে পরপারে আসিয়া খেয়ামাঝিকে সন্তুষ্ট করিয়া, এবং পুনরায় কাদা ভাঙ্গিয়া সেটেলমেণ্টের ক্যাম্পে আসিয়া আড্ডা লইলাম। মিঃ সেন তখনও বাড়ী ফেরেন নাই। তাঁহার কর্ম্মচারী ভূপেনবাবু আমাদিগকে যাইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন যে ধবলাটের রাস্তা ভয়ানক খারাপ,—

আমাদিগের এই সময় যাইতে যথেষ্ট কষ্ট হইবে। আমরাও দেখিলাম যে, এখানে যখন বেশ আশ্রয় পাওয়া গেল এবং রাত্রিতে ভাত খাইবার আশাও রহিল, তখন অনিশ্চিতের পথে না যাইয়া নিশ্চিত যাহা পাইয়াছি তাহাকে ধরিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেইজন্য এইখানেই রাত্রি যাপন করিব বলিয়া রহিয়া গেলাম। ভূপেনবাবু ও স্থানীয় 'জানাদের' কাছারীর নায়েব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন আমরা ভ্রমণের প্রোগ্রাম করিলাম যে, ভোরে উঠিয়া মগরা সাসমলদের কাছারীতে যাইয়া জিনিষপত্র সেখানে রাখিয়া বাতিঘর দেখিতে যাইব; এবং সেখান হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে যাইয়া সমুদ্র দর্শন ও স্নান করিয়া পুনরায় মগরা ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর পথে রওনা হইব।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ভোর ৫টায় ঘুম হইতে উঠিলাম। সুন্দরবনে প্রথম রাত্রি প্রভাত। ভোরে উঠিয়াই মনে হইল এ যেন কোন অপরিচিত জায়গায় আসিয়াছি। সবই যেন আমাদের কাছে কি রকম নূতন নূতন লাগিতেছে। এখানে বিশাল নগরীর কর্ম্মকোলাহল নাই; কিম্বা পল্লীগ্রামের পাখীর প্রভাতী গান নাই; আছে শুধু তেপান্তর মাঠের নির্জ্জনতা ও ধূসর ছবি।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া জিনিষপত্র কাঁধে বাঁধিয়া ৬-২০ মিঃ মনসা দ্বীপ ত্যাগ করিলাম। সুরেন নামক একটী স্থানীয় লোককে গাইড হিসাবে আমাদের সঙ্গে লইলাম; কারণ, সঙ্গে রাস্তাঘাট-জানাশুনা লোক না থাকিলে এই অঞ্চলে পথ চলিতে যে কিরূপ বিষম বেগ পাইতে হয়, তাহা পূর্ব্ব দিন আমরা কিছু উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

৭ ১৫ মিঃ মগরা পৌছান গেল। মনসাদ্বীপ হইতে মগরা প্রায় ৪ মাইল। সেখানে জিনিষপত্র রাখিয়া লাইট-হাউস অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন ভাঁটা হইয়াছে—সমস্ত খাল ও নদীতে একটুও জল নাই,—একদম গভীর কাদায় ভরিয়া রহিয়াছে। খানিকদূর চলিবার পর আমাদিগকে বেগখালির খাল পার হইতে হইল। খুব গভীর পাঁকে তাহা ভরা ছিল। সহযাত্রী নলিনীর অবস্থা ভীষণ,—পাঁকে ডুবিয়া যায় আর কি! মামার (দ্বিজেন কর) অবস্থা তাহার্ অপেক্ষাও অধিক শোচনীয়!

বেলা ৯—১৫ মিঃ লাইট-হাউসে পৌছিলাম। মগরা

ধবলাট দত্তদের বাড়ী—বিশালাক্ষী মন্দির ও Protoctive tank

হইতে লাইট-হাউস প্রায় ৫ মাইল। বাতিঘরের অধ্যক্ষ A. T. Manual সাহেবকে আমাদের উদ্দেশ্য বলায়, তিনি আনন্দের সহিত আমাদিগকে লাইট-হাউস দেখিতে অনুমতি দিলেন; এবং ভিতরে বেশী লোক ধরিবে না বলিয়া আমাদিগকে দুইজন দুইজন করিয়া ভিতরের সিঁড়ি দিয়া লাইট-হাউসের উপরে উঠিয়া দেখিতে বলিলেন। তাঁহার

মানচিত্র

কথা অনুসারে আমরা দুইজন করিয়া উপরে উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং অন্যান্য সকলকে তিনি তাঁহার ঘরে যত্ন করিয়া বসাইয়া টেলেস্কোপ দিয়া সমুদ্র দেখাইয়া Light-house সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। লাইট-হাউসটী দেখিতে বেশ সুন্দর। তাহার অপেক্ষাও সুন্দর সাহেবের অমায়িক মধুর ব্যবহার।

সমুদ্র-পথে চলাচল করিতে জাহাজের পক্ষে এই বাতি-ঘরের বিশেষ দরকার। এইখান হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম নিকটেই। কোন জাহাজকে সমুদ্র হইতে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে হইলে, প্রথমে তাহাকে তাহার জাতীয় পতাকা উড়াইতে হইবে। তার পর এই লাইট-হাউস হইতে পতাকা উড়াইয়া অনুমতি দিলে পর, সে গঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারিবে। এ নিয়মের ব্যতি-ক্রম করিলে কোন জাহাজ-কেই আসিতে দেওয়া হয় না।

সীমাপুরে (সাগরমেলার নিকটে) এই বাতি-ঘরেরই একটী টুণ্ডেল থাকিয়া, জোয়ারের সময় সমুদ্রের যে পথে জাহাজ যাতায়াত করে, তাহাতে স্বাভাবিক জলের উপর কত জল আছে তাহা মাপে, এবং সেখানে একটী খুব উচ্চ flag-staffএ সাঙ্কে-তিক ভাষায় তাহা দেখাইয়া থাকে। উহা দেখিয়া সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করে। সীমাপুর জলমাপঘর হইতে বাতিঘর পর্য্যন্ত টেলিফোন আছে। সীমাপুর হইতে জোয়ার ভাঁটার রিপোর্ট বাতিঘরে পাঠান হয় এবং সেখান হইতে তাহা প্রত্যহ ৪ বার করিয়া কলিকাতা পোর্টকমিশনার অফিসে প্রেরিত হইয়া থাকে।

বেলা ১০—৩৫ মিঃ আমরা লাইট-হাউস হইতে সাগর-মেলায় রওনা হইলাম। তখন জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে; তাই আমরা সমুদ্রের তীরের রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতে

পারিলাম না। আমাদিগকে ঘন বনের ভিতর দিয়া কর্দ্দমাক্ত রাস্তা দিয়া যাইতে হইল। ম্যানুয়েল সাহেব টেলিফোন করিয়া আমাদিগকে রাস্তার ব্যবস্থা ও তাঁহার টুণ্ডেলের বাড়ীতে খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং টুণ্ডেলকে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিলেন। সাহেবের সৌজন্যেই এই জনহীন জায়গায় আমাদের উত্তম আহার ও ততোধিক প্রয়োজনীয় সুশীতল পানীয় মিলিয়াছিল।

বেলা ১—১৫ মিঃ আমরা সীমাপুরের জল-মাপ-ঘরে (৬ মাইল দূরে) আসিয়া পঁহুছি। এবার আমাদিগকে খুব গভীর বনের মধ্য দিয়া আসিতে হইল। গভীর বনের মধ্যে লোক-চলাচলের জন্য যে সরু রাস্তা থাকে, তাহাকে 'সয়েলের' রাস্তা বলে। পথের মধ্যের একটী ছোট খাল আমরা এক অভিনব ও অভাবনীয় উপায়ে পার হইলাম। খালের গভীরতা যথেষ্ট। নৌকা নাই। সাঁতার দেওয়া ব্যতীত কি উপায়ে কাপড় বাঁচাইয়া পার হইব তাহার বুদ্ধি জোগাইতেছি, এমন সময় অতি লম্বা নলিনী এক অসমসাহসের কাজ করিয়া বসিল। খালের অপর পারের একটী জীবন্ত সুন্দরী বৃক্ষ হেলিয়া এপারের নিকটেই জলে পড়িয়াছিল,—নলিনী এপার হইতে গাছের সরু ডাল ধরিয়া অতি জোরে এক লাফ দিয়া গাছের অপেক্ষাকৃত মোটা ডালের উপর যাইয়া পড়িল; এবং গাছের ডাল অবলম্বন করিয়া পরপারে পঁহুছিল। নলিনীর অবস্থা দেখিয়া এবং শাস্ত্রোল্লিখিত মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিতে যাইয়া 'মামা' (দ্বিজেন কর) এক বিরাট হাসির পাহাড় সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। আনন্দের আবেগে (কারণ অতি অল্পেই মামার আনন্দ ও হাসি হয়) মামার পা হোচট খাইয়া ডালে না থাকিয়া জলে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মামাকেও খালে ডুবাইয়া দিল। বেচারী নাকানি চুবানি খাইয়া উঠিল। মামার ইত্যাকার অবস্থা দেখিয়া হাসি চাপিতে যাইয়া (কারণ অপরকে হাসিতে দেখিলে মামা বড় রাগ করেন) অমূল্য ভায়ার (সাধু) হাতের লাঠি ও মাথার টুপী জলে পড়িয়া গেল। যাহা হউক কোন মতে খাল পার হইয়া আসিলাম।

খানিক দূর চলিবার পর আমরা একটী নদীর উপরে সুন্দরী বৃক্ষ ও লতা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত পুল পাইলাম। ভারি সুন্দর সে জায়গার দৃশ্যটা। কূলে কূলে ভরা নদী ছল ছল করিয়া সাগরের পানে চলিয়াছে। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল। পুলের উপর উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু গাইড আমাদিগকে কোন মতেই সে জায়গায় বেশীক্ষণ থাকিতে দিল না; কারণ, ভরা দুপুরে নাকি বাঘেরা জল খাইতে জঙ্গলের নিকট জলাশয়ে আসে। মোটের উপর এই রাস্তাটুকু চলিতে আমাদের কাদার জন্য বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সীমাপুরে পঁহুছিয়া টুণ্ডেলের সঙ্গে দেখা করিয়া আমরা সমুদ্র-স্নান করিতে ছুটিলাম। সেখান হইতে সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল, কিন্তু সম্মুখে বন ছিল বলিয়া সমুদ্র দেখা যাইতেছিল না। ফটোগ্রাফার ও আর্টিষ্ট অরুণ ভায়া পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখেন নাই। তিনি সমুদ্রের রূপ ও তরঙ্গভঙ্গী মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ নীহার সমুদ্রবিষয়ক গান ধরিলেন। সদানন্দ মামা হৃদয়ের ভাবের আবেগে লাফাইতে লাগিলেন। নলিনী ও অমূল্য ভায়া (বৈরাগী ও সাধু) এখানে কোন বাবাজি কিম্বা মাতাজীর সন্দর্শন মিলিবার সম্ভাবনা আছে কি না, সে বিষয়ে গোপনে গোপনে (যদিও সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছিল) আলোচনা করিতেছিল; সর্ব্বদা-তৃষ্ণার্ত্ত মনোরঞ্জন সমুদ্রের জল পান করিতে পারিবে কি না এবং কতখানি পারিবে তাহার একটা মীমাংসা করিতেছিল। আমি বেচারী আর কি করিব—খাতা পেন্সিল লইয়া তাহাদের মনের ভাব টুকিতেছিলাম।

অতি অল্পকাল মধ্যে বনভূমি পার হইলে পর আমরা সমুদ্র দেখিতে পাইলাম এবং গঙ্গাসাগর-মেলার ভূমি পার হইয়া আসিয়া সাগরের মৃদু পরশ লইলাম। মনের আনন্দে অনেকক্ষণ সমুদ্র-স্নান করিলাম। পুরীর সমুদ্রে যেমন জলে নামিলে কেবল বালু, এখানে তেমন নহে। প্রথমে সমুদ্রের ধারে নদীর আঁটাল মাটি; তারপর বালু ও মাটি মিশ্রিত। কাজেকাজেই এখানে একটু সাবধানতা সহকারে স্নান করিতে হয়, নতুবা পা পিছলাইয়া যাইতে পারে। ইহার কারণ আর কিছুই না,—এখানে সাতবেকী নামে একটী নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে—তাহার আঁটাল মাটিতে সমুদ্রের এই অবস্থা হইয়াছে।

আমরা ছাড়া সমুদ্রে আর কোন লোকই স্নান করিতে-ছিল না। এখানে সমুদ্র কি রকম তাহার আমরা কিছুই জানি না, তাই আমরা বেশী দূর গেলাম না। তবে আমরা যতদূর

গিয়াছিলাম তাহাতেই আমাদের গাইড বেশ ভয় পাইয়া গিয়াছিল এবং আমাদিগকে বার-বার ফিরিয়া আসিতে বলিতেছিল।

এই জায়গাটাকে যে কেন গঙ্গাসাগর-সঙ্গম বলা হয়, তাহা আমরা বুঝিলাম না; কারণ, সাগরের ও গঙ্গার যেখানে সঙ্গম হইয়াছে, তাহা এখান হইতে কিছু দূর পশ্চিমে। যে জায়গাটায় যাত্রীরা নানা দেশ-দেশান্তর হইতে আসিয়া মিলিত হয় ও স্নান করে এবং যে জায়গাটায় মেলা হয়, তাহা গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে নহে, সাতবেকী নদীর যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গম হইয়াছে, সেই জায়গায়। পূর্ব্বে হয়ত গঙ্গা-সাগরের সঙ্গম খুব নিকটেই কোথাও ছিল; এখন হয়ত চড়া পড়িয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। না হয়, এই জায়গাটায় কপিলমুনির আশ্রম আছে বলিয়াই এখানে সাগর-সঙ্গম স্নান হয়। ঐতিহাসিকরা এই ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবেন; আমাদের যাহা ধারণা তাহাই বলিলাম।

সাগর-মেলার স্থানটীকে এখন মরুভূমির মত দেখা যায়। এখানে এখন গুটিকয়েক জটাজূটধারী সাধু আছেন। এক-দিকে কপিলমুনির আশ্রম আছে। আর আছে কেবল পুরান আস্ত, ভাঙ্গা ও আধাভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ির মেলা। অল্পদিন পূর্ব্বেই স্নান হইয়া গিয়াছে, তাই ঐ সব এখনও বর্ত্তমান। এই সব ভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ি হইতেই, গঙ্গাসাগরে যে কত অসংখ্য লোকের সমাবেশ হয়, তাহার একটা ধারণা করিয়া লইলাম। ধর্ম্মের জন্য ভারতের নানাদেশ হইতে এখানে কত যে লোক আসে, এবং কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে কত লোক যে মারা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বে এই সব জায়গায় আসা অত্যন্ত অসুবিধাজনক ও ভীতিবহ ছিল। তাই বোধ হয় লোক গঙ্গাসাগরে আসিলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আসিত।

কপিলমুনির আশ্রমে আমরা আশ্রমত্ব কিছুই দেখিলাম না। চারিদিকে রেলিঙ দিয়া ঘেরা লাল টীনের পাক্কা দেওয়াল দেওয়া ঘর। আশ্রমের কথা বলিলেই আমাদের মনে পড়ে পূর্ব্বকালের সেই মুনি-ঋষিদের তপোবন। লতাগুল্ম দিয়া ঘেরা কানন-পরিশোভিত, বিহঙ্গ-কূজিত মলয়-সেবিত একটী আবাস। সেখানে শান্ত, স্নিগ্ধ, মৌন ও স্বর্গীয় ভাব সর্ব্বদাই বিরাজ করিবে। কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। মনে হইল এটী যেন একটা ডাকবাংলা। কপিলমুনির আশ্রমে মেঝেতে নিম্নলিখিত কবিতাটী লেখা আছে—

"মিলিতা মা মন্দাকিনী সাগরের সনে
পরম পবিত্র তীর্থ এ ভব ভবনে।
বিরাম-মন্দির হেথা করিল স্থাপন
৺ভারত সাধুখা পৌত্র ৺যাদবনন্দন
সেবাকৃপা প্রার্থী এই বিনোদবিহারী
তিষ্ঠ সাধু, ভক্তগণ কামনা তাহারি
জন্ম কপিলমুনি খুলনা জেলায়
স্থাপিল ভকতি মঠ এ জলধি বেলায়।"

গঙ্গাসাগর দর্শন ও স্নান করিয়া টুণ্ডেল দেরাজতুল্লার বাড়ী আহার করিলাম। ম্যানুয়েল সাহেবের কৃপায় ও সৌজন্যে আমাদের খাবার বন্দোবস্ত এখানে হইয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, গঙ্গাসাগর হইতে 'ধবলাট' হইয়া যাওয়া যায় কি না, কারণ, দূরে ধবলাটকে ভারি সুন্দর দেখা যাইতেছিল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে ধবলাট হইয়া যাই; কারণ, এত কাছে আসিয়াও যদি ধবলাট হইয়া না যাই, তবে আর কোনদিন যে আমাদের ইহা দেখা হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।

ভাঁটার সময় ছাড়া সমুদ্র-তীর দিয়া হাঁটা যায় না; তাই আমরা বেলা ৩-৩০মিঃ ধবলাট রওনা হইলাম। প্রথমেই আমাদিগকে সাতবেকী নদীর মোহানা হাঁটিয়া পার হইতে হইল। জোয়ারের সময় আমরা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, ভাঁটার সময় এই বিশাল নদী হাঁটিয়া পার হইতে পারিব। যদিও নদীতে কোমর জলমাত্র ছিল, কিন্তু এত স্রোত যে, আমাদিগকে পরপারে পৌঁছিতে বেশ বেগ পাইতে হইল।

সমুদ্রের তীরে মনের আনন্দে ঝিনুক ও শঙ্খ কুড়াইতে কুড়াইতে পথ চলিতেছি। মাঝে মাঝে চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গিতে হইতেছে। এত সুন্দর রাস্তা পূর্ব্বে আর কখনও আমরা পাই নাই। এখানে বনে বেশ বড় বড় গাছ আছে; এবং দৃশ্যও খুব সুন্দর। মাঝে মাঝে সরু সরু খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া বনের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বেলা ৫-১০ মিঃ সময় আমরা ধবলাটে লালুবাবুদের বাড়ী পৌঁছিলাম। তাঁহাদের বাড়ীটা বেশ সুন্দর জায়গায়

অবস্থিত—ঠিক সমুদ্রের ধারে এবং ইহা আরও এইজন্য দেখিবার জিনিষ যে, এই বাড়ী, ৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ও বাগান প্রভৃতি সমস্তই protective tankএর মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রে বন্যা হইলেও তাহাদের ধ্বংস হইবে না, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

লালুবাবুরা খুব ভদ্রলোক। তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন এবং কিছুতেই আমাদিগকে রাত্রিতে না রাখিয়া ছাড়িলেন না। লালুবাবু এবং রাসবিহারীবাবু দুই ভাই এখানে থাকেন। তাঁহারা সুশিক্ষিত লোক। কিন্তু চাকুরীর দিকে না যাইয়া কৃষি-কর্ম্ম লইয়া আছেন। তাঁহারা উন্নত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-কর্ম্ম করিবার চেষ্টায় আছেন এবং ধান ছাড়াও সুন্দরবনে আর কিছু জন্মে কি না তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে অনেকটা সাফল্যও লাভ করিয়াছেন।

লালুবাবুরা ধবলাটের লাটদার (অর্থাৎ জমিদার)। কৃষি এবং প্রজা বিষয়ে তাঁহাদের বড় উচ্চ ধারণা দেখিলাম। তাঁহারা বলেন যে, প্রজা বড় হইলেই, তাহাদের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি, তাহাদের সুখেই আমাদের সুখ; এবং প্রজাদের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট করিয়াও থাকেন দেখিলাম।

এইখানে একটী কথা বলা দরকার। আমাদের দেশে এখন চাকুরীর বাজার যে রকম হইয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ও গরীব শিক্ষিত যুবকদের বড় কষ্ট ও অসুবিধা হইতেছে। তাঁহারা যদি সুন্দরবন অঞ্চলে যাইয়া কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ আবাদ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বেশ লাভবান হইতে পারেন। তাহাদের নিজেদেরও উন্নতি হইবে এবং দেশমাতৃকার মুখেও আবার হাসি ফুটিয়া উঠিবে। সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ অঞ্চলে এখনও যথেষ্ট জমি পাওয়া যায়। কৃষিকর্ম্মে ইচ্ছুক লোকেরা লালুবিহারী ও রাসবিহারী বাবুর নিকট হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন।

ধবলাটের ৺বিশালাক্ষী দেবী বড় জাগ্রত। তাঁহার মন্দিরেই আটেশ্বর মহাদেব ও রাধাকান্ত জিউ অবস্থিত আছেন। বিশালাক্ষী দেবীর স্থাপনা সম্বন্ধে একটী বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। কথিত আছে পামার কোম্পানীর পামার সাহেব দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া মাটী খুঁড়িয়া তাঁহাকে বাহির করাইয়া একজন পূজারী ব্রাহ্মণ রাখিয়া তাঁহাকে স্থাপনা করেন। পামার কোং ফেল হইবার পর ৺অদ্বৈতচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ৺বিশালাক্ষীর পূজা করিবেন এই সর্ত্তে জমি বিক্রয় করা হয়। ধবলাটের লাটদারদের নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইলে পর, যাহাতে দেবীর কোন দিন ধ্বংস না হইতে পারে, এইজন্য তাঁহারা দেবীকে protective tankএর ভিতর স্থানান্তরিত করেন। ইহাতে নাকি দেবী অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তাহাদের ২৫০০ বিঘা জমি সমুদ্র দ্বারা গ্রাস করান।

এই অঞ্চলের লোকেরা ইঁহাকে খুব জাগ্রত দেবী বলিয়া জানে। জেলেরা সমুদ্রে জাল ফেলিবার পূর্ব্বে ইঁহাকে পূজা না দিয়া যায় না; এবং অনেকে মনস্কামনা পূর্ণ হইবার জন্য এখানে আসিয়া ঢিল বাঁধিয়া যায়। আমরাও তাহাদের দেখাদেখি ঢিল বাঁধিয়া আসিলাম, দেখা যাক কি হয়।

সন্ধ্যার সময় ধবলাটের Protective tankএর ঘেরীর উপর বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিলাম এবং সমস্ত সন্ধ্যাটা গান গাহিয়া কাটাইয়া দিলাম। ধবলাট জায়গাটা ভারি সুন্দর। ঠিক সমুদ্রের উপরে, অনেকটা পুরীর মত। ফটোগ্রাফার ও আর্টিষ্ট 'অরুণ' ইহাকে 'Lapland' নাম দিয়াছে। এই জায়গাটায় যদি কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাল রাস্তা থাকিত, তবে আমাদের দেশের অসহায় যক্ষ্মাগ্রস্ত লোকেরা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিতে পারিত। এবং এত সুন্দর স্থানের অবস্থা আজ এই রকম থাকিত না,—স্বাস্থ্যান্বেষী ও বিলাস-প্রিয় বড়লোকের কৃপায় তাহা আজ একটা দেখিবার মত জায়গা হইত। রাত্রিতে লালুবাবুদের প্রদত্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া এবং ভাল বিছানায় ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ভোরে উঠিয়া সাগরতীরে সূর্য্যোদয় দেখিতে গেলাম। তাহা যে কত সুন্দর, তাহা আর কি বলিব। এই গভীর স্বর্গীয় ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই, তাই বৃথা সে চেষ্টা করিব না।

ধবলাট ত্যাগ করিয়া মগরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম ভোর ৭—৪০ মিঃ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সাতবেকীর খালের ধারে আসিয়া পৌছিলাম। তখন সবেমাত্র জোয়ার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভরা জোয়ার না হইলে 'খেয়া নৌকায়' খাল পার হওয়া মুস্কিল। নৌকা এখন ডাঙ্গায় উঠিয়া রহিয়াছে। আমাদের গরজ ও উৎসাহ বেশী—তাই আমরা কাদা হইতে নৌকা ঠেলিয়া জলে নামাইতে

লাগিলাম। নলিনীর কাদায় ডুবিয়া যাইবার ভয় বেশী থাকায়, সে আমাদিগকে কাদা ঠেলিতে সাহায্য না করিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল। আমাদের যদিও ইহাতে খুব রাগ হইতেছিল ; কিন্তু কি করিব, বেচারী কাদায় ডুবিলে তো আমাদিগকেই টানিয়া তুলিতে হইবে (ভারও নেহাৎ কম নয়), তাই উহাকে রেহাই দিলাম। অনেক কষ্ট করিয়া নৌকা জলে নামাইয়া খাল পার হইলাম এবং বেলা ১১টার সময় মগরা কাছারীতে পৌছিলাম। এই ৮ মাইল রাস্তা আসিতে আমাদের খুব দেরি হইয়াছিল। কারণ গাইডে ও 'খেয়া'য় আমাদিগকে অনেক সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল।

মগরা পঁহুছিয়া স্নান করিলাম এবং সঙ্গের খাবার যাহা ছিল তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। এবার আমাদের খাবার সম্বল ফুরাইল, জল ছাড়া আর কিছুই রহিল না।

বেলা ১২টার সময় মগরা ত্যাগ করিয়া কচুবেড়ে অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মগরা হইতে কচুবেড়ে পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডের রাস্তা আছে। আমরা যাইবার সময় শিকারপুর দিয়া গিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় এই রাস্তায় ফিরিব, তবে আমাদিগের সমস্ত সাগরদ্বীপের ভিতর দিয়া হাঁটা হইবে। অল্প একটু চলিবার পর পথের সাথী গাইডকে বিদায় দিলাম। বেচারীর আমাদের মত হতভাগাদের প্রতি বেশ মায়া পড়িয়াছিল,—যাইবার সময় কাঁদ কাঁদ হইয়া আমাদিগকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আমরা আসিয়া মরিগঙ্গার হাটে পৌছি। অনেকক্ষণ পরে পরিচিত জায়গা দেখিয়া মনে আনন্দ হইল। সেখানে আসিয়া খবর লইয়া জানিলাম যে, তার পরদিন বেলা ১২টার সময় 'কাকদ্বীপের খেয়া'। ইহার পূর্ব্বে সেখানে যাইবার আর কোন উপায় নাই। কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এখানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। পূর্ব্বদিন লালুবাবুরা আমাদিগকে মরিগঙ্গায় পৌছিয়া শ্রীযুত মহেন্দ্র দাসের বাড়ী কিম্বা রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জির কাছারীতে অতিথি হইতে বলিয়াছিলেন। এখানে দোকান আছে, তাই খাবার ভাবনা আমাদের ছিল না ; তবে রাত্রিতে থাকিবার জায়গা চাই।

প্রথমে আমরা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ী যাই। লোকটী না কি খুব সদাশয় ; কিন্তু তাঁহাকে বাড়ী না পাওয়ায়, আমাদিগকে জমিদারের কাছারীতে যাইতে হইল। সেখানে প্রথমে একটী ভদ্রলোকের সহিত আমাদের দেখা হয়। তাঁহাকে আমাদের উদ্দেশ্য বলায়, তিনি যেন কি রকম সন্দিগ্ধচিত্তে আমাদের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন এবং এখানে কিছু হইবে না বলিলেন। সাতটী যুবককে একসঙ্গে লাঠিশুদ্ধ দেখিয়া এবং তাহাদের সঙ্গে আবার torch-light, জলের flask (ইহাকে নিশ্চয়ই তাহারা bulletএর বাক্স মনে করিয়াছিল) ইত্যাদি আছে দেখিয়া তাঁহারা বোধ হয় একদম ভড়কাইয়া গেলেন।

যাহা হউক, আমরা নায়েব মহাশয়কে খবর পাঠাইলাম। তিনি ভয়ে আমাদের সহিত দেখা করিলেন না, লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, এখানে থাকা হইবে না ; এবং সেই লোকটী আমাদিগকে নানাভাবে জেরা করিতে লাগিলেন। হয় ত এই লোকটী গ্রামের মধ্যে সামান্য একটু লেখাপড়া-জানা মোড়ল লোক। আমরা মোটঘাট লইয়া নিকটে একটী স্কুলের বারান্দায় যাইয়া বসিলাম এবং সেখানেই পড়িয়া থাকিয়া রাত্রি কাটাইব মনস্থ করিলাম। নায়েব বাবুর কাছারী ছাড়িয়া আমরা আসিলাম ; কিন্তু তাহাদের একঘেয়ে জেরা হইতে কোনমতেই রেহাই পাইলাম না। প্রায় ২০।২৫ বার নানারকমের লোক আসিয়া নানাভাবে আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহাদের কাহাকেও আমরা জবাব দিলাম ; কাহারও সহিত আবার কোন কথাই বলিলাম না। আমাদের ভয়ানক রাগ ও বিরক্তি ধরিয়াছিল।

সেদিন আমাদের ভাত খাওয়া হয় নাই,—সমস্ত দিন চিঁড়া খাইয়াই কাটাইয়া দিয়াছিলাম। ভাতের যোগাড় করিতে পারি কি না, এই আশায় নিকটবর্ত্তী দোকানে গেলাম এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম। জমিদারের পুকুরের জল ভাল থাকায় এবং নিকটবর্ত্তী কোন পানীয় জলের পুকুর না থাকায় মনোরঞ্জন ও আমি চালডাল ধুইয়া ও জল আনিবার জন্য সেখানে গেলাম। অন্যান্য সকলে রান্নার জোগাড়ে দোকানে গেল। আমরা অন্ধকার রাত্রির জন্য সঙ্গে torch-light লইয়াছিলাম। মনোরঞ্জন উপর হইতে focus করিতেছে, আমি জলে নামিয়া চাল ডাল ধুইতে লাগিলাম। এই সময়ে একজন লোক আসিয়া আমাদিগকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার

torch-light এর আলো দেখিয়া তাঁহারা আমাদিগকে ডাকাত বলিয়া ধারণা করিলেন; কারণ, এই রকম আলো তাঁহারা পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তাই তো, এ কি রকম আলো! কোন লোকজন দেখা যায় না, হঠাৎ আলো জ্বলে আর নিভে! জল লইয়া পথ চলিতেছি,—মনোরঞ্জন রাস্তা দেখিবার জন্য focus করিল, অমনি বন্দুকের আওয়াজ হইল এবং অতি নিকটেই গুলি পড়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কাহারও গায়ে গুলি লাগে নাই। তার পর তাহারা মুহুর্মুহু বন্দুকের ধ্বনি করিয়া আমাদিগকে জানাইতে লাগিল যে, তাহার প্রস্তুত। আমরা ফিরিয়া দোকানে আসিলাম, এবং আজ রাত্রিতে যে আমাদের কোথায় এবং কোন্ অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম।

খিচুড়ি ও আলু ভাজা পাক করিয়া বেশ আনন্দের সহিত খাইতে লাগিলাম। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া মনোরঞ্জন ও নলিনীর ক্ষুধা ভয়ানক পড়িয়া গেল এবং তাহারা খুব অল্প খাইয়াই ক্ষুধা নিবৃত্ত করিল। সমস্ত রাত্রি স্কুলের বারান্দায় পড়িয়া রহিলাম।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোরে উঠিয়া কাকদ্বীপের খেয়ার জন্য মোটঘাট লইয়া কচুবেড়ে খেয়ার পারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিবার সময় দেখিলাম জমিদার-কাছারীর লোকেরা আমাদের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। খেয়াপারে আসিয়াও তাহাদের জেরা হইতে নিস্তার নাই—২।৩ জন লোক আসিয়া জেরা করিতে লাগিলেন। বেচারীরা বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল—কতক্ষণে আমরা পরপারে যাইব এবং উহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

বেলা ১২টার সময় ভরা জোয়ার আসিল,—খেয়া নৌকায় চড়িলাম কাকদ্বীপ যাইবার জন্য। নৌকা খুব বড়, উহার খোলের ভিতরও লোক থাকিতে পারে। খেয়া নৌকায় ছৈ নাই,—রৌদ্র যাহাতে না লাগিতে পারে, সেইজন্য আমরা খোলের ভিতর যাইয়া ঢকিলাম।

বেলা ১টার সময় কাকদ্বীপ আসিয়া পৌছিলাম। পথের মধ্যে একটা মস্ত বড় নদী পার হইতে হইল। কাকদ্বীপ জায়গাটা বেশ একটী বড় বন্দর; প্রায় সমস্ত জিনিষই এখানেই পাওয়া যায়। বাজারে আসিয়া একটী দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্নান করিলাম ও খাবার খাইলাম। রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে ডায়মণ্ডহারবার যাত্রী নৌকা পাওয়া যাইবে না। স্থানীয় লোকদিগের নিকট খবর লইয়া জানিলাম যে, কাকদ্বীপ হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত এই ৩২ মাইল বরাবর জেলাবোর্ডের বেশ ভাল হাঁটা-পথ আছে। তাই আমরা পদব্রজে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়াই স্থির করিলাম। মামার প্রথমে হাঁটিয়া যাওয়ায় আপত্তি ছিল। কিন্তু উহাকে একটু ঠাট্টা করায়, সে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া সকলের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া পড়িল। বেলা ৪-২৫ মিঃ আমরা কাকদ্বীপ ত্যাগ করিলাম এবং সন্ধ্যা ৬টায় আসিয়া সীতারামপুর হাটে পৌছিলাম। হাটের লোকজনেরা আমাদের চারিদিকে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। সীতারামপুর হইতে পানীয় জল লইয়া পুনরায় রওনা হইলাম এবং রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ কুলপী আসিয়া পৌছিলাম। কুলপী আসিয়া একটী দোকানে খাবার ও জল খাইয়া এবং খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ১১টায় রওনা হইলাম।

রাত্রির অল্পক্ষণমাত্র আমরা চন্দ্রের আলো পাইয়াছিলাম, তার পর এই আঁধার পথেই চলিতে লাগিলাম। খানিকদুর চলিবার পর আমরা একটী সুন্দর রাস্তা পাইলাম। দুই দিকে খেজুর গাছের সারি, বাতাসে রসের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। এইভাবে কতকদূর চলিবার পর আমরা নদীর ধারে আসিয়া পৌছিলাম। এই জায়গার রাস্তা অতি চমৎকার। কোথাও নদীর পার দিয়া গিয়াছে, আবার কোথাও নদী ছাড়িয়া একটু দূরে সরিয়া যাইয়া আবার নদীর পারেই আসিয়া মিশিয়াছে। রাস্তার ধারে ধারে বাবলা গাছের সারি, ভারি সুন্দর। বাবলা ফুলের গন্ধ নদীর শীতল বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নৈশ অন্ধকারে নদীর তীরে একটী সুন্দর স্থানে আসিয়া আমরা সাতজন যুবক বসিলাম। কি সুন্দর সে স্থান। মনে কত গভীর ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কুলু কুলু করিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, ছলাৎ ছলাৎ করিয়া তরঙ্গ আসিয়া পারের উপর আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া পড়িতেছে। এমনি শান্ত, স্নিগ্ধ, মৌন প্রকৃতি দেখিয়া নীহার গান আরম্ভ করিল। তাহার সুরের রেশ বাতাসে জমিয়া দূরে বহিয়া যাইয়া চারিদিকে প্রকৃতিতে একটা পুলকের শিহরণ

জাগাইয়া দিল। আমরা তাহার গানে আত্মহারা হইয়া অনন্তের পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রকৃতি তখন নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। দূরে নোঙ্গর করা ষ্টীমারের আলো দেখিতে পাইতেছিলাম। Gas-boatএর আলো ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিতেছিল ও নিবিতেছিল।

এইরূপ মনোরম রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে রাত্রি ৩টার সময় আমরা ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম। এবার আমাদের হাঁটা-পথে যাত্রার শেষ হইল। অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত, অনেক কবিত্ব ও কল্পনাময় হাঁটা-পথ আজ আমাদের কাছ হইতে বিদায় লইল।

ভোর ৫টার সময় যাদবপুরগামী ট্রেণ। এই দুই ঘণ্টা আমাদিগকে ষ্টেসনে বসিয়া থাকিতে হইল। ডায়মণ্ডহারবার ষ্টেশনে যা মশা। তাহাতে একদিনেই ম্যালেরিয়া করিয়া ছাড়ে আর কি। ভোর ৭টার সময় গাড়ী আসিয়া যাদবপুরে পৌছিল এবং আমরাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

এইবার আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী শেষ হইল। ভবিষ্যতে যদি কোন ভ্রমণকারী সাগরদ্বীপে বেড়াইতে যান, তাহা হইলে আমাদের নির্দ্ধারিত পথে গেলে, তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইবে। তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন মনে করিয়া এক একটী জলের flask সঙ্গে লয়েন, নতুবা তৃষ্ণায় যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইবে। ভ্রমণকারীগণের পক্ষে পুলিশের নিকট হইতে একটী ছাড়পত্র লওয়া বিশেষ দরকার; নতুবা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বিপদে পড়িতে হইতে পারে।

সাগরদ্বীপের প্রায় সব জায়গাতেই আমরা সুন্দর ব্যবহার পাইয়াছি। ঐ অঞ্চলের লোকেরা বেশ সরল,—আমাদিগকে তাহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে।

এইখানে আর একটী বিষয় বলা দরকার। ধবলাটের অপর পারে সমুদ্রের ভিতর মৌমুনি ফরেষ্ট। সেখানে এখনও মনুষ্য-বসতি হয় নাই। এই বছরই সেখানে জমি বিলি দেওয়া হইবে। সুন্দরবনের হিংস্র প্রকৃতির Royal Bengal Tiger ঐ জঙ্গলেই পাওয়া যায়। মৌমুনি forest দেখিবার সুযোগ আমরা পাই নাই।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি এ

১

তোমার নির্ঝর নদী অরণ্য কান্তার
উপত্যকা অধিত্যকা সমতল পাড়
গুহাগুম্ফা—সবি শুধু দেয় পরিচয়
তোমারে দিয়েছ ধরা সর্ব্ব সমন্বয়।
তোমারি শিখরে হেরি অখণ্ড আকাশ,
তোমারে ঘেরিয়ে আছে পবিত্র বাতাস—
জীবের জীবনরূপী—ধাতুশিলা প্রাণী
একত্র আহরি বক্ষে মহারাজধানী
গাঁথিয়াছ বক্ষে তব ওগো হিমরাজ,
যা কিছু নিখিল বিশ্বে, হেরি তব সাজ।
প্রথম প্রভাত রবি উঠে তব ভালে,
প্রথম চন্দ্রের টিপ তোমারি কপালে,
কোটি তারা-হার কণ্ঠে; মেঘের বসন
বিচিত্র বর্ণের মেলা অঙ্গের ভূষণ।

২

প্রত্যহ প্রত্যূষে রবি পরায়ে তিলক
তোমার তুষার-ভালে, প্রসাদ আলোক
বিতরে বিপুল বিশ্বে, বন্দনার শেষে;
চন্দ্রের চন্দন-রেখা ও ললাটদেশে
প্রথম পরশ লভি ঝরি পড়ে ধীরে
সুস্মিত কিরণরূপে তিমিরের তীরে।
তব আজ্ঞাবাহী মেঘ বহি বৃষ্টিধার
সৃষ্টিরে পালিছে নিত্য ভরিয়া ভাণ্ডার
ফল শস্য বারিদানে, আর্ত্ত জীব তরে।
পবন ঢুলায় নিত্য ঝাউএর চামরে
তুহিন-শীতল বায়ু; অনন্ত আকাশ
তারার ঝালরঘেরা ধরে বারোমাস।
ধরণীর একচ্ছত্র অজেয় সম্রাট
এই ত রাজার রূপ—শাশ্বত বিরাট।

অরূপ-রতন

শ্রীমন্মথ রায় এম-এ

এক-দৃশ্যের একাঙ্ক নাটক

"ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে
অরূপ-রতন আশা করে!"
—রবীন্দ্রনাথ

ইঙ্গিত।

বৃহদ্রথ ... বৃদ্ধ কাশীরাজ।
জয়াদিত্য ... কাশীরাজ কন্যা লেখার সহিত সদ্য-পরিণীত কোশলেশ্বর।
রেখানাথ ... সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী; চিত্র-কূট জনপদের অধিপতি।
লেখা ... কাশীরাজ-কন্যা।
সু-লেখা ... কাশীরাজের শ্যালিকা কন্যা।
মাধবিকা ... রাজকন্যাদের অন্তরঙ্গ সখী।

এতদ্ভিন্ন...চিত্রকূট দূত, সেনাপতি, রেখানাথের শিষ্য, ঘাতক।

স্থান এবং কাল :—চিত্রকূট জনপদ-প্রান্তে
কাশীরাজের শিবির।
রাত্রিতে উদ্বোধন এবং উষাতে বিসর্জ্জন।

* * *

দৃশ্য।—রাজকীয় শিবির। শিবিরটি একটি বিরাট বস্ত্রাবাস। তাহার যে অংশ দেখা যাইতেছে তাহা তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে "দরবার", দ্বিতীয় ভাগে "অতিথি-নিবাস", এবং তৃতীয় ভাগে "বিলাস-কক্ষ"। প্রত্যেক কক্ষ অপর কক্ষের সহিত অন্তর্নিহিত ক্ষুদ্রায়তন দরজা দ্বারা সংলগ্ন। তদ্ভিন্ন সকল কক্ষের সম্মুখ দিয়াই বিস্তৃত অলিন্দ। সেই অলিন্দ-পথে এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাতায়াত চলে। সকল কক্ষেরই সম্মুখে বিশালায়তন সুবিস্তৃত দরজা, তাহা কালো পুরু পরদা দ্বারা আবৃত। প্রয়োজনকালে সেই পরদা উত্তোলিত হয়, এবং তখন কক্ষাভ্যন্তর সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। *

শিবিরস্থ দরবার-কক্ষে বৃদ্ধ কাশীরাজ বৃহদ্রথ এবং তাঁহার নবজামাতা কোশলেশ্বর জয়াদিত্য। সম্মুখে চিত্রকূট-দূত যুক্তকরে দণ্ডায়মান।]

বৃহদ্রথ। দূত! তুমি অবধ্য, কিন্তু, মনে রেখো তোমার প্রভু অবধ্য নয়!

দূত। মহারাজ! দাস তা অবগত আছে। এ দাস শুধু তার প্রভুর বারতা আপনার সকাশে নিবেদন করেই মুক্ত, কিন্তু, সেই যে নিবেদন ..সে নিবেদন তো নির্ভয়েই করা বিধি!

বৃহদ্রথ।...নির্ভয়েই নিবেদন কর—

দূত। আমাদের প্রভু কুমার রেখানাথ যে এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী, তা দেশবিদেশের সকল কলাবিদ্ই স্বীকার করেন। শুধু তা-ই নয়, তৎপ্রবর্ত্তিত চিত্র-কলা আজ দেশবিদেশে চিত্রশালায় প্রচলিত। অজন্তাগুহায় তাঁর পরিকল্পিত শিল্প-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয়ে, ভূতপূর্ব্ব মগধ-সম্রাট, কুমার রেখানাথকে এই গিরি-মেখলা নির্ঝরিণী-স্নাতা পরম রমণীয় চিত্রকূট জনপদ দান করেন।

---

* দৃশ্য-সজ্জার এই পরিকল্পনা এবং এই নাটকের মূল আখ্যান-ভাগ (plot) প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক আমার নিকট পরিকল্পিত। এই নাটকখানি সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম।

নিঃ শ্রীমন্মথ রায়।

জয়াদিত্য। সে কথা সকলেই জানে। কাজের কথা বল—

দূত। এ হয় ত আজ একটা দুর্ঘটনা যে তিনি আপনাদের উভয়ের পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে নিতান্ত দুর্ব্বল, নিতান্ত অসহায়, কিন্তু…,কিন্তু বর্ত্তমান যুগে শিল্পজগতে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট!

জয়াদিত্য। আমি শিল্পজগতের প্রজা নই, আমি বাস্তবজগতের রাজা…অর্থাৎ আমি দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক, আমি অপমান সহ্য করি না, অপযশ তুচ্ছ করি, আমার জয়-যাত্রায় যদি পর্ব্বতও প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই পর্ব্বত চূর্ণ করে আমার অভিযান…পর্ব্বতের নিজের পথে নয়!

দূত। আমি স্বীকার করি কোশলেশ্বরের এ বৃথা দম্ভ নয়। আপনি আজ দেশের সার্ব্বভৌম নরপতি।…কিন্তু… ঐ কাশীরাজ একদিন শিল্পজগতের উন্মাদনায় মেতে উঠেছিলেন বলেই আজ এই বিরোধ।

জয়াদিত্য। সরল ভাষায় কথা বল দূত! আমি শুনেছি কাশীরাজ তাঁর কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে তার চিত্র রেখানাথকে দিয়ে অঙ্কিত করে রাখতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কন্যা স্বামীগৃহে গেলে সেই চিত্র তাঁকে সান্ত্বনা দেবে। যথেষ্ট অনুনয় সত্ত্বেও রেখানাথ সেই চিত্র অঙ্কন কর্ত্তে সম্মত হন নি!

রাজা। শুধু তাই নয় দূত!…তোমাদের কুমার আমার নিমন্ত্রণে আমার রাজপ্রাসাদে এসে আমার কন্যাকে দেখলেন। দেখে বললেন আমার কন্যার ছবি এঁকে তিনি তাঁর তুলির আর অমর্য্যাদা কর্ত্তে চান না! এমনি বিরাট তাঁর দম্ভ!

দূত। দম্ভ নয়, তার কারণ আছে। তাঁর শেষ কীর্ত্তি অজন্ত-গুহার চিত্র-পরিকল্পনা। তিনি রমণী-মূর্ত্তি এত বেশী অঙ্কন করেছেন যে, তিনি রমণী-মূর্ত্তির ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে হঠাৎ এক দিন এমন এক অপরূপ সুন্দরীর সন্ধান পান ..যে… তারপর হ'তে, তিনি সেই মূর্ত্তির রূপ-দান-সাধনায় আত্মদান করেছেন। সেইদিন হতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে, যদি তিনি রমণী মূর্ত্তিই অঙ্কন করেন, তবে সেই মূর্ত্তির; তা না হ'লে, তার চাইতে নিকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি এঁকে তাঁর তুলির অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না!…আপনার কন্যা—

বৃহদ্রথ। হাঁ, আমার কন্যা কোশলেশ্বর জয়াদিত্যের রাজসূয় যজ্ঞে দেশবিদেশের রাজন্যবৃন্দ কর্ত্তৃক এ যুগের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে অভিনন্দিতা হয়েছেন!

দূত। কিন্তু, কিন্তু কুমার রেখানাথ বলেন যে আপনরা কন্যার চাইতেও তাঁর সুন্দরী আরো সুন্দরী!

জয়াদিত্য। আমি আমার বধূ দিয়ে তার সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য্যগর্ব্ব পদদলিত কর্ব্ব বলেই তোমার কুমারের চিত্রকূট-জনপদ অবরোধ করেছি। যতক্ষণ তা না পারি, ততক্ষণ আমার বিবাহ সম্পূর্ণ হবে না!…হাঁ!

বৃহদ্রথ। জানো দূত, আমার কন্যার সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য শ্রীমান জয়াদিত্য তার বিবাহের সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলি শেষ কর্ব্বার বিলম্বও সহ্য করে নি। বিবাহ-রাত্রি প্রভাত হলেই সে আমাদের নিয়ে তোমাদের এই জনপদে ছুটে এসেছে…এখনো তার ফুলশয্যা হয় নি!—আজ, আজ এই বিদেশে, এই যুদ্ধ-শিবিরে, তার ফুলশয্যার অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর্ত্তে হবে! এও কি কম পরিতাপের বিষয়!

জয়াদিত্য। শোনো দূত! আর কথাতে কাজ নেই। কাল প্রভাতে তোমাদের শিল্পজগতের একচ্ছত্র সম্রাট এই বাস্তব-জগতের সার্ব্বভৌম সম্রাটের সম্মুখে হয় তাঁর সুন্দরীর শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে আমাদের দর্পচূর্ণ কর্ব্বেন, নয়, নিজে, জয়াদিত্যের জয়যাত্রার রথচক্রে চূর্ণ হবেন!

দূত। দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সেই অপরূপার খোঁজ করেছেন, কিন্তু তবু কুমার তাঁর আর দেখা পান নি। কিন্তু…কিন্তু, তবু রেখানাথ সেই অপরূপার রূপ-রেখার যে পরিকল্পনায় বিভোর, আমরা তার আভাস পাই তাঁর চোখে, মুখে, স্বরে, গানে, স্বপ্নে!…কাজেই, আমি নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি না, কিন্তু, তবু, আবার জিজ্ঞাসা করি, এই কি শেষ কথা?

বৃহদ্রথ। হাঁ, এই শেষ কথা।

জয়াদিত্য। আজ আমাদের ফুলশয্যা। এই ফুলশয্যার রাত্রিটুকু তোমাদের কুমারের অবসর। তিনি এই অবসরে যেন তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করেন, নইলে আগামী প্রভাতে, আমার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য তোমাদের জনপদ অগ্নিদগ্ধ করা—

দূত। তার প্রয়োজন নেই। আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, তবে কুমারের কথা স্বতন্ত্র। তিনিও আজ রাত্রেই

তাঁর কর্ত্তব্য স্থির কর্ব্বেন। আগামী প্রভাতেই তাঁর দর্শন পাবেন। যদি তাঁর আর কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আজ রাত্রেই তিনি তা আপনাদের জানাবেন আমাকে বলেছেন। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন!…বিদায়!

[দূতের প্রস্থান।]

জয়াদিত্য। আমি বিস্মিত হয়েছি এই চিত্রকরের স্পর্দ্ধা দেখে!

বৃহদ্রথ। তার এই স্পর্দ্ধা কাল প্রভাতে চূর্ণ করা চাই বৎস!…অপরূপ রূপসী আমার কন্যা, রাজন্যমণ্ডলে এ কথা একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছে! আমার লেখার একমাত্র তুলনা আমার শ্যালিকা-কন্যা সুলেখা!…যেন দুইজনে দুইজনের প্রতিমূর্ত্তি!…যারা জানে না, তারা বলে লেখা আর সুলেখা দুই যমজ ভগিনী! প্রকৃতির এই খেয়ালে আমাদের বিপদের অন্ত নেই! তবু,…প্রভেদ আছে, সে প্রভেদ শুধু তাদের মনে। একজন তেজঃদৃপ্তা, আর একজন কুসুম-কোমলা! একজন দিনের রৌদ্র, আর একজন রাত্রির জ্যোৎস্না!…এই প্রভেদটুকু না থাকলে কে যে লেখা আর কে যে সুলেখা আমিই চিনে উঠ্‌তে পার্ত্তুম না!

জয়াদিত্য। না চিনে উঠ্‌তে পারার ভয় আমিও প্রতিপদেই করে এসেছি; সেই জন্যই, আমি লেখাকে চোখে চোখে রেখেছি!

বৃহদ্রথ। চোখে চোখে রাখবার প্রয়োজন নেই। সুলেখা যখন আমার রাজ-সংসারে এসে দাঁড়াল, তখন সাদৃশ্যের এই গোলযোগ দূর করবার জন্য, আমি আমার লেখার হাতে আমার রাজ-চিহ্নখচিত হীরকাঙ্গুরীয়ক পরিয়ে দিলুম! ঐ চিহ্নেই তুমি সব সময়েই তাকে চিনতে পার্ব্বে, রাজপুরীর সবাই ঐ চিহ্নে রাজকুমারীকে চিনে থাকে। এই গোলযোগ হ'ত না, যদি আমার শ্যালিকা বেঁচে থাকৃতেন। তিনি সুলেখাকে প্রসব করেই পরলোকে আমার স্ত্রীর কাছে চলে যান। মরবার সময় তিনি তাঁর ঐ অনাথা কন্যাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই হতে দুই মাতৃহারা কন্যাকে আমি সমভাবে লালনপালন করে এসেছি। সুলেখা আমার নিকট, লেখার চাইতে কিছু কম নয়!…যাক্ সে কথা। আমি যাই, ফুলশয্যার আয়োজন করি! আজ সে কাজও আমাকেই করতে হবে; যার করবার কথা, সে নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গসুখ উপভোগ করছে! [পরিচ্ছদের প্রান্ত দ্বারা চোখ মুছিতে মুছিতে অলিন্দ-পথে বিলাস-কক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন।]

[তিনি দৃষ্টিপথের অন্তরালে যাওয়া মাত্র রাজকন্যার সখীগণ দরবার-কক্ষের দুই পার্শ্বস্থিত দরজা-পথে প্রবিষ্ট হইয়া চকিতে জয়াদিত্যকে নৃত্যদ্বারা আক্রমণ করিল। সেই নৃত্যগীতে তাহারা জয়াদিত্যকে ফুলশয্যায় আবাহন করিতেছিল। নৃত্যগীতান্তে কাশীরাজকন্যা লেখা দরবার-কক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বামীকে সহাস্যে অভিনন্দিত করিলেন, এবং ইঙ্গিতে সখীকুলকে সেস্থান হইতে অপ-সারিত করিলেন।]

লেখা। শুভ রাত্রি!

জয়াদিত্য। শুভ রাত্রি!

লেখা। ফুলশয্যা?

জয়াদিত্য। হাঁ, ফুলশয্যা। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম, সেই আমাদের রাজসূয় যজ্ঞে, আমাদের নাট-মন্দিরের সেই নৃত্য-উৎসবে,—সেই দিন রাত্রে আজকার এই ফুলশয্যা কল্পনা করেছিলুম! সেই কল্পনা প্রতিরাত্রে স্বপ্নময়ী হয়ে আমাকে ছলনা করেছে! দেশের শ্রেষ্ঠ বীর, সেখানে, ঐ এক যায়গায়, পরাজিত হয়েছে!… কিন্তু, আজ?

লেখা।…ছলনা করেছে!…বটে! কি যে ছলনা নয়, কে যে ছলনা নয়, এই ছলনার সংসারে তা বলা শক্ত।…হাঁ, শক্ত। প্রথমেই ধরুন, আপনি বললেন নাট-মন্দিরের সেই নৃত্য-উৎসবে আপনি আমাকে প্রথম দেখে-ছিলেন। কিন্তু…

জয়াদিত্য। কিন্তু?

লেখা। কিন্তু, সে কি আমাকেই দেখেছিলেন?

জয়াদিত্য। হাঃ হাঃ হাঃ ..আমার চোখকে আমি অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে!

লেখা। সত্যি?…কিন্তু, শাস্ত্রে কি পড়েন নি নিজের চোখে দেখেই অনেক সময় পণ্ডিতগণও রজ্জুকেই সর্প বলে ভ্রম করেন। করেন না কি?

জয়াদিত্য। তুমি কি বলতে চাও, সেদিন আর কাউকে তুমি বলে ভ্রম করেছিলুম?

লেখা। আমি বলতে চাই, যদি সেদিন আপনি আমাকে না দেখে সুলেখাকে দেখে থাকেন ?

জয়াদিত্য।…কিন্তু তোমার হাতের হীরকাঙ্গুরীয়ক ?

লেখা। ও আপনার আত্মপ্রবঞ্চনা। নয় কি ?—হীরকাঙ্গুরীয়কের কথা আপনি আজ এই ক্ষণকাল পূর্ব্বে পিতার নিকট জানতে পেরেছেন, সে দিন জানতেন না! তার পরেও না!

জয়াদিত্য। আমার কল্পনার সঙ্গে খেলা ক'রো না লেখা।…আমার সকল স্বপ্ন ভেঙে দিয়ো না, দিয়ো না—আমি তোমাকেই ভালোবেসেছি লেখা!—আর কাউকে নয়!

লেখা। তবেই দেখুন আমার এই রূপ আপনি ভালোবাসেন নি! কারণ আমারো যা রূপ সুলেখারও সেই রূপ! আপনি ভালোবেসেছেন রাজকন্যার স্মৃতি!

জয়াদিত্য। হাঁ, হয় ত তাই। কিন্তু, তাতে কি কিছু আসে-যায় ?

লেখা। হয় ত যায়, হয় ত যায় না। আমি ঠিক্ জানি না। কিন্তু, লোকে যে স্মৃতিকেই ভালোবাসে, তার জ্বলন্ত নিদর্শন আজ পেলুম ঐ পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে, যখন চিত্রকূট-দূতের কথা শুনছিলুম!…সেই চিত্রকর কোন দিন, হয় ত মুহূর্ত্তের তরে, কোন এক নারীকে দেখেছে, আজো তার ধ্যানেই সে বিভোর! তার সেই ধ্যান রাজকুলের শ্রেষ্ঠা রূপসীও ভঙ্গ করতে পারে নি, কাল প্রভাতে মৃত্যু-রাক্ষসী পার্ব্বে কি না তাও জানি না!

জয়াদিত্য। কাল প্রভাতের আর বিশেষ বিলম্ব নেই, অতএব, শীঘ্রই তোমার কৌতূহল চরিতার্থ হবে! এখন চল…ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ রক্ষা করি!

লেখা। ফুলশয্যা? ফুলশয্যা! হাঁ, ফুলশয্যা। কিন্তু, তার পূর্ব্বে আমার আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। অনুমতি পেলে নিবেদন করি!

জয়াদিত্য।—দয়া করে বল!…

লেখা। রাজসূয় যজ্ঞে যাকেই দেখে থাকুন, আপনি রাজকন্যারূপে আমার স্মৃতিকেই ভালোবেসে আজ আমাকে আপনার বধূরূপে বরণ করেছেন।… কিন্তু, ..কিন্তু…

জয়াদিত্য। নিঃসঙ্কোচে বল লেখা!

লেখা। কিন্তু, আমার ভয় হয়! হাঁ, আমি শিউরে উঠি!…অন্ধকার রাত্রে…অন্ধকার কক্ষে…

জয়াদিত্য। বল…বল লেখা!

লেখা।…যদি সুলেখাকে আপনি লেখা বলে ভ্রম করে বসেন!

জয়াদিত্য। অন্ধকারেও হীরক জ্বলে!

লেখা। তা আমিও জানি! কিন্তু, তবু,…তবু সুলেখা যদি…

জয়াদিত্য। হাঁ, বল…সুলেখা যদি—

লেখা।—কোন দিন আমার অজ্ঞাতে, ধরুন আমার ঘুমের মাঝে, আমার এই অঙ্গুরীয়ক চুরী করে হাতে দিয়ে, …পরে

জয়াদিত্য। এ যে বিষম সমস্যায় পড়লুম!…শোন। কালই আমরা কোশল যাত্রা কর্ব্ব। সেখানে আর তোমার সুলেখা রইবে না!

লেখা। তা ঠিক্ বটে!…হাঁ, সেখানে সুলেখা রইবে না বটে। ..যাক্।…কিন্তু, হাঁ, ঐ চিত্রকরের বড় দর্প। কাল প্রভাতে সে পরাজিত হলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দিতেই হবে। কি শাস্তি ঠিক্ হয়েছে ?

জয়াদিত্য। প্রাণদণ্ড…খুসী হবে তবে ?

লেখা। না…না…না। তা নয়। মৃত্যু তার শ্রেষ্ঠ দণ্ড নয়।

জয়াদিত্য। তবে ?

লেখা। আমার কথা থাকবে ?

জয়াদিত্য। আমি প্রতিজ্ঞা কর্ছি, অবশ্য থাকবে।… বল তুমি কি দণ্ড দিতে চাও ?

লেখা। ঐ সুলেখার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে হবে!

জয়াদিত্য। হাঃ হাঃ হাঃ, সে কি!

লেখা।—আমার খেয়াল! সে রাজকন্যাকে তুচ্ছ করেছিল, এইবার অনাথাকে বধূ বলে বরণ করুক! সুলেখার হাত হতেও আমি মুক্তি পাই!

জয়াদিত্য। তুমি তবে তাকে এখনো চেন নি!—বেশ্! সে যদি সুলেখাকে বিবাহ কর্ত্তে অসম্মত না হয়, সুলেখা তারই বধূ হবে!—এইবার চল…

লেখা। আপনি অগ্রসর হন্…আমার সাজসজ্জা বাকী রয়েছে।

জয়াদিত্য। শীগ্‌গীর এসো কিন্তু!

লেখা। তাতে ত্রুটি হবে না।

জয়াদিত্য। বেশ্! আমি চললুম। [অলিন্দ-পথে নেপথ্যে প্রস্থান।]

লেখা। মাধবিকা! [মাধবিকার প্রবেশ]

মাধবিকা। কি সখী!

লেখা। আমার বিশ্বস্ততমা প্রিয়তমা সখী!

মাধবিকা। ও কি ভাই! তুমি অমন শিউরে উঠ্ছ কেন?…ও কি! তোমার চোখ ছলছল কেন?

লেখা। একটা গান শুনেছিলুম "ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে অরূপ-রতন আশা করে!" আমি আজ সেই ডুব দিতে চলেছি!

মাধবিকা। কি হয়েছে বোন্, খুলে বল—

লেখা। তোকে পূর্ব্বেই যখন আভাস দিয়েছিলুম, তখন তুই আমার কথা রাখতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলি। এইবার তার পরীক্ষা।

মাধবিকা। অক্ষরে অক্ষরে আমি তোমার কথা রাখব বোন্! এখন কি করতে হবে বল!

লেখা। আজ ফুলশয্যা!

মাধবিকা। তার সময় হয়েছে। চল—

লেখা। কিন্তু, আমি ফুলশয্যায় যাবো না।

মাধবিকা। তবে কি সই আমি যাবো?

লেখা। যাবে সুলেখা।

মাধবিকা। তবে তোমার সেই খেয়ালই বজায় রইবে।

লেখা। হাঁ।

মাধবিকা। কিন্তু, সুলেখা কি সম্মত হয়েছিল?

লেখা। তাকে আমি আজ সারাটি অপরাহ্ণ বুঝিয়েছি। অবশেষে সে সম্মত হয়েছে। তোরা তাকে আমার কৃতদাসী বলে থাকিস, এমনি অনুগত আমার সে।—কিন্তু তোরা তাকে ভুল বুঝেছিস। প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসলেই কৃতদাসী হতে হয়। সে আমার সেই কৃতদাসী। তা ছাড়া—

মাধবিকা। তা ছাড়া?

লেখা। সুলেখা জয়াদিত্যকে ভালোবাসে। জয়াদিত্য এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর! সুন্দর সুপুরুষ সে! জয়াদিত্য সার্ব্বভৌম নরপতি! কে তাকে না ভালোবেসে থাকতে পারে!

মাধবিকা। তবে তুমি?

লেখা। আমি সব-চাইতে ভালোবাসি তাকে যে আমাকে তুচ্ছ কর্ত্তে পেরেছে। নারী যার পূজা পায়, তাকে সে পূজা কর্ত্তে চায় না; নারী পূজা করতে চায় তাকে, যে তাকে পূজা করে না!

মাধবিকা। তবে তুমি জয়াদিত্যকে ভুললে?

লেখা। আমি যে চিত্রকরকে ভুলতে পার্চ্ছি নে! নারীকে যে ভালোবাসে, নারী তাকে হয় ত ভুলতে পারে, কিন্তু, নারীকে যে আঘাত করে, নারী তাকে ভুলতে পারে না!

মাধবিকা। তুমি যা ভালো বোঝ, কর। আমি আমার কাজ করে যাব। যা করতে বলবে তাই কর্ব্ব।

লেখা। হাঁ বোন্, তাই কর, তাই কর। আমার জন্য ভেবো না। এই নাও অঙ্গুরীয়ক, এই অঙ্গুরীয়ক সুলেখাকে পরিয়ে দাও, আমার সাজে সাজিয়ে দাও। তাকে ব'লো শুধু আজকের রাতটুকুর জন্য আমি ছুটি চাইছি! একটি রাত! শুধু একটি রাত!

মাধবিকা। বলব। কিন্তু, কোশলরাজ যদি অঙ্গুরীয়ক সত্ত্বেও সুলেখাকে আর কোনরূপে চিনতে পারে!

লেখা। কোশলরাজ স্মৃতির ধ্যান করেন। যাকেই তিনি পান না কেন, মনে কর্ব্বেন সে আমি, কাশী-রাজকন্যা লেখা। তা ছাড়া, "অন্ধকারে হীরক জ্বলে ব'লে" তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। [শিবির-প্রান্তে সানাই বাজিয়া উঠিল।] ঐ সানাই বাজছে!…ফুলশয্যার তান!—না বোন্, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়, তুই যা…শীগ্‌গীর! [তাহাকে অঙ্গুরীয়ক দিয়া অলিন্দ-পথে ঠেলিয়া দিলেন। মাধবিকা লেখার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়া, পরে অদৃশ্য হইল।]

[শিবির-প্রান্তে সানাই বাজিতে লাগিল। একমনে লেখা তাহা শুনিতে লাগিলেন। পরে একবার অলিন্দ-পথে বাহির হইলেন, আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া পর্দ্দা ছাড়িয়া দিয়া আত্মগোপন করিলেন। একাধিকবার এইরূপ করাতে মনে হইল তিনি খুব বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, এদিকে, ফুলশয্যার শোভাযাত্রা অলিন্দ-পথ দিয়া ক্রমে বিলাস-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। লেখা ছুটিয়া যাইয়া অতি সঙ্কোচে সেই জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলেন। ধূপ দীপ আলো, নানাবিধ যৌতুক প্রভৃতি বহন করিয়া, সখীগণ, বাহকগণ, অনুচরগণ, শোভাযাত্রার পুরোভাগে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে সুসজ্জিত ছিল। মধ্যভাগে

ছিলেন বরণডালা হাতে কুলস্ত্রীগণ এবং, ক্রমে, জয়াদিত্য, (অবগুণ্ঠিতা সুলেখা), এবং বৃহদ্রথ।

বিলাস-কক্ষে শুধু তাঁরাই প্রবেশ করিলেন যাঁরা শোভাযাত্রার মধ্যভাগে ছিলেন। কাশীরাজ ও কুলস্ত্রীগণ বর ও বধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পার্শ্বস্থ দ্বারপথে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সখীগণ, বরণডালা হাতে লইয়া, দুই পার্শ্বস্থ দ্বারপথে বিলাস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সানাই বাদ্যের তালে তালে, বর ও বধূকে আরতি-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিল। নাটকে গানের প্রয়োজন, অতএব, খুব সম্ভবতঃ তাহারা সময়োপযোগী গানও গাহিয়াছিল। তাহা শেষ হইলে, ক্রমে, তাহারা অদৃশ্য হইল, এবং বিলাস-কক্ষের সম্মুখস্থ পর্দা, ধীরে ধীরে, বিলাসকক্ষের সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল। শোভাযাত্রার যাহারা বাহিরে ছিল, ততক্ষণ, তাহারাও অপসৃত হইয়াছে। ক্রমে সানাইও থামিয়া গেল।

অতিথি-নিবাসের সম্মুখস্থ দরজা-পথের পর্দ্দার আড়াল হইতে লেখা বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত চরণে বিলাস-কক্ষের পরদা-পথে উঁকি দিতে যাইয়াই সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে অলিন্দ-পথে, ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখেন সেখানে চিত্রকর-সম্রাট রেখানাথ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। বোধ করি তিনি শোভাযাত্রার ভিড়ের মধ্য হইতে কোন সময়ে এইখানে আসিয়া কাহারো প্রতীক্ষা করিতেছেন। লেখা তাঁহাকে দেখিয়াই প্রথমে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে গিয়াই আবার ফিরিলেন। এবং ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাহস-ভরে কথা কহিয়া তাঁহার তন্ময়তা দূর করিলেন।]

লেখা। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন!

রেখানাথ। আমার আশীর্ব্বাদ! [হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

লেখা। আপনার পদস্পর্শে আমাদের এই দীন বস্ত্রাবাস ধন্য!

রেখানাথ। পরিহাসও তবে কলাবিদ্যা হিসাবে শিক্ষা করা যায় দেখছি! বাঃ চমৎকার!...হুঁ...কিন্তু রাজা কোথায়? অথবা কোশলেশ্বর জয়াদিত্য?

লেখা। রাজা শয়নকক্ষে এতক্ষণ নিদ্রাগত। আর কোশলেশ্বর তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে ফুলশয্যার প্রেমরঙ্গে মত্ত। আপনার যা প্রয়োজন, যদি নিতান্ত অসঙ্গত না হয়, তবে আমাকেই বলতে পারেন...

রেখানাথ। আপনি—

লেখা। আমি সুলেখা, কাশীরাজের শ্যালিকা-কন্যা।

রেখানাথ। আমি আপনার কথা শুনেছি; তবে দেখলুম আজ এই প্রথম। রাজকন্যা লেখার চিত্রাঙ্কনার্থ যখন আমি নিমন্ত্রিত হয়ে রাজপ্রাসাদে অতিথি ছিলুম, তখনি আপনাদের এই অশ্রুতপূর্ব্ব সাদৃশ্যের কথা শুনি। আর সেই সময় রাজকন্যার সেই হীরকাঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানের খবর জেনেছিলুম বলেই আজ আপনাকে রাজকন্যা লেখা বলে ভুল করে বসিনি!

লেখা। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ এই গভীর রাত্রে এখানে আপনার শুভ-পদার্পণের উদ্দেশ্য?

রেখানাথ। কাল প্রভাতে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ! তবু, আজ রাত্রের এই অনিয়ম ক্ষমা করা কি এতই কঠিন?

লেখা। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন! আমি কোন কৈফিয়ৎ চেয়েছিলুম না। কৌতূহল হয়েছিল, সেই কৌতূহল চরিতার্থ কর্ত্তে চেয়েছিলুম। বরং আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন!

রেখানাথ। তর্ক-বিতর্কে নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই! তোমাদের অভিভাবকগণের আমি দর্শন ভিক্ষা করি।

লেখা। আমিও বৃথা কথা বলে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট কর্ত্তে চাই নে। আপনার উদ্দেশ্য আমার নিকট বিবৃত করুন......আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। জানবেন আমি তাঁদেরই প্রতিনিধি।

রেখানাথ। তবে আপনিই শুনুন। কাল প্রভাতে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। আজ তাই এই সুন্দর ধরণী হতে বিদায় নেবার জন্য নিজকে প্রস্তুত করছি! স্নেহ-কাতর বৃদ্ধ কাশীরাজের মনে আমি যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছি, আজ আমাকে আমার সেই অনুতাপ হতে মুক্ত হতে হবে। মুক্ত না হলে আমার বিদায় পরিপূর্ণ হবে না। এই নিন রাজকন্যা লেখার প্রতিকৃতি!

লেখা। [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্য কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া] সে কি! এ কি!...কই? [হাত বাড়াইয়া

প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহা দেখিয়া] উঃ, এ যে অবিকল, অবিকল প্রতিচ্ছবি !···কিন্তু, কিন্তু, তবে আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ কর্লেন ?···নিকৃষ্টতর সৌন্দর্য্য এঁকে আপনি পরাজয় স্বীকার কর্লেন ?

রেখানাথ। প্রতিমূর্ত্তি নিখুঁত হয়েছে ?

লেখা। নিখুঁত, নিখুঁত! এ তো শুধু প্রতিকৃতি নয়, এ জীবন্ত মূর্ত্তি।···যাক্, আমার সাধনা সফল হ'ল।···আজ তোমার এই পরাজয় কামনা করেই আমি তোমার শিল্প-কুঞ্জে অভিসারে চলেছিলুম—

রেখানাথ। ···বিদায়! আমার শিষ্যের শ্রম সার্থক হয়েছে।···অতি যত্নে সে এঁকেছে! আমি আমার শ্রেষ্ঠ তুলি দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্ব!

লেখা। [সবিস্ময়ে]···এ চিত্র তবে তুমি আঁকো নি ?

রেখানাথ। আমি ?—হাঃ হাঃ হাঃ।

লেখা। এ চিত্র আমরা গ্রহণ করলুম না!···[সরোষে] ফেরৎ নাও···

রেখানাথ। —ফেরৎ নিতে হয়, শিষ্য নেবে; আমার কাজ শেষ হয়েছে। শোন নারী! আমার সুন্দরী তোমাদের দেখ্ছে, আর হাস্ছে!···ঐ যে চিত্র···ঐ চিত্রে, ঐ মধু-মুখের ঐ চারু ওষ্ঠের একটি পাশে ছোট্ট একটি কালো তিল বসিয়ে দিলে ঐ চিত্র আরো শতগুণ সুন্দর হয়ে উঠত··· সেই যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যের চাইতেও শতগুণে সুন্দর আমার সুন্দরী!···কাল প্রভাতের পরীক্ষায় আমি ভয় পাই নি!···আমার এই শিষ্যও তো ভয় পেতো না··· সে শুধু ঐ ছবিতে একটি তিল বসিয়ে দিত!···কিন্তু, আমার ভয়, আমি, আমার সুন্দরীকে, কাল প্রভাতে বিশ্ব-ভুবনে তার মহিমার পরিপূর্ণ সমারোহে প্রকাশিত কর্ত্তে পার্ব্ব কি না!···আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত, আমার তুলি চলে না! কালী সরে না!···দীর্ঘপথের যাত্রী আমি! সাথী নেই, দোসর নেই।...তবু চলেছি! চলেছি! সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে—তারি উৎসাহে চলেছি! চল্‌ব!

লেখা। চিত্রকর! চিত্রকর! বল···আরো বল···

রেখানাথ। "ডুব দিয়েছি রূপ-সাগরে
অরূপ-রতন আশা ক'রে!"

লেখা। চিত্রকর! চিত্রকর!···তুমি কি যাদুকর ?

রেখানাথ। আমি চললুম। আজ এই রাত্রিটুকু আমাকে অমানুষিক শ্রম কর্ত্তে হবে। আমার মাথার ভেতর রূপের আগুণ জ্বলছে! হয় ত সে আগুণ বিশ্ব আলোকিত কর্ব্বে, না হয়, তাতে আমার সকল সত্ত্বা ভস্মীভূত হবে।·· কিন্তু, তবু এর শেষ দেখব! মর্ত্তে হয় মর্ব্ব, স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরলোকে যাবো···সেখানে আবার চেষ্টা কর্ব্ব, না পারি, আবার মর্ত্ত্যে নেমে আসবো! যুগে যুগে জন্ম আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার এই সাধনা চল্‌বে!

লেখা। চিত্রকর! চিত্রকর! তোমার সুন্দরীর কথা বল—

রেখানাথ। সময় নেই, সময় নেই। আমার শেষ কথাটি তোমাকে বলে যাই! রাজকন্যা লেখাকে ব'লো, সে যেন আমাকে ভুল না বোঝে। যদি আমি কাল প্রভাতে জয়ী হই, বিশ্ব ভুবন বুঝবে কি সৌন্দর্য্যে আমি মত্ত মাতাল হয়ে রয়েছি! আর যদি পরাজিত হই, তবু, রাজকন্যা লেখাকে আমি আমার সুন্দরীর আভাস দিয়ে যাবো। চিত্রপটে আমি তার রূপরেখা যতটুকু ফোটাতে পারি, সেইটুকু লেখাকেই উৎসর্গ করে যাব—সেই হবে আমার জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ! লেখা সেই রূপরেখা ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে আরো সুন্দর হবে, আরো অপরূপ হবে!

লেখা। লেখাকে এ উপহার কেন ?

রেখানাথ। আমি জানি, সে আমাকে ভালোবেসেছে!

[বলিয়াই চকিতে অলিন্দ-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লেখা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিলেন।]

[মুহূর্ত্তপরে সেখানে ত্বরিৎপদে মাধবিকা আসিয়া বিস্ময়াভিভূতা লেখাকে স্পর্শ করিয়া সচকিত করিল।]

মাধবিকা। তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়েই রয়েছ ?— সর···সর···ছুটে পালাও!···ওরা এখানে উঠে আস্‌ছে!

লেখা। কারা ?

মাধবিকা। বর এবং বধূ!

লেখা। তুমি তা জানলে কেমন করে ?

মাধবিকা। আমি আড়ি পেতে বসে ছিলুম! ওদের সব প্রেমালাপই শুনেছি। এখন ওদের বেড়াতে সখ হয়েছে। ঐ জ্যোৎস্না উঠেছে! বসন্ত-সমীরণ ভেসে আসছে! প্রেমসাগরে তুফান উঠেছে!

লেখা। কবিত্ব থাক্। শোন্—

মাধবিকা। বল—

লেখা। আমার ঘরে চল। সুলেখাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু নিজমুখে তা বলতে সাহস পাচ্ছি নে! লজ্জা হচ্ছে! তুমি আমার দূতী হয়ে তাকে তা নিবেদন কর্ব্বে!

মাধবিকা। কিন্তু তাকে একলা পাবার সুযোগ পেলে হয়। সে হবে এখন।…ঐ তারা আসছে!—চল…পালাও—[লেখার হাত ধরিয়া অতিথি-নিবাসে আত্মগোপন।]

[কিছু পরে, সুলেখা ও জয়াদিত্য হাত-ধরাধরি করিয়া অলিন্দ-পথে দরবার-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

জয়াদিত্য। এই জ্যোৎস্না রাত্রে তুমি আমার কোলে মাথা রেখে গান গাও, আমি শুনি!

সুলেখা। গান নয়, তুমি গল্প কর, আমি শুনি। তোমার যুদ্ধজয়ের কাহিনী বল, তোমার কীর্ত্তি-কাহিনী বল, দেশের সার্ব্বভৌম নরপতি তুমি, কি তোমার গৌরব, কি তোমার গর্ব্ব আমাকে বল…আমি শুনব! আমি শুনব!

জয়াদিত্য। বল্‌ব! সব বল্‌ব!… কিন্তু আমি কি শুধু বল্‌ব-ই? শুনব না?…

সুলেখা। বেশ, তবে শোন…

[সুলেখা গান গাহিলেন। গান শুনিতে শুনিতে জয়াদিত্য সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।]

সুলেখা। [গীতান্তে] এ কি! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ? [কিয়ৎক্ষণ তাঁহার ঘুমন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া] না থাক্।…সারাদিন যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত তুমি,… ঘুমাও। আমি গান গাই! সেই স্বপ্নের গান, যার আরম্ভও জানি নে, কখন যে ভেঙে যাবে তাও জানিনে! …কি রহস্যময় এই স্বপ্নের জীবন, অথবা, জীবনের স্বপ্ন! [তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অথবা, নাটকীয় প্রয়োজনে হয় ত আর একটি গানও গাহিলেন।]

[অতি শঙ্কিত চরণে মাধবিকা আসিয়া সুলেখার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুলেখা চমকিয়া উঠিলেন।]

সুলেখা। কি?

মাধবিকা। চুপ!…[নিম্নকণ্ঠে] শুনে যাও—

সুলেখা। কোথায়?

মাধবিকা। …নির্জ্জনে!…চল…ঐ বিলাস-কক্ষে—

সুলেখা। [অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে জয়াদিত্যকে দেখাইলেন।]

মাধবিকা। ঘুমিয়ে রয়েছেন, বেশ!…ওঁকে না জাগানোই ভালো, তবে আমাদের কথা কইবার সুযোগ হবে না, অথচ, বড় জরুরী কথা—

সুলেখা। কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে?

মাধবিকা। তুমি এসে শুনে যাও বোন্!

[নিতান্ত অনিচ্ছাতেই সুলেখা মাধবিকার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইলেন। যাইবার সময় দরবার-কক্ষের পরদা টানিয়া দিয়া গেলেন। তাঁহারা অলিন্দ-পথে চলিয়া বিলাস-কক্ষের পরদা অপসারিত করিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।]

সুলেখা। …কি বোন?

মাধবিকা। লেখার কাজ শেষ হয়েছে।

সুলেখা। কিন্তু, কিন্তু…রাত কি ভোর হয়েছে?

মাধবিকা। না, এখনো বিলম্ব আছে। শোন বোন! কাল প্রভাতে চিত্রকর রেখানাথ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপনীত হবেন। আজ রাত্রে সেই মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য, লেখা, তোমার হাতে তার আজ রাত্রির পত্নীত্ব সমর্পণ করে, অভিসারিকা সেজেছিল—হাঁ, এ অভিসারিকা ভিন্ন আর কি!

সুলেখা। —[আপন মনে] চন্দ্রমা তো এখনো অস্ত যায় নি!

মাধবিকা। লেখার সেই পরীক্ষা শেষ হয়েছে!

সুলেখা। কিন্তু আমার স্বপ্ন তো এখনো শেষ হয় নি!

মাধবিকা। শোন বোন—

সুলেখা। না…না…ব'লো না, ব'লো না…রাত্রি শেষ হোক্, তার ঘুম ভাঙুক…

মাধবিকা। সুলেখা!

সুলেখা। চুপ!

মাধবিকা। তবে শোন—

সুলেখা। বল…বল…না, না, ব'লো না!

মাধবিকা। …তুমি বুঝেছ!…লেখা এখন তোমার হাতের ঐ অঙ্গুরীয়ক ফেরৎ চায়—

সুলেখা। ও—হো—হো! [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া কৌচে এলাইয়া পড়িলেন]

ঝরণা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

মাধবিকা। সুলেখা! সুলেখা! আমি ঐ পর্দ্দার আড়ালে যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম…ওঠ…আত্মসম্বরণ কর…অঙ্গুরীয়ক দাও—

সুলেখা। না—না—না—! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

মাধবিকা। সে কি!

সুলেখা। পারি না, পার্ব্ব না, তাকে ছেড়ে দিতে পার্ব্বো না! তিনি আমাকে ভালোবেসেছেন! তিনি আমাকে তাঁর ইহকাল পরকাল নিবেদন করেছেন, আমি তাঁকে আমার জীবন-মন সমর্পণ করেছি! এ তো একদিনের, এক রাত্রির ভালোবাসা নয় সখী!

মাধবিকা। মনে রেখো তুমি তার পত্নী নও—

সুলেখা। হাঁ, মন্ত্রপাঠ হয় তো হয় নি! কিন্তু··না—না—না—এ যে কিসের বন্ধন আমি বলতে পার্ব্ব না!

মাধবিকা। লোকে বলবে এ ব্যভিচার!

সুলেখা। রাধিকার এই ব্যভিচার তাঁর মাথার মণি ছিল, আমার এই ভালোবাসা আমারো মাথার মণি!

মাধবিকা। কিন্তু কথার তো আর সময় নেই! তুমি তবে রাজকন্যার প্রস্তাবে সম্মত নও?

সুলেখা। না—না—না! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।]

মাধবিকা। জীবনে বোধ করি এই প্রথম তোমার ভগিনীর অবাধ্য হলে।

সুলেখা। ওঃ [মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।]

মাধবিকা। মূর্খ তুমি! জয়াদিত্য তোমাকে ভালোবাসে নি, ভালোবেসেছে রাজকন্যাকে। তাঁর ধারণা তুমিই রাজকন্যা। যে মুহূর্ত্তে তিনি জানতে পার্ব্বেন যে তুমি সুলেখা, নও, সেই মুহূর্ত্তেই···

সুলেখা। [চমকিয়া উঠিয়া]—সে কি!

মাধবিকা। হাঁ, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তোমাকে ঘৃণায় পরিত্যাগ কর্ব্বেন। যাও দেখি তুমি তাঁর কাছে একবার ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ করে!

সুলেখা। না—না—না!···তা কি সে পারে! সে আমাকে মনে প্রাণে ভালোবেসেছে বলেছে! বলেছে—ওগো রাণী! যুগযুগান্তেও জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়েও আমি তোমারি!

মাধবিকা। অবোধ তুমি! নিতান্ত সরলা তুমি! তোমার অদৃষ্টে বহু দুঃখ আছে। সময় থাকতে এখনো সাবধান হও!··একবার গিয়েই দেখ না তাঁর কাছে ঐ অঙ্গুরীয়ক ত্যাগ করে!

সুলেখা।—হাঁ, তাই যাব। তাতে আমার ভয় নেই! আমি তাঁর কালো চোখে তাঁর মনের অন্তরতম কথাটি পর্য্যন্ত পড়েছি।···হাঁ যাব।—এই নাও তোমার অঙ্গুরীয়ক। [অঙ্গুরীয়ক দান।] আমি চললুম। আমি তাঁকে সব খুলে বলব! তবু দেখবে সে আমারি, আমি তাঁরি! [উদ্‌ভ্রান্তভাবে পার্শ্বস্থ দ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মাধবিকা তাহার এই উন্মাদনা লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার চমক ভাঙিল তখন, যখন পরে লেখা আসিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন।]

লেখা। অঙ্গুরীয়ক—?

মাধবিকা। নাও··[অঙ্গুরীয়ক দান।]···কিন্তু প্রথমে সে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নি!

লেখা। আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। কিন্তু, কি কর্ব্ব! উপায় নেই! অরূপ-রতন আশা করে রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি! কি পাব কে জানে!...

মাধবিকা। সুলেখা সেজে তবে আশা মিটল না?

লেখা। মিটল না! মিটল না!···কিসে যে কি পাব কে জানে! আলেয়ার আলো লুকোচুরী খেলছে! তারি পেছনে আবার ছুটেছি এই অঙ্গুরীয়ক নিয়ে! হয় ত তার উপহার পাবো।..কিন্তু, পাবো কি না তাই বা কে জানে! ওগো, এই কি মরীচিকা? মাধবিকা! মাধবিকা! মৃগতৃষ্ণিকার অর্থ জানিস?

মাধবিকা। রাত্রি শেষ হয়ে এল। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও লেখা!

লেখা। ঘুম? আজ রাত্রে ঘুম?...জীবনে আর ঘুম আছে কি না তাই বা কে জানে!···না, না···আমি চললুম! এইবার জয়াদিত্যের পরীক্ষা। আমার ভাগ্যের জাল আমি নিজে বুনে যাচ্ছি!—সেই জালে কে জড়িয়ে মর্ব্বে জানিনে!···আমি নিজে? না জয়াদিত্য? না চিত্রকর?

[বিহ্বলভাবে পার্শ্বস্থ দ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, মাধবিকাও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। প্রহর শেষের সানাই বাজিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।]

[ইহার পর দেখা গেল দরবার কক্ষের পরদা সরাইয়া সুলেখা ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত জয়াদিত্যকে জাগাইলেন]

সুলেখা। জাগো! ওগো জাগো! জাগো!

জয়াদিত্য। কে?

সুলেখা। বল দেখি কে! [দীপ নিভাইয়া দিলেন]

জয়াদিত্য। আমি দেখেছি।…তুমি আমারই হাতের লেখা। কিন্তু লেখা! অন্ধকারে এ আবার তোমার কি খেলা?

সুলেখা। আলোতে নির্ভয়ে কথা বলা যায় না। আলোতে সত্য কথা দীপ্তি পায় না। অন্ধকারেই আজ আমাদের হৃদয় খুলতে হবে। আমি একটা দুঃস্বপ্নের কথা যদি তোমার কাছে বলি—

জয়াদিত্য। তুমি কি ভয় পেয়েছ রাণী?

সুলেখা। ভয় পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।… বলব?

জয়াদিত্য। নির্ভয়ে বল! যুগের শ্রেষ্ঠ বীরের বুকে তোমার আশ্রয়। নিঃসঙ্কোচে তোমার রহস্য প্রকাশ কর রাণী!

সুলেখা। তবে শোন! আজ যেন আমি তোমার ভালোবাসা পেয়েছি, এখনো পাচ্ছি, কিন্তু—

জয়াদিত্য। থেমো না, বল—

সুলেখা। কিন্তু, মনে কর আমি রাজকন্যা নই, আমি কোন অভাগিনী ভিখারিণী!

জয়াদিত্য। রাণী হতে হলেই যে রাজকন্যা হতেই হবে, এ কথা তোমাকে কে বল্‌লো লেখা? আর, ও কষ্ট-কল্পনারই বা প্রয়োজন কি?

সুলেখা। প্রয়োজন আছে। যদি আমি ভিখারিণী হতুম, তবু তুমি আমায় ভালোবাসতে?

জয়াদিত্য। তা না বাসলে, আমার এ ভালোবাসা যে মিথ্যা হ'ত প্রিয়তমে!

সুলেখা। আজ যদি আমি বলি আমি লেখা নই, আমি সুলেখা —

জয়াদিত্য। হাঃ হাঃ হাঃ! অন্ধকারেও হীরক জ্বলে!—তোমার হাতের ঐ হীরকাঙ্গুরীয়ক ঘোষণা কর্ব্বে যে তুমি…কিন্তু এ কি! তোমার অঙ্গুরীয়ক?

সুলেখা। নেই! নেই! . ওঃ [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

[সহসা দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল সুলেখার পার্শ্বে মাধবিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।]

মাধবিকা। সখী!…এই তোমার হীরকাঙ্গুরীয়ক। [তাহার হাতে পরাইয়া দিতে দিতে]…তুমি হারিয়েছিলে,. তোমার বোন্ পেয়ে আমাকে দিয়ে তোমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন!

সুলেখা। ওঃ [মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

জয়াদিত্য। মাধবিকা! মাধবিকা! জল আনো! বাতাস কর!

[সম্মুখস্থ পর্দ্দা পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে সমস্ত শিবির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। করুণ সুরে সানাই বাজিতে লাগিল। ক্রমে উষার আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শিবিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ দিয়া এক দল বৈতালিক প্রভাতী গাহিয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন প্রভাত হইয়াছে। পাখীরা গান গাহিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে দরবার-কক্ষের পর্দ্দা সরিয়া গেল। জয়াদিত্য ও কাশীরাজ বৃহদ্রথ দরবার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন।]

বৃহদ্রথ। তোমার প্রভু কোথায়?

দূত। তিনি তাঁর চিত্রশালায়।

জয়াদিত্য। তার সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার চিত্র কই?

দূত। [নতশিরে নীরব রহিল]

জয়াদিত্য। তার সুন্দরী শ্রেষ্ঠার চিত্র কোথায়?

দূত। [তথাপি পূর্ব্ববৎ নীরব।]

বৃহদ্রথ। এই মুহূর্ত্তে উত্তর চাই—বল দূত অবিলম্বে, নইলে, সেনাপতি! ঘাতক!

[তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ও ঘাতক আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।]

দূত। আমার যা বলবার আছে, আমি নির্ভয়েই বলব।

জয়াদিত্য। কথা রাখ।…বল, কোথায় তার সেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি?

দূত। তিনি তা অঙ্কন কর্ত্তে অক্ষম হয়েছেন!

জয়াদিত্য। তা আমি পূর্ব্বেই জানতুম!

বৃহদ্রথ। আমিও তা পূর্ব্বেই জানতুম! কিন্তু, শুধু

অক্ষমতা জ্ঞাপন কর্লেই তো চলবে না, আমার কন্যার বিশ্ববিজয়িনী রূপের অমর্য্যাদা করবার গুরু অপরাধের দণ্ডভোগ কর্ত্তে হবে। সেনাপতি! চিত্রকর রেখানাথকে এখানে অবিলম্বে উপস্থিত কর—

[সেনাপতি প্রস্থান করিল।]

দূত। স্মরণ রাখবেন কুমার রেখানাথ যুগপ্রবর্ত্তক চিত্র-শিল্পী। এই প্রতিভা অকালে ধ্বংস কর্লে ভবিষ্যৎ-মানব পর্য্যন্ত আপনাকে ধিক্কার দেবে, আপনাকে অভিশাপ দেবে!

বৃহদ্রথ। সে আমার কন্যার অপরূপ রূপকে অপমান করেছে। অন্য কেউ এ অপমান কর্লে, ক্ষমা করা যেত, কিন্তু, ঐ যুগ-প্রবর্ত্তক শিল্পী আমার যুগ-বরেণ্য কন্যাকে অপমান করেছে, যুগান্তরেও, লোকে ইতিহাসের কল্যাণে এ কথা না জেনে ছাড়বে না! আমি শুদ্ধ সেই জন্য সেই অপরিণামদর্শী চিত্রকরকে ক্ষমা করতে অক্ষম!

[চিত্র হস্তে লেখার প্রবেশ।]

লেখা। ক্ষমার প্রয়োজনও নেই!—সে···চিত্র দিয়ে গেছে!······আর, সে চিত্র আমাদের রূপগর্ব্ব চূর্ণ করেছে! ···এই দেখুন—[বৃহদ্রথ-হস্তে চিত্র দান।]

বৃহদ্রথ। এ কি! মা সুলেখা! এ চিত্র তুমি কোথায় পেলে?

লেখা। সে কাল রাত্রে, ফুলশয্যার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময়, এই চিত্র আপনার উদ্দেশে নিবেদন করে গেছে!

বৃহদ্রথ। দেখ দেখি বৎস! [চিত্রখানি জয়াদিত্যের হস্তে দিলেন।]

জয়াদিত্য। কিন্তু···এ যে রাজকন্যা লেখার মুখখানিই মনে করিয়ে দেয়!

লেখা। হাঁ রাজা!···ও লেখা-সুলেখারই প্রতিমূর্ত্তি; কিন্তু, ঐ ছবির মুখ-সৌন্দর্য্য আরো শতগুণে ফুটে উঠেছে··· ঐ চারু ওষ্ঠের পাশে ঐ ছোট্ট কালো তিলটিতে, যা আমাদের কারো নেই!

বৃহদ্রথ। সত্য?

জয়াদিত্য। [অধোমুখে]—সত্য।

লেখা। [পিতাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া] এইবার তবে আমাকে বিদায় দিন!

বৃহদ্রথ। সে কি মা!

লেখা। মনে মনে আমি তাঁকে আমার গুরুরূপে বরণ করেছি!···এইবার তাঁর পথেরই পথিক আমি!

বৃহদ্রথ। সে কি কথা মা!···আসুক সে, সে কি বলে শুনি!

[সেনাপতির ও রেখানাথের শিষ্যের প্রবেশ]

সেনাপতি। সে আশা বৃথা। তিনি বিদায় নিয়েছেন।

লেখা। [পাংশু হইয়া] সে—কি!

সেনাপতি। আমি যখন তাঁর দেখা পেলুম, তখন তাঁর শেষ-মুহূর্ত্ত!···তিনি এই বস্ত্রাবৃত চিত্রখানি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "রাজকন্যা লেখাকে সশ্রদ্ধ উপহার!"

লেখা। আমি জানি! আমি জানি! ওঃ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অব্যক্ত বেদনায় অভিভূত হইলেন।]

জয়াদিত্য। কিন্তু, তবে কি সে-ই আমাদের পরাজিত করে চলে গেল?···বল সেনাপতি, এখনও ছুটে গেলে কি তার সঙ্গে দেখা হয়?

সেনাপতি। তাঁর আত্মা নশ্বর দেহ বহুক্ষণ ত্যাগ করেছে!

বৃহদ্রথ। [জয়াদিত্যের প্রতি] বৎস···যাবে?

জয়াদিত্য। হাঁ, যাব। সার্থক তার দম্ভ। তার জীবনের দম্ভ মরণে গগনস্পর্শী হয়েছে, সম্ভ্রমে আমার মাথা নত হয়েছে, আসুন পিতা···তার মৃতদেহের সম্রাটোচিত সংকার-ব্যবস্থা করি।

বৃহদ্রথ। চল······

[একটা মৌন বেদনা সকলের চোখে মুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সসম্ভ্রমে, সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহারা রেখানাথের মৃত্যু-বাসরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন শুধু লেখা আর রেখানাথের সেই শিষ্য।]

শিষ্য। আপনিই কি রাজকন্যা লেখা?

লেখা। না—না—না—!

শিষ্য। তবে আমার গুরুর এই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ দান... এই বস্ত্রাবৃত চিত্রখানি রাজকন্যার হাতে দেবেন···আমি আর বিলম্ব কর্ত্তে পাচ্ছিনে!"

লেখা। দিন। [পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় চিত্রগ্রহণ]···সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য এই চিত্রে লুকিয়ে আছে!...আমি খুলব! আমি দেখব! হাঁ, আমার অধিকার আছে!

[চিত্র আচ্ছাদন-মুক্ত করিলেন।]......কিন্তু, কিন্তু... এ কি!

শিষ্য। কি?

লেখা।—[চিত্রপট দেখাইয়া] চিত্রপট···শূন্য···সাদা··· সম্পূর্ণ সাদা!···এতে রেখামাত্র পড়ে নি!···

শিষ্য। ঐ হচ্ছে অরূপ-রতনের অরূপ চিত্র, রেখা দিয়ে তা আঁকা যায় না,···গেলে, জগতে একমাত্র তিনিই তা আঁকতে পার্ত্তেন!···বিদায় দেবী! বিদায়!

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান।]

লেখা। [শূন্যে চাহিয়া] হে আমার অরূপ-রতন! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। [প্রণাম।]

যবনিকা

মসুরীর কথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬ই এপ্রেল—আমার মধ্যে যে "ভবঘুরে"টা আছে তার জ্বালায় বিরক্ত হয়ে যখন কোথায় পালাই ভাবছি, তখন অনাহূত বৃষ্টি-ধারার মত বন্ধুবর নীরদবরণ এসে হাজির।

—কি সমাচার? ··

—কবি-লোক হয়ে তুই বুঝতে পারলি না; বিছানা-পত্তর বেঁধে ফেল্, আমার সঙ্গে মসুরী চল্!

বল্লুম—হঠাৎ মসুরী যাওয়া হচ্ছে যে? আর আমার ত দেখা আছে। বন্ধু হেসে বল্লে—"সে ত সেই লর্ড ক্লাইভের

চ্যাপম্যান্‌স্ এজেন্সী—রাজপুর

কতকগুলো খাতা ধপাস্ করে খাটের উপর ফেলে সুর করে সে গাইলে—"চলো মুসাফের, বাঁধ গাঁটরিয়া, বহুদুর জানা হৈ"—

আমলে গিছলে। ঢের জিনিষ বদলে গেছে বন্ধু—দেখবে চল—মাস দেড়েক আমি সেখানে থাকব, আফিস থেকে আমায় পাঠাচ্ছে Charleville hotel অডিট্ করতে জানো। তোমার কোন কষ্ট হবে না বন্ধু। নাও, তৈ

হয়ে পড়! Bombay mailএ যাব। আমি টিকিট কিনে বিছানা-পত্তর নিয়ে তোমার এখানে বেলা তিনটার সময় আসব। তা হলে এখন আমি চল্লুম, আফিসে সাহেবের কাছে আবার instructions নিতে হবে, দশটা বেজে গেছে।

হাফ-ওয়ে হাউস, ঝরিপানী

আমি বল্লুম,—তুই ত এক নিশ্বাসে অনেক বলে গেলি। তার পর আমার কিছুই গোছানো নেই, কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা না করে—

বাধা দিয়ে বন্ধুবর বল্লে—গোছানোর ঢের সময় আছে; আর কাজ-কর্ম্ম তোমায় কোন দিন ত আটকে রাখতে পারে নি বন্ধু,—এখন আর নতুন করে অভ্যাসটা বদলে ফেলে, জীবনটাকে আর প্রহসন ঘেঁসিয়ে নিয়ে নাই বা গেলে! আচ্ছা আমি চল্লুম, ঠিক তিনটার সময় আসছি!

বন্ধু ত বিদায় নিলেন! যাক্, ভাবলুম—একা একা কোথায় যেতুম, তার চেয়ে এর সঙ্গে যাওয়াই ভাল! স্নানাহারের পর suit-case গুছিয়ে, বিছানা বেঁধে বসে আছি। বেলা ৫টা বাজতে চলল, কিন্তু বন্ধুবরের আর দেখা নাই! ভারী রাগ হতে লাগল! ভাবলুম, April fool বানিয়ে গেল না ত! কিন্তু না, আজ ত ১লা এপ্রিল নয়! এই রকম যখন সাত পাঁচ ভাবছি, তখন গাড়ীর মাথায় জিনিষপত্তর চাপিয়ে তিনি এসে হাজির। রেগে বল্লুম—এই বুঝি তোমার তিনটে?—

খুব ব্যস্ত হয়ে নীরদ বল্লে—কি করব ভাই, বাড়ীর সব জিনিষ কিনতে হল, ছেলেটার বার্লী, ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে মেয়েটার প্রেসক্রিপসান বদলে আনলুম, শালাটার অসুখ করেছে বড্ড, আজ দশ দিন বলছিল দেখে আসতে, আফিস থেকে বেরিয়ে শালাকে দেখতে গেলুম,—কত ঝঞ্ঝাট বল দেখি। তোমার ত আর এসব বালাই নেই, বুঝবে কি বল! তারপর বিদায়ের পালাটাও আছে। দেড় মাস থাকব না, অনেক দিনের বিরহ—কাজেই অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক চক্ষের জল এড়িয়ে আসা...যাক্ সে সব তুমি বুঝবে না। এখন এস! ওরে মাধা, মোট-পত্তর সব গাড়ীতে তোল্!

একটা বেতের ঝুড়ী দেখে জিজ্ঞাসা করলুম—ওর মধ্যে কি আছে?

নীরদ হেসে বল্লে,—সেখানে কষ্ট হবে বলে, গিন্নী ৪টা বড় এঁচোড়, পটল, আম, মুগের ডাল, মশলা, সজনে ডাঁটা এই সব গুছিয়ে দিয়েছে। এসব ত সেখানে পাওয়া যায় না!

আমি বল্লুম, ওই অত-বড় লগেজ নিয়ে, এই তিনদিনের রাস্তা—

বাধা দিয়ে বন্ধু বল্লে,—কি করব ভাই, শুনলে না—মাথার দিব্বি দিয়ে এটা-ওটা করে, সব জিনিষই দিয়েছে!

লাইব্রেরী বাজার,—মসুরী

—বেশ হয়েছে, এখন চল!

গাড়ীতে যখন উঠে বসেছি, বন্ধু আমার গা টিপে বল্লে,—তোর উড়ে চুবেটার মুখে হাসি ধরছে না দেখেছিস;

এই দেড়মাস বেটারা রাম-রাজত্বি করবে! যাক্, "সজল কাজল আঁখি" দেখার ভাগ্য যখন করে আসনি, তখন এই দন্ত-বিকশিত মুখ দেখেই চল!

বোম্বাই মেল তখন প্ল্যাটফরমে হাজির। গাড়ীতে বেশী ভীড় পাওয়া গেল না! দুখানি বেঞ্চে আমরা দুজনে বিছানা পাতলুম! সে গাড়ীতে আর দুজন সহযাত্রী ছিল। একজন এখানে ল পড়েন—ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত ভদ্রলোক—সাজাহানপুর চলেছেন, দাদার কাছে হাওয়া বদলাতে, আর একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে গয়ায় যাবেন তাঁর পিসীমাকে আন্‌তে! অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা দুজনেই বেশ আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেল্লেন!

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব প্রাণ বহে' যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর—
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!!

* * *

গাড়ী বর্দ্ধমানে আসতে আমাদের টিফিন বাক্স খুলে তাঁদেরও যোগ দিতে বল্লুম। চারজনে বেশ জলযোগ সম্পন্ন করে বসা গেল! তখন আমার বন্ধু সেই ছেলেটিকে বল্লে, "খোকা, তোমার যখন ভাই রবিবাবুর মতন চুলের বাহার, তখন তুমি নিশ্চয় রবিবাবুর গান জান! একখানা গান ধরে ফেল, আমরা বেশ চোখ বুজে শুনি!" সে বারকতক "জানি না" "ভাল হবে না" "সর্দ্দিতে গলাটা বুজে আছে" ইত্যাদি বলে গাইতে সুরু করলে! তার বেশ মিষ্টি সুর ছিল। গান মন্দ লাগল না! তার পর সে আমার কাছ থেকে রবিবাবুর "চয়নিকা" খানা চেয়ে নিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল! বেশ লাগল! সে না কি প্রায়ই 'ইনষ্টিটিউটে' আবৃত্তি করে থাকে! সে এবার আই-এ দিয়েছে। সে আমায় বল্লে, আপনি দাদা ভাল গাইতে পারেন, নীরদবাবু বলছেন,—আপনি একখানা গান শোনান্।

চার্লিভিল রোড

আমি বল্লুম—আচ্ছা, সে তখন হবে, তুমি এখন পড়ে যাও ভাই, থেমো না, ভারী ভাল লাগছে! সুধীন্দ্র "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" পড়তে লাগল!

মনটাকে বেশ একটু দোলা দিয়ে দিলে। মনে মনে বল্লুম, যদি আবার কখনও এখানে পাঠাও ভগবান তাহলে অমনি তটিনীর রূপে, অমনি স্বচ্ছ, সহজ সরল—

—কি হে, ভাব লাগল না কি? এস, এইবার তাসে বসা যা'ক্! রাত্রে ঘুম ত আর কারুরই হবে না! খোকা গয়ায় নেমে গেলে ঘুমুনো যাবে!

সকলেরই সেই মত! কাজেই তাস খেলা চলতে লাগল! রাত তিনটার সময় গাড়ী গয়ায় এলে, খোকা আমাদের নমস্কার করে নেমে গেল! যতক্ষণ ট্রেণ ছিল, সে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেণ ছাড়্‌তে বল্লে, মসুরী থেকে চিঠি দেবেন, কলকাতায় ফিরলে দেখা করব দাদা! সুধীন্দ্র

নেমে যেতে গাড়ীটা আমাদের তখন ফাঁকা-ফাঁকা লাগল! ভদ্রলোকটি আমাদের এতক্ষণ বেশ জমিয়ে রেখেছিল। সকলে শুয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম!

বেলা সাতটার সময় গাড়ী মোগলসরাইতে আসতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুলী আমাদের মালপত্তর সব নামালে! আমরা ওয়েটিং-রুমে স্নান করে বেলা দশটার সময় রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে আহার সেরে—পেশোয়ার মেলে চাপলুম! এ গাড়ীতেও ভাগ্যক্রমে ভীড় পেলুম না! যে যার বিছানা বিছিয়ে কাত হলুম! রাত্রে ঘুম হয়নি, কাজেই এক ঘুমে বেলা তিনটে বেজে গেল! উঠে চোখ মুখ ধুয়ে উঠেছেন। আমি গাড়ীর কাছে আসতে, তিনি উর্দ্দুতে কি বল্লেন বুঝতে পারলুম না। তবে "তকলিফ্" কথাটা শুনে বুঝলুম, বিনয় জানাচ্ছেন! "কুছ নেহি" বলে তাঁর সঙ্গের জিনিষগুলো এধার-ওধার করে একটু পা ফেলবার পথ করে নিলুম ও আমার বিছানা সরিয়ে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাঁদের বসতে বল্লুম।

নীরদ এসে বল্লে—বাবা, এ যে go-down হয়েছে দেখছি!···এঁরা কদ্দুর যাবেন?

আমি বল্লুম—তা ত জানি না! ভদ্রলোকের কথা আমি একবিন্দুও বুঝতে পারি নি···হিন্দি ও ইংরিজী দুইটাই

চালিভিল হোটেল

বসলুম;—কিন্তু কেবলই মাঠের পর মাঠ, আর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর···ভারী বিরক্তি লাগল! একটু ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে···টাইম টেবেল হাতড়ে দেখলুম, সাড়ে চারটার সময় লক্ষ্ণৌতে গাড়ী পৌছবে! কি আর করা যায়, মুখ বুজে চুপ করে এই দেড় ঘণ্টা কাটানো ছাড়া উপায় নাই!

লক্ষ্ণৌ খুব বড় ষ্টেশন! গাড়ী থামতেই নেমে পড়া গেল! বন্ধু তরমুজ, ফুটি ও কিছু মিষ্টি কিনতে লাগলেন—আমি চায়ের যোগাড়ে গেলুম। খানসামাকে নিয়ে এসে দেখি, আমাদের কামরায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গে একটি ১৬৷১৭ বছরের মহিলা রাজ্যের জিনিষ নিয়ে চালিয়েছি, কিন্তু তাতেও সুবিধে হয় নি, শুধু একটু হাসি ও ঘাড় নাড়া ছাড়া আর কোন জবাব পাই নি!

এমন সময় দুজন স্থূলকায় বাঙ্গালী ভদ্রলোক দুটি ব্যাগ হাতে করে গাড়ীতে ঢুকে নীরদের ও কালীবাবুর বেঞ্চে বিনা বাক্যব্যয়ে দুটি জায়গা করে নিয়ে বসলেন! এরা দুজনে একবার পরস্পরের দিকে চাইলে, আমি জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপলুম! গাড়ী ছেড়ে দিলে! নীরদ তরমুজ কেটে ও কিছু মিষ্টি দিয়ে একটা বাটি আমার দিকে এগিয়ে দিলে ও বাকি কালীবাবু আর সে খেতে লাগল! কালীবাবু ভদ্রলোকদের

জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তাঁরাও সাজাহানপুর যাবেন। কালীবাবুর দাদা ডাক্তারবাবুকে এঁরা খুব চেনেন; সুতরাং পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হল! খাওয়া শেষ করে কালীবাবু আমায় বল্লেন, আসুন্‌না—এইবার ত কয়জন পাওয়া গেছে, একটু তাস খেলা যাক্! কিন্তু তাঁরা ব্রিজ খেলা জানেন না, আর নীরদও সবে মাসখানেক হল বাড়ীর মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের কাছ থেকে গ্রাবু খেলাটা শিখেছে—তার ঝোঁকটাও খুবই বেশী,—কাজেই বল্লুম—আমাকে বাদ দিন কালীবাবু, নীরদকে নিয়ে আপনারা চারজনে গ্রাবু খেলুন। আমার গ্রাবু খেলা আসে না। ওঁরা কয়জনে তাস খেলতে মেতে গেলেন।

আমি জলধর দাদার গ্রন্থাবলী নিয়ে বসলুম। বোধ হয়

চিরতুষার

মিনিট পাঁচ সাত পরেই "এই ছক্কা" বলে নবাগত ভদ্রলোক দুটি এমন বেয়াড়া চেঁচিয়ে উঠলেন, যে, চমকে যেতে হয়! মুখ ফিরিয়ে দেখি—তাঁরা একখানি 'ছক্কা' ধরেছেন! আর খেলা ভারী জমে উঠেছে। আমার সামনে বসে মুসলমান মেয়েটিও এদের খেলার মজা দেখে মুখ টিপে হাসছিলেন! তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটি ট্রাঙ্ক খুলে কি বার করছেন!

এই মেয়েটিকে "ঘোমটা-বিহীন" দেখে আমার গোড়া থেকে একটা বিস্ময় হয়েছিল! কারণ "পরদা" এঁদের মধ্যে ত খুবই বেশী। কিন্তু এখন তাঁর পাশে খানদুই হিন্দি ও উর্দ্দ বই, ও খাতা পেন্সিল নিয়ে তাঁকে কি লিখতে দেখে বুঝলুম, কেমাল পাশার প্রভাব এই ইউ-পিতেও এসে পড়েছে! মেয়েটির পোষাকও আমাদের এখানকার মুসলমান মহিলার মতন নয়! এঁর পোষাকে একটু বিশেষত্ব আছে; পায়ে ফিতা-বাঁধা জুতা, পরণে বড় ঢিলা পাজামা; গায়ের জামা অনেকটা আমাদের কোটের মতন, আর মাথায় মোটা সাদা ধবধবে চাদরের ওড়না! পিঠে বিনুনী ঝুলছে! দাঁতগুলি বেশ ঝকঝকে, দেখলেই বোঝা যায়—"পানের" ছোপ জীবনে পড়েনি! মেয়েটি বেশ সুশ্রী!

লোকটি ফিরে বসতেই মেয়েটি কি বল্লে। সে ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে টাইম-টেবেলট চেয়ে নিয়ে মেয়েটিকে দিতে, সে পাতা উল্টে দেখতে লাগল! বুঝলুম—মেয়েটি একটু-আধটু ইংরিজী লেখাপড়াও জানে! আমি ভদ্রলোক-টিকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনারা কোথায় যাবেন?

প্রত্যুত্তরে মেয়েটি বেশ পরিস্কার হিন্দিতে বল্লে—"আমরা লাহোর যাব।" মেয়েটিকে এ-রকম আগ-বাড়িয়ে কথা কইতে দেখে আমি একটু বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, এবং সেটা তাঁর নজর এড়ায় নি! তাই মেয়েটি এবার হেসে বল্লে—আমার দাদা হিন্দি বা ইংরিজী জানেন না! আমাদের দেশে উর্দ্দুটাই বেশী চলে।

বল্লুম—কিন্তু আপনি ত বেশ হিন্দি বলতে পারেন!

তিনি হেসে বল্লেন—আমি ইস্কুলে শিখেছি। আমাদের ইস্কুলে হিন্দি পড়ানো হয়।

মেয়েটির দাদা তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি কি বল্লেন—কিছুই বুঝতে পারলুম না।

এইবার মেয়েটি কলিকাতার দাঙ্গার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। যা জানতুম—তাঁকে আগাগোড়া বল্লুম। শুনে তিনি দুঃখিত হলেন! আরও বল্লেন, তাঁরাও 'অখাদ্য' খান না। শুনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হল। তাঁর হিন্দি বইখানা চেয়ে নিয়ে দেখি, সেখানা সাবিত্রী উপাখ্যান, খানকতক ছবিও আছে। তারপর তিনি লাহোরের গল্প করতে লাগলেন। "শাহ্‌দারা" (নুরজাঁহা বেগমের সমাধি)

বেশ দেখবার জিনিষ। আরও অনেক পুরনো জিনিষ দেখবার আছে! কাছেই অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির দেখবার আছে। আমায় বল্লেন—চলুন না, লাহোর হয়ে মসুরী যাবেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম, আমার বন্ধুটি আফিসের কাজে যাচ্ছে, সুতরাং দেরী করা চলবে না। আর ওকে ছেড়ে একা যাওয়াও হয় না। যাই হোক্, বল্লুম, লাহোর এইবার একবার দেখে যাব।

মেয়েটি তার ভাইটিকে কি বলাতে, তিনি আমায় উর্দ্দুতে কি বল্লেন; কিন্তু আমি বুঝতে না পেরে মেয়েটির পানে চাইতে, তিনি সলজ্জ ভাবে হেসে বললেন, দাদা ও দুটি ভদ্রলোক নেমে গেলেন। গাড়ী বেরিলী ষ্টেশনে আসতে আমরাও নেমে পড়লুম! ভাই ভগ্নী দুজনেই "আধা বরষ" জানিয়ে বিদায় দিলেন। তাঁদের ভদ্রতা ও বিনয় দেখে মনে হল—হায়, যদি বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় এমনি উন্নত ও সংযত হত, তাহলে আর এই রক্তা-রক্তি হত না। যাক্, রিফ্রেস্‌মেণ্ট-রুমে কিছু আহারাদি করে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় দেরাদুন এক্সপ্রেসে চাপলুম এবং সকালে সাড়ে ছটার সময় দেরাদুনে এলুম। ষ্টেশনের ধারে গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল (Great Indian Hotel) আছে; জিনিষপত্তর নিয়ে সেখানে উঠা

কুলুরীর পথে

বলছেন, সেখানে গেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আমাদের অতিথি হবেন। অবশ্য, আমাদের প্রতিবাসী হিন্দু ব্রাহ্মণের দ্বারাই আপনাদের খাবার যোগাড় করাব। কবে আসছেন বলুন?

আমার বিশুদ্ধ (?) হিন্দি বলায় তিনি ত গোড়া থেকেই হাসছেন; যাই হোক্ এবার কোন রকমে মাতৃভাষাটাকে হিন্দিতে মিশিয়ে খিচুড়ী করে আর এক প্রস্থ তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্লুম, কবে যাব তা বলতে পারি না; তবে সেখানে গেলে আপনাদের সঙ্গে না দেখা করে আসব না জানবেন। সাজাহানপুরে কালীবাবু গেল। হোটেলের ম্যানেজার একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। উপরের একটি ঘর খুলে দিলেন। বেশ সাজানো ঘর, ঘরের সঙ্গেই স্নানের ঘর আছে। বন্দোবস্ত বেশ ভালই। তবে রান্নাতে লঙ্কার আধিক্য একটু বেশী,—সেইজন্যে একটু অসুবিধা বোধ করা গেল। ৪।৫ জন Transport Agencyর লোক এসে হাজির। নীরদ Chapman's Agencyর লোকের সঙ্গেই ঠিক করলে যে, আমরা বেলা ৪টার সময় এখান থেকে বেরুব—সেই সময় মোটর চাই। আর আমাদের বিছানা, সুটকেস প্রভৃতি তার জিম্মা করে দিয়ে তাকে মসুরীতে Charleville Hotelএর ঠিকানা

দিয়ে দিলে। ঠিক হ'ল আমরা রাজপুর থেকে ঘোড়াতেই পাহাড়ে উঠবো। লোকটি তার ফরমে রসীদ দিয়ে সেলাম করে চলে গেল। স্নানাহার করে এক ঘুম দিয়ে বেলা ৪টার সময় যখন উঠেছি,—হোটেলের বেয়ারা এসে বল্লে মোটর এসেছে। আমরা জামা কাপড় ছেড়ে হোটেলের হিসাব

কুলুরীর বাজার

মিটিয়ে রওনা হলুম। দেরাদুন থেকে রাজপুর যাবার জন্য বেশ ভাল পাকা বড় রাস্তা আছে। কোন্ এক কোম্পানী ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম মসুরী পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে বলে লাইন পেতে পোষ্ট পুঁতে রাজপুর পর্য্যন্ত লাইন নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তার পর আর পাহাড় কেটে লাইন নিয়ে যাবার সুবিধে হয়নি বলে যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। শুনলুম সে কোম্পানীও ফেল হয়ে গেছে। দেরাদুন থেকে রাজপুর ৭ মাইল রাস্তা! ট্যাক্সি, টঙ্গা যথেষ্ট পাওয়া যায়। আজকাল আবার "বাস্" সার্ভিসও হয়েছে।

আমরা সাড়ে চারটা আন্দাজ সময় রাজপুরে চ্যাপম্যানের এজেন্সি আফিসে এলুম। দেখলুম আমাদের জন্য দুটি ঘোড়া তৈয়ারী আছে! আমাদের জিনিষপত্তর পূর্ব্বেই এঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে যে ছোট ব্যাগ আছে, তাহা যে ছোকরা দুজন ঘোড়ার সঙ্গে যাবে তাদেরই একজন নেবে! ম্যানেজার সাহেব আমাদের বিল দিলেন, তাহাতে মোটরের ভাড়া দেরাদুন থেকে রাজপুর ৫৲ টাকা, প্রত্যেক ঘোড়া ৩৲; ৩ জন কুলী প্রত্যেকে দেড় মণ মাল নেয়; ১৲ টাকা হিসাবে ৩৲ টাকা। এখানে "ডাণ্ডি" পাওয়া যায়—তাহা ৬ জন কুলী বদলাবদলী করিয়া একজন লোককে বহিয়া লইয়া যায়; তাহার ভাড়া ৬৲ টাকা। সাধারণতঃ মেয়েরাই "ডাণ্ডি"তে যায়। আমরা ত ম্যানেজারের বিল মিটিয়ে অশ্বারোহণে রওনা হলুম, পেছুনে দুজন সহিস আস[তে] লাগল। প্রথমে রাজপুর বাজারের মধ্যে দিয়ে আসতে হ[য়]; রাস্তার দুধারে যেমন পচা ড্রেনের গন্ধ, তেমনি ধুলো। খানিকটা চড়াই এসে "টোল ফটকে" আসা যায়। এখানে প্রতি লোক-পিছু দেড় টাকা করে দিতে হয়, এবং নিজের নাম, মসুরীতে কোথায় থাকা হবে ইত্যাদি লেখাতে হয়! তাঁরা একখানা ছাড়-পত্র দেন। যাক্—ছাড়পত্র নিয়ে ত আমরা যাত্রা করলুম! চার মাইল পথ এসে (পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে) ঝরিপানীতে "Half-way house"এ নেমে ঘোড়া দুইটাকে রাস্তার ধারে রেলিংএ বেঁধে, হাতার মধ্যে ঢুকতেই, এক বৃদ্ধ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন! এখানে চা, ডিম, রুটি, সোডা প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমরা চা, টোষ্ট ও ডিম চাই বলাতে মেমসাহেব তাঁর খানসামাকে অর্ডার করলেন। সাহেব আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন! ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ৮০র কাছাকাছি; কিন্তু এখনও তিনি বেশ কর্ম্মঠ! তিনি পূর্ব্বে রেলে কাজ করতেন। এখন অবসর নিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে এই মনোরম যায়গায় বাস করছেন। শীতকালে বরফ পড়লে দেরাদুনে নেমে আসেন! এই "Half-way House" করাতে জনসাধারণের যেমন উপকার হয়েছে, তাঁদেরও এই থেকে বেশ আয় হয়েছে। ভদ্রলোক যেমন আমুদে তেমনি রসিক! এখানে খানাপিনার দক্ষিণাও তেমন বেশী নয়। যাক্, ৬টার সময় আমরা পুনরায় রওনা

স্কেণ্ডাল পয়েন্ট, ক্যামেল্‌স ব্যাক রোড (কুর্ম্মপৃষ্ঠ পথ)

হলুম। আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন ক'রে আসাতে সাহেব আমাদের বল্লেন "full speed"এ যান, না হলে প[থে] শিলাবৃষ্টি পাবেন। আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম! কি[ছু] দূর এসেই আর একটা ফটক পড়ে। এখানে টোল আফিসে

রসীদ বার করে দেখাতে হয়। তাঁরা "পাঞ্চ" করে ফটক খুলে দেন! খানিকটা এসেই "বারলোগঞ্জে" আসা গেল! এখান থেকে দুইটা রাস্তা দুদিকে গেছে! যাঁরা "লেণ্ডোর" বা পুরানো মসুরীতে যাবেন, তাঁরা ডানদিকের রাস্তা ধরে যান ; আর যাঁরা, "Charleville" বা সহরের পশ্চিম প্রান্তে যাবেন, তাঁরা বাঁ দিকের রাস্তা ধরেন! আমরা বাঁ দিকের রাস্তা ধরে চল্লুম! সেখান থেকে দেরাদুনের বাড়ীগুলি দেখাচ্ছিল যেন ছোট ছেলেদের খেলাঘরের মতন!

পিকচার প্যালেস

ল্যাণ্ডোরের সাধারণ দৃশ্য

আমাদের আর ভাল করে পথের দৃশ্য উপভোগ করবার অবসর নাই, কারণ, আকাশে তখন কড় কড় করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি এলে পথের ধারে একটু দাঁড়াবার পর্য্যন্ত যায়গা নাই। কাজেই মরি-বাঁচি করে সেই পাহাড়ের পথে পুরা দমে ঘোড়া ছোটানো গেল! আমাদের সহিস দুটো যে কোথায় পেছিয়ে পড়ে রইল তা জানি না। রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ সময় মসুরীর উপরে লাইব্রেরী বাজারে (Library Bazar) এসে পড়া গেল। রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলছে। পথের ধারে বড় বড় দোকান খোলা আছে। রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার। আমার বন্ধু দোকান থেকে এক টিন বিলিতী দুধ কিনে নিলেন—কি জানি, এত রাত্রে যদি হোটেলে চা না পাওয়া যায়!

এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০০০ ফিট্‌!

লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে মালের (Mall) রাস্তা! আমাদের গন্তব্য স্থান তখনও তিন মাইল। আমরা অপেক্ষা না করে আবার ঘোড়া ছোটালুম। Charleville রোডে পড়ে মাইল

চা খাইয়ে আমাদের যথেষ্ট আরাম দিলেন! নীরদে সঙ্গে পূর্ব্ব থেকেই এঁর পরিচয় আছে; কারণ, নীরদ প্রা বছরেই এখানে অডিট করতে আসে! যে চাকর
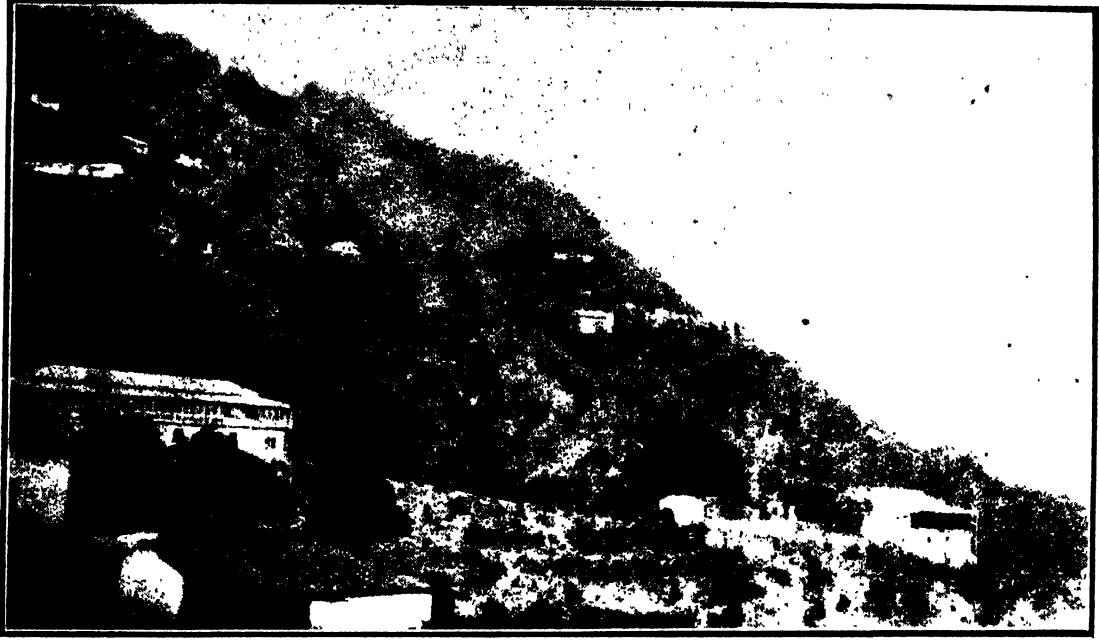
ল্যাণ্ডোর হাসপাতালের পথে

দু-এক যখন এসেছি, তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হল। তেমনি ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস,—পথে জনমানব নেই, কেবল দুধারে বড় বড় গাছের সারি। ভাগ্যে সেখানকার ঘোড়াগুলো খুব শান্ত, আর এ সব পথে ছুটতে অভ্যস্ত; নচেৎ আমার মতন সওয়ারের ভাগ্যে যে কি দুর্গতি হোতো তা বলা যায় না! যখন আমরা হোটেলের কাছাকাছি এসেছি, তখন মুষলধারে শিলাবৃষ্টি নেমে এল! ঘোড়াদুটাকে হোটেলের ফটকের পাশে রেলিংএ বেঁধে চৌকীদারের জিম্মা করে দিয়ে ছুটতে ছুটতে হোটেলে আসা গেল! হোটেলের এক প্রান্তে একাউন্‌টেণ্ট বাবু ও ষ্টোর বাবুর থাকবার বাড়ী। তাহারই লাগোয়া একটা বাড়ী বন্ধুবর অডিটবাবু অর্থাৎ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল! আমরা গিয়ে দেখলুম, আমাদের জিনিষ সব এসে গেছে। একাউন্‌টেণ্ট বাবু আমাদের জন্য একজন পাহাড়ী চাকর ঠিক করে রেখেছেন! আমরা যেতেই ভদ্রলোক আমাদের এক পেয়ালা করে গরম

প্রতিবার নীরদের কাজ করে, সে এবার এখনও বাড়ী থেকে আসেনি, তাই এই "পাহাড়ী"কে রাখা হয়েছে! এ পূর্ব্বে "রিক্স" টান্‌ত! নীরদ তাকে খাবারের ঝুড়ি থেকে ঘী, ময়দা, আলু ও ডিম বার করে দিয়ে বল্লে, "পুরি আউর
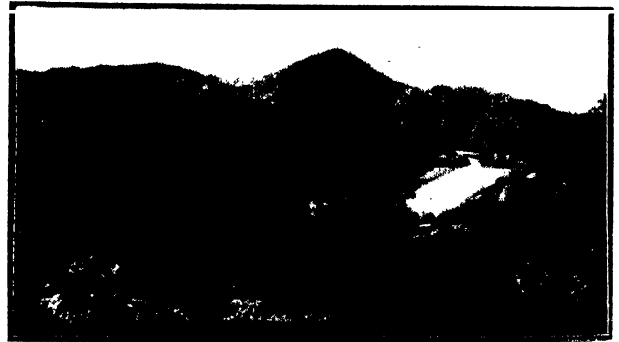
হ্যাপি ভেলী ক্লাব, মসুরী

ডিম্‌কা ডালনা বানাও।" গিরধারী প্রত্যুত্তরে "জী হুজুর" বলে সেগুলো নিয়ে গেল। একাউন্‌টেণ্ট—রাত হয়েছে, আবার কাল দেখা হবে—বলে বিদায় নিলেন। ভদ্রলোকের

বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে। এখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আজ বছর চারেক আছেন! অল্পক্ষণ আলাপ হলেও, লোকটি যে তেমন মিশুক নয়, এটা বেশ বুঝতে পারলুম। নীরদকে বলতে, সেও

"মসি" জলপ্রপাত

সমর্থন করে বল্লে—থাক্ না, দেখ্‌বি—ওর অনেক রকম বুজ্‌রুকী আছে। আমি নতুন যেবার এসেছিলুম, দেখলুম, তিন ঘণ্টা ধরে ধ্যান করে, চেঁচিয়ে কত রকম শ্লোক আওড়ায়, নিরামিষ খায়। আমায় বল্লে—সাধন-পথে স্ত্রীলোক হচ্ছে প্রধান বাধা;—তাদের এড়িয়ে না চল্লে মুক্তি নাই! পরিবার থাকা সত্ত্বেও দাদা আমার মূর্ত্তিমান ভীষ্ম দেব। পরের বছর এসে দেখি—সব ওলট-পালট! দাদা আমার গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসে তোফা খিচুড়ী বানিয়ে ফেলেছে। ডিম, রামপাখী কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এ ধারে বউদির কোলে ৪ মাসের ছেলে। উপরন্তু, আর একটি নবাগতের সম্ভাবনা হয়েছে! বউদিটি দাদার আমার দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম গৃহিণীর গুটি দুই তিন মেয়ে আছে, সকলেই বিবাহিতা। এ পক্ষের তিনটি ছেলে ছিল,—' দাদার যোগাভ্যাসের দরুণ গেল বছরে একটি বেড়ে গণ্ডা পুরো হয়েছে। আমি হেসে বল্লুম—বলিস কি রে?

হ্যাঁ, কাল তখন দেখতে পাবি! দেখ্, ওর Vanityতে কখনও আঘাত করিসনি,—ও যা আওড়ে যাবে, কেবল সায় দিবি, তাহলে অনেক রগড়ের কথা শুনবি! রাত্রি ১ টা আন্দাজ রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, পাহাড়ী-পুঙ্গব বেশ বড় বড় "ফুলকা" (মোটা রুটি) বানিয়েছে, ডালনা তখন চড়েছে! আমি বল্লুম—লুচী বানানে নেহি জানতা?

জী হুজুর!

তব্ আগে বোলা নেই কাহে, হাম দেখায় দেতা!

জী হুজুর!

সব কথাতেই "জী হুজুর" ছাড়া আর কিছু বলে না! যাক্ কি আর করা যাবে; যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল—তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, "চারপাই"এর ওপর লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল! হোটেলে তখন জনমানবের সাড়া নেই! বৃষ্টি অবিরল ধারে তখনও পড়ছে!

বেলা আটটার সময় ঘুম ভাঙ্গলে দেখি, নীরদ নাই। পাহাড়ীটাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। চা খেয়ে, গায়ে লেপ জড়িয়ে বসে আছি,—

কয়লা-বিক্রেতা

১২ মাইল পাহাড়ের রাস্তা অশ্বারোহণে আসার ফলে সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা। বৃষ্টি তেমনি পড়ছে—বিরাম নাই। এমন সময় একাউণ্টেট কাছে এসে বল্লেন—কি মশাই, উঠেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আসুন!—তার পর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা গেল। কথায় কথায় ভদ্রলোক বল্লেন—আপনারা ত কলকাতার বাবু, আপনাদের আমার জানা আছে! আমি হেসে বল্লুম—চাক্ষুশ জানা আছে, না, কল্পনার সাহায্যে জানা আছে?

—কেন, শরৎ বাবুর "শ্রীকান্ত"তে "কলকাতার বাবুর" কথা পড়েন নি?

আমি হেসে বল্লুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পড়েছি। কিন্তু এই কলকাতাতেই আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতন মহাপুরুষও আছেন! তাঁরাও কলকাতার বাবু! শুধু কেতাবেই

বারলোগঞ্জের পথে

"কলকাতার বাবু" দেখলেন—কখনও কলকাতায় গিয়ে দেখেননি বোধ হয়।

ভদ্রলোক হেসে বল্লেন—বইতে পড়ে আর দেখতে যাবার প্রবৃত্তি হয়নি!

—আমাদের দুর্ভাগ্য! মশায়ের দেশ কোথায়?

তিনি বল্লেন...জেলায়...গ্রামে। আমার গ্রামের মধ্যে আমিই প্রথম ইংরিজী লেখাপড়া শিখি।

আমি হেসে বল্লুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পূর্ব্বেই অনুমান করেছি। কিন্তু এই পাহাড়ে কে আপনার কদর বুঝ্বে মশাই, সহরে চলুন।

তিনি মাথা দুলিয়ে বল্লেন—আজ্ঞে না, ওইটি পারব না না হলে কলকাতায় আমায় ৫০০৲ টাকার চাকরী দিতে সাধাসাধি করেছিল মশাই, আমি accept করিনি। এখানে আমার ১৫০ টাকাই ভাল। সেখানকার environments আমার ভালই লাগে না। এমন সময় নীরদ এসে পড়ল। একাউণ্টেণ্ট বাবু উঠে বল্লেন,—৯টা বাজল, আচ্ছা এখন যাই, আবার অফিসে যেতে হবে! তিনি চলে গেলেন, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখা গেল, পাহাড়ীটা ডাল ভাত রেঁধেছে। নীরদ, বল্লে—"মাংস আতা হ্যায়, হাম বোলকে আয়া, আনেসে পাকাও।"

আমি বল্লুম—ওর দ্বারা হবে না—দেখছিস না, বেটা জানোয়ার। আমি রাঁধব। তুই কখন কাজে যাবি?

বল্লে—ছুটোর সময়!

যাক্, পাঁচ দিন ধরে ত শিলা বৃষ্টির বিরাম নাই,—কোথাও বেরুন যাচ্ছে না,—কেবল খাওয়া-দাওয়া করে চুপ-চাপ ঘরের মধ্যে লেপ জড়িয়ে বসে থাকা। নীরদ খেয়ে অফিস যায়, আসে বেলা ৪টার সময়,—আমার আর সময় কাটে না। বিছানায় কাত হয়ে জানালার সার্শির মধ্য দিয়ে অদূরে তুষার-ধবল পাহাড়ের দিকে চাই। আকাশে মেঘের খেলা দেখি, আর মনে হয় সত্যই হেথা—

"শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল-মধুর বেড়ে যায় জীবনের গতি
ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্র শান্ত বেশে, ধরে যেন
আনন্দ মুরতি।"

পাঁচদিন পরে আজ বৃষ্টি থেমেছে। রৌদ্রের শ্রী পাহাড়ের গায়ে গলিত-কাঞ্চন-ধারা ঢেলে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি চা খেয়েই বেরিয়ে পড়া গেল। নীরদ বল্লে, আসবার সময় একটা "রিকশ" নিস্, না হলে বেলা হয়ে যাবে!

আচ্ছা—বলে সটান সিধে রাস্তা ধরে লাইব্রেরী বাজারের রাস্তা ছাড়িয়ে আসা গেল। সেখান থেকে এসে বাঁয়ে "Camel's back" দিয়ে "কুলুরী বাজারে" এলুম। পথে তখন দলে দলে সাহেব মেমেরা ভীড় করে চলেছে। খানিকটা এসেই Picture Houseএর সামনে পড়া গেল। ঘড়ীতে দেখলুম বেলা ১১টা বাজে! আর দেরী করা উচিত

নয়। একে পাহাড়ীর হাতের মধুর রান্না,—তার উপর এই হাওয়ায় সে সব জমে যা অবস্থা হবে, সে আর মুখে দিতে পারা যাবে না,—কাজেই একটা "রিকস" নিলুম। এখানে "রিকস" ৪ জন পাহাড়ীতে টানে—আর একজন সঙ্গে থাকে—সে সকলকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করে। এক ঘণ্টার ভাড়া একটাকা-পাঁচ আনা। একঘণ্টার কম হলেও ওই ভাড়া দিতে হয়।

বিকেলে নীরদ আফিস থেকে এসে বল্লে, চল্, ল্যেণ্ডোর বেড়িয়ে আসি। জীতেন নাগ ফোন্ করেছে,—তোকেও নিয়ে যাবার জন্যে অনেক করে অনুরোধ করেছে।

আমি বল্লুম—সে ভদ্রলোক কে ?

—এখানে একটা আপিসে কাজ করে। আমি তাদের ফার্ম্মেও প্রতিবার অডিট করতে যাই, এবারও যাব। লোকটি খুব ভাল, আর আমায় খুব খাতির করে ও ভালবাসে। আর ল্যাণ্ডোরেই যা ৫।৬ জন বাঙ্গালী দেখতে পাই, আর কোথাও নয়! বাঙ্গালীদের মধ্যে নাগ বাবুই হচ্ছে সকলের চেনা! সে ভদ্রলোক আবার অনেকের House Agent. এবং অনেকেরই বেগার খাটেন! কেউ মেয়েছেলে নিয়ে এসে পড়েছেন—বাড়ী পাচ্ছেন না, চাকর পাচ্ছেন না,—নাগবাবু যোগাড় করে দেন। কারুর অসুখ হয়ে পড়ল, ভদ্রলোক ডাক্তার ডেকে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করে দেন। লোকটার ভারী সাদা প্রাণ!

ল্যাণ্ডোর Charleviile থেকে ৫ মাইল।

ল্যাণ্ডোরে নাগবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হ'লে ভদ্রলোক খুব অভ্যর্থনা করলেন। আর অল্প সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে এমন আলাপ করে ফেল্লেন, যেন মনে হল, তাঁর সঙ্গে আমার কতদিনের পরিচয়! তাঁর ওখান থেকে জলযোগ করে তাঁদের আড্ডায় যাওয়া গেল। সেটি হাসপাতালের কাছেই! এক ভদ্রলোকের বাসায় এঁদের আড্ডা বসে। সেখানে আরও ৬জন বাঙ্গালী দেখলুম—সকলেই চাকুরীজীবী। কেহ সার্ভে আফিসে, কেহ ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করেন। আমরা যেতেই ভদ্রলোকরা ভারী খুসী হলেন। বল্লেন —বাঙ্গালীর মুখ দেখে বাঁচলুম মশাই! এখানে আমরাই যা ৬।৭ জন বাঙ্গালী আছি। তাও সকলের সঙ্গে সব সময় দেখা হয় না। কেউ বা কাজের জন্য দেরাদুন ব্রাঞ্চে চলে যান, কেউ বা লক্ষ্ণৌতে যান! তার পর গান-বাজনা আরম্ভ হল! এক ভদ্রলোকের একটি হারমোনিয়ম ছিল, সেটি আনানো হল, এবং প্রায় সকলেই "কোরাসে" গাইতে লাগলেন। ডি, এল, রায়, মহাশয়ের গান থেকে আরম্ভ করে, "আলিবাবার" "বাজে কাজে মিনষেকে আর যেতে দোব না" পর্য্যন্ত হল! তাঁদের সকলের "ঠাকুর্দ্দা"—তাঁর বয়স প্রায় ৫০ হবে,—সে ভদ্রলোক এমন রসিক ও আমুদে যে, তিনি অনায়াসে রেপারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে মাথায় ঘোমটা দিয়ে স্ত্রীলোক সেজে "নাচতে" নেমে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি, "নাগবাবুও" নীরদের শালখানা চেয়ে নিয়ে "ঠাকুর্দ্দা"র অনুকরণ করে দুজনে হাত-ধরাধরি করে নাচতে লাগলেন! দেখে মনে হল, এই পাহাড়ে—নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে এঁদের আনন্দ-উৎস যা এতদিন চাপা পড়েছিল,

মল,—মসুরী

আজ পরস্পরের সম্মিলিত অবস্থায় বোধ হয় তা বাইরে এল! এই নির্দ্দোষ, প্রাণখোলা আনন্দের মাঝে ২।৩ ঘণ্টা কাটিয়ে যখন ফিরে এলুম, মনে হল, আমার মনের গোপন কোণে যেখানে যা কিছু দুঃখ জমা ছিল, যেন এই আনন্দ-ধারায় ধুয়ে মুছে গেছে। অচেনা লোকের সঙ্গে এঁদের এই যে কুণ্ঠাহীন আলাপ, প্রাণখোলা ব্যবহার, একটুও আড়ষ্ট ভাব নাই, কোন রকম আদবকায়দা নাই, দ্বিধা সঙ্কোচ নাই, এঁদের প্রতি সম্ভ্রমে আমার হৃদয় ভরে গেল।

দিন পাঁচ সাত পরে হোটেলের ষ্টোর-কিপার বিনোদ বাবু এলেন। ভদ্রলোকের বয়স বোধ হয় ৪৬।৪৭। ইনি আসাতে আমাদের বাসাটি সরগরম হয়ে উঠল! ভদ্রলোক এসেই আমাদের জংলী পাহাড়ীটার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।

হোটেলের একটি ভাল লোককে আমাদের জন্ত দিলেন। মসুরীর বাজারে মাছের আমদানী হয় না, কিন্তু ভদ্রলোক আমাদের এই দুটি "আমিষাশী"কে প্রায় প্রত্যহই মাছ খাওয়াতে লাগলেন! তাঁর পাকা হাতে আমাদের গেরস্থালীর ভার চাপিয়ে দিয়ে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্রত্যহ আহারের সময় "নূতন মিনু" দেখতাম, কিন্তু আহারের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত, কাপ্তেন বিনোদ আমাদের খাবারের ফর্দ্দ জানিবার কোন উপায় রাখতেন না। এই কাপ্তেন (captain) উপাধিটি তিনি হোটেলের সাহেব মহল থেকে

লেখক—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পেয়েছেন। কাপ্তেন বিনোদ সকল সাহেব ও মেম সাহেবদের প্রিয়। ইনি হোটেলের অতি পুরাতন কর্ম্মচারী! ভদ্রলোক যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি রসিক। আর সদাই মুখে হাসি লেগে আছে। সন্ধ্যার সময় কাপ্তেন আমাদের পরলোকতত্ত্ব শোনাতেন। সেখানকার অধিবাসীদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতেন! তাঁর গ্রামের কোন্ নৈয়ায়িকের মৃতা কন্যা বিরজা, কবে কোন্ গভীর নিশীথে বাপের কাছে এসে বলেছিল "বাবা বঁড় ক্ষিঁদে পেঁয়েছে খেঁতে দাও," আর নৈয়ায়িক মশাই শিকেয় তোলা হাঁড়ি থেকে মৃতা কন্যাকে ৮ গণ্ডা সন্দেশ দিয়েছিলেন, আর সেই অশরীরী মেয়েটা, চক্ষের পলকে তাহা খেয়ে ফেলে, ঘরের কোণের এক কলসী জল ঢক্ ঢক্ করে পান করলে। এমনিধারা সব অদ্ভুত গল্প বলতেন। যদি বলতুম, আচ্ছা কাপ্তেন, ওরা ত অশরীরী—শরীর ত নাই, তবে আট গণ্ডা সন্দেশ বা খেলে কেমন করে, আর এক কলসী জলই বা গেল কোথায়।

তিনি অমনি বলতেন "তা জানেন না বুঝি, ওঁরা যে রূপ ধরতে পারেন।"

হাসি চেপে বল্লুম—তা হবে!

একাউন্‌টেণ্ট বাবু অমনি ফোঁস করে বল্লেন—আপনি বুঝি ওসব জানেন না? আচ্ছা, একখানা বই দিচ্ছি পড়ুন দেখি—এই বলে তিনি আমায় একখানা বই এনে দিলেন "Man and the Spiritual World।"

আমি হেসে বল্লুম,—হয়ত তাঁরা আছেন, কিন্তু তাই বলে তাঁরা যে আট গণ্ডা সন্দেশ খেতে পারেন, বা এক কলসী জল ঢক্ ঢক্ করে এক চুমুকে নিঃশেষ করেন, এটা মশাই কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন। আমরা স্বচক্ষে দেখছি, তাদের জড়দেহখানা পুড়ে ছাই হচ্ছে, stomachএর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকছে না!

একাউণ্টেণ্ট বাবু বল্লেন—কি করে খায়, তা কি মশাই বলা যায়। তবে বিশ্বাস করতে হবে যে তারা খায়! এই সেদিন একখানা ইংরিজী মাসিক পত্রে পড়লুম,—একজন মেম আজ ২০ বছর হল মারা গেছে, কিন্তু সেদিনও লোকে তাকে পিয়ানো বাজিয়ে গান করতে শুনেছে।

আমি বল্লুম,—সে কাগজখানা আমায় দেখাতে পারেন?

—কাগজখানা বোধ হয় হারিয়ে গেছে, খুঁজে দেখবো'খন। আর আমি কি মশাই মিথ্যে কথা বলছি?

এর ওপর আর কথা চলে না; তাহলেই ভদ্রতার গণ্ডী পেরিয়ে যেতে হয়,—কাজেই চুপ করে গেলুম! মনে মনে বুঝলুম, একাউণ্টেণ্ট বাবু কাপ্তেন বিনোদকে পাকড়ে, নিরালায় এই ক'বছর ধরে ওঁর মাথার মধ্যে এই যে সব আজগুবীর বীজ বুনেছিলেন, আজ তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত! যাক্, মোটের ওপর এখানে দিনগুলো মন্দ কাট্‌ছিল না।

বিকালে Happy valley clubএ গেলুম। সারা মসুরীর মধ্যে এই একটি টেনিস খেলবার স্থান! ৫।৬টি লন্ আছে।

বারলোগঞ্জের কাছে, "মসি ফল্" আছে। শুনলুম, সকল সময় জল থাকে না। Charleville থেকে ১২ মাইল দূরে "কামটি fall" আছে। কিন্তু এ সময় সেখানে জল নাই বলে আর দেখতে যাওয়া হয় নি!

মসুরীর পাহাড়ীদের বস্তী নাই বল্লেও চলে। ৪।৫ মাইল দূরে নীচে তাদের বাস। তাদের পুরুষরা এখানে 'রিকশ' ও "ডাণ্ডি" টানার কাজে আসে ও "কুলীর" কাজ করে। এখানে পাহাড়ীরা কাঠ পুড়িয়ে কয়লা করে, সেই কয়লারই প্রচলন খুব বেশী। তাহাতেই সকলের রান্না চলে। এক ঝাঁকা কয়লার দাম ২৲ ৩৲ টাকা। তাহাতে প্রায় ১ মোণ ১০ সের আন্দাজ কয়লা থাকে। ঝাঁকা বড় ছোট হিসাবে দাম হয়, ওজন করে বিক্রী হয় না।

দার্জ্জিলিংএর মতন এখানে জলো হাওয়া নাই, আবহাওয়া শুক্‌নো; বেশ মনোরম স্থান। এখানে স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ উপভোগ করা যায়। মাস দেড়েক সেখানে কাটিয়ে আবার পুরাতন জীবন-যাত্রার মধ্যে ফিরে আসা গেল।

দিক্শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৭]

সুকুমারীর স্বামী নরেশচন্দ্র আলিপুরের একজন উকিল। পিতার জীবদ্দশায় সে ব্রুম্ গাড়ী চড়িয়া ব্রীফ-ব্যাগ এবং মুহুরী লইয়া ওকালতি করিতে যাইত; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হইতে এতাবৎ এক দিনেরও জন্ত সে আদালতের ভূমি স্পর্শ করে নাই, যদিও প্রতি বৎসর যথারীতি সরকারী সেলামী জমা দিয়া সযত্নে নিজের নামটি আলিপুর উকিলের সুদীর্ঘ তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পিতৃশ্রাদ্ধের পর আদালতে না গিয়া নরেশচন্দ্র যখন ঘরে বসিয়া রহিল, লোকে মনে করিল, অনির্ব্বাপিত পিতৃশোকই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহার অন্যান্য আচরণাদি হইতে শোকের ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইলেও যখন সে আদালতে যাইবার কোনো উপক্রম দেখাইল না, তখন তাহার জমিদারীর প্রধান আমলা অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচের পর সভয়ে বলিয়াছিল, "আর কিছু না হলেও ষ্টেটের উকিলরা যে টাকাটা খায়, আদালতে বেরোলে সেটার ত' অনেকটা বাঁচ্‌ত।" উত্তরে নরেশ বলিয়াছিল, "আর কিছু হলে না হয় ও-কাজটাও করা যেতে পারত। কিন্তু আমার ওকালতী বিদ্যে কেবলমাত্র ষ্টেটের উকিল-মারা ব্যাপারেই শেষ হলে আমার ওকালতী আর ষ্টেট্ দুই-ই একই মাত্রায় মর্য্যাদা হারাবে!" সুকুমারী কিছু বলিলে নরেশ বলিত, "কাছারী গিয়ে পসার না হওয়ার চেয়ে কাছারী না গিয়ে পসার না হওয়া অনেক ভাল; তাই কাছারী যাই নে। আদৎ কারণটি তোমাকে শুনিয়ে রাখলাম।" বন্ধুরা যদি বলিত, "ওকালতীই যদি না করলে তা হলে বছরে বছরে লাইসেন্সের পিছনে অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ করা কেন? একেবারেই ছেড়ে দাও না।" নরেশ উত্তর দিত, "একেবারে ছেড়ে দিলে এত খরচ-পত্র করে ওকালতী পাশ করা ষোল আনাই লোকসান হয় যে—তাই বছরে বছরে ও টাকাগুলো খরচ করি।"

এইরূপে নরেশ কৌতুকে পরিহাসে সকলের মুখ বন্ধ করিত। লোকে বলিত নরেশের বিদ্যা-বুদ্ধি, চাতুর্য্য যে রকম আছে সেইরূপ একটু তৎপরতা যদি থাকিত, তাহা হইলে সে একটা মস্ত লোক হইতে পারিত। অবহেলার জন্ত উহার যত কিছু ভাল ভাল গুণ সব নিষ্ফল হইল! শুনিয়া নরেশ বলিত, "সফলতার দিকটা খুব বড় হয়ে উঠ্‌লে মাধুর্য্যের দিকটা ছোট হয়ে যায়। গোলাপ ফুলে যদি লিচু ফলের মত ফল ফল্‌ত, তা হলে লোকে গোলাপ গাছের কাছে সাজি হাতে না গিয়ে ডালা হাতে উপস্থিত হ'ত। তোমরা ভেবে দেখ, তোড়ার মধ্যে যে সব ফুলের প্রধান স্থান, রসনা

তৃপ্তির দিক দিয়ে সবগুলোই নিষ্ফল।" উত্তরে সুকুমারী যদি বলিত, "কিন্তু আমগাছে আম না ফলে গোলাপ ফুলের মত ফুল ফুট্‌লে লোকে এত যত্ন করে আম-বাগান করত না, চাঁপা গাছের মত এক আধটা কোথাও পুঁতত।" নরেশ বলিত, "তা' হলে তার দ্বারা লোকের রসজ্ঞানের অভাবই প্রকাশ পেত। আমি কিন্তু খুব খুসী হতাম যদি আমাদের মজিলপুরের বড় আম-বাগানের আমগাছগুলোতে ফল না ফলে গোলাপ ফুলের মত বড় বড় ফুল ফুটত। কি সুন্দর শোভা হত বল দেখি! আমাকে বিশ্বাস কর—সুকু, তুমি যে ফল প্রসব না করে শুধু ফুল হয়ে আমার জীবনের মধ্যে চিরদিন ফুটে থাকবে, তার জন্যে আমার মনে দুঃখের লেশমাত্র নেই!" শুনিয়া সুকুমারীর মুখে কথা আসিত না, পরিতাপে এবং পরিতৃপ্তিতে চক্ষুদুটি সজল হইয়া উঠিত।

কথা দিয়া নরেশ সুকুমারীর মুখ বন্ধ করিয়া দিত বটে, কিন্তু কাজের বেলা তাহাকে সুকুমারীর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইত। বচনে-বাচনে, হাস্যে-পরিহাসে, উত্তরে-প্রত্যুত্তরে সে একটি হাল ফ্যাসনের বৃহৎ এঞ্জিনের মত ফোঁস্-ফাঁস্ করিত, কিন্তু চলিবার সময়ে যেদিকে সুকুমারী লাইন্ পাতিয়া দিত সেই দিকেই সে চলিত। শুধু বাহিরের গতিই নহে, তাহার অন্তরের প্রবৃত্তিও অবিচ্ছিন্ন অভ্যাসের ফলে নিরুপদ্রবে সুকুমারীকে অনুসরণ করিয়া চলিত। তাই অপরাহ্নে যখন নরেশ রমাপদকে বলিল, "ভায়া, চল একটু বাজারের দিকে বেড়িয়ে আসা যাক্,—একখানা গাড়ী আনাও।" তখন সে সুকুমারীর পাতা লাইনেই চলিবার উপক্রম করিতেছিল।

বাজারে যাইবার ভিতরে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে সন্দেহ করিয়া রমাপদ মৃদুভাবে আপত্তি তুলিল। বলিল, "আজই রেল থেকে নেমেছেন, আজ ঘোরাঘুরী না করে একটু বিশ্রাম করলেই ভাল হয়।"

নরেশ বলিল, "বল কি রমাপদ! সটান এক হাজার মাইল রেলে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমেই সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারে, আর দুশো আড়াইশো মাইল রেলে এসে বাজারে বেড়াতে যেতে তুমি মানা করছ? এই শক্তি আর উৎসাহ নিয়ে তোমরা তা হলে দেশোদ্ধার করবে কেমন করে?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "তাছাড়া এখানকার বাজারে এমনই বা কি আছে,—তার চেয়ে বরং—"

নরেশ বাধা দিয়া বলিল, "আমার হাতেই বা এমন কি সঙ্গতি আছে যে এখানকার বাজার আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে না; তার চেয়ে বরং আর দেরী না করে তুমি গাড়ী আনাও।"

সুকুমারী সহাস্যমুখে রমাপদকে বলিল, "ওঁর সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না রমা,—তুমি গাড়ী আনতে পাঠাও।"

গাড়ী আসিল।

সুকুমারী সরমাকে বলিল, "সরো তৈরী হয়ে নে, চল্ তোদের বাজার কি রকম দেখে আসি।"

সবিস্ময়ে সরমা বলিল, "আমরা বাজার যাব কি দিদি!"

"আমরা কি আর দোকানে নামব? গাড়ীতে বসে থাকব।"

সরমা আপত্তি করিল। তাহার অনেক কাজ আছে, বৈকালের খাবার তৈয়ারী করিতে হইবে, রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সন্ধ্যা জ্বালিতে হইবে, আরও কত কি করিতে হইবে। সুকুমারী সরমার কোনও ওজর-আপত্তি শুনিল না—বলিল, "তুই কি মনে করেছিস লঙ্কা থেকে দুজন রাক্ষস তোদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে যে সমস্ত দিন শুধু তাদের খাবার তৈরী করতেই তোকে ব্যস্ত থাকতে হবে? নে, শীঘ্র তৈরী হয়ে নে।"

অগত্যা সরমাকে যাইতে হইল। গৃহে রহিল শুধু বিশুয়া। যাইবার সময়ে সরমা তাহাকে অনেক কাজের ভার দিয়া গেল! ঈশ্বর যথারীতি তাহার সাজ-পোষাক পরিয়া কোচবক্সে চড়িয়া বসিল এবং ঝিণ্টু তাহার মাসীর ক্রোড় অধিকার করিয়া চলিল।

ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। যাইবার সময়ে যে অর্থ নরেশের মণিব্যাগের ভিতর অদৃশ্যভাবে গিয়াছিল, বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে রূপান্তরিত হইয়া তাহা দুই তিন বাণ্ডিলে বদ্ধ এবং দুই তিন ঝুড়ি বোঝাই হইয়া ফিরিয়া আসিল। দ্রব্যাদির মধ্যে সরমা এবং সুকুমারীর জন্য রেসমী এবং মাদ্রাজী কয়েকখানা শাড়ী এবং ব্লাউসের কাপড় ভিন্ন আর যাহা কিছু ছিল সমস্তই ঝিণ্টুর; সোয়েটার্, সুট্, জুতা, মোজা, টুপি, বিস্কুট, লজেঞ্জস্, খেলনা, বার্লি, মেলিন্‌স্ ফুড, জেলি, জ্যাম, আরও কত কি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস।

বাজারে জিনিসগুলো কেনার সময়ে রমাপদ প্রতিবারেই মৃদুভাবে আপত্তি করিয়াছিল, গৃহে ফিরিয়া সে একটু প্রবলভাবে বলিল "এ কিন্তু ভারী অন্যায়!"

ঔৎসুক্যের সহিত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নরেশ বলিল, "কি ভারী অন্যায় ?"

মনের সূক্ষ্ম অথচ জটিল অভিযোগটা ঠিক কিরূপে ব্যক্ত করিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ বলিল, "দু-দিনের জন্য এসে মিছিমিছি এতগুলো জিনিষ কেনা।"

"দু-দিনের জন্য এসে এতগুলো জিনিস কেনা যদি এতই অন্যায় হয়, তুমি না হয় দু-দিনের জন্য আমাদের বাড়ী গিয়ে এত জিনিস কিনো না। আমি প্রতিশ্রুত হলাম কিছুমাত্র আপত্তি করব না!" বলিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল। তাহার পর সুকুমারী নিকটে আছে কি না, একবার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া লইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "তা ছাড়া, তুমি যখন মেশোমশায় হতে পারলে না, তখন এমন সব উপদ্রব তোমাকে একটু আধটু ভোগ করতেই হবে। বুঝলে না কথাটা ?" বলিয়া নরেশ অর্থময় কটাক্ষ-ক্ষেপ করিল।

বুঝুক আর নাই বুঝুক অতঃপর রমাপদ আর কোনো কথা বলিল না, কিন্তু রাত্রে সরমার কাছে একান্তে সে কথাটা তুলিল।

সরমা বলিল, "কিন্তু কি করবে বল? আপত্তি ত তুমিও করছিলে আমিও করছিলাম, তার পরও যদি না শোনেন তা হলে আর উপায় কি ? তা ছাড়া অবস্থা আর সম্পর্ক হিসেবে দিতে যে পারেন না তা নয়; তবে একটু বেশী রকম খরচপত্র করছেন এই যা!"

এ কথার বিরুদ্ধে মুখে বিশেষ কিছু বলিবার না পাইলেও রমাপদর মন সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হইতে পারিল না। তাহার আহত আত্মাভিমান কেবলই তাহার কাণে কাণে বলিতেছিল, 'এ উপহার দেওয়া নয়, উপঢৌকন দেওয়া নয়; এত খুঁটিয়ে গুছিয়ে কেউ উপহার দেয় না। এ যেন সব দিক ভেবেচিন্তে দরিদ্রের অভাব মোচন করা!'

[১৮]

পরদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া রমাপদ দেখিল তাহারই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে, আর সকলেই উঠিয়াছে; এমন কি ঘিণ্টু পর্য্যন্ত নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহার মাসীর ক্রোড়ে বেড়াইতেছে।

রমাপদকে দেখিয়া সুকুমারী হাসিমুখে বলিল, "তোমার ছেলেটিকে একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছি রমা, শেষকালে যাবার সময়ে কলকাতায় নিয়ে না পালিয়ে যাই।"

রমাপদ স্মিতমুখে বলিল, "তা বেশ ত! নিয়েই যাবেন।"

নরেশ রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "কে কাকে বেশী দখল করছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ভায়া; শেষকালে খোকাই না ওঁকে ভাগলপুরে আটকে রাখে!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "তা হলে ত' আরো ভাল হয়!"

নরেশ বলিল, "তুমি ত' বল্‌লে ভাল হয়। কিন্তু ওঁর নিজের দখলে একটি যে ভদ্রলোক আছেন তাঁর ব্যবস্থা কি হবে তা ভেবেছ ?"

"তিনি দখলেই থাকবেন।"

"দখলে ত' থাক্‌বেন। কিন্তু খাসদখলে থাকবেন, না বামুন-চাকরের হাতে ইজারায় পড়বেন, তাই হচ্ছে কথা।"

"খাসদখলে নিশ্চয়ই!" বলিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল।

যেন একটা গুরুতর শঙ্কট কাটিয়া গেল সেইরূপ ভান করিয়া নরেশ বলিল, "তাই বল!"

অপাঙ্গে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুকুমারী মৃদু হাস্য করিল; তাহার পর রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "বামুন-চাকরের হাতে ইজারার কথা ভেবে এত ব্যস্ত, অথচ গেল বছর খানসামা বাবুর্চির ইজারায় পড়ে বিলাত যাবার জন্য যখন ক্ষেপে উঠেছিলেন তখন খাসদখলের কথা কত মনে ছিল সে কথা একবার জিজ্ঞাসা করো ত' রমা!"

রমাপদ কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বে ব্যস্ত হইয়া নরেশ বলিল, "হাঁ, সে দুর্ম্মতি একবার হয়েছিল বটে, কিন্তু প্যাসেজ বুক্ করে বাড়ী ফিরে এসে কান্নাকাটির যে—"

"আঃ!"

"—কান্না-কাটির যে মর্ম্মন্তুদ পালা—"

"আবার!"

রমাপদ চাহিয়া দেখিল অস্তাকাশের মত সুকুমারীর মুখ স্তব্ধ সলজ্জ হাস্যে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রমাপদর দিকে সভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া নরেশ বলিল, "কি অন্যায় দেখ রমাপদ! অভিযোগ চলবে, অথচ সে অভিযোগের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়া চলবে না, এত বড় বে-আইনী কথা কোনো দেশের আইনে আছে বলে কখনো শুনেছ ?" তাহার পর সুকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হয় তুমি তোমার অভিযোগ তুলে নাও, নয় আমাকে সবিস্তারে জবাব দিতে দাও!"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দোহাই

তোমার! তোমাকে জবাব দিতে হবে না, আমি অভিযোগ তুলে নিচ্ছি!"

রমাপদর দিকে চাহিয়া বিজয়-গর্ব্বিত ভাবে নরেশ বলিল, "এরূপ ক্ষেত্রে আমি বাদিনীর বিরুদ্ধে খেসারৎ পাবার অধিকারী। তুমি বিচারক, আমাকে উপযুক্ত খেসারতের ডিক্রী দাও।"

খেসারতের ডিক্রী দেওয়ার পক্ষে বিচারকের প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, খেসারৎ যে কি পদার্থ তাহা তিনি জানিতেন না। তবে ডিক্রী কথাটা কতকটা পরিচিত, এবং ডিক্রী যে জারী করা হয় এমন কথাও মাঝে মাঝে শুনা ছিল; তাই নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া রহস্যটা পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে রমাপদ ভয়ে ভয়ে বলিল, "ডিক্রি জারী করবেন ত?"

নরেশ সজোরে বলিল, "করব না? নিশ্চয় করব!"

তখন, কথাটা একেবারে বেফাঁস্ হয় নাই বুঝিয়া সাহস পাইয়া রমাপদ বলিল, "কি করে করবেন?"

"কি করে করব সে কথা খুলে বল্লে বাদিনী আর বিচারক উভয়েই লজ্জিত হতে পারেন। অতএব সে কথাটা অপ্রকাশিত থাকাই ভাল।"

এ সাবধানতায় কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। কথাটা না শুনিয়াও বাদিনী এবং বিচারক উভয়েই লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

আরক্ত মুখে সুকুমারী রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "সঙ্গ-দোষে তুমিও দেখছি ক্রমশঃ—" তাহার পর ঠিক কি বলা যায় ভাবিয়া না পাইয়া সে থামিয়া গেল।

রমাপদ কিন্তু এই অসমাপিত তিরস্কারেই শুষ্ক হইয়া উঠিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "বিশ্বাস করুন দিদি, ডিক্রী-জারীর মানে ঠিক কি তা আমি জানি নে। আন্দাজি ব্যবহার করেছি!"

রমাপদর কথা শুনিয়া এবং বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া নরেশ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "মানে ঠিক না জেনে আন্দাজি কথা ব্যবহার করবার একটা মজার গল্প আমি জানি শোন। সুবোধচন্দ্র সান্যাল নামে পূর্ব্ববঙ্গের একটি ভদ্রলোক একেবারে সাত শ' মাইল দূরে কাশীতে গিয়ে হঠাৎ এক দিন হোমিওপ্যাথী প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করলেন। হিন্দুস্থানীর দেশ, রুগী অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, কাজেই হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কইতে হয়। কিন্তু তখন তাঁর হিন্দীর জ্ঞান, তোমার বিশুয়া চাকরের এখন বাংলার জ্ঞান যেমন, ঠিক তেমনি; অর্থাৎ আর সমস্ত কথাই প্রায় অবিকল বাংলা থেকে যাচ্ছে—শুধু ক্রিয়াপদগুলির উপর হিন্দীর একটা আমেজ পড়তে আরম্ভ হয়েছে। পথের ধারে বারাণ্ডায় বসে এক দিন তিনি রুগী দেখছেন, আমরা কয়েকজন বন্ধু বসে খবরের কাগজ পড়ছি আর গল্প করছি, এমন সময়ে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের নাড়ী পরীক্ষা করে সুবোধবাবু বলে উঠলেন, "বোখার তো তাঁতিল হুয়া।" ভদ্রলোকটি চম্‌কে উঠে ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "কেয়া হুয়া?" ডাক্তার বাবু আবার বললেন,"তাঁতিল হুয়া।" ভদ্রলোকটি চঞ্চল হয়ে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, "সমঝা নহি!" রুগীর মূঢ়তায় বিরক্ত হয়ে ডাক্তার বললেন, "কি আশ্চর্য্য! সমঝা নেহি? তাঁতিল হুয়া—তাঁতিল হুয়া!" ডাক্তার বাবুর মূর্ত্তি দেখে রুগীর আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হ'ল না, দ্বিধাভরে মৃদুস্বরে বললেন, "যব্ আপ্ কহতে হেঁ তব্ জরুর হুয়া হোগা!" রুগী ওষুধ নিয়ে চলে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার বাবু, বোখার তাঁতিল হুয়াটা কি ব্যাপার তা'ত আমিও বুঝলাম না! তাঁতিল মানে কি?" ডাক্তার বাবু ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বিস্মিত বিরক্ত ভাবে বললেন, "কি আশ্চর্য্য! এতদিন হিন্দুস্থানীর দেশে বাস করে তাঁতিল মানে কি তা জানেন না? বন্ধ! বন্ধ! তাঁতিল মানে বন্ধ!" আমি সবিস্ময়ে বললাম, "তাঁতিল মানে বন্ধ, এ আপনাকে কে বললে?" একটু মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন, "তা'ও বলতে হবে?" বলে পথের অপর পারে সামনের বাড়ীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "আপনাদের অনাদি বাবু উকিল। মশায়, একটা নতুন জিনিস আয়ত্ত করতে হলে কি কম ফিকিরে থাকতে হয়? একদিন এইখানেই বসে অনাদি বাবু তাঁর একজন মক্কেলকে বলছেন, 'আজ কাছারী তাঁতিল হ্যায়।' একটা নতুন কথা শুনতে পেয়ে আমি অনাদি বাবুর কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করলাম 'আজ কাছারী কি আপনাদের?' অনাদি বাবু বললেন, 'আজ কাছারী বন্ধ।' তখনি বুঝে নিলাম তাঁতিল মানে বন্ধ।" ডাক্তার বাবুর কথা শুনে আমরা যে কয়েক জন ছিলাম একেবারে হো হো করে হেসে উঠলাম! হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছেঁড়বার উপক্রম হ'ল। ডাক্তার

মশায় আমাদের ও-রকম হাসি দেখে নিশ্চয়ই চটে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন যখন তাঁকে জানালে যে তাঁতিল মানে বন্ধ নয়, ছুটি, তখন কিছুক্ষণ তিনি নির্ব্বাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে দেরাজ টেনে বাদামী কাগজের একটা খাতা বার করে পেন্সিল দিয়ে একটা জায়গা কেটে কি লিখে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বস্‌লেন। তার পর কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ হেসে উঠে বল্‌লেন "কি আশ্চর্য্য! কালও আমি আমার চাকর কপুরীকে বলেছি 'দরোজা জান্‌লা সব তাঁতিল কর দেও, ধূলা আস্‌তা হায়!' "

নরেশের গল্প শুনিয়া রমাপদ এবং সুকুমারী উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। সরমা রান্না-ঘরে চা এবং জলখাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, হাস্য-কলরবে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

"এত কি হাসির গল্প হচ্ছে দিদি? আমি কিছুই শুনতে পেলাম না!"

সুকুমারী বলিল, "তুই রান্না-বাড়া নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক্‌বি ত' গল্প শুনবি কখন!"

নরেশ বলিল, "গল্প যদি শুনতে চাও সরমা, তা হলে রান্না-বাড়া একেবারে তাঁতিল করে দাও!"

আবার একটা হাসির কলরোল উঠিল।

সবিস্ময়ে সরমা বলিল, "তাঁতিল কি?"

এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিল না—শুধু হাসির মাত্রা বাড়িয়া গেল।

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। রহস্যে প্রবেশ করিতে হইলে কিছু সময় লাগিবে ভাবিয়া সরমা, সে ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চা ও জলখাবারের জন্য নরেশ এবং রমাপদকে প্রস্তুত হইতে তাগিদ দিয়া প্রস্থান করিল।

অপরাহ্ণে বেড়াইতে যাইবার কথা উঠিল।

রমাপদ বলিল, "টিলাকুঠি যাওয়া যাক্।"

সরমা বলিল, "বুঢ়ানাথের মন্দির।"

নরেশ বলিল, "স্বামী-স্ত্রীতে মতভেদ হলে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা মীমাংসা আবশ্যক: তুমি এর মীমাংসা কর সুকু!"

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, "মীমাংসা করতে গিয়ে শেষকালে যদি তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ হয় তার মীমাংসা করবে কে?"

নরেশ বলিল, "সে ভয় করো না। তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হতে পারে এ অপবাদ আমাদের কেউ দিতে পারে না। অবশ্য কার গুণে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে।"

রমাপদ এবং সরমার প্রতি অর্থময় ভ্রূভঙ্গী করিয়া মুচকিয়া হাসিয়া সুকুমারী বলিল, "কার গুণে শুনি? তোমার গুণে?"

নরেশ মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "রামঃ! তোমার গুণে; আমার দোষে।"

পুনরায় সরমা এবং রমাপদর প্রতি গূঢ় কটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া সুকুমারী বলিল, "শোন কথা! ওঁর দোষে! উনি যেন কত নিরীহ!"

নরেশ আর্ত্তস্বরে ব্যগ্রভাবে বলিল, "আমাকে বিশ্বাস কর সুকু, আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, আমার গুণে, তোমার দোষে। তোমার ভ্রূকুটি দেখে ভয়ে উল্টা বলে ফেলেছি!"

নরেশের কথায় তিন জনেই উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিল।

স্থির হইল, যেহেতু টিলাকুঠি এবং বুঢ়ানাথের মন্দির একই দিকে অবস্থিত—সময়ের অভাব না ঘটিলে উভয় স্থানেই যাওয়া হইবে।

যাত্রাকালে সুকুমারীর নগ্ন পদ দেখিয়া নরেশ বলিল, "অনেকখানি হাঁটতে হবে, জুতো পরে নাও।"

সুকুমারী বলিল, "সরো খালি পায়ে যাচ্ছে, আমি জুতো পরে কেমন করে যাই?"

সরমা একটু দূরে ছিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন দেখি জামাইবাবু, দিদির কি অন্যায়! আমি খালি পায়ে গেলে ওঁর জুতো পরে যেতে নেই তার কি মানে আছে?"

নরেশ কহিল, "খুব বেশী মানে না থাকলেও, আমি বলি তর্কে প্রয়োজন কি? তুমিও জুতা পরে নাও না। পা দুটোকে অকারণ কষ্ট দিয়ে আর বিপন্ন করে ত' কোনো লাভ নেই!"

সুকুমারী বলিল. "আমি আমার এক জোড়া ওকে জোর করে পরিয়ে দিয়েছিলাম, পায়েও হয়েছিল ঠিক, কিন্তু কিছুতে রাজী হল না, খুলে ফেল্‌লে।"

সরমার দিকে চাহিয়া নরেশ কহিল, "কেন? আপত্তি কিসের?"

মৃদু হাস্যের সহিত সরমা বলিল, "অভ্যাস নেই ; অসুবিধা হবে।"

নরেশ। কিন্তু অভ্যাস হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনভ্যাসের বিরুদ্ধে লাগা। সে হিসাবে ত' পরা যেতে পারে ?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সরমা বলিল, "সে না হয় অন্য কোনো দিন হবে—আজ থাক।"

নরেশ। পাঁজীতে নবজুতা পরিধানের জন্য যখন শুভ-দিন লেখে না, তখন আজ হলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

কিন্তু সরমা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না,—বলিল অভ্যাস লোক চক্ষুর অন্তরালেই শ্রেয় ; তদ্ভিন্ন, দেব মন্দিরে যাইতে হইবে,—সেখানে জুতা চলিবে না। অগত্যা সুকুমারীকেও নগ্ন পদে যাইতে হইল।

টিলাকুঠির সোপান-মূলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নরেশ ও সুকুমারী মুগ্ধ হইয়া গেল। সুবৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপের উপর বহু উচ্চে মনোরম অট্টালিকা, তৃণ-মণ্ডিত ঢালু স্তূপ-গাত্র বাহিয়া দুইটি প্রশস্ত সোপানাবলি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পাপাপাশি উঠিয়া একটি বৃহৎ চত্বালে মিলিত হইয়াছে, এবং তদূর্দ্ধে এক সারি সোপান সরল রেখায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া সৌধ-প্রাঙ্গণ-প্রান্তে পৌছিয়াছে। স্তূপ-গাত্রে স্থলে স্থলে সুদূর-প্রয়াসী আকাঙ্ক্ষার মত দীর্ঘ ঋজু ইউক্যালিপ্‌টস্ ও ঝাউ গাছ তৃণদাম ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে ; তাহাদের গগন-স্পর্শী শীর্ষদেশ সমীর-হিল্লোলে মর্ম্মরিত।

সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া সকলে গৃহ সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। তাহার পর গৃহ ও গৃহাভ্যন্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলের ছাদে উপস্থিত হইল। তথা হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়াহত আনন্দে সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। উত্তরে স্বচ্ছ-সলিলা ভাগীরথী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রসারিত, পরপারে বালুময় নদী-সৈকতের ক্রোড়ে শঙ্করপুর গ্রাম ; দক্ষিণে যতদুর দৃষ্টি যায় তরঙ্গমালা-বিক্ষুব্ধ নীল সমুদ্রের মত তালগাছের শীর্ষ, তাহার মধ্যে মধ্যে কচিৎ প্রকাশমান রেলপথ ; পূর্ব্বে ঘননিবদ্ধ বৃক্ষরাজির আবরণ ভেদ করিয়া ভাগলপুর সহরের সৌধাংশমালা দেখা যাইতেছে এবং পশ্চিমে অদূরে, জীবন-সূর্য্যের অস্তপ্রদেশ,—ভাগলপুরের শ্মশান, ঈষৎ ধূমান্বিত।

চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা তাহারা কোনো এক সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুই বিভিন্ন দিকে দাঁড়াইয়া পড়িল। নরেশ, সুকুমারী, এবং ঘিণ্টুকে ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বর দাঁড়াইল উত্তর দিকে এবং রামপদ ও সরমা দাঁড়াইল পশ্চিম দিকে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সরমার সর্ব্ব শরীর অল্প অল্প কাঁপিতেছিল। রমাপদ বলিল, "চেয়ে দেখ সরমা, ঈশ্বরের কোলে ঘিণ্টুকে কেমন সুন্দর মানিয়েছে। আজ সকালে এই পোষাক পরে সে যখন বিশুয়ার কোলে বেড়াচ্ছিল—কেমন যেন খাপছাড়া দেখাচ্ছিল।"

স্বামীর কথায় সরমা পিছন ফিরিয়া একবার ঘিণ্টুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল, কিছু বলিল না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপদ পুনরায় বলিল, "শুধু ঈশ্বরের কোলেই নয়—ঈশ্বরদের দলেও ও কেমন মিশে গিয়েছে দেখ! মনে হচ্ছে ও যেন ওদেরি একজন ; আমাদের কেউ না।"

এবার সরমা পিছন ফিরিয়া পুত্রকে না দেখিয়া পাশ ফিরিয়া স্বামীকে দেখিল। স্নিগ্ধ মেঘের মধ্যে তড়িৎ যেমন অদৃশ্য ভাবে লুক্কায়িত থাকে, তেমনি তাহার স্বামীর শান্ত বাক্যের মধ্যে আর অন্য কোনো পদার্থ লুক্কায়িত আছে কি না জানিবার জন্য সে একবার গভীর ভাবে রমাপদর মুখে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু রমাপদ তখন মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল—স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া সরমা হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভাগ্যে আমি জুতো পরে আসি নি, তা হলে আমাকেও ত' তুমি ঈশ্বরদের দলে ফেলতে!"

রমাপদ সহাস্যমুখে বলিল, "তা হলে এমন মন্দই বা কি হ'ত ? বিশুয়ার দল ছেড়ে ঈশ্বরের দলে ঢুকতে পারলে একটা খুব বড় রকম প্রমোশনই ত' হয়!"

এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না, পদশব্দে সরমা পিছন ফিরিয়া দেখিল—ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দল তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

নিকটে আসিয়া নরেশ বলিল, "এমন ভাবে দুজনে পৃথক হয়ে পড়ে নিভৃত আলাপ কাব্যশাস্ত্রের অনুমোদিত সন্দেহ নেই, কিন্তু অতিথিদের কাছ থেকে হঠাৎ এমন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে লোকাচারের দিক থেকে একটু আপত্তি তোলা যেতে পারে।"

সরমা লাল হইয়া উঠিল। রমাপদ হাসিয়া বলিল, "না, একেবারে বিচ্ছিন্ন হইনি; ঘিণ্টু আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে ছিল।"

"ওঃ তাও ত বটে! এত বড় যোগসূত্রটার কথা আমার মনেই পড়েনি!" বলিয়া নরেশ হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, "এই যোগসূত্রের একটা চমৎকার গল্প জানি—বলি শোন।"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "রক্ষে কর! তোমার গল্প আরম্ভ হলে আর বুঢ়ানাথে যাওয়া হবে না,—সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া নরেশ বলিল, "দেখ, প্রোগ্রাম অগ্রাহ্য করবার আর কাজ পণ্ড করবার শক্তি ভগবান যাদের দেন নি, তারাই হচ্ছে অরসিকের দল! রসিক যারা তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের লোভে বর্ত্তমানকে কখনো অবহেলা করে না।"

সরমা বলিল, "তেমন যদি বড় না হয়, তা হলে গল্পটা শোনাই যাক না দিদি।"

সুকুমারী বলিল, "তুই ক্ষেপেছিস না কি সরো! সামান্য ব্যাপারকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কি রকম বড় করে তুলতে পারেন তা'ত জানিস নে। এখনি তিলের মত ছোট গল্প তালের মত বড় হয়ে উঠবে!"

গম্ভীর মুখে নরেশ বলিল, "তাকেই বলে ক্ষমতা! গুণকে দোষের মত করে বর্ণনা করবার এমন অদ্ভুত শক্তি তোমার আছে যে নিন্দার ছলে যখন স্তুতি কর তখন প্রথমে বোঝাই যায় না যে যা করছ তা নিন্দা নয়, স্তুতি!"

নরেশের কথায় তিনজনে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুকুমারী বলিল, "না, না, চল নেমে পড়া যাক্। ও-দিক থেকে কি সব ধোঁয়া টোঁয়া আসছে; রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে পড়ন্ত বেলায় এখানে থেকে কাজ নেই!"

শ্মশানে তখন বোধ হয় একটা নূতন চিতায় অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল। সকলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল।

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। সমস্ত আকাশ সন্ধ্যার কিরণে আরক্ত; সেই কিরণ গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া নদীর জল দ্রবীভূত স্বর্ণপ্রবাহে পরিণত হইয়াছে। নরেশ প্রভৃতি বুঢ়ানাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে রেলিংএর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিম্নে, বহু নিম্নে বাঁধানো ঘাটের শেষ সোপান স্পর্শ করিয়া জাহ্নবী-ধারা প্রবাহিত; পরপারে বিস্তৃত চরভূমি শীতসন্ধ্যার সঙ্কীয়মান কুয়াসায় ধূসর; তাহার পশ্চাতে বহুদূরে হিমিকাস্পৃষ্ট মসীমাখা তরুশ্রেণী চিত্রের মত অবস্থিত। গো-চর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনশীল গৃহপালিত পশুদিগের কণ্ঠনিবদ্ধ ঘণ্টার ঢং ঢং ধ্বনি শুনা যাইতেছে, কিন্তু কুহেলী ভেদ করিয়া তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। গগনে, পবনে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্র বিরাট যেন তাঁহার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন! বিশ্বচরাচর থম্ থম্ করিতেছে। নিখিলেশের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে!

বাক্যহারা হইয়া স্তব্ধ-বিস্ময়ে সকলে শুধু চাহিয়া রহিল! কাহাকেও বলিয়া দিতে হইল না যে যাহা দেখিতেছে তাহা অপূর্ব্ব—অবর্ণনীয়!

মৌন ভঙ্গ করিল নরেশ; গভীর স্বরে সে বলিল, "ধন্য রমাপদ! যে দৃশ্য দেখালে ভাই, জীবনে তা ভুলব না! খুব যে বেশী দেখা শুনা আছে তা বলতে পারিনে—কিন্তু এমনটি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

সুকুমারী বলিল, "সত্যি! মন্দিরও ত' অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন গঙ্গাগর্ভ থেকে একেবারে সোজা উঠেছে, এমন মন্দির বোধ হয় কোথাও দেখি নি!"

সম্মুখস্থ দৃশ্যাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নরেশ ধীরস্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এমন শোভাসম্পদময় বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়ে, কি-জানি কেন, আমার কেবল মনে হচ্ছে সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা—মনে হচ্ছে—

নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভূমিঃ
নাসীৎ তমোজ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।"

নরেশের গভীর মিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত মহাপ্রলয়ের এই ধ্যান-বর্ণনা শুনিয়া অর্থ না বুঝিয়াও সকলে একটা অননুভূতপূর্ব্ব মোহাবেশে মগ্ন হইল। কিছুকাল পরে পশ্চাতে মন্দির দ্বার বিলম্বিত ঘণ্টা সহসা বাজিয়া উঠিলে সেই শব্দে মোহ-বিমুক্ত হইয়া সকলে সে স্থল পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

'উপরি'-পাওনা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বেলমা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে 'মশাই' বলে ডাকতো, কিন্তু তাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত সনাতন শাণ্ডিল্য। তিনি গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই। তাঁর ধরণধারণ খুব সাদা-সিধে। সরল প্রকৃতির লোক, সংসারের কোনও কিছুরই খবর রাখতেন না। আজীবন শুধু ছেলে পড়িয়ে আসছিলেন—গ্রামের বারোয়ারী-তলার পাশে বড় বকুল-তলায়। যেদিন বড্ড ঝড় জল হত বা হবার আশঙ্কা থাকতো, সেদিন তিনি সেই বকুলতলার বাঁধান বেদীটা বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিয়ে তারই পাশে শিবঘরের দাওয়ায় বসে ছেলেদের পড়াতেন। তাঁর কত ছাত্র মানুষ হয়ে দেশ-বিদেশে বেশ দুপয়সা রোজগার করে বেড়াচ্ছে; কত মেয়ে সুশিক্ষা পেয়ে সুনাম-সুযশ নিয়ে শ্বশুর-ঘর কর্চ্ছে। এদেরও সব ছেলেমেয়েরা আবার পাততাড়ি বগলে করে তাঁর পাঠশালায় তাদের বাপ-মায়ের মত আস্‌তে আরম্ভ করেছে। 'মশাই'এর বয়স এখন বছর ষাটের কাছাকাছি। তাঁর মাথার সব চুল সাদা; গলায় তুলসীর মালা; গায়ের রং সুন্দর। সাদা ধবধবে কাপড়, কাঁধে একখানি গামছা এই হচ্ছে মশাইএর সনাতন পোষাক।

হঠাৎ একদিন তিনি জমিদারের কাছারীতে উপস্থিত হয়ে বাবুকে বল্‌লেন—"কর্ত্তামশায়,বাড়ীতে বড়ই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে; পাঠশালাটা আর রাখা গেল না দেখ্‌ছি। এ বয়সে আবার বিদেশ কোথায় গিয়ে কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা কর্ব্বো! আপনি বড় খোকাকে একটা পত্র দিন, আমারই মারফতে আমার একটা কাজের জন্য—রামকৃষ্ণপুরের চালের আড়তে। সে ইচ্ছা করলে আমাকে সেখানে একটা কাজ দিয়ে বড়লোক করে তুলতে পারবে। বাড়ীর সকলের—হঠাৎ বড়লোক হবার বড় খেয়াল চেপেছে। আমার নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলে পড়ান এঁদের বড় অপছন্দ—বলে কি না 'তোমার পড়োরা মাসে যা উপায় করছে, তোমার পাঁচ বছরেও তা হয় না। তুমি এ বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে বেশী পয়সা উপায়ের চেষ্টা কর।' তবু ছেলে মেয়ে পাঁচটা কেঁদে বেড়াচ্ছে না কর্ত্তামশায়! একবার ভেবে দেখুন, এরা কি বলে আর আমাকে দিয়ে কি করাতে চায়। যা হোক, এর একটা বিহিত করে দিন।"

বাবু বল্লেন,—"সনাতন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখানর গুরুমশায়ী স্বভাব ও বিদ্যে নিয়ে এ বয়সে আর রকম-ফের বিদ্যের হাতে-খড়ি না করলেই হত ভাল! কিন্তু তুমি যখন স্ত্রীবুদ্ধি-চালিত হয়ে মাথা খারাপ করে এসেছ, তখন অন্যকথা বুঝবেও না, শুনবেও না। এখন কি করতে চাও বলো? আড়তে কোন্ কাজ তুমি করতে পারবে বলে মনে হয়। যা পারবে তারই জন্যে পত্র লিখে দিই।"

মশাই বল্লেন—"বাড়ীতে বলছিলেন পাশের বাড়ীর যদু ও মধু দুজনে মাসে মাসে মাইনে ছাড়া ২০।২৫ টাকা 'উপরি' উপায় করে—কলিকাতার নানা দ্রব্যে কেমন ঘর-বাড়ী গুছিয়েছে,—সাজিয়েছে। তাদের কোনও অভাবই নেই। তা ছাড়া পাঁচজনকে টাকা কড়ি ধার দিয়ে মহাজনী করে আরও যথেষ্ট উপায় করে মহাসুখে দিন কাটাচ্ছে; আর আমাদের শুধু কোনও রকমে খেয়ে দেয়ে দিন যাচ্ছে—গিন্নী কখন ত কাউকে একটা পয়সাও হাতে তুলে দিতে পারছেন না; ব্রতধর্ম্ম করতে পারছেন না; তাই তিনি বড় দুঃখিত হয়েছেন। বলেন 'যদু-মধু ত রামকৃষ্ণপুরের আড়তে ১২ বার টাকা মাইনেই কাজ করে। মাইনে ছাড়া কি করে এত 'উপরি' উপায় করে।'"

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম যে তারা ওজন-সরকার। ধান-চাল মাপের পরিমাণ ধরবার জন্য ব্যাপারীর ধান-চালের মুঠো মুঠো নিয়ে ওজনের সংখ্যা রেখে দিনান্তে পাঁচ-সাত সের চাল-ধান তাদের উপায়ে আসে। আর বল্লে 'এই সঙ্গে সময়-শিরে—খুব ভিড়ের দিনে আড়তের চাল হতে দুএক সরা চাল নিয়ে পরিমাণটা আরও

বাড়িয়ে নিই।' তাই আমি মনে করছিলাম যে, এ ত খুব সহজ কাজ; এ কাজ আমি কেন পারবো না। আমার গায়ে এখনও খুব জোর আছে। দেখুন না আমার হাতের কব্জি—আমি ধামা-ধামা চাল 'উপরি' নিয়ে আমার প্রাপ্য চালের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই আমার আয় খুব বেশী হয়ে পড়বে।"

কাছারি-ঘরের সব লোকজন মশাইএর কথা শুনে হেসে অস্থির হতে লাগলো; আমলারা সব গা-টেপাটেপি করতে লাগলো। মশাই তাদের রকম-সকম দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে বল্লেন—"এতে বাপু, এমন হাসির কথা কি আছে?"

বাবু বল্লেন—"সনাতন, এ রকম 'উপরি'র নামান্তর হচ্ছে চুরি। তা কি তুমি করতে রাজী আছ? অতি সরল-উদার প্রকৃতির মানুষ তুমি—এ সব কথারই কিছু তুমি বোঝ না; তুমি যাবে সহরে চাকরী করতে। যাক্, আমি তোমার ও তোমার 'বাড়ীর' সব কথাই বুঝে নিয়েছি,—এবং এর যা বিহিত, তা শীঘ্র করছি।"

মশাই অপ্রস্তুত হয়ে টাকের উপর হাত বুলাতে বুলাতে কোনও কথা না ব'লে সেথান হতে তখনই দ্রুত পালিয়ে গেলেন।

বাবু তখন আর সকলকে বল্লেন—"এই যে সনাতন কোনও কথা না ব'লে এমন ভাবে চোরটির মত পালাল, এতেই শেষ হল না। ও এখনই ফিরে এসে আবার কি হাঙ্গামা বাধায় দেখ। আমি আজ ষাট বছর ধরে ওকে দেখে আস্‌ছি;— ওকে মাত্র আমিই চিনেছি। আমি বল্‌ছি, ওর যোগ্য কাজ ঐ ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া—তা ছাড়া আর কিছু ও পারবে না। তা বুঝেই আমি কখনও সনাতনকে কোনও কাজের মধ্যে আনতে চেষ্টা করিনি। এতকাল আমি ওর মনে বা মুখে কোনও মালিন্য কখন দেখি নি। মুখে হাসি সদাই লেগে আছে। ওর এই সবে প্রথম বিষণ্ণ ও ভাবান্তর দেখ্‌লাম। আমি মনে করছি—গ্রামে একটি স্কুল করে দিই; তার নাম দিই 'সনাতন-পাঠশালা'। সনাতন তারই তত্ত্বাবধান ক'রে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিক্‌। আর দেখুন নায়েব মশাই; আমার নাম করে পত্র দিন ওর যত সব ছাত্র দেশে বিদেশে আছে—তারা সংখ্যায় ত বড় কম হবে না, শ'দেড়েকের উপর—যারা ওর শিক্ষায় মানুষ হয়ে আজ দেশের সেবা কর্চ্ছে তাদের কাছে লিখে দিন যে আমি 'সনাতন-পাঠশালা' স্থাপন করব, স্থির করেছি। তারা সকলে যেন আগামী পূজার সময় সনাতনের বাড়ীতে মহাপূজায় আগমন ক'রে 'মশাই-গিন্নী'র,—তাদের গুরু-পত্নীর ব্রত-ধর্ম্মের আশাটা পূরণ করে দেয়; এবং সনাতনের 'উপরি' উপায়-স্বরূপ যথাযোগ্য গুরুদক্ষিণা দিয়ে তার "মহাজন" হবার আশা মিটিয়ে দেয়। সনাতন এতদিন ধরে যে বিদ্যের মহাজনী করে এসেছে, সেটা যেন তারা সুদে-আসলে উশুল করে দিতে ভুলে না যায়।"

এমন সময় সনাতন মশাই একরাশ খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রফুল্ল মুখে হাসতে হাসতে কাছারী-বাটীতে এসে বল্লেন "দেখুন কর্ত্তামশায়,—আমার এই চল্লিশ বছরের হাজিরে-খাতা; এতে যদু-মধুর নাম নেই—ওরা আমার ছাত্র নয়। আমার ছাত্র হয়ে কি কেউ কখন 'উপরি' উপায় করতে পারে? চুরী-বিদ্যাও আমি কখন কাউকে শিক্ষা দিই নি—নিজেও তা জানিনে। বুড়া মানুষ—হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল কর্ত্তা মশাই, কিছু মনে করবেন না।"

বাবু হেসে বললেন "সনাতন, তোমাকে কি আমি চিনিনে। যাও, তোমার সহধর্ম্মিণীকে বল গিয়ে, এবার আমি সমস্ত খরচ-পত্র ক'রে তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব করব। তোমার সব ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করব। তাতে তোমার সহধর্ম্মিণীর যথেষ্ট 'উপরি'-পাওনা হবে, বুঝলে সনাতন!"

সনাতন মশাই বল্‌লেন—"সে কি কর্ত্তা মহাশয়, আমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব! সে কি করে হবে? লোকে কি বল্‌বে? আমার মত গরিব গুরুমশায়ের কি অমন বড়মানুষী সাজে? আপনি ও-সঙ্কল্প ত্যাগ করুন; আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

বাবু সহাস্যে বলিলেন—"সনাতন, হাকিম ফেরে, ত হুকুম ফেরে না। এবার তোমার বাড়ী দুর্গোৎসব হবেই; তোমার গৃহিণীর 'উপরি'-পাওনা এবার চাই-ই।"

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যুৎ সাহায্যে চাষ—

আমেরিকার বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক বুর্‌ব্যাঙ্কের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ফরাসী দেশেও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের মত উদ্ভিদ্‌-জগতে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটন করিয়াছেন।

তিনি মাটি, আকাশ এবং সূর্য্য হইতে তাঁহার নির্ম্মিত একটি বিশেষ যন্ত্র-সাহায্যে তড়িৎ-শক্তি সংগ্রহ করিয়া

তড়িৎ-শক্তিতে উৎপন্ন বৃক্ষ

তাহাকে বৃক্ষ-লতাদির মধ্যে পরিচালনা করিয়া নানাবিধ ফলমূলের বিবিধ প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন। একটি আপেল বৃক্ষে বহুকাল কোন ফল ফলে নাই। ফরাসী বৈজ্ঞানিক Justin Christoflorean এই আপেল গাছটিকে তড়িৎ-চিকিৎসা করার পর ইহাতে এত ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, যে গাছটি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। অন্যান্য নানা প্রকার ফলের আকার তিনি তড়িৎ-সাহায্যে তাহার পূর্ব্ব-আকারের দ্বিগুণ করিয়াছেন।

Justin Christoflorean বলেন যে, তড়িৎ শক্তির এমন একটি গুণ আছে, যাহা বৃক্ষলতাদির অনিষ্টকারী সকল রকম পোকা মাকড় ইত্যাদি হত্যা করিয়া বৃক্ষকে নানাভাবে নবশক্তি দান করিয়া তাহার স্বাস্থ্য শতগুণ বাড়াইয়া দ্যায়।

৩০০০ ফিট উঁচু হইতে লাফ—

কলিকাতার গড়ের মাঠের মনুমেণ্টে চড়িয়া তাহার উপর হইতে নীচে লাফ দিয়া পড়িবার ইচ্ছা অনেকের

লাফ-দিবার সময়ের ছবি

হয়—কিন্তু কেহ লাফ দিয়াছে বলিয়া এখনও শোনা যায় নাই। সঙ্গে প্যারাস্যুট লইয়াও কেহ লাফ দিবে কি না জানি না।

শুনিলে অবাক হইতে হয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বায়ু সৈন্যের করপোরাল আর্থার্ আর্ বার্গো ৩০০০ ফিট উচ্চে স্থিত এরোপ্লেন হইতে প্যারাস্যুট লইয়া শূন্যে লাফ দিয়াছিলেন। প্রথম ১৫০০ ফিট সোঁ করিয়া নীচে নামি

আসেন—এই ১৫০০ ফিট প্যারাসুট বন্ধ ছিল। এই প্রকার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া লাফ দিবার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র

আশ্চর্য্য উল্লম্ফন

পরীক্ষা করা যে, মানুষ এত উঁচু হইতে লাফ দিয়া বাঁচিতে পারে কি না। এই পরীক্ষায় তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তিনি এই লাফ দিয়া সফলকাম হইবার পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, এত উঁচু হইতে বন্ধ প্যারাসুট লইয়া লাফ দিয়া কেহ বাঁচিতে পারে না। প্যারাসুট খুলিবার সময় আর তাহার হয় না, তাহার পূর্ব্বেই সে মাটিতে পড়িয়া ছাতু হইয়া যাইবে।

সার্জ্জেণ্ট বোস্ নামক আর একজন লোকও ১৫০০ ফিট উঁচু স্থান হইতে লাফ দিয়া কিছু পরে প্যারাসুট খুলিয়া নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ইহারা দুইজন বলেন যে "লাফ দিবার পর আমাদের কোনোপ্রকার বুদ্ধি লোপ পায় নাই। জীবনের আশাও একবিন্দু ত্যাগ করি নাই।" বোস্ বলেন "লাফ দিবার পর আমার প্রথম কথা মনে হয়—মাটিতে নামিয়া কি ভাল খাবার খাইব।"

স্বাধীন দেশের লোক যেমন জীবনকে পুরামাত্রায় ভোগ করে, তেমনি মরিবার সময়ও ইহারা মরণকে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পারে।

অভিনব মানুষ—

আফ্রিকার কঙ্গোর জঙ্গলে নানাপ্রকার অসভ্য জাতি

অভিনব মানুষ

বাস করে। কত রকম জাতি যে বাস করে তাহাদের সংখ্যা এখনও সব জানা যায় নাই।

"ওয়ামবুটি" 'পিগ্‌মি' অর্থাৎ বেঁটে মানুষ বা বামন বলিয়া এক জাতি এই জঙ্গলের এক স্থানে বাস করে। ইহাদের দুইজনের ছবি (পিতা ও কন্যা) এক সাধারণ মানুষের

অভিনব মানুষ

দুই পাশে দেওয়া হইল। এই পিতা ও কন্যা এই জাতির মধ্যে অত্যন্ত লম্বা বলিয়া খ্যাত।

কঙ্গোর কিভু নামক জঙ্গলে আর এক জাতির বাস। ইহারা তাহাদের পিঠ নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র করিয়া উল্কি কাটে। উল্কির নমুনা দেওয়া হইল।

হেনরি মামবোল্ট—

যে বালকটির ছবি দেওয়া হইল, তাহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর। এই বয়সেই যে গণিত-শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ইয়োরোপের চিকিৎসক-মহল এবং বৈজ্ঞানিকগণ এই বালকের অসাধারণ মস্তিষ্ক দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়াছেন। গণিত-শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল সমস্যা এই বালক বিনা কষ্টে সমাধান করিয়া দ্যায়। উচ্চ গণিতের কতকগুলি ভয়ানক জটিল প্রশ্ন এই বালককে করা হয়। বালক অতি কম সময়ে সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানে সকলকে চমৎকৃত করিয়া দ্যায়। অনেক গণিত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দান করিতে বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা ঘামাইতে হয়। বালক যেমন ভাবে প্রশ্নের উত্তর

হেনরী মাম্‌বোল্ট (বয়স ৬ বৎসর)

দান করে, তাহাতে মনে হয় যেন তাহার ঠোঁটের আগায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আসিয়া প্রশ্নের অপেক্ষা করিতেছে।

রুডলফ্ ভ্যালেনটিনো—

বিখ্যাত বায়স্কোপ-অভিনেতা রুডলফ্ ভ্যালেনটিনো গত ২৩এ আগষ্ট নিউইয়র্ক সহরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে আমেরিকায় এবং জগতের অন্যান্য সভ্য সমাজে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নিউইয়র্কে ইহার মৃতদেহ দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। পুলিশ অনেক চেষ্টা করিয়াও ভিড়

সরাইতে পারে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম কিছু তাজা রক্ত দরকার হয়। শত শত লোক রক্ত দিবার জন্য তাহাদের হাত বাড়াইয়া দ্যায়। ইঁহার অসুখের সংবাদ টেলিফোনে এত লোক জানিতে চায়, যে, তাহার জন্য বিশেষ একদল টেলিফোন অপারেটার নিযুক্ত করা হয়।

পরলোকগত মিঃ রুডল্‌ফ ভ্যালেনটিনো

ভ্যালেণ্টিনোর ভক্তবৃন্দ হাসপাতালকে সকল সময় ফুলে ফুলে ফুলময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিখ্যাত বায়স্কোপ-অভিনেত্রী পোলা নেগী (?) ইঁহার স্ত্রী। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহাদের বিবাহ হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা সুড়ঙ্গ—

যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরের ২০০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে দুইটি বৃহৎ হ্রদের জল যোগ করিবার জন্ত একটি ১৫ ফিট প্রশস্ত এবং ১৩ মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ পথ খোঁড়া হইয়াছে। পাঁচ বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি ক্রমাগত খোঁড়ার ফলে এই কার্য্যটি সমাপ্ত হইয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া এই সুড়ঙ্গ পথ করিতে হইলে সময় কম লাগিত, কিন্তু সুড়ঙ্গটি আগাগোড়া কেবল লোহা অপেক্ষাও শক্ত গ্র্যানাইট পাথর কাটিয়া তৈয়ার করিতে হইয়াছে। ইহাতে খরচ পড়িয়াছে প্রায় ৫১,০০০,০০০৲ টাকা। কলের সাহায্যে এই পাথর কাটার কাজটি করিতে হয়। কার্য্যের প্রথম দিকে প্রত্যহ ১২ ফিট করিয়া পাথর কাটা হইত; কিন্তু শেষের দিকে ৩২ ফিট পর্য্যন্তও হয়। প্রায় ৩০০০ লোক দিবারাত্রি এই কাজে নিযুক্ত ছিল। যে প্রদেশে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়, সেখানে শীতকালে অত্যন্ত বরফ পড়ে, পথঘাট সব জমিয়া যায়। কুকুর টানা গাড়ীর সাহায্যে খাদ্য এবং চিঠিপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কর্ম্মীদের চিত্তবিনোদনের জন্য র‍্যাডিও সাহায্যে নানাপ্রকার গীতবাদ্য তাহাদিগকে প্রত্যহ শোনান হইত।

বেতারের সাহায্যে সুড়ঙ্গ খননের কার্য্যও পরিচালনা করিতে হইত। নভেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটার কাজে নিযুক্ত লোকেরা লোকালয়ের সহিত সাক্ষাৎ কোন প্রকার যোগ রাখিতে পারিত না। চারিদিকে বরফের দেওয়াল। এই সময় বেতারই তাহাদের একমাত্র সম্বল। বাহিরের জগতের সহিত কথাবার্ত্তা ইত্যাদি সবই বেতারের সাহায্যে চলিত।

সুড়ঙ্গের দুই প্রান্ত হইতে কাজ আরম্ভ হয়। মাঝে আসিয়া যখন দুই দল মিলিত হইল, তখন দেখা গেল সুড়ঙ্গ মাত্র ·০৩৬ ইঞ্চি বাঁকা হইয়াছে!

সুড়ঙ্গের নাম "ফ্লোরেন্স লেক টানেল"। এই সুড়ঙ্গের ফলে দুইটি বৃহৎ হ্রদ মিলিত হইল, এবং তাহার ফলে আশেপাশের প্রদেশে তড়িৎ শক্তির পরিমাণ বহু হাজার গুণ

কেইসার রিজ

বেশী হইবে। ইহা ব্যবসা এবং বাণিজ্যের যে কত উন্নতি করিবে, তাহা বলা যায় না।

পৃথিবীতে এত বড় সুড়ঙ্গ আর নাই। ইহার পরেই নাম করা যায় সুইস্ আল্পসের টানেল (১২ মাইল লম্বা)।

সুগঠিত-দেহা নারী—

কুড়ি হাজার আমেরিকান্ বালিকার মধ্য হইতে মিস্ ফ্রেডি এষ্টেলি হাম্‌ফ্রিজ্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর-তনু বালিকা বলিয়া বাহির করা হয়। এই বালিকার প্রত্যেকটি অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের এমন একটি চমৎকার মিল ও সামঞ্জস্য

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মিস্ ফ্রেডি হাম্‌ফ্রি

আছে যে, মনে হয় যেন কোন এক আশ্চর্য্য শিল্পী ইহাকে নিজের মানস প্রতিমার রূপে পাথর খুদিয়া গঠন করিয়াছে। গ্রীসের ভাস্করদের তৈরী কোন মূর্ত্তির দেহই এই বালিকার দেহ-সৌষ্ঠবের কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

নিউ ইয়র্কের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাসাদ—

ছবি দেখিলে মনে হয় যেন একটা ছোট খাট পর্ব্বত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমেরিকাতে বোধ হয় এত উঁচু এবং বড় আর কোন বাড়ী নাই। এই প্রাসাদের আ[শ] পাশের সকল বড় বড় বাড়ীগুলিকে ইহার কাছে কুটী[র] বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত সিঙ্গার বিল্ডিং এই বাড়ীর কা[ছে] দাঁড়াইতে পারে না। একটি সহরে যাহা থাকা দরকা[র]
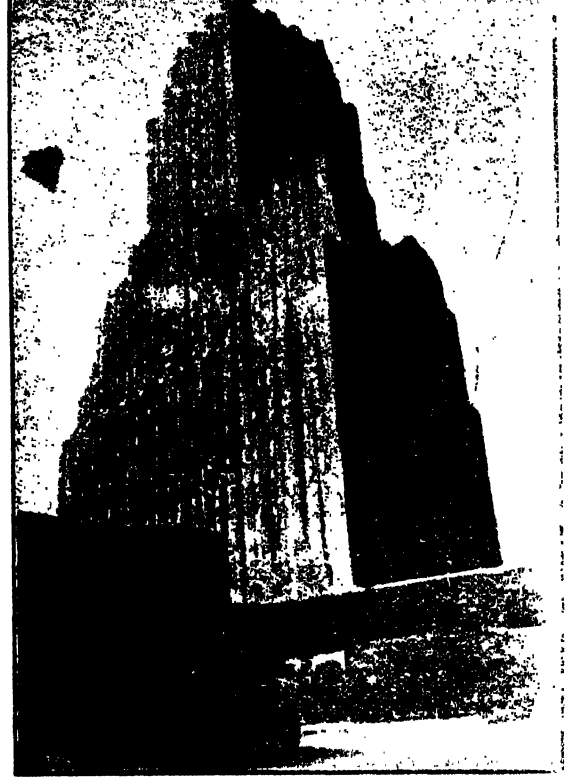
নিউইয়র্কের সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা

এবং থাকে, সমস্তই এই বাড়ীতে আছে। ইহাকে এ[কটি] সহর বলিলেও চলে।

মেয়েদের হকি খেলা—

বিলাতে এবং আমেরিকায় আজকাল মেয়েরা পুরুষে[র] সকল খেলা দখল করিতেছে। টেনিস খেলায় অ[নেক] নারী আজকাল জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। মাদামে[া]ল্যাং লেনের নাম এখন জগৎ-বিখ্যাত। ফুটবল, [হকি] ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাও আজকাল মেয়েরা খেলি[তেছে]। কোমলাঙ্গী বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না [যে তাহারা] কোমল ভাবে এই সকল খেলা খেলে! অনেক পু[রুষ] নারীদের কাছে এই সব খেলায় হটিয়া যায়। ক্রমে [ক্রমে]

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের মেয়েদের হকি ম্যাচ

দিন আসিবে যখন নারীরা সকল রকম ক্রীড়াতে পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিবে। সাঁতারে নারী বর্ত্তমান সময়ে পুরুষকে অতিক্রম করিয়াছে। মেয়েদের হকি খেলার একটি ছবি দেওয়া হইল।

নূতন খেলা

বাইসাইকেল পোলো—

আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া পোলো খেলা দেখিয়াছি। ইহা বড়লোকদের খেলা, কারণ গরীবরা নিজেরাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ঘোড়াকে খাওয়াইবে কি।

আমেরিকার লোকেরা পোলো খেলাকে সকলের উপযোগী করিবার জন্ম বাইসাইকেল পোলো খেলা আরম্ভ করিয়াছে। ছেলে মেয়ে সকলেই ইহা খেলিতে পারে। ছবিতে দেখুন একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে বাইসাইকেল পোলো খেলিতেছে।

রাজ্য-পালন

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

শেষরাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সকালবেলার আকাশ বিধবার মত একখানি শুভ্র বসন পরিধান করিয়া আছে। পত্র-পুষ্প-লতার চক্ষু দিয়া যেন অশ্রু ঝরিতেছে। জম্বুদ্বীপের তরুণ রাজা স্মরজিৎ প্রকৃতির এই ছবি দেখিয়া করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিলেন। মনে হইল, আমার যে সব প্রজাদের আজ ছাতা নাই, এ বৃষ্টিতে তাহাদের কত কষ্টই না ভোগ করিতে হইতেছে!

রাজা আপনার প্রাসাদ-রক্ষককে ডাকিয়া কহিলেন—"বলবন্ত, আমার প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়া এস, আমি এখনই জানিতে চাই, আমার এই রাজধানীতে কতজন এমন হতভাগ্য আছে, যাহাদের মাথায় দিবার ছাতা নাই।"

প্রাসাদ-রক্ষক তীরের মত বেগে ছুটিয়া প্রধান মন্ত্রীর আবাসে গিয়া সংবাদ দিল—"মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ এখনি জানিতে চান, এ নগরে কতগুলি লোক আছে, যাহারা ছাতা মাথায় না দিয়া হাঁটে।"

প্রধান মন্ত্রী অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নগরপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নগরপাল উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া প্রণতিপূর্ব্বক আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন—"কতকগুলো দুষ্ট লোক মহারাজকে বুঝি বিরক্ত করিয়াছে। মহারাজ এখনি জানিতে চাহেন—কতগুলি অসভ্য লোক এ নগরে আছে, যাহাদের ছাতা নাই। আমি এত করিয়া তোমাকে সতর্ক থাকিবার পরামর্শ দিয়াছি, তাহা সত্ত্বেও তোমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

নগরপাল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"হুজুর, আপনারই উপদেশমত মহারাজের বাড়ীর চারিদিক সুন্দর পুষ্পবাটিকায় ঘেরিয়া রাখিয়াছি। সেখান হইতে বাহিরে দৃষ্টি কি প্রকারে পড়িল? আমাকে আর ঘণ্টাখানেক সময় দিন—আমি এখনি ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

নগরপাল আপনার গৃহে ফিরিয়া শান্তি-রক্ষককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শান্তিরক্ষক মুহূর্ত্তমাত্র কাল ব্যয় না করিয়া কম্পিত-কলেবরে নগরপালের সান্নিধ্যে পৌছিলেন। তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে কহিলেন—'দাসকে কি জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন?' নগরপাল দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—'দাসকে কি জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন! আমি কি তোমাকে বসিয়া বসিয়া মিষ্টান্ন খাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছি? আজি তোমার কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া কাজ ছাড়িয়া দাও—তোমার মত চাকর আমার ঢের মিলিবে।' শান্তিরক্ষক আর একবার প্রণিপাত করিয়া বলিল—'কি হইয়াছে দাসকে না বলিয়া তিরস্কার করিলে দাস কি প্রকারে বুঝিবে?'

নগরপাল একটু শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন—'নগরের কতকগুলি দুষ্ট লোকের মাথায় দিবার ছাতা নাই;—তাহারা মহারাজকে বিরক্ত করিয়াছে। মহারাজ সে রকম কত গুলি লোক আছে এই দণ্ডে জানিতে চাহিয়াছেন। পারিবে?'

শান্তিরক্ষক আর একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—'আমি চলিলাম—শীঘ্রই আপনাকে সংবাদ দিব।'

তৎক্ষণাৎ শান্তিরক্ষকের আদেশে নগরীর চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী প্রহরী ধাবিত হইল। ছত্রহীন হতভাগ্য নরনারী যাহাকে পাইল ধরিয়া রাজধানীর কারাগারের প্রাঙ্গণে উপস্থিত করিল। তাহাদের সংখ্যা হইল সহস্রাধিক। শান্তিরক্ষকের আদেশে তাহাদের শির ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল।

বেলা ১০টা বাজিতেই প্রধান মন্ত্রী রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন—'জানিয়া আসিয়াছ আমার এই নগরীতে ছত্রহীন কয়জন আছে? বল—কিছুমাত্র গোপন করিও না—আমি প্রকৃত সত্য জানিতে চাই।'

প্রধান মন্ত্রী নিবেদন করিলেন—'প্রকৃত সত্যই কহিতেছি মহারাজ। এইক্ষণে আপনার সুশাসিত রাজধানীতে এমন একটী লোক নাই, যাহার ছত্র নাই।'

রাজার মুখে আনন্দ ও তৃপ্তির আভা ফুটিয়া উঠিল। তখন বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছিল। বর্ষণ-ধৌত বৃক্ষলতা ও বিশাল সৌধরাজির উপর তপ্ত সূর্য্যকিরণ পড়িয়া তাহাদিগকে এক মধুর সৌন্দর্য্য দান করিয়াছিল।

সেই অমল-ধবল মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রাসাদে সুকোমল ঈষত্তপ্ত রত্নখচিত মনোরম আসনে সমাসীন হইয়া চতুর্দ্দিকের নয়ন সুখদ পুষ্পবাটিকা, শান্ত রবিকরে উদ্ভাসিত ক্রীড়া প্রস্রবণ, অদূরে অন্তঃপুরের বিচিত্র হর্ম্ম্যাদি অবলোকন করিয়া রাজা ধীরে ধীরে বলিলেন—কি সুন্দর এই রাজ্য, যেখানে কাহারও কোন অভাব, কোন দৈন্য নাই,—প্রকৃতি ও বিজ্ঞান দেবতা যেখানে মুক্ত হস্তে সুখ সমৃদ্ধি দান করিতেছেন! আর এমন নগরের রাজা হইয়া ধন্য আমি!

পরদিন প্রধানমন্ত্রী, নগরপাল ও শান্তিরক্ষক তাঁহাদের কার্য্যকুশলতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য প্রচুর পুরস্কার সম্মান ও প্রকাশ্য প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন। এই গুণবান কর্ম্মচারি-ত্রয়ের বেতন রাজকোষ হইতে দ্বিগুণিত করিয়া দিবার আদেশ হইল। রাজধর্ম্মে সাহায্যকারী অস্ত্রধারী প্রহরিগণ পর্য্যন্ত রাজসম্মান ও বেতন বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইল না। রাজ্যের উৎসব ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গতপ্রাণ লুণ্ঠিতশির হতভাগ্যগণের আত্মীয় স্বজনের কাতর ক্রন্দন কোথায় ডুবিয়া গেল!
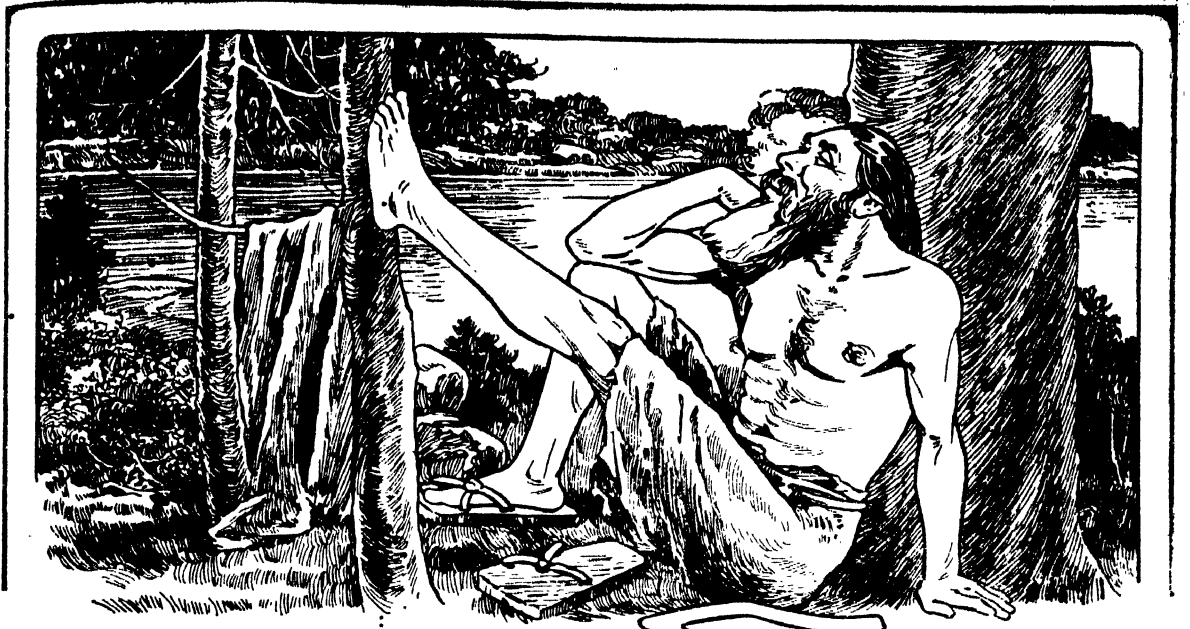
পরশুরাম রচিত

জাবালি

নারদ বিচিত্রিত

ভরতের সঙ্গে বশিষ্ঠাদি যে সকল ঋষিগণ, মহিষীগণ ও কুলপতিগণ চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সত্যসন্ধ রাম অটল রহিলেন। অবশেষে মহর্ষি জাবালি বলিলেন—

রাম, তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। জীব একাকী জন্ম গ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব মাতা-পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাসক্তি হইয়া থাকে সে উন্মত্ত।...পিতার অনুরোধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজ-ভোগে কালক্ষেপ করিয়া দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন; তিনি অন্য, তুমিও অন্য।...বৎস, তুমি স্ববুদ্ধি-দোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্তে মহা-বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃ-দেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ, কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃতব্যক্তি আহার করিতে পারে?...যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোক-দিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব রাম, পরলোক-সাধন ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্ব্ব-সম্মত বুদ্ধির অনুসরণপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

জাবালির কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন—তপোধন, আপনি আমার হিতকামনায় যাহা কহিলেন তাহা বস্তুত অকার্য্য, কিন্তু কর্ত্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার এই কার্য্যকে যথোচিত নিন্দা

করি। বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সঙ্গে সম্ভাষণও করিবেন না।...

জাবালি তখন বিনয়বচনে কহিলেন—রাম, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার অবসরক্রমে আস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত। এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত এইরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহা প্রত্যাহার করিতেছি। *

জাবালির কথা রামায়ণে এই পর্য্যন্ত আছে। যাহা নাই, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

মহর্ষি জাবালি ক্লান্তদেহে বিষণ্ণচিত্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমস্ত পথ তাঁহাকে নীরবে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কারণ অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার সংস্রব প্রায় বর্জ্জন করিয়াই চলিয়াছিলেন। খর্ব্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে দূর হইতে নির্দ্দেশ করিয়া বিদ্রূপ করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

অযোধ্যার বিপ্রগণ কেহই জাবালিকে শ্রদ্ধা করিতেন না। স্বয়ং রাজা দশরথ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কোনো লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন রামচন্দ্র কর্তৃক জাবালির প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। সহযাত্রী বিপ্রগণের ব্যবহার দেখিয়া জাবালি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তপ্তৈতলমধ্যে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার অযোধ্যায় বাস করা অসম্ভব হইবে।

রামচন্দ্রের উপর জাবালির কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, পরন্তু তিনি রামের ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়াছেন। ছোকরার বয়স মাত্র আটাশ বৎসর, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনো কিছুমাত্র জন্মে নাই। শাস্ত্রজীবী সভাপণ্ডিতগণ এবং মুনি-পুঙ্গব বিশ্বামিত্র—যিনি এক কালে অনেক কীর্ত্তি করিয়াছেন,—ইঁহারা যেরূপ ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়াছেন, সরল-স্বভাব রামচন্দ্র তাহাই চরম পুরুষার্থ বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। বেচারাকে এর পর কষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে জাবালি অযোধ্যায় নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

নগরের উপকণ্ঠে সরযূতীরে জাবালির পর্ণকুটীর। বেলা অবসান হইয়াছে। গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন অঙ্গনের এক পার্শ্বে পনসবৃক্ষতলে জাবালি-পত্নী হিল্লুলিনী রাত্রের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছেন। নদীর পরপারবাসী নিষাদগণ যে মৃগমাংস পাঠাইয়াছিল তাহা শূল্যপক্ক হইয়াছে, এখন খান কয়েক মোটা মোটা পুরোডাশ্ সেঁকিলেই রন্ধন শেষ হয়। হিল্লুলিনী যবপিণ্ড থাসিতে থাসিতে নানাপ্রকার সাংসারিক ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁর এতখানি বয়স হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পুত্রমুখ দেখিলেন না। স্বামীর পুন্নাম নরকের ভয় নাই, পরলোকে পিণ্ডেরও ভাবনা নাই,—ইহলোকে দু' বেলা নিয়মিত পিণ্ড পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। পোষ্যপুত্রের কথা তুলিলে বলেন—পুত্রের অভাব কি, যখন যা'কে ইচ্ছা পুত্র মনে করিলেই হয়। কিবা কথার শ্রী! স্বামী যদি মানুষের মতন মানুষ হইতেন তাহা হইলে হিল্লুলিনীর অত খেদ থাকিত না। কিন্তু তিনি একটি সৃষ্টি-বহির্ভূত লোক, কাহারো সহিত বনাইয়া চলিতে পারিলেন না। সাধে কি লোকে তাঁকে আড়ালে পাষণ্ড বলে! ত্রিসন্ধ্যা নাই, জপতপ নাই, অগ্নিহোত্র নাই, কেবল তর্ক করিয়া লোক চটাইতে পারেন। অমন যে রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ তাঁকেও চটাইয়াছে। যতদিন দশরথ ছিলেন, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই। বৃদ্ধ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন বটে, কিন্তু নজরটা তাঁর উচ্চ ছিল। এখন কি হইবে ভবিতব্যতাই জানেন। ভরত ত নন্দিগ্রামে পাদুকা-পূজা লইয়া বিব্রত। সচিব সুমন্ত্র এখন রাজকার্য্য দেখিতেছে; কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ, ঘোড়ার বল্‌গা টানিয়া তার সকল বিষয়েই টানাটানি করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটী হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাওয়া যায় তা'তে এই দুর্ম্মূল্যের দিনে সংসার চলেনা। হিল্লুলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন সত্যযুগে এক কপর্দ্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে মাত্র তিন কলস পাওয়া যায়, তাও ভঁয়সা। ঘৃতের জন্য জাবালির কিছু ঋণ হইয়াছে, কিন্তু শোধ করার ক্ষমতা নাই। নীবার ধান্য যা সঞ্চিত ছিল ফুরাইয়া

* বাল্মীকি রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ।

আসিয়াছে, পরিধেয় জীর্ণ হইয়াছে, গৃহে অর্থাগম নাই, এদিকে জাবালি শত্রুসংখ্যা বাড়াইতেছেন। স্বামীর সংসর্গ-দোষে হিন্দ্রলিনীও অনাচারে অভ্যস্ত হইয়াছেন। অযোধ্যার নিষ্ঠাবতীগণ তাঁকে দেখিলে শূকরীর ন্যায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে। হিন্দ্রলিনী আর সহ্য করিতে পারেন না; আজ তিনি আহারান্তে স্বামীকে কিছু কটুবাক্য শুনাইবেন।

অঙ্গনের বাহিরে হুঙ্কার করিয়া কে বলিল—হংহো জাবালে, হংহো! হিন্দ্রলিনী ত্রস্তা হইয়া দেখিলেন দশ-বারোজন ক্ষুদ্রকায় ঋষি কুটীর-দ্বারে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের খর্ব্ব বপু বিরল শ্মশ্রু ও স্ফীত উদর দেখিয়া হিন্দ্রলিনী বুঝিলেন তাঁহারা বালখিল্য মুনি।

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—হে মহাতপা মুনিগণ, আমার স্বামী সরযূতটে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা ততক্ষণ ঐ কুটীর-অলিন্দে আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করুন।

বালখিল্যগণের অগ্রণী মহামুনি খর্ব্বট কহিলেন—ভদ্রে, তোমার ঐ অলিন্দ ভূমি হইতে বিতস্তি-ত্রয় উচ্চ, আমরা নাগাল পাইব না। অতএব এই প্রাঙ্গণেই আসন-পরিগ্রহ করিলাম, তুমি ব্যস্ত হইও না।

জাবালি তখন সরযূ-তীরে জম্বুবৃক্ষতলে আসীন হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন—এই অন্নজলাবলম্বী মানব-শরীরে পঞ্চভূতের কিম্বিধ সংস্থান হইলে সুবুদ্ধির উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা মূর্খতা জন্মে। অপরন্তু, লাঠৌষধি দ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূত প্রকম্পিত করিলে মূর্খতা অপগত হইয়া যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তাহা স্থায়ী কিনা। এই জটিল তত্ত্বের মীমাংসা কিছুতেই করিতে না পারিয়া অবশেষে জাবালি উঠিয়া পড়িলেন এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

জাবালি বালখিল্যগণকে কহিলেন—অহো, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে খর্ব্বট খল্লাট খালিত প্রভৃতি মহামুনিগণ আমার এই আশ্রমে সমাগত। হে মুনিবৃন্দ, তোমাদের ত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? যাগ-যজ্ঞাদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত? ঋষিভুক্ রাক্ষসগণ তোমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করে না ত? তোমাদের সেই কপিলা গাভীটির বাচ্চা হইয়াছে? রাজগুরু বশিষ্ঠ তোমাদের জন্য যথেষ্ট গব্য-দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন ত?

মহামুনি খর্ব্বট দর্দ্দুর-ধ্বনিবৎ গম্ভীরনাদে কহিলেন—জাবালে, ক্ষান্ত হও। আপ্যায়নের জন্য আমরা আসি নাই। তুমি পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া আছ, আমরা তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। প্রায়োপবেশন-চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা তোমার কিছু হইবে না। আমরা অথর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে তোমাকে অগ্নিশুদ্ধ করিব, তাহাতে তুমি অন্তে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। তুষানল প্রস্তুত, তুমি আমাদের অনুগমন কর।

জাবালি বলিলেন—হে খর্ব্বট, তোমাদিগকে কে পাঠাইয়াছেন? রাজ-প্রতিভূ ভরত, না রাজগুরু বশিষ্ঠ? আমার উদ্ধার-সাধনের জন্য তোমরাই বা অত ব্যগ্র কেন? আমি অতি নিরীহ বানপ্রস্থাবলম্বী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, কখনো কাহারো অনিষ্ট করি নাই, তোমাদের প্রাপ্য দক্ষিণারও অংশভাক্ হই নাই। তোমরা আমার পরকালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিজ নিজ ইহকালের জন্য যত্নবান হও।

তখন অতিকোপনস্বভাব খল্লাট ঋষি অশ্বধ্বনিবৎ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—রে তপোধন, তুমি অতি দুরাচারী ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক। তোমার বাসহেতু এই অযোধ্যাপুরী অশুচি হইয়াছে, ধর্ম্মাত্মা বিপ্রগণ অতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমরা ভরত বা বশিষ্ঠ কাহারো আজ্ঞাবাহী নহি। ব্রাহ্মণ্যের রক্ষাহেতু আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি। তুমি আর বাক্যব্যয় করিও না, প্রস্তুত হও।

জাবালি বলিলেন—হে বালখিল্যগণ, আমি স্বেচ্ছায় যাইব না। তোমরা আমাকে ব্রহ্মতেজোবলে উত্তোলন কর।

জাবালির শালপ্রাংশু বিরাট বপু দেখিয়া বালখিল্যগণ কিয়ৎক্ষণ নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিলেন। অবশেষে গলিত-দন্ত খালিত স্খলিতস্বরে কহিলেন—হে জাবালে, যদি তুমি অগ্নি-প্রবেশ করিতে নিতান্তই ভীত হইয়া থাক তবে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ক্রয় স্বরূপ তিন শূর্প তিল ও শত নিষ্ক কাঞ্চন প্রদান কর। আমরা যথাবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে পাপমুক্ত করিব।

জাবালি কহিলেন—আমার এক কপর্দ্দকও নাই, থাকিলেও দিতাম না।

তখন খর্ব্বট খল্লাট খালিতাদি মুনিগণ সমস্বরে কহিলেন—রে নরাধম, তবে আমরা অভিসম্পাত করিতেছি শ্রবণ কর। সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য তারা, সাক্ষী দেবগণ পিতৃগণ বষট্‌কারগণ—

জাবালি বলিলেন—শৌণ্ডিকের সাক্ষী মণ্ডপ, তস্করের

সাক্ষী গ্রন্থি-ছেদক। হে বালখিল্যগণ, বৃথা দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছ, তাঁরা আসিবেন না। বরং তোমরা জুজুগণ ও কর্ণকর্ত্তকগণকে স্মরণ কর।

হিড়ম্বলিনী বলিলেন—হে আর্য্যপুত্র, তুমি কেন এই অল্পায়ু অপোগণ্ড অকালপক্ক কুষ্মাণ্ডগণের সঙ্গে বাগ্‌-বিতণ্ডা করিতেছ, উহাদিগকে খেদাইয়া দাও।

রে রে রে রে—

বালখিল্যগণ কহিলেন—রে রে রে রে—

জাবালি তখন তাঁহার বিশাল ভুজদ্বয়ে বালখিল্যগণকে একে একে তুলিয়া ধরিয়া প্রাঙ্গণ-বেষ্টনীর পরপারে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রস্থান করিলে জাবালি বলিলেন—প্রিয়ে, আমাদের আর অযোধ্যায় বাস করা চলিবে না, কখন কোন্‌ দিক হইতে উৎপাত আসিবে তার স্থিরতা নাই। অতএব কল্য প্রত্যুষেই আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিয়া দূরে কোনো নিরুপদ্রব স্থানে যাত্রা করিব।

পরদিন উষাকালে সস্ত্রীক জাবালি অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কয়েকজন অনুগত নিষাদ তাঁহাদের সামান্য গৃহোপকরণ বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে পথ-প্রদর্শন পূর্ব্বক চলিল। মাসাধিক কাল তাঁহারা নানা জনপদ গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয়ের সানুদেশে শতদ্রুতীরে এক রমণীয় উপত্যকায় উপনীত হইলেন। জাবালি তথায় পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতবাসী কিরাতগণ তাঁহার বিশাল দেহ, নিবিড় শ্মশ্রু ও মধুর সদয় ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং নানাপ্রকার উপঢৌকন দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিল। জাবালি তথায় বিবিধ দুরূহ তত্ত্বসমূহের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহিলেন এবং অবসরকালে শতদ্রু নদীতে মৎস্য ধরিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

দেবতাগণের খ্যাতি আছে—তাঁহারা অন্তর্যামী। কিন্তু বস্তুত তাঁহাদিগকেও সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুজবের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয় এবং তাহার ফলে জগতে অনেক অবিচার ঘটিয়া থাকে। অচিরে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমাচার আসিল যে মহাতেজা জাবালি মুনি শতদ্রু-তীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন,—তাঁহার অভিসন্ধি

কি, তাহা এখনও সম্যক্ অবধারিত হয় নাই ; তবে সম্ভবত তিনি ইন্দ্রত্ব বিষ্ণুত্ব কিম্বা ঐরূপ কোনো একটা পরম-পদ আয়ত্ত না করিয়া ছাড়িবেন না। দেবরাজ চিন্তিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন—উর্ব্বশীকে ডাক।

মাতলি আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—হে দেবেন্দ্র, উর্ব্বশী আর মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে চাহে না—

ইন্দ্র কহিলেন—হুঁ, তার ভারি তেজ হইয়াছে।

আবার নৃত্য সুরু করিলেন।

দেবর্ষি নারদ কহিলেন—মর্ত্ত্যের কবিগণই স্তুতি করিয়া তার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন কিছুকাল তাকে বিরাম দাও, দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ থাকিলে আপনিই সে মর্ত্ত্যলোকে যাইবার জন্য আব্দার ধরিবে। জাবালির জন্য অন্য কোনো অপ্সরা পাঠাও।

মাতলি বলিলেন—মেনকা তার কন্যাকে দেখিতে

গিয়াছে। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখনো তিনমাস বাহির হইতে দিবেন না। অলম্বুষার পা মচ্‌কাইয়াছে, নাচিতে পারিবে না। অষ্টাবক্র মুনি দেবগণের উপর বিমুখ হইয়া বাঁকিয়া বসিয়াছেন, রম্ভা তাঁকে সিধা করিতে গিয়াছে। নাগদন্তা হেমা সোমা প্রভৃতি তিনশত অপ্সরাকে লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ করিয়াছেন। বাকী আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।

ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমাকে না জানাইয়া কেন অপ্সরাগণকে যত্র তত্র পাঠানো হয়? মিশ্রকেশী ঘৃতাচীর বয়স হইয়াছে, তাদের দ্বারা কিছু হইবে না।

নারদ বলিলেন—হে ইন্দ্র, সেজন্য চিন্তা করিও না। জাবালিও যুবা নহেন। একটু গৃহিণী-বাহিনী-জাতীয়া অপ্সরাই তাঁকে ভালরকম বশ করিতে পারিবে।

ইন্দ্র বলিলেন—মিশ্রকেশীর চুল পাকিয়াছে, সে থাক্। ঘৃতাচীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। তাকে একপ্রস্থ সূক্ষ্ম চীনাংশুক ও যথোপযুক্ত অলঙ্কারাদি দাও। বায়ু, তুমি মৃদুমন্দ বহিবে। শশধর, তুমি মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া উজ্জ্বল হইয়া লও। কন্দর্প, তুমি সেই অভ্রের পোষাকটা পরিয়া যাইবে, আবার যাতে ভস্ম না হও। বসন্ত, তুমি সঙ্গে একশত কোকিল লইবে।

নারদ বলিলেন—আর একশত বন্যকুক্কুট। ঋষি বড়ই মাংসাশী।

ইন্দ্র বলিলেন—আচ্ছা, তাহাও লইবে। আর দশ কুম্ভ ঘৃত, দশ স্থালী দধি, দশ দ্রোণী গুড় এবং অন্যান্য ভোজ্য-সম্ভার। যেমন করিয়া হোক জাবালির ধ্যান ভঙ্গ করা চাই।

সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে ঘৃতাচী জাবালি-বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

জাবালির তপোবনে তখন ঘোর বর্ষা। মেঘে পর্ব্বতে একাকার হইয়া দিগন্তে নিবিড় প্রাচীর রচনা করিয়াছে। শতদ্রুর গৈরিকবর্ণ জলে পালে পালে মৎস্য বিচরণ করিতেছে। বনে ভেকবংশের চতুর্প্রহরব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঘৃতাচী সাঙ্গোপাঙ্গসহ জাবালির আশ্রমে পৌঁছিলেন। আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, কারণ বহুবার এইরূপ অভিযান করিয়া তাঁহারা পরিপক্ব হইয়াছেন। নিমেষের মধ্যে মেঘ দূরীভূত হইল, মলয়ানিল বহিতে লাগিল, শতদ্রুর স্রোত মন্দীভূত হইল, নির্ম্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিল, পাদপসকল পুষ্পস্তবকে ভূষিত হইল, অলিকুল গুঞ্জরিতে লাগিল, ভেকগণ নীরব হইয়া পল্বলে লুকাইল।

জাবালি শতদ্রু-তীরে ছিপহস্তে নিবিষ্টমনে মাছ ধরিতে-ছিলেন। আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তিনি বিচলিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সহসা ঋতুরাজ বসন্তের খোঁচা খাইয়া নিদ্রাতুর কোকিলকুল আকুল চীৎকার করিয়া উঠিল। জাবালি চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা কটিতটে বামকর, চিবুকে দক্ষিণকর নিবদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছে।

ধীমান জাবালি সমস্ত ব্যাপারটি চট্ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ঈষৎ হাস্যে বলিলেন—অয়ি বরাঙ্গনে, তুমি কে, কি নিমিত্তই বা এই দুর্গম জনশূন্য উপত্যকায় আসিয়াছ? তুমি নৃত্য সম্বরণ কর। এই সৈকতভূমি অতিশয় পিচ্ছিল ও উপল-বিষম। যদি আছাড় খাও তবে তোমার ঐ কোমল অস্থি আস্ত থাকিবে না।

অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিলেন—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি ঘৃতাচী স্বর্গাঙ্গনা। তোমাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার তোমারই। এই ঘৃতকুম্ভ দধিস্থালী গুড়দ্রোণী—সকলি তোমার। আমিও তোমার। আমার যা' কিছু আছে—নাঃ, থাক্।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া লজ্জাবতী ঘৃতাচী ঘাড় নীচু করিলেন।

জাবালি বলিলেন—অয়ি কল্যাণি, আমি দীন হীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। গৃহিণীও বর্ত্তমানা। তোমার তুষ্টি বিধান করা আমার সাধ্যের অতীত। অতএব তুমি ইন্দ্রালয়ে ফিরিয়া যাও। অথবা যদি তোমার নিতান্তই মুনি-ঋষির প্রতি ঝোঁক হইয়া থাকে তবে অযোধ্যায় গমন কর। তথায় থর্ব্বট থল্লাট খালিতাদি মুনিগণ আছেন; তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা এবং যতগুলিকে ইচ্ছা তুমি হেলায় তর্জ্জনী-হেলনে নাচাইতে পারিবে। আর যদি তোমার অধিকতর উচ্চাভিলাষ থাকে তবে ভার্গব দুর্ব্বাসা কৌশিক প্রভৃতি অনল-সঙ্কাশ উগ্রতেজা মহর্ষিগণকে জব্দ করিয়া যশস্বিনী হও। আমাকে ক্ষমা দাও।

ঘৃতাচী কহিলেন—হে জাবালে, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ কি বিধাতা শুষ্ক কাষ্ঠে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তুমি দীন হীন তাতে ক্ষতি কি, আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারাণসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগতযৌবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর,—চিরযৌবনা, নিটোলা, নিখুঁতা। উর্ব্বশী মেনকা পর্য্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছট্‌ফট্ করে।

জাবালি সহাস্যে কহিলেন—হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মুখের

...ত্রেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? ...মার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার ...পংক্তিতে ও কিসের ফাঁক?

ঘৃতাচী সরোষে কহিলেন—হে মূর্খ, তুমি নিশ্চয়ই ...ত্রান্ধ, তাই অমন কথা বলিতেছ। পথশ্রমের ক্লান্তিহেতু ...মার লাবণ্য এখন সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। আগে ...কাল হোক্, আমি দুধের সর মাখিয়া চান করি, তখন দেখিও, মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে।—এই বলিয়া ঘৃতাচী আবার নৃত্য সুরু করিলেন।

অদূরবর্ত্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালি-পত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃতাচীর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জ্জনী হস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।

তখন কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে পলায়ন করিলেন। আকাশ আবার জলদজালে আচ্ছন্ন হইল, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাবৃত হইল, কোকিলকুল ঢুলিতে লাগিল, মধুকরনিকর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিল, শতদ্রু স্ফীত হইল, ভেককুল মহা উল্লাসে বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জাবালি পত্নীকে কহিলেন—প্রিয়ে, স্থিরা ভব। ইনি স্বর্গাঙ্গনা ঘৃতাচী, ইন্দ্রের আদেশে এখানে আসিয়াছেন,—ইঁহার অপরাধ নাই।

হিন্দ্রলিনী কহিলেন—হলা দগ্ধাননে নির্লজ্জে ঘেঁচি, তোর আস্পর্দ্ধা কম নয় যে আমার স্বামীকে বোকা পাইয়া ভুলাইতে আসিয়াছিস! আর, ভো অজ্জউত্ত, তোমারই বা কি প্রকার আক্কেল যে এই উৎকপালী বিড়ালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত বিজনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলে!

জাবালি তখন সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিয়া অতি কষ্টে পত্নীকে প্রসন্না করিলেন এবং রোরুদ্যমানা ঘৃতাচীকে বলিলেন—বৎসে, তুমি শান্ত হও। হিন্দ্রলিনী তোমার পৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ ইঙ্গুদী তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলেই ব্যথার উপশম হইবে। তুমি আজ রাত্রে আমার কুটীরেই বিশ্রাম কর। কল্য অমরাবতীতে ফিরিয়া গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ এবং ঘৃত-দধি-গুড়াদির জন্য বহু ধন্যবাদ জানাইও।

ঘৃতাচী কহিলেন—তিনি আমার মুখ-দর্শন করিবেন না। হা, এমন দুর্দ্দশা আমার কখনো হয় নাই।

জাবালি বলিলেন—তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি দেবেন্দ্রকে জানাইও যে ইন্দ্রত্বের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই, তিনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতে থাকুন।

ঘৃতাচীর পরাভব শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে কহিলেন—হে দেবর্ষে, এখন কি করা যায়? জাবালি ইন্দ্রত্ব চাহেন না জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জনরব শুনিতেছি যে ঐ দুর্দ্দান্ত ঋষি সমস্ত দেবতাকেই উড়াইয়া দিতে চায়।

নারদ কহিলেন—পুরন্দর, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।

নৈমিষারণ্যে সনকাদি ঋষিগণের সকাশে দেবর্ষি নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—হে মুনিগণ, শাস্ত্রে উক্ত আছে সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ, পাপ নাস্তি। কিন্তু এই ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ মাত্র এবং একপাদ পাপও দেখা দিয়াছে। ইহার হেতু কি তোমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?

মুনিগণ বলিলেন—আশ্চর্য্য, ইহা আমরা কেহই ভাবিয়া দেখি নাই।

তখন নারদ বলিলেন—তবে তোমাদের যাগ যজ্ঞ জপ তপ সমস্তই বৃথা।—ইহা কহিয়া তিনি তাঁহার কাষ্ঠ-বাহনে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট অপর এক ষড়যন্ত্র করিতে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ নারদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী প্রভৃতি সপ্তদ্বীপ হইতে বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিপ্রগণ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইলেন। মহর্ষি জাবালিও আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর সকলে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—ভো পণ্ডিতবর্গ, সত্যযুগে পুণ্য চতুষ্পাদ ছিল, এখন তাহা ত্রিপাদ হইয়াছে। কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকার কি, যদি তোমরা কেহ অবগত থাক তবে প্রকাশ করিয়া বল।

তখন জলন্ত পাবকতুল্য তেজস্বী জামদগ্ন্য মুনি কহিলেন—হে প্রজাপতে, এই পাপাত্মা জাবালিই সমস্ত অনিষ্টের মূল। উহার সংস্পর্শে বসুন্ধরা ভারগ্রস্তা হইয়াছেন।

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন—ঠিক, ঠিক, আমরা তাহা অনেকদিন হইতেই জানি।

জামদগ্ন্য কহিলেন—এই জাবালি ভ্রষ্টাচারী উন্মার্গগামী নাস্তিক। ইহার শাস্ত্র নাই, মার্গ নাই। রামচন্দ্রকে এই পাষণ্ডই সত্যধর্ম্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বালখিল্য-গণকে এই দুরাত্মাই নির্য্যাতিত করিয়াছে। দেবরাজ পুরন্দরকেও এই পাপিষ্ঠ হাস্যাস্পদ করিয়াছে। ইহাকে বধ না করিলে পুণ্যের নষ্টপাদ উদ্ধার হইবে না।

পণ্ডিতগণ কহিলেন—আমরাও ঠিক তাহাই ভাবিতে-ছিলাম।

দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—হে জাবালে, সত্য করিয়া কহ তুমি নাস্তিক কিনা। তোমার মার্গ কি, শাস্ত্রই বা কি।

জাবালি বলিলেন—হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। দেবতাগণকে আমি নিষ্কৃতি দিয়াছি, আমার তুচ্ছ অভাব অভিযোগ জানাইয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করি না। বিধাতা যে সামান্য বুদ্ধি দিয়াছেন তাহারই বলে কোনোপ্রকারে কাজ চালাইয়া লই। আমার মার্গ যত্র তত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়, পরিবর্ত্তন-সহ।

দক্ষ কহিলেন—তোমার কথার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না।

জাবালি বলিলেন—হে ছাগমুণ্ড দক্ষ, তুমি বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি এখন চলিলাম। বিপ্রগণ, তোমাদের জয় হোক।

তখন সভায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল এবং ধর্ম্মপ্রাণ বিপ্রগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কয়েকজন জাবালিকে ধরিয়া ফেলিলেন। জামদগ্ন্য তাঁহার তীক্ষ্ণ কুঠার উদ্যত করিয়া কহিলেন—আমি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিয়াছি, এইবার এই নাস্তিককে সাবাড় করিব।

স্থিরপ্রজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি কহিলেন—হাঁ হাঁ কর কি, ব্রাহ্মণের দেহে অস্ত্রাঘাত! ছি ছি, মনু কি মনে করিবেন! বরং উহাকে হলাহল প্রয়োগে বধ কর।

মহাচীন হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ হলাহল জলে গুলিয়া জাবালিকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইল। তারপর তাঁহাকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোকদর্শী পণ্ডিতগণ কহিলেন—পাষণ্ড এতক্ষণে কুম্ভীপাকে পৌঁছিয়াছে।

•

চৈনিক হলাহল জাবালির মস্তিষ্কে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

জাবালি যজ্ঞের নিমন্ত্রণে বহুবার সোমরস পান করিয়াছেন; প্রথম-যৌবনে বয়স্য ক্ষাত্রিয়কুমারগণের পাল্লায় পড়িয়া গৌড়ী মাধ্বী পৈষ্টী প্রভৃতি আসবও চাখিয়া দেখিয়াছেন; ছেলেবেলায় মামারবাড়ীতে একবার ভৃগু-মামার সঙ্গে চুরি করিয়া ফেনিল তালরসও খাইয়াছিলেন,—কিন্তু এমন প্রচণ্ড নেশা পূর্ব্বে তাঁহার কখনো হয় নাই। জাবালির সকল অঙ্গ নিশ্চল হইয়া আসিল, তালু শুষ্ক হইল, চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

সহসা জাবালি অনুভব করিলেন তিনি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রক্তমাল্যধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ-যোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে নীয়মান হইতেছেন। রক্তবসনা পিঙ্গলবর্ণা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃত-বদনা রাক্ষসী তাঁহার রথ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে বৈতরণী পার হইয়া তিনি যমপুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় যমকিঙ্করগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ধর্ম্মরাজের সকাশে লইয়া গেল।

যম কহিলেন—জাবালে, স্বাগতোহসি। আমি বহুদিন যাবৎ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তোমার পারলৌকিক ব্যবস্থা আমি যথোচিত করিয়া রাখিয়াছি, এখন আমার অনুগমন কর। দূরে ঐ যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গবাক্ষহীন অগ্ন্যুদ্গারী সৌধমালা দেখিতেছ, উহাই রৌরব; ইতর-প্রকৃতি পাপীগণ তথায় বাস করে। আর সম্মুখে এই যে গগনচুম্বী তাম্রচূড় রক্তবর্ণ অলিন্দ-পরিবেষ্টিত আয়তন, ইহাই কুম্ভীপাক; সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ এখানে অবস্থান করেন। তোমার স্থান এখানেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভিতরে চল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যম জাবালিকে কুম্ভীপাকের গর্ভমণ্ডপে লইয়া গেলেন। এই মণ্ডপ বহুযোজনবিস্তৃত, উচ্চ ছাদ, বাষ্পসমাকুল, গম্ভীর আরাবে বিধুনিত। উভয় পার্শ্বে অনন্ত

রে নারকী যমরাজ

চুল্লীর উপর শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় কুম্ভসকল সজ্জিত আছে। তাহা হইতে নিরন্তর শ্বেতবর্ণ বাষ্প ও আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। নীলবর্ণ যমকিঙ্করগণ ইন্ধন-নিক্ষেপের জন্য মধ্যে মধ্যে চুল্লীদ্বার খুলিতেছে, জ্বলন্ত অনলচ্ছটায় তাহাদের মুখ উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উদ্‌ভাসিত হইতেছে।

কৃতান্ত কহিলেন—হে মহর্ষে, এই যে রজতনির্ম্মিত কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত সুবৃহৎ কুম্ভ দেখিতেছ, ইহাতে নহুষ যযাতি দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাযশা মহীপালগণ পরিপক্ক হইতেছেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই সংশোধিত হইয়া গিয়াছেন, কেবল যযাতির কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর এক প্রহরের মধ্যে সকলেই বিগতপাপ হইয়া অমরাবতীতে গমন করিবেন। ঐ যে বৈদূর্য্যখচিত হিরণ্ময় কুম্ভ দেখিতেছ, উহার তপ্ত তৈলে

ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকেন। গৌতমের অভিশাপের পরে সহস্রাক্ষ পুরন্দরকে বহুকাল এই কুম্ভমধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি-প্রয়োগে ইহার তলদেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে রুদ্রাক্ষমালাবেষ্টিত গৈরিকবর্ণ প্রকাণ্ড কুম্ভ দেখিতেছ, ইহার অভ্যন্তরে ভার্গব, দুর্ব্বাসা, কৌশিক প্রভৃতি উগ্রতপা মহর্ষিগণ সিদ্ধ হইতেছেন।

করিলেন। সিক্তজটাজুট, ধূমান্বিত-কলেবর কয়েকজন ঋষি দর্ব্বীতে সংলগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত আরম্ভ করিলেন—রে নারকী যমরাজ, যদি আমাদের কিঞ্চিদপি তপঃপ্রভাব থাকে—

দর্ব্বী উল্টাইয়া কুম্ভের ঢাকনী ঝাটিতি বন্ধ করিয়া যম কহিলেন—হে জাবালে, এই কোপনস্বভাব ঋষিগণের কাঠিন্য

বৎস আমি প্রীত হইয়াছি

জাবালি কৌতূহল-পরবশ হইয়া বলিলেন—হে ধর্ম্মরাজ, কুম্ভের ভিতরে কি হইতেছে দয়া করিয়া আমাকে দেখাও।

ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া জনৈক যম-কিঙ্কর কুম্ভের আবরণী উন্মুক্ত করিল। যম তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ দারুময় দর্ব্বী নিমজ্জিত করিয়া সন্তর্পণে উত্তোলিত

দূর হইতে এখনো বহু বিলম্ব আছে। ইঁহারা আরো অষ্টাহকাল পরিসিদ্ধ হইতে থাকুন।

এমন সময় কয়েকজন যমদূতের সহিত ধর্ম্মট ললাট খালিত বিষণ্ণবদনে কুম্ভীপাকের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন।

জাবালি কহিলেন—হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানে কেন, ব্রহ্মলোকে কি স্থানাভাব ঘটিয়াছে ?

খর্ব্বট উত্তর দিলেন—জাবালে, তুমি বিরক্ত করিও না, আমরা এখানে তদারক করিতে আসিয়াছি।

যমরাজের ইঙ্গিতে কিঙ্করগণ বালখিল্যত্রয়কে একত্র বাঁধিয়া উত্তপ্ত পঞ্চগব্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্রকায় কুম্ভে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভ হইতে তীব্র চীৎকার উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তের বাপান্তকর বাক্যসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন—হে মহর্ষে, এই নরকের অনুষ্ঠানসকল অতিশয় অপ্রীতিকর, কেবল বিপন্না ধরিত্রীর রক্ষা হেতুই আমাকে সম্পন্ন করিতে হয়। যাহা হউক, আমি আর তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিব না, এখন তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই পালন করিব। দেখ, যে পাপ মনের গোচর তাহা আমি সহজেই দূর করিতে পারি। কিন্তু যাহা মনের অগোচর, তাহা জন্ম-জন্মান্তরেও সংক্রামিত হয়, এবং তাহা শোধন করিতে হইলে কুম্ভীপাকে বার বার নিষ্কাশন আবশ্যক। তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে তাহা তুমি জানিয়া শুনিয়াই দৌর্ব্বল্যবশাৎ করিয়া ফেলিয়াছ, কদাপি আত্ম-প্রবঞ্চনা কর নাই। সুতরাং আমি তোমাকে সহজেই পাপমুক্ত করিতে পারিব, অধিক যন্ত্রণা দিব না।

এই বলিয়া কৃতান্ত জাবালিকে সুবৃহৎ লৌহসংদংশে বেষ্টিত করিয়া একটি তপ্ত তৈলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ছ্যাঁক্ করিয়া শব্দ হইল।...

সহস্র বিহগ-কাকলীতে বনভূমি সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। প্রাচীদিক্ নবারুণকিরণে আরক্ত হইয়াছে। জাবালি চৈতন্যলাভ করিয়া সাধ্বী হিন্দ্রলিনীর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন বদনে মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন—বৎস, আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।

জাবালি বলিলেন—হে পিতামহ, ঢের হইয়াছে। আর বরে কাজ নাই। আপনি সরিয়া পড়ুন, আর জ্বালাইবেন না।

লোকপিতামহ বলিলেন—জাবালে, অভিমান সম্বরণ কর। তুমি বর না চাহিলেও আমি ছাড়িব কেন? আমিও প্রার্থী। হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশঃবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোক-সমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হোক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন কর। তোমাকে কেহ বিনষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানব-মনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক।

জাবালি বলিলেন—তথাস্তু।
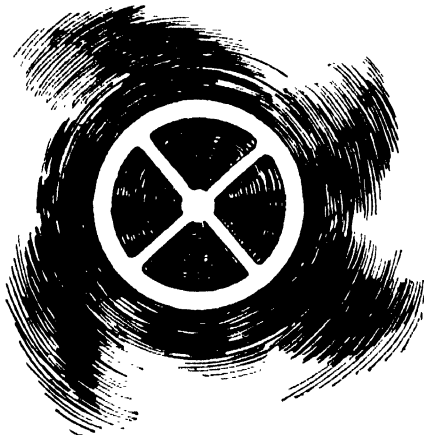
পাহাড়পুরের স্তূপ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

জগতের প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পে ভারতের স্থান কোথায়, তাহার উত্তর না দিয়াও এ কথা আজ নিঃসঙ্কোচেই বলা যায় যে, ভারতবর্ষ এই শিল্পটিতে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলিতেও দ্বিধা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না যে, সময় বা কালের প্রভাব তাহার এ শিল্পটার যতটা সর্ব্বনাশ না করিয়াছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী করিয়াছে বিদেশী বিজয়ীদের নিষ্ঠুরতা।

না। কেবল সম্প্রতি পাহাড়পুরে এ চেষ্টা প্রথম সুরু হইয়াছে। এখনও খননের কাজ শেষ হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেখানে যে সমস্ত জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাংলার শিল্প-পরিচয়ের দিক হইতে এবং জাতীয় ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার দিক হইতে তাহা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাহাড়পুরের এই স্তূপের বিষয় লইয়া ঐতিহাসিক ও

নূর নদীর বর্ত্তমান গর্ভ—দূরে পাহাড়পুরের মন্দিরের স্তূপ

ভারতবর্ষে বহু স্থানে খনন করিয়া ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধ-শিল্পের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, এখন তাহাই উদ্ধার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে তক্ষশিলা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, কৌশম্বী, কাশী, কুশীনগর প্রভৃতি স্থান খুঁড়িয়া যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সমজ্‌দারদের লেখনী তাহারই প্রশংসায় আজ মুখরিত।

বাংলায় এ ধরণের শিল্পোদ্ধারের চেষ্টা এতদিন ছিল

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মাথায় টনক অনেক আগেই নড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মার্টিনের 'ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন ইহার এমন একটা বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন, যাহা হইতে ইহার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনটা স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়ে। তাঁহার পর দিনাজপুরের কলেক্টর মিঃ ই-ভি-ওয়েষ্টম্যাকট ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক

নুর নদীর গর্ভ হইতে পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ—দূরে প্রধান মন্দিরের ধ্বংসের স্তূপ

নুর নদীর গর্ভ হইতে পাহাড়পুর মন্দিরের বাহিরের প্রাকার

সোসাইটির জার্ণালে' এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার পর স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্থানটি পরিদর্শন করিয়া আসেন। তাঁহার রিপোর্ট ক্ষুদ্র হইলেও বহু আবশ্যকীয় আলোচনায় পরিপূর্ণ ছিল।

সুতরাং স্থানটি যে বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইবার যোগ্য, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহা সত্বেও ইহার অনুসন্ধানের কাজ যথেষ্ট তৎপরতার সহিত আরম্ভ হয় নাই। যে কাজ বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের নিকট হইতে ২৫০০৲ টাকা এবং গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ২০০০৲ টাকার অর্থ-সাহায্য পাইয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকার ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে খননে ব্রতী হন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাহা পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আবার কাজ সুরু হইয়াছিল। এবার ভার লইয়াছিলেন—ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ নিজে। বরেণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
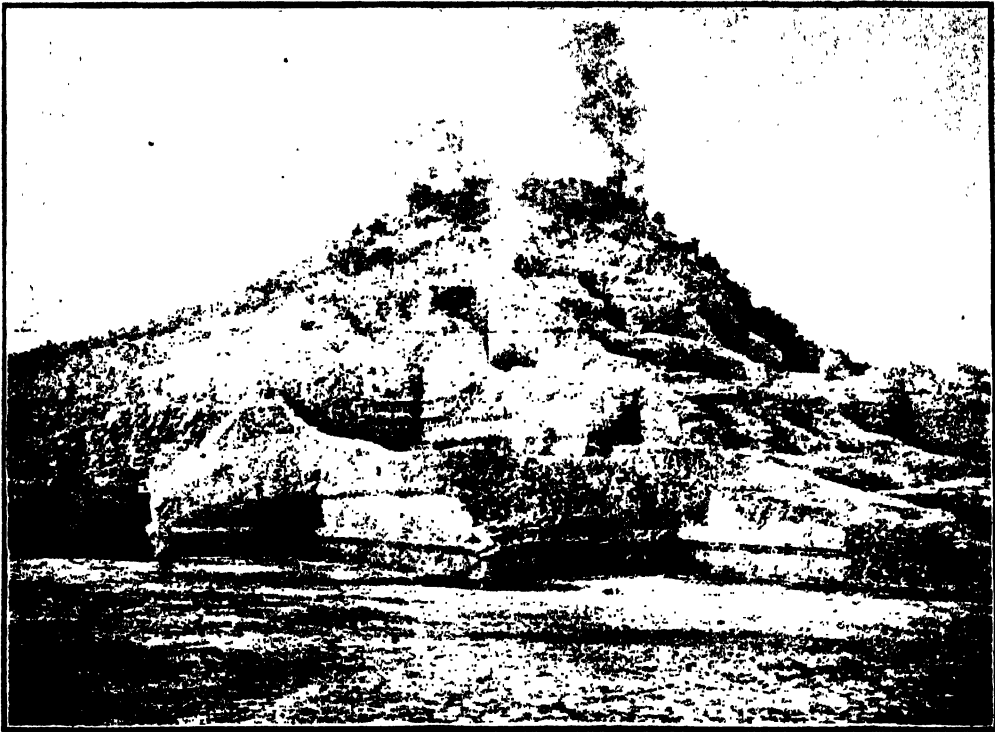
পাহাড়পুর স্তূপের দৃশ্য—(উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে গৃহীত)

তাহা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র তিন বৎসর আগে—১৯২৩ খৃষ্টাব্দে।

এই খননের কাজ সম্বন্ধে তিনজন লোকের নিষ্ঠা এবং আগ্রহ বিশেষ ভাবেই প্রশংসনীয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই এবং শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এই তিন মহারথীর নাম ইহার খননের উদ্যোগ-পর্ব্বের সঙ্গে চিরদিনের জন্য যুক্ত হইয়া থাকিবে।

প্রথমবারে ইহার খননের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল পরিচালনায় এবারকার খননের কাজ চলিয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভারতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিবে।

পাহাড়পুর রাজসাহী জেলার একেবারে উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। এখন ইহাকে রাজসাহীর বাদলগাছি থানার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের জামালপুর ষ্টেশনে নামিয়া এখানে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে ইহার ব্যবধান ৪ মাইল মাত্র। সমৃদ্ধির দিনে করতোয়া নদীর
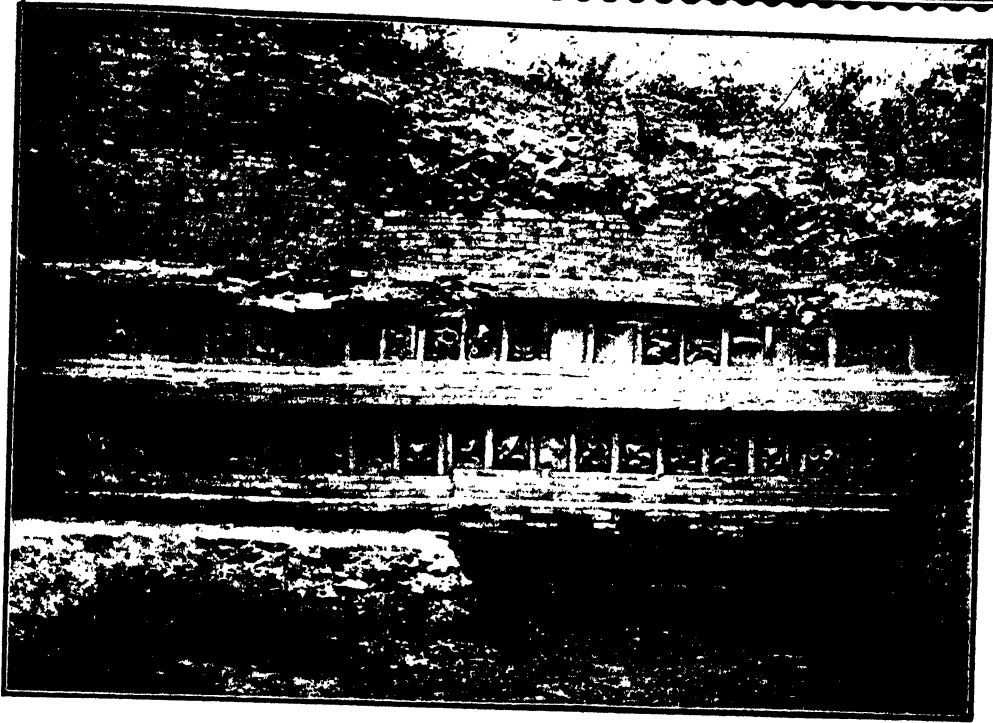
মধ্যভাগের মন্দিরের চারিপার্শ্বের প্রাকার
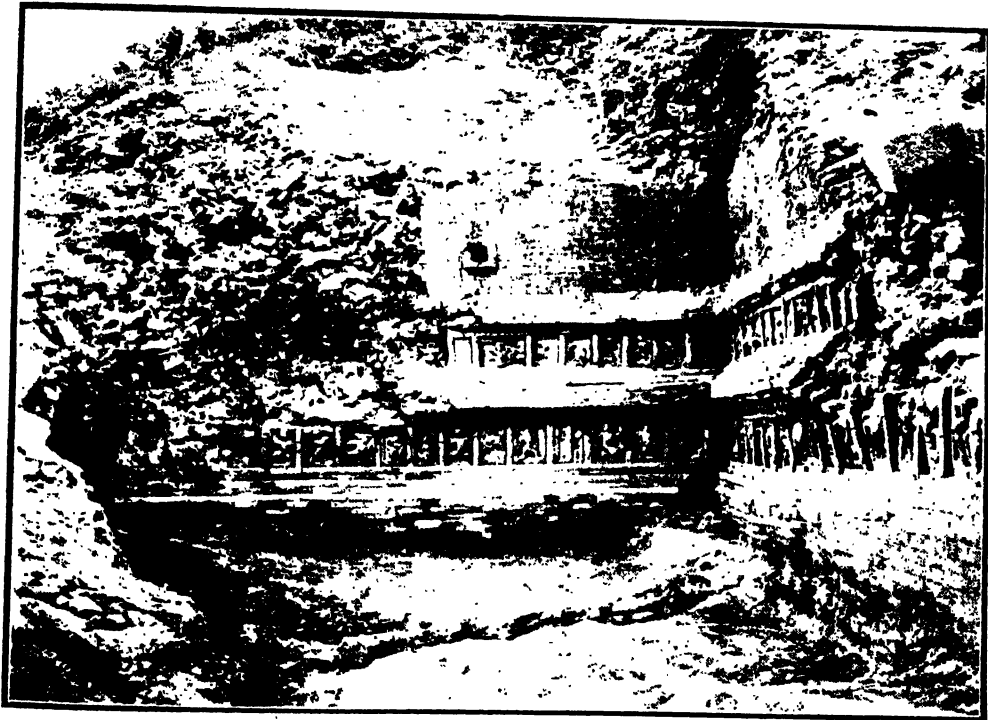
মধ্যভাগের বেষ্টনী-প্রাঙ্গণ
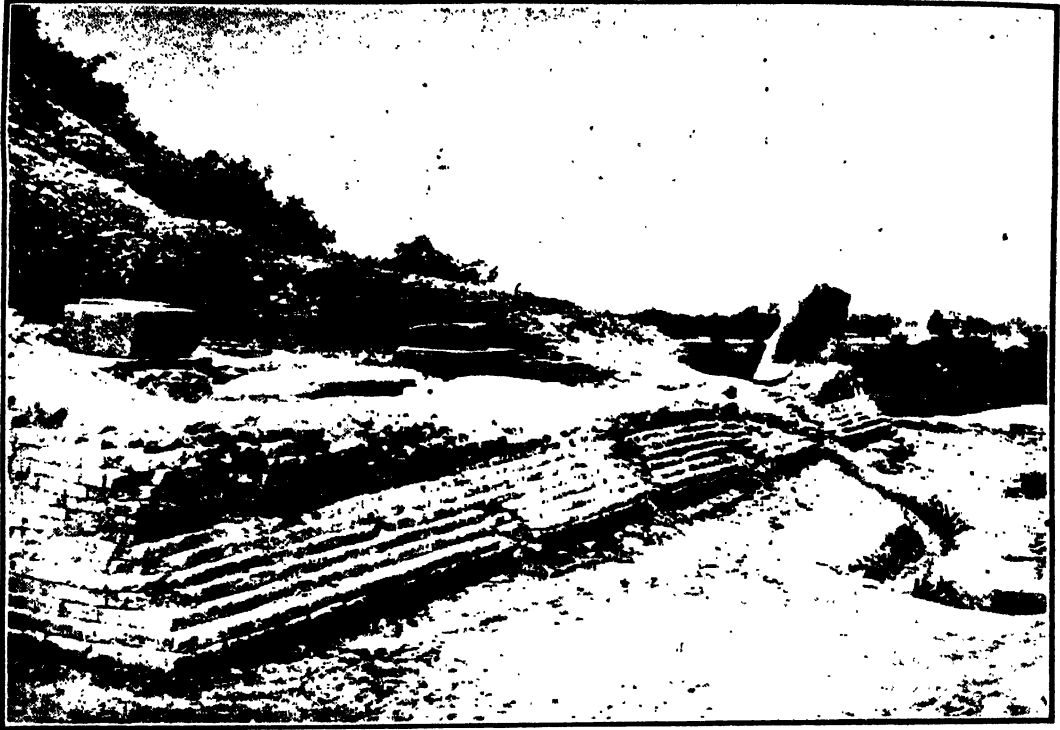
উত্তর দিকের মণ্ডপের সম্মুখভাগ

একটি শাখা ইহার পদতল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। এ নদী এখন শুষ্ক। স্থানীয় লোকেরা এ নদীর নাম দিয়াছিল সুর নদী। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ইহার উপর একটি ঘাটের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার পাহাড়ের মত বিরাট স্তূপ হইতেই সম্ভবতঃ ইহার নাম হইয়াছে পাহাড়পুর।

এই স্তূপটি একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ গড়ের ভিতর
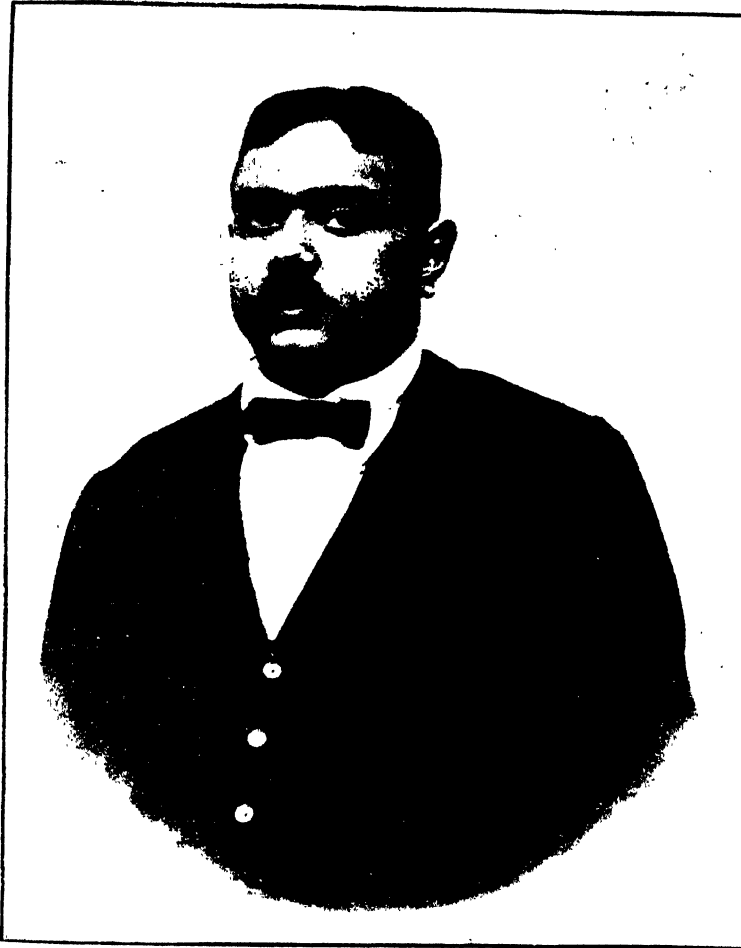
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠিত। গড়ের চারি দেয়ালের প্রত্যেকটিরই মধ্যস্থলে একটি করিয়া তোরণ ছিল। তোরণগুলির ভিতর উত্তর দিকের তোরণটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

মধ্যস্থলের স্তূপটি একটি বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে খনন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অন্যান্য জিনিষের সহিত দুইটি প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের একটিতে রাজা মহেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ মহেন্দ্র সম্ভবতঃ প্রতীহার-সম্রাট মহেন্দ্র পাল। মহেন্দ্র পাল আনুমানিক ৮৯০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, মুঙ্গেরের যুদ্ধের পর বিহার পাল-রাজাদের করচ্যুত হইয়া প্রতীহারদের করতলগত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতীহার-সম্রাট ভোজ পাল রাজা নারায়ণ পালকে মুঙ্গের-যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রথম মহেন্দ্র পাল এবং প্রথম ভোজের অনুশাসন-লিপি দক্ষিণ বিহারের বহু স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের এই শিলালিপিটি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমস্ত উত্তর-বঙ্গ পালদের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহারদের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল এবং প্রতীহার-সাম্রাজ্য আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই শিলালিপিগুলিতে দেখা যায় যে মহেন্দ্র পালের রাজত্বকালে পাহাড়পুরের এই মন্দিরটির সংস্কার করা হইয়াছিল। সংস্কারের পরিচয় ইহার বিভিন্ন ধরণের ইষ্টকের ভিতর দিয়াও ধরা পড়ে। সুতরাং পাহাড়পুরের মন্দিরটি নবম শতকেরও অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই নবাবিষ্কৃত মন্দিরটি এ যুগের এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার। ইহার গঠন, ইহার পরিকল্পনা একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। এ ধরণের মন্দির হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন-স্থাপত্যের ভিতর আর কোথাও চোখে পড়ে না। নর, বানর, হংস, মৎস্য, কুক্কুট, কচ্ছপ, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি নানা জীবের ছাঁচে ইষ্টক তৈরী করিয়া তাহার দ্বারাই এ মন্দির গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এ ধরণের ইষ্টকও আর কোনো স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শের ভিতর পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া এগুলি শিল্প ও কারু-নৈপুণ্যেরও চরম নিদর্শন।

সরলা

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

১

ভবশঙ্কর কবিরাজের কপাল ভাল!—ছেলেটি মূর্খ, গোঁয়ার; মেয়েটা একটু আড়-পাগল; আর জামাইটি পাঁড় মাতাল! অদৃষ্টাকাশে এই ত্র্যহস্পর্শের সংঘটন সত্ত্বেও ভবশঙ্কর মেয়েটাকে ভালবাসিতেন এবং সেই সঙ্গে খানিকটা শ্রদ্ধাও করিতেন। ছেলে-জামাইয়ের আচরণে তাঁহাকে যেমন মধ্যে মধ্যে লজ্জিত, মর্ম্মাহত হইতে হইত, সরলার পাগলামীর জন্ম তাঁহাকে তেমন কখনও হইতে হয় নাই। বরং অনেক সময় মেয়ের পাগলামী তাঁহাকে মহত্ত্বের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে।—অর্থাভাবে রোগী ঔষধের মূল্য দিতে অক্ষম বলিয়া ভবশঙ্কর তাহাকে ঔষধ দেন নাই। সরলা জানিতে পারিয়া, তাহাকে গোপনে অর্থ দিয়া পিতার কাছে পাঠাইয়া দিল। পরদিন ভবশঙ্কর সংসার-খরচের তহবিল মিলাইতে গিয়া দেখেন, যে-পরিমাণ অর্থ তিনি সেই নিঃস্ব রোগীর নিকট হইতে ঔষধের মূল্য স্বরূপ আদায় করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ অর্থ ই তাঁহার তহবিলে কম পড়িতেছে। অনুমানে জানিলেন, তাঁহার পাগল মেয়ে বাপের দাবী মিটাইবার জন্ম তাঁহারই বাক্সের চাবি খুলিয়া সেই দরিদ্রকে সাহায্য করিয়াছে! শুধু কি এই এক-রকম পাগলামী সরলার?—রান্নাশালের রকে ছোট-বড় দুইটা ঘটি ছিল, ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিয়া সুযোগ দেখিয়া একটা লইয়া চলিয়া গেল। সরলা উপর হইতে তাহা দেখিয়াও কোন কথা বলিল না। পরে ঘটির খোঁজ পড়িলে সরলা জানাইল—"দুপুর বেলা একটা ভিখিরী নিয়ে গেছে।" সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ভিখিরী নিয়ে গেছে কি রে?···তা তুই কিছু বল্লি নি?···অমন মস্ত ঘটিটা..." সরলা কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—"ওমা! বড় ঘটিটা নিয়ে গেছে? .. আমার মনে হ'ল যেন ছোট্‌টা নিয়ে গেল। তবে বোধ হয় তার বড় ঘটিরই দরকার ছিল।" সকলে সরলার বুদ্ধির সৎকার করিতে লাগিল।

সরলার পাখী পুষিবার সখ—বে-তর। কিন্তু কোন পাখীই সাত দিনের বেশী সরলার আতিথ্য স্বীকার করিত না। পাখী কিনিয়া দু-তিন দিন পরেই সরলা খাঁচা খুলিয়া দিয়া পরীক্ষা করিত—পাখী পোষ মানিল কি না। এই বোকামীর জন্ম তাহাকে কেহ কিছু বলিলে, সরলা বলিত, যে-পাখী দু-তিন দিনেও পোষ না মানে, সে কোন জন্মেও পোষ মানিবে না। সুতরাং তাকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়া লাভ?

সরলার এইরূপ মতিগতিতে তার পিতা প্রকাশ্যে কোন রকম সায় না দিলেও, মনে মনে তিনি খুসী হইতেন না। তাঁর ধারণা, মেয়ের এই রকম কাণ্ডকারখানা দেখিয়াই তাকে তার শ্বশুরবাড়ীর কেহ পছন্দ করে না। মেয়ে যদি একটু চালাক চতুর হইত, তবে কি স্বামী অমন বিগড়াইয়া যায়, না, তারা এমন বার মাস বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখে?

২

"বলি সরি, তোর এ কাণ্ডখানা কি বল্ দেখি?"—

সরলাও মাতার কথার ঝঙ্কারে সুর চড়াইয়া বলিল—"আমার আবার কাণ্ডখানা কি দেখলে?"

"তা নয় ত কী···বেলা দুটো বাজতে যায়, তবু তোর দেখা নেই···এত পাড়া-বেড়ান অভ্যেস্ ভাল নয়, সরি···"

"আহা, আমি বুঝি পাড়া-বেড়াতে গিছলুম?—আমি তো বাগ্দী পিসীর বাড়ী ছিলুম!"

"কি মহাভারত শুনছিলে, শুনি,—যে নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে ছিল না?"

"মা, তুমি যদি সেখানে যেতে, তুমিও নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যেতে!"

"কি এমন দুগ্‌গোচ্ছব হচ্ছিল—শুনি?"

"দুগ্‌গোৎসব নয় মা,—ওদের ছোট বৌ প্রসব-বেদনায় যা কষ্ট পাচ্ছিল—মা!"

"তা ওদের ছোট বৌ কষ্ট পাচ্ছিল, তুই তার কি করবি?···তুই দাই, না, ডাক্তার?"

"দাই ডাক্তার না হলে বুঝি আর কিচ্ছু করা যায় না? এই তো আমি গিয়ে দেখি—তারা একটা আনাড়ি দাইয়ের হাতে দিয়ে বৌটাকে শুধু কষ্টই দিচ্ছিল।···

মাতা গম্ভীর ভাবে বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"তা—তুই গিয়ে কি করলি ?...পাকা দাই সেজে ছেলে প্রসব করিয়ে দিলি ?"

"আহা তা কেন, আমি ডাক্তার ডাক্‌তে বল্লুম। তাতে তারা বল্লে—তাদের অত টাকা নেই! তখন আমি গিয়ে ডাক্তারের বউয়ের হাতে পায়ে ধরে বিনা ভিজিটে ডাক্তার আনালুম।"

মেয়ের হৃদয়ের পরিচয়ে মাতা তুষ্ট হওয়া দূরে থাক্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোর কি মান-অপমান জ্ঞান কিচ্ছু নেই, সরি?...পরের জন্যে আর একজনের পায়ে-হাতে ধরার দরকার কি ছিল - শুনি ?"

"আহা, মা, তারা বড্ড গরীব...ডাক্তার না এলে বৌটা নিশ্চয়ই মরে যেত!"

"মরে যেত, না, আর কিছু!...তোর যত সব বাড়াবাড়ি!...আসল কথা, তুই একটা হুজুক নিয়ে এ পাড়া ও-পাড়া করতে ভালবাসিস! হলি-ই বা ঝিউড়ী, তা বলে কি লাজ-লজ্জা সব বিসর্জ্জন দিতে হয়—আসুন উনি!"

৩

সেই বছর অসহযোগের একটা বড় রকম ঢেউ আসিয়া ভবশঙ্করদের মহকুমায় বিষম গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া বসিল। উচ্চ-ইংরেজী ইস্কুলটী প্রায় ছাত্রশূন্য হইয়া হেলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কলেজ স্থাপনের উৎকট চেষ্টায় চাঁদা তোলা অর্দ্ধেক পথে থামিয়া গেল! ডাক্তার গুহের বৈদ্যুতিক বক্তৃতার আগুনে মা-লক্ষ্মীদের এক এক সুট বিলাতী-সেমিজ শাড়ী ব্লাউজ বডি ভস্মীভূত হইয়া গেল। আব্‌কারী দোকানে আর উকীল-মোক্তারের আস্তানায় যথাক্রমে মাতাল ও মক্কেলের অভাবে হা-হাকার উঠিল। হেম দত্তের সাত-পুরুষের বিলাতী-বস্ত্রের দোকানখানা দেখিতে দেখিতে স্বদেশী লেবেল-আঁটা বিলাতী সূতার গুদামে পরিণত হইল। গাঁয়ের হরিসভায় জাতীয়-বিদ্যালয় জমকাইয়া উঠিল। ভবশঙ্করের বৈঠকখানার পাশের ঘরে জমীদার-বাড়ীর ভাঙা চেয়ার টেবিলে সুসজ্জিত কংগ্রেস আপিস খদ্দরের দোকান ঘাড়ে করিয়া দেখা দিল। জমীদার-পুত্র প্রাজাপত্য বি-এ ডিগ্রি লাভ করার পর হইতে সারস্বত বি এ ডিগ্রি লাভে বীতশ্রদ্ধ হইয়া লেখাপড়া ত্যাগ করিবার অছিলা অন্বেষণ করিতে-ছিলেন, এই সুযোগে তিনি কলেজ-ত্যাগ করিয়া 'ত্যাগী' ডিগ্রি পাইয়া কংগ্রেস আপিসের কর্ণধার হইয়া বসিলেন। শ্রীনিবাস অধিকারী ওকালতীতে উপবাস করিতেছিল। সে, এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে—বুঝিয়া চলিতে পারিলে—বেশ দু-পয়সা করা যায় শুনিয়া, দীর্ঘ উপবাসের পর পারণের আশায় অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া 'বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী' রূপে পথে-ঘাটে মহাত্মার বাণী বিলাইতে লাগিল। অসহযোগ ভাল-না-মন্দ লইয়া আজন্ম বন্ধুতে বন্ধুতে মতের অমিল হইতে মনের অমিল দাঁড়াইল। এক কথায়, দামোদরে বন্যার ন্যায় 'অসহযোগের' ঢেউ আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল।

'অসহযোগে'র অঙ্গে সাবেক 'স্বদেশী'র গন্ধ থাকায়, ভবশঙ্কর দেখিলেন, তাঁহার স্বদেশী কবিরাজী ঔষধের—বিশেষতঃ তাঁহার "জ্বরান্তকচূর্ণ" নামে বর্ণান্তর-প্রাপ্ত বিলাতী কুইনিনের কাট্‌তি খুব বাড়িয়া গেল! সুতরাং তিনি অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ হইয়া পড়িলেন!

একদিন সরলা বলিল—"বাবা আমি 'ডলী' দিদির সঙ্গে খদ্দর বিক্রী করতে যাব!"

"কোথায় রে?"

"এই পাড়ার মেয়েদের কাছে।"

"মোট ঘাড়ে করে?"

"তাতে কি? 'ডলীদি' তিন্‌টে পাশ করেছেন,—তিনিও মোট নিয়ে বাড়ী-বাড়ী ফিরি করে বেড়াবেন!"

"তাই না কি?...আচ্ছ, তা যাস!"

৪

সংসারের সঙ্কীর্ণ কাজে সরলার সহায়তা পাওয়া সুলভ না হইলেও, দেশের কাজে সে মাতিয়া উঠিল। সে আহার বিশ্রাম ভুলিয়া গ্রামে গ্রামে খদ্দরের মোট ঘাড়ে করিয়া ঘুরিতে লাগিল। অধিনেত্রী 'ডলীদিদি' সরলার কাজের ঝোঁকে হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। সে বেচারা কয়-বছর কলেজে পড়িয়া কেবল যে নামের প্রান্তে উপাধির অক্ষর গাঁথিয়া আনিয়াছে তাহা নয়, সেই সঙ্গে অম্ল, অজীর্ণতা, হিষ্টিরিয়া (মূর্চ্ছা) প্রভৃতি কয়েকটী সভ্য ব্যাধির আধার হইয়া আসিয়াছে। কাজেই অত পরিশ্রম তাহার সহ্য হইবে কেন? এ অবস্থায় 'অবরোধ অঞ্চলে' খদ্দর প্রচারে অধিনেত্রী হইল—সরলাই!

এক দিন সরলা এক কংগ্রেস ছোকরাকে সঙ্গে লইয়া

কোন দরিদ্র পল্লীতে খদ্দর প্রচার করিতে গেল। গিয়া দেখিল—এক বৃদ্ধার চালে খড় নাই, লজ্জানিবারণের উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্রেরও সংস্থান নাই। বৃদ্ধার দুরবস্থার পরিচয়ে কংগ্রেসকর্ম্মী তাহাকে চরকার উপযোগিতা সম্বন্ধে লেকচার দিতে গেলে সরলা বলিল—"ও-সব থাক্, তুমি একখানা কাপড় একে বা'র করে দাও।"

কর্ম্মী বিস্মিত ভাবে বলিল—"ও কি আর এই দেড়া দামের কাপড় কিন্‌তে পারবে?"

"বিক্রী নয়,—অমনি—"

"অমনি!" কর্ম্মী চমকাইয়া উঠিল।

"হাঁ—অমনি।" এই বলিয়া সে বৃদ্ধাকে কাপড়খানা ও খদ্দর বিক্রয়ের তহবিল হইতে চারি আনা পয়সা দিয়া বলিল—"এই নাও, আমি আর এক দিন আবার আসব।"

এই অপরিচিতা করুণাময়ীর অযাচিত দানে বৃদ্ধার চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"রাজরাণী হও মা!"

কংগ্রেস-কর্ম্মী ভাবিল—এ তো দেখছি মুস্কিল করবে! কংগ্রেসের পয়সা এই রকম বাজে কাজে নষ্ট করলেই হয়েছে—আর কি! সে সরলার কাছে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল "এ সব গরীব দুঃখীর দিকে চাইতে গেলে কংগ্রেসের কাজ কিন্তু এগুবে না!—আপনি চলে আসুন!"

আশ্চর্য্য ও ঈষৎ বিরক্তির স্বরে সরলা বলিল—"কি রকম? গরীব-দুঃখীর দিকে চাইতে গেলে কংগ্রেসের কাজ চলবে না? ওরা কি দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি নয়?"

কংগ্রেসের ছোকরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আপনার তাহলে দেখছি কংগ্রেসের কাজের সম্বন্ধে ক্লিয়ার আইডিয়া (স্পষ্ট ধারণা) নেই!—কংগ্রেসের আসল কাজ হচ্চে—গভর্মেন্টের সঙ্গে নন্‌ভায়লেণ্ট ফাইট্ করে'—দেশের স্বরাজ আদায় করা!...স্বরাজ এলেই দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য সব ঘুচে যাবে!"

"আর যত দিন স্বরাজ না আসে?"

"ততদিন দুঃখদৈন্য ভোগ করতেই হবে আমাদের! কংগ্রেস তার কি করবে বলুন?"

সরলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তাহলে বল, কংগ্রেস হচ্চে—পাইকারী দোকান...খুচরা খরিদ্দারের ঠাঁই সেখানে নেই!"

"তা কি করে থাক্‌তে পারে—বলুন?...ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের মত শক্তিশালী পক্ষের সঙ্গে যাকে পাল্লা দিতে হবে, তার কি খুচরো দুঃখদৈন্যের দিকে নজর দেবার সময় আছে, না, সে পারে?"

"সময়ও আছে, শক্তিও যে নেই, তা নয়;...আসলে নেই মর্জ্জি! এই দেখ না, ব্রিটিশ গভর্মেণ্টও তো তোমাদের নিয়ে কম নাস্তানাবুদ হচ্চে না, কিন্তু কই তারা তো এ দেশের মঙ্গলের জন্য যে কটা কাজ আরম্ভ করেছিল, তা তো বন্ধ করে দেয়নি?"

"তা'রা কি, ভাবেন, প্রাণের টানে এ দেশের উপকার করছে?—যা কিছু করেছে বা করছে তা রাজত্বের ঠাট বজায় রাখবার জন্যে। হাঁসপাতাল বলুন—দু চারটে রিলিফ ফণ্ড বলুন, ক্রেডিট্ সোসাইটি বলুন স্রেফ্—পলিসি!"

"স্বীকার করলুম—'পলিসি!' তোমরাও কেন পলিসি স্বরূপ তাই কর না!"

বুড়ী এতক্ষণ তাহাদের তর্ক শুনিতেছিল; এবং কিছু না বুঝিলেও, সরলা যাহা বলিতেছিল, তাহাতেই সে ঘাড় নাড়িয়া অনুমোদন করিতেছিল। হঠাৎ তর্ক থামিয়া গেলে সে কংগ্রেস-কর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তোমরা এসেছিলে বলে দুটো ভাল কথা শোনা গেল; আর একখানা বস্তরও পেলাম—শীতের দিনে গায় দিয়ে বাঁচব!...হাঁ বাছা, তোমরা বেরাম্মোন?—পেন্নাম!"

৫

কংগ্রেসওয়ালারা দেখিল, সরলার দ্বারা খদ্দর বিক্রয়ের কাজ চালানো নিরাপদ নহে। মাসের মধ্যে যদি সে পাঁচ খানা খদ্দর খয়রাৎ করিয়া বসে—এবং খদ্দরের তহবিল হইতে রোজ দু-চারি আনা দান করিতে থাকে, তবে কংগ্রেসের খদ্দর বিভাগে শীঘ্রই 'লালবাতি' জ্বলিতে হইবে!

কংগ্রেসের অর্থ ঐ প্রকারে অপব্যয় করিতে নিষেধ করিলেও সরলা শোনে না। বলে,—"আমার নামে খাতায় খরচ লিখে রেখো!" খাতায় খরচ লিখিয়া রাখিলে হিসাব দুরস্ত থাকে বটে, কিন্তু তহবিলের অবস্থা যে সুস্থ থাকে না, এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সকলেই সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছে—বিশেষতঃ (কংগ্রেস আপিসের জন্য কেহ বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী না হওয়ায়) যখন তাহারা ভবশঙ্করের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করিয়া আসিতেছে।

অবশেষে কংগ্রেসওয়ালাদের মাথায় এক ফন্দি আসিল। তাহারা এক দিন সরলাকে বলিল—"দেখুন, আমরা এই কংগ্রেস কমিটীর লাগাও একটা সেবা-সমিতি খুলিতে ইচ্ছা করছি। কিন্তু আপনি যদি তার ভার নিতে স্বীকার হন—তবেই সাহস করি খুল্‌তে!"

সরলার মনের মত কাজ হইবার উপক্রম দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"বেশ তো! আমি খুব রাজী আছি, তবে একবার বাবার মতটা নিই।"

পিতার মত পাইয়া সরলা সেবা-সমিতির যোগ্যা অধিনেত্রী হইবার প্রবল উৎসাহে ধাত্রীবিদ্যা ও রোগি-পরিচর্য্যা সংক্রান্ত কয়েকখানা বাংলা বই আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ইতিমধ্যে এক দিন তাহার কাণে গেল—পুলিশের জমাদার শৈলজা সিকদার টাইফয়েড রোগে মরণাপন্ন, আর ওদিকে তার পত্নী প্রসব বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের দুইজন সেবক এত দিন শুশ্রূষা করিতেছিল; কিন্তু তাহারাও ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। শৈলজা বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় মারা যাইতে বসিয়াছে।

সেদিন বড় দুর্য্যোগ!—সমস্ত দিন আকাশ অন্ধকার করিয়া মুষলধারে শ্রাবণের মেঘ বৃষ্টি ঢালিতেছিল—যেন বিধাতার সৃষ্টি ধুইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে! এই দুর্য্যোগে শৈলজার কথা শুনিয়া সরলা কংগ্রেসের আপিস-ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

সরলার মুখে সমস্ত শুনিয়া তাহারা মুনিজনতুল্য অনুদ্বিগ্নমনাঃ হইয়া বলিল,—"ওরা গভর্মেণ্ট সারভেণ্ট···ওদের জন্যে আমাদের ভাবতে হবে না···ওদের লোকের অভাব হবে না—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না!···কাল আমরা খোঁজ নেব'খন।"

সরলা দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—"কা—ল খোঁজ নেবেন!—হয়েচে!"

আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া সরলা সেই দুর্য্যোগে শৈলজার বাড়ীর দিকে চলিল।

(৭)

সরলার বাড়ী হইতে শৈলজার বাড়ী যাইতে সোজা পথ পড়ে থানার কম্পাউণ্ডের মধ্য দিয়া। এই পথে সরলা শৈলজার বাড়ী যাতায়াত করে। এক দিন মধ্যাহ্নে সরলাকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া পুলিশের এক কর্ম্মচারী তাহার এক সহকর্ম্মীকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—"অমন টুক্‌টুকে হাতের সেবা পেলে ঘাটের মড়াও, বাবা, বেঁচে উঠে!···শৈলজার বরাত আচ্ছা বল্‌তে হয়!"

অনুচ্চস্বরে বলিলেও কথাটা সরলার কাণে গেল। সে অমনি ফিরিয়া নিকটে আসিয়া বলিল—"শৈলজার কি আচ্ছা বলচেন, বাবা?"

পুলিশ-কর্ম্মচারী তাহার বেফাঁস কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"না, এই বলছিলুম, শৈলজার আচ্ছা বরাত বল্‌তে হবে যে, আপনার মত সেবা করবার লোক পেয়েছিল—"

সরলা সটান তাহার মুখের উপর বলিল—"না বাবা, আপনি ঠিক ও-ভাবে বলেন নি তো যাই হোক্, অমন বল্‌তে নেই···আমরা যে মায়ের জাত!"

বলিয়াই সরলা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় পুলিশের ভদ্রলোকটী বলিল—"কেমন, মুখের মত হ'ল তো?"

"আঃ, কি আর এমন বলে গেল?···তারে ওঁর সতীগিরি বের করছি—মাগগীর!"

"দোহাই, পঞ্চা, আর তোর পুলিশী বিক্রম দেখাতে হবে না!···নিজের দোষ স্বীকার করতে একটু শেখ!"

পঞ্চানন গুপ্ত মুখে আর কিছু বলিল না বটে, কিন্তু ইহার কয়েক দিন পরে সরলার স্বামী তার স্ত্রীর চরিত্র-সংক্রান্ত এক বে-নামী পত্র পাইল।

(৮)

সে রাত্রে শৈলজার বাসায় জীবন-মৃত্যুর তুমুল লড়াই চলিতেছিল। সরলা পাশের ঘরে শৈলজার মূর্চ্ছিতা পত্নীকে কোলে লইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সাংঘাতিক সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সরলার বাপ এক দিন বলিয়াছিলেন—ভগবানকে প্রাণভরে ডাকিলে কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। সেইমত সরলা ভগবানকে ডাকিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু নিরাকার ভগবানকে সরলা আপন ধ্যানের মধ্যে ধরিতে গিয়া বার-বার বিফলতার অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ রাত্রে সরলা আবার চক্ষু মুদিয়া ভগবানকে ডাকিতে চেষ্টা করিল। প্রথমে চক্ষু মুদিতে আধ-আলো, আধ-অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তার পর কেবল অন্ধকার;—ক্রমে সে অন্ধকার সুদূর প্রসারী সুড়ঙ্গের আকার ধারণ করিল। অনেকক্ষণ এইরূপে গেল। তার পর সে অন্ধকারের শেষ প্রান্তে জ্যোতির্ময় একটা বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সেই বিন্দু দেখিতে দেখিতে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া দ্বাদশ সূর্য্যের প্রভায় সেই আঁধারের সুড়ঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সেই জ্যোতির্ম্ময় সুড়ঙ্গের শেষভাগে মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট এক মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখা দিল। সরলা প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না। ক্রমে এই স্বর্ণাসন আলোক-তরঙ্গে যেন ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে সরলা বিস্ময়ে আনন্দে দেখিল, সে—তাহার স্বামীর মূর্ত্তি!

এই দৃশ্যে সরলা কতকটা অভিভূত হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে কে তাহাকে তার স্বামীর কণ্ঠে ডাকিল—"সরলা!" চক্ষু চাহিতেই স্বামীকে দেখিয়া সরলা কোন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া কেবল ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমার শৈলজাকে বাঁচাও!"

সরলার স্বামী নরেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—"শৈলজা কে ?"

"আমার ছেলে।...যাও, শীগ্‌গির তাকে বাঁচাও!"

বে-নামী পত্র পাইয়া সরলার স্বামী যে জ্বালা লইয়া অতর্কিত ভাবে ছুটিয়া আসিয়াছিল, এখানে আসিয়া সরলার অবস্থা দেখিয়া সে জ্বালা মুহূর্ত্তে শীতল হইয়া গেল। শৈলজার বাটী প্রবেশের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা নরেশের মনে পড়িয়া গেল। নরেশ বলিল—"বাড়ী ঢুকিবার সময় এইমাত্র কে একজন আমার হাতে এই শিকড়টা দিয়ে বল্লে—'এইটে বেঁটে শৈলজার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিতে বলগে—' আমি শিকড়টা নিয়ে দু-পা এসে আবার পিছন ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই!"

মাসখানেক পরের কথা। শৈলজা সেই দৈব ঔষধেই মরণের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সরলার স্বামী এক দিন সেই বে নামী চিঠিখানা সরলার হাতে দিল। তাহা পাঠ করিয়া সরলা অনেকক্ষণ গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। পরে স্বামীকে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ চিঠি বিশ্বাস করেছ ?"

নরেশ বলিল—"না, যদি তা করতুম, তবে তুমি আমি আজ এমন জ্যান্ত থাকতুম না! তোমার আড়ালে তোমার কত বড় শত্রু আছে, তাই শুধু জানিয়ে দিতেই দেখালুম। হাঁ, একটা খবর এসে পর্য্যন্ত তোমায় দিই নি—"

"কি ?"

"আমি মদ ছেড়ে দিইচি।"

সরলা মৃদু হাস্যে বলিল—"কদ্দিনের জন্যে—শুনি ?"

"না ঠাট্টা নয়! জন্মের মতন!"

আনন্দে সরলার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল—"তা এখন আমার সম্বন্ধে কি ঠিক করলে? এবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ তো ?"

"নিয়ে যেতেও লোভ হচ্চে, আবার এমন মহৎ কাজ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতেও ক্ষোভ হচ্চে!"

"দোহাই তোমার! আর আমায় মহৎ কাজের লোভ দেখিও না। বিশেষতঃ সতাত্বের ওপর অপবাদের ছাপ নিয়ে আমি বড় কাজে মহীয়সী হতে চাইনে!"

নরেশ সরলার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—"তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা!"

প্রচ্ছদপট

কার্ত্তিকের "ভারতবর্ষে"র প্রচ্ছদপটে যে মহাত্মার ত্রিবর্ণ চিত্র মুদ্রিত হইল, তিনি সুবিখ্যাত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারক। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম যৌবনে ইনি প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। তথায় তিনি খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত মিশিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হন, এবং খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপরে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি বিলাতে গিয়া অক্সফোর্ডে বেদান্তের ব্যাখ্যামূলক কয়েকটি বক্তৃতা করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি 'সন্ধ্যা' নামে প্রসিদ্ধ দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে যে রাজদ্রোহের মামলা হয়, সেই মামলার রায় প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ২৭শে অক্টোবর প্রবল অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অস্ত্রোপচারের ফলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজনৈতিক সংবাদপত্র পরিচালনে ইনি অনন্যসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আমরা এই প্রকৃত দেশ-নেতার প্রতিকৃতি 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ প্রণীত "বাঙ্গালীর খাদ্য" মূল্য ।০ আট আনা

শ্রীমতী মায়ানাদেবী প্রণীত "মালিকা" স্বরালাপ, মূল্য ১

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি এইচ ডি প্রণীত "আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা", মূল্য ১০

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গুরুগোবিন্দসিংহ" জীবনী, মূল্য .

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "শিক্ষা ও দীক্ষা" মূল্য ২৲

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সোম প্রণীত "দুটি-প্রাণ" উপন্যাস, মূল্য ১৲

শ্রীনগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার প্রণীত "স্মরমণি" কাব্য, মূল্য—

শ্রীসুরেন্দ্ররঞ্জন রায় প্রণীত "ভিখারীর বর" গল্পপুস্তক, মূল্য—১॥০

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত "রায়তের কথা" মূল্য—৷৵০

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "মহারাজা সীতারাম" নাটক, মূল্য—১৲

নজরুল ইসলাম প্রণীত "সর্ব্বহারা" কাব্য মূল্য—৸৵০

শ্রীঅমিয়কান্তি দত্ত প্রণীত "অদ্বৈতাচার্য্য" মূল্য—॥০

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত "শাহজালাল" মূল্য—।০

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ প্রণীত "শ্রীচৈতন্য" মূল্য—৵০

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি এ প্রণীত "ঠাকুরবাড়ী" মূল্য—।৵০

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বিশী প্রণীত "নরনারী" মূল্য—১॥০

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works.
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

শিল্পী— শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস,
মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত।

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
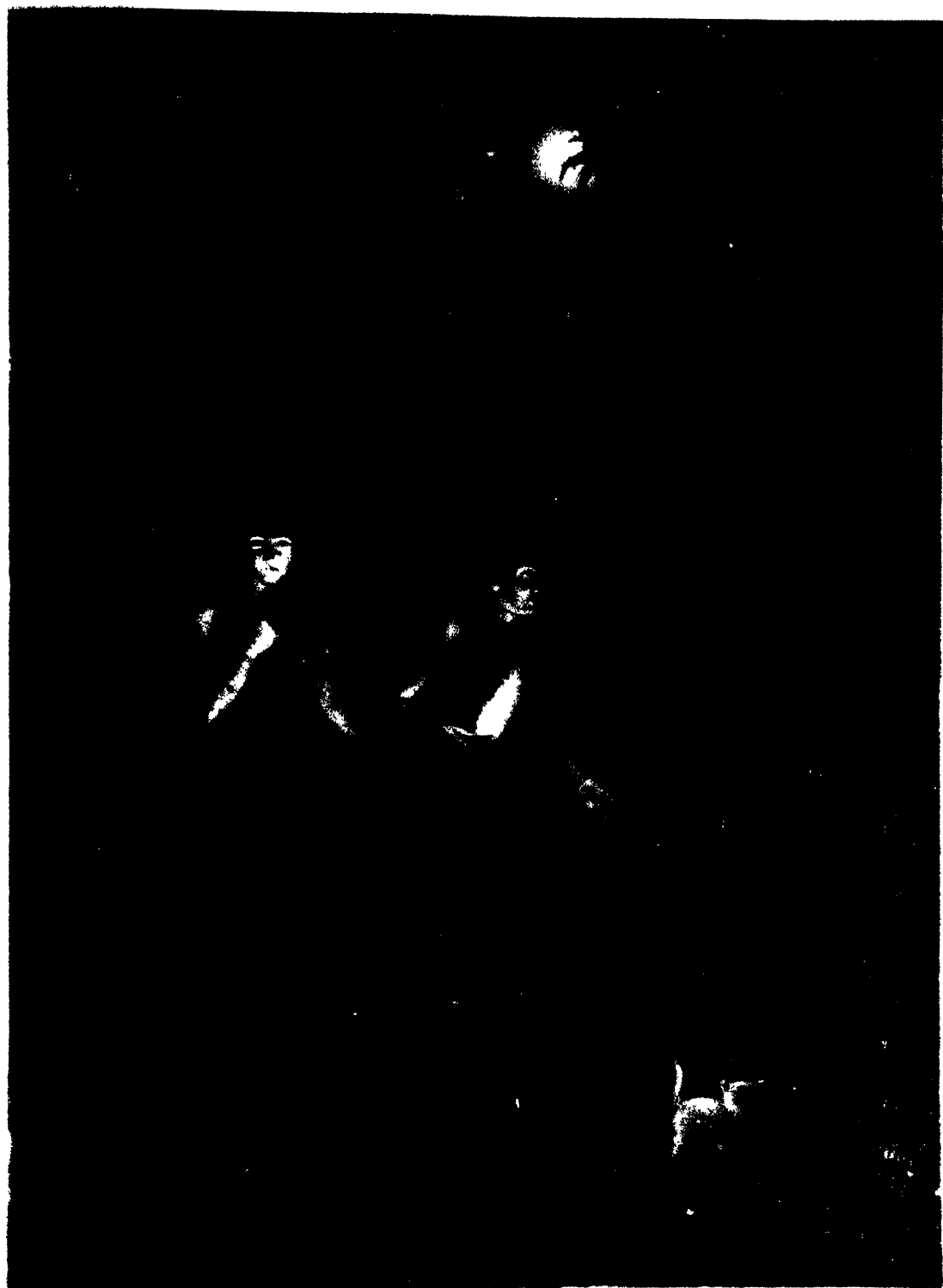
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আতঙ্ক-নিগ্রহ

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই

ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা সম্যক্ অমূলক না হইলেও, সাধারণ জনসমাজে অসাধারণ আতঙ্ক সঞ্চার করে। তাহাতে কত অনর্থ উৎপন্ন হইতে পারে, সিপাহী-যুদ্ধ তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। সেদিন এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে; তথাপি সে আতঙ্ক-প্রবণতা তিরোহিত হয় নাই। কিছু দিন হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে কলহ ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহা ধর্ম্মের আবরণে আত্মগোপন করিয়া, অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিত জনসমাজের মনে আতঙ্ক-প্রবণতা জাগাইয়া তুলিয়া, রাজা প্রজাকে তুল্য ভাবে চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। রোগ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। তাহার মূল তর্ক-সঙ্কুল হইলেও চিকিৎসার প্রয়োজন অস্বীকার করিতে না পারিয়া, রাজশক্তি মুষ্টিযোগ-প্রয়োগে অগ্রসর হইয়াছে। অনেক গুটিকা-বটিকা চর্ম্ম-পেটিকা ছাড়িয়া অনেকের চর্ম্ম ভেদ এবং কাহারও কাহারও মর্ম্মভেদ করিয়াও, আতঙ্ক-নিগ্রহে সম্যক্ সফলকাম হইতে পারিতেছে না।

কোন্ সময়ে কোন্ ঘটনা-সূত্রে হিন্দু এবং মুসলমান ভারতবর্ষে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য এখন আর কাহারও কৌতূহল উপস্থিত হয় না; কারণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, কেহই এখন আর দেশ-সম্পর্ক-শূন্য, সদ্যঃ-সমাগত আগন্তুক বলিয়া কথিত হইতে পারে না। জনগণনার তারতম্যে কাহারও সংখ্যাই নগণ্য নহে; অগণ্য। বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে হিন্দুর সংখ্যাই বরং নিতান্ত নগণ্য; তথাপি হিন্দু-মুসলমান বহুদিন হইতে নিকটতম প্রতিবেশীরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, একত্র অবস্থান করিতেছে। এখন আর একজনকে ছাড়িয়া অন্য জনের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা কল্পনা করা যায় না। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব কেবল প্রার্থনীয়

নয়,—পরন্তু তাহাই কেবল স্বাভাবিক। এবং স্বাভাবিক নিয়মেই সে সদ্ভাব ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। অকস্মাৎ তাহার অভাব উপস্থিত হইয়াছে। মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইয়া মুসলমান-কুল নির্ম্মূল করিবার কল্পনা সংগঠন নহে, সং-গঠন; হিন্দু সমাজের কোন ব্যক্তিই সেরূপ হাস্যাস্পদ প্রয়াস স্বীকার করিতে অগ্রসর হয় নাই। হিন্দুকে মুসলমান করিয়া লইয়া হিন্দু-কুল নির্ম্মূল করিবার কল্পনাও সেইরূপ। তাহা কেবল বাচালতা নহে, বাতুলতা। সুতরাং এই শ্রেণীর চেষ্টা আন্তরিক বা আড়ম্বর-পূর্ণ হইলেও কোন পক্ষেই ইহা সফল হইতে পারে না। যাহা হয় না, বা হইতে পারে না, তাহা যখন মানব-মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া কর্ম্মের পথ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই অনর্থ উৎপন্ন হয়। ঐ যায়—ঐ গেল—ধর্ম্মনাশ—সর্ব্বনাশ—এইরূপ কোলাহল মুখর হইয়া উঠে।

রাজ-শক্তি দণ্ড-নীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমা-নিবদ্ধ থাকিয়া দণ্ডনীয়কে দণ্ডদান করিয়া লোক-রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু প্রজা-শক্তি তাহার সহিত অসহযোগ করিলে সে অসহ-যোগ রাজশক্তির অসাধু চেষ্টার ন্যায় সাধু চেষ্টাও বিফল করিয়া দেয়। উভয় শক্তি এক উদ্দেশ্যে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালনে অগ্রসর না হইলে, কেবল মুষ্টিযোগে এই শ্রেণীর দুরারোগ্য রোগের মূল নির্ম্মূল হইতে পারে না। আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা যতই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হউক না কেন, তাহা স্থানবিশেষে কিয়ৎকালের জন্য সফল হইবামাত্র তাহার প্রশংসা-পত্রে কেবল সাহিত্যই ভারাক্রান্ত হয়, জন-সমাজ স্বস্তি লাভ করিতে পারে না।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই আতঙ্কের লক্ষণ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মুসলমানের আতঙ্ক অপেক্ষা কোন কোন স্থানের হিন্দুর আতঙ্ক অধিক প্রণিধান-যোগ্য। হিন্দু-সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্য গণ্ডী-নিবদ্ধ প্রাচীন সমাজ; তাহার মধ্যে সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল নর-নারীকে টানিয়া আনা সম্ভব হইতে পারে না; হইলেও, যাহাদিগকে টানিয়া আনা হইবে তাহাদের কাহাকেও দ্বিজাতি-পদ-বাচ্য প্রথম তিন শ্রেণীতে স্থান দিবার উপায় নাই; এবং পঞ্চম শ্রেণী না থাকায়, চতুর্থ অর্থাৎ শূদ্র-শ্রেণীতে স্থান দিতে হইবে। এই শ্রেণীর কেহ কেহ সৎ এবং অবশিষ্ট অসৎ নামক দুই ভাগে বিভক্ত; কাহারও জল চল, কাহারও অচল। সকলের জল চালাইয়া লইবার শাস্ত্র নাই; চালাইয়া লইতে পারিলেও সকলের সামাজিক মর্য্যাদা সমান করিয়া দিবার উপায় নাই। মুসলমান স্ব-সমাজে এরূপ কঠিন নিয়মের অধীন নয়। শিক্ষা, সদাচার এবং ঐশ্বর্য্য নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানকেও উচ্চ শ্রেণীর পদ-মর্য্যাদা প্রদান করিতে পারে। তাহা জন্ম-গত দৈব-ঘটনার উপর নির্ভর করে না; পৌরুষ-গত আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে। এরূপ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-সমাজের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে আবার হিন্দু হইতে পারিলেও, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু হইতে হইবে, তজ্জন্য মুসলমান সহসা ধর্ম্ম-ত্যাগে সম্মত হইতে পারে না। হিন্দুর পক্ষেও মুসলমান হইবার প্রলোভন বড় অধিক বলিয়া বোধ হয় না। এখন আর হিন্দুর পক্ষে মুসলমান হইয়া কোনরূপ সামাজিক বা সাংসারিক মর্য্যাদা লাভের বা স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং হিন্দুর পক্ষেও মুসলমান হইবার জন্য স্বাভাবিক লালসা উপস্থিত হইতে পারে না। এখন হিন্দুকে মুসলমান করিতে হইলে বা মুসলমানকে হিন্দু করিতে হইলে অধিকাংশ স্থলেই ছলে-বলে-কৌশলে তৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। অল্প সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভব হইলেও, সকলের পক্ষে এরূপ প্রক্রিয়া নিতান্ত অসম্ভব। তথাপি, হিন্দু-সমাজে শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ক্রমে বদ্ধমূল হওয়ায়, মুসলমানের পক্ষে বলপূর্ব্বক হিন্দুকে মুসলমান করিবার সম্ভাবনা স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে। যে উপায়ে হউক, হিন্দুকে একবার বাহ্য বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন সাধন করাইয়া মুসলমানের ধর্ম্ম-মন্ত্র পড়াইয়া দিতে পারিলে, অথবা বলপূর্ব্বক তাহার মুখে হিন্দুর অখাদ্য গুঁজিয়া দিতে পারিলে, হিন্দু একদম মুসলমান হইয়া যায়, স্ব-সমাজে দাঁড়াইবার স্থান হারাইয়া মুসলমান সমাজেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই কারণে হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিবার চেষ্টা কোনও কোনও মুসলমানকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। ইহা যে হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মানুমোদিত নহে, মুসলমান তাহা জানে না, হিন্দু-জনসাধারণও তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

স্বয়ং ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, হিন্দুর ধর্ম্ম-নাশ সংঘটিত হইতে পারে না,—ইহা হিন্দু ধর্ম্মের একটি মূল সূত্র এবং ইহা তাহার একটি শ্রেষ্ঠতা-বিজ্ঞাপক প্রধান নীতি। পাতিত্য-জনক যে সকল কার্য্যের জন্য হিন্দুর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহার অধিকাংশই

এক শ্রেণীর ;—তাহা পরকৃত নহে স্বকৃত। যাহা পরকৃত তাহা অত্যাচার ; তাহার সাধারণ নাম "বলাৎকার"। তদ্দ্বারা নির্য্যাতিত ব্যক্তি—স্ত্রী বা পুরুষ—সমবেদনার পাত্র-পাত্রী ; কিন্তু এই মূল সূত্র বিস্মৃত হইয়া, আধুনিক হিন্দু-সমাজ নির্য্যাতিতের প্রতি সমবেদনার পরিবর্ত্তে যাহা বর্ষণ করে, তাহা অবিমিশ্র অত্যাচার,—শাস্ত্রাচার নহে, শস্ত্রাচার ;—অজ্ঞতা-প্রসূত অমার্জ্জনীয় অনাচার। এই সকল স্থলে, হিন্দু-সমাজের দ্বার রোধ না করিয়া, উন্মুক্ত-দ্বারে প্রসারিত ক্রোড়ে নির্য্যাতিতগণকে স্থান দান করিবামাত্র হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিবার জন্য মুসলমানের আগ্রহ মন্দীভূত হইয়া কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই পথে হিন্দু-সমাজের 'সংগঠন' কার্য্য পরিচালিত করিলে, তাহা 'সং'-'গঠন' হইবে না।

হিন্দু-সমাজের অনেক প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় হিন্দু-রমণীর পক্ষে স্বধর্ম্ম-ত্যাগের প্রলোভন উপস্থিত হইতে পারে। তাহাকে কেহ বলপূর্ব্বক নির্য্যাতিত করিলে স্ব-সমাজে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। হিন্দুর শাস্ত্র তাহার পক্ষে এ সকল স্থলে কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা আদৌ বিধিবদ্ধ করে নাই। এতৎসংক্রান্ত দেশাচার বা লোকাচার আবহমানকাল-প্রচলিত দেশাচার বা লোকাচার বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। তাহা অজ্ঞতা-প্রসূত আধুনিক অনাচার। হিন্দুসমাজে নারীর মর্য্যাদা যে ভাবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে হিন্দু রমণীর পক্ষে পরকৃত "বলাৎকারে" স্বধর্ম্মচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই ; কেবল স্বকৃত পাপই ধর্ম্মনাশের ও সমাজচ্যুতির একমাত্র কারণ। যেখানে তাহা সংঘটিত হয়, সেখানে "বর্জ্জন" এবং যেখানে তাহার সম্পর্ক নাই সেখানে "গ্রহণ" কেবল প্রার্থনীয় নহে, তাহাই শাস্ত্রানুমোদিত প্রকৃত ব্যবস্থা।

বল পূর্ব্বক হিন্দুর জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মে সমাজ রক্ষার যে সকল বিধি-ব্যবস্থা নিবদ্ধ আছে তাহা যুক্তি-যুক্ত উদার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে পাপের তারতম্য অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলেই বর্জ্জনের বা ত্যাগের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কোন স্থলেই বহিস্করণের ব্যবস্থা নাই। যে সকল স্থলে বর্জ্জনের বা ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, সে সকল স্থলে 'বর্জ্জন' বা 'ত্যাগ' শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; তাহা ধর্ম্মনাশ বা জাতি-নাশ সূচিত করে না ; অপরাধীর স্ব-সমাজে অচল হইবার কথাই সূচিত করিয়া থাকে। যেখানে অন্যে বলপূর্ব্বক হিন্দুর জাতিনাশের বা ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করে, সেখানে নির্য্যাতিতের অপরাধ হয় না, এবং তাহার বহিস্করণের কারণ উপস্থিত হইতে পারে না। ইহাই যে হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য মূল সূত্র, তাহা বুঝাইবার জন্য নিবন্ধকারগণ নানা স্থানে নানা ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্তে সকল পাপেরই শুদ্ধি সাধিত হয় ; ইহা আর একটি মূল সূত্র। কোন কোন অবস্থায় মহাপাতকে পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে ; ইহাও আর একটি মূল সূত্র। এই দুইটি মূল সূত্র পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন কামনায় নিবন্ধকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন—মহাপাতকে যে পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রায়শ্চিত্তের অক্ষমতা সূচিত করে না ; তাহা কেবল অপরাধীর ব্যবহার্য্যতার নিষেধ মাত্রই সূচিত করিয়া থাকে। যথা,—

"মহাপাতকেষু পরিত্যাগ এব।
ইদন্তু কৃতে প্রায়শ্চিত্তে ব্যবহার্য্যতা নিষেধ পরং ॥"

সুতরাং যে স্থলে পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে সেখানেও বহিস্করণের ব্যবস্থা নাই, ধর্ম্মহানির ব্যবস্থা নাই,—আছে কেবল সামাজিক ব্যবহার্য্যতার নিষেধ। কিন্তু ইহাও কেবল নিজকৃত পাপের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ; অন্যকৃত "বলাৎকারে" এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

পাপের নাম "প্রায়ঃ" ; তাহার বিশোধনের নাম "চিত্তং" ; এইরূপে "প্রায়শ্চিত্ত" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে শাস্ত্রকারগণ পাপের বিশুদ্ধি ক্রিয়াকে "প্রায়শ্চিত্ত" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"প্রায়ঃ পাপং সমুদ্দিষ্টং চিত্তং তস্য বিশোধনঃ।"

পাপ কি, তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত রহিয়াছে। তাহার বিশোধক প্রায়শ্চিত্ত কোন্ কোন্ স্থলে প্রযোজ্য তাহাও স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত রহিয়াছে। মহর্ষি অঙ্গিরার মতে অনিচ্ছাকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধিলাভ করে। ইচ্ছা-পূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই মত

কঠোরতম শাস্ত্র-শাসন বিজ্ঞাপিত করিতেছে। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। মনুর মতে বিহিত কর্ম্ম না করিলে, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে, এবং ইন্দ্রিয়ার্থে স্খলিত-পদ হইলে, মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তের অধীন হয়। যথা,—

"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিষিদ্ধঞ্চ সমাচরণ্।
প্রসজ্জং শ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥"

এখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ কোনও বিভাগ কল্পিত হয় নাই; সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, বচনোক্ত পাপ-কর্ম্ম করিলে, প্রায়শ্চিত্ত তাহার শুদ্ধি-সাধন করিতে পারে। যেখানে অনিচ্ছাকৃত পাপ সেখানে দণ্ডের পরিমাণ লঘু. এইমাত্র পার্থক্য। সুতরাং ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বিচার করিয়া অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, শাস্ত্র তদ্বিধ পাপাচারীর সহিত স্পষ্টাক্ষরে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। স্বকৃত কর্ম্ম ভিন্ন অন্যকৃত কর্ম্মে, স্থলবিশেষে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ঘটিলেও, তাহা সমধিক সহানুভূতি-সূচক।

হিন্দু সমাজে নারীর মর্য্যাদা সুরক্ষিত করিবার জন্য যার-পর-নাই সহানুভূতি-মূলক বিধি-ব্যবস্থা নিবদ্ধ আছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা প্রমাদ বশতঃ হউক, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা বলপ্রয়োগে হউক, অথবা নিতান্ত স্বভাবদোষে হউক, স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন স্থলেই ত্যাগের বা বর্জ্জনের ব্যবস্থা নাই। সকলেরই কৃত-পাপের নিষ্কৃতির উপায় আছে। স্ত্রীজাতির উপায় আরও বিশেষভাবে বিহিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অতুলনীয় পবিত্রতার আধার; তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। তাহাদের প্রতিমাসের আর্ত্তব সকল দুষ্কৃতি দূর করিয়া থাকে। যথা,—

"স্ত্রীয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।
মাসি মাসি রজস্তাষাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি॥"

কেহ বলপূর্ব্বক কোন রমণীকে উপভোগ করিলে, কোন রমণী চৌরহস্তগতা হইলে, কেহ স্বয়ং বিপথ-গামিনী হইলে, অথবা অন্যকর্ত্তৃক বিভ্রান্তা হইলে, অত্যন্ত দূষিতা হইলেও পরিত্যাগের যোগ্য হয় না। যথা,—

"বলাৎকারোপভুক্তা বা চৌরহস্তগতাপি বা।
স্বয়ং বিপ্রতিপন্না বা অথবা বিপ্রমাদিতা॥
অত্যন্ত দূষিতাপি স্ত্রী ন পরিত্যাগমর্হতি।
সর্ব্বেষাং নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ॥"

"শুদ্ধি-চিন্তা-মণি"-ধৃত এই বচনে ব্যভিচার-পরায়ণা স্ত্রীর পক্ষেও পরিত্যাগের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সাধারণতঃ ইহা স্বীকার করিয়াও কয়েকটি স্থলে ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তাঁহার মতেও ব্যভিচারে ত্যাগের ব্যবস্থা নাই; কারণ ব্যভিচারের পর ঋতু হইলেই শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া যায়। তিনি কেবল. গর্ভ হইলে, গর্ভপাত করিলে, ভর্ত্তৃবধ করিলে এবং মহাপাতকে লিপ্ত হইলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

"ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধিয়তে।
গর্ভ ভর্ত্তৃবধে তাসাং তথা মহতি পাতকে॥"

যমের বচনে দেখিতে পাওয়া যায়,—স্ত্রীলোকের পক্ষে পাতকের সংখ্যা এত অধিক নহে। তাহা কেবল তিনটি পাতকে সীমাবদ্ধ: (১) ভর্ত্তৃবধ, (২) ব্রহ্মহত্যা, (৩) আত্ম-গর্ভপাত। এই তিনটি ভিন্ন অন্য পাতক উল্লিখিত হয় নাই।—প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—অগ্নি নানা দ্রব্য দহন করে, কদাপি দ্রব্যদোষে অপবিত্র হয় না; মূত্র-পুরীষ-সংযোগে জল অপবিত্র হয় না; বেদোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য হিংসাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দ্বিজ অপবিত্র হয় না। স্ত্রীও সেইরূপ জারের সংসর্গে অপবিত্র হয় না। যথা,—

স্ত্রী ন দুষ্যতি জারেন নাগ্নির্দহন-কর্ম্মণা।
নাপো মূত্র-পুরীষাভ্যাং ন দ্বিজো বেদকর্ম্মণা॥"

'জীর্য্যতি স্ত্রায়াঃ সতীত্বমনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তিক্রমে স্ত্রী-সতীত্ব বিনাশকারী ব্যক্তি "জার" নামে কথিত। উদ্ধৃত বচনে জানিতে পারা যায় পরপুরুষ-ধর্ষিতা রমণী জারের কার্য্যের জন্য অপরাধিনী হয় না, সুতরাং মুসলমান-ধর্ষিতা হিন্দু রমণীকে হিন্দুসমাজে স্থান দিতে অস্বীকার করিয়া আধুনিক হিন্দুজন-সাধারণই নির্য্যাতিতার প্রতি অবিচার এবং নির্য্যাতনের প্রশ্রয় প্রদান করিতেছে।

আর একটি বচনে ইহা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া, যম বলিয়া গিয়াছেন—নারী যদি স্বচ্ছন্দচারিণীও হয়, তথাপি পরিত্যজ্যা নহে; তাহার বধ-দণ্ড বা অঙ্গ-কর্ত্তনও হইতে পারে না। যথা,—

"স্বচ্ছন্দগাপি যা নারী তস্তস্ত্যাগো বিধিয়তে।
ন চৈব স্ত্রীবধং কুর্য্যান্নচৈবাঙ্গ-বিকর্ত্তনং ॥"

মহর্ষি বশিষ্ঠ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপাচরণ-শালিনী স্ত্রীর পক্ষে চতুর্ব্বিধ অপরাধে পরিত্যাগের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যে স্ত্রী শিষ্যগা, যে গুরুগা, যে পতিঘ্নী এবং যে নিন্দিত-সংসর্গ নিরতা সে পরিত্যাগ যোগ্যা। যথা,—

"চতস্রস্ত পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যগা, গুরুগা চ যা।
পতিঘ্নী চ বিশেষেণ জুঙ্গি তোত্যগতা চ যা ॥"

এই সকল বিধি-ব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়,—অনিচ্ছাকৃত পর-প্রযুক্ত নির্য্যাতনে নারী আদৌ অপরাধিনী হয় না; এবং সেরূপ স্থলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবারও শাস্ত্র-সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় না। যথাযোগ্য বিশোধন-ক্রিয়া তাহার শুদ্ধি সম্পাদন করে। হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষার এই সকল উদার ব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়া আধুনিক হিন্দু জন-সাধারণ নির্য্যাতিতা ভগিনী-দিগের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ না হইয়া, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে গিয়া, তাহাদিগকে হিন্দু-সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া, তাহাদিগের প্রতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া আসিতেছে; এবং তজ্জন্যই এক শ্রেণীর মুসলমান মনে করিতেছে,—বলপূর্ব্বক হিন্দু রমণীকে উপভোগ করিতে পারিলেই তাহাকে বাধ্য হইয়া মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু জন-সাধারণের এই অজ্ঞতা দূর হইলে, দুর্ব্বৃত্তগণের এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার উত্তেজনা মন্দীভূত হইয়া যাইবে।

নির্য্যাতিতের পক্ষে দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। অনেক সময়ে রাজদ্বারে প্রতিকার লাভ অসুবিধা-জনক অথবা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু তাহার পক্ষে স্বসমাজের সহানুভূতি-লাভে অসুবিধা বা বাধা ঘটিলে তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। নির্য্যাতন হিন্দু নর-নারীর ধর্ম্মনাশ সাধন করিতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম্ম এই অক্ষয়-কবচে হিন্দু-সমাজকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে; অন্যথা, বহু-বিপ্লব-বিপর্য্যস্ত হিন্দু-সমাজের অস্তিত্ব মাত্র বর্ত্তমান থাকিত না। যাহার প্রভাবে হিন্দু-সমাজ অচল-অটল হিমাচলের ন্যায় আত্ম-মর্য্যাদায় চির-প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া নির্য্যাতিতের বহিস্করণে আধুনিক হিন্দু সমাজ আত্ম-দ্রোহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ইহার সংশোধন আবশ্যক।

সে সকল স্থানে মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তথায় নির্য্যাতনের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু যেখানে মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য, তথায় তথাবিধ দুর্দ্দশাপন্ন নগণ্য হিন্দুগণের আতঙ্ক নিতান্ত স্বাভাবিক। অনেক স্থানের অনেক সত্য ঘটনা সেই আতঙ্ককে উত্তরোত্তর প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। ভঙ্গপ্রবণ মৃৎভাণ্ড সামান্য আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু হিন্দু-সমাজের অবস্থা প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ ভঙ্গপ্রবণ নহে; কেবল আধুনিক ভ্রান্ত বিশ্বাস তাহাকে ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া নিন্দার্হ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা শাস্ত্র নহে, লোকাচার,—সে লোকাচারও শাস্ত্রানুমোদিত লোকাচার নহে, আধুনিক চিত্ত-দুর্ব্বলতা-প্রসূত অপরিণামদর্শী লোক-ব্যবহার।

কোনও রূপ নির্য্যাতনই যে হিন্দু নরনারীর পাতিত্য সাধন করিতে পারে না, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়। কারণ স্বয়ং-কৃত কর্ম্ম ভিন্ন কোনও রূপ পরকৃত কর্ম্ম তাহার পক্ষে পাতিত্য-সাধক হইতে পারে না। স্বয়ং-কৃত কর্ম্ম, ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম এবং অনিচ্ছাকৃত কর্ম্ম, এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। উভয়ের জন্যই প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি-সাধনের ব্যবস্থা আছে। কারণ উভয় স্থলেই অপরাধীর কর্ত্তৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে তাহা নাই, সেই পরকৃত কর্ম্ম যতই উৎপীড়নজনক হউক না কেন, তাঁহা উৎপীড়িতের পক্ষে পাতিত্য-জনক হইতে পারে না। ইহা সম্যক্ প্রণিধান না করিয়া আধুনিক হিন্দু জন-সাধারণ শাস্ত্রানভিজ্ঞতা বশতঃ নির্য্যাতিতা রমণীকে এবং নির্য্যাতিত পুরুষকে সমাজ বহিস্কৃত করিয়া দিয়া নির্য্যাতনকারিগণের দুষ্কৃতি-সাধনে প্রশ্রয় প্রদান করিতেছে।

কেন এমন হইল তাহা ঐতিহাসিক কথা। তাহার সহিত হিন্দুর স্বাধীনতা-লোপের সম্পর্ক আছে। স্বাধীনতার দিনে কামতঃ এবং অকামতঃ কৃতকর্ম্মের শ্রেণী ভাগ ছিল। পরাধীনতার যুগে তাহা জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ বলিয়া কথিত হইতে আরম্ভ করে। ইচ্ছা না থাকিলেও বিধর্ম্মী প্রবল পুরুষের অপ্রতিবিধেয় পীড়ন ভয়ে লোকে যখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, তখন তাহা অনিচ্ছাকৃত হইলেও অজ্ঞানকৃত হইত না। এই শ্রেণীর কার্য্যকেও প্রায়শ্চিত্তে বিশোধিত করিয়া লইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল।

ইচ্ছাকৃত অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত পাপ এইরূপে জ্ঞানকৃত হইলেও লঘু দণ্ডে নিষ্কৃতি লাভ করে। ইচ্ছাকৃত, তথা জ্ঞানকৃত, পাপের দণ্ড অপেক্ষাকৃত গুরু হইলেও তাহা বিশোধনের অতীত হইয়া যায় না। কেহ যদি এই ভাবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার মতিভ্রম দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইতে পারে। বলপূর্ব্বক বাধা প্রদান করা যায় না। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেও আবার ফিরিয়া আসিতে চাহিলে হিন্দুধর্ম্মের সহানুভূতিপূর্ণ উদারতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। শুদ্ধি-ক্রিয়া তাহা সাধিত করিতে অগ্রসর হইলে কোনও অহিন্দু তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারে না। মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর শুদ্ধি ক্রিয়ায় বাধা প্রদানের বা আপত্তি প্রকাশের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়া মুসলমান সমাজে প্রবেশ ও আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলে খৃষ্টান তাহাতে বাধা প্রদান বা আপত্তি প্রকাশ করিতে পারে না। হিন্দু একবার পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবার হিন্দু হইয়া হিন্দু-সমাজে প্রবেশ ও আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলে, পরধর্ম্মিগণও তাহাতে বাধা প্রদান বা আপত্তি প্রকাশ করিতে পারে না। এ সকল বিষয়ে যে সমাজে পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছা সেই সমাজের লোকমতের এবং শাস্ত্র ব্যবস্থার একমাত্র প্রাধান্য।

অবস্থানুসারে ব্যবস্থা সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া থাকে। শাস্ত্র তাহারই পক্ষ সমর্থন করে। এ বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্র ত্যাগ পরায়ণতা অপেক্ষা গ্রহণ-পরায়ণতার পক্ষপাতী। এই শাস্ত্র-মর্ম্ম বিশেষভাবে আলোচনা করিবার এবং কার্য্যক্ষেত্রে অনুসরণ করিবার সময় এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যাহার রোগ তাহাকেই চিকিৎসা করিতে হইবে। কেবল রাজপুরুষদিগের মুখের দিকে অথবা মুসলমান নেতৃপুরুষদিগের সুবিবেচনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

নিশুতি রাতের একতারা

শ্রীহরিধন মিত্র

নিশুতি রাতে, নীরবতায়
যখন জগৎ ঘুমিয়ে পড়ে,
তৃপ্তি ছায়া খেল্‌তে থাকে
আকাশ বাতাস ধরার পরে;
একটী যেন অস্ফুট সুর,
কোথায় উঠে—অনেক দূর;
তার-ই যেন একটু খানি
আমার বুকে আঘাত করে!

কি সে সুর কে সে বাজায়,
হাত কি তার নয়কো পাকা;
অসাড় অবশ নিথর সে সুর—
সেও যেন রে ঘুমে মাখা!
সে সুরটী কি—নীরবতা,
নীরবতাই তার কি কথা;
বেজে ওর-ই একতারাতে
সে কি আমার প্রাণে ঝরে?
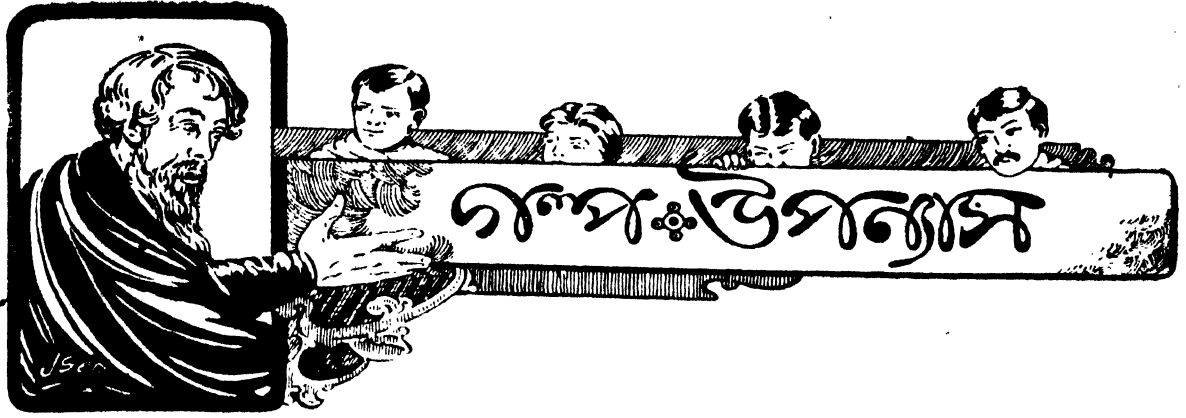
পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৫)

অত বড় দীর্ঘ পত্রখানা লিখিয়া সত্য যে উত্তরখানা পাইল তাহাতে ছিল মাত্র গোটাকতক সংবাদ—অত্যন্ত সহজ এবং সরল,—কল্পনা তাহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই, ভাবের ঝঙ্কার তাহার মধ্যে নাই। তবু সেই পত্রখানা বুকের উপর রাখিয়া সত্য স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সামনের বাড়ীর জানালাটা খোলা। গৃহমধ্যে একটী তরুণী একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া লেখাপড়া করিতেছিল। সত্য ভাবিতেছিল, কবে সে তাহার স্ত্রীকে এইরূপ ভাবে লেখাপড়া করিবার সুযোগ দিতে পারিবে,—সে দিন আর কতদূরে? সে হাত দু'খানি কি শুধু গৃহকর্ম্ম করিবার জন্যই সৃজিত হইয়াছে? সে যদি লেখাপড়া বেশী রকম শিখিত, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের সহিত সেই লেখাপড়া মিশিয়া তাহাকে আরও রমণীয়, আরও কমনীয় করিয়া তুলিত। হায়, ভগবান তাহাকে পলাশের মত বাহ্যিক রূপই দিয়াছেন, আর কিছুই দেন নাই।

সন্ধ্যাবেলায় সামনের বাড়ীটায় প্রত্যেক দিনকার মতই অর্গান বাজিয়া উঠিল,—একটা বড় কোমল—বড় মিষ্ট নারী-কণ্ঠ সেই সুরের সহিত মিশিয়া গেল। সত্যর মনে আজ নূতন চিন্তা জাগিয়া উঠিল—কোন দিন কি দেবী এইরূপে তাহার সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতে পারিবে—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার নিভৃত সাধনা।

হায় রে, ইহার সম্ভবপরতা মনে করিতে বড় দুঃখেই হাসি পায়! দেবী আবার লেখাপড়া শিখিবে, সে আবার অর্গান বাজাইয়া গান গাহিবে! সে জানে শুধু সংসারের কাজ করিতে, নিঃশব্দে সেবা করিয়া যাইতে। দিনের বেলায় স্বামীকে কখনও সে মুখ দেখাইতে পারে নাই—এত ভয়, এত লজ্জা তাহার,—সে না কি সত্যর মনের মত হইবে?

কিন্তু এই যে তাহার কল্পনা। বিদুষী সুন্দরী নলিনীর প্রতি সে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ, সে ঠিক তাহার কল্পনার দেবীই ছিল। সত্য তো রূপ চায় নাই। সে জানিত রূপ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু গুণ চিরকালস্থায়ী। তাহার দেবীর গুণ—সে ভাল রাঁধিতে জানে, কাজকর্ম্ম করিতে জানে। এ আদর্শ পাচিকার, আদর্শ দাসীর,—আদর্শ স্ত্রী নেই ইহার মধ্যে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সত্যর সমস্ত বুকটা কাঁপাইয়া দিয়া গেল। হায় রে, এ জগতে যে যেমনটী চায়, সে তেমনটী পায় না কেন? সত্য যা চায় নাই, তাহাই পাইয়াছে—যাহা চাহিয়াছিল, তাহা পায় নাই।

ঝাঁ করিয়া একটা কথা মনে পড়িয়া গেল,—দেবী তাহার পড়ার জন্য তাহার গায়ের সব গহনা দিয়াছে। এই কথাটা

মনে হইতেই মনটা যেন একটু মুসড়িয়া পড়িল,—হঠাৎ কোন বিরুদ্ধ যুক্তি সে আনিতে পারিল না।

একটা কথা আছে—মন যখন কোনও ত্রুটী খুঁজিয়া বেড়ায়, কোনও ছল চাহিয়া ফেরে, তখন তাহা পাইতে বেশী দেরী হয় না। সত্যও অবিলম্বে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এ দেবীর কর্ত্তব্য কাজই বটে। যে স্ত্রী এমন কাজ করে না সেই আশ্চর্য্যের কথা বটে; যে করে তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। হঠাৎ এই সত্যটাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া সত্য যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

"বলি—কি হে সত্য, ডেকে ডেকে যে আজ সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না, ব্যাপারখানা কি হয়েছে আজ,—কোথা হতে অমন সুন্দর এনভেলাপখানি এলো?"

চমকিয়া উঠিয়া সত্য দেখিল—দরজার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে প্রকাশ। সে নিবিষ্ট চিত্তে একটা বিঁড়ি ধরাইয়া সজোরে টান দিতেছে,—তাহারি ফাঁকে তাহার অধরে বিদ্রূপের হাসি ভাসিয়া উঠিয়াছে।

সত্য তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া বলিল, "ব্যাপার কিছুই না, একটা ভাবনায় পড়েছিলুম।"

প্রকাশ বলিল, "ভাবনাটা কি জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি বোধ হয়?"

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কাছে কি আমার কোনও কথা গোপন আছে বন্ধু, আমার সব কথাই তো তুমি জানো।"

প্রকাশ তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল, বলিল, "কেমন ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছ? রাত্রে বেশ শীত বোধ হয়, না?"

একটা কথা চলিতে চলিতে আর একটা কথা আসিয়া পড়ায় সত্য একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। খানিকটা হাঁ করিয়া প্রকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তা বোধ হয় বটে।"

প্রকাশ বলিল, "এ দেশে এই সামান্ত শীতের জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে পড়ি,—আর বিলেতে কি শীত সেটা একবার ভেবে দেখ। আমি শীতকে ভারি ভয় করি, তাই ভাবি, সে দেশে মানুষগুলো থাকে কি করে? তাও না হয় হ'তে পারে,—তারা সেখানে জন্মেছে কাজেই সেখানকার শীত তাদের সহ্য হয়ে গেছে। কিন্তু যারা আমাদের দেশ হতে পড়বার উপলক্ষে বিলেতে যায়, তারা টিঁকে থাকে কি করে? আমি হলে কখনই যাইনে, কখনও যাবও না।"

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, "কেউ তোমায় যাওয়ার জন্যে খোসামোদও করবে না—এ দেখে নিয়ো।"

প্রকাশ সগর্ব্বে বলিল, "আমি গেলে তবে তো বলবে। সেই শীতের দেশে জমাট বেঁধে থাকতে আমি কখনই যাব না, লাখ টাকা দিলেও না। এখানকার এই শীতে—তাই, আমি কোথায় যাব ভেবে ঠিক পাইনে—উঃ—"

কোথায় বিলেত আর কোথায় কলিকাতা! আর পূজার ঠিক পরেই শীতও যে কত পড়িয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়, সুতরাং সত্য চুপ করিয়া গেল। এই মিথ্যা একটা কথা লইয়া অনর্থক তর্ক করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। মনটা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিত, সে অন্য দিনের মত তর্ক করিতে অগ্রসর হইয়া পড়িত। আজ তাহার মনটা ভারি খারাপ ছিল,—চুপচাপ কাটাইতে পারিলে সে আর কথা চায় না।

প্রকাশ তাহার সাড়া না পাইয়া খানিক চুপ করিয়া রহিল। ততক্ষণে আর একটা বিঁড়ি সে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া, হাত দু'খানা রুমালে মুছিয়া বলিল, "কই দাও দেখি পত্রখানা—একটু পড়ে দেখা যাক। এতক্ষণ ধূমপানে ব্যতিব্যস্ত ছিলুম,—সময়টা অমন পত্রখানা হাতে নেওয়ার উপযুক্ত ছিল না, যেহেতু আমার বন্ধুপত্নী হলেও বন্ধুর প্রিয়া—কাজেই বন্ধু তার প্রিয়ার পত্র নোংরা হাতে কখনই দিত না। সেই জন্যে—ওই সময়টা কাটানোর জন্যে অগত্যা শীত গ্রীষ্মের অবতারণা করতে হয়েছিল। এবার দাও দেখি,—নিশ্চিন্ত হয়ে একটু পড়া যাক।"

সত্য যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "চিঠি কি রকম?"

প্রকাশ তাহাকে একটা মিঠা গোছের ধাক্কা দিয়া বলিল, "আর নেকামোর দরকার নেই। আজ কলেজে যাওয়ার সময় সেই পত্রখানা যে তোমার হস্তগত হয়েছে সে প্রমাণ আমি বেশ দিতে পারি। তার পর আমার চোখ দুটোকে তো অবিশ্বাসী বলা চলবে না; কারণ এ বেচারা তোমার হাতেই পত্রখানা দেখেছে, আবার চটপট করে লুকোতেও দেখেছে। পত্রখানা লুকিয়ে রেখে দিয়েই বা কি ফল হবে? এমন নয় যে তোমার প্রিয়ার পত্র তুমি

আমায় কখনও দেখাওনি, বা আমার পত্র আমি তোমায় কখনও দেখাইনি। অতএব—কি রকম কথাটা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি সেখানা আমার হাতে দিয়ে ফেল, আমি একবার দেখে নিই। এ আমি ঠিক জানি, আমার পত্রে যাও বা দুটো চারটে বেফাঁস কথা থাকে, তোমার পত্রে তাও নেই। একেবারে খোলা পত্র যারে বলে, তোমার পত্র তাই-ই। এ রকম পত্রকে—'প্রিয়ার চিঠি' নামে অভিহিত করা যায় না; কারণ, না আছে উচ্ছ্বাস, না আছে ভাবের ঝঙ্কার,—কিছু নেই। আছে শুধু সেই মামুলী ধারার 'তুমি কেমন আছ', 'আমি ভাল আছি'—এই কথা দুটো। ওতে কেবলমাত্র তার স্মৃতিটা তোমার মনে জাগিয়ে তুলে অতীতকে ভেবে তুমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পার,—পত্র পেয়েছ বলে নয়।"

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সত্য বলিল, "তোমার কথা যথার্থ। পত্রের মধ্যে এমন কিছুই নূতন গোছের থাকে না, যাতে প্রাণটাকে মাতিয়ে তুলতে পারে। প্রাণ মেতে উঠে অতীতের স্মৃতিতেই বটে। এই নাও পত্র, পড়ে দেখ।"

প্রকাশ পত্রখানা হাতে লইয়া, আড়ে আড়ে তাহার মুখখানার পানে তাকাইয়া বলিল, "মুখখানা একেবারেই বিবর্ণ হয়ে উঠল। মনে এতদূর দুঃখ করো না ভাই—তোমার মত অদৃষ্ট অনেকেরই আছে, তোমার শুধু একার নয়। এই পত্র? এই দুটো নিতান্ত আবশ্যকীয় চিরন্তন কথা দেখাতে তোমার এত আপত্তি ছিল? ফুঃ, আমি হলে এমন পত্র দেয়ালের গায়ে আঠা দিয়ে বসিয়ে রাখতুম,—আর যারা পত্র দেখার জন্তে বিরক্ত করে মারে, তারা ঘরে ঢুকতেই আগে তাদের চোখে পড়ে যেত।"

সত্য বিব্রত হইয়া শুধু বলিল, "তা তুমি পারো।"

প্রকাশ পত্রখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "নাও, বাক্সে বন্ধ করে রাখো গিয়ে. বাইরে ফেল না—শেষে আবার কেউ চুরি করবে। আমার আবার যে রকম স্বভাব ভাই,—এই বোর্ডিংটায় তো প্রবাদই আছে—আমি না কি বিবাহিত ছেলেদের বাক্স হতে পত্র চুরি করে পড়ি। যতদিন তোমার বিয়ে হয় নি, ততদিন তোমার দিকে মোটেই চোখ পড়ে নি। তোমার বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত—কে জানে কেন, তোমার বাক্সটা আমায় বড়ই আকর্ষণ করে। যাক, এই সামান্ত পত্রখানা পেয়ে এতটা ভাবনা তোমার কিসের বল তো?"

সত্য একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সামান্ত বলেই তো ভাবছি। আমি—শুধু আমি কেন, আজকাল-কার কোন ছেলেই এমন সেকেলে ধরণের পত্র পছন্দ করে না। এখনকার দিনে সবাই চায় একটু নূতন গোছের। সেকালের সেই বুড়োদের মত একঘেয়ে জীবন-যাপন করতে কেউ চায় কি?"

প্রকাশ বামচক্ষুটা একেবারে মুদ্রিত করিয়া ফেলিয়া, দক্ষিণ চক্ষুটা সঙ্কুচিত করিয়া বন্ধুর পানে চাহিল—"অর্থাৎ তুমি চাও না সে তোমায় এমন করে পত্র লেখে? তুমি চাও জীবনটাকে একটা নূতন পথে বেয়ে নিয়ে যেতে, অর্থাৎ জীবনটাকে একটা নভেল তৈরি করতে,—তার নায়ক হবে তুমি, আর নায়িকা হবে তোমার স্ত্রী। নভেলের নায়িকার মত সে চাঁদের আলো খাবে, ফুলের গন্ধ ঘ্রাণ নেবে, আর বসন্ত বাতাসে তার লঘু মনটা ভেসে বেড়াবে। তোমার বিরহে তার বুকটা যে ব্যথায় ভরে উঠবে, সেই ব্যথাকে সে কথায় পরিবর্ত্তিত করে নিত্য তোমার কাছে পত্রে জানাবে, কেমন?"

সত্য হাসিল, বলিল, "না, অতদূর নয়।"

উত্তেজিত প্রকাশ বলিল, "অতদূর নয় কি, তবে কতটা উঠাতে চাও বল? দেখছি, আজকালকার নভেলগুলো পড়ে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। তুমি আর নিজের স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী রূপে পেতে চাও না, চাও বিলাস-সঙ্গিনী রূপে—বাঃ, বেশ। দাও দেশালাইটা, আর একটা সিগারেট খাওয়া যাক।"

সিগারেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে সে বলিল, "কিন্তু ওটা কিছুই নয়, বুঝলে? আমার মতে—পাখীর গান, ফুলের সুবাস, মৃদু বাতাসের কম্পনে দারুণ বিরহ—গুলো না জানালেই ভাল হয়। ও সব কবিত্ব চলতে পারে কবিতায়—ও সব ভাব ঢালতে পারা যায় নভেলে। বাস্তব জীবনে বড় একটা খাটে না, বিশেষ আমাদের মত সামান্য অবস্থাপন্ন লোকেদের ঘরে। যাদের ঘরে দাসী চাকর আছে, যাদের রান্নাঘরে ঢুকতে হয় না, ছেলেপুলে মানুষ করতে হয় না,—ও সব তাদেরই মানায় ভাই। দেখ, সত্যি কথা বলছি বলে রাগ কর না। স্বামীর

পড়ার খরচ চালাবার জন্তে যারা গায়ের গহনা খুলে দেয়, বুড়ো শ্বশুরের সেবায় যে এতটুকু সময় পায় না, তার এ সব নিয়ে আত্মহারা হতে গেলে চলে না। এরা এ সব করবে কখন? সারাটা দিন ভূতের মত খেটে যাচ্ছে, রাত্রে সকলকে খাইয়ে শুইয়ে তখন তার একটু অবকাশ, সে তখন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে—না এই সব ভাববে? বিয়ে যখন করেছিলে—একটু ভেবে-চিন্তে করলে হতো। বড়লোকের ঘরে করলে হতো ভাল,—ঠিক তোমার কল্পনার উপযুক্ত পত্র পেতে—এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

উচিতমত কথা পাইয়া সত্য চুপ করিয়া গেল। একটু পরে বলিল, "অতটা বাড়াবাড়ি না হলেও সামান্ত রকম শিখানো ত যায়। সত্যি—ভারি কষ্ট বোধ হয় যখন আমার একটা কথা সে বুঝতে পারে না, শুধু মুখের পানে চেয়ে হাসে। দেখ তো সামনের বাড়ীর ওই মেয়েটীর পানে তাকিয়ে, যে ওকে বিয়ে করবে যথার্থই সে কি সৌভাগ্যবান নয়?"

উদ্ধতভাবে প্রকাশ বলিল, "থামো, ও দিকে তাকিয়ো না বলছি, জানালাটা বন্ধ করে রেখো। তা হলে নিজের স্ত্রীর ক্রটীটা চোখে পড়বে না। যখন নলিনীর বাপ তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন, তখন তাকে বিয়ে করলেই পারতে! কেন বাপের কথা শুনে জেনেশুনে এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটীকে বিয়ে করলে? আজকালকার শিক্ষার দোষ এই—বাহিরটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাও, ভেতরটা দেখতে চাও না। মনে কর—তোমার স্ত্রীর কাছে যা পেয়েছ—এদের কাছে তা পেতে?"

সত্য একটু উষ্ণ হইয়া উঠিল, "সেই লজ্জানম্র ভাব? আমি তা চাইনে প্রকাশ। চিরটা কাল নূতন বউয়ের মত যে ঘোমটা টেনে পালানো, এটা সাজে তোমার বর্ণিত অশিক্ষিতা এই গ্রাম্য মেয়েদের। শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে অনাবশুক এই অতিরিক্ত লজ্জার আড়ম্বর নেই। আমি ঠিক তেমনিটী চাই—নলিনী যেমন ছিল। এক-একবার ভাবি—আমি অনেকখানি ত্যাগ করে দেবীকে পেয়েছি। যদি সে আমার এই ত্যাগের মূল্য একটীবার বুঝে—অন্ততঃ একটুখানির জন্তেও আমার কল্পনানুযায়ী চলবার চেষ্টা করত। আমি তাকে এইটী বুঝাতে চাই—সে আমার ত্যাগ অন্তর দিয়ে অনুভব করে চেতনা পাক, সম্পূর্ণা নারী না হতে পারুক, চেষ্টা করলে অর্দ্ধেকও হতে পারে তো, অর্থাৎ সব সময়ে আমি তাকে আমার সঙ্গিনীরূপে না পেলেও অধিকাংশ সময় পাব তো?"

প্রাণপণে সিগারেটটার একটা টান দিয়া অবশিষ্টাংশ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে প্রকাশ বলিল, "তাই বটে, অর্থাৎ তুমি তাকে তার নিভৃত স্থানটী হতে ঠেলে নিয়ে আসবে! তাকে সর্ব্বতোভাবে তোমার আদর্শ—অর্থাৎ একটী বিলাসিনী নারী রূপে গড়ে তুলতে চাও, এই তো? আমার কথা আমি বলি শোনো,—তোমার স্ত্রী যেখানে আছে, তাকে সেইখানে থাকতে দাও। তুমি যাকে উন্নতি বলতে চাও—আমি তোমার মুখের ওপর স্পষ্ট বলছি, সে উন্নতি নয়, অবনতি। তুমি বাহ্য দৃষ্টে যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছ, ভাল বলেছ,—আমি ভেতর পর্য্যন্ত দেখে তাকে ঘৃণা করছি, তাকে মন্দ বলছি। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার স্ত্রীকে এখনই তোমার মতে চলতে বাধ্য করতে পার; কারণ, সে হিন্দুর ঘরের অশিক্ষিতা মেয়ে, স্বামীকে একমাত্র দেবতা বলে জানে। তাই স্বামীর আদেশে যে কোন কাজ করতে পারে—যে কোনও পথে চলতে পারে। কিন্তু মনে করো সত্য—তোমার বাপ আছেন, যাঁর কথা রাখতে তুমি নলিনীকে কাছে পেয়েও পাওনি। কতকাল তিনি বাঁচবেন তার ঠিক নেই। এই শেষ সময়টায় তাঁকে অসুস্থ করা তোমার কোন মতেই উচিত হবে না।"

সত্য একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমিও মনে করো প্রকাশ—আমি কতখানি তাঁর জন্তে ত্যাগ করেছি। নিজের জন্তে এতটুকু না রেখে সবটাই তাঁকে ধরে দিয়েছি। আরও ছাড়তে গেলে আমায় যে একেবারেই নিঃস্ব হতে হয়, ভবিষ্যতের জন্তে কিছুমাত্র থাকে না। তুমি ভেব না আমি কিছু ভাবি নি। সব দিক দেখে ভেবে ঠিক করেছি—যা করবার, তা আমায় এই সময়েই করতে হবে, এর পর আর সময় পাব না।"

শান্তকণ্ঠে প্রকাশ বলিল, "কি করবে তুমি?"

সত্য বলিল, "আমি বিলেত যাব।"

অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিয়া প্রকাশ বলিল, "এই মরেছে রে, এরও আর আশা নেই দেখছি।"

সত্য হাসিয়া বলিল, "আশা নেই—যাকে বলে হোপলেস, সাংঘাতিক ব্যারাম তবে ?"

প্রকাশ স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "এ কুবুদ্ধি তোমায় কে দিলে সত্য ?"

সত্য বলিল, "কুবুদ্ধি কিসে ?"

প্রকাশ শান্তকণ্ঠে বলিল, "তুমি আমার গ্রামবাসী, তোমাদের কোন্ কথা জানতে আমার বাকি আছে বল ? একজন বিলেত গিয়ে খাঁটি সাহেব হয়ে ফিরে এসেছে,—বুড়ো বাপের সে ছেলে থেকেও নেই। একটীমাত্র ছেলে এখন তুমি, তাঁর দুটি চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি এখন তোমার ওপর ন্যস্ত। মনে ভেবে দেখ, তোমাকেও যদি তাঁকে এই রকমে হারাতে হয়, তার বেশী দুঃখ তাঁর আর আছে কি না। আমার মত যদি নিতে চাও সত্য, তবে বিলেতে যেয়ো না। সেখানে গিয়ে কিছু চতুর্ভুজ হয়ে ফিরবে না,—গায়ের রংটা পর্য্যন্ত বদলাবে না। দেশের ছেলে দেশে থাকো, অন্ততঃপক্ষে বাপ যত দিন আছেন। তারপর—যদি ইচ্ছা হয়, তোমার দাদা যেমন স্ত্রীসহ বিলেত গিয়ে সভ্য হয়ে এসেছেন, তুমিও তেমনি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেয়ো, তাকেও সভ্য করে এনো।"

সত্য একটু থামিয়া বলিল, "তোমার আগেকার কথাগুলো যথার্থ—আমিও তা অস্বীকার করছিনে প্রকাশ। তবে আমারও কয়েকটী কথা আছে,—একে একে বলছি, শোনো। প্রথম—আমার জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত বেশী। এখানে এই শিক্ষায় আমার দারুণ পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আমি তাই বেশী করে শিক্ষার জন্যে বিলেত যেতে চাই। যদি কোন রকমে যেতে পারি—মনে করো না, আমার বুকে ব্যথা বাজবে না, কেন না, জগতে যারা আমার প্রিয়তম, আমি সেই স্নেহময় বাপ, বোন, স্ত্রী,—এই সোণার বাংলা ছেড়ে যাব। ভাবতে বসে বড় ব্যথা বাজে—জগতে যারা আমার—তাদের ছেড়ে আমায় থাকতে হবে কোথায়—কত দূরে! সেখানে আমি যদি শেষ শয্যাতে শুই,—কোনও আত্মীয়ের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাব না,—কারও ব্যগ্র ব্যাকুল চোখ দুটি সর্ব্বদা আমার মুখের ওপর পড়ে থাকবে না। তবু আমি যেতে চাই। তার কারণ, এই সময় আমার বুকে যে অদম্য পিপাসা জেগেছে, এর পর আর তা থাকবে না। কে বলতে পারে—এর পরে দেশ ছেড়ে দু'পা যেতে গেলে আমার বুকে ব্যথা বাজবে না ? তুমি বলছ আমার বাপ কিছু চিরকাল থাকবেন না—তখন আমি সহজেই যেতে পারব। কিন্তু ধরে রাখ—দশ পনের বছর। তখন ঘর ছেলে-মেয়েতে ভরে যাবে, এক পা নড়বার ক্ষমতা থাকবে না, তাদেরই অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের চেষ্টায় দিন আমার কাটবে। কোথায় যাবে তখন জ্ঞানের জন্যে সুদূর ইয়োরোপে যাওয়ার এই চেষ্টা ? আমার ইচ্ছা ক্রমে স্বপ্নেই মিশিয়ে যাবে মাত্র। তখন অতীতের পানে চেয়ে আমায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলতে হবে—"পেয়েছিলুম, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি।"

প্রকাশ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া ছিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি তোমায় বাধা দেব না। জানি মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপর্য্যাপ্ত। এর শেষ যে হয় না, তার প্রমাণ তুমিও দিও। তোমায় বাধা দিতে গেলে তোমার বাসনা আরও বেড়েই উঠবে মাত্র! এর পর তুমি ভাববে, আমি হিংসার তাড়নায় তোমায় বাধা দিতে গিয়েছিলুম। তুমি বিলেত যাবে, ফিরে এসে তোমার স্ত্রীকে তোমার বউদির মত করে তুলবে, এই তোমার ইচ্ছা। কিন্তু এ যে সহজে পারবে, তা আমার বোধ হয় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহে ভুলে তুমি তোমার আজন্মের সংস্কার উড়িয়ে দিতে পারবে;—মেয়েরা যে সহজে পারবে, তা আমার বোধ হয় না। তোমার স্ত্রী যে সহজেই পারবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু তা নিয়ে আমি আর কথা বলব না। কেন না, আমি তার বাহ্যিক চেহারাটাই দেখেছি মাত্র,—মেয়েদের অন্তরের পরিচয় আমি পাই নি। তুমি কয়েক বছর পরে ফিরে আসবে, তোমার বাপ যদি তখন বেঁচে থাকেন—তোমায় গ্রহণ করবেন তো ?"

সত্য উত্তর দিল, "সেটা যখনকার কথা তখন হবে। এখন ও-সব কথা ভাবলে আমার উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে।"

প্রকাশ বলিল, "যথার্থ বীরের যোগ্য কাজ। বাড়ীতে খবর দেবে তো ?"

সত্য বলিল, "আমি ভেবেছি তোমায় দিয়ে খবর দেব।"

অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া প্রকাশ বলিল, "আমার ঘাড়ে কেন ? তোমার দেশবাসী বলে আমি যেন চোর হয়েছি;

তাই এই মর্ম্মান্তিক কথাটা আমিই বয়ে নিয়ে যাব তাঁদের কাছে? আমি এ খবর তাঁদের গিয়ে দিতে পারবই না। তোমার খুসী হয়, তুমি যে কোন রকমে তাঁদের জানাতে পার।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "তার পর, বিলেত যাওয়ার খরচ, সেখানকার থাকা খাওয়া পোষাকের সব খরচ তুমি পাচ্ছ কোথা হতে? তোমার দাদা যেন বড় ঘরের একটী মাত্র মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত বেড়িয়ে এলেন,—তোমার তো সে উপায় নেই।"

সত্য একটু হাসিল,—উঠিয়া একখানা পত্র আনিয়া সে প্রকাশের সম্মুখে ধরিল।

প্রকাশ পত্রখানার উপর চোখ বুলাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, সুখী হয়েছি, এমন সুযোগ থাকতে হারাবে কেন? তোমার দাদা যে তোমায় যথার্থ শিক্ষিত করার ভার নিচ্ছেন, এতে তাঁর অসীম ভ্রাতৃ-স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এর এতটুকু যদি হতভাগ্য বুড়ো বাপটা পেতেন,—যাক, উঠি তবে, আর বসব না।"

গম্ভীর মুখে উঠিয়া সে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শিল্পের শিক্ষানবীশি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-আই-ই-ই

সুদীর্ঘ শত সহস্র বৎসরের কর্ম্ম-কোলাহল-ক্লান্ত জাতির পক্ষে একটা সুপ্তির অবসাদ স্বভাবতঃই আসে; আবার দীর্ঘ শতাব্দীর অবসাদের পর সেই জাতিরই সুপ্তির ঘোর ভেঙ্গে যায়,—এমন উদাহরণও স্বাভাবিক। জগতের নজর এখন ক্রমশই ভারতের ওপর পড়ছে। সবাই সোৎফুল্ল-লোচনে দেখছে যে কৃষি-প্রধান ভারত এখন শিল্প-পথে শনৈঃ অগ্রসর হবার জন্য অপরিসীম চেষ্টায় ব্যাপৃত।

যে ভারত এক দিন ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরের শাল-দোশালা, কাশীর পিত্তল দ্রব্য-সামগ্রী থাইবার বা সমুদ্র-পথে প্রেরণ করে' দিগ্‌বিদিকে বিস্ময়ের পুলক-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং আজও করে; যে ভারতের কুতুব-সন্নিকট-বর্ত্তী অশোক-স্তম্ভ যুগযুগান্ত ধরে শীত, আতপ, বর্ষা অগ্রাহ্য করে অক্ষত শরীরে আজও বর্ত্তমান; যে ভারতের অজান্তা ও এলোরা-গুহা-গর্ভস্থ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, মন্দিরাদি হিন্দুযুগের শিল্পকলা, স্থাপত্যের অপরূপ নিদর্শন সৃষ্টি করেছে; যে ভারতের তাজের আকর্ষণ জগতের সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট, সে ভারতের পক্ষে দীর্ঘ শত সহস্র শতাব্দীর সুপ্তির ঘোর কাটিয়ে, আবার নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জগতে সবায়েরই সঙ্গে সমান ভাবে এগিয়ে চলবার আকাঙ্ক্ষা যে আজ আসতে সুরু করেছে, তা একটুও বিচিত্র নয়।

ভারতের কৃষি, খনি-সম্পদ ও জনবল যে এক দিন ভারতকে অন্য সকলের সমকক্ষ করবেই, তা অভ্রান্ত সত্য কিন্তু এ উদ্দেশ্যে আমাদের যে কর্ম্মি-সঙ্ঘ আবশ্যক তাদে কি ভাবে তৈরি হতে হবে, তারি একটু আলোচনা করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে সকল দেশেই প্রথা ছিল যে, সাধারণ ভাবে কাে প্রবেশ করে মজুর, মিস্ত্রী, সদ্দার মিস্ত্রী ইত্যাদি অবস্থ অতিক্রম করে ক্রমে লোক ওস্তাদ-কারিগর রূপে পরিগণি হোত। কিন্তু এখনকার এই শিল্পকলা-কারিগরি বৈজ্ঞানিক যুগে নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, যাতে ক কাজের নানা সুব্যবস্থা, অল্পখরচে অধিক কাজ আদা করা, কর্ম্মী-সঙ্ঘের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যা বিষয়ের সহজ-সাধ্য খুঁটিনাটি জ্ঞানগুলি অল্পায়াসেই আয় করতে পারা যায়। এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলি তাহার প্রধা সোপান। তথায় আমাদের ছাত্রগণ যে ভাবে শিক্ষাগ্রহ করে আসে, তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়।

আমি নিজে বহুকাল ধরে কলকারখানার কাযের স ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ থাকায়, এই শ্রেণীর ছাত্রগণের সহি বিশেষ ভাবে পরিচিত। এরূপ অসংখ্য যুবকের সংস্প অবিরত আমাকে আসতে হয়। তাদের খুঁটিনাটি, ছোটব ভালমন্দ নানা অভিমত আমি সদা সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ ক থাকি। বরাবরই আমি লক্ষ্য করে আসছি যে, এঞ্জিনিয়া

স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে তারা মনে করে যে, যে কোন বড় একটা প্রতিষ্ঠানের ভার তারা গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষানবীশ অবস্থাতেও এ ভাব তাদের কাটে না; নানারূপ অসন্তোষের ভাব তারা সর্ব্বদা প্রকাশ করে; যথা—তাদের যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, কেউ তাদের গুণাবলি যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করে না, গুরুভার দায়িত্ব তাদের ওপর দেওয়া হয় না, নানা অবিচার তাদের প্রতি করা হয়; ইত্যাদি। ক্রমশঃ তাদের বিরক্তি এত বেশী হয় যে, শেষে তারা সেখানকার কাযে ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র কাযের সন্ধান করে বা জুটিয়ে নেয়। বলা বাহুল্য সেখানেও তারা পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই অভিনয় কোরে পুনরায় তৃতীয় স্থানে কাযের যোগাড় করে।

এই ভাবে কিছু দিনের মধ্যে তারা ক্রমশঃ বুঝতে অভ্যস্ত হয় যে, তাদের নিজেদের সম্বন্ধে যে ধারণা এত দিন ধ'রে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, তা ঠিক নয়। বাল্য ও ছাত্র-জীবনে অনেক আকাশ-কুসুম তারা রচনা করে; কারণ, ব্যবহারিক জ্ঞানের ধার সে সময় তারা অতি অল্পই ধারে। তার পর কার্য্যক্ষেত্রে এসে এই ভাবে কয়েক স্থান ঘুরে বা উপর্য্যুপরি কয়েকটা ধাক্কা সামলে, তার পর সাধারণতঃ তারা ধাতস্থ হয়। অবশ্য সকলেই যে এরূপ তা নয়। অনেককে আবার দেখেছি যে যেমনটি হওয়া দরকার তারা ঠিক তেমনটিই হয়। এতে কাযের সুবিধা এত বেশী হয় যে, আমি তাদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে থাকি। তবে এ কথা ঠিক যে, পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা একত্রীভূত না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই এটা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বিলাতের ও ভারতের এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ও কলকারখানায় এবং বর্ত্তমানে টাটার বিখ্যাত সুবৃহৎ লোহার কারখানায় প্রতি-নিয়তই এ-সব ব্যাপারের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে ও হচ্ছে। এজন্য আমি এ সম্বন্ধে দুচার কথার অবতারণা করতে সাহসী হয়েছি।

স্কুলে কলেজে অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কারখানা বা লেবোরেটরিতে ছাত্রেরা যে ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তার চেয়ে কারখানার একজন সাধারণ কারিগর অনেক বিষয়েই অনেকাংশে ব্যুৎপন্ন ও কর্ম্মঠ হয়, এরূপ দেখতে পাওয়া যায়। আমি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে আসছি যে, কার্য্যক্ষেত্রে এসে ছেলেদের ঠিক যেমন হওয়া উচিত—স্কুলে তাদের ঠিক তেমনি ভাবে তৈরি করতে কিছুতেই পারা যায় না। কারখানায় আর একটা বিষয় আছে, যাকে "সংস্পর্শ" বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে সাধারণতঃ তাকে atmosphere বলে।

আমার মতে আমাদের দেশের যুবকদের এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের শিক্ষা শেষ করার পর কিছু দিন—অন্ততঃ দুচার বৎসর, কোন বড় কারখানায় এই সংস্পর্শে শিক্ষানবীশি করা উচিত। এতে শুধু যে তারা নানাশ্রেণীর কারিগরের সংস্পর্শে আসবে তা নয়, সেই সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়তা-কল্পে উন্নত প্রণালীতে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করবার উপায় আয়ত্ত করবে। এই শিক্ষানবীশি অবস্থায় তাদের এরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা আবশ্যক যা অনায়াসে বিক্রীত হতে পারে; এবং বিক্রয় প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। কলকজার বা কারখানার নক্সা এরূপ ভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে তা কার্য্যকারী বা সম্পূর্ণ ব্যবহারিক হয়; কলকজা বা কারখানার বিভিন্ন অংশ যথাযথ স্থানে সংস্থাপিত করবার বিশেষ কৌশল; দ্রব্যাদির সরবরাহ সম্বন্ধীয় চুক্তি-পত্রের বিচার (drafting contracts) এবং লোকজন খাটাবার বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী, বিশেষভাবে তাদের এসব স্থান থেকেই আয়ত্ত করে নিতে হবে। কারণ এই সকল বিষয়ে শিক্ষানবীশির জন্যই তারা তথায় উপস্থিত হয়েছে। তার পর পূর্ণ দায়িত্বের শিক্ষাও তারা এ স্থানে গ্রহণ করবে। তাদের সেখানে মনে রাখতে হবে যে তারা আর তখন কলেজের বা লেবোরেটরির ছাত্র নয়, যে, কোনরূপ গলদ হলে ব্যক্তিগত ভাবে তাদের ওপর দায়িত্বের তত বেশী আরোপ হবে না। তাদের মনে রাখতে হবে যে, কর্ম্মক্ষেত্রে এই তাদের গোড়া-পত্তন। এই গোড়া-পত্তনের ওপরেই তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে।

আমাদের দেশের টেকনিক্যাল স্কুলগুলি আমার মতে, যেরূপ দরকার, ঠিক সেরূপ শিক্ষা দেয় না, বা সেরূপ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সে সব স্কুলে নেই। সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে ছাত্রেরা বড় জোর কারিগর (mechanic) বা electrician হতে পারে; এবং কিছু কিছু নক্সাও শিক্ষা করে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এঞ্জিনিয়ার হবার কোন সুযোগই তারা তথায় পায় না। আমার মতে তাদের সে

শিক্ষা পাওয়া তো উচিতই ; আর সেই সঙ্গে দেখা উচিত—যাতে তারা কেবলমাত্র সহকারীর কাজগুলিরই অধিকারী না হয়ে ভবিষ্যতে দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীন কাজগুলিরও অধিকারী হয়।

বর্ত্তমান প্রণালীর এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা,—সময় নষ্ট, পণ্ডশ্রম, ও অর্থের অনাবশ্যক অপব্যবহার ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই নয়। শুধু তা নয়। তাকে 'ভয়াবহ'ও বলা যেতে পারে। কারণ, এর দ্বারা শুধু যে আমাদেরি ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ মনকে চোখ ঠারা হয় তাই নয়,—সেই সঙ্গে আমরা আমাদের সমাজ ও দেশকে ফাঁকি দিচ্ছি। তাই আমি এরূপ শিক্ষা-প্রণালীকে অপরাধ বলেই মনে করি ; ও দেশের নেতা ও শিক্ষা-মন্ত্রিগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

এ বিষয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে তিনটী বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে—

১ম—প্রাথমিক ও সাধারণ শিক্ষা।

২য়—কারিগরী শিক্ষা।

৩য়—ব্যবহারিক শিক্ষা।

অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসায় গ্রহণ করতে হলে যেমন মোটা-মুটি সাধারণ শিক্ষা পেতে হয়, এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাতেও সেরূপ পাওয়া উচিত। আমাদের দেশের আই-এস্‌সি পাশ করা ছাত্রেরা এ বিষয়ে উপযোগী। অবশ্য যারা কেবলমাত্র কারিগর হতে চায়, তাদের জন্য আমি এ কথা বলছি না,—তারা মোটা-মুটি কিছু শিখেই এ সব কাযের শিক্ষানবীশি করতে পারে। আমি যা বলছি, তা' যারা এঞ্জিনিয়ার হতে চায় তাদের জন্য। আমি এ স্থলে এঞ্জিনিয়ার শব্দ ব্যবসায় ও বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রের এঞ্জিনিয়ার অর্থে প্রয়োগ করেছি। অনেকের ধারণা—এঞ্জিন হতেই এঞ্জিনিয়ার শব্দের উৎপত্তি ও এই কারণে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কি তাই ? সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপযোগী কারিগরী বিদ্যায় সুনিপুণ কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণকেই এঞ্জিনিয়ার বলে অভিহিত করা যায়।

এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের স্কুলসমূহের ব্যবস্থা (১) চারি বৎসর-ব্যাপী শিক্ষা,—এক সপ্তাহ স্কুল ও এক সপ্তাহ বাহিরের কায অথবা প্রাতে স্কুল ও সকালে ও বৈকালে বাহিরে কায ; (২) চারি বৎসরের মধ্যে একটানা ছয়মাস করে পূর্ব্বোক্ত ভাবের শিক্ষা। কিন্তু এ শিক্ষায়, যে ছয়মাস বাহিরের কায শিক্ষা করতে হয়, তার মধ্যে রীতিমত শিক্ষানবীশিও করতে হয়। এই শেষোক্ত পদ্ধতি বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু দিন থেকে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ স্কুলে প্রথমোক্ত প্রথাই অনুসৃত হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় দুটী জিনিষের মুখ্য প্রয়োজন ; ১ম—আবশ্যক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষা, ও ২য়—ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। এ দুটীর প্রতি যথাবশ্যক মনোনিবেশ না করলে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও ভবিষ্যতে বড় এঞ্জিনিয়ার হওয়ার পথ রুদ্ধ হওয়া।

আমাদের দেশের যে সকল যুবক বিলাতে বা আমেরিকায় এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য যেতে চান, আমি তাঁদের উপরিউক্ত বিষয়গুলির ওপর দৃষ্টি রাখিতে বলি ; কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই আমি দেখেছি যে, তাঁদের মধ্যে ডিগ্রী নেবার আগ্রহ যাদৃশ বলবান, ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের আগ্রহ তাদৃশ নয়। আমাদের দেশের অনেক ছাত্র ওদেশে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করে ডিগ্রী নিয়ে আসেন ; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরিচয় অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। অনেকে আবার এই সব বিষয় শুনে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার জন্য course গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তা হয় ফিরে আসবার আগে ২।৪ মাসের জন্য, না হয় তো কলেজের অবকাশ কাল মাত্রের জন্য। বলা বাহুল্য, ইহার কোনটীতেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যেতে পারে না। পক্ষান্তরে যে সব ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য সে দেশে অন্ততঃ তিন বৎসরের course গ্রহণ করেন, তাঁরা দেশে ফিরে এসে প্রায়শঃই তাঁদের দক্ষতা সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয় ত পরীক্ষায় উত্তম স্থান অধিকার করেন নি, কিন্তু এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তাঁরা প্রায়ই যশস্বী এঞ্জিনিয়ার বলে পরিগণিত হন। এই সব কারণে আমি বিলাত-আমেরিকা গমনোদ্যত ছাত্রগণকে উপদেশ দিই যে, তাঁরা যেন অন্ততঃ পাঁচ বৎসর অর্থাৎ তিন বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও অপর দুই বৎসর কোন কারখানায় হাতে-কলমে কায শিখবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যান।

আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টর যদি তাদের বৃত্তি-প্রদান-কালের মেয়াদ বাড়াতে না পারেন, তবে এ দেশের

টেক্‌নিক্যাল স্কুলসমূহ থেকে উপযুক্ত ছাত্রদের কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্যই বিলাত পাঠান গবর্ণমেণ্টের উচিত। এরূপ ব্যবস্থা হ'লে আমরা এ দেশের বড় বড় কারখানাসমূহে উপযুক্ত দেশীয় এঞ্জিনিয়ার পেতে পারি।

ভারতে বর্ত্তমান প্রণালীর এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায়, বিক্রয়ের জন্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা পরিচালন-ক্ষমতা লাভার্থ আবশ্যক জ্ঞান অর্জ্জন, এ দেশের স্কুলসমূহে সম্ভব নয়। কি করে এ-সব দ্রব্য সঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে, চুল-চেরা সময় ধরে, দামের পরিমাণ করে, এবং চারিদিকে অন্য সকল প্রকার আবশ্যক নীতির অনুসরণ করে তৈরি হতে পারে, তা কেবল তৎ তৎ দ্রব্যাদির কারখানায়ই শিক্ষা করা যেতে পারে। এ বিষয়টার প্রতি আমাদের পূর্ণ লক্ষ্য রাখা উচিত, এবং ছাত্রগণকে তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর বড় বড় কারখানায় যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রথায় হাতে-কলমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করে পাকা এঞ্জিনিয়ার হবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

কিন্তু কাযটী খুব সহজ নয়। তাই এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের ও অন্যান্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত যে, তাঁরা বিভিন্ন দ্রব্যাদির কারখানা, রেল-কারখানা, পাওয়ার-ষ্টেসন প্রভৃতির মালিকদিগের সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করেন, যাতে তাঁদের ছাত্রেরা ঐ সব কারখানায় কায শিখতে পারে ও পরীক্ষার পর যোগ্যতা অনুসারে certificate পায়, এবং সেই সঙ্গে শিক্ষানবীশ অবস্থায় তাদের খাওয়া-পরা চলে এরূপ বৃত্তিও পায়।

ছেলেরা কিরূপ শিক্ষা লাভ করে তা দেখবার জন্য কারখানার ম্যানেজার ও যে সব স্কুল থেকে ছেলেরা এসেছে সেই স্কুলের শিক্ষক অথবা উপযুক্ত অন্য কোন শিক্ষককে ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক।

এরূপ ব্যবস্থায় ছেলেরা বুঝতে পারবে যে, পরে যখন তাদের প্রকৃত পক্ষে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে, তখন তাদের কি ভাবে চলতে হবে। তারা আরও বুঝবে যে, সে সব কারখানায় মুখস্থ করা বিদ্যায় কোনই ফল হবে না। সেখানে শুধু কৃতিত্বের দরকার! এইখান থেকেই অনেকে বুঝে নিতে পারবে যে, বাস্তবিকপক্ষে কি দরকার; এবং অনেকে হয় ত এইখান থেকেই ইস্তফাও দিবে। তাতে সুবিধা তাদের নিজেদের এবং তাদের ভাবী মনিব যাঁরা হবেন তাঁদের উভয়েরই। কারণ, সে মনিবদের বিরক্ত করবে না, আর মনিবদেরও তাকে নিয়ে বিব্রত হতে হবে না।

আমাদের দেশে 'এঞ্জিনিয়ার' অর্থে লোকে সাধারণতঃ বিশেষ একটা কিছু বুঝতে পারে না,—মোটামুটি ঠিক করে নেয় যে রাস্তায় মাটী ফেলা অথবা ড্রেন বা বাড়ী মেরামত বা নির্ম্মাণ করবার কর্ম্মচারী। মেক্যানিকেল এঞ্জিনিয়ার অর্থে তারা সাধারণতঃ ষ্টিম এঞ্জিন ও বয়লার মেরামত করা ও পরিচালন কার্য্যের উপযুক্ত লোক মনে করে। আর ইলেকট্রিকেল এঞ্জিনিয়ার অর্থে পাখা ও আলো মেরামতের উপযুক্ত লোক বুঝে নেয়। অনেক কাল আগে অন্যান্য দেশের লোকও এইরূপই মনে করত এবং এঞ্জিনিয়ার অর্থে পাণ্ডিত্যহীন কোন এক বিশেষ কারিগরি কাযের উপযুক্ত লোক আন্দাজ করে নিত। কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। এখন অন্যান্য বড় বড় পেশাদার ব্যবসায়ীর মত এঞ্জিনিয়াররাও লোকের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখনকার যুগে প্রতি কাযেই এঞ্জিনিয়ারের সাহায্য আবশ্যক। জগতের প্রত্যেক বৃহৎ কাযেই এঞ্জিনিয়ারদের সুনিপুণ হাতের ছাপ লেগে রয়েছে।

এঞ্জিনিয়ারের সাহায্য ছাড়া এখন আর কোন জাতি বড় হতে পারে না! কাজেই প্রত্যেক এঞ্জিনিয়ারের এরূপ হওয়া উচিত যে, সে তার এঞ্জিনিয়ার নামের সার্থকতা সম্পাদন করতে পারে। এজন্য তার শিক্ষার পূর্ণতা থাকা তার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হলে, পুঁথিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতেই হবে।

উপন্যাস-কলেজ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্-ল

"সুন্দরী যত হোক্ আর না হোক্, ভাল রকম লেখাপড়া জানা মেয়ে ভিন্ন, আর কাউকে বিয়ে করবো না",—ইহাই ছিল অবিনাশের আকৈশোর প্রতিজ্ঞা। একটি মাত্র ছেলে—পিতা অবিনাশের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণও করিয়াছিলেন। সে ম্যাট্রিকে, আই-এ-তে বৃত্তি পাইয়াছিল, ডবল অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছে, দেশে কিছু বিষয় সম্পত্তিও আছে—এমন সুপাত্র—বিবাহের বাজারে তাহার দর আট হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু সদয়-হৃদয় পিতৃদেব, নগদ ছয় হাজার টাকা লোকসান স্বীকার করিয়া, মাত্র দুই হাজারে সন্তুষ্ট হইয়া, ভবানীপুর নিবাসী, বেসরকারী কলেজের গরীব অধ্যাপক হরকুমার গাঙ্গুলীর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন।

বিশেষ করিয়া সুন্দরী মেয়ে কামনা না করিলেও, প্রজাপতি অবিনাশকে সুন্দরী মেয়েই দিলেন। কনের নাম সুষমা, বয়স ১৬½ বৎসর, এ বৎসর সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে—রেজল্ট এখনও বাহির হয় নাই।

বিবাহ হইল ৫ই আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই হইতে পারিত, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ছেলের বিবাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইতে নাই। অবিনাশের পিতা রাধাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খুলনা জেলার অধিবাসী। পুত্রবিবাহ জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া এক মাসের জন্য শ্যামবাজারে বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন।

ফুলশয্যার রাত্রেই, কনেকে বিশেষভাবে জেরা করিয়া অবিনাশ জানিতে পারিল যে, সে কবিতা লেখে এবং কবিতায় পরিপূর্ণ দুইখানি খাতা ভবানীপুরে তাহার বাক্সমধ্যে আবদ্ধ আছে। শুনিয়া আনন্দে অবিনাশ যেন পাগল হইয়া উঠিল। বলিল, "আসবার সময় খাতা দু'খানি আনলে না কেন সুষু?—আমি দেখতাম!"

নববধূ বলিল, "সে খাতা আমি কি কাউকে দেখাই?"

অবিনাশ বলিল, "কিন্তু আমি কি 'কাউ'?"

কনে বলিল, "তুমি 'কাউ' হবে কেন, তুমি 'বুল্'।"

বধূর এই রহস্যপটুতায় একটা দীনবন্ধু বা ডি-এল রায়ের প্রতিভার সন্ধান পাইয়া অবিনাশ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, "সাধে কি আর আমি শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে কর্‌বো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম?"—কোনও কবিতা যদি মুখস্থ থাকে, তবে তাহাই শুনিবার জন্য অবিনাশ বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কোনও কবিতাই সুষমার মুখস্থ নাই। বরের আগ্রহ ও আক্ষেপ দর্শনে অবশেষে সে আশ্বাস দিল—"আট দিন পরে, আমার সঙ্গে তুমি ত যোড়ে যাবে আমাদের বাড়ী, তখন দেখাব।"

অবিনাশ বলিল, "আট দিন ধৈর্য্য ধরে থাকাই বা যায় কেমন করে?"

২

আটদিন আট রাত্রি অতিবাহিত হইল। উভয়ের আত্মীয়তা, অন্তরঙ্গতা, অভিন্নহৃদয়তা এই আট দিনে এতই বিশাল ও গভীর হইয়াছে যে, অবিনাশের স্থির বিশ্বাস—বোধোদয় কথামালা পড়া কোনও মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে, আট বৎসরেও তাহা হইত কি না সন্দেহ।

আট দিন পরে অবিনাশ "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী গেল। স্ত্রীর লিখিত কবিতা পাঠে তাহার অষ্টাহব্যাপী আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল। কবিতাগুলি পড়িয়া সে এতই প্রশংসা করিতে লাগিল যে বেচারী সুষমা সত্য সত্যই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, "কি বল তুমি তার ঠিক নেই! ভারি ত কবিতা—তারই এত সুখ্যাতি!" অবিনাশ, রবিবাবু কোট করিয়া বলিল, "পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা—জান না নিজে মোহন কি যে তোমার মালিকা!"—অবিনাশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—যত শীঘ্র সম্ভব, কবিতাগুলি পুস্তকাকারে সে ছাপাইয়া ফেলিবে। কলেজ খুলিলেই মেসে বসিয়া স্বহস্তে খাতা নকল করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবে।

পিত্রালয়ে অষ্টাহ, শ্বশুরালয়ে অষ্টাহ—এই ষোড়শ দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল অবিনাশ তাহা ভাল বুঝিতেই পারিল না। অবশেষে বিদায়-রজনী উপস্থিত হইল। গভীর নিশীথে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, পরস্পরের বক্ষে অবিরল অশ্রুজল সেচন ইত্যাদি ইত্যাদি একরকম শেষ হইলে, অবিনাশ বলিল, "তুমি রোজ একখানি ক'রে চিঠি আমায় লিখ্‌বে। নইলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠবে—পড়াশুনো চুলোয় যাবে—আমি ফেল হব।"

সুষমা বলিল, "তা লিখ্‌বো বৈ কি! তুমিও আমায় রোজ একখানি চিঠি লিখবে ত?"

অবিনাশ বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"আর, কি শনিবারে আসবে ত? বাবা ত তোমায় বলেই রেখেছেন,—যাও যাবার সময় তোমায় বলবেন। শনিবার বিকালে আসবে, রবিবার থেকে, সোমবার সকালে উঠে চা-টা খেয়ে মেসে ফিরে যাবে। কেমন, কথা রইল ত?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়!—কিন্তু, অতদিন অতদিন বাদে এক একটিবার দেখা—সহ্য করা শক্ত যে সুষু! মাঝে অন্ততঃ একটি দিন—ধর বুধবার—তোমার মুখখানি আর একবার আমার দেখতে পাওয়া চাই।"

সুষমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কিন্তু তা কি করে হবে?"

অবিনাশ বলিল, "আমি তার একটা উপায় স্থির করেছি। তুমি, প্রতি বুধবারে, বেলা ঠিক ৮টার সময়, তোমাদের ছাদে উঠে, উত্তর-পশ্চিম কোণটায় দাঁড়াবে। আমিও ঠিক সেই সময় হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যাব। যদিও এ বাড়ী গলির ভিতর, কিন্তু হরিশ মুখুয্যের রোড থেকে ছাদের প্রায় আধখানা বেশ দেখা যায় তা জান ত?"

সুষমা বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি! হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যখন বর-টর যায় আমরা ছাদে উঠে দেখি কি না।"—বলিয়া সুষমা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

হাসির কারণ জানিবার জন্য অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুষমা বলিল, "একটা কথা মনে হল তাই হাসলাম।"

"কি কথা—বল—বল।"

"মনে হল, এতদিন ছাদে উঠে পরের বর দেখে মরেছি, এখন নিজের বরটিকে দেখে বাঁচবো। কেবল রোশনাই, বাজনা-বাদ্যি থাকবে না এই যা তফাৎ।"

অবিনাশ, প্রিয়তমার এই রসিকতায়, স্বয়ং কালিদাসের কবিত্ব-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিল। আনন্দ বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া, চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর তোমার ভাব; কি সুন্দর তোমার প্রকাশ-ভঙ্গি! কিন্তু, কেন রোশনাই থাকবে না? চোখে যাদের প্রেমের মাণিক জ্বলছে, তাদের কি রোশনাইয়ের অভাব? হৃদয়ে যাদের স্বর্গের বীণা বাজছে তাদের অন্য বাজনার দরকার কি?"

অবিনাশ শ্বশুরালয় হইতে শ্যামবাজারে পিতামাতার নিকট ফিরিবার দিন-দুই পরেই, তাঁহাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। অবিনাশ কিন্তু বাড়ী যাইবার কোনও উদ্যোগ করিল না। পিতাকে বলিল, "আর মোটে তিন হপ্তা ত আছে কলেজ খুলতে। আবার যাওয়া, আবার আসা, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ বৈ ত নয়! তার চেয়ে বরঞ্চ মেসেই গিয়ে থাকি।"

পুত্রের অন্তরের গোপন অভিপ্রায় জানিয়া, পিতা মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, সেই ভাল। পড়াশুনো বেশ মন দিয়ে কোর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সে আমায় বলতে হবে না। এখন মেস ত প্রায় খালি, পড়াশুনোর বেশ সুবিধে হবে। অনেকটা সেই কারণেও, এখন বাড়ী যেতে চাচ্ছি নে।"—বলিয়া অবিনাশ সরিয়া পড়িল। ভাবিল, বুড়াদের ঠকানো কি সহজ!

৩

পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এ পাঁচ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সুষমা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ হইয়াছে—ইহা ত বিবাহের অল্পদিন পরেরই ঘটনা। অবিনাশ উচ্চ সম্মানের সহিত এম-এ পাস হইয়া, আশুবাবুর কৃপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে। এই সময় তাহার একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করে—কন্যাটি এখন তিন বৎসরের। ভবানীপুরে, শ্বশুরালয়ের অনতিদূরে, একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়া অবিনাশ সস্ত্রীক বাস করিতেছে।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর ফিরিয়া, নিজ কক্ষে বসিয়া

অবিনাশ ডাকিল, "ও বউ, শোন।"—অবিনাশ তার স্ত্রীকে এইরূপই সম্বোধন করিয়া থাকে; শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কিন্তু অবিনাশ তাহা গ্রাহ্য করে না।

"বউ, একটা কথা শুনে যাও।"—

বউ তখন ঝির সাহায্যে রান্নাঘরে বসিয়া রুটি বেলিতেছিল—স্বামীর আহ্বানে উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ঘরে আসিল। দেখিল, স্বামী একখানি খবরের কাগজ নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছেন।

স্ত্রীর পদশব্দে অবিনাশ মুখ তুলিয়া বলিল, "ব্যস্ত ছিলে?"

"রুটি বেলছিলাম।"

"দেরী কত বউ?"

"কেন, ক্ষিদে পেয়েছে? আর আধঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরি হয়ে যাবে।"

"না, ক্ষিদে পায় নি। একটা বিশেষ কথা ছিল,—তা, সব সেরেই তুমি এস।"

"কেন, কি হয়েছে, বল না।"

"সে, একটু সময় লাগবে। তুমি কায সেরে এস, তার পর ধীরে সুস্থে কথাবার্ত্তা হবে।"

স্বামীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সুষমা ভীত হইয়া বলিল, "হ্যাগা, কোনও মন্দ খবর নাকি?"

অবিনাশ ব্যস্তভাবে বলিল "না না কোনও মন্দ খবর নয়—ভাল খবরই। যাও, তুমি কায সেরে এস।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সুষমা চলিয়া গেল।

অবিনাশ আবার সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইয়া, নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিতে লাগিল:—

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

সাহিত্য-সেবাকাঙ্ক্ষীর অপূর্ব্ব সুযোগ

উপন্যাস-কলেজ

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কথা-সাহিত্যের কিরূপ সমাদর তাহা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ যুগটা বিশেষ করিয়া গল্প ও উপন্যাসেরই যুগ বলিতে হইবে। ভাল গল্প, ভাল উপন্যাসের জন্ত প্রকাশকেরা, মাসিক সম্পাদকগণ হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ তাঁহারাই প্রতিদিন, নবীন লেখক লেখিকাগণের রচিত শত শত গল্প ও উপন্যাস, অনুপযুক্ত বোধে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ, লেখক লেখিকাগণ কোনওরূপ ট্রেণিং (তালিম) না পাইয়াই লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। রীতিমত গুরূপদেশ ভিন্ন, কোনও কার্য্যেই দক্ষতা লাভ করা যায় না। দেশের এই মহা অভাব দূর করিবার জন্ত কয়েকজন বিখ্যাত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক মিলিয়া এই "উপন্যাস-কলেজ" সংস্থাপন করিয়াছেন। রীতিমত উপদেশ দিয়া, সাপ্তাহিক এক্সারসাইজ সংশোধন করিয়া শিক্ষার্থিগণকে কথাসাহিত্য-রচনার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলেজে দুইটি বিভাগ আছে—ছাত্র বিভাগ ও ছাত্রী বিভাগ। সোম, বুধ ও শুক্রবারে ছাত্র বিভাগে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে ছাত্রী বিভাগে লেকচারাদি হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভর্ত্তি হইবার ফী ১০৲ এবং মাসিক বেতন ৬৲ টাকা মাত্র। এখনও উভয় বিভাগে কয়েকটী করিয়া সীট খালি আছে—যাঁহাদের প্রয়োজন, সত্বর আবেদন করুন। অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে, এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ আবেদন করুন। ঠিকানা—২২৫ নং সেণ্ট্রাল আভেনিউ, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটির উপরিভাগে একটি সুবৃহৎ পাঁচতলা বাড়ীর ছবি ছাপা আছে।

বিজ্ঞাপনটি বার দুই পড়িয়া, অবিনাশ কাগজখানি রাখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইল। স্ত্রীর অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শনে, তাহার মনে বড় আশা হইয়াছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমতী সুষমা দেবীর আবির্ভাব মাত্র দেশময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে—তাহার বৈঠকখানায় পুস্তক-প্রকাশক ও মাসিক সম্পাদকগণের ভিড় লাগিয়া যাইবে, দেশসুদ্ধ লোক সমস্বরে বলিবে, হাঁ, এতদিন পরে খাঁটি কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া গেল বটে! কিন্তু অবিনাশের সে মনের আশা মনেই লয় পাইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর কয়েক মাস মধ্যে, স্ত্রীর অনেকগুলি কবিতা একত্র করিয়া, অবিনাশ "পুষ্পহার" নামক একখানি বহি ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিয়াছিল। কিন্তু পুষ্পহারের আদর হয় নাই—আগাগোড়া সব কথা ভাবিলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হয় যে, সমালোচকগণ ও পাঠক সাধারণ জোট বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া, তার স্ত্রীর

বইখানি বয়কট করিয়াছে। বই বাহির হইবার পর বছর খানেক ধরিয়া, সুষমার অন্ততঃ একশতটি নূতন কবিতা, অবিনাশ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকে পাঠাইয়াছিল—তার মধ্যে ৯৫টি ফেরৎ আসিয়াছিল, পাঁচটি মাত্র ছাপা হইয়াছিল, তাও মফঃস্বলের পত্রিকায়। এই কারণে, অবিনাশ বড়ই ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। সে স্থির বুঝিয়াছে, কাব্যের যুগ এখন আর নাই;—এ যুগে, স্বয়ং কালিদাস একখানি নূতন মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি হাতে করিয়া কলিকাতায় আসিলে, কোন প্রকাশকই নিজব্যয়ে তাহা ছাপিতে সম্মত হইবেন না—অথচ তাঁহারাই, রামা শ্যামা নিধের অতি ওঁচা উপন্যাসও গোগ্রাসে গিলিতেছেন!—বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিত হইয়াছে—বঙ্গে গল্প উপন্যাসের যুগই আসিয়াছে বটে। সুষমার মত প্রতিভাশালিনী লেখিকা যদি উপন্যাস রচনায় মন দেয়, তবে তাহার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, বিজ্ঞাপনে ঐ যে কথা লিখিয়াছে, গুরূপদেশ ভিন্ন কেহ কোনও কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারে না। ঐ কলেজেই বউকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া অবিনাশের ইচ্ছা—এখন বউ রাজি হইলে হয়।

৪

বউ রাজি হইল, কিন্তু অনেক তর্কবিতর্ক, মান অভিমানের পর।

সুষমা বলিয়াছিল "আমি না হয় একটু ইংরেজিই শিখেছি, কিন্তু তা বলে' মেম ত আর হই নি! জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে আমি কলেজ যেতে পারি কখনও?"

"কেন, জুতো মোজা পরে ট্রামে চড়ে তুমি বায়স্কোপ দেখতে যেতে না বউ? এখনই না হয় খুকী হয়ে অবধি—"

"সে ত তোমার সঙ্গে যেতাম।"

"তা বেশ ত! একলা যেতে যদি তোমার ভয় হয়, আমি সঙ্গে করে তোমায় রেখে আসবো নিয়ে আসবো গো।"

"দুজনকার ট্রামভাড়া লাগবে ত? তার উপর, কলেজের ছ' টাকা মাইনে আছে, কাপড় চোপড়ের খরচ, ধোবার খরচও বাড়বে—চালাবো কেমন করে'?"

"মাইনের টাকায় না কুলোয়, আমি না হয় একটা প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় করে' নেবো এখন, তার জন্তে ভাবনা কি? না হয় দিন কতক একটু টানাটানি করেই কাটানো যাবে। তার পর, যখন তোমার এক একখানি উপন্যাস বেরুবে, তখন টাকা যে হুড়হুড় করে আসতে আরম্ভ হবে বউ!"

"তা কি কিছু বলা যায়? এতদিন কবিতা লিখেছি—গল্প উপন্যাস লিখতে কখনও ত চেষ্টা করিনি, চেষ্টা করলেই যে সফল হব এমন কি কথা আছে?"

"আসল কথা কি জান? প্রতিভাই হল আসল কথা। সে প্রতিভা তোমার যথেষ্ট রয়েছে—সেটা তুমি কাব্যেই খাটাও আর উপন্যাসেই খাটাও—তোমার হাত থেকে উঁচু-দরের জিনিষ বেরুতে বাধ্য যে!"

"প্রতিভা ট্রতিভা আমার কিছু নেই! ও সব আমি পারবো না,—এ নিয়ে আমায় পীড়াপীড়ি কোর না গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"—বলিয়া সুষমা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

অবিনাশ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে, বড় রকম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সুষমা আড় চোখে স্বামীর পানে চাহিল; একটু অনুতাপের স্বরে বলিল, "অমনি রাগ হল পুরুষের!"

স্ত্রীর দিকে না চাহিয়া অবিনাশ বলিল, "রাগ নয় বউ, দুঃখ।"

স্বামীর হাত ধরিয়া সুষমা বলিল, "কেন, কিসের দুঃখ তোমার? সবাইকের স্ত্রী কি আর অনুরূপা নিরুপমা হয়?"

অবিনাশ বলিল, "না না, আমার দুঃখের কারণ তা নয়। আমার দুঃখের কারণ, মোহভঙ্গ।"

"কেন, কি মোহ তোমার ভঙ্গ হল শুনি?"

অবিনাশ আর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখ, এতদিন আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের দুজনের প্রেম, আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম। এখন দেখছি আমার সে ধারণাটা একটা মোহ—একটা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।"

সুষমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কেন, ভুল কিসে?"

অবিনাশ বলিল, "যথার্থ দাম্পত্য-প্রেম কাকে বলে? প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বরী বলে দু'জনে দুজনার গায়ে ঢলে পড়াই কি দাম্পত্য-প্রেম? বঙ্কিম বাবু কি বলেছেন মনে নেই? সমহৃদয়তা, একাভিসন্ধিতা—সেইটেই হল আসল দাম্পত্য-প্রেম। নইলে, আমি বলবো যাব দক্ষিণে, তুমি

বলবে যাব উত্তরে—এ রকম হলে দাম্পত্য-প্রেম হয় না।"

স্বামীর বেদনা জড়িত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুষমার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। সস্নেহে তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "তুমি দুঃখ কোরো না—আমি তোমার অবাধ্য হব না—তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।"

তখন আবার দুইজনে 'ভাব' হইয়া গেল। বিজ্ঞাপনটি আবার পঠিত হইল। কত কথার আলোচনা হইল। সুষমা সেই বিজ্ঞাপনের উপরিভাগে মুদ্রিত পঞ্চতল অট্টালিকা দেখিয়া বলিল, "উঃ, বাড়ীটা ত মস্ত!" অবিনাশ বলিল, "তা হবে না? এত বড় একটা ব্যাপার—কত ছাত্র ছাত্রী ভর্ত্তি হবে তার কি হিসেব আছে?"

৫

ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে, উভয়ে একদিন গিয়া কলেজটি দেখিয়া আসিবার পরামর্শ ছিল; সেই পরামর্শ আজ কার্য্যে পরিণত হইবে। আজ বিকালের ঘণ্টায় অবিনাশের ক্লাস ছিল না; বেলা দুইটার সময় সে বাড়ী আসিয়াছে। চারিটা বাজিলেই, স্ত্রীকে প্রস্তুত হইবার জন্য সে তাগাদা দিতে লাগিল।

সুষমা জুতা মোজা পরিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, বেলা সাড়ে চারিটার সময় স্বামীর সহিত বাহির হইল। দুজনে ট্রামেই গেল। কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়া, পাঁচ মিনিট মধ্যেই নূতন রাস্তায় উপন্যাস-কলেজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিল, বাড়ীটা বিজ্ঞাপনের ছবির অনুরূপ প্রকাণ্ড পঞ্চতল অট্টালিকাই বটে; কিন্তু সমস্তটাই উপন্যাস-কলেজ নহে। নীচের তলার কুঠুরিগুলিতে সাইকেল মেরামতের দোকান, পাণবিড়ির দোকান, ময়রার দোকান প্রভৃতি। দোতালাটা মাত্র কলেজ। ত্রিতল, চতুস্তল ও পঞ্চতলে মাড়োয়ারীগণ বাস করে।

যাহা হউক, উভয়ে দ্বিতলে উঠিল। প্রথমেই একটা কক্ষের বাহিরে আঁটা তক্তায় "অফিস" অঙ্কিত দেখিয়া, পর্দ্দা ঠেলিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। গোঁফদাড়ি কামানো, ঝাঁকড়া চুল, চোখে সোণার চশমা আঁটা এক যুবক রেজিষ্টারি বহি খাতাপত্র লইয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি আগন্তুকদ্বয়ের পানে চাহিয়া, চেয়ার দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া, একখণ্ড নিয়মাবলী এবং একখানি ভর্ত্তি হইবার ফরম অবিনাশের হাতে দিলেন। অবিনাশ ও সুষমা একত্র তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

পাঠ শেষে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "ছাত্রী বিভাগে কতগুলি মেয়ে ভর্ত্তি হয়েছে মশাই?"

বাবুটি বলিলেন, "জন কুড়ি এ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হয়েছে। আরও অ্যাপ্লিকেশন আসছে। ত্রিশ পূর্ণ হলে আর আমরা নেবো না; মেয়েদের ক্লাস-ঘরে আর বেশী ধরবে না। এত ছাত্রী ভর্ত্তি হতে চাইবে তা আগে আমরা ভাবিনি।"

"মেয়েদের ক্লাসে কে কে পড়াবেন?"

কেরাণীবাবু একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া তাহার উপর চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, "ছোট গল্প সম্বন্ধে লেকচার দেবেন সরোজ রায় আর শৈলেন চাটুয্যে। উপন্যাস সম্বন্ধে রজনী বাবু আর লীলাবতী সেন। ভাষা, বর্ণনা শেখাবেন নৃপেন সোম আর চঞ্চলা দেবী।"

সকলেই জানেন—সুষমা অবিনাশও জানিত—বর্ত্তমান বঙ্গীয় সবুজ সাহিত্যে এই লেখক লেখিকাগণের স্থান কত উচ্চে। অবিনাশ বলিল, "এঁরা ত আজকালকার খুব নামজাদা সাহিত্যিক!"

কেরাণী বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়।"

"ঐ যে সরোজ বাবুর নাম করলেন, 'নবরশ্মি' মাসিক পত্রের সম্পাদক সরোজ বাবু কি?"

"তিনিই।"

"তা হলে ষ্টাফ্ ত খুব ষ্ট্রং হয়েছে!"

"আজ্ঞে হাঁ। নইলে আর ভর্ত্তি হবার জন্যে এত ভীড়!"

"আচ্ছা—নমস্কার মশাই—এখন তাহলে আমরা উঠি।" —বলিয়া অবিনাশ দাঁড়াইল। কেরাণী বাবু বলিলেন, "যদি ভর্ত্তি হওয়াই স্থির হয়, তবে বেশী দেরী করবেন না,—কারণ স্থান বড়ই কম,—আর যে রকম অ্যাপ্লিকেশন আসছে—"

"যে আজ্ঞে—দেরী করবো না—খুব সম্ভব, কালই এসে টাকা জমা দিয়ে যাব।"—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

৬

পরদিনই অবিনাশ গিয়া সুষমার ভর্ত্তি হওয়ার ফী প্রভৃতি জমা দিল। সপ্তাহ পরে লেকচার আরম্ভ হইল। অবিনাশ

বেলা ২টার সময় স্ত্রীকে তাহার কলেজে দিয়া, নিজকর্ম্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। বেলা ৪টায় সুষমার ছুটি হইবে—অবিনাশের কার্য্যও তৎপূর্ব্বেই শেষ হইবে। উপন্যাস-কলেজে গিয়া স্ত্রীকে লইয়া সে ট্রামে বাড়ী ফিরিবে।

ছুটির পর রাস্তায় বাহির হইয়া সুষমা স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ, বলেছিল যে ৫০ জন পর্য্যন্ত ছাত্রী নেওয়া হবে—তা নয়, আমি নিয়ে মোটে সতেরোটি মেয়ে ত দেখলাম। আর সবাই কোথায় গেল?"

অবিনাশ বলিল, "আজ ত মোটে প্রথম দিন কিনা। যারা ভর্ত্তি হয়েছে সবাই আজ আসে নি। ক্রমে সব আসবে বোধ হয়।"

ট্রামে উঠিয়া, দুইজনে বেশী কথাবার্ত্তা হইল না। বাড়ী আসিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর, চা খাইতে বসিয়া অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি কি হল বউ?"

"আমরা সবাই ক্লাসে বসলাম। তার পর ঘণ্টা বাজলো—বর্ণনা শিক্ষার প্রোফেসার নৃপেন সোম এলেন। বোর্ডের গায়ে একখানা মস্ত ছবি টাঙ্গিয়ে দিলেন। বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি এক মিন্সে; চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে; বয়স ত্রিশের বেশী নয়—প্রোফেসার বল্লেন,—'এই লোকটার চেহারা তোমরা সবাই এক মনে বেশ করে খানিকক্ষণ দেখ—তার পর, খাতায় এর চেহারার বর্ণনা লেখ—আর, উপস্থিত এর মনের ভাব কি হওয়া সম্ভব—তাও অনুমান করে' লেখ।' এই বলে' তিনি পকেট থেকে এক তাড়া প্রুফ বের করে, দেখতে বসে গেলেন। আমরা ছবিখানা দেখে, বর্ণনা লিখতে লাগলাম।"

"তার পর?"

"ঘণ্টা শেষ হলে, তিনি খাতাগুলো সব নিলেন। দ্বিতীয় ঘণ্টায়, এক এক খানা খাতা নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন আর ভুল ত্রুটিগুলি সব বোঝাতে লাগলেন।"

"তুমি কি লিখেছিলে?"

"আমি চেহারাটা বর্ণনা করবার পর লিখেছিলাম, প্রথম যৌবনে একটি মেয়ের সঙ্গে এর ভালবাসা হয়েছিল; কিন্তু মেয়ের বাপের ঘোর আপত্তি থাকায় বিয়ে হতে পারে নি—তখন দু'জনে পরস্পরের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করে বিদায় নিয়েছিল যে, তারা আজীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন ক'রে, পরলোকে মিলনের আশায় থাকবে। মেয়েটি পিতৃগৃহেই রইল, যুবকটি মনের খেদে বনবাসী হল। দশ বৎসর পরে যুবকের ইচ্ছা হল,—দূর থেকে একবার তার প্রিয়তমাকে চোখের দেখা দেখে আসবে। বন ছেড়ে লোকালয়ে এসে দেখলে, তার প্রিয়তমা দিব্যি বিয়ে থাওয়া করে সুখে সংসার ধর্ম্ম পালন করছে। তাই দেখে, যুবকের মনে ভয়ানক দুঃখ ও রাগ হয়েছে।"

অবিনাশ বলিল, "এনক আর্ডেন। অন্য ছাত্রীরা সব কি লিখেছিল?"

সুষমা বলিল, "সে সব অদ্ভুত। কেউ লিখেছিল এ খুন কিংবা ডাকাতি করতে যাচ্ছে—কেউ লিখেছিল গাঁজা খেয়ে এ পাগল হয়ে গেছে—এই রকম সব।"

"প্রোফেসার কি বল্লেন?"

"তিনি আমারটাই খুব ভাল হয়েছে বল্লেন। বল্লেন, যে সকল লোকের সঙ্গে তুমি সংস্রবে আস,—তোমার স্বামী, আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী—সকলের মুখ দেখে তার মনের ভাবটা বিশ্লেষণ করতে সর্ব্বদা চেষ্টা করবে। মনস্তত্ত্বই হল আসল জিনিষ—সেইটে যিনি যত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন,—উপন্যাস রচনায় তিনি তত বেশী সিদ্ধিলাভ করবেন।—বল্লেন, তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, এক মনে সাধনা কর।—আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন।"

এই সংবাদ শ্রবণে অবিনাশের বুকটা আহ্লাদে দশহাত হইল। বলিল, "তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ যে আছে এটা ত অনেক দিন আগেই এ অধম আবিষ্কার করেছিল!"

সপ্তাহে তিনদিন সুষমার ক্লাস হইয়া থাকে। অবিনাশ তাহাকে নিয়মিত ভাবে কলেজে পৌঁছাইয়া দেয় এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। লেকচার, এক্সারসাইজ প্রভৃতি কিরূপ হইতেছে তাহা নিত্যই সে খবর লয়।

একদিন সুষমা বলিল, "ওগো, কালকে আমার ডবল ক্লাস—বেলা একটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলেজ। ছোট গল্পের প্রোফেসার সরোজ রায়, আমাদের একটি গল্পের চুম্বক দেবেন—ক্লাসে বসে,—সেই গল্পটি চা'র ঘণ্টায় আমাদের সবাইকে লিখতে হবে। যে গল্প সব চেয়ে ভাল হবে, সেটি সরোজ বাবু তাঁর 'নবরশ্মি' কাগজে ছেপে দেবেন বলেছেন।"

"আচ্ছা বেশ, কাল আমি তোমায় সময় মত কলেজে পৌঁছে দেবো এখন।"

পরদিন অবিনাশ তাহাই করিল। তার নিজ ক্লাস সেদিন ৩টা হইতে ৪টা। সুতরাং দুই ঘণ্টা কাল তাহাকে গোলদীঘির ধারে বসিয়া কাটাইতে হইল। বৃক্ষছায়ায় বেঞ্চির উপর বসিয়া বায়ুভরে গোলদীঘির ঈষত্তরঙ্গিত বক্ষের পানে চাহিয়া, তাহার নিজ বক্ষও আশার হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী সুষমা দেবীর নবপ্রকাশিত উপন্যাসের প্লাকার্ডে কলিকাতার দেওয়াল ছাইয়া যাইবে! এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন পথে, ট্রামে, ট্রেণে, সভাসমিতিতে, তাহাকে দেখাইয়া লোকে ফুস্‌ফুস্ করিয়া বলাবলি করিবে—"ও লোকটা কে জান হে? ওই হচ্চে সুষমা দেবীর স্বামী!"—আশা কাণে কাণে কহিল—"আসিবে, সেদিন আসিবে।"

৭

এক্সারসাইজ স্বরূপ লিখিত সুষমার গল্পটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে বিবেচনায় প্রোফেসার সরোজ রায় সেটি "নবরশ্মি" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। যেদিন উহা প্রকাশিত হয়, অবিনাশ স্বয়ং "নবরশ্মি" কার্য্যালয়ে গিয়া ঐ সংখ্যা ২৫ খানি কিনিয়া আনিয়া, ২০ খানা ডাকযোগে আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। বউয়ের গল্পটির শিরোনামার উভয় পার্শ্বে মোটা লাল পেন্সিলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল। কোনও বন্ধু বান্ধব সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, দুই চারি কথার পর অবিনাশ বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, ভাল কথা, 'নবরশ্মি' কাগজে বউয়ের একটা গল্প বেরিয়েছে পড়েছ কি?"—এবং বন্ধুকে, সেইখানে বসাইয়া, গল্পটি আগাগোড়া না পড়াইয়া ছাড়িত না। একখানি 'নবরশ্মি' সর্ব্বদাই তাহার পকেটে থাকিত, এবং প্রায় প্রতিদিনই সে নিজে গল্পটি দুই একবার পড়িত।

একদিন অবিনাশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কাল তোমাদের কি বিষয়ে লেকচার হচ্চে বউ?"

সুষমা বলিল, "প্রেম-তত্ত্ব। প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমের স্বরূপ, আর প্রেমের প্রকার ভেদ হয়ে গেছে—কথা-সাহিত্যে প্রেমের প্রভাব এখন হচ্চে। কিন্তু সরোজ বাবু যা বলছেন, তা কিন্তু আমার মনে লাগছে না।"

"সরোজ বাবু কি বলছেন?"

"তিনি বলছেন, দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে, নিষিদ্ধ প্রেমেই রস বেশী—আবেগ বেশী—উন্মাদনা বেশী, তাই নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র থাকলেই গল্প উপন্যাস সব চেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। এই কথা শুনে, ৭।৮টি মেয়ে চটেমটে ত কলেজ ছেড়েই দিয়েছে।"

"আজকাল তোমাদের কলেজে ছাত্রী সংখ্যা কত?"

"আমি নিয়ে উনিশটি।"

"কেন? প্রথম দিনেই ছিল সতেরটি। পঞ্চাশজন পর্য্যন্ত নেওয়া হবে—সে পঞ্চাশ ত কোন্ কালে পুরে যাবার কথা। এত কমে গেল কি করে বউ?"

সুষমা বলিল, "পঞ্চাশ কোনও দিনই হয়নি। ৩১।৩২ জন হয়েছিল। তার পর আবার অনেকে ছেড়ে দিলে।"

"কেন? ছেড়ে দিলে কেন?"

"দু'জনকার, ছেলে হবে ব'লে তারা চলে গেছে। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে ৭।৮ জন পালালো। আরও ৩।৪ জন তাদের স্বামীদের মত থাকলেও, শ্বশুর শাশুড়ীর মত নেই তাঁরা শুনে রাগ করেছেন, সেই ওজুহাতে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল। দেখ, আমারও কিন্তু আর ভাল লাগছে না—পাছে তুমি রাগ কর, সেই জন্যে এতদিন আমি তোমায় বলিনি। বিশেষ ঐ সরোজ রায়—যখন থেকে 'নবরশ্মি'তে আমার গল্পটা বেরিয়েছে—তখন থেকে, আমার সঙ্গে যেন কী রকম ব্যবহার করে।"

"কি রকম ব্যবহার করে?"

"পুরুষ শিক্ষক আর ছাত্রীর মধ্যে যে শোভন ব্যবধান-টুকু থাকা দরকার, তা সে আর রেখে চলছে না।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "ওটা তোমার ভুল, সুষমা। সবুজ সাহিত্যের তিনি একজন অত বড় লেখক—অত বড় কাগজের সম্পাদক—হঠাৎ, তাঁর প্রতি কোনও মন্দ উদ্দেশ্য আরোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমিই হলে ক্লাসের সব চেয়ে ভাল ছাত্রী—সবার চেয়ে তোমার উপরেই বেশী ভরসা রাখেন—তাই বোধ হয় একটু আত্মীয়তার ভাব এসে পড়েছে। ওটা কিছু নয়।"

কিছুদিন পরে সুষমার খুকীর জ্বর হইল। জ্বরটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই কারণে এক সপ্তাহ সুষমা কলেজ যাইতে পারিল না।

সপ্তাহ পরে, খুকী আরোগ্যলাভ করিলে, অবিনাশ স্ত্রীকে আবার যথারীতি কলেজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

যথাসময়ে স্ত্রীকে আনিতে গিয়া অবিনাশ শুনিল, আজ কলেজ বন্ধ—রাসপূর্ণিমার ছুটি। স্ত্রীর খোঁজ করিতে দ্বারবান বলিল, মাইজী বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। প্রবল জ্বরে তিনি কাঁপিতেছিলেন, চক্ষু দুইটি লাল সুরুখ হইয়াছিল, দ্বারবান ট্যাক্সি ডাকিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়াছে।

অবিনাশ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে, ট্রামে বাসায় ফিরিল। বাসায় আসিয়া ভৃত্যের নিকট শুনিল,—মাইজী কলেজ হইতে ট্যাক্সিতে ফিরিয়া আর উপরে উঠেন নাই, ঝিকে ডাকিয়া গঙ্গাস্নানের বস্ত্রাদি আনিতে আদেশ দিয়া কালীঘাট যাতায়াতের জন্ম তাহাকে ঠিকা গাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ী আসিবা মাত্র, খুকীকে ও ঝিকে লইয়া তিনি কালীঘাট যাত্রা করিয়াছেন।

শুনিয়া অবিনাশ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর শরীর কেমন দেখলি?" ভৃত্য বলিল, "কেন, শরীর ত ভালই ছিল বাবু! তিনি বলেছেন গঙ্গাস্নান ক'রে, কালীঘাটে পূজো দিয়ে তার পর ফিরবেন। বল্লেন, বাবু এলে বোলো তিনি যেন না ভাবেন।"

ব্যাপারটা অবিনাশের নিকট দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার ন্যায় মনে হইল। প্রবল জ্বর ও রক্তচক্ষু লইয়া কলেজ হইতে যে মানুষ চলিয়া আসিল—বাড়ী আসিয়াই—তার জ্বর ভাল হইয়া গেল, সে গঙ্গাস্নানে বাহির হইল! হঠাৎ কালীঘাটে পূজা দিবারই বা অর্থ কি? যাহা হউক, অবিনাশ ধৈর্য্য সহকারে স্ত্রীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

৮

সন্ধ্যার সময় সুষমা ফিরিল। সদ্যস্নাতা, পরিধানে গরদ, সীমন্তে মোটা করিয়া সিন্দুর লিপ্ত—অবিনাশ স্ত্রীর এই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সুষমা আসিয়াই গড় হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল।

অবিনাশ বলিল, "সুষমা, ব্যাপার কি? জ্বর হয়েছে ব'লে তুমি কলেজ থেকে ট্যাক্সি করে চলে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ জ্বর হল কেমন ক'রে—আর তাই হয়েছিল যদি, ত গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলে কেন বউ?"

"জ্বর হয় নি।"

"কিন্তু দারোয়ান যে বল্লে!"

"সে তাই মনে করেছিল বটে! জ্বর আমার হয় নি।"

"তবে? হঠাৎ এই অবেলায় স্নান—আর, তাড়াতাড়ি কালীঘাটে পূজো দিতে যাওয়া—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে বউ!"

সুষমা বলিল, "পরে বলবো।"

"কখন বলবে?"

"রাত্রে। এখন এই সব ঝি চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটু নিরিবিলি না হলে তোমায় সব কথা বলতে পারবো না।"

অবিনাশ বলিল, "তুমি যে আমায় বড়ই দুশ্চিন্তায় ফেল্লে সুষমা। কোনও অমঙ্গল, কোনও অশুভ ঘটেছে কি?"

"হ্যাঁ—না।"

"ঘটেওছে, ঘটেওনি? কি বলছ তুমি? বিস্তারিত না পার সংক্ষেপে বল।"

সুষমা বলিল, "সংক্ষেপেই বলছি—আমি আর ও কলেজে পড়বো না। সব কথা শুনলে, তুমিও আমায় আর সেখানে যেতে বলবে না। এখনও আমার মনটা বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত রয়েছে—আর কোনও কথা এখন তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কোর না গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"—বলিয়া, প্রায় সাশ্রু নয়নে সুষমা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। রান্নাঘরে গিয়া স্বামীর চায়ের উদ্যোগ করিতে বসিল।

রাত্রে সুষমা স্বামীর কাছে সকল কথাই বলিল—"তোমায় ত আমি আগেই বলেছিলাম, সরোজ রায় লোকটা কী রকম ভাবে আমার পানে চায়—দেখে আমার ভারি রাগ হয়। তুমি আমাকে বলেছিলে, ও সব কিছু নয়, ও সব আমার মনের ভ্রম। খুকীর অসুখের জন্যে সাত দিন কলেজ যাইনি ত! আজ তুমি আমায় সিঁড়ির কাছে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে। আমি উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ক্লাস সব শূন্য। দরোয়ান বল্লে, আজ রাসপূর্ণিমার ছুটি আপনি কি জানতেন না?—আমি বল্লাম, না, আমি ত এক হপ্তা কলেজে আসিনি। বলে' আমি বারান্দায় গেলাম, তোমায় যদি রাস্তায় দেখতে পাই ত তোমায় ডাকবো ব'লে। রেলিংএর উপর ঝুঁকে দেখলাম তুমি প্রায় কলুটোলা ষ্ট্রীটের কাছে গিয়ে পৌঁছেছ—ডাকলে তুমি শুনতে পাবে না। কলেজেই অপেক্ষা করবো—না একটা ট্যাক্সি আনিয়ে বাড়ী ফিরবো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি—এমন সময় দেখি, সরোজ রায় ক্লাস ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে—"সুষমা,

শুনে যাও।"—"আজ ছুটি—আমি জানতাম না স্যার"—ব'লে আমি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। সরোজ রায় এসে জিজ্ঞাসা করলে, "এ ক'দিন আসনি কেন?" বল্লাম, "আসতে পারিনি স্যার—আমার খুকীর অসুখ হয়েছিল।" "কি অসুখ হয়েছিলো?"—বলতে বলতে সরোজ আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। খুকীর যা অসুখ হয়েছিল, আমি সংক্ষেপে বল্লাম। শূন্যক্লাস ঘরে আমার গা ছমছম্ করছিল, কোনও রকমে কথাটা সেরে পালাতে পারলে বাঁচি। সরোজ বল্লে—"এখন খুকী ভাল হয়েছে ত? যাক্। কিন্তু তুমি যে কামাই করলে, ছুটি নিয়েছিলে?"—বল্লাম, "আজ্ঞে না, ছুটি নিতে হয় তা আমি জানতাম না স্যার।" সরোজ বল্লে, "কামাই করার জন্যে তোমার জরিমানা হবে তা জান?"—বল্লাম, "তা যদি হয় ত দেবো স্যার।" সরোজ বল্লে, "দেবে? দেবে?"—তার কথার স্বরে আর তার ভঙ্গি দেখে আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো। চলে আসবার জন্যে আমি ফিরে দাঁড়াতেই—সরোজ পিছন থেকে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে—"এই তোমার জরিমানা" ব'লে—না গো—আর আমি বলতে পারবো না।"—বলিয়া সুষমা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাগে অবিনাশের সর্ব্বশরীর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্ত্রীর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া, সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেঁদনা—যা হবার তা হয়ে গেছে। সে দুর্ব্বৃত্তকে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি দেবো। তার পর, তুমি কি করলে তাই আমায় বল।"

সুষমা ক্রমে স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে, ঠাস্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলাম।—চড় মেরে, আমার নিজেরই হাত ঝনঝন করতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দারোয়ানকে বল্লাম, "দারোয়ান আমায় শীগ্‌গির একখানা ট্যাক্সি ডেকে দাও আমি বাড়ী যাব।"—আমি তখন ঠক ঠক করে কাঁপছি। দরোয়ান বল্লে, "বোখার হুয়া মাইজী?"—আমি বল্লাম "হ্যাঁ বাবা, বহুৎ বোখার হুয়া। দাঁড়াতে পারছি নে।" সে নিজের টুল ছেড়ে উঠে বল্লে, "আঁখভি বহুৎ লাল হুয়া। আপ হিঁয়া বৈঠিয়ে মাইজী, হাম অভি ট্যাক্সি বোলায় দেতে হাঁয়।" ট্যাক্সিতে বসে বসেই স্থির করেছিলাম, এ অপবিত্র দেহ নিয়ে বাড়ী ঢুকে স্বামীর মন্দির কলুষিত করবো না—গঙ্গাস্নান করে, সতী শিরোমণি কালীমাকে প্রণাম ক'রে, তাঁর প্রসাদী সিন্দুর মাথায় পরে', পবিত্র হয়ে তবে বাড়ী ঢুকবো।"—বলিয়া সুষমা নীরব হইল। স্বামীর উরুতে মাথা দিয়া, বিছানার উপর দেহ এলাইয়া দিল। অবিনাশও নীরবে স্ত্রীর মাথায়, কপালে, বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

স্বামার এই নীরব সান্ত্বনায় কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমা অনেকটা শান্ত হইল। ক্রমে সে উঠিয়া বসিল।

"আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সুষমা, এর উপযুক্ত প্রতিফল সেই পাষণ্ডকে আমি দেবো, এবং কালই। তুমি শান্ত হও—যা হয়েছে তা ভুলে যেতে চেষ্টা কর।"—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল।

সুষমা বাধা দিয়া বলিল—"এখন না—গঙ্গাস্নান ক'রে গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়ে এই ঠোঁট দুটো বেশ করে আমি মেজে ফেলেছি। তার পর, মা কালীর মন্দিরের চৌকাঠের উপরও ঠোঁট দুটো বুলিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার মনের গ্লানি যায় নি—তোমার পায়ের ধুলো দাও, আমি তাই ঠোঁটে মেখে এ দুটোকে পবিত্র ক'রে নিই।"—বলিয়া সুষমা স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া, নিজ মস্তকে ঠেকাইয়া তাহাতে চুম্বন করিতে লাগিল।

পরদিন "নবরশ্মি" আপিসে প্রবেশ করিয়া ক্রোধোন্মত্ত অবিনাশ সরোজকে সড়াং সড়াং করিয়া কয়েক ঘা বেত মারিয়াছিল, সে কথা লইয়া সাহিত্যিক মহলে কিরূপ হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু আসল কারণ কেহই জানিতে পারে নাই। 'নবরশ্মি'র তরফ হইতে ইহাই প্রচার করা হইয়াছিল যে, অবিনাশ বাবুর প্রেরিত কোনও প্রবন্ধ অমনোনীত করার জন্যই নিরীহ সম্পাদক মহাশয় ওরূপ ভাবে তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

———

গ্রামরত্ন ফুলিয়া

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে যাইবার কয়েকটি রাস্তা আছে; যথা—(১) রাণাঘাট ষ্টেসনে নামিয়া চুর্ণি-নদীর অপর পারে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যাত্রা করিলে শান্তিপুর যাইবার পাকা রাস্তার ধারে ফুলিয়া গ্রাম পাওয়া যায়। উহা রাণাঘাট হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ হইবে। (২) রাণাঘাটে নৌকা ভাড়া করিয়া চূর্ণি দিয়া গঙ্গায় পড়িতে হয়, তৎপরে শান্তিপুরের দিকে যাইতে বয়ড়া গ্রাম পাওয়া যায়। বয়ড়ার ঘাট হইতে

ফুলিয়া—(১) হরিদাসের পাটের সাধনকূপ (২) কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি (৩) ঠাকুর ঘর

ফুলিয়া অনুমান একমাইল দূরে অবস্থিত। (৩) হোর মিলার কোম্পানীর (কলিকাতা ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর) ষ্টীমার প্রাতঃকালে কলিকাতা হাটখোলা ঘাট হইতে ছাড়িয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বয়ড়ার ঘাটে উপস্থিত হয়, তথা হইতে ফুলিয়ায় যাইতে হয়। কিন্তু এই তৃতীয় পথ সুবিধাজনক নহে, কারণ রাত্রে ফুলিয়ায় থাকিবার সুবিধা নাই। (৪) রাণাঘাট—শান্তিপুর রেল লাইনের বৈঁচি নামক ষ্টেসনে নামিলে তথা হইতে ফুলিয়া প্রায় দেড় মাইল। এই শেষোক্ত পথটি সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। দুইবার এই শেষোক্ত পথ দিয়া এবং আর একবার বিখ্যাত উলা গ্রাম হইতে পদব্রজে ফুলিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম।

উলা হইতে ফুলিয়ার দূরত্ব পদব্রজে ২৷৷৩৷৷০ ক্রোশ মাত্র। একবার যে মাসে আমরা চারিজন বন্ধু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একখানি গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া এক দিন প্রত্যূষে পদব্রজে ফুলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। দ্রব্যাদি লইয়া গরুর গাড়ী হাঁটা-পথ ধরিয়া চলিল। আমরা উলার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া পথ ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম। আমাদের সঙ্গে শিকারের জন্য দুইটি দোনলা বন্দুক ও কার্তুজ চলিল। মাঠের আলির ঝোপ ও জঙ্গলের মধ্যে সজারু, খরগোস ও পক্ষী অন্বেষণ করিতে করিতে বেলা প্রায় ৯টার সময় মাঠ ছাড়িয়া বৈঁচির উচ্চভূমিতে উঠিলাম। উলা হইতে বৈঁচির এই পূর্ব্ব প্রান্তের দূরত্ব দুই ক্রোশের অধিক হইবে। এই স্থানে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিলাম—সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে মাঠ ও বিলের খাতের নিম্নভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। এই নিম্নভূমির পূর্ব্ব প্রান্তে বিস্তৃত উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর বনজঙ্গলাবৃত প্রাচীন ও অভিশপ্ত উলা গ্রামের কঙ্কাল মাত্র দণ্ডায়মান আছে। এতদূর হইতে উলাকে ধূম্রবর্ণ ও ভয়াবহ দেখাইতেছে। বৈঁচি ও উলার মধ্যবর্ত্তী যে মাঠ ও বিল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বকালে এই বিশাল নিম্নভূমি গঙ্গার খাত ছিল। এককালে গঙ্গা উলা, খিসমা ও ফুলিয়ার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত।

বৈঁচি গ্রামটি মুসলমান-প্রধান। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কামার প্রভৃতি জাতীয় কয়েকজন অবস্থাপন্ন হিন্দুর কোঠা বাড়ী আছে। একটি বড় পুকুর আছে; উহার জল সুপেয়।

বৈঁচি হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া ফুলিয়া অভিমুখে চলিলাম। আকাশে সামান্য মেঘের সঞ্চার হওয়ায় সূর্য্য-কিরণের প্রখরতা ছিল না; সে কারণ পথ চলিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। বৈঁচির দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে আসিয়া সরকারি কাঁচা রাস্তা ছাড়িয়া আর একটি বৃহৎ মাঠের মধ্য দিয়া চলিলাম। ক্রমে রাণাঘাট শান্তিপুর রেল লাইন পার হইলাম। তৎপরে রাণাঘাট হইতে শান্তিপুরে পদব্রজে যাইবার পাকা রাস্তা পার হইয়া ৭।৮ মিনিটকাল চলিয়া জন-মানবহীন কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভিটায় উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ১০টা। চতুর্দ্দিকে সিকি মাইলের মধ্যে কোথাও জনপ্রাণীর বাস আছে বলিয়া মনে হইল না। চারিদিকের বন-জঙ্গল ও বাঁশবাগানের মধ্যে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভিটা অবস্থিত। মেঘ সরিয়া যাওয়ায় রৌদ্রের প্রখরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে দারুণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কদাচিৎ বনমধ্য হইতে ক্লান্ত পাখীর ডাক বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

যে ভূমিখণ্ড ঘিরিয়া কৃত্তিবাসের স্মৃতি স্থাপিত হইয়াছে, উহার মাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪১০´ ফিট × পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৯০´ ফিট। চতুর্দ্দিকের বন-জঙ্গলের মধ্যে এই ভূমিখণ্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে উত্তর দিকে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত একতালা ক্ষুদ্র স্কুল-গৃহ আছে। উহার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছাদযুক্ত বারান্দা আছে; বারান্দা দুইটির বাহিরের দিকে তিনটি করিয়া ফোকর বা খিলান আছে। এই গৃহটির মাপ—দীর্ঘ ৪৮´ ফিট × প্রস্থ ৩০´ ফিট × উচ্চ ১৩´।১৪´ ফিট। ইহা একটি মাইনর স্কুলের বাটী। ফুলিয়ার নিকটে বয়ড়া, শিমুলিয়া, নবলা, মালিতোতা প্রভৃতি যে সকল গ্রাম আছে, ঐ সকল গ্রামের বালকগণ এই স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করিত। ঐ সকল গ্রামের অধিবাসী-দিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে বড় চাকুরী ও ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। কিন্তু এমনই ইহাদিগের দেশের প্রতি টান, এবং এতদঞ্চলে যাঁহারা বার মাস বাস করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের এমনই বিদ্যানুরাগ যে, সাহায্যের ও সহানুভূতির অভাবে এই অত্যাবশ্যক স্কুলটি প্রায় বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং তৎস্থলে ৩০।৩২টি ছাত্র ও দুইজন শিক্ষক লইয়া একটি লোয়ার প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। জনৈক ব্যক্তির নিকট শুনিলাম, রাণাঘাটের সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয়ের নিকট স্কুলের তহবিলে এখনও যৎসামান্য অর্থ মজুদ থাকা সম্ভব। স্কুল গৃহের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে শ্বেত প্রস্তরের স্মৃতি ফলকে লেখা আছে:—

" Krittibas memorial School

1916

কৃত্তিবাস স্মৃতি-বিদ্যালয়

১৩২২ "

স্কুলটির গঠন ইংরাজী H অক্ষরের ন্যায়। ইহার মধ্যস্থলে একটি হলঘর ও উহার দুই প্রান্তে আর দুটি ঘর আছে। বারান্দার দেয়ালে বালকগণ পেন্সিল দ্বারা নানাকথা লিখিয়া রাখিয়াছে, কেহ লিখিয়াছে "সেকেন মাষ্টার বড় মারে", কেহ লিখিয়াছে অমুক "বাবুকে না তাড়াইলে স্কুলের মঙ্গল নাই" ইত্যাদি।

ফুলিয়া—বাঁশবনের মধ্যে বনাকীর্ণ কৃত্তিবাসের ভিটা

স্কুল-গৃহের দক্ষিণ দিকে ১৪০´ ফিট দূরে একটি ১৩´ ফিট × ১১½´ ফিট স্থান ৩´ ফিট উচ্চ কারুকার্য্য বিমণ্ডিত রেলিং দ্বারা ঘেরা আছে। ইহার উত্তর দিকে দ্বার আছে। এই ঘেরা স্থানের মধ্যে মাটীর উপরে কটা বর্ণের বেলে পাথরের একটি বেদী আছে। উহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৮´ ফিট ও উহা ১´ ফিট উচ্চ। এই বেদীর উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের বেদী আছে। উহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৬´ ফিট ও উহা ৭" ইঞ্চ উচ্চ। ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত

ছোট আরও দুইটি বেদী আছে। তদুপরি একটি চতুষ্কোণ শ্বেত প্রস্তর রহিয়াছে। উহার প্রত্যেক দিকের মাপ প্রায় ১´ফিট ও উহা ৪´ ফিট স্থূল। ইহার উত্তর দিকের গাত্রে লেখা আছে :—

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব ১৪৪০ খৃঃ অব্দ, মাঘ মাস
শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।
হেথা দ্বিজোত্তম—
আদি কবি বাঙ্গালার, ভাষা রামায়ণকার,
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে, ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে—
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।"

ফুলিয়া—শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ

যে প্রস্তর-খণ্ডের উপর এই কবিতা খোদিত আছে, তাহার উপর আরও তিন স্তর শ্বেত প্রস্তর আছে, ও তাহার উপরে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের উর্দ্ধদেশে একটি শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত "ওঁ" অক্ষর : আছে। এই স্তম্ভের পাদদেশ প্রত্যেক দিকে ২´ ফিট ও উহা ৫½´ ফিট উচ্চ। মৃত্তিকা হইতে স্মৃতি-স্তম্ভের শিখরদেশের "ওঁ" শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চতা প্রায় ১৪½´—১৪½´ ফিট হইবে। স্মৃতি-স্তম্ভটি দেখিতে কতকটা কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি-স্তম্ভের ন্যায়।

স্মৃতি-স্তম্ভের প্রায় ১৬´ ফিট দূরে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণার দিকে একটি ক্ষুদ্র বনাকীর্ণ স্থান একটিমাত্র তারের বেষ্টনী দ্বারা সীমাবদ্ধ করা আছে। ঐ স্থানটির মাপ ১১´×১০´। এই স্থানে কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের শেষ চিহ্ন একটি ক্ষুদ্র স্তূপ সমতল ভূমি হইতে মাত্র ২´ফিট উচ্চ হইয়া আছে। স্তূপের উপরিভাগে ২।৪ টি সেকালের ইষ্টক পড়িয়া আছে। সাধারণ অশিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকে যে কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের ঢিপির উপরে উঠিলে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

উক্ত ভিটার ২৬ ফিট দূরে পশ্চিম দিকে একটি পাকা ইন্দারা বা কূপ আছে। কূপটির মধ্যে নানাপ্রকার আবর্জ্জনা ও তালগাছের পাতা প্রভৃতি পড়িয়া উহার জল অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। কূপের পাড়ের উপরে চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কূপের ব্যাস প্রায় ৭৷৷০১৮ ফিট। কূপের ভিতর দিকে প্রাচীর গায়ের শ্বেত প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে :—

"কৃত্তিবাস কূপ
১৩২০"

কৃত্তিবাসের স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচনের দিবস কৃত্তিবাসের ভিটার জমিতে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৺ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও নাটোরের মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছিলেন। ঐ সময় কৃত্তিবাসের ভিটার জমির পশ্চিম দিক দিয়া যে কাঁচা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা আজিও "কৃত্তিবাস রোড" নামে পরিচিত। যে ভূমিখণ্ডের উপর কৃত্তিবাসের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় পূর্ব্বে বাঁশবাগান ছিল।

কৃত্তিবাসের ভিটার প্রায় ৪৯০ ফিট দূরে, পূর্ব্ব দিকে, বাঁশ ও বন-জঙ্গল-বেষ্টিত একটি ছোট বাগান আছে। উহাতে আমের গাছই বেশী। দক্ষিণ দিক দিয়া এই বাগানে প্রবেশ করিলে দেখা যায়—সম্মুখে একটি একতালা ঘর আছে, উহার দক্ষিণ দিকে বারান্দা।—এই গৃহটির প্রত্যেক দিকের মাপ ২০´ ফিট। ইহা ভূমি হইতে ১৪´ ফিট উচ্চ। গৃহ-মধ্যে একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বড় জলচৌকির উপর দারুময় ৺কৃষ্ণ, বলরাম, রাধিকা ও সুভদ্রা মূর্ত্তি রহিয়াছে। ৺কৃষ্ণ ও বলরাম মূর্ত্তিদ্বয় প্রায় ৪´ ফিট, সুভদ্রা ৩´ফিট ও রাধিকা

প্রায় ২॥ ফিট উচ্চ। কবি নবীনচন্দ্র সেনের মতে, এই গৃহ প্রথমে ভিখারী বৈষ্ণবগণ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে কৃষ্ণরাধা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা যবন হরিদাসের পাট বলিয়া খ্যাত। বৈষ্ণব চূড়ামণি হরিদাস গৌড়াধিপতি হুসেন শার রাজত্বকালে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া অচেতন অবস্থায় হরিনাম করিতে করিতে এই স্থানে গঙ্গা-তীরে আসিয়া লাগিয়াছিলেন ও এই স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

উক্ত একতলা কোঠার সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সিমেণ্ট দ্বারা বাঁধান ১৫´ ফিট×৮´ ফিট চতুষ্কোণ উচ্চ স্থান বা বেদী আছে। এই শান-বাঁধান বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র পাতকুয়া আছে। উহা ৬´ ফিট গভীর ও উহার ব্যাস মাত্র ২´ ফিট। এই কূপের দক্ষিণ দিকে সিমেণ্টের উপর খোদাই করা আছে—"ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের পাট।" শুনা যায় যে, এই কূপের মধ্যে বসিয়া হরিদাস কঠোর তপস্যা ও প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করিতেন। এখানে প্রতি বৎসর একবার মেলা হয়।

হরিদাসের পাটের এই কূপের প্রায় ১১ ফিট পশ্চিম দিকে ও পূর্ব্বোক্ত একতলা কোঠার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ৭´ ফিট দূরে একটি ক্ষুদ্র সমাধির স্থান ইষ্টক দ্বারা বাঁধান আছে। ইহাকে একটি ক্ষুদ্র বেদী বলা যাইতে পারে। ইহার মাপ ৪´-২´´×৩´—৮´´ ইঞ্চ। ইহা ভূমি হইতে প্রায় ৩´ ফিট উচ্চ। ইহার পশ্চিম দিকে সিমেণ্টের জমাটের উপর খোদাই করা আছে :—"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি ১৩১২"।

হরিদাস ঠাকুর বা যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস সম্বন্ধে "চৈতন্য ভাগবতে" লিখিত আছে –

"বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥"

"তিনি বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রামের নিকটস্থ বুঢ়ন গ্রামে অনুমান ৩০০ শকের শেষাংশে মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুঢ়নের নিকটস্থ বেনাপোলের অরণ্যে প্রত্যহ ৩ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন ও হরিসাধনায় নির্বিষ্ট থাকিতেন। রামচন্দ্র খাঁ নামক জনৈক জমিদার তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট করিবার জন্য তাঁহার নিকটে বেশ্যা প্রেরণ করেন। ফলে উক্ত বেশ্যা উদাসিনী হইয়া গৃহত্যাগ করিল। তিনি হুগলীর সন্নিকটস্থ চাঁদপুর গ্রামে বলরাম আচার্য্যের গৃহে কিছুদিন ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখনিঃসৃত হরিনাম সুধাপানে বিমোহিত হইতেন। ইহার পরে তিনি ফুলিয়ায় রামায়ণকার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভিটার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাস করেন এবং সেই সময় শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন হয়। তখনও নদীয়ায় চৈতন্যদেবের লীলা আরম্ভ হয় নাই। অদ্বৈত ও হরিদাস প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

"হরিদাসের হরিনাম লওয়ার কথা শুনিয়া মুসলমান কাজি কহিলেন—

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥

ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বনাকীর্ণ ক্ষুদ্র দোলমঞ্চের (১) চিহ্নিত স্থান

তৎপরে কাজি শাসনকর্ত্তাকে হরিদাসের কথা জানাইলেন। শাসনকর্ত্তা হরিদাসকে সর্ব্বজন-সমক্ষে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের হুকুম দিলেন। হরিদাস কহিলেন—

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

"ক্রমে হরিদাসকে ২২টি বাজারে সর্ব্বজন-সমক্ষে নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত করিয়া বেড়ান হইল। অবশেষে হরিদাস সমাধিস্থ হইলে তাঁহাকে মৃত বিবেচনায় গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হইল। তিনি ভাসিতে ভাসিতে ফুলিয়ার

আশ্রমের নিকটে উঠিলেন। ফুলিয়ার পাটে যে কূপটি আছে, উহার মধ্যে বসিয়া হরিদাস প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

"চৈতন্য দেব অবতীর্ণ হইলে হরিদাস তাঁহার একজন প্রধান পার্শ্বচর হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে চৈতন্যদেব যখন পুরী বা নীলাচলে ছিলেন, সে সময় হরিদাস তথায় তাঁহার আশ্রমের অদূরে বাস করিতেন এবং তথায় তিনি দেহ-ত্যাগ করেন এবং সমুদ্রতীরে সমাহিত হন।"

পুরাকালে হরিদাসের এই পাটের দক্ষিণ দিক দিয়া ও পূর্ব্ববর্ণিত কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। গঙ্গা এক্ষণে প্রায় ১ মাইল

ফুলিয়া কৃত্তিবাস স্মৃতি-বিদ্যালয়
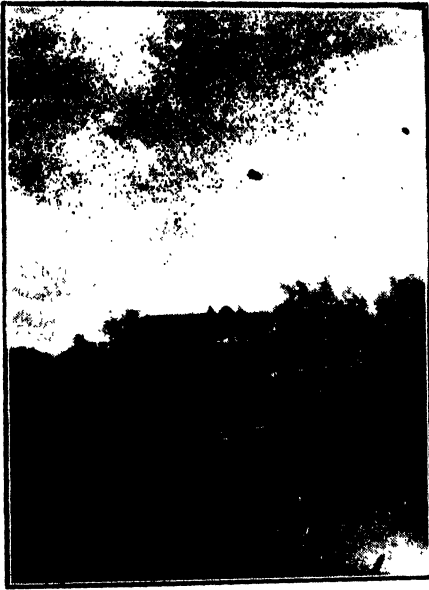
দূরে বয়ড়ার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ফুলিয়ার পার্শ্বদেশ দিয়া যে গঙ্গা এককালে প্রবাহিত ছিল, তাহার পরিত্যক্ত খাতের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। কৃত্তিবাসের ভিটার সন্নিকটে নানাস্থানে বনমধ্যে ফুলিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদিগের গৃহের অনুচ্চ স্তূপ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই স্থানে অসংখ্য বিছুটির গাছ, মশক ও কাঠ পিপড়ার উপদ্রব আছে। শুনিলাম, হরিদাসের উক্ত পাটের উত্তর দিকে বাঁশ বনের মধ্যে কৃত্তিবাসের ভিটা অবস্থিত। এক্ষণে এ সকল জনৈক শাক্ত ভট্টাচার্য্যের করতলগত।

ফুলিয়া এককালে সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ফুলিয়ার মুখটীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ফুলিয়া আবার রামায়ণকার বিখ্যাত কৃত্তিবাস ওঝার বাসস্থান ও ভক্তচূড়ামণি হরিদাসের সাধনার স্থান। এই সকল কারণে ফুলিয়া হিন্দু বাঙ্গালীর নিকটে অতি পবিত্র স্থান।

কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন তিনি ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে ও কেহ বলেন ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে তিনি ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময় বর্ত্তমান ছিলেন। অপর দিকে "বিশ্বকোষে" লিখিত আছে যে তিনি ১৪০৮ হইতে ১৪২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের পদ্যানুবাদ ছাড়া তৎকর্ত্তৃক রচিত অন্য কয়েকখানি গ্রন্থের নাম জানিতে পারা যায়, যথা—"শিবরামের যুদ্ধ", "রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী", "যোগাদ্যার বন্দনা" প্রভৃতি।

কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। তাঁহার ভ্রাতাদিগের নাম শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার চারিটি ভগ্নী ছিলেন, ইহা ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত 'মহাবংশের' কারিকা হইতে জানা যায়। কৃত্তিবাস ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত। কিন্তু কৃত্তিবাস স্বীয় গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিবার কালে লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা ছয় সহোদর ছিলেন ও তাঁহাদের একটি ভগ্নী ছিল, যথা :—

"কুলেশীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥"

* * * *

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা
তার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা।
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিহ সুখের সংসার।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর

* * * *

মালি জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ ও থানা
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা-তরঙ্গিনী।

* * * *

সুশীল ভগবান তথি বনমালি
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী।
কুলশীলে ঠাকুরালে গোসাঞী প্রসাদে
মুরারী ওঝার পুত্র বাড়য়ে সম্পদে ॥
মাতার পতিব্রতা যশ জগতে বাখানি
ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী ॥"

আর এক স্থানে কৃত্তিবাস স্বীয় পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :—

"আদিত্যবারে শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস
তিথি মধ্যে জন্ম লইলেন কৃত্তিবাস।

* * * *

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারে উষা পোঁহালে শুক্রবার
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার
তথা করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার
যথা তথা যাই আমি বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন
গুরুক দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥"

বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া কৃত্তিবাস চন্দ্রদ্বীপের "রাজা গৌড়েশ্বরের" নিকট পাঁচটি শ্লোক প্রেরণ করিলে রাজা তৎপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজসভায় আসিতে অনুমতি দিলেন। রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া তিনি আর ৭টি শ্লোক পাঠ করিলেন—

ইহাতে "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥"

অতঃপর কৃত্তিবাস চন্দ্রদ্বীপরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রামায়ণের পদ্যানুবাদ করিলেন। কৃত্তিবাসের যে কোন সন্তানাদি ছিল তাহা বংশ-তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনা যায় যে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করেন।

কায়স্থ-কুলতিলক দনুজমর্দ্দন দেব রাজা গণেশের পুত্র হিন্দু কুলাঙ্গার স্বধর্ম্মত্যাগী ও অত্যাচারী যদু বা জালালুদ্দীন মহম্মদের রাজত্বকালে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরী জয় করিয়া লইয়া স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করেন। উহা ১৩৩৯ শকাব্দ=১৪১৭ খৃষ্টাব্দ=৮১৯-২০ হিজিরার কথা। দনুজমর্দ্দনদেবের পরে তৎপুত্র বীরবর মহেন্দ্র দেব পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদের অধিপতি হন। মহেন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ২।১ বৎসর পরে পাণ্ডুয়া তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। মহেন্দ্রের মৃত্যুর পরে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাবল্লভ সিংহাসনারোহণ করেন। সে সময় চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের অধিকার চন্দ্রদ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে" মহাশক্ত মহাবীর দনুজ-মর্দ্দনকে মহেন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বুধভট্টের "দেববংশ" হইতে গৃহীত উক্ত বর্ণনা কেহ কেহ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। উক্ত "দেব-বংশে" লিখিত আছে যে দনুজমর্দ্দন গৌড় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গুরুর আদেশে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। ইদিলপুরের কারিকায় প্রকাশ আছে যে, দনুজ-মর্দ্দন দেব চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিক-গণের মতে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের রাজত্বকালে গৌড় রাজ্যের রাজধানী পাণ্ডুয়া ও উত্তরবঙ্গ তাঁহাদের করতলগত ছিল। হয় ত সেজন্য তাঁহারা গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস দনুজ-মর্দ্দন হইতে রমাবল্লভের রাজত্বকালে কোন সময় চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাসভূমি কান্যকুব্জের উডুম্বর গ্রামে ছিল। তৎপরে মহারাজ আদিশূরের সময়

এতদ্বংশীয়গণ ব্রহ্মপুরী গ্রামে অবস্থান করেন। কৃত্তিবাস হইতে গণনা করিলে তাঁহার উর্দ্ধতন নবম পুরুষ উৎসাহকে মহারাজা বল্লাল সেন কৌলীন্ত প্রদান করেন। উৎসাহের পুত্রদ্বয় অন্বিত ও মহাদেব লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক ও কুলীন ছিলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র 'বেদানুজ মহারাজ' দনৌজ মাধবের সভায় আশ্রিত মুখটীর প্রপৌত্র নৃসিংহ ওঝা জনৈক সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহার বংশ ফুলের মুখটী বলিয়া বিদিত। তৎকালে গঙ্গা ফুলিয়ার পাদদেশ ধৌত করিত। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে যে ফুলিয়ার

মানচিত্র

নীচে গঙ্গা ছিল তাহা রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়।

দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেল-বন্ধন-কালে এই বংশ রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কৃত্তিবাসের অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত অনিরুদ্ধের প্রপৌত্র-দ্বয়ের নাম সুষেণ পণ্ডিত ও গঙ্গানন্দ। এই গঙ্গানন্দকে লইয়াই প্রথম ফুলিয়ার মেল-বন্ধন হয়। আবার পূর্ব্বোক্ত উৎসাহের অন্যতম পুত্র মহাদেবের শাখায় মহাদেব হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ যোগেশ্বর ও কামদেব খড়দহ মেলের প্রথম। এই বংশেই কুলীন বিষ্ণু ঠাকুরাদি জন্মগ্রহণ করেন। দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেল-বন্ধনের পরে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের মুখটি, বন্দ্যঘাটী প্রভৃতি পদবী পরিবর্ত্তিত হইয়া মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবী ব্যবহৃত হইতেছে।

কৃত্তিবাসের অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত মদনের বংশে মদন হইতে অধস্তন দশম পুরুষের নাম ভারতচন্দ্র। ইনিই "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র।

ফুলিয়া-পূর্ব্বে-কুলীন ব্রাহ্মণদিগের জন্য বিখ্যাত ও সমৃদ্ধি-শালী ছিল। ফুলিয়া মেলের বহু ব্রাহ্মণ বিখ্যাত উলাগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। আজিও উলায় মুখুর্য্যেপাড়া, দেওয়ান মুখুর্য্যেপাড়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। আজি প্রাচীন ফুলিয়ার প্রান্তভাগে শান্তিপুরে যাইবার পাকা রাস্তার ধারে "নূতন ফুলিয়া" গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস আছে মাত্র। বনাকীর্ণ প্রাচীন ফুলিয়ার ধ্বংসের মধ্যে হরিদাসের পাটের পূর্ব্বদিকে দুই ঘর মাত্র সদগোপ ও তিন ঘর ভট্টাচার্য্য উপাধিধারী মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের বাস আছে, অন্য কোন লোক নাই।

যে মহামারী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে বিখ্যাত উলাগ্রামে দেখা দিয়া উহাকে সামান্য কয়েক বৎসরের

মধ্যে ধ্বংস করিয়াছিল, ডাক্তার এলিয়টের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ মহামারী উলা হইতে বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ১৮৫৯।৬০ খৃষ্টাব্দে ফুলিয়া ও উহার নিকটবর্ত্তী নবলা ও মালিপোতা প্রভৃতি গ্রামে দেখা দিয়া ঐ সকল গ্রামকে নিমেষ মধ্যে ধ্বংস করে। Lieut. Col. G. A. Searle তাঁহার "Project of a Navigable Canal from the Ganges at Sahibgunge to Calcutta" 1871 নামক গ্রন্থে মহামারী দ্বারা ফুলিয়া ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ধ্বংসের ও লোকক্ষয়ের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সেবার ফুলিয়ায় পানীয় জলের অভাব, এবং বেলা দুই প্রহর অতীত হইতে চলিল দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি দ্রব্যাদি গাড়ীতে উঠাইয়া পদব্রজে বয়ড়ার গঙ্গাতীর অভিমুখে চলিলাম। দুই প্রহর অতীত হইলে বয়ড়ার ঘাটের বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় শয্যা বিস্তৃত করিয়া সেই স্থানে চড়ুইভাতি করা হইল। অপরাহ্নে পুনরায় পদব্রজে উলা অভিমুখে চলিলাম। ক্রোশাধিক পথ বাকী থাকিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। গভীর অন্ধকারে মাঠের ঢেলা ভাঙ্গিয়া যখন উলার পশ্চিম প্রান্তে বীরনগর রেল ষ্টেসনে শ্রান্ত দেহ ও স্খলিত পদে উপস্থিত হইলাম তখন রাত্রি ৮টা।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

তখন সন্ধ্যা আসন্ন। নদীর জল পাথরের গা বহিয়া দুরন্ত শিশুর মতন কলরব করে আছড়ে পড়ছে। ধীরু ছিল একটা পাথরের উপর চুপ করে বসে। তাহার হাতে পিসীমার চিঠি! পিসীমা লিখেছেন—"টাকা পেলুম। সোণার যাদু আমার বেঁচে থাক, রাজা হও,—তোমায় ঘরবাসী দেখে যেন আমি মরি। পূজার সময় এখানে একবার এস, কত দিন তোমার চাঁদমুখখানি দেখি নি। নিশ্চয় আসবে বাপ্ আমার। এখানে একটি ছোট টুকটুকে মেয়ে দেখে রেখেছি, আমাদেরই স্বঘর। তাকে আমার বুকে তোমার তুলে দিতে হবে।" ধীরু হাসিল। বিবাহ? কই, তাহার এই ২৩ বৎসর বয়সের মধ্যে এ কল্পনা ত তাহার মাথায় কোন দিনই আসে নি। তাহার মনের ভিতরকার মানুষটি যে মাথার সব চুল পাকাইয়া কর্ম্মক্লান্ত লোল-কম্পিত দেহখানি লইয়া পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। তাহার মাথায় এখন এত বড় বোঝা চাপাইলে সে বহিতে পারিবে কেন? আর তাহার এই ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে কেহই সুখ দুঃখ মিশাইয়া চলিতে পারে না। যে আশায় তাহারা নিজের সমস্ত সত্তাটি মিশাইয়া দিবে, এতখানি ত্যাগ স্বীকার করিবে, বিনিময়ে কি লাভ করিল সে বিচার কি কোনদিন করিতে বসিবে না? নিশ্চয় করিবে। তখন?—না…জানিয়া শুনিয়া সে এমন করিয়া ঠকাইয়া কাহারও জীবন ব্যর্থ করিবে না। সে একটা ধূমকেতুর মতন আসিয়াছে…আবার কবে কোন্ প্রলয়ান্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। সম্মুখে তাহার এই যে নিরানন্দ ধূসর অনন্ত অফুরন্ত পথ, ইহা তাহাকে একাই অতিক্রম করিতে হইবে। তাহার এই জরাজীর্ণ মনের ভগ্ন কুঁড়ে ঘরে সে আর কাহাকেও ডাকিয়া আনিবে না। না—কখনও না। কোন্ সাহসে আনিবে? যাহার পতন প্রতিমুহূর্ত্তে একটা দমকা বাতাসের অপেক্ষা করছে, তাহারই আশ্রয়ে? না—না—না! এমনি এলোমেলো চিন্তাগুলো যখন তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন বাতাসে ভেসে বেড়ানো নদীর মৃদু কলধ্বনির সঙ্গে বহুদিনের একটা করুণ আর্ত্ত স্বর তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল—"এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হলে ধীরুদা"। সে সবলে ঠেলিয়া দিতে চাহিল; কিন্তু সে শব্দ যেন আরও কাছে তাহার বুকের মাঝে আসিয়া

চাপিয়া বসিল। না—না, সে ত ভাষা নয়, কথা নয়,—সে যে শরীরি হয়ে আজ তাহারই সম্মুখে—এ যে কল্যাণী···ম্লান মুখে পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছে—"ওগো, তুমি কোথায়—আমি কোন্ সুদূরে!"

"ওগো!"—

ধীরু চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, রাধি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া একান্ত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া আছে। তার মুখখানায় পড়ন্ত রৌদ্রের লাল আভাটুকু পড়িয়া গাল দুটা লাল করিয়া দিয়াছে। চোখ দুটো কিসের উজ্জলতায় জ্বলিতেছে। অধরের কোণে হাসির শেষ রেখাটুকু তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। রাধি বলিল "কি এত ভাবছিলে বল ত? আমি আধঘণ্টা ধরে তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি—তোমার হুঁস নেই; বিয়ের ভাবনা ভাবছিলে বুঝি?"

ধীরু কোন জবাব দিল না। রাধি হাত হইতে চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে চিঠিখানা ধীরুর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, "তাই না কি? সেই ভাল, একটা বিয়ে কর, তাহলে রাতদিন এমন মনমরা হয়ে থাকতে হবে না! কিন্তু ছোট মেয়ে বিয়ে করো না যেন!"

ধীরু কহিল "কেন"?

"কেন?···জান না?···যাও···আমি জানি না।" রাধি ধীরেনের পাশে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল! ধীরুর ইচ্ছা হইল উঠিয়া যায়; কিন্তু সেটা অশোভন হইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু বিরক্তির চিহ্নটা তার চোখে মুখে এমন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, যে, তাহা রাধির দৃষ্টি এড়াইল না। রাধি এক গাল হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা এই চিঠিখানাতে কি তোমার ফাঁসির হুকুম এসেছে, যে, অমন মুখ গোঁজ করে বসে আছ!"

ধীরু হাসিয়া কহিল, "তার চেয়েও বেশী।"

রাধি মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "বিয়ের আগে অমন সকলেই বলে গো। তার পর বিয়ে হলে একেবারে বউএর চরণের চুটকী হয়ে থাকে।"

"সত্যি না কি? তবে আমাদের বাঁকড়োর মুখুজ্যে-মশাই···"

রাধি বাধা দিয়া মুখ লাল করিয়া কহিল, "আঃ, দেখো, মাকে বলে দেব, আমায় রাগাচ্ছ!"

এমনি গল্পে যখন দুজনেই মত্ত, তখন শরতের খামখেয়ালী মেঘ আকাশে তাহার কাল চুলগুলি মেলিয়া দিতেছিল! সেই চুলের গোছা বহিয়া যখন ফোঁটায় ফোঁটায় জল পৃথিবীর বুকে পড়িতে লাগিল, তখন নিকটেই বয়লার-খালাসীর পরিত্যক্ত চালা দেখিয়া রাধি ধীরুর হাত ধরিয়া ছুটিয়া চলিল সেই ভগ্ন চালাঘরের মধ্যে। ঘরে একটা ভাঙা খাটিয়া পড়িয়া ছিল, এবং কোণে ২।১টা হাঁড়ি ও একটা মাটির কলসী। রাধির কাপড়ের কতকাংশ ভিজিয়া গিয়াছিল। সে চালাঘরে ঢুকিয়া কাপড়ের জল নিংড়াইয়া ধীরুকে কহিল, "তোমার জন্যেই ত ভিজে মলুম!"

"আমার জন্যে কি রকম?"

"বাঃ গো, মশাইকে ডাকতে এসেই না আমার এই দশা! বাবা তোমায় ডাকলেন, জওয়া নেই,—দেখলুম, তুমি বড় পাথরটার ওপর বসে আছ, তাই ত এলুম!"

"যেমন এসেছ, তার ফলভোগ কর। বিষ্টি এখন আর ছাড়ছে না!" ধীরু খাটিয়াখানা টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল! রাধিও তাহার পাশে বসিয়া হাসিয়া কহিল, "একা ত নই, তুমি আছ ভয় কি?"

"আমি চল্লুম।"

"বাঃ গো"—এমন সময় সশব্দে বিদ্যুৎ চমকাইতেই রাধি "মাঃ গো" বলিয়া সত্রাসে ধীরুকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল। রাধির সমুন্নত বক্ষের একাংশ ধীরুর অঙ্গস্পর্শ করিতেই তাহার দেহ-মনে একটা শিহরণ আনিয়া দিল। সে কি একটা কথা বলিতে গিয়া পারিল না। শুধু অস্ফুট শব্দে রাধি ধীরুকে আরও নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া মাথাটা তাহার কাঁধের উপর রাখিল। রাধির দ্রুত গরম নিঃশ্বাস ধীরুর গালে লাগিতেই তাহার দেহের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দুটি এমন উন্মত্ত ভাবে মাতলামী সুরু করিয়া দিল, যে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে ধীরুর হৃদয়ে হাতুড়ির আঘাত পড়িতে লাগিল। কি একটা উন্মাদ বাসনা মনের কোণে উঁকি মারিতেই, দুই হাতে সজোরে নিজেকে রাধির বাহু-বেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া বাহিরে বৃষ্টিতে আসিয়া দাঁড়াইল! ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "বৃষ্টি ছাড়বে না, বাড়ী এস!"

রাধি কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল। তাহার সমস্ত মুখখানা বর্ষাকাশের মতন অন্ধকার,

চক্ষের কোণে উদ্বেল অশ্রু। বয়লার-খালাসী তাহার চালা অভিমুখে আসিতেছিল, রাধিকে ধীরুর পশ্চাতে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "বহুত বরখা বাবু!" ধীরু কোন কথা না বলিয়া চলিল; কিন্তু ব্যাপারটার কদর্য্যতা তাহার সমস্ত চিত্তকে তিক্ত করিয়া তুলিল।

বাটীতে ঢুকিতেই জগত্তারিণী ব্যস্ত ভাবে ধীরুকে কহিলেন, "ওমা, এমনি করে ভিজে আসতে হয় বাছা? তার পর এই বিদেশে একটা অসুখ-বিসুখ করুক। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন রাধি, ধীরুকে একটা কাপড় এনে দে,—বাছা আমার হাপুসে ভিজে গেছে!"

রুক্ষকণ্ঠে রাধি কহিল, "আর আমি বুঝি খুব শুকনো কাপড়ে আছি—চোখ দিয়ে দেখছ?"

"মেয়ের কথার ছিরি দেখ! সখ করে তুই ভিজতে গেলি—আমার দোষ? বল্লুম না যে পাঁড়েকে পাঠিয়ে দে ধীরুকে ডেকে আনুক!"

লজ্জায় রাগে রাধির চক্ষে জল আসিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রাধি কহিল "বলো আমায় আর কোন কথা, দেখব তখন!" বলিয়া রাধি দ্রুত তার ঘরে গিয়া দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

ধীরু ভিজা কাপড় ছাড়িয়া গা মাথা মুছিয়া যখন ঘোষাল মহাশয়ের ঘরে গেল, তখন তিনি বিছানায় শুইয়া ছিলেন। অত্যধিক পান দোষ ও শারীরিক অত্যাচার হেতু আজ তিনি কয়মাস হইতে পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছেন। ডাক্তার বলিয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে এ রোগ সারিবার আর উপায় নাই। ধীরু ঘরে ঢুকিতেই দীনুবাবু মুখখানা বিকৃত করিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "ধীরু বসো।" ধীরু পাশে চেয়ারে বসিলে তিনি বলিলেন, "এ হপ্তায় পেমেণ্ট কত লাগল?"

"আজ্ঞে ১৮৫০৲ টাকা।"

"বেশ; তাহলে কালকেই বিলগুলো সব তৈরী করে পাঠিয়ে দাও।"

"যে আজ্ঞে।"

"এ মাসে কত থাকবে দেখেছ?"

"আজ্ঞে ১৫০০ টাকা আন্দাজ লাভ থাকবে।

"বেশ। দেখ বাবা, তোমার অংশে আমার কাছে হাজার পনের টাকা জমেছে। তুমি ইচ্ছে করলে সে টাকা নিতে পার। কিন্তু আমি বলি কি—আরও কিছু জমিয়ে একটা ছোট খাটো অভ্রের খাদ করতে পারলে মন্দ হয় না। অভ্রের কাজে খুব লাভ। গিরিডির সাগরমল মাড়োয়ারী আমাকে একটা জমির কথা বলেছিল,—আমাকে এক রকম এমনি দিতে চায়! দরকার হলে আমি না হয় আরো কিছু টাকা তোমার হিসেবে আগাম দিতে পারি। কেমন, রাজী আছ?"

ধীরু গভীর বিস্ময়ে দীনুবাবুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "আমার অংশ—এত টাকা—এ আপনি কি বলছেন?"

"আমি অকর্ম্মণ্য হয়ে ত আজ ৬।৭ মাসের ওপর পড়ে আছি—কাজকর্ম্ম কিছুই দেখতে পারি নি; তুমি সুশৃঙ্খলে কাজ চালিয়ে এসেছ।—এই বছর খানেকের ওপর খাটছ।—আমার সময়ে যা লাভ হচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হচ্ছে। তার ওপর, তুমি আসতেই না আমি খরিদ-বিক্রি কাজ আরম্ভ করি? সে কাজও ত তুমি একাই চালাচ্ছ। তোমার সততা, তোমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, তোমার কার্য্যকুশলতা এ সবের কি কোন দাম নেই বাবা! তুমি না থাকলে ত আমার কাজ বন্ধ হয়ে যেত; কারণ, বিশ্বাসী, কর্ম্মঠ লোক কোথায়? তাই আমি তোমাকে ৬ আনা অংশ মনে মনে দিয়েছিলুম ও তোমার লাভের টাকা আমার কাছে মজুত করে রেখেছি।"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "না—না—এ আপনি কি—আমার কোন অংশ নেই, আর আমিও মাসে মাসে আমার খরচের মতন টাকা নিয়েছি।"

দীনুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "সে ত তোমার হাত-খরচের টাকা নিয়েছ,—২৫ টাকা করে পিসীকে পাঠিয়েছ। তোমার লাভের টাকা মজুত আছে।"

জগত্তারিণী আসিয়া সহাস্যে কহিলেন, "কি হয়েছে?" দীনুবাবু হাসিয়া কহিলেন "ধীরু বলে ওর কোন অংশ নেই।"

জগত্তারিণী কহিলেন, "আঃ হাবা ছেলে, এ যে তোমার নেয্য পাওনা বাবা। তুমি এই হাড়ভাঙ্গা মেহনত করছ। মুখের রক্তওঠা কড়ি,—তোমায় ফাঁকি দিলে ভগবান কি ভাল করবেন? একেই ত ওঁর—" জগত্তারিণী আর বলিতে পারিলেন না—আঁচলে চোখ মুছিলেন।

দিনু বাবু কহিলেন, "গিন্নী, আর আমার ভাবনা নেই! আমি মরে গেলেও এই তোমার ধীরু রইল—দেখবে। তোমার পেটের ছেলেও এর মতন দেখত না!"

জগত্তারিণী কহিলেন, "সে তুমি বলবে কি, সে কি আর আমি জানি না। ও আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী। ওর গুণ এক মুখে আমি বলতে পারি না। কত পুণ্যে যে বাবাকে পেয়েছি—"

রাধি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দৃষ্টি ধীরুর পানে নিবদ্ধ। ধীরু এতক্ষণ অন্ত দিকে চাহিয়া ছিল। রাধিকে দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল এবং নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর ধীরু যখন নিজের ছোট ঘরখানিতে আসিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। আকাশে একরাশ নক্ষত্রের মাঝে সপ্তমীর চাঁদ ভাল করিয়া আপনার মজলীস্ জমাইয়া বসিয়াছে। ধীরু বাহিরের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশের কোথাও কোন মলিনতা নাই, একটা শান্ত সর্ব্বব্যাপী শুব্ধতা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাহারও চিত্ত শান্ত। সে মনে মনে দীনুবাবুর কথা যতই তোলাপাড়া করিতে লাগিল, তাহার মাথাটা আপনা হইতেই এই বৃদ্ধ পঙ্গু লোকটির পায়ের কাছে নত হইতে চাহিল। এই লোকটির দয়া আজ তাহাকে এমন যায়গায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, যেখান হইতে সংসারের কোন বস্তুই তাহার অগোচর থাকিবে না। কিন্তু ইহার সার্থকতা কোথায়? জীবনের সব চেয়ে বড় ক্ষতিটাকে ত এই সব মিথ্যা দিয়া পূরণ করা যাইবে না। ধীরুর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার এই শুষ্ক কঠোর জীবনের নীচে নিজের যে আরও একটা স্নেহসিক্ত জীবন আজও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এ ধারণা ধীরুর ছিল না। উৎসবের মাঝে গোপন শোকের মতই একটা ব্যথা তাহার বুকের এক পাশে আড়ষ্ট ভাবে চাপিয়া বসিয়া রহিল! কল্যাণীর প্রতি তাহার ভালবাসার গভীরতা যে কতখানি, তাহা সে নিজে কোন দিন জানিত না। যেদিন কল্যাণী তাহাকে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইল ও অশ্রুজলের ভিতর দিয়া প্রাণের গোপন কথাটি জানাইল, সেইদিন শুধু একটা সাধ কেবলই রহিয়া রহিয়া তাহার বুকে সারাদিন নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু সে যেন জোর করিয়াই সেদিন তাহার মনটাকে দাবিয়া রাখিয়াছিল। কল্যাণীর সেই এক ফোঁটা চোখের জল, একটি মাত্র কথা যে তাহার কাজ কর্ম্মে, শোয়া বসায়, চিন্তার মধ্যে সজীব থাকিয়া তাহার জীবনের ধারাটা এমন করিয়া বদলাইয়া দিবে, ইহা সে কল্পনা করে নাই। তাহার গৃহ-বিচ্ছেদ, সকলের অবজ্ঞা, ঘৃণা, তাহাকে চোখের জল ফেলাইয়া গ্রামছাড়া করাইলেও, একজনের এই চোখের জলের জন্যই তাহার মনটা আজও সেই গ্রামের একটা ভাঙ্গা ইট-বার-করা একতলা বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিয়া হাসি ও অশ্রুর নাগরদোলার মাঝে পাক খাইতে থাকে! ছোট খাটো স্মৃতিগুলা মনের মাঝে ভিড় করিয়া এমনি কলরব করিতে থাকে, ধীরু কোন মতেই তাহাদের বিদায় করিতে পারে না। তারা যেন তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের প্রিয়সঙ্গী, একান্ত দরদী,—তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না। ধীরু ভাবিল অর্থ, ঐশ্বর্য্য, কাহার জন্য? তাহার নিজের ইহার কোন দিনই প্রয়োজন হইবে না। নিজের ভাবনা সে কোন দিনই ভাবে নাই। আর সকল ভাবনারই একটা ধরণ আছে। যাহার জগতে আশা আছে, সে এক রকম ভাবে একটা গতি লক্ষ্য করিয়া ছুটে। আর যাহার জীবন গভীর নৈরাশ্যে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার সুখ নাই, দুঃখ নাই, উৎকণ্ঠা নাই—উদ্বেগহীন জীবনটা স্রোতের মুখে তৃণের মতন ভাসিয়া যায়—কোথায় যায় জানে না, কেন যায় জানে না, কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না।

ধীরুর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল একজন লোককে আসিতে দেখিয়া। ধীরু আশ্চর্য্য হইল—এত রাত্রে কে আসে? লোকটা জানালার কাছে আসিয়া কহিল, "এইটে কি দীনুবাবুর বাসা?"

"হ্যাঁ—আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"আমি বাঁকড়ো থেকে আসছি,—আমি দীনুবাবুর জামাই।"

ধীরু হেরিকেনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। লোকটা ভিতরে আসিলে ধীরু দেখিল, তাহার বয়স ৩০।৩২ হইবে। রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, তামাটে রং, মুখে এক-মুখ দাড়ী। লোকটা কহিল "আপনাকে ত চিনতে—"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, "আমি দীনুবাবুর কাজকর্ম্ম দেখি। আমার নাম ধীরেন!"

"ওঃ বেশ। আমার নাম রামপদ মুখুজ্যে।"

ধীরু কহিল, "আপনার নাম শুনেছি। আপনি বসুন, এঁদের খবর দিই!"

রামপদ বাধা দিয়া কহিল, "না—না, দরকার নেই,—সকলে ঘুমুচ্ছে—আবার এত রাত্রে ডাকাডাকি!"

ধীরু কহিল, "বিলক্ষণ! তাতে কি হয়েছে!"

রামপদ কহিল, "কোন দরকার নাই। খাবার হেঙ্গামা ত নাই; কারণ, আমার মার কাল হয়েছে কি না—আর এই খাটিয়াখানার ওপরে শুয়েই এই বাকী রাতটুকু কাটাতে পারব।" বলিয়া তাহার হাতের সাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগটা খাটিয়ার ওপর রাখিল। "তারপর আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

ধীরু কহিল, "প্রায় বছরখানেক হবে। দীনুবাবুর ভাগ্নে মণি আমার বন্ধু। মণিকে বোধ হয় আপনি চেনেন?"

রামপদ হাসিয়া কহিল, "আপনি মণির বন্ধু? আরে তাই বলুন! মণিকে বিলক্ষণ চিনি! বেশ ভাল ছোকরা। বেশ, মণির যখন আপনি বন্ধু, তখন আপনার সঙ্গেও আমার ঠাট্টার সম্পর্ক,—কি বলেন, হ্যাঁ?"

ধীরু একটু হাসিল। রামপদ ধীরুকে কহিল, "এক গ্লাস জল দিতে পারেন?"

ধীরু কহিল, "দিচ্ছি। কিন্তু শুধু জল খাবেন? বাড়ীর ভেতর থেকে একটু মিষ্টি—"

রামপদ বাধা দিয়া কহিল, "মিষ্টি আনবেন? তা হলেই যেটুকু হয়েছে সব মাটি হয়ে যাবে।"

ধীরু বিস্ময়ে রামপদর মুখের দিকে চাহিতেই, রামপদ হাসিয়া কহিল, "বুঝতে পারলে না? তবে বৃথাই এতদিন কয়লার খাদে এসেছ! সবে কালেজ ছেড়ে এসেছ বুঝি? কি কর এখানে—মাইনিং পড়?"

ধীরু কহিল, "হাঁ, লেকচারও এটেণ্ড করি। কিন্তু আপনি কি বল্লেন আমি ত বুঝতে পারলুম না!"

রামপদ হাসিয়া কহিল, "বুঝতে খুবই পেরেছ ভাই, কেবল ছলনা করছ! তোমরা হচ্ছ কলকাতার বাবু—তবে আমিও নেহাৎ গেঁও নই, বুঝলে? আমার কাছে দিশী পাবে না, বিশ্বাস না হয় বার করি দেখ!" এই বলিয়া রামপদ তাহার ব্যাগ হইতে একটা কাঁচের গ্লাস ও মদের বোতল বাহির করিল।

ধীরু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "আপনার অশৌচ—"

রামপদ বাধা দিয়া কহিল, "সেই জন্যে প্রথম ক'দিন এটার [illegible] চালিয়েছিলুম; কিন্তু তাই সুবিধে হল না। আমাদের দলের চক্রবর্তী ঠাকুর—সে মস্ত কুলীন বামুন,—সে বলে 'শরীর রক্ষার্থে যদি খাও কোন দোষ নাই।' কি জান ভাই, ১৪-১৫ বছরের অভ্যেস,—আর আমি বাঁচলে ত তবে আমার মার শ্রাদ্ধ করব। কিন্তু আমিই যদি পটল তুলি, তাহলে মা আমার এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত পাবে না! এই শীতকালে শুধু আলোচাল আর কাঁচকলা-সেদ্ধ খেলে আমাকেও তাহলে মার কাছে পৌছতে হবে!"

ধীরু আর কোন কথা কহিল না। তাহার সমস্ত মনটা ঘৃণায় ভরিয়া গেল! সে এক গ্লাস জল লইয়া টেবিলের উপর রাখিল। রামপদ কাঁচের গেলাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া গেলাসটা ধীরুর দিকে ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "নাও ভাই, দেখ কি রকম জিনিষ।"

ধীরু কহিল, "আপনি খান, আমি খাই না!"

"আরে আমি ত খাবই,—গাড়ীতে চড়েই চালাচ্ছি। অর্দ্ধেকটা সাবাড় করেছি, দেখছ না? কিন্তু তোমার সঙ্গে ভাই আমার আলাপ হল, তুমি হলে কুটুম্ব লোক—"

"মাফ করবেন, সত্যিই আমি খাই না! আপনি খেয়ে শুয়ে পড়ুন, অনেক রাত হল, গাড়ীতে এসেছেন, কষ্ট হয়েছে।"

রামপদ কহিল, "কষ্ট ত খুবই হয়েছে, এতটা পথ হেঁটে! সেই কষ্টর জন্যেই ত এই ওষুধ খাওয়া! না হলে আমিও মাতাল নই। হ্যাঁ, সত্যিই তুমি খাও না?...একটু, এক চুমুক—"

"আজ্ঞে না, মাফ করবেন, আমার সাত পুরুষে কেউ ও জিনিষ ছোঁয়নি।"

বাধা দিয়া রামপদ কহিল, "আরে রামঃ, নেহাৎ টিকিদাস ভট্‌চাজ্যির দল দেখছি! All right, তাহলে আমি একাই—কি বল হ্যাঁ?—" এক নিশ্বাসে সমস্তটা গলাধঃকরণ করিয়া খালি গেলাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া রামপদ আবার কহিল, "ধূম পান আসে? না নস্য চলে?"

ধীরু হাসিয়া কহিল, "সিগারেট খাবেন? আছে!" বলিয়া টেবিলের উপরের টিন হইতে একটা সিগারেট লইয়া রামপদকে দিল।

"তবু ভাল যে একেবারে নিরিমিষ্যি নও! হ্যাঁ, এরা আমার খুবই নিন্দে করে, নয়?"

"আজ্ঞে না, তবে—"

"দেখ ভাই, মাইরী বলছি, আমার কোন দোষ নেই! মা বেটি বৌকে ছুচক্ষে দেখতে পারত না! না হলে আমার কি জ্ঞান নেই, যে, বিয়ে করেছি, ধর্ম্ম সাক্ষী আছে, সত্যিই তুমিই বল না? আমি কি আর সত্যিই মানুষ নই? না আমার বৌ নিয়ে সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে হয় না? মা কত চেষ্টা করেছে আবার আমার বিয়ে দিতে, কিন্তু শর্ম্মা সেদিকে খুব শক্ত; বিয়ে আর আমি করি নি ভাই।"

"সে ত ভালই করেছেন!"

"একবার? পাঁচশবার ভাল করেছি! বাইরে মেয়েমানুষ থাকলেও, বিয়ে আর আমি করি নি ভাই! আর সেটা দোষের হয় নি—তুমিই বল না! বেটাছেলে, পুরুষবাচ্ছা, তাতে আর দোষ কি বাবা! আমার কাছে ভাই লুকোছাপা নেই! হয় না হয় আমার পরিবারকে জিজ্ঞাসা করো!"

ধীরু কোন কথা বলিল না। আজ রাধির সকল দুর্ব্বলতা সে ক্ষমা করিল ও তাহার প্রাণটা করুণায় ভরিয়া উঠিল! এই পশুটার পাশে রাধিকে কল্পনা করিতেই তাহার সমস্ত মনটা অনুশোচনায় ভরিয়া গেল!

রামপদ আরও খানিকটা মদ গিলিয়া ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "এইবার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাব ভাই। ভাব দেখি, এই ক'বছর ধরে কম কষ্টটা সে পেয়েছে? সতীলক্ষ্মীর চোখের জল পড়েছে, এ পাপ আমি রাখব কোথায়? আসবার সময় আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে, 'ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় তাড়িয়ে দিও না' সে কথা কি আমি কখনও ভুলতে পেরেছি? কিন্তু মা বেটি যে বেজায় একগুঁয়ে ছিল, কিছুতেই ওই একবোখা বউ নিয়ে ঘর করতে চাইলে না। আমি আর কি করব বল? মার কথা ত অবজ্ঞা করতে পারি না। গুরুজন! আহা, স্বগ্গে গেছেন, কি বলব তোমায় দেখাতে পারব না—কিন্তু অমন মা কারুর হয় না! আহা, মাগো—" বলিয়া রামপদ কাঁদিয়া ফেলিল।

ধীরুর ভয়ানক হাসি আসিল; কিন্তু সে প্রাণপণে তাহা চাপিয়া কহিল, "যাক্, এখন কেঁদে আর কি করবেন বলুন। অনেক রাত হয়েছে—ওই বিছানায় শুয়ে পড়ুন! আমারও সারাদিন খাটুনী হয়েছে" বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আলোটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িল। খানিক বাদে রামপদ কহিল, "কি ভাই, ঘুমুলে? ধীরু বালিসে মুখ গুঁজিয়া হাসি চাপিল ও কোন জবাব না দিয়া চাদরটা টানিয়া মাথা পর্য্যন্ত চাপা দিল! বার কতক এমনি ডাকাডাকি করিয়া যখন ধীরুর কোন সাড়া পাইল না, তখন রামপদ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিল।

(১২)

দেবেন্দ্রের নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে খুব ঘটা। গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছে। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী পরিপূর্ণ। কলিকাতা হইতে হালুইকর বামুন আসিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছে। গ্রামের শিরোমণি ঠাকুদ্দা মাথায় গামছা বাঁধিয়া খবরদারী করিতেছেন।

অন্দরে দালানের বারান্দায় বসিয়া জটলা করিয়া মেয়েরা তখন তরকারী কুটিতেছিল ও পান সাজিতেছিল। সত্যবালা মুখ চোখ লাল করিয়া আসিয়া একজন বর্ষীয়সী বিধবাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "শুনেছ মাসীমা, এদিকের ব্যাপার? সাধে কি আমি বলি আমার ভাল কারুর সয় না...বিষ নেই অথচ কুলোপানা চক্কোর আছে। না এলি, না এলি, আমার ছেলের ভাত তোদের জন্যে কিছু আটকে থাকবে না। দেমাক কত! মর্, তোদের খাই না পরি, যে এত কথা!...আসুক সে অন্দরে...শুধু শুধু আমার ভাইকে পাঠিয়ে এতটা অপমান করানো কেন শুনি?"

"সুরী এল না বুঝি তাহলে বৌমা? তুমি আর কি বলবে মা, ও আমি আগেই জানি। ভাবলেম তখনি বলি, তা আবার দেবু কি মনে করবে ভেবে চুপ করে গেলুম। কাজ কি মা সব কথায় থেকে।...কি বল্লে শুনি?"

"লাখ কথা মা—হাজার-গণ্ডা কথা শুনিয়ে দিয়েছে। অপরাধের মধ্যে আমার ভাই কেন নেমন্তন্ন করতে গেছে... এই নেমতন্ন মানী লোকেরা নিলেন না। কেন তাঁর ভাই গিয়ে তাঁকে চতুর্দ্দোলা করে নিয়ে এল না! আর ঠাকুর জামায়েরই বা কি আক্কেল! জানিস ত বাপু আমার কেউ আপনার বলতে নেই...একজন হয়েছেন বিবাগী, আর একজন ত খোঁদল ছেড়ে নড়তে চান না...যেন যক্ষির ধন আগলাচ্ছেন...থাকবার ভেতর ওই ত একা মানুষ—তাকে

নিয়ে মরছেন সবাই...হিংসে...হিংসে···ওসব কোন কথা নয় মাসীমা···হিংসেতেই সব জ্বলে মরছে।"

একজন মধ্যবয়সী বিধবা একটি মোটা কাল স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া কহিল "কেমন বিশুর মা, বলি নি আমি? দেখলি ত! সেবারেই সুরী যখন পিসীমার কাশী যাবার সময় দেখা করতে এল, যেন মুখ ভার-ভার, তখনই জানি। মরব করে কেবল তাই জানি নি। তুমি আমাদের ভালবাস বলে বৌ, হিংসে কি কম? আমায় কত ঠাট্টা করা হল। সো ননদ, কত কি বল্লে! সত্যি জাঠতুতো ননদ ত বটে, ভায়েরা জ্ঞাতি হলেও পর ত নয়। এদের ত দশ রাত্রের ওষুধ নিতে হয়। কর্ত্তারা না হয় ভেন্নই হয়েছিলেন, এক রক্ত ত বটে। তাই ত ভুলো বলে 'আজ যদি সব এক সঙ্গেই থাকতুম দিদি, তাহলেও সেই ওবাড়ীর মেজদার কথাই মানতে হত। হাজার হোক বড় ভাই, পরিচয় দিতে দশের কাছে মুখ উজ্জ্বল হয়। আর মেজ বউদি হতেই আমাদের বাড়-বাড়ন্ত,—ওবাড়ী-এবাড়ী সকলের উন্নতি!'

এমন সময় একটি ২৬।২৭ বছরের শ্যামবর্ণ বধূ আসিয়া প্রণাম করিতেই, সত্যবালা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, "হাঁালা ছোট বৌ, এই এখন তোর আসা হল? ও ঠাকুরঝি, এই নাও, ছেলের কাকীকে পাতা করে দাও, উনি নেমন্তন্ন রাখতে এসেছেন!"

বধূটি হাসিয়া কহিল, "তোমার দেওরকে যে আফিসের ভাত রেঁধে দিয়ে আসতে হল। আমার দোষ বুঝি!"

"কেন, ঠাকুর-পো একটা দিন ছুটি নিতে পারলে না?"

"আফিসে গিয়ে চলে আসবেন বলেছেন।"

"ভুলোর যে আফিসে মেলের কাজ পড়েছে কি না, তাই; আমায় যে কাল বল্লে, মেজ বৌদিকে বলো দিদি, আমি আফিসে গিয়েই চলে আসব!"

সত্যবালা দালানের অপর প্রান্তে গিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল, "কি করছ তুমি রাখালের পিসী ওখানে বসে বসে? কুমড়োগুলো কোট না বাছা!"

রাজলক্ষ্মী একখানি পট্টবস্ত্র পরিয়া নারায়ণ পূজা ও নান্দিমুখ শ্রাদ্ধের সমস্ত গোছাইয়া দিতেছিল। প্রয়োজন বশতঃ সত্যবালার নিকটে আসিতেই সে মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "কি—আবার এখানে কি মনে করে···ওখানে সব ফেলে এলে ত, কোন জিনিষ নষ্ট হয় তাহলেই তোমাদের ভাল...গেলে আর তোমার কি? দেখছ, ঠাকুরঝি এদের আক্কেলখানা?"

"সত্যিই ত বউ, তোমার আক্কেলখানা কি বল ত? কার ওপর অত সব জিনিষ রেখে এলে···"

রাজলক্ষ্মী গম্ভীরভাবে বলিল, "পুরুত ঠাকুর আছেন, আর পূজোর জিনিষ কে নেবে ঠাকুরঝি? আমি একটু মধু চাইতে এসেছি!"

সত্যবালা হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল, "শুনলে মাসীমা, ওঁর কথার ছিরী! একটু মধু নেবেন তাও আবার আমার কাছে চাইতে এসেছেন···যেন সব কাজে আমার অনুমতি চাই। তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন···নাওগে যাও!"

রাজলক্ষ্মী যাইতেছিল, সত্যবালা কহিল, "ওই বড় আলমারীর তাকে···আচ্ছা চল, আমিই যাচ্ছি! তুমি আবার এক জায়গার জিনিষ সাত জায়গায় রাখবে···আবার আমাকে খুঁজে মরতে হবে···"

মাসীমা নিম্নস্বরে কহিলেন, "তুমিই যাও না মা, নিজের ঘর সংসার কি আর পরের হাতে ছেড়ে দিলে চলে?···কিছু লোকসান হলে তোমারই যাবে!"

দেখিতে দেখিতে পণ্ডিত-বাড়ী লোক-সমাগমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরে ঢোল কাঁশি বাঁশির শব্দ,—অন্দর স্ত্রীলোকের কলরবে মুখর! যথাবিধি কার্য্যের পর রাজেন্দ্রনাথ নবজাত শিশুকে কোলে করিয়া বান্ধবগণ সহ গ্রামের প্রতিষ্ঠিত দেবতা "শ্যাম সুন্দরের" মন্দির ঘুরিয়া আসিলেন। তার পর নাম রাখার পালা আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ পুরাতন খানসামা নবীন হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্রের নবাগতা শ্যালিকারা পর্য্যন্ত সকলেই আপনাপন পছন্দ মত এক একটা নাম বলিল।

দেবেন্দ্র এতক্ষণ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া ছিল, নিকটে মাধব বসিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন। দেবেন্দ্র কহিল, "ধীরুর ঠিকানা জানলে আমি তাকে আসতে লিখতুম খুড়ো; আর সে ইচ্ছা আমার খুবই ছিল; কিন্তু কি করব—তার ঠিকানা আমার এত দিন জানা ছিল না। সে যে আপনার চিঠিতেই খোকার ভাতের খবর পেয়ে ৫০৲ টাকা আশীর্ব্বাদী পাঠিয়েছে তা আজ বুঝছি।"

মাধব চক্রবর্ত্তী হুঁকাটা দেয়ালে রাখিয়া কহিলেন, "হাঁ, ধীরু মাঝে মাঝে আমার কাছে চিঠিপত্তর দেয় বটে।

গাঁয়ের সকলের জন্ত তার একটা টান আছে। হাজার হোক, দেশের মায়া যাবে কোথায় বল !"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া দেবেন্দ্র কহিল, "যাক্, সে যে আজ রোজগার করে মানুষ হয়েছে চক্রবর্ত্তী খুড়ো, এইটাই হচ্ছে আমার মহা আনন্দের কথা। সত্যিই বিষয় কিছু আর আমি সঙ্গে নিয়ে যাব না। তবে কি জানেন, প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র আয় থাকা দরকার ! যে রকম দিন কাল পড়েছে, তাতে শেষটায় একটা বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হলে—"

বাধা দিয়া মাধব বলিলেন, "কিন্তু যাই বল না মেজকর্ত্তা, ধীরু ঝগড়া করবার ছেলে নয় ! তার মন···"

বাধা দিয়া দেবেন্দ্র কহিল "আহা হা, আপনি বুঝছেন না খুড়ো, সে কথা আমি বলছি না। আমি বলছি কি, আগে ত তার কোন মতিস্থিরতাই ছিল না। সে তো কোন দিন কিছু রোজগার করবে এ ধারণা আমার ছিল না। নিজের খেয়ালেই চলত ! তাহলে দেখুন···একা সব ঝঞ্ঝাটই যদি আমার মাথায় সকলেই চাপায়···"

"তা ত বটেই বাবা ! তবে কি না দেখ, তাকে যদি কোন দিন ভাল ভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে, তাহলে বেশ বুঝতে পারতে তার স্বভাবটি হচ্ছে সরল উদার কিন্তু তেজস্বী। তাকে চোখ রাঙ্গিয়ে কেউ যে কোন দিন বশে আনতে পারবে···সে ধারণা আমার নেই ! দেখ বাবাজী, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল ত সমান হয় না।"

"দেখুন, লোকে হয় ত আমায় মন্দ বলতে পারে; কিন্তু আমি বাস্তবিক তার ভালর জন্যই বলতুম। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার জীবন একরকম ভাবে নাম বজায় রেখে কাটিয়ে যেতে পারব; সে জন্যে কোন স্বার্থের বশে যে তাকে বলতুম তা নয়। কিন্তু বংশের সকলেই যাতে মানুষের মতন হতে পারে সেটা দেখা উচিত নয় কি ? লোকে হয় ত বলবে ভাইকে ফাঁকী দিলে, পথে বসালে..."

"রামচন্দ্র ! রামচন্দ্র ! যেতে দাও ওসব কথা...হাঁ্যা, তার পর এধারের খাওয়ানোর বন্দোবস্ত সব কি রকম কি হচ্ছে ?···কে দেখছে ?···"

দেবেন্দ্র কহিল, "আমার শালা চিনিবাস বামুনদের কাছে আছে !"

মাধব হাসিয়া কহিলেন, "তাহলে তরকারীগুলো আর মিষ্টি না হয়ে যায় না !"

এমন সময় চিনিবাস ব্যস্তভাবে আসিয়া দেবেন্দ্রকে কহিল "খুব লোক যা হোক্ !"

দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "কেন হে, কি হল ?"

"হবে আবার কি···টাকা দিতে হবে !"

"কেন ? কাল রাত্রে ত তুমি ফর্দ্দ মাফিক সব টাকা বুঝে নিলে হে ?"

চিনিবাস মাধবের দিকে ফিরিয়া কহিল, "দেখুন ত মশায়; এত বড় একটা কর্ম্মে আমার কি ছাই মাথার ঠিক আছে ?"

"যাক্ গে ; কত দিতে হবে এখন ?"

"এই ধর না ৩খানা নৌকোভাড়া দশ টাকা করে ৩০৲ টাকা; আর ১২জন মাঝির খোরাকী ছআনা করে ছটাকা···"

বাধা দিয়া মাধব বলিয়া উঠিলেন, "ছআনা হিসেবে ছটাকা হয় না বাবাজী, সাড়ে চার টাকা হয়।"

চিনিবাস হাসিয়া কহিল, "তাই তাই, আর এ বয়সে কি নামতা মনে থাকে খুড়ো ! হাঁ্যা, তাহলে এই হল গিয়ে তোমার···কত ?···"

"তুমি কি বলছ চিনু, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না...নৌকোভাড়া, খোরাকী—কি এ সব ?" দেবেন্দ্র বিস্মিত দৃষ্টিতে চিনিবাসের মুখের পানে চাহিল।

"বেশ যা হোক ! সতু বলেনি তোমায় যে আমাদের গাঁয়ে আমাদেরই জ্ঞাতি ১০।২০ ঘরে বলা হয়েছে ? বেশীর মধ্যে এসেছে আমার জন ১০।১৫ বন্ধুবান্ধব ! তোমার নাম-ডাকটা ওদিকে ত বড় কমতি নেই, কাজেই বলতে হয়েছে তাদের !"

"যাক্‌গে ; এখন কি করতে হবে তার ?"

"টাকাকড়ি দাও ; এদের পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিই ! বাড়ীতে এত লোকজন—দেখ দিকি, কি বলবে তারা এর পরে ?"

"দাওগে মিটিয়ে মেজকর্ত্তা, ও আর ভেবে কি করবে··· যখন দিতেই হবে তখন আর মিছে···"

"বলুন ত চক্রবর্ত্তী মশায় !"

মাধব চিনিবাসের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, "বেশ

বাবাজী, এই ত চাই। "খড়দা গাঁয়ে এত বড় একটা কর্ম্ম হচ্ছে, যদি তোমাদের গাঁয়ের লোক না দেখতে পেলে তাহলে দেবুর এত খরচই যে বৃথা!"

চিনিবাস একটু জোরের সহিত কহিল, "নিশ্চয়, বিশেষ আমি যখন এ কাজে মাথা দিয়েছি! আর আমাদের নামটাও ত নেহাৎ ফেলনা নয়!"

মাধব কহিলেন, "তা আর বলতে! কেউ না জানুক আমরা ত জানি!"

চিনিবাস দেবেন্দ্রকে কহিল "কই হে মেজকর্ত্তা, টাকা দাও?"

দেবেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, "ওই ত তোমায় বল্লুম, তোমার বোনের কাছে টাকা আছে, যা নিতে হয় নাওগে!"

"দেখেছেন চক্রবর্ত্তী মশায়! আবার তাঁর কাছে চাইলে তিনি বলবেন ওঁর কাছে নাওগে। তাহলে আমি এমনই ছুটোছুটোই করি, আর এ-ধারে যাক সব মাটি হয়ে। না, এদের কাজে মাথা দেওয়া ঝকমারী হয়েছে।"

মাধব কহিলেন, "আরে চট কেন বাবাজী, ও কি টাকা টেঁকে করে বেড়াচ্ছে? চল না বউ মার কাছ থেকেই নেবে,—আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। অমনি দেখে আসি, ওদিকের সব কি বন্দোবস্ত হল!"

চিনিবাস আপন মনে কি বকিতে বকিতে চলিল। মাধব তাহার অনুসরণ করিলেন। দেবেন্দ্র দালান হইতে নামিয়া অন্য আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন।

মাধব ভিতরে যাইতেই শিরোমণি ঠাকুর তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেছিলেন, মাধব কহিলেন, "কি দাদা ভারী ব্যস্ত যে……"

"হ্যাঁ দেখ না, নীলু এখনও সব দই দিয়ে গেল না, লোকজন সব…যাই দেখি…" বলিয়া হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মাধব শিরোমণির পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া ভিয়ানের দিকে গেলেন। শিরোমণি পুকুর ধার দিয়া যাইতে যাইতে একজন মধ্যবয়সী শ্যামাঙ্গী বিধবাকে কলসী-কক্ষে জল লইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার গমন-গতি মন্থর করিলেন। রমণী দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল। উভয়ে কাছাকাছি আসিলে, শিরোমণি একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিলেন; পরে ঈষৎ হাসিয়া কুঞ্চিত বক্রদৃষ্টিতে বিধবার পানে চাহিয়া কহিলেন, "বলি ও ক্ষ্যান্ত…এলি কবে…আছিস কেমন!" রমণী তাহার মুখখানা কলসীর দিকে ফিরাইয়া কহিল, "আজ ৩ দিন হল এসেছি! ভাল আছেন ত আপনারা ঠাকুর্দ্দা?"

"ওঃ ভারী যে দরদ দেখাচ্ছিস লো? তিন দিন হল এসেছিস...একবার আছি না মরেছি সে খবরটাও নিতে পারিস নি!"

"বালাই, মরবে কেন? সত্যি সময় পাইনি ঠাকুর্দ্দা!—"

"তা যাবি কেন?…বলি চল্লি যে…শোন্ না...যাস্ তাহলে একবার ওদিকে…কেমন?"

রমণী হাসিয়া কহিল, "দেখি যদি পারি ত পরশু নাগাদ……"

শিরোমণি কহিলেন "যাস্ কিন্তু...বামুনের কাছে সত্যি কর্‌লি…তোর ঠানদি মারা গিয়ে অবধি তুই ত আর মোটেই যাস নি…যাস্ তাহলে…আমার মাথা খাস্! নিরাশ করিস নি।"

রমণী হাসিয়া চলিয়া গেল। শিরোমণি ঘাড় ফিরাইয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ঋষির মেয়ে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই

'বেণের মেয়ে'র কিছুদিন পরেই এলেন 'ঋষির মেয়ে'। এ দুয়ের মধ্যে কিছু সম্পর্ক আছে কি না জানি না, তবে এই জানি যে দুজনেই এ দেশের পুরাণকথা লইয়া আসরে নামিয়াছেন। বেণের মেয়ে বাঙ্গালার কথা লইয়া, ঋষির মেয়ে কুরুক্ষেত্রের কথা লইয়া। বেণের মেয়ে ন'শ বছরের কথা লইয়া, আর ঋষির মেয়ে তিন-নাম সাতাশ'শ বছরের কথা লইয়া। বেণের মেয়ের সমাজের জের আজও চলিতেছে,—সেই সংস্থিয়া আছে, সেই বেণেরা আছে, সেই ব্রাহ্মণেরা আছেন, সেই মুসলমানেরা আছে; তবে তখন তাঁহারা হিন্দুস্থানে মাত্র উঁকি মারিতেছিলেন, এখন দেশটা প্রায় ছাইয়া ফেলিয়াছেন। ঋষির মেয়ের যখন জন্ম, সে অনেককাল; তখন জৈন হয় নাই, বৌদ্ধ হয় নাই, মুসলমান হয় নাই, খ্রীষ্টান হয় নাই; তখন দ্বিজেরা আগুন রাখিতে জানিতেন, আর কেহ জানিত না। দ্বিজের সংখ্যা বড় কম ছিল, কিন্তু অগ্নি তাঁহাদের সহায় ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তখন আমাদের এ সমাজ গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু ইহার বীজ পোতা হইয়াছিল। তখন ছোট ছোট রাজ্য ছিল, ছোট ছোট রাজা ছিলেন। রাজাদের ক্ষমতা অনেক ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণই কর্তা ছিলেন। আইন তাঁহাদের হাতে, আইনের ব্যাখ্যা তাঁহাদের হাতে, বিচার তাঁহাদের হাতে, শিক্ষা তাঁহাদের হাতে। লড়াইএ রাজা সর্ব্বময়কর্ত্তা, কিন্তু দেশে তিনি ব্রাহ্মণের হাতধরা।

ঠিক এই সময়ে আপস্তম্ব নামে একজন ঋষি সরস্বতীর তীরে একটা রাজ্যে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ঋক, যজু, সাম তিন বেদে তাঁহার সমান দখল। ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার অগ্নিশালা ছিল। তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল। কিন্তু সন্তানের মধ্যে একটী মেয়ে, তাহার নাম সুদত্তা। মেয়েটী লিখতে-পড়তে, সংসারের কাজ করতে, বিশেষ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সিদ্ধহস্ত। মেয়ের বয়স হইলে ঋষি ও ঋষিপত্নী মনে করিয়াছিলেন, চারুদত্ত নামক একটী ছাত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবেন। চারুদত্তের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, কথা পড়িলেই বুঝিতে পারিত। যা পড়িত কখন ভুলিত না, সুতরাং উপনয়নের পর গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়া গুরুর সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে তাহার বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। তাহার ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইয়াছে; সে পাঠ-সমাপ্তির স্নান করিয়া স্নাতক হইয়াছে। "এক ডুবে ব্রহ্মচারী হইতে গৃহস্থ হইয়াছে।" সুতরাং বিবাহের আর বড় বিশেষ গোল নাই।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই রাজ্যে একটা বিষম গোল উঠিয়াছে। উগ্রশ্রবা নামে একজন লোক আসিয়াছেন। তিনি বলেন অথর্ব্ব বেদও বেদ, আর উহার প্রামাণ্য অন্য বেদেরই মত। আপস্তম্ব বলেন উহা ভেল্‌কী মাত্র, উহাতে পাপের বৃদ্ধি হয়। রাজা ইঁহার খুব সম্মান করিয়াছেন, দু এক সময় আপস্তম্বের সঙ্গে বিচারে তাঁহাকে জয়মাল্য দিয়াছেন। যেদিন বিচার হয়, চারুদত্ত সেদিন রাজসভায় ছিলেন। তিনি গুরুর পরাজয় দেখিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে উগ্রশ্রবার কাছে গিয়া অথর্ব্ববেদের ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লন। তাই স্নানের দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্বে একবার সেখানে গিয়েছিলেন। স্নানের দিন আপস্তম্ব সে কথা শুনিতে পাইলেন। গরম তেলে বেগুন ফেলিয়া দিলে যেরূপ হয়, ঋষির অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। চারুদত্ত স্নান করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে আজ ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে। গুরুপত্নী ও গুরুকন্যা সমস্ত সকাল পরিশ্রম করিয়া উত্তম আহার প্রস্তুত করিয়াছেন। চারুদত্ত খাইতে বসিয়াছে এমন সময় গুরু আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, চারুদত্ত, শুনিলাম তুমি উগ্রশ্রবার কাছে গিয়াছিলে! চারুদত্ত অস্বীকার করিল না। এই সম্বন্ধে একটু তর্কাতর্কি হওয়ায় গুরু বলিয়া উঠিলেন "যাও, দূর হও, আমার গৃহ থেকে"। বেচারার আজ সমাবর্ত্তনের দিনে গণ্ডূষ করাও হইল না। সেও উঠিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল; গুরুপত্নী অনেক বলিলেন, কিছুই হইল না। মুখের ভাত ফেলিয়া এই অভ্যুদয়ের দিনে বেচারা ১২ বছরের স্নেহ-মমতা কাটাইয়া চলিয়া গেল। গেল কোথা? উগ্রশ্রবার বাড়ী গিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। শিখিবে কি? বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি।

ব্যাপারটায় চারুদত্তের যতই দোষ থাকুক, তাহার জন্মের মধ্যে সকলের চেয়ে মঙ্গলের যেদিন, সেইদিন বেচারা ভাত কোলে করিয়া বসিয়াছিল; তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া, দূর হও বলা, গুরুর পক্ষে ভাল হয় নাই। কিন্তু শিষ্য গুরুকে ডিঙ্গাইয়া যাইতেছে এ কথা গুরুর যখন মনে হয়, তখন তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। দেড়শ বছর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে মাণিক্য তর্কভূষণ নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রায় একশ পড়ুয়া পড়াইতেন। তাঁহার মেজোছেলে শ্রীনাথ ইহাদের মধ্যে একজন। ছাত্রটী খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রটা আয়ত্ত করিয়া লইতে তাঁহার বেশী দিন লাগিল না। ২৫ বছর বয়সে তিনি পাঠ সমাপন করিলেন। বরিশালের রামমাণিক্য নামে আর এক ছাত্র তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিল, তিনিও পাঠ সমাপন করিলেন। তাহার পর দুজনের সখ হইল যে মুরশিদাবাদে গিয়া সেখানকার ন্যায়শাস্ত্র পড়ার ধারা ও ফাঁকির কায়দা

শিখিয়া আসিবেন। গেলেন, সব শিখিয়া আসিলেন। কিন্তু বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, বাবা ভয়ানক চটিয়াছেন, ছেলের মুখদর্শন করিলেন না। ছেলে টোলে পড়াইতে লাগিলেন। তিনি বাড়ী বসিয়া থাকিতেন, কোথাও নিমন্ত্রণ হইলে, বাবা যাইতেন না, ছেলে যাইতেন। এমন সময় মহারাজাধিরাজ কুমার প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের মাতা তুলাদান করিলেন। বাবা গেলেন না। ছেলে গেল, ঘোর বিচারে সভাশুদ্ধ স্তব্ধ করিয়া দিয়া ছেলে দুইটী রূপার ঘড়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিতে পথে ডুমুরদহের নিকট ডাকাতে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। তাহার পর বাবা আবার টোলে বসিতে লাগিলেন। কিন্তু পারিবেন কেন? পুত্রশোক ত! ছয় মাসের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন। ছাত্র ডিঙ্গাইয়া যাইতেছে, একবার ধারণা হইলে গুরুর যে কি আপশোষ হয়—যাহার হইয়াছে—সেই জানে। তাহার উপর আবার যদি দুটো কথা শুনিয়া শিখিয়া, সে হতভাগ্য লোক, চালাকী করিয়া, বদমায়েসী করিয়া, গুরুর লাভসৎকারের ব্যাঘাত করে, তাহাকে মা কালীর কাছে বলিদান দিলেও রাগ যায় না, ইচ্ছা করে, জবাই করিয়া তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া দিই। এইরূপে গুরুর শিক্ষা লইয়াই একদিন যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর বিদ্যা উগরিয়া দিয়াছিলেন, তাই তৈত্তিরীয় সংহিতা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যও সূর্য্যের নিকট শিষ্য হইয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। নরেশবাবু ঋষির যে এই চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট গুণপণা প্রকাশ হইয়াছে। এই যে বাঁশপাতার আগুনের মত জ্বলিয়া উঠা ও পরক্ষণেই নিবিয়া যাওয়া এটা ঋষিদের স্বাভাবিক। তাহাতে ত ঋষিদের স্বভাবেরই বর্ণনা হইল। কিন্তু ঋষির মেয়ের স্বভাবটা কি রকম এখন সেইটাই দেখিতে হইবে।

আপস্তম্বের মেয়ে সুদত্তা সব বিষয়েই পাকা। সে অগ্নি উপাসনা করে, মা-বাপের সব কাজেই সহায়, তাঁহারি উপদেশ ও দৃষ্টান্তে সে মানুষ এবং তাই সে জীবনে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছে করিতেছে ও করিবে। সেও চারুদত্তকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। তাহার মা যেমন আপস্তম্বের ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, সেও চারুদত্তের তাই হইবে, ইহাই তাহার শিক্ষা। সে যখন দেখিল বাবা নিষ্ঠুরভাবে চারুদত্তকে তাড়াইয়া দিলেন এবং অন্যের হাতে সুদত্তাকে দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন সে চুপ করিয়া রহিল এবং কি একটা মনে মনে স্থির করিয়া লইল। তাহার পর যখন চারণী আসিয়া গান ধরিল, সুদত্তা বুঝিল চারুদত্তই এ গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। তখন সে নিশীথ রাত্রে চারুদত্তকে আপস্তম্বের অগ্নিশালায় ডাকিয়া পাঠাইল। চারুদত্ত এখন অথর্ব্ববেদীর শিষ্য। সে আসিয়াই "নিদিলি" দিল। কুকুর, ছাগল, বিড়াল পর্য্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। সুদত্তা মন্ত্রপূত অগ্নি জ্বালিয়াই রাখিয়াছিল, অগ্নির বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া স্বামীর দক্ষিণ হস্তের উপর আপনার বামহস্ত রাখিল এবং বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিল। বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু "নিদিলি" দেওয়ায় বোধ হয় কিছু দোষ হইয়াছিল। তাই হাতের উপর হাত থাকিতেই আপস্তম্ব উঠিয়া অগ্নিশালায় আগুন জ্বলিতেছে দেখিয়া সেখানে আসিলেন এবং পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান না করিয়া চারুদত্তকে চোর স্থির করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শিষ্যেরা আসিল। চারুদত্তকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। পরদিন রাজসভায় বিচার হইল। চারুদত্ত স্বীকার করিল, যে সুদত্তার হার চুরি করিবার জন্য সে গুরুর অগ্নিশালায় গিয়াছিল। আপস্তম্বেরও নালিশ তাই। সুতরাং মন্ত্রী আসল খবর জানিবার জন্য একটু চেষ্টা করিলেও কবুল জবাব করায় আর বিচার চলেনা বলিয়া চারুদত্ত চোর বলিয়া সাব্যস্ত হইল। চোরের দণ্ড প্রাণদণ্ড। ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড নাই, তাই তার কপালে কুকুরের থাবা আঁকিয়া দিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। রক্ষীরা তাহাকে লইয়া দণ্ডশালায় গেল, ওদিকে সুদত্ত ইন্দ্রায়ুধকে সঙ্গে করিয়া ঘুরিতেছে, কোথায় চারুদত্তের দেখা পাওয়া যায়। সভায় যখন গেল, সেখানে নাই। দণ্ডশালায় নাই। রাজ্যের বাহিরে বনে বনে ঘুরিয়া দেখা গেল চারুদত্ত, মাথার ঘায়ে সরস্বতীর স্রোতে ঝাঁপ দিবার চেষ্টা করিতেছে। সুদত্তা পিছনের দিক হইতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তুমি আমার আশ্রয় দিয়াছ, অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছ, আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে আমায় লইয়া চল। তাহারা এই সব কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে ইন্দ্রায়ুধ বলিল, তোমার বাপ মা ও রাজার লোক তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা এখনই পালাও। কোথায় যাই? দেখা গেল একটা দড়ির পোল রহিয়াছে। চারুদত্ত বলিল, এই পোলে আমি পার হইতে পারি কিন্তু সুদত্তার কি হইবে? সে বলিল আমিও পারিব। তাহারা পার হইল। ইন্দ্রায়ুধ দড়ির পুল কাটিয়া দিল। আর তাহাদের উদ্দেশ পাইবার কোনও উপায় রহিল না।

অগ্নিশালায় আসিয়া বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করার আগে চারুদত্ত বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, গুরুর তাঁহার উপর যে রাগ হইয়াছে তাহা বেশী দিন থাকিবে না। ছয় মাসের মধ্যে তিনি উগ্রশ্রবার জারিজুরি সব ভাঙ্গিয়া দিবেন। প্রমাণ করিয়া দিবেন, উহারা ভেল্কীবাজী করে মাত্র। তুমি এই ছয় মাস মাত্র অপেক্ষা কর। অমনি অভিমানে গরগর হইয়া সুদত্তা কহিল, আমি আপস্তম্বের কন্যা, তোমায় আমার হাত বাড়াইয়া দিলাম, তুমি সে হাত প্রত্যাখ্যান করিলে, আর আমি তোমায় চাহি না। তুমি যাও,—দূর হও। ছয় মাস পরে কাহার ভাগ্যে কি আছে, কে বলিতে পারে? চারুদত্তকে মাথা পাতিয়া তাহার কথা শুনিতে হইল, তাহাতেই চারুদত্তের এত কষ্ট এত লাঞ্ছনা এই চোর অপবাদ এবং এই শাস্তি। তাহার একমাত্র সান্ত্বনা—বাল্যলীলা সুদত্তাকে বনিতা পাইল আর সুদত্তাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার কষ্টময় জীবনের সাথী হইল। যেটা যখন ভাল বলিয়া মনে হয় ঋষিরা তাহা তৎক্ষণাৎ করিয়া বসেন, তাহার ফলাফলের কথা বড় একটা ভাবেন না। তাঁহাদের মেয়েরাও তাই।

সরস্বতী পার হইয়া নিবিড় বনে রাত্রে অন্ধকারে দুজনে ত ভয়েই কাট; এমন সময় আর এক বিপদ। সেই রাত্রে চণ্ডালেরা সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছিল। তাহারা ব্রাহ্মণ পাইয়াছে, মহা আহ্লাদ। চারুদত্তকে মারিয়া ফেলিবে ও সুদত্তার ধর্ম্ম নষ্ট করিবে। সুদত্তা চীৎকার করিয়া উঠিল। সে রাত্রে সে অন্ধকারে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

সেই দেশের রাজার এক শালা আছেন, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও ক্ষত্রিয়। কিন্তু রাজার শালা ঘোর বিলাসী—মস্ত প্রচুর পরিমাণে পান করা হয়। অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে নর্ত্তকী করা হইয়াছে। সহরে আমোদের ব্যাঘাত হয় বলিয়া এই বনের ধারে বাড়ী করিয়া সেইখানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। একদিন তাঁহার আমোদ খুব জমিয়াছে; উত্তম শীধুপানে মত্ত হইয়া নর্ত্তকীরা গান করিতেছে। তিনি এক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বাহির করিয়া আনিয়া তাহাকে তাঁহার প্রিয়তমা করিয়াছিলেন, সে খুব প্রেমের গান গাহিতেছে। কর্ত্তাও ভোর। দূর হইতে সুদত্তার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে গেল। তাঁহার ক্ষত্রিয় রক্ত গরম হইয়া উঠিল। তিনিও চীৎকার করিয়া উঠিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেগে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আর্ত্তনাদ লক্ষ্য করিয়া যাইয়া দেখিলেন, একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা চণ্ডালপতির অঙ্কগত, আর ব্রাহ্মণ নিকটে দাঁড়াইয়া এই ভীষণ ব্যাপার দেখিতেছে, আর দেবতাদের নাম স্মরণ করিতেছে। শালাবাবু হঠাৎ উপস্থিত হওয়ায় ও তাঁহার তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইয়া চণ্ডাল সুদত্তাকে ছাড়িয়া দিল। শালাবাবু তাহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে লইয়া গিয়া মহা আদরে আপনার বাড়ীতে রাখিলেন, আর একজনকে সখা আর একজনকে সখী করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে চারুদত্তের বিদ্যা বুদ্ধি নিষ্ঠা ও তপ তাঁহাকে দেশমান্য করিয়া তুলিল। শালাবাবু তাঁহার সহায়, রাজদরবারে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি হইল। চারুদত্ত কিন্তু তাঁহার কপালের কুকুরের থাবাটী চন্দন দিয়া ঢাকিয়া রাখেন। ক্রমে রাজা চারুদত্তকে নানা রকমে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। চাণক্য তাঁহার অর্থ-শাস্ত্রে যত প্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সব ব্যবস্থা মতই পরীক্ষাতে চারুদত্ত উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহাকে অমাত্য পদ দেওয়া সাব্যস্ত হইল। পরীক্ষাও ঘোরতর রকম। যাহাকে পরীক্ষা হইতেছে সে জানেও না যে তাহার পরীক্ষা হইতেছে; সুতরাং সে আপনার স্বভাব ও শিক্ষামত কাজ করিয়া যাইতেছে। শালাবাবু একদিন বলিলেন এ রাজাটা বড় অধার্ম্মিক, এটাকে নিপাত করিয়া আমি রাজা হইব, তুমি আমার সহায় হও। চারুদত্ত বলিলেন, গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া হইতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়ের মত সম্মুখে সম্মুখে যদি প্রবৃত্ত হও তখন দেখা যাইতে পারিবে। একদিন রাজবাড়ীর এক দাসী আসিয়া বলিল মহারাণী চারুদত্তের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী। চারুদত্ত ত তাহাকে তাড়াইয়াই দিল এবং রাজাকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিল তিনি বড় অভাগ্য। রাজা ত রেগেই লাল। দাসীর সাক্ষ্য লওয়া হইল। সে বলিল আমি এ কথার বিন্দুও জানি না বিসর্গও জানি না। রাণীর তলপ হইল। রাণীও রাজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এ পরীক্ষায়ও চারুদত্ত উত্তীর্ণ হইল। সুতরাং চারুদত্ত অমাত্য হইবেন।

শালাবাবু চারুদত্ত ও সুদত্তার সঙ্গে ঠিক সখাসখীর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বভাব যায় মলে আর ইল্লত যায় ধুলে। একদিন নির্জ্জনে পাইয়া শালাবাবু সুদত্তাকে বলিয়া বসিলেন, তিনি সুদত্তার প্রণয়প্রার্থী। সুদত্তা বলিল, সে কি সখা? আমি যে তোমায় দেবতার মত দেখি, তুমি যে পরনারীর মানধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য জন্মিয়াছ, তোমার কি এই সকল কথা মনে করা উচিত। ছি ছি তুমি এমন সব কথা মনেও করিও না। তুমি এসব দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ কর, দেখিবে তুমি কত বড় হইয়াছ। তুমি ক্ষত্রিয়, তোমায় জন্ম আর্ত্তত্রাণের জন্য, তা কি তুমি ভুলিয়া গেলে? শালাবাবু বিলাসী হইলেও ক্ষত্রিয়, সরলমতি। তিনি ভাবিলেন আমি অনেক নারীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছি, অনেকে আমায় অনেক তিরস্কারও করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া আমার প্রাণে নূতন আবেগ ত কেহ আনিয়া দেয় নাই। সে বলিল, দেখি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিও, আমি এখন হইতে ভাল হইব।

তাঁহারা এইরূপ গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে শালাবাবুর স্ত্রী সেইখান দিয়া যায়। স্বামী যার লম্পট, সে ত চিরদিনই ঈর্ষায় দগ্ধ হয়। সুদত্তা বাড়ী আসা অবধি সে সন্দেহ করিতেছিল তাহার স্বামীর আবার একটা উপপত্নী বুঝি জুটিল। আজ তাদের দুজনকে গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া সে একেবারেই অনুমান করিয়া বসিল যতদূর মন্দ হইতে হয় এবং সে কথা প্রচার করিয়াও দিল। শালাবাবুর যেরূপ সুখ্যাতি, সকলে বিশ্বাসও করিল। শুনিল না কেবল চারুদত্ত। তাঁহার অমাত্য হইবার দিন স্থির হইয়াছে। সে এই খবর লইয়া বাড়ী আসিল এবং সুদত্তাকে বলিল। সুদত্তা শুনিয়া খুসীও হইল। চারুদত্ত কিন্তু দেখিল সুদত্তা অন্যমনস্ক। এমন সময়ে শালাবাবুর স্ত্রী আসিয়া খবর দিল, যে তোমার স্ত্রী তাহার স্বামীর "জারিণী"। চারুদত্ত বিশ্বাস করিলেন না। সুদত্তা বলিল, এই মেয়েটার কথা তুমি শুন না। শালার স্ত্রী জেদ করিয়া বলিতে লাগিল তোমার এই অগ্নিশালায় আমার স্বামী আর উনি কি ফুসফুস করিতেছিলেন। চারুদত্ত বলিলেন, কেমন সুদত্তা তিনি এখানে এসেছিলেন? সুদত্তা বলিল হ্যাঁ। কি কথা হইয়াছিল? "বলিব না"। তাহার পর চারুদত্ত শালার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী এখন কোথায়। সে বলিল সে তাঁহার প্রণয়িনীর সঙ্গে মদ্যপান করিতেছে। সুদত্তা বলিল মিথ্যা কথা, সে আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়া—বলিয়াই চুপ করিল। চারুদত্ত বলিল, সুদত্তা, আমাদের সখী তোমার উপর দোষ দিতেছেন, তুমি বলিতেছ ইহাঁর স্বামী তোমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রণয়িনীর সম্বন্ধে তোমায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। সখীর কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সুদত্তা বলিলেন "তবে আমায় শাস্তি দাও।" "বিনা প্রমাণে কি শাস্তি দিব, তোমায় দিব্য প্রমাণ দিতে হবে।"

সুদত্তা। প্রমাণ দিতে হবে। আমি অগ্নির দিব্য দিব। কিন্তু এখন তুমি সভায় যাও, মন্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এস। সকলে আসিল। সুদত্তা জবার মালা পরিয়া রাঙা কাপড় পরিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। রাজপুরোহিত বলিলেন, সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা দেবতা, তাঁহারা যা পারেন সামান্য মানুষে তা পারেনা। বলিয়া তিনি সুদত্তার হাতে ৭টী অশ্বত্থ পাতা বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে কতকগুলি ঘসা যব দিলেন। সাঁইপাত দিলেন দূর্ব্বা ও ফুল সাজাইয়া; তাহার উপর তপ্ত লৌহপিণ্ড দিলেন এবং

সুদত্তাকে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া লৌহপিণ্ড আগুনে ফেলিয়া দিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সুদত্তার হাতের কোথাও পুড়ে নাই, ফোসকা হয় নাই। সুদত্তার জয়জয়কার হইল। চারুদত্ত, সকলে চলিয়া গেলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সুদত্তা বলিল, আমি আপস্তম্বের মেয়ে, আমার প্রতি যখন তোমার বিশ্বাস নাই, আমায় তুমি ছুঁইওনা। বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কোথা গেলেন কে জানে? চারুদত্ত ও অগ্নিবর্ণ অনেক খুঁজিলেন পাইলেন না।

সুদত্তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বেশী রাগ হইল শালাবাবুর স্ত্রীর। সে তাহার ভাইএদের সঙ্গে অর্থাৎ শালার শালাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ও মন্ত্রীকে সহায় করিয়া এক নালিশ রাজসভায় উপস্থিত করিল যে অগ্নিবর্ণ (রাজার শালা) ও চারুদত্ত চক্রান্ত করিয়া রাজাকে তাড়াইয়া রাজা হইবার চেষ্টায় আছে। আর চারুদত্ত চোর, কোথাও চুরি করিয়া সাজা পাইয়া এ রাজ্যে আসিয়া পদস্থ হইয়াছে। তাহার কপালে কুকুরের থাবা আছে। সে চন্দন দিয়া সব ঢাকিয়া রাখে। সভার বিচার হইল, অগ্নিবর্ণ নির্দোষ প্রমাণ হইল, চারুদত্ত নির্দোষ প্রমাণ হইল। কিন্তু চারুদত্ত যে চোর, কপালের চন্দন মুছিতেই সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। চারুদত্তও স্বীকার করিলেন, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। তখন প্রড্বিবাক্ বলিলেন তুমি চোরের দণ্ড পাইয়াছিলে এ সত্ত্বেও তুমি যে চোর নহ, তাহার কিছু প্রমাণ আছে? চারুদত্ত নীরব।

এমন সময়ে আদালতের ভিড় ঠেলিয়া সুদত্তা ও আপস্তম্ব সেখানে উপস্থিত হইলেন। সুদত্তা বলিলেন, সে প্রমাণ আমি দিব। কিন্তু আসামীর স্ত্রী বলিয়া তাঁহার প্রমাণ অগ্রাহ্য হইল। তখন আপস্তম্ব মাথা খাড়া করিয়া সভামঞ্চের নিকটে আসিয়া বলিলেন, সে প্রমাণ আমি দিব। আমিই মিথ্যা মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়া উহার শাস্তি দেওয়াইয়াছিলাম। আজ এই ধর্ম্মসভায় সে পাপ স্বীকার করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করছি। জিজ্ঞাসা হইল, আপনি কে? উত্তর হইল, আমি বাৎস্যগোত্রীয় আপস্তম্ব। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, রাজা উঠিয়া আপস্তম্বের নিকটে আসিলেন, পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। আপস্তম্ব মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন। আদালতের হুকুম হইল, আসামী খালাস। সুদত্তা রাজার জয়জয়কার দিয়া চারুদত্তের পায় জড়াইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। চারুদত্ত বলিলেন, সুদত্তা তুমি যে ফিরিয়া আসিয়াছ, তাহাতেই আমি ধন্য হইয়াছি। আদালতে এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, এমন সময় অগ্নিবর্ণ দাসীবেশ করাইয়া আপনার স্ত্রীকে ও তাহার ভাইয়ের সেখানে উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন ধর্ম্ম-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, আমার অভিযোগের বিচার চাই। আমার নালিশ যে ঐ মন্ত্রী, আমার এই স্ত্রী ও আমার এই দুই শালা ষড়যন্ত্র করিয়া চারুদত্তের প্রাণহানির চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাদের উপযুক্ত শাস্তি হউক।

সুদত্তা চিত্রলেখার নিকট আসিয়া অগ্নিবর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভেবে দেখেছ সখা, কেন চিত্রলেখা এই সব কাজ করেছে? সে তোমায় বড় ভালবাসে। তুমি সে ভালবাসার অবমান করেছ বলে অধিকারের দর্পে তুমি তাহার লাঞ্ছিত প্রেমের এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহের শাস্তি দিতে চাচ্ছ—কিন্তু তোমার অপরাধের কে শাস্তি দিবে অগ্নিবর্ণ!" তিনি চিত্রলেখাকে বলিলেন আমা হতে তোমার এ ঘোর অনিষ্ট হয়েছে, আমি আজীবন দাসী হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমায় ক্ষমা কর। চিত্রলেখা বলিল দেবী—দেবী তুমি—মানবী নও, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, বলিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। সুদত্তা তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিল। অগ্নিবর্ণ বলিলেন, দেবি এ অপরাধীকে তুমি ক্ষমা কর, চিত্রলেখা তুমি খালাস। তুমি সুদত্তার আশ্রমে কিছুদিন বাস কর, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সুদূর দক্ষিণাপথে যাব, সেখানে রাজ্য অর্জ্জন করবো, আর্য্য অধিকার স্থাপন করবো। আপস্তম্ব তখন বলিলেন, "অগ্নিবর্ণ, সাধু, অগ্রসর হও, জয়যুক্ত হও, আমি তোমার সহযাত্রী"। মনে মনে ভাবিলেন আর্য্যাবর্ত্তের লোক জানিল আমি মিথ্যাবাদী। দক্ষিণে সে কথা কেহ জানে না—সেখানে আমি আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিব।

"চারুদত্ত (সুদত্তার কাছে অগ্রসর হইয়া)—সুদত্তা। তুমি পিতাকে পায়ে ধ'রে নিবৃত্ত কর।"

সুদত্তা। পিতা, না বাধা দেব না। আমি নারী? কিন্তু ঋষির মেয়ে।"

আপস্তম্বের সূত্রগুলি দক্ষিণদেশে চলে। এইমাত্র এই নাটকের ইতিহাস। বাকীটা নরেশবাবুর কল্পনা। সে কল্পনা সংযত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত, যুক্তিসম্মত। নরেশবাবুর পড়াশুনা যে অনেক তাহা বলিতে হইবে না। তাঁহার সৃষ্টিশক্তিও যে অপূর্ব্ব তাহাও অনেকে জানেন। কিন্তু প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে এরূপ সৃষ্টি এই নূতন। এমন অনেক সৃষ্টি তাঁহার নিকট পাইব প্রত্যাশা করি।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩

পরদিন অপরাহ্ণে লীলা একা ড্রয়িংরুমে বসিয়া কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিসেস রায় সেদিন বীণাকে লইয়া তাঁহার এক বন্ধুগৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। লীলার অনেক চেষ্টা যত্ন ও শাসনের ভয়ে বীণা শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইয়াছিল।

ফটকের বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। পরক্ষণেই কুমার শুণেন্দ্রভূষণ ঘরে প্রবেশ করিয়া সহাস্যে লীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আজ যে আপনি এখানে একা বসে আছেন মিস রায়? এঁরা সব কোথায়?

লীলা প্রতিনমস্কার করিয়া সংক্ষেপে বলিল—মা দিদিকে নিয়ে মিসেস পালিতের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণে গেছেন। আমি আজ একাই বাড়ীতে আছি।

বীণা বাহিরে গিয়াছে শুনিয়া কুমারের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন—তাঁদের আসতে বেশি দেরি হবে না বোধ হয়? চায়ের নিমন্ত্রণ তো? সে আর এমন কি দেরী হবে? আমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে পারি কি?

লীলা কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করিবে, তাহাই এক মনে ভাবিতেছিল। কুমারের কথার সে কোন উত্তর দিল না।

কুমার তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিলেন—আপনি আজ বেড়াতে যাবেন না? কিরণ বাবু কোথায়? আসেন নি এখনো?

লীলা এবার বলিল—আজ আমি তাঁকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। আমার আপনাকে বলবার গোটা কতক কথা আছে, তাই বেড়াতে না গিয়ে আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম।

কুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া লীলার মুখের দিকে চাহিলেন—বলিলেন—আমার সঙ্গে কথা আছে? কি কথা, আজ্ঞা করুন।

লীলা ক্ষণকাল নীরবে রহিল। কুমার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত মৃদু ও কোমল ভাবে আবার বলিলেন—এমন কি কথা মিস রায়, যা' বলতে আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন?

লীলা একবার মুখ তুলিয়া বলিল—আপনি ঠিক কথাই ধরেছেন কুমার! কথাটা বলতে আমার নিজের ভদ্রতায় বাধছে; কারণ, আমরা সকলেই আপনাকে বিশ্বস্ত বন্ধু রূপেই গ্রহণ করেছিলুম কুমার! আমার রূঢ়তা মাপ কর্ব্বেন, কিন্তু আমরা আর আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে অক্ষম—আমাদের ইচ্ছা—আমাদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের অবসান হোক্!

কুমারের প্রফুল্ল হাস্যময় মুখ শুকাইয়া গেল! তিনি কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত লীলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিহ্বল ভাবে বলিলেন—আমি কি স্বপ্ন দেখছি না কি? আপনি কি বলছেন মিস রায়? আবার বলুন ত!

লীলা অচঞ্চলস্বরে বলিল—দুর্ভাগ্য ক্রমে এটা স্বপ্ন নয়! আমি সত্যই বলছি—আপনার সঙ্গে আমাদের আর বন্ধুত্ব থাকতে পারে না।

কুমারের মুখ ক্রোধে ও অপমানে আরক্তিম হইয়া উঠিল! তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—গৃহাগত অতিথিকে আপনি যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করতে জানেন—দেখছি! কিন্তু কেন আমায় এ ভাবে অপমানিত করা হলো, তা ত কিছুই শুনলুম না? সে কথা জানবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে! আমি কি পথের কুকুর—যে, এক কথায় তাড়িয়ে দিলেই তখনি চলে যাব?

লীলা তাহার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি কুমারের মুখের দিকে স্থির রাখিয়া বলিল—কেন যে এ কথা আপনাকে আমি বলতে

বাধ্য হলুম, তার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি সে সব কথা শুনতে চান? আপনার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর কথা আমি জান্‌তে পেরেছি। যদি আপনি আমাদের পরিবারে সাধারণ বন্ধু হিসাবে মিশতেন, তা হলে হয় ত এ সব কথা আপনাকে বলবার কোন দরকার হতো না। কিন্তু আমি দেখেছি—আপনি বীণার সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন। আপনার সম্বন্ধে নানা কথা শুনার পর তার সঙ্গে আর আপনার কোন ঘনিষ্ঠতা থাকৃতে পারে না। কাজেই কথাটা বলতে হলো।

এবার কুমারের যথেষ্ট ভাবান্তর ঘটিল। তিনি অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে বলিলেন—আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝলুম না মিস রায়! বীণার সঙ্গে আমি একটু বেশি ভাবে মিশি বটে, কিন্তু তার মধ্যে গোপনতা কিছুই নেই। মিসেস রায় সমস্তই জানেন, তাঁর এতে কোন আপত্তি নেই। কোন দিন তিনি আমায় বাধ দেন নি। আপনারা সকলেই আমায় জানেন; আমার পরিচয় আপনাদের কাছে লুকোন নেই কিছু। তবু আপনি কার মুখে কি একটা উড়ো ভাষার কথা শুনে আমায় এ ভাবে অপমান কর্‌লেন, এটা বড় দুঃখের বিষয়।

লীলা বাধা দিয়া বলিল—আমি বাজে কথা শুনে হঠাৎ আপনার মত সম্মানিত ব্যক্তির সম্বন্ধে এ রকম ব্যবহার করলুম, এই কথা যদি আপনি বুঝে থাকেন, তা হলে কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করা হয়। বীণার সঙ্গে আপনার যে কোন সম্বন্ধ হতে পারে না, এর জীবন্ত প্রমাণ আপনার গৃহে এখনো বর্ত্তমান রয়েছে। আমার কথা আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন? আমি ডেপুটি বাবুর বাড়ীর কথাই বলছিলুম! এর পর আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?

কুমার অত্যন্ত চমকাইয়া লীলার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার সহিত দৃষ্টি মিলিতেই তাঁহার দৃষ্টি নত হইয়া গেল।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া লীলা বলিল—এই সব বিষয় নিয়ে আমরা সমাজে আপনার দুর্নাম করতে চাই না—আপনাকে তাই বন্ধুভাবে সাবধান করে দেওয়াটাই সমীচীন বলে মনে হলো। আপনি আমার কথামত চললেই আর কোন গোল হবে না। তা হলে এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ হয়ে গেল।

কুমার অত্যন্ত হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন, না! না! সে হবে না মিস রায়। আমি এত সহজে বীণার আশা ছাড়তে পারবো না! আপনি যে কথা বল্লেন, সে সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য আছে, সে আমি তাকেই বোলবো! এ কথা আপনার সঙ্গে চলতে পারে না! আপনি একটু ভেবে দেখুন, ভুল ভ্রান্তি মানুষের জীবনে আছেই, তার জন্য—

লীলা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজার নিকট যাইয়া ডাকিল—বেহারা—কুমার সাহেবকা গাড়ী ঠিক করনে বোলো—

তাহার পর অত্যন্ত গম্ভীর মুখে দৃঢ়স্বরে বলিল—কিন্তু এ রকম ভুল-ভ্রান্তি যার জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তার সঙ্গে, আর যাই হোক, কোন ভদ্র মহিলার সম্বন্ধ হতে পারে না। আমি আপনার সঙ্গে কোন রূঢ় ব্যবহার করতে চাই না। যদি আপনি আমার কথা শুনে চলেন, তা হলে সমাজে কোন দিন কোন কথা প্রকাশ পাবে না, আমি কথনো এ সব কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবো না। কিন্তু এর পরও যদি আপনি বীণার সঙ্গে দেখা করবার বা তাকে চিঠি লেখবার কোন চেষ্টা করেন, তা হলে জানবেন—কোন দিন আর আমি আপনাকে ক্ষমা করবো না। মা আপনার সম্বন্ধে কোন কথা জানেন না বলেই আপনি এখানে এত ঘনিষ্ঠতা করতে পেরেছিলেন। আমি সুস্থ থাকলে কথনো এতটা সম্ভবপর হতো না।

বেহারা আসিয়া জানাইল কুমার সাহেবের গাড়ী প্রস্তুত।

কুমার অগত্যা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, আপনি আজ সামান্য অপরাধে আমার সঙ্গে এমন অন্যায় ব্যবহার করলেন; এটা কিন্তু পরিণামে ভাল হবে না, বলে রাথ্‌ছি। আমি আবার বলছি মিস রায়—আর একবার কথাটা ভাল করে ভেবে দেখুন—আমার যা বলবার আছে, আমি বীণাকে—

লীলা বাধা দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—এইমাত্র আমি আপনাকে বল্লুম না—সে চেষ্টা করলে আপনি বিষম অপমানিত হবেন? আপনি এখনো বীণার নাম মুখে আনছেন কোন্ সাহসে? লজ্জা হচ্ছে না আপনার? যান—আপনার গাড়ি তৈরি—নমস্কার।

লীলার উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া বেত্রাহত কুকুরের মত কুমার বেহারার সহিত কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কিরণের বসিবার ঘরে টেবিলের ধারে

অরুণ একা বসিয়া ছিল। মেঘমুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশ—প্রথম অরুণোদয়ের তরুণ সোনার আলো দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগানে ঘন আম্র-পল্লবের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া একটা কোকিল থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।

কিরণ চা খাইয়া তাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। সে বলিয়া গিয়াছে—আজ বীণা অরুণের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে। অরুণ একা বসিয়া তাই অধীর আগ্রহে পথের দিকে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর তাহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল, সে দিকে আজ আর সে মনঃ সংযোগ করিতে পারিতেছিল না।

আজ দীর্ঘ দুই মাসের অধিক কাল সে তাহার বীণার দেখা পায় নাই,—তাহার একটি কথা শুনিতে পায় নাই। মন তাহার অনুক্ষণ তৃষিত চাতকের মত লীলার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকিত। কিরণ তাহার নিজের কাজ-কর্ম্ম ভুলিয়া অধিকাংশ সময় তাহারই নিকট কাটাইত,—তাহাকে পুস্তক পড়িয়া শোনাইত,—তাহার রচনা সংশোধনের সময় সাহায্য করিত। গল্প করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করিত। কিন্তু অরুণ কিছুতেই মনে শান্তি পাইত না। তাহার গল্পের মধ্যে কেবল লীলার প্রসঙ্গ। লীলার কথা সর্ব্বক্ষণ নানা ভাবে নানা রূপে বলিয়া ও শুনিয়া কিছুতে সে তৃপ্তি পাইত না। কিরণের অনুপস্থিতির সময় সহর হইতে কিরণের যে সব বন্ধু-বান্ধব তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত, সে তাহাদের সহিতও অনেক সময় কেবল জজ সাহেবের মেয়েদের বিষয় আলোচনা করিয়া কাটাইত। লীলার স্মৃতি, লীলার ভালবাসা তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল,—তাহার অন্তরে আর কোন চিন্তার স্থান ছিল না।

রাস্তার উপর পরিচিত অশ্ব-পদ-শব্দ শুনিয়া অরুণ তাহার চিন্তা ত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে কাণ পাতিয়া রহিল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার কক্ষের ভিতর তাহার চিরপরিচিত কোমল মৃদু পায়ের শব্দ নিকটে আসিয়া থামিয়া গেল।

হর্ষে পুলকে অরুণ চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। আন্দাজে লীলার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া সে ডাকিল—বীণা, এত দিন পরে সত্যই তুমি এসেছ? এসো—আমার কাছে এসো! এলে যদি, দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না!

তাঁহার প্রসারিত হস্ত উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া লীলা বলিল, হ্যাঁ অরুণ! এসেছি আমি! এত দিন আমাদের উপর দিয়ে যে বিপদের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, সে সব শুনেছ ত? একটু ছাড়া পেতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি আমি! খুব বেশি দেরী হয়েছে কি?

অরুণ তাহাকে নিকটে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—তোমার এ কথায় আমি কি উত্তর দেব বীণা? যে আমার কাছ থেকে এক মুহূর্ত্ত অন্তর হলে আমার এক যুগ বলে মনে হয়, তাকে দীর্ঘ দু'মাস হারিয়েও আমায় দিন কাটাতে হয়েছে, এর পর আর কি বোলবো বলো? কিন্তু বীণা! তুমি আজ এত অন্তরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, আমার কাছে আসছো না কেন?

লীলা বলিল, আজ আমার তোমাকে বলবার অনেক কথা আছে অরুণ! আগে আমি সে সব বিষয় তোমার কাছে বলতে চাই। তার পরেও যদি তুমি আমায় কাছে ডাক, তখন তোমার নিকটে যাব—

অরুণের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, দাঁড়াও বীণা, আগে আমি একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করে নি। বীণা, সত্য বলো, এই অন্ধের পরিচর্য্যা করে করে তুমি কি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ? যদি তাই তোমার বক্তব্য হয়—

লীলা বাধা দিয়া বলিল, সে সব কিছুই নয় অরুণ! তুমি ত জান, আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গ বরণ করে নিয়েছি। সে জন্য কোন দিন আমার মনে কিছু হয় নি। আজ আমি যা তোমায় বলতে এসেছি, সে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমি এত দিন ধরে তোমায় বঞ্চনা করে এসেছি অরুণ! তুমি আমায় যা বলে জান, বাস্তবিক আমি তা নয়,—সেই কথা স্বীকার করবার দিন আজ এসেছে।

অরুণের মুখের কালিমা কাটিয়া গেল। সে উৎফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিল, সে জন্য তোমার ভাববার কোন দরকার নেই লীলা! আমি সে কথা ত অনেক দিন থেকেই জানি। তুমি কিছু বল নি, তাই আমিও সে সম্বন্ধে কোন কথা তুলি নি। তোলবার দরকারই বা কি ছিল? আমার সর্ব্বস্ব বলে যাকে আমি জানি,—তাকে আমি একেবারে আমার নিজস্ব করে

পেয়েছি,—তাতেই আমার মন ভরে গেছে! সেই ত আমার পক্ষে যথেষ্ট লীলা!

লীলা এক মুহূর্ত্ত ঘোর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল! অরুণ তাহার এতদিনকার ছলনার কথা সবই জানে? লজ্জায় ও ধিক্কারে প্রথমে তাহার মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরই কিরণের কথা ভাবিয়া তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল! আর তাহার কোন আশাই রহিল না।

অরুণ লীলার লজ্জা ও স্তব্ধ ভাব অনুভব করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া নিজের পাশে বসাইল। তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল– এ কি লীলা? কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?

লীলা বিস্তর আয়াসে নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল—আমি ভেবেছিলুম, তুমি সব কথা জানতে পারলে আমায় দূর করে তাড়িয়ে দেবে!

তোমায় তাড়িয়ে দেব? এত দিন আমায় দেখে—আমায় ভাল করে বুঝে শেষে তুমি এই কথা ভাবতে পারলে লীলা! তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব বলো? অরুণ অত্যন্ত বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া এই কথা বলিল।

লীলা বলিল—আমি যে বড় দোষ করেছিলুম অরুণ! তোমায় এত দিন ধরে বঞ্চনা করে ধাঁধায় ফেলে রাখা কি কম অন্যায়?

অরুণ উত্তেজিত ভাবে বলিল—হ্যাঁ অন্যায়! কিন্তু তুমি কার জন্য এ অন্যায় করেছিলে লীলা? আমি কে তোমার? আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব দূরে থাক, কখনো যাকে চোখেও দেখ নি, তার দুর্দ্দশা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য, তাকে আনন্দ দেবার জন্য তুমি অযাচিত ভাবে ছুটে এসেছিলে! আমি ত মরতেই বসেছিলুম, সংসারের সকল আশা, আনন্দ, সকল সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। হয় ত আর কিছুদিন ওই ভাবে থাকতে হ'লে আত্মহত্যা করে সকল জ্বালার অবসান করতে হতো! আমাকে আবার নব জীবন, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িত করে, গভীর আঁধারের মধ্যে এ আলোর পথে কে নিয়ে এলো? আমার এ জীবনের যা কিছু আবার ফিরে পেয়েছি, তুমি ত সে সবের মূল লীলা! তুমি লীলাই হও, আর বীণাই হও, তাতে আমার কি যায় আসে? তুমি যে আমার—এই আনন্দেই ব্যর্থ জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে!

অরুণের কথা শুনিতে শুনিতে লীলা একমনে ভাবিতেছিল, যাই হোক, এই যে তাহার জীবনের গতি এক দিকে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, এ ভালোই হইল! যে ভাগ্যলিপি সে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারই হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সে আর সব চিন্তা ভুলিয়া অনন্যচিত্তে অরুণের বিশ্বস্ত পত্নী হইয়াই এবারকার জীবন কাটাইয়া দিবে,—আর দোটানার মধ্যে পড়িয়া উদ্বেগ ও অশান্তির তাড়নায় তাহাকে পীড়িত হইতে হইবে না।

অরুণের কথা শেষ হইলে সে বলিল, আজ আমার বুকের উপর থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। এত দিন কথাটা তোমার কাছে বলতে না পেরে আমি যে কি অশান্তি ভোগ করেছি, সে আর তোমায় কি বোলবো! যা হোক্, এখন, কি করে এ ব্যাপার যে ঘটলো সেটা শোন। যেদিন প্রথম বীণার কাছে তোমার সেই চিঠিটা এলো,—ঘণ্টা-দুই মা আর বীণা অনেক দুঃখ, বিলাপ, কান্নাকাটি করে শেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে, তোমার সঙ্গে বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই ভালো। বীণা তখনি তোমায় একটা চিঠি লিখে ফেললে। আমি কিন্তু সে কথা মোটে ভাবতেই পারলুম না। এখন—যখন তোমার জীবনে বেশি ভালবাসা, বেশি সেবা-যত্নের দরকার—তখন তোমার বাগদত্তা পত্নী যে তোমায় এক কথায় এমন করে ঝেড়ে ফেলে দেবে, এ আমার মোটেই ভাল লাগলো না। মাকে, বীণাকে অনেক বোঝালুম, কোন ফল হলো না—মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন কিরণ এক দিন বল্লে—তুমি তার বাড়ীতেই আছ। আমি কিরণকে বলে এক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করবো স্থির করলুম। আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'লে, আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে তোমার নিঃসঙ্গ অবসর কথায়-বার্ত্তায়, গল্পে কতকটা আনন্দে কাটিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু কার্য্যকালে সবই উল্টো হয়ে গেল। আমার একটা কথা শুনেই বুঝি আমাকে বীণা বলে ভুল করে বসলে! তাতেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

অরুণ লীলার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল, সেই

ভুলটা ভাগ্যে করেছিলুম, তারি ফলে ত তোমায় পেয়েছি। না হলে আমার কি আর দাঁড়াবার স্থান থাকতো?

লীলা বলিতে লাগিল, আমায় বীণা বলে জেনে তোমার মুখে যে আনন্দের জ্যোতি দেখলুম, তাতে আমার কেমন দুর্ব্বলতা আসতে লাগলো। কতবার মনে ভাবলুম, কাজটা অন্যায় হচ্ছে—আমার পরিচয় দিয়ে তোমার ভুল ভেঙ্গে দি। কিন্তু কিছুতে তা পারলুম না। তখন মনে হলো, কিছুদিন যাক্—আমার মাঝে মাঝে আসা যাওয়ার ফলে যখন তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জন্মে যাবে, তোমার মনটাও আরো শান্ত হয়ে আসবে, সেই সময় এক দিন সব কথা গুছিয়ে তোমায় বোলবো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার অসুখ হয়ে পড়লো। সেই জন্য যা ভেবে রেখেছিলুম, তার কিছুই হলো না।

লীলা তাহার বুকের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া অরুণের হাতে দিয়া বলিল, এই চিঠিখানা বীণা লিখে আমার হাতে দিয়েছিল, তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য। আমি ভেবেছিলুম, সময়মত এখানা তোমাকে নিজেই দেব। তবে ঘটনা-চক্রের ফলে এত দিন এটা দেবার আর সময় হচ্ছিল না। এই চিঠিখানি আমার দুষ্কৃতির প্রমাণ স্বরূপ আমার কাছে থেকে আমার জীবনটা অশান্তিময় করে তুলেছিল।

অরুণ চিঠিখানি লইয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া লীলার হাতে দিয়া বলিল—এ চিঠিখানার আর দরকারই বা কি আছে? যা হোক—তুমি একবার পড়ে আমায় শোনাও।

লীলা বীণার পত্রখানা পড়িতে লাগিল। অরুণ নীরবে শুনিয়া তাহার হাত হইতে পত্রটা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—বীণার পক্ষে যা উচিত. সে তাই করেছে; কিন্তু আমি এজন্য তার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো লীলা! সে-ই আমার আজকার সকল সৌভাগ্যের মূল। সে যদি এক কথায় আমায় এমন করে দূরে ঠেলে না দিতো, তা হলে আমি হয় ত তোমাকে জানতেও পারতুম না। অন্য কেউ এসে তোমায় নিয়ে যেত।

লীলা এ কথা চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু অরুণ! তুমি কি করে আমায় চিনেছিলে? আমার এটা এত আশ্চর্য্য লাগছে! আমি কোন দিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি, বা আমার সন্দেহ হয় নি যে তুমি আমায় জান। কিরণকে আমি বলতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিলুম, সে কখনো বলে নি—এটা নিশ্চয়। তবে তুমি কি করে জানলে?

অরুণ হাসিয়া বলিল, সেটা জানা কি এতই কঠিন—লীলা? ভুল-ভ্রান্তি মানুষ এক দিনই করে—চিরদিন সে ভুলের জের টান্‌লে চলবে কেন? বিশেষ, বীণার সঙ্গে তোমায় যে প্রভেদ—সে তুমি কত দিন লুকিয়ে চলতে পারো? তোমার কথাবার্ত্তা শুনে, তোমার চাল-চলন দেখে দু'এক দিনের মধ্যেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। বীণাকে কি আমি জানতুম না? তার হাবভাব, তার কথা গল্প, তার সমস্ত অসার প্রকৃতির সঙ্গে আমি যে বেশ ভাল করেই পরিচিত ছিলুম। তাই সন্দেহ হতেই আমি গল্পচ্ছলে কিরণের সঙ্গে কেবল তোমার বিষয় আলোচনা করতে আরম্ভ করলুম। কিরণ যখন বাড়ী না থাকতো, তখন তার বন্ধু-বান্ধব যারা এসে আমার কাছে বসতো, প্রসঙ্গ ক্রমে তাদের কাছেও আমি তোমারি কথা পাড়তুম, তোমার বিষয় জানতে চাইতুম। তার পর তুমি যখন আমার কাছে আসতে, তখন তাদের বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে তোমার প্রত্যেক কথা, হাসি, গান, গল্প মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতুম। এর পরেও কি আমার পক্ষে তোমায় চেনা শক্ত কথা? তবে তুমি এ সম্বন্ধে কিছু বল না কেন, সেইটাই মাঝে মাঝে অদ্ভুত বলে মনে হতো। আমার নিজের দিক থেকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না, আমি ত তোমাকে পেয়েই সুখী। তবে তোমার দিক থেকে যে কিসে কি হলো—সেইটাই সময় সময় ভাবতুম। আজ তোমার কথা শুনে সব স্পষ্ট হয়ে গেল।

তাহার পর অরুণ বলিল, এখন এ সব কথা ছেড়ে দাও লীলা! আমাদের মধ্যে যা কিছু এত দিন অস্পষ্ট ছিল, সে সবই আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে, আর ও সব কথার কিছু দরকার নেই। এখন আমি আর কত দিন এ ভাবে পড়ে থাকবো বলো? তোমাকে ছেড়ে একা একা আমার দিন যে আর কিছুতেই কাটতে চায় না। এই দীর্ঘ দু' মাস আমি যে শরীরে মনে কি অশান্তি, কি উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়েছি, সে তুমি বুঝতে পারবে না। আর আমি পারছি না। আমায় কবে তোমার কাছে নিয়ে যাবে লীলা?

লীলা সস্নেহে বলিল, আর ত বেশি দেরী হবে না অরুণ! এত দিন আমাদের নিজেদের মধ্যে এই গোলযোগ ছিল, এটা না মিটে গেলে ত বাড়ীতে কোন কথা বলতে

পারি না? তাই এত দেরী হয়ে গেল। আজ আমার সব কথা বলা হয়ে গেছে, আজই বাড়ী গিয়ে এ কথা মাকে বাবাকে বলবো। তার পরে আর কতই বা দেরী হবে?

অরুণ উদাসভাবে বলিল, কিন্তু এই কথাটা শুনলেই কেন জানি না, মনটা আমার বিষণ্ণ হয়ে যায়। কেবল মনে হয় তাঁরা, বিশেষ করে তোমার মা কি এতে সন্তুষ্ট হবেন? তিনি হয় ত আপত্তি করতে পারেন। তা হলে আমার দশা কি হবে?

লীলা হাসিয়া বলিল, তুমি এই সামান্য কথা ভেবে মন খারাপ করো কেন? আমি ত তোমায় কত দিন বলেছি যে আমি শুধু আমার নিজের মতেই চলি। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের জীবনের ব্যাপার। আমি যদি তোমায় নিয়ে সুখী হই, তাতে তাঁদের আপত্তি করবার কি আছে? আর করলেই বা আমি সে কথা শুনবো কেন? তবে মা প্রথমে একটু গোল করবেন, এটা ঠিক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার কথাই থাকবে—সে জন্য তুমি ভেবো না, নিশ্চিন্ত থাক।

অরুণ তৃপ্তচিত্তে বলিল, তবে তাই করো লীলা। যত শীঘ্র পার, আমায় এখান হতে তোমার নিজের কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। আমি অধীর হয়ে উঠেছি।

(ক্রমশঃ)

তক্ষশিলা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ

চতুর্থ অধ্যায় (১)

বিবিধ নগর (২)

তক্ষশিলার গৌরব এবং বিষাদময় ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। এইবার আমরা বিভিন্ন কীর্ত্তিরাজির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এতদুদ্দেশ্যে আমরা সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত নগরত্রয়ের বিবরণ প্রদান করিব।

বীরনগর।

যে ভূখণ্ডের মধ্যে প্রোথিত থাকিয়া উল্লিখিত প্রাচীন নগর এবং সৌধাবলীর ধ্বংসাবশেষ আজ তক্ষশিলার বিগত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহারই দক্ষিণ প্রান্তে, স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে ও উত্তর-পূর্ব্বে, একটি উচ্চ ভূমির উপর তক্ষশিলার প্রাচীনতম নগরীর ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। এই ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ বর্ত্তমান গ্রামখানির নাম ভির বা বীরদরঘাট; কাজেই আমরা এই নগরকে বীরনগর নামে অভিহিত করিলাম। Sir John Marshall ইহার নামকরণ করিয়াছেন "ভির মাউণ্ড" (Bhir Mound)। (৩) উত্তর-দক্ষিণে এই উচ্চ ভূমির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ ফিট, এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিসর স্থানে ইহার প্রশস্ততা কিঞ্চিদধিক ৭০০ ফিট। নগরের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিককার সীমা রেখা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়; কিন্তু উত্তর এবং পূর্ব্ব সীমানার কতক কতক অংশ বক্রগতি তম্রানালার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায়, ঐ সব স্থানের প্রাচীরের স্থিতি নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না।

বিভিন্ন স্তর।

বীরনগরের গৃহসমূহের চারিটি স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন স্তরের গৃহাবলী বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক স্তর কালের প্রভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর আবার নূতন

---

(১) কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, এই অধ্যায় এবং ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি Sir John Marshall কৃত "A Guide to Taxila" ও তদীয় বিভিন্ন Annual Reports অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

(২) স্মরণাতীত কাল হইতে কুষান রাজত্ব পর্য্যন্ত তক্ষশিলার রাজধানী পর পর এই উপত্যকা-মধ্যস্থ তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক স্থানে অবস্থিত ছিল। যখন যেখানে যে নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন সেখানে তাহার নাম হইয়াছে তক্ষশিলা নগর। নতুবা এই তিনটি স্থানের মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই;—ইহারা পরস্পর ১ মাইল, ১॥ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। স্তূপ ও বিহারগুলির অধিকাংশই এই নগরত্রয়ের বহির্ভাগে, উপত্যকার অন্যান্য স্থানে বিরাজিত। সংক্ষেপে, সমগ্র উপত্যকাটিই তক্ষশিলা নামে পরিচিত।—লেখক।

(৩) বীরনগরের উত্তর প্রান্তে বর্ত্তমান অস্থায়ী মিউজিয়ম এবং তৎসংলগ্ন অফিস অবস্থিত। স্থায়ী মিউজিয়মের গৃহ ইহার কিছু দক্ষিণে নির্ম্মিত হইতেছে।—লেখক।

গৃহসমূহ গঠিত হইয়াছে,—এইরূপে পর পর চারি-প্রস্থ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তরের তলদেশ ১ হইতে ২ ফিট, তন্নিম্ন স্তরের তলদেশ ৩ হইতে ৪ ফিট, তৃতীয় স্তরের তলদেশ ৬ হইতে ৭ ফিট, এবং সর্ব্ব নিম্ন স্তরের তলদেশ ১২ হইতে ১৫ ফিট নিম্নে অবস্থিত। ইহাদের মাঝে মাঝে আরও দুই একটি স্তরের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেগুলি ঠিক নির্দ্দিষ্ট করা যায় না।

নির্ম্মাণ-প্রণালী।

এই নগরের সমস্ত গৃহ এবং প্রাচীর কাদার গাঁথনি যোগে আকৃতি-হীন অসমান ছোট বড় পাথর (rubble masonry) ও কঞ্জুর নামক

বীরনগরের ধ্বংসাবশেষ

ছিদ্রবহুল নরম পাথর দ্বারা নির্ম্মিত। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের গৃহগুলির অতি সামান্য ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয় স্তরের গৃহগুলির তলদেশ ঈষৎ গোলাকৃতি পাথর অথবা সুবিন্যস্ত কঞ্জুর দ্বারা প্রস্তুত। অন্যান্য স্তরের গৃহসমূহের মধ্যে কতকগুলির প্রাচীর-গাত্রে—অর্থাৎ নিম্নস্থ ভিত্তি-প্রাচীর এবং উপরিস্থ মূল গৃহের-সংযোগ স্থলে—কাটান (offsets) দেখা যায় ; আর কতকগুলির মেঝের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পাথরের জালা আংশিক ভাবে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই কাটান এবং জালা দৃষ্টেই ঐ সমস্ত গৃহের মেঝে-ভাগ নির্ণয় করা যায়। অধিকাংশ গৃহ-প্রকোষ্ঠই এক ধরণ-বিশিষ্ট, ক্ষুদ্রাকার এবং পরস্পর সংলগ্ন। সর্ব্ব নিম্ন স্তরে পোড়া মাটীর নির্ম্মিত কতকগুলি মুক্ত-বক্ষ পয়ঃপ্রণালী বাহির হইয়াছে। প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় স্তর হইতে খনিত অনেকগুলি পাকা কূপ বা গর্ত্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কূপগুলির দৈর্ঘ্য ১৩।১৪ ফিট, এবং ব্যাস ২ হইতে ৩½ ফিট। ইহাদের সঙ্কীর্ণ গঠন দেখিয়া অনুমান হয়, এগুলির অধিকাংশই জলাশয় ছিল না,—ময়লা ও আবর্জ্জনার আধাররূপে ব্যবহৃত হইত। কতকগুলি কূপের মধ্যে অনেক উপুড়-করা বিভিন্ন আকারের মাটীর হাঁড়ি পাওয়া গিয়াছে। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ একটি বড় গৃহের মধ্যে ৪।৫ ফিট উচ্চ তিনটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভগুলি পরস্পর সমদূরে অবস্থিত। প্রত্যেকটির অগ্রভাগে এক একখানি বৃহৎ পাথর স্থাপিত আছে। এই স্তম্ভগুলির নির্ম্মাণোদ্দেশ্য অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, এগুলির উপর তৎকালীন অগ্নি-উপাসকগণ হোম সম্পাদন করিত। নগর-মধ্যস্থ রাস্তা এবং গলিগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, বক্রগতি এবং শৃঙ্খলাহীন।

মোটের উপর, গৃহ, প্রাচীর এবং রাস্তাসমূহ দেখিয়া মনে হয়, এই নগর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নির্ম্মিত হয় নাই ; বিশেষতঃ

গৃহগুলি বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত বলিয়াই, নগর-বিন্যাসে কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী বা শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। (৪)

আবিষ্কৃত দ্রব্যসামগ্রী।

প্রাচীন দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে বীরনগরে বহু সংখ্যক মাটীর বাসন, খেলনা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, মূল্যবান প্রস্তর-নির্ম্মিত মালা এবং কতিপয় স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি ভাণ্ড নগরের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান অফিস যথায় অবস্থিত) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ভিতর ১৬০টি নিরেস রূপার যন্ত্রাঙ্কিত (punch-marked) মুদ্রা, সিরীয়ার ২য় এণ্টিওকাসের নামাঙ্কিত একটি অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণমুদ্রা, কতকগুলি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অলঙ্কার এবং বহু সংখ্যক মুক্তা, বেগুনী ও লাল রংয়ের পাথর, প্রবাল এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথর পাওয়া গিয়াছে। আর একটি মৃৎ-হাঁড়িতে

শিরকাপ—উত্তর প্রাচীরের বহির্ভাগের কতকাংশ

আলেকজাণ্ডারের ২টি ও ফিলিপের ১টি রৌপ্য মুদ্রা এবং অন্যবিধ প্রায় ১২০০ শত যন্ত্রাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা সহ কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত দ্রব্য গৃহগুলির প্রথম স্তর হইতে বাহির হইয়াছে। (৫)

ইতিহাস।

স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে এবং নগরের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দৃষ্টে জানা গিয়াছে, তক্ষশিলার যাবতীয় নগর ও সৌধাবলীর মধ্যে বীরনগরই প্রাচীনতম। Sir John Marshall অনুমান করেন, যীশু খৃষ্টের অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই নগরের পত্তন হইয়াছিল। আর ইহা নিঃসংশয় রূপেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই নগর অন্ততঃ গ্রীকগণের আগমনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল; খৃঃ পূঃ ২৬ অব্দে মহাবীর আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণের পূর্ব্বে এই স্থানে রাজা অম্ভির প্রাসাদে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে মৌর্য্য অধিকারের সময়ও তক্ষশিলা নগরী এই স্থানেই বর্ত্তমান ছিল। বলা বাহুল্য, প্রথম স্তরের গৃহগুলি সমস্তই মৌর্য্য যুগের। এই স্তরে প্রাপ্ত উপরিউক্ত এণ্টিওকাসের মুদ্রা এবং স্থানীয় যন্ত্রাঙ্কিত মুদ্রাগুলি খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে দুই চারিটি মুদ্রা ব্যতীত গ্রীক প্রভাব-সূচক কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। মোটের উপর, অধিকাংশ দ্রব্যই মৌর্য্য ও তৎপূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের বলিয়া বোধ হয়। মৌর্য্য রাজত্বের পর খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে (অঃ ১৭৫ খৃঃ পূঃ অব্দে) ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকগণ রাজধানী বর্ত্তমান শিরকাপ নামক ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত করেন।

শিরকাপ।

দ্বিতীয় নগর শিরকাপ বীরনগরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে তম্রানালার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত, এবং বীরনগরের মতই উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। মিউজিয়ম হইতে এই স্থানের দূরত্ব এক মাইল।

(৪) এই ভূখণ্ডের অধিকাংশই এ পর্য্যন্ত খনিত হয় নাই। ঐ সমস্ত স্থানে এখনও কৃষকগণ হাল চাষ করিতেছে। আর পূর্ব্বে যে বীর দরবাই গ্রামের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাও অনেক স্থান ব্যাপৃত করিয়া রহিয়াছে।—লেখক।

(৫) আমরা এখানে শুধু সামান্য কয়েকটি দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। পরবর্ত্তী একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোক-চিত্র সহ তক্ষশিলার বিভিন্ন স্থানের আবিষ্কৃত দ্রব্যসমূহের আলোচনা করিব।

—লেখক।

নগর-প্রাচীর।

শিরকাপের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সমগ্র প্রাচীরটিই পরিষ্কাররূপে দেখা যায়; উহা দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিন্যূন ৩॥০ মাইল এবং পরিসরে ১৫ হইতে ২০ ফিট। উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকের প্রাচীর সরলগতি; কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সীমা-রেখা উচ্চ-নীচ ভূমির উপর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। সমগ্র প্রাচীরটিই অসমান আকৃতিহীন ছোট বড় পাথরে (rubble masonry) কাদার গাঁথনি যোগে প্রস্তুত। মাঝে মাঝে চতুষ্কোণ বুরুজ (bastions) দ্বারা প্রাচীরটিকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে কোন কোন স্থানে আবার এই বুরুজগুলিকেও ঢালু ঠিকা (battresses) দ্বারা মজবুত করা হইয়াছে। উত্তর দিকে নগরের অন্যতম প্রধান প্রবেশ-দ্বার; এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকেও প্রবেশদ্বারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর প্রবেশ দ্বারের সন্নিকটে, পশ্চিম দিকে, প্রাচীরের অভ্যন্তর-ভাগে কতকগুলি সুগঠিত প্রকোষ্ঠের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। সম্ভবতঃ এগুলির মধ্যে দ্বারবানগণ বাস করিত। অপর দিকে একটি উচ্চ বেদীর ভগ্নাবশেষ; বোধ হয় ইহার সাহায্যে রক্ষিগণ প্রাচীরের উপর উঠিত। প্রবেশ তোরণের মধ্যে পূর্ব্ব দিকে একটি কূপ আছে; সম্ভবতঃ নগরে প্রবেশ করিবার সময় পথিকগণ এখানে থামিয়া জলপান করিত।

শিরকাপের দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী প্রায় অর্দ্ধেক অংশ হথিয়াল শৈলশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্তস্থ কঠিন প্রস্তরময় বৃক্ষলতা-বিরল তিন-চারিটি পাহাড়ের উপর যাইয়া পড়িয়াছে। উত্তর অংশ একটি সমতল নিম্নভূমির উপর প্রসারিত। এই সমতল অংশের উপর দিয়া উত্তর প্রবেশ-দ্বারের মুখ হইতে একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ সোজা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে।

শিরকাপ নগরের ধ্বংসাবশেষ

রাজপথ।

আমরা এই রাজপথ ধরিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি; আর সম্মুখে ও পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে অগণিত ধ্বংসের স্তূপ তাহাদের দীন-হীন, জীর্ণ মূর্ত্তি লইয়া আমাদের দুই চক্ষুর সম্মুখে আছাড়িয়া পড়িতেছে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত কত সভ্যতা, কত সাধনার বিস্মৃত কাহিনী যেন অস্ফুট ক্রন্দন স্বরে আজ এই উন্মুক্ত আকাশের তলে, এই জনহীন প্রান্তর-বক্ষে, এই ধ্বংস-সমাধি নিচয়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে আঘাত করিতেছে। আর সে আঘাতে প্রাণ এক অব্যক্ত বেদনার সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। এই মূক যাতনা বক্ষে চাপিয়া লইয়া কম্পিত পদে, সজল নেত্রে আমরা ধ্বংস-সমাধি ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি।

ইতিহাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিরকাপ নগর খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই নগর গ্রীক-অধিকারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সিথীয় পার্থিয় এবং কুষান-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট বিম কদফিসের রাজত্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পৌনে তিন শত বৎসর কাল বিদ্যমান ছিল (খৃঃ পূঃ ১৭৫—খৃঃ ১০৫ অব্দ)।

বীরনগরের ন্যায় শিরকাপের গৃহাবলীরও কতকগুলি স্তর বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তরের গৃহগুলি প্রধানতঃ নবীন কুষানদের সময়কার। তন্নিম্ন স্তরের ভগ্নাবশেষ পার্থিয়-সিথীয় যুগের, এবং সর্ব্ব নিম্ন স্তর দুইটি ব্যাকট্রিয় আমলের। ইহার নীচেই—১৬ হইতে ১৭ ফিট নিম্নে —সাধারণ মৃত্তিকা।

গৃহসমূহের নির্ম্মাণ-প্রণালী।

রাজপথের উভয় পার্শ্বে বাসগৃহ পরিপূর্ণ সারি সারি মহল্লা; রাজপথ হইতে সরু সরু পার্শ্বপথ বাহির হইয়া মহল্লাগুলিকে পরস্পর পৃথক করিয়াছে। উভয় পার্শ্বে এ পর্য্যন্ত ৩০।৩৫টি মহল্লা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহল্লা মধ্যস্থ সমস্ত বাটীরই নির্ম্মাণ-প্রণালী চতুঃশালা ধরণের, অর্থাৎ মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, আর তাহার চারিপার্শ্বে প্রকোষ্ঠ সমূহ। বাসস্থানের প্রয়োজন অনুসারে এইরূপ চতুঃশালা কোনখানে দুইটি, কোনখানে তিনটি, কোনখানে চারিটি বা ততোধিক। রাজপথের উপরকার ছোট ছোট গৃহগুলিতে দোকান-পসার ছিল। গৃহগুলি দুই গৃহগুলি অতি উচ্চ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল; আর অধুনা যে প্রকোষ্ঠগুলি বাহির হইয়াছে, সেগুলি হয় মূল গৃহের ভিত্তি, নয় তলগৃহ বা তয়খানা (underground cellars) ছিল। যদি এগুলি ভিত্তি হয়, তবে ইহাদের অভ্যন্তর মাটী ও পাথরে পরিপূর্ণ ছিল; আর তয়খানা হইলে উপরিস্থ গৃহ হইতে সিঁড়ি অথবা মইয়ের সাহায্যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা হইত। এই অন্তর্ভৌম কক্ষ অথবা তয়খানা সম্বন্ধে এপলোনিয়াসের জীবনী-লেখক ফিলোষ্ট্রেটাস লিখিয়াছেন, গৃহগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, বাহির হইতে দেখিলে সেগুলি একতল বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে তলপ্রকোষ্ঠ সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদিও বাটীগুলির দুইটার বেশী তল ছিল না, তথাপি তন্মধ্যস্থিত স্থানের পরিমাণ সেই যুগের একটি পরিবারের পক্ষে অত্যধিক বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, এগুলির মধ্যে একাধিক পরিবার একত্র বাস করিত। পরন্তু Sir John Marshall অনুমান করেন, নগরের এই সব অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের
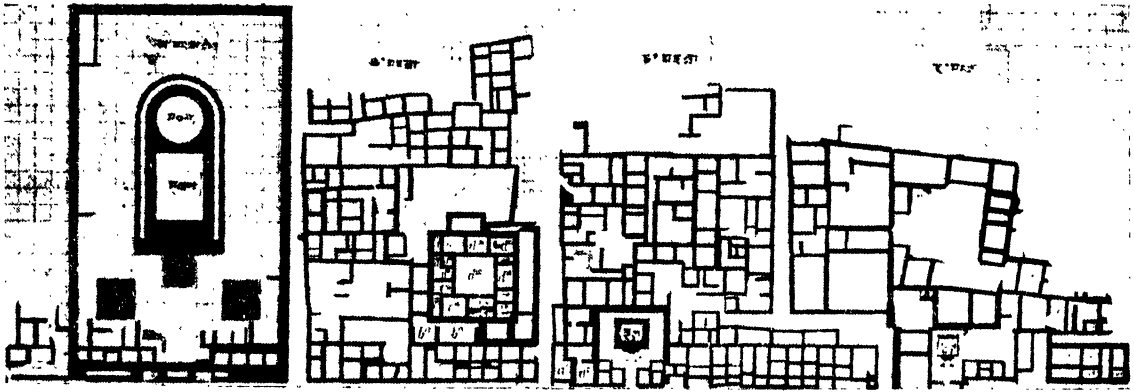
শিরকাপ—আংশিক নক্সা

ধরণের গাঁথনিতে প্রস্তুত,—প্রথম, অসমান আকৃতিহীন পাথরের; দ্বিতীয়, ঈষৎ সমান ও আকৃতিবিশিষ্ট বড় বড় পাথরের (diaper masonry)। শেষোক্ত ধরণের গাঁথনি কুষান অধিকারের প্রথম যুগে প্রচলিত হয়। দেওয়ালগুলির ভিতর এবং বাহির—উভয় পিঠেই চুণ ও কাদার আস্তর। কোন কোন জায়গায় আস্তরের উপর এখনও রংএর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দরজা, ছাদ প্রভৃতির সাজ-সরঞ্জামের জন্য, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়ালের উপর কারুকার্য্যের জন্য কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। কোন গৃহের মধ্যে টালি পাওয়া যায় নাই; এইজন্য অনুমান হয়, ছাদগুলি সমতল এবং কর্দ্দমাবৃত ছিল।

শিরকাপের বাটীগুলির প্রধানতঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, যদিও কোন কোন বাটীর অন্দর-প্রকোষ্ঠগুলির একটি হইতে আর একটিতে যাইবার দরজা আছে, কিন্তু আঙ্গিনা কিম্বা রাস্তা হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনও দ্বার নাই। ইহার কারণ এই যে, গৃহাদি অবস্থিত ছিল; এই সমুদায় গৃহে অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ বাস করিতেন।

তৃতীয়তঃ, কতিপয় বাটীর মধ্যে একটি করিয়া স্তূপ বা মন্দির দেখা যায়। প্রত্যেকটি সৌধ রাজপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক একটি আঙ্গিনার উপর দণ্ডায়মান।

গৃহসমূহে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি।

উপরিউক্ত গৃহসমূহ হইতে সাধারণতঃ যে অসংখ্য এবং বিবিধ প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

বিভিন্ন আকার ও আয়তনের বহু সংখ্যক মৃন্ময় পাত্র,—যথা— মল্লিকা, পানপাত্র, ধুনুচি, ৩।৪ ফিট উচ্চ বৃহৎ বৃহৎ জালা প্রভৃতি; ছোট ছোট পোড়া মাটীর (terracotta) মূর্ত্তি এবং খেলনা; পাথরের গামলা, পানপাত্র, কারুকার্য্য-খচিত রেকাব, থালা; লোহার পাত্র

এবং বাসন ; লোহার কেদারা, ত্রিপদী, ঘোড়ার লাগাম, চাবি, কাস্তে, কোদালি, তরবারি, ছোরা, ঢাল, তীরের অগ্রভাগ ; ব্রোঞ্জ এবং তাম্র-নির্ম্মিত বাটি, মল্লিকা, কৌটা, সুগন্ধি দ্রব্যের শিশি, আলঙ্কারিক পিন্, ঘণ্টা, অঙ্গুরী, বহু সহস্র মুদ্রা, বহু সংখ্যক স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অলঙ্কার ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'ক' মহল্লার স্তূপ।

নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই বাম দিকে, অর্থাৎ রাজপথের পূর্ব্ব ধারে দ্বিতীয় মহল্লার মধ্যে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে একটি চতুষ্কোণ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গণের চারিদিকে কতগুলি আবাসগৃহের চিহ্ন আছে। সম্ভবতঃ এই আঙ্গিনাটি সর্ব্বসাধারণের উপাসনার জন্ম ব্যবহৃত হইত। স্তূপের ভিতর হইতে

শিরকাপ—দ্বিমস্তক ঈগলবিশিষ্ট স্তূপ

অস্থি ভস্ম পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছে। ভস্ম-প্রকোষ্ঠের (relic-chamber) মধ্যে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে একটি অত্যুৎকৃষ্ট স্ফটিক-নির্ম্মিত কৌটার কয়েকটি টুকরা পাওয়া গিয়াছে। টুকরাগুলি দেখিয়া প্রতীয়মান হয়, আস্ত কৌটাটি যেরূপ বড় ছিল, তাহাতে তাহা কখনই ভস্ম প্রকোষ্ঠের মধ্যে যাইতে পারে নাই। এই জন্ম অনুমিত হয়, কৌটাটি ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, খণ্ডগুলি সহ তন্মধ্যস্থিত ভস্ম অন্য কোন প্রাচীনতর সৌধ হইতে আনিয়া এখানে প্রোথিত করা হইয়াছিল।

ঘ' মহল্লার চৈত্য।

উক্ত স্তূপের দুইটি মহল্লা পরে, রাজপথের পূর্ব্ব দিকে এক বিশাল গোলাকৃতি অংশবিশিষ্ট বৌদ্ধ মন্দির বা চৈত্যের (Apsidal Temple) ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। মন্দিরটি পশ্চিমদ্বারী, এবং একটি সুপ্রশস্ত চতুষ্কোণ অঙ্গনের উপর দণ্ডায়মান। মন্দিরের প্রবেশ-পথের দক্ষিণ ও বাম দিকে দুইটি মঞ্চ। তদুপরি ছোট ছোট দুইটি স্তূপ ছিল। পশ্চিম দিকের প্রাচীর সংলগ্ন সন্ন্যাসীদের সারি সারি বাস-কক্ষ। সিথীয়-পার্থিয় যুগের পুরাতন ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত বলিয়া এই মন্দিরের আঙ্গিনাটি এক সমুচ্চ ভূখণ্ডের উপর প্রসারিত। প্রাঙ্গণে উঠিবার জন্ম সম্মুখস্থ রাজপথ হইতে দুই প্রস্থ পার্শ্ব-সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বস্থিত পূর্ব্বোক্ত স্তূপ দুইটির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু সংখ্যক চূণ-বালি ও পোড়া মাটীর নির্ম্মিত (Stucco and terracotta) মস্তক ও নানাবিধ আলঙ্কারিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাঙ্গণোপরিস্থ ধ্বংসাবলীর মধ্যে বহুসংখ্যক তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রা প্রধানতঃ কজল কদফিস এবং হারমিয়াসের নামাঙ্কিত। এতৎসঙ্গে আরও অধিক পুরাতন কতিপয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত হইতে অনুমান করা যায়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগেই সৌধটি ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল।

যে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এই বিশাল মন্দিরটি অবস্থিত, তাহা যেমন রাজপথ হইতে উচ্চতর ভূমির উপর বিস্তৃত, তদ্রূপ মন্দিরটি আবার প্রাঙ্গণ বক্ষ হইতে উচ্চতর বেদীর উপর দণ্ডায়মান। মন্দিরটি তিনটি অংশে বিভক্ত,—সম্মুখে প্রশস্ত চতুষ্কোণ মণ্ডপ (nave) ; তদগ্রে দ্বার-কক্ষ (porch), এবং পশ্চাতে বৃত্তাকার মণ্ডপ (apse) ; আর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ-পথ। দ্বার-কক্ষের ভিতর দিয়া প্রদক্ষিণ-পথে প্রবেশ করা হইত। বৃত্তাকার মণ্ডলের ভিত্তির ব্যাস প্রায় ৩০ ফিট। এই মণ্ডলের উপর একটি মন্দির, এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি স্তূপ ছিল

বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উক্ত মণ্ডলের ভিত্তি-দেওয়ালের মূল প্রায় ২০-২২ ফিট মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত। প্রথম দৃষ্টিতে ইহাকে একটি কূপ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই অত্যধিক গভীরতার কারণ দ্বিবিধ: প্রথম, ইহার উপরিস্থ মন্দিরটি অত্যন্ত উচ্চ এবং ভারী ছিল; দ্বিতীয়, দেওয়ালটি পুরাতন ধ্বংসাবলী ভেদ করিয়া নিম্নস্থ সাধারণ মৃত্তিকা হইতে গাঁথিয়া উঠাইতে হইয়াছিল। মণ্ডলাভ্যন্তরে দেওয়াল-গাত্রে প্রাচীন মেঝের সন্নিকটে চারিদিক ঘিরিয়া প্রায় অর্দ্ধহস্ত চওড়া একটি সরল ফুকার দেখা যায়। এই স্থানে কাষ্ঠ-খণ্ডসমূহ সংবদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বর্ত্তমানে এই ফুকার পাথর দ্বারা ভরিয়া ফেলা হইয়াছে। ভগ্নাবশেষের মধ্যে বহু জীর্ণ কাষ্ঠ,

শিরকাপ—প্রাসাদের নক্সা

লোহার পেরেক, পাতরা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সব হইতে বুঝা যায়, ছাদের সাজ-সরঞ্জাম কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল। ভূমির উপর কোন টালির টুক্‌রা পাওয়া যায় নাই। কাজেই অনুমান হয়, ছাদটি সম্ভবতঃ সমতল এবং কর্দ্দমাবৃত ছিল।

এই মন্দিরটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে এই রীতির মন্দির অতি অল্পই আছে। এইরূপ আরও একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ তক্ষশিলাতেই পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতের মধ্যে এ পর্য্যন্ত এইখানেই সর্ব্বপ্রথম এই প্রকার দুইটি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঙ' মহল্লায় প্রাপ্ত দ্রব্যাদি।

উক্ত মন্দিরের পরবর্ত্তী মহল্লায় অতি মূল্যবান দুই প্রস্থ জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। দ্রব্যগুলি খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। নিম্নে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিষগুলির নাম প্রদত্ত হইল:—

(১) ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত বালদেবতা হার্পোক্রেটসের মূর্ত্তি, রৌপ্যনির্ম্মিত ডাইওনিসাসের আবক্ষ মূর্ত্তি, একটি রূপার চামচ, দুই জোড়া সোনার বালা, পাঁচটি সোনার মাকড়ি, তিনটি সোনার কর্ণদোলক, তিনটি স্বর্ণাঙ্গুরী, একটি সোনার দড়া হার, ছয়টি জসম, সাতটি সোনার মালা, একটি সোনার বাদামী লকেট, একজোড়া ডায়মণ্ডকাটা পাথর-বসান সোনার ফুল, একজোড়া মুক্তারাকৃতি সোনার দোলক, ৬০টি গোল এবং বিভিন্ন আয়তনের ফাঁপা সোনার মালা।

(২) এফ্রোডাইটের একটি ডানাযুক্ত মূর্ত্তি, কামদেবের মূর্ত্তিযুক্ত একটি সোনার 'পরিচক্র' বা পদক, অঙ্গুরীতে বসাইবার দশটি পাথর, বিন্দু এবং কমা আকারের তিনটি পাথর, সোনার চিকের ৭৪টি খণ্ড, পার্থিয় রাজা সাসান, সাপাডেন্‌স্ এবং শতবস্ত্রের এবং কুষান রাজা ২য় কদফিসের (?) নূতন ধরণের ২১টি রৌপ্য-মুদ্রা।

ঙ' মহল্লার স্তূপ।

এই মহল্লার বিপরীত দিকে, রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বের মহল্লাটির মধ্যে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। স্তূপটি মহল্লার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, রাজপথের উপর দণ্ডায়মান ছিল। ইহাতে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্ব দিকে রাজপথ হইতে সপ্ত ধাপ-বিশিষ্ট দুই প্রস্থ পার্শ্ব-সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। সমচতুষ্কোণ কঞ্জুর পাথরে সোপানগুলি মণ্ডিত। স্তূপটির বেদী, কেন্দ্র হইতে প্রসারিত কয়েকটি পুরু দেওয়ালের সমবায়ে গঠিত হইয়াছিল। কেন্দ্রস্থলে ৭/৮ ফিট মাটীর নীচে একটি সমচতুষ্কোণ ভগ্ন ভস্মপ্রকোষ্ঠ পাওয়া গিয়াছে।

চ' মহল্লার দ্বিমস্তক ঈগলবিশিষ্ট স্তূপ।

রাজপথের পূর্ব্ব দিকে পরবর্ত্তী মহল্লায় আর একটি সুন্দর স্তূপ অবস্থিত। Sir John Marshall এটিকে জৈন স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্তূপের বেদীর সম্মুখ অর্থাৎ পশ্চিম ভাগে, সিঁড়ির দুই পাশে ৪টি করিয়া মোট ৮টি গাত্রস্তম্ভ (pilasters)। স্তম্ভগুলি করিন্থীয় আদর্শে নির্ম্মিত। ইহাদের দুইটির কাণ্ড (Shaft) গোল; অবশিষ্ট চতুষ্কোণ। এই গাত্রস্তম্ভগুলির মস্তকে অবলম্বনী (brackets), এবং মাঝে একটি করিয়া কুলুঙ্গী (niches)। কুলুঙ্গীগুলি তিন ধরণে প্রস্তুত। সিঁড়ির নিকটবর্ত্তী দুইটির খিলান ত্রিভুজাকৃতি (pedimental arch)—গ্রীক আদর্শে রচিত; মধ্যস্থলের কুলুঙ্গী দুইটির খিলান বঙ্গদেশীয় দোচালা ঘরের ন্যায় বক্রাকৃতি (ogee arch);

এবং প্রান্তস্থ দুইটির আকার প্রাচীন ভারতের তোরণের ন্যায়। মধ্য এবং প্রান্তস্থ কুলুঙ্গীর প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া পক্ষীমূর্ত্তি—সম্ভবতঃ ঈগল—স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে একটি দ্বিমস্তক বিশিষ্ট। Sir John Marshall অনুমান করেন, খিলানের উপর পাখী স্থাপন—এই অভিনব স্থাপত্যরীতি সিথীয়গণ সর্ব্ব প্রথম তক্ষশিলায় প্রবর্ত্তন করেন। কালক্রমে ইহা তক্ষশিলা হইতে বিজয়নগর এবং সিংহলে প্রচলিত হয়।

স্তূপের গাত্রভাগ কঞ্জুর প্রস্তরাবৃত। গাত্র এবং তদুপরিস্থ ভাস্কর্য্য-বিন্যাস (mouldings) এবং অন্যান্য কারুকার্য্য সমস্তই সূক্ষ্ম বালি-চূণের (Stucco) একটি পাতলা আবরণে আস্তৃত ছিল। তার পর ইহার উপর লাল, হলদে প্রভৃতি রংয়ের বহুবিধ লেপন দেওয়া হয়। স্তূপের জয়ঢাক (drum) এবং 'অণ্ড' বা গম্বুজ (dome) উভয়ই সম্ভবতঃ চুণ-বালির কারুকার্য্যে খচিত এবং বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ছিল। আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত প্রকোষ্ঠদ্বয় ১ম এজেসের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। এই নিমিত্ত অনুমিত হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমভাগে লিপিখানি বর্ত্তমান জীর্ণ এবং ভগ্নাবস্থায় এইখানে লাগানো হইয়াছিল। এই লিপি-খানি হইতে তক্ষশিলায় এককালে পারসীক প্রভাব সূচিত হইতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ লিপিখানির সঠিক পাঠোদ্ধার হয় নাই।

ছ' মহল্লার স্তূপ।

ইহার পরবর্ত্তী মহল্লায় আর একটি ক্ষুদ্র স্তূপ অবস্থিত। Sir John Marshall এটিকেও জৈন স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্তূপের বেদীটি চতুষ্কোণ; বেদীর প্রত্যেক পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া গাত্রস্তম্ভ, পাদ-নিম্নে সরল ভাস্কর্য্য-বিন্যাস, এবং উপরিভাগে সাধারণ "মালা এবং কাটিম" ("bead and reel") ধরণযুক্ত কর্ণিশ। এই স্তূপেরও 'জয়ঢাক',

শিরসুখ—খনিত প্রাচীরাংশ

সোপানের ধার এবং বেদীর উপর চারিদিক দিয়া বৌদ্ধ-যুগ-সুলভ আবেষ্টনী (railing) দ্বারা শোভিত একটি অনুচ্চ প্রাচীর ছিল। Sir John Marshallএর মতে এই স্তূপের সমস্ত শিল্প-বিন্যাস, গাত্রস্তম্ভ, দন্তাকৃতি কর্ণিশ (dentil cornice), ত্রিভুজ খিলানবিশিষ্ট কুলুঙ্গী, সমস্তই গ্রীক আদর্শে সম্পাদিত; কেবল তোরণ, বক্র-খিলানযুক্ত কুলুঙ্গী এবং গাত্র স্তম্ভোপরিস্থ অবলম্বনীগুলি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

স্তূপের মধ্যস্থলে ভস্ম-প্রকোষ্ঠ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্য হইতে ভস্মাদি পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছে।

আর্ম্মিয় লিপি।

এই মহল্লার দুইটি প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের ভিতর একটি শ্বেত প্রস্তরের উপর আর্ম্মিয় অক্ষরে ও ভাষায় ক্ষোদিত একখানি লিপি

'অণ্ড' এবং ছত্র ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। তবে প্রাঙ্গণস্থ ভগ্নাবশেষের মধ্যে ইহাদের কতক কতক অংশ, আর সিংহ-শীর্ষ দুইটি গোল স্তম্ভের অংশ বিশেষ, এবং বেদীর প্রান্তোপরিস্থ বেদিকার (balustrade) অনেক-গুলি খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ স্তম্ভ দুইটি বেদীর কোণায় দণ্ডায়মান ছিল। ইহার মধ্যে একটি পাথরের কৌটা ও একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণ-কৌটা পাওয়া গিয়াছে। পাথরের কৌটার ভিতর সিথীয় রাজা ১ম এজেসের ৮টি তাম্র মুদ্রা, আর সোনার কৌটাটির মধ্যে কয়েক টুক্‌রা অস্থি, কয়েক খণ্ড স্বর্ণ-পত্র এবং কয়েকটি মালা পাওয়া গিয়াছে। ১ম এজেস খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দের সম সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এই স্তূপটি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উপরিউক্ত স্তূপের পরে, রাজপথের পূর্ব্ব দিকে আরও কতিপয়

মহল্লা। তৎপরে আর একটি বৃহৎ মহল্লা। ইহার গৃহগুলির সুদৃঢ় এবং সুশৃঙ্খল নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিয়া Sir John Marshall এটিকেও রাজপ্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদের পশ্চিম দিক দিয়া সুপ্রশস্ত রাজপথ চলিয়া গিয়াছে; এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিক দিয়া পশ্চিম প্রবেশদ্বারের রাস্তাটি প্রসারিত ছিল। দুইটি রাজপথের মিলন স্থলে অবস্থিত বলিয়া প্রাসাদটি নগরীর মধ্যে অতি চমৎকার স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার পশ্চিম পার্শ্বের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক ৩৫০ ফিট, এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমের পরিমাপ প্রায় ২৫০ ফিট। প্রাসাদের প্রাচীনতন অংশ বিশেষ অসমান আকৃতিহীন পাথরে নির্ম্মিত। সুতরাং এই সব অংশ সম্ভবতঃ সিথীয়-পাথিয় যুগে গঠিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ইহার মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তর দিগ্বর্ত্তী অন্দর মহলে বহু সংস্কার ও অনেক নূতন নির্ম্মাণকার্য্য হয়। কোন কোন দ্বারের তলদেশ (threshold) চূণাপাথরে নির্ম্মিত। অনেক প্রাচীরগাত্রে ফুকার (chase) দেখিয়া মনে হয়, তাহাতে কারুকার্য্যবিশিষ্ট কাষ্ঠ-ফলকসমূহ (wooden panelling) সংবদ্ধ ছিল। অন্যান্য প্রকোষ্ঠের প্রাচীর চূণ অথবা কর্দ্দমে আস্তৃত, এবং তদুপরি রংয়ের লেপন ছিল।

এ পর্য্যন্ত প্রাসাদের মধ্যে পাঁচটি মহল আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি মহলের মধ্যভাগে একটি করিয়া অঙ্গন; অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এইরূপ একটি মহল। ইহার মধ্যভাগে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের চারি দিকে বাসগৃহ। ইহার মধ্যে একটি স্নান-কক্ষ, তন্মধ্যে ছোট একটি চৌবাচ্চা। প্রাঙ্গণটি অনির্দ্দিষ্ট আকৃতির পাথরে আবৃত। ইহার দক্ষিণ দিকে চৌকস (ashler) কঞ্জুর পাথরে নির্ম্মিত একটি সমুচ্চ মঞ্চ (dais)। সম্ভবতঃ এই চৌকটি দীওয়ান-ই-খাষ্‌ ছিল। এই চৌকের দক্ষিণ দিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চৌখণ্ডী; ইহার চারিদিকে কক্ষসমূহ। সম্ভবতঃ এখানে রক্ষী এবং সহচরগণ বাস করিত। এই মহলের উত্তর দিকে অনেকগুলি কক্ষবিশিষ্ট আর একটি মহল। সুদৃঢ় প্রাকার দ্বারা দুইটি মহলকে পরস্পর পৃথক করা হইয়াছে। শেষোক্ত মহলটি বোধ হয় অন্তঃপুর ছিল। ইহার উত্তর দিকে পরবর্ত্তী কালে আরও কতকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অন্দরমহলটিকে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। এ... গেল প্রাসাদের পশ্চিম দিকের মহল। পূর্ব্ব দিকেও আর দুই... মহল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ দিকের মহলটির মধ্যভাগে একটি সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে কয়েকটি কক্ষ, এবং উত্তর দিকে একটি সমুচ্চ মঞ্চ।—সম্ভবতঃ এই চৌকটি দেওয়ান-ই-আম্‌ ছিল। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষগুলিতে দপ্তরের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এই মহলের উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র-পরিসর আর কতকগুলি কক্ষ। সম্ভবতঃ এগুলি অতিথি-অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনা-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইত।
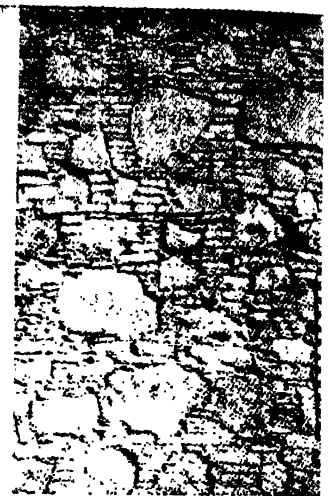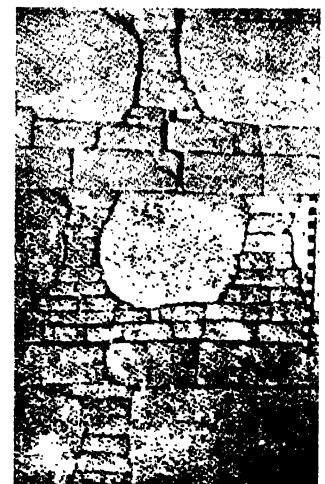
1. RUBBLE. 2. SMALL DIAPER.

বিভিন্ন ধরণের গাঁথনি

যদিও প্রাসাদটি শিরকাপের সাধারণ গৃহস্থদের বাড়ী অপেক্ষা বৃহদায়তন এবং সুগঠিত, তথাপি ইহার পরিকল্পনায় কোন আড়ম্বর কিম্বা সাজসজ্জায় পরিপাট্য নাই। এপলোনিয়াসের জীবনী-লেখক

ফিলোষ্ট্রেটাস বিশেষভাবে এই বৈশিষ্ট্যের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রাসাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, তাঁহারা এখানে কোন বিশাল অট্টালিকা দর্শন করেন নাই; বাসগৃহ, দ্বারমণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই অতি সাদাসিদা ধরণে প্রস্তুত।

যাহা হৌক, প্রাসাদটি এইরূপ আতিশয্যহীন সরল ধরণের হইলেও, ইহার ধ্বংসাবশিষ্ট পরিকল্পনাটি অত্যন্ত চমৎকার। এইরূপ পরিকল্পনায় নির্ম্মিত দ্বিতীয় একটি ইমারত ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার পরিকল্পনার সহিত মেসোপটেমিয়ার এসিরীয় প্রাসাদসমূহের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রাসাদে আবিষ্কৃত প্রাচীন দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে বহুসংখ্যক মৃন্ময়মূর্ত্তি ও পাত্র, ব্রোঞ্জ, তাম্র এবং লৌহনির্ম্মিত বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য, মালা, মুক্তা এবং মুদ্রাসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দ্রব্যের মধ্যে একটি পাত্রের ভিতর ১ম এজেস, ২য় এজেস, অশ্ববর্ম্ম, গণ্ডোফারনেস, হারমিয়াস এবং কজুল কদফিসের ৬১টি তাম্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আর এক প্রস্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিষ, অর্থাৎ কতিপয় মৃন্ময় মুদ্রার ছাঁচ—প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকগুলি ছাঁচের ছাপ বেশ পরিষ্কার। তদ্দৃষ্টে সেগুলি ২য় এজেসের বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ—সাধারণ দৃশ্য

পাহাড়-পরিবৃত অংশ।

প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি পাহাড় পর পর অবস্থিত। ইহার মধ্যে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী পাহাড়টির উপর একটি বৃহৎ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম অবস্থিত। এই স্তূপটি "কুণাল স্তূপ" নামে পরিচিত। পাহাড়টির গা বাহিয়া স্তূপের পূর্ব্ব দিক ঘেঁসিয়া নগরের পূর্ব্ব সীমার প্রাচীর-রেখা চলিয়া গিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই স্তূপের বর্ণনা প্রদান করিব। উক্ত পাহাড় এবং তাহার দক্ষিণ দিকস্থ পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা-ভূমিতে অনেক গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সব স্থান নগরের উপকণ্ঠ বিশেষ ছিল। শেষোক্ত পাহাড়ের দক্ষিণে নগর-সীমার মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ পাহাড়টি অবস্থিত। এই দুইটির উপরেও একটি করিয়া ক্ষুদ্র স্তূপ এবং সঙ্ঘারাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। "কুণাল স্তূপ" পাহাড়ের ঠিক পশ্চিম দিকে কিছু দূরে আর একটি পৃথক সমতল-অগ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। Sir John Marshall এই পাহাড়টির অবস্থান এবং আকৃতি দর্শনে অনুমান করেন, ইহার উপর নগরীর প্রধান অংশ (Acropolis) অবস্থিত ছিল। পরন্তু তিনি বলেন, পাহাড়-পরিবৃত এই অংশ দৃঢ় প্রাকারে সুরক্ষিত করিয়া তৎকালে শত্রুর অবরোধের সময় আশ্রয়-দুর্গ-রূপে ব্যবহৃত হইত। দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য উক্ত প্রাচীর মধ্যে দ্বার ছিল।

শিরকাপ নগরের বর্ণনা শেষ হইল। এখন আমরা তৃতীয় নগর শিরসুখে গমন করিব।

শিরসুখ।

শিরসুখ শিরকাপের ১॥ মাইল উত্তর পারে অবস্থিত। মিউজিয়াম হইতে এই স্থানের দূরত্ব ৩ মাইল।

ইতিহাস।

এই নগর খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কুষান বংশের দ্বিতীয় সম্রাট মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্য ভাগে হুন আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

নগর-প্রাচীর।

নগরটির পরিকল্পনা অনেকটা সমান্তরাল ক্ষেত্র (parallelogram) বিশেষ। চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রাচীর, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ মাইল, পরিসরে ১৮ ফিট বা ততোধিক। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের প্রাচীর দুইটি যুক্ত সুবিন্যস্ত বড় বড় (large diaper type) চুণা পাথরে মণ্ডিত। প্রাচীরটি নির্ম্মাণের পরবর্ত্তীকালে ইহার ভিতর এবং বাহির, উভয় পিঠেই পাদদেশে (base) একটি গোলাকার ভিটি (roll plinth) দ্বারা ইহাকে সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। বহির্গাত্রে প্রায় ৯০ ফিট অন্তর অন্তর অর্দ্ধ গোলাকার শূন্যগর্ভ বুরুজ সকল (bastions) সংলগ্ন। ইহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রাচীর দেহের মধ্য দিয়া এক একটি সরু পথ প্রসারিত। বুরুজ এবং প্রাচীর, উভয়েরই মধ্যে প্রায় ৫ ফিট উচ্চে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র; ছিদ্রগুলি নগর-রক্ষিগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রশস্ত্র চালনাকালে ব্যবহৃত হইত।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের নক্সা
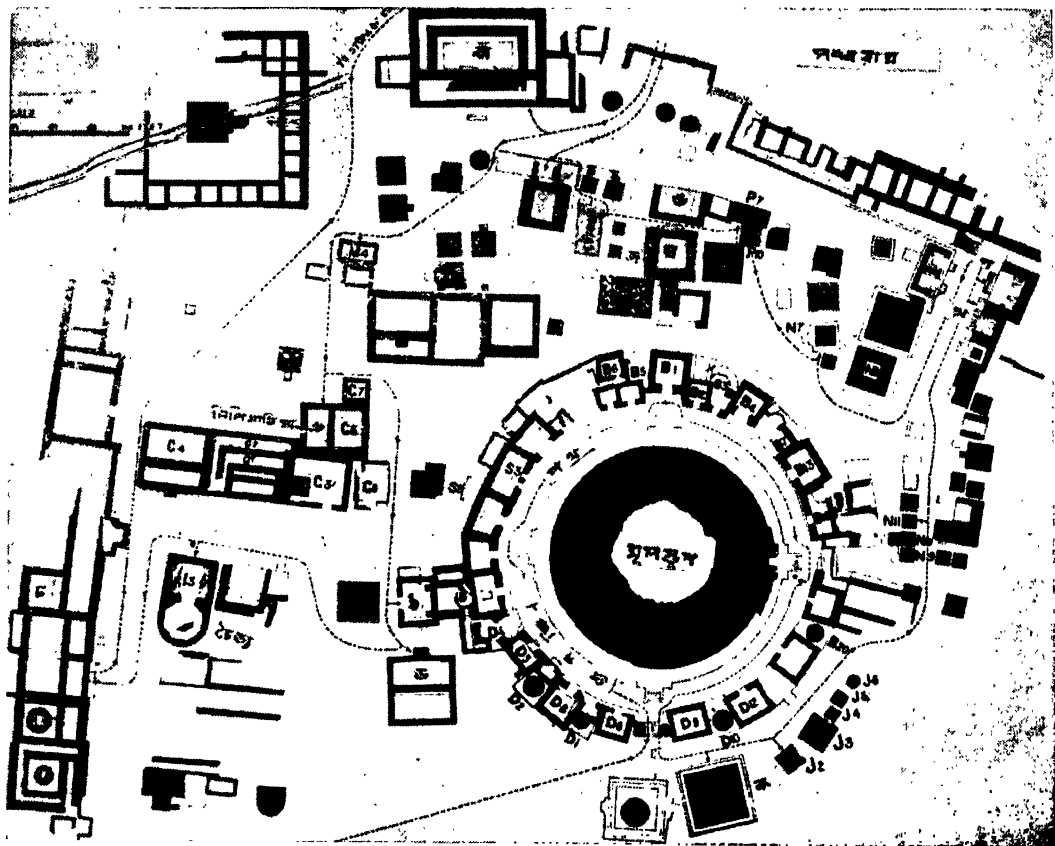
অপেক্ষাকৃত অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু উত্তর এবং পশ্চিম দিকের প্রাচীর সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া অধুনা কৃষকদের শস্যক্ষেত্রের নীচে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই দুই দিকের সীমা-রেখা অতি কষ্টে নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথমোক্ত প্রাচীরদ্বয় মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়া এখন দুইটি সমুচ্চ শিরার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের কিয়ৎ স্থান খনিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগ অসমান আকৃতিহীন ছোট পাথরে নির্ম্মিত, গাত্রভাগ ঈষৎ সমান ও আকৃতি-

এই বুরুজগুলির তলদেশে হারমিয়াস, এবং ২য় কদফিসের কতকগুলি তাম্রমুদ্রা, হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত একটি দর্পণের হাতল, ও বাদশাহ আকবরের ৫৭টি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

শিপমুখের অতি সামান্য অংশ খনিত হইয়াছে। এই স্থানের উপর পিণ্ডগাখ্‌রা, টোপকিয়া এবং মীরপুর নামক তিনটি গ্রাম বসিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বৃহৎ অংশ কৃষকদের শস্যক্ষেত্র,—ইহার উপর দিয়া বহুসংখ্যক কৃত্রিম জলপ্রণালী প্রবাহিত। এই নিমিত্ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সমস্তই মৃত্তিকার গভীর নিম্নে প্রোথিত হইয়া

লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে। বিশাল প্রান্তরের মাঝে মাঝে কয়েকটি সমুচ্চ মাটির ঢিবি। ইহাদের অভ্যন্তরে অবশ্যই অনেক সৌধাবলীর ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে। কিন্তু এগুলির উপর এখন সমাধিক্ষেত্র, জিয়ারৎ এবং গ্রাম অবস্থিত। কেবল টোপকিয়াঁ গ্রামের পূর্ব্ববর্তী কতক অংশ খনিত হইয়াছে। আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিতেছি।

আবিষ্কৃত গৃহসমূহের নির্ম্মাণ-প্রণালী।

উক্ত স্থানে কতকগুলি গৃহ-পরিপূর্ণ দুইটি চৌকের কতক অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে,—বৃহৎটি পশ্চিম দিকে, এবং ক্ষুদ্রটি পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই দুই চৌকের চারিদিকে কতকগুলি প্রকোষ্ঠের শ্রেণী, আর উভয়ের মধ্যে চলাচলের একটি পথ। যতদূর বুঝা যায় তাহাতে মনে হয়, এই ইমারতের বিস্তার এবং পরিকল্পনা শিরকাপের গৃহসমূহেরই মত,—অর্থাৎ মধ্যস্থলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, আর চতুর্দ্দিকে সারি সারি প্রকোষ্ঠ (চতুঃশালা)। আবিষ্কৃত গৃহাদির আয়তন এবং গঠনরীতি দৃষ্টে Sir John Marshall মনে করেন, তিনি শিরকাপ নগরের যে গৃহ-সমষ্টিকে রাজপ্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আলোচ্য গৃহ-গুলির সমগ্র অংশ বাহির হইলে তাহাও তদ্রূপ জটিল এবং সুবিস্তৃত একটি বাটী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। গৃহগুলির দেওয়ালে প্রবেশ-দ্বারের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এই জন্য অনুমান হয়, শিরকাপের সাধারণ বাটীগুলির ন্যায় এখানকারও নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠসমূহে সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণ বা রাস্তা হইতে প্রবেশ করা হইত না, উপরতল হইতে সিঁড়ি বাহিয়া নিম্নতলে অবতরণ করা হইত। পূর্ব্বোক্ত প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে একটি চওড়া দেওয়াল দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা একটি স্তম্ভযুক্ত সমুচ্চ বারান্দার ভিত্তি ছিল। গৃহগুলির প্রাচীরের উপরিভাগ অর্দ্ধ-চৌকস (Semi-ashler) পাথরে নির্ম্মিত; প্রোথিত নিম্ন অংশে অসমান আকৃতিহীন পাথরের গাঁথনি।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদি।

কতিপয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে শস্য, তৈল কিম্বা জল রাখিবার উপযোগী বড় বড় মাটীর জালা,—২য় কদফিস, কণিষ্ক এবং বাসুদেবের বহুবিধ মুদ্রা এবং অন্যান্য বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য-সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, তক্ষশিলা নগরী স্মরণাতীত কাল হইতে মৌর্য্য-অধিকারের শেষ (অনুমান খৃঃ পূঃ দ্বিসহস্রাব্দ হইতে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ) পর্য্যন্ত বীরনগর নামক স্থানে, তৎপর ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক অধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া সিথীয়-পার্থিয় এবং কুষান বংশের দ্বিতীয় সম্রাট বিম কদফিসের রাজত্ব (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে খৃঃ প্রথম শতাব্দীর শেষ) পর্য্যন্ত শিরকাপে, এবং সর্ব্বশেষ মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকাল হইতে হুন আক্রমণের পূর্ব্ব (খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ) পর্য্যন্ত শিরসুখে অবস্থিত ছিল। এই সুদীর্ঘ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসরকাল বিভিন্ন জাতির অধীনে তক্ষশিলার স্থাপত্য-বিদ্যার কিরূপ উন্মেষ হইয়াছিল, আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব।

বীরনগর, শিরকাপ এবং শিরসুখের তুলনামূলক আলোচনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তক্ষশিলার প্রাচীনতম সহর বীরনগর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নির্ম্মিত হয় নাই; নগর-প্রাচীরের সীমা রেখা ইতস্ততঃ বক্রগতি। পক্ষান্তরে শিরকাপের উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকের প্রাচীর দুইটি বেশ সরল; অবশ্য দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের প্রাচীর এরূপ নয়। শিরসুখ নগরের পরিকল্পনা একটি সমান্তরাল-ক্ষেত্র বিশেষ। শিরকাপের প্রাচীরের বহির্ভাগ কিছু দূর অন্তর অন্তর চতুষ্কোণ বুরুজ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। এই বুরুজগুলি বোধ হয় দ্বিতলবিশিষ্ট—উপরতল ফাঁপা এবং রন্ধ্রযুক্ত, আর নিম্নতল নীরেট বা পূর্ণগর্ত্ত ছিল। শিরসুখের প্রাচীরের বুরুজগুলি অর্দ্ধ-গোলাকার, সম্পূর্ণ ফাঁপা এবং রন্ধ্রযুক্ত;—আর সমগ্র প্রাচীরটিও সচ্ছিদ্র ছিল। বীরনগরের রাস্তা এবং গলিগুলি শৃঙ্খলাহীন, বক্রগতি এবং সঙ্কীর্ণ; শিরকাপের সুপ্রশস্ত সরল রাজপথটি ছাড়া অন্যান্য রাস্তা এবং গলিগুলিও অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল এবং সুপরিসর। শিরকাপের এই শৃঙ্খলা এবং একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে নগর-বিন্যাস—Sir John Marshallএর মতে খৃঃ প্রথম শতাব্দীর সিথীয়-পার্থিয়গণের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। শিরসুখের যে অল্প স্থান খনিত হইয়াছে, তাহাতে রাস্তাদি কিছু বাহির হয় নাই। তথাপি এই নগরের পথগুলি যে আরও উন্নত ধরণে পরিস্কৃত ছিল, তাহা অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। প্রথম নগরের গৃহগুলি যদিও একই ধরণে নির্ম্মিত, তথাপি সেগুলির অবস্থানে কোন শৃঙ্খলা নাই। এই নগরের গৃহসমূহে কোন প্রবেশ-দ্বার পরিলক্ষিত না হওয়ায় মনে হয়, উপর হইতে ইহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হইত। কিন্তু দ্বিতীয় নগর শিরকাপের গৃহগুলি এরূপ নয়। এখানে এক একটি পৃথক মহল্লার মধ্যে সারি সারি গৃহ অবস্থিত; প্রত্যেক বাটীর নির্ম্মাণে চতুঃশালা রীতি অনুসৃত হইয়াছে। গৃহগুলি দ্বিতল বিশিষ্ট ছিল। সাধারণ বাটীগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কোন গৃহের নিম্ন প্রকোষ্ঠের একটি হইতে আর একটিতে যাইবার দরজা আছে বটে, কিন্তু কোন গৃহেই বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বার-পথ নাই। ইহাতে মনে হয়,—সিঁড়ির সাহায্যে উপরতল হইতে নিম্নতলে অবতরণ করা হইত। কিন্তু রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থা এরূপ নয়। তথায় প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইবার যেমন দ্বার আছে, তেমনি সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণ অথবা পথ হইতে নিম্ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবারও দরজা আছে। দরজা এবং ছাদের সাজ-সরঞ্জাম গঠনে, এবং প্রাচীরের উপর কারুকার্য্য করিবার জন্য কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। ছাদগুলি সমতল এবং কর্দ্দমাবৃত ছিল। প্রাসাদটি সাদাসিদা অনাড়ম্বর হইলেও ইহার গঠন অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের। প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগুলি খুব চওড়া এবং মজবুত। ইহার নির্ম্মাণ-পরিকল্পনার সহিত মেসোপটেমিয়ার এসিরীয় প্রাসাদের আশ্চর্য্য-রূপ সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিরসুখের বাটীগুলিও দ্বিতল, এবং চতুঃশালা আদর্শে পরিকল্পিত। শিরকাপের সাধারণ বাটীগুলির ন্যায় এগুলিরও নিম্ন-প্রকোষ্ঠে উপরতল হইতে সিঁড়ির সাহায্যে প্রবেশ করা হইত।

বিভিন্ন ধরণের গাঁথনি।

এখন গাঁথনির কথা। বীরনগরের প্রাচীর এবং গৃহ, সমস্তই অসমান আকৃতিহীন চুণা-পাথরে কাদাযোগে নির্ম্মিত। এই পাথরের সঙ্গে কঞ্জুর নামক এক প্রকার স্থানীয় ছিদ্রবহুল নরম পাথর মিশ্রিত আছে। শিরকাপেরও বহিঃপ্রাচীর অসমান আকৃতিহীন পাথরে, এবং গৃহগুলির কতক উক্ত প্রকার পাথরে, কতক ঈষৎ সমান ও আকৃতিযুক্ত ছোট পাথরে গঠিত। তবে প্রথমোক্ত নগরের গাঁথনি অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলাহীন হইলেও অত্যন্ত সুদৃঢ়। শিরকাপের প্রাসাদের কোন কোন স্থান চৌকস কঞ্জুর পাথরে মণ্ডিত। অনেক গৃহের প্রাচীর কর্দ্দম এবং চুণে আস্তৃত; আস্তরের উপর কোন কোন জায়গায় এখনও রংয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিরসুখের প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগ অসমান আকৃতিহীন পাথরেই নির্ম্মিত; কিন্তু বহির্ভাগ ঈষৎ সমান ও আকৃতিযুক্ত বড় বড় পাথরে মণ্ডিত। গৃহের প্রাচীরগুলির উপরিভাগ অর্দ্ধ চৌকস পাথরে নির্ম্মিত, নিম্ন অংশে অসমান পাথরের গাঁথনি। এইরূপে আমরা মোট চারি নমুনার গাঁথনি পাইতেছি: প্রথম, অসমান আকৃতিহীন (rubble); দ্বিতীয়. ঈষৎ সমান ও আকৃতিযুক্ত ছোট ধরণ (Small diaper); তৃতীয়, ঐ বড় ধরণ (large diaper); এবং চতুর্থ, অর্দ্ধ চৌকস ধরণ (semi-ashler)। এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত ধরণ সাধারণতঃ খৃঃ পূঃ ৪র্থ অথবা ৫ম শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক।—পারসীক, মৌর্য্য এবং ব্যাকট্রিয় গ্রীক যুগ হইতে সিথীয়-পার্থিয় আমল পর্য্যন্ত শুধু এই নমুনাই প্রচলিত ছিল। তবে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে শেষোক্ত নৃপতিগণের রাজত্বকালে ইহার অনেকটা উন্নতি হয়। দ্বিতীয়োক্ত গাঁথনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে কজুল কদফিস এবং বিম কদফিসের রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত হয়। তৃতীয় ধরণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে, আর চতুর্থ ধরণ খৃষ্টীয় তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলন লাভ করে। তবে শিরকাপে মোটামুটি এই চারি ধরণের গাঁথনিরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

কবির আত্মম্ভরিতা

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের গোড়াতেই এই বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছেন যে, 'তিনি অল্প-বুদ্ধি হইয়াও যে কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছেন, তাহাতে তিনি উপহাসাস্পদই হইবেন। তিনি যেন বামন হইয়া প্রাংশুলভ্য ফলে হাত বাড়াইয়াছেন।' এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে এইরূপ বিনয় প্রকাশ খুব সাধারণ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। বরং, বড় বড় কবিরা অনেক স্থলে বেশ একটু আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়াছেন। 'আত্মম্ভরিতা' শব্দটা যদি সকলের ঠিক মনোমত না হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রতিভার আত্মবিশ্বাস বলা যাইতে পারে। আজ ইহারই কয়েকটি উদাহরণ দিবার জন্য এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা।

কালিদাস উক্ত রূপ বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকিলেও, কবি ভবভূতি নিজের নাটকগুলি সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা তিনি ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার নাটক-বিশেষ জনসমাজে সম্যক্ আদৃত হয় নাই দেখিয়া, তিনি 'মালতী মাধবে' লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'যাঁহারা আমাকে অনাদর করেন, তাঁহাদের এই মনোভাবের কি কারণ আছে জানি না, কিন্তু "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"; সুতরাং কোন না কোন সময়ে এই পৃথিবীতে এমন লোক নিশ্চয়ই জন্মিবেন, যাঁহারা আমার সমানধর্ম্মা হইবেন এবং আমাকে বুঝিতে পারিবেন।' এখানে কবি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, জীবদ্দশায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিতে না পারিলেও, তাঁহার নাটকগুলি মাঠে মারা যাইবে না,—তাহা অনন্ত কাল ধরিয়া এই বিপুল জগতে স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার জন্য জীবিত থাকিবে।

ঠিক এইরূপ কথা ইংরাজ কবি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের মুখে আমরা শুনিতে পাই। তাঁহার কাব্যও প্রথমে বড় অনাদৃত হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার কোন কোন বন্ধু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিয়াছিলেন, 'তোমরা আমার জন্য যত দুঃখিত ও বিচলিত হইয়াছ, আমি নিজে সেরূপ হই নাই। কারণ, আমি জানি, এই আধুনিক পাঠক ও সমালোচক সম্প্রদায় আমার কাব্য বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; তাহারা তুচ্ছ পার্থি-

বিষয় লইয়া এত মত্ত যে, আমার কাব্য ভাল করিয়া মনোযোগ দিয়া পড়িবার অবসর পর্য্যন্ত তাহাদের নাই। আর সে যোগ্যতা, সে হৃদয়ও তাহাদের নাই। সুতরাং, Trouble not yourself upon their present reception; of what moment is that compared with what I trust is their destiny? এখনকার লোকেরা যে আমার কবিতা সাদরে গ্রহণ করিল না, সেজন্য দুঃখ করিয়ো না। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার কাব্যের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। তাহার তুলনায় এই অনাদরের মূল্য কি?'

(লেডী বোমণ্টকে লিখিত পত্র হইতে)

টেনিসন প্রথম-যৌবনে রচিত একটি কবিতায় মূর্খ সমালোচকদিগকে তীব্র ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কথা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

Vex not thou the poet's mind
With thy shallow wit:
Vex not thou the poet's mind,
For thou canst not fathom it.

(কবিকে বিরক্ত করিও না। কারণ তোমার বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র; কবির মনের গভীরতা তুমি মাপিতে পারিবে না)। নির্ব্বোধ সমালোচকদের প্রতি এই অসহিষ্ণুতা কবিদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' নামক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালও কোন কোন নাটকের ভূমিকায় সমালোচকদের কশাঘাত করিয়াছেন।

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে কবিদের স্ব স্ব কাব্যে আত্ম-পরিচয় দিবার যে রীতি চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অনেক স্থলে আত্মশ্লাঘা ও আত্মম্ভরিতায় পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাই। জয়দেব হইতে আরম্ভ করা যাক। তিনি কৃত্তিবাস প্রভৃতি খাঁটি বাংলা কবিদের মত একটা দীর্ঘ আত্ম-পরিচয় দেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার গীতগোবিন্দের প্রথমেই আত্মপ্রশংসা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্' শুধু এই কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। পরবর্ত্তী শ্লোকে অন্যান্য কবিদের সঙ্গে নিজের তুলনা করিয়া বলিতেছেন—

'উমাপতি ধর নামক কবি কেবল বাক্যবিন্যাসে পটু, শরণ নামক কবি দুর্ব্বোধ কাব্যরচনায় নিপুণ, শৃঙ্গাররস প্রধান কবিতায় আচার্য্য গোবর্দ্ধন-তুল্য কেহই নাই, ধোয়ী কবি শ্রুতিধর মাত্র, কিন্তু সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব।' ইহাকে ঘোর আত্মম্ভরিতা ব্যতীত আর কি বলিব?

বিদ্যাপতিও এই আত্মম্ভরিতা এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার 'কীর্ত্তিলতা' নামক গ্রন্থের প্রথম পল্লবে এইরূপ আত্মপ্রশংসা আছে—

বালচন্দ বিজ্জাবই ভাসা
দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা।
ও পরমেসর হরসির সোহই
ঈ নিচ্চয় নাঅর মন মোহই।

বালচন্দ্র এবং বিদ্যাপতির ভাষা এই দুয়ে দুর্জ্জনের হাসি লাগে না। উহা (বালচন্দ্র) পরমেশ্বর হরের শিরে শোভা পায়, ইহা (বিদ্যাপতির ভাষা) নিশ্চয় নাগরের মন মোহিত করে। এতদ্‌ব্যতীত বিদ্যাপতির অনেক পদাবলীতে আত্মপ্রশংসাসূচক ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

মধুর মধুর রসগান। মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস তাঁহার সুদীর্ঘ আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে বলিতেছেন—

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥

*　　*　　*　　*

পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥

*　　*　　*　　*

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে।

*　　*　　*　　*

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে 'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে' এই কথায় হয় ত ঠিক অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইতেছে না। এই যে 'সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে' ইহাকে কবির প্রেরণা (inspiration) বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবিই এক রহস্যময়ী দৈবী শক্তির

দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনিই বাগ্‌দেবী সরস্বতী বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবির জীবন-দেবতা। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে গিয়া একবার লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি অমার্জ্জনীয় দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা দম্ভ নহে, তাহা অতি সত্য কথা। তবে কৃত্তিবাসের 'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে' ইত্যাদি উক্তিতে কেহ যদি আত্মম্ভরিতার গন্ধ পান, তাহা হইলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইরূপ দূষণীয় আত্মশ্লাঘা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না; কিন্তু প্রতিভার যে আত্মবিশ্বাস তাহা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় আছে, এবং নানা রূপে তাহা তাঁহার কাব্যে আপনি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিজেরই প্রতিভার আলোকময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণের প্রেরণায় আত্মহারা কিশোর কবি যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন। তিনি যখন লিখিয়াছিলেন

আমি—ঢালিব করুণাধারা,
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া—
আকুল পাগল পারা—!

* * * *

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই!

তখন ইহা তিনি প্রাণ দিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা কবির নিজের কথা বলিয়া ধরিয়া লইতে বোধ হয় বাধা নাই। আর তাঁহার প্রথম যৌবনের এই 'দম্ভ' আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমরা ধন্য। ইহারই কিছুকাল পরে রচিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামক গীতিনাট্যে কবি সরস্বতীর মুখ দিয়া যে কথা বলাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই কবি-জীবনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শেষ কয় ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই সে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

বাল্মীকির ভূমিকায় তরুণ রবীন্দ্রনাথকে অভিনয় করিতে দেখিয়া ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও মনে যে উক্তরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তখন তিনি একটি গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই গীতের দুই ছত্র এই—

উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্ব্বার।

সুতরাং আমাদের অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই।

রূপকের আড়ালে রবীন্দ্রনাথের দম্ভ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু মাইকেল যখন তাঁহার কল্পনা দেবীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি

তখন যে তাঁহার আত্মম্ভরিতা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। শুনিতে পাই, বালক কিশোরী গোস্বামীকে প্রতি দিন এক ঘণ্টা করিয়া ইংরাজি পড়াইবার জন্য মাইকেলকে যখন অনুরোধ করা হইয়াছিল তখন তিনি পাঁচ শত টাকা বেতন চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে যখন বলা হইল যে, তিনি অত্যধিক বেতন চাহিতেছেন, তখন তদুত্তরে তিনি বলিলেন, But Michael is an extraordinary man। তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন সে কথা প্রকাশ করিতে তাঁহার কোন কুণ্ঠা ছিল না।

কিন্তু আরও বেশী অকুণ্ঠিত ভাবে আত্ম-প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন আমাদের দেশের আর একজন বড় কবি—নবীনচন্দ্র সেন। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি তাঁহার সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে এমন কিছু বলেন নাই, যাহা আত্মম্ভরিতাসূচক বলিয়া মনে হইতে পারে;—বলিয়াছেন, তাঁহার স্ব-লিখিত জীবন-বৃত্তান্তে। তাঁহার সুবৃহৎ 'আমার জীবন' অহমিকায় পূর্ণ, এবং স্থানে স্থানে এই অহমিকা এত বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাঠকের পক্ষে তাহা পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

আর বেশী উদাহরণের প্রয়োজন নাই। কবি যখন স্বীয় অসামান্য প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন, নব নব বাণী যখন তাঁহার বীণার তারে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে, তখন তিনি যে অশেষ শক্তিসম্পন্ন, এ কথা ভুলিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাই কোন কোন ক্ষেত্রে আত্ম-শ্লাঘায় প্রকাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা আপনার প্রতি অটুট বিশ্বাসেরই ফল। জগৎ চিরকাল ইহা মার্জ্জনা করিয়া আসিয়াছে। এই আত্মবিশ্বাসের বলেই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপনার বাণী প্রচার করিবার সাহস হারান না। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কাব্য-জগতে এই সত্যালোক বা প্রেরণার অনুভূতি কবিকে ইহাই বলিতে প্রবুদ্ধ করে—'আমারে কর গো তোমার বীণা, লহ গো তুলে'। কবি যে সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক ও প্রচারক, সে কথা তিনি প্রচার না করিয়া থাকেন কিরূপে?

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

বালি হইতে ত্রিবেণী

(৪)

ইহার পর চন্দননগর। এ স্থানের বিশিষ্টতা ফুটিয়াছিল এখানকার শিল্প ও বাণিজ্যে,—কিন্তু ফরাসীদের সহিতই ইহার পরিচয়। ইংরাজি ১৪৯৫ অব্দে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসা মঙ্গলে ও কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতিতে বা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত পাণ্ডব-দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে, ইহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানের উল্লেখ দৃষ্টে ইহার প্রাচীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইলেও, কতিপয় পল্লী একত্র করিয়া চন্দননগর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল সম্ভবতঃ ফরাসীদের উপনিবেশ স্থাপনের পর।

গঙ্গা-বক্ষ হইতে ধনুরাকৃতি ধূর্জ্জটি-ললাটে চন্দ্রকলার ন্যায় সহরের আকৃতি থাকায় চন্দ্র হইতে চন্দ্রনগর এবং তাহা চন্দননগর, অথবা চন্দন-কাষ্ঠের ব্যবসা বা প্রচুরতা হইতে চন্দননগর নামের উৎপত্তি হয়। (১) শেষোক্ত কারণ হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এখানে চন্দন-কাষ্ঠের কাজ ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায়। (২)

চন্দননগর নামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১ শে নভেম্বরে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ সার্টিন্, দেলান্দ (Andre Boureau Deslande) এবং পেল্এ (Pelle) স্বাক্ষরিত তদানীন্তন প্যারিস্থ ডিরেক্টরকে লিখিত এক পত্রে। (৩)

ফরাসী কোম্পানির প্রথম অধিনায়ক মসিয়ে দেলান্দ মোগল বাদসার নিকট হইতে ৪০০০০৲ মুদ্রা বিনিময়ে ইং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে কুঠী স্থাপন ও তথাকার মালিকত্ব লাভের অনুমতি প্রাপ্তির অনেক কাল পূর্ব্বে ডুপ্লেসি (Du Plessis) নামক এক ব্যক্তি ১৬৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে সহরের উত্তর প্রান্তে বোড় কিষণপুর নামক পল্লীতে প্রথম এক খণ্ড প্রায় ২০ আরপাঁ (arpents) (৪) পরিমিত জমি ৪০১৲ টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (৫)

---

(১) প্রজাবন্ধু, ২৭ কার্ত্তিক, ১২৮৯ সাল ও Hooghly Past & Present.

(২) La Compagnie des Indes Orientales.

(৩) La Compagnie des Indes Orientales.

(৪) ফ্রান্সের পূর্ব্বেকার জমির এক প্রকার মাপ। এক আরপাঁ প্রায় তিন বিঘার সমান।

(৫) La Mission du Bengale Occidental, Vol. 1.

দেলান্দ এখানে কুঠি স্থাপনের পর এই নূতন উপনিবেশে কোম্পানির কার্য্য-পরিসর দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় কোম্পানি বলিতে ডিরেক্টর ১ জন, ৫ জন সভ্য লইয়া এক কাউন্সিল, ব্যবসাদার ও দোকানদার ১৫, নতের ২ জন, পাদরি ২ জন, ডাক্তার ২ জন ও সূত্রধর ১ জন মাত্র ছিল।
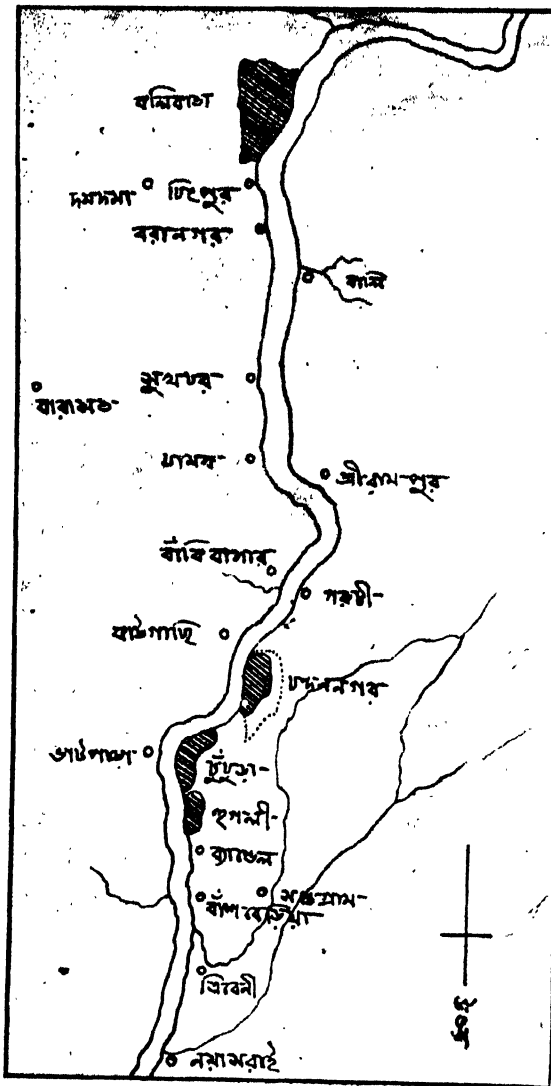
রেনেলের প্রস্তুত হুগলী নদীর নক্সা

এবং পদাতিক ১০৩ জন—তন্মধ্যে ২০ জন ভারতীয়—ও ৩টি কামান ছিল। (৬) চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ আরলঁ্যা দুর্গ (Fort de Orleans) ১৬৯৬।৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা সহরের মধ্যস্থলেই ছিল এবং হুগলীর ওলন্দাজ দুর্গ ও কলিকাতার পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মজবুত ও জমকাল ছিল। (৭) কিন্তু উহার প্রসিদ্ধি ইহাতে নহে। আজি যে পরাক্রান্ত বৃটীশ জাতি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় নরপতি, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ এই দুর্গপাদমূলেই তাঁহাদের ভাগ্য পরীক্ষিত হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণর দুপ্লে যে নীতি ধরিয়া এই চন্দননগরে বসিয়া এক দিন ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই নীতি গ্রহণ করিয়াই আজ তাঁহারা ভারতের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান নরপতি। ভাগ্যচক্রের গতি ভিন্নরূপ হইলে আজ ভারতেতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত।

ফরাসীদের প্রথম অভ্যুদয়ের পর ফ্রান্সের মূল কোম্পানির অমনোযোগিতা ও এখানকার অর্থাভাবে কোম্পানির অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। তৎপরে কিঞ্চিদধিক প্রায় সিকি শতাব্দী গত হইলে ইংরাজি ১৭৩১ অব্দে দুপ্লের ডাইরেক্টার-রূপে এখানে আগমনের সহিত শিল্পে, বাণিজ্যে, সম্পদে, সম্ভ্রমে দশ বৎসরের মধ্যে যেন যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক দণ্ড-স্পর্শে এ স্থান নবীন শ্রী ধারণ করিয়া ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী অপর সকল পাশ্চাত্য জাতি সকলের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে। এই সময় এখানকার সহিত সুরাট, জেড্ডো, বসোরা, তিব্বত, পারস্য এমন কি সুদূর চীন পর্য্যন্ত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায় তখন সমস্ত বাঙ্গালার উপর এখানকার বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন এই উন্নতিশীল উপনিবেশটিকে বেশ সুরক্ষিত দেখিয়া এবং এখানে ব্যবসায়ি কার্য্যের সুবিধা বিবেচনায় অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক এখানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতার শোভা-সম্পদ-বাণিজ্য সর্ব্ব বিষয়েই এ স্থানের তুলনায় হীন ছিল। এই সময় এখানে সুন্দর রাজ-বর্ত্ম বেষ্টিত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা ছিল, ও এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ ছিল। (৮) দুপ্লের সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পর পর্য্যন্ত এ স্থানের

(৬) La Mission du Bengale Occidental Vol. I.

(৭) Hughly Past and Present ও Calcutta Past and Present.

(৮) History of the French in India.

উন্নতি হইয়াছিল। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের পর ইহা বৃটীশদের হস্তগত হয় এবং সেই সঙ্গে ফরাসী জাতির ভারতে প্রতিষ্ঠালাভের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ক্লাইবের আদেশে দুর্গের তলদেশ পর্য্যন্ত তুলিয়া ফেলা হয় এবং সহরের প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া সহরের পূর্ব্ব শ্রী লুপ্ত করা হয়। ইংরাজি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ইহা ইংরাজদের অধিকারে থাকে। তৎপরে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ সাতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যর্পিত হয়। এইরূপ আরও কয়েকবার ইংরাজ হস্তে, পুনঃ ফরাসীদিগের হস্তে যাওয়ার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা শেষবার ফরাসীদের হস্তে আসিয়াছে এবং সেই পর্য্যন্ত ইহা ফরাসীদের হাতেই আছে। ভাগীরথী-তীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইংরাজদের কথা ছাড়িয়া দিলে এক্ষণে কেবলমাত্র ফরাসীরা ভিন্ন তাঁহাদের আর সকলেই গিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে এখানে অহিফেন, বস্ত্র, নীল, রেশম, চাউল, দড়ি, চিনি প্রভৃতির কাজ খুব বেশি ছিল। এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন ইয়োরোপে পর্য্যন্ত রপ্তানি হইত। চন্দননগরের গৌরবময় যুগে যে সকল শ্রীসম্পন্ন লোকের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রধান। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তৎকালে সম্ভ্রম ও সম্পদে এ প্রদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম যশোহরের কোন স্থান হইতে তাঁহার বিধবা মাতার সহিত এখানে মাতুলালয়ে আগমন করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ফরাসী কোম্পানির অধীন সামান্য চাকরীতে প্রবেশ করিয়া শেষে প্রধান সহায় রূপে কোম্পানির বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন; এবং কোম্পানির মাল খরিদ বিক্রয় দ্বারা প্রকৃত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজ-সম্মানেও তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং দুইটি সুবর্ণ পদক পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর চন্দননগর অবরোধের পর ইংরাজ সেনা কেবল তাঁহার আবাস লুণ্ঠন করিয়াই প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া যায়। (১) এই সময় ক্লাইবের গোলায় তাঁহার বিশাল বাসভবন চূর্ণ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে চৌধুরী-বংশ একেবারে হতশ্রী হইয়া যায়। এখন তাঁহাদের সবই গিয়াছে; আছে কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "চৌধুরী ঘাট" "নন্দদুলালের মন্দির" প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র।

পুরাতন চন্দননগর

উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে খলিসানীর বসু ও গোন্দলপাড়ার হালদার মহাশয়েরাই এখানকার মধ্যে ধনী জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বসু মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ করুণাময় বসু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাম্রলিপ্ত হইতে আসিয়া প্রথমে বেলকুলি, পরে বেলকুলির নবাবের প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থ হইয়া তাঁহার

(১) ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন সন ১৩১৮ সাল।

প্রদত্ত জমিতে খলিসানী গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই বংশ প্রাচীনতায় ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য এখানে বিশেষ খ্যাত। দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পথ ঘাট প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বসু-বংশ অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া যাইলেও যথারীতি দোল দুর্গোৎসব ও পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী, নন্দনন্দন, বিষ্ণু গোপাল প্রভৃতি দেব দেবীর পূজা হইয়া থাকে। হালদার মহাশয়দের আদি পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় না।

সরকার, নবকৃষ্ণ দে, দুর্গাচরণ রক্ষিত, শম্ভুচন্দ্র শেঠ, অদ্বৈতচরণ মণ্ডল প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম শুনা যায়।

পূর্ব্বকালে কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কথক, যাত্রাওয়ালা এখানে যত ছিল এত আর কোথাও ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ রাসু নৃসিংহ, আণ্টুনি ফিরিঙ্গী, গোরক্ষনাথ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলমণি পাটুনী, বলরাম কপালী প্রভৃতি কবিওয়ালা; চিন্তে মালা, নবীন গুঁই প্রভৃতি পাঁচালীওয়ালা; রঘুনাথ শিরোমণি, উদ্ধব চূড়ামণি, তমাল অধিকারী প্রভৃতি কথক এবং মদন মাষ্টার, বৌ মাষ্টার, মহেশ চক্রবর্ত্তী, ব্রজ

একটি পুরাতন নীলকুঠি—বৃটিশ চন্দননগর

এখানকার গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রী বোড়াইচণ্ডী ও শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বরী অতি প্রাচীন ও জাগ্রত। এখানকার অন্যান্য প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু বংশের মধ্যে বারাশতের শ্রীমানী ও দে, বাজবাজারের সরকার, নেড়োর মনের চট্টোপাধ্যায় ও ঘোষ, পালপাড়ার পাল, বোড়োর পালিত, পাল, বসু ও কুণ্ডু প্রভৃতি এবং দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দেবী সরকার, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোল্লা হাজি, কাশীনাথ কুণ্ডু, রামকানাই

অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ এই স্থানেই বাস করিতেন। এই সহরে এতাবৎ যতগুলি শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, লেখক ও গ্রন্থকারের উদ্ভব হইয়াছে, অন্যত্র তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তকত্রয়ের অন্যতম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" নামক গ্রন্থ চন্দননগরের পাদরি গেরাঁ (J. F. M. Guerin M. A. S.) দ্বারা শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া এই স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কবি ভারতচন্দ্র রায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ম্যাডাম্ গ্রাণ্ড, বর্ম্মার রাজকুমার মাইন্‌গুন্, ম্যাডাম্ ওয়াটস্ জাল প্রতাপচাঁদ, জন্ ব্রুষ্টো (John Bristow), মহারাজ নন্দকুমার, বৈকুণ্ঠ মুন্সি, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এখানে বাস করিয়াছেন। বিশপ কুরি (Daniel Corrie) হিবার (Reginald Heber) গ্রাঁপ্রে (L. De Grandpre) ষ্ট্রাভোরিনাস্ (Stravorinus) হ্যামিল্টন (Hamilton) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পর্য্যটকগণও এ স্থানে আসিয়াছিলেন।

দিনের। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ফ্যান্তার উৎসব হইয়া থাকে।

মানচিত্রে চুঁচুড়া চন্দননগরের ঠিক পরে দৃষ্ট হইলেও, বৃটীশ চন্দননগর নামে আর একটি স্থান দেখা যায়। এই স্থানের প্রাচীন স্বতন্ত্র ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। ইহা ফরাসী চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঠিক কোন সময় কি প্রকারে ইহা হস্তান্তরিত হয়, তাহা জানা যায় না। কেবল ১৮৫৩ সালে চন্দননগরের সীমা নির্দ্ধারণার্থ ফরাসী ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এক একরারনামার দ্বারাই পাকা রকমে ইহা ফরাসী চন্দননগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে।
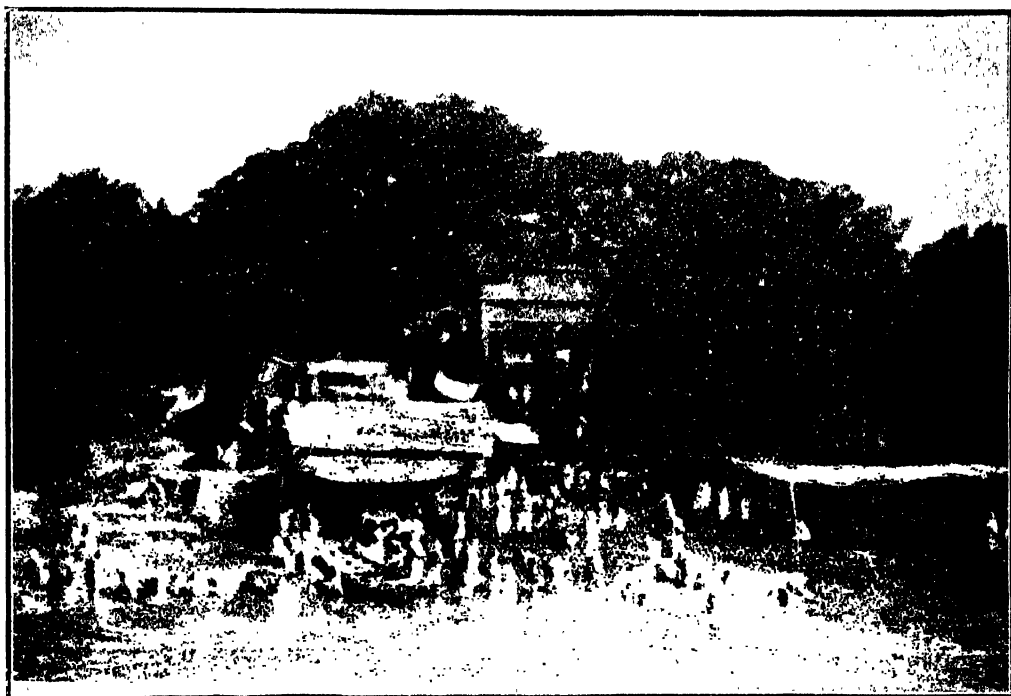
ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাট—চুঁচুড়া

পুরাতন চন্দননগরের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন এখন আর অল্পই আছে। যাহা আছে তন্মধ্যে কোম্পানির সময়ের গোরস্থান, সুবৃহৎ জলাশয় 'লালদীঘি', ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত কনভেণ্ট সংলগ্ন গির্জ্জা, শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির, শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর মন্দির, তায়ৎখানা বাগানের ডাচ নির্ম্মিত ভজনাগারের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফরাসী জাতীয় উৎসব ফ্যান্তা (Fete National) যাদুঘোষের রথ ও বারোয়ারির সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাও বহু

(১০) ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের দশম আইন অনুসারে ইহা পরে হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানকার প্রসিদ্ধ লোকের মধ্যে আত্মারাম সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ কিঙ্কর সেন এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখানকার ঘোষ বংশও প্রাচীন এবং খ্যাতিপন্ন।

(১০) Aitchison's Treaties, Engagements and Sanads.

ওলন্দাজদের অধিকারে আসার পর হইতেই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। ইহার পূর্ব্বের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ গাস্টেভাস নামক দুর্গ কলিকাতার ফোর্ট্ উইলিয়ম্ ও চন্দননগরের ফোর্ট্ দে অর্ল্যাঁ দুর্গের সমসাময়িক এবং শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বহু ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যাইলেও, উহার দক্ষিণ ফটকে ১৬৯২ এবং উত্তর ফটকে ১৬৮৭ লেখা ছিল। ষ্টাভোরিনাস্ ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে স্বচক্ষে যে দুর্গ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় একটি স্বতন্ত্র দুর্গ পূর্ব্বে ছিল।

এখানে প্রথম একজন গভর্ণর ও সাতজন কাউন্সিলের সভ্য লইয়া কোম্পানি গঠিত হয়। তন্মধ্যে পাঁচজনের মাত্র ভোট দিবার অধিকার ছিল। তৎকালে গভর্ণর ভিন্ন অন্য কাহারও পাল্কি চড়িয়া বেড়াইবার অধিকার ছিল না। গভর্ণরের বিলাসিতা প্রসিদ্ধ ছিল।

এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলিতে হইলে, কর্ণেল ফোর্ডের অধিনায়কত্বে বৃটীশ সৈন্যের সহিত ওলন্দাজ সৈন্যের যে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাই উল্লেখযোগ্য। ফরাসীদের ন্যায় ওলন্দাজরাও এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা হারাইয়াছিলেন। নচেৎ দেশ ইংরাজ শাসনে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধনৈশ্বর্য্যে তাঁহারাই ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহারা প্রথমাবধিই এখানে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া ১৭৭০ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত উহার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তখন ইয়োরোপে রপ্তানি ব্যবসায়ে এখানকার যত না লাভ ছিল, জাভার সহিত অহিফেনের ব্যবসায়ে তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে লাভ ছিল। পাটনা হইতে তাহারা বৎসরে যে ৮০০ বাক্স অহিফেন পাইত, তাহা ব্যাটেভিয়ায় পাঠাইয়া বৎসরে প্রায় চারি লক্ষ টাকা লাভ করিত। এই স্থান বরাবরই ব্যাটেভিয়ার অধীন ছিল এবং তথা হইতে এখানকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া আসিত।

ওলন্দাজের সময় চুঁচুড়া

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজ কোম্পানির অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে এবং ক্রমে এই উপনিবেশ রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। অবশেষে ইংরাজি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে

জুলাই বৃটিশদের সুমাত্রা দ্বীপের পরিবর্ত্তে ওলন্দাজেরা মালক্কা ও চুঁচুড়া তাঁহাদিগকে দান করেন। ইংরাজ হস্তে আসার পর দুর্গ ও গভর্ণমেন্ট-ভবন বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয় এবং তৎস্থানে বর্ত্তমান ব্যারাক নির্ম্মিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেন্যান্ট্ ক্রমলিন্ (Lieutenant J. A. C. Crommelin) দ্বারা

পুরাতন গির্জ্জা ও হুগলী কলেজ চুঁচুড়া

আরম্ভ হইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন বেল্ (C ptain W. Bell) দ্বারা ইহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। উহার মধ্যে এক সহস্র লোকের থাকিবার উপযুক্ত স্থান রাখা হয়। ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত এখানে সৈন্য থাকিত। এতদ্রূপ দীর্ঘ অট্টালিকা বাঙ্গলার মধ্যে অল্পই আছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চুঁচুড়ার গভর্ণর কর্ত্তৃক টানাপাখার প্রচলন হয়। (১১) তৎকালে কাচের শার্সীর প্রচলন ছিল না। চুচুড়ায় সে সময়ে প্রধান অট্টালিকাসমূহে উহার পরিবর্ত্তে বেত বুনিয়া সে কার্য্য সাধন করা হইত।

চুঁচুড়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সাধারণ অট্টালিকা হিসাবে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে আরমানীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত খৃষ্টান উপাসনা-মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার ধারের গির্জ্জাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিঃ সিয়ারম্যান্ (Mr. Sichterman) ও ভারনেট্ (Mr. Vernet) প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোরস্থানটিও পুরাতন। হুগলী কলেজ হুগলী জেলার একটি গৌরব। ইহা প্রাতঃস্মরণীয় দানশীল মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীনের অন্যতম কীর্ত্তি। ইনি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই বিদ্যালয় ও একটি এমামবাড়া প্রতিষ্ঠার জন্য বাৎসরিক অর্দ্ধলক্ষেরও অধিক টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

হুগলী কলেজ (১৮৫৪ সাল)

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যুবকদিগের উচ্চশিক্ষা লাভার্থ এরূপ বিদ্যালয় খুব কমই ছিল। তখন ইহা মহম্মদ

(১১) কয়েকজন গ্রন্থকার এই মত প্রকাশ করিলেও Col. Yule ও Mr. Burnell এর Anglo Indian Terms এর Glossaryতে দেখা যায়, অষ্টম শতাব্দীতে আরবে ইহার ব্যবহার ছিল। কিন্তু প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে কোর্ট উইলিয়মের একটি নিচু ঘরে একজন কেরাণী গরম ও মশায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া টানাপাখা আবিষ্কার করেন।

মহসীনের কলেজ নামেই খ্যাত ছিল। পূর্ব্বের কাগজপত্রে এই নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিরূপে তৎপরিবর্ত্তে হুগলী কলেজ নাম হইয়াছে তাহা জানা যায় না। বঙ্কিম বাবু এই কলেজ হইতেই প্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ। (১২) হুগলী কলেজের বাড়ীটিরও পূর্ব্ব-ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ইহা মসিয়ে পেরন্ (Mons. Perron) নামক একজন ফরাসী সেনাপতির দ্বারা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সামান্য সৈন্যরূপে এ দেশে আইসেন। পরে মহারাষ্ট্রীয়দের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বহু ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৮০৩ হইতে ১৮০৫ পর্য্যন্ত তিনি চন্দননগরে

No. [illegible]

Baboo [illegible] Dr.

TO THE COLLEGE OF MOHAMMAD MOHSIN.

To the Education of [illegible]

for the Month of [illegible] 184[illegible] .... *Co's Rs.* [illegible]

Received Payment,

College of Md. Mohsin,
HOOGHLY,
The [illegible] 184[illegible]

[illegible]
Head Master.

মহম্মদ মহসীন কলেজের একখানি বিল—১৮৪৯

বাস করিয়াছিলেন। এই বাটী নির্ম্মাণের পরই তিনি ইয়োরোপে যাত্রা করেন। তখন উহা প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক এক বিলাসি ধনাঢ্যের হস্তগত হইয়া, তাঁহার বৈঠকখানা বা নাচবাড়ী রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক্ষণে যে সুবৃহৎ মুসলমান বোর্ডিং আছে, উহা উক্ত হালদার মহাশয়ের পূজার বাড়ী ছিল। তৎপরে ইহা স্থানীয় ধনী জগমোহন শীলের হস্তগত হয় এবং তাঁহার নিকট হইতে ২০০০০৲ টাকা মূল্যে ইহা কলেজের জন্য ক্রয় করিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কলেজ খোলা হয়। টমাস্ ওয়াইজ্ (Dr. Thomas A. Wise) নামক স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন ইহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিঃ অলিভার কর্ত্তৃক যে বিখ্যাত জরিপ কার্য্য (Trignometrical Survey) আরম্ভ হয়, তাহার প্রথম কার্য্যের জন্য এই অট্টালিকার সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত ছাদ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

এমামবাড়ার কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, উহা হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চুঁচুড়ায় যে এমামবাড়া হাঁসপাতাল নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, উহার ব্যয় এমামবাড়া তহবিল হইতে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। উহাও উল্লিখিত ডাক্তার ওয়াইজ্ কর্ত্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ইং ১৮৬২ সালে বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আইসে।

এখানকার গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রী৺ষণ্ডেশ্বর জাউ নামক মহাদেব অতি প্রসিদ্ধ। ইহার প্রতিষ্ঠা কাল বা প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন কবির রচনায় এই দেবমন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়।

এখানে যে সব প্রসিদ্ধ বৈদেশিক লোক বাস করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গলার প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ মিশনারি সুপ্রসিদ্ধ কিরনাণ্ডার (Kiernander) এবং চার্লস্ ওয়েষ্টন্ (Charles Weston) নামক, অন্ধকূপ-হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট

(১২) The Life of Ram Tanu Lahiri.

কল্কি অবতার

সুপ্রসিদ্ধ হলওয়েল্ সাহেবের বন্ধু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত ব্যক্তি প্রতি মাসের প্রথম দিনে নিজ হস্তে ষোল শত মুদ্রা দীন-দুঃখীদিগকে দান করিতেন।

স্বনামধন্য মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ও বঙ্কিম-যুগের সুরসিক সাহিত্যিক দীননাথ ধর মহাশয়ের আবাসস্থান এই-খানেই। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শীল, মণ্ডল, লাহা, দত্ত প্রভৃতি সুবর্ণবণিক ও ষণ্ডেশ্বরতলার সোমবংশ প্রসিদ্ধ। কলিকাতার বিখ্যাত লাহা মহাশয়েরা চুঁচুড়ার লাহা-বংশ-সম্ভূত। শুনিয়াছি, কলিকাতায় মাধবদত্তের বাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট যে মাধব বাবু ছিলেন, তিনিও এখানকার দত্ত-

হাজি মহম্মদ মহসীন
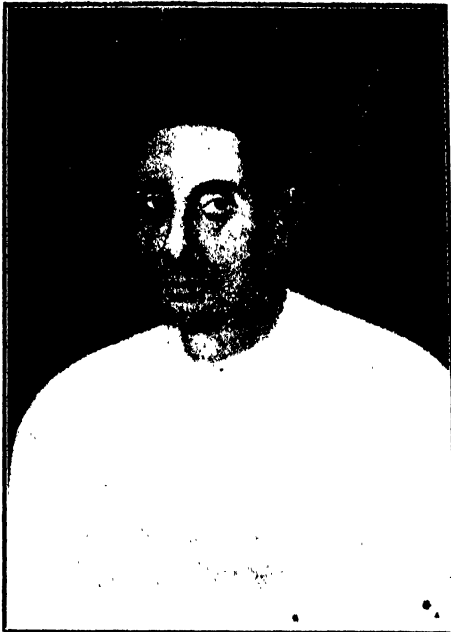
বংশ-সম্ভূত। সোমেরা বাগাটি হইতে প্রথমে চন্দননগর, তৎপরে চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ রামচরণ সোম ওলন্দাজ কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া কোম্পানি তাঁহাকে 'বাবু' উপাধি দিয়া-ছিলেন। এই বংশের দয়ালচন্দ্র সোম চিকিৎসা-বিদ্যায় ও শিবচন্দ্র সোম শিক্ষকতা কার্য্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। (১৩)

চুঁচুড়ার পরই হুগলী। ভাগীরথী-তীরে যে কয়টি নগরীতে ইয়োরোপীয় জাতিগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন, তন্মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অপর সকল নগরের অপেক্ষা প্রাচীন। পোর্টুগীজেরাই এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতেই ইহার পরিচয়। তৎপূর্ব্বে এই স্থানের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সেই সময় ইহা একটি নগণ্য স্থান ছিল।

পুরাতন গ্রন্থাদিতে হুগলী গোলিন্, ওগোলি, ওগ্লি, গলি, হুবলে, হিউগলি, হাগলে প্রভৃতি বহু ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই অংশে ভাগীরথীর তীরে জলের ধারে অনেক হোগলা গাছ জন্মিত। তাহা হইতে হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। হুগলীর মধ্যে ব্যাণ্ডেল, বাবুগঞ্জ, পিপুলবাতি প্রভৃতি কতিপয় পল্লী আছে। পোর্টুগীজদের এখানে আসার সময় সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্যাম্প্রায়ো (Samprayo) বা স্য প্রায়ো নামক এক ব্যক্তি একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া নবাবের অনুমতি লইয়া একটি কুঠি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১৪) ওম্যালি (L. S S. Omalley) সাহেব বলেন, ১৫৭০ সালে তাঁহারা এখানে আসিয়াছিলেন। (১৫)

খৃষ্টান-নির্ম্মিত বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম নির্ম্মিত সৌধ—ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌড়ের রাজার প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহারা এই ব্যাণ্ডেল নামক স্থানটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফরাসীরাও চন্দননগরে পাকা রকমে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে কিছুদিনের জন্য ছিলেন। পরে এখানে আশ্রম-সংলগ্ন আর একটি গির্জ্জা আগষ্টিনিয়ানরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে একটি জেসুইটদের কলেজ ও কনভেন্ট্ ছিল। স্থানটি পূর্ব্বে অতি স্বাস্থ্যকর ছিল এবং পর্টুগীজদের সময় হইতে এখানকার পনির অতি বিখ্যাত। ব্যাণ্ডেল নামটি বন্দরের অপভ্রংশ।

হুগলী পোর্টুগীজদের হস্তে অতি সত্বর উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল; কিন্তু এই উন্নতিই তাঁহাদের অনিষ্টের

(১৩) নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি হইতে চুঁচুড়ার বিবরণ লিখিত হইল—(ক) Hooghly Past and Present (খ) Notes on The Right Bank of Bhagirathi=Calcutta Review Vol-Vi. (গ) Hooghly District Gazetteers (ঘ) Carey's Good old Days (ঙ) a Brief History of the Hooghly District (চ) Rural Life in Bengal.

(১৪) Hughly Past and Present.

(১৫) Hooghly District Gazetteer.

অন্যতম কারণ হয়। পোর্টুগীজদের এখানে ব্যবসায়ের প্রাবল্য হেতু, পুরাতন সাতগাঁ বন্দরের যথেষ্ট ক্ষতির জন্য, ছোট ছোট বালক বালিকাদের খরিদ করিয়া বা গোপনে ধরিয়া লইয়া ভারতের অন্যত্র ক্রীতদাসরূপে বিক্রয়ের জন্য ও পোর্টুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার জন্য, মোগল সরকার বিশেষ ক্রুদ্ধ হন; এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের আদেশে কাশিম খাঁ হুগলী আক্রমণ করেন। (১৬) পোর্টুগীজরা সার্দ্ধ তিন মাস কাল প্রবল বিক্রমে মোগল সৈন্যদিগের গতিরোধ করিয়াছিল। এই সময় চৌষট্টিখানিরও অধিক বৃহদায়তনের তরী ও দুইশত খানি স্লুপ গঙ্গাবক্ষে নোঙ্গর করা ছিল। ইহার মধ্যেও তিনখানি মাত্র পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপর সমস্তগুলির জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। গির্জ্জার অভ্যন্তরে যে সব চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি সঞ্চিত ছিল, তাহা সমস্ত নষ্ট করা হইয়াছিল। এই যুদ্ধে এক সহস্র পোর্ত্তুগীজ হত এবং চারি সহস্র বন্দী হয়। এই বন্দীদের মধ্য হইতে সমস্ত যাজক এবং পাঁচশত সুশ্রী বালক বালিকাকে আগরার রাজ-দরবারে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সময় দুর্গ ও ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা ধ্বংস করিয়া তাহার সমস্ত নথিপত্র নষ্ট করা হয়। পরে পূর্ব্বোক্ত যাজকদের মধ্যে ডিক্রুজ (Father De Cruz) নামক এক ব্যক্তি বাদশাহের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়া গির্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি ও তৎসহিত ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন। পরে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মিঃ সোটো (Gomez de Soto)র দ্বারা উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়।

মুসলমানরা হুগলীতে পোর্ত্তুগীজদের পরাজিত করার পর পঞ্চদশ শত বৎসরের বাণিজ্য-সম্পদে সম্পদশালী সাতগাঁ পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতেই বাঙ্গলার রাজকীয় বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। উহা ক্রমে পশ্চিম বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর ও মোগল কর্ম্মচারীদের আবাসস্থান হইল। সরকারি দপ্তরখানা সকল তথা হইতে এই স্থানে উঠিয়া আসিল। ক্রমে সাতগাঁ একটি সামান্য পল্লীগ্রামে পরিণত হইল এবং তৎসঙ্গে হুগলীর পুনরুন্নতি হইতে লাগিল। এই সময় ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরাজগণ—যতদিন পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্থান লাভ না হইয়াছিল, ততদিন—এই স্থানেই ব্যবসা করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকগণ উভয়েই ঘোলঘাট নামক স্থানে তাঁহাদের কুঠি বা কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপরে পাশ্চাত্য বণিকগণের এই স্থান ত্যাগের সহিত ইহা পুনরায় ক্রমে অবনতির পথে নামিতে লাগিল। এই সময় মোগল শাসনকর্ত্তা হুগলীতে বাস করিতেন। তাঁহার বাসস্থানের সন্নিকটে একটি বাজার ছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর এই বাজারে ইংরাজ সৈন্যের সহিত নবাবের পেয়াদাদের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ চারনকের (Job Charnock) সহিত শাসনকর্ত্তার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে তিনি হুগলী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়েই (১৬৯০এর আগষ্ট মাসে) চারনক্ সুতানুটিতে

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

(১৬) Hughly Past and Present.

কুঠি স্থাপন করিয়া কলিকাতা নগরীর ভিত্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

ইংরাজ বণিকদের হুগলী ত্যাগের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তৎপরে ইং ১৭৫৭ অব্দের ১০ই জানুয়ারি ক্লাইব এই স্থান আক্রমণ করেন এবং ১৬ই তারিখে দুর্গ ধ্বংস করেন। এই সময় হইতেই হুগলীর উন্নতির পথ চির-অবরুদ্ধ হয়। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র খ্যাতনামা নবাব খাঁজেহান খাঁ উক্ত দুর্গ মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেন। ষ্ট্রাভোরিনাস্ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তৎকালে হুগলীর মধ্যে নবাবের এই বাড়ী ও হস্তীশালা ভিন্ন বিশেষ দ্রষ্টব্য আর কিছু ছিল না। খাঁজেহান খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি বরাবর এই ভবনে বাস করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা ধূলিসাৎ করিয়া মোগল দুর্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত করা হয়। ঐ বাটীর ভগ্নস্তূপ শেষে দুই সহস্র টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বোক্ত ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা ভিন্ন হুগলীর ইমামবাড়া, ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও জুবিলি ব্রীজ এখানকার দ্রষ্টব্য। হাজি মহম্মদ মহসীন তাঁহার মৃত্যুকালীন দানপত্রের দ্বারা যে অগাধ সম্পত্তি দিয়া যান, তাহার অংশ হইতেই এই মহাকীর্ত্তি ইমামবাড়া নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৬১তে মোট প্রায় পৌনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাধা হয়। গঙ্গার ধারে পোস্তা নির্ম্মাণে প্রায় ৬০০০০৲ টাকা এবং বিলাত হইতে ঘড়ি আনাইতে ১১৭২১৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কথিত আছে, যেস্থানে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় একটি পুরাতন ইমামবাড়া ছিল। উহা ১৬৯৪ অথবা অন্য মতে ১৭১৭তে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রীজ্ নির্ম্মাণ কার্য্যে মোট ৯০০০০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। উহা লম্বে ১২০০ ফিট্।

মোগলটুলির গলিতে আর একটি ইমামবাড়া ছিল। উহা চুঁচুড়ার হাজি কারবালা নামক একজন পারস্য দেশীয় ধনী বণিকের আনুকূল্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে একখানি উইল দ্বারা হুগলীর পশ্চিমাংশে কাশীমপুর ও বাঁশবেড়িয়া লাখেরাজ সম্পত্তি উহার জন্য দান করিয়া

চুঁচুড়ার গোরাবারিক

যান। প্রথমোক্ত কাশীমপুর নাম মল্লিক কাশীমের নাম হইতে হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে—দিল্লীর এক মুসলমান সম্রাট বাঙ্গলা দেশকে 'দোজাক' অর্থাৎ নারকী প্রদেশ মনে করিতেন। যখন কোন আমির ওমরাহ বা বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করিতেন, তখন তাঁহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা না হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা দেশে নির্ব্বাসিত করা হইত। মল্লিক কাশীম একজন সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ১৬৮৬ নাগাইদ ১৬৯২ পর্য্যন্ত তিনি হুগলীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নামে আজিও হাট চলিতেছে। (১৭)

হুগলীতে বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হইয়া উহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। উইল্কিন্স (Charles Wilkins) পঞ্চানন কর্ম্মকার ও তাঁহার সহকারী মনোহর দাসের সহায়তায় বাঙ্গলা ছাপার অক্ষর খোদাই করিয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড্ সাহেবের বাঙ্গলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। আমেরিকা হইতে ১৮৩১ সালে বরফ এদেশে প্রথম আইসে। তৎপূর্ব্বে হুগলীতে বরফ প্রস্তুত হইত। যেখানে উহা হইত তাহাকে এখনও বরফ তোলার মাঠ বলে। বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদ ঘটিত বিখ্যাত মোকদ্দমা এইখানে হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারের সহিতও এই স্থানের ইতিহাস বিজড়িত।

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নামক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়টি হুগলীর জজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্মিথের চেষ্টায় বর্দ্ধমানের রাজা, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উহার বাড়ী নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৩৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বিদ্যালয় খোলা হয়। চাঁদা দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় প্রথম প্রথম লোকে উহাকে চাঁদার স্কুল বলিত। উহার প্রথম প্রধান শিক্ষকের নাম ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলীর সেন, মল্লিক, চৌধুরী, মিত্র প্রভৃতি কতিপয় সমৃদ্ধ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। মল্লিক-বংশ খুব বড় এবং প্রাচীন। এই বংশের ব্রহ্মমোহন মল্লিক, চৌধুরী বংশের ডাক্তার বদনচন্দ্র ও মিত্র-বংশের ঈশানচন্দ্র বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহারা অনেকটা আধুনিক

(১৭) The Banks of the Bhagirathi—
Calcutta Review, Vol. [illegible]—18[illegible]

[বস]ন-বংশের গৌরী সেন একজন বঙ্গ-বিশ্রুত ব্যক্তি। প্রায় [তি]ন শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি হুগলীর মধ্যে বালি নামক স্থানে [ব]াস করিতেন। এ স্থানের বিখ্যাত মুসলমান অধিবাসাদের ছিলেন। এখানে ব্যবসার মধ্যে সোরা, লবণ, রেশম, বস্ত্র, অহিফেন, চিনি প্রভৃতিই প্রধান ছিল।

প্রসিদ্ধ বৈদেশিকগণ, যাঁহারা পূর্ব্বকালে এখানে সময়

ভূদেববাবুর বাটী—চুঁচুড়া

মধ্যে খাঁ জেহান খাঁ, কাশাম মল্লিক আলি খাঁ বা মল্লিক কাশীম ভিন্ন মির্জ্জা সালে উদ্দিন, মহম্মদ খাঁ, খোজা ওয়াজেদ, হাজি কারবেলা মহম্মদ, আশাদুল্লা মিয়া, হাজি মহম্মদ
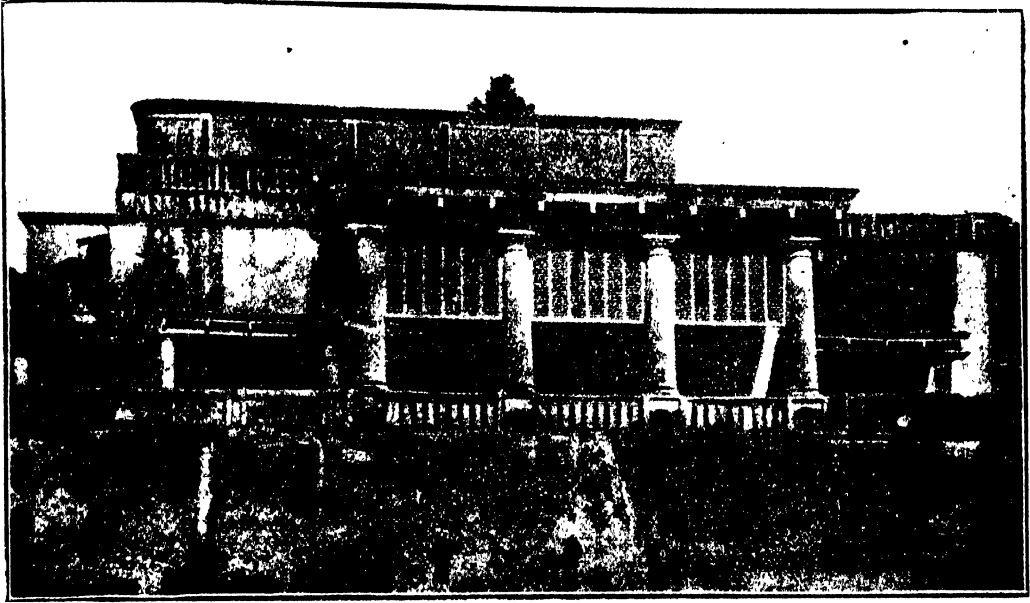
সময় বাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে তৎকালীন পাশ্চাত্য সুন্দরীগণের প্রধান মাদাম্ গ্র্যাণ্ড, (ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের দ্বিতীয়া পত্নী) সুপ্রসিদ্ধ এলিগ্যাণ্ট্ মেরিয়ন্ (Elegant
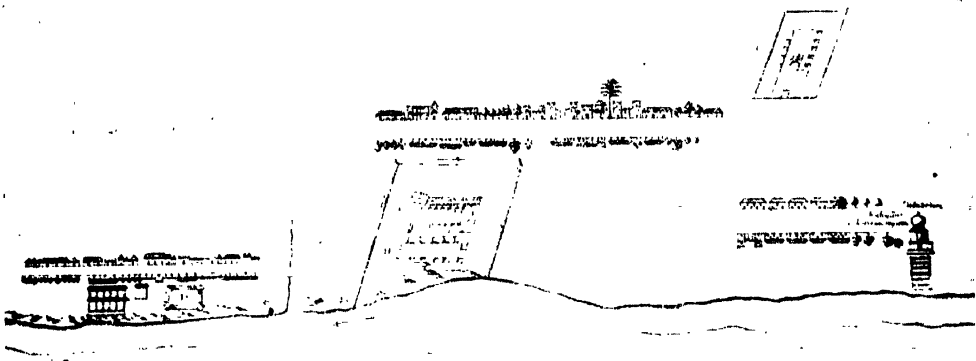
টিফেণ্ঠারের প্রস্তুত প্রাচীন হুগলীর নক্সা

মহসীন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রায় সকলেই ব্যবসা দ্বারা প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া-

Marian) মিঃ রস্ (Mr. Ross) প্রভৃতির কথা জানা যায়। প্রথম ইংরাজ পর্য্যটক ফিচ্ (Ralph Fitch)

পারকাশ (Purchas) হ্যামিল্টন্ (Hamilton) প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। (১৮)

ইমামবাড়া—হুগলী

হুগলী ও ব্যাণ্ডেলের পর কেওটা নামক একটি বৈশিষ্টতাশূন্য সামান্য পল্লী আছে। ইহার পূর্ব্বকথা কিছু জানা যায় না। হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ জজ ম্যাজিষ্ট্রে মিঃ স্মিথের (D. C. Smyth) এখানে একটি বাগানবাড়ী ছিল। তিনি ঐ বাটীতে এবং এখানকার সারাক হাউস্ নামক ঐতিহাসিক বাটীটিতে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়। তৎকালে বিচারপতিগণের স্থানে স্থানে গিয়া তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক বিচারকার্য্য সমাধা করিবার প্রথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট বাড়ী থাকিত। ইহাও একটি সেইরূপ বাড়ী। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৬০০০৲ টাকায় উহা ক্রীত হয়।

এই স্থানের উত্তরে সাগঞ্জ। সাগঞ্জ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও, ইহার পূর্ব্ব-ইতিহাস ও প্রসিদ্ধির কথা জ্ঞাতব্য। ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে মোগল-শাসনকালে এই স্থানে একটি বিখ্যাত গ ছিল। আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার পৌত্র আজিম উশান সা যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন এই স্থানটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়া উহা সা আজিমগঞ্জ নামে পরিচিত হয়। পরে সংক্ষিপ্ত হইয়া সাগঞ্জ নাম হইয়াছে।

এই স্থানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা অন্যত্র হইতে এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী কেউটিয়া নামক গ্রাম হইতে আগত সুপ্রসিদ্ধ নন্দী-বংশই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি ও সম্ভ্রম লাভ করিয়া-

---

(১৮) (ক) Hooghly Past and Present.

(খ) District Gazetteers—Hooghly.

(গ) Good Old Days of Honourable John Company.

(ঘ) Notes on the Right Banks of Bhagirathi.

(ঙ) A Brief History of the Hughly District প্রভৃতি হইতে হুগলীর কথা সংগৃহীত হইল।

ছিলেন। তৎকালে এই বংশের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বীরেশ্বর নন্দী। লোকে সচরাচর তাঁহাকে বীরু নন্দী বলিত। আনুমানিক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি কেউটিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, নন্দীদের আদি বাসস্থান রামেশ্বরপুরের নিকট নন্দীগ্রাম। বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার—বৰ্দ্ধমান জেলার জাবগ্রামের নন্দী-পরিবার এই কেউটিয়া নন্দীদের একটি শাখা।

মির্জ্জা রসনআলি নামক সুপ্রসিদ্ধ জমিদারের তিনি দেওয়ান ছিলেন। এই মুসলমান জমিদারের অবস্থান্তর ঘটিলে, তিনি তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান জমিদারী ক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হন। এমন কি, তাঁহার চাঁদুনিবাগ নামক প্রকাণ্ড গড় ও আবাসবাটী পর্য্যন্ত পরে তাঁহার পুত্রদের হস্তগত হয়, এবং উহা পরে নন্দীদের বৈঠকখানা বাটীতে পরিণত হয়।

বীরেশ্বর ধনোপার্জ্জনে যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম কর্ম্মেও তেমনই তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল। শিবমন্দির,

হুগলীর ইমামবাড়ার ভিতরের দৃশ্য

পরবর্ত্তীকালে নন্দীদের পরিচয়েই সাগঞ্জের পরিচয়। কথিত আছে, বীরেশ্বরের সহিত তাঁহার পিতা তিলকরামের ব্যবসা বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায়, পিতার কোন অর্থ গ্রহণ না করিয়া বীরেশ্বর সাগঞ্জে আইসেন, এবং নিজ চেষ্টায় কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রথমে রাম রাম ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত একত্রে একখানি সামান্য দোকান করেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে মুরশিদাবাদ, সিরাজগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, আটয়ারি পচাগড়, বালিগঞ্জ প্রভৃতি বহু স্থানে ব্যবসা, এবং বান্দাপাড়া, গরুটী, রায়নপুর প্রভৃতি স্থানে লবণের কারখানা স্থাপন দ্বারা বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন

চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, রথ প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি বহু সৎকার্য্যের দ্বারা তিনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। বীরেশ্বরের পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র মধুসূদন ও অভয়াচরণ নন্দী যথেষ্ট আড়ম্বরের সহিত তাঁহাদের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন; এবং তদ্দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু কালের গতিকে সাগঞ্জের নন্দীবংশের এক্ষণে আর সে পূর্ব্ব-গৌরব নাই। (১৯)

(১৯) (ক) সাগঞ্জের তিলি জাতির বিবরণ—তিলি-বান্ধব, ৫ম বর্ষ।
(খ) Hooghly Past and Present.

সাগঞ্জের পর বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে মিরকালা ও খামারপাড়া নামক দুইটি ছোট গ্রাম আছে। মিরকালা সাগঞ্জের একটি পল্লী বিশেষ। খামারপাড়ার মধ্যে কুণ্ডু-বংশ ও তাঁহাদের পূর্ব্বের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির কথা ভিন্ন উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। এই কুণ্ডু-বংশের স্থাপয়িতার নাম অথবা পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা যায় না। রামকমল কুণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভুবনচাঁদ কুণ্ডু মহাশয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১২৩০ সালে ভুবনবাবু জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসা দ্বারাই এই বংশের উন্নতি হয়। রামকমল হুগলীতে বাবুগঞ্জ নামক স্থানে গুড়ের কাজ করিতেন। ভুবনবাবু বিবাহের পর শ্বশুরের সাহায্যে এই স্থানে প্রথম লবণের কাজ আরম্ভ করিয়া, পরে মুঙ্গের, পাটনা, সেকপুর, খাগড়িয়া, দ্বারভাঙ্গা, পুর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে মোকামি কার্য্য দ্বারা বহু ধন সঞ্চয়ে সমর্থ হন। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং দান-ধ্যান ও পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে বহু ব্যয় করিতেন। (২০)

খামারপাড়ায় দীর্ঘকাল হইতে পিত্তল কাঁশার কাজ বিস্তৃত ভাবে হইয়া আসিতেছে।

বংশবাটী হইতে বাঁশবেড়িয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানকার রাজা মহাশয়দের পরিচয়েই এ স্থানের পরিচয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের আদিপুরুষ দেবা... দত্ত কনোজ হইতে মুরশিদাবাদের মায়াপুরে আসিয়া ... করেন। এই বংশের দ্বারিকানাথ তথা হইতে কাটো... সন্নিকটে পাটুলিতে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র সত... মোগল বাদশাহ আকবরের অনুগ্রহে বাঙ্গালা ৯৮০ স... জমিদার বলিয়া ঘোষিত হন। তাঁহার পুত্র উদয় রা... মানসিংহের কৃপায় সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ ... এবং আকবরের নিকট হইতে বংশানুক্রমে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাঘব সম্রাট শাহজাহানের নিকট হইতে সাতগাঁর অন্তর্ভুক্ত একুশখানি পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন এবং ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে 'চৌধুরী' এবং পর বৎসর মজুমদার উপাধি-ভূষিত হন। এই জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনিই সাতগাঁর সন্নিকটে ভাগীরথী-তীরে বাঁশবন পরিষ্কার করাইয়া সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস স্থাপন করেন এবং গ্রামের নাম দেন বংশবাটী।

পুরাতন ব্যাণ্ডেল—হুগলী

পুরাতন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ এখানে যে বিষ্ণু-মন্দিরটি আছে, উহা ১৬৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাঘবের দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেব তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন; এবং তাঁহাদের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ রামেশ্বর দশ আনা এবং কনিষ্ঠ বাসুদেব ছয় আনা সম্পত্তির অধিকারী হন। এই সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বংশানুক্রমে রাজা মহাশয় উপাধিতে ভূষিত হন। রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়াতেই স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং বাসুদেবের পুত্র মনোহর সেওড়াফুলিতে যাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। উহাদের বাঁশবেড়ের বাটী গড়বেষ্টিত বলিয়া ইঁহাদিগকে অনেকে গড়বাটীর রাজাও বলিয়া থাকেন।

---

(২০) ভুবনচাঁদ কুণ্ডুর জীবনী—তিলি-বান্ধব, ৩য় বর্ষ।

এই বংশের রাজা নৃসিংহদেব একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি ইংরাজি ১৭৮৮-৮৯ সালে একটি কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্য বাঙ্গলার একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় তন্ত্র ও কাশীখণ্ড তর্জ্জমা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন; এবং বাঁশবেড়িয়ার গৌরব ত্রয়োদশ-চূড় হংসেশ্বরী মন্দিরের পত্তন তিনিই করিয়াছিলেন। উহা শেষ করার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই; তিনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা ত্যাগ করেন। কথিত আছে, তাঁহার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন সহমৃতা হন। তাঁহার অপর স্ত্রী রাণী শঙ্করী উক্ত মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া উহা ও চতুর্দ্দশেশ্বর দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কার্য্যে এবং তুলা-পুরুষ ব্রতাদিতে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়েরা পরে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। কালক্রমে এক্ষণে তাঁহাদের সে পূর্ব্বশ্রীর বহু পরিমাণে লাঘব হইয়া গিয়াছে। (২১)

বাঁশবেড়ে গ্রামে অনেকগুলি অবস্থাপন্ন পরিবারের বাস ছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে অনেকে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছেন। এখানকার কুণ্ডু মহাশয়েরাও বহুদিনের সম্ভ্রান্ত ও ধনী জমিদার। ইহাঁদের পূর্ব্ববাস কোথায় ছিল, জানা যায় না। শুনা যায়, সাতগাঁ যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, সেই সময় ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথ কুণ্ডু ব্যবসা উপলক্ষে কয়েক ঘর স্বজাতিকে লইয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের নিকট দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাঁর পৌত্র বলরাম কুণ্ডুর সময়ে কয়েকখানি তালুক খরিদ করা হয়। পরে ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতিতে ও অন্যান্য আকস্মিক বিপদে ইহাঁরা কতকটা হতশ্রী হইয়া পড়েন। এই বলরামবাবুর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ লক্ষ্মী দাসী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এ অঞ্চলে ইহাই শেষ সহমরণ। (২২)

হংসেশ্বরী মন্দির—বংশবাটী

বলরামবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগের পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র হরিশ্চন্দ্র বিশেষ মনোযোগ সহকারে জমিদারীর কার্য্য দেখিয়া উন্নতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া নূতন ব্যবসা কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং কতিপয় নীলকুঠী স্থাপন ও জোড়াসাঁকোর সিংহ মহাশয়দের বাঁশ-

(২১) (ক) The Bansberia Raj.
(খ) Bengal District Gazetteers—Hooghly.

(২২) বাঁশবেড়ের রাজা মহাশয়দের বাটীতে যে সহমরণ হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন তাহাই এই অঞ্চলের শেষ সহমরণ।

বেড়িয়ার নীলকুঠী ইজারা লইয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে সাগঞ্জের নন্দী মহাশয়দের তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই কুণ্ডুরা পূর্ব্বাপর বরাবরই সৎকর্ম্মরত এবং ধার্ম্মিক বংশ বলিয়া খ্যাত। (২৩)

বাঁশবেড়েতে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত শিক্ষার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১২।১৪টি টোল ছিল। (২৪) ইট ও পিত্তল কাঁসার কাজের জন্য এই স্থান বহু দিন হইতে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী যাজক লইয়া খৃষ্টান উপাসনা-মন্দির এই স্থানেই প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। সেই

ত্রিবেণী ঘাট

যাজকের নাম তারাচাঁদ। দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের নীলকুঠির স্থান এই বাঁশবেড়িয়া। এখানে পূর্ব্বে নীলের কাজ অনেক ছিল। অতি পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধর্ম্মার্থ অনেকে গঙ্গায় জীবন বিসর্জ্জন দিত বলিয়া জানা যায়। (২৫)

বংশবাটী অতিক্রম করিয়া ত্রিবেণী। ইহাকে বংশ-বাটীর উত্তর সীমাও বলা যাইতে পারে। অধুনা ত্রিবেণী একটি সামান্য পল্লী হইলেও বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম ত্রিবেণী হইয়াছে। ইহাকে মুক্তবেণী বলে এবং এই কারণে ইহা হিন্দুদের নিকটে অতি পবিত্র স্থান।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'পবন-দূতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারও বহু পূর্ব্ব হইতে ত্রিবেণী হিন্দুতীর্থ বলিয়া খ্যাত। বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ ইহাকেও ত্রিপানি, ত্রিভেনী, তারবানি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমুদ্রগামী জাহাজ সকল যাতায়াতকালে এই স্থানে নোঙ্গর করিত, ইহা বিপ্রদাস ও তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্লিনি (Pliny) ও টলেমি (Ptolemy) এই স্থানের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হেজ্ (William Hedges) এবং ১৭৭০তে ষ্ট্রাভোরিনাস্ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে ইহা একটি বিশিষ্ট ব্যবসা স্থান ছিল। এক সময় এখানে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, তখন এখানে ত্রিশটিরও অধিক সংস্কৃত বিদ্যালয় বা টোল ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হিন্দু আইন প্রকাশের বিশেষ ভার তিনি লইয়াছিলেন। ১০৯ বৎসর বয়সে তাঁহার

(২৩) বাঁশবেড়িয়ার কুণ্ডু বাবুদের ইতিবৃত্ত—তিলি-বান্ধব, ৪র্থ বর্ষ।
(২৪) Adam's Report on Vernacular Education.
(২৫) Calcutta Review—Vol. Vi—1845

মৃত্যু হয়। বহুকাল হইতে এখানে মকর-সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ, বিষ্ণু-সংক্রান্তি, বারুনি, দশহরা, কার্ত্তিক পূজা প্রভৃতির সময়ে ও অর্দ্ধোদয় যোগাদি উপলক্ষে বহু লোক-সমাগম হয় ও একটি করিয়া মেলা বসিয়া থাকে। ত্রিবেণী এখনও তীর্থ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, পুরাতন দর্শনীয় বিশেষ কিছুই নাই। ত্রিবেণীর ঘাট ও তাহার অনতিদূরে সপ্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাফর খাঁ পাণ্ডুয়া-বিজয়ী সাহা সুফির খুল্লতাত। এখানকার হিন্দু যাত্রিগণ এই সমাধি শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করিয়া থাকেন। কথিত আছে, জাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র বারখান গাজি হুগলীর হিন্দু রাজাকে জয় করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারও সমাধি এই স্থানে থাকায় ইহা হিন্দুদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

জাফরখাঁ গাজীর মসজিদ—ত্রিবেণী

শিব-মন্দির—ইহাই এখানকার প্রাচীন নিদর্শনের অবশিষ্ট আছে। এই ঘাটটি উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ দেও দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিবেণী উড়িষ্যার মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র নামক হিন্দু রাজার হস্তগত হয় বলিয়া জানা যায়।

এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে পাঁচটি ডোম্-বিশিষ্ট জাফর খাঁ গাজির সমাধি ও মসজিদ অন্যতম। মসজিদটি ১২৯৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া উহার উপাদান হইতে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বস্তুতঃ এখনও তাহার প্রমাণ শুনা যায়, জাফর খাঁ মুসলমান হইলেও গঙ্গা দেবীর পূজা করিতেন। (২৬)

(২৬) (ক) Bengal District Gazetteers—Hooghly.
(খ) The Banks of Bhagirathi—Calcutta Review—1846.
(গ) Satgaon and Tribeni—Bengal Past and Present. Vol. III

লেখকের অনুসন্ধিৎসার অভাব বা অজ্ঞতাবশতঃ "পুরাতনী"তে কোন কোন বিষয়ে ভুল থাকিয়া যাইতেছে। যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ভুলগুলি আমায় জানাইলে বাধিত হইব। চাতরার সুবিখ্যাত কাশীশ্বর পণ্ডিতের কথা লিখিতে আমার ভুল হওয়ায় আমি দুঃখিত। চাতরার গৌরাঙ্গ-মন্দির, শীতলা-মন্দির, দাওয়ানের ঘাটেরও উল্লেখ করা আমার উচিত ছিল।

—লেখক।

সাংখ্যে বন্ধনবাদ *

[অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজি হইতে

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ

পিএইচ-ডি (লণ্ডন) কর্তৃক অনূদিত]

প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতির ভোগ হইতে পুরুষের যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের অনুভূতি হয়, তাহাকেই বন্ধন বলে। এই ভোগের কারণ কি? সৃষ্টি বা সর্গের জন্য পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগই ইহার কারণ। কিন্তু, পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নিত্য, সুতরাং অবিচ্ছেদ্য। তাহা হইলে কি পুরুষ নিত্যবদ্ধ? 'বন্ধন' শব্দের দুইটী অর্থ আছে—একটী ব্যাপক ও অপরটী সঙ্কীর্ণ। প্রথমোক্ত অর্থে 'বন্ধন' শব্দে পুরুষ-প্রকৃতির এক নিত্য ও সাধারণ সংযোগ বুঝায়; এমন কি, প্রলয়-কালেও যখন সকল বস্তু প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখনও এই সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। বন্ধনের এই অর্থানুসারে বলা যাইতে পারে যে, পুরুষ নিত্যবদ্ধ; কারণ, পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করেন না, কিন্তু প্রকৃতিকে নিত্য ব্যাপ্ত করিয়াই অবস্থান করেন। বন্ধনের দ্বিতীয় অর্থে ইহা এক বিশিষ্ট (Specific) বন্ধনকেই বুঝায়। বিশেষ ভোগার্থে পুরুষ যে সকল বিশিষ্ট উপাধি রচনার জন্য প্রকৃতির সহিত বিশিষ্টযোগে যুক্ত হন, তাহা হইতে যে ত্রিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহারই অনুভূতি এই বিশিষ্ট বন্ধন। এই অর্থেই সাংখ্যে 'বন্ধন' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিশিষ্ট বন্ধনের বাস্তব ও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অবিবেক, যাহার ফলে জীব নিজ স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া তাহার ভোগের বস্তুগুলি, অর্থাৎ মহদাদি পঞ্চ মহাভূতের সহিত নিজেকে একীভূত করিয়া ফেলে। এইরূপে পুরুষ যখন সম্পূর্ণ রূপে ভোগ্য বস্তুগুলির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়ে, তখন অজ্ঞানতাবশে সে ভাবিতে থাকে যে, ইচ্ছা, অভাব প্রভৃতি যে সকল ভাব প্রকৃত দেহের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা

* মূল ইংরাজিটী আমেরিকার 'The philosophical Review'র ১৯২৬ সালের মে সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহারই। অথবা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সমস্ত অন্তঃকরণ বা চিত্ত তাহার নিজেরই অংশ। আরও অধিক অগ্রসর হইলে পুরুষ নিজেকে তাহার পরিবার, সন্তানাদি সকল পার্থিব পদার্থের সহিত জড়িত করিয়া ফেলে এবং তখন সে বলিতে থাকে, 'আমি সুখ অনুভব করিতেছি, আমি দুঃখ অনুভব করিতেছি' ইত্যাদি। এইরূপে সে নিজ স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতিতে মগ্ন হইয়া যায়। সাংখ্য বলেন যে, এই সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতিই জীবের সকল দুঃখ কষ্টের আদি কারণ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, বন্ধনের প্রকৃত কারণ পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নহে, কিন্তু এই অবিবেকই। অতএব এই কারণটী মানসিক (psychological),—তাত্ত্বিক (metaphysical) নহে। অর্থাৎ এই অবিবেকিতা জীবের মানসিক বিকারেরই ফল, তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। মানসিক বিকারের ফল হওয়ায় এই মোহকে মানসিক উন্নতি বিধায়ক সাধনার দ্বারা দূরীভূত করা যাইতে পারে। সাংখ্যও স্বীকার করেন যে, মনের এইরূপ উন্নতি নানাবিধ ধর্ম্ম ও নৈতিক সাধনার দ্বারা সাধিত হইতে পারে। এবং বহুযুগব্যাপী এইরূপ সাধনার পর মোহ কাটিয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন দূর হয়। অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বিষয়ে প্রকৃতি দুইটী কার্য্য সাধন করে। এক পক্ষে, প্রকৃতি বহুরূপ প্রকাশ দ্বারা পুরুষের ভোগার্থ নানারূপ বস্তুর যোগান দিয়া তাহার বন্ধন রচনা করে; এবং অপর পক্ষে, প্রকৃতি পুরুষের পূর্ণ সন্তোষ উৎপাদন করিয়া ভোগ পরিসমাপ্তি দ্বারা তাহার বন্ধন মোচন করে। (সাংখ্য কারিকার ৫৬, ৫৮ ও ৫৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এইরূপ মোহ ও তাহার ফলের এক বিস্তৃত বর্ণনা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩০২ অঃ, ৪১—৪৯ শ্লোকে ও ৩০৩ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—এই মোহ ও তাহার ফলরূপ যে বন্ধন তাহা প্রকৃত পক্ষে কাহার? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, সাংখ্য যোগ বলিতেছেন যে, ইহা পুরুষের হইতে পারে না; কারণ পুরুষ নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। (সাংখ্য কারিকার ১৯ শ্লোঃ ও সাংখ্য প্রবচন সূত্রের ৩ অঃ, ৭১ ও ৭২ সূঃ, ৫অঃ ১৩ সূঃ ও ৬অঃ, ১০ম সূঃ দেখ)। তাহা হইলে ইহারা প্রকৃতিরই হইবে যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পুরুষ কিরূপে মোহগ্রস্ত ও বদ্ধ হন? প্রথমতঃ দেখিলে মনে হয় যে সাংখ্য বলিতেছেন যে, সান্নিধ্য হেতুই প্রকৃতির এই মোহ ও বন্ধন পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, যেরূপ সান্নিধ্য হেতু জবা-পুষ্পের লোহিত বর্ণ স্ফটিকের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয় (সাং, প্র, সূত্রের ৬ অঃ, ২৭ ও ২৮ সূত্র দেখ)। যদিও এই উপমাটী সাংখ্যের অন্যান্য উপমার ন্যায় ঠিক নহে, তথাপি ইহার ভিতর একটী সত্য নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ দেখিলে মনে হয় যে, এই উপমাটীর দ্বারা এই কথার উপরই জোর দেওয়া হইতেছে যে, প্রকৃতি যে এই প্রতিবিম্ব পুরুষের উপর নিক্ষেপ করিতেছে, পুরুষ যেন তাহার দ্বারা স্বভাবতঃ অনভিভূত থাকেন, যেরূপ জবাপুষ্পের লোহিত বর্ণ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্ফটিকের পাত্রকে লোহিত বর্ণ দেখায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্ফটিকের পাত্রটী তাহার দ্বারা অভিভূত হয় না, অর্থাৎ যাহা তাহাই থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ এই উপমাটী বিপরীত সত্যটীর উপরই জোর দিতেছে। স্ফটিকের পাত্রটীর প্রতিবিম্ব গ্রহণের শক্তি আছে, অন্যথা ইহার উপর কোন রূপেই প্রতিবিম্ব পড়িতে পারিত না। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যে প্রতিবিম্বের দ্বারা পুরুষের উপর মোহ ও বন্ধন নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার প্রতি পুরুষ উদাসীন থাকেন না; কিন্তু তিনি প্রকৃতি-নিক্ষিপ্ত এই প্রতিবিম্বের দ্বারা অভিভূত হন; এবং এই প্রতিবিম্বটী যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুরুষও তদবস্থ থাকেন। ফলতঃ **পুরুষের এই মোহ ও বন্ধন বাস্তব।** এই বাক্যটী কি—পুরুষ যে নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত এই বাক্যটীর সহিত অসমঞ্জস নহে? এই প্রশ্নটীর যথার্থ উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে সাংখ্যমতে **অবিদ্যা** বা **অবিবেক** জিনিষটা কি?

অবিদ্যা বা অবিবেক বিদ্যা বা বিবেকেরই বিপরীত, ইহা **পুরুষ-প্রকৃতির একত্ব জ্ঞান।** পুরুষ যখন নিজেকে প্রকৃতি ও তদ্‌গুণের সহিত এক মনে করেন তখনই বলা যাইতে পারে যে তাঁহাতে অবিবেক বা অবিদ্যা উদ্ভূত হইয়াছে। অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, বিদ্যা বা বিবেক প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধে **ভিন্নত্বের জ্ঞান** (discriminative knowledge), এবং অবিদ্যা বা অবিবেক প্রকৃতি-পুরুষের **অভিন্নত্বের** বা

একত্বের জ্ঞান। যোগসূত্রেও অবিদ্যা বা অবিবেকের এই একই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। "অনিত্যাঽশুচি দুঃখানাঽত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা", অর্থাৎ "অনিত্যকে নিত্য বলিয়া অশুচিকে শুচি বলিয়া, দুঃখকে সুখ বলিয়া এবং অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভাবিবার নামই অবিদ্যা।" ব্যাসদেব এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্ন, তথাঽগোষ্পদঃ ন গোষ্পদাভাবো ন গোষ্পদমাত্রং, কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যৎ বস্তন্তরং, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যা-বিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যেতি", অর্থাৎ "যেরূপ অমিত্র অর্থে মিত্রের অভাব বা মিত্রমাত্র বুঝায় না, কিন্তু শত্রুকেই বুঝায়; এবং অগোষ্পদ অর্থে গোষ্পদের অভাব বা গোষ্পদমাত্রকে বুঝায় না, কিন্তু অন্য বিস্তৃত দেশকেই বুঝায়; সেইরূপ অবিদ্যা অর্থে প্রমাণ বা প্রমাণাভাবকে বুঝায় না, কিন্তু বিদ্যার বিপরীত একপ্রকার জ্ঞানকেই বুঝায়।" সুতরাং ব্যাসদেবের মতে অবিদ্যা বিদ্যাভাব নহে, কিন্তু বিদ্যার বিপরীত একপ্রকার বিশেষ জ্ঞান (positive knowledge); অথবা, অন্য ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, অবিদ্যা অভিন্নত্বের জ্ঞান (non-discriminative knowledge), অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের একত্বের জ্ঞান। অতএব অবিদ্যা বিদ্যার ন্যায়ই বাস্তব,—উভয়ই বিশেষ জ্ঞান, কিন্তু এই জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে, এইমাত্র প্রভেদ। বিদ্যা হইতেছে পুরুষ প্রকৃতির ভিন্নত্বের জ্ঞান এবং অবিদ্যা হইতেছে পুরুষ প্রকৃতির একত্বের জ্ঞান। কিন্তু পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, আনন্দময়, আত্মস্বরূপ (spiritual), এবং প্রকৃতির বিকাশগুলি অনিত্য, অশুদ্ধ, দুঃখময় ও অনাত্ম স্বরূপ; সুতরাং অবিদ্যা হইতেছে নিত্য, শুদ্ধ ইত্যাদির ও অনিত্য, অশুদ্ধ ইত্যাদির অভিন্নত্বের জ্ঞান; এবং এই কথাই উপরিউক্ত ৫ম সূত্রে বলা হইয়াছে। যদিও সকল জ্ঞানই, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, জ্ঞান, তথাপি তাহাদের মূল্য সমান নহে; কতকগুলিকে রক্ষা করা আবশ্যক, আবার কতকগুলিকে বর্জ্জন করা আবশ্যক। বিদ্যাই প্রকৃত জ্ঞান, কারণ ইহা পুরুষ প্রকৃতির ভিন্নত্বের জ্ঞান, যাহা সত্য; কিন্তু অবিদ্যা মিথ্যা বা ভ্রান্ত জ্ঞান, কারণ ইহা পুরুষ প্রকৃতির অভিন্নত্বের জ্ঞান, যাহা মিথ্যা বা ভ্রান্ত। এই জন্যই মনে হয় সাংখ্য বলিতেছেন যে, অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ও বিদ্যাকে লাভ করা উচিত, যদি আমরা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—আমরা কেন বলি যে পুরুষ-প্রকৃতির অভিন্নত্বের জ্ঞানটী ভ্রান্ত? অবশ্য এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন; কিন্তু তাহারা সম্বদ্ধও বটে; অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই সর্ব্বব্যাপী,—তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ নিত্য ও অবিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্নও বটে; আবার অভিন্নও বটে, অর্থাৎ তাহারা একেবারে ভিন্নও নহে, আবার একেবারে অভিন্নও নহে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে। এক্ষণে সাংখ্য যে কারণে প্রকৃতি-পুরুষের একত্বের জ্ঞানটী ভ্রান্ত বলিতেছেন, তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে—পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ এক বস্তু নহে; এবং যদি আমরা পুরুষ ও প্রকৃতিকে এক বস্তু বলিয়াই মনে করি, যেরূপ সাধারণ লোকে করে, তাহা হইলে আমাদের সেই জ্ঞানটী ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে; এবং যতক্ষণ অবধি আমাদের সেই জ্ঞানটী থাকিবে, ততক্ষণ আমরা অবিদ্যাজনিত মোহের দশাতেই থাকিব। সুতরাং, প্রকৃতি-পুরুষের একত্বের জ্ঞানের জন্য অবিদ্যা মিথ্যা বা মোহাত্মক নহে; কিন্তু সকল জীবই যতক্ষণ না তাহাদের বিদ্যালাভ হেতু মুক্তি লাভ হয়, ততক্ষণ এই একত্বকে সম্পূর্ণ (adsolute) বলিয়া ধরে বলিয়াই অবিদ্যা মিথ্যা বা মোহাত্মক।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, ঈশ্বরের জীবরূপ ধারণ, যাহা প্রকৃতির সহিত বিশিষ্টরূপ সংযোগ দ্বারা সাধিত হয়, এবং যাহার ফলে মহদাদি পঞ্চমহাভূত ও তাহাদের সংমিশ্রণে অন্যান্য বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাই অবিদ্যার প্রকৃত কারণ। কিন্তু পুরুষের এই বহুধা প্রকাশ-ক্রিয়া নিত্য; সুতরাং ইহার ফল-রূপ অবিদ্যাও নিত্য। এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে—অবিদ্যা যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে কিরূপে ইহার ধ্বংস সাধিত হইতে পারে? সাংখ্য বলেন যে, বিদ্যা বা বিবেকজ্ঞান দ্বারাই ইহার ধ্বংস সাধিত হইতে পারে (সাং, প্রঃ, সূঃ ৩ অঃ, ২৩ সূঃ, ও সাংখ্য কারিকার ৪৪ শ্লোঃ দেখ)। কি

বিদ্যালাভ দ্বারা অবিদ্যার এই বিনাশ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাধিত হয়। তাহা হইলে, যাহা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটে সেই ধ্বংস কিরূপে অবিদ্যাকে অভিভূত করিতে পারে? কারণ ইহা নিত্য ও কালাতীত বা সর্ব্বকালব্যাপী। অর্থাৎ অবিদ্যা নিত্য হওয়ায় তাহার ধ্বংস হইতে পারে না। তাহা হইলে ইহার সহিত, সাংখ্যের "বিদ্যা অবিদ্যাকে নাশ করিতে পারে, যেরূপ আলোক অন্ধকারকে নাশ করিতে পারে" (সাং প্রঃ সূঃ—১ম অ, ৫)—এই উক্তিটীর সামঞ্জস্য বিধান কিরূপে করা যাইতে পারে? তাহা এই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে—প্রকৃতি ও পুরুষের একত্ব-রূপ ভ্রান্ত ধারণার ফলে উৎপন্ন অবিদ্যার নাশ কেবল ঐ ভ্রান্ত ধারণার প্রকৃত স্বরূপ-বোধের দ্বারাই হইতে পারে; এবং সেই স্বরূপ-বোধটী এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ সম্পূর্ণ নহে; অর্থাৎ ইহার দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির ভিন্নত্বও বুঝায়। সুতরাং, বাস্তবিক পক্ষে অবিদ্যা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, কেবলমাত্র রূপান্তরিত হয়; অথবা ইহা পূর্ব্ব রূপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করে। পুরুষ ও প্রকৃতির একত্বের জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না বা হইতে পারে না, যেহেতু উহা অংশতঃ সত্য। সুতরাং সাংখ্য যখন বলেন যে, বিদ্যা অবিদ্যাকে নাশ করিতে পারে, তখন এই কথাই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নত্বের জ্ঞান প্রকৃতি ও পুরুষের অভিন্নত্বের ভ্রান্ত জ্ঞানকে রূপান্তরিত করে, একেবারে নাশ করে না। এবং অবিদ্যার এই রূপান্তর প্রাপ্তি তাহার নিত্য স্বভাবের বিরোধী নহে, কারণ সাংখ্যের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের নিয়মানুসারে কিছুই শূন্য হইতে জাত হয় না বা শূন্যতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সকল বস্তুই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং এই ধারাও নিত্য। সেইরূপ অবিদ্যাও নিজ স্বভাবের একেবারে পরিবর্ত্তন না করিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং মুক্তিদশায় যখন অবিদ্যার রূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তখন ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। অবিদ্যার এই পূর্ণ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরকেই সাংখ্য ইহার নাশ বলেন; কারণ ইহার প্রভাবে পুরুষ আর মোহগ্রস্ত হয় না।

আমরা প্রথমে যে প্রশ্নটী উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং যাহার উত্তর প্রদত্ত হয় নাই, তাহার উত্তর এখন দেওয়া যাইতে পারে। সেই প্রশ্নটী এই—অবিদ্যা ও বন্ধনের সত্তা কিরূপে পুরুষের নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত স্বভাবের সহিত সমঞ্জস হইতে পারে? উপরে যে দুইটী বিপরীত বাক্য বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা এই বুঝায় যে, আমরা পুরুষের স্বভাবকে দুই ভাবে দেখিতে পারি। জীবমাত্রেই একপক্ষে পুরুষেরই পূর্ব্ব প্রকাশ। ঈশ্বর বা পুরুষ প্রত্যেক জীবে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকায়, তাহাকে নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে ঈশ্বর বা পুরুষ জীবের সীমাবদ্ধ ও দেহ তত্তৎ উপাধিগণের মধ্য দিয়া নিজস্বরূপকে প্রকাশ ও অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে মোহগ্রস্ত ও বদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হয়। অতএব জীবের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে গেলে এই দুইটী ভাব বুঝা আবশ্যক; এবং জীবের এই মোহ ও বন্ধন বাস্তব, কারণ কেবল ইহার দ্বারাই ঈশ্বর জীবের মধ্যে নিজস্ব রূপকে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেন ও পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়েন। কিন্তু ঈশ্বর কেন এইরূপ সীমা সৃষ্টি করিলেন তাহার উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ তাহা অর্থহীন। অবিদ্যাদি যে কোনও বাক্য প্রয়োগ করা যাউক না কেন, তথাপি এই সমস্যার মীমাংসা করা ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। যে সকল কাঠিন্য উত্থিত হয়, তাহার লাঘব হইবে না, যদি আমরা বলি যে, অবিদ্যা প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতিরই, এবং সান্নিধ্য-হেতু তাহা পুরুষে নিক্ষিপ্ত হয়। কারণ, পুরুষ যদি অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতেন, তাহা হইলে তিনি কোনও প্রকারেই অবিদ্যার দ্বারা অভিভূত বলিয়া প্রতীত হইতে পারিতেন না। জবা ও স্ফটিকের যে উপমাটী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহা আদৌ প্রমাণিত হয় না যে, সান্নিধ্য-হেতু প্রকৃতি পুরুষের উপর যে অবিদ্যা নিক্ষেপ করে, তাহার দ্বারা পুরুষ সম্পূর্ণ রূপে অভিভূত থাকেন। অধিকন্তু, 'সান্নিধ্য' এই শব্দটীর দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ প্রকটিত হইতে পারে না; কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্যযুক্ত ও পরস্পরব্যাপী। ইহার দ্বারা কাঠিন্যটী বরং আরও অধিক বৰ্দ্ধিত হয়; কারণ ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের অবিদ্যাভিভূত রূপে প্রতিভাত হইবার ক্ষমতা আছে, যেরূপ জবার সন্নিকটস্থ স্ফটিকের লোহিত বর্ণে প্রতিভাত হইবার ক্ষমতা আছে। অধিকন্তু, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং যাহা কিছু প্রকৃতির তাহা পুরুষের দ্বারাও ব্যাপ্ত হইবে; অর্থাৎ তাহাও পুরুষের স্বভাবান্তর্গত হইবে। সুতরাং আমরা

দেখিতে পাইতেছি যে, পুরুষ সর্ব্বব্যাপী হওয়ায়, প্রকৃতিতে এমন কিছুই নাই, যাহা একেবারে পুরুষের স্বভাবের বহির্ভূত। পুনশ্চ, অবিদ্যা একপ্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান হওয়ায়, উহা প্রকৃতির হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি জড়স্বভাবা বা পূর্ণ চৈতন্যশালিনী (subconscious) নহে। ফলতঃ, অবিদ্যাকে যে প্রকারেই হউক পুরুষের হইতে হইবে। এই সকল কারণেই আমরা বলিয়াছি যে, এই প্রশ্নটীর উত্তর একান্ত অসম্ভব—ইহা একেবারে সৃষ্টি-রহস্য বিষয়ক। এক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঈশ্বর জীবে বিদ্যমান থাকায়, জীবের মানসিক ও দৈহিক সকল বিধানই তাঁহার স্বভাবান্তর্গত এবং কেবল এইগুলির দ্বারাই তিনি আত্মানুভূতি ও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৯]

পরদিন সকালে নরেশ সুকুমারীকে বলিল, "মায়া-মমতার শিকড়গুলি যত গভীর হয়ে বসবে, যাবার দিন উপড়ে ফেল্‌তে তত বেশী কষ্ট হবে। অতএব আর বিলম্ব না করে আজই চল।"

সরমা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কিছুতেই হবে না জামাইবাবু! যাবার দিন দেরী হলে কষ্ট যত বেশীই হ'ক না কেন, সে কষ্ট তা বলে এত শীঘ্র ভোগ করা হবে না!"

রমাপদ বলিল, "তা ছাড়া, যাবার দিনে যদি কষ্টই না হল তাহলে সে যাওয়াই বৃথা! যাবার সময়ে যত বেশী কষ্ট হয় ততই ভাল!"

নরেশ বলিল, "গভীর রসতত্ত্বের দিক দিয়ে যখন কথাটা বললে, তখন বলি, যত শীঘ্র যাবে তত বেশী সে কষ্ট হবে। আজ যদি সে কষ্ট বেশী না হয় কাল আরো কম হবে, এ নিশ্চয় জেনো। অতএব সে হিসাবে বিলম্ব না করে আজই যাওয়া উচিত।"

শীঘ্র যাওয়ার পক্ষে সুকুমারীরই এখন সকলের চেয়ে অধিক আপত্তি ছিল। সে বলিল, "হিসেবটা যেমন করেই কষ, সুবিধাটা মোটের উপর তোমারই দিকে থাক্‌ছে!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "কতকটা কথামালার সেই বাঘের মত!"

এ ক্ষেত্রে কিন্তু কথামালার কাহিনার মত ফল না ফলিয়া অন্যরূপ ফলিল। সে দিন ত যাওয়া হইলই না, তাহার পরও ক্রমে ক্রমে রমাপদ এবং সরমার নির্ব্বন্ধে দুই তিন দিন যাওয়া পিছাইয়া গেল। বাহিরের শক্তি যত দিন কাজ করিতেছিল, তত দিন সুকুমারী নিজ শক্তি প্রয়োগ করে নাই। কিন্তু সে শক্তি যখন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিল, তখন সে নিজ শক্তি-বলে আরও চার পাঁচ দিন যাওয়া স্থগিত করিল এবং তাহারি মধ্যে কোনো এক দিনে রেল টিকিটগুলির ভাগলপুর হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত অব্যবহৃত অংশ নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু অবশেষে যেদিন যাওয়া অনিবার্য্য বলিয়া মনে হইল, সেদিন সকাল হইতে সকলের সহিত সর্ব্বপ্রকার যোগ ছিন্ন করিয়া সুকুমারী ঘিণ্টুকে লইয়া দূরে দূরে বেড়াইতে লাগিল; এবং বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার নেত্র দুটি কোনো ক্রিয়া-বিশেষের ফলে উত্তরোত্তর লাল হইয়া উঠিল।

দূর হইতে এই রক্ত-চিহ্ন দেখিয়া নরেশ বিপদ গণিল। পরের ছেলের প্রতি সুকুমারীর এই নিরতিশয় মমতায় একবার তাহার মনে বিরক্তির উদয় হইল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল যে অধিকারবিহীন নিরুপায় আকর্ষণের পিছনে কত বড় একটা আগ্রহ এবং আক্ষেপ লুকাইয়া আছে,—যখন তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে পরের ছেলের প্রতি সুকুমারীর এই অধীর অস্বাভাবিক আকর্ষণের কারণই এই যে ঘিণ্টু তাহার নিজের ছেলে নয়,

পরের ছেলে,—তখন নিবিড় করুণায় নরেশের হৃদয় ভরিয়া গেল!

কোনো সুযোগে সুকুমারীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সে বলিল, "সুকু! একটা কাজ করবে?"

অন্যদিকে চাহিয়া সুকুমারী বলিল, "কি কাজ?"

"এদের তিনজনকে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ধরে নিয়ে যাবে? চেঞ্জে মিণ্টুর শরীরটাও সেরে যেতে পারে।"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সুকুমারী বলিল, "পার ত' চল না।"

"রমাপদকে বলব?"

"বল।"

রমাপদ শুনিয়া বলিল, "বেশ ত! আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আপনি এদের দুজনকে নিয়ে যান। আমার কিন্তু যাওয়া হবে না নরেশদা। সে বিষয়ে বাধা আছে।"

"কি বাধা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমাপদ বলিল, "এই মাস থেকে আমি একটি ছেলে-পড়ানো পেয়েছি।"

নরেশ সজোরে বলিল, "এই বাধা? এ কোন বাধা নয়! তুমি অন্য লোক ঠিক করে দাও।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপদ বলিল, "না, তা হয় না। তাঁরা আমাকেই চান। আর আমিও তাঁদের কাছ থেকে কিছু টাকা আগাম নিয়েছি।"

এক মুহূর্ত্ত রমাপদর দিকে নির্নিমেষভাবে চাহিয়া থাকিয়া নরেশ বলিল, "কত টাকা? সঙ্কোচ কোরো না রমাপদ, আমি তোমার বড় ভাই!"

রমাপদর মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে বলিল, "টাকার কথা নয় নরেশদা,—টাকা এমন কিছু বেশী নয়, সে আমি ফিরিয়ে দিতেও পারি। এই পড়ানোর ব্যবহার মধ্যে অন্য লোক জড়িত আছেন, আমি তাঁর কাছে অপ্রস্তুত হব। তা ছাড়া ছেলেটি আমার কাছে পড়বার প্রতীক্ষায় এ কয়েকদিন অন্য কারো কাছে পড়ছে না। আমার কোনো অসুবিধা হবে না, বিশুয়া সব কাজ করবে, আমি কুকারে খাবার তৈরী করে নেব। আপনি স্বচ্ছন্দে এদের দুজনকে নিয়ে যান।"

কথাটা যখন সরমা এবং রমাপদর মধ্যে উঠিল, সরমা বলিল, "সে কিছুতেই হবে না! আমরা কলকাতায় আরামে কাল কাটাবো, আর তুমি এখানে বসে হাত পুড়িয়ে খাবে, এতে আমি একেবারেই রাজী নই!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "হাত ত আমার মোটে দু'টা, সে আর কদিন পুড়িয়ে খাব? তার চেয়ে অন্য কিছু পুড়িয়ে খেলেই হবে। কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া যে অসম্ভব তা মানো কি না?"

সরমা ব্যগ্রভাবে কহিল, "আমি ত' তা একবারও বলছি নে। আমি বলছি আমরাও যাব না।"

রমাপদ বলিল, "এ কিন্তু তোমার অন্যায় কথা সরো! দেখছ ত' ওঁদের কত আগ্রহ! তা ছাড়া খোকার একটু চেঞ্জ হলে উপকার যদি হয় সেটাও একটা ভাববার কথা। পয়সা খরচ করে লোকে যে ব্যবস্থা করে তোমার সেটা এমনিই হচ্ছে। আমার জন্যে যে ভাবনার কথা কিছু নেই সেটা ত বুঝতে পারছ?"

সরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "মোটেই বুঝতে পারছিনে। তুমি হাজার বার বললেও আমার ভাবনা একটু কমবে না। তা ছাড়া খোকার জন্য কলকাতায় যাবার কোনো দরকার নেই। আমরা গরীব মানুষ। তুমি কিছু ভেবো না, এই ভাগলপুরের জল-হাওয়ার গুণে খোকা সেরে উঠবে। দোহাই তোমার, আর এ বিষয়ে আমাকে পীড়াপীড়ি করে ওঁদের কাছে অপ্রস্তুত করো না! আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না এ নিশ্চিত জেনো।"

কথাটা রমাপদর সহিত এইখানেই শেষ হইল, এবং তাহার কিছু পরেই সুকুমারী এবং নরেশের সহিতও শেষ হইয়া গেল।

সরমা দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমার এক একবার মনে হচ্ছে দিদি, খোকাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই। ও যে রকম তোমার বাধ্য হয়েছে, ওর কোনো কষ্ট হবে না।"

সুকুমারী বলিল, "পাগল হয়েছিস! তুই রাজী হলেও আমি তাতে রাজী নই। লোকে কথায় বলে মায়ের বাছা রায়ে বাঁচে। এখানে তোর চোখে চোখে থেকে আমার কাছে বেশ রয়েছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন মার মুখ না দেখে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন মাসীর মুখ কোনো কাজ লাগবে না। তোরা তিনজনে যদি যেতিস তা হলে কোনো গোল ছিল না; কিন্তু কর্ত্তাটিকে ত' টানতে পারলি নে!"

নরেশ বলিল, "এ ত' আর তোমার কর্ত্তাটি নয় যে আত্মসমর্পণ করে ভেসে আছে, টান্‌লেই হল! এ সব কর্ত্তারা ক্রিয়া-কর্ম্মের নোঙর ফেলে নিজেদের বেঁধে রেখেছে, সহজে নড়ে না। কিন্তু আমার মনে কি সন্দেহ হচ্ছে জান? সরমা যে টান্‌তে পারে নি তা নয়; টানে নি। ষ্টিম্‌লঞ্চ্ টান্‌লে গাধাবোট চলে না এ আমি বিশ্বাস করিনে!"

নরেশের কথা শুনিয়া সরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল; শুধু পরিহাসের জন্য নয়, পরিহাস বাণীর মধ্যে সত্য অনেকখানি বর্ত্তমান ছিল বলিয়া। সে রমাপদকে সত্যই টানে নাই, এবং টানিলে ফল যে কি হইত সে বিষয়ে তাহার নিজেরও সন্দেহ ছিল না।

সুকুমারী বলিল "ষ্টীম্‌লঞ্চ্‌রা যে অন্যায় ভাবে কখনো টানে না! যখন টানে সব দিক ভেবে চিন্তে তবে টানে।"

"শুধু গাধাবোটের দিকটা বাদ দিয়ে।" বলিয়া নরেশ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বিদায়কালে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া সুকুমারী সকলের সমক্ষে কাঁদিয়া ফেলিল। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া হাসিমুখে কহিল, "ভাগলপুরে এসে ভাল করি নি সরো! এখন দেখছি না এলেই ভাল ছিল!"

সরমার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছিল; কহিল, "আমারো তাই মনে হচ্ছে দিদি! আর একবার খোকাকে নেবে?"

"আচ্ছা, দে।" বলিয়া সুকুমারী দুই হাত বাড়াইয়া সরমার ক্রোড় হইতে ঘিণ্টুকে লইয়া বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর নিবিড় আগ্রহে একবার তাহার মুখ দেখিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া সাবধানে সরমাকে ফিরাইয়া দিল।

পথের অনুজ্জ্বল আলোকে সুকুমারীর অশ্রু-বিগলিত মুখে অঙ্কিত যে পদার্থ দেখিয়া সরমার মনে হইল সুগভীর স্নেহ—রমাপদ দেখিল তাহা প্রচণ্ড ক্ষুধা! একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্বস্তিতে তাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

নরেশ বলিল, "ঘিণ্টুকে ষ্টেশনে না হয় নিয়ে চল না রমাপদ – আবার গাড়ীতেই ফিরিয়ে এনো।"

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, কাজ নেই। ঠাণ্ডা লাগবে। ছেলেকে খুব সাবধানে রাখিস সরো—ভারী শরীর খারাপ!" (ক্রমশঃ)

মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

শ্রীনগর

২

কলকাতায় এই কাজ-কর্ম্মের নিগড়, বাঁধা-ধরা অবসর, গাড়ী-ঘোড়া লোকজনের ভিড়, আর ধোঁয়ায় ভরা আকাশ—এ-সব ছেড়ে নিরবচ্ছিন্ন অবসর, প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যের এই বিরাট সান্নিধ্য আর বাঁধাবাঁধির শিকল ছিন্ন!—ঘোরার উৎসাহ এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো যে দু-তিন দিনে তার ফলভোগও করতে হলো! ভ-ভায়া আর আমি দু'জনে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লুম। 'টন্সিল্' সুদর্শ হয়ে অশেষ যন্ত্রণা জাগিয়ে তুললে! সঙ্গে ছিলেন ষ-ভায়া,—ডাক্তার; কাজেই দৌড়-ঝাঁপ করতে হলো না। ওখানকার ললিতবাবু প্রভৃতি এসে বললেন, চেনার-নালা থেকে বোট সরিয়ে ঝিলামে চলুন। চেনার-নালায় স্বাস্থ্য ভাল রাখা সম্ভব হবে না—বড় ঘেঁষি আর নোংরা।

সত্য বলতে কি, এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াটুকু খুবই উপলব্ধি করছিলুম,—কিন্তু নামের মোহ এক প্রকাণ্ড ব্যাপার! ঐ যে চেনার-বাগ আর চেনার-নালা নাম দুটী...শ্রুতিমূল থেকে হৃদয়মূল পর্য্যন্ত এক বিমুগ্ধ আবেশে ভরিয়ে তুলেছিল। মনে হতো, কোন্ আরব-রজনার কাহিনীর মাঝখানে ঢুকে পড়েছি! 'ঝিলাম'—এ নাম তো

ছেলেবেলায় জিয়োগ্রাফি পড়ার সময় থেকে মুখস্থ হয়ে গেছে—ও-নামে আর নূতনত্ব কি!

চেনার-নালায় বোট আছে বিস্তর,—ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি, আর বেশীর ভাগই ভর্ত্তি। তাতে বাঙালী আছেন, পঞ্জাবী আছেন, সাহেব আছেন, আরো কত জাত। জল এদিকটায় ভারী নোংরা, কারণ বাথরুমের জল প্রভৃতিও ঐ জলেই তো পড়ছে! পানের ও ব্যবহারের জন্ম কলের জলের কড়া ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও বোটের ভৃত্য শিকারায় চড়ে দুটো কলসী নিয়ে যাত্রা করে, চোখে দেখি, ভাবি, এত যখন উদ্যোগ, তখন কলের জলই আনে! একদিন হঠাৎ এক সময় কি খেয়াল হলো, ভৃত্য জল আনতেই তাকে ধম্‌ক বলা হলো, কলের জল না এনে এই চেনার-নালার জল সে আনে কোন সাহসে! প্রথমে সে বললে, না শেঠ-সাব্, কলের জলই এনেছি। কিন্তু দ্বিতীয়বার ধমক দিতেই স্বীকার করলে যে, না, কলের জল নয় বটে! খুব ধমক-ধামাক দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প জানালে সে 'গোড় ধরে কসুর' স্বীকার করলে এবং 'মাপ' চাইলে। বোটের মালিক বোটেই থাকে; সব ব্যাপারের তদ্বির-তদারক করা তার কাজ। সে বললে,—আর এমন হবে না! এ কথাটা বিশেষ করে বললুম এই জন্ম যে, কাশ্মীরে অনেকেই যান—কাশ্মীরী ভৃত্যও নিয়োগ করেন; এবং ভৃত্যকে হুকুম করা হলে সে-হুকুম সে কেন তামিল করবে না, তা আমাদের বাঙালী-মনিবদের ধারণাতেও আসে না। কাশ্মীরী-ভৃত্য,—বলতে মনে ব্যথা লাগে, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদাও রক্ষা করা চাই, কাজেই বলতে হচ্ছে—এরা ভয়ানক মিথ্যাবাদী, আর ভয়ানক কাপুরুষ! এদের প্রতি নরম হয়েছেন কি এরা মাথায় চড়ে বসেছে! গরমের বেজায় ভক্ত! যাঁরা কাশ্মীরে গিয়ে কাশ্মীরী ভৃত্য নিয়োগ করবেন, তাঁরা কড়া নজর রাখবেন এদের উপর—এরা ভারী নোংরা আর ভারী মিথ্যাবাদী। যাঁরা কাশ্মীরে বসবাস করছেন, তাঁদের ভৃত্যেরা ভালো, দেখেছি। সেটা নিশ্চয় শিক্ষা আর সহবাসের গুণে! না হলে 'ফক্‌রে' চাকর—তাদের মনে সর্ব্বক্ষণ চাবুকের ভয় জাগিয়ে রাখা দরকার।

ঝিলাম-বক্ষে

যাক্, ললিতবাবুর কথামত বোট সরানো হলো। ঝিলামে থাকতে চাইলুম—মাঝির দল কি পাজী কম্! ঘুরে এসে বললে, ঝিলামের ধারে ভালো জায়গা মিললো না; তবে ঝিলামের মুখের কাছাকাছি নার্সিং-হোমের সামনে এই

ভাবার কথাও! ও কণ্ঠের সুরে বনের পশু বশ হয়, মানুষ কি ছার! ওস্তাদজীর 'কারণ-সলিলে'র প্রতি একটু বেশী মায়া। 'পুরী'-তরকারী না মিলুক, দু' বোতল 'বীয়ার' তাঁর রোজ চাই! দু' বোতল মাত্র! আর বীয়ার! হুইস্কি বা অপর কোন জাত নয়।

দু' চারদিন সকলের সঙ্গে মেলামেশা করছি, হঠাৎ একদিন
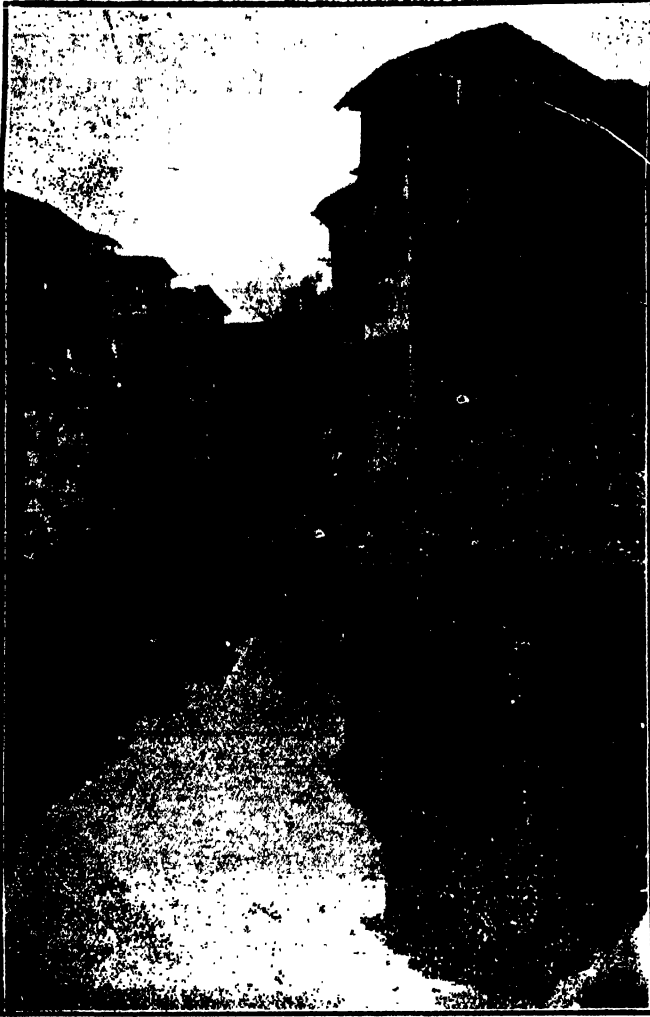
চেনার নালা

শুনলুম, মহারাজ প্রতাপসিং সঙ্কটাপন্ন রোগে শয্যাগত। শ্রীনগরের প্রাসাদেই তিনি আছেন। জম্মুতে যাবার ইচ্ছা, কিন্তু তাঁর অবস্থা এমন নয় যে তাঁকে স্থানান্তরিত করা যায়! মহারাজকে কখনো চোখে দেখিনি, তাঁর প্রজাও নই—তবু শুনে বুকটা বেদনায় ভরে উঠলো। ছেলেবেলায় রূপকথায় কাশ্মীরের নাম শুনেছি, তারপর স্কুলের ভূগোলে ইতিহাসে কাশ্মীরে হিন্দু রাজ্যের কথা পড়ে বিমুগ্ধ গৌরবে গর্ব্বে বালক চিত্ত স্ফীত হয়ে উঠেছে—সেই কাশ্মীরে আজ এসেছি! সেই কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা—মাত্র কুড়ি মহারাজ নয়, তাজা মহারাজা! সমস্ত আকাশ যেন কি এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় মূর্চ্ছাতুর চিত্তে নিস্পন্দ নেত্রে চেয়ে আছে, মনে হলো! বেড়ানোর সুখ সেদিন জমলো না!

তার দু'দিন বাদে সন্ধ্যার পর শুনলুম, মহারাজার মৃত্যু হয়েছে! পরদিন দুপুরবেলা তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া। কাছাকাছি আরো ক'টি খণ্ড রাজ্যের রাজামহারাজারা এ ক'দিনে শ্রীনগরে এসেছিলেন। সকাল থেকে সমস্ত শ্রীনগর সহর শোকে স্তব্ধ—লোকজনের মুখে মলিন কাতর ভাব। বোটের তুচ্ছ মাঝিটা অবধি যেন কেমন শোকে আতুর! আমাদের কাছে বায়োস্কোপের ফিল্ম ক্যামেরা ছিল। ভাবলুম, শোক-যাত্রার ছবি তুলবো। একটি বাঙালী ভদ্রলোক বোটে এসেছিলেন সকালে; তিনি বল্লেন, রাজা হরিসিং ফটো নিতে নিষেধ করেছেন—ফটো নেওয়া হিন্দু sentimentএর প্রতিকূল যে!

শেষে কি মামলায় পড়বো! নিরস্ত হলুম। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে ক্যামেরা হাতে দ-ভায়া আর আমি ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। শ্রীনগরের হাসপাতালের ওধারে রামবাগ। সেইখানেই দাহ হবে। আমরা হাসপাতালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কি ভিড়! লোকের পর লোক ছুটেছে—সমস্ত সহর যেন ভেঙ্গে পড়েছে! ক্রমে শোভাযাত্রা কাছে এলো। গড়ের বাজনা, ঘোড়সওয়ার, রাজকর্ম্মচারীর দল, রাজা হরিসিং, রাজছত্র, শয্যায় শবদেহ। শবের পিছে-পিছে কর্ম্মচারীরা দু' হাতে টাকা ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন। শুনলুম, বহু সহস্র রৌপ্যমুদ্রা (টাকা) এ শোভাযাত্রায় ছড়ানো হয়েছিল। রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে শোক-বেশে সাহেবরাও ছিলেন। কাশ্মীরী এবং পঞ্জাবী হিন্দুরা মুণ্ডিত মস্তকে, তাঁদের শ্মশ্রু-গুম্ফও মুণ্ডিত। অনেক

...াঙালীকে দেখলুম, মুণ্ডিত-শির; পায়ে জুতা নাই! ভিড়ের মধ্যে দু' তিনখানা ছবি তোলা হলো। তারপরে শোভাযাত্রা দৃষ্টির অন্তরালে গেলে আমরা মোটে ফিরলুম।

বৈকালে শুনলুম, রাজাদেশ বার হয়েছে—অশৌচ-কাল বারো দিনের মধ্যে কাশ্মীরে মাছ-মাংস ডিম ও মদ বিক্রয় বা খাওয়া নিষেধ। গান-বাজনাও নিষেধ। বাজার বন্ধ থাকবে; শুধু নিত্যকার আহারের জন্য শাকসব্জী ফলমূল মাত্র বিক্রয় হবে। ডাক্তারখানা ছাড়া সব দোকান-পশার বন্ধ! মাছ মাংস বা মদ বেচলে বা খেলে জরিমানা দিতে হবে। এ আদেশ সাহেব-অসাহেব সকলকার পক্ষে সমান ভাবে প্রযুজ্য! তার উপর দরবারী রাজ-কর্ম্মচারীদের প্রতি রাজাদেশ হলো,—রাত্রি আটটায় সকলে বিছানা নিয়ে রাজ-প্রাসাদের দরবার-হলে সমবেত হবেন,—স্বর্গীয় মহারাজের জন্য শোকপ্রকাশ করে তাঁরা সেইখানেই নিদ্রা দেবেন এবং ভোর পাঁচটায় উঠে গীতা-পাঠ ও পরলোকগত রাজআত্মার জন্য প্রার্থনা ও শোক-প্রকাশের পর সকালে সকলে গৃহে ফিরবেন। শুধু শরীর খারাপ বলে প্রবীণ ঋষিবর বাবু এ ব্যাপার থেকে মুক্তি পেলেন। বাকী সকলকে,—না কি ইংরাজ, কি হিন্দু-মুসলমান—এ আদেশ পালন করতে হয়েছিল।

তার পর শুনলুম, এক প্রসিদ্ধ ইংরাজ ফার্ম্ম দু'বোতল মদ বেচেছিলেন বলে তাঁদের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়েছে। গোয়েন্দা-পুলিশ নদীতে নৌকায় চড়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতো—হাউস-বোটে কেউ মাছ মাংস বা ডিম খাচ্ছে কি না, বা কোথাও গান-বাজনা চলছে কি না—দেখার জন্য। শ্রীনগরে এক মস্ত হোটেল আছে; কলিকাতার গ্রেট ইষ্টার্ণের মত প্রতিপত্তিশালী। য়ুরোপীয়ের মধ্যে যাঁরা জলে বাসের খুব পক্ষপাতী নন, তাঁরা এখানেই থাকেন। দেশী লোকের বাস সম্বন্ধে সেখানে কোনো বাধা-নিষেধ নাই—তবে সেখানকার ব্যবস্থা পুরোপরি য়ুরোপীয়-ষ্টাইলের। এই হোটেলেও এ ক'দিন অশৌচ-রীতি আদেশ-মোতাবেক পালিত হয়েছিল।

এখানকার শ্রীপ্রতাপ কলেজে ক'জন বাঙালী প্রোফেসর আছেন—কলেজটি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। কাশ্মীরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় নেই। শ্রীপ্রতাপ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ী কলিকাতায়, ভবানীপুরে; আমার প্রতিবেশী তিনি। তাছাড়া তাঁর প্রথম কর্ম্ম-জীবনে ভবানীপুরের সবার্বন স্কুলে তিনি সহকারী-হেডমাষ্টার ছিলেন, সে সময় আমি তাঁর ছাত্র ছিলুম। তাঁর বাসার ঠিকানা জেনে একদিন সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। সে মহল্লার নাম, বর্বর শা। দাস মহাশয় মহা খুশী হলেন। তাঁর উদ্যোগে ওখানকার বাঙালী ছাত্রদের নিয়ে পুরস্কার-বিতরণ-উপলক্ষে আবৃত্তি আর নাট্যাভিনয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত হচ্ছিল।

কাশ্মীর মহারাজের শব-যাত্রা (১)

ছেলেদের ডাকিয়ে আবৃত্তি করিয়ে তিনি শোনালেন; নাট্যাভিনয়ের রিহার্শাল দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু অচিরে দরবার থেকে নোটীশ বেরুলো, শোকের জন্য প্রাইজ-বিতরণ বন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয়, উৎসব প্রভৃতিও এক বৎসরের জন্য মুলতুবি রইলো।

এ সব ব্যাপারে ভড়কে গেলুম। কাশ্মীরে এসে এখানকার উৎসব-আনন্দ চোখে দেখা ঘটলো না! তখন ঘুরে এধার-ওধার দেখার দিকেই মনসংযোগ করলুম।

প্রকৃতির অবাধ-অজস্র সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য, তার পর ফুল-ফল আর নারীর রূপ—এই হলো কাশ্মীরের বিশেষত্ব।

কথাটার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নাই! নারীই লক্ষ্মী—কাশ্মীর-রমণীর দিকে চাইলে এ কথার মর্ম্ম নিমেষে হৃদয়ঙ্গম হয়! দেশে বসে তাঁদের চরিত্রের সম্বন্ধে কত ইতর কুৎসাই শুনেছিলুম। এখানে এসে শুনলুম, কথাটা খাঁটী নয়। কবে কোন্ কালে হয়তো কোন্ বদমায়েস বিদেশীর দল এসে কোনো বিশেষ পল্লীতে প্রলোভনের জাল পেতে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে গেছলো, তার জন্ম একটা জাতিকে এমন হীন কলঙ্কে কলঙ্কিত করা মহাপাপ! কোনো জাতির পুরুষ এত নীচ, এমন হেয় হতে পারে না যে অসঙ্কোচে নিজের গৃহের মেয়েদের

কাশ্মীর-মহারাজের শব-যাত্রা (২)

অপরের ভোগের পায়ে অসঙ্কোচে ডালি দিতে পারে! তা সে জাতি ঘোরতর দারিদ্র্যের অভাবে যতই পিষ্ট আর দলিত হোক্! এমন অপবাদও মানুষ দিতে পারে—ছি! কাশ্মীরী নারীকে যতদূর দেখেছি, পুরুষের সর্ব্ব-কর্ম্মে সঙ্গিনী আর সহায়ই দেখেছি! নিজে স্বামীর ক্ষেত দেখা, গৃহকর্ম্ম করা, নৌকা বহা প্রভৃতি, তাছাড়া ধান কোটা ছাঁটাই, বেসাতি করা! কাশ্মীরী নারীকে অলস তো আমি কোনোদিনই দেখিনি। তাঁরা খুব পরিশ্রমী। পুরুষ অলস আছে বিস্তর—কিন্তু নারী? একটা-না-একটা কাজ নিয়েই ব্যস্ত আছেন। লজ্জার একটু অভাব! হয়তো অতি-শীতের দেশ বলে নিম্নস্তরের মধ্যে লজ্জার মাত্রাটা একটু কম হয়েছে। তাছাড়া লজ্জার মাত্রা আচারের উপর রীতির উপর নির্ভর করে—লজ্জার মাপকাঠি তো সকল দেশে সকল কালে সমানও নয়।

তবে হিন্দু-মুসলমান ভেদে কাশ্মীরীর রূপের তারতম্য লক্ষ্য করলুম। হিন্দুর নাম এখানে পণ্ডিত-পণ্ডিতানী। পণ্ডিতদের গায়ের রং একেবারে দুধে-আল্‌তাই, সদ্য ফোটা তাজা তরুণ গোলাপের আভা সে রঙে! আর মুসলমানের বর্ণে একটু সাদার ভাব,—গোলাপী আমেজটুকুর অভাব। চেহারা থেকে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বেশ বোঝা যায়। বহুকাল থেকে বা পুরুষানুক্রমে যাঁরা মুসলমান নন্, তাঁদের রং পণ্ডিতদের সমতুল্য। তাছাড়া মজুর-মাঝি মেথর বা মিস্ত্রী অর্থাৎ খাটিয়ে লোক যারা, তারা বেশীর ভাগ মুসলমান। বাইরে সর্ব্বক্ষণ কাজ করতে হয় বলে হয়তো বর্ণে কালিমা পড়েছে!

এঁদের পোষাকেও পার্থক্য আছে। হিন্দু-মুসলমান 'দু'-জাতেরই পুরুষের পোষাক খুব সাদাসিধে। নারী ও পুরুষ দুজনেই আংরাখা গায়ে দেন। হিন্দু-মুসলমান পুরুষের মাথায় সাদা পাগড়ী, হিন্দু সে-পাগড়ীর ঝুল গোঁজেন ডান দিকে, মুসলমান গোঁজেন বাঁ দিকে। হিন্দু কোর্ত্তা আংরাখায় হাতের ঝুল রাখেন দীর্ঘ, আর মুসলমান ঝুল রাখেন খাটো। পণ্ডিতানীরা পায়জামা পরেন না, শুধু ঘাগরাতেই লজ্জা নিবারণ করেন। ঘাগরায় সাদা কোমর-বন্ধ বাঁধেন, মাথায় সাদা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেন; একেবারে সাদা, তাতে কোনো কারিগরি নাই এবং এই শিরস্ত্রাণ ভেলের মত মুখাবরণেরও কাজ করে। স্বামীর নাম-উচ্চারণে তাঁদের নিষেধ আছে। পণ্ডিতানী চামড়ার জুতা পায়ে দেন না—ঘাসের জুতা ব্যবহার করেন। মুসলমান নারী ঘাগরায় কোমর-বন্ধ ব্যবহার করেন না—মাথায় রঙীন শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেন, কিন্তু সাদা কখনো না; চামড়ার জুতা পায়ে দেন। হিন্দু সধবারা কাণে যে গহনা পরেন, বিধবা বা কুমারীর সে-গহনা পরার রীতি-রেওয়াজ নাই। পণ্ডিতানীরা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাথার বেণী দু-থাক, তিন-থাক, চার-থাক, পাঁচ-থাক করে পিঠে দুলিয়ে দেন; বেণী

রচনা করা হয় পশমী বা রেশমী সুতায়। বিবাহের পরে এই বেণীর বিভিন্ন থাক সংযুক্ত করা হয়। কেউ খোঁপা বাঁধেন, কারো বেণী 'দোদ্বল'ই থেকে যায়, তবে থাকগুলি সংযুক্ত করা চাই! থাকে থাকে দোলানো থাকে না। আর একটি জিনিষ এঁদের পোষাকের অঙ্গ—সেটি থাকা চাই। সে জিনিষটি হলো 'কাংরী'।

'কাংরী' হলো ছোট-বড় মাটীর ভাঁড়, বেতের সাজির মধ্যে সংরক্ষিত। শীতের সময় কিম্বা একটু ঠাণ্ডা পড়লে কাশ্মীরী নর-নারী চলায়-ফেরায় ওঠায়-বসায় এই কাংরীটি অগ্নিপূর্ণ করে সঙ্গে রাখেন। অর্থাৎ ঐ মাটীর ভাঁড়টিতে গুলের বা কয়লার আগুন থাকে। আমাদের ধুনুচির মত করে' সে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং প্রশস্ত আঙরাখার মধ্যে ঐ 'কাংরী' এঁরা ঝুলিয়ে রাখেন। বুক-পেটে আগুনের 'ভাব' লাগার দরুণ এবং হাত দুখানি বুকের কাছে জড়োসড়ো রাখার দরুণ হাত শীতে কালিয়ে যায় না! এজন্য মাঝে মাঝে বিপদও ঘটে খুব—গায়ের কাপড়ে আগুন লেগে যায়। কাশ্মীরী আংরাখা, সে তো সামান্য ব্যাপার নয়, এক-থান কাপড় থাকে তাতে; হাত বা অঙ্গ দগ্ধ হয়ে যায়! এ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তবু 'কাংরী' কাশ্মীরী নর-নারীর অপরিহার্য্য। এ সম্বন্ধে এক বিদেশী পর্য্যটক পরিহাসচ্ছলে বলে গেছেন,—"What Laili was on Majnu's bosom, so is the 'Kangri' to a Kashmiri. কাশ্মীরীদের আর একটি অদ্ভুত রীতির কথা শুনলুম, কাশ্মীরী হিন্দুরাও 'পক্ষীর মাংস' খেতে হলে তা 'হালাল' করে খান্।

আসছে বারে কাশ্মীরের বাগ-বাগিচা, ইমারত প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু বলে কাশ্মীর-কথার শেষ করবো। (ক্রমশঃ)

জয়-পরাজয়

শ্রীমুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

(১)

বৈশাখ মাস—ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। কালবৈশাখীর আকাশে একটু মেঘের ছায়া পর্য্যন্ত ছিল না। গ্রামের শেষ সীমানায় অনন্ত মিশ্রের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে একটী সুন্দর ফুলবাগান। ফুলবাগানের উত্তর দিক দিয়া শীর্ণকায়া পার্ব্বত্য নদী ধীর, মন্থর গতিতে বহিয়া যাইতেছিল। পশ্চিমে গগনচুম্বী পাহাড়, অসংখ্য খনিজ রত্ন বুকে করিয়া, কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া আছে, কে বলিবে? দিনের শেষে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আভাটুকু আসিয়া নদীর জলে সোণার কিরণ ছড়াইয়া দিয়াছিল। নদীর পূর্ব্ব সীমানায় একটা পাথরের বাঁধা ঘাটের উপর, একটী জীর্ণ শিব-মন্দিরের মধ্য হইতে আরতির ঘণ্টার শব্দ থাকিয়া থাকিয়া দূরাগত পথিকের কাণে একটা অতীত গরিমার ব্যথার স্মৃতি ঢালিয়া দিতেছিল। পাহাড়ের উপর, মন্দিরের পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড দেবদারুর লহর চলিয়াছিল। তাহারই শেষ প্রান্তে, কত ভগ্ন ইষ্টক এবং প্রস্তর-ঘেরা কোন্ এক হিন্দুরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, তখনও ব্যথিতের ক্রন্দনের মত, নিরাশ প্রেমিকের অতীত স্মৃতির মত, দেবতার অভিসম্পাতের মত, কালের বক্ষে তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ছড়াইয়া দিতেছিল।

(২)

কৃষ্ণা অনন্ত মিশ্রের একমাত্র কন্যা। গ্রীষ্ম চলিয়া গেল, বর্ষা আসিল। শীর্ণকায়া নদী দুকূল ছাপিয়া উঠিল। কৃষ্ণার প্রাণে যেন কাহার বিরহ-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। প্রাণ, মন কাহার ভাবে যেন বিভোর হইয়া রহিল। বসন্তের নবমুকুলিতা লতা, বর্ষার আকাশের পাহাড়িয়া পাখীর দিকে চাহিয়া, আপন মনে বঁধুর কাহিনী বলিয়া যাইত। ভাদ্রের ভরা নদীর কলতানে, সে তা'র প্রেমময়ের মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইত। নীল পাহাড়ের উপর চাঁদের জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িত, আর কৃষ্ণার মনে হইত বুঝি

তার বঁধু ঐ চাঁদের কোলে, জ্যোৎস্নার তরঙ্গে হাসিয়া, ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নদীতে জোয়ার আসিয়াছিল, আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল, পাহাড়ের উপর জ্যোৎস্নার রজতধারা গলিয়া পড়িতেছিল; বিশ্ব-পৃথিবী প্রেমের সঙ্গীতে বিভোর হইয়া ছিল। রুক্মা আপন মনে, তাহার করুণ সঙ্গীতে নির্জ্জন পাহাড় মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভরা যৌবনের পূর্ণ নদীতে, প্রেমিক বঁধুর আবাহনের সঙ্গীতে কত যে করুণা মাখান ছিল, তাহা সেই জানিত। অনন্ত মিশ্র মেয়েকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। কিন্তু কোথায় তার ব্যথা, তাহা বুঝিবার শক্তি বৃদ্ধের ছিল না। সে বুঝিত বিগ্রহের পূজা, আর খনির ইজারার টাকা। কিন্তু তার মেয়ের বুকের সোনার খনিতে যে মহা বিপ্লব, তাহা সে বুঝিতে চাহিত না; কারণ রুক্মা ভিন্ন তা'র অন্য অবলম্বন ছিল না।

(৩)

ভবনগরের রাজ-প্রাসাদের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া শীতল আর শান্তা তাহাদের কত সুখ-দুঃখের চিত্র পরিকল্পনা করিয়া যাইতেছিল। যৌবন-জোয়ারে, প্রেমের তরীতে, আশার পাল খাটাইয়া দিয়া মনের আনন্দে তাহারা ছুটিয়াছিল। শান্তা ছিল রাজার মেয়ে, আর শীতল ছিল মন্ত্রীর ছেলে। শীতল পাঠক বড়ই সুপুরুষ, তার মত বীরও সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। পূর্ব্বে যে তাহারা কোথায় থাকিত, কেহ জানে না। শীতলের হাসির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ লুক্কায়িত ছিল। কোন নিকট আত্মীয়ই তাহার মনের খবর রাখিত না। কি যে তাহার বিরহ, কি যে তাহার বেদনা, তাহা সুধু সে-ই জানিত।

ভবনগরের প্রধান সেনাপতির পদ খালি হইয়াছিল। শীতলের ডাক পড়িল। শীতল শান্তার কাছে অনুমতি চাহিল। শান্তা রাজার মেয়ে,—সে অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠিল—"বীর তুমি, এই তো তোমার উপযুক্ত কার্য্য; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই হচ্ছে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করা।"

শীতল—তুমি কি নিষ্ঠুর, শান্তা!

শান্তা—উচিত কথা বল্লেই তুমি রেগে যাও; বল, আমি আর কি করব?

(৪)

সামান্তে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। ভয়ানক যুদ্ধ। প্রান্তবাসীরা বিষাক্ত তরবারি, বিষাক্ত বল্লম, বিষাক্ত তীর লইয়া যুদ্ধ করিত। প্রধান সেনাপতি ছাড়া আর কেহই সেখানে যাইতে সাহসী হইল না।

নির্জ্জন সীমান্ত প্রদেশ, কেবলই নীল পাহাড়ের লহর চলিয়াছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ীয়া নদী ভরা-বুকে দুকুল ছাপিয়া উঠিয়াছে। আর এক দিন পরেই যুদ্ধ। শীতল আপন মনে নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তা'র বক্ষস্থলে একটা গুলিভরা পিস্তল সর্ব্বদাই লুক্কায়িত থাকিত। শীতলের পিতা পুনঃ পুনঃ তাহাকে পাহাড়ীয়াদের বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী আরও বলিয়া দিয়াছেন—"ওদের বিষাক্ত তীর অপেক্ষা, ওদের মেয়েদের বিষাক্ত হাসি ভয়ানক! সাবধান শীতল।"

শীতল আপন মনে সীমান্তের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল,—অকস্মাৎ একটা তীর তাহার কাণের নিকট দিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গেল। শীতল নিজের তূণে হাত দিল। তার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। হৃদয়ে ক্ষত্রিয় তেজের বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত পাহাড়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শীতল স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে এক বিরাট বাহিনী।

(৫)

শীতল যত বড় যোদ্ধাই হউক, বিরাট বাহিনীর সম্মুখে সে কতক্ষণ একা দাঁড়াইতে পারে? অকস্মাৎ শত্রু-শিবির হইতে কে একজন ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইয়া গেল। শীতলের সমস্ত তীর নিঃশেষ হইয়া গেল। নৈশ অন্ধকার পাহাড়ের বুকে জমাট বাঁধিয়াছে। তাহার শেষ সম্বল পিস্তলের দুইটা আওয়াজ হইল। শীতল একবার পিছন দিকে ফিরিয়া দেখিল,—ভবনগরের পতাকা হস্তে কে একজন অশ্বারোহী ছুটিয়াছে, পশ্চাতে অসংখ্য সৈন্য। হঠাৎ সে ঘোড়া ছুটাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহই জানিল না। সীমান্তবাসীরা পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেল। সহকারী সেনাপতি নারায়ণ বন্ধুভাবে শীতলকে একটু মৃদু ভৎর্সনা করিল।

রণক্লান্তি দূর করিয়া শীতল, নারায়ণকে জিজ্ঞাসা

করিল—আচ্ছা, তোমরা কি ক'রে এখানে এমন সময় এসে পড়লে ?

নারায়ণ—কি জানি ভাই, শিবিরে অপ্রস্তুত হয়ে ব'সে আছি, কোথা থেকে এক নারীমূর্ত্তি একটা বিদ্যুতের ছটার মত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আমার চমক ভেঙ্গে দিলে। সে কেবল প্রস্তুত হ'বার ইঙ্গিত ক'রে, পতাকাটা তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। আর আমি যন্ত্র-চালিত পুত্তলির ন্যায় আমার বিরাট বাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে চ'লে এলাম।

শীতল—তাই ত ভাবছি—কি ক'রে কি হল ? আচ্ছা, তুমি কি তাকে কখনও দেখেছ ?

নারায়ণ—না ভাই; সীমান্তে ত আমার এই প্রথম অভিযান। তাও তুমি ধ'রে নিয়ে এলে ব'লে। আর একটা আশ্চর্য্য,—সে আমাদের ইঙ্গিত কর্লে এমনিভাবে—যেন এ তার নিজের শিবির। তার পর তার রূপ। যাক্ ভাই—এ যুদ্ধ-ক্ষেত্র।

শীতল—মনে থাকে যেন বৃদ্ধ মন্ত্রীর আদেশ।

নারায়ণ—হুঁ, সেটা মনে থাকলেই কাজ হয়েছিল আর কি ? যদি না পাহাড়ীয়া মেয়েকে বিশ্বাস কর্ত্তাম, তাহলেই আজকের যুদ্ধ ফতে হত, আর প্রধান সেনাপতির মাথাটা নদীর জলে ভেসে যেত।

শীতল কি বলিতে যাইতেছিল—অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন মধুর সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। আকাশের মাঝখানে তখন মেঘঢাকা আধখানা চাঁদ, ঘোমটাপরা পল্লীবধূর ন্যায় সলজ্জ হাসি হাসিতেছিল। তখন নারায়ণ বলিল—চল ভাই, এ স্থানটা ভাল নয়, এইবার শিবিরে ফেরা যাক্।

শীতল—তুমি ক্ষেপলে নাকি ? তুমি সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ের নীচে একটু অপেক্ষা কর,—আমি ব্যাপারটা দেখে আসি।

(৬)

রূক্ষা গাহিতেছিল। তাহার আশালতা মুকুলিত হইবার সময় হইয়াছে। তাহার বিরহের রাহু কাটিয়া গিয়া, মিলনের পূর্ণচন্দ্র উদয় হইবার সময় হইয়াছে। শীতল তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। সঙ্গীত শেষ হইলে শীতল ডাকিল—রূক্ষা! কি সুন্দর সে কণ্ঠ! এ যে রূক্ষার প্রাণের দেবতার স্বর; এ যে তার বহুকালের আরাধনার বংশীধ্বনি; এ যে তার জীবন-মরণের একমাত্র সাথী।

কৈ—কোথায় তুমি ? নিষ্ঠুর, এতকাল পরে কি অভাগিনীকে মনে পড়েছে ? – রূক্ষা ছুটিয়া আসিল শীতলের বুকে। শীতল ছিল তার বাল্যের সাথী, শৈশবের সহচর, যৌবনের প্রিয়তম। রূক্ষা ছিল তার বাগ্‌দত্তা। তখন তাহারা কত সুখ-দুঃখের কথা কহিল। কত মিলনের চুম্বনে বিরহের বিচ্ছেদ দূর করিয়া ফেলিল। যদি সেখানে কোন অন্তরঙ্গ সুহৃদ থাকিত, তবে সে দেখিতে পাইত—শীতলের মুখের বিষাদ কালিমাটুকু ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কি যেন এক অমৃতের স্পর্শে তাহার সমস্ত মন-প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(৭)

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নারায়ণের বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। সে দুইজন অনুচরকে বৃক্ষান্তরালে অপেক্ষা করিতে বলিয়া শীতলের সন্ধানে ছুটিল। তখন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। তটিনী, কল্ কল্, ছল্ ছল্ রবে উজান বহিয়া চলিয়াছে। আর শ্যামল পাহাড়ের বুকে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, প্রেমের মন্দাকিনী-ধারার মত হাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। নারায়ণ দেখিল, শীতলের পার্শ্বে রূক্ষা বসিয়া আছে। নারায়ণ ছিল অতি সোজা লোক। সে চীৎকার করিয়া সেকেলে বয়স্যের ন্যায় বলিয়া উঠিল—কি হে ভায়া! বৃদ্ধ মন্ত্রীর আদেশ, পিতৃ-আজ্ঞা—সব ভুলে গেলে ?

শীতল—কেন ভাই ? যুদ্ধ জয় ক'রে জয়লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্ছি।

নারায়ণ আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—ভাই! এ সেই দেবী, যিনি আমাদের যুদ্ধ জয় কোরেছেন। যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন।

শীতল বলিল—ভাই, এই আমার জীবন-মরণের সঙ্গিনী।

নারায়ণ—ভাই, রাজকুমারীর দশা কি হবে ? তিনি যে তোমার আশা-পথ পানে চেয়ে আছেন।

শীতল—তাঁকে বলো ভাই, আমি তাঁর আদেশ পালনের জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। শত্রুর সঙ্গে একাকী যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিতেই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমার জয়লক্ষ্মী আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তোমরা

তোমাদের রাজ্যে ফিরে যাও, আমি ভাই এই পাহাড়ীয়াদের সঙ্গেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটিয়ে দোব।

নারায়ণ—ভাই, এ তোমার রাজকুমারীর উপর অন্যায় অভিমান।

শীতল—না ভাই, এ সুধু অভিমান নয়, এ আমার মনুষ্যত্বের জাগ্রত চেতনা। আমি দরিদ্র, তাই রাজকুমারী আমাকে ঘৃণা করেন। কিন্তু দেখ ভাই, এই পাহাড়ীয়া পাখী, আমাকে বুকে তুলে নিয়েছে। তাই আমি প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছি। তোমাদের সীমান্ত জয় ক'রে দিলাম, কেবল আমিই পরাজিত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কটি-গণ্ড (Adrenal gland)

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্

আমাদের কটিদেশে দুইটী মূত্র-গণ্ড (Kidney) আছে। এই দুইটী গণ্ড তলপেটের দুইদিকে অবস্থিত ; একটী বামে, একটী দক্ষিণে। ইহারা দেহের রক্ত হইতে মূত্র পৃথক করে। প্রত্যেক মূত্র-গণ্ডের উপরে এক একটী যুক্ত-গণ্ড আছে। সুতরাং ঐ যুক্ত-গণ্ডদ্বয়ও কটিদেশের সম্মুখভাগে তলপেটের ঐ দুই দিকে অবস্থিত। ঐ যুক্ত-গণ্ড দুইটী প্রত্যেকে দুই অংশে বিভক্ত, এক অংশকে কেন্দ্র বলিব ; অপর অংশকে বাহ্যাংশ বলিব। এই দুই অংশ সম্পূর্ণ পৃথক নহে ; উহারা কোষ-তন্তুর দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। এই নিমিত্তই উহাদিগকে যুক্ত-গণ্ড বলা যায়। উহারা মূত্র-গণ্ডের উপরে অশ্বারোহীর ন্যায় বসিয়া আছে। ইংরাজিতে এই দুইটী যুক্ত-গণ্ডের নাম Adrenal gland। আমি ইহাদিগকে কটি-গণ্ড বলিব

মেরুদণ্ড-যুক্ত জীবগণকে স-মেরু জীব বলা যায়। প্রত্যেক স-মেরু জীবের তলপেটেই দুইটী কটি-গণ্ড আছে ; একটী বামে, একটী দক্ষিণে। স-মেরু জীব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত জীব মৎস্য। এই জীবের দেহে কটিগণ্ডের কেন্দ্র এবং বাহ্যাংশ সম্পূর্ণ পৃথক ; অর্থাৎ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত নহে। সরীসৃপগণের দেহে কটি-গণ্ডের এই দুই অংশ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ; কিন্তু সংযুক্ত হয় নাই। পক্ষিগণের দেহে ঐ অংশদ্বয় কোষ-তন্তুর দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কটি-গণ্ডের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ।

বাল্যাবস্থায় এবং কৈশোরে দেহের তুলনায় কটি-গণ্ডের আয়তন যত বড় থাকে, যৌবনে তাহার তুলনায় কটি-গণ্ডের আয়তন অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হয়। কিন্তু সকল বয়সেই এই গণ্ড প্রচুর পরিমাণে রক্ত দ্বারা সিক্ত হয়।

কটি-গণ্ডের বাহ্যাংশ, এবং স্ত্রী-দেহের ডিম্বাশয় ও পুং দেহের অণ্ড, এক পদার্থ হইতেই উদ্ভূত। কললের (ভ্রূণ-দেহের প্রথম অবস্থার নাম কলল) ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে মানবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হয়। উহার যে অংশ হইতে কটিগণ্ডদ্বয়ের বাহ্যাংশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অংশ হইতেই ডিম্বাধার এবং অণ্ড জাত হইয়াছে। এই নিমিত্তই ঐ বাহ্যাংশের আয়তন কামভাবের আধিক্যের ও অল্পতার উপর নির্ভর করে। লিঙ্গভেদেও উহার আয়তনের পার্থক্য হইয়া থাকে। সাহস এবং ভীরুতা ঐ বাহ্যাংশের আয়তনের উপর নির্ভর করে। মহিষ প্রায়শঃ সাহসী হয় ; খরগোষ প্রায়শঃ ভীরু হয়। মহিষের কটিগণ্ডের বাহ্যাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত ; খরগোষের ঐ বাহ্যাংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মানব সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী। এ কারণ মানবদেহে ঐ গণ্ডের বাহ্যাংশ সকল প্রাণীর অপেক্ষাই বৃহত্তর।

স-মেরু জীবদেহে যদি কটিগণ্ডের বাহ্যাংশে অর্ব্বুদ (tumor) হয় এবং উহা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ঐ জীবগণের লিঙ্গ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ভ্রূণ অবস্থায় বাহ্যাংশের ঐ পীড়া হইলে, স্ত্রীগণের স্বভাব ও আচরণ পুং জাতীয়ের ন্যায় এবং পুংগণের স্বভাব ও আচরণ স্ত্রী-জাতীয়ের ন্যায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু স-মেরু জীবগণ ভূমিষ্ঠ হইবার পর অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যেই যদি কটিগণ্ডের বাহ্যাংশের ঐ পীড়া হয়, তাহা হইলে কতিপয় দৈহিক ক্রিয়া অতি বেগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দুই, তিন অথবা চারি বৎসর বয়স্কা বালিকার রজোদর্শন হয়, স্তনোদ্গম হয়। ঐ বালিকার দৈর্ঘ্য এবং ওজন বৃদ্ধি পায় ; মনও প্রাপ্ত-বয়স্কের ন্যায় পরিপক্কতা লাভ করে। পক্ষান্তরে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক বালক ছোটখাট একটী যুবক সাজিয়া উঠে। সে হৃষ্টপুষ্ট হয় ; কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। সে বিশিষ্ট মোটাসোটা ও দৃঢ় হয় ; তাহার গুম্ফ জাত হয়, পেশী বলিষ্ঠ হয়। তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও পরিপক্ক হইয়া থাকে।

কিন্তু যৌবন-প্রাপ্তির পর কটিগণ্ডের বাহ্যাংশে tumor হইলে,

দেহের বিভিন্ন স্থানের লোম অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। ভ্রূ, গুম্ফ, শ্মশ্রু অধিক হয়, স্বর গভীর হয় এবং দেহ কঠিন পরিশ্রমের উপযুক্ত হইয়া উঠে।

কটিগণ্ডের বাহ্যাংশের tumor হওয়ায় উহার রসক্ষরণের ইতর-বিশেষ হইয়া ঐ সকল আশ্চর্য্যজনক ফল উৎপন্ন হয়। ভ্রূণ অবস্থায়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর অথবা যৌবন-প্রাপ্তির পর—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে tumor হইবার ফলও বিভিন্ন হইয়া থাকে।

এই গণ্ডের বাহ্যাংশের সহিত মস্তিষ্ক বৃদ্ধিরও যোগ আছে। সাধারণতঃ প্রাপ্ত-বয়স্কগণের দেহে কটিগণ্ডের কেন্দ্রের সহিত বাহ্যাংশের আয়তনের একটা মোটামুটী অনুপাত থাকে। বাহ্যাংশের আয়তন কেন্দ্রের আয়তন অপেক্ষা কত গুণ, তাহা স্বভাবতঃ মোটামুটী একটা ঠিক থাকে। সেই অনুপাতের তুলনায় দুমাস আড়াই মাস বয়স্ক ভ্রূণের এই গণ্ডের বাহ্যাংশ কেন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড়। এই অবস্থা মানুষের মধ্যেই দেখা যায়; এবং মানুষের মস্তিষ্কই সকল জীবের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বড়। যদি কোন কারণে ভ্রূণদেহে কটিগণ্ডের কেন্দ্রের তুলনায় বাহ্যাংশ অপেক্ষাকৃত বড় না হয়, তাহা হইলে মস্তিষ্কও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং জাতক ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমে দেখা যায় যে, সে নির্বোধ হইয়া উঠিতেছে।

কেন্দ্র অপেক্ষা বাহ্যাংশে ফস্ফরসের (Phosphorus) ভাগ অধিক। মস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ স্তরে তাহা যে অনুপাতে থাকে, বাহ্যাংশেও তদ্রূপ।

ইতর জীবের মস্তিষ্ক অপেক্ষা মানবমস্তিষ্ক যেমন বৃহত্তর তেমনই অধিকতর দীপক-বিশিষ্ট। এই কারণেই মানবমস্তিষ্কের প্রাধান্য এবং মানব সকল জীব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কটিগণ্ডের বাহ্যাংশের আয়তন কামভাবের আধিক্য অথবা অল্পতার উপর নির্ভর করে। এই কথাই এরূপেও বলা যায় যে কামভাবের ন্যূনাধিক্যই ঐ বাহ্যাংশের আয়তনের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কটিগণ্ডের বাহ্যাংশের আয়তন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও কামভাব পরস্পরের সহিত সংসৃষ্ট। কামুকের বুদ্ধি ও পিঁপড়ার বল চিরপ্রসিদ্ধ।

বাহ্যাংশ নষ্ট হইলে অথবা উহার ক্রিয়ার হানি হইলে গাত্রচর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হয়। (ইহাকে কি পাণ্ডুরোগ বলে?) কিন্তু কেন্দ্রের এইরূপ হইলে চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হয় না।

জীবদেহ হইতে কটিগণ্ড বাহির করিয়া লইলে ঐ জীব অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কটিগণ্ডের কেন্দ্রভাগের রস দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে রক্তের বেগ ও চাপ বৃদ্ধি হয়, হৃৎপিণ্ড দ্রুতবেগে চলে এবং পেশীগুলি সবল হয়। এই রস হইতে রাসায়নিকগণ অ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) নামক পদার্থ বাহির করিয়াছেন। কটিগণ্ডের রসের পরিবর্ত্তে শুধু এই পদার্থ (অ্যাড্রেনালিন) দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেও রক্তের চাপ ও বেগ বৃদ্ধি হয়। নেশা হইলে, পরিশ্রম করিলে, হর্ষ, বিষাদ, ক্লেশ, ভয় এবং ক্রোধ এই সকল ভাব মনে অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিত হইলে, কটিগণ্ড হইতে অতিরিক্ত রসস্রাব হইয়া রক্ত-মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাতেই ঐ সকল ভাবের সময় হৃৎপিণ্ড দ্রুতবেগে চলে, মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চিত হয়, এবং পেশী সকল সবল হয়। অতিরিক্ত হর্ষ, বিষাদ, ভয় অথবা ক্রোধ হইলে, হৃৎপিণ্ড এত দ্রুতবেগে চলিতে পারে এবং মস্তিষ্কে এত রক্ত সঞ্চিত (?) হইতে পারে যে, মানুষের হঠাৎ মারা যাওয়াও অসম্ভব নহে। এই সকল ভাব মনে অনেকবার উৎপন্ন হইলে, কটিগণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ রসের স্রাব হইয়া রক্ত-মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং বহুবার অতিরিক্ত মাত্রায় রসস্রাব হইতে হইতে ঐ গণ্ড দুর্ব্বল ও ক্রমে ক্রিয়াহীন হইয়া উঠে। মানুষ পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে হঠাৎ মারা না গেলে, এইভাবে কটিগণ্ড দুর্ব্বল ও প্রায় রসশূন্য হওয়ার ফলে, মানুষ ক্রমে অবসন্ন ও নিরুদ্যম হইতে পারে; জীবনীশক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে পারে; অবশেষে এভাবেও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল মেরুদণ্ডী জীবেরই কটিগণ্ড আছে। নিম্নতম মেরুদণ্ডী জীব হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যে যে আশ্চর্য্য বিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে জীবন-সংগ্রামের প্রভাব ছিল। সম্পূর্ণ থাকুক বা আংশিক থাকুক, ছিল। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে জীবগণকে অনেক সময়ে আক্রমণ করিতে হইয়াছে, অনেক সময়ে পলায়নও করিতে হইয়াছে। এই উভয় স্থলেই কটিগণ্ড হইতে প্রচুর রসক্ষরণ হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে। কারণ, আক্রমণ অথবা পলায়ন করিতে হৃৎপিণ্ড সবেগে চলা আবশ্যক হইয়াছে, পেশী সকল সবল হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, যকৃত হইতে রক্তমধ্যে অধিক মাত্রায় শর্করা-ক্ষরণ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, মস্তিষ্কে অধিক রক্ত যাওয়া আবশ্যক হইয়াছে এবং শ্বাস দ্রুতবেগে চলা আবশ্যক হইয়াছে। এ সকলই অধিক মাত্রায় কটিগণ্ডের রসক্ষরণের ফল। সুতরাং কটিগণ্ডের কেন্দ্র হইতে রসক্ষরণ হওয়া জীববিবর্ত্তনে অত্যাবশ্যক হইয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই গণ্ডের কেন্দ্র হইতে যত অধিক রসক্ষরণ হইয়া রক্ত-সহযোগে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পেশী প্রভৃতি আবশ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উত্তেজিত অথবা কর্ম্মঠ করিয়াছে, ততই জীবন-সংগ্রামের সাহায্য হইয়াছে। ইহাতে এক পক্ষ আক্রমণ করিয়াছে, অপর পক্ষ পলায়ন করিয়াছে অথবা হত হইয়াছে। যুগ-যুগান্তর হইতে এ গণ্ডের ঈদৃশ ক্রিয়া চলিয়া আসায় উহা বংশগত হইয়াছে। এস্থলে বিড়াল ও ইঁদুরের কথা স্মরণ করুন। ইঁদুর বিড়ালকে দেখিলেই পলায়ন করে; বিড়ালও ইঁদুরকে দেখিলেই আক্রমণ করে। ইহাকে আমরা উভয়েরই সহজ জ্ঞান (১) বলি। কিন্তু ঈদৃশ সহজ জ্ঞানের মূলে কটিগণ্ডের রসস্রাব হেতুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আক্রমণ অথবা পলায়নের পূর্ব্বে কটিগণ্ড হইতে রসস্রাব হইয়া উহা মস্তিষ্কে, পেশী-মধ্যে, হৃদ্‌পিণ্ডে ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত সংযোগে আসিয়া উপস্থিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। আক্রমণের অথবা পলায়নের ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কটিগণ্ডের কেন্দ্রের রস আসিয়া উপস্থিত

(১) Instinct.

হইয়াছিল। তাহাতেই আক্রমণ অথবা পলায়ন সম্ভবপর হইয়াছিল। ভাব মস্তিকে উদয় হয়। পরে যথাযোগ্য স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া সেই উত্তেজনার ফল পেশীতে পৌঁছাইয়া দেয়। তৎপরে আক্রমণ অথবা পলায়নের ভাব কার্য্যে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিড়াল অথবা ইঁদুরের আক্রমণ অথবা পলায়ন যদিও এক্ষণে সহজ জ্ঞানের মত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এ সহজ-জ্ঞান, ভাবজনিত স্নায়ুপেশীর কর্ম্ম; সুতরাং মূলতঃ কটিগণ্ডের কেন্দ্ররসের ফল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই গণ্ডের রসই বংশপরম্পরায় স্বকর্ম্ম সাধন করিতে করিতে বর্ত্তমান সময়ের সহজ-জ্ঞানের জন্ম দিয়াছে। কটিগণ্ডের রস শক্তিকে কর্ম্মে প্রয়োগ করে। এই কথাই এরূপ ভাবেও বলা যায় যে, অধিক কর্ম্ম করিতে গেলে, অধিক শক্তি-ব্যয়ের কারণ হইলে, কটিগণ্ডের রসও অধিক ক্ষরিত হওয়া আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান যুগে জীবন-সংগ্রামের যেরূপ প্রাবল্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নানাবিধ কর্ম্মসাধন করিতে না পারিলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকলেরই বিশেষতঃ বাণিজ্য-তৎপর ও সংগ্রাম-প্রিয় ব্যক্তিগণের কটিগণ্ড সর্ব্বদা অতিরিক্ত রসক্ষর হেতু ক্রমেই অধিক দুর্ব্বল এবং ক্রিয়াহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে, আর কিছু না হইলেও, কেবল এই কারণ বশতঃই, ঐ ভাবের ব্যক্তিগণ অথবা ঐ ভাবের জাতি সকল অনতিবিলম্বেই এতদূর অবনত হইয়া পড়িবে যে, ইহারা পরিণামে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইয়োরোপ আমেরিকায় স্নায়বিক অবসাদ, (২) উন্মত্ততা, রক্তের বেগবৃদ্ধি, (৩) বুকের ধক্‌ধকাণি অথবা হৃদরোগ এবং শিরোঘূর্ণন এত অধিক দেখা যাইতেছে যে, তৎ তৎ দেশবাসী জাতিগণ সময় থাকিতে সাবধান না হইলে, তাহাদিগের অধঃপতন অনিবার্য্য। শাস্তিতে জ্ঞান-চর্চ্চা, দেশরক্ষা, কৃষি-বাণিজ্য এবং সেবা—এ সকলকেই শুধু বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, ইয়োরোপ আমেরিকার ন্যায় অধঃপতন সকলেরই হইবে। দৈহিক অবনতি, নৈতিক অবনতি, ধর্ম্মহীনতা এ সকলই এ পথের চিরসঙ্গী। অতিরিক্ত মাত্রায় কটিগণ্ডের রসক্ষরণ এ সকলের মূলে বিদ্যমান আছে।

বলিয়াছি, কটিগণ্ডের সহিত স্ত্রীগণের ডিম্বাধারের এবং পুংগণের অণ্ডের বিশেষ সংস্রব আছে। ডিম্বাধার কাটিয়া ফেলিলে স্ত্রীগণের গৌণ (৪) পুংলক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, স্বভাবও কিয়ৎ পরিমাণে পুংবৎ হয়।

পুংগণের অণ্ড কাটিয়া ফেলিলে তাহাদিগের দেহে অনেকগুলি গৌণ স্ত্রীলক্ষণ উৎপন্ন হয়। এ কার্য্য ডিম্বাধার ও অণ্ডের আভ্যন্তরিক রসক্ষরণের মুখ্য ফল। সুতরাং কটিগণ্ডের রসক্ষরণের গৌণ ফল। জীবের প্রথমাবস্থায় লিঙ্গভেদ ছিল না। কাল-সহযোগে বিবর্ত্তনের ফলে জীবগণ মধ্যে লিঙ্গভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি, বিবর্ত্তনের সহিত কটিগণ্ডের রসক্ষরণের নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বিবর্ত্তন এবং লিঙ্গভেদ, এতদুভয়ের সহিতই কটিগণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই গণ্ডের বাহ্যাংশের সহিত লিঙ্গভেদের এবং কেন্দ্রের সহিত বিবর্ত্তনের যোগ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু একটি গণ্ডের রস দ্বারা দেহের ও মনের ক্রিয়া হয় না। বিবিধ গণ্ডের রস রক্ত-সংযোগে বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নীত হইয়া পরস্পরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে; এবং তাহারই মিশ্রিত ফলে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সে সকল কথা আগামী বারে বিবৃত করিব।

(২) Nervous Prostration or Nervous break-down.

(৩) Blood Pressure.

(৪) Secondary sexual character.

ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি হইল না কেন?

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী, এম্-আর-এ-এস্

এক দিন এক বন্ধু হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করেন, "ওহে ভায়া, কৃষিকার্য্যে তো অনেক দিন কাঠ-খড় পোড়াইয়াছ,—আমার একটী প্রশ্নের উত্তর কর তো? আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, ভারতের মুনিঋষিগণ স্বহস্তে যজ্ঞভূমি হল-কর্ষণ দ্বারা সমতল করিয়া লইতেন। এমন কি রাজারাও সময়ে সময়ে হলকার্য্য করিতেন। প্রাচীন কালে লাঙ্গলের পূজা হইত। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলভদ্র দেব তো হল ছাড়িয়া কখনও কোন স্থানে গমনাগমন করিতেন না। তথাপি এদেশে কৃষি-যন্ত্রাদি কিম্বা কৃষিকর্ম্মের কোন উন্নতি হইল না কেন?" উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিলেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রে লাঙ্গলের যে অংশের যে মাপ, এখনও সেই মাপেরই লাঙ্গল প্রস্তুত হয়। চাষ-বাসের কিম্বা শস্যের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও উপলব্ধি করা যায় না। বলা বাহুল্য, প্রশ্ন শুনিয়া থতমত খাইয়া গেলাম। অন্য দেশে যখন কৃষি প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যখন তথায় মনুষ্যগণ মৃগয়াজীবী হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাণধারণ করিত, তখন ভারতের এক শ্রেণীর লোক হলযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং আপনাদিগকে আর্য্য নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কৃষিবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা তাঁহারা এক এক স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জনপদ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষি-অনভিজ্ঞ মৃগয়াজীবী বিক্ষিপ্ত অন্যান্য জাতি আর্য্যের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া অনুর্ব্বর পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর্য্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ এই হল বা কৃষি। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি" এই উক্তি হিন্দুদিগের পরবর্ত্তী সংস্কারের পরিচয় দিতেছে। অজ্ঞতা নিবন্ধন যখন হিন্দুদিগের কৃষির উন্নতির আশা বিলুপ্ত হইল, তখন তাঁহারা বাণিজ্যের উপর লক্ষ্মীর উচ্চ আসন স্থাপন করিয়া কৃষি-উন্নতির চিন্তা দূর করিয়া দিলেন। কৃষিলব্ধ মাল-পত্র লইয়াই বাণিজ্য। কৃষিতে অবহেলা করিয়া পরবর্ত্তী হিন্দুগণ বাণিজ্যেরও

সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অজ্ঞ ও অসংবদ্ধ কৃষকের হাতে কৃষি ন্যস্ত হওয়ায় বর্ত্তমান কালে কৃষি লাভজনক হইতেছে না; কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে কৃষি বাণিজ্য অপেক্ষা কম লাভজনক নহে।

জিজ্ঞাস্য এই যে, আর্য্যভূমে আর্য্যজাতির নিকট কৃষি পূজ্য হইলেও, বর্ত্তমান কালে ভারতে কৃষির অবস্থা অনুন্নত কেন? পক্ষান্তরে ইয়োরোপ ও মার্কিন দেশে, এমন কি চীন ও জাপান দেশেও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি দেখিতে পাই। ইয়োরোপে কৃষিযন্ত্রের কতই না উন্নতি হইয়াছে বা হইতেছে। তথাকার লাঙ্গলের সহিত তুলনায় আমাদের লাঙ্গল খেলনা বিশেষ। আমাদের লাঙ্গলে ৮ বারে যে জমীর পাইট না হয় তাহাদের লাঙ্গলে একেবারেই তাহা হয়। তাহাদের লাঙ্গল ১ ফুট পর্য্যন্ত মাটী খনন করে; আর আমাদের লাঙ্গল দ্বারা ৪ ইঞ্চি খনন করাই সুকঠিন। তাহাদের ১ খানা লাঙ্গল ১ দিনে, আমাদের ১ খানা লাঙ্গলের ৫০ হইতে ১০০ গুণ জমী চাষ দিয়া থাকে। আমাদের বিদে ইয়োরোপের বিদের সহিত তুলনার অযোগ্য। তাহাদের কত রকমের শস্য কাটার, মাড়াইর ও ছাঁটার যন্ত্র আছে, তাহা আমাদের দেশের লোক ইয়ত্তাই করিতে পারিবেন না। ঐ দেশে গাভী ও বলদের কত উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিলে আমাদের দেশের চাষীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। এক একটী গাভী দৈনিক ২০ সের হইতে ১ মণ দুগ্ধ প্রদান করে। যে গাভী হইতে অর্দ্ধমণের কম দুধ পাওয়া যায়, সেই গাভী পালনের অযোগ্য বলিয়া বিদায় করা হয়। পূর্ব্বকালে তাহাদের দেশের গাভীও এতদ্দেশীয় গাভীর ন্যায় ৩.৪ সের করিয়া দুধ প্রদান করিত। কিন্তু গত ২০০ বৎসরের মধ্যে গাভী নির্ব্বাচন ও উপযুক্ত ঘাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর আহারের ব্যবস্থা করিয়া তথায় গোজাতির এইরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমরা এখনও প্রাচীন কালের ন্যায় গোমাতার পূজা করিয়া থাকি কিন্তু গোমাতা যে অনাহারে শুষ্ক হইয়া ও অযত্নে মড়ক লাগিয়া ধ্বংস হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি না। গোচারণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার ফল, দুগ্ধাভাবে শিশুগণ দিনদিন ক্ষীণজীবী হইয়া পড়িতেছে।

সার সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান প্রাচীন কালের ন্যায় অনগ্রসর। প্রাচীন কাল হইতে গোবর সারই চলিত হইয়া আসিয়াছে। খৈল সারও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিচিত নহে। হাড় চূণ সোডা প্রভৃতির সার অল্প দিন হইল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা উহা ব্যবহার করি না বলিয়া হাজার হাজার মণ এই সার বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে ও ভারতবর্ষের উর্ব্বরতা নষ্ট হইতেছে। জমীর উর্ব্বরতা রক্ষা কিম্বা বৃদ্ধি করা আমাদের সাধ্যাধীন এ কথা আমাদের চাষীদিগের চিন্তার অতীত।

ভারতবর্ষে যে কেবল কৃষির দুরবস্থা ঘটিয়াছে, আর অন্যান্য শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সব এক অবস্থায় শায়িত। উন্নতিশীল জাতির সব দিকেই উন্নতি। আর্য্য-সভ্যতা যখন উচ্চতম সোপানে আরূঢ় ছিল, তখন ভারতবর্ষের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতিশীল ছিল। যখন ভারতবর্ষে আর্য্যগণ তাঁহাদের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করিলেন, যখন তাঁহাদের আর প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ রহিল না এবং যখন তাহাদের ধন ও ঐশ্বর্য্যের কোন অভাব রহিল না, তখন তাঁহারা অর্থকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি পেশা সমাজস্থ ভালমানুষদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞগণ ধর্ম্মচিন্তা ও শাস্ত্র প্রণয়নে, এবং বলিষ্ঠ ও যুদ্ধ-নিপুণ ব্যক্তিগণ রাজকার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ ধর্ম্মকার্য্য, রাজকার্য্য, কৃষি-শিল্পকার্য্য সব ব্যক্তিগত হইয়া দাঁড়াইল এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইল। কৃষি শিল্প-পরিচালক ভালমানুষের দল বৈশ্যগণ পাঠাদি শিক্ষা গ্রহণ হইতে বিমুক্ত হইয়া অজ্ঞতা-তিমিরে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আর্য্যদিগের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী হইয়া স্বাধীন চিন্তা বিসর্জ্জন দিলেন। সাধারণ শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার অভাবে তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক কৃষিশিল্পের আর উন্নতি ঘটিল না, পিতৃপুরুষদিগের অনুকরণই তাহাদের কৃষি-শিল্প শিক্ষার চূড়ান্ত হইয়া রহিল। কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা জাতিগত হওয়াতেই আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের বর্ত্তমান কালোপযোগী উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে নাই। আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইয়োরোপের উন্নতি যৌথ-কারবার দ্বারা কল-কারখানা স্থাপন এবং উহাতে কৃষি-শিল্পের জন্য যন্ত্রাদি প্রস্তুত করণ। এই যন্ত্রাদির সাহায্যে কৃষি-শিল্প সুলভে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই যৌথ-কারবার গঠন ও চালাইবার জন্য প্রচুর অর্থ ও বুদ্ধির দরকার। ভারতের যাহারা মস্তক স্বরূপ সেই উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে উদাসীন। সমাজের অজ্ঞ ও অপদস্থ লোক দ্বারা কৃষি-শিল্পের অধিক উন্নতি আর কি হওয়া সম্ভব?

শিশুদের যকৃৎ-রোগ

অধ্যাপক মেজর ডি, বি, গ্রিণ আর্ম্মিটেজ, এম্-ডি, এম্-আর-সি-পি, (লণ্ডন)—আই-এম্-এস্

(শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল বি-এস্‌সি-অনূদিত)

শিশুদের যকৃৎ-রোগের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ, চিকিৎসা, ও পরিণতি সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য অনেকবার অনুরুদ্ধ হইয়াছি; তাই আজ এই রোগ সম্বন্ধে দু চারি কথা বলিব।

গত সাত বৎসরের মধ্যে এই রোগে কঠিনভাবে আক্রান্ত ৬৩টি রোগী আমার হাতে আসিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি ইহার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছি। এই ৬৩টি রোগীর মধ্যে ২০টি ইউরোপীয়ান অথবা এংলো-ইণ্ডিয়ান, ৩টি হিন্দু এবং ৬টি মুসলমান। প্রায় সকল রোগীর বয়সই পাঁচ মাস হইতে সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে ছিল। মাতৃস্তন্যপায়ী সতেরোটি শিশুর মধ্যে ১২টি স্ব স্ব

জননীর একাধিক গর্ভের সন্তান। বাকী সব স্থলেই যদিও শিশুরা অতি অল্প সময়ের জন্তই স্তন্যপায়ী ছিল, তবু তাহাদের উপযুক্ত খাদ্যের মধ্যে ভুল ত্রুটির অন্ত ছিল না। অনেক সময়ই দেখা যায়, রুক্ষ মেজাজের শিশুকে সাময়িকভাবে শান্ত করিবার জন্ত জননী ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদের হাতে মিষ্টি, জিলিপি, রসগোল্লা প্রভৃতি তুলিয়া দেন। আমার ৩০টি রোগীরই, এবম্প্রকার খাদ্য অথবা নানা পেটেণ্ট ফুড, নিয়মিত খাদ্য ছিল।

সুতরাং শিশুর পরিপাক-শক্তি যে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরিপাক-শক্তির অভাবে যকৃতের উপর যথেষ্ট বেশী কাজের ভার পড়ায় প্রথমে যকৃৎ মধ্যস্থ কোষগুলি (Hepatic Cells) প্রত্যেকটি বড় হয় এবং তাহাতে রক্ত জমাট (Congestion) হওয়ার দরুণ সমস্ত যকৃৎটিই খুব বড় হয়। পরে ঐ কোষগুলির চারিদিকে সুতার মত এক প্রকার বৃংহতন্ত্র (Fibrosis) জন্মে এবং তাহাতেই সমস্ত যকৃৎটি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

আমার মতে নিম্নলিখিত কারণেই এই রোগের উৎপত্তি হয়।

(১) শিশুর জন্মের পূর্ব্বে প্রসূতি যদি নিজের খাদ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক না হন, তাহা হইলে জন্ম হইতেই শিশুর এই রোগের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ থাকে। এটা অনেকেই স্বীকার করেন যে শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে 'এণ্ড্রক্রিনে'র যে সম্বন্ধ, 'এণ্ড্রক্রিনে'র সঙ্গে 'ভিটামিনের'ও সেই সম্বন্ধ। ইহা হইতে অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে জননীর খাদ্যে 'ভিটামিনে'র অল্পতা হেতু মার দুধেও 'ভিটামিন' কম থাকে এবং শিশুর গ্রন্থিমণ্ডল (Endocrine system) যাহা ২—৫ মাসের ভিতর কার্য্যক্ষম হয়, তাহার উপরও এই খাদ্যের অনিষ্টকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) দুগ্ধবতী জননী প্রায়ই রক্তশূন্যতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও দাঁত হইতে পুঁয পড়া রোগে ভুগিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সময়েই তাঁহার শরীরে বিষ ঢুকে, আবার সময় সময় এই বিষের ক্রিয়ার ফলেই উপরিউক্ত অসুখগুলি হয়। ইহার ফলে, শিশু জননীর স্তন হইতে যে দুধ খায় তাহাতে প্রায়শঃই গ্রন্থিমণ্ডলের উত্তেজক রস (Hormone) চুণ, লোহা, ফস্ফরাস, আইডিন ইত্যাদি অতি অল্প থাকে এবং এই অল্পতা-নিবন্ধনই শিশুর উদরাময় ও যকৃতের দোষ ঘটে।

(৩) যে সকল শিশু সর্ব্বদা পেটেণ্ট ফুড খায়, অথবা জনক জননীর নিকট হইতে যাহা তাহা খাইতে পায় প্রায়শঃ ইহাদেরই এই অসুখ হয়। এই সকল শিশুর অনেকেই পরিমাণে বেশী খায় এবং তাহাতে যকৃৎ, পেনক্রিয়াস (Pancreas) ও অন্ত্রমধ্যস্থ গ্রন্থি (Intestinal Glands) গুলির উপর এত কাজের চাপ পড়ে যে শরীরে বিষ না জন্মিয়া পারে না; এই কারণেই যকৃৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় শিশুর জিহ্বা অতি অপরিষ্কার এবং বাহ্যি দেখিয়া মনে হয় যে, তাহার যকৃতের শর্করা জাতীয় খাদ্য (carbohydrate) হইতে শরীর সংগঠনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলেও শিশুকে 'কড্‌লিভার অয়েল', সর, ঘি, সন্দেশ, চকোলেট, প্রভৃতি খাইতে দেওয়া হয়; কিন্তু শিশু কিছুই খাইতে চায় না। এই বিষের প্রক্রিয়ার দরুণ যকৃতের মধ্যে এক প্রকার প্রদাহ (inflammation) হইতে থাকে; তাহারই ফলে যকৃত বড় হইয়া উঠে; এবং যদি যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হয়, তাহা হইলে শিশুর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে।

(৪) প্রায়ই দেখা যায়, ভারতবর্ষে, বৎসরের মধ্যে অনেক কাল গরু ছাগল প্রভৃতি শুধু শুষ্ক ঘাস খাইতে পায়, এবং মাঠে ঘাস শুকাইয়া যাওয়াতে চরিয়া খাইবার সুবিধা হয় না। এইজন্ত গো ও ছাগ দুগ্ধে দুগ্ধপায়ী শিশুর আবশ্যকমত লবণ (salts) ও 'এণ্ড্রক্রিন' থাকে না। এটিও এই রোগের উৎপত্তির অন্যতম কারণ।

রোগ লক্ষণ :—প্রথমেই এটুকু বিশেষভাবে বলিয়া রাখি যে এই রোগ প্রায়শঃই অতি ধীরে ধীরে রোগীকে আক্রমণ করে এবং অধিকাংশ স্থলেই রোগের প্রকোপ খুব বেশী হয় না। সৌভাগ্যক্রমে জননী ও চিকিৎসকের এটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে যখন শিশু কিছুই খাইতে চায় না ও তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠে—প্রকৃতিই তাহার আহার বন্ধ করিয়া, তাহাকে উপযুক্ত বিশ্রাম লাভের অবসর দিয়া—আরোগ্য করিবার চেষ্টা করে।

অনেক সময় ইউরোপীয়ান শিশুকে দেখিবার জন্ত আহূত হইয়া দেখিয়াছি,—এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত রোগে এক সপ্তাহ কি দশাহ অর্দ্ধাশনে রাখিয়া অল্প পরিমাণে নিয়মিতভাবে পথ্য ও প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। এই উপায়ে বেদনাযুক্ত বৃহৎ যকৃৎ ছোট হইয়া পড়ে এবং প্রকৃতির রোগ আরোগ্যের নিজস্ব ক্ষমতা যথেষ্ট সাহায্যলাভ করিয়া থাকে। একটা কথা আছে "ভাল কিছু পাইতে হইলে, খারাপ কিছুও নিতে হয়।" এই সকল স্থলে এই পুরাতন প্রবাদের অনুবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। এটুকুও স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন শিশু কি কোন প্রাণীই এক সপ্তাহ অর্দ্ধাশনে থাকিলে এমন বিশেষ কিছু রুগ্ন হইয়া পড়ে না।

রোগের প্রথম অবস্থাতে অল্প অল্প জ্বর হয়, জ্বর চড়ে না, সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে ও কাল দুর্গন্ধযুক্ত বাহ্য হয়। শিশুর ক্ষুধা থাকেনা, এবং রুক্ষ মেজাজে খাদ্য ফেলিয়া দেয়। রোগী বিছানায় শুইয়া ছটফট্ করিতে থাকে এবং প্রায়ই উপুড় হইয়া পেটের উপর শুইয়া থাকে। প্রস্রাব পরিমাণে অল্প ও ঘোলাটে রকমের হয়, এবং তাহাতে 'ইণ্ডিকান' ও 'এসিটোন' থাকে। জননী প্রায়ই লক্ষ্য করেন যে শিশু ওজনে কমিয়া যাইতেছে, তাহার পেশীগুলি ঝুলিয়া পড়িতেছে এবং মুখ ফ্যাকাশে ও রক্তশূন্য হইয়া যাইতেছে।

অন্যান্য চিহ্ন :—যকৃৎ প্রথমেই বেশ বড় হয় ও বক্ষপঞ্জর হইতে তিন ইঞ্চি অথবা ততোধিক নীচে নামিয়া পড়ে। যখনই তাহার উপর হাত দেওয়া যায় শিশু কাঁদিয়া উঠে। চক্ষুর শ্বেতাংশ ঘোলাটে রংএর হইয়া যায় ও পরে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। শরীরের ত্বক শুষ্ক ও কুঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলেই পা ফুলিয়া যায়। রোগের চরম অবস্থায় যকৃৎ ছোট হইয়া পড়ে ও উদরী রোগ দেখা যায়।

একটি সাত মাসের রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

তাহাতে কোন বীজাণু পাওয়া যায় নাই। মল পরীক্ষায় শুধু পিত্ত (Bile salts) এবং তৎবর্ণ সামগ্রী (Bile Pigment), যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বি এবং অপরিপক্ব খাদ্যাবশেষ ছাড়া কোন স্থলেই অস্বাভাবিক বীজাণু কি তাহাদের অণ্ডকোষ (ova) প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই।

রোগ নির্ণয় :—এই রোগ নির্ণয় করা অতি সহজ। প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করার সময়, ইহা কালাজ্বর, গরমী কি ম্যালেরিয়া ঘটিত যকৃৎ রোগ কি না, বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অনেক স্থলেই আমাকে রোগীর পরামর্শদাতা রূপে ডাকার পূর্ব্বে, রোগীকে কুইনাইন অথবা ইহা হইতে প্রস্তুত ঔষধাবলী, কিংবা গ্রে পাউডার (Grey Powder) খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। চিকিৎসক ও জননী প্রায়ই শিশুকে গ্রে পাউডার দিতে একটুও ভাবেন না—কিন্তু ইহাতে অনেক স্থলেই রোগীর অনিষ্ট হয়।

আমার মতে, এই রোগ, শুধু সান্নিপাতিক জ্বরের জীবাণু জাতীয় জীবাণু দ্বারা কোন রোগ বিশেষ বলিয়াই ভুল হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত রোগে জ্বর সর্ব্বদাই বেশী থাকে এবং রোগের প্রকোপ প্রথমাবধিই খুব বেশী হয়। কিন্তু শিশুদের সঙ্কুচিত যকৃৎ রোগ প্রায়ই অতি ধীরে ধীরে আক্রমণ করে এবং অনেক মাস ব্যাপিয়া রোগীকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিতে থাকে।

রোগ নির্ণয়ে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া খুবই আবশ্যক। যদিও এই রোগ 'রিকেট' রোগের মতই খাদ্য হইতে শরীর বৃদ্ধির ক্ষমতার অভাব হইতেই উদ্ভূত হয়, তবুও ইহাকে 'রিকেট' বলিয়া অবহেলা করা উচিত নয়। অনেক সময়েই ধাত্রী ও চিকিৎসকেরা, রোগীর জিহ্বা অপরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও রোগীর জন্য 'কড্ লিভার অয়েল', 'অষ্টলিন', 'ভিরল' প্রভৃতি 'ভিটামিন এ' সম্পন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। ফলে, রোগী ভয়ানক বমি করিতে থাকে এবং কয় সপ্তাহ এমন কি কয়দিনের ভিতরই রোগে একেবারে অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।]

চিকিৎসা :—যদি রোগের কারণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকে, এবং রোগের প্রথম অবস্থাতেই, উদরী ও রক্তশূন্যতা লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব্বে, উপযুক্ত চিকিৎসা হয়, তাহা হইলে শতকরা ৭০টি স্থলেই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

রোগ নিবারণের উপায় :—গর্ভাবস্থায় জননীকে খাদ্য সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রত্যেক গর্ভবতী জননীর জন্য নিম্নলিখিত খাদ্যগুলির ব্যবস্থা করা বিধেয়। অবশ্য রক্তশূন্যতা ও শরীরে চূণ জাতীয় পদার্থের অল্পতার জন্য আবশ্যক মত 'কড্ লিভার অয়েল', ও 'পেরিস ফুড' (Parish's food) এর সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে।

খাদ্য :—(১)

(ক) ওট্ মিল পরিজ (Oat meal porridge), দুধ, আটার রুটি, টোষ্ট, বিস্কুট ইত্যাদি।

(খ) শাকসব্জী—যে কোনরূপ দেওয়া যাইতে পারে, শুধু ভাজা নয়।

(গ) ফলমূল—টাট্‌কা অথবা সিদ্ধ ; যে কোন ফলমূল দেওয়া চলে।

(ঘ) মাংস—একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। মাংসের ঝোলও অপকারী।

(ঙ) পক্ষীর মাংস—রাজহাঁস, পাতিহাঁস, অথবা অন্যান্য—শিকার করা পক্ষীর মাংস বর্জ্জনীয়।

(চ) মাছ—ইলিশ বোয়াল প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য মৎস্য দেওয়া চলে।

(ছ) ডিম—দেওয়া যাইতে পারে।

(জ) সুপ—সব রকমের সুপই দেওয়া চলে, কিন্তু ঐ সুপ ঘন, পরিষ্কার ও চর্ব্বিশূন্য হওয়া উচিত।

(ঝ) মিষ্টি—'জাম' 'জেলি', মধু প্রভৃতি (বিশুদ্ধ খাঁটি মধু খুবই উপকারী)। দুধের পুডিং, মোহনভোগ, পিষ্টক ইত্যাদি বর্জ্জনীয়।

(ঞ) বেশী মশলাযুক্ত তরীতরকারী নিষিদ্ধ।

(ট) পানীয়—জল, 'সোডা ওয়াটার' বাড়ীতে প্রস্তুত 'লেমনেড্,' 'ওরেঞ্জেড,' লঘু চা, কফি ও আবশ্যকমত দুধ দেওয়া যাইতে পারে। মদ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

ইচ্ছা হইলে মাখন দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেশী দেওয়া উচিত নয়। সর, চর্ব্বি, মাংস ও বেশী ভাজা মাছ, একেবারে বর্জ্জন করা উচিত।

প্রত্যহ দুইবার ফলমূল ও শাকসব্জী খাওয়া আবশ্যক। মাংস দুই দিন অন্তর একবারের বেশী কখনই দেওয়া উচিত নয়।

'St. Ivel'এর মত স্নিগ্ধ পানীয় (cheese) দেওয়া যাইতে পারে।

(২) যতদিন শিশু স্তন্যপায়ী থাকে, ততদিন জননীকে খাদ্য সম্বন্ধে উপরিউক্ত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিতে হইবে। ইহাতে স্তন দুগ্ধে চূণ, লোহা, ফস্ফরাস্, আইডিন্, লবণ এবং অন্যান্য গ্রন্থিরস পরিবর্দ্ধক সামগ্রী (Hormone) বর্দ্ধিত হইবে। জননী একাধিক সন্তানের প্রসূতি ও রক্তশূন্য হইলে, তাঁহার জন্য 'কড্ লিভার ওয়েল', 'অষ্টলিন' ও 'পেরিস' খাদ্য ব্যবস্থা করা উচিত।

(৩) যখন শিশু স্তন্য পান ত্যাগ করিয়া গো কি ছাগ-দুগ্ধ খাইতে আরম্ভ করে, তখন গরু ও ছাগলের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কাঁচা ঘাসই এই সকল জন্তুর উপযুক্ত খাদ্য। ছাগলের এতাদৃশ খাদ্যের ব্যবস্থা করা অতি সহজ, এবং ছাগলকে পরিষ্কৃতভাবে অনায়াসে দোহন করা যায়। এই জন্যই আমি সকলকে গৃহে ছাগল রাখিতে অনুরোধ করি।

(৪) পেটেণ্ট খাদ্য, সন্দেশ, চকোলেট, রসগোল্লা, ঘৃত প্রভৃতি গুরুপাক্য খাদ্য একেবারে বর্জ্জন করা উচিত। এটুকু স্মরণ রাখা উচিত যে শর্করাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে, মধু ও পাকা ইক্ষুর রস সহজে পরিপাক হয়, কিন্তু সন্দেশ প্রভৃতি হজম করা শক্ত। এই জন্যই এগুলি দেওয়া উচিত নয়।

(৫) ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কমলা, আনারস, আম, আঙুর, ডালিম প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রত্যেক শিশুকেই এই সকল ফলের রস, প্রত্যহ ন্যূনকল্পে দুই কি তিন আউন্স করিয়া দেওয়া উচিত।

(৬) প্রাতে ও অপরাহ্ণে সূর্য্যের তাপে 'আলট্রা ভায়োলেট' রশ্মি (ultra violet raep) প্রচুর পরিমাণে থাকে। এইজন্য, ভারতীয় কি ইউরোপীয় প্রত্যেক শিশুকে প্রাতে ৬টা—৯টা ও অপরাহ্ণে ৩টা—৬টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পারদ বাষ্পযুক্ত কোয়ার্জ দীপ (Mercury Vapour Quartz Lamp) হইতে শিশুর উপর ১০—২০ বার 'আ্যালট্রা-ভায়োলেট' রশ্মি নিক্ষেপ করা উচিত।

(৭) এটুকু মনে রাখা উচিত—মুরগীর ঝোল (Chicken Broth) খাদ্যের কাজ করে না; শুধু দেহে পিউরিন (Purin) নামক দ্রব্যের উদ্ভবের সহায়তা করে—। শাকসব্জীর ঝোলে, পোনর মিনিটের বেশী সিদ্ধ না হইলে, যথেষ্ট পরিমাণে 'ভিটামিন সি' 'ফস্ফরাস', 'সোডিয়াম', 'পোটাসিয়াম', লোহা, 'মেগনেশিয়াম্', 'আইডিন' প্রভৃতি থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, ইউরোপের তুলনায় মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে সার না থাকায়, শাকসব্জীতে উপরিউক্ত ধাতুর লবণ (metallic Salts) এবং আইডিন অল্প থাকে।

রোগ-চিকিৎসা :—জামা কাপড় খুলিয়া শিশুকে প্রত্যহ রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা উচিত। যদি শিশু হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে, তাহা হইলে, তাহাকে নগ্নদেহে, পূর্ব্বোক্তমত প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে রৌদ্রে ছুটাছুটি করিতে দেওয়া উচিত। রোগীর খাদ্যে যাহাতে চর্ব্বি না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অত্যধিক পরিশ্রান্ত, রক্তপূর্ণ (congested) যকৃতের কর্ম্ম লাঘব করিবার জন্য চর্ব্বিহীন খাদ্য একান্ত আবশ্যক।

প্রথম দিন :—শুধু বার্লির জল, অথবা চাল সিদ্ধ জল, আবশ্যক মত এক পাইন্ট জলে ½ গ্রেণ চিনি মিশাইয়া মিষ্ট করিয়া দিলেই চলিবে।

দ্বিতীয় দিন :—মাখন তোলা দুধ (যাহাতে চর্ব্বি থাকে না) দেওয়া যায়।

একটা ছোট 'এনামেল ডুসে'র পাত্রে কিয়ৎপরিমাণে সদ্যঃ দুগ্ধ ঢালিয়া, একটা ছিপি দিয়া নলের মুখ বন্ধ করিয়া, ঐ দুগ্ধ আধ ঘণ্টা অল্প উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। তারপর ঐ দুধ ঢালিয়া, বরফের উপর অথবা কোন ঠাণ্ডা যায়গায় ২—৩ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে দুধের সমস্ত চর্ব্বি উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তখন নলের মুখ খুলিয়া নীচের তিনভাগের দুইভাগ দুধ একটি পরিষ্কার পাত্রে ঢালিয়া লইতে হইবে। এই নীচের দুধে মাখন মোটেই থাকে না। এই উপায়ে অতি সহজে দুধ হইতে মাখন উঠাইয়া লওয়া চলে।

প্রথমে এই মাখন-তোলা দুধ একভাগে তিনভাগ জল মিশাইয়া দিতে হইবে। পরে আস্তে আস্তে দুধের পরিমাণ বাড়ান উচিত।

কি পরিমাণে দুধ দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে এটুকু মনে রাখা উচিত যে, জীবন ধারণের জন্য একটি শিশুর পক্ষে শরীরের প্রত্যেক পাউণ্ড (প্রায় আধসের) ওজনের জন্য দৈনিক দেড় আউন্সের বেশী আবশ্যক হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই যকৃৎ রোগের সমস্ত লক্ষণ ও উপলক্ষণ যুক্ত ৯ মাস বয়স্ক একটি শিশুকে আমার কাছে আনা হইয়াছিল। শিশুটি ওজনে ১২ পাউণ্ড, সুতরাং তাহার পক্ষে ১৮ আউন্স দুধ আবশ্যক। নিম্নলিখিত উপায়ে আমি তাহার খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

মাখন তোলা দুধ দুই আউন্স ও ছয় আউন্স জল দিনে তিনবার করিয়া দিতে হইবে।

৩য় দিন—মাখন তোলা দুধ ২½ আউন্স ও জল ৫½ আউন্স।

৪র্থ দিন— " ৩ " " ৫ " ।

৫ম দিন— " ৩½ " " ৪½ " ।

৬ষ্ঠ দিন— " ৪ " " ৪ " ।

৭ম দিন— " ৪½ " " ৩½ " ৩½ ঘণ্টা অন্তর।

৮ম দিন— " ৫ " " ৩ " " ।

৯ম দিন— " ৫½ " " ২½ " " ।

১০ম দিন— " ৬ " " ২ " ৪ ঘণ্টা অন্তর।

১১শ দিন— " ৬½ " " ১½ " " " ।

১২শ দিন— " ৭ " " ১ " " ।

১৩শ দিন— " ৭½ " " ½ " " ।

১৪শ দিন— খাঁটি দুধ ৪½—৫ ঘণ্টা অন্তর।

(১) প্রথম দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত খাদ্যের মাঝে মাঝে ২-৪ আউন্স পরিমিত ফলের রস দেওয়া উচিত।

(২) শিশুর দাঁত ও মুখ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

(৩) দুইবার খাওয়ার মাঝামাঝি সময়ে রোগী যতটুকু চায়, জল খাইতে দেওয়া উচিত, কিন্তু সোডা ওয়াটার কি সরবৎ খাইতে দেওয়া কখনই উচিত নয়।

(৪) চতুর্থ দিনে, প্রত্যেকবার এক চামচ মেলিন্সফুড মিশান উচিত। সপ্তম দিনে দেড় চামচ ও দশম দিন দুই চামচ করিয়া মিশাইতে হইবে।

(৫) রোজ রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার করা উচিত। সম্ভবপর হইলে 'মিল্ক অব্ ম্যাগনেশিয়া' অথবা 'প্যারাফিন' এক চামচ করিয়া দিয়া যাহাতে দিনে দুইবার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহাই করা উচিত।

(৬) পিত্তবর্দ্ধক কিছু দিবার আবশ্যক হইলে, 'এটফান', জার্ম্মেণীর কার্লস্বাড্ পাউডার, সোডা সেলিসিলাস্ (Atophan, German Carlebad powder, Sodi Salicylas) প্রত্যেকটি তিন গ্রেন নিদ্রার পূর্ব্বে অথবা দিনে দুইবার করিয়া দিলে সুফল পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে হাইড্রার্জ কাম ক্রিটা (Hydrag cum creta) দেড় গ্রেণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এক পাইন্ট জলে ১ গ্রেণ পটাস্ পারমেঙ্গানাস্ (Potas Permenganas) গুলিয়া তাহা দিনে দুইবার আস্তে আস্তে গুহ্যপথে ডুস্ দিলে উপকার হয়।

১৪—২১ দিন শিশুকে শুধু খাটি মাখন তোলা দুধ এবং মেলিন্স ফুড্, তিন চামচ করিয়া দিতে হইবে। উপরিউক্ত নিয়মে মেলিন্স ও এলেনবারী ফুড্ও দেওয়া যাইতে পারে।

২১শ দিন—মাখম তোলা দুধ ৭ আউন্স দুধ এক আউন্স ৪½-৫ ঘণ্টা অন্তর

২২শ	„—	„	৬½	„	„	১½	„	„
২৩শ	„—	„	৬	„	„	২	„	„
২৪শ	„—	„	৫½	„	„	২½	„	„
২৫শ	„—	„	৫	„	„	৩	„	„
২৬শ	„—	„	৪½	„	„	৩½	„	„
২৭শ	„—	„	৪	„	„	৪	„	„
২৮শ	„—	„	৩½	„	„	৪½	„	„
২৯শ	„—	„	৩	„	„	৫	„	„
৩০শ	„—	„	২½	„	„	৫½	„	„
৩১শ	„—	„	২	„	„	৬	„	„
৩২শ	„—	„	১½	„	„	৬½	„	„
৩৩শ	„—	„	১	„	„	৭	„	„
৩৪শ	„—	„	½	„	„	৭½	„	„

৩৫শ „— শুধু খাটি দুধ।

দুই সপ্তাহ পরে আগের মতই খাদ্য দিতে হইবে তবে, দিনে দুই একবার দুধের পরিবর্ত্তে মাছের অথবা শাক সজ্জীর ঝোল দেওয়া উচিত। আমি, চতুর্দ্দশ দিবস পরে, শরীর গঠনের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রত্যহ দুইবার করিয়া 'থাইরয়ড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট' (Ext. Theyroid sic) ½ গ্রেণ দেওয়ার পক্ষপাতী। ম্যাক্‌কেরিসনের ভাষায় ইহাকে 'জল সিঞ্চন দ্বারা, অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি' বলা যাইতে পারে।

এইরূপে চিকিৎসার পর শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হয়, ও যকৃতের দোষ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। সময় সময় অনুপযুক্ত খাদ্যের জন্য নানা অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ আরোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া রোগীর খাদ্যের পরিমাণ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

যখন জিহ্বা ও চক্ষু পরিষ্কার হইয়া যায়, তখন প্রত্যহ একটি ডিমের আভ্যন্তরীণ কুসুমের এক-চতুর্থাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কুসুমটি পর্য্যন্ত দেওয়া চলে। পরে কড়লিভার অয়েল ৫—১৫ ফোঁটা, দিনে তিনবার অথবা 'অষ্টিলিন' প্রথম সপ্তাহে—এক ফোঁটা করিয়া দিনে দুইবার, দ্বিতীয় সপ্তাহে—দু ফোঁটা করিয়া ও তৃতীয় সপ্তাহে—তিন ফোঁটা করিয়া মধু অথবা দুধের সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে।

ভাত, মাখন, অথবা ঘী অনেকদিন পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত নয়। ইউরোপীয় রোগীদিগকে মাংস অথবা বেশী মশলাযুক্ত খাদ্য দেওয়া অবিধেয়। মাছের ডিম, সিদ্ধ মাছ, অথবা অল্পসিদ্ধ মুরগীর মাংস ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যায়।

রোগের গতি নিরূপণ :—যদি রোগের প্রথম অবস্থাতেই ডাক্তার ডাকা হয় এবং পিতামাতা সুবিবেচনার সহিত উপরিউক্ত উপদেশ মানিয়া চলেন, তাহা হইলে ৬—১০ সপ্তাহের মধ্যে অসুখ ভাল হয়। কিন্তু যদি পিতামাতা কি শিশুর পরিচারিকা, শিশুর রুক্ষ মেজাজ শান্ত করিবার জন্য অথবা তাহার আব্দার পুরণের জন্য উপরিউক্ত নিয়ম পালন করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করেন—তাহা হইলে পুনরায় অসুখ হওয়া অনিবার্য্য।

রোগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিস্, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া অথবা ফোঁড়া প্রভৃতি দেখা দিলে, রোগ প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। রোগের শেষ অবস্থায় প্রায়ই পাণ্ডুরোগ ও উদরী দেখা দেয়। এ সকল লক্ষণ প্রকাশের পর রোগ আরোগ্য হইতে আমি কখনও দেখি নাই।

অথই জলের সাঁতার-খেলা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ক

মানুষ যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পেত, তাহলে 'রোমান্সে'র সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় ঘটত কি না সন্দেহ! অন্ততঃ এটা বেশ জোর ক'রে বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি থাকলে, "মহিলা-মঙ্গল" মাসিকপত্রের সম্পাদিকা শ্রীমতী সুনীতি তার বাল্যসখা মোহিনীকে নিশ্চয়ই নিজের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্যে নিমন্ত্রণ ক'রে আনত না।

বৈধ কার্য্যের অভাবে মানুষ যা করে, সুনীতির স্বামী অবলাকান্ত ঠিক সেই কার্য্যই করত—অর্থাৎ কাব্যচর্চ্চা! একমাত্র সুনীতি ছাড়া আর কোন সম্পাদক যদিও তার কবিতা ছাপাতে ভরসা করত না, তবু সেজন্যে অবলার মনে কবিতা লেখবার উৎসাহের অভাব ঘটে নি কোনদিন! কারণ হাতে প্রচুর অবকাশ, এবং পিতা পরলোকগত হ'লেও

কোম্পানীর কাগজগুলি তিনি ইহলোকেই ফেলে রেখে গিয়েছেন।

ইতিমধ্যে মোহিনীর আবির্ভাব। বেথুন কলেজে সুনীতি ও মোহিনী অনেক দিন একসঙ্গে কাটিয়েছে—তাদের দুজনের বন্ধুত্ব ছিল খুব প্রগাঢ়। তার পর কলেজ থেকে বেরিয়ে মোহিনী গেল বিদেশে এবং সেই থেকে দুই বন্ধুতে আর দেখা হয় নি।

মোহিনী নামেও মোহিনী, রূপেও মোহিনী! অন্ততঃ অবলাকান্ত যে তাকে দেখে অত্যন্ত মোহিত হয়ে গেল, এর মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নেই। পাটনার কোন্ বালিকা-বিদ্যালয়ে সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে এবং যে কারণেই হোক্, স্বামী নামক বিখ্যাত দেবতাটির অনুগ্রহ থেকে এখনো পর্য্যন্ত সে বঞ্চিত হয়ে আছে। অথচ তার বয়স "সুমিষ্ট সতেরো"র সীমানা পার হয়েছে অনেক দিন আগেই।

মোহিনীর কথা-বার্ত্তা ও হাবভাবের মধ্যে বেশ একটি লীলা আছে—তাকে দেখলেই ভালোবাসতে সাধ যায়! নারীর নয়নে সত্যই যে বিদ্যুৎ থাকে, মোহিনীর চোখ দেখে অবলা আজ সেটা প্রথম অনুভব করলে। তার মনের ভিতর থেকে যেন একটা অনুতাপের স্বর শোনা যেতে লাগল—হায় মোহিনী, আমার বিবাহের আগে কেন তুমি আমাকে দেখা দিলে না!

খ

কিছুদিন যায়। সুনীতি "মহিলা-মঙ্গলে"র কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে আছে যে, বাড়ীর ভিতরেই কি এক নাটকের সরস অভিনয় চলছে ঘুণাক্ষরেও তার আভাস পর্য্যন্ত জানতে পারলে না।

মোহিনীর উদ্দেশে অবলা লুকিয়ে লুকিয়ে গোটাকয়েক কবিতা লিখে ফেলেছিল। কবিতাগুলি সে "মহিলা-মঙ্গলে" প্রকাশ করে নি বটে, কিন্তু মোহিনীর চোখে যাতে পড়ে এ ব্যবস্থা করতে তার ভুল হ'ল না। তার পর যখন সে দেখলে কবিতাগুলি পাঠ ক'রেও মোহিনী কিছুমাত্র বিরক্ত হ'ল না, তখন তারও সাহস আরো বেড়ে উঠল এবং নানা বিচিত্র উপায়ে নিজের মনকে সে মোহিনীর কাছে প্রকাশ করতে লাগল।

প্রিয়তমা সখী সুনীতির স্বামী তার অনুরক্ত, এ সত্যটা মোহিনী যেন একান্ত সহজ ভাবেই গ্রহণ করলে। নিজের সখীর কথা ভুলেও সে ভাবলে না, বরং চোখের মৌন ইঙ্গিতে, ঠোঁটের রঙিন হাস্যে ও তনুলতার লীলায়িত ভঙ্গীতে অবলার নির্ব্বোধ মনকে দিনে দিনে অধিকতর প্রলুব্ধ ক'রে তুলতে লাগল।

গ

সুনীতির রূপের অভাব ছিল না এবং এজন্যে অবলাকান্ত বরাবরই মনে মনে নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করত।

"মহিলা-মঙ্গলে"র কাজ নিয়ে সুনীতিকে প্রায়ই একলা বাইরে যেতে হ'ত এবং এজন্যে প্রকাশ্যে বাধা না দিলেও অবলা এটা মোটেই পছন্দ করত না। "মহিলা-মঙ্গলে"র কাজে অবলা যদি তার স্ত্রীকে সাহায্য করত, তাহলে সুনীতিকে হয়তো এমন একলা বাইরে যেতে হ'ত না, কিন্তু তাতেও সে ছিল সম্পূর্ণ নারাজ। কারণ তার আলস্য।

অবলা লক্ষ্য করলে, ইদানীং তার স্ত্রীর বাইরে বেরুনোটা যেন অন্যায়-রকম বেড়ে উঠেছে! অধিকন্তু একবার বাইরে গেলে সুনীতি আর যেন বাড়ীতে ফিরতেই চায় না! এর কারণ কি? এতক্ষণ সে কি করে, কোথায় থাকে? স্ত্রীকে প্রশ্ন ক'রেও সন্তোষজনক জবাবের অভাব হ'তে লাগল।.........সুনীতি আগে তো জবাব দিতে গেলে এমন ইতস্তত করত না! লক্ষণ বড় সুবিধের নয়। বাড়ীর বাইরে নিশ্চয়ই রহস্যময় কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে!

অবলার স্বভাব-সন্দিগ্ধ মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু স্ত্রীকে সন্দেহ করবার সময়ে এটা একবারও ভেবে দেখলে না যে, সে নিজে স্ত্রীর কাছে কত-বড় অবিশ্বাসী! এম্‌নি সংসারের নিয়ম—দুর্নীতির দাসই দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোলাহল করে সব চেয়ে বেশী।

সুনীতির অনুপস্থিতিতে তারই যে সুবিধা, মোহিনীকে সে যে আরো বেশী ক'রে নিজের কাছে পায়, এতেও অবলার মন আশ্বস্ত হ'ল না। একদিন সে স্পষ্ট ভাষাতেই মোহিনীর কাছে নিজের মনের সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বললে।

মোহিনী কিন্তু ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, "না অবলাবাবু, এমন কথা মুখেও আনবেন না! আমার বন্ধুর চরিত্রে সন্দেহ? এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না!"

অবলা বললে, "বেশ, তাই যদি হয়, তবে এতক্ষণ ধ'রে সুনীতি রোজ কোথায় থাকে?"

—"মহিলা-মঙ্গলে'র কাজে।"

—"আগেও তো 'মহিলা-মজলিস' ছিল, কিন্তু আগে তো সুনীতি এতক্ষণ ধ'রে রোজ বাইরে থাকত না।"

অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে মোহিনী বললে, "হ্যাঁ, এ কথাটা ভাববার কথা বটে। তা আপনি সুনীতিকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন ?"

—"জিজ্ঞাসা করি বৈকি! সে কিন্তু জবাব দিতে পারে না।"

মোহিনীকে মান্‌তে হ'ল, ব্যাপারটা সন্দেহজনক বটে।

অবলা বললে, "সুনীতির গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রাখতে পারে, যদি এমন কোন লোক পাই, তাহ'লে—তাহ'লে—"

—"তাহ'লে কি লাভ হবে অবলাবাবু ?"

—"যদি বুঝি তার চরিত্র খারাপ, তাহ'লে তাকে ত্যাগ করি!"

মোহিনী সচকিত কণ্ঠে বললে, "সে কি!"

—"হ্যাঁ। তারপর আবার নতুন ক'রে সংসার পাতি।"

—"বলেন কি ?"

—"যাকে ভালোবাসি, তাকে বিবাহ করি!"

ঠোঁট টিপে অল্প একটু হেসে মোহিনী বললে, "কাকে আপনি ভালবাসেন অবলাবাবু ?"

মোহিনীর একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে, ঢুলু-ঢুলু চোখে কোমল স্বরে অবলা বললে, "তা কি তুমি জানো না মোহিনী ?" ব'লেই সে তার নরম তুলতুলে হাতখানির উপরে আলতো চাপ দিলে।

মোহিনী এই 'তুমি' সম্বোধনে একটুও বিরক্ত হ'ল না, বরং মধুর নেত্রে একবার অবলার দিকে তাকালে। তার পর মুখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "অবলাবাবু, আমি বলচি আমার বন্ধু নির্দ্দোষ। তার গতিবিধির উপরে আপনি অনায়াসেই লক্ষ্য রাখতে পারেন।"

—"কিন্তু তেমন লোক পাই কোথায় ?"

—"আমি চেষ্টা করলে আপনাকে লোক দিতে পারি।"

—"সে কি, তুমি লোক পাবে কোথায় ?"

—"আমার এক আত্মীয় কলকাতার গোয়েন্দা-পুলিসে কাজ করেন। এ বিষয়ে তিনি বোধ হয় আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আমি আজকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব!"

—"মোহিনী, মোহিনী, তোমার এ উপকার আমি জীবনেও ভুলব না"—ব'লেই অবলাকান্ত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার মুখের এত কাছে মুখ এগিয়ে আনলে যে, মোহিনী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে ব'সে ব'লে উঠল—"চুপ, চুপ, সুনীতি আসচে!"

অবলা অমনি এক মুহূর্ত্তে সোজা হয়ে ব'সে বললে, "হ্যাঁ, যা বলছিলুম। নিরামিষ আহার আমার মতে যুক্তি-সঙ্গত নয়।"

মোহিনী বললে, "আপনার মতে আমি সায় দিতে পারলুম না। আমিষ আমি ঘৃণা করি।"

ঘ

পরের দিন সকালে মোহিনী চুপি চুপি এসে অবলাকে জানালে যে, তার গোয়েন্দা-আত্মীয় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে ফেলেছেন।

অবলা আগ্রহ-ভরে বললে, "তার মানে ?"

—"এবার থেকে সুনীতি বাড়ীর বাইরে গেলেই তার উপরে পুলিসের একজন লোক পাহারা দেবে।"

শুনে অবলা খুব খুসী হ'য়ে উঠল।

মোহিনী বললে, "কিন্তু গাড়ীভাড়া প্রভৃতির জন্যে সে লোকটিকে শ' দেড়েক টাকা দিতে হবে। আপাততঃ আমিই তাকে দেড় শো টাকা দিয়ে এসেচি।"

অবলা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললে, "মোহিনী, তোমাকে আমি কি ব'লে ধন্যবাদ দেব, তা জানি না! ও দেড়-শো টাকা এখনি আমি দিয়ে দিচ্ছি!"

হপ্তা-খানেক পরে মোহিনী একদিন বললে, "অবলাবাবু, আজ আমি গোয়েন্দা-পুলিসের কাছে খবর নিতে গিয়েছিলুম।"

উদ্দীপ্ত কৌতূহলে অবলা ব'লে উঠল, "তার পর—তার পর ?"

গলার আওয়াজে দুঃখের আমেজ এনে মোহিনী বললে, "আপনার কথাই ঠিক!"

—"অ্যাঁ!"

—"হ্যাঁ অবলাবাবু। প্রিয়সখী সুনীতির যে এমন অধঃপতন হবে, আমি কখনো তা কল্পনাও করতে পারি নি।"

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অবলা অধীর স্বরে বললে, "তুমি কি শুনলে, আগে তাই বল!"

—"সুনীতিকে প্রায়ই একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে যেখানে-সেখানে দেখা যায়। দেখলেই বোঝা যায়, লোকটির সঙ্গে তার খুব মাখামাখি আছে।"

অবলা দুই হাতে ঘুষী পাকিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "কে এই রাস্কেল ?"

—"শীঘ্রই তা জানা যাবে। আপাততঃ তার চেহারার বর্ণনাটা পাওয়া গেছে" এই ব'লে একখানা কাগজ বার ক'রে মোহিনী পড়তে লাগল :—"রং কালো। বেঁটে ও মোটা। ভুঁড়ি আছে। মাথায় যাত্রাওয়ালার মতন ঝাঁকড়া চুল। ঝাঁটার মতন গোঁফ। গালে আর চিবুকে প্রায়ই ক্ষুর পড়ে না ব'লে খোঁচা খোঁচা দাড়ী গজিয়েচে। চেহারা দেখলে মনে হয়, তেল-জল-সাবানের সে কোনই ধার ধারে না। জামা কাপড় কখনো ময়লা, কখনো আধ-ময়লা।"

অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে অবলা ব'লে উঠল, "অ্যাঁ, বল কি ? এমন একটা ছোট লোকের সঙ্গে সুনীতি—না, না, তাও কি সম্ভব ?"

মোহিনী বললে, "কিছুই অসম্ভব নয়। মেয়েদের মনের কথা আপনি কতটুকু জানেন ? বিলাতী খবরের কাগজে পড়েচি, আমেরিকার অনেক বড় ঘরের সুন্দরী মেয়েও কাফ্রীদের প্রেমে পড়তে লজ্জিত হয় না।"

অবলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "যাক্, ও-কথায় আর কাজ নেই, আমার মন দমে যাচ্চে।"

প্রগাঢ় দৃষ্টিতে অবলার দিকে তাকিয়ে, ওষ্ঠাধরে সরস হাসি মাখিয়ে মোহিনী বললে, "কেন অবলাবাবু, আমি সামনে রয়েছি তবু আপনার মন দমে যাচ্চে ?"

অবলা বিভোর হয়ে মোহিনীর ডাগর চোখের দিকে চেয়ে বিহ্বল স্বরে বললে, "মোহিনী, তুমি আছ তাই আমি এখনো বেঁচে আছি" ব'লেই সে দুই হাত বাড়িয়ে মোহিনীকে আলিঙ্গন করতে গেল।

মোহিনী তাড়াতাড়ি পিছনে হটে গিয়ে ত্রস্ত স্বরে বললে, "না না, ও সব এখন থাক্!"

—"কেন মোহিনী ?"

—"আপনি এখনও সুনীতিকে ত্যাগ করেন নি। আগে আমাদের বিবাহ হোক্" ব'লেই দ্রুত-চরণে প্রস্থান করলে।

৬

হঠাৎ কি একটা কাজে সপ্তাহখানেকের জন্যে মোহিনীর স্থানান্তরে যাবার দরকার হ'ল। যাবার সময়ে সে গোপনে অবলাকে ব'লে গেল, "দেখবেন অবলাবাবু, এর-মধ্যে আপনি যেন সুনীতির কাছে সব কথা ফাঁস ক'রে ফেলবেন না। এখনো তার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি, আমাদের আরো প্রমাণের দরকার। এর ভেতরেই আমি বোধ হয় আরো অনেক খবর পাব, ফিরে এসে সব আপনাকে জানাব।"

... ...

এক হপ্তা পরে মোহিনী ফিরে এল। তার চোখ-মুখ দেখেই অবলা বুঝলে, সে তাকে কিছু বলতে চায়।

যখন ঘরের ভিতরে আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই, মোহিনী তখন বললে, "অবলাবাবু, গোয়েন্দার কাছ থেকে আমি খবর পেয়েচি, সেই যাত্রাওয়ালার মতন লোকটার সঙ্গে সুনীতিকে সেদিন থিয়েটারে দেখা গিয়েছিল !"

—"কোন্ থিয়েটারে ?"

—" 'প্যারাডাইসে'।"

—"ওহো, বোঝা গেছে। যাত্রা নয়, নিশ্চয়ই সে উল্লুকটা থিয়েটারের লোক!"

—"কিসে জানলেন আপনি ?"

—"আমিও সেদিন সুনীতিকে নিয়ে 'প্যারাডাইস থিয়েটার' দেখতে গিয়েছিলুম। সুনীতি তো প্রথমে আমার সঙ্গে যেতেই রাজি হয় নি। তার পর গেল বটে, কিন্তু সারাক্ষণ আমার পাশে কেমন যেন জড়সড় হ'য়ে বসে ছিল, আর একটা ঝাঁকড়া-চুলো বদমাইস বরাবর অসভ্যের মতন তার পানে তাকিয়ে ছিল। আমার সন্দেহ হওয়াতে খোঁজ নিয়ে জানলুম, সে ঐ থিয়েটারেই অভিনয় করে।"

—"আপনি যা বলচেন, তা অসম্ভব নয়!"

—"রোসো, সে ইস্টুপিডকে আমি উচিতমত শিক্ষা দিচ্চি—অ্যাঁ, এত-বড় আস্পর্দ্ধা !...আচ্ছা মোহিনী, তার সঙ্গে সুনীতিকে থিয়েটারে দেখা গিয়েছিল কবে, তা শুনেচ কি ?"

—"শুনেচি বৈকি—পশু।"

—"পশু ? তা কেমন ক'রে হবে ? পশু তো সুনীতি আমার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল!"

—"তাই নাকি ?"

—"হ্যাঁ। তোমার গোয়েন্দা নিশ্চয়ই ভুল দেখেচে।"

—"না, সে বড় সাবধানী লোক।"

—'উঁহু, পর্শু এ ঘটনা কিছুতেই ঘট্‌তে প'রে না।"

"তাহ'লে—ও, বোঝা গেছে! কিন্তু এমন মজার কথা কি সত্য হ'তে পারে" বলতে বলতে মুখে আঁচল দিয়ে মোহিনী আচম্বিতে কৌতুক-হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল!

অবলা বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "আমার মান নিয়ে যেখানে টানাটানি চলচে, সেখানে তুমি আবার কি মজা পেলে মোহিনী?"

কোন রকমে হাসির দমক দমন ক'রে মোহিনী বললে, "আমার সন্দেহ হচ্চে, আমাদের গোয়েন্দা গোড়া থেকে আপনাকেই সুনীতির অজানা সঙ্গী বলে ভ্রম করেচে!... হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই!"

অবলা ভুরু কুঁচ্‌কে বললে, "তার মানে?"

সেই কাগজখানা বার ক'রে মোহিনী বললে, "এই দেখুন না! রং কালো, বেঁটে, মোটা ভুঁড়ি আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁটার মতন গোঁফ। সব আপনার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্চে। আপনিও অনেক দিন অন্তর দাড়ী কামান, আর স্নানটাও বিশেষ পছন্দ করেন না। ও অবলাবাবু, এ যে হুবহু আপনার বর্ণনা—ওমা, কি হবে!"—মোহিনী ফের হাসি সুরু করলে!

রাগে অবলার মুখ রাঙা হয়ে উঠল! দাঁড়িয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, "এ-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না মোহিনী! তুমি কি বলতে চাও আমাকে দেখতে যাত্রাওয়ালার মতন?"

পিছন থেকে শোনা গেল,—"প্রিয়তম, সে কথা সহজে অস্বীকার করাও যায় না।"

চম্‌কে ফিরে অবলা দেখলে, তার অজ্ঞাতসারে সুনীতি কখন্ ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে! ক্রোধে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে সে বললে, "তা'হলে তুমি—তুমিও এই ষড়যন্ত্রের ভিতরে আছ?"—হঠাৎ সুনীতির পরোনের রঙিন, জমকালো শাড়ীর উপরে তার চোখ পড়তেই সে আবার ব'লে উঠল, "ও কাপড় তুমি কোথায় পেলে, কে দিলে?"

সুনীতি মুচ্‌কে হেসে বললে, "তুমি।"

—"আমি? কবে?"

—"গোয়েন্দার হাত-খরচের জন্যে যে দেড়শো টাকা তুমি দিয়েছিলে, তাইতেই এই শাড়ীখানা কিনেছি।"

মাথা হেঁট ক'রে অবলা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বল্‌লে, "আমার চেহারার বর্ণনাটা কার কীর্ত্তি, শুনি?"

সুনীতি বললে, "দোহাই তোমার, ও বর্ণনা আমার রচনা নয়। তুমি বরং মোহিনীকে জিজ্ঞাসা কর।"

কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মোহিনী এক দৌড়ে সে ঘর থেকে পালিয়ে গেল!

... ...

কবি অবলাকান্ত এখন প্রতি মাসে একবার ক'রে চুল ছাঁটে, প্রতি দিন দাড়ী গোঁফের উপরে স্বহস্তে ক্ষুর চালনা করে, এবং সকালে-বিকালে সুগন্ধ সাবান মেখে স্নান করতে ভোলে না।

এবং সুনীতিকে ত্যাগ করবার কথা স্বপ্নেও তার মনে আর উদয় হয় না।

বংশীধারী

শ্রীশচশচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বধূ নিশীথিনী রঙ্গে ভ্রমিয়া
চকিতে চাহিলা পথপানে,
নিটোল তনুর গন্ধ ছড়ায়ে
কহিল শেফালি অভিমানে—
"সখি কেন এত ত্বরা?"

তন্দ্রাজড়িত অলস নয়নে
হেরিনু সহসা মোর দ্বারে
সলজ্জ এক কিশোরী মূরতি
ডাকিছে আমারে আঁখি-ঠারে
"এস না গো যাই মোরা!"

সারা শর্ব্বরী কাটায়ে সমীর
নগ্ন শেফালি বধূর ঘরে
নিদ্রা-কাতর রয়েছে পড়িয়া
পৃথ্বীর শ্যাম আঁচল' পরে ;
জাগিবে ঊষার সনে।
তারাবালাদের সকরুণ দিঠি
ধরার গোপন বক্ষ যেথা
ঢলিয়া পড়েছে গভীর সোহাগে
মুছাতে তাহার তপ্ত ব্যথা
ছুটী মধু আলাপনে।
ধীরে ধীরে মোরা চলিনু দুজনে
স্তব্ধ কুটীর পিছনে রাখি,
কাহার পরশ বেড়িল মোদের
স্নিগ্ধ তরল আঁধার মাখি'—
দেখিতে নারিনু হায়!
ক্ষণে ক্ষণে দেহ উঠিল কাঁপিয়া
অজানা পুলক হিল্লোলে
কি জানি কেমনে যাই চলি' যেথা
তটিনীর কালো বুক দোলে—
অবশ বিহ্বল পায়!

রূপসী আমার তরুণী সহসা
মধুর হাসিতে পাগল করি'
কোথায় পালাল পলকে আঁখির
বারি-চুম্বিত কূল ধরি'—
জল ছল্ ছল্ কাঁদে।
কাতর প্রাণের বারতা আমার
চুপি চুপি আসি নয়ন-পাতে
সমুখে বংশীবাদকে নিরখি
থামিল কুণ্ঠানত্র মাথে—
পড়িনু এ কোন্ ফাঁদে ?
বিভোর বাদক প্রবাহিনী বুকে
আকাশের পরিতৃপ্ত হাসি
দেখিতেছিল সে পূর্ণ নয়নে
নামায়ে অলস দীর্ঘ বাঁশী,—
যেন গো স্বপন-ঘোর।
সহসা বাঁশীর করুণ রন্ধ্রে
মোর কিশোরীর আঁচলখানি
ত্বরিতে লুকাল, শুনিনু ঊষার
সমীরণে মৃদু সোহাগ-বাণী—
"জাগো, ওগো সখা মোর!"

বিক্রমাদিত্য ভট্টাচার্য্য

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

পিতার অর্থ ছিল—সেই কারণে আমার এক মাসতুতো ভাইএর অবসর ছিল প্রচুর। অখণ্ড অবসরকে সে দেশহিতব্রতে লাগাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তাহার এই ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল হয় যে, দেশের লোকেরা যদি তাহাদের আলস্য-মহাঘুম ত্যাগ করিয়া না জাগে, তবে তাহাদের স্বরাজ পাইবার কোন আশাই নাই।

আমার মাসতুতো ভাইএর নাম ছিল বিক্রমাদিত্য। স্কুলে যখন পড়িত তখন হইতে সে খুব বক্তৃতা করিতে পারিত। স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের সে একজন মহা বক্তা ছিল। মনে পড়ে এক দিন একটাম হাসমন্তাপূর্ণ তর্ক ওঠে ; বিষয় ছিল "ডিম আগে না প্যাঁচা আগে—" অর্থাৎ প্যাঁচার জন্ম প্যাঁচার ডিমএর পূর্ব্বে কি না। সামান্য কয়েকটি কথায় বিক্রমাদিত্য এই মহাসমস্যার সমাধান করিয়া দ্যায়। ডবল বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া, জামার আস্তিন অর্দ্ধেক গুটাইয়া সেইদিন বিক্রমাদিত্য, পূর্ব্বদিকে মুখ এবং উত্তর দিকে পশ্চাৎ ও দক্ষিণ-উপর কোণে হাত করিয়া, তারস্বরে বলিয়াছিল "হে আমার বন্ধুগণ এবং মৌলভীজি-সভাপতি মহাশয়—"প্যাঁচা আগে না প্যাঁচার ডিম আগে—" এই যে মহাসমস্যা আজ আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছে, ইহার সমাধান এক্ষুনি এক কথায় আমি করিয়া দিব—আপনারা কেবল মন দিয়া শ্রবণ করিবেন। বাজে তর্ক করিবেন না। আমি ধর্ম্ম-শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার অন্তরে

সচকিতা

শিল্পী— শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দৃঢ় বিশ্বাস প্যাঁচার ডিমই আগে। আপনারা বলিবেন 'প্রমাণ?'—প্রমাণ আছে—বিনা প্রমাণে আমি কোন কথা বলি না। প্যাঁচার ডিম আগে, তাহার কারণ প্যাঁচা প্যাঁচার ডিমের পরে আসিয়াছিল। আশা করি আর কোনও প্রমাণের দরকার হইবে না। আপনারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি—বোকা নহেন। কাজেই আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে প্যাঁচাই পরে।" এমন অকাট্য যুক্তির পরে আর কেহ কোন কথা তুলিতে পারে নাই। সেইদিন হইতেই আমরা বুঝিয়াছিলাম যে বিক্রমাদিত্য কালে একজন মহামানব হইবে।

বিলাত হইতে অর্থ ও সমাজনীতি এবং পাইপ সেবন শিক্ষা শেষ করিয়া আসিয়া বিক্রমাদিত্য দেশ-উদ্ধারে মাতিয়া উঠিল। কলেজ স্কোয়ারের কাছে এক হলে তাহার বক্তৃতা প্রায়ই হইত। আমাকে প্রায় সব বক্তৃতা শুনিতে হইত—অর্থাৎ শুনিবার ভান করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। প্রথম বেঞ্চিতেই বসিতাম যাহাতে ভায়ার চোখে পড়ি। বিপদে আপদে ভায়ার কাছে একটু ঘুরিয়ে হাত পাতিতে হইত। হাত—মুখের সাহায্যে পাতিতে হইত, অর্থাৎ ভায়ার বক্তৃতার প্রশংসা করিতে হইত।

এক দিন বিকালে বাহিরে যাইতেছি, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একটা খাম হাতে দিয়া গেল। খাম খুলিয়া দেখি:—

ওভারটুন হল
১২ই মে: বেলা তিনটা
প্রসিদ্ধ দেশোদ্ধারী বক্তা
বিক্রমাদিত্য ভট্টের
"কাফ্রি বালবিধবাদের দুঃখজীবন"
বিষয়ে বক্তৃতা।
[এক জন প্রবেশ করিবে]

ভায়া আমাকে দয়া করিয়া টিকিট পাঠাইয়াছে। ১২ই মে বেলা তিনটা। ঠিক সেই দিন ৪টার সময় থিয়েটার আছে! আবক্কন নাট্যমন্দিরে। 'নাট্যকলা' কাগজে ছয় সপ্তাহ ধরিয়া প্রশংসা গাহিয়া অধিকারীর দয়া উদ্রেক করিয়া একখানি complimentary পাইয়াছি। ইহা ছাড়া যাইতে পারে না। এদিকে বক্তৃতায় না যাইলেও বিপদ—ভায়া রাগ করিবেন—তাহাতে আরো বিপদ—পকেট হালকা ঠেকিবে। উপায়? উপায় নাই।

অনেক চিন্তা করিলাম - উপায় পাইলাম না। অবশেষে complimentaryর মায়া ত্যাগ করিয়া ভায়ার লেকচারে যাওয়াই ঠিক করিলাম। কাপড়চোপড় পরিয়া যখন বাহির হইব—তখন হঠাৎ যেন মাথা খুলিয়া গেল! সাবাস! বাহবা! কেয়াবাৎ! কিস্তিমাৎ!

লেকচারে যাইলাম না। থিয়েটারে যাইলাম। থিয়েটার সেদিন চমৎকার জমিয়াছিল। এমন জমিয়াছিল যে সামনের চায়ের দোকানের ছোকরাগুলাও যেন থিয়েটারের আবেশ মোহ চ্ছন্ন হইয়াছিল। মাঝখানে একবার এক কাপ চা খাইতে গেলাম—দোকানে ঢুকিতেই ৩৩ বছরের ধেড়ে চা-ওয়ালা আত্তালি-ঢঙ্গে বলিয়া উঠিল "আসুন আসুন—হৃদ-বেঞ্চে বসুন—মন-পেয়ালা ভরিয়া দিব কি চা?—" আমি অবাক হইয়া কেবল ঘাড় নাড়িলাম। তারপর সে চা আনিয়া যাত্রার সখীর গলার স্বরে এবং হাতের ঢঙ্গে বলিল "ধরুন ধরুন মন পেয়ালা—ভরা আছে প্রাণ জলে ভিজান গরম গরম চা।" কোন রকমে হাসি চাপিয়া চা পান শেষ করিয়া চা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দাম তার চায়ের। উত্তর যা পাইলাম, তাতে ভয় পাইয়া গেলাম। চা-ওয়ালার তখন সখীর ভাব কাটিয়া গিয়াছে—"এর্গ দাসের" ভাব তখন তার মাথায়। সে বলিল "আঁ হি হি হি—কি বুঝবে তুমি এঁহে-হে হে প্রহণের জ্বালা—প্রাণ কে পিষিয়া তোমার পাত্রে আহামার সমস্ত রস নিঙ্গাড়িয়া দিলাম—তুমি বল—কতোহ দাম—দাম নাহিহ নাহিহ—আঁ হাঁ হা হা হি হি হি—! চায়ের দাম? চাইর পায়সা।" চার আনি দিলাম। আবেশের চোটে চেঞ্জ দিতে সে ভুলিয়া গেল।

থিয়েটার এবং তার চারিপাশের সব লোকজন পশুপক্ষী সব যেন থিয়েটারের নেশায় মশগুল! সবাই ভাবিতেছে যেন তাহারা এক মহা-নাট্যশালায় দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতেছে। পানওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া সহিস কোচোয়ান সকলেই সোজা ভাষায় কেহ যেন কথা বলিতে পারে না। সবাই অভিনয়ী ভাবে কথা কয়! কোচোয়ান ভাবিতেছে সে আলমগীর—দিল্লীর মসনদে বসিয়া আছে। সহিস ভাবিতেছে, সে মহব্বত খাঁ! পানওয়ালা ভাবিতেছে, সে দিল্লীর তোষাখানার মালিক! যে যা—সে যেন আর তা নাই! এমন দৃশ্য আর দেখি নাই। চমৎকার!

পরের দিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই ভায়াকে এক পত্র লিখিলাম।

ভ্রাতঃ গতকল্য তোমার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম, একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া পিছনের বেঞ্চে বসিয়াছিলাম। তোমার দিকে চাহিয়া রুমাল নাড়িলাম প্রায় সাতবার, তুমি দেখিতে পাও নাই।

তোমার বক্তৃতা চমৎকার হইয়াছিল। কাফ্রি বালবিধবাদের অবস্থা যে এত ভয়ানক, তা কোন দিন ভাবিতেও পারি নাই। কাফ্রি পুরুষরা কি মানুষ নয়? তাহাদের প্রাণে কি সামান্য দয়া-মায়াও নাই! সত্যি বলিতেছি, কাল তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমার চোখ দিয়া জল পড়িবার উপক্রম হয়। অনেক কষ্টে তাহা বন্ধ করি। কিন্তু আমার পাশে একজন আমেরিকান মহিলা বসিয়া ছিলেন—তোমার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছিল। একবার মনে হইল, তাঁহার চোখের জল রুমাল দিয়া মুছাইয়া দি—কিন্তু তাঁহার পাশে যে লোকটা বসিয়াছিল, সেও আর্ম্মেনিয়ান্। সে অত্যন্ত বদরাগী দেখিতে এবং ষণ্ডামার্ক। এখন আমার মনে হইতেছে যে আমরা কাফ্রি বালবিধবাদের প্রতি অবহেলা করিয়াছি। আমাদের কংগ্রেসও ইহাদের জন্য কিছু করে নাই। আগামী কংগ্রেসে যাহাতে কিছু হয়, তাহার জন্য নেতাদের তোমার কিছু বলা উচিত। ইহা পরের কথা, এখন অবিলম্বে এই বিষয়ে তোমার আরো অন্তত ২০টি লেকচার দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমার এবং অন্যান্য অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। কাল তোমার লেকচারের সময় আমার পাশে এক ষাট বছরের বুড়া বসিয়া ছিলেন। তিনি হঠাৎ ভয়ানক কাঁদিয়া উঠিলেন। ব্যাপার কি, খোঁজ করিয়া জানিলাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি বাঙ্গালী না হইয়া কাফ্রি হইতেন, তবে তিনি সেই দেশের প্রচুর উপকার করিতে পারিতেন।

ভ্রাতঃ, কি আর বলিব আমি। চমৎকার—অতি চমৎকার তোমার বক্তৃতা! একবার যে শোনে বার বার তাহাকে শুনিতেই হইবে—না শুনিয়া তাহার অন্তর তৃপ্তিলাভ করিবে না। বেশ ভাই! কাল তুমি বেশ বলিয়াছ। তোমার যুক্তি অকাট্য—তোমার ভাষা প্রাণ-কাঁদান!

আমার এই প্রশংসাবাক্যে লজ্জা বোধ করিও না। আমি আমার অন্তরের কথাগুলি তোমাকে বলিলাম। আর একটি কথা বলি—সুরেন বাঁড়ুযো, বিপিন পাল প্রভৃতি এঁরা সকলে বক্তা, কিন্তু তোমার কাছে এঁরা সকলে শিশু—বোবা! হাঁদা। তুমি যে আমার মাসতুতো ভাই—এ গৌরবে আমার বুক যেন ৪৮ ইঞ্চি হইয়া গিয়াছে।—বেশ চমৎকার কাল তোমার বক্তৃতা হইয়াছিল।

কাল বক্তৃতার পর আমি হলের গেটে দাঁড়াইয়াছিলাম—কিন্তু ভিড়ের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই—আশা করি ক্ষমা করিবে। আবার কবে তোমার বক্তৃতা হইবে দয়া করিয়া সময়মত জানাইও। ইতি—

তোমারই ভ্রাতা অবল।

পত্রখানা একেবারে ডাকঘরে দিয়া আসিলাম। দেরী হইলে সকালের ডাকে যাইত না। তার পর এক পিয়ালা চা খাইয়া ঘরে আসিলাম। লেটার বাক্সে দেখিলাম আমার নামে একখানা খাম রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলাম—

ভ্রাতঃ অবল—

তোমাকে কাল নিশ্চয়ই খুব কষ্ট দিয়াছি অনর্থক! তোমাকে কার্ড পাঠানোর পরে আমার হঠাৎ জ্বর আসে। সর্দ্দিও বেশ হয়। তার পর গলার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। আমি কাল বক্তৃতা করিতে যাইতে পারি নাই বলিয়া লজ্জিত—তার চেয়ে বেশী লজ্জিত তোমাকে অনাবশ্যক অতদূর হাঁটাইয়া কষ্ট দিয়াছি বলিয়া! আশা করি আমায় ক্ষমা করিবে এবং অদ্য বৈকালে অতি অবশ্যই আমাদের এখানে চা খাইয়া যাইবে। আজ একটু ভাল আছি। ইতি

তোমারই বিক্রমাদিত্য।

* * * *

আমি চা খাইতে যাই নাই। ইহার পর আর গল্প নাই। বিক্রমাদিত্য মরিলে তাহার শ্রাদ্ধ খাইতে যাইব—তাহার পূর্ব্বে আর কিছু খাওয়া হইবে না।

কয়েকটি কারবারী তথ্য

শ্রীহরিপদ মহলানবীশ

চাকরির মোহে অন্ধ আমরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থাগমের সুগম পন্থাগুলি দেখিতে পাই না। উমেদারি করিতে করিতে আমরা গোল্লায় যাইতে বসিয়াছি। স্বজাতির এই ঘোর অধঃপতনে ব্যথিত-চিত্ত বিশ্ববরেণ্য আচার্য্যদেব হইতে পল্লীমান্য শিক্ষাচার্য্য মহাশয় পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুবকদের আন্তরিক চাকরির মোহ অপসারিত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে স্বাধীন জীবিকার প্রতি আগ্রহ জাগাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক আমরা এতই মোহান্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা দেখিয়াও দেখিতে চাই না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না,—এক মাত্র পরাধীন জীবিকার প্রতি বিতৃষ্ণ বলিয়াই, ব্যবসা-বাণিজ্যে একান্ত-চিত্ত বলিয়াই আমাদের প্রতিবেশী কাবুলী, আফ্রিদি, ভাকাথলা, ভুটিয়া, আবর, মিরি, মিস্‌মি নাগা প্রভৃতি জাতিরা নিরক্ষর হইলেও এত সভ্য, উন্নত ও প্রতাপশালী। সরকারী Inland Trade Report দেখিলেই সম্যক্ প্রতীতি হইবে ফল-ফলারি, ছাগলোম, মৃগনাভি প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের ঘর্ম্ম-নিষিক্ত কত লক্ষ লক্ষ টাকা তাহারা প্রতি বৎসর লুটিয়া লইতেছে।

যাহা হউক, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় বাঙ্গালী আজ ঠেকিয়া শিখিতেছে—পেটের জ্বালায় বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিতেছে। আজকাল অনেক শিক্ষিত যুবকই ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, আগ্রহ, উৎসাহ এবং অধ্যবসায় থাকিলেই যে কেবল ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ হইবে, তাহা নহে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে এমন কি সামান্য পান-বিড়ির দোকানেও যে tactএর আবশ্যক হয়, আমাদের শিক্ষিতাভিমানী যুবকদের তাহা নাই। অধিকন্তু ব্যবসায়ের যাহা প্রাণ, সেই দূরদর্শিতা, তথ্য-সংগ্রহ-দক্ষতা এবং দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে প্রখর জ্ঞান ইত্যাদিরও অভাব আমাদের যুবকদের মধ্যে যথেষ্ট। কাজেই, অহরহ দেখিতে পাই, Garduate class Fellows, এবং M. Sc. Cousinদের সাইন্ বোর্ড দোকান খোলার দুই এক মাসের মধ্যেই উল্টিয়া যাইতেছে। এই সব অসুবিধা দূরীকরণার্থ বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষী যুবকগণের সুবিধাকল্পে আমরা একটা ব্যুরো খুলিয়াছি। নাম মাত্র ফি লইয়া আমরা ব্যবসা-ঘটিত যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিই এবং যে-কোন সমস্যার সমাধান করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি কোন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়েচ্ছু বঙ্গীয় যুবক আমাদের সাহায্য যাচ্ঞা করেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয় আমাদের যোগ্যতায় অবিশ্বাস। সুতরাং ব্যবসায়িগণের বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমরা কয়েকটি বাণিজ্যিক নিগূঢ় তথ্য (trade secret) সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।

(১) কচু। বঙ্গদেশের যত্রতত্র প্রচুর কচু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, অবোধ বাঙ্গালী আহার্য্যোপযোগী কচুরই কেবল সমাদর করিয়া থাকে। বিষ কচু প্রভৃতি কচু অতীব প্রয়োজনীয় হইলেও, আমরা উহা অযত্ন অবহেলায় নষ্ট করিয়া ফেলি। আমাদের তেমন প্রখর ব্যবসায়-বুদ্ধি থাকিলে কচুর এই অপচয় নিবারণ করিয়া ইহার ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। সকলেই জানেন, কচুর বিশেষতঃ বিষ-কচুর রস লাগিলে মুখে এবং আলজিবের গোড়ায় একটা দুর্দ্দমনীয় সেনসেশন্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সেন্‌সেশন্ বাক্‌শক্তি-স্ফুরক। এই নিমিত্তই বঙ্গের পল্লীগ্রামে প্রবাদ আছে পাড়া-কোন্দলিনীরা ঝগড়ার প্রাক্কালে কচু ভক্ষণ করিয়া লন। যাঁহারা জীবনে ভাতের গ্রাস মুখে পোরার সময় ছাড়া মুখব্যাদান করেন নাই, তেমন অনেক ভোটপ্রার্থী আজকাল প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া নাকাল হইতেছেন। তাঁহাদের কাছে বিষ কচুর প্রচুর সমাদর হইতে পারে। তার পর ইলেক্‌শনের হাঙ্গামা কাটিলে যখন স্বরাজী দল, পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়মী

দল, * আবগারী দল, আহুরে দল, হ্যালা-ক্যাপা দল কাউন্সিলে যাইবেন, তখন স্বয়ং সরকারই লক্ষ লক্ষ টাকার কচুর অর্ডার দিবেন। কুম্ভকারগণ এখন হইতে সচেষ্ট হইলে এতৎসঙ্গে দেশীয় মৃৎশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিতে পারিবেন। কারণ, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, এবার হইতে গভর্ণমেণ্ট কচু দণ্ডের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ অম্বাংধনিকারও অর্ডার দিবেন। ভাই বাঙ্গালী, সময় থাকিতে সজাগ হও।

(২) বেত্র। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর বেত্র জন্মে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে, এতদ্দেশের পাঠশালায় ও ইস্কুলে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বেতের চাহিদা বেজায় কমিয়া গিয়াছে। ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চল বেতের ঝোপে ছাইয়া গিয়াছে। আমাদের যদি ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিত, তবে অবশ্যই বেত্র ব্যবসায়ের চরম উন্নতি দেখিতে পাইতাম। সরকার এবং কলিকাতা কর্পোরেশন চাপা দিবার নিমিত্ত এবং দেশীয় নীডারগণ চাপা দেওয়া ও ধারণ করা এই উভয়বিধ কর্ম্মেই লক্ষ লক্ষ ধামা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কথাটা স্মরণ রাখিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী বেত্রশিল্পে মনোনিবেশ করিলে জীবিকা-সমস্যার জটিলতা অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। বেতের ধামা অতি উৎকৃষ্ট। সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষকের মতে উহাদের ধামাও বেত্র ধামা অপেক্ষা অপকৃষ্ট। আমরা শুনিলাম, ইলেক্‌শনের সময়টা থাকিতে থাকিতেই বড়বাজারের বিখ্যাত মাড়োয়ারী শ্রীযুক্ত টঙ্কারমল ঝঙ্কারমল পিঁজরাপোলিয়া চট্টগ্রামে গিয়া ধামার কারখানা খুলিতেছেন। হায় হায়, বাঙ্গালীর কবে চক্ষু ফুটিবে?

(৩) টার্পিন তৈল। এই ব্যবসাটা আমাদের দেশে তেমন প্রসার লাভ করে নাই। শুনিয়াছি, হিমালয়জাত ফার নামক দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের হয় পত্র, না হয় ত্বক, না হয় অস্থি, নতুবা বোধ হয় মূল হইতে টার্পিন প্রস্তুত হইতে পারে। সকলেই জানেন, এই পদার্থটি বেদনা-নিবারক। মুষ্টি, চপেট, যষ্টি, পাদুকা, কাষ্ঠপাদুকা, ইত্যাদি সঞ্জাত গুরু আঘাতে ইহা মন্ত্রৌষধিবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের অসংখ্য রেলরাস্তার অসংখ্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রমহলে বারমাস, বিশেষতঃ দুর্গাপূজা, বড়দিন প্রভৃতি পর্ব্বের সময় টার্পিনের যথেষ্ট কাটতি হইতে পারে। কোন কোম্পানী, সিণ্ডিকেট বা বড় মহাজন এই ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিলে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সহায়তা করিব। অনেক অবুঝ ভারতবাসী তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমান হউক বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। টার্পিন ব্যবসায়েচ্ছুর সন্ধান পাইলে এই শিশু বাণিজ্যের পুষ্টিকল্পে আমরা বিস্তৃত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির নিমিত্ত রেলওয়ে বোর্ডের নিকট আবেদন করিব মনস্থ করিয়াছি। ভারতীয় টার্পিন-ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্যাম্বক্ প্রভৃতি অদৃশ্য হইবে।

(৪) সোডাওয়াটার। এই জিনিষটা আপামর সাধারণের পরিচিত। এতাবৎকাল কেবল পানীয় হিসাবেই এ জিনিষটার প্রচলন ছিল। কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে ইহার প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে চাহিদা বহুদূরে বিস্তৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা কথা বলিতেছি। আজকাল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইতেছে। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারি না—গোঁড়া সম্প্রদায় উৎসাহী সংগঠকদের কথামত অত সহজে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ হুঁকা দান করিবেন, এবং জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের হুঁকায় তাম্রকূট পান করিবেন। এমন অবস্থায় হুঁকার জলের পরিবর্ত্তে সোডাওয়াটার ভরিয়া তামাক খাওয়ার প্রথা সত্বরই প্রচলিত হইবে। কেহ কেহ সোডাওয়াটারের পরিবর্ত্তে দুগ্ধের কথা ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য; সোডাওয়াটার সস্তা ত বটেই অধিকন্তু অজীর্ণনাশক। সুতরাং জলমিশ্রিত দুগ্ধ অপেক্ষাও সোডাওয়াটারের চান্স এক্ষেত্রে দ্বিগুণ। বাঙ্গালী এই দিকে নজর না দিলে বায়রন্ টমসন্ প্রভৃতিরা সুযোগ ছাড়িবে না তাহা নিশ্চয়।

(৫) রবার। এই জিনিষটা আজ পর্য্যন্ত জুতার শুকতল, মটর ও সাইকেলের টায়ার প্রভৃতি হিসাবে ব্যবসা জগতে বিরাট স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, শ্রমবিমুখ বাঙ্গালী আমরা ভাবিতে চাই না, পেন্সিল, কালি এবং টাইপরাইটারের রিবনের কালো দাগ যখন রবার ঘর্ষণে উঠিয়া গিয়া কাগজ বেমালুম শাদা

* I shall scratch your back, if you scratch mine—এই ধরণের একটা কথা ইংরাজীতে আছে, তাহা বোধ হয় পাঠক জানেন।

হইয়া যায়, তখন একটু উন্নত-ধরণের রবার আবিষ্কার করিতে পারিলে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীর কাছে উহা কত সমাদর লাভ করিতে পারে। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালী ও অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ-লাঞ্ছিত হ্যাটকোটধারী কালো সাহেব দিন-রাত আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, গাত্রত্বকের কৃষ্ণত্বাপহারী রবার পাওয়া যায় কি না। প্রতি বৎসর হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবক ইউনিভার্সিটি হইতে বিজ্ঞনন্দিত হইয়া বাহির হইয়াও হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মরিতেছেন। আমরা এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(৬) মুখোস। মুখোস জিনিষটা আমাদের দেশে অতীব প্রাচীন। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম ইহার ব্যবহার হইয়া থাকিবে। আমাদের মন্দিরে মন্দিরে দেবদেবীর মুখশ্রী দেখিলে, এবং প্রাচীন চিত্রাদিতে দেবদেবীর প্রতিকৃতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সে যুগে তাঁহারা মুখোস পরিয়া তবে ভক্তকে দর্শন দিতেন। মুখোস জিনিষটা প্রাচীন হইলেও উহার ব্যবসাটা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যাহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহাদের অজ্ঞতাই বোধ হয় ইহার কারণ। কলিকাতার জেলেপাড়ার সংএ বা ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলে কয়টা মুখোসেরই বা আবশ্যক হইয়া থাকে? চেষ্টা করিলে কলিকাতায় এবং বঙ্গদেশের প্রত্যেক মফস্বল সহরে লক্ষ লক্ষ মুখোসের কাটতি হইতে পারে। ইলেকশনের সময়টাই কচু এবং বেতের ব্যবসার মত মুখোসের ব্যবসারও মরশুম। আমাদের হাতে অনেক গ্রাহক আছেন। ব্যবসায়ীগণ নমুনা পাঠাইলে, উপযুক্ত কমিশনে আমরা তাঁহাদিগের মাল চালাইতে পারি।

(৭) সাদা কালি। নাম শুনিয়াই অনেকে দয়ার্দ্র হইয়া আমাদের জন্য বহরমপুরের টিকেট কিনিতে ষ্টেশনে ছুটিবেন। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলেই পাঠক দেখিবেন, আমরা ততটা কৃপা-পাত্র নই। এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল—লেখা হয় শুধু লিখিতব্য বিষয় পাঠকের বোধগম্য করার নিমিত্ত। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে কিছুই বুঝিতে না দিয়া ধাঁধায় ফেলিয়া দেওয়া। আশা করা যায়, অনতিদূর-ভবিষ্যতে সর্ব্ব শ্রেণীর লেখকরাই এই মত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু অসুবিধা এই যে, শাদা কাগজে কাল, লাল, নীল, বেগুণে ইত্যাদি যে কোন রংএর কালিতেই যাহা কিছু লেখা হয়, নির্ব্বোধ পাঠকগুলা তাহারই কিছু না কিছু মর্ম্ম গ্রহণ করে এবং দন্ত বিকাশ করিয়া ফেলে। এই অর্ব্বাচীন বিদূষকের নিমিত্ত শীঘ্রই আমাদের দেশে শাদা কালির বহুল প্রচার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা শুনিলাম Stephen প্রভৃতি বিলাতী কালি-ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পি, এম, বাগচি, জে, বি দত্ত, ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী কি করিতেছেন?

এই সকল অতীব প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য গোপনীয় সংবাদ মাসিকপত্রের মারফত সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলে আমাদের সমূহ ক্ষতি। ইতিমধ্যেই ব্যুরোর তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকি পড়িয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আজ এইখানেই দাঁড়ি টানিতে হইল।

পাষণ্ড-প্রেসিডেণ্ট (Vice President)
ব্যবসায়ে ব্যবহারিক সংবাদ ব্যুরো।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার—

গত মহাযুদ্ধের সময় প্রথম বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়। জার্মাণ সৈন্যই ইহার উদ্ভব করে এবং তাহারাই ইহা প্রথম ব্যবহার করে। শত্রুবধ করিবার যত রকম অস্ত্র বাহির হইয়াছে—বিষাক্ত গ্যাস তাহাদের মধ্যে ভীষণতম। এই অস্ত্রের কাছে কোনো চালাকি বা পাল্টা অস্ত্র খাটে না। বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের ভয়াবহ ফলাফল দেখিয়া ১৯২২ খৃঃ অব্দের Washington Limitation

বিষাক্ত ধূমের কৃত্রিম প্রদর্শনী

of Armaments conference এ যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার সকল জাতি কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। কাগজে কলমে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক শক্তি বিষাক্ত গ্যাস লইয়া নানা রকম পরীক্ষা করিতেছে। একের পরীক্ষার ফল অন্যে জানিতে পারিতেছে না, এ সকল কার্য্যই অতি গোপনে হয়। সকল শক্তিই জানে রকম জানে যে ভবিষ্যতে যে-কোন যুদ্ধ হইবে—তাহাতে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে হইবে এবং যে জাতি ভীষণতম বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারিবে—তাহারই নিশ্চিত জয়। সকল জাতিই বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের বিপক্ষে মত দিতেছে; অথচ তাহারাই বিষাক্ত গ্যাস প্রকৃষ্ট ভাবে ব্যবহার করিবার নানা উপায় অনুসন্ধান করিতেছে। কোনো জাতিই কোনো জাতিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

ভবিষ্যতের যুদ্ধে গ্যাস ছাড়া অন্য অস্ত্র প্রয়োগ বোধ হয় প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। হাতাহাতি যুদ্ধ ত প্রায় বন্ধ হইয়া

গিয়াছে। ভবিষ্যতে সৈন্যদলকে যতদূর সম্ভব ছড়াইয়া রাখা হইবে। তাহাতে গ্যাসের মধ্যে পড়িয়া একেবারে দলকে দল মারা যাইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কম হইবে। রাত্রিদিন যুদ্ধ চলিবে। কারণ গ্যাস দ্বারা আক্রমণ রাত্রিকালে সহজ হয়। উভয় দলকে সকল সময় সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে—এমন কি হয় ত ২৪ ঘণ্টাই গ্যাস-মুখোস আঁটিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; কারণ কোন সময় যে বিপক্ষ দল বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িবে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। শারীরিক শক্তির বিশেষ কোনো দরকার হইবে না। মস্তিষ্কের লড়াইই ভবিষ্যতে প্রধান লড়াই হইবে।

১৯১৮ সালের পর হইতে যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল প্রকার অস্ত্রেরই অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন চেষ্টা হইতেছে যে শত্রুপক্ষের লোককে বেশী হত্যা না করিয়া কেমন করিয়া তাহাদের অকেজো করিয়া দেওয়া যায়। হত্যা করিয়া কোনো লাভ নাই, কিন্তু লোককে অকেজো করিয়া লাভ আছে, তাহাতে শত্রু পক্ষের ভার বাড়ান হইবে এবং

বিষাক্ত ধূমের ব্যবহার

তাহার চলাফেরারও নানা প্রকার অসুবিধা হইবে। মরাকে ফেলিয়া পলায়ন করা সহজ; কিন্তু একটা জীবিত লোককে ত্যাগ করিয়া পালান তত সহজ নহে।

গ্যাস হইতে আত্মরক্ষা করিবারও নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে। বহু প্রকার গ্যাস মুখোস এবং গ্যাস-গাত্রাবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুখোস যে কেবল মানুষের জন্য হইয়াছে, তাহা নয়, ঘোড়া কুকুর ইত্যাদির জন্যও হইয়াছে। নানা রকম বিষাক্ত গ্যাসের ছোঁয়া লাগিলে ঘোড়ার ক্ষুর আঘাত পায়, নানা প্রকার ঘা হয়, সেইজন্য তাহার ক্ষুরের জন্যও গ্যাস আবরণ বাহির হইয়াছে।

গ্যাস কামান, গ্যাস-বোমা ইত্যাদি দ্বারা ভবিষ্যতের যুদ্ধ ক্ষেত্র দেখিতে কেমন হইবে, তাহার কয়েকটি ছবি দেওয়া হইল। ইহা দেখিয়া ভবিষ্যতের যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিষয় খানিকটা ধারণা করা যাইবে। গ্যাস-মুখোসেরও কয়েকটি ছবি দেওয়া গেল।

বিষাক্ত গ্যাস প্রতিরোধক বর্ম্ম

মেডেল পাওয়া গাভী—

মিঃ ডাবলিউ আর্ কেনান, নিউইয়র্ক, এই গাভীর মালিক। গাভী-প্রদর্শনীতে ইহা ৪টি সোনার এবং ১টি রূপার পদক পাইয়াছে। গাভীটি প্রথম দুধ দিবার দিন হইতে ধরিয়া মোট ৯২,৮০০০ পাউণ্ড দুধ এবং ৪,৫৮৫ পাউণ্ড মাখন দিয়াছে। গাভীকুলে এমন গাভী আর আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

লণ্ডনে ফায়ার-ব্রিগেড—

কলিকাতা সহরে আমরা ফায়ার-ব্রিগেড দেখিয়াছি। কোথাও আগুন লাগার খবর পাইলেই এই সকল দমকল হাওয়ার মত বেগে সেইখানে উপস্থিত হইয়া আগুন
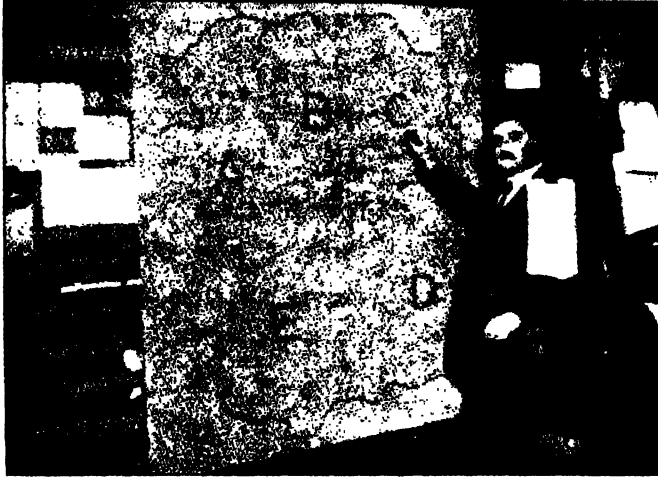
ফায়ার-ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টারে লণ্ডনস্থিত দমকলের শাখা আপিসগুলির মানচিত্র

নিবাইবার কাজে লাগিয়া যায়। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সকল বড় বড় সহরেই একটি করিয়া ফায়ার-ব্রিগেড আছে। লণ্ডন সহরের যে ফায়ার-ব্রিগেড—তাহা জগতের মধ্যে

ফায়ার-সিগন্যালের কাচের ঢাকনা ভাঙ্গিবার সঙ্কেত

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফায়ার-ব্রিগেড বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লণ্ডন সহরে ঘুরিলে চারিদিকে লাল লোহার থাম্বার গায়ে "Pull Alarm and wait for Engine." এই লেখাটিতে সকলের চোখ পড়ে। এই থাম্বাটি ফাঁপা—তাহার গায়ে কাচের ঢাকনির ভিতর একটি হ্যাণ্ডেল আছে। কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিতে দেখিলে যে-কোনো লোক এই কাচের ঢাকনি ভাঙ্গিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া দ্যায়। হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে ফায়ার-ব্রিগেড আপিসের টেলিফোনে

অগ্নিকাণ্ডের খবর শোনা

যোগ আছে। হ্যাণ্ডেল ঘুরাইবামাত্র ফায়ার-ব্রিগেড আপিসে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। ঘণ্টা বাজিবামাত্র ফায়ার-ব্রিগেড এঞ্জিন
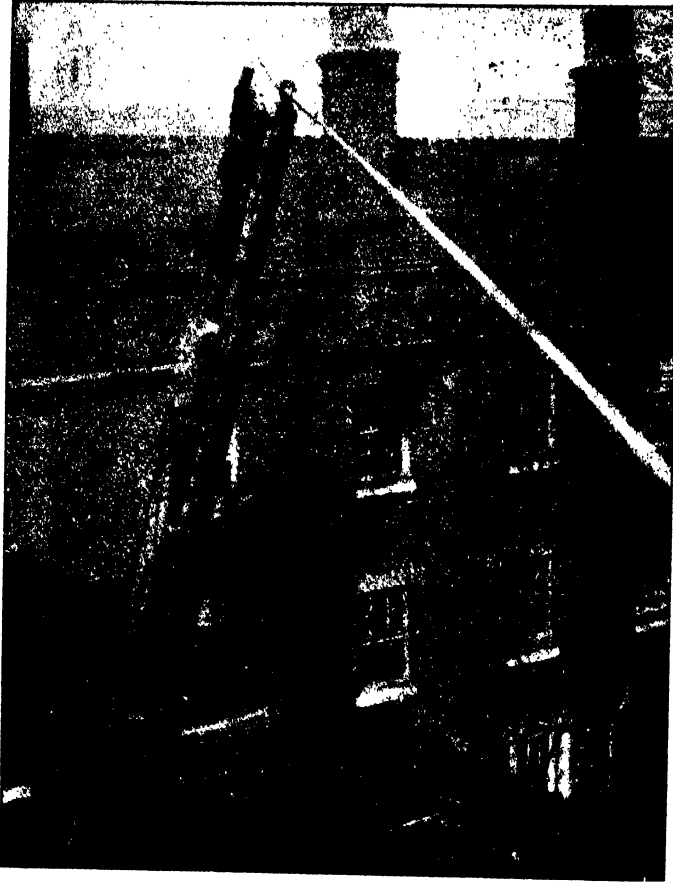
৮০ ফিট উচ্চ মইতে উঠিয়া হোজ হইতে জলের পিচকারী

বাহির হইয়া পড়ে। সহরের কোন্ অংশে আগুন লাগিয়াছে, তাহাও ঘণ্টার নম্বর দেখিয়া বুঝা যায়।

কি রকম করিয়া ফায়ার-সিগন্যালএর কাচের ঢাকনা ভাঙ্গিতে হয়, তাহা ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। হাতের কনুই দ্বারা কাচ ভাঙ্গিয়া তার পর হ্যাণ্ডেল ঘুরান ভাল, তাহাতে হাত কাটিবার ভয় থাকে না। ফায়ার-ব্রিগেড আপিসে ঘণ্টা বাজিবামাত্র একটি মোটর ৪জন

লোক এবং ৫০ ফিট উঠিতে পারে এমন একটি মই লইয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার কয়েক সেকেণ্ড পরেই আর একখানি গাড়ী, মোটর-পাম্প এবং ৫ জন লোক লইয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার সামান্য একটু পরেই নিকটতম অন্য আড্ডা হইতে আর একখানি মোটর গাড়ী পাম্প লইয়া বাহির হইয়া যায়। ফায়ার-সিগন্যাল পড়িবার ১ মিনিটের ভিতর তিনখানি মোটর—দুইটি পাম্প, এবং একখানা ৫০ ফিট উচ্চ মই এবং ১৪ জন লোক লইয়া ঘটনাস্থলের দিকে চলিয়া যায়। আগুন যদি খুব ঘন বস্তির বা বড় কারখানা ইত্যাদির নিকট অথবা ভিতরে লাগে, তাহা হইলে আরো অনেক পাম্প এবং লোক যায়।

ফায়ার-ব্রিগেডএর কয়েকটি শাখা আপিস আছে। এক একটি শাখা আপিস সহরের বিশেষ অংশের ভার লইয়া থাকে। প্রথম ফায়ার-সিগন্যাল এই শাখা আপিসে যায়। শাখা আপিস ফায়ার এঞ্জিন ইত্যাদি পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই হেড বা সেণ্ট্রাল ফায়ার-ব্রিগেড আপিসে টেলিফোনে খবর দেয়। দরকার মত সেণ্ট্রাল ফায়ার

আপিস শাখা আপিসকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকে।

ফায়ার-ব্রিগেডে যে সমস্ত লোক নিযুক্ত হয়, তাহাদের পাকাপাকি নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে রীতিমত শিক্ষানবীশি করিতে হয়। শিক্ষানবীশি করিবার পূর্ব্বে তাহাদের ডাক্তারী মতে পরীক্ষা করা হয়। খুব লম্বা চওড়া এবং ষণ্ডা হইলেই যে সে ভাল অগ্নি-যোদ্ধা হইবে, এমন কোন মানে নাই। অতি সাধারণ চেহারার লোকও অতি দক্ষ অগ্নি-যোদ্ধা হয় দেখা গিয়াছে। ভার তুলিবার ক্ষমতাও পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষানবীশকে ২৪৩ পাউণ্ড ভারী কোন জিনিষ ৪০ সেকেণ্ডে প্রায় ২৫ ফিট তুলিতে হয়। এই

দোলার সাহায্যে বিপন্ন উদ্ধারের অভ্যাস

প্রকার নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর শিক্ষানবীশকে ফায়ার-ব্রিগেড বিদ্যালয়ে লওয়া হয়। বিদ্যালয়ে আগুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সকল রকম শিক্ষা লাভ করিতে হয়। তীরবেগে মইএ চড়া, ধূম্র চ্ছন্ন স্থানে কেমন করিয়া যাইতে হয়, কেমন করিয়া গ্যাস-মুখোস পরিতে হয়, আহত ব্যক্তিকে কেমন করিয়া প্রথম সাহায্য দান করিতে হয়, মোটর চালান, পাম্প ব্যবহার করা ইত্যাদি সহস্র প্রকার ব্যাপার খুব দক্ষ ভাবে শিখিতে হয়।

পল্টনের লোকদের যেমন কুচ-কাওয়াজ করিতে হয়, ফায়ার-ব্রিগেডের লোকদেরও ঠিক সেই সকল করিতে হয়। সংঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইলে যে সকল শিক্ষার দরকার, সেই সকল শিক্ষা ফায়ার-ব্রিগেডের লোকদের যেমন দেওয়া হয়, এমন বোধ হয় আর কাহাদেরও দিতে হয় না। কারণ, একজন লোকের সামান্য ভুলে হয় ত কোটী কোটী টাকা এবং সহস্র লোকের জীবন নষ্ট হইতে পারে। পাকা অগ্নি-যোদ্ধা হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ফায়ারম্যানকে দুই বৎসর ধরিয়া কঠিন শ্রম করিয়া শিক্ষানবীশি করিতে হয়।

মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘণ্টা বাজাইয়া লোকদের তৎপরতা পরীক্ষা হয়। ফায়ার-ব্রিগেডের লোকদের প্রায় সকল সময়ে আড্ডাতে থাকিতে হয়। অবশ্য বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দল বিশ্রাম এবং দরকার মত ছুটি পায়। ইহাদের চিত্ত-বিনোদনের নানা প্রকার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু খুব কম সময়ই ইহারা বিনা বাধায় আমোদ-আহ্লাদ করিতে পায়।

অভিনব খাটিয়া—

একপ্রকার নতুন ধরণের খাটিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই খাটিয়ায় দরকার মত আরামে শোওয়া যাইতে পারে—এবং দিনের বেলায় বা বিদেশ-যাত্রার সময় আবার যোড় খুলিয়া মুড়িয়া একটি ছোট বাণ্ডিলের মত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই ধরণের মোড়া চেয়ারও বাহির

অভিনব চেয়ার। বসা যায়, আবার দরকার হইলে মুড়িয়া বহিয়া লইয়া যাওয়া যায়

অভিনব খাটিয়া। যোড় খুলিয়া মুড়িয়া লওয়া যায় ... হইয়াছে। বনভোজন বা অন্য কাজে যাহাদের বাহিরে বাহিরে কাটাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে এই প্রকার চেয়ার এবং খাটিয়া খুব সুবিধাজনক।

চন্দ্রালোকের ফটোগ্রাফ—

আমরা নানা কাগজে চন্দ্রালোকের এবং চাঁদের নানা প্রকার ছবি দেখি—ইহার মধ্যে অধিকাংশই আসল চাঁদ বা চন্দ্রালোকের ছবি নয়। তৈরী করা চাঁদের ছবিই বেশীর ভাগ। সূর্য্যোদয় অথবা সূর্য্যাস্তের সময়ের 'স্ন্যাপ্‌শট্' তুলিয়া চাঁদের ছবি বলিয়া চালানো হইয়া থাকে অনেক ক্ষেত্রেই।
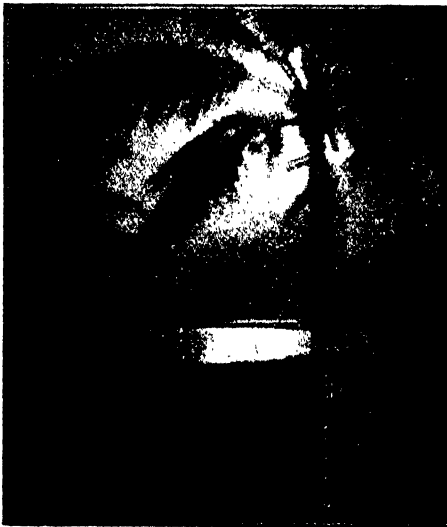
এখানে দুইখানি আসল চাঁদ এবং চন্দ্রালোক শোভিত দৃশ্যের ছবি দেওয়া হইল। ছবি দুইখানি পূর্ণিমার সময় রাত্রি ১০টার সময় তোলা হয়। চাঁদের দিকে 'ফোকাস' ঠিক করিয়া ক্যামেরার মুখ পাঁচ মিনিট খুলিয়া রাখা হয়। তার পর ক্যামেরা বন্ধ করিয়া

চন্দ্রালোকে নারিকেল-কুঞ্জ
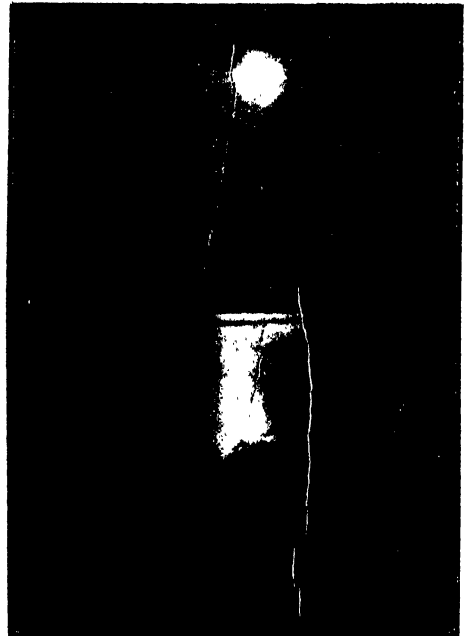
চন্দ্রালোকের ফটোগ্রাফ

ফেলা হয়। প্লেট ডেভেলপ করিবার সময় দেখা যায় যে আরো কিছু সময় ক্যামেরার মুখ খোলা রাখিলে ছবি আরো সুন্দর হইত। তবে পাঁচ মিনিটে যে ছবি উঠিয়াছে—তাহা অস্পষ্ট বা খারাপ হয় নাই।

আমাদের দেশেও আজকাল ঘরে ঘরে ক্যামেরার ছড়াছড়ি। যাঁহাদের ছবি তুলিবার খুব সখ, তাঁহারা এই প্রকারে চাঁদের ছবি তুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

হাতীর দাঁতের ঘায়ের চিকিৎসা—

আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় একটা হাতীর মুখে ঘা হয়। এই হাতী বাগান-রক্ষক এবং দর্শক সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। হাতীটিও তাহার রক্ষকের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। ছবিতে দেখুন, ডাক্তার আসিয়াছে এবং হাতীর রক্ষক হাতীকে হাঁ করাইয়াছে। ডাক্তার তাহার মাড়িতে অস্ত্রোপচার করিতেছেন। শেষে এমন হয় যে, ডাক্তার তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া আসিবামাত্র হাতী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া থাকিত।
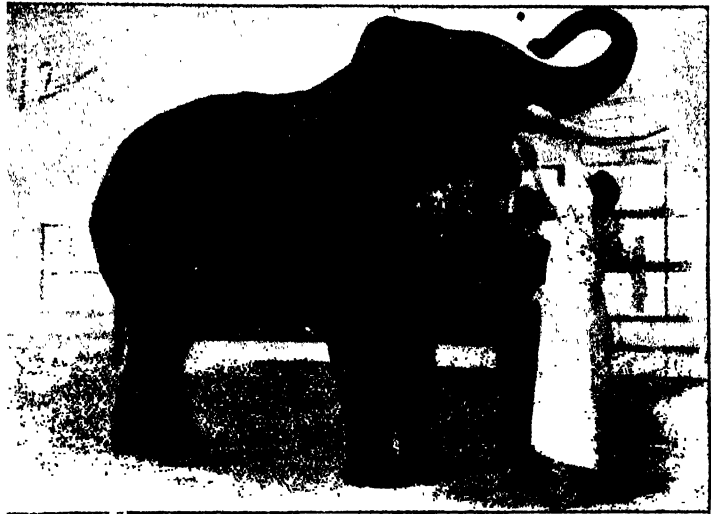
হাতীর দন্ত-চিকিৎসা

আর একটি ছবিতে দেখুন, একজন ডাক্তার একটি বাঁদরের ভাঙ্গা পায়ের চিকিৎসা করিতেছেন। বাঁদরেরা খুব ভাল রোগী হইতে পারে। ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি যখন বাঁধা হয়, বাঁদর তখন একেবারে অত্যন্ত ভালমানুষের মত চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। দুই তিন জন লোক যে তাহাকে লইয়া এমন ভাবে নাড়াচাড়া করিতেছে, ইহাতে সে অত্যন্ত আনন্দ ও আরাম অনুভব করে।

বানরের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা

বায়ুর সাহায্যে মোটর সাফ করা—

জল দিয়া মাজিয়া ঘসিয়া মোটর সাফ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য্য। বিশেষতঃ গাড়ীর নীচের কাদা ঝাড়ন ভিজাইয়া পরিষ্কার করার মত জঘন্য কার্য্য আর নাই। শ্রম লাঘব করিবার একপ্রকার নতুন উপায় বাহির হইয়াছে। একটি মোটা ক্যানভাস হোজ দিয়া বায়ুমিশ্রিত জলের ছিটা খুব জোরের সঙ্গে বাহির হইয়া আসে। পাম্পের সাহায্যে এই জোর পাওয়া যায়। বায়ুমিশ্রিত জলের ছিটায় গাড়ীর ধূলা এবং জমাট কাদা সমস্তই পরিষ্কার হইয়া যায়—অথচ যে পরিষ্কার করে,

বায়ুমিশ্রিত জলের হোজের দ্বারা মোটর সাফ

তাহার বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না। এই প্রকারে গাড়ী পরিষ্কার করার খরচও বিশেষ বেশী নয়। ছবি দেখিলে ব্যাপারটির খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

অভিনব ছাতা—

ভদ্রলোকটির বাঁ হাতে একটি ছাতা রহিয়াছে। ডান হাতে এক মোড়ক রহিয়াছে। দরকার না থাকিলে বাঁ হাতের ছাতাকে ডান হাতের মোড়কে পরিণত করিয়া পকেটে করিয়া লওয়া যায়। সকল সময় ঘাড়ে করিয়া ছাতা বহিবার দরকার হয় না।

নতুন ডুবুরি-পোষাক—

লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে মিঃ জে, এস্, পেরেস্-নির্ম্মিত একটি অভিনব ডুবুরি-পোষাক দেখান হয়। এই পোষাক

পকেট-ছাতা

নতুন ডুবুরি-পোষাক

যে ইস্পাতের তৈয়ারি, তাহাতে কখনও মরিচা ধরিবে না। ডুবুরি ইচ্ছামত তাহার হাত পা ঘাড় নাড়িতে পারিবে। এই পোষাকে ডুবুরি ৬৫০ ফিট জলের নীচে নামিতে পারিবে। এত নীচে এখনও কেহ নামিতে পারে নাই।

*সোলার বাড়ী—

বিলাতে আজকাল অনেক স্থানে সোলার বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। সোলাকে ইস্পাতের ফ্রেমের মধ্যে আটকান হয়। তার পর তাহার দুই দিকে পাম্পের সাহায্যে গলিত কন্‌ক্রিট

ইস্পাতের ফ্রেমের কর্কসজ্জিত বাড়ীতে কংক্রীট নিক্ষেপ

ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গলিত কন্‌ক্রিট জমিয়া গেলে বাড়ীখানিকে কন্‌ক্রিটের বাড়ী বলিয়া মনে হয়। ভিতরের সোলা বাড়ীর ভিতরের ঠাণ্ডা এবং গরম উভয়ের সমতা রক্ষা করে—কিছুই অত্যধিক হয় না। এই প্রকার বাড়ী স্যাঁতসেঁতেও হয় না। ছবিতে দেখুন, কেমন করিয়া ইস্পাতের ফ্রেম এবং সোলার উপর গলিত কন্‌ক্রিট ঢালা হইতেছে।

অদ্ভুত বাদ্যকর—

ছবিতে এক অদ্ভুত বাদ্যকর দেখুন। এক সঙ্গে এই ব্যক্তি ছয় রকম বাদ্য বাজাইতে পারে। এক একটি অঙ্গে এক একটি বাদ্য আছে। মাথা নাড়িলে ঘণ্টা বাজে, পা ফেলিলে ঢাক বাজে, মুখ দিয়া নানা রকম বাঁশি বাজে, হাত দিয়া আর

একাই একশো! একানে ব্যাণ্ড বাজনদার

একটি বাদ্য বাজে। এই লোকটি সিসিলি বাসী। এই ব্যক্তি পথে পথে এই প্রকার বাদ্য বাজাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে।

রুমাল-কাটা কল—

ছবিতে যে রুমাল-কাটা কল দেখিতেছেন, ঐ কলটি

রুমালের কল

ঘণ্টাতে ২০০ ডজন রুমাল কাটিতে এবং গুছাইয়া রাখিতে পারে। কাপড়ের রোল শেষ হইয়া গেলে বা রোলের কাপড় মাঝখানে ছেঁড়া বা খারাপ হইলে কল আপনিই থামিয়া যায়। ৬ ইঞ্চ হইতে ২০ বর্গ ইঞ্চি যে কোনো মাপের রুমাল এই কলে কাটা যায়। এই কল বসাইতে ১৬ বর্গ ফিট স্থানের দরকার হয় এবং একজন ছোকরা বসিয়া ইহা চালাইতে পারে। এই কলের আবিষ্কর্ত্তার নাম Max Schleifer, ইনি আমেরিকার Newark সহরের লোক।

শস্য কাটা এবং ছাঁটা কল—

Delmar Van Horn নামক এক কৃষক তাঁহার নিজের চাষের কাজে লাগাইবার জন্য একটি শস্য-কাটা এবং ছাঁটা কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কল একই সময়ে শস্য কাটাই এবং ছাঁটাই দুই কার্য্য করে। এই কল মোটরের সাহায্যে চলে এবং এক দিনে (১০ ঘণ্টা) পাঁচ হইতে সাত একর জমির যবাদি শস্য, কাটাই-ছাঁটাই করিতে পারে। পুরাণ ধানের যে সকল কল আছে, তাহা অপেক্ষা এই কল একই সময়ে তিনগুণ বেশী কাজ করিতে পারে।

শস্য কাটা ও ছাঁটা কল

উভচর যান—

ফিলিপ ম্যাকোভিচ নামক এক ব্যক্তি একখানি তিনচাকাওয়ালা মোটর গাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। এই গাড়ীখানি স্থলে এবং জলে, উভয় স্থানেই চলিতে পারে। স্থলে ইহার বেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল, এবং জলে ১২ মাইল। জলে চলিবার সময় পিছনের চাকা দুটির স্থানে একটি হাল এবং 'প্রপেলার' বাহির হইয়া আসে।
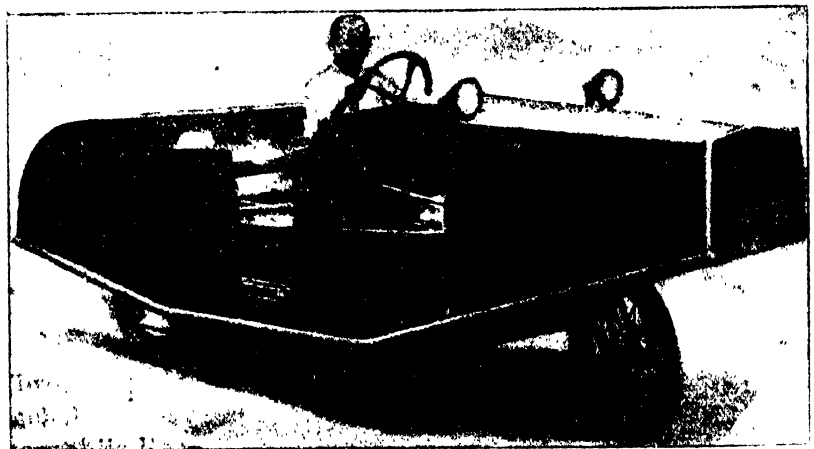
উভয়ে মোটর বোট

শাস্তি

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(১).

বলরামপুরের জগন্নাথ গুড়্যা গ্রাম্য সমাজের মাথা বলিয়া লোকে তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা যতটুকু করুক না কেন, কিন্তু অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিত—কারণ, তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাহারও কোনও অনাচারই ধরা না পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং ধরা পড়িলে তাহার শাস্তির মাত্রাও নিতান্ত অল্প হইত না। কে কোথায় কোন্ নিষিদ্ধ বৃক্ষের শাখা ছেদন করিল, কে কাহার ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে ঠিক করিয়া চুক্তিভঙ্গ করিল, কে গ্রাম্য শীতলাদেবীর পূজার ফণ্ডে চাঁদা কম দিল—ইহার সমস্ত সংবাদ সে রাখিত, এবং সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলেই ইহার যথোচিত শাস্তি বিধান করিত। ইহার ফলে গ্রাম্য বারোয়ারী ফণ্ডের টাকা যেমন বাড়িয়া যাইত—তেমনি তাহার লাভের অনুপাতও সমভাবেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত; কারণ, জগন্নাথ গুড়্যাই ছিল এই অর্থের একমাত্র ট্রেজারার।

সেদিন প্রাতঃকালে গুড়্যার পো গোয়ালে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিল; এবং যে গাভী ও বলদ যেরূপ কার্য্যক্ষম, সেই অনুপাতে তাহাকে খাদ্য দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহার তদারক করিয়া ফিরিতেছিল। সহসা একটি অতিশীর্ণ বৃদ্ধ গাভীর খাদ্যের পরিমাণ দেখিয়া সে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এই গাভীটি কিছু দিন হইল একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে—অথচ এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহার মরিবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় না। ইহাকে লইয়া সে যে কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। নরঘাটের গোহাটায় অনেক ব্যাপারী গরু বিক্রয় করিয়া থাকে; এবং এই গরুগুলি বিশেষ কোনও সৎকার্য্যের জন্য কলিকাতার ব্যাপারী-সম্প্রদায় ক্রয় করিয়া লইয়া যায়—এ সংবাদ এই সৎবংশসম্ভূত হিন্দুকুল-ধুরন্ধরটি জানিত। এই জন্য সে অনেকটা আশান্বিত হইয়া এক মুসলমান ব্যাপারীকে ধরিয়া বসিল।

গরু দেখিয়া ব্যাপারীটি হাসিয়া কহিল—"এ গরু তোমারই থাক কর্ত্তা—এমন জীব বেচ্‌তে আমাদেরও সরম লাগবে। আর কিছু না করুক, অন্ততঃ সাত আটটা বছরও তো তোমার কাজে লেগেছে—এই কয়টা মাসও কি আর ওকে বসিয়ে খাওয়াতে পারবে না? চার-পাঁচ মাসের বেশী তোমাকে কষ্ট করতে হবে না কর্ত্তা—তার পর সাতাজা বাড়ীর ছিদাম মুচিকে ডেকো—সে যা হোক করে চামড়ার দাম বলে দুটো টাকা দেবেই।"

কর্ত্তা চটিয়া উঠিল, দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল—"এ্যাঁ—আমি হিঁদু হয়ে করবো গরুর চামড়া বিক্রি?"

ব্যাপারী রুষ্ট না হইয়া সহাস্য মুখেই কহিল—"কর্ত্তা কি ভেবেছো—আমি টাকা দিয়ে গরু কিনে কলকাতায় পিঁজরাপোলে পাঠাবো?"

গুড়্যার পোর মুখে সদুত্তর জুটিল না বটে, কিন্তু এই উচিত-বক্তা মুসলমানের প্রতি তিনি যে বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন—তাহা অনেক ছোটলোকের মুখ দিয়াও বাহির হইত না।

সেই হইতে সে গরু বিক্রয়ের আশা ত্যাগ করিল; এবং ব্যবস্থা করিল—মাঠের ঘাস ভিন্ন সে অন্য কোনও খাদ্য পাইবে না। কাজ করিতে না পারুক, অন্ততঃ নিজের খাদ্যও মাটি খুঁটিয়া সংগ্রহ করুক। কিন্তু তাহার এ আদেশ এই গরুগুলির পরিচর্য্যাকারক রক্ষা করিতে পারিত না; এবং দয়া করিয়া অন্যের সহিত দুই এক আঁটি বিচালীও তাহাকে দিয়া যাইত।

জগন্নাথ গুড়্যা ক্ষিপ্ত হইয়া হুঙ্কার দিয়া হাঁকিল—"জনার্দ্দন!"

জনার্দ্দন গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতেছিল; মনিবের হাঁক শুনিয়া গোবরমাখা হাত লইয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শুড্যার পো কহিল—"ব্যাটা আমারই খাবে—আর আমারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে!"

জনার্দ্দন ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

—"আমি তোকে কি বলেছিলাম রে হারামজাদা?"

জনার্দ্দন কিছুই স্মরণ করিতে না পারিয়া কহিল—"আজ্ঞে?"

—"এটাকে খড় দিতে বারণ করেছিলাম যে—আমার কথা রাখা হয় নি কেন শূয়ার?"

জনার্দ্দন আমতা আমতা করিয়া কহিল—"আজ্ঞে, অন্ত গরুকে খড় দিতে গেলে ও হাঁ করে চেয়ে থাকে তাই।"

—"ওঃ, ভারী দরদ যে! অত দয়া হলে নিজের বাড়ী নিয়ে পুষগে যা! পরের পয়সায় নবাবী অমন সব ব্যাটাই কর্ত্তে পারে। নে ব্যাটা, ওর মুখ থেকে আঁটিটা কেড়ে।... সবটাই খেয়ে ফেল্লে যে! তোর মাইনে থেকে যদি আমি খড়ের দাম না কাটি—তাহলে কি বলেছি।" এই বলিয়া সত্য সত্যই এই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুটি সেই ক্ষুধার্ত্ত নির্জ্জীব পশুর মুখ হইতে খড়ের আঁটিটা কাড়িয়া লইল।

পশুটি নীরবে কাতর ভাবে চাহিয়া রহিল—একবার 'হাম্বারবে' ডাকিয়া প্রতিবাদ করিবে, এমন শক্তিটুকুও বোধ করি তাহার দেহে ছিল না।

জনার্দ্দনের চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল—জগন্নাথ কহিল—"নে, ছোট্ট দড়ি দিয়ে পুকুর-পাড়ে বেঁধে রাখগে যা। বড় বড় ঘাস—ওতেই ওর পেট ভরবে। আর বুড়ো গরুর কি শুক্‌নো খড় সহ্য হয়। শেষে পেটের অসুখ হয়ে পড়ুক আর কি। এখন তবু ঘুঁটেটা, ঘঁসিটা হচ্ছে—তখন সে দফাও ঠাণ্ডা। নে, নে, সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকিস নে—আরও অনেক কাজ আছে।" এই বলিয়া এই পরম ভাগবত শুড্যার পো রুগ্ন গাভীর পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

(২)

গ্রামের মধ্যে জগন্নাথ শুড্যার প্রতিপত্তির প্রধান কারণ—তাহার জমি-জায়গা অনেক এবং সে মহাজনী কারবার করে। তাহার জমি ভাগে চাষ করিয়া অনেক গরীবের বৎসরের খোরাকী সংগ্রহ হয়; এবং অভাবে পড়িলে তাহার নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া তাহারা প্রাণ ধারণ করে। গ্রামের মধ্যে সে যাহা বলিবে, অন্তে তাহার প্রতিবাদ করিতেও সাহস করে না; কারণ, একটা না একটা দায়ে প্রত্যেকেই তাহার নিকট বাঁধা রহিয়াছে। অন্তের হইয়া মোকর্দ্দমা করিতে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে, সৎ বলিয়া কুপরামর্শ দিতে তাহার একটুও বাধিত না—কারণ, ইহারই দ্বারা তাহার অবস্থার যেমন উন্নতি হইয়াছে—অন্ত কোনও ভাবে সেরূপ হয় নাই। মোকর্দ্দমার ঝোঁকে পড়িলে যেমন লোকে কড়া সুদে টাকা ধার করে, অথবা অল্প মূল্যে জমি-জায়গা বিক্রয় করিয়া ফেলে—এমনটা বোধ হয় স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকিলেও লোকে সচরাচর করে না। সুতরাং একটা কিছু গোলমাল হইতে না হইতেই, সে সদরে যাইয়া এক নম্বর জুড়িয়া দিতে পরামর্শ দেয়; এবং টাকার জোগান সেই দিয়া থাকে। ইহার ফলে মোকর্দ্দমায় হারিয়া অথবা জিতিয়াও লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়; এবং তাহারই হাতে জমিজমা, এমন কি ভিটা পর্য্যন্ত সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

অর্থের জোরে সে একেবারে সমাজের উচ্চ শিখরে আসন পাইয়াছিল; এবং শত সহস্র ব্যভিচারও তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিতে সমর্থ হইত না। বৃদ্ধ বয়সে নিমাই মণ্ডলের বিধবা ভগিনীর সহিত তাহার গুপ্ত সম্বন্ধ প্রকাশ পাইলেও লোকে কিছু বলিতে পারিত না—এমন কি, কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে নিমাই মণ্ডলের ভগিনীর নিমন্ত্রণ না হইলে, জগন্নাথের চক্রান্তে সে-ই একঘরে হইয়া থাকিত। অথচ সেবার কোন্ এক দুর্ব্বৃত্ত রাস্তার মাঝে কিনু ঘোষের বিধবা পুত্রবধূর কাপড় ধরিয়া টানিয়াছে—এই অপবাদ দিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদ করে এমন সাহসও গ্রামের মধ্যে কাহারও নাই। সেদিন জগন্নাথের যুবক পুত্রের বিরুদ্ধে ধোপা-বৌ অভিযোগ করে যে, সে তাহার সধবা যুবতী কন্যার উপর কুৎসিত অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ তাহার অভিযোগে কর্ণপাত করে নাই। বাধ্য হইয়া ধোপা-বৌ কন্যার সহিত ভিন্ন গ্রামে জামাতার আশ্রয় লইয়াছে। মোট কথা, জগন্নাথ শুড্যা সমাজের মাথা হইয়া সমস্ত গ্রামটি অত্যাচারে প্রপীড়িত করিয়া তুলিতেছিল—কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করে, এমন বুকের পাটা সে গ্রামের মধ্যে কাহারও ছিল না।

সেদিন জগন্নাথ শুড়্যা প্রত্যুষে হুঁকা হাতে লইয়া কড়া তাম্রকূটের তীব্র ধূম আরামে পান করিতেছিল—এমন সময় বৃদ্ধ পদ্মলোচন মাইতি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রত্যুষেই এমনি একটা আরামদায়ক ব্যাপার দেখিয়া শুড়্যার পো হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কহিল—"হয়েছে কি মাইতির পো—অমন করছো কেন ?" মাইতির পো তাহার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ও বিরলদন্ত পাটির ভিতর দিয়া যে কাহিনী বিবৃত করিল, তাহা সংক্ষেপে এই—হরিধনের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তাহার বিবাহ একরূপ পাকাপাকি রকমে ঠিক হইয়াছিল—এমন কি, এই বিবাহ উপলক্ষে তিনকুড়ি টাকা পণের মধ্যে দুকুড়ি পাঁচ টাকা হরিধনকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। বিবাহের তারিখও আগামী কল্য ঠিক আছে। কিন্তু সে সঠিক জানিতে পারিয়াছে—হরিধন ভিতরে ভিতরে তাহার কন্যার বিবাহ শিবপ্রসাদ জানার কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত ঠিক করিয়াছে ; এবং সে বিবাহের লগ্ন আজই রাত্রে।

জগন্নাথ হেলিয়া দুলিয়া বসিয়া মাথা ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে কহিল—"হরিধনের এমন সাহস কি হবে পদ্মলোচন ?" পদ্মলোচন জগন্নাথের পেয়ারের লোক—অনেক কুকার্য্যে তাহার সহায়। সে যখন গর্ভাবস্থায় লাথি মারিয়া তাহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়—সে সময় জগন্নাথই তাহাকে পুলিশের কবল হইতে বাঁচাইয়াছিল। সুতরাং তাহার চতুর্থ পক্ষকে গৃহে আনিতে যে সেই জগন্নাথ নিশ্চিত সাহায্য করিবে, ইহা সে বিশেষ ভাবেই জানিত ; এবং এই জন্যই সে তাহার নিকট ধন্না দিয়াছিল। সে কাঁদো কাঁদো সুরে কহিল—"তাই তো দেখছি কর্ত্তা। এখন তোমার দয়ায় যদি উদ্ধার পাই। মেয়ে তো দেবেই না—আবার টাকা গুলোও যদি—"

জগন্নাথ বাধা দিয়া কহিল—"হরিধনের ক বিঘে জমি মাইতির পো ?"

—"আজ্ঞে, ঐ ভিটেটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। সেবার নবীন মাইতির সাথে গরুচুরির মামলা করতে যেয়ে আপনার কাছেই বাঁধা রেখেছিল যে !"

জগন্নাথ কহিল—"কিছু নাই, অথচ বুকের পাটা তো খুব দেখছি !"

"শিং ভাঙা দামড়া আর কি—ওদেরই তো বুকের পাটা বেশী কর্ত্তা।"

কর্ত্তা একটু ভাবিয়া কহিলেন—"আচ্ছা দেখাচ্ছি।" তখনই হরিধনের ডাক পড়িল। হরিধন আসিলে জগন্নাথ ধমক দিয়া কহিল—"তোদের কি ধর্ম্মভয় নেই রে হরিধন ! একজনকে কথা দিয়ে আবার অন্যের সাথে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিস যে বড় ?"

হরিধন কহিল—"সুবিধে পেলে কে ছেড়ে দেয় কর্ত্তা। ভাল ছেলে পেয়ে কি করে ছেড়ে দি' বল।"

—"তবে টাকা নিয়েছিস কেন রে ?"

—"টাকা নিয়েছি বলেই কি মেয়ে বেচা হয়েছে ? টাকা ফিরিয়ে না দিলে তখন অবিশ্যি বলতে পার—"

হরিধনের কথার ভঙ্গী দেখিয়া জগন্নাথের আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে ধমক দিয়া কহিল—"টাকা নিয়েছিস্, তখনই তো মেয়ে বেচা হয়েছে। সে এখন ধর্ম্মতঃ পদ্মলোচনের স্ত্রী। এখন অন্যের সাথে বিয়ে দিলেই ধর্ম্মচ্যুত হতে হবে।"

হরিধন কহিল—"আমরা গরীব লোক, ওসব ধর্ম্মব্যাখ্যা আমরা বুঝি না। ভাল জামাই পেয়েছি যখন—ওই বুড়োর সাথে আর মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না। আমার সোজা কথা !"

শুড়্যার পো চীৎকার করিয়া কহিল—"ওঃ, বড় বাড় বেড়েছে দেখছি যে। তোর কতটা আস্পর্দ্ধা আমিও দেখে নিচ্ছি।"

তৎক্ষণাৎ গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বৈঠক বসিল। সকলে সমস্বরে রায় দিল—যেমন করে হোক পদ্মলোচনের সহিত আজই রাত্রে হরিধনের কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে। নইলে এ গ্রামের মুখ রক্ষা হইবে না। ছোটলোক হরিধনের এ রকম অনাচার নীরবে সহ্য করিয়া থাকিলে গ্রাম্য সমাজে আরও অনেক ব্যভিচার প্রবেশ করিবে।

তৎক্ষণাৎ শিবপ্রসাদ জানাকে ডাকা হইল এবং তাহাকে জানানো হইল—হরিধনের কন্যাকে গৃহে আনিলে তাহারও নিষ্কৃতি নাই। সে যখন অন্যের বাক্‌দত্তা, তখন তাহার পুত্রের ঐ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে ব্যভিচারিণীকে গৃহে আনার ফলে তাহাকে সমাজের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। এমন কি, গ্রামের মোড়লদের কথা অমান্য করিলে সেই পাপের ফলে ঐ বালিকার সতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে না—ইহাও তাহাকে আভাষে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। শিবপ্রসাদ ধর্ম্মভীরু নিরীহ লোক—গ্রামের

বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে সাহস করিল না—হরিধনকে জবাব দিয়া বসিল।

সেই রাত্রেই জগন্নাথ গুড়্যা বরকর্ত্তা হইয়া জোর করিয়া হরিধনের কন্যার সহিত বৃদ্ধ পদ্মলোচনের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিল। পদ্মলোচন আনন্দে গদগদ হইয়া গুড়্যার পোর পদধূলি লইয়া জিহ্বায় ও মস্তকে স্পর্শ করিল। পরদিন শোনা গেল হরিধনের স্ত্রী কন্যার ভাবী দুঃখ কল্পনা করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

(৩)

সেদিন গুড়্যার পো মধ্যাহ্নে তাহার দেহখানি উত্তমরূপে তৈলসিক্ত করিতেছে—এমন সময় ও-পাড়ার শিবুমণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিল—"গুড়্যারপো, সর্ব্বনাশ!"

জগন্নাথ কহিল—"সর্ব্বনাশটা আবার কি হল হে?"

শিবু কহিল—"মণ্ডল-পাড়ার অশথ গাছ কেটে ছয়লাপ করেছে একেবারে!"

অতি বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া জগন্নাথ কহিল—"কার এমন আস্পর্দ্ধা শিবু, যে অশথ গাছে হাত দেয়।"

—"আস্পর্দ্ধা আজকাল অনেকেরই হয়েছে গুড়্যার পো—অনেকেরই হয়েছে। গ্রামে কি আর শাসন আছে, যে, আচারধর্ম্ম পালন করবে। যা ইচ্ছে সবাই তাই করছে। নইলে ঐ নফরা তাঁতির এত বাড়!"

—"তা হলে নফরারই এই কাণ্ড?"

—"তা নয় তো আবার এত সাহস হবে কার? ওদের কি আর 'ধর্ম্মকর্ম্ম' বলে জ্ঞান আছে। সব খুইয়েছে যে!"

জগন্নাথ গুড়্যা হাত পা ঝাঁকাইয়া কহিল—"সে খোয়ালেই তো আর আমরা এসব দেখেও চুপ করে থাকতে পারি নে। আমাদের তো একটা বিধান করতেই হবে।"

—"সেই জন্যই তো তোমার কাছে ছুটে আসছি গুড়্যার পো। এ সমাজ যে টিঁকে আছে—শুদ্ধ তোমারই দয়ায়।"

আত্মপ্রশংসায় স্ফীত হইয়া জগন্নাথ কহিল—"আজ বিকেলেই পাঁচটা মাথা এক হয়ে এর বিহিত করছি। হারে, দিন দিন এ হ'লো কি! হিন্দুধর্ম্ম তো যায় যায় দেখ্‌ছি। অশথ গাছের ডাল কাটা—এ যে গোহত্যা ব্রাহ্মণ-হত্যারও বাড়া! নরকে যাবে, নরকে যাবে!"

শিবুমণ্ডল বুক ফুলাইয়া কহিল—"এর উচিত শাস্তি দেওয়া চাই গুড়্যারপো। ঐ নফরা তাঁতি—চার মাসের মধ্যে পনেরোটা দিন যাকে উপোস করে থাকতে হয়—তার বুকের পাটা দেখলে তো। আমি গেলাম ভাল ভাবে জিজ্ঞাসা করতে—নফ্‌রার ছেলেটা কি না তেড়ে মারতে এলো। যণ্ডামার্ক কোথাকার! না খেয়েও যে কি করে অমন ষাঁড়ের মত চেহারা হয় জানি নে বাপু!"

জগন্নাথ মাথা দুলাইয়া কহিল—"দাঁড়াও না, মজাটা দেখাচ্ছি।"

বৈকালে গ্রামের বৈঠক বসিলে নফরের ডাক হইল। বৃদ্ধ নফর যষ্টি-হস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাতে তাহার যুবক পুত্র—নিধি।

জগন্নাথ গুড়্যা কহিল—"অশথ গাছে হাত দেওয়া হয়েছে কেন নফর?"

নফর কোনও উত্তর দিল না—লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। হিন্দু হইয়া অশথ গাছের ডালে সে বড় দুঃখেই হাত দিয়াছিল। সে নিতান্ত গরীব—মাত্র একটি বিঘা জমি তাহার সম্বল। জমির ধারেই এই অশথ গাছটি। তাহার ঘন-পল্লব-বিশিষ্ট কয়েকটি ডাল জমির দিকে প্রসারিত হইয়া স্থানটিকে এমনি ছায়াবহুল করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার আওতায় কয়েক বছর শস্য একেবারেই হয় নাই। কিন্তু এতখানি সহ্য করিয়াও অশথ গাছে সে হাত দেয় নাই। নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া পুত্রের প্ররোচনায় সে এবার সম্মতি দিয়াছে। আশা এই যে, ডাল কয়েকখানি কাটিয়া ফেলিলে দুমুঠা বেশী ধান মাঠে ফলিতে পারে।—কিন্তু ইহাতে যে এত কাণ্ড ঘটিবে, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ তাহার বিচার করিয়া দণ্ড দিতে বসিবে—ইহা তাহার ধারণায় আসে নাই।

জগন্নাথ গুড়্যা হুঙ্কার দিয়া কহিল—"বলি, মাথা নীচু করে থাকলেই চলবে? তোমার চেহারা দেখার জন্য তো আর ডাকা হয়নি।"

পিতার অবস্থা দেখিয়া নিধি আগাইয়া আসিয়া কহিল—"যা তোমাদের জিজ্ঞাসা করার আমাকে কর, বাবা কিছু জানে না।" সভাশুদ্ধ লোক মুখ খিঁচাইয়া অশ্রাব্য কটূক্তি করিয়া উঠিল। জগন্নাথ গুড়্যা রসান দিয়া কহিল—"সুবুদ্ধি তাঁতির পো'র কুবুদ্ধি ঘনালো। বলি, এমন কাজটা করলে কেন হে বাপু?"

নিধি কহিল—"ক্ষেত নষ্ট হচ্ছিল—তাই।"

গুড়্যারপো মুখ ভ্যাঙ্গচাইয়া কহিল—"ক্ষেত নষ্ট হচ্ছিল—তাই! কিন্তু এতে যে ধর্ম্মনষ্ট হলো তার খবর রাখো?"

বৈকুণ্ঠ মাইতি ফোড়ণ দিয়া কহিল—"তাঁতির বুদ্ধি আর কত হবে!"

চারিদিকের টিট্‌কারি শুনিয়া নিধির মগজ গরম হইয়া উঠিয়াছিল—সে বৈকুণ্ঠ মাইতির দিকে চোখ পাকাইয়া কহিল—"খবরদার! ফের জাত তুলবে তো মাথা গুঁড়ো করে ফেল্‌বো।" সভাশুদ্ধ লোক হতভম্ব হইয়া মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।—নিধি 'মরিয়া' হইয়া বলিতে লাগিল—"ওঃ, সব লাটসাহেব রে! বিচার করতে বসেছেন! বেশ করেছি—গাছের ডাল কেটেছি। তোদের যা ইচ্ছে তাই কর। এই আমরা যাচ্ছি।"

সভাশুদ্ধ লোকের মুখে আর কথা নাই। নফর এতক্ষণে মাথা তুলিল। সে পুত্রের গায়ে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিল—"ছিঃ, ও-সব কথা বল্‌তে নাই।" তার পর করযোড়ে সভাস্থ সকলের নিকট বলিতে লাগিল—"ও ছেলেমানুষ, বুদ্ধিহীন—ওর কথায় কাণ দেবেন না। সত্যিই আমি অপরাধ করেছি—কিন্তু বড় দুঃখেই করেছি। এর উচিত শাস্তি আপনারা যা দেবেন—আমি মাথা পেতে নেবো।"

সভা-শুদ্ধ লোক আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈকুণ্ঠ মাইতি কহিল—"ও-ছোঁড়া যে আমার মাথা গুঁড়ো করতে চায়?"

নফর করযোড়ে কহিল—"ওর কথায় রাগ করো না মাইতির পো। তোমরা মহৎ লোক।" তার পর সভাস্থ সকলের দিকে চাহিয়া বিনীত ভাবে কহিল—"তাহলে আমার উপর কি হুকুম হয়?"

জগন্নাথ গুড়্যা তখন আরও পাঁচটি মাথার সহিত পরামর্শ করিতেছিল। এইবার মুখ তুলিয়া কহিল—"হাঁ! তোমার অপরাধ গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যার চেয়ে কম নয়। তবু আমরা ন্যায্য বিচার করে মাত্র পঁচিশটা টাকা জরিমানা করলাম। বারোয়ারী ফণ্ডে এই টাকাটা তোমাকে দিতে হবে।"

নফর সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল—"অত টাকা আমি কোথায় পাব কর্ত্তা। আমার যে দুবেলার অন্ন জোটে না!"

জগন্নাথ গুড়্যা কহিল—"সে আমরা জানি নে বাপু! গ্রামের শাসন মানার ইচ্ছা থাকে—টাকা দাও, নইলে পথ দেখ। ব্যস্, আমাদের পথও আমরা খুঁজে দেখ্‌ছি।"

নিধি আবার গরম হইয়া কহিল—"আচ্ছা তাই দেখ। চল বাবা এখান থেকে।"

নফর পুত্রকে থামাইয়া কহিল—"তোমাদের বিচারই মাথায় করে নিলাম। এখন যাই—টাকার জোগাড় দেখি।" বৃদ্ধ সপুত্র বাহির হইয়া আসিল।

নিধি কহিল—"এত টাকা কোথায় পাবে বাবা? কেন তুমি কথা দিয়ে এলে?"

শীর্ণ বক্ষে বলিষ্ঠ পুত্রকে চাপিয়া ধরিয়া বৃদ্ধ কহিল,—"আমার আবার টাকার ভাবনা! তুই যে আমার লাখ টাকার নিধি রে!"

(৪)

পরদিন প্রত্যুষে নফর জগন্নাথ গুড়্যার নিকট আসিয়া কহিল—"টাকার তো কিছুতে জোগাড় করতে পারলাম না কর্ত্তা।"

গুড়্যার পো গম্ভীরভাবে কহিল—"কাল স্বীকার করে না গেলেই তো ভাল কর্ত্তে বাপু।"

নফর একটুখানি হাসিয়া কহিল—"স্বীকার যখন করেছি, তখন একটা উপায় কর্ত্তেই হবে। আচ্ছা, নিধিকে এক মাস তোমার বাড়ীতে বিনা মাইনেতে 'মজুর' রাখলে কি এ টাকাটা উশুল হয় না?"

প্রস্তাব শুনিয়া জগন্নাথ গুড়্যা মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিল। কারণ, আবাদের সময় একেবারে আসন্ন—সুতরাং এ সময় বিনা পয়সায় নিধির মত কর্ম্মঠ 'মজুর' রাখিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইবে।

সে মুরুব্বিয়ানার চালে কহিল—"তা' হতে পারে। কিন্তু এক মাসে টাকাটা কি করে উশুল হবে হে? দেড়টি মাস চাই।"

নফর কহিল—"এই একটা মাসই আমাদের কি করে কাটবে তাই ভাবছি—তার উপর আর মেয়াদ বাড়িও না কর্ত্তা। আর জানই তো—যে, নিধির মত কাজের ছেলে এ গ্রামে আর বেশী নাই।"

জগন্নাথ মাথা দুলাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"সবাই

নিজের ছেলেকে ভাল দেখে হে। তা যাক্, এক মাসই থাকবে। আজ থেকেই কিন্তু পাঠিয়ে দিও বাপু!"

সেই দিন হইতেই নিধি জগন্নাথ গুড়্যার কাজে লাগিয়া গেল। গুড়্যার পো তাহাকে ক্রমাগত হুকুম করিয়া গ্রাম্য বারোয়ারী ফণ্ডের টাকাটা উশুল করিতে লাগিল। কিন্তু নফরের সংসার চলা একেবারেই দুরূহ হইল। যে এক বিঘা জমি ছিল, তাহাও পতিত পড়িয়া রহিল। দিন মজুরি করিয়া নিধি যাহা পাইত—তাহাতেই তাহাদের সংসারের খরচটা কোনও রকমে চলিত। এখন প্রায়ই উপবাস দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর রহিল না। নিধির এক একবার ইচ্ছা করিত যে, পিতার আদেশ অমান্য করিয়া চলিয়া আসে—জগন্নাথ গুড়্যা যাহা পারে তাহাই করুক। কিন্তু তাহার মনের ইচ্ছা সে মনেই দমন করিয়া রাখিত। বাড়ীতে ফিরিয়া সব চেয়ে কষ্ট হইত তাহার ছোট ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়া। এই বোনটি কিছুদিন হইল স্বামী হারাইয়া বাপের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও তাহার মুখে দুটি বেলা অন্ন তুলিয়া দিবে—এমন সঙ্গতিও তাহার বাপ দাদার নাই। এই ভগ্নীকে নিধি আন্তরিক স্নেহ করিত। তাহার শুষ্ক চোখ-মুখ, অনাহারে মলিন চেহারার দিকে চাহিয়া নিধির দুই চোখ জলে পুরিয়া আসিত। এই কয়টা দিন কোনরূপে কাটিয়া গেলে সে অন্য জায়গায় খাটিয়াও যে বাপ-বোনের মুখে দুটি অন্ন দিতে পারে!

সেদিন গুড়্যার পোর সহসা খেয়াল হইল—নিধিকে দিয়া সেই অকর্ম্মণ্য গরুটাকে বিক্রয় করিয়া দিলে তো আপদ চুকিয়া যায়। সে নিধির কাছে প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিল।

নিধি বলিল—"ও গরু কে নেবে কর্ত্তা?"

গুড়্যার পো কহিল—"নরঘাটার হাটে কলকাতার ব্যাপারীরা মরা গরু ফেলে না—ও তো তবু ধুকধুক করছে। তুই নিয়ে যা—যা হোক করেও দশটা টাকা হবেই।"

নিধি আমতা আমতা করিয়া কহিল—"গরু কিনে নিয়ে না কি কলকাতার ওরা—"

গুড়্যার পো অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—"টাকা দিয়ে কিনে তারা যা ইচ্ছে তাই করুক না—আমাদের তাতে কি? আমরা তো আর চোখে দেখতে যাচ্ছি নে। তুই কাল অন্ধকার থাকৃতে থাকৃতে বেরিয়ে পড়বি। গাঁয়ের শালারা যদি দেখতে পায়, অমনি টিটকারি দেবে। তাদের কি—পরের পয়সা লুট হয়ে যাক না!"

নিধি আর কোনও আপত্তি করিল না, কিন্তু কহিল—"তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে কর্ত্তা।"

গুড়্যার পো কহিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা যাব বৈকি। কিন্তু তুই গরু নিয়ে আগে বেরিয়ে যাবি। আমি পরে যাব।"

পরদিন অনেক দর-কষাকষি করিয়া চারটি টাকায় গরুটি বিক্রয় হইয়া গেল। জগন্নাথ 'যথা লাভ' মনে করিয়া টাকা কয়টি ভাল করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে জগন্নাথ নিধির সহিত দিল্‌খোলসা ভাবে আলাপ করিতে করিতে চলিল। অনেক দিন পরে সে এই অকর্ম্মণ্য গরুটিকে নিজের স্কন্ধ হইতে নামাইতে পারিয়াছে দেখিয়া তাহার মনটাও বেশ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নিধির মন মোটেই প্রসন্ন ছিল না। আজ সারাদিন তাহার আহার হয় নাই—উপরন্তু এই গরু বিক্রয় ব্যাপারটিতেও তাহার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু সেদিকে নিতান্ত স্বার্থপর জগন্নাথের ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

কথায় কথায় নিধির বাড়ীর কথা উঠিল এবং সেই প্রসঙ্গে তাহার বিধবা ভগ্নীর কথাও হইল। তাহাকে সে দু'বেলা দু' মুঠা ভাতও দিতে পারিতেছে না—নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে নিধি এ কথাও বলিয়া ফেলিল।

জগন্নাথ গুড়্যার তখন নিতান্ত খোস মেজাজ। সে সহসা তাহার নাত্‌নীর বয়সী নিধির বোনের সম্বন্ধে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া বসিল। নিধি যদি তাহার বোনকে তাহারই আশ্রয়ে পাঠায়—তাহা হইলে তো তাহার অন্নের অভাব হয় না। আর গ্রামের মধ্যে এ ব্যাপার তো চলিতই রহিয়াছে। দীনদুঃখীর মেয়ের বিধবা হইয়া ঐ ভাবে পড়িয়া থাকিলে চলিবে কেন?

দপ করিয়া নিধির মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এতদিনকার ধূমায়িত বহ্নি এইবার আর বাধা মানিল না। এই নিবিড় সন্ধ্যায় নির্জ্জন পথের মাঝে নিধি গুড়্যার পোর গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার এমন শক্তি অবশিষ্ট রহিল না যে সে চীৎকার করিয়া উঠে।

ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত ভয়ঙ্কর হইয়া নিধি, তাহাকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিয়া বলিল—"তোর বদমায়েসির শাস্তি

আমি দিচ্ছি। গ্রামের লোকের উপর বিনা দোষে শাস্তি দেওয়া আমি বের করছি। তোকে প্রাণে মারবো না—কিন্তু এমন শাস্তি দেব যে চিরদিন মনে থাকবে।"

গলা টিপিয়া ধরিতেই জগন্নাথের জিভ্ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নিধির হাতে একখানি 'কাস্তে' ছিল। কথা ছিল ফিরিবার পথে কিছু কাঁচা ঘাস সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবে। সেই অস্ত্র দিয়া নিধি তাহার জিহ্বার আধখানি কাটিয়া লইল। তার পর জগন্নাথ গুড়্যাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"এই তোর পাপের শাস্তি। এইবার গ্রামে ফিরে যা! গরীব দুঃখীকে পা দিয়ে মাড়াতে এইবার তোর সরম লাগ্‌বে।" এই বলিয়া নিধি ভগ্ন পথ ধরিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

উৎকল-অভিযান ও খুর্দ্দা-বিদ্রোহ

শ্রীহরিচরণ বসু

(১) উৎকল-অভিযান

উৎকল বা উড়িষ্যা প্রদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-উপকূলে অবস্থিত। ইহা প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে বলেন যে, প্রাচীন উড্র বা ঔড্র দেশই বর্ত্তমান উড়িষ্যা; কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি সমীচীন নহে। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড, যাহার উত্তর সীমা কপিশা নদী এবং দক্ষিণ সীমা ভিজিগাপত্তন, তাহাই প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। (১) এবং ইহাই বর্ত্তমান উড়িষ্যা। এই কপিশা নদীই এখনকার সুবর্ণরেখা নদী। কেহ কেহ মেদিনীপুর জেলার কংশাবতী বা কাঁশাই নদীকে প্রাচীন কপিশা নদী বিবেচনা করেন।

কটক এই উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী। যে কলিকাতা আজ শোভা-সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বলিয়া জগতে বিঘোষিত হইয়াছে, তাহার সৃষ্টির বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে কটকের নাম ইতিহাসে সুপরিচিত। (৯৪১—৯৫৩ খৃঃ অঃ) নৃপেন্দ্রকেশরী উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। তিনিই এই কটক সহর নির্ম্মাণ করেন। কটক সহরের প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে মহানদী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; এক শাখার নাম মহানদী এবং অপর শাখার নাম কাটজুড়ী। কাটজুড়ী কটকের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া এবং মহানদী উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে আরও কিছু দূর গিয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে। এই দুই নদীর মধ্যস্থলে কটক সহর নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই দুই নদীর ভয়ঙ্কর জল-প্লাবন হইতে নগর রক্ষার্থ কটকের চারিদিকে উচ্চ বাঁধ আছে। নৃপেন্দ্রকেশরীর পুত্র মকরকেশরী (৯৫৩—৯৬১ খৃঃঅঃ) এই বাঁধ প্রস্তুত করেন। ইহা অতি স্থূল ভাবে নির্ম্মিত ও অধিকাংশ স্থলে প্রস্তর দ্বারা গাঁথা। কাটজুড়ীর ধারের বাঁধ প্রায় ২৬ ফিট উচ্চ।

ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িষ্যা প্রদেশ হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল। ৫৮৪ খৃঃ অঃ কেশরা-বংশীয় রাজা যযাতিকেশরী রক্তবাহু বংশীয় যবন রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা স্বাধীন করেন। ইনি ভুবনেশ্বরের মন্দিরও নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার পরে রাজা অলাবুকেশরী (৬২৩—৬৭৭ খৃঃ অঃ) উক্ত মন্দির সম্পূর্ণ করেন। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৫—১২০২ খৃঃ অঃ) পুরীতে জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৫৬৮ খৃঃ অঃ আফ্‌গান সেনাপতি সোলেমান কার্ণানী উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং জাজপুরে হিন্দুরাজ মুকুন্দদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া উড়িষ্যার রাজা হন। ছয় বৎসর রাজত্ব করার পর ১৫৭৪ খৃঃ অঃ মোগল সেনাপতি মমিন খাঁ ও রাজা টোডরমল্ল উড়িষ্যায় আগমন করেন এবং জলেশ্বরের নিকট মোগলমারীতে 'আফ্‌গান-রাজ' দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া

(1) Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal, (1897-98)

সন। ১৫৮০ খৃঃ অঃ সেনাপতি রাজা জয়সিংহ এবং রাজা টোডরমল্ল উড়িষ্যা প্রদেশের জমিদারীসমূহের বন্দোবস্তের জন্য উড়িষ্যায় আগমন করেন। তাঁহারা মৃত রাজা মুকুন্দদেবের পুত্র রামচন্দ্র দেবকে খুর্দ্দার রাজা করেন। এবং খুর্দ্দা প্রদেশের সহিত লিখি, রহং, সেরাই ও চৌবিশ কুড—এই চারি পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। এই রামচন্দ্র দেবই বর্ত্তমান খুর্দ্দা রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি ১৫৮০ খৃঃ অঃ হইতে ১৬০৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। (২) খুর্দ্দার রাজগণ নির্ব্বিবাদে মোগল বাদশাহ প্রদত্ত উক্ত জমিদারী ১৭৬১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবান্বিত উপাধি "শ্রীউৎকলেশ্বর গজপতি মহারাজ" পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তাঁহারা "উড়িষ্যা মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

উড়িষ্যা মোগলদিগের অধীন হইলেও পাঠানগণ মধ্যে মধ্যে উড়িষ্যায় আসিয়া মোগল শাসনকর্ত্তাদিগকে দূরীভূত করিয়া আপনারা রাজা হইতেন। ১৬১৮ খৃঃ অঃ মোগলগণ পাঠানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা পুনর্ব্বার দখল করেন। এই বৎসর হইতে ১৭৫১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। পাঠানগণ আর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। প্রায় দুই শত বৎসর পাঠান ও মোগলগণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ উড়িষ্যায় আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, উড়িষ্যা প্রদেশ ঐ সময় বাণিজ্যের জন্য বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৬৩৪ খৃঃ অঃ ইংরাজ বণিকগণ সুবর্ণরেখা নদীর মুখে পিপ্‌লী নামক স্থানে প্রথম কুঠী নির্ম্মাণ করেন; এবং পরে ১৬৪২ খৃঃ অঃ বাগেশ্বরেও ঐরূপ কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৩)

১৭৫১ খৃঃ অঃ মোগল রাজপ্রতিনিধি আলিবর্দ্দী খাঁ মারহাট্টাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া উহাদের সহিত সন্ধি করেন; এবং উড়িষ্যা প্রদেশ মারহাট্টাদিগকে অর্পণ করেন। সুবর্ণরেখা নদী উড়িষ্যার উত্তর-সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। মারহাট্টাগণ এইরূপে উড়িষ্যার অধিকার প্রাপ্ত হইলে, ১৭৬১ খৃঃ অঃ মারহাট্টা সুবেদার শিউভট সাম্বিয়া মোগল প্রদত্ত লিখি, রহং প্রভৃতি চারিটী পরগণা খুর্দ্দা হইতে বিযুক্ত করিয়া নিজেদের দখলে রাখেন, কিন্তু খুর্দ্দা তালুক ১৮০৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজাদের দখলে থাকে। (৪) এই সময় বীরকৃষ্ণ দেব খুর্দ্দার রাজা ছিলেন। মারহাট্টাগণ অর্দ্ধশতাব্দী উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে ১৮০৩ খৃঃ অঃ উহা ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয় এবং আজ পর্য্যন্ত উহা ইংরাজ অধিকারেই আছে।

বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি Sir Arthur Wellesley—যিনি পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন উপাধিতে ভূষিত হইয়া ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে ফ্রান্স-সম্রাট অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন—১৮০৩ খৃঃ অঃ ভারতবর্ষে বিপুল বাহিনী পরিচালনা করিয়া আসাই ও ওয়ারগামের যুদ্ধক্ষেত্রে সিন্ধিয়া ও ভোঁস্‌লা রাজকে পরাস্ত করিয়া মারহাট্টা-শক্তি বিধ্বস্ত করিয়া দেন। এই যুদ্ধের ফলে সমুদ্রতীরস্থ উড়িষ্যাপ্রদেশ মারহাট্টাদের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু আসাই প্রভৃতির যুদ্ধের সহিত তুলনায় উৎকল-অভিযান অতি সামান্য ঘটনা মনে করিয়া ঐতিহাসিকগণ ইহার বিবরণ প্রদান করেন নাই, কেবল ইহার উল্লেখ করিয়াই ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই অভিযান সামান্য হইলেও ইহার মূল্য কিন্তু অনেক অধিক। ১৭৫৭ খৃঃ অঃ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড ক্লাইব বঙ্গ ও বিহার অধিকার করেন এবং ইংরাজের প্রভাব ভারতবাসীকে জানাইয়া দেন। সেইরূপ ১৮০৩ খৃঃ অঃ উৎকল অভিযানে জয়লাভ করিয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লী উড়িষ্যা প্রদেশ অধিকার করেন এবং ব্রিটিশ প্রভাব আরও বাড়াইয়া দেন। এই অভিযানের ফলে ১৬ লক্ষ টাকা আয়ের ২৪ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত প্রদেশ তিন লক্ষ অধিবাসী সহ ইংরাজ অধিকারে আইসে; এবং এই অভিযান হেতু উড়িষ্যায় বহু বাঙ্গালী জমীদারের সৃষ্টি হয়। এই অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করাই

(2) Vide Toynbee's Account of Orrisa.

(3) Hunter's Orissa.

(4) Toynbee's Account of Orissa.

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইহা পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না মনে করি।

মারহাট্টাগণ উড়িষ্যার রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বঙ্গদেশে অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। তাহাদের অশ্বারোহীগণ মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালাদেশে আসিয়া গ্রাম লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। ইহাই বঙ্গদেশে "বর্গীর হাঙ্গামা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ওয়েলেস্লী দেখিলেন যে, মারহট্টা শক্তি নষ্ট না করিতে পারিলে, এবং উৎকল হইতে মারহাট্টাদিগকে দূরীভূত করিয়া না দিলে বঙ্গ ও বিহারে শান্তি স্থাপন দুর্ঘট। এইজন্য তিনি তাঁহার ভ্রাতা আর্থারকে বিপুল বাহিনী ও প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন, এবং উৎকল-অভিযান জন্য নিম্নলিখিত সৈন্যদল গঠন করিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গঞ্জাম সহরে একত্র হইতে আদেশ প্রদান করেন।

(১) 1st. Madras Fusiliers

(২) H. M. S. 22 Regiment

(৩) 20th Bengal Native Infantry

(৪) 9th or 19th Regiments & Madras Native Infantry

(৫) A small force of Artillery

কর্ণেল হারকোর্ট এই দলের অধিনায়ক এবং জন মেলবিল সি, এস, কমিশনর নিযুক্ত হইয়া অভিযানের সঙ্গে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। (৫)

অভিযানের পূর্ব্বে সমর-সভা হইতে স্থির হয় যে, কটক অধিকার করিয়া উপরিউক্ত সৈন্য দলের কতক অংশ তথায় অবস্থিতি করিবে, এবং অবশিষ্ট সৈন্য বারমূল গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া বেরারে সেনাপতি ওয়েলেস্লীর সহিত মিলিত হইবে। বঙ্গদেশ হইতেও এই অভিযানের সাহায্য জন্য ৬২১৬ জন সৈন্য প্রেরিত হইবে। ইহাদের মধ্যে ৮৫৪ জন জলেশ্বরে অবস্থান করিবে, এবং ৫২৮ জন বালেশ্বর অধিকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিবে, এবং অপর ১৩০০ জন মেদিনীপুরে শিবির স্থাপন করিয়া ভোঁস্লা রাজার অশ্বারোহী-দলের গতিরোধ করিবে, ও ইংরাজ সৈন্যদের সম্মুখভাগ রক্ষা করিবে; এবং আবশ্যক হইলে ইহারা জলেশ্বর ও বালেশ্বরের সৈন্যদলেরও সাহায্য করিতে পারিবে। অবশিষ্ট সৈন্য মাদ্রাজ হইতে আগত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য করিবে। (৬)

এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া সেনাপতি ওয়েলেস্লী বেরারে মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে গমন করেন। কর্ণেল হারকোর্ট ১৮০৩ খৃঃ অঃ ৮ সেপ্টেম্বর গঞ্জাম হইতে সসৈন্য কটকাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে রশদবাহী ৩০০ শকট এবং আহতদিগকে বহন করিবার জন্য ৪০০ ডুলি ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই ডুলির কোনই আবশ্যকতা হয় নাই। সেনাপতি স্থানীয় জমিদারদিগকে রশদ সংগ্রহ জন্য আদেশ প্রদান করিলে তাহারা উহা সংগ্রহ না করিয়া পরদিন প্রাতে ১৪৫০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিল। সেনাপতি প্রথম দিন গঞ্জাম ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী প্রয়াগ নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাত্রি-বাস করেন। পরদিন তাঁহার সৈনিকদল চিল্কা হ্রদ ও সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী উপকূল দিয়া গমন করিতে থাকে। ১৫ই তারিখে তাহারা মাণিকপত্তনে উপস্থিত হয়। (৭) মারহাট্টাগণ ইহাদের উপস্থিতির পূর্ব্বেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

(৫) Mill's History of British India, vol. IV.

(৬) Vide Hunter's Orissa, vol. II.

(৭) মাণিকপত্তন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী এদেশে প্রচলিত আছে। রাজা পুরুষোত্তম দেব কোন সময়ে কাঞ্চী নগরের রাজাকে জয় করিবার জন্য যাত্রা করেন। এই মহাত্মার ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলভদ্রদেব উৎকল রাজার পক্ষে যথাক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের তুরঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া যাত্রা করেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে সৈনিকবেশে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হন। রাজা এই ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। কর্ণাটদেশ জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে জগন্নাথ ও বলরাম মাণিক্য নাম্নী এক গোয়ালিনীর নিকট হইতে জগন্নাথ দেবের হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক বন্ধক দিয়া দধি ক্রয় করেন এবং গোয়ালিনীকে বলেন যে পশ্চাতে যে রাজা আসিতেছেন তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গুরী ফেরৎ দিয়া দধির মূল্য লইবে। উভয়ে প্রস্থান করিলে রাজা তথায় আসিয়া গোয়ালিনীর নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি ভক্তিতে আত্মহারা হইলেন এবং গোয়ালিনীকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে ঐ গোয়ালিনীর নামানুসারে উক্ত গ্রামের নাম মাণিক্য-পত্তন হইয়াছে এবং এই নাম এখনও প্রচলিত আছে।

১৬ ও ১৭ তারিখে ইংরাজ সৈন্য চিল্‌কা হ্রদের মুখে, সমুদ্রের সহিত সংযোগস্থল পার হইয়া নৃসিংহপত্তনে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মারহাট্টাদের অত্যাচারে স্থানীয় জমিদারগণ ও অধিবাসীবর্গ এতই উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, ইংরাজদের আগমনে তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল এবং কেহই উহাদের কোনরূপ প্রতিকূল আচরণ করে নাই, বরং সাহায্যই করিয়াছিল। এই সময় মালুদের জমিদার ফতে মহম্মদ ইংরেজদের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপকারের জন্য কমিশনার সাহেব বিনা করে ঐ জায়গীর তাঁহাকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে ভোগ করিবার সনন্দ প্রদান করেন। ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৪ ধারা মত কোম্পানি উহা মঞ্জুর করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর সৈনিকদল নৃসিংহপত্তন পরিত্যাগ করিয়া পুরী প্রবেশ করেন। এখানেও মারহাট্টগণ কোনরূপ প্রতিকূলতাচরণ করে নাই। এই সময় ব্রাহ্মণ ও মন্দিরের পুরোহিতগণ আসিয়া সেনাপতির শরণাপন্ন হন, এবং মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব ইংরাজদিগকে প্রদান করিয়া উহার রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। সেনাপতি দুই দিন এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার পরে জগন্নাথ দেবের মন্দির ও বিগ্রহের ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য একদল হিন্দু সিপাহী পুরীতে রাখিয়া ২০ সেপ্টেম্বর তিনি কটক অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময় ইংরাজ সৈন্যদিগকে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পুরী হইতে কটকে যাওয়ার যে সমস্ত গ্রাম্য রাস্তা ছিল, তাহা জল ও কর্দ্দম পূর্ণ থাকায় কামান ও আহার্য্য দ্রব্যের গাড়ীর গমনে বিলম্ব ও অসুবিধা হইতে লাগিল। ইহার উপর মারহাট্টা অশ্বারোহীগণ মধ্যে মধ্যে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে লাগিল। এই জন্য সেনাপতিকে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তিনি ১৪ দিনে অর্থাৎ ৪ অক্টোবরে পুরী হইতে ২০ মাইল দূরস্থ মুকুন্দপুর গ্রামে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইখানে মারহাট্টাদের সহিত তাঁহার এক যুদ্ধ হয়। সংখ্যায় মারহাট্টাগণ অধিক থাকিলেও তাহারা অবশেষে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া খুর্দ্দার জঙ্গলে পলায়ন করে। ইহার পরে মারহাট্টাগণ আর কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই। এখান হইতে রাস্তাও সুগম হওয়ায় সেনাপতি মুকুন্দপুরের যুদ্ধের কয়েক দিন পরেই কাটজুড়ীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইস্থানে ইংরাজ-সেনাপতিকে অন্য এক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কাটজুড়ী পার হওয়ার জন্য কোন নৌকা ছিল না। যে ব্যক্তি এই ঘাট পারাপারের জন্য মারহাট্টাদের নিকট হইতে জায়গীর ভোগ করিতেছিল, সে ব্যক্তি ইংরাজ সৈন্য আসিতেছে সংবাদ পাইয়া নৌকা সহ কোথায় যে লুক্কায়িত হইয়াছিল, বহু অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ইংরাজ সৈন্য অগত্যা নদী পার হইতে অসমর্থ হইয়া কাটজুড়ীর দক্ষিণ তীরে আম্র বাগানে আসিয়া তাম্বু স্থাপিত করিয়া রহিল। অবশেষে উক্ত জায়গীরদারের একজন মাঝীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে আনা হইল। সেই ব্যক্তি নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য মারহাট্ট প্রদত্ত জায়গীর উক্ত মাঝীকে অস্থায়ী ভাবে প্রদান করা হয় এবং পূর্ব্বতন জায়গীরদারের মৃত্যু হইলে উক্ত মাঝী স্থায়ী রূপে উক্ত জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সৈন্যদল নিরাপদে নদী পার হইয়া ১৮০৩ খৃঃ অঃ ১০ অক্টোবর কটক সহরে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিয়া লইল, এবং কাটজুড়ীর উত্তর তীরে রামবাগে (৮) শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেনাপতি সহরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, সমস্ত গৃহই উন্মুক্ত-দ্বার এবং অধিবাসীশূন্য। নগরবাসীগণ এই সময় ইংরাজ-ভয়ে ভীত হইয়া কটকের ১০ মাইল উত্তরে মহানদী তীরস্থ টাঙ্গী নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছিল, এবং কমিশনারদের অভয়বাণী ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা প্রত্যাগমন করে নাই। যদি তাহারা সহরে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ-সেনাদের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিত অথবা প্রবেশকালে গৃহের ছাদ হইতে ইংরাজদের উপর গোলা বর্ষণ করিত, তাহা হইলে ইংরাজদের অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক ইংরাজ-সেনাপতি প্রভূত সতর্কতা অবলম্বন

(৮) এই বাগান ও উদ্যান-বাটী ১৬৭৮ খৃঃ অঃ জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় নির্ম্মিত হয়। মহারাষ্ট্র অধিকারকালে তাঁহাদের স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণ এই বাগানে বাস করিতেন। ইহাকে অনেকে লালবাগও বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং কামান আসিয়া পৌঁছিলে দুর্গ অবরোধ করিয়া ফেলিলেন।

এই দুর্গ বারাবাটী (Barabaty) দুর্গ নামে খ্যাত। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার গজপতি-বংশের শেষ রাজা অনঙ্গভীম দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন ইহা কেশরী রাজবংশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যিনিই নির্ম্মাণ করুন, ইহার গঠন-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ইহাকে হিন্দু-স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন বলিতে পারা যায়। ইহার Square sloping Towers or Bastions উক্ত অনুমানই সমর্থন করে। মারহাট্টা বা মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ কেবল মাত্র ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ এবং পূর্ব্ব দিকে একটী বৃহৎ খিলান-সমন্বিত তোরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় লিখিত যে শিলালিপি এখানে আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ১৭৫০ খৃঃ অঃ উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গে দুই সারি প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর আছে। উহার মধ্যস্থ প্রাঙ্গণ ২১৫০×১৮০০ ফিট্। ইহার মধ্য হইতে একটী বৃহৎ চতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে এবং তাহার উপর একটী সুন্দর ধ্বজপীঠ নির্ম্মিত আছে। নদীর তীরে প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চ প্রাকার থাকা হেতু মহানদীর অপর তীর হইতে ইহার সুদৃঢ় প্রাকার অতি সুন্দর পরিদৃশ্যমান হয়। বিখ্যাত ভ্রমণকারী M. Motto যখন ১৭৬৭ খৃঃ অঃ এই প্রদেশ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এই দুর্গ দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উহাকে Castleএর অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (i) অধুনা গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগের অনুগ্রহে ইহার আর সে শ্রী নাই। ইহার প্রাচীরের প্রস্তর-খণ্ড সকল হাসপাতাল, সমুদ্রতীরস্থ আলোকস্তম্ভ এবং অন্যান্য সরকারী বাটী নির্ম্মাণের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা এখন ভগ্ন মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়া আছে। কেবল মাত্র পূর্ব্বদিকের খিলান সমন্বিত তোরণদ্বার এবং একটী সুন্দর প্রাচীন মসজিদ বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত যুগের স্থাপত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই মসজিদ্ "ফতে খাঁ রহমন" নামে উক্ত হয়।

১৪ অক্টোবর প্রাতে দুর্গ হইতে ৫০০ গজ দূরে কামান সংস্থাপন করিয়া ইংরাজ-সৈন্য দুর্গোপরি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। মারহাট্টাগণও নিস্তব্ধ ছিল না। এই দুর্গ প্রস্তর-নির্ম্মিত ও ইহার চতুর্দ্দিকে একটী পরিখা ছিল। উহার বিস্তার ৩৫ হইতে ১৩৫ ফিট। দুর্গে প্রবেশের জন্য একটী সামান্য অপ্রশস্ত সেতু উহার উপর নির্ম্মিত ছিল। বেলা অনুমান ১১টার সময় দুর্গের কামান নিস্তব্ধ হইলে, ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্যগণ দ্রুতপদে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সেতুপার হইতে আরম্ভ করিলে পুনরায় দুর্গ হইতে প্রচুর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। ইহাতে ইংরাজ সৈন্য ভীত বা পশ্চাৎপদ না হইয়া অসীম সাহসে দুর্গ-প্রাচীরের সমীপস্থ হইল; এবং অর্দ্ধঘণ্টা কাল গোলা-বর্ষণের পর প্রাচীরের কিয়ৎ অংশ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। উক্ত ভগ্ন স্থান দিয়া একজন মনুষ্য অতি কষ্টে প্রবেশ করিতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ সৈন্য ও তাহাদের পশ্চাতে দেশীয় সৈন্যগণ একে একে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রুত ধাবমান হইয়া মারহাট্টাদিগকে আক্রমণ করিল। মারহাট্টাগণ অল্পক্ষণ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই অবস্থায় তাহারা হত ও আহতদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বৃটিশ বৈজয়ন্তী তখন সগর্ব্বে দুর্গোপরি উড্ডীয়মান হইয়া ইংরাজরাজের বিজয় ঘোষণা করিয়া দিল।

এদিকে কটক অধিকারের পূর্ব্বেই বালেশ্বরও ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। ইংরাজ-সেনা আহার্য্যাদি সমস্ত লইয়া নৌকাযোগে বালেশ্বর সহরের ৪ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তথায় অবতরণ করিয়া ক্রমে দুর্গাভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২১ সেপ্টেম্বর এই সেনাদল নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বালেশ্বরে উপস্থিত হইল, এবং দুর্গ-প্রাচীর ও সেই সঙ্গে ফৌজদার কর্ত্তৃক অধিকৃত ভগ্ন ইংরাজ কুঠী অচিরেই হস্তগত করিয়া লইল। জলেশ্বরে যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারা ২৩ সেপ্টেম্বর তথা হইতে যাত্রা করিয়া ৪ অক্টোবর নির্ব্বিঘ্নে বালেশ্বরে উপস্থিত হইল। ১০ অক্টোবর ৮১৬ জন সৈন্য গবর্ণর জেনারেলের আদেশ মত সেনাপতি হারকোর্টের সহায়তার জন্য কটকে গমন করিয়াছিল।

এইরূপে উড়িষ্যার তিনটী দেশই অধিকার করিয়া পূর্ব্ব

(১) Stirling's Account of the Fort as noted in Toynbee's Account of Orisa.

বন্দোবস্ত অনুসারে মেজর ফরবেস্ (Major Forbes) কিয়দংশ সৈন্ত লইয়া বারমল গিরিসঙ্কট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং কর্ণেল হারকোর্ট (Colonel Harcourt) অপর কতক সৈন্ত লইয়া পাটামুণ্ডী হইয়া কুজংএর বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই রাজা খুর্দ্দা এবং কণিকার রাজার সহিত গোপনে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ-সেনার আগমন সংবাদে ইনি পলায়ন করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পারাডিপে কারারুদ্ধ ছিলেন; ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে স্থাপিত করেন এবং পলায়িত রাজাকে ধৃত করিবার জন্ত প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দেন। অল্প দিন পরে ইনি ধৃত হইলে ইঁহাকে কটকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহার দুর্গ ভূমিসাৎ এবং যে সমস্ত কামান তথায় পাওয়া গিয়াছিল তাহা কটকে প্রেরিত হয়। এই কামানের মধ্যে E. I Company নামাঙ্কিত দুইটী পিত্তলের কামান ছিল।

কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সেনাপতি হারকোর্ট কণিকা এবং হরিশপুরের রাজাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের দুর্গগুলি ভূমিসাৎ করিয়া দেন, এবং যে সমস্ত কামান তথায় পাওয়া গিয়াছিল সেগুলিকে কটকে পাঠাইয়া দেন।

যখন পূর্ব্ব-উপকূলে এই সমস্ত ঘটনা হইতেছিল তখন মেজর ফরবেস্ পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল রাস্তা দিয়া বারমল গিরিসঙ্কটে উপনীত হন। এখানে মারহাট্টাগণ তাঁহাদের বাধা প্রদান করে এবং অবশেষে ২রা নবেম্বর তাহারা যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া পলায়ন করে। সোনপুর ও বোদের রাজা এই সময় আসিয়া ইংরাজদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

এই সময় কর্ণেল হারকোর্ট পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া মেজর ফরবেসের সহিত মিলিত হন। অতঃপর ইঁহারা জেনারেল ওয়েলেস্‌লির সহিত বেরারে মিলিত হইবেন স্থির করিয়া উভয়ে যখন বারমল গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন জানিতে পারেন যে, সিন্ধিয়া ও নাগপুরের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। তখন তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে উড়িষ্যা প্রদেশ ইংরাজ-রাজ প্রাপ্ত হন। এই সন্ধি ১৮০৩ খৃঃ অঃ ১৭ ডিসেম্বর দেবগ্রামে উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দিনে ২৩৯০৭ বর্গ মাইল বিস্তৃত উড়িষ্যা প্রদেশ, ৩ লক্ষ অধিবাসী ও ১৪৮৯৭৩২ টাকা রাজস্ব চিরতরে ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল।

অতঃপর সেনাপতি কটকে আসিয়াই সৈনাদল বিদায় করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব দেশে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এইরূপে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে সেনাপতি হারকোর্ট মেলভিল সাহেবের সহিত একযোগে জমিদারীসমূহের রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এবং এই জন্ত হাণ্টার সাহেবকে পুরী ও মেজর ফ্লেচারকে খুর্দ্দা পাঠাইয়া দিলেন।

উড়িষ্যায় অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জমিদার ছিলেন। ইঁহারা নামমাত্র রাজস্ব প্রদান করিয়া মারহাট্টাদের অধীনে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। এই সমস্ত জমিদারীর রাজস্ব মারহাট্টাদের সময় অনুমান ১৪ লক্ষ টাকা ছিল। ইংরাজ কমিশনারগণ এই রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ১৬ লক্ষ টাকা করিয়াছিলেন। জমিদারগণ ইহা প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় অনেক টাকা রাজস্ব অনাদায় পড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট তখন অন্ত উপায় না দেখিয়া দেশে সূর্য্যাস্তের আইন (Sun Set Law) প্রচলন করেন এবং রাজস্ব অনাদায় জন্য জমিদারী সমস্ত প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিতে আদেশ দেন।

কটক উড়িয়াদের সহর হইলেও এখানে ঐ সময় বাঙ্গালী ভাবেরই প্রাধান্য ছিল। চৈতন্যদেব ধর্ম্ম-প্রচারার্থ যখন ১৫১০ খৃঃ অঃ উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন, তখন এখানে বাঙ্গালীদের বসতি হয় নাই। পরে ইংরাজ-অধিকারের প্রাক্‌কালে এখানে বাঙ্গালীরা আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে চাকুরী গ্রহণ করিয়া এবং কেহ কেহ ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে বাস করিতেছিলেন। যাঁহারা গবর্ণমেণ্ট অধীনে চাকুরী করিতেন, তাঁহাদিগকে "আম্‌লা" বলিত। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালা বাবু প্রধান ছিলেন। ইনি কালেক্টর সাহেবের দেওয়ান ছিলেন; ১৮০৫ খৃঃ অঃ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া ইনি কটকে বাস করিতেছিলেন।

রাজস্ব অনাদায়-হেতু জমিদারী সমস্ত নীলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলে বাঙ্গালীরা উহা খরিদ করিতে আরম্ভ

করেন। ১৮০৬-০৭ খৃঃ অঃ নীলামে ৩৫০টী জমিদারী উড়িয়া জমিদারদিগের অধিকার হইতে বাঙ্গালীদের হস্তগত হয়। উহাদের রাজস্ব ৫,৭২,৩৪৪৲ ছিল। নীলামে উহা ৬,০৭,০৩৩৲ টাকায় বিক্রয় হয়। ১৮১৮-১৯ খৃঃ অঃ ১১২৯টী জমিদারী নীলাম হয়, উহার রাজস্ব ৯৬৫৯৮৪৲ ছিল। এগুলি সমস্তই বাঙ্গালীগণ এবং আম্‌লাবর্গ খরিদ করিয়া লওয়ায় উড়িয়া জমিদারগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপে অল্প মূল্যে জমিদারী খরিদ করিয়া এই সমস্ত বাঙ্গালা উড়িষ্যার জমিদার বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিলেন। (১০) ইঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ নির্ব্বিবাদে এই সমস্ত জমিদারী ভোগ করিতেছেন। এই হেতু উড়িষ্যায় বাঙ্গালী জমিদারের সংখ্যা এত অধিক।

(১০) Toynbee's Account of Orissa.

ভাই-ফোঁটা

(চিত্র)

শ্রীরাধারাণী দত্ত

অ মা—মাগো,—তুমি কোথায়? ভাঁড়ার ঘরে না কি?... পেন্নাম ক'রবো—পা ছুঁতে পারি?

"..............................."

নন্তু বাবু! দিদিমাকে পেন্নাম করো! চিনু, জোনাকি, দিদিমাকে পেন্নাম কর্ রে!

"..............................."

হাঁ মা, উপস্থিত সবাই ভালোই আছেন। তোমার জামাই বিন্ধ্যাচলে হাওয়া বদ্‌লে আসার পর থেকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটা একটু কমেছে।

"..............................."

শাশুড়ীর শরীর ভালো নয়, সেই জন্যেই তো আসতে পারি নে মা! বুড়ো মানুষ, বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, তাঁকে ফেলে কি ক'রে আসি?

হাঁ মা, দাদা কোথায়? নন্তু, ছুটে দেখে আয় তো—মামাবাবু বৈঠকখানায় আছেন কি না?

"..............................."

অ্যাঁ—দাদা বেরিয়ে গেছে? আচ্ছা কি রকম ছেলে বাপু? কাল আমি এত করে বলে দিলুম—"দাদা, কাল সকালে বাড়ী থেকো, কোথাও বেরিও না, আমি তোমাকে ফোঁটা দিতে যাব," তা' দাদার বুঝি একটা দিনও একটু ত্বর্ সইল না? আচ্ছা আসুক আজ বাড়ী! 'কুঁদুনী' নাম তো দিয়েছেই, আজকে দেখাবো মজা!

"..............................."

তবুও মা, ছেলেটির তুমি বিয়ে দেবে না! এত বয়স হ'ল, সংসারের গোছগাছএর দিকে একটুও দাদার মন হ'ল না। দিন রাত্রি কাব্য কবিতা মাসিকপত্র আর সাহিত্যিক বন্ধুদল নিয়েই—ঐ যে বাবু আসছেন!...

আচ্ছা দাদা! তোমার আক্কেল কী রকম বলো তো? আজকের দিনেও কি তুমি একটু বাড়ী থাকতে পারলে না?

"..............................."

যাঃও, আমি তোমার কথা শুনতে চাই নে। একটা মাত্তর ছোট বোন—তার জন্যে তুমি একটা দিনও বাড়ীতে অপেক্ষা করে থাক্‌তে পার্‌লে না! বন্ধুরা তোমার এতই বেশী আপনার! আমি তোমার কোনও কৈফিয়ৎ শুনবো না।

"..............................."

"হাঁ—'রমা' নাম না রেখে 'রণচণ্ডী' নাম রাখলেই ঠিক হ'ত বৈকি! সত্যি কথা বললেই 'রণচণ্ডী' নাম হয়।

এখন দাঁড়াও দেখি, আজকের দিনে নমস্কার ক'রতে হয়। সতেরো মাসের বড় বয়স,—সেটা আজকে না-মেনে উপায় নেই।

"..............................."

নমস্কার করলুম, ঐ আশীর্ব্বাদ? "অসংখ্য জোনাকীর আলোকে গৃহ আলো হোক্!" নিজে বিয়ে করো নি, বেশী

মেয়ে হওয়া যে কত বড় অভিসম্পাৎ তা' তুমি বুঝবে কি ক'রে? বাঙালীর ঘরে ঠাট্টাচ্ছলেও ও কথা বলতে নেই!

"......................."

বুড়ো বয়স অবধি আইবুড়ো রেখে মা'ই তোমার মাথা খাচ্ছেন। মনে ভাবো এখনও মায়ের সেই কচি খোকাটিই আছো! সব ভার মায়ের উপর চাপিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত আছ। একটি শক্ত বৌয়ের হাতে পড়তে, তা'হলে দিনরাত্রি এত কাব্য-চর্চ্চায় মস্‌গুল্ থাকা বেরিয়ে যেত!

"....................—"

ছাখো দাদা, আমাকে রাগিও না বল্‌ছি।

নাও, ঢের হয়েছে। ওপরে চলো দেখি! বেলা হয়ে গেছে ঢের। এই জোনাকি! মামাবাবুর কাঁধ থেকে নাম্। বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে—কাঁধে চড়তে লজ্জা করে না বুঝি? মামাবাবুকে পেন্নাম করেছিস্—বুড়ো মেয়ে, সবই কি শিখিয়ে দিতে হবে?

"........... ...."

না দাদা! আমি আজই যাবো ভাই! শাশুড়ী বুড়োমানুষ, একলা আছেন। আমি না গেলে তাঁর কষ্ট হবে। তুমি ও-বেলায় কিন্তু আমাদের ওখানে নিশ্চয় খেতে যেও, নইলে আমার শাশুড়ী ভারী দুঃখু করবেন। তিনি একেই আজকাল দুঃখু করেন—"সরোজ আর মোটে আমার কাছে আসে না, আগে কত আসতো!"

"......................."

হঁ্যা ভাই, তিনি সত্যিই তোমায় বড় ভালবাসেন। সকলের কাছেই তোমার সুখ্যাতি করে বলেন—"আমার বৌমার ভাইটির মত সুন্দর স্বভাবের ছেলে দেখা যায় না!" তিনি কিন্তু ভাই তোমার বিয়ের জন্যে ভারী ব্যস্ত। বলেন—"আমার যদি আইবুড়ো মেয়ে থাকতো, সরোজকে জামাই করে সাধ মেটাতুম।"

"................."

তোমার দাদা, সবেতেই ঠাট্টা আর চালাকী!!

"................."

না—দাদা, তুমি আমার ছেলে-পিলের সামনে আমাকে 'মেনি' বলে ডেকো না বল্‌চি। কেন? রমা বল্‌তে কি হয়?

"..............."

না, দেশশুদ্ধ লোক সবাই 'রমা' বলচে, আর তুমিই শুধু পার্ব্বে না!

"................."

অ-মা—মা—ছাখো না,—দাদা আমার ছেলেদের সামনে আমার নামের ছেলেবেলাকার ছড়া'টা বলছে!

"................."

না বাবু, আমি ও'সব দেখতে পারি না। রোসো না, তোমার বিয়ে হোক্, আমিও তোমার বৌয়ের কাছে তোমার নামের সেই—

"হাঁদু বাবু যাদু কিন্তু দুদু খেতে ক্রুদ্ধ"—ছড়াটা বলে দেবো অখন্। ছেলেবেলায় এই ছড়াটায় কেমন ক্ষেপ্‌তে, মনে আছে?

"................."

হঁ্যা—বৌ আসবে কি না দেখে নেবো! সবাই-ই অমন বলে গো! শেষকালে আবার সেই বৌয়েরই পাঁইজোরের পাকে এমন জড়িয়ে যায় যে, জোট্ ছাড়িয়ে খোলা শক্ত হয়ে ওঠে!

"................."

আচ্ছা—আচ্ছা—আমার পাঁইজোরের পাকে কে জড়িয়েছে, তার খবরে তোমার কাজ নেই। জ্বালাতন কোরো না বল্‌চি দাদা!

"................."

মুখরা হ'বো না তো কি? তুমি দিনরাত্রি আমার সঙ্গে লাগো কেন? আমি ছেলেবেলায় কবে কি-করেচি না-করেচি—'কসে রাগতুম কাঁদতুম,—সব কথা টুক্ টুক্ করে ভগ্নীপতির কাছে লাগিয়ে এসো কেন? সেই নিয়ে আমাকে দিনরাত্রি ক্ষেপিয়ে তোলে!

এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আমার সঙ্গে লাগবে, না, ভাই-ফোঁটা নেবে—বলো? বেলা দশটা অবধি উপোস্ করে খালি রমা-পোড়ারমুখাকে রাগালেই পেট ভ'রবে কি?

"................."

ছাখো না মা,—দাদাই তো আজকের দিনে ঝগড়া ক'রচে খালি-খালি।

মা, চিনু নন্তু ওরা গেল কোথায়? ওরা ছাদে উঠেছে বুঝি? চিনু—ও চিনু, নেমে আয় শীগ্‌গির। মামা বাবুর এই আসন-টাসনগুলো ওপরে নিয়ে চ'।

"......................"

না না ভাই, তোমায় ক'রতে হবে না। ওরাই নিয়ে চলুক।

"......................"

না মা, ঠাঁই আমিই কোরবো। আজ যে আমাকেই সব ক'রতে হয়। দাদার জলখাবার আমি সব নিজের হাতে ঘরে তৈরী করে এনেছি। ও-বেলাকার রান্নাও আমি নিজে ক'রবো দাদার জন্যে।

চিনু, তুই মা তোর মামা বাবুর আসনখানি আর গেলাস রেকাবি, বাটীগুলো ওপরে নিয়ে চল্ তো! আমি চন্দনের রেকাবি মশলার থালা এই গুলো গুছিয়ে নিয়ে যাচ্চি। দেখিস্!! সাবধানে সিঁড়িতে উঠিস্! শাদা পাথরের গেলাস আর আসনখানা না হয় রেখে যা। রেকাবী আর বাটীগুলো আগে নিয়ে যা, তার পরে আসন গ্লাস নিয়ে যাবি।

"......................"

এবার জয়পুর থেকে এই শাদা পাথরের বাসন-সেট্ দাদাকে ভাই-ফোঁটায় দেব বলে এনেছি মা! আর এই ধুতি-চাদর আমার নিজের হাতে-কাটা সুতোয় তৈরী!

"......................"

ধুতিটা বড্ড মোটা হয়েচে, না দাদা? মুগা'র পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে ত্তাখো তো—ঠিক হয় কি না? আমি তোমার সেই ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবীটার মাপে এটা কেটেছি।...দেখি? ...না—ঠিকই হয়েছে। ঝুলটা বোধ হয় একটু বড় হয়েছে, না? ও' বোধ হয় ধোপ্ পড়লে গুটিয়ে সমান হয়ে যাবে!

"......................"

না দাদা! ও' আসন কেনা নয়। ও' তোমার চিনুর বোনা। মাঝখানে 'বন্দেমাতরম্'টা আমি লিখে দিয়েছি। চারপাশের ফুল লতা চিনুই করেছে। ছেলেমানুষ, এই প্রথম বুনেছে কি না, তত পরিষ্কার হয় নি!

"......................"

না দাদা, ও' মোটে বিলিতী সুতো নয়। পি, সি, রায়ের রংয়ের সুতো। খাঁটী দেশী। আমি কি জানি না বিলিতী হলে তোমার ব্যবহারে লাগবে না!

দাদা, ওপরে চলো ভাই! ঢের বেলা হয়ে গেছে, তোমার তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়।

"......................"

তোমার এখনও চান্ করা হয় নি? যাও যাও—নেয়ে এসো শীগ্গির! পুরুষ মানুষ এত বেলা অবধি জল না খেয়ে রয়েচো—কত কষ্ট হচ্চে। তুমি চট্ করে এসো, আমি ওপরে চল্লুম।

মা—পিদিম্-পিলসুজ্ কি ভাঁড়ার ঘরে আছে?

"......................"

না—তোমায় আসতে হবে না, আমিই যাচ্চি।

"......................"

না, এই যে আমি নেমে এসেছি! আমি পিদিম্ সাজিয়ে নিচ্চি। একটু গাওয়া ঘি চাই যে মা, পিদিমে দেব। আর, একটু তুলো—সল্তে পাকাতে হবে। এই যে—শাঁখ এইখানেই আছে—পেয়েচি।

"......................"

হ্যাঁ মা, সত্যি! দাদা ঘরখানার যা' অবস্থা করে রেখেছে, দেখলে যেন কান্না পায়! টেবিলটা যেমনি নোংরা, বইয়ের আলমারীগুলো তেমনি ধুলো-পড়া হাঁট্কানো! জিনিষপত্র এলোমেলো ছড়ানো। ঘরখানা কী কাণ্ড করে রেখেছে তার ঠিক নেই। আমি আসচে রবিবার আসবো—এসে এই ঘর পরিষ্কার করে যাবো। আর কাপড়ের আলমারী বইয়ের আলমারীগুলো ঝেড়েঝুড়ে রোদ্দুরে দিয়ে গুছিয়ে রেখে যাবো। তোমার ছেলেটি কিন্তু বিশ্ব কুড়ে মা! তুমি ওর বিয়ে দিলে না, এঁর পরে তুমি অবর্ত্তমানে ওর কী অবস্থা হবে ভাবো দেখি? নিজের জামা কাপড় পর্য্যন্ত আজ অবধি ও' নিজে ঠিক করে রাখতে শিখলে না!

"......................"

হ্যাঁ—তোমার ঐ এক-কথা! "কি করবো? শোনে না!" তুমি কি চিরকালই সংসারে খাটবে না কি? বুড়ো হয়েচো—তোমার ছুটী নেবার সময় হয় নি কি? তোমারও কি একটু সেবা-যত্ন'র লোক চাই না? বুড়ো বয়সে বৌয়ের সেবা-যত্নও তো মানুষ আশা করে!

"......................"

হ্যাঁ—আমি মাকে কুপরামর্শ দিচ্চিই তো! মা কি চিরকালই এমনি তোমার সেবা করবেন না কি?

কবি মশাই! তোমার সাহিত্যিক বন্ধু-টন্ধুরাও তো কৈ দেখে শুনে একটা বিয়ে-থাওয়া দিয়ে দেয় না! কারুর আইবুড়ো বোন টোন নেই কি?

"..................."

উহুহু,—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—বড্ড লাগে দাদা—আর ব'লব না। বাবা গো—এমনি চুলের মুঠি ধরেছো—মাথাটা টন্ টন ক'রছে! ভালো কথা বললুম, আমি "রাক্কুসী পোড়ারমুখী" বৈ কি!!

"..................."

বেশ হয়েচে। মা ঐ ও'দালান থেকে বকৃচেন তোমায়, শোনো। কেমন মজা?...আর আমার চুলের মুঠি ধরবে? হি হি হি—

"..................."

না না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি! আর ক'রবো না! আমার রাম-চিমটী কেটো না। আমি তোমার রাম-চিম্‌টীকে বড় ভয় করি।

আচ্ছা ছেলেরা কি ভাববে বলো দিকিন? বুড়ো মামা আর তাদের মায়েতেই যদি এমন খুনসুটী ঝগড়া করে, তা'হলে ওরাই বা লাঠ'লাঠি ক'রবো না কেন?

"..................."

আচ্ছা আচ্ছা। এখন আজকে ভাইফোঁটা নিয়ে থাবে দাবে কি না বলো? এসো এদিকে।

"..................."

না ওখানে নয়। এই আসনের ওপর বোসো। ও চিনু, দেশলাইটা নিয়ে আয় তো মা, ঘিয়ের পিদিম্‌টা জ্বালিয়ে দে। এক ছড়া শিউলী ফুলের মালা এনেছিলুম, সেটা শুকিয়ে গেছে। কি আর হবে! এই শুক্‌নো মালা ছড়াই মাথায় গলিয়ে নিয়ম-রক্ষে করে নাও দাদা! কোরা ধুতি পরে গরম হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা ফোঁটা নেওয়া হলে উঠে ছেড়ে ফেলো অখন্। এই চিনু, শাঁখটা বাজা এইবার—

ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা
যমের দোরে পড়লো কাঁটা—
যমরাজ যেমন অমর—
(আমার) ভাই তেমনি হোন্ অমর!"

রোসো রোসো—খাওয়ার জন্যে অত ব্যস্ত কেন? আরও দু'বার মন্তোর বলে ফোঁটা দিতে হয় যে—

"..................."

আঃ না, দাদা, তুমি ভারী পেটুক কিন্তু। আমাকে মন্তোরটা আর দু'বার বলে ফোঁটা দিতে দাও!

"ভাইয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা"—

"..................."

এই হয়েচে হয়েচে! আর একটিবার আছে—লক্ষ্মীটি দাঁড়াও।

"ভাইয়ের কপালে দিলুম ফোঁটা"—

লক্ষ্মীটি ভাই, আর একটু থামো—রোসো—হাত পাতো—এই দুধ-গণ্ডুষটা নাও—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্ত মিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

ওটা চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। হ্যাঁ হয়েচে। রোসো প্রণাম করি আগে।

"..................."

প্রণামে কি মন্তোর বল্লুম বলচো? মন্তোর কি আর বলবো? বল্লুম—জন্ম জন্মান্তরে তোমাকেই যেন দাদা পাই। তোমার কপালে ফোঁটা দিতে দিতে যেন মরতে পারি।—

আচ্ছা, তুমি আমায় কি আশীর্ব্বাদ ক'রলে বল' তো?

সুর-হারা

শ্রীবীণাপাণি রায়

থাম্‌রে বীণা—থাম্‌রে বীণা—ওরে সকল সুর-হারা!
ভাঙা সুরে গান কেন তোর গাওয়া?
কেউ শোনে না—কেউ শোনে না—মিছেই গেয়ে হও সারা;
মিথ্যা ওরে পথপানে তোর চাওয়া!
ওই যে গাছের পাতায় পাতায় মুক্তাগুলি ঝ'রুচে রে
হেমন্তের এই নিশীথ রাতের শেষে;
সুরগুলি তোর বিমান ভেদি' তার পায়ে কি প'ড়্‌চে রে
তার আঁখিজল তাই শিশিরের বেশে?

নয় কভু নয়—নয় কভু নয়—মিথ্যা মরীচিকা যে;
বেদরদী—দরদ কোথায় পাবে?
এই জীবনে এম্‌নি কোরে জ্বল্‌বে হোমের শিখা রে
ভাঙা সুরে গান গেয়ে দিন যাবে?
বাজিস্ না রে—বাজিস্ না রে,—স্তব্ধ যেন শবের প্রায়
গীত-হীনা তুই থাক্ রে প'ড়ে ভুঁয়ে,
আস্‌তে হবে—তুল্‌তে হবে—রাখ্‌তে হবে চরণ-ছায়
তবেই আবার বাজ্‌বি সে কর ছুঁয়ে।

বাকী-খাজ্‌না

শ্রীনির্ম্মল দেব

চন্দ্রবেড় মহলে খাজনা-পত্তর রীতিমত আদায় হইতেছে না। অকর্ম্মণ্য নায়েবটাকে আর রাখা চলে না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া জমীদারবাবু স্বয়ং সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

জমীদারবাবু থাকেন কলিকাতার বেলেঘাটায়। ধান-চালের কারবার, তেজারতি, জমী কেনা-বেচা এবং মোকদ্দমা সাজানো ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে বেশ দু'পয়সা করিয়াছেন। সময় তাঁহার একেবারেই নাই,—তবে কি না নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই রেল, নৌকা, পাল্কী চড়িয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সুন্দরবনের এই দুর্গম মহলে অসভ্য প্রজাদের মধ্যে তাঁহাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে,—এমন আল্‌গা দিলে যে প্রজাগুলা পাইয়া বসিবে, খাজনা বাকীই পড়িতে থাকিবে—আদায় আর হইবে না! জমীদারবাবুর বিশ্বাস প্রজা এবং স্ত্রী দুইই একজাতীয় জীব,—সর্ব্বদা রাশ টানিয়া না রাখিলে তাহাদের সাম্‌লানো যায় না!

সকাল-বেলায় কাছারী বসিয়াছে। শাদা ধব্‌ধবে ফরাসের উপর একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া স্থূল-দেহ জমীদারবাবু নিস্পৃহ ভাবে বসিয়া পার্শ্বের গড়গড়ার নলটা মুখে ঠেকাইয়া মধ্যে মধ্যে ধূম উদ্গারণ করিতেছেন। ফরাসের বাহিরে মেজেয় একখানা পটপটির মাদুর পাতিয়া একটা কাঠের বাক্সর উপরে খেরো বাঁধানো খাতা খুলিয়া নায়েব সিদ্ধেশ্বর সিক্‌দার গম্ভীর মুখে প্রভুর হুকুম-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে প্রাঙ্গণে পাইক, প্রজা ইত্যাদির দল যোড়-হস্তে কাঠের মূর্ত্তির মত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সকলেই ত্রস্ত, শঙ্কিত—নিঃশ্বাসটুকুও জোরে ফেলিতে কাহারও সাহস হইতেছে না!

দাওয়ার এক প্রান্তে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক একখানা ময়লা লাল-পাড় শাড়ীর অঞ্চলে গোটা কয়েক আকন্দ-ফুল লইয়া একখণ্ড শণের সুতায় একটা বাব্‌লা কাঁটা বাঁধিয়া মালা গাঁথিতেছিল। বয়স তাহার আন্দাজ করা কঠিন; কিন্তু চুলগুলি তাহার রুক্ষ বিপর্য্যস্ত এবং শুষ্ক চক্ষের দৃষ্টি যে তাহার কোন্‌খানে তাহা সে-ই জানে। চতুর্দ্দিকের থম্‌থমে আতঙ্কের কোনো চিহ্ন তাহার চোখে-মুখে হাবে-ভাবে ছিল না। এই নিঃশঙ্ক নারী-মূর্ত্তির পানে দৃষ্টি পড়িতেই জমীদারবাবু নায়েববাবুকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ও মাগীটা কে?"

নায়েববাবু মনে মনে প্রমাদ গণিয়া উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে ও দুখী পাগ্‌লী, রোজ সকালে এসে ওইখানে ব'সে থাকে, কাছারী ভাঙ্গ্‌লে চলে যায়।"

জমীদারবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"এখানে ওর কি দরকার?"

নায়েববাবু নম্র-কণ্ঠে কহিলেন—"হুজুর, ওকে তাড়িয়ে দিতে গেলে ও ভারী অনর্থ বাধায়। তা'-না-হ'লে সারা-ক্ষণ ওইখানেই চুপ ক'রে ব'সে থাকে, কিচ্ছু করে না,—কাছারী ভাঙ্গ্‌লে আপনিই উঠে চ'লে যায়। তাই আমরা ওকে ঘাঁটাই না।"

জমীদারবাবু আর অনাবশ্যক সময় নষ্ট না করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, ডাকো, কোন্ শালারা খাজনা দিচ্ছে না!"

প্রথমেই ডাক পড়িল গোবিন্দ মাইতির। অনাহার-ক্লিষ্ট, শুষ্ক, শীর্ণ দেহ লইয়া এক প্রৌঢ় কাঁপিতে কাঁপিতে যোড়-করে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জমীদারবাবু একবার অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত বাকী?"

নায়েববাবু খাতা দেখিয়া কহিলেন—"আসল—এগারো টাকা, সাত আনা, তিন পাই, সুদ—ন'টাকা, পাঁচ আনা, খরচা—পাঁচ টাকা, দু'আনা, মোট—পঁচিশ টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই।"

জমীদারবাবু কহিলেন—"জিজ্ঞাসা করো—কবে দেবে।"

গোবিন্দ কহিল—"ধর্ম্মাবতার, দেবার সামর্থ্য থাক্‌লে আপনাকে কষ্ট ক'রে ব'ল্‌তে হ'তো না। একটা মাত্তর মা-মরা মেয়ে আমার, চোখের সাম্‌নে তিন দিনের জ্বরে

ম'রে গেল,—পয়সার অভাবে এক ফোঁটা ওষুধও তা'কে দিতে পারলুম না!"

জমীদারবাবু ধমক দিয়া কহিলেন—"ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না! টাকা কবে দিবি বল্!"

গোবিন্দ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

জমীদারবাবু কহিলেন—"ধান সব কি ক'রেছিস্?"

আকাশের দিকে চাহিয়া গোবিন্দ কহিল—"হুজুর, ধর্ম্ম সাক্ষী—আট বিঘে ভুঁই চ'ষে মোটে সাড়ে তিন মণ ধান পেয়েছিলুম, ফুলোবার মুখে মাজরা লেগে সব ধান নষ্ট ক'রে দিয়েছে!"

জমীদারবাবু কহিলেন—"সে ধান কি হ'লো?"

গোবিন্দ কহিল—"হুজুর, দু'মণ কাছারীতে জমা দিয়েছি দেড় মণ আজ এই চার মাসে খেয়েছি!"

জমীদারবাবু কর্কশ-কণ্ঠে কহিলেন—"কেন খেলি?"

গোবিন্দ কাতর-স্বরে কহিল—"দেবতা, দেড়মণ ধান থেকে এক মণ চাল হ'য়েছিল, সেই চাল চার-মাসে এক-বেলা ক'রে খেয়েছি। না খেলে প্রাণে বাঁচবো কি ক'রে হুজুর!"

"শালা তোমায় প্রাণে বাঁচাচ্ছি!" এই বলিয়া পাশ হইতে সোণা-বাঁধানো শঙ্কর-মাছের চাবুকটা লইয়া পাইকের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া জমীদারবাবু কহিলেন—"দে শালার পিঠে ঘা-কতক! টাকা দেয় কি না দেখি!"

পাইক বড়লোক নয়, গরীব,—গোবিন্দের হাঁড়ির খবর সে জানে। তাই চাবুকটা সসম্ভ্রমে উঠাইয়া লইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

জমীদারবাবু হুঙ্কার ছাড়িলেন—"শূয়ার, হুকুম কাণে পৌঁছয় নি?"

পাইক চমকিয়া উঠিয়া সপাং-সপাং করিয়া চাবুকটা গোবিন্দর শীর্ণ দেহের উপর বসাইতে লাগিল, আর গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চাপিয়া, চোখ-দুইটা বুজিয়া শক্ত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

সহসা দাওয়ার কোণে দুখী পাগ্‌লী হা হা করিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। অকস্মাৎ তাহার এই হাস্যোচ্ছ্বাসে সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নায়েববাবু ধমক দিয়া উঠিলেন —"চুপ কর্, হেসে ম'রছিস কেন!"

নায়েবের ধমকে দুখী পাগ্‌লী কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তেমনি হাসিয়া লুটাপটি খাইতে খাইতে জমীদারবাবুর দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল—"নায়েববাবু, ও লোকটা পাগল!"

কাছারীশুদ্ধ লোকের দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল—জমীদার বাবুর মুখের উপরে তাঁহাকে পাগল বলে!! আজ কাহার মাথা যে কোথায় থাকিবে, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। নায়েব লাফাইয়া উঠিয়া চোখ রাঙাইয়া কহিলেন—"বেরো পাজী এখান থেকে! দূর হ'য়ে যা!—এই, দে মাগীকে লাঠি মেরে বার ক'রে!" পাইক, প্রজা, আমলা,—যে যেখানে ছিল হৈ হৈ করিয়া পাগ্‌লীর দিকে ছুটিল—সারা কাছারীময় একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড বাধিয়া গেল!

সহসা জমীদারবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া পাগ্‌লীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া মোলায়েম-কণ্ঠে কহিলেন—"হ্যাঁরে, আমায় পাগল ব'লছিস কেন রে?"

জমীদারবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া, তেমনি হাসিতে হাসিতে পাগ্‌লী কহিল—"তুমি তো পাগলই গো! তোমার এত টাকা, তবু টাকা টাকা ক'রছো,—এত টাকা নিয়ে ক'রবে কি!"

শোক-সংবাদ

৺আদীশ্বর ঘটক

১২৭১ সনে কলিকাতার দক্ষিণে চেৎলা নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যশোহর জেলার ঝাঁপা মশ্মিনগর গ্রামের শাস্ত্রজ্ঞ ৺শিবচন্দ্র ন্যায়রত্নের পৌত্র এবং ২৪ পরগণার খ্যাতনামা উকিল ৺কাশীশ্বর ঘটক মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বড় বড় ওস্তাদের নিকট হইতে সঙ্গীত, এবং পাখোয়াজ, তানপুরা, হারমণিয়ম, বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করেন এবং চিরকাল অবসর সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীতের চর্চ্চায় নিজের এবং শ্রোতাদের মন আমোদিত করিতেন।

৺আদীশ্বর ঘটক

এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলেজে পড়িতেছেন, তখন সাংসারিক কারণে তাঁহাকে কলেজের পড়া ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি ইংরাজী ভাষায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সমস্ত শাস্ত্র রীতিমত নিজের চেষ্টায় অধ্যয়ন করেন এবং সাত বৎসর চেৎলা, বেহালা, কালীঘাট ও ভবানীপুর অঞ্চলে সুখ্যাতির সহিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবসা করেন। সপ্তবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম-কালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া তিনি চিত্রকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। বাল্যকাল হইতে নিজের চেষ্টায়—বিনা গুরুর সাহায্যে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অল্পকালের মধ্যে তিনি সুযোগ্য চিত্রকর বলিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি লাভ করেন। কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের তিনি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন।

শৈশব কাল হইতেই ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। চাকুরী অথবা দাসত্ব-বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া যাহাতে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন তিনি বাঙ্গালা ভাষায় 'চিত্রবিদ্যা' নামক একখানি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। ফটোগ্রাফীও তিনি রীতিমত শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রণীত 'ফটোগ্রাফী-শিক্ষা' পাঠ

করিয়া অনেকেই ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। পাশ্চাত্য মেঘ-বিদ্যা (Meteorology) শিক্ষায় তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য এই উভয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের তিনি চর্চ্চা করিতেন। মেঘবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং রসায়ন সম্বন্ধে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত অনেক সাধনায় তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি কেবল ধর্ম্মকর্ম্মের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি যোগাদি সাধনায় নিজের স্বাস্থ্য অতি উত্তম রাখিয়াছিলেন। মাসাবধি তিনি যকৃতের ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। তৎপরে তিনি চার পুত্র, তিন কন্যা এবং পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া ৬২ বৎসর বয়সে সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রঘুপতি ঘটক এম-এ এক্ষণে ত্রিপুরা জেলার ইনকমট্যাক্স অফিসার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ইউনিভার্সিটি কলেজের এবং কনিষ্ঠ স্কুলের ছাত্র। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺জগদীশ্বর ঘটক একমাত্র নিজের চেষ্টায়—বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ধানভানা কল, জলের উপর দ্বিচক্রগাড়ী প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া সকল এক্জিবিশনে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পুত্রগণ এক্ষণে বেহালায় ঘটক কোম্পানি নামক কারখানায় ধানের কল, দেয়াশলাইয়ের কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন।

পরলোকগত স্বামী বেদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্থাপিত বৃন্দাবন সেবাশ্রমের পরিচালক স্বামী বেদানন্দ আর ইহজগতে নাই; বিগত ২৭শে অক্টোবর তারিখে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ত্যাগী কর্ম্মী ও বেদান্তে পণ্ডিত বলিয়াই যে স্বামী বেদানন্দের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, তাহা নহে; তিনি বাঙ্গালাদেশের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাকে আমরা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতাম, তাঁহার অতুলনীয় বিনয় ও মহত্ত্বের জন্য তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি স্বামী বেদানন্দ নামে পরিচিত হইলেও আমরা তাঁহাকে আমাদের গণ্ডী হইতে কোন দিন অব্যাহতি প্রদান করি নাই;—তাই আমরা তাঁহাকে আমাদের বড় আদরের প্রভাস মহারাজ নামে অভিহিত করিতাম। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই; যখন তখনই বাঙ্গালাদেশে আসিলে শরৎচন্দ্রের আবাসে কিছু দিন বাস করিতেন। সেই উপলক্ষেই আমরা প্রভাস মহারাজ বা স্বামী বেদানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রভাস মহারাজ যে এতবড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তিনি কখনও কাহাকেও জানিতে দেন নাই; আত্মগোপন করিয়া কার্য্য করাই তাঁহার প্রকৃতি ছিল। বৃন্দাবন সেবাশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। বৎসরাধিক কাল হইতে তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন, মধ্যে দুই একবার নিউমোনিয়াও হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার শরীর অতিশয় রুগ্ন হইয়াছিল। ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য শরৎচন্দ্রের পল্লী-নিবাসে আগমন করেন এবং সেইখানেই প্রিয়তম জ্যেষ্ঠভ্রাতার কোলে মাথা রাখিয়া এই কর্ম্মী মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৩৮ বৎসর হইয়াছিল। সোদরপ্রতিম প্রভাস মহারাজের অকাল-মৃত্যুতে আমরাই শোকাভিভূত, শ্রীমান্ শরৎচন্দ্রকে কি সান্ত্বনা দিব?

সাময়িকী

এই মাসের 'ভারতবর্ষে' যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, প্রাতঃস্মরণীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা হেয়ার স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেইখান হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গণিত বিদ্যায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পর বৎসরেই বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিনের জন্য বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ডি-এল্ উপাধি লাভ করেন। দুই বৎসর পরে ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইনি "হিন্দুগণের বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় আইন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাহার পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ীভাবে এবং পর বৎসর স্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এই পদ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। শিক্ষা বিষয়ে সার গুরুদাসের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিয়মিত দুই বৎসর কাল কার্য্য করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দুই বৎসরের জন্য ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সার গুরুদাস ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটি কমিসনের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ছাত্রমণ্ডলীর ইনি পরম হিতৈষী ছিলেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সার গুরুদাসের অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল; এ দেশের সমস্ত সাহিত্যিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ সার গুরুদাসের এই ছিল যে, তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু, তাঁহার ন্যায় দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজে দ্বিতীয় ছিল না বলিলেই হয়। বাঙ্গালা দেশের সকল সৎকার্য্যের, সদনুষ্ঠানের অগ্রণী ছিলেন ব্রাহ্মণ-কুলতিলক সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আজ 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে এই বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাপুরুষের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করিলাম।

এবারের সাময়িক প্রধান ব্যাপার হচ্চে ভোটের খেলা, যাকে আমাদের পরম পূজনীয়, হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু দাদামহাশয় 'বন্দে মাতনম্' নাম দিয়া একখানি হাস্য-রসোৎসব প্রহসন লিখিয়াছেন। বাস্তবিকই এমন যে মহাপূজা—দুর্গোৎসব, এমন যে লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, সে সব ঢাকিয়া দিয়াছে এই ভোট-মঙ্গল উৎসবে। সরকারের অপার অনুগ্রহে ঢাকের বাজনা বলিতে গেলে এক রকম বন্ধই হইয়া গিয়াছে,—এবার সেই ঢাক স্কন্ধে করিয়াছেন আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং তাঁহাদের এ কি দুর্ভোগ যে, যে স্থানে, পল্লীর যে প্রান্তে জন্মাবধি এতকালের মধ্যে তাঁহাদের পদধূ'ল পড়ে নাই, সেই সকল স্থানেই এই সকল ভোট-ভিখারীর দল ঢাক স্কন্ধে লইয়া পরিভ্রমণ করিতে-ছেন। আরও সুন্দর দৃশ্য এই যে, পূর্ব্বে যাঁহাদের গৃহদ্বারে দর্শনপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে সামান্য লোকদের দ্বারবানের মধুর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতে হইত, এবার সেই সকল রাম শ্যামের কুটীরেও সেই মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সহর গ্রাম পল্লী এই ভোট নিনাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আর, এই উপলক্ষে সত্য মিথ্যা, দ্বন্দ্ব কলহের যে বান ছুটিয়াছে, তাহার কাছে দামোদরের বন্যা কোথায় লাগে! এই সব দেখিয়া সেকালের কবির দলের লড়াই, সেকালের খেউড়ের কথা মনে পড়ে। তবে তাদের সঙ্গে এই ভোট লড়াইয়ের পার্থক্য এই যে, তাঁরা একেবারে 'মোটা' ধরিতেন, আমাদের এঁরা সেটাকে সভ্য ভাষার আবরণে প্রচার করিতেছেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত সত্যই বলিয়াছেন—

"এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা।" প্রথম যখন রেল খোলে, তখন একজন গ্রাম্য কবি গাহিয়াছিল 'কি কল বেনিয়েছে সাহেব কোম্পানী।' এই ভোট-রঙ্গ দেখিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করিতেছে 'কি কল বেনিয়েছে সাহেব কোম্পানী।' এই ভোট-ব্যাপার এখন এমন হইয়াছে যে, লোকে আত্মীয়তা-অন্তরঙ্গতা ভুলিয়া গিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের কুৎসা-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়াছে! আর, অর্থব্যয়ের কথা যদি বলেন মহাশয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভোট-প্রার্থীর তহবিলের সঠিক হিসাব না দিতে পারিলেও, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রত্যেক ভোট-ভিখারী এই উপলক্ষে যে অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহাতে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অসংখ্য গ্রামে অন্ততঃ একশতটী ইঁদারা খনিত হইতে পারিত। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত নিঃস্ব দেশে এ কি প্রহসনের অভিনয় হইতেছে, তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

এবারের এই ভোট-সংগ্রামে অতি অল্প কয়েকটী স্থানেই বিনা-যুদ্ধে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছে; অন্যান্য স্থানে তুমুল সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ফল দুই-চারিদিন পরেই প্রকাশিত হইবে। এবার দেখিতেছি, এই ভোটের ব্যাপারে নদীয়া, মেদিনীপুর, বরিশাল ও কলিকাতার অমুসলমান মহলেই বেশী যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে; চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এত জোরে ঢাক বাজিয়া উঠে নাই। এখন শুধু চারিদিকে ধ্বনি উঠিতেছে "কি হয় কি হয় রণে জয়-পরাজয়!" উত্তর কলিকাতায় রাজবন্দী শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর মধ্যে লড়াই। একজন সুদূর ব্রহ্মদেশে অন্তরীণে আবদ্ধ, তাঁর হইয়া একদল বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, আর এক দিকে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। দুই জনই দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ, দুই জনই সমাজে পদস্থ; দুই জনের পশ্চাতেই লোকবল অর্থবল আছে। ওদিকে দক্ষিণ কলিকাতায় দুই জন বড়-বড় উকীল দুই দিকে দণ্ডায়মান; কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট নহেন। একজন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, আর একজন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। তার পর, নদীয়ায় দুই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের লড়াই;—এক জন শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়, আর এক জন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়। বোধ হয় দুই পাল্লা সমান করিবার জন্য ভাদুড়ী মহাশয় এই ভোট-ব্যাপারে স্বরাজী দলে প্রবেশ পূর্ব্বক 'রায় বাহাদুরী'র মমতা ত্যাগ করিয়াছেন। এখন যা করেন নদীয়ার চাঁদ! মেদিনীপুরে একদিকে নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ, অপর দিকে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এখানেও তুমুল সংগ্রাম। ও-দিকে বরিশালে একপক্ষে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত, আর একদিকে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী। মান সম্ভ্রম, বিদ্যা বুদ্ধি, ও অর্থবলে এই দুই জনেই সমকক্ষ; কেহই রণে ভঙ্গ দিবার লোক নহেন! এ ছাড়া অন্যান্য স্থানেও যুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু তেমন জোরের নয়। নির্ব্বাচনে যাহা হইবার হইয়া গেলে, শেষে আছে বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে আনা-গোণা, ধরণা, তোষামোদ ইত্যাদি ইত্যাদি। সেও একটা দেখিবার মত ব্যাপার!

এই সু-সংস্কৃত মণ্টফোর্ড আইনে ভারতবর্ষে কেবল দুই জাতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—মুসলমান ও অ-মুসলমান। 'হিন্দুস্থানে' এখন হিন্দু নাই, আছে অ-মুসলমান। আর সেই জন্য এই ভোট ব্যাপারে মুসলমানের সহিত অ-মুসলমানের কোন সম্বন্ধ নাই, কোন প্রকার সংঘর্ষেরও সম্ভাবনা নাই; কারণ, মুসলমানেরা স্বজাতির ভোট-ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবেন, আর অ-মুসলমানেরা তাঁদের ভোটের লড়াই করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে যে প্রকার গভীর প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে যদি সরকার এই পার্থক্য সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে এখন যেমন মুখোমুখিতেই লড়াই শেষ হইতেছে, তাহা হইত না, হাতাহাতি লাঠালাঠি রক্তা-রক্তি যে হইত, তাহা এখনকার অবস্থা দেখিয়া কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই দুই জাতিকে ভোট-উপলক্ষে পৃথক করিয়া দেওয়ায় আমরা মনে করিয়াছিলাম, অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশের মুসলমানগণ এই ভোট-ব্যাপারে একযোগে কাজ করিবেন, কারণ, তাঁহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যথেষ্ট আছে। কিন্তু, ঐ যে 'কি কল্ বেনিয়েছে সাহেব কোম্পানী'। এমন যে জোট-বাঁধা মুসলমান-সমাজ, তাঁহাদের মধ্যেও দলাদলি হইয়াছে, দুইটী প্রবল দল হইয়াছে।

আমরা একটীকে স্যর রহিমী দল, আর একটীকে স্বাধীন দল নামে অভিহিত করিব। এই দুই দলেও বেশ লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে বাহির হইতে মনে করিতেন যে, স্যর আবদর রহিম বাহাদুর-ই বাঙ্গালার মুসলমান দলের অবিসম্বাদিত নেতা—একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু এই ভোট-ব্যাপারে স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ নহেন, তিনি চারি জনের এক জন; অর্থাৎ তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আরও তিন জন মহারথী দণ্ডায়মান, এবং তাঁহাদের কেহই বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিবেন না। ভোটের ব্যাপার শেষ হইলেই কিন্তু এ নাটকের যবনিকা-পতন হইবে না; তাহার পর মনোনয়ন আছে, মন্ত্রী নিয়োগ আছে, মান-অভিমান আছে, গমন ও নিষ্ক্রমণ আছে। সকলের শেষে আছে সংবাদ-পত্রের মারফত ঘরের কথা, পরের রহস্য প্রকাশ। সেগুলি যে পরম উপভোগ্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

আমাদের দেশের লোকের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের কথা যাঁহারা ভাবেন, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যবিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রতীকারের ব্যবস্থার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহাদের প্রচারিত বিবরণ-পত্রে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বহুদিন হইতে আমাদের দেশের লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন; তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। সম্প্রতি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বাঙ্গালীর খাদ্য' নামক একখানি অতি সুন্দর পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি বাঙ্গালীর খাদ্য, বিশেষতঃ ছাত্রগণের খাদ্য সম্বন্ধে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে যে যে কথা বলা দরকার, বিশেষতঃ 'ভাইটামিন' তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা এতদিনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা এই পুস্তকখানি পড়িবেন, তাঁহারাই উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক আলোচনার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা নিম্নে এই সুন্দর পুস্তিকা হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, অধ্যাপক চারুবাবু খাদ্য সম্বন্ধে একটা লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্যয়-সাপেক্ষ নহে, শুধু একটু চেষ্টা ও অনুধাবন-সাপেক্ষ।

পুস্তিকার শেষ ভাগে, অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর চারু বাবু বলিতেছেন—

"শেষ অবধি ব্যবস্থাটা মন্দ দাঁড়াইল না। ভাত কমাইয়া রুটীর বন্দোবস্ত কর, মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, দুধ এদের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াইয়া দাও,—সর খাও, মাখন খাও, টাটকা ফল খাও, রকমারি তরকারি খাও, জলখাবার খাও, সন্দেশ রসগোল্লা। এক পর্ণকুটীরবাসী থালা ঘটী বিক্রয় করিয়া রোগীর জন্য ডাক্তার আনিয়াছিল; ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন আল্‌মোড়ায় চেঞ্জ এবং প্রেস্‌ক্রিপসন্ করিলেন ২৭৲ টাকার দামের শিশির ট্যাবলেট্। খাদ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থাটা যে অনেকটা সেইরূপ দাঁড়াইল। যে দেশের সমস্ত লোক দুই বেলা দু' মুঠা ভাত পায় না, সে দেশের লোকের জন্য মাথা ঘামাইয়া এ সব ব্যবস্থা পত্র জারির করিয়া লাভ কি? আগে দেশের দারিদ্র্য ঘুচুক, আগে আটা চাল কিনিবার পয়সা জুটুক তাহার পর শুনা যাইবে রুটী খাইব কি ভাত খাইব। কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিবার মত নয়। কিন্তু অনেক সময় কেবল মাত্র আর্থিক অভাবে যে উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটে তাহা নয়। লাল চাল, যাঁতাভাঙ্গা আটা নিশ্চয়ই মাজা চাল এবং সাদা ময়দার অপেক্ষা সস্তা এবং সকাল বেলা টিনের দুধ ও চিনি দিয়া চা খাওয়া অপেক্ষা চারিটি ভিজা ছোলা ও একটু গুড় এবং একটু টাট্‌কা দুধে নিশ্চয়ই বেশী খরচ পড়ে না। আগেকার সে দিন চলিয়া যাইলেও আজও পল্লীগ্রামে শাকসবজীর দাম কম। অবশ্য দুধ, দই, মাখন, আজকাল অনেকটা দুর্ম্মূল্য, তবে ঘরে গরু পুষিবার সুবিধা থাকিলে দামটা অপেক্ষাকৃত কম হয়; বৈকালের জলখাবারে 'মিশ্রিত' ঘৃতে প্রস্তুত কচুরী গজার অপেক্ষা মুড়ি গুড় কড়াইভাজা নারিকেলে খরচাও কম বুকজ্বালাও কম, এবং সময়ের দু' একটা ফল—কলা, শশা, পেয়ারা, আঁব, জাম, জামরুল, পেঁপে, আনারস খুব বেশী দামী হয় না। মাছ, মাংসের পরিমাণ বাড়াইতে না পারিলেও ডাল দুধের মাত্রা বাড়াইয়া দিলে কাজ চলিয়া যায় এবং তজ্জন্য খরচ একটু বাড়ে বটে! রাত্রে ভাতের বদলে যাঁতাভাঙ্গা আটার রুটীর চলন করিলে খরচের বৃদ্ধি খুব বেশী হয় না।"

ছাত্রদিগের খাদ্য সম্বন্ধে চারুবাবু প্রত্যেক ছাত্র-নিবাসে একটা সমিতি গঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন

এবং ছাত্রদিগের খাদ্য-তালিকা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"প্রথমতঃ প্রাতে প্রত্যেক ছাত্রকে একটু করিয়া দুধ দিতে হইবে। এই কলিকাতা সহরে দুগ্ধ সমবায় সমিতি আছে; তাহাদের সহিত একটা বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। তাহাদের লোক ভোরে এই খাদ্য-সমিতির আপিস-গৃহে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুধ দিয়া গেল। আপিস-গৃহ মানে অবশ্য ৬০।৭০ টাকার ভাড়া করা ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান লাগ নঁ টেবিল চেয়ার মণ্ডিত ঘর নয়। কোন একটা ছাত্রাবাসের একটা নির্দ্দিষ্ট ঘরে বা এ বিষয়ে উৎসাহী স্থানীয় কোন ভদ্রমহোদয়ের বাটীতে এই ভাণ্ডার খোলা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যয় না হয়। এখন সমবায় সমিতির নিকট হইতে দুধ লইলে টাকায় ৩ সের তো বটেই, চাই কি আরো একটু বেশী পরিমাণে দুধ পাওয়া যাইতে পারে। এ দুধ অবশ্য খাঁটী দুধ—বাজারে যাহা টাকায় ২৷৷০ সেরের বেশী সচরাচর পাওয়া যায় না। এই দুধ একেবারে না ফুটাইয়া ৭০ ডিগ্রি অবধি উত্তপ্ত করায় কোন দুষ্ট জীবাণু ইহাতে থাকে না, পক্ষান্তরে খুব বেশী উত্তপ্ত না হওয়ায় ভাইটামিনগুলি পুরা মাত্রায় বজায় থাকে। এই দুধ এবং আগের দিনের ভিজান ছোলা বা অন্ত কড়াই চারিটী, দু' একখানা আদার কুচি, একটু লবণ, কয়েকখানা করিয়া বাতাশা যদি প্রতি ছাত্রকে দেওয়া যায় তো খরচ মোটেই বেশী পড়ে না তাহারা সাধারণত এখন যাহা খায় তাহার খরচের অপেক্ষায়। তাহার পর ৯৷৷০।১০টার সময়কার ভাত। আজকাল প্রায় প্রতি ছাত্রাবাসে একটা করিয়া মেস-কমিটি আছে। এই মেস-কমিটি সমবায় সমিতির সহিত একযোগে কাজ করিবে। প্রতি ছাত্রাবাসের মেস কমিটি তাহাদের মধ্যে একজন বা দুইজনকে পালা করিয়া বাজারে পাঠাইবে; তাহারা তরকারি কিনিবার সময় এটা লক্ষ্য রাখিবে যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ একঘেয়ে একরকম তরকারি না হয়। তরকারির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা উপযুক্ত পরিমাণ লবণ জাতীয় পদার্থ এবং কতকটা ভাইটামিন পাইব। আসল কথাটা এই কোন্ তরকারিতে কি ভাইটামিন কতটা পরিমাণে আছে আমাদের ঠিক জানা যায় নাই। সুতরাং সেই যে একজন লোক বলিয়াছিল সব দেবতাকে একটা করিয়া প্রণাম ঠুকিয়া রাখিয়াছি কি জানি পরকালে কোন দেবতা কাজে আসেন; হরেক রকম খাইয়া যাও যেটা যে ভাবে কাজে আসিয়া যায়। মেস-কমিটি দেখিবেন যে শুক্তানি, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, লাউয়ের ঘণ্ট, এঁচড়ের ডালনা, চড়চড়ি প্রভৃতি দু' একটা করিয়া রকমারি তরকারি রোজই হয়। তাহার পর প্রোটিনের মাত্রাটা যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে। ডালটা নানা রকমে খুব বেশী পরিমাণে চালান চাই। দু বেলা ডাল তো চাই - বেশ একটু ঘন ডাল, তাহা ছাড়া বড়ি বড়া, ধোকা, পাঁপর ভাজা, ব্যাসম প্রভৃতির চলন বেশী পরিমাণে করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে খিচুড়ির আয়োজন করিতে হইবে। কলিকাতায় লাল কুড়া মাখানো চাউল একরকম দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং বাহির হইতে এই লাল চাউল আমদানি করিতে হইবে। আটা ভাঙ্গাইয়া আনিয়া এক বেলা ভাতের বদলে এই লাল আটার রুটী চালাইতে হইবে। এ কথাট, একেবারে ঠিক যে ১৬ বৎসর ধরিয়া যে বাড়ীতে দুই বেলা ভাত খাইয়া অভ্যস্ত হঠাৎ তাহার জন্য একবেলা লাল আটার রুটী, ঘন ডাল, মধ্যে মধ্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করিলে তাহার উদরাময় দেখা দিবে। খাদ্য তালিকার পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। এক বেলা রুটী না সয় আচ্ছা পুরা রুটীর বদলে ভাতের সঙ্গে একখানা, দুই খানা করিয়া রুটী চালাইতে আরম্ভ করা হউক, তাহার পর দেখা যাইবে যে 'শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।' এইবার মাছ মাংসের কথা। এখানে অবশ্য দরাজ ফরমাজ করিলে চলিবে না—কারণ ইহা অর্থ-সাপেক্ষ বিশেষ এই কলিকাতা সহরে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে মাছ মাংস অপেক্ষা অধিকতর সারবান খাদ্য পাওয়া যায় যদি ডিমটা ভাল করিয়া ব্যবহার করা যায়। অবশ্য রুচি বা ধর্ম্মের দিক দিয়া কাহারো আপত্তি থাকে সে কথা পৃথক। আর চেষ্টা করিতে হইবে ভাতের সঙ্গে বা পৃথক ভাবে একটু করিয়া মাখন দিতে। আর রোজ সম্ভব না হইলেও অন্তত সপ্তাহে দু' এক দিন একটু করিয়া দই দিতে হইবে।"

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

রসসাগর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নূতন ভোটরঙ্গ দ্বন্দ্বে মাতরম্—।৵০

জ্যোতিঃ বাচস্পতি প্রণীত মাস ফল—১৲

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রণীত নীলাচল—১৲

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদার প্রণীত দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্যজাতি—১৷০

ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা—২৲

ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ—১।০

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার শীল লিখিত যৌবনের ডাক—১।৵০

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ প্রণীত কমলাক্ষী—১।০

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মুক্তার আলো—২৲।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত তত্ত্বভরা বা শ্রীমদ বিজয়কৃষ্ণের উপদেশ বাণী—২৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত,—সাহেব বর্গী ও রূপসীর ফাঁদ—প্রত্যেকখানি—৸০।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক প্রণীত ব্রজবিপঞ্চী—১৲, অতসী ১৲।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—৸০।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাণিকণ্ঠ প্রণীত শ্যামসুন্দর—১৲।

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী প্রণীত স্নেহময়ী—১৲।

শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ প্রণীত বিপ্লবের পথে—১।০।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত মারাঠী মেয়ে—১৲।

শ্রীযুক্ত যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সতীলক্ষ্মী—১৲।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.